মাসিক বসুমতী

১৩শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৪১ সাল—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩শ বর্ষ] ১৩৪১ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

কবিতা—

সাময়িক প্রসঙ্গ— (বর্ণানুক্রমিক)

বৈদেশিক প্রসঙ্গ — (বর্ণানুক্রমিক)

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্র — শিল্পী — পৃষ্ঠা

সুরঞ্জিত চিত্র ঃ—

দেবদেবীর চিত্র ঃ—

দেশনায়কগণের চিত্র ঃ—

বৈদেশিক নায়ক-চিত্র ঃ—

বিশিষ্টগণের চিত্র ঃ—

ভারতীয় মহিলাগণ ঃ—

বিভিন্নদেশের নর-নারী—

রেখা-চিত্র ঃ—

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক সূচী

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায়।

সচিত্র মাসিক

বসুমতী
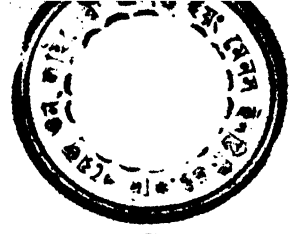
১৩ বর্ষ]   কার্ত্তিক, ১৩৪১   [১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট দক্ষিণেশ্বরের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (ক্যাপ্টেন) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্র তানপুরা সংযোগে গান আরম্ভ করিলেন। দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া মধুর কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল,—

আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইতিমধ্যে আপনাকে ভুলিয়া "প্রেমানন্দে মগন" হইয়াছেন। সমস্ত দেহ স্থির—"চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।" নরেন্দ্র গান শেষ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—তখনও সমাধি অবস্থার অন্তরের প্রসন্নতা বাহিরের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট। শ্রীবুদ্ধের ন্যায় ঠাকুরও তখন,—

বসেছেন পদ্মাসনে · প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ-মূরতি,
দৃষ্টি হ'তে শান্তি ঝরে · স্ফুরিছে অধর'পরে
করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতিঃ।

আর একবার চারিদিকে তাকাইয়া কাহাকে যেন সন্ধান করিলেন, এক ঘর লোক, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হইল না। নরেন্দ্র নাই, তানপুরাটি পড়িয়া আছে। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন,—

"আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাক্‌লো আর গেল।" *

নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সে দিন যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে পরমহংসদেবের সম্বন্ধেই সেই কথাগুলি আমাদের মনে উদিত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারিরূপে রাণী রাসমণির ঘনবনাকীর্ণ দক্ষিণেশ্বরে দেবীর পূজারী হইয়া অখ্যাত ও অজ্ঞাত জীবন যাপন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহার সে দিনের সেই ক্ষীণ দীপরেখা সমগ্র ভারতবর্ষে কি আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে—তাহা অনুভব করিবার দিন আজ আমাদের উপস্থিত হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের এই দুর্দ্দিনে আজ তাঁহার বাণী স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যে উদার ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহাকে কোন ধর্ম্ম কখনও নিন্দা করিতে দেয় নাই, যিনি ধর্ম্মমতকে কখনও ঈশ্বরের অধিক করিয়া দেখেন নাই, যিনি অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—যে কেহই হউক না কেন, আন্তরিক ভক্তি থাকিলে ভগবান্‌কে পাইবেই, সেই সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমের পুরোহিতকে ভাল করিয়া চিনিবার ও জানিবার প্রয়োজন স্বধর্ম্মহীন, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষে আজিকার মত আর কোনও দিন হয় নাই। আমরা আগ্রহের সহিত নেপোলিয়নের জীবন-চরিত পাঠ করি—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক জগতে এই অতিমানুষের আবির্ভাব সত্য সত্যই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। অজ্ঞাত ও অখ্যাত আইন-ব্যবসায়ীর পুত্রের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শত সহস্র লোক আনন্দচিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, সমস্ত য়ুরোপ ত্রস্ত ও কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্রীড়নকের ন্যায় রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, ইহা পিনাকপাণির প্রলয়-নাচনের ন্যায় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। কিন্তু নিঃসম্বল, নিরক্ষর, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, স্বজনহীন ও সহায়হীন হইয়াও কিরূপে ধীরে ধীরে আত্মার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া সমগ্র জগৎকে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করিয়াছেন, তাহা নেপোলিয়নের জীবন-কাহিনীর অপেক্ষাও শতগুণে আরও শিক্ষাপ্রদ ও বিস্ময়কর। ফরাসীবিপ্লবের স্রোত নেপোলিয়নকে জোর করিয়া ভাসাইয়া লইয়া সিংহাসনের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে জগতে পরিচিত করিবার জন্য কোনও বাহিরের অবস্থাই অনুকূল ছিল না, কোনও অদ্ভুত ঘটনাও সংঘটিত হয় নাই। তাই দেখিতে পাই যে, তাঁহার দেহত্যাগের পর আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরেও সেই আত্মার জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া কোথাও দরিদ্র ছাত্রগণের সুশিক্ষার বিধান করিয়া প্রাণে ধর্ম্মের শান্তি আনিয়া দিতেছে, কোথাও বা মাতৃ-পিতৃ-হীন শিশু-সন্তানগুলিকে জননীর ন্যায় লালনপালন করিতেছে, কোথাও বা শুদ্ধচিত্ত যুবকগণকে আত্মোৎসর্গে নিয়োজিত করিয়া কাঙ্গালের
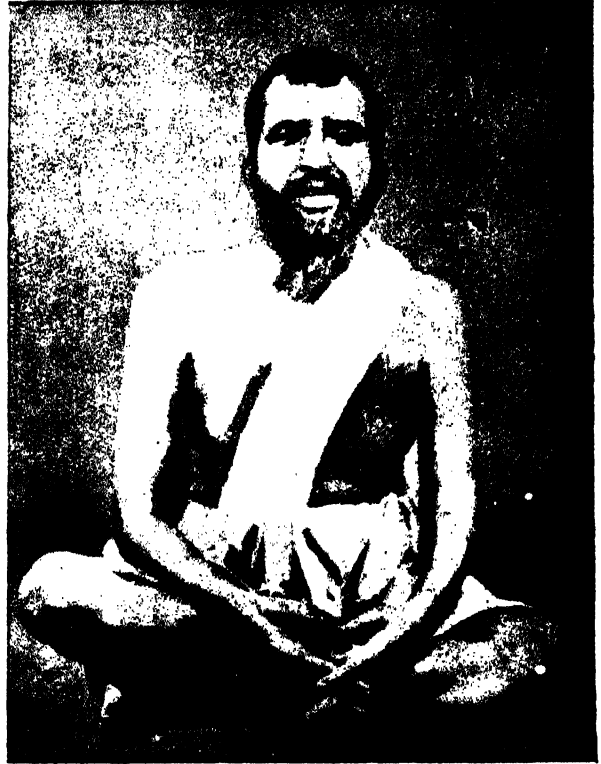
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দুঃখ দূর করিয়া দেশে নূতন প্রাণের সৃষ্টি করিতেছে। ঠাকুরের সম্বন্ধে আজ বারংবার সেই কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে—

"আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাক্‌লো আর গেল।"

ধর্ম্মজীবনে মহীয়ান্ ঋষিগণের জীবন-কাহিনী বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কর্ম্মজীবনে যাঁহারা মহান্, বাহিরে তাঁহাদের জীবনের একটা প্রকাশ আছে, যাহার দ্বারা তাঁহাদের মহত্ব উপলব্ধি করা অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, এব্রাহাম লিনকল্‌ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণের জীবন কর্ম্মের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং জগতের ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সকলের সম্মুখে দেখান যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মজীবনে যাঁহারা গরীয়ান্, সেই মহাপুরুষগণের জীবন তাঁহাদের অন্তরের মধ্যেই প্রকাশিত এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে যে ভাগ্যবান্ ভক্তগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরের দীপ্তিতেই সেই জ্যোতির উৎসের সম্যক্ পরিস্ফুরণ। অন্তর্নিহিত নিগূঢ় শান্তি ও ভাস্বরতায় তাঁহাদের উপলব্ধি। সুতরাং জীবন-চরিত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা আজ পর্য্যন্ত কোনও ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের কেহই লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের কথাগুলি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে গেলে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই হয় না, নিজের জীবনে তাহাদের উপলব্ধি করিতে হয়। কর্ম্মজীবনের সত্য অনুভূতিগুলি বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের অনুভূত সত্য কেবলমাত্র জীবন দিয়াই উপলব্ধি করিতে হয়, নতুবা তাহারা প্রাণহীন অক্ষরসমষ্টিই থাকিয়া যায়, জ্বলন্ত সত্য-রূপে কখনও প্রতিভাত হয় না। এই দুঃখেই এক দিন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে দেহত্যাগের ঠিক পাঁচ মাস পূর্ব্বে কঠিন রোগভোগের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"কারেই বা বোল্‌বো, কে-ই বা বুঝবে!" ঐহিক জীবনের সায়াহ্নে সেই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত এই সহজ কথাগুলির মধ্যে কি গভীর আত্মবেদনা ও জগতের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নিহিত ছিল, তাহা কোন ভাষাই সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। সেই দিন নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি তাঁহার প্রাণকল্প শিষ্যগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তথাপি এই করুণ আক্ষেপ প্রকাশ।

নরেন্দ্রনাথ

কিন্তু যে ভাগ্যবান্ ভক্তবৃন্দ সেই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট তিনি নিজের অনুভূতিগুলি যে ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই বিবৃতি অনুধাবন করিলে বিস্ময় ও আনন্দরসে মন আপ্লুত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ও তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তি ও উজ্জ্বলতার উৎস তাঁহার জগৎজননীর দর্শন ও সেই জগন্মাতার বাণী শ্রবণ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রেল দেহত্যাগের প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে এক দিন কাশীপুরের বাগানে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন, নরেন্দ্র পদসেবা করিতেছেন, মণি পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর মণির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন। স্থিরনেত্রে পাখাটির দিকে তাকাইয়া আছেন, যেন কিছু বলিবেন; ভক্তরা উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ঠাকুর কি বলেন। ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—

"এই পাখা যেমন দেখছি—সাম্‌নে, প্রত্যক্ষ—ঠিক অম্‌নি আমি ঈশ্বরকে দেখছি। *

আর এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কথা কয়েছে—শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে।" *

এরূপ বিস্ময়কর সত্য প্রত্যক্ষ এরূপ দৃঢ়ভাবে আর একবার এই ভারতের কোন্ তপোবনে মেঘমন্দ্রস্বরে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছিল—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

জগতের আর কোথাও কোনও মহাপুরুষ এই অমৃতময়বাণী এত সুস্পষ্ট ও হৃদয়স্পর্শীরূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। উপনিষদ্‌কার যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

এবং ইংরাজপণ্ডিত যাঁহাকে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পাইতে যাইয়া তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) বলিয়া হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, 'সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে' দেখিবার ও তাঁহার সহিত কথা কহিবার সৌভাগ্য জগতে আজ পর্য্যন্ত অধিকসংখ্যক মহাপুরুষের হয় নাই। সেই কথাই এক দিন শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা
ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং
দৃষ্টবানসি মাং যথা॥

মথুরমোহন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত শক্তি ও জ্ঞানের উৎস এই ভগবদ্দর্শনের পর হইতে আরম্ভ। এই ঈশ্বরদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং তাঁহার সমস্ত বাণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অমোঘ ও অমৃতময়ী বাণী—

"এই পাখা যেমন দেখ্‌ছি—সাম্‌নে, প্রত্যক্ষ—ঠিক্ অম্‌নি আমি ঈশ্বরকে দেখছি!"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে রাণী রাসমণির সেজ জামাতা মথুর বাবুর কথাই আমাদের
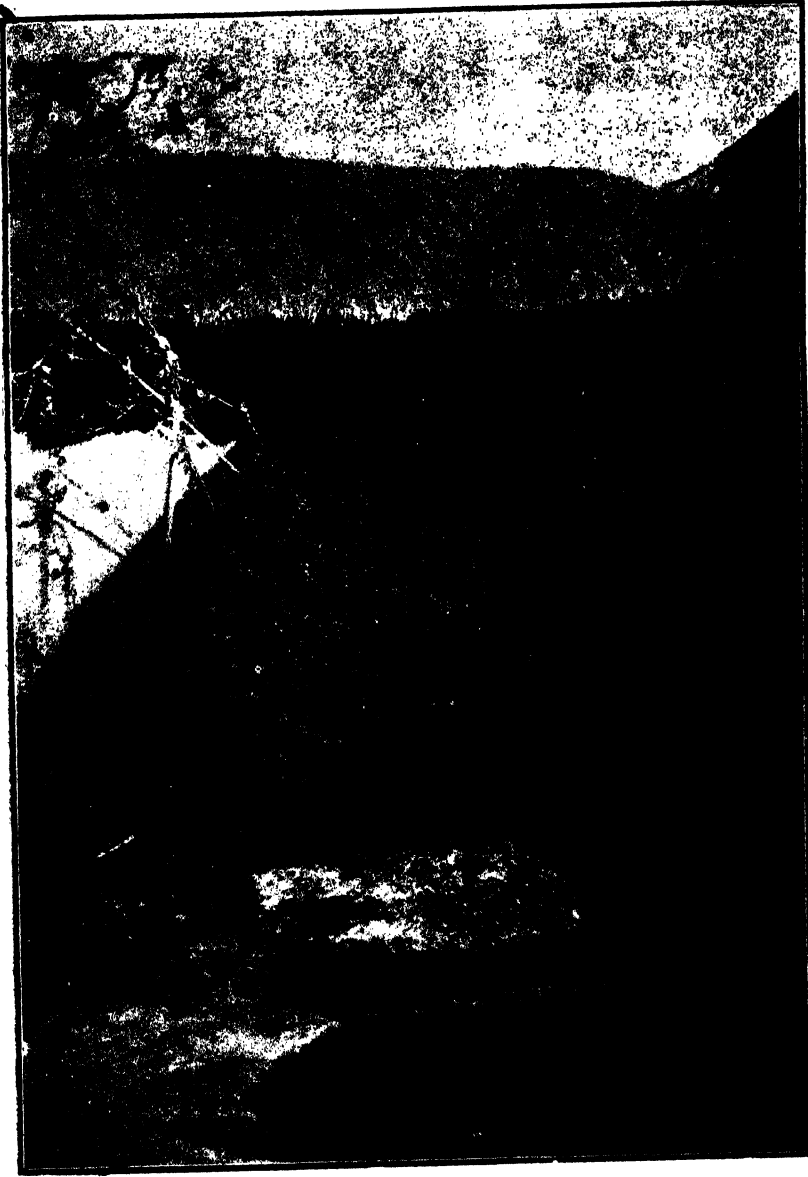
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

কামারপুকুর—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান

ঠাকুরের সহিত তাঁহার কি বিচিত্র সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্ব্বের দুই একটি ঘটনা আমরা ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করিব।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই ফাল্গুন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলার কামারপুকুর নামে একটি গণ্ডগ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কুলদেবতা রঘুবীরের পূজার জন্য ফুল তুলিতে যত উৎসাহ দেখা যাইত, পড়াশুনায় তাহার কিছুই পরিদৃষ্ট হইত না। ঠাকুর বলিতেন, বাল্যকালে শুভঙ্করী তাঁহার ধাঁধাঁ লাগিত, কিন্তু পাঠশালার পড়াশুনার ভিতর কোন্ বিষয় যে তাঁহার ধাঁধাঁ লাগিত না, তাহা বলা বড় কঠিন। ইংরাজী শিখেন নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যও জানিতেন না, অঙ্ক দেখিলে ভয় পাইতেন। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। মহাপ্রভু শাস্ত্রাম্বুধি পার হইয়া পণ্ডিতের চূড়ামণি বলিয়া জগতে পরিগণিত হইয়াছিলেন, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের দর্প তাঁহার নিজ অস্ত্র অধীতশাস্ত্রবিদ্যার দ্বারাই চূর্ণ করিয়াছিলেন, ন্যায়ের টীকা লিখিয়া মহামহিম পণ্ডিতাগ্রগণ্যকে ভীত ও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন।

মনে পড়ে। ইনিই ঠাকুরের প্রথম ভক্ত ও সেবক। যখন দক্ষিণেশ্বর নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ প্রভৃতি কাহাকেও চিনিত না, সেই সময় এই ভক্তচূড়ামণি স্বীয় অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তিপ্রভাবে তাঁহার বেতনভোগী পুরোহিতের বাহিরের দীনতা ভেদ করিয়া তাঁহার মহান্ আত্মার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দের অগ্রে ইঁহারই নাম উল্লেখযোগ্য।

পরমহংসদেব প্রায়ই বলিতেন, "আমি মুখ্যু", কখনও কখনও কৌতুক করিয়া শাস্ত্রাধ্যায়ী বিদ্বান্ শিষ্যমণ্ডলীকে বলিতেন, "আমি মূর্খোত্তম"। কিন্তু উপনিষদের মৈত্রেয়ী যেমন শাস্ত্রজ্ঞান পরিহার করিয়াও একটি সরল কষ্টিপাথরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অসার বস্তু ত্যাগ করিয়া অমৃতকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরমহংসদেবও তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" উপলব্ধি করিয়া, শাস্ত্রের অমীমাংসিত, বহু জল্পনা-কল্পনাধূমায়িত, বক্র ও দীর্ঘ পথ ত্যাগ করিয়া জীবনের প্রভাতেই সহজ ও সরল ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বয়স যখন প্রায় ১৭ বৎসর, সেই সময় তিনি কলিকাতায় আসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার তাঁহার পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া একটি চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন। ঠাকুর কলিকাতায় ঝামাপুকুরে থাকিয়া দেবসেবা করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। এ দিকে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মে পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামকুমার এই মন্দিরের প্রথম পূজারী নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এ দিকে কলিকাতার মরুভূমির মধ্যে ঠাকুর কোথাও প্রাণ দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী জননীকে তখনও খুঁজিয়া পান নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার দক্ষিণেশ্বর আসার কয়েক দিনের পর হইতেই ঠাকুরকেও সেখানে আসিয়া বাস করিতে হইল। পুরোহিত রামকুমার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ঠাকুর মথুরবাবুর অনুরোধে শ্রীশ্রীভবতারিণীর বেশবিন্যাস করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার ও তৎপরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; রাণী রাসমণি মধ্যে মধ্যে আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে নারীর স্থান যত উচ্চে, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের এই 'অশিক্ষিতা' মাতৃজাতি লোকচক্ষুর অন্তরালে ধর্ম্মপ্রাণতার স্তন্যরস দিয়া কত মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবন গঠন ও পরিপোষণ করিয়া

শ্রীশ্রীভবতারিণী
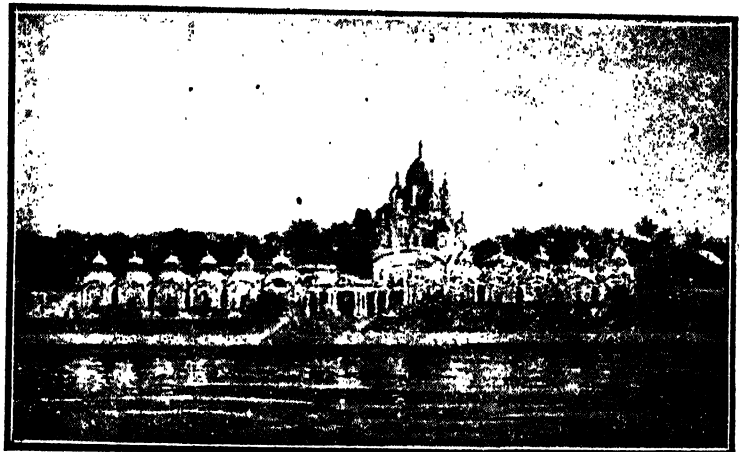
দক্ষিণেশ্বর—গঙ্গাবক্ষ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপীঠ

গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আমাদের দেশে আজিও অজ্ঞাত। রাণী রাসমণি মন্দির-স্থাপনের পর মাত্র ৬ বৎসরকাল জীবিতা ছিলেন—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। রাণী রাসমণি তখন কয়েক দিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর-বাড়ীতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। এক দিন তিনি শুদ্ধাচারে আসনে উপবেশন করিয়া দেবীর চিন্তা করিতে করিতে ঠাকুরকে শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনেকেই তখন চারিদিকে উপস্থিত। ঠাকুর গান গাহিতে গাহিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ তাঁহাকে মৃদু আঘাত করিয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর দেখিলেন, রাণী ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত, পার্থিব বস্তুর চিন্তায় নিরত। ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রভুস্থানীয়া, সর্ব্বজনমান্যা রাণী রাসমণিকে সকলের সম্মুখেই আঘাত ও তিরস্কার করিলেন। উপস্থিত সকলেই যুবক পুরোহিতের ধৃষ্টতা দেখিয়া যুগপৎ বিরক্ত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু সেই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী তিরস্কৃতা হইয়া কিশোরী বালিকার ন্যায় লজ্জিতা হইলেন, স্থির ও নম্রভাবে সেই আঘাত ও তিরস্কার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং বুঝিলেন, জননী ভবতারিণীই ঠাকুরের মুখ দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। কত বিশাল হৃদয় হইলে তবে নিজ বেতনভোগী পুরোহিতের নিকট হইতে এই তাচ্ছীল্য ও সর্ব্বজন-সমক্ষে অপমান অবিকৃতচিত্তে সহ্য করা যায়। যেমন পুরোহিত—তেমনই তাঁহার নিয়োগকারিণী রাণী রাসমণি! পূজারী ও মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার ভিতর এরূপ মধুর সম্বন্ধ বাঙ্গালা দেশের আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।
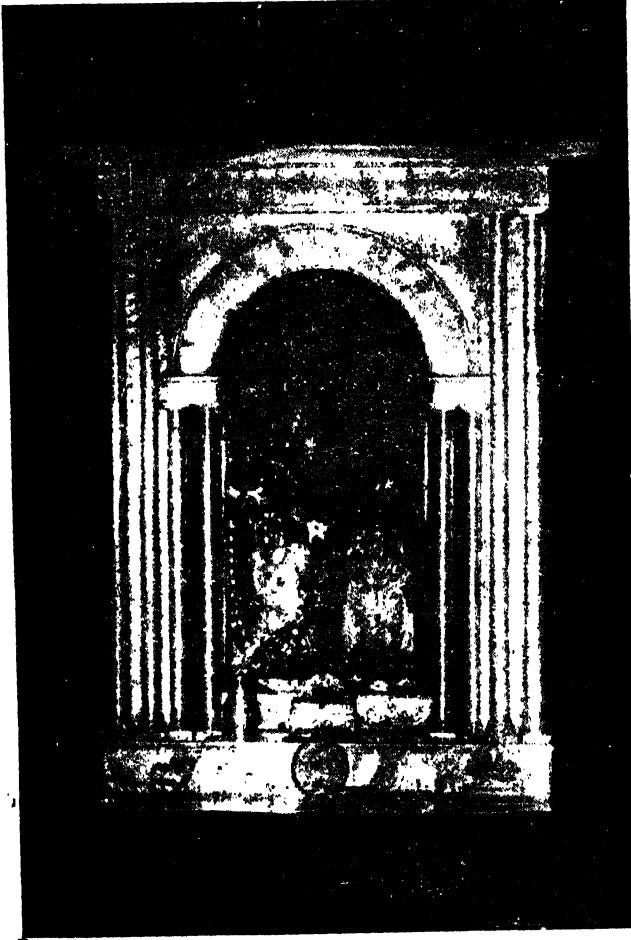
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজী

এ দিকে মন্দিরময় মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। কর্ম্মচারিবৃন্দ প্রভুভক্তি-দর্শনের পরাকাষ্ঠা করিয়া তুলিল। কিন্তু যিনি এই কোলাহলের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই ঠাকুরের প্রশান্ত মূর্ত্তি—অধরে মৃদু মৃদু হাসি। কত লোক ত কতবার বিষয়চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু তিনি "যাও মন্দির দেখ গে, এখানে ব'সে থেকে কি হবে" ইহার অধিক আর কিছুই বলেন নাই। কিন্তু রাণী রাসমণির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অন্যরূপ ছিল, সংসারচিন্তানিমগ্না এই মহীয়সী রমণীকে

জাগ্রত করিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি ভাব হইতে তিনি সর্ব্বজনসমাদৃতা বর্ষীয়সী এই রমণীর অঙ্গে আঘাত ও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বহুবর্ষ পরের একটি কথা হইতে উপলব্ধি করা যায়। সে দিন তিনি কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার তাঁহার চিকিৎসার জন্য তখন উপস্থিত। কথায় কথায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ করতে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কটকেনা করতে হবে।

"বৈদ্য তিনপ্রকার;—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা ব'লে চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়, মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে, ঔষধ না খেলে কেমন ক'রে ভাল হবে, লক্ষীটি, খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও', সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনমতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

"বৈদ্যের মত আচার্য্য তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লন না, তিনি অধম আচার্য্য। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান, তিনি মধ্যম আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনমতে শুনছে না দেখে কোন আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁকে বলি উত্তম আচার্য্য।" *

ধর্ম্মোপদেষ্টা সম্বন্ধে ঠাকুরের এই অভিমত হইতে রাণী রাসমণির প্রতি তাঁহার সেই বহু বর্ষ পূর্ব্বের অপূর্ব্ব ব্যবহার আমরা বিশদভাবে বুঝিতে পারি।

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই ত পুরস্কার।

এ আঘাত ও তিরস্কার কয় জনের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে!

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

* শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

কুসুমায়ুধা

নিরালা পল্লীর পথ গন্ধে ভরা বন-তুলসীর,
চারিদিকে লতা-গুল্ম রহিয়াছে কেলিকুঞ্জবন,
কেকা ভেসে আসে কাণে, সিক্তবায়ু বহে অতি ধীর,
তরুণী শ্যামলী তন্বী অকস্মাৎ হরি নিল মন।

প্রথম চাহিল, দুটি আধফোটা 'অরবিন্দ' যেন,
আবার চাহিল; একি! অনুরাগে হয়েছে 'অশোক;'
চাহিল আবার ফিরি, ফাগুনের 'চুত'-পুঞ্জ হেন,
মনোজের তিন শর বিদারিল দূর অন্তর্লোক।

'অচ্ছোদ' সরসে পশি বারি দিয়া ভরিয়া গাগরি,
কক্ষে ধরি যক্ষবালা নৃত্যপরা বিজয়িনী সমা,
হানিল আবার বাণ, আকুঞ্চিয়া ভুরূ-ধনু ধরি,
স্বচক্ষে হেরিনু আমি 'নোমালিআ' পুষ্প মনোরমা।

শেষ বিদায়ের বাঁকে পুন দিঠি করিনু চয়ন,
আসন্ন বিচ্ছেদ স্মরি 'নীলোৎপল' হয়েছে নয়ন।

শ্রীগোপাললাল দে (বি, এ)।

নাগিনী

১

আমার বাসস্থান ইটালী দেশে। পিতার একমাত্র সন্তান, বাল্যকালেই মাতৃবিয়োগ হয়। আমার বয়স যখন কুড়ি বৎসর, সেই সময় পিতারও মৃত্যু হইল। তিনি প্রভূত সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, উত্তরাধিকারী আমি একা। লেখাপড়া অল্প-স্বল্প শিখিয়াছিলাম, ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে পারিতাম, ইংরাজীও মোটামুটি বলিতে পারিতাম।

পিতার উইলে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বন্ধু সমস্ত সম্পত্তি দেখিবেন, আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন, আমাকেও দেখিবেন। আমার একুশ বৎসর বয়স হইলে আমাকে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিয়া তিনি ট্রষ্টীর পদ পরিত্যাগ করিবেন।

আমার ইয়ার মোসাহেব জুটিয়াছিল বিস্তর, কিন্তু ট্রষ্টী সকল দিকে নজর রাখিতেন, আমাকে অপব্যয় করিতে দিতেন না ; কাহারা আমার কাছে আসে যায়, তাহার খবর রাখিতেন। কাযেই আমাকে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইত। আমোদ-প্রমোদ একটু-আধটু করিতাম—অত্যন্ত গোপনে। বন্ধুদের সকল সময়ে আসিতে নিষেধ করিতাম, বলিতাম, একটা বছর সাবধানে কাটানো যাক, তার পর ত বুড়ো ট্রষ্টী স'রে যাবে, তখন প্রাণ ভ'রে সদরে স্ফূর্ত্তি করা যাবে।

ছয় মাসের পর ট্রষ্টী আমাকে বলিলেন, তোমার বাপ তোমার জন্য অনেক বিষয় রেখে গিয়েছেন, আর আমার তত্ত্বাবধানে টাকা আরও বেড়ে যাচ্ছে। টাকার লোভে অনেকে তোমার কাছে জুটবে, টাকা নষ্ট করবার অনেক রকম প্রলোভন দেখাবে। আমার বিবেচনায় তোমার কালবিলম্ব না ক'রে বিবাহ করা উচিত, তা হ'লে অনেক প্রলোভন নিষ্ফল হবে। তুমি বলতে পার, এত অল্পবয়সে বিয়ে কেন ? তোমার বাবা থাকলে আরও কিছুদিন পরে তোমার বিয়ে করলে ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু তিনি নেই, আমিও মাস কতক পরে তোমার বিষয়-সম্পত্তি দেখা ছেড়ে দেব, এই বেলা তুমি সংসারী হও, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হই।

ভাল বিপদে পড়িলাম। একে ত বুড়ার জন্য ভয়ে ভয়ে থাকিতেই হয়, তাহার উপর সে মরিবার আগে আমার গলায় জগদ্দল পাথর ঝুলাইয়া দিতে চায়। বিবাহ হইলেই ত আমোদ-আহ্লাদ সব ফুরাইল, বাঁধা গরুর মতন গোয়ালে থাকিতে হইবে। অথচ বুড়াকে স্পষ্ট জবাবও দেওয়া যায় না। আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, বিয়ের জন্য কি বিশেষ তাড়া আছে ? আরও কিছুদিন যাক না।

—সে তোমার পক্ষে নয়। তুমি যত শীঘ্র বিবাহ কর, ততই মঙ্গল।

—বেশ ত, আপনি যেমন আদেশ করবেন, তাই হবে।

—সেই কথা ভাল। আমি ভাল ঘরে মেয়ে দেখছি দুটি তিনটি, তার পর তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তোমার যাকে পছন্দ হয়, তাকে বিয়ে করো।

—যে আজ্ঞা।

বৃদ্ধ ট্রষ্টী খুব খুসী হইয়া বিদায় হইলেন। বন্ধুদের সহিত দেখা হইলে আমার আশু বিপদের কথা বলিলাম। তাহারা বিমর্ষ হইয়া বলিল, তবেই হয়েছে। এ হাতীর গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা। তখন আমরা কল্কে পাব না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমি চট ক'রে ধরা দেব না, সে ভয় নেই। বুড়ো কি করে, দেখা যাক না, ফাঁদ পাতলেই ত আর তাতে পা পড়ে না ? ছটা মাস বই ত নয়, কোন রকম ক'রে ফাঁড়া কেটে যাবে। কত টাল যায়, এটা আর যাবে না ? বুড়ো দেখুক না কনের বাজার, মাল কেনবার বেলা ত আমি।

২

দিন দশেকের মধ্যে ট্রষ্টী আসিয়া আমাকে বলিলেন, চল আমার সঙ্গে, এক যায়গায় যেতে হবে।

—কোথায় ?

—সে কথা ত আমি তোমাকে ব'লে রেখেছি। বেশ ভাল ঘরের মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।

ট্রষ্টী নিজের মোটরে করিয়া আমাকে একটা বড় বাড়ীতে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি, বৈঠকখানায়

তিন ব্যক্তি বসিয়া। বাড়ীর কর্ত্তা, তাঁহার স্ত্রী আর অষ্টাদশবর্ষীয়া এক কন্যা। কন্যা সুন্দরী হইতে পারে, কিন্তু সুন্দরী অসুন্দরীর কথা আমি ভাবিতেছিলাম না। আমার পায় যাহাতে শৃঙ্খল বদ্ধ না হয়, আমার একমাত্র সেই চেষ্টা। ট্রষ্টীর সঙ্গে কর্ত্তা-গৃহিণীর পূর্ব্বেই কিছু কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে ; কেন না, আলাপ-পরিচয়ের কিছুক্ষণ পরে কর্ত্তা কন্যাকে বলিলেন, তুমি এঁকে ছবি-ঘরে ছবি দেখিয়ে নিয়ে এস। তার পর চা খাবেন।

কন্যা উঠিল। আমি তাহার সঙ্গে ছবির ঘরে গেলাম। দেয়ালে চারিদিকে ছবি, বসিবার জন্য ঘরে স্থানে স্থানে সোফা আর চেয়ার। কন্যা আমাকে ছবি দেখাইতে আরম্ভ করিল। ছবি দেখা সমাপ্ত হইলে বলিল, এখন বৈঠকখানায় যাবেন, না একটু বসবেন?

—বেশ ত, একটু বসা যাক।

আমি একটা সোফায় বসিলাম। কন্যাও সেই সোফায় একটু দূরে বসিল।

আমি বলিলাম, আমাদের আজ এই প্রথম দেখা। এখন যদি তোমাকে কোন গোপনীয় কথা বলি, তা হ'লে তুমি আশ্চর্য্য হবে, হয় ত বিরক্ত হবে। কিন্তু দোষের কোন কথা নয়। তুমি যদি কাউকে না বল, তা হ'লে তোমাকে বলি।

কন্যা বিস্মিত হইয়া কহিল, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে। এইমাত্র ত আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল, এরি মধ্যে কি গোপনীয় কথা হ'তে পারে?

—কোন দোষের কথা নয়, কোন অন্যায় কথাও নয়। কথাটা আমাদের দু'জনের সম্বন্ধে। কি কথা আমি জানি, তুমি জান না, কিন্তু তোমার জানা উচিত। তুমি যদি আর কারুর কাছে প্রকাশ না কর, তা হ'লে বলতে পারি।

—দোষের কথা না হ'লে আমি কাউকে বলব না। আপনি বলুন।

—আজ আমি আসবার আগে আমার কথা কারুর কাছে শুনেছিলে? ঐ যে বুড়া মানুষটি আমাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, উনি এর আগে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, এসেছিলেন। উনি চ'লে যাবার পর মা আমাকে আপনার নাম বলেছিলেন আর বলেছিলেন, আপনি মস্ত ধনী, বাপের অনেক টাকা পেয়েছেন।

—তা হ'লে কথাটা বুঝতে পারলে?

—কি কথা?

—এই দেখ, আজ তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, এরি মধ্যে আমাদের দু'জনকে আলাদা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—যাতে আমরা নির্জ্জনে কথা কইতে পারি। এখন কিছু বুঝতে পারছ?

কন্যার চক্ষু নত হইল, কপোল ও ললাটে লালিমা দেখা দিল। মৃদুস্বরে কহিল, কিছু বুঝতে পারচি।

সে সময় তাহাকে যথার্থ সুন্দরী দেখাইতেছিল, কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রতি আমার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। আমার কেবল চেষ্টা, যাহাতে ফাঁদে পা না পড়ে।

বলিলাম, ওই যে বুড়ো মানুষটি, উনি আমার ট্রাষ্টী। উনি ঠিক করেছেন রাতারাতি আমার বিয়ে দেবেন। তোমার বাপ-মায়ের সঙ্গেও কিছু কথা হয়ে থাকবে। আমাদের দুজনের যদি পরস্পরের প্রতি টান হয়, সে আলাদা কথা, কিন্তু এ রকম ধ'রে বেঁধে বিয়ে দেওয়া কেন?

কন্যা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বলিল, আমি প্রাণান্তে কখন এ বিয়ে করব না।

এবার তাহাকে আরও সুন্দরী দেখাইতে লাগিল, লজ্জিত, গর্ব্বিত, দৃপ্ত লাবণ্য-প্রতিমা! আমি কেবল দেখিতেছিলাম, ফাঁদ সরিয়া যাইতেছে, আমার আবদ্ধ হইবার আশঙ্কা কমিয়া যাইতেছে। আমিও উঠিলাম, বলিলাম, তুমি আমার উপর রাগ কর নি ত?

—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। যা আমাকে বললেন, তা আমি প্রকাশ করব না। বিয়ের প্রস্তাব হলেই অস্বীকার করব।

—আর একটি অনুরোধ। এখন আমাদের পরস্পরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলে ওঁরা কিছু সন্দেহ করতে পারেন। অন্ততঃ ওঁদের সাক্ষাতে আমাদের সদ্ভাব থাকা উচিত। বিয়ের প্রস্তাব ত আর আজই হচ্ছে না। আর আমি নির্দ্দোষ, সে কথা ভুলে যেও না।

কন্যার ললাট-আকাশ হইতে মেঘবিদ্যুৎ অন্তর্হিত হইল, গণ্ডস্থলের লোহিত আভা তিরোহিত হইল, নয়নে কৌতুক-তরঙ্গ দেখা দিল। কহিল, আপনি আমার বড় উপকার করেছেন, আমার মনে থাকবে। আমাদের দুজনের কোন দোষ নেই, অপরাধী—যাঁরা আমাদের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ

নিজেদের মনের মতন স্থির করতে চেয়েছেন। আপনি আমার সুহৃৎ, তবে—

—তার বেশী কিছু নয়।

বলিয়া আমি কন্যার হস্ত ধারণ করিলাম। কোমল, উষ্ণ কর, আমার হস্তের ভিতর কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার হস্ত হইতে আমার হস্তে, সর্ব্বাঙ্গে, হৃদয়ে তড়িৎ-প্রবাহ প্রধাবিত হইল, কিন্তু আমি কেবল ভাবিতেছিলাম, এইবার ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইলাম।

অদৃশ্য ভবিতব্য-দেবতা পাশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন, তাহা কেমন করিয়া জানিব?

কন্যা হস্ত মুক্ত করিবার প্রয়াস করিল না। দরজার নিকটে আসিয়া তাহার হস্ত ত্যাগ করিলাম।

বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া চা পান করিয়া কিছু কথাবার্ত্তার পর বিদায় হইলাম। মোটরে ট্রষ্টী জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়ে কেমন দেখিলে?

—বেশ ভাল।

—উহাকে বিবাহ করিতে কোন আপত্তি আছে?

—কিছু না।

—তা হ'লে আর কোন মেয়ে দেখবার আবশ্যক নেই?

—কিছুমাত্র না।

কন্যার নাম বিয়াত্রিচে। আমার ক্রমাগত মনে পড়িতে লাগিল।

তাহার পর সর্ব্বদাই বিয়াত্রিচের সঙ্গে দেখা হয়। কখন আহারে নিমন্ত্রণ, কখন ট্রষ্টী সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, কখন ভ্রমণ, কখন বসিয়া গল্প করা। বিয়াত্রিচে উত্তম গান গাহিত, মাতার অনুরোধে বাজনা বাজাইয়া গান করিত। সে সময়ও আমার চিত্তের চাঞ্চল্য হইত, কিন্তু আমার একমাত্র সঙ্কল্প ট্রষ্টীকে বঞ্চিত করিব, অবন্ধনে আনন্দ করিব। আর বিয়াত্রিচের সহিত বিবাহের কথা ত কখন মনেই হইত না। সে পথে ত আমি নিজে কাঁটা দিয়া রাখিয়াছি।

এক মাস অতীত হইলে ট্রষ্টী আমাকে বলিলেন, তুমি আর বিলম্ব করছ কেন? বিবাহের প্রস্তাব কর, কন্যার সম্মতি হইলেই বিবাহ হইবে। তার বাপ-মায়ের সম্মতি আছে, আমি জানি।

আমি বলিলাম, আমাদের আলাপ অল্পদিনের, কন্যার মনোভাব এখনো বুঝতে পারিনি। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা আবশ্যক।

ট্রষ্টী বলিলেন, মিছামিছি সময় নষ্ট করছ কেন? তুমি কন্যাকে ব'লে দেখ, তার কোন আপত্তি হবে না।

বিয়াত্রিচেকে আমি এ কথা বলিলাম। সে বলিল, এত তাড়া কিসের? আপনি যদি বিয়ের কথা বলেন, তা হ'লে আমি অস্বীকার করব। তার পর আমাদের দেখাশোনা বন্ধ হয়ে যাবে।

আমার কিঞ্চিৎ কৌতূহল হইল। বলিলাম, তা হ'লে কি তুমি দুঃখিত হবে? যদি এ রকম পীড়াপীড়ি না হ'ত, আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে বিয়ে করতে চাইতাম, তা হ'লে কি তুমি অস্বীকার করতে?

বিয়াত্রিচে কুণ্ঠিতা হইল। বলিল, সে আলাদা কথা। সে কথায় কায কি?

আমি বাড়ী ফিরিয়া একটা কৌশল করিলাম। বলিলাম, আমার শরীর অসুস্থ, চলাফেরা করতে আমার কষ্ট হয়।

শুনিয়া ট্রষ্টী তাড়াতাড়ি আমাকে দেখিতে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে?

আমি শয্যাশায়ী। বলিলাম, আমার মাথা ঘোরে। উঠে দাঁড়ালে সব অন্ধকার দেখি।

নাড়ী টিপিয়া কিংবা শরীর পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার কিছুই স্থির করিতে পারে না। মাথা ঘোরে আমার, ডাক্তার তাহার কি বুঝিবে? ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ঔষধ দিয়া গেল। নিয়মিত ঔষধ-সেবনের পরিবর্ত্তে আমি নিয়মিত ঔষধ ফেলিয়া দিতাম। ট্রষ্টী আসিলে আমি বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া থাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম, এখনো বিশেষ কিছু উপকার বুঝতে পারছিনে। ট্রষ্টী বিদায় হইলে দিব্য বাড়ীর ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতাম, বন্ধুদের সঙ্গে হাস্য-কৌতুক করিতাম।

অবশেষে ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন, বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সুইজারলণ্ডে হ্রদের ধারে এক মাস বাস, নৌকায় ভ্রমণ, মুক্ত বায়ু সেবন। এক মাস দেড় মাস এইরূপে থাকিতে হইবে। ট্রষ্টীর অনিচ্ছা থাকিলেও তিনি

কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। আমার আনন্দের সীমা রহিল না।

হ্রদের উপকূলে এক মাস, দেড় মাস, দুই মাস অতিবাহিত হইল। ট্রষ্টীকে লিখিতাম, এখানে উপকার মনে হইতেছে, আরও কিছুদিন থাকিলে সুস্থ হইয়া উঠিব।

তিনি আর কি বলিবেন? আমার বাড়ী ফিরিতে আড়াই মাস হইয়া গেল। সবশুদ্ধ চারি মাস কাটিয়া গিয়াছে। ট্রষ্টীর মিয়াদ আর দুই মাস। আমি ফিরিয়া আসিলে ট্রষ্টী বলিলেন, আর বিলম্বে চলিবে না। তুমি বিবাহের প্রস্তাব কর।

আমি নিতান্ত ভাল মানুষের মতন স্বীকৃত হইলাম। বিয়াত্রিচের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার না কি অসুখ করেছিল, শরীর সারতে গিয়েছিলেন?

আমি হাসিমুখে বলিলাম, আপনি বলা ছাড়। অনেক দিন ত হ'ল, তুমি বলা কি চলে না?

—বেশ, তাই। তোমার কি হয়েছিল?

—কিছুই হয়নি। ট্রষ্টী মশায়ের চোখে খানিক ধূলা দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে ঘাড় চেপে ধরেছিলেন, কিন্তু এবার আর এড়াতে পারব না। বিয়ের প্রস্তাব করতে এসেছি।

বিয়াত্রিচে একটি ছোট নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, কিন্তু আমি কিছুই লক্ষ্য করিলাম না। সে বলিল, আমাকে অস্বীকার করতে হবে ত?

—সেই কথা ত আমাদের ঠিক আছে?

—ভাল, তুমি প্রস্তাব কর।

আমি যথানিয়মে বিয়াত্রিচের সম্মুখে জানু পাতিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাতে অধরোষ্ঠ স্পর্শ করিলাম। বিয়াত্রিচের হস্ত থর থর কম্পিত হইতেছিল।

আমি বলিলাম, দেখ, বিয়াত্রিচে, আমি তোমাকে ভালবাসি। শুধু আমি তোমার পদতলে নহি, আমার সম্পত্তি, আমার মনপ্রাণ সমস্ত তোমাকে অর্পণ করছি। তুমি আমাকে বিবাহ কর।

কয়েক মুহূর্ত্ত বিয়াত্রিচে কোন কথা কহিল না। তাহার পর বলিল, তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ, এ কারণে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

কথা কহিতে বিয়াত্রিচের সহসা স্বরভঙ্গ হইল কেন? তাহার দুই চক্ষু আর্দ্র হইল কেন?

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, হয় ত কিছুদিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে না, কিন্তু আমাদের মনান্তর হবার কোন কারণ হয় নি। তুমি আমাকে বন্ধুভাবে মনে রেখো।

রুদ্ধ কণ্ঠে বিয়াত্রিচে বলিল, রাখব। তুমি এখন যাও।

আমি চলিয়া আসিলাম। যদি অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া দেখিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, বিয়াত্রিচে বসিয়া নিঃশব্দে আকুল চিত্তে রোদন করিতেছে।

ট্রষ্টীকে বলিলাম, বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, বিয়াত্রিচে অস্বীকার করেছে।

—বল কি? এমন হতেই পারে না।

—আপনি গিয়ে সহজেই জানতে পারেন।

ট্রষ্টী তখনই চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বিয়াত্রিচের বাপ-মা রেগে অস্থির, ওদিকে মেয়ে একেবারে বেঁকে বসেচে। আমি ভাবতাম, তোমার সঙ্গে বেশ সদ্ভাব। এ রকম করলে কেন?

বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অবকাশ আমিই বা ছাড়ি কেন? বলিলাম, স্ত্রীলোকের মন কে বুঝতে পারে?

ট্রষ্টী বলিলেন, যাক গে, আমি আর এক যায়গায় দেখছি।

আমি বলিলাম, মশায়, বিয়াত্রিচে আমাকে প্রত্যাখ্যান করাতে আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। আমাকে একটু সামলাতে দিন। আর বিয়ে ত বাজারে মাল খরিদ নয় যে, এক দোকান ছেড়ে অন্য দোকানে যাব? চাহিদা আর জোগানের নিয়ম কি সব তাতে চলে?

ট্রষ্টী নিরুত্তর হইলেন। যে দিন ছয় মাস পূর্ণ হইল, তিনি আমাকে হিসাবপত্র সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। ব্যাঙ্কের খাতা, দলিল-পত্র রসীদ দিলেন। বলিলেন, ব্যাঙ্কে উইলের নকল রাখা আছে, তুমি লিখলেই তারা নতুন চেক-বুক পাঠিয়ে দেবে আর তোমার সহি নিয়ে রাখবে।

ব্যাঙ্কের খাতা খুলিয়া দেখিলাম, অনেক টাকা জমা আছে।

ট্রষ্টী বলিলেন, যদি আবশ্যক মনে কর, তা হ'লে যে কোন বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতে পার। তোমার টাকার

লোভে অনেকে জুটবে, সাবধান থেকো। এখন তুমি কি করবে?

—আপাততঃ দেশ-ভ্রমণে যাব।

আমি স্বাধীন এবং পৈতৃক সম্পত্তি আমার হস্তগত হইয়াছে জানিয়া, মধুভাণ্ড দেখিয়া যেরূপ মক্ষিকাকুল আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ বন্ধু মোসাহেবের দল আমাকে ঘিরিল। তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা একটা বড় রকম কাপ্তেন ধরিয়াছে। আমি ট্রষ্টীর শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি, নিজের কৌশলে উদ্বাহ-বন্ধন এড়াইয়াছি, এখন কেন না প্রাণ ভরিয়া কিছুদিন কাপ্তেনী করিব? তাহারা সকলে মিলিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিল।

এক জন বলিল, ভায়া, এখন আর কিসের ভাবনা? দুশো মজা কর। নতুন থিয়েটারে একজন নর্ত্তকী এসেছে, দেখেছ? অমন রূপসী আর একটি মেলা ভার। তুমি এক কথা বললেই তাকে নিয়ে আসি।

আর এক জন বলিল, খাবার বন্দোবস্ত কর গায়োভিনীর হোটেলে। অমন রান্না কোথাও পাবে না, ওর মতন মদও কেউ রাখে না।

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আর গান যদি শুনতে হয়, তা হ'লে লিয়োনোরার। আদেলিনা পাত্রীর পর আর অমন গায়িকা হয় নি। আর কি রূপ! একেবারে ভরা জোয়ার!

টাকা হাতে পাইয়া আমার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইয়াছিল। নিজে আমোদের জন্য অর্থব্যয় করিতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না, কিন্তু কতকগুলা জোঁক নিজের গায়ে বসাইব কেন? আমি ধীরভাবে বলিলাম, তোমাদের যার যা মনে আসছে তাই বলছ, আমারও যে কিছু বলবার থাকতে পারে, তা ভাবছ না। তোমরা যে সব কথা বললে, সে সব এখন কিছুই হবে না। আমি দু'চার দিনের মধ্যেই দেশ বেড়াতে যাব।

তাহারা আসিয়াছিল বুক দশ হাত হইয়া, আমার কথায় দমিয়া গেল। দুই এক জন বলিল, এরি মধ্যে কেন? কিছুদিন স্ফূর্ত্তি কর, তার পর না হয় যেও।

সকলে হাল ছাড়িয়া দেয় নাই, ডুবু ডুবু আশা-তরণীকে ভাসাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, যদি নিতান্তই যাও, তা হ'লে ত আর একা যাবে না? তাতে কি আমোদ হবে? আমরাও তোমার সঙ্গে যেতে রাজি।

—আমি একা যাব, চাকর পর্য্যন্ত সঙ্গে নেব না।

—কোথায় যাবে?

—তাও কিছু ঠিক করিনি। কোথায় যাব, কাউকে ব'লে যাব না।

এক জন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, অজ্ঞাতবাস?

—কতকটা তাই।

মধুপাত্র শূন্য দেখিয়া বিমর্ষ মক্ষিকাদল উড়িয়া গেল।

তাহার পরদিবসই আমি যাত্রা করিলাম। কোথায় যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলি নাই। আমার ইচ্ছা, ইস্তাম্বোল নগর দেখিব। এত দিন গল্পই শুনিয়াছিলাম, এইবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটাইব। সে নগরে রহস্যের একটা আবরণ আছে, তিরস্করণী অপসারিত করিয়া দেখিব, তাহার পশ্চাতে কি আছে। আমাদের দেশে কিংবা এ অঞ্চলে পর্দ্দা নাই, স্ত্রীলোকরা পুরুষের মত ঘুরিয়া বেড়ায়, কৌতূহলের কোন অবকাশ নাই। ইয়শমক আর বুর্কা পরিধান করিলে স্ত্রীলোককে কেমন দেখায়? তুরকী রমণীরা সুন্দরী, কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে তাহারা সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখে, তাহাতে কল্পনা ও কৌতূহল উত্তেজিত হয়। দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

ইস্তাম্বোলে উপনীত হইয়া আমি একটা বড় বাড়ী ভাড়া করিলাম। ভৃত্য, পাচক নিযুক্ত করিলাম। ভাল দরজি ডাকাইয়া তুরকী পোষাক তৈয়ার করাইলাম। শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তুরকী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। যাহাকে প্রধান ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে আমাকে এক দিন বলিল, বাড়ীতে দাসী নেই, আপনার মতন ধনীর বাড়ীতে দাসী থাকা আবশ্যক।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, আমি একা পুরুষমানুষ, দাসীর কি প্রয়োজন?

—সহরের এই প্রথা। দাসীরা উত্তম পাচিকা হয়, অন্য কর্ম্মও পরিষ্কার করিয়া করে।

—তবে এক জন দেখ। কিন্তু যুবতী দাসী রাখিব না।

মনে হইল, ভৃত্যের মুখে অল্প হাসি দেখা দিল; কিন্তু

আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, যুবতী নয়, বর্ষীয়সী। আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।

দাসী আসিল। বয়স হইয়াছে, কিন্তু এককালে যে সুন্দরী ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কথাবার্ত্তা বেশ, আদব-কায়দা দোরস্ত। আমি তাহাকে নিযুক্ত করিলাম।

সে রাত্রিতে দাসী পাক করিল। তোফা পাকপ্রণালী, পোলাও চমৎকার, নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছে। দাসী পরিবেষণ করিতেছিল। আহার সমাপ্ত হইলে বলিলাম, তোমার রান্না খুব চমৎকার। খেয়ে আমার তৃপ্তি হয়েছে।

দাসী বলিল, সাহেব, আমি আরও অনেক রকম রাঁধতে জানি। আপনি এখানে নতুন এসেছেন, কিছু দেখাশোনাও ত চাই।

তাহার কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম।

৫

দেখাশোনা যে আমার কিছু হয় নাই, তাহা নয়। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় নগরে ভ্রমণ করিতাম। ইয়শমক দ্বারা আবৃতমুখ অথবা বুর্কাপরিহিত স্ত্রীলোকদিগকে পথে দেখিতে পাইতাম। ইয়শমকে মুখের অর্দ্ধাংশ আবৃত, কিন্তু ওষ্ঠাধর ও চিবুক দেখা যাইত। কাহারও চিবুক সুগঠিত, ওষ্ঠাধর প্রফুল্ল গোলাপের ন্যায়, কিন্তু পূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিতে না পাইলে সৌন্দর্য্যের কল্পনা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। বুর্কায় আপাদমস্তক আবৃত থাকিলে অবয়ব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। আমি কল্পনা করিতাম, কোন শুভক্ষণে কোন সুন্দরী আমার প্রতি সুনয়নে দৃষ্টিপাত করিবে, তাহার পর পরিচয়ের কোনরূপ সুযোগ হইবে।

কিছু দিন এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে আমি লক্ষ্য করিলাম, একটি রমণী সর্ব্বদাই পথে যাতায়াত করে। মুখে ইয়াশমক, বুর্কা পরিধান করে না। ইয়শমকের ছিদ্র দিয়া বিশাল, উজ্জ্বল, কৃষ্ণতার চক্ষু দেখিতে পাইতাম। ফুল্ল ওষ্ঠাধর কোমল, আর্দ্র, লোহিতাভ, চিবুক সুন্দর। তরঙ্গায়িত দেহযষ্টি, মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য হিল্লোলিত হইতেছে। কয়েক দিন তাহাকে দেখিয়া, সাহস করিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিলাম। চোখে চোখে মিলিল। রমণী আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইল না, চক্ষু অবনত করিল না। সকৌতুক দৃষ্টিতে আমাকে চাহিয়া দেখিল, অধরপ্রান্ত সস্মিত হইল।

রমণী চঞ্চল গতিতে গমন করিতেছিল, এখন মৃদু-পদক্ষেপে চলিতে লাগিল। আমি কিছু দূর পশ্চাৎ হইতে তাহার অনুসরণ করিলাম। বুঝিতে পারিলাম, ইহাতে তাহার বিরক্তি হইল না। কিছু দূর গিয়া একটা গলির ভিতর অপেক্ষাকৃত একটি বৃহৎ গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পূর্ব্বে পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাকে চাহিয়া দেখিল।

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। দ্বারের নিকটে না দাঁড়াইয়া গলির অপর পার্শ্বে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ক্ষণকাল পরে গলির উপরে একটি দ্বিতল কক্ষের বাতায়ন মুক্ত হইল। বাতায়নের অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া সেই রমণী। মুখের ইয়শমক মোচন করিয়াছে, নয়নে কুটিল তরল দৃষ্টি, অধরে মৃদু-মন্দ মধুর হাসি। সে রূপ দেখিয়া আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, নির্নিমেষ-নয়নে গবাক্ষপটে সে অতুলনীয় মুখশ্রী দেখিতে লাগিলাম।

দুই হস্ত বাহির করিয়া রমণী ঊর্দ্ধে চাহিয়া আমাকে দশটি চম্পক অঙ্গুলি দেখাইল। মস্তক ঈষৎ হেলাইল। তাহার পর ধীরে ধীরে, কটাক্ষে আহ্বান করিয়া, গবাক্ষ রুদ্ধ করিল।

আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পথে কোথায় পদক্ষেপ করিতেছিলাম, লক্ষ্য করি নাই, মনে হইতেছিল, শূন্যপথে যাইতেছি। সমস্ত পথে রমণীর সঙ্কেত মনে পড়িতেছিল। সে আমাকে রাত্রি দশটার সময় যাইতে ইঙ্গিত করিয়াছে।

তখন সন্ধ্যা। বাড়ীতে ফিরিয়া আরসীতে মুখ দেখিলাম। সমস্তই সুপুরুষের লক্ষণ। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত মার্জ্জিত সুগন্ধিত কেশের নীচে প্রশস্ত, নির্ম্মল ললাটচ্ছবি, নিবিড় ভ্রূযুগলের তলে দীর্ঘপক্ষ্ম, আয়ত লোচন, উন্নত, সরল নাসা, পূর্ণ ওষ্ঠাধর, নবীন কোমল গুম্ফের রেখা। সুগোল, দৃঢ় চিবুক, মধ্যস্থলে বিভক্ত।

অঙ্গের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, বক্ষ প্রশস্ত, পীনকণ্ঠ স্কন্ধ, বাহুর মাংসপেশী কঠিন, করতল কোমল ও লোহিতবর্ণ। রমণী-মনোমোহন কান্ত মূর্ত্তি।

অন্য দিন রাত্রি নয়টার পর আহার করিতাম, আজ আদেশ করিলাম, আটটার সময় আহার করিব। এই স্বল্পকাল কিছুতেই কাটিতেছিল না। সাজ-সজ্জার শেষ হয়

না। কত রকম বেশ দেখি, কোনটাই মনোনীত হয় না। চুল কত রকম করিয়া আঁচড়াইলাম, গন্ধসামগ্রী কি ব্যবহার করিব স্থির করিতে পারি না, পাদুকা বাছিতেই কত সময় লাগিল। আটটা বাজিবার পূর্ব্বেই নটবরবেশে সজ্জিত হইলাম।

আহারের সময় কিছুই খাইতে পারিলাম না। দাসী লক্ষ্য করিয়া আমার বেশভূষা দেখিতেছিল। আহারে আমার রুচি নাই দেখিয়া বলিল, আগা, আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না।

আমি বলিলাম, আজ তেমন ক্ষুধা নেই। আমাকে এক যায়গায় এখনি যেতে হবে।

তা ত দেখতেই পাচ্চি। আমি একটা কথা বলি, আপনি রাগ করবেন না। কোন সুন্দরী আপনার চোখে পড়েছে, আপনি তার কাছে যাচ্ছেন। তাতে কোন দোষ নেই। আপনি নবীন যুবা, ধনী, আমোদ-আহ্লাদ করবারই কথা। কিন্তু আপনি বিদেশী আর ইস্তামবোল সহর বড় কঠিন স্থান। বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। তাই জেনেই আমি আপনার কাছে কায করছি আমি সব জানি, সকলকে চিনি। আমাকে আপনি স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পারেন।

একবার মনে হইল, তাহাকে সব বলি, কিন্তু বলিবই বা কি? যে সুন্দরী আমাকে অভিসার-সঙ্কেত করিয়াছিল, সে কে, কিছুই জানি না, গলির নাম জানি না। আরও ভাবিলাম, এ রকম আলাপে রহস্যই প্রধান আকর্ষণ। মাঝে দূতী থাকিলে নূতন আর কি হইল? আমি কথা খুলিলাম না। দাসীকে কিছু রুষ্টভাবে বলিলাম, তুমি নিজের কায কর, আমি কি করি না করি, সে খোঁজে তোমার কায নেই।

দাসী আর কিছু বলিল না।

নয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে যথেষ্ট টাকা ও বহুমূল্য মুক্তার হার লইলাম। একখানা গাড়ী করিয়া সেই গলির নিকটে গিয়া দেখি, ঘড়ীতে সবে নয়টা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে। এতক্ষণ বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে পথের লোক কিছু মনে করিতে পারে। গাড়োয়ানকে বলিলাম, আরও খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াও।

—কোথায় যাইব?

—যেখানে ইচ্ছা। আধ ঘণ্টা পরে এখানে ফিরে আসবে।

গাড়োয়ান এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরিয়া দশটা বাজিবার মিনিট পাঁচেক পূর্ব্বে সেই স্থানে ফিরিয়া আসিল—গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাকে ভাড়া দিলাম। তাহার ন্যায্য প্রাপ্যের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী। সে দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, পাশা, গাড়ী হাজির রাখব?

আমি বলিলাম, না, তুমি যাও, গাড়ীর আবশ্যক নাই।

আমার দ্রুত পদোন্নতি হইতেছিল। ছিলাম সাহেব, তাহার পর আগা, এখন পাশা। সুলতান হওয়া বাকি। হাত কিছু দরাজ হইলে উপাধিপ্রাপ্তি সুলভ হয়।

দরজার সম্মুখে গিয়া ভাবিলাম, দ্বারে করাঘাত করিব কি না। প্রথমে গলির অপর দিকে দাঁড়াইয়া দোতলার ঘরগুলি দেখিলাম, কোথাও আলোক জ্বলিতেছে কি না।

দূরে একটা বড় ঘণ্টায় ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল। তৎক্ষণাৎ একটা গবাক্ষ মুক্ত হইয়া আমার মুখে ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চের আলোক পড়িল। তখনি নির্ব্বাপিত হইল। আমি দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দরজা মুক্ত হইল, ভিতরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে। এক জন যুবতী, সুন্দরী পরিচারিকা বলিল, সাহেব, আমার সঙ্গে আসুন।

৬

পরিচারিকা আমাকে দোতলায় লইয়া গেল। প্রশস্ত সজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া, একটা গদিমোড়া কেদারা দেখাইয়া দিয়া বলিল, আপনি এইখানে বসুন। খানম এখনি আসছেন।

বসিয়া চারিদিকে দেখিলাম। দরজায় প্রবেশ করিতে আমি বামদিকে বসিয়াছিলাম। অপরদিকে ঠিক আমার সম্মুখে একটি সুন্দর সোফা, দুই জনে ঠেসান দিয়া বসিতে পারে। ঘরের মাঝখানে একটা বড় অটোমান, মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা। বসিবার আরও কয়েকটা স্থান। দুই কোণে কাচের ফোয়ারা দিয়া সুবাসিত জল উঠিতেছে, দেয়ালে বড় বড় উত্তম ছবি। ধনীর গৃহ, সজ্জা সুন্দর, নিন্দনীয় কিছুই নাই। দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম।

পরিচারিকা দরজা ভেজাইয়া দিয়াছিল। আর সব দরজা বন্ধ, কেবল কামরার অপর দিকে আমার সম্মুখে একটি

দ্বার মুক্ত। দেখিলাম, সে ঘরে আলোক মৃদু, উজ্জ্বল নহে। গৃহের মাঝখানে বহুমূল্য বৃহৎ পালঙ্ক, তাহাতে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা, পালঙ্কের উপরে আলোক জ্বলিতেছে। যে সুন্দরীর সঙ্কেতে আমি আসিয়াছি, উহা নিশ্চিত তাহার শয়ন-মন্দির। দেখিয়া আমি চমৎকৃত, আকুলচিত্ত হইলাম।

আমি একদৃষ্টে শয্যার দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় যাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম, সে শয্যাগৃহ হইতে পালঙ্কের পাশ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিল। পথে যে রকম চলন দেখিয়াছিলাম, এখন সেরূপ নয়। অলস দোলায়মান গতি, কটিতট আন্দোলিত হইতেছে। অলস, অনির্দ্দিষ্ট চরণবিন্যাস, বঙ্কিম গ্রীবার উপর মস্তক হেলাইয়া, শিথিল, আলস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছে। তখন দেখিয়াছিলাম, অনাবৃত মুখ, এখন মণিবন্ধ হইতে বাহুমূল পর্য্যন্ত অনাবৃত, অর্দ্ধবক্ষ মুক্ত, নিবিড় বক্ষঃস্থলের গঠন, অঙ্গলিপ্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রে সূচিত সর্ব্বাঙ্গের ললাম লালিত্য—সকলই দেখিলাম! রমণী আসিয়া আমার সম্মুখে অপর দিকে সোফায় বসিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং তাহার রূপের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলাম।

রমণী বীণাবিনিন্দিত মধুর, অলস কণ্ঠে বলিল, সিয়োনোর, আপনি বিদেশী, আপনি ইটালীনিবাসী?

পরিষ্কার ফরাসী ভাষা, উচ্চারণ নির্দ্দোষ। আমি কয়েক মুহূর্ত্ত মূকের ন্যায় রহিলাম। বিস্ময় কিঞ্চিৎ অপনীত হইলে বলিলাম, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

রমণী হাসিল। তন্ত্রীর ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর নিক্বণ। নয়নে কৌতুক-তরঙ্গ। বলিল, নূতন লোক কেহ আসিলে তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে হয়। দেখিতেছি আপনি ধনী। আপনার বিবাহ হইয়াছে?

—না, আমি অবিবাহিত!

—কখন কোন সুন্দরীর সহিত প্রেমালাপ হইয়াছে?

—কখন না। তোমার তুল্য সুন্দরীও কখন দেখি নাই!

—আমার বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?

—আমি এইমাত্র জানি যে, এমন রূপ কোথাও দেখি নাই। আর কি জানিবার আছে?

—আপনি আমার পাশে বসুন।

আমি উঠিয়া সোফায় রমণীর পাশে বসিতে যাইতেছি, এমন সময়, ফোঁস! দেখিলাম, সোফার পার্শ্বে একটা সর্প ফণা বিস্তার করিয়া মাথা তুলিয়াছে!

আমি তাড়াতাড়ি পিছাইয়া পড়িলাম। ভীত, উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলাম, আপনার সোফার পাশে একটা সাপ! আপনি অবিলম্বে উঠে আসুন। ভয়ানক বিষাক্ত সাপ!

রমণী ফিরিয়া সর্প দেখিল, উঠিবার কোন চেষ্টা করিল না। মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন নাই। পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত মধুর কণ্ঠে কহিল, আপনি আসুন না, কোন ভয় নাই।

ভয় নাই? ভয়ে আমার শরীর কম্পিত হইতেছিল। সর্প যদি রমণীকে দংশন করে, অথবা আমাকে আক্রমণ করে! আমার হাতে একগাছা ছড়ি পর্য্যন্ত নাই। গৃহের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহা দ্বারা সর্পকে বধ করা যাইতে পারে। আমি ভয়ে অস্থির হইয়া বলিলাম, আপনি কি জানেন না যে, এ জাতীয় সর্প দংশন করিলে মৃত্যু নিশ্চয়? আপনি চলিয়া আসুন, লোক ডাকিয়া সাপটাকে মারিতে আদেশ করুন।

রমণী উঠিল না, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল, ভয়ের কোন কারণ নাই। আপনি আমার কাছে বসিবেন না?

আমি দরজা খুলিয়া লোক ডাকিতে যাইতেছি, দেখিলাম, দরজা খানিকটা খোলা, দরজার ভিতর আর একটা সাপ ঐরূপ ফণা তুলিয়া রহিয়াছে! আমি যে চেয়ারে বসিয়াছিলাম, তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, এই দেখুন আর একটা সাপ! আপনার বাড়ীতে কি সাপের বাসা?

রমণী হাসিতে লাগিল। যেমন বসিয়াছিল, সেইরূপ বসিয়া রহিল।

আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। কোথায় গেল সে যত্নরঞ্জিত বেশ, রমণীমোহন মূর্ত্তি! ললাট হইতে স্বেদ বহিতে লাগিল, বেশভূষা শিথিল, অসংবৃত হইয়া পড়িল।

আমার সেই ভীত কম্পিত, স্বিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া রমণী আরও হাসিতে লাগিল। তাহার পর করতালি-শব্দ করিল। অসুরের ন্যায় দুই জন ভৃত্য দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। দরজার পাশে সর্পের প্রতি চাহিয়াও দেখিল না। রমণী সোফার নীচে হইতে একটা ধামা

বাহির করিয়া এক জন ভৃত্যের হস্তে দিল। সে সাপ দুইটাকে তাহার ভিতর পুরিয়া কোথায় রাখিয়া দিয়া আসিল। আমি চেয়ার হইতে নামিয়া রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে লাগিলাম।

রমণী শয়নগৃহে গিয়া অঙ্গ আবৃত করিয়া আসিল। তাহার ইঙ্গিতে ভৃত্য দুই জন দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

রমণীর পূর্ব্বের ন্যায় হাবভাব কিছুই নাই। দৃষ্টি কঠোর, কঠিন। বলিল, ইহাই আমার পরীক্ষা। এ জাতীয় সর্প এ দেশে হয় না, আমি ভারতবর্ষের এক দল সাপুড়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাদের শুধু ফণা আর ফোঁস আছে, কিন্তু নির্ব্বিষ। আমি সপ্তাহে দুইবার করিয়া নিজে বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিই। যদি তুমি সাহস করিয়া ভয় না পাইয়া আমার কাছে আসিতে, তাহা হইলে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকিত না। তুমি দেখিলে, সাপ দেখিয়া আমি কিছু ভয় পাই নাই, তবে তুমি কেন ভয়ে অস্থির হইলে? আমার সঙ্গে আইস।

রমণী আমাকে আর একটা কামরায় লইয়া গেল। ভৃত্যরা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। ছোট কুঠুরী, আলোক জ্বলিতেছে। কোথাও কিছু নাই, কেবল দেওয়ালে কয়েকখানা কাগজ। তাহাতে কি লাগান রহিয়াছে, ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, কিছু দেখিতে পাইতেছ?

এতক্ষণে আমার মুখে কথা সরিল, বলিলাম, কি?

—কাগজগুলা ভাল করিয়া দেখ।

আমি কাছে গিয়া দেখিলাম, প্রত্যেক কাগজে একটি ভুরুর লোম ও গোঁফের অর্দ্ধেক আটা দিয়া আঁটা। ইহার অর্থ কি?

সুন্দরী বলিল, যাহাদের মুখে এগুলা ছিল, তাহারা সকলেই আমার আশায় আসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল। মুখে সকলেই বলিত, আমার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু যে পরীক্ষায় তুমি ভয় পাইয়াছিলে, তাহাতে সকলেই ঐরূপ ভয় পাইয়াছিল। তাহাদের এই দণ্ড দিয়াছি। তোমারও এই শাস্তি হইবে।

রূপের মোহ তিরোহিত হইল। সেই ভীষণোজ্জ্বলা নারীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ সর্পিণীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

রমণীর দৃষ্টি কোমল হইল, কণ্ঠও কিছু মধুর হইল। কহিল, তোমাকে এই শাস্তি দিতে আমার মন সরিতেছে না, তোমার প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। এই শেষ। কাল আমি সাপ দুইটাকে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দিব। আর কাহাকেও এরূপ পরীক্ষা করিব না।

রমণী ইঙ্গিত করিল। দুই জন ভৃত্য আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি এক জনের মুখে এমন ঘুষি মারিলাম যে, সে পড়িয়া গেল। আর এক জন পশ্চাৎ হইতে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। দুই জনে মিলিয়া আমাকে ধরিল। দুই জনে মিলিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

রমণী বলিল, তোমার বল দেখিয়া আমার অনুতাপ বাড়িতেছে। আর কেহ এরূপ বল প্রকাশ করিতেও সাহস করে নাই। কিন্তু এখন চুপ করিয়া থাক, নহিলে কাটাকুটি হইয়া তোমারই রক্তপাত হইবে।

আমি স্থির হইয়া রহিলাম। এক জন ভৃত্য একখানা ক্ষুর আনিয়া আমার ডান ভুরু ও বাম দিকের গোঁফ কামাইয়া দিল। তাহার পর রমণীর আদেশে আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল।

রমণী কহিল, ইহার কাছে কি আছে দেখ।

এক জন ভৃত্য আমার পকেট হইতে টাকা ও মুক্তার মালার কৌটা বাহির করিল। রমণী তাহা লইয়া টাকা দেখিয়া কৌটা খুলিয়া মালা ছড়া বাহির করিয়া দেখিল। কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, মুক্তার হার আমার জন্য আনিয়াছিলে?

ক্রোধে, লজ্জায়, অপমানে আমি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিলাম। বিকট চীৎকার করিয়া কহিলাম, পিশাচী, তোমার জন্য নয় ত আর কাহার জন্য?

রমণী দুর্ব্বাক্য শুনিয়া রাগ করিল না, কহিল, আমি কুকর্ম্ম করিয়াছি। যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় নাই, আমার অনুতাপে তোমার অপমানের প্রতিশোধ হইবে না।

টাকা ও মুক্তার হার রমণী আমাকে ফিরাইয়া দিল। ভৃত্যদিগকে কহিল, ইহাকে ছাড়িয়া দাও। কিছু বলিও না।

আমি পথে রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া

আসিলাম। শয়নকক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আরসীতে মুখ- দেখিলাম।

কোথায় গেল সেই নয়ন-ভুলানো রমণীমোহন মুখ- কান্তি! বাড়ী হইতে গিয়াছিলাম মদনমোহন রূপ লইয়া, ফিরিয়া আসিলাম এই বিকৃত, কুৎসিত মূর্ত্তিতে! আমি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেক গোঁফ কামাইয়া ফেলিলাম। ভ্রূ কি করিব? যদি আর একটা মুণ্ডিত করি, তাহা হইলে যে মর্কটকে ডারুইন মানবের অতিবৃদ্ধ পিতামহ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য হইবে।

প্রভাতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আমি মাথায় এমন করিয়া একটা পাগড়ী জড়াইলাম যে, দুই ভ্রূ একবারে ঢাকা পড়িল, কেবল চক্ষু অনাবৃত রহিল! মুণ্ডিত মুখ দেখিয়া চাকররা কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। আহারের সময় বৃদ্ধা দাসী আমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আগা, মাথায় চোট লাগে নি ত?

আমি বলিলাম, চোট লাগবে কেন? কপালে ব্যথা, তাই বাঁধিয়া রাখিয়াছি।

তিন মাস আমি বাড়ীর বাহির হইলাম না। দিনে দশ বার দেখিতাম মুণ্ডিত ভ্রূতে কেশোদ্গম হইতেছে কি না। তিন মাস পরে ভ্রূ ও গোঁফ যেমন ছিল, সেইরূপ হইল। আমি দেশে ফিরিয়া আসিলাম। দেশভ্রমণ ও সুন্দরী- সম্মিলনের সাধ একবারে মিটিয়া গিয়াছিল।

যৌবনে চিত্তের কোনরূপ বিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি কুস্বপ্নের মত রহিয়া গেল, আর কোন গ্লানি রহিল না।

ফিরিবার পথে বিয়াত্রিচের নির্ম্মল অনিন্দ্য রূপের প্রতিমূর্ত্তি আমার স্মৃতিপটে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিফলিত হইতে লাগিল। মূঢ়ের ন্যায় স্বেচ্ছায় তাহার প্রণয়ে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এখন অনুতপ্ত হইলে কি ফল? সে আমার প্রতি আর দৃক্পাতও করিবে না।

আমি দেশে ফিরিতেছি, কাহাকেও কোন সংবাদ দেই নাই। কিন্তু চাটুকার দলের টনক নড়িল। আমি গৃহে ফিরিতেই তাহারা আসিয়া আমাকে ঘিরিল।

তাহাদের স্তোকবাক্যে ও চাটুবাদে আমার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, দেখ, তোমরা যে আশা ক'রে এসেছ, তা কিছুই হবে না। আমি দেশ বেড়িয়ে যা শিখে এসেছি, তাতে আমার অপব্যয় করবার কিম্বা জঘন্য প্রমোদে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে একেবারে দূর হয়েছে। তোমরা এখানে আসা বন্ধ কর, আমার এক পয়সাও তোমরা দেখতে পাবে না।

তাহারা আকাশ হইতে পড়িল। শুষ্ক মুখে কয়েক জন বলিল, বল কি! বল কি! আমরা তোমার যথার্থ বন্ধু।

আমি উঠিয়া গিয়া, সাদাসিধা বেশ ধারণ করিয়া সোজা বিয়াত্রিচের গৃহে গমন করিলাম। তাহার পিতা- মাতা আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কহিলেন, এস, এস, তুমি না কি কোন দেশ বেড়াতে গিয়েছিলে? কবে এলে?

—কাল এসেছি। যদি আপনাদের অনুমতি হয়, তাহা হইলে একবার বিয়াত্রিচের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।

—সে ত আনন্দে কথা। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল, তুমি আর আসবে না।

—সে কোথায় আছে?

—নিজের ঘরে। তাকে খবর দেব?

—কোন আবশ্যক নেই। আমি তার ঘর জানি।

আমি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বিয়াত্রিচের ঘরের দরজায় করাঘাত করিলাম। সে দরজা খুলিতেই আমি, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিলাম।

বিয়াত্রিচের মুখ আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—আবার পাণ্ডু- বর্ণ হইয়া গেল। সরমের রাঙ্গা জোয়ার আসিয়া আবার সরিয়া গেল। বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

দেহলতা কিঞ্চিৎ শীর্ণ হইয়াছে, চক্ষুর কোলে ঈষৎ কৃষ্ণ রেখা। তাহাতে তাহার রূপের কমনীয়তা ও কোমলতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বিয়াত্রিচে আর আমি দুজনেই দাঁড়াইয়া। মুক্ত গবাক্ষ দিয়া প্রভাত-সূর্য্যালোক কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল।

চঞ্চল বক্ষে বাম হস্ত রক্ষা করিয়া বিয়াত্রিচে কেবলমাত্র বলিল, তুমি ?

—কেন, আমার আসিতে নাই ?

—আমি স্থির করিয়াছিলাম, তুমি আর কখন আসিবে না।

—আমাদের ত কখন বিবাদ হয় নাই ?

—না, কিন্তু আর কিছুও হয় নাই।

—শোন, বিয়াত্রিচে, তোমাকে যে কথা একবার বলিয়াছিলাম, সেই কথা আবার বলিতে আসিয়াছি। তুমি আমাকে বিবাহ করিবে ?

—এবার কাহার উত্তেজনা ? তুমি ত আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলে, আমাকে ভালবাস না।

—তখন আমার মনের স্থিরতা ছিল না। ট্রষ্টীর কথায় আমার বিরক্তি হইয়াছিল।

—আর এখন ?

—এখন আর কাহারও উপরোধ অনুরোধ নাই। কাল আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। আজ তোমার কাছে আসিয়াছি।

—আমি কি বলিব ? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই হইবে।

আমি বিয়াত্রিচেকে বক্ষে ধারণ করিলাম। সে আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, নিষ্ঠুর, তুমি কি পূর্ব্বে আমার মনোভাব বুঝিতে পার নাই ?

—ট্রষ্টীর কথা উল্লেখ না করিলে তুমি সেবার কি করিতে ?

—তোমাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিতাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অম্লান

চলেছিলে পথে তুমি বৈশাখের ঝঞ্ঝা বহি শিরে—
সুদীর্ঘ যাত্রার পথে, গোধূলির তরল তিমিরে—

দিগন্তের প্রান্ত হ'তে এসেছিল কাহার আহ্বান !
তুমি ছুটে গেলে চলি, বাতায়নে বসি গাহি গান।
ভেবেছিনু সন্ধ্যামণি মালা গাঁথি দিব তব গলে,
যে মালা গাঁথিয়া তব অপেক্ষায় আছি পলে পলে !

কত ব্যর্থ মালিকার কত শুষ্ক ঝরা পুষ্পদল
পথপ্রান্তে পড়ে আছে জন্মস্মৃতি বহিয়া সকল।
সার্থক হইল তারা আজি তব পদস্পর্শ লভি—
বসিয়া রহিনু আমি বাতায়নে—অনিমেষ ছবি।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দীর্ঘ রাত্রি অবসানে নির্ম্মল প্রভাতে
তরুণ রবির স্পর্শ লাগিল ঘুমন্ত আঁখি-পাতে।
শুনিনু প্রভাত বায়ে মর্ম্মরিয়া ওঠে তরু-শাখা।
বাতায়নে বসি মোর শ্রান্ত পাখী ঝাপটিছে পাখা।

ফুটেছে প্রভাত-পুষ্প গন্ধ তার ভাসিছে পবনে,
আঁখি না মেলিনু তব ভাবি যেন রয়েছি স্বপনে !
যে আহ্বানে দূর যাত্রা করেছিলে ঝঞ্ঝার সন্ধ্যায়
আমার কি আছে বাণী তাহা হতে ফিরাব তোমায় !

তবু যদি পাই তোমা স্বপ্নে গানে আভাসে ইঙ্গিতে
নয়ন মুদিয়া তাই ধ্যান করি, দুরু দুরু চিতে—
সহসা মেলিনু আঁখি চেয়ে দেখি দুয়ারের কাছে
অম্লান মালাটি তব ভূমিতলে লুটাইয়া আছে।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮

স্তব্ধ বিজন মধ্যাহ্নে মাতা-পুত্র বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন। মেঝেয় পাটী বিছাইয়া যশোদা শয়ন করিয়াছেন। কোলের কাছে পুত্র দিবাকর। তপু স্কুলে গিয়াছে। কুহু দাদার নিকটে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' স্নেহোপহার পাইয়া দ্বারদেশে বসিয়া পড়িতেছে। কক্ষের অপর প্রান্তে খাটের বিছানায় ভোলানাথ শয়ান। তাঁহার হস্তে পুরাতন দেবীমাহাত্ম্য।

দুই দিন হইল দিবাকর বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু কুহুর বিবাহের এখনও স্থির হয় নাই। এ অভাবনীয় সৌভাগ্য-সূচনায় যশোদার মনের খুঁত যাইতেছে না। সে খুঁত প্রবল বংশমর্য্যাদা। তাঁহাদের বংশে এ পর্য্যন্ত যে ঘরের মেয়ে আসিতে সমর্থ হয় নাই, সেই বংশে কন্যা-দান। নিম্ন ঘরের মেয়ে আনা দোষের নহে, কিন্তু বড় ঘরেই যে কন্যা-দান প্রশস্ত। ঐশ্বর্য্যের পায়ে মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দেওয়া তাঁহার ধারণার বহির্গত।

ধারণার বাহিরে হইলেও দিবাকরের যুক্তিতর্কের কাছে মাকে অনেকটা নরম হইতে হইল। আজও মাতাপুত্রের মধ্যে কুহুর বিবাহের আলোচনাই চলিতেছিল। দিবাকর বলিল, "তা হ'লে কালকের ডাকেই জ্যোতির্ম্ময় দাদাকে চিঠি লিখে দিই, মা? আমাদের প্রথমে তাঁদের বিয়ে দেবার ইচ্ছা। দেখতে দেখতে আজ মাসের সাত দিন হয়ে গেল।"

যশোদা ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "কুহু রাজরাণী হবে, এ আমার কম ভাগ্যের কথা নয়, দিবা। ওর বিয়ে নিয়েই বড্ড ভাবনা হয়েছিল। এখানে হ'লে চিরকালের জন্যে নিশ্চিন্ত। উনি মত দিয়েছেন, তোর এত আগ্রহ, এ ক্ষেত্রে আমার অনিচ্ছার কারণ নেই। আমার কেবলই মনে হয়, পূর্ব্বপুরুষ যে বংশগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, দায়ে ঠেকে ঐশ্বর্য্যের লোভে আমরা তাকে খোয়াব। দেখ দিবা, ভাঙ্গা সোজা, গ'ড়ে তুলতে কত যুগ—কত বছর কেটে গেছে।"

"এটা যে ভাঙ্গার যুগ, মা। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে উঁচু নীচু কোন ব্যবধান থাকবে না। থাকবে কেবল মানুষ। যারা তোমার স্বজাতি, স্বঘর, কোন্ কালে কোন্ বিষয়ে তারা খাটো ছিল, সে বিচার এখন চলে না। দায়ে ঠেকে কুহুকে এখানে বিয়ে দেবার আমার ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা, জ্যোতির্ম্ময় দাদার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়ানো। তাঁকে যতটুকু দেখলাম, তাতেই এমন শ্রদ্ধা হয়েছে, তা বলার নয়, মা। তিনি কুহুকে চেয়েছেন, কুহু তাঁর কাছে থাকতে পারবে, এই আমাদের যথেষ্ট। কিন্তু তোমার সম্মতি সকলের আগে। অপ্রসন্ন হয়ে বল্লে হবে না মা, প্রসন্নমনে মত দিতে হবে।"

ভোলানাথ দেবীমাহাত্ম্য ফেলিয়া বিছানায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌ছিস, দিবা? বালিগঞ্জে এখনও চিঠি লেখা হয়নি? বুঝেছি, তোর মা আপত্তি করেছেন? তুই ত জানিস না, উনি কোন্ বংশের মেয়ে? তাঁরা সমাজের শিরোমণি ছিলেন, সে গন্ধ যাবে কোথায়? তা উনি যখন জমীদার ধনী ভালবাসেন না, তখন ভূষণডাঙ্গায় আমার কায নেই। হিরণ ছেলে ভাল, তার সঙ্গে—"

দিবাকর বাধা দিয়া বলিল, "না বাবা, তার সাথে হ'বে না। সে ব্রাহ্মণ।"

"ও, তা মনেই ছিল না।" বলিয়া ভোলানাথ মহা সমস্যায় বিছানার চাদর ঝাড়িতে লাগিলেন।

ক্ষণেক চিন্তার পর যশোদা হাসিমুখে কহিলেন, "ভাবনায় অস্থির হয়ে তোমার আর বিছানা ঝাড়্‌তে হবে না গো, আমি খুসী মনেই বলছি—তোমরা ভূষণডাঙ্গাতেই কুহুর বিয়ে দাও। বিয়ের দিন ঠিক করতে কালকেই তাঁদের চিঠি লিখে দে, দিবা।"

দিবাকরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল।

ভোলানাথ প্রসন্নহাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণে নিশ্চিন্ত করলে। তোমাকে যে 'হাঁ' করতেই হবে, সেটা আমার জানাই ছিল। তোমাকে, তোমার মেয়ে দুটিকে বিধাতা যে রাজরাণী করেই গড়েছিলেন। গড়লেও হঠাৎ তাঁর ভুল হয়েছিল। ভুল ক'রে তুমি এলে আমাদের বাড়ী। সুলোচনার সময়েও সেই ভুল। কিন্তু ভুল বার বার হ'তে পারে না। ভগবান এবার আর ভুল না ক'রে কুহুকে পাত্তিকারের রাজরাণী করলেন। সুন্দর ক'রে সৃষ্টি করলে তার মূল্য যে তাঁকেই দিতে হয়। তোমাদের মত এত সুন্দর আর কোথায় আছে?"

উপযুক্ত পুত্রের সম্মুখে সেই চির-পুরাতন সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যায় যশোদা লজ্জিত হইলেন।

কুহু চয়নিকা লইয়া থাকিলেও কাণ সজাগ হইয়াছিল মায়ের কথার দিকে। মা যেমনই সম্মতি দিলেন, তেমনই কুহুর বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি তাহার কোরক জীবন-পদ্মের দল স্পর্শ করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিল। আবেগে আবেশে কিশোরীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কুহু বসিয়া থাকিতে পারিল না। বইখানা হাতে লইয়া উত্তরের পড়ো জমীর সংলগ্ন তাহাদের ক্ষুদ্র বাগানে উপনীত হইল।

বাগানের শেষ সীমায় দুইটি প্রাচীন বকুল-বৃক্ষ আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া পরস্পর পরস্পরের পানে চাহিয়া আছে। দুই বৃক্ষের শিকড় আঁকিয়া-বাঁকিয়া একখানি সুন্দর আসন রচনা করিয়া রাখিয়াছে। বর্ষার জলপ্লাবনে শিকড়ের নিম্নের মাটী ধুইয়া ধুইয়া বৃক্ষের আসনটি সমতল ভূমির উর্দ্ধে ঝুলিতেছে। এ আসনখানি তপু ও কুহুর বড় আদরের। বৃক্ষাসনের অনতিদূরে এক অপ্রশস্ত নালা, নদীর সহিত সংলগ্ন। নিদাঘে নালা শুষ্ক হইলেও বর্ষার স্রোতোবেগে আবার স্ফীত হইয়া উঠে।

দুই দিন হইল নালায় জল পড়িয়াছে। এখনও জল ছাপাইয়া নালার শেষ রেখা ভরিয়া উঠে নাই। অল্পের আড়ম্বর বেশী, প্রবল জলস্রোতে বেতস-বন ভয়ে কম্পিত হইতেছে। পড়ো জমীতে দুইটি গাভী ঘাস খাইতেছে, গুটিকয়েক ছাগল চরিতেছে। গাছের ডালে পাখীরা একত্র হইয়া কিচির-মিচির শব্দে স্থানটি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

কুহু বকুল বৃক্ষের আসনে বসিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। বর্ষার আকাশ আসন্ন বর্ষণের সম্ভাবনা না থাকিলেও মেঘভারে আচ্ছন্ন। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ধরিত্রীর সহিত লুকোচুরি খেলিতেছে। মেঘ শ্যামতুলিকা বুলাইতে না বুলাইতে রৌদ্রের সোণার আখরে মেঘের গাঢ় নীলিমা বিলীন হইতেছে। আকাশ বিচিত্র, ধরণী স্বপ্নময়ী, বাতাস উতলা, তৃণে পত্রে কোন অলক্ষ্য হস্তের সবুজের ছোপ লাগিয়াছে! যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজে সবুজে সমাচ্ছন্ন। সবুজের মাঝে মাঝে স্বর্ণবর্ণের আউস ধান্য শ্যামল শাড়ীর স্বর্ণ অঞ্চলের ন্যায় বর্ষার সজল শীতল বায়ু-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া কৃষককে ডাকিতেছে—"আয়, আয়, তোর দুঃখের ধন—আশার ধন মাথায় তুলিয়া লইয়া যা।"

জগৎ আজ ডাকাডাকিতেই সারা। গৈরিক বসন পরিয়া নদী ডাকিতেছে মেঘকে "এস, এস, তোমার বিপুল জলরাশি আমার ঘোলা জলে মিশাইয়া চল প্রিয়, আমরা দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হই।" নদী যেমন মেঘকে ডাকিতেছে, তেমনই নদীকে ডাকিতেছে তটভূমি,—তাহার বিদীর্ণ তটকে তটিনীর স্নিগ্ধ বক্ষে মিশাইবার জন্য! আজ বিশ্বের সমস্তই যেন অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় নব আলোকে আলোকিত হইয়া কুহুর আঁখির সম্মুখে মায়া-কানন সৃষ্টি করিয়াছে।

মার মধুর একটি বাক্যে যত দ্বিধা-সংশয় অন্তর্হিত হইয়াছে। জয়ন্তকে এখন কেবলই জয়ন্ত বলিয়া মনে হইতেছে না, আর সে পথের পথিক নহে। দাদার আগ্রহ, বাবার বাসনা, মা'র শুভেচ্ছার মূর্ত্তিমানরূপে জয়ন্ত কুমারীর শুভ্র সুন্দর হৃদয়ে দেবতার আসনে এখনই প্রতিষ্ঠিত হইল।

কুহুর আক্ষেপ হইতেছিল, পূর্ব্বে জানিলে সেই ধ্যানের ধনের মুখখানি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইত। অপরিচিত পথিক ভাবিয়া তাহার দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করিত না।

দিবাকরের নিকটে হিরণ জয়ন্তর অনুরাগ-কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া বিবৃত করিয়াছিল। মা'র করুণা উদ্রেকের আশায় দিবাকর আবার তাহাই সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিল। কুহু তাহাই স্মরণ করিয়া আনন্দে লজ্জায় তন্ময় হইল। সত্যই তিনি কুহুকে এত ভাল-বাসিয়াছেন। কোথায় ভূষণডাঙ্গা, কোথায় ক্ষীরপুর, কে তাঁহাকে এত দূরে টানিয়া আনিয়া কুহুর জীবন-পথখানি কুসুমকোমল করিল? বিদর্ভ-রাজকুমারী রুক্মিণীর বারতা দ্বারকানিবাসী শ্রীকৃষ্ণ যেমন করিয়া জানিয়াছিলেন, দময়ন্তীর নিমিত্ত নলরাজা যেমন চঞ্চল হইয়াছিলেন, তেমনই ভাবেই তিনি কুহুর সমাচার জানিতে পারিয়াছেন? এ বিধাতার লীলা, অনন্ত প্রণয়বন্ধনে বাঁধিবার অপূর্ব্ব কৌশল।

জয়ন্তর কথা ভাবিতে ভাবিতে কুহু তাহার অবয়ব

স্মরণপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে অস্পষ্ট আলেখ্য তখন তেমন সুস্পষ্টরূপে হৃদয়াকাশে উদয় হইল না। দেখিব বলিয়া সে যে তাহাকে দেখে নাই। পথের উপদ্রব মনে করিয়া বিমুখ-চিত্তে পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। স্মৃতি ঝাপ্‌সা হইলেও একবারে অকরুণ নহে। চিন্তা করিতে করিতে অন্ধকারে শুকতারার মত জয়ন্তর রজতগিরিনিভ বর্ণ দীর্ঘ দেহ কুহুর নির্ম্মল হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িল, বিদেশী বস্ত্র, আগ্নেয় অস্ত্র, দীপ্ত মধ্যাহ্নতুল্য প্রখর জ্বালাবর্ষী দৃষ্টি। কুহু তখনই বিমনা হইল। এমন সময় তিনি কেন পরের বেশের অনুকরণ করিয়াছেন, পরের অস্ত্রে প্রাণি-হত্যা করিয়া বেড়াইতেছেন। নিরীহ বিহঙ্গম কাননকুন্তলা পল্লী-মা'র অপূর্ব্ব সম্পদ, তাহাদিগকে মারিতে তাঁহার প্রাণে কি ব্যথা বাজে না? যিনি চকিতের দৃষ্টিপাতে কুহুকে এত ভালবাসিয়াছেন, তিনি ত নিষ্ঠুর হইতে পারেন না? বিবাহের পর কুহু তাঁহাকে পক্ষী শিকার করিতে দিবে না। আর দিবে না পরের বসন-ভূষণে দেহ সাজাইতে। পুরুষের সবল বলিষ্ঠ বাহু ফুলের মালায় বাঁধিয়া রাখিবে না। সে বাহুতে শোভা পাইবে তরবারি, যষ্টি।

"দিদি!"

কুহু সচমকে পশ্চাতে চাহিল। তপু স্কুল হইতে ফিরিয়া, তাহার সন্ধানে এ পল্লববিতানে ছুটিয়া আসিয়াছে। বেলা বেশী নাই, অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া চারিদিকে ঘনায়মান।

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কুহু তপুকে কহিল, "তুই কখন্ এলি, তপু? জল এ বেলা বেড়েছে কি না, তাই দেখ্‌ছিলাম।"

তপু বালক হইলেও এ কৈফিয়তে ভুলিল না। কণ্ঠে অপার উল্লাস ঢালিয়া বলিল, "তুই বুঝি জল দেখতে এসেছিস, দিদি? কি জন্যে এখানে লুকিয়ে রয়েছিস, তা আমি জানি।"

"কি জন্যে? বল্ ত?"

"বল্‌তে বুঝি পারি না? বল্‌বো?"

"বল্"।

"ভূষণডাঙ্গার জয়ন্ত বাবুর সাথে তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই লজ্জায় এখানে লুকিয়ে রয়েছিস।"

কুহু হাসিতে হাসিতে ভাইটিকে কোলের উপর টানিয়া লইল। দিদির স্কন্ধে মাথা রাখিয়া তপু কহিল, "এইবার তুই ত রাণী হতে চল্লি দিদি, আমার কামান তৈরির টাকা কিন্তু দিতে হবে। ভুলে যাসনে?"

"না তপু, ভুলবো না।" বলিয়া কুহু তপুর যুগ্মভ্রূর মাঝখানে কৃষ্ণ তিলটির উপর একটি স্নেহচুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

১৭

পরদিন দিবাকর জ্যোতির্ম্ময়কে পত্র লিখিল। পত্রোত্তর আসিতে বিলম্ব হইল না। একুশে আষাঢ় শুভ বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া জ্যোতির্ম্ময় লগ্নপত্র পাঠাইলেন এবং জানাইয়া দিলেন, জল-কাদার ভিতর জয়ন্ত ক্ষীরপুরে যাইয়া বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। দিবাকর যেন সকলকে লইয়া অবিলম্বে কলিকাতায় চলিয়া আসে। তাঁহাদের ভবানী-পুরের বাড়ী-খানি খালি পড়িয়া আছে। সেইখানেই বিবাহাদির ব্যাপার মিটিতে পারিবে।

বরপক্ষের প্রস্তাবে যশোদা খুসী হইলেন না। ভাগ্য-লক্ষ্মী বিরূপ হইলেও মানুষের সাধ আহ্লাদ ত থাকে? কুহু বাড়ীর শেষ মেয়ে, তাহার বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধুদিগকে আহ্বান করিতে ইচ্ছা হয়। প্রতিবেশীরা বিবাহে আমোদ করিবার জল্পনা-কল্পনা লইয়া আছেন, এখানে বিবাহ না হইলে সকলেই ক্ষুণ্ণ হইবেন।

আর্থিক দুরবস্থায় জ্যোতির্ম্ময়ের প্রস্তাবে দিবাকরের তেমন আপত্তি হইল না। বর্ষার সময় পল্লীগ্রামে উৎসবাদি নির্ব্বাহ করা দুরূহ ব্যাপার। ভোলানাথ সাতে পাঁচে থাকেন না। পত্নী, পুত্রের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। বিবাহে বরপক্ষকে কিছু না দিলেও একটা খরচ আছে। সম্বল যশোদার সেকেলে গহনা ক'খানি, আর দিবাকরের জমানো কয়েকখানি শপাঁচেক টাকা। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া মাতা পুত্র অগত্যা কলিকাতায় যাওয়া স্থির করিলেন। জামাইবাড়ী উঠিয়া কন্যাদান যশোদার মনঃপূত হইল না। স্বজন স্বগৃহ ছাড়িয়া পরগৃহে প্রবাসে বিবাহ দেওয়াই ত লজ্জার বিষয়, তার পর বরের বাড়ী বসিয়া কন্যাদান! কাযেই দিবাকর তাহার বন্ধুকে পৃথক বাড়ী ভাড়া করিতে লিখিল।

গ্রামে নিরীহ ভোলানাথের শত্রুপক্ষ না থাকিলেও

তাঁহাদের এ অভাবনীয় সৌভাগ্যে কন্যাদায়গ্রস্তা প্রতিবেশিনীরা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রণের আশা পর্য্যন্ত যেখানে রহিল না, সেখানকার নিন্দাচর্চ্চায় অনেকে সান্ত্বনা লাভ করিতে লাগিলেন। গ্রাম সম্পর্কে কুহুর পিসী, মাসী, কাকী, জ্যেঠাই বাড়ী বহিয়া যশোদাকে শুনাইতে আসিলেন "ধনের পায়ে মান বিসর্জ্জন দিলে, বৌ? কত বড় বোস বংশের মেয়ে, সে কি না ভূষণডাঙ্গায় চল্ল। এটা টাকার যুগ, টাকা থাক্‌লে হাড়ি-বাগ্‌দীও বিকিয়ে যায় তা দিলে দিলে, তোমার বড় মানুষ জামাই কি বিলেত থেকে এসেছেন? গাঁয়ের জল-কাদায় তাঁর এত ভয় কেন?"

যশোদা সনিশ্বাসে বলিলেন, "কি করবো, দিদি? পয়সা না থাক্‌লে খাটো হ'তেই হয়। দিবার খুব ইচ্ছা, তাই এখানে বিয়ে ঠিক হ'ল। আমাদের কাল চ'লে গেছে, ওরা যা ভাল বোঝে, এখন তাই করতে হয়। জামাই সহুরে মানুষ, বর্ষার দেশে আস্‌তে ভয় পান। কি করবো, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, দিদি! এখন তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, কন্যাদায় থেকে অব্যাহতি পাই।"

"আমরা দিনরাত আশীর্ব্বাদ করছি, বৌ, ভাল হালে বিয়ে দিয়ে এস। কুহুর বিয়ের আমোদ হল না, এই যা দুঃখু। তা একালে অমনধারা হয়েই থাকে। 'যার ঝি, তার জামাই, পড়শী বাড়ীর কাটনা কামাই।' জামাই সহুরে বল্‌ছ, তা নয় গো, ওটা বড়লোকি ঢং। মহলে এসে শিকার করবার সময় কি জলকাদার ভয় ছিল না? তাদের ইচ্ছা, তোমরা কি করবে? এইবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছেলের বিয়ে দাও। মেয়ে চ'লে গেলে একটি বৌ না আনলে ঘর মানাবে কেন?" বলিয়া প্রতিবেশিনীরা যে যার মত প্রস্থান করিলেন।

যে সাধ মাতৃহৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল, সকলের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সত্যই কুহু চলিয়া গেলে যশোদা কাহাকে লইয়া থাকিবেন? সুলোচনা গেলে হাতের দোসর কুহু ছিল। পিতার ফরমাইস, মা'র খুঁটি-নাটি কায-কর্ম্ম তাহার স্কন্ধেই পড়িয়াছে। কুহুর নীরব সেবা-যত্নে সুলোচনার অভাব একটি দিনের তরেও মা জানিতে পারেন নাই।

ভোলানাথ একদণ্ডকাল ঘরে থাকিতে পারেন না। ত্পুর খেলাধুলা বাহিরে বন্ধু-মহলে, শূন্য গৃহে একাকী থাকিবার কল্পনায় যশোদা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, দিবার বিবাহে অভিরুচি নাই। দেশমাতৃকার চরণে ইহজীবনের ভোগ, সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সে চিরকুমার-ব্রত গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছে। কিন্তু মা'র মন যে মানিতে চায় না। তাঁহার অলক্ষ্যে হৃদয়ের পাতে পাতে কত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। হাস্য-মুখী স্মিতনয়না একটি কল্যাণী বধূ দরিদ্রের সংসারে শান্তি সুখ বহিয়া আনিয়াছে। কেবল বধূ নহে, অদূর-ভবিষ্যতে তাঁহাদের নয়নানন্দ বালগোপালরূপে যে আসিবে, যশোদা অমৃত ছানিয়া তাহাকেও অন্তরের অন্তস্তলে গড়িয়া রাখিয়াছেন। ইহা কি কেবলই কল্পনা? আকাশকুসুম?

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দিবাকর বাড়ী ফিরিলে মা ছেলেকে লইয়া বসিলেন। ছেলের গা খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন, "আমার একটি কথা এবার তোকে শুনতে হবে, দিবা! আপত্তি করলে চল্‌বে না। এতদিন আমি চুপ ক'রে ছিলাম, আর চুপ ক'রে থাকতে পারবো না।"

বলিবার ধরণে মা'র বক্তব্য দিবার অগোচর রহিল না। দিবা হাসিয়া উত্তর করিল, "এতদিন যেমন চুপ ক'রে ছিলে মা, এখনো তেমনি থাকাই ত ভাল। যা না বল্লে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, তা বলা কেন? আমি কোনকালে তোমার কোন কথায় আপত্তি করেছি? যাতে আমার আপত্তি, তুমি ত আমায় তেমন আদেশ কখনো করো নি, মা?"

"এতদিন করি নি। আজ করবো, সুলোচনা গেছে, কুহুও যাবে, আমি কাকে নিয়ে থাকবো? এবার আমার সাথের সাথী হাতের দোসর একটি বৌ এনে দিতে হবে।"

দিবাকর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "আগে যদি তোমরা আমার বিয়ে দিতে মা, তা হ'লে তোমাদের ওপর আমার বলার কিছু থাকতো না। জিজ্ঞাসা যখন করলে, তখন আমার ইচ্ছা তোমাদের জানতে হবে। বিয়ে আমি করতে পারবো না। আমার এ অপরাধ মাপ কর। আমি যে কায নিয়েছি, তাতে স্ত্রী থাকা বিড়ম্বনা—ঘরকন্নার আশা বিড়ম্বনা। তোমাদের সন্তানের জন্যে তোমরা কষ্ট পাবে, তাই ব'লে আর একটি প্রাণীকে জুটিয়ে দুঃখ দেওয়া ধর্ম্মের কায হবে না।"

যশোদা বলিলেন, "আমি তোর মা, আমি তোকে বলছি, তুই ঘরে ব'সে দেশের সেবা কর। তোর বুড়ো বাপ-মাকে

দেখা-শোনা, বংশরক্ষা করা—এ কি ধর্ম্ম নয়? দেশকে মা ব'লে দেশের দুঃখে ঘর-ছাড়া হলি, কিন্তু নিজের মা'র দুঃখ কি তোর লাগে না, দিবা? আমার চেয়ে জগতে তোর বড় কি আছে?" যশোদার অসম্বরণীয় অশ্রুধারা নেত্র বাহিয়া গণ্ডে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দিবাকরের চোখের কোণ চক চক করিতে লাগিল। সে বালকের ন্যায় মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া জড়িত স্বরে কহিল, "আমি তোমাদের বড় কষ্ট দিলাম, মা। কিন্তু আমার উপায় নাই। এখন তোমরা আমায় ধ'রে রাখলে আমি বাঁচবো না। তোমার দুটি ছেলে—একটি দেশকে দিয়েছ, অন্যটি তোমার রইল। তোমাদের যা সেই করবে। তুমি মা, তোমার মনস্তাপ আমার অকল্যাণ। আমার সকলের ওপর তুমি, তোমার ওপরেও দেশ, তা আমি ভুলতে পারবো না।"

মা চক্ষু মুছিয়া পুত্রের মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন। মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া কণ্ঠের ভাষা রুদ্ধ হইয়া গেল। এ কি সেই দিবাকর? জননী-গতপ্রাণ, মা'র মলিন মুখ দেখিলে যে শতবার প্রশ্ন করিত। মাকে আনন্দ দিতে, শান্তি দিতে কঠোর শাস্তি মাথা পাতিয়া লইত। সেই দিবা মা'র অশ্রুতেও সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইল না! যে দীপ জ্বলিবার জন্যই প্রজ্বলিত হইয়াছে, মা তাহাকে কি প্রকারে নিবাইবেন? জ্বলিবার নিমিত্ত যাহার জন্ম, তাহাকে যে জ্বলিতেই হইবে। কিন্তু মা কোন্ প্রাণে বলিবেন, "সহস্র বিপৎসঙ্কুল কণ্টকবনে তুমি আবাস রচনা কর। শত উদ্যত বজ্র তোমার শিরে পতনোন্মুখ হইলেও তাহাই তোমার ইষ্ট!"

মা'র মর্ম্মান্তিক বেদনা দিবাকর মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া বলিল, "মা, রাগ করলে? তুমি যদি খুবই কষ্ট পাও, তা হ'লে না হয় জীবনে ম'রে আমি তোমার কাছেই থাকবো। কিন্তু আমার বিয়ে করা হবে না। আমি পৃথিবী শুদ্ধ মেয়েকে মা, বোন ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারি না। ভগবান্ তোমার বৌ তৈরি করতে ভুলে গিয়েছিলেন, সেই জন্যেই মেয়ের জাত আমার মা, বোন। স্ত্রী হবার মত কেউ নেই।"

মা'র বদ্ধ ওষ্ঠে একটু ক্ষোভের হাসি খেলিয়া গেল। কিছু না বলিয়া দিবাকরের মাথায় ডান হাতটি রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

২০

প্রভাতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নাই। আকাশের নবনীল নীরদমালায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন; রহিয়া রহিয়া গুরু গুরু মেঘ ডাকিতেছে। আসন্ন বর্ষণ সম্ভাবনায় বাতাস স্তব্ধ।

মজুমদারদের পড়ো ভিটায় পাড়ার মেয়েরা অরণ্য-ভোজনের আয়োজন করিয়াছে। বসতিবিরল নিবিড় কানন বনভোজনের উপযুক্ত স্থান। এক প্রাচীন কাঁটালতলায় রন্ধন ও ভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তাড়াতাড়ি ঘরকন্নার কায সারিয়া পাড়ার কয়েকটি বধূ ও মেয়ে কাঁটালতলায় রান্না করিতে আসিয়াছে। আগামী প্রভাতে কুহু কলিকাতায় রওনা হইবে। তাহারই বিদায় উপলক্ষে বনভোজনের অনুষ্ঠান। রন্ধনের প্রচুর উপকরণ থাকিলেও মেঘের ঘনঘটায় সংক্ষেপে কায সারিতে হইতেছে। রান্না চড়িয়াছে খিচুড়ী, বেগুন ভাজা, মাছের চচ্চড়ী। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর অবধি ডোবা-নালায় ছিপ ফেলিয়া তপু ও তপুর দুই বন্ধু অনেক মাছ ধরিয়াছে। মাছের খাতিরে ছেলে তিনটিকে চড়িভাতির সভ্য-শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। কুহু কলাপাতায় করিয়া কুলের আচার আনিয়াছে। তাহার সখীগণ মা'য়ের হাতের আচারের ভক্ত। হয় ত এই আনাই শেষ আনা, এই দেওয়াই শেষ দেওয়া। স্তব্ধ আকাশের ন্যায় আজ কুহুর হৃদয় অশ্রু-বাষ্পে ভারাক্রান্ত। তাহার স্বভাবসুন্দর মুখ বিষণ্ণ, আয়ত আঁখি ছলছল।

রান্না শেষ করিয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া দিয়া মেয়েরা খাইতে বসিল। এ দলের সকলেই বিবাহিতা, কেবল কুহু কুমারী। কুহুর সহিত সকলের বন্ধুত্ব থাকিলেও তাহার সম্মুখে বিবাহিত জীবনেই সরস আলোচনায় একটু আধটু বাধ-বাধ ঠেকিত। আজ কোন বাধা নাই, উল্লাসে সবগুলি কিশোরী যেন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে।

মিত্রদের নূতন বধূ তরু বাটীর বাকী ঘিটুকু কুহুর পাতে ঢালিয়া দিয়া বলিল, "কুহুর পাতে ঘি বেশী পড়লো ব'লে তোরা রাগ করিস্ নে, ভাই? কুহুকে নিয়েই না আজকের মজা, কুহু আমাদের নতুন বৌ হতে যাচ্ছে; নতুন প্রেমে নতুন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু।"

ঘোষেদের বীণার বছর দুই হইল বিবাহ হইয়াছে। সে চোখ ঘুরাইয়া—ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, "মধু বেশী দিন থাকে না। ঐ নতুন নতুন যা, বছর না ঘুরতেই মধু ঝাল হয়ে যায়—টকে যায়। প্রথম অনুরাগে তেঁতুলের পাতাতেও অকুলান হয় না। পরে বিরাগে মানের পাতাতে যায়গা হয় না। প্রেমের কথা বইতে পড়তেই ভাল লাগে। আসলে কিছু নয়। পুরুষের আবার প্রেম, ভালবাসা। ও জাতের মুখে আগুন!"

তরু হাসিয়া বলিল, "এত রাগ কেন, ভাই? এক জনার দোষে সমস্ত জাতটার মুখে আগুন দেওয়া অন্যায়। সকলের ভেতর দেব, দৈত্য দু'টোই থাকে। তোমার বর তোমায় অনাদর করে ব'লে সকলে করে না।"

এতগুলি মেয়ের মধ্যে এতবড় অপমান বীণা নির্ব্বিকারে সহ্য করিতে পারিল না। আরক্ত-মুখে সর্পিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমার বর আমায় দেখতে পারে না। যত আদরিণী ওঁরাই। কথা শুনে গা জ্বালা করে। এখনও বছর পার হয়নি; সবে কলির সন্ধ্যে। দেখা যাবে কত ভালবাসা? নতুন নতুন তেঁতুল-বীচি, পুরান হ'লে বাতায় গুঁজি।"

তরু কহিল, "এত রাগ কেন ভাই? আমি ত মন্দ কিছু বলিনি? তুমি গোটা পুরুষ জাতটার মুণ্ডপাত করছিলে, বলেই না বলতে হ'ল? তাতে শাপ-মন্যি কেন? সত্যিকারের ভালবাসা সন্ধ্যেতে যা, রাতেও তাই। দেখতে চাচ্ছ দেখো, আমার ভয় নেই।"

উপহাসের ধারা ক্রমে কলহের দিকে গড়াইতে দেখিয়া লীলা বলিল, "তুচ্ছ কথা নিয়ে তোরা বকে মরছিস কেন রে? মুল্লুকের তর্ক এখন রেখে দে। আমোদ করতে এসে ঝগড়া বাধানো, কালকের জন্যে ঝগড়া শিকেয় তুলে রেখে স্বামী বশ করার মন্ত্রতন্ত্র যার যা জানা আছে, কুহুকে শিখিয়ে দে।"

উষা কহিল, "এখনকার মেয়েদের আর বশীকরণ-বিদ্যা শেখাতে হয় না লীলাদি, নাটক-নভেলের কল্যাণে বাঙ্গালার মেয়েরা এ বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। প্রথম চাহনিতেই কুহু জয়ন্ত বাবুকে কাহিল ক'রে দিয়েছে। ওকে কিছু শেখাতে হবে না। তোরা ওর কাছে শিখে নে।"

এক বীণা ছাড়া সকলে সকৌতুকে বলিতে লাগিল, "চোখের যাদু আমাদের শিখিয়ে দে না, কুহু! আমরা তোর শিষ্যা হব, ভাই? তোর ভয় নেই, আমরা জয়ন্ত বাবুকে অস্ত্রাঘাত করবো না। ঘরে যেটি আছে, তাকেই ভাল ক'রে বিদ্ধ করবো।"

লজ্জায় আনন্দে কুহুর মুখ আবিরের মত রাঙ্গা হইল, সে সখীদের প্রতি উজ্জ্বল-নয়নে চাহিয়া পাতের খাদ্যগুলি নাড়িতে লাগিল।

বীণা এতক্ষণ নীরবে গুম্‌রাইতেছিল। উহাদের বলিবার আর যেন কিছুই নাই। কেবলই এক বিষয়ের অবতারণা, প্রেম-পীরিত শুনিয়াই গা জ্বালা করে। একদিন সেও ঐ সব বলিতে ভালবাসিত। বালিকার করপুটে প্রীতির অঞ্জলি লইয়া প্রেমবিহ্বলা বালিকা তাহার প্রিয়তমকে—দয়িতকে উপহার দিতে গিয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহার জীবনদেবতা সে পূজা গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষায় বিদ্রূপে বালিকার সুকোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই বীণা মুখরা, বিদ্রোহিণী। তাই প্রেম, প্রণয় তাহার নিকটে তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছে। সে যাহা হইতে বঞ্চিত, অপরে তাহারই গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বীণা ইহা সহিতে পারে না।

বীণা পাতের খিচুড়ীগুলি ঠেলিয়া দিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "তোরা রেখে দে, চোখের নেশা! তোদের ন্যাকামীর কথা শুনতে শুনতে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। ভূষণডাঙ্গার জমীদারের ছেলেকে কুহু নজর দিয়ে ঘায়েল করেছে? তিনি তেমনই ছেলে কি না? তার, 'কত হাতী, ঘোড়া গেছে তল, ভেড়া বলে কত জল।' শিকারের নাম ক'রে গাঁয়ে এসে বৌ-ঝিদের ত্যক্ত ক'রে তুলেছিল, দু'চোখ যেন চোখ নয়, আগুনের ভাঁটা, ধ'রে খেতে চায়। কুহুর রূপ আছে, রূপের সেবার জন্যেই নামের বিয়ে, নইলে তার দায় পড়েছিল।"

সহসা কুহুর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। পাতের উপর হাত আড়ষ্ট হইয়া রহিল। শৈশবের পুতুল-খেলায় কিশোরের সুখস্বপ্নে দিনে দিনে তিলে তিলে যে আলেখ্য বালিকার নব উন্মেষিত অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়াছিল, সে চিত্রের কোথাও ত মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার মানসদেবতা আকাশের মত শুভ্র, সাগরের ন্যায় গভীর, ফুলের মত নির্ম্মল, ভালবাসার অঞ্জন চোখে

লাগিয়াছে বলিয়া তিনি কুহুকে আপনার হইতে আপন করিয়া লইতেছেন। সে কি রূপের লালসায় ? না মোহে ? বীণা বলে কি ?

নীলা সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুহুর দিকে তাকাইয়া মৃদু ভৎর্সনার স্বরে কহিল, "ছিঃ বীণা, তোমার এ সব বলা অন্যায়। দেখো ত কুহুর মুখটি শুকিয়ে গেল। আজ ওকে আনন্দ দিতে ডেকে এনে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। এক জন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে যা তা বলাও কিছু ভাল নয়, জয়ন্ত বাবু ভালবেসেই কুহুকে নিচ্ছেন, সুন্দরের কথা বলছ, সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ ? সুন্দর প্রজাপতি, ফুল, পাখী দেখলে আমরা কি চেয়ে থাকি না ? মানুষের দিকে মানুষ চাইলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ?"

তরু টিপিয়া টিপিয়া বলিল, "বীণা ঠাকুরঝি দেখতে ভাল বলেই জয়ন্ত বাবু চেয়ে দেখেছিলেন। তা বীণা ঠাকুরঝিকে যে ধ'রে খাননি, এই ভাগ্যি। নজর দিয়ে ধ'রে খেলে আমরা কি করতাম, ভাই ?"

তরুর বলিবার ভঙ্গীতে আবার একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল।

বীণা রাগে গর-গর করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আর ঢং করতে হবে না, খুব হয়েছে। আমি না হয় কালো-কুৎসিত আছি। তোরা আছিস সুন্দরী, সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনানো কেন ? আমি এমন কি বলেছি—যাতে কুহুর মুখ শুকনো হয় ? এ যে দেখছি, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ। এখুনি এত দরদ, দিন ত পড়েই আছে। তোকে কষ্ট দিতে চাই না কুহু, দোহাই, গোমড়া মুখে থাকিস নে, আমি যা বলেছি, তা ফিরিয়ে নিলাম। তুই হাস, একটু-খানি হাস।"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বীণার কথায় রাগ করিসনে কুহু, ওর কথার ছিরিই অম্‌নি। তুই হাস্ ভাই।"

চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত হাসিবার আদেশে কুহু গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার ওষ্ঠে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় একটুখানি হাসির রেখা খেলিয়া গেল।

আহারান্তে কুহু কহিল, "মা আমায় শীগ্‌গির ফিরতে বলেছেন, বড্ড মেঘ করেছে, বৃষ্টি আসবে, এখন তা হ'লে বাড়ী যাই ?"

"এত তাড়াতাড়ি যাবি, কুহু ? এক বাজি কড়ি-খেলা হবে না ? কত দিনের তরে ছাড়াছাড়ি, আজ যে বেশী ক'রে তোকে কাছে রাখতে ইচ্ছে হয়।" বলিয়া নীলা কুহুকে জড়াইয়া ধরিল।

কুণ্ঠার সহিত কুহু জবাব করিল, "কা'ল ভোরে যাওয়া, সব গুছিয়ে নিতে হবে। মা একলা, তাঁর কষ্ট হচ্ছে।"

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, সুলোচনা দিদি এলো না ?"

কুহু ঘাড় নাড়িল, "জামাই বাবুর ছুটী নেই, তাই তাঁদের এখানে আসা হ'ল না। সেই দিন কল্‌কাতায় তাঁরা পৌছোবেন।"

তরু বলিল, "কোন্ দিন রে ? সে কোন্ দিন ?"

"জানি না।" বলিয়া কুহু সলাজ হাসি হাসিল।

সে দিনের মত মেয়েদের বন-সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

২১

যশোদা ব্যস্তভাবে সমস্ত গুছাইয়া লইতেছিলেন। বিবাহের মেয়েলী আচারের যাহা কিছু এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। কলিকাতা সহরে কুলা, চালুনী এবং মঙ্গল-ঘট যদি না মিলাইতে পারা যায়, তখন ছেলে হয় ত বলিয়া বসিবে—"গঙ্গাতীরে, গঙ্গাজলে অনুষ্ঠান শেষ করিয়া নাও।"

দিবার আশ্বাসে ভুলিয়া যশোদাকেই বিপদে পড়িতে হইবে। সেই জন্য যাহা কিছু লইতে পারা যায়, তিনি সেই চেষ্টায় আছেন।

কয়েক দিন নগরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকি-বার আশঙ্কায় ভোলানাথ মনের খেদ মিটাইয়া পাড়া প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন।

দিদির বিবাহ ও কলিকাতায় যাওয়ার আনন্দে উৎসাহে তপুর আহার-নিদ্রা তিরোহিত হইয়াছিল। উল্লাসের আতিশয্যে তাহার সাধের ঘুড়ি-লাটাই বন্ধুদের উপহার দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মজাদার দ্রব্যজাত আনিয়া বন্ধুদিগকে বিতরণ করিবার প্রলোভনে ভক্ত বন্ধুর দল তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছে না। সঙ্গী-সাথী-পরিবৃত হইয়া তপু কল্পিত কলিকাতার আজব গল্পে আসর জমাইয়া তুলিয়াছে।

কুহু ফেরামাত্র যশোদা বলিলেন, "খাওয়া হ'ল। আজ নতুন কাপড় প'রে পায়েস খেতে হয়, তা আমার মনেই ছিল না। নখুড়ীমা এসে মনে করিয়ে দিলেন। বাজারে বেশী

দুধের কথা বলা হয়নি, ঘরের দুধটুকু দিয়েই পায়স ক'রে রেখেছি। আর খানিকটা বাদে তপুকে নিয়ে সেইটুকু মুখে দিস্ মা।"

কুহু কহিল, "এখুনি যে খিচুড়ি খেয়ে এলেম মা, খানিক বাদে আর খেতে পারবো না। ক্ষিধে হ'লে রাত্রে খাব।"

মা হাতের কায স্থগিত রাখিয়া দুঃখ করিয়া কহিলেন, "আমার যে ভোলামন হয়েছে, কিছু যদি মনে থাকে। সকালে গাই দোহান হয়, তখন যদি ক'রে দিতাম, তা হ'লে বাছার মুখে দেওয়া হতো।"

সেক্‌রা-বৌ বারান্দায় বসিয়া রাঙ্গা রেশমী সূতায় যশোদার সেকালের তাবিজ, বাজু, চিক নূতন করিয়া গাঁথিতেছিল। মা'র আক্ষেপ তাহার কর্ণগোচর হইতেই সে কহিল, "ভুল হয়েছে ব'লে সন্দে করো না মাঠা'ন, বিয়ের আগের দিন ত পায়েস খেতে হয়। কল্‌কাতায় যেয়েই দিতে পারবে, সে হ'ল গে গঙ্গাতীর; সেখেনে যাই করবে, তাতেই পুণ্যি।"

"তাই দেব।" বলিয়া যশোদা আরব্ধ কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

কুহু নিবিষ্ট-নয়নে সেক্‌রা-বৌয়ের তাবিজ-গাঁথার দিকে তাকাইয়া রহিল। খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত সোণার চাক্‌তি মানুষের হস্ত-নৈপুণ্যে কি সুন্দর ভূষণে পরিণত হয়! মানবের অস্পষ্ট ক্ষীণ আশা এমনই বাসনার রঙ্গীন সূতায় গ্রন্থিত হইয়া অলক্ষ্যে স্বপ্নের জাল বপন করে।

সেক্‌রা-বৌ একগাছা তাবিজ শেষ করিয়া কুহুর বাহুতে পরাইয়া দিতে দিতে ডাকিল, "মাঠা'ন দেখসে এসে, কুহুদির সোণার হাতে সোণার তাবিজ কেমন হয়েছে? ফাঁস এত বড়টি থাক্‌বে? না ছোট ক'রে দেব?"

যশোদা উঁকি দিয়া বলিলেন, "না, আর বড় দরকার নেই। হাত গলিয়ে প'ড়ে যাবে। অমনি থাকুক।"

কুহু তাবিজ-ছড়া সেক্‌রা-বৌকে ফেরত দিয়া মায়ের কাছে উঠিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, তোমার তাবিজ, বাজু, চিক সবই যে গাঁথতে দিয়েছ? এত দিয়ে কি হবে?"

মা জবাব দিলেন, "সব কি রে, কুহু? ভারী ত ক'টা গয়না, এত দিন আমার বোঝা হয়েছিল, এইবার তোকে পরিয়ে আমি হাল্‌কা হব।"

"সব আমি নেব না মা, দাদার বৌ-এর জন্য কিছু রেখে দাও। তোমার সব চিহ্ন দিয়ে দিলে, দাদার-বৌ, তপুর বৌ এসে কি পাবে?"

যশোদার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। দিবার বৌ আসিবে, সে সাধ-আহ্লাদ চির-জীবনের মত অতল সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি যে হৃদয় বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছেন। যেখানে ব্যথা, সেইখানেই আঘাত!

যশোদা সনিশ্বাসে কহিলেন, "না কুহু, দিবার বৌ আস্‌বে না, সে আশা আমি ত্যাগ করেছি, মা। আমার অদৃষ্টে এ শূন্যপুরী চিরকাল শূন্যই থাক্‌বে। তপু বেঁচে থাক্‌বে, বড় হবে, তবে না তার বৌ? সে অনেক দিনের কথা। যদি কখনো তপুর বৌ হয়, তুই ওর থেকেই কিছু দিস, তা হ'লেই মা'র চিহ্ন থাকবে।"

যশোদা অশ্রু গোপন করিতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু কুহুর কাছে মা'র হৃদয়-উচ্ছ্বাস গোপন রহিল না। মা'র একাকী জীবন-যাপন করিবার কল্পনায় কুহুর অন্তর কুয়াসা-ঢাকা প্রভাতের ন্যায় অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিল। কুহু সেখানে থাকিতে পারিল না। তাহার বুকের ভিতর যে অশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহা না ফেলিয়া দিলে বুক হাল্‌কা হইতে চাহে না।

রন্ধনশালার পশ্চাতে বৃক্ষ-বেষ্টিত এঁদো পুকুরের ভাঙ্গা সোপানে পা ছড়াইয়া কুহু কাঁদিতে বসিল। এ কান্না যে কিসের, তাহা সে ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। মা'র অশ্রুই তাহার অশ্রু টানিয়া আনিয়াছে? না আজন্মের স্নেহনীড় ত্যাগ করিয়া অনির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া এত ব্যাকুলতা? আজিকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, শুষ্ক বাতাস, বিষণ্ণ প্রকৃতি সকরুণ নেত্রে কুহুর পানে কি তাকাইয়া রহিয়াছে? শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীর তিন পাড়ের ঘন বন। ঘাটের সংলগ্ন কদম-গাছটি পর্য্যন্ত পল্লবের নয়ন প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। এ শৈশবের লীলা-নিকেতন—কিশোরের সুখ-বৃন্দাবন ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? দিনে দিনে এখানকার প্রতি দ্রব্যের সহিত তাহার হৃদয় যে জড়িত হইয়া গিয়াছে, ইহাদের ফেলিয়া গেলে জীবনান্তের অনেক মাধুর্য্য পড়িয়া থাকিবে।

কুহু কদম-গাছটির প্রতি চোথ তুলিল। এ বৃক্ষ তাহার স্বহস্তে রোপিত। কে জানে, কত বছর পূর্ব্বে দিবাকর ও কুহু একত্রে দুইটি কদম-গাছ রোপণ করিয়াছিল। দিবার গাছ মরিয়া গেল, কুহুরটি শাখা-প্রশাখায় বাড়িতে লাগিল। তুচ্ছ গাছ লইয়া দুই ভাই-বোনের কত উল্লাস—অভিমান।

বছর কয়েক হইল গাছে কদম-ফুল ধরিতেছে। কিন্তু এবারেই ফুল আসিয়াছে বেশী। ফুলের ভারে সরু ডালগুলি এখনই নুইয়া পড়িয়াছে। তবু সকল কুঁড়ির গায়ে এখনও কেশর গজায় নাই। গুটীকয়েক কোর বনতলের ধূলিতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। এক ঝাঁক মৌমাছি ফুলে ফুলে বিচরণ করিতেছে।

কদমগাছটিকে পাকে পাকে জড়াইয়া একটি অপরাজিতা লতা উর্দ্ধে দুলিতেছে। এটি তপু বুনিয়াছিল, এখনও ফুল হয় নাই। ফুলের আশায় তপু বহুবার কদমতলায় দাঁড়াইয়া বিস্ফারিত-নয়নে লতাটিকে নিরীক্ষণ করে।

পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে যশোদা নটের ক্ষেত বানাইয়াছিলেন। বন-কল্মী ও ভাঁটিবনে শাকের অবশিষ্ট অল্পই আছে। যাহা আছে, বর্ষার জলে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া শাকক্ষেত্রে কাজলী গাভীটিকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কুহু আস্তে আস্তে উঠিয়া দক্ষিণ পারে উপনীত হইল। কাজলী আহার ফেলিয়া দুই বিশাল নেত্রে চাহিয়া কুহুর নিকটে ছুটিয়া আসিল।

কুহু বাহু প্রসারিত করিয়া কাজলীর গ্রীবাদেশ জড়াইয়া ধরিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "কাজলী, কাজলী, কি খাচ্ছিস? আহা, কাঁটায় গা তোর ছড়ে গেছে। মশা কামড়ে গলাটা ফুলিয়ে দিয়েছে। এত কষ্ট, তবু খাওয়া ছাড়িস নে, বড্ড লোভী ত?"

এ তিরস্কারের ভাবার্থ কাজলী উপলব্ধি করিল কি না, তাহা ভগবান জানেন। কিন্তু কুহুর স্নেহ সে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিয়া তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া হাত চাটিতে লাগিল। কুহু স্তব্ধ অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কা'ল এতক্ষণ সে কতদূরে থাকিবে! আর ইহারা? কুহুর চোখের কোণে জল আসিল। বর্ষার মেঘ আরও ঘন গভীর কালিমায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সজল শীতল বাতাসে ভাঁটিফুলের মিঠা গন্ধ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। স্বর্ণরেণুর ন্যায় কয়েকটা বাব্‌লা-ফুল শাখাবিচ্যুত হইয়া কুহুর মস্তকে ঝরিয়া পড়িল।

মেঘের ঘটায় ভৃত্য সনাতন কাজলীকে লইতে আসিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ কি দিদি, কাজলীরে সোহাগ করতে বনবাদাড়ে আস্‌ছেন কেনে? আমারে কইলেই বাড়ী নিয়ে দিতাম। পায়ে যদি জোঁক ধরতেন, তা হ'লে কি করতে?"

কুহু স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "না সনাতন দাদা, আমার পায়ে জোঁক ধরে না। এমন যায়গায় কাজলীকে আর কখনও বেঁধে রেখো না, মশা কাম্‌ড়ে ওর গলা ফুলিয়ে দিয়েছে। দড়িটা খুলে আমার হাতে দাও, আমিই কাজলীকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।"

সনাতন বাবলা-গাছের গুঁড়ি হইতে কাজলীর বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া কুহুর হাতে তুলিয়া দিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

মৌন ভাষা

শুধালে তাহারে কিছু
সরম আবেশে হাসে মৃদু মধু
নয়ন করিয়া নীচু।

সাধাসাধি যদি করি
হাসিয়া নয়নে নয়ন মিলায়
ক্ষণতরে সুন্দরী।

ভাষায় যে কথা ফুটে না কখনো
সে কথা হাসিতে ফুটে—
সরম-জড়িত-নয়নের কোণে
অরুণ-অধর-পুটে॥

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত।

বাঙ্গালা সাহিত্য, ৭ম অধ্যায়—চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাসের নাম করিতে গেলেই 'রামী' বা 'রামতারা' বা "রামা ধুবনী"র নাম আপনিই আসিয়া পড়ে। রাধার নামের সাথে যেমন কৃষ্ণ, হরের নামের সাথে যেমন গৌরী, রামের নামের সাথে যেমন সীতা বা নলের নামের সাথে যেমন দময়ন্তীর নাম অতর্কিতভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়, তেমনই—"কামগন্ধবর্জ্জিত" সজীব মূর্ত্তি চণ্ডীদাসেরও নামের সাথে "রামী"র নামও মানসপটে জাগিয়া উঠে।

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে "চণ্ডীঠাকুর" বলিয়া ডাকিত। বীরভূম জিলার অন্তর্গত থাকুলি থানার অধীনে, সিউড়ির পূর্ব্বাংশে বারো ক্রোশ দূরে "নান্নুর" নামক গ্রামে এক শিলাময়ী দেবী ও তাঁহার মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান। দেবীর নাম বিশালাক্ষী। চণ্ডীদাস ঐ নান্নুরে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীদাসের পিতা উক্ত বিশালাক্ষী দেবীর পুরোহিত ছিলেন। বিশালাক্ষী চণ্ডীরই নামান্তর। দেবীর পূজক পিতা এই জন্যই বোধ হয় পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তির উপাসক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস উক্ত মন্দিরে পুরোহিত নিযুক্ত হন।

"চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ **চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে** নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়দেবের কেন্দুবিল্ব (বর্ত্তমান কেঁদুলী) ও বিদ্যাপতির বিসপী হইতে নান্নুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ। চণ্ডীদাসের নিবাসভূমি পবিত্র নান্নুর পল্লী এবং তথায় পাগল চণ্ডীর স্বর্গীয় অশ্রুসিক্ত পবিত্র বাশুলী দেবীর মন্দির এখনও আছে। সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রেমের যে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল, এ জগতে তাহার তুলনা নাই; প্রেমিকের নিকট নান্নুর পল্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য সুদৃশ্য।" ১৪৫

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁকুড়া "আনন্দভবন"-নিবাসী সাহিত্য-রসিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা বি, এ, বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, "নান্নুর" বীরভূমিতে নহে, বাঁকুড়ার অন্তর্গত পল্লীবিশেষ।

চণ্ডীদাস যে বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন, পদকল্পতরুর কতিপয় পদে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পদ কয়টি এই :—

"চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতিগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাসগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ ॥
দুহুঁ উত্‌কণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল ॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই, চলল দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন, দুহুঁ গুণ গাওত, দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি ॥
দৈবহি দুহুঁ দোহাঁ দরশন পাওল, লখই না পারই কেহি।
দুহুঁ দোঁহা নাম শ্রবণে তহি জানল, রূপনারায়ণ গেহি ॥" ১৪৬

বিদ্যাপতির পদাবলী—যাহা "বিদ্যাপতি" বলিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত, তাহা যেমন কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের আকারে পাওয়া যায় নাই, সেইরূপ চণ্ডীদাসের পদসমূহও গ্রন্থাকারে পাওয়া যায় না, অপরাপর বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহাদের উভয়ের পদসমূহ উদ্ধৃত দেখা যায় এবং তাহাই সঙ্কলিত হইয়া পরবর্ত্তী সময়ে, নানা সম্পাদক কর্ত্তৃক, উভয় কবির রচিত পদ গ্রন্থের রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৪৭

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী যে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বেও দেশে কিরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা পদকল্পতরু ও চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। চৈতন্যদেব,—অবসরকালে,—পারিষদ সহ জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ পাইতেন। পদকল্পতরুতে আছে—

"জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রস-শেখর অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
চকর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্যপদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত ॥

১৪৫—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫ম সংস্করণ পৃঃ ১১১

১৪৬—পদকল্পতরু—vide Literature of Bengal by R. C. Dutt. P. 29.

১৪৭—ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ—৩৮

আবার চরিতামৃতেই দেখি—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীত,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গান শুনে পরম আনন্দ॥ ১৪৮

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অক্লান্তকর্ম্মা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে,—চণ্ডীদাসের প্রণীত "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামে একখানি অতি প্রাচীন ও প্রমাণযোগ্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা মুদ্রিত এবং ভারতীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যরূপেও নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ঐ পুঁথি সম্বন্ধে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন বলেন :—

"এই পুঁথিখানি যে অতি প্রাচীন অক্ষরে লিখিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুঁথিখানি আমি দেখিয়াছি, এ পর্য্যন্ত ৭।৮ হাজার বাঙ্গালা পুঁথি আমি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এরূপ প্রাচীন পুস্তক অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। এই পুস্তকখানির অক্ষর দেখিয়া কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, ইহার হস্তলিপি ১৩৮৫ খৃঃ অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ের, বরং তাহারও পূর্ব্বের, কিছুতেই তৎপরবর্ত্তী নহে।" "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আরও জানা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত, তিনি "বড়ু" উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাশুলী দেবীর আজ্ঞায় পদ রচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্ব্বে তাঁহার অনন্ত নাম পাওয়া গিয়াছিল। * * সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই।" ১৪৯

চণ্ডীদাসের প্রণীত "কৃষ্ণকীর্ত্তনের" নকলই যদি ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহারও পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকে, তবে **চণ্ডীদাস স্বয়ং অন্ততঃ যে চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশে বর্ত্তমান ছিলেন,** এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

মহাকবি কালিদাসের সময় হইতে দেড়শ দু'শ বছর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক জন কবি যশস্বী হইয়া উঠিলে, তন্নামক একাধিক কবি গজাইয়া উঠিতেন। চণ্ডীদাসের বেলায়ও উহা ঘটিয়াছিল। ২।১টি নকল চণ্ডীদাস দেখা দিয়াছিল। আবার "কৃষ্ণকীর্ত্তনের"—চণ্ডীদাস ও পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, ইহাও কতিপয় ঐতিহাসিক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের সময় এখনও আসে নাই। আরও আলোচনার দরকার। ক্রমে কালে সত্য প্রকাশ পাইবেই পাইবে।

যাহা হউক, বিশ পঞ্চাশ বছর আগে বা পাছে—জন্মের তারিখ লইয়া চণ্ডীদাসের মহত্ত্বের মাপ করা চলে না বা তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বের দরদস্তর হয় না।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে। সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য তত বেশী না থাকিলেও, চণ্ডীদাস যে সেই ছয় শত সওয়া ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও স্বীয় অনির্ব্বচনীয় কবিতার মাধুর্য্যে বাঙ্গালার প্রেমিক অধিবাসী দিগের হৃদয় কতটা জুড়িয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অনেকটা বোঝা যায়।

পরম শাক্তের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং নিজে শাক্ত হইয়া কি কারণে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের ভক্ত হইলেন, এ সম্বন্ধে যত কিংবদন্তী প্রচলিত, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতটি বড়ই চিত্তাকর্ষিণী, তাই পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহৃত হইল।

শৈশব হইতে চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী বা বাশুলী-নাম্নী শক্তি-দেবতার অর্চ্চনা করিতেন, কবির কবিতাতেও বহুস্থলে বাশুলীর স্তুতি ও নাম আছে। এক দিন স্নান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস দেখেন—একটি সুন্দর ফুল নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তিনি অমনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ফুলটি তুলিয়া লইলেন ও তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া, বিশালাক্ষীর চরণে ফুল দিবার জন্য মন্দিরে ছুটিয়া গেলেন। মন্দিরে উপস্থিত হইতেই দেবী স্বয়ং চণ্ডীদাসের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, ঐ ফুলটি আমার মাথায় পরাইয়া দাও। ভক্ত চণ্ডীদাস পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেবীকে যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ ফুলটির এমন কি মাহাত্ম্য যে, তুমি স্বয়ং সশরীরে প্রাদুর্ভূত হইলে এবং ফুলটিকে মাথায় দিতে অনুমতি করিলে? আমার যে বাসনা মা ফুলটি তোমার রাঙ্গা পায়ে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই।"—মা বিশালাক্ষী তখন সস্মিত-বদনে কহিলেন—"বোকা ছেলে, আমার উপাস্য দেবতার পূজায় ঐ ফুল ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা আমার পায়ে অর্পিত হইতে পারে না, সে আমায়, আমি মাথায় পরি।" বলিয়াই দেবী ফুলটি চণ্ডীদাসের হাত হইতে লইয়া মাথায় পরিলেন, ভক্ত চণ্ডীদাস তখন ভক্তিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার আবার উপাস্য

১৪৮—Literature of Beugal P. 23.
১৪৯—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ—১১৯

কে মা ?"—"শ্রীকৃষ্ণ" এই উত্তর দিয়াই—দেবী অন্তর্হিত হইলেন, এবং সেই দিন হইতে বিশালাক্ষীর পূজা ছাড়িয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণের পূজায় দেহ-মন অর্পণ করিলেন।—

খুব সুন্দর বটে, কিন্তু একটু নিবিষ্টভাবে করিলে মনে হয়,—পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবগণ, শক্তি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য যে অধিক, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই সব উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৫০

নিজের অপ্রতিম কবিত্ব-শক্তির প্রভাবে চণ্ডীদাস নিজে যেমন অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, কবিতার মধ্যে "রামা ধুবনী" বা রামীর নাম, হারের মধ্যে মধ্যমণির মত গাঁথিয়া—তাঁহার সাধনা-মার্গের পুতুল রামীকেও অমর করিয়া রাখিয়াছেন। এ সম্বন্ধেও বহু কিংবদন্তী প্রচলিত, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতটিই অনেকাংশে সত্যের সন্নিহিত বলিয়া মনে হয়।

চণ্ডীদাস যখন সাধন-ভজন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন, তখন এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "এরূপ অর্দ্ধভাবে সাধন হইতে পারে না, উহাতে সাধকের পূর্ণতা আবশ্যক, অর্থাৎ—সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদোষমুক্ত একটি সঙ্গিনীর প্রয়োজন। অন্য কোনরূপ পার্থিব সম্বন্ধে বা উপায়ে সংগৃহীত সঙ্গিনীর দ্বারা সিদ্ধি হইবে না, যাহার প্রথম সন্দর্শনে চণ্ডীদাসের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তদ্‌গত হইয়া পড়িবে, সেই কামিনীই তাঁহার সাধনমার্গের অনুরূপ সহায় হইবে।" চণ্ডীদাস তদবধি সেইরূপ নিষ্পাপ রমণীর সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী দিন ঘুরিতে হইল না, এক দিন দেখিলেন, এক রজকিনী নদীতে কাপড় কাচিতেছে, প্রথম দৃষ্টিতেই চণ্ডীদাস আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং রজকবালাকে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। পরে, প্রতিদিন মাছ ধরিবার ছলে একটা "ছিপ" হাতে লইয়া ঐ ধোপার ঘাটের অদূরে যাইয়া বসেন ও অনিমেষনেত্রে রজক-দুহিতার দিকে চাহিয়া থাকেন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল, সরল হৃদয়, প্রেমিক চণ্ডীদাস বাড়ী-ঘর, মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন,—সমস্ত ত্যাগ করিয়া ঐ রজকিনীর সহিত একত্র বসবাস করিতে লাগিলেন।—উহারই নাম রামী। চণ্ডীদাস উহাকেই পুনঃ পুনঃ—"শুন রজকিনী রামী" বলিয়া কবিতার বাঁশরীতে আহ্বান করিয়াছেন। ১৫১

চণ্ডীদাস অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। তখন সঙ্গীতে তাঁহার সমকক্ষ বড় আর কেহ ছিল না। এক দিন মতিপুর নামক স্থানে রামীকে লইয়া তিনি গান করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে পথিপার্শ্বস্থ এক গৃহের মধ্যে যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ ঐ গৃহ পতিত হইয়া প্রেমিক-যুগলকে নিহত করে। রামী ও চণ্ডীদাস একাত্মভাবে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ১৫২

আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের যে মার্জ্জিত বঙ্গভাষার অমিয় প্রবাহে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র সরস ও প্লাবিত,—ঐ প্রবাহের প্রথম অভিব্যক্তির উৎস ছিল সেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কবি চণ্ডীদাসের অনুপম হৃদয়।—"বান" ডাকিয়াছিল,—সারা বাঙ্গালা সেই বানে ডুবিয়াছিল, গত ছয় শত বৎসর ধরিয়া, থিতাইয়া থিতাইয়া,—সেই বানের জল বর্ত্তমান সুমার্জ্জিত, সুনির্ম্মল বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে যখন সুপ্রসিদ্ধ কবি চসার (Geoffrey Chaucer ১৩৪০—১৪০০ খৃঃ অঃ) ক্যান্টারবেরি টেলস্ (Canterbury Tales) নামক গ্রন্থ লিখিয়া অমরতা লাভ করেন, বাঙ্গালা দেশে তখন চণ্ডীদাস, তাঁহার অননুকরণীয় বংশীর সুরে ও স্বরে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস সত্যই বাঙ্গালার "চসার" ছিলেন। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস যে প্রথম গান ধরিয়াছিলেন, তাহার সুরের রেশ যেন এখনও অনন্তে মিলায় নাই, সে গানের শেষ তান যেন এখনও লয় হয় নাই। তাহা বাঙ্গালার কুঞ্জে কুঞ্জে, শ্যামল বনানীর প্রতি তরুলতার পত্রে পত্রে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহারই সুরে সুর মিলাইয়া, বাঙ্গালার অধিবাসীরা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় গায়—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

যদিও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় গীতি-কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সুপরিশুদ্ধ গীতি-কবিতার আদি বাঙ্গালী কবি বলিতে তাঁহাদের উভয়কেই

১৫০—R. C. Dutt's Literature of Bengal, P. 30.

১৫১—R. C. Dutt's Literature of Bengal, P 30, 31.
১৫২— ঐ ঐ পৃঃ—৩১

আমরা বুঝি। কিন্তু এই দুই মহাকবির কবিত্বগত ব্যবধান বড় কম নহে। এ সম্বন্ধে জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের উক্তি যেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিত্বস্বর্ণের নিকষোপল। বিশ্বকবি বলিয়াছেন:—"গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এই জন্য ছন্দ, সঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙ্গে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এই জন্য তাহাতে সৌন্দর্য্য সুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যবহিত সঙ্গীতধ্বনি। দুঃখ নাই যে তাহা নহে, কিন্তু দুঃখের মাঝখানে একটা অন্তরাল ব্যবধান আছে। হয় সুখ, নয় দুঃখ, হয় মিলন, নয় বিরহ, এইরূপ পরিষ্কার শ্রেণী-বিভাগ। চণ্ডীদাসের মতো সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেই জন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।" ১৫৩

"চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক, বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর। এক জন ভাবুক, অপর দার্শনিক। এক জন সোজা কথায় সরল ভাষায় সাধারণের মন মাতাইয়াছেন, অন্য ব্যক্তি রচনাচাতুর্য্যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও শব্দ-বিন্যাসে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পণ্ডিতের সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন।" * * বিদ্যাপতি "সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক রত্ন গ্রহণ করিয়া পদাবলী গ্রথিত করিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাস আপনার হৃদয়-উৎস হইতে যাহা কিছু উৎসারিত হইয়াছে, তাহাই সুমধুর সরল ভাষায় বিন্যাস করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতাতে ছন্দঃপতন বা যতিপতন প্রায় হয় না, চণ্ডীদাসের তাহা ভূয়োভূয়ঃ হইয়াছে। কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর সুমিষ্ট গীতধ্বনির সহিত বনবিহঙ্গের মধুর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের মর্ম্ম-উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত-উল্লাসের সেইরূপ প্রভেদ। "ভারতী, ১ম বর্ষ ২৮৪।" ১৫৪

বঙ্গমাতার বরেণ্য পুত্র, বঙ্গ-সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধি-প্রাপ্ত রমেশচন্দ্র দত্ত—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার "বাঙ্গালার সাহিত্য" নামক উপাদেয় ইংরাজী গ্রন্থে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যে তুলনার সমালোচনা করিয়াছিলেন,' পাঠকগণের তৃপ্তি-সাধনার্থ তাহা উদ্ধৃত হইল।

"The poetry of Chandidas presents a striking contrast to that of Bidyapati. Both are poets of high order, both sang of the amorus of Krishna and Radha, both are noted for the beauty of their songs, but here the parallel ends. Bidyapati excells in the richness of his imagery, the wide range of his ideas, the skill and art displayed in his varied similiesy. Chandidas has but his native, simple, excessive sweetness in place of all these qualities. Bidyapati ransacks the unbounded stores of nature and of Art to embellish his poetry; Chandidas looks within, and records the fond workings of a feeling, loving heart in simple strains. In Chandidas's poetry there is a wealth of feeling and pathos; Bidyapati combines this with a quick fancy, a varied imagery, a leaning for grace and ornament. The faults of the two poets are also characteristic. Chandidas is cloying and sometimes monotonous. Bidyapati is often artificial in his images and ideas. At the same time both display a knowledge of the workings of a lover's heart and pourtray them feelingly and minutely,—the first troubled impressions of love, the resistless force of its influence, the bitter pangs of separation and jealousy, the workings of hope, the effects of despair." ১৫৫

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আর এক স্থলে বলিয়াছেন—"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লেখাইয়া লন।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন; চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার সুখের মধ্যে ভয় ও দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে, মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন। চণ্ডীদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে, প্রেমের যা কিছু সুখ, সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়। চণ্ডীদাস কহেন প্রেমের কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।" ১৫৬

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থল লইয়া দেখিলে—উভয়ের কবিত্বের

১৫৩—আধুনিক সাহিত্য, বিদ্যাপতির রাধিকা, প্রারম্ভভাগ।

১৫৪—"বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের সুন্দর তুলনা" বলিয়া "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" (১৩১৭) গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ৪০।

১৫৫—R. C. Dutt's Literature of Bengal (1877) P. 32

১৫৬—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য (১৩১৭) পৃঃ ৪১, পাদটীকা।

তুলনা একটু সহজ-বোধ্য হইতে পারে।—নিম্নলিখিত স্থলে বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণের প্রথম রাধাদর্শন ও চণ্ডীদাসের রাধার প্রথম কৃষ্ণনাম শ্রবণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির—কৃষ্ণের প্রথম রাধাদর্শনে—

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘলতা সঙ্গে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।
আধ আঁচল খসি, আধ বদনে হাসি, আধই নয়ন তরঙ্গ,
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি, তদবধি দগধে অনঙ্গ।
একে তনু গোরা, কনয় কটোরা, অতনু কাঁচল উপাস,
হরি হরি কহ মন, জনু বুঝি ঐছন, ফাঁস পসারল কাম।
দশন-মুকুতা-পাঁতি, অধর মিলায়ত, মৃদু মৃদু কহত হি ভাষা,
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে যে দুখ রহ, হেরি হেরি না পূরল আশা। ১৫৭

চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রথম কৃষ্ণনাম শ্রবণে—

সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়ান দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায়॥ ১৫৮

প্রথম দর্শনের পর,—শ্রীরাধার মনের ভাব, হৃদয়ের আবেগ প্রভৃতি বিদ্যাপতির ভাষায়—

কানু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব ধরী অবোধী জুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় না পারি॥ ৪
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লইগেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥ ১২
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৫৯

চণ্ডীদাসের রাধার প্রথম শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পর হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ?—

সিন্ধুড়া

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা।
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি
দেখায় খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ করি, ময়ুর ময়ুরী—
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥ ১৬০

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিদ্যাপতির শ্রীমতীর সখীর নিকট আর্ত্তনাদ-

(১৯)

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—
শূন্য মন্দির মোর॥ ৩
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥ ১১
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন-রাতিয়া॥ ১৫। ১৬১

১৫৭ বিদ্যাপতি, বসুমতী সংস্করণ।
১৫৮ চণ্ডীদাস, বসুমতী সংস্করণ।
১৫৯ কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতি, (১৩০৫) পৃঃ ৪৩
১৬০ বৈষ্ণব পদাবলী, বসুমতী, চণ্ডীদাস পৃঃ ৮
১৬১—কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতি, (১৩০৫), পৃঃ—১৭২

কৃষ্ণবিরহে চণ্ডীদাসের রাধিকার সখীর নিকট বিলাপ—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করমদোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু
বরজ পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পীরিত
মরমে রহল শেল ॥ ১৬২

সখীর প্রশ্নে বিদ্যাপতির রাধিকার কৃষ্ণপ্রীতি বিষয়ক উচ্ছ্বাস-

(১৩)

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ৩
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনন্নু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥ ৭।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥ ১১।
কত বিদগধজন রসে অনুমগন
অনুভব—কানু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥ ১৫৩। ১৬৩

চণ্ডীদাসের রাধিকার কৃষ্ণানুরাগে কেমন অবস্থা?—

কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই
কানাকানি শুনি এই কথা ॥
সই, লোকে বলে কালাপরীবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো।
ত্যাজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা ॥ ১৬৪

পদকর্ত্তাদের পদাবলীর পাঠ এবং তাহা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা বড়ই কঠিন। কত কাল—কত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু যখন পড়ি, যতবার পড়ি, তখন এবং ততবারই মনে হয়,—এক নূতন অপূর্ব্ব বস্তু। বাঙ্গালা দেশ এক দিন এই মধুর সঙ্গীতে মাতিয়াছিল। বাঙ্গালী কবি সজল-নয়নে প্রেমের এই অপূর্ব্ব কাহিনী গাহিয়াছিলেন,—ইহা যখন ভাবি, তখন সত্যই, বাঙ্গালাদেশে জন্ম এবং বাঙ্গালী বলিয়া একটা অপরিসীম শ্লাঘা অনুভব করি!

ছন্দের পরিশুদ্ধতায়, উপমার ঝঙ্কারে, সংস্কৃত শব্দরাশির স্থানোপযোগী সঞ্চয়নে বিদ্যাপতি যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সরল-ভাবে এবং অতি সহজ কথায়, হৃদয়কে ব্যবচ্ছেদ করিয়া একটি একটি করিয়া, তাহার অন্তর্নিগূঢ় ভাবগুলি দেখাইতে চণ্ডীদাস তেমনই প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। বিদ্যাপতি বীণাপাণির পাদপূজার জন্য বাছিয়া বাছিয়া, অতি সদয় হস্তে, ধীরে ধীরে কুসুম চয়ন করেন, যেন একটি পাপড়িও না ভাঙ্গে বা না মুচড়ায়, আর চণ্ডীদাস ভাবের মাদকতায় উন্মত্ত হইয়া মায়ের পূজার জন্য কুঞ্জে কুঞ্জে ছুটিয়া ছুটিয়া, সম্মুখে যাহা পান, তাহাই আনিয়া মায়ের চরণে ঢালিয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। যাহা সুন্দর, যাহা নবীন, যাহা নয়নবিমোহন, তাহাই বিদ্যাপতির,—পাগল চণ্ডীদাসের কাছে ভাল-মন্দ নাই,—লৌকিক বিচারে যাহা সদসৎ, তাহার তিনি ধার ধারেন না। যাহাতে প্রাণ আছে, যাহাতে দেবদুর্লভ হৃদয় আছে, তাহাই তিনি আবেগভরে কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বাশুলীর চরণপ্রান্তে যান ও উপহার দেন। ভস্মের মধ্যেও রত্ন দেখিলে তিনি সযত্নে তুলিয়া লন। বিদ্যা-পতির প্রেমকুসুমের বিকাশ দেখিতে পাই কেবল বসন্ত

১৬২—বৈষ্ণব পদাবলী বসুমতী, চণ্ডীদাস, পৃঃ—৭৪
১৬৩—কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতি, (১৩০৫) পৃঃ ২১৪।
১৬৪—বৈষ্ণব-পদাবলী, বসুমতী, চণ্ডীদাস, পৃঃ—৬৭

ঋতুতে, আর চণ্ডীদাসের প্রেমের ফুল ছয় ঋতুতেই সমান ফোটে। চণ্ডীদাসের কাছে উচ্চ-নীচ নাই, ইতর-ভদ্র নাই, যেখানে হৃদয়ের সন্ধান পান, সেইখানেই গিয়া তিনি আত্ম-সমর্পণ করেন। "রামাধুবনী"ই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বিদ্যাপতির প্রেম ভোগের কস্তুরিকার সৌগন্ধে সর্ব্বদা ভুর-ভুর করে, আর চণ্ডীদাসের প্রেম ভোগবর্জ্জিত, "কামগন্ধ নাহি তায়।" প্রেম এবং উপভোগ তিনি এক করিয়া দেখেন না।

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলিয়াছেন :—

"ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহ্লাদ-বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস-রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপমা দৃষ্টে প্রীত হইবেন, এবং তদপেক্ষা উচ্চ-শ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিহ্বলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিবেন। কিন্তু সরল মর্ম্মের কথা—যাহাতে প্রাণ উদ্‌গ্রীব হইয়া সাড়া দেয় এবং যাহার অবিসংবাদিত দাবী চোখের জলের উপর, সেরূপ কথা বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস বেশী কহিয়াছেন। * * তদীয় গীতিকবিতায় সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষ-মিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রথিত রহিয়াছে। কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাস প্রভু—কর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণব পদের সঙ্গে সেগুলি একই মূল্যে বিকাইবে। তাদৃশ পাঠক সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে,—

> কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল
> গুঞ্জা রতন করই সমতুল ॥
> যো কিছু কভু নাহি কলা রসজান।
> নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান ॥ ১৬৫

"বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাসের পৃথক কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার রচিত পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়।" ১৬৬ প্রকৃতপক্ষে ইহারাই বাঙ্গালার প্রথম কাব্যরচয়িতা, না ইহাদেরও পূর্ব্বে এতাদৃশ অন্য কোন কাব্য ছিল? তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা যাঁহাদিগকে আদি কবির যশোমাল্য দিতেছি, তাঁহারাই আদি কবি কি না, ঠিক বলা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা এই প্রাচীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার হলাগ্রভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না।" ১৬৭ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বারান্তরে আলোচ্য।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

১৬৫ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং পৃঃ ২২৪
১৬৬ বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য, ন্যায়রত্ন ৩য় সং, পৃঃ ৩৮
১৬৭ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র ৩য় সং পৃ ১১৪, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের ৩য় সংস্করণের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠের পাদটীকাধৃত।

সন্ধ্যা-বেলা

ধীরে ধীরে নদীতীরে নামে পল্লীবধূ—শতদল সুন্দরীর নয়ন মলিন,
লুকায়েছে অন্তরালে দিবসের আলো, সন্ধ্যাবায়ে ব্যথা লাগে বনানীর বুকে ;
পারাবারে যারা যারা গেছে তরী নিয়ে—অন্ধকারে শ্যামসিন্ধু হয়ে যায় লীন,
মায়াময়ী বনলতা জড়ায়েছে তরু, নীরবতা কণ্ঠে রহে, বাণী নাহি মুখে।
নিরালায় ঝিল্লীরব উঠে অবিরত, ঘুম আসে বিহঙ্গের সারা দিন গেয়ে,
পথ-ভোলা ভ্রমরের বিষাদের কথা, মুকুলের মনোমাঝে আঁকে অবসাদ,
সব বাধা পুঞ্জীভূত প্রিয়জন বিনে, অশ্রু ঝরে বিরহীর আঁখিপুট বেয়ে ;
কোন আশা না মিটিতে দূরে যায় তার প্রেম-তীর্থ পথে যেতে ছিল যত সাধ।

অলক্ষ্যে ফুটিছে তারা, দেবদাসী সম আরতির উপচার অর্ঘ্য বহি আনে,
গগন-মন্দিরে হাসে একে একে সবে দেবতার বন্দনায় নাচে দলে দলে।
সুদূরের শঙ্খধ্বনি দিবসের শেষে রাত্রি যেথা মিশিতেছে সেই পথপানে—
প্রণাম জানাই মোর নত করি শির, প্রয়াগ-সঙ্গম যেথা হ'ল পলে পলে।

দিনান্তের মোহানায় অলস-চরণে সঙ্গিহীন চলিয়াছি শূন্য মোর সব,
হিসাবের খাতাখানি হাতে আছে শুধু, নাহি কোন জীবনের পণ্য কলরব।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

তুলোরাম-খেলারাম

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

তুলোরামের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, খেলারামের ও বালাই নাই। কারণ,—খেলারাম বিবাহের পরই বিপত্নীক। স্ত্রী মৃত্যুকালে মাত্র তিন মাসের কন্যা স্বামীকে উপহার দিয়া স্বর্গীয়া হইয়াছেন। খেলারাম সেই কন্যাটিকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন এবং "নলিনীর" পাছে এতটুকু অযত্ন হয়, এই ভয়ে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। যে ভাবে খেলারাম নলিনীকে লালনপালন করিতেন, অনেক ধনবান নিজপুত্রকন্যাকে সেরূপ আদরযত্নে মানুষ করে কি না সন্দেহ। "নলিনী" অপ্সরার মত সুন্দরী না হইলেও গৃহস্থ ভদ্রলোকের ঘরে তাহাকে সুন্দরী বলা চলে। রংটি ফর্সা, মুখখানি নিখুঁত না হইলেও দেখিলে সবাই বলিত— "দিব্যি মেয়েটি।" বাপের খাওয়া দাওয়ার তদ্বিরে নলিনীর গড়নখানি চমৎকার দাঁড়াইয়াছিল। মেয়েকে সাবান মাখাইয়া স্নান করানো হইতে—মেয়ের চুল বাঁধা কার্য্যটি পর্য্যন্ত খেলারাম নিজে উপস্থিত থাকিয়া সম্পন্ন করাইতেন। পোষাক-পরিচ্ছদ, এসেন্স-পাউডার ইত্যাদির নলিনীর কিছুমাত্র অভাব ছিল না। বিধিদত্ত সৌন্দর্য্য যাহা ছিল, বাপের "তোয়াজে" নলিনীর সে সৌন্দর্য্য চারগুণ বাড়িয়াছিল,—কথাটা অতি সত্য। খেলারাম নলিনীকে বেথুন কলেজে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। গানবাজনায় নলিনী বাপের দৌলতে বেশ ভালরকম "পোক্ত" হইয়াছিল।

বগা-বৌ বলিত, "নিজে না খেয়ে না পোরে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে মেয়েটাকে বেশ নবাবের মেয়ের মত তৈরী করেছ, ঠাকুর-পো! এবার করবে কি? মেয়ের যে চোদ্দ পেরিয়ে গেল। বিয়ে দিতে হবে ত?"

খেলারাম বলিতেন, "সময় হলেই দেওয়া যাবে, বৌদি!"

"দেওয়া ত যাবে, ঠাকুরপো। কিন্তু দেবে কোথা থেকে? মেয়ের যে রকম নবাবী চাল করিয়ে দিয়েছ, ও কি গরীব গেরো-স্তোর ঘরে মন বসিয়ে ঘর-বসতি করতে পারবে?"

"আরে ছোঃ, বৌদি! আমার মেয়ের বিয়ে দেবো গরীব গেরোস্তোর ঘরে? দস্তুরমত লাখো-পতির বৌ হবে আমার নলি-রাণী!"

বগা-বৌ দেবরের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া থাকিত।

"দাদার আর তোমার ছি-চরণের আশীর্ব্বাদ থাকলে, দেখবে, নলি আমার রাজার বেটার বৌ হবে!"

বগা-বৌ দেবরটিকে যথার্থই ছোট ভায়ের মতই ভাল-বাসিত। নম্রস্বরে বলিল, "আশীর্ব্বাদ ত নলিকে দিন-রাত্তির কচ্ছি, ঠাকুরপো! কিন্তু বাজার যে খারাপ! নইলে এমন রূপে গুণে 'সবার-টেক্কা' মেয়ে তোমার, ওর ত লাখ-পতির ঘরে বিয়ে হওয়াই উচিত। তবে কি জানো ভাই, সবই টাকার খেলা! টাকা যেমন খরচ করবে, পাত্রও তম্‌নি মিলবে! লাখপতির ঘরে মেয়ে দিতে হ'লে দু'দশ হাজার টাকা খরচ করতে হবে, ভাই! সে ত আমরা পেরে উঠবো না।"

রামশঙ্কর মুখুয্যে হালি বড়লোক। পাড়া প্রতিবেশী হিসাবে তুলোরাম-খেলারাম তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। রামবাবু কৃপণ ব্যক্তি,—কাহারও সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতেন না। পাছে অনর্থক দু'দশ টাকা খরচ হয়। বড়লোক বলিয়া সকলেই তাঁহাকে খাতির করিত, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ তেমন কেহ পাইত না। কিন্তু তুলোরাম-খেলারাম ভ্রাতৃযুগল তাহা মানিবেন কেন? যেখানে ছুঁচ চলে না, সেখানে বেটে চালানোই তাঁহাদের কায। রামবাবু আমল না দিন, তাঁহারা ঘনিষ্ঠতা করিতে ছাড়িলেন না। বিশেষতঃ খেলারাম ভাইটি।

সকাল-বিকাল মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া খেলারাম রামবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। রামবাবুর চারিটি ছেলে,— বড়টির নাম গিরিজাশঙ্কর। দিব্য ছেলে, বি এস্ সি পড়িতেছে, দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়! রামবাবুর পত্নীর তাগিদে চারিদিকে পাত্রী অন্বেষণে ঘটক-ঘটকী ছুটিয়াছে। খেলারামের নজর এই ছেলেটির উপর প্রথম হইতে।

বাপের উপদেশে নলিনী রামবাবুর বাড়ীতে সকলের সঙ্গে 'বাড়ীর মেয়ের' মত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিল। রূপবতী গুণবতী মেয়েটিকে রামবাবু—বিশেষতঃ রামবাবুর গৃহিণী বাস্ত-বিক অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিলেন। রাম-গৃহিণী যখন তখন নলিনীকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনাইতেন, গান শুনিতেন। রামবাবুর ছেলেমেয়েরাও নলিনীকে পাইলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইত। খেলারাম বুঝিলেন—"ওষুধ ধরেছে!"

ভিতরের অবস্থা যেমন হউক, তুলোরাম-খেলারাম লোকের কাছে মুখে "লাখ-পঁচাশী" করিতে খুব মজবুত। "দেশে আমাদের মস্ত বড় জমীদারী! মাম্‌লাটা একবার চুক্‌লে হয়,— তা হ'লে কল্‌কেতায় বড়মানুষী কি ক'রে করতে হয়—একবার দেখিয়ে দিই—" ইত্যাদি ইত্যাদি এমন সব কথা রামবাবুর মত লোককে গুছাইয়া বলিতেন যে, মনে মনে একটু সন্দেহ করিলেও কথাগুলি একেবারে অবিশ্বাস করিবার উপায় থাকিত না।

দুর্গা বলিয়া রামবাবুর বৈঠকখানায় জনকতক বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া তুলোরাম-খেলারাম রামবাবুর ছেলে গিরিজাশঙ্করের সঙ্গে নলিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন। কৃপণ রামবাবু নিজমুখে স্বীকার করিলেন বটে, মেয়েটিকে তাঁহার খুবই পছন্দ হইয়াছে, পুত্রবধূ করিবার মত উপযুক্ত পাত্রী বটে—কি—

"কিন্তুটি" কি, তাহা সকলেই বুঝিল। মোটামুটি আভাস পাওয়া গেল,—অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা হইলে রামবাবু নলিনীকে পুত্রবধূ করিতে পারেন এবং তাও দুটি বিশেষ কারণে;—প্রথমতঃ—মেয়েটির উপর তাঁহার বিশেষ একটা

মায়া পড়িয়াছে; দ্বিতীয়তঃ—গৃহিণী আবদার ধরিয়াছেন—"যেমন্ ক'রে হোক্, এই মেয়েটি ঘরে আনো, টাকার কামড় কোরো না, তোমার পায়ে পড়ি গো!" তাই রামবাবু নিরুপায় হইয়া টাকার "কামড়" মোটেই করিতেছেন না, মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা দিলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার অনুমতি এখনই দিতে প্রস্তুত!

বাক্যবিশারদ খেলারাম দম্ভভরে বলিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে—বুঝেছেন মুখুয্যে মশাই, অভাব আমার দশ-বিশ হাজারের কখনই হয় না! তবে আপাততঃ এই মামলাটা যত দিন না চোকে, তত দিন নগদ টাকাটা বের করতে পাচ্ছি না! তার পর—মামলাটা চুকলেই, নিন্ না, বিশ পঞ্চাশ হাজার! এই ঘরে এইখেনে ব'সে গুণে দিয়ে যাব!"

রামবাবুও বড় ফেল্না যান না! বলিলেন—"বেশ ত,—এত টাকার সম্পত্তির মালিক যখন আপনি, তখন কর্জ্জ ক'রে পাঁচ সাত হাজার—"

"ঐটি—ঐটি—শুধু ঐ কথাটি অধীনকে বল্‌বেন না, দোহাই মুখুয্যে মশাই! সব করতে পারবো, বলেন ত নিজের মাথাটা কেটে সেই রক্তে আপনার শ্রি-চরণ ধুইয়ে দিতে পারব—কেবল পারব না কর্জ্জ করতে! ঐটি আমার স্বর্গীয় পিতার নিষেধ" বলিয়া খেলারাম স্বর্গবাসী পিতৃদেবের উদ্দেশে করযোড়ে ভক্তি-ভাবে একবার মিনিটখানেকের জন্য প্রণাম করিয়া লইলেন।

কনিষ্ঠকে দম্ লইবার অবকাশ দিয়া তুলোরাম সুরু করিলেন,—"কর্জ্জ যদি করতুম, তা হ'লে কি আর এত কষ্ট ক'রে ঐ ছোট পুরোনো বাড়ীটায় বাস করতুম? না, এইরকম গরীবয়ানা চালে সংসারধর্ম্ম করতুম? টাকা ধার দেবার জন্যে মহাজনরা ত আমার দরজায় দিনরাত ব'সে রয়েছে। একবার মুখের কথাটা খসালেই হয়—এখনই লাখ্ টাকা ধার ঘরে এসে দিয়ে যেতে সবাই উদ্‌গ্রীব—কি বল হে?"

রামবাবুর বৈঠকখানায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই তুলোরাম-খেলারামের বিশেষ বন্ধু! দুই ভায়ের কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া সকলেরই এমন অবস্থা—হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলেন আর কি? কোনমতে সকলেই প্রাণপণে সে ভাব চাপিয়া, কেবল মাথা নাড়িয়া কথায় সায় দিতেছেন। কথা বলিবার অবস্থা কাহারও নাই!

আর রামবাবু? তিনি সম্প্রতি এ পল্লীতে বাড়ী তৈরী করাইয়া আসিয়া বাস করিতেছেন। আপনার ব্যবসা কাযকর্ম্ম লইয়াই তিনি সকাল হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, কাহারও সহিত মেলামেশা করেন না। কাহারও কোনও খবর রাখেন না। প্রতিবেশী হিসাবে চেনা পরিচয় কাহারও কাহারও সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু পরচর্চ্চা বা পরের কোনও কথায় তিনি কর্ণপাতই করেন না। দৈবাৎ কাহারও সহিত দেখা হইলে, কেহ যদি কোন কথা বলে, কেবল শুনিয়া যান। তাহা লইয়া নিমেষের জন্য মাথা ঘামান না। সে অবসর ও প্রবৃত্তিই তাঁহার নাই।

রামবাবুকে নীরব দেখিয়া তুলোরাম বলিলেন, "এদিককার খরচপত্র—পাকাদেখা, বিয়ের রাত্রে লোকজন খাওয়ানো,—মেয়েকে গা-সাজানো গহনা,—সে সবের অবিশ্যি কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না,—তবে নগদ টাকাটা,—"

খেলারাম দাদার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"আরে, কিসের নগদ টাকা? কি বলছ দাদা তুমি? রামবাবু ক্রোর টাকার মালিক! তোমার ও নগদ দু-পাঁচ হাজার টাকা কি উনি গ্রাহ্য করেন? তার চেয়ে এমন একটা জিনিষ বরকে যৌতুক দেবো—যাতে বরের তিনচার পুরুষ ব'সে খেতে পারবে! নগদ টাকা আবার কি!"

কথা শুনিয়া ঘরশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল! তুলোরাম এই খেলারামেরই ত বড় দাদা! তিনি পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া ভাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"খেলাটা বলে কি?"

রামবাবু বিশেষ রকম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বলেন কি, খেলারাম বাবু? এমন জিনিষ জামাইকে দেবেন যে পাঁচপুরুষ—"

"ব'সে খাবে! সত্যি কি মিথ্যে, যখন ফুলশয্যের তত্ত্বের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব—তখন দেশশুদ্ধ লোকের সামনে যাচাই করিয়ে নেবেন—"

* * * * * *

রামবাবু নলিনীর সঙ্গে গিরিজাশঙ্করের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। মুখে সকলকেই বলিতে লাগিলেন—"কি করি! ভদ্র লোক হাতে পায়ে ধল্লেন,—মেয়েটিও খুব পছন্দসই,—কাযেই দেনা-পাওনার কথা আর কইলুম না।" কিন্তু রামবাবু "পাঁচপুরুষ ব'সে খাবার জিনিষটার" উপরে মনে মনে যে বিষম একটা লোভ লুকাইয়া রাখেন নাই,—এ কথা কেহই বিশ্বাসই করিল না।

রামবাবু দিনরাত্রি কেবল মনে মনে ভাবিতে থাকেন—"কি এমন জিনিষ—যাতে পাঁচ পুরুষ ব'সে খাবে! হয় ত খেলারামের একটা গঙ্গামণ্ডল গোছের তালুক আছে। ঐ একটিমাত্র মেয়ে আর ছেলেপুলে কিছু নেই,—বিপত্নীক,—ভবিষ্যতে ছেলেপুলে হবার সম্ভাবনাও সেইজন্যে কিছু নেই। ঐ মেয়েটিই ওর প্রাণ—যথাসর্ব্বস্ব! সুতরাং ঐ তালুকটা মেয়ে-জামাইকে লিখে প'ড়ে দেবে, এ আর আশ্চর্য্য কি?"

আবার ভাবেন—"হীরে-জহরৎ কিছু লুকোনো আছে কি,—দুদশ লক্ষ টাকা হয় ত তার দাম? ফুলশয্যের রাত্রে জামাইকে দিয়ে যাবে?" রামবাবু ভাবিয়া কূল-কিনারা কিছু পান না। যে শোনে, সেই অবাক্ হইয়া যায়! কিন্তু তুলোরাম-খেলারামকে যাঁহারা ভাল রকম চেনেন, তাঁহারা কেবল দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন, কি একটা নূতন চালে তুলোরাম-খেলারাম এবার বাজিমাত করে।

কিছু টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খুব ধুমধামে পাকা দেখাটা হইল বটে, কিন্তু হঠাৎ বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে তুলোরামের কলেরা হইয়াছে, পাড়ায় রাষ্ট্র হইল। তা হউক, এ অবস্থায় বিবাহ ত বন্ধ করা যায় না। তবে লোকজন নিমন্ত্রণ অর্থাৎ বরযাত্রী কন্যাযাত্রী খাওয়ানো যথাসম্ভব কম করিলেই হইবে। খেলারাম সকলকে বুঝাইলেন,—"দাদা সারিয়া উঠিলেই জামাইকে জোড়ে আনিয়া আমি ঘটা করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে খাওয়াইব। তার জন্যে দুঃখ কি?"

কনের বাড়ীর সকলেরই ভীষণ মন খারাপ। বরের

বাড়ীতেও ঐ ভাব! বিশেষতঃ রামবাবু এবং রাম-গৃহিণীর! কিন্তু উপায় কি? গিন্নী বলিলেন—"তা কি করা যাবে। চার হাত এক ক'রে দাও কোন গতিকে,—বৌ-বেটাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে খুব আমোদ করা যাবে। ফুলশয্যে-আছে, বৌভাত আছে, প্রাণ ভরে ঘটা কর না!"

তা ত বটেই! কনের বাড়ীতে ত এক রাত্রির মামলা। বিয়ের ঘটা ত বরের বাড়ীতে। রামবাবু কিন্তু ভাবেন—"ফুলশয্যের রাত্রিতে বরের যৌতুক আসবে,—সেটা ত কনের জ্যাঠার অসুখের দরুণ পাঠাবার অসুবিধে হবে না?" কথাচ্ছলে রামবাবু হাসিতে হাসিতে খেলারামকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বলেন কি? সে ত আমার মজুত। আমি নিজে হাতে ক'রে নিয়ে গিয়ে পৌছে দিয়ে আস্‌বো। তার সঙ্গে দাদার অসুখের সম্বন্ধ কি?"

নমো নমো করিয়া দু'দশজন বরযাত্রী এবং বামুন-পুরুত সঙ্গে লইয়া রামবাবু ছেলের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কনের গা-সাজানো গহনা দেখিয়া বরের বাপের ত চক্ষু-স্থির! নলিনীকে রামবাবু যে সব গহনা—(যথা—পাঁচগাছি পাঁচগাছি দশগাছি সোনার চুড়ী অতি সামান্য ওজনের,—গলায় একটি মাফ্‌ চেইন,—কাণে ইয়ারিং, হাতে দুগাছি অনন্ত, এই সব নিত্য ব্যবহার্য্য গহনা) পরিয়া তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতে দেখিতেন,—বিবাহের রাত্রিতে দেখিলেন, সেই সব গহনাই কনের অঙ্গে শোভা পাইতেছে,—উপরন্ত, নূতন বলিতে একটি টায়রা কনের মাথায় পরানো, তাহাতেই সুন্দর মুখখানির শোভা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও,—গা-সাজানো গহনা যাহা দিবার কথা ছিল,—সে সব কোথায়? ফর্দ্দ কিছু দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু যে ভাবে কথাবার্ত্তা কওয়া হইয়াছিল,—তাহাতে রামবাবু এবং পরিবারস্থ সকলেই বুঝিয়াছিলেন—অন্ততঃ একশো ভরির সোনার গহনা দিয়া কনে সাজাইয়া দেওয়া হইবে! এ ত দেখা যাইতেছে—১৫।১৬ ভরির সোনাও কনের গায়ে নাই! রামবাবু মনে মনে চটিয়া আগুন! বৈবাহিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন কি, বৈবাহিক তখন গরদের চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া স্যাকরাকে 'এই মারেন ত এই মারেন' অবস্থায় চীৎকারের চোটে বিয়ে-বাড়ী ফাটাইবার উপক্রম করিতেছেন। "পুলিসে দেবো, পুলিসে দেবো! দুশো ভরি সোনার গয়না আজ বেলা বারোটার মধ্যে দেবার কথা, রাত্রি দশটা বেজে গেল, কনে সম্প্রদান করতে যাচ্ছি! বেটা বলে কি না—এখনও একখানাও পুরো তৈরী হয়নি—"

স্যাকরা বেচারা ভয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে কি বলিতে যাইতেছিল, ক্রোধোন্মত্ত খেলারাম তাহাকে এক ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, "তোমার সাত গুষ্টীকে আগে পুলিসে গ্রেপ্তার করাই, তার পর আমি কন্যা সম্প্রদান—উঃ, বেটা কি শয়তান।"

বন্ধুবান্ধব আসিয়া খেলারামকে ঠাণ্ডা করিতে ব্যস্ত হইলেন। সবাই বলিলেন—"তার আর কি, আজ রাত্রির মধ্যে তৈরী ক'রে দেবে বল্‌ছে—"

"আজ এখুনি হাম গহনা মাংতা! যাও—সেটাকে নিয়ে ওর দোকান থেকে গহনা গড়িয়ে—যাও—যাও—" কাহাকে যে হুকুম দিতেছেন, আর সে হুকুম তামিল করেই বা কে, তাহা কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। ইত্যবসরে এক জন স্যাকরাটিকে টানিয়া লইয়া বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু খেলারামের গর্জ্জন আর থামে না! রামবাবু কথা কহিবেন কি—হক্‌চকিয়ে এক পাশে দুই চারিজন আত্মীয়দের সহিত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভট্‌চাযি্য মশাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া খেলারামকে বলিলেন,—"আরে ছোট কর্ত্তা—তুমি এ সময় মাথা গরম কল্লে চল্‌বে কেন? এ দিকে যে লগ্ন ভ্রষ্ট হয়ে যায়! আরে, স্যাক্‌রা-বাড়ীতে যখন সোণা গেছে—তখন সে ত গহনা হয়েই আস্‌বে—! আজ না হয়—কা'ল আস্‌বে—"

এতখানি ঘোমটা টানিয়া দুই চারি জন বর্ষীয়সীর সঙ্গে বগলা-মুখী পর্য্যন্ত বাহিরে আসিয়া দেবরকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বুড়ো মিন্‌ষে—একটু আক্কেল নেই,—গয়না গয়না ক'রে একেবারে পাগল হয়ে উঠলে যে, ঠাকুরপো! চুলোয় যাক্‌ গয়না,—এ দিকে লগ্ন উৎরে গেলে ছাই-পাঁশের গয়না নিয়ে ধুয়ে খাবে! যাও বেয়াই মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে—"

উপস্থিত সকলেই বলিয়া উঠিল—"বটেই ত—বটেই ত! চলো—চলো ছোটকর্ত্তা—এই যে ব্যাই মশাই এখানে দাঁড়িয়ে—"

খেলারাম কোন কথা না কহিয়া একেবারে গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে বেয়াই মহাশয়ের কাছে গিয়া বলিলেন—"তা হ'লে—অনুমতি করুন—" বৈবাহিক মশাই অনুমতি না দিয়া করেন কি এ অবস্থায়। এ যেন তাঁহাকে "ধয়ে-বন্ধনে" ফেলা হইয়াছে! কি যে বলিবেন—কি যে করিবেন, কি যে হইতেছে—কি যে হইবে,—ব্রাহ্মণ যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না! যেন গোলকধাঁধায় পড়িয়াছেন!

হৈ-হৈ করিয়া বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ-রাত্রিতে বর আসা হইতে—পরদিন বর-কনে বিদায় হওয়া পর্য্যন্ত রামবাবু বেচারা এক মুহূর্ত্তের জন্য খেলারামকে ধীরভাবে তাঁহার কাছে পাইলেন না যে, নিরিবিলি দুটো কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা করেন। খেলারাম সদাই ভয়ঙ্কর ব্যস্ত! সমস্ত বাড়ীটায় যেন "চরকী"—ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! যখনই রাম-বাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হয় অমনি মহা আপ্যায়িত করিয়া বলেন—"ব্যাই মশাইয়ের কোনো কষ্ট হচ্ছে না ত! সব দেখে শুনে নেবেন,—এ এখন আপনারই বাড়ী,—কিছু নিন্দে হলে এখন আপনারই নিন্দে—হা-হা-হা-!" এই রকম কথা মাঝে মাঝে রামবাবুকে বলেন—আবার মহা ব্যস্তভাবে সরিয়া পড়েন! "ওরে ব্যাই মশাইকে তামাক দে, ওরে পাণ—পাণ, নাঃ—আমিই এনে দিচ্ছি—" বলিয়াই ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে একমুঠো পাণ লইয়া আনিয়া দেন। নিজেই কল্‌কেতে ফুঁ দিয়া রূপো-বাঁধানো হুঁকাটা রামবাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া খাতির করেন! রাম বাবু বৈবাহিকের চালাকী দেখিয়া যথেষ্ট রাগ করিলেও ভদ্রতার খাতিরে মুখে বলেন, "থাক্‌ থাক্‌, আপনি ব্যস্ত হবেন না!" ইত্যাদি।

বর-কনে বিদায় হইল বেলা দশটার সময়!

রাম বাবু শুধু বিবাহের রাত্রি হইতে নয়, পাকাপাকি হইবার পর হইতেই মনে মনে একটু নয়—বৈবাহিকের প্রতি বিশেষ রকম চটিয়াছিলেন। কিন্তু বরকনে বাড়ী লইয়া আসিবার পর—"কনে" দেখিয়া আত্মীয়কুটুম্বরা সকলেই যখন খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিল, বিশেষতঃ—যখন বুঝিলেন, মনের মত স্ত্রী পাইয়া পুত্র গিরিজাশঙ্কর বেশ খুসী হইয়াছে, তখন খেলারামের প্রতি রাগের ভাবটা অনেক কমিয়া গেল।

যথাসময়ে ফুলশয্যা লইয়া জন কুড়ি লোক উপস্থিত। মোটামুটি জিনিষপত্র মন্দ দেয় নাই,—বিশেষ অখ্যাতি করিবার কিছু ছিল না। তবে জিনিষপত্রের পরিমাণ হিসাবে "বাহকের" সংখ্যা খুবই বেশী, সবাই একবাক্যে এ কথা বলিতে লাগিল।

ফুলশয্যা লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, রাম বাবু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাই মশাই কি আস্‌বেন ?"

তাহাদের মধ্যে ওস্তাদ ছিল হলধর নাপিত। সে দীর্ঘ প্রণাম ঠুকিয়া বলিল—"এজ্ঞে, বাবু পুলীশ নিয়ে স্যাক্‌রার দোকানে গিছেন।"

"আরে সে ত বিয়ের রাত্তির থেকেই শুনছি—! গয়নার কি হলো ?"

হলধর বলিল—"এজ্ঞে, গয়না নিয়েই ত ছোট বাবু আস্‌বেন। আজ এস্‌পার কি ওস্‌পার! হয় আপনি গয়না পাবেন—নয় ত ছোট বাবু বলেছেন—একেবারে স্যাক্‌রার পো-কে বেঁধে আপনার ছি-চরণতলায় এনে ফেল্‌বে—"

"তবেই ত আমি আপ্যায়িত হয়ে গেলুম!" বলিয়াই রাম বাবু ভগ্নমনে বৈঠকখানায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নিমন্ত্রিত আত্মীয়কুটুম্ব অনেকেই উপস্থিত ছিল। হঠাৎ একটা বিকট হাসির রোলে বিবাহ-বাটী মুখরিত হইয়া উঠিল। আত্মীয়কুটুম্ব, এমন কি, রাম বাবু পর্য্যন্ত ব্যাপার কি জানিবার জন্য বৈঠকখানার বাহিরে আসিলেন। গৃহিণী জানালা হইতে সকলকে হাসিমুখে বাড়ীর ভিতর আসিতে বলিলেন।

সকলেই—মেয়েছেলেরা যে যেখানে ছিল, হাসিয়া কুটোকুটি!

"ভারি নকুলে বেয়াই! বেশ ঠাট্টা করেছে!"

কেহ বলিল—"রসিক লোক বটে!"

অপর এক জন বলিল,—"খুব ঠকিয়েছে বটে! যেমন টাকা চেয়েছিল বেটার বিয়েতে—মুখের মত দিয়েছে!"

রসিকগোছের এক জন বলিল—"হুঁ-হুঁ, চালাক লোক—আইন বাঁচিয়ে কাম করেছে,—কথাটি কইবার জো নেই!"

রামবাবু গৃহিণীকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিছে বাজে গোলমাল কচ্ছ কেন? আমার মেজাজের ঠিক নেই—ব্যাপার কি বল!"

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে একখানি পত্র এবং শিল্কের কাপড়ে জড়ানো একটি দ্রব্য কর্ত্তার হাতে দিয়া বলিলেন—"এই নাও,—ফুলশয্যের রাত্রিতে বেয়াই যা দেবেন বলেছিলেন—"

রামবাবু কম্পিত হস্তে—চিঠিখানি পড়িতে সুরু করিলেন। ইত্যবসরে গৃহিণী শিল্কের কাপড়-জড়ানো বস্তুটি বাহির করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

"পূজনীয় বৈবাহিক মহাশয়, প্রতিশ্রুতিমত দুইখানি তিন ইঞ্চি পুরু মেহগিনিকাঠের ফরমাজ দিয়ে তৈরী পিঁড়ে পাঠাইলাম। বরকনেকে ইহাতে বসাইয়া ফুলশয্যের ক্ষীর-ভোজনাদি নিয়মকর্ম্ম করাইবেন। যত্নপূর্ব্বক রাখিতে পারিলে, 'দু পাঁচ পুরুষ স্বচ্ছন্দে বসে খেতে পারবে'।"

বিকট অট্টহাস্যে রামবাবুর বাড়ী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণটি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাত্রি

হে রাত্রি, তোমার ওই নীলঘন শান্তস্নিগ্ধ ছায়—
বোধাতীত কোন্ সুর মনেরে মাতায়,
ছন্দে ছন্দে,
ভাগ্যহীন গভীর আনন্দে।
ভুলে যাই যত কিছু ভুলি বারে বারে
আপনারে পাই শুধু ভুলের আঁধারে।

আমার মানব-মনে তবু উঠে সংশয় জাগিয়া
সকরুণ তব হেন বিলাপ লাগিয়া
ভাবি অনুবেলা—
দিবসের কোলাহল করি যারে হেলা,
ভুলানো মানবে তার আত্ম-পরিচয়,
মনে হয়—
তুমি বুঝি কাঁদো তার লাগি'
হইয়া বিবাগী
কালে কালে
ক্ষয়েরে অক্ষয় করি' সত্যের আড়ালে।
যত ভাবি আরো যেন থেকে থেকে যায়
সমস্যার ঘূর্ণিপাকে—মনের গুহায়।

হে রাত্রি, যোগিনীবালা, বসি' নিরজনে
তপস্যার উদ্বোধনে—
কি কাব্য রচেছ তুমি আকাশ ভরিয়া
কালের কলুষনাশি'—যুগান্তর ধরিয়া ধরিয়া!—
তত্ত্বকথা তার,
সঙ্গোপনে বল আজ হে রাত্রি আমার!
চির-মরণের দেশে
প্রথম প্রচার করি—প্রভাতের বৈতালিকবেশে!

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

মহাকবি মধুসূদন

"মহাকবি" এই মহিমান্বিত আখ্যাটি মধুসূদনের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, তেমন বুঝি আর কাহারও পক্ষে নহে। কারণ, তিনি শুধু মহাকাব্যের রচয়িতা নহেন, বঙ্গসাহিত্যে তিনিই উহার স্রষ্টা বা প্রথম পথিপ্রদর্শক। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে মধুসূদনের "মেঘনাদবধ" বাঙ্গালার প্রথম মৌলিক মহাকাব্য। মৌলিক বলার উদ্দেশ্য—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত মহাকাব্য হইলেও, বাল্মীকি ও ব্যাসের অনুবাদ ও অনুবর্ত্তন অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচায়ক হইলেও মৌলিক রচনা নহে। কবি গুণাকর ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডী" গ্রন্থকে মহাকাব্যের পর্য্যায়ে স্থাপন করা যায় না। দেবীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই সুন্দর ও সুবিখ্যাত কাব্যদ্বয়ে মহাকাব্যোচিত সর্ব্বরসের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং মেঘনাদবধই বঙ্গভাষার প্রথম মৌলিক মহাকাব্য—যাহার মধ্যে মহাকাব্যোচিত রসোৎকর্ষ পূর্ণ-মাত্রায় দেখা যায়। শুধু প্রথম নহে, ইহাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধানতম মহাকাব্য। অধুনা অগণিত কাব্যগ্রন্থে বঙ্গবাণীমন্দির পরিপূর্ণ হইলেও প্রকাশের প্রথম দিবসের মতই আজিও মেঘনাদবধের সমকক্ষ মহাকাব্য আর রচিত হইল না। এক কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহারের সহিত মধুসূদনের মধুময়ী প্রতিভার এই অপূর্ব্ব অবদানের উপমা চলিতে পারে। ত্যাগমহিমায় ও তত্ত্বালোকে বৃত্রসংহারের স্থান মেঘনাদবধের উপরে হইলেও, কাব্যোচিত সৌন্দর্য্যে মধুসূদনের মহাকাব্য হৈমপ্রতিভার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া অনেক ঊর্দ্ধে তাহার উপযুক্ত গৌরবাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মধুসূদনকে কবি-প্রতিভার মূর্ত্ত প্রকাশ বলিলে আদৌ অতিরঞ্জন হয় না। তিনি নিরবচ্ছিন্ন কবি, সংসারে ও সাহিত্যে উভয়তঃই তাঁহাকে আমরা শুধু কবিরূপেই দেখিতে পাই। কাব্যরসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানিসুলভ বিচার ও সংযমের আলো বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার জীবন বোধ হয় পরিণামে এত দূর শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইত না। ভাবাবেগ বিবেকের দ্বারা সংহত না হইলে উহা অনেক সময় মানবজীবনকে ধ্বংসোন্মুখ করিয়া দেয়। রস-মাধুর্য্যে ও কাব্যসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়াও মধুসূদনকে সেই জন্যই শেষে দুঃসহ দুঃখ-দারিদ্র্যে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। তবে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এই অপ্রিয় সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না যে, মধুসূদনের দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য তাঁহার environment বা পরিবেষ্টনও অনেকখানি দায়ী। তিনি এমন যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মায়ামন্ত্রে মরীচিকা-মুগ্ধ মৃগের মত এ দেশের শিক্ষিত সমাজ অতিশয় আকৃষ্ট। আবেগপ্রবণ কবির পক্ষে আবেষ্টনের মোহজাল ছিন্ন করিয়া ভারতের সনাতন আদর্শানুযায়ী শুদ্ধ-সংযত জীবন যাপন করা সম্ভব হয় নাই। "একাল ও সেকাল" গ্রন্থে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেই সময়ের যে জীবন্ত আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতকটা বুঝিতে পারি, কবির শেষ জীবনের অশেষ কষ্টের জন্য তদানীন্তন প্রতীচ্য প্রীতিকে কতখানি দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারে। আবার ইহাও ভাবিবার বিষয়, এই পরিবেষ্টনের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মহোদয়গণ পাশ্চাত্য শিক্ষালোক পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়াও প্রাচীন আদর্শানুগত শুচি-শুভ্র জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। বিবেকবান ভূদেবের পক্ষে আবেষ্টনের প্রচণ্ড প্রভাব পরাভূত করা যেমন সহজ হইয়াছিল, উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবির পক্ষে তাহা হইয়াছিল তেমনই অতি সুকঠিন। সুতরাং অন্তরের দৌর্ব্বল্য ও বাহিরের আবেষ্টন উভয়ে সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালার যুগ-প্রবর্ত্তক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবির জীবনকে জ্বালাজর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল, এই ধারণা বোধ হয় মিথ্যা নহে।

মধুসূদনের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে যে ধারা চলিতেছিল, তাহাকে আমরা প্রতীচ্যের কাব্যবিচার অনুসারে classic বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্লাসিক কবি কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রকে বঙ্গসাহিত্যের "পোপ" বলা যাইতে পারে। ক্লাসিক কবিরা ছিলেন অসাধারণ কাব্যকলাকুশলী, ভাষা-বিন্যাসে তাঁহারা দেখাইয়াছেন অতিশয় দক্ষতা। প্রকৃতির সুন্দর ও সুমহান্ মূর্ত্তি, মানব-হৃদয়ের বিচিত্র ভাবপ্রবাহ ও রসধারা, এই সকল স্বাভাবিক বস্তু ও বিষয় অপেক্ষা ছন্দ ও ভাষার কৃত্রিম নৈপুণ্যের পানে ছিল তাঁহাদের তীব্রতর দৃষ্টি। অন্তরের উন্নত উচ্ছ্বাস বা আবেগ বর্ণনার দিকে তাঁহাদের প্রবণতা ছিল না, তাঁহাদের মন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত কল্পনাকাশে অবাধে বিচরণ করিতে জানিত না। মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অনুভবটিকে উপলব্ধি করার মত অন্তর্দৃষ্টিও তাঁহাদের মধ্যে দেখা যাইত না, আবার অন্যদিকে বাহ্য-প্রকৃতির সুমহান্ ও সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ভাবে আত্মহারা হইতে পারিতেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহারা স্বভাবসৌন্দর্য্যের সাধক ছিলেন না, ছিলেন কষ্টকল্পিত কৃত্রিম কাব্যকলার উপাসক। অবশ্য এ বিষয়ে মুকুন্দরামের মধ্যে আমরা অনেকটা স্বভাবপ্রবণতা দেখিতে পাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আমরা বঙ্গসাহিত্যে ক্লাসিক প্রণালীর শেষ কবি বলিতে পারি। তাহার পরেই মধুসূদন আবির্ভূত হইয়া বঙ্গের কাব্য-জগতে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিলেন, তাঁহার পূর্ণ প্রদীপ্ত প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অভিনব ভাবালোকে ও ভাব-রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া বাঙ্গালার কাব্যলক্ষ্মী এক অনুপমা শ্রী ধারণ করিল। এই নূতন ভাবধারাকে আমরা বঙ্গসাহিত্যের Romantic School of Poetry বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। কাব্যকাননে মধুসূদনের ন্যায় গদ্য-বিভাগে যুগান্তর আনিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম। যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এক দিক দিয়া আমাদের সমাজে তীব্রতম হলাহল উদ্গীর্ণ করিয়াছিল, এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষদ্বয়ের সমীকরণ-শক্তিবলে তাহাই প্রাণময় পীযূষপ্রবাহে পরিণত হইয়া বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রকে অভিনব শস্যসম্পদে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল এবং বাঙ্গালীর সম্মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল। কাব্যকলা-কৌশলের নামে যে কৃত্রিমতা বাঙ্গালার কবিতাকে দিন দিন স্বভাব হইতে দূরে লইয়া গিয়া স্রোতোবিহীন

বদ্ধ জলাশয়ের মত করিয়া তুলিতেছিল, মধুসূদনের অলোক-সামান্য প্রতিভা তাহাকে কূলে কূলে পরিপূর্ণা পূর্ণ-যৌবনা প্রবাহিণীতে পরিণত করিল।

"কলম্বাস" আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া যে গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন,সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের গৌরব তদপেক্ষা অনেক অধিক। কারণ, তিনি শুধু আবিষ্কারক নহেন, তিনি স্রষ্টা। শুধু স্রষ্টা বলিলেও বোধ হয় মধুসূদনের কার্য্যের পরিচয় দেওয়া হয় না, এই সৃষ্টি এত আকস্মিক, এত অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ, ইহা বাঙ্গালার কাব্যজগতে এত আমূল পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা বহন করিতেছে যে, ইহা দেখিবামাত্র বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে বলিতে বাসনা হয়, "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!" ক্লান্ত-কায়, শয্যাসীন, আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ যদি সহসা নবযৌবনের উদ্বেগ শক্তিতরঙ্গের পরিচয় দান করে, তাহা হইলে মানুষ যেমন বিস্মিত হয়, বঙ্গসাহিত্যে মহাকবি মধুসূদনের বিচিত্র অবদান তেমনই বিস্ময় জাগাইয়া তুলে।

মহাকবি মধুসূদনের "মেঘনাদবধ" মহাকাব্য বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে অপূর্ব্ব মহিমালোকে সমুজ্জ্বল এক অভিনব অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। মেঘনাদবধের আবির্ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন বঙ্গসাহিত্য-রূপ প্রসুপ্ত কেশরী সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া মেঘ-গম্ভীর-নির্ঘোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নিবিড় অন্ধকারের বক্ষে অকস্মাৎ অভিব্যক্ত অত্যুন্নত আলোক-স্তম্ভের মত এই অদ্বিতীয় মহাকাব্য সমগ্র সাহিত্য-সংসারকে দিব্যতম দ্যুতিপ্রবাহে প্লাবিত করিয়া তুলিল। ভারতচন্দ্রের প্রভাবে পরিচালিত ভাষা মধুসূদনের মধুময়ী প্রতিভার মায়ামন্ত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া অম্বরচুম্বী গম্ভীর মহান্ মূর্ত্তি ধারণ করিল। বঙ্গসাহিত্যে সুমহান্ বা Sublime ভাব ও ভাষার প্রবর্ত্তক তিনিই।

এই বিচিত্র মহাকাব্যখানিতে মহাকাব্যোচিত সকল রস যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বীররসের বজ্রগম্ভীর তূর্য্যনাদে কবির যেমন প্রবল পারদর্শিতা, করুণ রসের শান্ত মধুর বীণা-তন্ত্রী-বাদনেও তাঁহার তেমনই অসাধারণ নৈপুণ্য। কবির ভাষা কখনও আনন্দে উদ্বেল, কখনও শোকে সকরুণ, কখনও ঘৃণায় কুঞ্চিতনাসা, কখনও মানে-ক্রোধে কম্পিতকায়, কখনও বা নম্রতার নত-শীর্ষ। তেজোবীর্য্যের প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা ও শান্ত ভাবের কান্ত করুণ রসধারা উভয়ের সমন্বয়ে সৌন্দর্য্যময় এই মহাকাব্য বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম রস-বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়াছে, ইহা অত্যুক্তি নহে। পরাধীনতার প্রচণ্ড পেষণে জাতির অজ্ঞ দৈন্যরাশির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাষাও ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বামাকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনের মত ঐ ভাষা হইতে তখন বীরোচিত বাণী বিনির্গত হয় না, কিন্তু বিপুল বিস্ময়ের বিষয়, পরতন্ত্রতার প্রভাব যখন প্রবলতম, তখনই মধুসূদন মাতৃ-ভাষাকে নূতন ভাবে, নূতন ভাষায় ও নূতন ছন্দে মণ্ডিত করিয়া তাহার কণ্ঠে "মেঘ-নাদ" জাগাইয়া তুলিলেন। যাহা ক্রমঃ বিকশিত হইয়া জন্মলাভ করিতে একটা সুদীর্ঘ যুগের প্রয়োজন হয়, মধুসূদনের অলৌকিক প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ তাহা সাধন করিল মাত্র কয়েকটি বৎসরে।

অম্বুধি-মন্থনে যেমন অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, তেমনই বিশ্বের কাব্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া বহু ভাষাবিদ্ মধুসূদন এই অপূর্ব্ব কাব্যামৃত-ভাণ্ড আহরণ পূর্ব্বক বঙ্গবাণীর কর-কমলে অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহার আখ্যান-ভাগ স্বদেশের প্রাচীন মহাকাব্য হইতে গ্রহণ করিয়া, স্বীয় অসামান্য কল্পনার বিচিত্র বর্ণ-রাগে তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়া, পরে প্রতীচীর কাব্যভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি আনয়ন পূর্ব্বক সেই মানসী মূর্ত্তিকে মনের মত করিয়া সাজাইয়াছিলেন। ছন্দে ও প্রকাশভঙ্গিমায় মধুসূদন ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টনের পদ্মানুবর্ত্তী হইয়াছেন, চরিত্রচিত্রাঙ্কনেও মিল্টনের আদর্শ তাঁহাকে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। মেঘনাদবধের রাবণের মধ্যে আমরা প্যারাডাইজ লষ্টের "সেটানের" সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই। বাইবেলের সয়তানকে মিল্টন যেমন একটা অবিচলিত তেজোবীর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছেন, মধুসূদনও তেমনই কুৎসিত কলঙ্ককালিমার পরিবর্ত্তে রাবণের মুখমণ্ডলে একটা মহারাজোচিত মহিমাদীপ্তি দান করিয়াছেন। অতিশয় উচ্চাশায়, এমন কি, ত্রিলোকাধিপত্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাসনায় রাবণ ও সেটান প্রায় সমশ্রেণীর। মিল্টনের "সেটান" স্বর্গ হইতে অনন্ত দুঃখযন্ত্রণাময় নরকে নির্ব্বাসিত হইয়াও সৃষ্টি-কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, তখনও সে তাহার অনুগত অনুচরবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিয়াছে—

"To reign is worth ambition thouge in Hell!
It is better to reign in Hell than to serve in heaven!

মধুসূদনের রাবণও সেই প্রকার অসংখ্য আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, সহস্র প্রতিকূল প্রবাহের মধ্যে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক বসিয়া থাকে। রাবণের বর্ণনায় সর্ব্বপ্রথমেই মহাকবি মধুসূদন এই উচ্চাচলবৎ অবিকম্পিত ভাবটি ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

"কনক-আসনে বসি দশানন বলী,
হেম-কূট-হৈম-শিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ।"

(মধুসূদন-গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির)

মিল্টনের পরেই প্রতীচীর কবিগুরু হোমরের প্রভাব আমরা এই মহাকাব্যের মধ্যে প্রাপ্ত হই। "ইলিয়দের" মধ্যে আমরা দেখিয়া থাকি, মর্ত্ত্যলোকে কোনও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে স্বর্গের দেবদেবীরা অনুগৃহীত ব্যক্তিদের পক্ষাবলম্বন করেন। এমন কি, অনেক সময় মানুষরা দেবতাদের হস্তচালিত যন্ত্রবৎ তাঁহাদের বাসনার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করে। গ্রীক মহা-কবিকে অনুসরণ পূর্ব্বক মধুসূদনও তাঁহার মহাকাব্যের মধ্যে এইরূপ দেবানুগ্রহের অবতারণা করিয়াছেন। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে আমরা ইহা বিশেষ পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাই, অষ্টম সর্গে পরজগতের যে বিচিত্র চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ইতালীয় মহাকবি দান্তে রচিত "ডিভাইনা কমেডিয়ার" প্রতিচ্ছবি দর্শন করি। নবম বা শেষ সর্গে রক্ষোলক্ষ্মী প্রমীলার চিতারোহণের অশ্রুকরুণ দৃশ্যটি দেখিতে দেখিতে ইতালীর অন্য-তম মহাকবি ভার্জ্জিলের "ইনিয়দ" নামক মহাকাব্যের স্মৃতি জাগ্রত হয়। "ইনিয়দ" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, উক্ত মহাকাব্যের প্রারম্ভের সহিত মেঘনাদবধের পরিশেষের কি সুন্দর সাদৃশ্য! প্রবল উদরাগ্নির দ্বারা পুষ্টিপ্রদ আহার্য্যসামগ্রী জীর্ণ হইয়া যেমন রক্তরূপে সমগ্র দেহকে শক্তি-মান করে, মধুসূদনের প্রখরতম প্রতিভাগ্নিও তেমনই সমীকরণ-শক্তিপ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের ভাবধারাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে স্বদেশীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণ উপযোগী স্বরূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই গ্রহণশক্তির তারতম্যানুসারে প্রতিভার প্রকৃতি আমরা বুঝিতে পারি। কাব্যজগতের সৃষ্টি শূন্যের মধ্যে সহসা আবির্ভূত হয় না, ইহা সকল সময়েই একটি আদর্শকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে, এই সত্যটি আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। তবে ইহাও সত্য যে, সময়ে সময়ে সেই সৃষ্টি-প্রচেষ্টা আদর্শকে অতিক্রম পূর্ব্বক উর্দ্ধে আরোহণ করে। মধুসূদনও অনেক স্থানে প্রতীচীর কবিগুরুগণের নিকট হইতে গৃহীত আদর্শ অপেক্ষা মধুরতর ও উন্নততর রসের বিকাশ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

অমিত্রাক্ষরছন্দ রচনায় মিল্টন স্বদেশীয় সাহিত্যের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবাসন গ্রহণ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়র ব্যতিরেকে আর কাহারও সহিত তাঁহার এ বিষয়ে তুলনা চলে না। মধুসূদন বঙ্গ-সাহিত্যে এই ছন্দের শুধু স্রষ্টা নহেন, তাঁহার রচনাই ইহার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। বঙ্গবাণী আজ নানা ছন্দে নানা হাব-ভাব-ভঙ্গীতে নৃত্য করি-তেছেন, কিন্তু দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয়, সেই বাণীর বীণাতন্ত্রীকে এই অপূর্ব্ব ছন্দে মধুসূদন ছাড়া আর কেহই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে বাজাইতে সমর্থ হন নাই। যাঁহারা এই ছন্দকে স্বেচ্ছাচার মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। সামর্থ্য থাকিলে সুমধুর সঙ্গীতের সুর-তালের মত একটা সৌন্দর্য্যবন্ধনে এই ছন্দকে বেষ্টন করা যায়। সমিল ছন্দ অপেক্ষা ইহাতে সূক্ষ্মতর অনুভূতির প্রয়োজন। ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার না থাকিলে এই ছন্দ-রচনায় কখনও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। সুবিখ্যাত সাহিত্যরথী "জন্সন" তাঁহার কবি-জীবনীতে (Lives of poets) মিল্টনের অদ্বিতীয় মহাকাব্যের গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগ বেশী দেখিয়াছেন। যে পবিত্র গম্ভীর মহাগ্রন্থের দ্বারা সমগ্র ইংরাজী সাহিত্য গৌরবালোকে উদ্ভাসিত, জন্সনের ন্যায় এক জন মনীষী তাহার গুণগরিমা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না, এ কিরূপ কথা? আমাদের মনে হয়, ইহার কারণ—সাহিত্য সম্বন্ধে রক্ষণ-শীল জন্সন ছিলেন প্রাচীন ক্লাসিক পন্থার অতিশয় অনুবর্ত্তী, পোপের আদর্শকেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন; নিজেও তিনি সেই আদর্শে তাঁহার "Vanity of Human wishes" নামক কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিতরেও কাব্যোচিত মাধুর্য্য বিকশিত করা চলে, এ ধারণা তাঁহার ছিল না; সেই জন্যই তিনি এই অপূর্ব্ব মহাকাব্যের সুমহান্ অথচ সুমধুর সুরটি শুনিতে পান নাই। মেঘনাদবধ প্রকাশিত হওয়ার পর মধুসূদনের এই অভিনব সৃষ্টির উপরেও চারিদিক হইতে বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের ছন্দোভাষাই তখন ছিল আমাদের দেশের কাব্য রচনার একমাত্র আদর্শ। মধুসূদনের নূতন ভাব, নূতন ছন্দ, নূতন ভাষার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অনেকের পক্ষে বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের মত কবি, যিনি নূতনের অদ্বিতীয় উপাসক, তিনিও তাঁহার সূক্ষ্ম সমালোচক-দৃষ্টিতে এমন প্রাণময় মহাকাব্যের মধ্যে প্রাণস্পন্দন দেখিতে পান নাই। অবশ্য পরে পরিণত জীবনে তিনি ইহার প্রাণের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া তরুণ বয়সের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন।

মেঘনাদবধের মত সতেজ ও সজীব কাব্যামৃতধারা শুধু বঙ্গসাহিত্যে নহে, বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্ল্লভ। বর্ষার কূলপ্লাবিনী প্রবাহিণীর মধ্যে তর-তর-বেগে যে সুতীব্র প্রাণতরঙ্গ বহিয়া যায়, এই মহাকাব্যের মধ্যে সেইরূপ প্রবল প্রাণের পরিচয় আমরা পদে পদে পাইয়া থাকি। মধুসূদন ছিলেন যেমন অসাধারণ রস-কুশলী, তেমনই অদ্বিতীয় শব্দশিল্পী। রসোপযোগী শব্দ-চয়নে তিনি দেখাইয়াছেন অতুলনীয় দক্ষতা। গম্ভীর বিষয় বর্ণনায় গম্ভীরনাদী শব্দ-সম্ভারে তিনি যেমন বিষয়টি পূর্ণ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, মধুর দৃশ্যাঙ্কনের সময় তেমনই বীণাতন্ত্রীর শান্ত ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর শব্দরাজি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আজকাল বঙ্গসাহিত্যে ভাষা সম্বন্ধে যে প্রকার চটুলতার প্রাধান্য চলিতেছে, তাহাতে মেঘনাদ-বধের ন্যায় শব্দ-সম্পদ্-গরিষ্ঠ মহাকাব্যের

মহিমা হয় ত অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই অভিনব রাষ্ট্রীয় জাগরণের দিনে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির বীররস ও বীরভাষা-মণ্ডিত মহাকাব্যের মর্ম্ম যদি আমরা বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে জানিব, আমাদের সৌভাগ্যরবি সমুদিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

অমিত্রাক্ষরের ভিতর কতদূর কাব্য-সৌন্দর্য্য ও রস-মাধুর্য্য ব্যক্ত হইতে পারে, তাহার জলন্ত নিদর্শন এই মহাকাব্যের চিত্ত-চমৎকারী চতুর্থ সর্গ। করুণ ও কান্তরসের এমন জীবন্ত আলেখ্য বঙ্গসাহিত্যে আর আছে কি না সন্দেহ। মধুসূদনের মধুময়ী প্রতিভার অপূর্ব্ব অবদান এই স্বর্গস্বরূপ সর্গটি। কবির বাক্য-বীণার এই করুণতম ঝঙ্কার কাণের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রবেশ পূর্ব্বক সমগ্র মর্ম্মকে মধুময় করিয়া তোলে। আমরা নিম্নে এই সর্গের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম, যাহাতে কবি অশোক-কাননে নির্ব্বাসিতা সীতার শোকে সমবেদন-পরা প্রকৃতির বিষাদ করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

"একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর-বনে।
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্তমণি
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে!
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা। নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল। বসেছে অরবে
শাখে পাখী। রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে; যেন তরু তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিনী
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি, চলিছে সাগরে
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী।
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে।"

করুণ রসের এই অপূর্ব্ব আলেখ্য আঁকিবার আগে রসশিল্পী মধুসূদন মহোৎসবমগ্না লঙ্কার হর্ষোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া অশোক-কাননের শোকচ্ছবিটিকে যেন আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। সতীশিরোমণি সীতা যখন আঁধার কুটীরে একাকিনী শোকাকুলা, তখন—

"ভাসিছে কনকলঙ্কা আনন্দের নীরে
সুবর্ণ-দীপমালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা!"

শুধু ভাষার দিক দিয়া নহে, ভাবের দিক দিয়াও 'একাকিনী'র সহিত 'শোকাকুলা'র এবং 'শোকাকুলার' সহিত 'অশোক-কাননে'র কি মর্ম্ম-গত সাদৃশ্য! অন্য অভিধানের পরিবর্ত্তে 'রাঘববাঞ্ছা' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া কবি সীতা উদ্ধারের সমগ্র প্রচেষ্টাটিকে যেন দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র বাক্যটির পশ্চাতে রহিয়াছে যেন একখানি বিরাট বিরহ মহাকাব্য! সীতার পরিবর্ত্তে "সতী" শব্দটি দিয়া প্রচণ্ড প্রতিকূল প্রবাহের মধ্যস্থলে স্বীয় সতীত্ব-মহিমায় অবিকম্পিতা অশোকবনাবস্থিতা সীতার পবিত্র স্বরূপটি কি সুন্দরভাবে কবি ব্যক্ত করিয়াছেন! সেই নিবিড় তিমিরাবৃত বনানীবক্ষে একাকিনী উপবিষ্টা লক্ষ্মীস্বরূপিণী ললনাললাম সীতার লাবণ্য-বিভা বর্ণনায় কবি যে অনুপমা উপমাদ্বয় প্রয়োগ করিয়াছেন, ভাবে ও ভাষায় তাহা কি মনোমদ! "কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে" এই সুমহান্ কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই কবি এইরূপ সমধ্বন্যাত্মক সুগম্ভীর শব্দ-সম্ভার সজ্জিত করিয়া সঙ্গীতের ন্যায় ঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপমায় মহাকবি কালিদাস যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনই বঙ্গদেশে এ বিষয়ে মহাকবি মধুসূদন অদ্বিতীয়।

আর একটি বিষয়েও মধুসূদনের সমকক্ষ আজ পর্য্যন্ত কোনও কবি হইতে পারেন নাই। মহাকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নাটকীয় গুণের বিকাশ। "লিরিক" বা গীতিকাব্যের সহিত "এপিক" বা মহাকাব্যের এইখানেই প্রকাণ্ড পার্থক্য। মহাকাব্যের ব্যক্তিগত উক্তিগুলির মধ্যে এই নাটকীয় শক্তির পরিচয় অবশ্যই থাকা চাই। "সেটানের" কণ্ঠ-বিনিঃসৃত বহ্নিজ্বালাময়ী ওজস্বিনী বাণী-সমূহ যেমন "প্যারাডাইজ লষ্টের" মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য-গরিমা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তেমনই বীরবর রাবণ ও বীরবালা প্রমীলার কণ্ঠ হইতে কবি যে সকল বহ্নিবাণী বাহির করিয়াছেন, তাহাদের দ্বারা সমগ্র মেঘনাদ-বধ মহিমালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সীতা ও সরমার কথোপকথন মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার পূর্ণোৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কাব্যের মধ্যে এইরূপ জলস্রোতের মত প্রাঞ্জল উক্তির অবতারণা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কবি যেন সারল্যমূর্ত্তি সীতা ও সরমার হৃদয়-সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক এই অমৃতবাণীগুলি উদ্ধার করিয়াছেন। বঙ্গের কবি-কুলশিরোমণি এই কথোপকথনের ভিতর দিয়া বঙ্গনারীর নিরুপমা হৃদয়মধুরিমা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সীতার বনবাস বর্ণনার মধ্যে আমরা "কান্তার-কান্তির" সঙ্গে সঙ্গে কান্তরসের যে শান্ত-সুন্দর ছবিখানি দেখিতে পাই, তাহার তুলনা কোথায়? দাম্পত্যপ্রীতি বর্ণনায় মধুসূদনের মত কৃতিত্ব কোনও কবি দেখাইতে পারেন নাই, এ সত্য সংশয়াতীত।

মধুসূদনের কাব্যরচনার প্রথম প্রচেষ্টা "তিলোত্তমা-সম্ভব"। এই প্রাথমিক রচনাখানির মধ্যে স্থানে স্থানে প্রাঞ্জলতার কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হয়। কবি এই গুরু-গম্ভীর কাব্যখানির সর্ব্বত্র ভাব ও ভাষার সমুজ্জ্বল রত্নরাজি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু মেঘনাদবধের মত অসাধারণ বিন্যাস-নৈপুণ্য ইহার সকল স্থানে দেখিতে পাই না। প্রারম্ভ হইতে পরিশেষ পর্য্যন্ত এই কাব্যবীণাখানিকে উদাত্ত-গম্ভীর সুরে বাঁধিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার সমস্তটাই sublime ভাব-রাজির ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। "অম্বরপথে হৈম-ব্যোমযানের" ন্যায় এই কাব্যে কবির কল্পনা গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বিচরণ

করিয়াছে, মর্ত্ত্যের মলিন মৃত্তিকাতলে অবতরণ করে নাই। রস অপেক্ষা "তিলোত্তমায়" কবিত্বের বিকাশ অধিকতর। কল্পনার লীলা-লহরীতে, বর্ণনার সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে, ইহা সময়ে সময়ে মেঘনাদবধকে অতিক্রম করিয়াছে। "তিলোত্তমার" তৃতীয় সর্গ কবি-কল্পনায় বঙ্গ-সাহিত্যে তুলনা-রহিত। সমগ্র কাব্যখানি সুগম্ভীর শব্দসম্ভারের দ্বারা সজ্জিত। মেঘনাদবধ অপেক্ষা তিলোত্তমাসম্ভব মধুসূদনের শব্দচয়নচাতুর্য্যের উজ্জ্বলতর নিদর্শন।

ইতালীয় কবির আদর্শে মধুসূদন "বীরাঙ্গনা" নামক পত্রময় কাব্যখানি রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কতদূর সরল সহজ ও প্রাণময় হইতে পারে, তাহার অপূর্ব্ব নিদর্শন এই বিচিত্র কাব্যখানি। পৌরাণিকী কথা হইতে কবি ইহার বিষয় গ্রহণ করিয়া, স্বীয় অলৌকিক কল্পনার দিব্যালোকে সেগুলিকে অভিনব মূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই কবিতাময়ী প্রণয়-পত্রিকাবলী পাঠ করিলে মনে হয়, প্রণয়তত্ত্ববিদ মহাকবি মধুসূদন নারী-হৃদয়ের মাধুর্য্য-মহাসিন্ধু মন্থন করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। কবির প্রতিভা-স্পর্শমণি যাহা স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই যেন বর্ণরাগরঞ্জিত স্বর্ণ-প্রভা ধারণ করিয়াছে। মধুসূদনের মধুময়ী প্রতিভা শূর্পনখার হৃদয়েও অভিনব মাধুর্য্যধারা ঢালিয়া দিয়াছে। মধুসূদন খৃষ্টান হইয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুর পৌরাণিক আখ্যান-গুলির উপর তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কবিত্বময়ী কল্পনাবলে অতি সামান্য বিষয়েও অসামান্য সৌন্দর্য্য বিকশিত করিতে মধুসূদন বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। "বীরাঙ্গনার" এক একটি পত্র যেন এক একখানি জীবন্ত আলেখ্য। বঙ্গ-সাহিত্যের শিরায় শিরায় তিনি কি অভূতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহা বীরাঙ্গনা পড়িলে হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হয় না। ভাবভরে রসাবেশে দোদুল্যমানা শ্রাবণের স্রোতস্বিনীর মত স্বচ্ছন্দগামিনী ভাষা প্রত্যেক পত্রখানিতেই পরিলক্ষিত হয়। এই পত্রময়ী কবিতা-গুলির মধ্যে মধুররস যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সকল আবেগময়ী বাণীর নাটকীয় সৌন্দর্য্যও অনন্যসাধারণ; এই বাণী কোথাও বহ্নিশিখার মত জ্বালাময়ী, কোথাও নীর-নির্ঝরের ন্যায় শান্ত শীতলা। ভক্তিসুধাসিক্ত কান্ত-রসের অপূর্ব্ব উদাহরণ দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, বিদ্রূপবাণ-বিদ্ধা ওজস্বিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দশরথের প্রতি কৈকেয়ী। বীরাঙ্গনার ও ভাবতরঙ্গময়ী ভঙ্গী ও ভাষা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে যেন অভিনব মহাশক্তির বোধনসঙ্গীত।

"ব্রজাঙ্গনা কাব্য" কৃষ্ণবিরহবিধুরা রাধার করুণ বিলাপ-বাণী। মিত্রাক্ষর রচনাতেও মধুসূদনের দক্ষতা কতদূর, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই বিরহাত্মক গীতিকাব্যখানি। হেমন্তের স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় শান্ত-সুন্দর সুর এই কাব্যের ভিতর দিয়া মৃদুকলতানে বহিয়া গিয়াছে, তাহা অতিশয় প্রাণস্পর্শী। রাধার অনন্ত বিরহ-ব্যাকুলতা কবি অতি সরল ও সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এক একটি প্রাকৃতিক পদার্থকে আশ্রয় করিয়া রাধার এই করুণ কৃষ্ণজিজ্ঞাসা বিকাশলাভ করিয়াছে। কবি দুই একটি সহজ কথায় রাধিকার এই কৃষ্ণ-পিপাসা কি পূর্ণভাবে বিকাশ করিয়া তুলিয়াছেন!

"চল সখি ত্বরা করি হেরি গে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন!"

রাধার বিরহার্ত্তির কি উচ্ছ্বাসময়ী অভিব্যক্তি!

"ফেলিয়া দিয়াছি আমি শত অলঙ্কার,
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ!
ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা, জুড়াতে মনের জ্বালা
চন্দন-চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন!
আর কি এ সবে সাধ আছে গো রাধার!"

কিম্বা—

"হায় রে কোথায় আজ শ্যাম-জলধর?
তব প্রিয় সৌদামিনী কাঁদে, নাথ, একাকিনী!
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধা-মনোহর?
রত্ন-চূড়া শিরে পরি এস বিশ্ব আলো করি
কনক-উদয়াচলে যথা দিনকর!"

কৃষ্ণপ্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারস-প্রবাহপূত বৈষ্ণব-পদপীযূষপ্লাবিত বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন এমন করুণ ও কমনীয় কণ্ঠে কৃষ্ণকথা কহিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। বিস্ময়ের বিষয় এই কৃষ্ণানুরাগী কবির ধর্ম্মান্তরগ্রহণ।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীও ইতালীয় কাব্যাদর্শে রচিত। কবিবর "ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্ক" এই পন্থার প্রবর্ত্তক। মধুসূদনের উন্নতোজ্জ্বল কবি-হৃদয়ের বিবিধবিষয়িণী বিশালতার বার্ত্তা এই কবিতাবলী ঘোষণা করিতেছে। যাহা অপরের নিকট অতি তুচ্ছ, কবির চিন্তাশীল চিত্ত তাহার অভ্যন্তরেও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছে। মধুসূদনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-প্রভা-পরিপূর্ণ প্রাণের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই কবিতাবলী। কবি সকল বিষয়ের ভাবগ্রাহী, সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল, সকল বস্তুর মর্ম্ম-মাধুর্য্য-গ্রহণে সমর্থ। দেশবিদেশের কবিদের প্রতি মধুসূদনের শ্রদ্ধাসিক্ত কবিতাকুসুমাঞ্জলি তাঁহার অন্তরের অসীম উদারতার পরিচায়ক। অপরের প্রতি এরূপ গুণ-গ্রাহিতাপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য কয়জন কবি দিতে পারিয়াছেন? ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াও কবি দেশের সনাতন ভাবধারার প্রতি, দেশের প্রাচীন আচারানুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল পাঠ করিলে মনে হয়, কবি শুধু বাহ্যতঃ খৃষ্টান হইয়াছিলেন, তাঁহার অন্তর চিরদিন ছিল স্বধর্ম্মাসক্ত। য়ুরোপপ্রবাসকালে "চতুর্দ্দশপদী" লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং কবির পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন ভারতীয় ভাবের, প্রাচীন পন্থানুবর্ত্তিনী দেবার্চ্চনার একান্ত প্রতিকূল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি স্বদেশের সনাতন পুণ্যোৎসব সকলকে স্মরণ করিয়া তাহাদের উদ্দেশে কবিতাগুলি নিবেদন করিয়াছেন। "আশ্বিন মাস" শীর্ষক কবিতায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, তাঁহার প্রাণ পিতৃধর্ম্মকে কোনও দিনই পরিত্যাগ করে নাই। কবিতাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত,
এসেছেন ফিরি উমা বৎসরের পরে
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;

বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী স্বর্ণবীণা করে,
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক অসুর-শ্রেষ্ঠ, গণদল যত
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবর
করি-শির: আদি ব্রহ্ম বেদের বচনে
এক পদ্মে শতদল। শত রূপবতী
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্র গগনে
কি আনন্দ! পূর্ব্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে
ফলিবে কি মনে পুন: সে পূর্ব্বভকতি ?"

মানসনেত্রে মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে য়ুরোপে বসিয়া যিনি অশ্রুসিক্ত-নয়নে গাহিয়াছিলেন, "ফলিবে কি মনে পুন: সে পূর্ব্বভকতি ?" তিনি ঘটনাচক্রে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও অন্তরতম প্রদেশে চিরদিনই ছিলেন স্বধর্ম্মানুরাগী। যিনি সেই সুদূর বিদেশেই সম্পূর্ণ বিপরীত আবেষ্টনের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া কোজাগর-পূর্ণিমা-রজনীতে লক্ষ্মীদেবীকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে
থাক বঙ্গ-গৃহে যথা মানসে, মা, হাসে
চির-রুচি কোকনদ, বাসে কোকনদে
সুগন্ধ, সুরন্ত্রে জ্যোৎস্না, সুতারা আকাশে
শুক্তির উদরে মুক্তা; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে।"

তাঁহার স্বধর্ম্মাসক্তি সম্বন্ধে সন্দেহবুদ্ধি পোষণ করিবে কে? যিনি বিজয়া-দশমীর করুণ স্মৃতি বুকে বহিয়া সেই প্রবাসে বসিয়াই গাহিয়া গিয়াছেন,—

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে,
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে॥"

রুক্মিণীদেবীর রচনাছলে কৃষ্ণরূপ বর্ণনায় যাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে,—

"চিত্রপটে যেন
চিত্রিত সে মূর্ত্তি-চিত্র, হায়, এ হৃদয়ে
নবীন নীরদবর্ণ; শিখিপুচ্ছ শিরে
ত্রিভঙ্গ; সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা
মধুর অধরে বাঁশী, বাস পীতধড়া,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন রাজীবচরণে
যোগীন্দ্রমানসপদ্ম মোক্ষধাম ভবে।"

তিনি শুধু হিন্দু নহেন, তিনি ভক্ত, পিতৃধর্ম্মের পবিত্র প্রবাহ তাঁহার প্রাণের পরতে পরতে অনুপ্রবিষ্ট।

মধুসূদন বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন একটা বিপুল বিস্ময়ের মত। মধুসূদন ও বঙ্কিম বাঙ্গালার দুই বিরাট পুরুষ,—সাহিত্যের দিক দিয়া বর্ত্তমান যুগচক্রের যাঁহারা প্রবর্ত্তক। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম কবি-সম্রাট মধুসূদন সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—"জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন"। সত্যই, মধুসূদনের ন্যায় মহাকবি জাতির অদ্বিতীয় গৌরবের বস্তু। কোনও জাতির বিশেষ শুভাদৃষ্ট না হইলে এরূপ মহাকবির আবির্ভাব হয় না। কবির কাব্যরাজির ভিতর দিয়া জাতির অন্তরনিহিত ভাবরাশি অভিব্যক্ত হয়, আবার ভাবানুশীলনের সহায় হইয়া সেই কাব্যকুসুমাবলীই জাতির চিত্তকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যায়। মহাকবির উদ্ভব জাতির মহত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে। তাই স্বজাতিবৎসল বঙ্কিম বলিয়াছেন,—"যদি কোনও ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত য়ুরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্য, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।" বাঙ্গালীর মত প্রাচীন ও প্রকাণ্ড জাতির সাহিত্যকে যিনি নূতন ভাষায় বিচিত্র সুরে বিচিত্র ছন্দে গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে বিশ্বমনোহর মূর্ত্তি দান করিয়াছেন, যিনি বিশ্বসাহিত্যসমুদ্র-মন্থনে অপূর্ব্ব কাব্যামৃত উত্তোলন পূর্ব্বক বঙ্গবাণীকে নব শক্তিতে নব প্রাণ-প্রবাহে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি কত বড় শক্তিমান সাহিত্যরথী, তাহা অনুভবের বিষয়।

মধুসূদনের অবদানের সহিত কোনও কবির দানের তুলনা চলে না। কঠোর সাধনাবলে মধুসূদন যে অভিনব কাব্যজগৎ রচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী কবিমাত্রই তাহার অধিবাসী। মধুসূদনই বর্ত্তমান বাঙ্গালার প্রকৃত কবি-গুরু। তাঁহার কবি-প্রতিভা—তাঁহার কল্পনাশক্তি ছিল মহাসিন্ধুর মত অসীম। সর্ব্বোপরি তাঁহার শিক্ষালোকে সমুজ্জ্বল, সার্ব্বজনীন প্রীতিপ্রবাহে পরিষিক্ত প্রাণখানি ছিল অগণ্য-নক্ষত্রখচিত আকাশের মত উদার অথচ পুষ্পগন্ধামোদিত মলয়ের মত মধুর। এত থাকিতেও তাঁহার জীবন সাংসারিক সুখ-সম্পদের দিক দিয়া সার্থকতা লাভ করে নাই, ইহা শুধু তাঁহার দুর্ভাগ্য নহে, আমাদের কলঙ্কের কথা। স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া বোধ হয় কবি স্বদেশবাসীর সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাসমুদ্রমন্থনে অমৃত ও হলাহল দুই-ই উঠিয়াছিল। দেশকে অমৃত দিয়া নীলকণ্ঠের ন্যায় মধুসূদন নিজে সেই তীব্রতম কালকূট পান করিয়াছিলেন।

কবি মিথ্যাশারূপ মরু-মরীচিকার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বাহ্যত: পিতৃ-পুরুষের পদাঙ্কপূত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে সত্যের স্বরূপ তাঁহার সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন আর প্রত্যাবর্ত্তনের পথ ছিল না। আশা-মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্লান্তকায় কবি শেষে করুণকণ্ঠে কহিয়াছিলেন,—

"রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুমভাতি
কত দিন রবে?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কি রে ঝলমলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্য:পাতি?"
"নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কি সুখ তার,
জাগে সে কাঁদিতে!

ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে!
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার!"

মধুসূদনের অনন্ত কবিকল্পনাকাশে তত্ত্বালোকের যে তড়িৎ-শিখা মাঝে মাঝে স্ফুরিত হইয়া উঠিত, ইহা তাহারই উদাহরণ। এই "আশা-মরীচিকা" কবিতাটি মিত্রাক্ষর ছন্দের উপরেও কবির অসাধারণ অধিকারের কথা ঘোষণা করিতেছে। যথাযোগ্য রূপক ও উপযোগিনী উপমা সৃষ্টি করিতে তাঁহার অতুলনীয় দক্ষতার বার্ত্তাও ইহা ব্যক্ত করিতেছে।

হেমচন্দ্রের মত দেশাত্মবোধের উদ্দীপনাময়ী অভিব্যক্তি মধুসূদনের রচনাবলীর মধ্যে না থাকিলেও, দেশপ্রীতির পরিচয় তাহাদের ভিতর পাওয়া যায় না, ইহা সত্য নহে। তিনি দেশের প্রাচীন গৌরবগাথা-সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার এক একখানি কাব্যই দেশানুরাগের পরিচায়ক। যিনি দেশের ক্ষুদ্র নদীটিকেও ভালবাসিয়া স্বীয় কাব্যের মধ্যে অমরতা দিয়া গিয়াছেন, আবেগময়ী বাণীতে দেশের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি যিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে সংশয় করিবে কে? সুদূর প্রবাসে বসিয়া বিদেশীর নিকট স্বদেশের পরিচয়স্থলে যিনি কাব্যরসময়ী ভাষায় কহিয়াছেন,—

"যে দেশে উদিয়া রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে ব্যাপিত বাস উর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতোরূপে গলে)
শোভেন শৈলেন্দ্ররাজ!"

যিনি অতীতের মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে বর্ত্তমানের বিপুল দৈন্য-দুর্দ্দশা ও গভীর গ্লানির কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আকাশপরশী গিরি দমি গুণবলে
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে!
পরাধীন, হা বিধাতঃ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে;
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধ? কে কবে মোরে? জানিব কিমতে?"

যিনি সুদূর প্রবাসে যাইবার সময় দেশমাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বেদনা-বিকম্পিত স্বরে গাহিয়াছিলেন—"মধুহীন কোরো না গো, তব মনঃ-কোকনদে!" তাঁহার প্রাণে দেশাত্মবোধ ছিল না, এ অসম্ভব কথা!

কেবল কাব্য নহে, বঙ্গসাহিত্যে অভিনয়োপযোগী নাটক ও প্রহসনেরও প্রবর্ত্তক প্রতিভার্ণব মধুসূদন। মধুসূদনের পূর্ব্বে যে কয়েকখানি বাঙ্গালা নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রাঞ্জলতা গুণ আদৌ ছিল না বলিয়া নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে তাহারা উপযোগী ছিল না। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহাকবি মধুসূদনের প্রতিভাপ্রভাবে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী প্রভৃতি নাটক পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়, সরল ও সহজ গদ্য রচনাতেও মধুসূদন ছিলেন কতদূর পারদর্শী। পরে মধুসূদনের আদর্শেই নাটক রচনা করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যরথী বঙ্গের নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ (কবিরত্ন)।

রাজ-মিস্ত্রী

কত দিন মাস বর্ষ ধ'রে,—
সুনিপুণ করে,
থরে থরে থরে,
ইষ্টক সজ্জিত করি ইষ্টকের পরে
গড় তুমি হর্ম্ম্য মনোহর।
ঢালিয়া অন্তর,
ফুটাইয়া তোল তাহে রূপের মাধুরী,
শিল্পের চাতুরী,
চারু তব কারুকর্ম্মরাশি,
অলিন্দে গবাক্ষ কক্ষে ওঠে গো উদ্ভাসি।
কখন,—
নিদাঘের খর তর তপন-কিরণ
দগ্ধ করে দেহ, ধারা বরষার
সিক্ত করে সর্ব্বাঙ্গ তোমার।
পলে পলে স্বাস্থ্য আয়ু দিয়ে বিসর্জ্জন,
গড় তুমি ধনিজন-গৃহ সুশোভন।
সমাপ্ত করিয়া কার্য্য প্রফুল্ল অন্তরে,
আপনার কৃতকর্ম্ম চেয়ে দেখ কত তৃপ্তিভরে।
যদিও সে গৃহ হায় নহেক তোমার,
দিনেকেরও তরে বাসে নাহি অধিকার,
তবুও মমতা কত উপরে তাহার,
নিজ হস্তে সে যে তব গড়া আপনার।
গড়ি' তুলি অট্টালিকা থাক কুঁড়ে ঘরে,
দারিদ্র্যের বোঝা লয়ে শিরে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

বিষের ধোঁয়া

১৮

পাঞ্জাব মেল হাওড়া ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে কিশোর বিমলাকে লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিল, প্ল্যাটফর্ম্মের উপর বিরাট জনতা, দেশী ও বিলাতী বহুবিধ ভদ্রশ্রেণীর যাত্রীর ভিড়ে কোথাও তিল ফেলিবার স্থান নাই। কিশোর আগে হইতে দুই খানি প্রথম শ্রেণীর বার্থ্ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল, তাই গাড়ীতে যায়গা পাওয়া সম্বন্ধে তাহার কোন দুর্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেক গাড়ীর সম্মুখস্থ তালিকায় নিজের নাম খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে নির্দ্দিষ্ট গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বিমলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় গাড়ীর ভিতর হইতে এক জনের পরিচিত সকৌতুক কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল,—"এ কি কিশোর বাবু, আপনি কোথায় চলেছেন ?"

কিশোর মুখ তুলিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল,—সম্মুখের বেঞ্চির গদীর উপর বসিয়া যে মেয়েটি হাসিমুখে তাহার পানে তাকাইয়া আছে, সে যে করবী হইতে পারে, তাহা যেন কিশোর সহসা বিশ্বাস করিতেই পারিল না।

করবী হাসিয়া বলিল,—"একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেম যে! চিনতে পারছেন ত ?"

কিশোর হাঁ-না কোন কথাই বলিতে পারিল না। যে দিন সন্ধ্যাবেলা বিনয় বাবুর বাড়ীতে সেই কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, সে দিন করবী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল; উপস্থিত না থাকিলেও সে ব্যাপার তাহার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইত না। কিশোর বুঝিয়াছিল, ইহার পর করবীদের সহিত তাহার নব-স্থাপিত বন্ধুত্বের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে আবার দেখা হইবার সম্ভাবনাও সে কল্পনা করে নাই, এবং যদি দৈবাৎ দেখা হয়, তাহা হইলে দুই পক্ষই যে দূর হইতে অপরিচিতের মত সরিয়া যাইবে, ইহাই সে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছিল। অনুপম করবীর পিসতুত ভাই, তাহার উপস্থাপিত অভিযোগ যে করবী শেষ পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া কিশোরের সংসর্গ বর্জ্জন করিবে, ইহাই ত সঙ্গত।

কিন্তু এ কি অচিন্তনীয় ব্যাপার! করবীর এই একান্ত বন্ধুভাবে সম্ভাষণের সহিত নিজের অন্তরস্থ বদ্ধমূল ধারণার আপোষ করিতেই কিশোরের খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তার পর নিজের বিচ্ছিন্ন চেতনাকে সংহত করিয়া সে ভাবিয়া দেখিল যে, করবী ছেলেমানুষ, হয় ত সব দিক না ভাবিয়াই তাহার সম্বন্ধে এতটা সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার অভিভাবকরা জানিতে পারিলে নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং এ কথা ভাবাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে যে, কিশোরই গায়ে পড়িয়া তাঁহাদের সহিত পুনশ্চ ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।

কিশোরের একবার ইচ্ছা হইল, এ গাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোন খালি গাড়ী খুঁজিয়া লইয়া তাহাতে গিয়া উঠে। কিন্তু এখন সে পথও বন্ধ, কুলীরা ইতিমধ্যে মোটঘাট লইয়া এই গাড়ীতেই রাখিয়াছে, বৌদিদিও গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আবার মোটঘাট তুলিয়া লইয়া অন্যত্র যাইবার চেষ্টাও যে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইবে, তাহা বুঝিয়া কিশোর সেই গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িল এবং সংযতভাবে করবীকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল,—"আমরা কাশী যাচ্ছি।"

করবী করতালি দিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল,—"আমরাও কাশী যাচ্ছি, বেশ হ'ল, একসঙ্গে যাব। ইনি আপনার বৌদিদি ত? দেখেই চিনতে পেরেছি। আসুন বৌদি, এখানে এসে বসুন। আপনাদের সঙ্গে ট্রেণে এমন ভাবে দেখা হবে, তা ভাবিও নি—ভারী আশ্চর্য্য নয়? আচ্ছা, আপনারা কাশী যাচ্ছেন, আগে আমাদের একটা খবর দেননি কেন? জানা থাকলে কত সুবিধে হ'ত।"

কিশোর নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে ত কাউকে দেখছি না, আপনি কি—?"

করবী হাসিয়া বলিল,—"না, একলা যাচ্ছি না, বাবা সঙ্গে আছেন। মা আজ দু'মাস হ'ল কাশীতেই রয়েছেন কি না—তাঁকেই আনতে যাচ্ছি। মা'র শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছিল, তাই মামা এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মামার বাড়ী কাশীতে, আপনি জানতেন না বুঝি?"

কিশোর মাথা নাড়িয়া নিঃশব্দে বেঞ্চির এক কোণে গিয়া বসিল। কুলীগুলা মজুরীর জন্য দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের

ভাড়া চুকাইয়া দিতে দিতে ক্ষুব্ধ-মনে ভাবিতে লাগিল, এ কোন্ দৈবী দুষ্টবুদ্ধি সারারাত্রির জন্য তাহাকে এই অনীপ্সিত সাহচর্য্যের মধ্যে ফেলিয়া দিল?

বিমলা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, করবী উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, "কিশোর বাবু ত পরিচয় করিয়ে দিলেন না, নিজেই নিজের পরিচয় দিই। আমি করবী,—বোধ হয়, ওঁর কাছে নাম শুনে থাকবেন।"

বিমলা হাসিয়া বলিল,—"শুধু নাম নয়, অনেক প্রশংসাও শুনেছি।"

সুস্মিতমুখে কিশোরের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া করবী বলিল,—"সত্যি? এ ত আমার ভারী সৌভাগ্যের কথা। আমি জানতুম, উনি কেবল মুখের ওপর কম্প্লিমেণ্ট দিতে পারেন। যা হোক, আড়ালেও আমার সুখ্যাতি করেছেন, এ আমার পক্ষে কম গৌরব নয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই প্রমদা বাবু হন্তদন্ত হইয়া কোথা হইতে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই নানাবিধ চীৎকার ও হুড়াহুড়ির সহযোগে গাড়ী ধীরে ধীরে আলোকদীপ্ত প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

অপরিচিত একটি স্ত্রীলোকের সহিত মুখোমুখি বসিয়া করবী কথা কহিতেছে দেখিয়া প্রমদা বাবু প্রথমটা বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিলেন, তার পর কিশোরের দিকে ফিরিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন,—"আরে কিশোর বাবু যে।" কিশোরের পাশে গিয়া বসিয়া বলিলেন,—"যাক, বাঁচা গেল। কে, সি, চক্রবর্ত্তী আর মিসেস হালদারের নামে রিজার্ভ-কার্ড দেখে ভয় হয়েছিল, বুঝি একযোড়া বাঙ্গালী মেম-সাহেব বড়দিন করতে চলেছে—সারাটা পথ জ্বালাতে জ্বালাতে যাবে।—তার পর, এখন যাওয়া হচ্ছে কদ্দূর? মোগলসরাই পর্য্যন্ত রিজার্ভ করেছেন দেখছি—কাশী চলেছেন নাকি?"

কিশোর বলিল,—"হ্যাঁ,—আপাততঃ কাশী যাচ্ছি।"

প্রমদা বাবু বলিলেন,—"তার মানে বেড়াতে চলেছেন। বেশ বেশ। বড়দিনের ছুটীতে একটা কিছু করা চাই ত।—এই দেখুন না, আমি গেঁতো মানুষ, কলকাতা ছেড়ে এক পা যেতে মন সরে না, আমাকেও বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। বুড়ো বয়সে শ্বশুরবাড়ী চলেছি।"

করবী বলিল,—"বাবা, ইনি কিশোর বাবুর বৌদিদি। ইনি বলছেন, কিশোর বাবু এঁর কাছে আমার খুব প্রশংসা করেছেন। কিশোর বাবু ভারী ভাল লোক—নয়?"

প্রমদা বাবু বলিলেন,—"তোমার প্রশংসা করলেই যদি ভাল লোক হওয়া যায়, তা হ'লে ভাল লোক বলা খুব সহজ বলতে হবে। কিন্তু আমি এত সহজে কিশোর বাবুকে ভাল লোক বল্‌তে রাজী নই। উনি আস্‌ব ব'লে কথা দিয়ে সেই একবার বই আমাদের বাড়ীতে আর আসেননি।" বিমলাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"মা লক্ষ্মীকেও সঙ্গে আনবার কথা ছিল, তাও আন্‌লেন না। আমি পুলিসের লোক, এই সব নানা রকম প্রমাণ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, উনি এক জন নিতান্ত বদ্‌লোক। এমন কি, ওঁকে বোমাবাজ বিপ্লবী বলেও সন্দেহ করা যেতে পারে।"

প্রমদা বাবুর কথায় সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। কিশোরের বুক হইতে একটা ভারী বোঝা নামিয়া গিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন প্রফুল্লতা সে বহুদিন অনুভব করে নাই। তাহার অকৃত অপরাধের জন্য সমস্ত পৃথিবী হইতে যেন সে একঘরে হইয়াছিল, সংসার তাহার প্রতি অন্যায় বিচার করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে, এই অভিমানে সে নিজেই পৃথক হইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিল। আজ প্রমদা বাবু হাত ধরিয়া যেন তাহাকে সেই পরিচিত সংসার-মধ্যে টানিয়া আনিলেন। তিনি যেন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"তোমার নামে কে কি কুৎসা রটনা করিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে চাই না। তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ যতই গুরু হোক্, আমরা জানি, তুমি নির্দ্দোষ, তোমার দ্বারা এত বড় অপরাধ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি—ভালবাসি। তুমি আমাদেরই এক জন।"

কৃতজ্ঞতার এক অপূর্ব্ব আবেগে কিশোরের কণ্ঠ পর্য্যন্ত বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে বলিল,—"আমায় মাপ করুন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। একটা কাযে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, সময় ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। সত্যি কি না বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করুন।"

ইহার পর তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তার আর কোনও

সঙ্কোচ রহিল না। ট্রেণ রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল; দীর্ঘ ব্যবধানে এক একবার ক্ষণকালের জন্য গতি সংহত করে, আবার সগর্জ্জনে উর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইয়া পড়ে। স্থিতিকে স্থায়ী হইতে দিবে না, এই যেন তাহার পণ।

আর, সেই দীপালোকিত ক্ষুদ্র দারু-কক্ষটির মধ্যে এই চারিটি প্রাণী যেন সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ এক ইন্দ্রিয়াতীত মন্ত্রকুহকে পরস্পরের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িলেন। মনের আড়াল যখন একবার ঘুচিয়া যায়, তখন বুঝি এমনই হয়। যে কথা অন্য সময় অতি অন্তরঙ্গের কাছেও প্রকাশ পাইত না, তাহা সহজে স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া আসিল। কৃত্রিম ব্যবধান যেখানে নাই, সেখানে কথারও অন্ত থাকে না। আনন্দের, দুঃখের, আশার, আকাঙ্ক্ষার কত কাহিনীই যে বিনিময় হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শুধু একটা প্রসঙ্গ সকলেই সাবধানে এড়াইয়া গেলেন, সুহাসিনী সম্বন্ধে কোন কথা হইল না।

গল্প-গুজবে যখন অনেক রাত্রি হইয়া গেল, তখন প্রমদা বাবু এক রকম জোর করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন এবং বিছানাপত্র পাতিয়া শয়নের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

কিশোর তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রমদা বাবুর হোল্ড্-অল্ খুলিয়া তোষক, বালিশ, লেপ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিল। কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, বিমলা ও করবী দুই পাশের বেঞ্চিতে শয়ন করিবে, প্রমদা বাবু ও কিশোর মেঝের পরিসর স্থানে বিছানা পাতিয়া শুইবেন। পথের জন্য বিমলা সামান্য একটা বিছানা জড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাতে নিজের জন্য একটা মোটা ভুটিয়া কম্বল এবং কিশোরের জন্য লেপ বালিশ তোষক ছিল। কিশোর সেটা খুলিয়া বিছানা পাতিতে লাগিয়া গেল। প্রমদা বাবুকে বলিল,—"আপনি বসুন, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

প্রথমে দুই বেঞ্চির উপর দুটা তোষক পাট করিয়া পাতিয়া তাহার উপর বালাপোষ বিছাইয়া বালিশের জন্য প্রমদা বাবুর বিছানার স্তূপ খুঁজিতে খুঁজিতে দুটি ছোট ছোট অতি সুন্দর চিকনের কাষ-করা বালিশ বাহির হইয়া পড়িল। কিশোর সহাস্যমুখে করবীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ দুটি বুঝি আপনার?"

করবী বিব্রত হইয়া বলিল,—"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ছেড়ে দিন, আমরা বিছানা পেতে নিচ্ছি।"

কিশোর বলিল,—"আমাকে কি এত অপদার্থ মনে করেন, বিছানা পাতবারও ক্ষমতা নেই?"

বিমলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া করবীকে বলিল,—"ওঁকে কিছু বোলো না, ঝি-চাকরের কায করতে উনি বড্ড ভালবাসেন।"

কৃত্রিম কোপে চোখ পাকাইয়া কিশোর বলিল,—"ঝি-চাকরের কায—আচ্ছা বেশ"—শয্যা প্রস্তুত শেষ করিয়া বলিল,—"এবার শুয়ে দেখুন, ঝি-চাকরের চেয়ে ভাল হয়েছে কি না।"

প্রমদা বাবু শুইয়া পড়িলেন, আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আঃ, দিব্যি হয়েছে। এবার আলোর উপর পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে যে যার ঘুমিয়ে পড়।"

বিমলা নিজের নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"ঠাকুরপো, কম্বলটা আমায় দাও, নইলে সারারাত গা কুটকুট্ করবে, ঘুমতে পারবে না।"

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল,—"নাঃ, ওতে আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

বিমলা বলিল,—"আমি বলছি, লক্ষ্মীটি, তুমি লেপ নাও। কম্বলে আমার অভ্যেস আছে, তুমি লেপ না হ'লে ঘুমতে পার না।"

কিশোর বলিল,—"কম্বলটি নিজের জন্যে নেওয়া হয়েছিল, আমি তা বুঝতে পারিনি। তা তোমারি বুঝি গা কুটকুট্ করতে নেই?"

বিমলা বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, কম্বল নিজে নিয়ে লেপটি আমার ঘাড়ে চাপাবে। এমন একগুঁয়ে মানুষও যদি কোথাও দেখা যায়।"

করবীও শুইয়া পড়িয়াছিল; লেপের ভিতর হইতে এতক্ষণ দুজনের তর্কাতর্কি শুনিতেছিল, এবার ঘাড় তুলিয়া বলিল,—"কিশোর বাবু, আপনার মাথার বালিশ দেখছি না?"

কিশোর কহিল,—"নিষ্প্রয়োজন। বালিশ না থাকলেও আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। বাহুই আমার শ্রেষ্ঠ উপধান।"

বিমলা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল,—"আর বড়াই করতে হবে না। এই দেখ না, নিজের বালিশটি আমাকে দান করা হয়েছে। আমার বালিশের দরকার হয় না, তাই ওঁর জন্যে একটা বালিশ নিয়েছিলুম—"

কিশোর আলো দুটি ঢাকা দিয়া কম্বলের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল,—"বৌদি, এত রাত্রিতে যদি তর্ক আরম্ভ কর, তা হ'লে ঘুম চ'টে যাবে। আর নয়, এবার চট্‌পট্ ঘুমিয়ে পড়া যাক।"

আবরিত বাতির ক্ষীণ প্রভায় কক্ষটি চমৎকার ছায়াময় হইয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে করবী বলিল,—"কিন্তু আমার ত দুটো বালিশ রয়েছে, আপনি একটা নিন না, কিশোর বাবু।"

"না, না, তার দরকার নেই।"

করবী ঝুপ করিয়া একটা বালিশ কিশোরের মাথার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"এই নিন্।"

কিশোর নরম বালিশটি নাড়িয়া সযত্নে মাথার তলায় দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"অন্যায় করলেন। ভাবছিলুম, যখন তীর্থ-যাত্রা করেছি, তখন পথেই কৃচ্ছ্রসাধন সুরু ক'রে দেব,—তা আর আপনারা হ'তে দিলেন না।"

কিছুক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। প্রমদা বাবুর নাসা-নিঃসৃত শব্দ ঘোষণা করিতে লাগিল যে, তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে। গাড়ী অন্ধকারের বুক চিরিয়া উল্কার বেগে ছুটিয়াছে, বদ্ধ কাচের শার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের দৃশ্য কিছু দেখা যায় না। ভিতরে কক্ষটি স্বপ্নদৃষ্ট মায়া-লোকের মত অস্পষ্ট মোলায়েম হইয়া আছে।

অনেকক্ষণ পরে করবী মৃদুস্বরে বলিল,—"মনে হচ্ছে, আমরা যেন কোন নিরুদ্দেশের যাত্রী। এমনি ভাবে গাড়ী যদি চিরকাল চল্‌তে থাকত, কি সুন্দর হ'ত?"

কেহ তাহার কথায় উত্তর দিল না, কিন্তু কিশোর ও বিমলার মনে সে কথার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল।—জীবনটা যদি এমনই নিশ্চিন্ত নিরবচ্ছিন্ন একটি যাত্রা হইত! এমনই নিরুদ্বেগ ছায়াময় রাজ্যের ভিতর দিয়া, সহযাত্রীদের সঙ্গে নিবিড় স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এই যাত্রাপথ যদি কখনও শেষ না হইত!

১৯

পরদিন সকালে চা, জলযোগ ইত্যাদি সমাপ্ত হইবার পর সকলে অলসভাবে বসিয়া মোগলসরাই ষ্টেশনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মোগলসরাই পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই। কথা ছিল, প্রমদা বাবুরা কাশী পর্য্যন্ত ট্রেণে না গিয়া এই-খানেই নামিয়া যাইবেন এবং মোটরে কাশী পৌঁছিবেন। আগে হইতে যান-বাহনের বন্দোবস্তও করিয়া রাখা হইয়াছিল।

করবী ও বিমলা গাড়ীর একটা কোণে বসিয়াছিল, কখনও নিম্নস্বরে গল্প করিতেছিল, কখনও বা বাহিরের শীত-প্রভাতের শিশির-ঝলমল দৃশ্য নীরবে দেখিতেছিল। করবী তাহার স্বভাবসুলভ ছেলেমানুষী ও অকপট সরলতার দ্বারা সহজেই বিমলার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিল; তাহাদের পরিচয় এই অল্পকালের মধ্যেই এমন একটা স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল—যেখানে পাশাপাশি বসিয়াও নিরবচ্ছিন্ন বাক্যালাপের প্রয়োজন হয় না।

গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে একটা কঙ্করময় ষ্টেশনকে দলিত বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল। প্রমদা বাবু পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আর কুড়ি মিনিট। ঠিক টাইমে যাচ্ছে।"

কিশোর উঠিয়া পড়িল; রাত্রির ব্যবহৃত বিছানাপত্র ইত্যাদি তখনও ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল, গোছগাছ করা হয় নাই। কিশোর সেগুলাকে গুছাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই প্রমদা বাবু বলিলেন,—"থাক না হে, অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি? পাশের গাড়ীতে আমার আর্দ্দালী আছে, গাড়ী থামলে সে-ই ঠিকঠাক ক'রে নেবে অখন।"

কিশোর বলিল,—"তা হোক। তাড়াতাড়িতে সে হয় ত পেরে উঠবে না, আমিই ঠিক ক'রে নিচ্ছি।"

করবী বিমলার গা টিপিয়া বলিল,—"আপনি ঠিক বলেছিলেন, বৌদি।" বিমলা হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

কিশোর তাহাদের কথা শুনিয়াও শুনিল না, গম্ভীর-মুখে কার্য্য করিতে লাগিল। সকলে সকৌতুকে দেখিতে লাগিলেন।

প্রমদা বাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল কথা, তোমরা কাশীতে উঠ্‌ছ কোথায়, শুনলুম না ত! কোনও আত্মীয় আছেন বুঝি?"

কিশোর মুখ তুলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"না, আত্মীয় কেউ নেই। কোথায় উঠ্‌ব, এখনও কিছু ঠিক করিনি। যেখানে হোক ওঠা যাবে—দিন তিন চার বৈ ত নয়। শুনেছি, এ দিকের ধর্ম্মশালাগুলো বেশ ভাল।"

প্রমদা বাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন,—"বল কি হে! সঙ্গে স্ত্রীলোক রয়েছেন, ধর্ম্মশালায় উঠবে কি? আমি ভেবেছিলুম, তোমার বুঝি একটা আস্তানা আছে—তাই এতক্ষণ খোঁজ করিনি। বেশ যা হোক।"

উৎসুকভাবে গলা বাড়াইয়া করবী বলিয়া উঠিল,—"বাবা, তা হ'লে—?"

প্রমদা বাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে! এক যায়গাতেই সকলে মিলে ওঠা যাবে। কিন্তু কি ছেলেমানুষী বল দেখি! ভাগ্যিস জিজ্ঞাসা করেছিলুম, নইলে ত ধর্ম্মশালাতেই গিয়ে উঠ্‌তে!"

কিশোর অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"না না, সে আপনাদের বড় কষ্ট হবে। আমরা যেখানে হোক—"

প্রমদা বাবু বলিলেন,—"বিলক্ষণ! কষ্ট কিসের? আমার শালাদের প্রকাণ্ড বাড়ী, দুজন অতিথি বেশী হ'লে তাদের কোনও কষ্টই হবে না। তা ছাড়া, করবীর মা যদি শোনেন যে, তোমাদের ধর্ম্মশালায় পাঠিয়ে দিয়ে আমরা বাড়ী এসেছি, তা হ'লে আমাদেরও হয় ত সেই ব্যবস্থা করতে বলবেন। তাঁর ভায়েদের বাড়ী—বুঝছ না?" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

করবী বলিল,—"কিশোর বাবু, কোনও আপত্তি শোনা হবে না। আপনাদের যেতে হবে।"

কিশোর বিমলার দিকে চাহিয়া বলিল,—"বৌদি, কিন্তু এটা কি উচিত হবে?"

করবী বিমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"আপনি কিন্তু অমত করতে পারবেন না, তা ব'লে দিচ্ছি!"

বিমলা সহাস্যে বলিল,—"অমত করব কেন—বেশ ত। এ ত বরং ভালই হ'ল। আর অসুবিধে যদি হয়, সে ত আমাদের হবে না, তোমাদেরি হবে। তা সে অসুবিধা যখন তোমরা স্বীকার ক'রে নিচ্ছ, তখন আর আমাদের আপত্তি কি?"

নিজের জন্য যতটা নয়, বিমলার কথা ভাবিয়াই কিশোর করবীদের বাড়ী আতিথ্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছা জানাইয়াছিল। বিমলা শুদ্ধাচারে থাকে, তাহার জপতপ স্নানাহারের নানা হাঙ্গামা আছে,—পরের বাড়ীতে উঠিয়া হয় ত এ সকলের কোন সুব্যবস্থা হইবে না; হয় ত তাঁহারা সাহেব লোক, একঘড়া গঙ্গাজলও তাঁহাদের বাড়ীতে পাওয়া যাইবে না;—বিমলা হাসি-মুখে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিলেও ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাইবে, এই সব নানা কথা ভাবিয়া কিশোরের মন কিছুতেই এ প্রস্তাবে সায় দিতেছিল না। কিন্তু বিমলা যখন কোন অনিচ্ছাই প্রকাশ করিল না, বরং সহজেই রাজি হইয়া গেল, তখন কিশোরের নিজের পক্ষ হইতে একটা অজ্ঞাতনামা আপত্তি মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল। প্রমদা বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সংসর্গ অপ্রীতিকর নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তবু অন্ধকার রাত্রিতে অজানা পথে চলিতে চলিতে গভীর খাদের কিনারায় আসিয়া পড়িলে অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেমন ঘাড়ের রোঁয়া খাড়া হইয়া উঠে, তেমনই একটা নামহীন দুর্দ্দৈবের পূর্ব্বাভাস কিশোরের মনটাকে যেন শঙ্কায় কণ্টকিত করিয়া তুলিল এবং মনে হইল, ইঁহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া পলাইতে পারিলেই যেন সব দিক দিয়া ভাল হয়।

অথচ এরূপ সহৃদয় নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া সহরের পান্থনিবাসে আশ্রয় লওয়ার মত অশিষ্টতা অতি অল্পই আছে; তাই কুণ্ঠিতভাবে রাজি হওয়া ছাড়া তাহার আর গতি রহিল না। প্রমদা বাবু ও করবী অকপটভাবে খুসী হইয়াছেন বুঝিয়াও সে মনের মধ্যে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। বাকী পথটা একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়া প্রায় নীরবেই কাটিয়া গেল।

যথাসময় মোগলসরাই ষ্টেশনে নামিয়া সকলে মোটর-যোগে কাশী পৌঁছিলেন। কাশীতে করবীর মামার বাড়ী দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটেই। তাঁহারা মোটেই সাহেব নহেন, বরঞ্চ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হিন্দু দেখিয়া কিশোর বিমলার বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। করবীর মা আগন্তুকদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বিমলাকে হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। বেলা হইয়াছিল, অল্প দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পর বিমলা গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই স্নান সারিয়া পূজার ঘরে ঢুকিল।

পূজা শেষ করিয়া যখন সে বাহির হইল, বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা সকলেই তাহার জন্য অভুক্ত আছেন দেখিয়া সে লজ্জিত হইয়া বলিল,—"কেন আমার জন্যে আপনারা কষ্ট করলেন ? আমি ত বিশ্বনাথ দর্শন না ক'রে মুখে জল দিতে পারব না। আমারই অন্যায় হয়েছে, আগে বলা উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা আর দেরী করবেন না, খেয়ে দেয়ে নিন। আর যদি সুবিধা হয়, এক জন লোক সঙ্গে দিয়ে আমাকে বিশ্বনাথ-মন্দিরে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন। ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিতে পারতুম, কিন্তু সমস্ত রাত গাড়ীতে এসে তিনি ক্লান্ত হয়েছেন।"

করবী বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"আর আপনার শরীরে বুঝি ক্লান্তি নেই ? কাল গাড়ীতে ওঠার পর থেকে আজ এই বেলা পর্য্যন্ত আপনাকে মুখে এক ফোঁটা জল দিতে ত দেখলুম না। ক্ষিদের কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু তেষ্টাও কি আপনার পায় না, বৌদি ?"

বাড়ীতে অন্য কোন বিধবা ছিলেন না, তাই বিমলার জন্য আলাদা হবিষ্য রাঁধিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; করবীর বড় মামী বলিলেন,—"আপনার রান্নার উয্যুগ সব আমি ক'রে রেখেছি, শুধু আমাদের হাতে খাবেন কি না, তাই রান্না বসাতে পারিনি।"

বিমলা হাসিয়া বলিল,—"সে কি কথা, খাব বৈ কি।"

বড় মামী বলিলেন,—"তা হ'লে, আপনার রান্না আমিই চড়িয়ে দিই; বিশ্বনাথ ত কাছেই—আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্‌তে পারবেন —করবী, তুথেকে ডেকে ব'লে দে ত মা, মোটরকার ক'রে এঁকে যেন বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনে। আর সুরেনের ত স্কুল নেই, সেই সঙ্গে যাক—"

করবী বলিল,—"কিন্তু খেয়ে দেয়ে গেলেই ত ভাল হ'ত।"

বিমলা জিভ কাটিয়া বলিল,—"তা কি হয়, ভাই, কাশীতে এসে বিশ্বনাথের মাথায় জল না দিয়ে কি খেতে আছে ?"

করবী বলিল,—"কেন খেতে নেই ? আমি ত এসেই চা-হালুয়া খেয়েছি।"

বিমলা হাসিয়া উঠিল,—"শোনো কথা। তুমি আর আমি কি সমান ? তা ছাড়া, উপোস করতে আমাদের কষ্ট হয় না—"

করবী রাগিয়া উঠিয়া কি একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, তাহার বড় মামী বাধা দিয়া বলিলেন,—"তর্ক করিস নি, করবী। ছাখ সুরেন কোথায়, সে আবার এখনই হয় ত কোথায় বেরিয়ে যাবে। আর, গাড়ী সামনে আনতে ব'লে দে।"

করবী চলিয়া গেলে বিমলা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"একেবারে ছেলেমানুষ—"

গাড়ী অন্দরের দরজায় উপস্থিত হইলে তাহাতে উঠিতে উঠিতে বিমলা বাড়ীর বধূদের অনুনয় করিয়া বলিল,—"দোহাই, আপনারা আমার জন্য যেন আর না খেয়ে ব'সে থাকবেন না—তাতে কেবল আমার অপরাধ বাড়বে। বরং খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে আমার জন্য দুটো আলোচাল ফুটিয়ে রাখবেন; আমার ফিরতে আজ তিনটে বাজবে।"

বিমলা চলিয়া গেল। এই অপরূপ সুন্দরী বিমলাকে দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু এত অল্পবয়সে তাহার এই কঠিন নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল, যেন হিন্দু-বিধবার অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধানের সীমা কঠোর তপস্যার বলে সে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যথায় তাঁহাদের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

সে দিন বিকালবেলাটা ক্লান্তিবিনোদনেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর বাড়ীর পুরুষরা বৈঠকখানায় আসর জমাইয়া তুলিলেন। করবীর অনেকগুলি মামা। যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি প্রায় প্রমদা বাবুর সমবয়স্ক—বহুদিন পরে শালা ও ভগিনীপতির সাক্ষাতে হাসি-তামাসা ও বাক্যবাণের অবাধ বিনিময় চলিতে লাগিল। বাহিরের লোক কিশোর ছাড়া আর কেহ ছিল না, তাই করবীও এক সময় তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া বসিল। মামার বাড়ীর পর্দ্দাপ্রথা করবী মানিত না; মামারা যদিও ইহা পছন্দ করিতেন না, তথাপি আদরিণী ভাগিনেয়ীকে কিছু না বলিয়া ভগিনীপতির উপর ঝাল ঝাড়িতেন। শ্বশুরবাড়ীতে প্রমদা বাবুর 'সাহেব' ডাকনাম শ্লেষ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছিল।

বৈঠকের লক্ষ্যহীন আলোচনা প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে একটা জটিল আইনের প্রশ্নে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিশোর নীরবে বসিয়া শুনিতেছিল। করবী কিছুক্ষণ মন দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে

"নৃত্যপরা বিম্বাধর বিদ্যাধরা বামা।"

বসুমতী-চিত্রবিভাগ
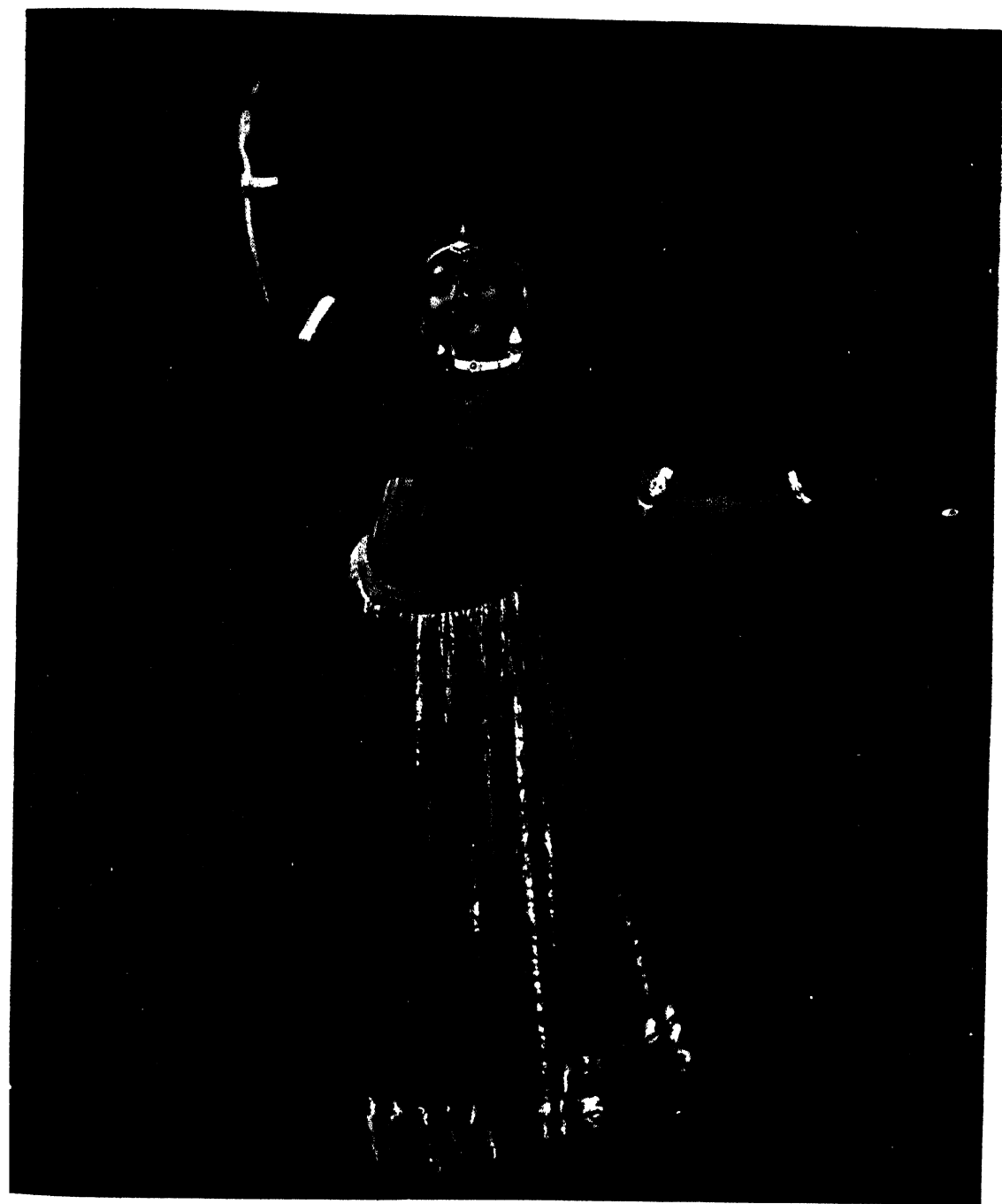
[শিল্পী—মিষ্টার টমাস।

কিশোরের দিকে একাই সরিয়া আসিয়া চুপে চুপে বলিল, —"কিশোরবাবু, কাল খাওয়া-দাওয়া ক'রে সারনাথ দেখতে যাব ঠিক হয়েছে। আমি, আপনি আর বৌদি—আর কেউ নয়।"

কিশোর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"আচ্ছা।"

করবী আর কিছু না বলিয়া এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিয়া গেল। তাহার আগমন ও প্রস্থানে বৈঠকের আলোচনা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না বটে, কিন্তু কিশোরের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া চুপি চুপি কথা কহিয়া উঠিয়া যাইবার দৃশ্যটা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

রাত্রিতে আহারাদির পর করবীর জ্যেষ্ঠমাতুল প্রমদা বাবুকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সাহেব, মেয়ের বিয়ের কি কচ্ছ?"

"কিছুই ত এখনও করিনি।"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু করার সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে। করবীর বয়স কত হ'ল—সতের? বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, আর বেশী দিন ঘরে রাখা ত চলবে না! মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে আরম্ভ কর।"

"সে হবে এখন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

"দেখ, ঐ কথাগুলো আমার ভাল লাগে না। মেয়ের সতের বৎসর বয়স হ'ল, এখনও তাড়াতাড়ি কিসের? অন্য বিষয়ে সাহেবিয়ানা কর, ক্ষতি নেই, কিন্তু এ দিকে যা রয়সয়, তাই ভাল। তুমি না পার, আমিই পাত্র দেখছি।"

"আরে, অত চট্‌ছ কেন? মনের মত পাত্রও ত পাওয়া চাই।"

"অপাত্রে মেয়ে দিতে ত আমি বল্‌ছি না। কিন্তু মনের মত পাত্রও জগতে দুর্লভ না—খুঁজলে পাওয়া যায়।"

প্রমদা বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। বড় মামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, এই কিশোর ছোকরার সঙ্গে তোমাদের কদ্দিনের আলাপ?"

"বেশী দিন নয়,—মাস চার পাঁচ।"

"ওর সঙ্গে আজ কথা কইছিলুম—বেশ ছেলে, তোমাদের পালটি ঘর, ওর কথা কখনও ভেবে দেখেছ?"

"দেখেছি। সব দিক দিয়েই সুপাত্র। কিন্তু করবীর মনের ভাব না বুঝে ত স্থির করা যায় না।"

"সাহেব, সে আমি জানি। মেয়েকে যখন ইংস্কুলে পড়িয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছ, তখন তার অমতে কিছু হবে না। কিন্তু এক দিন দেখেই আমার যা ধারণা হয়েছে, তাতে করবীর বিশেষ অমত হবে ব'লে বোধ হয় না, বরং খুব বেশী রকম মত হবে বলেই আন্দাজ হচ্ছে। তুমি ত অনেক দিন ধরেই দেখছ, তোমার কিছু সন্দেহ হয় না?"

"ভাই, এ সব আঁচ আন্দাজের কথা নয়, পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। বুঝছ না, আমাদের আন্দাজ ভুলও ত হ'তে পারে।"

"বেশ, সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেই দেখ না?"

"তা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কিন্তু তাতে অনিষ্ট হ'তে পারে। এখন কিছু না বলাই ভাল, সময় উপস্থিত হ'লে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকারই হবে না।"

"দেখ, আমি সেকেলে লোক, এই সব অবাধ মেলামেশা পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, ও জিনিষটাকে বিনা বাধায় অগ্রসর হ'তে দিলেই অনিষ্টের সম্ভাবনা বেশী। যা হোক, তুমি যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু আমার এ একটুও ভাল বোধ হচ্ছে না। শেষকালে হয় ত এমন জট পাকিয়ে যাবে যে, জট ছাড়াতেই প্রাণান্ত হয়ে পড়বে।"

অতঃপর আর কোন কথা হইল না। রাত্রিতে শয়নকালে প্রমদা বাবু অন্যান্য কথার পর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিশোর সম্বন্ধে করবীর মনে কিছু আছে তোমার মনে হয়?" করবীর মা বলিলেন,—"হয়। করবী আগে অনেক ছেলেমানুষী করেছে, কিন্তু এবার বোধ হয় সত্যি সত্যি—"

"সুহাসিনীর বিষয়ে সব কথাই ত সে জানে?"

"জানে। তার মুখেই ত আমরা শুনেছি।"

'হুঁ' বলিয়া প্রমদা বাবু পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিলেন। নিদ্রা সহসা আসিল না, ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্যালকের সুস্পষ্ট আশঙ্কার কথাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। কিশোরের সহিত অবাধে করবীকে মিশিতে দিয়া ভুল করিয়াছেন কি না, ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

২০

পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর বাহির হইতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল।

বিমলা, করবী ও কিশোর এই তিন জনেরই যাওয়া স্থির ছিল, কিন্তু যাত্রা করিবার সময় সুরেন আসিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। তাহার বয়স তের-চৌদ্দ বছর, এই এক দিনেই সে বিমলার বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িয়াছে।

করবী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল,—"তুই আবার কোথায় যাবি? তুই ত অনেকবার দেখেছিস।"

সুরেন বয়সে এবং অন্তরে ছেলেমানুষ হইলেও কথা-বার্ত্তায় বেশ পরিপক্ক, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—"দেখলেই বা! আবার বুঝি দেখতে নেই?"

করবী অধীর হইয়া বলিল,—"না না, তুই ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেল্ গে যা না বাপু।"

সুরেনও গরম হইয়া বলিল,—"ব্যাড্‌মিণ্টন্ তুই খেল গে যা, ও ত মেয়েমানুষের খেলা। আমি আজকাল টেনিস খেলি—জানিস?"

করবী চোখ পাকাইয়া বলিল,—"অ্যাঁ—আমাকে তুই বলা! আমি না তোর দিদি! দাঁড়া ত—" বলিয়া তাহার কাণের দিকে হাত বাড়াইল।

সুরেন দুই হাতে নিজের কাণ চাপিয়া ধরিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল,—"খবরদার করি-দি, কাণে হাত দিলে ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি—দেখুন ত, বৌদি—"

বিমলা তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল,—"আহা, চলুক না, ও আমাদের দেখাতে শোনাতে পারবে।"

সুরেন উৎসাহিত হইয়া বলিল,—"হ্যাঁ, আলবৎ। করি-দি সারনাথের জানে কি? কলা। মিউজিয়ামে যে এ্যাত্তবড় হাঁড়ি আছে, দেখেছিস? কত দিনের পুরানো বল্ দেখি?"

"তোর এ্যাত্তবড় হাঁড়ি আমি দেখতে চাই না।"

দুই ভাইবোনে সারাটা পথ ঝগড়া করিতে করিতে চলিল।

সারনাথের ধ্বংসস্তূপে পৌঁছিয়া সকলে মোটর হইতে নামিল। আর একখানা শূন্য ট্যাক্সি মোড়ের উপর দাঁড়াইয়াছিল, এ সময়ে প্রত্যহই দুই চারি জন দর্শক মৃগদাবের লুপ্ত গৌরবের চিহ্নগুলি পরিদর্শন করিতে আসিতেন। নিকটেই মিউজিয়াম—তাহাতে খননোদ্ধৃত মূর্ত্তি প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। অদূরে একটি বৌদ্ধ মঠ, তাহাতে কতকগুলি মুণ্ডিতশির শ্রমণ বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা অধিকাংশই সিংহলী বা ব্রহ্মদেশীয়। বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও দুই এক জন ছিলেন।

সম্মুখেই মহাচৈত্যের বিরাট দেহ আকাশে মাথা তুলিয়া আছে। উৎসাহী সুরেনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সকলে প্রথমে সেই দিকে চলিল। কোথায় চৈনিক পরিব্রাজক পাথরের উপর সোণা বসাইয়া গিয়াছে, হাজার বছরেও তাহা মুছিয়া যায় নাই, কোনখানটা মেরামৎ করিতে গিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট চৈত্যের শিল্প-শোভা কুশ্রী করিয়া তুলিয়াছে, কোন লৌহ-শৃঙ্খল অবলম্বনে চৈত্যের উপরে উঠিয়া দীপালী সাজাইবার নিয়ম ছিল, এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দর্শন শেষ হইলে সঙ্ঘারামের খনিত ভূমির উপর সকলে উপস্থিত হইল। স্থানটা বহু বিস্তৃত, কোথাও প্রকাণ্ড দরদালানের স্তম্ভের পীঠিকাগুলি রহিয়াছে, আর সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কোথাও সারি সারি ক্ষুদ্র কুঠারীর ছাদহীন নগ্ন দেওয়ালগুলি সেকালের ছাত্রদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পরিচয় দিতেছে; কোথাও বা সঙ্কীর্ণ গুপ্ত সুড়ঙ্গ এখনও অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে, দেখিতে দেখিতে অতীতের অসংলগ্ন স্বপ্নে মন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

বিমলা সুরেনের মুখে এই সব স্মৃতি-চিহ্নের সত্য অসত্য ইতিহাস শুনিতে শুনিতে একবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। কিশোর বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা অনুভব করিতেছিল, যেন তাহার নিজেরই অতীত জীবনের ইতিহাস এইখানে ছিন্ন—খণ্ডিত হইয়া কালের চরণতলে দলিত পিষ্ট, ইহার মর্ম্মকাহিনী চিরদিন এমনই অনাদৃত অপঠিত রহিয়া যাইবে। করবীও ইহাদের দুজনের দেখাদেখি গম্ভীর হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা এই সব মৃত অতীতের স্মৃতির সঙ্গে ঠিক সুর মিলাইতে পারিতেছিল না। তাহার সতর বছর বয়স, আজ না জানি কি কারণে তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল, চোখে যেন কিসের ঘোর লাগিয়াছিল। তাহার সমস্ত দেহটা সুরবাঁধা সেতারের মত বিনা কারণেই রণিয়া রণিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। শুষ্ক নীরস অতীতের কথায় তাহার প্রয়োজন ছিল না। তাহার কি আসে যায় কবে সাম্রাজ্যের কোন্ রাণী সঙ্ঘের জন্য কোন্ অলিন্দ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া?

এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে করবী ও কিশোর অজ্ঞাতসারে আলাদা হইয়া বিমলা ও সুরেনের নিকট হইতে দূরে পড়িয়া গিয়াছিল, হঠাৎ কিশোর একবার চারিদিকে তাকাইয়া বলিল,—"বৌদি কোন্ দিকে গেলেন ?"

করবী বলিল,—"সুরেন বোধ হয় কোথাও ব'সে তাঁকে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে সুরু ক'রে দিয়েছে।—চলুন, ঐ স্তম্ভটা দেখে আসি।" স্তম্ভের দিকে যাইতে যাইতে করবী আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল,—"দেখুন, আমাদের মত আরও কারা বেড়াতে এসেছে।"

কিশোর চাহিয়া দেখিল, এক জন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়াইয়া এক জন ভিক্ষুর সহিত কথা কহিতেছেন। ভিক্ষু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের এটা ওটা দেখাইয়া কি কথা বলিতেছেন, শুনা গেল না। কিশোর নিরুৎসুকভাবে বলিল, "বাঙ্গালী মনে হচ্ছে।"

করবী কৌতূহলভরে সেই দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিল। আধঘণ্টা পরে স্তম্ভ দেখিয়া ফিরিবার সময় হঠাৎ কোন্ দিক দিয়া যেন কি হইয়া গেল। মেয়েমানুষের মনের কথা যাহা সহজে প্রকাশ হইবার নয়—অচিন্তিতপূর্ব্ব অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাহা দমকা হাওয়ায় বদ্ধ জানালার মত খুলিয়া একেবারে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল; কোথাও এতটুকু আড়াল বা আবরণ রহিল না।

প্রাচীন ইষ্টকের দেওয়াল দিয়া ঘেরা চৌবাচ্ছার মত একটা স্থানে এক খণ্ড প্রস্তরলিপি দেখিয়া কিশোর সেটা পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে নামিয়া পড়িয়াছিল। চারিধারের দেয়াল হইতে স্থানটা পাঁচ ছয় ফুট নীচু, নামিবারও কোন পথ ছিল না, কিশোর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। করবী সেখানে নামিবার কোন সহজ উপায় না দেখিয়া উপরেই দাঁড়াইয়াছিল।

নিবিষ্টমনে শিলালিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিতে করিতে কিশোর এক সময় চোখ তুলিয়া দেখিল, করবী হঠাৎ কি মনে করিয়া পাঁচিলের মত দেয়ালের উপর দিয়া পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কয়েক পদ গিয়া আর যাইতে পারিতেছে না, মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার পা দু'টা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দেয়ালটা মাত্র হাতখানেক চওড়া, তাহার দুই দিকেই একমানুষ প্রমাণ গর্ত্ত। কিশোর ভীতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সাবধান!"

কিন্তু সাবধান হইবার মত অবস্থা করবীর ছিল না, সার্কাসে তারের উপর খেলা দেখাইতে মেয়েরা যেমন দুলিতে থাকে, সেও তেমনই একবার এদিক একবার ওদিক দুলিতেছিল। তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। কিশোরের দিকে না চাহিয়াই সে ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।"

করবী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটিয়া তাহার নীচে গিয়া দাঁড়াইয়া কিশোর বলিল,—"ব'সে পড়, ঐখানে ব'সে পড়। আমি তোমাকে তুলে আন্‌ছি।"

কিশোরের কথামত বসিতে গিয়া করবী আর তাল সামলাইতে পারিল না,—অস্ফুট চীৎকার করিয়া যে দিকে কিশোর ছিল, সেই দিকে ঢলিয়া পড়িল।

তাহার পতনোন্মুখ দেহ কিশোর অর্দ্ধপথে ধরিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু করবীর হাই হীল্ জুতাশুদ্ধ পা দু'টা সজোরে মাটীতে ঠুকিয়া গেল। পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণপণে কিশোরের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, মাথাটাও কিশোরের বুকের উপর পড়িয়াছিল,—সেই ভাবেই দুইজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। করবীর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হাতুড়ির মত কিশোরের বুকে আঘাত করিতে লাগিল।

পাঁচ সেকেণ্ড এইভাবে থাকিবার পর কিশোর চমকিয়া করবীকে ছাড়িয়া দিল। কি সর্ব্বনাশ! এই অবস্থায় যদি কেহ তাহাদের দেখিয়া ফেলে?

করবী কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না, বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেই সে ভীত শিশুর মত আরও জোরে তাহার গলা আঁকড়াইয়া ধরিল। চক্ষু মুদিতই ছিল, কেবল তাহার বুক হইতে একটি দীর্ঘ কম্পিত নিশ্বাস বাহির হইল মাত্র।

কিশোর ত্রস্ত ও বিব্রত হইয়া বলিল,—"কোথাও লাগেনি ত?"

করবী সাড়া দিল না। দুশ্চিন্তায় কিশোরের গলা শুকাইয়া গেল—তবে কি করবী মূর্চ্ছা গেল না কি?

সে ভীতকণ্ঠে ডাকিল,—"করবি!"

করবী একবার চোখ খুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল।

যাক্, তবু ভাল, মূর্চ্ছা নহে: কিশোর অস্বস্তিপূর্ণ দেহে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া পুনরায় বলিল,—"তোমার কোথাও লাগেনি ত?"

করবী মাথা নাড়িয়া জানাইল,—"না।"

কিশোর সঙ্কুচিত স্বরে বলিল,—"তা হ'লে—তা হ'লে এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে হ'ত না?"

করবীর মুখে আবার রক্তসঞ্চার হইয়াছিল, সে ঠোঁট টিপিয়া চুপি চুপি বলিল,—"কেন, আমি ত বেশ আছি। তোমার কি আমাকে বড্ড ভারী বোধ হচ্ছে?"

দারুণ শীতেও কিশোরের কপাল ঘামিয়া উঠিল। করবী আঘাত পায় নাই, মূর্চ্ছাও যায় নাই,—অথচ তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। অনেক সময় ভয় পাইলে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া যায়, দাঁড়াইতে পারে না—ইহা সম্ভবপর বটে, কিন্তু তাহার মুখে এ কি রকম কথা! কিশোরের মনে ভীষণ একটা সন্দেহ মাথা তুলিতে লাগিল। তবে কি—

না না, এ সম্ভব নহে, তাহারই বুঝিবার ভুল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"কিন্তু কেউ যদি আমাদের এ-ভাবে দেখতে পায়—মনে করবে—"

"মনে করুক্ গে—"

কিশোর পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর সন্দেহ করিবার তিলমাত্র স্থান নাই। করবীর কণ্ঠস্বর, তাহার সিন্দুরবর্ণ মুখ, মুদিত চক্ষু কেবল একটি কথার সাক্ষ্য দিতেছে—সে তাহাকে ভালবাসে। কিশোরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ কি হইল! ইহা যে সে কখনও ভাবিতেও পারে নাই! কিন্তু করবীর এ ভাব ত আকস্মিক নহে, ইহার পশ্চাতে বহুদিনের রুদ্ধ নিগৃহীত আবেগ সঞ্চিত হইয়া আছে। আজ নাড়া পাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে মাত্র। কিন্তু কেন এমন হইল! কেন এমন হইল!

হাওড়া ষ্টেশনে করবীর সহিত প্রথম চোখোচোখির সময় ইহারই পূর্ব্বাভাস বুঝি সে পাইয়াছিল! কেন তখন সে সাবধান হয় নাই? কেন করবীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠে নাই? এখন এই অপরিসীম লজ্জার বোঝা লইয়া সে কি করিবে? করবীর এই অনাহূত ভালবাসা কেমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে?

কিন্তু—

করবী যদি সত্যই তাহাকে ভালবাসে, তবে কেন সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে? করবীকে ভালবাসিবে না কেন? সে ত মুক্ত, তাহার ত কোনও বন্ধন নাই। সারাজীবন কেন সে উদাসীর মত কাটাইয়া দিবে? করবীকে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইতে পারে না? করবীর মত মেয়ে এ সংসারে কয়টা পাওয়া যায়? করবীকে বিবাহ করিয়া তাহার বুকের শূন্য গহ্বর কি ভরিয়া উঠিবে না?

কিশোরের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। অন্তর্যামীর কাছে ত ছলনা চলে না। নহিলে, এই যে একটি পূর্ণযৌবনা নারী তাহার বুকের উপর পড়িয়া যতদূর সাধ্য সরল ভাষায় তাহাকে প্রেম নিবেদন করিতেছে, ইহা তাহার অন্তরের অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি করিতে পারিল না কেন? করবী যে পাষাণমূর্ত্তি নয়, বেপমানা স্পন্দমানা নারীমূর্ত্তি, এ কথা, মন ত দূরের কথা, শরীরের তপ্ত রক্তস্রোতও স্বীকার করিতে পারিল না কেন? না,—করবীকে দিবার মত তাহার কিছু নাই। আর এক জন, তাহার হৃদয় বলিয়া যাহা কিছু ছিল, তাহা লুটিয়া পুটিয়া নিঃশেষ করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। শূন্য হৃদয় লইয়া করবীর প্রেম সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। দু'দিন পরে, এই নিঃস্ব অন্তঃসারশূন্যতা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখনকার ভয়াবহ জীবনযাত্রার কথা কল্পনা করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। না, করবীকে সে ঠকাইতে পারিবে না।

কিন্তু তবু করবীর প্রতি স্নেহে করুণায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। তাহার উপর, কি দুর্ব্বিষহ লজ্জা যে এখনই করবীকে মাটীর সহিত মিশাইয়া দিবে, তাহা ভাবিয়া সে নিজেও লজ্জায় মরিয়া গেল। কি করিবে, কেমন করিয়া এই দুর্নিবার লজ্জার হাত হইতে করবীকে রক্ষা করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া সে করবীর চুলের উপর মৃদু অঙ্গুলিস্পর্শে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"করবি, তুমি ত জানো—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কিশোর হঠাৎ থামিয়া গেল। সূর্য্য

পশ্চিমদিকে চলিয়া পড়িয়াছিল, ঠিক এই সময় কাহার সুদীর্ঘ ছায়া তাহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িতেই কিশোর চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। করবী চোখ বুজিয়াছিল বলিয়া কিছু দেখিতে পাইল না। কিন্তু বৈকালী সূর্য্যের পশ্চাৎ পটের সম্মুখে এক অতি পরিচিত নারীমূর্ত্তি দেখিয়া কিশোরের মনে হইল, সে একটা অসম্ভব অবাস্তর স্বপ্ন দেখিতেছে। ক্ষণকাল অভিভূতের মত থাকিয়া সে সবলে রূঢ়ভাবে নিজেকে করবীর বাহুমুক্ত করিয়া লইল।

কিন্তু উপর হইতে সেই ক্ষণিক মূর্ত্তি তখন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

এই সময় দূর হইতে সুরেনের বালক-কণ্ঠের ডাক আসিল,—"করি-দিদি! কিশোর বাবু!"

কিশোর নীরস নিস্তেজ স্বরে কহিল,—"চলুন। ওরা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

আর কোনও কথা হইল না, কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিল না, নিঃশব্দে দুই জনে ফিরিয়া গিয়া বিমলা ও সুরেনের সহিত যোগ দিল।

বিমলা একবার দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিল,—কিছু একটা ঘটিয়াছে। কিন্তু কি ঘটিয়াছে, তাহা এই দুটি শুষ্ক পাংশু পীড়িত মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল না এবং অনুমান করিতেও সাহসী হইল না।

অন্তরের দুঃসহ বেদনা চাপিয়া যাহাদের মুখে হাসিতে হয়, তাহাদের মত হতভাগ্য অল্পই আছে। কিশোর ও করবী আরও দুই ঘণ্টা যেন কিছুই ঘটে নাই, এমনি অভিনয় করিয়া, সমস্ত দ্রষ্টব্য বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য মোটরে উঠিল, তখন হৃদয়-ভারাক্রান্ত অবসাদে কিশোরের সর্ব্বশরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং করবীর মনে হইতেছে, আরও খানিকক্ষণ এইরূপ অভিনয় করিতে হইলে সে আর পারিবে না, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে। তাই, বাড়ী যাইবার পথে এই বৃথাভিনয়ের চেষ্টা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে চলন্ত গাড়ীর মধ্যে সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেনের অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, সেও বাক্যব্যয় করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে রাজি হইল না।

বাড়ী আসিয়া নামিবার উপক্রম করিতেই প্রমদা বাবুর ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে, বিনয় বাবু ও সুহাসিনী দেখা করিতে আসিয়াছেন।

করবী তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

মোটর-ড্রাইভারকে গাড়ী গারাজে তুলিতে নিষেধ করিয়া কিশোর দ্রুতপদে গিয়া প্রমদা বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। ভাগ্যক্রমে প্রমদা বাবু একাকী ছিলেন, কিশোর কোন প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিল, "এখনই আমি বৌদি'কে নিয়ে ষ্টেশনে রওনা হব, শুনেছি, আটটার সময় একটা পশ্চিমের ট্রেণ আছে।—কিছু মনে করবেন না—আপনারা ত সব জানেন।"

তাহার ক্লান্ত-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া প্রমদা বাবু কি যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু বলিবার পূর্ব্বেই কিশোর নত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল,—"থাকতে অনুরোধ ক'রে আমার লজ্জা আর বাড়াবেন না। আপনাদের সংসর্গে এলেই আমি অপরাধ ক'রে ফেলি, এই আমার ভাগ্য, দয়া ক'রে একটা চাকরকে ব'লে দিন, আমাদের জিনিষপত্রগুলো গাড়ীতে তুলে দিক। বৌদি গাড়ীতেই ব'সে আছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বি-এল)।

উদারতা

হিন্দুর সংকীর্ণতাই হিন্দুর অধঃপাতের প্রধান কারণ। উদারতা ভিন্ন পুনরভ্যুত্থানের আর উপায়ান্তর নাই। বাঁধনের উপর বাঁধন আঁটিয়া হিন্দুর শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে। স্বেচ্ছায় নিজের গলায় ফাঁস টানিয়া নিজের কণ্ঠরোধের এই যে ব্যবস্থা, ইহার আশু প্রতীকার না হইলে "হিন্দুস্থান" আর হিন্দুর স্থান থাকে না। তাই হিন্দুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেই উদারতার উপাসক; তাই তরুণ হিন্দু সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতার উপর খড়্গ-হস্ত, সকল অন্যায় বাঁধন নির্ম্মমভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর,—বিধিনিষেধের সকল গণ্ডীই অতিক্রম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দুঃখের বিষয়, সুযোগ বুঝিয়া,—"সঙ্কীর্ণতা"ই "উদারতার" ছদ্মবেশে আমাদিগকে নূতন করিয়া প্রতারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রই না কি সকল অনিষ্টের মূল! হিন্দু-ধর্ম্মের অনুশাসন এই যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" অর্থাৎ যিনি যে ভাবেই বিশ্বপতির উপাসনা করিতে চান, হিন্দুর তাহাতে কোনই আপত্তি নাই, হিন্দুর পাগল বিশ্বনাথ তাহাতেই তৃপ্ত হইবেন। হিন্দুর নিজস্ব পূজাপদ্ধতিগুলি বাহিরের কেহ যদি গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার অদৃষ্টে যে অনন্ত নরক, এ কথা হিন্দু কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না। হয় ত আপন ধর্ম্মের অভ্রান্ততার উপর তাহার ততখানি প্রগাঢ় বিশ্বাসই নাই! ভগবান দয়া করিয়া কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে পরিত্রাণের পেটেণ্ট অধিকারের "সোল এজেন্সি"র যে "মনোপলি" দিয়াছেন, হতভাগ্য হিন্দুর অদৃষ্টে হয় ত তাহার একটুও ভাগ মিলে নাই। নদীসকল যে ভাবে বা যে পথেই প্রবাহিত হউক, সমুদ্রবক্ষে এক দিন তাহাদের প্রত্যেকেরই স্থান মিলিবে, ইহাই হিন্দুর অন্ধ বিশ্বাস। খড়্গপুর হইতে যিনি কলিকাতা যাইবেন, তাঁহারও সিদা-পথে বি, এন্, আর দিয়া যাওয়া চলিবে না,—বাঁকুড়া, আদ্রা, এসানসোল ঘুরিয়া তাহাকে ই, আই, আর ধরিতেই হইবে, এরূপ জিদ করিতে হিন্দু মোটেই অভ্যস্ত নহে। সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, সেখান হইতে তাহার পক্ষে যে পথটা সোজা, অন্য স্থানের লোককেও যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেইখানে হাজির হইয়া, ঠিক ঐ পথ দিয়াই যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, ইহার যৌক্তিকতা সে স্বীকার করে না। নিজ নিজ স্থান হইতে অন্য সরল পথের সন্ধান পাওয়া,—হয় ত অন্য লোকের পক্ষে অসম্ভব নহে, এবং অবস্থাভেদে পৃথক পৃথক যান-বাহনাদিরও অভাব না থাকিতে পারে। এ কথা স্বীকার করিতে সে লজ্জিত নহে। ইহাতে তবে সংকীর্ণতা কই? মানুষ যখন ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-সামর্থ্য লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপর অবস্থিত, যখন যাহার যাহাতে সুবিধা, তাঁহাকে সেই পথটায় চলিতে দেওয়াই ত যথার্থ উদারতা। অনেকে কিন্তু সে কথা মানিয়া লইতে রাজী নন। ইহার ভিতর কোথায় যেন একটা মস্ত ন্যায়ের ফাঁকি লুকাইয়া আছে। ঠিক ধরিতে হয় ত পারিতেছি না, কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম যদি সংকীর্ণই না হইবে, তবে এতগুলি সুশিক্ষিত হিন্দু-সন্তান, অন্য ধর্ম্মের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া, খোলাখুলিভাবে অথবা প্রকারান্তরে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? ফলেন পরিচীয়তে। সুতরাং প্রমাণ করিতে না পারিলেও, হিন্দুধর্ম্ম যে সংকীর্ণ, তাহা মানিয়া লইতেই হইবে।

যাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই আমরা অনেকেই মানিয়া লইয়াছি, তাহার পৃথক প্রমাণই যদি অন্বেষণ করা যায়, তবে তাহারও অভাব হইবে না। প্রথমতঃ সাম্যের কষ্ঠি-পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্, হিন্দুর এই বিভিন্ন প্রকার পূজা-পদ্ধতি-প্রচলনে প্রশ্রয়দান যথার্থ উদারতা কি না? সাম্যবাদীরা বলেন, যাহা সকলকে সমান পথের পথিক হইতে বাধ্য করে না, তাহাতে আর সাম্য কোথায়? যে, মন্দিরকে শ্রদ্ধা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, মসজিদ-গির্জ্জাকে ঘৃণা করিতে শিখিল না, সে কোন দিনই মসজিদ-গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া, তাহার মালমসলায় নূতন মন্দির গঠন পূর্ব্বক সাম্যপ্রচারের সহায়তা করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। আমি যাহা, পৃথিবী-শুদ্ধ লোককে যদি তাহাই না করিতে পারিলাম, তবে আর সাম্য হইল কি? আর সাম্যপ্রতিষ্ঠায় যাহা সহায়তা করিল না, তাহাতে আর উদারতা কই?

তার পর দেখা যাক্, স্বার্থের বাট্‌খারায় ওজন করিয়া। যিনি স্বার্থপর, তিনি নিশ্চয়ই উদার নহেন। হিন্দু স্বার্থ-পরতা যে কতখানি, তাহা ভাবিলে হতাশ হইতে হয়।

হিন্দুর মুনিঋষিই যখন স্বার্থপর, তখন সাধারণ হিন্দুর কথা আর কি বলিব? মুনিঋষিদের বাস ঘোর বনে, নিবিড় জঙ্গলে, নিভৃত গিরিগুহায়, দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে। সংসারের সুখদুঃখের দিকে দৃষ্টিই নাই, চক্ষু বুজিয়া, বাক্য সংযত করিয়াই আছে, অথচ তাহাদের এমন শক্তি যে, ইচ্ছামাত্রই দ্বেষহিংসা নাকি স্তম্ভিত হইয়া যায়! এ দিকে পৃথিবী-শুদ্ধ মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। ইহা কি উদারতা? আমি নিজের রোজগারটি নিজেরই ভোগে লাগাই, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের বাঁটিয়া দিই না বলিয়া সেই অপরাধে আমি যদি স্বার্থপর বলিয়া পরিগণিত হই, তবে যে অমূল্যধনের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা নির্জ্জনে ভোগ করিতেছেন, তাহা কি স্বার্থপরতা নহে? এই মুনি-ঋষিই যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাহাতে যে ষোল আনাই সংকীর্ণতা থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সমস্ত জগৎ হিংস্র পশুর মত কামড়াকামড়ি করিয়া যে মরিতেছে, তাহার মস্ত ঔষধ না কি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নিহিত। অথচ হিন্দু তাহাকে গোপনে বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে দিবে না। এমন কি, নিজেরাও তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিবে না, পাছে অপরে সে সব গোপন তথ্যের সন্ধান পায়। স্বামী বিবেকানন্দ একবার সেই রত্নাগারের দ্বার একটুখানি খুলিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সংকীর্ণ হিন্দু সমুদ্রযাত্রায় বাধা দান করিয়া সে সব সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। এ দিকে, ইসলামের উদারতার কথা একবার ভাবিয়া দেখুন! শুনিয়াছি, তরবারি হস্তেও সেই অমৃতময়ী বাণীর প্রচার হইয়াছে। মা যেমন দুরন্ত শিশুর দাঁতে জাঁতি দিয়া, রোগের ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, সেই ভাবে রুগ্ন-জগতের চিকিৎসাই ত' চাই। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ আলোকবিস্তারের জন্য যে অর্থ ব্যয়, যে ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। শিশুপুত্র তিক্ত কুইনাইন পাছে না খাইতে পারে, মা তাই সুপক্ক কদলীর মধ্যে পিলটি নিহিত করিয়া পুত্রকে খাওয়াইয়া দেন। সেইরূপ কত রকমের চিনির কোটিং দিয়া, তাঁহারা যে ধর্ম্মকে মুখ-রোচক করেন, তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। এই সব উদারতার পাশে হিন্দুর সংকীর্ণতা লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে না।

চলিত কথায় উদারকে আমরা বলিয়া থাকি "উদর।" হয় ত উদরের সঙ্গেই উদারতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যিনি খেচরের মধ্যে "ঘুঁড়ি" ও জলচরের মধ্যে "ডিঙ্গি" বাদে সমস্তই নির্ব্বিচারে উদরস্থ করেন, তিনিই যথার্থ উদারপন্থী। হিন্দু এমনই সংকীর্ণ যে, মুখে যাহাকে "ভগবতী" বলিয়া শ্রদ্ধায় গদ্‌গদ, ভোজনব্যাপারে তিনিও নিষিদ্ধ, কথায় কাযে কোন সামঞ্জস্যই নাই। এত অসহযোগে শরীর থাকে? ভরসার কথা, কোন কোন হিন্দু এই সব কুসংস্কারকে দূর করিবার সৎসাহস দেখাইতেছেন। তাঁহারাই হিন্দুর ভবিষ্যৎ ভরসা। আর যাঁহাদের সেরূপ সাহস নাই, তাঁহারা গোঁড়া, পাতি নয়, কাগজী নয়, একবারে আসল গোঁড়া, অস্থি-মজ্জা টকে ভরা। তাঁহাদিগকে লুঙ্গী পরাইয়া বাবুর্চ্চিদের খানা খাওয়াইয়া উদ্ধার করিতেই হইবে। তবে না তাঁহারাও কন্যা-ভগিনীদের পাঠাইতে পারিবেন স্বাধীন কাবুলীওয়ালার প্রণয়-বাসরে, তবে না হিন্দুর ভবিষ্যৎ সংস্করণে আপনা আপনি স্বাধীনতার বীজ ভাসিয়া আসিবে?

উদারতার প্রধান লক্ষণ, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ।" অর্থাৎ আমার যা অভিমত, তাহা সকলেরই মানা কর্ত্তব্য। আমি যাহা ভাল মনে করি, সকলকেই তাহাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সহজে না রাজী হয়, জোরে, কৌশলে, ধর্ণায়, অনশনে, অন্ততঃ বানপ্রস্থ-গমনের ভয় দেখাইয়া, রাজী করাইতেই হইবে। তাই ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস আজ হরিজন ভোজনাগার প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন! যিনি হরিজনের রান্না খাইতে নারাজ, তিনি সঙ্কীর্ণ, সুতরাং উদারের দল তাঁহাকে স্থান দিতে পারেন না, সুতরাং হয় তিনি ল্যাজ কাটুন, নয় সরিয়া পড়ুন। গোঁড়ারা বলেন, তোমাদের যা খুসী খাও না বাবা, আমাদের একটু পৃথক ব্যবস্থাই থাক্ না, তাহাতে এমনই কি ক্ষতি? ক্ষতি অনেক,—কিন্তু মূর্খে তাহা বুঝিবে না, তর্ক করিয়া লাভ কি? উদারতার এই যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ইহার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিলকের দল যদি কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়ে, তবে সেটা দেশের কি তোমার পক্ষে কম লাভ?

উদারতার দ্বিতীয় লক্ষণ, "পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।" ছলে বলে কৌশলে, ছেলে ভুলাইয়া, চোখের জল ফেলিয়া, যে কোন উপায়ে পরস্ব গ্রহণ করিতে ও পার্টিফণ্ড বেমালুম

আত্মসাৎ করিতে যিনি যত সমর্থ, তিনিই তত উদার। গ্রহণের সময় আত্ম পর কোন দ্বিধাই নাই। ফণ্ডের টাকার হিসাব দিবার কোন বালাই নাই, জগৎসংসার যে আত্মবৎ, নিজের হিসাব নিজেকে আর কি দিব, বিশেষ লোষ্ট্র-বিষয়ে?

উদারতার তৃতীয় লক্ষণ "মাতৃবৎ পরদারেষু!" মাকে যেমন দিন-রাত ধমক দিতে বা বিপন্ন করিতে মোটেই দ্বিধা করি না, সেইরূপ দ্বিধা-সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া নারীর নিকট সর্ব্বদাই আবদার করিতে হইবে। অনেক অত্যাচারের কথা মাকে চাপিয়া যাইতে হয়, অনেক কারণে আবদারের খোরাক জোগাইতে গিয়া পরস্ত্রীকেও অনেক সময় অনেক কারণে অনেক কথা চাপিয়া যাইতে হইবে। এ সংসারে কে আপন, কেই বা পর? উদার-চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্। পরকে যদি কোন রকমে আপনার না করিতে পারিলাম, অর্থাৎ আপনার ভোগে, আপনার সেবায়, আপনার কাযে লাগাইতে না পারিলাম, তবে চিত্তের উদারতা বাড়িল কৈ? সংকীর্ণচিত্ত লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর সীতাদেবীর মুখদর্শন করেন নাই। আমরা কত যায়গায় কত রমণীর সহিত "বৌদিদি" পাতাইয়া নকল দেবরত্বকেই বরাসনে বসাইতেছি। আপনার যা কিছু পরস্ত্রীর চরণতলে অর্ঘ্যদানের মত উদারতা আর কি আছে? তবে পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য চলিয়া গেলে, মাকে যেমন তাড়াইয়া দিই—সেইরূপ ফেল কড়ি, মাখ তেলের হিসাবে। এই পরকীয়া সাধনায়, যে সব সাধক সিদ্ধহস্ত, তাঁহারাই প্রকৃত উদারপন্থী।

উদারতার আর একটি লক্ষণ,—পরহিতে আত্মবিলোপ। দধীচির মত উদার কে? বাঙ্গালীকে সকল প্রদেশ হইতে কুক্কুরের মত দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেও বাঙ্গালায় অবাঙ্গালীর অবাধ অধিকার। ইহাই বাঙ্গালার উদারতা। নিজে অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াও সে নিত্য অবাঙ্গালীর খোরাক যোগাইতেছে, ইহাই ত দধীচিব্রত! ইহাই ত উদারতা। আর যদি চোরই ঢুকিয়া থাকে, তাহাকে কোন্ প্রাণে বাধা দিব? তাই ত সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণে না গ্রহণ, না বর্জ্জননীতি গ্রহণ করিয়াছি। নিজের সর্ব্বস্ব যায় যাক, সংসার ত নিতান্তই অসার, তাহার জন্য উদারতার উপর আঘাত করি কি করিয়া?

উদারতার আর একটি চমৎকার লক্ষণ হইতেছে—"মাকড় ধোকড়" নীতি। যে বুদ্ধিটি এক জনের জন্য খাটে, তা অপরের পক্ষে অচল। রামের পক্ষে যাহা গুণ, শ্যামের পক্ষে তাহা দোষ। আপনার পুত্র যদি জমীদারের বাগানে আম পাড়িয়া খায়, তবে আপনার কর্ত্তব্য পুত্রকে তিরস্কার করা এবং জমীদারের ক্ষতিপূরণ করা। কিন্তু জমীদারপুত্র যদি আপনার বাগানে আম পাড়িতে আসিয়া ধরা পড়েন, তখন আপনার কর্ত্তব্য সসম্মানে তাঁহাকে কিছু আম পাড়াইয়া উপহারসহ বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া। এক স্থানে যে যুক্তি অকাট্য, অবশ্য তাহা শুধু আম নহে, বিপরীতভাবে প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথাই ধরা যাক্। জনসংখ্যার অনুপাতে য়ুরোপীয়গণ হয় ত ২৫০টি আসনের মধ্যে মাত্র ১টি আসনের হক্‌দার। কিন্তু ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহারাই কর্ম্মী, তাঁহারাই ধনী, তাঁহারাই বুদ্ধিমান, গাধার সঙ্গে কি হাতীর তুলনা করা চলে, সুতরাং ২৫টি আসন তাঁহাদের পক্ষে মোটেই বেশী নয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের ভাগাভাগির সময়ে এ সব উপযোগিতার ওজর চলিতে পারে না। হিন্দু খাজনা দেয় মুসলমানের চতুর্গুণ, আক্ষরিক শিক্ষায় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের দ্বিগুণ, ইংরাজী শিক্ষায় প্রায় তিন গুণ, উচ্চশিক্ষায় ছয় গুণ, আইন-শিক্ষায় আট গুণ। তাহা হউক না, ভাগের সময় ওসব বাজে কথা তুলিয়া লোকের মনে কষ্ট দিতে আছে কি? ঘরোয়া ব্যাপারে কে কতখানি শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, কাহার কত আয় বা কত অপব্যয়, এ সব অপ্রাসঙ্গিক তর্ক উঠান শুধু সংকীর্ণতা নহে, মহাপাপ! এক পরিবারের মধ্যে থাকিতে গেলে অন্ন-বস্ত্র কি ওভাবে কোন সংসারে চলিতে পারে? পুত্রগণের শিক্ষা বা রোজগারের অনুপাতে, পিতা যদি খাবার পরিবার ব্যবস্থা করেন, তবে সংসার ভাঙ্গিতে কতক্ষণ লাগে। এই জন্যই ত সংসার ভাঙ্গিতেছে। কাযেই একতার খাতিরে, এ ক্ষেত্রে বড় জোর, মোট জনসংখ্যার অনুপাতেই হিসাব করা চলে। কিন্তু তাহা হইলে ত নিছক কর্ত্তব্যটাই পালন করা হইল। উদারতা হইল কোথায়? যদি উদারতাই দেখাইতে হয়, তবে হিন্দুকে আরও কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। মোট জনসংখ্যার অনুপাতেও হিন্দুর যাহা প্রাপ্য, তাহা হইতে অক্ষম বড় ভাইটিকে শতকরা ৮টি ফাউ দিতে হইবে। মোট জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানের যাহা হক্,

তদপেক্ষা শতকরা ১৫টিও তাহার বেশী চাই। এই হিসাবে বড় ভাই যে ছোট ভাইএর চাইতে ১৬টি ভোট নিছক জোর করিয়াই লইতেছেন, তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইলে সংকীর্ণ মনেরই পরিচয় দেওয়া হয়! সাধে কি কংগ্রেস এই বাঁটোয়ারা ভণ্ডুল করিতে চান না? পৌরাণিক মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে আধুনিক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র পর্য্যন্ত হিন্দুর সম্মুখে কি সেই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন? যে হিন্দু অতিথির জন্য পুত্রের শিরে করাত চালাইতেও ভয় করেন নাই, বুকের মাংস কাটিয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই, মনে রাখিতে হইবে, আমরা সেই উদার জাতিরই বংশধর!

উদারতার আর এক লক্ষণ,—যে কাযের যে অনুপযুক্ত, তাহাকে সেই কায করাইবার চেষ্টা। ছাগলকে দিয়া যব মাড়ান পূর্ব্বে ততটা চল ছিল না, আজকাল প্রায় প্রত্যেক অফিসেই তাহা চলিতেছে। উপরওয়ালাদের তাহাতে প্রাণান্ত হইতে পারে, কিন্তু পাঁচটি অপগোণ্ডকে প্রতিপালনের যে পুণ্য, তাহার অংশ তাঁহারা নিশ্চয়ই পরজন্মে পাইবেন। কাউন্সিল এসেম্‌ব্লিতে যে যুদ্ধ হইবে, তাহা অবশ্য বুদ্ধিরই যুদ্ধ। তাই বলিয়া তাহাতে শুধু বুদ্ধিমানের দলই যদি ঢুকিবেন, তবে উদারতা রহিল কোন্‌খানে? মূর্খরা কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে? বরং যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা যাহাতে বুদ্ধির জোরে মূর্খদিগকে বেশী দাবাইয়া না রাখিতে পারেন, সেইজন্য ক্ষেত্রবিশেষে, বোকামির পাষাণ ভাঙ্গিতে, মূর্খের সংখ্যার দিক্‌টা বেশী করিয়া দেওয়াই দরকার। তাহা ছাড়া, অতি বুদ্ধিমানদের বিদ্‌কুটে প্রশ্নমালার উত্তর যোগাইতে অনেক সময় অনেকের গলদ্‌ঘর্ম্মও হয়, অযথা সময় অপব্যয়ও হইয়া থাকে; নিরীহ মূর্খের হাতে সে সব বিপদের সম্ভাবনা কম। অতএব বুদ্ধির লড়াই-এর একটা টিম্ হইবে, তীক্ষ্ণধী রাজকর্ম্মচারী, অপর পক্ষে থাকিবেন দেশের "ভাল মানুষের" দল। উন্নত-ধরণের খেলায় অনুন্নতর সংখ্যা যত বেশী হইবে, ততই খেলিবার আরাম। একবার রক্তের আস্বাদ পাইলে, এই অনুন্নতর দলও নিজের ভাগ কিছুতেই আর ছাড়িবে না। কোন দিনই আর তাহারা বুঝিতে চাহিবে না যে, গৃহরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরিতে হয় শুধু বলিষ্ঠ ও কুশলী যোদ্ধার, অপগোণ্ডদের সেখানে বথ্‌রা লইতে যাওয়া খুব সুবিধারও নহে, নিরাপদও নহে। মনকে এই বলিয়াই তাহারা প্রবোধ দিবে যে, যুদ্ধে গিয়া যদি পরাজয়ই হয়, তাহাতেও অগৌরব নাই, কিন্তু কাপুরুষ ও অকর্ম্মা বলিয়াই ঘরে বসিয়া সেই অপবাদটা চুপ্‌চাপ্ মানিয়া লওয়া মোটেই ভাল দেখায় না। উদারপন্থীদেরও সেই কথা। জয়-পরাজয় ত আছেই, তাই বলিয়া সঙ্কট-কালে অনুন্নতদের আত্মরক্ষার অবসর দিতে হইবে না! লোকে পড়িতে পড়িতেই চলিতে শিখে, হাবুডুবু খাইতে খাইতেই সাঁতার শিখে। তাহা ছাড়া হাত তুলিতে তেমনই কি বুদ্ধির দরকার। ইসারায় একটু বুঝিয়া লওয়া, কোন্ দলে কত মধু। সেটুকু বুদ্ধি সকলেরই আছে। কাযেই দেশের মধ্যে উদারতার বান ডাকিয়া যাইতেছে, ভারতমাতা তাহাতে ডুবুন, ক্ষতি নাই।

আর এক প্রকারের উদারতা আছে,—আত্মনিগ্রহের পথে। অন্যের সহিত মতের অনৈক্য হইলে, তাহাকে স্বমতে আনিবার দুইটি পন্থা আছে;—এক মুষ্টিযোগ—হিংসার পথে, আর এক আত্মবলি—অহিংসমতে। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে স্বমতে আনিবার জন্য মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাবণ রামচন্দ্রকে স্বমতে আনিতে সীতাদেবীর চুলের মুষ্টি ধরিয়া সাগরপারে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উদারতার পন্থা হইতেছে আত্মবলির পথ। কৈকেয়ী যখন বুঝিলেন, রামচন্দ্রের বনবাস খুব সহজে হইবে না, তখন ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন অভিমানের ধূলিশয্যা। বুদ্ধদেব, ভগবানের লুকোচুরি খেলায় অস্থির হইয়া বলিলেন, "ইহা-সনে শুষ্যতু—" "অস্থিমাংসং।" দেশের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গান্ধী মহারাজ বাঙ্গালীকে পুণা প্যাক্ট গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য করিবার জন্য গ্রহণ করিলেন প্রায়োপবেশন। চরকা যখন কিছুতেই কংগ্রেসে চল হইল না, তখন অহিংস মতে দেখাইলেন বান-প্রস্থের বিভীষিকা। পিতা যখন কিছুতেই কথা শুনেন না, তখন পুত্রকে নিরুদ্দেশ যাত্রার কষ্টই বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহা প্রায়ই নিরর্থক হয় না, শেষ পর্য্যন্ত পিতারই পরাজয় ঘটিয়া থাকে। আত্মবলির উদারতায় পাষাণ গলিয়া যায়, দাম্পত্য জীবনে কে না তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

উদারতার লক্ষণের কথা আর কত বলিব। একটি লক্ষণ হইতেছে—বেগতিক দেখা মাত্র অপর পক্ষের সহিত বন্ধুতা করা। কাউন্সিল বর্জ্জন, স্কুল-কলেজ বর্জ্জন যখন

নিষ্ফলই হইল, তখন মিতালী করাই উদারতা। উদারতার ব্যস্ততায় যে নিরীহ সোণার চাঁদগুলি এই বর্জ্জনের মাদকতায় জেলখানায় পচিতেছে, তাহাদের কথা ভাবিবারও সুযোগ হয় না। সয়তানের আইন ভাঙ্গা যখন কিছুতেই সম্ভব হয় না, তখন ছেলের বিবাহেও সেই আইনকে অনাবশ্যক উদারতা দেখাইয়া সমাদর করিতে হয়। আর দেবতা যখন সয়তানের শত্রু, তখন সয়তানের আইন দিয়াই দেবমন্দির ভাঙ্গিতে হয়!

সে দিন এক কৃতবিদ্য শিক্ষকের মুখে এক উদারতার কথা শুনিলাম। এক জন ভোটপ্রার্থীর ভোট-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "আপনি খুব উদ্যোগী ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু সনাতনীরা যদি আপনাকে ভোট দেয়, তবে অগত্যা অনুপযুক্ত লোককেই আমরা ভোট দিব। অর্থাৎ পিতা গুরুজন হইতে পারেন, কিন্তু রামা কাহার যদি তাঁহাকে প্রণাম করে, তবে আর তাঁহাকে পিতার সম্মান দেওয়া চলে না, কাহারের সম্মান সম্পর্কে তাঁহার জাতিচ্যুতি অনিবার্য্য। ইহাই উদারতা। সভার ভিতর ডিম্ববৃষ্টি বা চেয়ারবৃষ্টি এইরূপ উদারতার দৃষ্টান্তস্থল। বক্তা ভাল হইতে পারেন, কিন্তু মতের গরমিল হইলেই উপদ্রব করিতে হইবে। অপরের মতটা কি, কাহাকেও জানিতে দেওয়া নিশ্চিত উদারতা নহে।

বিলক্ষণ দ্রুতবেগে আমরা উদারতা শিক্ষালাভ করিতেছি। হিন্দু ইতিমধ্যেই অমুসলমান হইয়াছে। এইবার শীঘ্রই হিন্দুত্বরূপ সংকীর্ণতা বলিদান করিয়া, আত্মবিলোপের আত্মপ্রসাদ লাভ করিব। তখন দেশে খৃষ্টান থাকিবে, মুসলমান থাকিবে, বৌদ্ধ থাকিবে, জৈন থাকিবে, থাকিবে না শুধু হিন্দু। সে আপনার উদারতায় সকলের সহিত নিঃশেষে মিশিয়া গিয়া ধন্য হইবে। হায়! সে সুখের দিন আর কত দূরে?

শ্রীপ্রমথনাথ দে (বি, এ, বি, ই)।

পাষাণের প্রেম

বাংলাদেশের শ্যামল মাটির মায়া
প্রবাসী ছেলের নয়নে ঘনায়ে আসে।
ঊষর পাষাণে মেদুর মেঘের ছায়া,
বলাকারা উড়ে পাহাড়ের পাশে পাশে।
সন্ধ্যাবেলায় পলাশের বনে বনে
বাউল বাতাস বাজায় কি একতারা!
শ্যামল মাটির বিরহ ঘনায় মনে,
জাল বুনে যায় অতীতের স্মৃতি-ধারা!
মনে পড়ে আজি কত পুরাতন কথা—
পল্লীমায়ের অতুলন প্রীতি-স্নেহ;
হারায়ে ফেলেছি তাই মনে জাগে ব্যথা—
ছোট্টবেলায় শত-স্মৃতি-ঘেরা গেহ।
সে সব গানের ভেসে আসে শুধু সুর,
পদগুলি তার পড়িছে না আর মনে,
তাহারি স্বপ্নে রঙীন হৃদয়পুর
লুপ্ত দিনের খেলা অন্তর-কোণে!
অতীতের ধ্যানে কাটিয়া যেতেছে বেলা
রবির সারথি থামিল অস্তচূড়ে,
সুরু হয়ে গেল গোধূলির রং-খেলা
পাহাড়ের বুকে সাঁঝের আকাশ জুড়ে।

রত্নপুরীর যবনিকা হায় বুঝি
কোন যাদুকর সরাইয়া দিল চুপে,
ঝর্ণার বাণী সহসা পাইল খুঁজি'
গিরি-কন্দরে লুপ্ত তাহার রূপে।
ছিঁড়ে গেল মোর স্বপ্নের জালখানি
সার্থক এই মহিমার পানে চেয়ে,
কোন সুছন্দে মূক বনানীর বাণী
রণিয়া উঠিল সারা অন্তর ছেয়ে!
রৌদ্রতপ্ত সারা দিনমান ধরি'
রূঢ় পাষাণের বুকে যে সাধনা জাগে,
পূর্ণত্বা তার দিয়াছে চিত্ত ভরি'
দীপিছে মুকুট গোধূলি স্বর্ণরাগে।
বিস্ময়-প্লুত হিয়ার বিজনে আজি
কোন্ সে অজানা পথিক আসিয়া ডাকে—
রবির বীণায় এ কোন রাগিণী বাজি'
ভেসে এল হায় সন্ধ্যামেঘের ফাঁকে!
চিত্ত আমার সাগ্রহে নিল বরি'
রহস্যময় পাষাণের আহ্বানে,
রিক্ত প্রাণের তীর্থ গিয়াছে ভরি'
পাষাণের স্নেহে, নির্ঝরিণীর গানে।

শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত।

মৃত্যু-কবলে

যঃ পলায়তি স জীবতি

মুলিঙ্গার হাওড়ের পাঁকে পড়িয়া সেই পাঁক হইতে উঠিবার আশায় পথপ্রান্তবর্ত্তী উইলো-শাখা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিবার জন্য বাহুদ্বয় প্রসারিত করিল বটে, কিন্তু সে পদস্খলিত হইয়া দূরে সরিয়া গিয়া পাঁকে প্রোথিত হওয়ায়, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বৃক্ষশাখা ধরিতে পারিল না। সুতরাং সে এবং রয়েড কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে থাকিলেও, হাওড়ের মহাপঙ্কে পড়িয়া উভয়কেই পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় বিপন্ন হইতে হইল। রয়েড উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া কঠিন মৃত্তিকায় করতল স্থাপন করিলেন, এবং বাহুপেশীর সাহায্যে ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য যতই ঝাঁকুনি দিতে লাগিলেন, ততই গভীরভাবে পাঁকের ভিতর প্রোথিত হইতে লাগিলেন। উভয়েরই দেহের পাশ দিয়া রাশি রাশি পাঁক বজ্‌-বজ্‌ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহাদের জানু পর্য্যন্ত গ্রাস করিল।

মুলিঙ্গার প্রাণভয়ে মুখ বিকৃত করিল। তাহার ললাট-নিঃসৃত ঘর্ম্মধারায় মুখমণ্ডল প্লাবিত হইল; কিন্তু বৃক্ষশাখা ধরিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। সে দুই হাত বাড়াইয়া আঁকু-বাঁকু করিতে লাগিল; ইহাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার কোমর পর্য্যন্ত সেই মহাপঙ্কে প্রোথিত হইল। সে পথের দিকে ঝুঁকিয়া উভয় হস্ত প্রসারিত করিলেও উইলো বৃক্ষের শাখা তাহার প্রসারিত অঙ্গুলী হইতে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি দূরে রহিল। কিন্তু সেই পাঁচ ইঞ্চির ব্যবধান সে এক মাইলের অপেক্ষা অল্প মনে করিতে পারিল না। কাহারও হস্তের মাংসপেশী ও শিরা উপশিরা তাহা অপেক্ষা অধিক দূর প্রসারিত হইতে পারিত না। উইলো-শাখায় মুলিঙ্গারের অঙ্গুলী স্পর্শ হইল না।

অবশেষে রয়েডের কোমর পর্য্যন্ত সেই পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু-সমূহ তাঁহার ললাট সিক্ত করিল; কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, তাঁহার নীলনেত্রে মানসিক চাঞ্চল্যও পরিস্ফুট হইল না।

রয়েড মুলিঙ্গারের দিকে চাহিয়া তাহারও সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,"বৃথা চেষ্টা মুলিঙ্গার, আজ তোমারও শেষ!"

মুলিঙ্গার সক্রোধে বলিল, "তুমি গোল্লায় যাও। তুমি পাঁকের ভিতর তলাইয়া গিয়াছ দেখিলে আমার সকল চেষ্টা সফল হইবে।"

রয়েড বলিলেন, "গোল্লায় আগে আমি যাইব কি তুমি যাইবে, তাহা কে বলিবে? পাঁকের ভিতর হইতে উঠিতে পারিলে ত তোমার চেষ্টা সফল হইবে।"

"উঠিতে পারি কি না দেখ।" বলিয়া মুলিঙ্গার দুই হাত বাড়াইয়া উইলো-শাখা ধরিবার জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা করিল; কিন্তু বৃক্ষশাখা তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে যত দূরে ছিল, তত দূরেই রহিয়া গেল।

তাহার চেষ্টা বিফল হইতে দেখিয়া রয়েড মৃদু হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল, ভাগ্যদেবী সুবিচারের প্রতি সর্ব্বদা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না।

চেষ্টা পুনঃপুনঃ বিফল হওয়ায় মুলিঙ্গার দুই তিন মিনিট নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল, সেই সময়ের মধ্যে পাঁক তাহার কোমরের আরও কিছু ঊর্দ্ধে উঠিল। মুলিঙ্গার কি ভাবিয়া তাহার কোটের কিয়দংশ ঘাড়ের নিকট হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার কোটের যে অংশ পঙ্কে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা টানিয়া পাঁকের ঊর্দ্ধে তুলিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা ছিল—সে তাহা টানিয়া তুলিয়া পাঁকের উপর প্রসারিত করিবে; কিন্তু তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। অবশেষে সে যথাসাধ্য চেষ্টায় জ্যাকেটটা খুলিয়া লইয়া, তাহাই সম্মুখের পাঁকের উপর প্রসারিত করিল। মুলিঙ্গার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সেই বস্ত্রখণ্ডের উপর বাঁ হাত রাখিয়া, ডান হাতখানি বৃক্ষশাখার দিকে প্রসারিত করিল। রয়েড তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। বাঁ হাত সেই কাপড়ের উপর থাকায় পূর্ব্ববৎ তাহা পাঁকে ডুবিবার আশঙ্কা ছিল না, এই জন্য মুলিঙ্গার আশা করিয়াছিল, বাঁ হাতে এই ভাবে জোর পাইলে সে ডান হাতখানি গাছের দিকে আর একটু অধিক দূর বাড়াইতে পারিবে, এবং এই উপায়ে বৃক্ষশাখা ধরিতে পারিবে!

এই সময় একটা উদ্দাম ঝটিকায় উইলো বৃক্ষের শাখা-গুলি আন্দোলিত হওয়ায় একটি শাখা মুলিঞ্জারের হাতের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িতেই সে তাহা ধরিয়া ফেলিল। সে তাহা মুঠায় পুরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই শাখাটি অবলম্বন-দণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া, পাঁকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এই চেষ্টার ফলে তাহার দেহের চতুর্দ্দিকস্থ পঙ্করাশি, যেন শিকার হাত-ছাড়া হইল ভাবিয়া, ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। উইলোর ক্ষীণ শাখাটি সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল, এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার ভাঙ্গিবার আশঙ্কা প্রবল হইল।

মুলিঞ্জার প্রথমে যে শাখাটি ধরিয়াছিল, তাহার সাহায্যে পাঁকের ভিতর হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া প্রসারিত হস্তে একটি স্থূলতর শাখা ধরিয়া ফেলিল; ইহাতে সে অপেক্ষা-কৃত অধিক বল পাইল এবং পাঁকের ভিতর হইতে দেহের নিম্নাংশ উর্দ্ধে তুলিয়া উভয় হস্তে সেই শাখা ধরিয়া শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। তাহার দেহের ভারে সেই শাখাটি আন্দোলিত হইতেছিল। যাহা হউক, মুলিঞ্জার সেই পঙ্ক-রাশির পার্শ্বস্থিত পথটি লক্ষ্য করিয়া, বৃক্ষশাখা ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে সেই পথের উপর লাফাইয়া পড়িল। দল্‌দলে আঠাল পাঁকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হওয়ায়, তাহাকে বিকটাকার ভূতের মত দেখাইতে লাগিল। মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া, সে রণজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্ব দৃষ্টিতে অসহায়, বিপন্ন রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিল।

সেই সময় রয়েডের সমগ্র দেহের নিম্নাংশ বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত পাঁকের ভিতর প্রোথিত হইয়াছিল। পঙ্করাশির নিষ্ঠুর আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় না দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে মুলিঞ্জারের আত্মপ্রসাদে উল্লসিত মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার চক্ষুতে আতঙ্ক বা মানসিক চাঞ্চল্য প্রতিফলিত হইল না।

বিড়াল যেমন পলায়নে অসমর্থ নিরুপায় কোণঠেসা ইঁদুরের দিকে চাহিয়া আস্ফালন করে, মুলিঞ্জার তাঁহার সঙ্কটজনক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ আস্ফালন করিতে লাগিল।

মুলিঞ্জার সগর্ব্বে বলিল, "তোমার অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে, রয়েড! কাহাকে পাঁকে ডুবিতে হইবে, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি? আমি ত বাঁচিয়া গিয়াছি, হাওড় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; তোমাকেই ডুবিয়া মরিতে হইবে; হাঁ, তোমার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। আর কয়েক মিনিট পরেই তুমি ডুবিয়া মরিবে, আমি নিশ্চিন্ত হইব। আমার আশা পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। হা, হা, কি মজা!"—তাহার বিকট হাস্যে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।

রয়েড তাহার কথা শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; তাঁহার বলিবারও কথা ছিল না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া, তাঁহাকে অধিকতর মর্ম্মাহত করিবার জন্য মুলিঞ্জার হাসি বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "এখন শেষবার তোমার রক্ষাকর্ত্তা ঈশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লও। শুনিয়াছি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, অন্তর্য্যামী। তিনি তোমার মনের কষ্ট বোধ হয় জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু তাঁহার বাপেরও সাধ্য নাই যে, ঈশ্বরের বাবা কেহ থাকিলে, সে তোমার প্রতি সদয় হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে। না, এবার আর তোমার উদ্ধার নাই। কাহার সঙ্গে তুমি চালাকী করিতে আসিয়াছিলে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। আর কয়েক মিনিট পরে পাঁকের ভিতর তোমার থুৎনি পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইবে, তাহার পর তোমার মুখ। তোমার নাকে মুখে পাঁক ঢুকিবে, তখন তোমার আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শক্তি থাকিবে না, সে পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার দুই চারি মিনিট পরে তোমার কাণে পাঁক ঢুকিয়া কাণের ফুটা বুজিয়া যাইবে। তুমি তখনও হয় ত পাঁকের উপর মাথাটা চাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু যাহার নাক, মুখ, কাণ পর্য্যন্ত পাঁকে ডুবিয়া যাইবে, সে মাথা চাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া কি ফল পাইবে? তাহা অপেক্ষা নিশ্চিন্ত-মনে ওপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য।"

তাহার পরিহাস-পূর্ণ কঠোর উক্তি শুনিয়াও রয়েড বিন্দু-মাত্র বিচলিত হইলেন না; কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি তাহার এই প্রকার অবজ্ঞার পরিচয় পাইয়া তাঁহার মন ক্ষোভে পূর্ণ হইল। তিনি স্থির করিলেন, মৃত্যু আসন্ন হইলেও তিনি ভয়ের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিবেন না; তাহা হইলে সেই নরপিশাচ পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে না। এই

চিন্তায় তিনি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া মুলিঙ্গারকে অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "দেখ মুলিঙ্গার, আমি এখনও ত মরি নাই, তবে তোমার এত স্ফূর্ত্তির কারণ কি ? হাঁ, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তোমার মত অবিশ্বাসী, ঈশ্বরবিদ্বেষী নরপিশাচ যাহা অসম্ভব, অসাধ্য মনে করে, তাঁহার ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা তোমার ধারণা করিবার শক্তি নাই। মূঢ় ! তুমি জয় লাভ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছ, কিন্তু এই গর্ব্ব স্থায়ী হইবে না। তুমি দীর্ঘকাল নিরাপদ থাকিতে পারিবে, এরূপ আশা করিও না। তোমার মত নরপিশাচের পরিণাম চিরদিনই শোচনীয় হইয়া থাকে, তোমাকেও ধরা পড়িয়া অবশেষে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

মুলিঙ্গার রয়েডের কথা শুনিয়া, যেন অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়াছে, এইভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমাকে ধরা পড়িয়া শেষে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—ইহাই তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ! তোমার এই বাণী সফল হউক না হউক, আমাকে শাস্তি দেওয়া ত তোমার সামর্থ্যে কুলাইবে না। তুমি ত আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিঙ্গা ফুঁকিবে, তবে আর আমি কাহার তোয়াকা রাখি ? তোমার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে বলিয়া যাইব, আমি ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীকে ধরিয়া আনিয়া কোথায় বাঁধিয়া রাখিয়াছি। পুলিসের কোনও কুকুর তাহাদের সন্ধান পাইবে না। তোমার মৃত্যুর পর যদি তোমার অভিশপ্ত আত্মা গোয়েন্দাগিরি করিয়া আমার কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

এই কথা বলিয়া মুলিঙ্গার করতালি দিয়া সেই পথের উপর নৃত্য করিতে লাগিল, আনন্দের বেগ সংবরণ করা যেন তাহার অসাধ্য হইয়াছিল।

মুলিঙ্গার নৃত্য বন্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, "হাঁ, কোথায় তাহাদের দুই জনকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি, তোমার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে তাহা তোমার নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি। আমি জানি, এ জীবনে তুমি আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। ফ্রিন্টমেয়ারের অদূরবর্ত্তী ফ্রি অ্যাস ফার্ম্মে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ল্যাংটনের প্রণয়িনীর পিঠে শপাশপ্ চাবুক পড়িতে আরম্ভ হইলেই ল্যাংটন—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুলিঙ্গার হঠাৎ নীরব হইল। তাহার হাস্য-পরিহাস হঠাৎ ভীষণ ক্রোধে পরিণত হইল। সে কিছু দূরে কি একটা জিনিষ দেখিতে পাইয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মুলিঙ্গারকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া দূরে চাহিতে দেখিয়া রয়েড সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহসা যেন তাঁহার আড়ষ্ট দেহে তড়িৎপ্রবাহের সঞ্চার হইল, তাঁহার হৃৎপিণ্ড সবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই হাওড়ের প্রান্তভাগে মাঠের ভিতর এক জন অশ্বারোহীকে দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন। অশ্বারোহীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, সে সাধারণ কৃষক। সে যেরূপ বেগে অশ্ব পরিচালিত করিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল, সে তাঁহার উদ্ধারের জন্যই সেই দিকে আসিতেছিল। রয়েড অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর, তোমার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা আমি কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। যে অনাথ নিরাশ্রয় তোমাকে ভুলিয়া থাকে, তোমার অনন্ত করুণায় যাহার নির্ভর করিবার শক্তি নাই, তাহাকেও তুমি ত্যাগ করিতে পার না, প্রভু।"

মুলিঙ্গার এই দৃশ্য দেখিয়া উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া যেন বায়ু আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর পকেটে হাত দিয়া কোন পকেটেই তাহার রিভলভার পাইল না। তখন সে বুঝিতে পারিল, যে সময় সে উইলো শাখা ধরিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় রিভলভারটা অজ্ঞাতসারে তাহার পকেট হইতে স্খলিত হইয়া, হাওড়ের পাঁকের ভিতর পড়িয়া তলাইয়া গিয়াছিল। সেই বৃক্ষশাখা ধরিবার জন্যই তখন তাহার প্রবল আগ্রহ; তাহার সকল চিন্তা তখন সেই দিকেই কেন্দ্রীভূত হওয়ায় রিভলভার কখন্ তাহার পকেট হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। রিভলভারটি তাহার পকেটে থাকিলে সে রয়েডকে হত্যা না করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিত না। তাহার ইচ্ছা হইল, সে রয়েডের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে পাঁকের ভিতর প্রোথিত করিবে; কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, রয়েড তখন দূরে পাঁকের ভিতর দাপাদাপি করিতেছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কৃষক হাওড়ের প্রান্তে আসিয়া অশ্ব হইতে

অবতরণ করিল এবং যে ভাবে পঙ্করাশির অভ্যন্তরস্থ সঙ্কীর্ণ পথে আসিল, তাহা দেখিয়া রয়েড বুঝিতে পারিলেন, সেই পথ তাহার সুপরিচিত। তাহাকে হাওড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুলিঙ্গারের হৃদয় ক্রোধে ও আতঙ্কে পূর্ণ হইল। নিরস্ত্র মুলিঙ্গার বুঝিতে পারিয়াছিল, আগন্তুক সশস্ত্র। যদি সে মুলিঙ্গারকে গুলী করে, তাহা হইলে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, হয় ত গুলীর আঘাতে তাহাকে খোঁড়া হইয়া সেই স্থানেই পড়িয়া থাকিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মুলিঙ্গার হাওড়ের অপর প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বিপরীত দিকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

কৃষক রয়েডের অদূরে উপস্থিত হইলে রয়েড তাহার হস্তে অশ্বের লাগাম দেখিতে পাইলেন। সে হাওড়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে লাগামটি অশ্বের মুখ হইতে খুলিয়া লইয়া তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল; সেই লাগাম সহ সে রয়েডের নিকটে আনিয়া লাগামের একপ্রান্ত রয়েডের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। রয়েডের গলা পর্য্যন্ত তখন পাঁকের ভিতর নিমগ্ন হইলেও তিনি হাত দুইখানি মাথার উপর তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি উভয় বাহু প্রসারিত হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সেই লাগাম চাপিয়া ধরিলেন।

কৃষক তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল, "ভয় নাই কর্ত্তা, আপনি জোর করিয়া লাগাম ধরিয়া থাকুন, উহা ছিঁড়িবার ভয় নাই। আমি দুই মিনিটের মধ্যেই আপনাকে টানিয়া তুলিব।"

কৃষক বলবান্। সে যাহা বলিল, তাহার সেই কথা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল। সে সেই লাগামের অপর প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া রয়েডকে পঙ্কের ভিতর হইতে টানিয়া অতি অল্পসময়ের মধ্যেই পথের উপর তুলিয়া ফেলিল।

দশ মিনিট পরে রয়েড ফ্লিন্টমেয়ারের পথে অগ্রসর হইলেন। স্থানীয় পুলিসের সাহায্য-গ্রহণই তিনি তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন; কারণ, অতঃপর কোন বিষয় পুলিসের নিকট গোপন রাখা সঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনী মুলিঙ্গারের ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়াছে, সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইতে পারে। এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি পুলিসের সাহায্য-গ্রহণ ব্যতীত তাঁহার নিজের চেষ্টায় তাহাদের উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

রয়েড মনে মনে বলিলেন, "মুলিঙ্গার এইবার শেষ চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। আমার আর জীবনের আশা নাই মনে করিয়াই সে ফ্রি অ্যাসের খামার-বাড়ী সংক্রান্ত গুপ্ত কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু সে হাওড়ের পাঁক হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া পলায়নের পূর্ব্বে জানিয়া গিয়াছে, আমি অবিলম্বেই নিরাপদ হইয়া তাহাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব; এই জন্য সে যত শীঘ্র সম্ভব সঙ্কল্পসিদ্ধি করিয়া দূরে—বহু দূরে পলায়নের চেষ্টা করিবে। তাহার এই দুরভিসন্ধি আমাকে বিফল করিতেই হইবে। পরমেশ্বর কি ভাবে হঠাৎ মানুষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহার লীলা-খেলা কিরূপ বিচিত্র, মানব-কল্পনা তাহা ধারণা করিতে পারে না।

রয়েড ফ্লিন্টমেয়ারে হোলিংহামের বিভাগীয় পুলিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তদন্তাধীন বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যুবক ইন্‌স্পেক্টর বেল চারি জন কন্‌ষ্টেবল সহ একখানি মোটরকারে রয়েডের নিকট উপস্থিত হইলেন।

রয়েড যে মোটর-কারে মুলিঙ্গারের সন্ধানে আসিয়াছিলেন, সেই শকটখানি ক্ষুদ্র, তাহাতে দুই জনের মাত্র বসিবার স্থান ছিল। রয়েড সেই গাড়ীতে ইন্‌স্পেক্টর বেলকে তুলিয়া লইয়া কন্‌ষ্টেবল চারি জনকে অন্য গাড়ীতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন, রয়েড ফ্রি অ্যাসের খামার-বাড়ী অভিমুখে তাঁহার শকট পরিচালিত করিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর বেলের নিকট ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীর বিপদ-সংক্রান্ত সকল কথাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছিলেন।

গাড়ীতে বসিয়া রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীর সঙ্কটজনক অবস্থার কথা আপনি জানিতে পারিয়াছেন। খামার-বাড়ীতে দস্যুদের আড্ডায় তাহাদের দলের কত লোক আছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; তবে মুলিঙ্গার তাহার দুরভিসন্ধি-সিদ্ধির জন্য একাকী আসে নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। তাহাদের বিপদ অনিবার্য্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহারা হয় ত তাড়াতাড়ি আড্ডা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি হাওড় হইতে উদ্ধার লাভ করিবার পূর্ব্বেই মুলিঙ্গার

পাঁকের ভিতর হইতে উঠিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিল সুতরাং সে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় আড্ডা ত্যাগের জন্য উৎসুক হইয়া থাকিলে তাহার সুযোগের অভাব হয় নাই। তবে যদি তাহারা এখনও সেখানে থাকে, এবং আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাহারা যে বে-পরোয়া গুলী চালাইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্য আমার মনে হয়, তাহাদের আড্ডার কিছু দূরে গাড়ী রাখিয়া, পদব্রজে তাহাদের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া আমরা হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেই কাযটি সঙ্গত হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল অল্পদিন পূর্ব্বে পুলিসের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, রয়েড বহুদর্শী পুরাতন ডিটেক্‌টিভ, এজন্য ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডের উপদেশে পরিচালিত হওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন, বিশেষতঃ মুলিঙ্গার সম্বন্ধে রয়েডের অভিজ্ঞতা অনেক অধিক ছিল।

রয়েডের মোটর-কার খামার-বাড়ীর কিছু দূরে থাকিতেই ইন্‌স্পেক্টার বেল তাহার সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া রয়েডকে বলিলেন, "আশা করি, দস্যুরা এত শীঘ্র পলায়ন করে নাই।"

কিন্তু তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল। মুলিঙ্গার হাওড় হইতে যেরূপ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা দেখিলে মনে হইত, তাহাকে ভূতে তাড়া করিয়াছিল! সে তাহার সহযোগী ভার্ণি ও ক্যারোকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে আড্ডায় প্রবেশ করিয়াছিল।

ভার্ণি ও ক্যারো ব্যগ্রভাবে মুলিঙ্গারের সম্মুখে আসিলে মুলিঙ্গার হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "গাড়ীতে শীঘ্র পেট্রল ভরিয়া লও, তাহার পর সেই ছোঁড়া-ছুঁড়ীকে দোতলা হইতে নীচে টানিয়া আনিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠাও, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

ক্যারো তাহার বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি আড্ডা হইতে যাইবার সময়—"

মুলিঙ্গার তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "চুপ কর আহাম্মুক! শীঘ্র আমার আদেশ পালন কর, আর দশ মিনিট বিলম্ব হইলে, সেই কুকুরটা— গোয়েন্দা রয়েড এক পল্টন পুলিস সঙ্গে আনিয়া আমাদের সকলকে বাঁধিয়া ফেলিবে। তাহার পর যাহা হইবে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছিস্ না গাধা?"

ক্যারো আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতবেগে মুলিঙ্গারের আদেশ পালন করিতে চলিল।

ভার্ণি তখনও মুলিঙ্গারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। মুলিঙ্গারের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে সে ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

মুলিঙ্গার দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "তুমি কি খোঁড়া হইয়াছ? না, তোমার পায়ে পক্ষাঘাত হইয়াছে? দলের অন্য সকলকে শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দাও। যাও, এই মুহূর্ত্তে আমার আদেশ পালন কর।"

ভার্ণি আতঙ্ক-বিহ্বল চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে মুলিঙ্গারের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলে, মুলিঙ্গার তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুছাইয়া প্যাকবন্দী করিতে লাগিল। সেই সময় তাহার অন্য চারি জন অনুচর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মুলিঙ্গার অতি অল্প কথায় তাহাদিগকে তাহাদের বিপদের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলে, তাহাদেরও সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল। তাহাদের হৃৎকম্প হইল। তাহাদের এক জন অস্ফুটস্বরে বলিল, "এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, কর্ত্তা!"

মুলিঙ্গার বিকট মুখভঙ্গী করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "আমাদিগকে কি করিতে হইবে কর্ত্তা! এখানে বসিয়া হুইস্কির সঙ্গে চপ-কাট্‌লেট্ গিলিতে হইবে! গাধা, উল্লুক! যা, শীঘ্র এখান হইতে সরিয়া পড়। যদি জেলে ঢুকিবার ইচ্ছা না থাকে ত সকলে আলাদা আলাদা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া চম্পট দে। দল বাঁধিয়া একসঙ্গে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিস্, কি ধরা পড়িয়াছিস্, পুলিস তোদের হাতে লোহার বালা পরাইয়া সকলকে গারদে পুরিবে। আলাদা আলাদা হইয়া সরিয়া পড়িলে তোদের ধরা পড়িবার ভয় থাকিবে না, কারণ, রয়েড তোদের কাহাকেও চেনে না; তোদের হঠাৎ দেখিতে পাইলেও মনে করিবে, তোরা এই গ্রামেরই লোক, সাংসারিক কাযে স্থানান্তরে যাইতেছিস্। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছিস্? তাহার পর তোরা"—

মুলিঙ্গার হঠাৎ নীরব হইয়া কি ভাবিল, এবং একটি নূতন আড্ডার নাম করিয়া বলিল, "সেখানে আগামী বুধবার বেলা

বারোটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিস্। মনে থাকে যেন, আগামী বুধবার বেলা বারোটার সময়।”

তাহার কথা শুনিয়া তাহার এই সকল অনুচর—সেই ভাড়াটে গুণ্ডার দল কোন কথা না বলিয়া অস্ফুটস্বরে বিড়-বিড় করিতে লাগিল, আতঙ্কে তাহাদের সকলেরই চক্ষু বিস্ফারিত। তাহারা পলাইতে পারিলেই বাঁচে, তখন তাহাদের এইরূপ ভাব!

মুলিঙ্গার তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিল, “আমার কথাগুলা কাণে ঢুকিয়াছে কি? তোদের বাঁচিবার একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা বলিয়াছি; এক কথা পুনঃ-পুনঃ বলিতে চাহি না। ইচ্ছা হয়, আমার উপদেশ পালন কর, না হয়, পুলিসের হাতে ধরা দিয়া জেলে যা। আমার তাহাতে লাভ-লোকশান নাই।”

মুলিঙ্গার তাহার কাঠের সিন্দুক হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া লইয়াছিল, তাহা সে সেই কক্ষের দ্বারের দিকে প্রসারিত করিয়া স্থানীয় অনুচরগণকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিল।

ভার্ণি তখনও সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে অন্যান্য দস্যু প্রস্থান করিলে, সে ভার্ণিকে বলিল, “যাও, তুমি ক্যারোর সাহায্যে বন্দীদের শীঘ্র এখানে হাজির কর। ক্যারো কেন এত বিলম্ব করিতেছে?”

ভার্ণি অদৃশ্য হইলে মুলিঙ্গার আরও কতকগুলি জিনিষ বাক্স হইতে বাহির করিয়া ব্যাগে পূরিল। সেই সময় সে সেই কক্ষের মুক্ত বাতায়নপথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া পুনঃ-পুনঃ মাঠের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষু ও মুখ ক্ষুধাতুর শ্বাপদ জন্তুর চোখ-মুখের মত অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহার আশঙ্কা হইল, নগরে তাহার যে আফিস ছিল, পুলিস হয় ত সেখানে হানা দিয়া খানা-তল্লাস আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল দস্যু তাহার আফিসের কর্ম্মচারী সাজিয়া সেখানে তাহার আদেশ-পালনে নিযুক্ত ছিল, তাহারা পলায়নের সুযোগ না পাওয়ায় সম্ভবতঃ পুলিসের হস্তে বন্দী হইয়াছে, এবং সে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল জালিয়াতি করিয়াছে, উৎপীড়নের ভয় দেখাইয়া অসংখ্য সম্রান্ত নরনারীর নিকট যে ভাবে উৎকোচ আদায় করিয়াছে, পুলিসের খানাতল্লাসীর ফলে তাহার সকল প্রমাণই হয় ত পুলিসের হস্তগত হইয়াছে, এবং তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্তরালে কি ভীষণ অপরাধ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা জানিতে পারিয়া নগরের পুলিস চতুর্দ্দিকেই হয় ত তাহার সন্ধানে ফিরিতেছে! কিন্তু তখন পর্য্যন্ত একটি বিষয়ে সে হতাশ হয় নাই। তাহার মনে হইল, যেথে। ল্যাংটনের-ফটোর যে ফ্রেমখানি সে হস্তগত করিয়াছিল, সেই ফ্রেমের ফটো যদি সে কোন কৌশলে তাহার বন্দী ল্যাংটনের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সকল চেষ্টা, যত্ন পরিশ্রম সফল হইবে; কিন্তু যদি সে অবিলম্বে তাহা সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি দেশান্তরে পলায়ন করিতে না পারে—”

ক্রোধে ক্ষোভে তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া পদাহত কেউটে সাপের মত গজরাইতে লাগিল। তাহার পর সে খেঁকী কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “আমি নির্ব্বিঘ্নে সকল কায শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু পুলিসের ঐ কুকুর রয়েড়—”

তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে ক্যারো তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জানাইল, শকট প্রস্তুত। ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীকে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া এবং তাহারা চীৎকার করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের মুখ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া তাহাদিগকে গাড়ীর পশ্চাতের আসনে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের নড়িবারও শক্তি নাই, পলায়নের চেষ্টা ত দূরের কথা!

এই সংবাদে মুলিঙ্গারের ক্রোধ-প্রদীপ্ত মুখ সংযত ভাব ধারণ করিল। সে ক্যারোকে স্বাভাবিক স্বরে বলিল, “চল ক্যারো, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না। তুমিই গাড়ী চালাইবে। ভার্ণি, তুমি ক্যারোর পাশে বসিবে।”

তাহারা তিন জনেই মুলিঙ্গারের শকটে আরোহণ করিতে চলিল।

মুলিঙ্গার ভার্ণিকে গাড়ী চালাইতে বলিল বটে, কিন্তু গাড়ী লইয়া কত দূরে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা বলিল না; তাহার মন তখন এরূপ উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত যে, প্রধান কথাই সে বলিতে ভুলিয়া গেল।

ক্যারো তাহার ভীষণ মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, “আমাকে ত গাড়ী চালাইবার ভার দিলে; কত দূরে

কোথায় যাইতে হইবে, তাহা কি আমাকে গণিয়া স্থির করিতে হইবে? ও বিদ্যা আমি শিখিতে পারি নাই, পারিলে বোধ হয় এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না!

মুলিঙ্গার তীব্রস্বরে বলিল, "কাপুরুষরাই দুঃখে কষ্টে অভিভূত হইয়া জীবনের ভার দুর্ব্বহ মনে করে। বিনা কষ্টে কাহারও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয় না। আমার দুর্ভাগ্য যে, তোমাদের মত ভীরুর দল আমার সহকারী। কিন্তু এখন তোমাদের তিরস্কার করা বৃথা। আমরা এখন ইস্‌প-উইচে কীলের আড্ডায় যাইব, তাহাই আমাদের লক্ষ্যস্থল। ইস্‌প উইচে গাড়ী চালাও। সদর রাস্তা ছাড়িয়া গলিপথে চল।"

ক্যারো গুম্ হইয়া গাড়ীতে বসিয়া সেই সুসজ্জিত সুবৃহৎ শকট মুলিঙ্গারের ইঙ্গিত অনুসারে চালাইতে আরম্ভ করিল। মুলিঙ্গার ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীকে দুই পাশে রাখিয়া মধ্যস্থলে বসিয়াছিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে পর্য্যায়-ক্রমে সে উভয়েরই মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার নির্নিমেষ নেত্রের দৃষ্টি সর্পের দৃষ্টির ন্যায় খলতাপূর্ণ। তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য প্রণয়ি-যুগলকে সেই স্থানে হত্যা করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে জানিত, তাহাদিগকে হত্যা করিলে তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। এই জন্য শকটের ভিতর তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে তাহার আগ্রহ হইল না।

ওলিভার কীল মুলিঙ্গারের অন্যতম এজেণ্ট। সে মুলিঙ্গারের ন্যায় সাধু ব্যবসায়ী। অরওয়েল নদীতীরে তাহার একটি উদ্যানভবন সংস্থাপিত ছিল, তাহার এক দিকে ইস্‌প-উইচ, অন্য দিকে সমুদ্রতট। এই নির্জ্জনস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে মুলিঙ্গারের প্রেরিত জাল-নোটগুলি দেশের সেই অংশে প্রচারিত করিত।

মুলিঙ্গার রয়েডের ভয়ে ফ্রি-অ্যাসের খামার-বাড়ীর আড্ডা হইতে পলায়ন করিবার পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, বন্দিযুগলকে সঙ্গে লইয়া সে তাহার পরম বন্ধু কীলের উদ্যান-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এবং সেই স্থানে তাহার বন্দিনীর প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে, ল্যাংটন প্রণয়িনীর নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া ফটোখানি তাহাকে প্রদানের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবে। তার পর সে সেই যুবক-যুবতীকে সেই উদ্যান-ভবনে—

এই কথা চিন্তা করিতে করিতে মুলিঙ্গার মাথা ঘুরাইয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই সময় মুলিঙ্গারের 'বেণ্ডলেট' শকট একটা গলি হইতে বাহির হইয়া, সুপ্রশস্ত রাজপথের সহিত সমকোণে (at right angles) অবস্থিত আর একটি গলির ভিতর সবেগে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

মুলিঙ্গারের শকট গলি অতিক্রম করিয়া রাজপথে প্রবেশ করিতেই মুলিঙ্গার বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই পথের অন্যদিক হইতে দুই জন আরোহী সহ একখানি ক্ষুদ্র মোটর-কার তাহার শকটের অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে দেখিল।

মুলিঙ্গার সেই শকটের আরোহিদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে মুহূর্ত্তের জন্য আড়ষ্ট হইল; কিন্তু সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্যারোকে ক্ষীণস্বরে বলিল, "পূর্ণবেগে গাড়ী চালাও। যাহা ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিল! তাড়াতাড়ি এই পথটা পার হইতে পারিলে না মূর্খ!—ঐ গাড়ীর দুই জন আরোহীর এক জন রয়েড, আর এক জনকে চিনি না; সে বোধ হয় পুলিস-কর্ম্মচারী। আমরাই উহাদের লক্ষ্য।"

মুলিঙ্গারের অনুমান মিথ্যা নহে; রয়েডের পার্শ্বে সে যাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়াছিল, তিনি ইন্‌স্পেক্টর বেল। রয়েড মুলিঙ্গারকে তাহার গাড়ীতে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রথম অধ্যায়, ২য় পাদ

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণ :—সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (১)

ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ এখানে বিচার করা হইতেছে :—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ।

অনুবাদ, "সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, (কারণ) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মে বিলীন হয়, ব্রহ্মেই অবস্থান করে। অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। মানব (হয়) সংকল্পেরই বিকার,—ইহ জন্মে মানব যেরূপ সংকল্প করে, মৃত্যুর পর সেইরূপ হয়। সে সংকল্প করিবে,—মনোময়, প্রাণ শরীর, তেজোময় (এই প্রকার সংকল্প করিবে)"

এখানে বাক্যের প্রারম্ভে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, ইহা সত্য ; কিন্তু বাক্যের শেষে মন, প্রাণ এবং রূপের উল্লেখ আছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যখন মন, প্রাণ এবং রূপ নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে,—এখানে ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ হইতেছে,—"সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ",—ব্রহ্মের যে সকল গুণ সর্ব্বত্র (সকল বেদান্ত-বাক্যে) প্রসিদ্ধ, সে সকল গুণের এখানে উপদেশ আছে। ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ, ইহা সকল বেদান্তবাক্যে প্রসিদ্ধ। যে শ্রুতিবাক্য উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে "তজ্জলান্" শব্দে ব্রহ্মের এই গুণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। তজ্জ (তৎ+জ) অর্থাৎ তাহা হইতে জাত, তল্ল (তৎ+ল) অর্থাৎ তাহাতেই বিলীন ; তদন (তৎ+অন) অর্থাৎ তাহাতেই চেষ্টাযুক্ত। তজ্জ, তল্ল, তদন এই তিনটি শব্দ মিলিয়া, মধ্যবর্ত্তী দুইটি তদ্ শব্দের লোপ হইয়া তজ্জলানম্ শব্দ সিদ্ধ হয়, তজ্জলানম্ শব্দই বৈদিক ভাষায় তজ্জলান্রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উপরি-লিখিত শ্রুতিবাক্যের প্রারম্ভে যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তাঁহাকেই মনোময় প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মনোময় প্রভৃতি শব্দের নিকটে যখন ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই সকল শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এখানে জীবের কোনও উল্লেখ নাই। অতএব জীবকে লক্ষ্য করা সঙ্গত হয় না।

রামানুজ বলেন, মনোময়ত্বাদি যে সকল গুণের এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল গুণ ব্রহ্মেরই আছে, ইহা সকল বেদান্তবাক্যে প্রসিদ্ধ। যথা "মনোময়ঃ প্রাণ শরীরনেতা" (মুণ্ডকোপনিষদ)—ব্রহ্ম মনোময়, তিনি প্রাণ এবং শরীরের নেতা (চালক)। "স এষোহন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ" (তৈত্তিরীয় শিক্ষোপনিষদ্) হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহার মধ্যে মনোময়, অমৃত ও হিরণ্ময় পুরুষ বাস করেন। "প্রাণস্য প্রাণঃ" (কেনোপনিষদ্) তিনি প্রাণের প্রাণ। রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "মনোময়" শব্দের অর্থ 'বিশুদ্ধ মনদ্বারা গ্রহণীয়' "প্রাণ শরীর" শব্দের অর্থ প্রাণের আধার এবং নিয়ন্তা। এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে, উপনিষদে অন্যত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "অপ্রাণো হ্যমনাঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রাণ নাই, মন নাই ; তাহার অর্থ—ব্রহ্ম মন দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন না, প্রাণের উপর তাঁহার স্থিতি নির্ভর করে না। এই ভাবে উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

মধ্বাচার্য্য বলেন যে, এই সূত্রের অর্থ এইরূপ :—বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়াই সর্ব্বত্র ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা মহাভারতে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বিষ্ণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "পরমং যো মহদব্রহ্ম"।

বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ (২)

বিবক্ষিত গুণ, অর্থাৎ যে সকল গুণ বিবক্ষিত হইয়াছে,—যে গুণাবলি উল্লেখ করা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হইতেছে,—সেই গুণাবলি ব্রহ্ম সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় উপপত্তেঃ), সে সকল গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জীবের থাকিতে পারে না।

প্রথম সূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যে আছে :—সত্যসংকল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ।

এই সকল গুণবাচক শব্দ ব্রহ্ম-সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায়। ব্রহ্ম "সত্যসংকল্প"; কারণ, জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়,

তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখনই তাহার সংঘটন হয়। "আকাশাত্মা" অর্থাৎ আকাশের ন্যায় আত্মা যাঁহার,— আকাশ যেমন সর্ব্বত্র অবস্থিত অথচ নির্লেপক, ব্রহ্মও সেইরূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং নির্লেপক। এইরূপ অপর সকল গুণ ব্রহ্মেরই আছে, জীবের নাই।

রামানুজ পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "মনোময়" এবং "প্রাণশরীর" এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব-সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। "ভারূপ" অর্থাৎ ভাস্বররূপ, নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত, "আকাশাত্মা" অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ; নিজে প্রকাশ পান, এবং অন্যকেও প্রকাশ করেন, এভাবেও আকাশ শব্দ ব্যাখ্যা করা যায়; "সর্ব্বকর্ম্মা" অর্থাৎ সর্ব্বজগৎ যাঁহার কর্ম্ম; অথবা সকল ক্রিয়া যাঁহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; "সর্ব্বকামঃ" যাঁহার সকল ভোগের উপকরণ আছে, "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" সকল উৎকৃষ্ট দিব্যগন্ধ ও রস তাঁহার আছে, প্রাকৃত (পার্থিব) গন্ধ এবং রস তাঁহার নাই, কারণ, শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন, "অশব্দম্ অস্পর্শম্"। "সর্ব্বমিদমভ্যাত্তঃ" এই সকল (পূর্ব্বোক্ত সকল কাম, রস, গন্ধ) স্বীকার করিয়াছেন; "অবাকী" কোনও বাক্য নাই; তাহার কারণ তিনি "অনাদর" তিনি সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আদরের বস্তু কিছু নাই, তাঁহার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত থাকেন।

মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন, এই সূত্রের অর্থ এই যে, বিষ্ণুর কেবল অশ্রুতত্ব প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা নহে, কারণ, চতুর্ব্বেদ শিখাতে আছে যে, এই অশ্রুত, অদৃষ্ট, অনন্ত বিষ্ণুই সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি রূপ ধারণ করেন।

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ (৩)

অনুপপত্তেঃ (যুক্তিযুক্ত হয় না বলিয়া) তু (নিশ্চয়) ন শারীরঃ (জীব হইতে পারে না)।

পূর্ব্ব-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে যে গুণাবলি উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুণাবলি ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লেখ হইলে যুক্তিযুক্ত হয়। এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, সেই গুণগুলি জীব সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। যিনি শরীরে থাকেন, তিনি "শারীর", অর্থাৎ জীব। ব্রহ্মও শরীরে থাকেন, কিন্তু তিনি শরীরের বাহিরেও থাকেন। জীব কেবলমাত্র শরীরেই থাকেন। এজন্য ব্রহ্মকে শারীর বলা হয় না, জীবকে শারীর বলা হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন, শ্রুতি যে গুণসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, খদ্যোতের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবে তাহা কি করিয়া থাকিতে পারে? শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া জীব দুঃখী; কখনও বদ্ধ, কখনও মুক্ত। জীবের সে সকল গুণ থাকিতে পারে না।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, সূর্য্য বায়ু প্রভৃতির উল্লেখ হেতু আশঙ্কা হইতে পারে যে, কোনও জীবের প্রসঙ্গ হইতেছে। এই সূত্রে সে আশঙ্কা নিবারিত হইতেছে।

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ (৪)

(ব্রহ্মকে) কর্ম্ম এবং (জীবকে) কর্ত্তা এইরূপ ব্যপদেশ আছে, অর্থাৎ উল্লেখ আছে (এজন্য মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত বস্তু জীব হইতে পারে না, ইহা ব্রহ্ম)।

আলোচ্যমান শ্রুতিবাক্যের পরে আছে, "এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতা অস্মি"। "এতম্", অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত এই বস্তুটিকে, "ইতঃ প্রেত্য" অর্থাৎ এই পৃথিবী হইতে পরলোকে প্রয়াণ করিবার সময়, "অভি সংভবিতা অস্মি" প্রাপ্ত হইব। জীব এই বস্তুটিকে প্রাপ্ত হইবে এইরূপ উল্লেখ আছে, অতএব এই প্রাপ্ত বস্তুটি জীব হইতে পারে না।

মধ্ব এখানে "আত্মানং পরস্মৈ শংসতি" এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। (আত্মাকে পরমাত্মার নিকট নিবেদন করে)।

শব্দবিশেষাৎ (৫)

শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ত্তমান প্রকরণ উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে, —"যথা ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা এবম্ অয়ম্ অন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ যথা জ্যোতিরধূমম্" অর্থাৎ ব্রীহি (আশুধান্য) যব, শ্যামাক (ধান্যবিশেষ), অথবা শ্যামাকধান্যের তণ্ডুল যেরূপ (সূক্ষ্ম), সেইরূপ জীবাত্মার মধ্যে (অন্তরাত্মন্) হিরণ্ময় পুরুষ ধূমহীন জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল)। "অন্তরাত্মন্" অর্থাৎ আত্মার মধ্যে; সপ্তমীর বিভক্তি লোপ হইয়াছে। জীবাত্মাকে বুঝাইবার জন্য "অন্তরাত্মন্" এই সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষকে বুঝাইবার জন্য প্রথমাবিভক্তিযুক্ত "পুরুষঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইভাবে দুইটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হেতু ("শব্দবিশেষাৎ") বুঝিতে পারা যায় যে, মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষ জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন।

রামানুজ এই সূত্রের ভাষ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত বাক্য ব্যতীত আর একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন —"এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে" অর্থাৎ আমার এই আত্মা হৃদয়ের মধ্যে (অবস্থান করে)। তিনি বলিয়াছেন যে, এখানে "মে" শব্দ জীবাত্মাকে বুঝাইতেছে, "আত্মা" শব্দ পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। বিচার্য্য বস্তুকে "আত্মা" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব ইহা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, এই মনোময় পুরুষকে শ্রুতিতে "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে—"এতৎ ব্রহ্ম" (ছা ৩।১৪।৪) জীবকে কখনও ব্রহ্ম বলা যায় না। "ব্রহ্ম" এই বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ-হেতু ("শব্দবিশেষাৎ") বুঝিতে হইবে যে, এই মনোময় পুরুষ জীব নহেন।

স্মৃতেশ্চ (৬)

পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন,—জীব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্য। যথা গীতায়—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥"

অর্থাৎ, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মায়া দ্বারা সকল প্রাণীকে যন্ত্র-চালিতের ন্যায় ভ্রমণ করান।

শঙ্কর এখানে বলিয়াছেন যে, এই সকল সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক,—দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মেরই নাম জীব,—উভয়ের মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই,—কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তৎ ত্বমসি" (তুমিই ব্রহ্ম) "নান্যোঽতো্ঽস্তি দ্রষ্টা" (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা—জীব—নাই)

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎ,
ন, নিচায্যত্বাদেবং, ব্যোমবচ্চ (৭)

অর্ভকং (ক্ষুদ্র) ওকঃ (আবাসস্থান) যস্য স অর্ভকৌকাঃ। "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ",—ক্ষুদ্র গৃহের কথা আছে বলিয়া, (সেই মনোময় পুরুষ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন। এইরূপ বাক্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "এষ ম আত্মা অন্তর্হৃদয়ে"—ইনি আমার আত্মা, ইনি হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন)—তদ্ব্যপদেশাৎ (ক্ষুদ্র পরিমাণের উল্লেখ হেতু,—("অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা" ছান্দোগ্য উপনিষদ,—তিনি ব্রীহিধান্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম, যব অপেক্ষাও সূক্ষ্ম), অতএব ইনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না। "ইতি চেৎ"—যদি এই আপত্তি করা যায়। "ন"—না, এ আপত্তি যথার্থ নয়। "নিচায্যত্বাৎ এবং"—এইরূপ উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম হৃদয়ের মধ্যে "নিচায্য" দ্রষ্টব্য। "ব্যোমবৎ"—আকাশের ন্যায়,—আকাশ সর্ব্বগত হইলেও সূচীর (ছুঁচের) মধ্যে অবস্থিত আকাশকে লক্ষ্য করিয়া যেমন আকাশকে ক্ষুদ্র আবাসস্থিত এবং ক্ষুদ্র পরিমাণযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও হৃদয়মধ্যস্থিত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র আবাসস্থিত, এবং ক্ষুদ্র পরিমাণ-যুক্ত বলা হইয়াছে। যিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাঁহাকে ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থিত বলা যায়, কিন্তু যিনি কেবলমাত্র ক্ষুদ্রস্থানে অবস্থিত, তাঁহাকে সর্ব্বত্র অবস্থিত বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন, "যথা শালগ্রামে হরিঃ"—হরি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও শালগ্রামে তাঁহাকে উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হন।

রামানুজ "ব্যোমবচ্চ" এই বাক্যটির ভিন্নরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতি এই স্থানে মনোময় পুরুষকে কেবল ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, "ব্যোমবৎ" আকাশের ন্যায় বৃহৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো" (ছা ৩।১৪।৩) ইনি পৃথিবী হইতেও বৃহৎ, আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ, স্বর্গ অপেক্ষাও বৃহৎ"। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোময় পুরুষকে ক্ষুদ্র বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, উপাসনার জন্যই তাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রামানুজ এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সমগ্র চতুর্দ্দশ খণ্ডের তাৎপর্য্য সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুকে ক্ষুদ্র আবাসে স্থিত এবং চক্ষু প্রভৃতিযুক্ত, এই ভাবে উপাসনা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। তিনি স্কন্দপুরাণ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়ো বিষ্ণুঃ সর্ব্বপ্রাণিষু চ স্থিতঃ।
সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদোদিতশ্চ সঃ॥

"বিষ্ণু সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়, তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত, তিনি সকল নামের দ্বারা অভিধেয়, এবং সকলবেদে তিনিই উক্ত হইয়াছেন।"

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ (৮)

ব্রহ্ম যদি জীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জীবের হৃদয়গত সুখ-দুঃখ ব্রহ্মকেও ভোগ করিতে হইবে

("সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ")—কেহ যদি এইরূপ তর্ক করেন ("ইতি চেৎ"), না, তাহা হয় না ("ন")—ব্রহ্মকে জীবের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, কারণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বিশেষ আছে—প্রভেদ আছে ("বৈশেষ্যাৎ")। জীব পাপপুণ্যের কর্ত্তা, এবং পাপপুণ্য অনুসারে সুখ-দুঃখের ভোক্তা, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি। পাপের সহিত ব্রহ্মের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই (তিনি অপহতপাপ্মা), সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্। অতএব জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

রামানুজ "বৈশেষ্যাৎ" শব্দটির ভিন্নপ্রকার ব্যখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বৈশেষ্যাৎ" শব্দের অর্থ "হেতু-বৈশেষ্যাৎ"। হৃদয়মধ্যে অবস্থান করাই সুখদুঃখভোগের হেতু নহে। সুখদুঃখভোগের হেতু হইতেছে পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মের অধীনতা। জীব পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মের অধীন; এজন্য জীব সুখদুঃখ ভোগ করে। ব্রহ্ম কর্ম্মের অধীন নহেন,—তিনি অপহতপাপ্মা,—এজন্য ব্রহ্ম হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিলেও সুখদুঃখ ভোগ করেন না। শ্রুতিও অন্যত্র তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি (মুণ্ডকোপনিষদ্)

"জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে জীব পরিপক্ক কর্ম্মফল ভোগ করেন; ব্রহ্ম ভোজন না করিয়া কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করেন।"

মধ্ব বলিয়াছেন যে,"বৈশেষ্যাৎ" অর্থাৎ সামর্থ্যের বৈশেষ্য বা প্রভেদ্ব দেখা যায়। যদিও জীব এবং ব্রহ্ম এক শরীরেই অবস্থান করেন, তথাপি জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, ব্রহ্ম করেন না; কারণ, উভয়ের শক্তির প্রভেদ আছে।

মধ্ব গরুড়পুরাণ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

সর্ব্বজ্ঞাল্পজ্ঞতাভেদাৎ সর্ব্বশক্ত্যল্পশক্তিতঃ।
স্বাতন্ত্র্য-পারতন্ত্র্যাভ্যাং সংভোগো নেশজীবয়োঃ॥

ঈশ্বর এবং জীব উভয়ের (কর্ম্মফল) সম্ভোগ হয় না (কেবল জীবের হয়)। কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, স্বতন্ত্র কিন্তু জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, পরতন্ত্র।

অত্তৃ—অধিকরণ

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ (৯)

কঠোপনিষদে আছে,—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

"ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাহার অন্ন, মৃত্যু যাহার উপসেচন (অর্থাৎ অন্নের সহিত ভুক্ত ঘৃত বা ব্যঞ্জন), তিনি যে স্থানে থাকেন, তাহা কে জানে?"

এখানে কাহার কথা হইতেছে? ব্রহ্মের, না কোনও জীবের? এখানে ব্রহ্মকেই অত্তা বলা হইয়াছে। কারণ, প্রলয়ের সময় তিনি চরাচর জগৎ ভক্ষণ করেন। এখানে "চরাচর" জগতের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু মৃত্যু শব্দের উল্লেখ আছে, মৃত্যু চরাচর জগৎই ধ্বংস করে, সুতরাং চরাচর জগতের ধ্বংসের কথাই শ্রুতির অভিপ্রেত, চরাচর জগতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, এজন্য কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে বলা হইল,—ব্রহ্ম ভোক্তা নহেন, জীবই ভোক্তা। এজন্য এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, বর্ত্তমান সূত্রে উদ্ধৃত কঠোপনিষদের বাক্যেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভক্ষকরূপে কোনও জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, যিনি ভোক্তা,তাঁহাকেই ভক্ষক বলা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা নহে। জীবের কর্ম্মনিমিত্ত ভোগ হয়, কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছায় সমগ্র জগৎ সংহার করেন।

মধ্ব বলেন যে, এই সূত্রের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য্য অত্তা নহেন, বিষ্ণুই অত্তা। সর্ব্বং অত্তি,—সকল বস্তু ভক্ষণ করেন, এজন্য সূর্য্যের নাম অদিতি হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক নিখিল জগতের ভক্ষক সূর্য্য নহেন, বিষ্ণু।

প্রকরণাচ্চ (১০)

ব্রহ্মের প্রসঙ্গেই (প্রকরণাৎ) উক্ত শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়; কারণ, ঐ বাক্যের পূর্ব্বে আছে,—

"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি "সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে অবগত হইলে আর শোক করে না। ইহা ব্রহ্মসম্বন্ধেই বলা যায়, জীবসম্বন্ধে বলা যায় না।

মধ্ব এখানে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে সৃষ্টি-প্রকরণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

ফুল ও কাঁটা

(গল্প)

সকালে ডাকওয়ালা চিঠি দিয়া গেল। একখানি পোষ্টকার্ড। চিঠি হাতে করিয়া শ্যামল দেখে,—এ চিঠি লিখিয়াছেন শিবশঙ্কর মিত্র।

শিবশঙ্কর মিত্র 'রথচক্র' পত্রিকার সম্পাদক। মস্ত লেখক। তাঁর ছাপাখানা আছে। 'যুগন্ধর পাব্লিশিং' কোম্পানির তিনি মালিক।

শ্যামল বহুবার তাঁর দ্বারে হানা দিয়াছে। সম্প্রতি একখানি নভেল লইয়া তাঁর হাতে দিয়া আসিয়াছে—যদি তাঁর কৃপাদৃষ্টি পায়, বেচারার হিল্লে হইয়া যায়।

চিঠি পাইয়া বুকখানা আশায় দুলিয়া উঠিল। চিঠি পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে,—

সবিনয় নিবেদন,

চিঠি পাইবামাত্র একবার আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আশা করি, শারীরিক কুশল। ইতি

ভবদীয়

শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র

কৈ, উপন্যাসের কথা তো লেখেন নাই! পছন্দ হয় নাই, তাই। পছন্দ হইলে সে কথার উল্লেখ নিশ্চয় করিতেন।

নৈরাশ্যের আঘাতে গুম্ হইয়া বেচারা চিঠি হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। পত্নী অনিলা স্নান সারিয়া সিক্ত-বসনে ঘরে আসিল, কহিল—কি গা! অমন করে দাঁড়িয়ে আছো যে! কার চিঠি এলো?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামল স্ত্রীর পানে চাহিল, কহিল,—শিবশঙ্কর বাবু লিখেচেন।

অনিলা কহিল,—রথচক্রের সম্পাদক?

—হ্যাঁ।

—তোমার উপন্যাস পছন্দ হয়েচে?

শ্যামল কহিল,—সে সম্বন্ধে কোনো কথা লেখেন নি—শুধু যেতে লিখেচেন।...

শ্যামলের মুখ মলিন। অনিলা তাহা লক্ষ্য করিল,—তার বুকে যেন কে তীর হানিল! সে-বেদনা গোপন করিয়া অনিলা কহিল,—বেশ—যাও, ভালোই হবে।

শ্যামল কহিল,—ছাই হবে। উপন্যাসখানি ফেরত দেবেন—দিয়ে বলবেন, সুবিধে হলো না—আর কোথাও দাও হে!

একটা উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া অনিলা কহিল,—মন্দটাই ভাবচো কেন? হয়তো পছন্দ হয়েচে, তাই ডেকেচেন।

শ্যামল কহিল,—পছন্দ হলে চিঠিতে সে কথা জানাতেন। অশুভ সংবাদ—তাই জানান নি।

অনিলা স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শ্যামল নিশ্বাস ফেলিল। অনিলা কহিল,—তা নয়। পছন্দ হয়েচে গো। টাকা-কড়ির কথা কইবেন, তাই যেতে লিখেচেন। নিশ্চয়! দেখো, আমার কথা ঠিক কি না!

শ্যামল স্ত্রীর পানে চাহিল। বেচারী! এ বয়সে স্বপ্ন-কুহকে তার মন কোথায় ভরিয়া থাকিবে—তা নয়, অভাবের দুশ্চিন্তায় তারো অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হইতে বসিয়াছে! শ্যামলের সঙ্গে সেও সারাক্ষণ উদ্বেগে-কাঁটা হইয়া আছে! শ্যামল হাসিল।

হাসিয়া সে কহিল,—আমার সঙ্গে সমানে দুঃখ ভোগ করে আজো তুমি এমন আশা কি বলে করো, অনু!

অনিলা কহিল,—আমার দুঃখটা কোথায়, শুনি! আমি ভালো আছি—খুব ভালো আছি।

শ্যামল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল—ভালোই বটে!

অনিলা কহিল,—তুমি ভেবো না। কাল রাত্রে শুতে যাবার সময় মা-কালীকে ডেকে আমি জানিয়েচি, সুরাহা করো মা! আমার যেন মনে হলো, মা হেসে বললেন—হবে সুরাহা! দেখো তুমি—আমি বলচি, এ চিঠিতে ভালোই হবে। তুমি এখনি গিয়ে দেখা করো। আমার কাছে বাবা সত্য-নারায়ণের ফুল আছে। পকেটে করে নিয়ে যেয়ো। বাবা সত্যনারায়ণ নিশ্চয় সুফল দেবেন।

শ্যামল হাসিল, হাসিয়া কহিল—তাই হবে। তোমার দেওয়া ফুলই আমি সম্বল করবো, অনু!

অনিলা কহিল—এখন তুমি ঘর থেকে যাও দিকিনি—আমি কাপড় ছাড়ি।

শ্যামল বাহির হইয়া আসিল।

ভাবিল, হয়তো অনিলার অনুমান সত্য। নভেলখানা পছন্দ হইয়াছে, তাই ডাকিয়াছেন! অপছন্দ হইলে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া কোনো সম্পাদক সে-সংবাদ লেখককে জানায় না। সেও রিপ্লাই-কার্ড দিয়া আসে নাই যে জবাব মিলিবে! যদি পছন্দ হইয়া থাকে—কত টাকা দিবেন? তিনি যদি প্রশ্ন করেন—কত টাকা চাও? রথচক্রে মাসে মাসে ক্রমশঃ ছাপিয়া বাহির হইবে; তার পর স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে। দুটা ছাপার জন্য কত চাহিবে? আড়াইশো? না দুশো? কত?

যদি উনি বলেন—একশোটি টাকা নাও বাপু। নূতন লেখক—এ তোমার প্রথম উপন্যাস!

মনটা ছমছম্ করিয়া উঠিল। হোক প্রথম উপন্যাস! সে মামুলি কথা লেখে নাই। দুই বন্ধু এবং এক তরুণী নারী—তিন জনকে লইয়া সেক্স-সমস্যা! এ ধরণের লেখা এমন মামুলি হইয়া গিয়াছে যে সিচুয়েশনে ইতর-বিশেষ থাকিলেও মূলে প্রায় একই কথা সকলে লেখে। সে লিখিয়াছে—দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে বাঙালী গৃহস্থের প্রাণপণ সংগ্রামের কাহিনী! পদে পদে হুঁচট খাইয়া, ঝড়-বাদলে মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া কি ভাবে লক্ষ্য-পথে চলিয়াছে—চলিয়াছে! সামনে নিরাশার ঘন ঘোর অন্ধকার! শক্তি দিতে পাশে পাশে চলিয়াছে শুধু এক দুর্ব্বল নারী! তার হাসি, তার আশ্বাস—কতখানি শক্তি জোগায়···এত বড় message! তার কোনো দাম নাই? সে রঙীন ছবি আঁকে নাই। রঙের পুঁজি তার নাই! সুখ-দুঃখের সাদা-কালো রেখায় আঁকিয়াছে সে নিত্যকার জগৎকে!···সত্যই তার কোনো দাম নাই সাহিত্যে? সমাজে? সংসারে?

যদি উনি একশো টাকা দিতে আসেন? তাহাই লইতে হইবে!

বুক জুড়িয়া নিশ্বাস···শ্যামল ভাবিল, উপায় কি? একশো টাকাই কে দেয়? এত পাব্লিশার রহিয়াছে। অনেকের কাছে সে গিয়াছে। সকলে জবাব দিয়াছে—নূতন লেখক—পয়সা দিতে পারিবে না। ছাপাইতে পারে—তার পর বিক্রী-সিক্রী হইলে যেমন আমানত হইবে, সেই হিসাবে পঞ্চাশ-ষাট টাকা মিলিতে পারে! তবে বিক্রয় হইতে সময় লাগিবে দশ বৎসর—হয়তো বা পনেরো বৎসর।

এ জবাব শুনিয়া এত দারিদ্র্যের মধ্যেও রাগে শ্যামলের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, দেয় পিঠে সজোরে ঘুষি বসাইয়া! কি করিয়া নিজেকে সম্বরণ করিয়া লেখা খাতা সে ফিরাইয়া আনিয়াছে, আজো তাহা ভোলে নাই!

ভিজা কাপড় ছাড়িয়া অনিলা বাহিরে আসিল, আসিয়া কহিল,—কখন্ যাবে?

শ্যামল কহিল,—খেয়ে-দেয়ে।

অনিলা কহিল—এখনি কেন গেলে না?

শ্যামল কহিল—তাঁর আপিস খুলবে দশটায়। সাড়ে দশটায় তিনি আপিসে আসেন।

অনিলা কহিল—আমি উনুনে আগুন দিয়ে ভাত চড়িয়ে দি। আমার ঘরে ঘট রাখবো—তুমি শুধু দোকান থেকে একটু দই এনে দিয়ো," বুঝলে! সেই ঘটে প্রণাম করে বেরিয়ো। ঠাকুর-দেবতা একটু মেনো দিকিন্! আমি মানি। তাই এত দুঃখেও ছাখো, তিনি একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি।

শ্যামল হাসিল। সে যে কতখানি দমিয়া পড়ে! উপায় নাই! আশা নাই! সামনে জীবন-পথের যতখানি দেখা যায়, ধু-ধু করিতেছে! যেন সাহারা মরুভূমি! কোথায় তরু? কোথায় ছায়া? পিপাসা মিটাইবার জল কোথায়?

অনিলা তাহাকে এমনি কথায় সান্ত্বনা দেয়! যখন শ্যামলের মন সান্ত্বনা মানে না, তখন ছল-ছল চোখে অনিলা বলে,—তুমি যদি কাতর হও, তাহলে কার মুখ চেয়ে আমি বুক বাঁধবো, বলো?

সত্য কথা! বিবাহ করিয়া আর একজনের সকল দায় সে মাথায় লইয়াছে!

তাই—যত ছেলেমানুষীই হোক, অনিলার কথায় মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া শ্যামল তার সান্ত্বনা শিরোধার্য্য করে। মন রুদ্র রবে গর্জ্জিতে থাকে, ওরে মূঢ়, ওরে কাপুরুষ, ওরে হতভাগা! তবু সে মনকে থাবড়া দিয়া

বলে, চুপ, চুপ! বেচারী অনিলা! কার মুখ চাহিয়া—কাহাকে অবলম্বন করিয়া সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে!

অনিলার কথায় শ্যামল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—মুখ আবার আমাদের পানে কবে ফিরিয়েচেন তোমার ঠাকুর-দেবতারা, অনু?

শিহরিয়া অনিলা কহিল,—ও কথা বলো না। আমাদের চেয়েও কত অভাগা দুনিয়ায় আছে বলো তো! আমাদের তবু দুবেলা আহার জুটচে—তাদের···?

মানস-নয়নের সম্মুখে সর্ব্বহারা আর্ত্ত আতুরদের করুণ ছবি জাগিয়া উঠিল—ঘন বাষ্পে অনিলার কণ্ঠরোধ হইল।

২

বেলা এগারোটা।

শ্যামল আসিয়া রথচক্র-সম্পাদকের সামনে নমস্কার নিবেদন করিয়া দাঁড়াইল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন,—শ্যামলবাবু!···বসুন।

সামনে চেয়ার। শ্যামল বসিল। বুকের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুততালে সম্পন্ন হইতে লাগিল। শিবশঙ্কর বাবু প্রকাণ্ড মোটা একটা রচনার পৃষ্ঠা খুলিয়া বসিয়াছিলেন।

ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলিতেছে। শ্যামল তার পানে চাহিয়া রহিল। ঐ পেণ্ডুলাম দুলিয়া-দুলিয়া নড়িয়া-নড়িয়া ছোট বড় দুটা কাঁটাকে সরাইয়া বারোটা, একটা, দুটা, তিনটার ঘর পার করিয়া ছটার ঘরে আনিয়া ফেলিবে—তখন সকলের দিনের হিসাব-নিকাশ সারা হইয়া যাইবে। কে জানে, তার হিসাব তখন···

চিন্তায় বাধা পড়িল। শিবশঙ্কর বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন—আমার চিঠি পেয়েচেন?

আনন্দে বুক দুলিল। শ্যামল কহিল,—পেয়েচি। আমার নভেলটা বুঝি সুবিধের হয়নি?

শিবশঙ্কর কহিলেন,—না, না, সেটার সমস্ত এখনো পড়ে উঠতে পারিনি। সেজন্য ডাকিনি—আমি ডেকেচি অন্য কারণে···

শ্যামল আকুল নয়নে শিবশঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল।

শিবশঙ্কর কহিলেন,—আপনি এখানে চাকরি চেয়েছিলেন,—তা, এখানে সুবিধা এখনো দেখছি না! তবে আমি আপনার কথা ভুলিনি। সম্প্রতি একটা কাজ হাতে আছে—টাকা বেশ মিলবে।···মোদ্দা···

শ্যামলের দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল,—কি কাজ?

শিবশঙ্কর কহিলেন,—কাজটা খুব honorable কি না, ভাবচি। তা, আপনার আর্থিক স্বচ্ছলতা ঘটলো?

হতাশা-মিশ্রিত স্বরে শ্যামল কহিল—না। বাড়ীর ভাড়া দু'মাসের জমে গেছে—ষোল টাকা করে বত্রিশ টাকা। বাড়ীওয়ালা লোক ভালো—কিছু বলেন নি। তাঁকে বলেচি, আমার নভেলখানা যদি শিববাবু ন্যান, তাহলে সব টাকা একসঙ্গে শোধ করে দেবো।

শিবশঙ্কর একটু লজ্জা বোধ করিলেন, কহিলেন,—সেটা আমি এবার দেখবো। একটু পড়েচি, ক'পাতা উল্টে। আপনার লেখার ষ্টাইল ভালো! বাঙলাতেই আপনি লেখেন। ইংরিজির বুকনি ঢুকিয়ে পাণ্ডিত্যের ফ্যানায় লেখা গাঁজিয়ে তোলেন না। যা লেখেন, তা স্পষ্ট এবং precise··· এই গুণটিই লেখার বড় গুণ। বেশ ষ্টাইল! ষ্টাইল দেখেই এ কাজের জন্য আপনাকে যোগ্য ভেবে কাল আপনাকে চিঠি লিখেছি।

কথাটা বলিয়া টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া শিবশঙ্কর বেশ দামী একখানা খাম বাহির করিলেন,—খামের মধ্য হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন,—এটা পড়ুন।

শ্যামল চিঠি পড়িল—

মান্যবরেষু

আমি ষ্টেজ থেকে অবসর নিয়েচি। ভালো লাগলো না। এক একবার জীবনটার কথা ভাবি। মনে হয়, আর কেন এ-সব ঝড়-ঝাপটা সয়ে থাকি!

আপনার কথা রাখবো। কবিতা লেখার পাপ করবো না আর। অনেক পাপ করেছি—ও পাপটা না হয় বন্ধ থাকুক।

আমার জীবনের কাহিনী যদি অকপটে লিখি, তা থেকে সমাজের অনেক কথা জানতে পারবেন। হয়তো তাতে দু'চারজনের লাভ হতে পারে।

লিখবো। কিন্তু লেখার চর্চ্চা তো কখনো করি নি। অনেক কথাই এলোমেলো ভাবে মনে আসে। সেগুলো গুছিয়ে লিখতে হবে। যদি আপনার জানা কোনো লেখক আমার মুখে কথাগুলি শুনে বেশ গুছিয়ে ভালো করে

তা লিখে দ্যান, তা হলেই লেখা হয়। এমন লোক পাওয়া যায় না? আমি তাঁর যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে রাজী আছি। দেখবেন চেষ্টা করে?

আমার প্রণাম জানবেন। আমাদের মত হতভাগিনীদের কথা স্মরণ করেচেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানবেন। ইতি

শ্রীপুষ্পতারা দাসী

চিঠি পড়িয়া বিস্ময়ে কৌতূহলে শ্যামল বাক্যহারা!

শিবশঙ্কর কহিলেন,—পুষ্পতারা দাসীর নাম শুনেচেন নিশ্চয়। বাঙলা ষ্টেজের সম্রাজ্ঞী! এঁর জীবনের সঙ্গে অভিজাত-সমাজের জীবনের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিজড়িত যে শুনলে অবাক হয়ে যাবেন! We mean no scandal. এঁর মনের ভাব আশ্চর্য্য বদলে গেছে। ইনি আমার কাগজে কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে আমার মাথায় idea জাগে! ওঁকে দিয়ে যদি ওঁর জীবন-কথা লেখানো যায়—তা থেকে সমাজের এক দিককার মস্ত ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে সে বই বেচলে অজস্র টাকাও মিলবে। তবে অনেকের নাম-ধাম এঁর নামের সঙ্গে জড়িত। সে সব নাম-ধাম একদম্ গোপন করা চাই···। এ জীবনী লেখাবার জন্য লোকের সন্ধান করতে গিয়ে আপনার কথা মনে পড়লো। বইখানা লেখাবার জন্য পুষ্পতারা এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেবেন। আপনি যদি বলেন,—আগাম আপনাকে পাঁচশো টাকা দিতে বলবো—তারপর একশো দুশো করে মাঝে মাঝে,—যেমন আপনার দরকার হবে। বই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পূরো টাকা পেয়ে যাবেন।

এক হাজার টাকা! স্বপ্নের কথা! কল্পনার অতীত! সারা জীবন খাটিয়া মরিলেও এক হাজার টাকা সে চোখে দেখিবে, এমন চিন্তা মনের কোণেও স্থান পায় না!

তার চোখের সামনে হইতে বিশ্ব-জগৎ চকিতে উবিয়া গেল—শুধু এক সহস্র রৌপ্যচক্র অগ্নিচক্রের মত গড়াইয়া গড়াইয়া ঘূর্ণী রচনা করিয়া তুলিল! শিবশঙ্কর কহিলেন,—আপনার বিবাহ হয়েচে। আপনাকে আমি খুব সম্ভ্রান্ত মনের young man বলে বিশ্বাস করি—তাই। না হলে বথা লক্ষ্মীছাড়া সাহিত্যিকের অভাব নেই। আমার এখানে তারাও এসে ভিড় জমায়—তাদের এ কাজে পাঠাতে পারি না। কোনো রকম অমর্য্যাদার আচরণ যদি করে বসে—আমাদের ইজ্জৎ নষ্ট হবে।···তবে ভেবে দেখুন, আপাততঃ এই কাজ আমার হাতে আছে।

চট্ করিয়া শ্যামল জবাব দিতে পারিল না; চুপ করিয়া রহিল। এত টাকা! কিন্তু পুষ্পতারা! থিয়েটারের অভিনেত্রী···পতিতা গণিকা!

শিবশঙ্কর কহিলেন—আজকের দিনটা ভেবে দেখুন—কাল আমায় খপর দেবেন। যদি এ-কাজ নেওয়া মত হয়, জানাবেন—আপনাকে আমি চিঠি দেবো। তাঁর সঙ্গে দেখা করবা-মাত্র পাঁচশো টাকা তিনি আপনাকে দেবেন··· লেখা-পড়া যা করতে হয়, আমিই করে দেবো··

শ্যামল কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—কথাগুলা তার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল মাত্র···

শিবশঙ্কর বলিলেন—আমি অবশ্য আপনাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করতে পারি না। পতিতাও মানুষ—এত বড় তত্ত্বকথা কলমের মুখে লিখলেও বাস্তব জীবনে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করে থাকাই আমি উচিত বলে চিরদিন স্বীকার করবো—এত বড় কাগজের সম্পাদকতা করা সত্ত্বেও! দশ হাজার টাকা পেলেও এ কাজ করতে আজ আমি রাজী হবো না। তবু এ কথা মনে হচ্ছে, এঁর যখন লেখবার বাসনা মনে জেগেচে,—এবং এ সব মেয়েরা খুব খেয়ালী হয়—তখন ভাবচি, কোন্ হতভাগা লেখক টাকাটি মেরে যা-তা scandalous কিছু লিখে একটা দারুণ দুর্নীতির না সৃষ্টি করে বসে—তাই! অর্থাৎ নিজেকে যদি ঠিক রাখতে পারেন—মন্দ কি! তবে সাবধান! তাঁর বয়স বেশী হলেও—still it would be playing with fire—যে জীবনে উনি বেড়ে উঠেচেন, যে আবহাওয়ায়—once fallen always fallen—এ কথা ভোলা শক্ত। হয়তো ওঁর উপর অবিচার করচি···still···মানে, আপনি বোধ হয় আমার কথা বুঝতে পারচেন!···তাছাড়া উনি কোনো খারাপ পল্লীতে বাস করেন না; চমৎকার বাড়ী তৈরী করেচেন টালিগঞ্জে। সুতরাং যে রকম atmosphere হবার কথা, তা নয়!

এমনি অসংলগ্ন অনেক কথার পর শিবশঙ্কর কহিলেন—কাল আমাকে জানাবেন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও পরামর্শ করুন। তাঁর কোনো আপত্তি আছে কি না, জানুন!··· তবে—এ-কথাও বলি, এর চেয়ে অনেক বেশী risk জীবনে আমি গ্রহণ করেচি! আমিও এক দিন দারিদ্র্য-দুঃখ কম ভোগ করিনি!···

শ্যামল কহিল,—বেশ, কাল আমি আপনাকে এসে জানাবো—আমার স্ত্রী কি বলেন !·········

অনিলাকে এ কথা খুলিয়া বলিলে অনিলা কহিল,—তুমি এ কাজের ভার নাও...যে দুশ্চিন্তায় তোমায় মলিন দেখি, সত্যি—তুমি যে অভাবের হাত থেকে নিস্তার পাবে, এর চেয়ে বড় কামনা আমার আর কিছু নেই !

মৃদু হাস্যে শ্যামল কহিল,—যদি আমি পুষ্পতারার প্রেমে পড়ি ?

অনিলা কহিল,—তা হবে না গো, আমি জানি।

—তবু ! জানো তো সে অভিনেত্রী—প্রণয়লীলার শত অভিনয় সে করেচে !...মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করা ছিল তার জীবনের পেশা !

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনিলা কহিল,—দারিদ্র্য ঘুচবে—তার উপর জেনেশুনেও যদি তুমি তাকে ভালোবাসো, তাহলে সে ভাগ্য !

অনিলার মুখ সহসা মলিন হইল।

শ্যামল হাসিল, হাসিয়া অনিলাকে বক্ষোলগ্ন করিয়া তার মুখ অজস্র চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়া কহিল,—তোমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যদি আর কারো পানে তাকাবার প্রবৃত্তি আমার হয় অনু, তো তার আগে আমার এ দুই চোখ আমি কলমের খোঁচায় বন্ধ করে দেবো !

অনিলা হাসিল, কহিল,—তোমাকে আর নভেল করতে হবে না···!

নগদ পাঁচশো টাকা !

এত টাকা জীবনে কখনো চোখে দেখে নাই। অনিলা কহিল,—ধার-দেনা যা আছে, চুকিয়ে ফ্যালো। কিছু টাকা পোষ্টাপিসে জমা রাখো—দুদিন সুখের পর আবার যখন দুঃখের রাত আসবে···

শ্যামল কহিল,—আমার মাথায় কোনো বুদ্ধি আসচে না। তুমি যা ভালো বোঝো, করো···

শ্যামলের মন দমিয়া গিয়াছিল। পয়সার জন্য এক পতিতা নারীর দাস্য ! দাস্য বৈ কি ! সে খেয়াল-মত বকিয়া যাইবে, নির্দ্দেশ করিবে—আর শ্যামল কেরাণীর মত সে সব কথা লিখিবে ! একজন গণিকা !

তাহাতে কি ! গণিকার কাহিনী লইয়া গল্প যে অনেকে লেখে !

লিখিলেও সে কাল্পনিক কাহিনী ! আর এ···

মানুষ জীবন-চরিত লেখে কাহাদের ? জগতে যাঁরা মহৎ···সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে—তাঁদের কথা ! আর শ্যামল···

পরক্ষণে মনে হইল, যে গরীব, তার এত বাছ-বিচার চলে না।

তা যদি না চলে, চোর, ডাকাত—তারাই বা কি অপরাধ করিয়াছে !

কিন্তু, না ! মিথ্যা ভাবা ! এখন আর ভাবিয়া কি হইবে ?

তারপর চাকরি সুরু করার দিন।

অনিলা কহিল,—একটু ভদ্রবেশে যাও ! নহিলে না দীন-দুঃখী মনে করে !

শ্যামল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—দীন-দুঃখী মনে করবে কি অনু, দীন-দুঃখী বলেই তো জানে।

জানে ! অনিলার দুই চোখে বিস্ময়।

শ্যামল কহিল,—নয় ? নাহলে এ চাকরি কোনো ভদ্রলোক নেয় ?

অনিলা স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল—অবিচল দৃষ্টি। পরে কহিল,—দ্যাখো, এ-কথা আমারো মনে হয়েচে। ভেবেচি, যদি কোনো হতভাগা রাজা কি রাজপুত্র তোমাকে পয়সা দিয়ে গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক লিখিয়ে নিত ? কিম্বা ধরো, পয়সার জন্য তাদের জীবন-চরিতই তুমি লিখতে !—তাতে যদি লজ্জার কিছু না থাকে তো এতেও নেই। তোমার লেখবার ক্ষমতা আছে—সে লেখার জন্য দাম দিচ্ছে। এ তো সত্যি কেরাণীগিরি নয়।

শ্যামল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—লোকের কাছে তোমার স্বামীর এ চাকরির কথা তুমি বলতে পারবে, অনু ? যদি তারা জিজ্ঞাসা করে—তোমার স্বামী কি কাজ করেন ? তুমি বলতে পারবে—একজন পতিতা নারীর কেরাণীগিরি ? তার জীবন-চরিত লিখচে ?

অনিলার মুখ ম্লান, দুই চোখ ছল-ছল ! সে কহিল,—তাহলে টাকা ফেরত দাও। এত যদি বাধে···কাজ কি ?

মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামল কহিল,—তুমি ক্ষেপেচো অনু! বাড়ীর ভাড়া দিতে পারচি না—একটি পয়সা খরচ করতে হলে কত দুশ্চিন্তা জাগে—আমার আবার মান-ইজ্জৎ কি! এক হাজার টাকা দশ বছরেও রোজগার করতে পারবো কখনো?

অনিলা বাঁচিল—তার বুকের উপর হইতে যেন ভারী পাথর সরিয়া গেল।

সে কহিল,—তাহলে আর দো'মনা হয়ো না। যদি লোকে বলে, এ চাকরি করচো কেন? স্পষ্ট বলো, পয়সার জন্য......

টালিগঞ্জে সাজানো গৃহ। ফটকের পর বাগান। তার পর বাড়ী—চমৎকার! যেন ছবি! শ্যামলের বুক কাঁপিল। এ গৃহ কত ভদ্র-সন্তানের দুর্ব্বল মোহে গড়িয়া উঠিয়াছে! এক নারীর নারীত্বের মূল্যে এ গৃহ রচিত!

পুষ্পতারার সঙ্গে দেখা হইল। পুষ্পতারা শ্যামলকে দেখিয়া খুশী হইয়া কহিল,—শিববাবুর কথায় মনে হয়েছিল, বুঝি কোন্ বুড়ো পণ্ডিত ঠিক করে দেছেন! আপনার বয়স খুব কম দেখচি। এই বয়সে এত ভালো লিখতে পারেন!

লজ্জায় শ্যামল মাথা নামাইল। সেও বিস্মিত হইয়াছিল। এই পুষ্পতারা! বহুকাল ধরিয়া কলিকাতার সৌখীন সমাজের যিনি মুকুটমণি...বাঙলার রঙ্গপীঠ যাঁহার কীর্ত্তি-রশ্মিতে সমুজ্জল...! দেখিলে কত মনে হয়? বয়স যেন ত্রিশের কাছাকাছি!

পুষ্পতারা কহিল,—আপনি কি-কি বই লিখেচেন? আমি বাঙলা বই খুব পড়ি।

মাথা না তুলিয়াই শ্যামল কহিল—দু-চারটে ছোট গল্প লিখেচি। মাসিকপত্রে তা ছাপা হয়েছে। সম্প্রতি একখানি উপন্যাস লিখেছি—শিববাবুকে দিয়েচি। যদি তাঁর পছন্দ হয়, ছাপা হবে।

পুষ্পতারা একাগ্র মনোযোগে শুনিতেছিল। ভারী বিনয়ী! ভারী নম্র শান্ত কথাগুলি!

পুষ্পতারা কহিল,—আপনি নাটক লিখেচেন?

মাথা নাড়িয়া সলজ্জ কুণ্ঠিত স্বরে শ্যামল কহিল—না।

পুষ্পতারা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আচ্ছা, আপনারা বেশীর ভাগ লেখকই দেখি, গল্প-উপন্যাস, নয় কবিতা লেখেন! নাটক কেন লেখেন না? যে-সব গল্প-উপন্যাস পড়ি, সেগুলি এত ভালো লাগে—লেখায় বেশ কারিগরি দেখতে পাই। ষ্টেজে যে-সব নাটকে আমি প্লে করেচি, সেগুলো যেন আকাশ-ছেঁড়া—অসম্ভব আজগুবি রকমের লেখা। যেমন ভাষা, তেমনি প্লট—মার্-মার্, কাট্‌কাট্—লেখকদের হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান নেই! আপনারা এত ভালো গল্প লেখেন, আপনারা যদি নাটক লিখতেন, আমরা প্লে করে বর্ত্তে যেতুম!

শ্যামল মুখ তুলিল। মুখ তুলিতে পুষ্পতারার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিল। টানা ডাগর দুটি চোখ—সে চোখে কি সুগভীর আবেশ! অজস্র আবেগ! আঁখির ভাষা বলিয়া যে কথা শুনা যায়, সে ভাষা বুঝি এমনি আঁখিতেই শুধু মেলে!

দৃষ্টি মিলিবামাত্র সে মাথা নামাইল। পরে কহিল,—গল্প-উপন্যাস কোনমতে মাসিকে ছাপা হবার সম্ভাবনা থাকে। নাটক লিখলে তা নিয়ে থিয়েটারের মালিকের দোরে ধর্ণা দেওয়া কি আমাদের কাজ! সেখানে পৌঁছুতে হলে থিয়েটারের গার্ড য়্যাক্টর কত লোকের যে সাধনা করতে হয়...

হাসিয়া পুষ্পতারা কহিল,—বটে! আপনি কখনো সে সাধনা করেচেন?

শ্যামল কহিল—না।

—কি করে তবে জানলেন?

শ্যামল কহিল,—দু'একজনের মুখে শুনেচি।

পুষ্পতারা হাসিল। হাসিয়া সে কহিল—কথাটা মিথ্যা নয়। আমি নিজে দু'একটি ইতিহাস জানি......

তার পর সে বলিল, একটি ছাপোষা কেরাণীবাবুর কাহিনী। বাবুটি একবার একখানি নাটক লেখেন। দেশে সখের দলে অভিনয় করতেন—তাহা হইতেই নাটক লিখিবার সাধ জাগে। নাটক লিখিয়া সে-নাটক প্লে করাইবার জন্য থিয়েটারের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া মালিকদের দেখা পান নাই। অবশেষে এক চা-ওয়ালার সঙ্গে মিশিয়া তাকে খোসামোদ করিয়া বেচারী এক প্রম্পটারের শরণাপন্ন হয়। প্রম্পটারকে ভদ্রলোকটি প্রায় হোটেলে খাওয়াইত—একটি রিষ্ট-ওয়াচ অবধি কিনিয়া দেয়। ঐ প্রম্পটার পুষ্পতারার

হাতে সেই নাটক দিয়া বলে, কোনো মতে বইখানি প্লে করাইয়া দিতে হইবে। বই পড়িয়া পুষ্পতারা দেখে, কিছু নয়! বইখানা এমনি তার কাছে পড়িয়া থাকে। অবশেষে একদিন নাট্যকার বেচারা তার দ্বারে আসিয়া ধর্ণা দেয়। থিয়েটার হইতে ফিরিবার সময় পুষ্প তাকে দ্বারে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সকল সংবাদ জানিতে পারে। বেচারী কাঁদ-কাঁদ হইয়া জানায়—প্রম্পটারটিকে তোয়াজ করিতে তার প্রায় আশী টাকা দেনা হইয়াছে। শুনিয়া পুষ্পতারার মমতা হয়। কিন্তু উপায় ছিল না। নাটকখানায় এতটুকু পদার্থ ছিল না! কাজেই নাটকখানি ফেরত এবং সেই সঙ্গে বেচারাকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়া সে বলে—এ কাজ আর কখনো করিয়ো না!

চাকার।

বেলা দশটায় আহারাদি সারিয়া শ্যামল নিত্য আসে পুষ্পতারার গৃহে। হাসিয়া পুষ্পতারা আসিয়া বলে, বসুন…আমি আসচি।

তাঁর পর স্নানাহার সারিয়া তার আসিতে ঘড়িতে একটা বাজিয়া যায়। নিত্য এমন ঘটে।

শ্যামল অবাক হইয়া যায়, পুষ্পতারার নিত্য নব-সজ্জাশ্রী দেখিয়া। তার পর পুষ্প তার জীবনের কাহিনী সুরু করে।

শ্যামল প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, আপনি যখন প্রথম থিয়েটারে নামেন, খুব ভয় হতো?

পুষ্প কহিল,—ভয় কখনো হয়নি—তবে মজা লাগতো! কত তখন বয়স? চোদ্দ বছর। সখীর দলে নামলুম। ভদ্রঘরে জন্মাবার ভাগ্য করি নি। মা অনেক কষ্ট সহ্য করেছিল—তাই কুপথে যাতে না যাই—সে হীন বৃত্তিকে অবলম্বন না করি—সেদিকে ছিল মায়ের লক্ষ্য! তাই থিয়েটারে দেয়। আমার খুব বুদ্ধি ছিল। একবার কোনো গান শুনলে সেটা শিখে ফেলতুম। একবার নাচের ভঙ্গী দেখিয়ে দিলে তা আর ভুলতুম না। আর ছিল বই পড়বার ঝোঁক! কোনো বই বাদ দিতুম না! সীতা-নির্ব্বাসন প্লে হবে। সীতা সাজবে—মস্ত এ্যাকট্রেশ বীণাপাণি। তার কি খ্যাতি ছিল—ওঃ! যেদিন বই খোলা হবে, সেদিন সকালে সে গঙ্গাস্নান করতে গেল। এ সবে তার ভক্তি ছিল খুব! প্রথম অভিনয়—তাই মা গঙ্গাকে প্রণাম করবে বলে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল। স্নান সেরে উপরে ওঠবার সময় সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে পা ভাঙ্গে! ব্যস! তার সীতা সাজার আশা নির্ম্মূল হলো। থিয়েটারে হৈ-হৈ পড়ে গেল। রাত্রে প্লে—কে সীতা সাজে? ম্যানেজার ভারতবাবু আমাদের সকলকে ডাকিয়ে পরখ করলেন—কে কেমন পড়তে পারে, বলতে পারে। আমার বলার ভঙ্গী শুনে আমাকে বললেন,—পারবি পুষ্প? আমি বললুম,—পারবো। রোজ রিহার্শাল দেখতুম নিবিষ্ট মনে। তখনি আমায় পার্ট শেখানো হলো। পার্ট মুখস্থ করে ফেললুম। রাত্রে নামলুম। বয়স তখন পনেরো বৎসর। প্লে দেখে সকলে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো। মাহিনা হয়ে গেল পরের দিন থেকে পঞ্চাশ টাকা! আমার ভাগ্য ফিরলো…

তন্ময় মুগ্ধ চিত্তে শ্যামল এ কাহিনী শুনিতে লাগিল। বাস্তব-জগতের কাহিনী যেন নয়! এ যেন কোন্ কল্প-লোকের কথা! নাট্যালয়ে যবনিকার অন্তরালে সবটাই রহস্যাচ্ছন্ন। যবনিকা উঠিলে আলো-ছায়ায়, সুরে-কথায় যে বিচিত্র জীবন বিচ্ছুরিত হইয়া মনকে নিমেষে বিভোর উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে, বাস্তব জীবনের অভাব-দুঃখ রোগ-শোক দারিদ্র্যের যাতনা ভুলাইয়া অপরূপ মাধুরী জাগাইয়া দেয়… সেই নাট্যপীঠের ওদিককার কাহিনী জানিবার জন্য কি আগ্রহ যে মনে জাগিত!…

সীতা সাজিয়া নারীর মর্ম্মবেদনার এমন নিখুঁত পরিচয় ঐ যে নারী দিতেছে—কি করিয়া অমন করে? ও বেচারাও কি অমনি দুঃখ জীবনে ভোগ করিয়াছে? নহিলে কি করিয়া সীতার বেদনা এমন ভাবে জাগাইয়া তোলে? নাট্যালয়ের অন্তরালে কি ভাবে ও দিন কাটায়? কি ওর চিন্তা? কি সুখ—কি দুঃখ? কৌতূহলে মন আচ্ছন্ন হইয়া আছে চিরকাল…

কাহাকে প্রশ্ন করিয়া এ কৌতূহল মিটাইবে? উহাদের কাছে প্রশ্ন তোলা সম্ভব নয়। সমাজের যে-দিক হইতে আসিয়া উহারা মঞ্চে চড়িয়া দাঁড়াইয়াছে, ওদিকটায় মস্ত প্রাচীরের ব্যবধান! ওদিককার কথা মনে করিতে দেহ-মন শিহরিয়া ওঠে! তবু মনের শাশ্বত আগ্রহে কতবার ভাবিয়াছে, উহারাও মানুষ—মানুষ! হিংস্র বাঘ নয়, ভালুক নয় যে, উহাদের এমন ভয় করিতে হইবে!

পুষ্পতারা নিত্য নব-নব কাহিনী বলিয়া চলে যায়, শ্যামল শোনে তন্ময় মুগ্ধ চিত্তে! সে কোন্ রহস্যলোকের অজানা কথা—অজানা সুর···

একদিন পুষ্পতারা কহিল—আপনি তো কৈ লিখচেন না এ-সব!

শ্যামল কহিল—এখানে লিখি না। বাড়ীতে লিখি। আপনার কথা শুনে শুনে মনে একটা আদরা গড়ে তুলি—তার পর চিন্তা করি, কোথা থেকে কাহিনী সুরু কর্‌বো—তার পর লিখি।

পুষ্পতারা কহিল—যখন বই পড়ি, তখন তার কত চরিত্রে যে নিজেকে কল্পনা করি—করে হাসি কাঁদি। এই তো আমাদের জীবন! উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ···

পুষ্পতারা নিশ্বাস ফেলিল। শ্যামল কহিল—জীবনে কোনো···

কথাটা বাধিল। মনে হইল, পুষ্প নারী···পতিতা নারী! তার জীবনে যে-সব লোক আসিয়া দেখা দিয়াছে, সমাজ তাদের সে আসার সমর্থন করে না! তারাও সে আসা গোপন করিতে চায়—প্রকাশ করিতে মাথা কাটা যায়!···

শ্যামলের ছোট কথাটুকু পুষ্পর কাণে গিয়াছিল। সে হাসিল, হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—কোনো···কি? বললেন না তো!

শ্যামল লজ্জিত হইল। পরে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোনো-মতে কহিল,—মানে, কোনো বন্ধু-বান্ধব···?

পুষ্প নিশ্বাস ফেলিল, কহিল—বন্ধু নয়—বন্ধু-বেশে··· হাঁ, তা এসেচে বৈ কি—কত লোক! সমাজে মস্ত প্রতিপত্তি, সাহিত্যে অচল নিষ্ঠা—ধর্ম্মে প্রচণ্ড ভক্তি—অনেক লোক এসেচে! মুখে হাসি নিয়ে, বুকে প্রীতির তুফান তুলে! তারা কি বন্ধু? তারা শীকারী! সমাজ আমাদের মানে না—একপাশে সরিয়ে রেখেছে···তবু এ-সব বড় বড় মান-ইজ্জৎ-ওয়ালা লোক গোপনে এসে আমাদের পায়ে মাথা লুটিয়ে দেছে! আমাদের মনের পানে তাকায় নি—নিজেদের মনের ইতর বাসনা-তৃপ্তির জন্য এসেচে! কত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যে এসেচে অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতার দেহ-লুণ্ঠনে!··· নিজেদের ভাবতো বড় চতুর! কিন্তু আমরা সমাজের এধারে মস্ত আক্রোশে শীকারীর মত দুর্ব্বার লোভে তাকিয়ে থাক্‌তুম! কাজেই এ দেহ-পশরা ধরে দিয়ে তা পূর্ণ করেচি তাদের ধনে, মণি-মুক্তায়! দুদিক থেকে চলেছে শুধু লুণ্ঠনের কারবার···কিন্তু না, এ সব কথা আজ থাক! কাল বলবো। অনেকের কথা মনে পড়চে···রাজা, জমিদার, দেশনেতা, কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সমাজ-পতি···জীবনে যেন প্রকাণ্ড মেলা বসেছিল।···আজ শ্রান্ত, বড় শ্রান্ত হয়েচি এ বিকি-কিনিতে!

পুষ্প নিশ্বাস ফেলিল।

শ্যামল তার পানে চাহিয়াছিল। সে লক্ষ্য করিল, এই কৌতুকময়ী বিলাস-লালিতা নারী···তার দুই চোখের পিছনে যেন বাষ্পের আভাস!···শ্যামল কোনো কথা কহিল না।

ঘড়িতে তিনটা বাজিল।

পুষ্প সচকিত হইল। ডাকিল—শ্যামলবাবু···

শ্যামল তার পানে চাহিল। পুষ্প কহিল—আমার একটি অনুরোধ আছে।

—বলুন···

শ্যামলের কথা বাধিল···আর কিছু বলিতে পারিল না। সে মুখ নামাইল।

পুষ্প কহিল—আসেন তো সেই বেলা সাড়ে দশটায়—থাকেন পাঁচটা পর্য্যন্ত। কিছু মুখে দেন না! এতে শরীর থাকবে কেন? আজ কিছু মুখে দিতে হবে—চা আর সামান্য জলযোগ···

শ্যামল কথা কহিল না।

পুষ্প কহিল—আমি ঘৃণ্য আবর্জ্জনা, জানি। চা চাকরে করে দেবে। এমন তো অনেকের বাড়ীতে দেয়। আর মিষ্টি দোকানের। আপনার কোনো পাপ হবে না।

পাপ! ছি ছি! শ্যামল কহিল,—ও কথা বলবেন না। আপনার যে পরিচয় পাচ্ছি, তাতে আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে আপনার উপর!

—শ্রদ্ধা! পুষ্পতারার স্বরে বিস্ময়।

শ্যামল কহিল,—শ্রদ্ধাই!

পুষ্প অনিমেষ নেত্রে শ্যামলের পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল; পরে কহিল—কথা বলবার সময় ওজন করে বলবেন। আপনি লেখক মানুষ···

পুষ্প মৃদু হাসিল। শ্যামল দেখিল, সে হাসির পিছনে অশ্রুর উচ্ছ্বাস!

পরের দিন পুষ্প সুরু করিল তার জীবনে রোমান্সের কাহিনী! সে সীতা সাজিতেছে…বাড়ীতে কত চিঠি যে আসিতে লাগিল! থিয়েটারেও! শেষে একদিন থিয়েটারের সাজ-ঘরে আসিয়া দেখা দিল সাজোয়ার তরুণ জমিদার অনঙ্গলাল চৌধুরী…

তার পর কি ভিড়! রাজা-জমিদারেরা দল বাঁধিয়া একে একে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, জানাইল, এত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তাদের মত দুঃখী পৃথিবীতে আর নাই! সে দুঃখ ঘোচে—শুধু যদি পুষ্পতারা একবার সদয় নেত্রে বেচারাদের পানে চাহিয়া দেখে…

পুষ্প জানিত,—এ সব লোকের ভালোবাসার কি অর্থ—তার গভীরতা কতখানি! এরা মানুষ? না। জানোয়ার! ইতর পশু! যে-পশুকে যে অস্ত্রে বিঁধিয়া বন্দী করা যায়—পুষ্প তাহাতে তাই কোনো কার্পণ্য রাখে নাই।

কিন্তু শ্রান্ত, বড় শ্রান্ত সে আজ! এ নিষ্ঠুর খেলা যত আক্রোশে খেলিয়াছে, মনকে ততই ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে—ততই শুধু বিষ মন্থন করিয়া তুলিয়াছে!

শেষে এ শ্রান্তি ঘুচাইতে সব ছাঁটিয়া আজ আসিয়াছে সে বিশ্রাম করিতে! অতীতের পানে মন তবু ফিরিয়া তাকায়! না হয় এ ঘরে জন্মিয়াছিল, তবু যে-মনটাকে বিধাতা তার বুকে পুরিয়া দিয়াছিলেন, সে-মনকে তুচ্ছ খেলার মোহে, আক্রোশে কালি মাখাইতে গেল সে কিসের লোভে!

পুষ্পতারার দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল…নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—আজ আপনি লেখা শোনাবেন, বলেছিলেন!

শ্যামল কহিল,—একখানা খাতা লিখে ফেলেচি—এনেচি। পড়ুন।

পুষ্পতারা কহিল,—আপনি পড়ুন, আমি বসে বসে শুনবো।

শ্যামল পড়িতে লাগিল—পুষ্পতারার জীবনের কাহিনী। তার দরদ-ভরা মনের রঙে সে-কাহিনী এমন রঙীন হইয়া উঠিয়াছে! তার লেখার গুণে…

পুষ্পতারা তন্ময় মুগ্ধ চিত্তে সে কাহিনী শুনিতে লাগিল। হাসি-কৌতুকে সে দিন কাটাইয়াছে চিরকাল—দেহ-মন তুচ্ছ করিয়া নিতান্ত লঘু রঙ্গ-ভরে! সে হাসি-কৌতুকে এ যাদুকর কোথা হইতে এমন অশ্রুর রেখা টানিয়া দিল! এ যে শুনিতে শুনিতে বুকের শুষ্ক মরু ভাসাইয়া ডুবাইয়া অশ্রুর পাথার বহিয়া চলিয়াছে!…

কাহিনী পড়া শেষ হইল। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে।…

পুষ্প কহিল,—চমৎকার হয়েচে! কিন্তু এ আমার কাহিনী?

শ্যামল কোনো কথা বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

পুষ্প কহিল,—সত্যি, নিজেকে যে আমি চিনতে পারচি না!

শ্যামল কহিল,—আপনার কথাই লিখেচি। ভাগ্যহীন ঘরে জন্ম—নিরুপায় হয়ে লোকের মনোরঞ্জনের জন্য মুখে হাসি ফুটিয়েচেন—আজীবন…প্রাণের সব ব্যথা, সব নৈরাশ্য চেপে পিষে…

পুষ্প কহিল,—আপনি ঠিক ধরেচেন, আমার মনটাকে কখনো আমি চিন্‌তে পারিনি! নিজেকে কখনো বোঝবার চেষ্টা করিনি! যখনি নিজের কথা ভাবতে বসতুম, এমন নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হতো—এত ব্যথা মনে জাগতো! অসহ্য সে ব্যথা! তখনি নেচে-গেয়ে আপনাকে ভোলবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেচি!…

পুষ্প চুপ করিল।

শ্যামল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নিজের লেখার কথা সে ভাবিতেছিল।

পুষ্প ডাকিল,—শ্যামলবাবু…

শ্যামল কহিল,—কেন?

পুষ্প কহিল,—এখানে রোজ নিজের কথা শুধু কই। আপনার কথা কখনো জিজ্ঞাসা করিনি! আপনার মা আছেন?

শ্যামল কহিল,—না।

—কে আছেন?

—শুধু স্ত্রী। আর কেউ নেই।

—স্ত্রী! পুষ্পর চোখের সামনে হইতে আলোর রেখা নিবিয়া গেল।…মুখে কথা ফুটিল না।

বাহিরে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল।

শ্যামল কহিল,—আজ আসি। কাল আর-একখানা খাতা আনতে পারবো—এনে প'ড়ে শোনাবো।

পুষ্প কহিল,—দাঁড়ান…

শ্যামল দাঁড়াইল—হতভম্বের মত। পুষ্প কহিল,—আপনার ঠিকানা বলুন তো!

শ্যামল ঠিকানা বলিল। পুষ্প কহিল—আসুন তাহলে… রাত হয়ে যাচ্ছে।

৫

রাত্রি প্রায় আটটা। শ্যামল খাতা পাড়িয়া পুষ্পর কাহিনী লিখিতেছিল, অনিলা খাবার আনিয়া কহিল,—খেয়ে নাও গো—নাহলে জুড়িয়ে যাবে। কখন্ সেই খেয়ে বেরিয়েচো!

শ্যামল কহিল,—আগে শোনো অনু—যেটুকু লিখেচি…

অনিলা কহিল,—খাবার জুড়িয়ে যাবে।

শ্যামল কহিল,—একটু জুড়োলে কোনো ক্ষতি হবে না। তোমাকে না শোনালে তৃপ্তি পাচ্ছি না।

অনিলা কহিল,—পড়ো।

শ্যামল পড়িতে লাগিল। অনিলা বসিয়া শুনিতেছিল—সহসা দ্বারে মানুষের পায়ের ধ্বনি!

অনিলা চাহিয়া দেখে, এক নারী! সে কহিল,—কে আপনি?

শ্যামলও চাহিয়া দেখিল। তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সামনে দাঁড়াইয়া পুষ্পতারা!

সে কহিল,—আপনি!

পুষ্প অনিলার পানে চাহিল, কহিল,—আপনি শ্যামল বাবুর স্ত্রী!

অনিলা প্রণাম করিতে যাইতেছিল, পুষ্প সরিয়া গেল। তাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিল,—ছি ছি! আমি ছোট জাত—আমাকে প্রণাম করতে নেই। আমিই এসেচি তোমার পায়ের ধুলো নিতে!

শ্যামল কহিল,—কি বলচেন আপনি!

পুষ্প কহিল,—আমায় ক্ষমা করবেন। এ মুখখানি…

স্বহস্তে সে অনিলার চিবুক তুলিয়া ধরিল, ধরিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী কেমন, জানি না। তবে মনে হয়, এঁর চেয়ে সুন্দরী নন্!

অনিলার মুখে কথা নাই! বিস্ময়ে সে বিহ্বল…

শ্যামল বুঝিল, বুঝিয়া কহিল,—ইনি শ্রীমতী পুষ্পতারা…

হাসিয়া পুষ্প কহিল,—দাসানুদাসী…

বিস্ময়ে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় অনিলার দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। সে কহিল,—আপনি…আপনি দেবী…

—দেবী নই। দেবী-দর্শনে এসেচি। দেখা হলো। এবারে বাড়ী ফিরি।…

পরের দিন যাহা ঘটিল—উপন্যাসেও এমন ঘটে না। সকালে পুষ্পর দরোয়ান আসিয়া একখানা চিঠি দিল। চিঠি খুলিয়া শ্যামল পড়িয়া দেখে, লেখা আছে…

লেখার সখ আর নাই, শ্যামল বাবু। দেবীর পায়ে কিছু প্রণামী দিয়া কয়েকদিনের জন্য একবার বাহিরে যাইতেছি। নিরুদ্দেশ হইব না—ফিরিয়া আসিব।

আমার গুরুদক্ষিণার বাকী মূল্য পাঁচশো টাকা দরোয়ানের হাতে পাঠাইলাম। লইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ফেরৎ দিলে মর্ম্মান্তিক বাজিবে। যাইবার পূর্ব্বে একবার দেবী-দর্শনে যাইব—দেবী যেন দর্শনে বঞ্চিত না করেন।

ভালোবাসা কি—এত দিনে বুঝিয়াছি। কিন্তু কত বড় দুর্ভাগিনী আমি—তাহা বুঝাইবার সাধ্য নাই! এবং তাহা উচিত হইবে না।

পুষ্পতারা দাসী।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিমানে মেরু-প্রদক্ষিণ

মিঃ চার্লস এ লিণ্ডবার্গ ও তাঁহার পত্নী অ্যানি মরো। লিণ্ডবার্গ বিগত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আটলাণ্টিক সমুদ্র পার হইয়া বিমানযোগে গ্রীণল্যাণ্ড, আইস্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা, এই বিমান-ভ্রমণ সখের নহে। আকাশপথে বিমান-পরিচালন বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এজন্য কোথায় কোথায় বিমানপোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন, আকাশের কোন্ পথে নির্ব্বিঘ্নে বিমানগুলি যাতায়াত করিতে পারে—আমেরিকা ও য়ুরোপের মধ্যে বিমানগুলি সহজে ও নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থান সমূহে কিরূপে যাতায়াত করিয়া সাফল্যলাভ করিতে পারে, লিণ্ডবার্গ-দম্পতি তাহাই স্থির করিবার জন্য এই বিঘ্নসঙ্কুল বিমানযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই বিমান-ভ্রমণ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তাই আমরা মাসিক বসুমতীর পাঠকবর্গের জন্য উহা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

তাঁহাদের ব্যবহৃত বিমানের সহিত তাঁহারা রবারনির্ম্মিত ভাঁজ করা একখানি নৌকা সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই রবারের নৌকাখানি জলনিবারক আচ্ছাদনের দ্বারা আবৃত; একটি পালও তাহাতে ছিল। যদি বাধ্য হইয়া কখনও বিমানকে জলের উপর নামিতে হয়, সেই জন্য তাঁহারা এইরূপ নৌকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই নৌকায় এক প্রস্থ রেডিও যন্ত্র ছিল। ৮ গ্যালন জল, কয়েক সপ্তাহের উপযোগী খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং নানাপ্রকার অবশ্য-প্রয়োজনীয় যন্ত্র নৌকায় সংগৃহীত ছিল। বিমান ছাড়িয়া যদি প্রয়োজন ঘটে, এক মাসকাল তাঁহারা নৌকায় যাপন করিতে পারিবেন, এমনই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রীন্‌ল্যাণ্ডএর তুষারস্তূপের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী স্লেডগাড়ী এবং নিদারুণ শীতের উপযোগী বস্ত্র এবং দেড় মাসের খাদ্যও বিমানে তাঁহারা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

লিণ্ডবার্গ-দম্পতি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই নিউ-ইয়র্কের "ফ্লাশিং বে" হইতে বিমানযোগে যাত্রা করেন। আকাশে তখন অন্য বিমানও উড্ডীন হইতেছিল। তাঁহারা সাবধানে তাহাদিগকে এক পাশে রাখিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ নর্থ হ্যাভেন্, মেইন,
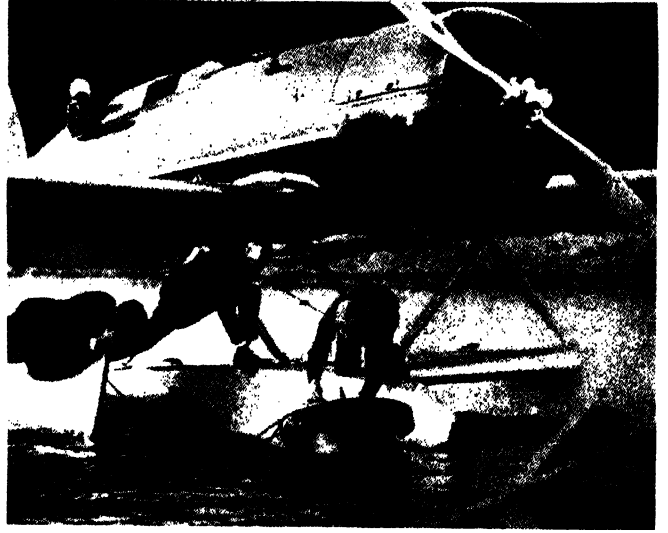
লিণ্ডবার্গ-দম্পতির বিমান

মিসেস লিণ্ডবার্গ

অভিমুখে চলিয়াছিলেন। নিউহ্যাভেন্, হার্টফোর্ড অতিক্রম করিয়া বিমান লোয়েলএ পৌঁছিল। তখন কুজ্ঝটিকা ছিল। পোর্টল্যাণ্ডে পৌঁছিয়া তাঁহারা আকাশ পরিষ্কার দেখিলেন। সন্ধ্যা ৬টা ৩৮ মিনিটে সাউথপণ্ডএ বিমান হইতে অবতরণ করিলেন। তথায় সমাদরে সকলে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

পরদিবস সাউথপণ্ড হইতে নর্থ হ্যাভেনএ তাঁহাদের বিমান গমন করিল। ১১ই জুলাই তারিখে দুই ঘণ্টার জন্য হ্যালিথ্যাক্স্, নোভাস্কোসিয়া তাঁহারা ঘুরিয়া আসিলেন। রয়াল ক্যানাডিয়াস বিমান' সেনাদলের সাহায্যে বিমানে তৈল ভরিয়া পরদিবস তাঁহারা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সেণ্টজন অভিমুখে পোতচালনা করিলেন। পাঁচ ঘণ্টাকাল মনোরম তীরভূমির উপর দিয়া বিমান চালনার পর সেণ্টজন বন্দরে তাঁহারা অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা সংকল্প করিয়াছিলেন যে, পরদিবস তাঁহারা লাব্রাডর কার্টরাইটএ পৌঁছিবেন। সেখানে ইটালীর বিমানবিহারীরা আইসল্যাণ্ড হইয়া ফিরিয়া আসিবার কথা। কিন্তু ভীষণ কুজ্ঝটিকা বশতঃ তাঁহারা সে দিন যাইতে পারিলেন না।

বিমানের ছাদে মিঃ লিণ্ডবার্গ

গ্রীনল্যাণ্ডের বিখ্যাত বাতায়ন

পরদিবস কার্টরাইটএ পৌঁছিয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে, বুঝি পৃথিবীর প্রান্ত-সীমায় আসিয়া তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন। স্থানের বহির্দৃশ্য অত্যন্ত অতৃপ্তিকর। পাহাড়গুলি খর্ব্বকায়, দেবদারু গাছগুলি শীর্ণ ও খর্ব্ব, তটভূমি শৈল-সমাকীর্ণ, জলের বর্ণ ধূসর। মোটের উপর স্থানটি দেখিলেই মন অপ্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। সহরটিও তেমন প্রিয়দর্শন নহে। এখানে সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চুণকাম করা অট্টালিকাশ্রেণী। একটি গির্জ্জা আছে। পাহাড়ের উপর সমাধিক্ষেত্র। সেইখানে জর্জ্জ কার্টরাইটের সমাধি-সৌধ বিদ্যমান। তিনিই এই সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার এখানে তাঁহারই প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হইয়াছিল। উপসাগরের অপর পারে গ্রেনফেল মিশনের অট্টালিকা।

লিণ্ডবার্গ-দম্পতি এই সহরে এক সপ্তাহ-কাল বাস করিয়া "নর্থওয়েষ্ট" নদের দিকে বিমানযোগে গমন করিতেছিলেন। আকাশে বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা ছিল। সে জন্য তাঁহারা বাধ্য হইয়া তথায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানে একটিমাত্র হোটেল ছিল। এই-খানেই তাঁহারা প্রধানতঃ থাকিতেন। সেখান হইতে প্রত্যহ পদব্রজে ডকে গিয়া বিমান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেন। "হডসন্ বে" নামক একটি প্রকাণ্ড দোকানে সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়।

জলের মধ্যে বিমান—ফক্‌স্‌দ্বীপ

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কুকুরবাহিত গাড়ী

হেত্রনের এস্কিমো
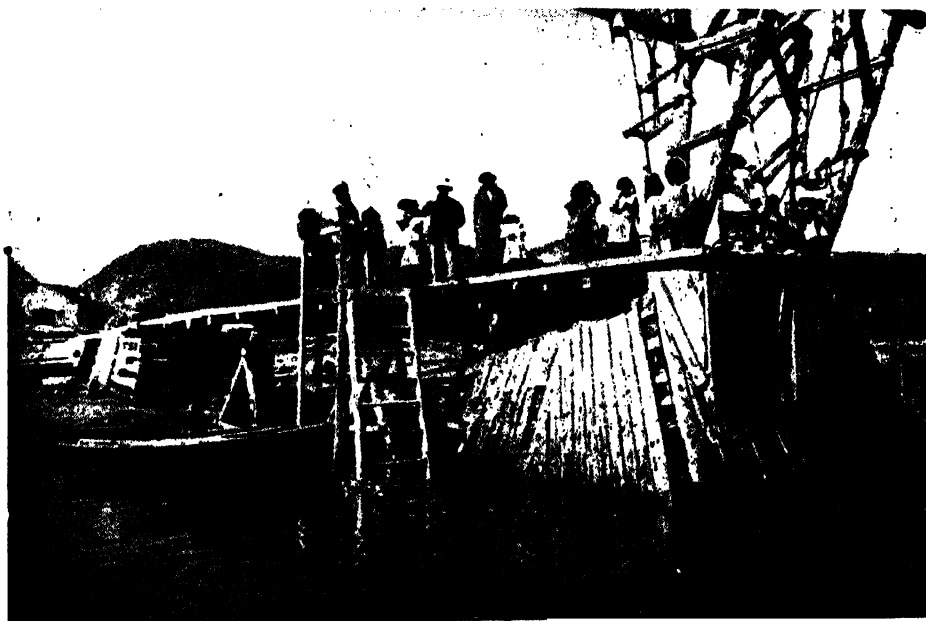
হেত্রনের বন্দর

কার্টরাইটের হোটেল

টিনভরা খাদ্য, পরিচ্ছদ, কম্বল, বুটজুতা, চামড়া, সীলচর্ম্ম, আসল বন্দুক, খেলার বন্দুক প্রভৃতি সবই এখানে বিক্রয়ার্থ পাওয়া যায়। এখানে ডাকঘর ও রেডিও আপিস আছে।

২১শে জুলাই আকাশ পরিষ্কার হইলে, তাঁহারা কার্ট-রাইট পরিত্যাগ করিয়া গ্রীনল্যাণ্ডের ফ্রেডারিকস্‌হাভ অভিমুখে বিমান চালনা করিলেন। কিন্তু ৪০ মাইল অতি-ক্রম করিবার পর তাঁহারা দেখিলেন, কুজ্ঝটিকার প্রাচীর তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। তখন তাঁহারা বিমানের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া উত্তরদিকে হোপডেল অভিমুখে পোত চালনা করিলেন। পাহাড়পূর্ণ দ্বীপের গোলকধাঁধায় তাঁহারা এই ক্ষুদ্র উপনিবেশ আবিষ্কার করা সহজসাধ্য বলিয়া মনে করিলেন না।

ছোট ছোট দেবদারু গাছ ব্যতীত অন্য বৃক্ষ তথায় নাই। ছোট ছোট রক্তবর্ণ ছাদবিশিষ্ট বাড়ীগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটি বাড়ী মোরাভিয়ান্ মিশনের। মিশনারীরা লিণ্ডবার্গ-দম্পতিকে সমাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন।
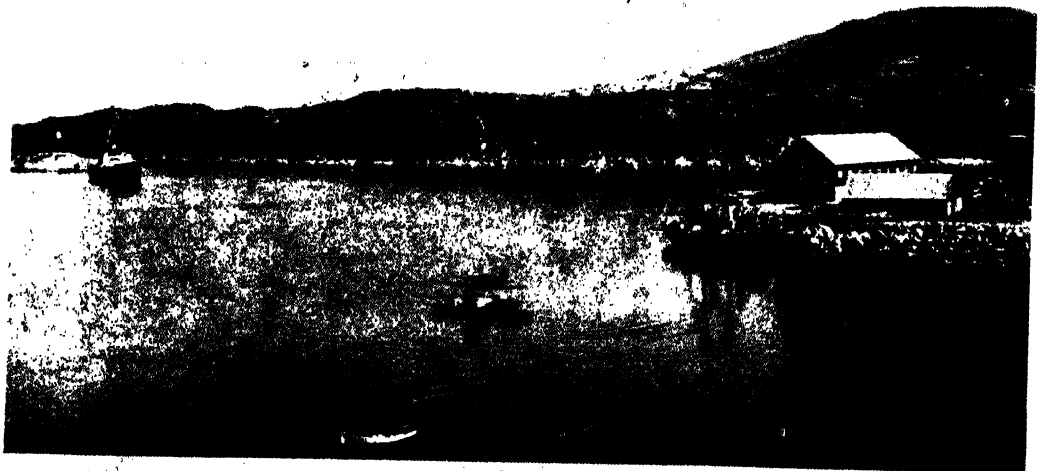
স্কুলের উপর দিয়া বিমান চলিয়াছে—গডথ্যাব

সেট্‌ল্যাণ্ডের লারউইক্‌ সহর

পথে তাঁহারা এক দল এস্কিমোর দেখা পাইলেন। তাহাদের সঙ্গে কুকুরের দল। তাহারা ঘেউ ঘেউ রবে ডাকিয়া কর্ণপীড়া উৎপাদন করিতেছিল। মিশনারীদের দুইটি কন্যা মিসেস্ লিণ্ডবার্গকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন। মিঃ লিণ্ডবার্গ তখন বিমানে তৈল প্রভৃতি ভরিয়া লইতেছিলেন। মিশনারী-কন্যাদের নিকট মিসেস্ লিণ্ডবার্গ অবগত হইলেন, এখানে জাহাজ কদাচিৎ আসিয়া থাকে। হোপডেলএ এস্কিমোরা ব্যতীত দুইটি য়ুরোপীয় পরিবার মাত্র এখানে বাস করেন। চিকিৎসকের বালাই সেখানে নাই। মিশনারী-দম্পতিই চিকিৎসকের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে এক জন দন্ত-চিকিৎসক এখানে আসেন।

সভ্য সমাজ হইতে বর্জ্জিত থাকিয়াও মিশনারী পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই এখানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাজা ডিম, সুস্থ সবল কুক্কুট, তাজা শাকসব্জীর অভাব ইঁহাদের ছিল না।

সেখান হইতে লিণ্ডবার্গ-দম্পতি হেব্রনে গমন করেন। এখানকার বাড়ী-ঘরের অবস্থা হোপডেল্‌এর মত। তবে

গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা গির্জ্জায় চলিয়াছে

বৃক্ষপল্লবের সংখ্যা এখানে আরও অল্প। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত। এখানেও এস্কিমোরা তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিল। মিশনারী-বাড়ীতে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৎসরে এখানে একবার জাহাজ আসে। তাহাতে খাদ্যদ্রব্যাদি, পরিধেয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ থাকে। লিণ্ডবার্গ-দম্পতি জানিতে পারিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ না আসায় মিশনারীদিগের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। ময়দা, চিনি, তরকারী সবই ফুরাইয়া গিয়াছে। লিণ্ডবার্গ-দম্পতি বলিলেন যে, এক শত মাইল দূরে তাঁহারা জাহাজ দেখিয়া আসিয়াছেন।

সেখান হইতে যাত্রা করিয়া তিন ঘণ্টা পরে তাঁহারা গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-শ্রেণী দেখিতে পাইলেন। সমুদ্র তখন নীল, আকাশ মেঘশূন্য—নির্ম্মল। বিমান আকাশ-পথে অনেক ঊর্দ্ধ দিয়া চলিতেছিল। নিম্নভাগে ভাসমান তুষারশৈল-সমূহ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতগুলি যেন প্রাচীর রচনা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাঝে মাঝে তুষার নদীগুলি দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইতে-ছিল, যেন তুষার-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, পাহাড়ের সানুদেশে যে ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা যেন শত শত দীপমালায় পূর্ণ। কোথাও বৃক্ষ বা তৃণের নামমাত্র নাই। গডথ্যাব্ নামক বন্দরটি একটি উপত্যকা-ভূমির একাংশে বিদ্যমান। ইহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রাকার। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সহরের মধ্য হইতে কামানের শব্দ তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য হইয়াছিল।

সহর দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল, যেন পুতুলখেলার উপযোগী গ্রামমাত্র। বন্দরের ডক জনসমাগমে পূর্ণ হইয়াছিল। নৌকা-যোগে তাঁহারা বন্দরে আসিয়াছিলেন। নৌকার উপর হইতে তাঁহারা গ্রীনল্যাণ্ডের

লিণ্ডবার্গ-দম্পতিকে দর্শনার্থ সমাগত হোল্‌ষ্টেনবর্গের বালক-বালিকা

হোলষ্টেনবর্গ—নৌকায় মিসেস্ লিণ্ডবার্গ

এল্লাদ্বীপে ডাঃ কচের শিবির

ক্লেভারিং দ্বীপ—মিঃ লিণ্ডবার্গ, ডাঃ কচ ও দিনেমার কর্ত্তৃপক্ষ

টিংমিসারটক্ বিমান আংমাসালিক ত্যাগ করিতেছে

গ্রীনল্যাণ্ডের সমুদ্রে ভাসমান তুষার-শৈলসমূহ

নারীদিগকে দেখিতে পাইলেন। সকলেরই অঙ্গে যেন উৎসবের পরিচ্ছদ।

ডকে নামিলে জনতা তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া শাসকের গৃহাভিমুখে তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল। গভর্ণর ও তাঁহার অনুচরগণ সকলেই সমাদরে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। স্থানটি দিনেমারদিগের উপনিবেশ। দিনেমার সরকারের সেনাপতি ড্যানের সহিত এখানে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ইনি লিণ্ডবার্গ-দম্পতির সহিত জেলিংএ চড়িয়া গমন করিবেন ব্যবস্থা ছিল।

জেলিং তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। পরদিবস তাঁহারা সহর পরিদর্শন করিলেন। হেব্রন অপেক্ষা ইহা অনেক বড় এবং উন্নতিশীল। বাড়ীগুলি সুনির্ম্মিত। কোন কোন বাড়ীর সম্মুখে উদ্যানও তাঁহারা দেখিলেন। এখানে একটা বড় গুদামঘর—তাহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায়। একটি গির্জ্জা, হাঁসপাতাল এবং বেশ বড় বিদ্যালয় আছে। এখানকার অধিবাসীদিগকে গ্রীন্ল্যাণ্ডার বলে, এস্কিমো বলে না। তাহারা সুস্থ, সবল এবং প্রফুল্ল। লিণ্ডবার্গ-দম্পতি এখানকার খাঁটি এস্কিমো কুটীর-সমূহ দর্শন করিলেন। মাটীর চাপড়া ও প্রস্তরের ইট দিয়া সেগুলি নির্ম্মিত।

তৃণশ্যামল উপত্যকা-ভূমিতে লিণ্ডবার্গ-দম্পতি তরুণ গ্রীনল্যাণ্ডারদিগকে ফুটবল ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। শিল মৎস্যের চর্ম্ম-নির্ম্মিত বুট পরিয়া তাহারা খেলিতেছিল। সেদিন রবিবার, কাযকর্ম্ম সব বন্ধ। অপরাহ্নকালে গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নারীদের বেশভূষাও পরিচ্ছন্ন, তাহাদের কণ্ঠে বহুবর্ণ-বিশিষ্ট মালা দুলিতেছিল। পাঁচটা বাজিতেই সকলে গির্জ্জায় প্রবেশ করিল। লিণ্ডবার্গ-দম্পতি

মিসেস্ লিণ্ডবার্গ পার্ব্বত্য-ঝর্ণার সন্ধানে চলিয়াছেন—হোলষ্টেনবর্গ

গ্রীনল্যাণ্ডে এস্কিমোদিগের ব্যবহৃত বুটজুতা

লিণ্ডবার্গ-দম্পতির দর্শনার্থী বালক-বালিকার দল

টেভেরা নদীর দৃশ্য

গ্রীনল্যাণ্ডারদিগের নৃত্য দর্শন করিলেন। দুই জন বৃদ্ধ সারঙ্গী লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। যুবক ও যুবতীরা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তার পর নৃত্য আরম্ভ হইল। অবশেষে একটি যুবতী দল ছাড়িয়া বাহির হইল। সে ছুটিতে লাগিল। তাহার পশ্চাতে এক জন যুবক ধাবিত হইল। যুবতীর কেশরাজি মুক্ত হইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ নৃত্য থামিয়া গেল। যুবক-যুবতীরা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া তার পর স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিল। এখানে নারীরা সকাল সকাল শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, প্রত্যুষ হইতেই তাহাদের সংসারের কায আরম্ভ হয়। লিণ্ডবার্গ-দম্পতি "জেলিং"এ আরোহণ করিলেন। সম্মিলিত নরনারীরা উচ্চধ্বনিসহকারে তাঁহাদিগকে বিদায় দিল। "জেলিং" হোল্‌ষ্টেনসবর্গ অভিমুখে যাত্রা করিল।

সমুদ্রে তখন গাঢ় কুজ্ঝটিকা ছিল। উত্তরাভিমুখে বিমান উড়িয়া চলিল। হোলষ্টেনস্‌বর্গ বন্দরের উত্তরদিকে পর্ব্বতমালা। ঢালু জমীর উপর সহর অবস্থিত। বাড়ীগুলি সমুজ্জ্বল বর্ণের। এখানে লিণ্ডবার্গ-দম্পতি ৭ দিন অবস্থান করেন। স্কুল, গির্জ্জা, মন্ত্রীর গৃহ, গভর্ণরের বাসভবন প্রভৃতি সুন্দর। মিঃ এ, এ, সি, রাসমুসেন এখানকার শাসক। তিনি লিণ্ডবার্গ-দম্পতিকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থিত করেন।

মিঃ রাসমুসেনের বাতায়ন এখানে দর্শনীয় বস্তু। সমগ্র গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যে এমন সুন্দর বাতায়ন আর নাই। ৪ঠা আগষ্ট দম্পতি রাসমুসেন বাতায়নের নিম্ন দিয়া হোল্‌ষ্টেনস্‌বর্গ ত্যাগ করিবার জন্য বিমানে আরোহণ করেন। বিপুল জনতা তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য সমবেত হয়।

তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গের বহু উর্দ্ধ দিয়া তাঁহাদের বিমান উড়িয়া যাইতে লাগিল। এল্লা দ্বীপের অভিমুখে তাঁহাদের যাইবার কথা ছিল। সেখানে দিনেমারদিগের একখানি বিমান অবস্থান করিতেছিল ডাঃ কচ্‌ নামক দিনেমার আবিষ্কারক এখানে তাঁহার শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন।

লিণ্ডবার্গ-দম্পতি এল্লা দ্বীপে অবতরণ করিলেন। ডাঃ কচের দ্বিতীয় শিবির ক্লেভারিং দ্বীপে। সেখানে মনুষ্যবাসচিহ্ন নাই বলিলেও চলে। খালি তুষারশীর্ষ পর্ব্বত, খাদ ও তুষার-নদী। এখানে কস্তূরীবৃষ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। উহারা দেখিতে মহিষের মত প্রকাণ্ড-কায়। এই জাতীয় পশু ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে।

আংমাসালিকের এস্‌কিমো

তুষারযুগেই ইহাদের প্রাধান্য ছিল। ৬ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা ক্লেভারিং দ্বীপ ত্যাগ করিয়া শূন্যপথে বিমান পরিচালনা করিলেন। এক দিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা, অপর দিকে তুষার-নদী-সমূহ।

আঙ্গমাগ্‌সালিক বন্দরে অবশেষে তাঁহারা আসিলেন। এখানে ভাসমান তুষার-শৈলসমূহের সংখ্যা অসংখ্য। "জেলিং" এখানে আসিতে গেলে নিশ্চয়ই তুষার-শৈলসমূহে প্রতিহত হইবার আশঙ্কা। গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্তে আঙ্গমাগ্‌সালিকই একমাত্র মনুষ্য-অধ্যুষিত স্থান। এখানে তুষারশীর্ষ পর্ব্বত এবং সুদৃশ্য রক্তবর্ণ বাসভবনের বাহুল্য।

প্যালেন্টাইনের পুরাতন দুর্গ

পোর্ত্তুগীজ দুর্গের ভগ্নাংশ

এখানকার এস্কিমোরা খাঁটি এস্কিমো। ইহাদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, চক্ষু তির্য্যগাকৃতি। সকলেরই দেহে দেশীয় পরিচ্ছদ। বহু রমণীর কেশরাজি মাথার উপর চূড়ার আকারে আবদ্ধ। এ রীতি প্রাচীন। এখানকার বাসভবনগুলি পুরাতন পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। সারমেয়কুল এখানে অনুক্ষণ চীৎকার করিতে থাকে। তবে স্থানটি পরম রমণীয়।

লিণ্ডবার্গ-দম্পতি গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম তটভূমির দিকে একমাত্র উপনিবেশ জুলিয়ানহ্যাভ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশটি বৃহত্তম এবং দ্রুত উন্নতিশীল। সহরের রাজপথে আলোকের ব্যবস্থা আছে। উদ্যানভূমিতে একটি ফোয়ারা আছে।

লিণ্ডবার্গ-দম্পতি দেখিলেন, সরকারী নৌকা "ডিসক্রো" বন্দরে টানিয়া আনা হইতেছে। নৌকার উপর গ্রীনল্যাণ্ডরা তখন নৃত্য করিতেছিল।

গড্‌থ্যাব গ্রীনল্যাণ্ডের প্রথম উপনিবেশ। হোল্‌ষ্টেনবর্গ লিণ্ডবার্গ-দম্পতির নিকট বিশেষ রমণীয় মনে হইয়াছিল। জুলিয়ান্‌হ্যাভও বেশ সুন্দর। আঙ্গমাস্‌সালিক শেষ বন্দর। এইখানেই বিখ্যাত আবিষ্কারক ডাঃ মুড্‌ রাস্‌মুসেনের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল।

ঐ বন্দরেই লিণ্ডবার্গ-দম্পতির বিমানের নূতন নামকরণ হইয়াছিল—"টিং-মিস্‌আটক।" গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরাই ঐ নামকরণ করিয়াছিল।

১৫ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা গ্রীনল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া আইসল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। তিন ঘণ্টা পরে রেক্‌জাভিক্‌এ তাঁহারা অবতরণ করেন। গ্রীনল্যাণ্ডের সহিত আইসল্যাণ্ডের পার্থক্য যথেষ্ট। এখানকার বাড়ীগুলি আধুনিক প্রথায় নির্ম্মিত। মোটর-যান এখানে অসংখ্য।
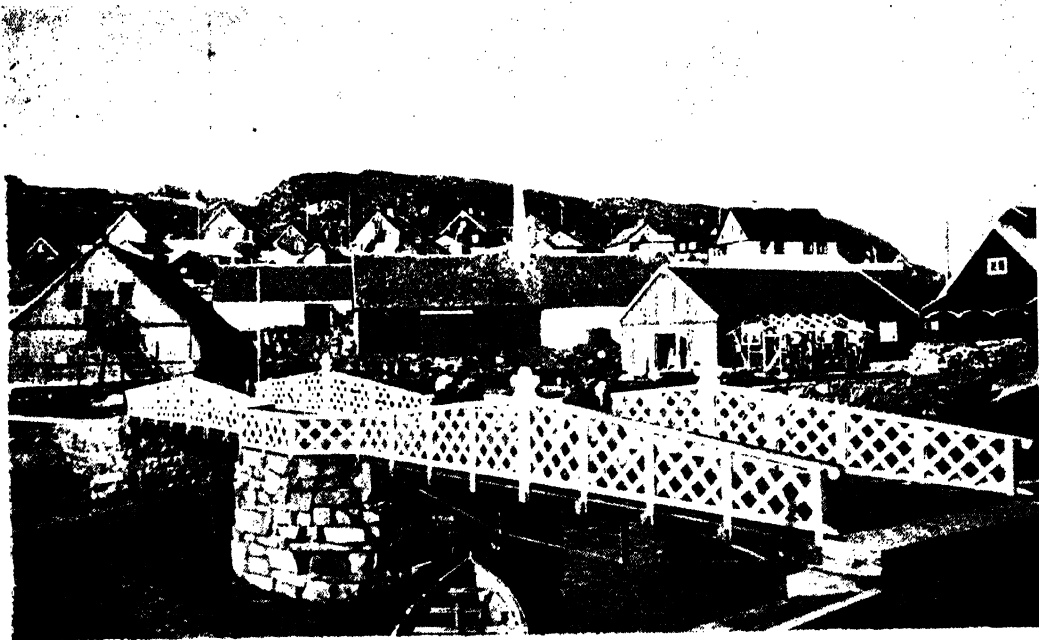
গ্রীনল্যাণ্ডের উপনিবেশ সহরের দৃশ্য

ফেরো দ্বীপের একটি গ্রাম

ষ্টকহলম্ নগরের নদীতীরবর্ত্তী দৃশ্য
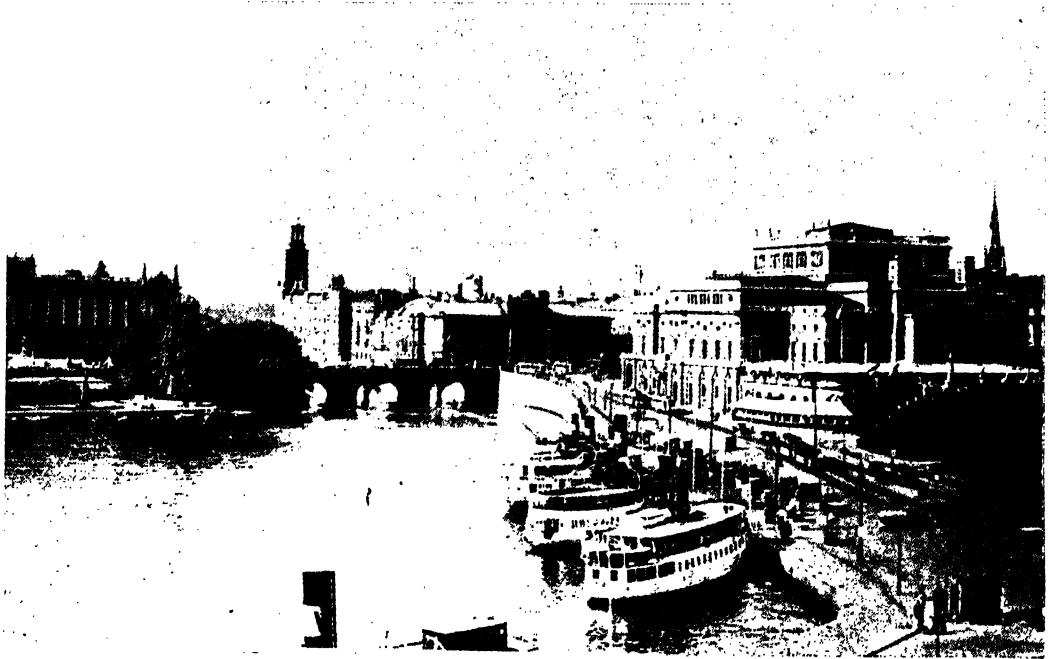
মস্কো নগরের প্রসিদ্ধ সেতু
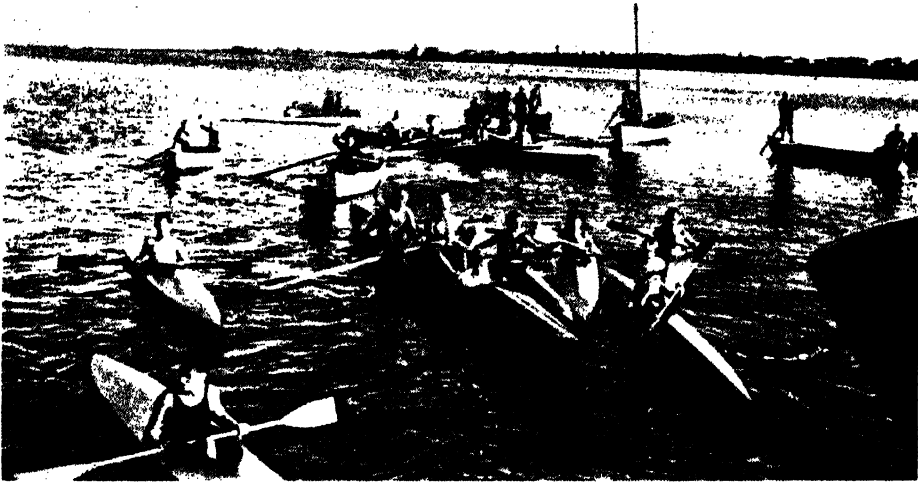
কোপেনহেগেনে নৌবিহারী যুবকদল

সাউদাম্পটন সমুদ্রবক্ষে বিমান
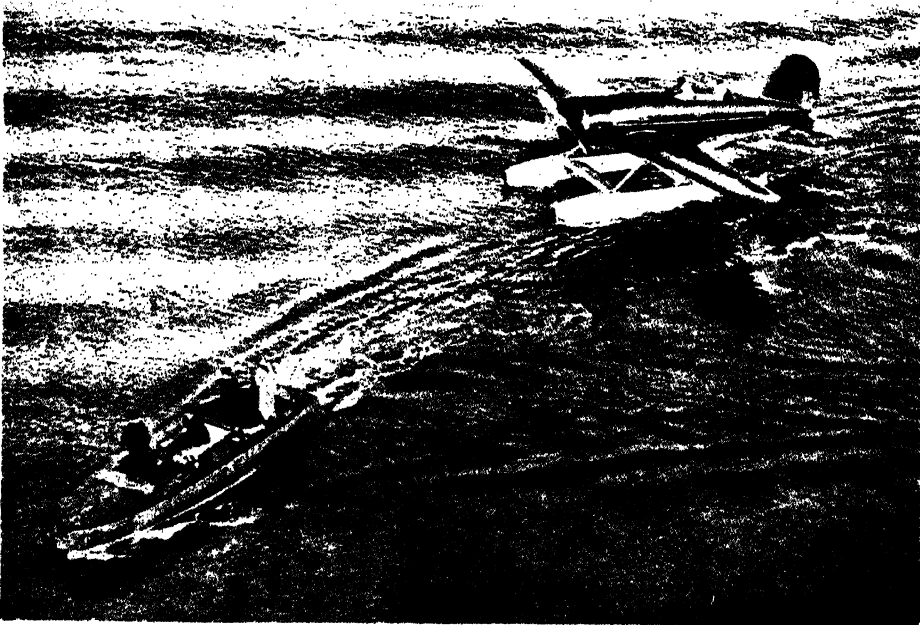
মিন্‌হো নদের তীরে লিণ্ডবার্গ-দম্পতির আলোকচিত্র গ্রহণ

পোর্ত্তু গালে বিমান অবতীর্ণ হইতেছে

ডকে নৌযানগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত। দেখিলেই মনে হইবে, সভ্যজগতের স্পর্শ এখানে বেশ আছে। সভ্য মানব এখানকার প্রস্তরাকীর্ণ ভূমিতে ফসলের জন্য আবাদ করিয়াছে। প্রকৃতির উষ্ণ প্রস্রবণকে গৃহকার্য্যে লাগাইয়াছে। এখানে পার্লামেণ্ট আছে। বহু আগ্নেয়গিরি এখানে বিদ্যমান।

২৩শে আগষ্ট তারিখে আইসল্যাণ্ড হইতে তাঁহারা ফেরো দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করেন। অনেকগুলি সুন্দর দ্বীপ এখানে বিদ্যমান। এখানকার আবহাওয়া ভাল নহে। কুজ্ঝটিকা তাহার দিগন্তবিস্তৃত যবনিকা বিছাইয়া দিয়া রাখিয়াছে। অনেক কষ্টে লিণ্ডবার্গ-দম্পতি টিভেরা নদীর কূলে অবতরণ করেন।

২৬শে আগষ্ট উত্তর-সমুদ্রের উপর দিয়া তাঁহাদের বিমান উড়িয়া চলিল। নরওয়ের তটভূমি পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহারা ডেনমার্কের সবুজ তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। কোপেনহেগেনএ বিমানকে তাঁহারা ৯দিন বিশ্রাম দিলেন।

৩রা সেপ্টেম্বর সেখান হইতে তাঁহারা সুইডেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে কারলস্ক্রোনা গিয়া পুনরায় তথায় বিশ্রাম করিলেন। ২০শে সেপ্টেম্বর লিণ্ডবার্গ-দম্পতি হেলসিং ফোরস্ যাত্রা করিলেন। বলটিক সমুদ্রের উপর দিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহস্র দেবদারু-বৃক্ষ-সমন্বিত দ্বীপে পৌঁছিলেন।

সেখান হইতে লেলিনগ্রাড্-গমন বিমানে অধিকক্ষণ লাগে না। দুই ঘণ্টার মধ্যে রুস-রাজ্যে তাঁহারা পৌঁছিলেন। দূরে তাঁহারা সেণ্ট আইজাক্ গির্জ্জার স্বর্ণচূড়া দেখিতে পাইলেন। রুসিয়ায় লিণ্ডবার্গ-দম্পতি এক সপ্তাহ ছিলেন।

লেলিনগ্রেডের প্রশস্ত রাজপথ-সমূহ, উন্নতশির দুর্গ এবং প্রাসাদনিচয়, প্রমোদোদ্যান-সমূহ দেখিয়া লিণ্ডবার্গ-দম্পতি প্রথমতঃ বিশেষ আমোদিত হইলেন। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করার পর মিসেস্ লিণ্ডবার্গ দেখিলেন যে, অট্টালিকা-সমূহের বর্ণবিন্যাস ম্লান হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে অট্টালিকার প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়াছে, রাজপথের অবস্থা ভাল নহে—অপরিচ্ছন্নতা বিরাজিত। দেখিলেই মনে হইবে, যেন প্রবল বন্যার প্রবাহে নগর প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, বন্যার পর কেহ নগর-পরিষ্কারে মনোনিবেশ করে নাই।

রাজপথের উপর জনতার পরিচ্ছদ মলিন। সকলেই যেন একই দিকে চলিয়াছে। সর্ব্বত্রই লেলিনের ছবি। শীতপ্রাসাদে রক্তপতাকা উড়িতেছে। লেলিনের একখানা
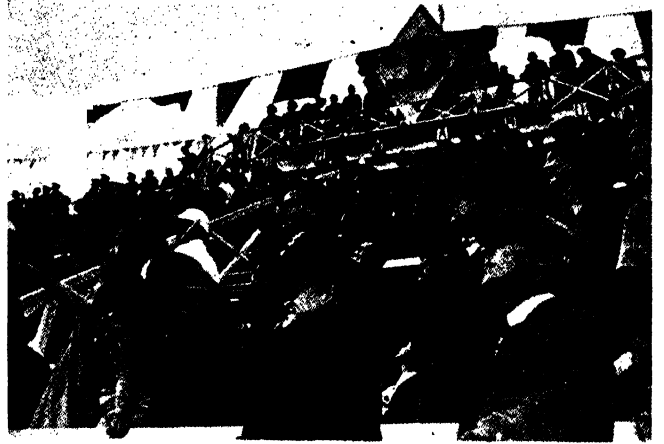
মস্কো এর জনতা লিণ্ডবার্গ-দম্পতিকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছে
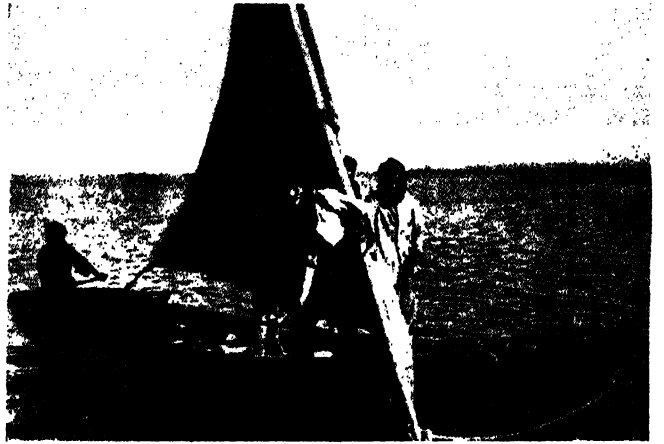
কাস্ক্রী ধীবর

প্রকাণ্ড চিত্র অট্টালিকায় ঝুলিতেছে—উহার নিম্নভাগ ভূমিস্পর্শ করিয়াছে।

গগনপথ হইতে মস্কো সহর দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। নূতন ও পুরাতনের অতি বিচিত্র সমন্বয় লিণ্ডবার্গ-দম্পতি এখানে দেখিয়াছিলেন। নদীর ধারে তাঁহারা বিমান

নামাইলেন। মস্কোবাসীরা জয়ধ্বনিসহ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। মস্কো সহরে নব নির্ম্মাণকার্য্যের বহু নিদর্শন তাঁহারা পাইলেন। লেলিনগ্রাড অপেক্ষা এখানে জনগণের মধ্যে তাঁহারা প্রচুর কর্ম্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন। মানুষের মুখে আনন্দের চিহ্ন না থাকিলেও, তাহাদের মুখ দর্শনীয়। কর্ম্মের চঞ্চলতা সকলেরই আননে

ভিলা সিস্‌নেরোসের মুরগণ

কেপভার্ড দ্বীপ—মিসেস লিণ্ডবার্গ

ছাপ মারিয়া দিয়াছে। রঙ্গালয়, যাদুঘর সর্ব্বত্রই প্রচুর জনসমাগম হইয়া থাকে।

রুসিয়ার জনসাধারণ বিমান সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল। নূতন বিমান দেখিলেই উহা দেখিবার জন্য অসম্ভব জনসমাগম হইয়া থাকে। ২৯শে সেপ্টেম্বর লিণ্ডবার্গ-দম্পতি "রেড স্কোয়ার" শেষবার দেখিয়া লইলেন। ক্রেমলিনের সুন্দর প্রাচীর, উভয় প্রান্তস্থিত লোহিত চূড়া প্রভৃতি দেখিয়া, সেন্ট-বেসিল গির্জ্জার (এখন উহা যাদুঘরে পরিণত হইয়াছে) লেলিনের ক্ষুদ্র সমাধিস্তরের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। মস্কোকে নতি জানাইয়া লিণ্ডবার্গ-দম্পতি যাত্রার জন্য বিমানে আরোহণ করিলেন।

অপরাহ্নকালে তাঁহারা ইষ্টোনিয়ার রাজধানী ট্যালিনে আসিলেন। তার পর ফিন্‌ল্যাণ্ড, উপসাগরের উপর দিয়া নরওয়ে অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অস্‌লোভে আসিয়া এক দিন তথায় অবস্থানের পর আবার আকাশ-পথে যাত্রা করিলেন। ৪ঠা অক্টোবর তাঁহারা সাউদামটনে আসিলেন।

সেখান হইতে আয়র্ল্যাণ্ডের গ্যালওয়ে, ইন্‌ভারনেস্, লেমুরো হইয়া আমষ্টারডামে তাঁহারা গমন করিলেন। রটারডামে তাঁহারা বিমান হইতে অবতরণ করিলেন।

৮ই নভেম্বর তারিখে তাঁহারা রটারডাম হইতে যাত্রা করিয়া জেনেভায় গমন করেন। স্পেনের স্যানটোনা যাত্রাকালে কুজ্ঝটিকা, ঝড়-বৃষ্টি ও তুষার-পাতের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সূর্য্যালোক দেখিবার সুযোগ স্পেনে তাঁহারা পান নাই।

ঝটিকা মাথায় লইয়া তাঁহারা স্যানটোনা ত্যাগ করেন। স্পেন ও পোর্ত্তুগালের সীমান্ত-স্থিত রায়ো মিনহোতে তাঁহারা অবতরণ করেন। ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীরা তাঁহা-দিগকে দেখিবার জন্য দলে দলে সমবেত হইল। অনেকে তাঁহাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করিল।

সেখান হইতে তাঁহারা লিস্‌বন্ যাত্রা করিলেন। সে-দিন ২১শে নবেম্বর। হোর্টা-বন্দরে বিশ্রামের পর তাঁহারা সোজা মেডিরা ও পণ্টাডাল-গাডা গমন করিলেন। আফ্রিকা গমনের জন্য পরে তাঁহারা লাপামা ত্যাগ করেন।

সমুদ্র ও রায়ো দে ওরোর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভিলা সিস্‌নে-রোস্ অবস্থিত। কতিপয় অট্টালিকা, বস্ত্রাবাস ব্যতীত

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে বিমানোপরি মিঃ লিণ্ডবার্গ

আধুনিক মুর বালক

সেই বালুকাময় স্থানে আর কিছুই নাই। স্পেনীয়দিগের এখানে একটা দুর্গ আছে। মুরদিগের সহিত স্পেনীয়রা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকে। এই স্থানের পরই সীমাহীন মরুভূমি। মুরদিগের বস্ত্রাবাসগুলি কৃষ্ণবর্ণের।

স্পেনীয় গভর্ণর ও তাঁহার পরিবারবর্গ লিণ্ডবার্গ-দম্পতিকে সযত্নে গৃহে লইয়া যান। মুরগণ সে সময়ে এক দিকে দলবদ্ধ হইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহাদের আচক্ষু অবগুণ্ঠন। তাহারা উষ্ট্রসহ গমনকালে একবারও

মুরদিগের শিবির

সন্তানকে পৃষ্ঠে লইয়া বেথরস্টের নারী

বেথরস্টের নারী বোঝা লইয়া বাজারে চলিয়াছে

তাঁহাদিগকে ফিরিয়া দেখিবার চেষ্টা করে নাই। যেন এ সকল বিষয়ে তাহাদের অহেতুক কৌতূহল নাই।

অপরাহ্ণকালে সূর্য্যালোক হ্রাস পাইল। মুরগণ তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার জন্য আগমন করিল। লিণ্ডবার্গ-দম্পতির বিমান-পর্য্যটনের গল্প শুনিয়াও তাহারা কোনও প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ করিল না। গভর্ণর এই

বৃটিশ গ্যাম্বিয়ার বেথরস্ট সহর

ব্যোমপর্য্যটক দম্পতির বিবরণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার পর জনৈক মুর লিণ্ডবার্গ-দম্পতিকে শিষ্টভাষায় অভিনন্দিত করিল।

পরদিবস তাঁহারা কেপ ভার্ড দ্বীপের দিকে উড়িয়া চলিলেন। পোর্ট প্রাইয়া বন্দরে তাঁহারা বিমান হইতে অবতরণ করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা অনুকূল আবহাওয়া পাইলেন না—প্রত্যহই প্রচণ্ড বায়ুবেগ, আকাশ মেঘময় দেখিলেন। তাঁহারা সুদিনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিন্তু সেরূপ সুযোগ না দেখিয়া তাঁহারা পুনরায় আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

৩০শে নবেম্বর তাঁহারা পোর্টো প্রাইয়া হইতে বেথর্ষ্টএ যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ ডাকারএ যাইবার অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল; কিন্তু সেখানে পীতজ্বরের প্রাবল্যের কথা শুনিয়া সেখানে যাইবার সঙ্কল্প তাঁহারা পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা বৃটিশ গ্যাম্বিয়ায় যাইবার ছাড়পত্র পাইলেন।

অপরাহ্নকালে তাঁহারা বেথরষ্টের এক কর্দ্দমময় নদীর ধারে অবতীর্ণ হইলেন। এখানকার বন্দর নৌকাসমূহে পরিপূর্ণ দেখিলেন। রাজপথগুলি সুন্দর। পথে শ্বেত উর্দ্দীপরা সৈনিকদল বিচরণ করিতেছে। বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল পরিচ্ছদে নিগ্রোরা পথে চলাফেরা করিতে ব্যস্ত। বাড়ীগুলি রংকরা। এখানে ক্রিকেট খেলার মাঠ আছে। বৃটিশ সরকারের প্রাসাদে পতাকা পতপত রবে উড্ডীন। সবই যেন শান্তিপূর্ণ।

বেথরষ্ট হইতে যাত্রা করিবার পর মিসেস্ লিণ্ডবার্গ রেডিওযোগে দক্ষিণ-আমেরিকায় সংবাদ প্রেরণ করিলেন। প্রথমতঃ কোনও উত্তর আসিল না। রাত্রি ৩টায় সংবাদ আসিল। বাহিয়া হইতে জবাব আসিয়াছে।

সমুদ্রের উপর দিয়া ব্যোমরথ তখন উড়িয়া চলিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই এই অভিযান। তার পর তাঁহারা নেটালে পৌছিলেন। নেটালবাসীরা তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। সেখানে বিশ্রামের পর তাঁহারা নেটাল ত্যাগ করিলেন। পারা নদীর ধারে বিমান হইতে তাঁহারা অবতীর্ণ হন।

১০ই ডিসেম্বর তাঁহারা পারা ত্যাগ করিয়া মানাওস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবহাওয়া তখন ভাল ছিল না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঘন ঘন বারিপাত হইতেছিল।

সমুদ্রবক্ষে বিমান চলিয়াছে

দ্বীপ -৩০ হাজার মাইল ভ্রমণের পর গৃহপ্রত্যাগত বিমান

অনেক কষ্টে তাঁহারা ঐ সহরে উপনীত হন। অরণ্যের মধ্যে এই সহর সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে রবারের কারখানা আছে। শ্বেতবর্ণের অট্টালিকা, বস্ত্রালয় সবই এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর ট্রিনিডাড অভিমুখে তাঁহারা যাত্রা করেন।

রায়ো নিগ্রোর উপর দিয়া বিমান উড়িয়া চলিল। কিছুদূর যাইবার পর তাঁহারা বামে ও দক্ষিণে দিক্‌চক্রবালে পর্ব্বত-শ্রেণীর রেখা দেখিতে পাইলেন। বোয়াভিষ্টা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, অরণ্যের দেখাও তাঁহারা পাইতেছিলেন। রেডিও যন্ত্রযোগে ট্রিনিডাডের সহিত তাঁহারা সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছিলেন।

পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বৃটিশ গায়েনায় গিয়া পৌছিলেন। পুন্টাবাজা হইতে ট্রিনিডাড যাইবার পথে ঝটিকার বেগ বর্দ্ধিত হইল। ইহাতে তাঁহারা বিমানকে নীচের দিকে নামাইয়া আনিতে বাধ্য হইলেন। জল হইতে ১ শত ফুট ঊর্দ্ধ দিয়া তখন বিমান চলিতেছিল।

ক্রমে ঝড়ের বেগ হ্রাস পাইল—দূরে ট্রিনিডাড দেখা গেল। তাঁহারা পোর্ট অব স্পেনএ অবতারণ করিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া লিণ্ডবার্গ-দম্পতি সানজুয়ান্ পুয়েরটোরিকো অভিমুখে পোত চালাইলেন। সেখানে এক রাত্রিবাসের পর তাঁহারা ডোমিনিকান রিপব্লিকের উপর দিয়া উড়িয়া চলিলেন। ভামাস পার হইয়া ক্রমে তাঁহারা ফ্লোরিডার দিকে চলিলেন। মিয়ামির গগনস্পর্শী অট্টালিকাসমূহ দেখা যাইতেছিল। মিয়ামি হইতে নিউইয়র্ক গিয়া তথায় অবস্থান করিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর চার্লষ্টন হইতে যাত্রা করিয়া ৬ ঘণ্টা পরে দূরে মানহাট্টানের দুর্গ সকল দেখিতে পাইলেন। ৬মাস পূর্ব্বে যেখান হইতে তাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন, নিম্নে সেই স্থান দেখা যাইতেছিল।

জলের উপর দিয়া পারাণী নৌকাগুলি তেমনই ভাবে গতায়াত করিতেছিল। ফ্লশিং বেতে ৭টা ৩৭ মিনিটে তাঁহারা অবতরণ করেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

প্যারীচরণ

প্রদীপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ হৃদয়-ভাণ্ডার,
কালিমার লেশশূন্য চরিত্র নির্ম্মল,
সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি, দয়ার আধার
একাধারে দেখাইতে আদর্শ উজ্জ্বল
এসেছিলে ধরি' তুমি মানব-আকার
স্বর্গ হতে দীন বঙ্গে, স্নিগ্ধ সুশীতল
মন্দাকিনী-ধারা বহি' বক্ষের মাঝার—
সুরার্ণবে মত্ত যেথা যুবকের দল।
নর-নারী-হিতব্রত সর্ব্ব-ব্রত-সার
করেছিলে একমাত্র জীবন-সম্বল,
ছাত্রগণে পিতৃতুল্য দিয়া ব্যবহার
ফুটায়েছ তাহাদের হৃদয়-কমল।

তব সম সর্ব্বগুণে গুণী মহাত্মার
দেখা কি মিলিবে পুনঃ এ বঙ্গে আবার !

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

বৈষ্ণব মতবিবেক

শ্রীসম্প্রদায় ও শ্রীরামানুজাচার্য্য

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রাচীনতা

অতি প্রাচীনকাল হইতে শ্রীসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। সুপ্রাচীন পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র এই সম্প্রদায় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং দার্শনিক মতবাদ হিসাবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিধিপূর্ব্বক প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড় দেশে কত প্রাচীনকাল হইতে যে এই সম্প্রদায়বন্ধন চলিয়া আসিতেছিল, তাহা সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ করা দুষ্কর। প্রাচীন তামিল গাথা, তামিল স্তোত্র ও তামিল বেদ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর অনেকাংশ যে খৃষ্টপূর্ব্ব চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা এই সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস বিচার করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয়। এই সম্প্রদায়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের বন্দনামূলক যে স্তোত্র আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের অবতার সারযোগী (তামিল নাম পোইহে আলোয়ার) দ্বাপরযুগে কাঞ্চী নগরে আবির্ভূত হন।* ইঁহাদের মতে এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সাধু শঠারি বা শঠকোপ কলিযুগারম্ভের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তামিলভাষার সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত-কবি মধুর-কবি ৩২২৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। রাজা কুলশেখর ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আবির্ভূত হন। ইঁহার রচিত সুপ্রসিদ্ধ মুকুন্দমালা-স্তোত্র সর্ব্বত্র সুপরিচিত। নিরুপাধি ভক্তি ও আত্মনিবেদনের ভাবে এই সুমধুর স্তবটি পরিপূর্ণ। † ফলতঃ শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তিবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল। তবে মনে হয়, শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর শ্রুতিপ্রমাণমূলে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিবার পর হইতেই এই সম্প্রদায় হইতে শ্রুতিপ্রমাণমূলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা ও আচার্য্য শঙ্কর-প্রচারিত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে অনুভূত হয় এবং শ্রীমদাচার্য্য রামানুজে সেই চেষ্টা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ফলতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভক্তিবাদের মূলরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্মসূত্রে আচার্য্য আশ্মরথ্যের নামের উল্লেখ আছে। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, মহাভারতেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ও পাঞ্চরাত্রাগমের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদাচার্য্য রামানুজ, ভগবান্ বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমূলক শ্রুতিসম্মত শিষ্টপন্থার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্রসম্বাদে দ্রাবিড় দেশের ভক্তগণের মহিমাপ্রকাশক দুইটি শ্লোক আছে; যথা—

"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥ ৩৯।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥ ৪০।"
(শ্রীভাগবত ১১.৫)

বিদেহরাজ শ্রীনিমিকে যোগীন্দ্র শ্রীকরভাজন বলিতেছেন—
"হে মহারাজ! যে স্থলে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী, প্রতীচী ও মহানদী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া পবিত্র নদী সকল বর্ত্তমান আছেন, সেই দ্রবিড় দেশের কোথাও কোথাও ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ঐ সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহারা বিমলবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া প্রায়ই ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হইয়া থাকেন।"

ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে যে দ্রাবিড় দেশে ভক্তসমাজের অস্তিত্ব ছিল, ইহা প্রতিপন্ন হয়।

এই প্রাচীন ভক্তসমাজে প্রাচীন নিয়মানুসারে যথাবিধানে গৃহস্থাশ্রমের পর বা বানপ্রস্থাশ্রমের পর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রাচীন হিন্দু সন্ন্যাসের অনুকরণে গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষু আশ্রমের সৃষ্টি করেন। এই ভিক্ষু আশ্রমের অনুকরণে আচার্য্য শঙ্কর একদণ্ড সন্ন্যাস প্রথার ও বিবিদিষা সন্ন্যাসের প্রবর্ত্তন করিয়া দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বে বিবিদিষা সন্ন্যাসের বা দশনামী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। একদণ্ড সন্ন্যাসে যেরূপ উপবীত পরিত্যাগ এবং পূর্ব্বাশ্রমের নাম পরিত্যাগের বিধি আছে, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসে তাহা নাই। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসে পূর্ব্বাশ্রমের নাম বর্ত্তমান থাকিত এবং যত দিন পর্য্যন্ত পরমহংস পদবীপ্রাপ্তি না হইত, তত দিন যজ্ঞোপবীতও রাখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। শ্রীসম্প্রদায়ে এই প্রথা অনুসারে এখনও সন্ন্যাস প্রচলিত আছে। শ্রীল নাথমুনি, শ্রীল যামুনাচার্য্য, শ্রীল রামানুজাচার্য্য এই প্রথানুসারেই গার্হস্থ্যাশ্রমের পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

নাথমুনি ও যামুনাচার্য্য

শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধমত নিরসনের ও সমগ্র ভারতে বৈদিক পন্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁহার দেবস্তোত্রাবলী, তাঁহার চারিমঠ স্থাপন ও মঠাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা-প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করিলে, তিনি যে ভক্তিবাদের

* তুলায়াং শ্রবণে জাতং কাঞ্চ্যাং কাঞ্চনবারিজাৎ।
দ্বাপরে পাঞ্চজন্যাংশং সারযোগিনমাশ্রয়ে ॥

† মুকুন্দমালার আত্মনিবেদনমূলক একটি শ্লোক এই—নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে, যদ্ভব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি, তৎপাদাম্ভোরুহগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥ কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতিও বলিয়াছেন, "কিয়ে মানুষ-পশু, পাখী বা জনমীয়, অথবা কীট পতঙ্গে। করম বিপাকে, গতাগতি পুন পুন মতিরহু তুয়া পরসঙ্গে॥"

বিরোধী ছিলেন না, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কালধর্ম্ম বশতঃই আচার্য্যের উচ্চতম আদর্শের বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, এই কারণেই দাক্ষিণাত্যে ভক্ত সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার জন্য শাঙ্কর দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমধিক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শ্রীসম্প্রদায়ের এক জন প্রধান আচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে এই কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহার নাম শ্রীনাথমুনি। আনুমানিক ৯০৮ খৃষ্টাব্দে বীরনারায়ণপুরে (মদুরায়) জ্যৈষ্ঠ মাসের অনুরাধা নক্ষত্রে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের মতে ইনি শ্রীনারায়ণের আবরণদেবতা বিষ্বক্‌সেনের পার্ষদ গজবদনের অংশে আবির্ভূত হন। ইনি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্ব-সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। ইঁহার ন্যায় দূরদর্শী সংযতচরিত্র ভগবদ্ভক্ত ভূমণ্ডলে কচিৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীল যামুনাচার্য্য ইঁহাকে "অচিন্ত্যাদ্ভুতাক্লিষ্টজ্ঞান-বৈরাগ্যরাশি এবং অগাধ-ভগবদ্ভক্তি-সিন্ধু" বলিয়া স্তব করিয়াছেন। * এই মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের প্রভাব ও তাঁহাদের অনেকের ভক্তিবিরোধিতা দর্শন করিয়া, ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ এক জন উপযুক্ত শক্তিশালী ভক্তের আবির্ভাব কামনা করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে ইঁহার ঔরসে ঈশ্বর মুনি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উপযুক্ত পৌত্রকামনায় পুত্রের বিবাহ দেন। বিবাহিত পুত্র ও পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া ইনি বহুকাল মথুরামণ্ডলে বাস করেন। শ্রীবৃন্দাবন-সন্নিকটবর্ত্তী যমুনাকূলে পুত্রবধূর গর্ভসঞ্চার হয়। এই গর্ভ হইতে পাণ্ড্যরাজধানী মদুরা নগরে ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে একটি পরম সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পিতামহ নাথমুনি এই বালকের "যামুন" এই নাম রাখেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি যামুনাচার্য্য নামে বিখ্যাত হন। তামিল ভাষায় ইনি আল্‌ওয়ান্দার নামে বিখ্যাত। শ্রীসম্প্রদায়ের মতে ইনি শ্রীশ্রীনারায়ণের সিংহাসনের অংশাবতার। অল্পবয়সেই যামুনের পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতামহ নাথমুনিই শৈশবে ইঁহাকে প্রতিপালন করেন; কিন্তু তথাপি মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া ইনি শিশুপৌত্রের জন্য স্বীয় কর্ত্তব্যে বিমুখ হন নাই। বালক পৌত্রকে এক অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়নার্থ রাখিয়া ইনি যথাকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বালক যামুন পরিণামে যাহাতে বিষয়ভোগে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীভগবানকে বিস্মৃত না হন, তজ্জন্য ইনি রামমিশ্র (তামিল নাম মানাক্কাল নম্বি) নামক ইঁহার এক জন শিষ্যকে যামুনের উপর লক্ষ্য রাখিতে বলেন, এবং উপযুক্ত সময়ে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বপথের পথিকরূপে পরিণত করিবার পরামর্শ দিয়া যান। মহাপুরুষ নাথমুনি যামুনাচার্য্যের ভাগ্যলিপি পূর্ব্ব হইতে পাঠ করিয়া, এই বালকের দ্বারা পরিণামে যে মহৎ কার্য্য সাধন হইবে, তাহা বুঝিয়া তদুপযোগী বন্দোবস্ত করিয়াই সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

যামুনাচার্য্য শৈশবেই অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহার অধ্যাপক ভাষ্যাচার্য্য ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, ইনি এক জন অসাধারণ পুরুষ হইবেন বলিয়া স্থির করেন। দেশপ্রসিদ্ধ পরমদাম্ভিক বিদ্বজ্জনকোলাহল নামক রাজপণ্ডিতকে যামুন বিচারে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই রাজানুগ্রহে পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করেন। এই রাজ্য লাভ করিয়া ইঁহার শাসনকার্য্যেও যামুন অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু যৌবনে রাজ্যভোগে প্রমত্ত হইয়া তিনি যে পিতামহ নাথমুনির পৌত্র, এ কথা বিস্মৃত হন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতামহের শিষ্য রামমিশ্র কৌশলে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জ্জনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্ম-পিপাসা জাগ্রত করিয়া তোলেন, এবং যথাসময়ে তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন। যামুন যেরূপ রাজ্যশাসনে অদ্বিতীয় ছিলেন, ভক্তিপথে আগমন করিয়াও তিনি অত্যল্পকালমধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীরঙ্গমের শ্রীশ্রীরঙ্গনাথমন্দিরের ভক্তগণের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। "সিদ্ধিত্রয়ং" "আগম-প্রামাণ্যম্" "গীতার্থসংগ্রহ" "স্তোত্ররত্নং" ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি শ্রীসম্প্রদায়ে নূতন জীবনের সঞ্চার করেন। তাঁহার রচিত "স্তোত্ররত্ন" নামক অপূর্ব্ব স্তবটি সর্ব্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের আদরের বস্তু। কিন্তু যামুনাচার্য্যও যোগ্যতর লোকের অপেক্ষায় স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের বৈষ্ণব ভাষ্য নির্ম্মাণে হস্তার্পণ করেন নাই। পূর্ব্বতন আচার্য্য বোধায়নের ব্যাখ্যা বিলুপ্তপ্রায়; অধিকন্তু ঐ বৃত্তি দেশকালপাত্রের উপযোগী খণ্ডনমণ্ডনে সমলঙ্কৃত নহে। এই জন্য ঐ ব্যাখ্যার উদ্ধারসাধন করিয়া উহার মর্ম্মাবলম্বনে অদ্বৈত ভাষ্যের ভক্তিবিরোধী অংশের খণ্ডন করিয়া যিনি নূতন ভাষ্য নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, এই প্রকার শক্তিশালী মহাপুরুষের প্রয়োজন।

শ্রীল রামানুজাচার্য্যের অবির্ভাব

শ্রীল যামুনাচার্য্য যখন অন্তরে এইরূপ মহাপুরুষের অবতারের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে হারীত গোত্রের কেশবাচার্য্য নামক এক জন ধর্ম্মশীল নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পতিব্রতা পত্নী কান্তিমতী ধার্ম্মিক সুপুত্র লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া ভগবান্ পার্থসারথির নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছিলেন। এই দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মাদ্রাজ হইতে প্রায় ত্রয়োদশ ক্রোশ পশ্চিমস্থ শ্রীপেরমবতুর বা শ্রীমহাভূতপুরী নামক গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীযামুনাচার্য্যের শ্রীশৈলপূর্ণ নামক এক জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। কেশবাচার্য্য এই শৈলপূর্ণের ভগিনী কান্তিমতী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ দম্পতি দীর্ঘকাল যাবৎ কুলপাবন পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়া ভগবান্ পার্থসারথির নিকট সুপুত্র লাভের বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ দিকে ভারতবর্ষেও বৈদিক ধর্ম্মসম্মত ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম ও অন্যান্য অপধর্ম্ম, বিধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মের হস্ত হইতে মানবকে উদ্ধার করিতে এক ভক্তিদেবীই সমর্থা। এই জন্য পরম করুণাময়বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অনুগ্রহে সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীমল্লক্ষ্মণদেব স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইবার জন্য এই দম্পতিকে আশ্রয় করিলেন। ৯৩৯ শকে (১০১৭ খৃষ্টাব্দে) চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আর্দ্রানক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে আসুরি

* নমোঽচিন্ত্যাদ্ভুতাক্লিষ্টজ্ঞানবৈরাগ্যরাশয়ে।
নাথায় মুনয়েঽগাধভগবদ্ভক্তিসিন্ধবে॥ ১।" (স্তোত্ররত্নং)

কেশবাচার্য্যের ঔরসে কান্তিমতীদেবী একটি সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। কান্তিমতীদেবীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভক্তপ্রবর শৈলপূর্ণ এই পুত্রটির অলৌকিক লক্ষণাবলী দেখিয়া এই বালকের "লক্ষ্মণ" নাম রাখেন। এই বালকই ভবিষ্যতে লক্ষ্মণাচার্য্য বা আচার্য্য রামানুজ নামে বিখ্যাত হন।

বাল্যজীবন

বাল্যকালে বালক লক্ষ্মণ অত্যন্ত শিষ্টস্বভাব ছিলেন। তিনি কখনও কোনরূপ চাঞ্চল্যের পরিচয় প্রদান করেন নাই। বিদ্যা-শিক্ষায় তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অনুরক্তি দর্শনে পিতা নিরতিশয় প্রীত হইতেন। কিন্তু শৈশব হইতেই রামানুজে একটি অসাধারণ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত। বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার পরমা ভক্তি পরিদৃষ্ট হইত। কাঞ্চীনগরীস্থ শ্রীবরদরাজের মন্দিরে প্রায়ই ভক্তিপূতচিত্তে দেববিগ্রহ দর্শন করিতে সমাগত হইতেন। এই মন্দিরে তিনি কাঞ্চিপূর্ণ নামক এক জন ভক্তের অসামান্য ভক্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ বরদ-রাজের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইয়া দীনতায় ভূষিত ছিলেন। শ্রীল বরদরাজের সেবায় ইনি আত্ম-সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার কৃপাদেশে পরিচালিত হইতেন। শ্রীল বরদরাজ এই ভক্তকে দর্শন দিতেন; ইঁহার সহিত কথোপকথন করিতেন। বালক লক্ষ্মণ কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট হইলেন। এই অঞ্চলের সদাচারী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব-প্রকারে শূদ্রের সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া থাকেন। শূদ্রের দর্শন পর্য্যন্ত ইঁহারা সযত্নে পরিহার করিতেন। অধিক কি, এতদঞ্চলের শূদ্রগণের ব্রাহ্মণের সহিত নদীর একঘাটে স্নানাদির বা এক রাজপথে যাতায়াতের অধিকারও নাই। কিন্তু রামানুজ মহানুভব কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি পিতা-মাতার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই এই শূদ্র সাধুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। পিতা-মাতা পুত্রের অভিলাষে বাধা দিলেন না; কিন্তু বালক রামানুজ যখন কাঞ্চিপূর্ণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া ভোজনান্তর তাঁহার পদসেবা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন, তখন তাঁহারা লোকব্যবহারবিরুদ্ধ এই বিষয়ে কিছুতে সম্মত হইলেন না। "ব্রাহ্মণের পক্ষে কখনও এইভাবে শূদ্রের পরিচর্য্যা বিধেয় নহে।" কাঞ্চিপূর্ণ এই কথা বলিলে রামানুজ বলিলেন যে, "বৈষ্ণবের কখনও জাতিকুল বিচার করিতে নাই। তিরুপ্পান আলোয়ার চণ্ডালবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে ব্রাহ্মণের দ্বারা বাহিত হইয়া 'মুনিবাহন' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।"

তৎকালে ঐ অঞ্চলে প্রচলিত সামাজিক প্রথার অনুসরণ করিয়া আসুরি কেশবাচার্য্য ষোড়শবর্ষ বয়সেই রামানুজকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। পুত্রের বিবাহের কিছুকাল পরেই আসুরি কেশবাচার্য্য ইহলোক ত্যাগ করেন। রামানুজ যথাবিধানে পিতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া সস্ত্রীক জননীর সন্নিধানে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রামানুজ বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করি-বার অভিপ্রায়ে জননীর আদেশ গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে গমন করিলেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্ব্বত্রই শঙ্করাচার্য্য-প্রচা-রিত অদ্বৈতমতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অদ্বৈতবাদিগণের অনেকেরই এই সময়ে শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের অভিপ্রায় গ্রহণের মত সাধনা এবং অধিকার ছিল না। ইহার ফলে সন্ন্যাসি-গণের মধ্যেও বামদেব্যসামের বিকৃত অর্থ গ্রহণে ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা "কাঞ্চন পরিহরেৎ" অর্থাৎ আসনে স্বেচ্ছায় সমাগতা কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না, এই বিধির অনুসরণক্রমে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারী হইয়া উঠিতেছিলেন। অন্যদিকে সাধনার অভাবে অদ্বৈতবাদ ভক্তিবিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। কাঞ্চীপুরে ঐ সময়ে যাদবপ্রকাশ নামক এক জন অধ্যাপক শাঙ্করমতের বেদান্ত অধ্যাপনার আচার্য্য ছিলেন। রামানুজ বেদান্তশাস্ত্র অধ্য-য়ন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়নে রামানুজের প্রতিভা স্ফুরিত হইল। তিনি অল্প-কালের মধ্যেই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র অধিগত করিয়া অদ্বৈতবাদের অযৌক্তিকতা ও অপ্রামাণিকতা প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন।

প্রথম বয়স হইতেই পরম ভক্ত রামানুজের অদ্বৈতবাদের প্রতি অনুরাগ ছিল না। তাহার উপর স্বাভাবিক শ্রীভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি উপাস্যের মর্য্যাদাহানিকর কোন কথা সহ্য করিতে পারিতেন না। এক দিন প্রাতঃকালে শ্রীলক্ষ্মণ স্বীয় অধ্যাপকের অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতেছিলেন, এমন সময়ে যাদবপ্রকাশের জনৈক শিষ্য তাঁহার নিকট ছান্দোগ্য উপনিষদের "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবাক্ষিণী" এই অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। যাদবপ্রকাশ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া "কপ্যাসং" শব্দে কপির আসন বা বানরের অপান দেশ এই ব্যাখ্যা করিলেন। বানরের অপানদেশের সহিত ভগবানের চক্ষুর তুলনা শুনিয়া উপাস্য দেবতার মর্য্যাদাহানিকর কথায় রামানুজ প্রাণে ব্যথা পাইলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তৈলমর্দ্দন করিবার সময়ে উঁহার এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু যাদবপ্রকাশের শরীরে পতিত হওয়ায়, যাদবপ্রকাশ বিস্মিত হইয়া রামানুজকে অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, "কপ্যাসং" শব্দের শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যায় রামানুজ মনে ব্যথা পাইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, তখন তিনি শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যায় এক জন অর্ব্বাচীন বালককে আপত্তি করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং রামানুজকে ঐ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। রামানুজ "কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ সূর্য্যঃ এবং 'আস' শব্দে বিকসিত অর্থ করিয়া সূর্য্যদ্বারা বিকসিত বা সূর্য্যকিরণে বিকসিত এই অর্থ করিলেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের অর্থ গৌণ ও কষ্টকল্পিত বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। আর এক দিন যাদবপ্রকাশ শাঙ্করমতে তৈত্তীরিয়োপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই অংশের নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে বালক রামানুজ তাহাতে আপত্তি করিয়া ঐ শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যার দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন করেন। ইহার পরে আর একটি ঘটনা ঘটিল। কাঞ্চিরাজকুমারী ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হইয়া পড়িলে আগম-মন্ত্রে ব্যুৎপন্ন যাদবপ্রকাশ তাঁহার চিকিৎসার জন্য রাজ-পুরীতে আহূত হইলেন। যাদবপ্রকাশ যথাসাধ্য মন্ত্র-শক্তির প্রকাশেও রাজকন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিলেন না, পরন্তু ব্রহ্মরাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল যে, যাদবপ্রকাশ

পূর্ব্বজন্মে গোধা ছিলেন ; ঐ জন্মে এক জন বৈষ্ণবের পাত্রাবশেষ মহাপ্রসাদ ভক্ষণের পুণ্যে তিনি এ জন্মে মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মরাক্ষস-বিতাড়নের শক্তি তাঁহার নাই। তবে কি করিলে ব্রহ্মরাক্ষস রাজকুমারীকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মরাক্ষস বলিল—"যাদবপ্রকাশের নিকট রামানুজ নামক এক মহাপুরুষ ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিতেছেন। আমি তাঁহার পাদোদক পাইলেই রাজকুমারীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।" তদনুসারে শ্রীল রামানুজের পাদোদক আনয়ন করিয়া দিলে ব্রহ্মরাক্ষস কৃতার্থ হইয়া রাজকুমারীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একেই গুরুর অবলম্বিত শঙ্করমতের বিরোধী ভাব প্রকাশ করায় এবং অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বেদান্তের অভিনব ব্যাখ্যা করায় যাদবপ্রকাশ রামানুজের উপর কোনও দিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাহাতে আবার রাজকুমারীর দেহ হইতে ব্রহ্মরাক্ষস বিতাড়ন-ব্যাপারে যাদবপ্রকাশের হীনতা-ব্যঞ্জক পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়ায় এবং রামানুজের মহত্ত্ব খ্যাপিত হওয়ায় যাদবপ্রকাশ রামানুজের উপর এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন যে, তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত কয়েকটি শিষ্যের সহিত তীর্থযাত্রাব্যপদেশে দূরদেশে লইয়া যাইয়া রামানুজের প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র করিলেন। যাদবপ্রকাশ সশিষ্য ত্রিবেণী-স্নানে যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন, সরল-স্বভাব রামানুজও তাঁহাদের সহিত ত্রিবেণীস্নানে যাইতে সম্মত হইলেন। যাদবপ্রকাশ স্থির করিলেন যে, পথে কোনও নিবিড় বনের মধ্যে লইয়া গিয়া রামানুজকে হত্যা করিবেন। যাদব-প্রকাশ যখন সশিষ্য বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত গোণ্ডারণ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন রামানুজের মাতৃস্বসৃতনয় গোবিন্দ যাদবপ্রকাশের হীন ষড়যন্ত্রের কথা রামানুজের নিকট গোপনে প্রকাশ করিলেন এবং রামানুজকে প্রাণরক্ষার্থ তদ্দণ্ডেই পলায়ন করিতে প্রোৎসাহিত করিলেন। রামানুজ গোবিন্দের পরামর্শা-নুসারে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন এবং প্রসিদ্ধ পথে গমন করিলে পাছে অনুসন্ধানপরায়ণ যাদবপ্রকাশ বা তাহার শিষ্যগণের হস্তে ধৃত হন, এই মনে করিয়া অতি দ্রুতবেগে অরণ্যপথে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি অরণ্যমধ্যবর্ত্তী একটি বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রামানুজকে না দেখিতে পাইয়া যাদবপ্রকাশ শিষ্যবর্গ সহ বিশেষভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার কোনও সন্ধান না পাইয়া তাঁহার অপমৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া গোবিন্দাদিকে দেখাইবার জন্য বাহ্য শোক প্রকাশ করিতে থাকিলেও অন্তরে পরমানন্দ লাভ করিলেন। অতঃপর যাদব-প্রকাশ সশিষ্য ত্রিবেণীস্নান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এ দিকে রামানুজ ঘোর অন্ধকারে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে একাকী পরিশ্রান্ত হইয়া অসহায় হইয়া পড়িলে অল্পক্ষণ পরেই এক ব্যাধ দম্পতির সাক্ষাৎ পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ব্যাধ এই অরণ্য হইতে বহির্গত হইবার পথের সন্ধান জানে। রামানুজেরও ইহাদিগকে দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইল—লোকে যেমন বহু দিনের বন্ধুকে কোনও বিষয়ে বিশ্বাস করিতে দ্বিধাবোধ করে না, রামানুজও তেমনি ইহাদিগকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে বিশ্বাস করিয়া ইহাদের সঙ্গী হইলেন। ইহারা অরণ্য-পথে চলিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে ইহারা একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিলেন। ঐ সময়ে ব্যাধ-পত্নী পিপাসাতুরা হইয়া জল প্রার্থনা করিলেন। ব্যাধের ন্যায় নীচজাতির ত' কোনও কূপ স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। অতএব রামানুজ ঐ সময়েই পানীয় জলের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইতে চাহিলেন। কিন্তু ব্যাধ এই অন্ধকারময়ী রজনীতে কিছুতেই রামানুজকে এই বিপৎসঙ্কুল পথে বহির্গত হইতে দিলেন না। প্রাতঃকাল হইবা-মাত্র ব্যাধ রামানুজকে জল আনিতে আদেশ করিলেন। রামানুজ নিকটেই একটি সোপানবিশিষ্ট কূপ দেখিতে পাইয়া কূপমধ্যে অবতরণ করিয়া তিনবার তিন অঞ্জলি জল আনয়ন করিয়া ব্যাধপত্নীর পিপাসার পরিতৃপ্তিসাধন করেন। চতুর্থবার কূপ হইতে জল লইয়া আসিয়া রামানুজ আর ব্যাধ-দম্পতিকে দেখিতে পাইলেন না। অধিকন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়াই তিনি লোকালয় ও রাজপথ দেখিতে পাইলেন। পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি কাঞ্চীপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

রামানুজ কাঞ্চীপুরীতে আসিয়াই শ্রীবরদরাজের মন্দিরে যাইয়া কাঞ্চিপূর্ণের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। কাঞ্চি-পূর্ণ রামানুজের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কোনও অনিষ্ট না ঘটায় তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং লক্ষ্মী-নারায়ণই যে ব্যাধ-দম্পতির রূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন এবং তিন অঞ্জলি জল পান করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, এই রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন রামানুজ ভক্তিবিগলিত-হৃদয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপা স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে আশ্বাস দান করিয়া প্রত্যহ ঐ কূপ হইতে এক কলসী করিয়া জল আনিয়া শ্রীবরদরাজের সেবা করিবার উপদেশ দিলেন। শ্রীবরদরাজের সেবা করিবার এই সুযোগ পাইয়া রামানুজ কৃতকৃতার্থ হইলেন।

যাদবপ্রকাশ কিছুকাল পরে গঙ্গাস্নান করিয়া শিষ্যবর্গ সহ কাঞ্চীপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তথায় রামানুজকে জীবিত দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং অন্তরে ক্রুদ্ধ হইলেও বাহ্যতঃ আনন্দের ভাব দেখাইতে লাগিলেন। রামানুজও যাদবপ্রকাশের হীন সংকল্পের কথা মনে না করিয়া অধ্যাপকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এই সকল কথা যামুনাচার্য্য জানিতে পারিলেন এবং শ্রীবরদরাজদর্শন করিতে কাঞ্চীতে আসিয়া পরম স্নেহের পাত্র রামানুজকে যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ননিরত দেখিয়া গেলেন। রামানুজ যাহাতে শ্রীসম্প্রদায়ের রক্ষক হইতে পারেন এবং যাহাতে শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহার প্রতি তাদৃশ কৃপা করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদায়রক্ষক আচার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তোলেন, এই জন্য পরম কারুণিক আলোয়ান্দার শ্রীযামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের নিকট সতত রামানুজের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম, এ, বি, এল)।

ওয়ালি

মিঃ সি ই গ্রীণওয়ে ইংরাজ যুবক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্ব-জাভায় কফির আবাদে চাকরী করিবার সময়ে মনিব কোম্পানীর অনেকগুলি টাকা হারাইয়াছিলেন। কোন তস্কর টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল। অপহৃত অর্থরাশি কি অদ্ভুত উপায়ে উদ্ধার হইয়াছিল, তৎপ্রসঙ্গে তিনি যে চিত্তাকর্ষক কাহিনী সংপ্রতি লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিকে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, এই আশায় আমরা গল্পটির অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। লেখক লিখিয়াছেন, তাঁহার এই কাহিনীতে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তিনি অনতিরঞ্জিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু সকলে ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন কি না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। তথাপি ইহা আলোচনার যোগ্য।

মিঃ গ্রীণওয়ে লিখিয়াছেন, "প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক দেশেই ইন্দ্রজাল-কৌশলের এবং রোজাগিরির নানা অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্র সান্ ষ্টেট্স ব্যতীত, জাভা ও তাহার সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জেই ইন্দ্রজালপ্রভাবে সংঘটিত বিস্তর অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রজালের এরূপ প্রভাব অন্য কোনও স্থানে লক্ষিত হয় না।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমি কফির একটি আবাদের সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই চাকরী উপলক্ষে আমাকে পূর্ব্ব-জাভায় বাস করিতে হইয়াছিল। জাভা দ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তে যে গিরিশ্রেণী বর্ত্তমান, তাহার পাদভূমির দক্ষিণাংশ প্রথমে ঢালু হইয়া উঠিয়া অবশেষে প্রায় দশ হাজার ফুট খাড়া। তাহার শীর্ষদেশে যে আগ্নেয়গিরি অবস্থিত, তাহার নাম মাউণ্ট রাওয়েঙ্।

পূর্ব্ব-জাভায় কফির যে সকল আবাদ আছে, সেই সকল আবাদের ম্যানেজারকে তাঁহার বাংলোতে বিস্তর নগদ টাকা মজুত রাখিতে হয়; কারণ, কুলীদের বেতন দেওয়া ও আবাদের দৈনিক খরচের জন্য সর্ব্বদাই টাকার প্রয়োজন। বিশেষতঃ, আমাদের আবাদ নিকটতম সমুদ্রতট হইতে শতাধিক মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া, কোন কোন সময়ে আমাকে নগদ পাঁচ হাজার গিল্ডার (জাভার প্রচলিত রৌপ্য-মুদ্রা) পর্য্যন্ত হাতে রাখিতে হইত। টাকা রাখিবার জন্য কোম্পানীর যে সিন্দুকটি আমার জিম্মায় ছিল, তাহা সেকেলে লোহালক্কড়ের সমান; তাহার তালাও নিতান্ত সাধারণ তালা। সেই প্রকার বাক্সে সিন্দুকে অত টাকা রাখিয়া আমাকে বড়ই অশান্তি ভোগ করিতে হইত।

এক দিন বাগানের কাযে দীর্ঘকাল কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাংলোয় ফিরিলাম। সেই সময় আমার ইচ্ছা হইল, সিন্দুকের টাকাগুলি মিলাইয়া দেখি। সিন্দুক খুলিয়া টাকা মিলাইতে গিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! তহবিলে বারশো গিলডার অর্থাৎ প্রায় এক শত পাউণ্ডের ঘাট্‌তি! সিন্দুক হইতে বারশো গিলডার অদৃশ্য হইয়াছে! আমি তৎক্ষণাৎ আমার খানসামাদের এবং যে সকল কুলী বাংলোর অদূরবর্ত্তী ক্ষেতে কায করিতেছিল, তাহাদিগকেও ডাকাইলাম। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেই চুরির কথা অস্বীকার করিল। অবশেষে আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, দিবাভাগে আমি যখন ক্ষেত-পরিদর্শন উপলক্ষে বাংলোয় অনুপস্থিত ছিলাম, সেই সুযোগে আমার খানসামার দল বাংলো অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া অদূরবর্ত্তী গ্রামে আড্ডা দিতে গিয়াছিল। আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই অবসরে কোনও সন্ধানী চোর আমার বাংলোয় প্রবেশ করিয়া, এইভাবে আমার মাথায় হাত বুলাইয়া, কায গুছাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের আবাদের অদূরেই থানা; চুরির সংবাদ থানায় এত্তেলা করিলাম। কিন্তু পুলিস চোরের সন্ধান করিয়া টাকাগুলি উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এরূপ আশা করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ, যে সকল নোট অপহৃত হইয়াছিল, আমার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তাহাদের নম্বর পূর্ব্বে টুকিয়া রাখি নাই। কোম্পানীর টাকা আমার জিম্মায় ছিল, তাহা চুরি

গিয়াছে, কোম্পানীর এই ক্ষতি আমাকেই পূরণ করিতে হইবে ভাবিয়া আমার মন বড়ই দমিয়া গেল। যাহা হউক, আমি তিন সপ্তাহকাল নানাভাবে চেষ্টা করিয়া চুরির কোন কিনারা করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, এক শত পাউণ্ড আমাকেই দণ্ড দিতে হইবে; চোর ধরা পড়িবে না, টাকাগুলি আদায় করা ত দূরের কথা!

এই সময় শুনিতে পাইলাম, মাউণ্ট রাওয়েডের উত্তরাংশে আসেম বাগোজ নামক স্থানে এক জন বৃদ্ধ ওয়ালি অর্থাৎ সাধু বাস করে; তাহার নাম নবি বিন্ হালিম। আরও শুনিলাম, স্থানীয় অধিবাসীরা এই সাধুকে দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, এবং সেই অঞ্চলের সকল লোকই সাধুকে চেনে। আমাকে অনেকেই বলিল, সাধুর ঐন্দ্রজালিক শক্তি অদ্ভুত, সে ইন্দ্রজালের সাহায্যে না কি অসাধ্যসাধন করিতে পারে। যে সকল য়ুরোপীয় দীর্ঘকাল প্রাচ্যদেশে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় আমিও স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলাম যে, এই সকল ঐন্দ্রজালিকের কেহ কেহ অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

যাহা হউক, আমার সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় এই বৃদ্ধ ওয়ালির কথা আমি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, এই লোকটা আমাকে সাহায্য করিতে পারে কি না, একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে দোষ কি? যদি সে আমার উপকার করিতে না পারে, তাহাতে আমার ত কোন ক্ষতি হইবে না। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আমার গাড়ী বাহির করিলাম, এবং সেই সাধু-দর্শনে যাত্রা করিলাম।

যদি আমি দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে ৬০ কিলোমিটার যাইতে হইত; কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া যে ঘুরো পথ ছিল, সেই পথে যাইতে আমাকে দুই শতাধিক কিলোমিটার পাড়ি দিতে হইল। যাহা হউক, আসেম বাগোজে উপস্থিত হইয়া আমার গাড়ী গ্রামের ভিতর রাখিলাম, এবং গ্রামের এক জন লোককে সাধুর আস্তানার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। গ্রাম হইতে সিকি মাইল দূরে একটা জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলের কিয়দংশ পরিষ্কার করিয়া সাধু আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছে দেখিয়া আমি তাহার আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইলাম।

সাধুর কুটীরের বাহিরে বাঁশের বেড়া দেওয়া একটি আঙ্গিনা দেখিতে পাইলাম। কুটীরখানি বৃহৎ, সমচতুর্ভুজ গৃহ; তাহার দেয়ালগুলি বাঁশের বাখারি-নির্ম্মিত, এবং নারিকেলপত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত। আঙ্গিনা এবং কুটীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

আমি সেই কুটীরের আঙ্গিনায় কয়েকটি যুবক ও বালককে উপবিষ্ট দেখিলাম। আমার মনে হইল, তাহারা সাধুর পরিচারক অথবা চেলা। আমাকে দেখিয়া তাহাদের এক জন উঠিয়া আসিয়া বিনীতভাবে আমার অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু আমি যখন বলিলাম, আমি ওয়ালির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তখন সে গম্ভীর স্বরে বলিল, তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া অসম্ভব। তাহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, আমি ওয়ালির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়াছি, কিন্তু এ কথা শুনিয়াও যখন সে মাথা নাড়িল, তখন আমি তাহার হাতে কিঞ্চিৎ দর্শনী গুঁজিয়া দিলাম। দেখিলাম, তাহাতেই ফল হইল। সে বলিল, আমি সাধুর দর্শনলাভ করিতে পারিব; কিন্তু আমাকে সে জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর সে আমাকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। বুঝিলাম, সে ওয়ালিকে আমার সাক্ষাতের জন্য রাজী করিতে গেল।

সেই আঙ্গিনায় একটি বৃহৎ 'জেম্‌টং' অর্থাৎ জয়ঢাক দেখিতে পাইলাম, তাহার খোলটি একটি গাছের গুঁড়ি খুদিয়া নির্ম্মিত। একটি বালক সেই জয়ঢাকের নিকটে গিয়া এক খণ্ড কাঠ দিয়া তাহা দমদম শব্দে পিটিতে আরম্ভ করিল। তার পর আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইল—ওয়ালি আমাকে দর্শন দান করিবে।

আমার তরুণ যৌবনে আমি রাইডার হ্যাগার্ডের কেতাবে এবং অন্যান্য লেখকদের পুস্তকেও ভূতের রোজাদের আকার-প্রকারের বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া যে মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, সেই মূর্ত্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এরূপ কোন মূর্ত্তির কথা আমি কোনও দিন কোন কেতাবে পাঠ করি নাই।

শয্যার উপর যে উপবিষ্ট ছিল, তাহার মত কল্পনাতীত জীব দেখা যায় না

সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া একটি 'বালি-বালি'র অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত খোলা চৌকীর উপর আসন-পীড়ি হইয়া একটি মনুষ্যমূর্ত্তিকে উপবিষ্ট দেখিলাম, সেই প্রকার অসাধারণ মূর্ত্তি কোনও দিন আমার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই! লোকটির প্রকাণ্ড মাথা দেখিয়া মনে হইল, একটা মাথার খুলী পার্চ্চমেণ্ট-আবৃত করিয়া তাহার কাঁধের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লোকটির দেহ কৃশ, যেন একরাশি অস্থি চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। দেহটি এইরূপ অস্থিচর্ম্মসার। আমার ধারণা, আমি সহজে ভয় পাই না; কিন্তু সেই আতঙ্কজনক অদ্ভুত মূর্ত্তি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। আমি স্বীকার করিতেছি, সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া শ্রদ্ধামিশ্রিত আতঙ্কে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। সে অতি ভীষণ আতঙ্ক!

ওয়ালি মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর সে যে স্বরে কথা বলিল, তাহা এইরূপ মধুর যে, তাহা শুনিয়া আমাকে বিস্মিত হইতে হইল।

ওয়ালি বলিল, 'সাহেব, আমি জানি, তুমি সঙ্কটে পড়িয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ। আমার নিকট তোমার কি প্রার্থনা?'

আমি তখন আমার বাংলোর সিন্দুক হইতে কিরূপ অদ্ভুত-ভাবে টাকাগুলি চুরি গিয়াছিল, তাহার বিবরণ যতখানি প্রকাশ করা উচিত মনে করিলাম, তাহাই তাহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিবার সময় ওয়ালি মুদিত-নেত্রে বসিয়া রহিল; কিন্তু তাহার মস্তকটি ধীরে ধীরে এক পাশ হইতে অন্য পাশে আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমার কথা শেষ হইলে বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পর সে হঠাৎ আমাকে বলিল, 'সাহেব, তোমার টাকাগুলি কোথায় রাখা হইয়াছে, সে কথা যদি তোমাকে বলি, তাহা হইলে তুমি পুলিসকে সেই সংবাদ জানাইতে, কিংবা চোরকে কোন রকমেই ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না। সে আর কখন তোমার কোন জিনিষ চুরি করিবে না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আর তুমি আমাকে মহিষ-শাবকের একটি মুণ্ড পাঠাইবে। আমি অন্য কোনও দ্রব্যের প্রার্থী নহি।'

আমি তাহার এই সকল সর্ত্ত পালনের অঙ্গীকার করিলে ওয়ালি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, 'যে ব্যক্তির কুটীরের ভিতর সেই টাকাগুলি প্রোথিত আছে, 'দীন' এই শব্দটির যোগে তাহার নাম শেষ হইয়াছে। সেই কুটীর তোমার বাসগৃহের অদূরে নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত।'

এই কথা বলিয়া সাধু ইঙ্গিতে আমাকে জানাইল, তাহার সহিত আমার আলাপের কাম শেষ হইয়াছে। সুতরাং আমি তাহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া আমার গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আবাদে প্রত্যাগমন করিয়া আমি সন্ধান লইয়া অনতিবিলম্বে জানিতে পারিলাম, সামসুদ্দীন নামক এক জন লোক আমার বাংলো হইতে দুই মাইল দূরে একখানি কুটীরে বাস করিত। তাহার সেই কুটীর কালীবাতোই নামক নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। সেই নদী আমাদেরই আবাদের সীমার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। আমি যখন সামসুদ্দীনকে আমার টাকা চুরির জন্য ধরিলাম, তখন সে ভয়ানক রাগ করিয়া চুরির কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, তাহার মত সচ্চরিত্র কঠোর-শ্রমনিরত লোককে কি করিয়া আমি চোর বলিয়া সন্দেহ করিতেছি?

তাহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, এই সংবাদ আমি ওয়ালির নিকট জানিতে পারিয়াছি। সামসুদ্দীন ওয়ালির নাম শুনিবামাত্র ঘাবড়াইয়া গেল, এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া অপহৃত টাকাগুলি আনিয়া দিল।

তাহার পর আমি জানিতে পারিলাম, এক সময় সে অদূরবর্ত্তী সুরবায়া নগরে তালাচাবি মেরামতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই জন্য সে সিন্দুক ও সিন্দুকের তালা-চাবি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। যে দিন আমার চাকররা আমার বাংলো অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, সেই দিন সে সুযোগ বুঝিয়া আমার বাংলোয় প্রবেশ করিয়াছিল, এবং সিন্দুক খুলিয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল।

সে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখন ঐরূপ দুষ্কর্ম্ম করিবে না। আমিও তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করিলাম না। ওয়ালি আমার নিকট মহিষ-শাবকের মুণ্ড চাহিয়াছিল, তাহাও সে ঠিক সময়ে পাইল।

এখন এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ওয়ালির সঙ্গে আমার দেখা হইবার পূর্ব্বে, এই চুরি-সংক্রান্ত কোনও সংবাদ সে জানিতে পারে নাই। যে স্থানে সে বাস করিত, আমার আবাদ হইতে কোন স্থানীয় লোক তত দূরে হাঁটিয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না; এবং আমি সেই সাধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইব, আবাদের কোন লোক এ সংবাদ জানিয়া থাকিলেও, কোন সংবাদ-বাহক, আমার সেখানে গমনের পূর্ব্বে, পাহাড়ের উপর দিয়া হাঁটিয়া আসেম বাগোজে উপস্থিত হইয়া-ছিল, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং ওয়ালি কিরূপে চোরের সন্ধান পাইল, ইহা স্থির করা আমার অসাধ্য হইয়াছিল।

আর এক কথা, সাধারণের ধারণা ছিল, এই ওয়ালির বয়সের গাছ-পাথর নাই! স্থানীয় জনসাধারণ এই জনরব বিশ্বাস করে যে, ওয়ালি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গলের ভিতর হইতে আসেম বাগোজে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কেহ এই অদ্ভুত জনশ্রুতি সত্য বলিয়া মনে করুক না করুক, এ কথা কিন্তু সত্য যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রোজাগিরি-সংক্রান্ত একটি অদ্ভুত মামলার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, সেই মামলায় স্থানীয় এক জন সাধু জড়িত ছিল; তাহার নাম নবি বিন হালিম। এই সাধুই কি সেই সাধু?"

মিঃ গ্রীণওয়ে এই স্থানেই তাঁহার গল্প শেষ করিয়াছেন। সাধুর বয়স কত, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই; ইহাতে কিছু যায় আসে না। একালেও যে দেড় শতাধিক বৎসরের লোক জীবিত থাকে, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যোগবলই বলুন, আর ঐন্দ্রজালিক শক্তিই বলুন, সাধু মিঃ গ্রীণওয়েকে যে সংবাদ দানে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তাহা অলৌ-কিক শক্তির ফল। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ ইংরাজী বিদ্যা শিখিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর এই প্রকার দৈব-শক্তির অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না, এবং বুজরুকি বলিয়া সকলেই উড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা যাহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, এবং যাহাদের মুখের কথা খাঁটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই ইহসর্ব্বস্ব, জড়বাদী য়ুরোপীয়দেরই এক জন ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতার ফলে যাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহারা বুজরুকি বলিয়া তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও শঙ্করাচার্য্য

অভিজ্ঞ বৌদ্ধগণ বলেন যে, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু-কুলে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধনার দ্বারা পরম প্রজ্ঞাসম্পন্ন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জনৈক য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থির করেন যে, শাক্যসিংহ শক-জাতীয় ছিলেন। তিনি শাক্য শব্দের এবং শক শব্দের একতা দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সুধীসমাজে বিশেষ গ্রাহ্য হয় নাই। তবে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় জনৈক রাজা পিতৃশাপে কপিলাশ্রমে শাকবৃক্ষসমাচ্ছন্ন হইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারই বংশধরগণ শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। * সেই বংশেই শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাক্য-সিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়া দেবী, মাতামহ অঞ্জন। এ সমস্তই সংস্কৃত এবং ভারতীয় নাম। এরূপ অবস্থায় সীথীয় ও শক শব্দের কতকটা সামঞ্জস্য আছে বলিয়া বুদ্ধদেবকে শক বলিয়া নির্দ্দেশ করা অতি উৎকট প্রগল্‌ভতার কায। যাহা হউক, এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিকের উক্তির সম্যক্ প্রতিবাদ করিতে যাইলে পুঁথি এতই বাড়িয়া যাইবে যে, শেষে উহা সামলান কঠিন হইবে। সেই জন্য আমি ঐরূপ অনর্থক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম না। আমাদের দেশের পুঁথি-পত্রে যাহা আছে, আমরা কেবল তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টির আলোচনা করিব।

প্রথমে শাক্যসিংহ-প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মের কথাই আলোচনা করিব। হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মে যে নির্ব্বাণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত কপিলের কৈবল্য শব্দের এবং হিন্দুর মোক্ষ শব্দের কোন পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য হইয়াছিল পরবর্ত্তী কালে। এ কথা সত্য যে, বুদ্ধদেব শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন যে, ভূতদয়া অর্থাৎ সর্ব্বজীবে দয়া করাই মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার শিক্ষার মর্ম্মই এই যে, মানবের চরিত্র, কার্য্যাবলী, কর্ম্ম প্রভৃতিই তাহাকে পরজন্মে উত্তম বা অধমগতি প্রদান করে। নরক, প্রেতলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক এবং উচ্চতর ব্রহ্মলোক আছে। ব্রহ্মলোকের আয়ু ৮৪ কল্প। ব্রহ্মচর্য্যপালন দ্বারা মানুষ "অভিজ্ঞা" নামক দিব্যজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। তিনি বলেন, মানুষ মহাভূতের সমষ্টি। কিন্তু তাহা হইলেও মানুষের একটা আধ্যাত্মিক শরীর আছে। ঐ আধ্যাত্মিক শরীরের লক্ষণ এই কয়টি :— রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। যত দিন মানব সংসারে থাকে, তত দিন তাহাকে তাহার কর্ম্ম অনুসারে নানারূপ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয়। দেবলোক, ব্রহ্মলোক, প্রেতলোক এবং তিরশ্চীন লোক সমস্তই এই সংসার-ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। যত দিন অজ্ঞানতা থাকিবে, তত দিন জীবকে নাক-ফোঁড়া বলদের মত তাহার ইহসংসারে কখনও সুখে, কখনও দুঃখে, কখনও সমৃদ্ধিতে, কখনও দারিদ্র্যে, কখনও নিন্দায়, কখনও বা প্রশংসায় কাল কাটাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোন বিরোধই ছিল না। সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে হইলে বুদ্ধদেব অর্হতের পন্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। পূর্ণ মাত্রায় আত্মজ্ঞান অর্থাৎ "অহং মমেতি বুদ্ধি" বর্জ্জন করিতে হইবে, এক কথায় প্রত্যেক মানুষকে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সংসারে চলিতে হইবে। অন্য জীব হইতে তাঁহার আপনাকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ উন্নত বা অবনত মনে করিতে নাই। তাঁহাকে আপনাকে ভুলিয়া সকল কায করিতে হইবে। মাতা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, প্রত্যেক অর্হৎ সকল জীবকে সেইরূপ ভাবে ভালবাসিতে থাকিবেন।

জাতক গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে নির্ব্বাণলাভের তিনটি পন্থা আছে। যথা—(১) অনুত্তর-সম্যক্‌সম্বোধি, (২) প্রত্যেকবোধি এবং (৩) শ্রাবক পারমি-বোধি। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এ স্থানে দেওয়া অসম্ভব। যিনি অনুত্তরসম্যক্‌সম্বোধিসত্ত্বসাধন পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাকে ধরাকে পাপমুক্ত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। দশ পারমিতা কি কি, তাহা এইখানে বিবৃত হইল,— দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, সত্য, ক্ষান্তি, অধিষ্ঠান,

* শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।
তস্মাৎ ইক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ॥ শাকবৃক্ষ অর্থে সেগুণ বা শিরীষগাছ।

ইতি অমরটীকায়াং ভরতঃ

মৈত্রী এবং উপেক্ষা। নৈষ্ক্রম্য অর্থে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্ম-ত্যাগ। দানের পরিমাণ, প্রার্থীকে আপনার সন্তান, স্ত্রী এবং জীবন দান পর্য্যন্ত। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র যখন বোধিসত্বের নিকট দান চাহিয়াছিলেন, তখন বোধিসত্ব তাঁহাকে নিজ দুইটি সন্তান দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র যখন তপশ্চরণপরায়ণ বেশন্তর বোধিসত্বের নিকট তাহার পত্নীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন বেশন্তর বোধিসত্ব তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্বের নিকট কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি কিছুতেই তাহাকে দিব না বলিতে পারিবেন না। ইহাতে বুঝা যায় যে, দান এবং জীবে দয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান সাধন। এই সকল বিষয়ে হিন্দুর সহিত বৌদ্ধদিগের মতের কোন প্রভেদ নাই। হিন্দুদিগের বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই দান-ধর্ম্মের কথা বিশেষভাবে বিবৃত আছে। প্রজাপতির তিন পুত্র দেবতা, মনুষ্য এবং অসুর এক সময়ে মুক্তির উপায় জানিবার উদ্দেশে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাপতির নিকট উপদেশ লইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তিনি সকলকেই একাক্ষর উপদেশ করেন "দ"। দেবগণকে তিনি বলিয়াছিলেন "দ" অর্থাৎ "দম"। দেবতারা স্বভাবতঃ অদান্ত, সেই জন্য তিনি তাঁহাদিগকে দমন করিতে বলিয়াছিলেন। মনুষ্যদিগকে তিনি যে "দ" বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ "দান" কর। মানুষ স্বভাবতঃ লোভী, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকেই সেই লোভ সম্বরণ পূর্ব্বক দান করিতে বলেন। আর অসুরদিগকে তিনি যে "দ" বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ "দয়া" কর। অর্থাৎ অসুররা নিষ্ঠুর ও ক্রূরস্বভাব। তিনি তাহাদিগকে নিষ্ঠুরতা এবং ক্রূরতা পরিহার করিয়া লোককে দয়া করিতে উপদেশ প্রদান করেন। সুতরাং দম, দয়া, এবং দান হিন্দুরও ধর্ম্মসাধনের বিষয়। অদ্যাপি জীমূত-গর্জ্জনে মানবজাতিকে প্রজাপতির সেই উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য দ দ দ ধ্বনি নিনাদিত হইয়া থাকে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ পঞ্চম অধ্যায় ২য় ব্রাহ্মণ)। সুতরাং, বৌদ্ধদিগের ঐ দশ পারমিতার সহিত হিন্দুদিগের কোন বিরোধ ঘটিতে পারে না।

উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি প্রদান করিলাম। অবশ্য অতি সংক্ষেপে এত বড় একটা ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করা সম্ভবে না। তাহা হইলেও আমি মোটামুটিভাবে উহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই ধর্ম্ম যে হিন্দুর জ্ঞানকাণ্ডের অনুসারী, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু বিকৃতি ঘটায় ঐ ধর্ম্মমত সহজেই উহার নির্ম্মল ভাব হইতে স্খলিত হইয়াছিল। সেই কথা বুঝিতে হইলে মূল ধর্ম্মমতের একটু পরিচয় লইতে হয়। এখানে আমি প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি কথা বলিব। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়, উহা মোক্ষ দিতে পারে না। অতএব তুমি নির্দ্দ্বন্দ্ব-নিত্যসত্ত্বস্থ এবং আত্মবান্ হইয়া ত্রৈগুণ্যের ভাবরহিত হও। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বে ভগবান্ গীতায় এই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। * অর্জ্জুন এই উপদেশ শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি তাহা হইতে পারিয়াছিলেন? তাহা যদি তিনি হইতে পারিতেন, তাহা হইলে অভিমন্যুর মৃত্যুর পর তিনি এতটা শোকাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন কেন? কারণ, নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া সকলের সাধ্য নহে। অর্জ্জুনের ন্যায় (যিনি উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং যিনি জ্ঞাতিবধের ভয়ে

* আজকাল জনকয়েক নব্য প্রত্নতাত্ত্বিক অদ্ভুত গবেষণাবলে স্থির করিতেছেন যে; বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের পর বর্ত্তমান প্রচলিত ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। সার আর জি ভাণ্ডারকর বলেন যে, গীতা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। সার রাধাকৃষ্ণণ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম হইতে ৩য় শতাব্দীর মধ্যে লিখিত। এই সম্ভবতঃ (Perhaps) কথায় বুঝা যায়, এই শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মতের দৃঢ়তা নাই। তাঁহাদের যুক্তির একটা নমুনা দেওয়া গেল। তাঁহারা বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যে যুক্তিজাল বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব এবং মহাবীরের মতখণ্ডন। অতএব অগ্রে মহাবীর ও বুদ্ধদেব, পরে গীতা। এ যুক্তি নিতান্ত পল্লবগ্রাহিতার লক্ষণ। বুদ্ধদেব গৃহস্থ যুবকদিগকে কৃষিবিদ্যা, গো-পালন, দুগ্ধ-ব্যবসায় এবং উটজ শিল্প-শিক্ষা দিতে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনই তাহাদিগকে উচ্চতর শিল্প-বিদ্যা, হিসাবরক্ষা, রাজনীতি এবং সমরবিদ্যা শিক্ষা দিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, ইহাও বুদ্ধদেবের মত ছিল। যুদ্ধ করিবার প্রয়োজনই যদি না থাকিত এবং উহা হিংসামূলক বলিয়া বর্জ্জনীয়, ইহাই যদি বুদ্ধদেবের মত হইত, তাহা হইলে তিনি সংসারীর পক্ষে ঐ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে বলিবেন. কেন? প্রত্নতাত্ত্বিকরা আরও বলেন যে, গীতার ৩য় অধ্যায় ২৬ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফলাসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া দেওয়া উচিত নহে। ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন সাধক ও লোকসংগ্রহের জন্য স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইবেন। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন,—ইহা বুদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের উত্তরে হিন্দুদিগের কথা। সুতরাং গীতার আগে বৌদ্ধধর্ম্ম। এ যুক্তি নিতান্তই বালকোচিত। হিন্দু চিরকালই বলিয়া আসিতেছেন যে, যাহারা জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ গ্রহণে অশক্ত, তাহারাই কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিবে। হিন্দুর চারি আশ্রম এবং অধিকারভেদব্যবস্থা বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও যে ছিল, ইহা বুদ্ধদেবের উক্তি হইতেই বুঝা যায়। সুতরাং এই যুক্তি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন) আত্মজয়ী ব্যক্তির পক্ষে যাহা করা সম্ভব হয় নাই,—সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা করা কি সম্ভবে ? অথচ বুদ্ধদেব সাধারণ লোককে এই প্রকার নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে বলিয়াছিলেন। কর্ম্ম দ্বারা প্রথমে চিত্তশুদ্ধি করিতে তিনি উপদেশ দেন নাই। সেই জন্য লোক মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া ভ্রান্তিজালে পতিত হয় এবং তাহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটে। সে কথা আমি পরে বলিতেছি।

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিবার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোনপ্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। অন্ততঃ ঐরূপ সংঘর্ষের কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দুই শত বৎসরের কিছু অধিককাল পরে অশোক প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ এবং ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে নানাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারসাধন করেন। তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে সকল মলিনতা আসিয়াছিল, তাহার সংশোধন করিবার জন্য তৃতীয় বৌদ্ধ-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই এই বৌদ্ধধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত ও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম করিয়াছিলেন। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। বুদ্ধদেব তাঁহার জীবদ্দশাতেই নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নারীদিগকে শ্রমণধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। যখন তিনি তাহাদিগকে ভিক্ষুণী করিয়াছিলেন, তখনই তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "আনন্দ! আজ আমি আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বিনাশের বীজ বপন করিলাম।" হইয়াছিলও তাহাই। রাজা অশোকও নারীদিগকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকের কাযে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে তাঁহার পুত্র মহিন্দকে (মহেন্দ্র ?) এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্তাকে পাঠাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও তিনি নানা স্থানে ভিক্ষুদিগের সহিত ভিক্ষুণীদিগকেও ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা কাশীখণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়। অশোকের রাজত্বকালে কাশীতে দিবোদাস নামে এক ধর্ম্মিষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরব্ধ হয়। তখন স্বয়ং বিষ্ণু বৌদ্ধধর্ম্ম-রূপে কাশীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং লক্ষ্মী পরিব্রাজিকা বিজ্ঞানকৌমুদী নাম ধারণ করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। গরুড় পুণ্যকীর্ত্তি নামে বুদ্ধদেবের শিষ্য এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষ-দিগের মধ্যে এবং বিজ্ঞানকৌমুদী নারীদিগের মধ্যে বৌদ্ধ-মত প্রচার করিতে থাকিলেন। এই প্রকারে কাশীতে বৈদিকধর্ম্ম প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, ইহা কি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক কাশীতে ধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী ? বুদ্ধদেব প্রথমে কাশীর সন্নিহিত মৃগদাবে (বর্ত্তমান সারনাথে) তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই সময় বা তাহার কিছুকাল পরে তাঁহার পক্ষে কাশীতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে তিনি বিজ্ঞানকৌমুদী নামক কোন পরিব্রাজিকাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান নাই, ইহা নিশ্চয়। কারণ, তাহা যদি যাইতেন, তাহা হইলে কোন না কোন জাতক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত। ঋষিপত্তন বা মৃগদাবে তিনি কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি যাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম দীক্ষাদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পুণ্যকীর্ত্তি নামে কেহ ছিলেন না। বুদ্ধদেব যখন সারনাথে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন বারাণসীর যশ নামে এক জন শ্রেষ্ঠী ও তাঁহার চারিজন গৃহী বন্ধুও তাঁহার নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ চারিজনের নাম সুবাহু, পুন্নজি, গবম্পতি এবং বিমল। ইহার মধ্যে পুন্নজির নামের সহিত পুণ্যকীর্ত্তি নামের সাদৃশ্য আছে। ইনি যে বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। ঐ সময়ে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ৬০ জনের অধিক হয় নাই। মহাবগ্গে সে কথা আছে। ঐ সময়ে তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রব্রাজিকা গ্রহণ করিবার নিয়মও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই জন্য ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, কাশীখণ্ডে বর্ণিত বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার বুদ্ধ-দেবের পরবর্ত্তী কালে ঘটিয়াছিল। কাশীখণ্ডে বিষ্ণুর যে বুদ্ধরূপ পরিগ্রহের কথা আছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম। কারণ, বুদ্ধ তথায় কোন ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য করেন নাই। তাঁহার শিষ্য পুণ্যকীর্ত্তি, তস্য শিষ্য বিনয়কীর্ত্তি এবং বিজ্ঞানকৌমুদীই তাহা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার জীবদ্দশায় কোন পরিব্রাজিকা বা ভিক্ষুণীকে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই।

পুরাণাদির ভিতর কোন ঐতিহাসিক তথ্য লুক্কায়িত আছে, অনেকে ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহা অবশ্য তাঁহারা তাঁহাদের য়ুরোপীয় গুরুদিগের অনুকরণে করিয়া থাকেন। কিন্তু আজকাল দেখিতেছি, স্রোতের গতি বিপরীত দিকে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ কেহ পৌরাণিক আখ্যায়িকায় ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, ইহা স্বীকার করিতেছেন। এ কথা সত্য যে, পূর্ব্বে পুরাণগুলির রক্ষক ছিলেন ব্যাসগণ বা কথক ঠাকুররা। তাঁহারা সূত এবং মাগধদিগের নিকট হইতে তথ্য জানিয়া লইয়া তাহা রূপক আকারে বা আখ্যায়িকাভাবে তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং কথকতাকালে লোক-রঞ্জনের জন্য তাহা একটু পল্লবিত বা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণিত করিতেন। এইভাবে কোন কোন পুরাণে কিছু কিছু অংশ যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে এবং মহাবস্তুতে এইরূপ অনেক শিক্ষাপ্রদ অলৌকিক উপাখ্যান আছে। সেজন্য যদি জাতক গ্রন্থগুলিকে অপ্রামাণ্য না কর, তাহা হইলে গরিব হিন্দুদিগের উপাখ্যান-সম্বলিত পুরাণগুলিকে অপ্রামাণ্য বলিয়া বর্জ্জন করিবে কেন?

বৌদ্ধধর্ম্ম কি প্রকারে দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল, জাতক গ্রন্থে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের আখ্যায়িকা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিষ্ণুপুরাণকে অনেকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। বিষ্ণুপুরাণের আখ্যায়িকাটি এইরূপ :—পুরাকালে দেবাসুরের অতি ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অসুরগণ জয়লাভ করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য বিস্তার করে। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া মায়ামোহকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, এই মায়ামোহই দৈত্যগণকে বেদাচার হইতে পরিভ্রষ্ট করিবে। তখন মায়ামোহ এই জগৎ মিথ্যা স্বপ্নবৎ অলীক, এই কথাই বলিতে থাকেন। ফলে তাহারা শূন্যবাদই গ্রহণ করে। কারণ, মায়ামোহ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, এই জগৎ আধারশূন্য, অর্থাৎ ইহার মূলে কিছুই নাই। ইহা নাস্তিক্য মত। অবশ্য বৌদ্ধদিগের মধ্যে নানামত ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। যথা—(১) বৈভাষিক, (২) সৌত্রান্ত্রিক, (৩) যোগাচার এবং (৪) মাধ্যমিক। ইহার মধ্যে মাধ্যমিকরা কিছুই মানেন না। তাঁহারা না মানেন বিজ্ঞান, না মানেন বাহ্যবস্তু। তাঁহাদের মতে সবই ভুয়া। তাঁহারা শূন্যবাদী; সুতরাং পরমাত্মাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বৈভাষিক ও সৌত্রান্ত্রিকরা বাহ্যবস্তু ও বিজ্ঞান এই দুইই স্বীকার করেন। যোগাচারমতাবলম্বীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু বিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করেন। বলা বাহুল্য, ইহা দার্শনিক বিভাগ। মায়া-মোহই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারকরূপে বৌদ্ধদিগের মধ্যে এই প্রকার মতভেদের সৃষ্টি এবং বৌদ্ধদিগকে প্রকৃত বৈদান্তিক মত হইতে পরিভ্রষ্ট করেন—ইহা বিষ্ণুপুরাণের ঐ উক্তি হইতে অনুমিত হয়। কারণ, মায়ামোহ রক্তবসন পরিয়া এবং নয়নে অঞ্জন লেপন করিয়া (অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশে) বৌদ্ধদিগকে এই উপদেশ দিতে থাকেন যে, এই জগৎ বিজ্ঞানময়, আধারশূন্য এবং স্বপ্নের ন্যায় ভ্রান্তিজ্ঞানপূর্ণ। বৌদ্ধধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ এইরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। বেদান্তদর্শন যোগাচারমতাবলম্বীদিগকে শূন্যবাদী বলিয়া তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। জগৎ বিজ্ঞানময়, এ কথার অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, স্বপ্নে যেমন কেহ নানা হর্ম্ম্যাদি-শোভিত, উদ্যানখচিত নগরের অস্তিত্ব দেখিতে পায়, তেমনই আমরাও এই বাহ্যবস্তু প্রভৃতি সম্বলিত বিচিত্র বিশ্বটি দেখিতেছি; স্বপ্নে দৃষ্ট নগরীর ন্যায় ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। ইহার মূলেও কিছু নাই। মাধ্যমিকরা বলেন, বিজ্ঞানও কিছু নহে, বাহ্যবস্তুও কিছু নহে। সবই শূন্য; এই বিশ্ব শূন্যময়। ইহাতে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে মূল বৌদ্ধমতকে বিকৃত করিয়া উহার ভিতর নানা মতের বা বাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র এবং সকল ব্যাপারেই তাহা হইয়া থাকে। কেবল বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দায় বৌদ্ধপ্রচারকগণ একমত ছিলেন।

এখন এই বৌদ্ধদিগের মধ্যে নানা মত ও নানা সম্প্রদায় জন্মিয়াছে। এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে জাপানে বৌদ্ধদিগের ১২টি সম্প্রদায় আছে। তাহার মধ্যে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ বিদ্যমান।* চীনদেশেও বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের

* There are more than a dozen sects of Budhism now in Japan, several of which have numerous sub-sets. C. Pfoundies on the Religions of Japan.

বহু সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায় আছে। কাল সহকারে বহু ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মতের সঙ্ঘর্ষে নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সহস্রাধিক বর্ষে যে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের তাহা হইয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন হেতু নাই। তবে উহার মধ্যে নিরীশ্বরবাদের এবং মায়াবাদের বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, ইহা অনেকটা বুঝা যায়। এই সময়েই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব ঘটে।

শঙ্করাচার্য্য যে ভাবে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহাতে যেন বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে নিরীশ্বরবাদটি অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। বহ্লিক দেশে তাঁহার সময়ে মাধ্যমিকমতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। শক নরপতি কনিষ্কের সময় হইতে মাধ্যমিকগণ এই দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব তথায় উপস্থিত হইলে মাধ্যমিকমতাবলম্বী জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি শঙ্করকে বলেন, ব্রহ্মে ও শূন্যে ত কোন প্রভেদ নাই। আপনি যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহা নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ এবং বাক্য ও মনের অগোচর। আপনার মতে এই দৃশ্যমান জগতের সত্তা যেমন ব্রহ্ম, আমাদের শূন্যও ত তাহাই।

যতীশ্বর শঙ্কর তাহার উত্তরে বলেন যে, আপনাদের শূন্যবাদ ও আমাদের ব্রহ্মবাদ এক হইতেই পারে না। কারণ, নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই পারে না। অর্থাৎ একটা কিছুর অধিষ্ঠান বা স্থিতি না থাকিলে ভ্রম হয় না। রজ্জু থাকিলেই তাহাতে সর্পভ্রম হয়, রজ্জু না থাকিলে ত তাহাতে সর্পভ্রম হয় না। আমাদের ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, সেই জন্য তাঁহাতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের ভ্রম হয়।

এইরূপ অনেক তর্ক-বিতর্কের পর মাধ্যমিক বৌদ্ধাচার্য্য মহাশয় পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, বিজ্ঞান হয় কাহার? যাহার বিজ্ঞান হয়, তাহারও ত অস্তিত্ব থাকা চাই।

তখন এক জন যোগাচারী বৌদ্ধ বলেন যে, ঠিক কথা। বিজ্ঞান না থাকিলে শূন্য বলিবেই বা কে? সেই জন্য আমরা এই বিশ্বকে বিজ্ঞানস্বরূপ বলি। এই জন্য আমরা সমস্তই বিজ্ঞানস্বরূপ বলি। তবে উহা ক্ষণিক অর্থাৎ নিয়ত উৎপত্তি এবং বিনাশশীল বলিয়া আমরা উহাকে সদৃশ সবিষয়ক বিজ্ঞানের ধারা কল্পনা করি।

শঙ্করাচার্য্য তাহার উত্তরে বলেন,— এ মতও ঠিক নহে। কারণ, স্থির বস্তুর যে প্রবাহ বা অবস্থান্তর, তাহাকেই ধারা বলা যায়। যাহার উৎপত্তি ও নাশ হইতেছে, তাহার মূলে একটা স্থির বস্তু থাকা চাই। ঘটের উৎপত্তি এবং নাশ স্বীকার করিতে গেলে তাহার মূলে মৃত্তিকারূপ একটা স্থির বস্তু থাকা চাই। যদি এই বিশ্বব্যাপারকে একটা বিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার মূলস্বরূপ একটা স্থির বিজ্ঞান স্বীকার করুন। নতুবা এই বিজ্ঞান হইবে কাহার? ক্ষণিক বিজ্ঞানের মূলে একটা স্থির বিজ্ঞান মানিয়া লওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, আপনারা যাহাকে ক্ষণিক বলিতেছেন, ক্ষণকালের জন্য তাহার স্থিতি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। নতুবা তাহার ক্ষণিকত্ব হয় না। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি নাশ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উৎপত্তিক্ষণের এবং বিনাশক্ষণের মধ্যে একটা স্থিতিক্ষণ মানিতে হয়। উৎপত্তি এবং নাশ একসঙ্গেই হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ত উৎপত্তিই হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব বলেন যে, অলৌকিক বিষয়ে নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞের বাক্যই প্রমাণ। সেই সর্ব্বজ্ঞের উপদেশই বেদ। ভগবান্ বুদ্ধদেব বেদজ্ঞান সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করেন। আপনারা তাঁহার কথা না বুঝিয়াই যত গোল বাধাইতেছেন। আচার্য্য শঙ্কর বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানিতেন। তিনি দশাবতার-স্তোত্রে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত কালবশে বিকৃত হইয়া পড়াতে বুদ্ধদেব উহার প্রতিবাদ করিয়া উহার স্থানে বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের আর একটি বিকৃতি ঘটিয়াছিল। উহাতে মায়াবাদের অতিশয় বাড়াবাড়ি করা হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ, বিশেষতঃ মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ,—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে মায়া বা ভ্রান্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। উহা একেবারে শূন্যের উপরে স্থাপিত হয়। হিন্দুর উপনিষদেই মায়াবাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু

উহা শূন্যের উপর স্থাপিত নহে। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধদিগের, অন্ততঃ পরবর্ত্তী যুগের বৌদ্ধদিগের এই উৎকট শূন্যমূল মায়াবাদকে সংস্কৃত ও সমুজ্জ্বল করিয়া এক সুন্দর দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের এই মায়াবাদ এক সময়ে এরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, চীনদেশ হইতে ইৎসিং, ফাহিয়ান, হুয়েন্থ সাং প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মহাযান মতে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ভারতীয় বৌদ্ধগণের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যও এই মায়াবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"অজ্ঞানং ভ্রম ইত্যাহুর্বিজ্ঞানং পরমং পদম্।
অজ্ঞানং চান্যথাজ্ঞানং মায়ামেতাং বদন্তি তে।
ঈশ্বরং মায়িনং বিদ্যান্মায়াতীতং নিরঞ্জনম্।
সদানন্দে চিদাকাশে মায়ামেঘস্তড়িন্মনঃ॥"

"জ্ঞানীরা অজ্ঞানকেই ভ্রম বলেন আর বিজ্ঞানকে বলেন পরমপদ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তব্য বস্তু। অজ্ঞান বলিলে অন্যথাজ্ঞানকে বা ভ্রান্তজ্ঞানকেই বুঝায়, জ্ঞানের অভাবকে বুঝায় না; এই অজ্ঞানকেই পণ্ডিতরা মায়া বলিয়া জানিবেন। ঈশ্বরকে মায়া বলিয়া জানিবে, কিন্তু তিনি মায়ার অতীত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল। সদানন্দস্বরূপ চিদাকাশে মায়াই মেঘ এবং মনই বিদ্যুৎ।" এই মায়ায় বা ভ্রান্তজ্ঞানে সকলে আচ্ছন্ন। কিন্তু ইহার অন্তরালে একটি নিত্যসত্তা আছে। সেই সত্তাই ব্রহ্ম। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন :—

"সৃষ্টির্নাম ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দবস্তুনি।
অব্ধৌ ফেনাদিবৎ সর্ব্বনামরূপপ্রসারিণা॥ বাক্যসুধা ১৪

সমুদ্রে যেমন ফেন, বুদ্বুদ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মে সমস্ত নাম ও রূপের বিকাশ ঘটে, তাহাকেই সৃষ্টি বলে।

ইহাই হইল শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ। বুদ্ধদেব মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মায়ার অন্তরালে যে স্থিরসত্তা ব্রহ্ম আছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই। সেই জন্য প্রশিষ্যগণ একেবারে পরব্রহ্মকে উড়াইয়া দিয়া সমস্তই মায়াকল্পিত বলেন। শঙ্করাচার্য্য এই বিকৃত-বৌদ্ধ মতকে খণ্ডন করিয়া বৈদান্তিক মতকে স্থাপন করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ডকে ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয় লইয়া স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া বিষম ভুল করিয়াছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানী না হইলে কেহ জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করিতে পারেন না। যিনি যত বড় শক্তিশালী এবং ঐশী শক্তিশালী ব্যক্তি হউন না কেন, কাহারও কথায় যেমন সকল মানুষ মন হইতে হিংসাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহার কথায় সকলেই জ্ঞানী হইতে পারে না। সাধারণ মানুষ পূজা অর্চ্চনা করিতে এবং আড়ম্বরবহুল উৎসবাদি করিতে ভালবাসে। ঐরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়া যাইলে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়। মানুষের মন ঐরূপ বাহ্য পূজা চায়। সেই জন্য মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণ অনেক তান্ত্রিক দেবতাকে তাঁহাদের দেবতার মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। উহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মের ঘোর অবনতি ঘটে। বৈশালীর বৌদ্ধ সম্মেলনে বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। একটির নাম স্থবিরবাদ আর একটির নাম মহাসঙ্ঘিক। মহাসঙ্ঘিকরা ক্রমে মহাযান নামে খ্যাতিলাভ করেন। ক্রমে মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে। রাজা হর্ষের সময়ে লিখিত নাগানন্দে এবং যশোবর্ম্মার সময়ে লিখিত মালতীমাধবে বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের যে বিবরণ দেখিতে পাই, তাহা কোনমতেই সন্তোষজনক নহে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাযানীর যোগাচারী সম্প্রদায় মন্ত্রযানে পরিণত হয়। উহা হইতে কালচক্রযান এবং বজ্রযান নামক ভয়ঙ্কর দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাহাদের প্রভাবে জঙ্গলীতারা, বজ্রবরাহী, বজ্রতারা, মারীচী প্রভৃতি দেবীগণ বৌদ্ধদিগের পূজার দেবতা হইয়া দাঁড়ান। ইহাঁরা কতকগুলি হিন্দুর তন্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা ভিন্ন মঞ্জুশ্রী, অক্ষোভ্য, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি দেবতা মহাযানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রবেশ করে। এই তান্ত্রিকভাব বৌদ্ধধর্ম্মে ঠিক কোন্ সময়ে প্রবেশ লাভ করে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারেন নাই। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সকলে এই বিষয়ে একমত নহেন। ঐরূপ মতভেদের প্রধান কারণ, তাঁহাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত একেবারেই অনুমানমূলক বা আন্দাজী। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নয়নসমক্ষে যে সকল ঘটনা

ঘটিতেছে, তাহারই সকল বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ করা কত কঠিন, তাহা সকলেই ভাবিয়া দেখুন। সুতরাং দেশের লোকের চিরাগত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে সেই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দৃঢ় তথ্যের উপর স্থাপন করা আবশ্যক। মহাদেব এক স্থলে পার্ব্বতীকে বলিতেছেন যে, "হে পার্ব্বতি, তুমি ভারতে যাইয়া এই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার কর।" এই উক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তান্ত্রিকধর্ম্ম বিদেশ হইতে ভারতে আনীত। এইরূপ সিদ্ধান্ত যে কতদূর অভ্রান্ত হইবে, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন।

কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তান্ত্রিক উপাসনা প্রবেশ করিয়াছিল, এবং কে কোন্ স্থানে কিরূপে উহা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তান্ত্রিক ধর্ম্ম অতি প্রাচীন, উহা অর্ব্বাচীন নহে। অধ্যাপক শ্যাম শাস্ত্রীর মতে খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের পরিচয় মিলে। * খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর কতকগুলি মুদ্রার উপর যে সমস্ত দুর্ব্বোধ্য চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার মতে তান্ত্রিক যন্ত্র। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, অথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরীয়, আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক-গ্রন্থে তান্ত্রিক যন্ত্রের ও চক্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। † সৌন্দর্য্য-লহরীর ৩২শ শ্লোকের টীকায় লক্ষ্মীধর তন্ত্রের বৈদিকত্ব সপ্রমাণের জন্য তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক হইতে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ‡ সুতরাং দেখা যায় যে, কতকগুলি বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে বৈদিক যুগ হইতে তান্ত্রিক মত এ দেশে চলিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বেও যে এই ভারতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু ঠিক কোন্ সময় হইতে তান্ত্রিকাচার বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতে আরম্ভ করে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

তবে এ কথা সত্য যে, তান্ত্রিক আচার বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটাইয়াছিল। যে বুদ্ধদেব পার্থিব ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া অতি নির্ম্মলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধদেবের ধর্ম্মে "সুখেন প্রাপ্যতে বোধিঃ সুখং ন স্ত্রীবিয়োগতঃ।" সুখের মধ্য দিয়াই বোধি (বুদ্ধত্ব) লাভ করা যায়, কিন্তু স্ত্রী-বর্জ্জন করিলে ত সুখ হয় না।" এবং

"দুস্তরৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানৈর্ন সিধ্যতি।
সর্ব্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিধ্যতি।
তথাগত গুহ্যক।

কঠোর নিয়মপালন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না,—সর্ব্ববিধ কামের উপভোগ দ্বারাই মানুষ শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করে। হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধ তন্ত্রের এই ভাবের উক্তির কোন গূঢ় অর্থ আছে কি না, তাহা আমি জানি না। তবে ইহার আপাত-প্রতীয়মান অর্থই মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্রে যেরূপ বিধি-নিষেধের গণ্ডী আছে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা তাহা লঙ্ঘন করিয়া একেবারে ভোগবিলাসের সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নৈতিক কঠোরতার প্রতিক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ইংলণ্ডে পিউরিটান দল যে নৈতিক কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, মানুষের স্বভাবধর্ম্মের নিয়মবশে এক শত বৎসর যাইতে না যাইতে দ্বিতীয় চার্লসের আমলে তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল। ভারতেও যে সেই নিয়মবশে বৌদ্ধদিগের নৈতিক কঠোরতার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় নাই, তাহা হইতেই পারে না। তবে কোন্ সময়ে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিতে আরম্ভ করে, তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, শঙ্করাচার্য্য যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তান্ত্রিকতার অপব্যবহারফলে বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর অবনতি ঘটিয়াছিল। শঙ্করবিজয়ের বিবিধ বিবরণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালচক্রযানে ত বুদ্ধদেবকে পর্য্যন্ত পিশাচরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অপরস্য কিং ভবিষ্যতি!

কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে তান্ত্রিকতা প্রভৃতি আসিয়া আশ্রয় করিয়াছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত জানা না গেলেও আমার এই প্রবন্ধের কোন ক্ষতি নাই। কারণ, এ কথা সত্য যে, শঙ্করাচার্য্য যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিবাদ

* Indian Antiquary 1906 P 271
† Indain Antiquary 1906 P 262-267
‡ হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখামালা ১মখণ্ড "তন্ত্রের প্রাচীনতা প্রামাণ্য" ১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

করিয়াছিলেন, তখন যে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে বিশেষভাবে অবনত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা শঙ্কর-বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। শঙ্করের জন্মসময় সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয়দিগের মধ্যে বিষম মতভেদ। যাহা হউক, তিনি যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিশেষ সংশয় করিবার কারণ নাই। এই সময়েই ভাক্ত তান্ত্রিকাচার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম অধঃপতিত হইয়াছিল। সেই কলুষিত বৌদ্ধধর্ম্মই শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হয়। শঙ্করাচার্য্য অতি অল্পদিনই জীবিত ছিলেন। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বা তাহার অল্পদিন পরেই ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, ইহা বলিলে বোধ হয় বিশেষ অন্যায় হয় না।

এ কথা সত্য যে, ঐ সময় ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইলেও উহা একেবারে নিঃশেষে নির্ব্বাসিত হয় নাই। উহার অবশেষ ছিল এবং এখনও উহার অতি ক্ষীণ অবশেষ আছে। শঙ্করের পর উহার যে অবশেষ ছিল, তাহা মুসলমান আক্রমণে প্রায় লুপ্ত হয়,—কিন্তু তখনও উহা নিঃশেষ হয় নাই। উহার অতি ক্ষীণ অবশেষ এখনও আছে। ২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গায় প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমার দিন যে ধর্ম্ম-সন্ন্যাসের মেলা হয়, তাহা এই বৌদ্ধধর্ম্মের অতি ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। মুচি জাতিরা ঐ উৎসব করে। উহারা সোলার শ্বেত ছত্র ও মাটী দিয়া স্তূপ ও ধমকের মত প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ মুচিরা এখন আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও উহাদের ঐ উৎসব যে তাহাদের বৌদ্ধত্বের প্রমাণ দেয়, তাহা তাহারাই বুঝে না। এবার বোধ হয় ৪ঠা কিম্বা ৫ই অগ্রহায়ণ ঐ ধর্ম্ম-সন্ন্যাসের বাজার বসিবে। সুতরাং উহার একটু অবশেষ যে এখনও আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

গৌতম বুদ্ধ জাতিভেদ মানিতেন কি না, ইহা লইয়া একটা কথা আছে। বুদ্ধদেব যে জাতিভেদের বা বর্ণ-ভেদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। অধিকন্তু বৌদ্ধদিগের মতে বর্ত্তমান কল্পের নাম মহাভদ্র কল্প। এই কল্পে পাঁচ জন বৌদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন। ইঁহাদের নাম কুকুসন্দ, কোনগমন, কশ্যপ, গৌতম ও মৈত্রেয়। তন্মধ্যে প্রথম চারি জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বুদ্ধ মৈত্রেয় এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধাচার্য্যগণ বলেন যে, বুদ্ধগণ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়-বংশেই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কখনই বৈশ্য বা শূদ্রের কুলে জন্মগ্রহণ করেন না। কশ্যপ বুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে, এবং গৌতম বুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য দুই জনও ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন। ইহাতে কি পরোক্ষভাবে জাতিভেদ স্বীকার করা হইল না? বুদ্ধের ন্যায় পবিত্র ব্যক্তিকে যদি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিতে হয়, তাহা হইলে জাতিভেদের কৌলিক শক্তি অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বুদ্ধদেব জাতিভেদ মানিতেন না,—এ কথা ঠিক স্বীকার করা যায় না। তবে তাঁহার মতে সকলেই সাধন দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণগণকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধদিগের অষ্টাঙ্গিক মার্গে বলা হইয়াছে।—

"অত্থি লোকে সমণ-ব্রাহ্মণা সম্যগ্‌গতা সন্মাপটিপন্না যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সয়ং অভিজ্ঞঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তি" ইহার অর্থ এই—মনুষ্যভূমিতে মনুষ্যলোকে সমচিত্ত, বিশিষ্ট সম্যক্ শীলাদি আচরণযুক্ত সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ শ্রমণ ব্রাহ্মণাদি আছেন, যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে বুঝা যায়, বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদিগকে অস্বীকার করিতেন না, বা তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেন না। সুতরাং বুদ্ধদেব যে জাতিভেদ মানিতেন না, এ কথা ঠিক নহে।

বুদ্ধদেব ২৯ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে রাজগৃহে অলার এবং রমাপুত্র বা উদ্রক নামক দুই জন ব্রাহ্মণের নিকট হিন্দুর শাস্ত্র সম্বন্ধে ও সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের উপদেশে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। প্রকাশ, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞানকাণ্ডেরই উপদেশ দিয়াছিলেন, কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে উপদেশ দেন নাই। ইহা অনুমানমাত্র হইলেও যেন কতকটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, তিনি রাজগৃহ হইতে গয়ার নিকটস্থ উরুবিল্ব জঙ্গলে যাইয়া ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যা করেন; কিন্তু তথায় তিনি উপবাসে ক্লিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত

হন। তাহার পাঁচ জন শিষ্য এই ব্যাপার দেখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এত কষ্ট করিয়াও তিনি সত্যের ও আনন্দের সন্ধান পান নাই। তৎপরে তিনি নৈরঞ্জনানদীতীরে অশ্বত্থবৃক্ষের তলে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তপশ্চরণ-কালে তিনি মারকে বা কামকে জয় করিয়াছিলেন। সাত সপ্তাহকাল তিনি উরুবিল্বের জঙ্গলে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়াছিলেন। যে 'একান্ত সুখের' সন্ধানে তিনি ফিরিতেছিলেন, এইবার তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর সারনাথে যাইয়া তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন।

এই বিবরণ পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধদেব ঐ দুই জন ব্রাহ্মণের নিকট অধিক দিন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। কারণ, যিনি ঊনত্রিংশ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ছয় বৎসর কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে নৈরঞ্জনাতীরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি যে অধিক দিন ঐ ব্রাহ্মণদ্বয়ের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই, ইহা বেশ বুঝা যায়। সেই জন্যই উর্সলী বলিয়াছেন যে, "তিনি যদি তাঁহার প্রাথমিক ভ্রমণ-কালে দুই জন বিশিষ্ট-জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাইতেন, তাহা হইলে প্রাচীন জগতের সমস্ত ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত", ইহা সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি সাধারণ পল্লীভাষায় (মগধী পালিভাষাতে) উপদেশ দিতেন। কোন বড় পণ্ডিতের সহিত যে তিনি শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, তিনি মানবের হিতার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন ; সে জন্য তিনি সকলেরই নমস্য। ডক্টর শ্রীমতী রাইস ডেভিস বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব হিন্দুকুলে জন্মিয়াছিলেন, হিন্দুভাবে লালিত-পালিত হইয়া হিন্দুভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। * ওল্ডেনবার্গও ঐরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। † সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক্ নহে। হিন্দুর মতে এই বিশ্ব মায়াময়। তবে ইহার অন্তরালে পরব্রহ্মরূপ সদ্‌বস্তু রহিয়াছে। বুদ্ধদেব এই জগৎকে মায়াময় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার অন্তরালে ব্রহ্মরূপ সদ্‌বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা বলেন নাই ; কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকারও করেন নাই। বরং সময়ে সময়ে স্বল্প কথায় উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আসল বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটি শাখা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

* Buddhism p. 83 84.

† It is certain that Buddhism has acquired an inheritance from Brahminism, not merely a series of its most important dogmas, but what is not less significant to the historians, the bent of his religious thought and feelings which is more easily comprehended than expressed in words.

Buddha p. 62.

বঙ্কিমচন্দ্র

(আবির্ভাবে)

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জননী
গ্রহবশে শীর্ণা যবে মগ্না দুঃখ-কূপে
সপ্তকোটি পুত্র তাঁর শুধু ভাগ্য গণি'
যাপে দিন আলস্যের অবতাররূপে,
সে সময়ে দেবতার আশীর্ব্বাদ-বাণী
স্বর্গ হ'তে লয়ে নামি' দেবদূত তুমি
দেখা দিলে ঘুচাইতে মা'র দুঃখ-গ্লানি-
জাগাইতে মহামন্ত্রে সুপ্ত বঙ্গভূমি।

আদিত্য-উদয়ে যথা জাগে জীবলোক,
পূর্ণ হয় ধরাতল হর্ষ-কলরবে,
তোমার উদয়ে তথা, ওহে পুণ্যশ্লোক,
সচেতন হইল এ বঙ্গবাসী সবে—
পশু-পক্ষী নর-নারী স্থাবর-জঙ্গম
গাহিয়া উঠিল উচ্চে 'বন্দে মাতরম্' !

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

১৭

সিঁড়ি নামিয়া লুলু নিজের কামরায় প্রবেশ করিল। মুমী জিনিষ-পত্র গুছাইতেছিল, টোটো শিকলে বাঁধা। কামরা বেশ বড়, তাহার পাশে স্নানাগার। লুলু অশ্রুচিহ্ন ধৌত করিয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া আসিল। মুমী বলিল, তোমার মন কেমন করছে? তা ত করবেই।

লুলু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল, আর তোমার?

—আমারও করবে বৈ কি! তবে আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, কত দেশ দেখ্‌ব, তাই ভাব্‌ছি।

লুলু এক হাতে কয়েকখানা মাসিক পত্র ও অপর হস্তে টোটোর শিকল ধরিয়া উপরে উঠিল। জাহাজের উপর এক পাশে তাহার নাম লেখা চেয়ার ছিল। লুলু তাহাতে বসিয়া চেয়ারের পায়ায় শিকল বাঁধিয়া দিল। টোটো লুলুর পায়ের কাছে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লুলু একখানা মাসিক পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে অপর যাত্রীরা একে একে আসিয়া নিজের নিজের চেয়ারে উপবেশন করিল। কেহ কেহ পায়চারী করিতে লাগিল। সকলেই আড়চোখে লুলুকে দেখিতেছিল। পাঠে তাহাকে নিবিষ্ট-নয়ন দেখিয়া কেহ কেহ তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে জাহাজের কাপ্তেন আসিয়া লুলুর সঙ্গে আলাপ করিলেন। কহিলেন, আপনি আমার জাহাজে যাত্রী, এতে আমি গৌরব অনুভব করছি। আপনার নাম জানে না, এমন কে আছে? আপনি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছেন। এক দেশ জয় ক'রে অন্য সব দেশ পরাজয় করতে যাচ্ছেন। সমস্ত জগতে আপনার একচ্ছত্র রাজ্য হবে!

লুলু মধুর মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমার রাজ-দরবারে আপনাকে প্রধান মোসাহেব নিযুক্ত করব। আপনি চাটুবাদে সকলকে হারিয়েছেন। এ রকম প্রশংসা শুনলে আমার মাথা ঘুরে যাবে।

কাপ্তেনও হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার শুভ্র কেশ, তীক্ষ্ণ চক্ষুর পাশে কুঞ্চিত চর্ম্ম। অল্পক্ষণ কথা কহিয়া নিজের কার্যে চলিয়া গেলেন। সে সময় আর কাহারও সহিত আলাপ করিলেন না।

লুলুর কোলে খোলা মাসিক পত্র পড়িয়া রহিল। সে তরঙ্গ-চঞ্চল জলের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। মনে পড়িল, আর এক দিন এই রকম জাহাজে আরোহণ করিয়াছিল। তখনও জাহাজের লোকরা কুতূহলী হইয়া তাহাকে দেখিতেছিল, যেমন করিয়া বন্য পশুকে দেখে। লুলু স্বয়ং বিস্ময়-বিহ্বল, কিছু ত্রস্ত, স্বপ্ন দেখিতেছে কিম্বা কোন অন্য লোকে উপস্থিত হইয়াছে, স্থির করিতে পারিতেছিল না। সেই এক দিন আর আজ আর এক দিন। কালের ব্যবধান এক বৎসর মাত্র, কিন্তু এই এক বৎসর যুগান্তর। সেই যে সায়ংকালে লুলু ডিঙ্গী ভাসাইয়া স্থির সমুদ্রে নৌকা বাহিতেছিল, সে সময় জগতের এ মূর্ত্তি সে কি কল্পনা করিতে পারিত? কোথায় সমুদ্রগর্ভে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ, মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা আর কোথায় লক্ষ যোজনব্যাপী এই বিস্তৃত দেশসমূহ, বিপুল জনতাপূর্ণ অসংখ্য মহানগরী! কোথায় সেই অসভ্য অশিক্ষিত কৌশলানভিজ্ঞ বর্ব্বর জাতি আর কোথায় এই সকল সুশিক্ষিত বিচিত্রকুশলী জাতি! এই মহাসাগরে কোন অজানিত স্থানে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ লুক্কায়িত আছে, কোন দিন তাহারই অন্বেষণে লুলুকে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে হইবে।

আহারের সময় কাপ্তেনের পাশে লুলুর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আহারান্তে অনেক যাত্রী লুলুর সহিত আলাপ করিতে চাহিল। কাপ্তেন তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলেন। যাত্রীদিগের মধ্যে অনেক ধনী, কেহ প্রৌঢ়, কেহ যুবা। রমণীরাও কেহ বর্ষীয়সী, কেহ যুবতী। সকলেই লুলুর সঙ্গে কথা কহিবার জন্য উৎসুক, সকলেই তাহার মুখের কথা শুনিতে চায়। অনেকে রঙ্গালয়ে তাহাকে দেখিয়াছিল, সকলেই সংবাদপত্রে তাহার কথা পড়িয়াছিল। লুলু প্রফুল্ল চিত্তে হাস্যমুখে সকলের সহিত বাক্যালাপ করিল। তাহার সরল হাস্য-কৌতুকে, তাহার কথা কহিবার মধুর ভঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইল।

কয়েক দিন নিশ্চিন্তভাবে কাটিল। আকাশ নির্ম্মল, বায়ুর অধিক বেগ নাই, তরঙ্গের তুমুল উচ্ছ্বাস নাই। যাত্রীরা নানারূপ আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাইত। গল্প,

গান, খেলার বিরাম ছিল না। লুলু সকল প্রকার আমোদে যোগ দিত, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রাত্রিতে কখন কখন গান করিত। তাহাকে অপর যাত্রীরা সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকিত। দুই এক জন যুবক যাত্রী তাহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। সাধারণতঃ থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ যে রকম রসিকা হয়, লুলু আদৌ সে রকম নয়। কোন পুরুষের সহিত আড়ালে কথা কহিত না, কাহারও সহিত একা বসিয়া অধিকক্ষণ কথা কহিত না। টোটো সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিত, অনেক সময় মুমীও তাহার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিত। জাহাজের মহিলা যাত্রিগণ লুলুর আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। অধিকাংশ সময় লুলু তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত।

পঞ্চম দিবসে সায়ংকালে পশ্চিমদিকে মেঘ দেখা দিল। অস্তমান সূর্য্য মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত হইল। যেখানে নীল আকাশের সীমা নীল জলে মিশিয়াছে, সেইখানে নীল পটের গায় তরঙ্গের মাথায় তুষার-শুভ্র ফেনমালা দৃষ্ট হইল। সারির পর সারি, একের পর এক, ধবল ফেনের দীর্ঘ পংক্তি অগ্রসর হইতে লাগিল। বায়ু অল্প খর বহিল। কাপ্তেন বায়ুমান যন্ত্র দেখিতেছিলেন। লুলু জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়াছিল, তাহার পাশে আর কয়েক জন আরোহী। কাপ্তেন আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, একটু পরেই ঝড় উঠিবে, তখন আপনাদিগকে নীচে যাইতে হইবে। জাহাজের উপর ঢেউ আসিবার সম্ভাবনা।

ঝড় আসিতেছে শুনিয়া আরোহীরা শঙ্কিত হইল। দুই চারি জন রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ঝড় কি বড় জোরে আস্‌বে? জাহাজের কি কোন আশঙ্কা আছে?

কাপ্তেন বলিলেন, আশঙ্কা কিছু নেই, কিন্তু ঝড় সমস্ত রাত্রি থাক্‌তে পারে। রাত্রিতে আপনাদের পক্ষে জাহাজের উপর আসা পরামর্শ-সঙ্গত হবে না।

লুলু নির্ভীক, নিশ্চিন্ত। কহিল, আমাকে তাড়াতাড়ি নীচে পাঠাবেন না। আমি খানিকক্ষণ ঝড় দেখতে চাই।

কাপ্তেন লুলুর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার মুখে আশঙ্কা অথবা উদ্বেগের কোন চিহ্ন নাই। আগ্রহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। চক্ষু উজ্জ্বল চঞ্চল, নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত। কাপ্তেন বলিলেন, আপনার কোনরূপ আঘাত না লাগে, আমার এই আশঙ্কা। যাহা হউক, আপনি কিছুক্ষণ আমার পাশে থাকিতে পারেন।

সন্ধ্যার পরেই যাত্রীরা আহার করিলেন। সে পর্য্যন্ত বায়ুর বেগ বিশেষ বাড়ে নাই। লুলু কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজের উপর আসিল। তাঁহার দাঁড়াইবার স্থানে তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। আকাশে চাঁদ ছিল না। নক্ষত্র কখন মেঘে ঢাকা পড়িতেছিল, কখন দেখা যাইতেছিল। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গরব অতিক্রম করিয়া দূর হইতে বায়ু-গর্জ্জন শ্রুত হইল। অকস্মাৎ প্রচণ্ড বেগে ঝঞ্ঝা জাহাজকে আঘাত করিল। জাহাজ এক পাশে হেলিয়া পড়িল। লুলু সতর্ক ছিল, জাহাজে ঝড় লাগিবার পূর্ব্বেই লোহার রেলিং চাপিয়া ধরিয়াছিল।

সমুদ্র ও প্রভঞ্জন একত্রে গর্জ্জিয়া উঠিল। সে গর্জ্জনে শ্রবণ বধির হইয়া যায়, হৃদয় কম্পিত হয়। পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ জাহাজে আহত হইল, জাহাজের উপর ভাঙ্গিয়া সমস্ত ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। প্রকাণ্ড জাহাজ ক্ষুদ্র উডুপের ন্যায় দোলায়মান হইতে আরম্ভ হইল। কখন তরঙ্গের শিরোদেশে বহু উচ্চে উঠিয়া যায়, কখন জলের বিশাল গহ্বরে নামিয়া যায়। জড়প্রকৃতির দৈত্যগণ জাহাজকে ক্রীড়নক করিয়া খেলা করিতে লাগিল। কখন কন্দুকের ন্যায় উপরে নিক্ষেপ করে, কখন সমুদ্রের অতল গর্ভে মগ্ন করিবার চেষ্টা করে। চারিদিকে তোলপাড়, মাতালের মত ঢেউ উঠিতেছে পড়িতেছে, উন্মত্ত বায়ু হুঙ্কার দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আকাশে এলোমেলো মেঘ, ঝটিকার ঝঞ্ঝাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আর সেই অবিশ্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গোচ্ছাস, জাহাজের পাশে, জাহাজের উপরে ঘোর-রবে ভাঙ্গিয়া তীব্র তরল প্রবাহে আবার জলে মিশিতেছে। বৃহৎ তপ্ত কটাহে দুগ্ধ যেমন ফুলিয়া ফেন লইয়া উঠে, সেইরূপ ফেন মাথায় করিয়া তরঙ্গ জল হইতে উত্থিত হইতেছে। বাতাসে যেন প্রলয়ের বিষাণ বাজিতেছে, নিসর্গের শান্ত মূর্ত্তি রুদ্র মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, জলে পড়িলে তৃণও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়।

সেই তুমুল আহবে মানুষে ও নিসর্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ। প্রত্যেক তরঙ্গাঘাতে মনে হয়, জাহাজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে,

গহ্বরে পড়িলে মনে হয়, ডুবিয়া যাইবে আর উঠিবে না, কিন্তু মানুষের কৌশল, উদ্যম ও সাহস সহজে পরাভূত হয় না। সমুদ্রে তুফান ত আছেই, তুফানের ভিতর দিয়া জাহাজ নিত্য যাতায়াত করে, যদি একটা জলমগ্ন হয় ত শত শত জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়। পলিতকেশ তীব্রচক্ষু কাপ্তেন অবিচলিত, যখন যাহা আবশ্যক, তখন সেইরূপ আদেশ করিতেছেন। জাহাজের কর্ম্মচারী ও খালাসীরা অসুরের ন্যায় পরিশ্রম করিতেছে! ঝড়ের বেগ একবার অল্প মন্দীভূত হইতেই কাপ্তেন লুলুকে বলিলেন, এইবার আপনি নীচে যান। আপনার অসীম সাহস, কিন্তু আপনি এখানে থাকিলে আমার একটু ভাবনা হয় আর এখানে কোন যাত্রীর থাকা উচিত নয়। এই বেলা আপনি নামিয়া যান।

কাপ্তেনের আদেশমত এক জন খালাসী লুলুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। লুলু অকুতোভয়, সাবধানে, সম্মুখে যাহা দেখিতে পায়, ধরিয়া ধরিয়া নামিয়া গেল। নামিবার পথ আঁটা ছিল, খালাসীরা একবার খুলিয়া, লুলুকে সিঁড়িতে নামাইয়া আবার বন্ধ করিয়া দিল।

লুলু প্রথমে নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে গেল। মুমী ভয়ে ইষ্টদেবতার নাম করিতেছে, টোটো এক পাশে চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। বাহিরে আসিয়া লুলু দেখে, বসিবার ঘরে এক দল যাত্রী ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কেহ রোদন করিতেছে, কেহ প্রার্থনা করিতেছে। কেহ কেহ অসুস্থ বোধ করিয়া নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছে। পুরুষরা অনেকেই নির্ভয়, ভীত ব্যক্তিদিগকে আশ্বাস দিতেছে, নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করিতেছে। লুলুকে দেখিয়া কয়েক জন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

লুলু বলিল, জাহাজের উপর কাপ্তেনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—আপনার ত ধন্য সাহস! সকলে বিস্মিত নয়নে লুলুকে দেখিতে লাগিল।

এক জন বলিল, উপরে ত কাহারও থাকিবার অনুমতি নাই। ঢেউয়ের জলে জাহাজের উপর ভেসে যাচ্ছে, মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আপনি কেমন ক'রে ছিলেন?

—আমার অনুরোধে কাপ্তেন আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। মাঝ-সমুদ্রে এ রকম ঝড় আমি কখন দেখি নি, তাই দেখছিলাম। আর আমার ত কিছুই ভয় হয় নি। এখন আমাকে কাপ্তেন নেমে আস্তে বল্লেন, তাই চ'লে এলাম।

একটি যুবতী কাতর দৃষ্টিতে লুলুর হাত ধরিয়া বলিল, কোন ভয় নেই ত?

—কাপ্তেন ত ভয়ের কথা কিছু বলেন নি। তাঁর অনুমান, শেষ রাত্রিতে ঝড় বন্ধ হয়ে যাবে।

সমস্ত রাত্রি কাহারও নিদ্রা হইল না। স্ত্রীলোকরা অনেকে সারা রাত্রি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। জাহাজের বিষম আন্দোলন, তাহাতেই আশঙ্কা হয়। তাহার উপর ঝড়ের উৎপাতে সকলের হৃৎকম্প হইতেছিল। বায়ু ও মেঘের মিলিত গর্জ্জন, জাহাজের অঙ্গে বজ্রনাদে তরঙ্গাঘাত, মাঝে মাঝে অশনি-সম্পাত। নিসর্গের উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল লীলা!

রাত্রিশেষে ক্রমে ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। প্রভাত হইতে আকাশ পরিষ্কার হইল, খালাসীরা জাহাজের উপর সমস্ত মুছিয়া মার্জ্জন করিয়া পথ খুলিয়া দিল। একে একে আরোহীরা উপরে উঠিলেন। অনেকের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর কোলে কালি পড়িয়াছে, কেবল লুলুর কোন বিকার নাই, প্রসন্নচিত্ত, হাস্যমুখী। তখনও জলে বড় বড় ঢেউ, জাহাজ টলমল করিতেছে।

জাহাজের অবশিষ্ট যাত্রা নিরাপদে সমাপিত হইল। এক দিন প্রভাতে জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিল। লুলু দেখিল, অদূরে বিশাল নগর, যে সহর হইতে সে আসিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। গগনস্পর্শী উচ্চ সৌধমালা, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশতল। জাহাজ তীরে লাগিতেই লুলুর পূর্ব্ব-পরিচিত থিয়েটারের অধ্যক্ষ জাহাজে উঠিলেন। লুলুর আগমন-সংবাদ সহরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য তীরে ও পথে লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধ্যক্ষ লুলুকে সম্ভাষণ করিয়া তাহাকে, মুমীকে ও টোটোকে মোটরে তুলিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে অপর লোক ছিল, সে লুলুর আসবাব সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল। লুলু যে হোটেলে গিয়া উঠিল, তাহা ইন্দ্রভবন তুল্য, গৃহের সজ্জা রাজপ্রাসাদের

বসুমতী-চিত্রবিভাগ

আমার আশায়

শিল্পী—শ্রীরণজিৎ রায় সিংহ
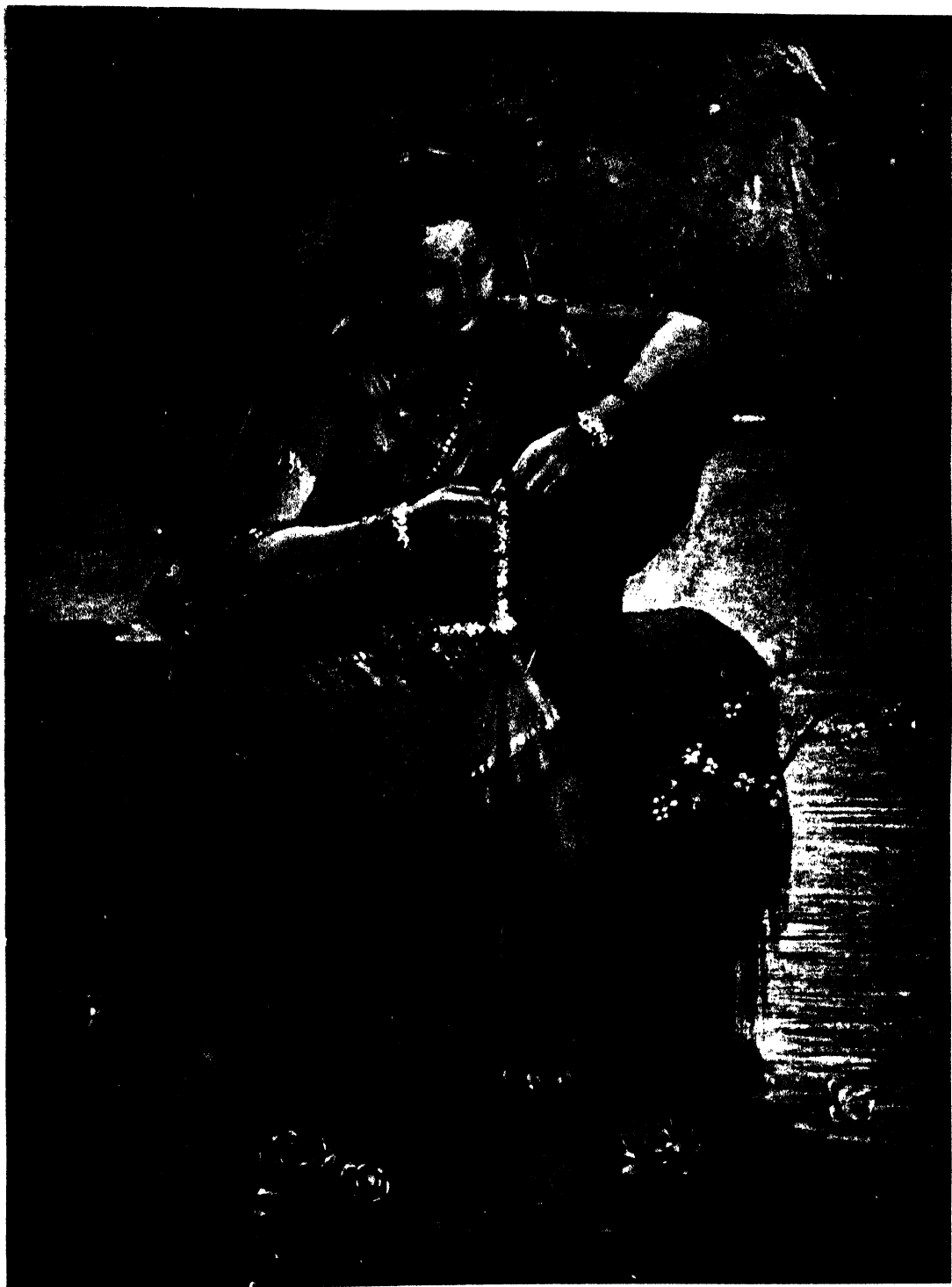
লুলু মুচকিয়া হাসিয়া রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষকে বলিল, আয়োজনের যে খুব ঘটা দেখ্‌ছি। এত খরচ করা কি আবশ্যক ?

—নিতান্ত আবশ্যক। যারা শুধু টাকা বোঝে, তাদের একটু চাল দেখাতে হয়। তোমার জন্য যে ক'টা ঘর নিয়েছি, তাতে কত বড় বড় রাজারাজড়া নেমেছিল। তোমার যেমন নাম, তেমনি টাকা, লোককে তা জানাতে হবে।

—টাকাটা এখনও আস্‌তে বাকি।

—তুমি হাত বাড়াবার আগেই এসে পড়্‌বে। সব চেয়ে বড় থিয়েটার ভাড়া করেছি। প্রথম দশ রাত্রির টিকিট এরি মধ্যে বিক্রী হয়ে গিয়েছে। কত যায়গা থেকে যে টিকিটের টাকা আসছে, তার ঠিক নেই। দু'লক্ষ টাকার উপর টিকিট বিক্রী হয়েচে।

—তেমনি খরচাও ত আছে।

—খরচার বিশগুণ আয় হবে। তুমি দু'দিন বিশ্রাম কর, পরশু থেকে থিয়েটার আরম্ভ হবে। অভিনয়ের জন্য আরও অনেক লোক আছে। আমি এই হোটেলেই তোমার কাছাকাছি একটা ঘরে আছি। এখন আমি যাই, তুমি বিশ্রাম কর। বিকেলবেলা একটা বড় দোকান থেকে তোমাকে পোষাক দেখাতে আসবে। তার পর যেখানে ইচ্ছা হয় বেড়াতে যেও।

—পোষাক আবার কি হবে ?

—আরও কয়েকটা দরকার। তুমি যেমন পছন্দ করবে, সেই রকম ক'রে দেবে।

২০

দুই দিন লুলু বিশ্রামের অবকাশ পাইল। এই সময়ের মধ্যে সে সহর সমস্ত ঘুরিয়া দেখিল। বড় সহর পূর্ব্বেও দেখিয়াছিল, কিন্তু এই বিশাল নগরীর তুলনায় কিছু নয়। এমন লোকের জনতা সে কখন দেখে নাই, এরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যও ইতিপূর্ব্বে তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অট্টালিকা-সমূহের আয়তন বিশাল, যেমন প্রশস্ত পরিসর, সেইরূপ অদ্ভুত উচ্চতা। দোকান-পসার দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। রাশি রাশি বহুমূল্য সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। দলে দলে ক্রেতারা সেই সকল পণ্যশালায় প্রবেশ করিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের বহুমূল্য বেশ, অলঙ্কারও তদনুরূপ। পথে অসংখ্য মোটর, গঠন সুন্দর, উৎকৃষ্ট সজ্জা। নগর যেমন সমৃদ্ধিশালী, নগরবাসিগণ সেইরূপ অকাতরে অর্থ ব্যয় করে।

লুলুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নানা রকম লোক আসিত। সংবাদপত্র-সমূহের লোক ত ছিলই, তাহার উপর প্রধান প্রধান রঙ্গালয়-সংক্রান্ত লোক, ধনী, গুণী, লোকের আর বিরাম ছিল না। অনেক সময় লুলু বাড়ী থাকিত না, অনেক সময় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ তাহাদিগকে ছলে কৌশলে ঠেকাইয়া রাখিতেন; কিন্তু সকল সময় পারিতেন না। কখন কোন সুন্দরী যুবতী রমণী হীরা-মুক্তায় অঙ্গ সাজাইয়া আসিতেন, তাঁহাকে কি বলিয়া বিদায় করা যায় ? যদি শুনিলেন, লুলু বাড়ী নাই, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন, বলিলেন, ভাল কথা, আমি তাঁহার অপেক্ষা কর্‌ব, আমার কোন তাড়া নেই। অগত্যা লুলুকে সাক্ষাৎ করিতেই হইত। রমণী আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেন, আপনার বিষয়ে আমরা খবরের কাগজে কত কি পড়েছি, কত দিন থেকে আপনাকে একবার দেখ্‌বার ইচ্ছে আছে। থিয়েটারের টিকিট আমরা ত সকলেই কিনেছি, কিন্তু থিয়েটারে দেখা এক আর এখানে আপনার কাছে ব'সে আপনাকে দেখা আর এক রকম। আপনার সাবকাশ হ'লে এক দিন আমাদের বাড়ী পায়ের ধূলা দিতে হবে। সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হবে।

লুলু কিছুতে নিস্তার পায় না। সে বুঝাইয়া বলিল, সেখানে বেশী দিন থাকিবে না আর ইহার মধ্যে তাহার অবসর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে কথা কে শুনে ? কোনরূপে অতিকষ্টে লুলু নিষ্কৃতি পাইল।

যাহারা সাক্ষাৎ পাইত না, তাহারা নিজেদের নাম রাখিয়া যাইত। থিয়েটারের অধ্যক্ষ সেই সকল নাম সংগ্রহ করিয়া লুলুকে দেখাইতেন। বলিতেন, এই এত বড় সহরে যারা প্রধান লোক, তারা সকলেই তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়, তোমাকে সম্মান কর্‌তে চায়। এতে শুধু সমাজে প্রতিষ্ঠা নয়, কাযের হিসাবেও লাভ। এই সব লোকের নাম লিখে রাখ্‌তে হবে। অন্ততঃ একবার এদের সকলকে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে।

লুলু কপট বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, এখানেও

আবার সেই হাঙ্গামা! আর আমি একা পারব কেন? এখানে গারা তুলাকা কেউ নেই, নিজের বাড়ীও নেই।

—এমন বাড়ী তুমি কোথায় পাবে? ক'টা বড় বড় কামরা আছে দেখেছ? দু'হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করলেও কোন অসুবিধা হবে না। হোটেলের লোকদের বললে তারা খুব খুসী হয়ে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আর তুলাকা আর গারা নাই বা রইলেন? তুমি বললেই খুব বড় ঘরের মেয়েরা এসে তোমার সহায়তা করবেন।

—বেশ, আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন, তাই হবে।

থিয়েটারে প্রথম রাত্রিতে যেমন ভিড় হইবার কথা, তাহার অপেক্ষাও অধিক। টিকিট বিক্রয়ের ঘর বন্ধ, সেখানে লোক ছিল না। দর্শকরা যাহারা আসিতেছিল, সকলেরই নির্দ্দিষ্ট স্থান। থিয়েটারের সম্মুখে ভিড় সরাইবার জন্য ও ও মোটর শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য থিয়েটারের অধ্যক্ষ পুলিসের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। থিয়েটারের প্রবেশদ্বারে জনতা অধিক না হইলেও, চারিদিকে লোকের ভিড়। তাহারা আর কিছু না দেখিতে পায়, মোটর দেখিবে, মোটরে যাহারা সাজিয়া-গুজিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে দেখিবে। লুলুকে দেখিতে পাইবে, এই তাহাদের প্রধান আশা। কিন্তু লুলুকে কেহ দেখিতে পাইল না। তাহার জন্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ নূতন মোটর আনাইয়াছিলেন। ক্রয় করা তখনও স্থির হয় নাই। বিক্রেতা বলিয়াছিল, উনি যত দিন ইচ্ছা মোটর ব্যবহার করিতে পারেন, পরে ক্রয় করা না করা উঁহার ইচ্ছা। বাজারে একটা মস্ত বিজ্ঞাপন হইয়া গেল। মোটর-চালকও দোকানদারের প্রেরিত। তাহার পাশে লুলুর এক প্রহরী, মোটরের ভিতর লুলুর সম্মুখে বসিয়া মুমী। মোটর বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার। থিয়েটারে পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিবার স্বতন্ত্র পথ: মোটর আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। চালক ও প্রহরী নামিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া দরজার দুই পাশে দাঁড়াইল, লুলু ও মুমী নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। শীতকাল, লুলুর আপাদ-মস্তক ঢাকা, যে কয়েক জন উঁকি-ঝুঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও কিছু দেখিতে পাইল না।

থিয়েটারের অধ্যক্ষ, নট ও নটীগণ সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লুলুকে সকলে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিল। অধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়া লুলুর সুন্দর সজ্জিত কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইতেই লুলুর ডাক পড়িল না। প্রথমে অন্য প্রকার অভিনয় প্রদর্শিত হইল। দর্শকরা লুলুকে দেখিবার নিমিত্তই সমবেত হইয়াছিল, সেই কারণেই পূর্ব্বাহ্নে টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন। শিষ্টতার অনুরোধে দর্শকরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন না, কোলাহল করিলেন না। অপর পক্ষে কোনরূপ উৎসাহ বা আনন্দ প্রকাশ করিল না। অবশেষে যখন লুলু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ রঙ্গালয় আনন্দ-অভিনন্দনে মথিত আলোড়িত হইয়া উঠিল। এরূপ দৃশ্য লুলুর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি সে একবার রঙ্গালয়ের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সেই শ্রেণীবদ্ধ লোকের জনতা, কোথাও শূন্য স্থান নাই। পশ্চাতে স্থানাভাবে কয়েক সারি লোক দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীলোকদিগের বাহু, কণ্ঠ, বক্ষের উপরিভাগ অনাবৃত, তাহাতে হীরামুক্তা জ্বলিতেছে। বার বার করতালির চটচটা শব্দ, সহস্রকণ্ঠে রঙ্গালয় কম্পিত করিয়া অভিবাদন। লুলুর নৃত্যগীত সমাপ্ত হইলে, আবার সেই পুষ্পবৃষ্টি, দর্শকদিগের দণ্ডায়মান হইয়া বার বার আহ্বান—লুলু! লুলু! লুলু!

লুলু সজ্জাকক্ষে ফিরিলে থিয়েটারের অধ্যক্ষ হাত কচলাইতে কচলাইতে হাসিভরা মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, দেখলে ত, কি রকম লোক হয়েছিল! প্রতি রাত্রিতেই এই রকম হবে। কত লোকের আজ যায়গা হয় নি, তারা এর পর আসবে। আর একবার দেখে কারুর তৃপ্তি হয় নি। আজ যারা এসেছিল, এরাই আবার আসবে। টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি মারামারি আরম্ভ হয়েছে। টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু এ দেশে ত টাকার অভাব নেই, দর্শকদের ভিড় কিছুতেই কমবে না। তুমি যত টাকা চাও, মনে কর, এরই মধ্যে তোমার হাতে এসেছে।

লুলু মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, আমার আবশ্যকমত টাকা হ'লেই আমাকে আর দেখতে পাবেন না।

—সে আমার দুর্ভাগ্য। শুধু আমার কেন, লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ হবে। তা তুমি যেমন সঙ্কল্প করেছ, তাই করবে জানি। এখন সে কথা তুলে কায নেই।

সেই যে প্রথম রাত্রি হইতে ভিড় হইতে আরম্ভ হইল, সে স্রোতের বিরাম হইল না। নানা স্থান হইতে দলে দলে

লোক আসিতে লাগিল। রঙ্গালয়ে যেমন তিলমাত্র স্থান নাই, বাহিরেও সেইরূপ জনতা। লুলুর মোটর দেখিলেই কোলাহল আরম্ভ হইত। লুলুর বাসস্থানেও সর্ব্বদা লোক আসিত। অনেকে সাক্ষাৎ পাইত না, কিন্তু তাহাতে কেহই নিরুৎসাহ হইত না।

তিন সপ্তাহ অতীত হইলে অধ্যক্ষের অনুরোধে ও পরামর্শে লুলু কতক লোককে নৈশ সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিল। সে জন্য তাহাকে নিজে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল না। গৃহসজ্জা, আহার্য্য সামগ্রীর সকল প্রকার ব্যবস্থা হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা করিলেন। বিপুল আয়োজন হইল। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিলেন। সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইতেই মহানগরীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অধ্যক্ষের নিকটে নিমন্ত্রণ-পত্রের জন্য অসংখ্য আবেদন আসিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে বলিলেন, সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে কি আমাদের অনিচ্ছা? কিন্তু সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইবার মত স্থান কোথায়? সকলের মনস্তুষ্টি আমরা কেমন করিয়া করিতে পারি? এই দেখুন, আমি এখানকার লোকদের পরামর্শে এই ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়াছি। যদি আপনাদের অনুরোধে আরও কিছু নাম যোগ করি, তাহা হইলে আবার যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের অনুরোধ কেমন করিয়া এড়াইব? স্থানে যেরূপ কুলাইবে, সেই হিসাবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা স্থির করিয়াছি।

এ কথার কোন উত্তর নাই। যাঁহারা অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিলেন, আপনার ফর্দ্দ উত্তম হইয়াছে, কিন্তু একটা কথা আপনার জানা আছে কি? এখানকার সমাজের প্রধান ব্যক্তি দুই জন মহিলা—বেলুলা ও শিরাণী। সকল সম্মিলনেই ইঁহাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। প্রকাশ্যভাবে ইঁহাদের কোনরূপ অসদ্ভাব নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরস্পরের ঈর্ষা করেন। যেখানে এক জন যান, সেখানে আর এক জন সহজে যাইতে স্বীকার করেন না। সেই কারণে এখানে সম্মিলন-সমিতিতে তেমন সুখ নাই। আপনারা যেরূপ লোক সংগ্রহ করিতেছেন, এরূপ এখানে অনেক দিন হয় নাই। ইঁহারা উভয়ে উপস্থিত না থাকিলে বৃহৎ আয়োজন পণ্ড হইবার আশঙ্কা।

অধ্যক্ষ বলিলেন, আমরা দুই জনকেই আনিবার চেষ্টা করিব। লুলুকে অধ্যক্ষ সকল কথা বলিলেন। বলিলেন, এই দুই জনে দলাদলি, অথচ এঁরা দুই জন না থাকলে কোন কাযই হবে না। এঁদের দুই জনকে আনা বড় কৌশলের কায, তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।

লুলু আড়চক্ষুতে চাহিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, আপনি আমাকে খুব ধূর্ত্ত ঠাউরেছেন, কেমন?

অধ্যক্ষ হাসিয়া বলিলেন, সুবুদ্ধি সেয়ানা হ'লে যদি ধূর্ত্ত হয়, তবে তাই। এ ভার তোমার উপর রইল। তুমি তাঁদের দুই জনকে হাত কর, তার পর আমি ঢাক পিটিয়ে দেব।

—খবরের কাগজে যেন ছাপাবেন না, তা হ'লে সব ফেঁসে যাবে।

—এ ঢাক চুপি চুপি বাজাতে হয়, যাকে বলে ঢাক ঢাক গুড় গুড়।

মধ্যাহ্ন অতীত হইলে লুলু বেলুলার বাড়ী উপস্থিত হইল। বেশের সমারোহ কিছুমাত্র নাই, মাথায় একটি ফুল পর্য্যন্ত নাই। উচ্চ প্রশস্ত অট্টালিকায় বেলুলা বাস করেন। সর্ব্বত্র প্রচুর ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন। লুলুর আগমন-সংবাদ পাইয়া বেলুলা তাড়াতাড়ি আসিয়া দুই হাত দিয়া লুলুর হাত চাপিয়া ধরিলেন, উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন, এ কি ভাগ্যি! আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছি!

লুলু বলিল, ভাগ্যি আমার! এসে অবধি আপনার এখানে আস্‌ব ভাবছি, তা ঢেঁকির কপাল জানেন ত! স্বর্গেও ঢকঢকানি বন্ধ নেই।

—বল না কেন, স্বর্গের অপ্সরীর মর্ত্ত্যেও বিশ্রাম নেই!

বেলুলা লুলুকে স্বতন্ত্র আসনে বসিতে দিলেন না, তাহার হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইলেন।

বেলুলা ঠিক সুন্দরী নহেন, কিন্তু মুখে বেশ চটক আছে। বয়স অনুমান ত্রিশের কিছু উপর হইবে, অঙ্গে অল্প স্থূলতা দেখা দিয়াছে। কথাবার্ত্তা বেশ। বলিলেন, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে আপনি বল্‌তে পারি নে।

লুলু বলিল, তা হ'লে আমার মনে দুঃখ হবে। এখন ভরসা হচ্ছে আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হব না।

বেলুলা লুলুর অঙ্গে হস্ত দিয়া বলিলেন, থিয়েটারে তোমাকে ত কতবার দেখেছি, তবে এমন কাছের গোড়ায়

এর আগে ত দেখি নি। উপন্যাসে ত কত অদ্ভুত ঘটনা লেখে, কিন্তু তোমার জীবন-কাহিনী তার চেয়েও আশ্চর্য্য। কোথায় ছিলে তুমি কোন্ অজানা দেশে, বয়সে তুমি এখনও বালিকা বল্‌লেই হয়, এরই মধ্যে এমন দেশ নেই—যেখানে তোমার নাম জানে না, যেখানে তোমাকে দেখবার জন্য হুড়োহুড়ি হয় না।

লুলু বলিল, আমি আপনার কাছে একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি।

বেলুলা বলিলেন, সে কি কথা! আমার কি এমন ক্ষমতা যে, আমি তোমাকে অনুগ্রহ কর্‌তে পারি? তোমার কিসের অভাব?

—দেখুন, অনেকে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসেন, কিন্তু সময়াভাবে সকলের সঙ্গে আমি দেখা কর্‌তে পারিনে। তাই ভাবছি, কতক লোককে একটা সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করব। কিন্তু আমি এখানে নতুন লোক, কাউকে চিনিনে, আমার কত রকম ত্রুটি হ'তে পারে। তাই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, আপনি আমার সহায় হ'লে আমার আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

—এ আর কি এমন বড় কথা! তোমার পার্টির খবর ত খবরের কাগজে বেরিয়েছে আর বোধ হয়, সহর শুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণপত্র পাবার জন্য তোমাকে জ্বালাতন কর্‌ছে! আমাকে দিয়ে যা হ'তে পারে, তাতে আমি হামেহাল রাজি আছি। প্রথম কথা হচ্ছে, কত লোককে তুমি ডাক্‌তে পার, সেই হিসাবে একটা ফর্দ্দ কর্‌তে হবে। সকলের ত আর মন রক্ষা করা যায় না, যথাসাধ্য বাছা বাছা লোক ডাক্‌তে হবে।

লুলু তালিকা বাহির করিল, কহিল, এই দেখুন, একটা ফর্দ্দ তৈরী হয়েছে। কেমন হয়েছে, আপনি বল্‌তে পার্‌বেন। আমার অনুমান এক হাজার লোক ডাকা, তার বেশী পেরে ওঠা যাবে না। ফর্দ্দ ঠিক হয়েছে কি না, আপনি দেখুন। এখনও এক হাজার নাম পুরা হয় নি, যদি কোন নাম বাদ প'ড়ে থাকে, তা হ'লে লিখে দিন। লোকজনকে অভ্যর্থনা কর্‌বার ভার আপনার উপর, আপনি একটু আগে আসবেন।

—শুধু তা কেন, আমি দিনের বেলা গিয়ে কি রকম আয়োজন হয়েছে, সব দেখে আস্‌ব।

—আমি বড় মুখ ক'রে আপনার কাছে এসেছিলাম, তা আমার মুখ রক্ষা হয়েছে।

বেলুলা বলিলেন, তোমার মুখ দেখে দেশ শুদ্ধ লোক ভুলেছে, আমি ত আমি!

বেলুলা নামের তালিকা আগাগোড়া দেখিলেন। ফর্দ্দের গোড়াতেই তাঁহার নিজের নাম ছিল, কিন্তু শিরাণীর নাম কোথাও ছিল না। বেলুলা দুই চারিটি নূতন নাম যোগ করিয়া দিলেন; কিন্তু শিরাণীর নাম লিখিলেন না। বলিলেন, ফর্দ্দ ত খুব ভাল হয়েছে, তুমি ত কাউকে চেন না, তা হ'লে এ সব নাম পেলে কোথায়?

লুলু বলিল, আমার আগেকার থিয়েটারের অধ্যক্ষ আমার সঙ্গে এসেছেন, তিনি কয়েক জন লোকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এই ফর্দ্দ করেছেন। তিনি একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে বলেছেন।

—কি কথা?

এখানে শিরাণী ব'লে কে এক জন আছেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না? তাঁকে না ডাকলে কোন কথা উঠ্‌বে না ত? এ বিষয়ে আমার কোন মতামত নেই, আপনি যা বল্‌বেন, তাই হবে।

বেলুলা কিছু উদাসভাবে কহিলেন, শিরাণীর নাম আমার মনে পড়েনি। তা তাঁকে ডাক্‌লে কোন ক্ষতি নেই।

—তা হ'লে আপনি তাঁর নাম লিখে দিন।

বেলুলা লিখিয়া দিলেন। তাঁহার পীড়াপীড়িতে লুলু চা পান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেখান হইতে গেল শিরাণীর বাড়ী। বাড়ী বেলুলার অপেক্ষাও বড়, গৃহসজ্জা আরও উৎকৃষ্ট। শিরাণীও লুলুকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। শিরাণী বয়সে বেলুলার অপেক্ষা কিছু বড়, কৃশাঙ্গী, কথা কহিবার ধরণ কিছু গম্ভীর।

অন্য কথাবার্ত্তার পর লুলু ফর্দ্দ বাহির করিল। বেলুলাকে যে ফর্দ্দ দেখাইয়াছিল, সেটা নয়, আর একটা। ইহাতে শিরাণীর নাম প্রথমে ছিল, বেলুলার নাম ছিল না। শিরাণী তালিকা অনুমোদন করিলেন, কয়েকটা নাম যোগ করিলেন, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে অভ্যর্থনা করিতে স্বীকার করিলেন। তাহার পর লুলু যেন কিছুই জানে না, প্রসঙ্গক্রমে বেলুলার নামোল্লেখ করিল। কহিল, আমি ত

কিছুই জানিনে, আপনি সব জানেন, বেলুলা ব'লে কে আছেন, আপনি কি তাঁর নাম শুনেছেন? যদি আপনার মত হয়, তা হ'লে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হবে।

শিরাণী শুষ্কভাবে কহিলেন, তাঁকে বল্‌লে কোন দোষ নেই। তোমার ইচ্ছা হয় বলতে পার।

—তা হ'লে তাঁর নাম লিখে দিন।

শিরাণী লিখিয়া দিলেন। হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া লুলু দুইখানি ফর্দ্দ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষকে দেখাইল। সকল কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া অস্থির। কহিলেন, তোমার এত রকম ফন্দী আসে, কে জানে? বেলুলা আর শিরাণীকে সকলে খুব সেয়ানা বলে, কিন্তু তুমি তাঁদের এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আস্‌তে পার। তোমার কৌশল তাঁরা টের পেলে তোমার মাথা থাক্‌বে না।

—কেউ কি নিজেকে কখন বোকা বলে? আমি কোথাকার একটা অসভ্য জাতের মেয়ে, আমার কাছে কেউ ঠক্‌লে কখন কি স্বীকার করবে?

সম্মিলনের রাত্রিতে শিরাণী ও বেলুলার সাক্ষাৎ হইল। দুই জনে যেন অভিন্ন-হৃদয়, কেহ কাহার হাত ছাড়িয়া দেন না। শিরাণী ভাবিতেছিলেন, তাঁহার প্রসাদেই বেলুলা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, বেলুলা মনে করিতেছিলেন, তাঁহার কৃপা না হইলে এই লোকসমাগমে শিরাণীকে কেহ দেখিতেই পাইত না। লুলু তাঁহাদিগকে বলিল, আপনারা আমার কাছে থাকুন, নইলে সব গোল হবে। আমি কাউকে চিনি নে, কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলুব, আপনারা থাক্‌লে আমার অনেক ভরসা।

লুলুর কথায় দুই জনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন, দুই জনে ভাবিলেন, তাঁহারা না থাকিলে লুলু মুস্কিলে পড়িত। দরজার সম্মুখে লুলুর দুই পাশে দুই জন দাঁড়াইলেন।

নিমন্ত্রিত লোকরা দেখিয়া বিস্মিত হইল, বেলুলা ও শিরাণী লুলুর সঙ্গে একত্র দাঁড়াইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। এমন কেহ কখন দেখে নাই। দুই জনের দুই দল, যেখানে যাইতেন, নিজের নিজের দল লইয়া আলাদা থাকিতেন। আজ কোন্ কৌশলে ইঁহাদের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোন্ মন্ত্রে লুলু দুই জনকে এমন করিয়া বশ করিয়াছে!

লুলুর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ত সকলেই উৎসুক, বেলুলা ও শিরাণী সকলকে পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলেন। বৃহৎ বারান্দায় টবে অনেক রকম গাছ সজ্জিত ছিল, গাছের আড়ালে নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষরা কাণাকাণি করিতে লাগিল। বলিল, লুলুর কলাবিদ্যা আছে, আমরা তাই জানি, আজ দেখলে তাহার কুহকবিদ্যা! বেলুলা-শিরাণীর নামে সহর শুদ্ধ কাঁপে, আজ যেন দুটি পোষা বেরাল! আঁচড়-কামড় ত নেই-ই, ফ্যাঁসফোঁসও কেউ শুনতে পাচ্ছে না! কেবল ল্যাজ তুলে ম্যাও ম্যাও ক'রে লুলুর পায়ে গা ঘষ্‌ছে।

পরদিবস সংবাদপত্রে সম্মিলনের দীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশিত হইল। লুলু সমাজে কিরূপ সম্মানিত, তাহার প্রমাণস্বরূপ বেলুলা ও শিরাণীর উপস্থিতি এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভ্যর্থনার ভার-গ্রহণ উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও এরূপ সৌভাগ্য হয় নাই।

সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বেলুলা ও শিরাণী সিদ্ধান্ত করিলেন, তাঁহাদের অনুকম্পাতেই লুলু সম্মানিত হইয়াছে। অপর সাধারণের ধারণা হইল আর এক রকম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

"হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম"

(প্রতিবাদ)

গত শ্রাবণ সংখ্যার "বসুমতী"তে শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন) মহাশয়ের লিখিত "হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা যতদূর সুখী হইতে পারিলাম না, ততোধিক দুঃখিত হইলাম। অবশ্য প্রথমে এ কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করিতেছি যে, কেহ যেন ইহাকে সমালোচনা বলিয়া মনে না করেন। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করা বা হিন্দুধর্ম্মের হীনতা প্রতিপাদন করা এখানে লেখকের উদ্দেশ্য নহে। শশিভূষণ বাবু হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মকে এক করিতে যাইয়া যে মত-সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, খাঁটি প্রমাণ দ্বারা সেই মত-সমূহের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করাই এই প্রতিবাদের অবতারণা।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন—"কুশিক্ষার প্রভাবে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বিরোধিতা করিয়া এই ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিরুদ্ধবাদী।" আমরা দেখিতেছি বর্ত্তমানে অনেকে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, যাঁহারা ভারতে দার্শনিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক দার্শনিক আপনাদের দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া বৌদ্ধ দর্শনামৃতের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা এ স্থলে হিন্দু সাংসারিকদের নামোল্লেখ না করিলেও কয়েক জন হিন্দু-ভিক্ষুর নামোল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরাহুল সংস্কৃত্যায়ণ (এম, এ) ও ভিক্ষু আনন্দ (বি, এ) বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সংস্কৃত্যায়ণ ভিক্ষু রাহুল তাঁহার হিন্দুভ্রাতাদিগকে বুদ্ধের অমিয়বাণী শ্রবণ করাইবার জন্য সম্প্রতি "বুদ্ধচর্য্যা", ধর্ম্মপদ ও সূত্রপিটকের মজ্ঝিম নিকায় হিন্দীভাসায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ১৯৩৪এ বিনয়পিটকের প্রাতিমোক্ষ, মহাবর্গ, চুলবর্গ, ১৯৩৫এ সূত্রপিটকের দীর্ঘনিকায় ১৯৩৬এ সংযুক্তনিকায় এবং ১৯৩৭এ সূত্রনিপাত, উদান, মিলিন্দ-প্রশ্ন প্রকাশ করিবেন বলিয়া কার্য্যতালিকা ছাপিয়া দিয়াছেন।

"বসুমতী"ও লিখিয়াছেন—বিহারের গুরুকুল বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ মিঃ জে, নারায়ণ (এম, এ) ২৫ বৎসর বয়সেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সিংহল গমন করিয়া কলম্বোর বিদ্যালঙ্কার ওরিয়েণ্টাল কলেজের এক সভায় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তিনি ভিক্ষু কশ্যপ নামে পরিচিত। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অচিরে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিবেন।

এখন জিজ্ঞাস্য—সংস্কৃত ভাষায় এই পারদর্শী ব্যক্তিরাও কি কুশিক্ষার প্রভাবেই শিক্ষিত?

তিনি লিখিয়াছেন—"বুদ্ধদেব হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা বিষ্ণুর অবতার। হিন্দুরা বুদ্ধদেবের স্তব করিয়া থাকেন।" হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতার বলিয়া পূজা করিলেও আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধাঙ্কুর) সুমেধ তাপস জন্মে দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্বলাভের বর প্রাপ্ত হইয়া সেই হইতে ৫৫০ জন্ম পর্য্যন্ত দান-শীলাদি দশ প্রকার পারমী (গুণ-ধর্ম্ম) পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই অনন্ত আয়াস-পূর্ণ গুণ-ধর্ম্মের সহিত মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি বিষ্ণুর দশ অবতারের কোন অবতারের লীলাখেলার সামঞ্জস্য নাই, থাকিতে পারে না।

শাক্যসিংহকে হিন্দুরা প্রথমেই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করুক, আর প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক পরে অবতার বলিয়াই স্বীকার করুক অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবনের বেগ দেখিয়া ভীত হইয়া পরে তাঁহাকে অবতার বলিয়াই স্বীকার করুক না কেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি অবতার নহেনই। ইহার কারণ হিসাবে এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, হিন্দুরা যদি বুদ্ধকে অবতার বলিয়া গ্রহণই করিল, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে গ্রহণ করিল না কেন? "ধরে মাছ না ছোঁয় পানি" গোছের ভাব দেখাইয়া কথায় ও কাযে অসামঞ্জস্য দেখাইবার কারণই বা কি?

তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"বুদ্ধ স্বীয় প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম দ্বারা দৈত্য-দানব ও অসুরদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্ম হইতে লোককে পাষণ্ড ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহাকে শুদ্ধ বা পবিত্র বলা হইয়াছে। কারণ, তিনি হিন্দুধর্ম্ম হইতে আপনাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।" যিনি ষড়্‌বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যান্তে ও বুদ্ধত্বলাভের পর সেই অলোকসামান্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া আনন্দোদ্বেলিত-চিত্তে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধ্যাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং,
গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খার গতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝাগা।*

(ধর্ম্মপদ—৭০)

তাঁহার সেই জ্ঞান কি দৈত্য-দানব ও অসুরদিগকে ভ্রান্তপথে চালিত করিবার জ্ঞান? মোহ-পাশ ছেদনের অনন্ত উপদেশ আজ পর্য্যন্তও যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারই কি উদ্দেশ্য যে, দৈত্যদানব ও অসুরদিগের মোহ উৎপাদন করা, ভ্রান্তপথে চালিত করা? লেখক বুদ্ধকে জ্ঞানকাণ্ডের প্রবর্ত্তক স্বীকার করিয়া আবার মোহ ও ভ্রান্তপথের চালক বলিলেন কিরূপে? লেখকের এ অনুমান যে নিতান্তই ভিত্তিহীন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ছাগ-মেষাদি পশুবলি যে ধর্ম্মের নীতি হিসাবে বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, যে ধর্ম্মে প্রাণীর রক্তস্রোত দর্শনে, মরণোন্মুখ প্রাণীর ছট্‌ফট্ যন্ত্রণা দর্শনে প্রাণীর প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, জীবের মরণ-যন্ত্রণা দর্শনে সেই ধর্ম্মাবলম্বী তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে। করুণাপারাবার ভগবান স্নেহসিক্ত হৃদয়ে বলিয়া গিয়াছেন—

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে॥

(ধর্ম্মপদং—৬০)

অর্থাৎ সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয়। (তাই) নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া হত্যা করিও না ও হত্যা করাইও না। লেখক হিন্দু হইয়াও এমন অযুক্তিপূর্ণ কথা বলিতে পারেন, এতদূর আশা আমরা করি নাই।

তিনি পক্ষান্তরে এক স্থানে বলিয়াছেন—"বুদ্ধদেব যদি প্রথম ভ্রমণকালে বিশিষ্ট-জ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাইতেন, তাহা হইলে প্রাচীন জগতে সমস্ত ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।" এ কথা যে একান্তই আন্দাজী বা অনুমানমূলক, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কারণ, বুদ্ধের প্রথম ভ্রমণকালে যে অনেক বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বৌদ্ধগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ, ভদ্রীয়, বপ্র ও মহানাম এই পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তদ্ব্যতীত কোলিত, উপতিষ্য, উরুবিল্বকশ্যপ, নদী-কশ্যপ, গয়াকশ্যপাদির নামও উল্লেখ করা যায়। ইঁহারা যে এক এক জন বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন, তাহার প্রমাণও বিরল নহে।

* "জন্ম-জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ॥
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার—
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর।
ভেঙ্গেছি তোমার স্তম্ভ চূরমার গৃহ ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

এমন কি, তখন উরুবিল্বকশ্যপ ৫০০, নদীকশ্যপ ৩০০ ও গয়াকশ্যপ ২০০ শিষ্যের অধ্যাপনা করিতেন।

এই তিন জনের প্রথমে বুদ্ধের প্রতি (তিনি বুদ্ধ কি না) সন্দেহ হইয়াছিল। ভগবান তাঁহাদিগকে অনেক প্রাতিহার্য্য প্রদর্শন করাইলে, এক সহস্র শিষ্য সহ তাঁহারা তিন জনেই ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার (দ্বাদস নহুতং) এক লক্ষ বিশ সহস্র মগধবাসীকে লইয়া রাজগৃহে বুদ্ধ-দর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় হিন্দুদের ভগবান আর্যাপ্রাপ্ত সপারিষদ উরুবিল্বকশ্যপকে ভিক্ষুবেশে দেখিয়া "বুদ্ধ কি উরুবিল্ব-কশ্যপের শিষ্য, না—উরুবিল্বকশ্যপ বুদ্ধের শিষ্য" দর্শকদের মনে এ সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া সন্দেহ দূরীকরণার্থ উরুবিল্বকশ্যপকে বলিয়াছিলেন—

কিমেব দিস্বা উরুবেলবাসী পহাসি অগ্গিং কিসক বদানো,
পুচ্ছামি তং কস্সপ এতমত্থং কথং পহীনং তব অগ্গিহুত্তং॥

(মহাবগ্গ মহাকখন্ধক ৩৬)

অর্থাৎ হে উরুবিল্বাসী তাপসাচার্য্য কশ্যপ! তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কি দেখিয়া, কোন্ কারণে তোমার অগ্নিচর্য্যা ও হোমোপকরণাদি ত্যাগ করিলে? এতচ্ছ্রবণে উরুবিল্বকশ্যপ কারণ দর্শাইতে গিয়া দর্শকমণ্ডলীর সন্দেহদূরীকরণার্থ বলিয়া-ছিলেন,—"সত্থা মে ভন্তে ভগবা সাবকো হমস্মি।" অর্থাৎ প্রভু ভগবান আমার শাস্তা শিক্ষক, আমিই ভগবানের শিষ্য।

লেখকের মতে—"পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ, উর্শলি (Worsly) বুদ্ধ যদি তাঁহার প্রথম ভ্রমণকালে দুই জন বিশিষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইতেন, তাহা হইলে প্রাচীন জগতে সমস্ত ইতিহাস বদলাইয়া যাইত" এ কথা বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অন্ধ অনুকরণের ন্যায় এই পাশ্চাত্য লেখকের ভ্রান্ত মত বিশ্বাস ও সমর্থন করিতে যাইয়া বিদ্যারত্ন শশিভূষণ বাবুও ভুল করিয়া বসিয়াছেন।

ভাগবতকারের মতে সুরদ্বেষী অসুরদিগের মোহ উৎপাদনের জন্যই হউক, আর পুরাণকারের মতে ধর্ম্মের ব্যবস্থাপন এবং অসুরদিগের উচ্ছেদসাধনের জন্যই হউক যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রবর্ত্তক (লেখকের মতে) শ্রীহরি হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধ নহেন। মোহ উৎপাদন ও উচ্ছেদসাধন বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য নহে। বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য—বিষয়তৃষ্ণা ও আত্মপীড়ন ত্যাগ করিয়া মধ্যপন্থা বা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-দ্বারা দুঃখের নিরোধ। (ধর্ম্ম সংহিতা-সূত্র ব্যাখ্যা ৩৬৭)

তিনি আবার বলিয়াছেন—"বুদ্ধদেবের শিষ্যগণও তাঁহার উপদেশ ও আলোচনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থগুলি পিটক নামে অভিহিত। যাঁহারা উহা লিখিয়া লইয়া-ছিলেন, তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে সকল কথা বুদ্ধদেবের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। ইহার ফলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিকৃতি ঘটিতে আরম্ভ হয়।"

এই উক্তির মিথ্যা প্রমাণ করিতে যাইয়া লেখকের চেষ্টা বাতাসে অসি-প্রহারের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহার সমস্ত উপদেশ ও আলোচনা শুনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বুদ্ধের আজীবন সেবক ও প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ অন্যতম। জন্মে জন্মে এই আনন্দের প্রার্থনা ছিল—গৌতম বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করা। তাই বুদ্ধ অন্যত্র ধর্ম্মোপদেশ দিতে যাইবার সময় আনন্দকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এমন কি, কোন সভায় যদি আনন্দ অনুপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ভগবান ফিরিয়া আসিলে তাঁহার কথিত উপদেশ পুনঃ আনন্দকে বলিতেন। তাই ভগবানের কোনও আলোচনা আনন্দের অজ্ঞাত ছিল না। তবুও ভগবানের পরিনির্ব্বাণের পর ত্রিপিটক লিপিবদ্ধের জন্য সাত লক্ষ ভিক্ষুর মধ্যে অধিকন্তু ভগবৎ-প্রশংসিত, ত্রিপিটকধারী, মহানুভব ও যড়ভিজ্ঞাপ্রাপ্ত মাত্র পাঁচশত ভিক্ষু নির্ব্বাচিত হন। ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ কল্পে সংগায়ন (সভা) আদির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন—রাজা অজাতশত্রু। ইহাতেই বুঝা যায় যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। সংগায়নাদি সহ এ সমস্ত বিবরণ লেখক বিনয়ের অর্থকথা "সামন্ত পাসাদিক" নামক গ্রন্থের প্রথমাংশে পড়িয়াছেন কি? না কি তাঁহার অনুমান-গ্রন্থ সাহায্যে এই অমূলক সত্য উদ্ধার করিয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের যশঃ কিনিতে চাহিতেছেন?

শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে কেবল বৌদ্ধরা অনাত্মবাদী ছিলেন, এ কথা সত্য নহে। শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁহার এক "অনাত্মলক্ষণসূত্র" দেশনার (ব্যাখ্যার) ভিতর দিয়া সমগ্র এসিয়াবাসীকে অনাত্মবাদীরূপে গড়িয়াছেন বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাত্মবাদের উপর স্থিত। সুতরাং বৌদ্ধদের লয়বাদ খণ্ডন করিয়া শঙ্করমতের যে স্থাপনা করা হয়, এ উক্তিও ঠিক নহে।

সিদ্ধার্থ এবং তাঁহার পিতা-প্রপিতামহগণ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধার্থ যখন এক অভূতপূর্ব্ব অলোকসামান্য জ্ঞানালোকে নিজে আলোকিত হইয়া স-নর দেব-ব্রহ্মকে সেই জ্ঞানালোক দর্শনের অধিকারী করিলেন, এবং তাঁহার সেই আলোকে যাঁহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়া জাতি হিসাবে আজ পর্য্যন্তও মোহান্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে না, তাঁহারা আর হিন্দু নহেন। এমন কি, আপন পিতা শুদ্ধোদনকেও সেই আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থের পূর্ব্ব-পুরুষরা পূর্ব্বে মোহান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিলেও তদবস্থায় সিদ্ধার্থের আর শান্তি আসিল না। তাই তিনি নিজে আলোকে আসিয়া আপন পিতা-পুত্রকেও টানিয়া আনিলেন—আলোর পথে—শান্তির পথে—মুক্তির পথে। যে পথে আসিয়া তাঁহারা নবালোকে মুক্তিপথের সন্ধান পাইলেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম নহে।

লেখক আবার বলিয়াছেন—"বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম তেমন বিস্তার লাভ করে নাই।" বুদ্ধ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল বিনা রক্তপাতে, বিনা ভীতি-প্রদর্শনে, বিনা ষড়যন্ত্রে—একমাত্র মৈত্রীর দ্বারা শুধু ভারতে কেন, সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডে ধর্ম্মপ্রচারে যতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোনও ধর্ম্মপ্রচারক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া, অর্থব্যয়ে, তরবারির সাহায্যে রক্তগঙ্গা বহাইয়াও ততদূর ধর্ম্মপ্রচারে সমর্থ হয় নাই। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার বিচারভার পালিভাষাবিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের উপর নির্ভর রহিল।

বুদ্ধ ভারতে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। লেখক বলেন—"বুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন।" এ কথা নিছক মিথ্যা। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে যে চতুরার্য্যসত্য (অর্থাৎ দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখধ্বংস ও দুঃখধ্বংসের পন্থা) অধিগত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই দেশনা (ব্যাখ্যা) করিয়া সদেব-নরকে মুক্তিপথের সন্ধান দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনন্যসাধারণ জ্ঞান দর্শনে হিন্দুরা তাঁহাকে অসুর বলিয়া বর্জ্জন দূরে থাকুক, বরং জগদ্বরেণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিয়াছিলেন—শুধু মুখের কথায় নহে, অন্তরের প্রেরণায়। তাঁহাদের সেই প্রেরণাও অধিকন্তু নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া অনেকেরই জীবনে শান্তি আসিয়াছিল।

"শাক্যসিংহ সাংখ্যদর্শনের ধারা ধরিয়া ধর্ম্মোপদেশগুলির বিকাশসাধন করিয়াছিলেন" এ অনুমান নিতান্তই ভিত্তিহীন। কারণ, বুদ্ধ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন সূত্রের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—"ওদহথ ভিকখবে সোতং অমতমধিগতং অহং ধম্মং দেসেম।" অর্থাৎ……হে ভিক্ষুগণ! মনোনিবেশ কর, মৎকর্ত্তৃক অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি ধর্ম্মদেশনা (ব্যাখ্যা) করিব। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধের ধর্ম্মের বিকাশসাধন করিতে কোনও সাংখ্য বা পাতঞ্জলের সাহায্য লইতে হয় নাই।

তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—"বুদ্ধদেব জীবের ত্রিবিধ দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন।" ইহা সর্ব্বথা সত্য নহে। কেননা—সংক্ষেপে জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ ও মরণদুঃখ আর বিস্তার বশে সমস্ত দুঃখ মোচনের জন্যই তাঁহার বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্ম্মপ্রচার। এ স্থলে অবশ্য এ কথা কেহ মনে না করেন যেন—তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন না করিলেও তিনি কাহাকেও মুক্তি দিতে পারিতেন। যেহেতু, আপনার মুক্তি আপনি অর্জ্জন না করিলে অপরের দ্বারা মুক্তি মিলে না।

লেখকের মতে—"বুদ্ধ লোকের জন্য যে তিনদফা নিয়মাবলী করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম নিয়মাবলীর সাধনা করা কঠিন নহে।" ধার্ম্মিকদের পক্ষে কঠিন নহে বটে, কিন্তু উহার সাধারণ নিয়ম দেখাইতে গিয়াও গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই পাঁচটি নিয়ম হইল—জীবহত্যা-বিরতি, চুরি-বিরতি, ব্যাভিচারবিরতি, মিথ্যাকথনবিরতি ও নেশাপান-বিরতি। বাহুল্যভয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করিলাম না।

স্থানান্তরে তিনি বলিয়াছেন—"বুদ্ধদেব-কথিত নির্ব্বাণ কি?" এ সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া তিনি সন্তোষজনক

প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তৃষ্ণা-ক্ষয়ই নির্ব্বাণ। "নির্ব্বাণ অলৌকিক অবস্থা। লৌকিক ভাষা দিয়া ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তর্ক দ্বারাও ইহা অববোধ্য নহে। যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। এক তার্কিকের সীমাবদ্ধ সঙ্কল্প অপরে খণ্ডন করে। অধিগম প্রজ্ঞাপ্রভাবে নূনকল্পে স্রোতাপত্তিমার্গজ্ঞান দ্বারাও নির্ব্বাণের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। তৎপূর্ব্বে ত্রিপিটকানুকূল অনুমান দ্বারাও সাধারণ অনুমিত হয়।" ভগবান বলিয়াছেন—

দুদ্দসং অনতং নাম নহি সচ্চং সুদস্সনং,
পটিবিদ্ধা তনহা জানতো পস্সতো নাথ কিঞ্চনং ॥

অর্থাৎ—অনন্ত নির্ব্বাণ সত্য, মানস-নয়নে
দর্শন সহজ নহে, কষ্টে যায় দেখা,
ভেদ করি জ্ঞানে তৃষ্ণা, ধ্যান-বিদর্শনে
দূরীভূত হয় কাম-কালিমার রেখা।

(উদানং নিব্বাণ সুত্তং—২০২)

লেখক বলেন—"বুদ্ধদেব কোন কোন স্থানে নির্ব্বাণের পর অনন্ত ও বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তার সহিত মিলনের কথাও বলিয়াছেন।" লেখক ত্রিপিটকের কোন্ গ্রন্থে দেখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। ত্রিপিটকের কোনও গ্রন্থে উল্লেখ নাই যে, নির্ব্বাণের পর সত্তার সহিত পুনর্মিলন হইতে পারে। "নির্ব্বাণদর্শী জীবন্মুক্তের মৃত্যুর পর পঞ্চস্কন্ধের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তখন তিনি অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণে নির্ব্বাপিত হন। বুদ্ধত্বলাভের পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে কুশীনগরে পরি-নির্ব্বাণমঞ্চে ভগবানের এই নির্ব্বাণ হয়। এই অবস্থা অনির্ব্ব-চনীয়। ভগবান ইহার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

বিঞ্ঞানস্স নিরোধেন তণহাক্খয় বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বাণং বিমোকেখা হোতি চেতসো ॥

"প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ নির্ব্বাণের মত তৃষ্ণাক্ষয়বিমুক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাণের পর সত্তার মিলন সম্ভব নহে।

লেখকের মতে—"নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্মে লীন, ইহাই বুদ্ধ বলিয়া-ছেন।" ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে বুদ্ধত্বলাভের পর তাঁহার এই বহু আয়াসলব্ধ প্রতিস্রোতোগামী দুর্দ্দর্শ ধর্ম্ম অবিদ্যা-তিমিরা-চ্ছন্ন কামাসক্ত নররা বুঝিবে না ভাবিয়া যখন তিনি প্রচারের অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং মহাব্রহ্মা আসিয়া নির্ব্বাণগামী ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন কেন? ব্রহ্মে লীনই যদি নির্ব্বাণ হইল, ব্রহ্মলোকবাসী মহাব্রহ্মার নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষা উদ্রেকের কারণই বা কি? মোহান্ধ জীবরা তাঁহার এই গম্ভীর ধর্ম্ম বুঝিবে না ভাবিয়া প্রচারে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বয়ং সহম্পতি মহাব্রহ্মা আসিয়া প্রার্থনা করিলেন—

উটেঠহি বীর বিজিত সঙ্গাম সথবাহ অনণবিচর লোকে
দেসস্সু ভগবা ধম্মং অঞ্ঞাতারো ভবিস্সন্তি ॥

(মহাবগ্‌গ—মহাকখন্ধক—৭)

অর্থাৎ

"উঠ বীর, রণজিৎ, নেতৃবর কাম-ঋণহীন,
পরিভ্রমি ভবে ধর্ম্ম দেশনা করুন ভগবন্
নিশ্চয় থাকিবে জ্ঞানী জানিবারে এ সত্য বচন।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্মে লীন নহে। নির্ব্বাণ কি (?) সংক্ষেপে আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। নির্ব্বাণের সহিত ব্রহ্মের কোন তুলনাই হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্ম মতে যাঁহারা অনাগামী ফললাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অধোগতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়! সুতরাং অনাগামী ফলপ্রাপ্ত মানব ও ব্রহ্ম ক্রমে অর্হত্ত্ব ফললাভ করিলেই নির্ব্বাণ।

লেখকের মত—"বুদ্ধ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথাই বলেন নাই বা ঈশ্বরের আরাধনা বা পূজা সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই।" ঈশ্বরের আরাধনা বা পূজা সম্বন্ধে যে কোন কথাই বলেন নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে কত কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ত্রিপিটক শাস্ত্রে অপ্রচুর নহে। ব্রহ্মলোক কয় প্রকার এবং কোন্ ব্রহ্ম কোন্ উপায়ে কোন্ ব্রহ্ম-লোকে উৎপন্ন হইতে পারেন, তৎসমুদয়ও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। এমন কি, কোন্ ব্রহ্মলোকবাসীদের কত পরমায়ু, তাহাও তিনি অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহের ভূমি পরিচ্ছেদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন ঈশ্বরের পূজা। ঈশ্বর বলিয়া এমন কোন একটা কিছু আছে, এ কথা বুদ্ধ বলেন নাই। তবে ঈশ্বর আছে বলা যাইতে পারে লৌকিক মতে। যেমন—রাজ্যেশ্বর, ধনেশ্বর ইত্যাদি। তাই তিনি ঈশ্বরের পূজা বা আরাধনা সম্বন্ধে কোন উপদেশই দেন নাই। কিন্তু ভগবানের গুণাবলীকে পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এ স্থলে শশিভূষণ বাবু ঈশ্বর ও ভগবান বলিতে এক বলিয়াই বুঝিয়াছেন মনে হয়। যদি ঈশ্বর ও ভগবান একই হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের কিছুরই অভাব নাই, কোন দুঃখ নাই, তিনি কিসের জন্য, কোন্ স্বার্থের জন্য জগৎ সৃষ্টি করিলেন? তিনি যদি পরার্থে জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে সৃষ্টি সুখময়ী করিলেন না কেন? জগতে জীবে জীবে বৈষম্য কেন? ঈশ্বর করুণাময়, তিনি কাহাকেও দুঃখ দিতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কোন প্রয়োজন সম্ভব না হওয়ায় সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা ইহা অস্বীকার করিলেও ঈশ্বর ভগবান হইতে পারেন না।

"ভগ্‌গ রাগো ভগ্‌গ দোসো ভগ্‌গ মোহো অনাসবো
ভগ্‌গাস্স পাপকা ধম্মা—ভগবা তেন বুচ্চতি।

(ধর্ম্মসংহিতা-বন্দনাকথা-৪১)

অর্থাৎ যাঁহার রাগ (কামতৃষ্ণা), দ্বেষ ও মোহ ভগ্ন বা বিধ্বংস হইয়াছে, মদিরাসব তুল্য আসব বা পাপরস ক্ষয় হইয়াছে, সেই পাপধর্ম্মবিহীন মহাত্মাই ভগবান নামে কথিত হন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বর ভগবান নহে।

লেখক বলিতেছেন—"বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সকল কথা শিষ্যবৃন্দকে বলেন নাই।" সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা, জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু দ্বারা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া নর-দেবব্রহ্মের জন্য যত কিছু বলা ও উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, সমস্তই বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি অনন্ত-অপ্রমেয়-গুণাধার হইলেও সত্তাদের ধারণাতীত ও চিন্তাতীত কিছু বলিয়া যান নাই।

"বুদ্ধ যে উপনিষদুক্ত পরমাত্মা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথাই বলেন নাই", লেখকও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ কেন, তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বলেন নাই। মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া

মানবরা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব এবং মানবাত্মা বা পরমাত্মা আছে বলিয়া মনে করেন।

তথাগত যে কেবল হিন্দুদের বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তাহা নহে, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের কপিল-নির্দ্দিষ্ট মতেরও পক্ষসমর্থন করেন নাই। পাতঞ্জলির উপরও যে তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় নাই, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহার বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দ্বিতীয় জনের সাহায্য লইতে হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত কোনও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য নাই এবং ইহা একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম।

লেখকের মতে—"বুদ্ধ কোথাও জাতিভেদের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন নাই।" এ কথাও যেন কেহ মনে না করেন যে, তিনি জাতিভেদের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে জাতি দ্বারা কিছুই আসে যায় না। মানবের উৎকর্ষ অপকর্ষ সাধিত হয় আপনাদের কৃতকর্ম্মের দ্বারা। তিনি শ্রাবস্তীতে এক সময় ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন—

ন জচ্চা বসলো হোতি—ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মনা বসলো হোতি—কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো।

(ধর্ম্মসংহিতা-নিক্রমণাশংস কথা ৩৯)

অর্থাৎ জাতি দ্বারা কেহ বৃষল (পাপী) বা ব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম্মের দ্বারাই বৃষল ও ব্রাহ্মণ হয়।

ভগবান কর্ম্মকাণ্ডকে বাদ দিয়া মানবকে বিপথে চালিত করিয়াছিলেন কি সুপথে চালিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান জগতের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতবাসী একমাত্র বুদ্ধের উপদেশকে ভুলিতে বসিয়া অশান্তির তীব্র দাবানল আজ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মানব-মনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। আজ ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রু, গৃহে গৃহে বিচ্ছেদ, সমাজে সমাজে দলাদলি, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধসজ্জা, অসির ঝনৎকার, তরবারির আস্ফালন বন্যার স্রোতের ন্যায় সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। মনে শান্তি নাই, প্রাণে তৃপ্তি নাই। সর্ব্বত্র অশান্তি, বোমার শব্দ, পিস্তলের আওয়াজ, মৃত্যু-বিভীষিকা প্রতিক্ষণে মানব-মনকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। অতীতের দিকে ফিরিয়া দেখিলে মনে হয়, তখন—আর এখন? ভারতবাসী ক্রমে বুঝিতে শিখিতেছে, তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে সুবুদ্ধি জাগ্রত হইতেছে। না—ইহা ত শান্তির পন্থা নয়। ইহাতে ত শান্তি আসিতে পারে না। শান্তির পন্থা আমরা হারাইয়া বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের সেই হারানো ধন মিলন-মন্ত্রকে পুনঃ ফিরিয়া পাইতে চাই। তবেই আমাদের শান্তি।

তথাগতের বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে তিনি যে কয়েক জন বেদবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাল্যগুরু বিশ্বামিত্র অন্যতম। তাঁহার নিকট প্রথম অক্ষর "অ" উচ্চারণ করিলে—সমস্তই তিনি অনিত্য বলিয়া উঠেন। ইহাতে বিশ্বমিত্রের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তিনি তাঁহার প্রখর প্রতিভাবলে বিশ্বমিত্রের নিকট ছত্রিশ প্রকার লিপি ও তখনকার যাবতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। এ সব শিক্ষা করিলেও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞানলাভে ঐ সকল বিদ্যা কোন কাযেই আসিল না। ধর্ম্মপ্রচারেও তাই। ইহা সর্ব্বজ্ঞ সম্যক সম্বুদ্ধের নবাবিষ্কৃত সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম।

উপসংহারে শশিভূষণ বাবু বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মকে এক করিতে যাইয়া এমন অন্যায় আক্রমণ ও বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া কতদূর লাভবান বা প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, তিনিই তাহা অনুভব করিতে পারেন। তবে বিদ্যারত্ন শশিভূষণ বাবুর এই বিপরীত আলোচনায় বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ ও শ্রদ্ধাসম্পন্নগণের শ্রদ্ধা হ্রাস না পাইয়া আশা করি, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রগাঢ় হইবে।

শ্রীধর্ম্মপ্রিয় ভিক্ষু।

হুগলীজেলার ইতিহাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হুগলীজেলার ডাকাইতি, ঠগী ও কর্ম্মচারী নিয়োগ *

হুগলীজেলায় পূর্ব্বে অত্যন্ত ডাকাইতি হইত। তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা	
১৮৪৩	৩০	১৮৪৮	৯৩	১৮৫৩	৯৩	
১৮৪৪	৬৩	১৮৪৯	৭৬	১৮৫৪	৫৯	হুগলী
১৮৪৫	৯৭	১৮৫০	১১০	১৮৫৫	১৩	
১৮৪৬	৬৩	১৮৫১	১১৮			
১৮৪৭	৬৮	১৮৫২	১২৮			

সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা	
১৮৩৮	১৪	১৮৪১	১৫	
১৮৩৯	১৩	১৮৪২	২৯	হুগলী ও হাব
১৮৪০	২০			

পুরাতন সংবাদপত্রে ডাকাতি সম্বন্ধে সংবাদ ও কর্ম্মচারী নিয়োগ :—

"হুগলী জেলার লোকেরা আর পৈতৃক বাসস্থানে অবস্থান করিতে পারে না, এক বালক সাহেব একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, ডাকাইতেরা তাঁহাকে ভয় করে না, তাহারা স্বেচ্ছাচারিত্বরূপে হুগলীমধ্যে প্রতিরাত্রে নানাস্থানে ডাকাতি করিতেছে আর প্রতি রাত্রে প্রতি গ্রামে সিঁদ যে কত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই, চোরেরা দরিদ্র লোকেদের ঘরে সিঁদ কাটিয়া [illegible]রাঙ্কাঠী পর্য্যন্ত লইয়া যায়।"

৫৮৪ সংখ্যা ১৮৪৯। ১৩ মার্চ্চ বাঙ্গালা ১২৫৫। ১ চৈত্র "সংবাদ ভাস্কর।"

"চাতরা হইতে এক ক্রোশ ব্যবহিত পশ্চিমাংশে হরিপুর নামক গ্রামে ২০শে চৈত্র রবিবার রাত্রিযোগে কার্ত্তিক পোদ্দারের বাড়ীতে অতি নিদারুণ ডাকাইতি হইয়াছে। দস্যুরা তকমা চাপরাশ বন্দুকাদি সহিত রাত্রি একাদশঘণ্টাকালে গ্রামের নিকট যাইয়া বন্দুকধ্বনী করিয়া চৌকিদার চৌকিদার বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে এবং কোম্পানি বাহাদুরের লোক বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাতেই চৌকিদার ও ফৌজদারি গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, দস্যুরা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কহিল কি করিস্ নানা

* সমস্তগুলিই পুরাতন সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত

স্থানে ডাকাইতি কেন হয়, দারোগা কোথায়, চৌকিদার কহিল এখান হইতে সিঙ্গুরথানা দেড় ক্রোশ ব্যবহিত…দস্যুরা চৌকিদারকে ও ফৌজদারী গোমস্তাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল।… ফৌজদারী গোমস্তা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল গ্রামস্থ লোকসকল বাহির হও অরে কমলা পাইক আর কি দেখিস ইহারা সরকারি লোক নহে।…কমলা পাইক পূর্ব্বে চাতরা-নিবাসি গোস্বামী বাবুদিগের বাটীতে চাকর ছিল।…দারোগা কমলা পাইক সহিত তাহারদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন ঐ গোলমালে দুইদস্যু বহুগুনা পরিপূর্ণ আভরণ লইয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু শেওড়াফুলীর দশআনির জমিদার যোগীন্দ্রচন্দ্র রায়ের চৌকিদাররা তাহাদের ধৃত করিয়া দারোগার হস্তে দিয়াছে শুনিলাম দস্যুদলের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের নামকাটা সিপাহি বিমা কোম্পানিদিগের এবং বৈকুণ্ঠবাসি ককরেল হৌসের চাপরাশধারি লোক।"

৫৯২ সংখ্যা ১৮৪৯। ২০ এপ্রেল বাঙ্গালা ১২৫৫। ২৯ চৈত্র মঙ্গলবার "সম্বাদ ভাস্কর।"

"……হুগলী জিলাতে ঠগী নিবারণার্থ অসিষ্টান্ট সুপারিন-টেনডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তেন সি, সি, বর্চসাহেব অন্য হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত বালেশ্বরে জাইণ্ট ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

৫৮৭ সংখ্যা ১৮৪৯। ২৩ মার্চ্চ বাঙ্গালা ১২৫৫। ১ চৈত্র শুক্রবার "সম্বাদ ভাস্কর।"

"হুগলীর একটিং জজ মেং মেকিণ্টস সাহেব গবর্ণমেণ্টে এমত রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে দস্যু একবার দোষের নিমিত্ত পূর্ব্বে একবার দণ্ড পাইয়াছিল এইক্ষণ খালাস হইয়াছে, ডাকাইতি দমনীয় কমিস্তনর সাহেব সেই দোষের নিমিত্ত সেই দস্যুকে পুনর্ব্বার ধৃত করত সেসনের বিচারাধীনে অর্পণ করিতেছেন বিচার ও নীতিমতে যে ব্যক্তি একদোষে দণ্ড পাইয়াছে সে ব্যক্তিকে সেই দোষের নিমিত্ত পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ করিয়া দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য হয় না; কারণ ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে এবং সংপূর্ণরূপেই রাজধর্ম্মের অতীত হইতেছে এমত ব্যক্তিদিগের পুনরায় শাস্তিপ্রদান করণের কোন আইন দেখিতে পাই না অতএব গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যদ্রূপ আদেশ করিবেন তদনুরূপে করা যাইবেক।……৪৮৫৪ সংখ্যা বুধবার ৫ ফাল্গুন ইং ১২৬০। ইং ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪ "সংবাদ প্রভাকর।"

"হুগলীর ম্যাজিষ্টেট মেং এস, ওয়াকোপ সাহেব ১৮০০০৲ অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতনে ডাকাইতি• শাসন সম্বন্ধীয় কমিস্তনর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন……॥ ৪৩১১ সংখ্যা ১৫ বৈশাখ ১২৫৯ সাল ইং ২৫ এপ্রিল ১৮৫২ সাল "সংবাদ প্রভাকর।"

"বিশ্বনাথ নন্দী *—পুনশ্চ সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ গুণনিধি বিশ্বনাথ নন্দী মোং কলিকাতা হইতে পলাইয়া অনেক অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া মোং হুগলীতে এক দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি ও মূর্ত্তির বিবরণ পূর্ব্বে হুগলীর সকল লোক জ্ঞাত হইয়াছিল ও তাহার জামিন যে ছিল সেও খবর দিল তৎপ্রযুক্ত তথাকার থানাদার আদর পূর্ব্বক তাঁহার দুই হাত এক করিয়া শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের নিকট সমর্পণ করিয়াছেন। এখন তাহার শেষ দশা কি হয় তাহা জানা যায় না। ৬৫ সংখ্যা ১৮১৯। ১৪ আগষ্ট বাং ১২২৬। ৩১ শ্রাবণ "সমাচার দর্পণ।"

"বাবু চন্দ্রশেখর রায় ডাকাইতি দমনীয় কমিস্তনর সাহেবের অধীনে হুগলীতে সংপূর্ণ ক্ষমতায় ডেপুটী ম্যাজিষ্টেটপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ২৪ পরগণা, হুগলি, নদিয়া, হাবড়া, যশোর, মেদিনীপুর ও বারাসত এই সাত জেলার মধ্যে দস্যু ধৃত করণের ক্ষমতা পাইয়াছেন। ডাকাইতি দমনীয় কমিস্তনর মেং জ্যাকসন সাহেব একজন অতিরিক্ত আমলার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছেন। হুগলীর শেসন জজ মেং টরন্স সাহেব ডাকাইৎ দমনীয় কমিস্তনর মেং জ্যাকসন সাহেবের সহিত অত্যন্ত কুব্যবহার করিয়াছেন, জজ সাহেব মহাশয় দস্যুদিগের দোষ বিচার কালীন উক্ত কমিস্তনরকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে রহিয়াছে।" ৪৭১৫ সংখ্যা মঙ্গলবার ১ ভাদ্র ১২৬০ সাল ইং ১৬ আগষ্ট ১৮৫৩ সাল "সংবাদ প্রভাকর।"

"এইচ উলকিন্স ৩য় শ্রেণীর সহকারি পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট হুগলীতে হইয়াছেন।"

৫ম ভাগ ১৮ সংখ্যা সন ১২৬৯। ৪ঠা চৈত্র ইং ১৮৬৩। ১৬ মার্চ্চ "সোমপ্রকাশ।"

"শ্রীযুত কাপ্তেন এফ, এস, নিসতন সাহেব অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত জিলা হুগলীতে ঠগী নিবারণার্থ আশিসটান্ট সুপারিনটেনডেণ্ট হইবেন।" ১০ সংখ্যা ১৮৪৯। ৩ মে বাং ১২৫৬। ২২ বৈশাখ বৃহস্পতি বার "সম্বাদ ভাস্কর।"

"হুগলীর পত্র দ্বারা অবগতি হইল ডাকাইতি কমিসনর শ্রীযুত জ্যাকসন সাহেবের কারাগার হইতে বেণীপুর নিবাসি নবীনচন্দ্র চঙ্গ নামা একজন মনস্বর ডাকাইত পলায়ন করিয়াছে তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় এমন কোন সন্ধান পাইলে সন্ধানদাতাকে ৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান স্বীকার করা হইল।" ১২৪ সংখ্যা ১৮৫৪। ২ ফেব্রুয়ারি বাং ১২৬০। ২১ মাঘ "সম্বাদ ভাস্কর।"

"জিলা হুগলীর ডাকাইৎ দমনকারি কমিস্তনর সাহেব গোয়েন্দা বিভাগের সন্তানগণের শিক্ষা জন্য হুগলীতে এক বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।"

"হুগলীর বিখ্যাৎ ডাকাইৎ সাতকড়ি ডুলিয়াকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণ করণের অনুমতি হইয়াছে।

"হুগলীর বিখ্যাত ডাকাইৎ রাইচরণ ডুলেনী ডাকাইতি দমনীয় কমিস্তনর সাহেবের দ্বারা ধৃত হয়।"

৪৮৫১ সংখ্যা ১লা ফাল্গুণ ১২৬০ সাল "সংবাদ প্রভাকর।"

"ঠগী ও ডাকাইতি ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যভার কর্ণেল হেভার্ণস আগামী ৩১ শে মার্চ্চ তারিখে ডাক্তার লেথব্রিজকে প্রদান পূর্ব্বক আগামী ১৫ই এপ্রেল মহীশূরের রেসিডেণ্টের ভার গ্রহণ করিবেন। ৬১ ভাগ ২৪২ সংখ্যা ৪ঠা চৈত্র ১২৯৮ সাল "সংবাদ প্রভাকর।"

"ধনেখালিতে ডাকাইতি—আমরা হুগলিনিবাসি কোন ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইয়া লিখিতেছি যে গত ৯ নভেম্বর তারিখে রজনীযোগে একদল ডাকাইত ন্যানাধিক ৭০ জন

* ইহাকেই বিশে ডাকাত বলিত।

বলপূর্ব্বক উক্ত জিলার অন্তঃপাতী থানা ধনেখালি নিবাসি বাবু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের বাটী আক্রমণ করিয়া প্রায় তিনশত টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি অপহরণ করে।" ২০ অগ্রহায়ণ ১২৫৭ সাল "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।"

"ডাকাইতের শাস্তি—পূর্ব্বসন হালের ৭ জুন তারিখের ৯৬৪ সংখ্যক দর্পণে দুরাত্মা রাধাচন্দ্র সরদার ডাকাইতের সমুচিত দমন বিষয়ে সেশন আদালতে সোপর্দ্দ হওন পর্য্যন্ত সম্বাদ পাঠকবর্গের অবগত হইয়া তদবশিষ্ট সমাচার জানিবার অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত আছেন।...তাহাতে হাকেমান ধর্ম্মাবতারের সূক্ষ্ম বিচারে সেসন জজ সাহেবের রায় ঐক্য হইয়া দুষ্ট দমন ও প্রজাবর্গের আপদ নিবারণ জন্য রাধা সরদারের প্রাণদণ্ডকরণ ও তৎসাঙ্গি-গণের মধ্যে মঙ্গরু ও সেবক চামারকে দ্বীপান্তর প্রেরণ এবং মধুমালা ও গোপাল চন্দ্রকে যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ রাখেন ও রাধার কালান্তক সেখ গোলাম হোসেন নাজিরকে ৩০০ ও থানা বাঁশবেড়িয়ার দারোগা গোলাম আলীকে ১০০ এবং তৎসমভিব্যাহারি বরকন্দাজ প্রভৃতিকে যথাসম্ভব পারিতোষিক পুরস্কৃত করণের হুকুম আসিবাতে ১৮৩৪ সালের ২৫ আগস্ট মোতাবেক ১২৪১ সালের ১০ ভাদ্র সোমবার দশঘণ্টা সময়ে উদ্বন্ধনে রাধা সরদারের প্রাণদণ্ড হইয়াছে!"......৯৯২ সংখ্যা কলম ১৬। ১৮৩৪ সাল ১৬ সেপ্তেম্বর শনিবার ১২৪১। ২৯ ভাদ্র "সমাচার দর্পণ।"

"পাঁচুচন্দ্র নামক একজন মনওর ডাকাইত দুই বৎসর পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিল। তাহাকে গ্রেপ্তার করণার্থ অনেক পরওয়ানা তাবৎ জিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। পরে ২১ তারিখে বেনিপুর থানার জ্যাকি ও নজর মহম্মদ নামক দুইজন বরকন্দাজ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া উক্ত তারিখে ম্যাজিষ্টেট সাহেবের নিকট আনয়ন করে।" ১১১১ সংখ্যা কলম ১৮। ১৮৩৬ সাল ৫ নভেম্বর "সমাচার-দর্পণ।"

"কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা অবগতি হইল যে ২৪ কিম্বা ২৫শে মাঘ রাত্রি অনুমান দুই প্রহর একঘণ্টা সময়ে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি পরগণা বালিগড়ির মধ্যস্থিত থানা হরিপালের অধীন কৈকালার সান্নিধ্যে ইচ্ছাপুর নামক গ্রামে এক ধনি তন্তুবায়ের ভবনে একদল অস্ত্রধারি দস্যু আগমন পূর্ব্বক অত্যন্ত বিক্রম প্রকাশ করতঃ সদর দরজা ভগ্ন করে, ঐ কালীন বাটীর কর্ত্তার ৮ আটজন পুত্র ভোজন করিতে বসিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ ডাকাইত পড়া দেখিয়া আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই সাহসের সহিত সমর-সজ্জা করতঃ অস্ত্রধারি হইল, তন্মধ্যে একজন খড়্গ লইয়া মাজের দরজার একখানা কপাট খুলিয়া তাহার পার্শ্বে শরীর গোপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল, আর একজন ঐরূপে খিড়কীর দ্বারে খাঁড়া লইয়া থাকিল, অপর ছয়জন তাঁতবাড়ী লইয়া বাহিরে গিয়া চীৎকার করতঃ গ্রামস্থ লোক সকলকে সতর্ক করিতে লাগিল, এইরূপে ষড়যন্ত্র হইলে দস্যুদলের প্রধান বেলের পাইক স্বজন মধ্যে শ্লাঘা করিয়া বলিল কি হাবা জাতি তাঁতির বাড়ীতে আসিয়া আমরা ভয়পূর্ব্বক পলায়ন করিব...অতএব সকলে বলপূর্ব্বক অগ্রসর হও ইত্যাদিরূপে আসফালন করিয়া উক্ত বেলের পাইক যেমন প্রথমতঃ মাজের দরজায় প্রবিষ্ট হইবেক অমনি বৃদ্ধ তাঁতির অস্ত্রধারি পুত্র যিনি কপাটের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বাহুতে অস্ত্রাঘাত করিলেন, কথিত ব্যক্তি আঘাতিত হইয়া যৎকালীন পলায়ন করে তাহার সঙ্গি আর একব্যক্তি তৎকালীন ঐরূপে আহত হইল। আবার দুর্জ্জনদিগের মধ্যে একজন খিড়কির দ্বার দিয়া প্রবেশ করণে উপক্রম করাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আহত ও তাড়িত হয়।......"

৩০৪ সংখ্যা ৪ ফালগুন ইং ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ সাল "সংবাদ প্রভাকর।"

"জিলা হুগলির জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় যেরূপ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেছেন তদ্বিষয়ে আমরা এই প্রভাকরে বারম্বার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার সুশাসনে দোষী লোকেরা অতিশয় ভীত হইয়াছে এবং নিরীহ নির্ব্বিরোধি প্রজারা পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন।" ৩১৭৩ সংখ্যা ১৫ শ্রাবণ ১২৫৫ সাল "সংবাদ-প্রভাকর।"

"নবীন নিয়ম। জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী গ্রাম সকলে কয়েকবার ডাকাইতির ঘটনা হইবাতে তন্নিবারণার্থে তত্রস্থ শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা কর্ত্তৃক নানাবিধ সদুপায় সাধন সত্ত্বেও দুর্বৃত্তেরা অত্যাচারে ক্ষান্ত না হইবাতে সম্প্রতি তিনি এই এক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার বশীভূত স্থানসকলে দশ দশ গ্রামে এক এক ফাঁড়িদার নিযুক্ত হইবেক আর ঐ দশ গ্রামের প্রত্যেক কর্ম্মচারি ও গ্রাম্য প্রহরীদের নিকট হইতে এইমত অঙ্গীকারপত্র দেওয়া যাইবেক যে তাহারা পরস্পর প্রত্যেক গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেক।" ২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ সাল "সমাচার দর্পণ।"

ডাকাইতির একটা সীমা নির্দ্দেশ—"যদবধি ইংরেজ বাহাদুর রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও শাসন করাতে অনেক নিবারণ হইয়া যদ্যপিস্যাৎ গমনাগমনের বিশেষ আশঙ্কা প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাচ জিলা মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী পলাসি নামক প্রচরদ্রূপ বিখ্যাত এক স্থান আছে তৎস্থানস্থ দস্যুভয় ব্যাপককাল পর্য্যন্ত সম্যক্‌প্রকারে নিবারণ হয় নাই তদনুরূপ জিলা কৃষ্ণনগরের শামিল বাগেরখাল নামক এক প্রসিদ্ধ স্থান এবং কলিকাতার সান্নিধ্যে কোন্নগর আঁড়িয়াদহ টিটাগড় এবং চাপদানি প্রভৃতি এই সকল স্থানেও মধ্যে মধ্যে শঙ্কা ছিল কিন্তু বিশেষরূপ ব্যাপককাল পর্য্যন্ত হুগলির শামিল ডুমুরদহ নামক এক প্রচরদ্রূপ স্থান ঐ স্থান অবধি গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত ইহার অন্তঃপাতি ফামারডেঙ্গির খাল প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে যে স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি স্থলপথে নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাজশাসনের দ্বারা অনেক নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধ্যে মধ্যে ঐ দুরাত্মা নির্দ্দয়দিগের নিষ্ঠুরতা ব্যবহার প্রকাশ হওয়াতে বিশেষরূপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবর্ষীয় মহোৎসব শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে দুরাত্মাদিগের কুকর্ম্ম ক্রমিক প্রকাশ হইয়াছে এই স্থূল লিখিলাম।" ৮ই মার্চ্চ ১৮৩৪। ২৬ ফালগুন ১২৪০ সাল, "সমাচার দর্পণ।" [ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতিরত্ন)।

সবাক চিত্র

১

সবাক-চিত্র—বিজ্ঞানের বিচিত্র দান। প্রথম যেদিন পর্দার গায়ে সবাক চিত্র দেখা দেয়, অনেকে সেদিন বলিয়াছিলেন—'ইহার পরমায়ু খুব বেশী দিন নয়! অচিরে আবার নির্ব্বাক-ছবির যুগ ফিরিয়া আসিবে!' কিন্তু সে-কথা ফলে নাই। সবাক-চিত্র আজ সকলের চিত্তে তার আসন বেশ পাকা করিয়া তুলিয়াছে। এই সবাক-চিত্র আমদানী করিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। নির্ব্বাক-যুগের নাম-করা অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে এই টকির আবির্ভাবে চিত্র-জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। শুধু যাঁহাদের কণ্ঠস্বর ভালো, তাঁহারাই টিঁকিয়া রহিলেন।

নির্ম্মম মাইক্রোফোন নির্ব্বাক-যুগের বহু প্রসিদ্ধ নট-নটীর সর্ব্বনাশ করিলেও রুথ চ্যাটারটন্, এ্যানা স্টেন, ক্যাথ্রিন হেপ্বার্ণের মত অভিনেত্রী ও ফ্রেডরিক মার্শের মত অভিনেতাকে আমরা লাভ করিয়াছি।

বহুকালের সাধনায় বহু অর্থব্যয়ে সবাক-চিত্রের উপযোগী ষ্টুডিয়ো নির্ম্মিত হইল। মূক-চিত্র তুলিবার ধারা এবং মুখর-চিত্র তুলিবার ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মূক-চিত্রে ঘটনার গতি থাকে অত্যন্ত দ্রুত। এক একটি ক্ষুদ্র দৃশ্য পনেরো সেকণ্ডের বেশী স্থায়ী হয় না। সেজন্য গোড়ার দিকে সবাক-চিত্রের ঘটনার গতি ছিল ধীর। তাই সিনারিয়ো লেখা, ফিল্ম্ তোলা, ফিল্ম্-সম্পাদনার কায এবং রাসায়নিক ক্রিয়াদিতে পরিবর্ত্তন ঘটিল। সম্পাদনের কায খুব সাবধানে করিতে হয়। কারণ, ফিল্ম্ কাট-ছাঁট করিবার সময় ভুলক্রমে একটু বেশী কাটা হইলে হয়তো এমন একটা কথা বাদ পড়িবে—যাহার জন্য হায়-হায় করা ছাড়া শেষে আর কোন উপায় থাকিবে না! ক্যামেরার গতিকে যথানিয়মে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলাফেরায় বসা-দাঁড়ানোয় সীমা নির্দ্ধারিত হইল।

সে এক দিন গিয়াছে, যে দিন আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাক-চিত্র 'দি গ্রেট ট্রেন রবারী' প্রদর্শিত হইয়াছিল। তার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা দিক দিয়া চলচ্চিত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্নের ফলে নির্ব্বাক-চিত্র সবাক হইয়াছে।

যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন যে, রেডিয়ো-হর্ণ এবং গ্রামোফোনের সাহায্যে সবাক-চিত্র প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন! রেডিয়ো-হর্ণ ও গ্রামোফোন ব্যতীত আরও এমন কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন ঘটে, যেগুলি না হইলে সবাক-চিত্র আবিষ্কৃত হইত কি না সন্দেহ! বৈজ্ঞানিক টমাস্ এডিসন সবাক-চিত্র-রচনায় নানা সাহায্য করিয়াছেন। 'ইন্ক্যান্ডিসেন্ট-ল্যাম্প' সৃষ্টি করিয়া আধুনিক চিত্র-জগৎকে মহা সমস্যার হাত হইতে তিনি রক্ষা করিয়াছেন।

প্রত্যেক শিল্পের একটা ইতিহাস আছে। সবাক-চিত্রের যে নাই, এমন নয়। সে ইতিহাস বলি। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লীয়ন্ স্কট ফ্রান্সে ফনোটোগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা একখণ্ড কাগজের উপর শব্দ-তরঙ্গ (সাউণ্ড ওয়েভস্) গ্রথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রদর্শন-যন্ত্রে তিনি তাহা চালাইতে পারেন নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে টমাস্ এডিসন একটা পাৎলা টিনের চোঙ্গার উপর শব্দ-তরঙ্গ গ্রথিত এবং প্রদর্শন-যন্ত্রের সাহায্যে তাহা হইতে শব্দ বাহির করেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন 'ফনোগ্রাফ'। বিবিধ পরীক্ষার ফলে এডিসন সে প্রদর্শন-যন্ত্রটি বাহির করিতে সমর্থ হন। ক্রমোন্নতির ফলে এডিসনের সেই টিনের চোঙা এখন গালার রেকর্ডে নব কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই হইল শব্দপরীক্ষা বা গ্রামোফোনের প্রথম যুগ।

চিত্রকে মুখর করিয়া তুলিতে কে প্রথম প্রয়াস পান, বলা কঠিন। তবে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ইউজিন ল্যস্তের নামই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সবাক-চিত্র সৃষ্টির সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হার রোমার এবং ফ্রিজ গ্রিনের সাধনার রশ্মি লইয়া ল্যস্তে এমন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, যাহার জন্য সবাক-চিত্র দেখানো আজ সম্ভব হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ জানিতেন, রাসায়নিক পদার্থসমূহের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, আলোকের সাহায্যে যাহা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হয়। সেই পদার্থটির নাম 'সিলিনিয়াম'। এই 'সিলিনিয়াম' আবিষ্কৃত হইলে বৈজ্ঞানিক-মহলে রীতিমত চাঞ্চল্য জাগিল। সকল

বৈজ্ঞানিক একবাক্যে স্বীকার করিলেন, সিলিনিয়ামের সাহায্য ব্যতীত কোন কায করা যাইবে না। ইহার পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল, আলোকের গতি, রসায়ন ও বৈদ্যুতিক-গতি—এগুলার মধ্যে কোন যোগ নাই। প্রকৃত-পক্ষে সিলিনিয়াম ও এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আছে, বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যেগুলিতে বহু বিচিত্র গতির সঞ্চার হয় এবং তাহার ফলে সে পদার্থগুলির ক্রিয়ার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। কিরূপে ইহা জানা গেল, এখানে সেই কথা বলি।

মিঃ মে ছিলেন প্রফেসর উইলোবি স্মিথের সহকারী এবং ভ্যালেন্‌সিয়ার ট্রান্সঅ্যাণ্টিক কেব্‌ল্ ষ্টেশনের কর্ত্তা।

লিলিয়ান গীশ্

হঠাৎ এক দিন তিনি দেখিলেন, ইন্‌ডিকেটরের কাঁটাগুলি খট্‌খট্ করিতেছে। মনে করিলেন, হয়তো কেহ সংবাদ পাঠাইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোন রকম সংবাদ আসিল না। মাঝে মাঝে কাঁটাগুলির একঘেয়ে খট্‌খট্ শব্দ শুনিয়া তিনি প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। মেশিনের যাবতীয় কলকব্জা বারংবার ভালো করিয়া দেখিয়াও তিনি কোন বৈলক্ষণ্য নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিবার পর মিঃ মে বুঝিতে পারিলেন, বাতাসে হাত নাড়িবার দরুণ কাঁটাগুলি তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে এবং সেই জন্য এমন অদ্ভুত শব্দ হইতেছে। তিনি আর-ও বুঝিলেন, তাহার উপর হাতের ছায়া পড়াতেই এ শব্দ উঠিবার কারণ। ধীরে ধীরে হাত নাড়িতে নাড়িতে তিনি মেশিনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, সিলিনিয়াম দিয়া যে সকল বৈদ্যুতিক রেজিশটান্স তৈয়ার করা হইয়াছে, সেইগুলি হইতেই ঐরূপ শব্দ বাহির হইতেছে। মিঃ মে তৎক্ষণাৎ তাঁহার গুরু প্রফেসার স্মিথকে ইহা জানাইলেন। ইহার পর বৈজ্ঞানিক-গণ বুঝিলেন, একমাত্র সিলিনিয়ামের দ্বারাই শব্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে।

জন গিলবার্ট

মিঃ মে'র পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে টেলিফোনের স্রষ্টিকর্ত্তা—আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল্ ঠিক এই উপায়েই শব্দ-রহস্যের সমাধান করেন। ইহার ফলে ট্রান্সমিটার, রিসিভার, লাইন্স, সুইচ্‌বোর্ড প্রভৃতির জন্ম ঘটে। টেলিফোন আবিষ্কৃত হইলেও তখনকার দিনে দূরবর্ত্তী স্থানে টেলি-ফোনের কার্য্য সুশৃঙ্খলে চালানো যাইত না। তার পর জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক রোমার সর্ব্বপ্রথম বেতার-টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ফিল্মের উপর শব্দের স্পন্দনগুলির ফটো কিরূপে তুলিতে পারা যায়, তিনিই তাহা দেখাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ল্যস্তে তাঁহারই পদাঙ্ক-অনুসরণে সবাক-চিত্র প্রদর্শনের যন্ত্র বাহির করেন। আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক জগতে যাহা কিছু আবিষ্কার হইয়াছে, সেগুলির সঙ্গে কোন-না-কোন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকের নাম জড়িত আছেই!

কাথরিন হেপবার্ণ

কোন কোন বৈজ্ঞানিক সে সময় লিখিয়াছিলেন—একই সময়ে যে কোন লোকের কণ্ঠস্বর ও চেহারা ফিল্মে তুলিয়া প্রদর্শন-যন্ত্রের দ্বারা তাহা দেখানো সম্ভব হইতে পারে। যেখানে অভিনয় হইতেছে, সেখান হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গ টানিয়া আনিয়া ফটোর মত ফিল্মের উপর গ্রথিত করিতে পারি। পরে পর্দ্দার গায়ে সেই চিত্র দেখাইবার সময় আমরা একই নিয়মে সাউণ্ড-বিশিষ্ট ফিল্মের উপর পরিমাণ-অনুযায়ী আলো ফেলিবার ফলে সিলিনিয়ামের তৈয়ারী একটা 'সেলের' উপর ফিল্মের

এ্যানা ষ্টেন

আলো-ছায়া প্রতিফলিত হইবার পর শব্দগুলি বৈদ্যুতিক গতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন আমরা একটা লাউড-স্পীকারের সাহায্যে খুব উচ্চ (amplified) করিয়া যে কোন স্থানে সকলকে তাহা শুনাইতে পারিব।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এক দিন বলিয়াছিলেন,—"এমন এক দিন হয়তো আসিবে—যে দিন বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারের সাহায্যে অদৃশ্যলোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যাইবে।" ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কথায় লোকের আস্থা ঘটিল যখন হেনরিচ্ হার্জ ল্যাবরেটরীতে বসিয়া বিনা-তারে বার্ত্তা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হেনরিচের সাধনার ফলে বেতারের জন্ম হইয়াছে। তাহার পরে মার্কনী এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ বেতার বা রেডিয়োকে বহু পরীক্ষায় ও অধ্যবসায়ে উন্নতির পথে আনিয়াছেন।

এবার আমরা সবাক-চিত্রের যুগে ফিরি। সিলিনিয়ামের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকরা যত দিন ইহার রহস্যভেদ করিতে অক্ষম ছিলেন, তত দিন শব্দ-সমস্যার কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে

রুথ চ্যাটারটন

ড্য ফরেষ্ট সবাক-চিত্র দেখাইবার যন্ত্র বাহির করিলেন; কিন্তু তখন এ্যামপ্লিফায়ার-ভাল্‌ভের জন্ম না হওয়ায় তাঁহার যন্ত্র অচল হইয়া রহিল। তাঁহার যন্ত্র হইতে শব্দ বাহির হইলেও সে শব্দকে বর্দ্ধিত করিবার কোন উপায় ছিল না।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে টেলিফোনের জন্মদাতা গ্রাহাম বেল্ বেতার টেলিফোন সৃষ্টি করেন—এ্যামপ্লিফায়ার ভাল্‌ভের সাহায্যে। সেই বৎসর সারা দুনিয়ার লোক বেতার-টেলিফোনের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। কোন

লোক এক জায়গায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবেন, আর তাঁহার সেই বক্তৃতা দূরে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া একসঙ্গে পাঁচ হাজার লোক শুনিতে পাইবে, ইহাতে জন-সাধারণ বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই! এবং ইহা লাউডস্পীকার, মাইক্রোফোন ও এ্যামপ্লিফায়ারের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একখানি ছবি বা ফটোকে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে অন্যত্র প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া অনেকে তখন হাসিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে দেশের কুডসেন্ নামক জনৈক ভদ্রলোক এই কাযে সফলতা লাভ করেন। সেই হইতে জগতে টেলি-ফটোগ্রাফীর প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এতদূর
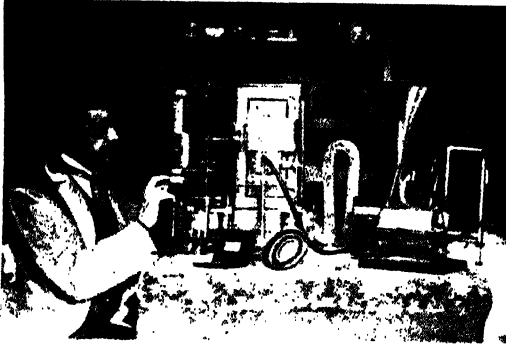
ইউজিন ল্যস্তে

অগ্রসর হইয়াও বৈজ্ঞানিকরা সবাক-চিত্রকে সাফল্যের পথে আনিতে পারিলেন না।

বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল, সবাক চিত্রের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কেহ বা ইহা লইয়া জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়া দিলেন। অবশেষে সত্যই এমন এক দিন আসিল, যেদিন তাঁহারা বুঝিলেন, সবাক-চিত্র তুলিয়া দেখানো মোটেই অসম্ভব নয়।

বহু উপায়ে শব্দকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা চলিবার ফলে মাইক্রোফোনের জন্ম হইল। মাইকের কায, দূরের শব্দকে টানিয়া কাছে আনা। ইহার সহিত বৈদ্যুতিক আর্ক-ল্যাম্প সংযুক্ত করিয়া দিলে বেতার-বার্ত্তা-প্রেরণে সুবিধা হয়; কারণ, 'অতি নিম্ন গ্রামে উচ্চারিত কথাবার্ত্তা মাইকের অপেক্ষা আলোকে নাকি বেশী কার্য্যকর হইয়া থাকে। মাইকের সহিত আর্ক্-ল্যাম্প সংযুক্ত করিয়া-ও বেতার বার্ত্তা-প্রেরণে কিন্তু তেমন সুবিধা ঘটিল না, মাঝে মাঝে আর্ক্-ল্যাম্পের কার্ব্বণ দুইটা হইতে এক উদ্ভট শব্দ বাহির হইয়া মাইকের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটাইতে লাগিল। এই জন্যই আধুনিক সবাক ষ্টুডিয়োতে আর্ক্-ল্যাম্পের পরিবর্ত্তে ইন্ক্যান্‌ডিসেন্ট ল্যাম্পের প্রচলন হইয়াছে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সবাক-চিত্র তুলিবার প্রচেষ্টা চলে। তাহার পূর্ব্বে মহাযুদ্ধের দরুণ বৈজ্ঞানিক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি জড়ভরতের ন্যায় নিশ্চল বসিয়াছিলেন। সবশেষে মিঃ ডেলমার হুইটসন নামক
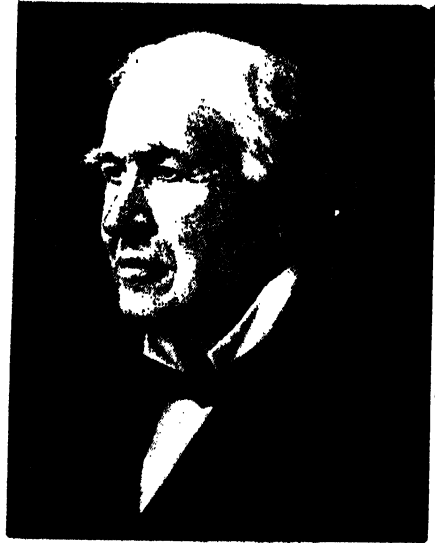
টমাস এডিসন

জনৈক আমেরিকান সবাক-চিত্র-নির্ম্মাণ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। রোমারের পথ ধরিয়া তিনি সেলুলয়েড ফিল্মে শব্দ গ্রথিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার রেকর্ডিং করিবার নিয়ম—একটা প্রজ্বলিত আর্কের আলো কয়েকটা লেন্সের ভিতর দিয়া গিয়া লম্বালম্বিভাবে কাটা সরু একটি ছিদ্র (ইহাকে স্লিট বলে) ভেদ করিয়া ফিল্মের উপরে পড়িত। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইয়া-ও হইতে পারিলেন না। আর্ক্-ল্যাম্পের মুখ হইতে বিন্দু বিন্দু ফেন নির্গত হইয়া রেকর্ডিং-এর কাযে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে না দমিয়া মিঃ হুইটসন শেষে রেকর্ডিং আলো

একটা "রোধী" বস্তুর (shutter) ভিতর দিয়া চালিত করিয়া তাহাকে নিয়মিতরূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

ইহা ছাড়া তিনি কেমিকাল্‌সের (chemicals) সাহায্যে এক রকম 'ভাল্‌ভ্‌' তৈয়ার করিয়াছিলেন। ভাল্‌ভের কায, বৈদ্যুতিক গতিশক্তিকে প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এত চেষ্টা-যত্ন করিয়াও তিনি সবাক-চিত্রকে নিখুঁতভাবে সাফল্যের পথে আনিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, যদি না তখন 'এ্যামপ্লি-ফায়ার ভাল্‌ভ্‌', মুভিংকয়েল' ও লাউড স্পীকারের সাহায্য পাইতেন!

সাফল্য লাভের পর সকলের মনে তিনি বিস্ময়ের সঞ্চার করিলেন। কিন্তু এমনই তাঁহার দুর্ভাগ্য যে, প্রথমে কোন চিত্রনির্ম্মাতা সবাক চিত্রের কাযে হাত দিতে সাহস করিলেন না। করিলেন কেবল ওয়ার্নার ভ্রাতৃবর্গ (Warner Brothers)। সবাক চিত্রের কাযে তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করেন। ঠিক সেই সময়ে কিংবা তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে—বোধ হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে—জার্ম্মাণীর এক বৈজ্ঞানিক সবাক-চিত্র তুলিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সে ছবি নাকি 'ট্রায়রগন' (Triergon) পদ্ধতিতে তোলা হয়। আসলে উক্ত ব্যবসায়ের দিক হইতে সবাক-চিত্র-নির্ম্মাণ-ব্যাপারে নামিয়াছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডি ফরেষ্ট। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত রকমের আবিষ্কারকে চাপা দিয়া তিনি এক প্রকার 'এ্যামপ্লিফায়ার ভাল্‌ভ্‌' প্রস্তুত করেন। তাঁহার সেই ভাল্‌ভ্‌ জগতের বেতার-ব্যবসায়ীদিগকে সচেতন করিয়া তুলিল।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সবাক ছবির যুগ দেখা দিল। সেই সময় নানা দেশে বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণী, ডেনমার্ক ও আমেরিকায় সবাক-ছবি দেখাইবার যন্ত্র, ক্যামেরা ইত্যাদির প্রচলন হইল। প্রত্যেক দেশের শক্তিমান বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন—যাহাতে জগতের চিত্র-প্রিয়রা সবাক-চিত্রকে সাদরে বরণ করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই অগষ্ট—সবাক-চিত্রের ইতিহাসে এক মহাস্মরণীয় দিন! সেই দিন রাত্রিকালে ওয়ার্নার ভ্রাতৃবর্গ 'ডন্ জুয়ান্' নামক একখানি সবাক-চিত্র আমেরিকার দর্শক সাধারণকে প্রথম দেখাইতে সমর্থ হন।

আমেরিকায় 'জ্যাজ সিঙ্গার,' 'সিঙ্গিং ফুল' প্রভৃতি ছবিগুলি সাফল্য লাভ করিতে না পারিলে সবাক-চিত্র কখনই এরূপ দ্রুত-পদসঞ্চারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। পূর্ব্বোক্ত ছবিগুলি আমেরিকার ওয়েষ্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানীর 'ভিটাফোন' যন্ত্রে রেকর্ড করা হইয়াছিল। এক একখানি রেকর্ড ষোল ইঞ্চি।

ভাল্‌ভ্‌

ভিটাফোনের পদানুসরণ করিয়া উইলিয়াম ফক্সের 'মুভিটোনের' জন্ম হইল ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। এবার আর রেকর্ডে নয়,—মুভিটোন জন্মিবার ফলে কর্ত্তারা ফিল্মের উপরেই শব্দ রেকর্ড করিতে পারিলেন। এই যন্ত্র দুইটার নির্ম্মাতা ওয়েষ্টার্ন কোম্পানী। ইঁহাদের প্রণালীর নাম 'ওয়েষ্টার্ন ইলেকট্রিক সাউণ্ড সিষ্টেম'।

ওয়েষ্টার্নের পর কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন আমেরিকার রেডিয়ো কর্পোরেসন। ইঁহাদের যন্ত্রে ফিল্মের গায়েই শব্দ রেকর্ড করা হয় বটে, কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে। ইহা ছাড়া আজকাল বহু কোম্পানী নানা রকমের সবাক-চিত্র দেখাইবার যন্ত্র, ক্যামেরা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেছেন। উইলিয়ম ফক্সের পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বহু চিত্র-প্রতিষ্ঠান নির্ব্বাক-ছবি তুলিবার কায বন্ধ করিয়া সবাক ছবি তুলিবার কাযে অবতীর্ণ হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সবাক-ছবির আশাতীত উন্নতি হয়। ছবির গল্প, পরিচালনা, অভিনেতা-অভিনেত্রী-নির্ব্বাচন, আলোক-বিতরণ ইত্যাদি সকল কাযই নব পদ্ধতিতে হইতে লাগিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথমে ফনোগ্রাফ, পরে টেলিফোন ও বেতার হইতে শব্দ আসিয়া স্থান অধিকার করিল নীরব ছবির সেলুলয়েডের পাশে। কাযেই ইহাকে বৈজ্ঞানিক জগতে অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার কে না বলিবে?

[ক্রমশঃ

শ্রীনিতাই ঘোষ ও শ্রীসুকুমার হালদার।

মঙ্গোলিয়ার স্বায়ত্তশাসনলাভ

মঙ্গোলিয়া চীন সাম্রাজ্যের উত্তর এবং মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্বে অবস্থিত। এই রাজ্যটি বিস্তারে ১৩ লক্ষ ৬৭ হাজার বর্গ-মাইল। ইহা একটি তৃণশস্পাচ্ছাদিত দেশ। এখানকার অধিবাসীরা সংখ্যায় ২০ লক্ষের অধিক হইবে না। ইহারা অধিকাংশই পশুপালন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা নানা জাতিতে বিভক্ত। যথা—মোগল, কালমাক, টুঙ্গু, চীনা এবং বিবিধ তুর্কজাতি। চীনারাই ইহার একাংশে কৃষি-সেবাপরায়ণ। অন্য সকল জাতিই তথাকার বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে পশুচারণ করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এক কালে এই দেশের লোক ধরাপৃষ্ঠে অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দেশের জেঙ্গিজ খাঁই এই জাতির খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুবলাই খাঁ ভারতবর্ষ, আরব এবং এসিয়া-মাইনর ভিন্ন সমস্ত এসিয়ার এবং য়ুরোপের রুসিয়ায় স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল। বাবর এই দেশের মোগল-বংশেই জন্মিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। আজ এই দেশের সেই অতীত গৌরবের কোন নিদর্শনই নাই। এখন এই দেশ চীনাদিগেরই অধীন। অনেক দিন হইতে এই দেশকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিবার কথা হইয়া আসিতেছে। মঙ্গোলিয়াবাসীরাও কতকটা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার চাহিয়া আসিতেছে। চীনের রাজনীতিক মহাপুরুষ ডক্টর সান ইয়েটসেন প্রথমে মোগলদিগকে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দিবার পরিকল্পনা করিয়া যান। বিশেষতঃ যে সকল সম্প্রদায় সংখ্যায় অল্প ছিল, তাহাদিগকে চীন সরকারের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিবার বাসনা তাঁহার ছিল। সেই জন্য মঙ্গোলিয়ার চাহার (Chahar) এবং সুইয়ুয়ান অঞ্চলে তিনি প্রথমে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। অনন্তর মঙ্গোলিয়ার (Inner Mongolia) নেতৃবর্গ বহুদিন ধরিয়া এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া আশা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরপূর্ব্ব চৈনিক প্রদেশের রাজপুরুষ প্রভৃতিরা ইহার প্রতিকূলতা করিয়া আসিতেছিলেন বলিয়া ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু সম্প্রতি সান ইয়েটসেনের সেই পরিকল্পনা বাস্তব ব্যাপারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। যে সকল প্রদেশ চীনের প্রাচীরের বহির্ভূত, কিন্তু চীনের চক্রবর্ত্তিত্বাধীন (যথা চাহার, সুইয়ুয়ান, চিহিলি, জেহোল প্রভৃতি) সেই সকল স্থানের মধ্যে চাহার এবং সুইয়ুয়ানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐরূপ অন্য প্রদেশগুলিতেও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিবার কথা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা নূতন ব্যবস্থা নহে। বহুদিন পূর্ব্বে ডাক্তার সান ইয়েটসেন এই ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া যান। তিনি স্থির করিয়া যান যে, যে সকল অঞ্চলে বা প্রদেশে ঊনজন সম্প্রদায় বা জাতি আছে, সেই সকল প্রদেশে খাস চীনের চক্রবর্ত্তিত্বাধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেই স্বায়ত্তশাসন কেবল নামমাত্র এবং দর্শনধারী স্বায়ত্তশাসন হইবে না,—উহা মোঙ্গলদিগের পক্ষে সত্যই স্বায়ত্তশাসন হইবে। স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত প্রদেশগুলির ভিতরেই তাহাদের রাজধানী রহিবে, বাহিরের কোন লোকই উহাদের শাসন-পরিষদে মোড়লী বা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কেবল চীনের জাতীয় সরকার এই সকল স্বায়ত্ত-শাসনপ্রাপ্ত প্রদেশে এক জন করিয়া পরিদর্শক (Supervisor) রাখিয়া দিবেন।

উপস্থিত যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মোঙ্গল সর্দ্দার বা দলপতিদিগের শাসনপদ্ধতি যে ত্রুটিশূন্য বা আদর্শস্থানীয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কেহ তাহা মনেও করে না। কারণ, ঐ সকল সর্দ্দারের মনে আভিজাত্যের অহঙ্কার আছে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলিবার বাসনাও বলবতী। কাযেই তাহাদের দ্বারা খাঁটি গণতন্ত্রমূলক শাসনযন্ত্র পরিচালিত হওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু প্রথমে এই ভাবেই গণতন্ত্রবাদের প্রাথমিক ভিত্তিপত্তন করা হইল। ক্রমশঃই ইহার বিকাশসাধন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে একতা-বন্ধন দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সময় না হইলে জোর করিয়া সেই গণতন্ত্রমূলক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। চীনের খাস প্রদেশগুলিতে যখন প্রকৃত গণতন্ত্রমূলক স্বায়ত্তশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই ঐ সকল মোঙ্গলপ্রদেশেও উহা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে। তাহার পূর্ব্বে সেরূপ স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। যাহা হউক, চীন যে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাই সুখের কথা।

ফরাসীদিগের উপনিবেশ

ফরাসী উপনিবেশগুলির অবস্থা ইদানীং বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে পৃথিবীব্যাপী মন্দা উপস্থিত হইয়াছে, ফরাসীদিগের উপনিবেশগুলিতে তাহার প্রভাব অল্প পতিত হয় নাই। ফরাসীরা বলিতেছেন যে, সম্প্রতি

এই ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আলজিরিয়া ফরাসী-দিগের একটি উপনিবেশ। ইহার আয়তন ২ লক্ষ সাড়ে ২২ হাজার বর্গ মাইল। সুতরাং রাজ্যটি ছোট। আগামী বৎসরে এই রাজ্যে ১ শত ৮১ কোটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ফ্রাঙ্ক আয় হইবে স্থির হইয়াছে, ব্যয় হইবে ১ শত ৮০ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ১ শত ৮২ ফ্রাঙ্ক। এবার রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গ্যাসোলিন এবং মদ্যের উপর করের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন কমাইয়া খরচ কিছু কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দেশের লোকসংখ্যা ৫৫ লক্ষ ৬৩ হাজার। শিশু এবং বৃদ্ধ ধরিয়া লোকসংখ্যা ঐরূপ। যদিও ফ্রাঙ্কের মূল্য অত্যন্ত অল্প, তাহা হইলেও ঐ দরিদ্র দেশের করভার নিতান্ত অল্প নহে। ঐ দেশে যাহারা তামাকের চাষ করে, তাহাদের অবস্থা বড় সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তামাক-চাষী-দিগের সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৭ শত ৬০ আর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ হাজার ৮ শত ২ জন। তামাকের উৎপত্তিও খুব কমিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে তথাকার উৎপন্ন তামাকের পরিমাণ ৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে নামিয়া ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। টিউনিসে যাহারা সীসার খনিতে মজুরী করিত, তাহাদের সংখ্যা ৪ হাজার ছিল। এখন ঐ খনিগুলির অবস্থা এতই মন্দ হইয়াছে যে, উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টিউনিস আলজিরিয়ার পূর্ব্বস্থিত একটি অতি ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকীর্ণ দেশ। ইহার ভূমি-পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা ২০ লক্ষেরও কম। সীসার খনি বন্ধ হওয়াতে তথায় ৪ হাজার লোকের একটা উপার্জ্জনের পন্থা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তথায় লোকের অবস্থা কি, তাহা সহজেই বুঝা যায়! এই দেশের লোক অত্যন্ত নিঃস্ব।

মরক্কো ফরাসীদিগের একটি সংরক্ষিত রাজ্য। এই রাজ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে এক হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজ্যটি অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার ভূমি-পরিমাণ ২ লক্ষ সাড়ে ৩১ হাজার বর্গ-মাইল। সুতরাং ইহা বিস্তারে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা এবং আসাম অপেক্ষা বৃহত্তর। কিন্তু ইহার অধিবাসিসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষের অধিক হইবে না; সুতরাং কেবল বাঙ্গালার অধিবাসিসংখ্যা হইতে কিছু অধিক। এই দেশের ফরাসী শাসন-কর্ত্তা পঁসো (Ponsot) বলিতেছেন, এখন এই অঞ্চলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। আটলাস পর্ব্বতের উপর পার্শ্বস্থ লোকদিগের বিদ্রোহ দমিত হইয়া গিয়াছে আর মারাকেস্ হইতে টিউনিসের রাজধানী টিউনিস সহর পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়াতে উত্তর-আফ্রিকার ফরাসীদিগের অধিকৃত ভূভাগগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। মারাকেস্ মরক্কোর অন্যতম রাজধানী। মরক্কো দেশে ম্যাঙ্গ্যানিজ ধাতুর উৎপত্তি বাড়িয়াছে ৪ হাজার টন হইতে ৪ হাজার ৮ শত টন এবং এনথ্রাসাইট (এক প্রকার কয়লা) নামক খনিজ পদার্থের উৎপত্তি বাড়িয়াছে ১০ হাজার টন হইতে ২৭ হাজার ৩ শত টনে। ফস্ফরাসের রপ্তানী দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ৭ হাজার টন, গত বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন অধিক। ফ্রান্সের এই উপনিবেশ এবং আশ্রিত রাজ্যগুলি ফ্রান্সের যে সমৃদ্ধি বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান বৎসরে এই রাজ্যগুলি হইতে ফ্রান্স ১৮৯ কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের পণ্য স্বদেশে আমদানী করিয়াছে আর ফ্রান্স হইতে এই রাজ্যগুলি লইয়াছে ১শত ৮৫ কোটি ৮০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যের পণ্য। ফ্রান্সের সমস্ত বহির্ব্বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ প্রায় এই সকল অধীন রাজ্যের সহিত নির্ব্বাহিত হয়। ইহাতে ঐ সকল রাজ্যের মূল্য ফ্রান্সের নিকট কত অধিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

রুসিয়া ও জাতিসঙ্ঘ

সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়া জেনিভার জাতিসঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন। উদ্যোগ-আয়োজন সমস্তই পূর্ব্বে ঠিক হইয়া গিয়াছিল। ভোটও গৃহীত হইয়াছে। লীগের এসেম্ব্লিতে ৩৯টি ভোট রুসিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছে, ৩টি মাত্র ভোট প্রতিকূলে এবং ৭টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই ব্যাপারে ভোটদান করে নাই। সুইটজারল্যাণ্ডের, পর্ত্তুগালের এবং হলাণ্ডের প্রতিনিধিরা রুসিয়ার প্রতিকূলে ভোট দিয়াছিলেন। আয়ার্লণ্ডের তরফ হইতে ডি ভ্যালেরা বলেন যে, এই ব্যাপারটা কেবল রাজনীতিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ নহে। ইহার শাখা-প্রশাখা আরও অধিক দূর বিস্তৃত। তিনি আরও বলেন যে, সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়ার পক্ষে তাহাদের অধীন জনসাধারণকে নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার এবং ভগবানের আরাধনা করিবার স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। আরও অনেকে এই মর্ম্মে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, অধিকাংশের ভোটে রুসিয়া এখন জাতিসঙ্ঘে আসন পাইলেন। লীগের কাউন্সিলে অর্থাৎ পরামর্শ-সভায় সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়া এক স্থায়ী আসন পাইয়াছেন। ঘটনাটি বিস্ময়জনক। কিছুদিন পূর্ব্বেই রুসিয়ার কোন বিশিষ্ট জননায়ক বলিয়াছিলেন যে, "জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীর জাতিসমূহের (অর্থাৎ সমস্ত জনসাধারণের) বিরোধী ও অকল্যাণজনক ধনী-দিগের একটা সম্মেলন মাত্র।" আবার কতকগুলি রুস জননায়ক বলিয়াছিলেন যে, "জাতিসঙ্ঘ আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র পাকাইবার একটা বিরাট বোল্‌তার চাক।" "উহা পৃথিবীর সাধারণ লোক-দিগকে শোষণ করিবার নিমিত্ত গঠিত, পৃথিবীশুদ্ধ দস্যুদিগের একটা গঠিত দলমাত্র।" সেই রুসিয়া আজ জাতিসঙ্ঘে যোগ দিবার জন্য এতই আগ্রহান্বিত যে, আগে থাকিতেই তাঁহার সদস্যগণ তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আসন দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য রাজনীতির এই গহনা গতি বুঝিয়া উঠা ভার।

আজ যে ফ্রান্সের উদ্যোগে সোভিয়েট রুসিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগদান করিলেন, সেই ফ্রান্সের আধাসরকারী সংবাদপত্র জাতি-সঙ্ঘকে কিরূপ অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিলেন, তাহাও দ্রষ্টব্য। ঐ পত্রে অল্পদিন পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল যে, "এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যতপ্রকার শোষণের এবং পীড়নের শাসনপদ্ধতি দেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে এই বলশেভিক শাসনপদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য।" এখন সেই সাম্যবাদী ফ্রান্সও আছে,—সেই অত্যুৎকট সাম্যবাদী রুসিয়াও রহিয়াছে। উহাদের পরস্পরের মূলনীতিগত কোন পার্থক্যই ঘটে নাই। বলশেভিক রুসিয়ার নীতির যে

কোন কোন বিষয়ে সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটান হইয়াছে, তাহা অবস্থার চাপেই করা হইয়াছে। উহাতে মূলনীতির ব্যতিক্রম করা হয় নাই। আজ সেই ফ্রান্স সেই সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়াকে হাত ধরিয়া জাতিসঙ্ঘে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ !"

বর্ত্তমান সময়ে এই ব্যাপার-সঙ্ঘটন বড়ই বিস্ময়কর। কারণ, এখন জাতিসঙ্ঘের প্রভাব অতিশয় ক্ষুদ্র। উহার স্বল্পদিনস্থায়ী ইতিহাসে এরূপ অবস্থা কখনও ঘটে নাই। রুসিয়ার অবস্থাও এখন সুবিধাজনক নহে। সুতরাং তাহার পক্ষে এখন নীতির পরিবর্ত্তন কোনমতেই বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না। উহার এক পার্শ্বে বিজয়দৃপ্ত জাপান সাইবেরিয়ার সম্পদগর্ভ ভূমিগুলি অধিকৃত করিয়া লইবার জন্য লোলুপ দৃষ্টি হানিতেছে এবং আপনাকে সুদূর প্রাচীর অধীশ্বর করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। অন্য দিকে হিটলার-পরিচালিত জার্ম্মাণী নবগঠিত ইউক্রেণ রাজ্যটি অধিকৃত এবং পশ্চাৎপদ স্লাভ জাতিদিগের উপর আর্য্যজাতির প্রভাববিস্তারে প্রয়াস পাইতেছে। জাপান এবং জার্ম্মাণী এই দুইটি দেশই সর্ব্বস্বত্ববাদের বিরোধী এবং নিজ নিজ অধিকার সম্প্রসারণের পক্ষপাতী। সর্ব্বস্বত্ববাদের সহিত এই দুই দেশের কিছুমাত্র সহানুভূতিই নাই। বরং এই দুইটি দেশই বাদী ও সরকার উহার উপর একবারেই খড়্গহস্ত। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় যে সর্ব্বস্বত্ববাদী রুসিয়াকে উভয়সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চীনের অভিজ্ঞতা হইতে রুসিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, জাতিসঙ্ঘ তাহার অন্তর্ভুক্ত জাতিদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এরূপ দেখিয়া শুনিয়া আজ সেই সোভিয়েট রুসিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগ দিবার জন্য এতটা আগ্রহ কেন করিলেন, তাহাই অনেকের নিকট একটা বড় প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে চিচেরিণ জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন :—"সোভিয়েট সরকারের ধারণা এই জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের যে অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ যে সময়ে সকল রাজ্যেরই এই নীতি দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা কেবল নিজ নিজ স্বার্থরক্ষা করিয়া চলিবে,—এই সময়ে সকল জাতিকে নিরপেক্ষভাবে প্রবল জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান রচনা করিলে তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিফল হইবে। সেই জন্য যে প্রতিষ্ঠান কেবল কতকগুলি রাজ্যের অথবা রাজ্যসমূহের স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের এবং অন্যকে আক্রমণ করিবার সুবিধা দান করিবে, সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া উহাদের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়া একবারেই অসম্মত।" কিন্তু এই ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় হইবে, যে সময়ে চিচেরিণের প্রতিকূল মন্তব্য সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, সেই সময়ে চিচেরিণের পদে অধিষ্ঠিত রুস রাজনীতিকরা তাহার প্রতিকূল সমালোচনার বিষয়ীভূত প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার বাসনা করিলেন। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে একটা কথা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে বণিক এবং সর্ব্বস্বত্ববাদী সম্প্রদায়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহাদের পরস্পরের মত সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেই জন্য উভয় দলকেই নিজ নিজ পায়ের মল খসাইতে হইয়াছে।

সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়ার সহিত জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতের কোনরূপ ভিন্নতা নাই। বলসেভিক রাজনীতিকরা শান্তিকামী। শান্তিসংস্থাপনই তাঁহাদের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য লক্ষ্য। বলসেভিকরা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমনিরত দরিদ্রেরই স্বার্থে অবহিত; এক জাতির সহিত অন্য জাতির যুদ্ধ বাধিলে বর্ত্তমান যুগে তাহার তরঙ্গোচ্ছ্বাস আসিয়া দেশের সাধারণ লোকের উপরই পতিত হয়, দেশের সাধারণ লোকরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কাযেই বলসেভিকরা আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রামের ঘোর প্রতিকূল। ইহার উপর অন্য কারণেও তাহারা সংগ্রামের বিরোধী। তাহারা সাম্যবাদকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজিতে বসিয়াছে। ইহা একটা নূতন ব্যাপার। বিদেশী জাতির সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহাদের সমস্ত সামাজিক পরিকল্পনারই ওলট-পালট হইয়া যাইবে। এই কারণে তাহারা বিদেশীদিগের সহিত সংগ্রামের ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত। উহারা সংগ্রামের ভয়ে এত ভীত হইয়া পড়ে কেন, এবং শান্তিরক্ষাই উহাদের মুখ্য নীতি বলিয়া কেন মানিয়া লইয়াছে ? কার্ল রাডেক এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,—"কারণ, সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্রী সমাজ সংগঠনের অনুকূল সমস্ত অবস্থাই পাওয়া চাই।" সমাজের আদিস্থানীয় শ্রমিকদিগের ভূমি রক্ষা করাই যখন সোভিয়েটদিগের প্রধান কাম্য, তখন তাহারা কোনক্রমেই নূতন যুদ্ধে ব্রতী হইয়া একটা উৎকট অপরাধ করিয়া বসিতে পারে না।

সোভিয়েটদিগের এই শান্তিরক্ষা-নীতি দুই প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা নিরস্ত্রীকরণের একান্ত পক্ষপাতী। রুসিয়া যেরূপ অস্ত্রসংকোচনের জন্য চেষ্টা করিয়াছে, অন্য কোন জাতি সেরূপভাবে ঐ বিষয়ের জন্য চেষ্টা করে নাই। অথচ ধনী সম্প্রদায় উহাদের কথা কপট বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাহাদের পরকে দোষী বলিবার মুখ নাই। সোভিয়েট দলের মুখপাত্ররা নিরস্ত্রীকরণের যে ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ নিখুঁত হইয়াছিল, এ কথা অনেকেই বলিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জেনোয়াতে সোভিয়েটদিগের প্রথম মুখপাত্র অস্ত্রত্যাগ সম্বন্ধে প্রথম কথা বলেন। তিনি বলেন যে, অন্য সমস্ত কর্ম্ম শিকায় তুলিয়া রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে অস্ত্র ত্যাগ করা আবশ্যক। অগ্রে অস্ত্রত্যাগ, পরে আর্থিক ব্যাপারের পুনর্গঠন। সে কথা বাতাসে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের আখড়াই কমিশনে সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াই এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, অবিলম্বে পূর্ণমাত্রায় নিরস্ত্রীকরণের নীতি কার্য্যে পরিণত হইবে। সমস্ত সৈনিককে বিদায় করিয়া দিতে হইবে, নৌবাহিনী এবং বৈমানিক সৈন্য, সমর বিভাগ, সামরিক বজেট ও সামরিক শিক্ষা রহিত করিয়া দিতে হইবে। সে প্রস্তাব কেহই গ্রাহ্য করে নাই। তাহার পর তাঁহারা উহা অপেক্ষা কতকটা নরম করিয়া অর্থাৎ সমর-সজ্জার কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া

অস্ত্রসঙ্কোচনের এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু সে প্রস্তাবও বড়ই উৎকট বলিয়া অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়। উপর্য্যুপরি দুইটি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়াতে সোভিয়েট প্রতিনিধিরা বলিলেন যে, তাঁহারা সমরসজ্জা রহিত করিবার একান্ত পক্ষপাতী, কারণ, সামরিকতাকে একবারে ঝাড়ে মূলে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে কখনই নির্বিঘ্নতাকে ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করা ঘটিবে না, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস; তবে সামরিকতা বর্জ্জনের কোন অসম্পূর্ণ প্রস্তাবও যদি কেহ করেন, আর তাহা যদি নির্বিঘ্নতা-সাধনের কতকটা সহায়তা করে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার পক্ষে সহযোগিতা করিবেন। ফলে সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়া প্রথম হইতেই জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য এক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অস্ত্রশস্ত্র বর্জ্জনের কোন ব্যবস্থাই হইল না দেখিয়া রুসিয়া শান্তিরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সন্নিহিত প্রায় ১৪টি জাতির সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহারও রাজ্য আক্রমণ করিবেন না। এসিয়া খণ্ডে কেবল জাপান এবং চীনের সহিত তাঁহারা এইরূপ চুক্তি করিতে পারেন নাই। জাপানের সহিত এই চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে। য়ুরোপে একমাত্র গ্রেটবৃটেন ভিন্ন অন্য কোন দেশের লোকের সহিত তাঁহাদের ঐরূপ সন্ধি হয় নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, শান্তি-সংস্থাপনের জন্য রুসিয়া জাতিসঙ্ঘ অপেক্ষা অল্প চেষ্টা করিতেছে না। জাতিসঙ্ঘের কথিত উদ্দেশ্যের সহিত রুসিয়ার উদ্দেশ্যগত একতা আছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

যাহা হউক, জাতিসঙ্ঘের সহিত রুসিয়ার উদ্দেশ্যগত কোন কোন বিষয়ের একতা আছে, কোন কোন বিষয়ের একতা নাই। সে সকল বিষয়ের আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সর্ব্বস্বত্ববাদী রুসিয়া আর্থিক বিষয়ে ধনিপ্রধান রাষ্ট্র-সমূহের সহিত বাণিজ্যক্ষেত্রে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহেন। ১৯২৭ এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যে পৃথিবীর বার্ত্তিক সমিতি (The World Economic Conference) বসিয়াছিল, রুসিয়ার প্রতিনিধিরা তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা এ কথা বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, রুসিয়া শান্তিসংস্থাপনেরই পক্ষপাতী। ধনিপ্রধান রাজ্যগুলির সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইবার কোন মৌলিক কারণই নাই। ঐ সকল রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা হইতে রুসিয়ার আর্থিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র বটে, তাহা হইলেও উভয়বিধ রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিকক্ষেত্রে একতা বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। লিট্‌ভিনফ সে কথা বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। কারণ, রুসিয়া শান্তি চাহে। এখন রুসিয়া কয়েকটি সর্ত্তে জাতিসঙ্ঘে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি সর্ত্তই প্রধান। প্রথমতঃ জাতিসঙ্ঘের কতকগুলি শক্তিকে রুস সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এখন পৃথিবীর ৫৭টি শাক্তিক রাজ্য জাতিসঙ্ঘে নাম লেখাইয়া আছেন, তন্মধ্যে ইহার পূর্ব্বে কেবলমাত্র ২৮টি রাজ্য রুস সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। উহারা সংখ্যার অর্দ্ধেকেরও অল্প। সুতরাং রুসিয়ার পক্ষে আর কতকগুলি রাজ্যকে সোভিয়েট সরকারকে সরকার বলিয়া স্বীকার করাইবার দাবী অসঙ্গত নহে। এই সর্ত্ত রক্ষিত হইয়াছে। ৪০টি রাজ্য সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, জাতিসঙ্ঘকে রুসিয়াকে উহাতে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে হইবে। এই দ্বিতীয় সর্ত্তটি করিবার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, অন্যথা তাঁহারা আবেদন করিলে অন্যান্য বহুসংখ্যক শক্তি তাঁহাদিগের যোগদানে আপত্তি করিতে পারেন। তাহা করিলে রুসিয়াকে অপমানিত হইতে হইবে। এই সর্ত্তও রক্ষিত হইয়াছে, ইহা ভিন্ন এ কথাও একরূপ বুঝা যাইতেছে যে, একটি বড় শক্তি হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে জাতিসঙ্ঘের পরামর্শ পরিষদে একটি স্থায়ী আসন দিতে হইয়াছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে যদি পোল্যাণ্ড উক্ত পরিষদে একটি স্থায়ী আসন প্রাপ্তির দাবী করেন, তাহা হইলেই নানা জটিলতার উদ্ভব হইতে পারে। সোভিয়েট সরকার এখন সালিস-মীমাংসায় মত দিতেছেন। আসল কথা, এখন উভয় পক্ষের মতের ও ভাবের পরিবর্ত্তন অনেক ঘটিয়াছে।

কেন এমন হইল? ইহাই হইল সঙ্গীন সমস্যা। জর্ম্মাণী যদি প্রবুদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা হইলে রুসিয়ারও চিন্তার কারণ আছে, ফ্রান্সেরও আছে, ইটালীরও অনেকটা আছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে হয় ত গরজই বড় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

রুসিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগদান করাতে জাতিসঙ্ঘের বলবৃদ্ধি হইল। এখন জাতিসঙ্ঘের পসার এবং প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল; এ সময়ে রুসিয়ার ন্যায় একটি জাতি উহাতে যোগ দেওয়াতে উহার যে সেই প্রণষ্ট গৌরব পুনরায় লাভ হইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে কেহ কেহ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের শঙ্কার প্রধান কারণ, সোভিয়েট মতাবলম্বী রুসিয়া কখন্ কি ঘটায়, তাহা বুঝা কঠিন। এখন ইহার ফল দেখিবার জন্য সমস্ত সভ্য জগৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

মার্কিণের হেডি-ত্যাগ

হেডি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। সমস্ত দ্বীপটার বিস্তার ২৮ হাজার ৫ শত ২০ বর্গ-মাইল। ইহার কিয়দংশ মার্কিণ দখল করিয়াছিলেন। যে অংশটা মার্কিণের দখলে ছিল, সেই অংশটার নাম এইচ বা "কৃষ্ণ প্রজাতন্ত্র রাজ্য।" উহার বিস্তার ১১ হাজার বর্গ-মাইলের কিছু অধিক। গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে মার্কিণ এই দ্বীপ হইতে তাঁহাদের নৌবাহিনী সরাইয়া লইয়া আসিবেন বলিয়া কথা ছিল। তাহা সম্ভবতঃ কার্য্যে পরিণত করা হইয়া থাকিবে। এই ব্যাপারে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ জাতিরা সহজে তাঁহাদের অধিকৃত কোন অঞ্চল পরিত্যাগ করেন না। কিছুদিন পূর্ব্বেও মার্কিণরা হেডি দ্বীপ পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। এই অঞ্চলের কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদিগের উপর মার্কিণীরা অল্প অত্যাচার করে নাই। মার্কিণ নৌবাহিনীর দ্বারা হেডি দ্বীপটি দখল করিলে পর মার্কিণীদের পক্ষে হেডি দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজপথ নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। তাহারা সুস্থদেহ হেডিবাসীদিগকে "বেগার" ধরিয়া দূরদেশে চালান দিতে এবং তাহাদের দ্বারা জোর করিয়া রাজপথ

নির্ম্মাণ করিয়া লইতে থাকে। উহাদিগকে মার্কিণীরা বহুদিন ধরিয়া সেই সকল স্থানে আটক রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে একটা খোলা যায়গায় আটক রাখা হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে মার্কিণীরা প্রহার এবং গুলী করিত। সেই জন্য উহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সময় সময় মার্কিণীরা প্রায় ২ হাজার নরনারী এবং শিশুকে হত্যা করে। যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাদিগকে মার্কিণীরা ডাকাইত (Bandit) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। ফলে এই বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিটী অত্যাচারী মার্কিণী কর্ম্মচারীদিগকে একরূপ নির্দ্দোষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া দেয়।

এই ব্যাপারে হেডিবাসীদিগের মনে জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহ দমিত হইলেও হেডিবাসীদিগের মনের অসন্তোষ দমিত হয় নাই। ফলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে হেডিদ্বীপে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এবার বিদ্রোহীরা ধর্ম্মঘট করে। এবারেও নররক্তে ধরাতলকে অভিষিক্ত করিয়া বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। হেডির কথা তখন মার্কিণের সংবাদপত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হইতে থাকে। ফলে প্রেসিডেন্ট হুভার সেবার এই ব্যাপারের অনুসন্ধানকল্পে ফর্ব্বেশ কমিশন নিযুক্ত করেন। যাহা হউক, এইরূপ নানা হাঙ্গামার পর মার্কিণীরা হেডি দ্বীপ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং সেক্রেটারী হল (Hall) শেষটা সাব্যস্ত করেন যে, প্রতিবেশীদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলাই কর্ত্তব্য। সেই জন্য সাব্যস্ত হয় যে, মার্কিণ এই রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছেন। ইহা ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কারণ, এরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। মার্কিণের 'কৃশ্চিয়ান সেঞ্চুরী' লিখিয়াছেন যে, হেডি পরিত্যাগ আমাদের (মার্কিণের) পক্ষে যেরূপ শোভন হইয়াছে, আমাদের হেডি দখল করিবার পর আর কখনও সেরূপ শোভন ঘটনা ঘটে নাই। এই কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদিত হইলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সত্য সত্যই সমস্ত সভ্য জগতের ধন্যবাদার্হ হইয়া উঠিবেন। এখন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ সম্পর্কে মার্কিণ কি করেন, তাহাই দেখিবার জন্য সমস্ত সভ্য জগৎ মার্কিণের দিকে তাকাইয়া আছেন।

রাজা-হত্যা

ফ্রান্সে মার্সেলিজ সহরে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। গত ৯ই অক্টোবর তথায় যুগোশ্লেভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ক্যারাজর্জ্জভিচ কয়েক জন নরঘাতকের হাতে নিহত হইয়াছেন। যাহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় এই কার্য্য করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রসচিব মঁসিয়ে বার্থাউব নিহত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ পাঠক দৈনিক পত্রে পাঠ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে আর সে বিবরণ প্রদান করিলাম না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই হত্যাকাণ্ডের কারণ কি? ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপে যে অনর্থ ঘটিতেছে, ইহা তাহারই একটি অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখনও এ বিষয়ের সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ে যুগোশ্লেভিয়া রাজ্যটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বড় বড় শক্তিধরদিগের সুবিধার জন্য বলবান রাজ্যের দেশগুলিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে দেশকে সারভিয়া ও মন্টেনিগ্রো নামে অভিহিত করা হইত, এখনকার মানচিত্রে আর তাহা নাই। এখন ঐ দুই রাজ্য এবং অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় ও তুরস্কের কিছু লইয়াই সার্ভিয়ার সহিত উহাদিগকে সংযুক্ত করিয়া যুগোশ্লেভিয়া রাজ্য গঠিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার গ্রাণ্ডডিউক যে সেরাজেভো সহরে বেড়াইতে যাইয়া বিপ্লববাদীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তাহা এখন এই যুগোশ্লেভিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে নানাজাতির বাস। তন্মধ্যে হাঙ্গেরীর অঙ্গীভূত প্রাচীন ক্রোসিয়ার অধিবাসীরা ক্রোট নামে অভিহিত। ইহারা শ্লাভজাতিভুক্ত। ক্রোটজাতি শিল্পী এবং শ্রমশিল্পসেবী। কিন্তু এই যুগোশ্লেভিয়া রাজ্য গঠিত হইবার পর ইহারা অনেকটা সার্ভিয়ান-দিগের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, সার্ভিয়ান ও ক্রোট জাতি উভয়ই শ্লাভজাতীয়। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের নিকটস্থ স্থান হইতে ইহারা এই দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং দেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ক্রোট এবং শ্লোভেন (শ্লোভেনিক জাতি) জাতিরা যুগোশ্লেভিয়াতে যুক্তরাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য দাবী করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই নিহত রাজা আলেকজাণ্ডার জবরদস্তির সহিত যুগোশ্লেভিয়ায় এক শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সার্ব্ব বা সার্ভিয়ার অধিবাসীদিগকে প্রাধান্য দিয়াই এই শাসনযন্ত্র গঠন করেন এবং স্বয়ং তাহার নিয়ন্তা হয়েন। সেই সময় হইতে ক্রোট ও শ্লোভেন জাতি রাজা আলেকজাণ্ডারের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট রহিয়াছে। আততায়ীর মধ্যে যে ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জাতিতে ক্রোট, সেই জন্য অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, রাজনৈতিক কারণেই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ভিতর যে রাজনীতিক অসন্তোষ কিছু আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রাজা আলেকজাণ্ডার

কিন্তু তাই বলিয়া উহা নিছক রাজনীতিক ব্যাপার হইতে

উদ্ভূত কি না বলা যায় না। সকল কথা প্রকাশ না পাইলে তাহা বলাও সম্ভবে না। তবে এই ব্যাপারে যে কোন বার্ত্তিক প্রশ্ন জড়িত নাই, তাহা নহে। যুগোশ্লেভিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ হাঙ্গেরী হইতে কোন পণ্যই সোজা পথ দিয়া তাঁহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দেন না। উভয় রাজ্যের ৩ শত মাইল বিস্তীর্ণ এবং পরস্পর সংলগ্ন সীমারেখার মধ্যে কেবল নয়টি মাত্র স্থানে তাঁহারা হাঙ্গেরীর কৃষীবল এবং সার্থবাহদিগকে সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে

যুগোশ্লেভিয়ার নূতন রাজা দ্বিতীয় পিটার

ফ্রান্সের নিহত পররাষ্ট্রসচিব বার্থাউ

এবং আসিতে দেন। যুগোশ্লেভিয়াতে হাঙ্গেরীর অনেক কৃষকের জমী আছে। সেই জমী হইতে বাড়ী ফসল আনিতে হইলে তাহাদিগকে ৯৫ মাইল ঘুরিয়া আসিতে হয়, ইহা ঘোর অসুবিধাজনক, তাহা বলাই বাহুল্য। সে জন্য উভয় রাজ্যের মধ্যে বিদ্বেষভাবও বিশেষ প্রবল। তাহার পর আর একটা ব্যাপার আছে। সে ব্যাপারটি রাজনীতিক। গত ১লা মে তারিখে যুগোশ্লেভিয়ার রাজধানী বেলগেডে জার্ম্মাণীর সহিত যুগোশ্লেভিয়ার এক সন্ধি হইয়া গিয়াছে। ১লা জুন হইতে ঐ সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সন্ধি অনুসারে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা খুব সুবিধাজনকভাবে যুগোশ্লেভিয়ার কৃষিজাত পণ্য যথা—তামাক, কাঠের চকোর, তৈল-বীজ, ফল এবং তরিতরকারী জার্ম্মাণীতে প্রবিষ্ট এবং বিক্রীত হইতে দিবেন; পক্ষান্তরে, যুগোশ্লেভিয়ার সরকারও ঐরূপ সুবিধাজনক সর্ত্তে জার্ম্মাণীর শ্রমশিল্পজ পণ্য যুগোশ্লেভিয়ায় আনিতে এবং বিকাইতে দিবেন। ইটালী,—কেবল ইটালী কেন, য়ুরোপের আর কতকগুলি রাষ্ট্রনায়কও এই ব্যাপারটা বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। এ কথা সত্য যে, ইটালীর সহিত যুগোশ্লেভিয়ার বিশেষ প্রীতি নাই। অষ্ট্রিয়ায় যে হাঙ্গামা এবং রক্তারক্তি হইয়া গেল, তাহার মূলে কাহাদের ষড়যন্ত্র ছিল, তাহা লইয়া উভয় দেশের সংবাদপত্রে বেশ কথা-কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। ইটালীয়ানরা বলেন যে, যুগোশ্লেভিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ অষ্ট্রিয়ার নাজী বিদ্রোহকে পোষণ করিয়াছিলেন, যুগোশ্লেভিয়ার লোকরা বলেন যে, ইটালী আপনাদের দায়িত্ব পোষণ করিবার জন্য সকল দোষ যুগোশ্লেভিয়ার স্কন্ধে চাপাইতেছেন। ফলে এই অঞ্চলে নানা ষড়যন্ত্র ও হাঙ্গামা বিদ্যমান। ইহার কোন্ কারণে যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

এই হাঙ্গামায় যে ব্যক্তি আততায়ী বলিয়া নিহত হইয়াছে, সে এক জন ক্রোট। ক্রোটদিগের রাজা আলেকজাণ্ডারের উপর অসন্তুষ্ট হইবার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি বড় কারণ এই যে, রাজা আলেকজাণ্ডারের ব্যবস্থাকালে তাহাদের আর্থিক এবং রাজনীতিক অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছে। এখন সকল তথ্য জানিতে না পারিলে এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। একটা কথা এই যে, মানুষ যখন ক্ষমতা পায়, তখন সে নিজ বা নিজ জনের অথবা আশ্রিত ব্যক্তিদিগেরই স্বার্থসাধন করিতে প্রলুব্ধ হয়, অন্যের অর্থাৎ দুর্ব্বল পক্ষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। তখন দুর্ব্বল পক্ষ কাপুরুষের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া তাহাদের প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এখানে তাহাই হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। রাজা আলেকজাণ্ডার কতকটা দম্ভভরে স্বহস্তে ও স্বপক্ষে অধিক ক্ষমতা রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে বিদেশে এইরূপে নিহত হইতে হইল। কিন্তু যাহারা এই হত্যাকাণ্ড করিয়া বসিল, তাহাদের ইহাতে কোন প্রকার লাভই হইবে না। কারণ, এরূপ হত্যাকাণ্ড দুর্ব্বলতার এবং কাপুরুষতারই পরিচায়ক, ইহার দ্বারা সুফললাভের আশা করা বাতুলতামাত্র।

এ বারের কংগ্রেস

কংগ্রেস বসিবার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই গুজব রটিয়াছিল, মহাত্মাজী এইবার কংগ্রেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া যাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে কংগ্রেস উঠিয়াছে, বসিয়াছে, লাফাইয়াছে, পড়িয়াছে, তাঁহার মনে অকস্মাৎ এই বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল কেন, তাহা লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। মহাত্মাজীর অন্তরঙ্গ ভক্ত-বৃন্দের মধ্যেও কেহ কেহ কাণাঘুষা করিতে লাগিলেন যে, নবীন দলের সহিত মতভেদ হইতেই এই বৈরাগ্যের স্ফূর্ত্তি। মহাত্মাজী যে পথে কংগ্রেসকে পরিচালিত করিতে চাহেন, তাহার উপর নবীন দলের নেতৃবৃন্দের আস্থা নাই। সুতরাং এই অবিশ্বাসীদিগের স্কন্ধের উপর নেতৃত্বের বোঝা চাপাইয়া দিয়া মহাত্মাজী অবসর গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প।

কিছু দিন পরেই মহাত্মাজী স্বয়ং যে বিবৃতি প্রচার করিলেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, গুজবটা মোটেই ভিত্তিহীন নহে। সে বিবৃতির সারমর্ম্ম এই যে, তাঁহার আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে না পারাই যে আইন-অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ, সে বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহমাত্র নাই। তবে কংগ্রেসকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বোম্বায়ের অধিবেশনের সময় দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সে প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে কংগ্রেস কি রায় দেন, তাহা দেখিয়া তিনি নিজের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। প্রস্তাব দুইটি এই—(১) শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে কংগ্রেস স্বরাজ লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, এ কথা না বলিয়া বলিতে হইবে যে, কংগ্রেস সত্য ও অহিংস উপায়ে স্বরাজ লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। (২) যাহারা নিজ হাতে চরকায় বা টাকুতে সূতা কাটিতে রাজি হইবে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না।

যাঁহারা অভক্ত, তাঁহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, মহাত্মাজীর উপর লোকের ভক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, এই দুইটি অদ্ভুত প্রস্তাব গলাধঃকরণ করিবার সামর্থ্য অধিকাংশ লোকেরই নাই। সুতরাং মহাত্মাজীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হইতে কংগ্রেস এইবার অব্যাহতি পাইয়া দেবলোক ছাড়িয়া মরলোকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিবে। তবে এ ভয়ও তাঁহাদের মনে ছিল যে, মহাত্মাজীকে হারাইয়া অনাথ হইবার ভয়ে কংগ্রেস হয় ত কার্য্যতঃ না হউক, মুখে এ দুইটি প্রস্তাবই মানিয়া লইতে পারে। চরকার পরমায়ু তাহা হইলে অক্ষয় হইয়া যাইবে, এবং অহিংসা অভ্যাসের ঠেলায় কংগ্রেস হয় ত ক্রমশঃ রাজনৈতিক নেড়ানেড়ীর দলে পরিণত হইবে! কোন কোন অভক্তের মনে এরূপ পাপ-চিন্তাও দেখা দিল যে, হয় ত মহাত্মাজীর কংগ্রেস ছাড়িবার সদিচ্ছা মোটেই নাই। তিনি শুধু একটা অহিংস হুমকি দিয়া তাঁহার সাধের প্রস্তাব দুইটি পাশ করাইয়া লইতে চান।

অভক্তরা যাহাই মনে করুন, মহাত্মাজীর কংগ্রেস-ত্যাগের কথা শুনিয়া ভক্ত মহলে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। তাঁহারা বলিলেন—"প্রভু, আমরা নিতান্তই অভাজন। দোষ-ত্রুটির আমাদের অন্ত নাই! ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ ও পুলিসের ব্যাটন সত্ত্বেও যে আমাদের মনে মাঝে মাঝে হিংসার ছায়া আসিয়া পড়ে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর চরকা-মাহাত্ম্য ঘোষণা হইবার পরেও যে আমরা স্বরাজলাভের জন্য সূতা কাটিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, এ কথাও সত্যের অপলাপ না করিয়া বলিতে পারি না। তবে এইবার হইতে আমরা ভালছেলে হইতে আরম্ভ করিব। সদা সত্য কথা কহিব; কখন কাহাকেও কুবাক্য কহিব না, প্রহার খাইলে দন্ত বাহির করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিব; এবং প্রত্যহ নিয়মিতভাবে একবার চরকা লইয়া বসিব। তবে মাঝে মাঝে যদি ভুলচুক হয়, তাহা আপনাকে নিজগুণে ক্ষমা করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু দোহাই আপনার, কংগ্রেস ছাড়িবার সংকল্প আপনি ত্যাগ করুন।"

মহাত্মাজী এই সমস্ত আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রসন্ন হইলেন কি অপ্রসন্ন হইলেন, তাহা ম [illegible] জানেন। তবে মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের কেহ কেহ আর্ত্ত ভক্তদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন যে, কাতর অনুনয়-বিনয়ের ফলে মহাত্মাজী তাঁহার কঠোর সংকল্প প্রত্যাহার করিয়া হয় ত একটা রফায় রাজী হইয়া যাইতে পারেন।

যাঁহারা এই ভক্ত ও অভক্ত দলের মাঝামাঝি, তাঁহারাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এ কথা দিন দিন প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, অহিংসা ও খদ্দর লইয়া কংগ্রেসে যে মতভেদ আছে, সেগুলি ভিন্ন মতভেদের অন্যান্য আরও অনেক কারণ বিদ্যমান। মহাত্মাজী আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত করিয়া একটি পার্লামেণ্টারী দলের সৃষ্টি করায় অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, মহাত্মাজী এইবার অসহযোগের পথ ত্যাগ করিয়া একটি নূতন মডারেট দল সৃষ্টি করিতেছেন, এবং ইহার ফলে, মুখে না হউক, কার্য্যতঃ কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। অসহযোগ আন্দোলন যখন প্রথম আরম্ভ করা হয়, তখন পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতীকারসাধন ও খিলাফতের উদ্ধার, এই দুইটি ছিল ঐ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং অপরের অনুরোধে যে মহাত্মাজী ঐ দুইটি উদ্দেশ্যের সহিত স্বরাজলাভের ব্যাপারটা যোগ করিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা অনেকেই বিস্মৃত হন নাই। তাহার পর বহুদিন যাবৎ মহাত্মাজী যে স্বরাজ কথাটির কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে স্বীকৃত হন নাই, এবং পরিশেষে নবীন দলের জিদ রক্ষা করিবার জন্য কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই যে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে স্বরাজ শব্দটি ব্যবহার করিতে রাজী হইয়াছিলেন—পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আবার এ সমস্ত প্রসঙ্গ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, অসহযোগের দম্ ফুরাইয়া গিয়াছে। এইবার মহাত্মাজী শাসনসম্প্রদায়ের সহিত একটা রফা করিয়া ভারত উদ্ধার পর্ব্ব শেষ করিয়া দিবেন। যুবক সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে যদি স্বদেশ-প্রেমের চাঞ্চল্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেটুকুকে তিনি নিরাপদ সমাজ-সংস্কারের পথে পরিচালিত করিয়া ক্ষয় করিবার চেষ্টা করিবেন।

এ সব কথা বলিতে লাগিলেন প্রধানতঃ সমাজতন্ত্রী দল; এবং ইঁহাদের দৃষ্টিতে মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্য্যগুলিও সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিল। সমাজতন্ত্রী দল প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, মহাত্মাজীর তথা-কথিত গঠন-মূলক কর্ম্মপদ্ধতি সেবাধর্ম্মের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ পন্থা অনুসরণ করিলে জনসাধারণের অল্পবিস্তর নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হয় ত হইতে পারে; কিন্তু উহার কোন রাজনৈতিক মূল্য নাই। উহার ফলে দেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীর দল যে কস্মিন্‌কালে সংঘবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সচেষ্ট হইবে, অথবা স্বরাজ সংগ্রামে যোগ দিবে, সে সম্ভাবনা আদৌ নাই। যাঁহারা মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্য্যপ্রণালীর সমর্থন করেন, তাঁহাদের সহৃদয়তা ও পুণ্যার্জ্জনস্পৃহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, কিন্তু উহার ফলে যে জনসাধারণের আর্থিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ হইবে, এরূপ আশা করিবার কোনও কারণ নাই। সমাজতন্ত্রী দল সেই জন্য চাহিতে লাগিলেন শ্রমিক ও কৃষকদিগকে তাহাদের আর্থিক অভাব ও অভিযোগের ভিত্তির উপর সংঘবদ্ধ করিতে। মহাত্মাজী মনে করিলেন, উহার ফলে দেশে শ্রেণী সংগ্রামের আবির্ভাব হইবে, এবং কংগ্রেসের অহিংস নীতি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহাই হইল মহাত্মাজীর সহিত সমাজতন্ত্রী দলের মতভেদের প্রধান কারণ।

যাঁহাদের আইন অমান্য আন্দোলনের উপর বিশেষ কোন আস্থা ছিল না, অথচ যাঁহারা মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন ও কংগ্রেসী নাম বজায় রাখিবার জন্য সভা-সমিতিতে খদ্দর পরিয়া আবির্ভূত হইতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুযোগ বুঝিয়া পার্লামেণ্টারী দলে যোগ দিয়া ফেলিলেন। ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিবার পর বেশ ঝাঁজাল বক্তৃতা দিয়া তাঁহারা যে অল্পমূল্যে স্বরাজ ক্রয় করিয়া দেশকে উপহার দিবেন, পার্লামেণ্টারী দলের নেতৃবৃন্দ এরূপ আশা-ভরসা দিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা লইয়া তাঁহারাও ফ্যাঁসাদে পড়িয়া গেলেন। বাঁটোয়ারাটা যেরূপ বেয়াড়া, তাহাতে উহার সমর্থন করাও চলে না; আবার উহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে গেলে মুসলমান বন্ধুরাও চটিয়া যান। কাযেই অনেক গবেষণার পর মহাত্মাজীর পরামর্শমত তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সমর্থন বা প্রত্যাখ্যানের গণ্ডগোলের ভিতর না যাওয়াই ভাল। বোবার যখন শত্রু নাই, তখন বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বোবা সাজিয়া বসিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। লোকে কোন কথা কহিলে তাঁহারা বলিলেন যে, কংগ্রেস বাঁটোয়ারাটিকে গ্রহণও করে না, বর্জ্জনও করে না।

কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় এ ক্ষেত্রে বোবারও শত্রু দেখা দিল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলিয়া বসিলেন যে,

প্রকাশ্যভাবে বাঁটোয়ারাটিকে প্রত্যাখ্যান না করিলে দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। তর্ক-বিতর্ক, রফার প্রস্তাব সমস্তই বিফল হইল; এবং পণ্ডিত মদনমোহন কংগ্রেসজাতীয় দল নামে একটি স্বতন্ত্র দল খাড়া করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী কর্ত্তাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন।

এই সমস্ত গণ্ডগোলের ভিতর দিয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মহাত্মাজী আর একটি বিবৃতি প্রচার করিলেন। সংবাদপত্রগুলির সমালোচনার ফলে তিনি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসের মূলনীতির যে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চাহেন, তাহা কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যের মনঃপূত নহে। সুতরাং সে প্রস্তাবগুলি তিনি কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন না। তবে তাঁহার বিদায়কালে তিনি কংগ্রেসের মঙ্গল-কামনায় কংগ্রেসের গঠনপ্রণালীর মধ্যে এমন কতকগুলি পরিবর্ত্তনসাধন করিতে চাহেন—যাহাতে কংগ্রেস অধিকতর সংহত ও শক্তিশালী হইয়া পড়িবে। কংগ্রেসের গুরুভার দেহের সঙ্কোচসাধন এবং ওয়ার্কিং কমিটি ও সভাপতির হস্তে কংগ্রেস পরিচালনা বিষয়ে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ—এই দুইটিই ছিল মহাত্মাজীর পরিবর্ত্তন-প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী নিখিল ভারতীয় চরকা-সঙ্ঘের অনুরূপ আর একটি সঙ্ঘ গড়িয়া মরণোন্মুখ গ্রাম্যশিল্পের উদ্ধারসাধনের সংকল্পও জানাইয়াছিলেন।

মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবগুলি লইয়া সংবাদপত্রে নানাবিধ আলোচনা হইল। মোটের উপর বুঝিতে পারা গেল, কংগ্রেসের বিশাল দেহ কিঞ্চিৎ শীর্ণ করিয়া ফেলিতে জনসাধারণের বিশেষ কোন আপত্তি নাই; তবে ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রকারান্তরে কংগ্রেসের নিয়ন্তা করিয়া তুলিতে লোকের তেমন বেশী আগ্রহ নাই।

এই সমস্ত তর্কবিতর্ক, দলাদলি ও সন্দেহের আবহাওয়ার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। যে কয়টি দল যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

(১) মহাত্মাজীর অন্তরঙ্গ ভক্তের দল। ইঁহাদের নিজস্ব মতামতের বিশেষ কোন বালাই নাই। অহিংসা, খদ্দর, কংগ্রেসের পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয়ে মহাত্মাজীকে পূর্ণভাবে সমর্থন করাই ইঁহাদের লক্ষ্য।

(২) পার্লামেণ্টারী দল। কংগ্রেসের নামে ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেই ইঁহারা তুষ্ট। ইঁহারা প্রধানতঃ প্রাচীন স্বরাজ্যদলের ভগ্নাবশেষ লইয়া গঠিত। আপনাদিগের কার্য্য উদ্ধারের জন্য ইঁহারা মহাত্মাজীর প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখাইতে বিশেষ তৎপর।

(৩) সমাজতন্ত্রী দল—সংখ্যায় অল্প হইলেও যুবক সম্প্রদায়ের উপর এই নবগঠিত দলের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী দলকে ইঁহারা একটি প্রচ্ছন্ন মডারেট দল বলিয়া মনে করেন, এবং মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্য্যপ্রণালীর উপরেও ইঁহাদের আস্থা নাই। কৃষক ও শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করিয়া দেশের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক সংঘর্ষের আবহাওয়ার সৃষ্টি করা ইঁহাদের বর্ত্তমান লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা লইয়া ইঁহারা আপাততঃ বিশেষ নাড়াচাড়া করার বিরোধী।

(৪) পণ্ডিত মালব্যের জাতীয় দল। ইঁহাদের রাজনৈতিক মনোভাব বহুপরিমাণে পার্লামেণ্টারী দলের অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টারী দলের সহিত মতভেদই ইঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রধান কারণ এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ধ্বংসসাধনই ইঁহাদের বর্ত্তমান লক্ষ্য।

মহাত্মাজীর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যিনি যে মতই পোষণ করুন না, কংগ্রেসের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব যে কিরূপ প্রবল, তাহা বোম্বাই অধিবেশন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। মহাত্মাজীর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এমন আপত্তি করিতে লাগিলেন যে, খদ্দর ও অহিংসা সম্বন্ধে যে দুইটি প্রস্তাব মহাত্মা স্বয়ং উত্থাপন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সে দুইটি তাঁহারা নিজে যদি যৎসামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে উত্থাপন করেন, তাহা হইলে হয় ত সেগুলি গৃহীত হইয়া যাইতে পারে। মহাত্মাজীর আশু অবসর-গ্রহণ সম্ভাবনায় কংগ্রেস যখন কাতর, তখন মহাত্মাজীকে তুষ্ট করিয়া কংগ্রেসের ভিতর ধরিয়া রাখিবার আশায় হয় ত কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ অনেক কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন।

হয় ত বা তাহাই হইত। কিন্তু মহাত্মাজীর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ বিজয়-সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া মাঝে মাঝে যেরূপ

সাত্ত্বিক অহমিকার উৎকট প্রকাশ করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে হিসাবে কিঞ্চিৎ গোলমাল হইয়া গেল। সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসী-কর্ত্তাদের উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি তীব্র-ভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রথম প্রথম তাঁহারা পরাজিত হইলেও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যখন বিশুদ্ধ উর্দ্দু ভাষায় কংগ্রেসের বৈধ ও শান্তিপূর্ণ নীতির পরিবর্ত্তন করিয়া "সত্য ও অহিংসা" নীতির প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলেন, তখন ভোটগণনার সময় দেখা গেল যে, ছক উল্টাইয়া গিয়াছে!

মহাত্মাজীর ভক্তবৃন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহারা মহাত্মাজীর শরণাপন্ন হইলেন। মহাত্মাজী পূর্ব্বেই জানিয়া-ছিলেন যে, এই যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না। কিন্তু ভক্তবৃন্দের কাতর ক্রন্দনে তাঁহার সংকল্প টলিল। স্থির হইল যে, কংগ্রেসের পুনর্গঠন-বিষয়ক প্রস্তাবটি তিনি নিজেই উত্থাপন করিবেন। সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখিলে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধেক ভাগ ত্যাগ করিয়া থাকেন। মহাত্মাজীও তাহাই করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগের সহিত পরামর্শ ও তর্ক-বিতর্ক করিয়া তিনি একটা নূতন খসড়া খাড়া করিলেন, এবং এই রফার ফলে তাঁহার ইচ্ছা ষোল আনা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু সমাজতন্ত্রীদিগের আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইল, এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য প্রস্তাব-গুলি গৃহীত হইবার পথ সুগম হইয়া গেল। পণ্ডিত মালব্য যখন ওয়ার্কিং কমিটীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন দেখা গেল যে, মহাত্মাজীর খাস ভক্তমণ্ডলী ও পার্লামেন্টারী দলের সহিত সমাজতন্ত্রী দলও পূর্ণভাবে যোগ দিয়াছেন। পণ্ডিতজীর জাতীয় দল কাঁযে কাযেই সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন।

গ্রাম্যশিল্প উদ্ধারের জন্য মহাত্মাজী যে স্বতন্ত্র সংঘ গড়িবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, অল্পবিস্তর প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহা পাশ হইয়া গেল।

রণবাদ্য যখন শান্ত হইল, তখন দেখা গেল যে, মহাত্মাজীর দলেরই জয়লাভ হইয়াছে। ষোল আনা না হউক, তাঁহাদের বারো আনা ইচ্ছাই সফল হইয়াছে। মহাত্মাজীর কৃপায় পার্লামেন্টারী দল আপনাদিগের কায গুছাইয়া লইয়াছেন। পণ্ডিত মালব্যের জাতীয় দল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সমাজতন্ত্রী দলও মহাত্মাজীর রণকৌশলের প্রভাবে অবনতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মহাত্মাজী তাঁহার কথামত কংগ্রেস পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেসের গঠনমূলক কায বলিতে যাহা কিছু বুঝাইত, সে সমস্তই তাঁহার কর্তৃত্বাধীন রহিল। পুনর্গঠিত কংগ্রেস তাঁহার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিলেও, কংগ্রেসের পরিচালনভার তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের উপরেই ন্যস্ত থাকিবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা যে আবার নূতন করিয়া কংগ্রেসকে আপনাদিগের ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন, সে সম্ভাবনাও রহিয়া গেল।

তবে তাঁহারা যে নিষ্কণ্টকভাবে রাজ্যভোগ করিবেন, তাহাও মনে হয় না। পণ্ডিত মালব্যের জাতীয় দল কংগ্রেসের ভিতর পরাজিত হইলেও দেশের ভিতর হীনপ্রভ নহেন; তাঁহাদের সহিত পার্লামেন্টারী বোর্ডের শক্তি-পরীক্ষারও শেষ হয় নাই।

সমাজতন্ত্রী দলের প্রভাবও ক্রমবর্দ্ধমান, এবং মহাত্মাজীর গঠনমূলক নীতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে তাঁহারাও যে ভবিষ্যতে দেখা দিবেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনতার অন্তরালে দাঁড়াইয়া ঘোড়াদৌড় দেখা

বিপুল জনতার প্রাচীর ভেদ করিয়া পশ্চাতের দর্শকরা ঘোড়ার দৌড় দেখিতে পায় না, এ জন্য জার্ম্মাণীতে "পেরিস্‌কোপ" সাহায্যে দর্শকগণ সে অসুবিধা এড়াইয়াছে। অনেকগুলি দর্পণ একটি দণ্ডে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, দৌড়ের ঘোড়ার প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রতিফলিত হয়। তাহাতে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রিয় ঘোড়া কি ভাবে দৌড়াইতেছে, তাহা দেখিতে পায়। চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে, দর্শকগণ জনতার পশ্চাতে থাকিয়াও

দর্পণ-সাহায্যে ঘোড়দৌড় দেখা

কিরূপ ভাবে ঘোড়দৌড় দেখিতেছে। নিম্নস্থ দর্পণে ঘোড়ার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

ডাক্তারী ষ্টেথস্‌কোপ যন্ত্রের ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে গ্যাসবাহিত নলের কোথায় ছিদ্র হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারা যায়। এই যন্ত্র নলে সংলগ্ন করিয়া কাণে লাগাইলে গ্যাস-নির্গমনের শব্দ ধরিতে পারা যায়। কত দূরে ছিদ্র হইয়াছে, তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না। তাহা অবগত হইবার পর অনতিবিলম্বে ছিদ্রমুখ রোধের ব্যবস্থা হয়। চিত্র দেখিলেই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইবে।

যন্ত্র-সাহায্যে গ্যাসপাইপের ছিদ্র আবিষ্কৃত হইতেছে

কুকুর-বাহিত গাড়ী

কানাডার উত্তর অণ্টারিও অঞ্চলে রেলপথের উপর কুকুর-বাহিত গাড়ী চলিতেছে। সেই গাড়ীতে বাড়ী নির্ম্মাণের উপযোগী দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হইয়া থাকে। ইহাতে সহজেই এক স্থান হইতে অন্যত্র মাল পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা। ব্যয়ও অল্প পড়ে। রেল লাইনের উপর দিয়া কুকুরগুলি সহজেই প্রচুর পরিমাণ মাল দ্রুতগতিতে লইয়া যায়।

কুকুর-বাহিত গাড়ী

নূতন ধরণের ঠেলা-গাড়ী

ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগের জন্য ইদানীং এক প্রকার ঠেলা-গাড়ী বাজারে বাহির হইয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাস যাহাতে শিশুদিগের গায় লাগিতে না পারে, এ জন্য বাতায়ন-বিশিষ্ট
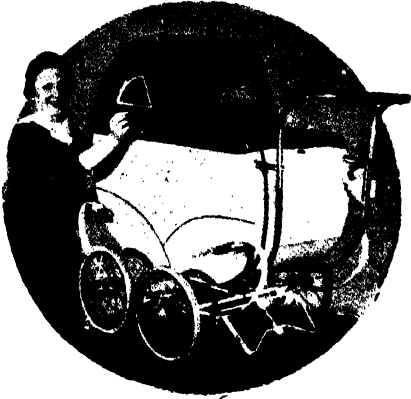
নূতন ধরণের ঠেলা-গাড়ী

আবরণ গাড়ীর উপর থাকে। আধুনিক মোটর-গাড়ীতে যেরূপ বাতায়ন থাকে, উল্লিখিত আবরণে সেইরূপ বাতায়ন সন্নিবিষ্ট আছে। গাড়ীর মধ্যে অবস্থিত শিশুর গায়ে বাতাসের ঝাপটা লাগে না, অথচ বায়ু-চলাচলও বন্ধ থাকে না।

ভাসমান পোতাশ্রয়

ইয়াংসি নদীতে ভাসমান পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। সমুদ্র-বিহারী যানগুলি এই ভাসমান পোতাশ্রয়ে প্রয়োজনকালে আশ্রয় লইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাসমান পোতাশ্রয় পাঁচটি কক্ষে বিভক্ত। প্রত্যেক কক্ষ এমনভাবে নির্ম্মিত যে, বাহির হইতে জল প্রবেশ করিতে পারে না। মাঝখানের কক্ষটিতে জল ভরিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। পাটাতনের উপর সমুদ্র-বিহারী পোতগুলি অবস্থান করে। পোতাশ্রয়ের মাঝখানে একটি দ্বার আছে। উহা বন্ধ করিয়া দিলে, এক বিন্দু জল কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কোনও পোত যখন এই ভাসমান পোতাশ্রয়ে বিশ্রাম করে, তখন জলের উপর পোতাশ্রয়ের তলদেশ জাগিয়া উঠে। যখন পোতকে জলে ভাসাইবার প্রয়োজন হয়, তখন মাঝের কক্ষটি পাম্পের সাহায্যে জলপূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। তখন সমগ্র পোতাশ্রয়—তাহার পাটাতন জলরেখার নীচে কিছু নামিয়া যায়। সে সময় পোত অনায়াসে জলের উপর ভাসিতে থাকে। এই পোতাশ্রয়কে সহজেই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়।
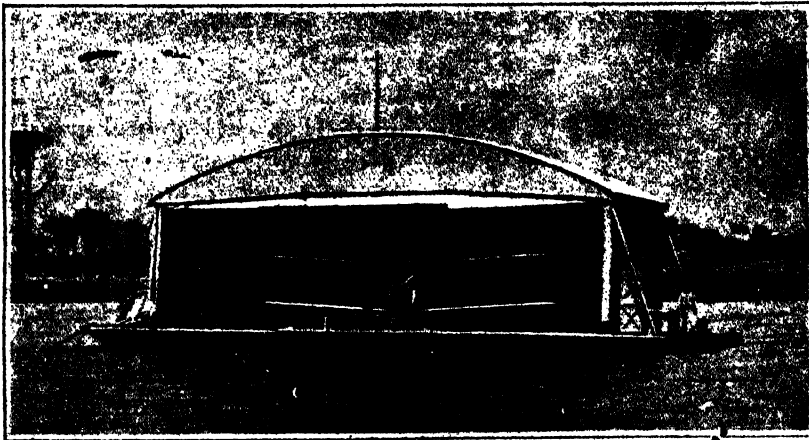
ভাসমান পোতাশ্রয়

বিজ্ঞাপনের কৌশল

কানসাসের লরেন্স নামক স্থানে একটি রেডিও ষ্টেশনের নাম "রেন্"। রেন্ বলিতে গায়ক পক্ষীদিগকে বুঝায়। রেডিও

বিজ্ঞাপনের কৌশল

ষ্টেশনটি ঐ নামে অভিহিত করিয়া, তাহার সম্মুখে একটি বৃহদাকার গায়ক পক্ষীর মূর্ত্তি স্থাপিত করা হইয়াছে। এই পাখীর ওজন বড় কম নহে—১৫ শত পাউণ্ড বা সওয়া ১৮ মণেরও উপর। পাখীর পাগুলি ভারী ইস্পাতে নির্ম্মিত। সমগ্র দেহটিও ইস্পাত-গঠিত। তাহার উপর দুই ইঞ্চ পুরু সিমেণ্টের দ্বারা পালিশ করা। চিত্রকর তার পর সমগ্র দেহে বর্ণ সন্নিবেশ করিয়াছে। পক্ষীর পুচ্ছটি ৭ ফুট উচ্চ।

পর্ব্বতারোহী জোড়া মোটর ট্রেণ

আল্পস পর্ব্বতে মোটর ট্রেণ-যোগে যাত্রীদিগকে বহন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এই জোড়া গাড়ীর যাত্রীরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কামরার মধ্য দিয়া গতায়াত করিতে পারে। সম্মুখের কামরায় মোটর সংযুক্ত। পর্ব্বতের উপর দিয়া যাহাতে এই গাড়ী সহজে চলিতে পারে, তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা ইহাতে আছে। মোড় ফিরিবার সময় কোনও বাধা হয় না।
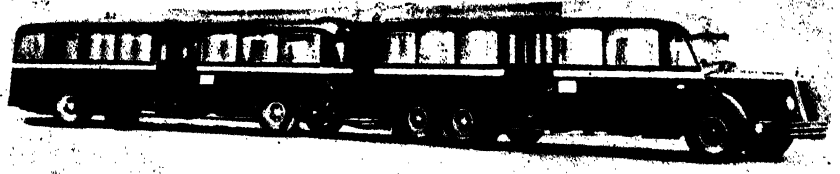
পর্ব্বতারোহী জোড়া মোটর ট্রেণ

কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্য

কলিকাতা বিরাট সহর। এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস। নানা দেশদেশান্তর হইতে অহরহ এখানে লোকজন আসিয়া বসবাস করিতেছে। বস্তুতঃ কলিকাতা সহর যে প্রকার দ্রুত গতিতে প্রসারিত হইতেছে, তাহাতে ইহা ভবিষ্যতে আকার ও আয়তনে একটি ছোটখাট মহকুমা সদৃশ হইবে, এরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। গত কয়েক বৎসর হইতে যাঁহারা এই সহরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, ইতিমধ্যে সহরের কতদূর পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ-কলিকাতায় বালীগঞ্জ, কালীঘাট, টালীগঞ্জ, ও লেক অঞ্চলের দিকে তাকাইলে আর যেন চেনাই যায় না।

কলিকাতা বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশের রাজধানী। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও ইহা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। ইহা শিল্প, বাণিজ্য, লেখাপড়া, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর, লণ্ডন নগরীর পরেই ইহার স্থান। এহেন কলিকাতা যে স্বাস্থ্য ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিক দিয়াও আদর্শস্থানীয় হইবে, ইহা সকলেই আশা করিয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের এই বাঞ্ছিত আদর্শ কতদূর রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা আলোচনা ও বিবেচনার বিষয়।

কলিকাতা সহরে লোকসংখ্যার তুলনায় খোলা যায়গা, পার্ক, পুষ্করিণী প্রভৃতি খুবই কম বলিতে হইবে। খোলা যায়গা বলিতে এক গড়ের মাঠ ব্যতীত সহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন স্থানই দেখিতে পাওয়া যায় না। খোলা বাতাসে বেড়াইলে শরীর মন উভয়ই ভাল হয়। পুরুষ না হয় এখানে সেখানে কষ্ট করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইল, কিন্তু স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আছে? ধনী লোকের স্ত্রী-কন্যারা গাড়ীতে করিয়া গড়ের মাঠে বা লেকের ধারে প্রত্যহ বেড়াইতে বাহির হন; কিন্তু স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র লোকগণের পরিবারবর্গের সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি? সুতরাং এই সমস্ত পরিবারের মহিলাগণের স্বাস্থ্য যে উপযুক্ত বাতাস ও আলোর অভাবে দিন দিন নষ্ট হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? ফলে এই সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে, এবং সংক্রামতার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাও তাহাদের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ থাকে না। এই দারুণ আর্থিক দুরবস্থার দিনে একে পুষ্টিকর আহারের অভাব, তদুপরি সন্তান-প্রসবের বিরাম নাই। সুতরাং এই সমস্ত মহিলা অচিরকালমধ্যেই রক্তহীনতা রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে অল্প জ্বর ও কাসি আসিয়া দেখা দেয়। প্রথমতঃ রোগিণী নিজে অথবা বাড়ীর লোকরা কেহই গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু পরে যখন অবস্থা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, তখন সকলেরই চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। কিন্তু তখন আর সময় থাকে না। রোগিণী অত্যল্পকালমধ্যেই দুরন্ত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ছেলেমেয়ে সম্বন্ধেও এরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এক কলিকাতা সহরেই এই ভীষণ রোগে বহু নরনারী এবং শিশু প্রাণ হারাইয়া থাকে। ইহার পরিণাম যে কত ভীষণ, এবং ইহা দ্বারা যে দেশের অর্থবলের এবং জন-বলের কি প্রভূত ক্ষতি-সাধন হইতেছে, তাহা কেবল বিশেষজ্ঞগণই জানেন।

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। এই দুর্গতির দিনে এমন কোনওরূপ কথার "রাজা মিডাসের" আবির্ভাব হইবে না, যিনি সহসা কোন কিছু পরিবর্ত্তনসাধন করিয়া ফেলিতে পারিবেন। আমাদিগকে এই আবহাওয়ার মধ্যেই যতদূর সম্ভব ভালভাবে বাস করিতে হইবে। এই বিরাট সহরের আমূল পরিবর্ত্তন ২১ দিন বা ২১ মাস, এমন কি, ২১ বৎসরের মধ্যেও সম্ভব নয়। আমরা চিকিৎসা-জীবনের কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখিতেছি যে, এই সমস্ত রুগ্ন মাতা ও শিশুগণকে নিয়মিতরূপে "সিরোলিন রচি" সেবন করাইলে খুব সুফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ সেবন করিয়া কত হতাশ রোগীর প্রাণে যে আশার সঞ্চার করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই ঔষধ গত ৪০ বৎসর যাবৎ বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা সর্দ্দি-কাসি, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি শ্বাসনালী এবং ফুসফুসের পীড়ায় অব্যর্থ এবং অমোঘ ফলপ্রদ। কলিকাতা সহরে যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করিবার জন্য প্রত্যেকেরই বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজনীয়। দুরন্ত যক্ষ্মাব্যাধি সহর হইতে নির্ব্বাসিত না হইলে, দেশের কল্যাণ নাই।

ডাঃ অশ্বিনীকুমার সেন, (এম, বি)

একাদশ পরিচ্ছেদ

"অলি বার-বার ফিরে যায়!"

সীলেটের ছুটী মঞ্জুর হইল। তারপর ঘটনাচক্র এমন দাঁড়াইল, সেখানে ফিরিবার আশা বুঝি নির্ম্মূল হয়! মঙ্গলময় কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। গুরুপদ আসিয়া বুঝাইলেন, পয়সা-কড়ির দিক দিয়া মনে যত বড় বাধা পাহাড় রচিয়া তুলুক, মানুষের মত বিবেচনা করিয়া ছাখো,—সে তোমার একমাত্র আত্মীয়—সে তোমার শুভার্থী—সে চক্ষু মুদিলে তার যথাসর্ব্বস্ব তোমাদের হইবে। তাহাতে লজ্জা বা অপমান নাই। তাছাড়া দেনাপত্র মিটাইয়া যাহা বাঁচানো গিয়াছে—সে সম্পত্তি নিতান্ত তুচ্ছ নয়! সামান্য চাকুরি করিতে গিয়া এ সম্পত্তি যদি খোয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে। বিশেষ, মঙ্গলময়ের এ অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া সীলেটে গেলে মনুষ্যত্ব থাকিবে না!

এমনি নানা ব্যাপার। তাছাড়া নিজের মনেও একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিতেছিল—সে কৌতুহল এই কণিকাকে কেন্দ্র করিয়া!

জীবনে বহু নারীর সঙ্গে সে মিশিয়াছে। বিলাস-লীলায় তারা ছিল সহচরী! প্রণয়ের যে অভিনয় তারা দেখাইয়াছে, সে অভিনয়ে মুগ্ধ কখনো হয় নাই, এমন নয়। এবং সে অভিনয়-কলার ফাঁক দিয়া তাদের মনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাইতেও কোনোদিন বিলম্ব ঘটে নাই! লীলা-বৈচিত্র্য থাকিলেও তাহাতে হেঁয়ালি ছিল না! তারা ছিল…

কণিকা স্ত্রী! বাঙালীর ঘরে যে স্ত্রী স্বামীর আদর অনাদর নির্ব্বিকারে সহিতে বাধ্য—আদর-অবহেলা সত্ত্বেও স্বামীর মন জোগাইয়া যাকে চলিতে হয়! স্বামীর তৃপ্তি-সাধন ছাড়া যার আর অন্য উপায় নাই! স্বামীর জীবনেই স্ত্রীর জীবন! কিন্তু কণিকার ব্যবহারে সে দেখিতেছে একটা তেজের দীপ্তি। রাধাবিনোদ যে তার প্রতি প্রসন্ন নয়—এ কথা সে ভালো করিয়া জানে। আরো জানে, তার যা সম্পত্তি আছে, রাধাবিনোদের মত সাতটা লোককে তাহা দিয়া কিনিয়া পায়ের বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে। অথচ কণিকা সে-দিক দিয়া তেজের আগুন জ্বালে না! তার দরদ আছে। রাধাবিনোদের সেবা-পরিচর্য্যাতে সে আপনা হইতে আগাইয়া আসে। রাধাবিনোদের উপেক্ষা গায়ে মাখে না—সে জন্য যে তার কোথাও বাধিতেছে, কণিকাকে দেখিলে এমন মনে হয় না। একটা কথা বলিলে শ্লেষভরে দুটা কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়ে না,—সে কথায় কিন্তু ঝাঁজ বা উগ্রতা নাই! অপূর্ব্ব হেঁয়ালি এই কণিকা! তাই তার ইচ্ছা হয়, কণিকা-চরিত্রটিকে একবার ভালো করিয়া অনুশীলন করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

প্রায় মাসখানেক রোগে ভুগিয়া মঙ্গলময় সারিয়া উঠিলেন। ডাক্তাররা বলিলেন—একবার হাওয়া বদলাইয়া আসুন!

মঙ্গলময় মেয়ের পানে চাহিলেন।

কণিকা কহিল,—আমি না গেলে কার সঙ্গে তুমি যাবে?

মঙ্গলময় কহিলেন,—গুরুপদ বারণ করচে—তোমাকে এখানে থাকতে হবে। রাধুকে এখন ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

কণিকা কোনো কথা কহিল না। মঙ্গলময় কহিলেন—গুরুপদর বাড়ী আছে বাঙ্গালোরে। সেখানে থাকবো। ওর ছেলেমেয়ে, স্ত্রী—তাঁদেরো পাঠাতে চায়—তারা দেখবে'খন। তুমি মাঝে মাঝে যেয়ো। গিয়ে দেখে এসো।

তাহাই হইল। কণিকার দুঃখ নাই! নিজেকে এ কয় মাসে সে এমন করিয়া তুলিয়াছে—কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট আর তার মনের নাগাল পায় না······

মঙ্গলময়কে ট্রেণে তুলিয়া গুরুচরণকে অফিসে নামাইয়া কণিকা গৃহে ফিরিল। বেলা তখন প্রায় বারোটা বাজে। আসিয়া দাসীকে কহিল—বাবুর খাওয়া হয়েচে?

দাসী কহিল,—না।

এত বেলাতেও আহার হয় নাই! সন্ধান লইয়া কণিকা জানিতে পারিল, বেলা প্রায় আটটা হইতে বাহিরের ঘরে তাসের আসর বসিয়াছে। সেই জন্য···

কণিকা কহিল,—ক'জন বাবু আছেন?

ভৃত্য কহিল,—সাত-আটজন।

কণিকা কহিল,—তাঁদের বল্ গিয়ে—অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখানে তাঁরা খেতে চান যদি তো স্নান করে নিন—নাহলে এবেলার মত বাড়ী যান্। বামুন-চাকর কত বেলা অবধি উপোস করে বসে থাকবে?

ভৃত্য এ আদেশ পাইয়া কেমন হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। পুরানো ভৃত্য। এ বাড়ীর চিরদিনকার রীতি তারা অজানা নয়!

কণিকা কহিল—দাঁড়িয়ে রইলি যে! যা···

ভৃত্য একান্ত সঙ্কোচ-ভরে কহিল—বাবু যদি রাগ করেন?

কণিকা কহিল—রাগ করবার আগে বেশ বড় গলাতেই তুই গিয়ে এ কথা বলবি—আমার নাম করে বলবি। বাবুকেও বলবি আমার নাম করে—আমি ডাকচি।

কর্ত্রীর আশ্বাস-কবচ বুকে আঁটিয়া ভৃত্য বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল। সে স্বস্তি বোধ করিল। সত্য, চাকরি করিতে আসিয়াছে বলিয়া কি সময়ে আহার করিতে পাইবে না? আগেকার সেই বিশৃঙ্খলা আবার দেখা দিয়াছে!

কণিকা গম্ভীর মুখে দাড়াইয়া রহিল। গুরুপদ ও গুরুপদর গৃহিণী তাকে উপদেশ দিয়াছে—রাশ ছাড়িয়া দিলে রসাতলে গিয়া পড়িবে! নিজের সংসার—মেয়ে-জন্ম লইয়াছ বলিয়া স্বামীর সকল খেয়াল শিরোধার্য্য করিয়া চলিবে—এমন শিক্ষা তো পাও নাই! অমানুষ স্বামীকে মানুষ করিয়া তোলার ভার স্ত্রীকেই গ্রহণ করিতে হয়···ইত্যাদি।

এ উপদেশ শুনাইয়াই তাঁরা কণিকাকে শান্তি দেন নাই। তাঁর কাছ হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন—সংসারটিকে কণিকা অবহেলা করিবে না। এবং ঐ খেয়ালী স্বামীকে···

বাহিরের ঘরের দিকে সে কাণ পাতিয়াছিল একটা মিশ্র ভর্ৎসনা...তারপর ক্ষণেক স্তব্ধতা! আবার কোলাহল —এবং সে কোলাহলের অন্তরালে কয়েকটা স্বর—এই বাজিটা খেলেই উঠচি—তোর মা-ঠাকরুণকে গিয়ে বল্···

রাধাবিনোদ কহিল—এইখানেই খেয়ে যাও না—নিমন্ত্রণ পেলে তো!

জবাব হইল,—বাড়ীতে বলা নেই, কওয়া নেই—সেখানকার খাবার নষ্ট হলে রক্ষা থাকবে না, ভাই!

রাধাবিনোদ কহিল—এত ভয়! যাও তবে আঁচলের নীচে···

কথাগুলা কণিকা স্পষ্ট শুনিল—শুনিয়া হাসিল।··· তারপর ভৃত্য ফিরিয়া সংবাদ দিল, বাবু আসিতেছেন।···

স্নান করিয়া খাইতে আসিয়া রাধাবিনোদ দেখে, আসনের কাছে কণিকা বসিয়া আছে। রাধাবিনোদ একটু কৌতুক-বোধ করিল, কহিল—তোমার বোধ হয় এখনো খাওয়া হয়নি?

কণিকা কহিল—না।

রাধাবিনোদ কহিল—কেন—জানতে পারি?

কণিকা কহিল—আমাদের দেশে নিয়ম, স্বামীর খাবার আগে স্ত্রীকে খেতে নেই।

রাধাবিনোদ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তাহলে স্বামী বলে আমাকে মানো!

কণিকা কহিল—না মানা ছাড়া উপায় তো নেই।

রাধাবিনোদ কহিল—হুঁ···

সে কণিকার পানে চাহিল—তার মুখে সেই তেজ! সর্ব্বাঙ্গে অবিচল দৃঢ়তা! ভাবিল, লোকের স্ত্রী কি তবে এমনি হয়!

হয়তো। ঐ যে বন্ধুরা···এখানে খাইতে চাহিল না! বাড়ীতে বলিয়া আসে নাই—তাই! বলিল, খাইলে রক্ষা থাকিবে না। স্ত্রী এমনি বিভীষিকাময়ী?

কণিকাকে কিন্তু সে ভয় করে না। বরং কণিকার

এই রুদ্র মূর্ত্তি তার ভালো লাগে। যে-সব নারীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, নদীর মতই তাদের বিগলিত দেখিয়াছে!…কিন্তু তারা!…কণিকা স্ত্রী!

রাধাবিনোদ কহিল—তোমার বাবা চলে গেলেন?

—হ্যাঁ।

—তোমার যাওয়া উচিত ছিল তাঁর সঙ্গে।

কণিকা কহিল—জানি।

—জানো যদি তো গেলে না কেন?

কণিকা কহিল—বাবা নিয়ে গেলেন না। বললেন,—এখানে থাকবে।

মৃদু হাসিয়া রাধাবিনোদ কহিল—আমার গার্জ্জেন-গিরি করতে!

কণিকা কহিল—আমার লাভ?

রাধাবিনোদ নিরুত্তরে আহার করিতে লাগিল। সহসা কি মনে হইল, বলিল—আমার গার্জ্জেন-গিরিতে যদি তোমার লাভ না থাকে, তাহলে পুরোনো নিয়ম মেনে আমার না খাওয়া পর্য্যন্ত উপোস করে বসে থাকাই বা কিসের জন্য? পাছে আমার কোনো অমঙ্গল ঘটে? সে অমঙ্গল কাটাবার জন্য এ কষ্ট করায় লাভ?

কণিকা কহিল,—তাতেই আমার সবচেয়ে বেশী লাভ—তাই উপোস করে বসে থাকি। মেয়ে-জন্মে স্বামীর বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে কাম্য!

—স্বামী পাছে অধঃপাতে যায়—তাকে চৌকি দিয়ে গার্জ্জেনগিরি করাই বা তাহলে কাম্য না হবে কেন?

কণিকা কহিল,—আমাদের দেশে মেয়েরা কেবল চেয়েছে, স্বামী শুধু বেঁচে থাকুক—তাদের সীঁথির সিঁদুর আর হাতের লোহা বজায় থাকবে! স্বামী বিরূপ হোক, লক্ষ্মীছাড়া হোক—এয়োতির তাতে বিঘ্ন ঘটে না!

রাধাবিনোদ আবার মুখ তুলিয়া কণিকার পানে চাহিল, মৃদু হাসিয়া কহিল,—তোমারো সেই মত?

কণিকা কহিল,—যখন এদেশের মাটীতে মেয়ে হয়ে জন্মেচি, তখন তাই বৈ কি!…

কথায় কণিকাকে পারা ভার! রাধাবিনোদেরও ভালো লাগে এই বাগ্‌যুদ্ধ।

আহার সারিয়া রাধাবিনোদ কহিল,—তুমি বোধ হয় এবারে খেতে বসবে?

কণিকা কহিল,—হ্যাঁ। তোমার কোনো দরকার আছে?

রাধাবিনোদ কহিল,—খাওয়া হলে একবার আমার ঘরে এসো। কটা জিনিষের একটু ভাগ-বাটোয়ারা আছে—বিয়ের সময় দানে পাওয়া জিনিষ! বুঝলে?

কণিকা কহিল,—আসবো।…

রাধাবিনোদের মনে কৌতূহল জাগিয়াছে। কণিকাকে যে সে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তার কারণ,—যে ঘটনা-সূত্র ধরিয়া এ মিলন রচিত হইয়াছে, তাহাতে সে এমন হীন হইয়া আছে যে, কণিকার মত স্ত্রীর সামনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে তার বাধে। হয়তো কণিকা সে কথা লইয়া মাথা ঘামায় না; কিন্তু তার ব্যবহারে এমন মমতা সে দেখিয়াছে—যে, স্বামিত্বের অধিকার লইয়া তার পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইতে রাধাবিনোদের সঙ্কোচ বোধ হয়। তাছাড়া সম্প্রতি এই যে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলে, সে কথাবার্ত্তা হইতে কণিকার যে পরিচয় সে পায়, তাহাতে বেশ বুঝা যায়, কণিকার মন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। স্ত্রী বলিয়া যথেচ্ছভাবে যেমন-খুশী তাকে রাখিবে বা তাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবে—সে যো নাই! এইমাত্র সে যে-কথা বলিল,—সে কথার অন্তরালে ঐ যে শ্লেষ—মনের বিরাগই তাহাতে প্রকাশ পায়!

নারীকে সে জানিত বিলাস-খেলায় সহচরী! কিন্তু নারী কি তাই?

পুরানো চিঠির জঞ্জাল লইয়া সে ঘাঁটিতে বসিল। প্রত্যেক চিঠিখানিতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিবার জন্য কি মিনতি—কতখানি স্তুতি!

তোষামোদ! শুধু তোষামোদ! ইহার অন্তরালে মনের দেখা মিলে না—আছে শুধু লুণ্ঠনে প্রবৃত্তি!…

এই প্রবৃত্তি দেখিয়াই তো নারীর উপর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে! স্ত্রী—সেও শুধু স্বামীর কাছে হাত পাতিয়া আছে! যে স্বামী সহস্র দানে তৃপ্ত করিবে, সেই স্বামী হয় স্ত্রীর মাথার মণি! নহিলে বিবাদ-কলহ-বিরোধের অন্ত থাকে না। বন্ধুদের সঙ্গে কথায়-গল্পে এই সত্যই সে ভালো করিয়া জানিয়াছে!

এই যে চিঠিখানা…

রাধাবিনোদ চিঠি পড়িতেছিল—

যে ঘরে জন্মিয়াছি—দুর্ভাগা ! কি করিয়া বুঝাইব, পয়সা-কড়ি, গহনা-পত্র—এ সবে আমার রুচি নাই ! আমি চাই শুধু তোমাকে—তোমার ভালোবাসা। বিশ্বাস না হয়, আমাকে লইয়া চলো তুমি বিজন মরুপ্রান্তে—যেখানে বিলাস নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, মোটর গাড়ী নাই, গহনা-পত্র নাই ! তোমার বাহুর বাঁধনে শুধু আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়ো প্রিয়তম ! সে মরুভূমি হইবে আমার স্বর্গ !

চিঠি পড়িয়া রাধাবিনোদ কৌতুকে সারা হইতেছিল। এ চিঠি কে লিখিয়াছে ? এই যে নাম—মৃগবালা !···

মরু-পিয়াসিনী মৃগ ! মরুর বুকে স্বর্গ চাহিয়াছিল ! এখন পরম সুখে বাস করিতেছে—ছপ্পড়ম্যল কাপড়ওয়ালার বাগান-বাড়ীতে। তার মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে। একখানা দামী মোটর আদায় করিয়াছে এবং তার খেয়াল মিটাইতেই বেচারা ছপ্পড়ম্যলের কাপড়ের কারবারটি আজ-মাটী হইতে বসিয়াছে !

কণিকার কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙ্গিল।···

কণিকা কহিল,—আমায় ডেকেছিলে ?

রাধাবিনোদ কহিল,—হ্যাঁ।···তার আগে একটা কথা রাখবে ? এই চিঠিখানা পড়বে ?

—কার চিঠি ?

—আমাকে লিখেছিল,—একটি স্ত্রীলোক !

কণিকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—আমার দরকার ?

রাধাবিনোদ কহিল,—দরকার কিছু নেই। এমনি বলচি !···এক-বাড়ীতে বাস করচি—দুজনে আলাপ-পরিচয়ও আছে ! সামান্য একটু অনুরোধ যদি করি—খপরের কাগজও তো পড়ো, নাটক-নভেলও পড়ো, তেমনি এ চিঠিখানা···

কথা না বাড়াইয়া কণিকা চিঠি পড়িল। পড়িয়া চিঠি ফেরত দিয়া অবিচল কণ্ঠে কহিল,—পড়লুম :

রাধাবিনোদ কহিল,—এমন চিঠি অনেক আছে,—আমায় কি ভালো বাসাই বাসতো···

গম্ভীর মুখে কণিকা কহিল,—আর একদিন ও-কথা বলেচো।

রাধাবিনোদ কহিল,—এ সব চিঠি পড়লে এমন হাসি পায় ! ভালোবাসা যাদের কাছে ব্যবসা, তারা এ কথা কি করে চিঠিতে লেখে ?

—প্রশ্রয় পেয়েছিল,—তাই বোধ হয়···

—প্রশ্রয় !···প্রশ্রয় পায়নি—পয়সা পেয়েছিল !

কণিকা কহিল—এ নিয়ে শুধু পুরুষই তামাসা করতে পারে !···ভাগ্যে আমায় তুমি ভালোবাস না !···যাক্, ও চিঠি আমি দেখতে চাই না। ও সম্বন্ধে কোন কথাও কইতে চাই না···যেজন্য ডেকেছিলে, বলো···

রাধাবিনোদ স্থির দৃষ্টিতে কণিকার পানে চাহিল, কহিল,—বলবো—আর একটু কাছে এসো ··

কণিকা কাছে আসিল, কহিল—বলো

রাধাবিনোদ কণিকার হাত ধরিল; কণিকা হাত ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া গেল, কহিল—এই কথা !

রাধাবিনোদ কহিল—ক্ষমা করো···তোমাকে স্পর্শ করেচি !···কথাটা এই—নীপু আসচে কলকাতায়—আমার মাসতুতো ভাই। বোম্বাইয়ে কাজ করে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। সে জানে না, আমি ফতুর হয়ে আবার তোমার বাবার কৃপায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি! ভয়ানক খাতির করে। বয়সে আমার চেয়ে ছ-মাসের ছোট ! আমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করো না ! আমাদের সংসারে মেয়েরা দ্যাওর-ভাসুরকে মানে—তেমনি !

কণিকা মাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

তারপর কহিল—আমি এখন যেতে পারি ?

—কাজ আছে ?

—তাস খেলবো না—এটা ঠিক।

বলিয়া কণিকা তখনি চলিয়া গেল; রাধাবিনোদ তার পানে চাহিয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সংসার-তরণী

যে-মন আনত হইয়াছিল, আবার সে মন কঠিন হইল।···

সীলেটের চাকরি চিঠি লিখিয়া ছাড়া হইয়াছে। গুরুপদ বুঝাইলেন,—তুমি যাইবে পরের চাকরি করিতে, তোমার সম্পত্তি এখানে কে দেখিবে ? একবার পোড় খাইয়াও যদি তোমার জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে ভদ্র সম্ভ্রান্ত গৃহে জন্ম লইয়াছিলে কেন ?

কাজেই বৈষয়িক কাজের ঠাট বজায় রাখিতে হইয়াছে। কাজ করে সরকার-গোমস্তা। বাবুর সে দিকে নজর দিবার প্রয়োজন হয় না। বৈঠকখানার তাস-পাশার আসর বসে। সঙ্গীর দলে অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। বিলাসিনী নারীর সঙ্গ—সেদিকে উদ্যোগ-আয়োজন একেবারে বন্ধ।

সেদিন সকালের দিকে খেলার আসরে একটা কলরব উঠিয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। কণিকার কাণে সে কলরবের ছিটা আসিয়া লাগিল! পর্দ্দার আড়াল হইতে বাহিরের দিকে একটু কাণ পাতিয়া থাকিলে ওদিককার কোনো সংবাদ অগোচর থাকে না।

এক বেচারা ভাড়াটিয়া আসিয়া কান্নাকাটী তুলিয়াছিল। সদর রাস্তার উপর সে একখানা দোকান-ঘর ভাড়া লইয়া আছে বহু বৎসর। ভাড়া দিতে কখনো গোলযোগ বাধে নাই। এখন ভাড়ার হার খুব বাড়িয়া গিয়াছে, তার উপর বাজার মন্দা! বয়স হইয়াছে; স্ত্রী আজ পাঁচ-সাত মাস রোগে শয্যা লইয়াছেন; বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিল—তারি গৃহে ফিরিয়া একটি পুত্র প্রসব করিয়া যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া ভুগিয়া দুমাস হইল, মেয়েটি মারা গিয়াছে। এ অবস্থায় দোকান দেখিতে পারে নাই—দু'মাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে, সামর্থ্যের অভাবে। ম্যানেজারবাবু দরোয়ান দিয়া শাসন জারি করিয়াছেন, জিনিষ-পত্র ক্রোক করিয়া ভাড়া আদায় করিবেন। একে বিধাতার নিগ্রহ—তার উপর হাত নাই! কিন্তু এ নিগ্রহে মান-ইজ্জৎ ঘুচাইয়া যে বিপত্তি ঘটিবে, তাহাতে আর মাথা তুলিয়া কারবার করা চলিবে না। তাই সে আসিয়াছে বাবুর পায়ে ধরিয়া সময় ভিক্ষা করিতে।

এ সব ব্যাপার রাধাবিনোদের কোন দিন ভাল লাগে না। সে কহিল,—কত টাকা বাকী?

ভাড়াটিয়া জানাইল, দেড়শো টাকা। মাসে এখন পঁচাত্তর টাকা হিসাবে দিতে হয়।

রাধাবিনোদ চুপ করিয়া রহিল। ম্যানেজার বাবু আসরে বসিয়া তাস পিটিতেছিল। সে কহিল,—সকলে যদি টাকা ফেলে রাখো, তাহলে চলবে কি করে—বলতে পারো?

ভাড়াটিয়া কহিল,—আমার এই দেড়শো টাকা দিতে দুদিন দেরী হলে রাজার ভাণ্ডারে লাভ-ক্ষতি কিছুই হবে না।

ম্যানেজার কহিল,—একজনকে এমনি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখালে আর পাঁচজনও এসে কেঁদে পড়বে। বিপদ-আপদ কার নেই? তা বলে জমিদারের খাজনা বন্ধ থাকতে পারে না।

ভাড়াটিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। ফেলিয়া রাধাবিনোদের পানে চাহিল। কহিল—বাবুর হুকুমের প্রার্থনায় আমি বসে আছি। সব কথাই তো বাবুকে বললুম! বারো বছরের বিলগুলি আনিয়ে হুজুর দেখুন, বারো বছরের মধ্যে কখনো আমার ভাড়া দিতে গাফিলি ঘটে নি! মাসের দু'তারিখে দরোয়ান বিল নিয়ে গেছে, তখনি টাকা আদায় দিয়েচি। না খেতে পেলেও ভাড়ার টাকা মজুত রেখেছি।

ম্যানেজার কহিল,—এখনো না খেয়ে ভাড়ার টাকা ফেলে দিতে পারো তো!

ভাড়াটিয়া কোনো কথা বলিল না—নিশ্বাস ফেলিল। ম্যানেজার খেলায় ভুল করিয়া তাড়া খাইল। রাগিয়া সে ভাড়াটিয়াকে বলিল,—ভ্যালা জ্বালাতন করতে এলো! যাও যাও বাপু, অত দয়া-ধর্ম্ম করলে রাজ্যরক্ষা হয় না। ভাড়াটিয়া তবু নড়িল না।

সাধু ভৃত্য আসিয়া ভাড়াটিয়াকে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গেল। প্রশ্ন করিল,—তোমার কত টাকা বাকী পড়েচে?

ভাড়াটিয়া বলিল,—দেড়শো টাকা। তাও একটা মাস সময় চাইছি।

সাধু পর্দ্দার ওদিকে গেল; পর্দ্দার কাছে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল,—কখনো এমন গাফিলি হয় নি?

ভাড়াটিয়া কহিল,—না।

সাধু কহিল, সন্ধ্যার সময় আসিয়ো—দেড়শো টাকা ধার মিলিবে। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া আনিতে হইবে না। সেই দেড়শো টাকা ম্যানেজার বাবুকে দিয়া যে-রসিদ মিলিবে, তাহা আমার কাছে রাখিয়া যাইবে। সুবিধা-মত টাকা শোধ করিলে রসিদ পাইবে।

ভাড়াটিয়া অবাক! সে সাধুর পানে চাহিল। সাধু কহিল,—মা তোমার কথা শুনেচেন। এ টাকা মা দিচ্ছেন। ভিক্ষা নয়, দান নয়—ধার।...কি বলো তা'হলে ভাড়া দেওয়ার ভাবনা যাবে তো? ..মা বলচেন, তোমরা টাকা-কড়ি না দিলে আমাদের যে চলে না। তোমাদের পাঁচজনের টাকাতে তোমাদের ঘর-বাড়ী সারাতে হয়, টেক্স দিতে হয়, লোকজনের মাহিনা—নিজেদের ভরণ-পোষণ—এ-সব চলে। তোমাদের উপরেই বাবুর নির্ভর।

চমৎকার কথা! উদ্দেশে নতি জানাইয়া ভাড়াটিয়া কহিল—মাকে কখনো চক্ষে দেখিনি! তবে বুঝচি, মা আমাদের করুণাময়ী অন্নপূর্ণা।...এ টাকা যত শীঘ্র পারি, আমি শোধ করবো। মায়ের করুণা যা পেলুম......

সন্ধ্যার পর ম্যানেজার ভাড়ার টাকা গণিয়া পাইল। বাবুকে বলিল,—দেখলেন তো, চোখ রাঙ্গিয়েছিলুম বলে টাকাটা দিতে পথ পেলে না। হুঁঃ, আমি তো জানি, কি রোগের কি দাওয়াই!

সাধু কাছে ছিল। সে ম্যানেজার বাবুকে বুঝাইয়া দিল, ভদ্রলোক কোথা হইতে ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়াছে······

এ-কথায় ম্যানেজারের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। ম্যানেজার কহিল,—এ কথাটা এবারে ঢাক পিটিয়ে ভাড়াটে-মহলে জানিয়ে দিক! সকলে এসে এখানে হাত পাতবে।

রাধাবিনোদ কোনো কথা বলিল না। শুধু ভাবিল, পয়সার দম্ভ! ধনি-কন্যা—তাই কণিকা দানের পরিচয় দিয়াছে!······স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান এইখানে!···

কণিকার ক্রমে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল—সংসারের সকল দিকে। স্বামী কুসঙ্গ ছাড়িয়াছে, সত্য। কিন্তু সারা দিন কি করিয়া যে কাটায়! তাস আর পাশা! নয়তো সদলে বায়োস্কোপে গিয়া জুটিল! সারাক্ষণ কোলাহল। বিষয়-কর্ম্ম না করো, যারা কাজ করিতেছে, তাদের সে কাজ-কর্ম্মের উপর নজর রাখিতেও পারো না! এই যে আদায়-পত্র, জমা-খরচ—লোকেরা কি আদায় করিয়া কতখানি ব্যয় করিতেছে—খাতা দেখিয়া তার একটা হিসাব লও! নিত্য না লও, মাঝে মাঝে অন্ততঃ! অদেখায় রাজার রাজ-ভাণ্ডার লুঠ হইয়া যায়—এ তো সামান্য···

তার পিতার হিসাব-নিকাস পিতা নিজে দেখেন। সে কাজে কণিকাও সহযোগিতা করিত!···এখানে সকলই অনাসৃষ্টি। সংসারে যাহোক সে একটা শৃঙ্খলা আনিয়াছে—কিন্তু সদরে দারুণ অরাজকতা!···

রাত্রে রাধাবিনোদ আহারে বসিলে কণিকা কহিল—একটা পরামর্শ ছিল···

রাধাবিনোদ কহিল,—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—বলো! কিন্তু পরামর্শ দেবার মত সুবুদ্ধি কি আমার আছে?

কণিকা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল,—ম্যানেজার যে আদায়-পত্র করচে, সে সবের হিসাব তোমার দেখা উচিত। তাতে তারা অবিশ্বাসী হতে পারবে না।

রাধাবিনোদ কহিল,—ম্যানেজার ভালো ঘরের ছেলে—এককালে আমার সঙ্গে খেলা-ধূলা করেচে। এখন অবস্থা খারাপ হয়েচে বলেই আমার কথায় এখানে চাকরি নিয়েচে। তার খাতা-পত্র দেখতে চাইলে বোঝাবে না যে, তাকে অবিশ্বাস করচি?

কণিকা কহিল—তা কেন বোঝাবে! তোমার বিষয়—খাতা দেখায় তোমার অধিকার আছে। কি রকম আদায় হচ্ছে, কি খরচ-পত্র হচ্ছে, মানুষ তারো একটা হিসাব তো দেখে। এতে অবিশ্বাসের কথা মনে হবে কেন? বড় বড় অফিসেও শুনেচি খরচ-পত্র অডিট হয়। তাতে তো কারো মনে অবিশ্বাস বা সন্দেহের ছায়া পড়ে না।···

রাধাবিনোদ কহিল—বুঝেচি।···কিন্তু ভাড়াটেকে তুমি যেভাবে টাকা দেছ, সে ভাবে দয়া করতে গেলে দয়ার ভাণ্ডার উজাড় হয়ে যাবে। সকলে এসে যখন কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে···

কণিকা কহিল—শুনলুম, বারো বছর ধরে' ও লোকটি তোমাদের ভাড়াটে আছে। কখনো ভাড়া দিতে দেরী করেনি। এবারে এত বড় বিপদ বলেই দেরী। ম্যানেজার বাবু বেইজ্জৎ করবে বলে শাসিয়েছে। মানুষটা বাজে সখে টাকা উড়িয়ে দয়া চাইতে আসেনি। তাও ভাড়া মাপ করতে বলেনি—শুধু একমাস সময় চেয়েছে! তা দিলে এমন বিশেষ ক্ষতি হতো না। আমি টাকা দিয়েচি,—সে দান নয়। ধার। ভাড়ার রসিদ সাধুর কাছে সে জমা রেখে গেছে—এ টাকা শোধ দিয়ে রসিদ নিয়ে যাবে।

রাধাবিনোদ কহিল—ভালো হলো। যে-ভাড়াটে এবার টাকা দিতে পারবে না, ম্যানেজারকে বলবো, তাদের তোমার দিকে লেলিয়ে দেবে। তোমার দয়ায় আমাদের ভাড়া বাকী পড়বে না! অনেক হাঙ্গামা বাঁচবে।

কণিকা এ কথার জবাব দিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সভাপতির অভিভাষণ

বোম্বাইয়ের আবদুল গফুর নগরে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে এবার কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় সাড়ে তিন বৎসরের পর এবার শান্তিপূর্ণভাবে কংগ্রেসের এই অধিবেশন হইয়াছে, সেই হেতু ইহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোকের যে আগ্রহ জন্মিয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক। কংগ্রেসের অধিবেশনে এবার সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য লোকের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কারণ, কংগ্রেসের যিনি মূলাধার, তিনিই স্বয়ং কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস যে সরাসরি কার্য্য (direct action) পরিচালিত করিয়া আসিতেছে, তাহা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্ম যেমন সমস্ত শক্তিকে আপনার মধ্যে গুটাইয়া লইয়া থাকেন, সেইরূপ মহাত্মাজীও সমস্ত আইন অমান্য আন্দোলনটি আপনাতেই নিবদ্ধ করিয়াছেন। অসহযোগ কার্য্যকেও কাউন্সিল প্রবেশ দ্বারা প্রায় 'সসেমিরে' অবস্থায় লইয়া আসা হইয়াছে। এমন কি, কংগ্রেসের কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে যে মূলনীতি আজ তের চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া একই ভাবে চালাইয়া আসা হইতেছিল, তাহারও পরিবর্ত্তন-সাধন করা হইয়াছে। এতকাল ধরিয়া পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিবার জন্য কংগ্রেস legitimate এবং peaceful উপায় অবলম্বন করিয়া কায করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন,—এবার মহাত্মা তাহার পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত জরুরী বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং তাহার স্থানে truthful and non-violent কথা বসাইতে হইবে বলিয়া এক প্রস্তাব কংগ্রেসে নির্ব্বিরোধে পাশ করাইয়া লইয়াছেন। ইহাই কংগ্রেসের কার্য্যবিধির পরিবর্ত্তন-সাধন-সম্পর্কে তাঁহার প্রথম (এবং সম্ভবতঃ প্রধান) প্রস্তাব। যেখানে কার্য্যসিদ্ধির উপায়ের ধারা পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, এ যাবৎ যে কার্য্য-ধারার অনুসরণ করিয়া আসা হইয়াছে, তাহা ভুল; সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তনসাধন করা আবশ্যক। সে পদ্ধতি বর্জ্জনীয় বলিয়াই মহাত্মাজী উহার পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব কংগ্রেসে পাশ করাইয়া লইলেন। ইহাতে বুঝা গেল, প্রায় এক যুগ পরে এই ভুলটি ধরা পড়িল। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" ইহা প্রাচীন নীতি-বাক্য! যে বড় বোকা, সেও ঠেকিয়া শেখে। এখন এই ভুল কি হইয়াছিল, সভাপতির অভিভাষণে আমরা তাহার আলোচনা
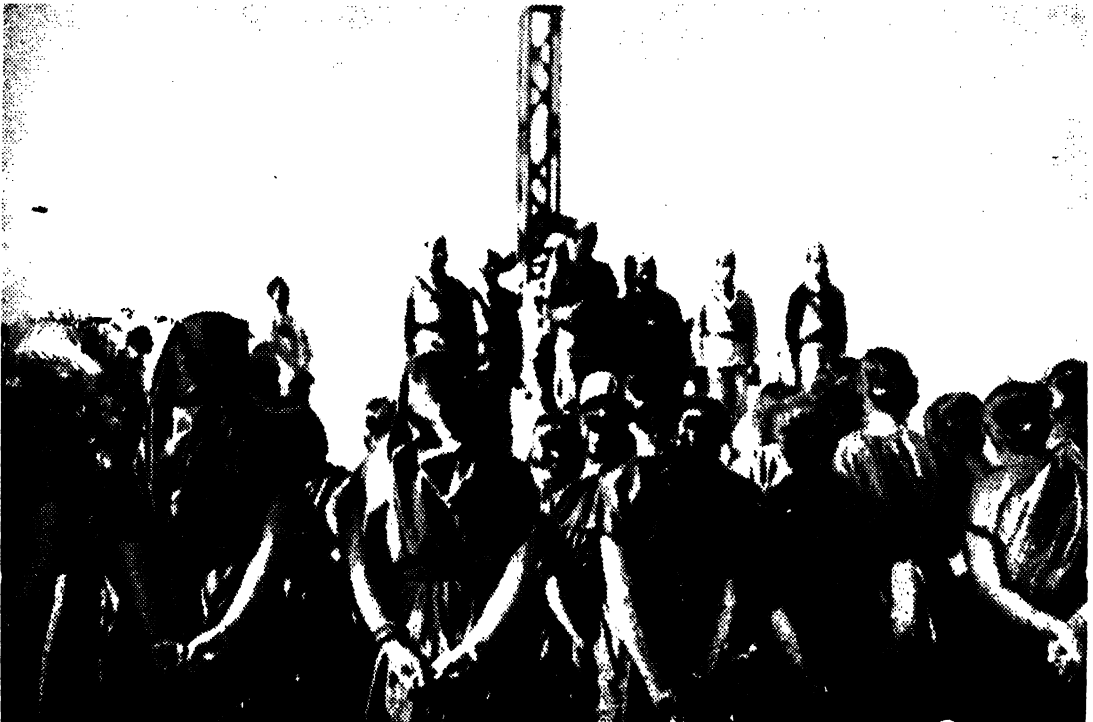
জাতীয় পতাকা অভিবাদনে দেশসেবিকাগণ

রোয়েদাদ সম্মিলনে রামানন্দ বাবু ও মালব্যজী

[illegible]জী খাদি প্রস্তাবসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন

কংগ্রেসনগরে স্বেচ্ছাসেবিকাগণের শোভাযাত্রা

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে মহিলাদের একাংশ

দেখিবার আশা করিয়াছিলাম। সে আশায় আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। তিনি তাঁহার অভিভাষণে গত করাচি কংগ্রেসের পরবর্ত্তী রাজনীতিক ইতিহাস সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন,—শ্বেতপত্রে পরিকল্পিত শাসন-ব্যবস্থার বিশদ অথচ মৌলিকতাশূন্যভাবে আলোচনা করিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ সম্বন্ধে তিনি এমন উল্টা-পাল্টা কথা বলিয়াছেন যে, এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে সেরূপ বলিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমরা সহজে করিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সিদ্ধান্ত জাতীয়তা-বিরোধী, ইহা জাতির অগ্রগতির পরিপন্থী; কিন্তু তাহা হইলেও উহা বর্জ্জন করা যাইতেছে না। কেন, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, —বা তাহার সমর্থনে কোন অকাট্য যুক্তিও উপস্থিত করেন নাই। এই সকল কারণে আমরা এই অভিভাষণ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। ইহাতে কেবল 'দাদার জয়ই' গাওয়া হইয়াছে।

বৈধ ও শান্তিপূর্ণ বনাম সত্য ও অহিংস

প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের ব্যবস্থা ছিল যে, কংগ্রেসের লোকদিগকে অর্থাৎ দেশের লোকদিগকে বৈধ এবং শান্তিময় পথ ধরিয়া পূর্ণ স্বরাজলাভ করিতে হইবে। এবার মহাত্মাজী স্থির করিয়াছিলেন যে, বৈধ এবং শান্তিময় পথ ছাড়িয়া দিয়া সত্য এবং হিংসাশূন্য পথ ধরিতে হইবে। দুইটি পথের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা ত মোটাবুদ্ধি লোকের পক্ষে বুঝা কঠিন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান বৎসরের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, "দুই পথই এক। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এক যুগের অধিককাল অতীত হইয়া যাইবার পর আচম্বিতে এই পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন ঘটিল কেন?" সে কথা কেহ বলিতেছেন না। অবশ্য ইংরাজী Legitimate এবং Truthful এক কথা নহে। ইংরাজী Legitimate কথায় অর্থ বৈধ অর্থাৎ যাহা রাজবিধি, সমাজবিধি ধর্ম্মবিধি, ন্যায়বিধি এবং অন্যান্য বিশেষ বিধির সহিত অবিরোধী তাহা, সুতরাং এই শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ইহার বদলে সত্য শব্দ বসাইলে আপত্তির কোন কারণ নাই। কিন্তু ইহাতেও গোল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অবস্থাবিশেষে কোন্ পথটা সত্য এবং কোন্ পথটা অসত্য বা ভ্রান্ত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মহাত্মাজীর অন্তরস্থ ভগবান অনেক সময় তাঁহাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের মত পাপীরা অনেক সময়ে বাসনার কল্লোল-কোলাহলে অন্তরস্থ ভগবানের বাণী শুনিতে এবং বুঝিতে পারে না। আজ যুগাধিককাল কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন পর্য্যন্ত করিয়া যখন তোবা করিয়া আবার ব্যবস্থা পরিষদের বিবরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন সত্য পথ যে কোন্টা, তাহা বুঝা কঠিন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় যে সুবিধা হইল, তাহা বলা যায় না। কেবল লোক গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া মরিবে। Peaceful শব্দের অর্থ শান্তিময়। যাহা শান্তিময়, তাহাই যে non-violent, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। violence বা হিংসার সহিত শান্তি খাপ খায় না। অতএব শান্তিময় কথাটি বর্জ্জন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক, মহাত্মাজী কংগ্রেসের এই কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া ত সরিয়া পড়িলেন। এখন কংগ্রেসের গতি কি হয়, এ স্থলে তাহাই দেখিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

মহাত্মাজীর কংগ্রেসত্যাগ

গত বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনের পর মহাত্মাজী কংগ্রেসের সহিত সংস্রবত্যাগ করিয়াছেন। তবে সে সংস্রবত্যাগ অর্থে প্রকাশ্য সংস্রবত্যাগ। তিনি এখন রঙ্গমঞ্চে কংগ্রেসের বিধাতৃ-সাজে না দেখা দিয়া সাজঘরে উপদেষ্টারূপে বিরাজ করিবেন, তাঁহার বিবৃতি পাঠে ইহাই তিনি বলিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। তিনি যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া পুঁথি-ধারকের (Prompter) কায করিতে বাধ্য হইবেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে? তিনি দূর হইতে কংগ্রেসের উপর দৃষ্টিপাত করিবেন বলিয়াছেন।
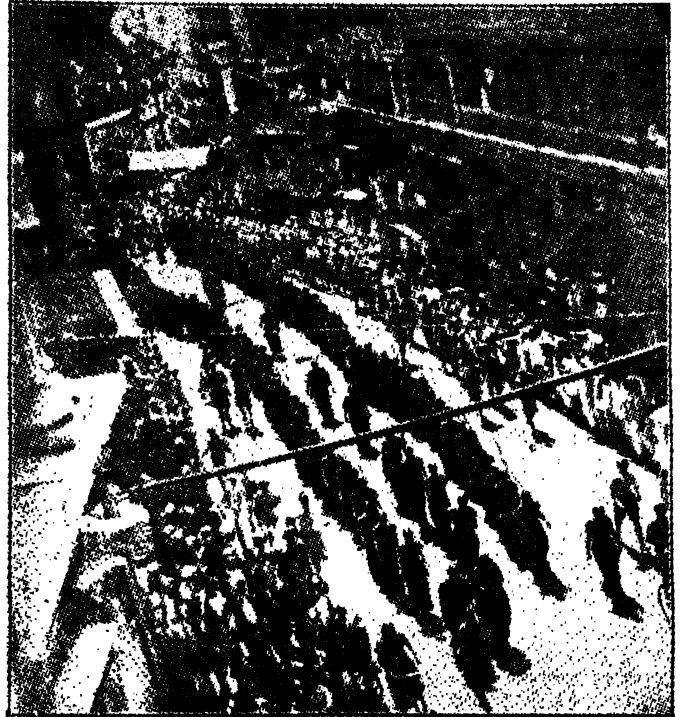
স্বেচ্ছাসেবিকাদলের শোভাযাত্রা

সুতরাং তাঁহার বিয়োগে শোকে অধীর হইয়া পড়িবার সময় আসিয়াছে কি না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে এই ব্যাপার আমাদিগকে একটু চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। কারণ, মহাত্মাজীই এখন কংগ্রেসের প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কংগ্রেসে এখন তেমন প্রতিভাশালী লোক কেহই নাই। আজ যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কিম্বা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অথবা লালা লাজপৎ রায় জীবিত থাকিতেন, এবং তাঁহারা পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালব্যের দলে ভিড়িয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই দুর্দ্দিনে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাঁহারা ত নাই। মদনমোহন এখন ভিন্ন গোঠে যাইতে বসিয়াছেন। কাযেই মনীষা এবং প্রতিভাবলে কংগ্রেসের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া উহাকে চালাইতে পারেন, এমন লোক ত লক্ষিত হইতেছে না। মহাত্মাজীর অনেকগুলি গুণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান গুণ তাঁহার বশীকরণ-শক্তি। তিনি তাঁহার বিশিষ্ট চরিত্র-প্রভাবে লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ। তাঁহার সেই অসাধারণ শক্তি ইদানীং কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইলেও উহার অবশেষ এখনও যাহা আছে, তাহা ভারতে আর কাহারও নাই। সেই জন্য মনে হয়, তাঁহার অভাবে কংগ্রেসকে উহার নির্দ্দিষ্ট পথে চালান কঠিন হইয়া পড়িবে।

কিন্তু এই ব্যাপারের আর একটা দিকও আছে। সে দিকটাও বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি কংগ্রেসে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা (Dictatorial power) পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রভাবের সম্মুখে দাঁড়াইতে লোক ভয় পায়। এরূপ প্রভাবশালী লোক কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্তা হইয়া থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানকে ঠিক গণতন্ত্রমতে পরিচালিত করা সম্ভবে না। এ কথা তিনি স্বয়ংই বুঝিয়াছেন। তিনি এ কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহার সম্মুখে অনেকে যখন স্বাধীনভাবে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিতে পারেন না—তখন তাঁহার কংগ্রেসে থাকাই কর্ত্তব্য নহে। ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা। কংগ্রেসকে গণতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে বজায় রাখিতে হইলে এরূপ অসাধারণ শক্তিশালী লোককে কখনই উহার পরিচালকরূপে রাখা সঙ্গত হইতে পারে না। মূল নীতির গুরুত্ব (Fundamental principle) ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তাঁহার অভাবে কংগ্রেসের যতই ক্ষতি হউক না কেন, কংগ্রেসের গণতান্ত্রিকতা রক্ষা করা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমাদের ধারণা, মহাত্মাজীর কংগ্রেস-পরিত্যাগ যতই দুঃখের এবং ক্ষতির কারণ হউক না কেন, তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা মোটের উপর ভালই হইয়াছে। তিনি যদি এখন কংগ্রেসের সাজঘরেও থাকেন, তাহা হইলেও অনেক লোক তাঁহার মতই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবেন, আপনাদের বিচারবুদ্ধির পরিচালনা করিবেন না। মানুষ একবার যে ব্যক্তিত্বের নিকট নত হইয়াছে, আপনার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, সে ব্যক্তিকে সে আর প্রায় অস্বীকার করিতে পারে না। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, তিনি যদি কংগ্রেসকে ঠিক গণতান্ত্রিক ধারায় চালিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার কংগ্রেস হইতে দূরে থাকাই বিধেয়।

বাঙ্গালী-বর্জ্জন

এবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী হইতে বাঙ্গালী-বর্জ্জনই কংগ্রেসের প্রধান ঘটনা। যে বাঙ্গালী কংগ্রেসটি এইরূপ ভাবে একটি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই বাঙ্গালী আজ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি হইতে বহিস্কৃত হইল। মহাত্মাজীর মতের গ্রামোফোন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজ বাঙ্গালীর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙ্গালীকে বিদায় করিয়া দিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন নিখিল বিহার অজ্ঞতার নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। বোম্বাইয়ে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে গত বারের কংগ্রেস পর্য্যন্ত উহার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন ১০ জন বাঙ্গালী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে ধরিলে ১১ জন হয়। কারণ, শ্রীমতী সরোজিনী বাঙ্গালীর কন্যা। তন্মধ্যে কেহ কেহ একাধিকবারও কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালা দেশেই ৯ বার কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে। সুতরাং সেই বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে
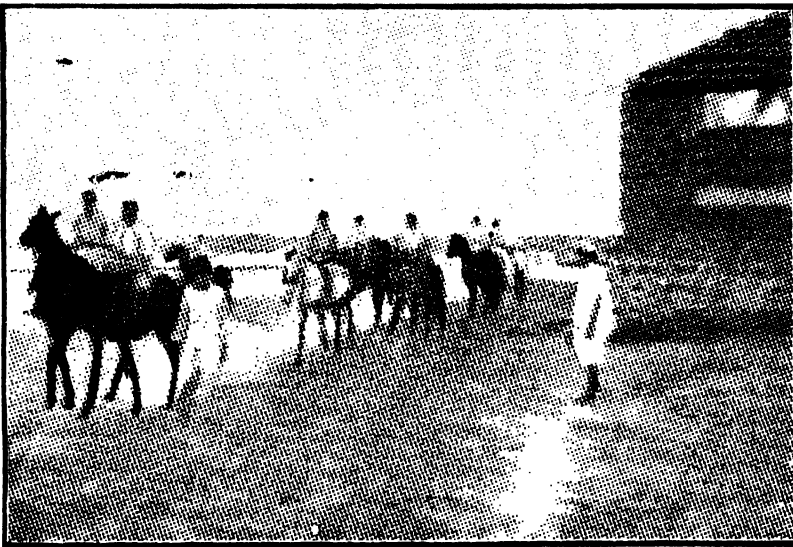
অশ্বপৃষ্ঠে স্বেচ্ছাসেবকগণ
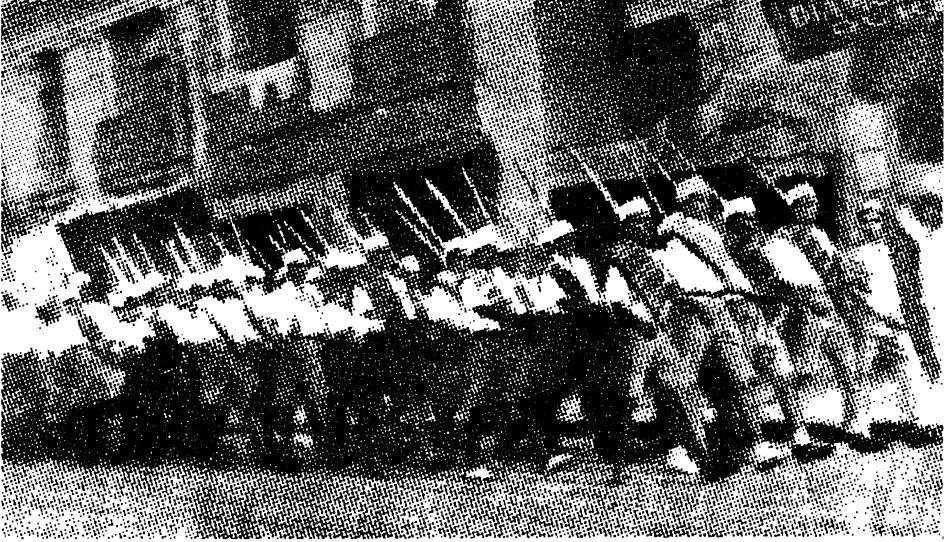
বোম্বায়ের রাজপথে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দল

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যে বিশেষ ধৃষ্টতার এবং দুঃসাহসের কায, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আজ বাঙ্গালার দেউটী একে একে নিবিয়া গিয়াছে। আজ বাঙ্গালার সুভাষচন্দ্র রোগে কাতর হইয়া য়ুরোপে প্রবাস করিতেছেন। চিরকালই বাঙ্গালী কংগ্রেসের নিয়ন্তা ছিলেন। তাই আজ মহাত্মাজীর হুকুম-বরদার বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙ্গালীকে গলা ধাক্কা দিয়া কংগ্রেসের পরিচালক সভা হইতে বাহির করিয়া দিতে সাহস পাইয়াছেন। বরং সূর্য্যের তাপ সহা যায়, কিন্তু তাহার ধার করা তাপে প্রতপ্ত সর্ব্বজীবের পদদলিত বালির তাপ সহ্য করা যায় না। আজ মহাত্মাজীর চিন্তার ধারা ধরিয়া বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের চিন্তার ধারা প্রবাহিত বলিয়া তিনি আজ বাঙ্গালার অতীত কাহিনী ভুলিয়া বাঙ্গালীকে এতটা অবমাননা করিতে সাহসী হইলেন! বাঙ্গালায় কংগ্রেসওয়ালাদিগের মধ্যে দলাদলি আছে, এই অজুহতে বাঙ্গালীকে কংগ্রেস হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, এ কথা বলিলে উহা টিকিবে না। কারণ, বাঙ্গালা ছাড়া আর কোথাও যে দলাদলি বা মতবিরোধ নাই, তাহা বলা যায় না। ইহার পর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার কার্য্যের আর একটি অতি বিস্ময়কর কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা আরও চমৎকার। তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস কনষ্টিটিউশনে গোটা ভারতে ২১টি প্রদেশ আছে। অথচ কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিতে কেবলমাত্র ১৪টি সদস্য পদ আছে। সুতরাং সকল প্রদেশ হইতে এক এক জন সদস্য লইতে পারা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল প্রদেশ হিসাবেই কি কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভায় লোক লইতে হয়? যে প্রদেশ কংগ্রেসের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিয়াছে,—অর্থ দ্বারা কংগ্রেসকে অধিক পুষ্ট করিয়াছে,—সে প্রদেশকে বর্জ্জন করা কি ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত? আজ মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে বাঙ্গালার প্রতিনিধি করাতে কি বাঙ্গালার অবমাননা করা হয় নাই? ইনি বাঙ্গালী ঘরের কথা কি জানেন, মর্ম্মকথাই বা কি বুঝেন? মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত (সুতরাং কংগ্রেস-প্রবর্ত্তিত) আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য বাঙ্গালার মেদিনীপুর জিলার লোক যত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহা কি হিন্দুস্থানের ও গুজরাটের কৃষীবলের ত্যাগস্বীকার অপেক্ষা অল্প? যদি তাঁহারা সে কথা বলেন, তাহা হইলে বুঝিব, তাঁহারা বাঙ্গালার কথা জানেন না,—বাঙ্গালার সংবাদ রাখা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু তাঁহাদের কথা নরীম্যান একবারও বলা সঙ্গত মনে করিলেন না। বাঙ্গালা আজ নানা দিক দিয়াই লাঞ্ছিত। হায় চিত্তরঞ্জন!

সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ-বিরোধী সভা

গত ৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার এবং ৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার বোম্বাই সহরে সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ-বিরোধী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সভার সভাপতি এবং সার গোবিন্দ রাও বলবন্ত প্রধান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে এই সভায় সদস্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভারম্ভে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মুখবন্ধস্বরূপ একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং সভাপতি তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃত
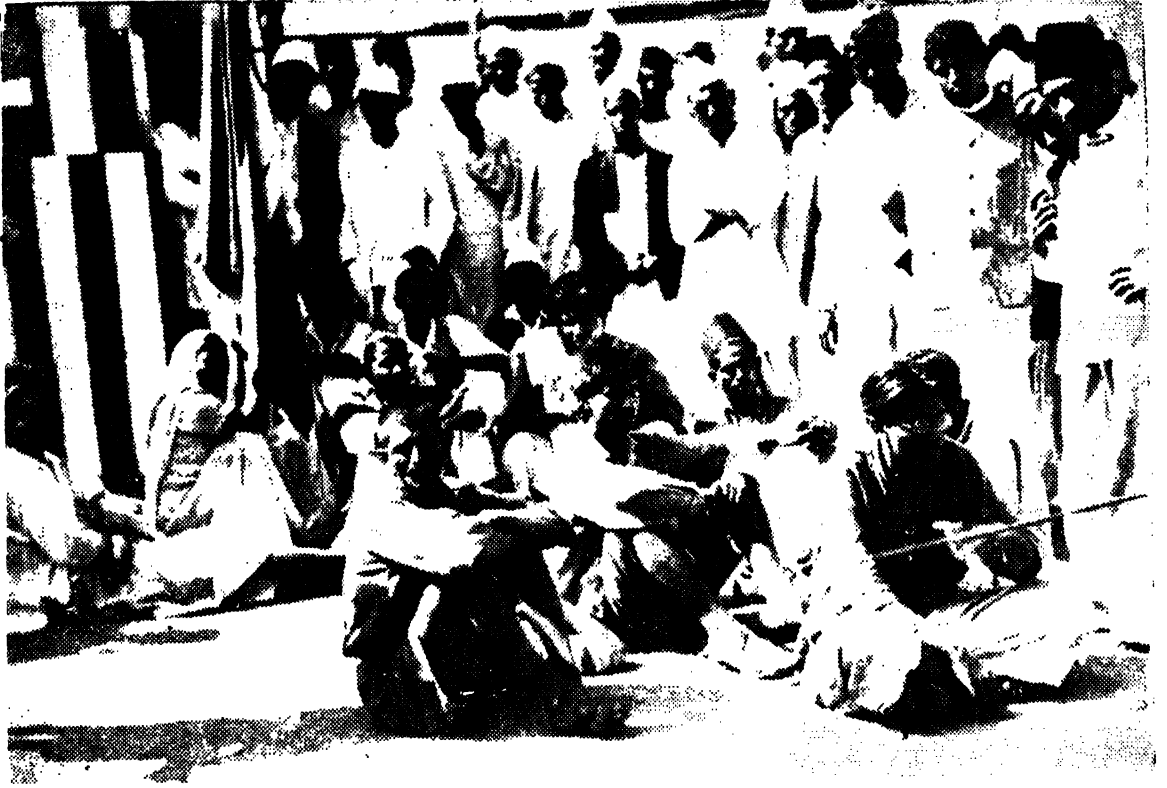
রাজপথের উপর বসিয়া আজমীরের সত্যাগ্রহী কংগ্রেসকর্ম্মিগণ

পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। কংগ্রেসের কোন সদস্যই তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই, করিবার চেষ্টাও করেন নাই। এ স্থলে সভাপতি মহাশয়ের সকল কথার আলোচনা করা সম্ভবে না। কারণ, তাঁহার বক্তৃতা দীর্ঘ হইয়াছে এবং তিনি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনকেন্দ্র গঠন সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই বলিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কোন জাতি সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যবান্, সম্মানত, এবং জ্ঞানী হইতে পারেন না। ঐ সকল সম্পদ লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতিকে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে হয়। তিনি ইতিহাস হইতে ইহার প্রমাণ দেখাইয়াছেন। গ্রেট বৃটেনে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ছিল এবং এখনও আছে। ঐ সকল দেশে এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের মারামারি এবং কাটাকাটিও হইত। প্রবল দলের পীড়নে দুর্ব্বল দলকে নানা নিগ্রহ এবং অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। ইহুদী রোম্যান ক্যাথলিক এবং ননকমফর্ম্মিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রবল দলের হাতে পড়িয়া অনেক দুর্ভোগ ভুগিয়াছে। ফ্রান্সে এবং অন্যান্য পুরাতন দেশেও কোন কোন সম্প্রদায়কে ঐরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিবাদ ঈর্ষ্যার কলহ থাকিলেও কোন কালেই ঐ সকল দেশে সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ-রক্ষার অজুহতে সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যবস্থা পরিষদে জন কয়েক সদস্যের আসন সংরক্ষিত করা বা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় নাই। ঐরূপ ব্যবস্থার অভাব ছিল বলিয়া ঐ সকল দেশের লোকের পক্ষে ক্ষমতাশালী এবং ঋদ্ধিযুক্ত হইবার পথে কোন প্রকার বাধা ঘটে নাই। ঐ সকল দেশের অতিমাত্র পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ও এখন ভারতের উন্নততম সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর উন্নত এবং ধনবান। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা যদি ভালই হইবে, তাহা হইলে উহা য়ুরোপের পুরাতন এবং নূতন কোন দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই কেন? বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ রামানন্দ বাবুর যুক্তি অতি সুন্দর, কিন্তু তাঁহার সেই হিতবাণী শুনিবে কে? যাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক হলাহল একবার পান করিয়াছেন, তাঁহাদের বুদ্ধি এরূপ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কখনই তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হয় না। সেই জন্যই এত গোল।

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ

কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ সম্বন্ধে যে দুনিয়া ছাড়া নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কংগ্রেসের কর্ত্তারা উহার সম্বন্ধে "হাঁ" "না" কোন মতই প্রকাশ করিবেন না

ইহা যে প্রকারান্তরে ভয়ে বা চক্ষুলজ্জায় মানিয়া লইবার প্রস্তাবই হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাত্মাজী যখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালার পক্ষে এই সর্ব্বনাশা ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলেন, তখন তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা ক্রমাগতই রটাইতে থাকেন যে, মহাত্মাজীর অবস্থা অতিশয় মন্দ। ডাক্তার আম্বেদকরকে তুষ্ট করিয়া রাজী করিবার জন্য যাঁহারা পুণায় বৈঠক বসাইয়াছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বৈঠকের কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিয়া মোটর চড়িয়া মাঝে মাঝে যারবেদা জেলের দিকে ছুটিতে-কোন পদস্থ রাজপুরুষও বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার কোন সংবাদপত্র ত তখন উহার প্রতিবাদ করে নাই। এখন উহাতে আপত্তি করিলে কি হইবে? গোঁড়া কংগ্রেসওয়ালারা কি মনে করেন যে, পদস্থ রাজপুরুষরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অধিকাংশ মুসলমান ও সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দিবার কথা বলিলে তাহাই করিবেন? যদি তাঁহারা তাহা মনে করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের আক্কেল-দাঁত কখনই উঠিবে না। গোলটেবিল সভায় এই মহাত্মাজীই কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া

মহাত্মাজী, সর্দ্দারজী ও কুমারী মণিবেন

ছিলেন। সে সময়ে মহাত্মার প্রাণের হানি হইবার আশঙ্কায় বাঙ্গালার লোক ঐ চুক্তির যৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোন কথা ভাবিবার অবকাশ পান নাই। বাঙ্গালার অনেক সংবাদপত্র তখন তীব্র ভাষায় উহার প্রতিবাদ করেন নাই,—বা উহার সমর্থনও করেন নাই। তাহার পরই যখন বাঙ্গালায় কোন কোন ব্যক্তি ও দৈনিক বসুমতী উহাতে আপত্তি করিলেন, তখন মহাত্মাজীরই স্তাবক কোন কোন বক্তা ও সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন, —বাঙ্গালার লোকের উহাতে যদি আপত্তি ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা সে কথা বলেন নাই কেন? সরকার পক্ষের কোন উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন মানিয়া লওয়া অপেক্ষা কংগ্রেসের দশ বৎসর বনে গমন করাই ভাল! তখন তাঁহার গ্রামোফোন রেকর্ডরূপ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মুখ হইতে ঐ ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল। আজ কি জানি, কোন্ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে মহাত্মা গান্ধীজীর সেই মতটা বদলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সুরও ফিরিয়া গেল। কিন্তু এ কথা সত্য যে, মহাত্মা যখন কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া গোলটেবিলের বৈঠকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তখন বিশ্ববাসী লোক এই কথাই বুঝিয়াছিল যে,

সাম্প্রদায়িকনির্ব্বাচন ব্যবস্থা কংগ্রেস তখন বর্জ্জনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারা কেন সেই সিদ্ধান্ত বদলাইয়া ফেলিলেন, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ৎ কংগ্রেস দিতে পারে নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে যখন ডাক্তার আন্সারীর প্রস্তাবের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন পণ্ডিতজীর প্রস্তাবের অনুকূলে হইয়াছিল কেবলমাত্র ১২টি ভোট আর উহার প্রতিকূলে হইয়াছিল ১ শত ১৪টি ভোট। ইহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। কংগ্রেস আজ গণতন্ত্রবাদ হইতে যে এতটা সরিয়া পড়িয়াছেন, ইহা দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন কোন লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান তাহার মূল নীতি পরিত্যাগ করিয়া সুবিধাবাদকে গ্রহণ করে, তখন সে প্রতিষ্ঠানের অধোগতি স্বাভাবিক।

ভোট-দ্বন্দ্বে মাতন

এক দিকে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী রিপোর্ট লোহিত সাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গভীর গর্জ্জনে বোম্বাই বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, অন্য দিকে কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ডওয়ালারা অর্থাৎ মহাত্মাভক্ত কংগ্রেস-ওয়ালারা এবং জাতীয় দলের সদস্যরা উভয়ে ভোট-দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠিয়াছেন। যেরূপ আবহাওয়া দেখা দিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, মহাত্মাজীর নিষ্ঠাবান্ ভক্তরা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস-ওয়ালাদিগকে কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে না বাহির করিয়া দিয়া ছাড়িবেন না। ইতোমধ্যেই পার্লামেণ্টারী বোর্ডের দল অর্থাৎ নৈষ্ঠিক দল জাতীয় দলের উপর কর্দ্দম নিক্ষেপ

মিঃ নরীম্যান—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
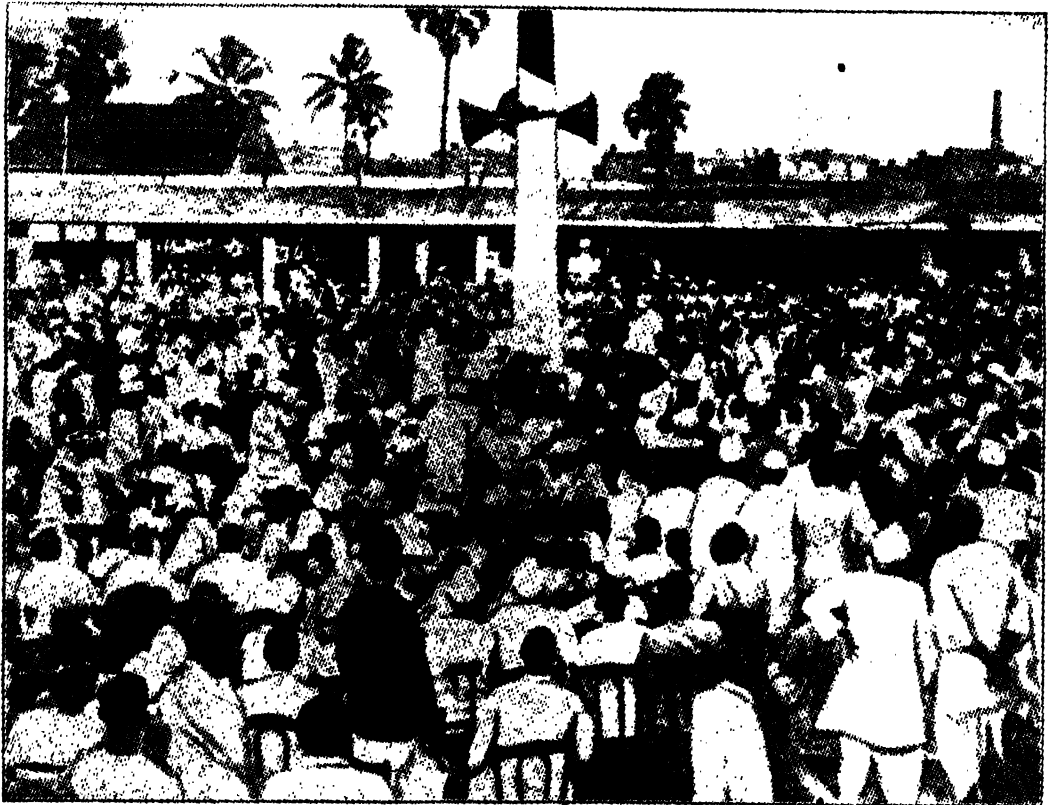
কংগ্রেস মণ্ডপের সম্মুখদৃশ্য

করিতে ছাড়িতেছেন না। জাতীয়তার নাশক সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে মতপ্রকাশ লইয়াই উভয় দলের মতভেদ ও বিবাদ দেখা দিয়াছে। ভক্তদল বলিতেছেন, A vote for the Nationalist candidate is a vote against the Congress।"—জাতীয় দলের লোককে ভোট দিলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া হইল। গলা-ধাক্কা আর কাহাকে বলে? কিন্তু ইহাও সত্য যে, বোর্ডওয়ালা বলিতেছেন যে, তাঁহারা নেপথ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া সাম্প্রদায়িক রোয়দাদকে "কু"ই বলিবেন, কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া জলদাগমে কোকিলের ন্যায় ঐ সম্বন্ধে মৌনই রহিবেন, কিছুমাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবেন না। জাতীয়তবাদীরা বলিতেছেন,—যাহা কু, তাহাকে কুই বলিব, মেঘ দেখিয়া ভয় পাইব না, বরং শিখীর ন্যায় বর্হ বিস্তার করিয়া জাতীয়তারূপ ভেকানুসারী ভুজঙ্গকে বধ করিতে ছাড়িব না। ভক্তদলের মতপ্রচারক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ ত জাতীয়তার নাশক বটে, উহা যে "কু", সে কথাও স্বীকার করি, কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদে যখন মুসলমান ও য়ুরোপীয়দিগের নবজলধরপটল সংযোগ হইবে, তখন আমরা উহাকে 'সু'ও বলিব না, "কু"ও বলিব না, একেবারে চুপচাপ থাকিব, এবং কু শব্দটি বসন্তাগমের প্রতীক্ষায় শিকায় তুলিয়া রাখিব।" চমৎকার রাজনীতিক চাল। ইহাতে কি ফললাভ হইবে? মুসলমান ও য়ুরোপীয়রা কি তোমাদের এই চতুরালী বুঝিবে না? এই বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা ভারত উদ্ধার করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধিকে শত হস্ত দূর হইতে নমস্কার!

সুভাষবাবুর কথা

কার্লসবেড হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"তিনি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে বঙ্গভঙ্গ অপেক্ষা অল্প দোষের ব্যাপার মনে করেন না। যেমন জনসাধারণের চেষ্টার ফলে লর্ড মর্লির অবধারিত বিষয়ের বিপর্য্যয় করা হইয়াছিল, সেইরূপ সকলে যদি সমবেত হইয়া চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহা উল্টাইয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। মানুষের কূটবুদ্ধি যত প্রকার জাতীয়তার বিরোধী ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিতে পারে, সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ তাহার চরম। যদি এই সাম্প্রদায়িক রোয়দাদের একাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার জন্য মহাত্মাজীকে তাঁহার বহুমূল্য জীবন পণ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে এই দারুণ ক্ষতিজনক সিদ্ধান্ত

মহাত্মাজী ও বল্লভভাই প্রভৃতি

পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার জন্য সকলের সর্ব্বস্ব পণ করা আবশ্যক। যদি এই সিদ্ধান্ত বহাল হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর পক্ষে জীবন মরণের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে এবং ইহার ফলে গত ত্রিশ বৎসরের কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে। সেই জন্য যাঁহারা সাম্প্রদায়িক রোয়দাদকে মন্দ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে সম্মিলিত হইয়া উহার পরিবর্ত্তন অথবা পরিবর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক।" ইহাই সুভাষ বাবুর চিঠির মর্ম্ম। আজ বাঙ্গালী জাতিকে রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এক দিকে সরকারও যেমন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, অন্য দিকে কংগ্রেসও সেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী এ অপমান বিস্মৃত হইতে পারে না।
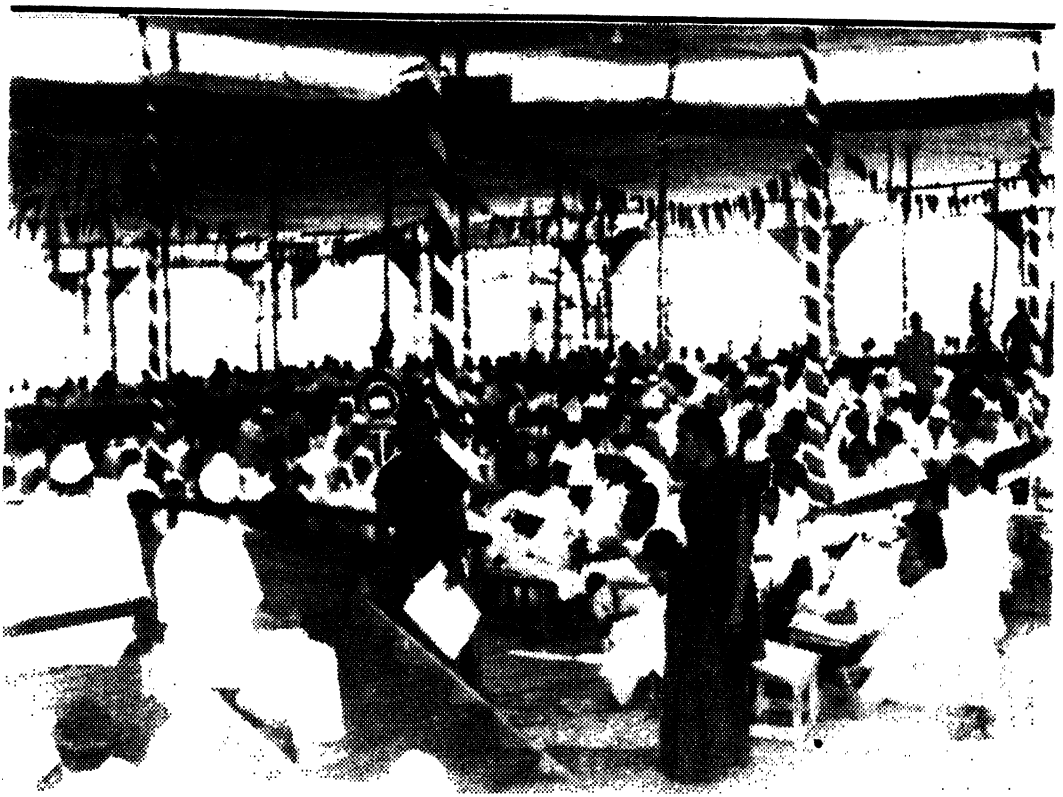
কংগ্রেস নগরের মণ্ডপ-মধ্যে

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল

এবার বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের মূল দলের মতের সহিত ইহাদের কোন কোন বিষয়ে মতামতের পার্থক্য দেখা গিয়াছে। মহাত্মাজী তাঁহার পদ-ত্যাগের কারণের মধ্যে এই দলের আবির্ভাবই যে তাহার অন্যতম কারণ, এ কথা বলিয়াছিলেন। এই দলের লোক এখন সংখ্যায় অল্প সত্য, কিন্তু কালে ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বাঙ্গালায় এই অভিনব মতাবলম্বী লোক অধিক আছেন বলিয়া মনে হয় না। এই দল বলিয়া থাকেন যে, পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রাপ্তিই তাঁহাদের লক্ষ্য। দেশের জনসাধারণের হস্তেই দেশের কার্য্য-পরিচালনার ভার ন্যস্ত করাই এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। মহাত্মাজী এই সমাজতন্ত্রবাদী-দিগের মতের ব্যাখ্যায় এখানে বলেন,—পাশ্চাত্য দেশে সমাজতন্ত্র বাদ এবং সাম্যবাদ যে অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার পার্থক্য আছে। মৌলিক চিন্তাধারার উপরই এই পার্থক্য রহিয়াছে। এই মতবাদীরা মানব-প্রকৃতির অহঙ্কারে এবং স্বার্থপরতায় অধিক আস্থাবান। সমাজতন্ত্রবাদীরা করাচী কংগ্রেসে গৃহীত স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে চাহেন না। ইহারা অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রবাদীদিগের ন্যায় বিত্তশালী লোকদিগের বিরোধী এবং শ্রমিক ও কৃষীবলের পক্ষপাতী। মহাত্মা বলিয়াছেন যে, এই দলের সহিত তাঁহার মতের মূলসূত্রগত পার্থক্য আছে। এই সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমাজে ধনগত যে বৈষম্য আছে, তাহা থাকিতে সমাজে সম্পূর্ণ অহিংসভাব স্থাপিত হইতে পারে না। ইহাদের সম্বন্ধে সমস্ত কথা এই স্থানে আলোচনা করা সম্ভব নহে। পরে আমরা সে সম্বন্ধে সকল কথা বলিব। কিন্তু কংগ্রেস যে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহাদের আবির্ভাব তাহারই সূচনা করিতেছে।

রিপোর্ট

পার্লামেণ্টারী জয়েণ্ট কমিটীর রিপোর্ট ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছে। আগামী ২০শে নবেম্বর ৪ঠা অগ্রহায়ণ উহা ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং উহা ভারতে প্রকাশিত হইবে। উহা দেখিবার জন্য ভারতের কতকগুলি ব্যক্তির যে হিয়া দগদগি ও পুরাণ পোড়ানি আরম্ভ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উঁহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি লোক আশা করিতেছেন যে, উহার মধ্যে হয়ত এমন কিছু জয়েণ্ট কমিটী দিয়া বসিবেন,—

রাজাগোপালাচারী, ভুলাভাই দেশাই ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ
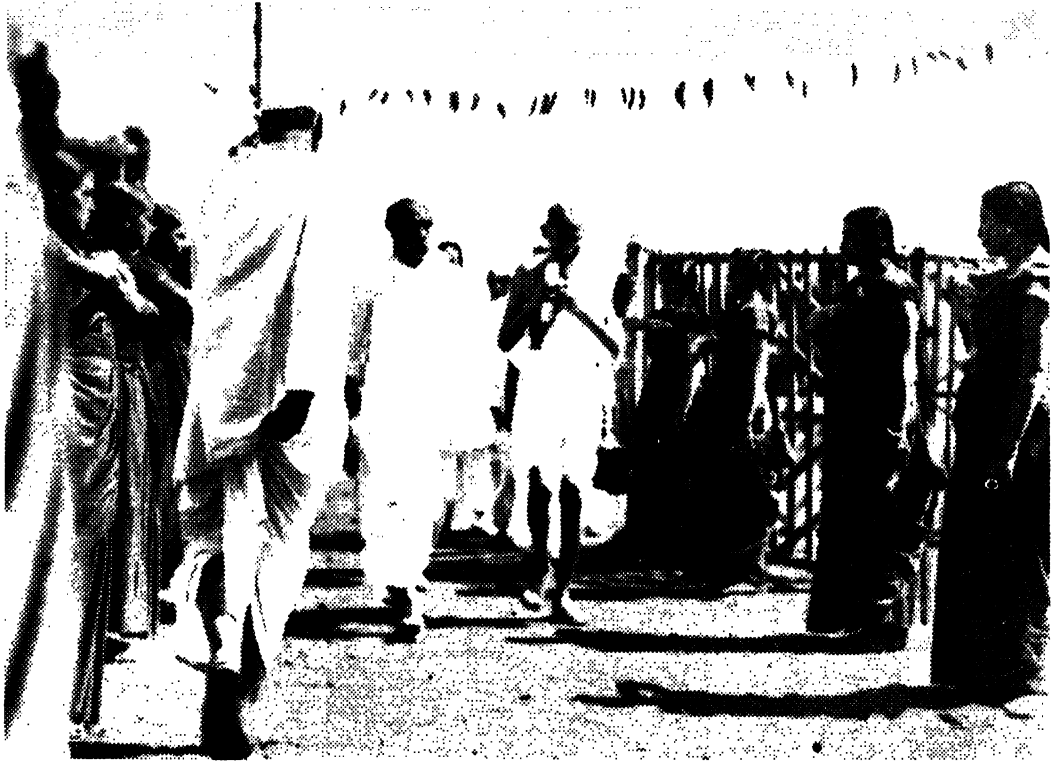
স্বেচ্ছাসেবিকাগণের মধ্যে গান্ধীজী

যাহা পাইয়া ফুলের মত উড়ন্ত প্রজাপতির ন্যায় ভারতবাসী নাচিতে থাকিবে। কুহকিনী আশা ত সকলকে সহজে ছাড়ে না। মহাত্মাজী ত তাঁহার অনুচর, সহচর ও অনুগত ব্যক্তিদিগের উপর রাজনীতিক নাচঘরের কায ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন, কিন্তু তিনি দুই একবার ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য রাজনীতিক "সাজ"ঘরে ভক্তবৃন্দকে তালিম দিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইবেন কি না,—তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যদি তিনি তাহা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তবৃন্দের পক্ষে ত সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ক্ষেত্রে কায চালান কঠিন হইবে। এখন মহাত্মাজী কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়ার পর এই তেসরা সম্বর কংগ্রেস কি করেন, তাহা দেখিবার জন্য অনেকেই কৌতূহলী হইয়া রহিয়াছেন। রিপোর্ট না আসিলে এবং এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব শেষ না হইলে কিছুই বুঝা যাইতেছে না

——

মুক্তিদানে আপত্তি

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে সরকার কর্তৃক ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশন অনুসারে ধৃত হইয়া বন্দিশালায় দিনপাত করিতেছেন। তাঁহাকে কি জন্য সরকার আটক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কেহই অবগত নহেন। তিনি স্বয়ং সরকারের নিকট আবেদন করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ যে মিথ্যা, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেন তাঁহাকে সুযোগ দেওয়া হয়। এক কথায় তিনি সরকারের নিকট প্রকাশ্য বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। গত ৫ই নভেম্বর কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিষ্টার টমাস উইলিয়ম ভারত-সচিবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভারত সচিব মিষ্টার বসুকে মুক্তি দিবার জন্য অথবা তাঁহার অপরাধের বিচারের জন্য ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবেন কি ? ভারত-সচিব ঐ কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত নহেন। অর্থাৎ তিনি বসুজ মহাশয়কে ছাড়িবেন না ও তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত গুপ্ত অভিযোগের বিচার আদালতও করিবেন না। কারণ, মিষ্টার বসু বাঙ্গালার এক জন বিপজ্জনক ব্যক্তি। ইনি যে এতবড় বিপজ্জনক ব্যক্তি, তাহার প্রমাণ কি ? আজকাল বিনা প্রমাণে ত কেহই বিধাতার কথা পর্য্যন্ত মানিতে চাহে না। ভারত-সচিব বলিয়াছেন, নেপথ্যে থাকিয়া এক জোড়া জজ সেই প্রমাণ অকাট্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। সে প্রমাণ কিন্তু তাঁহারা প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করিতে পারেন না। অতএব সরকার শরৎ বাবুকে যাবৎ গঙ্গা মহীতলে তাবৎকাল পুলিসের নজরবন্দী অবস্থায় রাখিতে পারেন। ভারতবাসীর স্বাধীনতার সীমা কতটুকু, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন। সার স্যামুয়েলের যুক্তি কি সুন্দর !

বীরেশ্বর ধর্ম্মশালা

গত ১৮ই কার্ত্তিক রবিবার কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে স্বর্গীয় সাহিত্যিক বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে বারাণসীর লক্ষ্যা রোডের উপর বীরেশ্বর ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালার একটি প্রধান কলঙ্কমোচন করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে এবং নানা তীর্থে যে সকল ধর্ম্মশালা আছে, তাহা প্রধানতঃ মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের দানে প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী পূর্ব্বে নিজ বাসভবনে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অজ্ঞাত কুলশীলদিগকে আশ্রয় ও আহার্য্য দান করিত,—এখন ঐরূপ অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা 'বর্ব্বর যুগের অবশেষ' বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে,—কিন্তু অন্যান্য দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এখনও নানা স্থানে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আগন্তুক ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত এইরূপ ধর্ম্মশালা একমাত্র বর্দ্ধমান ভিন্ন কুত্রাপি নাই। মনোমোহন বাবু সে অভাব দূর করিয়াছেন। সে জন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। এই ধর্ম্মশালাটি প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার দুই লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে মনোমোহন বাবুর ন্যায় দানশৌণ্ড অতি অল্পই আছেন। তাঁহার এই দানে বাঙ্গালীমাত্রই গর্ব্বানুভব করিবেন। মনোমোহন বাবুর দান অনন্যসাধারণ; কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এবং উহার নব প্রতিষ্ঠিত যক্ষ্মাবিভাগ তাঁহার অসাধারণ বদান্যতার এবং লোকহিতৈষণার পরিচয় দিতেছে। তিনি যেরূপ আড়ম্বরশূন্য এবং বিলাসবর্জ্জিতভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সাধারণের হিতার্থে তাঁহার অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকেন,—বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালায় তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। মনোমোহন বাবু সেই সাবেক কালের দানশৌণ্ডের শেষ নিদর্শন। তাঁহার ন্যায় কয় জন আছেন? কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ দিন বীরেশ্বর ধর্ম্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বেদপাঠ, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতবিদায় প্রভৃতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানগুলিও করা হইয়াছিল। পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্। মনোমোহন বাবুর এই সকল কার্য্যে স্বর্গীয় সাহিত্যিক বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের পুণ্যলক্ষণই প্রতিবিম্বিত।

বীরেশ্বর পাঁড়ে

শ্রীযুত মনোমোহন পাঁড়ে

কাশ্মীরে ব্যবস্থা পরিষদ

কাশ্মীরের মহারাজ সম্প্রতি তাঁহার রাজ্যের প্রজাদিগকে ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠার অধিকার দিয়াছেন। সে জন্য তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। যদি কাশ্মীরে আসল ব্যবস্থা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে সত্য,—কিন্তু যদি উহা একটা দর্শনধারী প্রতিষ্ঠান হয়, যদি কাশ্মীর দরবার উহার মারফতে দণ্ডনীতিমূলক আইন পাশ করাইয়া লইবার সুবিধা করিতে পারেন,—তাহা হইলে কাশ্মীরের পক্ষে ইহা বিশেষ অমঙ্গলজনক ব্যাপার হইবে। এরূপ প্রতিষ্ঠান ভাল না হইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে।

পরলোকে পুলিনবিহারী

গত ১৮ই কার্ত্তিক রবিবার বেলা ৯টার পর সাহিত্যিক পুলিনবিহারী দত্ত তাঁহার কলিকাতাস্থিত শিকদারপাড়ার ভবনে দেহরক্ষা করিয়া অনন্তধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮২ বৎসর। তিনি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এবং রজনীকান্ত গুপ্তের সহাধ্যায়ী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। বাল্যকাল হইতে পুলিনবিহারী বাবুর সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঐ সময় তিনি "হৃদয় প্রতিধ্বনি" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি "বৃন্দাবন কথা," "মাথুর কথা" "কাব্য কণা" "কাব্যকথা" প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। শেষ জীবনে কেবল ধর্ম্মসাধনায়ই ব্যাপৃত ছিলেন। ইনি এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে!" —রবীন্দ্রনাথ

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]   [শিল্পী—মিষ্টার টমাস

১৩ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ [২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র বহু পরিশ্রমে
যত্নে চর্চ্চা করি' যাহা না বুঝে বিদ্বান্,
না পড়িয়া তুমি, দেব, অবলীলাক্রমে
পেয়েছিলে সে জ্ঞানের নিগূঢ় সন্ধান।

শাস্ত্রের কঠিন মর্ম্ম তোমার শ্রীমুখে
বাহিরিত যবে হয়ে সহজ সরল
চলিত দৃষ্টান্ত সহ, ধরিতে তা বুকে
জ্ঞানী মূর্খ সমভাবে হয়েছে পাগল।

নানা জাতি, নানা শ্রেণী, নানা মত তাই,
নানা রূপ মুক্তিপথ নানা ধর্ম্মমতে,
কালী-কৃষ্ণ শিব-রামে ভেদ মাত্র নাই,
সাধনায় নিজে তাহা দেখালে জগতে।

সর্ববধর্ম্ম-সমন্বয় তোমার জীবনে,
করিল বিস্মিত মুগ্ধ বিশ্ববাসী জনে।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

রাণী রাসমণি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস মন্দিরের কার্য্য পরিচালনা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার লইয়াছিলেন। মথুরানাথ প্রথমে রাণী রাসমণির তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্ত্রী পরলোকগতা হইলে রাণীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মথুরানাথকে সাধারণতঃ "সেজ বাবু" বলিতেন। মথুরানাথ শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রথম সেবাইৎ। এই ভক্ত-চূড়ামণির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিযাছি। পরমহংসদেবের কথা ভাবিবার সময় আমরা এই ভক্তের কথা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ-কৌশল বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে কোন এক বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি লিখিয়াছেন যে, সেই ফরাসীবীরের জীবন-চরিত পাঠ করিবার সময় আমরা তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি নে, সোল্ট, মুরা প্রভৃতি বীরগণের কথা বারংবার লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, কিন্তু যে এঞ্জিনীয়রগণ সমস্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, সৈন্যদিগের যাতায়াতের পথ তৈয়ার করিয়া, ঘন-বনানী পরিষ্কার করিয়া, কামান রাখিবার স্থান প্রস্তুত করিয়া নেপোলিয়ানকে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিয়াছিল, সেই অদ্ভুত পূর্ত্তকর্ম্ম-কৌশলী নীরব সহকর্ম্মীদিগের কথা নেপোলিয়ানের কোন জীবন-কাহিনীতেই বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। মথুরাবাবুর সম্বন্ধেও আমাদের ঠিক সেই কথাই মনে পড়ে।

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে গোপনে একটি সাধ পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধনার সময় মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, ভক্তের রাজা হব।" দেবী ভবতারিণী তাঁহার সে সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই। কিন্তু এই ভক্তসম্রাটকে সর্ব্বপ্রথমে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রথম অর্ঘ্য ও রাজকর মথুরাবাবুই প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভক্ত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই ইহলোক পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রায় চৌদ্দ বৎসরকাল তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে, দাস যেমন প্রভুকে সেবা করে, ভক্ত যেমন ইষ্টদেবকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, পুত্র যেমন পিতাকে ভক্তি করে এবং পিতা যেমন শিশুপুত্রের স্নেহের দাবী পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপে মথুরাবাবু নানাভাবে এই মহাপুরুষের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্থিব সম্বন্ধ তাঁহাদের মধ্যে মন্দিরের বিভবশালী অধিকারী ও বেতনভোগী পুরোহিত মাত্র ছিল। এই ভক্তের সহানুভূতি, ধৈর্য্য ও অন্তর্দৃষ্টির তুলনা ছিল না। দেবীর পূজা করিতে করিতে যখন ঠাকুর "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দেখিতে পাইলেন, তখন পূজার প্রসাদী লুচি হইতে মন্দিরদ্বারে উপবিষ্ট বিড়ালও বঞ্চিত হইল না। এই প্রসাদী লুচি মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ প্রত্যহ পাইতেন এবং মহাসমাদরে গ্রহণ করিতেন। লুচি বিড়ালকে খাওয়াইয়া পুরোহিত অপব্যয় করিতেছেন, ইহা হিসাবী খাতাঞ্জী সহ্য করিতে না পারিয়া মথুরাবাবুর নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আলেকজান্দারের প্রতিনিধি তাঁহার মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আলেকজান্দারের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা যেমন আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ মথুরাবাবু খাতাঞ্জীকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও ঠাকুরের জীবনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন, "সেজোবাবু আমাকে বুঝ্‌তো, উত্তর দিয়েছিল, তিনি যা করেন, কিছুতে বাধা দিও না।" এই ঘটনার উপর কিছুই লিখিবার নাই, কিন্তু পরমহংসদেবের বিড়ালকে লুচি খাওয়ান যত বিস্ময়কর, তদপেক্ষা আরও বিস্ময়কর এই সাংসারিক, বিভবশালী, বদ্ধজীবের পুত্র যিনি যুবক পুরোহিতের বিড়ালকে লুচি খাওয়াইবার ভিতরের বস্তুটি যথাযথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মন্দিরের পূজা করিতে করিতে যখন ভাবান্তর হইতে লাগিল, যখন সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই আরতি চলে, কোথাও পূর্ণচ্ছেদ হয় না, যখন দেবীর চরণে পুষ্প না পড়িয়া মন্দিরের চারিদিকে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল, যখন চন্দনচর্চ্চিত জবা একবার

দেবী ভবতারিণীর শ্রীপাদপদ্মে, একবার পূজারীর মস্তকে স্থান পাইতে লাগিল, তখন এই মথুরাবাবু অন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া ঠাকুরকে ভগবৎচিন্তা করিবার পূর্ণ অবসর প্রদান করিলেন।

মথুরাবাবু পরমহংসদেবকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এই বিনা প্রয়োজনের মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিবার শক্তি ও পবিত্রতা এই ভক্তচূড়ামণির হৃদয়ে ছিল। কিন্তু পিতা যেমন শিশু পুত্রের সহিত ব্যবহার করেন, তাহার আদর ও আবদার সহ্য করেন, ঠিক সেই ভাবেই মথুরাবাবু ঠাকুরের সহিত চিরদিন ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। জানবাজারে যখন মথুরাবাবু সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন স্বামিস্ত্রীর সহিত একই শয়নকক্ষে পরমহংসদেবের শয্যা রচিত হইত। এই আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাসের তুলনা কোথায়? মথুরাবাবু এক দিন কৌতূহল-পরবশ হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি কি আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পাও?" দ্বিধাশূন্য-ভাবে ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, পাই," কিন্তু তথাপি একই শয়নকক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। একবার কোন এক বালককে জরির পোষাক পরিতে দেখিয়া এই বালক-পরমহংসের জরির পোষাক পরিবার সাধ হইয়াছিল। মথুরাবাবুর উপর আবদার হইল—"আমি জরির পোষাক পরব।" ধনী পিতা যেমন শিশু পুত্রের কোন সাধই অপূর্ণ রাখেন না, সেইরূপ মথুরাবাবুও ঠাকুরের সকল সাধই পূর্ণ করিয়াছিলেন। জরির পোষাক আসিল, ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া জরির পোষাক পরিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়্‌গুড়িতে তামাক খাইতে লাগিলেন। সে চিত্র কে বর্ণনা করিবে? এ যেন শিশু পৌত্র চশ্‌মা চোখে দিয়া সকলের অগোচরে—ঠাকুর-দাদা সাজিয়া বসিয়াছে! মথুরাবাবু দাঁড়াইয়া কৌতূহলে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, আর গম্ভীরমূর্ত্তি শিশু পরমহংস কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একবার তাকিয়ার এদিক্ একবার অন্যদিক্ ফিরিয়া গুড়্‌গুড়ির নল একবার মুখের এক পার্শ্বে পুনরায় অপর পার্শ্বে দিয়া মনের সাধ নিবৃত্ত করিতেছেন। হঠাৎ সাধ মিটিয়া গেল, গায়ে আগুন লাগিলে মানুষ যেমন ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি পরিধেয় জামাগুলি খুলিয়া ফেলে, সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া ঠাকুর যখন জরির পোষাকগুলি খুলিয়া চারিদিকে ফেলিয়া দিলেন, তখনও পার্শ্বে দণ্ডায়মান মথুরাবাবুর মুখে পূর্ব্বের ন্যায় সেই প্রশান্ত ও মধুর হাসি। আবার বালক যেমন পিতার নিকট শিক্ষা করে, তেমনই মথুরাবাবুর নিকট ঠাকুর শিক্ষা করিতেন। জনৈক পণ্ডিত নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে, নিজের দেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "ইনি খেয়েছেন," "ইনি করেছেন" বলিতেন, দেহে যাহাতে আত্মবোধ না হয়, তাহারই জন্য এইরূপ অভ্যাস করিতেন। ঠাকুরও পণ্ডিতের দেখাদেখি সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, নিজের দেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "ইনি করিয়াছেন," "ইনি বলিলেন" বলিতে লাগিলেন। মথুরাবাবু এক দিন তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি কেন ও রকম বল। ওদের অহঙ্কার আছে, ওরা ঐ রকম বলুক্। তোমার ত অহঙ্কার নেই, তুমি কেন ওরকম বলবে?" সেই দিন হইতে ঠাকুরের আপনাকে "ইনি" বলা বন্ধ হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মথুরাবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সহিত ঠাকুর তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণ। ঠাকুর পূর্ব্বে একবার ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নিজ জননীকে লইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মথুরাবাবুর কোন কোন পুত্র-কন্যাও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ-ধাম প্রভৃতি নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে যমুনা-পুলিনে রাখালরা গোচারণ করিতেছে দেখিয়া ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া বেলাভূমিতে "কোথায় কৃষ্ণ" "কোথায় কৃষ্ণ" বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরীয় বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইলে কি প্রবল অনুভূতি তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিত, দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন, তাহা সাধারণ কল্পনা-শক্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সুকঠিন। তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াও সাধারণ মানুষের হৃদয় দিগ্‌-নির্ণয় যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদাই সংসারের দিকে ফিরিয়া থাকে, দেহ ঘুরিয়া বেড়ায়, মন পুত্র-কলত্র-সংলগ্ন হইয়া থাকে। তাই তীর্থপর্য্যটনপ্রত্যাগত মানুষের পেটিকা নানা তীর্থের নানাবিধ খেলানা, বস্ত্র ও সাংসারিক কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদিতে প্রায়ই পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর

তীর্থপর্য্যটন শেষ করিয়া বৃন্দাবন হইতে রজঃ আনিয়া তাঁহার সাধনার স্থল পঞ্চবটীতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন ও একটি মাধবীলতা আনিয়া পঞ্চবটীতে রোপণ করিয়াছিলেন। সমস্ত তীর্থসিন্ধু মন্থন করিয়া তিনি একমুষ্টি—"ধূলি" ও একটি ফলবিহীন লতা সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথধামে যাইয়া ঠাকুর এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এত দিন কেবল "মা ও ছেলে" ইহাই দেখিয়া আসিতেছিলেন, আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া "মা" "মা" করিয়া হাসিয়া, কাঁদিয়া আদর আব্দার করিয়া মায়ের ক্রোড়ের নিকট ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দিন কাটাইয়াছিলেন। তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়া যখন মাতৃক্রোড় হইতে একটু দূরে যাইয়া পড়িলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার জননীর আরও সন্তান আছে, তাহারা কাছে নয়, মার নিকট হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বিমাতার অনাদৃত সন্তানের ন্যায় অন্নবস্ত্রবিহীন, তাহারা 'মা' বলিয়া ডাকিতে শিখে নাই বলিয়া মা-ও যেন তাহাদের ভুলিয়া রহিয়াছেন। মথুরাবাবু ঠাকুরকে লইয়া যখন বৈদ্যনাথধাম পৌঁছিলেন, তখন দুর্ভিক্ষের করাল প্রতিমূর্ত্তি সমস্ত স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া অনশনক্লিষ্ট সাঁওতাল অধিবাসীদের শীর্ণ ও মলিন দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছিল। দুঃখে মৌন ও মূক এই হতভাগ্যদের নীরব বেদনায় ঠাকুর যেন অবশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মথুরাবাবুর নিকট আব্দার করিয়া বসিলেন যে, এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হইবে।

মহাপুরুষগণের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদাই বিচিত্র। ঠাকুর পূর্ব্বে কিছু দিন তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়ীতে শিওড়ে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় হৃদয় একবার আনন্দ করিয়া বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ সংসারী লোক। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই যদি এই সব লোক ফের্ খাওয়াবি, তা হ'লে তোর বাড়ী থেকে তক্ষুনি চ'লে যাব।" আর একবার বহু বর্ষ পরে নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি শিষ্যগণকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইবার জন্য কোনও এক ভক্তকে ঠাকুর আদেশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, শুদ্ধ-সত্ত্ব-সম্পন্ন মানুষকে ভোজন করাইলে মানবদেহে অগ্নিরূপে অবস্থিত ভগবানকে আহুতি দেওয়া হয়। ঠাকুর এই নিরক্ষর, গভীর বেদনায় মূক ও নীরব সাঁওতালদের সহিত শিওড়ের ভদ্রবংশসম্ভূত শিক্ষাভিমানী লোকদের কি প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইবার জন্য মথুরাবাবুকে ধরিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন। মথুরাবাবু কিন্তু ঠাকুরের অনুরোধে মহা বিপদ্ গণনা করিলেন। এই বালক-পরমহংস অসীম ধৈর্য্যশালী এই ভক্তপ্রবরকে যত প্রকার বিপদে ফেলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুই বারের কথাই আমাদের সর্ব্বদা মনে পড়ে। এইবার মথুরাবাবু কাতরকণ্ঠে ঠাকুরকে বলিলেন যে, এতগুলি বুভুক্ষু-মুখে অন্ন প্রদান করা তাঁহার আর্থিক অবস্থার অতীত। ঠাকুর কিন্তু সে কথায় ভুলিলেন না, প্রাণ তখন কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সাধ্য অথবা অসাধ্য হিসাব করিয়া দেখিবার ক্ষমতা নাই। তিনি সেই দরিদ্র সাঁওতালদেরই মধ্যে গিয়া বসিলেন, নয়নধারায় বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল, তিনি তাহাদেরই এক জন হইয়া সেইখানেই থাকিবেন আর উঠিবেন না, এই কথা বলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের অশ্রুধারা তাহার সৌন্দর্য্য কত শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, তাহা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণ মহাসমারোহে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মানবজাতির দুঃখতাপক্লিষ্ট মহাপুরুষ-হৃদয়ের সহানুভূতি-প্রসূত এই যে আঁখিধারা, তাহার সৌন্দর্য্য কোন ভাষাই প্রকাশ করিতে পারে না। মথুরাবাবু "বাবাকে" কত বুঝাইলেন, কিন্তু "বাবা" নিজে যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা ভুলাইয়া দিবার শক্তি মথুরাবাবুর ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাঁওতালদের তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইতে হইল।

কিন্তু মথুরাবাবুর ইহাতেও চৈতন্য হয় নাই। আর একবার ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার জমীদারী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি এই ধনী সেবাইৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তিনি সর্ব্বদাই এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গসুখলিপ্সায় উৎসুক হইয়া থাকিতেন। জমীদারীতে যাইয়া মথুরাবাবু খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দুই বৎসর ভালরূপ ধান্য উৎপন্ন না হওয়ায়, প্রজাগণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না! ঠাকুর ধরিয়া বসিলেন, তাহাদের খাজনা মাপ করিয়া দিতে হইবে এবং এক দিন তাহাদিগকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে

হইবে। মথুরাবাবু চোখে অন্ধকার দেখিলেন। কোথায় জমীদারীতে টাকা আদায় করিতে আসিয়াছেন, তাহা দূরে থাকুক, তাঁহাকে অর্থব্যয় করিয়া প্রজাদের খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু নির্ভীক, স্বাধীনচেতা এই পুরোহিত অশেষ স্নেহভক্তিসম্পন্ন তাঁহার নিয়োগকর্ত্তাকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ত নায়েব, এরা মার খাস তালুকের প্রজা ;—মার টাকা মার প্রজাদের জন্য খরচ করবে, এ তোমাকে করতেই হবে।" আর একবার ঠিক এইরূপ কথাই ছত্রপতি শিবাজীকে তাঁহার দরিদ্রগুরু রামদাস শুনাইয়াছিলেন—

"তোমারে করিল নিধি　　ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
জানিবে যে রাজধর্ম্ম　　জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাব্রত হৃদয়নাথ

ঠাকুরের সত্য কথাগুলি তীক্ষ্ণ সূচির ন্যায় মথুরাবাবুর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি খাজনাও পাইলেন না, প্রজাদের খাওয়াইতেও হইল, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতা হইতে যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুর সাধনার প্রারম্ভেই কাল, স্থান, এমন কি, নিজ দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন হইতে লাগিলেন, তখন ঠাকুরের দেহের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। আহার, নিদ্রা, কিছুই মনে থাকে না, পঞ্চবটীতে গিয়া গভীর রাত্রিতে "মা" "মা" করিয়া ডাকিয়া বেড়ান, এই অবস্থায় তাঁহাকে ডাকিয়া খাওয়ান, নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা, শরীরের পরিচর্য্যা, এই সমস্ত ভার অন্য কেহ না লইলে তখন দেহরক্ষা হইত না। ঠাকুর এই সময়কার অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মাকে বল্লাম্, এ দেহরক্ষা কেমন ক'রে হবে, আর সাধু ভক্ত লয়ে কেমন ক'রে থাকবো ? তাই সেজবাবু চৌদ্দ বৎসর সেবা ক'ল্লে।" মথুরাবাবুর ভক্তি ও সতর্কতাই এই সাধনার সময় তাঁহার দেহরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুরের এইরূপ অবস্থার সময়ে

আর এক জনও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া সেবা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভাগিনেয়, তাঁহার পিস্তুতো ভগিনীর ছেলে হৃদয়-নাথ মুখোপাধ্যায় সর্ব্বদা কাছে থাকিয়া, স্নান, আহার, এমন কি, প্রয়োজনমত ঠাকুরের মলমূত্র পর্য্যন্ত নিজ হস্তে পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের নিজ জিহ্বার উপর কোনও সংযম ছিল না এবং ঠাকুরকে সময় সময় বুঝিতে না পারিয়া অযথা কটুকথা বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পীড়া দিতেন। অবশেষে তাঁহার কোন এক অপরাধের জন্য মন্দিরের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার বহুদিন পরে মহাপুরুষের ভগবৎপ্রেম নিবন্ধন আত্মবিস্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"তাঁর ওপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাক।...জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন কাল্‌কার জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হ'লে তোমার পরিবারদের জন্য তিনি ভাববেন। যখন জমীদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়!" ঠাকুরের এই কথাগুলি স্মরণ করিলে গীতায় অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়ে।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

যখন ভক্ত তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া দেহের কথা বিস্মৃত হইয়া যায়, অথবা দেহরক্ষার চেষ্টা করিবার ইচ্ছা বা শক্তি থাকে না, তখন তিনিই এই সকল ভক্তের দেহ-রক্ষার বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে, তিনি নিশ্চয়ই ভারগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-শর্ম্মার বিখ্যাত শ্লোকে—

"যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতা কৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি॥"

এই কথাগুলি সংসার-বুদ্ধি-সম্পন্ন অহংকারবিমূঢ়াত্মা সাধারণ লোকের প্রতি প্রযোজ্য নহে। যে লোক সর্ব্বদাই অহংবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহার পুরুষকার ব্যতীত কিছুই লভ্য নহে। কিন্তু যে মহাপুরুষ দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মা সমস্তই ভগবানের নিকট উৎসর্গ করিয়া অহংবুদ্ধির বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহার পুরুষকার বলিয়া কিছুই রহিল না, সুতরাং তাঁহার "যোগক্ষেম" স্বয়ং শ্রীহরি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তকবি এইরূপ লোকের সম্বন্ধেই গাহিয়াছেন—

"নাথ, কি ভয় ভাবনা তার,
তুমি যার যে তোমার।
ঐ অভয় পদ দিয়ে প্রহরী হইয়ে
নিজে রক্ষা কর যারে নিরন্তর।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতেন—"এর নাম প্রেমোন্মাদ। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে বাহিরের জিনিষ ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, তাও ভুল হয়ে যায়। তখন কেবল "মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন মন কেউ না দেখে।" এই কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুর আর এক দিন বলিয়াছিলেন—"সঞ্চয় কর্‌তে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সঞ্চয় কর্‌তে নাই।" ঠাকুরের এই কথাগুলির সহিত যীশুখৃষ্টের শিষ্যগণের প্রতি উপদেশের আশ্চর্য্য-জনক সামঞ্জস্য আছে। তাঁহার শিষ্যগণ যখন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চারিদিকে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবার সময় যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন—

"Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves. For the werkman is worthy of his meat."

(অর্থ সঞ্চয় করিও না, কোন দ্রব্য লইবার জন্য পেটিকা লইও না, দুইটি জামা লইবে না। জুতা অথবা লাঠিরও প্রয়োজন নাই। যে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছ, সেই কার্য্য করিলে তিনিই তোমার সমস্ত প্রয়োজনের বিধান করিবেন।)

আবার তাঁহার জগদ্‌বিখ্যাত—"The sermon on the Mount"এ তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন—

"Therefore take no thought saying, what shall we eat? or what shall we drink? or wherein that shall we be clothed?......But

seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you."

(কি খাইবে, কি পান করিবে, অথবা কি পরিবে, ইহার জন্য চিন্তা করিও না। আগে তাঁহাকে পাইতে এবং তাঁহার ইচ্ছা জীবনে সফল করিতে চেষ্টা কর, তোমার পার্থিব কোনও প্রকৃত অভাবই তিনি অপূর্ণ রাখিবেন না।)

ধর্ম্মের সত্য অনুভূতির মধ্যে দেশ, কাল অথবা পাত্র-ভেদে কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। গীতা যাহাকে 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' বলিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাকে "অছী নাবালকের ভার লয়" বলিয়াছেন, সেই কথাই যীশুখৃষ্ট অন্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"Seek ye first the kingdom of God and his righteousness; and all these things shall be added unto you."

কিন্তু এরূপ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন কে করিতে পারে?

ঠাকুরের প্রেমোন্মাদনার সময় শ্রীশ্রী৺ভবতারিণী মথুরা-বাবুকে দিয়াই তাঁহার যোগক্ষেম বহন করিয়াছিলেন। পদগৌরব, আত্মমর্য্যাদা সমস্ত ভুলিয়া, বিষয়ের লাভক্ষতি গ্রাহ্য না করিয়া যখন এই ভক্তশ্রেষ্ঠ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের সেবা করিতেছিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরে দেবালয়ের সমস্ত কর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র পুরোহিত কি শক্তিবলে এই ধনী রাজজামাতাকে বশীভূত করিতে পারে? সকলে বলিতে লাগিল—"ছোট ভট্‌চায্যি তুক্ করেছে।" তাহাদের নিকট "তুক্ করা" ব্যতীত মানুষকে বশীভূত করিবার আর কোন উপায় পরিজ্ঞাত ছিল না।

কিন্তু এই অশেষ-ঐশ্বর্য্যশালী, ভক্তিমান্, ধনী সেবাইৎ-কেও সময় সময় ঠাকুরের নিকট কঠোর সত্যকথা শুনিতে হইত। মানুষের চরিত্র ও মন উভয়ই বিচিত্র। সেবা করিয়াও মানুষের অহঙ্কার হয়। বড় বড় সাহেবদের খান্‌সামা অথবা বাবুর্চ্চি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, অন্যান্য লোকের সংস্পর্শে আসিলে এই দাসগণ "সাহেবের খানসামা" বলিয়া কত অহঙ্কারের সহিত আচরণ করিয়া থাকে। সাধারণ শক্তি-মদমত্ত মানুষের সেবা করিয়াই যদি এত অহঙ্কার হয়, তাহা হইলে শুদ্ধচিত্ত মহাপুরুষের পরিচর্য্যা করিয়া দুর্ব্বলচিত্ত মানব গৌরব অনুভব করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। মথুরাবাবুর হৃদয়ের কোন্ গোপন অন্তস্তলে কোথায় এই মহাপুরুষকে সেবা ও ভক্তি করিবার অহঙ্কারের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু ঠাকুরের দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হইত না। এক দিন তিনি মথুরাবাবুর এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি মনে ক'র না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মান্‌ছো ব'লে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটা কথা আছে, মানুষ কি কর্‌বে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো।" সেই যন্ত্রীর হাতে মথুরাবাবু যে কেবল যন্ত্রস্বরূপ—কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়—সেই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইয়াছিল।

"ভক্তের রাজা" ঠাকুর পরমহংসদেবের প্রথম রাজভক্ত প্রজা মথুরানাথ বিশ্বাস ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
(অধ্যাপক, সিটী কলেজ)

২২

তপুর আর বিস্ময়ের সীমা নাই। এ কি স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? গাড়ী হইতে নামিয়া রাস্তায় দোলায়মান বারান্দায় আশ্রয় লইয়া তপু একদৃষ্টে কলিকাতার মহানগরী নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার বয়সে এই প্রথম সহর-দর্শন। কলিকাতার বিরাট সৌধাবলী, সারি সারি বিপণিশ্রেণী মুগ্ধ বালকের নয়নে অলকার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। এত লোক, দ্রব্যসম্ভার কোথা হইতে আসিয়া কোথায় যায়? এত গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, ট্রাম, বাস কোথায় থাকে?

বালিগঞ্জে ভূষণভিলার নিকটে সুবিধামত বাসা না পাইয়া দিবাকরের বন্ধু মণীন্দ্র তাহার হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। ভাড়াটিয়া উঠিয়া যাওয়াতে বাড়ী খালি হইয়াছিল। বাড়ীখানি বড় এবং স্থান অনেক।

মণীন্দ্র বাড়ীর কলি ফিরাইয়া মোটামুটি আস্‌বাবপত্রে সাজাইয়া দিবাকরদের বাসের উপযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। দুইটি দাস-দাসী ও একটি পাচক নিযুক্ত হইয়াছিল। ভাঁড়ারে চাল, ডাল, মশলা, তরকারী গুছাইয়া রাখিয়াছিল।

সকলের আসিবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময় হিরণকে লইয়া বিবাহবাড়ী দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। মণীন্দ্রের গৃহিণীপনার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যশোদা নূতন ঘরকন্নার মধ্যে আসিয়া মণীন্দ্রের সুব্যবস্থায় স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া মনে মনে ছেলেটিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ষ্টেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সকলকে সমাদরের সহিত নূতন বাসায় তুলিবার অদম্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও জ্যোতির্ম্ময়ের যাওয়া হইল না। ষ্টেশনের বিপুল জনতার ভিতর তিনি ভাবী গৃহলক্ষ্মীকে প্রথম নিরীক্ষণ করিবেন না বলিয়া গাড়ীসহ হিরণকে ষ্টেশনে পাঠাইলেন।

সকলে বাসায় আসিয়া স্থির হইলে নিজে খবর করিতে আসিলেন। জমীদারের ছেলে, নিজে জমীদার, তায় বর-পক্ষ, তাঁহার এরূপ মহানুভবতায় ভোলানাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। জ্যোতির্ম্ময়কে কোথায় বসাইবেন, কি করিবেন, ভোলানাথ তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

দিবাকর, মণীন্দ্র চাকর লইয়া বাজারে গিয়াছিল। হিরণের নিকটে জ্যোতির্ম্ময় আসিবেন, জানিয়া জ্যোতির্ম্ময়কে জ্যোতির্ম্ময় অনুমান করিতে ভোলানাথের বিলম্ব হইল না। জ্যোতির্ম্ময়ও প্রথম দৃষ্টিপাতে ভোলানাথের অন্তর বাহির চিনিয়া লইলেন। এ কৃত্রিমতার যুগে এমন সরল আপনা-ভোলা মানুষটিকে জ্যোতির্ম্ময়ের খুব ভাল লাগিল।

প্রথমে রাস্তার বিষয়, তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদের প্রতি রেলের কর্ত্তাদের অবহেলার কথা উঠিল। তাহার পর আলোচনা চলিল গৃহস্থের বর্ত্তমান জীবন-সমস্যা, চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালীর দুরবস্থা।

সরল ভোলানাথ জ্যোতির্ম্ময়ের মতামতের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া আপনা আপনিই বকিয়া যাইতে লাগিলেন।

অবশেষে বিদায়-মুহূর্ত্ত আসিল। জ্যোতির্ম্ময় নম্রস্বরে কহিলেন, "পুরোহিতকে দিয়ে দিন দেখিয়েছি, আজ সন্ধ্যা সাতটায় আপনারা যেয়ে জয়ন্তকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবেন। হিরণ এসে আপনাদের নিয়ে যাবে।"

এতক্ষণে ভোলানাথের চমক ভাঙ্গিল। তিনি ব্যস্ত-সমস্তভাবে বলিয়া বসিলেন, "তুমি ত কুহুকে দেখনি, বাবা? এখুনি দেখে কি আশীর্ব্বাদ করবে?"

জ্যোতির্ম্ময় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "এ বেলা দিন ভাল নেই, আর আপনি আশীর্ব্বাদ না করলে আগে ত আমার আশীর্ব্বাদ হবে না। আজ আপনার আশীর্ব্বাদ হ'লে কাল বেলা নটায় সময় ভাল আছে, তখন আমি কুহুমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবো।"

ভোলানাথ অপ্রতিভ হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

যশোদা দ্বারান্তরালে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন, এখন নিকটে আসিয়া ঝঙ্কার দিলেন—"হ্যাঁ গা, তোমার কিসের আক্কেল, বাড়ীতে ভদ্র লোক নতুন এলেন, সাধারণ ভদ্রলোক নয়, কুটুম, তুমি তাঁকে একটু চা খেয়ে যেতে আদর করলে না? জল খেতে বল্লে না। কল্‌কাতা সহরের রীতি—বাড়ীতে কেউ এলে তাকে খাবার দিয়ে চা দিয়ে খাতির করতে হয়, আর ওদের যে বেশী ক'রে আদর করবার কথা।"

পত্নীর মৃদু ভর্ৎসনায় ভোলানাথ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "জানই ত আমার ভুলো মন, তুমি কেন আমায় ডেকে বল্লে না? সত্যি বড্ড ভুল হয়ে গেল।"

"ভুল হ'ল বল্লেই চলে না গো, এ সব মনে রাখতে হয়। এ কি তোমার ক্ষীরপুর গাঁ, না গাঁয়ের দাঠাকুররা এসেছিলেন যে, আমি চাবী নেড়ে, চুড়ি বাজিয়ে তোমায় ডাকবো? ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছ, সে সময় কি ডাকা চলে? আর ডাকবোই বা কাকে দিয়ে? চাকরটাকে নিয়ে দিবা, মণি বাজারে গেছে, একঘড়া গঙ্গাজল আনতে ঠাকুরকে গঙ্গায় পাঠিয়েছি। ঝি মাগী ত কারুর সামনে বার হয় না, সাত হাত ঘোমটা টেনে লজ্জাবতী লতা হয়ে থাকে। তপু খানিক আগে বারান্দায় ব'সে ছিল, এখন উঠেছে চারতলার ছাদে। লক্ষ সিঁড়ি ভেঙ্গে তাকে ডাকাও অসাধ্যি।"

"কেন, কুহুকে দিয়ে আমাকে ডাকালেই পারতে? কুহু ত ছাদে ওঠে নি?"

যশোদা হাসিলেন, "ভাল কথা মনে করিয়ে দিলে! কুহুর হ'ব ভাসুরের সামনে এসে তোমাকে ডাকাই তার উচিত ছিল, দিন দিন তুমি কি হচ্ছ বল ত? এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছ, নাতি হয়েছে, আর এক মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছ, তবু পরিবর্ত্তন হ'ল না?"

"আর হবে? তুমিই ত আমায় এত দিন চালিয়ে নিয়ে এসেছ বৌ, এখন না চালালেই বা চলবে কেন?" বলিয়া ভোলানাথ বেতের চেয়ার খুঁটিতে লাগিলেন।

যশোদা পার্শ্বের চৌকীতে উপবেশন করিয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কাহার প্রতি তাঁহার অনুযোগ, অভিযোগ? স্বামী যে তাঁহার সামাজিক রীতি নীতির অনেক উর্দ্ধে। তাঁহার ন্যায় এমন করিয়া কে ভোলানাথকে জানে? চেনে? কিন্তু জানিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতি কঠিন বাক্যপ্রয়োগ তিরস্কার স্ত্রীর মুখে শোভা পায় না।

যশোদা অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, "আজ কিছু খাওয়ানো হ'ল না, তাতে কি এসে গেছে। কাল ত আবার জ্যোতির্ম্ময় আসবেন কাল বেশ ক'রে খাইয়ে দিলেই হবে। দিবারা এলে বলি, কিছু মেওয়া ফলটল এনে রাখুক।"

ভোলানাথের প্রশান্ত বদনের ক্ষীণ মেঘরেখা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া সেখানে বৈশাখীর শুভ্র জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল হাস্য-জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল। তিনি ব্যস্তভাবে উঠিয়া বলিলেন, "দিবারা কোন্ দিকে গেল? কোন্ বাজারে? আমি এখুনি যাচ্ছি, তাদের ফল কিনতে ব'লে আসি।"

"তোমাকে ব্যস্ত হয়ে বাজারে যেতে হবে না। আজ ত ফলের দরকার নেই, কাল সেই বেলা ন'টায়। দিবারা এলেই আন্‌বেখন। তুমি বোস।" বলিয়া যশোদা স্বামীর হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আজকেই ত আশীর্ব্বাদ করতে হবে তোমাকে? প্রথম আশীর্ব্বাদ জামাইকে একটু সোণা দিতে হয়। তাদের রাজার ঘরে আমাদের দেবার যুগ্যি কিই বা আছে? তবু যেমন শক্তি, তেমনি দিতে হবে। আমার কাছে একটা আকবরি মোহর আছে, আমি বলি কি, সেইটা দিয়েই আশীর্ব্বাদ ক'রো।"

২৩

সেই দিনই সন্ধ্যায় ভোলানাথ জয়ন্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। জয়ন্তর কান্ত রূপ, ভূষণডাঙ্গা প্রাসাদের অপূর্ব্ব গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে মুগ্ধ পুলকিত করিল জ্যোতির্ম্ময়ের সৌজন্য। এমন বিনয়ী উদারপ্রকৃতি ছেলেটিকে আত্মীয়-রূপে পাওয়া তিনি সকল প্রাপ্তির চরম প্রাপ্তি মনে করিতে লাগিলেন।

পরদিন বেলা আটটায় জ্যোতির্ম্ময় কুহুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিল পুরোহিত ও হিরণ।

জ্যোতির্ম্ময় মহা ধনী হইলেও এ বিবাহে তাঁহার ধন-গর্ব্বিত আত্মীয়-পরিজনদিগকে আনিয়া কন্যাপক্ষকে বিব্রত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই এ অনুষ্ঠান সংক্ষেপেই হইল।

দ্বিতলের হলে আশীর্ব্বাদের আয়োজন হইয়াছিল। কুহুকে আনা হইলে, সে সকলের পায়ের ধূলা লইয়া, নীরবে নতনেত্রে জ্যোতির্ম্ময়ের সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

ভূষণডাঙ্গার জমীদারদের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও এক কালে ভোলানাথদের বৈভবের খ্যাতি ছিল। সেদিনের কয়েকটা দামী শাড়ী ও গহনা থাকা সত্ত্বেও যশোদা

মেয়েকে একখানি লালপাড় শাড়ী পরাইয়া দিয়াছিলেন। গলায় একনর ছোট হার, কাণে দুইখানি মুক্তার কাণবালা, হাতে কঙ্কণ। কুহুর চুল খুলিয়া দিয়া শুভ্র ললাটে একটি সিন্দূরের টিপ আঁকিয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় চোখ তুলিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার নয়নদ্বয় স্নেহে প্রশংসায় উজ্জ্বল হইল। পুরোহিতের আশীর্ব্বাদের পর জ্যোতির্ম্ময় ধান-দূর্ব্বা দিয়া কুহুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার হাতে একটি মকমলের বাক্স দিয়া বলিলেন, "আমাদের কায হয়ে গেছে মা, এখন তুমি যেতে পার।"

তপু নিকটেই ছিল, বালচপলতা বশতঃ কুহুর হাত হইতে বাক্স লইয়া খুলিয়া ফেলিল। তাহার মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিল—শাড়ী আটকানো একটি চরকা ব্রুচ। চরকার সর্ব্বাঙ্গে হীরা-মুক্তা ঝক-মক করিতেছে।

কুহু চলিয়া গেলে যশোদা মাথায় অঞ্চল টানিয়া দিয়া সকলকে প্রচুর জলযোগ করাইলেন। আহারচ্ছলে জ্যোতির্ম্ময় ও হিরণের সহিত অল্প অল্প আলাপ-আলোচনা হইল। প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল।

* * * *

জ্যোতির্ম্ময় বেলা সাড়ে এগারটায় বাড়ী ফিরিলেন। ভাতি উৎসুক হইয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্বামি-সঙ্গ-সুখের নিমিত্ত তাহার ঔৎসুক্য নহে। স্বামীর নিকটে কুহুর রূপের বিস্তারিত বিবরণ শুনিতেই সে আগ্রহান্বিত। ভাতি বিলাসিনী, বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতির মত সর্ব্বদা সাজিয়া থাকিতে তাহার বড়ই উৎসাহ। আজ তাহার সাজিবার স্পৃহা আরও বলবতী হইয়াছে। অপরের মুখে কুহুর রূপের খ্যাতি তাহার কাণে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। এবার জ্যোতির্ম্ময়ের পালা, অনেক রূপসী তাহার অপেক্ষা সুন্দরীর রূপের ব্যাখ্যা শ্রবণে ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়েন। সে ব্যাখ্যা যদি স্বামি-কণ্ঠ-নিঃসৃত হয়।

ভাতি একটি সাদা মাদ্রাজী শাড়ী পরিয়াছিল, শাড়ীর পাড়টি বেগুনি। গায়ে ভাতির ফ্যাসানের ছোট্ট বুকখোলা আদ্দির ব্লাউজ। সর্ব্বাঙ্গে এক ইঞ্চি পাউডারের প্রলেপ। অধরোষ্ঠ গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত। ঘষা চুল এলো খোঁপায় আবদ্ধ। কাণে মুক্তার দুল, গলায় মুক্তার মালা, হাতে একগাছি করিয়া মুক্তাবসানো চুড়ি। শুভ্র বসন-ভূষণে ভাতিকে বড়ই মানাইয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময় কক্ষে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সোফায় অর্দ্ধশয়ানা পত্নীর বঙ্কিম ভঙ্গীটি তাঁহার মিষ্ট লাগিল। দক্ষিণ বাহু সোফার হাতলে অলসভাবে এলাইয়া পড়িয়াছে। বাম হস্তে একখানি পুস্তক, ঈষৎ অবগুণ্ঠন সরিয়া যাওয়াতে দীর্ঘ গ্রীবার উপর কুঞ্চিত কেশের সহিত খোঁপার লাল ফিতাটুকু দেখা যাইতেছে। শাড়ীর ঘন বেগুনি পাড়টি বাঁকিয়া শুভ্র জুতার উপর শুভ্র পদপল্লব বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

স্বামীর আগমন-সংবাদ জানিয়াই ভাতি এমনই মনোরম ভঙ্গীতে বসিয়াছিল। কেবল স্বামী নহে, স্ত্রী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিপথে নিজের সুন্দর শোভন দেহটিকে প্রকাশ করিবার প্রয়াস ভাতির আন্তরিক। বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণী ভাতিকে নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হউক, উন্মুখ হউক, স্থানবিশেষে আহত হউক, ইহাই ভাতির মনোগত ইচ্ছা।

স্বামী দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারই রূপসুধা পান করিতে-ছেন। এই আত্মপ্রসাদে পুলকিত হইয়া সে ঘাড় ফিরাইয়া বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কখন্ এলে? দাঁড়িয়ে কেন? আমি ভাবছিলাম, আজ বুঝি পথ ভুলে গেছ।"

জ্যোতির্ম্ময় অগ্রসর হইয়া পত্নীর আসনের এক প্রান্ত অধিকার করিয়া কহিলেন, "না ভাতি, এ বয়সে আমাদের পথ ভোলার ভয় নেই, ওঁরা খুব খাওয়ালেন, খেয়ে দেয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল। তোমাদের খাওয়া হয়েছে? তা হ'লে রামচরণকে ডেকে ব'লে দাও, ওরা খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে ফেলুক, ঢের বেলা হয়েছে।"

"দেখ, তোমাদের বাঙ্গালী জাতটার নাম যে ভোজন-বিলাসী, তা মিছে নয়। সেই কোন্ সকালে সেজেগুজে গেলে, এতক্ষণে ফিরেই আগে খাওয়ার কথা। যাকে দেখতে গেলে, তাকে কেমন দেখলে? কেমন লাগলো, তা না ব'লে রামচরণ, সর্ব্বশরণ, চিন্তামণির খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। ওরা ত তোমাদের মত বাবু নয়, যখন ইচ্ছে তখন খাবে'খন।" বলিয়া ভাতি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

জ্যোতির্ম্ময় জবাব দিলেন, "শুধু শুধু কাউকে কষ্ট দিতে আমার ভাল লাগে না, ভাতি। আমাদের টাকার দুঃখ নেই ব'লে যে বেশী বেশী ক্ষিধে পায়, যাদের তা নেই, তাদের

কম ক্ষিধে পায়, তা নয়। কি দেখে এলাম ? তা বলছি, ফুরিয়ে যাচ্ছে না, বাসনা কোথায় ? দুজনে একসঙ্গে আশীর্ব্বাদের গল্পটা শুনে নাও।”

“সে ঠাকুরপোর মহলে গেছে, সে না এলে আমাকে কিছু বল্‌তে তোমার বোধ হয় ভাল লাগবে না ? তখন তোমার সাথে যেতে চাইলাম, তাতেও অমত করলে, আবার দেখতে কেমন, সেটাও বলতে চাচ্ছ না। সে নয় সুন্দরী আছে, আমি না হয় কুচ্ছিত। তাই ব’লে এত অপমান ? চাই না শুন্‌তে তোমার কোন কথা।” ভাতি সরোষে প্রস্থানোদ্যত হইল।

জ্যোতির্ম্ময় সস্নেহে স্ত্রীর বাহু ধারণ করিয়া চুপে চুপে বলিলেন, “ছিঃ ভাতি, ছেলেমী করো না। তখন নিই নি কেন বলেই ত গিয়েছি। তাঁদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়, আমরা সবাই গেলে একটা হাঙ্গাম-হুজ্জুত হ’ত। তাই বাসনাকে অবধি নিলাম না। দু’দিন পর বিয়ে, বিয়ের সময় ত যাবে। এতে কি রাগ করে ? তুমি কোন কথা শুনতে চাও না, কিন্তু আমি যে বলতে চাই। সকলের আগে তোমাকেই বলতে চাই। বল, কি বলবো ? কেমন দেখলাম ? জয়ন্তর কোন কায কোন দিন আমার মনের মত হয় নি। কিন্তু এবার তার পছন্দকে আমি প্রশংসা করছি। আমাদের যে নতুন মা’টি ঘরে আস্‌ছেন, যথার্থ লক্ষ্মীপ্রতিমা। আজ আমার দুঃখ হচ্ছে, এমন সুন্দর বৌ বাবা, মা দেখলেন না।”

জ্যোতির্ম্ময় চুপ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ভাতির হৃদয়ে যেন শেলাঘাত হইল। বিদ্বেষ লুকাইতে না পারিয়া ভাতি বিকৃতস্বরে কহিল, “বাবাঃ, প্রথম দর্শনে তুমিও যে ভাইএর মত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলে ? রূপ আছে ভাল, সে রূপ শিমুল কি পলাশ, তা কে জানে ? যেখান থেকে তোমাদের লক্ষ্মীপ্রতিমা আস্‌ছেন, সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা আমার ভাল করেই জানা আছে। যাক্, এইবার অন্ধকার ঘর আলোকরা বৌ আসবে। কিন্তু ঠাকুরপোর যেন ঘর আলো হবে। আমি না ম’লে তোমার ঘরের ত আঁধার কাট্‌বে না। জীবন আলো হবে না ”

“ছিঃ ভাতি, কেন পাগলামী করছ ? অন্য কেউ যদি তোমার চেয়ে সুন্দরী হয়, তাতে রাগ কিসের ? আমি ত তোমায় কারুর চেয়ে ছোট মনে করি না। জীবন আমার আঁধার নয়, আলো। সে আলো তুমিই।” বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় ভাতিকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

২৪

গরীবের বাড়ীর বিবাহ হইলেও বিবাহবাড়ী ত বটে। মণীন্দ্র দেবদারু-পাতা ও আম্রপল্লবে গৃহদ্বার সাজাইয়া অনেকগুলি আলোর ব্যবস্থা করিয়াছিল। বাড়ীর সম্মুখ-ভাগে একটি ফুলের তোরণ করিয়া একদল রসুন-চৌকী-ওয়ালাকে বসাইয়াছিল।

লগ্নের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বরের গুটিকয়েক বন্ধু ও দুই একটি আত্মীয় ছাড়া জ্যোতির্ম্ময় অন্য কাহাকেও লইয়া আসেন নাই। ভাতি আপত্তি করিলে জ্যোতির্ম্ময় আশ্বাস দিয়াছিলেন, “বিবাহের পর বৌ-ভাতের সময় আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া আনন্দ উৎসব করিলেই চলিবে। পরের ঘাড়ে আনন্দের বোঝা বেশী চাপানো ভাল নহে।”

বরের গাড়াতে বাসনাকে লইয়া ভাতি আসিল। ভোলানাথ বাসনার হাত ধরিয়া ভাতিকে অভ্যর্থনা করিলেন, “এস মা, এস ; তুমি এসেছ, বড় খুসী হলাম, নিশ্চিন্ত হলাম, তোমাদের কায তোমরাই নির্ব্বাহ ক’রে দাও, মা। কুহু, আয় রে, দেখে যা কারা এসেছেন।”

সুলোচনা একপাশে দাঁড়াইয়া শাঁখ বাজাইতেছিল। জয়ন্তর রূপে তাহার চক্ষু যেন ধাঁধিয়া গেল। তাহাদের কুহু, তাহার এই স্বামী, ভগবান এত দিনে রতনে রতন মিলাইয়া দিলেন।

বর এবং বরযাত্রীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভোলানাথের কুহুকে ডাকিবার মূঢ়তায় সুলোচনা লজ্জিত হইল। কিন্তু পুলক-প্লাবনে এ লজ্জা কোথায় ভাসিয়া গেল।

অগ্রসর হইয়া সুলোচনা বলিল, “কুহু পাটা-পিঁড়িতে বসেছে বাবা ; এখন তাকে উঠ্‌তে নেই। এঁদের আমি নিয়ে যাচ্ছি। এস খুকী, আসুন দিদি, আপনাদের মা’র কাছে নিয়ে যাই।”

ভাতি সুলোচনার অনুসরণ করিয়া অপাঙ্গে তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া চমকিত হইল।

সুলোচনা দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের পত্নী। হাল্‌কা গহনা ক’খানা এবং একটি রাঙ্গাপাড় তসরের শাড়ীতেই তাহার

রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। পুষ্পিত লতার ন্যায় নবীন সৌন্দর্য্যভারে সুলোচনার দেহ হিল্লোলিত হইতেছে। নিজেকে সাজাইবার যত্ন নাই, প্রয়াস নাই, সরল স্বচ্ছন্দ-গতি, কিন্তু কি সুন্দর, কি মনোরম!

নীচের ঘরে যশোদা বরণের দ্রব্যাদি গুছাইতেছিলেন, মণীন্দ্রের মা তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। সুলোচনা ভাতিদের সেইখানে লইয়া গিয়া ডাকিল, "মা, জয়ন্তর সাথে এঁরা এসেছেন।"

যশোদা ত্রস্তে বাহিরে আসিয়া ভাতির দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "এসেছ মা? তোমরা যে এসেছ, আমার এর বাড়া আর আনন্দ নেই। এর নামই বুঝি বাসনা? বাঃ, বেশ ত খুকীটি! যাও মা, তোমরা ওপরে বসো গে। আমি এখুনি আস্‌ছি। সুলোচনা, এঁদের কুহুর কাছে নিয়ে যা।"

প্রস্থানোদ্যত ভাতি যশোদাকে দেখিয়া লইল। ছেলে-মেয়েদের এমন অনবদ্য রূপ যে কোথা হইতে আসে, তাহা উপলব্ধি করিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

দ্বিতলের 'হলে' গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর শীতল-পাটি পাতিয়া কুহু বরশয্যায় বসিয়াছিল। নববধূবেশিনী কুহুর সম্মুখে একটি জলপূর্ণ সিন্দুরে রঞ্জিত মাটীর হাঁড়ি। মণীন্দ্রের তিন বোন, পাড়ার গুটিকয়েক মহিলা কুহুকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। মেয়েদের হাসি-গল্পে 'হল' মুখরিত হইতেছে।

সুলোচনার সহিত ভাতি ও বাসনা হলে প্রবেশ করিবামাত্র তরুণীগুলির হাসি-গল্পের উৎস হঠাৎ থামিয়া গেল। কয়েক যোড়া উৎসুক-নেত্র ভাতি ও বাসনার মুখের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

ভাতি আজ ইন্দ্রাণী-তুল্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহার কমনীয় অঙ্গ হইতে হীরা-মুক্তার দ্যুতি উজ্জ্বল বিজলী-বাতির প্রভায় ঠিকরিয়া উঠিতেছিল। একে গর্ব্বোজ্জ্বল প্রখর মুখচ্ছবি, তাহাতে মণি-মাণিক্যের আধিক্য, কাযেই সকলে সসম্ভ্রমে ভাতির পানে তাকাইয়া রহিল।

ভাতি কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কুহুর সম্মুখে গিয়া বসিল। বাসনাকে কুহুর পাশে বসাইয়া দিয়া সুলোচনা কহিল, "কুহু, এঁকে প্রণাম কর। ইনি আমাদের দিদি, জয়ন্তর বৌদিদি। আর এটি জয়ন্তর ছোট বোন বাসনা।"

কুহু তাহার ঘনকৃষ্ণ চক্ষু দুইটি তখনই নত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ভাতির পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

ভাতি স্তব্ধ হইল। এই কুহু? এত রূপ? রূপের উজ্জ্বলতায় চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়। ইহার সুকোমল মাধুর্য্যে বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে স্নেহের সঞ্চার হয়। কুহুকে ভাতি কি কথা জিজ্ঞাসা করিবে? কোন্ কথার সূত্র ধরিয়া আলাপ জমাইয়া তুলিবে?

ভাতি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আজ কি খেয়েছ, কুহু?"

বধূ-সুলভ লজ্জায় কুহু কথা কহিল না।

ভাতি কুহুর হাতটি হাতের ভিতর চাপিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "কি খেয়েছ, বল্লে না?"

কুহু নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল, "কিছু খাইনি।"

"খাওনি? সারাটা দিন এমনি উপোস ক'রে রয়েছ? আনন্দের দিনে কি এমনি থাকতে আছে? এ ব্যবস্থা অন্যায়, ভারী অন্যায়!"

এতক্ষণে বাসনা কথা বলিল। বালিকাসুলভ চপলতার সহিত বলিয়া উঠিল, "কিছু না খেয়ে কি থাকা যায়, বৌদি-মণি? মা গো, আমি হ'লে কক্ষনো পারতাম না। আচ্ছা, ওঁর—কুহুর ক্ষিধে পায় নি? তৃষ্ণা পায়নি?"

ভাতি বলিল, "পেয়েছে কি না, তুই শোন না বেবী। ওঁর, কুহুর এ আবার কি কথার ছিরি? কুহু যে তোর ছোট বৌদি, সেটা বুঝি ভুলে গেছিস?"

বাসনা দিব্য সপ্রতিভভাবে প্রত্যুত্তর করিল, "না, ভুলবো কেন? কুহু যে ছোট বৌদি হবেন, তা ভাল ক'রেই জানি, এখনও ত হয় নি। বিয়ের পর আমাদের বাড়ী গেলে তবে না বৌদিদি। এখন কুহু কুহুই।"

বাসনার কথায় সকলে হাসিতে লাগিল। ঘরের গুমট ভাব হাসির বাতাসে স্বচ্ছ হইল।

সুলোচনা সাদরে বাসনার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, "বাঃ, বাসনা বেশ বলেছে। বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত কুহু কুহু ছাড়া আর কিছু নয়, সুন্দর বলেছে।"

মণির বড়দিদি বলিলেন, "ঠিক কথাই, বিয়ে না হ'লে ত সম্বন্ধ হয় না।"

মেজদিদি কহিলেন, "সম্বন্ধ হবার দেরীও নেই। দশটার লগ্নে বিয়ে, সময় প্রায় হ'য়ে এলো!"

ভাতি কাহারও কোন কথায় জবাব না দিয়া মৌন

হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ইহাদের অনাহারে বিবাহ দিবার বর্ব্বরোচিত প্রথায় তাহার চিত্ত বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। প্রথম নয়নপাতে কুহুর প্রতি যে একটা কোমল সদয় ভাব আসিয়াছিল, মুহূর্ত্তে তাহা কঠিন আকার ধারণ করিল।

ভাতি কুসংস্কার সহ্য করিতে পারিত না; অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন অশিক্ষিতদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় মনে করিত। সে সুলোচনার প্রতি একটি কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "দেখুন, একটা কথা বলতে চাই, মনে কিছু করবেন না? ওকে উপোসী রেখে বিয়ে দেবার বিধান কে দিয়েছে, বলতে পারেন? আপনারা না হয় লেখাপড়া করেন নি, আপনার দাদা না উচ্চ-শিক্ষিত? তিনিও কি সে কালের সনাতন নিয়ম মেনে চলেন?"

সুলোচনা আশ্চর্য্য হইল। এই সুন্দরী ধনি-গৃহিণীর ছলছুতা খুঁজিয়া কথা শোনাইবার প্রবৃত্তিতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর বধূ হইয়া হিন্দুর নিয়মাবলীর প্রতি ঝাল ছাড়িবার যাহার এত আগ্রহ, তাহাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইবার বিদ্যা বা বুদ্ধি থাকিলেও এ ক্ষেত্রে সুলোচনা চাপিয়া গেল। একে নূতন কুটুম্ব, তায় অতিথি, তাহার সম্মানে আঘাত দেওয়া যে তাহাদেরই লজ্জা।

ক্ষণেক ভাবিয়া সুলোচনা হাসিমুখে জবাব দিল, "দিদি, মেনে চলতে হয় বৈ কি! দাদা লেখাপড়া যতই করুন না কেন, তিনি যে হিন্দুর ছেলে, সেটা এখনও ভুলতে পারেন নি। আর দাদা ভুল্লে কুহুই বা ভুলবে কেন? কুহু এখন ডাগর হয়েছে, জীবনের প্রধান দিনে ভগবানের উদ্দেশে শুদ্ধ সংযত হয়ে থাকবে না? ঠাকুর মশাই কাঁচা দুধ, ফল খেতে বলেছিলেন, কিন্তু কুহু তা শুনলে না। বল্লে, 'আমি ত ছেলে-বেলা থেকে শিবরাতের উপোস ক'রে আসছি দিদি, তখন যখন কষ্ট হয়নি, তখন আজকের দিনেই বা কষ্ট হবে কেন?' তাই শুনে আমরা আর খেতে বলি নি।"

বড়দিদি কহিলেন, "একটু বাদে বিয়ে হয়ে গেলেই ত খাবে, তাতে আর কষ্ট কি, ভাই? হিন্দুর মেয়ের পাল-পার্ব্বণ ব্রত উপবাস না করলে কি চলে? কুহু শিবরাতের উপোস করেছিল বলেই না শিব তুল্য বর এসে উপস্থিত হয়েছে। বরের মত বর, এমন বর পাওয়া তপিস্যের ফল।"

মেজদিদি একটু মুচকি হাসি হাসিয়া টিপিয়া টিপিয়া বলিলেন, "দিদির যেমন কথা, আজকাল আবার হিন্দুর মেয়ের পাল-পার্ব্বণ, এখন কিছু নেই। যারা কোন ধর্ম্ম মানে না, তারাই এখন হিন্দু।"

অকস্মাৎ ভাতির রঞ্জিত কপোল দুইখানি আরক্ত হইল। নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল।

চক্ষুর পলকে ভাতির ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সুলোচনা মনে মনে প্রমাদ গণিল। সে ব্যস্ততার ভাণ করিয়া কহিল, "ও, খোকা বোধ হয় কাঁদছে। আপনারা বসুন, আমি খোকাকে নিয়ে আসি" বলিতে বলিতে ত্বরিতপদে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে একটি বছর দেড়েকের সুন্দর স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশুকে কোলে করিয়া সুলোচনা ফিরিয়া আসিল। খোকাকে ভাতির পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া কহিল, "এই খোকা দিদি, এর নাম অসিত। অসি, খোকামণি, তোমার রাণীমাসীকে নমো কর ত? ভয় কি বোকা ছেলে? দেখ কেমন সুন্দর মাসী, রাণীমাসী, নমো কর লক্ষ্মী ছেলে!"

নূতন প্রণাম করা শেখা অবধি নমো করিবার প্রতি খোকার খুবই উৎসাহ। স্থানে অস্থানে সে বহুবার নমো করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেও এতগুলি অপরিচিত লোকের ভিতর তাহার নমো করিবার কিছুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ পাইল না।

খোকা দুই হাতে মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আড়চোখে সকলের মুখের পানে তাকাইতে লাগিল।

সুলোচনা কৃত্রিম ক্রোধে খোকার রাঙ্গা ফুলো ফুলো গাল দু'টি টিপিয়া দিয়া ধমকের স্বরে কহিল, "নমো করলি নে অসভ্য ছেলে? দুষ্ট ছেলে; বুড়ো হয়ে গেলেন, এখনও ভয়ে সারা, কুণো কোথাকার? কর শীগ্‌গির নমো রাণীমাসীকে।"

মণির মেজদিদির টিপ্পনিতে ভাতির গর্ব্বিত হৃদয়ে একটু মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। একটি শিশুর অতর্কিত আবির্ভাবে সেই মেঘদীপ্ত অন্তরাকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

ভাতি খোকার ছোট হাতটি টিপিয়া দিয়া বলিল, "না, খোকা, তোমায় নমো করতে হবে না। তুমি ভাল ছেলে,

চুপ-চাপ ব'সে থাকো। খোকার মা, আপনিও বসুন। মা কাছে থাকলে ছেলের বিদ্যা আস্তে আস্তে বের হয়।"

"ছেলের বিদ্যা জাহির করবার এখন যে আমার সময় নেই, দিদি। একটা কায ভুলেই গিয়েছিলাম। সকলের কাছ থেকে কুহুর সোহাগজল নেওয়া হয়েছে, এখন নেওয়া বাকী আপনার কাছে। দয়া ক'রে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন ওটুকুও দিতে হবে।" বলিয়া সুলোচনা একটি মাটীর কলসী আনিয়া হাজির করিল।

কলসীটা ভাতির সম্মুখে রাখিয়া কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া বলিল, "আপনার আঁচলের সুতো ধুয়ে কলসীতে একটুখানি জল দিন, দিদি।"

ভাতির পিত্রালয় অত্যন্ত আধুনিক। তাঁহারা কোনরূপ আচার অনুষ্ঠানের ধারও ধারেন না। গৃহিণীশূন্য শ্বশুরালয়ে ঐ সব মেয়েলি প্রথার বালাই ছিল না। গ্রাম্য-মেয়ের সোহাগ-জলের উল্লেখে সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ক্ষণেক সুলোচনার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সোহাগ-জল! সে আবার কি? শাড়ীর সুতো ধোয়া জলে কি হবে? কৈ, কোন বিয়েতে ত সোহাগ-জলের নাম শুনিনি?"

"শুনবেন কি ক'রে? আপনারা সহরের সভ্য, শিক্ষিত, আমাদের মত পাড়াগেঁয়ে ভূত নয়। আমাদের ও দিকের নিয়ম বিয়ের দিন সন্ধ্যেয় স্বামি-সোহাগিনী মেয়েদের আঁচল-ধোওয়া জল কলসী ক'রে রেখে পরদিন বর কনেকে চান করান হয়। এ সোহাগজল দোজ পক্ষের বৌ দিতে পারে না। যারা স্বামীর সোহাগ পায় নি, তারাও না। কেবল স্বামিসোহাগিনীরাই দিতে পারে। নিন, দিদি, শাড়ীর কোণটুকু বার ক'রে তিনবার আমায় জিজ্ঞাসা করুন, 'কার সোহাগ' আমি বলবো 'কুহুর সোহাগ'।"

ভাতি তাহার বেণারসীর অঞ্চল বাহির করিতে করিতে কহিল, "এখানকার সবাই আঁচল ধোয়া জল দিয়েছেন ত? আবার আমায় কেন?"

সুলোচনা ভাতির প্রতি স্নিগ্ধ কটাক্ষ করিয়া হাসিমুখে কহিল, "সকলে দিলেও আপনাকে দিতে হবে, দিদি। আমি জানি, আপনি সকলের ওপরে, টাকা-কড়ি হীরা-মুক্তায় আপনাকে ওপরে বলছি নে, স্বামীর আদরে আপনি রাণীর চেয়েও মহারাণী।"

এক ঘর স্ত্রীলোকের মধ্যে মহারাণী বিশেষণে ভাতি আনন্দে গর্ব্বে উজ্জ্বল হইল। নানারূপ আলাপ-আন্দোলনে তাঁহার মনের ভিতর যে মেঘ জমিয়াছিল, গৌরবের দক্ষিণা-সমীরণে তাহা নিঃশেষে মুছিয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী

(স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র সমাজপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা)

কে মা তুমি দেবাঙ্গনা বিধবার বেশে,
জগতের মাতৃস্নেহ বুক ভ'রে ল'য়ে
বিরাজিছ বঙ্গগৃহ-কোণে একদেশে
লোকলোচনের দৃষ্টি-বহির্ভূতা হয়ে।

সতত ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বরে নির্ভর,
তাঁহারি আদেশ যেন পালিতে যতনে
শ্রমে ক্লান্তি নাই, দুঃখ-কষ্টে নাহি ডর,
দিয়াছ এ সবই বলি তাঁহার চরণে।

নিজপুত্র পরপুত্রে স্নেহ সমভাগে,
নিরখিয়া বিধাতা কি পরীক্ষার তরে,
তব পুত্রদ্বয়ে পাশে নিলা ডাকি আগে,
কিংবা বাড়াইতে তব নির্ব্বেদ অন্তরে?

বুঝি না নিগূঢ় তত্ত্ব—মা গো শুধু জাগে
তোমার চরণ-পদ্ম হৃদি-সরোবরে।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

কালিদাসের কাব্যে রঙের সন্ধান

রস-সংবেদনার জন্য যে অমৃতময় কাব্যনিচয় কালিদাস লিখিয়াছেন, তাহাতে রস-শতদলের খোঁজ না করিয়া বর্ণ-শতদলের সন্ধান করিলে অরসিক বলিয়া নিশ্চিত নিন্দালাভ করিব। কিন্তু নিরুপায়, কবির লেখনী, প্রতিভার বরপুত্র কালিদাসের লেখনী সার্থক-শক্তিসম্পন্ন। প্রয়োগের নিপুণতা এবং অব্যর্থ মাধুর্য্যই শক্তিমান সাহিত্যিকের চিহ্ন। তাই কালিদাসের কাব্যের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বর্ণতত্ত্বের সন্ধান করিব।

মেঘদূত লইয়াই আরম্ভ করি। বিরহী যক্ষের যে মনোবেদনা রসের শাশ্বত লোকে সার্থক ও অক্ষয়, সে রসের জন্য আজ লোলুপ নহি। মেঘ বিরহ-বার্ত্তা বহিয়া আর্ত্তা যক্ষ-প্রিয়ার নিকট যাইবার সময় ভারতবর্ষের নানা জনপদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ কোন্ রঙ কবির কল্পনা-চক্ষুতে পড়িয়াছিল, তাহাই দেখিব।

মেঘকে পথ-নির্দ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন :—

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ,
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥ ১৫

পদ্মরাগাদি মণিপ্রভা-সমুচ্চয়ের মত ইন্দ্রধনু শ্যাম মেঘকে কান্তিমান করিবে বলিয়া যক্ষ মেঘকে প্রলোভিত করিতেছেন। রামধনুকে রত্নচ্ছায়াব্যতিকর বলা হইয়াছে। এখানে শ্যাম কাল রঙ।

আম্রকূটের শেখর পরিপক আম্রফলের বর্ণে পাণ্ডু, তাহার শৃঙ্গে শ্যাম মেঘ বসিলে মেঘল ধরণীর স্তনের মত দেখাইবে।

মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ। ১৮

শ্যাম মেঘকে এই শ্লোকে স্নিগ্ধ বেণীস্পর্শ বলা হইয়াছে, অতএব শ্যাম কালচুলের মত কাল। নীল পয়োধর যেমন চারিদিকে পাণ্ডু, বৃন্তদেশে পাণ্ডু, আম্রকূটও সেইরূপ শোভাময় হইবে। পাকা আমের রঙকে পাণ্ডু বলা হইতেছে—সাদা ও হলুদ রঙ মেশানো রঙ।

পরে কদম্ব-ফুলের বর্ণনায় পাই—

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈঃ। ২১

স্থলকদম্বের ঈষদুদ্গত কেশরের সবুজ ও কপিশের মিশ্র বর্ণ দেখিতে পাইবে।

শুক্লাপাঙ্গ ময়ূরদের স্বগতঃ বাণী শুনিয়া মেঘ দশার্ণে পৌছিবে।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রাম-চৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়ি-হংসা দশার্ণাঃ॥

দশার্ণের কি সুন্দর চিত্র। পাকা পাকা জাম-ফলে জম্বুবন শ্যাম হইয়া গিয়াছে, কেতকীর বেড়ায় সদ্য-মুকুলিত কেয়া-ফুলের পাণ্ডুচ্ছায়া দেখিতে চমৎকার, পাখীগুলি নীড় বাঁধিতেছে আর মানসযাত্রী শোভায় ভুলিয়া কয়েক দিন দশার্ণে বাস করিয়া যাইতেছে। নিপুণ শিল্পী তুলিকার ছায়া-বিলাসেই কি মনোরম ছবি আঁকিয়াছেন। শ্যাম এখানে কাল রঙ, কারণ, কাল জাম (black berry আর পাণ্ডু আপীত সিতবর্ণ (yellowish white)।

মেঘ তাহার পর বিরহী সিন্ধু নদের দুর্দ্দশা দেখিবে। সেখানে তটতরুর জীর্ণ পাতা পড়িয়া সিন্ধুকে পাণ্ডুচ্ছায়া করিয়াছে। এখানে পাণ্ডু জীর্ণপাতার রঙ—(pale-brown) আপিঙ্গল।

মেঘকে উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরের শিব দর্শন করিতে বলিয়া বলিতেছেন—হে বন্ধু, পশুপতি তাঁহার রজত-গিরিনিভ বপুর চারিদিকে গজাসুরের রক্তবিন্দুবর্ষী চর্ম্ম জড়াইয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিতে বড়ই ভালবাসেন। অতএব তুমি সান্ধ্যমেঘরূপে প্রতি নব জবাপুষ্পের মত রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া শিবের সন্তোষবিধান করিও। মেঘ উজ্জয়িনীর রাজপথে অভিসারিকাদিগকে কনকনিকষ রেখার মত সৌদামিনী দেখাইয়া পথ দেখাইবে। তাহার পর গম্ভীরা নদীর সলিলরূপা নীলাম্বরী মুক্ত দেখিয়া অপেক্ষা করিবে। মল্লীনাথ নীলের প্রতিশব্দ দিয়াছেন কৃষ্ণবর্ণ। মেঘ যখন চর্ম্মণ্বতীতে নামিবে, তখন কৃষ্ণের ন্যায় শ্যাম মেঘ পৃথিবীর মুক্তাহারে ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় শোভা পাইবে।

মেঘ যখন কৈলাসে যাইবে, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া কালিদাস বলিতেছেন :—

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্ত-দ্বিরদ-দশনচ্ছেদ-গৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিত-নয়ন-প্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৫৯

হলধরের স্কন্ধে নীলাম্বর রাখিলে যেমন শোভা হয়, সদ্যশ্ছিন্ন হাতীর দাঁতের মত গৌরবর্ণ কৈলাসের অঙ্গে দলিত অঞ্জনবর্ণ মেঘ বসিলে সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা হইবে। মেচক মানে নীল, গৌর এখানে শ্বেত দলিতাঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ।

নানা দিক্ দেশ, নানা জনপদ পার হইয়া মেঘ অবশেষে অলকায় পৌছিবে। অলকার সবই সুন্দর, সেখানে সিতমণিময় হর্ম্ম্য বিরাজমান, সেখানে নানা বর্ণের কুসুম জ্যোতিশ্ছায়ার মত দীপ্তি পায়। যথের বাপীতে সুনীল বৈদূর্য্যমণির নালে শত সহস্র স্বর্ণ-কমল ফুটিয়া আছে, মরকত-সবুজ সোপান, সেই বাপীর শোভা কত আনন্দ-জনক। সেখানে অশোকের রক্তগুচ্ছ সকলের নয়ন ভুলায়।

সেখানে পুরমধ্যে খদ্যোতালী-বিলসিতনিভা বিদ্যুৎ-উন্মেষদৃষ্টি মেলিয়া মেঘ বিরহিণী তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী যক্ষপ্রিয়াকে দেখিতে পাইবে।

পক্কবিম্ব রক্তবর্ণ, শ্যাম। এখানে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। যক্ষ-প্রিয়াকে ভর্ত্তার বার্ত্তা জানাইয়া মেঘ বিদ্যুতের সহিত চিরমিলনের শুভাশিস্ লাভ করিয়া বিদায় লইল।

ঋতু-সংহারে প্রথমে গ্রীষ্মবর্ণনা। নিদাঘে 'শশাঙ্ক-ক্ষতনীলরাজয়ঃ নিশাঃ' লোকের আশ্রয়। নীল এখানে কাল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্ধকারের রঙ কৃষ্ণ। নিতম্বিনীগণ তখন নিতান্ত লাক্ষারসরাগলোহিত চরণে লোকের মনোমোহন করে। তাহাদের বক্ষোবিলম্বিত হার তুষার-গৌর। তাহারা সিত হর্ম্ম্যে শয়ন করিলে চন্দ্রমা লজ্জায় পাণ্ডু হইয়া যায়। ভিন্নাঞ্জনসন্নিভ মেঘ দেখিয়া তৃষাতুর মৃগদল ছুটাছুটি করে। তৃষাতুর মহিষী লোহিত জিহ্বা বাহির করিয়া গুহা হইতে বাহির হইতেছে। বিকচ-নবকুসুম্ভ-স্বচ্ছ সিন্দুর-ভাতি অগ্নি চারিদিক্ দগ্ধ করিতেছে।

গ্রীষ্মের শেষে বর্ষা আসিয়াছে। মেঘের রূপ কত বিচিত্র, নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ ক্বচিৎ সগর্ভপ্রমদাস্তন প্রভৈঃ সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ। আকাশ মেঘে ছাওয়া, কোনও মেঘ নীলোৎপলের পাতার ন্যায় গাঢ় সবুজকান্তি, কোথাও দলিত কজ্জলের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও বা গর্ভলক্ষা সীমন্তিনীর পীনস্তনের ন্যায় প্রভান্বিত মেঘ শোভা পাইতেছে। বর্ষাগমে তৃণাঙ্কুর উঠিতেছে। সেগুলি প্রভিন্ন বৈদূর্য্যনিভদ্যুতি। হরিণীর মুখ-ক্ষত বিচিত্র নীল তৃণরাজি সুকোমল অঙ্কুরে শোভমান। বনগজের কপোলদেশ বিমলোৎপলপ্রভ। নূতন বর্ষার জলস্রোত বিপাণ্ডুর হইয়া বহিয়া যায়। ভূধরের উপলরাজি সিতোৎপলাভাম্বুদের দ্বারা চুম্বিত হইতেছে। কুবলয়দলনীল মেঘমালা ইন্দ্রচাপে সুশোভিত হইয়া পথিক-বধূদিগের চিত্ত আন্দোলিত করিতেছে।

শরতে সকলই শুক্ল। কাশকুসুম-শুভ্র পরিধেয় পরিয়া শরৎ হাসিতেছে। জ্যোৎস্নায় শুভ্র কিরণে রাত্রি, হংস দ্বারা তটিনীজল, কুমুদে সরোবর, কুসুমভারনত ছাতিমের দ্বারা বনভূমি এবং মালতী-কুসুমে উপবনভূমি শ্বেত হইয়া গিয়াছে। জলভারশূন্য মেঘ রজত-শঙ্খ-মৃণাল-গৌর-বর্ণ। আকাশ ভিন্নাঞ্জন সম কৃষ্ণ, পৃথিবী বন্ধূকপুষ্পে অরুণিতা, বন্ধূককুল বাঙ্গালায় অতি প্রচলিত দুমুখী বা দোপাটী ফুল (Balsam), শরতের প্রিয় এই ফুল দেখিয়া পথিকজন আজ প্রিয়ার অধর-শোভা স্মরণ করিয়া কাতর, অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ।

হেমন্তে সম্ভোগ-সুখে রমণীদের নেত্রদ্বয় রাত্রি-প্রজাগর বিপটল, তাহাদের নীল-ললিত অলকভরে লম্বিতভাবে দোদুল্যমান হওয়ায় তাহাদের নয়ন কুঞ্চিত দেখাইতেছে।

শীতে —

কনক-কমল-কান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ
শ্রবণ-তটনিষক্তৈঃ পাটলোপান্ত-নেত্রৈঃ।
উষসি বদনবিম্বৈরংস-সংসক্ত-কেশৈঃ
শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽদ্য ॥

ঊষাকালে গৃহলক্ষ্মীগণ প্রাতঃস্নান করিয়া স্বর্ণ-কমলের মত কমনীয় কান্তি, আকর্ণ-বিশ্রান্ত, আরক্ত নেত্রপ্রান্ত বদন-বিম্বের উপর দিয়া কেশপাশ অংসদেশে এলাইয়া দিয়াছে।

চোখের রক্তিমাকে পাটলবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। বসন্তে ভামিনীরা কুসুম্ভরাগারুণিত দুকূল পরে, কুঙ্কুমরাগ-গৌর রক্তাংশুকে স্তনমণ্ডল সজ্জিত করে, তাহাদের মুখ হেমাম্বুরুহের মত সুন্দর। অনঙ্গ তাহাদিগের গণ্ডকে পাণ্ডু

করে। তাহারা সুরভি কালীয়ক, কুঙ্কুম ও মৃগনাভিযুক্ত চন্দন মাখাইয়া স্তনদেশ গৌরবর্ণে রঞ্জিত করে। বসন্তের নবোদ্গত পল্লব তাম্রপ্রবালের মত দ্যুতিমান হয়। নববধূর বিভ্রমসুন্দর হাস্যের মত অবদাত কুন্দকুসুমে কানন সমৃদ্ধিশালী।

ঋতু-সংহার ছাড়িয়া এইবার কুমারসম্ভবের আশ্রয় গ্রহণ করি। দেবতাত্মা হিমালয় লইয়া কবি আরম্ভ করিলেন। হিমালয়ের অনুপম শোভার মাঝে বিদ্যাধরীরা কুঞ্জর-বিন্দু-শোণ ভূর্জ্জপত্রে প্রণয়লিপি লেখে—

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র ভূর্জ্জত্বচঃ কুঞ্জর-বিন্দু-শোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধর-সুন্দরীণামনঙ্গলেখ-ক্রিয়য়োপযোগম্॥

হিমালয় নগাধিরাজ, তাই চমরী মৃগরা চন্দ্রমরীচি-গৌরব্যজনের দ্বারা হিমালয়কে ব্যজন করে।

তৃতীয় সর্গে মদনের অভিযান বর্ণন করিতে গিয়া কবি অকাল-বসন্তোদ্গমের কথা বলিতেছেন—বসন্তে অতি লোহিত পলাশকলিকা বাঁকা চাঁদের মত শোভা পায়, বালারুণ-কোমল রাগের মত চূত-মুকুল বসন্তলক্ষ্মীর অধরে অলক্ত-রাগ রঞ্জিত করে। মহাদেব বনে তপস্যা করিতেছেন, কৃষ্ণসার মৃগের কৃষ্ণচর্ম্ম তাঁহার পরিধানে, সেই কৃষ্ণচর্ম্ম নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-নীলিমায় নীলবর্ণে যেন অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। পার্ব্বতী উমা তখন—

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্ট-হেমদ্যুতি-কর্ণিকারং
মুক্তাকলাপীকৃত-সিন্ধুবারং বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী।
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

কুসুমভারনতা পার্ব্বতীকে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাঁহার অঙ্গের অশোক পুষ্প অরুণ রক্ত পদ্মরাগকে লজ্জা দেয়, কর্ণিকার-ফুল হেমদ্যুতিসম্পন্ন আর মুক্তাধবল সিন্ধুবার-ফুলের হার গলায় এবং তরুণার্ক-রাগের মত বসন পরিয়া পার্ব্বতী আসিতেছিলেন।

পার্ব্বতীর নীলালকে কর্ণিকার-ফুল পরা, হাতে পদ্ম-বীজের জপমালা। তিনি তাম্র-রুচি করে সেই মালা বাঞ্ছিতের চরণে উপহার দিলেন। বিম্বফলাধরোষ্ঠী উমাকে দেখিয়া শিবের মনে ভাবাত্যয় ঘটিল। ক্রোধে তিনি মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

পতিবিরহিণী রতি বিলাপ করিতে লাগিলেন। হরি-তারুণ চারুবন্ধনচূতমুকুল আর মদনের বাণ হইবে না ভাবিয়া রতির দুঃখের সীমা নাই। বিফলমনোরথা পার্ব্বতী 'ববন্ধ বালারুণবভ্রু বল্কল' বালারুণের মত পিঙ্গল-বর্ণ বল্কল পরিলেন এবং তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। Brown বভ্রু বলিলেও চলে। ভক্তবৎসল আশুতোষ ব্রহ্মচারিরূপে পার্ব্বতীর কাছে আসিয়া বলিলেন, অয়ি তাপসি, তোমার অধররাগ অলক্তরাগ ব্যতীত পাটল, নবোদ্গত প্রবালের সহিতই তাহার তুলনা চলে।

অহো স্থিরঃ কোঽপি তবেপ্সিতো যুবা
চিরায় কর্ণোৎপলশূন্যতাং গতে।
উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ
কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ॥

হে তাপসি! কে তোমার বাঞ্ছিত প্রিয়, যে তোমার নিটোল গণ্ডে ধানের শীষের মত কটা জটাজাল দেখিয়াও স্থির হইয়া বসিয়া আছে?

যখন ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীর সখীর নিকট শুনিলেন, মহেশই উমার অভিলষিত বর, তখন শিবের নিন্দা করিয়া বলিলেন, "অয়ি তপস্বিনি কলহংসলক্ষণ তোমার বধূ-দুকূলের সহিত শিবের শোণিত-বিন্দুবর্ষি গজাজিন মানাইবে কেন?" তাহার পর সপ্তর্ষিগণ ঘটক সাজিয়া উমা ও মহেশের বিবাহ ঠিক করিলেন। বিবাহকালে পার্ব্বতীর সজ্জা কি অপূর্ব্ব। কোনও প্রসাধিকা দূর্ব্বাদল-খচিত পাণ্ডুবর্ণ মধুদ্রুম-কুসুমের মালায় কেশপাশ বাঁধিয়া দিলেন, মধুদ্রুম মহুয়া গাছ। কেহ শুক্লাগুরু দিয়া তাঁহার অঙ্গলতিকায় পত্র রচনা করিলেন।

কর্ণার্পিতো লোধ্রকষায়রুক্ষে গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে।
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্ ববন্ধ চক্ষুংষি যবপ্ররোহঃ॥

নবোদ্ভিন্ন যবাঙ্কুর উমার কাণে পরান হইল। লোধ-পরাগের বিলেপনে উমার কপোল ধবলীকৃত, গোরোচনার বিন্যাসে তাহা রক্তাভ, আর যবাঙ্কুরের স্পর্শে শ্বেত, রক্ত, হরিতের সংস্পর্শে এমন অপূর্ব্ব শ্রী জন্মিল যে, তাহা হইতে চোখ ফিরানো যায় না। সুজাতোৎপলপত্রকান্তি গৌরীর নয়নে তাহারা বৃথাই অঞ্জন পরাইল।

শিবও প্রসাধন করিলেন। ভস্মের সিতাঙ্গরাগ অঙ্গভূষণ

হইল, অমল পিঙ্গ-তার তৃতীয় নয়ন হরিতাল-তিলকের মত শোভা পাইল। বৃষভারোহণে শিব চলিলেন। প্রভামণ্ডল-রেণু-গৌর মুখে সপ্তমাতৃকারা নীলাকাশকে পদ্মাকর করিয়া তুলিলেন। আর তাহার পশ্চাতে চলিলেন মহাকালী—

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং কালী কপালাভরণা চকাশে।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী দূরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্রদেব ॥

কষিতকাঞ্চনকান্তি মাতৃকাদের পশ্চাতে শ্বেত-নৃমুণ্ডমালিনী কৃষ্ণবর্ণা কালী চলিলেন। যেন শ্বেতবলাকাশ্রেণীশোভিত সুনীল মেঘমালা ছুটিয়াছে আর পুরোভাগে হেমকান্তি বিদ্যুৎ ঝলকিত হইতেছে।

বিবাহের পর নবদম্পতির সে কি মিলনানন্দ। সন্ধ্যার রক্তচ্ছবি দেখাইয়া বলেন—

রক্তপীতকপিশাঃ পয়োমুচাং কোটয়ঃ কুটিলকেশি ! ভান্ত্যমূঃ।
দ্রক্ষ্যসি ত্বমিতি সন্ধ্যয়ানয়া বর্তিকাভিরিব সাধু মণ্ডিতাঃ।
সিংহকেশরসটাসু ভূভৃতাং পল্লবপ্রসবিষু দ্রুমেষু চ।
পশ্য ধাতুশিখরেষু ভানুনা সংবিভক্তমিব সান্ধ্যমাতপম্ ॥

সন্ধ্যা তুলিকা দিয়া মেঘ রঙাইয়াছে। পার্ব্বতীর জন্য মেঘপ্রান্তগুলি রক্ত পীত কপিশ প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। সন্ধ্যায় সব লালে লাল। পর্ব্বতচারী সিংহের কেশর, নবপত্রোদ্গমরুচি তরুশ্রেণী, ধাতুরঞ্জিত গিরিশিখরে অরুণ যেন আপন অঙ্গরাগ ভাগ ভাগ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

কুমারের প্রথমাষ্টম সর্গ কালিদাসের, তাই এইবার রঘুবংশের শরণ লইব। প্রথম সর্গে পুত্রকামী দিলীপকে বশিষ্ঠের আশ্রমে ধেনুচারণকার্য্যে ব্রতী দেখিতে পাই। অপরূপ ধেনু।

ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা।
বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্ ॥

সন্ধ্যা যেমন আকাশে নবোদিত চন্দ্রমা ধারণ করে, সেইরূপ পল্লব-স্নিগ্ধ-পাটলা নন্দিনী ললাটে শ্বেতরোমরাজী ধারণে শোভাময়ী। দিনান্তে যখন গোষ্ঠে ফিরে, তখন—

সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লব-রাগ-তাম্রা প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ ॥

অস্তায়মান তপন আর বশিষ্ঠের হোমধেনু উভয়েই পল্লবরাগতাম্র, উভয়ের পাদসঞ্চারে দিগন্ত পবিত্র এবং দিনান্তে উভয়েই নিলয়ে ফিরিয়া যান। দিলীপ হোমধেনু চরাইতে চরাইতে শ্যামায়মান বন, নবতৃণশোভিত শাদ্বল দেখেন।

তপস্যার ফল ফলিল। রাজ্ঞী সুদক্ষিণা সন্তানসম্ভাবিতা হইলেন। তাঁহার মুখ লোধ্র-পাণ্ডু হইল, কৃশা তনু নক্ষত্র-হীন দীপ্তিহীন চন্দ্রমায় উপলক্ষিত প্রভাতকল্প শর্ব্বরীর মত দেখাইতে লাগিল। নীল পয়োধরমুখ আনীল হইল। ভ্রমরলক্ষিত পদ্মের মত দেখাইতেছিল। যথাকালে রঘুর জন্ম হইল। হরিদশ্বের দীধিতি-সম্পর্কিত বালচন্দ্রমার ন্যায় কুমার দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন।

রঘু রাজা হইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। ঘনসন্নিভ গজ লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মহোদধির তালীবন-শ্যাম উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে নানাদিগ্-দেশ জয় করিয়া বিজয়ী রঘু ফিরিলেন। বিজয়-শেষে সকলকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। প্রণত রাজগণের মৌলিমাল্যচ্যুত মকরন্দ-রেণুতে রঘুর পদাঙ্গুলি গৌরবর্ণ ধারণ করিল।

রঘুর তনয় ভোজরাজসভায় যাইবার সময় নর্ম্মদাতীরে এক গজরাজ দেখিতে পান।

নিঃশেষবিক্ষালিতধাতুনাপি বপ্রক্রিয়ামৃক্ষবতস্তটেষু।
নীলোর্দ্ধরেখাশবলেন শংসম্ দন্তদ্বয়েনাশ্মবিকুণ্ঠিতেন ॥

নর্ম্মদার জলরাশি ভেদ করিয়া গজ উঠিল। তাহার দন্তদ্বয় উপলাঘাতে কুণ্ঠিত, দন্তলগ্ন গৈরিকাদি ধাতু প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি নীলোর্দ্ধরেখাশবল শুণ্ডদ্বয় দর্শনে বুঝা যায় যে, গজরাজ ঋক্ষবান পর্ব্বতে উৎখাত-কেলি করিয়াছিল।

স্বয়ংবর-সভায় প্রভাতে বৈতালিকগণকে যুবরাজ অজকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন :—

"তাম্রোদরেষু পতিতং তরুপল্লবেষু
নির্ধৌতহারগুলিকা-বিশদং হিমাম্ভঃ।
আভাতি লব্ধপরভাগতয়াঽধরোষ্ঠে
লীলাস্মিতং সদশনার্চ্চিরিব ত্বদীয়ম্ ॥

বিধৌত মুক্তাফলশুভ্র শিশিরবিন্দু নব পল্লবচয় তাম্রবর্ণ উদরে পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, কুমারের আরক্ত অধরোষ্ঠে দন্তপংক্তির" শোভা পড়িলে এমনই কান্তির উদয় হয়

মাতঙ্গগণের দন্ত-সমূহ তরুণারুণরাগযোগে ছিন্ন-গৈরিক গিরিতটের মত দ্যুতি দিতেছে, অতএব কুমার, তুমি উঠিয়া ধরিত্রীকে প্রসন্ন কর।

নানাবর্ণ-বিচিত্র রত্নসিংহাসনে বসিলে অজকে ময়ূর-বাহন কার্ত্তিকের মত দেখাইল। মগধেশ্বরকে দেখাইয়া ইন্দুমতীকে দ্বারপালিকা সুনন্দা বলিতেছেন—"মগধরাজ নানা যজ্ঞ করেন, যজ্ঞভাগ গ্রহণে ইন্দ্রকে প্রায়ই অমরাবতী ত্যাগ করিতে হয়, তাই শচীবিরহদুঃখে পাণ্ডু হইয়া থাকেন।

পরে পাণ্ডুকে দেখাইয়া বলিলেন :—

ইন্দীবরশ্যামতনুর্নৃপোঽসৌ ত্বং রোচনাগৌরশরীরযষ্টিঃ।
অন্যোন্য-শোভা-পরিবৃদ্ধয়ে বাং যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু॥

দেখ, এই নৃপতি নীলোৎপলশ্যামল আর তুমি গোরোচনা-গৌরকান্তি ; মেঘের ও তড়িতের মিলনের মত তোমাদের মিলনও উভয়ের শোভা বৃদ্ধি করিবে। ইন্দুমতী সকলকে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গল-চূর্ণ-গৌর বরমাল্য অজের গলায় দিলেন।

বিবাহকালে ধূমে মত্ত চকোরনেত্রা হুতাশনে লাজাঞ্জলি দিলেন। আবার ধূমে আরক্তমুখী নববধূর অঞ্জনসিক্ত বাষ্পজলে প্লাবিত হইল, যবাঙ্কুরের হরিৎ কর্ণভূষণ ম্লান হইল এবং গণ্ডস্থল পাটলবর্ণ হইল। বিবাহশেষে প্রত্যাগমনপথে অজ যুদ্ধে ক্ষুব্ধ নরপতিগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দুমতীকে লইয়া আসিলেন। ইন্দুমতী তখন—

রথতুরগরজোভিস্তস্য রুক্ষালকাগ্রা
সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ সৈব মূর্ত্তা বভূব।

রথচক্র ও তুরগপদোত্থিত ধূলিপটলে ধূসর-কেশশ্রী ইন্দুমতী মূর্ত্তিমতী সমরলক্ষ্মীর মত মনে হইল।

অজ ইন্দুমতীর শোকে প্রায়োপবশনে প্রাণত্যাগ করিলে সোমসমদ্যুতি দশরথ রাজা হইলেন। তাহার পর যখন বসন্ত আসিল, তখন—

উপযযৌ তনুতাং মধুখণ্ডিতা হিমকরোদয়পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ।
সদৃশমিষ্টসমাগমনির্বৃতিং বনিতয়ানিতয়া রজনীবধূঃ॥

রাত্রি-বধূ প্রিয়সমাগমসুখহীন বনিতার ন্যায় বসন্ত কর্ত্তৃক কৃশতা প্রাপ্ত হইল এবং চন্দ্রের উদয়ে তাহার মুখকান্তি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। যখন অঞ্জন-বিন্দু-মনোহর অলি তিলক-পুষ্পে পড়িয়া বনস্থলীকে তিলক-ভূষিতা প্রমদার মত শোভাময়ী করিল, যখন বিলাসিনীরা অরুণরাগরঞ্জিত বসন পরিল, এবং নবমল্লিকা স্মিতরুচিতে চিত্তবিভ্রম জন্মাইল, তখন মহারাজ দশরথ মৃগয়ায় চলিলেন।

গ্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া তরুপলাশ-সবর্ণতনুচ্ছদঃ।
তুরগবল্গনচঞ্চলকুণ্ডলো বিরুরুচে রুরুচেষ্টিতভূমিষু॥

তিনি বনমালায় চূড়া বাঁধিলেন, তরুপত্র-সবুজ কবচে অঙ্গ আবৃত করিলেন, তুরঙ্গগতির জন্য দোদুল কুণ্ডল পরিয়া মহারাজ রুরুমৃগের সঞ্চারভূমিতে বিচরণ করিলেন।

তাহার পর ভাদ্রমাস যেমন কনকপিঙ্গ তড়িদ্‌গুণ-সংযুত রামধনু ধারণ করে, দশরথও তেমনই অধিজ্য ধনু ধারণ করিলেন। মৃগয়া হইয়া অন্ধমুনির শাপ বহন করিয়া দশরথ গৃহে ফিরিলেন।

এই সময়ে রাবণের অত্যাচারে বিব্রত দেবগণ অনন্ত-শয়নে শয়ান মহাবিষ্ণুর নিকট চলিলেন। দেখিলেন—

প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥

বালারুণ-রঞ্জিত শরৎপ্রভাতের ন্যায় মনোজ্ঞ পীতবসন পরিয়া নারায়ণ বসিয়া আছেন। কৃষ্ণমেঘের মত শ্যামকান্তি নারায়ণ বাক্যামৃত দিয়া দেবতাগণকে আশ্বস্ত করিলেন।

দশরথের যজ্ঞচরু খাইয়া তিন মহিষী গর্ভবতী হইলেন। অন্তর্গতফলারম্ভ শস্যের ন্যায় তাঁহাদের আপাণ্ডুর কান্তি অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইল। রাণীরা স্বপ্ন দেখেন—কোনও দিন দেখেন, গরুড় হেমপক্ষপ্রভাজাল বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছেন। কোনও দিন বা দেখেন, লক্ষ্মী ব্যজন করিতেছেন। যথাকালে কুলপ্রদীপ চারি পুত্র জন্মিল। শ্যামাভ্র দিবস যেমন প্রাণ জুড়ায়, কুমার-চতুষ্টয়ের আচরণেও তেমনই প্রজাপুঞ্জের প্রাণ জুড়াইত।

প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিয়া তাড়কাকে বধ করেন। মদনের মত চারুকান্তি রাম শরাসনে জ্যা সংযোগ করিলেন।

জ্যানিনাদমথ গৃহ্নতী তয়োঃ প্রাদুরাস বহুল-ক্ষপাছবিঃ।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥

জ্যাশব্দ শুনিয়া রাক্ষসী আসিল। তাড়কা অমানিশার ন্যায় বহুলক্ষপাছবি চলকপালকুণ্ডলা কালিকার মত কৃষ্ণা। অস্থিমাত্রসার নরকপালের সহিত দৃষ্ট তাহাকে বলাকা-যুক্ত নিবিড় মেঘের মত দেখাইল।

তাড়কা-বধের পর যখন ঋত্বিকগণ যজ্ঞ আরম্ভ

করিলেন, তখন বন্ধুজীবের মত রক্তবিন্দুতে যজ্ঞবেদী দূষিত দেখিয়া ঋষিগণ শঙ্কিত ও নিবৃত্ত হইলেন। রাম বায়ব্য অস্ত্রে মারীচকে পাণ্ডু পত্রের মত পাতিত করিলেন।

মারীচ-বধ শেষ করিয়া হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ যখন বিবাহান্তে ফিরিতেছেন, তখন দুর্লক্ষণ দেখিলেন—

শ্যেন-পক্ষ পরিধূসরালকাঃ সান্ধ্যমেঘ-রুধিরার্দ্র-বাসসঃ।
অঙ্গনা ইব রজস্বলা দিশো নো বভূবুরবলোকনক্ষমাঃ॥

দিক্‌বধূগণ রজস্বলা অঙ্গনার ন্যায় অবলোকনক্ষম রহিলেন না। ধূসর অলকের ন্যায় শ্যেন পক্ষীর পক্ষে আকাশ আচ্ছন্ন হইল, রুধিরসিক্ত বাসের ন্যায় সন্ধ্যামেঘে দিগন্ত পরিবৃত হইল। ভার্গব পরশুরাম আসিয়া আপন ধনুর্ভঙ্গ করিতে রামকে আহ্বান করিলেন।

ত্রিদশচাপলাঞ্ছিত নবাম্বুদের যেমন শোভা হয়, ভার্গবের শরাসন গ্রহণ করিতে রামেরও সেইরূপ শোভা হইল। রাম ভার্গবকে পরাজিত করিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন।

কৈকেয়ীর জন্য রাম রাজা না হইয়া বনে চলিলেন। সেখানে সন্ধ্যাভ্র-কপিশ বিরাধ রাক্ষস পথরোধ করিলে, তাহাকে নিহত করিলেন। অবশেষে সীতা-হরণকারী রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া রাম রাজ্যে ফিরিলেন।

পুষ্পকরথ হইতে রাম সীতাকে সব দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন :—

বৈদেহি! পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥

বৈদেহি! চারু নক্ষত্রদীপ্ত শরতের প্রসন্ন আকাশ যেমন ছায়াপথে বিভক্ত হইয়া শ্রীসমন্বিত হয়, মলয় পর্য্যন্ত সেতুবিভক্ত ফেনিল সমুদ্র সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজীনীলা,
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সীতা, ঐ দেখ, লবণাম্বুরাশির বেলা দূরে দেখা যাইতেছে। তমাল ও তালবন-সমূহে নীলা বেলাভূমি কি সুন্দর! মনে হইতেছে, যেন ঐ তন্বী বেলারেখা অয়শ্চক্রের কলঙ্করেখা।

পরে চিত্রকূটের তমাল দেখাইয়া বলিলেন :—

অয়ং সুজাতোঽনুগিরং তমালঃ প্রবালমাদায় সুগন্ধি যস্য। ·
যবাঙ্কুরপাণ্ডুকপোলশোভী ময়াবতংসঃ পরিকল্পিতস্তে॥

জানকি! ঐ দেখ, চিত্রকূটের সানুদেশে তমালতরু। ঐ তমালের সুগন্ধি পল্লব দিয়া এক দিন তোমার অবতংস রচনা করিয়াছিলাম। স্নিগ্ধ যবাঙ্কুরের ন্যায় পাণ্ডু তোমার কপোলের তাহাতে কি অনবদ্য শোভাই না হইয়াছিল।

রামের পরে কুশ রাজা হইলেন। তিনি কুশাবতী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিলে গতশ্রী অযোধ্যা লাবণ্যময়ী হইল।

গ্রীষ্মকাল আসিল। তখন—

আপিঞ্জরা বদ্ধ-রজঃকণত্বাৎ মঞ্জর্য্যুদারা শুশুভেঽর্জ্জুনস্য।
দগ্ধ্বাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য॥

অর্জ্জুনের মঞ্জরী সকল পরাগচূর্ণে আপিঞ্জর হইয়া শোভা পাইল। গিরিশ মদনকে ভস্মীভূত করিয়া তাহার ধনুকে খণ্ডীকৃত করিলে যেমন শোভা হইয়াছিল, অর্জ্জুন-কুসুমেরও সেইরূপ দ্যুতি হইল।

ইহার পর রঘুবংশের পতনের কথা। কুশ জল-বিহারে মত্ত হইলেন। তিনি যে বিলাসের লীলা দেখাইলেন, অগ্নিবর্ণ তাহার চরম করিয়া রাজযক্ষ্মায় পাণ্ডু হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের তৃতীয় অঙ্কে প্রমোদবনের শোভা দেখিয়া অগ্নিমিত্র বলিতেছেন :—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরুবকং শ্যামাবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীমাধবী যোষিতাম্॥

ঐ দেখ বিদূষক! রমণীরা বিম্বাধরে যে অলক্তক পরে, রক্তাশোক তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে। শ্যাম, শ্বেত এবং অরুণ বর্ণের কুরুবক সুন্দরীগণের পত্রভঙ্গ-রচনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে আর তিল-ফুলের উপর ভ্রমর বসিয়া ললাট-রঞ্জিত তিলক-রেখাকে অবজ্ঞা করিতেছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক দিয়া আলোচনা শেষ করিব। পরিণত বয়সের ভাব-সমৃদ্ধ ও রস-সমৃদ্ধ এই রচনায় অত্যুক্তির অবকাশ নাই, তাই এই কাব্যে রঙের বৈচিত্র্য নাই।

শকুন্তলার পেলব অধরকে কবি কেবল কিসলয়রাগ বলিয়া সন্তুষ্ট, বাক্যচ্ছটা দিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে আকুল নহেন। ঘটোৎক্ষেপণ হেতু শকুন্তলার করতল লোহিত হইয়া উঠে।

দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলা ও তাহার সখীগণের সহিত রসালাপে মগ্ন, তখন বাহির হইতে উচ্চস্বর আসিল :— মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্ত সমাগত।

তুরগখুরহতস্তথাহি রেণু-
বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ
শলভসমূহ ইবা শ্রমদ্রুমেষু॥

অস্তায়মান রবির কিরণের মত রক্তবর্ণ শলভসমূহের মত তুরগখুরোত্থিত পরিণতারুণপ্রকাশ ধুলি বল্কললগ্ন আশ্রম-বৃক্ষে পড়িতেছে। উদধিশ্যামসীমা ধরিত্রীর অধিপতি দুষ্মন্ত তাই মৃগয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং লতাকুঞ্জের পাণ্ডু সিকতায় পদচিহ্ন দেখিয়া সখীগণের বিস্রব্ধ আলাপ শুনিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা লতাকুঞ্জে বাঞ্ছিতের দেখা পাইলেন। প্রিয়তমার মনোরঞ্জন করিতে বলিলেন :—

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতান্
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ॥

নলিনীদলরচিত পাখা দিয়া কি শীতল শ্রান্তিহর বাতাস করিব না পদ্মতাম্র তোমার চরণ অঙ্কে রাখিয়া সংবাহন করিব?

কুলপতি কাশ্যপ আসিয়া সখীমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন বনস্পতি ইন্দুপাণ্ডু মাঙ্গল্য ক্ষৌমবস্ত্র প্রদান করিয়া প্রীতি জানাইল।

আকাশে মঙ্গলধ্বনি হইল :—

রম্যান্তর-কমলিনী-হরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক-ময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়-রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

হরিতবর্ণ কমলিনীপূর্ণ সরোবর পথের মাঝে থাকুক, ছায়াদ্রুম সূর্য্যাতপ দূর করুক, পদধূলি পদ্মরেণু-কোমল হউক, শান্ত ও অনুকূল পবনপ্রবাহে পথ নির্ব্বিঘ্ন হউক।

বসন্তোৎসব করিবার জন্য এক চেটী আম্রমুকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে :—

আতাম্রহরিতপাণ্ডুরঃ বসন্তমাসস্য জীবসর্ব্বস্ব।
দৃষ্টোঽসি চূতকোরক ধাতুমঙ্গল ত্বাং প্রসাদয়ামি॥

হে বসন্তের প্রাণ, ধাতুমঙ্গল, আতাম্র, হরিৎ ও পাণ্ডুবর্ণ আম্রমুকুল! তোমাকে দেখিলাম, আমি তোমার প্রসন্নতা উৎপাদন করিব। কিন্তু শকুন্তলার বিরহ-ব্যথায় বসন্তোৎসব দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ, তাই কঞ্চুকী চেটীকে ভৎর্সনা করিল।

রাজা দুষ্মন্ত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া শকুন্তলার জন্য ব্যাকুল হইলেন। দৈব সহায়ে বিরহ মিলনে পর্য্যবসিত হইল। নীললোহিতকে নমস্কার করিয়া কবি গ্রন্থ শেষ করিলেন।

কবি কালিদাসের সরস ও ভাবমধুর কাব্যগুলির উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া লইলাম। বর্ণবাচক শব্দের অভাব কবির লেখাকে অস্পষ্ট করিতেছে। শ্যাম, পাণ্ডু ও গৌর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাকৃতিক দ্রব্য ও বস্তুর সহিত মিলাইয়া কোথাও কোথাও এই অভাব দূর করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহাতে নামের অভাব দূর হইতেছে না।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে আমার অধিকার যৎসামান্য, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত মত ব্যক্ত করা হয় ত দুঃসাহস, তথাপি বলিতে ইচ্ছা হয়, বর্ণজ্ঞান ও বর্ণপ্রিয়তায় আমাদের আগ্রহ বরাবরই কম ছিল। মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে বর্ণবৈচিত্র্যের যাদুসম্পদ আছে, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু আমার মনে হয়, তাহাতে চলিবে না। বর্ত্তমান মানুষের জন্য যে সকল বিচিত্র নাম বাহির হইতেছে, তাহার নূতন নামকরণ করিতে হইবে। প্রাচীন প্রয়োগ ও নামের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া এই কায করিতে হইবে।

পৃথিবীতে বিধাতা নানা রঙে যে আলেখ্য প্রতিদিন অঙ্কিত করিতেছেন, ভাষা ও প্রকাশের অভাবে তাহার মাধুর্য্য আমরা অনুভব করিতে পারিব না, ইহা সত্যই দুর্ভাগ্যের বিষয়। নামকরণ অবহেলার নহে, তাহাতে রস ও বুদ্ধির পরিচয় পাই। রসিক বাঙ্গালী কি চুপ করিয়া রহিবে?

শ্রীমতিলাল দাশ।

পক্ষপাত

শরৎ গ্রামে আসিয়াছে।

এগার বৎসর একাদিক্রমে কলিকাতায় থাকার পর শরৎ তাহার জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিল গত সন্ধ্যায়। পনের বৎসর বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল। শরৎ এখন ছাব্বিশ বৎসরের যুবক।

ইহার মধ্যে সে এম-এ পাশ করিয়াছে এবং সরকারী চাকুরী যোগাড় করিয়াছে। এখনও বিবাহ করে নাই। মা শরতের অর্থে সুখভোগ করিবার আশায় আজও পৃথিবীর মাটী আঁকড়াইয়া আছেন। শরৎ আসিল, মার এত দিনের আশাতরুকে ফলবান করিয়া শরৎ মার কোলে ফিরিল। মার চোখে আনন্দাশ্রু ধরে না। গ্রামের লোক বলিল, ধন্য ছেলে।

মা যখন শরৎকে দূর-সম্পর্কের দেবর বিনয় চাটুয্যের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন—কলিকাতায় পড়িবার জন্য, সেই দিনের কথা তাঁহার আজ কেবলই মনে পড়িতেছে।

খাবার সংস্থান ছিল না, পড়ার কথা শরৎ ভাবিবে কি করিয়া! কিন্তু মা কতখানি চোখের জলের মিনতি ঢালিয়া বিনয় বাবুকে ধরিয়া তাহার পড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শরৎও আজ সে কথা না ভাবিয়া পারে না। না,—শরৎ সর্ব্বদা সেই কথা ভাবিয়াছে, সেই কথা ভাবিয়াই সে এতগুলি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, বৃত্তি পাইয়াছে এবং স্থায়ী চাকরী যোগাড় করিয়াছে।

"কি খাবি বাবা?"

"মাকে আবার কি খাবো বল্‌তে হয়—মা?"

মা হাসিলেন; ছেলে তাঁহার তেমনই শিশু আছে। সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার স্নেহের রোমাঞ্চন বহিয়া গেল। এ ত' ছেলে, এখনও ত' সেইটুকুই আছে, কিন্তু উহার চারিটা পাশ, দেড়শ' টাকার চাকরী! মা সত্যই রত্নগর্ভা!

জলযোগ সারিয়া শরৎ বাহিরে চলিয়া গেল। এগার বৎসরের তাহার না-দেখা বন্ধু সব, কে কেমন আছে, কে কি করিতেছে—শরতের আগ্রহের অন্ত ছিল না।

গ্রামের লোক তাহাকে দেখিল, দেখিয়া খুসী হইল; শরৎ তাহাদের তেমনই সরল সুন্দর আছে; এত দিন কলিকাতায় থাকার পরেও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সে তেমনই গ্রামের লোকের সহিত গ্রামের কথা কহিল, গ্রামের চাষ-আবাদ ঘর-গৃহস্থালীর খবর লইল, লোকের সহিত এমনভাবে মিশিল, যেন সে ছাব্বিশ বৎসরই গ্রামে রহিয়াছে। অতখানি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির কথা এতটুকু জানাইবার চেষ্টা সে করিল না। হাঁ, শরৎ একটি ছেলে বটে!

সারা সকালটা এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরিয়া শরৎ ফিরিবার পথে লীচুপুকুরের পাশ দিয়া বাড়ী আসিতেছিল। ঐখানে ঐ বেলগাছ, বাঁশগাছ এবং শিরীষগাছে জড়াজড়ি করিয়া সেখানে একটি কুঞ্জের মত হইয়াছে; সেইখানে শরৎ কত খেলাই না খেলিয়াছে! ঐখানে তাহারা খড়ের চালা করিয়া সরস্বতী-পূজা করিত; পাড়ার ছোট মেয়েরা দল বাঁধিয়া আসিয়া ঘর নিকাইত, আলপনা দিত, মা সরস্বতীকে সাজাইত, আর ছেলেরা ফুল দিয়া পাতা দিয়া তোরণ তৈয়ার করিয়া, লাল-নীল কাগজের ফুল করিয়া চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া কি চমৎকারই না করিত ঐ স্থানটা!

শরতের ইচ্ছা করিতে লাগিল, ঐ বাল্যকালের ক্রীড়া-কুঞ্জে একটিবার বসিয়া যায়। ঐ স্থানের কত আনন্দময় স্মৃতিকে আর একবার বর্ত্তমান জীবনের উপর টানিয়া আনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। শরৎ ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিল।

"কবে এলে শরৎদা?"

শরৎ মুখ তুলিয়া চাহিল; একটি কিশোরী যুবতী; ঠিক সে চিনিতে পারিতেছে না, অথচ অত্যন্ত পরিচিত যেন। কে?

শরৎ চুপ করিয়া রহিল একটুক্ষণ, তার পর বলিল, "কাল এসেছি সন্ধ্যেয়, কিন্তু তোমাকে ত চিনতে পারছিনে।"

মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; বাল্য-চাঞ্চল্য উহার এখনও ঘুচে নাই, কিন্তু কি সারল্য!

শরতের সহরে দেখা প্রজাপতির মত সুসজ্জিতা মেয়েদের মনে পড়িল, মনে পড়িল তাহার একান্ত মনের কোণে যে আসন পাড়িয়া আছে, সেই অণিমাকে।

অণিমা সুন্দরী—তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী সে;

তাহার উপর শিক্ষার ও সভ্যতার দ্বারা সেই রূপকে সে আরও শাণিত করিয়া রাখিয়াছে।

শরতের আর ভাবিবার অবসর হইল না।

"চিনতে পারলে না? আমি যে তোমার বন্ধু হরিশের বোন, সেই টুসী—মনে পড়ছে না?"

মনে তাহার পড়িয়াছে। হরিশের সহিত শরতের সব চেয়ে বেশী বন্ধুত্ব ছিল, কারণও একটা ছিল তাহার। হরিশের বাবা ছিলেন শরতের বাবার বিশেষ বন্ধু। শরতের পিতৃবিয়োগের পর সে হরিশের বাবার নিকটেই যা একটু স্নেহ-সাহায্য পাইয়াছে, নতুবা সারা গ্রামের কেহই তাহার দুঃখিনী জননীকে একটা মুখের কথা বলিয়াও উৎসাহ দেয় নাই। হরিশের বাবা ধনী ছিলেন না, তবুও তিনিই উদ্যোগ করিয়া শরৎকে কলিকাতায় পড়িতে পাঠান, নতুবা গ্রামের সকলেই একবাক্যে তখন বলিয়াছিল—ধানভানা মায়ের ছেলে আবার লেখাপড়া শিখবে!

শরতের মনে পড়িল;—সমস্ত কথাই এক মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া গেল তাহার। এই টুসীকে সে চিনিতে পারিল না! কিন্তু চিনিবেই বা কিরূপে? টুসীর তখন বয়স বড় জোর পাঁচ ছয় বৎসর। কিন্তু আশ্চর্য্য, ঐ মেয়েটাই বা তাহাকে চিনিল কিরূপে? শরৎ একটু থামিয়া ভাবিয়া লইল, তার পর বলিল,—"কিন্তু তুই-ই বা আমাকে চিনলি কি ক'রে, টুসু?"

"আমি-? বা রে! আমি চিনবো না? জ্যেঠাই-মার কাছে রোজ তোমার কথা শুনি, তার পর তুমি আসবে, তাও শুনেছি, তার পর তোমাকে দেখছি—"

"কিন্তু আমিই যে শরৎ, তা তুই কি ক'রে জানলি?"

"কেন? এ গাঁয়ে তোমার মত আর কেউ আছে না কি? কলকাতার বাবুদের দেখলেই চেনা যায়, মশাই—"

"বড্ড ডেঁপো হয়েছিস্! হরিশ কেমন আছে? কোথায় সে?"

"দাদা কাল আসবে। চাকরী করছে যে পাটনায়, শোননি?"

"কি ক'রে শুনবো বল, চিঠিপত্র ত' লেখা নাই; কাকীমা ভাল আছেন? বড়দি?"

"সবাই ভালো, যাওনি কেন আমাদের বাড়ী?"

"বিকালে যাবো ভাই, এ বেলা বেলা হয়ে গেল।"

শরতের আর ক্রীড়াকুঞ্জে যাওয়া হইল না। বাড়ীর পথ ধরিল সে।

টুসী পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

খাইতে বসিয়া শরৎ মাকে বলিল—"মা, হরিশদের অবস্থা এখন কেমন?"

"খুব ভাল আর কি ক'রে বলি বাবা, ওর বাবা মারা যাওয়ার পর হরিশ ত' কিছুদিন বসেই রইল, চাকরী আর কোথাও পাওয়া যায় না—বোনটার বিয়ে দিতে পারেনি, অনেক দেনা হয়ে গেছে ব'সে ব'সে খেয়ে।"

"কেন, হরিশ যে চাকরী করছে শুনলাম!"

"সে ত' এই ক'মাস হ'ল। তাও মাইনে খুব কম, তবে চলছে কোন রকমে।"

"টুসীর সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়েছিল মা, তাকে চিনতেই পারিনি প্রথমে। ও ত বেশ বড় হয়ে গেছে দেখলাম।"

"হয়নি আবার! গাঁয়ে কাণ পাতবার যো নেই; আর কি আইবুড়ো রাখা ভাল দেখায়।"

"তা ওরা চেষ্টাবেষ্টা করছে'ত?"

"কি দিয়ে করবে বাবা, টাকা ত চাই।"

শরৎ আর কিছু বলিল না; নীরবে খাইতে লাগিল। মা একটু থামিয়া বলিলেন,—"ওর মায়ের ইচ্ছে, টুসীকে আমার ঘরে দেয়—আমারও তাই ইচ্ছা বাবা, বেশ মেয়েটি, তা ছাড়া ওর বাবা তোর যা করেছেন।"

শরৎ চমকিয়া উঠিল। মা এ কি বলিতেছেন? অণিমাকে তাহার মনে পড়িতেছে। সুসজ্জিতা সুন্দরী অণিমা, যখন অর্গান বাজাইয়া সে গান করে, শরৎ যে জগৎ ভুলিয়া সেই সুরসুধা পান করে। সেই অণিমাকে ভুলিয়া এই গ্রাম্যবালিকা টুসী! কিন্তু টুসীকে তাহার মন্দ লাগে নাই। টুসীও সুন্দরী, তবে সে সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধ শরৎচন্দ্রের মত। টুসী সত্যই লোভনীয়, কিন্তু অণিমাকে যে সে বাক্য দান করিয়াছে, শুধু মার সম্মতির অপেক্ষা। অণিমাকে সে কি বলিবে! কিরূপে কলিকাতায় গিয়া তাহার বাবাকে, ভাইকে মুখ দেখাইবে?

শরৎ মাকে কিছুই বলিতে পারিল না। মা জানেন, ছেলে তাঁহার তেমন নহে। তিনি শরতের সম্মতি বুঝিয়া আশ্বস্ত হইলেন। •

সন্ধ্যায় শরৎ হরিশদের বাড়ী যাইতেই টুসীর মা সাগ্রহে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বাড়ীর উঠানের এক কোণে হরিশের বাগান। হরিশের বাগানের সখ শরৎ জানে। হরিশ খাইতে না পাইয়াও বাগানের পরিচর্য্যা ভোলে নাই। উঠানের এক কোণে ছোট বাগানটি তল্‌তা বাঁশের বাখারি দিয়া গণিত চিহ্নের মত করিয়া ঘেরা। তাহার উপর তরুলতার গাছ উঠিয়া লাল লাল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ভিতরে বেলা, যুঁই, গাঁদা আর হরগৌরী ফুলের গাছ অজস্র ফুলে ফুলময় হইয়া আছে। দুইটি ছোট গোলাপ গাছ, ফুল এখনও ফুটে নাই। শরৎ মুগ্ধ হইয়া গেল। এইটুকু ঘরের উঠানে এই বাগান যেন স্বর্গের এক অংশ ছিঁড়িয়া আনিয়াছে। শরৎ একটা বাঁশের মোড়া লইয়া বাগানের বেড়ার ধারে বসিয়া পড়িল।

টুসী আসিয়া একটা প্রণাম করিল, বলিল, "তখন ভুল হয়ে গেছলো, সেরে নিচ্ছি।"

টুসীর মা আসিয়া কাছে বসিলেন। তার পর অনেক কথা;—কলিকাতার কথা, দেশবিদেশের খুচরা সংবাদ, হরিশের চাকরীর খবর। শরতের প্রায় দুই ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল। ফিরিবার সময় টুসী তাহাকে একটা কলাপাতের ঠোঙ্গায় ভরিয়া একরাশ যুঁই-ফুল উপহার দিল।

পথে আসিয়া শরৎ ভাবিতে লাগিল, টুসী ত বেশ বড় হইয়া গিয়াছে; দেখিতেও বেশ ফুটফুটেটি হইয়াছে; উহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া বাহির করিলে অণিমার চেয়ে কিছু খারাপ হইবে না দেখিতে। কিন্তু টুসী কতটা লেখা-পড়া শিখিয়াছে? শরৎ এত কথা কহিল, অথচ এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় খবরটাই লইল না! শরৎ নিজের উপর চটিয়া উঠিল।

কিন্তু টুসী নিশ্চয় বেশী লেখা-পড়া শেখে নাই, কেমন করিয়া শিখিবে? গ্রামে ত আর উচ্চ ইংরাজী স্কুল নাই। হরিশ কি তাহাকে পড়াইয়াছে? হয় ত সামান্য কিছু পড়াইয়া থাকিবে। টুসীকে দেখিয়া এবং তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া কিন্তু কিছুই ধরা যায় না। যদি লেখাপড়া না জানে, তবে টুসীকে লইয়া শরৎ কিরূপে ভদ্র সমাজে চলাফেরা করিবে? তাহার ভাল চাকরী-সম্বন্ধে উচ্চ স্থান—। কিন্তু টুসীকেই যে বিবাহ করিবে, তাহারই বা ঠিক কি? অণিমা যে শরতের অপেক্ষায় বসিয়া আছে,—তাহার তারুণ্যের রূপ-শিখাকে সভ্যতার রঙে রাঙাইয়া। শরৎ বাড়ী ফিরিল।

খাইতে বসিলে মা বলিলেন—"টুসীদের বাড়ী গিছ্‌লি?"

"হ্যাঁ—"

"তা হ'লে ওদের মত দিই—কি বলিস?"

"অত তাড়া কেন মা, হরিশ আসুক, তার পর যা হয় করা যাবে।"

"এবার কিন্তু বাবা, আমার একটি মেয়ে নইলে চলবে না; ঢের কষ্ট আমি পেয়েছি, ভগবান মুখ তুলেছেন—আর তুই অমত করিস নে!"

শরতের অসীম দুর্ব্বলতা এইখানে। মাকে ক্ষুণ্ণ করা—না—তদপেক্ষা শরৎ মৃত্যু বরণ করিবে। মৃত্যু—হাঁ, দিনে দিনে পলে পলে মৃত্যুই ত। যাহার সহিত মন মিলিবে কি না—নিশ্চয়ই মিলিবে না—যাহার রুচি এখনও সম্পূর্ণ অমার্জ্জিত, যাহাকে ভাল কাপড় কিনিয়া দিলেও পরিতে জানে না, সেই টুসীকে লইয়া সংসারযাত্রা—মরণ ছাড়া কি আর! তবু শরৎ তাহাই করিবে, মা যদি তাই চান।

কিন্তু অণিমাদের কথা দেওয়া হইয়াছে যে। শরৎ একটু থামিয়া, একটু ভাবিয়া বলিল—"মেয়ে তোমার আসবে মা, কিন্তু টুসীকেই আনতে চাইছ কেন? কলকাতায় আমার এক বন্ধুর একটি বোন আছে, তারা বড় লোক, আমাকে সাহায্য ক'রে তারাই আজ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আমি কথা দিয়েছি মা, তোমার মত নিয়ে সেই মেয়েটিকে তোমার দাসী ক'রে দেব।"

মা প্রায় এক মিনিট নীরব রহিলেন। তিনি যে বেশ ক্ষুণ্ণই হইয়াছেন, শরৎ তাহা বুঝিল। কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মা বলিলেন,—"বেশ, তাই কর—এদের তবে জবাব দিয়ে দিই।"

শরৎ আর কোন কথা বলিল না, নীরবে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল এবং হাত ধুইয়া শুইয়া পড়িল।

লণ্ঠনটি মৃদুভাবে জ্বলিতেছে; শরৎ চোখ মেলিয়া সেই তরল অন্ধকার দেখিতেছিল। মা কি এতটা ক্ষুণ্ণ হইবেন! টুসীকে না পাইলে মা যেন বেশ নিরাশ হইবেন মনে হয়। শরতের নিদ্রা আসিতেছে না।

টুসীর দেওয়া কলাপাতার ঠোঙায় যুঁইফুলগুলি মৃদু

আলোকে হাসিতেছে ; সুমিষ্ট সুন্দর হাসি হাসিতে যেন ঘরের বাতাস গন্ধ-মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎ উঠিল—ধীরে ধীরে উঠিয়া ঠোঙাটি লইয়া সমস্ত ফুলগুলি বিছানায় ছড়াইয়া দিল। মৃদু আলোকে সেই দুগ্ধশুভ্র বিছানার উপর শিশিরবিন্দুর মত ফুলগুলি যেন কোন মায়ারাজ্যের স্বপ্ন রচনা করিয়াছে।

শরৎ সে বিছানায় শুইতে পারিল না ; জানালার ধারে একটা চৌকী টানিয়া বসিল। বাহিরে মৃদু জ্যোৎস্না-লোক। দূরে—বহু দূরে একটা আলোক জ্বলিতেছে আর নিবিতেছে—আলেয়া হইবে হয় ত'। শরৎ আবিষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। এমনই ঘরে, এমনই ফুলভরা বিছানায় একা যেন থাকা যায় না। শরতের মন আবার টুসীর পানে ফিরিল।

টুসী লেখাপড়া জানুক আর নাই জানুক, ফুল সে উপহার দিতে জানে। ফুল যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য—টুসী তাহা বোঝে। বুঝিবে না কেন? হরিশেরই বোন ত'! হরিশ ফুলের পাগল—হরিশ কবি। শরৎ ভাবিতে লাগিল—মা যখন চান, তখন টুসীকেই—কিন্তু অনিমাকে, তাহার বাপকে শরৎ কিরূপে মুখ দেখাইবে?

কেন? বিবাহের মত একটা কায কাহারও খাতিরে পড়িয়া করা যায় না। শরৎ তাহাদের বলিয়া দিবে, অনিমাকে লইয়া সে সুখী হইবে না,—অনিমাও না।

কিন্তু ইহাই কি সত্য? শরৎ নিজের অন্তরকে বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। অনিমাকে ছাড়িয়া দিতে পারে কি সে? অনিমা পর হইয়া যাইবে। অনিমা আর তাহার সহিত কথাটিও হয় ত' কহিবে না। যে অনিমা শরতের মত করিয়া নিজকে গড়িতেছে। প্রতিদিন সে কতভাবে বুঝাইয়া দেয়, সে তাহারই—সেই অনিমাকে শরৎ একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারিবে?

অনিমা শিক্ষিতা, মার্জ্জিতরুচি, তাহার সহিত শরতের মন বেশ খাপ খায়। অনিমার চিন্তাধারা শরতের চিন্তা-ধারার সহিত তাল রাখিয়া চলে—অনিমা যে শরতের সমস্ত মন অধিকার করিয়া রাখিয়াছে!

শরৎ বিছানার কাছে আসিয়া ফুলগুলি আবার ঠোঙায় তুলিল। টুসীকে গ্রহণ না করিলে এ ফুল লইবার তাহার কি অধিকার!

সকালে উঠিয়াই শরৎ দেখিল, মাজন, বুরুশ, তোয়ালে সব ঠিক করা আছে। মা কি এত সব করিয়াছেন? শরৎ মাজনের শিশিটা তুলিয়া লইতে রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল, কালো চুলে পরিপ্লাবিত কাহার পৃষ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে। উহার অধিকারিণী কে? অত চুল যাহার, আর সে চুল অমন সুন্দর,—কে সে? শরৎ উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিল।

মা এ ঘর হইতে ডাকিলেন,—চিনি নিয়েছিস্ রে—চুলের অধিকারিণী মুখ বাড়াইয়া বলিল "হাঁ জেঠিমা, নিয়েছি—"

টুসী আশ্চর্য্য সুন্দর ত! স্নান করিয়া তাহাকে কি চমৎকার মানাইয়াছে! ডুরে সাড়ীটিতে পিঠের আধখানা ঢাকা, বাকি আধখানা চুলের ফাঁকে ফাঁকে চিক-চিক্ করিয়া উঠিতেছে। দেহে অটুট স্বাস্থ্যের লাবণ্য। ছোট মুখখানি গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়া চুলে ঢাকিয়া যেন পত্রান্তরালে মালতী কুসুমের মত বোধ হইতেছে। শরৎ অবাক্ হইয়া গেল।

মুখ ধুইয়া বসিতেই টুসী আনিল চা, আর গরম মুড়ি তেল মাখাইয়া, নারিকেল ও শশার টুকরা তাহার উপর। শরৎ চায়ে চুমুক দিতে দিতে টুসীর মুখের দিকে চাহিল। কি অপরূপ লাবণ্য উহার মুখে! অনিমা—কোথায় পাইবে এ রূপ! কৃত্রিমতার জৌলুষে রূপ তাহার বিজলী আলোকের মত তীক্ষ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্পর্শে মৃত্যু না হউক, আঘাত অনিবার্য্য। আর এই স্বভাবের সুকোমল চন্দ্রালোক—ইহাকে প্রাণ ভরিয়া—শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া উপভোগ করিবার বস্তু,—পান করিবার সুধা!

"তুমি কখন্ এলে, টুসু?"

"তা অনেকক্ষণ—তুমি যখন স্বপ্ন দেখে হাসছিলে।"

"হাসছিলুম! তাই না কি?"

"জিজ্ঞেস কর না জ্যেঠাইমাকে?"

"না, তুমি যখন বলছ, তখন সত্যিই হবে ; কিন্তু কি স্বপ্ন দেখছিলুম মনে পড়ে না ত'।"

"ভেবে দেখো না—পড়বে এখন ; কিন্তু শরৎদা, কালকার ফুলগুলো অমনি ক'রে শুকিয়ে রাখতে তোমায় আমি দিয়েছিলুম?"

শরৎ চাহিয়া দেখিল, মা কাছে নাই। বলিল, "তবে কি মালা গেঁথে তোমাকে পরাবার জন্য দিয়েছিলে?"

"যাঃ!" টুসী চলিয়া গেল।

শরৎ কি করিল? অবোধ বালিকাকে কেন এমন রসিকতা করিয়া বসিল! টুসী হয় ত ভাবিবে—শরৎ নিশ্চয় তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছে। হয় ত এই সামান্য কথার জন্যই টুসী শরৎকে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিবে। শরৎ এ কি করিয়া বসিল!

"টুসী—টুসী—একটু চা দিয়ে যা আরও।"

টুসী আসিল—ধীরে, অতি ধীরে আসিয়া শরতের হাতের বাটিটায় চা ঢালিয়া দিল। শরৎ তাহার মুখের দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া। ডাগর দুটি চোখের কালো তারা দুটি যেন নাচিতেছে! টুসী কাঁপিতেছে যেন।

"পালিয়ে গেলি যে, টুসী?"

"কেন? মুড়ি দেবো আর—"

"না, বোস তুই।"

"আমার কায আছে। দাদা কাল রাত্রে এসেছে, এখনও ঘুমুচ্ছে।"

টুসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শরৎ তাহার পিঠভরা কালো চুলের দিকে চাহিয়া রহিল আনমনে।

"অণিমার বাবা আমার চাকরী ক'রে দিয়েছেন মা, তা ছাড়া সময়ে অসময়ে কত যে উপকার পাই ওঁদের দ্বারা! অণিমাকে তিনি তোমার পায়েই দিতে চান—তাই আমাকে তোমার অনুমতি নিতে বলেছেন। টুসীর মাকে কি তুমি পাকা কোন কথা দিয়ে ফেলেছ মা—?"

"না বাবা, কথা আর কি? তবে টুসীর মার ইচ্ছে আর মেয়েটাও বড্ড ভালো, দিন-রাত আমার কাছে ও থাকে—ও না থাকলে একা আমার এই ফাঁকা বাড়ীতে থাকা যে কি কঠিন হ'ত! তা যাক্ গে। তুই সেই মেয়েকেই নিয়ে আয় বাবা, আমি খুসী মনে অনুমতি দিচ্ছি।"

একটু থামিয়া মা বলিলেন—"কি দেবে রে তারা?"

"হাজার পাঁচেক টাকার গয়না ইত্যাদি দেবে মা, নগদ কিছু আমি চাইতেও পারবো না, ওরা দেবেও না। তবে গয়না, জিনিষ যা দেবে, তা' দেখে তুমি খুসী হবে নিশ্চয়ই।"

"মেয়েটি কেমন?"

"তা ভালই মা, তুমি খুসীই হবে।"

"বেশ বাবা, তাকেই নিয়ে আয়।"

"টুসীর বিয়ের যোগাড় করতে তুমি ওদের ব'লে দিও মা, আমি ওর পণের টাকা দেব।"

"কিছু সাহায্য করা উচিত বাবা—ওর বাবা তোর অনেক করেছে। তা ছাড়া টুসীকে ওরা তোর জন্যেই রেখেছিল। তবে ব্যাপারটা গাঁয়ের বড় কেউ জানে না বলেই—নইলে—তা অনেকেই এক আধটু শুনেছে বৈ কি—টুসী ত' দিন-রাত আমার কাছে থাকে—"

আর একটা দিক তাহা হইলে আছে। টুসীকে হয় ত' ইহার জন্য অপমানিতা হইতে হইবে। হয় ত' গ্রামের লোকে তাহাকে শরতের বাগ্‌দত্তা বলিয়া জানে। হয় ত' টুসীর বিবাহ হওয়াই কঠিন হইবে। শরতের ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিল।

মা দেখিয়া বুঝিলেন—সমস্তই বুঝিলেন। শরতের মনের ঝোঁক কোন্ দিকে, তাহা মার কাছে আর গোপন নাই। তিনি নিশ্বাসটা চাপিয়া বলিলেন,—"তাতে কিছু ক্ষতি হবে না শরৎ—তুই সেইখানেই বিয়ে কর। কিন্তু বিয়ে কর বাবা, আর দেরী ভাল দেখায় না।"

শরৎ হাসিল। মা যেন শরৎকে আইবুড়ো মেয়ে ঠাওরাইয়াছেন!

"তাই হবে মা, তোমার ইচ্ছে আর অপূর্ণ রাখবো না।"

মা আশীর্ব্বাদ করিলেন মনে মনে। কিন্তু ইচ্ছা কি তাঁহার পূর্ণ হইবে? টুসীকে যে তিনি বধূভাবেই এতকাল স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। তাহাকে একান্ত পর করিয়া দিয়া মা অন্যকে লইয়া কিরূপে ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন? তবুও মা আশীর্ব্বাদই করিলেন।

সন্ধ্যায় শরৎ কলিকাতায় যাইবে। রাস্তায় তাহার খাবার চাই। মা টুসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শরৎ বাড়ীর চালায় বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে। টুসী আসিল, ময়দা মাখিয়া উনানের কাছে গিয়া বসিল, তার পর দুটি সুনিপুণ হাতে খাবার তৈয়ারী আরম্ভ করিয়া দিল।

টুসীকে মা যেন ছাড়িতে চাহেন না; এত কথার পরেও ঐ মেয়েটাকে আবার ডাকা কেন? নাই বা খাবার হইত। পথে ত দোকানের অভাব নাই? তবুও শরতের যেন ভাল লাগিতেছে। সে বিদেশে যাইবে, তাহার খাওয়ার

ব্যথার চিন্তা করিতে করিতে, আর এক জন তাহারই জন্য সযত্নে খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে, এই চিন্তা যেন মনকে আশ্রয় দেয়, আনন্দিত করে।

শরৎ উঠিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইল,—"টুসু, কি রকম লুচি ভাজছিস্ দেখি"

"খাও না—খাবে দু'খানা গরম গরম? খাও, লক্ষ্মীটি।"

টুসী অত্যন্ত গরম, ফোলা দু'খানি লুচি, কাছে সুবিধামত পাত্র না পাইয়া একটা শালপাতায় করিয়া শরতের হাতে দিল। তিনটি ছোট ছোট আঙ্গুল চিনির ভাঁড়ে ডুবাইয়া একটু চিনি তুলিয়া দিল।

—"ভাজা ত এখনো হয়নি, শরৎদা—চিনি দিয়েই খাও—"

মুখে তাহার সুমিষ্ট হাসিখানি, আপনার জনকে খাদ্য পরিবেষণের মধ্যে কি এত আনন্দ আছে! তাও আবার শালপাতার ঠোঙায় উপাদানহীন দু'খানি লুচি মাত্র!

শরৎ লুচি মুখে দিয়া টুসীর দিকে চাহিল; সে তখন কড়াতে আবার লুচি ফেলিয়া ছাঁকনী দিয়া চাপিতেছে।

শরতের মনে পড়িল অণিমাকে। কতখানি তফাৎ এই গ্রাম্য বালিকার সহিত তাহার! সে স্বহস্তে খাবার দিয়াছে কি কখনও? হাঁ, দিয়াছে, কিন্তু তাহার খানসামার তৈরী, সভ্য খাবার এবং অতিশয় সভ্যতার সহিত চামচ দিয়া পরিবেষিত।

আঙ্গুলের স্নেহস্পর্শ উহাতে লাগিয়া নাই—শালপাতার ঠোঙায় উহাকে মানায় না—এবং অণিমার মত সুসভ্যা মেয়ে ক্ষুধায় মরিয়া গেলেও পাতার উপরকার খাবার খাইবে না।

"আমি যাচ্ছি, তাতে তোমার দুঃখ হচ্ছে না, টুসু?—খুব যে তাড়াতাড়ি খাবার করতে লেগে গেলে—একবার মুখেও বললে না, আর এক দিন থাকতে?"

টুসী মুখ তুলিয়া চাহিল। নিমিষে তাহার দুটি চোখ স্নেহে কোমল হইয়া উঠিয়াছে। নীরবেই সে আবার মুখ নামাইয়া লইল।

কিন্তু শরৎ বারম্বার এ কি করিতেছে! নিজের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। টুসী যদি ভুল বুঝিয়া থাকে—টুসী যদি তাহাকে স্বামী ভাবিয়া থাকে! শরৎ বাহির হইয়া আসিল। আবার ভিতরে ঢুকিল, টুসী লুচি ভাজিতেছে আর তাহার হাস্য-স্ফুরিত ঠোঁটখানি দাঁত দিয়া চাপিতেছে।

শরৎ বুঝিল—টুসী শরৎকেই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বরণ করিয়াছে।

কি মূর্খ—কি মূর্খ ঐ মেয়েটা। উহাকে লইয়া শরতের একটা দিনও চলিবে না। আর ও কি না—

শরৎ গুম্ হইয়া রহিল।

যাত্রার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে শরতের প্রতীক্ষিত পত্র আসিল। অণিমা লিখিয়াছে:—

*　　*　　*

"সতী বাবু এসেছেন—সতীপদ—দাদার বন্ধু—মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট অফিসে বড় চাকরী করেন—তাঁকে নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলাম কদিন, এমন মিশুক লোক আর দু'টি দেখিনি—গাইতে বাজাতে ক্যারিকেচার করতে ওস্তাদ একেবারে। বিকালে তাঁর কারে বেড়াতে না গেলে মুখ গোঁজ ক'রে থাকেন, আর এমন সব কথা বলেন—না যেয়েই পারিনে। বাবা ওঁকে খুবই স্নেহ করেন—আমরাও। লোকটি সত্যিই খুব ভালো—আর তেমনি চেহারাটিও···"

টুসী আসিয়া শরতের পাশে দাঁড়াইল। অত্যন্ত কুণ্ঠিত-ভাবে টুসী বলিল—"আজকার দিনটা থেকে যাও না শরৎদা—আজ দিন কেমন—কে জানে, বৃহস্পতিবার—"

"এই চিঠি এসেছে, দেখছো? কার চিঠি জানো? তোমার হবু বৌদির—জোর তাগাদা দিয়েছে।"

শরৎ চাহিয়া দেখিল—টুসীর সমস্ত মুখ মুহূর্ত্তে সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুহূর্ত্তেই সে মুখ আবার পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিল। অতি মৃদু—মরণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মানুষ যেরূপ হাসি হাসে, তেমনই একটু হাসিয়া টুসী বলিল, "ওঃ! কিন্তু দিনটা ভাল নয়, শরৎদা; কাল গেলে বৌদি কি তোমায় ঘরে ঢুকতে দেবে না?"

"বলতে পারি না—যদি না ঢুকতে দেয়—"

"তা যদি হয়, তবে যাও—কিন্তু দিনটা—"

শরৎ এক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সে মুখ—ভণ্ডামী সেখানে কখনও স্থান পায় নাই।

শরৎ বাহিরে চলিয়া গেল।

"শরৎ কি ব'লে গেছে রে, টুসী? সময় হয়ে এল, এখনও কোথায় সে—যাবে না নাকি আজ?"

"যাবে জেঠাইমা, যাবেই ত' বল্লে।"

মা আর কিছু বলিলেন না। টুসীকে এরকম কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার হইতে শরৎ তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চলিয়াছে। টুসীর মুখের দিকে মা ভাল করিয়া চাহিতে পারিতেছেন না। তবু রক্ষা, মেয়েটা সমস্ত জানে না। মা নিশ্বাস ফেলিলেন। টুসী বসিয়া বসিয়া মায়ের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। ছোট দেরকোর উপর প্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। উঠানে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া।

শরৎ আসিয়া দাঁড়াইল উঠানে। আকাশের অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে যেন।

"মা!"

"আয়, কোথায় ছিলি বাবা, আজ আর যাওয়া হ'ল না ত'।"

"না মা, তোমার টুসুমণি বলে, আজ দিন খারাপ; তা ছাড়া—কে মা তোমার কাছে?"

বলিতে বলিতে শরৎ আসিয়া মার মাথার কাছে বসিল।

"তুই এখনও বাড়ী যাস নি, টুসী?"

"ও যে আমার কাছে রাত্রে থাকে বাবা, তুই এ কদিন বাড়ী ছিলি ব'লে থাকে নি।"—মা নিশ্বাস ছাড়িলেন।

"ওঃ! আচ্ছা মা—এ মাসে বিয়ের দিন আছে ত'?"

"শ্রাবণ মাস, দিন থাকবে বই কি বাবা, কেন?"

"ভাবছি, টুসীর বিয়েটা দিয়ে ওকে দিন-রাত্রের জন্যে তোমার কাছেই রেখে দিয়ে যাই।"

মার ডান হাতখানি শরৎ নিজের মাথায় লইল; তাঁহার বাঁ হাতখানি তখন টুসীর মাথার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শ্রীফাল্গুন মুখোপাধ্যায়।

পান্থের প্রেম

"ওগো শোনো, শোনো, কাল রাতে এক দেখিয়াছি কু-স্বপন,
কাছে এসে ব'সো, গায়ে দাও হাত, কেমন করিছে মন;
আজিকার মত এমনি রজনী, সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা,
তরুলতাগুলি তারই মাঝে যেন, পটের তুলিতে আঁকা,

পাতলা মেঘেতে ঢাকা চাঁদখানি, লতা-পল্লব দিয়া,
কভু দেখা যায়, কখনও লুকায়, নব মেঘে পরশিয়া,
তোমার কোলেতে মাথাখানি থুয়ে, 'তাজ সাজাহান' কথা,
শুনিতে শুনিতে ঘুমায়ে পড়েছি, অন্তরে আকুলতা,

সহসা কি যেন!—তোমায় যেমন, খুঁজে আর নাহি পাই,
খুঁজি গৃহবাসে, ফিরি পথপাশে, বনপথ ধরি যাই।
ওগো কাছে এসো, কোথা তুমি প্রিয়, কেমন যে করে মন,
সলিল ঢলিল আঁখির কোণায়, স্বপনেতে অচেতন;

'ওগো সাড়া দাও, আমারে বাঁচাও',—সহসা শুনিনু কাণে,
'এই যে হেথায় রহিয়াছি প্রিয়ে, ধ্বনিল গগন পানে,
সভয়ে দেখিনু মুখখানি তব, সুদূঢ় আকাশ কোলে,
অনিমেষে রহি মোর মুখে চেয়ে, নীল নভে যেন দোলে,

তোমার কেশের আশ-পাশ দিয়া, তারকার ম্লান ভাতি,
দেহখানি তব ঘেরিয়া দাঁড়ায়, ঘন নীহারিকা পাতি,
শুধু মুখখানি, শুধু আঁখি দুটি, তাও যেন ঘন ঘন,
ঢাকা প'ড়ে যায়, মেঘের ছায়ায়, বিষাদে মাখানো যেন,

বুঝিতে পারি না, কি কহিছ চোখে, বিষাদ কি বিস্ময়,
ক্রোধ-অভিমান কৌতুক সে কি? সকলই যে ভুল হয়।
আরও মেঘে ঢাকে, সরাইতে চাই, তবু যেন মেঘে ঢাকে,
হ্যাঁগো এ কেমন? মন মোর বড় কেমন করিতে থাকে?"

"কিছু নহে প্রিয়ে, আরও কাছে এসো, গায়ে রাখ হাতখানি,
স্বপন হয় ত স্বপনই এ শুধু, অর্থ কিছু না জানি,
আরও কাছে এসো তোমায় আমায় আছে কি এখনও দূর?
এস এস কাছে দূরে কিগো সাজে, ধরা বড় ভঙ্গুর!

এস প্রেমময়ী, প্রাণময়ী এসো প্রেয়সী অপরাজিতা,
এস সুনয়না নবনী-বদনা বিচ্ছেদ-ভয়-ভীতা,
মনে প্রাণে এস নয়নে বচনে চেতনা হরণ করি,
এস অনুপমা এস নিরুপমা এস শ্যামা-সুন্দরী।

হয় ত দুদিন এই দুদিনেও রাখিব না কোন ফাঁক,
মাটীর মানুষে হয় ত আসিবে নীলাম্বরের ডাক!
হায় কত কথা কত ব্যথা দিয়ে জড়ানো এ নীড়খানি;
মেঘলোকে আমি! না, না, কিছু নয়, স্বপন স্বপনই জানি;

বড় ভঙ্গুর কাচের ফানুস শুধু আলেয়ার আলো,
চকিতে মিলায় তাই মনে হয় বেসে লই আরো ভালো;
ওগো, আরও কাছে, স্বরগের ক্ষণ মণি-মণ্ডিত হেম,
এস করে তুলি আরও সুনিবিড় পান্থশালার প্রেম।

শ্রীগোপাললাল দে।

গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণ

গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ (১১) কঠোপনিষদে এই বাক্য আছে,—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।

"হৃদয়-গুহার মধ্যে দুইটি বস্তু প্রবেশ করিয়া আছেন, জগতে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, ইঁহারা তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন, ইঁহারা ছায়া এবং আলোকের ন্যায় (বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত), ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইঁহাদের কথা বলিয়া থাকেন, যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা তিন-বার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও ইঁহাদের কথা বলিয়া থাকেন।"

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—যাঁহারা যজ্ঞাদিকর্ম্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, সেখানে স্বর্গসুখ ভোগ হয়, যখন পুণ্য শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহারা চন্দ্র হইতে পতিত হইয়া মেঘের মধ্যে অবস্থান করেন, পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পড়েন, পরে যবাদি শস্যের মধ্যে অবস্থান করেন, পরে ঐ শস্যভোজনকারী পুরুষের দেহে অবস্থান করেন, পুরুষের দেহ হইতে শুক্রের সহিত স্ত্রীর গর্ভে গমন করেন, তথা হইতে পুনরায় জন্ম হয়। অন্তরিক্ষ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী এই পাঁচটিকে অগ্নি বলিয়া চিন্তা করি-বার বিধান আছে, ইহাই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার বিবরণ আছে।

নাচিকেত অগ্নি,—নচিকেতা নামক ব্রাহ্মণকুমার যমের নিকট যে অগ্নিবিদ্যা লাভ করিয়াছিল, তাহার নাম নাচিকেত অগ্নি, ইহার উপাসনা করিলে স্বর্গলাভ হয়। কঠ উপনিষদে এই উপাখ্যান আছে।)

এই উপনিষদ্‌বাক্যে "গুহাপ্রবিষ্ট" বলিয়া যে দুইটি বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহারা দুইটি আত্মা,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ("গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি")। পরমাত্মা যে গুহায় (হৃদয়াকাশে) প্রবেশ করেন, শ্রুতিতে তাহার উল্লেখ আছে, ("তদ্দর্শনাৎ") যথা—

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

"সেই দুর্দর্শ, গূঢ়, অনুপ্রবিষ্ট, গুহাস্থিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ দেবকে অধ্যাত্মযোগদ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক ত্যাগ করেন।"

যদিও জীবাত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না, তথাপি উভয়কে "ঋতং পিবন্তৌ" বা কর্ম্ম-ফলভোক্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দুইটি পথিকের মধ্যে একটির মাথায় ছাতা থাকিলেও "ছত্রধারীরা যাইতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। এখানেও সেইরূপ হইয়াছে। অথবা জীব কর্ম্মফলভোগ করে, ব্রহ্ম জীবকে এই ফল ভোগ করান, এজন্য উভয়কে "ঋতং পিবন্তৌ" বলা হইয়াছে।

এখানে "গুহাং প্রবিষ্টৌ" এই বাক্য চেতন জীব ও অচেতন বুদ্ধিকে বুঝাইতে পারে না, দুইটি চেতন বস্তুকেই নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত।

রামানুজ "দর্শনাচ্চ" ইহার অর্থে বলেন যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই গুহায় প্রবিষ্ট আছেন, এরূপ শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়। পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হন, এরূপ শ্রুতি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। জীবাত্মাও হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হন। তাহার শ্রুতি,—

যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত॥

(কঠ, ২।৪।৭)

কর্ম্মফল ভোগ করেন (অত্তি) এজন্য জীবের নাম 'অদিতি'। প্রাণেন সম্ভবতি, অর্থাৎ প্রাণের সহিত বর্ত্তমান থাকে। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী,—হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করে। ভূতেভিঃ ক্ষিত্যপ্‌তেজ প্রভৃতি ভূতের সহিত। ব্যজায়ত বিবিধরূপে জন্মলাভ করে; দেব, মনুষ্য প্রভৃতি রূপ ধারণ করে।

মধ্ব বলেন, এখানে "গুহাং প্রবিষ্টৌ" শব্দে বিষ্ণুর দুই রূপ,—আত্মা ও পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৃহৎ-সংহিতাতে আছে,—

নিবিষ্টো হৃদয়ে নিত্যং রসং পিবতি কর্ম্মজম্।

"হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়া কর্ম্মজাত রস পান করেন।"

শুভং পিবত্যসৌ নিত্যং নাশুভং সঃ হরিঃ পিবেৎ।

পূর্ণানন্দময়স্তাস্ত চেষ্টা ন জ্ঞায়তে কচিৎ॥

পদ্মপুরাণ

হরি শুভ (কর্ম্মফল) পান করেন। অশুভ পান করেন না। তিনি পূর্ণানন্দময়। তাঁহার ক্রিয়া কোনও রূপে জানা যায় না।

বিশেষণাচ্চ (১২)

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মা দেহরূপ রথে আরোহণ করিয়া পরমাত্মারূপ গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হয়। এইভাবে জীবাত্মাকে গন্তৃ এবং পরমাত্মাকে গন্তব্যরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে "বিশেষণাৎ"। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বসূত্রে যে কঠোপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেখানেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথাই হইতেছে।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় না। মুক্ত অবস্থাতেও জীব ব্রহ্মের উপাসকরূপে অবস্থান করে। নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে," মনুষ্য "প্রেত" হইলে লোকের যে সন্দেহ হয়, সে আছে, না নাই। এখানে "প্রেত" অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত অবস্থা। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায়, মৃত্যুর পর যে জীবাত্মা থাকে, এ বিষয়ে নচিকেতার কোনও সন্দেহ নাই—মুক্ত হইলে জীবাত্মা থাকে, না ব্রহ্মে বিলীন হয়, ইহাই নচিকেতার সন্দেহের বিষয়।

মধ্ব ব্রহ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"ব্রহ্মশব্দোঽয়ং বিষ্ণোরেব বিশেষণং" অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দ বিষ্ণুকেই বোঝায়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সত্য।

অন্তর উপপত্তেঃ (১৩)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা ইতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি" অর্থাৎ এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দেখা যায়, ইহাই আত্মা, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই অক্ষিপুরুষ কি প্রতিবিম্ব? না চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা? না জীব? না ব্রহ্ম? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি ব্রহ্ম, যোগিগণ ইঁহাকে চক্ষুর মধ্যে দর্শন করেন। কারণ, যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, (নির্লেপত্ব, কর্ম্মফলদাতৃত্ব ইত্যাদি) সে সকল ব্রহ্ম ভিন্ন কাহারও উপপন্ন হয় না, ("উপপত্তেঃ")।

মধ্ব এখানে বলিয়াছেন যে, "সোঽহমস্মি" এই বাক্য হইতে কেহ মনে করিতে পারেন যে, জীব ও ব্রহ্ম এক। কিন্তু তাহা নহে। এখানে অন্তর্যামী ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া অহংশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মহাকূর্ম্মপুরাণ হইতে তিনি এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

অন্তর্যামিণমীশেশং অপেক্ষ্যাহং ত্বমিত্যপি।

সর্ব্বে শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে সতি ভেদেঽপি বস্তুষু॥

"অন্তর্য্যামী ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া অহং ত্বং প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়, যদিও জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ আছে।"

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ (১৪)

(স্থান প্রভৃতির উল্লেখ হেতুও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে) আশঙ্কা হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মের কথা হয় নাই, কারণ, বলা হইয়াছে যে, এই পুরুষ চক্ষুর মধ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে এরূপ স্থান নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হয় না, কারণ, তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত। কিন্তু এ যুক্তি বিচার-সহ নহে। অন্যত্রও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্থান, নাম, রূপ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" (বৃঃ উঃ); "তস্য উদিতি নাম" (উহার উৎ এই নাম) (ছাঃ উঃ) "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" (ছাঃ উঃ) (স্বর্ণময় শ্মশ্রু)। শ্রুতির অন্যত্রও উপাসনার জন্য ব্রহ্মের এই ভাবে স্থান, নাম ও রূপের উল্লেখ আছে।

মধ্ব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদে পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের পরে আছে—চক্ষুতে ঘৃত বা জল প্রদান করিলে ঐ ঘৃত বা জল চক্ষুর পার্শ্বদেশে চলিয়া যায়। অর্থাৎ চক্ষু অসঙ্গ, নির্লেপক। ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হেতু চক্ষুর এই শক্তি হইয়াছে। বামনপুরাণ হইতে তিনি এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

যৎস্থানত্বাদিদং চক্ষুরসঙ্গং সর্ব্ববস্তুভিঃ।

স বামনঃ পরোঽস্মাকং গতিরিত্যেব চিন্তয়েৎ॥

"যাঁহার অধিষ্ঠান হেতু চক্ষুতে কোন বস্তু লিপ্ত হইতে পারে না, সেই ক্ষুদ্রাকার পুরুষ আমাদের পরম গতি, এইরূপ চিন্তা করিবে।"

স্থখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ (১৫)

"ইনি স্থখবিশিষ্ট এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া।" ১৩ সূত্রে যে উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে স্থখবিশিষ্ট ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, অতএব এখানেও ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে এই বাক্য আছে, "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম···যদেব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং" "ক" অর্থাৎ সুখ, "খ" অর্থাৎ আকাশ। "কং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, এই বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, বিষয়সুখই ব্রহ্মের স্বরূপ ; কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্য হইতে এই আশঙ্কা নিবৃত্ত হয়, কারণ, পরবর্ত্তী বাক্যে আছে যে, তিনি আকাশস্বরূপ (খং ব্রহ্ম)। যদি বিষয়সুখ তাঁহার স্বরূপ হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে আকাশস্বরূপ বলা যাইত না। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সাধারণ আকাশ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, কারণ, তাহা হইলে তাঁহাকে সুখস্বরূপ বলা যাইত না। তিনি আনন্দময় অথচ বিষয়সংস্পর্শরহিত, ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে—"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম।" যাহা সুখ, তাহাই আকাশ, যাহা আকাশ, তাহাই সুখ, এই কথা বলিয়া উপনিষদ উক্ত তত্ত্বটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, পরমানন্দ বিষ্ণুরই লক্ষণ, এখানে সেই লক্ষণ দেখা যায়, এ জন্যই বুঝিতে হইবে যে, এখানে বিষ্ণুর প্রসঙ্গই হইতেছে।

শ্রুতোপনিষৎক গত্যভিধানাৎ (১৬)

"শ্রুতোপনিষৎক" অর্থাৎ যিনি উপনিষদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন (এবং জানিতে পারিয়াছেন) অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিৎ। তাঁহার যে গতি প্রসিদ্ধ আছে, এখানে সেই গতির উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ হইতেছে।

উপনিষদ ও গীতাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পর দেবযানমার্গে গমন করেন, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। অক্ষিপুরুষবিদ ব্যক্তিও মৃত্যুর পর সেই পথে গমন করেন এবং পরিশেষে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ দেখা যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই অক্ষিস্থিত পুরুষ।

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ (১৭)

ইতরঃ না (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পুরুষ—যথা সম্মুখবর্ত্তী পুরুষের যে ছায়া চক্ষুতে পড়ে,—এখানে উদ্দিষ্ট হইতে পারে, না)। অনবস্থিতেঃ (সর্ব্বদা অবস্থান করেন না বলিয়া,—সম্মুখে যখন যে ব্যক্তি থাকেন, তাঁহার ছায়া চক্ষুতে দেখা যায়, সম্মুখে কেহ না থাকিলে দেখা যায় না)। অসম্ভবাৎ (অমৃতত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, সে সকল গুণ ছায়াপুরুষে থাকা সম্ভব নহে)।

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ (১৮)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—"য ইমং চ লোকং পরংচ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি অন্তরো যময়তি, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যাদি।

অনুবাদ—"যিনি ইহলোক, পরলোক, এবং সকল প্রাণীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে নিজ বশে রাখিয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না।"

এই ভাবে পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতার মধ্যে (আধিদৈবাদিষু) অন্তর্য্যামীরূপে যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই। কারণ, "তদ্ধর্ম্ম"—তাঁহার ধর্ম্ম, ব্রহ্মের ধর্ম্ম "ব্যপদেশ" অর্থাৎ উল্লেখ আছে। সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে নিজ বশে রাখা ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের এখানে উল্লেখ আছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গই হইতেছে। ব্রহ্ম যাহাকে "যমন" করেন, তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারাই তাহাকে যমন করেন।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যেরূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, পরমাত্মা সেরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি করেন না।

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ (১৯)

স্মার্ত্ত অর্থাৎ স্মৃতি-উক্ত প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পারে না। তদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্মের উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বসূত্রোক্ত অন্তর্য্যামী পুরুষ সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পারে না। কারণ, ঐ অন্তর্য্যামী পুরুষ সম্বন্ধে দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সকল গুণ প্রধানের থাকিতে পারে না।

রামানুজ এই সূত্রের শেষে "শারীরশ্চ" এই শব্দটি যোজনা করিয়াছেন। শারীর অর্থাৎ জীবও অন্তর্য্যামী শব্দবাচ্য হইতে পারে না, কারণ, অন্তর্য্যামীকে সকলের

দ্রষ্টা, সকলের নিয়ন্তা, প্রভৃতি বলা হইয়াছে ; এ সকল ধর্ম্ম জীবের থাকিতে পারে না।

মধ্ব বলিয়াছেন, সত্ত্ব, রজ, ও তম এই তিনটি গুণ প্রধানের ধর্ম্ম ; ইহাদের যখন উল্লেখ নাই, তখন অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রধান হইতে পারে না। "অতদ্ধর্মাভিলাপাৎ" শব্দের এই ব্যাখ্যাটিই যেন সমীচীন বোধ হয়।

শারীরশ্চ উভয়েঽপি হি ভেদেন এনং অধীয়তে (২০)

"শারীর" (জীব) ও অন্তর্য্যামী শব্দবাচ্য হইতে পারে না। "উভয়ে অপি" কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই "এনং" এই জীবকে "ভেদেন অধীয়তে" পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদের দুইটি শাখার নাম কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন। কাণ্ব শাখাতে আছে—"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্"—যে অন্তর্য্যামী পুরুষ বিজ্ঞানময় জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। মাধ্যন্দিন শাখাতে আছে—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ" যিনি আত্মা (জীবাত্মায়) অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে ভিন্ন।

রামানুজ এই সূত্রের "শারীরশ্চ" শব্দটি বাদ দিয়াছেন।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ (২১)

মুণ্ডক উপনিষদে দুইটি বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে,—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে, পরা বিদ্যা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ অপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" অর্থাৎ অপরা হইতে ভিন্ন পরা বিদ্যা, যে বিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষরকে পাওয়া যায়, যে অক্ষরকে দেখা যায় না, গ্রহণ করা যায় না, যাহার গোত্র (বংশ) নাই, বর্ণ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত-পদ নাই, যিনি নিত্য, বিভু (প্রভু), সর্ব্বগত, যিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি-স্থল বলিয়া দর্শন করেন। পরে উক্ত হইয়াছে—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (অক্ষর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু)। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তুটিই ব্রহ্ম এবং অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত বস্তুটি প্রকৃতি বা প্রধান, কিন্তু তাহা নহে। "অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ" অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত বস্তুটি ব্রহ্মই। "ধর্ম্মোক্তেঃ" ব্রহ্মের ধর্ম্ম এখানে উক্ত হইয়াছে। কারণ, এই বস্তু সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্। ইহা ব্রহ্মের ধর্ম্ম, প্রকৃতির নহে। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এখানে অক্ষর ব্রহ্মকে বোঝায় না, প্রকৃতিকে বোঝায়।

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ (২২)

ইতরৌ (অপর দুইটি বস্তু,—প্রকৃতি এবং জীব) ন (এখানে উক্ত হয় নাই) বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং (শ্রুতি বলিয়াছেন "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" ইনি দিব্য এবং অমূর্ত্ত পুরুষ, এই ভাবে বিশেষণ করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, ইনি জীব হইতে পারেন না ; শ্রুতি পুনশ্চ বলিয়াছেন, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই ভাবে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, এ জন্য ইনি প্রকৃতি হইতে পারেন না)।

রামানুজ অপরা বিদ্যার অর্থ করিয়াছেন, শাস্ত্রপাঠজন্য পরোক্ষ জ্ঞান, এবং পরা বিদ্যার অর্থ করিয়াছেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ; এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, এখানে পরব্রহ্ম (বিষ্ণু)-কে প্রকৃতি এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তিনি স্কন্দপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, অক্ষর ত্রিবিধ,—(১) অপর অক্ষর (অচেতন প্রকৃতি), (২) পর অক্ষর (লক্ষ্মী), (৩) পরতঃপর অক্ষর (বিষ্ণু)।

রূপোপন্যাসাচ্চ (২৩)

এই অক্ষর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ)

"অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্র এবং সূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা"। এই যে রূপের উল্লেখ ("রূপোপন্যাস"), ইহা প্রধান সম্বন্ধে বলা যায় না, কোনও জীব সম্বন্ধেও বলা যায় না। অতএব এখানে পরমেশ্বরের কথাই হইতেছে।

মধ্ব এখানে অপর একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং", অর্থাৎ যখন দ্রষ্টা স্বর্ণের ন্যায় বর্ণযুক্ত, কর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মের উৎপত্তিস্থল সেই পুরুষকে দর্শন করেন। মধ্ব বলেন যে, এই রূপ পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের।

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ (২৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, কয়েকজন পণ্ডিতের মনে সংশয় হইল "কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম" অর্থাৎ আমাদের আত্মা কোন্ বস্তু, ব্রহ্মই বা কি বস্তু? তাঁহারা কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। অশ্বপতি তাঁহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করেন?" এক জন বলিলেন, স্বর্গলোক; এক জন বলিলেন, সূর্য্য; এক জন বলিলেন, বায়ু, ইত্যাদি। অশ্বপতি বলিলেন, বৈশ্বানর আত্মার অংশগুলিকে আপনারা বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিতেছেন, স্বর্গলোক এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সূর্য্য ইঁহার চক্ষু, বায়ু ইঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, ইত্যাদি। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, এই বৈশ্বানর আত্মা কি? বৈশ্বানর শব্দে জঠরাগ্নি, সাধারণ অগ্নি, বা দেবতাবিশেষ বোঝায়; আত্মাশব্দ জীব এবং পরমাত্মাকে বোঝায়। কিন্তু এ স্থলে বৈশ্বানর আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে। যদিও বৈশ্বানর এবং আত্মা এই দুইটি শব্দ উল্লিখিত বস্তুগুলির নির্দ্দেশক "সাধারণ শব্দ", তথাপি এখানে এই দুইটি সাধারণ শব্দের "বিশেষ" আছে; কারণ, উপনিষদ বলিয়াছেন যে, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, তাঁহাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ইত্যাদি। এই "বিশেষ" হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া "বৈশ্বানর আত্মা" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, এই শ্রুতিবাক্যের প্রারম্ভে আছে "কিং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা জানিবার জন্যই পণ্ডিতগণ অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন এবং অশ্বপতি বৈশ্বানর আত্মার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বৈশ্বানর আত্মাই ব্রহ্ম।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, বৈশ্বানর শব্দ অগ্নি এবং বিষ্ণু উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে ("সাধারণ"), কিন্তু বৈশ্বানর শব্দের সহিত আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে এবং আত্মা শব্দ বিষ্ণু সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়, অগ্নি সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ; এই বিশেষ আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, "বৈশ্বানর আত্মা" বিষ্ণুকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি (২৫)

স্মর্য্যমান অর্থাৎ স্মৃতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে বৈশ্বানর আত্মার যে রূপ উল্লিখিত হইয়াছে, স্মৃতিগ্রন্থে ব্রহ্মের সেইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে, এই শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য বিষয়, পরমাত্মাই। বিষ্ণুপুরাণ একটি প্রসিদ্ধ স্মৃতি * গ্রন্থ, তাহাতে আছে—

যস্য অগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা
খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে
তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ।

অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার পাদ, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিক্ যাঁহার কর্ণ, সেই সর্ব্বলোকাত্মক ভগবানকে প্রণাম।

রামানুজ বলিয়াছেন, অন্যত্র শ্রুতি এবং স্মৃতিতে পরমাত্মার এই প্রকার রূপ স্মর্য্যমাণ হয়, স্মরণ করা যায়, অতএব এখানেও পরমাত্মার প্রসঙ্গ হইতেছে বুঝিতে হইবে।

মধ্ব এখানে গীতার নিম্নলিখিত বাক্যকে "স্মর্য্যমাণ" বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ

"আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া থাকি।"

শব্দাদিভ্যঃ অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ অসম্ভবাৎ পুরুষমপি চ এনমধীয়তে। (২৬)

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যে শ্রুতিবাক্য আলোচনা হইতেছে, তাহাতে বৈশ্বানর শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে না— "শব্দাদিভ্যঃ," কারণ, বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পরমাত্মা নহে, বৈশ্বানরে আহুতি দিবার উল্লেখ আছে, অতএব এখানে অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। "অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ"—এই বৈশ্বানর দেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এরূপও উল্লেখ করা হইয়াছে। "ইতি চেৎ" যদি এরূপ আশঙ্কা করা যায়,

* বেদ শ্রুতি। তদ্ভিন্ন যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ স্মৃতি।

"ন" না, সেরূপ আশঙ্কা করা যায় না। "তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ" জঠরাগ্নিতে পরমাত্মারূপে দর্শন করিতে হইবে, এইরূপ উপদেশ আছে। "অসম্ভবাৎ" স্বর্গলোক বৈশ্বানরের মস্তক বলা হইয়াছে, জঠরাগ্নি সম্বন্ধে এই উক্তি সম্ভবপর নহে। "পুরুষমপি চ এনধীয়তে" এই বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ আছে; "স এব অগ্নির্বৈশ্বানরঃ যৎ পুরুষঃ" এই বৈশ্বানর অগ্নি হইতেছে পুরুষ। জঠরাগ্নিকে পুরুষ বলা যায় না।

অতএব ন দেবতা ভূতং চ (২৭)

এই সকল কারণেই বৈশ্বানর শব্দ এখানে দেবতা বা সাধারণ অগ্নিকে বুঝাইতে পারে না।

সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিঃ (২৮)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এখানে বৈশ্বানর শব্দে জাঠর অগ্নিরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইতেছে। কিন্তু জৈমিনি বলেন যে, এখানে কোনও উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রসঙ্গ হয় নাই, "সাক্ষাৎ অপি" নিরুপাধিক সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। "অবিরোধং" এইরূপ অর্থ করিতে কোনও বিরোধ নাই। বিশ্বস্য অয়ং নরঃ পুরুষ ইতি বৈশ্বানরঃ। সমগ্র বিশ্ব ইঁহার স্বরূপ এবং ইনি পুরুষ।

মধ্ব বলেন, জৈমিনির মত বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও ব্যাসেরও এইরূপ মত বুঝিতে হইবে।

অভিব্যক্তেরিতি আশ্মরথ্যঃ (২৯)

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি এখানে পরমেশ্বরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা হইলে জাঠর অগ্নিরূপ জগতের অংশমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন যে, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি সর্ব্বত্র সমান নহে, যেখানে অভিব্যক্তি সমধিক, সেইখানে তাঁহার উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ (৩০)

আচার্য্য বাদরি বলেন যে, ব্রহ্ম যদিও সর্ব্বত্র অবস্থিত, তথাপি তাঁহাকে হৃদয়ে অবস্থিত বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, হৃদয়স্থ মন দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করা হয় (অনুস্মৃতেঃ)।

রামানুজ বলেন, ব্রহ্মকে পুরুষের ন্যায় উপাসনা করিতে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রুতিতে আছে যে, এই ভাবে উপাসনা করিলে ব্রহ্মানন্দ পাওয়া যায়।

মধ্ব বলেন, এখানে অগ্নিতে বিষ্ণুকে স্মরণ করা হইতেছে।

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি (৩১)

জৈমিনি বলেন যে, শ্রুতির এরূপ অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, ব্রহ্মকে এইভাবে উপাসনা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্বপতি পণ্ডিতদিগকে উপদেশ দিবার সময় নিজের মস্তকাদি অবয়ব দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মেরও এইরূপ অবয়ব আছে, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, ইত্যাদি। দেবগণ ব্রহ্মকে এই ভাবে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

("সম্পত্তি—প্রাপ্তি")

রামানুজ বলেন, সম্পত্তি শব্দের অর্থ সম্পদুপাসনা। আহারের সময় প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুতে আহুতি দেওয়া হয়, এই আহুতিকে অগ্নিহোত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে, ব্রহ্মকে যজ্ঞের বেদী বলা হইয়াছে, ইত্যাদি।

মধ্ব বলেন, 'ব্রহ্মকে যে ভাবে উপাসনা করা হয়, উপাসক সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মকে অগ্নিভাবে উপাসনা করিলে অগ্নিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং অগ্নির মধ্যস্থ ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমনন্তি চৈনস্মিন্ (৩২)

জাবাল উপনিষদে ব্রহ্মকে মস্তকের উপরিভাগ এবং চিবুকের অন্তরালে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মকে প্রদেশবিশেষে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

রামানুজ বলেন যে, উপনিষদে ব্রহ্মকে উপাসকের দেহ-মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মধ্ব বলিলেন যে, অগ্নির মধ্যে ব্রহ্ম অবস্থিত, ইহা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সম্পূর্ণ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম, এ)।

২১

সংক্রামক ব্যাধির বিষাক্ত আবহাওয়া ছাড়িয়া ভয়ার্ত্ত মানুষ যেমন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করে, বিনয় বাবুও তেমনই কন্যাকে লইয়া কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই, কেবল এই বাড়ীটার দূষিত স্মৃতি হইতে সুহাসিনীকে দূরে লইয়া যাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, এই কথাটাই অঙ্কুশের মত তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া অনিশ্চিত ও নিরুদ্দেশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

সুহাসিনীও বাধা দেয় নাই। তাহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার শক্তি ছিল না। তা ছাড়া, পাশের বাড়ীটার দুঃসহ সামীপ্য তাহার অবসন্ন মনকে তুষানলের মত অহরহ দগ্ধ করিতেছিল। ওই বাড়ীটার দিকে চোখ পড়িলেই তাহার বুকের ভিতর হু হু করিয়া উঠিত, অথচ চোখে না পড়িয়াও উপায় নাই। তাই পিতার প্রস্তাবে সে আগ্রহের সঙ্গেই সম্মতি জানাইয়াছিল।

কিন্তু বিনয় বাবু যখন কলিকাতার বাস একবারে তুলিয়া দিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন সুহাসিনী জোরের সহিত বলিল,—"না, তা হ'তে পারে না। বাড়ী ছাড়া হবে না।" কাহারও অত্যাচারে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে, এ অপমানের গ্লানি এত বড় দুঃখের পরও সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।

সুহাসিনীর মনের ভাব বিনয় বাবু বুঝিলেন কি না, বলা যায় না, কিন্তু তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। বাড়ীওয়ালাকে ছয় মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়া, দরজায় তালা লাগাইয়া এক দিন অপরাহ্ণে পিতাপুত্রী বাহির হইয়া পড়িলেন।

মধুপুর ও দেওঘরে কিছুদিন কাটিল। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার জলহাওয়ায় সুহাসিনীর শরীর আরও ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতেছে দেখিয়া ভীত বিনয় বাবু সাঁওতাল পরগণা ত্যাগ করিয়া বেহার-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিজের শরীরও ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। সংসারের ভাবনা ভাবা যাঁহার কখনও অভ্যাস ছিল না, বৃদ্ধবয়সে এই দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও দুঃখের গুরুভার তাঁহার দেহ-মনকে যেন জাঁতায় পিষিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার পুরাতন হাঁপানির রোগ পুনঃ পুনঃ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তিনি নিজের দেহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সুহাসিনীর কথা ভাবিয়া তাহাকে কি করিয়া একটু সুস্থ দেখিবেন, এই চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া রহিলেন।

এইরূপ উদ্দেশ্যহীনভাবে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মাস তিন চার কাটিয়া গেল। দশ পনের দিনের বেশী কোথাও মন টেঁকে না, তাই নূতন নূতন স্থানের সন্ধানে ইঁহারা প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে সমস্ত উত্তর-ভারতটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যে বস্তুর সন্ধানে ফিরিতেছিলেন, সেই শান্তির দর্শন পাওয়া ত দূরের কথা, এই অবিশ্রাম যাযাবর-বৃত্তি তাঁহাদের মনকে আরও অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সুহাসিনীর মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু সে হাসি এতই নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ যে, তাহা দেখিয়া বিনয় বাবুর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িত। সুহাসিনী যে তাঁহাকে খুসী করিবার জন্যই হাসিবার চেষ্টা করিতেছে, এ কথা সরলচিত্ত বিনয় বাবুর কাছেও গোপন থাকিত না।

মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়া যাহারা দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে বিদেশে অজ্ঞাতবাস হয় ত শান্তিদায়ক হইতে পারে, কিন্তু নিজের মনের নিকট হইতে যাহারা পলাইতে চাহে, তাহাদের পক্ষে নিঃসঙ্গতা যে কিরূপ ভয়াবহ অবস্থা, তাহা যাহারা ভোগ করিয়াছে, তাহারাই জানে।

শারদীয়া পূজা কখন্ আসিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল, সুদূর-প্রবাসে বিনয় বাবু ও সুহাসিনী তাহা ভাল করিয়া জানিতেও পারিলেন না। হেমন্ত শেষ হইয়া শীত আসিল। তখন এক দিন সুহাসিনী হঠাৎ বলিল,—"চল বাবা, দেশে ফিরি।"

বিনয় বাবু ব্যাকুলভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাবি মা? তবে তাই চল,—এ আর ভাল লাগছে না।"

পিতার শীর্ণ মুখের এই আর্ত্ত আগ্রহ দেখিয়া সুহাসিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—"ঘুরে ঘুরে তোমার শরীরে যে কিছু নেই, বাবা, চল বাড়ী যাই।"

বিনয় বাবু নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"না না, আমার শরীরের জন্য ত ভাবনা নয়, তোকে সারাতে পারলুম না, এই দুঃখ। ভেবেছিলুম, নানা দেশ দেখে বেড়ালে তোর শরীরটাও ভাল হবে—"

চোখ মুছিয়া সুহাসিনী বলিল,—"না বাবা, আর পালিয়ে বেড়াব না। বাড়ী গেলে তোমারও শরীর ভাল হবে, আমিও ভাল থাকব। সেখানে করবী আছে—দীনবন্ধু কাকা আছেন—"

দীনবন্ধুর কথায় বিনয় বাবু বলিলেন,—"ভাল কথা, কাল দীনবন্ধুর একখানা চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানা অনেক যায়গা ঘুরে কাল এসে পৌছেছে।"

"কি লিখেছেন কাকাবাবু?"

"লিখেছে, বড়দিনের ছুটীতে সে কাশী আসবে, আমরাও যদি যাই, তা হ'লে দেখা হ'তে পারে।"

"তবে তাই চল বাবা, কাশী হয়ে বাড়ী যাওয়া যাক্। আজ ত ডিসেম্বর মাসের তেইশে।"

সেই দিনই যাত্রা করিয়া দুই জনে যথাসময়ে কাশী পৌছিলেন। কাশীতে পরিচিত লোকের অভাব ছিল না,—এক জন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন দীনবন্ধু বাবুরও সেইখানেই উঠিবার কথা, কিন্তু জানিতে পারা গেল যে, অকস্মাৎ স্ত্রী পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি এ যাত্রা আসিতে পারিলেন না।

বন্ধুর উপরোধে বিনয় বাবুকে দু'তিন দিন কাশীতে থাকিয়া যাইতে হইল। কাশী ছাড়িবার আগের দিন দুপুরবেলা তিনি সুহাসিনীকে লইয়া সারনাথ দেখিতে গেলেন। সেখানে যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্ব-অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কিশোর ও করবীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিবার পর সুহাসিনী যখন টলিতে টলিতে বিনয় বাবুর কাছে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া বিনয় বাবু ভয় পাইয়া গেলেন। কিন্তু কোন কথা উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই সুহাসিনী ক্লিষ্ট-স্বরে বলিল,—"বাবা, ভারি শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে। ফিরে চল।"

সমস্ত পথটা বিনয় বাবু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিতে করিতে ও দুর্ব্বল সুহাসিনীকে এইখানে টানিয়া আনার জন্য পরিতাপ করিতে করিতে গেলেন। সুহাসিনী কিন্তু কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, পিতার সব কথা তাহার কাণেও গেল না। আজ এই অজ্ঞাতস্থানে কিশোর ও করবীর সঙ্গে এমনভাবে দেখা হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল? তাহারা দুজনে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার একটিমাত্র অর্থ হয়—দ্বিতীয় অর্থের অবকাশ নাই! কিন্তু সাধারণের সহজগম্য প্রকাশ্য স্থানে এরূপ কার্য্যে নির্লজ্জতা কিশোরের পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে, করবী তাহাতে যোগ দিল কি করিয়া? ঘৃণায় সুহাসিনীর শরীর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ব্যভিচারীরা কি স্থান অস্থান বিচার করে না? তাহাদের প্রবৃত্তি কি এতই প্রবল যে, দুর্নীতির আচরণে সাধারণ লোকলজ্জাও তাহারা স্বচ্ছন্দে বিসর্জ্জন দিতে পারে?

কিন্তু করবী? করবীকে সে ছেলেবেলা হইতে জানে। বিলাতী স্কুলে পড়ার ফলে সে একটু চটুলস্বভাব ও ফাজিল হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু মন্দ সে ত নহে। তবে কি তাহার সরল প্রকৃতির সুযোগ বুঝিয়া একটা বিবেকহীন লম্পট তাহার সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টা করিতেছে? করবী ও কিশোরের বাহুবদ্ধ যুগ্মমূর্ত্তির চিত্র তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। উঃ, কি নির্ভরশীলতাই করবীর আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর কিশোরের মুখে কোন্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল? নিষ্ঠুর শিকারী মনই কপট উৎকণ্ঠার ভাব দেখাইয়াই বুঝি নির্ব্বোধ নারীকে নিজের ফাঁদে টানিয়া আনে।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সুহাসিনী বাসায় গিয়া পৌছিল এবং একেবারে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া সে মন হইতে এই চিন্তাটাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রক্তপায়ী জোঁকের মত তাহারই মর্ম্মরুধিরে স্ফীত হইয়া চিন্তাটা তাহার মনে জুড়িয়া রহিল। যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল,—কেন এমন হয়? যাহার সহিত চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে, যাহাকে সে দুর্নীতি-পরায়ণ চরিত্রহীন বলিয়া জানে, তাহাকে অন্য স্ত্রীলোকের সহিত দেখিয়া তাহার অন্তর্দাহ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিতেছে কেন? সে লম্পট, সে যদি স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? এবং তাহারই বা কি আসে যায়? এমন ত পৃথিবীতে কত হইতেছে।

তবে কি শুধু করবীর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই তাহার এই অন্তর্দ্দাহ ?

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে একটা সঙ্কল্প করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। করবীকে সাবধান করা দরকার। মুখে চোখে জল দিয়া বেশভূষার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া বিনয় বাবুর কাছে গিয়া বলিল,—"চল বাবা, করবীর মামার বাড়ী বেড়িয়ে আসি। কাল ত আর দেখা করবার সময় হবে না। হয় ত করবীরাও এসে থাকবে।"

সুহাসিনীর শরীর লক্ষ্য করিয়া বিনয় বাবু দু'একবার আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া শেষে গাড়ী ডাকাইয়া দুই জনে বাহির হইয়া পড়িলেন। করবীর মামার বাড়ীর ঠিকানা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, করবী ও প্রমদা বাবু সম্প্রতি আসিয়াছেন। প্রমদা বাবু বাড়ী আছেন বটে, কিন্তু করবী সারনাথ দেখিতে গিয়াছে, তখনও ফিরে নাই। বিস্মিত ও আনন্দিত বিনয় বাবু বৈঠকখানায় প্রমদা বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, সুহাসিনী অন্দরমহলে গেল। করবীর মা তাহাকে হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। করবীর মামীদের সঙ্গে সুহাসিনীর পরিচয় ছিল না, তাঁহাদের সঙ্গেও আলাপ হইল। করবীর মা সুহাসিনীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া গভীর সমবেদনার সহিত বলিলেন,—"শরীরে যে তোর কিছু নেই, সুহাস। এত দেশ বেড়ালি, তবু শরীর সারল না ?"

মলিন হাসিয়া সুহাসিনী শুধু ঘাড় নাড়িল। করবীর মা ভিতরের সব কথাই জানিতেন, তাই কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিশোর ও বিমলা যে এখানে আছে, তাহা সুহাসিনী জানে না; তাহারা ফিরিলে অন্ততঃ বিমলার সহিত সুহাসিনীর সাক্ষাৎ অনিবার্য্য। তখন কি ঘটিবে, এই ভাবিয়া তাহার মন সঙ্কোচ ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল, পরক্ষণেই করবী দ্রুতপদে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেক দিন পরে দুই সখীতে দেখা, কিন্তু কেহই সহজভাবে সম্ভাষণ করিতে পারিল না, কোথায় যেন বাধিয়া গেল। অপ্রতিভ ও ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর করবী জোর করিয়া হাসিয়া সুহাসিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"হাসি-দি, কদ্দিন পরে তোমাকে দেখলুম, ভাই! মনে হচ্ছে যেন পাঁচ বছর।"

সুহাসিনী অল্প হাসিল, কিন্তু করবীর কথাগুলা যে সহজ এবং স্বচ্ছন্দ নয়, বরং জোর করিয়া সহৃদয়তা দেখাইবার চেষ্টা, তাহা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়া সুহাসিনীর বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। তবু সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরে বলিল,—"সারনাথ দেখতে গিয়েছিলি, আগে দেখিস নি বুঝি ? কেমন দেখ্‌লি ?"

"বেশ ভাল। চল এখন আমার ঘরে।" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে নিজের ঘরে লইয়া চলিল।

নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সুহাসিনীকে খাটের উপর বসাইয়া করবী অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে একটা বুকভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'ধন্যি মেয়ে তুমি! এস, একটু পায়ের ধুলো নি।" বলিয়া সত্য সত্যই হাত বাড়াইয়া সুহাসিনীর পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল।

বিস্মিত হইয়া সুহাসিনী বলিল,—"ও আবার কি! ও কি করছিস ?" করবী পূর্ব্বের মত আবার জোর করিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল,—"কিছু না। তোমার পায়ের ধুলো নিলে পুণ্যি হয়, তাই একটু নিলুম। বোসো, এই কাপড়-চোপড়গুলা ছেড়ে ফেলি, ভাই।"

করবী কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, সুহাসিনী চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অন্তরের সত্যকার কথাটা গোপন রাখিবার জন্যই করবী এত বাজে বকিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই,—কিন্তু তবু সুহাসিনীর মনে একটা খটকা বাজিতে লাগিল। সে যাহা সন্দেহ করিয়াছে, তাহা নহে, করবী যেন অন্য কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

নিঃসংশয় হইবার উদ্দেশ্যে সুহাসিনী এক সময় জিজ্ঞাসা করিল,—"একলা সারনাথে গিয়েছিলি, না সঙ্গে আর কেউ ছিল ?"

করবীর মুখখানা হঠাৎ জবা-ফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। সে একটা গরম জামা পরিয়া তাহার বুকের

বোতাম লাগাইতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল,—"এ দিকের শীত কি বিশ্রী দেখেছিস ভাই, যেন হাড় পর্য্যন্ত কালিয়ে দেয়। কলকাতার শীত অন্যরকম—বেশ মোলায়েম। তুই যাই বলিস, আমার কিন্তু এত শীত ভাল লাগে না। ভাল জামা-কাপড় পরবার জো নেই ; দেখ্ না, এই মোটা গরম জামাটা গায়ে দিয়েও শীত ভাঙ্গে না"—বলিতে বলিতে সে যেন সুহাসিনীর প্রশ্নটা শুনিতেই পায় নাই, এমনইভাবে তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

সুহাসিনী স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"কি হয়েছে তোর ?"

"কি হবে আবার! কিছু না"—করবী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্য একটা প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা করিল। কিন্তু সুহাসিনী হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিল,—"কিছু না, তবে অমন করছিস কেন ? আমার পানে চোখ তুলে তাকা দেখি।"

করবী চোখ তুলিয়া তাকাইল বটে, কিন্তু সুহাসিনীর চোখের সহিত বেশীক্ষণ চোখ মিলাইয়া রাখিতে পারিল না। চোখ আপনি নত হইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই সে হঠাৎ সুহাসের কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আত্মনিগ্রহ এবং পরকে প্রতারণা একসঙ্গে আর তাহার দ্বারা সম্ভব হইল না।

সুহাস দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"কি হয়েছে, আমায় বল্।"

উঠিয়া করবী ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া ভারী গলায় বলিল,—"হাসিদি, পুরুষের হাতে তুমিও কম লাঞ্ছনা সহ্য করনি, কিন্তু আমার লজ্জা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। পুরুষের কাছে ভিক্ষে চাইবার দুর্ম্মতি ত তোমার কখনও হয়নি।"

সুহাসিনীর মুখ শাদা হইয়া গেল, সে দুই হাতে করবীর হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল,—"কি বলছিস, স্পষ্ট ক'রে বল।"

করবী তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিল,—"এক জনের কাছে যেচে ভালবাসা চাইতে গিয়েছিলুম। সে তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে ; ভিক্ষে যে চাইলেই পাওয়া যায় না, তা বুঝিয়ে দিয়েছে।—হাসিদি, আজ আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে, কেন আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল ? আমি যেচে নিজেকে তার গায়ে ফেলে দিলুম আর সে আমাকে নিলে না। আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ ত হাসিদি, সত্যিই কি আমি ফেলে দেবার মতন ? কিছু কি আমার নেই ?" অশ্রুসিক্ত মুখখানা করবী সুহাসিনীর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

সুহাসিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখে ভাল দেখিতে পাইল না। কিশোর তবে করবীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই লজ্জাই করবী এতক্ষণ লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তবে সারনাথের সেই মৃণ্ময়মূর্ত্তির সে যে অর্থ করিয়াছিল, তাহা ভুল! কিশোর করবীকে প্রলুব্ধ করে নাই। কিন্তু তবু সংশয় দূর হইল না, সে ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কে—কে সে, করবী,—সে তোকে নিলে না ?"

করবী বলিল,—"ম'রে গেলেও তার নাম বলতে পারব না। তুমি কখনও জানতে চেয়ো না, হাসিদি! আমার ওপর যদি তোমার এতটুকু দয়া থাকে, ঐ লজ্জা থেকে আমাকে রেহাই দিও।"

কিন্তু রেহাই পাওয়া করবীর ভাগ্যে ছিল না। এই সময় সুরেন দ্বার ঠেলিয়া বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিল,—"করি দি, কিশোর বাবু চ'লে গেলেন, বৌদিদিও চ'লে গেলেন। এখান থেকে সটান আগ্রা যাবেন। কিশোর বাবু বল্লেন—ওঃ—" আর এক জন অপরিচিত স্ত্রীলোক করবীর নিকট বসিয়া আছে দেখিয়া সুরেন থামিয়া গেল। অপ্রস্তুতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

একবার নিমিষের জন্য সুহাসিনীর সঙ্গে করবীর চোখোচোখি হইল। তার পর করবী বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অসহ্য রোদনোচ্ছ্বাস দমন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

মৃন্ময় মূর্ত্তির মত সুহাসিনী বসিয়া রহিল। আর এক দিনের কথা তাহার স্মরণ হইল, যে দিন কলিকাতার ড্রয়িংরুমে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া সে দেখিয়াছিল—করবী তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিয়া আছে। অবস্থার আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু সুহাসিনী একটা হাত নাড়িয়াও সে দিনকার ঋণ শোধ দিতে পারিল না। তাহার মুখ হইতে সান্ত্বনা বা সহানুভূতির বাণী যে বিদ্রূপের চাবুকের

মত করবীর গায়ে বাজিবে, তাহা বুঝিয়া সে নির্ব্বাক বেদনায় পাংশু রক্তহীন মুখে বসিয়া রহিল। কেবল তাহার দুই চক্ষু বহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

২২

শুক্তির অন্তরস্থিত মুক্তার লোভে সমুদ্রে ডুব দিয়া যাহারা শূন্য ঝিনুকটা হাতে করিয়া কূলে ফিরিয়া আসে, অনুপমচন্দ্রের অবস্থাটা প্রায় তাহাদের মত হইয়াছিল। কিশোরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজিত ভূমি দখল করিতে গিয়া সে দেখিল, দখল করিবার মত কিছুই নাই,—যাহা ছিল, যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অনুপম ভাবিয়াছিল, ধাক্কা খাইয়া সুহাসিনীর মন তাহার দিকেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহা যখন হইল না, বরঞ্চ বিপরীত ফলই দেখা গেল—তাহার প্রতি সুহাসিনীর চিত্তের বিরূপতা আরও গভীর ও অন্তর্মুখী হইয়া অস্থিমজ্জায় আশ্রয় লইল, তখন ব্যর্থ ও ক্রোধান্ধ অনুপমও তাহাকে যে কোন প্রকারে পাইবার জন্য মনে মনে জিদ ধরিয়া বসিল। যতই মনে হইতে লাগিল, সুহাসিনীর মন সে কোন দিন পাইবে না, পাইবার আকাঙ্ক্ষা ততই তাহার উগ্র ও দুর্নিবার হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ দিকে অনুপমের জননী হেমাঙ্গিনী কিন্তু উল্টা সুর ধরিলেন। এক-দিন তিনি অনুপমের সঙ্গে সুহাসিনীর বিবাহ ঘটাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, সে জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু সে মেয়ে আর এক জনকে ভালবাসে বলিয়া জানাজানি হইয়া গিয়াছে এবং যাহাকে লইয়া এত বড় একটা প্রকাশ্য সামাজিক কেলেঙ্কারি ঘটিয়া গেল, তাহাকে পুত্রবধূরূপে কোন বর্ষীয়সী রমণীই কামনা করে না—তা সে অন্য দিক দিয়া যতই লোভনীয়া হউক। অন্য পুরুষের হৃদয়হীন বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা করিয়া যে কুমারী দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে বধূরূপে ঘরে আনিবার মত উদারতা হেমাঙ্গিনীর ছিল না। তিনি এক দিন এই কথাটাই ইঙ্গিতে অনুপমকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অনুপমচন্দ্র মাতার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের পথে চলিতে লাগিল। তখন হেমাঙ্গিনী তাহাকে স্পষ্ট করিয়া, ধমক দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, পরের পরিত্যক্তা কন্যার পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার মত নির্লজ্জ নির্ব্বুদ্ধিতা অতি অল্পই আছে, ভাবিয়া দেখিতে গেলে সুহাসিনীকে পুনর্ভূ বলিলেও অন্যায় বলা হয় না এবং এত সত্ত্বেও সে যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে অন্ততঃ তিনি কখনই এরূপ বধূকে ঘরে স্থান দিতে পারিবেন না, অনুপম যেন অন্য ব্যবস্থা করে।

অনুপম তাহার পুরুষ-স্বভাব মাতাকে অত্যন্ত ভয় করিত, তাই ভিতরে গর্জ্জন করিতে থাকিলেও মুখে কোন কথা না বলিয়া মাতার অনুশাসন একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইল।

তার পর বিনয় বাবু কন্যাকে লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন, কিছুকাল আর তাঁহাদের কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না।

চারি মাস পরে হঠাৎ এক দিন অনুপম সংবাদ পাইল, বিনয় বাবু সকন্যা দেশে ফিরিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে ছুটিল।

মাত্র আগের দিন বিনয় বাবু আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, বাসার আসবাব-পত্র তখনও ভাল করিয়া গোছানো হয় নাই। অনুপম ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দীনবন্ধু বাবুও রহিয়াছেন।

বিনয় বাবু শীর্ণ অসুস্থ মুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"এস, অনুপম।"

অদূরে আর একটা চেয়ারে সুহাসিনী বসিয়াছিল, সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল। দীনবন্ধু কট্‌মট্ করিয়া একবার অনুপমের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ঘরের আবহাওয়া অনুকূল নহে বুঝিয়াই অনুপম যতদূর সম্ভব অপ্রতিভভাবে আসন গ্রহণ করিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একবার সুহাসিনীকেও বোধ করি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুহাসের দিকে চাহিয়া প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। মামুলিভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। ও-পক্ষ হইতে বিনয় বাবুই কেবল কথা কহিলেন, ঘরের আর দুই জন জোর করিয়া মুখ টিপিয়া বসিয়া রহিলেন।

এলোমেলোভাবে প্রায় মিনিট পনের আলাপ চলিবার পর বিনয় বাবু ক্লান্ত হইয়া থামিয়া গেলেন। তখন অনুপম

একলাই বাক্যালাপের চেষ্টাকে প্রাণপণে ঠেলিয়া লইয়া চলিল, কিন্তু পাঁচ জনের সম্মিলিত উদ্যমে যাহা স্বচ্ছন্দে চলে, একাকী তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া সহজ নহে। অনিচ্ছুক তিন জন শ্রোতাকে অনুপম তাহার জীবনে গত চারি মাসে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার অধিকাংশই একটানাভাবে বলিয়া গেল। কিন্তু কোন দিক হইতে লেশমাত্র উৎসাহ বা অনুমোদন না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত দম-ফুরাইয়া-যাওয়া কলের এঞ্জিনের মত তাহাকে চুপ করিতে হইল।

দীনবন্ধু ও সুহাসিনীর যত্নকৃত কঠিন নীরবতা অনুপমকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু এমন একটা আলোচনার বিষয়ও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না—যাহার মধ্যে এই দুই জনকে আকর্ষণ করিয়া আনা যাইতে পারে।

মিনিট দুই তিন চুপ করিয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া থাকিবার পর হঠাৎ একটা নূতন প্রসঙ্গের সূত্র পাইয়া সে বলিয়া উঠিল,—"পাশের বাড়ীর দরজায় তালা লাগানো দেখ্‌ছি। মহাপ্রভু গেলেন কোথায়? বাসা ছেড়ে দিয়েছেন না কি?"

বলিয়া ফেলিয়াই অনুপমকে অনুতাপ করিতে হইল। এ প্রসঙ্গ এরূপ সময় উত্থাপন করা যে ঘোরতর নির্ব্বুদ্ধিতার কায হইয়াছে, কিশোর বা তৎসম্পর্কীয় কোন কথা না বলাই যে সব দিক দিয়া শোভন ও নিরাপদ হইত, তাহা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিল। কিন্তু অনুভব করিলেও কথাটা ফিরাইয়া লইবার তখন আর উপায় ছিল না। সুহাসের মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতেছিল। দীনবন্ধু বাবু গভীরতর ভ্রূকুটি করিয়া নিজের মোটা লাঠিটার মুঠের দিকে চাহিয়াছিলেন, বিনয় বাবুর শীর্ণ মুখখানা যেন আরও পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তবু অনুপম চুপ করিয়া যাইতে পারিল না, সে মরিয়াভাবে ভুলের পথেই অগ্রসর হইয়া চলিল। পিছু হটিবার স্থান যেখানে সঙ্কীর্ণ, সেখানে একজাতীয় লোক বিপদ জানিয়াও গোঁ-ভরে সম্মুখদিকে চলে, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। অনুপমও কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া মুখখানাকে হাসি-হাসি করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"পালিয়েছে কি? যাক্, তবু ভাল, ভদ্রলোকের পাড়ায় যে ওসব চলে না, সেটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু গেল কোথায়?"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে সুহাস হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনুপমের মুখখানা নিজের অজ্ঞাতসারে কালো হইয়া উঠিয়াছিল, সুহাস চলিয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ হিংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে দীনবন্ধু বাবুর দিকে ফিরিল, মনের সমস্ত বিষ তাঁহার মাথার উপর উদ্গিরণ করিয়া দিয়া বলিল,—"আপনার সঙ্গে ত ভারি প্রণয় ছিল, রাত নেই, দিন নেই, যাতায়াত করতেন। আপনি জানেন, ভাজটিকে নিয়ে গেল কোথায়? বস্তি-টস্তিতে গিয়ে উঠেছে না কি?"

এবার দীনবন্ধু বাবু একবারে অগ্নিকাণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠিলেন,—"চোপরও বেয়াদব নচ্ছার কোথাকার! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।—বেরোও—বেরোও তুমি এখনি এ বাড়ী থেকে, নইলে দরোয়ান ডেকে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দেব।" বলিয়া তিনি হাতের স্থূল যষ্টিটা সজোরে মাটীতে ঠুকিতে লাগিলেন।

অনুপম চেয়ার হইতে ছিটকাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"কি! আমাকে আপনি বেরিয়ে যেতে বলেন! আপনি কে—হু আর ইউ! এ বাড়ী আপনার নয়, বিনয় বাবুর, সে কথা মনে রাখবেন।"

দীনবন্ধু লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন,—"এ বাড়ী আমার, এখানে আমি যা বলব, তাই হবে। তুমি এই দণ্ডে এখান থেকে বেরোও, ছোক্‌রা। ফের যদি কখনও মাথা গলাবার চেষ্টা করেছ, তা হ'লে তোমাকে চাব্‌কে লাল ক'রে দেব। যাও।"

বিনয় বাবু অসহায়ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়াছিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে কেবল বলিলেন,—"দীনবন্ধু! দীনবন্ধু!"

দীনবন্ধু ধমক দিয়া বলিলেন,—"আপনি চুপ করুন। এই শয়তানটাই যত নষ্টের গোড়া। সুরু থেকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে পাকিয়ে আজ আপনাদের এই অবস্থা করেছে—damned villain! আপনার যদি এতটুকু মনের জোর থাকত, অনেক আগেই এটাকে দূর ক'রে দিতেন। কিন্তু তা যখন আপনি পারবেন না, তখন আমাকেই এ

কায করতে হবে।—যাও, বিদেয় হও এখন।" বলিয়া অনুপমকে লাঠি দিয়া দরজা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

অনুপম তথাপি কি একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া তিনি একেবারে হুঙ্কার ছাড়িলেন,—"যাবে না? ভাল কথার কেউ নয় বটে! এই দরোয়ান! ইধার আও।"

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া অনুপম বলিল,—"আচ্ছা—এ অপমান আমি ভুলব না—আমিও দেখে নেব"—বলিতে বলিতে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

* * * *

দীনবন্ধু বলিলেন,—"আজ আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল। সেই দিন থেকে আমি আক্রোশ পুষে রেখেছিলুম—যে দিন ও কতকগুলো মিথ্যে কথা ব'লে আমার সুহাস মায়ীর মন ভেঙ্গে দিয়েছিল।"

বিনয় বাবু মাথা তুলিয়া বলিলেন,—"মিথ্যে কথা, দীনবন্ধু? তুমি বল্‌তে চাও মিথ্যে কথা—?"

"হ্যাঁ, মিথ্যে কথা, ওর এক বর্ণ সত্যি নয়। আর মিথ্যে কথা ব'লে এতখানি অনিষ্ট বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কেউ করেনি।"

"কিন্তু তার বাপের চিঠি—"

"বাপের ছেড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের চিঠি যদি থাকত, তবুও ও কথা মিথ্যে হ'ত কিন্তু সে ভেবে আর কি হবে বলুন, এখন ত আর কোন উপায় নেই।"

বিনয় বাবু একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, কিছুক্ষণ দু'জনেই মৌন হইয়া রহিলেন।

শেষে আর একটা শ্রান্তিভারাক্রান্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনয় বাবু বলিলেন,—"দেখ দীনবন্ধু, আমি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছি। কিন্তু সে জন্য ত ভাবি না, শুধু এই ভয় হয়, মেয়েটার কোনও বিধিব্যবস্থা না করেই যদি ম'রে যাই। তুমি দেখো দীনবন্ধু। জানো ত, তুমি ছাড়া আমার আপনার বলবার কেউ নেই।"

মৃদু তিরস্কারের সুরে দীনবন্ধু বলিলেন,—"এ সব আপনি কি যা তা বল্‌ছেন! শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে, তার পর মানসিক ক্লেশেরও অভাব নেই, তাই যত সব বাজে কথা মনে আসছে। ও চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন—এখনও দীর্ঘ জীবন আমাদের সামনে প'ড়ে রয়েছে।—আমি ত ও সব ভাবনা এখনও মনেই আনতে পারি না, আর আপনি আমার চেয়ে কতই বা বড় হবেন?—বড় জোর দু'তিন বছরের! এরি মধ্যে ও সব দুশ্চিন্তা কেন? শুধু রেলে ঘুরে ঘুরে শরীরটা কাহিল হয়ে পড়েছে বৈ ত নয়, দু'দিন পরে আবার দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে।"

বিনয় বাবু আস্তে আস্তে বলিলেন,—"তাই হবে বোধ হয়। ঘুরে বেড়ানোও ত কম হয়নি। তার ওপর সুহাসের জন্য মনটাও সর্ব্বদাই—"

"মৃত্যুর কথা ভাবলেই মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনা হয়। ও সব কথা যাক। আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আজ আর কায নেই, কাল থেকে আবার আমাদের পুরোনো ঈভ্‌নিং ওয়াক্ আরম্ভ করা যাবে। এখন বরঞ্চ আপনি কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম ক'রে নিন্ গে।" বলিয়া দীনবন্ধু সুহাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুহাস আসিলে বিনয় বাবু তাহার সঙ্গে দোতলায় নিজের শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলেন।

দীনবন্ধু আরও কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিলেন, তার পর লাঠিটা তুলিয়া লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই মৃদু কণ্ঠের "কাকাবাবু" শুনিয়া চকিতে ফিরিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী কখন্ নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সুহাসমায়ি! কি মা?"

সুহাসিনী তাঁহার চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল দেখা গেল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে যেন কথাগুলা গুণিয়া গুণিয়া বলিল,—"কাকাবাবু, আপনার কি মনে হয়, আমি ভুল করেছি?"

প্রথমে দীনবন্ধু প্রশ্নটা ঠিক ধরিতে পারিলেন না, তার পর বুঝিতে পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ মা, ভুল করেছ। বড্ড ভুল করেছ।"

সুহাসের নিকট হইতে অস্ফুট শব্দ আসিল,—"কিন্তু—"

দীনবন্ধু বলিলেন,—"ওর মধ্যে কিন্তু নেই, সুহাস। ভালবাসা আর বিশ্বাস—এ দুটো জিনিষ আলাদা করা যায় না। তুমি আলাদা করবার চেষ্টা করেছিলে, তাই আজ

এত কষ্ট পাচ্ছ। ভেবে দেখ, আমরা ত আদালত নই যে, সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তবে যাকে ভালবাসি তাকে বিশ্বাস করব। আর যে-বিশ্বাস দু'টোর বিরুদ্ধে তুমি যে-প্রমাণ পেয়েছিলে, আমিও ত তাই পেয়েছিলুম, কিন্তু আমি সে কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না কেন?"

সুহাসিনী রুদ্ধনিশ্বাসে নীরব হইয়া রহিল।

দীনবন্ধু বলিতে লাগিলেন,—"আমি জানি, কিশোর কখনও ও কায করতে পারে না, তাই হাজার প্রমাণেও আমাকে টলাতে পারেনি। মা, তুমি ছেলেমানুষ,—কিন্তু আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে, জীবনের অভিজ্ঞতাও কম সঞ্চয় করিনি। আমি জানি, মানুষের চেয়ে তার বিরুদ্ধে প্রমাণকে যারা বিশ্বাস করে, শেষ পর্য্যন্ত তাদের ঠকতে হয়। কিশোরকে আমি চিনি, তাই, যদি তাকে স্বচক্ষে ব্যভিচার করতে দেখি, তবু আমি আমার চোখকেই অবিশ্বাস করব, তাকে অবিশ্বাস করতে পারব না।"

"কিন্তু কাকা—"

দীনবন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"থাক সুহাস, আর নয়। বিশ্বাস কাউকে জোর ক'রে করানো যায় না, আমিও সে চেষ্টা করব না, আমি শুধু নিজের বিশ্বাসের কথা তোমায় বললুম। কিশোরকে আমি ভালবাসি, তাই আমি তাকে বিশ্বাস করি। আর ঐ মেয়েটি—বিমলা, ওকেও আমি ভালবাসতে শিখেছি। আমি জানি, ওদের ভিতরের সম্বন্ধ ভাই-বোনের মত পবিত্র। না—তার চেয়েও বেশী, কারণ, ওদের মধ্যে সত্যিকারের কোন সম্বন্ধ নেই। যে যাই বলুক, ওদের বিষয়ে কোনও কুৎসাই আমি কোন দিন বিশ্বাস করতে পারব না।"

একটু চুপ করিয়া বলিলেন,—"ওদের ওপর আমার কতখানি আস্থা, তা তোমাকে বোঝানো শক্ত। আমার যদি নিজের মেয়ে থাকত, আমি তাকে কিশোরের হাতে দিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করতুম।" এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দীনবন্ধু বাবুর শেষ কথাগুলির মধ্যে যে কতখানি অভিমান নিহিত ছিল, তাহা সুহাসিনী বুঝিল। তাহার বুক ছিঁড়িয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইল। দুহাতে মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া সে দীনবন্ধু বাবুর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কাশীতে করবীর সহিত দেখা হইবার পর তাহার নিম্নাভিমুখী মন ধাক্কা খাইয়া ভিন্ন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সন্দেহের বিষ এমনই মারাত্মক বস্তু যে, একবার কোনক্রমে মনকে আশ্রয় করিলে সেখান হইতে তাহাকে তাড়ানো অতিবড় চিত্তবলশালী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তাই দীনবন্ধু বাবুর কুণ্ঠাহীন, বিচারহীন বিশ্বাসের কথা শুনিয়াও তাহার মন শান্তি পাইল না, বরঞ্চ অনিশ্চয়তার যন্ত্রণায় আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এল)।

নিষ্ফলতা

ব্যর্থ মোর নারী-জন্ম, হে নিয়তি-নিয়ন্তা আমার।
জীবন যৌবন ব্যর্থ, ব্যর্থতায় হইবে মরণ,
বুভুক্ষু এ বক্ষে তুলি' দাও শুদ্ধ একটি রতন—
পুত্র হোক্, হোক্ কন্যা, নাহি ভেদ, না করি বিচার;

পূর্ণ কর পুণ্য-রসে পরাণের অপূর্ণ ভাণ্ডার,
ধন্য হোক্ বিধুমুখে ঢালি সুধা এ যুগল স্তন,
উঠুক্ কৌস্তভ মম দেহ-সিন্ধু করিয়া মন্থন,
পরম বেদনে হোক্ অন্ত মোর অনন্ত ব্যথার;

আয় আয় ওরে আয় কোথা তুই তপস্যা-দুর্লভ!
কেন আসিবি না বল্—অভিমান কিসের রে তোর?
দিব আয় যাহা চাস্—অযাচিত অমূল্য বৈভব—
অনাগত, অতীত ও বর্ত্তমান সমুদয় মোর!

দিব তোরে দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত রূপের গৌরব,
আলো হয়ে এস মোর নিষ্ফলতা-নিশি করি ভোর।

শ্রীমতী তুলসীরাণী আঢ্য।

হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

"নগুনা"—এই গ্রামে পৌঁছিতেই পাহাড়ী বালক-বালিকারা আজ প্রথম আমাদিগকে পাইয়া বসিল। "বদরী-বিশাল কী জয়" "গঙ্গোত্রী মায়ী কী জয়, "যমুনোত্রী মায়ী কী জয়" সমস্বরে এই রবের সহিত কেহ কেহ "সুঁই তাগা দেও," কেহ বা "লাল ডুরী দেও" ইত্যাদি প্রার্থনায় আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিল কতটুকু সামান্য দ্রব্যের আশায় এই কাকুতি-মিনতি! যে সুঁই (সূচ) আমাদের দেশে এক পয়সায় বিশটি পাওয়া যায় অথবা এতটুকু লাল সূতা, যাহা যেখানে সেখানে অবহেলায় পড়িয়া থাকে, সেই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যেরই এখানে এত আদর! এই অদ্ভুত দান কাহাকেও দিতে গেলে সে একেবারে আনন্দে গদ্‌গদচিত্ত, সব প্রার্থনাই যেন তাহার পূরণ হইয়াছে। এই সামান্য দ্রব্যের জন্য এখানকার যুবতীরা পর্য্যন্ত অকপট-চিত্তে হাত পাতে! মনে পড়িল, দেশের, বিশেষ করিয়া কাশীবাসী ভিখারীর দল—যাহাদের বলিতে কি, দিবাভাগে প্রায় সত্রে সত্রে আহারের ব্যবস্থা থাকে, অধিকন্তু সত্রাধ্যক্ষ মহাশয়দের নিকটে ইহাদের বেশ কিছু সঞ্চিত অর্থ বিদ্যমান। এই শ্রেণীর ভিক্ষুকের এমন কি, রাত্রিতে পর্য্যঙ্ক ভিন্ন স্বচ্ছন্দ শয়ন চলে না! ইহাদের হাত পাতিবার "ঢং" আর এই নিরক্ষর অল্পে সন্তুষ্ট পাহাড়ীদের অকপট প্রার্থনায় কতদূর প্রভেদ, আজ তাহা বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল।

এখানকার ধর্ম্মশালাটি দ্বিতল, উপরে তিনখানি ঘরের মধ্যে একটি ঘর খালি ছিল। সেখানেই রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বদিকে গঙ্গা এবং পশ্চিমদিক হইতে সম্মিলিত একটি সুবৃহৎ ঝরণা এই উভয়েরই জলধারার নিরন্তর ঝরঝর শব্দ যাত্রিগণকে এখানে বিলক্ষণ উন্মনা করিয়া রাখে। গঙ্গোত্রীর দূরত্ব এখান হইতে প্রায় ৭৯ মাইল। পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে "ধরাসু" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দৃশ্য হিসাবে এ স্থান অতীব রমণীয়। প্রশস্ত গঙ্গাতটে কালী কমলী-ওয়ালার সুন্দর দ্বিতল ধর্ম্মশালা। সহজেই যাত্রিগণকে এখানে থাকিবার জন্য উল্লসিত করে। ধর্ম্মশালার ঘরগুলিও বেশ প্রশস্ত, বিশেষতঃ গঙ্গার দিকে এই ঘরগুলির সংলগ্ন লম্বা বারান্দা নির্ম্মিত হওয়ায় সেখান হইতে সম্মুখের দৃশ্য অতীব চমৎকার মনে হয়। ধূম্রবর্ণের পাহাড় ও তন্নিম্নে স্রোতস্বতীর চির-চঞ্চল উদ্দাম গতি দেখিয়া দেখিয়া আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে! উপর্য্যুপরি দুই দিনের বৃষ্টিপাতে ইতিমধ্যেই জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মধ্যাহ্নের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া এ দিনে এখানেই থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। অগত্যা ডাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালা কুলীর দল আজ ছুটী পাইল। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে সকল জিনিষই পাওয়া গেল; কেবল তরকারীর অভাবে, বিশেষ করিয়া আলু দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, সঙ্গে আনীত পাঁপরই আজ ডালের সহিত আহারের উপাদান-রূপে ব্যবহৃত হইল।

১০ বৈশাখ রবিবার প্রভাতে আমরা ধরাসু হইতে আগে চলিলাম। একটি ঝরণার পুল পার হইয়াই বাম ভাগে চড়াইয়ের পথে উপরে উঠিবার জন্য ভগবান্ সকলকে সাবধান করিয়া দিল। এখান হইতেই গঙ্গাতীর-সংলগ্ন নীচের রাস্তা ও গঙ্গাকে আমরা ছাড়িয়া দিয়া ভিন্নপথে যমুনোত্তরীর দিকে অগ্রসর হইলাম। আর ৪৮ মাইল আগে গেলেই যমুনোত্তরীর দর্শন পাওয়া যায়। শুনিলাম, এই পথ অতীব দুর্গম, যাহার জন্য যাত্রীরা (এমন কি হিন্দুস্থানীয় পর্য্যন্ত) সাধারণতঃ এ তীর্থে অগ্রসর হইবার সাহস করেন না। প্রথমেই আড়াই মাইল আন্দাজ চড়াই পড়িল। পথের দুই পাশেই অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গল। জঙ্গলে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদির মধ্যে আমাদের চিনিবার মত কেবল কোথায়ও আমলকীবৃক্ষে অজস্র আমলকী ফলিয়া রহিয়াছে, কোথায় লম্বা লম্বা চীরের গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, কোথায়ও বা তেকাঠার কণ্টকময় জঙ্গল, বেশীর ভাগ পথে ডালিমগাছের মত এক প্রকার গাছে হলুদে রংএর ছোট ছোট অজস্র ফুল আশপাশ আলো করিয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এই ফুলের নাম "কেশর"। ইহা হইতেই (?) কেশর বা জাফ্‌রাণ প্রস্তুত হয়। আবার স্থানে স্থানে পাহাড়ী গোলাপের কণ্টকময় লতাকুঞ্জ হইতে অজস্র গোলাপের সুমিষ্ট আঘ্রাণ, আগে যাইবার পথে আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়া তুলিল। এই

গোলাপের একটি করিয়া পাপড়ী, রং সাদা। এক একটি স্তবকে একসঙ্গে অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া থাকে। এইরূপ নূতন নূতন দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমরা ৪ মাইল দূরে "কল্যাণী" চটী অতিক্রম করিলাম। তার পর সেখান হইতে আরও ৪ মাইল অগ্রসর হইয়া "কুমরানা" নামক চটীতে পৌছিতে দ্বিপ্রহর অতীত হয় দেখিয়া সেখানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম এই চটীর অবস্থা আদৌ ভাল নহে। একটিমাত্র ঘর, তাহাতে আবার অর্দ্ধেকাংশে, দোকানদার জিনিষপত্র সাজাইয়া রাখিয়াছে, অপরাংশ যাত্রীর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "এ-পথে এইরূপ চটীই দৃষ্ট হইবে" ভগবান্ ও ফতেসিং উভয়েই আমাদিগকে এ কথা জানাইয়া দিল। গঙ্গোত্রীর পথে কালী কম্লীওয়ালার কেমন সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মশালা ও আশানুরূপ সুব্যবস্থা আর এই যমুনোত্তরীর সুকঠিন যাত্রাপথে একেবারেই তাহার অভাব কিজন্য, তাহা আমাদের মোটেই হৃদয়ঙ্গম হইল না। বলা বাহুল্য, দোকান-দারগণই যাত্রীর জন্য এই ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ঘরের নীচে উঠানের এক পার্শ্বে একটি বাতাবী লেবুর গাছ ও আরও একটু নীচে দু-একটি আপেল্ ও কমলা লেবুর গাছ শোভা পাইতেছিল। দোকানের এক পার্শ্বে কড়াইশুঁটি-ক্ষেতের উপরে হঠাৎ আমাদের সকলের নজর পড়িল। এত দিন পরে আহারকালে আজ নূতন তরকারীর আস্বাদ জুটিল। ইহা ছাড়া দোকানে গোলাকার ছোট ছোট মিছরীর আম-দানী দেখিয়া দেড় টাকা মূল্যে দেড়সের খরিদ করিয়া রাখিলাম। কি জানি, আগের পথে যদি না পাওয়া যায়। ধরাসুর বড় ধর্ম্মশালায় কাল যাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, এই দুর্গম পথে আজ তাহা সুলভ দেখিয়া সকলেই সেদিনকার মত খুসী হইয়াছিলাম। কেবল একমাত্র অস্বস্তি—দিনের বেলায় এ স্থানে অসম্ভব মাছির উপদ্রব। বলা বাহুল্য, প্রতিক্ষণে ইহা যেমনই বিরক্তিকর, আহারকালে তেমনই আবার ঘোরতর অসহ্য মনে হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালের পথে মধ্যে মধ্যে কেবল কয়েকটি ঝরণা এবং আগাগোড়া অগণিত চীব বৃক্ষের শন্‌শন্ আওয়াজের মধ্য দিয়াই চারি মাইল পথ চলিয়া আসিলাম। পাহাড়ী ব্যবসায়ীরা এ পথে ঝরণার ধারে ধারে এই সকল চীর বৃক্ষ হইতে তক্তা বাহির করিয়া জমা রাখিয়াছে। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার ধারা প্রবল হইয়া উঠিলে, এই তক্তাগুলিকে ইহারা স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিয়া নীচের দিকে সহজেই লইয়া যায়। এ ভাবে মজুরী বাঁচাইবার তীক্ষ্ণবুদ্ধি অবশ্যই পাহাড়ীদের পক্ষে প্রশংসার বিষয়, সন্দেহ নাই।

বেলা নয়টা আন্দাজ সময়ে আমাদের সম্মুখের এক প্রকাণ্ড চড়াইএর পথে, সকলেরই ক্ষিপ্রগতি ক্রমেই যেন মৃদু-মন্থরে পরিণত হইল। পাঁচ মাইলব্যাপী ভীষণ চড়াই! পথের শেষ নাই, এ দিকে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রও তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। ডাণ্ডিওয়ালা সওয়ার-স্কন্ধে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিছুদূর উপরে গিয়াই সওয়ার নামাইয়া রাখে, ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে। ক্ষীণ-শরীরা বৃদ্ধা দিদি পরিশ্রান্ত হইলেও সুরো চাকর এবং আমার সহিত অগ্রে অগ্রে চলিয়া আসিয়া, বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে এই চড়াইএর শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীদের আর আর সকলে—বিশেষভাবে দাদা ও বৌদিদি তখন চড়াইএর অর্দ্ধ-পথে ভগবান্‌কে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিতেছেন। ক্রমে ডাণ্ডিওয়ালাগণ সওয়ার লইয়া নিকটে পৌছিল। আজিকার পথে সওয়ারদিগের অবস্থাও কাহিল দেখিলাম। প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া বসিয়া এই যানমধ্যে ইঁহাদের শরীর আড়ষ্ট-প্রায়, তদুপরি চড়াই-পথে বার বার ইঁহাদিগকে লইয়া "উঠা-নামা" করার, অসহনীয় ধৈর্য্য, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্টপ্রদ এই বাহকদিগের শ্রম-জনিত শ্বাস-প্রশ্বাসের মুহুর্মুহু কাতরধ্বনি নীরবে শ্রবণ —ইঁহাদের পক্ষে সবদিক দিয়াই অস্বস্তির কারণ হইয়াছিল। জ্ঞাতি-পত্নী এইবার তাঁহার পরিবর্ত্তে দিদিকে সওয়ার হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "চড়াই-পথে আজ আপনার যথেষ্ট ক্লেশ হইয়া থাকিবে। আমারও শরীর একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় এখনকার উতরাই-পথে স্বচ্ছন্দেই পদব্রজে নামিয়া চলিব।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজিকার এ প্রস্তাব তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

এ দিকে এই শিখরদেশের অপর প্রান্তে পৌছিয়া কি দেখিলাম! দূরে চোখের সম্মুখে সারি সারি রজত-শুভ্র গিরিশৃঙ্গের নয়ন-মনোহর শোভা! মরি মরি, তুষারের ঢেউ দিয়া ইহাদের চিরোজ্জ্বল বিস্তৃতি একেবারে আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও এতটুকু

মলিনতা নাই, অভ্রভেদী হিম-গিরির দিগন্ত-প্রসারী এই রজত-মুকুট রৌদ্র-কিরণে তখন ঝলমল করিতেছিল। কিছু-ক্ষণের জন্য সকলেরই চক্ষু সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। এ মর-জগতের এক প্রান্তে প্রকৃতি যেন এ রূপ দেখিয়া, চাহিয়া চাহিয়া একবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এতটুকু শব্দ নাই, লোকালয় হীন এই পাহাড়ের সবই যেন সুষুপ্তির শান্তিময় ক্রোড়ে চিরদিনের জন্য সমাধি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে!

এইবার আমরা ধীরে ধীরে উতরাই-পথে নামিতে সুরু করিলাম। নীচের পথে ক্রমেই জঙ্গলের পর জঙ্গল ভেদ করিয়া বেলা ১৷৷টা আন্দাজ সময়ে ৪ মাইল দূরে "ডণ্ডাল-গাঁও"এ উপস্থিত হইলাম।

তখনও আর আর সঙ্গীরা পশ্চাতে রহিয়াছেন দেখিয়া ইত্যবসরে এখানকার ধর্ম্মশালার অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলাম। দুইখানি পাকা ঘর ও তৎসম্মুখে চারি হাত মাত্র প্রশস্ত একটু বারান্দাই যাত্রিগণের একমাত্র আশ্রয়। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ একখানি ঘরে পূর্ব্ব হইতেই সুরাট-দেশীয় যাত্রী আসিয়া দখল করিয়া রাখিয়াছে, আর একখানি ঘর তালাবন্ধ করিয়া রক্ষক মহাশয় কোথায় সরিয়া গিয়াছেন। সম্মুখ বারান্দায় ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম লইয়া দোকানের সন্ধানে বাহির হইলাম। একটু দূরে একখানি ছোট আট্‌চালা। তন্মধ্যে দোকানদার কেবল আটা, চাউল, অল্পমাত্র ঘৃত, ও চিনি এবং দু এক রকম মশলা রাখিয়াই যাত্রীর অভাব পূরণ করিতেছেন। "আমরা কয়জন যাত্রী," "কোন্ চটী পর্য্যন্ত আজ যাইতে হইবে।" ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় যতদূর বুঝিতে পারিলাম, এখানে স্থানাভাব, সুতরাং আহারান্তে আগের চটীতে গিয়া রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করাই তাহার মতে যুক্তিযুক্ত। রাত্রির বিশ্রাম সে ত পরের কথা, এখানে পেটের চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিন অন্নাহার জুটে নাই, তার পর কতক্ষণে আর আর সঙ্গীরা আসিয়া পৌছিবেন, বোঝাওয়ালারা আজ হয় ত অনেক পশ্চাতে আছে ইত্যাদি অনেক কথাই মনকে বিশেষ করিয়া তোলপাড় করিতেছিল। বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে দাদা, বৌদিদি, ভগবান প্রভৃতি সকলেই দেখা দিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সকলেই তখন ম্রিয়মাণ। থালা, ঘটী, বাটি, বগুনা প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই ত বোঝাওয়ালার স্কন্ধে। সে বোঝাওয়ালারা আজ কতক্ষণে আসিয়া পৌছিবে? সুখের বিষয়, আজ পথিমধ্যে অন্য কোন চটী নাই, সুতরাং নিশ্চয়ই তাহারা বরাবর এখানে আসিতেই বাধ্য হইবে। সকলেই একে একে নিঃশব্দে বারান্দায় উপবেশন করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে, "আজিকার চড়াই অতি সাংঘাতিক, যেন স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি" এ কথা দাদাকে জানাইলে তিনি জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ত স্বর্গের সিঁড়ি বলিয়াই ছাড়িয়া দিলে। আমার কিন্তু মনে হয়, এই কয় মাইল চড়াইএ আজ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এইরূপ চড়াই যদি আরও দুই মাইল বেশী পড়িত, তবে যুধিষ্ঠিরের মত আমাদেরও সশরীরে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভের অসুবিধা ঘটিত না।" অগ্রজের এই সময়োচিত উক্তিতে সকলেই সে সময়ে হাসিয়া উঠিলাম। সুরাটী যাত্রিগণ আমাদের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের ষ্টোভে প্রস্তুত গরম দুগ্ধ (দেড়সের আন্দাজ হইবে) আনিয়া খাইবার জন্য আমাদিগকে বারংবার অনুরোধ করিলেন। আমরা ইতস্ততঃ করিলেও দলের মালিক কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুরুষ কয় জন অর্থাৎ দাদা, আমি ও সুরো চাকরকে সম্মত করাইয়া তিনি (আমাদের পাত্রাভাব ছিল) তিনটি গ্ল্যাসে ভরিয়া সেই দুগ্ধ আমা-দিগকে খাইতে দিলেন। অগত্যা তাঁহার অনুরোধ অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইলাম। বেলা চারিটা আন্দাজ সময়ে বোঝাওয়ালা কুলীর দল আসিয়া পৌছিল। সে দিন সন্ধ্যাকালে দিনগত পাপক্ষয়ের মত একমাত্র খিচুড়ীই আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। তার পর নূতন চিন্তা, রাত্রিযাপনের স্থান কৈ? সুরাটী যাত্রীর কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত খুবই আলাপ হইয়াছিল। তিনি এক জন ধার্ম্মিক ও সদাশয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই। সঙ্গে স্ত্রীলোক দেখিয়া দোকানদারের অসম্মতিতেই তিনি পাশের ঘরটির তালা ভাঙ্গিয়া থাকিবার পরামর্শ দিলেন। অবশ্য উহাতে কোন আসবাবপত্রাদি নাই, এ কথা দোকানদার পূর্ব্বেই আমা-দিগকে জানাইয়া রাখিয়াছিল। বিদেশে অজানা পাহাড়ের মাঝখানে রক্ষকের সম্মতি না লইয়া তালা ভাঙ্গিয়া ফেলা নিরাপদ নহে মনে হইলেও, অন্যদিকে এতগুলি লোকের বরফের রাজ্যে উন্মুক্তস্থানে রাত্রিযাপন আরও বিপজ্জনক হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ জানিয়াও ইতস্ততঃ করিতেছিলাম;

ইত্যবসরে সেই সুরাটদেশীয় কর্ত্তামহাশয় নিজেই কর্ম্মচারী দ্বারা তালা ভাঙ্গিয়া আমাদের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। এইরূপে সে রাত্রি স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রত্যুষে চাবি ভাঙ্গিবার দণ্ডস্বরূপ দোকানদারকে চারি আনা পয়সা ইনাম দিয়া আগে যাত্রা করিলাম। সুরাটী যাত্রিগণ তৎপূর্ব্বেই আগেকার পথ ধরিয়াছেন। তীর্থযাত্রী সকলেই অবগত আছেন, সারাদিনের যাত্রা-পথের শ্রম যতই কঠিন ও গুরুতর হউক না কেন, রাত্রিতে বিশ্রামের পর, পরদিনে সে শ্রম আদৌ মনে থাকে না। তাহা না হইলে তাঁহারা এইরূপ দুরারোহ কঠিন পার্ব্বত্য-পথে প্রতিদিন একভাবে কখনই অগ্রসর হইতে পারিতেন না। বিশ্বপতির এ দয়া বড় সামান্য নহে। আমরা আড়াই মাইল আন্দাজ আগে আসিয়া "সিমল্" চটী পাইলাম।

যাত্রাপথের এক স্থান

পাহাড়ের একদম নীচে নদীর দৃশ্য

জিনিষ-পত্র সুলভ জানিয়া এখানে কিছু কিছু জিনিষ খরিদ করিয়া সঙ্গে লওয়া হইল। উৎকৃষ্ট ঘৃতের দর প্রতি সেরে এক টাকা পাঁচ আনা, অড়হর ও মুগের দাল যাহা অন্য যায়গায় বড় একটা পাওয়া যায় নাই, প্রতি সের যথাক্রমে চারি ও পাঁচ আনা মূল্যে সংগ্রহ হইল। তরকারীর মধ্যে আলু সুলভ, প্রতি সের দুই আনা মাত্র। কি জানি, আগের পথে যদি কিছু না পাওয়া যায়, সেই আশঙ্কায় আমরা প্রায় প্রত্যেক চটীতেই জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এইরূপে নূতন দ্রব্যের সন্ধান লইতাম এবং সম্ভবমত এই সকল দ্রব্য বোঝাওয়ালার স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

সিমল চটী হইতে দেড় মাইল আসিয়া "গঙ্গানি" এবং গঙ্গানি হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে "খরাদ" চটী অতিক্রম করিলাম। এই সকল চটীর অবস্থা ক্রমশঃই সাংঘাতিক মনে হইল। এখানে পূর্ব্বদিক হইতে আগত দুইটি ঝরণার পুল পড়ে। তার পর কতকটা চড়াই উঠিয়া আগে যাইতে হয়। বামধারে যমুনার স্বচ্ছ প্রবাহ-ধারা এখান হইতেই তরতর শব্দে পাহাড়ের দুকুল ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। জলের রং নীল, তবে কতকটা কালো আভা-মিশ্রিত বলিয়াই মনে হইল। এই পবিত্র স্রোতস্বতীর তটসংযুক্ত পাহাড়ের ধার দিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে, ক্রমান্বয়ে আমরা একের পর একে আগে চলিতেছিলাম। নদীর ওপারেও সেই আকাশ-চুম্বী বিরাট-দেহ পর্ব্বত সমানভাবে আমাদের সহিত আগে

দূর হইতে যমুনা নদী

গিয়াছে। ক্বচিৎ দু'একটি পাহাড়ী কৃষক আশে-পাশের কথঞ্চিৎ ক্ষেত্রভূমিতে সে সময় লাঙ্গল চষিতেছিল। যাত্রীর জন্য ইহারাই আবার কেহ গরম দুগ্ধ রাখে। দু এক স্থানে আমরা ইহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া সেবন করিলাম। নদীর দুই ধারে কেবলই বিস্তৃত প্রস্তর-খণ্ড—বেশীর ভাগ শ্বেতবর্ণের, কোনটি বা বেশী উজ্জ্বল দেখা

যাইতেছিল। জলের গতি উদ্দাম, বিশেষতঃ এই সকল প্রস্তরখণ্ডের আঘাত পাইয়া যেখানে এই নীল জল আবার উচ্ছলিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানকার দৃশ্য আরও মধুর, ও উপর হইতে মনে হইল, ঠিক যেন তুষারের কণা চোখের সম্মুখে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দূরে উত্তরভাগে ইহারই

নদীতটে পুষ্পবৃক্ষ

পাহাড়ের নীচে নদীর ধারের রাস্তা

উৎপত্তিস্থল পাহাড়ের মাথার উপরের তুষারশুভ্র শৃঙ্গগুলি সে স্থানের চিরন্তন মহিমা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কখনও উচ্চে, আবার কখনও বা নীচু পথে এই পবিত্র ধারার নিরন্তর কল-কল্লোল শুনিতে শুনিতে তিন মাইল পথ চলিয়া আসিলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা হইবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হওয়ায় এক প্রশস্ত ঝরণার ধারে একটি লম্বা 'ছপ্পর' দেখিয়া, আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না। এখানে স্নানাহার সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইলাম। এ স্থানের নাম "কুত্‌নৌর" বা "জগন্নাথ" চটী। চটীর তিন দিক খোলা, কেবল পশ্চাদ্‌ভাগে ও মাথার উপরে কাঁচা লতা-পাতা দিয়া ঘেরা একটু আচ্ছাদন আছে। আশেপাশে ঝরণার জল শতধা বিভক্ত হওয়ায়, ইহার জমী এতই সেঁত্‌সেঁতে ও আর্দ্র যে, দোকানদার বাধ্য হইয়া ইহাতে খড় বিছাইয়া যাত্রীর মনোরঞ্জন করিতেছে। রাত্রিতে এই প্রকার চটীতে বিশ্রাম অপেক্ষা উপরের উন্মুক্ত শুষ্ক স্থান বোধ হয় বেশী আরামপ্রদ। এইরূপ মনে করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ করিয়া আগে যাইতে উদ্যোগী হইলাম। ইতিমধ্যে এক দল হিন্দুস্থানী যাত্রী যমুনোত্তরী দর্শন করিয়া ফিরিয়া

নদীতটে বিস্তৃত উপলখণ্ড

আসিল। বলা বাহুল্য, তাহাদিগকে ঘিরিয়া অধৈর্য্যের মত আমরা রাস্তা সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলাম। উত্তরে তাহারা মোটামুটি ইহাই জানাইল ;—"এখান হইতে দশ মাইল অর্থাৎ—'হনুমান' চটী পর্য্যন্ত পথ একরূপ 'চলন-সই', উহার আগের পথ ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়াছে। সে সকল স্থানে খুবই সন্তর্পণে যাইতে হইবে, বিশেষ করিয়া রাস্তার এক স্থান শুধু যে বরফ-ঢাকা পড়িয়াছে, তাহা নহে, ধ্বসিয়া রাস্তার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে।" রাস্তার অবস্থা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাহারা আরও বলিল, "যমুনোত্তরীর চারি মাইল নীচেই 'মার্কণ্ডেয় আশ্রম'। সেখানে এক দিন থাকিয়া প্রাতঃকালের দিকে যমুনোত্তরী গিয়া দর্শন করত সেই দিনেই আবার ঐ আশ্রমে ফিরিয়া আসা উচিত। কারণ, সে স্থানের চারিদিকেই কেবল বরফ। রাত্রিতে এই বরফ বেশী জমিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দিলে, ফিরিবার

জন্য হয় ত সেখানে এই দুরন্ত শীতে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে ইত্যাদি।” তাহাদের নিকটে কেবল একটি সংবাদে আমরা আশ্বস্ত হইলাম, রাজার তরফ হইতে এই সকল স্থানের বরফ কাটিবার জন্য ইতিমধ্যেই অনেক কুলী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং যাত্রিগণের আর অধিক দিন ভয়ের কারণ নাই।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে আমরা এই জগন্নাথ চটী পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিলাম। আর দেড় মাইল আগে যাইতে পারিলেই—“যমুনা” চটী; সেখানেই আজ রাত্রি-যাপনের কথা আছে। জানি না, সে চটীর অবস্থা আবার কেমনতর! যমুনার তীরে তীরে এবারকার প্রায় এক মাইলব্যাপী পথ নানা-জাতীয় পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ দেখিলাম। সৌন্দর্য্যে ও সৌগন্ধে সকলেরই মন ভরপূর হইয়া উঠিল। কোথায়ও লাল, কোথায়ও পীত, আবার কোথায়ও বা শ্বেতবর্ণের এই অজস্র গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পরাশি এই নির্জ্জন পাহাড়তলী আলো করিয়া রাখিয়াছে। সাদা গোলাপের ত কথা নাই, স্তবকে স্তবকে ইহার শোভা অনুপম। সৌন্দর্য্যসম্ভারে শাখা-প্রশাখা অবনত করিয়া এক একটি বৃক্ষ যেন এক একটি কুঞ্জের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ সুমধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা যমুনা চটীতে উপস্থিত হইলাম। আজ সর্ব্বসমেত প্রায় ১০॥ মাইল পথ আসা হইল।

এখানে চারিটি ছপ্পর, তবে এ সকল ছপ্পরের চারি দিকেই বিলক্ষণ ঘেরা, দরজার স্থান কেবলমাত্র আবরণহীন। জমী প্রায় সমতল ভূমির উপরে, এজন্য কিছু সেঁত্সেঁতে থাকিলেও আমরা কিছু কিছু খড় (এ দেশের লোকে ‘পোরা’ কহে) সংগ্রহ করিয়া বিছাইয়া লইলাম। সম্মুখে দুই বিঘা আন্দাজ প্রশস্ত শ্যামশস্পশোভিত ময়দান চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া স্থানটির শোভা-সমূহ অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে মনে হইল। এক দিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া সেই যমুনার উচ্ছল উজ্জ্বল নীল-ধারা উদ্দাম-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। অপরাহ্ণকালীন সূর্য্যের শেষ রশ্মি তখন সর্ব্বত্রই—বিশেষ এই নীলজলের আশে পাশে আপনার বিদায়কালীন অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিতেছিল। নীচে নামিয়া আজ প্রথমে সকলেই যমুনার তুষার-শীতল জল স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। জলের দুই ধারেই, এমন কি, মধ্যে মধ্যেও নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড বিস্তৃত ছিল। কোনটি শ্বেত, কোনটি গভীর লাল, আবার কোনটি বা মার্ব্বেল পাথরের মত মসৃণ ও উজ্জ্বল। বুঝি বা কালো জলের আশেপাশে এইরূপ উজ্জ্বল চাক্চিক্যময় প্রস্তরখণ্ড না বিছাইলে সৃষ্টি-কর্ত্তার সৌন্দর্য্যের ‘ষোল কলা’ পূর্ণ হয় না! একটার পর একটি করিয়া আমরা এই নীল জলের মধ্যগত একটি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের বৃহৎ প্রস্তরোপরি আসন বিছাইয়া নীরবে সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিলাম। দুকূল-ভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাসের শব্দে কাণ যেন বধির হইয়া গেল। এই নির্ঝরিণীই ত নিস্তব্ধ পাহাড়কে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছে। বলা বাহুল্য, এখান হইতে কাহারও নড়িবার ইচ্ছা ছিল না। চক্ষু কেবল উদ্‌ভ্রান্তের মত এই নীল জলে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আত্মবিস্মৃত হইল। প্রকৃতির রমণীয় রাজত্বে সে দিনের সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের চলচ্চিত্র আজও যেন সজীব ও চির-নূতন হইয়া মনের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নারী—পাশ্চাত্য-সমাজে ও হিন্দু-সমাজে

বিগত ১৩৪০ সনের অগ্রহায়ণ মাসের "বসুমতীতে" দেখাইয়াছি যে, সাম্যবাদ প্রচলনের ফলে ধনীরাই সকল ধনোপায়ের প্রধান উপায়—ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাস করায় সমাজের অধিকাংশ লোকদিগকে তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীন দাস হইতে বাধ্য করিয়াছেন ও তাঁহাদিগের বিলাস-ভোগের আতিশয্য দেখিয়া সকলেরই সাধ্যাতিরিক্ত ভোগেচ্ছা উদ্দীপিত হইয়াছে এবং যখন দাসত্ব জোটাও ভার হয়, তখন তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না—ধনীদিগের অশেষ ভোগ-বাসনা পূরণের জন্য অনেক লোক সৈনিক ও নাবিকের কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। তজ্জন্য অনেকে বহুকাল বা চিরকাল বিবাহ করিতে পারে না। তজ্জন্য অনেক নারী বহুকাল বা চিরকাল বিবাহিতা হইতে পায় না এবং তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পুরুষ-দিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। যাহা নারীরা বাধ্য হইয়া করে, তাহাই তাহাদিগের স্বত্ব-প্রসার বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে নারীদিগকে সাম্যবাদের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধনীদিগের দাসত্বে নীত করা হইতেছে, তাহাও বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের "বসুমতীতে" দেখাইয়াছি।

পৃথিবীতে কোথাও দুইটি জিনিষ সমান নাই—এমন কি, একই কোষে উৎপন্ন বীজগুলি ঠিক এক নয়—বৈষম্য সর্ব্বত্রই জাজ্বল্যমান। মানুষে মানুষে কি রূপে, কি আকারে, কি শক্তিতে, কি প্রকৃতিতে, কি প্রবৃত্তিতে, কি কর্ম্ম-ক্ষমতায়, কি বুদ্ধিতে, কি বুদ্ধির প্রকারভেদে কোথাও অভিন্নতা নাই—সকল বিষয়েই বৈষম্য। সুতরাং সকল লোকই সমান, এই ভিত্তিতে সমাজগঠন বা রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপন করিলে, সকল সংখ্যা-বাচক চিহ্ন—১, ২, ৩ ইত্যাদি সমান ধরিয়া লইয়া অঙ্ক কষারই মত তাহা প্রমাদজনক হইতে বাধ্য—পাশ্চাত্যেরা তাহা দেখেন না। আমরাও ঐ গোড়ার কথাটাই ভুলিতেছি। পাশ্চাত্যেরা এই সাম্যবাদ ফরাসী-বিপ্লবকারীদিগের নবযুগের দান বলিয়া গর্ব্ব করেন—ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাও অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। এই সাম্যবাদ প্রচারের ফলে পাশ্চাত্যেরা এত উন্নত হইয়াছে মনে করেন। আমাদিগের জাতিভেদ-প্রথা—স্ত্রী-পুরুষের ভিতর সাম্য অস্বীকার—নারীদিগকে সকল কর্ম্ম করিতে না দেওয়া, নারীদিগের ও নিম্নস্তরের জাতিদিগের উপর অত্যাচার বর্জ্জন—সকল মানুষই সমান ধরিয়া না লইলে আমাদিগের কোন উন্নতি হইতে পারে না বুঝিয়াছেন এবং তজ্জন্যই স্ত্রীলোকদিগকে সকল কর্ম্ম করিতে দিতে চাহেন, তরুণ-তরুণীদিগকে একত্রে শিক্ষা দিতে চাহেন—হরিজন আন্দোলন হইতেছে—আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ প্রচলন ও সমর্থন হইতেছে—জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ভারতে যখন বহু সহস্রাব্দ পূর্ব্বে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'তৎ ত্বমসি' প্রচারিত হইয়াছিল, তখন আরও অধিক উচ্চভাবে ও ব্যাপক-ভাবে সেই সাম্যবাদই (doctrine of equality) প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং এই মতবাদ ভারতে বহু বহু পুরাতন—ইহাতে কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু যে সকল ঋষি অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জাতিভেদ প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন—স্ত্রী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিই এক জন প্রথম ও প্রধান অদ্বৈতবাদী এবং তাঁহারই প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রের উপর স্থাপিত, এখনও ভারতে প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত মিতাক্ষরা আইন। তাহার কারণ, ভারত-মনীষিগণ জানিতেন যে, সাম্যবাদ তত্ত্ব হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তাহা অপ্রযোজ্য। কোন লোকই কোন কালে রাজা ও প্রজা, ধনী ও নির্ধন, পণ্ডিত ও মূর্খ, দাতা ও প্রার্থী, ধার্ম্মিক ও পাপী—ইহাদিগের সহিত সমান ব্যবহার করে না—করিতেও পারে না—করিতে যাইলেও প্রমাদ ঘটে।

প্রকৃতিগত, বুদ্ধি-বিদ্যাগত, অবস্থাগত বৈষম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হয়—পাশ্চাত্যেরাও কার্য্যতঃ স্বীকার করেন, কেবল মুখে তাহা স্পষ্ট স্বীকার করেন না—কেবল লোক ভোলাইবার জন্য—অনেক সময়েই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাঁহারাই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বিজেতা ও বিজিতদিগের সাম্য কোথাও কি স্বীকৃত হইয়াছে ও তদনুরূপ কার্য্য কি কোথাও হয়? নিজেদের দেশে কতক বাহ্য সাম্য ব্যবহার আছে বটে—সকলকে সকল কর্ম্ম করার সুযোগ দেওয়া প্রকাশ্যে আছে বটে, কিন্তু গরীবরা অর্থাভাবে ফলতঃ সে সুযোগ লইতে পারে না। এইরূপ মৌখিক সাম্য স্বীকারে রাজনৈতিক নেতারাই সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিয়াছেন, ধনীরাই দেশের সকল ধন ও ধনোপার্জ্জনের উপায়গুলি আত্মসাৎ করিয়াছেন—সাধারণ লোকদিগকে তাঁহাদিগের দাসত্বে নীত করিয়াছেন—অনেকাংশেরই দুর্দ্দশার সীমা নাই। এখন এই সাম্যবাদের প্রতারণায় নারীদিগকে ভীষণভাবে প্রতারিত করিতে-ছেন—তাঁহাদিগের নারীত্বই পিষিয়া নিষ্কাশিত করিতেছেন।

পুরুষে পুরুষে যতটা সাম্য আছে, স্ত্রী ও পুরুষে তাহাও নাই। এই সাম্যবাদ ও অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে ধনী ও ধনোপার্জ্জন-কুশল ব্যক্তিরাই সকল ধন ও ক্ষমতা গ্রাস করিয়াছেন—তজ্জন্য নির্ধন ও অর্থোপার্জ্জনে অকুশল পুরুষরা নির্য্যাতিত হয়, তাহা ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "বসুমতীতে" দেখাইয়াছি। পুরুষ ও নারীতে প্রকৃতিগত বহু বৈষম্য আছে, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও তাহার ক্রিয়ারও বহু পার্থক্য আছে। তাহার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্মে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে নারীরা বিশেষভাবে নির্য্যাতিত হইতে বাধ্য।

১৩৩৮ সালের 'ভারতবর্ষে'র পৌষ সংখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, পুরুষ ও নারীর পার্থক্যই মাতৃত্বে, সুতরাং মাতৃত্বই নারীত্ব। তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতি-যোগিতায় করিতে হইলে তাহাদিগের মাতৃত্বের বিশেষ ব্যাঘাত হয়; সেই জন্য ঐরূপ কার্য্য করাতে তাহাদিগের নারীত্বই নষ্ট হয়, সুতরাং তাহাদিগের বিশেষ কষ্টদায়ক ও স্বাস্থ্য-হানিকারক।

পুরুষ ও নারীতে সাম্য স্বীকারী রুশিয়াতে, যেখানে যৌনতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা হইতেছে, সেখানে ঐ তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু বহু বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফল আলোচনা করিয়া আণ্টন নেমিলভ লিখিত "Biological Tragedy of woman" নামক একখানি পুস্তক সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। নারী-সমস্যা-সমাধান করিবার জন্য তাহা সকলের পড়া আবশ্যক।

ঐ পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, হ্যাভলক এলিস্ তাঁহার "Psychology of sex" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, (Vol VI P. 524)—"Sexual maturity is determined in woman by a precise biological event—the completion of puberty on the onset of menstruation." অর্থাৎ রজের আরম্ভই যৌন পরিপক্কতা নির্দ্দেশ করে—তাহা এই পুস্তকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা নব্যতন্ত্রী সংস্কারকদিগের অবগতির জন্য তুলিয়া দিলাম :—

"The first ovulation signifies sexual maturity and is the last link in the chain of important processes which began in her infancy. The sexual apparatus is now ready for service for the benefit of the race, making regular attempts to realise its potentialities." P. 105

"The well-known and most obvious sign of the onset of sexual maturity is the periodic bleeding from the sexual channel called menstruation or the menses." P. 106

ইহা হইতে দেখা গেল যে, নবতন্ত্রীরা পাশ্চাত্য দেশের রীতি দেখিয়া যে বলিয়া আসিতেছেন—১৬, ২০, ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া বিধেয় নহে—তাহা তাহাদিগের ও অপত্যদিগের স্বাস্থ্যহানিকারক, জীববিজ্ঞান শাস্ত্র তাহা কোনরূপে সমর্থন করে না, বরং রজঃ আরম্ভের পরই স্ত্রীদেহ মাতৃত্বের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে এবং তাহাদিগের রসগ্রন্থির স্রাবের ফলে প্রকৃতি তাহাদিগকে ক্রমাগতই মাতা হইবার জন্য প্ররোচিত করিতে থাকে। তজ্জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত জীবজগতে তৎকাল হইতেই স্ত্রী জন্তুরা গর্ভবতী হয়। সুতরাং তৎকাল হইতে মাতা হওয়াই প্রকৃতির নির্দ্দেশ। প্রকৃতির নিয়ম না মানিলে সকল বিষয়ে তাহার ফল অশুভজনক—এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম করিতে বলিবার সংস্কারকদিগের কোন অধিকার নাই—কোন যুক্তি এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহ দেখাইতে পারেন নাই। সহবাস-সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে কমিটী ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা রজঃ আরম্ভের পর মিলনের দোষাবহত্বের এক কপর্দ্দক মূল্যেরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—কেবল ভগবানের অপেক্ষা—প্রকৃতির অপেক্ষা অনেক অগাধ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র।

মাতৃত্বের অঙ্গ যখন পরিপক্ক হইল, তখন তাহা ব্যবহার করিতে দেওয়া বিধেয়—না দেওয়া হস্তপদাদি অঙ্গ ব্যবহার করিতে না দেওয়ারই মত স্ত্রীজাতিদিগের প্রতি অত্যাচার, সেই অত্যাচার পাশ্চাত্য নারীদিগকে বহুকাল সহ্য করিতে হয়। মাতৃত্বের অঙ্গগুলি ব্যবহারাভাবে তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রসগ্রন্থির ক্রিয়াও বিকৃত হয়, তজ্জন্য বহু স্নায়বিক ব্যাধি হয়,—যাহার ফল অনেক সময়ে নারীদিগকে আজীবনই ভুগিতে হয়। এই সময়ে তজ্জন্য অবিবাহিতা তরুণীদিগের হিষ্টিরিয়া, রজঃসংক্রান্ত নানা ব্যাধি, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, অজীর্ণ, অতিদূষ্য রক্তহীনতা, বুক ধড়পড়ানি ইত্যাদি নানা ব্যাধি হয়। তাহাদিগের মাতৃত্বের কার্য্য করিবার সহজ প্রবৃত্তি ও পটুতাই ক্ষীণ হইয়া যায়। যে কার্য্য যাহাকে করিতে হয়, অল্পবয়স হইতে করিতে আরম্ভ করিলেই তাহা সহজসাধ্য হয়, অধিক বয়সে ঐরূপ কর্ম্ম কষ্টকর হয়। পাশ্চাত্যদেশে সচরাচর অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই মাতার কার্য্য নারীদিগের অধিকাংশের পক্ষেই কষ্টকর হয় এবং সেই জন্য সচ্ছল অবস্থায় বিবাহিতা নারীরাও গর্ভ-নিরোধ প্রথা অবলম্বন করেন। এই মাতৃত্ব-নিরোধ প্রথা অবিবাহিত ও বিবাহিতা ও বিধবারা অবলম্বন করার ফলে জন্মসংখ্যা পাশ্চাত্য সকল দেশেই কমিয়া যাইতেছে, জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যাও অনেক দেশে কমিয়াছে, সুতরাং উহা সকল দেশের শাসকগণের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে। লোকসংখ্যা কম হওয়ায় দেশ রক্ষা করাও পরে অসাধ্য হইবে, সে ভয়ও হইয়াছে, তজ্জন্য ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও ইটালীতে গর্ভনিরোধ প্রথার ব্যবহার বন্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

যখন নারীরা মাতা হইবার উপযুক্ত হইল, তখন বিবাহিত না হইতে পাইলে তাহাদিগকে পুরুষদিগেরই মত অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়—পুরুষদিগের মত লেখা-পড়া শিখিতে হয়। কিন্তু নারীদিগের প্রত্যেক বার-মাসিক রজঃকালীন যে স্নায়ুর ক্রিয়ার বিপর্য্যয় হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে হইলে যেরূপ করা বিধেয়, তাহা হইতে পায় না। রজঃকালীন কিরূপ রসগ্রন্থির ও স্নায়ুর ক্রিয়া-বিপর্য্যয় হয়, তাহা ঐ Biological Tragedy of woman নামক পুস্তক হইতে কতক অংশ তুলিয়া দিতেছি এবং তাহা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

"The observations of Jorgenson, Rabuteau, Jacobi, Stevenson, Reinl, Schröder, Weber, Fleischer, Chagar, Chalbam, Reprev, Schicharoff, Prussak, Ver Eeke, Voicechovsky, Bielov and others have shown that during the process of menstruation the following changes are observed in woman.

(1) Lower bodily transperature (2) Increased radiation of heat from the skin' i.e. lower heat retention (3) Slower pulse (4) Lower blood pressure (5) Changes in the number of blood cells (erthrocytes, leucocytes &) (6) Changes in the lymphatic glands, tonsils and endocrines (7) Diminished protein matabolism which is indicated by the decreased excretion of urea and nitrogen in the urine (8) Diminished elimination of phosphates and chloride and the lowering of gascons metabolism (9) Poorer

digestion of proteins and fats (10) Changes in the mammary glands somewhat resembling those occuring in the beginning of pregnancy. (11) Decrease of respiratory capacity and certain changes in the larynx (12) Decrease of muscular and tendon reflexes. (13) Decreased power of mental alertness and concentration. (Ch VII P. 119-120)

এইরূপ শারীরিক ক্রিয়াবিপর্য্যয় সম্পূর্ণ সুস্থ নারীদিগের হয়, কিন্তু অনেকেরই আরও অধিক ক্রিয়াবিপর্য্যয় হয় ও তাহার ফলও গুরুতর হয়। রজঃকালীন সুস্থ শরীরেও স্নায়ুমণ্ডলী, (nervous system) বিশেষতঃ উচ্চ মানসিক ক্রিয়াকারী মস্তিষ্কের অংশেরও অন্তঃস্রাবী রসগ্রন্থির (endocrine glands) ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হয়। এই সকল স্নায়ু ও রসগ্রন্থির ক্রিয়ার ফলেই মানুষ জীবসৃষ্টিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রজঃকালীন ক্রিয়াবিপর্য্যয়ের ফলে নারীদিগের স্বভাবের, মানসিক অবস্থারও বৈলক্ষণ্য হয়—মেজাজ পরিবর্ত্তনশীল হয়; তাহারা ক্রন্দন ও ক্রোধপ্রবণ হয়—সকলই মন্দ হইয়া যাইতেছে, এইরূপ তাহাদের মনে হয়। তৎকালে তাহাদিগের কর্ম্মের ধারাই যেন পরিবর্ত্তিত হয়—সেই সময়ে অভ্যস্ত কর্ম্ম যেন জোর করিয়া করিতে হয়। সকল কর্ম্ম করিতেই বিলম্ব হয়—অভ্যস্ত কর্ম্ম করিতেও ভুল হয়। তৎকালীন তাহাদিগের কার্য্য বিবেচনা ও বুদ্ধির সাহায্যে সম্পাদিত হয় না; প্রবৃত্তি (impulses) দ্বারাই হয়; ইচ্ছা-শক্তি ক্ষীণ হয়—স্নায়বিক ক্রিয়াবিপর্য্যয় হয়—সামান্য কারণে ব্যাধি হয়। সাধারণতঃ তাঁহারা বিরক্ত ও অস্থিরমতি হন—অনেক সময়ে ক্ষিপ্তের মত কার্য্য করিয়া বসেন। যাঁহারা আত্মহত্যা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই রজঃকালেই আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। অনেকে চুরি করিয়া বসেন—অনেকে স্নায়ুবিপর্য্যয়ের ফলে আশ্চর্য্য রকম দুষ্প্রবৃত্তিপ্রবণও হইয়া পড়েন ! *

নারীরা পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম করিতে হইলে রজঃকালীন যে বিশ্রাম তাহাদিগের একান্ত আবশ্যক, তাহা তাহারা পায় না—বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও যে বিশ্রাম পায় না—পূরামাত্রায় অন্য সময়ের মত কর্ম্ম করিতে বাধ্য হওয়ায়

* Most important are the changes which occur during this period in the nervous system, chiefly in the higher centers, as well as in the endocrine glands. These are precisely the organs through which, as we have seen, man has achieved mastery in the struggle for existence, and has elevated himself to the highest evolutionary plane. They are the organs which exercise the highest control over all bodily functions and effect their coordination.

Upon the normal functioning of these organs more than upon anything else depends the general physiological well-being of woman. Daily observations demonstrate how strongly these psychic processes influence woman's mental equilibrium. Her disposition shows its ups and downs according to the inner stimuli; periods, of lower vitality, pessimism, irritability and tearfulness alternate with calender-like-regularity with periods of liveliness, cheerfulness and good humor, when everything clicks right and life seems easy and agreeable. Woman's action during this period are different than at other times. The weakness and instability of the conditioned reflexes and their greater liability to inhibition during the menstruation signifies that even the simplest habitual actions of woman assume a forced character and are performed with a certain retardation. A woman street car conductor pulls out the wrong ticket and is muddled in counting the change, although she may ordinarily be very efficient; a menstruating motor-woman drives the street car slowly and with hesitance, becoming confused at crossings. The lady typist's fingers strike the wrong keys; she works more slowly and despite her efforts, leaves out letters and forms wrong sentences. The woman dentist cannot find the proper instruments or the right drill and her drilling machine works badly; it is improperly adjusted.

Dr. S. S. Schicharoff asserts very emphatically that woman's "freedom" and her "sense of responsibility" are very limited during menstruation. "From a scientific point of view freedom is restricted when human actions are not directed by the association of ideas and emotions but by impulses emanating from any organ of the body. In such cases the actions of the human being must be considered as forced and not dependent upon mental but on somatic conditions, and the capacity of judgment is impaired."

Kraft Ebbing writes "In daily life we meet with women tender wives and mothers, socially agreeable, between two menstrual periods whose conduct and character change entirely at the approach of menstruation. The temporary physiological aberration at the organism takes the form of a violent storm. They become irritable, quarrelsome and are sometimes transformed into furies and Xantippes feared and avoided by every one. Husbands and servants get it, also the children and makes unreasonable scenes of jealousy before her husbands friends creating havoc at home." * * * *

"Weinberg points out that nearly 50 p. c of suicides committed by women occur during menstruation." P. 123-125

তাহাদিগের উপর ঘোর অত্যাচার—তজ্জন্য তাহাদিগের নানারূপ ব্যাধি—বিশেষতঃ স্নায়বিক ব্যাধি হয়—যাহার জন্য তাহাদিগকে আজীবনও অনেক সময়ে ভুগিতে হয়। 'নারী-নিগ্রহী' হিন্দুরা তাহাদিগকে তৎকালে অশুচি বলিয়া তাহাদিগকে অভ্যস্ত কর্ম্ম হইতে বিরাম দিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিল—যাহা কোন অবলা-বান্ধব পাশ্চাত্য-সমাজ এ পর্য্যন্ত করে নাই। পূর্ব্বকালের হিন্দু রমণীরা তাঁহাদিগের অটুট স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁহারা অনেক স্ত্রীরোগ (একালের তরুণীরা সাধারণতঃ যে সকল রোগে ভুগিয়া থাকেন) হইতে মুক্ত ছিলেন, রজঃকালীন নিয়মাবলির অনুবর্ত্তন করার ফলেই ঐপ্রকার স্বাস্থ্য সম্ভবপর ছিল। যদি তরুণীদিগের অভিভাবকরা এই কথাটা মনে রাখেন ও তদনুযায়ী কার্য্য করেন, তাহা হইলে নারীদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি সহজেই ও বিনাব্যয়ে হইতে পারে। আমরা কিন্তু তাহাদিগকে সেই অবস্থায় স্কুলে পাঠাইতেছি—থিয়েটার বায়োস্কোপ ক্রিকেট-ম্যাচে লইয়া গিয়া তাহাদিগের স্নায়ু উত্তেজিত করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছি।

রজোনির্গমের আরম্ভ হইতেই—পুরুষদিগের শুক্র জন্মিবার পর হইতে—একপ্রকার নূতন শারীরিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। স্নায়ুমণ্ডলী কাম উদ্ভাসিত হয় (erotisation of the nervous system)। তৎকাল হইতে জননেন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট রসগ্রন্থি হইতে এক স্রাব নিঃসরণ হয় (hormone) যাহা স্নায়ুগণকে উত্তেজিত করিয়া বিশেষতঃ উচ্চ মানসিক ক্রিয়াকারী মস্তকের অংশের উপর বিশেষ প্রভাব প্রকাশ করে—তাহা বিশেষ সুখদায়ী—তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়—ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি করে (Stimulates the emotions); কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ হরমোনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাতে পুরুষের ক্রিয়াশক্তি, (energy) সৃষ্টি করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে—মনে মনে অনেক সাহসী কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা উদ্দীপিত হয়—তাহাদিগের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের স্নায়ু কাম উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে তাহাদিগের কর্ম্মশক্তি ও প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে না—তাহাদিগকে নম্র করে—পরের অনুগামিনী হইবার প্রবৃত্তি (passivity) বৃদ্ধি করে, তাহারা তৎকালে মনে মনে সুখের স্বপ্ন দেখে তাহাদিগের আত্মত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা বর্দ্ধিত করে—নিজেদের ব্যক্তিত্ব মুছিয়া ফেলিয়া দিবার প্রবৃত্তি হয়। *

সুতরাং দেখা গেল যে, বিভিন্ন প্রকার রসগ্রন্থির স্রাবের ফলে স্ত্রী ও পুরুষের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, কর্ম্মক্ষমতা প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়। যৌবনারম্ভ হইতে পুরুষদিগের কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়—নানারূপ কার্য্য করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার ইচ্ছা ও উদ্যম বৃদ্ধি হয়—অর্থোপার্জ্জনাদি কার্য্যের বিশেষ উপযোগী মানসিক অবস্থা প্রকৃতি হইতে আসে। কিন্তু রজোনিঃসরণ আরম্ভের পর হইতেই নারীদিগের আত্মত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি—ভালবাসিয়া নিজেকে বিলাইয়া দিবার প্রবৃত্তি

* With the onset of sexual maturity simultaneously begins that "erotization" of the nervous system, the stimulation of the sexual dominante of which we have spoken earlier in a general way. While the hormones of the yellow body drive the entire organism to subserve the processes of procreation at certain definite periods, the sexual dominante, under stimulation by nerve impulses and by the sex hormones, now dominates the body permanently. The waves of nervous excitation from the peripheral sphere and the stream of chemical stimuli from the sex glands that eroticize the cerebral cortex, this dominante which flares up in the brain cortex and holds its sway over the whole psychic sphere of the individual, is, like any other illusion, associated with a great many agreeable sensations. It is, therefore, undeniable, that the erotization of the brain within certain limits lends to the whole organism a healthy life tonus, nourishing and stimulating the emotional side of our being. But also in this respect there is a distinct difference between man and woman. In the specialization of the reproductive process man has been given the active part (just as the male gamete or sperm cell is active and mobile), while to woman has been allotted a more passive role. Sexual urge intensifies man's active energy and creative power, it fills his soul with keen and daring dreams and plans, and in some instances stimulates the development of his personality. In woman, on the contrary, the erotization of the brain merely increases her passivity. Her "soul" is not filled with the desire for struggle and movement, but with a longing, with tender dreams and hopes and aspirations to self-sacrifice. Man, under the domination of the sex hormones, becomes energetic to the point of audacity, where as woman, eroticized by the hormones, becomes feeble and passive to a degree of complete self-abnegation. Sexual desire activates man, but weighs down upon woman, whose activity normally does not go beyond coquetry.

* * * *

In a man of course on account of the greater simplicity of the sex functions the struggle between the mental and sexual dominante is sharp and precise but lasts only a short while when the inhibition disappears. In a woman however because of the greater sexual complicity and specially because of the constant dependance of her gametes, the activity of the sex dominante is of long duration. * * *

The above mentioned facts explain the peculiarities of woman's psychic being which sharply differentiates her behavior from that of man.

Ch VII P. 128—132

উদ্দীপিত হয়। তাঁহারা সুখের দিবা-স্বপ্ন দেখেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা—যাহা অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করিতে গেলে সকলকেই করিতে হয়—করিবার প্রবৃত্তিই হয় না। স্ত্রী ও পুরুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা, তর্ক স্থলে সমান ধরিয়া লইলেও রজঃ আরম্ভের পর হইতেই এইরূপ প্রকৃতি-প্রদত্ত মানসিক অবস্থার জন্য আর তাহা সমান থাকে না। যে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে, মানসিক অবস্থা তাহার প্রতিকূল হইলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না। জোর করিয়া বা বাধ্য হইয়া সেই কর্ম্ম করা অতিশয় কষ্টপ্রদ—প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা অত্যাচার। রজঃকালীন অর্থোপার্জ্জনাদি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের কার্য্য করা প্রকৃতির উপর ঘোর অত্যাচার, তজ্জন্য প্রকৃতি শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যহানি করিয়া তাহার প্রতিশোধ লয়।

গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর কিছুকাল ঐরূপ অর্থোপার্জ্জনাদি আত্ম প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিতে হইলে তাহাদিগের যে বিশেষ কষ্টপ্রদ—শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করে না। বিকৃত শিক্ষা, আবেষ্টনী ও সমাজগঠনের দোষে বহু পাশ্চাত্য নারীকে প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম করার প্রতিকূল মানসিক অবস্থায়, কি রজঃকালীন, কি গর্ভাবস্থায়, কি প্রসবের পর ২।৩ মাসের মধ্যেই পুরুষদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত কারণে বি-সম প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের, অর্থোপার্জ্জনের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়—ঐরূপ কর্ম্ম করার কষ্ট ভোগ করিতে হয়—সুতরাং তাহা তাহাদিগের উপর অত্যাচার। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহা তাহাদিগের প্রতি প্রকৃতপক্ষে অত্যাচার, তাহাই তাহাদিগের স্বত্বপ্রসার বলিয়া প্রচারিত হইতেছে এবং সেই অত্যাচার হইতে নারীদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই হিন্দু সমাজকে নারীনিগ্রহকারী বলা হইতেছে।

স্ত্রী হরমোন স্রাবের ফলে নারীদিগের ভালবাসিয়া আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, তাহা মাতৃত্বের বিশেষ উপযোগী। সৃষ্টিরক্ষার্থে প্রকৃতি নারীকে মাতা হইবার জন্যই তাহার সকল অঙ্গই তদুপযোগী গঠন করিয়াছেন। মাতৃত্বই তাহাদিগের জীবনের প্রধান প্রাকৃতিক কার্য্য। যখনই তাহাদিগের দেহ মাতা হইবার উপযোগী হইল,—রজঃ আরম্ভই তাহার চিহ্ন—তখনই এই স্ত্রী হরমোন স্রাবের আরম্ভ হইল—তাহার ফলেই ভালবাসিয়া মাতৃত্বের উপযোগী আত্মত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি—মাতৃত্বের উপযোগী মানসিক অবস্থা—তাহাতেই সুখবোধও উদ্দীপিত হইল ও বহু বৎসর ধরিয়া সেইরূপ স্রাব ক্রমাগতই হইতে লাগিল, ত্যাগের প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, ত্যাগের সুখবোধ জাগ্রত রহিল। সুতরাং ত্যাগেই তাহাদিগের জীবনের সুখের প্রধান উৎস। এই গোড়ার কথাটা না বোঝায় যত গোল হইতেছে। সুতরাং তৎকালে বিবাহ করিতে না দিয়া—মাতা হইতে না দিয়া—স্বামী পুত্রকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া—তাহাদিগের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে সেবা-যত্ন করিবার প্রবৃত্তি রুদ্ধ করায়—তাহাদিগের প্রকৃতি-প্রদত্ত ত্যাগের সুখের পথই রুদ্ধ করা হইতেছে। তজ্জন্য তাহাদিগকে ভোগের সুখপ্রবণ করা হইতেছে—তৎকালে তাহাদিগকে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য করা হইতেছে—তাহাও ত্যাগের প্রবৃত্তির বিরোধী। মাতৃত্বের উপযোগী অঙ্গ বহুকাল ব্যবহার অভাবে ক্ষীণ করা হইতেছে—তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রসগ্রন্থিও বিকৃত করা হইতেছে —মাতৃত্বের আবশ্যক গুণ, সেবাপরায়ণতা ও সহ্য গুণও ক্ষীণ করা হইতেছে—অনেককে তৎকালে মাতৃত্বনিরোধকারী উপায় বা অন্য উপায়ে কাম উপভোগ করিতে বাধ্য করা হইতেছে—তজ্জন্য স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারও বৃদ্ধি করা হইতেছে। এইরূপ করায় তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকভাবে পুরুষভাবাপন্ন করা হইতেছে—নারীপ্রকৃতি বর্জ্জন করিয়া কতক পরিমাণে নকল পুরুষ করা হইতেছে। বিরুদ্ধধর্ম্মী তড়িৎই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সমধর্ম্মী তড়িতে বিকর্ষণ হয়। নারীদিগকে পুরুষভাবাপন্ন করায় তাহাদিগের পুরুষ আকর্ষণকারী গুণই নষ্ট করা হইতেছে—তজ্জন্যও পাশ্চাত্যে জীবজগতে অদৃষ্ট ইতিহাসে অশ্রুত স্ত্রী ও পুরুষে বিদ্বেষভাব আসিয়াছে, এবং এই সকল কারণেই পরে বিবাহিতা হইয়াও তাঁহারা নিজেরাও সুখী হইতে পারিতেছেন না—স্বামীকেও সুখী করিতে পারিতেছেন না—বিবাহবিচ্ছেদও ক্রমাগতই বাড়িতেছে, অপত্যদিগকে নিজের কাছে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে অপারগ হইতেছেন, তজ্জন্য অপত্যদিগের পিতৃমাতৃভক্তিও ক্ষীণ হইতেছে।

তরুণ-তরুণীরা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হওয়ায়—স্বয়ং পছন্দ করিয়া বিবাহ-প্রথার পক্ষপাতী হওয়ার জন্য, দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তি পরস্পরের সখা-সখীভাবের উপর নির্ভর করে মনে করেন এবং সখা-সখীভাবে দীর্ঘ বিবাহিত জীবন সুখে শান্তিতে কাটাইয়া দিতে পারিবেন মনে করেন এবং তজ্জন্য তরুণরা তাহাদিগেরই মত শিক্ষিতা ও নৃত্যগীতবাদ্যকুশলা তরুণী বিবাহ করিতে চাহিতেছেন। বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের—তাহার অভিজ্ঞতা অভাবে তরুণদিগের কল্পনা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করে। শুধু সখা-সখীভাবে বিবাহিত জীবন অধিককাল সুখশান্তিদায়ী থাকে না—স্ত্রীর মাতৃত্বের অঙ্গীভূত সেবা ও যত্নপরায়ণতা, ক্ষমা, ত্যাগশীলতা, সহ্যগুণের একান্ত আবশ্যক, তাহার অভাবে দাম্পত্য জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে দাম্পত্য প্রেম অল্পদিনেই কর্পূরের মত উবিয়া যায়। স্থায়ী দাম্পত্য-প্রেমের প্রধান অঙ্গই স্ত্রীর মাতৃত্বভাব। মাতৃত্বের উপযোগী গুণসমন্বিত স্ত্রীর সখীভাবের গুণ থাকিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দাম্পত্য-প্রেম হয় সত্য। সেই জন্য হিন্দুর আদর্শ স্ত্রীর গুণ নিম্নলিখিত রামের উক্তিতেই বিবৃত আছে।

কার্যে্যু মন্ত্রী, করণেষু দাসী। ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী॥
স্নেহেষু মাতা, রমণেষু বেশ্যা। রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে॥
মহানাটক।)

করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী, স্নেহেষু মাতা—এই সকলগুলিই মাতৃত্বের উপযোগী গুণ—বাকীগুলি সখা-সখীভাবের গুণ। সখীভাবের গুণের অভাবেও দাম্পত্য-জীবন স্থায়ী সুখশান্তিদায়ী হইতে পারে, সেই গুণের অভাব অন্যত্র পূরণ হইতে পারে, কিন্তু মাতৃত্বের গুণের অভাব পূরণ হয় না (হয় তো অধিক ধনী হইলে, কি মাতা বাঁচিয়া থাকিলে হইতে পারে)। সখীভাবের গুণ থাকা সত্ত্বেও মাতৃভাবের গুণের অভাবে দাম্পত্য-জীবন কিছুদিন পরে অশান্তিকর হইয়া উঠে, সখীভাবের গুণও ক্ষীণ বা লোপ হইয়া যায়। এই গোড়ার

কথার দিকে পাশ্চাত্যদিগের দৃষ্টি নাই ব'ললেই চলে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্ত্রীর মাতৃভাবের যে দাম্পত্য-জীবনের প্রধান অঙ্গ, তাহা কোথাও দেখান হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এবং তজ্জন্য সেখানে বিবাহ এত অশান্তিকর হইতেছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ এত বাড়িতেছে। হ্যাভেলক এলিস তাঁহার "Psychology of sex" নামক বিখ্যাত পুস্তকে এবং অধ্যাপক টম্পসন তাঁহার "Sex and Civilization"এ স্ত্রীর মাতৃত্বভাব যে উৎকৃষ্ট দাম্পত্য-প্রেমের অঙ্গ, তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাই যে দাম্পত্য-প্রেমের প্রধান অঙ্গ, তাহা বোধ হয় বোঝেন নাই। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম, * তরুণরা তাহা হইতে অন্ততঃ ইহা বুঝিবেন যে, দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রীর মাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা প্রাচীনপন্থীদিগের আজগুবি কথা নহে।

সখা-সখীভাবের গুণ দেখিয়াই প্রতীচ্যদেশে সাধারণতঃ বিবাহ হইয়া থাকে। অথচ পাশ্চাত্যেই বিবাহ উত্তরোত্তর অধিক অশান্তিকর হইতেছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়িতেছে, বিবাহপ্রথাই বিফল, এই কথা পাশ্চাত্যেই উঠিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, সখা-সখীভাবে দাম্পত্য-জীবন স্থায়ী সুখদায়ী হয় না। তাহার কারণ সখা-সখীভাবের ভালবাসা পরস্পরের মন আকৃষ্টকারী গুণ থাকার উপর নির্ভর করে। সেই সকল গুণ প্রকৃত-পক্ষে আছে কি না, তাহাই পূর্ব্ব হইতে জানা বড় কঠিন।

* Professor Thompson in "Sex & Civilization"—The so-called happy marriages represents on equilibrium through an extension of the maternal interest of the woman to the man whereby she looks after his personal needs as she does after those of the children cherishing him in fact as a child or in an extension to the woman on the part of the man of the nurture and affection which is in his nature to give to pets and all helpless creatures"

Havelock Ellis তাঁহার Psychology of Sex নামক পুস্তকের Vol. VI. P. 572 তে লিখিয়াছেন "Husband and wife are each child to the other and are indeed parent and child by turns" তিনি আরও দুইটী স্ত্রীলোকের মত তুলিয়া দিয়াছেন; একজন লিখিয়াছেন যে.........................
"Love is really made up both of the sexual instinct and parental instinct" আর একটি স্ত্রীলোকের কথা এই :—
"When the devotion in the tie between the mother and the son is added to the relation of the husband and the wife the union of marriage is raised to a high and beautiful dignity it deserves and can attain in this world It comprehends sympathy love and perfect understanding even of the faults and weaknesses of both sides" আর একটি স্ত্রীলোক লিখিয়াছেন "The foundation of every true woman's love is a mother's tenderness. He whom she loves is a child of larger growth although she may have at the same time a deep respect for him.

কাম উভয়েরই দৃষ্টি আবৃত করে ও কল্পনা সেই সকল গুণালঙ্কৃত করিয়া পরস্পরকে দেখায়। কারণ, কাহাকেও আমরা পূর্ণভাবে দেখিতে পাই না, অল্প অংশ মাত্র দেখি, বক্রী অংশ অনুমান করিয়া লই। তাহাতে অনেক সময়েই ভুল হয়। দ্বিতীয় কারণ, মনের অবস্থা সকলেরই পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং যে গুণ এককালে বিশেষ আকর্ষণ করে, পরে হয় ত সে গুণ আকর্ষণ করে না, আবার অপরের সেই আকর্ষণকারী গুণই চলিয়া যাইতে পারে। আবার অনেক অপ্রত্যাশিত দোষও প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহাতেও সখা-সখীভাব বিশেষভাবে ক্ষীণ হয়। তাহার উপর সকলেরই জীবনে অস্বাস্থ্য, ক্লান্তি, ভগ্নাশা, পরের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য মানসিক বিরক্তিভাব অনেক সময়েই থাকে, তখন দাম্পত্য-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অযথা অথবা রূঢ় ব্যবহার করিয়া বসি; তখন স্ত্রীর মাতৃভাবের অঙ্গীভূত সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, সেবা ও যত্নপরায়ণতার একান্ত আবশ্যক। শিশুর বিরক্তির, ক্রন্দনের, অভাবের কারণ যেমন মাতা সহজেই বুঝিয়া লয় ও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পায়, স্ত্রীরও স্বামীর সহিত তৎকালে সেইরূপ ব্যবহার আবশ্যক। শুধু সখীভাবে সে সহিষ্ণুতা, সে ক্ষমাশীলতা থাকে না, আত্ম-সম্মানের ত্রুটিতে অধীর হইয়া পড়েন। পাশ্চাত্য নারীদিগের মাতৃভাব পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে ক্ষীণ হইয়াছে, ভোগ-বাসনা বাড়িয়াছে, ব্যক্তিত্ব অধিক বিকশিত হইয়াছে—সেই জন্য এরূপ অবশ্যম্ভাবী বিরক্তিভাবপ্রসূত অন্যায্য ব্যবহার সহ্য করা তাঁহাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে—অনেক সময়ে সেই জন্য অশান্তি ও বিরোধ উপস্থিত হয়, ঘাত-প্রতিঘাতে বাড়িয়া যায়, ক্রমে গৃহবিচ্ছেদও হইয়া পড়ে, অনেক পাশ্চাত্য উপন্যাসে সেইরূপে গৃহবিচ্ছেদের কথা বিবৃত আছে। সখা-সখীভাবের গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত দাম্পত্য-জীবন সুখ-শান্তিদায়ী না হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। সুতরাং দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য নারী-দিগের প্রকৃতিজ মাতৃভাব দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকার কালে ক্ষীণ হইয়া যাওয়ার নিমিত্ত তৎকালে তাঁহাদিগকে মাতৃভাবের বিরোধী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য করাও তাহা-দিগের বিবাহিত জীবন অশান্তিকর করার এক প্রধান কারণ। যাহাতে নারীদিগের প্রকৃতিজ মাতৃভাব ক্ষীণ হইতে না পায়, সেই জন্যই—বিবাহিত জীবন শান্তি ও সুখদায়ী করার জন্যই—অল্প বয়সে, রজঃ আরম্ভের সময় হইতেই, বিবাহ দেওয়া আবশ্যক. ঐরূপ প্রথা তাহাদিগের বিশেষ শুভজনক। বিবাহিত জীবনের সুখ-শান্তিই মনুষ্য-জীবনের প্রধান সুখ, তজ্জন্যই অল্প বয়সে বিবাহ এ দেশে প্রচলিত।

সুতরাং দেখা গেল যে, শরীর-বিজ্ঞানশাস্ত্র বাল্য-বিবাহ দোষাবহ বলে না, বরং নারীদিগের জীবনের সুখ-শান্তির জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। রজ আরম্ভের পর বিবাহিত হইতে না দেওয়াই তাঁহাদিগের উপর অত্যাচার—বিবাহিত হইতে না দিলে তাহাদিগকে অথবা জীবনের শূন্য হৃদয়ের অশান্তি ভোগ করিতে হয়—বহু অভীপ্সিত তরুণদিগের দ্বারা প্রত্যাখ্যানের অপমান সহ্য করিতে হয়—তজ্জন্য তাহাদিগের হৃদয় বিষাক্ত করা হয়—পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতে

হয়—তজ্জন্য স্নায়ুবিকার হয়, অধিকাংশকেই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে গিয়া গোলামীগিরির ফৈজয়তী ভোগ করিতে হয়—উত্তরোত্তর অধিকভাবে তাহাদিগের প্রকৃতিজ মাতৃভাবই ক্ষীণ হইয়া যায়, প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া ত্যাগের সুখের অভাবে ভোগ-সুখ-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়—তজ্জন্য ও সেই মাতৃভাব ক্ষীণ হওয়ার ফলে বিবাহিত জীবন সাধারণতঃ সুখ-শান্তিদায়ী হইতে পায় না—তদবস্থায় নিজেরাও সুখী হন না—স্বামীকেও সুখী করিতে পারেন না। মাতৃত্বের অনুপযোগী হওয়ায় অপত্যপ্রতিপালন কষ্টকর হয়—অপত্যদিগকে বোর্ডিং—স্কুলে পাঠাইতে হয়—অপত্যরা নিকটে না থাকায় ও পিতা-মাতার সর্ব্বদা যত্ন ভালবাসা না পাওয়ায়, পিতৃ-মাতৃভক্তিরও বিকাশ হইতে পায় না—তজ্জন্য অসুস্থ অবস্থায় ও বার্দ্ধক্যে অপত্যদিগের আন্তরিক যত্ন ও সেবা কেহই পান না—তৎকালে তাঁহাদিগের জীবন নির্জ্জন কারাবাসতুল্য হয়; বৈতনিক বা অবৈতনিক সেবা-সদনে কোন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে না পাইয়া পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইতে হয়। ইহা অপেক্ষা নারী-নির্য্যাতন কি হইতে পারে? সামান্যভাবে ভোগ-সুখে কিছু দিন থিয়েটার দেখিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, হৃদয়ের হাহাকার চাপা দেওয়া চলে মাত্র। অল্পমাত্রও ভোগ-সুখ দিবার ক্ষমতাই আমাদিগের নাই, বৈতনিক ও অবৈতনিক সেবা-সদন নাই বলিলেই চলে, বৈতনিক সেবা-সদনের অর্থ দিবার ক্ষমতাও নাই। সুতরাং আমাদিগের সমাজগঠন ভাঙ্গায় আমাদিগের তরুণীদিগের দুর্গতির যে সীমা থাকিবে না, তাহা পাশ্চাত্যের মোহ অন্ধতায় ও অনুকরণপ্রিয়তায় আমরা দেখিতেছি না—সে দুর্গতির এখনই যথেষ্ট হইয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রথা অনুবর্ত্তনফলে শুধু নারীদিগের দুর্গতি হইতেছে না, দেশই ধ্বংসপথে চলিয়াছে। আমরা ইংরাজদিগকে দেখিয়া তাহাদিগেরই মত ভোগ-সুখপ্রয়াসী হইতেছি। অধিক অংশ বিলাসদ্রব্য আমাদিগের প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা না থাকায়, তাহা কেনায় আমরা দেশের ধন-দোহনেরই সাহায্য করিতেছি, আমরা তাহাদিগেরই মত ব্যক্তিতান্ত্রিক হইতেছি, যৌথ পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়াছি বলিলেই হয়, এমন বিকৃত মনোভাব আনয়ন করিয়াছি যে, যৌথ পরিবারে থাকা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে (প্রাচীনপন্থীরাও নব্যতন্ত্রীদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে বিশেষ পশ্চাৎপদ নন)। সুতরাং যাবৎ স্ত্রীপুত্রাদি সম্যক্ প্রতিপালন-সমর্থ না হন, তাবৎ তরুণরা বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না। তরুণীদিগের বিবাহ, সুপাত্রাভাবে তরুণদিগের উপার্জ্জন-ক্ষমতা অভাবে, অসম্ভব হইতেছে Law of Demand and supplyএর জন্য বরপণ ক্রমাগতই বাড়িতেছে (তাহা রেজলিউসন পাশ করিয়া যে বন্ধ হইতে পারে না, তাহা কেহ দেখিতেছেন না)। বিবাহের বয়স দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। বহু ধনী ইংলণ্ডেই শতকরা ৭৫.৭টি পঁচিশ বয়স্কা তরুণী শতকরা ৪৩.৪ ত্রিশ বৎসর বয়স্কা নারী অবিবাহিতা; সুতরাং আমাদিগের দেশে যেখানে গড়পড়তা মাসিক আয় ৪, ৫, ৬, টাকা মাত্র, শতকরা একটিরও মাসিক ১০০ টাকা আয় নাই, সেখানে পাশ্চাত্য-মনোভাবাপন্ন হইলে, পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিলে, সকলকেই নিজের উপর নির্ভর করিতে হইলে যে শতকরা ১০, ১৫টি তরুণ-তরুণীদিগেরও বিবাহ হওয়া অসম্ভব, তাহাও কেহ দেখিতেছেন না। তজ্জন্য লোকসংখ্যা যে দ্রুতগতিতে কমিতে বাধ্য, তাহাও দেখিতেছেন না। মুসলমানদিগের দ্রুততর গতিতে সংখ্যাবৃদ্ধিতে হিন্দু নেতারা চিন্তিত দেখা যায়, অথচ যাহাতে আমাদিগের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমিতে বাধ্য, তাহাই অনুমোদিত হইতেছে। অসংখ্য তরুণী কি উপায়েই জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহাও কেহ ভাবিতেছেন না। আমরা অত্যন্ত গরীব বলিয়া পাশ্চাত্যদেশ অপেক্ষা বহু অধিকাংশ নারীকে ভ্রূণহত্যা, গর্ভপাত, জারজ সন্তান ত্যাগ করিতে হইবে—পেটের দায়ে ভিক্ষা ও বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইবে—সুতরাং তাঁহাদিগের যে দুর্গতির সীমা থাকিবে না, তাহাও কেহ দেখিতেছেন না। এখন পাশ্চাত্য প্রথা অনুকরণই প্রগতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং এইরূপ প্রগতির নামে সকলেই মুগ্ধ!

দেশের এই দুর্গতি-মোচনের কোন সুচিন্তিত উপায় এ পর্য্যন্ত এ দেশের কোন নেতা উদ্ভাবন করেন নাই—তাহা যে করা প্রধান ও আশু আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সকলেই ইংরাজের রাজ্যশাসনে প্রভাব খর্ব্ব করিতেই ব্যস্ত; কিন্তু ইংরাজ প্রভাব গেলে কি করা উচিত, সে বিষয়ে মতের কোন ঐক্য নাই—ইংরাজের হস্তচ্যুত রাজশক্তি গণতন্ত্রের উপর সমর্পিত করিতে চাহেন। এখনই দেশে যথেষ্ট প্রাদেশিক ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গত রেষারেষি আছে। এ রেষারেষি এত অধিক যে, ইহাকে যদি বৈরিতা বলা হয় ত অসঙ্গত হয় না। ইহাতে যে ইংরাজ-প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহাও ধরিয়া লওয়াই উচিত। কমিউনিষ্ট দল ব্যতীত অন্য সকলেই কেহ ইংলণ্ডে, কেহ জার্ম্মাণীতে কেহ বা ইটালীতে কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে, কিরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাই করিয়া দেশের দুর্দ্দশা মোচন হইবে মনে করেন। প্রথমতঃ ঐ সকল দেশ শিল্পবিষয়ে যত উন্নত, তাহাও এ দেশে হওয়া বহু কালসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ তাহা করিয়াও তাঁহারা দারিদ্র্য-সমস্যা, নারী-সমস্যা পূরণ করিতে যে অপারগ, তাহা এই জগদ্ব্যাপী দারিদ্র্য ও নারী-সমস্যা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে; সুতরাং আমরা যে সেইরূপ করিয়া দেশের দুর্গতি মোচন করিতে পারিব, বিশেষতঃ এখন, তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। চরকা কাটিয়াও যে বিশেষ কিছু হইতে পারে না—কংগ্রেসের অনুমোদন সত্ত্বেও যে কিছু তাহাতে হইল না—আধ ঘণ্টা চরকা কাটিতেও লোকে পারিল না—তাহাতে কোন লাভ হইল না—লক্ষ লক্ষ চরকা জ্বালানী কাষ্ঠে পরিণত হওয়াতে তাহা প্রমাণ করিতেছে। অথচ আমাদিগের দুর্দ্দশা এত ভীষণ হইতেছে যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও চলে না।

আমাদিগের দেশের এইরূপ অশেষ দুর্গতি নিবারণের কোন উপায়ই দেখিতে না পাইয়া একদল তরুণ রুষিয়ার কমিউনিসম্ প্রচলন করিবার উপক্রম করিতেছেন। ঈষৎ ধৈর্য্য সহকারে দেখিলে বুঝা যায় যে, স্বাবলম্বী ভারতের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা কমিউনিসম্ প্রচলন করিতে পারিবেন, তাহা সুদূর ভবিষ্যতেও অসম্ভব। দেশে এত অধিক বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে—এত অধিক বিভিন্নভাষা প্রচলিত আছে (লোকগণনার হিসাবে পাওয়া যায়, ২২২টি), তাহাদিগের মনোভাব, জীবনযাপনপ্রণালী,

জীবনাদর্শ, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার, আহার-ব্যবহার, চিন্তার ধারা এত বিভিন্ন যে, কোন কালে তাহাদিগের ভিতর একটি প্রধান অংশ ঐ মতাবলম্বী হইয়া একজোটে কার্য্য করিতে পারিবে, তাহা অসম্ভব; সমস্ত ধনশালী লোক তাহাদিগের বিপক্ষতা-চরণ করিবে ইংরাজদিগের সাহায্য করিবে। সুতরাং এরূপ চেষ্টা করার ফলে কেবল দেশের লোকদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি—অশান্তি বৃদ্ধি হইবে।

কিন্তু যদি মনে রাখি যে, ভারতে বহুকালব্যাপী অরাজকতা সত্ত্বেও তাহার সভ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার সঞ্জীবনী-শক্তি তাহার সমাজগঠনেই নিহিত ছিল—শাসন-প্রণালীতে নহে; এবং সেই সমাজ-গঠনের একটি মূল ভিত্তি যৌথ পরিবার প্রথা। একা একা যাহা করা অসম্ভব, অনেকের সমবেত চেষ্টায় তাহা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব হয়—তাহাই সমবায় প্রথার মূলমন্ত্র। কমিউনিজমের মূলমন্ত্র—from each according to his ability—to each according to his needs—প্রত্যেকেই সকলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, প্রত্যেকেই তাহার যাহা আবশ্যক, তাহা পাইবে। এই দুই প্রথার মূলমন্ত্রের সাহায্য আমাদিগকে যৌথ পরিবারপ্রথায় পাওয়া যায়—উপরন্তু ভালবাসার সাহায্যও পাওয়া যায়—যাহা ঐ দুই পাশ্চাত্য প্রথায় পাওয়া যায় না। আর কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় যদি দেখেন যে, রুষিয়ায় পাঁচ সাতটি কমিউনে বিভক্ত—কিন্তু প্রত্যেক যৌথ পরিবার এক একটি বিভিন্ন কমিউন বলিয়া ভারত অসংখ্য কমিউনে বিভক্ত ছিল—রুষিয়া ও ভারতে প্রভেদ এইটুকু মাত্র। এইরূপ হওয়ায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল—যাহা রুষিয়াতে লোপ হইয়াছে; সকলেই খাইতে পরিতে পাইত—সকলেই বিবাহ করিতে পারিত—নারীরা মাতা হইয়া স্বামি-পুত্রকে ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারিত—জীবনের মুখ্য অভাব খাইতে পরিতে পাওয়া, ভালবাসা পাওয়া, ভালবাসিতে পাওয়া—তাহাও পূরণ হইত; জীবনে সকলেরই আনন্দ ও শান্তি ছিল। এই যৌথ পরিবারপ্রথা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা পুরাণ পড়ার মত আমাদিগের সহজসাধ্য, ইহার নিমিত্ত রাজসরকারের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না; যে ভোগাসক্তিবৃদ্ধি আমাদিগের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ—তাহাও ইহাতে নিবারিত হয় ও ইহা আশু ফলদায়ী। আপাততঃ দেশশুদ্ধ একটা কমিউন করার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বত্র পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য কমিউন প্রতিষ্ঠা করিতে দিলেন আপততঃ চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই দেশের যথেষ্ট আশু মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন—অনেকেরই জীবনের দুঃসহভার লাঘব করিতে পারিবেন স্ত্রী-পুত্রপালন-সমর্থ পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বরপণও কমিবে, তরুণ-তরুণীদিগের বিবাহ হইতে পারিবে—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসার প্রকৃষ্ট সময় যৌবন বৃথা কাটিয়া যাইবে না—জীবন সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তাভার-গ্রস্ত থাকিবে না। জাপানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর সামান্য বিছানা ও সামান্য পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত কোন আসবাবপত্র নাই। দেশব্যাপী হাহাকার নিবারণের জন্য, নিকট আত্মীয় প্রতিপালনের জন্য, গরীব পরাধীন জাতির ভোগ্য তুচ্ছ বিলাসিতা ত্যাগও কি আমরা করিতে পারিব না? এই যৌথ পরিবার প্রথা স্থাপিত করিতে হইলে বাল্য-বিবাহও আবশ্যক। বধূরা স্বামীর বংশের পোষ্যকন্যা, তজ্জন্যই বিবাহের পর তাহাদিগের গোত্র-পরিবর্ত্তন হয়। অল্প বয়স ভিন্ন অন্য পরিবারে কেহ একীভূত হইতে পারে না, তাহাও যেন আমরা মনে রাখি। যাহা আমাদিগের দুর্গতি-মোচনের একমাত্র উপায়, কেহ এ পর্য্যন্ত অন্য উপায় দেখাইতে পারেন নাই—আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাই দুঃসাধ্য করিয়া তাঁহারা সংস্কারক সাজিতেছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)।

ক্রন্দন

সংসার-বন্ধন ছিঁড়িবারে
প্রাণ কেন আজি বারে বারে
উঠিতেছে কাঁদি?
কোথা অন্ত কোথা আদি
এই রে কান্নার;
কিছু ঠিক নাহি পাই তার।

এই অশ্রুজল,
খুঁজিতেছে আজি কোন্ অতলের তল?
কিছু নাহি বুঝি
কোথায় চলেছে খোঁজাখুঁজি;
কোথা শেষ, কোথা আদি
এই বসুধার—
এই রে কান্নার;
তাই আজ বারে বারে উঠিতেছি কাঁদি।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল।

২১

লুলু গারা ও তুলাকাকে নিয়মিত পত্র লিখিত। চার ছত্রের সংক্ষিপ্ত পত্র নয়, চার পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়িয়া বড় বড় চিঠি লিখিত। দিব্য রচনা-কৌশল, অসামান্য বর্ণনাশক্তি। সকল বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি, লোকচরিত্র দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিত, কৌতুকেও বিলক্ষণ পটু। বেলুলা ও শিরাণীর বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া তুলাকা ও গারা হাসি সম্বরণ করিতে পারেন না। দুই জনে পরস্পরের পত্র পাঠ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তুলাকা কহিলেন, এই দুখানা চিঠি যদি এঁদের দুজনকে পড়তে দেওয়া হয়, তা হ'লে কি হয়?

—তা হ'লে লুলুকে এঁরা আস্ত রাখবেন না। এঁরা ভেবে থাক্‌বেন, এঁদের অনুগ্রহে লুলুর কায সিদ্ধ হল; কিন্তু সে যে দুজনকেই পুতুলনাচ নাচিয়েছে, জান্‌তে পার্‌লে ওঁরা তাকে ছিঁড়ে খেতেন।

তুলাকা বলিলেন, দেখ, একটা কথা এক একবার আমার মনে হয়।

—কি কথা?

—সে কোন পুরুষমানুষের সম্বন্ধে কোন কথা লেখে না। এখনও তার বয়স অল্প জানি, কিন্তু এত অল্প নয় যে, পুরুষের মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারে না। মোরের রাজকুমারের কথা মনে হ'লে পুরুষমানুষের উপর তার অশ্রদ্ধা হ'তে পারে, কিন্তু সচ্চরিত্র ভাল লোকও অনেক আছে। কারুর সঙ্গে কি তার আলাপ-পরিচয় হয়নি, কারুর কথা কখন ভাবে না?

গারা বলিলেন, আমি ত এত দিন থেকে ওকে দেখছি, ওর প্রকৃতিতে কিশোরী কি যুবতীর চপলতা নেই। মুখে যতই তামাসা আমোদ করুক, ওর স্বভাবে অসামান্য বল আর একাগ্রতা আছে। এই দেখ না, এই অল্পসময়ের মধ্যে কি না করেছে! বছর দেড়েক আগে ছিল একটা অসভ্য জাতের মেয়ে, কিছু জান্‌ত না। আর এখন এমন দেশ নেই—যেখানে ওর নাম জানে না, ওকে দেখবার জন্য লোক ভেঙ্গে না পড়ে। অপর কেউ হ'লে তাঁকে মাটীতে পা পড়ত না; কিন্তু ওর কোন রকম 'বিকার হয় নি, কিছুই বদলায় নি। এখন ওর মনে কেবল এক ভাব, টাকা হ'লে বাপ-মাকে খুঁজতে যাবে। তার পর থিয়েটারে থাকলেই যে অনেক রকম পুরুষের সংস্রবে আস্‌তে হয়, সেটা ওর হয় নি। সে বিষয়ে প্রথমে আমি সাবধান হই, তাই ওর সঙ্গে যেতাম। অধ্যক্ষকেও সাবধান করা আছে। লুলু কোথাও যায় না, কারুর সঙ্গে মেশে না, নিজের কায নিয়ে ব্যস্ত, আর আলস্য কাকে বলে, তা জানে না। তবে ভবিষ্যতের কথা কে জানে?

তুলাকা বলিলেন, লুলুর সবই অলোকসামান্য, এমনতর বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে আমি যেটুকু বুঝতে পারি, লুলুর স্বভাবে বিরক্তি নেই। কোন রকম বিদ্বেষ কি তিক্ততা ওকে স্পর্শ করে নি! সুতরাং মানবজীবনে যেটুকু সুখ-সম্ভোগ হ'তে পারে, তা থেকে ও বঞ্চিত হবে না। এখন ওর স্বাভাবিক একাগ্রতার কারণে ওর আর কোন দিকে মন নেই। এখন ওর হৃদয় নির্ব্বাত-নিস্তরঙ্গ হ্রদের তুল্য, একখণ্ড লোষ্ট্রপাতে মধ্যস্থল থেকে তীর পর্য্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে।"

—সে যখন হবার হয় হবে, লুলু চিরকাল সুখে থাকুক, এই আমাদের কামনা। তাকে দেখিনি এখনও দু'মাস হয় নি, কিন্তু মনে হয়, যেন কত কাল দেখিনি। আমি ত মনে করলেই যেতে পারি, কিন্তু কিছু দিন একা থাক্‌লে ওর আত্মনির্ভরতা বাড়বে।

—এখানেই কি কিছু অভাব ছিল? যখন দুটো বদমায়েস লোক ওকে ধ'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, তখন কি লুলু কাউকে ডেকেছিল, না কারুর সাহায্য চেয়েছিল? তাকে দেখবার জন্য আমাদের ইচ্ছা ত করেই, কিন্তু আর কিছু দিন যাক্‌। সে প্রতি চিঠিতে লেখে, আমাদের জন্য তার মন কেমন করে; কিন্তু তাতে তার কোন রকম অস্থিরতা হয়নি। আমাদের আর কিছুদিন সবুর কর্‌তে হবে।

ইঁহারা দুই জনে ত এইরূপ করিয়া লুলুর প্রসঙ্গে জল্পনা করিতেন, কিন্তু আর এক জন সর্ব্বদা লুলুর কথা ভাবিত। সে সামান্য দাসী মাত্র—মুমী। মুমীর মনে হইত, সে কোন স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেছে। এই কি সেই লুলু—যাহাকে মুমী প্রথমে অর্দ্ধ-নগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিল? অপার সমুদ্রে গারা

তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। লুলু কোথাকার কোন্ অসভ্য জাতির কন্যা, কথা কহিতে জানিত না, বন্য পশুর ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্ক ত্রস্ত থাকিত। সেই লুলুকে আজ দেখ! দেশ-বিদেশে তাহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সহস্র কণ্ঠে তাহার নাম নিত্য ঘোষিত হইতেছে, তাহাকে দেখিবার জন্য সকলে লালায়িত, কত লোক তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার বাড়ীতে সম্মিলনে নিমন্ত্রণ হইলে এমন লোক নাই যে, নিজেকে সম্মানিত বিবেচনা না করে। লুলুকে সমুদ্রে যখন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা হয়, সে সময় সে নিঃস্ব, এক কপর্দ্দক তাহার সম্বল ছিল না। আর এই অল্পসময়ের মধ্যে লুলুর বিপুল অর্থাগম হইতেছে, যত ইচ্ছা সে উপার্জ্জন করিতে পারে। কলাবতী রমণী ত কত আছে, কিন্তু এরূপ যশ ও অর্থ উপার্জ্জন কে কবে দেখিয়াছে? সকলের অপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই যে, এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে লুলুর প্রকৃতিতে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে যেমন সরল নিরহঙ্কারস্বভাব ছিল, ঠিক সেই রকম আছে। একবারে আড়ম্বরশূন্য, নির্ম্মল, হাস্যকৌতুকপূর্ণ, আত্মাভিমানের লেশমাত্র নাই। কখন ভুলিয়া মুমীকে কটু কথা কহিত না, মুক্ত হস্তে তাহাকে উত্তম উত্তম পরিধেয় বস্ত্র ও নানা সামগ্রী দিত। পূর্ব্বে মুমী লুলুকে কতকটা কৃপাদৃষ্টিতে দেখিত, এখন তাহাকে ভয় করিত। এই কন্যা অসামান্য শক্তিশালিনী, তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইত, অধিকন্তু তাহার মনে হইত, এই সাগরোত্থিতা নবযুবতীর কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে, নহিলে কোন্ বশীকরণ-মন্ত্রে সে লক্ষ লক্ষ লোককে মুগ্ধ করিয়াছে? এ কি মানুষী, না কোন শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী?

তুলাকা ও গারা যে কথা আলোচনা করিতেন, মুমীও তাহা ভাবিত। লুলু সুন্দরী, তাহার সৌন্দর্য্য শত শত তুলিকায় চিত্রিত, ভাস্করের যন্ত্রে ক্ষোদিত হইয়াছে। এমন রূপে আকৃষ্ট না হওয়া অসম্ভব! মোরের রাজকুমার লুলুকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মুমী তাহাও জানিত। যে কালে বলবান্ পশুতুল্য পুরুষ স্ত্রীলোকের কেশ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিত, সে এখন উপকথা। কিন্তু বয়সের স্বভাব ত আছে, যৌবনের প্রকৃতিসিদ্ধ চঞ্চলতা আছে। লুলুর কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণ এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। তাহার চিত্ত নির্ব্বিকার, মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ, অদ্যাবধি তাহাতে কোন পুরুষের ছায়া পতিত হয় নাই। নিজের কর্ম্ম ছাড়া লুলুর যেন আর কোন চিন্তাই ছিল না। কোন পুরুষের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করিত না, কাহারও সহিত কোথাও বেড়াইতে যাইত না, কাহারও সহিত পত্রব্যবহার ছিল না। এই অজ্ঞাতযৌবনা রূপসীর প্রকৃতি উপকথার রাজকন্যার ন্যায় নিদ্রামগ্ন ছিল, কোন রাজকুমার সোণার কাঠি অথবা রূপার কাঠি তাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করায় নাই। চির-দিন কি এইরূপে কাটিবে, যৌবনের স্পর্শমণির কুহক স্পর্শে লুলু বঞ্চিত থাকিবে? নারীজাতির পক্ষে যাহা বাঞ্ছনীয়, লুলুর ত তাহা সকলই আছে। রূপে গুণে তাহার সমকক্ষ বিরল, অর্থের অভাব নাই, নিজের ক্ষমতায় সে সর্ব্বত্র যশস্বিনী হইয়াছে। তাহা হইলেও তাহার জীবন অসম্পূর্ণ, প্রণয়ের বংশীধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। নিত্য রজনীতে সহস্র মিলিত কণ্ঠে তাহার নাম ধ্বনিত হইত, কিন্তু যে আহ্বানে হৃদয়ের অন্তরাল মথিত করিয়া দেহ হইতে হৃদয়কে আকর্ষণ করে, এ পর্য্যন্ত সে তাহা শুনিতে পায় নাই। মুমী ভাবিত, আজ না হউক, দু'দিন পরে সকল শব্দ ডুবাইয়া সেই আহ্বান লুলুর শ্রবণে প্রবেশ করিবে, তখন সে আর কিছু শুনিতে পাইবে না। কবে কোথায় অলক্ষ্যে ফুলশর লুলুর হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে, আর তাহার সুপ্ত যৌবন জাগ্রত হইয়া উঠিবে! তখন এই নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য কোথায় থাকিবে? মুমী ত লুলুকে কিছু বলিতে পারিত না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিত না, কেবল লক্ষ্য করিত, লুলুর কোনরূপ চিত্তবিকার ঘটিতেছে কি না, তাহার কোন-রূপ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে কি না।

বিশেষভাবে লুলুর কথা কয়েক জন ভাবিত, কিন্তু তাহার কথা হইত না, এমন কোন স্থানই ছিল না।

২২

সে নগরে লুলুর এক মাস থাকিবার কথা, কিন্তু দুই মাস হইয়া গেল, তথাপি সে আর কোথাও যাইতে পারিল না। তাহার প্রধান কারণ অর্থাগম। অধ্যক্ষের যুক্তির কোন উত্তর নাই। তিনি বলিলেন, তুমি টাকা উপার্জ্জন করবার জন্য বেরিয়েছ। আমি যা হিসাব করেছিলাম, তার দশ গুণ বেশী টাকা এখানে পাওয়া গিয়েছে, আর এখন অবধি

ঠিক সমান টাকা আসছে। শুধু ত এ সহরের লোক নয়, কত দূর দূর থেকে যে লোক আস্ছে, তার ঠিকানা নেই। এখন এখান থেকে যাওয়া কোলের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

লুলু বলিল, তা হ'লে আমার কোথাও বেড়ান হয় না। আচ্ছা, আর এক মাস এখানে থাক্‌ব, কিন্তু এর পর যেখানে যাওয়া হবে, সেখানে সব ঠিকঠাক করুন।

—তা করা হচ্ছে। দিন পনর পরে একটা লোক পাঠিয়ে দেব, সে সব বন্দোবস্ত করবে।

—তুলাকা আর গারার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি। তাঁদের লিখ্‌লেই তাঁরা আসেন, কিন্তু এখন কিছু বলুব না। দিন কতক একা থাকি।

এ কথায় অধ্যক্ষ আর কিছু বলিলেন না।

এক সপ্তাহ পরে লুলুর শরীর কিছু অসুস্থ হইল। বিশেষ কোন পীড়া নয়, কেবল দুর্ব্বলতা। সন্ধ্যার সময় কিরূপ অবসাদ হইত, কিছু করিতে ইচ্ছা হইত না। এখানে আসিয়া অবধি লুলু প্রাতঃকালে অশ্বারোহণে বেড়াইতে যাইত না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। কোন কোন দিন মাথা ঘুরিত, থিয়েটারে নৃত্যগীতের পর শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িত। লুলু কাহাকেও কিছু বলিত না, শরীরে যে কোনরূপ গ্লানি হইয়াছে, কাহাকেও জানাইত না। মুমীর মনে সংশয় হওয়াতে সে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু লুলু হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, বলিত, আমার আবার কি হবে! কিছুই হয় নি।

এক রাত্রে রঙ্গালয় হইতে ফিরিয়া লুলু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মুমী ভয় পাইয়া অধ্যক্ষকে ডাকিল। হোটেলের নিকটেই এক জন বড় ডাক্তার ছিলেন, অধ্যক্ষ তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

লুলুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতে কিছু বিলম্ব হইল না। ডাক্তার ঔষধ সেবন করাইবার কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল। অধ্যক্ষ ও ডাক্তারকে দেখিয়া বলিল, আমার কি হয়েছে? আপনারা এখানে কেন?

অধ্যক্ষ বলিলেন, ইনি ডাক্তার, তোমাকে দেখতে এসেছেন।

লুলু বলিল, আমার ত কোন অসুখ করে নি। আপনারা কখন্ এসেছেন, আমি টের পাই নি। আমি কি অজ্ঞান হয়েছিলাম?

ডাক্তার বলিলেন, আপনি কথা কহিবেন না, আমি একবার আপনাকে দেখ্‌ব।

লুলু আর কথা কহিল না। ডাক্তার তাহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনার বিশেষ কোন ব্যারাম হয় নি, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল হয়েছে। কিছু দিন আপনাকে বিশ্রাম করতে হবে, একটু বল পেলেই কোথাও বেড়াতে যাবেন।

লুলু কিছু বেগের সহিত কহিল, থিয়েটারের কায আমি কিছুতেই বন্ধ করতে পারব না।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এত দিন কি কেউ আপনাকে নিষেধ করেছিল? এখন আপনি নিজেই বুঝ্‌তে পারবেন যে, আপনার পক্ষে থিয়েটারে যাওয়া অসম্ভব। বিশেষ আমি আপনার চিকিৎসক, আমার আদেশ আপনি লঙ্ঘন করতে পারেন না।

লুলু অধ্যক্ষকে বলিল, আপনি কি বলেন?

অধ্যক্ষ বলিলেন, ডাক্তার মশায় যা বলছেন, তার উপর কেউ কিছু বল্‌তে পারে না।

ডাক্তার ও অধ্যক্ষ ঘরের বাহিরে গেলেন। অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, চিন্তার কিছু কারণ আছে?

—কিছু না। তবে কিছুদিন সাবধান থাক্‌তে হবে। ওঁর শরীর খুব ভাল, অনবরত পরিশ্রম ক'রে দুর্ব্বলতা হয়েছে। উনি শুধু মনের জোরে সেটা স্বীকার করেন নি। ওঁর কাছে এক জন পরিচারিকা দেখলাম। আর কোন স্ত্রীলোক ওঁর সঙ্গে এসেছেন?

—না, তবে প্রয়োজন হ'লে দু'চার দিনের মধ্যে আস্‌তে পারেন।

—তা হ'লে তাঁকে ডাকিয়ে পাঠান। ওঁর আবার মূর্চ্ছা হবে। আমি ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। কাল সকালবেলা আমাকে খবর দেবেন, আবশ্যক হ'লে আমি সেবার জন্য একটি স্ত্রীলোক পাঠিয়ে দেব।

—আপনাকে বলা রইল, আপনি সকালবেলা প্রথমেই এখানে আস্‌বেন, আর স্ত্রীলোকটিকে পাঠিয়ে দেবেন। লুলুর সঙ্গে যে দাসী এসেছে, সে ভয়েই অস্থির, রোগের সেবা তাকে দিয়ে হবে না।

—ভাল, তাই হবে।

ডাক্তার চলিয়া যান, অধ্যক্ষ পকেট হইতে টাকা বাহির

করিয়া তাঁহার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। ডাক্তার বলিলেন, টাকা আপনি রাখুন। এমন রোগী দেখাই আমার লাভ। সহরে এমন কোন ডাক্তার নেই যে, এমন অবস্থায় পড়লে আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা না করে। কাল অন্য সব ডাক্তারের হিংসা হবে, লুলুর চিকিৎসা আমি করছি শুনে কত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসবে। টাকা ত' অনেক ডাক্তার পায়, এমন রোগী কে পায়?

অধ্যক্ষ আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

পরদিবস প্রাতে লুলুর মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর দেখিল, আবার সেই ডাক্তার তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, শয্যার আর এক পাশে শুভ্রবসনা, কোমলনয়না তরুণী। তাহাকে দেখিয়া লুলু বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মুমী লুলুর পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া, অধ্যক্ষ ডাক্তারের পশ্চাতে কিছু দূরে।

লুলুর চৈতন্য হইয়াছে দেখিয়া ডাক্তার তাহার নাড়ী দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

লুলু ম্লান হাসি হাসিল, কিন্তু চক্ষুতে কৌতুকের আভা। কহিল, আমার রোগ না ক'রে ত ছাড়বেন না, কাযেই রোগীর মত ছাড়া আর কি রকম বোধ হবে?

ডাক্তার অল্প হাসিয়া বলিলেন, এই ঠিক কথা! ডাক্তার আপনাকে ছাড়লে রোগও ছাড়বে।

লুলু বলিল, এ রকম ক'রে কদিন প'ড়ে থাকতে হবে?

—পাঁচ সাত দিনের বেশী নয়। তার পর দিন কতক আপনাকে বেড়াতে যেতে হবে।

—আর আমার থিয়েটার?

—ফিরে এসে থিয়েটারে যাবেন।

লুলু বলিল, শুনলেন অধ্যক্ষ মশায়? আমার বেড়াতে যাওয়া আপনি আটক করেছিলেন, আর এখন?

অধ্যক্ষ কহিলেন, এখন তুমি খুব বেড়াবে।

ডাক্তারের সঙ্গে যে নার্শ আসিয়াছিল, সে স্থির-দৃষ্টিতে লুলুকে দেখিতেছিল। মুমী কাষ্ঠমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল।

ডাক্তার নার্শকে বাহিরে ডাকিয়া তাহাকে কতকগুলা আদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নার্শ অধ্যক্ষ ও মুমীকে বাহিরে যাইতে বলিয়া লুলুর শয্যার পাশে একটা চেয়ারে বসিল।

লুলু বলিল, তোমাকে কি ডাক্তার এনেছেন?

নার্শ বলিল, হাঁ, আমি হাঁসপাতালে সেবা করি।

লুলু মৃদুস্বরে বলিল, হাঁসপাতাল আমি কখন দেখি নি। তোমার মুখখানি বড় ভাল লাগছে। তোমার নাম কি?

—আমার নাম তমলা। আপনি আর বেশী কথা কইবেন না, ডাক্তার বারণ করেছেন। এই ওষুধটা খেয়ে চুপ ক'রে থাকুন।

তমলা লুলুকে ঔষধ পান করাইল। তাহাতে নিদ্রার ঔষধ ছিল। অল্পক্ষণ পরেই লুলু নিদ্রিত হইল।

অধ্যক্ষ গারাকে তার করিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন, লুলু অসুস্থ, কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নাই। ডাক্তারের মতে আপনি এখানে থাকিলে ভাল হয়।

গারা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া তুলাকার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তুলাকা বলিলেন, তিনিও যাইবেন।

গারা বলিলেন, কাল একখানা জাহাজ যাবে, তাইতে যাব ভাবছি।

তুলাকা বলিলেন, সেই ভাল কথা। আমি টেলিফোন ক'রে আমাদের দুজনের জন্য একটা কামরা ঠিক করছি।

ওদিকে লুলুর অসুস্থতা-সংবাদে সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইল, হোটেলে জনস্রোত বন্ধ হয় না। সকলেই অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করে—লুলু কেমন আছে। টেলিফোনের ঘণ্টিকা-শব্দের বিরাম নাই, সহর শুদ্ধ লোক সংবাদ জানিতে চায়। অধ্যক্ষ সকলকে বলিলেন, কোন কঠিন পীড়া হয় নাই, সামান্য অসুস্থতা। ডাক্তার সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন, লুলুর বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক, হোটেলে লোকের ভিড় হওয়া উচিত নয়। এই মর্ম্মে তাঁহার স্বাক্ষরিত চিঠিপত্র হোটেলের প্রবেশদ্বারে লাগাইয়া দেওয়া হইল।

যে দিন তুলাকা ও গারা আসিয়া পৌঁছিলেন, সে দিন লুলু শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। আর কোন অসুখ নাই, কেবল সামান্য দুর্ব্বলতা। তমলা ঘরের জিনিষপত্র গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল।

লুলু দরজার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এমন সময় গারা ও তুলাকা একত্রে ঘরে প্রবেশ করিলেন। লুলু আনন্দধ্বনি করিয়া একে একে তাঁহাদের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহাদিগকে চুম্বন করিল। তমলা নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে মুমী আসিয়া উপস্থিত, তাহার পিছনে

টোটো। মুমীর মুখে হাসি ধরে না, বলিল, এইবার আপনারা এসেছেন, আর কোন ভাবনা নেই।

টোটো কণ্ঠে ও লাঙ্গুলের আন্দোলনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া গারার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। গারা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

অধ্যক্ষও আসিলেন। তিনি লুলুর ঘরের পাশেই তুলাকা ও গারার জন্য স্বতন্ত্র ঘর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা কথা কহিতেছেন, এমন সময় ডাক্তার আসিলেন, প্রৌঢ়, সৌম্য মূর্ত্তি। পরিচয় হইবার পর বলিলেন, এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম। দুচার দিন পরে এঁকে নিয়ে যাবেন।

তুলাকা বলিলেন, কোথায়?

—আমি স্থির করেছি, শাহানায় যাবেন। উত্তম স্থান।

শাহানা পর্ব্বতের উপর প্রসিদ্ধ স্থান। সেখানে শরীর সারিবার জন্য অনেকে যাইত। ডাক্তার বলিলেন, সেখানে বেশ ভাল বাড়ী পাওয়া যায়। একটা বাড়ী স্থির হ'লেই আপনারা চ'লে যাবেন। এখন একটা ওষুধ দিচ্ছি। পাহাড়ে গেলে কোন ওষুধ খেতে হবে না, খুব ঘুরে বেড়াবেন।

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তমলা আসিল। বলিল, আমার এখানে থাক্‌বার আর ত কোন আবশ্যক নেই, অনুমতি হয় ত আমি এখন যাই।

লুলু বলিল, তা হবে না, তোমাকে আমাদের সঙ্গে শাহানায় যেতে হবে। ডাক্তার মশায়, এঁকে আমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিন।

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, আপনার আদেশ সকলের শিরোধার্য্য। বেশ ত, তমলা, দিন কতক বেড়িয়ে এস।

তমলা কহিল, আমি গরিব মানুষ, পাহাড়ে কেমন ক'রে যাব? এখানে হাঁসপাতালে আমার কায কে কর্‌বে?

লুলু বলিল, কেমন ক'রে যাবে, সে ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। ডাক্তার মশায় ত' তোমাকে ছুটী দিচ্ছেন, হাঁসপাতালের কাযের ব্যবস্থা উনি কর্‌বেন।

তুলাকা বলিলেন, লুলুর যখন এত আগ্রহ, সে অবস্থায় তুমি কোন আপত্তি ক'রো না।

ডাক্তার বলিলেন, সেই আসল কথা। তুমি স্বচ্ছন্দে ওঁর সঙ্গে যাও, এখানকার ব্যবস্থা আমি ক'রে নেব।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। অধ্যক্ষ টেলিগ্রাম করিয়া শাহানায় বাড়ী ঠিক করিতে গেলেন। তমলা বাড়ী হইতে কাপড়-চোপড় আনিতে গেল। সে গেলে পর গারা বলিলেন, পাহাড়ে বড় শীত, এই স্ত্রীলোকটির যথেষ্ট শীতবস্ত্র আছে কি না বলতে পারিনে।

লুলু বলিল, যা আবশ্যক, সব ক'রে দিতে হবে। তোমরা দুজনে একটু জিরিয়ে সহর দেখতে যাও।

—তোমার কাছে কে থাক্‌বে?

মুমী রয়েছে, তমলা একটু পরে আসবে।

কয়েক দিন সকলেই বড় ব্যস্ত। তুলাকা ও গারা দোকান হইতে কতক সামগ্রী ক্রয় করিলেন, বাকি সমস্তই হোটেলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। অধ্যক্ষ টেলিফোন করিতেই বড় বড় দোকান হইতে পাহাড়ে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত রাশি রাশি সামগ্রী আসিল। তুলাকা, গারা, লুলু কতক মনোনীত করিলেন, কিছু ফরমায়েশ দিলেন। তমলা কোন সামগ্রী গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ প্রকাশ করিল, কিন্তু লুলুর কথা এড়াইবার কাহারও সাধ্য ছিল না। তমলাকে লুলু উত্তম শীতবস্ত্র কিছু কিনিয়া দিল, কিছু প্রস্তুত করাইয়া দিল। মুমী নূতন কাপড় পাইয়া আহ্লাদ করিয়া তুলাকা ও গারাকে দেখাইল। বরফের উপর বেড়াইবার জন্য পেরেক বাহির করা পাদুকা, দীর্ঘ লোহা বাঁধান যষ্টি ক্রয় করা হইল। পায়ে জড়াইবার পটি, অঙ্গের জন্য মোটা আঁটা গেঞ্জি, মাথার জন্য পশমের চাপা টুপি, বরফে পরিবার চশমা, পাহাড়ে দূরে দেখিবার জন্য দূরবীক্ষণ, এই রকম নানা সামগ্রী সংগৃহীত হইল। টোটোরও দুই চারিটি গরম পোষাক হইল।

অধ্যক্ষ জানাইলেন, বেশ বড় বাড়ী ভাল যায়গায় পাওয়া গিয়াছে। আপাততঃ দুই মাসের জন্য ভাড়া করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি বেশী দিন থাক্‌তে পার্‌ব না। এর পর আমরা কোথায় যাব, সব ঠিক কর্‌তে হবে।

লুলু কিছু আবেগের সহিত কহিল, পরের কথা পরে হবে, এখন ত চলুন। আমরা এই কটি অসহায় মেয়ে-মানুষ, আপনি না থাক্‌লে আমাদের রক্ষা কর্‌বে কে?

শেষের কথায় বিদ্রূপ থাকিলেও তাহার কোন উত্তর নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বৈষ্ণব-মতবিবেক

৫

শ্রীসম্প্রদায় ও শ্রীরামানুজাচার্য্য

যামুনাচার্য্য দর্শন ও প্রতিজ্ঞা

কথিত আছে, রামানুজের মঙ্গলকামনায় শ্রীরঙ্গনাথের স্তব করিয়া যামুনাচার্য্য তাঁহার "স্তোত্ররত্নং" নামে অপূর্ব্ব স্তোত্রটি রচনা করেন। এই স্তবটি এমন সুন্দর আত্মনিবেদনমূলক ভক্তি-ভাবে পরিপূর্ণ যে, ইহার "স্তোত্ররত্নং" নামটি সার্থক হইয়াছে। এই স্তবটি সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকটই পরম সমাদৃত। শ্রীল যামুনাচার্য্য এই স্তবটি রচনা করিয়া নিজ শিষ্য মহাপূর্ণকে এই স্তবটি শ্রীবরদরাজের নিকট পাঠ করিবার জন্য কাঞ্চীতে পাঠাইয়া দিলেন। যখন মহাপূর্ণ বরদরাজের নিকট ভক্তি-বিগলিত-হৃদয়ে এই স্তবটি পাঠ করেন, তখন রামানুজ সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই অপূর্ব্ব স্তবটি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। এই স্তবের রচয়িতা শ্রীল যামুনাচার্য্য, এই কথা অবগত হইয়া রামানুজ যামুনাচার্য্যকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মহাপূর্ণ তাঁহাকে শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট লইয়া চলিলেন। কিন্তু অচিন্ত্যচরিত্র মহাপুরুষগণের আচরণ সাধারণ জীবের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। রামানুজ বড় আশায় বুক বাঁধিয়া শ্রীল যামুনাচার্য্যের দর্শনে চলিয়াছিলেন; মনে করিয়া-ছিলেন, চিরদিনের জন্য তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি জীবন সার্থক করিবেন। রামানুজ নম্বি বা মহাপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গমের উত্তরাংশে পৌঁছিয়া কোলেড়ুন নদীর তীরে কতকগুলি লোককে দেখিতে পাইলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, আলোয়ান্দার নিত্যলীলায় তাঁহার চিরবাঞ্ছিত স্থানে গমন করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার চিন্ময়ভাববিভাবিত তনু হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে। তিনি স্বেচ্ছায় অলৌকিক শক্তির দ্বারা শ্রীরামানুজের জন্য তিনটি আদেশচিহ্ন স্বীয় শরীরে রাখিয়া গিয়াছেন। রামানুজ এই ভক্ততনুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আলোয়ান্দারের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি সংবদ্ধ হইয়া কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কি কারণে তাঁহার অঙ্গুলিত্রয় এই অবস্থায় আছে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে রামানুজের হৃদয়ে ইহার কারণ স্ফুরিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, আলোয়ান্দার তিনটি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বুঝিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমি শ্রীবৈষ্ণবমতে অবস্থান করিয়া অজ্ঞানমোহিত জীবগণকে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করাইয়া দ্রাবিড়বেদে শিক্ষাদান পুরঃসর সর্ব্বদা প্রপত্তিধর্ম্মপরায়ণ করাইব।" এই প্রতিজ্ঞা-বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযামুনাচার্য্যের কুঞ্চিত অঙ্গুলিত্রয়ের একটি সরল হইল। তখন রামানুজাচার্য্য দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—"আমি জগজ্জীবের মঙ্গলার্থ ভক্তিতত্ত্ব বিবৃত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিব।" এই প্রতিজ্ঞার পর আলোয়ান্দারের দ্বিতীয় অঙ্গুলি প্রসারিত হইল। রামানুজ তৃতীয়বারে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"পরাশর ঋষি জীব ও ঈশ্বরাদির স্বভাব, উপায় প্রভৃতি প্রকাশ পূর্ব্বক যে পুরাণরত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, আমি কোনও উপযুক্ত ভক্তের পরাশর নামকরণের দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিব।" এই তৃতীয় প্রতিজ্ঞার পরই যামুনাচার্য্যের তৃতীয় অঙ্গুলি ঋজুতা লাভ করিল। রামানুজের এইরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হইয়া যামুনাচার্য্যের শিষ্যগণ বুঝিতে পারিলেন যে, পরম ভগবদ্ভক্ত আলোয়ান্দার উপযুক্ত পাত্রেই গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। তখন শ্রীশৈলপূর্ণ মহাপূর্ণ প্রমুখ যামুনশিষ্যগণ গুরুবিরহেও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিলেন এবং শ্রীল যামুনাচার্য্যের ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সমাপ্ত করিলেন। শ্রীরামানুজ প্রবল দুঃখে দুঃখিত হইয়া অভিমানভরে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের দর্শন পর্য্যন্ত করিলেন না।

রামানুজ আলোয়ান্দারের সঙ্গলাভের প্রবল আশায় নিরাশ হইয়া শ্রীরঙ্গম হইতে কাঞ্চীপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সময়ে রামানুজের মাতা কান্তিমতীও ইহলোক ত্যাগ করেন। রামানুজ এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যথিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ নানাবিধ উপদেশে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য যতই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কাঞ্চীপূর্ণ নিজে শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রামানুজকে দীক্ষা দান করিতে ততই অসম্মত হইতে লাগিলেন। এক দিন রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে স্বভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় গৃহিণী জমাম্বাকে উত্তমরূপে রন্ধনাদি করিতে বলিলেন। রন্ধনাদি সমাপ্ত হইলে তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিবার জন্য শ্রীবরদরাজের মন্দিরে আসিতেছেন, এদিকে পরম বিনয়ী কাঞ্চীপূর্ণ অন্য পথে রামানুজগৃহে আগমন করিয়া অন্ন ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিয়া নিজ উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ফেলিয়া দিয়া উচ্ছিষ্টস্থানের সংস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। এ দিকে রামানুজগৃহিণী জমাম্বা শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণের জন্য যে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কাঞ্চীপূর্ণকে পরিবেষণ করিয়া তাহার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা এক জন নীচজাতীয় ব্যক্তিকে দান করিলেন। রন্ধনপাত্রাদি পরিষ্কার করিয়া রন্ধনগৃহ পুনঃসংস্কার পুরঃসর স্নানান্তর রামানুজের জন্য পুনরায় অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামানুজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া গিয়াছেন জানিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। ইহার উপর পত্নীর কাঞ্চীপূর্ণকে শূদ্রজ্ঞানে অবজ্ঞা-বুদ্ধিতে তিনি বিশেষরূপে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। যাহা হউক, কোনওরূপে মনের ব্যথা সম্বরণ করিয়া রামানুজ কাঞ্চী-পূর্ণের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে

শ্রীবরদরাজের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ শ্রীবরদরাজের নিকট অবগত হইয়া মহাপূর্ণকেই রামানুজের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। রামানুজ বরদরাজের এই কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দীক্ষা-গ্রহণ

এ দিকে দেবাদেশে মহাপূর্ণ রামানুজকে দীক্ষাদান করিয়া তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক আচারে পটু করিবার জন্য শ্রীরঙ্গম্ হইতে সস্ত্রীক কাঞ্চীপুরে গমন করিতেছিলেন। রামানুজও শ্রীরঙ্গমের পথে একান্ত উৎকণ্ঠাভরে মহাপূর্ণের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে মাদুরার নিকট অগ্রহার গ্রামে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। রামানুজ কালবিলম্ব না করিয়া সেই স্থানেই দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং সস্ত্রীক গুরুদেবকে লইয়া, স্বভবনে আগমন করিলেন এবং তাঁহাদের বাসের জন্য বাসভবনের একাংশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে রামানুজ মহাপূর্ণের নিকট ছয় মাসকাল ধরিয়া তামিল প্রবন্ধাবলী অধ্যয়ন করেন। কিন্তু জমাম্বা পতির সর্ব্ববিষয়ে অনুকূলা ছিলেন না। তিনি সাংসারিক কর্ম্মে নিষ্ঠাবতী থাকিলেও স্বামীর উচ্চতর সংকল্প ও মহত্তর আচরণের মর্ম্ম অবগত ছিলেন না। তিনি বংশগৌরব, কুলগৌরব ও পিতৃবংশের অবলম্বিত স্মার্ত্তাচারের গৌরবকে বহুমান প্রদর্শন করিতেন। মহাপূর্ণ রামানুজের গৃহে কয়েকমাস বাস করিবার পর এক দিন মহাপূর্ণের পত্নী ও জমাম্বা একই কূপ হইতে জল আনয়ন করিতে গেলে কূপ হইতে জলোত্তোলনের সময়ে মহাপূর্ণের ভার্য্যার রজ্জু হইতে এক বিন্দু জল জমাম্বার কুম্ভে পতিত হয়, ইহাতে জমাম্বা গুরুপত্নীর অকৌলীন্য ও স্বীয় কৌলীন্যের উল্লেখ করিয়া গুরুপত্নীকে রূঢ়বাক্যে তিরস্কার করেন। মহাপূর্ণ পত্নীর নিকট এই কথা জানিতে পারিলেন এবং যাহাতে পুনরায় এই প্রকার অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত না হয়, তজ্জন্য রামানুজকে কিছুমাত্র না বলিয়া পত্নী সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামানুজ গুরুদেবের এই প্রকারে তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার কথা অনুসন্ধানে অবগত হইয়া ঐ গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষিণী পত্নীর সঙ্গ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন এবং তজ্জন্য উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামানুজ শ্রীবরদরাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের শুভ অবসরের প্রার্থী হইলেন। শ্রীবরদরাজও অচিরে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার একটি শুভ সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন। এক দিন এক জন দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ রামানুজগৃহে আগমন করিয়া তাঁহার পত্নীর নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলেন। রামানুজ ঐ সময়ে গৃহে ছিলেন না। জমাম্বা ঐ সময়ে গৃহে অন্ন থাকিতেও 'কিছু নাই' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় রামানুজের ঐ ব্রাহ্মণের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। তিনি ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে লইয়া একটি দোকানে গমন করিলেন এবং একখানি নূতন বস্ত্র ও হরিদ্রা ক্রয় করত তৎসহ পত্র লিখিয়া উহা ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন—"বিপ্রবর, আপনি আমার গৃহে গমন করুন এবং এই পত্র, নববস্ত্র ও হরিদ্রা আমার পত্নীকে দিয়া বলুন যে, তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে ও আপনি সেই বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাকে পিত্রালয়ে লইতে আসিয়াছেন, তাহা হইলে আপনি যথেষ্টরূপে সমাদৃত হইয়া প্রচুর অন্নব্যঞ্জন প্রাপ্ত হইবেন।" রামানুজ এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে স্বীয় গৃহিণীর নিকট পাঠাইয়া অন্য পথ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পত্নী ভ্রাতার বিবাহের সংবাদে পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং সন্দেশবাহক ব্রাহ্মণকে ভূরিভোজন করাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ব্রাহ্মণকে ভূরিভোজন করাইয়া জমাম্বা রামানুজের নিকট তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রামানুজও পত্নীর পিতৃগৃহে যাইবার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া বিশ্বস্ত লোক দিয়া পত্নীকে পিতৃগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পত্নীর সহিত পত্নীর যাবতীয় বস্ত্রালঙ্কার ছিল, তাহাও পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে বরদরাজের সম্মুখে আগমন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বসিলেন—"প্রভো! অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার হইলাম, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক আত্মসাৎ কর।" অনন্তর শ্রীমদ্রামানুজ নিরপেক্ষ হইয়া বেদবিহিত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।* গৈরিক বসন, ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করায় কমনীয়মূর্ত্তি রামানুজের এমন অপূর্ব্ব শোভা হইল যে, পরম ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে "যতিবর" নামে আখ্যাত করিলেন। তদবধি আচার্য্য যতিবর নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইলেন।

শ্রীল রামানুজাচার্য্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরই কাঞ্চীপুরস্থ সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে তাঁহাদিগের মঠাধিপতিপদে বরণ করিলেন। রামানুজও কায়মনোবাক্যে শ্রীবরদরাজের শরণ গ্রহণ করিয়া স্বকর্ত্তব্যে অবহিত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পরম পণ্ডিত ও শান্তস্বভাব ভাগিনেয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। পরে হারীত গোত্রের কুরেশ বা কুরনাথ নামক এক জন ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কুরেশের স্মৃতিশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ ছিল, পরবর্ত্তী কালে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিবার কালে কুরেশ একমাসকাল রাত্রিতে অধ্যয়ন করিয়া বোধায়নবৃত্তি একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহা হউক, রামানুজ এই দুইটি মেধাবী গুরুভক্ত শিষ্য পাইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিয়া তৃপ্ত হইতেন, এবং সমাগত জিজ্ঞাসুগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিতেন। ঐ সময়ে যাদবপ্রকাশের বৃদ্ধা জননী বরদরাজকে দর্শন করিতে আসিয়া স্নিগ্ধমূর্ত্তি অথচ তেজস্বী রামানুজকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার প্রবীণ পুত্র যাদবপ্রকাশকে আচার্য্যের শিষ্য হইবার জন্য আদেশ করেন। যাদবপ্রকাশ কিছুতেই স্বীয় শিষ্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে চাহিলেন না, কিন্তু রামানুজের নিকট তিনি যে প্রকার অপরাধ করিয়াছেন, এই শিষ্যত্বগ্রহণ ভিন্ন সেই অপরাধ-মোচনের আর অন্য পথ

---

* ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসে পূর্ব্বাশ্রমের নাম ও উপবীত ত্যাগ করিতে হয় না। একদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীযজ্ঞমূর্ত্তি যখন শ্রীরামানুজের শরণাগত হন, তখন শ্রীরামানুজের আদেশমত তিনি উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত পুরঃসর উপবীত গ্রহণ করাইয়া তবে আচার্য্য রামানুজ তাঁহাকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস দান করেন।

দেখিতে পাইলেন না। তিনি পরম ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের নিকট শ্রীবরদরাজের আদেশের প্রার্থী হইলেন। শ্রীবরদরাজও তিনি আচার্য্য রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। শ্রীবরদরাজের আদেশ পাইয়া তিনি আচার্য্য রামানুজকে দর্শন করিতে গেলেন, শ্রীরামানুজের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি এবং বিনয়পূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া তিনি রামানুজের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামানুজ মর্য্যাদাভঙ্গভয়ে নিজে পূর্ব্ব-গুরুর সহিত শাস্ত্রালোচনা না করিয়া তদীয় শিষ্য কুরেশকে যাদবপ্রকাশাচার্য্যের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। কুরেশের সহিত শাস্ত্রালোচনায় যাদবপ্রকাশের মনের সন্দেহ দূরীভূত হইল। তিনি মাতার আদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীল রামানুজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধকালে যাদবপ্রকাশ পূর্ব্বে বৈষ্ণবের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া রামানুজের শরণাগত হন। অশীতি বর্ষেরও অধিক বয়সে রামানুজের আদেশে পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য যাদবপ্রকাশাচার্য্য "যতিধর্ম্ম-সমুচ্চয়" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া শান্তিলাভ করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের কিয়ৎকাল পরেই যাদবপ্রকাশ ইহলোক ত্যাগ করেন বলিয়া অনুমান হয়।

রামানুজ যখন শ্রীযামুনাচার্য্যকে দর্শন করিতে যাইয়া যামুনাচার্য্য ইহলোক ত্যাগ করায় বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীরঙ্গনাথই তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করেন নাই বলিয়া শ্রীরঙ্গনাথের উপর অভিমানভরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করিয়াই কাঞ্চীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদবধি রামানুজ আর শ্রীরঙ্গমে যান নাই। মহাপূর্ণ রামানুজকে দীক্ষা দিয়া, তামিল প্রবন্ধ বা তামিলবেদ পাঠ করাইয়া তাঁহাকে ব্যুৎপন্ন করাইয়া-ছিলেন। ইচ্ছা ছিল, তিনি রামানুজকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। এ দিকে শ্রীল যামুনাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য তিরু-বরঙ্গ তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারও তেমনই মধুর ছিল। কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাঁহার পটুতা ছিল না। এই জন্য তিনি নিজেই শ্রীরামানুজাচার্য্যকে মঠাধিপতি করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ইতোমধ্যে রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই আশ্বাসিত হইলেন। রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গনাথের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—"হে ভগবন্, তুমি সর্ব্বপ্রকার শরণাগত জনকে পালন করিয়া থাক এবং তাহাদের অভাব পূর্ণ করিয়া থাক, তুমি আমাদের প্রিয়জন পরম শক্তিশালী শ্রীমান্ রামানুজকে তোমার পাদমূলে আনয়ন করিয়া আমাদের অভাব পূর্ণ কর।" শ্রীরঙ্গনাথ ভক্তের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—"বৎস মহাপূর্ণ, রামানুজ শ্রীবরদরাজের আদেশ ব্যতীত কখনও তাঁহার পাদমূল পরিত্যাগ করিবেন না। অতএব তুমি দেবগীতিপটু বররঙ্গকে বরদরাজের নিকট প্রেরণ কর। বরদরাজ তাঁহার সঙ্গীতে প্রীত হইয়া বর দিতে চাহিলে তখন যেন তিনি তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরামানুজকে ভিক্ষা চাহিয়া এখানে লইয়া আসেন।" এই আদেশ অনুসারে বররঙ্গ কাঞ্চীপুরে প্রেরিত হইলেন। বররঙ্গ সঙ্গীতের দ্বারা শ্রীবরদরাজকে এরূপভাবে পরিতুষ্ট করিলেন যে, তিনি রামানুজকে ভিক্ষাস্বরূপে চাহিলে শ্রীবরদরাজ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া পারিলেন না। শ্রীরামানুজকে লইয়া বররঙ্গ শ্রীরঙ্গমে আগমন করিলে বৈষ্ণবগণের আর আনন্দের অবধি রহিল না। শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য্যের স্থলে রামানুজকে শ্রীরঙ্গমের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহাকে বিপন্নের রক্ষার ও ভক্তগণকে রক্ষা করিবার শক্তি সঞ্চার করিলেন। এদিকে রামানুজও স্বীয় গুরু মহাপূর্ণকে পাইয়া তাঁহার নিকট "সিদ্ধিত্রয়ং" "গীতারহস্য" "পঞ্চরাত্রাগম" প্রমুখ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীরঙ্গমের ভক্তমণ্ডলী তাঁহার মুখে শ্রীভগবৎকথা ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।

মহামন্ত্রলাভ ও জীবহিতসাধন

শ্রীযামুনাচার্য্যের ছয়জন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছয়টি বিষয়ে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপূর্ণ পঞ্চসংস্কারে, আগম-দীক্ষায় ও তামিল প্রবন্ধে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন; শ্রীগোষ্ঠিপূর্ণ মন্ত্ররহস্যে পণ্ডিত ছিলেন; শ্রীমালাধর শঠারি-রচিত সহস্রগীতি বা শঠারিসূক্তের অর্থবিজ্ঞানে, শ্রীবররঙ্গ ধর্ম্মরহস্যে, শ্রীশৈলপূর্ণ রামায়ণরহস্যে এবং বরদরাজের প্রিয়ভক্ত শ্রীকাঞ্চী-পূর্ণ সেবারহস্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীরামানুজ ইঁহাদের প্রত্যে-কের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, সেবার দ্বারা ইঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া, ইঁহাদের নিকট হইতে সকল রহস্য অবগত হইয়া অতুল সম্প্রদায়বিভবের অধিকারী হইলেন। শ্রীগোষ্ঠিপূর্ণের নিকট মন্ত্ররহস্য গ্রহণ করিবার জন্য আচার্য্যকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শ্রীগোষ্ঠিপূর্ণের নিকট মন্ত্ররহস্য অবগত হইবার জন্য রামানুজ অষ্টাদশবার তাঁহার শরণাগত হইয়া, অষ্টাদশবারই প্রত্যাখ্যাত হইলে রামানুজ ভাবিলেন, "আমার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও মালিন্য আছে, সেই জন্য গোষ্ঠিপূর্ণ আমাকে কৃপা করিতেছেন না।" এই ভাবিয়া রামানুজ নিরাশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সরহস্য মন্ত্ররাজ দান করিলেন এবং বলিলেন—"এক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত এই মন্ত্রের অনুপম মাহাত্ম্য আর কেহই অবগত নহেন। আমি তোমাকে মহাপুরুষ জানিয়া ইহা তোমাকে দান করিলাম, এই কলিকালে দ্বিতীয় অধিকারী আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। যে কেহ ইহা শ্রবণ করিবে, সেই দেহান্তে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ইহা আর কাহাকেও দিও না।" রামানুজ এই মন্ত্র লাভ করিয়া দিব্যজ্ঞান ও পরমানন্দ লাভ করিলেন। গুরুপাদ-পদ্মে প্রণাম করিয়া পথে আসিতে আসিতে তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব-ভাব জাগ্রত হইল। তিনি গোষ্ঠীপূর্ণের বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে যাহাকেই দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই বলিতে লাগিলেন, "মন্দির-সমীপে আইস, আমি তোমাকে এক অমূল্য রত্ন দান করিব।" তাঁহার আনন্দ-পূর্ণ অলৌকিক সরলতাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিল। ক্রমে সমস্ত নগরেই প্রচারিত

হইল যে, এক মহাপুরুষ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মন্দির-সমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং যে যাহা চাহিতেছে, তাহাকেই তাহা দান করিতেছেন। এই জনরবে কৌতূহলান্বিত হইয়া নগরস্থ তাবৎ নরনারী যে যেরূপ অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায়ই মন্দির-চত্বরে উপস্থিত হইল। সমাগত অসংখ্য নরনারীর আকুল আগ্রহে আচার্য্য রামানুজ পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। তিনি স্বীয় প্রিয়তম শিষ্যদ্বয় কুরেশ ও দাশরথির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মন্দিরের দ্বারে আরোহণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"আমার প্রিয়তম ভাই ও ভগিনীগণ, তোমরা যদি সমস্ত দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে চাও, তবে আমি যে দিব্য মহামন্ত্র লাভ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া বারত্রয় আমার সহিত উচ্চারণ কর।" এই কথায় সকলেই বলিয়া উঠিল—"বলুন, আমরা আপনার সহিত এই মন্ত্রোচ্চারণে প্রস্তুত।" তখন রামানুজ শ্রীযামুনমুনির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, হৃদয়ে অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি ধ্যান পুরঃসর মন্ত্রার্থে তন্ময় হইয়া উদার-গম্ভীরস্বরে অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। সমবেত জনতা পরমাগ্রহে তাঁহার সহিত সেই মন্ত্র বারত্রয় উচ্চারণ করিল। সকলেই সেই মহামন্ত্র লাভ করিয়া, ক্ষণেকের জন্য সকল বিস্মৃত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইল। মন্ত্রের মহাশক্তিতে শক্তিমান হইয়া সকলেই মুহূর্ত্তের জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠের শুদ্ধ সত্ত্বময় ভাবে বিভাবিত হইল। যাঁহারা সাংসারিক স্বার্থের প্রলোভনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহা বিস্মৃত হইয়া এক অপার্থিব আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। সকলেই আচার্য্যদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জনতা অপগত হইলে রামানুজাচার্য্য মন্দিরের গোপুর হইতে অবতরণ করিয়া গোষ্ঠিপূর্ণের পাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য সশিষ্যে তদ্গৃহোদ্দেশে গমন করিলেন।

মন্ত্রসিদ্ধ গোষ্ঠিপূর্ণের একনিষ্ঠ সাধনায় এই মহামন্ত্রের প্রভাব তাঁহার নিকট প্রকাশিত হওয়ায় গোষ্ঠিপূর্ণ এই মন্ত্রকে প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তর মনে করিয়া এ পর্য্যন্ত এই মহামন্ত্র কাহাকেও দান করেন নাই। শ্রীরঙ্গনাথের আদেশে রামানুজাচার্য্যকে মহাপুরুষ মনে করিয়াই তিনি এই মন্ত্ররত্ন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানুজ অবিচারে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এই মন্ত্র প্রকাশ্য-স্থানে সর্ব্বলোককে দান করিয়াছেন শুনিয়া তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। রামানুজ যখন আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তখন তিনি পরুষ-কণ্ঠে কহিলেন—"পাপিষ্ঠ, তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আমি আর জীবনে কখনও তোমার মুখদর্শন করিতে চাহি না। তোমার স্থায় পাষণ্ডকে এই মহামন্ত্র দান করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি। তোমার নরকেও স্থান হইবে না।" রামানুজ গোষ্ঠিপূর্ণের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন—"মহাত্মন্, আমি অনন্তকাল নরকবাসের জন্য প্রস্তুত হইয়াই এই কার্য্য করিয়াছি। আপনি বলিয়াছিলেন, যে কেহ উক্ত মন্ত্র শ্রবণ করিবে, সেই অগ্রে মুক্তি-লাভ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে। আপনার এইবাক্য কখনও অসত্য হইবে না, ইহা জানিয়াই আমি অসংখ্য নরনারীকে মুক্তির অধিকারী করিয়াছি। দেহান্তে তাহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিবে। যদি আমার ন্যায় এক জন নগণ্য লোক অনন্তকালও নরকে বাস করে এবং তাহার ফলে যদি এতগুলি জীব চিরশান্তিধনের অধিকারী হয়, তবে সেই নরকগমন আমার অনন্ত স্বর্গলাভের অপেক্ষাও প্রার্থনীয়। আমি আপনার বাক্য সত্য জানিয়াই এই কর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছি।" রামানুজের এই বিনীত মধুর অথচ সুদৃঢ়বিশ্বাস-পূর্ণ বাক্য শুনিয়া রামানুজের হৃদয়ের মহত্ত্ব, ত্যাগশীলতা ও পরমৌদার্য্যে গোষ্ঠিপূর্ণ বিস্মিত হইয়া ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বাক হইয়া একদৃষ্টে রামানুজের মুখের পানে চাহিয়া থাকিলেন। তিনি রামানুজের মুখের পরমানন্দময় দিব্যভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন না যে, রামানুজ মানুষ না দেবতা? তাঁহার গুরুদেব যামুনাচার্য্যই কি এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন? তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি প্রগাঢ় প্রেমভরে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে রামানুজকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। প্রেমভরে গুরুশিষ্য কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। কুরেশ ও দাশরথি এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। আচার্য্য রামানুজ কিছুকাল পরে গুরুদেবের চরণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"প্রভো, আপনি সাক্ষাৎ শ্রীযামুনাচার্য্যের শক্তিতে শক্তিমান। আপনি আমার নিত্যগুরু। আপনার অসীম প্রভাবের কণামাত্র এই মহামন্ত্রে সঞ্চারিত হওয়ায় এই মন্ত্র এত শক্তিশালী হইয়াছে যে, ইহা ত্রিজগতের জীবের পাপরাশি এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিতে সমর্থ। দেখুন, এই মহামন্ত্রের প্রভাবে আমি গুরুবাক্যলঙ্ঘন-রূপ মহাপরাধে অপরাধী হইলেও আপনার দেবদুর্লভ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। প্রার্থনা করি, আপনার এই চিরদাস কখনও যেন আপনার শ্রীচরণকৃপায় বঞ্চিত না হয়।" গোষ্ঠিপূর্ণ এত দিনে বুঝিতে পারিলেন যে, রামানুজ সত্যই শ্রীরামানুজ অনন্তদেব। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের পুত্র সৌম্যনারায়ণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে রামানুজের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা শ্রবণ করিয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের সমস্ত শিষ্যই শ্রীরামানুজকে মহাপুরুষ লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এত দিনে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, কেন যামুনাচার্য্যের রামানুজের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল।

শত্রুর হৃদয়-জয়

যে প্রকার অভাবনীয় উদার ব্যবহারে রামানুজ গোষ্ঠিপূর্ণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রকার ব্যবহারেই তিনি তাঁহার সকল গুরু ও যাবতীয় শিষ্যের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা শ্রীভগবান্ই যাঁহার হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার প্রতি যে জগতের সকল জীবই আকৃষ্ট হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? রামানুজের সহিত যাঁহারা শত্রুতা-সাধনে জীবন পণ করিয়াছিল, তাহারাও রামানুজের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত। শ্রীরঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক অত্যন্ত ধনাঢ্য ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে অধিষ্ঠিত ভক্তানুগ্রহপরায়ণ শ্রীরঙ্গনাথের অতি নিকটে অবস্থান করিয়াও তুচ্ছ অর্থ, যশেরই আকর্ষণ ত্যাগ করিতে

পারেন নাই। তিনি ইন্দ্রিয়সুখভোগে আসক্ত ছিলেন এবং সপরিবারে শ্রীমন্দিরে বাস করিতেন। শ্রীরামানুজের প্রতি সর্ব্বসাধারণের অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইল। লোকে শ্রীরামানুজকে শ্রীরঙ্গনাথের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিত—প্রধানার্চ্চকের কিছুতেই ইহা সহ্য হইল না। তিনি গুপ্তভাবে বিষপ্রয়োগে রামানুজের জীবন-নাশের সংকল্প করিলেন। নিজের অনুরূপস্বভাবা পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া অর্চ্চক এক দিন রামানুজকে নিজগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। পত্নীকে ভোজ্যের সহিত বিষ প্রদানের অনুমতি দান করিয়া প্রধানার্চ্চক দেবার্চ্চনার্থ শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। এ দিকে আচার্য্য রামানুজ মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অর্চ্চকের ভবনে সমাগত হইলেন। রামানুজের সরলতাপূর্ণ বদনকমল ও দিব্য রূপ দেখিয়া অর্চ্চকের পাপীয়সী পত্নীর পাষাণহৃদয়ও বিচলিত হইল। ইহার উপর যতি-রাজের মুখে মাতৃসম্বোধন শুনিয়া সে আত্মহারা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রামানুজকে বলিল—"বৎস, এ অন্ন গ্রহণ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য, যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ কর।" রামানুজ এই কথা শুনিয়া প্রধানার্চ্চকের ভবন হইতে নির্গত হইয়া একাকী কাবেরীর তীরের দিকে গমন করিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমি প্রধানা-র্চ্চকের নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমার প্রাণনাশ করিতে চাহেন? শ্রীরঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক হইয়াও কেন তাঁহার হৃদয় এরূপ বিদ্বেষবুদ্ধিতে কলুষিত হইল?"

তখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের কিরণে কাবেরীর বালুকাময় তীরভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রামানুজের সে দিকে লক্ষ্য নাই—সহসা অনতিদূরে—গোষ্ঠিপূর্ণকে দেখিতে পাইয়া যতিবর সেই দিকে ধাবিত হইয়া উত্তপ্ত বালুকার উপর সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহাকে উঠাইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়া কহিলেন—"প্রভো! আমি প্রধানার্চ্চকের মনের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াই রোদন করিতেছি। এই মহাপাতক হইতে কিরূপে তাঁহার নিষ্কৃতি হইবে, তাহা বলুন।"

গোষ্ঠিপূর্ণ রামানুজকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, "তোমার ন্যায় মহাপুরুষ যখন তাহার কল্যাণপ্রার্থী, তখন শ্রীরঙ্গনাথের কৃপায় অচিরেই সে পাপপথ হইতে পুণ্যপথে গমন করিবে।" অতঃপর রামানুজ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিরন্তর প্রধানার্চ্চকের মঙ্গল করিবার জন্য মনে মনে শ্রীরঙ্গনাথের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং এই ঘটনার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। এ দিকে প্রধান অর্চ্চক তাঁহার পত্নীর অসামর্থ্যের কথা অবগত হইয়া নিজেই বিষপ্রয়োগে রামানুজের জীবন নাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামানুজ প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর শ্রীরঙ্গনাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে গমন করিতেন। সে দিনও যথারীতি মন্দিরে গেলে, প্রধান অর্চ্চক তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথের স্নানজল পানার্থে প্রদান করিলেন। শ্রীরামানুজ নিঃসঙ্কোচে পূর্ব্বের বিষ-মিশ্রিত ঐ জল পান করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হে দয়ার সাগর, দাসের প্রতি তোমার অপার স্নেহ বলিয়াই এই অমৃত দান করিলে। আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, আমি ইহার অধিকারী হইলাম?" এই বলিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া টলিতে টলিতে তিনি শ্রীমন্দির হইতে নির্গত হইলেন। রামানুজকে ঐ ভাবে বহির্গত হইতে দেখিয়া প্রধানার্চ্চক ভাবিলেন যে, বিষের ক্রিয়াতেই রামানুজের পদস্খলন হইতেছে; কারণ, অর্চ্চক ঐ জলে দশ জনের প্রাণান্তকারী তীব্র বিষ মিশ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি পরদিনই রামানুজের চিতাধূম দর্শন করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাতঃকালে দেখিতে পাইলেন যে, শত শত লোক এককালে "ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে!" এই আনন্দকীর্ত্তন করিতে করিতে চন্দনপুষ্পে সুশোভিত যতিরাজকে বেষ্টন করিয়া শ্রীমন্দিরে আগমন করিতেছে। যতিরাজের নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। যতিরাজের দেবতুল্য শান্ত তেজোময় মূর্ত্তি ও তাঁহার অনুপম প্রেমভাব দেখিয়া প্রধানার্চ্চকের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি আপনার অনুষ্ঠিত ভীষণ পাপকর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপে উন্মত্তবৎ হইয়া সবেগে জনতামধ্যে গমন করিয়া উন্মত্তবৎ রামা-নুজের সম্মুখে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় পাপকর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে কঠিন মৃত্তিকা ও প্রস্তরের উপর সবেগে মস্তকাঘাত করিতে লাগিলেন এবং নখাঘাতে হৃদয়দেশ রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই প্রকার ক্রন্দন ও অনুতাপপূর্ণ অনুশোচনায় জনমণ্ডলী সকলে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিল—কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া গেল—রামানুজেরও বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। শ্রীরামানুজাচার্য্য অত্যন্ত স্নেহ সহকারে প্রধানার্চ্চকের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন—"ভাই! আর হৃদয়হীনের ন্যায় নৃশংস আচরণ করিও না, শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ জীউ তোমার সমস্ত পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।" প্রধানার্চ্চক যতিরাজের এই কথায় বিস্মিত হইলেন, শ্রীরঙ্গনাথ যে তাঁহার ন্যায় মহাপাতকীর পাপকে ক্ষমা করিবেন, তিনি স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারেন নাই। যতিরাজ সস্নেহে তাঁহার সমস্ত অঙ্গে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। তাঁহারই করস্পর্শে তিনি শ্রীভগবানের অপার করুণায় বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইলেন। বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। শ্রীরামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রধানার্চ্চকের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। শ্রীরঙ্গনাথ এই প্রকারে যতিবরের মহিমা বৃদ্ধি করিলেন।

দিগ্বিজয়ীর হৃদয়-জয়

যজ্ঞমূর্ত্তি নামক এক জন একদণ্ডী সন্ন্যাসী উত্তর-ভারতের এবং দক্ষিণ-ভারতের বহু পণ্ডিতকে বিচারে পরাজয় করিয়া যতিরাজ রামানুজের যশোমহিমা লুপ্ত করিবার জন্য বিচারার্থী হইয়া শ্রীরঙ্গমে আগমন করিলেন। এই সন্ন্যাসী ভাগীরথীতীরে কোথাও শাঙ্কর সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মায়াবাদমূলক অদ্বৈতবেদান্তমত স্থাপন করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থপরিপূর্ণ একখানি বৃহৎ

শকট-সহ ইনি রঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বিচারার্থে যতিরাজকে আহ্বান করিলেন। যতিরাজ অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"বিচারের আর আবশ্যক কি? আমি বিনা বিচারেই আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম।" কিন্তু উদ্ধত যজ্ঞমূর্ত্তি এই কথার উত্তরে বলিলেন যে, "আপনি যখন পরাজয় স্বীকার করিলেন, তবে কি আপনি ভ্রান্তিপূর্ণ বৈষ্ণব মত পরিত্যাগ করিয়া অভ্রান্ত মায়াবাদ গ্রহণ করিলেন?" জয়-পরাজয়ের আকাঙ্ক্ষাবিহীন মহাপুরুষ নিজের মর্য্যাদা-রক্ষায় উদাসীন হইলেও সাম্প্রদায়িক মতের মর্য্যাদা রক্ষণ না করিলে কর্ত্তব্য-হানি হয় ভাবিয়া অবশেষে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমাগত সপ্তদশ দিন ধরিয়া এই বিচার চলিল, অবশেষে সপ্তদশ দিনে যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের প্রায় সকল যুক্তিই খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। যতিরাজ যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া মঠস্থ শ্রীদেবরাজের শরণাগত হইলেন। যুক্তিতে মায়াবাদ খণ্ডন করিতে না পারিলেও যে ভক্তিবাদ জীবমাত্রেরই পরম নিঃশ্রেয়সসাধক, তাহার বিরোধী হইলে মায়াবাদ যে সাধারণ জীবের অহিতকর, এই কথা মনে করিয়াই শ্রীদেবরাজের নিকট তিনি ভক্তিবাদের যাহাতে উচ্ছেদ না হয়, সেই বর প্রার্থনা করিলেন। রাত্রিকালে দেবরাজ স্বপ্নে শ্রীরামানুজকে দর্শন দান করিয়া বলিলেন—"যতিরাজ, চিন্তার কারণ নাই, ভক্তির মাহাত্ম্য তোমার দ্বারাই জগতে প্রচারিত হইবে, তুমি যামুনাচার্য্যের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হও, মদীয় শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তুমি বিচারে জয়লাভ করিবে।"

রাত্রির শেষযামে আচার্য্য গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীদেবরাজকে প্রণাম করিয়া শ্রীল যামুনাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে মায়াবাদ খণ্ডনের যুক্তিগুলি অধিগত করিলেন এবং তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যজ্ঞমূর্ত্তির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি তাঁহার নিশ্চিন্তভাব ও উৎসাহ ও আনন্দে প্রদীপ্ত মুখশ্রী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলেন, আচার্য্য রামানুজ আজ দৈববলে বলীয়ান্। অচিরেই তিনি সর্ব্বাভিমান ত্যাগ করিয়া এই মহাপুরুষের পাদমূলে পতিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। শ্রীল রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তির এইরূপ দৈন্য দেখিয়া শ্রীদেবরাজের কৃপায়ই যে যজ্ঞমূর্ত্তির এই সুমতির উদয় হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীদেবরাজ বিগ্রহকে মনে মনে প্রণাম করিলেন। শ্রীরামানুজের আদেশে যজ্ঞমূর্ত্তি একদণ্ড সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন এবং পরে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। রামানুজাচার্য্যের আদেশে তিনি তামিল ভাষায় "জ্ঞানসার" ও "প্রমেয়সার" নামক দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীল রামানুজ তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া সেই স্থানে মঠাধিপতিরূপে তাঁহার অবস্থানের ব্যবস্থা ও যাহাতে পণ্ডিত যুবকগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যজ্ঞমূর্ত্তি অভিমান বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া স্বয়ং গুরু ও মঠাধিপতি হইতে স্বীকৃত হইলেন না, বরং শ্রীমদাচার্য্যদেবের পদান্তিকে যাহাতে তিনি চিরজীবন বাস করিতে পারেন, তাহার প্রার্থনা জানাইলেন। আচার্য্য তাঁহাকে স্বীয় মঠে রাখিয়া শ্রীদেবরাজের সেবা করিতে আদেশ করিলেন। আচার্য্য তাঁহার "দেবরাজ মুনি" এই নামকরণ করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম এ, বি এল)।

চির-তরুণ

প্রথম প্রভাতে যে বাণী উঠেছে,
আজিও জগতে ফিরিছে ধীরে।
মানব-সাগর উদ্বেল করি—
ছাপায়ে তাহার দুইটি তীরে।

সেই সাম-গীতি, সনাতন-রীতি,
সেই সে দিনের প্রভাতী গান।
শত মহামারি, অরাজকতায়,
জাগায়ে রাখিছে ভারত-মান।
এখনো সবারি পশে শ্রুতিমূলে,
সে দিনের সেই মিলন-ধ্বনি,
সে দিনের বেদ, রামায়ণ, আদি,
সভ্য জগতে মাথার মণি।

আজিও বাদল-ব্যাকুল নিশিতে,
মোরা শুনি সেই উদার বাণী।
ভারতের ইহা—তথা জগতের
সবারি হয়েছে এ শুধু জানি।
জগত হতেছে বুড়া ধীরে ধীরে,
বাণীটি কিন্তু তরুণ চির।
অচল, অটল, গিরিবর সম,
স্থাণুর মতন রহেছে স্থির।

শ্রীমতী বনলতা দেবী (বি-এ)।

স্বপ্ন

গ্রীষ্মকালের এক মধুর প্রভাতে মিস্ বোস কলিয়ারির ম্যানেজার বিজয় মিত্রের বাংলোয় প্রবেশ করিলেন।

চারিদিকে ফাঁকা রুক্ষ মাঠের মাঝে বাংলোখানির সৌন্দর্য্য প্রথম সন্ধ্যার আকাশে জ্বলজ্বলে সান্ধ্য-তারাটির মতই পরিপূর্ণতায় ভরিয়া আছে। মেহেদি গাছের ওপারে সবুজ তৃণের শ্যাম সজীবতা; বেলা, গোলাপ, যূঁই, রজনীগন্ধার কুসুম-মুকুলপূর্ণ সুশোভন সারি সেই সবুজের চারিপাশে। বিলাতী ঋতুপুষ্পও এখানে ওখানে ঘাসের বুকে প্রজাপতির মতই পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শ্যামল ঘাসের বুক চিরিয়া নাতি-প্রশস্ত লাল কঙ্করাস্তীর্ণ পথটি বাংলোর বারান্দায় মাথা রাখিয়াছে। প্রবেশ-পথের লৌহ-দ্বারটি ঝুমকা লতায় মণ্ডিত; লৌহকঠিন বুককে ফুটন্ত ফুলের শোভাশ্রীতে ভরিয়া প্রথম প্রবেশার্থীর অন্তরে একটা সৌন্দর্য্য-বিভ্রম জাগাইয়া তোলে। হাত দিয়া দ্বার ঠেলিবার সময় মিস্ বোস বুঝিলেন, উপরে ফুলের কোমলতা দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইলেও—ভিতরে লৌহের নির্ম্মমতা পরক্ষণেই সে মোহ দূর করিয়া দেয়।

লাল পথটিতে পা দিতেই জুতার তলায় কাঁকরগুলা 'কচ্' 'কচ্' শব্দ করিয়া উঠিল।

নিস্তব্ধ নিস্মল প্রভাতে সে শব্দ বিশেষ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল না। মিস্ বোস অগ্রসর হইলেন।

তিনি বারান্দায় উঠিতেই বাঁ-পাশের দুয়ার হঠাৎ খুলিয়া গেল এবং স্বল্পাভরণা এক সুন্দরী যুবতী হাসিমুখে বাহির হইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। মিস্ বোস তাহাকে অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন, "আমি বোধ হয় মিসেস্ মিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে?"

মিসেস্ মিত্র উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আপনি আপনার ছোট বোন সুলতার সঙ্গেই কথা কইছেন, দিদি। আদব-কায়দা আর রাখলুম না, সম্বন্ধ একটা পাতিয়ে ফেললুম; দোষ করলুম কি?"

মিস্ বোস হাসিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া কহিলেন, "না, দোষ করনি। অমন মিষ্টি ডাক আমি অনেক দিন শুনিনি।"

সুলতা বলিল, "চলুন দিদি, ভেতরে গিয়ে বসবেন।"

মিস্ বোস বলিলেন, "না, এই বারান্দায় একটু বসি, বেশ হাওয়া দিচ্ছে। তোমাদের বাংলোখানি ভারি সুন্দর।"

সুলতা আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিল, "মালী আমরা রাখিনি। বিকেলবেলায় নিজেরাই গাছগুলোর কেয়ারি করি, কোদাল ধরি,—জল ঢালি, ফুল তুলে তোড়া বাঁধি।"

মিস্ বোস সপ্রশংসদৃষ্টিতে উদ্যানের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাঃ! তাই ত এমন সুন্দর শোভা এর হয়েছে। প্রাণের যোগ না থাক্‌লে কি প্রাণ টান্‌তে পারে?"

সুলতা লজ্জিত হাস্যে মুখ নামাইয়া বলিল, "উনিও যখন তখন ঐ কথা বলেন।"

মিস্ বোস উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "বলেন? মিঃ মিত্রও বলেন? আচ্ছা, এই বাগানের নিশ্চয়ই একটা ইতিহাস আছে।"

সুলতা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "ইতিহাস?"

মিস্ বোস হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ইতিহাস। টেক্‌স্ট বুক কমিটির অনুমোদিত সে ইতিহাস কোন স্কুলের কোন ক্লাসের পাঠ্য নয়। বোকা মেয়ে বুঝতে পারছ না? তুমি আর মিঃ মিত্র প্রতিদিন যে তার পাতা উল্টে পাঠ নাও।"

সুলতা আরক্ত মুখখানি নামাইয়া বলিল, "এত সুন্দর ক'রেও আপনি বলতে পারেন, দিদি!"

তাহার আনত মুখখানি দু'হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া মিস্ বোস বলিলেন, "সুন্দর জিনিষের অসুন্দর ব্যাখ্যা চলে না। বল ত ওর ছোট ইতিহাস।"

সুলতা লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সে সব তুচ্ছ কথা শোনবার মত ধৈর্য্য আপনার থাকবে না, দিদি। —আপনি কাযের লোক।"

এই কথায় মিস্ বোসের মুখের উজ্জ্বলতা ঈষৎ যেন ম্লান হইয়া আসিল। উদ্যানের পানে মুখ ফিরাইয়া ছোট একটি নিশ্বাস বুকের মধ্যে পুরিয়া তিনি ম্লান হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তুচ্ছ জিনিষকে অগ্রাহ্য ক'রে কাযের লোক হওয়াকে আমি বিশেষ সৌভাগ্য ব'লে গর্ব্ব করিনে। কাযের উৎসাহ আসে তুচ্ছ জিনিষের অন্তর হতেই।"

সুলতা বলিল, "আপনি কথাকে এমন ঘুরিয়ে বলেন—"

মিস্ বোস হাসিয়া বলিলেন, "সহজ ক'রে বলবার

রূপকথার রাজকুমার

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

কৌশল জানি না যে, ভাই। এ-ও তোমার দিদির অক্ষমতা। আচ্ছা, বিকেলে ফিরে এসে তুমি আর মিঃ মিত্র যখন বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াও বা গাছে জল ঢাল, তখন সে সময়টা কেমন লাগে?"

সুলতা আনন্দ-বিগলিত স্বরে বলিল, "চমৎকার। সারাদিন-রাত্রির মধ্যে ঐ দুই এক ঘণ্টার জন্য আমি আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকি।"

মিস্ বোস বলিলেন, "অথচ সামান্য তুচ্ছ জিনিষ ওটা, ছোট ছোট গাছ, গন্ধভরা ফুল, সবুজ ঘাস, নীল আকাশ এই সব ত এর তুচ্ছ উপকরণ। শ্রান্তির নিরালা মুহূর্ত্তে এই তুচ্ছতম জিনিষগুলি কি প্রাণ-পূর্ণ সৌন্দর্য্যেই না ভ'রে ওঠে।"

সুলতা বলিল, "কিন্তু, দিদি,—এত তুচ্ছ নয়।"

মিস্ বোস বলিলেন, "কারণ, তোমাদের মন একে তুচ্ছ করে না। কিন্তু কোলিয়ারি থেকে কুলীর দল কায শেষ হ'লে যখন এর পাশ দিয়ে গান গাইতে গাইতে বা গল্প করতে করতে চ'লে যায়, তখন তাদের গান-গল্পের এক পাশে এটা কত তুচ্ছ হয়ে প'ড়ে থাকে বল দেখি। তারা ত ফিরেও চায় না এর পানে। তাদের তুচ্ছ গান-গল্পকেই তারা এর চেয়ে উঁচু আসন দেয়।"

সুলতা বিস্মিত স্বরে বলিল, "আমি ত এমন ক'রে কখনও ভাবিনি, দিদি।"

মিস্ বোস বলিলেন, "না, বোন, এমন ক'রে কোন দিন তুমি ভেবো না। চল, ঐ বাগানটার মধ্যে পায়চারি করতে করতে তোমার কথাগুলো শুনি।"

সুলতা ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তা আপনার কাযের তাড়া না থাকে, একটু চা—"

মিস্ বোস বলিলেন, "তার চেয়ে জরুরী তাড়া যে জন্য এসেছি, রোগী দেখা। রোগিণী কে শুনি?"

সুলতা বলিল, "আমি নিজে।"

মিস্ বোস বলিলেন, "তুমি! এমন স্বাস্থ্য, মনে এমন আনন্দ। না, না—"

সুলতা বলিল, "সত্যিই দিদি, পেটে মাঝে মাঝে এমন ব্যথা ধরে—"

মিস্ বোস তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আচ্ছা, বাগানের—ইতিহাসটা আগে শুনে—পরে তোমার রোগ সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি, দুঃখিত হবে না ত?"

সুলতা বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিল। ভাবিল,—লেডী ডাক্তার মিস্ বোস বলেন কি! কাযের কথার চেয়ে তুচ্ছ কথার দামই ওঁর কাছে বেশী হ'লো?

মিস্ বোস হাসিয়া বলিলেন, "ভাবছ, তুচ্ছ কথা শোনবার জন্য ওঁর এত আগ্রহ কেন? ভাবছ, আগে দুবার ডাকতে পাঠালেও যে আসেনি, আজ হঠাৎ সকালবেলায় বিনা ডাকে সে কেন এলো?"

সুলতা কুণ্ঠা কাটাইয়া বলিল, "সত্যি দিদি, আগে আপনি দুবার আমাদের কথা ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আয—"

মিস্ বোস হাসি-মুখে বলিলেন, "এর কারণ? আগে কাযের মানুষ ছিলাম, আজ হঠাৎ মনে হ'লো, কাযের মানুষ হয়ে ত বিশ বছর কেটে গেল, দেখি না বাজে মানুষ হয়ে কি লাভ হয়? মনটা বড় দুষ্ট,—কাযকে সে ভালবাসে অকাযকে ভোলবার জন্যে। আবার কাযকে প্রাণ দেয় অকাযের প্রাণটুকু চুরি ক'রে। বড্ড হেঁয়ালী, নয়?"

সুলতা কথা কহিল না, প্রশ্নকর্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিল।

মিস্ বোস তেমনই হাসিয়া বলিলেন, "হেঁয়ালি কিছুই নয়। তুমি এই বাগানটিকে ভালবাস এবং তোমার সমস্ত দিন-রাতের মধ্যে এটির মূল্য সব চেয়ে বেশী দিয়ে থাক, কারণ—" বলিয়া চুপ করিলেন।

সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ?"

—"মিঃ মিত্র তোমায় ভালবাসেন। তোমাদের দু'জনের তুচ্ছ কথাগুলো এর ঘাসে, পাতায়, ফুলে ছিট্‌কে প'ড়ে সব চেয়ে দামী হীরের টুকরো তৈরী করে,—এই জন্য। তার পর, সারা দিনরাত্রির কায সুশৃঙ্খলে চলে—এই স্বপ্নের সৌন্দর্য্য নিয়ে। তুমি গৃহস্থালীকে চালাও সুনিপুণ শৃঙ্খলায়, আর মিঃ মিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি, যশ, অর্থ আহরণ করেন আশ্চর্য্যভাবে শুধু এই বাগানখানির প্রাণের রস তোমাদের প্রাণকে সজীব ক'রে রেখেছে ব'লে।"

সুলতা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আর এই তুচ্ছ বাগানও সুন্দর হয়েছে—"

মিস্ বোস সমাপ্তির ছেদ টানিলেন, "তোমরা—পরস্পরকে ভালবাস ব'লে।"

সুলতা লজ্জায় মুখ নামাইয়া একটা প্রকাণ্ড রক্তবর্ণের গোলাপ ছিঁড়িবার প্রয়াস করিতে লাগিল।

মিস্ বোস বাধা দিলেন, "থাক, তুলো না। ওর সঙ্গে তোমার মনের হুবহু মিল আছে। না তুল্‌লেও বুঝতে পার্‌বো, ওর বুকের মত তোমার মনও—"

সুলতা সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিল, "এই গাছটা আমি পুতেছিলাম। কেমন সতেজ হয়েছে, দেখুন।"

মিস্ বোস বলিলেন, "আর এই মরুঞ্চে শুক্‌নো গাছটি কার হাতের?"

সুলতা কৌতুকভরে বলিল, "মিঃ মিত্রের। এত ক'রে বল্‌লাম, পুতো না ঐ ইটগাদায়, শুন্‌লেন না। এখন তেমনি, পাতাও গজায় না, ফুলও ফোটে না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

মিস্ বোস হাসিলেন না। সহসা যেন ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "অথচ ওটাও গোলাপ গাছ। আশ্চর্য্যের কথা এই, মাটী খারাপ নয়, রস টানবার অক্ষমতাতেই ও অম্‌নি রুগ্ন হয়ে পড়েছে।"

সুলতা বলিল, "আমি রোজ বলি, ওটা উপড়ে ফেল। উনি শুধু হেসে বারণ করেন। বলেন, 'থাক্ না, খেতে-পর্‌তে দিতে ত' হচ্ছে না'।"

মিস্ বোস রিক্তপত্র গাছটির পানে চাহিয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। আচ্ছা, তোমরা এ বেঞ্চিটা এ ধারে পেতেছ কেন? এইখানেই এসে বোস বোধ হয়।"

"হাঁ, উনি পুবদিকে মুখ ক'রে বস্‌তে ভালবাসেন।"

"আর ঐ রোগা-মরুঞ্চে গাছটাকেও দেখতে হয় না। সাম্নেই তোমার হাতে পোতা সতেজ ফুলওয়ালা সুন্দর গাছটি চোখে পড়ে! মিঃ মিত্রের রুচিজ্ঞানের প্রশংসা করি।"

সুলতা বলিল, "আমরা ওদিকে মুখ ক'রে বসি, চাঁদকে সাম্‌নে রেখে। ঐ আকাশের কোণটিতে প্রথম সে উঁকি মারে, তার পর মাঝখানে উঠে যায়। ফুরফুরে হাওয়ায় ফুলের গন্ধ ভেসে আসে! উনি বলেন,—এই স্বর্গ।"

মিস্ বোস আপন রহস্যভরা নেত্রদ্বয় সুলতার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বিহ্বলস্বরে কহিলেন, "তার পর?"

সুলতা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তার পর এ-কথা সে-কথা অনেক কথাই হয়। কোন দিন উনি কোলিয়ারির গল্প করেন, কোন দিন আমি ঘর-কন্নার কথা বলি। যত রাজ্যের পচা পুরোনো কাহিনী টেনে এনে আমরা সাম্‌নে সাজিয়ে রাখি। সত্যি দিদি, সে-সব কথা শুনতে যে এত আমোদ হয়, তা আগে জানতাম না।"

মিস্ বোস আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "তার পর?"

সুলতা বলিতে লাগিল, "পরশু ঐ গন্ধরাজের ঝাড়টা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া। একটা ডালে দু'টো কুঁড়ি ওর বড় হয়েছিল। আগের দিনে তর্ক হ'লো, কোন্‌টা আগে ফুটবে। উনি বল্লেন, বাঁ দিকেরটা, আমি বল্লাম, ডান দিকেরটা। পাছে গোলমাল হয় ব'লে কুঁড়ি দুটোয় লাল সাদা সুতো বেঁধে রেখেছিলাম। কিন্তু দিদি, এমনি চোর—কখন্ চুপি চুপি উঠে এসে সুতো রেখেছে বদল ক'রে। সন্ধ্যে-বেলায় গিয়ে দেখি, ফুটেছে ডানদিকেরটা, কিন্তু লাল সুতো বাঁধা। এই নিয়ে ঝগড়া!"

মিস্ বোসের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। সুলতাকে চুপ করিতে দেখিয়া দ্রুত প্রশ্ন করিলেন, "তার পর তার পর?"

সুলতা হাসিয়া বলিল, "তার পর ঝগড়া মিটে গেল এক সময়ে—আমরা ড্রয়িং-রুমে গিয়ে বসতেই। ওর দেওয়ালে নেপোলিয়ানের একটা মস্ত ছবি আছে। সেটার দিকে তাকিয়ে উনি বল্লেন, "ঐ বীর যে কৌশলে এক দিন পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন, তেমনি সৃষ্টির এক প্রত্যূষে তোমরাও আমাদের কৌশলে বন্দী করেছ। ফুলটা তোমারই আগে ফুটেছে।"

মিস্ বোস ঈষৎ যেন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তার পর জানালার ধারে সোফায় গিয়ে তোমরা বসলে বুঝি? টেবিলের ওপর টাইমপিস্‌টা টিক্-টিক্ করছিল, খানকয়েক টাট্‌কা উপন্যাস সেখানে উপর উপর সাজানো ছিল, সেন্ট, ফুলের তোড়া, এমন কি, ফাউণ্টেন পেনটি পর্য্যন্ত প্যাডের ওপর খোলা। ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই ব্লু রং পেন্ট করিয়েছ, কড়িগুলো ফিকে আসমানী—"

সুলতা বলিল, "দিদি, ঠিক ত বলেছ। তুমি ত ঘরের মধ্যে দেখনি—তবে—"

মিস্ বোস বলিলেন, "কোন্ কোন্ জিনিষ আছে, যার অর্দ্ধেকটা না দেখেও সবটা বোঝা যায়। যেমন ভাল উপ-ন্যাস, যেমন স্বপ্ন। তোমার এই বাগানখানির শোভা দেখে ঘরের সৌন্দর্য্যও কিছু কিছু অনুমান ক'রে নিয়েছি এবং এখানে যে স্বপ্ন ছড়ানো রয়েছে,—তা এক দিন সত্যিই স্বপ্ন হয় ত ছিল,—কিন্তু আজ বাস্তব এর প্রাণ দিয়েছে। আমি

কেবল ভাবি, যাঁরা বই লেখেন, তাঁরা কল্পনাকে সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেন, কিন্তু সব সময় জুটোতে মেলে কি ?"

সুলতা মিস্ বোসের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই আপনার মনে কোন দুঃখ আছে, দিদি। নইলে এত কথা ভাবতে পারেন কি ক'রে আপনি ?"

মিস্ বোস হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত একটু আগে বলেছিলাম, এমন ক'রে কখনও ভাবতে শিখো না। আমার অভিজ্ঞতার মূল্য বড় ভয়ানক। একটা গল্প বলি শোন :—

কুড়ি বছর কি তারও আগেকার কথা। দেওঘরে টিলার ওপর যে দুখানি পাশাপাশি ছোট বাংলো আছে, তার দুটিতে থাকতো দুজন তরুণ-তরুণী। তাঁদের আত্মীয়েরা স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের আশায় গিয়েছিলেন সেখানে। পাশাপাশি বাড়ী,—দু'বাড়ীর ব্যবধান ঘুচে গিয়ে আত্মীয়তা সুরু হ'লো। তরুণ-তরুণী পরস্পর মনে করলে—তারা পরস্পরের পরমাত্মীয়,—তাদের পরিচয় বহু জন্মের আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে। তারা এমনই নির্জ্জন এক মাঠে ফুল-বাগানের মধ্যে নীড় বাঁধবে, গান গাইবে, জীবনকে হাল্কা ফানুসের মত উড়িয়ে দেবে। নীড় বাঁধার মধুর স্বপ্ন তারা দেখতে লাগলো। নীল আকাশের বর্ণ-বিকাশ, দিনান্তের ধূসর অস্পষ্টতা, বাতাসের শন্ শন্ শব্দ, ঘাসের শ্যামলতা ও বর্ষা-দিনের ভিজে মাটীর গন্ধ, তারা মনে করতো, প্রকৃতির এই সমারোহ শুধু তাদের দু'জনের জন্যই! গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ অলস রৌদ্রে চারিদিক যখন আলস্যে ভ'রে উঠতো—তখন তাদের মনে হ'তো,—ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে বসে—তারা আবোল-তাবোল বকে। রাত্রিতে ঘাসের ওপর শুয়ে চাঁদকে মাথায় রেখে ভাবতো, আহা! এমনি ক'রে দিনশূন্য রাত্রি যদি দীর্ঘতর হয়, উষা আর না আসে। আবার প্রভাত ও গোধূলিতে ভ্রমণ সেরে ফিরবার মুখে ভাবত, কেন বিধাতা এই দুটি সময়কে অল্পায়ু করেছিলেন! এমনি কত কথা। তার পর এক দিন ডাক এলো। স্বাস্থ্যকামীরা চ'লে গেলেন, তরুণ-তরুণীর স্বপ্নও ভাঙ্গলো। কলকাতায় এসে স্বপ্নের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল—তাও গেল গুঁড়িয়ে। সেখানে সমাজ ছিল, সমাজের কর্ণধারস্বরূপ অভিভাবকরা ছিলেন। উত্তররাঢ়ী বা দক্ষিণ-রাঢ়ীতে না কি বিবাহ চলে না। তরুণী কাঁদলে, তরুণ বোঝালে। এ জন্মে না হয়—পরজন্মে মিলন তাদের হবেই। একটা জন্ম তারা স্বপ্ন দেখেই কাটাবে, এমনি কত কি প্রবোধের কথা। মেয়েটি সে-কথা মনে প্রাণে মেনে নিলে, নিয়ে কর্ম্ম-সমুদ্রে গা ঢেলে দিলে।"

সুলতা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "আর ছেলেটি ?"

মিস্ বোস ম্লান হাসিয়া বলিল, "আর নাই বা শুনলে।"

সুলতা বলিল, "তা কি হয় দিদি ? সবটা বলুন, নৈলে আধ-কপালের ব্যথা ধরবে।"

মিস্ বোস বলিলেন, "এই শুক্‌নো গাছটির পানে চেয়ে আমার সেই ছেলেটির কথা মনে হয়, কিংবা তোমাদের ঝুম্‌কো লতায় ভরা লোহার গেটটি দেখে। গাছটা নামে গোলাপ, কিন্তু কাঁটাই ওর সার হয়েছে, আর গেটটার ভেতর বার দুরকম।"

অধীর আগ্রহে সুলতা বলিল, "আপনি ছেলেটির কথা বলুন, দিদি।"

—"বলছি। কিন্তু যদি কখনও ঐ নীরস গাছটার ফুল ফোটে ত মিঃ মিত্রের কাছে এই গল্প করো, নইলে নয়। ও গাছটা শুকিয়ে গেছে ফুল নেই ব'লে।—প্রাণ নেই ব'লে—ফুলও ওর নেই।"

ঈষৎ বিরক্ত হইয়া সুলতা বলিল, "কেবল ত গাছ আর ফুলের কথাই বলছেন, মানুষটার কি হলো ?"

মিস্ বোস কৌতুকভরে কহিলেন, "এইবার সেই কথাই বলি। ছেলেটি এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে বিয়ে করলে।"

সুলতা সবিস্ময়ে বলিল, "বিয়ে করলে ? বল কি, দিদি ?"

প্রশান্ত স্বরে মিস্ বোস বলিলেন, "হাঁ, বিয়ে করলে। এক বছর বড় কম সময় নয়, দীর্ঘ ৩ শত ৬৫ দিন। তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েটি চেয়েছিল স্বপ্ন দেখতে, ছেলেটি ত স্বপ্নবিলাসী নয়, কাযেই বিয়ে তাকে করতে হ'লো। তার পর শুনবে ?"

সুলতা রাগ করিয়া কহিল, "না, আর শুনতে চাই না। গল্প, না ছাই।"

মিস্ বোস তাহার হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "গল্প নয়, সত্য কথা। তোমার মন দিয়ে তুমি মেয়েটির দুঃখ বুঝছো, কিন্তু পুরুষের মন নিয়ে বিচার করলে নিশ্চয়ই ছেলেটিকে সাধুবাদ দিতে।"

সুলতা ঘাড় দোলাইয়া বলিল, "না, দিদি, পুরুষ-মানুষকে আমি অতটা চঞ্চল মনে করি না। আমাদের উনি বলেন—"

মিস্ বোস বলিলেন, "ওঁর সঙ্গে ত সকলের তুলনা হয় না। তবু জেনে রেখ ভাই—তোমাদের লোহার গেটটাও এই স্বপ্ন-ভালবাসার ভগ্নাংশ। আজ ওর সারা দেহ ঘিরে ফুলের মালা, কাল শুক্‌নো লতায়, না, থাক সে বিশ্রী কল্পনা। আমি কেবল ভাবছি, সেই মেয়েটি যদি আজ এই বাগানে এসে বসতো ত' দেখতে পেত,—স্বপ্নেরও একটা রূপ আছে—রমণীয়তা আছে। তা কল্পনা ও বাস্তবে মিশানো; এবং স্বর্গ সেইখানে—কল্পনা ও বাস্তব যেখানে পাশাপাশি হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছে।"

সহসা সুলতা মিস্ বোসের পানে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার ভাসা ভাসা স্বচ্ছ দুটো চোখের কোণ চিক্-চিক্ করিতেছে, মুখখানি সুকোমল বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে।

নব-পরিচয়ের ব্যবধান ভুলিয়া সে অকস্মাৎ দুই হাত দিয়া মিস্ বোসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দিদি, এ-ঘটনা কি তোমারই জীবনে ঘটেছিল? উঃ, আমি কি অন্ধ! এই বিশ বছর ধ'রে তুমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছো, অথচ এ কাহিনী শুনেও আমি বুঝতে পারিনি।"

মিস্ বোস উদ্গত অশ্রুকে রোধ করিলেন না, দুটি গণ্ডে দুটি মুক্তার ধারা নামিয়া আসিল। কহিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখতেই ভালবাসি, বোন!"

সুলতা ব্যগ্রতাভরে কহিল, "মেয়েটির নাম কি দিদি?"

মিস্ বোস নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "নীলিমা। কুড়ি বৎসর হ'লো সে মরেছে—, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সে মরেনি। ঘুমিয়ে ছিল মাত্র, তার স্বপ্নকে সত্য হ'তে দেখে সে যেন আবার খুসী হ'তে চায়!"

সুলতা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তাই খুসী হও না, দিদি।"

মিস্ বোস হাসিয়া কহিলেন, "ছি! ও কি ছেলেমানুষী কর। কুড়ি পঁচিশখানা গ্রামে আর মেয়ে ডাক্তার নেই, আমার কি ও সব সাজে?"

সুলতা বলিল, "উনি শুনলে—"

বাধা দিয়া মিস্ বোস কহিলেন, "কিন্তু উনি ত শুনবেন না, এইটি আমার অনুরোধ। বেলা হ'লো, আজ উঠি। বেঞ্চিটাকে ঘুরিয়ে নিয়ো, দুটো গাছই একসঙ্গে যেন চোখে পড়ে। দেখলে মনে হবে, একই মাটীতে থাকলেও, রসের গুণে কারও বা ফুল ফোটে, কারও বা ফোটে না। ফুলটাকে মিঃ মিত্রের ভালবাসাও মনে করতে পার। ওঁরা বাস্তবকে ভালবাসেন, আমরা স্বপ্নকে। স্বপ্নের গতি এক মুখে, একটা নিষ্ঠা তার আছে। বাস্তব বহু বিচিত্র। বহুকে আয়ত্ত করাতেই তার আনন্দ।" বলিয়া মিস্ বোস আসন ত্যাগ করিলেন।

সুলতা তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল, "সেই নিষ্ঠুর লোকটির দেখা আর কখনও পেয়েছিলে, দিদি?"

মিস্ বোস সস্নেহে সুলতার গাল দুটি টিপিয়া দিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, "পাগল বোন, নিষ্ঠুর বলছো কাকে? নীলিমার স্বপ্নকে সে ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। আজ ত নীলিমার কোন অভিযোগ নেই, আছে মিস্ বোসের অভিজ্ঞতা। সুতরাং দেখা হওয়া না হওয়া সমান কথা।"

সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আপনি তাকে ক্ষমা ক'রেছেন।"

মিস্ বোস হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষমা! ও কথা ত আমার মনেই হয় নি। সম্বন্ধ না গ'ড়ে উঠলে কি ও-গুলো মনে আসে? আমি ত শুধু স্বপ্নই দেখেছি। আসি ভাই। ডাক্তার দেখিয়ো না, মিঃ মিত্রের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় ঐ বেঞ্চিটার ওপর ব'সো, সব ভাল হয়ে যাবে।"

বলিয়া সুলতার মস্তকে ছোট একটি স্নেহের চুম্বন আঁকিয়া দিয়া ধীরে ধীরে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সুলতা ফিরিয়া বেঞ্চে আসিয়া বসিল। পত্রবিরল শুষ্কপ্রায় গোলাপ গাছটির পানে চাহিয়া আপন মনে মিস্ বোসের কথাগুলি আবৃত্তি করিল, একই মাটী, রসের গুণে কারও বা ফুল ফোটে, কারও বা ফোটে না।"

সুলতার সতেজ গাছটিকে ভালবাসিয়া পরিমিত রসধারা পান করাইয়া মাটী উপহার দিয়াছে কয়েকটি রক্ত বর্ণের সুন্দর ফুল,—ধরিত্রীর বুকভরা ভালবাসার দান। রিক্ত-শাখা—কণ্টকবহুল—মৃতপ্রায় গাছটি মৃদু বাতাসে শুষ্কপ্রায় শাখাগুলি নাড়িয়া হয় ত বা প্রাণ ভরিয়া আপন অন্তরের নির্ব্বাপিতপ্রায় স্বপ্ন-দীপ জ্বালাইয়া অন্য গাছটির সার্থক সৌন্দর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

বায়ুমান জীব

জৈব ব্যারোমিটার

বায়ুমান যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত মানুষ আর এখন আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন পূর্ব্ব হইতে সহজে বুঝিতে পারে না। জীব-জন্তুদের মধ্যে কিন্তু বহু প্রাণীই স্বাভাবিক শক্তিতে বায়ুর পরিবর্ত্তন সুন্দরভাবে বুঝিতে পারে এবং নানা উপায়ে বায়ুমণ্ডলের আশু পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস দিয়া থাকে। এই সকল জীবজন্তুর আচরণ একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলেই আমরা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বহু বিষয় বুঝিতে পারিব এবং পশু-পক্ষীর মধ্যে অনেকগুলিকেই জৈব ব্যারোমিটাররূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। পশুপক্ষী ও নিম্নস্তরের জীবেরা কেমন করিয়া বায়ুর পরিবর্ত্তনের আভাস দেয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাই আলোচনা করিব।

ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব্বে সাধারণ কাক-চিলের আচরণ অবশ্য সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঝড় হইবার উপক্রম হইলেই চিলরা বহু সংখ্যায় আকাশে উঠিয়া উড়িতে থাকে। গৃহপালিত গাভীও অনেক সময় বায়ুর পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট আভাস দিয়া থাকে। ঝড় উঠিবার বা ঠাণ্ডা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে গাভী যথারীতি দুগ্ধ প্রদান করে না। বিলাতে সন্ধ্যার সময় গাভী ডাকিতে থাকিলে সে দেশের লোকরা পরদিন প্রত্যূষে তুষার-পাতের সম্ভাবনা বুঝিয়া লয়। গাভীরা গমন করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া পা ছুড়িলে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিতে হয়। গো-মহিষরা জলঝড়ের বিষয়ে আরও সঙ্কেত দিয়া থাকে। জল-ঝড়ের সম্ভাবনা থাকিলে গো-মহিষরা সকালে উঠিয়াই মাঠে গমন করিতে চাহে না। এরূপ অবস্থায় উহারা গোশালার মধ্যে অবস্থান করিয়া সম্মুখের পদদ্বয় লেহন করিতে বা খুঁটির গায়ে গাত্র-ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। কখনও কখনও বা ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনায় উহারা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করে এবং আকাশের দিকে চাহিয়া ডাকিতে থাকে। কোনও দিন গরুরা মাঠে নিয়মমত গমন না করিয়া গোশালায় অবস্থান করিলে এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ করিলেই গোপালকেরা পূর্ব্ব হইতেই দুর্যোগের সম্ভাবনা বুঝিয়া সাবধান হইয়া থাকে।

কুকুর-বিড়ালরাও জল-ঝড়ের কতক পূর্ব্বাভাস দিয়া থাকে। বৃষ্টি আসন্ন হইলেই বিড়ালরা কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ লেহন করে এবং গৃহকোণে আশ্রয় লইয়া নিদ্রা যায়। ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকিলে বিড়াল পূর্ব্ব হইতেই অস্থিরভাবে বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে এবং নিভৃত কোণে যাইয়া আশ্রয় লয়। কুকুররাও এরূপ স্থলে বিড়ালের মতই আচরণ করিয়া জল-ঝড়ের পূর্ব্বাভাস দিয়া থাকে। অধিক বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে কুকুররা ঘরের মধ্যে থাকিয়া নিদ্রা যায়। সে সময়ে সহজে উহাদিগকে জাগান যায় না।

গর্দ্দভরাও বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে ঘন ঘন চীৎকার ও কর্ণ-প্রকম্পন দ্বারা বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত দিয়া থাকে। কোনও দিন গর্দ্দভকে বহুবার চীৎকার করিতে শুনিলেই বৃষ্টির আসন্নতা বুঝিতে হইবে।

বৃষ্টির পূর্ব্বে ঘোটকরা অস্থিরতা প্রদর্শন করে। পথে চলিতে চলিতে ঘোটক চম্‌কাইয়া উঠিলে বা অস্থিরতা প্রদর্শন করিলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বুঝিতে হয়।

শূকররাও বায়ু-পরিবর্ত্তন বেশ বুঝিতে পারে। "ঝোড়ো" দিনের পূর্ব্বেই ইহারা অনুচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া এবং মস্তক ঊর্দ্ধে সঞ্চালন করিয়া দৌড়াইয়া বেড়ায়।

প্রতীচ্যে পার্ব্বত্যস্থানের মেষেরা ঝড়বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই পর্ব্বতের উন্মুক্ত ভাগ হইতে সরিয়া অন্যদিকে চলিয়া যায়। পর্ব্বতের যে দিকে ঝড়বৃষ্টি লাগিবার সম্ভাবনা নাই, জলঝড়ের পূর্ব্বে ছাগমেষরা সেই দিকে যাইয়া আশ্রয় লয়। এ দেশেও বৃষ্টির পূর্ব্বে ছাগরা যে ভীতিসূচক এক প্রকার চীৎকার করিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

ইন্দুর ও ছুছুন্দরীরাও শীতের প্রকোপ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারে। বিলাতের "মেঠো" ইন্দুররা শৈত্যাধিক্য বা তুষার-পাতের সম্ভাবনা বুঝিলেই গর্ত্তের মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেয়। ছুছুন্দরীরা এই অবস্থায় তাহাদের সুড়ঙ্গবাসের মধ্যে পোকা-মাকড় জমা করিয়া রাখিবার নিমিত্ত কতকগুলি ছোট ছোট গর্ত্ত খনন করিয়া থাকে। কোনও বৎসর শীতের প্রারম্ভে উহাদের সুড়ঙ্গের মধ্যে এই গর্ত্তের সংখ্যা অধিক দেখিলেই বিলাতের "ছুঁচা-শিকারীরা" সে বৎসর শৈত্যাধিক্যের বিষয়ই অনুমান করিয়া লয়। এ দেশে অধিক শীত পড়িবার পূর্ব্বেই ছুছুন্দরীরা গর্ত্তের নিম্নভাগে চলিয়া যায় এবং পোকামাকড়ের সন্ধানে ভূমির নিম্নে ক্রমাগত খনন করিয়া নামিয়া যায়। পোকা-মাকড়রাও আশ্চর্য্যরূপে শীত-গ্রীষ্ম বুঝিতে পারে। কোনও বৎসর অধিক শীত পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে পোকামাকড়রা পূর্ব্ব হইতেই তাহা অনুভব করিয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। শৈত্যাধিক্যের সম্ভাবনা যত অধিক হয়, পোকামাকড়রা ততই ভূমির মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে পোকামাকড়ের সন্ধানে ছুছুন্দরীকেও মাটীর মধ্যে সুড়ঙ্গ প্রসারিত করিতে হয়। কোনও বৎসর শীতের পূর্ব্বে ছুছুন্দরীকে মাটীর মধ্যে অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে দেখিলেই সে বৎসর যে অধিক শীত পড়িবে, তাহা বুঝিতে হইবে।

কাকরা বাদ্‌লার দিন পূর্ব্ব হইতেই বেশ বুঝিতে পারে। এইরূপ দিনের সম্ভাবনা হইলে তাহারা সোজাসুজি দূরে উড়িয়া না যাইয়া কলরব করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড্ডয়ন করিতে থাকে। বিলাতে ইহাদের উড্ডয়ন-রীতি লক্ষ্য করিয়া লোক তুষারপাতের বিষয় বুঝিয়া লয়। তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকিলে ইহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নীচুভাবে উড়িয়া যায় এবং সূর্য্যাস্তের পরে ভূমির উপর দিয়া নীচুভাবে উড়িয়া নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এরূপ ক্ষেত্রে গমন বা প্রত্যাগমনের সময় আদৌ কলরব করে না।

চাতকের উড্ডয়ন লক্ষ্য করিলে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বেশ

বুঝিতে পারা যায়। বায়ুর সাম্য থাকিলে চাতকরা খুব উচ্চে উড্ডয়ন করে, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা হইলেই ইহারা নিম্নে নামিয়া আসে ও নীচু হইয়া উড়িতে থাকে। মশকের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিয়া ভক্ষণ করিবার জন্যই চাতকরা আকাশে উড়িয়া থাকে। বৃষ্টির উপক্রমে বায়ুর তাপের হ্রাস হইলেই ঐ সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পতঙ্গ উচ্চস্তর হইতে বায়ুর নিম্নস্তরে অবতরণ করে; সুতরাং পতঙ্গান্বেষী চাতককেও এই কারণে এই কালে নিম্নে নামিয়া উড়িতে দেখা যায়। চাতকের মত সারসরাও পরিষ্কার দিনে আকাশের খুব উচ্চ দিয়া নিঃশব্দে উড়িয়া যায়। জলবৃষ্টির সম্ভাবনা হইলে সারসরা নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা হইলে গৃহপালিত হংস ও কুক্কুটরা সন্ত্রস্তভাবে উড়াউড়ি করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মের দিনে কুক্কুটরা সারাদিবস চীৎকার করিয়া ডাকিলে বা কোনও দিন অসময়ে বারংবার ডাকিতে থাকিলে বৃষ্টি সন্নিকট বুঝিতে হইবে। কুক্কুট-শাবকরা বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলে অধিক চীৎকার করিতে থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকর চঞ্চু দ্বারা মাটী হইতে খুঁটিয়া লইতে আরম্ভ করে।

বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে ময়ূরের কণ্ঠস্বর খুব তীক্ষ্ণ হইতে শুনা যায়। বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে পারাবতরা খোপে ফিরিয়া আসে। এরূপ সম্ভাবনায় বাদুড়রাও অল্পক্ষণ উড়িয়া শাখার তলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অনুচ্চ তীব্র স্বরে চীৎকার করিতে থাকে।

বন্য হংসরা প্রতিবৎসর শীতের প্রারম্ভে হিমালয় অতিক্রম করিয়া উত্তর-সাইবিরিয়া হইতে এ দেশের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোনও বৎসর অধিক শীত পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে ইহারা শীতের পূর্ব্বেই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিয়া এ দেশের পল্লীপ্রান্তরে বা নদীর চরে দেখা দেয়। ইহাদের এই প্রকার অকাল আগমনে সে বৎসর শীতের প্রখরতা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করা হইয়া থাকে।

বিলাতের ক্ষুদ্র রেড ব্রেষ্ট (Red breast) পক্ষীরা এ দেশের গৃহ-চটকের মত গৃহস্থের বাটীর সন্নিকটে অবস্থান করিতে ভালবাসে। উহাদের সুমধুর গীতে গৃহস্থের বাগান-বাগিচা সর্ব্বদাই মুখরিত থাকে। আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বেই ইহাদের গানের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিলাতের লোকরা ইহাদিগকে কোন সময় বিমর্ষ থাকিতে দেখিলেই জল বা ঝড়ের দিন সন্নিকট বুঝিয়া লয় এবং বাদলার দিনের মধ্যে ইহাদের গান শুনিতে পাইলেই শীঘ্র আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে, ইহাই অনুমান করে। সে দেশের গৃহিণীরা দিনের অবস্থা বুঝিবার জন্য রেড ব্রেষ্টকেই ব্যারোমিটার-রূপে গণনা করে।

ব্রেজিলের টুকান পক্ষী দেখিতে ধনেশ পাখীর মত। তবে ধনেশ অপেক্ষা উহারা সমধিক শ্রীসম্পন্ন। আলিপুরের পশুশালায় এখন একটি টুকান্‌কে রাখা হইয়াছে। বৃষ্টির পূর্ব্বে টুকানরা ভেকের মত চীৎকার করিতে থাকে। টুকানের এইপ্রকার চীৎকার শুনিয়াই সে দেশের লোক বৃষ্টির বিষয় বুঝিয়া লয়।

সামুদ্রিক পক্ষী ও জীবজন্তুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন আরও সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। ঝড় উঠিবার পূর্ব্বেই সি-গল (sea-gul) প্রভৃতি সামুদ্রিক পক্ষীরা তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাদের এই প্রত্যাবর্ত্তনের মধ্যে সামুদ্রিক জীবের অদ্ভুত বোধশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বেই সামুদ্রিক মৎস্যরা তাহা অনুভব করিতে পারে। এই কারণেই জল-ঝড় উঠিবার পূর্ব্বেই এই সকল মৎস্য সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে নামিয়া জলের তলে প্রবেশ করে। সমুদ্রের উপর মৎস্য না পাওয়ায় সি-গলরা এই সময় সমুদ্র ত্যাগ করিয়া তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও ভূমি হইতে পোকা-মাকড় ধরিয়া ভক্ষণ করে।

কবিতায় Stormy Petrelএর পরিচয় অনেকেই লাভ করিয়াছেন। ঝড় উঠিবার পূর্ব্বেই ইহারা বুঝিতে পারে এবং বহুসংখ্যায় আসিয়া জাহাজের সন্নিকটে উপস্থিত হয় ও পোতের পশ্চাতে অনুসরণ করে। জাহাজের পশ্চাতে ইহাদিগকে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিলেই নাবিকরা ঝড় সন্নিকট বুঝিয়া লয়।

সমুদ্রে ডল্‌ফিন্ ও শুশুকেরাও জল-ঝড়ের পূর্ব্বাভাস দিয়া থাকে। জল-ঝড়ের পূর্ব্বে ইহাদের আমোদ-প্রমোদের মাত্রা যেন বাড়িয়া উঠে। ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে জাহাজের নিকটে আসিয়া নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে দেখা যায়।

নদী ও পুকুরের মাছরাও এ বিষয়ে বিশেষ বোধশক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। বায়ুর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকিলে মাছরা আদৌ "টোপ্" ধরিতে চায় না এবং জলের উপরিভাগ ত্যাগ করিয়া নদী ও পুষ্করিণীর তলায় নামিয়া যায়। অনেক শ্রেণীর মৎস্য আবার বৃষ্টির পূর্ব্বে নদী ও পুকুরের জলের উপর ভাসিয়া খেলা করে। মাছের এই রীতি বোধ হয় প্রত্যেক মৎস্য-শিকারীই কিছু কিছু অবগত আছেন।

পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা ও মাকড়সার মধ্যেও এই শক্তি বিশেষ পরিস্ফুট। বৃষ্টির সম্ভাবনা হইলেই বাগানের "গেছো" মাকড়সারা জালের সূতা ছোট করিয়া বুনিয়া থাকে। বৃষ্টির পূর্ব্বেই মধুমক্ষিকারা চক্রে ফিরিয়া আসে এবং কিছুকাল চক্র হইতে আর বাহির হয় না। ইহাদিগকে হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে চক্রে ফিরিয়া আশ্রয় লইতে দেখিলে বৃষ্টির সম্ভাবনা সন্নিকট বুঝিতে হইবে। শ্রমিক মধুমক্ষিকারা মধু সংগ্রহের সময় আকাশের অবস্থার প্রতি এরূপ লক্ষ্য রাখে যে, হঠাৎ সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়িলেই ইহারা মধু লইয়া চক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকিলে পিপীলিকাদের বাসায় মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে তখন অণ্ডাদি মুখে লইয়া ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতে দেখা যায়। বৃষ্টির জলে সিক্ত হইয়া অণ্ড নষ্ট হইতে পারে বলিয়াই ইহারা উহার সংরক্ষণার্থে পূর্ব্ব হইতেই ব্যস্ত হইয়া উঠে এবং উহাদিগকে সুড়ঙ্গের নিম্নে নিরাপদ স্থানে লইয়া রক্ষা করে।

জলৌকা ও ভেককে উৎকৃষ্ট বায়ুমান জীব বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই দুই জীবকে জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখিয়া বায়ুমান যন্ত্রের কার্য্য চালান যাইতে পারে। বায়ুমণ্ডলের সাম্যতা থাকিলে জোঁকরা জলের মধ্যে স্থিরভাবে অবস্থান করে। বায়ুমণ্ডলের পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকিলে উহারা জলমধ্যে

চঞ্চল হইয়া উঠে এবং অস্থিরভাবে সন্তরণ দিতে থাকে। একটি জলপূর্ণ কাচের গেলাসে জলৌকা রাখিয়া অনেকেই গৃহে জৈব ব্যারোমিটারের সত্যতা পরীক্ষা করিতে পারেন।

জলপূর্ণ স্থালীর মধ্যে ভেক রাখিয়া জৈব ব্যারোমিটার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অর্দ্ধ-জলপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে কাঠির দ্বারা নির্ম্মিত "মই" রাখিয়া একটি ভেককে ছাড়িয়া দিতে হয়। জল-বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা না থাকিলে এবং বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে পাত্রমধ্যস্থ ভেক মই বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিবে; কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা হইলে উহারা জলের মধ্যে নামিয়া যাইবে। বায়ুর আর্দ্রতা অনুকরণে ভেকের চর্ম্মেরও বিশেষত্ব আছে। ইহাদের গাত্রচর্ম্ম "ব্লটিং পেপারের" মত বাতাস হইতে জল-কণা শুষিয়া লয়। বায়ুতে জল-কণার পরিমাণ যত অধিক থাকে, ইহাদের চর্ম্মের গ্রন্থিগুলিও সেই পরিমাণে জলকণা শোষণ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে এবং সমস্ত দেহই মসৃণ ও সরস দেখাইয়া থাকে। বায়ু শুষ্ক হইলে ইহাদের চর্ম্মও জলকণার অভাবে শুষ্ক ও কর্কশ ভাব ধারণ করে।

শামুক ও গেঁড়িরাও বায়ুর পরিবর্ত্তন বেশ বুঝিতে পারে। বর্ষাকালে কলাগাছ, কচুগাছ এবং আকন্দ গাছের পাতা ও শাখায় ইহাদিগকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বৃষ্টিপতনের প্রায় দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই ইহারা বাহির হইয়া গাছের উপর উঠিতে আরম্ভ করে। অধিক বর্ষণের সম্ভাবনা থাকিলে শামুকরা পাতার নিম্নভাগে আশ্রয় লয় এবং বৃষ্টি অল্প হইলে পাতার উপরিভাগেই অবস্থান করে। আর এক জাতীয় শামুক বর্ণ-পরিবর্ত্তন দ্বারায় আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সূচনা করে। উহাদের বর্ণ বৃষ্টির পূর্ব্বে পীত এবং বৃষ্টির পরে নীল হইয়া যায়। পার্ব্বত্য স্থানে বৃষ্টির পূর্ব্বে শম্বুকরা পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া উঠিয়া থাকে।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু (বি, এ)।

জীবন-স্মৃতি

ছোট্ট আমার ঘরটুকুতে ছিল যে সুখ কত,
"বাড়ীর ওরা" ছেলে-মেয়ে সবাই ছবির মত।
চারটা বলদ হাল দু'খানি, দোয়াল গরুর পাল
মাচায় তোলা খড়ের গাদা কাট্‌তো বছরকাল।

'মেনি বিলাই' ভোলা কুকুর, গণ্ডা তিনেক হাঁস,
'মেনির' সাথে—আবার টুনির আলাপ বারো মাস।
ডোবার জলে 'মধু'র সাথে হাঁসের খেলা কত,
দাওয়ায় বসি' বুড়ী-মায়ের মিছাই শাসন যত!

আষাঢ় মাসের বাদল-বাতাস ঢেউ খেলা'ত ধানে,
কেমন ক'রে সে ঢেউ যেন খেলা'ত মোর প্রাণে!
শাওন মাসে সাঁঝের বেলা মাথায় আঁটি বেয়ে,
ফির্‌লে ঘরে, লেজটি নেড়ে আস্‌তো ভোলা ধেয়ে!

আস্‌তো টুনি, আস্‌তো মধু, আস্‌তো মেনি কাছে,
"হুঁকোর" মাথায় "কল্‌কে" নিয়ে আস্‌তো "ওরা" পাছে।
ছেলে-মেয়ের সারা দিনের যতেক অত্যাচার,
বুড়ীমা সে বলে যেত একের পরে আর।

দুপুর বেলায় দাওয়ায় বসি' ছেলে-মেয়ের সাথ,
নুণ শাকেতে উড়িয়ে দিতাম একটা পাথর ভাত!
খাবার বেলা দাওয়ার পরে টুনির কোলটি ঘেঁসে,
বস্‌তো মেনি, দাওয়ার নীচে বস্‌তো ভোলা এসে।

অতিথ এলে ফির্‌তো নাকো থাক্‌তো বাপের মত,
কোথায় গেল সুখের সে দিন কোথায় হ'ল হত!
আশিন এলে বাবুর বাড়ী বাজতো কাঁসি ঢাক্,
দশ বছরেই মিটে গেছে—আজ সবে নির্ব্বাক্।

সেই যে সেবার যম ঢুকিল সবার ঘরে ঘরে,
সুখ-সুবিধা যা' ছিল সব নিল সাবাড় ক'রে।
টুনি গেল, মধু গেল, "ওরাও" গেল শেষে,
পাঁজরাখানা ভাঙিল যম বিকট হাসি হেসে!

আজ যে আমি দুঃখী বড়—কাঙাল সবার বাড়া,
একটা পোড়া ইঁটের পাঁজা রইছি যেন খাড়া!
দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত-শিখা জ্বল্‌ছে যেন আজ
অগ্নি-গিরির সমান যেন আমার বুকের মাঝ!

ঘরের দোরে ফির্‌তে নারি—ডুক্‌রে ওঠে প্রাণ,
যায় না দেখা কে যেন হায় গাইছে করুণ গান;
চোখ ফাটিয়ে জল আসে মোর আঁধার হয়ে যায়,
কবর ভেদি' গায় আসে মোর তপ্ত শ্বাসের বায়।

শ্রীগোপেশ্বর সাহা।

ইন্দ্রপ্রস্থ

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ভাদ্রমাসের শেষভাগে আমার প্রিয়তম ছাত্র দিল্লী হিন্দিয়া কলেজের প্রোফেসার শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থের আহ্বানে ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে গিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল যাবৎ অস্বাস্থ্য নিবন্ধন বসুমতীর পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই, এবারে দিল্লী দর্শনে যাহা বুঝিয়াছি ও জানিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। তাঁহাদের ইহাতে কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি হইলেও শ্রম সফল মনে করিব। অনেক দিন হইতে মহাভারত পড়িয়া এই ভারত সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী দেখিবার স্পৃহা জাগিয়াছিল এবং ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ঐ স্থানে গিয়া কিছু না কিছু হিন্দু-রাজত্বের চিহ্ন দর্শন করিতে পারিব। মহাভারতে যে ইন্দ্রপ্রস্থের কথা অমনভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যাহার নির্ম্মাণকর্ত্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ময়দানব যাহার প্রধান শিল্পী, যে স্থানে ধর্ম্মনন্দন সত্যসন্ধ পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি যুধিষ্ঠির সর্ব্বপ্রথমে রাজধানী স্থাপন করেন, স্বয়ং বেদব্যাস যাহার ভিত্তি স্থাপনের পুণ্যাহ-স্বস্তিবাচনাদির উপদেষ্টা, যে রাজধানীর মাত্র সভাস্থান ছিল দশ সহস্র হস্ত দীর্ঘ ও দশ সহস্র হস্তায়ত অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৪ মাইল দীর্ঘ ও ৪ মাইল আয়ত, যে স্থানে সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর নৃপতিবৃন্দ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে ভারত-সম্রাট বলিয়া এবং নিজেরা সকলে তাঁহার প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়া গৌরবান্বিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে সভায় লক্ষ লক্ষ লোক অনায়াসে বসিতে পারিত, ৮ হাজার রক্ষিবর্গ নিয়ত যাহার পাহারায় বিদ্যমান থাকিত, যাহার তুলনা পৃথিবীতে ছিল না, সেই পুরাতন হিন্দুর গৌরবক্ষেত্র পরম পবিত্র যমুনা-তীরস্থিত রাজধানীর দর্শনস্পৃহা যেমন জাগে, তেমন পূর্ব্বকার কালের কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিবার প্রবল কৌতূহলও মনকে উন্মাদিত করে। তাই সেই স্থানে পৌঁছিয়া ৪র্থ দিনেই নগরভ্রমণে বাহির হইলাম, কোনস্থানেও কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না, সেই ইন্দ্রপ্রস্থের সাগরোপম পরিখা, আকাশচুম্বী পর্ব্বত সদৃশ গোপুর সকল কোথায়, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। অতবড় সুন্দর চিত্রখানির একটি শেষ রেখাও সাক্ষ্য দিবার জন্য নাই, সকলই কালের করালগ্রাসে বিলুপ্ত, হয় ত বা এই কয়েক সহস্র বৎসরের ব্যবধানেও কিছু চিহ্ন থাকিত—যদি হিন্দু রাজত্ব অখণ্ড থাকিত। মধ্যকালে যদি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের কঠোর করস্পর্শ না হইত, যদি অবিচ্ছিন্ন ধারায় হিন্দু নরপতিগণই ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে পারিতেন, তবেই এই সকল স্থানের প্রাচীন সভ্যতার স্থাপত্যের নিদর্শন দেখিতে পাইতাম, কিন্তু ঘটিয়াছে সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদেশীয় বিধর্ম্মী রাজগণ নিজ কীর্ত্তি স্থাপনের অদম্য লালসায় প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া তাহারই উপাদানে নিজ কীর্ত্তি স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছিলেন, আজ তাহাও অস্তমিতপ্রায়। তবে পরম সৌভাগ্যের কথা, বর্ত্তমান কালে ভারত সরকার বিদেশীয় হইলেও শিক্ষিত সভ্যজাতি বলিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি-রক্ষণ-পরায়ণ, তাই আজ ভারতে মৃত্তিকাস্তূপের অন্তরাল হইতে কত শত ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন সকল আবিষ্কৃত হইয়া সুরক্ষিত হইতেছে। দেশের যখন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সকল রকমেই দুর্দ্দশা ঘটে, তাই যে দিন ভারতের লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধা বিদ্যমান সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় বিদেশী বিধর্ম্মী আসিয়া হিন্দুর প্রাণস্বরূপ দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া রাজ্যের পর রাজ্য লুণ্ঠন করিল, তখন ঐক্যের অভাবে—উপযুক্ত নেতার অভাবে হিন্দুগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিল, আর বিলাসমগ্ন বাদশাহগণ প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন, একটু চিহ্নও অবশিষ্ট রাখেন নাই। বহু বৎসরের রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ের পরও সেই পুরাতন দেখিবার সাধ অসম্ভব হইলেও কৌতূহল জন্মিয়াছিল, এ কথা সত্য। আমি প্রতিদিনই সেই মহাশ্মশানে নূতন নূতন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, প্রতিদিন ভগ্নমনোরথ হইয়াও মৃগতৃষ্ণান্ধ মৃগের ন্যায় পর পর অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হই নাই।

ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ হিন্দুরাজা চৌহান বা চাহমান-বংশীয় বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের দুর্গ ও তন্মধ্যস্থ ঠাকুরবাড়ী দেখিতে গিয়া ঐ ঠাকুর-বাড়ীর একাংশে লিখিত কয়েকটি দর্শকগণের প্রতি উপদেশ ও যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণ দেখিলাম, উহাতে লিখিত আছে কুতুবউদ্দীন ঐ স্থানের ২৭টি মন্দিরের দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা একটি মিনার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১২২৯ খৃষ্টাব্দে আলতমাস কর্ত্তৃক সমাপ্ত হইয়াছিল, এবং ঠাকুর-বাড়ীর চত্বরটিকে একটি মস্‌জিদ বলা হইয়াছে। ঐ চত্বরমধ্যেই উন্নত লৌহস্তম্ভ প্রোথিত আছে, ইহার কথা পরে বলিব। দুঃখের বিষয়, কুতুবমিনার ও মস্‌জিদের কথা যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা ঐ মন্দিরগুলি কাহার এবং কাহার দুর্গমধ্যে মিনার ও মস্‌জিদ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন নাই বা তাহার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করেন নাই—দিল্লীর অধিবাসী হিন্দুগণও এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বাক রহিয়াছেন। পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে বহুতর কিম্বদন্তী দিল্লীতে প্রচলিত আছে। তিনি নিজে মহা বীরপুরুষ ছিলেন। কনোজপতি জয়চন্দ্র তাঁহার মাসতুতো ভাই, ইহার সহিত রাজ্যপ্রাপ্তিকাল হইতেই পৃথ্বীরাজের মনোমালিন্য ছিল, পরে সংযুক্তা স্বয়ম্বরে পৃথ্বীরাজকে বরণ করায় ঐ মনোমালিন্য ভীষণভাব ধারণ করে। এই সময় গোরের সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী ক্রমান্বয়ে সাতবার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন, পরিশেষে জয়চন্দ্রের সহায়তায় ও চাতুর্য্যে মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে বন্দী করেন। একদিন পৃথ্বীরাজ যে উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ ছিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার তীরচালনানৈপুণ্য পরীক্ষার্থ দরবার-মধ্যে তাঁহার নেত্রদ্বয় বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া তাঁহার হস্তে মহম্মদ ঘোরী তীর ও ধনুক দিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র পায়ের সাহায্যে শব্দ লক্ষ্য করিয়া যে তীর ছুড়িয়াছিলেন, সেই তীরেই সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী মারা গিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি পৃথ্বীরাজের ইতিহাস-লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। আর একটি প্রবাদ আছে—পৃথ্বীরাজের একটি কন্যা ছিল, তিনি প্রতিদিন যমুনা দর্শন না করিয়া আহার করিতেন না, সেই জন্য পৃথ্বীরাজ একটি অত্যুন্নত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। উহার উপরে উঠিয়া তাঁহার কন্যা প্রতিদিন যমুনা দর্শন করিতেন, সেই স্তম্ভের বর্ত্তমান নাম কুতুবমিনার।

কুতুবমিনার সম্বন্ধে চিত্রকর হেমচন্দ্র ভার্গব যে তথ্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—Kutub Minar Delhi. Built by Prithviraj the Emperor of India in 1190 A. D. to enable his daughter to see the river Jamuna who used to see it before break-fast everyday. And it was remodelled by Qutubuddin Aibak and finished by Samsuddin Altamash in 1229 A. D. The pillar is 23th feet high of red sandstone with marble work and finely decorated with inscriptions. Now it has 5 storeys with
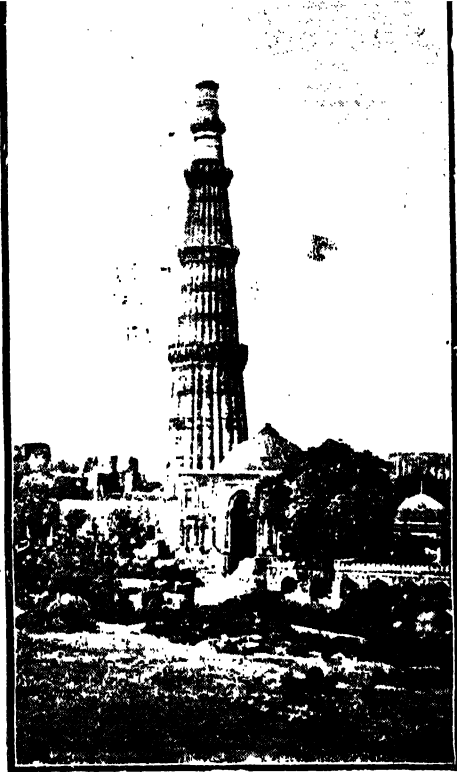
কুতুবমিনার

blaconies on each storey, and the 6th storey being affected by lightning is removed and is placed in its courtyard. The adjacent building with great dome and fine arches is the tomb of Samsuddin Altamash.

অর্থাৎ দিল্লীর কুতুবমিনার, ভারত-সম্রাট পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক ১১৯০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়, কারণ, তাঁহার কন্যা প্রতিদিন যমুনা দর্শন না করিয়া আহার করিতেন না। পরে কুতুবুদ্দিন ইবক কর্ত্তৃক ইহার উপর আরও কয়েকটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, এবং সামসুদ্দিন আলতমাস ঐ কার্য্য ১২২৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। ঐ স্তম্ভ বর্ত্তমানে ২৩৪ ফুট উচ্চ, উহা লাল মার্ব্বেল পাথরের নির্ম্মিত, কারুকার্য্য-মণ্ডিত, বর্ত্তমানে উহার পাঁচটি তলা আছে। উহা ৬ তলা ছিল, সর্ব্বোচ্চ তলাটি বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার ভগ্ন টুকরাগুলি রক্ষিত আছে, এবং ঐ মিনারের পার্শ্বে বড় বড় আর্চ্চযুক্ত একটি তোরণ-গৃহরূপ সমাধিস্থান সামসুদ্দিন আলতামাসের বলিয়া কথিত হয়।

আমি শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ ও শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দাস এম এ প্রভৃতির সাহায্যে কয়েকবার ঐ স্থান দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এইরূপ—ভারত-সম্রাট শাজাহানের লাল কিল্লা হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথ্বীরাজের কিল্লা বা কুতুবমিনার পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ১১মাইল স্থান সকলই মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ এবং উহারই মধ্যে ময়দানব-নির্ম্মিত পাণ্ডবদের সভাগৃহ বা দরবার-ক্ষেত্র, যাহার পরিমাণ ১৭ বর্গ-মাইল ইহা মহাভারতপাঠকমাত্রেই জানেন, (১)

মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমগ্র ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে লক্ষ নরপতি আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আবাসপ্রাসাদ সকল ৮ মাইলব্যাপী স্থানে ছিল এবং সেই প্রাসাদগুলি সুরম্য এবং রাজগণের থাকিবার যোগ্য ছিল। ইহা ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের দশ হাজার হস্তী, লক্ষ দাসী, লক্ষ ভৃত্য ছিল। তাঁহার পাকশালায় প্রতিদিন ৮৮ হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ ও ১০ হাজার উর্দ্ধরেতা যতি এবং রাজ্যের অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ, বালক দরিদ্রগণ খাইতে পাইত, সুতরাং বর্ত্তমানে ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া যে ক্ষুদ্র বেষ্টনীর অভ্যন্তরস্থিত একটু স্থান দেখান হয়, উহা কখনও সম্ভবপর নহে। যাঁহারা একদিনে দীর্ঘযানে গমন করিয়া শাজাহানের কিল্লা হইতে পৃথ্বীরাজের কিল্লা পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, এই সমস্ত স্থানই ইন্দ্রপ্রস্থ। তোমরগণকে বিজয় করিয়া চৌহানবংশীয় বীর বিমলদেব দিল্লীর সম্রাট হয়েন। সেই বংশেরশেষ রাজা—পৃথ্বীরাজ। শাজাহানের কিল্লার স্থানেও পূর্ব্বের হিন্দুরাজগণের দুর্গ ছিল এবং সেই স্থানে বিশিষ্ট সংস্কার করিয়া তাহাতে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছেন। শাজাহান ঐ স্থানে দরবার-গৃহদ্বয়, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি অনেক কিছু নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কুতুবমিনারের ৬ তলা অবস্থার একখানি চিত্র লাল কিল্লাস্থ মিউজিয়মে আছে। দিল্লীর ঐতিহাসিক বিবরণ যাহা কিছু জানিবার, সকলই ঐ স্থানে সযত্নে সুরক্ষিত আছে।

কুতুবমিনার যে কুতুবউদ্দিনের নির্ম্মিত নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রথম কারণ পৃথ্বীরাজের ঠাকুরবাড়ীতে যে মন্দির, অলিন্দ, প্রাচীর, গোপুর প্রভৃতি ছিল, যাহার ভগ্নাবশিষ্ট এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সকলগুলি নির্ম্মাণের বহু পরে যদি ঐ মিনার নির্ম্মিত হয়, তবে ঐ সূত্রে সুদৃঢ় মিনারের ভিত্তি যেরূপ হওয়া উচিত, তদ্রূপ স্থান ঐ স্থানে সম্ভব হইতে পারে না। একদিকে ৮ ফুট দূরে, অপরদিকে ৫ ফুট দূরে অপর একদিকে মন্দির ভিত্তিসংলগ্নভাবে মিনার উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং মন্দিরনির্ম্মাতাই মিনারনির্ম্মাতা। তিনি সেই স্থানের সর্ব্বাংশ খনন করাইয়া উপযুক্ত ভাবেই মৃত্তিকার নিম্ন হইতে

(১) দশ কিষ্কু সহস্রাং তাং মাপয়ামাস সর্ব্বতঃ। সভাপর্ব্ব ১মাধ্যায়ঃ। কিষ্কু হস্তঃসর্ব্বতশ্চতুর্দিক্ষু ইতি নীলকণ্ঠঃ।

গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, ইহা দর্শকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে কন্যার যমুনা দর্শনার্থ অত অর্থব্যয়ে মিনার রচনার কাহিনী ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয়, মুসলমানদের যে সময় হইতে উত্তরাপথে আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহার পর হইতে দূর হইতে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত এই মিনার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং হিন্দুদের নির্ম্মিত তিন তলা পর্য্যন্ত; উহার পর কুতুবুদ্দিন আরও তিন তলা নির্ম্মাণ করেন এবং আলতামাস উহার গাত্রে এবং সুচ্চ সুদৃঢ় ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন তোরণ সকলের গাত্রে আরবিকাক্ষরে নিজেদের বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা পরে যোজিত হইয়াছে। প্রস্তরাদির বিভিন্নতাও তাহার সাক্ষ্য দান করে। ভগ্ন মন্দিরগুলির মধ্যে সমাধি আছে। তাহাদের গাত্রে অতি অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য ছিল, তাহা স্থানে স্থানে এখনও লক্ষ্য করিবার মত আছে। এই তোরণের খিলান বা আর্চ্চের অনুরূপ দিল্লীর সর্ব্বত্র আর্চ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। হুমায়ুনের সমাধির উপরিস্থিত সুবৃহৎ প্রাসাদের সবদরজঙ্গের সমাধির লালকিল্লার সর্ব্বত্রই এক জাতীয় বৃহৎ বৃহৎ সুদৃঢ় খিলান দৃষ্ট হয়। জিতগড় কিংসওয়ে নূতন দিল্লীর সর্ব্বত্রই যাহা যাহা ইংরেজ রাজ্যে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত, উহা অত্যন্ত পরিষ্কৃত সুদৃশ্য হইয়াছে।

এইবার লৌহস্তম্ভের কথা বলিব, ঐ স্তম্ভটির গাত্রলিপি পাঠে জানা যায়,—(চন্দ্রবর্ম্মা নামে এক জন ভূপতি ছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি সিংহবর্ম্মার পুত্র। তাঁহার ভ্রাতার নাম নরবর্ম্মা। তিনি ৪০৪।৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি মরুভূমির পুষ্করণার অধিপতি।) যাহার বিরুদ্ধে আগত বঙ্গদেশে শত্রুসকল পরাজিত করিয়া বাহুতে কীর্ত্তি অভিলিখিত হইয়াছিল, যিনি সিন্ধুনদের সপ্ত মুখ পার হইয়া বাহ্লীক দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং যাহার বীর্য্যরূপ বায়ু দ্বারা অদ্যাপি দক্ষিণ সমুদ্রে অধিবাহিত হয়, যিনি মর্ত্ত্যলোকে অধিক দিন থাকিতে খেদপ্রাপ্ত হইয়াই যেন স্বমূর্ত্তিতে স্বর্গে গিয়াছেন এবং কেবল কীর্ত্তি দ্বারা পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন, মহাবনে প্রশান্ত বহ্নির ন্যায় যাঁহার মহান প্রতাপ, সেই শত্রুনাশকারীর প্রযত্নের শেষ অংশ এখনও পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নিজ বাহুবলে দীর্ঘকাল একাধিরাজ্য পৃথিবীতে প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র নামক পূর্ণচন্দ্র সদৃশকান্তি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রাজা বিষ্ণুতে বুদ্ধি প্রণিহিত করিয়া বিষ্ণুপাদ পর্ব্বতে উন্নত বিষ্ণুধ্বজ স্থাপিত করিয়াছেন (২)। এই লিপি দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, রাজার মৃত্যুর পরে এই ধ্বজ স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিষ্ণুপাদ পর্ব্বত কোথায়? কোন ঐতিহাসিক এ পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া জানি না, পরন্তু যে স্থানে ঐ ধ্বজ আছে, উহা বিষ্ণুপাদ পর্ব্বতের উপরে নাই, এ কথা সত্য, মনে হয়, গয়ায় বিষ্ণুপাদ-সমীপে পর্ব্বতগাত্রে এই ধ্বজ স্থাপিত হইয়াছিল, পরে কোন রাজা ঐ ধ্বজ উঠাইয়া আনিয়া নিজকৃত বিষ্ণুমন্দির-প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। অথবা তোমরবংশীয় বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রাজাও নিজ বিষ্ণুমন্দির সমক্ষে ঐরূপ ধ্বজ স্থাপিত করিতে পারেন। তিনি পার্ব্বত্যময় বিষ্ণুমন্দিরের অঙ্গনকে বিষ্ণুপাদ কল্পনা করিয়াই বিষ্ণুপাদ গিরি বলিতে পারেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, চন্দ্র নামক ভারত-বিজেতা রাজার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে বলা যায়, লক্ষ্মণসেনের কাশী প্রয়াগ পুরী বিজয়েরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না অথচ তাঁহার প্রশস্তিতে আছে। লৌহস্তম্ভ সম্বন্ধে এত প্রকার অলীক কিম্বদন্তী দিল্লীতে প্রচারিত আছে—যাহা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ সভাপণ্ডিত)।

---

(২) যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোঽভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জিতা বাহ্লীকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণঃ॥
খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্ত্যা কর্ম্ম জিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহা-
ন্নাদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিতরিপোর্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিং॥
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরং চৈকাধিরাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্রচন্দ্রসদৃশীং বক্ত্রশ্রিয়ং বিভ্রতা।
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ভাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংশুর্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণোর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ॥
(দিল্লী লৌহস্তম্ভলিপিঃ)

অনুতপ্তা

কর হানি দ্বারে গিয়াছে সে চ'লে
সেদিন তখন রাতে;
সুখের স্বপন ভেঙে গেছে মোর
নির্ম্মম সে আঘাতে।

আনমনে থেকে ফেলেছি হারায়ে,
আজি কেঁদে মরি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে,
সে দিন তাহারে পেয়েছিনু মোর
এই ঘরে হাতে হাতে।

রেখে দে, রেখে দে, রেখে দে লো সখী
মিছে ও আশার কথা,
যাতনার মাঝে ওযে শুধু হায়
বাড়ায় মরম-ব্যথা।

কি হবে এখন প্রসাধনে মোর,
সে রজনী যবে হয়ে গেছে ভোর,
এ জীবনে আর হয় ত হবে না
দেখা কভু তার সাথে।

কুমারী অশ্রুকণা দাস।

ভারত-সীমান্তে এক রাত্রি

(সত্য ঘটনা)

ভারতের সীমান্ত-প্রদেশের সামরিক কর্ম্মচারী কাপ্তেন এস, এইচ উলক্ তাঁহার অভিজ্ঞতা-লব্ধ যে লোমহর্ষণ ঘটনার বিবরণ লণ্ডনের কোনও প্রসিদ্ধ মাসিকে সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাষান্তরিত করিয়া 'মাসিক বসুমতীর' পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনের আশায় নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কাপ্তেন উলক্ লিখিয়াছেন, "যে সময় এই ক্ষুদ্র কাহিনী-বর্ণিত ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সময় আমার রেজিমেণ্ট আফগান সীমান্ত-সন্নিহিত বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে সন্নিবিষ্ট সুদূর ক্যাণ্টনমেণ্টে অবস্থিতি করিতেছিল। যে সকল ধর্ম্মোন্মত্ত পাঠান সম্প্রদায় এই দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী, তাহারা আইন-কানুন গ্রাহ্য করে না, সেখানে রক্তারক্তি কাণ্ড সর্ব্বদাই চলিতেছে এবং চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু গ্রহণের সুকঠোর প্রাচীন প্রথা এখনও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই সকল ভীষণ-প্রকৃতি পাহাড়ীয়ার প্রত্যেকেরই বন্দুকের নিশানা অব্যর্থ এবং রাইফেলই প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলিয়া সে একটি রাইফেলের জন্য রৌপ্য মুদ্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত মূল্য প্রদান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

এই প্রকার মনোহর স্থানে একটি বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে চাকরী করিবার পর আমার কঠোর শ্রমলব্ধ অবকাশ যাপনের জন্য কাশ্মীর যাত্রা আমার পক্ষে কিরূপ প্রীতিকর হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সম্পূর্ণ দুই মাসকাল আমি সীমান্তের যোদ্ধ-জীবনের কথা বিস্মৃত হইয়া সভ্য-জগতের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিব! আমার যাত্রার দিন কাছাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া আমি যেরূপ উৎসাহিত হইলাম, অবকাশ উপলক্ষে স্কুল বন্ধ হইবার পূর্ব্বে স্কুলের কোন ছাত্র তদপেক্ষা অধিকতর উৎসাহিত হইত না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় সীমান্ত প্রদেশের ঐ অঞ্চলে মোটর-শকটগুলির নামও কেহ জানিত না। এই জন্য রেলের লাইন পর্য্যন্ত দুই শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে অশ্ববাহিত একখানি দুই চাকার টোঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। টোঙ্গায় চাপিয়া আমি এই দুই শত মাইল পাড়ি দিতে পারিলে রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারিব। পথিপ্রান্তবর্ত্তী বিভিন্ন আড্ডায় টোঙ্গার ঘোড়া বদল করিয়া নূতন ঘোড়া জুড়িতে হইত, এবং এই উদ্দেশ্যে আড্ডায় আড্ডায় ঘোড়া পাওয়া যাইত। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে অন্যূন চারি দিন সময় লাগিত।

আগষ্ট মাসের এক দিন খর রৌদ্র-প্রতপ্ত প্রভাতে আমি প্যাকবন্দী আসবাব-পত্র লইয়া আমার ভাড়াটে টোঙ্গায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার বিশ্বস্ত পঞ্জাবী বেয়ারা আহম্মদ খাঁ আমার সহযাত্রী হইল। আহম্মদ খাঁ সমর-নিপুণ বীরপুরুষ, তাহার দেহ সুগঠিত এবং ইস্পাতের ন্যায় সুদৃঢ়। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া, আমাদের মেসের বারান্দায় সম্মিলিত সহযোগিবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার পর শকট-চালক অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিতেই অশ্বরাজ আমাদিগকে লইয়া ধূলিরাশি-সমাচ্ছন্ন শ্বেতবর্ণ পথে ধাবিত হইল।

টোঙ্গার ভিতর বিন্দুমাত্র স্থান খালি ছিল না। তাহার উপর সেই প্রদেশের উত্তাপ ছায়াচ্ছন্ন স্থানেও ফারণহীটের ১২০ ডিগ্রী! সেই উত্তাপ অসহ্য। কিন্তু তখন আমার উৎসাহিত চিত্ত সুখের পারাবারে ভাসিতেছিল, কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া আমার মনে হইল না। এই পথে রেল-ষ্টেশনে পর্য্যন্ত গমন করা জীবন-মরণের ব্যাপারের ন্যায় সঙ্কটপূর্ণ। বর্ব্বর পাঠানরা পথের ধারে কোনও গুপ্তস্থানে ওত পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া, পথিকগণকে আক্রমণ করে, এবং বিনা উত্তেজনায় হত্যা করে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমার তখন বয়স অল্প, জগৎ-সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের আগার বলিয়াই আমার তখন ধারণা ছিল, সুতরাং ঐরূপ দুশ্চিন্তা আমার মনে স্থান পাইল না।

ক্যাণ্টনমেণ্ট আমাদের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিবামাত্র চতুর্দ্দিকের দৃশ্য এরূপ ভয়াবহ বিজন বলিয়া মনে হইল যে, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই বৃক্ষলতা-বর্জ্জিত পীতাভ গিরিশ্রেণী একের উপর আর একটি—এইভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ক্রমনিম্ন

অন্তর্ব্বর গিরিপৃষ্ঠে প্রস্তরস্তূপ ও অনুচ্চ পাহাড়ে টিপি দ্বারা আচ্ছন্ন। তাহা বৃক্ষ-বর্জ্জিত, সবুজ তৃণপত্র-বিরহিত; মধ্যে মধ্যে নেত্রপীড়াদায়ক কদাকার পাহাড়ে ঝোপ দেখিতে পাওয়া গেল।

এই পথের প্রথম পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে স্থানে স্থানে এক একটি সুরক্ষিত আড্ডা ছিল, প্রত্যেক আড্ডায় এক এক জন ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে আমার রেজিমেণ্টের সৈন্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সেই পথে শান্তিরক্ষা করিত। আমার যাত্রারম্ভের পূর্ব্বে এই সকল আড্ডায় সেই সংবাদ প্রেরিত হওয়ায় আমি প্রত্যেক আড্ডা-সন্নিহিত পাহাড়ের ঊর্দ্ধে এক এক জন সতর্ক শান্ত্রীর মূর্ত্তি গগনতলে চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় দেখিতে পাইলাম।

সেই দিন সায়ংকালে রেজিমেণ্টের সৈন্যগণের শেষ আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথের এই অংশের পর অবশিষ্ট পথ অরক্ষিত, তবে অনিয়ন্ত্রিত দেশীয় ফৌজ স্থানে স্থানে কোন কোন সময়ে রোঁদে বাহির হইত। এই বিভাগ নামে মাত্র বৃটিশ রাজ্য হইলেও কার্য্যতঃ ইহা কোন দিন আমাদের আয়ত্তাধীন না হওয়ায়, আমি আমার রিভলভার হাতে লইয়া ঊর্দ্ধস্থিত পাহাড়ে কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে বিচরণ করিতে দেখা যায় কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কোন কোন সময় আমরা অতি ভীষণদর্শন, নিবিড় ও দীর্ঘ কেশধারী পাঠানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া আমাদের পাশ দিয়া যাইতে দেখিলাম। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, এবং তোজদান রাইফেল চালাইবার উপকরণে স্ফীত। গম্ভীরভাবে বিকট ভ্রূ-ভঙ্গিই তাহাদের একমাত্র অভিবাদন। আমার লটবহরের প্রতি যদিও তাহারা লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তথাপি তাহাদের কেহই আমাদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করে নাই।

পথের এই অংশে বিপদ এড়াইবার জন্য কোনও সৈন্যদল-রক্ষিত ঘাঁটিতে রাত্রিযাপনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা এইরূপ একটি ঘাঁটিতে উপস্থিত হইয়া, টোঙ্গার ঘোড়া পরিবর্ত্তনের জন্য যখন আসিলাম, তখন আর বেলা ছিল না। এই জন্য আহম্মদ খাঁ ও টোঙ্গা-চালক উভয়েই সেখানে রাত্রিবাসের জন্য আমাকে তাহাদের মতাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যদি আমার বয়স অধিক হইত এবং অধিকতর বিবেচক হইতাম, তাহা হইলেই আমি নিঃসন্দেহই তাহাদের উপদেশানুযায়ী কায করিতাম, রাত্রিটা সেই আড্ডাতেই অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু আমি তাহাদের সতর্ক-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার জন্য জিদ করিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে তখনও ঘণ্টা দুই বিলম্ব ছিল। সেই সময়টুকু অপব্যয় করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

আমি জানিতাম, আর কয়েক মাইল অগ্রসর হইলে একটা ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছিতে পারিব। আমি সেই স্থানে রাত্রি-যাপনের সঙ্কল্প করিলাম। আমার কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িল; কিন্তু তাহারা জানিত, সাহেবের মুখের কথাই আইন, এই জন্য আমার আদেশ শিরোধার্য্য করা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং আমাদের টোঙ্গা পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল। এই ভাবে চলিয়া আমরা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত ডাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইলাম।

সেই ডাকবাঙ্গলার রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত বৃদ্ধ নেটিভ ভৃত্য আমাদিগকে বলিল, দীর্ঘকাল পরে সে আমাদিগকে সেখানে রাত্রিবাসের জন্য সর্ব্বপ্রথম আসিতে দেখিল। তাহার নিকট এ কথাও শুনিতে পাইলাম যে, সেই স্থানটি একে জনসমাগম-বর্জ্জিত, তাহার উপর অরক্ষিত, এই জন্য পর্য্যটকরা সেখানে রাত্রিবাসের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। বাঙ্গলাটি প্রস্তর-নির্ম্মিত, তাহার আকার ক্ষুদ্র, তাহাতে দুইটি মাত্র খালি কামরা ছিল, কিন্তু সেখানে বাস করিয়া বিন্দুমাত্র আরাম পাওয়া যাইত না। কামরা দুইটির সম্মুখে একটা খোলা বারান্দা ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বাঙ্গলার সন্নিহিত আঙ্গিনা খানিকটা অসমান পতিত জমী, এবং সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

আমার ভোজন শেষ হইলে আহম্মদ খাঁ ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যাদি অপসারিত করিতে করিতে আমাকে উপদেশচ্ছলে বলিল, "আপনি শয়নের পূর্ব্বে দ্বার অর্গল-রুদ্ধ করিলে সুবিবেচনার কায হইবে সাহেব! এই বাঙ্গলার আস-পাশের যায়গাগুলা ভারী খারাপ।"

তাহার এই সতর্ক-বাণী শুনিয়া পুনর্ব্বার আমার মনে

হইল, তাহার অপেক্ষা আমি অনেক বেশী বুঝি। বিশেষতঃ রাত্রিটা অসহ্য গরম। দ্বার খুলিয়া রাখিয়া যতটুকু বাতাস পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই আমাকে কাজে লাগাইতে হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "আহম্মদ খাঁ, তুমি বোকার মত কথা বলিতেছ। অত ভয় করিবার কোন কারণ আছে কি ? এই বাঙ্গলার চারিদিকে ক্রোশের পর ক্রোশের ভিতর শিয়াল ও হায়েনা থাকিলেও অন্য কোন জীবিত প্রাণী নাই।"

বেয়ারা সসম্মানে বলিল, "হুজুরের মর্জ্জি।"

সে আর কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহার মনে বিন্দু-মাত্র শান্তি ছিল না।

সে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলে আমি বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম। কত কথাই মনে পড়িল। আর এক সপ্তাহমধ্যে আমি কাশ্মীরে পৌছিতে পারিব, সভ্যতার সংস্পর্শে আমার মানসিক জড়তা অন্তর্হিত হইবে। রিভলভারটি বালিশের নীচে রাখিয়া শয়ন করিলাম, এবং অত্যন্ত অধিক গরম বোধ করিলেও শয়নের অব্যবহিত পরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্তব্ধ রাত্রি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। নিদ্রাভঙ্গে যদিও কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু সংস্কারবলে বুঝিতে পারিলাম, কোন একটা বিপদ আসন্নপ্রায়। আমি মাথা না তুলিয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। মুক্ত আকাশ-স্থিত শুভ্রজ্যোতি নক্ষত্রপুঞ্জের মৃদু আলোক-প্রভায় বারান্দায় একটি মনুষ্যমূর্ত্তি জানুতে ভর দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম! তাহার মাথায় ফকিরের টুপি, এবং সেই মূর্ত্তি এরূপ স্থির যে, আমার মনে হইল, তাহা পাথর কুঁদিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহার হাতের রাইফেলের কুঁদা তাহার স্কন্ধসংলগ্ন এবং তাহার চোঙ আমার দেহ লক্ষ্য করিয়া প্রসারিত!

তাহার রাইফেলের চোঙ আমার দেহ লক্ষ্য করিয়া প্রসারিত

সে কি আনন্দ! দীর্ঘকাল যাহার নির্ব্বাসনে কাটিয়াছে, এই আশা তাহার পক্ষে কি লোভনীয়!

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করায় আমি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া, বায়ু-সেবনের আশায় আমার খাটিয়া মুক্ত দ্বারের নিকট টানিয়া আনিয়া, এবং আমার

সেই ছায়াবৎ মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমার ধমনীর শোণিতরাশি হিম হইয়া গেল! আমি বুঝিতে পারিলাম, কোন পাঠান গাজী ডাকবাঙ্গলায় আমাদের আগমনের সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহার স্বভাবসুলভ চাতুর্য্যের সাহায্যে যখন

নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল। তাহার মতলব ছিল, ঘৃণিত কাফেরদের একজনকে হত্যা করিয়া সে পুণ্যার্জ্জন করিবে। এই উদ্দেশ্যেই যে সে আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমি আহম্মদ খাঁর হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কি বোকামী করিয়াছি ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলাম; কিন্তু তখন আর সেই ভ্রম-সংশোধনের উপায় ছিল না, তখন শিয়রে শমন!

আমার তখন কিরূপ সঙ্কট, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমার হাত-পা নাড়িবারও উপায় ছিল না। সেই ধর্ম্মান্ধ গোঁয়ার পাঠানটা আমাকে সম্পূর্ণরূপে কায়দায় পাইয়াছিল। আমি অন্য কাহাকেও সাহায্যলাভের আশায় ডাকিতে সাহস করিলাম না। বিশেষতঃ, আমি জানিতাম, তাহাদের কাহারও নিকট অস্ত্র ছিল না। অধিক কি, বালিশের তলা হইতে আমার রিভলভারটা লইবার জন্যও হাত বাড়াইতে পারিলাম না। কারণ, আমি হাতখানি সরাইলেই পাঠানটা রাইফেলের ঘোড়া টিপিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শয্যায় প্রসারিত যে সাদা চাদরের উপর আমি শায়িত ছিলাম, তাহা তাহার লক্ষ্যভেদের অনুকূল—ইহাও বুঝিতে পারিলাম। আমাদের উভয়ের ব্যবধান এতই অল্প ছিল যে, সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলে তাহার গুলীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবারও সম্ভাবনা ছিল না।

আমি প্রাণভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলাম, এবং রুদ্ধনিশ্বাসে সেই ভীষণ মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, দৈবানুকম্পা ব্যতীত আমার প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু গাজী রাইফেলের ঘোড়া টিপিতে তখনও বিলম্ব করিতে লাগিল; বোধ হয়, আমার অসহায় অবস্থার কথা বুঝিতে পারিয়া সে পৈশাচিক আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়াছিল। যদিও তাহার মুখমণ্ডল ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিল, তথাপি পৈশাচিক আনন্দে তাহার মুখকান্তি কিরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল, কল্পনানেত্রে আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।

এইভাবে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইতে লাগিল এবং আমার যন্ত্রণা-মথিত হৃদয়ে এক এক সেকেণ্ড এক এক ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। আমার উৎকণ্ঠা এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, আমার মনে হইল, এ উদ্বেগ আর সহ্য হয় না, গাজী গুলী করিয়া তাহার হাতের কায তাড়াতাড়ি শেষ করুক, আমি মরিয়া বাঁচি। অবশেষে যখন বুঝিলাম, আমার সহিষ্ণুতা শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আর একটা প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি গুঁড়ি মারিয়া বারান্দায় উঠিয়া, আমার আততায়ীর পশ্চাতে আসিল, ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। পর মুহূর্ত্তে সেই নবাগত ব্যক্তি নিঃশব্দে গাজীর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।

আগন্তুক গাজীর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল

বিস্ময়বিজড়িত একটা ভীষণ চীৎকার নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। রাইফেল হইতে বজ্রনির্ঘোষবৎ গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল, কিন্তু গাজীর হাত নড়িয়া যাওয়ায় তাহার রাইফেল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল, এজন্য গুলীটা আমার দেহ স্পর্শ না করিয়া আমার মাথার উপর দিয়া বাঙ্গলার দেওয়ালে বিদ্ধ হইল।

এই ঘটনায় আমি অনির্ব্বচনীয় আরাম বোধ করিয়া চক্ষুর নিমেষে আমার রিভলভারটা টানিয়া লইলাম এবং শয্যা হইতে বাহিরে লাফাইয়া পড়িলাম। আমি আমার রক্ষাকর্ত্তাকে সাহায্য করিবার জন্য দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই রাইফেলটা সশব্দে পাথরের সানের উপর

নিক্ষিপ্ত হইবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। মুহূর্ত্ত পরে দেখিলাম, আমার রক্ষাকর্ত্তা—শেষোক্ত আগন্তুক—আহম্মদ খাঁ ও গাজী পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া মাটীতে পড়িয়া ধস্তাধস্তি করিতেছিল। পাঠানটা আহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মুক্তিলাভের জন্য তাহার সহিত এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিতেছিল যে, আমরা উভয়ে বহু চেষ্টায় তাহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলাম।

ইতিমধ্যে অন্য সকলে সেই কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তখন সেই দুর্দ্দান্ত গাজীর হাত-পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলে সে নিষ্ফল আক্রোশে আমাদিগকে গালি দিতে দিতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে লাগিল। ল্যাম্পের আলোকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, কি কদাকার ভীষণ মুখ! তাহার মাথার চুলগুলি এরূপ নোংরা যে, তাহাতে জটা ধরিয়াছিল, তাহার আরক্ত নেত্র বিস্ফারিত, তাহা যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল।

আহম্মদ খাঁ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আল্লাকে ধন্যবাদ, আমার সাহেবকে আহত হইতে হয় নাই!"

আমি আবেগভরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "তোমাকে ধন্যবাদ।"

অতঃপর আমি জানিতে পারিলাম, আহম্মদ খাঁর সতর্কতার ফলেই আমার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বস্ত অনুচর, কোন আততায়ী যদি আমার অজ্ঞাতসারে হঠাৎ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় আমাকে কোন কথা না জানাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলার চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিতেছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে সে গাজীকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া অলক্ষিতভাবে তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহাকে সতর্কতাবলম্বনের সুযোগ না দিয়া তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।

সেই রাত্রে আমি ও আহম্মদ খাঁ পর্য্যায়ক্রমে জাগিয়া বন্দীর পাহারায় থাকিলাম। প্রভাতে আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে সেই বিপজ্জনক স্থান ত্যাগ করিলাম। পরবর্ত্তী আড্ডায় উপস্থিত হইয়া আমরা গাজীকে যোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিলাম। যথাসময়ে সেই দুর্ব্বৃত্ত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইলে আমাদের সাক্ষ্যে সে দীর্ঘ কালের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইল।

অতঃপর আমি আহম্মদ খাঁ সহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাশ্মীরে উপস্থিত হইলাম। পথে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু সেই ডাকবাঙ্গলায় আমাকে যে ভীষণ সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা হইতে আমি একটি অমূল্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। তাহার পর যত দিন আমি সীমান্ত প্রদেশে চাকরীতে লিপ্ত ছিলাম, তত দিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন রকম গোয়ার্ত্তুমির কায করি নাই। আমাকে যে আরও অধিক মূল্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয় নাই, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এ কথা আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।

এই স্থানেই কাপ্তেন উলফ তাঁহার লোমহর্ষণ বিপদের কাহিনী শেষ করিয়াছেন। দুর্ঘটনার রাত্রিতে তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর আহম্মদ খাঁর প্রভুভক্তি, সাহস ও সতর্কতার জন্যই মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। এ দেশের হিন্দু-মুসলমান অনুচরবর্গের প্রভুভক্তি অতুলনীয়, তাহারা নিজের প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন করিয়াও বিপন্ন প্রভুর প্রাণরক্ষা করে, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত তাহার বহু নিদর্শন বর্ত্তমান; কিন্তু তাঁহাদের দেশীয় ভৃত্যগণের অসতর্কতায় বা বুদ্ধি-বিবেচনার ত্রুটিতে যদি তাঁহাদের 'পাণ হইতে' এক বিন্দু 'চুণ খসে,' তাহা হইলে তাঁহারা কি ভাবে ভৃত্যবাৎসল্যের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা এ দেশের লোক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কি বলিতে পারেন, তাঁহারা তাহাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করেন? তবে সকলেরই হৃদয় যে অভিন্ন উপাদানে গঠিত, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মাতা ও পুত্র

হৈমবতীর মৃত্যুর পর ঘরে আর মন বসিতেছিল না। কেবলই মনে হইতেছিল, বাহিরে কোথাও যাইতে পারিলে যেন পূর্ব্বশান্তি ফিরিয়া পাই। হৈমর জন্য শোক করিবার অধিকার নাই—আমার মত পাপীর উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে। চিরদিন যাহার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম—অনাদরে, অবহেলায় সেই সতীলক্ষ্মী আজ আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জীবনটা লইয়া আমি কেবল ছিনিমিনি খেলিয়াছি। কখনও আমার কাছ হইতে একটা ভাল কথা পায় নাই—তাহার সুগভীর ভালবাসার প্রতিদানে কেবল উপেক্ষা ও অবজ্ঞাই লাভ করিয়াছে। সবই সে প্রশান্ত হাসিমুখে সহ্য করিত—মুখ ফুটিয়া কখনও কোনও অভিযোগ করে নাই। আমাকে সে যেন একটা বয়স্ক শিশুর মত দেখিত—আমার অন্তরের তলদেশ পর্য্যন্ত যেন নখদর্পণে দেখিতে পাইত। কিন্তু তাহার কথায়-বার্ত্তায়, আচরণে-ব্যবহারে, কখনও এমনভাব প্রকাশ পাইত না, সে আমাকে বুঝিতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ তাহার দুঃখ সহিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তাহার অভাবে সমস্ত সংসার আজ শূন্য হইয়াছে। যে লক্ষ্মী গৃহে বৈকুণ্ঠের শোভা বিস্তার করিতেন—তাঁহার ভাগ্যে আজ শ্মশান-বিহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। হৈমবতীর শত-স্মৃতি-জড়ানো এই শয়ন-মন্দির—ঐ বাক্স—আলনায় টাঙ্গানো যত্নকুঞ্চিত সাড়ীগুলি, ঐ পানের বাটা, সিন্দুর-কৌটা, কাচের বাটি, মাথার কাঁটা—সবই তাহার কথা শত বৃশ্চিকজ্বালার ন্যায় মনে পড়াইয়া দিতেছে। কিছুতেই কাঁদিব না মনে করি—তবু পুনঃ পুনঃ চোখে জল আসিয়া পড়ে।

জগৎ-সংসারের মধ্যে আপনার জন বলিতে এখন আর কেহ নাই। পিতা ও মাতা এক বৎসরের মধ্যে পর পর গত হইয়াছিলেন। অবশ্য হৈমকে ঘরে আনিবার পর। আরও এক জন ছিল, কিন্তু থাক্! সে কথায় আর কায কি! এখন কে এ সংসারের ভার লইবে? কাহার হাতে ঘর-কন্নার বোঝা তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব? তিন বৎসরের শিশু-পুত্রটিকে লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।

ও-বাড়ীর জ্যেঠাইমা আসিয়া বলিলেন,—"নগেন, ছেলেটিকে নিয়ে তুই বড় বিপদে পড়েছিস—বৌমা বড় অসময়ে গেলেন—আর একটি বিয়ে কর—নইলে খুব কষ্ট হবে।"

আমি বলিলাম—"মাফ করো জ্যেঠাইমা—আর রুচি নেই—ছেলেটাকে তুমি দেখো—আমি দিন কতক ঘুরে আসি—"

"কোথায় যাবি রে—"

"আপাততঃ কাশী পর্য্যন্ত—"

"কবে ফিরবি—"

"মাস দুই পরে। তত দিন খোকার তুমি একটু যত্ন নিয়ো।"

"আচ্ছা রে আচ্ছা—খোকার জন্যে ভাবতে হবে না। তুই যেন শীগ্‌গীর ফিরে আসিস্।"

দিন দুই পরে খোকাকে কোলে লইয়া জ্যেঠাইমাদের বাড়ী গেলাম। গভীর স্নেহে খোকার মুখচুম্বন করিয়া বলিলাম—"খোকা, তুই এখন তোর ঠাকুরমার কাছে থাক—আমি তোর জন্যে খেলনা আনতে যাচ্ছি। দেখিস্—কাঁদিসনে যেন।"

"তুই কোথা চল্‌লি, বাবা?"

"তোর মাকে আন্‌তে।"

"সত্যি! মাকে আন্‌বি?"

"দেখিস্—সত্যি তোর মাকে আনবো। যা, এখন তোর ঠাকুরমার কাছে যা"—বলিয়া খোকাকে জ্যেঠাইমার কোলে দিয়া অশ্রুপূর্ণ-চোখে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত বিদায় লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিতেও সাহস হইল না।

* * * *

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিলাম। এক দিন দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে স্নান সারিয়া একটা গলিপথ ধরিয়া হন হন করিয়া বাসায় ফিরিতেছি. এমন সময় ঝি শ্রেণীর একটি বাঙ্গালী মেয়ে আসিয়া বলিল—"ওগো বাবু, দিদিমণি আপনাকে একবার ডাকছেন—"

থমকিয়া দাঁড়াইলাম—কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। দিদিমণি কে? এই গলির মধ্যে আমার পরিচিত কেহ আছে বলিয়া স্মরণ হইল না। বিস্মিত হইয়া কহিলাম—"আমাকে? তোমার মানুষ ভুল হয় নাই ত?"

"না—না, ভুল নয়! আপনাকেই বটে। ঐ যে ঐ বাড়ীটার দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন—"

কিছু দূরে একটা বাড়ীর দ্বারোপান্তে দণ্ডায়মান ঘোমটাপরা একটি কৃশাঙ্গী নারীমূর্ত্তি নজরে পড়িল।

সেদিক্ পানে চাহিতে চকিতের মধ্যে তিনি সম্মুখে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া তুলিয়া হাতছানি দিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন। ব্যাপার কি? রমণী কে? বুকের মধ্যে একটা সন্দেহ তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

ঝি বলিল,—"রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর দেরী করবেন না, দিদিমণি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন।"

"আচ্ছা চল" বলিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহার সহিত চলিলাম।

ঘরে ঢুকিতেই রমণী গড় হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নত নেত্রে কহিল—"আমাকে চিনতে পারো?"

এই বিষণ্ণনয়না দেবীমূর্ত্তিকে তখনও আমি চিনিতে পারি নাই। বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া ভাবিতেছিলাম—যাহা কিছু দেখিতেছি—তাহা যেন সত্য নহে—তাহা যেন স্বপ্ন—ঘুম ভাঙ্গিলেই সব মিলাইয়া যাইবে। মুখ তুলিতেই মুহূর্ত্তের জন্য চোখোচোখি হইয়া গেল—আশ্চর্য্য! মুখটা যেন চেনা চেনা—কতবার স্বপ্নে যেন এই মুখ দেখিয়াছি—এই মুখের স্মৃতি কত সময় মনকে ব্যাকুল করিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ দশ বৎসরের যবনিকা উঠিয়া গেল—হর্ষ ও বিস্ময়ের আতিশয্যে মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল—"মাধবী—তুমি!"

"হাঁ আমি। যা হোক চিন্‌তে পেরেছো, এই পরম লাভ। ভেতরে এসো—সেখানে কথা হবে।"

"তোমার মা বাপ কোথায়?"

"অনেক দিন হ'লো তাঁদের কাশীপ্রাপ্তি ঘটেছে।"

"এখানে আছ কার আশ্রয়ে?"

"মামার বাড়ীতে!"

"এ সব সংবাদ আমি কিছুই জানতাম না—আমারই দোষ।"

পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"চলো মাধবী—এখান দিয়ে লোক যাওয়া-আসা করছে—ভেতরে চল।"

"এসো" বলিয়া মাধবী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া একটা ছোট কুঠরী খুলিয়া আমাকে বলিল—"ঘরের ভেতর কম্বল পাতা আছে, বোসো। মামীমা ওদিকের ঐ ঘরটায় খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন—এখন উঠবেন না।"

"তোমার মামা কোথায়?"

"তিনি কলেজ গেছেন—ফিরতে দেরী হবে। তুমি একটু বোসো—আমি শীগ্‌গীর আসছি—আজ এখানেই দুটি খেতে হবে।"

ব্যস্ত হইয়া আমি কহিলাম "না না—সে কি হয়! আর এক দিন এসে—"

সে বলিল—"খুব হয়—তোমার কোনো কথাই আজ শুন্‌ছিনে। দাও—কাপড় আর গামছা, ছাতে মেলে দিই গে—ওলো ও কালিদাসী—কোথায় গেলি লো—" বলিতে বলিতে গামছা ও কাপড় লইয়া সে ত্রস্তপদে চলিয়া গেল।

* * * *

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর উপরতলার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বিশ্রাম করিতেছি। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া ঝির ঝির করিয়া হাওয়া আসিতেছে—সে দিক্ দিয়া তীর্থরাজ বারাণসীর অগণ্য সৌধশ্রেণী নজরে পড়িতেছে। মনে নানা চিন্তা—নানা ভাবনা। হৈমবতীকে ভুলিবার জন্য কাশী বেড়াইতে আসিয়া অকস্মাৎ যে মাধবীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে—এ কথা পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল? এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায় আর এক দিকে সূর্য্য উঠে—ইহাই চিরন্তন নিয়ম। আমার ভাগ্যেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই দেখিতেছি। লীলাময়ের কি অপূর্ব্ব লীলা! এক জনের স্মৃতি মন হইতে মুছিতে না মুছিতে আর এক জনের আবির্ভাব! কিন্তু মাধবীর সে চেহারা আর নাই—এ যেন তাহার অতীতের ছায়া। সেই অনুপম লাবণ্য ঝরিয়া গিয়া চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে—তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখার মত এই ক্ষীণাঙ্গী রমণীমূর্ত্তির পানে চাহিলে আমার মত পাষাণের চোখেও জল আসিয়া পড়ে। সাক্ষাৎ হওয়ার পর হইতে আমার সহিত যে ব্যবহার মাধবী করিতেছে, তাহাতে মনে হয়—দুষ্কৃতকারী এই হত-ভাগ্যকে সে আজও ভোলে নাই। কতকাল পরে সাক্ষাৎ—কিন্তু এমনই ব্যবহার করিল, যেন নিত্য দেখা মানুষ।

একদা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া এই মাধবীর সহিত যে অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছিলাম—সে

কথা স্মরণ হইলে আজও ঘৃণায়, লজ্জায়, অনুতাপে মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কি ক্ষমাময়ী সে! সে কথা যেন তাহার মনে নাই। এক দিন এই মাধবীই ছিল আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ—থাক! সে কথা গোপন থাকাই ভাল। ইহারই চিন্তা হৈমবতীর কাছ হইতে বরাবর আমাকে দূরে রাখিয়াছিল। হৈমবতীকে ভালবাসিতে না পারার মূল কারণ—এই মাধবী।

চিন্তা অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে মাধবী ঘরে ঢুকিল—তাহার পানে চাহিয়া বলিলাম—"মাধবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।"

সে একটু তফাতে বসিল। তার পর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—"হৈম কেমন আছে?"

বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম—"হৈমকে তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?"

ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল—"আমি সব জানি।"

তখন আমি বলিলাম—"হৈম ত নেই। মাস ছয়েক হলো মারা গেছে—"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া মাধবী মনে মনে কি যেন মিলাইয়া লইল—তার পর কহিল—"আচ্ছা, খোকা কোথায়?"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলাম—"তাকেও জানো?"

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে মাধবী বলিল—"হ্যাঁ, জানি। তাকে সঙ্গে এনেছো?"

"না। তাকে জ্যেঠাইমার কাছে রেখে এসেছি।"

"কেন আনলে না—দেখতে বড় সাধ হয়।"

"যদি জানতাম, তোমার সঙ্গে এমনভাবে দেখা হবে, তা হ'লে আনতাম।"

জানালার বাহিরে তাকাইয়া মাধবী বলিয়া উঠিল—"ঐ যা, বেলা প'ড়ে আসছে—তোমার জন্যে ততক্ষণ চা নিয়ে আসি। মামাবাবুর আসবার সময় হলো—তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে। মামীমার ঘুম ভাঙ্গবার এখনো সময় হয়নি"—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল।

* * *

আর গোপন করা বৃথা—এই মাধবীই আমার প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। এক দিন সে আমার হৃদয়ের যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা হইতে তাহাকে দীর্ঘকালের মধ্যেও বিতাড়িত করিতে পারি নাই। অথচ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বাবা তখন বাঁচিয়াছিলেন। বিবাহের তিন বৎসর পরে বাবা জানিতে পারেন, শ্বশুর মহাশয়ের একান্নভুক্ত এক সহোদর ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কোনও তরুণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সেই ভ্রাতা গৃহে বাস করিতেছেন। ইহাতে বাবা শ্বশুর মহাশয়কে বলেন যে, আমাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইলে, সেই ভ্রাতার সহিত তিনি সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্বশুর মহাশয় পিতাকে কড়া চিঠি লেখেন। মাধবী তখন পিত্রালয়ে ছিল। উভয় বৈবাহিকের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হইয়া উঠায় বাবা মাধবীকে গৃহে লইতে অস্বীকার করেন। আমি তখন উপার্জ্জন-অশক্ত যুবক মাত্র। স্নেহময় পিতার আদেশে বাধ্য হইয়া আমি মাধবীকে পরিত্যাগ করি। শ্বশুর মহাশয়ও ক্রোধবশে মাধবীকে আমাদের গৃহে পাঠাইতে চাহেন নাই। বলিয়া পাঠান, তাঁহার কন্যা বিধবা হইয়াছে। ইহাতে আমারও মনে ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হয়। মাধবীকে পরিত্যাগ করিবার ইহাই কারণ। তার পর হৈমর সহিত পিতা আমার বিবাহ দেন। মাধবীর কোন অপরাধ আছে কি না, তখন তাহাও বিচার করিয়া দেখি নাই।

পরিত্যাগ করার কিছু দিন পর তাহার মা-বাপ তাহাকে লইয়া কাশী চলিয়া যান—তার পর আর কোন সংবাদ পাই নাই, রাখিও নাই। সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে কাশীর পথে সেই বহুদিনের পরিত্যক্তা পত্নী মাধবীর সঙ্গে পুনরায় দেখা। হৈমবতীর মৃত্যুর পর মাধবীর সহিত এই যে অতর্কিত সাক্ষাৎ, ইহার মধ্যে বিশ্বনাথের যেন একটা হাত আছে বলিয়াই মনে হইতেছে। মাধবীর সহিত যতই অসৎ ব্যবহার করি না কেন—আজ মনে হইতেছে, চিরদিন ইহাকেই অন্তরের আসনে বসাইয়া ভালোবাসিয়া আসিয়াছি।

* * *

নিঃশেষিত চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া পাণ লইয়া বলিলাম—"আর এক দিন এসে তোমার মামার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো—আজ ছেড়ে দাও।"

অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে মাধবী বলিল—"কাশীতে এখন দিন কতক থাকবে ত ?"

কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম—কিন্তু কারণ বুঝিলাম না। কহিলাম—"জ্যেঠাই-মার পত্র না আসা পর্য্যন্ত আছি—"

গভীর ঔদাসীন্যের সহিত মাধবী কহিল—"আচ্ছা, আজ তবে যাও। অবসরমত আর এক দিন দেখা করো। আর গোটা কতক পাণ পাঠিয়ে দিই গে—" বলিয়া আমার মুখের পানে না চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে বাহির হইয়া গেল। তাহার এ গোপনতার অর্থ কি? যে ব্যবহার তাহার সহিত করিয়াছি, তাহার পর আমার জন্য তাহার নয়নে অশ্রুর আবির্ভাব সম্ভবপর কি?

একটু পরে পাণ লইয়া আমি পথে বাহির হইলাম। মাধবীর সহিত আসিবার সময় আর দেখা হইল না। ঝির হাতেই সে পাণ পাঠাইয়া দিয়াছিল। পথে চলিতে চলিতে মনে হইল—ভুল—ভুল—সমস্তই ভুল। সে মাধবী আর নাই। ইহার সহিত আর দেখা করিব না। দশ বৎসর পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় যাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলাম—ভাল হউক—মন্দ হউক, তাহার সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আশ্চর্য্য এই মানুষের মন—আজ প্রথম সাক্ষাতে যাহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে হইয়াছিল—বিদায়কালীন সে একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া হাসিয়া কথা বলে নাই বলিয়া এখন তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার অবধি নাই। বিনা অপরাধে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি, এ জন্য নারী-হৃদয়ের যে স্বাভাবিক অভিমান জাগ্রত থাকা সম্ভবপর, সে দিক্ দিয়া কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখিবার মত প্রবৃত্তি জাগিল না। মনে হইল,—হৈমবতীর স্মৃতির আর অপমান করিব না। মাধবীর চিন্তা মন হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া দিব।

দিন তিনেক পরে এক দিন অপরাহ্নবেলায় সেই গলিপথ দিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় পূর্ব্বপরিচিতা সেই ঝি আমার হাতে একখানি সাদা খামে মোড়া চিঠি দিয়া কহিল—"দিদিমণির চিঠি—আজ সকাল্ থেকে এই পথে আপনার খোঁজ করছি—যদি উত্তর দেন, কাল আটটার সময় আসবেন, আমি অপেক্ষা করবো।" বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

চিঠিখানি হাতে করিয়া নারীচরিত্রের অচিন্তনীয় রহস্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতপদে বাসায় ফিরিয়া নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিলাম ;—

শরণং—

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম শতকোটী নিবেদন—

সে দিন দশ বৎসরের পরে তোমার সঙ্গে দেখা—দীর্ঘ দশ বৎসর পর তোমাকে আজ চিঠি লিখিতেছি। চিঠিতে মনের ভাব যতটা ব্যক্ত করা যায়, মুখে তত নহে। আমি তোমার পরিত্যক্তা স্ত্রী—বিনা অপরাধে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। কথাটা ঠিক হইল না—পিতা ও শ্বশুর মহাশয়ের কলহের শাস্তি আজ পর্য্যন্ত আমি বহন করিতেছি। যত দিন দেশে ছিলাম—সই শৈলবালার পত্রে তোমার সংবাদ পাইতাম—ইদানীং কয়েক বৎসর তাহার পত্র বড় একটা পাই না—সে স্বামীর চাকরীস্থান সুদূর ব্রহ্মদেশে চলিয়া গিয়াছে—চিঠি লেখালেখিও বন্ধ হইয়াছে। সে কারণ তোমার সংবাদ পাইবার জন্য মাঝে মাঝে মন বড় উচাটন হইত—সে যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতাম। হৈমবতীর সহিত তোমার বিবাহের সংবাদ শৈলবালার পত্রেই অবগত হইয়াছিলাম। ঈশ্বর জানেন—আমার এতটুকু দুঃখ হয় নাই। বরং এই ভাবিয়া আমি সুখী হইয়াছিলাম যে, হৈম তোমার সকল কষ্ট ঘুচাইবে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, হৈমর মত মেয়েকেও তুমি ভালবাসিতে পার নাই। বুদ্ধিমতী শৈল তলে তলে সমস্ত সন্ধান লইয়া আমাকে জানাইয়াছিল। ক্ষমা করিও—আমি তোমার মন জানি। আমার জন্য তুমি হৈমকে ভালবাসিতে পার নাই—এ কথা মনে করিয়া আমি নিরতিশয় কষ্ট পাইতাম। এমনই করিয়াই দিন যাইতেছিল।

মা বাপ আমাকে লইয়া কাশী চলিয়া আসিলেন। মামা এখানে কোন কলেজের অধ্যাপক—তাঁহার বাসায় আমরা সকলে উঠিলাম। কিছুদিন পর ভগ্নহৃদয়ে মা বাপ কয়েকদিন অগ্রপশ্চাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। হতভাগিনী আমার ত মরণ নাই—তাই আমি জীবন্মৃত অবস্থায় মামার বাসাতেই আছি। মাতুল মহাশয় পরম ধার্ম্মিক—অতি সজ্জন লোক—আমাকে নিজের কন্যা তুল্য স্নেহ করেন—

কিন্তু মামীমা—তাঁহার কথা আর লিখিব না; এখন যত শীঘ্র আমার মরণ হয়, ততই ভালো। সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব মামীমার হাতে—তাঁহার উপর শান্ত নির্ব্বিরোধ একান্ত নিরীহ মামাবাবুর কোন জোর নাই। তিনি কেবল টাকা আনিয়া খালাস।

এইবার একটা আশ্চর্য্য সংবাদ দিব। সে দিন হৈম ও খোকার কথা জিজ্ঞাসা করায় তুমি খুব বিস্মিত হইয়াছিলে—আজ সমস্ত রহস্য ফাঁস করিয়া দিব।

যে দিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়—তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে বিছানায় একাকী শুইয়া আছি—কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে নাই; ঘুমের ঘোরে হঠাৎ মনে হইল, কে যেন আমার শিয়রে বসিয়া আছে। চোখ চাহিয়া দেখি—খোলা জানালা দিয়া ঝাপসা চাঁদের আলো ঘরের মেঝেয় আসিয়া পড়িয়াছে—সেই আলোয় স্পষ্ট নজরে পড়িল, চওড়া পাড় শাড়ীপরা একটি মেয়েমানুষ আমার শিয়রে বসিয়া আমার মুখের পানে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে।

শুধাইলাম—'তুমি কে?'

স্নিগ্ধকণ্ঠে রমণী কহিল—'দিদি, আমাকে তুমি চিন্‌তে পার্‌বে না—আমি তোমার ছোট বোন—হৈম।'

'তুমি এখানে কেন?'

'তোমার স্বামি-পুত্রের ভার তুমি নাও দিদি—তা'হলে নিশ্চিন্ত হ'লে আমি বিদায় হই।'

'তাদের কোথায় দেখা পাব, বোন্?'

হৈম কহিল—'স্বামী ত এই কাশীতেই এসেছেন—কাল বেলা দশটার সময় ঐ জানালার সামনেকার পথেই দেখা হবে। দেশের বাড়ীতে খোকা মা মা ক'রে কাঁদছে—তুমি তাকে দেখো দিদি—পেট ভাঁড়িয়ে এসেছিল, নইলে তুমিই ত তার আসল মা'—বলিতে বলিতে সে মূর্ত্তি তরল বাষ্পের মত জানালা-পথে অদৃশ্য হইল। চট্ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সমস্ত রাত্রি আর ঘুম আসিল না। পরদিন ঠিক বেলা দশটার সময়ই তোমার সঙ্গে দেখা…সতী-সাধ্বীর কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছে। তার পর যা ঘটিয়াছে—সে সব ত তুমি জানো।

আর আমার বেশী কিছু লিখিবার নাই।

প্রণতা—

মাধবী।"

চিঠিপড়া সাঙ্গ হইল। কিন্তু অশ্রুবাষ্পে কিছুই যে দেখিতে পাইতেছি না! আমার মত মহাপাতকীর প্রতি কি করুণাময়ের স্নেহের নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে? সেই যে গানে আছে—'ভাবি ছেড়ে গেছ—ফিরে চেয়ে দেখি—একপাও ফিরে যাও নি।' খোকাকে ভুলাইবার জন্য যে কথা বলিয়া আসিয়াছিলাম, সত্য সত্যই কৃপাসিন্ধু কি তাহার হারানো মাকে এমন ভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন! বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলাম।

* * *

পরদিন দেশ হইতে জ্যেঠাইমার চিঠি আসিল—লিখিয়াছেন:—

"নগেন, যত শীঘ্র পারিস দেশে ফিরিয়া আয়। তোর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা সারা হইল। মা-মরা ছেলেটাকে এমনি করিয়াই কাঁদাইতে হয়? ঢের ঢের বাপ দেখিয়াছি—তোর মত এমন পাষাণ বাপ দেখি নাই। পত্র পাঠ চলিয়া আসিস্।"

খোকা কাঁদিতেছে! আর ত বিলম্ব করা চলিবে না! শীঘ্রই দেশে ফিরিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ চিঠিখানি হাতে করিয়া মাধবীর উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম।

* * *

মামা বাবু সহজেই রাজী হইলেন—সরলহৃদয় প্রবীণ অধ্যাপকের চরণ বন্দনা করিয়া আমরা বিদায় লইলাম। এই দিনও মাতুলানীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না—শুনিলাম, এ বয়সেও তিনি অসম্ভব গোপনচারিণী। জামাতার সম্মুখে বাহির হয়েন না।

* * *

ঠিক সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনে নামিয়া গেটের বাহিরে আসিয়া একখানি গো-শকট ভাড়া করিয়া চড়িয়া বসিলাম। এখান হইতে আমাদের গ্রাম ছয় মাইল দূরে। লাল কাঁকর-বিছানো সুন্দর পাকা রাস্তা—একপাশে টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—রজতশুভ্র জ্যোৎস্নার বন্যায় দিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছে। অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ—উত্তর দিক্ হইতে শিশিরার্দ্র হাওয়া প্রবাহিত হইয়া শীতাগমের অলস স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। রাস্তার ধারের শিশির-ভেজা ঝোপ-ঝাড় লতা-পাতা হইতে এমন এক প্রকার কোমল সুমিষ্ট গন্ধ উঠিতেছে, যাহা মনকে মোহাবিষ্ট করিয়া তুলে।

ছইয়ের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া চন্দ্রালোকিত বিশ্ব-প্রকৃতির পানে চাহিয়া দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া গাঢ়স্বরে মাধবী কহিল—"কতদিন পরে আজ

আবার শ্যামপুরে ফিরে এলেম ! এই পথ-ঘাট, বন-বাগিচা, তালবাগান, ধানের ক্ষেত—সব যেন আজ নূতন লাগছে—আচ্ছা, সব চেয়ে উঁচু ঐ যে তালগাছটা নজরে পড়ছে—ওটা ঠাকুরঝি পুকুরের সেই বড় তালগাছটা নয় ?”

মাথা নাড়িয়া জানাইলাম—সেইটিই বটে।

“দেখ, সব আমার মনে আছে।”

হৈমর স্মৃতিতে মন তখন আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না। যতই গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ততই সেই পরলোকগতা দুর্ভাগিনীর স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

দুই জনেই চুপচাপ বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলাম। গ্রামে পৌছিতে আর বিলম্ব নাই। নিবিড় পল্লবাকীর্ণ গাছ-পালার ফাঁক দিয়া পল্লীকুটীরের আলো দেখা যাইতেছে।

* * * *

“এইখানে থাম—এই যে বাড়ী।” গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি নামিয়া গাড়ী খুলিয়া দিল। মাধবীকে সঙ্গে লইয়া আমি নামিয়া পড়িলাম।

গাড়ীর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ও-বাড়ী হইতে জ্যেঠাইমা আলো হাতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—“কে রে নগেন—এলি না কি ! তোর দুষ্টু খোকা এখনো ঘুমায় নি—সঙ্গে ঐ মেয়েটি কে রে ?”

আমাকে উত্তর করিতে হইল না। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া জ্যেঠাইমার পায়ের গোড়ায় নত হইয়া প্রণাম করিয়া মাথার ঘোমটা ঈষৎ তুলিয়া মাধবী বলিল—“আমাকে চিনতে পারেন না—জ্যেঠাইমা ? আমি আপনাদের বড় বৌ।”

এতক্ষণে জ্যেঠাইমার মনে পড়িল। কহিলেন—“এসো মা, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসো। বেশ করেছিস নগেন—বউ-মাকে যে নিয়ে এসেছিস, এর চেয়ে আনন্দ আর কিছু নেই। কোথায় দেখা পেলি রে ? কাশীতে বুঝি ? বেশ বেশ ! ঐ যে—ঐ দেখ বৌমা, তোমার খোকা এসেছে। এই দেখ খোকা—এই তোর মা—” তার পর আমার হাতে চাবী দিয়া বলিলেন—“এই নে চাবী, ঘর-দুয়ার যেন কাঁদছে !”

মাধবী তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গভীর স্নেহে মুখচুম্বন করিয়া কহিল—“বাবা, আমাকে তুমি চিনতে পারো ?”

খোকা বলিল—“পারি—”

মাধবী বলিল—“বল দেখি মাণিক, আমি তোমার কে হই ?”

মাধবীর বুকে মুখ লুকাইয়া খোকা বলিল—“মা।” খোকাকে কে শিখাইয়াছিল—খোকাই জানে।

দূরে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতা ও পুত্রের এই অভিনব মিলন-দৃশ্য আমি দেখিতে লাগিলাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাস

লক্ষ যুগের বক্ষ বাহিয়া
ছুটিয়া চলিছে কালের স্রোত
নাহি তার আদি নাহি তার শেষ
নাহি তার কভু বিরাম রোধ।

কত দেশ জাতি উঠিছে ভাঙিছে
ঠিকানা তাদের রাখেনি কেহ,
স্মৃতিটুকু তার গেঁথে ইতিহাস
গড়িয়া তুলেছ আপন গেহ।

রচিয়া রেখেছ কালের কাহিনী
সোণার আখরে আপন বুকে,
জীবন দিয়াছ অতীতের প্রাণে
মন্ত্র গাহিয়া আপন মুখে।

যোগায়েছ বল বীরের বক্ষে
স্মরণ করায়ে অতীত কথা
ধরিয়াছ আলো কর্ম্মী চক্ষে
পথে কণ্টক পড়েছে যেথা।

শিখায়েছ কত দর্শন জ্ঞান
আঁকিয়া মানব-মনের ছবি,
ভাব-বস্তুর মিলন ঘটায়ে
করেছ মানবে বিজ্ঞ কবি।

আয়েষা খাতুন।

ও

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

গত শ্রাবণ মাসে আমি মাসিক বসুমতীতে "হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কার্ত্তিক মাসের মাসিক বসুমতীতে দেখিলাম যে, ধর্ম্মপ্রিয় ভিক্ষু মহাশয় উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন বা প্রতিবাদ করিবার মত ভঙ্গী করিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ এক জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং ভিক্ষু বা সংসারত্যাগী সাধক। সুতরাং ইঁহার নিকট হইতে আমি সত্যনিষ্ঠার আশা করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার আলোচনায় সেই সত্যের অভাব দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন যে, "শশিভূষণ বাবু হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে এক করিতে যাইয়া যে মতসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মতসমূহের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করাই এই প্রতিবাদের অবতারণা।" আমি কোথায় হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম এক, এ কথা বলিয়াছি? আমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমি দেখিলাম, কুত্রাপি ভ্রমেও আমি সে কথা বলি নাই। আমি আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, "হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহারই আলোচনা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।" দুইটি পরস্পর ভিন্ন বস্তু, ব্যাপার বা বিষয় না হইলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কেহ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যায় না। জলের সহিত জলের কি সম্বন্ধ,—বাতাসের সহিত বাতাসের কি সম্বন্ধ, সূর্য্যের সহিত সূর্য্যের কি সম্বন্ধ, তাহা লইয়া বাতুল ভিন্ন অন্য কেহ আলোচনা করে না। সুতরাং ঐখানেই আমি উভয় ধর্ম্মের ভিন্নতা স্বীকার করিয়াছি। ইহা ভিন্ন আমি ঐ প্রবন্ধের বহুস্থানে বলিয়াছি, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের "অঙ্গজ"। একটি আর একটির "অঙ্গজ" বলিলে কি দুইটি একই পদার্থ বুঝায়? অঙ্গজ বলিতে দেহ হইতে যাহা জন্মে, তাহাকেই বুঝায়। পুত্র পিতার বা মাতার দেহ হইতে জন্মে, সেই জন্য পুত্রকে অঙ্গজ বলা হয়। এক জন কবি দশরথকে অজ-অঙ্গজ বলিয়াছেন। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, তিনি অজকে এবং দশরথকে এক করিতে গিয়াছেন? কেশকে অঙ্গজ বলা হয়; তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে, কেশ ও দেহ এক? তাহার পর আমি লিখিয়াছি,—"তাঁহার (বুদ্ধদেবের) প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের একটি শাখামাত্র ছিল।" শাখা বলিলে উহাকে কি মূলের সহিত এক করিতে যাওয়া হয়? যদি বলা যায় যে, ইচ্ছামতী পদ্মার একটি শাখা। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, পদ্মানদী এবং ইচ্ছামতী নদী এক? এমন বিপদেও মানুষ পড়ে না! ভাষায় যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে,—তাহার এইরূপ অনিচ্ছাকৃত ভ্রম কখনই হইতে পারে না। সুতরাং তিনি খাঁটি প্রমাণ দ্বারা যে মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে গিয়াছেন, তাহার অস্তিত্বই নাই। বাতাসে অসিপ্রহার আর কাহাকে বলে?

আমার প্রবন্ধের প্রথমেই আমি লিখিয়াছিলাম—"আজকাল কুশিক্ষার প্রভাবে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম্ম।" আমার কথায় প্রতিবাদ করিতে যাইয়া তিনি আমার এ কথাটি তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি উহা হইতে "সম্পূর্ণ" শব্দটি বাদ দিয়াছেন। এইখানেই ঐ সম্পূর্ণ শব্দটির সার্থকতা অত্যন্ত অধিক। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিলে একেবারে সম্বন্ধহীন বুঝায়; শুধু স্বতন্ত্র বলিলে যে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধবর্জ্জিত, ইহা না বুঝাইতেও পারে। যদি বলা যায় যে, ইচ্ছামতী পদ্মা হইতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নদী, তাহা হইলে ভুল বলা হইবে। কিন্তু ইচ্ছামতী পদ্মা হইতে স্বতন্ত্র নদী বলিলে ভুল হইবে না। গোদাবরীকে গঙ্গা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নদী বলা যাইতে পারে। কারণ, উহারা পরস্পর সম্বন্ধশূন্য। এখন জিজ্ঞাস্য, তিনি অনবধানতা বশতঃ এই সম্পূর্ণ শব্দটি বর্জ্জন করিয়াছেন, না ইচ্ছা করিয়া উহা বাদ দিয়াছেন? তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মকে এক করিতে গিয়াছি,—তাহা করিতে হইলে ঐ শব্দটি বাদ না দিলে চলে না। সুতরাং তাঁহার ভ্রমটা ঠিক প্রয়োজনসাধকই হইয়াছে। ইহাই কি কর্ত্তব্য? আমার এই কথাগুলি তুলিয়া তিনি কয়েকজন ইংরাজীশিক্ষিত এবং সংস্কৃতভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় এই পারদর্শী ব্যক্তিরা কি কুশিক্ষার প্রভাবেই শিক্ষিত? কুশিক্ষা অর্থে যে শিক্ষার প্রভাবে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মে, সেই শিক্ষা। যখন দেশে একটা ভ্রান্তির বা ভ্রান্তধারণার প্লাবন আসে, তখন কোন একটা ভাষাবিশেষ যাহারা জানে, তাহাদিগকে সে ভ্রান্তি যে ত্যাগ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং এই কথা বলিয়া তিনি যে বিশেষ কি খাঁটি প্রমাণ উপস্থিত করিলেন, তাহা আমি বুঝিলাম না। কতকগুলি লোক নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসমত এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার সহিত আমার প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই।

আমি লিখিয়াছিলাম—"বুদ্ধদেব হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা

বিষ্ণুর অবতার। হিন্দুরা বুদ্ধদেবের স্তব করিয়া থাকেন।" তিনি আমার এই দুই ছত্র তুলিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতার বলিয়া পূজা করিলেও আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না।" তাঁহারা কি স্বীকার করিতে পারেন না? আমি লিখিয়াছি, হিন্দুরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্তব করেন। তিনি তাহা হইতে "পূজা" আনিলেন কোথা হইতে? আমি ত এমন কথা বলি নাই যে, হিন্দুরা বুদ্ধদেবের পূজা করে। তবে এক কথায় আর এক কথা টানিয়া আনিয়া এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিবার উদ্দেশ্য কি? উহা কি খাঁটি প্রমাণ? তাহার পর তিনি হিন্দুর অবতার সম্বন্ধে অত্যন্ত গ্লানিকর ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে দানশীলাদি দশপারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন। "তাঁহার সেই অনন্ত আয়াসপূর্ণ গুণ ধর্ম্মের সহিত মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি বিষ্ণুর দশ অবতারের কোন অবতারের লীলাখেলার সামঞ্জস্য নাই, থাকিতে পারে না।" যিনি ঈশ্বর মানেন না, তাঁহার পক্ষে অবতারতত্ত্ব বুঝাই সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাগবতের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এই অবতারের কথা আছে। (ভাগবত ১৷৩৷২৬-৩০ দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালা ভাগবতে আছে—

প্রজাপতি মনু ঋষি দেবতা মানব।
সকলি হরির অংশে হয়েন উদ্ভব॥
তন্মধ্যে কেহ বা অংশে ধরি কলেবর।
ভুবনে প্রকাশ হন জন্মজন্মান্তর॥

যাঁহারা অবতারতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভগবানের সকল অবতারই পূর্ণাবতার নহেন। কেহ কলা অবতার, কেহ অংশ অবতার ইত্যাদি। ভাগবতের মতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পূর্ণ অবতার আর কেহ হন নাই। ভগবান স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে জীবের ভিতর যেরূপ ঐশী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন, তিনি সেই হিসাবে অবতার। মনুষ্যমধ্যে যাঁহারা অবতার বলিয়া সম্মানিত, তাঁহারা কতকটা ঐশী শক্তিসম্পন্ন মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। যিনি যেরূপ কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রেরিত, তিনি সেইরূপ কার্য্যই করিয়া যান। তাঁহাদের পরস্পরের কার্য্যের মধ্যে যে সামঞ্জস্য অথবা একতা থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। ভিন্ন কার্য্য সাধনার উপায় এবং পদ্ধতিও ভিন্ন হইয়া থাকে।

ইহার পর প্রতিবাদকর্ত্তা লিখিয়াছেন—হিন্দুরা তাঁহাকে (বুদ্ধদেবকে) অবতার বলিয়াই স্বীকার করুক না কেন, প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি অবতার নহেনই। ইহার কারণ হিসাবে এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, হিন্দুরা যদি বুদ্ধকে অবতার বলিয়াই গ্রহণ করিল, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে গ্রহণ করিল না কেন? কারণ ত আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমি স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছি যে, বুদ্ধদেব কর্ম্মকাণ্ডকে বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানকাণ্ডের দিকে ঝোঁক দিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কারণ, কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিলে জ্ঞানমার্গে যাইবার অধিকার জন্মে না।

আমার প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল—"বুদ্ধ স্বীয় প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম দ্বারা দৈত্য-দানব ও অসুরদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহাকে শুদ্ধ এবং পবিত্র বলা হইয়াছে। কারণ, তিনি হিন্দুধর্ম্ম হইতে আপনাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।" (মাসিক বসুমতী ৬০০ পৃষ্ঠা ১ম কলম ৫ হইতে ১১ লাইন)। এই কয় ছত্র তিনি ধম্মপদের কয়েক পংক্তি তুলিয়াছেন। ঐ কয় পংক্তিতে তিনি যে আমার বিরুদ্ধে কি "খাঁটি প্রমাণ" উপস্থিত করিলেন, তাহা ত বুঝিলাম না। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ভাগবতে এবং হিন্দুদিগের বহু পুরাণে বলা হইয়াছে। এরূপ বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এই বিষয়টি উভয় সম্প্রদায়ই ভিন্ন দিক দিয়া দেখিয়া থাকেন। কাযেই উভয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এক হইতে পারে না। আমি হিন্দুর দিক দিয়া এই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছি,—হিন্দুদিগের গ্রন্থে যাহা আছে, তাহাই বলিয়াছি। অবশ্য আমি এ কথা স্বীকার করি যে, বুদ্ধদেব যেরূপ সাত্ত্বিক বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে মনে হয় না যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া লোকের মোহ উৎপাদন ও উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহাতে ঐশীশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে যে পথে চালাইয়াছিলেন, তিনি সেই পথেই চলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ভগবানের যে কার্য্যসাধনের জন্য আসিয়াছিলেন, সেই কার্য্য করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা মানব-সমাজের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল। তিনি তদানীন্তন জ্ঞানকাণ্ড-ভ্রষ্ট হিন্দুদিগকে আবার জ্ঞানকাণ্ডের দিকে ফিরাইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মকাণ্ডকে বাদ দিয়া ভুল করিয়াছিলেন,—এ কথা আমি বলিয়াছি। কারণ, ঐ জন্যই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কালবশে অধোগত হইয়াছিল। কিন্তু সে ভ্রমের জন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দেই না। আমরা হিন্দু হিসাবে মনে করি—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা,—" এ ভ্রম তিনিই করাইয়াছেন। প্রতিবাদকর্ত্তা যে কয়েকটি পালিশ্লোক তুলিয়াছেন, তাহাতে তিনি শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ, এবং তাহার তৃষ্ণা ক্ষয় পাইয়াছিল ইহা প্রমাণিত হয়,—কিন্তু তিনি অভ্রান্ত, ইহা সপ্রমাণ হয় না। সুতরাং ভিক্ষুর এই খাঁটি প্রমাণের কোন মূল্য নাই।

প্রতিবাদকর্ত্তা ভিক্ষু মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদ-নিবন্ধে অনেক বাজে আলোচনাই করিয়াছেন, কিন্তু আসল কথা একেবারেই বলেন নাই। সেই জন্যই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে আমি তাঁহার সকল কথার বিশদভাবে আলোচনা করিতে পারিলাম না। সঙ্ক্ষেপে তাঁহার প্রধান প্রধান আপত্তির ও কথার উত্তর আমি লিখিলাম। আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, বুদ্ধদেব যদি প্রথম ভ্রমণকালে দুই জন বিশিষ্ট বৈদিক জ্ঞান-সম্পন্ন অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাইতেন, তাহা হইলে প্রাচীন জগতে সমস্ত ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, এ কথা একান্তই আন্দাজী বা অনুমান-মূলক। কথাগুলি এ উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন। যাহা হউক, কথাগুলি একেবারে অহেতুক অনুমান নহে। কারণ, বেদের জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড লইয়া তাঁহার সহিত কোন বিশিষ্ট বেদজ্ঞ অধ্যাপকের বিচার হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, অনেক বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বৌদ্ধগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধের প্রথম পঞ্চশিষ্যের মধ্যে কেহ যে বিশিষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন বেদজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন, সে বিষয়ে প্রমাণাভাব।

দ্বিতীয় কয়জনও যে বিশিষ্ট বেদজ্ঞ ছিলেন, তাহারও প্রমাণ নাই। উরুবিল্ব কশ্যপ, গয়াকশ্যপ প্রভৃতি স্থানীয় লোক। তাঁহারা হয় ত অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু কোন্ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, প্রতিবাদকর্ত্তা তাহা কিছুই বলেন নাই। বেদ লইয়া তাঁহাদের সহিত বুদ্ধের আলোচনা হইয়াছিল, এমন প্রমাণও তিনি দেখাইতে পারেন নাই। এরূপ অবস্থায় ঐ সকল বাজে কথা বলিয়া কি লাভ, তাহা আমি বুঝি না। উহাতে কেবল অনর্থক বিতণ্ডা বৃদ্ধি করিবারই প্রবৃত্তি সূচিত হইতেছে।

আমি লিখিয়াছি যে, "বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই।" প্রতিবাদকর্ত্তা তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থগুলি পিটক নামে অভিহিত। ইহাতে তিনি কোন আপত্তি করেন নাই। ইহার পর আমি লিখি যে, বুদ্ধের শিষ্যরা সাক্ষাৎভাবে সকল কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। এই কথার উত্তরে ভিক্ষু মহাশয় বলিয়াছেন যে, "তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ তাঁহার সকল উপদেশ শুনিয়াছিলেন।" জিজ্ঞাসা করি, যখন বুদ্ধদেব উরুবিল্ব হইতে সারনাথে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তখন আনন্দ কোথায় ছিলেন? বুদ্ধ ত একাই গয়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। উপদেশ দিয়াছিলেন কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চশিষ্যকে। যদি তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, তবে আনন্দকেই ত্রিপিটক লিখিবার ভার দেওয়া হইল না কেন? ভিক্ষু মহাশয়ই স্বীকার করিয়াছেন যে, ত্রিপিটক লিখিবার জন্য ৫ শত ভিক্ষু নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ত্রিপিটক লিখিবার সময়ে বুদ্ধদেবের উপদেশ সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিয়াছিল, এবং উক্ত সংগায়নে "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" হইয়াছিল। উহাই বৌদ্ধধর্ম্ম-বিকৃতি ঘটিবার একটি প্রবল কারণ।

ধর্ম্মপ্রিয় মহাশয় লিখিয়াছেন, "শঙ্করাচার্য্যের সময়ে কেবল বৌদ্ধরা অনাত্মবাদী ছিলেন, এ কথা সত্য নহে।" আমি কি বলিয়াছি, তাহা তিনি না দেখিয়া বা না বুঝিয়া একটা প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত। আমি শ্রাবণ মাসের প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, "বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার ধর্ম্মের বিকৃতি হইতে থাকে। কতকগুলি সম্প্রদায় একেবারে নিরীশ্বর হইয়া উঠেন।" সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের সময়েই যে কয়েকটি সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন, এ কথা আমি বলি নাই। (শ্রাবণ সংখ্যা বসুমতী ৬১১ পৃষ্ঠা প্রথম কলম দ্রষ্টব্য)। আমি ঐ সম্বন্ধে "বৌদ্ধধর্ম্ম ও শঙ্করাচার্য্য" শীর্ষক প্রসঙ্গে আরও একটু আলোচনা করিয়াছি। প্রতিবাদকর্ত্তা তাহা দেখিয়া লইবেন। অনর্থক বিতণ্ডা বাড়াইয়া লাভ নাই।

প্রতিবাদকর্ত্তা বুদ্ধদেবকে যেন অতিমানুষ হিসাবে সব কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বিচারকালে তাঁহাকে মানুষ হিসাবে ধরিয়াই কথা বলিতে হয়। সেই জন্য বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ হিসাবে ধরিয়া কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব যখন নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তখন নর হিসাবেই তাঁহার কার্য্যাবলি আলোচ্য। সেই জন্য আমি যাঁহারা হিন্দুও নহেন, বৌদ্ধও নহেন, খৃষ্টান অথচ যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, কেবল তাঁহাদের মত উদ্ধার বা উল্লেখ করিয়া দিয়াছি। ধর্ম্মপ্রিয় মহাশয় হিন্দুর দেবতা ও অবতার সম্বন্ধে উপেক্ষাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যেরূপ মেত্ত ভাবনার (মিত্র ভাবনার) পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে অবিলম্বে তাঁহার বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির বা পরিনির্ব্বাণলাভের সম্ভাবনা দেখিয়া আমি সুখী হইলাম।

তিনি লিখিয়াছেন—"শাক্যসিংহ সাংখ্যদর্শনের ধারা ধরিয়া ধর্ম্মোপদেশগুলির বিকাশসাধন করিয়াছিলেন—এ অনুমান নিতান্তই ভিত্তিহীন।" কেন ভিত্তিহীন, তাহার কারণ দর্শাইয়া তিনি লিখিয়াছেন, "বুদ্ধ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন—"হে ভিক্ষুগণ, মনোনিবেশ কর, মৎকর্ত্তৃক অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি ধর্ম্মদেশনা (ব্যাখ্যা) করিব।" তাঁহার এই উক্তি হইতে কি করিয়া বুদ্ধদেব সাংখ্যদর্শনের ধারা ধরিয়া তাঁহার ধর্ম্মদেশনা করেন নাই, তাহা খাঁটি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল? জগতে যিনিই যখন যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তিনিই তখন বলিয়াছেন, আমার এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, ইহা নিস্তার পাইবার একমাত্র হেতু। বুদ্ধদেবও তাহাই বলিয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাহা হইতে এই অপূর্ব্ব প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয় এক লম্ফে কি করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য কপিলের নিকট ঋণী নহেন? এ বিষয়ে আমি যে সকল কথা বলিয়াছি,—তাহার একটি কথারও তিনি উল্লেখ করেন নাই। সে বিষয়ে তিনি শান্তশিষ্ট বালকের ন্যায় চুপচাপ আছেন। তাঁহার দেখা উচিত, কপিলের মত হইতে বুদ্ধদেবের মতের নূতনত্ব কোথায়? প্রতিবাদ করিবার আশা আছে, কিন্তু যুক্তির বেলা অষ্টরম্ভা।

এই মেত্তভাবনাময় ও সত্যনিষ্ঠ ভিক্ষু মহাশয় করুণা করিয়া এই অধমের কথার কিরূপ বিকৃতি সাধন করিয়াছেন, তাহা সকলে বিশেষ করিয়া দেখুন। আমি আমার প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম যে 'নির্ব্বাণ কি?' তিনি ঐটুকু তুলিয়াই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি এই সমস্যার সন্তোষজনক প্রমাণ দেখাইতে পারি নাই। তিনি কৌশলে এমন ভঙ্গী দেখাইয়াছেন, যেন আমি একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছি। কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা তিনি বলেন নাই বা সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্যও করেন নাই। আমি এ প্রশ্নের সহিত আরও একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম—"উহা কি আত্মার লয় (Annihilation)? সাধারণ লোক নির্ব্বাণ অর্থে আত্মার লয়ই বুঝেন।" আমি বলিয়াছি, উহাতে আত্মার লয় বুঝায় না। এ বিষয়ে আমি বুদ্ধদেবের কথাই বলিয়াছি। তাহা যে ভুল হইয়াছে, এমন কথাও প্রতিবাদকর্ত্তা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্ব্বাণ। আমিও কি সেই কথা বলি নাই? তৃষ্ণা বা তন্হা শব্দ প্রয়োগ না করিলে কি নম্বর পাইব না? আমি বলিয়াছি যে, নির্ব্বাণ লয় নহে, তিনিও তাহাই বলিয়াছেন। তবে এরূপ ভাঁওতা করিবার কারণ কি? *

* বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন,—

সর্ব্বালম্বনধর্ম্মৈশ্চ সর্ব্বতস্থৈরশেষতঃ।
সর্ব্বক্লেশাসবৈঃ শূন্যং ন শূন্যং শূন্যমিষ্যতে॥

তাঁহাকেও তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রিয় ভিক্ষু নম্বর দিবেন না।

আমি বলিয়াছি যে, "বুদ্ধদেব কোন কোন স্থানে অনন্ত ও বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তার সহিত মিলনের কথাও বলিয়াছেন।" ইহার প্রতিবাদে ভিক্ষু মহাশয় লিখিয়াছেন—লেখক ত্রিপিটকের কোন্ গ্রন্থে উহা দেখিয়াছেন, তাহা বলেন নাই। কোন্ গ্রন্থে উহা আছে, তাহা দুইটি ব্রাহ্মণ-বটুর সহিত বুদ্ধদেবের আলাপ ও আলোচনার কথা তুলিয়া আমি বলিয়াছি। তিনি যদি তাহা না দেখেন, তাহা হইলে আমি কি করিব? সেখানে ব্রহ্মের সহিত লীন হইবার কথাই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন। আমি হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, "এ কথা সত্য যে, বুদ্ধদেব উপনিষদুক্ত পরমাত্মা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথাই বলেন নাই।" এইটুকু তিনি তুলিয়াছেন; তুলিয়া তিনি ঐ সম্বন্ধে টিপ্পনি করিয়াছেন,—বিশেষ কেন, তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বলেন নাই।" ঐ কথা বলিয়াই তাহার অব্যবহিত পরেই আমি লিখিয়াছি,—"কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, পুগ্গলপন্নত্তিতে যে শাশ্বতবাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ পরমাত্মার উক্তিমাত্র। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের টীকাকার নাগার্জ্জুনও তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন যে, "তথাগত কখনও কখনও আত্মার (পরমাত্মার) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪১ সাল ৬০৭ পৃষ্ঠা প্রথম কলম)। কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলিলেন না, বা "হাঁ" "না" কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলেন না। ইহার কারণ কি? হঠাৎ তিনি ভয়চকিত বালকের ন্যায় মৌনী হইলেন কেন?

তিনি আবার বলিয়াছেন যে, "তিনি কপিল-নির্দ্দিষ্ট মতেরও সমর্থন করেন নাই।" সমর্থন না করুন, অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, একই কথা বার বার বলিলে তাহা খাঁটি প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা হয় না। আমি যাহা বলিয়াছি, প্রমাণ দ্বারা তাহার খণ্ডন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তাহা যদি তিনি করিতেন, তাহা হইলে আমি অধিকতর প্রমাণ দিতাম।

আমি লিখিয়াছি—"বুদ্ধ কোথাও জাতিভেদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই।" এইটুকু তুলিয়া ভিক্ষু মহাশয় বলিয়াছেন যে, "এ কথাও যেন কেহ মনে না করেন যে, তিনি জাতিভেদের সমর্থন করিয়াছেন।" এই বিষয়ে তিনি শ্রাবস্তীতে ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—

ন জচ্চা বসালো হোতি—ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো।
কম্মণা বসালো হোতি—কম্মণা হোতি ব্রাহ্মণো॥

অর্থাৎ জাতি দ্বারা কেহ বৃষল হয় না, আবার জাতিহেতু কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম্মের দ্বারাই বৃষল হয়,—আবার কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। ইহা ত মহাভারতের যুধিষ্ঠির-নহুষ-সংবাদে লিখিত যুধিষ্ঠিরবাক্যের অবিকল প্রতিধ্বনি। হিন্দুরা এ কথা অস্বীকার করেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক রাজা যুধিষ্ঠির যখন বলিয়াছিলেন,—

ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ

তখন ঠিক সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধদেবকে জাতিভেদের বিরুদ্ধবাদী বলা যায় না। কারণ, হিন্দুর শাস্ত্রই বলিয়া থাকেন যে, "তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ এতদ্‌ব্রাহ্মণ্যকরণম্" তপস্যা (সাধনা), শাস্ত্রজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্ম এই তিনটিই ব্রাহ্মণ্যের কারণ। অর্থাৎ এই তিনটি থাকিলেই লোক প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা পূর্ণ ব্রাহ্মণ হয়। কেবল জাতিগত ব্রাহ্মণ হইলেই কোন লোক প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁহারা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশজাত,—কিন্তু তপঃ এবং বিদ্যাবর্জ্জিত, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রমতে "জাতিব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত এবং নিন্দিত। ইহাতে জাতিকে অস্বীকার করা হয় নাই। বুদ্ধও "জচ্চা" অর্থাৎ জাতিদ্বারা শব্দ প্রয়োগ করাতে জাতিকে অস্বীকার করেন নাই। এ সব কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যায় না।

তাহার পর প্রতিবাদকারক লিখিয়াছেন, "ভগবান কর্ম্মকাণ্ডকে বাদ দিয়া মানবকে বিপথে চালিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান জগতের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। ××× আজ ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রু, গৃহে গৃহে বিচ্ছেদ, সমাজে সমাজে দলাদলি, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধসজ্জা, অসির ঝণাৎকার, তরবারির আস্ফালন বন্যার স্রোতের ন্যায় সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।" তিনি বলেন, ভারতবাসী বুদ্ধের উপদেশ ভুলিয়াছে বলিয়া এইরূপ ঘটিয়াছে। বটে? ব্রহ্মদেশ ত বুদ্ধের উপদেশ ভুলে নাই, তবে তথায় নরহত্যা, ডাকাত এত অধিক হয় কেন? চীন এবং জাপান ত বৌদ্ধধর্ম্ম পরিহার করে নাই,—তবে তথায় বৌদ্ধ জাপানের অহিংস অনলবর্ষী কামানের গোলায় বৌদ্ধ চীনের পূর্ব্বদিকচক্রবাল অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়াছিল কেন? তবে বৌদ্ধধর্ম্মপরায়ণ চীন ভূমিতে

লক্ষ লক্ষ নরমুণ্ড গড়াগড়ি ধরাসনে
রুধিরের ছড়াছড়ি দিকে দিকে কত রণে

এই দৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল কেন? ধর্ম্মদেশনার অভাবে মানুষ হিংসা করে না, মানুষ অধর্ম্মবুদ্ধির বশেই কুকর্ম্ম করে।

ভিক্ষু মহাশয় লিখিয়াছেন:—"শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার এক অনাত্মলক্ষণ সূত্র দেশনার (ব্যাখ্যার) ভিতর দিয়া সমগ্র এসিয়াবাসীকে অনাত্মবাদিরূপে গড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" অত্যুক্তি হয় না, মিথ্যোক্তি হয়। কে গড়িয়াছেন, তাহা তিনি বলেন নাই। "আজও পর্য্যন্ত পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাত্মবাদের উপর স্থিত; সুতরাং বুদ্ধদেবের লয়বাদ খণ্ডন করিয়া শঙ্করমতের যে স্থাপনা করা হয়, এ উক্তি ঠিক নহে।" বৌদ্ধধর্ম্ম যদি অনাত্মবাদী হয়, অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহা হইলে বুদ্ধদেব দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট বর পাইয়া সেই হইতে ৫৫০ জন্ম পর্য্যন্ত দানশীলাদি দশ প্রকার পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন কি করিয়া? জন্মে জন্মে আনন্দই বা—বুদ্ধের উপদেশ শুনিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন কি করিয়া? যদি আত্মা না থাকে ত জন্মান্তর এবং কর্ম্মফলের ভোগ হয় কি করিয়া? আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাত্মবাদের উপর স্থিত, অতএব বুদ্ধদেবের লয়বাদ খণ্ডন করিয়া শঙ্করমতের যে স্থাপনা করা হয়, এ উক্তিও ঠিক নহে;—ইহা "খাঁটি প্রমাণ" দ্বারা স্থাপিত হইল কিরূপে? অশোক প্রভৃতি নৃপতিগণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনে তাহা করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার

মত যে অভ্রান্ত বলিয়া তিনি ভারতে স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ ভারত হইতে তদানীন্তন অনাত্মবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসন এবং বৌদ্ধ মঠগুলির মধ্যে যেগুলি প্রধান, তাহা শঙ্কর-শিষ্যদিগের হস্তে পতন।

এই স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি নির্ব্বাণ অর্থে আত্মার "অত্যন্ত বিলোপ" বা annihilation বুঝেন। কিন্তু পরে তিনি বলিয়াছেন যে,"নির্ব্বাণ তৃষ্ণাক্ষয়।" "নির্ব্বাণ অলৌকিক অবস্থা।" তাহা হইলে উহা আত্মার "অত্যন্ত বিলোপ" বা সম্পূর্ণ বিলোপ নহে। নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইতেষা পরমার্থতা॥

যাহার নিরোধ, উৎপত্তি, বন্ধন, মুক্তি ও মুমুক্ষুতা নাই, তাহাই পরমার্থ। সুতরাং শূন্য শব্দ ব্রহ্ম শব্দের নামান্তর মাত্র। পালি ইতিবুত্তক প্রভৃতি গ্রন্থে এই পরমার্থ তত্ত্বের বিষয় উল্লেখ আছে। অভিধর্ম্ম গ্রন্থে লৌকিক এবং লোকান্তরবিষয় সম্বন্ধে পার্থক্য করা হইয়াছে।

বিরুদ্ধত্বাত্তমোবৃত্তের্নাবকাশং দদাতি যা
সাবস্থা কাপ্যবিজ্ঞেয়া মাদৃশাং শূন্যতোচ্যতে
ন পুনর্লোকরূঢ়েব নাস্তিকার্থানুপাতিনী

অর্থাৎ যে স্থানে কোন প্রকার তমোবৃত্তির কার্য্য বর্ত্তমান নাই; যে অবস্থা বর্ত্তমান জ্ঞানে আমরা জানিতে পারি না, সেই অবস্থাকে শূন্য বলা হয়। যেখানে কোন বস্তু নাই, নাস্তিকরা যাহাকে শূন্য বলেন, তাহা শূন্য নহে। অর্থাৎ শূন্য অভাব পদার্থ নহে। অনাত্মবাদীরাই শূন্যকে অভাব পদার্থ বলেন।

ধর্ম্মপ্রিয় ভিক্ষু মহাশয় বুদ্ধদেবের প্রকৃত লয়বাদের এবং পরবর্ত্তী নাস্তিক্যবাদের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়।

ভিক্ষু মহাশয় বলিয়াছেন—"যদি ঈশ্বর ও ভগবান একই হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের কিছুরই অভাব নাই, কোন দুঃখ নাই। তিনি কিসের জন্য—কোন্ স্বার্থের জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন?" তিনি যখন বৌদ্ধ, তখন তাঁহার জানা উচিত যে, পরমার্থ সত্য সংবৃত্তি বা বুদ্ধিতত্ত্বের ভিতর থাকিয়া জানিতে পারা যায় না। উহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগোচর। সুতরাং অল্প কথায় উহার আংশিক আলোচনাও অসম্ভব।

পাঠকবর্গ, আমি হয়ত ধর্ম্মপ্রিয় মহাশয়ের সকল উক্তির উত্তর দিতে পারিলাম না,—তাহার কারণ,আমার সময়াভাব এবং মাসিক বসুমতীতে স্থানাভাব। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই,—এবং আমার কোন সিদ্ধান্তই তিনি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। অল্পস্থানে মাসিক পত্রিকায় অনেক কথা বলিতে হয়। অগত্যা সকল কথা বিস্তৃতভাবে বলা যায় না। সুতরাং বাদপ্রতিবাদ মূল কথা লইয়া আলোচনা করিতে হয়। প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করিবার জন্য বাজে কথা বলিয়া গণ্ডগোল বাধাইতে নাই। তর্ক দ্বারা অনেক সময় সত্য নির্ণীত হইয়া থাকে। তর্ক যদি সুপথে চালিত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা সত্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে। এক জন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন:—

Thought fights with Thought,
out springs a spark of truth
From the collision of the sword and shield.

চিন্তার সহিত চিন্তার অর্থাৎ একরূপ সিদ্ধান্তের সহিত অন্যরূপ সিদ্ধান্তের সংঘর্ষ হয়। মতের সহিত মতের বিরোধ ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন মতের বা সিদ্ধান্তের পরস্পরের অসিচর্ম্মের সজ্ঘর্ষে সত্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং বাদানুবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ন্যায্য পথে থাকিয়া সত্য সন্ধানের জন্য যদি সেই বাদানুবাদ চালিত হয়, তাহা হইলেই তাহাতে উপকার জন্মে। নতুবা কতকগুলি বাজে কথার কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া আসল কথা চাপা দেওয়া বা সিদ্ধান্তকে অস্পষ্ট কথা বাদানুবাদের লক্ষণ নহে। উহার নাম বিতণ্ডা; উহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন তাঁহার মাধ্যমিক সূত্রে বলিয়াছেন:—

দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা
সম্বৃং সংবৃত্তিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ॥

দুইটি সত্যকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধগণ ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া থাকেন। ঐ দুইটি সংবৃত্তি সত্য ও পরমার্থ সত্য। যতদূর বুদ্ধিগম্য, তাহাই সংবৃত্তি সত্য। বুদ্ধিতত্ত্বের অতীত সত্যই পরমার্থ সত্য। ধর্ম্মপ্রিয় মহাশয় কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি সংবৃত্তি সত্যকে আশ্রয় করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? হিন্দুর দেবতা হরির উপরও তিনি একটু চাপা স্বরে শ্লেষ করিয়াছেন। ইহা কি উদারতার পরিচায়ক?

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হুগলী

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ—এই খৃষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের পদ এক হইয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ দে প্রথম বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ—দামোদরের বন্যা—"দামোদর নদ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। রেলওয়ে রক্ষার জন্য ইহার পূর্ব্বপার্শ্বে দৃঢ়রূপে বাঁধ হইয়াছে, পশ্চিম পার্শ্বে একেবারেই বাঁধশূন্য। মধ্যে মধ্যে যদিও কোন কোন স্থানে ছিল, পাছে রেলওয়ের বাঁধের কোন ব্যাঘাত হয়, এজন্য গবর্ণমেণ্টের লোকেরা তাহা একেবারেই নির্ম্মূল করিয়াছে। শীলাবতীও বড় শান্ত নদী নহে, ইহারও পশ্চিমপার্শ্বে বিলক্ষণরূপে বাঁধ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বপার্শ্বে কিছুই নাই। সুতরাং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের যে কিরূপ ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে মহোদয় ব্যক্তিদিগের লেখনী কোনরূপে সমর্থ হয় না।" ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যা ১২৬৯।১০ই অগ্রহায়ণ ইং ১৮৬২।২৪ নভেম্বর "সোমপ্রকাশ।"

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ—হুগলী কৃষি-প্রদর্শন—"নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা নিম্নলিখিত প্রদেশের কৃষি-প্রদর্শন নির্ব্বাহার্থ লোকাল কমিটির মেম্বর হইয়াছেন। (হুগলী ব্যতীত অন্যস্থানের উল্লেখ করিলাম না)।

হুগলী—এ, ডি, পামার সাহেব, আর থোএট সাহেব, সি, এস, টরণবুল সাহেব, ডবলিউ আর পগসন সাহেব, বাবু জীবনকৃষ্ণ পাল, বাবু এককড়ি সিংহ।" ৫ম ভাগ ২৭ সংখ্যা, সন ১২৭০।৫ই জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৮৬৩।১৮ই মে "সোমপ্রকাশ।"

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর" সৃষ্টি হয়। কমিশনরগণ সকলেই 'মনোনীত' হইতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, একজন এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং ৭ জনের অনধিক গ্রামবাসী কমিশনর হইতেন। ১৮৭০ সালে ১ জন মাত্র ওভারসিয়ার, ৩ জন আমিন, ৩৫টি ধাঙড় কুলী, ৩টি মেথর, ৫ জন মুর্দ্দফরাস, ১০ জন গাড়ীবান মাত্র ছিল। "হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালেটীর কমিশনরগণ মিঃ রাজেন্দ্রনাথ সাধু অবসর প্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ ও মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরিকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত করিয়াছেন, ১৮৭৮ খৃঃ অঃ মিউনিসিপ্যালেটি স্থাপিত (এই সময় হইতে নির্ব্বাচন-প্রথা হয়) হওয়ার পর এই প্রথম একজন চুঁচুড়ার অধিবাসী চেয়ারম্যান মনোনীত হইলেন।" সমাচার ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৬ই জুলাই ১৯৩২ সাল হইতে উদ্ধৃত।

১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দের ঐ মিউনিসিপ্যালেটীর পানীয় জলের বিবরণ :—

ওয়ার্ড	১	২	৩	৪	৫	৬	মোট
স্বাস্থ্যকর পুষ্করিণী	১৮	৬২	২	৬৫	৭	১	১৫৫
অস্বাস্থ্যকর ঐ	—	—	১৬১	—	৯৯	২৮০	৫৪০
মোট সংখ্যা	১৮	৬২	১৬৩	৬৫	১০৬	২৮১	৬৯৫
স্বাস্থ্যকর কূপ	৪০	২	—	১৬৭	১৯৩	—	৪০২
অস্বাস্থ্যকর ঐ	—	—	১৪১	৩১	১৯	১৫০	৩৪১
মোট সংখ্যা	৪০	২	১৪১	১৯৮	২১২	১৫০	৭৪৩
সর্ব্বশুদ্ধ	৫৮	৬৪	৩০৪	২৬৩	৩১৮	৪৩১	১৪৩৮

Dr. Crawford's Medical Gazetteer.

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ—এই বৎসর হুগলী জেলার ড্রেনেজ কমিশনর নিযুক্ত হয়। "ডানকুনীর খাল—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হুগলী জেলার ড্রেনেজ কমিশনর নিযুক্ত হইলেন অর্থাৎ ইঁহারা ডানকুনীর খালের জমির মূল্যনিরূপণাদি কর্ম্ম করিবেন।

"মিঃ পি এস, ল্যাংডন এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হুগলী, শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন সিংহ, শিবপুর, শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে শ্রীরামপুর, শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামপুর, শ্রীযুক্ত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।" "সাধারণী" ১২৮১।২৪শে ফাল্গুন হইতে গৃহীত।

হাওড়া হইতে মন্থলি টিকিট—"ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আগামী ফেব্রুয়ারি মাস হইতে যাঁহারা প্রত্যহ গাড়ীতে যাতায়াত করিবেন তাঁহাদিগকে কম দামে টিকিট দিবেন। হাওড়া ষ্টেশন হইতে সুরু হইবে, কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেল। ঐ সাধারণী ১২৮১।১৯শে মাঘ।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে—প্রথম বাঙ্গালী গার্ড—"ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ১৩ জন বাঙ্গালি গার্ড নিযুক্ত হইয়াছেন।" ১২৮১।২৪শে ফাল্গুন "সাধারণী" হইতে উদ্ধৃত।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ—"ব্যারনেট হার্সেল বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ উইলিয়ম হার্সেলের পৌত্র ডবলিউ, জে, বেরনেট হারসেল সাহেব হুগলীর কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য আমাদের জেলার একটিং জজ ও কমিশনার ছিলেন।" সাধারণী ১২৮২।২২শে কার্ত্তিক।

এই হার্সেল সাহেবই প্রথম রেজেষ্টারির বৃদ্ধাঙ্গুষ্টের ছাপ দিবার উদ্ভাবক। তিনি গবর্ণমেণ্টে উহার প্রচলন জন্য লেখেন কিন্তু উহার অনুমোদন হয় নাই। ইঁহার ভারত ত্যাগের পরে ঐ প্রথা চলিতেছে। Dr. Crawfords Medical Gazeteer P. 576. ঐ সালে হুগলীতে প্রথম তৈলের কল হয়। "হুগলী বাবুগঞ্জে একটি নূতন রেড়ির তেলের কল স্থাপিত হইয়াছে। দেশে যতই কল বাড়ে, ততই আমাদের ভাল।" ১২৮২।১১ই আশ্বিন "সাধারণী।"

ঐ বৎসরে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। হুগলী হইতে হলুদপুরের রাস্তা—"এতদিন পরে হুগলি হইতে হলুদপুরের পুল পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তার সূচনা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই রাস্তার দুইপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করিবার জন্য গর্ত্ত করা হইয়াছে।" "সাধারণী" ১২৮২।২৪শে শ্রাবণ।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ—এই বৎসর হুগলী ইনস্টিটিউট স্থাপন হয়। "প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল আমাদিগের এখানকার অন্যতম শ্রদ্ধাস্পদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধর রায় মহোদয়ের বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগে এখানে 'হুগলী ইনস্টিটিউট" নামে একটি সাহিত্য-সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। গত চৈত্রমাসে এই সভায় যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে হুগলীর জজ আদালতের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ মহাশয় ইংরাজীতে মহম্মদ মাসীনের একটি সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী জীবন-চরিত পাঠ করেন। ২৩ ভাগ ২য় সংখ্যা, ১২৮৭।১৫ই বৈশাখ ইং ১৮৮০।২৬ এপ্রেল "সোমপ্রকাশ।"

এই ইনস্টিটিউটে ১৮৮০ খৃঃ কোন্নগর নিবাসী উকিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, "History of Hindu Music" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। উহা পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের প্রচ্ছদপটে লেখা আছে :—

History of Hindu Music
A lecture delivered at the Hooghly Institute.
By
Panchkari Banerjee B. A. B. T.
Bhabanipur
Printed by B. M. Bose at the
Saptahik sambad Press
1880.

ঐ পুস্তক এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একখণ্ড আছে মাত্র।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ—প্রথম হুগলী নাট্যশালা এই বৎসর হয়। "আমাদের পাড়ার জন কয়েক যুবকের যত্নে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। এ বিষয়ে নন্দলাল বাবুর যত্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহা স্থায়ী হইবে।" ২৩ ভাগ ৫ম সংখ্যা ১২৮৭।৫ই জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮৮০।১৭ই মে "সোমপ্রকাশ।"

রিডিং ক্লাব এই সালেই স্থাপিত হয়। "আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এখানকার কয়েকজন ভদ্রলোকের উদ্যোগে হুগলীতে একটা 'রিডিং ক্লব' স্থাপিত হয়।"—ঐ সোমপ্রকাশ।

এই বৎসরেই ছোটলাট ইডেন সাহেব হুগলীতে আইসেন।

ছোটলাটের আগমন—সংবাদদাতার পত্র—হুগলী ১৮৮০ সাল, ৩০এ আগষ্ট।

"গতকল্য আমাদিগের মহামান্য লেফটনেন্ট গবর্ণর সার আস্‌লি ইডেন মহোদয় বেহার হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন কালে হুগলী পরিদর্শনার্থ এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি এখানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে কোন সংবাদ ছিল না। উক্ত দিবসে তিনি এখানকার স্বর্গীয় খ্যাতনামা হাজী মহম্মদ মসীনের সুপ্রসিদ্ধ এমামবাড়ী ও হুগলী সহরের কিয়দংশ পরিদর্শন করেন। অদ্য প্রাতে তাঁহাকে বোটশ নামে জাহাজ হইতে সসম্ভ্রমে নামান হয়।" ২৩ ভাগ ২১ সংখ্যা, ১২৮৭।২২এ ভাদ্র ইং ১৮৮০।৬ই সেপ্টেম্বর "সোমপ্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে:—Act V of 1880তে টিকা দিবার আইন হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীতে উহার প্রবর্ত্তন হয়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ:—এই সালে ইঞ্জিনিয়ার লেস্‌লি সাহেব কর্ত্তৃক হুগলী জুবিলী ব্রীজ নির্ম্মিত হয়। শুধু পুলটীর দৈর্ঘ্য ১২০০ ফুট। নদীতীর হইতে দুইদিকের দুইটি খিলানের অন্তরের দৈর্ঘ্য ৪২০ ফুট এবং মধ্যের খিলানের অন্তরের দৈর্ঘ্য ৩৬০ ফুট। নদীর তলদেশ হইতে ৭৩ ফুট নিম্নে ঐ খিলানের থামের ভিত্তি আরম্ভ হইয়াছে এবং নদীর সর্ব্বোচ্চ জলতল হইতে পুলের নীচে পর্য্যন্ত ৩৬½ ফুট ব্যবধান আছে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ:—এই খৃষ্টাব্দে হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে "প্রভিডেন্ট ফণ্ড" আরম্ভ হয়।

"হাবড়া হুগলীর চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটী গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের জন্য পেনসনের পরিবর্ত্তে প্রভিডেন্ট ফণ্ড করিয়াছেন।" ৬২ ভাগ ৮৭ সংখ্যা, ১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৯ সাল "সংবাদ প্রভাকর" হইতে উদ্ধৃত।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী জেলার চট কল।

কলের নাম	স্থান	১৯০৮ খৃঃ পর্য্যন্ত কত তাঁত		১৯০৮খৃঃ গড় দৈনিক মাল	১৯০৭-৮ খৃঃ কত মাল	কোন্ সালে স্থাপিত
		তাঁত	মাকু			
ওয়েলিংটন জুট মিল	রিষড়া	২৭৭	৫৫৪৪	২৯১১	১০৪২৫ টন	১৮৫৫
ইণ্ডিয়া "	শ্রীরামপুর	৭০০	৯৯৩৬	৩২৬৭	৪৫৫৬৬৫ মণ	১৮৬৬
চাঁপদানি "	চাঁপদানি	৪৮২	৮৭৬৪	৩২০০	৩২৮৫৮৩ "	১৮৭৩
হেষ্টিংস "	রিষড়া	৭৫০	১৫৫৮০	৫৮২২	৬০৯২৪৯ "	১৮৭৫
ভিক্টোরিয়া "	তেলিনীপাড়া	১০৩৭	২২৭৬০	৯৩৮৭	৬৭৬০৬৫ "	১৮৮৫
ডালহৌসি "	ভদ্রেশ্বর	৪৩২	৯০৩০	২৮০০	১২৪৪০ টন	১৯০৫

দ্রষ্টব্য:—ওয়েলিংটন জুট মিল বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপুরাতন চটকল।

"Boycott and Bengal Jute trade" page 4.

হুগলীর ফৌজদারগণের তালিকা:—প্রথম পরিচয় পাই আকবর-নামায় যে, আকবর বাদশাহের সময় ১৫৭৯ খৃঃ মীরজা নজরৎ খাঁ হুগলীর ফৌজদার সপ্তগ্রামে থাকিতেন। ইহাতে মহম্মদ উল্লারও নাম পাই। ইনিই হুগলীর (মোগল কেল্লা) কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর মালিক বেগ ১৬৪৭-৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিন্তু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সরিফের নাম পাওয়া যায়। তিনি সংগ্রামদুর্গ সুরক্ষিত করিবার জন্য প্রেরিত হন। মালিকবেগের পুত্র মালিক কাসিম ১৬৬৮-৭২ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় বার ১৬৭৪-৮১ খৃঃ পর্য্যন্ত। ইহার পর বুবিন্দ মহম্মদ ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে—উইলিয়ম হেজের সময়। তাহার পর মালিক বর্ক্‌রদার ১৬৮৭ খৃঃ, আবদুলগণি ১৬৮৬ খৃঃ; মীর ইব্রাহিম জুন ১৭০৪ খৃঃ; জিয়াউদ্দীন খাঁ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আসিয়া ১৭১০ খৃঃ মে মাসে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। মুরশিদকুলী খাঁর সহিত মনোবিবাদ হওয়ায়, মুরশিদ, মির্জা ওয়ালিবেগকে ফৌজদার করেন এবং ১৭১৩ খৃঃ জিয়াউদ্দীন খাঁ অবসর লয়েন। ওয়ালিবেগের পর মীর নাজীর ১৭২৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ফৌজদার ছিলেন। তাহার পর আসানউল্লা খাঁ ফৌজদার হন। ইনিই 'অস্টেন কোম্পানীকে' বাঁকিবাজারে আক্রমণ করেন। তৎপরে আসান আলিখাঁ ফৌজদার হন। এই সময় দেখিতে পাই, মতিরাম নামে একজন ফৌজদার হন। "Moteram a Hindoo and man of family who had been lately appointed Fouzder of Hooghly through the interest of Mr. John Johnstone one of the council together with Busuntroy his Dewan were suddenly imprisoned."

Consideration on Indian Affairs Part II P. 59 By Wm. Bolts.

আলিবর্দ্দীর খাঁর সময়ে মহারাজ নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হন।* তাঁহার ফাঁসির পর মহম্মদ উমরবেগ খাঁ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; তাহার পর মহম্মদ রাজা (বা রেজা) খাঁ এবং শেষ ফৌজদার নবাব খানজা খাঁ ফৌজদার হন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারের পদ উঠাইয়া দেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতিরত্ন)।

* চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত "মহারাজ নন্দকুমার" হইতে উদ্ধৃত।

১০

পিশাচের কৌশল

মুলিঙ্গারের মোটর-কার বেঁজলেটের অস্ফুট ভস্ ভস্ ধ্বনি সহসা সুগম্ভীর গর্জ্জনে পরিণত হইল। তাহার পর তাহা তীরবেগে ধাবিত হইল। রয়েডের ক্ষুদ্র শকট ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ধূলিপুঞ্জ ভেদ করিয়া তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু পুলিসের ক্ষুদ্র শকটের শক্তি অল্প, মুলিঙ্গারের শকটের সহিত সমান-বেগে চলিতে ন পারিয়া উহা পিছাইয়া পড়িল। রয়েডের আশা পূর্ণ হইল না।

রয়েড তাঁহার শকট নিউল্যাণ্ডের পরিচালন-চক্রে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "বেঁজলেটের পশ্চাতের আসনে মুলিঙ্গারকে দেখিতে পাইলাম। সে ল্যাংটন ও এনিড ফরেষ্টকে ঐ গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া পলাইতেছে। আমি উহাদের বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছি। মুলিঙ্গার উহাদিগকে কোন গোপনীয় আড্ডায় লইয়া গিয়া উহাদের যেরূপ নির্য্যাতন করিবে, সেরূপ কঠোর নির্য্যাতন-প্রণালী কেবল চীনাম্যানদেরই সুবিদিত। তাহার ভীষণতা কল্পনা করিতেও বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠে; সেরূপ নিষ্ঠুরতার তুলনা কোন সভ্যদেশে মিলিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল উত্তেজিতভাবে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "কিন্তু উপায় কি? এরূপ বেগে গাড়ী চালাইয়া দীর্ঘকাল উহাদের অনুসরণ করিবার আশা নাই। উহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে।"

রয়েড মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আশা নাই? বটে! কিন্তু হতাশ হইবার কারণ কি, বলুন ত। এসেক্সের অধিকাংশ স্থানই সমতল। আমি বাজী রাখিয়া বলিতে পারি, মুলিঙ্গার প্রকাশ্য পথে গাড়ী না চালাইয়া, বিভিন্ন গলির ভিতর দিয়া তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবে। তাহার গাড়ীর দিকে নজর রাখিয়া তাহার অনুসরণ করা কি সত্যই আমাদের অসাধ্য হইবে?"

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। মুলিঙ্গারের বেঁজলেট পথের ধূলা উড়াইয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইয়াছিল। পথের যে সকল স্থানে ধূলা অল্প, সেই সকল স্থানের ধূলায় তাঁহাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ না হওয়ায়, মধ্যে মধ্যে অগ্রগামী বেঁজলেটের পশ্চাদ্ভাগ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "আমরা পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইয়াও উভয় গাড়ীর ব্যবধানের দূরত্ব হ্রাস করিতে পারিলাম না! তবে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পিছাইয়া পড়ি নাই, এ কথাও সত্য। এ অবস্থায় এ ভাবে চলিয়া কিরূপে উহাদিগকে ধরিতে পারিব?"

রয়েড ইন্‌স্পেক্টরের এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সমান-বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার গাড়ী পূর্ণবেগে চলিতে চলিতে হঠাৎ কোন বাধা না পায়, সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। একে ত অগ্রগামী শকটের চক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলার অন্ধকারে সম্মুখের পথ দেখিয়া গাড়ী চালাইবার অসুবিধা হইতেছিল, তাহার উপর পথের দুই দিকে বেড়া, তাহার গুল্মরাশির শাখা-পল্লব পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী চলিতে চলিতে সেই সকল গুল্মশাখায় বাধা পাওয়ায়, গাড়ী চালাইতে আরও অধিক অসুবিধা হইতে লাগিল; কিন্তু রয়েড তাহাতে নিরুৎসাহ হইলেন না।

হঠাৎ নিউল্যাণ্ডের সম্মুখের একখানি চাকার নীচে খর-র করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহা এঞ্জিনের 'ঘস্‌ঘস্' শব্দ ছাড়াইয়া উঠিল। রয়েড বুঝিতে পারিলেন, একখণ্ড ঝামা-ইটের সহিত সেই চাকার সংঘর্ষণে ঐরূপ শব্দ হইয়াছে।

গাড়ী সাধারণবেগে চলিলে ঐ বাধা সহজেই তিনি অতিক্রম করিতে পারিতেন, এবং তাহাতে বিপদেরও আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু ঐরূপ প্রচণ্ড বেগে চলিতে চলিতে বৃহৎ ঝামার সহিত চাকার সংঘর্ষণ হওয়ায় টায়ার ফাঁসিতে পারে ভাবিয়া রয়েড গাড়ী থামাইয়া চাকা পরীক্ষা করিলেন, এবং তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই বুঝিয়া পুনর্ব্বার গন্তব্য পথে ধাবিত হইলেন।

রয়েড চলিতে চলিতে ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "এই অঞ্চলের সকল অংশই আপনার সুপরিচিত। সম্মুখে কোন গ্রাম কি নগর আছে? অর্থাৎ এ রকম কোন স্থান আছে কি যেখানে প্রবেশ করিয়া কোন রকম বাধা পাইবার আশঙ্কায় মুলিঙ্গার শকটের বেগ সংযত করিতে বাধ্য হইবে?"

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "কিছু দূরে দুইখানি গ্রাম

আছে। একখানির নাম ক্রাম্‌লে, অন্যখানি সেহার্ষ্ট। কিন্তু সে বাধা পাইবার আশঙ্কায় এই দুইখানি গ্রামে প্রবেশ না করিয়াও তাহাদের প্রান্তসীমা দিয়াই গাড়ী চালাইতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল নীরব হইয়া দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর উৎসাহভরে বলিলেন, "হাঁ, আর একটা কথা মনে পড়িয়াছে। এই পথে চলিতে হইলে কয়েক মাইল দূরে রেলের একটা লাইন পার হইতেই হইবে। সেই লাইন পার না হইয়া, এই পথে লাইনের অন্য ধারে যাইবার উপায় নাই। এই পথের মাথায়, লাইনের ধারে গেট আছে। যদি সেই গেট খোলা থাকে, তাহা হইলেই সে গাড়ী লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রেল-লাইন অতিক্রম করিতে পারিবে; নতুবা তাহাকে থামিতেই হইবে।"

রয়েড বলিলেন, কোনও দিক হইতে ট্রেণ আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেই গেট বন্ধ থাকিবে; কিন্তু গেট বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সে যদি লাইন পার হইয়া যায়, এবং আমরা সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ট্রেণ আসিবার সম্ভাবনায় গেট বন্ধ হয়, তাহা হইলে আমাদেরই গতিরোধ হইবে। তাহার পর ট্রেণ সেই স্থান অতিক্রম করিলে, আমরা গেট খোলা পাইব বটে, কিন্তু সেই সুযোগে মুলিঙ্গার বহুদূরে প্রস্থান করিবে, এ অবস্থায় সম্মুখের পথে রেলের লাইন আছে বলিয়া আমরা তাহাকে ধরিবার সুযোগ পাইব, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, হয় ত আমাদিগকে অধিকতর অসুবিধায় পড়িতে হইবে।"

কিছুকাল পরে ইন্‌স্পেক্টর বেল উড্ডীয়মান ধূলিরাশির ভিতর দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রয়েডকে বলিলেন, "ঐ দেখুন, রেলের লাইন দেখা যাইতেছে। সমতল ক্ষেত্রের উপর রেলের লাইন প্রসারিত আছে। এই পথের মাথায় ঐ লাইন দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া পথটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে, ঐ দিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

নিউল্যাণ্ড রেল-লাইন অভিমুখে ধাবিত হইল। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রয়েড মসীচিহ্নের ন্যায় যে পদার্থ দেখিতে পাইলেন, তাহাই মুলিঙ্গারের বেঁজলেট্। তাহা দেখিয়া রয়েডের সুনীল চক্ষু আগ্রহে উৎসাহে যেন জ্বলিয়া উঠিল।

রয়েড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুলিঙ্গারের গাড়ীর দিকে চাহিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—"আমার মনে হইতেছে, মুলিঙ্গার সম্মুখে রেলের লাইন দেখিয়া তাহার গাড়ীর গতিবেগ হ্রাস করিয়াছে। যদি এ সময় 'লেভেল ক্রসিং'এর গেট বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা সফল হইতে পারে। পরমেশ্বর জানেন, ঐ স্থানে নরপশুটার গতিরোধ হইবে কি না।

ইন্‌স্পেক্টর বেল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুদূর-প্রসারিত রেলের লাইনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, লেভেল ক্রসিংএর গেট বন্ধ আছে। গেট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি দূরে ট্রেণের এঞ্জিনের কালো ধোঁয়া দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু ট্রেণখানি এখনও আমার দৃষ্টিসীমার বাহিরে আছে, উহা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে।"

উড্ডীয়মান ধূলিরাশি সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলে, রয়েড পুরোবর্ত্তী বেঁজলেট্ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। রুদ্ধ গেটের সম্মুখে তাহার গতিরোধ হওয়ায় তাহা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বেল মুলিঙ্গারের গাড়ীর দিকে বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া উৎসাহভরে সোজা হইয়া বসিলেন, এবং পিস্তলটি পকেট হইতে বাহির করিয়া, মুলিঙ্গারের শকট লক্ষ্য করিয়া তাহা উদ্যত করিলেন। নিউল্যাণ্ড পূর্ণবেগে অগ্রসর হইয়া মুলিঙ্গারের শকটের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। নিউল্যাণ্ডের এঞ্জিন হইতে তখনও 'ঘস্ ঘস্' শব্দ নিঃসারিত হইতেছিল। মুলিঙ্গার তাহার শকটের পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অদূরে রয়েডের গাড়ী দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া, উচ্চ কণ্ঠস্বরে রয়েডের শকটের এঞ্জিনের শব্দ ডুবাইয়া, রয়েডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"থামো, রয়েড, থামো। যদি তোমার গাড়ী এ দিকে আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে, আমার পাশে যে দুই জনকে দেখিতেছ, আমার পিস্তলের গুলীতে তাহাদের কপাল ফুটা হইবে। যদি তাহাদিগকে জীবিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যেখানে আছ, ঠিক ঐখানেই থাক। ইহাদের প্রাণ আমার হাতে।"

রয়েড অগত্যা তৎক্ষণাৎ 'ব্রেক' করিয়া গাড়ী থামাইলেন। তাঁহার শকট আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইল না। তখন

তাঁহার নিউল্যাণ্ডের মাথা ও মুলিঙ্গারের বেঁজলেটের পশ্চাৎ-স্থিত 'লগেজ ক্যারিয়ার' এই উভয়ের ব্যবধান এক গজেরও কম ছিল। তথাপি রয়েড নিরুপায়! তিনি ও ইন্‌স্পেক্টর বেল মুলিঙ্গারের সেলুন গাড়ীর পশ্চাদ্বর্ত্তী গবাক্ষ-পথে তাহার গাড়ীর ভিতরের দৃশ্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। সেই দৃশ্য সন্দর্শনে রয়েডের বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইল।

রয়েড সেই গাড়ীর ভিতর ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীকে রজ্জু দ্বারা সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ দেখিলেন। তাহাদের উভয়কে দুই পাশে বসাইয়া মুলিঙ্গার মধ্যে বসিয়া তাহাদের পাহারা দিতেছিল, এবং তাহার হাতের পিস্তল ল্যাংটনের ললাটের সম্মুখে উদ্যত, এবং তাহার স্থিরদৃষ্টি ল্যাংটনের মুখের উপর সন্নিবিষ্ট। সেই দৃষ্টিতে পৈশাচিকতা পরিস্ফুট।

ইন্‌স্পেক্টর বেলের হাতের রিভলভার এক ইঞ্চি ঊর্দ্ধে উঠিল। মুলিঙ্গার তাহার গাড়ীর পশ্চাদ্বর্ত্তী বাতায়ন দিয়া তাহা দেখিবামাত্র তাহার হাতের পিস্তলের নল ল্যাংটনের ললাটে চাপিয়া ধরিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলকে কর্কশ স্বরে বলিল, "শীঘ্র তোমার হাতের রিভলভার নামাও. এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেই ল্যাংটনের মৃতদেহ আমার পায়ের কাছে লুটাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল নিষ্ফল ক্রোধে চোখ-মুখ লাল করিয়া রিভলভার নামাইয়া রাখিলেন, এবং বিচলিত স্বরে রয়েডকে বলিলেন, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে, গুলী করিয়া উহার মাথার খুলী উড়াইয়া দিই, তাহাতে যাহা হইবার হইবে।"

রয়েড মুলিঙ্গারের চোখ-মুখের দিকে চাহিয়া তাহাতে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট দেখিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর বেলকে সংযত স্বরে বলিলেন, "না, আমাদের এখন কিছুই করিবার নাই, ইন্‌স্পেক্টর! আমরা নিরুপায়, সম্পূর্ণ নিরুপায়! ঐ পশুটার চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখিতেছেন না? উহার কথার ব্যতিক্রম হইবে না। আমাদের কেহ উহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেই উহার পিস্তলের গুলী ল্যাংটনের ললাট বিদীর্ণ করিবে। হাঁ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আহা, ঐ মেয়েটির জন্যই আমার বেশী দুঃখ হইতেছে।"

মুলিঙ্গার রয়েডের কথা শুনিতে না পাইলেও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে হাসিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "বড়ই আপশোসের বিষয়, রয়েড! এত নিকটে আসিয়াও তোমাদিগকে এত দূরে থাকিতে হইয়াছে যে, তোমাদের রিভলভারের গুলীও আমার নাগাল পাইতেছে না! তোমাদের ভাগ্যেরই দোষ!"

রুদ্ধ গেটের নিকট দুইখানি গাড়ীই নিষ্ক্রিয়ভাবে পর পর দাঁড়াইয়া রহিল। সেই পথে সে সময় জনমানবের সমাগম ছিল না, এ জন্য অন্য কেহই ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীর দুর্দ্দশা দেখিতে পাইল না। যাঁহারা অন্য সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন, মুলিঙ্গারের চাতুর্য্য-কৌশলে তাঁহারাও নিরুপায়! গাড়ীর ভিতর উভয়েই সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহাদের বাম দিকে 'গুরু গম্, গুরু গম্' শব্দ উত্থিত হইল, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে সেই শব্দ সুস্পষ্টতর হইতে লাগিল। তাহার পর একখানি সুদীর্ঘ ট্রেণ বিশালদেহ ভুজঙ্গের ন্যায় আঁকিয়া-বাঁকিয়া দ্রুতবেগে রেলের লাইনের উপর দিয়া অগ্রসর হইল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ দেহ বহুদূর হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, আর দুই এক মিনিটের মধ্যেই তাহা লেভেল ক্রসিংএর রুদ্ধ গেট দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হইবে। তাহার পর গেটের রক্ষী রুদ্ধ লৌহদ্বার উদ্ঘাটিত করিলেই মুলিঙ্গার তাঁহাদের চক্ষুর উপর হইতে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিবে। তাহার গতিরোধের কোন উপায় নাই। সেই বেগবান শকটের অনুসরণ করা নিষ্ফল।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "উহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়া গুলী করিব? তাহার কি ফল হয় দেখা যাউক, কি বলেন? আর কোন উপায় নাই, সুতরাং—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রয়েড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। মুলিঙ্গার কিরূপ ক্ষিপ্রহস্ত, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। আপনি আগে গুলী করিয়া উহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে পারিবেন, সে আশা ত্যাগ করুন। তদ্ভিন্ন, উহার এক পাশে ল্যাংটন ও অন্য পাশে তাহার প্রণয়িনী রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বসিয়া আছে। মুলিঙ্গার তাহাদের উভয়েরই গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। আপনার গুলী হঠাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া উহাদেরই কাহারও দেহে বিদ্ধ

হইতেও পারে। এ অবস্থায় আপনার নিশ্চেষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়। জানি না, বিধাতার কি অভিপ্রায়!"

ট্রেণ তখনও কিছু দূরে ছিল। তাহা শীঘ্রই গেটের নিকট আসিয়া পড়িবে বুঝিয়া মুলিঞ্জার তাহার অন্যতর সহযোগী, শকট-চালক ক্যারোকে বলিল, "ক্যারো, সকল রকম মোটর-গাড়ীরই নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আছে। নিউল্যাণ্ডের প্রত্যেক অংশের বিশেষত্ব সম্বন্ধেও তুমি অজ্ঞ নহ। তুমি এক কায কর। উহাদের অদৃশ্য থাকিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া, বুকে ভর দিয়া উহাদের গাড়ীর তলায় যাও, এবং উহার পেট্রল-ট্যাঙ্কের নীচে যে ছিপি আঁটা আছে, সেই ছিপির স্ক্রুর প্যাচটা আলগা করিয়া রাখিয়া এসো। যদি পার, তাহা হইলে উহারা আর আমাদের অনুসরণ করিতে পারিবে না। উহাদিগকে এইখানেই খোঁড়া হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। কাযটা একটু শক্ত, পারিবে কি?"

ক্যারো মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "আমি না পারি কি? আমার ঘাড়ে কত দিন কত কঠিন কাযের ভার পড়িয়াছে; পারিব না বলিয়া কি কোন দিন কোনও ভার এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছি? এ কাযও আমি চক্ষুর নিমেষে শেষ করিয়া আসিতেছি। উহারা কিছুই জানিতে পারিবে না। আঃ, কি মজাই হইবে!"

ক্যারো মুলিঞ্জারের গাড়ীর সেই অংশের দ্বার খুলিয়া, গুঁড়ি মারিয়া নিঃশব্দে গলিয়া পড়িল, এবং পথে উপুড় হইয়া পড়িয়া, সরীসৃপের মত এ ভাবে রয়েডের গাড়ীর সম্মুখে অগ্রসর হইল যে, রয়েড বা ইন্‌স্পেক্টর বেল গাড়ীতে বসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেল তখন নির্নিমেষ-নেত্রে মুলিঞ্জারের দিকে চাহিয়া, তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; এবং মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিলেই গুলী করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ক্যারো যে মুলিঞ্জারের আদেশে তাহার গাড়ী হইতে নামিয়া, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বুকে ভর দিয়া তাঁহাদের গাড়ীর নীচে প্রবেশ করিতেছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। মুলিঞ্জার তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনাতেও স্থান পায় নাই।

ক্যারো অদ্ভুত তৎপরতার সহিত রয়েডের নিউল্যাণ্ডের সম্মুখস্থ দুই চাকার ব্যবধানস্থিত ফাঁকের ভিতর দিয়া, রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেলের অজ্ঞাতসারে নিউল্যাণ্ডের তলায় উপস্থিত হইল।

ট্রেণখানি তখন পূর্ব্বোক্ত গেটের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল; তাহার সুগম্ভীর 'গুম্ গুম্ ঝম্ ঝম্' শব্দে অন্য সকল শব্দ ডুবিয়া গেল। এ জন্য ক্যারো পেট্রল-ট্যাঙ্কের নীচে কাত হইয়া পড়িয়া, তাহার ছিপির প্যাচ ঘুরাইয়া আলগা করিবার সময় যৎকিঞ্চিৎ শব্দ করিতে বাধ্য হইলেও সেই শব্দ রয়েড বা তাঁহার সঙ্গীর কর্ণগোচর হইল না। সে ক্ষিপ্রহস্তে প্যাচের স্ক্রু আলগা করিয়া যখন দেখিল, ট্যাঙ্ক-সঞ্চিত পেট্রল ছিপির চারি পাশ দিয়া ধারাকারে নিঃসারিত হইতেছিল, তখন সে যে ভাবে সেখানে আসিয়াছিল, হৃষ্টচিত্তে অতি সন্তর্পণে সেই ভাবেই তাহাদের গাড়ীর নিকট ফিরিয়া গেল। রয়েড বা ইন্‌স্পেক্টর বেল তখনও এই বিপদের কথা জানিতে পারিলেন না।

ক্যারো তাড়াতাড়ি মুলিঞ্জারের গাড়ীতে উঠিয়া তাহার আসন অধিকার করিল। কার্য্যসিদ্ধির সংবাদ পাইয়া মুলিঞ্জার পৈশাচিক আনন্দে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বক্র-দৃষ্টিতে রয়েডের মুখের দিকে চাহিল।

ট্রেণখানি গর্জ্জন করিতে করিতে প্রচণ্ড গতিবেগে রুদ্ধ গেট কম্পিত করিয়া গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। মুহূর্ত্ত পরে সুদীর্ঘ ট্রেণের শৃঙ্খলিত লাঙ্গুল আবর্ত্তিত চক্রসহ রুদ্ধ গেট অতিক্রম করিলে।

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডকে বলিলেন, "গেটের প্রহরী ত এখনই গেট খুলিয়া দিবে।"

রয়েড বলিলেন, "হাঁ, আমরাও প্রস্তুত আছি। আমি—" সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ষ্টার্ট' দিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিল। নিউল্যাণ্ডের এঞ্জিন 'ভস্' করিয়া একটা ফাঁকা শব্দ করিয়াই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অচল এঞ্জিনের নিষ্ফল আর্ত্তনাদ যেন তাহার অন্তিম শ্বাস! সেই মুহূর্ত্তে লাইনের উভয় পার্শ্বের গেটের সম্মুখস্থ সুদীর্ঘ লোহার রেলিংএর আগড় অপসারিত হইবামাত্র মুলিঞ্জারের বেঁজলেট মুক্তপথে বিদ্যুদ্বেগে রেলের লাইন অতিক্রম করিল। সেই সময় মুলিঞ্জার রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপভরে হী-হী শব্দে হাসিয়া উঠিল; যেন বিনা মেঘে অশনিসম্পাত!

রয়েড অচল গাড়ী হইতে পথে লাফাইয়া পড়িলেন, পথের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির! তিনি দেখিলেন, ট্যাঙ্কের সমস্ত পেট্রল পথের উপর ঝরিয়া পড়িয়া পথের ধূলিরাশি কর্দ্দমে পরিণত করিয়াছে, এবং তাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছে। ট্যাঙ্কের তলা পরীক্ষা করিয়া তিনি ধূলিরাশির উপর ক্যারোর প্রসারিত দেহের চিহ্নও দেখিতে পাইলেন। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর বেলের মুখের দিকে চাহিলেন। ক্রোধে ক্ষোভে ইন্‌স্পেক্টরের মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল। গভীর উত্তেজনায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

রয়েড শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! মুলিঙ্গার অদ্ভূত চাতুর্য্যবলে আমাদিগকে খোঁড়া করিয়া গিয়াছে। পেট্রল ট্যাঙ্কে এক বিন্দু পেট্রল নাই। কি কৌশলে এই কায করিয়া গিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। তাহার এই শয়তানী প্রশংসার যোগ্য, ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। সে এই ভাবে আমাদের গতিরোধ করিবে, ইহা আমি কল্পনা করিতে পারি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "উহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে একটু বেগ পাইতে হইবে। চালাকীর সাহায্যে দস্যুরা কত দিন নিরাপদ থাকিতে পারে? যাহা হউক, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, বলুন।"

রয়েড হতাশভাবে বলিলেন, "এখন এই খোঁড়া গাড়ী লইয়া আমাদের এক ফুটও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আপাততঃ এখানেই বিশ্রাম, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, কোন না কোন ট্যাক্সি বা বাস্ এই পথে আসিবেই। তাহার মালিকের সম্মতি লইয়াই হউক, আর অসম্মতিতেই হউক, তাহার পেট্রল-ট্যাঙ্ক খালি করিয়া আমাদের ট্যাঙ্ক পূর্ণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আমাদের নড়িবার অন্য কোন উপায় নাই, কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিলেও আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না। মুলিঙ্গার যেরূপ বেগে গাড়ী চালাইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, যদি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেও তাহার অনুসরণ করিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলেও তাহাকে ধরিতে পারিব না। এই সুযোগে সে বাতাসে মিশিয়া যাইবে। সুতরাং তাহার অনুসরণের চেষ্টা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া কোন ফল নাই। আমরা নিকটে কোন লোকালয় দেখিতে পাইলেই টেলিফোনের সাহায্য গ্রহণ করিব, এবং এই অঞ্চলের যেখানে যেখানে পুলিসের ঘাঁটি আছে, প্রত্যেক ঘাঁটির পুলিসকে উহার গাড়ী আটক করিতে আদেশ করিব। উহার গাড়ীর পরিচয় শুনিলে তাহারা সহজেই তাহা সনাক্ত করিতে পারিবে। আপনাকেই এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। মুলিঙ্গারের গাড়ী যেন কোন পুলিস-প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডের কথা শুনিয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও যুক্তিতে কোন কায হইবে না। যাহাকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে হইল, যে আমাদের বেকুব বানাইয়া আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পলায়ন করিল, সে ঘাঁটির প্রহরীদের প্রতারিত করিবার জন্য নূতন কোন উপায় অবলম্বন করিবে না, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? প্রহরীরা যদি তাহার গাড়ীর সন্ধান না পায়?"

রয়েড বলিলেন, "সে জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। এখনও আপনার হাতে বিস্তর কায, সেই সকল কাযে আপনাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। মুলিঙ্গার আমাদিগকে কৌশলে পরাজিত করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু সে যেখানেই যাউক, নিশ্চিন্তমনে সঙ্কল্পসিদ্ধি করিতে পারিবে না, হয় ত আবার তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে, এই ভয়ে সে কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইবে; সুতরাং এই বাধায় ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীর বিপদের আশঙ্কা হ্রাস হইবে। সে কোন নিরাপদ আড্ডায় আশ্রয় লইয়া, তা সেই আড্ডা যেখানেই হউক, ল্যাংটনের নিকট হইতে ফটোখানি আদায় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ইহাই এখন তাহার প্রধান সঙ্কল্প। তাহার বিশ্বাস, সে ফটোখানি সংগ্রহ করিতে পারিলেই বিপুল গুপ্ত ধনের অধিকারী হইবে এবং সেই অর্থ হস্তগত করিয়া অবশিষ্ট জীবন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিতে পারিবে। জীবনে তাহার অর্থাভাব হইবে না। এই আশাতেই সে ল্যাংটনের সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।"

বেল বলিলেন, "ল্যাংটনের নিকট হইতে সে ফটোখানি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে, এ বিষয়ে আমারও সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্যেই সে ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীকে বাঁধিয়া, তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে—তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু তাহার পর?"

রয়েড বলিলেন, "তাহার পর সে কি করিবে, তাহাও আমি কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছি। হাঁ, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সে কায তাহাকে করিতেই হইবে। সেই সময় আমরা আর একবার সুযোগ পাইব। সেই শেষ সুযোগে তাহার হাতে দড়ি দিতে চাই, ইন্স্পেক্টর!"

তাঁহারা ভবিষ্যৎ সুযোগের আশায় সেই অচল গাড়ীতে বসিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুশ্চিন্তা হ্রাস হইল না।

মুলিঙ্গার যদিও বুঝিতে পারিল, রয়েড আর তাহার অনুসরণ করিতে পারিবে না, তথাপি ক্যারো তাহার আদেশে পূর্ণ-বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। অল্পসময়ের মধ্যেই সে বহু দূরে প্রস্থান করিল; কিন্তু ক্যারো তাহার উপদেশে কোনও গ্রামে বা নগরে প্রবেশ না করিয়া, গ্রাম নগর পাশে ফেলিয়া, নির্জ্জন প্রান্তর ভেদ করিয়া, কখন বা পরিত্যক্ত মেঠো পথ ধরিয়া, তাহার গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইল। মুলিঙ্গার রেলের লাইন পার হইয়া কয়েক মাইল অতিক্রম করিবার পর গাড়ী থামাইয়া, গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত নম্বরের 'প্লেট্'খানি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, এবং অন্য নম্বরের একখানি 'প্লেট' আঁটিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, রয়েড সর্ব্বপ্রথমেই টেলিফোনে পুলিসের বিভিন্ন আড্ডায় তাহার গাড়ীর নম্বর বলিয়া দিবে, এবং পুলিস যে কোন গাড়ী দেখিতে পাইলেই সেই গাড়ীর নম্বর পরীক্ষা করিবে' নম্বর না মিলিলে তাহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা হ্রাস হইবে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য শকটের বেগ হ্রাস করিল না; ক্যারো পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইয়া ইস্পউইচের সীমাপ্রান্তে উপস্থিত হইল।

অতঃপর কতকগুলি গলি অতিক্রম করিয়া তাহারা কীলের উদ্যানভবনের নিকট উপস্থিত হইল। নানা জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ সুবৃহৎ বাগানের ভিতর সেই অট্টালিকা অবস্থিত, সেই অট্টালিকার সম্মুখে অরওয়েল নদীর তরঙ্গবিস্তার, এবং তাহার দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে সুপ্রশস্ত উদ্যান। সেই নিভৃত উদ্যানের নিকট কোন গৃহস্থের ঘর-বাড়ী ছিল না।

ক্যারো মুলিঙ্গারের মোটর-কার লইয়া কীলের উদ্যান-মধ্যস্থিত অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মুলিঙ্গার গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহস্বামী কীলকে বারান্দার নীচে দণ্ডায়মান দেখিল। তাহার প্রশস্ত 'আঙ্গিনায় মুলিঙ্গারের মোটর গাড়ীর ঘস্‌ঘসানি শুনিয়া কীল কৌতূহলভরে বাহিরে আসিয়াছিল।

মুলিঙ্গার কীলকে সাদর-সম্ভাষণ না জানাইয়া বা বিন্দুমাত্র শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া, নীরস স্বরে বলিল, "এখন তোমার ঘরে কি কেহ কোন কাযকর্ম্ম করিতেছে?"

কীল বলিল, "একটা ছোকরা চাকর ঘরের ধূলা ঝাড়িতেছে।"

মুলিঙ্গার বলিল, "সে যেন আমার গাড়ী দেখিতে না পায়, তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখ। গাড়ী সামলাইয়া রাখিবার পর তাহাকে ছুটী দাও, আজ যেন সে এখানে না আসে। বাহিরের কোনও লোক আজ তোমার বাড়ী আসিতে পাইবে না।"

কীল দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহার বালক ভৃত্যকে ঘরে পূরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া মুলিঙ্গারের নিকট ফিরিয়া আসিল। মুলিঙ্গার গাড়ীখানা সেই অট্টালিকার এক পাশে লইয়া গিয়া একটা গুদামে লুকাইয়া রাখিল। অনন্তর তাহার ইঙ্গিতে কীলের বালক ভৃত্য ছুটী পাইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিল। ছুটী না চাহিতেই ছুটী! সে পূর্ব্বে কোনও দিন মনিবের এই প্রকার দয়ার পরিচয় পায় নাই। রাত্রিতেও আর তাহাকে কাযে আসিতে হইবে না। কি মজা!

অট্টালিকাখানি দোতলা, সে-কেলে বাড়ী। পশ্চাতের অধিকাংশ কক্ষ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। সম্মুখের বারান্দার অধিকাংশ ঘন পল্লবিত আইভি লতার নিবিড় পত্রে আচ্ছাদিত। পত্রা-বরণ ভেদ করিয়া ইট-কাঠ দৃষ্টিগোচর হয় না।

ল্যাংটন ও এনিড্‌কে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় গাড়ীর ভিতর হইতে বারান্দার নিকট টানিয়া আনা হইলে, গৃহস্বামী কীল বক্র দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া মুলিঙ্গারকে শুষ্ক স্বরে বলিল, "ব্যাপার কি, ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না। আমি কি কিছুই জানিতে পারিব না? বাড়ী আমার কি না, এজন্য এ সকল ব্যাপারের এক-আধটু বিবরণ জানিয়া রাখা দরকার মনে করিতেছি। এ সকল কাযে ফ্যাঁসাদ ঘটিতে কতক্ষণ?"

মুলিঙ্গার হাসিবার ভঙ্গীতে খেঁকী কুকুরের মত দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার জানা দরকার বৈ কি, বিশেষতঃ আমরা যখন "দুর্দ্দিনে তোমার অতিথি। সকল কথাই তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি, শোন।"

মুলিঙ্গার সংক্ষেপে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনার বিবরণ কীলের নিকট প্রকাশ করিল। কীল তাহার সাধু ব্যবসায়ের এজেণ্ট; তাহার বিশ্বাসের পাত্র। কীলের নিকট মুলিঙ্গারের কোন গুপ্ত কথা গোপন রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, এবং গোপন করিলে কারবার চলিত না।

আদ্যোপান্ত সকল বিবরণ শুনিয়া কীল সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! পুলিস তোমার সদর আফিস খানাতল্লাস করিয়াছে? তোমার খাতাপত্রে আমার নাম আছে, ব্যবসায়ের হিসাব আছে। আমার হাতে দড়ি না দিয়া ছাড়িবে না দেখিতেছি। পুলিস যে আমাকে গ্রেপ্তার করে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! কিন্তু এবার আর আমার নিষ্কৃতি নাই, নিজেও মরিবে, আমাকেও মজাইবে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, তুমি তাঁতি নয় বটে, কিন্তু বেশী লোভ করিতে গিয়াই সব নষ্ট করিবে। শেষে জেলে পচিবে।"

মুলিঙ্গার নীরস স্বরে বলিল, "মরিবার আগেই যে ভয়ে মরিলে! তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; যদি সে আশঙ্কা থাকিত, তাহা হইলে আজ তোমাকে এখানে দেখিতে পাইতাম না। খাতাপত্রে এরূপ কিছু নাই, যাহা দেখিয়া পুলিস তোমার সন্ধানে এখানে আসিবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার ঘর দুই একটি মাত্র—ব্যবহার করিব। কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র। তাহাতে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। যাহারা আমার নিজের লোক, আমার বৈষয়িক কার্য্যের সহযোগী, তাহাদিগকে কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা আমি জানি। সুতরাং জেলে পচিবার ভয় ত্যাগ করিতে পার।"

কীল বলিল, "তা বটে, কিন্তু যদি কোন গোয়েন্দা—"

মুলিঙ্গার তাহার কথায় বাধা দিয়া, মুখ বাঁকা করিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "দেখ কীল, তুমি কি বলিবে, তাহা তুমি হাঁ করিতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার যে সকল সহকর্ম্মী আমার সরলতা ও সাধুতায় নির্ভর করিয়া আমার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করে, আমি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করি। আমার সঙ্গে এতকাল কারবার করিয়াও যদি তোমার ততটুকু অভিজ্ঞতা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও মনুষ্যচরিত্রজ্ঞতায় তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর পুচ্ছহীন দ্বিপদ গর্দ্দভ। বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার নামের পশ্চাতে একটি সুদীর্ঘ লাঙ্গুল সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল। আমি স্পষ্টভাষায় তোমাকে এই উপদেশ খয়রাত করিতেছি যে, যদি তুমি আত্মরক্ষার জন্য আমাকে কোন অসুবিধায় নিক্ষেপ কর, বা আমার বিপদের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে তোমারও বিপদ অনিবার্য্য হইবে। যদি আমাকে কোন কারণে ধরা পড়িতে হয়, তাহা হইলে আমাকে আত্মরক্ষার জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া, এপ্রুভার হইতে হইবে, তখন আমার সহকর্ম্মীদের ধরাইয়া দেওয়া ভিন্ন আমার আর কি গত্যন্তর থাকিতে পারে?—অবশ্য, আমার গলায় দড়ি উঠিবার সম্ভাবনা না ঘটিলে আমি সেই কুকার্য্য করিব না; কিন্তু স্বার্থানুরোধে যদি আমার সহধর্ম্মীদের সাহায্য না পাই, এবং সেজন্য বিপন্ন হই, তাহা হইলে সেই বিপদ আমার একার নহে। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রকাশ্য পথে বসিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে পথ নোংরা করে; কিন্তু তাহারা যে বেহায়াপনা করিতেছে, এ কথা তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহারা লাঠী লইয়া তাড়া করে; কোন কোন বেহায়া 'ডিফামেশনের'ও ভয় দেখায়। তুমিও সেই দলভুক্ত, এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু বিপন্ন হইয়া যদি তোমার কোনও সাহায্য না পাই, তাহা হইলে পুলিস তোমার হাতে দড়ি দিলে, আমাকে সরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইও না। আমি বিশ্বাসঘাতকদের ঘৃণা করি। আশা করি, তুমি আমার বিশ্বাস নষ্ট করিবে না।"

এই বক্তৃতার পর কীল তাহার প্রস্তাবে আপত্তি করিতে পারিল না। সে বুঝিতে পারিল, মুলিঙ্গার অতি সহজে তাহাকে জেলে পুরিবার ব্যবস্থা করিয়া কৌশলে আত্মরক্ষা করিবে। স্বয়ং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকেই বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং কীল তাহার মনোরঞ্জনের জন্য কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে বল! তোমার বাড়ী আর আমার বাড়ী—এ উভয়ে কোনও প্রভেদ আছে কি? আমি বলিতেছিলাম—কোন গোয়েন্দা তোমার সন্ধানে আসিলে, আমি কি কৌশলে তাহার চক্ষুতে লঙ্কা-মরিচের গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং অশ্রুবর্ষণ করিব, তাহার হদিশ বলিয়া দাও।"

"আমি তাহার ব্যবস্থা করিব" বলিয়া মুলিঙ্গার তাহার

গাড়ীর আসনের তলা হইতে একগাছা চাবুক বাহির করিয়া আনিল। সেই চাবুকের চামড়ার ফালির ডগায় গেরো দেওয়া। চাবুক দ্বারা কাহারও অঙ্গে আঘাতের সময় সেই গেরো দেহের যে স্থানে প্রতিহত হইত, সেই স্থানের ত্বক বিদীর্ণ হইয়া একদলা মাংস তাহাতে বাধিয়া উঠিত। মুলিঙ্গার একবার লণ্ডনের 'লাইম হাউস' নামক চীনা পল্লীতে আং-শি-কাং নামক প্রসিদ্ধ চীনা বোম্বেটের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই অপূর্ব্ব আয়ুধ উপহার পাইয়াছিল।

মুলিঙ্গার এই চাবুক মাথার উপর তুলিয়া শূন্যে একবার আস্ফালন করিল। এনিড সেই চাবুকের দিকে চাহিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইল।

ক্যারো ও ভার্ণি মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে ল্যাংটন ও এনিডের হাত ধরিয়া তাহাদিগকে কীলের ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া চলিল।

মুলিঙ্গার অসহায়, নিরস্ত্র, রজ্জুবদ্ধ বন্দিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কয়েক মিনিটের মধ্যে মন্ত্রণা-সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইবে; সেই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবে—আমার হাতের এই চর্ম্মদণ্ড। ইহার উপদেশ যেমন সুযুক্তিপূর্ণ, সেইরূপ অকাট্য।"

ল্যাংটন ও এনিড সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া যে কক্ষে নীত হইল, সেই কক্ষের সম্মুখেই অরওয়েল নদী খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। ভার্ণি মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে ল্যাংটনকে সেই কক্ষস্থিত একখানি চেয়ারে সবলে বসাইয়া দিয়া, চেয়ারের কাঁধার সঙ্গে তাহার বুক-পিঠ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল; তাহার পর এনিডের ঘাড় ধরিয়া, ল্যাংটনের মুখের দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া ল্যাংটনের চেয়ার হইতে দুই গজ দূরে তাহাকে দাঁড় করিয়া রাখিল। এনিড অন্য দিকে মুখ ফিরাইতে না পারে, এ জন্য সে তাহার কাঁধের উপর হইতে হাত নামাইল না। রজ্জুবদ্ধ ল্যাংটন যদি মুলিঙ্গারের আদেশপালনে অসম্মত হইয়া, চেয়ার হইতে জোর করিয়া ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বন্ধনসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবে—এই উদ্দেশ্যে ক্যারো ল্যাংটনের চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, রজ্জুহস্তে সতর্কভাবে পাহারা দিতে লাগিল।

ল্যাংটন ও এনিড চীৎকার করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের মুখও রুমাল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা চক্ষুর ইঙ্গিতে পরস্পরকে মনের ভাব জানাইতে পারিবে, ভাবিয়া মুলিঙ্গার তাহাদের চক্ষু অনাবৃত রাখিয়াছিল।

মুলিঙ্গার চাবুক হাতে লইয়া এনিডের পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চাবুকের চামড়ার গাঁটগুলি পরীক্ষা করিল; তাহার পর এনিডের পিঠ লক্ষ্য করিয়া তাহা বাগাইয়া ধরিয়া ল্যাংটনকে কর্কশ স্বরে বলিল, "শোন ছোক্‌রা! তোমার কাছে একখানা ফটোগ্রাফ আছে, তাহা আমি হাতাইতে চাই। কিন্তু তাহা হাত-ছাড়া করিতে তোমার ইচ্ছা নাই। আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য তুমি নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছ। আমার চেষ্টা বিফল করিবার জন্য তুমি একটা মুরুব্বী খাড়া করিয়াছিলে। আমি তাহাকে সায়েস্তা করিয়াছি, সে আর আমার সঙ্গে গোস্তাকি করিতে আসিবে না। আমার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তোমাদের দুই জনকে মুঠায় পুরিব, আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। এখন এইবার অবশিষ্ট কায শেষ করিব। সেই ফটোগ্রাফ অবিলম্বে আমাকে দাও, যদি সহজে না দাও, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় কি, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।"

এই কথা বলিয়া মুলিঙ্গার তাহার হাতের চাবুক ঊর্দ্ধে তুলিয়া এনিডের পিঠের উপর এ ভাবে আন্দোলিত করিল যে, তাহার গ্রন্থি-বিশিষ্ট অগ্রভাগ এনিডের পিঠ স্পর্শ করিল। সেই স্পর্শে এনিডের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। এনিডের চক্ষুতে কাতরতার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

প্রণয়িনীর অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিস্ফল ক্রোধে ল্যাংটনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল। দেবাদিদেব শঙ্করের ললাট-নেত্রের সন্ধুক্ষিত বহ্নিতে রতিপতি ভস্মীভূত হইয়াছিলেন; ক্ষুদ্র মনুষ্যের নয়নানলের যদি সে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মুলিঙ্গার সেই মুহূর্ত্তেই ভস্মে পরিণত হইত, কিন্তু ল্যাংটনের ক্রোধে সে সম্পূর্ণ অবিচলিত রহিল।

ল্যাংটন হতাশভাবে তাহার প্রণয়িনীর চক্ষুর দিকে চাহিল, তাহার অন্তর্বেদনা তাহার চক্ষুতে প্রতিফলিত

হইল। তাহার মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারিয়া, এনিড মুহূর্ত্ত-মধ্যে আত্মসংবরণ করিল। আতঙ্ক এবং কাতরতা অন্তর্হিত হইয়া, তাহার চক্ষুতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রতিফলিত হইল, তাহার নীরব নেত্র ইঙ্গিতে ল্যাংটনকে জানাইল, "আমার যন্ত্রণার ভয়ে তুমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিও না, এই পিশাচের নিকট পরাজয় স্বীকার করিও না; উহার আদেশ গ্রাহ্য করিও না। তোমার হৃদয়ভরা প্রেম দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় আমাকে রক্ষা করিবে। আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া বীর-নারীর ন্যায় সকল নির্য্যাতন, সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব। প্রেমের দেবতা আমার হৃদয়ে সাহস ও বলদান করিবেন। অকম্পিত হৃদয়ে কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিব।"

মুলিঙ্গার ল্যাংটনের চক্ষুতে মানসিক চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার ছায়া প্রতিফলিত দেখিয়া বলিল, "কি স্থির করিলে? তুমি চক্ষুর ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পার, আমি তাহা বুঝিতে পারিব।"

এনিড ল্যাংটনের মনের ভাব বুঝিতে পারিল, সে তাহার প্রণয়ীর বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে মুলিঙ্গারের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে নিষেধ করিল। মুহূর্ত্তে তাহার সুনীল নেত্রে সঙ্কোচ, কুণ্ঠা-বিহীন দৃঢ়তা, ধূমসংস্পর্শরহিত উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া মুলিঙ্গার আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। আকস্মিক উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুহূর্ত্তে কাঁপিয়া উঠিল, পৈশাচিক হুঙ্কার দিয়া সে হাতের চাবুক উর্দ্ধে তুলিল, এবং আন্দোলিত করিয়া এনিডের পৃষ্ঠে আঘাত করিল, এনিড সেই আঘাতে ঘুরিয়া পড়ে দেখিয়া, ভার্ণি দুই হাতে তাহার কাঁধ ধরিয়া তাহার পতনের বেগ নিবারণ

(১) ল্যাংটন, (২) ক্যারো, (৩) মিস্ এনিড ফরেষ্ট, (৪) ভার্ণি, (৫) মুলিঙ্গার।

মুলিঙ্গার এনিডের পশ্চাতে ঝুঁকিয়া চাবুক আস্ফালন করায়, ল্যাংটন তাহার প্রণয়িনীর নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া ফটো পাঠাইবার জন্য ব্যাঙ্কে পত্র লিখিতেছে।

করিল। এনিডের দুই চক্ষু হইতে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িল; তথাপি সে সেই কঠোর আঘাত-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার নলিন-নেত্রে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিল। উদ্গত অশ্রুর অন্তরালে করুণা-ভরা কোমল হাসি।

হায় নারী, বুক-ফাটা বেদনায় যখন তোমার বুকের রক্ত জল হইয়া যায়, তখনও তুমি তোমার প্রাণাধিক প্রিয়তমের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ও দুঃখ নিবারণের জন্য, ফুলের মত হাসি দিয়া তোমার সেই বুকের আগুন ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, স্বর্গের দেবীর যদি স্বার্থপঙ্কিল মর্ত্ত্যে আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবে সে তুমি!

ল্যাংটন আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য একবার সে প্রাণপণ চেষ্টা করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সতেজে দুলিয়া উঠিয়া, প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর বসুন্ধরা স্থির হইলেও, সরসীর নির্ম্মল, নিস্তরঙ্গ জলরাশি, বৃক্ষশাখার পল্লবগুচ্ছ যে ভাবে আন্দোলিত হইতে থাকে, তাহার বেদনাপ্লুত, আবেগ-বিহ্বল হৃদয় সেই ভাবেই আন্দোলিত আলোড়িত হইতে লাগিল। এনিড যন্ত্রণামথিত হৃদয়ের সহিত কি ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহা অনুভব করিয়া সে পিশাচের নিষ্ঠুরতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। সে কাতর নেত্রের ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। একটা আকুল আর্ত্তনাদ তাহার ব্যথিত পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া ওষ্ঠের নিকট আসিয়া, মুখের সুদৃঢ় বন্ধন অতিক্রম করিতে না পারিয়া তাহার অন্তরালে রুদ্ধ আবেগে গুঞ্জরিয়া উঠিল।

মুলিঙ্গার ল্যাংটনের চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার দুই বিপরীত মনোবৃত্তির সংগ্রামের বাহ্য অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প বিচলিত হইয়াছে বুঝিয়া সে উল্লাসভরে বলিল, "এতক্ষণ পরে তোমার সুবুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। তোমার দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই? ভার্ণি, উহার মুখের বন্ধন খুলিয়া দাও। ইচ্ছা হয় ও প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করুক, তাহার প্রতিধ্বনি শূন্যে মিলাইবে, কিন্তু কেহ শুনিতে পাইবে না। নিকটে লোকালয় নাই।"

ভার্ণি তৎক্ষণাৎ ল্যাংটনের মাথার কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের বন্ধন অপসারিত করিল। ল্যাংটন দুই মিনিট ধরিয়া হাঁপাইল। তাহার পর মুলিঙ্গারের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "ওরে নরপশু, নারীনির্য্যাতক রাক্ষস! তুই—"

মুলিঙ্গার মুখ বিকৃত করিয়া তাহার হাতের চাবুক ঊর্দ্ধে তুলিল। তাহা পুনর্ব্বার এনিডের পৃষ্ঠে পতনোন্মুখ দেখিয়া ল্যাংটনের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

মুলিঙ্গার চাবুক আস্ফালন করিয়া বলিল, "তোমার প্রলাপ শুনিবার জন্য তোমার মুখের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয় নাই। আমার সময় অল্প, কাযের কথা বল। সেই ফটো কোথায়? যদি চরম দুর্গতি এড়াইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সত্য কথা বল। আমি সত্য কথা শুনিতে ভালবাসি।"

ল্যাংটন বলিল, "আমার ব্যাঙ্কের ধনাগারের সিন্দুকে আবদ্ধ আছে।"

মুলিঙ্গার বলিল, "কোন্ ব্যাঙ্ক?"

ল্যাংটন মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হতাশভাবে বলিল, "মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের ফ্লীট্ ষ্ট্রীটের শাখা।"

মুলিঙ্গার গম্ভীর স্বরে বলিল, "উত্তম। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে চিঠি লিখিয়া দাও—সে পত্র-বাহকের হাতে ফটো ফেরত পাঠাইবে। ভার্ণি, উহার ডান হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দাও।"

ভার্ণি তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ পালন করিল।

মুলিঙ্গার পকেট হইতে একটি ফাউণ্টেন পেন এবং এক ফর্দ্দ কাগজ বাহির করিয়া ল্যাংটনের সম্মুখে আসিল।

ক্যারো মুলিঙ্গারের আদেশে একখানি ছোট টেবল আনিয়া ল্যাংটনের সম্মুখে স্থাপিত করিল, এবং তাহার উপর দুইটি মোমবাতি জ্বালিয়া দিল।

মুলিঙ্গার ফাউণ্টেন পেন ও সাদা কাগজখানি টেবলের উপর রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "যেরূপ আদেশ করিলাম, মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের ফ্লীট্ ষ্ট্রীটের শাখার ম্যানেজারকে সেইরূপ পত্র লিখিয়া দাও। বিলম্ব করিও না, আমার সময় মূল্যবান্।"

মুলিঙ্গার এনিডের পশ্চাতে সরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার চাবুক ধরিল।

ল্যাংটন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পত্রখানি লিখিয়া, তাহা মুলিঙ্গারের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল সে কি লিখিল, তাহা পাঠ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। পশুবলের নিকট এই পরাজয়ে তাহার অন্তরাত্মা

বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অন্তর্নিহিত ক্রোধে সে দগ্ধ হইতে লাগিল।

মুলিঞ্জার পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া মনে মনে পাঠ করিল। পৈশাচিক আনন্দে তাহার লুব্ধ চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া পত্রখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া ভার্ণিকে বলিল, "ভার্ণি, উহার ডান হাত চেয়ারের সঙ্গে আবার বাঁধিয়া রাখ। যদি জানিতে পারি, উহার কথা মিথ্যা, আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য চালবাজি মাত্র, তাহা হইলে এই প্রতারণার প্রতিফল কিরূপ ভয়াবহ হইবে, তাহা উহাদের ধারণা করিবার শক্তি নাই। দরজা বন্ধ করিয়া চাবি লাগাও। উহারা এই কক্ষে বন্দী।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মানসী

আমার হৃদয়-রাণী
চিনি না তাহারে দেখি নাই তারে তবু তারে যেন জানি।
যুগ যুগ ধরি' তাহারেই যেন চেয়েছি হৃদয়পুরে
ধরা ছোঁয়া যেন পাই নাই কভু—গিয়াছে সে স'রে দূরে।
না পাওয়ার মাঝে তবুও তাহারে পেয়েছি পরাণ ভরি'—
দূর-ব্যবধানে সে রূপসী মোর নিয়েছে হৃদয় হরি'!
নাহি প্রেম পরিচয়,
তারি তরে তবু প্রণয়-পুষ্প করিয়াছি সঞ্চয়!

গোলাপেরি রাঙা বুকে
তাহারি বুকের অমিয় পরশ রয়েছে জড়িত সুখে!
জানি না সে কোন্ মিলনলগনে আমার গোপন প্রিয়া
বুকেরি সুধায় সিঞ্চিত করি' দিয়েছিল তারি হিয়া,
শুধু এইটুকু জানি
গোলাপ পরশে প্রিয়ারি পরশ—হৃদয়ে হরষ মানি!
বিরহেরো মাঝে তাই
মিলনের হাসি ভরি' উঠে বুকে—প্রণয়ের সাধনাই।

শুনিনি ত' তারি গান,
নিখিলেরি সুরে তবু তারি সুর সিক্ত করে এ প্রাণ!
মধু পিক বধূ সনে
অতীতের কোন অজানা প্রভাতে মাধবী-কুঞ্জবনে
আমার প্রেয়সী উছসি' উলসি' গেয়েছিল প্রেমগান
তারো কিছু আমি জানি না ত' কোন রাখি নাক' সন্ধান-
শুধু জানি মনে মনে
অদেখারো মাঝে প্রেয়সী আমার গাহে মোর মন-বনে!

রূপের আলোক-শিখা
ঝলসি জলেনি নয়ন-সমুখে,—তবু জানি আছে লিখা—
দিবা অবসানে গোধূলি লগনে সুনীল গগন-বুকে,
দূরে—বহুদূরে—নদী-পরপারে মিলন মধুর সুখে,
মিশিয়া গিয়াছে তরুরেখা যেথা অভিসারিকার মত
শ্যাম অনুরাগে প্রণয়েরি রাগে শিহরিছে অবিরত,—
নব ঘন সেই নীলিমার বুকে প্রেয়সীর রূপরেখা,
রেখেছি আঁকিয়া কবে নাহি জানি চির অভিনব লেখা!

শুধু জানি, নহে ভুল,—
দিবস-শেষের রক্তরবির এই যে রঙীন ফুল—
চোখে মুখে মোর পড়িছে ঝরিয়া ঝর ঝ'র বারি সম—
চিরদিনই সে যে আমারি প্রিয়ার চুম্বন অনুপম।

প্রিয়ারি পরাণ রসে
মুঞ্জরি' মম মনমঞ্জরী ওঠেনি মদিরালসে!
বিকশিত তবু রূপে রসে সে যে গন্ধপুলকে ভরি'—
জানি না কাহারি সরস হৃদয় পরশ মাধুরী হরি'—
জানা আছে শুধু মোর
মুগ্ধ চাঁদিমা গগনগরিমা নাশিয়া আঁধার ঘোর
বন্দী করিয়া আকাশের শত মিটিমিটি তারকারে
ভ'রে দেয় যবে গগন পবন স্নিগ্ধ জ্যোছনা ধারে,
অমিয় মধুর পরশে তাহারি আমারো হৃদয়বনে
আধো ফোটা শত ফুটে ওঠে কলি সুমধুর সমীরণে!
মনে মোর তাই জাগে
পুষ্পিত হিয়া আমারি প্রিয়ার অন্তর রস-রাগে।

আমারি মানসরাণী
রূপ নাই তার, রূপময়ী তবু—ফুলময় দুটি পাণি!
রস নাই তার রসময়ী তবু অন্তর রসে ভরি'
কায়াময়ী নয় মায়াময়ী সে যে,—সে যে চির-যাদুকরী!
সীমারেখা নাহি জানে
হৃদয় প্রবাহ ছুটে চলে মোর অসীম সাগর পানে!
মুক্তি জীবন তার—
শাশ্বত চির বিশ্ব হিয়ার সাথে মিলি' একাকার!
আমার মানসপ্রিয়া
বন্দিনী তাই নহে হিয়া-মাঝে, নিখিলেরি সে যে হিয়া!
নিখিল বাসরে তাই
মিলনের হাসি, মিলনের বাঁশী, মিলনেরি প্রেরণাই!
নাহিক বিরহজ্বালা
বুকের আগুনে পড়ে না ঝরিয়া মিলনের ফুলমালা!
একটানা যেন চলেছি ভাসিয়া প্রথম প্রভাত হ'তে
আমার মানস প্রেয়সীর সাথে মিলনেরি সুধাস্রোতে।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার।

আদালত ও অন্তঃপুর

নাট্য-চিত্র)

পাত্র-পাত্রীগণ

নটবর—মফঃস্বল কোর্টের উকীল
উপেন—নটবরের মুহুরী
নির্ম্মল—মক্কেল
মালিনী—নটবরের স্ত্রী

দৃশ্য—নটবরের বৈঠকখানা

(নটবর পুরাতন খবরের একখানি কাগজের পাতা উল্টাইতেছিলেন। এমন সময় মালিনী আসিলেন।)

মালিনী।—আর ত পেরে উঠি নে। তোমার জন্য দেখছি হয় গলায় দড়ি দিয়ে, নয় ত আফিং খেয়ে মরতে হবে।

নটবর।—আফিং আর গলায় দড়ি! কি সর্ব্বনাশ! কেন, কি হ'ল? সংসারের ওপর এতটা বিতৃষ্ণা ত ভাল নয়।

মালিনী।—বিতৃষ্ণা কি আর সাধে হয়? এ ভাবে আর কত দিন চালাবো? গায়ের যে কখানি ছিল, কতক বিক্রী, কতক বাঁধা। দেনায় ত মাথার চুল বিকিয়ে যাচ্ছে। এখন নিত্যি বাজার-খরচ চলে, সে উপায়ও ত নেই। দোকানে না হয় এখনও ধারে দিলে, কিন্তু মাছ তরিতরকারী ত আর ধারে পাওয়া যায় না! মরণটা হয় ত বাঁচি।

নটবর।—কেন এই যে সে দিন তিনটে টাকা দিলাম, কি হ'ল?

মালিনী।—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। এই সাড়ে তের আনা রয়েছে, ফেলে দিচ্ছি, নাও।

নটবর।—ও, এখনও সাড়ে তের আনা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রয়েছে, তাতেই এত ম্রিয়মাণ? আমি বলি বুঝি সব ফুরিয়ে গিয়েছে। যাক্, কিছু তোমার ভাবতে হবে না। এখনই আমি হিল্লে কচ্ছি। ওহে উপেন!

(মুহুরী উপেন আসিল।)

হ্যাঁ হে, পাঁচটা কেসপত্তর জুটিয়ে আনবে ব'লে অত বেশী কমিশনে তোমার মত ঝানু লোককে মুহুরী রাখলাম, আর আজ ঘরের তবিল কি না সাড়ে তের আনা! মেজ-গিন্নী ত আফিং খাবেন ব'লে বায়না ধরেছিলেন। পেনাল কোডের কত ধারা হে? হুয়েভার—কি তার পরটা—

উপেন।—বেশ বলেছেন। আমি মুহুরী, আর আপনি হচ্ছেন উকীল, আইনের ধারা বাতলে দেব আপনাকে আমি? কিন্তু সাড়ে তের আনা তবিল, এ কথা ত আমাকে বলেন নি? খুকীর অসুখের ওযুধের শিশি-বোতলগুলো বেচলেও যে এখুনি টাকাটা পুরোপুরি হয়ে যায়। তাই ত! সকাল থেকে একটাও মক্কেল এলো না! সে দিন রেমোটাকে বল্লুম, চার পয়সার গাঁজা দেব, মল্লিকদের কাপড়ের দোকানে ইট ছুড়ে মার, মল্লিককে বল্লুম, রেমো ইট ছুড়ছে, জুড়ে দিন একটা ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়ে। তা বুড়ো বেটা বল্লে যে, মামলা করবো না দোকান দেখবো, কাযেই মতলব গেল ফেঁসে। আমি কি আর আপনার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি কচ্ছি?

নটবর।—তা যাই হোক, এইবার একটা সিরিয়াস এটেম্পট করো, তা নইলে ত কেলেঙ্কারী ব্যাপার!

উপেন।—একটা ব্যবস্থা ত করেছি সেদিন, কিন্তু তখন ত জানিনে যে, আজই হাঁড়িতে চাল বাড়ন্ত অবস্থা, তা হ'লে তাকে আজই আসতে লিখতাম। তবে তাকে চিঠিতে লিখেছি যে, "পত্রপাঠ মাত্র অবিলম্বে চলিয়া আসি-বেন, যেন কিছুতেই অন্যথা না হয়।" আর সে চিঠিও পোষ্ট করেছি পরশু। ভগবান যদি দয়া করেন, তা হ'লে আজই হয় ত এসে যেতে পারেন!

নটবর।—বুঝতে পারছি নে ত তোমার মতলবটা। কি ব্যাপার, খুলে বল দিকিনি। কাকে আসতে লিখেছ? কে সে?

উপেন।—সেই যে ভালমানুষ ছোকরাটি কলকাতায় চাকরী করে, তার আঁম-বাগানের স্বত্ব নিয়ে যে মামলাটা বাধানো গিয়েছে—

নটবর।—সে মোকর্দ্দমার ত এখনও অনেক হে। ও মাসের ২৭শে।

উপেন।—আজ্ঞে হাঁ, সেই জন্যই ত তাকেই লিখেছি। একখানা পোষ্টকার্ড কলকাতায় লিখে দিলাম যে, শুক্রবার আপনার মোকর্দ্দমার দিন। কতকগুলো পয়েণ্ট জানা দরকার, নইলে মোকর্দ্দমা ফেঁসে যেতে পারে! সুতরাং টাকাকড়ি নিয়ে পত্রপাঠমাত্র—আজ ত হ'ল বৃহস্পতি-বার, কাল সে চিঠিখানা পেয়েছে, কাযেই মা কালী যদি দয়া করেন, তা হ'লে আজই সে এসে পড়তে পারে।

নটবর।—তাই ত হে, ডাহা মিথ্যেকথাটা লেখা—

উপেন।—ও সব ধর্ম্ম-টর্ম্ম এখন শিকেয় তুলে রাখুন, ধর্ম্ম দেখতে গেলে কখনও নিজেদের চলে?

নটবর।—ঠিক বলেছ। কি নামটা তার? নির্ম্মল না? যাক্, সাড়ে নটা ত বাজলো। নটা এগারোর গাড়ীখানায় যদি এসে থাকে, তা হ'লে ত আসবার সময় হ'ল। ঐ যে বড়রাস্তার মোড়ে একখানা বাস এসে থামলো না?

উপেন।—ব্যোম কালী! হ্যাঁ, ঐ যে সুটকেস হাতে ক'রে আসছেন ভদ্রলোক। আপনি একটু সামলে সুমলে ব'সে থাকুন। গিন্নী-ঠাকরুণ, আপনি বাড়ীর ভেতর যান। দেখুন, কি রকম বড়ের চাল চেলেছিলাম।

(হঠাৎ নটবর খুব ব্যস্তভাবে কতকগুলি কাগজ ও বই নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। উপেন একটা বাক্সর উপর একরাশি কাগজ লইয়া একমনে কি দেখিতে লাগিল। নির্ম্মল প্রবেশ করিল।)

নটবর।—এই যে আসুন, আসুন নির্ম্মল বাবু, আসতে আজ্ঞা হয়। নটা এগারোর প্যাসেঞ্জারটায় আসা হ'ল বুঝি?

নির্ম্মল।—না, এসেছিলাম আগের গাড়ীতেই। এখানে আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁর ওখানেই স্নানাহার সেরে আপনার এখানে এলাম।

নটবর।—কি আশ্চর্য্য! আমি এখানে রয়েছি, আর স্নানাহারের জন্য অন্য যায়গায়! না! আপনারা যদি নিতান্তই আমাকে পর মনে করেন, তা হ'লে আর—হেঁ হেঁ কলকাতায় থাকেন, তাই ভাবলেন, বুঝি আমরাও কলকাতার উকীল। তা নই মশাই! আমরা মক্কেলকে বাড়ীর লোক বলেই মনে করি। বিশেষ আপনার পিতাঠাকুর মশাই—আহা; তাঁর কথা—

নির্ম্মল।—এ একটা সামান্য আমবাগান নিয়ে দেখছি অনেকগুলো পয়সা বেরিয়ে গেল। এর চেয়ে—

নটবর।—দেখছেন কি? খাসা পয়েণ্ট বার করেছি, আপনার ও পক্ষের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে তবে ছাড়বো। আর এ সবই ত খরচ শুদ্ধ ডিক্রী হবে কি না! তখন আপনার ঘরের টাকা ঘরেই ফিরে আসবে।

নির্ম্মল।—যারা দিনরাত বিষয় আর মামলা নিয়ে থাকে, তাদের এ সব পোষায়। আমার মত লোকের আফিস কামাই ক'রে যাওয়া আসা—কটার সময় আজ কোর্টে যেতে হবে?

নটবর।—আজ আপনাকে একদম কোর্টে যেতে হবে না। অনেক মাথা ঘামিয়ে আমি এক ব্যাপার যা বার করেছি—যাকে বলে একদম পাশুপত অস্ত্র।

নির্ম্মল।—কি রকম?

নটবর।—ঠিক আপনার মত একটা কেস হয়েছিল ৩।৪ বছর আগে মাদ্রাজ হাইকোর্টে। সেখানকার জজ যা পয়েণ্ট বের ক'রে রায় লিখেছে, সেইটি আপনার কেসে প্রোডিউস করলেই ব্যস্, ও পক্ষের আর কথাটি কইবার যো থাকবে না। সেই জন্যেই ত আজ আপনাকে আসতে হ'ল।—আর আর ব্যবস্থাও আমি ভেবেছি। ওহে উপেন, একটা কথা বলি শোন।

উপেন।—আজ্ঞে, আমার এখন মাথা তোলবার সময় নেই। এই সমস্ত কাগজপত্র—

নটবর।—আহা, শোন, এটা বিশেষ জরুরী ব্যাপার। মাদ্রাজের সে রিপোর্টটা এখানকার বার লাইব্রেরীতে নেই, তা তুমি ভাল ক'রে দেখেছ ত হে?

উপেন।—দেখিনি আবার? প্রত্যেক আলমারি, প্রত্যেক উকীলের বাড়ী খুঁজেছি। পেলে কি আর আপনাকে—

নটবর।—তা হ'লে এক কায কর বরঞ্চ। নির্ম্মল বাবুর মামলায় কিছু বাজে খরচ ক'রে একটা লম্বা টাইম নাও। ও মাসের শেষাশেষি—২৬শে ২৭শে নাগাদ যাতে দিন পড়ে, তারই ব্যবস্থা বরং পেস্কারকে কিছু দিয়ে—বুঝেছ

ত—তার পর তুমি আজই আড়াইটের গাড়ীতে চ'লে যাও জেলা কোর্টে। সেখানকার লাইব্রেরীয়ান বদরদ্দি মিঞাকে কিছু—ওর নাম কি—দিয়ে বইখানি দিন কয়েকের জন্য নিয়ে এসো। এ সব খরচপত্রের কথা মোটেই ভেবো না। জেদের মামলা, আগে কায, তার পর অন্য সব।

উপেন।—আমার দ্বারা ত তা হ'লে মশাই আপনার চাকরী করা পোষায় না। রোজ তারিকে পাহাড়প্রমাণ কেসের কাগজপত্র ঠিক করবো, না এই সব করবো? আমাকে রেহাই দিন, মশাই।

নটবর।—আহা, রাগ কর্চ্ছো কেন? নির্ম্মল বাবু আফিস কামাই ক'রে এসেছেন, মস্ত বড় জিদের মামলাটা, এটা যাতে জিততে পারি, সেইটে ত আমাদের দেখতে হবে। নিজেদের সুবিধে অসুবিধের চেয়ে মক্কেলের কায হ'ল সকলের আগে।

উপেন।—তার পর বদরদ্দি মিঞা কি আর চাইলেই বই দেবে? যদি কেউ ঘুণাক্ষরে টের পায় যে, বদরদ্দি চুপি চুপি আমাকে বই দিয়েছে, তা হ'লে তার তখনই চাকরী যাবে, আমারও হয় ত জেল হয়ে যেতে পারে।

নটবর।—তা বাপু, নির্ম্মল বাবুর কেসটা যখন হাতে নিয়েছি, তখন সে জন্য যদি জেলে যেতে হয়, যাব। তার জন্যে আর কি? তুমি বদরদ্দিকে বরং ২।১ টাকা—

উপেন।—এ সব কায ২।১ টাকায় হয় না, মশাই। অন্ততঃ দশটি টাকার কমে—

নটবর।—না, না, দশ ফস নয়, পাঁচটি টাকার এক আধলাও বেশী দিও না।

উপেন।—তার পর টাইম নেবার খরচ, পেস্কারের তো কিছু—

নটবর।—দুটি টাকা—ব্যস, আর নয়। মক্কেলের পয়সা নিয়ে যে আদালতশুদ্ধ লোক ছিনিমিনি খেলবে, সে বাপু আমি দেখতে পারবো না। তা হ'লে কত হ'ল? সময় নেওয়ার খরচ গোটা তিনেক, পেস্কার দুই,—পাঁচ, বদরদ্দির পাঁচ—এই দশটা টাকা।

উপেন।—আর আমি বুঝি এখান থেকে হেঁটে জেলা কোর্টে যাব? ট্রেণভাড়া লাগবে না?—না, আপনার কাছে আর আমার দেখছি থাকা হ'ল না।

নটবর।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা ভুলে যাচ্ছিলাম বটে, ট্রেণভাড়া যাওয়া আসার থার্ড ক্লাশের কতই বা? ছ আনা ক'রে বারো আনা। তা হ'লে হ'ল দশ টাকা বারো আনা।

উপেন।—আর সারা দিনটা কি আমি নির্ম্মল বাবুর কাযের জন্যে একাদশী ক'রে কাটাব? এখানকার কায সেরে আড়াইটের গাড়ীতে গিয়ে ফিরে আসতে ত অনেক রাত হয়ে যাবে। এতক্ষণ কি হরিমটর চিবুবো?

নটবর।—পয়সা দুয়েকের কলা আর একখানা পাঁউরুটী ষ্টেশন থেকে কিনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো না হে।

উপেন।—তা, সারা দিনটা নির্ম্মল বাবুর জন্যে মুখে রক্ত তুলে খেটে মরবো, উনি যদি আমার খোরাকী না দিতে চান, নাই দেবেন। ও আর পাঁউরুটীর দরকার নেই মশাই, আমি উপোস করেই থাকবো'খন। অদৃষ্টে দুঃখ না থাকলে কি আর উকীলের মুহুরী হ'তে এসেছি।

নির্ম্মল।—না, না, সে কি! আপনি উপোস করতে যাবেন কেন? সবই যখন দিতে হচ্ছে, তখন আর আপনার খোরাকীটাই বা দেব না কেন?

নটবর।—ব্যস, তবে আর কি? স্যাংসন হয়ে গেল। তা হ'লে এ দিকে হ'ল দশ টাকা বারো আনা। নির্ম্মল বাবু, আপনি বরঞ্চ একটা কায করুন। গোটা পনের টাকা আমার কাছে রেখে যান। ২।১ টাকা বরং বেশী থাকা ভাল, এর পরে ত সব টাকারই হিসেব পাবেন।

নির্ম্মল।—(দুঃখিতভাবে) তাই ত, ক্রমেই জলের মত টাকাগুলো খরচ হয়ে যাচ্ছে, ও আমবাগান—

নটবর।—আহা—দশ পনের টাকাতেই এত কাতর হচ্ছেন, নির্ম্মল বাবু, মামলা-মোকর্দ্দমায় কি টাকার দিকে দেখলে চলে? কেবল জেদ। আপনার পিতাঠাকুরমশাই একবার একটা বড় মোকর্দ্দমায় একশো টাকা কেবল বকসিস্ দিয়েছিলেন।

(নির্ম্মল নিস্তব্ধ রহিল)

কটা বাজলো হে উপেন? রিষ্ট ওয়াচের স্প্রীংটা কেটে গিয়ে ক'দিন থেকে কি অসুবিধেই হয়েছে। বড় ঘড়িটাও গেছে আবার ঠিক এই সময়েই অয়েল করাতে।

উপেন আসিয়া বলিল,—দশটা বাজতে দশ মিনিট।

নটবর।—এ্যাঁ, দশটা বাজতে দশ মিনিট! তা হ'লে ত আর বসবার উপায় নেই, নির্ম্মল বাবু! আমি ততক্ষণ

গিয়ে স্নানটা সেরে নিই গে। উপেন, তুমি তা হ'লে নির্ম্মল বাবুর কাছ থেকে পনেরটা টাকা নিয়ে একটা রসিদ দিয়ে দাও। তার পর তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও। আজ অনেকগুলো বড় বড় কেস রয়েছে। কাগজপত্রগুলো সব ঠিক ক'রে নাও। তোমাকেও আবার আড়াইটের গাড়ীতে যেতে হবে। তা হ'লে নির্ম্মল বাবু, আপনি বসুন, আমি উঠি। আপনার যখন কোর্টে যেতে হ'ল না, তখন ত আপনি ১০৷৪২এর গাড়ীখানাতেই ফিরতে পারবেন। একটু চা খাবেন কি? ওরে—এই হিরুয়া—বেটারা দরকারের সময় যে কোথায় যায়—বেহারীটাই বা আবার কোথায় গেল? আঃ, এ সব দলশুদ্ধ না তাড়ালে আর চলছে না দেখছি।

নির্ম্মল।—পনের টাকা বল্লেন বুঝি?

নটবর।—হ্যাঁ, পনেরটা। ও, দিচ্ছেন? তা হ'লে আমিই রসিদটা লিখে দিয়েই যাই। ওরে ফাউণ্টেন পেনটা কোথায় গেল রে আবার? আঃ জ্বালাতন! কোথায় কোন্ কাগজপত্রের মধ্যে মিশে গেছে। এ যা দেখছি, এক জন জুনিয়ার না রাখলে আর চলে না। দেখি হে উপেন, তোমার দোয়াত-কলমটা—এ কি হে, এ যে কালী নেই এতে—

উপেন।—আর মশাই, রোজ রোজ পাহাড়প্রমাণ কাগজপত্রে লেখালেখি করতে হ'লে দোয়াতের কালী ত তুচ্ছ কথা, পিপের কালীও ফুরিয়ে যায়। যাই, দোয়াতটায় একটু জল দিয়ে আনি।

নটবর।—তাই নিয়ে এসো। ওঃ, নির্ম্মল বাবু, আপনার কাছেই ফাউণ্টেন পেন রয়েছে, দিন ত, দিই একটা আঁচড় টেনে। এমন সব মুস্কিল হয়েছে—

নির্ম্মল।—তাই ত, পনের টাকা ত দেখছি সঙ্গে নেই। বেরিয়েছিলাম অথচ পনের টাকা নিয়ে, কিন্তু রেল ভাড়া বাস্ ভাড়ায় আবার কতক খরচ হয়ে গেল কি না! আপনি বরং দশটা টাকা রাখুন।

নটবর।—(একটু দুঃখিতভাবে) দশটা? হিসেব কত হ'ল হে উপেন? দশ টাকা বারো আনা বুঝি? আর তোমার খোরাকী। গোটা বারো টাকা হবে না কাছে? দেখুন দিকিনি?

নির্ম্মল।—আচ্ছা রাখুন তা হ'লে এই বারো টাকা। কিন্তু বাজে খরচগুলো যেন বড় বেশী হচ্ছে।

নটবর।—কিছু না। এই যে রুলিংটা আবিষ্কার করেছি, এ একেবারে অব্যর্থ।

নির্ম্মল।—যাই হোক, আপনাদের ওপরেই যখন সব ভার, তখন যা ভাল হয়, তাই করবেন। উঠি তা হ'লে এখন।

নটবর।—এই নিন রসিদ। আমার কাছে একটি পয়সার এদিক ওদিক হবার যো নেই। একটু চা খাবেন না? ওরে—

নির্ম্মল।—না, আর এ বেলায় চা খাব না। যাই, ১০৷৪২ খানাই ধরতে হবে। আচ্ছা নমস্কার। উপেন বাবু, বইখানা যাতে পাওয়া যায়, একটু দেখবেন।

উপেন।—আজ্ঞে, সে কথা আর ব'লে লজ্জা দেবেন না।

(নির্ম্মল চলিয়া গেল।)

নটবর।—যাই হোক বাবা। সেরেফ বচনবাজিতে বারোটা টাকা—তাই সই।

উপেন।—ও থেকে কিন্তু পাঁচটা টাকা আমাকে দিতে হবে।

নটবর।—পাঁচটা! কি সর্ব্বনাশ! সে যে প্রায় ফরটি পারসেণ্ট হয়ে যায়।

উপেন।—বাঃ, আমিই ত সব ক'রে কর্ম্মে দিলাম। তা না হ'লে—

নটবর।—সে কথা ত অস্বীকার কচ্ছিনে। কিন্তু আমার অবস্থাটা ত দেখছো? এই নাও ভাই তিনটি টাকা—আর আমার গলায় ছুরি দিও না!

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

ষট্‌পূজা বা সূর্য্য-ষষ্ঠী-পূজা

গত মঙ্গলবার ১২ই নভেম্বর ২৮শে কার্ত্তিক বেলা সওয়া ৬টার সময় প্রাতর্ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া দেখিলাম, দলে দলে স্ত্রীপুরুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সৌখীন বেশভূষা করিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়াছে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে, ঘোড়ার গাড়ীতে বা মোটরে প্রচুর পরিমাণে কলার (পক্ক ও অর্দ্ধপক্ক) কাঁদি চলিয়াছে। অনেক দলে গান হইতেছে। অধিকাংশই বিহারদেশীয় স্ত্রীলোক। সঙ্গে পুরুষ এবং বালক-বালিকাও আছে। সকলেরই অঙ্গে উৎসবের পোষাক। প্রত্যেকেরই মুখে আনন্দের দীপ্তি।

আমরা চারি জন বন্ধুতে চলিতেছিলাম। সকলেই "পঞ্চাশ ও ততোধিক ক্লাবের" সভ্য। আজ অনেক বৎসর ধরিয়া প্রাতর্ভ্রমণ আমাদের নেশা। এই ক্লাবের এমন অনেক সভ্য আছেন—যাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে প্রাতর্ভ্রমণ করিতেছেন। কেহই সামান্য অসুস্থতার জন্য ক্লাবে অনুপস্থিত হন না। বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়িলে অন্য কথা। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত আমাদের ভ্রমণের সময়। মাঠের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে ইডেনগার্ডেনের পশ্চিমদক্ষিণ কোণে আসিয়া একটি বটবৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করি। এখানে ৪।৫ খানি বেঞ্চি পাতা থাকে। এখানে আমরা প্রায় ১৫ হইতে ২০ জন একত্র হই। উদ্দেশ্য—প্রাতর্ভ্রমণের পর খানিকটা সময় আনন্দে কাটাইয়া দেওয়া। রাজা উজীর মারা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সব নীতিরই শ্রাদ্ধ এখানে আমরা প্রত্যহ করিয়া থাকি। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কিরূপভাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হইতেছে, তাহাদের কিরূপ প্রকৃত শিক্ষা হওয়া উচিত, যুবকরা বয়োবৃদ্ধ লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার বা অপব্যবহার করিতেছে, এইরূপ অনেক বিষয়েই আমাদের আলোচনা চলে। সংযত, অসংযত, অভিমত এইরূপ আলোচনা উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই ক্লাবের সভ্যের মধ্যে অনেক রকম লোকই আছেন। ব্যবসায়ী, জমীদার, শাস্ত্রী, অশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী সব রকম শ্রেণীরই লোক আছেন এবং সকলেই একত্র মিলিত হইয়া ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের এই ক্লাবের নূতনত্ব এই, যদিও ৫০ ও ততোধিক বর্ষের ক্লাব বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের পরিচয়, তথাপি সদস্য করিবার সময় অন্য বিষয়ে উপযুক্ত অর্থাৎ খুব হাঁটিতে পারিলে আর অবাধে আলোচনা অর্থাৎ বকিতে পারিলে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ধরাট্ (grace) দিয়া থাকি। অর্থাৎ দুই এক জন ৪৫ বয়স্কেরও সভ্য এই সভাতে আছেন। এই ক্লাবের সভ্যবৃন্দের একটি তালিকা দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমাদের এই ক্লাবে রকমারী সদস্য আছেন। বিত্তহীন হইতে আরম্ভ করিয়া মহাবিত্তশালী সকলেই আছেন। এই ক্লাবের একটি তালিকা দিতেছি। এই তালিকা গুণানুসারে বা বর্ণমালা অনুসারেও নয়। লেখকের খেয়ালের অনুযায়ী। ইহার মধ্যে অনেক ইন্দ্র আছেন, অনেক চন্দ্র আছেন, অনেক নাথ আছেন, অনেক দাস আছেন, অনেক লাল আছেন, লালাও বাদ পড়েন না।

১। শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী—বালটিকারী সদানন্দ মঠের আড্ডাধারী। ইনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন। নিজের ছেলের মুখ কখন দেখেন নাই, পরের ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য সদাই ব্যস্ত।

২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গভর্ণমেণ্ট পেন্‌সানার।

৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—গভর্ণমেণ্ট পেন্‌সানার।

৪। শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইহার বাটী বালিগঞ্জ পার্ক ইষ্ট। ইনি তাঁহার অমূল্য সময় চাষবাসের কথা লইয়া অতিবাহিত করেন। জমীদার লোক, অনেক জমীদারী আছে, সেখানে নিজের খেয়ালে কার্য্য করিতে পারেন।

৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু—ইনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার জগবন্ধু বসু এম, ডি মহাশয়ের পুত্র। নম্রতা হেতু নিজেকে হরিদাস বসু বলিয়াও পরিচয় দেন। যাবতীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের ইতিহাস ইহার নখদর্পণে আছে।

৬। শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ ধর—আমড়াতলা প্রসিদ্ধ ধরবংশের এক জন মেধাবী পুরুষ। স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ উকীল ও এটর্ণী বাবু আশুতোষ ধরের নিকট-আত্মীয়। তিনি এক জন বিশেষ গুণী জহুরী, শুধু হীরা-জহরতের নয়, মানুষেরও। কলিকাতার অধিকাংশ লোকের জীবনলীলা ইহার নখদর্পণে। ইনি হালে একটি ডিগবাজী খাইয়াছেন। আমড়াতলা হইতে তারাসুন্দরীতলায় আসিয়া বাস করিতেছেন।

৭। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়—ইহার নিবাস জোড়াসাঁকো রাজবাটী। ইহার পিতা রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় কলিকাতা করপোরেশানের এক জন বিশিষ্ট কমিশানার ছিলেন। তাঁহার জন্ম উচ্চবংশে, তবে তিনি নিজে পোষ্যপুত্র ছিলেন, কুমার রাজেনকেও পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ভগবানের দয়াতে তাঁহাদের এখন আর পরের ছেলে ধরিয়া বাপ বলাইতে হয় না। তিনি এখন অনেকগুলি সুসন্তানের পিতা—গুণী, সদনুষ্ঠানে সদাব্রতী। ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল্ সোসাইটীর, ইণ্ডিয়ান কমিটির আবাসস্থান তিনি বিনা ভাড়ায় দিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্ কমিটির বিশিষ্ট সভ্যদিগকে প্রত্যেক সভার দিনই তিনি ভোজ দিয়া থাকেন, অবশ্য তাঁহার নিজের অর্থে। তাঁহার মত সদাচারী, সমাজসেবী লোক পাওয়া আজকালকার দিনে দুর্ল্লভ।

৮। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল মল্লিক—জমীদার বাঁশতলা। সুবর্ণবণিকের অধিকাংশ বড় লোকই ইহাদের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি ৺রামসেবক মল্লিকের পুত্র ও ৺জগমোহন মল্লিক মহাশয়ের পৌত্র।

৯। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস নন্দী—গ্রেট ইণ্ডিয়ান মটর ওয়ার্কসের প্রোপ্রাইটার। ঠিকানা ৮নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস্ ইষ্ট। ব্যবসাদার হিসাবে ইহাকে এক জন ইনডাষ্ট্রীয়ালীষ্ট (Industrialist) বলা যায়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইহার স্থান অনেক উচ্চে। লোক হিসাবে অতি অমায়িক।

১০। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ চন্দ্র—এটর্ণি-এট-ল। ইঁহার বাটী তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট। অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক এবং দায় অদায়ে অনেকেই ইঁহার কাছে হাত পাতিয়া থাকে। ইঁহার পুত্রভাগ্য কম নহে। জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু কালাচাঁদ চন্দ্র এটর্ণিসিপ্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্ত পুরস্কারের পুস্তকাবলী মুটিয়া সাহায্যে গৃহে আনিতে হইয়াছে।

১১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত—এটর্ণি-এট ল। বাটী মেছোবাজার ষ্ট্রীটে। অনেক সময় দেখা যায়, শুধু লক্ষ্মী দয়া করেন, ষষ্ঠী দয়া করেন না। শরৎবাবুর প্রতি মা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মা ষষ্ঠী সকলেই সমান দয়া করিয়াছেন—দয়াতে কেহই কার্পণ্য করেন নাই।

১২। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানী—বাটী কৈলাস বোস ষ্ট্রীট। ইনি এক জন ধনী ও মানী কলিকাতাবাসী। ইঁহার বিশেষত্ব এই যে, ইনি ধূলা ছুঁইলে সোনা হইয়া যায়। নিজ-হাতে যথেষ্ট অর্থ করিয়াছেন। লোক হিসাবে অমায়িক।

১৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী—ইনি শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য শাস্ত্রী বলিয়া পরিচিত। মুখুয্যে মশাই, চাটুয্যে মশাই, ও শাস্ত্রী মশাইয়ের অনুপস্থিতিতে আমরা বিশেষ ফাঁকা মনে করি। আমরা অবাধ ও বেপরোয়া কথাবার্ত্তা ও সামাজিক ব্যক্তির মুণ্ড চর্ব্বণ করিতে যাইলে ইঁহারাই আমাদের আটক করিয়া রাখেন।

১৯। বেণীমাধব সিং—ইলেকট্রীসিয়ান (Electrician) "সিংহ এণ্ড কোম্পানীর" প্রোপ্রাইটার।

২০। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র শীল—অনেক সদ্গুণভূষিত অমায়িক ভদ্রলোক।

ইঁহারাই হইলেন সাধারণ, আটপৌরে বা পেশাদার সভ্য। ইহা ছাড়া অনেক সৌখীন বা পোষাকী সভ্য আছেন—যাঁহারা সময়ে সময়ে দলে যোগ দেন, অন্য সময়ে সরিয়া পড়েন।

এমন কোন বিষয় নাই—যাহা এই ক্লাবের সভ্যরা আলোচনা করেন না। তাঁহাদের পক্ষে কোন নীতিই কূটনীতি নয়।

উপবিষ্ট—বামদিক হইতে—কুমার রাজেন্দ্র রায়, নিত্যাইবর, বিষ্ণুচন্দ, তারকসাধু, শরৎ দত্ত, সপুত্র তারিণী লাহা, সতীশ শাস্ত্রী (ক্রোড়ে সুধা), স্বামী সদানন্দ, মহেন্দ্র শ্রীমানী, রণেন্দ্র ঠাকুর, বেহারী মল্লিক, বেণী সিং।
দণ্ডায়মান—শচীন বাবু, কৃষ্ণ নন্দী, প্রতাপ বাবু প্রভৃতি।

১৩। শ্রীযুক্ত পান্নালাল দত্ত—আই, এস, ও। (I. S. O.) নরেন্দ্রনাথ সেন পার্কের। ইঁহার স্বভাব সুন্দর, প্রকৃতি নম্র।

১৪। শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দে—ইনি "সেন কোম্পানীর" মালিক।

১৫। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সেন—ইনি "সেন ব্রাদার্সের" অন্যতম স্বত্বাধিকারী।

১৬। শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক মহাশয়ের এক জন সেনাপতি। (Lieutenant) মল্লিক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে এই সভ্যবৃন্দ লইয়া তাঁহাকে কার্য্য চালাইতে হয়।

১৭। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ লাহা—ইনি কলিকাতার প্রথিতনামা লাহা বংশের এক জন কৃতী সন্তান। অনেক ধনের অধীশ্বর হইয়া কিরূপে সাধাসিধাভাবে চালাইতে হয়, তাহা ইঁহাকে দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

তারিণীচরণ লাহা মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র লাহা ও তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা আমাদের ক্লাবের পোষাকী সভ্য।

সভ্যরা বয়োবৃদ্ধদের মান্য যথেষ্ট দিয়া থাকেন। ক্লাবের প্রেসিডেণ্টের বয়স ৭১ বৎসর। এই ক্লাবের একটি বিশেষত্ব—গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে নূতন সভ্য আদৌ হয় নাই। কারণ, যদি দুই এক জন লোক আসিয়া জোটেন, দু'মাস, চারমাস, ছ'মাস প্রাতর্ভ্রমণ করেন। তার পর সরিয়া পড়েন। অনুসন্ধানে জানা যায়, তাঁহারা শারীরিক অসুস্থতা হেতু এই ক্লাবে আসিতেন, অপেক্ষাকৃত একটু ভাল আছেন, সাংসারিক সুখের মায়া কাটাইয়া প্রত্যহ ৬০ মিনিট হইতে ৯০ মিনিট বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইতে নারাজ—বিশেষ এই ময়দানে। কেহ বা সাময়িক মনের বিকার হেতু এই ক্লাবে আসিয়া যোগ দেন, তবে ধোপে টেঁকেন না, অর্থাৎ ছয় মাসের বেশী তিনি চলেন না। কাহারও স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়াছেন, প্রাতঃকালে প্রাণটা হু হু করে, তাই এই ক্লাবে আসিয়া যোগ দেন। কারণ, যদিও সভ্যরা বয়োবৃদ্ধ, তাঁহাদের প্রাণে এখনও স্ফূর্ত্তির তুফান খেলে—সরস নীরস সব

বিষয়ে আলোচনা করেন। এমন ধর্ম্ম নাই—যাহা তাঁহারা প্রত্যেক দিন ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে শিরভক্ষণ না করেন। শাস্ত্রচর্চ্চা—সে ত শাস্ত্রী মহাশয় আছেন আর ব্রহ্মচারী মহাশয় আছেন, তাহা ছাড়া সদাচারী কদাচারী কথাচারী তাহারও অভাব নাই। আইনচর্চ্চা—তাহা তাঁহারা বেপরোয়া ভাবেই করিয়া থাকেন। কারণ, জজ উপস্থিত থাকেন না—তাহাদের ভুল ধরিয়া দিবার জন্য। জজও মাঝে মাঝে এখানে আসেন, তবে আইনের চর্চ্চায় যোগ দেন না। সমাজ-সংস্কার—ইঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিলে এত দিন সমাজ তোলপাড় হইয়া যাইত। অর্থনীতি—তাহাও এ ক্লাবে ফেলা যায় না। চন্দ্রমহাশয় এ বিষয়ে এক জন করিতকর্ম্মা লোক। ব্যবসানীতি—প্রকৃষ্ট ব্যবসায়ী নন্দীমহাশয় আছেন। জমীদার—এই দলের মধ্যে প্রকৃত জমীদার মল্লিক মহাশয় ব্যতীত সকলেই জমীদারী বিষয়ে আলোচনা করেন। পুরাতন বিষয়ে, পুরাতন সময়ের ও পুরাতন পাথরের উৎকৃষ্ট জহুরী, নিতাই বাবু সেখানে বিদ্যমান আছেন। তিনি জহুরী হিসাবে খুব ভাল। শুধু সোনা-রূপা কষ্ঠিপাথরে ঘষিয়া লন না, মানুষকেও কষ্ঠিপাথরে ঘষিয়া লন। মুখুয্যে মশাই ও চাটুয্যে মশাই ইঁহারা দু'জনেই মিষ্টভাষী ও সদ্‌গুণের অনুসন্ধানী। দোষ অনুসন্ধান তাঁহাদের চরিত্রে খাপ খায় না। রাজবংশের কুমার নিজে জমীদার হইলেও জমীদারীর কথা কহেন না। দত্ত মহাশয় ও চন্দ্রমহাশয় এটর্ণী হিসাবে প্রথিতনামা,—তবে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার এক সংসারে দুটি জামাতার ন্যায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশিষ্টতা-প্রমাণে ব্যস্ত।

অস্থায়ী সভ্য অনেক গুণী মানী ধনী লোক আছেন। তাঁহারা জোয়ারের ন্যায় আসেন এবং ভাটার ন্যায় মিলাইয়া যান। এই "পঞ্চাশ ও ততোধিক সভার" পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা আছে এবং ভবিষ্যতে চেষ্টা করিব।

যাক্, আসল কথা দূরে পড়িয়া আছে, তাহাকে অনেক দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। তাহার কথাই কিছু বলা হউক। লাট সাহেবের প্রতিবেশী ব্যবসায়ী সভ্য বলিয়া উঠিলেন,"এটা কাহার-কুর্ম্মীর পূজা। যাহারা হাতে খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, সেই সব লোকেরই জন্য এই কলা দেবতার পূজা।"

আমি বলিলাম, "কলা দেবতা কেন?"

উত্তর হইল, "দেখিতেছ না গাড়ী গাড়ী কলা যাইতেছে?—কাঁচা পাকা পুষ্ট অপুষ্ট সকল রকমই কলা যাইতেছে। আমরা যে সব দ্রব্য দেবপূজায় দিয়া থাকি, কলা তাহার মধ্যে প্রধান। ইহা নারায়ণের পূজায়, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী সকল পূজাতেই আছে। এই কাহার-কুর্ম্মীদের পূজায় লাগে। এই পূজার নাম কলাপূজা দিলে কিরূপ হয়?"

আমি বলিলাম, "মন্দ হয় না। বালক ও বৃদ্ধদের উদর-পূরণার্থে কলাপূজা আর নব্য যুবকদের 'কলার পূজা'।"

প্রতাপ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কই, এ পূজা ত ভদ্রঘরে দেখা যায় না।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, অজ্ঞতার একটা সীমা আছে। কিন্তু আমাদের এই সভার সভ্যদের অজ্ঞতার শেষ নাই। যেমন জ্ঞানেরও শেষ নাই, তেমন অজ্ঞানেরও শেষ নাই।

ষট্‌পূজা কাহার-কুর্ম্মীদের ঠাকুরপূজা, বন্ধুর এই কথার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এক জনের দোষ অশাস্ত্রীয় অহমিকা জ্ঞান, আর এক জনের অজ্ঞতা। দুই তুল্যমূল্য। আমি আমার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "নন্দী মহাশয়, আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক নয়। এই কলার পূজা এক হিসাবে পক্ব কদলীর পূজা বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহাতে ভগবানের বিভূতি নিহিত আছে। আমরা যে তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করি, তাহাতে সেই মৃত্তিকা ও প্রস্তরনির্ম্মিত দেবতার মূর্ত্তির পূজা করি না, তাহাতে ভগবানের যে প্রতিভা নিহিত আছে, তাহারই পূজা করি। প্রত্যেক হিন্দু একেশ্বর-বাদী। আমরা একেশ্বর বিনা একাধিক ঈশ্বরের বিষয়ে কখনও বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর এক, তবে তাঁহার বিভূতি ভিন্ন ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়। বেদেও একই ঈশ্বরের কথাই লিখিত হইয়াছে। যদিও বেদে অগ্নি, বায়ু ও বরুণ পূজার কথা আছে—ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য পূজার কথাও আছে, তাহা ভগবানের বিভিন্নরূপে বিকাশের পূজা। পূজা একই ঈশ্বরের, যদিও ভিন্ন ভিন্ন নামে তাহা করা যায়। আমি তখন আমার বন্ধুদের বলিলাম, "ভাই, এ কলার পূজা নয় এ ষট্‌পূজা বা ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্যদেবের পূজা—যাহাকে সাধারণে "সূর্য্যষষ্ঠী" পূজা বলিয়া থাকে। ইহা প্রত্যেক হিন্দুরই পূজা। এই পূজার ইতিহাস এইরূপ :—

যখন পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীকে লইয়া বনবাস করিতেছিলেন, তখন সতী দ্রৌপদী ধৌম্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন—"তাত, কি করিলে আমাদের কষ্টের লাঘব হইবে?" তাহাতে ঋষিরাজ বলিলেন—"তোমরা শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্যদেবের পূজা কর, তাহা হইলে তোমাদের কষ্টের লাঘব হইবে।"

সেই দিন হইতেই প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে হিন্দুরা সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া থাকেন। ইহার চলন বিহারেই বেশী। ষষ্ঠী তিথিতে ষট্‌পূজা, পরবর্ত্তী নবমীতে জগদ্ধাত্রীপূজা। পূজা সেই ভগবানেরই। সূর্য্যদেবের মধ্যে ভগবানের জ্যোতিপূজা—আর জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তির মধ্যেও সেই ভগবানের পালয়িত্রী জ্যোতির পূজা। তবে এই ষট্‌পূজায় একটু নতুনত্ব আছে। সকলেই উদীয়মান রবির পূজা করে। অরুণোদয়ের পূজা করে, কিন্তু যখন সূর্য্যদেব অস্ত যান, সেই অস্তগামী সূর্য্যের পূজা এই ষট্‌পূজাতেই হইয়া থাকে। এই ষট্‌পূজা—পূজাকামী ভক্তরা সকলেই অস্তমিত সূর্য্যের উদ্দেশে পূজা করে। ইহা দুই দিবস-ব্যাপী। প্রথম দিনে অপরাহ্নে অস্তগামী সূর্য্যের পূজা, দ্বিতীয় দিন প্রাতে বালার্কের পূজা। প্রবাদ আছে যে, এই ষট্‌পূজা করিলে কুষ্ঠব্যাধি হইতে লোক উদ্ধার পায়। ভগবানের তেজের পূজার মর্ম্ম এই। তা সূর্য্যদেবেরই হউক আর অগ্নিতেই হউক, আর বায়ুতেই বা বরুণদেবেই হউক। এই সকল ভূতের মধ্য দিয়া ভগবানের পূজা করিয়া থাকি।

পার্শিরাও সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া থাকে। বালার্ককে প্রণাম করে। সেই প্রণাম ভগবানের উদ্দেশে।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

নিষিদ্ধ উপকূল

ফরাসী উপনিবেশ ডিবোটি

ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের উত্তরভাগে ডানকালি অবস্থিত। এডেন উপসাগরের বেলাভূমি হইতে এই অঞ্চলের আরম্ভ। ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের ওবক্ বন্দর হইতে জলযানে আরোহণ করিয়া বাবেলমণ্ডব প্রণালী পার হইয়া ডানকালি গমন করা যায়। ডানকালি উপকূলে কোনও শ্বেতাঙ্গের প্রবেশ কিছু কালের জন্য নিষিদ্ধ। শ্বেতকায়-দিগের প্রতি ডান্‌কালিগণের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা বিদ্যমান। উহারা নিজদেশে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবার ঘোর বিরোধী। ফরাসীরাও তাহাদিগকে শান্তশিষ্ট করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস স্বীকারও করেন নাই।

আলটেয়ার নৌকা

আইডা ট্রিট্ নাম্নী কোনও মার্কিণ লেখিকা কৌশলে ডান্‌কালি অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। কোনও নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়া তিনি জলযান-যোগে ডানকালি অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। অজানাকে জানিবার কৌতূহল তাঁহাকে এমনই অভিভূত করিয়াছিল যে, ছদ্মবেশে পর্য্যটনের স্পৃহাও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিবরণ "মাসিক বসুমতীর" পাঠক-পাঠিকাবর্গের তৃপ্তিবিধান করিবে ভাবিয়া আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

এককালে ওবক্ ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী ছিল। ইদানীং ডিবোটিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ওবকের পূর্ব্ব-গৌরব এখন নাই। আলটেয়ার নামক পোতের অধ্যক্ষের বাসভবন এবং একটি শ্বেত অট্টালিকা ব্যতীত ওবক্‌এ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন অট্টালিকা এখন নাই। শেষোক্ত

অট্টালিকায় এক জন ফরাসী সার্জ্জেণ্ট এবং কতিপয় সোমালি সৈনিক বাস করিতেছে। ঔপনিবেশিক ফরাসীদিগের আর কেহ এখন তথায় বাস করে না।

কিন্তু দেশীয়দিগের গ্রামগুলি এখনও বেশ ভালই আছে। বাসভবনগুলি কুটীর মাত্র। অনেকগুলি কুটীর ঘন-সন্নিবিষ্ট। কুটীরের প্রাচীর তালপত্র-নির্ম্মিত। গ্রামের অদূরে বালুকাপূর্ণ মাঠ। সমুদ্রগর্ভ হইতে অধিবাসীরা মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। ওবক্‌এ মৎস্যই প্রধান খাদ্য। কারণ, মরুভূমিতে কোন খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয় না। মাঝে মাঝে চাউল ও খর্জ্জুর তথায় পাওয়া যায়। পারস্য উপসাগর পথে নৌকাযোগে ঐ সকল খাদ্য এখানে আনীত হইয়া থাকে। তৃণগুল্ম ও ঝোপের মধ্যে দুই চারিটা হরিণ বা ছাগল দেখিতে পাওয়া যায়। ছাগদুগ্ধ এবং মৃগমাংস উৎসবভোজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তীর-ধনুকের সাহায্যেই প্রধানতঃ মৃগ শিকার হইয়া থাকে। বন্দুকের গুলী কদাচিৎ এ সব কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ফরাসী সোমালিগণের নারীগণ

শেখ ইসা নামক এক জন প্রসিদ্ধ ডানকালির পরিচয় হয়। উপকূলভূমিতে এই ব্যক্তি বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বলিয়া লেখিকা শুনিয়াছিলেন। আইডা ট্রিট যখন ওবক্‌এ অবতীর্ণ হন, তখন তথায় কাল বসন্ত-রোগ প্রবল প্রতাপে বিরাজিত ছিল। প্রতিদিনই নূতন লোক আক্রান্ত হইতেছিল।

ক্ষীণদেহ, শীর্ণকায় কোন কোন ডানকালিকে ওবক্‌এ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কটিদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ছোরা। উহাদের চরণে খোলা সাণ্ডাল জুতা—দুই পাশে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। এক হস্তে চামড়া-নির্ম্মিত জলপাত্র। লোকগুলি দীর্ঘকায়, গঠনসৌষ্ঠব প্রশংসনীয়, মাথার কেশ কুঞ্চিত। উহারা সেমিটিক-জাতীয় কৃষ্ণকায় মানুষ, নিগ্রো-রক্ত তাহাদের দেহে প্রবাহিত থাকিতে পারে, কিন্তু নিগ্রোদিগের আকৃতির সহিত সৌসাদৃশ্য নাই। তাহাদের ব্যবহারে গর্ব্ব এবং আত্মাভিমানের পরিচয় সুস্পষ্ট।

ওবক্‌এ লেখিকার সহিত

আলটেয়ার নৌকার দাঁড়ি

খরআলির বালক ময়দা পিষিতেছে

কুটী প্রস্তুত

কিন্তু অধিবাসীরা সে জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ভগবানের উপর তাহাদের বিশ্বাস অনন্ত। বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হইয়া কেহ ওবক্‌এ আসিলে, সহর হইতে অর্দ্ধ-মাইল দূরবর্ত্তী কোন একটি কুটীরে তাহাকে ভগবানের নামে ফেলিয়া রাখা হয়। আয়ু থাকিলে সে বাঁচে। একটি বৃদ্ধা নারী রোগীদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে। সে সকলকে পথ্য প্রদান করে এবং ক্ষত ধৌত করিয়া দেয়।

মাঝিদের কেশপ্রসাধন

শুক্তি ও প্রবাল-সংগ্রহে দেশীয়

আইডা ট্রিট ডানকালি গমনের সময় আরব রমণীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। এই পরিচ্ছদে তাঁহাকে চমৎকার মানাইয়াছিল। পাছে কেহ তাঁহাকে য়ুরোপীয়া নারী বলিয়া সন্দেহ করিতে না পারে, সে জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এই প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল।

আল্‌টেয়ার পোত হইতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি আব্‌দি ও কাসেম নামক দুই জন দেশীয় সহচরের সঙ্গে নিষিদ্ধ উপকূলভূমিতে বিচরণ করিতে থাকেন। চারিদিকে পাহাড় ও মালভূমির বিচিত্র সমাবেশ। বহুদূরে সমুদ্রের নীল সলিল-বিস্তার। কিছুদূরে আসাল নামক লবণ-হ্রদ।

তাঁহার জনৈক সহচর তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, এই হ্রদদর্শন তাঁহার পূর্ব্বে কোনও শ্বেতাঙ্গের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মালভূমিতে বহু মৃগ বিচরণ করিতেছিল।

লেখিকা সহচরগণসহ টাড্‌জোরা অভিমুখে জলযানে গমন করিতে লাগিলেন। এ অঞ্চলে কোনও শ্বেতাঙ্গের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পথের মাঝে মাঝে তাঁহারা ডানকালি কৃষক ও ছাগপাল দেখিতে পাইতেছিলেন। বালুকা-রাশির মধ্যে তালকুঞ্জও দেখা যাইতেছিল।

ক্রমে ডানকালির প্রধান নগর টাডজোরা তাঁহাদের দৃষ্টি-পথে ভাসিয়া উঠিল। সন্নিহিত মসজিদ হইতে প্রার্থনার শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। তীরে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা রাজপথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। আব্‌দি ও কাসেম বন্দুক-স্কন্ধে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

ক্ষুদ্র অপরিসর পথে চলিবার সময় তাঁহারা এক দল ডানকালির সম্মুখে পড়িলেন। তাহারা তাঁহার সঙ্গীদিগকে
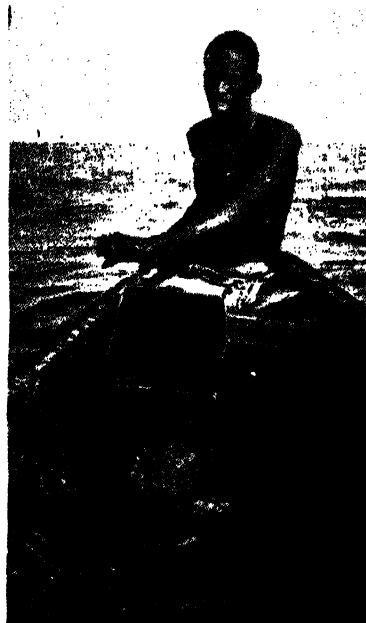
জিবোটির সুদৃশ্য ফরাসীভবন

সম্ভ্রমভরে অভিনন্দিত করিল। মরু-উদ্যান হইতে অনেক নারী চর্ম্মনির্ম্মিত আধারে জল ভরিয়া লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। এক দল বালক-বালিকা তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল; কিন্তু আব্দি কি একটা কথা বলিতেই তাহারা পলাইয়া গেল।

য়ুরোপীয় সহরগুলি যেরূপ আবর্জ্জনাপূর্ণ, এখানে লেখিকা তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়াছিলেন। পথের দুই ধারে বালিয়াড়ি। বাতাসের প্রভাবে তাহারা যেন তরঙ্গায়িত। সহরের উপকণ্ঠে আসিয়া একটি তোরণ পার হইয়া তাঁহারা একটা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। তথায় দুই জন নারী প্রায় এক ডজন দুগ্ধবতী ছাগীর দুগ্ধ দোহন করিতেছিল। একটি কুটীরের মধ্যে এক জন গুম্ফশ্মশ্রুধারী ডানকালি হুঁকায় তামাকু সেবন করিতেছিল।

নবাগতাকে দেখিয়া অতিথিসৎকারের উদ্দেশ্যে অন্যান্য নারীরা তালপত্রনির্ম্মিত চাটাই লইয়া আসিল। উহাতে নানাবর্ণের সমাবেশ আছে। লেখিকা কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভূমিতলে সমানভাবে শঙ্খরাজি বিস্তৃত। আসবাবপত্রের মধ্যে

সোমালী প্রবাল-সংগ্রাহকগণ

ঠেলাগাড়ীতে মাল-বহন

ডানকালি-দম্পতি

ডান্‌কালি কলসীর শ্রেণী এবং চাটাই। কলসীগুলি চর্ম্ম দ্বারা আবৃত। প্রত্যেক ঘরেই ধুনা-গুগ্‌গুলের গন্ধ।

ডানকালিরা ধুনা-গুগ্‌গুল প্রচুর পরিমাণে পুড়াইয়া থাকে। জীন দৈত্য নাকি ইহার গন্ধে তিষ্ঠিতে পারে না। জীন দৈত্য বালক-বালিকাদিগের পরম শত্রু। এই দৈত্যই যাবতীয় অনিষ্টের মূল কারণ। ডানকালিদিগের বিশ্বাস, জীনরা তাহাদের যাবতীয় ক্ষমতা শ্বেতকায়কে অর্পণ করিয়াছে। উহারাই বসন্তরোগ, দুর্ভিক্ষ এবং নানাপ্রকার মহামারী লইয়া আইসে। উহাদেরই জন্য ডানকালি দম্পতিরা বন্ধ্যা হইয়া পড়িতেছে—ক্রমেই তাহাদের জনসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

বন্ধ্যাত্বের জন্য ডানকালি নারীরা জীন দৈত্যকে অত্যন্ত ভয় করে। সকাল ও সন্ধ্যায় সে জন্য তাহারা ধুনাচিতে ধুনা-গুগ্‌গুল নিক্ষেপ করে। উহার ধূমে দৈত্য পলায়ন করিয়া থাকে।

জীন দৈত্যের আশঙ্কা নারীদিগের মধ্যে এত অধিক যে, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলেও নারীরা জননেন্দ্রিয়কে কণ্টক দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখে। সাত বৎসরের ডানকালি বালিকাকে এইরূপে জীন দৈত্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা জানিতে পারিলে ঐ ভাবে জীন দৈত্যের প্রভাব প্রতিহত করে। বর্ষীয়সী
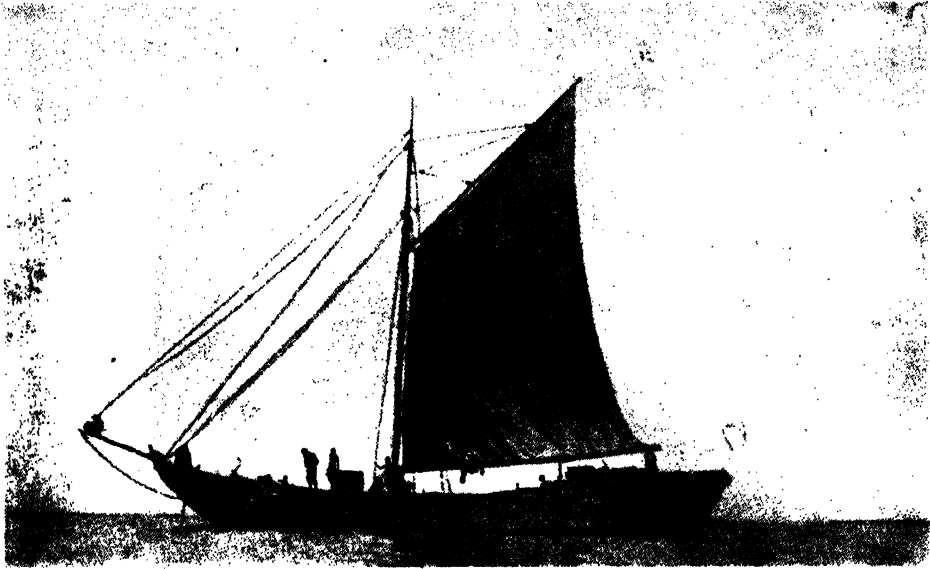
আরব-নৌকা

মুক্তা-সংগ্রহ

টাডজোরার পথের দৃশ্য

ডানাকিল গ্রামের কুটীরশ্রেণী

নারীরাও নিরাপদে থাকিবার জন্য ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।

জীনভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর একটা প্রথাও আছে। ঐন্দ্রজালিকা কোনও বিবাহিতা তরুণী যুবতীকে রুদ্ধদ্বার অন্ধকার কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া থাকে। তখন বাহিরে ঢাকের শব্দ, নৃত্য ও চীৎকার চলিতে থাকে।

পুরুষরা কিন্তু এই ব্যাপারটা—জারপ্রথা বলে—সুদৃষ্টিতে দেখে না। কারণ, প্রায়ই দেখা যায় যে, তরুণী পত্নী ঐরূপ প্রক্রিয়ার পর অস্থায়িভাবে উন্মাদরোগাক্রান্তা হইয়া পড়ে। কিন্তু কণ্টকবেধের ন্যায় এই 'জার' উৎসব ডানকালিদিগকে করিতেই হইবে। বৎসরে একবার করিয়া প্রত্যেক যুবতীকে উহা পালন করিতে হয়। কোনও স্বামী প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না। পাছে দৈব-বিড়ম্বিত হইতে হয়, ইহাই প্রধান আশঙ্কা।

টাড্জোরার রাজপথে কোনও শ্বেত সৈনিক দেখা দিলে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, সৈনিককে দেখিবামাত্র বালখিল্যের দল তাহাকে তাড়া করে, ধূলা ও কাদা তাহার দিকে নিক্ষেপ করে। সৈনিক প্রতিবাদ করিতে গেলেই তখনই অস্ত্রধারী অভিভাবকের দল তাহাকে তাড়া করিয়া আসে। ইহাতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এজন্য ফরাসী সরকার কোনও সৈনিককে ডানকালিতে অবতীর্ণ হইতে দেন না। তবে সেনাদলের সমবেত অবতরণে বাধা নাই। সুলতানের উপর দেশীয়দিগের তেমন আস্থা নাই। তিনি নাকি শ্বেতাঙ্গদিগের অর্থে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সুলতান যদি কোনও য়ুরোপীয়ের রক্ষার জন্য এক শত সৈনিক নিযুক্ত করেন—তাহার অধিক তাঁহার সামর্থ্যের অতীত, ডানকালিরা সে ক্ষেত্রে

ডিবোটার গায়ক

ডিবোটির তাঁতি

জলমগ্ন শৈল-সমাকীর্ণস্থানে নৌ-পরিচালনা

কুটীরাভ্যন্তরস্থ দেশীয়গণ

পাঁচ হাজার সশস্ত্র পুরুষ নিয়োগ করিতে পারে।

টাডজোরা হইতে লেখিকা খর আলিতে গমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি নানাপ্রকার প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্র কুড়াইয়া পান। প্রত্যেকটি প্রস্তর-যন্ত্র যত্নপূর্ব্বক নির্ম্মিত বলিয়া তাঁহার অনুমিত হয়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মানব এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিত। বর্ত্তমান যুগের লোক উহার ব্যবহার জানে না। লেখিকা অনেকগুলি এইরূপ যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন।

'আলটেয়ার' নৌকায় সে দিন কেশ-প্রসাধনের ব্যাপার ছিল। যুবক ডান-কালিরা কদাচিৎ কেশরাজিতে চিরুণী ব্যবহার করিয়া থাকে। কেশরাজি আপনা হইতে বর্দ্ধিত হউক, ইহাই তাহাদের রীতি। মাঝে মাঝে তাহারা কেশে মাখম ও লেবুর রস মাখাইয়া থাকে। ইহাতে চুল বেশ মসৃণ থাকে।

উহারা প্রায়ই দেহে মাখম ব্যবহার করিয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপে এজন্য চামড়া ফাটিয়া যায় না। বৃষ্টির দিন মাখমের জন্য গায়ে জল বসিতে পারে না। আলটেয়ারের মাঝি-মাল্লারা সকলেই মাখম ব্যবহার করিয়া থাকে। নৌকার মাঝিমাল্লারা মুসলমান। ইহারা হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া কখনই কোনও খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে না। ভোজন-শেষেও বেশ ভাল করিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া থাকে। প্রতিদিন ইহারা বহুক্ষণ ধরিয়া জলে অবগাহন করিয়া থাকে।

খর আলি হইতে যাত্রা করিয়া লেখিকা সন্ধ্যাসমাগমে আঙ্গরে নৌকা নোঙ্গর করিতে দেখেন। এখানকার বন্দরে

ডিবোটাতে সেলাইকল

জনৈক ডানকালি পুরুষ
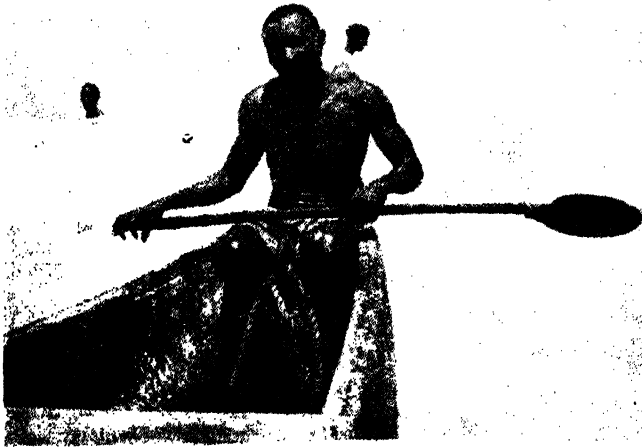
ডানকালি নাবিক

আরব রমণীর পরিচ্ছদে লেখিকা

নৌকা বাঁধিয়া তাঁহারা সারারাত্রি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। সকালে আলটেয়ারের অধ্যক্ষের সহিত লেখিকা তীরে অবতীর্ণ হইবামাত্র ৬ জন সোমালী এবং এক জন কৃষ্ণবর্ণ নায়ক বন্দুক হস্তে খাকী পোষাকে প্রশ্ন করিল, তাঁহারা কে? প্রচুর পরিমাণে চুরুটিকা বিতরণের পর তাহারা তাঁহাদিগকে বাধা দিল না।

তাঁহারা কতকগুলি কুটীর দেখিতে পাইলেন। একটা বড় কুটীর হইতে এক জন লোক বাহির হইয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল। লেখিকা ইহাকে চিনিতে পারিলেন। ওবক্এ এই শেখ ইসার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

গত পূর্ব্ব দিবস জেবেল ঘিন পর্ব্বত চূড়া হইতে সে তাঁহাদের নৌকা দেখিতে পাইয়া সারারাত্রি হাঁটিয়া আঙ্গরেএ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। শেখ ইসা

পত্নী আছে। কিন্তু আঙ্গরের কুটীরের বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না! সাধারণ কুটীরের মতই বৈশিষ্ট্যহীন।

তাহার কুটীরে পৌছিলে, একটি সুন্দরী যুবতী উষ্ট্রদুগ্ধ লইয়া আসিল। তাহার অঙ্গে আরবী রেশমের পরিচ্ছদ। কর-প্রকোষ্ঠে ও বাহুর অন্য স্থানে, তাম্রকঙ্কণ, কর্ণে রৌপ্য দুল! তাহার সঙ্গে একটি নগ্ন শিশু ছিল, এটি শেখ ইসার পুত্র।

লেখিকা ও তাহার সঙ্গীকে দুগ্ধ দিয়া সেই যুবতী পত্নী সেখান হইতে চলিয়া গেল। শেখ ইসা তখন বসিয়া বসিয়া

আলটেয়ারের সর্দ্দার-মাঝি

নৌকার উপর ধৃত শুশুক

লেখিকাকে গল্প বলিতে লাগিল। ইথিওপিয়া ও আরবে দাস-ব্যবসায় কি ভাবে চলিত, তাহারই কাহিনী সে বিবৃত করিতে লাগিল। তার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর লেখিকা কোথায় গমন করিবেন। উত্তরে সে যখন শুনিল যে, বাবেল-মণ্ডব প্রণালী উত্তীর্ণ হইয়া আরবদেশের খর ও মেডিয়ার দিকে তাঁহারা যাইবেন, তাহাতে সে বলিল যে, সে অঞ্চলে বিপদের আশঙ্কা আছে। আবদেল হাইয়ের দোহাই দিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। শুধু এক জন তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। সে ব্যক্তি স্বয়ং শেখ ইসা।

অতঃপর শেখ ইসাকে লইয়া লেখিকা জলযানযোগে যাত্রা করিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পথচারিণী নর্ত্তকীর দল

ডানকানিদিগের একজন বিশিষ্ট নেতা। সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেক ডানকালি সহরে তাহার বাড়ী ও বহু

ঘরের বউ

১

কিরণ ছেলেটি ছিল বিশেষ প্রতিভাবান্, আর পিতা গোবিন্দ বাবুর ছিল বড় টাকার টান। এঞ্জিনিয়ারী পড়িত ; শেষ পরীক্ষা যখন দিবে, একটি সম্বন্ধ আসিল, কন্যার পিতা নগদ তিন হাজার টাকা দিবেন। ইহার উপরে বরের দান-সামগ্রী ও কন্যার অলঙ্কার-পত্রাদি যাহা দিবেন বলিলেন, তাহাও লোভনীয়। গোবিন্দ বাবু নিজেদের মহকুমা সহরেই ওকালতী করিতেন। কিন্তু পশার যাহা হইয়াছিল, ক্রমে পড়িয়া গেল, শরীরও রুগ্ন হইয়া পড়িল। তখন বাসাবাড়ীটি ভাড়া দিয়া পৈতৃক বাসভূমিতে আসিয়া রহিলেন। জমী-জিরাত কিছু ছিল ; বাসাভাড়ায় টাকা কয়টি পাওয়া যাইত। আর গ্রামবাসীদের মামলা-মোকদ্দমায় ওকালতী পরামর্শ দিতেন, বর্ণনা ইত্যাদি লিখিতেন, কখনও বা সহরে গিয়া তদ্বিরও করিতেন। এই সব আয়ে সংসার একরকম চলিয়া যাইত। কিন্তু কিরণের পড়ার খরচটা ধার করিয়াই প্রায় চালাইতে হইত। কিরণ ভাল ছেলে, এঞ্জিনিয়ারী পড়িতেছে, বিবাহ দিয়া সুদে-আসলে সব পরিশোধ করিবেন, এই আশ্বাস পাইয়া এবং তাহার বেশ সম্ভাবনাও বুঝিয়া সম্পন্ন গ্রামবাসী কেহ কেহ প্রয়োজনমত ধারের টাকা যোগাইতেন। সম্বন্ধটি আসিল ; পাওনা-থোওনার দিক দিয়া বেশ ভালই। তবে কন্যাটি তেমন সুরূপা নহে ; আর বয়স্থা হইলেও উচ্চতর শিক্ষাও কিছু লাভ করে নাই। কন্যার পিতা ছিলেন গ্রাম্য তালুকদার, গ্রামেই বাস করিতেন। স্কুল-কলেজে কন্যাটির উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু করিতে পারেন নাই, আর তাহার যে একান্ত প্রয়োজন আছে, তাহাও মনে করিতেন না। ঘরে বাঙ্গালা এবং কিছু ইংরাজী ও সংস্কৃত যতদূর সম্ভব হয়, তাহাই মাত্র শিখিয়াছিল।

তা গৃহস্থ ঘরের বধূ, দুধে-আলতায় একেবারে পটের পদ্মিনী না হইলেই কি ? আর লেখাপড়া, সে দস্তুরমত কিছু জানিলেই হইল। আজকালই এই বাই হইয়াছে। নহিলে আগের দিনে এইটুকু লেখাপড়াই বা কয়টি মেয়ে জানিত ? নিত্যকার গৃহস্থালীই বল, কি বিবাহ-শ্রাদ্ধ পাল-পার্ব্বণাদি বড় বড় ক্রিয়া-কর্ম্মই বল, কোন্‌টা তাহারা হেলায়-খেলায় না চালাইতে পারিত ? গতরের বলেও ছিল এক এক জন যেন দশভুজা মহিষ-মর্দ্দিনী। দশটা চাকর-চাকরাণী রাঁধুনী লাগিত না,—জল তুলিয়া, মশলা পিষিয়া এক একটা যজ্ঞি নিজেদের হাতে রাঁধিয়া নামাইত, দশ হাতে পরিবেষণ করিয়া লোক খাওয়াইত,—আবার হাঁড়ী, কড়া, গামলা, থালা সব নিজেরাই পুকুরঘাটে গিয়া মাজিয়া ঘসিয়া ধুইয়া পাখলাইয়া আনিত, কোথাও একটু কালির দাগ কিছুতে দেখা যাইত না। আজকালকার কলেজে পড়া সহুরে মেয়েগুলাই বরং একেবারে অকেযো ! আর শরীর এক এক জনের যা, গ্রামের জল-হাওয়াও দুই দিন সয় না। ঐ ত রায়েদের বাড়ীর নতুন বৌটি কি পাশ নাকি করিয়াছে—তা পুকুরঘাটে গিয়া একটি দিন স্নান করিতে পারে না, জুতা ছাড়া মাটীতে পা দিতে পারে না, রাত্রি পোহাইলে চা না খাইয়া চোখ খুলিয়াও যেন চাহিতে পারে না। আর হেঁসেল ত যেন যমপুরী ; কাছে ঘেঁষিতেও ভয়ে সারা হয়। পূজায় আসিয়াছিল ; লক্ষ্মীপূজা যাইতে না যাইতেই বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। হতভাগা ছেলেটাই লইয়া পলাইল। যে কয়দিন ছিল—বউকে সার সার করিয়া রাখিত, যেন আটাশে ছেলেটি সবে মার পেট থেকে পড়িয়াছে—লজ্জা-সরমও ছাই একটু নাই !

প্রতিবেশিনীরা এইরূপ অনেক কথাই বলিতেন। গোবিন্দ বাবুর গৃহিণী সৌদামিনী ইহার যুক্তিযুক্ততাও স্বীকার করিতেন। কিন্তু মনের খুঁৎখুঁতি একেবারে দুর হইত না। কন্যা অতি সুরূপা নহে—ইহাতে তাঁহার নিজের যে অতি আপত্তি কিছু ছিল, তাহাও নয়। সুরূপা একটি বধূ যতই বাঞ্ছনীয় হউক, সাধারণ গৃহস্থের ঘরে কয়টি এমন পাওয়া যায় ? তিনি নিজেও ত এমন সুরূপা নহেন। পাড়ার সব বধূ কি গৃহিণী—কয় জনই বা এমন সুরূপা ? মুখের পানে চাওয়া যায় না, এমন কুরূপা যদি না হয়, তবে আর আপত্তির কি এমন কারণ হইতে পারে ? উনি ত দেখিয়া আসিয়াছেন। বলেন, এমন অপছন্দর মত নয়। আর লেখাপড়া—তা কাযকর্ম্মে যদি চতুর হয়, আর বাপের ঘরে তরিবৎ যদি শিখিয়া থাকে—তবে পাশকরা মেয়ে না হইলেই বা কি ? ছেলে মানুষ হইয়া

উঠিয়াছে, বধূ কিছু আর চাকরী করিতে যাইবে না। পাশের বিদ্যা সত্যই কি কাযে এমন লাগিবে? তবে ছেলের মতিগতি ঐ এক রকম। সে চায় অতি সুন্দরী—আর পাশ করা একটি বউ। সে দিন-কাল আর নাই। পিতা-মাতা কি চান, গৃহস্থালীতে তাঁহাদের সুখ-সুবিধা কিসে হইবে, বিবাহের সময় এ সব কথা ছেলেরা এখন বড় ভাবিতেই চায় না। ভাবে কেবল নিজেদের সুখ-সুবিধা কিসে হইবে। বড় চাকরী করিবে, বৌকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, কেবল তাহাকে লইয়াই সুখে থাকিবে। ভাবে, ঠিক মনের মতটি না হইলে, আর মনের মত হাবভাবে আদব-কায়দায় চলিতে না পারিলে, সেই সুখই হইবে না, জীবনই বৃথা হইয়া যাইবে। তা কেবল মুখ দেখিয়া, আর ভঙ্গরঙ্গ করিয়াই ত সত্য দিন কাটিবে না। যেখানেই যাক্, গৃহস্থালীও করিতে হইবে,—ষাট্, পাঁচটি ছেলেপুলে হইলে তাহাদেরও মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে,—আবার সময়ে অসময়ে গেঁয়ো ঘরের বুড়া এই মা-বাপের ডাকই কোন্ না পড়িবে? তা—এ সব কথা আগে হতভাগারা একটু ভাবে কয় জনে?

গোবিন্দ বাবু এক দিন একখানি চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া কহিলেন, "ওগো শুন্‌ছ, এই ত বেহারী বাবু চিঠি লিখেছেন—"

"কি, কি লিখেছেন?"

"লিখেছেন, অন্য কথাবার্ত্তা ত এক রকম ঠিক হয়েই গেছে। এখন পাকা দেখাটা—"

"পাকা দেখা—তা সেইটে হ'লেই ত সম্বন্ধ একেবারে পাকা হয়ে গেল?"

"তা ত গেলই। তখন কি আর ভদ্রলোক কেউ সম্বন্ধ ভাঙ্গতে পারে! মেয়ের বাগ্‌দানই ত ওতে হয়ে যায়। দিনকাল বদ্‌লে গেছে, নইলে আগে বাগ্‌দানের পর ছেলের ভালমন্দ কিছু হলেও সে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই দায় হ'ত।"

"তা হ'লে—"

একটু বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "নাঃ! মনের খুঁৎখুঁতি আর কিছুতেই তোমার যাবে না! পরীর মত একটি মেয়ে—বিএ-এম-এ পাশ করেছে—আবার এতগুলো টাকাও আমাকে দেবে! কে আস্‌ছে? ঐ রকম সব মেয়ে—সহরের বড় বড় ঘরের ছেলেরাই আজকাল যেচে নেয়—যেচে সদাসর্ব্বদা পায়ও না। পেলে টাকার দাবীও বড় করে না। বাপেরা একটু শক্ত হয়ে বস্‌লে আর দিন কত পরে টাকা দিয়েই হয় ত কিনে নেবে। আর হাজার হলেও আমার হ'ল গেঁয়ো গেরস্তর ঘর—"

"তা ছেলে ত হবে সহুরে বড় চাকরে।"

"হক্ আগে, তখন—"

"বিয়ে না হয় তখনই কর্‌বে।—পছন্দমত একটি মেয়ে নিজেই দেখে শুনে—"

"তার পর?—এই যে দেনাগুলো আমি করেছি—বড় চাকরে যে আজ হবে তারই মালমশলা যোগাতে,—সেগুলো শোধ দেবে কে?"

"তা তখন কি আর টাকা সত্যিই পাওয়া যাবে না?"

"যদি না যায়?—আর সে বিয়ের সম্বন্ধ ত বাপ আমি করব না। কর্‌বে ও নিজে। মেয়ের সঙ্গে—ঐ সাহেবদের মত আগে হয় ত একটা কোর্টশিপই চল্‌বে। টাকা চাইবে কোন্ মুখে?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী চুপ করিয়া রহিলেন। গোবিন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন, "এখনও আমি কর্ত্তা, মেয়ের বাপের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্ত্তা আমিই চালাচ্ছি, চালাতে পারি। রেওয়াজ যেমন হয়েছে, টাকা-কড়ির দাবীদাওয়াও একটা করতে পারি। তখন কোথায় থাকব আমি? আমার এই দায়ের কথা একটু ও ভাববে? হাঁ, এমন ছেলেও আছে, যারা লায়েক হয়েও বাপকে একেবারে গোটেল ক'রে দেয় না। তার ভাল মন্দটাও ভাবে, নির্ভরও তার ওপর যথেষ্ট করে। কিন্তু ও কি সেই ধাতুর ছেলে?"

সৌদামিনী কহিলেন, "আর ত কিছু ভাবছি না। নিজের দায়ে পরের একটা মেয়ে ঘরে আন্‌বে—শেষে যদি ও তার দিক ফিরেও না চায়?"

"পাগল!—তাও কি হয় কখনও? বিয়ে একবার হয়ে গেলে—মেয়েটি যা শুন্‌ছি, সত্যিই যদি লক্ষ্মী হয়—কয় দিন তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য ক'রে দূরে ঠেলে রাখ্‌তে পারবে? কেউ পেরেছে কখনও তা? কত এমন দেখ্‌লাম! সে যারা রাখে, রাখে অন্য কারণে। 'চেহারাটা ঠিক পছন্দসই নয়, কি লেখাপড়া একটু কম শিখেছে, তার জন্যে নয়।"

"দেখ যা বোঝ ! তবে—"

"তবে-টবের ভাবনা—না, ভাবতে আর পারছি নি—জানলে? পাওনাদারদের আর রাখতে পারছিনে। অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। ও কবে চাকরী ক'রে দেনা শোধ করবে, সে ভরসা ক'রে এত টাকা কেউ আমাকে দেয় নি, দিয়েছিল বিয়ে দিয়ে শোধ করব, তাই। এখন এই সম্বন্ধটা এসেছে, সবাই এসে চেপে ধরেছে। বলছে, স্থবিধে একটা পেয়েছ—টাকাগুলো এখন শোধ ক'রে দেও। আর আমিও এটা ছেড়ে দিলে, এর পর আর শোধ করতে পারব না। কারণ, ছেলের ঠিক মনের মত মেয়ে—আর এত টাকা—একসঙ্গে কোথাও পাওয়া যাবে না। খুঁজেও ত দেখেছি, সে আজকাল হবার নয়। হয় এই বিয়ে দিয়ে দেনাগুলো শোধ করতে হবে, না হয় বাড়ী-ঘর আর জমা-জমীটুকু ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় গে দাঁড়াতে হবে।"

"কিরণ যদি রাজি না হয়?"

"রাজি তাকে হ'তেই হবে। দেনা এতগুলো করেছি, নিজের সখে নয়, তারি জন্মে। পাওনাদাররা অপেক্ষা করতে আর চাইছে না। ওর রোজগারের ভরসাও বোধ হয় করতে পারছে না। আবার বাই ধরেছে—বিলেত যাবে? কত দিনই সত্যি আর তারা হাঁ ক'রে ব'সে থাকবে? দেনা সব আমাকে শোধ ক'রে এখুনি দিতেই হবে। আর এ ছাড়া তার উপায়ও কিছু নেই? রাজি হবে না? হারামজাদা! হ'তেই তাকে হবে!"

সৌদামিনী কহিলেন, "এক কায বরং কর। পাকা দেখার আগে ভাল ক'রে বুঝিয়ে তাকে বল। দেনার দায় যা আছে, সে ত আছেই। তার ওপর আবার ভদ্দর লোকের কাছেও বেকুব হবে? শুনেছি, পাকা সম্বন্ধ ভাঙ্গা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও আজকাল হয়। তুমিই ত সেবার ঐ যে কে বিলেস বাবুর এম্নি একটা মোকদ্দমার তদ্বির করলে।"

"হুঁ—দেখি! কথাটা ভাববার কথাই বটে। বড় ভুল করেছি গিন্নি, আমার মত হাভাতে লোকের পক্ষে এত দেনা ক'রে ছেলে পড়াতে যাওয়াটা বড়ই বেকুবী হয়েছে দেখছি!"

"তা ছেলেকে ত মানুষ ক'রে তুলতে হবে।"

"যার যেমন অবস্থা, সেই ভাবেই তাকে ছেলে মানুষ করতে হয়। লেখাপড়া কিছু শিখল, আর যেমনই হক্ কাযকর্ম্ম কিছু ক'রে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান যদি ক'রে নিতে পারলে, গরীবের ছেলের পক্ষে সেই ঢের মানুষ হওয়া। অত খরচ-পত্তর ক'রে অতি বড় করতে ছেলেদের বড় লোকেরাই পারে, ঘরে যাদের মেলাই টাকা আছে। আর মূর্খ আমি—বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম পরের ঘাড়ে চ'ড়ে। আর সেই ঘাড়ের লম্বা মুজরী যোগাব ছেলের বিয়ে দিয়ে। ভাবিনি, সময় যখন হবে, সে বিয়ের কর্ত্তা আমি নাও থাকতে পারি।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী কহিলেন, "সে যা হবার হয়েছে, শোধরাবার ত আর উপায় নেই। এখন দেখ—যা বল্লাম—বাড়ীতে ত আসবে লিখেছে সাম্নের এই ছুটীতে—"

"হুঁ—দেখি, আসুক ত।" বলিয়া গোবিন্দ বাবু উঠিয়া বাহিরের দিকে গেলেন।

যথাসময়ে কিরণ বাড়ীতে আসিল, কিন্তু প্রস্তাব শুনিয়াই একেবারে বাঁকিয়া বসিল। স্পষ্ট বলিল, খরচ করিয়া পিতা তাহাকে পড়াইয়াছেন, পিতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন; প্রত্যেক পিতাকেই ইহা করিতে হয়। তাহার জন্য তাহার জীবনটাকে এভাবে বলি দিবেন, এ অধিকার পিতার নাই। কোনও পিতারই থাকিতে পারে না। পিতার তিরস্কার, মাতার অনুনয়—কিছুতেই কোনও ফল হইল না। শেষে বন্ধু-বান্ধবরা শক্ত করিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল। অনেক যুক্তিতর্ক ও ধস্তাধস্তির পর কিরণ শেষে কহিল, "বেশ, তোমরা বলছ—বিকিয়ে দিতে আমাকে চান, দিন। এতেই যদি পিতৃঋণ আমার শোধ হয়, বেশ, তাই হ'ক; এর পর আর কিছুতে যেন দায়িক তাঁরা আমাকে না করেন, তোমরাও করতে পারবে না।"

২

পরীক্ষার পর বিবাহ হইয়া গেল। ফল বাহির হইলে বড় এক অধ্যাপক এবং অন্য কে এক জন বড় মুরুব্বীর সুপারিশে বাঙ্গালার বাহিরে দূরে বড় কোনও ব্যবসায়ের মধ্যে ভাল একটি চাকরী পাইয়া সে চলিয়া গেল। পিতাকে লিখিল, তাঁহার ঋণ শোধ সে করিয়া দিয়াছে। সংসার এত দিন যে ভাবে চলিতেছিল, তাহার অপেক্ষা আরও সচ্ছলভাবেই

বরং এখন চলিবে। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য সে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার উপার্জ্জনের অর্থ তাহারই জন্য সঞ্চিত রাখিবে, বাড়ীতে নিয়মিতভাবে কিছু পাঠান সম্ভব হইবে না। তবে নিতান্ত প্রয়োজন কখনও কিছু হইলে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতে সে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু এরূপ প্রয়োজন সদা-সর্ব্বদা যাহাতে না হয়, সে দিকেও যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা চলেন। ইত্যাদি।

পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থের নিয়মিত কোনও সাহায্য এখনই যে তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা নয়। সংসার যে ভাবে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও যাইবে। পুত্র ভাল চাকরীতে গিয়াছে বলিয়া, চাল বাড়াইবারও কোনও আগ্রহ তাঁহার ছিল না, তাহার আবশ্যকতাও কিছু মনে করেন নাই। ছোট আর দুইটি ছেলে মেয়ে আছে, বরাবরই ত ছিল। একটি বধূ মাত্র আসিয়াছে, সে আর কত খাইবে, কতই পরিবে—তাহাকে প্রতিপালন তিনিই বেশ করিতে পারিবেন। আর বধূটিও বড় লক্ষ্মী—ধনীর কন্যা—কিন্তু সে রকম চালচলন কিছু নাই। যেন গরীব গৃহস্থের কন্যা, গরীব গৃহস্থের ঘরের বধূটি হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু পত্রখানি পড়িয়া মনে বড় আঘাত গোবিন্দ বাবু পাইলেন। বিলাত যাইবে, ভাল কথা। খরচপত্র কিছু দিবে না, নাই দিত?—না দিলে তিনি গিয়া লাঠি মারিয়া ত আনিতে পারিতেন না। তা এরূপ ভাবে ও ভাষায় চিঠিখানা না লিখিলেও ত পারিত। একটু নরম কথায়ও ত জানাইতে পারিত, এই প্রয়োজনে টাকা সে হাতে রাখিতে চায়। পিতা যদি সংসারটা নিজের আয়ে আরও কিছু কাল চালাইয়া লইতে পারেন ত ভাল হয়। সন্তুষ্ট হইয়াই তিনি তাহা করিতেন। আবার ঋণ শোধের খোঁটাটাও দিয়াছে! লিখিয়াছে, ঋণ সে শোধ করিয়া দিয়াছে—যেন সে মনে করে, পিতৃঋণ তাহার ইহাতে শোধ হইয়াছে, আর কোনও দাবী-দাওয়া তাঁহাদের পুত্রের উপরে নাই। দয়া করিয়া নিতান্ত কোন প্রয়োজনে অর্থ-সাহায্য কখনও কিছু করিতে পারে।—তাই সত্য মনে করে কি? করুক, করিলে উপায় কি? পিতৃঋণ—বলিতে যাহা তাঁহারা এবং তাঁহাদের মত লোকরা বোঝেন, ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই পুত্ররা তাহা মানিয়া চলে। কেবল দাবীর জোরে কোনও পিতা তাহা মানাইতে পারেন না। তিনিও পারিবেন না, আর আর তা চাহেনও না। শেষ জীবনে—ভাগ্যে যাহা আছে, ঘটিবে। কিন্তু ঐ পরের মেয়েটা ঘরে আনিয়াছেন, তাহাকেও যদি এমনই উপেক্ষা করে! কোন আকর্ষণ তাহার প্রতি জন্মিয়াছে, এমন ত মনে হয় না। একখানি চিঠিও তাহার কাছে আইসে না। তাই ত!—গৃহিণী ঠিকই বলিয়াছিলেন, তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। হায় হায়! কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলেন? না হয় বাড়ী-ঘর জমা-জমী সব যাইত। কায না করিতে পারিতেন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন, গাছতলায় পড়িয়া মরিতেন। সেও যে অনেক ভাল ছিল।

শরীর পূর্ব্ব হইতেই রুগ্ন ছিল, এখন এই বেদনায় ও অনুশোচনায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুই এক মাসের মধ্যেই কালের ডাক আসিল।

সৌদামিনী কহিলেন, "কিরণকে এখন একটা খবর দিই?"

গোবিন্দ বাবু উত্তর করিলেন, "না না, কায নেই গিন্নি, পিতৃঋণ তার শোধ হয়েছে! কেন আসবে? আমিই বা কি দাবীতে ডাক্‌ব?"

আঁচলে মুখ চাপিয়া সৌদামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। একটু দম লইয়া গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "শোন; কেঁদো না। তার সম্বন্ধে কিছুই আমার বলবার নেই! সব চুকে গেছে। তবে—তবে—ঐ বৌমা—আমার মুখ নেই; তুমি ব'লো যেন আমাকে ক্ষমা করে।"

বধূ সুরবালা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছিল। মাথার কাপড় টানিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া দুই হাতে শ্বশুরের পা দু'খানি তুলিয়া মাথায় ছোঁয়াইল। তার পর উঠিয়া নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রতিবেশী নিকট-জ্ঞাতি এক জন কিরণকে পিতার মৃত্যু-সংবাদ জানাইলেন। বাড়ীতে আসিয়া কিরণ যথাসময়ে পিতার শ্রাদ্ধ করিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেন তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, নিজেও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, মাতাও যাচিয়া কিছু বলিলেন না। কর্ম্মস্থলে আজ ফিরিয়া যাইবে; আহারাদির পর কিরণ সুরবালাকে ডাকিয়া পাঠাইল। চৌকির উপরে বসিয়াছিল। সুরবালা আসিয়া একটু আড়ঘোমটা টানিয়া পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিরণ

একবার চাহিয়া দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "আমি আজ যাচ্ছি। শীঘ্র যে ফিরব, তার সম্ভাবনা কিছু নেই। তা যাবার আগে খোলাখুলিভাবে কয়েকটা কথা তোমাকে ব'লে যেতে চাই।"

"বল।"

"এটা বোধ হয় বুঝতে পারছ, ঠিক স্বামি-স্ত্রীভাবে তোমার সঙ্গে একত্র বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না!"

"হাঁ।"

"এ অবস্থায় এখন কি কর্ত্তব্য ব'লে তুমি মনে কর?"

"কর্ত্তব্য—সে আমি কি বল্‌ব? যা ভাল মনে কর, কর্‌বে।"

"ভাল—আমি যা মনে কর্‌ছি, তুমি হয় তা কর্‌বে না। লোকেও বল্‌বে, তুমিও হয় ত মনে কর, বিবাহ যখন হয়েছে, স্ত্রী বলেই তোমাকে গ্রহণ করা উচিত।—তবে বিবাহ হয়েছে—যেচে আমি নিজে করিনি। বাবা দিয়েছিলেন, তাঁর দেনার দায়ে জোর ক'রে। আমি এড়াতে পারি নি।"

সুরবালা নীরব। একটু কি ভাবিয়া কিরণ আবার কহিল, "তবু চেষ্টা কিছু করেছিলাম—ইচ্ছেয় হ'ক্, অনিচ্ছেয় হ'ক, যে দায়িত্ব ঘাড়ে এসে প'ল, সেটা কোনও মতে স্বীকার ক'রে নিতে পারি কি না। কিন্তু পার্‌লাম না।"

সুরবালা কোনও উত্তর করিল না। কিরণ কহিল, "চুপ ক'রে রয়েছ, তোমার কিছুই বল্‌বার নেই?"

"না।"

"তা হ'লে আমার যা বল্‌বার বল্‌ছি। এ বন্ধন থেকে আমি মুক্তি চাই, তোমাকেও মুক্তি দিতে চাই।"

"মুক্তি? বুঝতে পার্‌লাম না, কি কর্‌তে হবে।"

"বুঝতে তুমি সহজে পারবে না, জানি। তাই যদি পার্‌তে—যাক্! কথা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আর থাক্‌বে না। ইচ্ছেমত আমার পথে আমি চ'ল্‌ব, তোমার পথেও তুমি চল্‌তে পার।"

"তাই চ'লো।"

"আর তুমি?"

"আমি—কেন সে কথা জান্‌তে চাও? জান্‌বার কোনও দরকার আছে কি? আর সে অধিকারও কিছু তোমার এখন আছে?"

বটে! চমকিয়া কিরণ চাহিল। কিছুকাল থমকিয়া থাকিয়া কহিল, "অধিকার—জানি না কিছু আছে কি না। বোধ হয়—নেই। তবে দরকার আছে বৈ কি? মুক্তি পেয়েও ঠিক পরিষ্কার মনে আমি যেতে পারিনে, যদি না তুমিও আপনাকে সমান মুক্ত ব'লে মনে না কর, স্বীকার ক'রে না নেও।"

সুরবালা উত্তর করিল, "তোমার সুখের পথে কখনও বাদী হব না, কোনও দাবী-দাওয়াও তোমার উপরে কখনও কিছু করব না। এর বেশী—না, আর কিছুই বল্‌বার আমার নেই।"

"এই বন্ধন থেকে যে মুক্তি তোমাকে দিচ্ছি, সন্তুষ্ট চিত্তে সেটা স্বীকার ক'রে নিলে, সত্যিই এটা বল্‌তে পার না?"

"কেন পেড়াপীড়ি কর্‌ছ? এ সব কথা আমরা বুঝতেই পারিনে কিছু।"

"তা হ'লে আর কি বল্‌ব? তবে এটা জেনো, যে মুক্তি নিয়ে নিজে আজ যাচ্ছি, সেই মুক্তি স্বচ্ছন্দমনে তোমাকেও দিচ্ছি। তুমি সেটা স্বীকার ক'রে নেও না নেও, সে তোমার ইচ্ছা।"

"আচ্ছা। আসি তবে।"

"এস।"

মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া সুরবালা বাহির হইয়া গেল।

মাস দুই পরে সৌদামিনী কিরণের একখানি পত্র পাইলেন। সংক্ষেপে এই মাত্র লিখিয়াছে, তাহার খরচের সংস্থান হইয়াছে, শীঘ্রই বিলাত যাইতেছে। কবে ফিরিতে পারিবে, স্থির কিছু নাই। পিতা উপার্জ্জন কিছু করিতেন না, দেনাও সব শোধ হইয়াছে। অন্যান্য যে আয়ে সংসার চলিত, তাহাতেই চালাইয়া লইতে হইবে,—কারণ, ফিরিয়া কোনও কাযে বসিবার আগে বাড়ীতে কোনও [illegible] সাহায্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তখন যদি প্রয়োজন হয়, যথাসাধ্য করিতে সে প্রস্তুত থাকিবে।

পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিরণ বাড়ীতে কোন পত্রও লেখে নাই, খরচ-পত্রও কিছু পাঠায় নাই। আয় ছিল সহরের সেই বাসাভাড়ার কয়টি টাকা, আর সামান্য যে

জমাজমী ছিল, তাহার ফল-শস্যাদি। কিন্তু জমা-জমীর কায দেখিবার লোক কেহ নাই, তেমন কিছু ঘরে আসিত না; বাসাভাড়ার টাকাও মাসে মাসে আদায় হইত না। পুরাতন বাসা, ঘর-দরজা সব জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মেরামত-বাবদও ভাড়াটিয়া অনেক সময় টাকা কাটিয়া লইতেন। অতি কষ্টে সংসার চলিল। অভাব অনটন যখন বড় বাড়িয়া উঠিল, সৌদামিনী এক দিন কহিলেন, "বাপ বার বার এত ক'রে নিতে চাচ্ছে, তাই কেন যা না, মা? আমার কপালের দুঃখু—ভুগ্‌তেই হবে, ভুগ্‌ব। কিন্তু তুই কেন এর মধ্যে জড়িয়ে প'ড়ে মরছিস্?"

"আমি যে ঘরের বউ মা, ঘর ছেড়ে কোথায় যাব?"

"তা ঘরের বউ কি বাপের বাড়ী কখনও যায় না? দু'মাস ছ'মাস গিয়ে থাকে না? তাই কেন মাঝে মাঝে গিয়ে থাক্ না?"

একটু হাসিয়া সুরবালা উত্তর করিল, "আপনি যে একেবারেই বিদেয় ক'রে দিতে চান, মা।"

"সাধে কি চাই, মা? বড় ঘরের মেয়ে তুই, আর এখানে এই দুঃখু-ক্লেশ—"

"দুঃখ-ক্লেশ—তা এমনই বা কি দুঃখক্লেশ? খেয়ে প'রে ত দিন এক রকম যাচ্ছে—"

"এই ত খাওয়া পরা! কোনও দিন শাক-ভাত, কোনও দিন ডাল-ভাত, বিকেলে কোনও দিন কেবল ক্ষুদের জাউ। আর এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়—না মা, এ হাল তোর আর আমি চোখে দেখ্‌তে পারিনে। আমি বলি, একবার যা, ছ'মাস গিয়ে থাক্, আবার না হয় আস্‌বি।"

"কি বল্‌ছেন মা? ছটা মাস গিয়ে থাক্‌তে পারি? আপনি একা, ঠাকুরপোকে আর ইন্দুকে দুবেলা রেঁধে খাওয়ানো, নিজের হবিষ্যি আছে, তাই কি হয়, মা! [illegible] বাবা আছেন, দুচার দিনের জন্য কখন কখনও [illegible]তে পারি, দেখে শুনেও আসতে পারি। আর তা যখন পেড়াপীড়ি বড় করেন, যাইও ত।"

"যাস্, সে কালে ভদ্রে কখনও। যে পায়ে যাস্, সেই পায়েই আবার ফিরে আসিস্।"

"কি করব, মা? থাক্‌তে যে সেখানে ভাল লাগে না।"

"আর এখানে যে কিসে ভাল্ল লাগে, তাও ত ছাই বুঝতে পারিনে।"

"লাগে ত।"

"লাগে—কিসে যে লাগে, তুই-ই বল্‌তে পারিস, বাছা। ঘরের বউ—ঘরের বউ—তা যার জন্যে ঘরের বউ, সে একটিবার মুখ তুলে চাইল না! তা যা ভাল বুঝিস্ কর, বাছা। আমি আর পারিনে। বলি তোরই দুঃখ-ক্লেশ দেখে। নইলে সত্যি কি তোকে ছেড়ে দুদিনও থাক্‌তে পারি, মা!"

"তাই ত আমি আরও যেতে চাইনে, মা। আপনার এই বুকভরা দুঃখু—"

বলিয়াই কেমন যেন একটু লজ্জা পাইয়া সুরবালা মুখ ফিরাইয়া লইল।

"দুঃখু—সে দুঃখু যে সইতে পারছি, কেবল ত তোর মুখ চেয়ে। ছেলের বড় ছেলে হয়েও অকূল পাথারে বুকে ধ'রে আমাকে রেখেছিস্। আবাগে বুঝল না, কি রত্ন হেলায় সে হারাল!"

কাঁদিয়া সৌদামিনী দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। মুখ ফিরাইয়া সুরবালা চক্ষু দুইটি আঁচলে মুছিল।

একটু আত্মসংবরণ করিয়া সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন, "তোর কথা যখন ভাবি মা, তার নামও মুখে আন্‌তে ইচ্ছে হয় না। তবু মন ত বোঝে না, কোথায় গে লুকিয়ে রইল—পাঁচ পাঁচটা বছর গেল, কোনও খবর নেই। কোথায় আছে, কেমন আছে, একটু খবরও যদি পেতাম! তবে মায়ের মন—ষাট্, মন্দ কখনও কিছু ডাক দিয়ে ওঠে না। তাই মনে হয়, যেখানেই থাক, বেঁচে আছে, ভালই আছে। আর ক্ষমতা যোগ্যতা আছে, ভাল রোজগার-কামাই ক'রে সুখেও হয় ত আছে—সুখ তার কপালে সত্যি যদি থাকে। কিন্তু এমন নিষ্ঠুরও মানুষ হয়! পেটের ছেলে—"

"বেলা গেল মা, চলুন, পুকুরঘাটে গিয়ে কাপড় কেচে আসি গে।"

"চল।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী উঠিলেন।

দুই তিন মাস চলিয়া গেল। সৌদামিনী এক দিন কহিলেন, "একটা স্বপ্ন দেখলাম বৌমা—মনটায় আর স্বস্তি পাচ্ছি না—"

বুকটা সুরবালার কাঁপিয়া উঠিল,—সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, "কি—কি স্বপ্ন, মা?"

"আরও এক দিন দেখেছি—যেন বাড়ীর দরজায় উনি দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। তা ভাবলাম, দেহত্যাগ ক'রে গেলেও আছেন ত—আমাদের এই দুর্গতি দেখছেন—মায়া কাটিয়েও ওপরে উঠে যেতে পারেন নি, কাছে কাছেই ঘুরছেন। কাঁদছেন, কাঁদ্‌বেনই ত।—তা চর্ম্মচক্ষে ত দেখতে পাইনে, স্বপ্নে দেখলাম। উপায় ত নেই, দুঃখু পাচ্ছেন, কি করব? কাল আবার দেখলাম—হাত পেতে খাবার চাচ্ছেন।"

স্বপ্নের কথাটা সুখকর কিছু না হইলেও সুরবালা একটা স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলিল। যে আশঙ্কায় তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, স্বপ্নে অন্ততঃ তাহার আভাস কিছু নাই। কিন্তু তবু এমন একটা স্বপ্ন শাশুড়ী দেখিলেন—কেন দেখিলেন? সৌদামিনী কহিলেন, "বছরকী তিথিতে সত্যকে দিয়ে যেভাবে হ'ক্ শ্রাদ্ধ ত করাই। তবে পাঁচ ছ'বছর হয়ে গেল, গয়ায় পিণ্ডিটে প'ল না।—"

"হাঁ, শুনেছি, গয়ায় পিণ্ডি দিলে শান্তি হয়।—হাত পেতে খাবার চাইছিলেন—"

"তাই ত সেই রাত থেকে ভাবছি মা—কিন্তু কি করব? পয়সা-কড়ি কিছু নেই। আবার গয়ায় যাব, কাশী-বিশ্বনাথ কাছে, একবার দর্শন ক'রে আস্‌ব না—এ জীবনে ত সে ভাগ্যি কখনও হয়নি—" গভীর একটি নিশ্বাস সৌদামিনী ত্যাগ করিলেন।

"কত টাকা লাগবে মা?"

সৌদামিনী কহিলেন, "সত্য যাবে। আর তোকে আর ইন্দুকেই কি খালি বাড়ীতে ফেলে যেতে পারব? শতাবধি টাকার কমে কি হবে?"

"টাকার যোগাড়—বোধ হয় হ'তে পারে—"

"কি ক'রে? কে দেবে?"

"আমার গহনাগুলোও ত রয়েছে—"

"বলিস্ কি মা?—সেইগুলো খোয়াবি? সম্বল ত ঐ, না না, সে হয় না, মা।"

"তা হ'লে—বাবাকে বরং লিখতে পারি—যদি আপনি বলেন। মাসে মাসে খরচ পাঠাতেও ত চেয়েছেন, নিইনি—"

একটু ভাবিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "তা বরং লেখ। দেনা শোধ ক'রে ইহকালের শান্তি তিনিই ত দিয়েছেন। এখন পরকালের শান্তি—হাঁ, তিনিই দিতে পারেন। না মা, কোনও লজ্জা অপমান আমার নেই, তাঁকেই লিখে দে।"

সেই দিনই সুরবালা পিতাকে পত্র লিখিল। অতি আনন্দেই তিনি দেড় শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। লিখিলেন, কাশী, গয়া আরও যে কোনও তীর্থ বৈবাহিকা মহাশয়া করিয়া আসিতে পারেন। টাকা যাহা লাগে, দিয়া তিনি কৃতার্থ হইবেন। প্রতিবেশী একটি যুবক কিরণের বাল্যবন্ধু, নাম সতীশ, বাড়ীতেই তখন ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া বধূ ও পুত্রকন্যা সহ সৌদামিনী তীর্থযাত্রা করিলেন।

গয়ার কায সারিয়া সকলে কাশীতে আসিলেন। তীর্থ-কৃত্যাদি সব হইল। দেখা গেল, হাতে এখনও বেশ টাকা আছে।—আর ত জীবনে এ সুযোগ ঘটিবে না। বিন্ধ্যাচল দর্শন করিয়া সকলে প্রয়াগে গেলেন। সৌদামিনীর আশা ছিল, প্রয়াগ-কৃত্যের পর হাতে যদি টাকা থাকে, তবে দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে পুরীতেও একবার যাইবেন।

প্রয়াগে এক দিন যমুনায় স্নান করিয়া সকলে ফিরিতেছেন, সুবেশ একটি যুবা এবং সুসজ্জিতা একটি মহিলা সহ বড় একখানি মোটর গাড়ী রাস্তার বড় মোড় ঘুরিয়া চলিয়া গেল।

"কে—কে! আমার কিরণ গেল না! বাবা বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা, মা বিন্ধ্যবাসিনী,—মা গঙ্গা-যমুনা! মা গো! সত্যি—সত্যি—যা দেখলাম, তা সত্যি?"…কাঁপিতে কাঁপিতে সৌদামিনী রাস্তার উপরে বসিয়া পড়িলেন।

"উঠুন!—উঠুন, কাকীমা!—এই রাস্তার ওপর—উঠুন উঠুন—স্থির হ'ন্। হাঁ, দেখেছি—কিরণই বটে।"

সাবধানে ধরিয়া সতীশ সৌদামিনীকে তুলিল। তিনি থর থর কাঁপিতেছিলেন। সতীশ দুই হাতে জড়াইয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল।

"এইখানেই থাকে? কোথায়? আর একটিবার দেখাতে পারিস্? জন্মের শোধ আর একটিবার চোখে দেখে এই গঙ্গা-যমুনায় আমি ডুবে মর্‌ব। এইখানেই ঐ কি যে বলে—কাম্য-কূপ আছে না?"

"শান্ত হ'ন্, স্থির হ'ন্ কাকীমা, ও সব পাগলামো কথা বলবেন না। দেখছেন না, বৌ ভয় পেয়ে গেছে—"

"কই—কই—বৌমা! বৌমা! আয়—আয় মা আমার

চকিত মিলন

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] [শিল্পী—শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুর

বুকে আয়! পেয়েছি—হারাধন আজ ছ'বছর পরে ফিরে পেয়েছি—"

"থামুন! থামুন! একটু স্থির হয়ে আগে নিন্। এখনও কেমন কাঁপছেন, দেখতে পাচ্ছেন না?"

"হাঁ, কাঁপছি! বুক-গলাও শুকিয়ে যাচ্ছে; একটু বসি, চল্ ত গাছতলাটায় গিয়ে একটু বসি। আর দে ত বাবা—ঐ ঘটীতে জল আছে না? যমুনার জল—দে—দে—খানিকটে খাই—"

"আসুন—আসুন—ব'সে তার পর খাবেন। এই যে, বসুন এখন। হাঁ, এই নিন—জল খান!"

ঘটীটা হাতে লইয়া আধ ঘটীর উপর জল ঢক ঢক করিয়া সৌদামিনী খাইয়া ফেলিলেন, বাকী জল সতীশ তাঁহার মাথায় ও চোকে-মুখে ছিটাইয়া দিল। ক্রমে তিনি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সতীশ কহিল, "শুনুন কাকীমা, এইখানেই বা কাছেই কোথাও থাকে। নিশ্চয়ই বড় কোনও কায করে—আর নামটাও বোধ হয় ভাঁড়ায় নি। গাড়ীর নম্বরটাও তাড়া-তাড়ি দেখে নিয়েছি—হাঁ—ঠিক আছে। খুঁজে বের করতে আমি পারব। তবে দেরী কিছু হ'তে পারে। চলুন, এখন বাসায় চলুন। হাঁ, একটা গাড়ী ডাকি, অত পথ এখন হেঁটে যেতে পারবেন না।"

"তাই চল্—হাঁ রে,—সঙ্গে ঐ যে একটা মেয়ে দেখলাম, বিবিয়ানা সাজ-গোজ—ও কে?"

"কি ক'রে বলব, কাকীমা! দেখি—খোঁজ ত নেব—এই এক্কাওয়ালা! এধার—এধার! এই যে, উঠুন কাকীমা—আসুন, গাড়ীতে এসে উঠুন!"

সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া সতীশ বাসার দিকে গেল।

তিন চারি দিন অনেক ঘুরিয়া, পুলিস অফিসেও অনেক তদ্বির করিয়া, সতীশ কিরণের ঠিকানা পাইল। নিজে কিরণের সঙ্গে দেখা না করিয়া, গোপনে বাড়ীর পরিচারক কাহাকেও কিছু বক্সিস্ কবুল করিয়া জ্ঞাতব্য সংবাদ সব জানিয়া আসিল। কর্ম্মস্থলে কিরণ উচ্চপদস্থ এক ধনীর বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়া উঠে। তাঁহারই অর্থ-সাহায্যে বিলাত যায়। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করে। যাইবার পূর্ব্বেই এই কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় তাহার হয়। এখন এইখানেই বড় একটা এঞ্জিনিয়ারী কারখানায় ভাল চাকরীতে নিযুক্ত আছে। বেতন কমিশন ইত্যাদিতে হাজার টাকার উপরে নাকি মাসে উপার্জ্জন করে। দুইটি ছেলেও হইয়াছে। তবে পারিবারিক জীবনে কিরণ সুখী বিশেষ নয়। স্ত্রী অতি গর্ব্বিতা ও উগ্রস্বভাবা, এবং বিলাসাড়ম্বরে এত ব্যয় করে যে, এত টাকায়ও সে কুলাইতে পারিতেছে না। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটিও সদাসর্ব্বদা হয়।

নিঃশব্দে সকল কথা সৌদামিনী শুনিলেন। চোখ-মুখ শেষে লাল লইয়া উঠিল, বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। একটু দম লইয়া কহিলেন, "আমাকে একবার নিয়ে যাবি সতীশ? আজই—এখুনি—"

"আপনি যাবেন? হঠাৎ—না জানিয়ে—না, না, সেটা ঠিক হবে না, কাকীমা! আর গিয়ে সেথায় কি করবেন? বরং আমি গিয়ে দেখা করি—খবর দিই আপনারা এখানে এয়েছেন—"

"না—না! পালিয়ে যাবে। আসবে না, খবর আগে দিলে দেখাই আর পাব না। আমি যে একবার দেখতে চাই তাকে"—ডুকরাইয়া সৌদামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

সতীশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, একটু সামলাইয়া সৌদামিনী কহিলেন, "হাঁ, দেখতে চাই। দেখে সুখী হব না জানি। গেলে তেড়ে-মেড়ে উঠবে, তাও জানি! কিন্তু তবু—তবু—একটিবার যাব, দুটো কথাও তাকে বলতে হবে—আমি যে আর বরদাস্ত করতে পারছিনে, সতীশ! আমার এই সোনার লক্ষ্মী বউমা, তাকে ত্যাগ ক'রে—এই সর্ব্বনাশ সে করেছে! আর খোঁজ পেয়েও চুপ ক'রে আমি থাকব? না না, সে যে পারিনে, সতীশ! পারব না—কিছুতেই পারব না—"

সতীশ কহিল, "সবই বুঝতে পারছি, কাকীমা। কিন্তু কি বলবেন তাকে? সেখানে গিয়ে—"

"কোথায় তবে বলব? কোথায় দেখা পাব? খুন হয়ে ম'লেও সে আসবে না, আনতে তুই পারবিনে। যা—যা—ওঠ্! একটা গাড়ী ডাক্, কত দূর? বরং চল্—পথেই একটা গাড়ী ডেকে নিবি।" বলিয়াই সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সতীশও উঠিল, উঠিয়া কহিল, "যেতে চান, চলুন। কিন্তু—"

"কিন্তু টিস্তু কিছু নেই। যাব—যেতেই আমি চাই! চল্‌"

দরজার দিকে দুই জনে অগ্রসর হইলেন। পিছনের দরজার কাছে সুরবালা বসিয়াছিল। ছুটিয়া সে বাহির হইল, পায়ের কাছে পড়িয়া পা দুটি ধরিয়া কহিল, "কোথায় যাচ্ছেন, মা? দোহাই—দোহাই আপনার, যাবেন না। গিয়ে কি কর্‌বেন? কি বল্‌বেন? ব'লে কি লাভ হবে?"

"লাভ? লাভ না হ'ক্‌, ক্ষতিই বা কি হবে? বলব না? কেন বল্‌ব না? আমি মা—বল্‌তে যে আমাকে হবেই। পাঁচ ছ'বছর এই ভাবে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে—এই দুঃখ-ক্লেশ আমরা পাচ্ছি—একটিবার খবর করেনি, তাও না হয়—গায়ে তুলে না নিতাম। কিন্তু তোকে এই ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে—"

সুরবালা কহিল, "যদি ভাসিয়ে দেওয়াই বলেন, ভেসে যে আমি গিয়েছি, মা! কি হবে? ফিরিয়ে আর আন্‌তে পারবেন? ঐ একটা সংসারই মিছে ভেঙ্গে যাবে।"

"যাক্‌! ও-ও আবার সংসার? পাপের সংসার—ভেঙ্গে যায় যাক্‌! আর ঐ সংসার—সে তোরই বা কি আর আমারই বা কি?"

"তবু—তবু ছেলেদুটি হয়েছে, কেন মিছে এই সর্ব্বনাশ করবেন? তারা যে আপনারই নাতি—"

"আমার—আমার নাতি—না, তোর পেটে তারা জন্মায় নি, আমার কেউ নয় তারা!—চোখেও দেখিনি—কাণেও শুনিনি। কোথায় কাকে বিয়ে করেছে—খৃষ্টেনের মেয়ে না কে—"

"যেই হ'ক্‌, আপনার ছেলের বউ, আপনারই নাতিদের মা। আছে—যেখানে আছে, সুখে থাক্‌। আপনার এ সংসার ত আর জুড়্‌তে পারবেন না? তাদেরটাই কেবল ভাঙ্গবেন। কেন ভাঙ্গবেন? থামুন—থামুন,—যাবেন না, দোহাই আপনার!"

"আঃ,ছাড়্‌ না আবাগী! আমি মা—ছেলের কাছে যাব—ছেলেকে দেখব—ভাল মন্দ দুটো কথা তাকে বল্‌ব তুই কে যে তায় বাদী হচ্ছিস? আমার ছেলের ভালমন্দ আমার চাইতেও তোর বড় হ'ল? ছাড়্‌—ছাড়্‌ বল্‌ছি হতভাগী—"

জোরে পা ছাড়াইয়া সতীশের হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া সৌদামিনী বাহির হইয়া পড়িলেন। তার পর দরজার শিকল লাগাইয়া দিলেন।

৫

সুসজ্জিত কক্ষ। একখানি কৌচের উপরে বরুণা অর্দ্ধ-শায়িতা। নিকটেই একখানি চেয়ারে কিরণ উপবিষ্ট। পাশেই কাপড়ে ঢাকা ছোট একটি টেবলের উপরে স্মেলিং সল্‌ট্‌, ওডিকোলনের জল, আর এক গ্লাস লেমোনেড।

কিরণ কহিল, "একটু সুস্থ হয়েছ এখন?"

"হাঁ।" বলিয়া বরুণা উঠিয়া বসিল।

"এই লেমোনেডটা খেয়ে ফেল।"

"থাক্‌ এখন।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরের দিকে চলিল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"বাইরে যেতে হবে। কায আছে।"

"ব'সো। আমার কথা আছে।"

"কথা—"

"হাঁ, শুন্‌তে হবে। এখুনি শুন্‌তে হবে।"

"বল।" কিরণ বসিল।

"উনি তোমার মা?"

"হাঁ—সেটা ত জান্‌তেই পেরেছ। আবার এ প্রশ্ন কেন?"

"আবার এ প্রশ্ন কেন? এখনও কথার এই ভঙ্গী?"

"তুমিই বা অনর্থক এ প্রশ্ন কেন করছ?"

"কর্‌ছি আমার খুসী! আর তুমি—তুমি—"

"আমি—কি?"

"এত বড় পাষণ্ড—এত বড় প্রবঞ্চক—"

"পাষণ্ড—হ'তেও পারি। ঢের এমন পাষণ্ড এ পৃথিবীতে আছে।"

"কিন্তু এত বড় হীন প্রবঞ্চক—"

"কি এমন প্রবঞ্চনা আমি করেছি?"

"কি প্রবঞ্চনা করেছ! প্রবঞ্চনা আর কাকে বলে! দেশে একটা বিয়ে ক'রে ফেলে এসেছ—আর তাই গোপন ক'রে—বাবাকে ভুলিয়ে আমার এই সর্ব্বনাশ করেছ—"

"বিয়ে করেছি। কিন্তু সর্ব্বনাশ তাতে এমন তোমার কি হয়েছে? সে স্ত্রী আমি ত্যাগ ক'রে এসেছিলাম—এখনও তাকে গ্রহণ কর্‌বার কোনও অভিপ্রায় আমার

নাই। তোমার সংসার যেমন আছে, তেমনিই থাকবে। সপত্নী কেউ এসে শান্তি ভঙ্গ করবে না।"

"কিন্তু সেই সপত্নী এক জন রয়েছে! সপত্নী—ধিক! স—পত্নী! আজকাল আমাদের এই সমাজে সপত্নী! স—পত্নী। জানি না সে কে? আমিই বা কে? বুঝতে পারছি না—আমি তোমার পত্নীই কি না—এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আমাকে বিবাহ করেছ—এটা বৈধ বিবাহই হয় কি না।"

"উড়ো কতকগুলো কথাই শিখেছ, আইন-কানুনের জ্ঞান কিছু নেই। বিবাহ আমাদের হিন্দুমতে হয়েছিল। আগের এক স্ত্রী আছে, এ বিবাহ তাতে অবৈধ হয় না। তুমি আমার বৈধ পত্নীই বট।"

"ঠিক বলছ?"

"বিশ্বাস না হয়, কোনও উকিলকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।"

"কিন্তু কেন আগের ঐ বিয়ের কথা গোপন ক'রে রেখেছিলে? কেন বাবাকে ভুলিয়ে বিলেত যাবার টাকার লোভে—"

"আমি কাউকে ভোলাইনি। কারও টাকার লোভও করিনি। যেচে তিনি টাকা দেন, যেচে তিনিই বিবাহের প্রস্তাব করেন—"

"কিন্তু তখন কেন তাঁকে বলনি যে তুমি বিবাহিত? তুমি কি মনে কর, সেটা জান্‌লেও তিনি বিবাহ দিতেন।"

"সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসাও ত কিছু করেন নি? যেচে কেন আমি বল্‌তে যাব? প্রস্তাব তিনি করেন। জান্‌তাম, বৈধ বাধাও কিছু নেই—"

"কিন্তু ধর্ম্মতঃ—"

"ধর্ম্ম আমি মানি না। আর হিন্দুসন্তানের পক্ষে হিন্দুমতে এরূপ বিবাহে অধর্ম্মও কিছু নাই। ধর্ম্ম যারা মানে, তারাও একটার বেশী বিয়ে অনেক করে। বরাবরই করেছে। আগে যে ধর্ম্ম লোকে এত বেশী মান্‌ত, আরও বেশী এমন বিবাহ হ'ত।"

"চমৎকার ধর্ম্ম!"

কিরণ উত্তর করিল, "সে আলোচনা করবার অবসর এখন নেই। মীমাংসা ত সহজে কিছু হয়ে উঠবে না। যাক্, কায আছে—আমাকে এখুনি বাইরে যেতে হবে। উঠি।"

"না, বসো। ও ত তোমার ছুতো। পালাতে চাও। শোন! আমার এই শেষ কথা!—তোমাদের ও ধর্ম্ম অধর্ম্ম আইন-কানুন যাই থাক্, আমি বুঝিনে। বুঝতেও চাইনে। তোমার স্ত্রী ব'লে নিজে আমি নিজেকে আর মনে করতেই পারছি না। তোমার সংসারেও একটি দিন আর থাকতে পারব না। আজই বাবার ওখানে আমি চ'লে যাব—ছেলেদের নিয়ে।"

কিরণ কহিল, "ইচ্ছে হয়, যেতে পার,—জোর ক'রে আমি রাখতে চাইনে। কিন্তু এটাও জেনো; তুমি আমার স্ত্রী, রাখতে চাইলে যেতে পার না। ছেলেদেরও নিয়ে যেতে পার না।—আইন আদালতও আছে,—রায় তাদের আমার পক্ষেই হবে।"

"বেশ, আদালতেই তবে যাও। দেখ, পুলিস দিয়ে আমাকে ধ'রে আন্‌তে আবার পার কি না। আর তুমি কি মনে কর, তাই পারলে বড় সুখে থাকবে?"

"সুখে এখনও বিশেষ নেই। যেতে ইচ্ছে হয় যাও—বাধাও দেব না, জোর করেও ফিরিয়ে আনব না। আর এটাও জেনো—গেলে আমি সুখী বই দুঃখিত বিশেষ হব না। এ ক'টা বছর আমি কি ভাবছি জান? সুরবালাকে ত্যাগ ক'রে বড় ভুল করেছি। এ দেশেরই মেয়ে সে—আশ্চর্য্য তার চরিত্রের মহিমা! যে দিন তাকে ছেড়ে আসি—যাক্ সে কথা! এইটুকু বলতে পারি, যদি তাকে ফিরে চাই, সব ক্ষমা ক'রে কৃতার্থ হয়ে আমার সঙ্গে সে এসে থাকবে।"

"তাই তবে যাও। একটা দাসী পেয়েছ—দাসী নিয়েই গিয়ে থাক। কিন্তু আমি দাসী নই, দাসী কারও হ'তে আমরা পারিনে,—যাও!"

৬

দুই তিন দিন পরে সতীশ আসিয়া সৌদামিনীকে কহিল, "কিরণ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কাকীমা!"

"কি ব'ল্লে!"

"সে বউ তার বাপের বাড়ী চ'লে গেছে। ওর সঙ্গে আর থাকবে না।"

"বেশ হয়েছে। হাঁ, ছেলে দু'টি?"

"সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

"হুঁ—কচি দু'টি ছেলে—মা'ছাড়া হয়ে থাকবেই বা

কি ক'রে? তা—একেবারেই কি নিয়ে গেল? আর পাঠাবে না?"

"সম্ভব না।"

"দেখলাম, বড়টি বাইরে খেলা কর্‌ছিল, ছোটটি চাকরাণীর কোলে ছিল। চোখ তুলে একটিবার চেয়েও দেখলাম না—" বলিতে বলিতে গভীর একটি নিশ্বাস সৌদামিনী ত্যাগ করিলেন। শেষে আবার কহিলেন,—

"হাঁ, তা এখন কি করবে? বউ ত ছেড়ে গেল—"

"ব'ল্লে, সুরবালা যদি—"

"কি, তাকে নেবে? নিয়ে আবার নতুন সংসার করবে? তাই ব'ল্লে?"

"নিতে পারে—যদি—যদি—"

"কি? ওই বউটি যেমন ছিল—তেম্‌নি বিবির মত হয়ে গে' থাক্‌তে হবে?"

"তা দেখুন—মতিগতি ঐ এক রকম—ঐ একভাবে এত দিন কাটিয়েছে। ধাঁজ ত অম্‌নি এক কথায় এক দিনে বদ্‌লাতে পারে না।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী বলিলেন, "তা যাক্, যদি সে নেয়—তাই থাক্ গে! আমরা দেশেই চ'লে যাই! দিন যে ভাবে হয় যাবে, ওরা ত সুখে থাক্!"

দরজার কাছেই সুরবালা ছিল, বলিয়া উঠিল, "না, তা পার্‌ব না, মা। আপনাদের ছেড়ে, একলা ঐ বাড়ীতে ফেলে—ওখানে ওভাবে গিয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।"

"বলিস্ কি মা? সে হ'ল সোয়ামী—"

"আপনিও শাশুড়ী; সত্য ইন্দু দেওর-ননদ; ঘরের বউ আমি। যেখানেই হক্ থাক্‌তে পারি, যদি আপনার সঙ্গে আপনারই ঘরে থাক্‌তে পাই। নইলে—না মা, তা পার্‌ব না। উনি গিয়ে বলুন, যদি—যদি—সেই রুচি হয়, আপনি নিয়ে যান, যাব, নইলে—না, প্রাণ থাক্‌তে তা পার্‌ব না!"

সতীশ কহিল, "সেটা—এখনই হবে ব'লে মনে হয় না। কি জানেন, মনটা ভেঙ্গে গেছে, আর ঐ বউএর ওপর বেজায় রাগও একটা হয়েছে। রাগটা প'ড়ে গেলে, আবার কি মতি হয়, কে জানে? তার পর ঐ বউই যদি ফিরে আসে? তবে যাই, কথাটা বলেছে—সুরবালা যা ব'ল্লে ব'লে গে' আসি।"

সুরবালা কহিল, "না, এখ্‌নি দরকার নাই। একটা চিঠি বরং লিখে দিন। দেশে ফিরে আমরা যাই। যে সংসার ভেঙ্গে গেছে—যদি গ'ড়ে আবার ওঠে—কে জানে—কেন একটা জঞ্জালের সৃষ্টি করব?"

সৌদামিনী আর কিছু বলিলেন না। বুঝিলেন, বধূ যাহা বলিতেছে, বুদ্ধির কথাই বটে।

সকল কথা বুঝাইয়া সতীশ একখানি পত্র লিখিয়া দিল। পরদিনই সৌদামিনী বধূ ও পুত্র-কন্যাসহ দেশের দিকে ফিরিলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

মুরলীধারী

তোমার গীতি আমাতে নিতি
মৃদুল মন্দ বাজিছে
তোমার কথা আমার ব্যথা
মিশে এক সাথে কাঁদিছে

আমি দারুময় কেবলি রন্ধ্র
(ফোটে) তোমার উচ্ছ্বাস তব আনন্দ
আমি শুধু শূন্য বিহীন দ্বন্দ্ব
(জড়) আঁখি মুদে কাণ পাতিছে

ওগো তোমার মধুর অধর পরশে
জড়ের অন্তরে চেতন পরশে
হর্ষ কি বেদন কিছু না বুঝে সে
(শুধু) ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদিছে।

অপ্রকাশিত]

স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সবাক্-চিত্র

চিত্র ও চিত্র শিল্পী

আলোক-চিত্র দুই প্রকার,—গতিহীন ও গতিশীল। গতিহীন আলোক-চিত্রকে ইংরাজিতে বলে 'ষ্টিল্ ফটোগ্রাফী' (Still-Photography) এবং গতিশীলকে বলা হয় 'মোশন-পিক্‌চার'। গতিশীল আলোক-চিত্র যে গতিহীন আলোক-চিত্রেরই অংশ বিশেষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, গতিহীন আলোক-চিত্র হইতেই গতিশীল আলোক-চিত্রের জন্ম।

যে-কোন ফিল্ম্ কোম্পানীর নূতন ফিল্মের নাম, নট-নটী ও দৃশ্যাদির পরিচয়—গতিহীন-আলোক-চিত্রের সাহায্যে বিজ্ঞাপিত হয়। সিনেমা-সম্বন্ধীয় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পূর্ব্ব হইতে সেগুলি পাঠানো হয়; ফিল্মের বিশিষ্ট অংশসমূহের এই নমুনা দেখিয়া চিত্র-প্রিয়রা নূতন-ফিল্ম দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকেন।

একটা 'সেটের' ভিতর কোন দৃশ্য তুলিবার পূর্ব্বে 'ষ্টিল'-ফটোগ্রাফারকে ডাকা হয়। তিনি আসিয়া সেটের ফটো তুলিয়া লন। ভবিষ্যতে সেই সেটে দৃশ্য তুলিবার প্রয়োজন হইলে নূতন করিয়া সেট সাজাইবার সময় ভুল হওয়া বিচিত্র নয়, এজন্য সেটের ফটো রাখা থাকিলে তাহা দেখিয়া সেট সাজাইতে ষ্টেজ-পরিচালকের ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহা ব্যতীত কোনো অভিনেতা রূপসজ্জা করিয়া অভিনয় করিতে নামিলে তাঁহার ফটো তুলিয়া রাখিতে হয়। কেন না, তাঁহার অভিনয় এক দিনেই শেষ হইবে না, পর-দিনের রূপসজ্জা যাহাতে পূর্ব্বদিনের মত হয়, এ কারণে কর্তৃপক্ষকে এতখানি সাবধানে চলিতে হয়। প্রতিদিন কি পোষাকে কোন্ অভিনেতা অভিনয় করিতেছেন, তাহার রেকর্ড পাইতে হইলে ষ্টুডিয়োর 'ষ্টিল' বিভাগে যাইতে হয়।

আর্ট-বিভাগের দায়িত্ব বড় কম নয়। চলচ্চিত্র তুলিবার গল্প পড়িয়া কোথায় কিরূপ সেট সাজাইতে হইবে, পূর্ব্ব হইতে এ-বিভাগ স্থির করিয়া রাখেন। কোন্ সেটের জানালা, কোন্ সেটের দরজা বা দেওয়াল লইয়া গল্পে যেরূপ গৃহের উল্লেখ আছে, তাহা সুন্দররূপে সাজাইয়া দিবেন। ষ্টুডিওর মধ্যে অসংখ্য সেটের কোথায় কি আছে, কি পাওয়া যাইবে না যাইবে, তাঁহারা জানিতে পারেন শত শত সেটের আলোক-চিত্র দেখিয়া।

অভিনয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী, চিত্র-শিল্পী হইতে পরিচালক সকলেই সেটে (Set) নিজ নিজ স্থানে আসিয়া দাঁড়ান। পরিচালকের সঙ্কেত পাইলেই নট-নটীরা অভিনয় সুরু করিবেন, চিত্র-শিল্পী ক্যামেরা চালাইবেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় ষ্টিল-ফটোগ্রাফারকে ডাকিয়া আদেশ দেওয়া হয়, যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের ফটো লও। আদেশ পাইয়া ফটোগ্রাফার ফটো তুলিবেন। প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফটো প্রস্তুত হইয়া আসে। সেই ফটো দেখিয়া ক্যামেরাম্যান্ নিজের দোষ-গুণ বুঝিয়া ছবি তুলিতে অগ্রসর হন।

মাসিক পত্রিকায় 'তারকা' মার্কা অভিনেতা অভিনেত্রী-দের যে-সব চমৎকার চিত্র বাহির হইয়া থাকে, তাহার জন্য সুখ্যাতি পাইবার অধিকারী গতিহীন-আলোক-চিত্র-শিল্পী। (still cameraman)। একখানি চলচ্চিত্রের কায শেষ করিতে কর্তৃপক্ষের সময় লাগিবে হয় ত তিন-চারি মাস। তাহার পূর্ব্বে সংবাদ-পত্রে, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমরা যে সব চিত্র দেখি, সেগুলি ষ্টুডিওর প্রচার-বিভাগ (Publicity Department) আলোক-চিত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান।

আলোই আলোক-চিত্রের সর্ব্বপ্রধান সহায়। যে চিত্রে আলো-ছায়ার খেলা নাই, সে চিত্র চিত্রই নয়। সাধারণতঃ আলোকের গতির প্রতি আমাদের তেমন একটা লক্ষ্য থাকে না; কিন্তু যিনি চিত্র-শিল্পী, তাঁহার দৃষ্টি থাকে একমাত্র এই আলোকের গতির প্রতি।

হয় ত কোন মনোরম উদ্যানে পুষ্করিণীর জলে বড় বড় গাছগুলির ছায়ার পাশে সূর্য্যালোক পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। কোন চিত্র-শিল্পী যদি সে দৃশ্য দেখিয়া ছবি তুলিবার সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই!

কোন্ দিক্ হইতে ছবি তুলিলে ছবি ভালো হইবে, ইহাই হইবে তাঁহার একমাত্র চিন্তা।

ফটোগ্রাফী বা সিনেমাটোগ্রাফীর আলো দুই প্রকার ;— হার্ড-লাইট ও সফ্ট লাইট ('কড়া' আলো এবং 'নরম' আলো)। উজ্জ্বল মেঘ-মুক্ত দিবসে সূর্য্য হইতে যে রশ্মি সোজাসুজি আসে, সেই আলোর নাম 'কড়া' আলো বা (Hard-Light) এবং মেঘ-ভরা আকাশ চিরিয়া যে নিস্তেজ সূর্য্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, তাহার নাম 'নরম' আলো বা (Soft-Light)। এই দুই প্রকার আলোর সাহায্যে ছবি তুলিলে আলোক-চিত্রের পার্থক্য ঘটে 'কড়া' আলোয় ছবি তুলিলে তাহাতে ছায়া পড়িবে বেশী এবং 'নরম' আলোয় ছবি তুলিলে তাহা হইবে 'ফ্ল্যাট' (flat) বা বিশেষত্বহীন। সুতরাং কোন ব্যক্তির ছবি তুলিতে হইলে কিরূপ আলো চাই, অভিজ্ঞ চিত্র-শিল্পীকে তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

ফটোগ্রাফির ব্যাপারে পাঁচ দিক হইতে আলো পাওয়া যাইতে পারে। যথা—পিছন দিক্ (from behind) হইতে ; সামনের দিক (front) হইতে ; বাঁ বা ডান দিক (either sides) হইতে ; এবং মাথার উপর দিক (from above) হইতে।

এই পাঁচ প্রকার বিভিন্ন আলোর মধ্যে বাঁ বা ডান দিক হইতে যে আলো পাওয়া যায়, তাহার নাম—সাইড-লাইট। এ আলোয় ফটো লইলে যে-কোন ব্যক্তির আলোক-চিত্র সুন্দর হইবে, আলো-ছায়ার লীলায় তাহার শ্রী খুলিবে।

পিছন দিককার (Back light) ও মাথার উপর দিককার (Top-light) আলো একেবারেই ত্যাগ করা উচিত। ইহাতে যাহার ছবি তুলিবে, তাহার মুখের উপর বেশী রকম ছায়া পড়িবে ; রসিকজনের তাহা চিত্ত স্পর্শ করিবে না। ব্যাক্-লাইটে ছবি তুলিলে সে ছবির দাম আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির মুখে ছায়ার দিকটায় রিফ্লেক্টর (Reflector) ধরিতে হইবে। নহিলে সেই ব্যক্তির মুখ অত্যধিক কালো দেখাইবে।

'ল্যাণ্ডস্কেপ' (Landscape) তুলিতে হইলে ব্যাক্-লাইট ছাড়া উপায় নাই। যাঁহারা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলিয়া সুনাম কিনিয়াছেন, সেগুলি তাঁহারা তুলিয়াছেন ব্যাক্-লাইটে। ব্যাক্-লাইটে ছবি তুলিতে হইলে চাই 'ফিল্টার', ফিল্টার কাচের মত জিনিষ ; লেন্সের সম্মুখে রাখিয়া ছবি তুলিতে হয়।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য আলোর সাহায্যে কেমন করিয়া ছবি তুলিতে পারা যায়, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় আমরা তাহা লইয়া আজ আর আলোচনা করিলাম না।

এক জন বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা বলিয়াছিলেন, 'ভালো ছবির আদর হইলে ভালো ছবির সৃষ্টি হইবেই, এবং তাহার জন্য সমালোচনা ও সুখ্যাতির প্রয়োজন আছে।'

আমেরিকায় বিশিষ্ট আলোক-চিত্র-শিল্পীর অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন ষ্টুডিয়োর মধ্যে কৃত্রিম আলোর
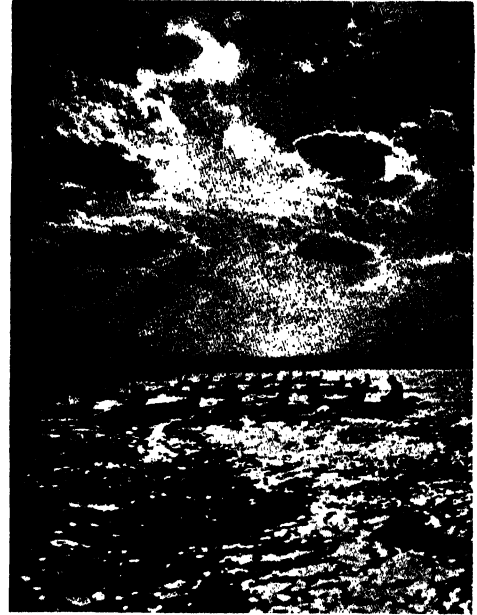
ব্যক-লাইটে তোলা নৌকার দৃশ্য—দৃশ্যটি ফিলটারের সাহায্যে তোলা হইয়াছে

সাহায্যে ছবি তুলিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, অনেকে আবার সুনাম কিনিয়াছেন প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি ও বিমান-পোতে আকাশের চিত্র তুলিয়া।

এক এক বিভাগে এক এক দলের শিল্পী সুখ্যাতি এবং সাফল্য লাভ করিলেও যাঁহারা প্রাকৃতিক দৃশ্য-সহ চলচ্চিত্র তুলিয়াছেন, আমেরিকার 'একাডেমী অফ্ মোশন-পিকচার আর্টস এ্যাণ্ড সায়ান্স' তাঁহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী

বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রতি বৎসর চলচ্চিত্র বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগকে সুবর্ণ-পদক উপহার দিয়া তাঁহারা গুণের আদর করিয়া থাকেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে 'সান রাইজ' (Sun Rise) চিত্রের জন্য চিত্র-শিল্পী চার্লস রোসনার ও কার্ল ষ্ট্রাসকে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হোয়াইট স্যাডো ইন দি সাউথ সি' চিত্রের জন্য ক্লাইড ডু ভাইনাকে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে 'বায়ার্ড অফ দি সাউথ পোল্' চিত্রের জন্য জোসেফ রাকার ও উইলার ভ্যাণ্ডারকে

'ডেভিলড্যান্সার' চিত্রের আলোক বিতরণের নমুনা চিত্র

এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে 'টাবু' চিত্রের জন্য ফ্লয়েড ক্রসবীকে শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ছবিগুলিতে চিত্র-শিল্পিগণ প্রাকৃতিক দৃশ্য বজায় রাখিয়া অতি সুন্দররূপে ক্যামেরার হাতল চালাইয়াছিলেন।

ষ্টুডিওর কৃত্রিম (Artificial) আলোকে ছবি তুলিয়া বহু চিত্র-শিল্পী যশোগৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। তন্মধ্যে 'এ্যানা ক্রিষ্টি' ছবি তুলিয়া চিত্র-শিল্পী উইলিয়াম ড্যানিয়েল্‌স, 'অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট' তুলিয়া আর্থার এডিসন, 'কল অফ দি ফ্লেশ' তুলিয়া ম্যারিয়েট জ্যারষ্টাড, 'সাংহাই এক্সপ্রেস' তুলিয়া লীগারমেস্, 'ট্রান্সল্যাণ্টিক' তুলিয়া জেমস ওয়াংহো 'সঙ্ অফ্ সঙ্গস' তুলিয়া ভিক্টর মিলনার, 'ট্রায়াল অফ ভিভিয়ান ওয়্যার' তুলিয়া আর্নেষ্ট পামার, 'ডাঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড' তুলিয়া কার্ল ষ্ট্রাস, 'ওভার দি হিল্' তুলিয়া জন্ সিট্জ এবং 'বিগ হাউস' তুলিয়া হ্যারল্ড ওয়েন্সট্রম বহু তারিফ পাইয়াছেন।

'হেলস্ এঞ্জেল' ছবি তুলিয়া এরিয়াল চিত্র-বিভাগে সুনাম কিনিয়াছেন এলমার ডায়ার ও হ্যারী প্যারী। অদ্ভুত নৃত্য-সম্বন্ধীয় ছবি 'হুপী' ও 'কিড ফ্রম স্পেন' চিত্রাদি তুলিয়া জর্জ্জ টোল্যাণ্ড, কমিক ছবি 'প্যাক আপ ইয়োর ট্রাবল্স্' তুলিয়া আর্ট লয়েড, 'সিটিলাইট' তুলিয়া গর্ডন পোলক, 'ওয়েলকাম ডেঞ্জার' ইত্যাদি তুলিয়া ওয়াল্টার লানডিন প্রভৃতি চিত্র-শিল্পিগণ চিত্র-জগতে অমর হইয়া আছেন।
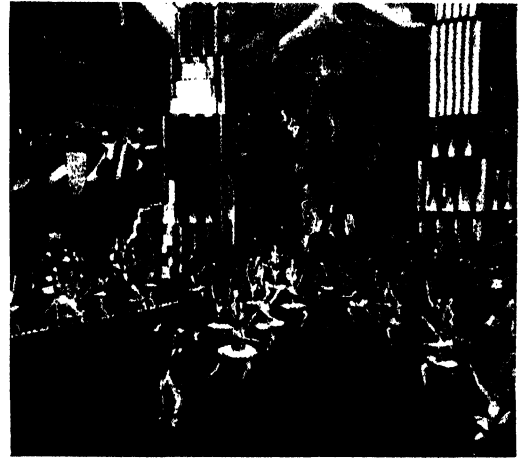
'ব্রডওয়ে'চিত্রের দৃশ্য—নৃত্যগীতবহুল চিত্র হইলে আলোকের ধারা হইবে উর্দ্ধগামী

ম্যাজিক ফটোগ্রাফীর চিত্র 'কিং কং' দেখিয়া এডওয়ার্ড লিনডেন এবং ভারনন্ ওয়াকারকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এবার ষ্টুডিয়োতে কি ভাবে আলোক-নিয়ন্ত্রণ করিয়া ছবি তোলা হয়, তাহাই বলিব।

যিনি ক্যামেরার হাতল চালাইয়া থাকেন, কেহ যেন তাঁহাকে চিত্র-শিল্পী বলিয়া ভুল না করেন। আসলে তিনি চিত্র-শিল্পীর সহকারী মাত্র। যিনি চিত্র-শিল্পী, আলোক ও মনোরম দৃশ্যাদির বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান থাকা

প্রয়োজন। তিনি শুধু দেখিবেন, ছায়াচিত্রের সৌন্দর্য্য কিরূপে বর্দ্ধিত হয়, প্রত্যেক চরিত্রগুলি কেমন করিয়া ক্যামেরার মারফৎ বিকাশ লাভ করিতে পারে ; এবং আলো-ছায়া লইয়া তিনি যদি কৌশল ও চাতুরী দেখাইতে পারেন, তবেই শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীর আসন তিনি কামনা করিতে পারিবেন।

সুতরাং চিত্র-শিল্পীর নিকট আলোর প্রয়োজন যথেষ্ট। যে দৃশ্য তিনি তুলিবেন, তাহাতে প্রচুর আলো থাকা চাই ; নহিলে সে দৃশ্যের সমস্ত খুঁটিনাটী বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

সেটের মধ্যে ব্যাপকরূপে আলো ফেলিলে গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। তাই কোন ছবি তুলিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে চাই 'টপলাইট', তার পর অন্যান্য আলো। এ ক্ষেত্রে ব্যাপক 'ম্যাজ্‌ডা' বাতি ব্যবহার করাই শ্রেয়। এইরূপে আলোক বিতরণ করিলে ছায়ারও সৌন্দর্য্য বাড়িবে এবং প্রত্যেক ছোটখাট জিনিষের উপর উজ্জ্বল আলো পড়িয়া দৃশ্যগুলিকে সুন্দর করিয়া তুলিবে।

আধুনিক সবাক্-চিত্রের যুগে এই নিয়মে ছবি তোলা হয়। পুরাতন যুগে দুইটা মাত্র ক্যামেরা হইলেই ছবি তোলা সম্ভব ছিল ; কিন্তু আজকাল একটা দৃশ্য তুলিতেই তিন-চারিটা ক্যামেরার প্রয়োজন।

বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন লেন্সের দ্বারা ছবি তুলিবার ব্যবস্থা আছে। সে জন্য প্রত্যেক চিত্র-শিল্পীকে বিভিন্ন ধারার আলো লইয়া কায করিতে হয়। তাই উপর হইতে আলো দিবার ব্যবস্থা এখন পাকা হইয়াছে।

প্রয়োজনীয় দৃশ্যে কি উপায়ে আলোক-বিতরণ করিতে হইবে, চিত্র-শিল্পীকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দৃশ্যে যদি বড় একটা জানালা কিংবা খিলান দেখাইতে হয়, তবে তাহার পিছন হইতে আলো আসা খুবই স্বাভাবিক। দৃশ্যে বৈদ্যুতিক-আলো জ্বলিতেছে দেখাইতে হইলে তাহার রশ্মি কতদূর পর্য্যন্ত উজ্জ্বল থাকিবে, তাহার হিসাব জানা দরকার। রাত্রির দৃশ্য তুলিতে হইলে আলোর ধারা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কক্ষের সম্মুখে কাচের সার্সি থাকিলে পিছন দিকের জিনিষের উপর লক্ষ্য না রাখিলে চলিবে না। কোন দোকানের দৃশ্য হইলে চিত্র-শিল্পীকে আরও সাবধান হইতে হইবে।

কৃত্রিম কিংবা সূর্য্যালোক, যে কোন আলোক হউক মোটের উপর আলোক-নিয়ন্ত্রণ ভালো না হইলে চিত্র চিত্তাকর্ষক হইবে না। সে জন্য পূর্ব্ব হইতেই চিত্র-শিল্পীকে চিত্র-নাট্য ও অভিনয়াংশ ভালো করিয়া পড়িয়া লইতে হইবে।

আর্ট ডাইরেক্টরের সহিত একযোগে কায না করিলে তাঁহার কাযে নানা অসুবিধা ঘটিবে। কারণ, আর্ট-ডাইরেক্টর জানেন, কোথায় কি রকম সেটে কোন্ দৃশ্য তোলা হইবে। আলোক-চিত্রের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে আলোক-নিয়ন্ত্রণের উপর। প্রকৃতপক্ষে চিত্র-শিল্পীই চলচ্চিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

আলোর গভীরতাই (density) আসল বস্তু। সুকৌশলে আলোক-নিয়ন্ত্রণ করিয়া সম্মুখের দিক্ অন্ধকার রাখিয়া ছবি তুলিলে আলোক-চিত্র যে সুন্দর হইবে, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। 'সিলুয়েট' (Silhouette) দেখাইতে হইলে দৃশ্যের প্রত্যেক জিনিষের উপর সূক্ষ্ম আলোক-রশ্মি দিতে হইবে। কোন সাদা বস্তুর পরিমাণ-অনুযায়ী আলোক-সম্পাত না করিলে ছবি তুলিবার পর তাহা বেশী সাদা হইয়া যাইবে, তাহাতে কোনপ্রকার বিশেষত্ব বা সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

দৃশ্যের পারিপার্শ্বিক দেওয়াল, থাম ও খিলান প্রভৃতির উপরে বা তলদেশে এরূপ কৌশলে আলোক-সম্পাত করিতে হইবে, যাহাতে সম্মুখের বা নিকটবর্ত্তী আসবাব-পত্রগুলিতে 'অল্প অন্ধকার' থাকে, অর্থাৎ সিলুউটভাব থাকে। সেটের দরজা, জানালা এমন করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে, যেন সেগুলির ভিতর হইতে অনায়াসে আলোক-সম্পাত করা যায়।

বৃত্তাকার সেটের সর্ব্বত্র আলো পাইতে হইলে টপ্-লাইটের প্রয়োজন। খিলানে আলো দিতে হইলে ভূমি হইতে অল্প আলোক-রশ্মি উহার বামে বা দক্ষিণ দিকে তুলিয়া দিতে হইবে। সেটে বক্র বা গোলাকার কোন পদার্থ থাকিলে তাহার পাশে হার্ড-লাইট থাকা আবশ্যক, নচেৎ সৌন্দর্য্য বাড়িবে না। সুদক্ষ চিত্র শিল্পীর প্রধান ও প্রথম কায আলোক-নির্ব্বাচন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে বেশী দৃষ্টি রাখিতে হইবে প্রধান নট-নটীদের উপর। কেন না, তাঁহাদের অভিনয়ের উপরই ছবির অর্দ্ধেক সাফল্য নির্ভর করে। এ স্থলে

নট-নটীদের উপর দুইপ্রকার প্রণালীতে আলোক-সম্পাত করিবার ব্যবস্থা আছে।

কোন ছবিতে কেবলমাত্র তারকাযুক্ত অভিনেতা-

পারসোন্যাল লাইটের চিত্র। সম্মুখে দণ্ডায়মান অভিনেতা জেমস্‌ডান্ ও শিশু অভিনেত্রী সারলে টেম্পলকে আলোকিত করা হইয়াছে মাত্র। বাকি অভিনেত্রীগুলিকে রাখা হইয়াছে অন্ধকারে।

অভিনেত্রীকে বেশী করিয়া পরিচয় করাইতে হইলে ছবিতে যেরূপে আলোক-নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে বলে 'পার্সোন্যাল লাইটিং' (Porsonal Lighting) এবং একাধিক নটনটীকে বেশী করিয়া পরিচিত করাইতে হইলে চাই 'ইম্পার্সোন্যাল-লাইটিং' (Impersonal-Lighting). *

যাঁহারা ডেনিস কিং ও জেনেট ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড কর্তৃক অভিনীত 'ভ্যাগাবণ্ড কিং' নামক সবাক্ ছবিখানি দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, নায়ক এবং অন্যান্য নট-নটীদের অন্ধকারে রাখিয়া কেবলমাত্র অভিনেত্রী জিনেট্ ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের উপরই আলোক-সম্পাত করা হইয়াছে। ইহাকে বলা হয় পার্সোন্যাল-লাইটিং।

ইম্পারসোন্যাল লাইটের চিত্র। স্পেনসার ট্রেসি ও ছয়টি অভিনেত্রীকে আলোকের ভিতর রাখা হইয়াছে।

এই জন্য পূর্ব্বে সামান্য ভূমিকার নট-নটীগণ সু-অভিনয় করিলেও উন্নতি তাঁহারা সহজে বড় একটা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। পার্সোন্যাল-লাইটিংএর পক্ষপাতী হইয়া বহু চিত্র-শিল্পী ও আলোক নিয়ন্ত্রণকারীকে বহু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

হয় ত কোন দৃশ্যে নায়কের সহিত পার্শ্ব-চরিত্রের অভিনেতার খুব প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা

'দুমকক্ষ' চিত্রের দৃশ্য। বিয়োগান্ত গল্পের চিত্রে তিমিরাচ্ছন্নভাবে আলোক সম্পাত করা হইয়াছে

আছে,—এখানে যদি চিত্রশিল্পী পার্সোন্যাল লাইটিং ব্যবহার করেন, তাহা হইলে পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতার অভিনয়ের ও

* In 'personal lighting,' everything is subordinated to making the Star look beautiful ; in impersonal lighting, photographic art and story requirements are paramount.

কথাবার্ত্তার কোন মূল্য থাকে না। এই কারণে চিত্র-শিল্পিগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকট ছোট-বড় সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীই সমান, পার্সোন্যাল-লাইটিং ব্যবহার করিয়া আর তাঁহারা কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইবেন না।

'লো-কে' লাইট। চিত্তোন্মাদক গল্প হইলে আলোকের ধারা হইবে নিম্নগামী

আলোক-নিয়ন্ত্রণের গুণে বহু চিত্র চিত্র-জগতে অমর হইয়া আছে। আপনারা হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, বিভিন্ন প্রকার গল্পে বিভিন্ন রকমের আলোক-সম্পাতের রীতি বর্ত্তমান।

বিয়োগান্ত ছায়াচিত্রের গল্পে প্রধান চরিত্রের উপর ছায়াচ্ছন্নভাবে (sombre) আলোক-সম্পাত করিতে হয়। মেলো-ড্রামা হইলে আলোকের ধারা নিম্নগামী (Low key light) হইবে। কিন্তু তাহাতে আলো-ছায়ার বৈসাদৃশ্য (contrast) থাকা চাই। হাস্যরসাত্মক চিত্রে আলোর গতি হইবে ঊর্দ্ধগামী। ইহার দুইটা কারণ আছে। প্রথমতঃ ইহাতে সমগ্র চিত্রের ঘটনাগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে; দ্বিতীয়তঃ হাস্যের কোন দৃশ্যই দর্শকগণের লক্ষ্য এড়াইবে না। অভিজ্ঞ চিত্র-শিল্পী ইচ্ছা করিলে সূর্য্যালোকের সহিত প্রয়োজনমত যে কোন প্রকার আলো মিশ্রিত করিয়া বহির্দৃশ্য তুলিতে পারেন। সময় সময় তাঁহাদের অতি সূক্ষ্ম চকচকে মশ্‌লিনের ন্যায় কাপড় বা চাদর ঢাকা দিয়া তীব্র আলোর গতিকে তেজোহীন করিয়া দিতে হয়।

বহির্দৃশ্যের আলো লইয়া ইচ্ছামত চালনা করিতে হইলে প্রয়োজন হয় রিফ্লেক্টর (Reflector)। এই জিনিষটির অভাব ঘটিলে ইচ্ছানুযায়ী আলো পাওয়া দুষ্কর। ষ্টুডিয়োতে যেমন ইনক্যান্ডিসেণ্ট-বাতি আছে, তেমনি বহির্দৃশ্যের পক্ষে এই রিফ্লেক্টরই বিশেষ-বাতি।

আর্টিফিসিয়াল আলোকের সাহায্যে রাত্রির দৃশ্য তোলা হইয়াছে

রিফ্লেক্টর আছে বহু প্রকার। বেশী চক্‌চকে হইলে তাহা হইতে বেশী আলো পাওয়া যাইবে। সূর্য্যদেবকে আকাশে দেখিতে পাওয়া গেলে 'হাই' (High), 'সফ্‌ট' (Soft), 'ফ্রণ্ট' (Front) 'ব্যাক্' (Back), 'ক্রশ্'
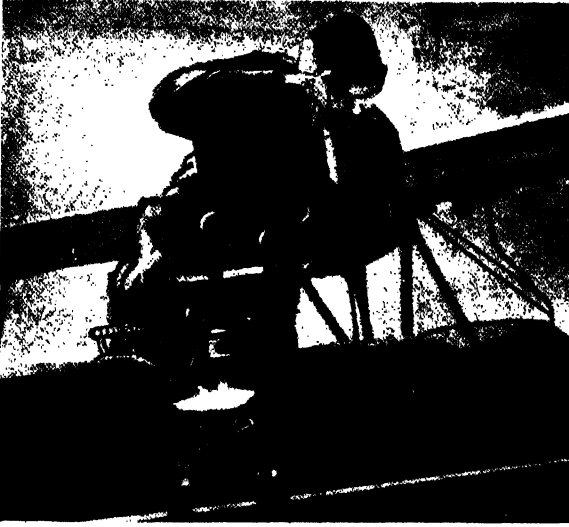
এয়ারপ্লেন হইতে আকাশের দৃশ্যাদি লওয়া হইতেছে

(Cros:) ও বীম-লাইটের কিছুমাত্র অভাব হইবে না, কিন্তু তিনি যদি মেঘের আড়ালে লুকাইয়া পড়েন এবং শীঘ্র মুক্তি পাইবার আশা না থাকে, তাহা হইলে ষ্টুডিয়ো হইতে আর্টিফিসিয়াল আলো আনিয়া মেঘলা দিনেও ছবি তুলিতে পারা যায়।

আমেরিকার চিত্র-শিল্পিগণ কড়া সূর্য্যালোক অপেক্ষা মেঘ-ঢাকা তেজোহীন সূর্য্যালোকের সহিত আর্টিফিসিয়াল আলো মিশাইয়া ছবি তুলিতে ভালোবাসেন এবং ইহাতে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণও তীক্ষ্ণ রিফ্লেক্টরের আলোয় চক্ষু ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অভিনয় করার কষ্ট হইতে অব্যাহতি পান। কিন্তু সমস্ত বহির্দৃশ্য—বিশেষ করিয়া 'লঙসট' দৃশ্যগুলি সূর্য্যালোকে না লইলে উপায় নাই। পুরাতন যুগে রাত্রির দৃশ্য লওয়া হইত দিবালোকে—নীল রঙের পজেটিভ ফিল্মে প্রিণ্ট করিয়া তাহাকে রাত্রির দৃশ্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইত। এখন এ-যুগে বাস্তবতা বজায় রাখিয়া রাত্রির দৃশ্য আর্টিফিসিয়াল আলোর সাহায্যে তোলা হয়।

আধুনিক চিত্র-জগতে বহির্দৃশ্য বা অন্তর্দৃশ্যের আলোর উপর কর্তৃত্ব করা বড় সহজ ব্যাপার নয়, বহু ক্ষেত্রে গতিশীল ক্যামেরাকে অনুসরণ করিয়া সুকৌশলে অনেক বাধাবিঘ্ন সহিয়া আলোক-নিয়ন্ত্রণকারীদের কায করিতে হয়। তাই অভিজ্ঞ চিত্র-শিল্পীর সাহায্য ব্যতিরেকে কোন চিত্রই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনিতাই ঘোষ ও শ্রীসুকুমার হালদার।

আকাঙ্ক্ষা

সুখে-দুখে মা গো, মোর অবিশ্রান্ত জীবনের ধারা
জন্ম হ'তে মৃত্যুপানে চলিয়াছে হ'য়ে লক্ষ্যহারা।
একটানা বহে স্রোত, স্থিতি তার নাহি কোনখানে,
অহঙ্কার-ঘূর্ণাবর্ত্ত কোলাহল তুলে স্থানে স্থানে।

সেই ঘূর্ণাবর্ত্ত-মাঝে ঘুরে ফিরে যত আবর্জ্জনা,
তীব্র আলোড়ন-বেগে বাজে মর্ম্মে বিষম বেদনা।
দুঃখের আঘাতে ডুবি' আপনাতে করি অন্বেষণ,
ক্ষণিকের তরে যেন পাই মা গো, তব পরশন!

আনন্দের কণা লভি' গতিবেগ হয় মন্থরিত,
বিক্ষোভ থামিয়া যায়, রহে প্রাণ চরণে চুম্বিত।
আবার হারায়ে ফেলি, আবার সে আসে কোলাহল,
আবর্ত্ত-আঘাতে উঠে বাসনা-ফেনিল হলাহল।

সুখ আনে ধ্যানে তব, বিহনে তোমার দুঃখভার,
বার বার ঠেকে শিখি' বুঝিয়াছি জননী আমার,
আনন্দরূপিণী তুমি। আনন্দস্বরূপ যদি মোর,
তুমি-আমি ভেদ কোথা? দুই জন নহি স্বতন্তর।

তোমার আমার মাঝে আজো রহে যেই আবরণ,
যে দিন প্রচণ্ডাঘাতে ভেঙ্গে দিবে জ্ঞানের কিরণ,
সে দিন তুমিই রবে; জীবনের ধারা যাবে থামি'—
বর্ত্তমান মহাকালে লয় হবে অতীত-আগামী।

সেই একার্ণব-জলে—সাধ মনে উঠে অনিবার—
আমিত্বের রেখাটুকু মুছিও না, জননী আমার!
সে রেখা জলের রেখা, স্বরূপ না করে আবরণ,
অনিমেষ আঁখিপাত লীলা'তব করিবে দর্শন।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য।

য়ুরোপে সমরশঙ্কা ও জটিল সমস্যা

আজকাল য়ুরোপে একটা অদ্ভুত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে য়ুরোপের বুদ্ধিমান জাতিরা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের আর কোনমতেই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে অর্থাৎ এই বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-শস্ত্রের যুগে কার্য্যটা যে কেবলমাত্র জনক্ষয়কারক, তাহা নহে, উহা অতিশয় ধনক্ষয়কারক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক একখানা জাহাজ জলে ডুবিলে কোটি টাকা জলসই হয়। এক একখানা রণবিমান পড়িলে শত শত টাকা মাটী হয়। এক একটা কামানের গোলা দাগিতে বহু টাকা ছাই হইয়া যায়, প্রতি সেকেণ্ডে এমন কত কামানের গোলা ছুড়িতে হয়, তাহার ধারণা করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং যুদ্ধের ব্যয় কত অধিক, তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। এত ব্যয় করিয়া আজকাল কোন দূরদর্শী জাতিই সংগ্রামে লিপ্ত হইতে চাহে না। পক্ষান্তরে, নিয়তির যেন কেমন একটা টান আছে। সেই টানে আকৃষ্ট হইয়া সকল জাতিই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সংগ্রামের উপকরণ নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য বিবিধ আয়োজনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। ঐ টাকা যদি তাহারা তাহাদের দেশের ও দশের উপকারের জন্য বিনিয়োগ করিত, তাহা হইলে মানবসমাজের অনেক উপকার হইত। কিন্তু য়ুরোপীয় জাতিরা যেরূপ সভ্যতায় লালিত-পালিত, তাহাতে তাহারা কেহ কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে। ইহা ভিন্ন অর্থগত এবং বাণিজ্যের স্বার্থগত সঙ্ঘর্ষ ত আছেই। যেখানে পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন, সেখানে প্রত্যেক জাতিই পৃথকভাবে নিজ নিজ প্রাধান্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। তাহারই ফলে আচম্বিতে এবং অতি সামান্য অথবা নিতান্ত অবোধ্য কারণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে। কতকগুলি প্রতিবেশী যদি পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন এবং কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ ও মামলা যেমন অতি তুচ্ছ কারণে আত্মপ্রকাশ করে, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে প্রায় সকল সভ্য জাতির মধ্যে সেইরূপ অন্তর্ব্বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক মাত্রায় দেখা দিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে এখন জার্ম্মাণাতঙ্ক সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। সেই জন্য সমস্ত য়ুরোপে আজকাল দল বাঁধিবার এবং দল পাকাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যুগোশ্লেভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারকে ফ্রান্সের মার্সেলস্ সহরে হত্যা করা হইল, সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্র-সচিব বার্থাউও ফাউ হিসাবে নিহত হইলেন। ইহার মূলে কি রহস্য নিহিত, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। আমরা গত মাসেই লিখিয়াছিলাম যে, এই রাজহত্যা ব্যাপারটি নিছক রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে উদ্ভূত কি না, তাহা বলা যায় না। এখন দেখা যাইতেছে, ইহার মূল অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। যুগোশ্লেভিয়ার সরকার সম্প্রতি জাতি-সঙ্ঘের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এক দল বিপ্লববাদী কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই হাঙ্গেরীতে আসিয়া আস্তানা লইয়াছে। উহারা বিদেশ হইতে আসিয়া হাঙ্গেরীতে অধিবাসী হইয়াছে। উহারা যুগোশ্লেভিয়ায় অনেকরূপ অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল। হাঙ্গেরীর কর্তৃপক্ষ উহাদের অত্যাচার-কার্য্যের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এই অভিযোগ যে অত্যন্ত গুরু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আরও একটা কথা আছে। ইটালীও এই ব্যাপারে হাঙ্গেরীর সহিত জড়িত, এরূপ অভিযোগ কেহ কেহ করিতেছেন। এ সব অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা, তাহা পরে জানা যাইবে। তবে যুগোশ্লেভিয়ার সরকার বলিতেছেন যে, তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা এই তথ্য জানিতে পারিয়াছেন। আমরা গতবারই বলিয়াছিলাম যে, গত ১লা মে তারিখে যুগোশ্লেভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড সহরে জার্ম্মাণীর সহিত যুগোশ্লেভিয়ার এক সন্ধি হইয়া গিয়াছে। ১লা জুন হইতে ঐ সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। ইটালীর—কেবল ইটালী কেন, য়ুরোপের আরও কতকগুলি রাষ্ট্রনায়কও এই ব্যাপারটা বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। যুগোশ্লেভিয়া, বাণিজ্যবিষয়েই হউক আর অন্য যে কোন বিষয়েই হউক, জার্ম্মাণীর সহিত প্রেম করেন, ইটালী ইহা ইচ্ছা করেন না, এ কথাটা খুবই সত্য। এখন কিঞ্চনকের সন্ধানে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইয়া বিষধর অজগর বাহির হইয়া পড়ে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? তাই মনে হয়, য়ুরোপের শান্তি এখন একটা অতি ক্ষীণ সূত্রে ঝুলিতেছে। কখন্ কি হয়, তাহা বলা যায় না। ইটালীতে সেনর মুসোলিনী, জার্ম্মাণীতে হার-হিটলার, পোলাণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব জোসেকিবেক প্রভৃতির বাক্য এবং কার্য্য সেই ক্ষীণ সূত্রের উপর যদি বারংবার আঘাত করে, তাহা হইলে এই শান্তি যে কখন্ ধূলায় লুটাইয়া পড়ে, তাহা বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। রুস পররাষ্ট্র-সচিবের সহিতও পোল্যাণ্ডের একটা সন্ধি হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক,

এখন পোল্যাণ্ড কয়েকটি রাষ্ট্রপতির নিকট ধমক খাইয়া একটু চুপ করিয়া গিয়াছে।

এ দিকে রুসিয়ার সম্বন্ধে জাপানের মনোভাব একেবারেই ভাল নহে। কোন প্রকারে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধটা স্থগিত রহিয়াছে। কিন্তু কত দিন আর এই ভাব থাকিবে, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। রুসিয়া য়ুরোপের কতকগুলি প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত ইদানীং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু জাপানের সহিত বিশেষ সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারিতেছে না। কারণ, প্রাচ্য এসিয়াতে উভয় পক্ষের স্বার্থ লইয়া বিবাদ বাধিবার যথেষ্ট হেতু বিদ্যমান। তাহার উপর তুরস্ক তাহার রাজ্যে বৈদেশিকদিগের বাণিজ্য করিবার অধিকার কতকটা সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছে। ইহার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রপতিদিগের মনে বিষম ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। উহা হইতেই পারে। এ দিকে স্পেনে গৃহবিবাদ ত আছেই। ফলে য়ুরোপের অন্তরে শান্তি নাই। ইহা যুদ্ধ বাধিবার অনুকূল অবস্থা, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিন্তু যুদ্ধের ব্যয় ও বিপজ্জনকতা বর্ত্তমান সময়ে সংগ্রাম-সজ্ঘটনের পক্ষে প্রবল বাধারূপে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে রণবিমান এক বিরাট ধ্বংসিনী শক্তিরূপে মানব জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে রণবিমান প্রায় দশ হাজার মিটার পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিতে পারে। অর্থাৎ প্রায় ৩২ হাজার ৮ শত ফুটের উপরে উঠিতে সমর্থ। সোজা কথায় এভারেষ্ট পর্ব্বতের মাথার উপর আরও ৩ হাজার ৮ ফুট উর্দ্ধে উড়িয়া যাইতে অসুবিধা বোধ করে না। এখনকার রণবিমান পূর্ব্ববর্ত্তী রণবিমান অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝা লইয়া উড়িতে পারে। অত উর্দ্ধ হইতে পৃথিবীস্থ কোন বস্তুই ঠিক লক্ষ্য করা যায় না। ভূপৃষ্ঠ হইতে কোন গোলাগুলীই ঐ বিমানকে বিদ্ধ করিতে পারে না, কারণ, অত উর্দ্ধে অবস্থিত বিমানকে কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না। কিন্তু উহা হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া গ্রাম জনপদ একেবারে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে। রোগবীজাণুপূর্ণ বোমা নিক্ষিপ্ত করিয়া রণবিমানগুলি শত্রুর দেশে জনসাধারণের মধ্যে অতি প্রবল এবং ভীষণ মহামারীর সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, অস্ত্রসঙ্কোচন সমিতি বা পরিষদ কর্ত্তৃক এই সকল ভীষণ সংহার-অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইবে। অস্ত্রসঙ্কোচসাধিকা সভাগুলিতে এই সম্বন্ধে কথাও উঠিয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রস্তাব ঐ সকল পরিষদে গ্রাহ্য হয় নাই। উহা গ্রাহ্য হইলেও যে, কোন জাতি সংগ্রামকালে সেই নিষেধ মানিয়া চলিত, তাহা মনে হয় না। সুতরাং যুদ্ধকালে রণবিমান হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু অত্যন্ত উচ্চ হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে, ততদূর হইতে লক্ষ্য স্থির হইবে না বলিয়া সেই বোমা কোথায় কাহার উপর পড়িবে, তাহা বুঝা যাইবে না। ফলে নিশাযোগে অনেক সুপ্ত নগরী আচম্বিতে বোমানিক্ষেপের ফলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, অনেক গ্রাম জনপদ কি দেশ পর্য্যন্ত সংক্রামক ব্যাধিতে উৎসন্ন হইবে। এইরূপ ব্যাপারে অতি শীঘ্রই প্রতিপক্ষদিগকে পরাজয় করা সম্ভব হইবে। সুতরাং যে দেশের রণবিমান যত প্রবল ও শক্তিশালী, সেই দেশ তত শীঘ্রই জয়লাভ করিবে। ইহাতে যে অনেক নিরীহ ব্যক্তি নিহত হইবে, সে বিষয় কেহ চিন্তা করিবে না। ইহাও যুদ্ধ বাধাইবার একটা প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে, সে কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

রণতরী বৃদ্ধির দিক দিয়া দেখিলেও দেখা যায় যে, পৃথিবীর বহু জাতিই এখন রণতরী নির্ম্মাণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এক একখানা রণতরী নির্ম্মাণের ব্যয় অতিশয় অধিক। সেই জন্য এই বাবদ প্রত্যেক শক্তিশালী জাতির যে কত টাকা জলে যাইতেছে, তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই রণতরীসঙ্কোচসাধনকল্পে এ পর্য্যন্ত বহুবার পরামর্শ-পরিষদ আহূত হইয়াছে। কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। যে জাতির যতদূর সাধ্য, সে জাতি ততদূরই তাহাদের নৌবল বাড়াইয়া তুলিতেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মার্কিণের ওয়াসিংটন সহরে নৌবল-সঙ্কোচনের প্রথম পরিষদ আহূত হয়। তখন ধরাপৃষ্ঠে তিনটি জাতি নৌবলে বলীয়ান্ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। প্রথম বৃটিশ সাম্রাজ্য, দ্বিতীয় মার্কিণ, তৃতীয় জাপান। রণতরী-সম্পদে তখন গ্রেট বৃটেন অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহার পর মার্কিণ এবং জাপান যে ভাবে রণতরী বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহাতে এই দুই দেশই নৌবলে প্রায় সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে মনে হইয়াছিল। কিন্তু কিছু দিন ধরিয়া রণতরী নির্ম্মাণের ব্যয়ের জন্য মর্কিণরা বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল, জাপানী করদাতারা বিষম দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিল। সে সময়ে রণতরী-সম্পদে ফ্রান্স এবং ইটালী গণনার মধ্যেই আসিত না। তাহার পর যখন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জেনিভা সহরে আবার রণতরীসঙ্কোচসাধক পরিষদ বসিল, তখন কায কিছুই হইল না, কেবল অর্থব্যয় এবং বাক্য-ব্যয়ই সার হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে উক্ত পরিষদের যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে পঞ্চশক্তি মিলিত হইয়াছিল। কারণ, ঐ সময়ে ইটালী এবং ফ্রান্স নৌশক্তিশালী দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু সেই পরিষদে যখন একটা কথা পাকা হইবার মত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ইটালী ও জাপান সরিয়া দাঁড়াইল। তখন ব্যাপারটা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, নৌবাহিনীর সঙ্কোচসাধন করিতে হইলে সকল নৌ-শক্তিশালী জাতিরই তাহাতে সম্মত হওয়া উচিত। তাহা হইল না। অগত্যা ইংলণ্ড, মার্কিণ এবং জাপান এই তিনটি দেশের কর্ত্তৃপক্ষ একটা আপসমৌজা ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। উহাতে গ্রেট বৃটেনকে কিছু ঠকিতে হইয়াছে। কারণ, গ্রেট বৃটেনে তখন সমাজতন্ত্রীরাই শাসন-তরণীর কাণ্ডারী। তাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে আপন দলের পশার জাঁকাইবার জন্য অনেকটা ত্যাগস্বীকার করিলেন। তাঁহারা ছাড়িয়া দিলেন অনেক, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সন্তোষজনক কিছুই পান নাই।

যাহা হউক, ওয়াসিংটনের অস্ত্রসঙ্কোচ সমিতিতে কতকটা সুবিধাজনক সর্ত্ত করা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, কতক পরিমাণে নৌবাহিনীর সঙ্কোচ সাধিত হইবে। কিন্তু সে আশা বিশেষভাবে সফল হইবার কোন লক্ষণই প্রকটিত হইল না। তখন যে অবস্থায় ঐ পরিষদের বৈঠক বসান হইয়াছিল, তাহা অনেকটা অনুকূল ছিল। য়ুরোপের বড় বড় দেশ তখন যুদ্ধক্রমে অবসন্ন। সকল দেশেই

অর্থের অতিশয় টানাটানি। কাযেই তাহারা একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। মার্কিণে ও জাপানে তখন জনসাধারণ নৌ-বাহিনীর জন্য অত্যধিক অর্থব্যয় করিতে অসম্মত। সেই জন্য সর্ব্বত্রই নৌ-বাহিনী বাবদ ব্যয়সঙ্কোচের জন্য ব্যস্ততা লক্ষিত হইয়াছিল। কাযেই সেবার যৎকিঞ্চিৎ সুবিধা-জনক সর্ত্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু আসলে যে কিছু হয় নাই, তাহা কেহ দেখিল না বা বুঝিল না। এ দিকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে যে ফাসিষ্ট-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে ইটালী একটি প্রথম শ্রেণীর রাজ্যে পরিণত হইয়া দাঁড়ায়। ইটালী ভূমধ্যসাগরে স্বীয় নৌবল সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠে। ভূমধ্যসাগরোপান্তে ইটালীর বেলাভূমি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। উহা রক্ষা করিবার জন্য ইটালীবাসীদিগের নৌবাহিনীর প্রয়োজন আছে,—ইহা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ঠিক ঐ সময়ে ফ্রান্স তাহাদের জন্য একটি বলবতী নৌবাহিনী নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে তাঁহাদের অধিকার-ভুক্ত অনেক দেশ আছে। ভূমধ্যসাগর পার হইয়া সেই সকল দেশে যাইতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের নৌবাহিনী-নির্ম্মাণের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ফলে ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লইয়া ইটালী এবং ফ্রান্স এই দুইটি প্রতিযোগী দেশের মধ্যে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহা শান্তি স্থায়ী রাখিবার পক্ষে কোনমতেই অনুকূল অবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এ দিকে গ্রেট বৃটেনের নৌবাহিনীর যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, সমস্ত পৃথিবীতেই তাহার অধিকার বিক্ষিপ্ত এবং বিস্তীর্ণ। গ্রেট বৃটেনকে সেই সকল দেশ রক্ষা করিতে হয়। কাযেই তাহার পক্ষে শক্তিশালী নৌবাহিনী রক্ষার হেতু বিদ্যমান। কিন্তু মার্কিণের সেরূপ কিছু নাই। পক্ষান্তরে, গ্রেট বৃটেনকে প্রতিদিন সাগরপথে ১ লক্ষ ১০ হাজার টন করিয়া পণ্যদ্রব্য সাগর বাহিয়া বিদেশ হইতে আনিতে হয়। ঐ সকল পণ্য ৮০ হাজার মাইল সাগরপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া পৌঁছায়। উহা না আসিলে বৃটেন-বাসীদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে। সেই সমস্ত পণ্য রক্ষা করাই বৃটিশ রণতরীর কায। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণ সবম্যারিণের অত্যাচারের ফলে গ্রেট বৃটেনে কেবলমাত্র ৬ সপ্তাহের খাদ্য সঞ্চিত ছিল। কিন্তু মার্কিণের সে সমস্ত বালাই কিছুই নাই। তথাপি মার্কিণ তাহার রণতরী কেন বাড়াইতে-ছেন, তাহা বুঝা কঠিন। মার্কিণ এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে বাণিজ্য-বিস্তার করিতে চাহে। জাপান তাহার প্রতিবাদী। কাযেই এই ব্যাপার লইয়া এসিয়ার পূর্ব্বখণ্ডে উভয় দেশের মধ্যে স্বার্থ লইয়া সজ্ঘর্ষ বাধিবার আশঙ্কা আছে। সে কথা কেহ মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে মনে সকলেই বুঝিতেছে। কাযেই এদিকটাও শঙ্কাহীন নহে।

গ্রেট বৃটেনও যে এই ব্যাপারে জাপানের উপর একটু সন্দেহ-দৃষ্টিতে না দেখেন, তাহা মনে হয় না। সম্পত্তি থাকিলেই সম্পত্তি রক্ষার জন্য উদ্বেগ আসিবেই। প্রাচ্য এসিয়াতে বৃটিশ জাতির সম্পত্তি নিতান্ত অল্প নহে। বাণিজ্যও যথেষ্ট ছিল, এখন জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় উহা অনেক হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

তাহার উপর এখন পৃথিবী শুদ্ধ সকল স্বাধীন জাতিই বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসারসাধনকল্পে অত্যন্ত অধিক অবহিত হইয়া উঠিতেছে। সকলেরই চেষ্টা যে, সে বিদেশে পণ্য বিক্রয় করিয়া ধনশালী হয়। শ্রমশিল্পজ পণ্য দিয়া বিদেশ হইতে অর্থ আহরণই ছোট বড় সকল জাতির লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাযেই আর্থিক ব্যাপারে সকল জাতির মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দাঁড়াইয়াছে। বাণিজ্যজনিত ঈর্ষার ফল যে বর্ত্তমান যুগে শান্তিভঙ্গের একটা প্রবল কারণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের মূলে যে কতকটা বাণিজ্যজনিত ঈর্ষা ছিল না, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত কেহ বলিতে পারেন না। এবারও যে ঐ কারণে য়ুরোপ যুদ্ধের বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

লর্ড সিসিল সম্প্রতি লিখিয়াছেন, অস্ত্রব্যবসায়ীদিগের চক্রান্তের ফলে অস্ত্র সঙ্কোচ করিবার এবং করাইবার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত সমিতি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। উহারাই শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রবল শত্রু। উহারা না থাকিলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অস্ত্রসঙ্কোচ সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। প্লাইমাথে বক্তৃতাকালে ইনি বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে এসিয়ার পূর্ব্বাংশ, এমন কি, ভারত পর্য্যন্ত বিজড়িত হইতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে ভারতে উদ্বেগের কারণ আছে। লর্ড সিসিল আরও বলিয়াছেন যে, বৃটিশ জাতি ভবিষ্যৎ যুদ্ধে বিজড়িত হইবেই হইবে। বিলাতের লয়েড জর্জ্জ এক জন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। বিগত
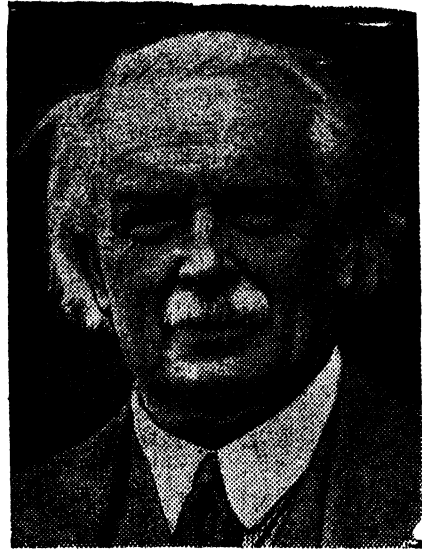
মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইনি গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি বলিয়াছেন, সমর যে খুবই আসন্ন, ইহা তিনি মনে করেন না। তাঁহার বিশ্বাস, সমরকে যতটা আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, উহা ততটা শীঘ্র ঘটিবে না বটে, উহার সময়

পিছাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইলেও উহা ঘটিবেই ঘটিবে। তিনি 'এক্সপ্রেসে' বলিয়াছেন যে, যাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে সমরসংঘটন নিবারণ করিবেন, তাঁহাদের কথায় তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। গগনে রণদৈত্যের দন্ত-বিকাশ দেখা যাইতেছে। ইহার উপর আর অধিক কথা বলা যায় না। মিষ্টার এ, জি, গার্ডেনার বলিয়াছেন, এইবার বুঝি শ্বেতাঙ্গ জাতির সভ্যতার খতম হয়। ইহার জন্যই সমস্ত মৃত্যুর আয়োজন। য়ুরোপের বড় বড় জাতি মৃত্যুর রসদ সংগ্রহে মন দিয়াছে। এখন কোথায় হঠাৎ একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্ভব হইয়া উহা সমস্ত পাশ্চাত্য জাতিকে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তাহা বলা যাইতেছে না। ইনি রণ-বিমানের দ্বারা যুদ্ধ চালাইবার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ফলে পৃথিবীর বর্ত্তমান লোকদিগের ভবিষ্যৎ কিরূপ অন্ধকারময়, তাহা অনেকটা অনুমান করা যাইতেছে। অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, এই সকল নৈরাশ্যপূর্ণ কথা কেবল পৃথিবীর সমস্ত শক্তিশালী জাতিকে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ করাইবার জন্যই বলা হইতেছে। আবার অনেকেই বলিতেছেন যে, এই সকল কথা বলার ফলে যুদ্ধ আরও আসন্ন হইয়া পড়িবে। পৃথিবীর শান্তি-রক্ষার সম্বন্ধে এইরূপ নানা মুনির নানা মত নানাদিক দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

এই সকল বাদবিতণ্ডার ভিতর দিয়া আর একটা ব্যাপার অত্যন্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কেবল পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা এবং অবিশ্বাসই এই অশান্তি উদ্ভবের কারণ নহে। য়ুরোপীয় জাতির অতিলোভ বা অতিরিক্ত অর্থলালসাও ইহার অন্যতম প্রবল কারণ। যাহারা অস্ত্রব্যবসায়ী, তাহারা অর্থ-লোভে অন্যকে অস্ত্র যোগাইতেছে। ভার্শাইলের সন্ধিসর্ত্ত উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মাণীকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে। মার্কিণ হইতে অস্ত্র আমদানী হইয়া জাপানের অস্ত্রাগার পূর্ণ হইতেছে। মার্কিণে রণবিমান কাটাইবার চেষ্টা বিশেষভাবে করা হইতেছে। ফলে পৃথিবীতে আর কত দিন শান্তি রক্ষিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যে ব্যাপারে লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিদ্যমান, তাহার ফল কখন ভাল হইতে পারে না। বিশিষ্ট রাজনীতিকরা তাহা বুঝিতেছেন, কিন্তু নিয়তির এমনই খেলা যে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও তাহা পরিহার করিতে পারিতেছেন না। এই সমস্যাটিই এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল এবং প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার নিরস্ত্রীকরণের কথা

আজ কয় বৎসর ধরিয়া নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা করিতে অনেকের প্রবৃত্তি জাগে না। যাহা হইবার নহে, তাহা লইয়া মস্তিষ্ক-পীড়ার সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন? কিন্তু নিয়তির এমনই খেলা যে, কথাটা বার বার যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতেছে। সম্প্রতি এই বিষয়টি আবার আসিয়া হাজির হইয়াছে। পাঠক সংবাদ পাইয়াছেন যে, রুসিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন। যোগ দিবার অষ্টাহ পরেই রুসিয়ার স্বনামধন্য ম্যাক্সিম এম লিটভিনফ নিরস্ত্রীকরণ সমিতির নিকট হইতে ভবিষ্যতের জন্য অস্ত্রসঙ্কোচ-সাধন সমস্যার এক নিষ্পত্তি করিয়া লইবার জন্য তাগিদ দিয়াছেন। তিনি লীগ-সমিতির সুইডিস জাতীয় সভাপতি রিচার্ড জে স্যাণ্ডলারকে এক পত্র দিয়াছেন। সেই পত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, অস্ত্রসঙ্কোচ প্রচেষ্টার ফল কতদূর হইয়াছে এবং ইহা ঘটিবার সম্ভাবনাই বা কতখানি, তাহার সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লীগের ইংরাজ সভাপতি আর্থার হেণ্ডারসনকে দাখিল করিতে বলা হউক।

জেনিভা সহরে যিনি রুসিয়ার মুখপাত্ররূপে বিরাজিত, তিনি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে নিউইয়র্ক টাইমসের জনৈক সংবাদ-

এম লিটভিনফ

দাতাকে বলিয়াছেন যে, আসল কথাটা এই—এই অস্ত্রসঙ্কোচ পরিষদ এখন যেরূপ কোনরূপে গয়ং গচ্ছ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছে, এইরূপ ভাবেই কি ইহা চলিবে? না ইহার দ্বারা কোন কাযের মত কায করাইয়া লওয়া হইবে? রুস প্রতিনিধিগণের কথা এই যে, এই সমিতির বা পরিষদের দ্বারা কিছু কায করিয়া লইতে হইবে। উহাকে অতিকায় রাখা হইবে না, উহার আকার গুটাইয়া ছোট করিয়া আনিতে হইবে। রুসিয়ানরা বরাবরই অস্ত্রসঙ্কোচসাধিকা সমিতিকে স্থায়ী করিয়া রাখিবারই পক্ষপাতী। বিগত সমিতিতে লিটভিনফ এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ী করা হউক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেহই সেই প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই। এইবার রুসিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণ পরিষদের নিয়ন্তা মিষ্টার হেণ্ডারসনকে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে জাতিসঙ্ঘ পরিষদে নিরস্ত্রীকরণ সমিতির অতীত এবং ভবিষ্যতের বিষয় আলোচনা করিয়া এক রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য প্রস্তুত রাখিতে বলা হইবে। ফ্রান্স প্রভৃতি কতক-গুলি দেশ লিটভিনফের এই প্রস্তাব পূর্ণ মাত্রায় অথবা অর্দ্ধ মাত্রায়

প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, ঐ পরিষদ বা সমিতিটি আর জিয়াইয়া রাখিয়া কোন লাভই নাই। লিট্‌ভিনফের প্রস্তাবের ভিতর একটা বড় বিষম ব্যাপার লুকাইয়া আছে। সেই জন্য অনেকে তাঁহাকে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ইহার কারণ, অনেক রাজনীতিকের মনে এইরূপ একটা শঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছে যে, মিষ্টার হেণ্ডারসন যে রিপোর্ট দাখিল করিবেন, তাহাতে তিনি পাছে বলিয়া দেন যে, জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অস্ত্র-সঙ্কোচক সমিতির সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে, তখন ঐ কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আরও অনেক কাহিনী প্রকাশ পাইবে। ভার্সাইলের সন্ধিসর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া জার্ম্মাণীর অস্ত্র-শস্ত্রসজ্জার কথা উঠিবে। গ্রেট বৃটেন ঐ কথাটা তুলিতে বড় একটা রাজী নহেন। যাহা হউক, আপাততঃ এই কথাটা ধামা চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে। লিট্‌ভিনফ নাছোড়বান্দা। তিনি বলিয়াছেন যে, লীগের পরিষদে প্রকাশ্যভাবে তিনি ঐ কথা তুলিবেন। এখন কোথাকার ব্যাপার কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কে বলিতে পারে। য়ুরোপের সর্ব্বত্রই শুষ্ক ইন্ধনের স্তূপ সজ্জিত রহিয়াছে। এখন আচম্বিতে কোন্ দিক হইতে বজ্রাগ্নি পতিত হইয়া উহাকে প্রজ্বালিত করিয়া দিবে, কে বলিতে পারে? গহনা নিয়তির গতি।

যুগোশ্লেভিয়ার হত্যাকাণ্ডের পরে

গত মাসে আমরা যুগোশ্লেভিয়ার রাজার হত্যার বিবরণ প্রদান করিয়াছি। সেই সময় প্রকাশ পাইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি যুগোশ্লেভিয়ার রাজা প্রথম আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করিয়াছে, সে ব্যক্তি জাতিতে ক্রোট, তাহার নাম পেট্রাস কেলমেন, কিন্তু পরে ভিয়েনার দূতসদন হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ঐ হত্যাকারীর নাম ভ্লাডা জর্জ্জেফ শেচেৰ্ণোসেজ। সে জাতিতে ম্যাকিডোনিয়ান। এই লোকটা এক জন ঘোর হিংসাশ্রয়ী বিপ্লববাদী এবং অধুনা মেকিডোনিয়া হইতে নির্ব্বাসিত বিপ্লবী সর্দ্দার আইভান মিহেলফির শরীররক্ষী ছিল। হত্যাকারীর জন্মস্থান বুলগেরিয়া রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত কামেইটজা নগরে। যে গাড়ীতে রাজা আলেকজাণ্ডার ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব মঁসিয়ে লুই বার্থাউ যাইতেছিলেন, দুর্ব্বৃত্তটা সেই গাড়ীর পাদানে উঠিয়া এক রিভলভার দিয়া উভয় আরোহীকেই গুলী করে। যে সময় এই লোকটা গাড়ীর পাদানে উঠিয়াছিল, সেই সময়ে সেই স্থানে রাজপথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতার মধ্যে মারামারি উপস্থিত হইয়াছিল। ফরাসী পুলিসের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ ছিল। সেই অবসরে ঐ মেকিডোনিয়ান বিপ্লবীটা চলন্ত গাড়ীর পাদানিতে উঠিয়াই গুলী করে। কিন্তু ফরাসী অশ্বারোহী পুলিসের তরবারির আঘাতে তাহার দেহ তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া ধরা চুম্বন করে এবং উত্তেজিত ফরাসী জনতা তাহার দেহকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়। এখন শুনা যাইতেছে যে, হত্যাকারীটা জাল ছাড়পত্র দেখাইয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছিল এবং চলন্ত গাড়ীর দক্ষিণ দিকের পাদানিতে দাঁড়াইয়া গুলী করিয়াছিল।

রাজা আলেকজাণ্ডার

বর্ত্তমান রাজা পিটার

হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পর চতুর্দ্দিকে ধর ধর রব পড়িয়া গেল। নিহত রাজা আলেকজাণ্ডারের পুত্র যুবরাজ পিটারের বয়স ১১ বৎসর। তিনিই এখন যুগোশ্লেভিয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যুগোশ্লেভিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল নহে। চারিদিকে গোলমাল। সেই গোলযোগের একটা মীমাংসা করিবার জন্য পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যেই রাজা আলেকজাণ্ডার ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। তিনি শাসন-সংস্কার কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রাজ্যে শান্তি ফিরিয়া আইসে নাই। তাঁহার রাজ্যে ৭০ লক্ষ সার্ব্বের বাস। কিন্তু ক্রোট, হাঙ্গেরীয়, জার্ম্মাণ এবং মেকিডোনিয়ানদিগের সংখ্যা সার্ব্বজাতীয় সংখ্যা হইতে অনেক অধিক। কিন্তু সার্ব্ব (Serb) জাতি কিছু অধিক রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতেছিল বলিয়া অন্য সকল জাতির তাহাদের উপর ঈর্ষা জন্মে। ফলে তথায় সাম্প্রদায়িক বিবাদ অত্যন্ত তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া রাজনৈতিক শান্তি অতিশয় ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিল। যুগোশ্লেভিয়ার রাজসিংহাসনে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন,—তাঁহাদের অনেককেই নিহত হইতে হইয়াছে। রাজা আলেকজাণ্ডার যে বংশে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন, সেই বংশের নাম কারা জর্জ্জ বংশ। কারা শব্দের অর্থ কালা (black)। জর্জ্জ পেট্রোভিক এই বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি এক জন কৃষক ছিলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি তুর্কীদিগকে সার্ব্বিয়া ভূমি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। সার্ব্বিয়ার সিংহাসনে কখনও বা এই কারা জর্জ্জ বংশের রাজগণ আরোহণ করিতেন, কখনও বা ওব্রেনোভিক বংশীয়গণ আরোহণ করিতেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সার্ব্বিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ওব্রেনোভিক ও রাণী ড্রেগা নিহত হইলে পর কালা জর্জ্জ বংশের পিটার কারাজর্জ্জভিক সার্ব্বিয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে ইনি মন্টোনিগ্রোতে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। পিটার এই বংশের প্রবর্ত্তক জর্জ্জ পেট্রোভিকের পৌত্র এবং মার্শেলে নিহত রাজা প্রথম আলেকজাণ্ডারের পিতা ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পর যে আট জন সার্ব্বিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন বিপ্লবের ফলে সিংহাসনচ্যুত হন এবং আর এক জন স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন কালা জর্জ্জকে লইয়া তিন জন রাজা গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র তিন জন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বাভাবিক মৃত্যুকে বরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এখন ত একটি বালক যুগোশ্লেভিয়ার কণ্টকাকীর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। নিহত রাজা আলেকজাণ্ডারের জ্ঞাতিভ্রাতা প্রিন্স পল এখন রাজকার্য্য পরিচালন সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদস্য হইয়াছেন।

রাজা আলেকজাণ্ডারের হত্যার পর অনেকেই শঙ্কা করিয়াছিলেন যে, সেরাজেভার হত্যাকাণ্ডের ন্যায় এই হত্যাকাণ্ডের ফলে বুঝি আবার একটা দিগ্‌দাহী সমরানলের উদ্ভব হয়। সে আশঙ্কা এখন কতকটা তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোকের মনে অশান্তির অনল ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। রাজা আলেকজাণ্ডারের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে যুগোশ্লেভিয়া ও হাঙ্গেরীর সীমান্ত দিয়া পণ্য লইয়া যাইবার অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য একটি চুক্তি হইয়াছে। উহাতে অসুবিধা অনেকটা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অসুবিধার কথা গত মাসের (কার্ত্তিক) মাসিক বসুমতীর ১৪৭ পৃষ্ঠার প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে। এই চুক্তি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। যাহা হউক, উপস্থিত ইটালীর সংযতভাবের জন্য ব্যাপার অধিক দূর গড়াইল না। যুগোশ্লেভিয়ার সংবাদপত্রগুলি এখনও ইটালীর উপর কোপানল বর্ষণ করিতেছে। অথচ যুগোশ্লেভিয়ার প্রধান মন্ত্রী উজুনোভিক নিশ সহরে বক্তৃতাকালে ইটালী সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল মন্তব্যই প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক, এখন হাঙ্গামাটা অল্পে অল্পে মিটিলেই মঙ্গল।

হল্যাণ্ডে অর্থ-সঙ্কট

পশ্চিম য়ুরোপের মধ্যে হল্যাণ্ড অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার বিস্তার ১২ হাজার ৫ শত ৮৮ বর্গ-মাইল অর্থাৎ ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সের ভূমিপরিমাণের সিকিরও কম। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির বৈশিষ্ট্য এই যে, অর্থ-সঙ্কট কখনই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই রাজ্যের অধিবাসীদিগের ক্রমশঃ অধিকতর ফলপ্রদ কৃষিকৌশল, শিল্প-পদ্ধতি, এবং মুদ্রার বাজার পৃথিবীর অনেক সভ্য জাতির কৃষিকৌশল এবং শিল্পপদ্ধতি প্রভৃতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। ইহাদের বাণিজ্য এবং ব্যাঙ্কের অবস্থাও অতি সুন্দর। এই রাজ্যের উপনিবেশগুলি হইতে ইহার বিশেষ আয় হয়।

কিন্তু সম্প্রতি সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া যে অর্থ-সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে এ হেন হল্যাণ্ডও পরিত্রাণ পায় নাই। চারিদিকে যে মন্দার বাজার উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রভাব হইতে এই রাজ্যের টাকার বাজার, পণ্য-রপ্তানী এবং বাণিজ্য নিস্তার পায় নাই। হল্যাণ্ডের অবস্থার সহিত ইংলণ্ডের অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। হল্যাণ্ড ইংলণ্ডের ন্যায় পাওনাদার দেশ। ইংলণ্ডের ন্যায় এই দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় উপনিবেশ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং জনবহুল। হল্যাণ্ডবাসীরা ইংলণ্ডবাসীদিগের আর্থিক নীতির বিশেষভাবে অনুবর্ত্তন করিয়া চলে। বহু দিন ধরিয়া হল্যাণ্ডবাসীরা অবাধ-বাণিজ্যের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেশে শিল্পপ্রাকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহারা সেই অবাধ-বাণিজ্যনীতি সম্প্রতি ক্রমশঃ পরিহার করিয়াছেন। এখন ঐ দেশের অর্থনীতিবিশারদদিগের মধ্যে অত্যন্ত অধিকসংখ্যক লোকই শিল্পসংরক্ষণ শুল্কপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ইহাদের সর্ব্বসাকল্যে ৮০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৩ লক্ষ অধিবাসী এখন বেকার। এই দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের শ্রমশিল্পীরা রক্ষাশুল্ক বসাইবার জন্য তথাকার সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। নেদারল্যাণ্ডে প্রস্তুত পণ্য ব্যবহার কর (Nederlandsch Fabrikat) এই রব সে দেশে উঠিয়াছে। ইহা ইংলণ্ডে Buy British এই রবেরই অনুরূপ। ভারতে স্বদেশীসেবাও ইহার মত। হল্যাণ্ডবাসী বার্ত্তাশাস্ত্রবিশারদগণ মনে করেন যে, স্বদেশীসেবার দ্বারাই তাঁহাদের বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে।

তবে এক বিষয়ে হল্যাণ্ডবাসীরা ইংলণ্ডবাসীদিগের অর্থনীতির অনুবর্ত্তন করেন নাই। মুদ্রামূল্য সম্পর্কে তাঁহারা সুবর্ণ-মান পরিহার করেন নাই। ইহারা বলেন যে, মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া দিলে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা একটা ফাল্‌তো তর্ক (Spurious argument)। কেবল তাহাই নহে, বরং যে দেশ ব্যাঙ্কের কাযে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সে দেশের পক্ষে ইহা ক্ষতিসাধক। বর্ত্তমান বৎসরে সুবর্ণের আমদানী রপ্তানী অধিক হইলেও হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি একটুও টলে নাই। গত ১৭ই সেপ্টেম্বরে তথাকার লোকের ৮৬ কোটি ৭০ লক্ষ গিল্ডার্শ (হল্যাণ্ডের মুদ্রা, ইহার মূল্য আনুমানিক দেড় টাকার কিছু অধিক) মূল্যের সুবর্ণ জমা ছিল। ইহার ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে ৮২ কোটি ২৭ লক্ষ গিল্ডার্শ মূল্যের সুবর্ণ সঞ্চিত ছিল। এত টাকার সুবর্ণ সঞ্চিত রাখিলেও বাহিরে কেবল ৮৮ কোটি ৭০ লক্ষ গিল্ডার্শের নোট বাহির করা হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে নোটের পরিমাণ ছিল ৯০ কোটি ২০ লক্ষ গিল্ডার্শ মূল্যের। সুতরাং তথায় নোটের মৌলিক বল বিশেষ অল্প নহে।

আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের দিক দিয়া দেখিলেও এই ক্ষুদ্র

দেশটির অবস্থা বেশ সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান বৎসরের, অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম আট মাসে এই রাজ্যে ৭১ কোটি ৪০ গিল্ডার্শ মূল্যের পণ্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। উহার পূর্ব্ব-বৎসর ঠিক ঐরূপ প্রথম আট মাসে ৭৭ কোটি ২০ লক্ষ গিল্ডার্শ মূল্যের পণ্য এই দেশে বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ঐ দেশ হইতে বিদেশে গত বৎসরের প্রথম আট মাসে ৪৭ কোটি ৪০ লক্ষ গিল্ডার্শ মূল্যের পণ্য বিক্রয়ার্থ রপ্তানী হইয়াছিল আর বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম আট মাসে ৬৪ কোটি ৪০ লক্ষ গিল্ডার্শ মূল্যের পণ্য এ দেশ হইতে বিদেশে চালান গিয়াছে। আমদানীর আধিক্য প্রায় ১২ কোটি ৮০ লক্ষ গিল্ডার্শ কমিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্য দিক দিয়া তাহা পোষাইয়া গিয়াছে। ভিন্ন দেশ হইতে এ দেশবাসী ওলন্দাজরা জাহাজ ভাড়া, ব্যাঙ্ক, বীমা, এবং টাকা লগ্নী করিয়া যথেষ্ট আয় করিতেছে। ইহা ভিন্ন ইহারা জার্ম্মাণীকে ১০ কোটি গিল্ডার্শ ঋণ দিয়াছে। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে এই দেশের আর্থিক অবস্থা মোটের উপর ভাল বলিয়াই মনে হয়।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর এই দেশের ষ্টেটস্ জেনারাল সভায় যে বজেট প্রস্তাব দাখিল করা হইয়াছে, তাহাতে ৭২ কোটি ৪০ লক্ষ গিল্ডার্শ ঐ দেশের ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। উহাতে সরকারী তহবিলে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ গিল্ডার্শ ঘাট্‌তি হইয়াছে। ঐ দেশের সরকার নূতন টেক্স বসাইয়া অথবা বর্ত্তমান টেক্সের হার বাড়াইয়া দিয়া ঐ ঘাটতি পূরণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ব্যয় কমাইয়া উহা পূরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যে যে বিভাগে যে পরিমাণে ব্যয়ের হ্রাস করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার কতকগুলি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—শিক্ষা বাবদ ১ কোটি গিল্ডার্শ, মিউনিসিপ্যালিটী সমূহে দান বাবদ ২ কোটি, বৃদ্ধ এবং বিকলাঙ্গীভূত ব্যক্তিদিগকে দানের বাবদ ১ কোটি ৪০ লক্ষ এবং দেশরক্ষা বাবদ ৫০ লক্ষ গিল্ডার্শ ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল বাবদ তথাকার সরকারের প্রচুর ব্যয় বরাদ্দ আছে। কিন্তু আজকাল শ্বেতাঙ্গ ও পীতাঙ্গ জাতির মধ্যে নৌবাহিনী বৃদ্ধির জন্য একটা প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। উহা যেন বাতিকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হল্যাণ্ডও এই বাতিক হইতে নিস্তার পায় নাই। হল্যাণ্ড সরকারও ইষ্টইণ্ডিয়ান নৌবহরের বৃদ্ধি বাবদ ১ কোটি ২০ লক্ষ গিল্ডার্শ এবং হল্যাণ্ডের নৌবাহিনী বৃদ্ধি বাবদ ৩০ লক্ষ গিল্ডার্শ ব্যয় বরাদ্দ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

হল্যাণ্ডে ইদানীং পণ্যের মূল্যও বেশ কমিতেছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তথায় পণ্যের যে গড় মূল্য ছিল, তাহাকে ১০০ গিল্ডার্শ বলিয়া যদি খুঁট (Index number) ধরা যায়, তাহা হইলে গত আগষ্ট মাসে তথায় পণ্যের মূল্য গড়ে ৭০ গিল্ডার্শ হইয়াছে, বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে উহা ৭৯ গিল্ডার্শ এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহা ৭৩ গিল্ডার্শ ছিল। সুতরাং তথায় জিনিষপত্র সুলভ হইতেছে, এ কথা বলা যাইতে পারে।

হল্যাণ্ডের রাজধানীতিক ক্ষেত্রে যে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। তথায় কমিউনিষ্ট বা সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগের একটা হাঙ্গামা হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ই তারিখে আবার যখন পার্লামেণ্ট খোলা হয়, তখন উহা আবার আত্মপ্রকাশ করে। ইতঃপূর্ব্বে হল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের কোন সদস্যকে পার্লামেণ্টের অধিবেশনসময়ে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এইবারই উহা করা হইয়াছে। তাহাদিগের গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের মূল আস্তানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সুব্যবস্থার গুণে কিরূপ বড় হইয়া থাকিতে পারে, এই হল্যাণ্ড রাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, তাহা বেশ বুঝা যায়। সে কথা আমাদের দেশের লোকের বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ফ্রান্সে অর্থ-কষ্ট

শুনা যাইতেছে যে, ফ্রান্সে অর্থ-কষ্ট বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। য়ুরোপীয় শক্তিশালী রাজ্যগুলি সামরিক আয়োজনের জন্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করিতেছে বলিয়া তথায় এই প্রকার অর্থ-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, কেহ কেহ এরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিতেছেন। ইহার উপর এই পৃথিবীব্যাপী মন্দার অবস্থাও ফ্রান্সের কর্ম্মজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিতেছে। ঐ দেশে এখন বেকার লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর এত লোক আর ঐ দেশে কখনই বেকার দশায় পতিত হয় নাই। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের শ্রমিক বিভাগের মন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঐ দেশে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত ২৩ জন বেকার লোককে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ-সাহায্য করা হইতেছে। যাহাদিগকে ফরাসী সরকার অর্থ-সাহায্য করিতেছেন, তাহারা ভিন্ন আর কত লোক ঐ দেশে বেকার অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইংরাজরা দেখিয়া শুনিয়া অনুমান করিতেছেন যে, ঐ দেশে সর্ব্বসাকল্যে ৮ লক্ষ লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছে। ঐ দেশে বেকার লোকমাত্রকেই সরকারী তহবিল হইতে অর্থ-সাহায্য করা হয় না। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ফ্রান্সে অনেক ভিন্‌দেশীয় লোক কাযকর্ম্ম করিয়া খাইত। কিন্তু তাহার পর হইতে ৪ লক্ষ বিদেশী লোক কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। বেকার-সংখ্যা শতকরা ৪০ জন হারে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কলকারখানায় উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। আর কমিয়াছে রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ এবং মালবাহী গাড়ীতে বোঝাই করিবার মালের পরিমাণ। রপ্তানী কমিয়াছে শতকরা ১২ ভাগ এবং পূর্ব্বে যত মাল লরীতে বোঝাই করা হইত, এখন তাহার অর্দ্ধেক মালও গাড়ীতে বোঝাই করা হইতেছে না।

শ্রমশিল্প ক্ষেত্রেও এবার মন্দা দেখা দিয়াছে, তাহার উপর তথায় কৃষীবলের অবস্থাও অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সে এক বুশেল গমের আইনসঙ্গত মূল্য ২ ডলার। কিন্তু তাহা পৌনে দুই ডলার মূল্যে বিকাইতেছে। বিদেশে ফ্রান্সের গমের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, ফরাসীরা তাহাদের গম তাহাদের দেশের বাহিরে চালিয়া দিতেছে। ফরাসী সরকার এখন কৃষকদিগকে বিদেশে মাল চালান দিবার জন্য প্রতি বুশেল ২০ ফ্রাঙ্ক করিয়া দান দিতেছেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের সরকারী তহবিলে টাকার

বেশ টান পড়িয়াছে। ফ্রান্সের মফস্বল বিভাগের মন্ত্রী এলবার্ট সরাট সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ফরাসী সরকারের এখন ক্ষেতোয়ালদিগের নিকট হইতে সমস্ত অতিরিক্ত গম কিনিয়া লইয়া উহা গুদামে রাখা এবং পরে ক্রমে ক্রমে উহা বাজারে বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থায় কৃষকদিগের সুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে সহরবাসীদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় কমিবে না।

ফ্রান্সে ইদানীং জীবনযাত্রানির্ব্বাহের ব্যয় অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। জীবনযাত্রানির্ব্বাহের পূর্ণ মাত্রা মগার্ঘ্যতাকে যদি ১৮০ সংখ্যা ধরিয়া হিসাব করা হয়, অর্থাৎ উহাকে যদি খুঁট সংখ্যা (Index number) ধরা হয়, তাহা হইলে ফ্রান্সের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় ৯৯ সংখ্যা, ইংলণ্ডের ৭৬ সংখ্যা আর মার্কিণের ৬৪ সংখ্যা অর্থাৎ ফ্রান্সে এখন জীবনযাত্রানির্ব্বাহের ব্যয় অতিশয় অধিক। উহার সহিত তুলনায় ইংলণ্ড এবং মার্কিণের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের ব্যয় অনেক অল্প। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ফ্রান্সের এই অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়াই ফ্রান্স এখন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কথা ভাবিতে পারিতেছে না। এই অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া ঐ দেশে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে। তাহারা বলিতেছে, "কেবল কথা শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইল, এখন একটা যা হয় কিছু কর।"

চীনে জাপানী নীতি

জাপান চীনে ভিতরে ভিতরে নিজ স্বার্থরক্ষার চাল চালিতেছেন। কেনিচি জোসিজোরা বলেন যে, জাপান চীনে যে নীতি চালাইতেছেন, তাহাকে হংসনীতি বলা যাইতে পারে। কারণ, হংস যখন জলের উপর সাঁতার দিয়া যায়, তখন উপরের জল একটুও আন্দোলিত হয় না বটে, কিন্তু নীচের জল আলোড়িত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাপান চীনে যে বাণিজ্য-নীতি চালাইতেছেন, তাহাতে বাহ্যদৃষ্টিতে সমস্তই স্থির রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে সত্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটু বিক্ষোভ দেখা দিতেছে। চীনে সম্প্রতি যে শুল্ক ব্যবস্থা বহাল করা হইয়াছে, তাহা লইয়াই এই বিক্ষোভ জন্মিয়াছে। গত ৩রা জুলাই হইতে চীনে এই শুল্কনীতি বহাল হইয়াছে। এই শুল্কব্যবস্থার ফলে পাশ্চাত্য দেশ হইতে যে সকল পণ্য চীনদেশে আমদানী করা হইতেছে, তাহার উপর ধার্য্য শুল্কের মাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ফলে আমদানী কলকব্জা, ইমারতের মালমসলা, কার্পাস তুলা প্রভৃতির উপর ধার্য্য শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, কার্পাসপণ্যের, কাগজের এবং সমুদ্রজাত খাদ্য প্রভৃতি যে সকল পণ্য জাপান চীন ভূমিতে চালান দিয়া থাকে, তাহার হার কিছু হ্রাস করা হইয়াছে। জাপানের দিকে পক্ষপাতমূলক এই শুল্কব্যবস্থা হওয়াতে চীনারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চীনের বহু বণিকসমিতি এই শুল্কব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। তথাকার শ্রমশিল্প সমিতিগুলিও এই প্রতিবাদে যোগদান করিয়াছেন। চীনের সংবাদপত্রগুলিও এই ব্যবস্থার প্রতিকূলে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। উঁহারা সকলেই বলিতেছেন যে, জাপানের আনুকূল্য করিয়া এইরূপ শুল্কব্যবস্থা করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছে? ইহাতে চৈনিক শিল্পের ক্ষতি ঘটিবে। চীনের সরকার পক্ষ হইতে এই প্রতিকূল সমালোচনা নিরস্ত করিবার চেষ্টাও অল্প হইতেছে না। চীন সরকার বলিতেছেন যে, জাপান হইতে যে সকল পণ্য আমদানী হইয়া থাকে, তাহার উপর ধার্য্য শুল্ক যেরূপ অল্প মাত্রায় হ্রাস করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে চীনাদিগের স্বদেশী শিল্পের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবেই না! চিয়াং কাইসেক তাঁহার ন্যায্য ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে, চীনের সংবাদপত্র প্রভৃতি ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না। উহা কেবল অজ্ঞ ব্যবসাদারদিগেরই মত মাত্র।

পক্ষান্তরে, জাপানী সংবাদপত্রগুলি চীনা সংবাদপত্রগুলির পাল্টা জবাবে বলিতেছেন যে, চীন দেশে যে শুল্কব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহাতে জাপানের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, সে কথা বলা ঠিক নহে। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী শুল্ক ব্যবস্থায় চীনাদিগের মনে যেরূপ জাপানের বিরুদ্ধভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল,—বর্ত্তমান শুল্কব্যবস্থায় তাহার কিছু প্রশমন করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, জাপানী সওদাগররা জাহাজ জাহাজ মাল চীন দেশে রপ্তানী করিতেছে। অন্ততঃ য়ুরোপীয়রা এ কথা বলিতেছেন। তবে এ কথা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে যে, জাপানীদিগের হুমকিতেই চীনা সরকার এইরূপ শুল্কব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মুখে কিন্তু তাঁহারা সে কথা স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। চীনারা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছে যে, বিগত মে এবং জুন মাসে অনেকগুলি জাপানী রণতরী টিয়েনসীনের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল এবং জাপানীরা চীনের প্রাচীরের বহির্দ্দেশে তাহাদের রণবিমানের সংখ্যা বিলক্ষণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ফলে চীন দেশের ভিতরে এবং বাহিরে অনেক লোক বলিতেছেন যে, নাঙ্কিন সরকার জাপানের সহিত কতকটা প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। তাহারা নাঙ্কিন সরকারের কতকগুলি কার্য্য দ্বারাও সে কথা সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ফলে এই ব্যাপারে লোকের অসন্তোষ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। হুয়াং ফুকে নাঙ্কিন সরকারই তাহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া উত্তর-চীনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। চিয়াং কাইসেকের অনুরোধেও তিনি সেই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া লইতে সম্মত হন নাই। ডবলিউ ডবলিউ ইয়েন নাঙ্কিন সরকারের তরফ হইতে রুসিয়ার দূতের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি এখন কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক বসিয়া আছেন। ইঁহাকে জেনিভায় যাইয়া চীনের স্বার্থরক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি ঐ কার্য্য করিতে প্রথমে সম্মত হয়েন নাই। শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর তিনি ঐ কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। ইনি এখন ইঁহার শরীর ভাল নয় বলিয়া সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বসিয়া আছেন। ডক্টর ওয়েলিংটন কু ছিলেন ফ্রান্সের দূত। ইনি জেনিভাতে জাপানের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে বিদ্যমান ছিলেন। সম্প্রতি ইনি

স্বীয় বৈষয়িক কার্য্য সমূহ পরিদর্শন করিবেন, এই কথা বলিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। ওয়াংচুঙ্গ হুই জাগতিক বিচারালয়ের (world-court) বিচারপতি ছিলেন। ইনি ডাক্তার কুর সহিত একই জাহাজে চীনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান সঙ্কটসময়ে চীনের পক্ষে অন্য কোন জাতির সাহায্য লইবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। চীনাদের নিজ ব্যবস্থা নিজদেরই করা বিধেয়। ইহাতে মনে হইতেছে যে, ঐ সকল ব্যক্তি নাৰ্কিন সরকারের সহিত আর তেমন সহানুভূতি-সম্পন্ন নাই।

চীনারা জাপানীদিগের উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। তাহারা জাপানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে চাহিতেছে। এই মর্ম্মে গত ২রা আগষ্ট তারিখে প্রায় তিন হাজার গণ্য-মান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ইস্তাহারে পরলোকগত সান্ ইয়াৎসেনের পত্নীর স্বাক্ষর আছে। ইঁহারা বলিতেছেন যে, এই কার্য্য সাধন করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা চীনভূমিতে অবস্থিত জাপানীদিগের কারকারবার (যথা জাপানীদিগের ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, খনি, কলকারখানা প্রভৃতি সমস্তই) বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে হইবে এবং উহার উপর ঐ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটা বিশেষ কর ধার্য্য করিলেই চলিবে।

এ দিকে চীন রাজ্যে সর্ব্বস্বত্ববাদ বিশেষভাবে প্রসারবৃদ্ধি করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে চীনের সাতটি অঞ্চলে সর্ব্বস্বত্ববাদের প্রবল প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। চিয়াং কাইসেক এই মতবাদীদিগকে দমন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। চীনের জাতীয় সৈনিকদিগের মধ্যে নিয়ম বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। উহারা স্থানীয় লোক। আপনাদের অঞ্চল ছাড়িয়া উহারা যুদ্ধ করিতে যাইতে চাহে না। অনেক সময় উহারা ছাতি-লাঠি লইয়াই যুদ্ধ করে। উহারা পরস্পর সংহতভাবে যুদ্ধ করে না। তবে প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাইসেক জার্ম্মাণী হইতে সামরিক পরামর্শ-দাতা আনিয়া কার্য্য করিতেছেন। উহারা চীনা সৈনিকদিগকে গত তিন বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া ক্রমশঃ নিয়মানুবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভিন্ন ইনি মার্কিণ হইতেও রণবিমান এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করিয়াছেন। এই প্রকারে ইনি চীনভূমি হইতে সর্ব্বস্বত্ববাদের উচ্ছেদসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিয়াংসি অঞ্চলে মার্কিণে প্রস্তুত রণবিমানই অত্যন্ত অধিক। অস্ত্র-শস্ত্রও মার্কিণ হইতে আমদানী। ফলে এই দেশে নানা অশান্তি ও অসুবিধা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার কোন কোন অঞ্চল বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে, কোন অঞ্চলে অনাবৃষ্টিতে শস্য জন্মে নাই, কোন অঞ্চলে পঙ্গপাল পড়িয়া শস্য নাশ করিয়াছে। এ অঞ্চলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ নহে। এই অনলকুণ্ড হইতে উৎক্ষিপ্ত একটি স্ফুলিঙ্গ কোথায় পড়িয়া এক আন্তর্জ্জাতিক দিগ্‌দাহী দাবানলের উদ্ভব করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এসিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলের অবস্থা শান্তিময় নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় উহা শান্তিময় হইতে পারে না।

প্রতিশোধ

ঘৃণা করি আমায় যারা
ব্যথাই হানে নিতি,
আজকে পাঠাই তাদের তরে
মোর হৃদয়ের প্রীতি,
বন্ধু নহে শত্রু যারা,
চক্ষে বহায় অশ্রুধারা,
পলায় দূরে অন্তরেতে
ভীষণ সায়ক হানি'
আজকে ভালবাসব তাদের
বক্ষে লব টানি'।

করল যে জন কৃতঘ্নতা
"মারীচ" সম আসি'
ছল করি যে জানায় মুখে—
"বড়ই ভালবাসি,"
চতুর সাজি আমায় যারা,
চায় ভুলাতে কথার দ্বারা,
পাঠাই শুভ-কামনা মোর
তাদের লাগি' আজি,
চাই ধোয়াতে নয়ন-জলে
সবার চরণ-রাজি।

ফুল বলি যে কণ্ঠে দিল
কণ্টকেরি মালা,
আজকে রে মন তাহার লাগি'
প্রাণের প্রদীপ জ্বালা,
গান্ গেয়ে তুই চল্ পুলকে
ভূলোক ভরি প্রেম-আলোকে,
বল "প্রতিশোধ দিবই আজি
কৃতঘ্নতার তরে,
প্রেম দিয়ে জয় সবার হৃদয়
করব সোহাগভরে।"

কাদের নওয়াজ।

নিশীথ রাতে

(গল্প

অগ্রহায়ণ মাস। রাত্রি দু'টা বাজিয়াছে। সারা আকাশ জুড়িয়া কেমন কন্‌কনে ভাব। নীচে সহর কলিকাতা শীতে কাঁপিয়া ঘুমের আড়ালে গা ঢাকিয়াছে।

শনিবার। ভারত থিয়েটারে মহা-সমারোহে নূতন নাটক জগৎ সিংহের আজ প্রথম অভিনয়। অভিনয় সত্ত ভাঙ্গিয়াছে। শীতের রাত্রে থিয়েটারের বদ্ধ গৃহে ছয় ঘণ্টা বসিয়া অভিনয় দেখিয়া দর্শকের দল পথে বাহির হইয়াছে। পথে ট্যাক্সি ও বাসের প্রচণ্ড ভিড়। কোলাহল আরো প্রচণ্ড। সে ভিড় ও কোলাহল ঠেলিয়া হাঁটিয়া বড় রাস্তা ধরিয়া আসিয়া দিলীপ সেন্‌ট্রাল এভেনিউয়ের এক গলিতে প্রবেশ করিল। এই গলির প্রান্তে চার-তলা ফ্লাটে তার বাস।

আসিতে আসিতে সে অভিনয়ের কথা ভাবিতেছিল। একখানা সাপ্তাহিক কাগজে তা ক থিয়েটারের সমালোচনা লিখিতে হয়; কাল সকালেই সমালোচনা লিখিবে। কি লিখিবে, সেই চিন্তায় সে ছিল তন্ময়। কাজেই পথের কষ্ট মনে এতটুকু আঁচড় টানিতে পারে নাই।

রাজধানীর পথ নিস্তব্ধ। দিনের বেলায় পথে অত যে মত্ত মাতন চলে,—এখন পথ দেখিলে কে বলিবে, এ সেই পথ!

আর পাঁচ-সাতখানা বাড়ী পার হইলেই তার আস্তানা। সহসা সামনে আহত পাখীর মত কি একটা বস্তু পড়িল—ঝুপ করিয়া! দিলীপের চিন্তা-সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। ঝুঁকিয়া চাহিয়া সে দেখে,—একটা ছোরা! থিয়েটারের সাজা রাজা-বাদশার কোমরে যে-রকম ছোরা জরির খাপে আঁটা থাকে, তেমনি! ছোরাখানা সে কুড়াইল—তার পর উর্দ্ধ দিকে চাহিল। পাশে চার তলা বাড়ী। উপরের ঘরগুলার খড়খড়ি বন্ধ। কোথাও জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই! কোন্ তলা হইতে পড়িল, জানিবার উপায় নাই। কেন পড়িল? রহস্য!

আর একটু হইলে তার গায়ে পড়িত। এবং পড়িলে… পড়িলে কি ঘটিত, ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

ছোরার গায়ে রক্তের দাগ! তার দুই চোখ বিস্ফারিত হইল।

পুলিশ ডাকিবে?…চারিদিকে চাহিয়া দিলীপ দেখে, পুলিশের চিহ্ন নাই!

এই গভীর রাত্রি! রক্তমাখা ছোরা আসিয়া পথে পড়িল! দিলীপ বুঝিল, একটা কিছু ঘটিয়াছে! কিন্তু এমন নিঃশব্দে! কোথায়? সে থ হইয়া দাঁড়াইল…যেন নিশ্চেতন!

চেতনা তখনি ফিরিল। চেতনা ফিরিতে দেখে, তার সামনে দাঁড়াইয়া সজল-নয়না এক কিশোরী!

স্বপ্ন? না, অভিনয়ের রেশ এখনো তার চোখে লাগিয়া আছে?

স্বপ্ন নয়। সত্য। কিশোরী কথা কহিল, বলিল,—ওখানা আমাকে দিন।

দিলীপ নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল,—এই ছোরার কথা বলচেন?

কিশোরীর দুই চোখে কাতর মিনতি! কিশোরী কহিল,—হ্যাঁ।

কিশোরী হাঁফাইতেছে। তার মুখে রাজ্যের ভয়!

দিলীপ কহিল,—দেবো না।

কিশোরী মিনতি করিল—অজস্র মিনতি! দিলীপ কহিল—আগে এর মানে কি, বলুন…নাহলে দেবো না, পুলিশ ডাকবো।

কিশোরীর দুই চোখে জল। সে কহিল,—না…

দিলীপ কহিল,—কি হয়েচে, আমায় বলুন…

কিশোরী কহিল,—বলবার কথা নয়…

দিলীপ কহিল,—তাহলে এ ছোরা পুলিশের হাতেই দেবো। তারা এসে তদন্ত করবে। কিন্তু তাতে আপনার বিপদ আছে। আপনাকে তারা গ্রেফ্‌তার করতে পারে।

কিশোরী কহিল,—আমায়?…কিন্তু আমি খুন করেচি, এ কথা কেন বলচেন?

দিলীপ কহিল,—খুন না করতে পারেন—খুনের কথা আপনি জানেন!···তাই বলচি, আমায় বলুন, কি হয়েচে। হয়তো আমি এ বিপদে সাহায্য করতে পারবো।

কিশোরী কোনো কথা কহিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই চোখে জলের ধারা!···দিলীপ কহিল,—বলবেন না?

কিশোরী নিশ্বাস ফেলিল; নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমাকে পুলিশের হাতেই দিন···আমার আর সহ্য হচ্ছে না···

কথার শেষাংশ অশ্রুর তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।··

দিলীপ কহিল,—মিছে দাঁড়িয়ে থাকা! আপনি বাড়ী যান। এ ছোরা আপনার হাতে দেবো না।···পুলিশকে দেবো কি না, জানি না। তবে এখন নয়। সে-সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন···

কথাটা বলিয়া দিলীপ অগ্রসর হইল। কিশোরী পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।···

দিলীপ গিয়া তার গৃহের দ্বারে আঘাত করিল—একবার এদিকেও চাহিল—কিশোরী তখনো পথে দাঁড়াইয়া আছে। তার বুকটা দুলিল।···একটা প্রশ্ন মনে জাগিল—ভদ্র ঘরের মেয়ে! ভারী শান্ত নম্র প্রকৃতি! অথচ রহস্য বিপুল!

কিশোরী কাহারো অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে? যদি করিয়া থাকে তো এ অস্ত্রাঘাতের যোগ্য সে—নিশ্চয়!

কিন্তু কেন? কারণ কি?···

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে খবর শুনিল, বাড়ীর অদূরে এক বাঙালী ভদ্রলোক ট্যাক্সি চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। পাড়ায় একেবারে হৈ-হৈ কাণ্ড!

দিলীপ চমকিয়া উঠিল। ছোরাখানা কাগজে মুড়িয়া সে খাটের নীচে রাখিয়া দিয়াছে। সে এখানে একা থাকে—একখানি মাত্র কামরা লইয়া। ছোরার কথা মনে পড়িল। কিশোরীর কথা মনে পড়িল। বুঝিল, লোকটাকে খুন করিয়া পথে ফেলিয়া দিয়াছে; তারপর কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভার বেহুঁশ হইয়া গাড়ী চালাইতে হয়তো নজর করে নাই···

এত বড় দুরভিসন্ধি! এবং এ-অভিসন্ধির মূলে নিশ্চয় আছে সেই কিশোরী!

এমন দুর্জ্জয়ময়ী! অথচ অমন শান্ত নম্র ভাব! সে তবে অভিনয়?

চায়ের পেয়ালা সামনে ছিল। চা পান করিয়া দিলীপ উঠিয়া পথে বাহির হইল; সেই চার-তলা বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর সামনে কয়েকজন লোক—যাদের অলস কৌতূহল কিছুতেই তৃপ্তি মানে না—বসিয়া দাঁড়াইয়া নানা মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিতেছে!

বাড়ীটায় অনেক ঘর ভাড়াটিয়ার বাস। শিখ, ভাটিয়া হইতে সুরু করিয়া বেচারা ছাপোষা গৃহস্থ ভদ্রলোক, মায় খোট্টা চা-ওয়ালা—কাহারো অভাব নাই। ভারতের নানা জাতি মিলিয়া একত্র নীড় বাঁধিয়াছে—বিরাট সভ্য প্রতিষ্ঠায়! অথচ হায়রে, কেহ কাহারও নাম জানে না!

বাড়ীর দরোয়ানকে প্রশ্ন করিয়া দিলীপ জানিল, ট্যাক্সি চাপা পড়িয়া যিনি মারা গিয়াছেন, তিনি বাঙালী ভদ্রলোক; তিন তলায় দুটা ঘর লইয়া সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন; বাবুটি কলিকাতার থ্যাটারে মস্ত 'এ্যাক্টর' ছিলেন। নাম বীরেন্দ্র দত্ত।

বীরেন্দ্র দত্ত! দিলীপ শিহরিয়া উঠিল। কাল রাত্রে ভারত থিয়েটারে এই বীরেন্দ্র দত্তর অভিনয় সে দেখিয়া আসিয়াছে! 'জগৎ সিংহ' নাটকে নায়ক জগতের ভূমিকায়—সে অভিনয় অপূর্ব্ব। সেই বীরেন্দ্র দত্ত···?

দিলীপ কহিল,—বাবুর বাড়ীর লোকজন?

দরোয়ান কহিল,—ওঁদের কে আপন-জন আছেন,—সেখানে তাঁরা সকালেই চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে তালা বন্ধ।

দিলীপ চলিয়া আসিল। মনের মধ্যে সেই এক প্রশ্ন ভূতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! সেই কিশোরী! সেই ছোরা! এ দুয়ের সঙ্গে বীরেন্দ্র দত্তর মৃত্যুর কোনো যোগ নাই তো? রক্তমাখা ছোরা! বুদ্ধি করিয়া লাসটাকে হয়তো পথে ফেলিয়া দিয়াছে, খুনের মস্ত দায়ে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য!

এ হত্যার পিছনে হয়তো সেই শাশ্বত হেতু—নারীর নির্লজ্জ অভিসারের কাহিনী!—এবং সে-নারী···সেই কিশোরী!

মনটা খারাপ হইয়া গেল।···

কিন্তু পাঁচ কাজে যাকে দিন কাটাইতে হয়, তার পক্ষে মন খারাপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না! বাসায় ফিরিয়া অভিনয়ের সমালোচনা লিখিতে হইল, তারপর স্নানাহার সারিয়া দৈনিক গজগামিনী অফিসে চাকরী বজায় রাখিতে গেল!...

বেলা তিনটা নাগাদ অফিসে বসিয়া খবর পাইল, বীরেন্দ্র দত্তর মৃত্যুর সঙ্গে আর একটি রহস্য পুলিশের মারফৎ প্রকাশ পাইয়াছে। গজগামিনী কাগজে সে রহস্য-সংবাদের হেডিংটা সম্পাদক-মহাশয় বেশ লাগসই ভাবে রচনা করিয়াছেন। বিচিত্র হেডিং—

নিয়তির চক্র!

সুবিখ্যাত অভিনেতা বীরেন্দ্র দত্তর

শোচনীয় মৃত্যু!!

সেই সঙ্গে নাট্যকার

থিয়েটারের সাজ-ঘরে বন্দী!!!

কে নাট্যকার? তপন চৌধুরী? জগৎ সিংহ নাটকের নাট্যকার? খবরটা দিলীপ পড়িল। তাই বটে! সম্পাদক নিজে সংবাদ লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন,—

গত রাত্রে ভারত রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত তপন চৌধুরী রচিত নূতন নাটক জগৎ সিংহের প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় সফল হয় প্রসিদ্ধ চরিত্রাভিনেতা বীরেন্দ্র দত্তের অভিনয়-চাতুর্য্যে। তিনি সাজিয়াছিলেন জগৎসিংহ। অভিনয়-শেষে রাত্রি দেড়টায় ট্যাক্সিতে করিয়া বীরেন্দ্র বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করেন। প্রকাশ, গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ী গিয়া তখনই বীরেন্দ্রবাবু আবার কোথায় বাহির হন; তারপর যতদূর জানা গিয়াছে, তিনি ভোরের একটু পূর্ব্বে আবার গৃহে ফেরেন। সেই সময় একখানা ট্যাক্সি চাপা পড়িয়া তিনি শোচনীয় ভাবে আহত হন। তখনি মৃত্যু ঘটিয়াছে। ট্যাক্সিওয়ালা ধরা পড়িয়াছে। লোকটা মাতাল ছিল।

এদিকে ভোরের বেলায় ভারত রঙ্গমঞ্চের এক বেয়ারা বীরেন্দ্রবাবুর সাজঘরের মধ্যে মানুষের চীৎকার শুনিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখে, নাট্যকার শ্রীযুক্ত তপন চৌধুরী মহাশয় সে ঘরে হাত-পা বাঁধা পড়িয়া আছেন। তিনি নাকি সম্পর্কে বীরেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধী। তপনবাবু বলেন, নাট্যাভিনয় শেষ হইলে বীরেন্দ্র বাবু নাটকের কয়েক স্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের কথা বলায় তিনি নাটকের খাতা লইয়া সে জায়গাগুলি দেখিতেছিলেন, এমন সময় একটা উগ্র গন্ধ পাইয়া পিছন ফিরিবার চেষ্টা করেন—কিন্তু সবলে কে তাঁর মুখ চাপিয়া ধরে! ক্লোরোফর্ম্ম-যোগে তাঁকে অচেতন করা হয়।

চেতনা-লাভে তিনি দেখেন, তাঁর হাত-পা বাঁধা; থিয়েটারের সাজ-ঘরের মেঝেয় তিনি পড়িয়া আছেন। তিনি তখন চীৎকার করেন। তাঁর চীৎকারে থিয়েটারের বেয়ারা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়। তপনবাবু সকালে গৃহে আসেন—আসিয়া বীরেন্দ্রবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পান। পুলিশে তিনি তাঁর বিপত্তির সংবাদ দিয়াছেন। পুলিশ জোর তদারক করিতেছে। সব চেয়ে রহস্য এই—তপনবাবু বলিতেছেন, এ বিপত্তির কোনো হেতু তিনি বলিতে পারেন না। তাঁর সঙ্গে কাহারো শত্রুতা নাই। তিনি দু'তিনমাস মাত্র কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন—বীরেন্দ্রবাবু তাঁর খুড়তুতো ভগ্নীপতি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাস করেন তাঁর স্ত্রী মাধবীলতা ও বিধবা ভগ্নী পুরবী। অপর কোনো থিয়েটারের বিদ্বেষ-বশতঃ এ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া পুলিশ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু এ সন্দেহ কতখানি টিঁকিবে, বলা যায় না।

সংবাদ পড়িয়া দিলীপের বিস্ময় সীমাহীন হইয়া উঠিল। ঘটনাটি আশ্চর্য্য! এমন ঘটনা কোনো কাল্পনিক উপন্যাসে কখনো পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না!...

তবু মনের কোণে সেই প্রশ্ন—রাত্রের সেই কিশোরী—পথে-পড়া সেই রক্ত-মাখা ছোরা!...

দিলীপ ভাবিল,—চার-তলা বাড়ীটায় বাঙালী ভদ্রলোক আর কেহ বাস করে না?

করিলেও ছোরার কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করা চলে না। কিশোরীর সেই কাতর করুণ মিনতি! কে জানে, যদি তাঁর কোনো বিপত্তি ঘটে!...

অপরাধিনী যদি তিনি সত্যই হন?...তবু, না! দিলীপের প্রাণে মমতা জাগিতেছিল।

•

অফিসের পর দিলীপ বাড়ী ফিরিল। অন্যদিন পাঁচ জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়া রাত্রে ফেরে। আজ কোথাও যাইতে ভালো লাগিল না, তখনি ফিরিল। ফিরিয়া একখানা চিঠি পাইল। ডাকে আসিয়াছে; খামে। খামের উপর স্ত্রীলোকের হাতে লেখা নাম-ঠিকানা।

সবিস্ময়ে খাম ছিঁড়িয়া দিলীপ চিঠি বাহির করিল। চিঠিতে লেখা আছে:—

মান্যবরেষু

দারুণ বিপদে পড়িয়া এ চিঠি লিখিতেছি। আপনার সঙ্গে আমার দেখা করা একান্ত প্রয়োজন। কাল দুপুর বেলায় দয়া করিয়া যদি ইডন্ গার্ডনে প্যাগোডায় আসিতে পারেন—বেলা ঠিক একটায়—তাহা হইলে বড় উপকৃত হইব। একটা পরিবারের মান-ইজ্জৎ এ সাক্ষাতের উপর নির্ভর করিতেছে। কৃপা করিয়া আসিবেন। ইতি

কাল রাত্রের সেই

অপরিচিতা

দিলীপের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। যে প্রশ্ন তার মনে জাগিয়া আছে, বিঁধিয়া আছে—সে প্রশ্ন তবে...?

কিন্তু কাল বেলা একটা!' এতক্ষণ বিলম্ব সহিবে না! কেন তিনি এই দণ্ডে দেখা করিবার কথা বলিলেন না?

তার মন কি রকম অধীর আকুল হইয়া আছে! কাল পর্য্যন্ত এ অধীরতা বুকে বহিয়া বাঁচা যায় ?

কিন্তু উপায় নাই। এ চিঠিতে অপরিচিতার নাম নাই, ঠিকানা নাই। পোষ্ট-মার্ক দেখিল,—বীডন্ স্কোয়ার পোষ্ট অফিসের ছাপ। এ ছাপ লইয়া ঠিকানা নির্ণয় করা অসম্ভব!

কাজেই প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই!···

৩

কোনমতে এ সময়টুকু কাটাইয়া বেলা বারোটায় অফিস হইতে ছুটী লইয়া ট্রামে চড়িয়া সে ইডন্ গার্ডেনে গিয়া উপস্থিত হইল। হাইকোর্টের ঐ উচ্চ চূড়া! দিলীপের মনে হইল, এই খুন! তার বিচার-কর্ত্তা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

সে আসিয়া প্যাগোডায় বসিল। এখানেও অলস লোকের অভাব নাই। কি সুখে সব পড়িয়া থাকে!

চারিদিক হইতে একটা মিশ্র গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিতেছিল। অসহ্য অধীরতা বুকে লইয়া দিলীপ প্যাগোডার সামনে পায়চারি করিতে লাগিল···একটা বাজিতে এখনো বিশ মিনিট বাকী!

সে ভাবিতেছিল, কিশোরী চিনিতে পারিবেন তো? দিলীপ পারিবে। অমন দুটি চোখের কালো তারা···! মৃগ-নয়না বলিয়া একটা কথা সাহিত্যে পড়িয়া আসিতেছে—সে মৃগ-নয়ন যদি কাহারো থাকে তো শুধু এই অপরিচিতার!···অনেক চোখ দিলীপ দেখিয়াছে! কিন্তু এমন···? এ দুই চোখ—লক্ষ চোখের মধ্য হইতে সে ঠিক চিনিয়া লইতে পারে।

তোপ পড়িল। দিলীপ চমকিয়া উঠিল। একটা।

প্যাগোডার সামনে একটি কিশোরী! গায়ে মোটা চাদর, পায়ে শ্লীপার। একা আসিয়াছেন। কিশোরী নমস্কার করিয়া মৃদু ভাষে কহিল—আপনি দিলীপবাবু?

দিলীপ কিশোরীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিল। মলিন-মুখী! তবু কি দীপ্ত মর্য্যাদা কিশোরীর মুখে! সিঁথিতে সিন্দুরের চিহ্ন নাই। দিলীপ কহিল,—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

কিশোরী কহিল,—পরশু রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম। আমার দাদা আপনাকে দেখিয়ে দেয়—দিয়ে বলে, কাগজে উনি নাটকের সমালোচনা লেখেন—"শ্রীমান্" ছদ্ম-নামে। আপনার নাম দিলীপবাবু—দাদাই বলে দেয়।

দিলীপ গর্ব্ব বোধ করিল। থিয়েটারের সমালোচনা লিখিয়া তার খ্যাতি—তা সে জানে। তবু সে খ্যাতির গরিমা এই কিশোরীর মুখে কীর্ত্তিত···

দিলীপ কহিল,—আপনার দাদার নাম···?

কিশোরী কহিল,—তপন চৌধুরী। 'জগৎসিংহ' নাটক দাদার লেখা।

দিলীপ কহিল—ও! বীরেন্দ্রবাবু তাহলে আপনার···?

কিশোরী কহিল—ভগ্নীপতি। জাঠতুতো ভগ্নীপতি।

দিলীপ কহিল—বটে!

তার দুই চোখে সহস্র প্রশ্ন ফুটিল। কিশোরী তাহা লক্ষ্য করিল, করিয়া কহিল—কোথাও একটু বসলে ভালো হয়। অনেক কথা আছে।···ঐ ঘাসের উপর···?

দিলীপ কহিল—বেশ।

আরব-রজনীর কি মোহময় স্বপ্নময় কাহিনী না জানি কিশোরী বলিতে আসিয়াছে! দিলীপের মন উদগ্র, আকুল হইয়া উঠিল।

তৃণ-শয্যায় দুজনে বসিল—সামনা-সামনি।···

কিশোরী কহিল—আমার সাহস দেখে আপনি হয়তো খুব আশ্চর্য্য হচ্ছেন! কিন্তু যে বিপদে পড়েচি, তাতে মেয়ে-মানুষ ভুলে যায় যে, সে মেয়ে-মানুষ! তার চলা-ফেরার সঙ্গতি; কি করচে না করচে,—তাও মনে থাকে না!···

দিলীপ কহিল,—আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন—বলুন!

কিশোরী নিশ্বাস ফেলিল; ফেলিয়া এক দিকে চাহিয়া রহিল—উদাস নয়নে। মালীরা অদূরে কাজ করিতেছে—একটা বেঞ্চে বসিয়া এক ভদ্র লোক ঝিমাইতেছেন!···বোধ হয়, ভাগ্যহীন বেকার!

দিলীপ কিশোরীর পানে চাহিয়া···ভাবিতেছিল, ও-মূর্ত্তির মনের কোণে কোনো পাপ, কোনো অন্যায় ঘেঁষিতে পারে না! কিন্তু সেই ছোরা···সেই ছোরা দিলীপের মনকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল!

কিশোরী আবার নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—সে ছোরা আপনার কাছেই আছে?

দিলীপ কহিল,—আছে।

—বেশ সাবধানে রেখেচেন ?

—খুব সাবধানে রেখেচি।

কিশোরী চুপ করিল। বহুক্ষণ তার মুখে কোনো কথা নাই !···

তার পর কিশোরী কহিল,—বড় দুঃখের ইতিহাস, দিলীপ বাবু ! মেয়ে মানুষের মান-ইজ্জতের শোচনীয় কাহিনী আপনাকে বলতে এসেচি ! গল্পে-উপন্যাসেও এমন দুর্ভাগ্যের কথা কখনো শোনেন নি ! এ কথা কাকেও বলবার নয়। তবু যে আপনাকে বলচি—অপরিচিত আপনি—কতখানি দায়ে—কতখানি কলঙ্ক থেকে বাঁচবার জন্য···আশা করি, আপনি তা বুঝবেন !···

দিলীপ কোনো কথা বলিল না। কিশোরী কহিল,—আমার দিদি—বড় লক্ষ্মী। কিন্তু ভারী মন্দ তার ভাগ্য। দিদি বীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী। বীরেন্দ্রবাবুকে বোধ হয় জানেন ! তাঁর চরিত্র ভালো নয়। মদ খান—আরো নানা দোষ আছে। দিদি এ অপমান নির্ব্বিবাদে সয়ে আস্‌চে বরাবর। দাদার চিরদিন নাটক লেখার সখ। সম্প্রতি ঐ জগৎসিংহ নাটক লেখে। সে নাটক বীরেন বাবুকে দেখায়। তাঁর পছন্দ হয়। থিয়েটারওলাদের কাছে দাদার সে নাটক বীরেনবাবুই দেখান। তাঁর পছন্দ করা নাটক—তারা মাথায় তুলে নেয়। দাদা কিছু টাকাও পেলে। তার পর আমাকে আর বৌদিকে নিয়ে দাদা কলকাতায় এলো। এসে বীরেনবাবুর বাসায় আমরা উঠলুম। ওঁর কি খাতির ! দাদাকে থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে নাটকের রিহার্শাল, নানা আলোচনা চল্‌তে লাগলো। আমরা রইলুম দিদির কাছে। থাকতে থাকতে জানলুম দিদির দুঃখের কথা—বীরেনবাবুর পীড়নের কথা ! বীরেন-বাবুকে একদিন আমি বলেছিলুম—অভিনয় তো করেন খুব ভালো—দিদির সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় না হয় করুন —তাতেও মানুষটা বাঁচতে পারবে !···তখন আমার সঙ্গে যে সব কথা কইলেন—তা অভদ্র, ইতরের কথা ! আমরা প্রায় থিয়েটার দেখতে যেতুম। ওঁর অভিনয় দেখতুম। সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হতো ! আমায় বলতেন—তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে, পূরবী—একটা inspiration পাই। তোমার দিদির কাছ থেকে এ জিনিষটা কখনো পেলুম না ! স্ত্রী, না, মাটীর পুতুল ! দুঃখ আমার সেইখানে ! আমরা আর্টিষ্ট লোক—আমরা চাই এমন দরদী বন্ধু—যারা আমাদের প্রাণে রসের জোগান দেবে !···এমন কথা প্রায় হতো ! এক দিন শেষে স্পষ্ট ভাষায় আমাকে জানালেন, আমাকে ভারী ভালোবাসেন···আমাকে না পেলে তাঁর পক্ষে বাঁচা সম্ভব হবে না ! স্পষ্ট বললেন, আমার জন্যই দাদার বই অভিনয় করতে নিয়েচেন—আমাকে সর্ব্বদা দেখতে পাবেন, তাই। আরো অনেক ইতর কথা বললেন ! মদের মুখ—আমি গন্ধ পেয়েছিলুম। দিদির এখানে এসে এ গন্ধের সঙ্গে পরিচয়।

কিশোরী চুপ করিল—চুপ করিয়া শূন্য নয়নে কেয়ারি-করা পথের পানে চাহিয়া রহিল।

দিলীপের চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ! তার মনে হইতেছিল, নারী-চিত্তের শাশ্বত অনুযোগ যেন আকাশে বাতাসে রণিয়া উঠিয়াছে ! যুগ-যুগান্ত ধরিয়া পুরুষের হাতে নারী যে উপেক্ষা, যে অপমান সহিয়া আসিতেছে, সে উপেক্ষা সে অপমান যেন আজ এই কিশোরীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তার সামনে উদয় হইয়াছে !···

কিশোরী আবার বলিল—বীরেনবাবুর পীড়ন চললো। এ অপমান নীরবে আমাকে সহ্য করতে হতো ! কার কাছে নালিশ করবো ? ক্রমে কিন্তু অসহ্য হয়ে উঠলো ! দাদাকে অন্য পাঁচ কথায় বুঝিয়ে আলাদা বাসা দেওয়ালুম। সেখানে বীরেনবাবুর যাতায়াত ছিল। এসে সুবিধা পেলেই আমায় সেই সব কথায় উত্ত্যক্ত করতেন !··· কি করবো ? চুপ করে শুনতুম ! উপায় ছিল না। বেচারী দিদি ! তার কাণে এ কথা গেলে বেচারী মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবে। শেষে পরশু রাত্রে দাদার নাটকের অভিনয়। দিদির শরীর ভালো ছিল না। তবু দাদার প্রথম নাটকের অভিনয় ! গেল ! অভিনয় ভাঙ্গলে দিদিকে নিয়ে আমি দিদির বাসায় ফিরলুম। বৌদি যায়নি,—তার সেদিন খুব অসুখ—নড়্‌বার শক্তি ছিল না। আমারো যাবার কথা নয়—কিন্তু দাদার জীবনে সেদিন স্মরণীয় উৎসব—তাই আমাকে যেতে হয়েছিল। ফিরলুম দিদির বাসায়। কথা ছিল, বীরেন-বাবু আর দাদা একসঙ্গে ফিরবেন—ফিরে দাদা আমায় নিয়ে আমাদের বাসায় আসবেন। আমরা ফিরে ছিলুম থিয়েটারের মালিকের প্রাইভেট গাড়ীতে। ফিরে দিদি

আর আমি দুজনে বসে গল্প করচি, এমন সময় বীরেনবাবু এসে হাজির। আমায় বল্লেন, তোমার দাদা গাড়ীতে বসে আছেন—চলো, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। দেরী করো না! এতে অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না! আমি তাঁর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে আসছিলুম···সিঁড়িতে ক'ধাপ নামবামাত্র নির্লজ্জের মত আমার হাত ধরে বীরেনবাবু আমায় একেবারে বুকে টেনে নিলেন, নিয়ে ডাকলেন,—পূরবী···

আমার মন ঘৃণায় রী-রী করে উঠলো। চোখের সামনে সমস্ত ঘর-বাড়ী যেন দুলতে লাগলো। জোরে তাঁকে ধাক্কা দিলুম। তিনি দেওয়ালের গায়ে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লেন, আমি তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম! বীরেনবাবু বাঘের মত ঝাঁপিয়ে আমার উপর পড়লেন; আমায় আঁকড়ে ধরলেন—তারপর ছোট ছেলের মত আমায় তুলে বুকে করে উপরের ঘরে এসে দাঁড়ালেন···দাঁড়িয়ে সে কি অভদ্র ইতর কথা!···আমায় ধরেছিলেন—বাঘের মত! তাঁর হাতে কামড়ে দিলুম···হঠাৎ তিনি আমায় ছেড়ে আর্ত্ত চীৎকার তুলে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন। দেখি, তাঁর গায়ের জামা রক্তে ভেসে গেছে।···আর সেই ছোরা···! আমি অবাক! চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন চিরে গেল!···ছোরাখানা তুলে নিয়ে আমি খড়খড়ি খুলে পথে ফেলে দিলুম। দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ভালো করিনি। এখনি যদি কোনো বিপদ ঘটে ঐ ছোরার জন্যে···

দুনিয়া যেন কালো হয়ে উঠলো! ছুটে আমি নীচে গেলুম। দাদা নেই! দাদার গাড়ীও নেই। দেখলুম, আপনি! কোথায় দাদা? মিছে কথা! ফন্দী! আপনার হাতে সেই ছোরা···সে ছোরা আপনার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলুম!...

দিলীপ নিশ্বাস ফেলিল, কহিল—আপনার দিদি তাহলে খুন করেচেন—নিজের স্বামীকে!

কিশোরীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ললাটে স্বেদবিন্দু! কিশোরী কহিল—না, না। আমি দিদিকে দেখিনি সেখানে—সত্যি।···বিশ্বাস করুন!

দিলীপ বুঝিল, দিদির নাম মুখেও উচ্চারণ করিবে না। সে বলিল,—আপনি তাহলে...

কিশোরী কহিল—হয়তো আমি! ইজ্জৎ বাঁচাতে ···আমার তখন জ্ঞান ছিল? না, চেতনা ছিল?···কিন্তু তাতে এ সর্ব্বনাশ ঘটেনি! আপনি ছোরা দিলেন না—আমি উপরে এলুম। এসে দেখি, বীরেনবাবু ঘরে! দিদি তাঁর সেবা করচে···আমি ভিজে ন্যাকড়া এনে সে রক্ত ধুয়ে মুছে নিলুম। দিদি পিঠে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল··· আমার পানে যে-দৃষ্টিতে বীরেন বাবু চাইছিলেন···কিন্তু তখনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। বললেন,—কোন্ বন্ধুর কাছে কি দরকার আছে! বলেই বেরিয়ে গেলেন। উপর থেকে দেখলুম,—পথে ট্যাক্সি যাচ্ছিল—বাড়ীর একটু দূরে ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন। দিদি বললে, আমি মরবো পূরবী! চাই না আমি স্বামী—চাই না সংসার! আমার সে সাধ মিটেচে!···দিদির যা অবস্থা তখন···আমি দিদিকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলুম দাদার বাসায়। পথ জানা ছিল।···এই কাহিনী···ছোরার জন্যে বুক তবু কাঁপচে সারাক্ষণ!···সেখানা যদি ফিরিয়ে দেন···

দিলীপ কহিল—সে ছোরার জন্য কোন ভয় নেই—আমার কাছে যতক্ষণ আছে, আপনারা নিরাপদ জানবেন!···কিন্তু বীরেনবাবু কোথায় গিয়েছিলেন?

কিশোরী কহিল—জানি না।

দিলীপ কহিল,—আমার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য?

কিশোরী কহিল—পুলিশ তদারক করচে। ডাক্তারে বলেচে, মোটর চাপা পড়লেও গায়ে ছোরার চোট—টাট্‌কা! তাই।···তাদের কাছে যদি এ ছোরার কথা বলেন—তাহলে দিদির নামে যদি কোনো কলঙ্ক রটে··· তাই আপনার কাছে মিনতি জানাতে এসেচি!··· আপনি বাড়ীর কাছেই থাকেন···

কিশোরীর চোখে কাতর দৃষ্টি, কণ্ঠে করুণ মিনতি!

দিলীপ কহিল—কোনো ভয় নেই! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!

স্নিগ্ধ আবেশ! সেই আবেশে মন ভরিয়া দিলীপ গৃহে ফিরিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

৪

তার ঘরের সামনে বসিয়া ছিল এক জন মধ্যবয়স্ক লোক। মলিন বেশ—দীন মূর্ত্তি!

দিলীপকে দেখিয়া উঠিয়া সে নমস্কার করিল, কহিল,—আপনার নাম দিলীপবাবু?

দিলীপ কহিল,—হ্যাঁ। আপনার প্রয়োজন ?

লোকটি মলিন মৃদু-হাস্যে কহিল,—একটু দরকার আছে।

দিলীপ কহিল,—বলুন…

ভদ্রলোক কহিলেন,—ঘরে চলুন। সে কথা বাইরে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না।

এ আবার কি নূতন রহস্য! দিলীপ কহিল,—আসুন…

সে ঘরের দ্বার খুলিল। দু'জনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

লোকটি বলিল,—বীরেন বাবু এ্যাক্টারকে আপনি জান্‌তেন ?

দিলীপ কহিল,—হ্যাঁ। মানে, সামান্য আলাপ-পরিচয় ছিল। কিন্তু…

লোকটি মৃদু হাসিয়া কহিল,—তিনি ট্যাক্সি চাপা পড়ে মারা গেছেন। অথচ এ কথা শুনেচেন যে, তাঁর গায়ে ছুরির চোট্ ছিল ?

দিলীপ চমকিয়া উঠিল, কহিল—শুনেচি। কিন্তু আমার সে খপরে প্রয়োজন নেই।

লোকটি বলিল,—হ্যাঁ। ছুরির চোট ছিল। আমি সে খপর পেয়েচি—আর সেজন্য পুলিশ এ ব্যাপারের তদন্ত করচে…। ট্যাক্সি চাপা না পড়লে হয়তো যে-চোট্ খেয়েছিলেন, তাতেই মারা যেতেন…

দিলীপের নিশ্বাস ক্ষণেকের জন্য রুদ্ধ হইয়া আসিল! বেচারী পূরবী! বেচারী মাধুরী!

লোকটি বলিল,—আপনাকে আমি চিনি। এই পাড়াতেই আমি বাস করি কি না। এ ছুরি মারার সঙ্গে আমার একটু সম্পর্ক আছে।

লোকটা হাসিল। সে কি হাসি! দিলীপের দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত! লোকটি বলিল,—হ্যাঁ, আছে। মানে, যে-ছুরি আপনি নিয়ে আসেন, সে-ছুরির চোট সামান্য—তার উপরে ছিল আমার ছুরির চোট।

লোকটার চোখ জ্বলিতেছিল। খুনী লোক দিলীপ কখনো চক্ষে দেখে নাই—তবে ভাবিত, ভয়ঙ্কর! কিন্তু এ লোকটির কোথাও ভয়ঙ্কর কিছু নাই! সে চমকিয়া উঠিল।

লোকটা বলিল—বীরেনবাবুর বাড়ীর পাশে যে দোতলা বাড়ী—ঐ বাড়ীর এক-তলার ঘরে আমি থাকি। আমার একটি মেয়ে…ডাগর মেয়ে। বিয়ে হয়নি। দিতে পারিনি। লেখা-পড়ার দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। গান গাইতে জানতো। বীরেনবাবুকে দেবতার মত ভক্তি করতো—তাঁর প্লে দেখে! তাই থেকে হতভাগা মেয়েটার সর্ব্বনাশ করে বসে! এমন সর্ব্বনাশ কোনো ভদ্রলোক করতে পারে—তা কেউ বিশ্বাস করবে না! আমাদের থিয়েটারের পাশ দিতেন …মেয়েটা থিয়েটারের সম্বন্ধে গল্প-আলোচনা করতো—ওঁর বাড়ীতে যেতো। বীরেনবাবুর পরিবার বড় ভালো—তাঁর কাছে যেতো! সেই সুযোগে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করে বসে। …যেদিন জানতে পারলুম, তাকে বললুম…মনে হলো… কি মনে হলো, বলতে পারবো না! মনে যেন আগুন জ্বললো!…মেয়েটা বুঝতে পারলে—কি করেচে! নিজের কত-বড় সর্ব্বনাশ! সে বাঁচলো না—জলে ডুবে প্রাণ দিলে!… এখনো পনেরো দিন হয়নি! পুলিশ কত হাঙ্গামা করলে… আমি কিন্তু স্থির থাকতে পারলুম না। পণ করলুম, যেমন করে পারি, হতভাগাকে দেখে নেবো।…ওৎ পেতে থাকতুম। একদিন শেষে সুযোগ মিললো—সেই রাত্রে! সেদিন অনেক রাত্রে বীরেনবাবু বাড়ী ফিরলেন…ফিরে ওঁর স্ত্রীর বোনের সঙ্গে কি চেঁচামেচি করছিলেন…তারপর মেয়েটি নীচে নেমে এলো—আমি থামের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম…মেয়েটি আবার উপরে গেল। তার অনেকক্ষণ পরে বীরেনবাবু নেমে এলেন…তখন ভাবলুম—দিই ছুরি বসিয়ে! মনে হলো, ওঁর স্ত্রীর কথা। না, এ বাড়ীতে মারবো না; পথে মারবো! বীরেনবাবু নেমে এসে ট্যাক্সি নিলেন। আমি পথেই বসে রইলুম…অনেকক্ষণ… উনি ফিরলেন তখন প্রায় ভোর হয়। ওঁর বাড়ীর দুখানা বাড়ী-আগে সরু একটা বন্ধ-গলি—তার সামনে দিলুম সে ছুরি বসিয়ে তাঁর বুকে—বেশ জোরে। উনি চীৎকার করে উঠলেন। আমি ছুরি বার করে নিয়ে সরে পড়লুম… একখানা ট্যাক্সি আসছিল হুড়মুড় শব্দে…কি হলো, জানি না। পরে শুনলুম—সেই ট্যাক্সিখানাই তাঁকে শেষ করে দেছে! ··চোট্ খেয়ে পা টলেছিল হয়তো—চলতে পারেনি—তখন আর কি……

সর্ব্বনাশ! দিলীপ শিহরিয়া উঠিল। লোকটা খুনে…!

লোকটা চুপ করিয়া রহিল—অনেকক্ষণ! পরে নিশ্বাস

ফেলিয়া কহিল,—জানেন না আপনি, কত বড় পাজী। ওর বিধবা শালী…তাঁর উপর পীড়ন করতে গেছলো—উপরের ঘরের সামনে। সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দেখেচি। ও লোককে রাখতে আছে!…তবে এখন ভয় হচ্ছে, আমার স্ত্রী…আরো দুটি বাচ্ছা ছেলে-মেয়ে…আমি মলে তাদের কে দেখবে?… কিন্তু সত্যি কি আমি মেরেচি, বাবু? আমার ছুরির চোট অত জোরে লাগেনি…হয়তো বাঁচতো! ট্যাক্সিখানা যদি…নয়?

লোকটা নিশ্বাস ফেলিল—তার দুই চোখে জল…

দিলীপ ভাবিতেছিল…

এ-সবের বিচার করিবার তার কি অধিকার আছে! এ লোকটা অনেক জলিয়াছে…তাছাড়া হয়তো ছুরির চোট সামলাইয়া বীরেন বাঁচিত…যদি ট্যাক্সিখানা আসিয়া চাপা না দিত…

সে বলিল,—ট্যাক্সি চাপা পড়ে মারা গেছেন। আপনি কেন উতলা হচ্চেন! তবে আপনি যা করেচেন, তা উচিত হয় নি!

লোকটা বলিল—কি' করে সহ্য করবো অত বড় অত্যাচার! ভগবান তো নেই…সে যুগের মত মেয়েদের এ সব অপমান-অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে তিনি আসেন কৈ? তাই বাধ্য হয়েই না! মেয়ের উপর এত বড় অপমান…তার জন্যই না মেয়েকে আজ হারিয়েচি…

এ সব সমাজ-তত্ত্বের কথা…আইনের কথা! দিলীপ বলিল,—আপনি বাড়ী যান…ভয় নেই। তবে, এ-কথা আর কারো কাছে বলবেন না—বিপদ হতে পারে। আমি এ-কথা কারো কাছে প্রকাশ করবো না!…

লোকটা বলিল,—পুলিশ?

দিলীপ কহিল,—না…

লোকটা তবু নড়িতে চায় না। অনেক বলিয়া, অনেক কহিয়া দিলীপ তাকে গৃহে পাঠাইল। তার পর নিজে খোলা জানালার সামনে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল…

এ কথা গোপন রাখা উচিত?

অনুচিত কি করিয়া হইবে! যদি ট্যাক্সি চাপা না পড়িত, তাহা হইলে এ খুন…এ ভদ্রলোক…

কিন্তু—বীরেন এ-লোকটার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে…

সেজন্য আইন আছে…পুলিশ আছে…

তা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে নারীর এত বড় কলঙ্ক—সারা পরিবারের মান, ইজ্জৎ, সম্ভ্রম…সেই সঙ্গে হয়তো ইহ-জন্মটাই…

সমস্যা!…

আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র। তারাও যেন ম্লান মলিন মুখে এ সমস্যার কথা চিন্তা করিতেছে। কিন্তু…না, এ সমস্যার সমাধান নাই।…মিছা চিন্তা! মিছা! মিছা!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রশ্ন

ছল করে কেন বলেছিলে মোরে 'বেসেছি ভালো'।
কেন বা জ্বালিলে হৃদয়ে আমার আশার আলো।

কেন বা ভরিলে ভুবন আমার কথায় গানে,
পিয়াসী নয়নে কেন বা চাহিলে আমার পানে।
যদি দু'দিনেই ভেঙে যাবে তব প্রেমের খেলা,
মিছে হাসি দিয়া ঢাকিতে চাহিবে—এ অবহেলা?
প্রেম-হীন সুধা-মাখা বাণী দিয়ে ভেবেছ না কি,
ভরি দিবে কল-গুঞ্জনে এই বিরাট ফাঁকি!
তার চেয়ে মোরে না দেখা তোমার ছিল গো ভালো,
হৃদয়ে না হয় না জ্বলিত মোর প্রেমের আলো।
তবু ত বিকালে সখীজন মিলি যেতাম জলে,
সরল হৃদয়ে করিতাম খেলা নানান ছলে।

সকালে উঠিয়া ছুটিতাম সুখে ফুলের বনে,
আড়ি করিতাম একটু কারণে সখীর সনে।
এখন যে আর কিছুই আমার লাগে না ভালো,
মনের উপর পড়েছে কি এক গভীর কালো।
বেলা পড়ে এলে সখী যবে ডাকে—'জলকে চল্,'
মনে ভেসে ওঠে বাঁধান ঘাট, সে অশথ-তল,
তবু কেন হায়, মুখে বাহিরায়,—ধরেছে মাথা,
দারুণ আবেগে উথলিয়া ওঠে বুকের ব্যথা,
সব কেড়ে নেছ,—হাসি, কথা, গান, মনের বল—
ভালো না বাসিয়া—কি খেলা! এই মিথ্যা ছল?

শ্রীমতী বনলতা দেবী (বি-এ)

রেডিওযুক্ত পুলিসের দ্বিচক্রযান

নিউইয়র্ক পুলিসে দ্রুতগামী রেডিওযুক্ত দ্বিচক্রযান ব্যবহৃত হইতেছে। উহার পার্শ্বে একখানি আসনে আর এক জন পুলিস-

রেডিওযুক্ত পুলিস দ্বিচক্রযান

কর্ম্মচারী বসিয়া থাকে। এক জন গাড়ী চালায়, অপর ব্যক্তি বেতার সংবাদ জানিবার জন্য নিযুক্ত থাকে। অপরাধীকে ধরিবার পক্ষে এইরূপ দ্রুতগামী দ্বিচক্রযান বিশেষ উপযোগী।

পুচ্ছহীন সমর-বিমান

গ্রেট বৃটেনের সমর বিভাগের কর্ত্তারা পুচ্ছহীন সমর-বিমানের
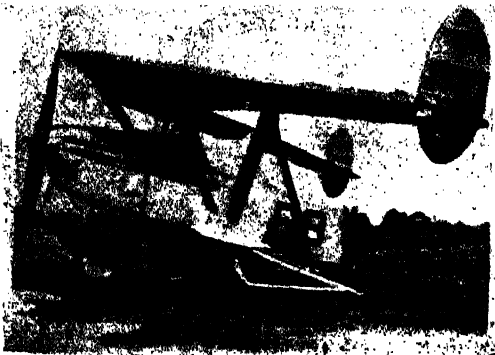
পুচ্ছহীন সমর-বিমান

পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই জাতীয় বিমানে দুই জনের বসিবার ব্যবস্থা আছে। উহার আকার অনেকটা বাদুড়ের ন্যায়। পুচ্ছাংশ বাদ দেওয়ায় বিমান হইতে প্রত্যেক বস্তু ভাল দেখিতে পাওয়া যায় এবং আক্রমণ ও গোলাবর্ষণও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সমর বিভাগে উহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

নৌবহরের নব্বই বৎসরের পুরাতন লৌহপোত

এরি পাতে "উলভারাইন্" নামক রণপোত ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। উহাই যুক্তরাজ্যের প্রথম লৌহনির্ম্মিত রণপোত। ৯০ বৎসর পরে উহা 'সিজারি' উপসাগরের তীরে
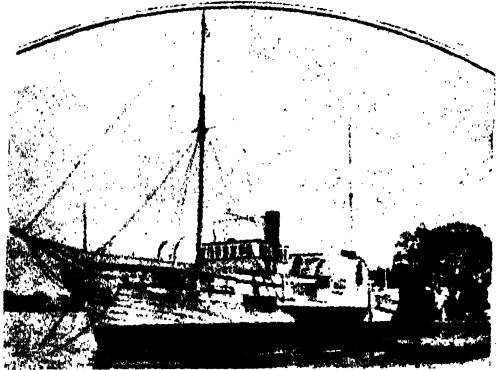
৯০ বৎসরের পুরাতন যুদ্ধ জাহাজ

নোঙ্গর করা হইয়াছে। এখন উহাকে যুদ্ধার্থ ব্যবহার করা হয় না। কালের প্রভাব উহার দেহে বিদ্যমান। তথাপি কলকব্জা চমৎকার অবস্থায় আছে। "উলভারাইন্" ১ শত ৬৮ ফুট দীর্ঘ, ২৭ ফুট প্রস্থ। উহার ভারবহনক্ষমতা ৬ শত ৮০ টন। জাহাজের চাকার ব্যাস ২০ ফুট। প্রত্যেক চাকার ষোলটি প্যাডেল আছে। দশ 'নট' করিয়া ঘণ্টায় উহা চলিতে পারে। যখন উহা যুদ্ধোপযোগী ছিল, তখন ৬টি ছয় পাউণ্ড ওজনের, দুইটি দুই পাউণ্ড ওজনের কামান ও ছোট হাউইটজার ব্যবহৃত হইত।

অশ্বপৃষ্ঠে রেডিও যন্ত্র

শান্তির সময়ে ইটালীর সেনাবিভাগে অশ্বপৃষ্ঠে রেডিও-যন্ত্র স্থাপন করিয়া কুচ-কাওয়াজ করা হয়। ছবি দেখিলেই বুঝিতে

অশ্বপৃষ্ঠে রেডিও-যন্ত্র

পারা যাইবে, রেডিও-যন্ত্র কিরূপভাবে অশ্বপৃষ্ঠে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয়। এক জন অশ্বারোহী সৈনিক অপর অশ্বের বল্গাধারণ করিয়া লইয়া যায়।

মৎস্যাকার ডুবো জাহাজ

চিকাগোর সন্নিহিত সমুদ্রে দশ ফুট দীর্ঘ ধাতব মৎস্যাকৃতি ডুবো জাহাজের গতিবেগের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই

মৎস্যাকার ধাতব ডুবো জাহাজ

ডুবো জাহাজের ওজন এক হাজার পাউণ্ড বা কিঞ্চিদধিক ১২ মণ। এই ডুবো জাহাজের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬ মাইল মাত্র। ১৭ ফুট জলের নিম্নে ইহা থাকিতে পারে। যিনি এই জাহাজের উদ্ভাবয়িতা, তিনি সহজে ইহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, এমন স্থান ইহাতে আছে।

আসবেস্‌টস্‌ পরিচ্ছদ ও ছত্র

লণ্ডনের অগ্নিনির্ব্বাণকারীরা আস্‌বেস্‌টস্‌ নির্ম্মিত ছত্র লইয়া অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহাতে অগ্নিশিখা তাহা-

অগ্নিনির্ব্বাণে আস্‌বেস্‌টসের পরিচ্ছদ ও ছত্র

দিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। অগ্নিনির্ব্বাণকারীরা আস্‌বেস্‌টস্‌-নির্ম্মিত পরিচ্ছদেও অঙ্গ আবৃত করিয়া থাকে। মুখোস, দস্তানা সবই আস্‌বেস্‌টস্‌-নির্ম্মিত। এইভাবে সজ্জিত হইয়া অগ্নিনির্ব্বাণকারীরা নির্ভয়ে এবং নিরাপদে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে।

রেডিয়ম প্রভাবে গাছের দ্রুতবর্দ্ধন

ডাক্তার লুথার গ্যাবেল আবিষ্কার করিয়াছেন—রেডিয়মচূর্ণ সাররূপে মাটীতে ব্যবহার করিলে, সেই মাটীতে গাছ দ্রুত বর্দ্ধিত

রেডিয়মচূর্ণ প্রয়োগে গাছের দ্রুতবর্দ্ধন

হয়। তাঁহার আবিষ্কৃত পন্থা অনুসরণ করিলে উদ্যান-কুঞ্জের পুষ্পবৃক্ষগুলি অল্পদিনেই ফুলভরে উদ্যান-শোভা বর্দ্ধিত করিবে। তিন সপ্তাহের পরীক্ষার ফল এই ছবির গাছ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বামদিকের গাছে রেডিয়মচূর্ণ দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণের গাছটি স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়াছে। উভয়ের পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

অগ্নিনিবারক দস্তানা

বৃটিশ রয়াল বিমান বিভাগের জন্য অগ্নিনিবারক দস্তানা উদ্ভাবিত হইয়াছে। কোনও পোতে আগুন লাগিলে এই দস্তানা পরিয়া অগ্নিনির্ব্বাণকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়। ভীষণ উত্তাপ
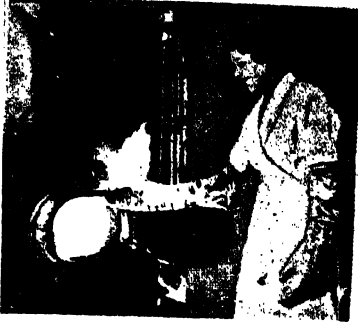
অগ্নিনিবারক দস্তানা

এই দস্তানা ভেদ করিতে পারে না। দস্তানা পরিয়া জ্বলন্ত কয়লা অনায়াসে হাতে তুলিয়া ধরা যায়। অগ্নিতপ্ত লৌহদণ্ড দস্তানা হস্তে ধারণ করিলেও বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। বিমানের পক্ষে এই দস্তানা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

অভিনব ভেলা

সেণ্ট লুইতে এক প্রকার কাঠের ভেলা দেখা দিয়াছে। উহাতে দুই জন আরোহীর স্থান আছে। দুইখানি ভাসমান

অভিনব ভেলা

ভেলার উপর পাটাতন বিস্তৃত, তাহার উপর দুইখানি দ্বিচক্রযান। চরণতাড়নায় পেডালগুলি আবর্ত্তিত হইলেই উহা চলিতে থাকে। ইদানীং এইরূপ ভেলার প্রচুর প্রচলন হইয়াছে।

বাঁধের উপর রেলগাড়ী

জার্ম্মাণ উত্তর সমুদ্রবর্ত্তী একটি দ্বীপের সহিত মূল দেশের সংযোগ রক্ষার জন্য একটি বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাঁধের উপর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে। বার্লিন ও

বাঁধেরউপর রেলগাড়ী

হামবার্গ হইতে রেল সিণ্ট পর্য্যন্ত গমন করে। যখন সমুদ্রে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তখন সমুদ্র শীকরের মধ্য দিয়া ট্রেণ ধাবিত হয়। বাঁধের দক্ষিণে একটি প্রাচীর আছে। ঝটিকার সময় রেলের যাতায়াতে কোনও বাধা হয় না।

বিমান-বোমা হইতে গৃহরক্ষার আচ্ছাদন

জাপানে বড় বড় বাড়ীগুলিকে জালের দ্বারা আবৃত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শত্রু-বিমান হইতে বোমা বা কামানের গুলী
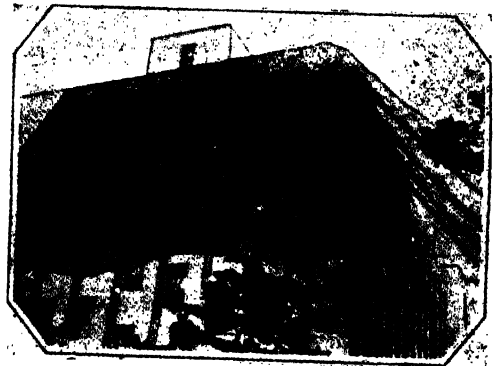
বিমান আক্রমণ হইতে অট্টালিকা রক্ষার ব্যবস্থা

নিক্ষিপ্ত হইয়া বাড়ীগুলিকে ধ্বংস করিতে না পারে, এই জন্যই জাপান এই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। সুবৃহৎ জালের দ্বারা অট্টালিকার উপরিভাগ আচ্ছাদিত করা হইলে উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হাওয়ার পরশ

দু'দিন পরের কথা।

নৃপেশ ওরফে নীপু আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরা-দস্তুর সাহেব। সঙ্গে খানসামা।

রাধাবিনোদ তার চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—কি হয়ে গেছ!

নীপু কহিল,—বড্ড ভুগেচি ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায়।

রাধাবিনোদ কহিল,—বোম্বাইয়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া!

নীপু কহিল,—তুমি যাও বঙ্গে—বরাত যায় সঙ্গে!

রাধাবিনোদ কহিল,—কিন্তু তুমি বঙ্গ ছেড়ে বোম্বাইয়ে গিয়েছিলে!

হাসিয়া নীপু কহিল,—সে কথা সত্যি! দু'মাসের ছুটী নিয়ে তাই দেশে এলুম।···তোমার এখানে অসুবিধা হবে না তো?

—তার মানে?

হাসিয়া নীপু কহিল,—এখন তুমি on Her Majesty's service—স্বাধীন নও!

রাধাবিনোদ কহিল,—সে কথা ঠিক। সার্ভিসেই আছি। জানো তো, আবু হোসেনী ষ্টাইলে সর্ব্বস্ব আমি উড়িয়ে দিয়েছিলুম?

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নীপু তার পানে চাহিয়া রহিল, কোনো কথা কহিল না।

রাধাবিনোদ কহিল—পয়সা কত শীঘ্র ওড়ে—আমি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখিয়েচি। অথচ কাপ্তেন বলে নাম রাখবার মত কিছুই করিনি! না দিয়েচি শ্রীমতী ডালিমমণির বিড়ালের বিয়ে, না কোনো ষ্টেজের অভিনেত্রীকে বাড়ী বা জমিদারী কিনে!···হঠাৎ এক দিন দেখি, আমার কিছু নেই—চোখের সাম্‌নে এক গাদা শুধু হাইকোর্টের ডিক্রী!

নীপু কহিল,—তার পর?

রাধাবিনোদ কহিল,—এটর্ণি গুরুপদবাবু—ব্যবসা-বুদ্ধি তত না থাকুক, পিতৃ-বন্ধু! সেই বন্ধুত্ব স্মরণ করে এক প্রকাণ্ড মহাজনের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন···

বাধা দিয়া উচ্ছ্বসিত হাস্যে নীপু কহিল,—সেই ধনী পত্নীর গার্জ্জেনীর ছত্রতলে তুমি তাঁর নাবালক ওয়ার্ড হয়ে দিনাতিপাত করচো!

রাধাবিনোদ কহিল,—ভিতরের রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করিনি। এখন আমি আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে খুব শ্রদ্ধাবান হয়েচি। ত্বয়া হৃষীকেশ—মন্ত্র স্মরণ করে বিষয় ভোগ করচি! অর্থাৎ ওঁরা হাত-টপকা-টপকি করে আমার কতকগুলো বিষয়-সম্পত্তি কোথা থেকে বাঁচিয়ে আমার হাতেই ফিরিয়ে দেছেন! সুতরাং স্ত্রীর এস্তাজারির কোনো প্রমাণ কেউ এখন কোথাও পাবে না। তবে যত বড় mystery এর মধ্যে থাকুক, আমি সে mysteryতে খোঁচা দিতে রাজী নই এবং খোঁচা দিই নি। যা পেয়েচি, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট মনে বাস করচি!···মধ্যে চাকরি নিয়ে শীলেটে গিয়েছিলুম। চাকরি করা হলো না—ছেড়ে দিয়ে বিষয়-কর্ম্ম দেখচি।

কণিকার কথা উঠিল। রাধাবিনোদ কহিল,—স্ত্রী খুব হিসেবী—মহাজনের কন্যা কি না! তবে মনে হয়, ভগবান তাঁকে কোনো এষ্টেটের ম্যানেজার গড়তে বসে ভুল করে নারী গড়ে ফেলেচেন!···

নীপুর বিস্ময় বুঝিয়া রাধাবিনোদ হাসিল, হাসিয়া বলিল,—বুঝচো না? স্ত্রী ছাড়া তিনি আর সব—অর্থাৎ গার্জ্জেন, ম্যানেজার, কর্ত্রী।

নীপু কহিল,—তুমি চিরদিন ছ্যাবলা রয়ে গেলে রাধ-দা!···যাক—আমায় নিয়ে চলো এখন বৌদির কাছে। মা মারা যাওয়া ইস্তক মেয়ে-মানুষের যত্ন-আদরে বঞ্চিত হয়ে প্রাণটা যেন সত্যি পাথর হয়ে আছে!

রাধাবিনোদ কহিল,—বিয়ে করে ফ্যালো নীপু···বিয়ে বস্তুটা তোমাদের মত ভদ্র যুবকদের সাজবে।

নীপু কহিল,—তোমার কাছে স্ত্রী-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত পাচ্ছি, তাতে ও-বস্তুতে কোন লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

রাধাবিনোদ কহিল,—কেন এমন হলো, বুঝতে পারি না! অথচ লাখ-লাখ বাঙালী বিয়ে করে দিব্যি মনের আনন্দে ঘর-সংসার করচে—চোখে তো দেখি!

নীপু কহিল,—তারা তোমার মত ঐতিহাসিক ব্যক্তি নয়—তাই।

—তার মানে?

—তোমার জীবনে এর মধ্যেই মস্ত ইতিহাস গড়ে তুলেচো যে! কত লোক ভিড় করে তোমার চিত্ত-ভারত-ভূমে পদার্পণ করে গেছে—কত যুদ্ধ, কত বিগ্রহ, কত উৎসব সেখানে ঘটেচে···

হাসিয়া রাধাবিনোদ কহিল,—তা সত্যি! তবু আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরে রয়ে গেছি—বিশ্বাস করো!

নীপু কহিল,—তার মানে, নিজের মনের পানে চেয়ে দেখবার অবসর তোমার কখনো ঘটে নি!

রাধাবিনোদ কহিল,—তোমার ঘটেচে?

নীপু কহিল,—যে-চাকরি নিয়ে মেতে আছি—সুন্দর বোম্বাই—রূপসী ললনার লালন-ভূমি···তবু কোনো দিকে চোখ তুলে চাইতে পারি না! যাক—এ সব বাজে কথা! চলো, বৌদির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি। তাঁর আশ্রয়ে কিছুকাল যখন থাকতে হবে, তাঁর বিরাগ-ভাজন না হই—সে দিকটা আগে দেখা দরকার।

রাধাবিনোদ মৃদু হাসিল, কহিল,—চলো। কিন্তু বৌদির যে-মূর্ত্তি কল্পনা করচো, চোখে দেখলে সে-মূর্ত্তি মিলিয়ে যাবে! দেখবে—সেই কবিতা পড়েচো? Stern Daughter···Voice of God.

নীপু কহিল,—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Duty?

—তাই বৌদির সে লালিত্য বা কোমলতা এঁতে পাবে না। পত্নী-রূপেই আমি তা পেলুম না—তুমি বৌদি-মূর্ত্তিতে পাবে কোথা থেকে!

নীপু কহিল,—তুমি রীতিমত ভয় পাইয়ে দিলে, রাধ-দা!

রাধাবিনোদ কহিল,—ভয় থেকে অনেক সময় ভক্তি জাগে—ছাখো!

হাসিয়া দু'জনে অন্দরে আসিল···

দোতলার ঘরে কণিকার সঙ্গে দেখা। নূতন দাসী আসিয়াছে, কণিকা তাকে তার রুটিনের কাজ বুঝাইয়া দিতেছিল।

রাধাবিনোদ কহিল,—এটি আমার ভাই নীপু—বোম্বাইয়ে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সাহেবী পোযাক পরা নীপু ঝুঁকিয়া দুই হাত অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া কহিল,—নমস্কার, বৌদি।

কণিকা গম্ভীর দৃষ্টিতে চকিতের জন্য নীপুকে দেখিয়া লইল, দেখিয়া কহিল—আপনি মুখ-হাত ধুয়েচেন?

নীপু কহিল—'আপনি' বলচেন ছাওরকে? সম্পর্কে আমি ছোট!

কণিকার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিল—কোনো জবাব দিল না।

নীপু কহিল—কিছুকাল আপনার আশ্রয়ে আমাকে থাকতে হবে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগের জন্য ছুটী নিয়ে এখানে এসেচি রোগ সারাতে। আপনি যদি সহজভাবে আমায় না নিয়ে কুটুম্বিতা করেন, তাহলে বুঝবো, আমায় অপ্রত্যক্ষ-ভাবে নোটিশ দিচ্ছেন হোটেলে গিয়ে থাকবার জন্য ···

এ-কথারও কণিকা জবাব দিল না; দাসীর দিকে চাহিয়া কহিল—সাধুকে ডেকে আনো তো। শীগ্‌গির।

নীপু কহিল—ঘরের সাজ-সজ্জা দেখে বৌদির হাতের যে-পরিচয় পাচ্ছি, তাতে মনে আশা হচ্ছে, আমার হাড়-পাঁজরাগুলো আবার যদি মাষ-মাংসে ঢাকা পড়ে তো সে বৌদির হাতের গুণেই হবে। এ-ঘরে আগেও এসেচি, গেছি—কি লক্ষ্মীছাড়া, অগোছালো সব ছিল! মাসিমার

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের যে-লক্ষ্মী বিদায় নিয়েছিলেন, বৌদির সঙ্গে আবার তিনি ফিরে এসেচেন—এ-বাড়ীতে পা দেবামাত্র আমি তা বুঝতে পেরেচি, বৌদি !···

এই অবধি বলিয়া নীপু রাধাগোবিন্দর পানে চাহিল, কহিল,—তুমি কি রাধদা ! নিজের ঘরে এসে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলে ! যেন পরের বাড়ী এসেচো ! আমি কিন্তু এ formality সহ্য করবো না—এতে বৌদির অপমান হবে। আমি এই কৌচটায় বসে পড়লুম।...লজ্জা পাবেন না, বৌদি। আমি বুঝতে পেরেচি,—ঐ 'আপনি' বলা নিয়ে যে মন্তব্য আমি করেচি, তাতেই আপনি ইচ্ছা থাকলেও আমার সঙ্গে কোন কথা কইতে পারচেন না !···তবু আপনার মুখের ভাব থেকে বুঝচি, I am no unwelcome guest here···তুমি বসো রাধদা!—আপনিও বসুন বৌদি···এই কৌচটায়···

সামনের কৌচখানার দিকে নীপু ইঙ্গিত করিল।

কণিকার মনে হইতেছিল, বদ্ধ ঘরের মধ্যে এতদিনে যেন মুক্ত বাতাসের ঝলক্ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে ! এ বাড়ীতে আসা-অবধি এমন স্বচ্ছ সহজ কথা কাহারো মুখে সে শোনে নাই। জীবন নেহাৎ বহিতে হয়—না বহিলে নয় ; তাই বহিয়া চলিয়াছে ! মানুষের কণ্ঠে ভগবান ভাষা দিয়াছেন—সে-ভাষা এ বাড়ীতে শুধু আদেশ-কর্ত্তব্য সারিয়াই নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। সে-ভাষা যে প্রীতি-দরদের ধারায় জীবনকে সরস, সুমধুর করিয়া তুলিতে পারে, এ লোকটির কথায় আজ তাহা সে প্রথম বুঝিল।

নীপুর কথার উত্তরে কণিকা কহিল—এখন আর বসবো না। কাজ আছে। সাধুকে ডেকে পাঠিয়েচি।···চা··· হবে তো ?

হাসিয়া নীপু কহিল—এ যে third personএ কথা হলো বৌদি !··কার জন্যে চা—কে এ-কথার জবাব দেবে, —তার কিছু বোঝা গেল না যে।

কণিকার মুখ আবার রাঙা হইয়া উঠিল। সে কোনো কথা বলিতে পারিল না।

নীপু বলিল—আমি চা খাবো না, বৌদি। স্নান করে একেবারে দুটী ঝোল-ভাত খাবো। এই ঝোল-ভাতের স্বপ্ন বুকে বয়ে আজ আমার সুপ্রভাত হয়েচে।

কণিকা কহিল—তাহলে নেয়ে নিন···আমি সেই ব্যবস্থা করি···

কথাটা বলিয়া কণিকা সে-ঘর হইতে চলিয়া গেল।

রাধাবিনোদ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; নীপু তার দিকে চাহিয়া কহিল—তুমি বসবে না ?

রাধাবিনোদ কহিল—এখানে আর বসে কি করবো ! এসো, স্নানের উদ্যোগ করবে।···দেখলে তো, stern daughter !

নীপু কহিল,—চুপ ! একটুতে আমি যে-পরিচয় পেলুম—চমৎকার ! তবে একটু কঠিন···সেটার জন্য দায়ী তুমি !

—আমি ?

—তাই ! রাধদা, তুমি হয়তো অবাক হবে—কিন্তু মেয়েদের psychology তোমার চেয়ে আমি ঢের ভালো বুঝি···

হাসিয়া রাধাবিনোদ কহিল—কেন না, জীবনে মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই—তাই ?

নীপু কহিল—অভিজ্ঞতার অভাব কোন্‌খানটায়—শুনি ? বাবার হাতে মায়ের লাঞ্ছনা—আমি জীবনে ভুলবো না, রাধদা ! He sought pleasures elsewhere···আমার দুঃখিনী মা আমাকে আর নীরুকে নিয়েই জীবন সার্থক করেছিলেন ! তাঁর সমস্ত জগৎ আমাদের দুটি ভাইবোনকে নিয়ে centred ছিল, enveloped ছিল। বাবা মারা যেতে মা শোক পেয়েছিলেন, সত্যি ! কিন্তু আমি বেশ বুঝতুম, মার বৈধব্য ঘটেছিল বহুকাল পূর্ব্বে—বাবা বেঁচে থাকতেই ! বাবার বদখেয়ালি যাতে আমায় না কখনো পায়—এই ছিল তাঁর প্রাণের প্রার্থনা ! লোক-নিন্দা তিনি সহ্য করেচেন শুধু আমাদের মুখ চেয়ে !

রাধাবিনোদ কহিল—যাক্—গুরুজনদের ও-সব কথা তুলে মিছে আর মন খারাপ করো কেন !

নিশ্বাস ফেলিয়া নীপু কহিল—বৌদিকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, ওঁর মধ্যে এই তরুণ বয়সে যে-কিশোরী স্বামীর বাহু-বন্ধন, সোহাগ-বচন, হাসি-খেলার জন্য কাঙাল হয়, সে-কিশোরীকে মন থেকে উনি নির্ব্বাসিত করে দেছেন ! তাকে মেরে ফেলেচেন ! তার বিয়োগ-বেদনা ভোলবার জন্যই এই বয়সে প্রৌঢ়া গৃহিণী সেজে তোমার সংসার-তরণীর হাল

ধরে বসেচেন ! তুমি ওঁর কাছে আজ স্বামী নও—সংসারের একজন অসহায় পোষ্য !···এ যে কত বড় ট্রাজেডি, আমি আমার মায়ের কথা মনে করে মর্ম্মে-মর্ম্মে তা বুঝচি।··· ···তুমি বিশ্বাস করবে রাধদা—এই সব অভিজ্ঞতা আছে বলেই নারীকে আমি বড় করুণার চোখে দেখি ? ওরা বড় অসহায়—বড় বেচারী। নিজেদের দুঃখ নীরবে সহ্য করে—অপরকে ব্যথিত করতে চায় না—অপরের কৃপাও এরা সহ্য করতে পারে না। এই জন্যই বিবাহে আমার ভয় হয়। কাজের মত্ততায় স্ত্রীকে যদি অবহেলা করি, উপেক্ষা করি···

রাধাবিনোদ হাসিল, হাসিয়া কহিল—ব্যাঙ্কিং ছেড়ে তুমি কবিতা লেখো, নীপু···

নীপু কহিল—লিখতুম এক-কালে ! কিন্তু তাতে পেট চলবে না বুঝেই পাশ করে এ চাকরি নিতে হয়েচে !

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

স্ফুলিঙ্গ

পাঁচ-সাত দিনে নৃপেশ স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক বুঝিয়া ফেলিল। বুঝিল, কণিকার মন কোমল হইলেও সে-মনে তেজ আছে। কাহারো করুণা বা কৃপা ভিক্ষা করিবে, এমন উপাদানে কণিকার মন গঠিত নয়! অথচ রাধাবিনোদ কেবলি ভাবিতেছে, এ কাঠিন্যের হেতু—কণিকার পয়সার দর্প! তার দুঃখ হইল। এমন ভুলে কণিকার জীবনটা নিঃসঙ্গ তপশ্চর্য্যায় কাটিবে !

রাধাবিনোদের কাছে একদিন সে বলিল—বিবাহ যখন হয়েচে, তখন দুজনে দু'ঘরে শোবে—এ কি কথা ! দাসী-চাকরেরা কি ভাবে, বলো তো ? তার একটা indignity...

রাধাবিনোদ কহিল—জীবনে অনেক পাপ করেচি নীপু, কিন্তু মনের সঙ্গে ছলনা করে ভণ্ডামি করেচি, এ অপবাদ আমার নামে কেউ দিতে পারবে না। Even those women...তারাও বেশ জান্‌তো, আমি তাদের ভালোবাসিনি—এক মুহূর্ত্তের জন্য নয় ! তাদের দাম দিয়েচি শুধু ভোগ-সুখের জন্য।

নীপু কহিল—চুপ করো !···তোমার এই baser passionsএর কথা যখন তুলচো, তখন বলতে হলো··· মানুষের দেহে-মনে ক্ষুধা জাগে—এ-কথা মানো ?

রাধাবিনোদ কহিল,—মানি।

নীপু কহিল—তবে ?···this poor girl··

রাধাবিনোদ কহিল—মানুষ যা চায়, সব সময়ে কি তা পায় !

নীপু কহিল—কিন্তু ওঁর অপরাধ ? যার জন্য উনি স্বামীর পাশে থেকেও স্বামীকে পাবেন না ?

রাধাবিনোদ কহিল—স্বামীকে উনি কখনো চেয়েছেন ?

নীপু কহিলেন,—You are a brute...

কথাটা এখানে থামিলেও নীপুর মনে জাগিয়া রহিল। সকালের দিকে দোতলার দালানে দাসীকে লইয়া কণিকা কলাই শুঁটির কচুরি ভাজিতেছিল। নীপু আসিয়া ডাকিল,—বৌদি···

কণিকা কহিল—এসো ঠাকুরপো···

দুজনে এ কয়দিনে অন্তরঙ্গতা হইয়াছে। 'আপনি' বলা ঘুচিয়াছে—নীপুর তাড়নায়।

নীপু মেঝেয় বসিয়া পড়িল। দাসীকে কণিকা বলিল—বাবুকে একখানা আসন পেতে দে, রাণুর মা···

রাণুর মা আসন আনিল। নীপু কহিল—আবার আসন ! তাহলে এখনি খাবার বাসনা জাগ্রত হয়ে উঠবে, বৌদি···

হাসিয়া কণিকা কহিল—জাগ্রত হলেই বা তোমায় এ জিনিষ কে খেতে দিচ্ছে !

নীপু কহিল,—আমায় খেতে দেবে না ?

কণিকা কহিল,—না। তোমার জন্যে আজ খুব ভালো করে কুমড়োর বরফি তৈরী করেচি !

নীপু কহিল,—দেবী অন্নপূর্ণেশ্বরী !...আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় বৌদি, এ বয়সে এত জিনিষ শিখেচো—শেখোনি শুধু একটি জিনিষ···

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি লইয়া কণিকা নীপুর পানে চাহিল ; কহিল,—কি ? শুনি···

নীপু কহিল,—বলবো'খন···অন্তরালে ···

কণিকা বুঝিল। আরো দু'দিন নীপু তার কাছে নালিশ জানাইয়াছে স্বামীর বিরুদ্ধে ! বলিয়াছে, তুমি কিছু বলতে পারো না বৌদি—রাধদা এক-গাদা বন্ধু নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে গেল—তোমায় নিয়ে যায় না কেন ?

সে অভিযোগের উত্তরে হাসিয়া কণিকা বলিয়াছিল—আমার ভালো লাগে না!

আর একদিন···ষ্টীমার-পার্টি। তার ব্যয় রাধাবিনোদ বহন করিয়াছিল। সে পার্টি নীপুর সম্মানে—অথচ কণিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে রাধাবিনোদ বলিয়াছিল,—ক্ষেপেচো! ওঁকে নিয়ে কোথায় যাবো? আমোদ হবে না! এ কথায় নীপু ষ্টীমারে যায় নাই। রাধাবিনোদ গিয়াছিল বন্ধুদের লইয়া। কণিকার কাছে সে কথা তুলিয়া নীপু অনুযোগ জানাইয়াছিল,—তোমার সব আচরণ ভালো দেখি বৌদি, কিন্তু রাধদাকে তুমি এ-সব ব্যাপারে উপেক্ষা দেখাও কেন, বল্‌তে পারো? কেন ও তোমায় ছেড়ে আমোদ-আহ্লাদ করে? এ সুযোগ কেন তুমি ওকে দাও?

এ প্রশ্নের জবাবে কণিকা বলিয়াছিল,—কখন্‌ যাবো, বলতে পারো? সংসারে আর পাঁচজন যাঁরা আছেন, আমাকেই তাঁদের দেখতে হবে, ঠাকুরপো!

রাগ করিয়া নীপু বলিয়াছিল,—আর যাঁরা আছেন, তাঁরা মানুষ! না, তেকাঁটা মনসার জঙ্গল! শুধু গায়ে বিঁধে জ্বালা দেন! কণিকা বলিয়াছিল—ছি, ও কথা বলতে নেই! গুরুজন!

নীপু জবাব দিয়াছিল—মাপ করো বৌদি—এ সব গুরু না গরুর পাল আমার বাড়ীতেও ছিল। দেখেচি—আমার বেচারী মা তাদের গুঁতুনিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে জীবন কাটিয়েচেন!

আজো বোধ হয় এমনি কোনো নালিশ—কণিকা বুঝিল।

নীপু কহিল,—এ সব খাবার তৈরী করতে শিখলে কবে, বৌদি? এদিকে তো শুনেচি মা-মরা মেয়ে!

কণিকা কহিল—মা-মরা বলে বাবা চিরকাল মাথায় করে রেখেচে! যখন যে সাধ হয়েচে,—বাবার কাছে বল্‌তেই তা পূরণ করেচে!

নীপু কহিল,—পয়সা থাকার সার্থকতা এইখানে!··· তা, এই যে কচুরি তৈরী করচো—এ তো রাধদার জন্যে? রাধদা কচুরি ভালোবাসে খুব—না?

কণিকা কহিল,—তা জানি না। পরশু বাইরের ঘর থেকে ফরমাস এলো বামুনদির কাছে—কচুরি ভেজে পাঠাও! বামুনদি ভেজে দিলে—পড়তে পেলে না। তাই আজ আবার আসর বসেচে দেখে আমি আগে থেকেই ভাজচি! সেদিন বামুনদি যা ভেজেছিল—দেখেচি তো খেয়ে—অখাদ্যি! ভদ্দর লোকের পাতে দেওয়া চলে না!

নীপু কহিল,—সাধে কবি বলেচেন, রহস্যময়ী নারী!

কণিকা কহিল,—হঠাৎ কবিকে স্মরণ করচো যে···

নীপু কহিল,—এই দেখি, দু'জনে কুরু-পাণ্ডব! আবার যত্ন করে খাবার তৈরী করে দেওয়াও চাই! এ প্রশ্রয় নাই দিতে! এর জন্যই তো রাধদাকে হৃদয়-বন্দরে ভেড়াতে পারচো না! ওর আস্কারা বাড়চে।

কণিকা কহিল,—তাতে আমার কোনো লাভ-ক্ষতি নেই, ভাই!

নীপু দাসীর পানে চাহিল, কহিল,—ও বাপু রাণুর মা, জানো কি, আমার কুমড়োর বরফী কোথায় আছে? তা'হলে আনো তো, বাছা! আমার ক্ষিদে পেয়ে গেল—এই কচুরির গন্ধে।

হাসিয়া রাণুর মার পানে চাহিয়া কণিকা কহিল,—নীচে খাবার ঘরে যে আলমারি, তার মধ্যে এনামেলের পাত্রে আছে কুমড়োর বরফী—নিয়ে আয় ঠাকুরপোর জন্যে···

রাণুর মা আদেশ পাইয়া নীচের তলায় গেল।

কণিকা তখন কড়া হইতে কতকগুলা কচুরি প্লেটে লইয়া নীপুর পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—হ্যাঁ, কি বলছিলে তোমার বোঝাপড়ার কথা···বলো···

নীপু কহিল,—বলছিলুম, এত বিদ্যা শিখেচো—শেখোনি কেবল দুরন্ত স্বামীকে বশীভূত করতে!

কণিকা কোনো কথা না বলিয়া উদাস নয়ন মেলিয়া নীপুর পানে চাহিয়া রহিল।

নীপু কহিল,—বলো···

ছোট একটা নিশ্বাস। সে নিশ্বাস চাপিয়া কণিকা মৃদু হাস্যে কহিল,—স্বামীকে বশ করতে হয়—এ কথা কেউ আমায় বলে দ্যায় নি। তা ছাড়া···

নীপু কহিল,—তা ছাড়া···কি?

কণিকা কহিল,—সে তুমি বুঝবে না, ঠাকুরপো···! তুমি মেয়েমানুষ নও...তাছাড়া কেন যে আমার সে লোভ নেই···অনেক মেয়েমানুষও বোধ হয় তা বুঝবে না! বিয়ে হয়েচে···বিয়ে হলে নাকি মস্ত পরিবর্তন হয়! আমার ভাগ্যে আমি তা বুঝতে পারলুম না কোনো দিন! স্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো···উনি বললেন,—তুমি বড়

লোকের মেয়ে ! আমার বাবার পয়সা আছে—মানি ! ওঁকে এ বিয়ে করতে গুরুপদ-কাকা আর বাবা সেধেছিলেন—তাও জানি ! কিন্তু এ-মহত্ত্ব না দেখালেই পারতেন। ওঁর সঙ্গে বিয়ে না হলে আর কারো সঙ্গে বিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার বাবার ছিল—আমাকেও দেখে পছন্দ করবে অন্য পাত্র—এমন যোগ্যতার আমার অভাব ঘটে নি, সত্যি। এ মহত্ত্বের দর্প উনি কি বলে করেন, আমি তাই শুধু ভাবি।

নীপু বুঝিল, দু'জনের মধ্যে ব্যবধান কি দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

স্বামি-স্ত্রী—চিরদিনের সে সংস্কার মাথা তুলিবে, এ-কালের শিক্ষায় তার আজ সে শক্তি নাই !

তবু সে বলিল—কিন্তু স্বামী, বৌদি ! পুরুষ-মানুষ মনে করলে দুট দশটা বিয়ে করতে পারে। স্ত্রীর ঐ স্বামীই সব !

কণিকা কহিল—ভুল ! আমার তো একদিনের জন্য তা মনে হয় না। স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীকার না করে, তবু স্ত্রী তার পায়ে মাথা লুটিয়ে পড়ে থাকবে ! কেন ? তার নিজের মান নেই ? মর্য্যাদা নেই ? আর-যে-কোনো স্ত্রী এমন মাথা লুটিয়ে স্বামীর মন নিতে চায়, নিক্—আমি সে হীনতা কখনো স্বীকার করবো না। স্বামী বলে ওঁর যেমন সম্মান আছে, মর্য্যাদা আছে—স্ত্রী বলে আমারো তেমনি সম্মান আছে, মর্য্যাদা আছে! এজন্য তোমরা আমায় যদি ঘৃণাও করো—নাচার !

কথাগুলায় কি তেজ! নীপু শুনিল। শুনিয়া শুধু বলিল—হুঁ…

কণিকা ষ্টোভে কড়া চাপাইয়া দিল, দিয়া কহিল—তা ছাড়া আমার দুঃখ কি? কোনো দুঃখ নেই। অনেকের স্বামী যে বদখেয়ালি করে বেড়ায়—স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও কখনো হয় না। তাদেরো দিন কাটে। স্বামী যদি কালা হয় ? বোবা হয় ? অন্ধ হয় ?…সুখ-দুঃখ মানুষের মনে। সত্যি ঠাকুরপো—আমি একটি কথা বাড়িয়ে বলিনি !

নীপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কোনো কথা বলিল না।

কণিকা কহিল—কি ভাবচো আমার মুখের দিকে চেয়ে?

নীপু কহিল—ভাবচি, তুমি দেবী…না…

কণিকা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—শয়তানী ?

নীপু কহিল—না, না—শয়তানী কি ! দেবী ? না—মানবী—এই কথা বলতে যাচ্ছিলুম !

কণিকা কহিল—এ-সব কথা নিয়ে ভাবনা করো না। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারুক—তার পর বিয়ে করে বোম্বাইয়ে ফিরো …নিজের ভাগ্য যেমনই হোক—একটি ভালো মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েচে দেখলে সত্যি আমি ভারী খুশী হবো !

নীপু কহিল—বিয়ে !

কণিকা কহিল—হ্যাঁ।

নীপু কহিল—কিন্তু সে কি সম্ভব ? তুমি তো তোমার বাবার একটিমাত্র কন্যা…

কণিকা হাসিয়া বলিল—আমার সঙ্গে কি ! আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে…

কথাটা বলিতে বলিতে বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সমস্ত রক্ত মাথার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া, মুখে-চোখে রাঙা আভাস্…

নীপু কহিল—তোমার সঙ্গে নয়! তাই বলচি কি আমি? তোমার যদি বোন থাকতো, তাহলে এই দণ্ডে তাকে বিবাহ করে ধন্য হতুম, বৌদি। তোমায় কি শ্রদ্ধা করি …সত্যি…

বলিতে বলিতে আবেগ-ভরে নীপু সেইখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, করিয়া কহিল—চরণ দুখানি একবার বার করো তো…সত্যি, আজ তোমার কথা শুনে শ্রদ্ধা কতখানি বেড়ে উঠলো…! অন্তঃপুরে এত বড় শুদ্ধ-চিত্তা ব্রতচারিণী…

সে কণিকার পায়ে হাত দিবার জন্য হাত বাড়াইল; লজ্জায় কুণ্ঠায় জড়সড় হইয়া কণিকা দুই পা হাত দিয়া চাপা দিল। নীপু ছাড়িল না; দুই হাতে কণিকার হাতের আড়াল সরাইয়া সে তার পায়ের তলায় হাত দিল…কণিকা উবু হইয়া বসিয়াছিল…প্রায় পড়িয়া যাইবার মত অবস্থা…

আনন্দ-বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে কণিকা বলিতেছিল,—কি করো ঠাকুরপো ! আঃ ! না ভাই…তুমি ভারী দুষ্টু…

নীপু তার সামনে মাটীতে বসিয়া মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে দুই হাত বুলাইয়া বলিতেছিল—দেহ-মনের অস্বাস্থ্য এ ধুলোয় সেরে যাবে বৌদি…সত্যি !

ঠিক এই সময়ে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল রাধাবিনোদ। রাধাবিনোদ কহিল—কি হচ্ছে তোমাদের ?

নীপু কহিল—বৌদি কচুরি তৈরী করচে—বসে বসে দেখচি…

রাধাবিনোদের মুখ গম্ভীর। সে বলিল—কেড়ে খাচ্ছিলে বুঝি ! তাই এ যুদ্ধ…

তার চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ! কণিকা তাহা লক্ষ্য করিল।

সুদৃঢ় কণ্ঠে কণিকা কহিল—বলো না, কিসের যুদ্ধ!··· পায়ের ধুলোর জন্যে অস্থির···আমি দেবো না!—তুমিও ছাড়বে না···

হাসিয়া নীপু কহিল—তাই! ছ্যাখো না রাধদা, বৌদির পায়ের ধুলো চাইলুম, কিছুতে দেবে না। শেষে জোর করতে হলো। বৌদি পারবে কেন আমার সঙ্গে?···

রাধাবিনোদ কাঠ! সে মূর্ত্তি দেখিয়া নীপুর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। হঠাৎ রাধদা এমন গম্ভীর যে!

রাণুর মা আসিল। কণিকা কহিল—এসেচিস! ঐ যে বরফি এনেচিস! বেশ হয়েচে.. দে। নাও ঠাকুরপো, তোমার খাবার এসেচে, খাও। গম্ভীর ভাইকে দেখে তোমাকে আর গম্ভীর হয়ে বসতে হবে না। অত ভ্রাতৃ-ভক্তি ভালো নয়! [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

অগ্রহায়ণ

গ্রীষ্ম সম ভীষ্ম নহ, নহ শরতের সম শস্য-শষ্পশ্যাম,
নহে বসন্তের মত কুসুমিত কমকান্তি নয়নাভিরাম;
আষাঢ়ের কলকথা, শ্রাবণের চঞ্চলতা, ভাদ্র সম রুদ্রভাব নাই,
নাহি সদা সঙ্কুচিত শীতার্ত্ত শিশির সম কুজ্ঝটিকা গায়;
ললাটে তোমার রাজে সমাহিত সাধকের শান্তি অপার্থিব,
পরম সুন্দর নহ, হে যোগি, তোমাতে ব্যক্ত শান্ত-সত্য-শিব!
ব্যাপ্ত তব বক্ষ জুড়ি স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি এক দিগন্ত-বিলীন!
মেঘ-মুক্ত নভস্তলে বিছাইয়া বস্ত্রাঞ্চল তুমি ধ্যানাসীন!
সুস্নিগ্ধ সুষমা তব নহে চিত্তোন্মাদকর—চিত্তরসায়ন!
সমাধিসাগরমগ্ন যোগিবর হে অগ্রহায়ণ!

প্রবাহিণী স্বচ্ছতোয়া—নাহি বর্ষা-শরতের উদ্দাম-উচ্ছ্বাস!
সাধকের হিয়া সম অনাবিল বক্ষে তার বিম্বিত আকাশ!
বরষা রচিয়াছিল মেঘমন্দ্রে ধারা-নীরে যে সৌন্দর্য্য-নীড়,
তুমি তার অচঞ্চল পুণ্যোজ্জ্বল পরিণতি প্রশান্ত-গম্ভীর!
নৃত্যপরা নদী যথা নীরেন্দ্র-হৃদয়ে পশি নীরব-নিথর,
শরতের শ্যামলিমা তেমনি পরশে তব সুবর্ণ-সাগর!
ধরিত্রীর যে অঞ্চল মন্দ-মন্দ আন্দোলিত হ'ত বায়ুভরে
তন্দ্রাবেশে যেন তাহা প'ড়ে আছে বিলুণ্ঠিয়া দিগ্-দিগন্তরে!
প্রশান্ত প্রান্তরে বসি এ কি মায়া-স্বর্ণ-জাল করিছ বয়ন,
মায়ামন্ত্র-বিশারদ যাদুকর হে অগ্রহায়ণ!

এক দিন তুমি ছিলে বরষের অগ্রদূত—সর্ব্বমাসাগ্রণী,
নাম তব বহিতেছে সেই দূর-অতীতের কথা পুরাতনী!
তখন আসিলে তুমি বাজিত মঙ্গল-শঙ্খ পুরনারী-করে,
বর্ষ আবাহন-গীতি ধ্বনিত মধুর মন্দ্রে প্রতি ঘরে ঘরে!
প্রতি পণ্যগৃহে হ'ত পুণ্যাহের অনুষ্ঠান তব পদার্পণে!
সুরভিত হোমধূম উঠিত অম্বর ভেদি বেদ-মন্ত্র সনে!
সে আনন্দময়ী স্মৃতি ঝঙ্কারিয়া তোলে আজি মম চিত্তবীণ,
কে যেন করুণ তানে কহে মোর কাণে কাণে—"ওরে পরাধীন,
জেগে ওঠ, তীব্র তেজে ত্যজি এ আলস্যভরা বিলাস-শয়ন!"
অতীত গৌরব-স্মৃতি-উদ্বোধক হে অগ্রহায়ণ!

না থাকুক অঙ্গে তব শরতের—বসন্তের সম্মোহন সাজ
অন্নগতপ্রাণ মোরা, আমাদের মুগ্ধ চোখে তুমি শ্রেষ্ঠ আজ।
পক্ব শস্য গন্ধ বহি বহে শান্ত ক্লান্ত তনু মরুত মন্থর,
ধরণীর অপরূপ কাঞ্চন-অঞ্চল হেরি হাসে নীলাম্বর!
সেই অঞ্চলেরে চুমি বহে নিরঞ্জনা নদী মৃদু কলতানে,
সমগ্র প্রকৃতি যেন চকিত হয়েছে কার বাঁশরীর গানে!
ব্যাপিয়া অম্বর-ধরা এ কি শুদ্ধ সুগম্ভীর সঙ্গীতের সুর!
কখনো আনন্দময়, কখনো করুণ অতি বিরহ-বিধুর!
নির্ম্মেঘ নির্ম্মল নভঃ নীলমণি-নিভ-কান্তি যেন নারায়ণ!
একি দিব্য দৃশ্য তুমি প্রকটিলে হে অগ্রহায়ণ!

দম্ভ-অভিমান-শূন্য পরার্থে অর্পিতপ্রাণ মহাত্মার মত
দিগন্ত চুম্বিত মাঠে বিলুণ্ঠিত শস্যশীর্ষ ধান্যভারনত!
কি প্রাণতর্পণ চিত্র প্রকাশিত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কান্ত রবিকরে,
বুলাইয়া দেয় যেন স্বপ্নময় স্পর্শ কেহ আমার অন্তরে!
দেখে মনে হয় মোর আবির্ভূতা মর্ত্ত্যলোকে লক্ষ্মী হেমাঙ্গিনী,
ব্যাপ্ত হ'ল সারা বঙ্গে যেন তাঁর বর্ণ-বিভা স্বর্ণ-তরঙ্গিণী!
উদ্ভাসিছ বঙ্গগৃহ নব-অন্ন-উৎসবের পুণ্য-দীপ জ্বালি,
অন্নপূর্ণারূপে তুমি দিতেছ নিরন্ন নরে পরমান্ন থালি!
দীন-দুর্ব্বলের লাগি আনিয়াছ প্রাণপ্রদ একি উপায়ন!
করুণাশ্রুসিক্ত-চক্ষু আর্ত্ত বন্ধু হে অগ্রহায়ণ!

প্রসারি গৈরিক বাস উদার প্রান্তরে বসি ওগো উদাসীন!
সুন্দর দিগন্ত-বুকে কাহারে দেখিতে চাহ তুমি রাত্রিদিন?
দিনান্তের ক্লান্ত রক্ত-রবি ঢ'লে পড়ে অস্তাচলে, নামে অন্ধকার,
অনন্ত অম্বর ভরি বেজে ওঠে মন্দ্র যেন কার বন্দনার!
নির্ব্বাক্ হইয়া তুমি ব'সে আছ কার লাগি—বিরাগী বাউল?
হেমন্তের শান্ত নদী বয়ে যায় পদতলে—কুল্ কুল্ কুল্!
বিশ্বের কল্যাণ লাগি নিঃশেষে সঁপিয়া সব স্বর্ণ শস্যরাজি
অনাসক্ত ভক্ত ওগো, কর কার অন্বেষণ নিজে নিঃস্ব সাজি?
কি এক অব্যক্ত ব্যথা করে অশ্রু-অভিষিক্ত আমার নয়ন
চাহিয়া তোমার পানে ভিক্ষুরাজ হে অগ্রহায়ণ!

শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া
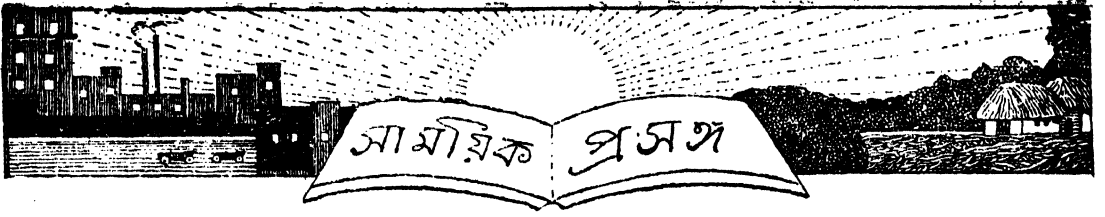
এত দিন যাহার জন্য লোক আশা করিয়াছিল, সেই জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট যথাসময়ে এই ভারতভূমিতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ইহা পড়িয়া যতটুকু বুঝা গেল, তাহাতে মনে হইল, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার এমন দৃষ্টান্ত আর পৃথিবীতে কেহ কখনই দেখে নাই - দেখিবে কি না, তাহাও বলা যায় না। প্রভাতকালীন মেঘাড়ম্বরের সহিতও ইহার তুলনা হইতে পারে না। এই ব্যাপারে শাসক সম্প্রদায় এই দরিদ্র ভারতের অর্থ লইয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এই রিপোর্ট পড়িয়া মনে হইয়াছে যে, ইহাই যদি শাসকদিগের মনে ছিল, তাহা হইলে এত পয়সা খরচ করিয়া তিন তিনবার গোল টেবিল বৈঠক বসাইবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? এই মন্দার বাজারে করভারে ক্লান্ত ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়া সেই অর্থ এরূপভাবে অপব্যয় করিবার কোন আবশ্যকতাই ছিল না। এমন অপদার্থ রিপোর্ট ত কেহ কখনও দেখিবেন বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ইহার সহিত তুলনায় সরকারের শ্বেতপত্র ম্লান হইয়া যায়। সাইমন কমিশনের রিপোর্টকেও ভাল বলিতে ইচ্ছা হয়। ইহাকে শাসন-সংস্কার-চেষ্টা বলিলে যেন একটা বিজিত জাতির সহিত পরিহাস করা হয়। ভারতবাসী শাসকদিগের নিকট হইতে তাহাদের আপনাদের দেশের শাসন করিবার কতকটা ভার আপনাদের হাতে লইবার জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাদের অদৃষ্টের এমনই নির্ম্মম উপহাস যে, "যা ছিল রয়ে ব'সে, তাও ঘুচাল বৈদ্য এসে।" ভারতে ইংরাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর হস্তে যেটুকু অধিকার ছিল, তাহা এই জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটী আসিয়া ঘুচাইয়া দিল। দৃষ্টান্ত ইহার পদে পদে। ভারতবাসীরা বরাবরই বিচার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগকে পৃথক্ রাখিবার দাবী করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে দাবী কি ভাবে পূর্ণ করা হইল? নিম্নতন বিচার বিভাগের কথা ছাড়িয়া দাও—যে হাইকোর্ট সিভিলিয়ানী প্রভাব হইতে কতকটা মুক্ত, যে হাইকোর্ট সম্রাটের খাস মহল বলিয়া সম্মানিত, তাহাতে অতঃপর সিভিলিয়ানী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, সিভিলিয়ানী ভৈরবীচক্র চালিত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অঙ্গুষ্ঠ-তলে উহাকে সন্নিবিষ্ট করা হইবে। আমরা অবশ্য সিভিলিয়ান-দিগকে কোনরূপ নিন্দা করিতেছি না। তাঁহারা বেশ বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয়ই মানুষের স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কখনই পরিহার করিতে পারেন না। তাঁহারা মানুষ, অতিমানুষ (Superman) নহেন। সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্র শাসন বিভাগের আমলারা যেরূপ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন, লোকের উপর শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া যেরূপ জঙ্গীভাব এবং সমালোচনা-অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন, তাহা ত তাঁহারা কিছুতেই পরিহার করিতে পারেন না। কার্য্য-ক্ষেত্রে যাঁহাদের ঐরূপ মনোবৃত্তি গজাইয়া উঠে, তাঁহাদের মনোবৃত্তি কস্মিন্‌কালেও নিরপেক্ষভাবে বিচার বিতরণের উপযোগী হইতে পারে না। শাসন বিভাগের আমলারা প্রায় জ্ঞানদর্পী এবং "হামবড়া" হইয়া থাকেন। জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা এই কায করিয়া চুল পাকাইয়াছেন, তাঁহারা কি নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার বিতরণ করিতে পারেন? কখনই না। তাঁহারা ক্রমাগতই শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ওয়াল্টার বেজহট (Walter Bagehat) বলিয়াছিলেন যে, A bureaucracy is sure to think that its duty is to augment official power, official business or official numbers rather than leave free the energies of mankind অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের আমলামণ্ডলী এ কথা নিশ্চিতই মনে করিবে যে, আমলাদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি, তাহাদের কার্য্য বৃদ্ধি এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের কায। উঁহারা মানুষের শক্তিকে স্বাধীনভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়াটা উঁহাদের কর্ত্তব্যমধ্যে তেমনভাবে গণ্য করেন না। আমলাতন্ত্রের আমলাদেরও মনোবৃত্তি তাঁহাদের কাযের ভিতর দিয়া যেরূপভাবে গড়িয়া উঠে, শাসন বিভাগের আমলা-দিগের মনোবৃত্তিও তাঁহাদের কাযের ভিতর দিয়া সেইরূপভাবে গড়িয়া উঠিতে বাধ্য। বরং উঁহারা নগদ ক্ষমতা অধিক মাত্রায় পরিচালিত করেন বলিয়া উঁহাদের মনোবৃত্তি শীঘ্রই ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইয়া উঠে। এই প্রকার মনোবৃত্তি কখনই বিচারবুদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না। ইঁহাদিগকে যদি বিচার বিভাগের কর্ত্তা করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সে বিচার কেমন হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটী এক কলমের আঁচড়েই ভারতীয় হাইকোর্টগুলির দফা রফা করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। শাসনকার্য্যে ভারতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদনীতি চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন, দেশে যাঁহারা বুদ্ধিমান ও ত্যাগী সম্প্রদায়, তাঁহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থাই বহাল করিবার পরামর্শ দিলেন। ইহার জন্য এত আড়ম্বর—এত কুর্দ্দন? বলি হারি বিলাতী রাজনীতি!

—

যুক্তির তারিফ

হাইকোর্টে সিভিলিয়ান বিচারক নিযুক্ত করিবার অনুকূলে কমিটী যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, এমন অদ্ভুত যুক্তি আমরা ইতঃপূর্ব্বে কখনই শুনি নাই। যে দেশের শাসন বিভাগের আমলারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী, সে দেশের বিচার বিভাগ বা হাইকোর্ট যদি শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন হয়, তাহা

হইলে জনসাধারণের শাসন বিভাগের কর্মচারীদিগের স্বৈরাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার একটা স্থল থাকে। ইহা সাধারণের আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান। সেই জন্য আমরা প্রথমেই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের কথা বলিতেছি। এ কথা অতি নির্ব্বোধ লোকও বুঝিতে পারে যে, যদি শাসন বিভাগ হইতে হাইকোর্টে বিচারপতি আমদানী করা হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বিচারপতি শাসন বিভাগের আমলাদিগের মনোবৃত্তি লইয়াই হাইকোর্টে আসিবেন। কমিটীর সদস্যগণ সে কথা শুনেন নাই, তাহা নহে। তাঁহারা সে কথা শুনিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ বুঝেন। তাঁহাদের রিপোর্টের ১৯৮ পৃষ্ঠায় তাঁহারা অম্লানবদনে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের নিকট ঐ আপত্তির কথা উপস্থিত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ উক্তি তাঁহাদের মনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, সে বিষয়ে তাঁহারা কোন কথা বলেন নাই—বলা আবশ্যকও মনে করেন নাই। যেখানে যুক্তি নাই, সেখানে ধাপ্পাবাজীই সোজা পথ! জয়েণ্ট কমিটীর সদস্যদিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁহাদের দেশে কি শাসন বিভাগের কর্মচারীদিগকে বিচার বিভাগে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিবেন? কোন্ সভ্যদেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে? তাঁহারা আরও লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মনে এইরূপ প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, সিভিলিয়ানরা বিচারক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা বিচারাসনকে পল্লী-জীবনের জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন, ব্যারিষ্টার এবং উকীলদিগের হয় ত সে জ্ঞানালোকের অভাব থাকিতে পারে। কারণ, তাঁহারা সহর হইতে আসেন। কি চমৎকার যুক্তি! সিভিলিয়ানরা কস্মিন্‌কালেও দেশের লোকের সহিত মিশেন না। তাঁহারা সকলেই জেলার সদরে বা মহকুমা সদরে নিজ নিজ কুঠীতে আপনাদিগকে যেন অন্তরীণ আসামীর মত আবদ্ধ রাখেন,—যখন ভ্রমণে বাহির হন,—তখন মাঠের যে দিকে লোকের বড় একটা গতায়াত নাই, প্রায় সেই দিকেই যান। সেও ত মহকুমা নয় সদর সহর। পক্ষান্তরে, যাঁহারা উকীল ব্যারিষ্টার, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এ দেশী, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে পনর আনা লোক পল্লীগ্রামবাসী। তাঁহারা পল্লীজীবনের সহিত পরিচিত নহেন, পরিচিত হইলেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আগত সিভিলিয়ানরা। কমিটীর সদস্যদিগের যুক্তির বহর দেখিয়া আমাদের একটা পুরাতন কথা মনে পড়িল। একবার এক জন গ্রাম্য পণ্ডিত আর এক জন খুব বিচক্ষণ পণ্ডিতের সহিত সর্ত্ত করিলেন যে, শেষোক্ত পণ্ডিত যদি তাঁহাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার যে কয় বিঘা ব্রহ্মত্র জমী আছে, তাহা তাঁহাকে দান করিবেন। সেই কথা শুনিয়া গ্রাম্য পণ্ডিতের পত্নী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কয় বিঘা জমী যাইলে তাঁহারা খাইবেন কি? তখন গ্রাম্য পণ্ডিতটি তাঁহার পত্নীকে কহিলেন—"অত উতলা হইতেছ কেন? আমি যদি না বুঝি, তাহা হইলে আমাকে বুঝায় কে?" জয়েণ্ট কমিটীর সদস্যগণের মনোবৃত্তি দেখিতেছি অনেকটা সেই রকমের। সিভিলিয়ানরা বিচারাসনে বসিলে যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রথম জীবনে অর্জ্জিত শাসন বিভাগের মনোবৃত্তি লইয়া তথায় বসিবেন,—ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় সত্য হইলেও তাঁহারা যদি তাহা না বুঝেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে কথা বুঝাইবার সাধ্য কাহারও নাই। পরাধীন জাতির পক্ষে ধর্ম্মাধিকরণের স্বাধীনতা এবং ন্যায়নিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। সুতরাং হাইকোর্টগুলিকে শাসন বিভাগের কর্ত্তা প্রাদেশিক কর্ত্তার অধীন করা অথবা সিভিলিয়ানদিগের মধ্য হইতে উহার প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা কোনমতে এ দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। হাইকোর্ট সম্বন্ধে জয়েণ্ট কমিটী যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের মনোবৃত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অধিক কথা বলা অনাবশ্যক।

লোকমত অগ্রাহ্য

পার্লামেণ্টারী জয়েণ্ট কমিটীর সদস্যগণ ভারতীয় লোকমতের প্রতি যে বিশেষ শ্রদ্ধা বা নির্ভরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই মনে হইতেছে না। রিপোর্টখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেও কুত্রাপি তাঁহাদের ঐরূপ মনোবৃত্তির নিদর্শন মিলে না। তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টের প্রথমেই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রতিনিধি (Delegates)-দিগের সহিত অকপটভাবে পূর্ণ-মাত্রায় আলোচনার ফলে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। এই প্রতিনিধিগণ কাহাদের বা কোন্ সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি? ইংরাজী ভাষায় ডেলিগেট শব্দের অর্থ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। যাঁহারা কোনও সমিতির বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সমিতির সদস্যগণের ভোটে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েন, ইংরাজী ভাষায় তাঁহারাই ডেলিগেট নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে ১২টি ভদ্র লোক সম্মিলিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া কমিটীর নিকট পেশ করিয়াছিলেন,—তাঁহারা জনসাধারণের কোন্ সভা-সমিতি অথবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইয়া তাঁহার মত তাঁহাদিগের নিকট পেশ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের কেহ অবগত নহেন। অথচ জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটী ইঁহাদিগকে delegate এই অভিখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা সরকারের পছন্দসই লোক হইতে পারেন, কিন্তু কাহারও প্রতিনিধি নহেন। ইহাকে একাদশটি (কারণ, আগা খাঁ এখন আর ভারতবাসী নহে) ভারতবাসীর মত বলিলেই ঠিক বলা হইত। তাহার পর জিজ্ঞাস্য, ঐ বারো জন যে সম্মিলিত মন্তব্য তাঁহাদের নিকট পেশ করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের কয়টি প্রস্তাব জয়েণ্ট কমিটী গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন? ইঁহারা যখন সরকারের মনঃপূত ব্যক্তি, তখন জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটী ইঁহাদের মন্তব্য এবং প্রস্তাব সমস্তই বা প্রায় সমস্তই অগ্রাহ্য করিলেন কেন? এরূপ অবস্থায় ইঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের জন্য প্রশংসাবাদ কি প্রকারান্তরে উপহাস বলিয়া গণ্য হইবার মত হয় নাই? ইঁহারা যদি জয়েণ্ট কমিটীকে কোন কথাই বুঝাইয়া দিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইঁহাদের সহিত আলোচনার মূল্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। কেহ

যদি গোড়া হইতে কি করিবে তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া থাকে,—তাহা হইলে তাহার সে বিষয়ে কর্ত্তব্য বা সিদ্ধান্তের জন্য পরামর্শ করিবার ভাণ করা কি উপহাস নহে? ভারত সরকারের এই দ্বাদশ সখা তাঁহাদের সম্মিলিত মন্তব্য পত্রে (Joint Memorandum) যাহা নহিলে নহে, সেইরূপ দাবীই করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়েণ্ট কমিটী কি কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের কোন মত গ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহারা সমস্ত প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের কেরদানি দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার সম্পর্কে রক্ষণশীল দল ভারতীয় জনমতকে যত দূর সম্ভব উপেক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা করিয়াছেন। ইহাতে যে কোন ভারতবাসীর মনে দারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে,—ইহাতে বৃটিশ রক্ষণশীল দলের দূরদর্শিতার অত্যন্ত অভাব সূচিত হইয়াছে। লর্ড হালিফাক্স যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা যদি বুঝিতে পারে যে, ভারতবাসীরা ইংরাজদিগের তুল্য অংশীদার, তাহা হইলে এই হাঙ্গামার অর্দ্ধেক মিটিয়া যায়। তাঁহার ঐ কথাটুকু খুবই সত্য। কিন্তু তাহা এই সকল স্বার্থান্বেষী রক্ষণশীলগণ বুঝেন কই? তাঁহারা ত সাইমন কমিশন নিযুক্ত করিবার সময় হইতে ভারতীয় জনমতকে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন। এবারেও জয়েণ্ট কমিটী তাহা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? জয়েণ্ট কমিটীর সদস্যগণ বেশ জানেন যে, তাঁহারা ভারতবাসীর হস্তে যেরূপ ক্ষমতা দিবার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতের অতি ধীরপন্থীরাও সন্তুষ্ট হইবেন না। পক্ষান্তরে, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ভারতে এক দল লোক আছেন, তাঁহাদের সহিত একমত হইবার আশা সুদূরপরাহত। শেষোক্ত দল কাহারা, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই। ইহারাই যে ভারতের বারো আনা লোক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

একতার পথে কণ্টক

কমিটী সকল দিক্ দিয়াই বৃটিশ ডিপ্লোমেসীর চরম কৌশল প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্টের প্রথম দুই খণ্ড ত অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের ন্যায় অতিকায়। কিন্তু সকল রিপোর্টেই সদস্যগণ যে যে প্রস্তাব করেন, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত সার বা চুম্বক (Summary) দেওয়া থাকে। শ্বেতপত্রেও তাহা ছিল। কিন্তু এখানিতে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কাযেই এই বিশাল রিপোর্টের ভিতর পড়িয়া লোককে হাবুডুবু খাইতে হয়। ইহাঁদের পরামর্শ কি, তাহা সমস্ত রিপোর্ট না পড়িলে জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, জয়েণ্ট কমিটী ভারতবাসীদিগের একতাবুদ্ধি হইবার পথে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিলেন, এই কথা বলিয়া এক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সেই ব্যবস্থামতে প্রত্যেক প্রদেশ স্বায়ত্তশাসন পাউক আর না পাউক, অনেকটা স্বাতন্ত্র্যলাভ করিবে, ফলে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিবে। কিন্তু ঐ সঙ্গে যে ভারতবর্ষের সংহতি রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার কথা ছিল, তাহা বোধ হয় কল্পান্ত পর্য্যন্ত ধামা চাপা দেওয়া রহিল। কবে যে সেই ধামা তোলা হইবে, তাহার কোন নির্দ্দেশই নাই। আশায় মানুষ বাঁচিয়া থাকে। সে আশাটুকুও দেওয়া হয় নাই। ভারতে যাহাতে বিভিন্ন অঞ্চল স্বতন্ত্র ও পৃথক থাকে, তাহার জন্যই ভারতে বিভিন্ন প্রদেশগুলি গঠিত করা হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারী কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময় মেজর জি উইংগেট (G. Wingate) প্রভৃতি সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কেন্দ্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে উদ্দেশ্য ভালভাবে সিদ্ধ হয় নাই; কতকটা সিদ্ধ হইয়াছে। এবারকার পার্লামেণ্টারী জয়েণ্ট কমিটী তাঁহাদের পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার ফলে সেই প্রাদেশিকতার বৃত্তি বা বেড়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিবার ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু উহার মধ্যে যেটুকু একতাসাধনের সম্ভাব্যতা সৃষ্টির কথা ছিল, তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। মেজর এটলি তাঁহার Draft রিপোর্টে এ বিষয়টি বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ রামেশ্বর যাহাই বলুন না কেন, সত্যপীর তাহা শুনিবেনই না। ভারতের অনুকূলে যিনি যাহা বলিবেন, সে কথা যাহাতে তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, কমিটী সে জন্য কাণে তূলা গুঁজিয়া বসিয়াছিলেন। কোন কথাই কাণে তুলেন নাই। বলি হারি যাই রাজনীতি!

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠনের অবশ্যম্ভাবী ফল যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য এবং বিবাদ, এ কথা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে যে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সাইমন কমিশনও তাহা অস্বীকার করিতে সমর্থ হন নাই। এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ফলে হিন্দু-মুসলমানে যে কি প্রকার বৈরীভাব বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়াই যেন কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দুদিগের মধ্যে উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত করিবার ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সাইমন কমিশনের নিকট কোন অস্পৃশ্য বা নিম্নবর্ণের হিন্দু স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন করিবার জন্য বিশেষভাবে দাবী করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। কেবল ডাক্তার আম্বেদকর নামক জনৈক ব্যক্তি নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের মুখপাত্র সাজিয়া এইরূপ ভাবের একটা দাবী উপস্থিত করেন। সকল প্রদেশের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা প্রদেশের—নিম্নবর্ণের বা অস্পৃশ্য হিন্দু জাতিরা যে তাহা সমর্থন করিয়াছেন, এমন কথা আমরা শুনি নাই। কিন্তু সেই অছিলা ধরিয়া সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া পরিজ্ঞাত মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এবার শাসন সংস্কারে হিন্দু সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যারবেদা জেলে আবদ্ধ অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী তখন বুঝিলেন যে, ইহার ফলে হিন্দু সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে। সম্ভবতঃ তিনি সেই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত উপায়

অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে বা ব্যর্থ হইল। সেই জন্ত তিনি তখন হরিজন উদ্ধারে মনোনিবেশ করিয়া এক জন অদ্বিতীয় সমাজ-সংস্কারক হিসাবে খ্যাতি লাভ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প এবং তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করেন। নতুবা তাঁহার জন্মকাল হইতে ঐ সময় পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই অস্পৃশ্যতা ছিল,—কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি মধ্যে মধ্যে বাক্যে ভিন্ন কার্য্যে কখনই এই বিষয়ে তাঁহার বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ তুলেন নাই। যাহা হউক, নবীন হরিজনসেবক মহাত্মাজী এই সময়ে উপবাস করিয়া অর্থাৎ প্রকারান্তরে হিন্দুদিগের উপর জোর করিয়া—ডাক্তার আম্বেদকরকে সম্মত করাইয়া একটা রফা বন্দোবস্ত করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। সে সম্বন্ধে তিনি বাঙ্গালার কোন রাজনীতি-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে আহ্বান করেন নাই। বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও অধিক ছিল না। এইরূপ অবস্থায় তিনি পুণা প্যাক্ট করিয়া বাঙ্গালার উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের বক্ষে যে শক্তিশেল হানিয়াছেন, তাহা অভাবনীয় এবং অচিন্ত্যপূর্ব্ব। অবিলম্বে সেই সিদ্ধান্ত তারযোগে মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ডের নিকট প্রেরিত হইল। মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড সেই তার পাইয়াই আনন্দে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাহ্য করিয়া লইলেন। বলডুইন, চার্চ্চিল প্রভৃতি অমনই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, যাহা পাইয়াছি, তাহা আর ছাড়িব না। যত দিন ভারতের একটি প্রাণীও ইহার সমর্থন করিবে, তত দিন উহার রদ-বদল হইবে না। ইহার রদ-বদল করিতে হইলে সর্ব্ববাদিসম্মত প্রার্থনা চাই। ইহাতেও মহাত্মাজীর আক্কেল হইল না!

মহাত্মাজী ও পুণা প্যাক্ট

বাঙ্গালার পক্ষে এইরূপ অন্যায় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও মহাত্মাজীর মনে কোনরূপ অনুশোচনা উপস্থিত হয় নাই, বরং যাঁহারা নিরপেক্ষ রাজনৈতিক, তাঁহারা এই ব্যবস্থা যে অন্যায় এবং অসঙ্গত, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মিষ্টার সি এফ এণ্ড্রুজ এই ব্যবস্থা যে অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার পরিবর্ত্তনসাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছেন। সে জন্য তিনি বঙ্গবাসিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। তাহার পর জয়েণ্ট কমিটীর সমক্ষে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব দুই জন শাসনকর্ত্তা মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড (লর্ড রোণাল্ডসে) ও লর্ড লিটন এবং ভূতপূর্ব্ব ভারতের বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ, সার রেজিনাল্ড ক্রাডক প্রভৃতি নয় জন সদস্য এই ঘোর অসঙ্গত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত ও সমর্থন করেন। যাঁহারা এই প্রস্তাব উপস্থাপন এবং সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সিংহাসন লাভ করিয়া বাঙ্গালা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব ভোটে টিকে নাই। ইহার অনুকূলে ৯টি এবং প্রতিকূলে ১৪টি ভোট হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাত্মাজীর বন্ধু লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (ভূতপূর্ব্ব লর্ড আরউইন) এই সংশোধন প্রস্তাবের প্রতিকূলে ভোট দিয়াছিলেন। আর প্রতিকূলে ভোট দিয়াছিলেন লর্ড রেডিং। এই উপলক্ষে লর্ড জেটল্যাণ্ড যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা প্রথম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড রিপোর্টের ৩৩৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩৪৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দর হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, যে সম্প্রদায় বাঙ্গালায় বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রাপ্য ন্যায্য অংশকে এইরূপভাবে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া আমাদের মতে অবিবেকিতাসূচক এবং অসঙ্গত হইবে। লর্ড রেডিং এবং লর্ড হালিফ্যাক্স যে এই প্রস্তাবের প্রতিকূল ভোট দিয়াছেন, তাহার কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। তাঁহারা বাঙ্গালার শাসকদিগের কথা শুনিয়া বাঙ্গালায় অনেক অর্ডিনান্স জারি করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই যখন দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট, তখনই স্বরাজী দল বাঙ্গালার কাউন্সিল অচল করিয়া দিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালায় অহিংস অসহযোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার উচ্চবর্ণের লোকদিগের নেতৃত্বে এইরূপ ঘটিয়াছিল, ইহা তাঁহারা শুনিয়াছিলেন। তাহার উপর বাঙ্গালার বিপ্লববাদীদিগের উৎপাতেও ইঁহারা বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত সমাজের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই বিরক্তির ফলে ইঁহারা মাথা ঠিক রাখিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবও তাঁহাদের এই ভ্রান্তির কারণ। কিন্তু যে মহাত্মাজী এই পুণা চুক্তির 'নাটের গুরু', তিনি তাঁহার ভ্রম এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না কেন, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত। কিন্তু অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মহাত্মাজী পরেও এই বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গবাসীদিগের সহিত পরামর্শ বা আলোচনা করিবার সময় পান নাই। অন্যের বুকে শক্তিশেল হানিয়া এরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ মহাত্মাজীর পক্ষে উপযুক্তই বটে! এখন এই অবস্থায় তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত। মহাত্মাজীর প্রদর্শিত পথে চলিয়াই বাঙ্গালার এই দুর্গতি হইল, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়।

শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা

বৃটিশ জাতি ভারতবাসীদিগকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি প্রদান করিবার কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন। এই দায়িত্বপূর্ণ শাসন (Responsible Government) কাহাকে বলে? যে ক্ষেত্রে দায়িত্ব আছে, অর্থাৎ কৃত কর্ম্মের জন্য জবাবদিহি করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই ক্ষেত্রেই কেবল দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে,—ইহা বলা যাইতে পারে। শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নগদ ক্ষমতা অধিক দিতে হয়। তাঁহারা যদি তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে কাহারও নিকট যদি জবাবদিহি করিতে হয়, তাহা হইলে সেইখানে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সে জবাবদিহি তাঁহাদিগকে কাহার নিকট করিতে হইবে? সে

জবাবদিহি তাঁহাদিগকে করিতে হইবে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের নিকট। যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, সেইখানেই দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যে দেশে শাসকবর্গ জনমতের প্রতি আস্থাবান্,—এবং জনমতের মর্য্যাদা উপলব্ধি করেন,—কেবল সেই দেশেই Responsible government বা দায়িত্বপূর্ণ শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যে দেশের শাসকবর্গ স্বৈরাচারী বা যে দেশ একান্ত পরাধীন, সে দেশে কখনই দায়িত্বপূর্ণ শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এখন দেখা যাউক, বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার প্রস্তাবে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটী ভারতবাসীদিগকে কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ শাসন-যন্ত্র প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের শাসক সম্প্রদায়কে, বিশেষতঃ সিভিলিয়ান চিকিৎসক ও সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা এই কথা বলিয়াছেন যে, আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা কার্য্যে শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে স্বাধীন করিতে হইবে। কারণ, ভারতের ন্যায় দেশে ঐরূপ করাই কর্ত্তব্য। কমিটী সেই জন্য বলিয়াছেন যে—

In the special circumstances of India it is appropriate that this principle of Executive independence should be reinforced in the constitution by the conferment of special powers and responsibilities on the Governor as the head of the provincial Executive." অর্থাৎ ভারতের অবস্থাগত বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করিয়া শাসন-প্রণালীতে শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করাই বিধেয়, সেই জন্য গবর্ণর যখন প্রাদেশিক শাসন বিভাগের নিয়ন্তা, তখন তাঁহারই হস্তে বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান পূর্ব্বক ঐ দিক্‌টা সুদৃঢ় করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং বুঝা গেল যে, এই কমিটী শাসন বিভাগের, বিশেষতঃ সিভিলিয়ানদিগের ও গবর্ণরের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার এবং দায়িত্ব বৃদ্ধি করিবারই পূর্ণমাত্রায় পক্ষপাতী। মন্ত্রীদিগের হস্তে নাম মাত্র ক্ষমতা দিতেই চাহেন। বিপ্লবীদিগকে দমন করিবার জন্য যেটুকু ক্ষমতা প্রধান শাসকের হস্তে দেওয়া আবশ্যক, তাহা দিতে কেহই আপত্তি করিবে না,—কিন্তু তাই বলিয়া মন্ত্রীদিগকে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' করিয়া রাখিয়া গবর্ণরদিগকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার দিলে কোনক্রমেই স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিপত্তন হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা ও অধিকার যেরূপ ভাবে বর্দ্ধিত করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে,—তাহাতে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে বারান্তরে অন্যান্য কথা বলিব।

ভোজসভায় বাঙ্গালার লাট

গত ৩০শে নবেম্বর ১৪ই অগ্রহায়ণ স্কটলণ্ডের পীর সেণ্ট এণ্ডরুজের ভোজের দিন গিয়াছে। ঐ দিন ভারতের সর্ব্বত্রই স্কটলণ্ডের অধিবাসীরা উৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং ভোজনানন্দে নিমগ্ন হন। এদেশপ্রবাসী স্কটদিগের অধিকাংশই ব্যবসায়ী, তাঁহারা তাঁহাদের ভোজসভায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইতে ছোট বড় সকল রাজপুরুষকেই নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। মামুলি প্রথামতে গবর্ণর বাহাদুর এই সভায় দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এবারও কলিকাতার সেণ্ট এণ্ডরুজভোজে বাঙ্গালার অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা সার জন উডহেড বাঙ্গালার রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট, বিপ্লববাদ, বাঙ্গালার বেকার সমস্যা প্রভৃতির কথাও আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে তাঁহার সকল কথার আলোচনা করা সম্ভব নহে। সুতরাং আমরা এখন তাঁহার কয়েকটি কথার উল্লেখমাত্র করিব। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত রিপোর্টখানি প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যত দিন পার্লামেণ্টে উহার আলোচনা হইয়া উহার আকার বদলাইয়া উহা একটা স্থায়ী রূপ ধারণ না করিতেছে, তত দিন ঐ সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলিবেন না। টোরীশাসিত পার্লামেণ্ট উহার কতটা পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নহে। যাহা হউক, তিনি যখন সরকারী আমলা, তখন সরকারী ব্যবস্থার বা প্রস্তাবের সম্বন্ধে তাঁহার কোন কথাই না বলাই ভাল। কারণ, সে মন্তব্যের মূল্য কেহ অধিক মনে করিবে না। কিন্তু তাহার পরই তিনি আবার বলিয়াছেন—"সকলের মনের মত করিয়া সন্তোষজনক শাসন পদ্ধতি গড়িয়া তোলা সম্ভবে না।" অতএব তিনি আশা করেন, "আলোচনা শেষ হইয়া যাইবার পর যাঁহারা ভারতবর্ষের শাসন-রথখানিকে দায়িত্বপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সকলেই যেন ইহার চাকা ঠেলিয়া উহাকে সাফল্যের দিকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করেন।" বাঢ়ম্। কিন্তু রথখানি যেরূপ গুরুভার এবং কদাকার ভাবে রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে অসন্তোষময় কর্দ্দমবহুল পথে চাকা ঠেলিয়া কতদূর লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে, তাহা বলা কঠিন। তাহার পর সার জন উডহেড হিংসাশ্রয়ী বিপ্লববাদীদিগের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সার জন এণ্ডারসনের প্রাণনাশের জন্য চেষ্টার পর বাঙ্গালার জনমত বিপ্লবীদিগের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই উক্তি যে সত্য, আমরা তাহা মনে করি না। বাঙ্গালার লোকমত বহুলভাবেই হিংসাপন্থী বিপ্লবীদিগের প্রতিকূল ছিল এবং রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আত্মগোপন করিয়া আমরা দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানহারা হইয়া জনকয়েক পদস্থ রাজপুরুষকে আহত বা নিহত করিলে যে কোন সাধু উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, কস্মিন্‌কালেও বাঙ্গালীর এরূপ ধারণা ছিল, এ কথা বলিলে বাঙ্গালী বুদ্ধির ঘোর অবমাননা করা হয়। তবে এ কথা সত্য যে, সার জন এণ্ডার্সনকে হত্যা করিবার প্রচেষ্টার পর হইতে লোক বিপ্লববাদের প্রসার দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, উহার ফলে দেশের লোকেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। তাহার পর সার জন উডহেড বাঙ্গালার বেকার-সমস্যার কথাও তুলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সরকার এই সমস্যার সমাধান করিতে বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে আর অধিক বলা অনাবশ্যক।

সৈন্যবিভাগে ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ

কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের লর্ড সভায় লর্ড ষ্ট্রাবল্‌গি ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগকে সেনা বিভাগে গ্রহণ কার্য্য কিরূপ অগ্রসর হইতেছে, এই মর্ম্মে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স সরকারের পক্ষ হইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। কিন্তু তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষা বড়ই প্রয়োজন। তদপেক্ষা প্রয়োজন আর কিছু নাই। ভারতীয় সৈন্য বিভাগে ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করিলে সৈনিক বিভাগের যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা আর থাকিবে না; সব নষ্ট হইয়া যাইবে, ভারত রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। ভারতের জঙ্গীলাট ভারত সরকারকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, ভারত সরকার সেই পরামর্শ অনুসারে কায করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। ভারতের জঙ্গীলাট সার ফিলিপ চেটউড যে পরামর্শ দিয়াছেন, তদনুসারে কায করিলে ভারতবাসীদিগকে আর কস্মিন্‌কালেও সমর বিভাগের উচ্চপদে গ্রহণ করা হইবে না। সুতরাং মুসলমানই হউন আর হিন্দুই হউন, খৃষ্টানই হউন আর শিখই হউন, ভারতবাসী হইলে কেহ আর সমর বিভাগের উচ্চপদ অধিক সংখ্যায় দখল করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে সমস্ত ভারতবাসীকে সরকার একই খেয়ায় পার করাইতেছেন। এ দিকে কিন্তু শিয়া কমিটী স্কীন কমিটী প্রভৃতি ভারতবাসী-দিগকে ক্রমশঃ সমর বিভাগের উচ্চপদ গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স তাহা জানেন। ঐ কমিটীর সদস্যদিগের মধ্যে সমর বিভাগের অভিজ্ঞ ইংরাজ অনেক ছিলেন। ভারতবাসীদিগকে সমর বিভাগের উচ্চপদে গ্রহণ করিলে যদি সেনাদলের হানি হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সে কথা নিশ্চয়ই বলিতেন। কিন্তু সে কথা ত তাঁহারা বলেন নাই। সার ভ্যালেন্টাইন চিরল তাঁহার ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, The Indian army has a fine record for gallantry and is a great fighting engine ভারতীয় সৈনিকদিগের বীরত্বের অতি সুন্দর প্রমাণ আছে, ইহারা যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। সেনাপতি এলেনবি, সেনাপতি সার আইয়ান হ্যামিল্টন প্রভৃতি কি ভারতীয় সৈন্যদিগের প্রশংসা করেন নাই? ভারতবাসীদিগের মধ্যে কি বড় বড় সেনাপতি জন্মগ্রহণ করেন নাই? সেনানায়কের কার্য্য করিবার পক্ষে ভারতবাসীর যোগ্যতা কম, এ কথা লর্ড হ্যালিফ্যাক্স অম্লানমুখে কি করিয়া বলিলেন, তাহা আমরা বুঝি না। ভারতবর্ষে কি কখনও বড় সেনাপতি জন্মে নাই? অশোক, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির কথা না হয় নাই তুলিলাম, কিন্তু শিবাজী, শেরসাহ, বাবর, প্রতাপসিংহ, মানসিং, আকবর, হাইদার আলি, টিপুসুলতান, রণজিৎসিং প্রভৃতি কি শৌর্য্যহীন ছিলেন? না অন্য কোন দেশের বীরদিগের তুলনায় শৌর্য্যে কোন অংশে হীন ছিলেন? কখনই না। সুতরাং এই ভাবে ছেঁদো কথা বলিয়া লোককে স্তোকবাক্য বলিলে লোক তাহা শুনিবে না। ভারতবাসীদিগকে উচ্চ অঙ্গের সমরবিদ্যা না শিখাইবার কারণ স্বতন্ত্র—সে কথা আমরা আলোচনা করিতে চাহি না। এ কথা সকলেই অবগত আছেন যে, বৃটিশ জাতি বণিক্‌বেশে ভারতে আসিয়া পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ছিল এবং তাহার শৌর্য্যের খ্যাতি পৃথিবী ব্যাপিয়া ছিল। গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া এত দূর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহার সৈন্যদল আর অগ্রসর হইতে চাহে নাই;—তিনি ভারতের সীমান্ত হইতেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তবে এ কথা সত্য যে, মানুষ যে প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে অভ্যস্ত নহে, সে সেই প্রকার বিপদের সম্মুখে যাইতে ভয় পায়। এক জন সাঁওতাল ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতির সম্মুখে কেবল বর্শা বা তীর-ধনুক লইয়া একটুও ভয় পাইবে না,—কিন্তু নৌকাযোগে একটু বড় নদীতে যাইতে ভয় পায়। বাঙ্গালী জেলের একটি ছোট ছেলেও ঐরূপভাবে নৌকায় যাইতে বিন্দুমাত্রও ভয় পায় না। ইহা অভ্যাসের ফল। গ্যালীপলিতে ভারতবাসী সৈন্য যে বিক্রম দেখাইয়াছিল, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স কি তাহার কথা শুনেন নাই? লেডিস্মিথ অবরোধ-কালে যে সকল বাঙ্গালী তথায় অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা কি কোনরূপ ভয়ের লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছিল? শৌর্য্য সাহসিকতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং সমরবিদ্যা শিখাইলে ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের অধিবাসীরা সমরবিদ্যাবিশারদ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতবাসীদিগকে সমর বিভাগে গ্রহণ করা হইতেছে না, এ কথা বলিলে লোক তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? ইংরাজ এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে কি আকবর বাদশাহ তাহার বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্য রক্ষা করেন নাই?

পাটনা-প্রবাসী বঙ্গীয় সঙ্গীত-সম্মেলন

পাটনা "লেডী ষ্টিফেন্‌সন্ হল"এ পাটনা-প্রবাসী বঙ্গীয় সঙ্গীত-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রধান বিচারপতি সার কোর্টনী টেরেল উক্ত সম্মেলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৬ই অক্টোবর হইতে ৯ই অক্টোবর চারিদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বহু প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও অনুরাগের ফলে সঙ্গীতবিদ্যার আলো-চনা ও কলানৈপুণ্য সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীরা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারকল্পে এইরূপ প্রচেষ্টা করিতেছেন, ইহা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা সম্মেলনের দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনা করি।

সুভাষচন্দ্র ও সরকার

স্বদেশপ্রাণ মনস্বী সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব জানকীনাথ বসু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু আকাশপথে করাচিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যে আশা করিয়া তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে দর্শন করিবার জন্য রোগক্লান্ত দেহ লইয়া এই দূরপথ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন,—সেই পিতৃদেবকে শেষ সময়ে দর্শন করিবার ভাগ্য তাঁহার হইল না। তাঁহার উপর রাজরোষ পতিত,—রাজপুরুষগণ তাঁহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিযোগ কেহ

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

প্রকাশ্যে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। করাচি হইতে কলিকাতায় আসিবার কালেই সুভাষ বাবু তাঁহার পিতৃবিয়োগ বার্ত্তা শুনিয়া ব্যথিত—মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি যখন দমদমায় বিমানের আড্ডায় অবতরণ করিলেন, তখন পুলিস তাঁহাকে মোটরে তুলিয়া তাঁহার সঙ্গে আনীত দ্রব্যাদি বীরদর্পে অনুসন্ধান করিয়া "স্বাধীনতার সংগ্রাম" নামক পুস্তকের খসড়া হস্তগত করে। তাহার পর তাঁহাকে তাঁহার পিতৃভবনে কলিকাতায় লইয়া গিয়া আদেশ জানায় যে, তিনি বাড়ীর লোক ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিবেন না, কাহারও সহিত ভাবের আদানপ্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না। এত ভয় কেন? এত শঙ্কাই বা কিসের? সরকার পক্ষ ত আনন্দে ডিগবাজী খাইয়া বলিতেছেন,—তাঁহারা ভারতের সমস্ত প্রতিকূল আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন। তবে এত শঙ্কা এবং সঙ্কোচ কিসের জন্য? এই আদেশ প্রচারের ফলে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মে যে, পুরোহিত মহাশয় সুভাষ বাবুকে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে পারিবেন কি না? সেই বিষয়ে সরকারের মত জানা উচিত কি না, এ বিষয় লইয়া লোক আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, সরকার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া সুভাষবাবুকে রওনা হইবার সময় দিবেন না,—তাঁহাকে সাত দিনের মধ্যে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সুভাষ বাবু একমাসকাল থাকিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। হিন্দুর পক্ষে পিতৃশ্রাদ্ধ না করিয়া গৃহত্যাগ করা নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় তিনি কি করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, তাহা আমরা বুঝি না। তাঁহার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত সরকার কোন আদালতে কোন অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই সরকারের এই কার্য্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলক বলিয়া এ দেশের লোকের মনে হইতেছে। সরকারের এই কার্য্যফলে এ দেশের জনসাধারণ তাঁহাদের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে জনমত যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ত সরকার অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহারা জনমতকে এরূপ ভাবে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করিয়া যে দেশের লোকের মনে তীব্র অসন্তোষ জাগাইয়া তুলেন,—ইহা বিস্ময়ের বিষয়। ইহাতে কি তাঁহাদের রাজনীতিক জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় মিলে? পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ—সরকার ৩ জন বিশেষবিদ্ ডাক্তারকে সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য অনুমতি করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াও গিয়াছেন, তবে ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

বর্জ্জন

পাটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, শ্বেতপত্র এবং জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট এক-যোগে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এ বিষয়ে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই একমত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, এই শ্বেতপত্র এবং রিপোর্ট পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ভারত-বাসীকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার প্রদানের জন্য উহা পরিকল্পিত হয় নাই, বরং উহাতে ভারতভূমিকে চিরকালের জন্য বৃটিশ জাতির অধীন এবং তাঁহাদের আয়ের ক্ষেত্ররূপে রাখিবার জন্যই চেষ্টা করা হইয়াছে। সম্প্রতি রক্ষণশীলদিগের কেন্দ্রী দলে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিষ্টার বল্ডুইন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে রক্ষণশীল সরকারের সেই মনোগত ভাবই ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কথা এই,—It is my considered judgment that you have a good chance of keeping India in the Empire for ever. I say it deleberately. If you refuse this opportunity you will infallibly lose

India before two generations have passed, অর্থাৎ "আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আপনারা এখন (অর্থাৎ এই ব্যবস্থার পর) ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্য-মধ্যে রক্ষা করিবার উত্তম সুযোগ পাইয়াছেন। আমি বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া এই কথা বলিতেছি। যদি আপনারা এই

মিষ্টার বল্‌ডুইন

সুযোগ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে দুই পুরুষের মধ্যেই ভারত-ভূমি নিশ্চয়ই আপনাদের হাত-ছাড়া হইয়া যাইবে।" মিষ্টার বল্‌ডুইন একটা বড় বিষম ভুল করিয়াছেন। তাঁহার বুঝা উচিত যে, শাসিত প্রজাবর্গের সন্তুষ্টিই শাসক এবং শাসিত দেশের মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। আর্থার নর্ম্যাণ হল্‌কোম্ব বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের দৃঢ়প্রত্যয়ই (Conviction) সেই প্রীতির পূত বেদিকা হওয়া উচিত। শাসকরা যদি শাসিত প্রজাবর্গকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিয়া উঠিতে না পারেন, এবং বিশ্বাস করিয়া যদি তাহাদের হাতে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-সম্পর্কিত কার্য্যভার অর্পণ না করেন, তাহা হইলে শাসকদিগের উপর প্রজাসাধারণের প্রীতি-মূলক প্রত্যয় জন্মিতে পারে না। "তুমি আমার পদসেবা কর, আমি তোমার মুড়ি খাই"—এ নীতি কখনই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। জয়েণ্ট কমিটীর রিপোর্টে ভারতবাসীদিগকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিবার মত কোন ব্যবস্থাই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যাহা হউক, জয়েণ্ট কমিটীর এই রিপোর্ট যখন ভারতের মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না, তখন সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত হইয়া ইহা বর্জ্জন করাই বিধেয়। সকলের একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে তাহা কি হইবে?

খান আবদুল গফুর খাঁ

সীমান্ত-প্রদেশের খান্ আবদুল গফুর খাঁ কংগ্রেসের এক জন অক্লান্ত কর্ম্মী। তিনি মহাত্মাজীর বিশেষ অনুরাগী। তিনি ইদানীং হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্বন্ধে কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতায় তিনি

খান আবদুল গফুর খাঁ

রাজদ্রোহের প্রচার করিয়াছেন বলিয়া সরকার তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। খাঁ সাহেব যখন ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মাজীর নিকট বসিয়া-ছিলেন, তখন পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে তথায় যাইয়া গ্রেপ্তার করেন। আদালতেই তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের বিচার হইবে। শুনিতেছি, মহাত্মাজী না কি খান্ সাহেবকে আদালতে আত্মপক্ষসমর্থন করিতে বলিয়াছেন। মামলা যখন বিচারাধীন, তখন এ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিব না। দেশের লোক তাঁহার এই মামলার বিচার দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

বাঙ্গালীর ধর্ম্মশালা

'বণিক' কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর দাস জানাইয়াছেন,—কাশীর 'বীরেশ্বর' ধর্ম্মশালা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নহে। কলিকাতা চোরবাগানের প্রসিদ্ধ রাজবাড়ীর কুমার যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতা ইমাম বক্স লেনের শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত ১৩৩৮ সালে বৈদ্যনাথ ধামে ও ১৩৪০ সালে কাশীর রামাপুরায় 'হরির বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা' প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩৪০ সালে 'কাশীতে 'হরসুন্দরী ধর্ম্মশালা' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পরলোকে প্রিয়ম্বদা দেবী

তাড়াসের (পাবনা জেলা) সুপ্রসিদ্ধ জমীদার, বৈষ্ণব দানবীর, স্বর্গীয় রায় বনমালী রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়ের পত্নী প্রিয়ম্বদা দেবী অকালে ৩৮

প্রিয়ম্বদা দেবী

বৎসর বয়সে রক্তচাপহেতু গত ২৬শে কার্ত্তিক পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন, দান এবং ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য এই রায়বংশ প্রসিদ্ধ। পাবনা এডোয়ার্ড কলেজ, বনমালী টেকনিক্যাল স্কুল, সিরাজগঞ্জ বনওয়ারীলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, নবদ্বীপের চৈতন্য চতুষ্পাঠী প্রভৃতি প্রিয়ম্বদা দেবীর শ্বশুর মহাশয়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই মহীয়সী মহিলার গোপন দানের কথা পাবনা জেলায় কিম্বদন্তীর ন্যায় প্রচারিত। কন্যাদায়গ্রস্ত বহু পরিবারকে প্রিয়ম্বদা দেবী গোপনে প্রচুর অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন—প্রার্থী কোনও দিন তাঁহার কাছে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিত না। কুলাগত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রবল ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। এই বৈষ্ণব পরিবার সনাতনী হিন্দু বলিয়া পরিচিত। দেবদ্বিজে নিষ্ঠাবতী, স্বামিসেবাপরায়ণা, আত্মীয় স্বজনপ্রতিপালিকা বলিয়া দেশে তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। এই হিন্দু মহিলার অকালবিয়োগে বহু দীন দরিদ্রের আশ্রয়স্থান চূর্ণ হইয়া গেল। প্রিয়ম্বদা দেবী নিজেও সুশিক্ষিতা ছিলেন। আমরা প্রিয়ম্বদা দেবীর পত্নীবিয়োগবিধুর স্বামী, দুই পুত্র ও দুই কন্যার দুঃসহ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

মেদিনীপুরের অবিসম্বাদিত জননায়ক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল পরলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন,—এই সংবাদে দেশের লোক

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। বীরেন্দ্রনাথের ন্যায় অক্লান্ত-কর্ম্মী বাঙ্গালায় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালীর আরও বেদনার কারণ এই যে, তিনি অত্যন্ত অধিকসংখ্যক লোকের ভোটে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার পরই নির্ম্মম শমনের আহ্বানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ছয় দিন শমনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। বিজয়ী বীরের মত এই নির্ভীক যোদ্ধা বিজয়লক্ষ্মীর অঙ্কেই অনন্ত শয়নে শয়ন করিলেন। আজ তাঁহার বিয়োগে মেদিনীপুর গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন—সমস্ত বাঙ্গালা নিষ্প্রভ। তিনি ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালী জাতির নেতৃত্ব করিবেন, এইরূপ আশা সকলেই করিয়াছিলেন। দেশের লোকের স্বার্থরক্ষায় তিনি সব্যসাচী ছিলেন। তাঁহাতে সাম্প্রদায়িক ভাব একেবারেই ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলকেই তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার

ত্যাগ, তাঁহার সাহস, তাঁহার কর্ম্মশক্তি সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি প্রথম হইতেই দেশের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার অন্তঃপাতী চণ্ডীভেট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল বাবু বিশ্বম্ভর শাসমল। বীরেন্দ্রনাথ প্রথমে কাঁথি স্কুলে, পরে কলিকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যান। তিনি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার দেশের এবং দশের উপকার করিবার স্পৃহা বলবতী ছিল। মেদিনীপুরের জেলা-বোর্ডে, মেদিনীপুরের বন্যা-পীড়িত ব্যক্তি-দিগের সাহায্যদানে, আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার নেতৃত্ব-কার্য্যে তাঁহার কার্য্য-কুশলতার পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রিয়পাত্র এবং হিতকামী হইলেও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিতেন,—এই প্রকার স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষই ঘোর অমঙ্গলকর। ইনি এক জন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার লোকের উপর ইঁহার কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা ঐ জেলার আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বুঝা গিয়াছিল। ফৌজদারী আইনে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস

ডাক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, আসাম ডিগ্‌বয়ের "আসাম অয়েল কোম্পানীর" প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ চিকিৎসক ছিলেন। উল্লিখিত তৈল কোম্পানী আসামের সীমান্ত প্রদেশে, ডিগ্‌বয়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তথায় বহু সহস্র ভারতীয় বসবাস করিতেছেন। অশ্বিনী বাবু ৩১ বৎসর ধরিয়া এই তৈল কোম্পানীতে কায করিয়া ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রধান চিকিৎ-সকের পদ অধিকার করিয়াছিলেন। স্থানীয় যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রাণস্বরূপ প্রধান নেতা ছিলেন। ভারতীয় ক্লাব, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, হিন্দু শ্মশান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি উহার প্রধান পরিচালকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম পরিচালক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও আপ্রাণ পরিশ্রমের বিনিময়ে ডিগ্‌বয়ের যাবতীয় লোক ও দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের তিনি গঠন

অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস

ও পরিপুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ডিগবয়ের সর্ব্বধর্ম্মা-বলম্বী ও সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহার দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, ভদ্রব্যবহার ও সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ ছিলেন। গত ২৪শে নবেম্বর ৮ই অগ্রহায়ণে তিনি হৃদ্‌রোগে পীড়িত হইয়া অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। সুদূর আসাম অঞ্চলের প্রান্তদেশে যাবতীয় জনহিতকর প্রতি-ষ্ঠানের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির অন্তরালে বাঙ্গালীর প্রতিভা ও চেষ্টা নিহিত, ইহাতে বাঙ্গালীমাত্রই গৌরব অনুভব করিবে। ডিগ্‌বয়ের তৈল কোম্পানীর প্রধান শ্বেতাঙ্গ পরিচালক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ডিগ্‌বয়ের ইতিহাসে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের জন্য অশ্বিনী বাবুর নাম অমর হইয়া থাকিবে। অশ্বিনী বাবুর আকস্মিক অকালমৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্তা পত্নী ও একমাত্র পুত্রের উদ্দেশে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ অশ্বিনী বাবুর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আদর

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] [শিল্পী—মিষ্টার টমাস

১৩ বর্ষ]　　পৌষ, ১৩৪১　　[৩য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

ঠাকুরের সাধকজীবনের ইতিহাস, বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তাঁহার অন্তরের কোন্ নিভৃতস্থলে কোথায় কোন্ সময়ে তাঁহার প্রকৃত সাধকজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজিও অজ্ঞাত, তাঁহার কোনও জীবনচরিতই তাহা লিপিবদ্ধ করে না, তাঁহার অভিন্নহৃদয় শিষ্যগণও তাহা জানিতেন না। কিন্তু মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে বাহিরের ক্রিয়াকলাপে তাঁহার যে অন্তরের সাধনার প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার আরম্ভ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মণীর' আগমনের পর হইতে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্ব্বে ঠাকুরের পার্থিব জীবনে যে মহারহস্যময় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা এখন উল্লেখ করিব। ঠাকুরকে সর্ব্বদাই বিমনা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাঁহার বিবাহ দেন। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীসারদামণি দেবীর সহিত ঠাকুরের বিবাহ হয়। ঠাকুরের বয়স তখন ২৩ বৎসর, শ্রীসারদামণির বয়ঃক্রম ছয় বৎসর মাত্র। এই বিবাহসম্বন্ধে চিন্তা করিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে। ঠাকুরের সহিত শ্রীশ্রীমার কোনও দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, তাহা আজ সকলেরই

পরিজ্ঞাত। জগতের অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী লক্ষ্য করিলে আমরা এই ঘটনার দ্বারাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিতে পারি, কেবলমাত্র এই বিবাহই তাঁহাকে অন্যান্য মহাপুরুষগণের মধ্য হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহার বিশিষ্টতা স্থাপন করিয়া থাকে। যীশুখৃষ্ট বিবাহ করেন নাই, তাঁহার অকলঙ্ক ব্রহ্মচারী জীবন আমাদের বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করে। বিবাহ না করিয়া চিরকুমারব্রত গ্রহণ করিয়া নিষ্পাপ পবিত্র জীবন যীশুখৃষ্ট ব্যতীত আরও অনেক অজ্ঞাত মহাপুরুষ যাপন করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুতরাং যীশুখৃষ্টের অবিবাহিত ব্রহ্মচারিজীবন প্রশংসনীয় হইলেও বিচিত্র নহে। যে মহাপুরুষ সাধক-জীবনে স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেন না, যাঁহার কামিনীকাঞ্চনত্যাগের আদর্শ যেমন কঠোর, তেমনই বিস্ময়প্রদ, যে ধর্ম্মোপদেষ্টা স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহার জন্য প্রাণপ্রিয় ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া নিজ আদর্শের উজ্জ্বলতা শতগুণে বৰ্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকেও যৌবনে দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়া সাধারণ গৃহীর ন্যায় আচরণ করিতে হইয়াছিল। “অহিংসা পরম ধর্ম্ম” এই মহামন্ত্র প্রচার করিতে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও বিবাহ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাকেও সাধারণ সংসারীর ন্যায় আচার-ব্যবহারে আবদ্ধ হইয়া পিতার দায়িত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ বিবাহ করিয়াও চির-ব্রহ্মচারী, সংসারী হইয়াও চির-সন্ন্যাসী। ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি কখনও স্বপ্নেও স্ত্রীলোকের সহিত দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন অথবা তাহার কল্পনাও করেন নাই। যে মহাপুরুষ সর্ব্বদাই বলিতেন যে, “সত্য কথা কলির তপস্যা”, যাঁহার সত্যনিষ্ঠা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর, সেই মহাপুরুষের এই কথাগুলি একবার ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ে দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাঁহার এই কথাগুলিই তাঁহাকে যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, ও শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ভিতর হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। এই বিবাহের কয়েক বর্ষ পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের বয়ঃক্রম তখন ৩৬ বৎসর ও শ্রীশ্রীমার বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। এই সময়ে একাদিক্রমে একই ঘরে ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা দিনের পর দিন প্রায় ৬ মাস-কাল দিবারাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এই সময়কার এক দিনের কথা আমরা উল্লেখ করিব। সে দিন রাত্রি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, ঠাকুরের ঘরে শয্যার চতুষ্পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড জ্যোৎস্না পড়িয়া ঘরটিকে আলোকে ও আঁধারে সুন্দর করিয়াছিল। শ্রীশ্রীমা শয্যার উপর নিদ্রিতা। ঠাকুর আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া সেই দিন বলিয়াছিলেন যে, ভাবের ঘরে চুরি করিয়া কোন লাভ নাই, পার্থিব সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা যদি অন্তরের কোনও নিভৃতস্থলে কোথাও লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মপ্রবঞ্চনা করা বৃথা, কিন্তু এই পার্থিব সুখভোগের দ্বারা পরমার্থলাভ হয় না, ইহাও সুনিশ্চিত। কি কঠোর আত্মপরীক্ষা! যে মন আপনাকে আপনি এমন করিয়া কঠিন পরীক্ষার ভিতর লইয়া যাইতে পারে, সে মনের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবারও শক্তি পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাই ঠাকুর বলিতে পারিয়াছিলেন, ৬ মাস একত্র একই কক্ষে নিজ সহধর্ম্মিণীর সহিত বাস করিয়াও তিনি এক দিনের জন্যও স্বপ্নেও কখনও স্ত্রীসংসর্গ করেন নাই। বিবাহিত জীবনে এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের আর একটি উদাহরণ কি কাহারও জানা আছে? ঠাকুর যদি জীবনে আর কোন কথাই না বলিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার এই অপরূপ কৌমার্য্যজীবনের আদর্শই শতসহস্র কণ্ঠে জগতে ঘোষিত হইয়া ভারতের অপূর্ব্ব চিত্তসংযমের জ্যোতিঃ চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিত।

কেহ কেহ মনে করেন, ঠাকুর তাঁহার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করেন নাই; তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তিবলে ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মচারিজীবন যাপন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর না হইতেও পারে। সুতরাং স্বামীর কর্ত্তব্য করিতে পরাঙ্মুখ মনকে বিবাহে প্রণোদিত করা তাঁহার উচিত হয় নাই। ঠাকুরের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে অনেক ধীমান্ ব্যক্তিকেও এইরূপ অসঙ্গত অভিমত প্রকাশ করিতে দেখা যায়। স্বামী ও স্ত্রীর আদর্শ সম্বন্ধ কি, সে বিষয়ে দুই একটি কথা এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনক্ষেত্রের তিনটি বিভিন্ন স্তর

আছে—এই মিলনক্ষেত্রে স্বামিস্ত্রীর পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য, সাধারণ মানুষের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। দৈহিক সম্বন্ধই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সর্ব্বনিম্ন স্তরের সম্বন্ধ। মানুষ কখনও কখনও পশু-প্রবৃত্তির তাড়নায় এই দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করে, দেশ, কাল, সমাজ সমস্ত ভুলিয়া, আত্মমর্য্যাদা, সমাজের বিধান, ধর্ম্মের আদেশ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া অবৈধ দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। তাই আজ বাঙ্গালাদেশে এই পশুপ্রবৃত্তির আক্রমণে হিন্দু সমাজ সন্ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের বন্ধনের ভিতর স্বামিস্ত্রীর মধ্যেও যখন নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখনও এই পশুপ্রবৃত্তিই যৌবনে প্রথম প্রকাশিত হইয়া বৈধ গণ্ডীর ভিতর মানুষের জীবনের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু স্বামিস্ত্রীর এই দৈহিক সম্বন্ধ দাম্পত্য-জীবনের আরম্ভ মাত্র, শেষ নহে। প্রস্ফুটিত কমলের বৃন্তের অধোদেশে যে পঙ্কিল সলিল, তাহার শেষ পরিণতি প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধে। এই দৈহিক সম্বন্ধের ঠিক্ উচ্চস্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাহচর্য্য। তাই আমরা দেখিতে পাই, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্বন্ধ স্বভাবতঃই সংস্থাপিত হইয়া থাকে। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক সহজেই আপনার একটি গোষ্ঠী নির্ম্মাণ করিয়া লয়, অনেকেই সেখানে যাতায়াত করিয়া থাকে, বিনা প্রয়োজনেও সেখানে লোকসঙ্ঘ দেখা যায়। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপিত এই সম্বন্ধ দৈহিক সম্বন্ধ হইতে অনেক উচ্চে, অধিক মধুর এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। তাই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধিবৃত্তিসর্ব্বস্ব বর্ত্তমান যুগে বিদ্বান্ যুবকগণ শুধু সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সৌন্দর্য্যের উপর আর কিছু অধিকতর স্থায়ী জিনিষ সন্ধান করিয়া থাকে। শুধু দৈহিক সম্বন্ধস্থাপন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে অপূর্ব্ব রূপবতী বিদ্যাহীনা যুবতীই বিবাহে একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইত। কিন্তু মানুষ শুধু সুন্দরী স্ত্রী হইলেই সুখী হইবে মনে করে না, তাই বিদুষী কি না, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

যৌবনের প্রবৃত্তির মূল কারণ এই যে, রূপ ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি তাহা অপেক্ষা চিরস্থায়ী ও তাহার পরিচালনা সমধিক আনন্দপ্রদ। দৈহিক আনন্দ স্থূল, সুতরাং সেই পরিমাণে কম সুখপ্রদ, বুদ্ধিবৃত্তির আদানপ্রদানজনিত যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, সুতরাং সেই পরিমাণে অধিক কালস্থায়ী ও সমধিক সুখপ্রদ। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ সম্বন্ধের অনেক উচ্চে মানুষের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত। ক্ষুদ্র প্রদীপের সহিত দীপ্তিমান মধ্যাহ্নসূর্য্যের যে প্রভেদ, সুখদুঃখপ্রপীড়িত পার্থিব জীবনের সহিত অপার্থিব আনন্দময় অনন্ত জীবনের যে পার্থক্য, দৈহিক অথবা মানসিক সম্বন্ধের সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধেরও সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানুষের সহিত মানুষের যে মিলন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের মিলন। তাই আমরা দেখিতে পাই, ধর্ম্মগুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা জগতের কোনও সম্বন্ধের সহিতই তুলনীয় নহে।

দরিদ্র স্বামীকে উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে আভিজাত্যাভিমানিনী স্ত্রীকে মনের সহিত অনেক সংগ্রাম করিতে হয়, দরিদ্র শিক্ষককে ধনী ছাত্র প্রায়ই করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বস্বত্যাগী ধর্ম্মগুরুর নিকট লঙ্কাধিপতি মন্ত্রশিষ্যকেও অবনত-মস্তকে ভক্তিবিনীত ব্যবহার করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষগণের জীবনে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকেন, কিন্তু পার্থিব সম্বন্ধ-বিহীন শিষ্যগণই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের গুরুর সহিত মিলিত হইয়া আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এক দিন যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যীশুখৃষ্ট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—'Who is my mother ? and who are my brethren ?' (কে আমার মা ? আমার ভাই কে ?) "And he streched forth his hand toward his disciples and said, Behold my mother and my brethren.' (এবং তিনি শিষ্যগণের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহারাই আমার মা ও ভাই')। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা ঠিক এইরূপ কথাই শুনিতে পাই। একবার কথাপ্রসঙ্গে তিনি

বলিয়াছিলেন—"দেখো, যারা আপনার, তারা হ'ল পর—রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর, তারা হ'ল আপনার।······এখন ভক্তরাই আত্মীয়।"* যীশুখৃষ্ট ও ঠাকুরের এই কথাগুলি অনুধাবন করিলে সহজেই বোঝা যায় যে, মহাপুরুষরা রক্তমাংসের সম্বন্ধকে অথবা বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে সাহচর্য্যের সম্বন্ধকে কখনও অধিক করিয়া দেখেন না, একমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের মিলনকেই প্রকৃত সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাধক-জীবনের এই আধ্যাত্মিক মিলনকে যদি মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

ঠাকুরের শ্রীশ্রীমার প্রতি ব্যবহারে কোনও বৈষম্যই পরিলক্ষিত হয় না। দৈহিক সুখের অপেক্ষা মানসিক তৃপ্তি অধিকতর প্রীতিপ্রদ, এবং মানসিক তৃপ্তি হইতেও আধ্যাত্মিক শান্তি অশেষ পরিমাণে বাঞ্ছনীয় ও আনন্দপ্রদ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সেই আধ্যাত্মিক সাহচর্য্যের আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুরকে আদর্শ স্বামী ও শ্রীশ্রীমাকে আদর্শ সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।' সাধারণ মানুষকে দৈহিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া মানসিক সাহচর্য্যের স্তরে অগ্রসর হইতে হয়, এবং মানসিক সাহচর্য্যের ক্ষেত্র হইতেই মানব-দম্পতি এক দিন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাইবার আশা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রেই স্বামিস্ত্রীর মিলনের শেষ হইয়া যায়, অতি অল্পসংখ্যক দম্পতিই সেই স্তর ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাঙ্গালার মহাকবির যে প্রচলিত সঙ্গীত বিবাহের সময় অর্থহীন অক্ষরসমষ্টিরূপে আরম্ভ হইয়া সাধারণতঃ চিরদিন অর্থহীন থাকিয়াই যায়, তাহা ঠাকুরের দাম্পত্য জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলেছে যদি
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেম-পারাবার
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিশিতে চায়।

ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীমার অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিকী শক্তি দৈহিক অথবা মানসিক বৃত্তি-সমূহের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত, সুতরাং তিনি আত্মীয়া হইয়াও অন্যান্য স্বজনবর্গের ন্যায় ঠাকুরের পর হন নাই, চিরদিন নিকটতম আত্মীয়া থাকিয়াই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সহধর্ম্মিণীর অধ্যাত্ম-জীবনে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, কোনও স্বামীই নিজ কর্ত্তব্যপালনে তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দপ্রদ, চিরস্থায়ী শান্তি নিজ সহধর্ম্মিণীর জীবনে প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। তাই একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, ঠাকুর হিন্দু স্বামীর আদর্শের মর্য্যাদা চিরদিন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ করিয়া দেশ হইতে ফিরিবার পর ঠাকুরের জীবন আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সংসারের প্রতি মন আকৃষ্ট করিবার জন্য আত্মীয়-স্বজনরা বিবাহ দিয়াছিলেন, বিবাহ হইল, কিন্তু ফল বিপরীত হইল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবীর পূজায় তন্ময় হইয়া পড়িলেন, সর্ব্বদাই 'মা' 'মা' করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করেন, পূজার সময় শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি পরিহার করিয়া প্রাণের আবেগে বিশৃঙ্খলার মধ্যেই দেবীর পূজা হয়, বিষয়ি-সংস্পর্শ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। দক্ষিণেশ্বর পূজামন্দিরের কর্ম্মচারিবৃন্দ মহাকৌতূহলী হইয়া সর্ব্বদাই "ছোট ভট্‌চায্যির"

* শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

এই আমূল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। রাণীর বুদ্ধিমান বিষয়ী জামাতা মথুরানাথও ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং মনে মনে এই ধর্ম্মোন্মাদকতার এক প্রতীকার উপায়ও স্থির করিয়া ফেলিলেন।

সাধক-জীবনের প্রারম্ভে সমস্ত মহাপুরুষই চিত্তশুদ্ধি ও সংযমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন স্বচ্ছ দর্পণ ব্যতীত প্রকৃত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ শুদ্ধ আধার না হইলে অরূপের রূপ তাহাতে প্রকাশিত হয় না। তাই মহাপুরুষগণের জীবনে দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবনে কত প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে চিত্তের সংযম ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন! এই প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম অখণ্ড ধর্ম্মজীবনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও প্রলোভনত্যাগের দ্বারাই মানুষের মন স্বচ্ছ, শুভ্র ও পবিত্র হইয়া চিৎস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উপযুক্ত আধারে পরিণত হইয়া থাকে। যীশুখৃষ্টের সাধকজীবনের প্রারম্ভেই সয়তান তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অসীম ঐশ্বর্য্য, যশোগৌরব, একাধিপত্য সমস্তই তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সয়তানকে সেই স্থান হইতে দূরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বারবনিতা কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন এবং বোধিগয়ায় তিনি যখন ধ্যানে নিমগ্ন, তখন "মার" নামক পাপপুরুষ তাঁহাকে নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল! কিন্তু শাক্যসিংহ ইন্দ্রিয়সংস্পর্শজাত ভোগসুখ তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! ভক্ত হরিদাস যখন ইষ্টদেবতার নাম জপ করিয়া তন্ময়, সেই সময় বিষয়ী লোকের ষড়যন্ত্রে তাঁহার নিভৃত কুটীরে সুরূপা এক বারবনিতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। লৌহ পরশমণির সংস্পর্শে আসিলে পরশমণিকে লৌহত্বে পরিণত করিতে পারে না, আপনিই সোণা হইয়া যায়। সেই ভাগ্যবতী রমণী ভক্ত হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া আপনিই ভগবানে ভক্তিমতী হইয়া শেষজীবন আনন্দে যাপন করিয়াছিল। ঠাকুরকেও বড় কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। মথুরাবাবু তাঁহাকে তখনও ঠিক্ চিনিতে পারেন নাই, সুতরাং পরীক্ষা করিবার মানসে, অথবা তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদকতা আরোগ্য করিয়া বিষয়রসে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তিনি ঠাকুরের কক্ষে এক সুরূপা বারবনিতা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব্ব মধুরভাবে এই ঘটনা নিজেই কতবার ব্যক্ত করিয়াছেন।—"সুন্দর চোখ ভাল।" ভক্ত হরিদাসকে যখন এই ভাবে প্রলুব্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল, তখন হরিদাস সাধকশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, দিবারাত্রিতে তিন লক্ষ ইষ্টনাম জপ করিতেন, ইন্দ্রিয়-প্রলোভন তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইতেও অধিক তুচ্ছ। কিন্তু ঠাকুরের সাধকজীবনের প্রারম্ভেই প্রায় ২৩ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই কঠিন পরীক্ষা হইয়াছিল। সাধারণতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম এই সময়ে বলবান্ থাকে. কিন্তু চিত্তসংযম ঠাকুরকে সাধনার দ্বারা করিতে হয় নাই, তিনি আজন্ম সংযমী ছিলেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, সেই "সুন্দরস্বরূপের" রূপ হৃদয়ে একবার দর্শন করিলে রম্ভা-তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়—'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং কুতঃ পরবধূসঙ্গঃ?" যে কবিদৃষ্টি তাঁহাকে বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎসের নিকট লইয়া গিয়াছিল, সে দৃষ্টিকে কি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও সসীম দেহের সৌন্দর্য্য আকৃষ্ট করিতে পারে? বিখ্যাত মনীষী প্লেটো সেই চিৎস্বরূপকে 'The Fountain of all Beauty' (সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎস) বলিয়াছেন। জগতে যত কিছু সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়,—পুষ্পের কোমলতা, শিশুর হাসি, রমণীর সৌন্দর্য্য, সবই সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণামাত্রের ঈষৎ পরিস্ফুরণ! কণামাত্রই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু যে ভাগ্যবান্ সেই অনন্ত আধারের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার কি "লোভের" সীমা আছে, না, তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য-পারাবার ত্যাগ করিয়া কণিকায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সহজেই সেই অনন্তসৌন্দর্য্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং রমণীর "সুন্দর চোখ ভাল" তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। তিনি শুদ্ধ, শান্ত ও পবিত্র মন লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

দান-প্রতিদান

২৫

বিবাহান্তে কুহু শ্বশুরালয়ে আসিল। জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার অংশের ভূষণডাঙ্গার বিস্তৃত পরগণাটি ভ্রাতৃবধূকে যৌতুক দিলেন। এই দানের ব্যাপারে ভাতির আক্রোশের পরিসীমা রহিল না। একটি মুক্তামালা, দুইটি হীরার গহনা এ ক্ষেত্রে লোক উপহার দিয়া থাকে। কিন্তু অত বড় জমীদারী হাতছাড়া হইয়া নববধূর করতলগত হইল, মনে করিতেই কুহুর প্রতি ভাতির মনের ভাব কঠিন আকার ধারণ করিল। কুহু রূপে ভাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। রাণীত্বেও সে তাহার উপরে উঠিবে। জ্যোতির্ম্ময়ের যাহা কিছু ভাতির অধিকারভুক্ত হইলেও একটি বিশাল জমীদারীর উপরে ধনী দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের অন্তরে ভাতির সুমধুর নামের জয়পতাকা উড়িবার আর সম্ভাবনা রহিল না। স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকার, ইহা ভাতির বিলক্ষণরূপে জানা থাকিলেও স্বামীকে অভিন্ন ভালবাসিয়া প্রিয়ের প্রিয় নামটির মধুরতায় আবিষ্ট হইয়া, জগতের যত মধুর শব্দের মধ্যে প্রিয় নামের শব্দটিকে প্রিয়তর করিবার আস্বাদ ভাতির জানা ছিল না। নিজের নাম জাহির করিতে পারিলেই সে অত্যন্ত তৃপ্ত হইত। কিন্তু নিজের নাম দূরে থাকুক, স্বামীর নামও সেখানে টিকিল না, যেখানে ধ্বজা উড়িল "রাণী কুঙ্কুমকুমারীর।" আর উড়িল এমন স্থানে, তাহাদের এলাকার মধ্যে ধনে, ধান্যে, বৈভবে, খ্যাতিতে যে পরগণাটি সমৃদ্ধ। ভূষণডাঙ্গা রায়-পরিবারের পৈতৃক আবাসভূমি, পুরাতন সম্পত্তি। প্রজারা অনেকেই অবস্থাপন্ন, সুন্দর নয়নরঞ্জন স্থান। দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্ট আফিস, ষ্টেশন, স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, কালীবাড়ী, হাট-বাজার, বন্দর পল্লীর এই সব দুর্ল্লভ সম্পদ বক্ষে লইয়া ভূষণডাঙ্গা লোকলোচনে প্রতিভাত হইতেছে।

বিবাহের পর ভাতি একবার ভূষণডাঙ্গায় গিয়াছিল। ভূষণডাঙ্গার অধিবাসীরা তাহাদের নূতন রাণীকে নজর দিতে আসিয়াছিল। তাহাদের সরলতা, অনাবিল ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মানপ্রদর্শন সে দিন ভাতির ভাল লাগে নাই। আড়ম্বরহীন পল্লীবাসীদিগকে সে নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিল। কিন্তু ভাতি তখনও প্রাপ্তির মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সেই রাণীর সম্মান, জমীদারের প্রতি প্রজার শ্রদ্ধা আজ তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিতেছে। যাহা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহারই প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণ।

ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া ভাতি জ্যোতির্ম্ময়কে আক্রমণ করিল। জ্যোতির্ম্ময় ধীরচিত্তে স্ত্রীর অনুযোগ, অভিযোগ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "এ ছোট বিষয় নিয়ে তুমি এত রাগ করছ কেন, ভাতি? এক দিন তুমি আমায় বলেছিলে, 'নতুন বৌকে কি দেবে?' আমি বলেছিলাম, 'গয়না কারুর কাযে লাগে না, বাক্সে বন্ধ হয়ে থাকে। আমি বৌমাকে সে সব দেব না। একটি পরগণা দেব। যা তার স্থায়ী হয়ে থাকবে, কাযে লাগাবে।' কৈ, সে দিন ত তুমি আপত্তি করনি?"

ভাতি ঠোঁট বাঁকাইয়া ঝাঁঝের সহিত উত্তর করিল, "এক দিন বলেছিলে বটে, কিন্তু সে দিন ভাল ক'রে শোনবার সময় আমার ছিল না। আমি তখনই মিসেস্ সেনের চা-পার্টিতে চ'লে গেলাম তার পর আর এ সব কথা হয় নি।"

"হবে আর কি? আমার কথা শোনবার তোমার অবসরই বা কোথায়? বিশেষ বড় ঘটনাও কিছু নয়।"

"অমন যে ভূষণডাঙ্গা দানপত্র লিখে রেজেষ্ট্রী ক'রে ভাজকে যৌতুক দিলে, সেটাও তোমার বড় কথা নয়? এর চেয়ে বড় অন্য কি থাকতে পারে, তা আমার জানা নেই। ভূষণডাঙ্গা ছাড়া আর কোন মহলের নামই কি তোমার মনে হ'ল না?"

"না ভাতি, মনে হয় নি। ভূষণডাঙ্গা আমার বড় ভালবাসার, যে আমার সকলের চেয়ে স্নেহের পাত্রী, তাকে আমার ভালবাসার জিনিষটি দিতে সাধ হয়েছিল। এর জন্যে তুমি এত দুঃখিত হচ্ছ কেন, আমি তা বুঝতেই পারছি না।"

"তোমার বুঝে কায নেই।" বলিয়া ভাতি রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার রসনা বিষ ছড়াইতে ত্রুটি করিল না। নৃত্য-গীতে পারদর্শিনী শিক্ষিতা সুমার্জ্জিত-বুদ্ধিসম্পন্না ভাতি অত্যন্ত আধুনিকা হইলেও নারী;

জমীদার-গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সেই প্রাধান্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বিবাহে সমবেত কুটুম্বিনীদের শুনাইয়া শুনাইয়া ভাতি বলিতে লাগিল, "পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আন্‌বার আমার ইচ্ছে ছিল না। ঠাকুরপো শিমুল দেখেই ভুললে। তাঁর দাদাটিও নামের সৌরভে অস্থির। এখন একে মানুষ ক'রে তোলা আমার অসাধ্য ব্যাপার। ঠাকুরপো আগেই ব'লে রেখেছেন, 'তোমার ছাত্রী এনে দিলাম। গুরুগিরি করতে হবে।' কিন্তু ছাত্রী যোগ্য না হ'লে কি গুরুগিরি করা চলে? না করলেও নিজেদেরই লজ্জা। আদব-কায়দা ভদ্রতা সমস্তই শেখাতে হবে। বড় ঘরে দেবেন বলেই বাবা আমাদের ক'বোনকে যত কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। শুধু কি শেখানো, আমার বিয়েতে বাবা কি খরচটা না করলেন? এদের রাজার সংসার হলেও বাবা আমায় এক ড্রংইরুম ভর্ত্তি আসবাব দিয়েছিলেন। কত জিনিষ, ছটো লরী বোঝাই হয়ে এসেছিল, আর ঠাকুরপোর বৌ এলেন"—ভাতি মন্তব্যটুকু শেষ না করিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল।

কয়েকটি বর্ষীয়সী কুটুম্বিনী গালে হস্তার্পণ করিয়া সবিস্ময়ে জবাব দিলেন, "তোমার বাবার সাথে অন্যের তুলনা বৌমা? লোকে কথায় বলে 'কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে।' অযোধ্যার কোথায় রঘু, কোথা বাঁশবনের ঘুঘু।"

এ হেন টিপ্পনী শুনিয়া ভাতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া স্বামীর বুদ্ধিহীনতার বার্ত্তা প্রচার করিতে বসিল। "আমি বাপের ঘর থেকে যা এনেছিলাম, পেয়েছিলাম, সেই অভাব পূরণ করতে ভাসুর বৌকে ভূষণডাঙ্গার রাণী ক'রে দিলেন। এটা বুঝলেন না, রাণী কি সকলেই হ'তে পারে? তারও ক্ষমতা থাকা চাই।"

কুহু সবই শুনিল, তাহার কল্পনার কুঞ্জবনের ফুটন্ত ফুল সহসা ম্লান হইয়া গেল। ইহাই শ্বশুরবাড়ী? নব বধূর পিত্রালয়ের নিন্দা-কুৎসা রটনা করা এখানকার চিরন্তন প্রথা। ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই, সে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত যে সম্প্রদায় হউক না কেন? শৈবালাচ্ছন্ন সরোবরের শীতল জল হইতে পদ্মটিকে তুলিয়া রাজপ্রাসাদের সোণার ফুলদানীতে রাখিলে যে অবস্থা হয়, কুহুর সেই অবস্থা।

সারাটি দিন হীরা-মাণিকের গহনা পরিয়া মহার্ঘ বসনে সাজিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। কেহ বলে, "লক্ষ্মী-প্রতিমা, রাণীর উপযুক্ত রূপ বটে।" কেহ বলে, "রংটা বড্ড ফ্যাঁকাসে, আর একটু দুধে আলতায় হ'লে ভাল হ'ত।" এক জন বলিল, "শরীরটি বেশ লতার মত।" অপরে বলিল, "ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা গড়ন। মাথায় একটু খাটো হ'লে মানানো হ'ত।" ভাতি কাছে আসে না। কেবল বেশ-পরিবর্ত্তনের সময় দাসীকে আদেশ করে। বাসনা দূরে দূরে থাকে। কুহুর বুকের ভিতর অশ্রুধারা জমিয়া বাহিরে আসিবার নিমিত্ত আকুলি-ব্যাকুলি করে, কোথায় সে অশ্রু ফেলিবে? চতুর্দ্দিকে আত্মীয়-কুটুম্ব, দাস-দাসী কোলাহলের অন্ত নাই। এখানে স্বজন নাই, নির্জ্জনও নাই।

বিবাহের পরদিন মেয়ে-জামাইকে বিদায় দিয়া ভোলানাথ সপরিবারে দেশে চলিয়া গিয়াছেন। অষ্টাহ পর কুহুদিগকে 'যোড়ে' লইয়া যাইবার আশায় দিবাকর মণির নিকটে অপেক্ষা করিতেছে।

প্রতি সন্ধ্যায় দিবাকর কুহুর সংবাদ লইতে আসে। "কুহু, ভাল আছিস রে?" এই স্নেহ-সম্বোধনটুকু শ্রবণ করিবার আশায় কুহু উৎসুকভাবে পথের পানে চাহিয়া থাকে। আর থাকে জয়ন্তর মুখে একটি মধুর "কু" শব্দ শুনিবার প্রতীক্ষায়, দুইখানি ব্যাকুল বাহুর একটি নিবিড় স্পর্শের নিমিত্ত।

স্বামীর কাছে নববধূর জীবনগ্রন্থি এখনও খোলা হয় নাই। বিবাহের পরদিন "কালরাত্রি"। তাহার পর ফুলশয্যা। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থিয়েটার দেখিয়া নিশা-শেষে শ্রান্ত কুহু জয়ন্তর বক্ষ আশ্রয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন আবার থিয়েটার, পরের রাত্রিতে বায়স্কোপ, মুকুন্দ দাসের যাত্রা, নিত্যই একটানা একটা সমারোহ লাগিয়াই আছে।

ভাতি নৃত্যগীতপ্রিয় হইলেও কুরুচিপূর্ণ অভিনয়ের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিত। রুচি-বিগর্হিত থিয়েটারের দল বাড়ীতে ঢুকাইতে তাহার খুবই আপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু পল্লীগ্রাম হইতে আগত কুটুম্বিনীগণ জ্যোতির্ম্ময়কে চাপিয়া ধরিলেন—"থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখিবার আশাতেই না তাঁহারা এত বর্ষায় ঘর ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন। ওসব বাদ দিলে আবার বিবাহ কিসের?"

প্রাচীনা এবং নবীনাদের আন্তরিক আগ্রহে জ্যোতির্ম্ময়

আপনাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি রাত্রি রং-তামাসা, বৌ-ভাতের ভোজ, কাঙ্গালী-বিদায় ব্যাপারে কাটিয়া গেল। তার পর চাকের মধুশূন্য মৌমাছির ন্যায় আত্মীয়কুটুম্বিনীগণ যে যাহার আবাসে প্রস্থান করিলেন। বিপুল জনতাপূর্ণ প্রাসাদে আবার স্নিগ্ধশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

ক্রমে বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান 'অষ্টমঙ্গলার' পর চির-পরিচিত চির-মধুর জন্মভূমির শান্ত শীতল কোলে পিতা-মাতার স্নেহের নীড়ে ফিরিবার জন্য কুহুর হৃদয় উদ্বেলিত হইল।

২৬

অষ্টমঙ্গলার পর অপরাহ্নে দিবাকর আসিল।

জ্যোতির্ম্ময় মহাদেওকে লইয়া বাগানের সংস্কার করিতেছিলেন। মালীর সাবধানতা সত্ত্বেও বিবাহে সমাগত বালক-বালিকারা অনেকগুলি ফুলগাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, কলি ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই ছিন্ন মুকুল, ভগ্ন শাখা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ব্যথিত হইতেছিলেন। গাছগুলি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, স্বহস্তে রোপিত, ফুলগুলি আনন্দদায়ক।

হিরণের সহিত দিবাকরকে পুষ্পোদ্যানে আসিতে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুলকিত হইলেন। তাঁহার প্রবল পুষ্প-প্রীতির নিমিত্ত বাধ্য হইয়া অনেক বন্ধুবান্ধবকে বাগানে আসিতে হয়, কিন্তু না ডাকিতে কেহ আসিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না।

জ্যোতির্ম্ময় পাতা-ছাঁটা কাঁচি হাতে করিয়া দিবাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিবা, এসেছ, ভাই? দেখ দেখি, ছেলেমেয়েরা আমার বাগানের কি দুর্দ্দশা ক'রে গেছে? এক দিন টুক্‌রি টুক্‌রি ফুল এসেছে, তা পেয়েও গাছগুলোকে অব্যাহতি দেয় নি। কাশ্মীরের এ ফুলগাছের সব ফুল উজাড় ক'রে তুলেছে। শিলংএর চন্দ্রমল্লিকার বড় ডালটা ভেঙ্গে ফেলেছে। ফুল যে আমি কি ভালবাসি, তা বলতে পারিনে। গাছে ফুল রেখে দেখতেই আমার বেশী ভাল লাগে। অনেকে সুন্দর ফুলে ঠাকুরপূজা করতে চায়, আমি গাছে রেখেই আমার ঠাকুরকে পূজো করি। মনে হয়, তাঁর পূজোর জন্যেই ফুলের জন্ম। তুলে কেন নষ্ট করবো? যেখানকার জিনিষ, সেখানে থেকেই তাঁর পূজো হবে।"

দিবা হাসিয়া বলিল, "ঠিক কথা, কিন্তু সকলেই গাছে ফুল রেখে 'পূজো' করতে জানে না। সকলের ত সৌন্দর্য্য-বোধ নেই।"

হিরণ কহিল, "ফুলের প্রধান শত্রু ছোট ছেলে-মেয়ে। ফোটা ফুল দেখলে আর রক্ষা নেই। চুরি ক'রে হোক, চেয়ে চিন্তে হোক, তাদের নেওয়াই চাই। পোকার চেয়ে ছোট ছোট মানুষ-পোকাগুলোই ফুল নষ্ট করে বেশী।"

ফুলের প্রতি এ সহানুভূতিতে জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্ন হইয়া দুই গুচ্ছ গন্ধরাজ দুই জনকে উপহার দিয়া বলিলেন, "তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? ব'সো। আমি বস্‌বো না। আমার বসবার সময় নেই। গাছের শুক্‌নো পাতাগুলো খুঁজে খুঁজে ফেলে দিতে হবে।"

দিবাকর পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, "মা চিঠি লিখেছেন, কুহুকে আর জয়ন্তকে নিয়ে যেতে। বিয়ের সময় দেশ থেকে কাউকে আনা হয়নি। সকলেই জয়ন্তকে দেখতে চেয়েছে। মা আপনাকে অনুমতি দিতে অনুরোধ করেছেন।"

জ্যোতির্ম্ময় কিয়ৎকাল চিন্তার পর শান্তস্বরে জবাব দিলেন, "মা গুরুজন, আমার নমস্যা, আমার কাছে তাঁকে অনুমতি চাইতে হবে না। তিনি যে ইচ্ছা করেছেন, আজ সকালে আমিও জয়ন্তকে তাই বলেছিলাম। জয়ন্ত তার বৌদিকে বলেছে, 'মাসী, পিসীদের আড্ডায় আটদিন ঘরে বন্দী থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। দিন পনেরো জিরিয়ে পরে ক্ষীরপুরে যাব। এখন যেতে পারব না।' জয়ন্ত যদি না যায়, তা হ'লে তুমি কি এক্‌লা কুহুমাকে নিয়ে যেতে চাও? দেশের সকলে দুটিকে যে একসাথে দেখতে চেয়েছেন। একটিকে পেলে কি খুসী হবেন?"

দিবাকর বলিল, "জয়ন্ত এখন যদি না যায়, তা হ'লে কুহু থাকুক। দিন পনেরো পর দুজন একসঙ্গেই যাবে। দুজনকে দেখলে সকলেই আনন্দিত হবেন। কিন্তু পরে আমি বোধ হয় নিয়ে যেতে পারবো না। হিরণদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।"

"তুমি তা হ'লে এখন বাড়ী যাবে না? ক'দিন পর কি তোমার নিয়ে যাবার সময় হবে না?"

দিবাকর কহিল, "না হবার সম্ভাবনাই বেশী। আমার অনেক সময় নষ্ট হ'ল, আর নষ্ট করতে চাইনে। আমি আজ রাতের গাড়ীতে বাঙ্গালার বাইরে রওনা হব। এইটুকু কেবল বলতে পারি, দাদা।"

দিবাকরের কণ্ঠে কি যেন ছিল, তার এতটুকু ইঙ্গিতেই জ্যোতির্ম্ময়ের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। উহাকে বিমুখ করিবার দুঃখে সঙ্কোচে জ্যোতির্ম্ময় ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দিবাকরের সহিত আজই নবদম্পতিকে ক্ষীরপুরে পাঠাইয়া দিবেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাই চূড়ান্ত নহে। যে স্থানে ব্যথার মূল্য থাকে না, সে স্থানে নিষ্ফল উপরোধ করা জ্যোতির্ম্ময়ের স্বভাববিরুদ্ধ। জয়ন্ত এখন যাইবে না জানিয়াও তিনি কুহুকে পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সে স্থলেও জয়ন্তর অমত বুঝিয়া অগত্যা চুপ করিয়া রহিলেন। কুহুকে তিনি স্নেহ করিতে পারেন, আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন, কিন্তু তাহার বেশী অধিকার তাঁহার নাই। ইহাই বর্ত্তমানে সংসাররীতি।

জ্যোতির্ম্ময় একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুমি কুহুমা'র কাছে যেয়ে বসো গে, দিবা। হিরণ দিবাকে নিয়ে যাও।"

হিরণ দিবার হাত ধরিয়া জয়ন্তর মহলের দিকে অগ্রসর হইল।

* * *

জয়ন্তর কাপড় ছাড়িবার ঘরে মেঝেয় কার্পেটের উপর কুহু বসিয়াছিল। পশ্চাতে দাসী নিস্তার শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা কুহুর বিপুল কেশরাশি ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিতেছিল।

সিঁড়িতে দিবাকরের সাড়া পাইয়া কুহু ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় 'দাদা' বলিয়া ছুটিয়া যাইতেই দিবার সহিত হিরণকে নিরীক্ষণ করিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

হিরণ জয়ন্তর বাল্যবন্ধু, তাহার ঐকান্তিক যত্ন-চেষ্টায় তাহাদের বিবাহব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে জানিয়া হিরণের প্রতি কুহুর অখণ্ড বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এ কয়েক দিন বিবাহবাড়ীর ব্যস্ত কোলাহলে হিরণের সহিত কুহুর 'হ্যাঁ, না' ছাড়া বেশী কিছু আলাপ হয় নাই। তাই লজ্জার সীমা অতিক্রম করিয়া কুহু অবাধে হিরণের সহিত মিলিতে পারে নাই। সে তাড়াতাড়ি শাড়ীর লুণ্ঠিত অঞ্চল মাথায় তুলিয়া দিতেই হিরণ স্নেহহাস্যে বলিল, "দাদা ব'লে ছুটে এসে, আমায় দেখে চুপ করলে কেন, দিদির লজ্জা হ'ল? আমি যে তোমাদের দাদা, আমায় লজ্জা করতে হবে না।"

দিবাকর কয়েক পা সরিয়া কুহুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া কহিল, "তুই হিরণদাকে লজ্জা করিসনে কুহু? আমি এখানে যখন থাকবো না, তখন মনে করিস, আমাদের আর একটি দাদা কাছে রয়েছেন। হিরণদা তোকে কত স্নেহে যে এখানে এনেছেন, তা ভুলে যাস্‌নে। ওঁর এক দিদি ছিলেন, তাঁকে অসময় যেতে হয়েছিল। উনি তোকে সেই দিদির মতই মনে করেন। সেটা তুই কখনো ভুলিস নে। আমি কাছে না থাকলেও আমার কথা মনে রাখিস।"

কুহু পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতার সহিত হিরণের প্রীতিসমুজ্জ্বল মুখের পানে স্নিগ্ধ আঁখি মেলিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

বাবুরা সিঁড়ির সন্নিহিত দালানে দাঁড়াইয়া আছেন লক্ষ্য করিয়া বিষণ বেহারা তিনখানা বেতের চেয়ার আনিয়া রাখিয়া গেল।

দিবাকর, হিরণ বসিল। কুহু বসিল না। দাদার চেয়ারের হাতল ধরিয়া এতক্ষণে কুহু কথা কহিল। কহিল, "দাদা, আজ কি আমরা বাড়ী যাব?"

ছোট্ট একটি প্রশ্ন, উহার ভিতরে কত অব্যক্ত উৎকণ্ঠা, আশা নিহিত রহিয়াছে।

দিবাকর মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া চুপে চুপে বলিল, "আজ তোদের যাওয়া হবে না, কুহু। জয়ন্ত এখন যেতে পারবেন না। দিন পনেরো পর তার যাবার ইচ্ছা। হিরণদা তখন তোদের নিয়ে যাবেন, আমি আজকেই অন্যত্র যাচ্ছি।"

একটি ফুংকারে কুহুর আশার বাতি নিভিয়া গেল। মনে পড়িল পিতার সৌম্য শান্ত বদনমণ্ডল। মা'র স্নেহ-বিমণ্ডিত মুখচ্ছবি। ছোট ভাই তপুর ভালবাসা। আরও একপক্ষকাল ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কাটাইতে হইবে। প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন, তাহার পর সন্ধ্যা ধীরমন্থরগতিতে আসিবে, যাইবে, তাহার কত দিন পর সেই শুভলগ্ন দ্বার-প্রান্তে আসিবে। কিন্তু সে দিন দাদা কোথায় থাকিবেন? এ রূপ-রসময়ী ধরণীর কোন্ প্রদেশে নির্জ্জন অন্ধকার তাহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে!

কুহুকে আজ লইয়া গেলে এই উপলক্ষে দিবাকর মা'র

স্নেহাঞ্চলের তলে আরও কয়েক দিন বিশ্রাম করিতে পারিত। যখন তাহারা যাইবে, তখন দাদা কাছে থাকিবেন না ভাবিতেই কুহুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া চোখে জল আসিতেছিল। দুইখানি ব্যাকুল বাহু মেলিয়া দাদাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার কেবলই বলিতে সাধ হইতেছিল, "তোমায় যেতে দেব না; যেতে দেব না।" কিন্তু আঁকড়িয়া ধরিলেই কি রাখা যাইবে? যে কর্ত্তব্যের বিষাণ ধ্বনিতে মা'র অশ্রুধারা, বাবার অব্যক্ত যন্ত্রণা ভাসিয়া গিয়াছে, সেখানে ক্ষুদ্র কুহুর কতটুকু শক্তি?

এখন যাওয়া হইল না, জানিয়া কুহু দুঃখে কিছু বলিতে পারিতেছে না, ভাবিয়া দিবাকর সস্নেহে বোনকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বিস্মিত হইল। কুহুর ঘনকৃষ্ণ আঁখির কোলে কয়েক ফোঁটা অশ্রু টল-টল করিতেছে।

হিরণের নিকটে উহা লুকান রহিল না। শুক্তির মুক্তার ন্যায় এ অশ্রু হিরণের কাছে কুহুর মূল্য বাড়াইয়া দিল। সংশয়ে, সম্ভ্রমে, সস্নেহে হিরণ আজ প্রথম উপলব্ধি করিল, ঐ চোখের ঐ জল মুছাইবার নিমিত্ত সংসারের অনেক দুঃখ সে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে পারে।

২৭

সন্ধ্যা হয় হয়। ললাটে তারার টিপ পরিয়া নীলবসনা সন্ধ্যারাণী দেবী ধরিত্রীকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন। দূরের নারিকেলকুঞ্জের শীর্ষে আষাঢ়ের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমিয়া নীলাম্বর-গায়ে মেঘডম্বর শাড়ী বিছাইয়া রাখিয়াছে।

মুক্ত বাতায়নে আশ্রয় লইয়া কুহু অনিমেষ-নয়নে সম্মুখের সরল প্রশস্ত পথের পানে চাহিয়াছিল। পথিক বা পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকা, ছায়ামগ্ন তরু, বিচিত্র যান-বাহনাদি কিছুরই প্রতি তাহার একাগ্রদৃষ্টি নিবদ্ধ নহে। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে পথ বাহিয়া দিবাকর চলিয়া গিয়াছে, কুহু দুই বিহ্বল নেত্রে সেই পথে তাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

রেশমের পর্দ্দা সরাইয়া দাসী নিস্তারিণী ওরফে নিস্তার নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিল। নিস্তার যৌবনসীমা অতিক্রম করিলেও এখনও তাহাকে প্রৌঢ়া বলা চলে না। তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ বর্ণের চাকচিক্য খর্ব্বাকৃতি শরীরের আঁটো-সাঁটো বাঁধুনিতে তাহাকে তরুণবয়স্কা বলিয়াই ভ্রম হয়।

নিস্তার অনেক দিন হইল এ সংসারে আসিয়াছে। বাসনার জন্মের পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময়ের মাতা পিত্রালয়ে যাইয়া স্বজনহীনা তাঁতি-বৌকে সাথে করিয়া আনিয়াছিলেন। তদবধি নিস্তার এই সংসারেই আছে, কেবল আছে নয়, আধিপত্য লাভ করিয়াছে, মনিবের কৃপায় নিস্তার অপরাপর দাস-দাসীদিগের মধ্যে সময়-অসময় দুই চারি টাকার মহাজনি করিয়া থাকে। তাহার শ্বশুরের আমলের জীর্ণ-প্রায় খড়ের কুটীর সম্প্রতি পাকাঘরে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

ভাতি পুরাতন দাস-দাসীকে পছন্দ করে না। তাহাদের অনেক দোষ, মনিবকে সমীহ করিয়া কথা বলিতে পারে না। কাযের খুঁত ধরিয়া অন্য ঝি-চাকরদের সহিত ঝগড়া করিয়া বেড়ায়।

ভাতি নিস্তারের প্রতি অপ্রসন্ন জানিয়া জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে ভূষণডাঙ্গার বাড়ীতেই রাখিয়াছিলেন। বিবাহোপলক্ষে আত্মীয়াদের সহিত নিস্তারকে এখানে আনিয়া কুহুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

নিস্তারের রসনা ক্ষুরধার হইলেও সে আসলে অন্তঃকরণ-শূন্য নহে। নির্ম্মল স্বভাবচরিত্র, মনিবের তুচ্ছ তৃণগাছির প্রতিও যত্ন, এই সমস্ত গুণে জ্যোতির্ম্ময়ের নিকটে নিস্তার অতিশয় করুণার পাত্রী।

বেশভূষার প্রতি নিস্তারের অখণ্ড অনুরাগ। মুখখানি দিবারাত্রি তৈলসিক্ত। সীঁথির নীচে কপাল পর্য্যন্ত পেটিপাতা চুলের একগাছিও এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। ঠোঁট দু'টি পাণ-দোক্তায় টুকটুকে। উপর হাতে মোটা ফুলদার অনন্ত। তিন আঙ্গুলে তিনটি পাথর-বসানো আংটী। গলায় সরু, মোটা দুই গাছা হার। কাণে ওপেলের বড় বড় কাণফুল। কোমরে রূপার গোট। এ সমস্তই মনিবের নিকটে বকশিস হিসাবে প্রাপ্তি। মাহিনার টাকা ভাঙ্গিয়া ইহার কিছুই নিস্তারকে করিতে হয় নাই। নিস্তার জমীদারের খাশমহলের দাসী। বে-আব্রু থাকিলে তাহাকে মানায় না। সে চওড়া পাড় শাড়ীর নীচে অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত লেসযুক্ত গোলাপী সেমিজ ব্যবহার করে। শাড়ীর পাড়, সেমিজের রং অপছন্দ হইলে সরকারের সহিত কোন্দল বাধায়।

বিধবা নিস্তার মণিবন্ধে অলঙ্কার পরিতে পায় না বলিয়া দুঃখিত। তাহার দুঃখ বুঝিয়া অন্য দাসীরা যদি বলে—"এতই করলি নিস্তার, ওইটুকুনই বা বাকী থাকে কেন? আঙ্গুল

ফুলে যখন কলাগাছ হয়েছে, তখন সোণার চুড়ি কগাছাই বা দোষ করলে কি ?"

নিস্তার চটিয়া লাল। "চোকখাকীরা আমার আঙ্গুল ফোলা ছাখে, বিধবাকে চুড়ি পরতে কয় ? কি লজ্জা, কি ঘেন্না মা গো। আমি কোথায় লুকোব ? যে গতরখাকীরা কয়, তাদের যে যেখানে থাকে মরুক, ঝরুক, পুড়ুক। তখন বিধবার গয়নার খোঁটার দুঃখু বুঝবে।"

নিস্তার কাঁদিয়া বকিয়া অবশেষে শান্ত হয়। তাহার সহিত কলহযুদ্ধে কেহই অগ্রসর হইতে চাহে না। কারণ, সময় অসময় উহার নিকটে হাত পাতিবার ভরসা রাখে।

নিস্তারের নিঃশব্দপদসঞ্চালনে কুহু চাহিয়াও দেখিল না। নিস্তার কুহুর পদতলে বসিয়া, কাংস্যকণ্ঠ যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া কহিল, "দাদা চ'লে গেলেন ব'লে দুঃখু করছেন, বৌরাণী ? আপনার ঘরে চেরকাল থাক্‌তে হবে। দুঃখু ক'রে লাভ কি ?"

কুহু বাহির হইতে নেত্রদ্বয় ফিরাইয়া আনিয়া নিস্তারের প্রতি স্থাপিত করিল।

নিস্তার পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আজ চুল বাঁধা হ'ল না। সাবান দিয়ে মুখ ধুইলে, কাপড় বদল হ'ল না। বড়রাণী দেখ্‌লে আমায় গাল দেবেন।"

কুহু একটি চাপা নিশ্বাস মোচন করিয়া জবাব দিল, "না, তোমায় গাল দেবেন কেন ? আমি যদি চুল না বাঁধি, কাপড় না ছাড়ি, তাতে তোমার দোষ কি ? দিনভোর কাপড় বদ্‌লানো, চুল আঁচড়ানো, গয়না পরা আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল লাগে না ? বলেন কি ? আপনারা রাজার রাণী, আপনারা বাবুগিরি না করলে কে করবে, মা ? ছাখেন না, বড়রাণীর কি সাজ পোষাক ? রাণী হলেই করতে হয়। হ্যাঁ, রাণী ছেলেন দিদিরাণী, তেঁনার মতন কারুকে হতে হবে না। একালের রাজা-রাণীরা ত সায়েব-মেম।" বলিতে বলিতে নিস্তার উঠিয়া আলোর সুইচের নিকটে গেল।

কুহু তাহাকে আলো জ্বালিতে নিষেধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিরাণী কে ?"

নিস্তার যথাস্থানে পা ছড়াইয়া বসিয়া আরম্ভ করিল, "দিদিরাণী এ বাড়ীর কর্ত্তা মা, আপনার শাউড়ী, আমার শ্বশুরবাড়ীর ছ্যাশের মেয়ে ছিলেন ব'লে আমি তাঁরে দিদি-রাণী ব'লে ডাক্‌তাম। বেবীদিদিবাবুর জন্মের আগে বাপের ঘরে যেয়ে আমার দুঃখু দেখে তিনি আমায় সাথে ক'রে এনেছিলেন। তাঁর বড্ড দয়ার শরীর ছেল, তেমন কারুর হয় না।"

কুহু কহিল, "তখন বুঝি তুমি বিধবা হয়েছিলে। তোমার আপন জন কেউ ছিল না ?"

"না বৌরাণী, কেউ ছেল না। আমার অল্পবয়সে বাপের বংশ সাবাড়। শ্বশুরঘরে স্বোয়ামী আর শাউড়ী ছেল। আমার মেয়ে পুঁটু যখন তিন মাসের কোলে, তখন গাঁয়ে মড়ক লাগলো। আমার স্বোয়ামী হাটে কাপড় বেচতে গিয়েছিল, সেইখেন থেকে ভেদ-বমি ক'রে ঝিমুতে ঝিমুতে ঘরে ফিরে রাতেই পরাণ ত্যাগ করলো। পরের দিন দুপুরে পুঁটু বার কতক দুধ তুলে বাপের কাছে চ'লে গ্যাল। রইনু দুই পোড়া কপালী। তাজা সা-জোয়ান ব্যাটার শোকে শাউড়ী লোকের কাছে বার হ'ত না। কথা কইতো না, ভাত, জল ত্যাগ ক'রে অঝোরে চোকের জল ফেল্‌তো। এত শোক মানুষের শরীলে কয় দিন সয় ? বচ্ছর না ঘুরতে শাউড়ী ব্যাটার কাছে চ'লে গেল। আমার ললাটে দুঃখু, তাই মরণ হ'ল না।

অতীতের স্মৃতি স্মরণে নিস্তারের চোখে জল আসিল। কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া গেল। সমবেদনায় বিগলিত হৃদয়ে কুহু কহিল, "আচ্ছা, সকলেই চ'লে গেল ? সেই সময় তুমি বুঝি মা'র সঙ্গে এ বাড়ী এলে ?"

নিস্তার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া উত্তর করিল, "না মা, তার বছর দুই পর এনু। শ্বশুরের ভুঁই লোকে কি সাধে ছাড়ে ? মেয়েমানুষের সক্কলের বড় তীর্থি সেই। দুঃখু-ধান্ধা নিয়ে সেইখেনেই প'ড়ে রইনু। একটা বুন আছে, সে কইলো 'দিদি, তুই আমার ঠেঙ্গে আয়। আমি যদি শাগ-ভাত খাই, তুই খাবি। আমি যদি উপোস দিই, তুই দিবি।' আমি তা গেলাম না মা, বুন যেন আমার নিজের, এক মার পেটের। ভগ্নীপোত ত তা নয়। সে ভাববে 'আপদ।' তাঁতির মেয়ে, কাপড় বোনা জানতাম। পাড়া-পড়শীদের ধ'রে হাটে থেকে সুতা এনে কাপড় বুনে হাটে পাঠাতেম, একটা পেটের জন্মে আর কত লাগে ? কিন্তু ক আবাগীর ব্যাটারা আমায় ঘরে থাকতে দেল না। রাত

নিশুতি হলেই মুখপোড়ারা চালে ঢিল দিতো, বেড়ায় লাঠি মারতো। পথে ঘাটে হাসি-মস্করা করতো।”

কুহু কহিল, “তুমি গাঁয়ের মোড়লের কাছে, স্বজাতির কাছে অত্যাচারের কথা বল্লে না কেন?”

“বল্লেম বৈ কি, মা। দুঃখীর কথা কে শোনে। যারা রক্ষক, তারাই যে ভক্ষক। সকলে মিলে আমায় দ্যাশে থাকতে দেল না, দিদিরাণী সব শুনে দয়া ক'রে নিয়ে এলেন। সেই থেকে আপনাদের সংসারে রইচি। বড় রাজার মার তুল্যি দয়ার শরীল। বড় রাণীর কিন্তু তা নয়।” বলিয়া নিস্তার সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া লইল।

নিস্তব্ধ অন্ধকার কক্ষে নিস্তারের জীবনের কাহিনী শুনিতে কুহুর মন্দ লাগিতেছিল না। গ্রামের কথার মধ্যে ক্ষীরপুরের অম্লান ছবি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। এ সেই ক্ষীরপুরের ন্যায় ছায়াময় আর একটি গ্রামের সকরুণ ইতিহাস, সুখে, দুঃখে, অবিচারে, অত্যাচারে, আনন্দে, উৎসবে বিজড়িত পল্লীস্মৃতি, উহার তারে তারে গাঁথা কত বেহাগ, ললিত, পুরবী। তাহার দোষ, তাহার গুণ, তাহার পাপ, তাহার পুণ্য তাহাও অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয়। পল্লীর তুলনা পল্লী।

কুহুকে নীরবে চিন্তামগ্ন দেখিয়া নিস্তার তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ডাকিল, “বৌরাণি!”

অত্যন্ত মৃদুস্বরে কুহু কহিল, “তুমি আমায় বৌমা বল্লেই পার? আমাদের মাকে যখন দিদি বল, তখন আমাকে বৌমা বল্লে ভাল হয়। আমি তোমায় পুঁটুর মা ব'লে ডাকবো। আমাদের বাড়ীতে মা নিয়ম ক'রে দিয়েছিলেন, যারা আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, তাদের নাম ধ'রে ডাকতে পাবো না।”

নিস্তার খুসীর সহিত উত্তর করিল, “না, বৌরাণী, আপনারে আমি বৌরাণীই বলবো। একবার বৌমা কয়ে আমার যে লাঞ্ছনা হয়েছিল, তা বলতে নয়। বড় রাণীর বিয়ের পর আমি তাঁরে বৌমা ব'লে ডেকেছিনু। রাণী রেগে মেগে আগুন। বল্লেক ‘বৌমা কি? ম্যামসাব ব'লে ডাকতে হবে।’ আচ্ছা মা, আপনিই বিচার কর, হিন্দুর মেয়ে ম্যামসাব হয় কবে? আমরা গরীব লোক, হুকুম হ'লে না হয় ম্যামসাব কইলাম, তা ব'লে কি সত্যিকারের ম্যাম হওয়া যায়? নতুন নোকরা যা ইচ্ছে বলুক, তাদের সাথে ত নিস্তারের সাধ নেই। নিস্তারের কদর বড় রাজা জানেন, তাই আর কারুর না হয়ে নিস্তারের পাকা দালান হয়? নিস্তার যে দিদিরাণীর ঝি।”

কুহু বলিল, “সত্যি ত, তুমি মার আনা লোক, তোমার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। মা তোমায় খুব ভালবাসতেন, বড়ঠাকুরও ভালবাসেন। উনি মা'র মতই হয়েছেন?”

“চরিত্তিরে হয়েছেন, রূপে নয়। দিদিরাণী আপনার তুল্যি সোন্দর ছেল, নোকে দেখে ধন্যি ধন্যি করতো। চওড়া লাল পেড়ে কাপড় প'রে পায়ে আলতা দিয়ে যখন ঘুরে বেড়াতেন, মনে হ'ত, লক্ষ্মী ঠাকুরুণ। কপালে ডগডগে সিন্দুর, ঠোঁটে পানের দাগ, মুখে হাসি লেগেই আছে। যেমন দয়া, তেমনি বাৎসল্যি। কারুর দুঃখ সইতে পারতেন না। কেউ খালি হাতে ফেরে নাই, কত দান, কত ধ্যান। বড় রাজার মায়ের সমান দয়ার শরীল হয়েছে। আর কারুর নয়।”

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।
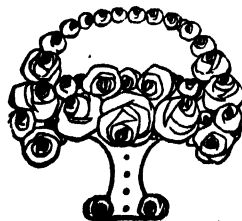
ভোগায়তন

মানবের শরীরযন্ত্র সত্যই প্রহেলিকাময়। এই সাড়ে তিন হাত পরিমিত মাংসপিণ্ডটি বিরাট আত্মাকে কোন এক অভেদ্য আবরণে এমনভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, মানব সহজে জানিতে—বুঝিতে পারে না—তাহার স্বরূপ কি ?

এই ক্ষুদ্র জড়-শরীর বিশ্বব্যাপী বিভু আত্মাকে কিরূপ কৌশলে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেই অপরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থের সহিত সংযুক্ত, শাশ্বত—সত্য—সনাতন—জ্ঞানাধার আত্মাই যে আমি, এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কত শাস্ত্রকথা, কত তত্ত্বোপদেশ কাণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রাণে ক্ষণিক তরঙ্গ তুলিলেও—কখনও বা অজ্ঞাত বেদনা সৃষ্টি করিলেও প্রত্যয় জন্মাইতে পারে না যে, এই শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই।

সকল ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত মালিক গৃহস্বামী যিনি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে— যেমন মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায় কোন চাটুকার বা দালাল, তেমনই এই আত্মজ্ঞানের পথে শরীর সদা-সর্ব্বদাই আগুলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বজন-বিয়োগে শোক-কাতর মানব অবিরত রোদন করিতেছে, মনে করিতেছে—এ মিথ্যা সংসারে আর থাকিব না—এ শরীর আর ধারণ করিব না, এবার নিত্যবস্তুর সন্ধান করিব। শরীর অমনই ধীরে ধীরে অবসাদ—দৌর্ব্বল্য—ক্ষুধার মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিয়া নিজেই দাঁড়াইল তাহার ক্ষণিক-বৈরাগ্যকে আড়াল করিয়া। কোন একটা ফাঁক দিয়া বা ফাঁকি দিয়া গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা মাত্রেই শরীর দালালের মত ছুটিয়া আসিয়া সব ফাঁককে ব্যবধান করিয়া—সমস্ত ফাঁকিকে ধরিয়া ফেলিয়া প্রহরীর মত দণ্ডায়মান থাকিবে। মানব চাহে সুখ—শরীর আপনার অঙ্গে কয়টা ছিদ্র দেখাইয়া দিয়া বলিতেছে—এই ত সুখের দ্বার, আর কোথায় যাইবে ? গৃহস্বামীর খাস কর্ম্মচারী মন। শরীর তাহাকেও বেশ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। শুধু আয়ত্ত নহে, খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিয়াছে। শরীর তাহার গুপ্তস্থান পর্য্যন্ত মনকে ছাড়িয়া দিয়াছে। শরীরের সর্ব্বত্র মনের গতি। কাযেই মন বিশ্বাস করে—এ আমারই প্রিয়, আমার স্বাধীনতা-স্বচ্ছন্দ গতিতে যে বাধা দেয় না, তাহার ন্যায় পরমাত্মীয় কে আছে ? কিন্তু শরীর তাহার অলক্ষ্যে এমন এক কঠিন কুহকের শৃঙ্খলে মনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, মনের সাধ্য নাই, শরীরের বাহিরে আসে। তবে শরীর যে দিন নিজেই শীর্ণ হইয়া যাইবে, জীর্ণ বস্ত্রের মত—শুষ্ক পত্রের মত আপনি খসিয়া পড়িবে, সে দিন মন ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হইবে বটে, কিন্তু পর-মাত্মীয়-বিয়োগে মানবের মত মনের বিশেষ কিছু কর্ম্মশক্তি থাকিবে না।

বাল্য যায়, কৌমার আসে—কৌমারের পর যৌবন দেখা দেয়, এক শরীর ধ্বংস হইয়া অন্য শরীর গঠিত হয়,—এই যে পরিবর্ত্তন, শরীর অদম্য উৎসাহে—এত সত্বর ভাঙ্গা-গড়া সারিয়া লয় যে, বালক ভাবিতেছে—আমি কুমার হইলাম ; কুমার ভাবিতেছে, আমি যুবক হইলাম—আমি সেই আছি। তবে, যখন বার্দ্ধক্যের কশাঘাতে পলিত কেশ ও গলিত মাংসের বোঝাটা দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, মৃত্যুর বিভীষিকা ক্ষণে ক্ষণে মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, তখনই শরীর-দালালের সমস্ত জারিজুরি ভাঙ্গিয়া যায়। এত কৌশল—এত চাতুরী সব ধরা পড়িয়া যায়। মানব তখন কখনও দন্তশূলে, কখনও জ্বরের প্রবল উত্তাপে, কখনও উদরযন্ত্রণায় কাতর হইয়া মনে করে—এ শরীর যদি 'আমি' হইতাম, তবে আমার ইচ্ছামাত্রে অপ্রীতিকর-অপ্রার্থিত উপদ্রব নিবারিত হয় না কেন ? তার পর যখন মৃত্যু আসিয়া পদাঘাত করিতে থাকে, এক এক অঙ্গ শিথিল-নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তখন শরীর আর কিছু করিতে পারে না, মনের কাণে কাণে মন্ত্রণা দিয়া যায়—নূতন শরীরে প্রবেশ করিয়া সুখে থাকিও—আমি চলিলাম। মন তখন 'হা-হুতাশ' করিয়া কিছুকাল ঐ পরম প্রিয় মৃত দেহটার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহে—শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া শরীরান্তরে প্রবেশের পরামর্শ স্মরণ করে।

এক খণ্ড কৃষ্ণমেঘ বিশাল সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু কতক্ষণ ? ভগবদিচ্ছায় একটা বায়ু আসিয়া যতক্ষণ না তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। এই শরীরযন্ত্রকেও এক জ্ঞান উদিত হইলে বিকল করিতে পারে,

নতুবা যে আবরণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—তাহা এক জন্মে কেন, এক কল্পান্তেও দুর্ভেদ্য।

শরীরের মধ্যে একটা চোরকুঠুরী আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন কখনও কখনও গৃহস্বামীর সাড়াশব্দ পায়, সে কুঠুরীর নাম পুরীতৎ নাড়ী, সুষুপ্তি দশায় সংবাদ লইয়া মন যখন বাহিরে আসে, তখন দালালের কলে পড়িয়া মূক হইয়া যায়—কিছুই বলিতে পারে না।

দালালকে বিশ্বাস করে না অনেকে। কিন্তু বিশ্বাস না করিলেই যে গৃহস্বামীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইবে, তাহার ত নিশ্চয় নাই। দালালকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে, অনেক বলের—অনেক ধৈর্য্যের প্রয়োজন। সে বল—সে ধৈর্য্যের অধিকারী হইতে হইলে বিশ্বনাথের করুণা চাই। * বল ও ধৈর্য্যের অভাবে কেহ কেহ দালালকেই গৃহস্বামী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাহারই চরণে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করাকেই পরম-পুরুষার্থ মনে করে। তাহাদের ধারণা—যে গৃহস্বামীর দেখা পাওয়া দুষ্কর, তাহার সন্ধানে ভ্রমণ করা অপেক্ষা—যে সুলভদর্শন, তাহাকেই উপাসনা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। শরীরই আত্মা—শরীরের ভোগই জীবন-সর্ব্বস্ব। জ্ঞান নামক যে পদার্থের এত মহিমা, সে জ্ঞানও এই শরীর হইতেই উৎপন্ন হয়। ভাত গাঁজিয়া যেমন মদ হয়, জ্ঞানও শারীরিক বিকার মাত্র। দেহ ভিন্ন আত্মা নামে অপর কোন পদার্থ মানিলে অনেক অসুবিধা। এক পরকালের দুশ্চিন্তা, দ্বিতীয়—পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি বহুবিধ অতীন্দ্রিয় বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার করিলেই তদনুসারে কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন; ফলে—প্রত্যক্ষ সুখপ্রদ দৈহিক ভোগ ত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবিত হইতে হইবে। এত গণ্ডগোলে যাওয়া অপেক্ষা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই শরীর—যাহা সম্মুখে পাওয়া গিয়াছে, তাহারই তৃপ্তিসাধন করাই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়।

ইহারই নাম চার্ব্বাক-মত। চার্ব্বাক অর্থাৎ চারু বাক—মনোরম উপদেশ! আপাততঃ শুনিতে বড় মধুর, বড় রুচিকর। পরিণামদর্শী সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা বিশেষ আকর্ষক বলিয়া প্রাচীন ভারতীয় মহর্ষিগণ দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে বহু তর্কযুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

* নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ॥

অসুররাজ বিরোচন ও দেবরাজ ইন্দ্র—বহুবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আত্মানুসন্ধান উদ্দেশ্যে সমিৎপাণি হইয়া শিষ্যরূপে প্রজাপতির সকাশে উপস্থিত। প্রজাপতি বলিলেন—ঐ যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দেখা যায়, উনিই আত্মা। পুনরায় প্রশ্ন হইল—জলে বা দর্পণে যে পুরুষমূর্ত্তি দেখা যায়—তিনি কে? উত্তরে প্রজাপতি বলিলেন,—উত্তম বসনে—উত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া পরিষ্কৃত হইয়া তোমরা এই শরাবের জলে দেখ দেখি কি দেখা যায়? তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন—সুভূষিত, সুবস্ত্রপরিহিত, পরিষ্কৃত আমাদের সদৃশ পুরুষ দেখিলাম। প্রজাপতি বলিলেন,—উনিই আত্মা। ইন্দ্র ও বিরোচন সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন। ইন্দ্র পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ প্রতিবিম্বিত পুরুষ-মূর্ত্তিও যে অনিত্য, তাহা জ্ঞাপন করিলে পুনরায় প্রজাপতি আত্মোপদেশ করিলেন। বিরোচন আর ফিরিলেন না—তিনি অসুর-সমাজে নিজ মত প্রচার করিলেন। অসুর-সমাজে দেহাত্মবাদের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাই দেহাত্মবাদের প্রাচীন সংবাদ। দেহাত্মবাদীর সকল কার্য্যই দেহকে লইয়া। তাই অসুরগণ মৃতদেহকে পুষ্প-বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পরকালের কার্য্য করা হইল মনে করে। (ছান্দোগ্য ৮ প্রপাঠক ৭।৮ খণ্ড)

লোষ্ট্রকাষ্ঠবৎ দেহটিকে দগ্ধ করিতে চাহে না, তাহারা দেহটিকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে রাখিলেই মনে করে—পরকালের ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে বিরাধ রাক্ষসের উক্তিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়,—

অবটে বাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ।
রক্ষসাং গতসত্ত্বানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ২৩।
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ।
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং বিরাধঃ শরপীড়িতঃ॥ ২৪
বভূব স্বর্গসংপ্রাপ্তো ন্যস্তদেহো মহাবলঃ।
* * *॥ ২৫

এই শরীরই সুখ-দুঃখ-ভোক্তা, এইরূপ যাহারা মনে করে, তাহাদের বহু সময়ে দুঃখাতিশয় উপস্থিত হইলে—আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জাগে। বেদ বলিলেন,—আত্মহত্যা মহাপাপমধ্যে গণ্য। কেন না, যাহাকে হত্যা করা হইতেছে, সেটা ত দেহ। দেহকেই দুঃখভোগী মনে করা অর্থে দেহকেই আত্মা বলিয়া বোধ করা। এই

জন্য—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ"—আত্মঘাতী ব্যক্তি অন্ধতামিস্র নামক নরকে প্রবেশ করে বলিয়া মানবকে সাবধান করিলেন, দেহাত্মবাদ নিরাশের জন্য শাস্ত্র বহু উপদেশ দিয়াছেন,—তথাপি শরীর যে কত খেলাই খেলিয়াছেন, তাহার সীমা নাই।

অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে যখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকের দল প্রবল হইয়া উঠিল, তখন দেখা যায়, এই শরীর মহাশয় চার্ব্বাকের চারুরূপ ত্যাগ করিয়া নব-কল্পনা লইয়া মানবের মোহ জন্মাইতে লাগিল। আত্মানুসন্ধানের শেষ ফল হইয়াছিল—মুক্তিলাভ, এই মুক্তি শরীর-পাত করিয়া প্রাপ্য না শরীর রক্ষা করিয়া? জীবন্মুক্তি না বিদেহমুক্তি—কোন্‌টা আকাঙ্ক্ষণীয়?

বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের মধ্যে তখন বহু সম্প্রদায়। বৌদ্ধ মতের সহিত তান্ত্রিক মতের এতই বিরোধ ছিল যে, 'বৌদ্ধ' নাম পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায়। মাহেশ্বর সম্প্রদায়, সিদ্ধোপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়, ইহাদের মতে বিদেহ-মুক্তি অকিঞ্চিৎকর। যদি দেহই গেল, তবে আর রহিল কি? বাঁচিয়া থাকিলেই অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। যদি বাঁচিতেই না পারা যায়, তাহা হইলে মুক্তি-সুখ উপভোগ করে কে?

যং জরয়া ঝর্ঝরিতং কাসশ্বাসাদিদুঃখবিপদক্ষ।
যোগ্যং তং ন সমাধৌ প্রতিহতবুদ্ধীন্দ্রিয়প্রসরম্॥

জরা-ঝর্ঝর—কাস-শ্বাস-কষ্টে ক্লিষ্ট দেহের বুদ্ধি ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ সমাধিযোগ্য হইতে পারে না। আরও দেখা যায়,—

বালঃ ষোড়শবর্ষো বিষয়রসাস্বাদ-লম্পটঃ পরতঃ।
জাতবিবেকো বৃদ্ধো মর্ত্ত্যঃ কথমাপ্নুয়ান্ মুক্তিম্॥

মানব ষোল বৎসর পর্য্যন্ত নাবালক, তাহার পর যৌবনে বিষয়রসে মগ্ন হইল। যখন বিবেক প্রাপ্ত হইল, তখন দেখা যায়—তাহাকে বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিয়াছে। তখন না আছে শক্তি, না আছে উৎসাহ—মুক্তিলাভ করিবে সে কেমন করিয়া? আর মুক্তি যদি জ্ঞানস্বরূপা হয়, তাহা হইলে দেহধারণই তাহার উপায়। আর যদি শশবিষাণাদিবৎ কাল্পনিক বস্তু হয়, তাহা হইলে অন্য কথা। সুতরাং দেহধারণ সহ জীবন্মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। এক্ষণে কাহারও শঙ্কা হইতে পারে—জীবন্মুক্তি সম্ভবপর কি না? তাহার উত্তরে উক্ত সম্প্রদায় প্রমাণ দিতেছেন—কেন, দিব্যদেহ নির্ম্মাণ করিলেই চিরজীবী হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ। স্বয়ং দিব্যদেহ নির্ম্মাণ করিতে হরগৌরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। হর—রসস্বরূপ অর্থাৎ পারদ ও গৌরী অর্থে অভ্র, এই পারদাভ্র প্রয়োগে—মানব চিরজীবী হইতে পারে। পারদ—যিনি পরপারে লইয়া যান (পারং দদাতীতি)—রসার্ণব গ্রন্থোক্ত অষ্টাদশ প্রকার সংস্কারে সংস্কৃত পারদাভ্র দিব্যদেহ নির্ম্মাণে সমর্থ। ভ্রূমধ্যে এই পারদাভ্র লাগাইলে মানব ঊর্দ্ধস্রোতাঃ হইবে, শরীরের ক্ষয় হইবে না। সিদ্ধোপাসক সম্প্রদায়মধ্যে পারদ পান করিবার প্রথা ছিল। জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে এই বিষয়ে সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এখনও তিব্বতে এইরূপ দিব্যদেহধারী মানবের অস্তিত্ব আছে। ইঁহারা 'দেও' নামে পরিচিত। ইঁহাদের জিহ্বায় প্রত্যহ মাখম লাগাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতেই তাঁহারা জীবিত থাকেন। সমাধিস্থ—জড়বৎ দেখা যায়, নখ দ্বারা চর্ম্ম খুঁটিয়া দিলেই রক্ত বাহির হয়, সুতরাং জীবিতের চিহ্ন বর্ত্তমান, এতদ্ব্যতীত আর কোন বাহ্যলক্ষণ নাই।

আত্মানুসন্ধানের পথে শরীরের যে কত খেলা, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। এই শরীর ও আত্মার মধ্যে বাস্তবিক কোন সাদৃশ্য নাই—স্বভাবগত ঐক্য নাই, অথচ আত্মজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় এই শরীর, আবার অন্যদিকে শরীরকে অবলম্বন করিয়াই আত্মজ্ঞানের সোপানে অগ্রসর হইতে হয়—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।—তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরকভাষ্যের আরম্ভ ভূমিকাতেই এই শরীর ও আত্মার স্বরূপ ও সম্বন্ধের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, 'তুমি' বলিতে শরীরকে আর 'আমি' বলিতে আত্মাকে বুঝা যায়। এই শরীর ও আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। একটা জড়, একটা চেতন; একটা খণ্ড—একটা অনন্ত। উভয়ের মিলন হইল কেমন করিয়া? এই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, উভয়ের সম্বন্ধ হইয়াই আছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। শেষে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, অবিদ্যা বা মায়াই এই সম্বন্ধ ঘটাইয়া মানবকে শরীরযন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। সেই মায়াকে বুঝিতে পারিলেই, শরীর ও আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটে না।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম, এ)।

"তরণী"-"তারিণী"-"তরুণী"

সরু গলির মধ্যে আমাদের বাড়ী। কলিকাতার গলির কথা আর বলিতে হইবে না, এমন গলিও আছে—যাহার ভিতর ঢুকিয়া আমাদের পাড়ার নিত্যানন্দ গোঁসাই এক দিন কষ্টে-সৃষ্টে অর্দ্ধপথ হইতে পাছু হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! কারণ, গোঁসাইজীর দৈহিক আয়তন সাধারণের তুলনায় একটু অত্যধিক, আমার মত প্রাণীর অন্ততঃ আট গুণ! সরু গলি হইলেও আমাদের পাড়া। তাহাতে এক সময়, ধরুন বিশ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের আশে-পাশে সম্মুখের বাড়ীতে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই পরস্পরের এমন মেলা-মেশা একাত্মভাব ছিল যে, মনে হইত, সমস্ত পল্লীটা যেন এক বাড়ী—আর সকলে একই বাড়ীর লোক—একই পরিবারভুক্ত। এখন "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী"—ভাব! কেহ বাড়ী বেচিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কেহ বা বাড়ী ভাড়া দিয়া তাহাতে নানাজাতীয় ভাড়াটিয়া বসাইয়াছেন। ভাড়াটিয়া আসুক দুঃখ নাই, কিন্তু বাড়ীর চারিদিকে যদি দোতলা তিনতলা কোঠাবাড়ীতে উড়ে বেহারার দল অথবা পাণওয়ালা, বিড়িওয়ালা, চানাচুরওয়ালা শ্রেণীর ভাড়াটে আসিয়া সদলে সপরিবারে ভর করে, তাহা হইলে পল্লীর ভদ্র গৃহস্থ বাসিন্দাদিগের পক্ষে নিজ ভিটায় বাস করা কিরূপ প্রাণান্তকর হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

আমাদের বাড়ীর ঠিক সম্মুখের বাড়ীটি আমাদেরই কোনও নিকটাত্মীয়ের নিকট হইতে এক জন "ক্ষেত্রী" ভদ্রলোক কিনিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। তিনি সপরিবারে থাকেন উপরে—দ্বিতলের দুইটি ঘরে; বাকী ঘরগুলি ভাড়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী গৃহস্থ ভদ্রলোক যদি সপরিবারে বাস করিবার জন্য কোন পল্লীতে বাড়ী ভাড়া করেন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তিনি পল্লীর আশে-পাশে ভদ্রলোকদের সহিত পরিচয় করিয়া মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা করেন। কিন্তু আমার বাড়ীর সম্মুখস্থ ঐ ক্ষেত্রী মহাশয়ের বাড়ীর নীচের তলায় দুটি ঘর যে বাঙ্গালী গৃহস্থ ভাড়া লইয়াছেন, আশ্চর্য্য, তাঁহাদের কেহই পল্লীর কোন লোকের সহিত কখনও বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন না, আলাপ-পরিচয় ত দূরের কথা।

থাকিতে থাকিতে ক্রমে সবই নজরে পড়ে। উক্ত পরিবারে দেখিতাম, হরেক রকমের তরুণ ও তরুণীর আসা-যাওয়া, রহস্যালাপ, কথাবার্ত্তা, গান-বাজনা চলিতেছে। জন তিনেক তরুণী আর জন পাঁচ-ছয় তরুণ, ইহাদের সদা-সর্ব্বদা দেখা যাইত। পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা বা গৃহিণীর কোনও বালাই ছিল না। সব তরুণ-তরুণী!

কিন্তু আমার বড় জ্বালা,—প্রত্যহ তরুণ-তরুণীর মেলা আমার বৈঠকখানার জানালার সম্মুখে বসিত। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রির ত কথাই নাই,—মিহিকণ্ঠে ক্রমাগত তান উঠিতেছে—

"তরণী জুয়ারে ভাসায়ে,—
(কে) এলে হে নবীন নেয়ে!"

কায নাই, কর্ম্ম নাই, কোন ঝঞ্ঝাট নাই, তাকিয়া ঠেস দিয়া গুড়গুড়ির নলটি মুখে লইয়া চক্ষু মুদিয়া নির্জ্জনে বসিয়া বামাকণ্ঠের সঙ্গীত বড় মন্দ লাগে না! কিন্তু আমার এ সবের কোনও সুবিধা নাই! সকাল-সন্ধ্যা বৈঠকখানায় বসা মানে রাজ্যের হাঙ্গাম পোহানো! সংসার করিতে বসিয়া সুখের মধ্যে, দেখি—চারিদিক হইতে সকলেই সমস্বরে হস্ত প্রসারণ করিয়া কেবল বলিতেছে—"অস্তি নাস্তি ন জানামি দেহি দেহীতি কেবলম্!" তাহার উপর ছেলের অসুখ, মেয়ের বাড়ীর তত্ত্ব, ঐ বড়মাসীর বাড়ী খবর লইতে যাওয়া হইল না। তাহার পর দশটা বাজিতে অফিস যাইবার তাড়া! এ সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে একটু আরাম করিয়া গান শুনি কখন্ মন নিবিষ্ট করিয়া? এই ত গেল—এক দফা! দ্বিতীয় দফা, তরুণ-তরুণীর মেলা বসিয়াছে, আমার পোড়া কপালদোষে আমারই বাড়ীর বৈঠকখানার জান্‌লার "রুজু-রুজু।" এখানে আমার কাছে আমার ছেলেরা বসিয়া রহিয়াছে, ভাইয়েরা আসিয়া কাযের কথা কহিতেছে। সাংসারিক ও বৈষয়িক পরামর্শ চলিতেছে, এমন সময় তান উঠিল—

"তরণী জুয়ারে ভাসায়ে—"

যুগ-মাহাত্ম্যে এবং গান্ধিজীর স্বরাজ-সাধনা বা হরিজনসেবার যুগে লজ্জা, সরম, সঙ্কোচ, দ্বিধা, এ সমস্তই বাঙ্গালা দেশে ক্রমে 'নিষিদ্ধ ফল হইয়া দাঁড়াইতেছে', কিন্তু আমাদের মত অর্ব্বাচীন সেকেলে পুরাতন যুগের দু-দশটা ভদ্র গৃহস্থ-সংসার এখনও আছে, যেখানে ছেলেরা বা মেয়েরা বাপমায়ের বা গুরুজনের সম্মুখে নগ্নচিত্র খুলিয়া আর্টের বিচার করিতে সাহস করে না, বা প্রকাশ্যে তাঁহাদের কাছ হইতে টাকা চাহিয়া লইয়া চাকরকে জনন-নিয়ন্ত্রণের বিলাতী বস্তু ক্রয় করিবার জন্য বাজারে পাঠাইবার কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং এই তরুণী-কণ্ঠের "তরণী"র গান শুনিয়া সে দিকে চাওয়া দূরে থাক্, কি জানি কিসের লজ্জায় সকলেরই মনে কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ হইল। আরও ছিল জ্বালার উপর জ্বালা! ছেলেবেলা হইতে একটা বদ্ অভ্যাস আছে—অবসর-মত একটু আধটু সাহিত্য-চর্চ্চা করা, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে গল্প-প্রবন্ধ লেখা! উৎকট বাতিকে দু দশখানা উপন্যাসও বাজারে বাহির করিয়া বিশ বৎসর যাবৎ দু পয়সা উপরি রোজগার করিতেছি। সেই অভ্যাসের দোষে, হয় ত কলম লইয়া কাগজে "শ্রীদুর্গা" ফাঁদিয়া এক ছত্র সুরু করিয়াছি, ব্যস্, কাণের কাছে তরুণী সুর ধরিলেন—

"তরণী জুয়ারে ভাসায়ে—"

লেখা গেল যমের দক্ষিণ-দ্বারে—তার উপর খুকী—(ছোট মেয়ে) গান শুনিয়া (কোথায় বাড়ীর ভিতর খেলা করিতেছিল) একেবারে ছুটিয়া আসিয়া গলা ধরিয়া ডেস্কের সম্মুখে আমার কোল জুড়িয়া বসিয়া আব্দার ধরিল—"বাবু—তরণী দেখবো—নীচের জান্‌লা খুলে দাও।"

"তরণী দেখ্‌বি কি রে, পাগ্‌লী?"

তাহার মনোগত ভাব যে বুঝি নাই—তাহা নয়।

"ঐ জান্‌লার নীচের দিকটা খুলে দাও—তোরোনি গান দেখ্‌বো!"

অর্থাৎ ত্'পাল্লার খড়খড়ির নীচের জোড়াটি ছিল বন্ধ, খুকীর বায়না, সে-দুটি খুলিয়া দিলে তিনি "তরণী" গানটি শোনেন, আর "তরণী"-গানের গায়িকাটিকেও সেই সঙ্গে দেখিয়া চক্ষু-কর্ণের সার্থকতা সম্পন্ন করেন।

আমি বলিলাম—"না—ছি! তরণী দেখ্‌তে নেই! যা, বাড়ীর ভেতর যা—"

খুকী বাপের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন তরণী দেখ্‌তে নেই, বাবু? মা তোমাকে বক্‌বে?"

খুকীর প্রশ্নে প্রাণ শুকাইয়া গেল! ছ'বছরের মেয়ে,—অজ্ঞান বলিলেও চলে! কিন্তু তাহার মায়ের শাসনগণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া তাহার হতভাগ্য বাপকে কোন্ কোন্ আইনগুলি অবশ্যই মানিয়া চলিতে হয়, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা খুকীর সঙ্গে সঙ্গত নহে বিবেচনায়—একটু যেন বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"কাযের সময় তুই বড্ড জ্বালাতন করিস্, খুকী! এই যে—জান্‌লা খুলে দিলুম,—চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে গান শোন্"—বলিয়া নীচের খড়খড়ি খুলিয়া দিলাম।

খুকী জানালার গরাদে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া তন্ময়চিত্তে "তরণী" দেখিতে ও শুনিতে লাগিল।

"তরণী জুয়ারে ভাসা" থামিল বটে,—কিন্তু বক্রদৃষ্টিতে দেখি, গায়িকা তরুণী "হারমোনিয়ামকে" বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে, খুকী?"

"না—" বলিয়া খুকী দৌড়িয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে গৃহিণী দস্তুরমত বিদ্রোহিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একেবারে কঠোর আইন জারি করিবার জন্য প্রস্তুত। বলিলেন, —"কাল থেকে বৈঠকখানায় চাবি দেবার ব্যবস্থা করো। তুমি কাযকর্ম্ম লেখাপড়া উপরে বসেই করবে—বুঝ্‌লে?"

গম্ভীরভাবে বল্লুম—"না।"

"না—মানে?"

"না—মানে, বুঝ্‌লুম না—এ-রকম অন্যায় আব্দারের তাৎপর্য্য কি?"

"দেখো,—এখনও মনে কর্‌ছো বুঝি ছোক্‌রাটি আছ? আর্সিতে একবার ভাল ক'রে দেখো দিকি,—মেঘে মেঘে যে ঢের বেলা হয়েছে! আর কেন এ সব বাঁদ্‌রামি?"

"মেঘে মেঘে বেলা যে যথেষ্ট হয়েছে—তা ঘড়ী দেখেই বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু তা ব'লে—বৈঠকখানায় বস্‌বো না—এ বা কোন্ দিশি কথা?"

দেবী আর তখন রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন না। স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে, আমি ঐ "তরণী"-র গায়িকা তরুণী-সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িয়াছি। আলাপের কোন সূত্র না পাইয়া শেষে দুধের মেয়েকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া সে কার্য্য-সাধনের উদ্যোগ করিয়াছি।

"রাম—রাম! দুর্গা—দুর্গা" বলিয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলাম। শুনিলাম—খুকী বেচারীকে পর্য্যন্ত রীতিমত একচোট্ তাড়না হইয়াছে—"ফের্ যদি ঐ 'তরণী' শুন্‌তে বার-বাড়ীতে ছুটে যাও—মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো!"

খুকীও নাকি তাড়নার চোটে এবং প্রহারের ভয়ে বলিয়াছিল,—"বাবু জান্‌লা খুলে দিলে 'তরুণী' শুন্‌তে! বা—রে—আমার কি দোষ?"

হায়! খুকীর মনে এই ছিল! ঘোর কলি!

একটা কথা আছে—"দশচক্রে ভগবান্ ভূত।" গোটাকতক ব্যাপারে সত্যই বিধাতার চক্রে লোকের কাছে আমাকে "ভূত" বনিতে হইয়াছিল! আমার সম্বন্ধে গৃহিণীর এই অন্যায় সিদ্ধান্তের দুই একটা কারণ আছে। তাঁহার এইরূপ বিচার এবং কঠোর রায়-প্রকাশ অনেকটা অবস্থা-ঘটিত সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য! সুতরাং তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

এক দিন বেলা প্রায় ছ'টা—বর্ষাকাল—অফিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছি। ট্রাম হইতে নামিলাম—আর মুষলধারে বৃষ্টি সুরু। আমি দিব্য ছাতা মাথায় চলিয়াছি,—দেখি, দুইটি তরুণী, সাণ্ডেল পায়ে,—পৃষ্ঠে বিনুনি ঝুলানো,—দুই জনেরই বগলে বইয়ের তাড়া,—বৃষ্টিতে নিজের নিজের আঁচল হাত দিয়া তুলিয়া মাথা বাঁচাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় যত্নবতী হইয়া চলিয়াছেন—আমাদেরই পল্লীর ভিতর দিয়া। দেখিয়াই বুঝিলাম—কলেজের ছাত্রী,—বোধ হয়, কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন। ভাবিলাম, বলি—"ভিজ্‌ছেন কেন অনর্থক? কোথাও—কোন বাড়ীর দরজায়—নিদেন গাড়ী-বারান্দার তলায় দাঁড়ান না!" কিন্তু তখনই মনে হইল—"অবলা! হঠাৎ কার বাড়ীর মধ্যেই বা ঢুকিবেন! আর কাছাকাছি গাড়ীবারান্দাও দেখা যায় না!" অগত্যা ছাতিটা তাঁহাদের মাথার উপর ধরিয়া বলিলাম, —"কিছু মনে করবেন না, ছাতিটা নিয়ে যান্—অনর্থক ভিজবেন না! ধরুন!"

অগত্যা আমার হাত হইতে ছাতাটা লইলেন বটে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"আপনি ভিজে যাবেন?"

"আমার বাড়ী ঐ সামনের গলিতে! ৩৮ নম্বর,—বারান্দাওলা লাল রঙের বাড়ী। যাকে দিয়ে হোক্ পাঠিয়ে দেবেন—যে দিন হোক্—"

দ্রুতপদে ভিজা-বিড়াল হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ঠিক পরের দিন—(সে দিনটি আবার দুর্ভাগ্যক্রমে কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে ছুটীর দিন ছিল) বেলা আন্দাজ সাড়ে সাতটায় ছেলেদের পড়িবার ঘরে বসিয়া চা খাইবার উদ্যোগ করিতেছি——বাবা তখন জীবিত,—বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন,—আমার বড় ছেলে মেজ ছেলে তাঁহার কা'ছে বসিয়া। এমন সময় কর্ত্তার বৈঠকখানার কাছে আসিয়া তরুণী দুইটি আমার ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনয় বাবু আছেন?"

আমার মুখের চা মুখেই রহিল। ভয়ে, লজ্জায়, সঙ্কোচে গলা শুকাইয়া গেল! মনে হইল, কি যেন ভীষণ পাপ-কার্য্য গোপনে

সাধন করিয়াছি, যেন—বাবার কাছে, ছেলেদের কাছে হাতে-হাতে ধরা পড়িলাম! তবু সাহসে ভর করিয়া—তাঁহাদের দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি পড়িবার ঘর হইতে বাহিরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম—"এই যে! আপনারা কষ্ট ক'রে এসেছেন!"

দুই জনেই হাসিয়া নমস্কার করিয়া পরম আপ্যায়িত ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"কষ্ট আর কি? বরং আমাদের জন্য যে কষ্ট কাল আপনি করেছেন"—বলিয়া ছাতাটি আমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

এক জন বলিলেন—"চা খাচ্ছেন বুঝি?"

"আজ্ঞে—"

তরুণী-যুগল নড়িতে চাহেন না!

"এইটি বুঝি আপনার পড়বার ঘর?" বলিয়া উঠান হইতে ঘরের ভিতরটা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সঙ্গীন অবস্থা! তবু ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম—"কষ্ট ক'রে যখন এতটা এলেন, এক পেয়ালা চা খেয়ে যান্ না।"

"আপত্তি কি!" বলিয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহারা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দুখানি চেয়ারে বসিলেন। বুক্-শেল্ফ্-আলমারির দিকে চাহিয়া এক জন বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ, আপনার ঘরখানি একটি ছোট-খাটো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী দেখছি।"

বিনোদ (ছোট ভাই) রীতিমত ব্রিট্যানিয়া বিস্কুট, মাখন-মাখানো রুটী ও চা নিজের হাতে বহন করিয়া তাঁহাদের সার্ভ করিল। ভদ্রমহিলা—না না—তরুণীরা আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন, বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, যে যা ভাবে ভাবুক, দূরে দূরে বসিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া যাহার যাহা খুসী অভিমত ব্যক্ত করিতে থাকুক, আমি সে সময়টুকুর মত ভদ্রতায় ত্রুটি করিব কেন? তার পর বাবা যদি ইঁহাদের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করেন, তার জবাবদিহী করিব আমি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা আমার নাম জান্‌লেন কি ক'রে?"

"মনে নেই,—সেই 'মার্ক অব্ জোরো' দেখতে গিয়ে বায়োস্কোপে আলাপ হয়েছিল?"

"আমরা আপনার গল্প উপন্যাস অনেক পড়েছি! সাহিত্য-বাজারে আপনাকে চেনা বড় শক্ত নয় ত!"

দুজনেই কলেজের ছাত্রী,—এক জন ইণ্টারমিডিয়েট সেকেণ্ড ইয়ারে পড়েন,—অপরটি বি-এস্‌সি থার্ড ইয়ারের ছাত্রী।

মনে পড়িল, ইঁহাদের সহিত প্রথম আলাপের দিনের ব্যাপার। কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারে ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কসের "মার্ক অফ জোরো" তখন সবেমাত্র দেখানো সুরু হইয়াছে। দুই তিন দিন টিকিট না পাওয়ায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিলে এক দিন ভগবান সদয় হইলেন। এক টাকা দুই আনা দিয়া একখানি টিকিট পাইলাম বটে, কিন্তু বর্ব্বর টিকিট-বিক্রেতা যে টিকিটখানি আমাকে গছাইলেন, সে আসনের চতুষ্পার্শ্বে কেবল নিছক তরুণীর দল। আমি তাহাদের মধ্যস্থলে "হংসমধ্যে বকো যথা" হইয়া পড়িলাম। এক একবার এমন অশোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল,—মনে হইল—"যাই—টিকিটখানা বদল করিয়া লই, অন্য যায়গায় বসি।" আবার ভাবিলাম—এই কঠোর অঙ্গে তরুণী-পদ্মরাশিকে আঘাত করিতে করিতে পদ-সঞ্চালন করিয়া স্থানত্যাগ শোভনীয় হইবে না, ঘণ্টা দুই-আড়াই বই নয়! থাকি—মরিয়া হইয়া,—চুপচাপ বসিয়া! তরুণী-সম্প্রদায় দস্তুরমত পূর্ণস্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক দিব্য পরস্পরে কথাবার্ত্তা বিশ্রম্ভালাপ চালাইতেছেন। আমি যে মাঝখানে একটা আকাট পুরুষ বসিয়া আছি, আমাকে ত গ্রাহ্য নাই! এ যেন—চারিদিকে ষণ্ডামার্ক পুরুষের দল মনের আনন্দে ফূর্ত্তির স্রোত চালাইয়াছে—আর আমি সেখানে একটি ভীতা—সন্ত্রস্তা—লজ্জানম্র নববধূ—নতমুখী—এমনি ভাব!

মাটী করিল একটা হতভাগা অর্ব্বাচীন! আমি যে আসনে বসিয়াছিলাম—তাহারই পশ্চাদ্ভাগের পশ্চাতে বর্ব্বরটা বসিয়াছিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"এই যে বিনয়দা'—বায়োস্কোপে এসেছেন?"

তাহার চীৎকারে চটিয়া গিয়া বলিলাম—"কি রকম বোধ হয়? গঙ্গাস্নানে এসেছি?"

তরুণীকুল হাসিয়া আকুল!

সে ব্যক্তি ইহাতেও নিরস্ত হইল না। বলিল—"আপনার 'অশোকের ব্যথা' উপন্যাসখানা পড়লুম! ভারি চমৎকার হয়েছে! এর মধ্যেই শুন্‌লুম প্রথম সংস্করণ ফুরিয়েছে! ফুরোবেই ত! উঃ, আচ্ছা লিখেছেন! আজকালকার সমাজটাকে—উঃ—"

সে আমার পশ্চাতে—আমি তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি নাই! কিন্তু এমন বিশ্রী বক্তার লোক,—আমি তাহার সঙ্গে আলোচনায় যোগদান না করিলেও সে অনর্গল তাহার পার্শ্বস্থ এক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে (পরিচিত কি অপরিচিত ভগবান জানেন) অনর্গল আমার সম্বন্ধে বকিয়া যাইতে সুরু করিল। খানিক পরে আবার একবার আমাকে খোঁচা দিয়া বলিল—"নতুন কিছু লিখছেন?"

গম্ভীরভাবে বলিলাম—"না।"

আমার কথা না শুনিয়াই আবার বলিল—"কবে বেরুচ্ছে? পূজোর পরেই?"

"হ্যাঁ।"

তরুণীদল আবার হাসির রোল তুলিলেন। কি জন্য, বলিতে পারি না, বোধ হয়, আমাদের অপরূপ প্রশ্নোত্তর শুনিয়া।

বায়োস্কোপ সুরু হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। পাখা চলিলে কি হইবে,—এত লোকের নিশ্বাসে প্রেক্ষাগৃহ যেন "বয়লার"-ঘর হইয়া উঠিয়াছে। রুমাল বাহির করিয়া একবার মুখখানা বেশ করিয়া মুছিয়া লইলাম।

সেই অর্ব্বাচীনটার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর বেশ বুঝিতে পারিলাম, তরুণীদলের মধ্যে আমার সম্বন্ধে একটু নিম্নস্বরে আলোচনা চলিয়াছে। তাঁহারা চিনিতে পারিয়াছেন, আমিই সেই সাহিত্যিক বিনয় মুখুয্যে! এক একবার তাঁহাদের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, বেশ বুঝিতে পারি—ইঁহারা আলাপ করিবার জন্য উৎসুক।

হঠাৎ আমার দক্ষিণ পাশের তরুণীটি বিনয়নম্র স্বরে বলিলেন—"কিছু যদি না মনে করেন, স্যর,—এটি কি এসেন্স? ভারি সুন্দর গন্ধ—চমৎকার!"

স্কুল-কলেজে পড়িবার সময় অর্থাৎ ছাত্র-জীবনে এসেন্স

সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করিবার রীতিমত বাতিক ছিল। এখন অর্থাৎ কেরাণীগিরি চাকরীতে বাহাল হইয়া সে রকম বাজে খরচের সামর্থ্য নাই, সুতরাং ইচ্ছাও নাই। এক শিশি রিমেলের ল্যাভেণ্ডার টেবলে ঘর-করা থাকে, নেহাৎ যে দিন ধোবার বাড়ীর কাপড়-চোপড় প্রথম দিনটা পরি, সেই দিনই খানিকটা ল্যাভেণ্ডার জলে মিশাইয়া রুমালে জামায় কাপড়-টায় মাখাইয়া রজক মহাশয়ের "ভাঁটির" দুর্গন্ধ যথাসম্ভব দূর করিবার চেষ্টা করি।

আজ তাহারই এমন মন-মজানো মধুর সুগন্ধ বাহির হইয়া তরুণীগণের নাসিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া উপলব্ধি করাইয়া দিল যে, এই দীন ব্রাহ্মণ শুধু সাহিত্য-সেবী নহে,—ইনি আবার সৌখীন বাবু,—চমৎকার এসেন্স টেসেন্স মাখিয়া থাকেন!

গম্ভীরভাবে সেই সঙ্গে একটু তাচ্ছীল্যভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলাম,—"এটা—এটা কাশ্মীয়ার বোকে!"

আর এক জন (তরুণী অব্যর্থ) যেন একটু বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন—"কাশ্মীয়ার বোকে? সে কি? তার manufacturing কোম্পানী যে আজ দশ বারো বৎসর ফেল হয়ে গেছে! সে ত এখন বাজারে পাওয়া যায় না।"

এঃ, বড় ধরা পড়িয়া গিয়াছি!

তরুণীর কথায় তিলমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মৃদুহাস্যে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হাঁ! এ আর বাজারে পাওয়া যায় না! তবে আমার বাল্যকাল থেকে সখের মধ্যে বলুন আর বাতিকই বলুন—একটু বেশী রকম ছিল, এই নানা রকমের এসেন্স কিনে ষ্টক্ করা! এখনও বোধ হয় গরীবের বাড়ীতে চেরি ব্লসমস্, কাশ্মীয়ার বোকে পাঁচ-সাত-দশ শিশি বেরুতে পারে।"

"সত্যি! সাহিত্যসেবী সুলেখক যাঁরা, এ জিনিষটা বাস্তবিক তাঁদের লেখার কাযে অনেকখানি সাহায্য করে।"

এক জন তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রির আলাপের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া পরমানন্দে বলিয়া ফেলিলেন—"যদি দু'একটা সেই কাশ্মীর বোকে থাকে, বলতে পারি না, তা হ'লে বন্ধু ব'লে উপহার দিন না" বলিয়াই দুই জনের সে কি মধুর হাসি!

সর্ব্বনাশ! হে ভগবান! মিথ্যা রহস্যের শাস্তি একেবারে হাতে হাতে! ছেলেরা কোন্ সময়ে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিছুই জানিতে পারি নাই!

এক জন সেই রকম মধুর হাসি হাসিয়া বড় ছেলেকে বলিল, "যাও ত খোকা, তোমার মাকে ব'লে—"

"আচ্ছা, আমি আসছি" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই ছেলেরা আমার মুণ্ডপাত করিতে "আনছি" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতর তাহাদের মায়ের কাছে ছুটিল।

আমাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে উদ্যত দেখিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা তরুণীটি বলিলেন—"বড্ড কষ্ট দিচ্ছি আপনাকে, রাগ করবেন না যেন—"

"না না, সে কি কথা! তুচ্ছ এসেন্স—" বলিয়া 'দেঁতো' হাসি হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলাম।

একটা কথা এইখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। গুপ্তচর-নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকিলে কোন রাজ্য যেমন সুশৃঙ্খলে চলে না, যে রাজ্যে যত—যাকে বলে ও-কাযে ঘুণ গোয়েন্দার সংখ্যা বেশী, সে রাজ্যে প্রজা-শাসন তত সুশৃঙ্খল এবং নিরাপদ। আমার গৃহিণীর রাজ্যে এই দীন শান্ত নিরীহ প্রজার শাসনের জন্য তাঁহার গুপ্তচর নিয়োগ কোন অংশেই উপেক্ষণীয় নহে। আশ্চর্য্য, বাড়ীর বাহিরে কোথায় কি করিয়া আসিলাম—কবে, ঠিক এক দিন না এক দিন তাহার সঠিক সংবাদ গৃহিণী দেবীর গোচর হইবেই! আর এত বাড়ীর সীমার মধ্যে নিজের পড়িবার ঘরে! তরুণী দুইটির সহিত আলাপ-পরিচয় কথা-বার্ত্তার প্রত্যেক অক্ষর তাঁহার কর্ণমূলে পৌঁছিতে এক দণ্ড বিলম্ব হয় নাই। ত্রিতলের ঘরে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র দেবী প্রচণ্ডা রণচণ্ডীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক "যুদ্ধং দেহি" ভাবে আক্রমণোদ্যতা হইয়া সম্ভবমত এবং সঙ্গতভাবে কণ্ঠ ছাড়িয়া বলিলেন—"এসেন্স বার ক'রে দেবো—বটে! এখুনি বিদেয় করো যাও, এখনি, কোন কথা নয়—"

"চুপ-চুপ, করো কি! আহা শোনো-শোনো—"

চুপ করে কে, আর শোনেই বা কে? "কি; শুনবো কি? দুটো ডবকা ছুঁড়ী সকালবেলা বিউনি দুলিয়ে, বুক-খোলা সেমিজ এঁটে, জুতো ফটাস্ ফটাস্ করতে, উঃ, কর্ত্তা বাইরে ব'সে, এক-বাড়ী লোক—পাড়াশুদ্ধ লোক! এমনি ক'রে আমি—আমি—"

ব্যস্—বলং বলং রোদনং বলং!

বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা—বৌ-ঝিয়েরা ইরাতক্রমে অবুঝ জন নাই! সকলে বেশ ধীরভাবে আদ্যোপান্ত শুনিয়া ব্যাপারটি বুঝিয়া লইল। ছোট বোন্ "সারি" খুব ভাল দুটি এসেন্স তাহার বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"যাক্, তুচ্ছ দুটো এসেন্স চেয়েছে—ভদ্র লোকের মেয়ে—"

"কক্ষণো না—কক্ষণো না—" বলিয়া আর এক চোট কোমর বাঁধিয়া রোরুদ্যমানা দেবী অগ্রসর হইতেছিলেন।

"আঃ, কি করিস্ বৌ! বাবা শুনতে পাবেন যে!" বলিয়া ভগিনী তাহাকে শান্ত করিবার ভার লইয়া আমাকে রেহাই দিল।

"এই দেখুন, বড় লজ্জিত হলুম! যে পেয়েছে, বাড়ীর মেয়েরা কে কখন্ সব নিয়েছে! একটা শিশিতে খানিকটা ছিল—তা যাক্—এ দুটো খুব চমৎকার দামী জিনিষ!"

যথালাভ ভাবিয়া আমার উপর ধন্যবাদ বৃষ্টি করিয়া তাঁহারা রেহাই দিলেন। তাহার পর দুই একবার বাড়ীতে তাঁহারা শুভাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু—আমল না পাইয়া ক্রমে অদৃশ্য হইলেন।

সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়া এবং আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গৃহিণী আমাকে রীতিমত শাসন করিয়া ভয় দেখাইয়া (অবশ্য ডাইভোর্সের নহে,—তবে অনাহারে প্রাণত্যাগ,—জন্মের মত বাপের বাড়ী অবস্থান ইত্যাদি কতকগুলো মামুলি ভীতি-প্রদর্শনের কথা বলিয়া) দস্তরমত আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইলেন যে, কোনও কারণেই আমি যেন এই "তরণীর" তরুণীদের কোন প্রসঙ্গেও কর্ণপাত না করি। "নিতান্ত যদি ঐ বেহায়া মেয়েরা "তরণী" ব'লে গান ধরে—

তুমি তখনি ও-ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চ'লে যাবে,—নয় ওপরে গিয়ে ব'সে কাযকর্ম্ম করবে,—নিদেন রাস্তার ধারের জানলাগুলো সব বন্ধ ক'রে দেবে।"

"বেশ—এই হলেই যদি সব গোল চোকে, এই রকমই হবে।"

* * * * *

হঠাৎ এক দিন খুব ভোরে তে-তলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখি,—আমারই অফিসের সহকারী ছোকরা "তারিণী" (পুরা নাম তারিণীচরণ লাহিড়ী) সম্মুখের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। ভাবিলাম—হয় ত আমারই দেখিবার ভুল। তারিণী ও-বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই,—বোধ হয়, অন্য কোথাও গিয়াছিল। অফিসে জিজ্ঞাসা করিলাম—"অত সকালে আমার বাড়ীর কাছ দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে হে, তারিণী ?"

তারিণী প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া শেষে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আমি ! আপনার বাড়ীর কাছ দিয়ে !"

"তোমার মতই দেখলুম যেন—"

তারিণী হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞে না, স্যর ! আমি থাকি বেলেঘাটায়, আমি সিকদের পাড়ায় কি করতে যাব ?"

এই গেল এক দফা !

আর এক দিন—রাত্রি প্রায় নয়টা, বেজায় গ্রীষ্মবোধ হওয়ায় সদর দরজায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছি,—দুটি পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী ছোকরা "তরুণী" গায়িকার জানলার কাছে আসিয়া ডাকিতে লাগিল—"তারিণী—তারিণী আছ ?"

অনেকগুলি তরুণ-তরুণী ঘরের ভিতর বসিয়া বেশ হাস্য-পরিহাস করিতেছিল;—কাপড়ের পর্দার আড়ালে কাহারও মুখ দেখা যাইতেছিল না,—তবে কথাবার্ত্তার গুন্-গুন্ ধ্বনিতে বোঝা গেল পূর্ণ মজলিস্। "তারিণী—তারিণী" বলিয়া ডাকিতে সেই তরুণীটি যিনি সঙ্গীতশাস্ত্র মন্থন করিয়া ঐ একটিমাত্র সঙ্গীত-রত্ন আহরণ করিয়াছেন—

"তরুণী জুয়ারে ভাসায়ে—
(কে) এলে হে নবীন নেয়ে !"

যাঁহার অহর্নিশি ঐ "তরণী"-প্রমুখ সঙ্গীতে আমার এবং সমগ্র পল্লীবাসীর সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি বীতরাগ জন্মাইয়াছে,—যাহার জন্য ঐ গায়িকার এ পল্লীতে নামকরণ হইয়াছে "তরণী",—সেই তরুণীটি তৎক্ষণাৎ স্ক্রিণ সরাইয়া জানলার কাছে দাঁড়াইয়া হাসি-মুখে বলিল, "তিনি আসেন নি ত—"

তরুণদ্বয় হাসিয়া বলিল, "আছে, বই কি—একবার ডেকে দাও—"

"ভেতরে আসুন না।"

"না—দেরী হয়ে যাবে ! বিশেষ কায আছে, একবার ডেকে দাও।"

বোধ হয়, ইহাদের চোখে চোখে ইঙ্গিতে কি একটা কথাবার্ত্তা হইল। তরুণ দুইটি আমার দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে কোন কথা না বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

খানিক পরে দেখি,—একটি দঙ্গল তরুণ-তরুণী (সব স্যাণ্ডেল পায়ে) আমার সম্মুখ দিয়া সার বাঁধিয়া কোথায় চলিয়া গেল। আমার রোয়াকে জন কয়েক পাড়ার ছেলে বসিয়াছিল। সকলেরই লক্ষ্য ইঁহাদের উপর,—সুবিধা পাইলেই সকলে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন, সকলেরই সমান কৌতূহল। কারণ, আজ পর্য্যন্ত ইঁহাদের কেহই পাড়ার কোন প্রাণীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন নাই,—এমন কি, একটা কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই।

ইঁহাদের বাড়ীওয়ালা জগন্নাথ ক্ষেত্রীও ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না। রোহিণীকান্ত নামে একটি ভদ্রলোক বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর,—এই তরুণ-তরুণী সম্প্রদায়ের মুরুব্বী। তিনি সব সময় এখানে থাকেন না। রাত্রি দশটার পর আসেন,—খুব ভোরে চলিয়া যান—অফিসের কাযে। কথাবার্ত্তা, ভাড়া আদায় ইত্যাদি যাহা কিছু,—সবই সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে। বাড়ীর অধিকাংশ ব্যক্তির বাস পূর্ব্ববঙ্গে। নানা রকমের তরুণীর এই ঘরটিতে আসা-যাওয়া আছে,—কিন্তু বসতি করেন এই "তরণী" গানের গায়িকা তরুণীটি,—নাম কলিকাসুন্দরী দাসগুপ্তা। বয়স আন্দাজ ২৩।২৪ এবং ইঁহার এক অভিভাবিকা—বয়সে ইঁহার অপেক্ষা বোধ হয় তিন চার বছরের বড়, নাম লীলাদিদি, সম্পর্কে কলিকার মাসীমা।

গৃহিণীর ভয়ে এবং অন্যান্য নানা কারণে আমি উপযাচক হইয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে নিগূঢ় তথ্য সংগ্রহ না করিলেও, পাড়ার লোকরা নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন ? যতদূর সাধ্য, সকলেই ইঁহাদের ব্যাপার জানিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অল্প স্বল্প বিবরণ ব্যতীত বিশেষ কিছু কেহ জানিতে পারে নাই।

পূজার ছুটীতে মাসখানেকের জন্য বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া শুনি—"তরণী"—গায়িকা স-দল-বলে স্থানান্তরে বাস উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। বাঁচা গিয়াছে ! পাড়ার অনেকে জানে, কোন্ ঠিকানায় তাঁহারা বাসা লইয়াছেন, এবং কোথায় এই তরুণী—"তরণী জুয়ারে" ভাসাইতে শুরু করিয়াছেন ! সেই ঠিকানা জানিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম, এই তরুণ-তরুণী সম্প্রদায়টি আমাদের পল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নিশ্চয়ই আছেন।

আমার all-section ট্রামের পাশ আছে। প্রতি শনিবার এবং রবিবারে বৈকালবেলা বাহির হইয়া প্রায় রাত্রি আটটা নটা পর্য্যন্ত আমি ঘুরিয়া বেড়াই। এক রাত্রিতে—বোধ হয়, সেটা অমাবস্যার রাত্রি হইবে, কালীঘাট হইতে "মাকে" দর্শন করিয়া টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাস ট্রামের প্রথম দুইটি "সারি" অর্থাৎ ড্রাইভারের কাছে প্রথম সার দ্বিতীয় সারের দুইধারের চারিখনি বেঞ্চে চারিটি তরুণী এবং প্রায় ছয়টি সাতটি তরুণ পরমানন্দে স্ফূর্ত্তি করিতে লাগিয়া গিয়াছে। সে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ-রসিকতার ঘটাই বা কি। তরুণীদের সাজসজ্জা সেই বিউনি ঝুলানো পৃষ্ঠদেশে, হাফ্ হাতা বুক খোলা "নিমা" আমায় শতগুণে বুকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে,—রকমারি জরি পাড়ের সাড়ী ব্রাহ্মধরণে পরা, কাহারও হাতে, কাহারও বুকের ফাঁকে গোঁজা, কাহারও বা কটিদেশে ঝুলানো সাদা রুমাল, পায়ে স্যাণ্ডেল ! চারিজনের বয়স ২১।২২ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬।২৭শের ভিতর। আমি বসিয়াছিলাম তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে

দুই তিন সারি পরে। সুতরাং ভাল করিয়া কাহারও মুখ দেখিবার উপায় ছিল না। তাহারা নির্ভয়ে প্রাণ খুলিয়া কত হাসি, কত রঙ্গ, কত মজাই করিতেছে—আশে-পাশে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট তরুণ কয়টির সঙ্গে। তরুণ দলের অট্টহাসির রোলে গাড়ীর "ইলেক্‌ট্রিক কারেন্ট্‌" বন্ধ হইয়া যায় আর কি!

কয়েক জন পরিচিত ভদ্রলোক ঐ গাড়ীতে ছিলেন। তাহার মধ্যে আমাদের পাড়ার চাটুয্যে বাড়ীর সত্যচরণ! তরুণ-তরুণীদের অপরূপ কাণ্ড-কারখানা—রঙ্গ-রহস্য—আমরা যে যাহার আসনে বসিয়া নীরবে কেবল চোখেই দেখিতেছিলাম, সত্যচরণের যেন সে রকমটা সহ্য হইতেছিল না! আমাদের কেবল বলিতেছিল, "দেখ্‌ছেন দাদা, রকমটা একবার দেখ্‌ছেন! এ সব হলো কি!"

আমি হাসিয়া কৃত্রিম রাগ করিয়া বলিলাম, "তোর কি?"

সত্যচরণ বলিল, "আমার ঘোড়ার ডিম! আমার আবার কি? জ্ঞাতি নয়, কুটুম নয়, চেনা নয়, পরিচিত নয়, মরুক্‌ যাক্‌—উচ্ছন্ন যাক্‌—আমার কি, আপনারই বা কি! তবে কি জানেন দাদা, এ রকমটা দেখ্‌তে আমরা অভ্যস্ত নই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আরে, সব জিনিষ কি আঁতুড় ঘর থেকেই মানুষ দেখে! যত দিন যাবে, তত সব নতুন নতুন জিনিষ দেখ্‌বি! -আর যত দেখ্‌বি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ততই তা সয়ে যাবে!"

অন্যান্য ভদ্রলোক আমার কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "বটেই ত!"

সত্যচরণ হটিবার পাত্র নয়। সে বলিল—"দেখেছি আমি ঢের, দেখ্‌ছিও অনেক! এ বা আপনারা কি দেখ্‌ছেন? চলুন না আমার সঙ্গে লেক্‌ রোডে! যাবেন দেখ্‌তে?"

"রক্ষে কর ভাই, আর রাত্তির বেলা লেক রোডে গিয়ে কায নেই! তোর ইচ্ছে হয়, তুই যা।"

"আমি ত যাবো বলেই বেরিয়েছি; নাহলে কি আপনার মত একটা 'বৃদ্ধো বা জরাগ্রস্তো বা পুত্রকলত্রনাশভীতো বা' একটা ভীষণ অরসিকের সঙ্গ-সুখ উপভোগের জন্য ট্রাম কোম্পানীকে 'বাস্' কোম্পানীকে অনর্থক পয়সা দিতে বেরিয়েছি?"

কথাবার্ত্তা আমাদের মধ্যে অনুচ্চস্বরে হইতেছিল, তরুণ-তরুণীদের এ দিকে লক্ষ্য হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এক জন আমাদেরই মধ্যে বিশিষ্ট মান্যগণ্য প্রবীণ ভদ্রলোক বলিলেন—"আমরা বাঙ্গালী, সুতরাং হঠাৎ দু'চার বছরের মধ্যে আমাদেরই বাঙ্গালী জাতের মেয়েদের এতটা বিলিতি ভাবে পরিবর্ত্তন, এখন যেন বড়ই বিসদৃশ ঠেকছে!"

আর এক জন বলিলেন—"একটা কথা আমি সেই অবধি ব'সে ব'সে ভাব্‌ছি—ঐ যে চারটি মেয়ে আর গুটি পাঁচ-সাত ছোক্‌রা ওদের সঙ্গে রয়েছে, ওদের পরস্পরের সম্বন্ধটা কি? কার বাপের সাধ্যি সেটা ওদের রকম সকম কথাবার্ত্তা শুনে বোঝে?"

আমি বলিলাম—"চার জনের হয় ত স্বামী সঙ্গে আছে, আর বাকী স্বামীর বন্ধু-বান্ধব।"

সত্যচরণ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, বলিল—"যত বুড়ো হচ্ছেন, ভীমরতি হচ্ছে! ওর একটারও বিয়ে হয়নি। চলুন—জিজ্ঞেস্‌ করি।"

সত্যচরণকে জোর করিয়া বসাইয়া বলিলাম—"আরে চুপ্‌, চুপ্‌, করিস্‌ কি!"

সে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "স্বামী যদি সঙ্গে থাকেন, তিনি বা তাঁরা এরকম ভাবে কিছুতেই স্ত্রীকে পরের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য কর্ত্তে দিতে পারেন না। ভাই-বোন্‌, খুড়ী-ভাইঝি, মামা-ভাগ্নী—"

"আরে না না! যাই হোক, ওদের ও নিয়ে মাথা ব্যথায় কায নেই—"

"ও কি! তারিণী, আমার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্‌ তারিণী লাহিড়ী না? আরে, এ ত দেখ্‌ছি আমাদের পাড়ার সেই "তরুণী!" যেমন এই কয়টি কথা বলিয়াছি, সেই তরুণ-তরুণীর দল পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া আমাকে দেখিয়া একেবারে চুপ! কাহারও মুখে কথা নাই! তারিণীর মুখখানা শুকাইয়া আমসী হইয়া গিয়াছে। সে আর সেই "তরণী জুয়ারে ভাসানো" তরুণীটি পাশাপাশি বসিয়া আমোদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল! এ যেন একেবারে "তরণী" ঘ্যাচ্‌ করিয়া আসিয়া লাগিয়া বসিয়া গেল ঘুসুড়ির চড়ায়! তারিণী আর আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহে না! সত্যচরণ তাহাকে চিনিতে পারিল। বলিল—"দাদা, ও ছোঁড়াটা আপনার ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে না? ওকে যে আপনার বাড়ীতে দেখেছি অনেকবার!"

সত্যচরণের মুখ খুলিলে আর রক্ষা নাই। গম্ভীরভাবে বলিলাম—"ছি, ওর কথা ওভাবে কইতে নেই। সঙ্গে ওর বাড়ীর মেয়েছেলে…"

সত্যচরণ থামিল বটে, তবে চুপি চুপি আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বড়বাবু আপনি, ও ছোঁড়ার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতেই হবে। আপনার পায়ে—"

"ষ্টুপিড্‌" বলিয়া তাহাকে একটা কনুয়ের ধাক্কা দিয়া বলিলাম—"নেমে আয় সত্য, অংশুমতীকে একবার দেখে আসি। তার অসুখ—"

সত্যকে লইয়া হাজরা রোডের মোড়ে গাড়ী হইতে নামিয়া ছোট বোন্‌ অংশুমতীর শ্বশুরবাড়ীর দিকে চলিলাম।

* * * *

তারিণীর মাস তিন চার অফিসে দেখা নাই,—ঠিক সেই ট্রামে দেখার পরদিন হইতে। সাহেবকে বলিয়া কহিয়া চাকুরিটি এখনও বজায় রাখাইয়াছি,—কিন্তু আর যে বেশী দিন পারিব, মনে হয় না। এ সদাগরী আপিস, চেয়ারে চাদর বাঁধিয়া রাখিয়া জলখাবারের ঘরে পাঁচ মিনিটের যায়গায় সাত মিনিট হইলে চাক্‌রী যায়,—এখানে বিনা রিপোর্টে আর কত কাল আমার কথায় নির্ভর করিয়া সাহেব তারিণীর স্থানে লোক বাহাল না করিয়া রাখিবেন?

হতভাগাটা পলাইল কেন? "তরণী"র জুয়ারে গা ভাসান্‌ দিয়াছিস্‌ যখন—তখন আমাকে দেখিয়া লজ্জা করিবার তোর কি আছে? আমার কাছে এ ব্যাপার গোপনই যদি রাখিয়া থাকিস্—তাহাতেই বা দোষের এমন কি হইয়াছে? ছোক্‌রার সঙ্গে একবার দেখা হইলে হয়!

দিন পনেরো পরে বড় সাহেব হুকুম দিলেন—"তারিণী

লাহিড়ীকে আমি ডিস্‌মিস্ করিয়াছি, তার যায়গায় কালই নূতন লোক লও !"

কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে বড় সাহেব একখানি বড় দরখাস্ত আমাকে পড়িতে দিয়া বলিলেন—"এইখানা পড়িলেই সব বুঝিতে পারিবে"—এবং ঘণ্টা টিপিয়া চাপ্‌রাশীকে বলিলেন—"সেই দুটি লোককে ভিতরে আনো—"

দুইটি ভদ্রলোক—পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী—(এক জন বৃদ্ধ এবং অপরটি যুবা) অতি দীন মলিন সাজে বড় সাহেবের সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইতে বড় সাহেব তাহাদের হিন্দীতে বলিলেন, "এই আমার অফিসের বড় বাবু, ইহাকে এক সময় তোমার সকল কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিও। আমি তারিণী বাবুকে অফিস হইতে ডিস্‌মিস্ করিয়াছি।"

* * * *

বৃদ্ধটি সেই "তরণী জুয়ারে ভাসানোর" পিতা এবং যুবকটি তাহার ভ্রাতা। মেয়েটির নাম কলিকাসুন্দরী,—বরিশাল জেলায় ইহাদের বাস। অবস্থা অতি হীন—উপাধি দাশগুপ্ত, জাতিতে বৈদ্য। লেখাপড়া শিখাইবার জন্য পল্লীবাসিনী তাঁহার সম্পর্কীয়া এক বিধবা শ্যালিকার নিকট বৃদ্ধ কলিকাকে পাঠাইয়া দেন। কলিকা বছর পাঁচ ছয় কলিকাতায় থাকিয়া—লেখাপড়া, গান, বাজনা, নাচ, কায়দা-করণ সবই শিখিয়া ফেলিল এবং বৃদ্ধ বাপ-মার আকুল অহ্বানে এবং পাড়াগেঁয়ে সহোদর ভ্রাতার শত অনুরোধ-উপরোধে পদাঘাত করিয়া—রীতিমত বাঙ্গালাদেশের তরুণী হইয়া তরণী জুয়ারে ভাসাইয়া পরমানন্দে বেড়াইয়া বেড়ায়। তারিণী তুখোড় ছোক্‌রা—ফরিদপুর অঞ্চলে বাড়ী! বিধাতার চক্রে—অনঙ্গদেবের রঙ্গে, ঐ কলিকার সঙ্গে পরিচয় করিয়া তাহার মঙ্গলকামনায় তাহার সহিত প্রকাশ্যে এবং গোপনে খুব ঘনিষ্ঠতা করে।

* * * *

কলিকার পিতা তারিণীকে বলিল—"আমার কলিকার দশা কি হবে? তারিণী বেলেঘাটায় নিজের বাসায় বসিয়া বলিল—"আমার একলার দোষ নয়! আপনার মেয়েরও এতে সম্পূর্ণ দোষ আছে।"

কলিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি সকলকে বলেছ—আমায় তুমি বিয়ে করবে,—তোমার বিবাহ হয় নি—"

নরপিশাচ তারিণী হাসিয়া বলিল—"প্রেমে এবং রণক্ষেত্রে অন্যায় ব'লে কোন কিছু নাই—"

বৃদ্ধ বলিল—"হোক্ তোমার স্ত্রী বর্ত্তমান,—তুমি কলিকে বিয়ে করো! লোকের ত দুই স্ত্রী থাকে—"

"আমার সে অবস্থা নয়—"

কলিকা তারিণীর কথায় শিহরিয়া উঠিল—কান্নায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছিল, রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল,—কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"কিন্তু আমার অবস্থা,—তোমার আমার মহাপাপের চিহ্ন-স্বরূপ যাকে আমরা পৃথিবীতে আহ্বান ক'রে এনেছি—"

কলিকা আর বলিতে পারিল না—মূর্চ্ছিতা হইয়া পিতার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল।

তারিণী হাসিতে হাসিতে বলিল—"তোমরা স্বচ্ছন্দে আমার এই ঘরে বিশ্রাম করো—শ্যামবাজারে আমার একটা নেমন্তন্ন আছে"—বলিয়া চলিয়া গেল।

তারিণীকে শুনাইয়া চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ বলিল—"ওরে অভদ্র শয়তান! মনে রাখিস্—আমি বরিশালের লোক—"

* * * *

অবলার প্রতি এই অবিচার-কাহিনী শুনিয়া বড় সাহেব তারিণীকে ডিস্‌মিস্ করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে এক দিন বলিয়া-ছিলেন—"ছি—তোমাদের জাত এমন কাওয়ার্ড।"

আমি মনে মনে উত্তর দিলাম—"জাতের দোষ নয় সাহেব, এ নবযুগের মহিমা! যখনই পথে ঘাটে বাহির হই—অমনি মনে পড়ে,—

তরণী—তারিণী আর তরুণী।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লী-বধূ

পল্লীর বধূ, পল্লীর বধূ, তব রক্তিম চরণ-ছায়,
কত সঙ্গীত গুঞ্জরি উঠে শতেক কবির কল্পনায়।
তব ঢল ঢল, আঁখি শতদল, লজ্জা-জড়িত চরণ তব,
আধ বিকশিত মুকুলিত মুখ, কাব্য-সুষমা ফুটায় নব।

নহ গো চটুলা নাগরিকা সম, তুমি পল্লীর শ্যামলা মায়া,
পল্লী দেবীর সাধের দুলালী, তুমি যে গো তাঁর স্বরূপ-কায়া।
নব বসন্তে, মধু উৎসবে নাহি চুল তুমি কুঞ্জ পানে,
প্রিয়রে তোমার হয় না তুষিতে, মধু বসন্তে মঞ্জু গানে।

কুঞ্জ তোমার কুটীর-দুয়ারে, বসন্ত তব সকল দিন,
তোমারে গো কভু হয় না বাজাতে নূতন করিয়া প্রেমের বীণ।
আপনার চেয়ে প্রিয়তম তব, নিজেরে করেছ বিসর্জ্জন,
তারি সাথে সাথে ফিরিয়া বেড়াও ছায়ার মতন অনুক্ষণ।

তোমার এ প্রেম সার্থক মানি, দেবী তুমি ওগো মানবী-বেশে,
স্বর্গ-সুষমা ঝ'রে ঝ'রে পড়ে, তুমি যবে চাহ ক্ষণিক হেসে—
জ্ঞানালোকহীন পল্লীর মাঝে তুমি যে গো এক দিব্যজ্যোতি,—
তোমারি অর্ঘ্য রচিব আমরা, তোমারেই ওগো করিব নতি।

শ্রীমতী বনলতা দেবী (বি-এ)।

বসনের মনোব্যাখ্যা

১

এই প্রবন্ধের নাম দেখিয়া এই প্রশ্ন অনেকেই করিবেন, বসনের আবার ব্যাখ্যা কি? পরিধান ব্যাপারটা এতই মামুলী যে, ইহার ভিতর কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে, এত কাল পরে কেহই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। বস্ত্র-বিজ্ঞান অনেকের কাছেই অদ্ভুত লাগিবে। কিন্তু মানুষের বসনভূষণেরও গভীরতর অর্থ আছে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা চোখে পড়িবার নহে। সে কথা সংক্ষেপে বলিব।

মানুষের জগতে কিম্বা প্রকৃতির জগতে কোন ব্যাপার বুঝিতে হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করাই নিয়ম। আবরণের কারণ কি? সাধারণভাবে ইহার তিনটি উত্তর সম্ভব। প্রথমতঃ, কাপড় পরি আমরা লজ্জা-নিবারণের জন্য; দ্বিতীয়তঃ, ঠাণ্ডা গরম হইতে দেহটাকে রক্ষা করিবার জন্য; তৃতীয়তঃ, দেহের কান্তিবর্দ্ধনের জন্য।

লজ্জানিবারণের কথাটা আগে বলিলাম, কারণ, ষোল আনা লোকেরই বিশ্বাস, পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য লজ্জা-নিবারণ। পাঠশালায় শিশু-বিদ্যার্থীকে না বুঝিয়াও ইহা শিখিতে হয় যে, লজ্জা-নিবারণের জন্য বস্ত্র, যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্য। কিন্তু কথাটা সাধারণ মানুষে যত সহজে সত্য বলিয়া মনে করে, আসলে ইহা তত সহজ নহে। বিভিন্নদেশে লজ্জার বিভিন্ন রূপ, এবং একই দেশে সকল সময়ে লজ্জা এক প্রকার নহে। শিশুদের লজ্জা নাই; গোড়াতে মানুষেরও অর্থাৎ আদিম অসভ্যদের লজ্জা ছিল না। অতএব লজ্জা মানুষের স্বভাবজাত নহে। এই স্থানে একটা কথা উঠিবে। অনেকে বলিবেন, অসভ্যদের লজ্জা থাক্ আর নাই থাক্, সভ্যতাযুগে মানুষের উলঙ্গতা লজ্জাকর মনে হইয়াছে বলিয়াই তাহারা আবরণ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং লজ্জাকে আবরণের উদ্দেশ্য বলিলে দোষ হয় না। কিন্তু এখানে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। মানুষ ও মানুষের সভ্যতার যিনি ইতিহাস লিখেন, অসভ্যতা ও সভ্যতার পরাম্পর্য্য এবং সভ্য মানুষের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন; কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক, পরিবর্ত্তনের সংখ্যা-নিরূপণ তাঁহার কার্য্য নহে। তাঁহার জানিতে হইবে, কেন একদা মানুষের লজ্জাবোধ হইল, এবং কেন সে নগ্নতা মোচন করিতে চাহিল। আরও একটি কথা বলা দরকার। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সত্য ও অসত্যের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক বৈষম্য নাই। মূলতঃ উভয়ের মধ্যে একই প্রকৃতি বিদ্যমান, তফাৎ এই, বিবিধ অবস্থার ফলে সভ্য মানুষ সাধারণের অতিরিক্ত কতিপয় গুণ ও অভ্যাস অর্জ্জন করিয়াছে; এই গুণসমষ্টিই তাহার সভ্যরূপ। এই সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া দিতে চাই। বসনের কারণ আলোচনায় গোড়ার দিকে নজর দিতে হইবে, অর্থাৎ সেই কল্পিত (hypothetical) নরনারীর কথা মনে করিতে হইবে। যাহারা এক দিন বৃক্ষবল্কলে নগ্নতার অবসান করিয়াছিল। শুধু আজিকার সভ্য মানুষকে ধরিলে চলিবে না। এক দিন এই পরিধানের পশ্চাতে যে শক্তিশালী তাড়না ছিল, আজ তাহা বহুপরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে। আজ বস্ত্রপরিধান আমাদের অভ্যাসগত বর্ণহীন পুনরাবৃত্তি।

এই ত গেল লজ্জার কথা। তার পর দেহরক্ষার জন্য বসনের প্রয়োজনের কথা। এই শীতের দিনে গরম জামার উপর 'র‍্যাপার' জড়াইয়াও যখন আরও কিছু জড়াইতে ইচ্ছা হয়, তখন দেহের পক্ষে জামা-কাপড়ের অপরিহার্য্যতা অস্বীকার করিবার উপায় কি? এখানেও প্রচলিত মত মানিয়া লইতে আপত্তি আছে। এই বাঙ্গালাদেশের সহরের রাস্তায় বাহির হইলে পুরু শীত-বস্ত্রের নীচে কম্পিতকলেবর যে কয় জনের সাক্ষাৎ হয়, তাহাদিগকে আঙ্গুলে গণা যায়। তাহাদের ছাড়া যে দিকে চক্ষু যায়, পাঞ্জাবী ও তাহার উপর চাদর। অথচ যাহাদের শীত-বস্ত্র নাই, শীতের কষ্টে তাহাদের প্রাণ যায় না, অথবা সর্দ্দি-কাসি লাগিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিতে হয় না। হোষ্টেলে, বোর্ডিংএ সকলেরই আর কিছু পুল্-ওভার বা চেষ্টারফিল্ড্ নাই। যে খদ্দরের পাঞ্জাবী গরমের দিনে চলে, তাহাতেই অধিকাংশের শীতও কাটে। আবার এই স্বল্প গাত্রবাসে সাইকেল চড়িয়া শীতের সন্ধ্যায় আড়াই মাইল দূরে ছেলে পড়াইতে যাইতে হয়।

অনুন্নত পল্লীগ্রামে যাঁহাদের বাসস্থান, তাঁহারা হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, মেয়েদের শীত কম। বাস্তবিক পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকদের পুরুষের মত 'র‍্যাপার সোয়েটারের' বালাই নাই। আর সকালে ঘুম হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই বাড়ীর

বধূটিকে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া শীতকাতর স্বামীটির দেহে লেপ দিয়া ভাল করিয়া ঢাকিয়া, খালিগায়ে আঁচল জড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গোবর-ঝাঁট দেওয়া, বাসন-মাজা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। র‍্যাপার কিম্বা সোয়েটার গায়ে দিয়া পুষ্করিণীতে বাসন-মাজা চলে না। যদিও চলে, মেয়েদের শীতসামগ্রী যোগাইবার সঙ্গতি অল্প পরিবারেরই আছে, এবং পাড়াগাঁয়ে ইহা অপ্রচলিত। আশ্চর্য্য এই, পৌষের শীতেও ইঁহাদের কোমল দুর্ব্বল দেহে কোন অনিষ্ট হয় না। এই ত গেল চোখের সম্মুখে যাহা ঘটে, তাহার কথা। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, মেরু-প্রদেশের অধিবাসীদের কোন গাত্রাবরণ ছিল না। ডারুইন্ লিখিয়াছেন, ইহাদের গায়ের উপরে বরফ পড়িয়া গলিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, ইহাদের খেয়াল হয় নাই।

হালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অতিরিক্ত বসনের বিরুদ্ধে একটা মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। এই মতাবলম্বীরা বলেন, পুরু জামা-কাপড় স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। এ যাবৎ চিকিৎকগণ বলিয়াছেন, জামা-কাপড়ে শরীর গরম না রাখিলে শরীরের মঙ্গল নাই। কিন্তু নূতনদের মতে বাহিরের শীত-উষ্ণতা নির্ব্বিশেষে কৃত্রিম উপায়ে শরীর গরম রাখা অনিষ্টজনক। প্রাকৃতিক তাপ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের উত্তাপ নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। এই নব আবিষ্কারের ফলে বিলাতে নারীরা ভারী বসন ছাড়িতেছে। মেয়েদের কথা বলিতে গিয়া এক জন বিখ্যাত বিলাতী ডাক্তার বলিয়াছেন, শ্লীলতা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, মেয়েরা যত কম কাপড়-জামা পরিবে, স্বাস্থ্যের পক্ষে ততই ভাল।* য়ুরোপের নিউড্ কাল্‌চারের খবর হয় ত কেহ কেহ পাইয়া থাকিবেন। প্রকৃতির দেওয়া তাজা ত্বকের উপর আবার আবরণ চাপানো মূঢ়তা; ইহাই ঐ কাল্‌চারের মূল নীতি। অতএব দেহরক্ষার প্রয়োজনে বসনের সৃষ্টি, এ কথা বলা চলে না। দেহের পক্ষে বসনের প্রয়োজন অকিঞ্চিৎকর।

অবশেষে সৌন্দর্য্যসাধনের যুক্তি। জামা-কাপড়ে দেহের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহা সত্য কথা; এবং দেখা গিয়াছে, আবরণের পূর্ব্বেই অলঙ্কারের জন্ম। উল্কিচিহ্ন, পাখীর পালক, ফুলমালা প্রভৃতি অঙ্গভূষণে মানুষ যখন আনন্দ পাইয়াছে, তখনও তাহার আবরণের খেয়াল হয় নাই। অতএব আবরণকে অলঙ্কারের ক্রমবিকাশ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কথা এই, এখানে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিই চরম নহে। ইহার অন্তরালে গভীরতর কামনা বিদ্যমান ছিল। সে কামনার কথা পরে বলিতেছি। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, অপরের মন আকর্ষণের বালাই না থাকিলে বেশ-ভূষার বহর অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত এবং দিন দিন নানা ঢংএর উৎপত্তিও দেখিতাম না। আমরা উৎসবে অনুষ্ঠানে সুসজ্জিত হইয়া যাই; বাক্সের মধ্যে বহু যত্নে পাট করা গরদ-মট্‌কার পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া বিশিষ্ট ভঙ্গীতে চাদর জড়াইয়া বহির্গত হই, সে শুধু দশ জনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কোথাও কোন নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে, এক রাশি ব্লাউস্-শাড়ীর সম্মুখে বসিয়া মেয়েদের আধ ঘণ্টা মাথা ঘামাইতে হয়, কোন্ শাড়ীটি এবং কোন্ শাড়ীটির সঙ্গে কোন্ ব্লাউস্‌টি হইলে উত্তম মানাইবে। অতএব সৌন্দর্য্য-সাধনের যুক্তিকেও সংশোধিত করিয়াই তবে গ্রহণ করা যায়। মোটের উপর দেখা গেল, লজ্জানিবারণ, দেহ-সংরক্ষণ ও কান্তিবর্দ্ধন—বস্ত্র-পরিধানের এই তিনটি যুক্তি এত সহজ-স্বীকার্য্য নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলেরই বিশ্বাস, লজ্জা হইতে বসনের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার স্বপক্ষে বাইবেলের নজীর আছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া আদিম মানবদম্পতি লজ্জায় অভিভূত হইয়া ডুমুর-পাতায় আপনাদের দেহ আবৃত করিয়াছিল। এই বিবরণ অনুসারে প্রথম লজ্জা এবং পরে বসন। কিন্তু যে যুগে বাইবেল রচিত হইয়াছিল, তখন যেমন ডারুইনের জীবতত্ত্বের সৃষ্টি হয় নাই, তেমনই নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বও অপরিজ্ঞাত ছিল। যাঁহারা জ্ঞানবৃক্ষের গল্পে আস্থাবান্ অর্থাৎ লজ্জাকে যাঁহারা বস্ত্রের কারণ মনে করেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন যে, লজ্জা হইতে বস্ত্রের উদ্ভব হয় নাই, বরং বস্ত্র হইতেই লজ্জার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়কর হইলেও ইহা সত্য। এখানে লজ্জা কথাটার মানে পরিষ্কার হওয়া দরকার। লজ্জার অর্থের অন্ত নাই। বক্তৃতা দিতে গিয়া বক্তব্য বিষয় ভুলিয়া

* এই উক্তিটি Flugel তাঁহার বইতে উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তারের নাম উল্লেখ নাই।

গেলে আমরা লজ্জা পাই। কাহারও কাছে টাকা হাওলাত চাহিতে লজ্জা পাই। তর্কে পরাজিত হইলে লজ্জা পাই। হয় ত অনুসন্ধান করিলে বিভিন্নরূপ লজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ দৈহিক বা মানসিক সাদৃশ্য পাওয়া হইতে পারে; কিন্তু আমরা এখানে সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব না। এখানে লজ্জার অর্থ অসংবৃতির ভীতি, দেহাংশ প্রদর্শনে সঙ্কোচ ও অনিচ্ছা। আমরা জানি, শিশুদের লজ্জার অপেক্ষা বড়দের লজ্জা বেশী। ইহার অর্থ, যে বয়সে শিশুরা হৈ হৈ করিয়া খেলাধূলা করে, তখন অপরের দৃষ্টি হইতে দেহ লুকাইবার বুদ্ধি সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই। কয় বৎসর পরেই তাহাদের লজ্জাবোধ জন্মে। অপরের সম্মুখে যাইতে ত্রাস ও আড়ষ্টতার অন্ত থাকে না, আবরণের কিঞ্চিৎ শিথিলতাও অসহনীয় মনে হয়। লজ্জা বলিতে এই বিশিষ্ট মনোভাব বলিতে হইবে।

বলিতেছিলাম, লজ্জা বস্ত্রের কারণ নহে, বস্ত্রের কারণ স্বতন্ত্র। নরনারী এক সময়ে উলঙ্গ ছিল, তখন পরস্পরের কাছে দেহের যৌন-রূপের বিচ্ছিন্ন মাদকতা ছিল না; অর্থাৎ আজিকার মত পুরুষের দৃষ্টিতে তখন নারীর হস্ত ও বক্ষের তারতম্য ছিল না। ঘনিষ্ঠতায় ঔদাসীন্য জন্মে; এখানেও সদা প্রকাশ্যতার দরুণ দেহাংশ বৈশিষ্ট্য-বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ যেন মনে না করেন, আমি বলিতেছি, তখন যৌন আকর্ষণ ছিল না। দেহের কামনা সম্পূর্ণই ছিল; তবে কোন অঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে অন্যকে তেমন বিচলিত করিত না। আবরণের উদ্ভাবনে এই উদাসীনতা দূর হইল। অঙ্গাবরণের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত অঙ্গে অপরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; ক্রমে বসন দেহকে রহস্যময় করিয়া লোভনীয় করিয়া তুলিল। প্রকাশ্য বলিয়া এত কাল যাহার মর্য্যাদা ছিল না, গোপন হইয়া তাহাই মহামূল্য হইয়া পড়িল। আপনার দেহকে অপরের আঁখির আড়াল করিয়া অধিকতর আকর্ষণীয় করিবার মানসে আদিম নরনারী দেহাবৃত করিয়াছিল। উলঙ্গ সমাজে কিরূপে পরিচ্ছদের সূচনা হইল, একটা কল্পিত দৃষ্টান্ত দিলে ইহা পরিষ্কার হইবে। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যখন প্রেম জন্মে, কিছু দিন একটা কৃত্রিম অবহেলার অভিনয় চলে এবং ইহাতে প্রেম ঘনীভূত হয়। এক জন অপরের কাছে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা চাহিবামাত্র দিতে অস্বীকার করিলে, প্রার্থনাকারীর আকুলতা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। পশু-মিথুনের ক্রীড়া যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, একে অন্যের সন্নিকট হইয়াই আবার দূরে সরিয়া যায়। পশুরা সজ্ঞানে ইহা করে না সত্য; কিন্তু পশুদের পরবর্ত্তী সজ্ঞান মানুষরা যে প্রণয়-লীলায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ। সভ্য যুবক-যুবতীর মান অভিমানের ব্যাপার পশু-যুগলের প্রণয়-লীলার অনুরূপ। তরুণী তরুণকে বলিল, অমুক দিবস অমুক সিনেমায়, অমুক ছবি দেখিতে যাইবে। যথাসময়ে যথাস্থানে তরুণ উপস্থিত, তরুণী নাই। তরুণীর এই স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি, আপনাকে দুর্লভ করিয়া তরুণের প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত। ব্যাপারটা এতই সাধারণ যে, বিশ্লেষণ করিবার দরকার করে না। এখন ধরুন, অসভ্য নগ্ন নর ও নারী একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত হইল! অপরের আকুলতা বাড়াইবার নিমিত্ত তাহারাও সহসা কেহ কাহারও কাছে দেহ সমর্পণ করিল না। উপেক্ষার কৌতুকে তাহারাও মাতিল। অঙ্গ যেখানে প্রকাশিত, সেখানে অঙ্গগোপনই প্রকৃষ্ট প্রণয়-লীলা। প্রণয়ীকে আসিতে দেখিয়া প্রণয়িনী হয় ত বৃক্ষের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিল। তার পর বৃক্ষান্তরাল হইতে মৃদু শব্দে আপনাকে প্রকাশিত করিল। পরে মুখ বাড়াইয়া দিয়া সমস্ত দেহ বৃক্ষের আড়াল করিয়া রাখিল। এই ক্রীড়ার অনিবার্য্য ফল, প্রণয়ীর আকুলতা-বৃদ্ধি। লুকোচুরি আরও অগ্রসর হইল। পরিশেষে নারী দেহকে বৃক্ষান্তরাল না করিয়া বৃক্ষপত্রে, বল্কলে আপনাকে ঢাকিয়া দিয়া, আপনার দেহকে দুর্নিরীক্ষ্য ও দুষ্প্রাপ্য করিয়া প্রণয়ীর ভোগলালসা শতগুণ বাড়াইয়া দিল। এই ভাবে দেহ দুর্লভ করিবার বুদ্ধিতেই বসনের জন্ম।

একটু লক্ষ্য করিলে সকলেরই ইহা দৃষ্টিগোচর হইবে যে, বসনের একটা লালসাকর ইঙ্গিত আছে। সংক্ষিপ্ত ব্লাউস্-সজ্জিতা নারী ব্লাউস্-বিহীনা নারী অপেক্ষা অধিকতর মনোহারিণী। যৌন-ব্যাপারে ইঙ্গিতের চিত্ত-আলোড়নকরী শক্তি অপরিমিত। অসভ্য দেশে য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদের কেহ কেহ অসভ্য যুবতীদিগকে কাছে আনিয়া গাউন পরাইয়া অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। 'আনাতোলে'র পেঙ্গুইন্ দ্বীপের গল্পে উলঙ্গ পেঙ্গুইন্ রমণীকে সভ্য মহিলার সজ্জা পরাইয়া বাহির করিয়া

দিবামাত্রই পেঙ্গুইন্ পুরুষরা তাহার দেহের প্রতি এক অভিনব মত্ততায় মাতিয়া উঠিল। সে মত্ততা শুধু অদ্ভুত বলিয়া নহে, আবৃত বলিয়াও। তাই আনাতোল বলিয়াছেন, বসন নারীকে এক দুর্জ্জয় আকর্ষণী শক্তি দান করে।

কোন মনস্বীর মতে পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য প্রদর্শন, আবরণ নহে। এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর বলিয়াছেন—সজ্জা অপেক্ষা নগ্নতা পবিত্রতর। ভেনাসের সম্পূর্ণ নগ্নমূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহার সহিত রবিবারের দৈনিকের স্বপ্নসজ্জাপরিহিতা বিলাতী সন্তরণকারিণীদের ছবি তুলনা করিতে বলি। দেখিবেন, যেখানে আবছায়া, সেখানেই মন মলিন হয়। আচার্য্য হেভলক্ এলিসের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন কোন স্থানে পরিচ্ছদ ধারণ করিত শুধু বারবনিতারা, দেহ দ্বারা অপরের মনোরঞ্জন করিয়া যাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, এবং অষ্ট্রেলিয়ায় শুধু কামনৃত্য উপলক্ষে বস্ত্র পরিধান করা হইত। ট্যালম্যের (Talmey) Love গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, অষ্ট্রেলিয়ায় বিবাহের পর মেয়েরা বসন সম্পূর্ণ ত্যাগ করিত। কারণ, স্বামিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন থাকে। বিবাহের পর সে প্রয়োজন থাকে না, অতএব বসন পরিত্যক্ত হয়। নৃতত্ত্ববিদ্ ওয়েষ্টার মার্ক নানা জাতি ও সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন—স্বল্পবাস যৌনোদ্দীপনার প্রকৃষ্ট কারণ। বার্টন বলিয়াছেন, Greatest provocation of lust are from apparel. তিনিও এক জন বৈজ্ঞানিক। অতএব দেখিতে পাই, বাইবেলের ডুমুর-পাতার বিবরণ বিজ্ঞান-সম্মত নহে।

দেহকে চিত্তাকর্ষক করিবার প্রবৃত্তি অতি আদিম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অলঙ্কার বসন অপেক্ষা প্রাচীনতর। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে একটা নূতন প্রবৃত্তি আবিষ্কার করা গিয়াছে। ইহার নাম আত্মপ্রদর্শন বৃত্তি (exhibitionism)। মৌলিক আত্মপ্রদর্শনবৃত্তি হইতেছে, নগ্ন দেহ প্রদর্শন করা, কিন্তু সভ্যযুগে এই বৃত্তি সুসজ্জিত দেহ প্রদর্শনের বাসনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এই যে আমরা প্রতিদিন এত ফ্যাসানের উদ্ভাবন দেখিতেছি, তাহার পশ্চাতে এই আত্মপ্রদর্শনের তাগিদ ক্রিয়া করিতেছে। বেশী দিন নহে, সোণার চশমা পরা একটা ফ্যাশান ছিল; কিন্তু সকলেই যেখানে সোণার চশমা পরে, সেখানে কাহারও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। আসিল শেলের ফ্রেম, কিন্তু তাহাও যখন সার্ব্বজনীন হইয়া পড়িল, তখন মোটা, সরু, নানা ঢংয়ের ফ্রেমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। আরও দশ জন চশমাধারীর তুলনায় একটু পৃথক হইয়া অন্যের দৃষ্টিতে পড়া চাই—ইহাই ভিতরের কথা। এক স্যাণ্ডালেরই কত বিচিত্র 'ইভলিউশান্' আমরা দেখিলাম ও দেখিতেছি। তার পর মেয়েদের সমাজে, যেখানে আত্মপ্রদর্শন-বৃত্তির চরম, সেখানে এই কয় বৎসরে কি বিপ্লব ঘটিয়া গেল। জামার কত ঢং, শাড়ীর কত রং, পাড়ের কত বৈচিত্র্য। মেয়েদের এই ফ্যাশান-প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনোবৈজ্ঞানিক মনে মনে হাসেন, দুর্ব্বৃত্ত পুরুষের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদেরই দৃষ্টিতে মুগ্ধ করিবার জন্য কি কৌতুককর প্রতিযোগিতা! *

প্রদর্শনপ্রবৃত্তি কেমন হাস্যকর রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহার তিনটি নমুনা দিতেছি। কোন এক বিবাহ উৎসবে দেখা গেল, এক জন বরযাত্রী চটকদার আলখিল্লা পরিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আর এক জন যুবক হোলির দিনে নূতন গরদের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া পরিচিত নারী-মহলে রং খেলিতে গিয়াছিলেন। বিলাতের কোন এক যুবক সপ্তবর্ণী জামা পরিধান করিয়া এক ডিনারে গিয়াছিলেন। প্রণয়িনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পোষাক তাঁহার মাথায় খেলে নাই। গত শীত-কালে এক জন মহিলাকে দেখিলাম—গলায় একটা পাতলা চাদর ঝুলাইয়া বাহির হইয়াছেন। এই চাদরে শীত যে তিলমাত্রও আটকাইতে পারে নাই, তাহা সুনিশ্চিত! তবে যে উদ্দেশ্যে তিনি চাদর ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সাধিত হইয়াছিল। তিনি কাহারও দৃষ্টি এড়ান নাই।

এইখানে আর একটি কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে কিছুকাল আগে তরুণদের মধ্যে এক ধরণের মেয়েলী ফ্যাশানের উদ্ভব হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে এক শ্রেণীর কাব্যভাবপীড়িত তরুণ মেয়েলী কেশ রাখিবার পক্ষপাতী। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শুভ্র শ্মশ্রু যখন প্রায় এক হাত পরিমাণ, তখন বাঙ্গালী

* মনোবৈজ্ঞানিক নাইট ডানলপের মতে বসনের একমাত্র কারণ যৌন-প্রতিযোগিতা।

তরুণের মুখ মসৃণ করিয়া নারীমুখশ্রীলাভের অধ্যবসায়কে রবীন্দ্র-প্রভাব-প্রসূত বলা ঠিক হইবে না। তবে ইহা সত্য যে, আপনাকে নারী কল্পনা করিয়া জীবন-স্বামীর উদ্দেশে কবির সহস্র মিষ্টিক্ গান ও কবিতা বাঙ্গালী তরুণ প্রকৃতিতে অনেকটা নারী-সুলভ পেলবতার সঞ্চার করিয়াছে।

কিন্তু এই মেয়েলী ভাবের আসল কারণ পুরুষের প্রকৃতিতে বর্ত্তমান। আত্মানুরাগ বা স্বদেহের প্রতি ভালবাসা মানুষের একটা সহজ বৃত্তি। মানুষের চেতনায় একটা অর্দ্ধ-নারীশ্বর রূপ রহিয়াছে। পুরুষ নিজের অস্তিত্বের মধ্যে নারীত্ব আরোপ করিয়া একটা অলীক সুখানুভব করিয়া থাকে। চুল বাড়াইয়া, মুখ মসৃণ করিয়া, চওড়া পাড়ের খদ্দরের চাদর জড়াইয়া, নারীকণ্ঠ অনুকরণ করিয়া, আপন অস্তিত্বে রমণী-স্পর্শ লাভ করা যায়। যৌন-মিলন-লালায়িত প্রকৃতি আপনার অন্তরে বাহিরে নারীর রূপ ও মাধুর্য্য সঞ্চারিত করিয়া সুখকর আত্ম-বঞ্চনায় লিপ্ত হয়। এক জন অধ্যাপককে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার চুল মেয়েদেরই মত কাণ ঢাকিয়া যাইত, তাঁহার চাদরকে শাড়ী বলিয়া ভ্রম হইত এবং ক্লাশে পড়াইতে গিয়া চাদর সরিয়া গেলে সংযত করিয়া দিতে মেয়েদেরই মত তিনি সজাগ ও সতর্ক ছিলেন।

অহমিকাও সজ্জিত দেহ প্রদর্শনের একটি কারণ। অসভ্যরা শিকার করিয়া নিহত পশুর শৃঙ্গ কিম্বা চর্ম্ম অলঙ্কাররূপে পরিয়া বীরত্ব প্রচার করিত। অপেক্ষাকৃত সভ্যযুগেও যুদ্ধজয় করিয়া বিধ্বস্ত শত্রুর দেহের অংশ বিজয়-চিহ্নরূপে ধারণ করা হইত। হার্বার্ট স্পেন্‌সারের মতে জয়নিদর্শন দ্বারা বীরত্ব ঘোষণার প্রবৃত্তিতেই অলঙ্কারের সূচনা হয়। ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদা প্রদর্শনার্থ বসন-ব্যবহার সভ্যযুগে সুপ্রচলিত। রাসিয়ার রাণী কেথারিণের পোষাকের দৈর্ঘ্য ছিল ৭৫ গজ এবং পঞ্চাশ জন অনুচর তাহা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধরিয়া চলিত।

কিন্তু মানুষ কেবল ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় না। শীর্ণ দেহ বলিষ্ঠ করিয়া দেখাইবার চেষ্টাও কম-বেশী সকলেই করেন। বসন দ্বারা দেহায়তন বর্দ্ধিত হয়। আমার মনে হয়, দেহ সম্প্রসারিত হয় বলিয়াই আমাদের মধ্যে চাদর এবং ঢিলা ও ঝোলা হাতা পাঞ্জাবীর এত সমাদর। অপরের সম্ভ্রম অর্জ্জন করিবার সাধ মানুষমাত্রের আছে এবং দেহবিস্তৃতিতে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব সম্পাদিত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এম্-এ পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার দিন পর্য্যন্তও চাদর দরকার হয় না। কিন্তু পাশ করিয়া অধ্যাপকের চাকুরী পাইলে, চাদর অপরিহার্য্য। কারণ, মাষ্টার হইলেই রাশ ভারি হওয়া চাই এবং রাতারাতি গুরুগম্ভীর হওয়ার পক্ষে চাদর প্রশস্ত। অল্পবয়সে যাহাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করিতে হয়, চাদরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ছড়িরও প্রয়োজন হয়। মুন্সেফী পাওয়ার কিছুকাল পরেই এক বন্ধু বর্ম্মা চুরুট ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, মোটা বর্ম্মা মুখে থাকিলে উকীল আমলারা অল্পবয়স বলিয়া তাচ্ছীল্য করিতে সাহস করে না।

দর্জ্জিরা কোটের কাঁধের দিকে পুরু বনাত জুড়িয়া দিয়া পরিধানকারীর স্কন্ধের মাংসাভাব পূরণ করে। সৈনিকদের পরিচ্ছদও এমন কৌশল করিয়া প্রস্তুত হয়, যেন তালপাতার সিপাইকেও প্রশস্তবক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। অপরের চিত্তাকর্ষণের অভিপ্রায়ে বসনোদ্ভাবনের আলোচনা সংক্ষেপে করা গেল। আর একটা কারণ উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। অসভ্য যুগে বসন না থাকিলেও প্রকাশ্য মিলনে নরনারীর বাধা ছিল। সে বাধা নীতির নহে, ভয়ের। এক নারী লইয়া একাধিক পুরুষের দ্বন্দ্ব তখনও ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে নরনারীর যৌনমিলন নিভৃতে হইত। মিলন-বিহ্বল নরনারীর অসতর্ক অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র শত্রুর পক্ষেও অনিষ্ট করা সহজ। অতএব অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত নিভৃতের প্রয়োজন। আজ যে সভ্য, তরুণ-তরুণী "আড়াল বুঝে, আঁধার খুঁজে, সবার আঁখি এড়ায়" তাহা কবি বলিবেন সুমিষ্ট লজ্জা। কিন্তু জীবতত্ত্ব-বিদ্ বলিবেন, ইহা আদিম প্রাণভয়ের উপর "সভ্যতার পলেস্তারা"।

এখন গোড়ার কথাটা পরিষ্কার করিয়া দিতে চাই। বলিয়াছিলাম—বস্ত্র হইতে লজ্জার জন্ম। বস্ত্রের উৎপত্তি হইলে ক্রমে সমাজে বস্ত্র-ব্যবহার প্রচলিত হইল। ব্যক্তি কিম্বা সমাজ-জীবনে একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেলে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে ভয়-সঙ্কোচের উৎপত্তি হয়। অভ্যাস-বিরতিই লজ্জা। বসন অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ায় আবরণের

অসংবৃতি আজ মহাসঙ্কোচের ব্যাপার। যে সকল অসভ্য সমাজে গাত্র উল্কি-চিহ্নিত করার প্রথা, সেখানে লোকে গায়ে ছাপ না দিলে লজ্জা পায়। যে দেশে মাথা ঢাকিবার চলন, সেখানে মাথা না ঢাকিলে লজ্জা। একই দেশে দুই আমলে লজ্জা দুই প্রকার। বিলাতে নারীদিগের পা ঢাকিয়া চলার প্রথা ছিল। তখন পা দেখান ছিল লজ্জা। সে প্রথা গিয়াছে। আজ পা দেখান ফ্যাশান। য়ুরোপীয় নারীরা হয় ত আজ লম্বা গাউন পরিতে লজ্জায় রাঙ্গা হইবেন। ফ্রক্ পরা অভ্যাস হইলে ছোট্ট শিশুকে স্নানের সময় ফ্রক্ ছাড়াইতে মারামারি করিতে হয়। ইহার পশ্চাতে টেবু (Taboo) ত আছেই। আমার মনে হয়, ইহার আর একটি কারণও আছে। জামা গায়ে দেওয়া অভ্যাস করিলে জামা সরাইলেই গাত্র-শিহরণ উপস্থিত হয়। এই গাত্রশিহরণের সঙ্গে সঙ্গে মনঃশিহরণ জন্মে। এই মনের শিহরণই লজ্জা। গাত্রশিহরণের কারণ আবিষ্কার কঠিন নহে। জামার নীচে দেহ বেশ গরম থাকে। অনাবৃত করিলেই বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া সোজা শরীরের চামড়ায় লাগে এবং হাওয়ার স্পর্শে ঈষৎ শীত করিয়া উঠে।

৩

পরিশেষে বসনের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। নাইট ডানলপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—অদূর-ভবিষ্যতে মেয়েরা সম্পূর্ণ বাসমুক্ত হইয়া সদর রাস্তায় বাহির হইবেন এবং বিন্দুমাত্রও লজ্জা পাইবেন না। এই ভবিষ্যৎ উক্তি অনেকেরই হাস্যোদ্রেক করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজের আদর্শ ও গতি যাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারা ডান্‌লপের বাণী হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন কি ?

যে সময়ে মেয়েদের সাজসজ্জার আতিশয্য ছিল, সে যুগের আদর্শ ও চিন্তাধারা আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পুরুষের রুচি-অনুযায়ী নারী আজ সকল ক্ষেত্রে নিজের জীবন পরিচালিত করিতে চাহে না। ভাল হউক, মন্দ হউক, শোভন হউক আর অশোভন হউক, পুরুষের অঙ্গুলী-নির্দ্দিষ্ট সমস্ত বিধি-পদ্ধতির বিরুদ্ধেই নারী বিদ্রোহ করিতে চাহে। নারীদের এই বিশ্বাস ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছে যে, যে নীতি বা এথিক্স্ এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা একান্তভাবে পুরুষ-রচিত। অনাবৃত পা বা হাত দেখান অপরাধ ছিল। কারণ, সন্দিগ্ধ স্বামীরা আপন আপন পত্নীদের নগ্ন-অঙ্গ-সুষমা পরপুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত হউক, ইহা পছন্দ করিত না। যে যুগে নারীরা এই নিষেধ মানিয়াছে, সেই যুগে পুরুষের সন্তোষ অসন্তোষের উপর নারীদের জীবনের সুখ নির্ভর করিত। নারীরা আরও বুঝিয়াছে যে, তাহাদের সাজসজ্জায় পুরুষরা যে অকাতরে ব্যয় করিয়াছে এবং ভূষণ-বাহুল্যে সুখী হইয়াছে, তাহার কারণ—পুরুষের কাছে নারী ছিল ঐশ্বর্য্য ; এই ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের সহিত প্রচার করিয়া পুরুষ গৌরব ও পৌরুষ বোধ করিত।

আত্মচেতনাশীলা য়ুরোপীয়া নারী আজ বসন-ভূষণ অসম্মানকর মনে করে এবং ভাবে, এক একটি ভূষণ-পরিত্যাগ দ্বারা পুরুষ জাতির উপর তাহাদের একটা জয়লাভ সূচিত হইতেছে। নারীদের বসন-হ্রাসের আর একটা কারণ আছে। আজ পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র এক হইয়া পড়িয়াছে। আপিসের টাইপিষ্ট্ স্ত্রীলোক, ষ্টেশনের টিকেট-চেকার স্ত্রীলোক, বীমা কোম্পানীর এজেন্ট্ স্ত্রীলোক, কাউন্সিল্-কর্পোরেশনে স্ত্রীলোকরা স্থান পাইতেছে। অল্প-দিনমধ্যে আইন-ব্যবসায়ে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া হারিতে হইবে। জীবনক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের এই ঘনতার একটা ফল—উভয়েরই চিত্ত-চাঞ্চল্য। পুরুষের নিরন্তর সান্নিধ্যে নারীর এবং নারীর সান্নিধ্যে পুরুষের চিত্ত-স্থৈর্য্য নষ্ট হইতেছে। উইলিয়ম্ ম্যাক্‌ডোনাল্ তাঁহার একটি হালে প্রকাশিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—আপিস ঘরে পাশের টাইপিষ্ট্ গার্ল্ দেখিয়া যাহাতে চিত্ত-বিক্ষোভ উপস্থিত না হয়, সে জন্য টেবলের উপর পত্নী বা পুত্র-কন্যার ছবি রাখিয়া দেওয়া ভাল। কিন্তু ছবির প্রতিষেধক শক্তি অকিঞ্চিৎকর।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাস (এম্, এ)

২৩

রেলপথে এক দিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। একখানা গাড়ীতে তুলাকা, গারা, তমলা ও লুলু, সে গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। পাশের গাড়ীতে মুমী, টোটো তাহার কাছে ছিল। অধ্যক্ষ স্বতন্ত্র গাড়ীতে ছিলেন। দ্বিতীয় দিবস প্রভাতকালে পাহাড়ের নীচে গাড়ী পৌছিল। সেখান হইতে অন্য গাড়ীতে পাহাড়ে উঠিতে হয়। গাড়ী বদল করিবার পূর্ব্বে সকলে শীতবস্ত্র ধারণ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে লুলু বড় পাহাড় দেখে নাই। গুহা দেখিবার সময় যে পাহাড়ে উঠিয়াছিল, তাহা বিশেষ উচ্চ নয়, সেখানে বরফও ছিল না। সে মনে করিয়াছিল, এ পাহাড় একেবারে গগনস্পর্শী হইবে, সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গসমূহ দেখা যাইবে। যাহা দেখিল, তাহাতে সে কিছু নিরাশ হইল। সম্মুখে পর্ব্বত তেমন কিছু উচ্চ নয়, বরফের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ে উঠিবার ছোট ছোট রেলগাড়ী, যেমন যেমন গাড়ী উপরে উঠিতে লাগিল, সেইরূপ লুলুর ভ্রম অপনীত হইল। গাড়ী বাঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কোথাও যেন লুকোচুরি খেলা, গাড়ীর সম্মুখে দেখা যায় ত পিছনে দেখা যায় না, কোথায় নীচে রেলের লাইন উজ্জ্বল লৌহ-রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথাও পর্ব্বতের প্রাচীর ভেদ করিয়া ঘোর অন্ধকারে গাড়ী চলিয়াছে, আঁকাবাঁকা সংসর্পিত গতি। তরুশ্রেণীর বিচিত্রতা লুলু লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। কোন স্থানে বহুসংখ্যক একজাতীয় বৃক্ষ, আবার একটু উপরে উঠিলে আর একজাতীয় গাছ। ফুল নানা জাতীয়। কোথাও কিছু দূর পর্য্যন্ত কেবল বন্য গোলাপ, কোথাও ডালিয়া ফুলে চারিদিক পরিপূর্ণ। এক স্থানে কেবল শেফালি। ক্রমে দেবদারু বৃক্ষ দেখা দিল, তাহার পর পাইন গাছ, সূচীর ন্যায় গুচ্ছ গুচ্ছ পত্র, কাটা কাটা কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বড় বড় ফল। পথের পাশেই অতল-স্পর্শ খাদ, নীচে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। খাদের নীচে দিয়া ঝরণার জল শীর্ণ শুভ্র রজতরেখার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। কোন চিত্রের আবরণ অল্পে অল্পে অপসৃত হইলে চিত্রের সৌন্দর্য্য যেমন ক্রমে ক্রমে চক্ষুর সমক্ষে ফুটিয়া উঠে, পর্ব্বতের বিশাল আয়তন ও মহান্ সৌন্দর্য্য সেইরূপ ক্রমে ক্রমে লুলুর নয়নগোচর হইল। প্রথম নিরাশার ভাব লুপ্ত হইয়া তাহার চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইল। পটের পর পট পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অভ্রভেদী চূড়া, সমতল সানু, পর্ব্বতের মধ্যে নিম্নতল উপত্যকা, স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হ্রদ, একে একে সম্মুখে আসিতে লাগিল, আবার পিছাইয়া পড়িল। মধ্যাহ্ন অতীত হইলে দূরে আকাশপটে হিমানী-ভূষিত পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখা দিল। শ্রেণীবদ্ধ, শুভ্র উষ্ণীষধারী, মহাকায় দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। শুভ্র তুষারে সূর্য্যকিরণ প্রতিহত হইয়া হোম-শিখার ন্যায় আকাশ লেহন করিতেছে।

শাহানায় পৌছিতে সন্ধ্যা হইল। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দূরে পর্ব্বত-চূড়ার কণ্ঠে মেঘ সংলগ্ন হইয়াছে। রেলগাড়ী হইতে নামিয়া সকলে দেখিলেন, যে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল, তাহার রক্ষক তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছে। সে তাঁহাদের জন্য কয়েকটা রিক্‌শা নিযুক্ত করিয়াছিল। প্রত্যেক রিক্‌শায় চারিজন বাহক। তাহারা পর্ব্বতনিবাসী, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠকায়। সকলে রিক্‌শায় আরোহণ করিয়া বাড়ীতে গমন করিলেন। পাহাড়ের গায় চারিদিকে বাড়ী তরুশাখায় পক্ষিনীড়ের ন্যায় লীন হইয়া রহিয়াছে। কিছু দূর গিয়া একটা স্বতন্ত্র পর্ব্বতের শিখরদেশে একটা বৃহৎ বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে খানিকটা সমতল ভূমি, চারিদিকে ফুলের গাছ, বাড়ীর তিন দিকে বারান্দা, কাচ দিয়া আঁটা। বাড়ীর সম্মুখে কয়েক জন ভৃত্য ও দাসী দাঁড়াইয়া আছে। রিক্‌শা হইতে নামিয়াই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সকলে বাড়ী দেখিতে লাগিলেন। লুলু আনন্দে বালিকার ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঘর বারোটি, সকল ঘরই সজ্জিত, ছয় সাতটি শয়নকক্ষ। প্রত্যেক শয়ন-প্রকোষ্ঠের পাশে স্নানাগার। বেশ বড় গোল কামরা, গদি-মোড়া চেয়ার, সোফা, একটা বাজনা। টেবলের উপর পুষ্পাধারে ফুল রহিয়াছে। লম্বা ডাঁটার উপর ছোট ছোট সাদা ফুল, ফুলের ভিতর পীত-বর্ণের বাটীর আকার। ফুলের সুগন্ধ পাইয়া লুলু তুলিয়া আঘ্রাণ করিল। বলিল, কি চমৎকার গন্ধ! এ ফুল ত কখনও দেখিনি।

তুলাকা বলিলেন, ও নরগস্ ফুল, পাহাড়ে আর শীতের দেশে হয়।

গারা সকলের শয়নকক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তুলাকার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহার পাশে গারা। তাহার পাশে একটা বড় ঘর, সেইটা লুলুর জন্য স্থির হইল, মুমীর জন্য একটা ছোট শয়নগৃহ ছিল। লুলুর ঘরের পাশেই তমলার ঘর। লুলু বলিল, তোমার জিনিষপত্র তোমার ঘরে থাক, কিন্তু তুমি আমার ঘরে শোবে। রোগীর ভার তোমার উপর কি না।

তুলাকা বলিলেন, তোমার রোগের সাধ এখনও কি মেটে নি?

তমলা বলিল, আমাকে যেখানে শুতে বল্‌বেন, সেখানেই শোব। কিন্তু রোগী এখানে কেউ নেই।

লুলু তমলার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, দেখ, আপনি মশায় ও-সব ছাড়। আমরা এত উঁচুতে উঠেছি যে, প্রায় স্বর্গের কাছাকাছি, এখানে কেউ কাকে আপনি বলে না। আমাকে যদি আবার আপনি বলেছ, তা হ'লে তোমার মুখ টিপে ধর্‌ব।

তমলা লজ্জিত হইয়া গারা ও তুলাকার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, আমি সামান্য গরীব মানুষ—

তাহার কথায় বাধা দিয়া লুলু বলিল, আর আমি অসামান্য বড় মানুষ, না? আমি একটা কোথাকার বুনো অসভ্য জাতের মেয়ে, পর্‌বার কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না। জিজ্ঞাসা কর না গারা আর মুমীকে।

গারা তমলাকে বলিলেন, লুলু ভারি একজিদী মেয়ে, যা ধরে, তা কিছুতেই ছাড়ে না। আর সত্যিই ত, ও একে ছেলেমানুষ, আর কোথা থেকে ভেসে এসেছে কে জানে? ও যখন বারণ কর্‌ছে, তখন আর ওকে আপনি ব'লো না।

তমলা বলিল, আচ্ছা, তাই হবে।

লুলু তমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল, তাহার কাণে কাণে বলিল, তোমায় আমায় বড় ভাব!

তমলা হাসিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার চক্ষুর কোণে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

লুলুর শয়নকক্ষে জোড়া পালঙ্ক ছিল, সুতরাং তমলার শয়নে কোন অসুবিধা হইল না। টোটো সারাদিন গাড়ীতে বদ্ধ ছিল, বাড়ীতে আসিয়া ছাড়া পাইয়া খুব খানিক লাফালাফি করিল। তার পর মুমী তাহাকে খাওয়াইয়া বাঁধিয়া রাখিল।

শয়নের পূর্ব্বে সকলে একবার বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশ মেঘে অন্ধকার, কোথাও একটি তারা দেখা যায় না। কেবল পাহাড়ের সর্ব্বাঙ্গে গৃহসমূহে দীপাবলীর ন্যায় আলোক জ্বলিতেছে,—উপরে, নীচে, পাশে, স্থির খদ্যোতের ন্যায় আলোকমালা।

রাত্রিতে সকলের উত্তম নিদ্রা হইল। প্রভাত হইলে প্রথমে লুলুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তমলা তখন নিদ্রিত। লুলু নিঃশব্দে উঠিয়া কাচের উপরকার পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য। পর্ব্বতের উপরে, নীচে, বাড়ীর সম্মুখে, গাছের মাথায়, ডালে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। আকাশ ধূসরবর্ণ, সূর্য্যের আলোক দেখা যায় না, আকাশ হইতে শুভ্র কার্পাসের ন্যায় তুষারপাত হইতেছে, শ্বেত আবরণ আরও শ্বেত দেখাইতেছে। কোন শব্দ নাই, বায়ু স্থির, কেবল নিঃশব্দে অজস্র তুষারখণ্ড পতিত হইতেছে। লুলু করতালি দিয়া সানন্দে বলিল, দেখ, কি চমৎকার দেখতে!

তমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে লুলুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বরফ পড়ছে। কাল যখন আসি, তখন ত কিছু ছিল না।

লুলুর আনন্দকোলাহলে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অধ্যক্ষের শয়নগৃহ কিছু দূরে, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে কিছু বিলম্ব হইল।

লুলু তখনই বাহিরে যাইতে চায়, বলে, আমি কখন বরফ পড়া দেখি নি, বাইরে গিয়ে হাতে নিয়ে দেখব।

তাহার আগ্রহ দেখিয়া আর সকলে হাসিতে লাগিল। তুলাকা বলিলেন, অত ব্যস্ত কেন? আমরা সকলেই যাব। কিছু খেয়ে কাপড় প'রে চল।

অল্পক্ষণ পরে সকলে দল বাঁধিয়া বাহির হইল। সকলের হাতে দীর্ঘ যষ্টি, পায়ে বরফের উপর হাঁটিবার জুতা। বাহিরে আসিয়া লুলু বলিল, বরফ পড়ছে, তা শীত কৈ?

শীতের বিশেষ কোন লক্ষণ ছিল না। লুলু বরফ হাতে তুলিয়া দেখিল, শুষ্ক গুঁড়ার মত, কাপড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিলে পড়িয়া যায়। তুলাকা হাসিয়া বলিলেন, শীত কি

এখন হবে ? এর পর যখন বাতাস উঠবে, তখন কন্‌কনে শীত হবে।

পাহাড়ের পথে আরও অনেক লোক চলিয়াছে। সকলের হাতে লম্বা লাঠি, সকলের অঙ্গে তুলার মত বরফ লাগিয়া আছে। পথে বরফে পা ডুবিয়া যায়। টোটোর পিঠে মোটা কাপড় বাঁধা ছিল। সে কখন ছুটিয়া আগে চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়া গায়ের বরফ ফেলিয়া দেয়, যে নিকটে থাকে, তাহার অঙ্গে বরফ লাগে। পথে দুই চারি জন লুলুকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও ভিড় হইল না। সকলেই কিছু সাবধানে চলিয়াছে, বরফে পথ ঢাকা, অসাবধানে উঁচু-নীচু স্থানে পা পড়িলে মচকাইয়া যাইবার আশঙ্কা। পথ সর্ব্বত্র উচ্চাবচ, কেবল উঠিতে নামিতে হয়। পর্ব্বত-ভ্রমণে কেহ তেমন অভ্যস্ত নয়, কিছু দূর গিয়া সকলেই শ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ মোটা মানুষ, তাঁহার হাঁপ ধরিল, কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল, বরফ মুখে লাগিয়া গলিয়া বক্ষে পড়িতে লাগিল। লুলু কিছুতে ক্লান্তি স্বীকার করিবে না। সে তমলাকে সঙ্গে করিয়া সকলের আগে যাইতেছিল। তমলা কৃশাঙ্গী, পরিশ্রমপটু, পাহাড়ে উঠা অভ্যাস না থাকিলেও আনন্দ অনুভব করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে তমলা কহিল, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। তোমার শরীর এখনও সবল হয় নি, র'য়ে স'য়ে পরিশ্রম করবে।

—তথাস্তু। আমি ত রোগী, তোমার হুকুম শোনাই আমার কায। তমলা লুলুর হাত ধরিয়া টিপিল, কহিল, আহা, এমন লক্ষ্মী কেউ কখনও দেখে নি।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া লুলু আর তমলা মিলিয়া বাড়ীর সম্মুখে বরফ দিয়া একটা মানুষের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল। প্রকাণ্ড আকার, চার পাঁচ হাত দীর্ঘ, অবয়ব বলবান পুরুষের ন্যায়। তমলা তেমন দক্ষ নয়, সে বরফ সংগ্রহ করিতে লাগিল আর লুলু অত্যন্ত কৌশলের সহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করিতে লাগিল। মস্তক, হস্ত, পদ নির্ম্মাণ করিয়া, অঙ্গুলি দিয়া চক্ষু, নাসা, ওষ্ঠাধর, শ্রবণ গঠন করিল। হস্ত-পদের অঙ্গুলি গড়িল, মাথায় বরফ দিয়া কুঞ্চিত কেশ রচনা করিল। তুলাকা, গারা, অধ্যক্ষ দাঁড়াইয়া সকৌতুকে দেখিতে লাগিলেন। মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে তুলাকা বলিলেন, লুলু, তোমার কোন কলাবিদ্যা শিখতে বাকি নেই। ভাস্করের কায কবে শিখ্‌লে ?

লুলু একটু তফাতে দাঁড়াইয়া নিজের কারিকরি দেখিতেছিল। মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, বিদ্যা ত ভারি ! ছেলেবেলায় বালি দিয়ে মাটী দিয়ে খেলাঘরে মূর্ত্তি তৈরী কর্‌তাম, এও তাই। তুমি তামাসা কর্‌বে কর, এ ত তামাসারই জিনিষ।

গারা বলিলেন, তামাসা কেন হবে ? তুমি ত খুব সুন্দর গড়েছ। আমরা হাজার চেষ্টা কর্‌লেও এ রকম গড়তে পারি নে।

একটু বেলা হইলে বাতাস উঠিল। সেই সঙ্গে শীত, অস্থিমজ্জায় সূচের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। লুলু তুলাকাকে বলিল, তুমি যা বলেছিলে, তাই হ'ল। এইবার শীতের দাঁত বেরিয়েছে।

তুলাকা বলিলেন, দাঁত কি ছুরী কি হ'ল বুঝ্‌তে পারিনে, কিন্তু হাড়ের ভিতর একটা কিছু ফুট্‌ছে আর বুকের ভিতর গুরগুর কর্‌ছে।

শীতের ভয়ে কিন্তু কেহই ঘরের ভিতর বসিয়া আগুন পোহাইতেছিল না, আহারাদির পর সকলেই বাড়ীর বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বাতাসে বরফ জমিতে আরম্ভ হইল, লুলু স্পর্শ করিয়া অনুভব করিল—বরফের মানুষের অঙ্গ কঠিন হইতেছে।

বাতাসের বেগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল আর সেই সঙ্গে মেঘ কাটিয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, বরফ পড়া বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমে মেঘমুক্ত সূর্য্য দেখা দিল, শিখরে শিখরে রৌদ্রকিরণে বরফের স্তূপ জ্বলিতে লাগিল। লুলু বলিয়া উঠিল, দেখ, দেখ, বরফ-ঢাকা পাহাড় কত কাছে।

তুলাকা হাসিয়া বলিলেন, কত কাছে মনে হয় ?

লুলু বলিল, কত দূর আর হবে ! বড় জোর ক্রোশখানেক কি ক্রোশ দুই হবে। চল না, আমরা গিয়ে উঠি।

অধ্যক্ষ বলিলেন, এখানে কি রকম চোখের ভুল হয় দেখেছ ? যে পাহাড় খুব কাছে, সেটাও অন্ততঃ দশ দিনের পথ হবে। আর সব মাসখানেক, দেড় মাসের রাস্তা, আর পথও বড় সোজা নয়।

—তাই না কি ! দেখলে মনে হয়, যেন খুব কাছে, একটু এগিয়ে গেলেই পৌছানো যাবে।

তমলা বলিয়া উঠিল, ঐ যা! তোমার বরফের পুতুলের কি হ'ল!

লুলু ফিরিয়া দেখিল, রৌদ্রের উত্তাপে তুষারনির্ম্মিত মূর্ত্তি গলিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে দুইটি কাণ গেল, তাহার পর নাক, তাহার পর অঙ্গুলি, তাহার পর সমস্তই গলিতে আরম্ভ হইল। লুলু কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিয়া কহিল, আমার এমন সুন্দর সাদা মানুষটি এরি মধ্যে ম'রে গেল!

বৈকালবেলা সকলে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। অধ্যক্ষ বলিলেন, এখানে বরফের উপর পায়ে চাকা বেঁধে ঘুরে বেড়াবার একটা যায়গা আছে, চলুন, সেইখানে যাওয়া যাক্।

লুলু বিস্মিত হইয়া বলিল, সে আবার কি?

তুলাকা বলিলেন, তুমি বুঝি কখনও দেখনি? সে ভারি কৌশলের খেলা, তোমার দেখতে খুব ভাল লাগবে।

লুলু উৎসুক ও আগ্রহের সহিত বলিল, চল, চল, শীঘ্র চল। আমাকে দেখতে হবে।

পথে দ্রুতগমন অসম্ভব। বরফ গলিয়া পথ পিচ্ছিল হইয়াছে, সাবধানে না চলিলে পদস্খলন হইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। যষ্টির সহায়তায় সকলে সাবধানে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া পথ নীচে নামিয়া গিয়াছে। নীচে গিয়া একটা সমতল স্থানে একটি ছোট হ্রদ, তাহার উপরের খানিকটা জল জমিয়া কঠিন বরফ হইয়া গিয়াছে। অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক জুতার নীচে চাকা বাঁধিয়া বরফের উপর নানাবিধ মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে। সকলের আঁটা পোষাক, লুলুরাও সেই রকম পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। বরফের ধারে কয়েক জন লোক অনেকগুলা চাকা লইয়া বসিয়াছিল, নির্দ্ধারিত মূল্য লইয়া সকলের পায়ে চাকা বাঁধিয়া দিতেছিল। তুলাকারা আসিতেই তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, আসুন, আপনাদের পায়ে চাকা বেঁধে দিই।

তুলাকা বলিলেন, আমি অল্প অল্প জানি, কিন্তু এঁরা এখনও শেখেন নি। খানিক দাঁড়িয়ে আমরা দেখি।

সে ব্যক্তি বলিল, শেখা খুব সহজ, শেখাবার লোকও আমাদের আছে। আর যাঁরা বরফের উপর রয়েছেন, তাঁরাও সাহায্য করেন।

লুলু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, এ খেলায় বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে পায়ে চাকা বাঁধিয়া বরফের উপর দাঁড়ানই কঠিন। সর্ব্বদা পা হড়্‌কিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। মাঝে মাঝে কেহ কেহ পড়িয়া যাইতেছিল। পড়িয়া গেলে কাহারও সহায়তা না পাইলে উঠা কঠিন, উঠিবার চেষ্টা করিলে চাকা সরিয়া যায়। সমস্ত কৌশল হস্ত-পদের ও অঙ্গের ভর রক্ষায়। পদক্ষেপ করিতে হয় না, পা তুলিবার আবশ্যক হয় না, সমস্ত শরীর যেন একটা চক্রযান যন্ত্রের মত, কটিদেশের অলক্ষিত চালনায় বেগে সর্ব্বত্র চালিত হইতেছে। কখন কখন দুই জনে হাত ধরাধরি করিতেছে। যাহারা কুশলী, তাহারা নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র গতিতে ছক কাটিয়া অথবা মণ্ডল করিয়া ঘুরিতেছে। এক জনের উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল। তাহার তুল্য কৌশল আর কাহারও ছিল না। দিব্যকান্তি যুবা পুরুষ, সহাস্য প্রসন্ন আনন, আয়ত চক্ষু কৌতুকপূর্ণ। আয়তন অল্প দীর্ঘ, শরীরের অনিন্দ্য গঠন। বরফের উপর অবলীলাক্রমে বহুতর মনোহর ভঙ্গীতে ঘুরিতেছিল।

কিছুক্ষণ দেখিয়া লুলু তুলাকাকে বলিল, এস, এবার আমরাও দেখি পারি কি না।

তুলাকা বলিলেন, আমি ত খুব ভাল জানি নে, তোমাকে শিখাতে গেলে আমিও প'ড়ে যাব। তোমাকে প্রথম প্রথম এক জনের হাত ধর্‌তে হবে, নহিলে পার্‌বে না।

যাহারা পায় চাকা বাঁধিয়া দিতেছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, আসুন, আমি আপনার হাত ধরছি।

তুলাকা ও লুলুর পায়ের তলায় চাকা বাঁধা হইল, আর কেহ স্বীকৃত হইলেন না। তুলাকা বরফের উপর চাকায় ভর করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, একটা লোক লুলুর হাত ধরিয়া বরফের উপর লইয়া গেল। প্রথমে লুলুর বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল, পা পিছলাইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু নৃত্যকলায় লুলু অদ্বিতীয়, পাদবিক্ষেপে অভ্যস্ত, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার পড়িয়া যাইবার বিশেষ আশঙ্কা রহিল না।

যে যুবক অত্যন্ত কৌশলের সহিত চক্রক্রীড়া করিতেছিল, সে দেখিল, এই যুবতী এ কৌশলে অনভ্যস্ত, নূতন শিখিতেছে। সে নিমেষের মধ্যে লুলুর পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল, আপনি কি নতুন শিখ্‌ছেন?

লুলু হাসিয়া বলিল, আমি এ খেলা আজ প্রথম শিখছি, আমি কিছুই জানিনে।

আমি আপনাকে শেখাচ্ছি, তা হ'লে আপনি শীঘ্র শিখতে পার্‌বেন।

লুলুর মনে একবার সন্দেহ হইল, এ ব্যক্তি এই কৌশলে তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে যে দিন হইতে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিন হইতে এত লোক তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিত যে, সে জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল, বোধ হয়, পুরুষ জাতির উপর কিছু বিদ্বেষও জন্মিয়াছিল। সে সন্দিগ্ধভাবে বলিল, আমাকে নিয়ে আপনার বিপদ হবে, আপনার নিজের আমোদ হবে না।

যুবক আর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল না, কহিল, আপনার যেমন ইচ্ছা, তবে আমার কোন অসুবিধা হবে না।

যে লোকটা লুলুর হাত ধরিয়া তাহাকে শিখাইতেছিল, সে বলিল, ওঁর কাছে আপনি খুব ভাল আর খুব শীঘ্র শিখতে পার্‌বেন।

তখন লুলু বলিল, আমাকে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা কর্‌বেন না। আমার সঙ্কোচও মার্জ্জনীয়। আপনি যদি আমাকে শেখান ত আমি উপকৃত হব।

যুবক লুলুর হাত ধরিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি ফিরিয়া গেল। হাত ধরিতেই লুলুর অননুভূতপূর্ব্ব শারীরিক ও মানসিক বিকার উৎপন্ন হইল। তাহার হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইল, সহসা বক্ষের ভিতর কিরূপ চঞ্চলতা অনুভব করিল, মুখে লোহিত আভা দেখা দিল। যুবকও কিছু বিচলিত হইল, কিন্তু দুই জনই তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবৃত হইল। যুবক লুলুর হাত লঘুভাবে ধারণ করিল, বিচিত্র কৌশলের সহিত তাহাকে হ্রদের মধ্যস্থানে লইয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল, আমার কৌতুহল মার্জ্জনা কর্‌বেন। আপনি কোন্ দেশের লোক, আমি ঠিক বুঝতে পার্‌ছি নে। আপনাকে দেখে এ সব দেশের লোক মনে হয় না।

এ ব্যক্তি কি লুলুকে কখন দেখে নাই, তাহার নাম শুনে নাই? তাহা হইলে লুলুর পক্ষে নূতন অভিজ্ঞতা। বলিল, আমার দেশ অনেক দূরে, এখানে কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। আপনি কোন্ দেশের লোক? ইতিমধ্যে কোন্ সহরে গিয়েছিলেন?

যে দুইটি প্রধান নগরে লুলু ছিল, তাহার নাম করিল। যুবক হাসিয়া বলিল, আমারও দেশ বহুদূর, আর সহরের কথা বলেন ত এক বৎসর আমি কোন সহর দেখিনি, গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি, হিংস্র জন্তু শিকার করেছি, নানা রকম অসভ্য জাতি দেখেছি। এক বৎসরের মধ্যে কোন সংবাদপত্র দেখিনি। এক সপ্তাহ ফিরেছি। এ পাহাড় আমার ভাল লাগে ব'লে সোজা এখানে চ'লে এসেছি। এক বছরের কোন খবর রাখি নে। আমার মত আর একটি অজ্ঞ খুঁজে পাবেন না।

লুলুর অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহার আশঙ্কা, সকলেই তাহার নাম জানে, কোন ছলে তাহার সহিত আলাপ করিতে চায়। সে আশঙ্কা তিরোহিত হইল। এ ব্যক্তি কখন লুলুর নাম শুনে নাই, লুলু কে, তাহা জানে না। সংশয়ের—সঙ্কোচের কোন কারণ রহিল না। কয়েকবার ঘুরিয়া যুবক কহিল, আপনি বলিতেছেন, বরফের উপর এ খেলা আপনি কখন দেখেন নি, কিন্তু আপনার পদবিন্যাস সে রকম মনে হয় না। আপনি খুব শীঘ্র শিখতে পার্‌বেন।

লুলু বলিল, আমার দৌড়ধাপ করা অভ্যাস আছে।

—শুধু তাতে হয় না, আপনি বোধ হয় উত্তম নৃত্য-কৌশল জানেন।

—তাও কিছু কিছু জানি।

এ পর্য্যন্ত যুবক লুলুকে সাবধানে লইয়া যাইতেছিল। এখন তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বেগে চলিল। লুলুর আবার সেই রকম চিত্তের চঞ্চলতা উপস্থিত হইল। কিন্তু গতির বেগে তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইল। চক্রাকারে সে ঘুরিতে লাগিল। তাহাদের গতিতে মণ্ডল রচিত হইতে লাগিল। পদস্খলন হইবার আশঙ্কায় লুলুও যুবকের হাত চাপিয়া ধরিল। আর সকলে যে তাহাদিগকে দেখিতেছে, লুলু তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে লুলু বলিল, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। আমার শরীর তেমন সবল নয়।

—আগে সে কথা বলেন নি কেন? বলিয়া যুবক বেগ মন্দীভূত করিল, হ্রদের ধারে আসিয়া লুলুর পায়ের চাকা খুলিয়া দিল, নিজেও খুলিয়া ফেলিল। তুলাকা তাহার পূর্ব্বেই চলিয়া আসিয়াছিলেন।

তুলাকা বলিলেন, এঁর মত শিক্ষাগুরু পেলে তুমি দুদিনে শিখে ফেল্‌বে। আমাদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দাও।

লুলু ও যুবক পরস্পরের মুখ চাহিয়া একত্রে হাসিয়া উঠিল। দুই জনে বলিল, আমাদেরই এখনও পরিচয় হয় নি।

গারা, অধ্যক্ষ ও তমলা যুবককে দেখিতেছিলেন। যুবক বলিল, আমার নাম কুশান। বাকি পরিচয় ত আপনাকে দিয়েছি।

লুলু বলিল, আমার নাম লুলু।

আর সকলের নাম বলিয়া লুলু বলিল, ইনি এক বছর বনবাসে ছিলেন, বাঘ-ভাল্লুক শিকার করছিলেন। এ সব অঞ্চলের কোন খবর রাখেন না।

সকলেই বুঝিতে পারিল, যুবক লুলুর নাম শোনে নাই। গারা কহিলেন, আপনি আমাদের বাড়ী আসবেন না?

—অনুমতি হলেই যাব।

অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় আছেন?

পাহাড়ে বাড়ীর নাম রাখা প্রথা। কুশান একটা বাড়ীর নাম করিল।' অধ্যক্ষ কহিলেন, ওঃ. সে যে বড় বাড়ী!

কুশান তাচ্ছীল্যভাবে কহিল, যেখানে হয় থাক্‌লেই হ'ল। এই ত এক বছর বন-জঙ্গলে কাটিয়েছি, তাতেও কোন কষ্ট হয়নি।

লুলুকে কুশান জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কাল চাকায় চলা শিখবেন?

—শিখব বৈ কি! আপনি শেখালে খুব শীঘ্র হবে।

গারা বলিলেন, কাল বিকালে আপনি আমাদের ওখানে চা খাবেন, তার পর সকলে একসঙ্গে আসা যাবে।

—যে আজ্ঞা, বলিয়া কুশান সকলকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় একবার লুলুর ও কুশানের চোখে চোখে মিলিল। দুই জনের সরল দৃষ্টি, দুই জনই তখনি চক্ষু নত করিল। কেবল তমলা তাহা লক্ষ্য করিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে তুলাকা বলিলেন, দেখলে লুলু, এমনও মানুষ আছে, যে কখনও তোমার নাম শোনে নি। কেমন লাগছে তোমার?

—আঃ, বাঁচলাম! সব সময় আমার পিছনে যেন ফেউ লেগে থাক্‌ত, কোন লোককে আমার বিশ্বাস হ'ত না, কেবল পালাই পালাই ডাক ছাড়তাম। এ লোকটি কস্মিন্‌কালে আমার নাম শোনেনি, আমার সঙ্গে আলাপ করবার কোন ইচ্ছা নেই। প্রথমে আমি একটু পিছিয়ে-ছিলাম ব'লে আমাকে শেখাতেই চায় নি, তার পর আমি আবার বলাতে রাজি হ'ল।

অধ্যক্ষ বলিলেন, লোকটা ধন-কুবের হবে। অনেক টাকা না থাক্‌লে অমন বাড়ী নিতে পারে না।

রাত্রিতে শয়নকালে তমলা লুলুকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কুশানকে তোমার কি রকম মনে হয়?

—কি আবার মনে হবে? আজ ত প্রথম আমাদের সঙ্গে দেখা।

—আমি একটা কথা ভাব্‌ছিলাম।

—কি কথা?

—কিছু না।

২৪

প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময় কুশানের কথা উঠিল। অধ্যক্ষ বলিলেন, এই লোকটি যে বাড়ীতে আছে, এক দিন আপনাদের দেখাব। অত বড় আর ও রকম সাজানো বাড়ী এখানে আর নেই। ভাড়া অনেক হবে, খুব ধনবান্ না হ'লে সে বাড়ী নিতে পারে না।

লুলু বলিল, সে কথা আমি ভাবছি নে। ও যে কখন আমার নাম শোনে নি আর আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য কোন কৌশল করে নি, তাতেই আমি খুসী হয়েছি।

তুলাকা বলিলেন, এইবার সব জান্‌তে পার্‌বে, তা হ'লে আর তোমার সঙ্গ ছাড়বে না।

লুলু বলিল, সঙ্গ ত আর এক জনে হয় না, ভাল লোক হ'লে আমাদের আলাপ কর্‌তে কোন আপত্তি নেই। সহ-রের লোকগুলার মত আমাকে একটা নতুন জানোয়ার মনে না কর্‌লেই হ'ল। সে রকম লোক হ'লে গারা চা খেতে নিমন্ত্রণ কর্‌তেন না।

গারা বলিলেন, এ ব্যক্তি সৎ লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লুলু তমলাকে টানিয়া আগে লইয়া গেল। অপর কেহ শুনিতে না পায়, এরূপ মৃদুস্বরে বলিল, কাল রাত্রে তুমি কি কথা ভাবছিলে, আমাকে বল্‌লে না?

তমলাও সেইরূপ মৃদুকণ্ঠে বলিল, এমন কোন কথা নয়, এখন যে কথা হচ্ছিল, তাই। আমি কুশানের কথা ভাবছিলাম।

—তবে কি আর গোপনীয় কথা যে, আমাকে বল্‌লে না ?

—আমি তোমার কথা ভাবছিলাম।

—আমিও কি নতুন মানুষ, না এর আগে আমাকে দেখ নি ?

—হঠাৎ কুশানের সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল, তাই ভাবছিলাম।

লুলু তমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। বলিল, ও কথা এখন থাক্, আর কোন সময় হবে।

—সেই ভাল।

চা পান করিবার সময় কুশান আসিল। সকলে বাড়ীর বাহিরে পায়চারি করিতেছিল, লুলু টোটোর সঙ্গে খেলা করিতেছিল। কুশানকে দেখিয়াই টোটো থমকিয়া দাঁড়াইল। কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কুশান নিঃশঙ্ক-চিত্তে টোটোর কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিল। জিজ্ঞাসা করিল, এর নাম কি ?

লুলু বলিল, টোটো।

— বেশ নাম। বেশ কুকুর। টোটো, টোটো !

কুশান কয়েকবার টোটোর মাথায়, পিঠে হাত দিল। টোটো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মাটীতে লুটাইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

গারা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য ! টোটো আপনাকে কখন দেখেনি, কিন্তু একবার দেখেই আপনাকে বন্ধু ঠাউরেছে !

কুশান বলিল, জানোয়ার-মহলে আমার খুব পসার। কুকুরের শত্রু-মিত্র-জ্ঞান খুব প্রবল। আপনারা যখন মিত্রভাবে আমাকে ডেকেছেন, সে অবস্থায় টোটো কেন আমার বিদ্বেষী হবে ?

চা খাইবার সময় গারা ও তুলাকার মাঝখানে কুশানের স্থান হইল। লুলু আর তমলা আর এক দিকে। অধ্যক্ষ তাহাদের মধ্যস্থলে। কুশানকে অধ্যক্ষের কোন বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল, ইনি রমণীদিগের কোন আত্মীয় বা বন্ধু হইবেন।

তুলাকা বলিলেন, শুন্‌ছি, আপনার বাড়ী নাকি এখানে দেখ্‌বার জিনিষ। অমন বাড়ী আর নেই।

—আপনারা একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন না ? আমার সঙ্কোচের কেবল একটা কথা আছে।

—কি ?

—আমি একা। বাড়ীতে আর কেউ নেই।

—স্ত্রীলোক কেউ নেই ?

—তা হ'লে তাঁদের দেখতে পেতেন। আমি অবিবাহিত, নিকট-সম্পর্কে কোন স্ত্রীলোক নেই।

গারা বলিলেন, আমরা সকলে মিলে যাব, তাতে আর দোষ কি ?

কুশান বলিল, বাড়ীখানা কিন্‌ব মনে কর্‌ছি। দর জান্‌তে চেয়েছি।

বিস্ময়ে অধ্যক্ষের চক্ষু কপালে উঠিল, বলিলেন, বলেন কি, দাম যে অনেক হবে ! কিনে কি ভাড়া দেবেন ?

কুশান হাসিল, বলিল, আমার কোন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয় না। লোকজন থাকে, তারা দেখে।

তুলাকা বলিলেন, আপনার কি অনেক বাড়ী আছে ?

—খানকয়েক আছে, বলিয়া কুশান অন্য কথা পাড়িল।

সকলে উঠিলে পর কুশান লুলুকে বলিল, আপনাকে চাকায় ঘোরা শিখতে হবে, মনে আছে ত ?

—খুব মনে আছে। আপনি ত গুরু মহাশয়, আমাকে খুব ঘুরপাক খাওয়াবেন।

হ্রদের তীরে উপনীত হইয়া কুশান নিজে লুলুর পায়ের তলায় চাকা বাঁধিয়া দিল। তুলাকা বলিলেন, আমি আজ আর বরফের উপর যাব না, তোমার শিক্ষা দেখি।

কুশান লুলুকে বলিল, আজ থেকে আপনাকে নিজে চেষ্টা কর্‌তে হবে। আমি সব সময় আপনার হাত ধর্‌ব না। আপনার পায়ের টিপ খুব ভাল, এক সপ্তাহে আপনি বেশ শিখে ফেল্‌বেন।

লুলু বলিল, এই কথা ভাল। না হয় দুচারবার আছাড় খাব, লোক দেখে হাসবে।

কুশান কহিল, প'ড়ে যাবার কোন আশঙ্কা নেই, তা হ'লে আমার গুরুগিরি কি হ'ল ? নিজের উপর আপনার ভরসা হওয়া দরকার।

লুলু কুশানের হাত ধরিল না, কেবল অঙ্গুলির অগ্রভাগ

ধরিয়া হ্রদের মধ্যস্থলে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া লুলুর হাত ছাড়িয়া দিল। প্রথম প্রথম লুলু তেমন পায়ের ঠিক রাখিতে পারিল না, এক পা এক দিকে ও দ্বিতীয় পদ অন্য দিকে চলিয়া যায়। কুশান সর্ব্বদা তাহার নিকটে, আবশ্যক হইলেই লুলুর হাত ধরিয়া তাহার সহায়তা করে। একবার পড়িয়া যাইবার উপক্রম হওয়াতে লুলু কুশানের স্কন্ধ ধারণ করিল। কুশানের অঙ্গ স্পর্শ করিতেই আবার পূর্ব্ব-দিবসের ন্যায় লুলু চঞ্চলতা অনুভব করিল, হস্ত কম্পিত হইল, হৃদয় স্পন্দিত হইল। কুশান লুলুর হাত সরাইয়া নিজের হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিল, বলিল, আপনি কোন শঙ্কা কর্‌বেন না, আমি আপনাকে বরাবর দেখ্‌ছি।

অল্পে অল্পে লুলুর পদক্ষেপের অনিশ্চিততা হ্রাস হইতে লাগিল, বিনা সাহায্যে এদিক ওদিক ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কুশান লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিল, আপনার মত এত শীঘ্র কাউকে শিখতে দেখিনি। এইবার আমরা দুজনে একটু ঘুরি।

কুশান লুলুর হাত চাপিয়া ধরিল। কুশানেরও কি হাত কাঁপিতেছিল? লুলুও বিনা চেষ্টায় নিজের অঙ্গুলি অল্প চাপিল। কুশান লুলুর হস্তধারণ করিয়া বিচিত্র দ্রুত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। অনবরত চক্রের ভিতর চক্র রচনা, কখন অর্দ্ধমণ্ডল, কখন হ্রদের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত বায়ুবেগে গমন। অবশেষে কুশান লুলুর হস্ত ধারণ করিয়া এক স্থানেই দাঁড়াইয়া লাটিমের মত ঘুরিতে আরম্ভ করিল। ঘুর্, ঘুর্, ঘুর্, কেবলি ঘুরপাক। ঘুরিতে ঘুরিতে লুলু একবার অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া মুক্ত বাহু দ্বারা কুশানের কণ্ঠ ধারণ করিল, কুশানও তাহার কটিতে হস্ত দিয়া এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল, মুহূর্ত্তকাল অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ হইল, বক্ষে বক্ষে ঠেকিল। সেই সঙ্গে দুই জনের চক্ষুতে চক্ষুতে মিলিল।

লুলু ও কুশান ফিরিয়া আসিয়া পায়ের চাকা খুলিয়া ফেলিল। লুলু আহ্লাদে উৎসাহে বলিল, এ খেলা খুব চমৎকার! একটু একটু আমি শিখতে পার্‌ব।

কুশান বলিল, আমি ত বলেছি, এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি বেশ শিখবেন।

তমলা অলক্ষ্যে ক্রমাগত লুলুকে দেখিতেছিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় কুশান অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গেল। বিদায় হইবার সময় কুশান বলিল, আপনারা আমার বাড়ী কবে যাবেন?

গারা তুলাকার মুখের দিকে চাহিলেন, কহিলেন, কি বল?

তুলাকা বলিলেন, যবে হয় গেলেই হ'ল!

গারা বলিলেন, আজ বুধবার, শনিবার বিকেলবেলা যাওয়া যাবে।

কুশান বলিল, চা খাবেন।

—বেশ, এই কথা রইল।

কুশান বিদায় গ্রহণ করিলে পর গারা অধ্যক্ষকে বলিলেন, এঁর সঙ্গে ত দু'দিনেই আমাদের খুব আলাপ হয়ে গেল, কিন্তু ওঁর পরিচয় আমরা ত ভাল ক'রে জানিনে, উনিও সব খুলে বলেন নি। সেটা ত জানা আবশ্যক।

অধ্যক্ষ বলিলেন, ও-কথা যদি বলেন, তা হ'লে আমাদের পরিচয়ও ত উনি জানেন না, লুলু কে, তাই জানেন না। ওঁর পরিচয় কাল সকালবেলাই আমি জান্‌ব।

শাহানায় কে আসে যায়, সন্ধান রাখিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। তাহার অধীনে কয়েক জন লোক বাড়ী বাড়ী ও সমস্ত হোটেলে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহা ছাড়া কোন নূতন লোক আসিলে তাহার দেশে টেলিগ্রাম করিয়া সকল সংবাদ লওয়া হইত। অধ্যক্ষ গিয়া জানিলেন, কুশান একটি অত্যন্ত দূরদেশের নিবাসী, অতুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। অল্পদিন হইল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কয়েকখানা বড় বড় বাড়ী ক্রয় করিয়াছে বা নির্ম্মাণ করিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়া অধ্যক্ষ সকল কথা বলিলেন।

লুলু প্রত্যহ পায়ে চাকা বাঁধিয়া বরফের উপর ঘুরিত, কুশান তাহার সঙ্গে থাকিত। প্রতিশ্রুতি অনুসারে শনিবারে অপরাহ্নকালে সকলে কুশানের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। বাড়ী বৃহৎ, সকলেই জানিতেন, কিন্তু বাড়ীর সজ্জা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঘরে ঘরে কত দেশের কত রকম সামগ্রী, তাহার সংখ্যা নাই। শুধু বহুমূল্য সামগ্রী নয়, নানারূপ দুর্লভ সামগ্রী। তুলাকা, গারা, লুলু, তমলা, অধ্যক্ষ, কুশানের সঙ্গে সমস্ত ঘর দেখিলেন। তুলাকা বলিলেন, শুধু টাকা থাকিলেই এ রকম বিচিত্র দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করা যায় না। আপনার জিনিষ বাছাই করিবার অসামান্য ক্ষমতা। পাহাড়ে যদি এত সামগ্রী এনেছেন,

তা হ'লে আপনার দেশের বাড়ীতে না জানি কত জিনিষ আছে!

কুশান বলিল, সেখানেও কিছু আছে, কিন্তু সে সব আমার জড় করা নয়। আগেও কিছু ছিল।

অধ্যক্ষ বলিলেন, আমি অনেক ধনীর বাড়ীতে অনেক রকম সামগ্রী দেখেছি, কিন্তু এত দেশের এত রকম বাছা বাছা জিনিষ কোথাও দেখি নি।

লুলু যাহা দেখে, তাহা দেখিয়াই বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করে। বলে, এ সব কি সুন্দর জিনিষ! বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে এত দেশের এত রকম জিনিষ জড় করা যায় না। আপনি কি পৃথিবীর সব দেশ ঘুরেছেন?

—সে অনেক কালের কথা! এখন ত এক বছর পরে বন থেকে বেরিয়েছি। আসুন, বনজঙ্গল থেকে কি এনেছি দেখবেন।

বাড়ীর মধ্যে যেটা সব চেয়ে বড় ঘর, তাহাতে মৃগয়ালব্ধ বহুবিধ সামগ্রী সজ্জিত ছিল। দেয়ালে কত রকম পশুর মুণ্ড ও শৃঙ্গ, ঘরে সর্ব্বত্র পশু-চর্ম্ম আকীর্ণ, স্থানে স্থানে স্তূপাকার চর্ম্ম সজ্জিত রহিয়াছে। কুশান একটা কাচের আলমারি খুলিয়া কতকগুলা উত্তম, কোমল, লোমশ চর্ম্ম দেখাইল। কতকগুলা তুষারের ন্যায় শুভ্র, কয়েকটা কৃষ্ণ-বর্ণ, তাহা আলোকে চক্‌চক্‌ করিতেছে, কয়েকটা অল্প মিশ্রিত লোহিত-পীতবর্ণ। তুলাকা ও গারা সেই সকল চর্ম্ম হাতে করিয়া দেখিয়া বলিলেন, আমরা আজ পর্য্যন্ত কোথাও এ রকম জিনিষ দেখি নি।

তাঁহাদের অঙ্গেই বহুমূল্য লোমের আবরণ ছিল, কিন্তু কুশান যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার তুলনায় কিছুই নয়।

কুশান বলিল, বাজারে এ রকম জিনিষ পাওয়া কঠিন। বরফের দেশে গিয়ে অনেক চেষ্টা ক'রে সংগ্রহ করেছিলাম। দেখুন দেখি, কোন্‌গুলা আপনাদের পছন্দ হয়?

তুলাকা বলিলেন, আমরা পছন্দ করব কি? আপনার পছন্দ দেখে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছি।

চা পান করিবার সময় সকলে দেখিলেন, ভৃত্যগণ অপর কোন দেশের লোক, নিঃশব্দে কর্ম্ম করিতেছে। প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী, অসময়ের নানাবিধ ফল, অনেক রকম মিষ্টান্ন। গারা বলিলেন, এ আপনি করেছেন কি! কোন জিনিষ বাকি রাখেন নি!

লুলু বলিল, আমরা কি এত খেতে পারব না কি?

কুশান বলিল, যা পারেন, একটু আধটু খান।

আহারান্তে আবার সকলে ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এবার সকলে একত্রে নয়, যাঁহার যেমন ইচ্ছা, সেই দিকে গমন করিলেন। তুলাকা ও গারা এক দিকে, তমলা আর লুলু আর এক দিকে। কুশান তাহাদের সঙ্গে। তুলাকা ও গারা সমস্ত ঘরের সজ্জিত সামগ্রী আবার দেখিতে লাগিলেন; লুলু, কুশান বাড়ীর বাহিরে বাগানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কুশান কয়েকটি উৎকৃষ্ট ফুল তুলিয়া লুলু ও তমলার হাতে দিল। বড় বড় গাছের সারির ভিতর পথ, সেই পথে কিছু দূর গিয়া মনোরম নিকুঞ্জ। চারিদিকে লতাবেষ্টিত, লতায় বিবিধ বর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, নিকুঞ্জের ভিতর বৃক্ষশাখানির্ম্মিত বসিবার স্থান। কুশান কহিল, আপনারা একটু বস্‌বেন না?

লুলু বসিল। তমলা বলিল, আমি একটু ঘুরে আস্‌ছি।

তমলা বাহিরে চলিয়া গেল। কুশান লুলুর নিকটে স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিল। একবার দুই জনের চক্ষু মিলিল, আবার নত হইল। কুশান বলিল, আপনার শরীর আগের চেয়ে ভাল বোধ হচ্ছে ত?

লুলু অসঙ্কোচে দ্বিধাশূন্যভাবে সকলের সহিত কথা কহিত, এখন কেন তাহার এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল? কেন এরূপ জড়িমা, কেন হৃদয়ের এরূপ চাঞ্চল্য, কপোলে এরূপ রক্তরাগ? লুলু চিত্তসংযম করিয়া কহিল, আমার বিশেষ কিছু হয়নি, দিনকতক একটু দুর্ব্বল হয়েছিলাম। এখন আর কিছু নেই।

—এখান থেকে আপনারা কোথায় যাবেন?

—তা এখনও স্থির হয়নি। আমরা ত সকলে একত্রে থাকি না, এখানে একসঙ্গে এসেছি।

—তা ত বুঝতে পারি, এঁদের মধ্যে কি কেউ আপনার আত্মীয়?

—না, তবে গারার কাছে আমি থাকি।

দুই জনে স্তব্ধ হইল। একটু পরে কুশান বলিল, এর পর কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না?

লুলু অস্পষ্ট, মৃদুস্বরে বলিল, কি জানি!

কুশান হাত বাড়াইয়া লুলুর হস্ত স্পর্শ করিল। উভয়ের

হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। কুশান লুলুর হস্ত ধারণ করিল, বলিল, তোমাকেও বেশী দিন দেখিনি, কিন্তু মনে হয়, তুমি চির-পরিচিতা, চির-বাঞ্ছিতা।

আবার চারি চক্ষুতে মিলিল, চোখে চোখে গভীর মর্ম্মকথা হইল। সহসা লুলু হস্ত মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, এখনি আস্‌বে ব'লে তমলা কোথায় গেল? চল, দেখি, সে কোথায় গিয়েছে!

কুশান বলিল, আমাকে তুমি কিছু বল্‌লে না?

লুলু কুশানের মুখে চক্ষু তুলিল, চক্ষু কোমল, আদ্র, স্থির। কহিল, কি বল্‌ব, তুমি ত সব জান।

লুলু কুঞ্জভবনের বাহিরে আসিল, কুশান তাহার পশ্চাতে। তাহারা দেখিল, কিছু দূরে তমলা পুষ্প চয়ন করিতেছে। লুলু তাহার নিকটে গিয়া বলিল, তুমি এখনি আস্‌বে ব'লে চ'লে এলে, সে কথা বুঝি মনে নেই?

—আমি এই গোটা কতক ফুল তুল্‌ছিলাম।

বাড়ীতে ফিরিয়া আহারাদির পর নিভৃত শয়নকক্ষে তমলা লুলুকে বলিল, তোমাকে একটা কথা বল্‌ব বলেছিলাম, মনে পড়ে?

—কৈ, তুমি ত আমাকে বল নি।

—এই কুশানের কথা। তাঁকে তোমার কি রকম মনে হয়?

লুলু মনোভাব গোপন করিতে জানিত না। তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, আমি কিছু বুঝতে পারিনে। এর আগে কাউকে আমার ভাল লাগত না, মনে হ'ত, পুরুষমানুষরা আমাকে একটা অদ্ভুত জন্তু মনে করে। কুশান আমার কথা কিছুই জানে না, আমার সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল নেই। এই কয় দিন আমাদের দেখা, সে বলে, যেন আমাদের কত কালের পরিচয়।

—সত্য কথা। কালের মাপে কি হৃদয়ের মাপ? কুশান তোমার প্রতি অনুরক্ত। তোমার মন কি বলে?

—তাকে দেখলে আমি বড় চঞ্চল হই।

তমলা হাসিয়া লুলুকে আলিঙ্গন করিল, কহিল, সেই কথা আমি ভাবছিলাম। বেশ, ভালই হয়েছে।

শয়নের পূর্ব্বে তুলাকা ও গারা এই বিষয় আলোচনা করিলেন। তুলাকা বলিলেন, তোমার কি রকম মনে হয়?

গারা বলিলেন, মনে হয়, দুজনেরই পা ফাঁদে পড়েছে।

—কুশানের সম্বন্ধে ত কোন সন্দেহই নেই আর লুলু বোধ হয় নিজের মনের ভাব এখনও ঠিক বুঝতে পারে নি।

—লুলু অনেক কিছু বোঝে না, তবে বুঝতে বিলম্বও হয় না। লুলুকে ত জানে না, আর সেই জন্য লুলু কোন রকম সন্দেহ করে না। কুশান বেশ সৎপাত্র।

তুলাকা বলিলেন, বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে আমাদের হাতে নেই, সে কথা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পরলোকে অভয়পদ ভট্টাচার্য্য

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী অভয়পদ ভট্টাচার্য্য ৪৯ বৎসর বয়সে রাঁচীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

অভয়পদ ভট্টাচার্য্য

অভয় বাবু দানশীল ও মহাপ্রাণ ছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি 'প্রবোধ মেমোরিয়াল হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য ভাবধারায় কার্টিসীয় মত

সংস্কারের দাসত্ব হইতে ব্যক্তিগত বিবেকের স্বাধীনতালাভ সমসাময়িক চিন্তার ইতিহাসের এক বিশিষ্ট পর্য্যায়। "রিণেসান্স" বা নব জ্ঞানালোকের বিস্তার হইতে মানব-চিন্তার উদারতা যে কিরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন। ঐ সময়ে পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে পাঁচ জন গঠনশীল ভাবুকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে জোর্ডিণো ব্রূণো, টমাস্ হব্‌স্, রেঁণে ডেকার্ট, বারুক্ স্পিনোজা এবং উইল্‌হেলম লিব্‌নিট্‌জ্। ইঁহাদের মধ্যে রেঁণে ডেকার্টই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-দর্শনের স্থাপয়িতা বলিয়া বিবেচিত হন; কারণ, তিনিই ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রথম মানব-জ্ঞানের মূল ভিত্তিগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে ডেকার্টের মত এবং কার্টিসীয় সম্প্রদায় নামে তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক উক্ত মতের যে পরিণাম হইয়াছিল, তাহারই আলোচনা করিব।

চিন্তাক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার জটিলতার পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও বিশ্বাসযোগ্য কয়েকটি সত্য নিরূপণের জন্য ডেকার্ট যে সকল ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সত্যটি এই যে, আমি ভাবি, তাই আছি (I think, therefore I exist) সমস্ত তর্ক ও সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু "আমি ভাবি, তাই আছি" ইহা ত মিথ্যা হইতে পারে না। এমন কি, এই বাক্যের ভিতর "তাই" কিম্বা "সুতরাং" এরূপ কোন সিদ্ধান্ত-বাচক শব্দেরও প্রয়োজন নাই; যেহেতু ভাবা মানেই থাকা। (To think is to exist)। ডেকার্ট এইরূপে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহহীন হইয়া ক্রমশঃ দেহের সহিত মন বা আত্মার এবং মানবের সহিত জড়প্রকৃতির এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয়-কল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আত্মা এবং অনাত্মাকে বিরুদ্ধধর্ম্ম মনে করিতেন; যাহা দেহ, তাহা মন নয়, যাহা মন, তাহা দেহ নয়, অথচ উভয়ের মধ্যে এমন এক সম্বন্ধ বিদ্যমান, যাহার ফলে আমরা মনে করি, যেন একের পরিবর্ত্তনে অপরের পরিবর্ত্তন না হইয়া পারে না। সর্ব্বশেষে ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আত্মা দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়াও স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করে। মানব স্বাভাবিক গতিসম্পন্ন এক যন্ত্রবিশেষ এবং তাহার গতিবিধি আত্মার ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ডেকার্ট আত্মা এবং দেহের সম্বন্ধ ব্যাখ্যাকল্পে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াও কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার কয়েক জন শিষ্য এই তথ্যের আলোচনা করিয়া যে সকল মন্তব্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে আর্ণল্ড গয়লিং বলিয়াছিলেন যে, দেহ এবং আত্মার মধ্যে দৃশ্যতঃ যে ক্রিয়া বা সম্বন্ধ লক্ষিত হয়, তাহা একমাত্র ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মা স্বয়ং দেহের উপর যে শক্তির সঞ্চারে অসমর্থ, একমাত্র ঈশ্বরই সেই শক্তি সঞ্চারিত করিবার অধিকারী এবং তিনি তাহাই করেন বলিয়া ইচ্ছামাত্রেই দেহে স্পন্দন বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতের অনুভূতিও এই প্রকারে হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বশতঃই আত্মায় প্রত্যেক দৈহিক উত্তেজনার অনুরূপ জ্ঞান জন্মে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা এবং অনাত্মার সংযোগক্ষেত্রে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অনিবার্য্য। কার্টিসীয়দিগের এই মতকে "আকশনালিজ্‌ম্" নাম দেওয়া হইয়াছিল; উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আমরা ইহাকে সম্ভাব-বাদ বলিতে বাধ্য হইলাম। গয়লিং আরও বলেন যে, শিল্পী যেমন সময় ঠিক রাখিবার জন্য দুইটি ঘড়িকে পরস্পর মিলাইয়া রাখেন, ঈশ্বরও তেমনই দেহ এবং মন কিম্বা আত্মার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ সামঞ্জস্যসাধন করিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই মত হাস্যকর মনে হইলেও অবিলম্বেই আমরা দেখিব যে, ইহাতে হাসিবার কিছুই নাই। গয়লিংএর সমসাময়িক এবং কার্টিসীয় দলভুক্ত অপর এক ভাবুক নিকোলাস্ মাল্‌ব্রন্‌শ্ সম্ভাববাদের আরও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। দেহ এবং আত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে কিছু সন্দেহ ছিল, তিনি তাহা ভঞ্জন করিয়া দেন। ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যসাধক মাত্র; ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অতীন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না। যখনই আমরা দৃষ্ট, শ্রুত, আঘ্রাত, স্পৃষ্ট বা আস্বাদিত যে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি, তখনই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণগুলিকে বস্তুগত মনে করিয়া প্রতারিত হই। এই তত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। তাহাই যদি হয়, তবে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় কি? তবে কি বুদ্ধিতেই এই জ্ঞানের উদয় হয়? তাহাও নহে; কারণ, বুদ্ধি ও দেহ আত্মার অতীত কোন বস্তু নয়। বহির্জ্জগৎসম্বন্ধে জ্ঞানের সঞ্চার করিতে বুদ্ধিও অসমর্থ। সীমাবিশিষ্ট কোন বস্তুই যখন সীমাহীন কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, তখন কিরূপে আমরা বহির্জ্জগতের জ্ঞানলাভ করি? কে এই অসাধ্যসাধন করে? মাল্‌ব্রন্‌শ এই স্থলেই ঈশ্বরের প্রভাব লক্ষ্য করেন। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন বস্তুরই জ্ঞান হয় না। ধারণামাত্রই ঈশ্বরের ধারণার অংশ। দেশ* যেমন বিস্তারবিশিষ্ট, যাবতীয় দেহের আধার, ঈশ্বরও তেমনই শক্তিরূপ যাবতীয় আত্মার আলয়। মাল্‌ব্রন্‌শ আলোকের সহিত ঈশ্বরের তুলনা

করিয়াছেন। চক্ষুর সহিত আলোকের যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত ঈশ্বরেরও সেই সম্বন্ধ। যেমন আলোকের অভাবে চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়, ঈশ্বররূপ আলোকের অভাবে আত্মার জ্ঞানরূপ আলোকও সেইরূপ নির্ব্বাপিত হয়। মন বা আত্মা ঈশ্বরে অবস্থিতি করে, ঈশ্বরকে ভাবে এবং ঈশ্বরকেই দর্শন করে, কারণ, উভয়েই সমজাতীয় এবং সমধর্ম্মী। সমজাতীয় এবং সমধর্ম্মী না হইলে কেহ কাহাকেও বিদিত হইতে পারে না। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, দৃশ্যতঃ দ্বৈতবাদী ডেকার্ট ও তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য শুষ্কপ্রায় চিন্তাধারায় নূতন করিয়া এক সরস গভীর ভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল; আবার যেন ভারতীয় ভাব-ধারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ডেকার্টের ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে দেখা দেয়; আবার যেন বৈদিক যুগের সেই ঋষিকণ্ঠো-চ্চারিত সর্ব্বভূতময় এক দেবতার মহামন্ত্র ধ্বনিত হয়—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

এই প্রসঙ্গে কার্টিসীয় দলের আর এক অধ্যাত্মবাদীর পরিচয় না দিয়া পারা গেল না। ইঁহার নাম ব্লেজ প্যাস্কাল্। ইনি ডেকার্টের দেহ এবং আত্মার পার্থক্যসূচক মতের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। প্যাস্কাল্ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাধিবাস, বিরাট ঈশ্বরের কল্পনায় ভীত ও সন্ত্রস্তচিত্তে আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত স্বীয় হৃদয়াভ্যন্তরে অর্থাৎ বিবেকের মধ্যে এক সীমাবিশিষ্ট সজাগ মূর্ত্ত ঈশ্বরের দর্শন মানসে ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সহস্রবাহু বিশ্ব-রূপ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে, বাইবেলের ঈশ্বর দ্বিভুজমূর্ত্তি যীশুর মধ্যেই তাহার সন্ধান পাইলেন। হউক তাঁহার রক্ত-মাংসের শরীর, তবুও তিনি এমন এক দেবতা, যাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে হয় না, যাঁহাকে বুঝিতে কষ্ট নাই এবং যিনি দরিদ্রের ভগবান্। অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের আবহাওয়ায় পড়িয়া প্যাস্কেলের ভক্তিতত্ত্ব জাগিয়া উঠিবার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু তাঁহার মতে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শপেন্-হয়ার্ এবং শ্লায়ার্‌মেকারের মত সমূহের আভাস পাওয়া যায়।

উপরি-লিখিত বিবরণ হইতে যাহা বুঝা গেল, তাহা এই যে, প্রথমতঃ যে কার্টিসীয় মত কেবল সদ্ভাব-বাদরূপে দেখা দিয়া-ছিল, তাহা একেশ্বর বা অদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ, এবং ক্রমশঃ তাহা সর্ব্বদেবত্ব বা ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়। এই মতের ফলে কিছুকালের নিমিত্ত পাশ্চাত্য মানব-চরিত্রের এক মহান্ পরিবর্ত্তন ঘটে। মানুষের চলাফেরা, খাওয়াপরা, শোওয়াবসা, হাসিকান্না সর্ব্বকর্ম্মই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়, তবে আর মানুষের কর্ত্তৃত্ব কোথায়? মানুষ তাহা হইলে কলের পুতুল। এই প্রকার ভাবের উদয় হওয়ায় মানবের আত্মগরিমা, অহংজ্ঞান অথবা "আমিই আমার কার্য্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা"-রূপ বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইয়া তৎপরিবর্ত্তে "ঈশ্বরই সর্ব্বময় কর্ত্তা"-রূপ বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। কার্টিসীয় মতের প্রভাবে পাশ্চাত্যগণ যে আবার "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ভাবের অধীন হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি এবং এই মতেরই অমিততেজঃ-সম্পাতে পাশ্চাত্য-গগন দেখিতে দেখিতে পুনরায় আলোকিত হয়। এই নিমিত্তই চিন্তার ইতিহাসে কার্টিসীয় মতের এত প্রাধান্য।

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

পৌরাণিক পঞ্চগৌড়

১৩৪১ সালের শ্রাবণ মাসের 'মাসিক বসুমতী' "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রবন্ধে" (পৃষ্ঠা ৪৩৭-৩৮) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পঞ্চগৌড়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেন মিথিলা সমেত বাঙ্গালাদেশকেই পঞ্চগৌড় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান যুক্তি ও প্রমাণ এই যে, বৈষ্ণব কবি 'বিদ্যাপতি' তৎকালীন মিথিলাপতিকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন * * "বিদ্যাপতির সময়ে বঙ্গ, মিথিলার একই রাজ্যের অর্থাৎ "পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত ছিল।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৫৪২) যে, খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বিদ্যাপতি বর্ত্তমান ছিলেন।

এক্ষণে যদি স্বীকার করা যায় যে, বিদ্যাপতি খৃঃ ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ এই তর্ক উঠে যে, বিদ্যাপতি তৎকালীন মিথিলাপতিকে কোন্ হিসাবে পঞ্চগৌড়েশ্বর বলিয়া আখ্যাত করেন? ইতিহাসে দেখা যায় যে, বক্তিয়ারপুত্র মহম্মদ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বিহার জয় করিয়া পরে নবদ্বীপ আক্রমণ করেন এবং ১২০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই মালদহ জেলার অন্তর্গত হিন্দুর প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরে রাজধানী স্থাপন করেন; (Early history of India…Vincent A Smith P.406) অতএব ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলাধিপতিকে পঞ্চগৌড়েশ্বর কি করিয়া বলা যায়? বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলাতে যে কোন রাজাই থাকুন না কেন, তিনি ত স্বাধীন রাজা নহেন, তাঁহাকে মুসলমান অধীনে মিথিলা অঞ্চলের জমীদার রাজা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। ইহাতে মনে হয়, "চিরঞ্জীব রহুঁ পঞ্চগৌড়েশ্বর" ইত্যাদি বচন তৎকালীন মিথিলাধিপের প্রতি বিদ্যাপতির স্তুতিবাক্যমাত্র। কিম্বা আর এক কারণ হইতে পারে, খৃঃ ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধরাজা ধর্ম্মপাল এবং দেবপাল, পশ্চিমে জলন্ধর, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং পূর্ব্বে কামরূপ ও উত্তরে হিমালয়ের ক্রোড় অবধি জয় করিয়া মগধে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহারা নিজেদের গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতেন (History V. A. Smith P. 398 এবং মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাস—পৃষ্ঠা ৩২) সেই সময়ে উক্ত মগধাধি-পতির কোন সভাপণ্ডিতের বাক্য—"চিরঞ্জীব রহুঁ পঞ্চ-গৌড়েশ্বর"—যাহা পরে বিদ্যাপতির বচন বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছে; কারণ, মগধাধিপতি ধর্ম্মপাল ও দেবপাল সত্যই পঞ্চগৌড়েশ্বর বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিতেন। বিদ্যাপতি উপাধিধারী আরও দুই জন পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে ছিলেন, এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া তাঁহাদের কোন পরিচয় দিলাম না।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্কন্দপুরাণ হইতে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথাঃ—"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চ গৌড়া ইত খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥" এই শ্লোক হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, মিথিলা ও বাঙ্গালাদেশ মিলিয়া পঞ্চগৌড় নহে। অবশ্য মিথিলায় একটি গৌড় ছিল এবং বাঙ্গালাদেশে মালদহ জেলায় একটি গৌড় ছিল—ইহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু সারস্বত গৌড়, কান্যকুব্জ গৌড়, উৎকল গৌড়—ইহাদিগকে বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত বলিলে চলিবে কেন? প্রাচীনকালে বাঙ্গালাদেশের চারিটি বিভাগ ছিল, যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ। রাজা বল্লালসেন মিথিলা জয় করিয়া মিথিলাকে পঞ্চম বিভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (History—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—পৃষ্ঠা ৩৫)। ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, বাঙ্গালায় তৎকালে পাঁচটি বিভাগ ছিল বলিয়া বাঙ্গালার নাম পুরাকাল হইতে 'পঞ্চগৌড়' হইতে পারে।

সারস্বত-গৌড়কে, কান্যকুব্জগৌড়কে এবং উৎকল-গৌড়কে কোন্ হিসাবে বাঙ্গালার অন্তর্গত বলা যায়? সারস্বত গৌড় যে মালব প্রদেশে শিপ্রা নদীতীরে (উপস্থিত গোয়ালিয়র ষ্টেটের মধ্যে) উজ্জয়িনী নগরী, যাহা ভারতের গ্রীণউইচ বলিয়া পরিচিত—(Ancient Geography of India—by Sir Alexander Cuningham—chapter-Central India) এবং কান্যকুব্জ-গৌড় যে উপস্থিত ফরাক্কাবাদ জেলার মধ্যে কনৌজনগরী এবং উৎকল-গৌড় যে উড়িষ্যা বিভাগে—ইহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। স্কন্দপুরাণোক্ত উক্ত পাঁচটি গৌড়ই বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদিকে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে, তাহা উক্ত শ্লোক হইতেই বুঝা যায়,—শুধু বাঙ্গালা ও মিথিলা লইয়া ত আর্য্যাবর্ত্ত নহে।

গৌড় অর্থে,—যে স্থানে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া থাকে এবং যে স্থানের অধিবাসীরা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ অর্থাৎ A seat of learning and culture—পুরাকালে সেই সকল স্থানই গৌড় বলিয়া বিখ্যাত হইত।

গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ—ইতি শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ৭মঃ পটলঃ।

আরও একটা কথা আছে,—বাঙ্গালার সেন-রাজগণ—গৌড়, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রাম এবং নবদ্বীপ,—এই চারিটি স্থানে প্রধান নগর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত লোক ঐ সকল স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং অনেক বিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোল ঐ সকল স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল বোধ হয়, এই কারণেই ঐ চারিটি স্থান বাঙ্গালার ৪টি গৌড় নামে ক্রমশঃ পরিচিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌরচন্দ্র বলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নবদ্বীপবাসী গৌড়চন্দ্র বলিয়া আখ্যাত ছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, নবদ্বীপও ক্রমশঃ একটি গৌড় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় পৌরাণিক পঞ্চগৌড়ের পরিচয় দিতে গিয়া স্কন্দপুরাণের উপরিলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়াই তর্কের অবতারণা করিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন আখ্যায়িকা-লেখকগণ এবং উপস্থিত সংস্কৃত টোলে শিক্ষিত পণ্ডিতগণ সাহিত্যের দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন,—ইতিহাস কিম্বা ভূগোলের দিকে তাঁহারা অতি সামান্যই দৃষ্টিপাত করেন,—এই দুঃখ কি ভারতের অদৃষ্টে চিরকালই থাকিবে?

শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হুগলীর লবণ-বিভাগ

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানির অধিকারী হওয়ায়, য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের উপকারের জন্য লবণ ব্যবসায় (তামাক ও সুপারী ব্যবসায়) একটি আলাহিদা কোম্পানীর উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ কর্ম্মচারিগণ মাহিনার পরিবর্ত্তে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ গ্রহণ করিত। ১৭৬৬ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসের আইনে এইরূপ স্থির হয় যে, দেশীয় লোকেদের নিকট লবণ প্রতি ১০০ মণ ২০০৲ টাকায় বিক্রীত হইবে এবং দেশীয় লোক ছাড়া অন্য কাহাকেও ঐ সর্ত্তে বিক্রয় করা হইবে না। যে লবণ প্রস্তুত হইত, গভর্ণমেণ্ট তাহার উপর শতকরা ৫০৲ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন। ১৭৬৮ খৃঃ অক্টোবর মাসে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের আদেশে এই নিয়ম উঠিয়া যায়। তখন দেশীয় বণিকগণ ও জমীদারবর্গ লবণ প্রস্তুত করিতে থাকেন, তবে কেহই একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি পান নাই। ১৭৭২ খৃঃ স্থির হয় যে (১) দেশের প্রত্যেক অংশে লবণ সমভাবে উৎপন্ন হইবে, (২) ইহা কেবল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য প্রস্তুত হইবে, (৩) প্রত্যেক জেলার লবণ প্রস্তুত করণের স্থানগুলিতে ৫ বৎসর কায চলিতে পারিবে। কিছু পরিমাণ লবণ চুক্তি মূল্যে বিক্রয় করিতে হইত। পরে যে সমস্ত দেশীয় ব্যবসার পরিচালক অগ্রিম অর্থ দিয়া উৎপাদনকারীদের সাহায্য করিত, তাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিতে হইত। ১৭৭৭ খৃঃ জুলাই মাসে ঐ ব্যবসার পরিবর্ত্তন হইলে প্রস্তুতকারিগণ যাহা ইচ্ছা করিতে পারিত। ইহাতে আর্থিক উন্নতি না হওয়ায় ১৭৮০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রথা আবার পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাতে কোম্পানীর প্রতিনিধিগণের তত্ত্বাবধানে সমস্ত লবণ প্রস্তুত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দরে নগদ মূল্যে বিক্রয় করা হইত। গভর্ণর জেনারল প্রতি বর্ষের প্রারম্ভে দাম ঠিক করিয়া দিতেন। এই প্রথায় ১৭৮০ খৃঃ লবণ-শুল্ক ৪ লক্ষ টাকা আদায় হয়। এই শুল্ক ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ১২ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়।

পুরাতন নথি হইতে লবণ-শুল্কের আয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ১৭৬৫ খৃঃ মুজাম-উলদ্দৌলার সন্ধিপত্রে এই জানা যায় যে, মোগল শাসনের সময় হুগলী লবণের আড়তের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই সন্ধিপত্র হইতে আরও জানা যায় যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্য সমস্ত মাল ও পণ্য দ্রব্যের কর বা মাশুল দিতে না হইলেও লবণের জন্য শতকরা

২॥০ টাকা মাশুল দিতে হইত এবং এই মাশুলের পরিমাণ হুগলীর বাজার দর হইতে নিরূপিত হইত।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণের একচেটিয়া ব্যবসা সম্ভবতঃ কলিকাতায় Board of salt, custom and opinion কর্ত্তৃক চালিত হইত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বহুরিয়া, হাওড়া, গোবরডাঙ্গা ও মল্লিকবাঘ নামক স্থানের লবণ-শুল্কের ভার হুগলীর কলেক্টর সাহেবের উপর পড়ে। ইহার জন্য তাঁহাকে মাসিক ২০০৲ টাকা দেওয়া হইত। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১১ ধারা অনুসারে যাহারা অবৈধভাবে লবণ-প্রস্তুতকারীদের সন্ধান দিত, তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হইত। এই সুযোগে ১৮৩২ খৃঃ Martin Hughes, Manual, এবং Tydd নামক চারিজন য়ুরোপীয় অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। ইহাদের কতকগুলি পেয়াদা ছিল। এই পেয়াদাগুলির এক রকম পোষাক ও বিশেষ নিশান থাকিত। ইহারা গ্রামে গ্রামে কোথায় অবৈধভাবে লবণ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দেখিবার ভাণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের শাস্তির বিশেষ কিছু ব্যবস্থা হয় নাই। পেয়াদাদিগের ব্যাজ কাড়িয়া লওয়া হয় ও তাহাদের নেতাদের ফৌজদারী কোর্টে বিচারের ব্যবস্থা হয়। বিচারের ফলাফল অজ্ঞাত।

যাহাই হউক, পুলিস ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের অবহেলায় চারিদিকে অবৈধভাবে লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতেছিল। এই সময় লবণের মূল্য অত্যধিক হ্রাস প্রাপ্ত হয়। গোলায় অনেক মাল মজুত থাকিত, গোলাদারগণ বিক্রয় করিতে পারিত না। জেলার দক্ষিণাংশে এরূপ অবৈধ বিক্রয় অধিক হইত। যাহারা কলিকাতায় বিক্রয় করিবার জন্য সরকারী লবণ আনিত, তাহারাও ইহার মধ্যে জড়িত থাকিত বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেন। গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিতে হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ প্রচার করেন যে, লবণ-শুল্ক কমিতে থাকিলে, কর্ম্মচারীদিগের মাহিনা কমাইয়া ক্ষতিপূরণ করা হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসকে অবৈধভাবে লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করা যাহাতে একেবারে বন্ধ হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছিল। জমীদার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও এ বিষয় জানান হইয়াছিল। পরে এক জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীকে (Mr. Macleod) লবণ-শুল্কের Superintendent করা হয়। তাঁহার অফিস ছিল ক্ষীরপাই।

১৮৩৬ খৃঃ জুলাই মাসে লবণ-বিভাগের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। গভর্ণমেণ্ট আর লবণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন না। সরকারী লবণ ১০০ মণ করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় করা হইত। এই দর পূর্ব্বের ১৩ বৎসরের গড়পড়তা হিসাবে ধরা হইত। জেলার প্রধান প্রধান হাটে ৫০ হাজার মণ লবণ ধরিতে পারে, এরূপ সরকারী গোলা নির্ম্মিত হইত। হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে এইরূপ গোলা নির্ম্মিত হয়। ভদ্রেশ্বর একটি বিখ্যাত গঞ্জ। ঐরূপ গোলা নির্ম্মাণ করিতে মাত্র ৪০৭৲ টাকা খরচ পড়িত। ইহা হইতে বুঝা যায়, তখনকার দিনে মজুর ও জিনিসপত্র কত সস্তা ছিল।

পাণ্ডুয়া, ধনেখালি প্রভৃতি স্থানে লবণের দাম সাধারণতঃ বেশী পড়িত এবং বৈদ্যবাটী, ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে খুব সস্তা ছিল। পঙ্গুলবণই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। পঙ্গুর সহিত মিশ্রিত করিবার জন্য করকচ লবণ ক্রয় করা হইত। বিশেষ বিশেষ ওজন ব্যবহার করা হইত। পাইকারী ব্যবসায়িগণ ৮২ তোলায় সের ধরিত, খুচরা ৭২, ৬২, এমন কি, ৬০ তোলায় সের বিক্রয় হইত। [ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)

তোমরা রাখিও মনে

আমারে ডাকি যবে দিন শেষে রাতের পথিক,
আমি যবে চ'লে যাব—ভুলে যাবে সবে মোর কথা ;
আমি কভু ভুলিব না, মোর মনে জেগে রবে ঠিক,
আত্মারও রয়েছে শক্তি অনুভব করিবারে ব্যথা।

ফুল, পাখী, লতা সবে যাবে এক দিন মোরে ভুলে
আমার পায়ের চিহ্ন পড়িবে না আর ধরা-বুকে ;—
একটি কুসুম ফুটে মুহূর্ত্তেক আলো মাঝে দুলে
আবার পড়িল ঝ'রে,—তারে ভাবিবে না সুখে দুখে।

তোমরা কহিলে কথা—মোর আত্মা পাবে তা শুনিতে,
তোমাদের ঘৃণা জানি—তাও ভালো—তাও মোর ভালো।
তবুও রাখিবে মনে, চাহিবে না আমারে ভুলিতে
বিস্মৃতির অন্ধকারে জ্বেলে দেবে স্মৃতিটির আলো।

ভুলে যাবে—শুধু এই ব্যথা মোর জাগিতেছে মনে,
ঘৃণা কর, অবহেলা তাও—আমি ভালো ব'লে জানি,
ভুলে যাবে—এই কথা জেগে থাকে মনে সর্ব্বক্ষণে
ফেলে রেখে যেতে হবে সুখ, সাধ, এই দেহখানি।

চিহ্ন রহিবে না আর—প্রিয়তম বন্ধুগণ যত
দিন গেলে ধুয়ে দেবে মন হতে সে স্মৃতির চিতা ;
বেদনা-পীড়িত আত্মা গুমরিয়া কাঁদিবে কে কত,
ধ্বংসের পূজারি ডাকে—"এসো এসো, আমি তব মিতা।"

দিন যায় ধীরে চলে, দূরে হেরি নামে অন্ধকার,
নিবিড় নিকষ কালো—ওর বুকে ছিদ্রটুকু নাই,
অচেনা পথিক ডাকে, বাঁশরীতে গান শুনি তার,—
আত্মহারা চলিয়াছি—যেতে তবু পেছু ফিরে চাই।

তোমরা রাখিয়ো মনে হে আকাশ, মাটীর ধরণী,
ফুল, পাখী, লতা, পাতা না হয় দিয়ো না ভালোবাসা,
ঘৃণা ক'রে তবু মোরে মনে রেখো তুচ্ছ মনে গণি,
আবার আসিব ফিরে—দিয়ো মোরে সেইটুকু আশা

সমাধান

১

কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে ডাক্তার লালমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে না জানে, এমন লোক নাই। তবে কাহারও সহিত তাঁহার খুব মাখামাখি ভাব নাই। ভদ্রলোক স্বল্পভাষী, প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা ছাড়া কোন বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার উত্তর দেন না সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে নানা জনের নানা রকম ধারণা থাকা অস্বাভাবিক নহে। তাঁহাকে কেহ বলে খৃষ্টান, কেহ বলে মাতাল। তবে ডাক্তার হিসাবে যে তিনি খুব বড়, তাহা নিঃসন্দেহ। দিনরাত সুট পরিয়া থাকেন। কখনও উপরে দোতলার ল্যাবরেটারীতে যন্ত্রপাতি লইয়া একমনে তাঁহাকে কায করিতে দেখা যায়; কখনও দেখা যায়, নীচে রোগী দেখিবার ঘরে পর্য্যায়ক্রমে একের পর এক রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা দিতেছেন। বাড়ীর দরজায় গাড়ীর ভিড় লাগিয়াই আছে। কেহ বলে, ভদ্রলোকের পসার খুব, কেহ বলে, ছোট মেয়ে সুনীতি বড় হইয়াছে, তাই বিলাতী ধরণে স্বয়ম্বরা হইতেছে বোধ হয়। মোট কথা, একটা রহস্য এই বাড়ীখানাকে ঘিরিয়া আছে।

লালমাধব বাবুর স্ত্রী বিদ্যমান নাই। দুইটিমাত্র মেয়ে;—সুজাতা বড় ও সুনীতি ছোট। সুজাতার বিবাহ হইয়াছে এলাহাবাদের সরকারী উকীল লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বরেনের সহিত। বরেন বহুদিন য়ুরোপে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কি শিখিয়াছে, ভগবান্ জানেন, কিন্তু আহারবিহারে, চালচলনে তাহার বিলাতী ভাবটা পরিস্ফুট খুবই। সুজাতা ও সুনীতি লরেটো স্কুলে পড়া শেষ করিয়া ডায়সেসনে পড়িত। সুজাতার বিবাহের ব্যাপার দেখিয়া লোক ভাবিয়াছিল, সুনীতিকেও অমনই কোন বিলাত-ফেরতেরই হাতে দেওয়া হইবে; কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াইল ঠিক উল্টা। সুনীতি তখন আই এ পড়ে। এমন সময় এক দিন লালমাধব বাবুর ডাক আসিল 'বালিতে'। কোন সরকারী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসুখ, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেশ লালমাধব বাবুকে লইয়া গেল।

লালমাধব বাবুকে দেখিয়া অনুকূল বাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, অসুখ আমার এমন কিছু নয়। বুড়ো বয়সে আজ এটা কাল সেটা—স্বাভাবিক নিয়মেই লেগে রয়েছে। বুকের ভেতরটা অস্বাভাবিক রকম দুরদুর করছে ক'দিন থেকে; যতদূর বুঝ্‌ছি, তাতে আমার এই বড় ছেলে নরেশের বিয়েটা পর্য্যন্ত যে টেঁকে যেতে পারব, তা মনে হয় না, ডাক্তারবাবু।"

"না না, অত ভাববেন না, আপনার এমন কিছু বয়েস হয়নি বা শরীরের যন্ত্রগুলো এমন কিছু বিকল হয়নি যে, কোন কিছু হবার সম্ভাবনা আছে।"

ডাক্তার হৃদযন্ত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বুকের অবস্থা ভালই, তবে দিন কতক বিশ্রাম করতে হবে।"

"কাযের ভেতর এখন নরুর বিয়েটা দেওয়ার তাগিদ ছাড়া আর কিছু নেই। গিন্নী তিন বেলা বল্‌ছেন, আমার নাকি কোন চেষ্টা নেই। আমি বরং বল্‌ছি যে, বাপু তোমরা মায়ে পোয়ে ঠিক ক'রে ফেল, আমি গিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বখন।"

লালমাধব বাবু নরেশ সম্বন্ধে যেন একটু বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। মানে—যাহা ডাক্তারী শাস্ত্রে একবারে অবান্তর কথা। দুই ঘণ্টা গল্প-গুজবের পর ফিরিলে সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "খুব শক্ত রোগ বুঝি, বাবা?"

"না। রোগ সামান্য জ্বর, আসল হচ্ছে বার্দ্ধক্য।"

"এত দেরী হ'ল যে?"

"তোর বিয়ের ঠিক-ঠাক ক'রে ফেল্লাম কি না, তাই। নরেশ ছেলেটি বড় ভাল।"

সুনীতিও বাপের ধারা পাইয়াছে, বেশী কৌতূহল নাই। কোন প্রশ্নই সে করিল না।

তার পর অনুকূল বাবু আসিলেন, আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। লক্ষ কথার অনেক কমেই সুনীতির সহিত নরেশের বিবাহ হইয়া গেল।

এইরূপ বিবাহে উভয় পক্ষেরই আত্মীয়স্বজন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শ্যামবাজারের লোক স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, বালির মত নগণ্য পাড়াগাঁয়ে লালমাধব বাবু আই এ পাশ করা মেয়ের বিবাহ দিবেন। ও দিকে বালির বন্দ্যোপরিবারের মত রক্ষণশীল ও নিয়মনিষ্ঠাপূর্ণ পরিবার যে

একবারে আই এ পড়া, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বধূ ঘরে আনিবেন, এ যে কল্পনারও অতীত। অনুকূল বাবু পণ্ডিত ব্যক্তি বটে এবং ছেলেদেরও পড়াশুনা সম্বন্ধে তাঁহার খুবই দৃষ্টি আছে, তাহা ঠিক, কিন্তু বৃদ্ধা জননী, গৃহিণী প্রভৃতি লেখাপড়ার ধার ধারেন না। অন্দরমহলে গৃহিণীর অখণ্ড প্রতাপ। সে সিংহদ্বারে বাগ্‌দেবী ছেলেদের কল্যাণে বৎসরান্তে একবার প্রবেশ করিতে পান মাত্র। মেয়েরা বাঙ্গালা বরং কিছু জানেন, কিন্তু ইংরাজী একবারে নিষিদ্ধ মাংসের মত বর্জ্জন করিয়াছেন। ভাঁড়ারের কুলুঙ্গিতে কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, খনার বচন, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক সিন্দুর ও তৈললিপ্ত এবং ছোট ছেলেমেয়েদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া কোন ক্রমে টিঁকিয়া আছে। ছেলেদের পড়ার ঘর বাহিরে। সেখানে যে দিন গৃহিণী প্রবেশ করেন, কর্ত্তা সশঙ্ক হইয়া ওঠেন। বলেন—"আহা হা হা, কর কি! ওটা নিও না, ও যে নরুর পড়ার বই! আরে, ও যে আজকের কাগজ!"

গৃহিণী এক দিন একখানা পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তকে হাত দিতেই কর্ত্তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সর্ব্বনাশ করবে দেখ্‌ছি, ওটা যে বেদান্তের পুথি, দাম দিলেও আর পাওয়া যাবে না।"

গৃহিণী পাঠাগারে হানা দিয়াছিলেন, দৌহিত্র-দৌহিত্রী-দিগের দুধ গরম প্রভৃতি অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য কাগজের সন্ধানে!

কর্ত্তা তখন পুরাতন খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক প্রভৃতি কয়েকখানা কাগজ আনিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি বাপু ব'লে পাঠিও, আমরা তোমার দরকারী কাগজ পাঠিয়ে দেব; দয়া ক'রে তুমি এস না। কারণ, তোমার কাছে যেটা অদরকারী, আমাদের কাছে সেটা ভয়ানক দরকারী।"

"আহা, আমি যেন নিজের কাযেই নিতে এসেছি। তোমারই নাতি-নাত্‌নীর জন্যে—"

"তা ঠিক, কিন্তু বেদান্ত, ষড়্‌দর্শনের পাতা পুড়িয়ে দুধ গরম ক'রে খাওয়ালে নাতি-নাত্‌নীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন আশা ত নেই?"

গৃহিণী ঘোর অসন্তোষ লইয়া সশব্দে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

আবার গৃহিণীর রাজ্যে কর্ত্তা প্রবেশ করিলেও ঐরূপ আর্ত্তকণ্ঠে হাঁকাহাঁকি পড়িয়া যায়। এক দিন কর্ত্তা গৃহিণীর রাজ্যে প্রবেশ করিতেই গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "আহা হা, থাম থাম। কোথায় যাচ্ছ, কি কাযে? ঐখানে দাঁড়াও; কোথাকার পা তার ঠিক নেই, সাত দেশ মাড়িয়ে এলেন।"

"আহা, মাড়িয়ে যদি এসেই থাকি, সে ত জুতো প'রে মাড়িয়েছি, জুতো ত বাইরে রেখেছি।"

"আর তর্ক করো না, যত ছেঁড়া কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে, কাপড় ছাড়া নেই, কিছু নেই, মা গো! জাতজন্ম আর রাখ্‌লে না।"

বৃদ্ধা জননী বলিলেন, "তুই বাপু হুড়মুড় ক'রে কি ব'লে ঘরে ঢুকে পড়িস্, বউমা একা মানুষ, কত আর সামলাবে।"

অগত্যা কর্ত্তাকেই সামলাইয়া ফিরিতে হইল। গৃহিণীর রাজ্যে আচার-বিচার, পূজা-আহ্নিক, ব্রত-পার্ব্বণ প্রভৃতির ত্রুটি নাই। এখানে বৃদ্ধা জননীর কল্যাণে কীর্ত্তন, কথকতা, ভাগবতপাঠ ইত্যাদি একটা না একটা লাগিয়াই আছে। এ হেন সংসারে সুনীতির প্রবেশ একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার বলিতে হইবে বৈ কি।

কারণ একটু আছে নিশ্চয়। কিছুদিন বন্দ্যো-পরিবারে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। অন্তঃপুরে সহসা জীর্ণ-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, একটা হারমোনিয়াম প্রবেশ করিয়াছে, ছোট মেয়ে অপর্ণার সুরসাধনা চলিয়াছে পূরা দমে এবং কাণাঘুষা শুনা যাইতেছে যে, বন্দ্যোগৃহিণীর গলাও নাকি কেহ কেহ শুনিয়াছে। হইতেও পারে, অল্প-বয়সে তাঁহার একটু গানটান হয় ত অভ্যাস ছিল, তাই বোধ হয় কন্যার সুরসংস্কার করিয়া দিতেছেন।

যতদূর শুনা গিয়াছে, তাহা এই যে, ও পাড়ার উমেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা বি-এ পরীক্ষা দেওয়ায় পাশ করা মেয়ের গরবে তাঁহাদের পাড়ায় প্রতিপত্তি জমিয়া উঠিতেছে। বন্দ্যোগৃহিণীও প্রতিপত্তি কমিবার জোগাড় দেখিয়া ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন, পাশকরা বধূ লইয়া আসিলেন।

অবশ্য অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিবাহে কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই। নরেশ এঞ্জিনিয়ারী পাশ করিয়া চাকরীর চেষ্টা দেখিতেছে। অবস্থাও উভয় পক্ষেরই ভাল। পাত্র ও পাত্রীর শারীরিক সৌন্দর্য্যও বেশ আছে। এই বিবাহে নাকি রাজযোটক মিলও হইয়াছে।

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো মোর
হৃদয়-নীরে।"—রবীন্দ্রনাথ

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]

২

ফুলশয্যার দিন খবর আসিল, রাণিগঞ্জে নরেশ কয়লার খনিতে তিনশ টাকা মাহিনার চাকরী পাইয়াছে। যে যেখানে ছিল, শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পুরুষরা বলিয়া ফেলিলেন, "স্ত্রীভাগ্য বলে আমাদের অনুকূল বাবুর বৌমার ভাগ্যকে।" সৌভাগ্যের এই বাত্যাবেগে সুনীতির দিদিশাশুড়ী, মাসশাশুড়ী, পিসশাশুড়ী প্রভৃতি প্রাচীনা শাশুড়ীদলের স্নেহসিন্ধু একবারে উথলিয়া উঠিল। কত আদর, চিবুক ধরিয়া কত চুম্বন, কত অশ্রুসিক্ত গদগদ আশীর্ব্বাদ। পদ্মপিসী আসিয়া বলিলেন, "বাঃ বাঃ, এ যে লক্ষ্মী-ঠাকরুণ! কি বউই করেছিস, নরুর মা!"

"তোমাদেরই আশীর্ব্বাদ দিদি। এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন নরুর সংসার গুছিয়ে দিয়ে, হাতের নোয়া বজায় রেখে—"

শেষের কথা অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া গেল। অমনই মৃদু-ভর্ৎসনার কোলাহল উঠিল, "ও কি অলুক্ষুণে কথা," ইত্যাদি।

সেই দিনের ভিতর, সংসারের খুঁটিনাটি কত কাযেই যে নববধূর আয়-পয় দেখা যাইতে লাগিল, তাহা আর বলিবার নহে।

রাত্রিতে নরেশ আর একপ্রস্থ সুরু করিল। হাতুড়ি পিটিয়া তাহার অন্তরটা নীরস হইয়া যায় নাই। কবিত্বময় কল্পনা তাহার যথেষ্ট আছে।

সে বলিল, "সুনীতি, তুমি কি আমার মানসী? আমার মনের ভেতর ব'সে ব'সে বুঝি আমার কল্পনাজালে ঊর্ণনাভের মত বিচিত্র জাল রচনা করছিলে? আজ তুমি আমার সকল কল্পনা, সকল বাসনাকে সফল ক'রে মূর্ত্তিমতী সৌভাগ্যের মত আমার হৃদয়দ্বারে এসে দাঁড়ালে।"

সুনীতির হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

নরেশ বলিল, "সুনীতি, তোমাকে আজ থেকে আমি রাণী ব'লে ডাকব, এটা হ'ল আমার দেওয়া নাম। শোন রাণি, তুমি হ'লে আমার কল্পলতা, আমার সকল কল্পনার সার্থকতা। না হ'লে এই যে তিনশ টাকা মাইনের চাকরী একেবারে এক কথায় কখনও পাওয়া যায়?"

তাহার পর নিম্নস্বরে কাণের নিকট মুখ রাখিয়া সে বলিতে লাগিল, "এত দিন ধ'রে কি স্বপ্ন দেখতাম জান? দেখতাম, আমার হৃদয়রাণী আর আমি আছি সুদূর বনময় নিরালা স্থানে, যেখানে শুধু পাখীর গান, উপলখণ্ডব্যথিত তটিনীর মৃদু আর্ত্তনাদ, ফুলের সৌরভ, ভ্রমর-গুঞ্জন, আর আকাশপটে বিচিত্রবর্ণের মেঘের মেলা। এই আনন্দের হাটে, রূপের, সঙ্গীতের আলয়ে শুধু তুমি আর আমি।"

সুনীতি হাসিল।

"হাসলে যে? শোন ভাল ক'রে, আরও আছে। পূর্ণিমা যামিনীতে যখন সমস্ত বনস্থলী ভেসে গেছে জ্যোৎস্নার প্লাবনে, 'সেই প্লাবনের মাঝে ব'সে তুমি আর আমি। তুমি গাইছ এক অতি মৃদু তরল সুর, সে গানের ভাষা নেই, শুধু গুঞ্জরণের মত একটা অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা আছে মাত্র। তোমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার চেতনা ক্রমে লুপ্ত হয়ে এল, আমার আত্মা অশরীরী হয়ে সেই সৌন্দর্য্যের স্রোতে, সুরের স্রোতে প্রাণ ভ'রে অবগাহন করল। তুমিও আমার বুকে কাণ পেতে যেন তোমার সুরের রেশটুকু শুনতে লাগলে, আমার বুকের কাঁপনের তালে তালে।"

নব-পরিণীত দম্পতি কয়েক মুহূর্ত্ত পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জার আরক্তরাগ সুনীতির আননে সৌন্দর্য্য-সুষমা বাড়াইয়া দিল।

পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া নরেশ আবার বলিল, "কালকেই চাকরীতে যেতে হবে। আমাদের মধুযামিনীর উৎসব, আমাদের অসমাপ্ত ফুলশয্যার আনন্দ জমা রইল ভবিষ্যতের জন্য। আজ আর কথা নয়, ঘুমোও, রাণি!"

সারাদিনের স্তুতিবাদ ও আশীর্ব্বচনের ক্লান্তিতে সুনীতি ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের দিন যাইবার সময় নরেশ আড়ালে সুনীতির কাণে কাণে বলিয়া গেল, "রাণি, আমি শীগ্‌গির আসছি, একটা ছুতো ক'রে নিয়ে যাব, বুঝলে?"

৩

সহসা তিন দিনের ভিতর দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যাহা কিছু সৌভাগ্যের পূর্ব্বরাগ বলিয়া এত দিন সুনীতিকে পূজার বেদীতে বসাইয়াছিল, আজ সহসা যেন কোন্ যাদুকরের মায়ামন্ত্রবলে অকস্মাৎ কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। টেলিগ্রাম আসিল, খনির কায দেখিবার সময় মাটী ধ্বসিয়া নরেশ কোন্ অতল অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না। আসন্ন ঝঞ্জার পূর্ব্বে যেমন সাগর

বর্ষণোন্মুখ মেঘের ফাঁকে সূর্য্যের ম্লান-আলোতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, তেমনই বুঝি এই নিদারুণ বিপৎপাতের পূর্ব্ব-লক্ষণে সুনীতির সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। গৃহে হাহাকার উঠিল। সন্তান-শোকে নরেশের জননী যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। সুনীতি উচ্চরোলে কাঁদিতে পারিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্ব্বাক্যের আঘাতে একবারে অসহায় হইয়া গোপনে নীরবে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। নরেশের কল্পনার পরিণতি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। নিয়তির কি নির্ম্মম পরিহাস! সে চাহিয়াছিল আলো, গীতিমুখর প্রাণ, তাহার শেষ হইল অন্ধকার পাতালপুরে!

সুনীতিকে একা একা বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়া অনুকূল বাবু ঘরে আসিয়া সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি করবে, মা! নিয়তির বিধান আমাদের মাথা পেতে নিতে হবেই।"

এতখানি সমবেদনা শাশুড়ীর দৃষ্টিতে অশোভন ঠেকিল; সুতরাং অনুকূল বাবুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে লালমাধব বাবু সুনীতিকে লইয়া গেলেন। যাওয়ার সময় সুনীতির সম্বন্ধে যে কয়টা কথা কাণে গেল, তাহাতে বুঝিয়া লইলেন, এ সংসারে সুনীতির স্থান হইবে না।

এক মাসের মধ্যে সুনীতির জীবনে উলটপালট হইয়া গেল। এই কয়টা দিন আগে পর্য্যন্ত ছিল যে কুমারী, বিবাহের কত সোণার স্বপ্নই না সে দেখিয়াছে। আপনার রূপ, আপনার যৌবনের স্তুতিবাদ শুনিয়া সলজ্জতৃপ্তিতে অন্তর কতবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মুঞ্জরিত লতিকার মত কারণে অকারণে কত শতবার শিহরিয়া উঠিয়াছে। নিয়তির নির্ম্মম আঘাতে আজ তাহার স্বপ্নজাল ছিন্ন হইয়া গেল। আজ সে বিধবা! হিন্দুর ঘরে 'বিধবার' রূপ থাকিতে নাই, কামনা থাকিতে নাই, বাসনা ভোজস্পৃহা কিছুই থাকিতে নাই। তাহার অলঙ্কার পরিতে নাই, প্রসাধন করিতে নাই, স্পন্দনশীল ইন্দ্রিয়গুলিকে সবলে নিষ্পিষ্ট করিয়া, দৃষ্টিকে নত করিয়া, জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়। সুনীতি একবার ভাবিল, বৈধব্য আর মৃত্যুতে প্রভেদ কি? মৃতের শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না, বিধবার সেটুকু থাকে, এইটুকুই প্রভেদ।

সুনীতি ভাবিতে লাগিল, জীবনের এই যে তরঙ্গসঙ্কুল সীমাহীন সমুদ্র, উহা পার হইবার অবলম্বন কোথায়?

দিনের পর দিন চলিয়া গেল, তাহার প্রশ্নের কোন সদুত্তরই সে পাইল না। শুধু সূত্রহীন চিন্তারাশি তাহাকে আকুল করিয়া দিল।

৪

সুজাতার পত্র আসিল, পিতাকে সে লিখিয়াছে, সুনীতির পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে। তাঁহার মত জানিলে সে পাত্র স্থির করিয়া দিবে।

লালমাধব বাবু কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। সুনীতিরও মনে কথাটা ভাল ঠেকিল না। আবার বিবাহ? ইহা কি সঙ্গত, শোভন?

কিছু দিন পরে সুনীতির দিদির অন্তরঙ্গ বন্ধু তরু দত্ত আবার ঐ কথাই পাড়িল।

"কাকাবাবু, সুনীতির মত বিধবার বিয়ের বিধান ত শাস্ত্রে আছে!"

অনুকূলবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হ'তে পারে।"

"সুনীতিকেও শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ে যাবে না বোধ হয়?"

"সম্ভব তাই।"

"সুনীতি যে এই বয়সে বিধবা সেজে দিন কাটাবে, সেটা যে আর আমরা দেখতে পারি না, কাকাবাবু!"

"তোর আমার দেখতে পারা না পারাটাকে অত বড় ক'রে দেখলে কি চলে রে, মা।"

"কিন্তু সুনীতির আবার বিয়ে দিতে হবে কাকাবাবু, আগের বিয়ে এক রকম কিছুই নয়।"

সুনীতি পাশের ঘর হইতে কথাটা শুনিল। কিছু নয়, কথাটা তরু দিদি যত সহজে বলিল, সে ত তত সহজে উহা মানিয়া লইতে পারিতেছে না! সেদিনকার রাত্রির পরিচিত যে মানুষটি বুকভরা আশা লইয়া গেল, সুখনীড় রচনা করিতে আর ফিরিল না, সে কি তাহার কেহ নহে? আজিও মৃত্যুর পরপারে তাহার অশরীরী আত্মাটা কি অপূর্ণ বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে না?

আবার সেই সূত্রহীন চিন্তা আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তরুর প্রশ্নে শেষে লালমাধব বাবু বলিলেন, "সুনীতির যদি ইচ্ছে থাকে, দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

তরু কি মতলব করিল কে জানে ! যাইবার সময় সে বলিল, "তা হ'লে আপনার আপত্তি নেই ?"

এমনই করিয়া প্রায় এক বৎসর কাটিল ! সুনীতি এক দিন বলিল, "চল বাবা, দিন কতক বাইরে বেড়িয়ে আসি। তোমার শরীরটা বড্ড খারাপ হয়েছে।"

লালমাধব বাবু রাজী হইলেন। ইদানীং তাঁহার মনটা বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

সুনীতির উদ্দেশ্যহীন দিনগুলির মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য আসিল। যাত্রার আয়োজনে ও তাহাদের অবর্ত্তমানে এখানকার কি ব্যবস্থা হইবে, এই সব নানারূপ কাযে সে ডুবিয়া রহিল।

ইহার মধ্যে তরু এক দিন বৈকালে আসিল। তাহার পশ্চাতে এক অতি সুপুরুষ যুবা।

"বুঝলে সুনীতি, এই পল্লবকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম পথে। আকাশে মেঘ দেখে বেচারা ভয় পেয়ে গেল, তাই আশ্রয়ের জন্য তোমাদের বাড়ী নিয়ে এলাম।"

"বেশ করেছ, ব'স, আমি আস্‌ছি।"

তরু বলিল, "শুনলাম, তোরা নাকি তীর্থযাত্রা কচ্ছিস ?"

"অনেকটা।"

সুনীতি চলিয়া গেলে তরু নিম্নস্বরে বলিল, "এরই নাম সুনীতি, এর কথাই তোমাকে বল্‌ছিলাম।"

"সুন্দর রূপ, এ যেন সন্ধ্যাতারা ; গোধূলির আলোর মত একটা সুন্দর অথচ ম্লান জ্যোতি চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। রূপ অনেক দেখেছি তরুদি, কিন্তু এমনটি কখনও চোখে পড়েনি।"

সুনীতি ফিরিয়া আসিলে তরু পরিচয় করাইয়া দিল।

"এর নাম পল্লব গঙ্গোপাধ্যায়, শ্বশুরবাড়ীর দেশের মানুষ। ছোট দেওরের সহপাঠী। আমায় দিদি বলে।"

উভয়ে প্রতিনমস্কার করিল।

পল্লব বলিল, "আমার একটা কথা বল্‌বার আছে। তরুদি যে বল্‌লে, আকাশে কাল মেঘ দেখে ভয় পাওয়ার কথা, ওটা যে ভিত্তিহীন, তা বুঝেছেন, সুনীতি দেবি ? কারণ, এ পর্য্যন্ত কাব্যে বা সাহিত্যে পুরুষকে কাল মেঘ দেখে ভয় পেতে দেখা যায়নি।"

সুনীতি হাসিয়া বলিল, "তরুদি যখন সাহিত্যিক হবে, তখন ওর সাহিত্য নায়কেরা ঐ রকম ধরণেরই হবে।"

৩

পল্লবের সহিত সুনীতির পরিচয়ের এই সূত্রপাত। তার পর লালমাধব বাবুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হইতে বিলম্ব হইল না। তাহার কথার একটা বিশেষ রূপ আছে, মাধুর্য্য আছে। কি সুন্দর বলার ভঙ্গী ! থাকিবে না কেন ? কিছু দিনের মধ্যে এমন হইল যে, পল্লবের সহিত খানিকটা কথা না কহিলে ডাক্তার বাবুরও তৃপ্তি হইত না।

যাত্রার দিন কাছে আসিলে লালমাধব বাবু বলিলেন, "পল্লব যাও ত চল, আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার বদরিকাশ্রম ঘুরে আসবে।"

পল্লব প্রথমে মৃদু আপত্তি করিল, শেষে রাজী হইল ; ব্যাপারটা দাঁড়াইল—যেন লালমাধব বাবুই তাহাকে লইয়া যাইতেছেন, কোন বিশেষ আকর্ষণে সে যাইতেছে না।

তরু এই যাওয়ার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার জয়যাত্রা সার্থক হক, পল্লব।"

সুনীতিকে ইদানীং পল্লব আর 'আপনি' বলিত না। 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিত।

নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সুনীতিরও মনের বিষণ্ণ ভাবটা অনেক কমিয়া আসিল। নরেশের কথা আর বড় মনে হয় না, নরেশের স্থান কি পল্লব অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে ?

লালমাধব বাবু পল্লব পল্লব করিয়া অস্থির। সুনীতিও প্রতিকূল নহে। পথে সুজাতাদের বাড়ী গেলে পল্লবকে দেখিয়া সুজাতা অত্যন্ত খুসী হইল।

সময় ও সুযোগ বুঝিয়া পল্লব এক দিন নিভৃতে সুনীতিকে জানাইল যে, লালমাধব বাবুর ইচ্ছা, পল্লবের সহিত সুনীতির বিবাহ হয়।

পল্লব অবশ্য মিথ্যা বলে নাই। লালমাধব বাবুর কথা-বার্ত্তায় পল্লবকে জামাতা করিবার ইচ্ছা অনেক সময় প্রকাশ পাইয়াছে, সুনীতিও তাহা জানে। তবু পল্লবের প্রশ্নে সে উত্তর দিতে পারিল না।

"তা হ'লে রাজী ত ?" বলিয়া আজ সর্ব্বপ্রথম পল্লব সুনীতির করস্পর্শ করিল।

সুনীতির সকল দেহে কি শোণিতস্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল ? মুখে 'হ্যাঁ' কথাটা বলিতে না পারিলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া কি সম্মতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল ?

পল্লব সুনীতির মৌনতায় সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া জয়গৌরবে চলিয়া গেল।

পল্লব সুনীতিদের পূর্ব্বেই কলিকাতায় ফিরিল। তরু শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়া সুজাতাকে পত্র দিল যে, সুনীতির আবার বিবাহ হইবে এবং এমন পাত্রের সহিত যে, নরেশের চেয়ে সে শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

সুনীতিরাও কিছুদিন বাদে ফিরিল। তরু আসিয়া জানাইল, পরদিন পল্লবের মামা সুনীতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন।

এত দিন পরে সুনীতির আবার প্রসাধনের প্রয়োজন উপস্থিত। তরু কাল আসিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়া গেলে, চাকর খান দুই চিঠি আনিয়া দিল।

প্রথম পত্র অনুকূল বাবুর লেখা। সুদীর্ঘ পত্র। সুনীতিকে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, এক বৎসর যাবৎ সুনীতিদের কোন সংবাদ না পাইয়া তাঁহারা ভাবিত। সুনীতির শাশুড়ী বাতে শয্যাশায়ী, তিনি নিজেও ভুগিতেছেন, সুনীতি না আসিলে সংসার আর চলে না। তাহার উপর ছোট মেয়ে অপর্ণার বিবাহের কথা চলিতেছে, এ সময়ে সে না থাকিলে কে দেখে-শুনে। সুনীতি যে তাঁহার গৃহের লক্ষ্মী। তিনি দিন দুই পরে তাহাকে লইতে আসিবেন। একটা ছত্র সুনীতি বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিল—"তুমি হ'লে বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর বড় বৌ, তুমিই গৃহিণী, তোমার অবর্ত্তমানে সংসার যে চলে না, মা!"

সুনীতি চমকিয়া উঠিল। এ নূতন পরিচয়, এ নূতন অধিকার যে তাহার কোন দিন মনে হয় নাই। সে বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর বড় বউ—সংসারের ভাবী গৃহিণী!

সুনীতি উভয়সঙ্কটে পড়িল, এক দিকে অনুকূল বাবুর কাতর আহ্বান, অপর দিকে আশায় উৎফুল্ল পল্লবের আহ্বান। কি করিবে, ভাবিবার যে সময়মাত্র নাই। সঙ্গে সঙ্গে ফুলশয্যার রাত্রির দৃশ্য তাহার মনে পড়িল। স্বামীর কথাও তাহার চিত্তক্ষেত্রে অগ্নির অক্ষরে যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে শিহরিয়া উঠিল।

তাহার মনের ভিতর এই কথাটা বাজিতে লাগিল—"তুমি না এলে যে সংসার চলে না, মা।"

না, না, এত দিনের প্রশ্নের সমাধান আজ হইয়াছে। সে বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারের বড়-বধূ, সংসারের গৃহিণী, সংসার-পালনের ভার তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে, সংসারের কাযে আপনাকে বিলাইয়া দিতে হইবে। আর দেরী নহে—ডাক আসিয়াছে। বাকী জীবন এই সংসারের গুরুভার বহন করিয়া যাইতে হইবে।

সুনীতি পিতাকে পত্র দেখাইয়া বলিল, "চল বাবা, আজই আমাকে রেখে আস্‌বে।"

"সেখানে যাবি? হ্যাঁ মা, সেই তোর ঘর। তবে পল্লব বড় দুঃখিত হবে।"

পল্লব বৈকালে আসিয়া দেখিল, সুনীতি বিধবার বেশে শ্বশুরালয়ে যাত্রার আয়োজন করিতেছে।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"শ্বশুরবাড়ী থেকে ডাক এসেছে, পল্লব বাবু। আমি ওঁদের বড় বৌ যে, না গেলে আর ভাল দেখায় না।"

পল্লব ঊর্দ্ধশ্বাসে তরুর শরণ লইতে ছুটিল।

তরু যখন আসিল, লালমাধব বাবু ও সুনীতি উভয়ে গাড়ীতে উঠিয়াছেন।

তরু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "এ কি সুনীতি, কোথায় যাচ্ছ?"

মুখ বাড়াইয়া স্নিগ্ধ হাস্যে সুনীতি বলিল, "তরুদি, এত দিনের পর আমার প্রশ্নের আজ সমাধান হয়ে গেছে। আজ সংসারের ডাকে আমাকে যেতে হচ্ছে, মাপ কর তোমরা।"

"হ্যাঁ, তা সমাধান হয়ে গেছে বটে, কিন্তু ছেলেটাকে অমন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার দরকার কি ছিল? বৃথা আশা দেবার কি দরকার ছিল? কাকাবাবু, আপনারই কি এটা উচিত হ'ল?"

"বাবার কিছু দোষ নেই, তরুদি। যা কিছু বলবার, ভাই, আমাকেই বল। আমি জানি, আমার অপরাধের ক্ষমা নেই! আচ্ছা, আসি।"

পল্লব এমন সমাধান-ব্যাপারে সমস্ত নারীজাতিটারই উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বিবাহ সে করিবে না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবায় হিন্দু ও মুসলমান

এক শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক ও অন্যবিধ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশসাধন করিতে বসিয়াছে। এক শ্রেণীর হিন্দুর সাহায্য ও সহানুভূতির ফলে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন এক শ্রেণীর মুসলমানের এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তীব্র হইতে তীব্রতর আকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ সম্বন্ধে যুক্তি, লোকলজ্জা ইত্যাদির বালাই নাই। সরকারী চাকুরী, মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট, লোকাল ও য়ুনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই কেবল "আমরা মুসলমান" এই অদ্ভুত দাবীর দ্বারা সর্ব্বস্ব গ্রহণের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। যে যে প্রতিষ্ঠানে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, সেখানে ত হিন্দুকে মোটেই আমল দেওয়া হইবে না (যথা পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটী ও বোর্ডগুলি) আর যেখানে মুসলমানের সংখ্যা কম (যথা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালেটী), সেখানে সংখ্যার একাধিকগুণ অধিকার ও উচ্চ হইতে উচ্চতর সম্মান দাবী করা হয়। সরকারী চাকুরীতেও সেই একই ব্যাপার। আগামী শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি অনুসারেই মুসলমানের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়া আছে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তাদের দেশহিতকর কার্য্যে কৃতিত্ব কতখানি, সে প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে স্বতঃই উদিত হয়। বাঙ্গালার একশ্রেণীর মুসলমান বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যের পনর আনা না হইলেও অন্ততঃ বারো আনা হস্তগত করিয়া হিন্দুকে দাবাইয়া রাখিবার দাবী প্রচার করিতেছেন। এ হেন মুসলমান-সম্প্রদায়ের, এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-সম্প্রদায়েরও অ-সাম্প্রদায়িক জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ ও কৃতিত্বের মোটামুটি একটা তুলনাত্মক বিচার এই প্রবন্ধে করা যাইতেছে। যে সম্প্রদায় দেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিবার আশা রাখেন, দেশের সেবা দ্বারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করা তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

১। শিক্ষাবিস্তার

শিক্ষাবিস্তারের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় কে কতখানি ত্যাগ করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশের বে-সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজগুলির আলোচনা করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। উচ্চশিক্ষার জন্য বাঙ্গালার হিন্দু-সম্প্রদায় মুসলমান অপেক্ষা বেশী উদ্যম ও ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন, অস্পষ্টভাবে এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা তুলনা করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, পার্থক্য প্রায় আকাশ-পাতাল। উচ্চশিক্ষার কথা এই জন্য বলিতেছি যে, মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং ঐগুলির মধ্যে সরকারী কর্ত্তৃত্ব আরও বেশী। অধিকন্তু, সরকারী ও বে-সরকারী চাকুরী, ডাক্তারী, আইন-ব্যবসায় ইত্যাদি শিক্ষিতজনপ্রিয় বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা দরকার (যদিও মুসলমানের পক্ষে এ সব নিয়মেরও যথাসাধ্য ব্যতিক্রম আবশ্যকমত করা হয়)। যাহা হউক, এক্ষণে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজগুলির সংখ্যা তুলনা করা যাউক। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সরকারী তালিকা (ইহার পরের তালিকা দেখিলে পার্থক্য আরও বাড়িয়া যাইবে) অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, খাস গভর্ণমেণ্টের কলেজ ও স্কুলগুলি (যাহার মধ্যে কেবল মুসলমানদের জন্য স্কুল-কলেজ কেবল হিন্দুর জন্য স্কুল-কলেজের প্রায় দশগুণ) বাদ দিলে, জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্থাপিত স্কুল-কলেজের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা এইরূপ :—

	স্কুল	......	কলেজ
হিন্দু কর্ত্তৃক স্থাপিত	১০০৩		২৯
মুসলমান কর্ত্তৃক স্থাপিত	৩৭		৩

কুচবিহার, ত্রিপুরা ও সিকিম এই তিনটি হিন্দুরাজ্যের যথাক্রমে ১, ৬ ও ১টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের কথা পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত স্কুলগুলির অধিকাংশই মধ্যবিত্ত লোকের কষ্টস্বীকার ও অর্থব্যয়ের ফলে স্থাপিত এবং হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর ছাত্রের উপকার করিয়া আসিতেছে। পাঠক, লক্ষ্য করিবেন যে, যে সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া পদে পদে স্বার্থলাভের কৌশলে সচেষ্ট, দেশের শিক্ষাবিস্তারে তাহাদের মনোযোগ ও প্রযত্ন কতখানি!

শিক্ষাবিস্তারের কথাপ্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান সম্প্রদায়ের চক্ষুঃশূল। অজুহাত এই যে, ওখানে মুসলমানদের কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রথমতঃ মুসলমানদের কর্ত্তৃত্ব থাকা না থাকা হিন্দুর ক্ষমতাধীন ছিল না, এখনও নাই; সরকারের আইনের বলে সেনেট সিণ্ডিকেট গঠিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট। তথাপি, মুসলমান-সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিয়া তুলিবার, অর্থাৎ টাকা-পয়সা দিবার বিষয়ে এবং ছাত্রসংখ্যা বিষয়ে যতখানি অগ্রসরত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, সেনেটে তাহার অনুপাতে অনেক বেশী সংখ্যায় প্রতিনিধি পাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে হিন্দুর বুদ্ধি, বিদ্যানুরাগ ও অর্থদান দ্বারাই বর্ত্তমান বিস্তৃত ও উন্নত অবস্থায় উঠিয়াছে, এই ঐতিহাসিক মত সর্ব্ববাদিসম্মত। সার তারকনাথ পালিত, সার রাসবিহারী ঘোষ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক হিন্দু দাতা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহার তুলনায় মুসলমানের দান নাই বলিলেই চলে। অথচ এই হিন্দু দাতৃগণের দানের ফল হিন্দু মুসলমান সকলেই ভোগ করিতেছে; পরলোকগত মহম্মদ মহসিনের মত ইঁহারা কেবল স্বসম্প্রদায়ের সুবিধার ব্যবস্থাই করিয়া যান নাই। হিন্দুর এই অত্যুদারতা বর্ত্তমান সময়ে কত দূর সমীচীন, তাহা বিবেচনার বিষয়। যাহা হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে ছাত্রবৃত্তি, পারিতোষিক ইত্যাদির জন্য হিন্দুপ্রদত্ত মোট ২৬৩টি ধনভাণ্ডার (endowments) আছে; আর মুসলমানপ্রদত্ত ধনভাণ্ডার মোট ৫টি। কথাটা এখানেই পরিষ্কার হইল না। উক্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে ২৫৯টি হিন্দুর বৃত্তি সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর জন্য উন্মুক্ত, আর ১টি মুসলমানের বৃত্তি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে উন্মুক্ত (বাকী ৪টি আরবী, ফার্সী ইত্যাদির জন্য, সুতরাং মুসলমানদেরই প্রাপ্য) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টির জন্য মুসলমান ভ্রাতাদের চেষ্টার ও ইচ্ছার প্রমাণ ত এই; অথচ "ভাইস চ্যান্সেলর মুসলমান হওয়া চাই, এতগুলি চাকুরী চাই" ইত্যাদি আবদারের শেষ নাই। সাধারণ শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দি। যে সরকারী শিল্পবিদ্যালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রভৃতির অনুসন্ধান করিলেও—একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

এক্ষণে পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মুসলমানরা শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে না হয় কমই উদ্যম দেখাইয়াছেন, কিন্তু শিক্ষালাভ করিতে কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখা উচিত। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গালাদেশের পঞ্চম বার্ষিক শিক্ষা-বিবরণীতে (Eighth Quin-quennial Report) এই বিষয়ের আবশ্যক তথ্য পাওয়া যায়। ঐ বিবরণী অনুসারে বাঙ্গালাদেশের সমগ্র ছাত্র-সংখ্যার তুলনায় মুসলমান ছাত্রের অনুপাত নিম্নলিখিতরূপ:—

বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ কলেজে	...	১৩.৩
ব্যবসায় শিক্ষার কলেজে	...	১২.৯
উচ্চস্কুল শিক্ষায়	...	১৮.৭
মধ্য শিক্ষায়	...	২৪.৭
প্রাথমিক শিক্ষায়	...	৫৪.৫
সকল রকম স্কুল-কলেজের মোট হার	...	৫০.৮

প্রাথমিক শিক্ষার যে হার উপরে দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে একটু টীকা দরকার। শিশুশ্রেণী ও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী মোট এইগুলিকে প্রাথমিক বলা হয়। শিশুশ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ও হিন্দু ছাত্রের সংখ্যার অনুপাত এইরূপ:—

মুসলমান ... ৯১.৮; হিন্দু ... ৮৩.৮।

সরকারী রিপোর্টেই বলা হইয়াছে যে, এই সব শ্রেণীতে প্রকৃত শিক্ষা প্রায়ই হয় না। বাড়ীতে বসিয়া গোলমাল করিবে, এই ভয়ে বাপ-মা যে সব বালক-বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন—এই তিন শ্রেণীতে সেই সবই বেশী এবং এই সকল শ্রেণীতেই মুসলমান ছাত্র বেশী। ঐ রিপোর্টেই লিখিত আছে যে, অন্ততঃ চতুর্থ শ্রেণীতে না পড়িলে ছাত্রের স্থায়িরূপে অক্ষরজ্ঞান হয় না। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে মুসলমান ছাত্রের হার হিন্দুর তুলনায় এইরূপ:— হিন্দু ১৬.২; মুসলমান ৮.২। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষায় যে মুসলমান ছাত্রসংখ্যার হার ৫৪.৫ দেখা যায়, তাহা দ্বারা ঠিক ঐ পরিমাণে শিক্ষার অগ্রসরত্ব বুঝায় না। সরকারী রিপোর্টেই বলা হইয়াছে—"প্রাথমিক বিভাগে মুসলমান ছাত্রদের ১২ জনের মধ্যে এক জন মাত্র স্থায়িরূপে অক্ষরজ্ঞান লাভ করে।"

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানশালী (literate) লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯·৫, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা শতকরা ৯·৮ মাত্র !*

অথচ মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল হইতে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। এককালীন বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকা য়ুনিভার্সিটী স্থাপন এবং কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীকে অবহেলা করিয়া ঢাকাকে বৎসরে ৯।১০ লক্ষ টাকা দান (যদিও সেখানে ছাত্রসংখ্যা অত্যল্প); উক্ত ইউনিভার্সিটীতে প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "মুসলিম হল" নামক রাজপ্রাসাদোপম মুসলমান ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার অধিকাংশই খালি পড়িয়া আছে। মৌলবী ফজলুল হক অল্পদিনের মন্ত্রিত্বের অবসরে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেবল মুসলমানদের জন্য সরকারী কলেজ (ইস্‌লামিয়া কলেজ) স্থাপন করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের নিজ ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জে কলেজ স্থাপনে বাধা ঘটে। কেবল মুসলমান ছাত্রদের জন্য বহুসংখ্যক সরকারী ছাত্রবৃত্তি; অধিক শিক্ষিত হিন্দুর দাবী উপেক্ষা করিয়া অল্পশিক্ষিত মুসলমানের চাকরীলাভ; হিন্দুদের স্থাপিত হিন্দুছাত্রবহুল বিদ্যালয়েও মুসলমান শিক্ষকের চাকরী ও কমিটীর সদস্যপদে মুসলমানের অনিবার্য্য নিয়োগ প্রভৃতি সুবিধার অজুহাতে ৩০ বৎসর ধরিয়া প্রশ্রয় লাভের পরও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্যালাভের কৃতিত্ব ঐটুকুতে উঠিয়াছে। কিন্তু কৃতিত্ব না থাকিলেও সরকারী শিক্ষাবিভাগে মুসলমানের কর্ত্তৃত্ব অসাধারণ! পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম বার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে (১৯৩১-৩২ পর্য্যন্ত) বাঙ্গালাদেশে মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ৫০ হাজার ৪৬ অর্থাৎ শতকরা ৪৬·৮, এবং ইন্‌স্পেক্টরদিগের সংখ্যা ২০৩ অর্থাৎ শতকরা ৫৪·২ ভাগ! ইহাতেও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান সন্তুষ্ট নহেন! মুসলমানদিগের সরকারী চাকুরী ইত্যাদির সংখ্যা বাড়াইবার জন্য "পরামর্শ সভা" (Muslim Advisory Committee) অনেক দিন হইল বসিয়াছে। শীঘ্রই ইহার ফতোয়া বাহির হইবে এবং হিন্দুকে সরকারী সাহায্য ব্যতীতই শিক্ষায় উন্নতি করার মহাপরাধে আরও লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এবং মুসলমানের প্রাধান্যবৃদ্ধির বহু সুপারিস বাহির হইবে। অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার এমন অদ্ভুত দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কি ?

কিন্তু কেবল সরকারী চাকুরীর সংখ্যা দ্বারাই মুসলমানের আধিপত্য স্পষ্ট পরিমিত হয় না। ইহাদের প্রভাব সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী! শিক্ষামন্ত্রী সাহেব হইতে সাধারণ স্কুলের মৌলবী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই মহাশক্তিধর ও সকলে একসূত্রে গাঁথা। হিন্দুরাজকর্ম্মচারীরাও ইহাদের প্রতাপে সদা সন্ত্রস্ত। কোনও মুসলমান যদি কোন হিন্দু ইন্‌স্পেক্টর, হেডমাষ্টার বা অন্য কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কথা তুলেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! একটি দৃষ্টান্ত আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দিতে পারি। বাঙ্গালার কোন জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার একদা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান শিক্ষকরা দেরীতে আসা, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বাড়ী চলিয়া যাওয়া, ক্লাশের কাযে অবহেলা, যখন তখন ছুটীর আব্দার করা ইত্যাদি বহু দোষ করিলেও হেডমাষ্টার ভয়ে কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না। হিন্দু হোষ্টেলের ছেলেরা সরস্বতীপূজা করায় পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান হোষ্টেলের ছাত্ররা একখানি গরুর হাড় হিন্দু হোষ্টেলে নিক্ষেপ করে। হেডমাষ্টার অনুসন্ধান করিয়া দোষী মুসলমান ছাত্রদিগকে তিরস্কার করিলে তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান ছাত্র, শিক্ষক ও স্থানীয় অন্য মুসলমানরা জোট বাঁধিল। ফলে, উপরিতন মুসলমান ইন্‌স্পেক্টর ইত্যাদিরা আসিয়া হিন্দু হেড মাষ্টারকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়া অন্যত্র বদল করিয়া দিয়াছিল। অবশ্য হিন্দুরা যথারীতি উদাসীন ছিল।

তার পর টেক্‌ষ্টবুক কমিটীর (text book committee) কথা। এ রাজ্যের রাজাই মুসলমান সভ্যরা। ইতিহাস, বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা পারদর্শী কি না, এ প্রশ্ন যেন কেহ তুলেন না; "মুসলমান" এই জোরেই প্রত্যেক পাঠ্যপুস্তকের ভাগ্য ইঁহারা নির্ণয় করেন। কোন মুসলমান সভ্য যদি কোন পুস্তকের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেন, তবে সে পুস্তক নিখুঁত হইলেও পাশ হইবে না। এইরূপেই, এই মুসলমান সভ্যদের আব্দারের বলেই ভারতে মুসলমান যুগের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিত হইতেছে। ইঁহাদের

*হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণী।। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের জন্য বিশেষ করিয়া একটি পয়সাও গভর্ণমেণ্ট খরচ করেন নাই। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা যথাক্রমে শতকরা ৭২, ৬২ এবং ৮২ জন অক্ষরজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

ফরমায়েস অনুসারে ঐতিহাসিকগণকে লিখিতে হইবে যে—"আরঙ্গজেব হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গেন নাই (বৈজ্ঞানিক সার পি, সি, রায়ও এই সুর ধরিয়াছেন); জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যান নাই; আলাউদ্দীন খিলজী পিতৃব্য হত্যা করেন নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি—অর্থাৎ কোন মুসলমান কোন অন্যায় করে নাই, কমিটীর হিন্দু সভ্যরা—"অনুগত ভৃত্যের" মত এই সকল আব্দারে কিরূপে সায় দেন, তাহা দুর্ব্বোধ্য!

"শিক্ষায় পশ্চাৎপদ হইলেও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানগণের আব্দার কিরূপ ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা সবিস্তারে লিখিতে গেলে এক মহাভারত হইয়া যায়। আর একটি মোটা কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। কেবল মুসলমানদের জন্যই ইসলামিয়া কলেজ, বহুসংখ্যক মাদ্রাসা ও মক্তব ইত্যাদি আছে। ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে ইহাদের জন্য সরকারী খরচের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকার বেশী। আর কেবল হিন্দুদের জন্য সরকারী ব্যয়ে স্থাপিত বিদ্যালয় 'একমাত্র সংস্কৃত কলেজ; এতদ্ভিন্ন কতকগুলি টোলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। ইহাতে ঐ বৎসর মোট ব্যয় হইয়াছে মাত্র কিঞ্চিদধিক ১ লক্ষ টাকা। এইরূপ বহু বৎসর হইয়া আসিতেছে। মুসলমানদের বিভিন্ন জেলায় কতকগুলি হাই স্কুল এবং তিনটি ইস্‌লামিক ইণ্টারমিডিয়েট (Islamlic Intermediate) কলেজের খরচ পূর্ব্বোক্ত ৭১ লক্ষের মধ্যে ধরা হয় নাই। অসম্ভব আব্দারেরও আর একটি শেষ উদাহরণ দিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মুসলমান ছাত্ররা খুব কম পাশ করে। ইহার কারণ, দেখান হইল যে, পরীক্ষার খাতায় ছাত্রের নাম লেখা থাকে। মুসলমানদের নাম দেখিয়া হিন্দু পরীক্ষকরা তাহাদিগকে ফেল করেন! এই ছুতা দেখাইয়া মুসলমানরা বলিলেন, পরীক্ষার খাতায় ছাত্রের নাম লেখা তুলিয়া দেওয়া হউক। তদনুসারে এখন আর খাতায় নাম থাকে না। তবে পরীক্ষার ফলাফল পূর্ব্ববৎ।

২। জনসেবাকার্য্য (দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল)

জনসেবা-কার্য্যের আলোচনা করিতে গেলে বাঙ্গালা দেশে সময় সময় যে দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন সংঘটিত হয়, তাহার বিষয় প্রথমেই মনে উদিত হয়। কিন্তু এ সব বিপদের সময় যে সেবাকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার কোন স্থায়ী বিবরণ রাখা হয় না। যে সহস্র সহস্র লোকের কাছে চাঁদা লওয়া হয়, এবং যে শত শত সেবকের দ্বারা সেবাকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাদের সকলের নাম ও সম্প্রদায় ইত্যাদি সহ বিবরণ লিখিতে গেলে বিরাট ব্যাপার হইয়া পড়ে। তথাপি এ কথা সকলেই মোটামুটি জানেন যে, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি বিপদের সময় হিন্দুর অর্থ ও হিন্দুর পরিশ্রম দ্বারাই প্রধানতঃ বিপন্নের সাহায্য হইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু, পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গেই ঐ সব বিপদ অধিকতর ঘটে বলিয়া সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। যাঁহার আহ্বানে বাঙ্গালী হিন্দু অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের (যাহাদের মধ্যে মুসলমানই বেশী) উপকারের জন্য বৎসর বৎসর দিয়া আসিতেছে, সেই আচার্য্য সার পি, সি, রায়ও এ কথা বোধ হয় স্বীকার করিবেন। কিন্তু যেখানে মুসলমানের হস্তে লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব হিন্দুর বিপদ (যথা চট্টগ্রামে, কিশোরগঞ্জে, ঢাকায়, পাবনায়), সেখানে মুসলমানের সাহায্য ত স্বপ্নাতীত; হিন্দুর চাঁদা সংগ্রহে বিশেষজ্ঞ মহারথরাও নিষ্ক্রিয়। বহু বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া দেখিয়া এই কথা মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতির সময়ে জনসেবার ভার চতুর সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা ভাবপ্রবণ হিন্দুর উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন; এবং ঐ বিপদ কাটিয়া গেলে হিন্দুর পয়সায় শরীরের সঞ্চিত বল লইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার স্পৃহাও তাঁহাদের প্রবল হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আমি এই প্রসঙ্গে যে জনসেবার কথা বলিতে যাইতেছি, তাহার হিসাব সরকারী বিবরণেই স্থায়িভাবে লিপিবদ্ধ আছে, এবং বৎসরের পর বৎসর উহা প্রকাশিত হয় (অন্ততঃ হইবার কথা)। অর্থাৎ দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতালের কথা বলিতেছি। এই প্রকার আর্ত্তসেবা হিন্দুর কাছে অতি উচ্চ ধর্ম্মকার্য্য এবং হিন্দু এ বিষয়ে জাতিধর্ম্মের বিচার করে না।

বাঙ্গালাদেশে যে শত শত দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল আছে, আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য সেগুলিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেছি। কতকগুলি

হাঁসপাতাল ও ঔষধালয়, খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর নামের সঙ্গে জড়িত—কেহ কেহ নিজের, কেহ বা আত্মীয়স্বজনের কেহ বা কোন সম্ভ্রান্ত সম্মাননীয় ব্যক্তির নাম স্মরণার্থ ঐগুলি স্থাপন করিয়াছেন। আবার বহুসংখ্যক ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল কেবল স্থানের নামানুসারে হইয়াছে। আমরা এ স্থলে কেবল হিন্দু ও মুসলমান কর্ত্তৃক স্থাপিত ব্যক্তিগত নামের সহিত জড়িত দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির সংখ্যার তুলনা করিতেছি। ইহা দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় জনসেবা-কার্য্যে অধিকতর আগ্রহান্বিত ও ত্যাগশীল, তাহা এক দিক দিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হাঁসপাতাল ও ঔষধালয়-সমূহের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী (Annual Report on the working of Hospitals and Dispensaries) অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়।

হিন্দু কর্ত্তৃক স্থাপিত হাঁসপাতাল ও ঔষধালয়ের সংখ্যা —১৩৬

খৃষ্টান	৫২
মুসলমান	৯

এই সংখ্যাগুলি সমগ্র বঙ্গদেশের। এ স্থলে যে ৫২টি হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় "খৃষ্টান" এই শিরোনামে দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ঐগুলির প্রায় সমস্তই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, লাট সাহেব ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণের স্মৃতির জন্য স্থাপিত। এই সব ক্ষেত্রে প্রায়ই জনসাধারণের চাঁদা দ্বারা কার্য্য সাধিত হয় এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সেবাকার্য্যে হিন্দুর স্বাভাবিক আগ্রহের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, ঐ চাঁদার প্রায় সবই হিন্দুর পকেট হইতে আসিয়া থাকে। কলিকাতায় ঐরূপে স্থাপিত কয়েকটি বড় হাঁসপাতাল আছে:—প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্, মেয়ো, কারমাইকেল, ক্যাম্বেল, লেডী ডাফরিন্, ইত্যাদি। মফস্বলেও ঐরূপ অনেক আছে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালার বহু স্থানে কেবল গ্রাম অথবা নগরের নামাঙ্কিত হাঁসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয়ও আছে। এগুলিতেও, অন্ততঃ বহুলাংশে, হিন্দুর অর্থ এবং উদ্যমের প্রমাণ বিদ্যমান। তথাপি, এই সব বাদ দিলেও, স্পষ্টতঃ হিন্দুর নামের সহিত জড়িত ও হিন্দুর দ্বারা স্থাপিত ঔষধালয় ও হাঁসপাতালের সংখ্যা ১৩৬; এবং ঐরূপ মুসলমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯। যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়াই সকল পাওনা বিষয়ে রাক্ষসী ক্ষুধার পরিচয় দেন, তাঁহাদের দেশহিতকর কার্য্যের পরিমাণ ঐরূপ!

কথা উঠিতে পারে যে, মুসলমানদের ৯টি ঔষধালয় হয় ত এত বেশী রোগীর উপকার করে যে, হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানগুলির সেবাপরিমাণ সেরূপ নহে। এই জন্য, ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়গুলির এক বৎসরের রোগীর সংখ্যা তুলনা করিতেছি। উক্ত সরকারী রিপোর্টেই একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের ৮টি চিকিৎসালয়ের (১টির সংখ্যা দেওয়া নাই) রোগীর সংখ্যা ৭০ হাজারের কিছু বেশী। ইহার সঙ্গে বাঙ্গালার মফস্বলের চারিটি হিন্দু চিকিৎসালয়ের তুলনা করিব।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জগন্নাথ হাঁসপাতাল, জাফরগঞ্জ (ত্রিপুরা) শোভাবাজার রাজ হাঁসপাতাল, আবুতরফের (চট্টগ্রাম) রাজলক্ষ্মী ঔষধালয়, বনগ্রাম (ময়মনসিং) শ্যামসুন্দর ঔষধালয়—এই চারিটির ঐ একই বৎসরের রোগীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার। ইহা ব্যতীত হিন্দুর স্থাপিত আরও ২।৩টি বড় হাঁসপাতালের কথা বলা যাইতে পারে:—ময়মনসিংএ সূর্য্যকান্ত হাঁসপাতাল—রোগীর সংখ্যা ৩৫ হাজারের বেশী; কলিকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতাল—রোগীর সংখ্যা ৩০ হাজারের বেশী; কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ সংযুক্ত শ্যামাচরণ চক্ষু হাঁসপাতাল—রোগীর সংখ্যা ২৮½ হাজারের বেশী। পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে, জনসেবাকার্য্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বাস্তবিক আকাশ পাতাল তফাৎ কি না?

পরিশেষে, প্রবন্ধ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আরও দু'একটি কথা বলা দরকার মনে করি। হিন্দুর সেবাকার্য্য প্রায়ই অ-সাম্প্রদায়িক। উহা জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে যে চিকিৎসালয়গুলির কথা বলা হইল, তন্মধ্যে হিন্দুদের গুলি হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্যই উন্মুক্ত। অনেকগুলি মুসলমান-প্রধান স্থানে (চট্টগ্রাম, ময়মনসিং প্রভৃতি) স্থাপিত বলিয়া, সাহায্যপ্রাপ্ত লোকদের প্রায় ৯০ জন মুসলমান। মুসলমানদের স্থাপিত যে ৮টি চিকিৎসালয়ের রোগীর সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিও হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্যই উন্মুক্ত, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

"ধরিয়া লওয়া হইয়াছে"—এ কথা কেন বলিতেছি, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। মুসলমানদিগের স্বসম্প্রদায়ের জন্য প্রীতি সর্ব্বজনবিদিত ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—"After me the deluge" অর্থাৎ আগে আমার কার্য্য সিদ্ধ হউক, তার পর পৃথিবী জলপ্লাবনে ভাসিয়া গেলেও ক্ষতি নাই। নিজের সম্প্রদায়ের বেলা লোকে এই নীতি খাটাইলে, সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থ-বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে দেশে একাধিক সম্প্রদায় বর্ত্তমান, সে দেশে ঐ নীতি অপর সম্প্রদায়ের পক্ষে মারাত্মক। ভারতের আজ সেই মারাত্মক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে—বাঙ্গালার কাউন্সিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমান সভ্যগণ একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাঁহাদের হাতে তুলিয়া না দেওয়ায় রোষ প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁহারা যে অর্থদান করিয়াছেন, তাহা না'র সমান (বিশ লক্ষের মধ্যে দশ হাজার,—প্রায় এই অনুপাত) এই কথা বলায়, খাঁনবাহাদুর আব্দুল মমিন সাহেব বলেন :—"মুসলমানরা দাতা নয়, কে এ কথা বলে? তাঁহারা ওয়াকৃফ্ (wakf) প্রভৃতিতে কত দান করেন!" এখানেই তাঁহাদের মনোবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মসজিদ প্রভৃতির জন্য অনেক মুসলমান অর্থ-সম্পত্তি দান করেন, এবং ঐ সংস্রবে যে দানের ব্যবস্থা থাকে, তাহা মুসলমানেরই প্রাপ্য। "জাকাৎ" (ভিক্ষা) মুসলমানকে দিলেই মুসলমানের ঠিক্‌ঠিক্ ধর্ম্মকার্য্য হয়, এইরূপ শুনা যায়। কোন মুসলমান পরোপকারের জন্য টাকা দান করিলে, সে উপকার অ-মুসলমান পাইলে নাকি বে-আইনী হয়। পূর্ব্বে হুগলী কলেজ মহম্মদ মহসিনের দান হইতে চলিত। সেখানে হিন্দুছাত্র পড়িত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত হেতুতেই মুসলমানরা আপত্তি তুলিয়াছিলেন। এখন অবশ্য, মহসিন ফণ্ডের টাকা ঐ কলেজের জন্য ব্যয় হয় না।

এইরূপ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বাঙ্গালার আকাশ-বাতাসকে কলুষিত করিতেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা সদ্বিবেচক, তাঁহাদের উচিত ইহার প্রতিবিধান করা। যাঁহারা সংখ্যা-গরিমায় গর্ব্বিত, সার্ব্বজনীন কার্য্যেও তাঁহারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করুন, তবেই সকল "দাবী-দাওয়া" শোভা পাইবে।

সঙ্গে সঙ্গে, একতা-শূন্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের আত্মপরনির্ব্বিশেষে অত্যুদারতা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা আবশ্যক কি না।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মীরা-বাঈ

কেমনে, হে রাণা, তাহারে বাঁধিয়া রাখিবে আপন পুরে,
যাহার পরাণে তাঁহার বাঁশরী বেজেছে আকুল সুরে?

সে যে ছুটিয়াছে হর্ষ-পাগল মত্ত নিজের গানে,—
সে যে ছুটিয়াছে উদাস নয়নে শ্রীহরির সন্ধানে,
চরণে দলিয়া সকল বাঁধন তুচ্ছ করিয়া সুখ,
বিলাস-বিভবে ছাড়িয়া চিত্ত ছুটে যবে উন্মুখ,
প্রেমের শিকল ছিন্ন যাহার, পরাভূত কামানল,
হৃদি-মন্দিরে জ্বলে উঠে যার ভক্তির হোমানল,—
তাহারে ফিরাবে কেমনে হে রাণা দেখায়ে রক্ত আঁখি,
সকল শঙ্কা যে করেছে জয়, শঙ্কা-হরণে ডাকি।
যাহারে পারনি ফিরাতে ভ্রান্ত মধুর আলিঙ্গনে,
তাহারে কখন পার কি ফিরাতে নিঠুর উৎপীড়নে?
মধুযামিনীরে সফল করিতে যে নারী করেছে পণ—
কি সাহসে তারে হে মেবার-রাজ করিবে আলিঙ্গন?

মন্দির তুমি কর ভূমিসাৎ রাজার অহঙ্কারে,
রাজার রাজা যে কত বলীয়ান্ আজো কি চেননি তাঁরে?
মীরার বুকেতে যে বেদনা দিলে পূজাতে সাধিয়া বাদ,
ভেবেছ কি ধুয়ে মুছে যাবে চ'লে সেই গুরু অপরাধ?
মহারাণী মীরা আঁখি-জলে ভাসি যে পথে গিয়াছে চ'লে
সাধের মেবার, সাধের চিতোর, প্রাণের কৃষ্ণে ফেলে,
সেই পথে তুমি একদিন রাণা তাহারি অন্বেষণে,
ভিখারীর বেশে ভক্তি-পাগল ছুটিবে বৃন্দাবনে;
সে দিন তোমায় কাঁদাবে আবার মীরার আঁখির জল,
সে দিন তোমার পাষাণ হৃদয় প্রেমে হ'বে চঞ্চল;
সে দিন আবার করিবে পাগল মুক্ত মীরার রূপ,
সে দিন ব্রজের ধূলায়, লুটাবে মেবার দেশের ভূপ!

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

বিষের ধোঁয়া

২৩

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন সকালে কিশোর বিমলাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিল।

গাড়ীতে সারারাত্রি বসিয়া আসিতে হইয়াছে। হাওড়া ষ্টেশনেও দারুণ ভিড়, মানুষ ও মোটঘাট ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেই দীনবন্ধু বাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি দ্রুতপদে ট্রেণ ধরিবার জন্য লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া ছুটিতেছিলেন, কিশোরকে দেখিতে পাইয়া দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি হে, খবর সব ভাল ত?—বর্দ্ধমান যাচ্ছি, আর সময় নাই, টিকিট কিনতে হবে—তোমাদের ওদিকটাতে গোলমাল বেধেছে, সাবধানে থেকো—"

কিশোর চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গোলমাল?"

"কাগজে পড়নি?—দাঙ্গা—সাবধানে থেকো,—আমি চল্লুম, সময় নেই—কাল সকালেই ফিরব—" বলিতে বলিতে তিনি প্রবহমাণ জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

কিশোর ব্যাপারটা ভালরকম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, গত কয়েক দিন খবরের কাগজ পড়িবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। সে চিন্তিত-মুখে ট্যাক্সিতে উঠিল। পথে হ্যারিসন রোডের মোড়ের উপর একখানা বাঙ্গালা দৈনিক কিনিয়া লইয়া তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতেই বড় বড় অক্ষরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ চোখে পড়িল। গত তিন দিন ধরিয়া এই নৃশংস আত্মঘাতী অনুষ্ঠান চলিতেছে, মেছুয়াবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের চৌমাথাকে কেন্দ্র করিয়া সহরের ঐ প্রান্তটাতেই ইহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেল্লা হইতে মিলিটারি আসিয়া মেশিনগ্যন ইত্যাদির সাহায্যে মোড়ে মোড়ে পাহারা দিতেছে বটে, কিন্তু খুন-জখম তাহাতে কিছুমাত্র কমে নাই। কাগজে উভয় সম্প্রদায়ের হতাহত ব্যক্তির দীর্ঘ তালিকা বাহির হইয়াছে।

বিমলা গলা বাড়াইয়া কাগজখানা দেখিতেছিল, সে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—"ঠাকুরপো, এ জিনিষ ত বাঙ্গালা দেশে কখনও ছিল না।"

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, ইংরাজ বাহাদুর স্বায়ত্ত-শাসনের যে প্রথম কিস্তি আমাদের দিয়েছেন, এটা তারই অনিবার্য্য ফল।"

বাড়ী পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল, পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ। বেলা প্রায় আটটা বাজে, কিন্তু এখনও রাস্তায় জনমানব নাই। কিশোরের বাসার সম্মুখে কিছু দূরে একটা চায়ের দোকান ছিল—প্রত্যহ সন্ধ্যায় সকালে সেখানে বহু-লোকের সমাগম হইত—সেটার দরজায় তালা লাগানো। আশে-পাশের বাড়ীগুলা যতদূর দেখা গেল, সব দরজা-জানালা বন্ধ। একটা আশঙ্কাপূর্ণ থমথমে ভাব যেন চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্রমে বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, নিকটে দূরে চারিদিক হইতে একটা সোরগোল ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক এক দল উন্মত্তপ্রায় লোক চীৎকার করিতে করিতে লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া রাস্তার এক দিক হইতে অন্য দিকে ছুটিয়া গিয়া—বোধ করি, গোরার তাড়া খাইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে আবার ফিরিয়া পলাইতেছে। অনতিদূরে ফুটপাথের উপর একটা স্থানে খানিকটা রক্ত জমিয়া শুকাইয়াছিল, বোধ হয়, আগের দিন কোন হতভাগ্য ছুরির আঘাতে ঐখানে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। জনহীন পথের উপর ঐ দাগটা যেন ধরিত্রীর বুকের উপর একটা দগদগে ক্ষতের মত দেখাইতেছে। কিশোর দোতলার জানালায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিমলা এক হাতে একখানা আসন ও অন্য হাতে রেকাবীতে করিয়া খানিকটা গরম হালুয়া আনিয়া কিশোরের সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"তোমাকে আজ যে কি খেতে দেব, তা জানি না। ঝিও আসেনি।"

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল,—"ঘরে কি কিছু নেই?"

"শুধু চাল আর ডাল।"

"ওতেই হবে। যে রকম কাণ্ড দেখছি, বাজার-হাট কিছুই বসবে না। তা ছাড়া বাড়ী থেকে বার হওয়াও ত অসম্ভব।"

"না, না, বাড়ী থেকে বার হবে আবার কি! কোনও রকমে প্রাণে প্রাণে এসে পৌঁছতে পেরেছি, এই ঢের। খাও—জল আনি।"

কিশোর খাইতে বসিল। জলের গেলাস আনিয়া

তাহার সম্মুখে রাখিয়া বিমলাও মাটীতে বসিল। আস্তে আস্তে বলিল,—ওঁরাও এসেছেন।"

"কারা?"—কিশোর চমকিয়া মুখ তুলিল।

বিমলা আঙ্গুল দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে দেখাইয়া বলিল,—"ওপরের ঘরের জানালা একটা খোলা ছিল, তাই জানতে পারলুম। কিন্তু সাড়া-শব্দ কিছু পেলুম না।"

কিশোর কোন কথা বলিল না, মুখ গুঁজিয়া আহার করিতে লাগিল। বিমলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিল,—"কেমন আছে সব, কে জানে!"

দ্বিপ্রহরে নাম মাত্র আহার করিয়া কিশোর নিজের ল্যাবরেটারী ঘরটার ধূলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কাযে তাহার মন বসিতেছিল না, পাশের বাড়ীতে উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, এই কথাটাই বার বার মনে পড়িয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া দিতেছিল। এমন সময় বিমলা প্রবেশ করিয়া বলিল,—"ঠাকুরপো, বিনয় বাবুর বোধ হয় খুব অসুখ।"

কিশোর একবার চকিতের জন্য মুখ ফিরাইয়া আবার ঝাড়ন দিয়া একটা কাচের যন্ত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল,—"কি ক'রে জানলে?"

"নীচের ঘরে সুহাস দরোয়ানটাকে ওষুধ আনতে দিচ্ছিল—শুনতে পেলুম। কিন্তু দরোয়ানটা কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। সব কথা ত ভাল শোনা গেল না, শুধু সুহাস মিনতি ক'রে বলছিল—একবারটি যাও, তোমায় দশ টাকা বখসিস দেব, ওষুধ না এলে বাবুকে বাঁচানো যাবে না। দরোয়ানটা কেবলই 'নেহি মাইজি' 'নেহি মাইজি' বলছিল—"

"বাড়ীতে কি আর কেউ নেই?"

"কি জানি, আর ত কারুর গলা পেলুম না।"

কিছুক্ষণ কিশোর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর হঠাৎ হাতের ঝাড়নটা ফেলিয়া দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। উৎকণ্ঠিত বিমলা বলিল, "ও কি, কোথায় চল্লে, ঠাকুরপো?"

"দেখি যদি কিছু করতে পারি—" বলিয়া কিশোর নামিয়া গেল।

সদর-দরজা খুলিয়া বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় বিমলা পশ্চাৎ হইতে বলিল,—"একটু দাঁড়াও, ঠাকুরপো, আমিও যাচ্ছি।"

সে সময়টা রাস্তা খালি ছিল, দুজনে বিনয় বাবুর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া গেল। দরোয়ানটার পাশ কাটাইয়া বিমলা আগে প্রবেশ করিল, কিশোর তাহার পশ্চাতে ঢুকিল।

সুহাসিনী কালিমালিপ্তমুখে নির্জ্জীবের মত ঘরের মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল, দুজনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যেন ভূত-দেখার মত চমকিয়া উঠিল। বিমলা দ্রুতপদে তাহার দিকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে, সুহাস? বাবার অসুখ করেছে?"

বুদ্ধিভ্রষ্টের মত সুহাস নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

বিমলা বলিল,—"কোথায় আছেন তিনি?—ওপরে?"

সুহাস হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া নিকটের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল। বিমলা তাহার পাশে বসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—"কেঁদো না। কি হয়েছে, আগে আমাদের ভাল ক'রে বল।"

সুহাস চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"কাল থেকে বাবার হাঁপানির ব্যথা উঠেছে, কিছুতেই কমছে না। ডাক্তারের কাছে খবর পাঠাতে পারছি না। আমি একলা, বাড়ীতে দুটো চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। যে ওষুধটা খেলে বাবার হাঁপানির ব্যথা কমে, সেটাও কাল রাত্তিরে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কেউ ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতে রাজি হচ্ছে না—" সুহাসিনী আঁচলে চোখ ।

কিশোর দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, নিমেষের জন্য বিমলার সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। বিমলা তাড়াতাড়ি সুহাসের দিকে ফিরিয়া বলিল,—"কিন্তু ওষুধ না আনলেই যখন নয়, তখন দরোয়ান যাবে না কেন? মরণ-বাঁচনের কথা—আর ডাক্তারখানাও ত বেশী দূর নয়—"

সুহাসিনী মাথা নাড়িয়া বলিল,—"ওরা যেতে চাচ্ছে না—বলছে, বাড়ী থেকে বেরুলেই ওদের ছুরি মারবে।"

বিমলা আর কিছু বলিতে পারিল না; নিজে প্রাণ দিয়া পরের প্রাণ বাঁচাইতে যদি কেহ রাজি না হয়, তাহাকে কি বলা যাইতে পারে!

কিশোর এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল,—"ওষুধের নামটা কি?"

সুহাসিনী অদূরে টি-পাইয়ের উপর একটা খালি শিশি

দেখাইয়া বিজড়িত স্বরে কহিল,—"ওর গায়ে লেখা আছে, পেটেণ্ট ওষুধ।"

কিশোর শিশিটা তুলিয়া লইয়া বিমলাকে বলিল,—"বৌদি, তুমি বোসো, আমি এখনই আসছি।"

বিবর্ণ মুখে বিমলা বলিয়া উঠিল,—"তুমি কোথায় যাচ্ছ, ঠাকুরপো—"

"এখনই ফিরব। কাছেই ডিস্পেন্সারি—কোনও ভয় নেই।" বলিয়া কিশোর নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দুজনে চিত্রার্পিতের মত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর সুহাসিনী জলে মজ্জমান ব্যক্তির মত সজোরে বিমলার একটা হাত চাপিয়া ধরিল। এইভাবে প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

বাহির হইতে কখনও অখণ্ড নিস্তব্ধতা, কখনও বা বহুকণ্ঠের দূরাগত চীৎকার আসিতে লাগিল। অসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে পনের মিনিট কাটিয়া গেল।

একবার সুহাসিনী কম্পিত অধরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার ভয় করছে না?"

বিমলা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলিল,—"আমার ভয় করছে বৈ কি, সুহাস। গেলে যে আমারই যাবে, আর ত কারুর যাবে না।"

তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় কঠিন শুনাইল। সুহাসিনী নতমুখে বসিয়া রহিল, আর কোন কথা বলিল না।

হঠাৎ বাহিরের দরজার উপর একটা গুরুভার পতনের শব্দে চমকিয়া দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল; তার পর বিমলা ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া ধরিল, সুহাসিনীও তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়া কিশোর বসিয়াছিল, দরজা খুলিতেই টলিয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেল। জামার বুকে রক্ত, মুখে রক্ত, মাথার চুলে রক্ত মাখামাখি—কিশোরকে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া বিমলা কাঁদিয়া উঠিল,—"আমার এই সর্ব্বনাশ করতেই কি তুমি বেরিয়েছিলে, ঠাকুরপো?"

বিমলার কণ্ঠস্বরে কিশোর চোখ মেলিয়া চাহিল, কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া,—"ওষুধ এনেছি" বলিয়া শিশিযুক্ত একটা কম্পমান হাত তুলিয়া ধরিল।

দুটি নারী তখন বহুকষ্টে বুকভাঙ্গা শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার অবসন্ন দেহটা টানিয়া আনিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। জামা খুলিয়া, মাথা-মুখ ধুইয়া দিবার পর দেখা গেল, মাথায় চোট লাগিয়াছে, ঠিক মূর্দ্ধার উপর প্রায় তিন ইঞ্চি স্থান কাটিয়া গিয়া হাড় পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। হাড়টা ভাঙ্গিয়াছে কি না বুঝা গেল না, কিন্তু রক্তস্রাব তখনও বন্ধ হয় নাই। বিমলা আঁচল ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানটা বাঁধিয়া দিবার পর কিশোরের আচ্ছন্ন ভাব একটু কমিয়াছিল, সে সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল,—"পেছন থেকে মাথায় লাঠি মারলে—যাবার সময় কিছু হয়নি, কিন্তু ফিরে আসবার সময়—ডিস্পেন্সারি থেকে বেরুতেই মারলে।—হঠাৎ প'ড়ে গেলুম—তার পর এই পথটা ছুটে আস্‌তে হাঁপিয়ে পড়লুম, নইলে লাগেনি বোধ হয় বেশী—"

ঘরের এককোণে দেয়ালে মাথা ঠেকাইয়া সুহাসিনী কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দেহটা বার-ম্বার শিহরিয়া উঠিল। বিমলা চোখ মুছিতে মুছিতে কেবল ভগবান্‌কে মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—"ঠাকুর, বুক চিরে রক্ত দেব, ভাল ক'রে দাও।"

কিশোর ক্লান্তভাবে ঘাড়টা নত করিয়া বলিল,—"মনে হচ্ছে, একটু শুতে পেলে ভাল হ'ত—"

সুহাসিনী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। একবার বুঝি একটু ইতস্তত করিল, তার পর বিমলাকে বলিল,—"আপনি ওঁকে নিয়ে ওপরে আসুন—দরোয়ান আর বদরী সাহায্য করবে। আমি বিছানা ঠিক ক'রে রাখছি।"

সুহাসিনীর ঘরে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোর বলিল,—"আঃ, এখন বেশ স্বস্তি পাচ্ছি!" শিয়রের দিকে দৃষ্টি পড়িতে দেখিল, খাটের বাজু দুহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া সুহাসিনী দাঁড়াইয়া আছে। কিশোর ম্লান হাসিয়া বলিল,—"আপনাদের কেবল কষ্ট আর অসুবিধাই ঘটালুম।"

সুহাসিনীর নিমীলিত চক্ষু দিয়া ধারার ন্যায় অশ্রু নামিয়া বুকের কাপড় ভিজাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু কিশোর তাহা দেখিতে পাইল না।

"বৌদি!"

"ভাই!" নিজের আঁচল দিয়া কিশোরের কপাল ও ঘাড় হইতে রক্তের দাগ মুছিয়া লইয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বিমলা বলিল,—"কি বলছ, ঠাকুরপো?"

"মাথার হাড়টা বোধ হয় ফ্রাক্‌চার হয়নি।"

"ঠাকুর করুন, তাই যেন হয়।"

"বিনয় বাবুকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে? কেমন আছেন তিনি?"

"ভাল আছেন—এখন ঘুমুচ্ছেন।"

"আমারও যেন ঘুম পাচ্ছে—"

বিমলার বুকের ভিতরটা আবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আর এক দিন, স্বামীর মাথা কোলে লইয়া সে এমনই ভাবেই মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সে দিন তিনিও এমনই ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান্! সেই পরীক্ষা কি আবার নূতন করিয়া পাঠাইয়া দিলে?

ব্যাকুলভাবে সুহাসের দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"একটা ডাক্তার—একটা ডাক্তারও কি পাওয়া যায় না, সুহাস?"

কিশোর বলিল,—"ডাক্তারের দরকার নেই, বৌদি। বেশী রক্ত বার হয়েছে ব'লে একটু অবসন্ন বোধ হচ্ছে, ঘুমুলেই সেটা কেটে যাবে। ডাক্তারের চেয়ে তোমার পায়ের ধূলো একটু মাথায় দাও—ঢের বেশী কায হবে—"

নিমীলিত নেত্রে কিশোর একটু হাসিল।

"সত্যি বলছ ঠাকুরপো, কোনও ভয় নেই? পোড়া মেয়েমানুষ—কিছুই যে বুঝতে পারি না, ভাই! কিন্তু তুমি ঠিক বুঝতে পারছ, কোনো ভয় নেই?"

"বুঝতে পারছি—কোন ভয় নেই।"

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বিমলা তাহার কপালে বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল,—"আচ্ছা, তবে ঘুমোও। আমরা কাছেই রইলুম।"

"তোমরা বরং বিনয় বাবুর কাছে যাও—"

কিছুক্ষণ পরে কিশোরের নিশ্বাসের শব্দে বিমলা বুঝিল, সে ঘুমাইয়াছে। তখন তাহার বুক পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

শীতের বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে। অস্তমান সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া যোড়করে বিমলা বোধ করি প্রাণের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষাই দিনদেবকে নিবেদন করিতেছিল, হঠাৎ মুখ নামাইয়া দেখিল, সুহাসিনী একবারে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

"সুহাস!"

"বৌদি!" বলিয়া সুহাসিনী তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"ছি ছি সুহাস, ওঠো।"

অবরুদ্ধ অশ্রু-বিকৃত স্বরে সুহাস বলিল,—"বৌদি, আমাকে কি তোমরা ক্ষমা করতে পারবে? আমার পাপেই আজ—" আর বলিতে পারিল না, তাহার দেহ অদমনীয় বাষ্পোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

বিমলা জোর করিয়া তাহাকে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"সুহাস, দোষ তুমি ওঁর কাছে অনেক করেছ, তাই বুঝি ভগবান্ আজ এই শাস্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুঃখ তুমি কম পাওনি জানি, কিন্তু ভগবানের চোখে হয় ত এখনও তোমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি। শুধু তোমার নয়, আমাদের সকলেরই আজ পরীক্ষার দিন। ক্ষমা তোমাকে আমি কি করব সুহাস, শুধু প্রার্থনা করি, তোমার ভালবাসার জোরে যেন ওঁকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পার।"

সুহাসের হাত ধরিয়া ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল,—"যাও, লজ্জা করো না, ওঁর কাছে গিয়ে বসো গে, ঐখানেই তোমার স্থান। আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে বসছি।" বলিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল।

এক ঘণ্টা পরে বিমলা বিনয় বাবুর ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কিশোর তখনও তেমনই পড়িয়া ঘুমাইতেছে এবং সুহাস খাটের পাশে হাঁটু গাড়িয়া কিশোরের একটা হাতের মধ্যে নিজের মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছে।

নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া বিমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

২৪

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বিনয় বাবু মারা গিয়াছেন। সে ধাকাটা সামলাইয়া গেলেও তাঁহার শরীর ভিতরে ভিতরে একবারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; সুহাসিনীর বিবাহের মাস কয়েক পরে তিনি কয়েক দিন মাত্র অসুখে ভুগিয়া হঠাৎ পরলোকযাত্রা

করিলেন। ইদানীং তাঁহার প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিয়া জীবন উপভোগ করিবার ইচ্ছাও জাগিয়াছিল। কিন্তু যাহার অমোঘ আদেশের উপর আপীল চলে না, তিনি এক দিন কাহাকেও কোন কৈফিয়ৎ না দিয়া বিনয় বাবুকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন: কন্যা, জামাতা, বন্ধু-বান্ধবের অসীম স্নেহ ও শুশ্রূষা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রাণোপম সুহৃদের বিয়োগে দীনবন্ধু বাবু বড়ই বেদনা পাইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কিশোর বিমলার টাকায় কাশীপুরের দিকে নূতন বাড়ী কিনিয়া সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেল। অধ্যাপকের চাকরী সে পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই অবধি বাড়ীতে মস্ত বড় ল্যাবরেটারী স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাল কাটাইতেছে।

রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর দুটা বড় বড় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া কিশোর ল্যাবরেটারীতে বসিয়া একমনে কায করিতেছিল। সুহাসিনী ঘরময় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং এটা-ওটা নাড়া চাড়া করিতেছিল। একবার কয়েকটা কাচের ছিপিযুক্ত শিশি হইতে খানিকটা তরল পদার্থ একটা টেষ্ট-টিউবে ঢালিল, তার পর কি ভাবিয়া সেটা রাখিয়া দিল। বুনসেন্ বার্ণার জ্বালিয়া সেটা খুব কমাইয়া দিয়া আবার ঘরময় বেড়াইতে লাগিল। কিশোরের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে গভীর মনঃসংযোগে কি লিখিতেছে।

তখন চুড়িগুলার শব্দ করিয়া, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া টানিয়া আবার সশব্দে পিঠে ফেলিয়া সে বলিল,—"আজ করবীর একখানা চিঠি এসেছে।"

কিশোর চিন্তা-নিমগ্ন চক্ষু একবার তুলিয়া আবার লেখার উপর নিবদ্ধ করিল। সম্ভবতঃ কথার অর্থ তাহার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। করবীর নামোল্লেখেও তাহার মনের চটকা ভাঙ্গিল না।

সুহাস বলিল,—"করবী লিখেছে যে, সে বরের সঙ্গে বিলেত চলল—এখন কিছুকাল সেখানেই থাকবে।"

এবার অন্যমনস্ক চক্ষু তুলিয়া কিশোর বলিল,—'ও।'

সুহাস জোরে হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"আমার একটা কথাও তোমার কাণে যায়নি। কি বললুম বল ত?"

তখন সচেতন হইয়া কিশোরও হাসিয়া বলিল,—"সত্যিই শুনতে পাই নি। কি বলছিলে?"

'কিছু না' একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

আজ বহুদিন পরে করবীর পত্র পাইয়া তাহার মনটা অকারণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আবার তেমনই অকারণে তাহা শান্ত হইয়া গেল।

বুনসেন্ বার্ণার উস্কাইয়া দিয়া সে টেষ্ট টিউবের তরল পদার্থটা গরম করিতে লাগিল, সেটা ফুটিয়া উঠিতেই আলোর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া সে বলিল,—"ওগো দেখ, কি সুন্দর রং।"

কিশোর কায ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল,—"এই হচ্ছে বুঝি! নিজেও কায করবে না, আমাকেও করতে দেবে না?"

সুহাস বলিল,—"যথেষ্ট কায হয়েছে মশায়, রাত এগারোটা বাজে, এবার শুতে চলুন।"

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার অন্য অ্যাসিষ্টাণ্ট্‌টি কোথায়?"

"দিদির আজ একাদশী, তিনি শুয়ে পড়েছেন। সত্যি চল, অনেক রাত হয়ে গেল—"

"কিন্তু—, তুমি বরঞ্চ এগোও,—আমি এই কাযটা সেরে নিয়েই—"

"সেটি হচ্ছে না, মশাই। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি সমস্ত রাতই কায ক'রে কাটিয়ে দেবে—" বলিয়া সুহাস তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

ঘরের আলো নিভাইয়া দুজনে উপরে উঠিয়া গেল। শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নাইট্ ল্যাম্প জ্বলিতেছে, কিন্তু খোকা বিছানায় নাই।

দুজনের একবার চোখাচোখি হইল, তার পর আবার তাহারা ঘর হইতে বাহির হইল। তেতলায় একটিমাত্র ঘর,—সেটিতে বিমলা শয়ন করে। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা উপরে গিয়া ভেজানো দরজায় কাণ পাতিয়া শুনিল, অস্পষ্ট কথার গুঞ্জন আসিতেছে। তখন দ্বার ঠেলিয়া দুজনে ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে কেবল পিলসুজের উপর তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা, তাহাতে দুইটি মাথা অত্যন্ত কাছাকাছি দেখা যাইতেছে।

সুহাস বলিল,—"বিদ্যুৎ, তোমার চোখে কি ঘুম নেই ?"

বিদ্যুৎ চকিতে বড়মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"ঐ সুহাস এল। বড়মা, এখুনি আমাকে নিয়ে যাবে।"

বিমলা বলিল,—"সুহাস, ও আজ আমার কাছে শোবে।"

সুহাস বলিল,—"শুলে ত কোন কথা ছিল না দিদি, কিন্তু বকিয়ে বকিয়ে যে তোমায় পাগল ক'রে দিলে। নে বিদ্যুৎ, ওঠ—কাল আবার গল্প শুনিস।"

বিদ্যুৎ কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিল,—"বড়মা—"

বিমলা বিদ্যুৎকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"না, আজ ও আমার কাছেই থাক। তুই যা সুহাস, গল্প শেষ না হ'লে ছেলে ঘুমুবে না।"

"না, আজ একাদশী—কিছুতেই আমি তোমাকে বকতে দেব না। আর এগারটা বাজতে চল্ল, ঘুমও কি ওর চোখে আসে না ? বিদ্যুৎ, আয় শীগ্‌গির।"

বিদ্যুৎ আরও জোরে বড়মা'র গলা জড়াইয়া ধরিল। বিমলা বলিল,—"বড় জ্বালাতন করিস তুই, সুহাস। গল্প শেষ না হ'লে যাবে কি ক'রে শুনি ? তোরা শুগে যা না, বাপু!"

তক্তপোষের পাশে বসিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ গল্পটা হচ্ছে ? সেই যেটাতে খোকাবাবু কালো ঘোড়ায় চ'ড়ে বাঘ শিকার করতে যাবেন—সেইটে ?"

বিমলার বুকের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া বিদ্যুৎ বলিল,—"না, সেটা নয়, তোমার বিয়ের গল্প।"

কিশোর আঁৎকাইয়া উঠিল,—"অ্যাঁ—সে আবার কি !" সুহাসও তক্তপোষের অন্যদিকে বসিয়া সকৌতুকে বলিল,—তবে আমিও একটু শুনি।" আর ভয় নাই দেখিয়া বিদ্যুৎ সোৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"আচ্ছা বড়মা, এই বাড়ীটা তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছ না ?"

বিমলা বলিল,—"হ্যাঁ—তার পর শোন্—"

"আর বাবার ঘরে যে ঘড়ীটা আছে—টিং টিং ক'রে বাজে—সেটাও আমার—না ?"

"হ্যাঁ— সেটাও তোর।"

"আর সুহাসের ঘরে যে গ্রামোফোন্—সেটাও আমার?"

"সেটাও তোর—সব তোর।"

বিদ্যুৎ নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া বলিল,—"এবার বল।"

বিমলা তাহার ক্ষুদ্র দেহটি কাছে টানিয়া লইয়া আরম্ভ করিল,—"তার পর, বুঝেছিস বিদ্যুৎ, আমি আর সুহাস তোর বাবাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিলুম। তোর বাবার গায়ে রক্ত, মাথায় রক্ত,—তাই দেখে তোর মা খুব কাঁদতে লাগল, আমিও খুব কাঁদতে লাগলুম। তার পর তোর মা'র বিছানায় নিয়ে গিয়ে তোর বাবাকে শুইয়ে দিতেই তোর বাবা ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্ত রাত সে ঘুম ভাঙ্গল না,—আর তোর মা সমস্ত রাত একলাটি জেগে ব'সে রইল—"

লুকাইয়া চোখের জল মুছিয়া সুহাস আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির মাথার কাছে দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ পরে কিশোর তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে সজলনয়নে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নিজের মাথাটা তাহার বুকের উপর রাখিল, একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"উঃ, কি দিনই গিয়েছে—ভাবলে যেন জ্ঞান থাকে না।"

কিশোর দুই বাহু দিয়া সজোরে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তার পর দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নীরবে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এল)।

সম্পূর্ণ

প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ (১)
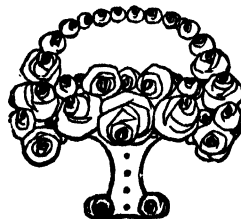
দ্যো (স্বর্গ) ভূ (পৃথিবী) প্রভৃতির আশ্রয় ব্রহ্মই, কারণ, স্বশব্দের প্রয়োগ আছে।

মুণ্ডক উপনিষদে আছে :—

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানং
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ॥

"যাহার মধ্যে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, এবং সর্ব্ব প্রাণের সহিত মন আশ্রিত, একমাত্র তাহাকেই জান, তাহাই আত্মা, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, উহা অমৃতের সেতু।" এখানে যাহাকে স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আধার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মই, "স্বশব্দাৎ" কারণ, স্ব বা আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে। সেতুর অপর পার আছে, কিন্তু ব্রহ্মের অপর পার নাই (ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই), এ জন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, প্রকৃতি বা বায়ুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রকৃতি এবং বায়ুকেও স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আশ্রয় বলা যায়, কারণ, প্রকৃতি বা বায়ু হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি বা বায়ুকে আত্মা শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। এ জন্য এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। বিধারক (যাহা ধারণ করে) অর্থে-ই সেতু শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, পারবান্ অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই।

রামানুজ বলেন, "স্বশব্দের" অর্থ—যে শব্দ পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয়, আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না, এরূপ শব্দ। ইনি অমৃতের সেতু,—এই কথা পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। ব্রহ্মকে জানিলেই মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই, ইহা শ্রুতিতে বহু স্থানে বলা হইয়াছে।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ (২)

মুক্ত পুরুষের দ্বারা উপসৃপ্য বা প্রাপ্য এইরূপ ব্যপদেশ আছে (উল্লেখ আছে)।

মুণ্ডক উপনিষদের যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে এই শ্লোক আছে,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

"সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টকে দেখিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয় ও সকল সংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" পুনশ্চ বলা হইয়াছে,—

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

"জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।"

উপনিষদে অন্যত্র ইহা সুপ্রসিদ্ধ যে, মুক্তিলাভ করিলে জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। অতএব এখানে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যে পাপ ও পুণ্যকার্য্য করে, তাহার ফলে সে নামরূপযুক্ত হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ইহারই নাম সংসার। যাঁহারা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন, তাঁহারা পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নাম ও রূপ হইতে মুক্ত হন।

মধ্ব বলেন, শ্রুতি যখন বলিয়াছেন—"অমৃতস্য এষ সেতুঃ", তখন বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষ ইঁহাকে প্রাপ্ত হন। অতএব ইনি ব্রহ্ম।

নানুমানম্ অতচ্ছব্দাৎ (৩)

অনুমান (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধান) ন (এখানে উদ্দিষ্ট নহে) অতচ্ছব্দাৎ (প্রধানবাচক শব্দ এখানে নাই বলিয়া)।

এই বাক্যে কোনও অচেতন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয় নাই, কারণ, এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্"—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ। অচেতন বস্তু সম্বন্ধে ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না।

মধ্ব বলেন, এখানে "অনুমান" অর্থে আগম। আগমে

যে রুদ্রের কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইতে পারে না। কারণ, রুদ্রবাচক 'ভস্মধর' 'উগ্র' প্রভৃতি শব্দের এখানে উল্লেখ নাই।

প্রাণভৃচ্চ (৪)

প্রাণভৃৎ অর্থাৎ জীবও এখানে উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ, সেরূপ শব্দের প্রয়োগ নাই।

ভেদব্যপদেশাৎ (৫)

এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব একং জানথ আত্মানং"এখানে যিনি জ্ঞাতা, তিনি জীব ; যিনি জ্ঞেয়, তিনি ব্রহ্ম। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই ভেদের উল্লেখ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে জ্ঞাতা জীবের কথা হইতেছে না, জ্ঞেয় ব্রহ্মের কথা হইতেছে।

রামানুজ ও মধ্ব এখানে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে ভেদবাচক অন্য শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

"দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী—জীব ও ব্রহ্ম বাস করে। জীব প্রকৃতির মোহে অভিভূত হইয়া শোক করে,যখন প্রীতি সম্পন্ন এবং প্রভু অন্য পক্ষী (ব্রহ্মকে) এবং উহার মহিমা দেখিতে পায়, তখন শোক ত্যাগ করে।"

প্রকরণাৎ (৬)

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে আছে—"কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সকল জ্ঞাত হওয়া যায় ? এই প্রকরণ হইতে বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে। কারণ, ব্রহ্মকে জানিলেই সকল জ্ঞাত হওয়া যায়, জীবকে জানিলে সকল জ্ঞাত হওয়া যায় না।

স্থিত্যদনাভ্যাং চ (৭)

এই শ্রুতিবাক্যের পরে আছে,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি॥

"দেহরূপ একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষী বাস করে,—জীব ও ব্রহ্ম। তন্মধ্যে একটি পক্ষী 'জীব' স্বাদুফল (কর্ম্মফল) ভোজন করে। অন্য পক্ষী 'ব্রহ্ম' ভোজন করে না,—কেবল চাহিয়া দেখে।"

এখানে একটি পক্ষীর 'স্থিতি' (সাক্ষীরূপে অবস্থান) এবং অন্য পক্ষীর "অদন" (ভোজন বা কর্ম্মফলভোগের) উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। প্রথম সূত্রে যে শ্রুতিবাক্যের বিচার হইতেছে, তাহাতে যখন ব্রহ্মের কথা হইতেছে বলিয়া বুঝিতে পারা গেল, তখন সেখানে জীবের কথা হয় নাই, ইহাও বুঝিতে হইবে। কারণ, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন।

রামানুজ বলেন যে, যিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন, তিনি কখনও সর্ব্বজ্ঞ এবং অমৃতের সেতু হইতে পারেন না। অতএব যিনি সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন (ব্রহ্ম), তিনিই অমৃতের সেতু এবং "দ্যুভ্বাদ্যায়তন"।

ভূমা সম্প্রসাদাধ্যুপদেশাৎ (৮)

"ভূমা" শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। কারণ, "সম্প্রসাদাৎ অধি" সম্প্রসাদের পরে 'উপদেশাৎ' ভূমার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ এবং সনৎকুমারের আখ্যায়িকাতে উক্ত হইয়াছে যে, নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ভগবন্, আমাকে অধ্যয়ন করান।" সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ ?" নারদ বলিলেন, তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, * তর্ক, গণিত প্রভৃতি অনেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মবিদ্ হইতে পারেন নাই। সনৎকুমার বলিলেন, "তুমি যে সকল বিদ্যার উল্লেখ করিলে, সকলই 'নামের' অন্তর্গত।" নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাম অপেক্ষা 'ভূয়ঃ' অর্থাৎ অধিক কিছু আছে ?" সনৎকুমার বলিলেন, "নাম অপেক্ষা বাক্ অধিক।" তাহার পর নারদের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার বলিতে লাগিলেন—বাক্ অপেক্ষা মন অধিক, মন অপেক্ষা সঙ্কল্প, তদপেক্ষা চিত্ত। এইরূপে ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ্, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা ও প্রাণকে ক্রমশঃ অধিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন, এবং বলিলেন, প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা। কারণ, যতক্ষণ প্রাণ থাকে,ততক্ষণ তাঁহাকে উচ্চবাক্য বলিলেও লোকে বলে,

* ইতিহাস (অর্থাৎ রামায়ণ এবং মহাভারত) এবং পুরাণ যে ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতেও প্রাচীন, ইহা এই স্থানে উহাদের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

"তুমি পিতৃঘাতী", কিন্তু প্রাণ না থাকিলে পিতার দেহকে দগ্ধ করিলেও কেহ বলে না "তুমি পিতৃঘাতী।" যিনি এই তত্ত্ব জানেন, কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কি অতিবাদী?" (অর্থাৎ তুমি যাহাকে উপাসনা কর, তাহা কি অপরের উপাসিত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?) তাহা হইলে তাঁহার বলা উচিত—"হ্যাঁ, আমি অতিবাদী।" তাহার পর সনৎকুমার বলিয়াছেন, "কিন্তু তিনিই যথার্থ অতিবাদী —যিনি সত্যই অতিবাদী।" নারদ বলিলেন, "আমি সত্যই অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।" সনৎকুমার বলিলেন, "বিশেষ-রূপে জানিলে তবে সত্য বলা যায়, চিন্তা না করিলে জানা যায় না; শ্রদ্ধা না করিলে চিন্তা হয় না, নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না, চেষ্টা না করিলে নিষ্ঠা হয় না, সুখ না পাইলে লোকে চেষ্টা করে না, ভূমা (অনন্ততেই) সুখ, অল্পে সুখ নাই।

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তৎ অল্পং, যো বৈ ভূমা তৎ অমৃতং, অথ যৎ অল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্।

"যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য বস্তু দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায়, তাহা অল্প। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত। যাহা অল্প, তাহা মরণশীল।"

বর্ত্তমান সূত্রে বিচার করা হইতেছে,—

এই ভূমা কি প্রাণ, না পরমাত্মা? নাম অপেক্ষা বাক্য অধিক, বাক্য অপেক্ষা মন অধিক, এইভাবে উল্লেখ করিয়া শেষে বলিলেন, মন অপেক্ষা প্রাণ অধিক, তাহার পর প্রাণ অপেক্ষা অধিক বলিয়া আর কোনও বস্তুর উল্লেখ হয় নাই, এ জন্য আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণকেই ভূমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। ভূমা শব্দ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। কারণ, সম্প্রসাদ অর্থাৎ প্রাণের পরে তাহার উল্লেখ আছে। "সম্প্রসাদ" শব্দের অর্থ সুষুপ্তির অবস্থা, কারণ, জীব সুষুপ্তির সময় "সম্যক্ প্রসীদতি" অর্থাৎ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে; এই সুষুপ্তির সময় সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার লোপ হয়, কেবল প্রাণ জাগিয়া থাকে, এজন্য সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তির দ্বারা কেবল প্রাণকে লক্ষ্য করা হইতেছে। যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, ভূমা প্রাণ অপেক্ষা অধিক, তথাপি শ্রুতির অর্থ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাণ ব্যতীত অপর বস্তুর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভূমা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা অমৃত, ইহার অপর কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ" নিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইহাকে জানিলে সংসার অতিক্রম করা যায়। এই সকল কথা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 'ভূমা' প্রাণ হইতে পারে না, ইহা পরমাত্মা।

রামানুজ বলেন যে, এই প্রসঙ্গে উপনিষদে যে প্রাণ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ অচেতন প্রাণবায়ু নহে, কিন্তু চেতন জীব। সুতরাং এখানে সংশয় এই যে, ভূমা শব্দ জীবকে বুঝাইতেছে, অথবা ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। এই সূত্রের সম্প্রসাদ শব্দের অর্থও জীব। প্রাণ অপেক্ষা অধিক কিছু আছে কি, এরূপ প্রশ্ন করা হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, প্রাণের পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্যগুলি অচেতন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন বস্তুর উল্লেখ হইতেছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নারদের মনে হইতেছিল যে, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক কোনও বস্তু আছে। কিন্তু চেতন প্রাণ (অর্থাৎ জীবের) সন্ধান পাইয়া তদপেক্ষা অধিক কোনও বস্তু থাকিতে পারে, এরূপ নারদের মনে হইল না। এজন্য নারদ আর এরূপ প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু সনৎকুমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নারদকে বলিলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু 'ভূমা'। এই ভূমাই ব্রহ্ম।

রামানুজ আরও বলিয়াছেন যে, জীব কর্ম্মফলে দুঃখ ভোগ করে, এজন্য জগতে দুঃখ দেখিতে পায়, যদি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে জগতে দুঃখ দেখিবে না, দেখিবে জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি এবং সুখময়। পিত্তাধিক্য হইলে দুধ বিস্বাদ লাগে; পিত্ত কমিয়া গেলে দুধ মিষ্ট বোধ হয়।

মধ্ব সূত্রটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—ভূমা শব্দ বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে, কারণ, এই ভূমাকে পরিপূর্ণ সুখস্বরূপ বলিয়া উলেখ করা হইয়াছে ("সম্প্রসাদাৎ") এবং সকলের শেষে ভূমার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ("অধি উপদেশাৎ")

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ (৯)

ভূমার যে সকল ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাহা পরমাত্মারই থাকিতে পারে, আর কাহারও থাকিতে পারে না। যথা:—সর্ব্বাত্মভাব (সকল বস্তুকে আত্মা বলিয়া বোধ), নিরতিশয় সুখ, সত্যত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠত্ব, সর্বগতত্ব ইত্যাদি

অক্ষরম্ অম্বরান্তধৃতেঃ (১০)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়,—

"কস্মিন্নু খলু আকাশ ওতপ্রোতশ্চ ?" স হোবাচ "এতদ্ বৈ তৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদাস্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতমস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমো অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুকম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্" ইত্যাদি।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আকাশ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "ইহাই অক্ষর, ব্রাহ্মণরা বলেন, ইহা স্থূল নহে, ক্ষুদ্র নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে, তরল নহে, ছায়াযুক্ত নহে, অন্ধকারময় নহে, আকাশ নহে, আসক্ত নহে, রসযুক্ত নহে, গন্ধযুক্ত নহে, চক্ষুষ্মান্ নহে, কর্ণহীন, বাক্‌হীন" ইত্যাদি।

এখানে অক্ষর শব্দ বর্ণকে বুঝাইতেছে না, পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, "অম্বরান্তধৃতেঃ" কারণ, আকাশ পর্য্যন্ত সকল বস্তু ধারণ করে। পূর্ব্বের প্রশ্নে গার্গী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এই নিখিল জগৎ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—"আকাশে"। তাহার পর গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই আকাশ কিসে প্রতিষ্ঠিত ?" উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"অক্ষরে"। অতএব আকাশ পর্য্যন্ত জগতের সমুদয় বস্তু অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অক্ষর শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অক্ষর শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে না, ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। তিনি বলেন যে, "কস্মিন্ নু খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" এই বাক্যে আকাশ শব্দ প্রধানকে বুঝাইতেছে, কারণ, ইহার পূর্ব্বেই গার্গী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইতি আচক্ষতে কস্মিংস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ।

"স্বর্গের ঊর্দ্ধে পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা আছে,—যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের স্বরূপ,—তাহা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?"

ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—"আকাশে।" এখানে সকল বিকারের আশ্রয় কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, সুতরাং এখানে সাধারণ আকাশ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ, সাধারণ আকাশ বিকারশীল বস্তু। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে আকাশ শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে। সূত্রে সেই প্রকৃতিকেই অম্বরান্ত বলা হইয়াছে—অম্বর অর্থাৎ আকাশের অন্ত বা পারভূত যাহা।

সা চ প্রশাসনাৎ (১১)

সা (অক্ষর কর্তৃক অম্বরান্ত ধৃতি) প্রশাসনাৎ (প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা)।

শঙ্কর বলেন যে, এই সূত্রের দ্বারা ইহা স্থাপিত হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত অক্ষর শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের পরে উক্ত হইয়াছে, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রামসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"—এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনহেতু সূর্য্য এবং চন্দ্র ধৃত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি বা প্রধান অচেতন, কাহাকেও শাসন করিতে পারে না। সুতরাং অক্ষর শব্দ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রের দ্বারা ইহা স্থাপিত হইতেছে যে, অক্ষর শব্দ জীবাত্মাকে বুঝাইতে পারে না। অক্ষর প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ ধারণ করিয়া আছেন, জীবাত্মার দ্বারা এরূপ প্রকৃষ্ট শাসন সম্ভব হয় না।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ (১২)

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ভাব নিবারণ করা হইয়াছে, অতএব (অক্ষর শব্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় নাই)।

এই অক্ষর সম্বন্ধে পরে বলা হইয়াছে, "তৎ বা এতৎ গার্গি অক্ষরম্ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ"—হে গার্গি, এই অক্ষর কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় না, অথচ দর্শন করে, কাহারও দ্বারা শ্রুত হয় না, অথচ শ্রবণ করে ইত্যাদি। কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় না, কাহারও দ্বারা শ্রুত হয় না, এই সকল গুণ প্রকৃতি বা প্রধানের থাকিতে পারে, কিন্তু দর্শন করে, শ্রবণ করে, এ সকল গুণ অচেতন প্রধানের থাকিতে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি করিতে পারে না। পুনশ্চ শ্রুতি বলিয়াছেন "নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি শ্রোতৃ" ইত্যাদি—এই অক্ষর ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা, বা শ্রোতা নাই, জীবাত্মা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

রামানুজ বলেন, "নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইহার অর্থ এই যে, অক্ষর যেরূপ জগতের দ্রষ্টা, সেইরূপ অক্ষরের দ্রষ্টা অক্ষর অপেক্ষা উত্তম তত্ত্ব আর কিছু নাই।

মধ্ব বলেন, "অন্য ভাব" অর্থাৎ অন্য বস্তু সকলের স্বভাব, (স্থূল, অণু প্রভৃতি) ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিবারণ করা হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তিনি "অস্থূলম্ অনণু" ইত্যাদি।

ঈক্ষতিকর্ম ব্যপদেশাৎ সঃ　　(১৩)

ঈক্ষতির কর্ম্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, এজন্য তিনি ব্রহ্ম। প্রশ্নোপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়:—"এতৎ বৈ সত্যকাম পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম যৎ ওঙ্কারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন এব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি"—অর্থাৎ "হে সত্যকাম, ওঙ্কারই পর এবং অপর ব্রহ্ম, ওঙ্কারধ্যানরূপ সাধনার দ্বারাই একটিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ইহার পরে আছে,—"যঃ পুনঃ এতম্ ত্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ সঃ পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্ত স সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরম্ পুরিশয়ম্ পুরুষম্ ঈক্ষতে,"—অর্থাৎ "যে ওম্ এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অক্ষর দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করে, সে সূর্য্যের সহিত এক হইয়া যায়। সর্প যেরূপ খোলস হইতে মুক্ত হয়, সেও সেইরূপ পাপ হইতে মুক্ত হয়। সামগণ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। সে উৎকৃষ্ট জীবঘন হইতে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে দর্শন করে।" এখানে যে পরমপুরুষের ধ্যানের কথা বলা হইল, তাহা ব্রহ্ম। কারণ, বাক্যের শেষে তাহাকে ঈক্ষতি ধাতুর কর্ম্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবঘন শব্দের অর্থ পরমাত্মার জীবরূপ মূর্ত্তি, এই জীবঘনকে পরম শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কারণ, অচেতন জগৎ অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মাকে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মার উপাসনা হইলে মোক্ষলাভ হইবে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ সসীম ফল লাভ হইবে কেন? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কাররূপ আলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করা হইলে সসীম ফলই লাভ হইবে, অসীম ফললাভ হইবে না।

কিন্তু রামানুজ বলেন যে, এই ব্রহ্মলোক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার আবাসস্থান নহে। ইহা পরব্রহ্মের আবাসস্থান। সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত ব্যক্তির পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই যুক্তিযুক্ত। ঈক্ষতি ক্রিয়ার কর্ম্ম পরব্রহ্মই। 'ব্যপদেশাৎ' উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া। পরব্রহ্মের গুণ অজরত্ব, অমরত্ব প্রভৃতির এখানে উল্লেখ আছে।

মধ্বাচার্য্য বলেন যে, এখানে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইতেছে:—'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ সদ্‌বস্তু মাত্র ছিল, তাহা আলোচনা করিল, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। এই সৎ বস্তু ব্রহ্মই। কারণ, তাহা ঈক্ষণ ক্রিয়া করিয়াছিল। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ ঈক্ষণ করে না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টৃ' (ইনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা নাই)

দহর উত্তরেভ্যঃ　　(১৪)

ছান্দোগ্যে এই বাক্য পাওয়া যায়,—অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং (বেশ্ম), দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।

"এই যে ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পদ্মরূপ গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ, ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করা উচিত, তাহা জানা উচিত।" এই দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ কি? ইহাই ব্রহ্ম। 'উত্তরেভ্যঃ' ইহার পরে শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী বাক্যে আছে,—বাহিরের আকাশ যেমন বড়, ভিতরের আকাশও এইরূপ বড়, এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ইহাতে অবস্থিত। এই দহর আকাশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে বটে, "তস্মিন্ যদন্ত তদন্বেষ্টব্যং" (ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহাকে অন্বেষণ করা উচিত) ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পরমাত্মাতে সত্যকামত্ব, সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ আছে, সেই সকল গুণ সমেত দহর আকাশকে জানিতে হইবে।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'দহর আকাশঃ' ইহার অর্থ ব্রহ্ম, তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ (তাহার মধ্যে যাহা আছে) ইহার অর্থ ব্রহ্মের অনন্তগুণাবলি, 'তৎ অন্বেষ্টব্যং' (তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে) এখানে "তৎ" শব্দে ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণাবলি উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

নারী-প্রগতি-বাহিনী

গল্প)

বগলার সম্বন্ধে গ্রামের প্রায় প্রত্যেকেরই মনে একটা উঁচু রকমের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার মত মেধাবী সচ্চরিত্র ছেলে যে হেলায়-শ্রদ্ধায় বি-এ পাশ করিয়া কেষ্ট-বিষ্টুর এক জন হইবে—বাগড়া গ্রামখানি উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, এ বিষয়ে কাহারও মনে সংশয়ের অবকাশমাত্র ছিল না। বগলার মা মহামায়া পাড়া-প্রতিবাসীদের নিকট জাঁক করিয়া কহিতেন যে, বগলাকে তিনি 'এঞ্জিন' না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহাদের দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয় এঞ্জিনীয়ার হইয়া লক্ষপতি হইয়াছিলেন, রায় বাহাদুর খেতাব পাইয়াছিলেন; সেই জন্যই একমাত্র সন্তান বগলাকেও 'এঞ্জিন' করিয়া তুলিবার জন্য বৃদ্ধার আগ্রহের অন্ত ছিল না।

কিন্তু ছাত্রবৃত্তি, ম্যাট্রিক ও আই, এ পরীক্ষার দরজাগুলি অবাধে অতিক্রম করিয়া, বগলা যখন বি-এ পরীক্ষার দ্বারদেশে হোঁচোট খাইয়া পড়িল, তখন তাহার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতগণের সকল আশাই ভাঙ্গিয়া গেল। বগলার এই অকৃতকার্যতা প্রত্যেকেরই নিকট যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষণীয় ব্যাপার। তাহার 'কমবিনেসন' লইয়া, অদৃষ্টকে উদ্দেশ করিয়া, পরীক্ষকদের ত্রুটি ধরিয়া—আলোচনার অন্ত নাই! গেজেটে নিজের নামের সন্ধান না পাইয়া বগলার যত না দুঃখ, ততোধিক মনঃকষ্ট তাহার—পাতায় পাতায় ছাপার অক্ষরে ছাত্রীদের নামের বাহুল্যতায়! উচ্চশিক্ষার পথে ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলিয়া মেয়েদের এই বিপরীত অভিযানকে বরাবরই সে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, অতি সন্তর্পণেই তাহাকে এই শ্রেণীর প্রগতিবাদিনীগণের পাশ কাটাইতে হইয়াছে, নানাসূত্রে ইঁহাদের সহিত মিশিবার—পরিচিত হইবার নানা সুযোগ ঘটা সত্ত্বেও সে তাহা সসংকোচে এড়াইয়া গিয়াছে;—কিন্তু গেজেটের পাতায় তাহার একান্ত উপেক্ষিতা সেই তরুণীদের নামগুলি যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দীপ্ত হইয়া সদর্পে ব্যক্ত করিতেছিল—আমরাও আজ গ্রাজুয়েট, আমাদের স্থান তোমার অনেক উপরে, তখন মর্ম্মাহত বগলার মুখ হইতে আর্ত্তস্বর ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ধরণী, দ্বিধা হও!

সকলেই ভাবিয়াছিল, বগলা আবার পড়িবে এবং এবার পরীক্ষা দিয়া সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। বগলাকে কিন্তু এ বিষয়ে কিছুমাত্র উদ্যোগী দেখা গেল না। মেয়েদের স্পর্দ্ধায় তাহার মন এমনই বিষাইয়া উঠিয়াছিল যে, পুনরায় কলেজে নাম লিখাইবার স্পৃহা তাহার একবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাইবার যে প্রবচন শুনা যাইত, বগলা শেষে তাহাই অবলম্বন করিয়া বসিল! অর্থাৎ—প্রগতিবাদিনীদের উপর রাগ করিয়া সে চিরদিনের মত কলেজের সংস্রব কাটাইয়া এমন পথে পাড়ি দিল, যেখানে এই স্পর্দ্ধিতাদের অবাধপ্রবেশের কোনও সম্ভাবনাই নাই;—বরং সে দিকে দৃষ্টি পড়িলেই তাহার নাসিকা সঙ্কুচিত করে উপেক্ষায়!

বগলার এক বন্ধু মিলিয়াছিল,—তাহার নাম বরদা। ফোর্থ-ইয়ারেই সে কলেজ ছাড়িয়া দেয় এবং রেল অফিসে একটা ভাল কায পাইয়া তাহাতেই বসিয়া পড়ে। তাহার বাবা ই, আই, রেলওয়ে অফিসের এক জন পদস্থ অফিসার। সুতরাং বন্ধুত্বের দাবিতে পরমবন্ধুর পিতাকে ধরিয়া পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনার একটা কায বাগাইয়া ফেলা বগলার পক্ষেও কঠিন হয় নাই।

বগলার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে যাঁহারা উচ্চ ধারণা মনে পোষণ করিতেন, লেখাপড়ায় ইস্তফা দেওয়ায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু যখন শোনা গেল, বগলা সঙ্গে সঙ্গেই রেল অফিসে চাকরী বাগাইয়াছে, তখন তাঁহারাই বলিলেন,—তা মন্দ কি! এ বাজারে পঁয়তাল্লিশ টাকার চাকরী পাওয়া কি সোজা কথা!

* * * *

মাথার উপর মুরুব্বী থাকিলে উন্নতির বিলম্ব হয় না। বগলারও উন্নতি সব দিকেই জাঁকিয়া উঠিল। তিনটি বৎসরের মধ্যেই বেতন বাড়িয়া আশী টাকা হইল। মনের সঙ্কীর্ণতাও সেই অনুপাতে বাড়িতে লাগিল। মেয়েদের হাতে বই দেখিলে সে যেন ক্ষেপিয়া উঠে! পাড়ার কোনও পরিচিতা মেয়েও ঘোমটা খুলিয়া যদি তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, বগলা থতমত হইয়া পলাইবার পথ খুঁজিতে থাকে। ডেলি প্যাসেঞ্জারী করিয়া সে আফিসের চাকরী বজায় রাখে, দুটি বেলা তাহাকে লোক্যাল ট্রেণে যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু পুরুষের কামরায় যদি কোনও মেয়ে কোনও দিন উঠে, তাহা হইলে বগলার রক্ষণশীলতার প্রাচুর্য্য দেখে কে! হয় মেয়েটিকে মেয়ে কামরায় পাঠাইবে, না হয়—নিজে সে কামরা হইতে নামিয়া যাইবে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, মেয়েরা বই লইয়া বেশ সপ্রতিভভাবে সহরের ফুটপাতের উপর দিয়া হাঁটিয়া স্কুলে চলিয়াছে; কিন্তু যদি কোনও দিন ইহারা এইভাবে বগলার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! বগলা এমনভাবে তাহাদের এড়াইবার প্রয়াস পায় যেন সে এক পাল হিংস্র ভল্লুকের দৃষ্টির অন্তরালে ছুটিয়াছে! রাস্তার লোক তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকায়—বগলার মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়!

বিলাসিতার সহিত বগলার কিছুমাত্র সম্বন্ধও নাই। চিরুণীর সংস্পর্শে না আসায় মাথার চুলগুলি তাহার সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা হইয়া বিভীষিকা দেখায়; সাবান এসেন্স সে স্পর্শও করে না। বেশভূষাও তাহার এত সাধারণ যে, অফিসের অ্যাপ্রেন্টিস্‌রাও তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল জামা-কাপড় পরিয়া আসে,—বগলা ত আশী টাকা বেতনের কেরাণী! বাজে খরচের তোয়াক্কাও সে বড় একটা রাখে না; সকাল-সন্ধ্যায় চায়ের অভ্যাস নাই, পান-বিড়ি স্পর্শও করে না, ট্রাম কোম্পানীকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সে আফিস করে। ট্রেণের মাসকাবারী টিকিট না কিনিয়া উপায় নাই,—কেন না, দেশ হইতে কলিকাতার দূরত্ব সতেরো মাইল; মাসিক টিকিটের ভাড়া পৌনে পাঁচ টাকা! বগলার মতে ইহাও অপব্যয়; কিন্তু এই ব্যয়সঙ্কোচ করিবার দ্বিতীয় পন্থাও নাই। সুতরাং শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া ট্রাম-কোম্পানীকে পুনরায় সেলামী দিবে, সে পাত্রই নয় আমাদের

বগলা ; দুটি বেলা ছাড়া মাথায় ও বগলে কাগজপত্র করিয়া বগলা শিয়ালদহ হইতে ফেয়ার্‌লিপ্লেস যাতায়াত করে।

এই সমস্ত কারণে বয়োবৃদ্ধ সমাজে তাহার প্রচুর প্রশংসা ; তাঁহাদের ভাষায় বগলা সত্যযুগের ছেলে। পক্ষান্তরে, আফিস অঞ্চলে সমবয়সী কেরাণীমহলে তাহার নাম শুকদেব গোঁসাই। বগলার কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই ; প্রশংসা শুনিয়া গায়ে মাখে না, নিন্দাবাদেও দৃক্‌পাত করে না।

সংসারে মা ছাড়া বগলার আর আপনার কেহ নাই। মা ও ছেলে এই দুই জন লইয়া তাহাদের সংসার। সাংসারিক অবস্থা তাহাদের খুব স্বচ্ছল। যে গ্রামে তাহাদের বাস, সেই গ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী আরও অনেকগুলি গ্রাম লইয়া যে জমীদারী মহাল, তাহার নায়েব ছিলেন বগলার পিতা। সুতরাং ছেলের জন্য রীতিমত গুছাইয়া রাখিবার কোনও ত্রুটি তাঁহার দিক হইতে ঘটে নাই। সদর-খিড়কী পুকুর-বাগান সমেত বিস্তীর্ণ ভদ্রাসন, প্রাচীরবেষ্টিত পাকা বাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ, ধানের বড় বড় মরাই, ধানজমী প্রভৃতি এই পরিবারের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। ইহা ভিন্ন জমীদার সরকারের অধীনে যে ভূসম্পত্তি প্রজাদের মধ্যে বিলিবন্দোবস্ত করা আছে, তাহার বার্ষিক মুনফা হাজার টাকারও উপর।

ইহা ভিন্ন চাকরীর বাঁধা আয় ত আছেই, এবং যে কাযে সে বাহাল হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ উন্নতি অনিবার্য্য। সকল দিক দিয়াই যাহার অবস্থা এমন স্বচ্ছল, কর্ম্মক্ষেত্রে যে এ ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, সে কিন্তু এ পর্য্যন্ত অবিবাহিত। তাহার সমবয়স্কগণ যে সময়ে পিতৃত্বের পর্য্যায়ে উঠিয়াছে, সে তখন কন্যাদায়গ্রস্তদের প্রবল আক্রমণ হইতে তাহার অনূঢ়ত্বকে সন্তর্পণে রক্ষা করিতে একান্ত ব্যস্ত। বগলার দৃঢ় পণ—সে আচার্য্য রায়ের আদর্শ গ্রহণ করিবে, চির-ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিবে। মায়ের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি, পাছে মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় সে শঙ্করাচার্য্যের মত পূর্ব্ব হইতেই মায়ের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ; তাহার আবদার ছিল, বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মা কোনও অনুরোধ তাহাকে করিবেন না।

বিবাহের উপর বগলার এই গভীর বিরাগের মূলে ছিল নারী-প্রগতির প্রতি তাহার বিষম বিদ্বেষ। ইহাই ক্রমে 'নারী-ফোবিয়ায়' পরিণত হইয়া তাহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলে।

* * * * *

মহামায়ার সংসারে অভাব নাই, দুঃখের বালাই নাই ; মনে কিন্তু সুখ নাই, আনন্দ নাই। পল্লীবধূরা যখন দলবদ্ধ হইয়া তাঁহারই গৃহের কানাচ দিয়া পুকুরের দিকে যায়,—কাহারও কক্ষে কলসী, কাহারও কোলে সন্তান,—তাঁহার নিষ্পলক দৃষ্টি তাহাদের দিকে পড়িয়া থাকে। তাঁহার যদি বধূ থাকিত, সেও আজ উহাদেরই মত কলহাস্যে কলসী লইয়া পুকুরে ছুটিত ;—ফুটন্ত ফুলের মত শিশুর একখানি সুন্দর মুখ তাঁহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিত! কল্পনার আবেশে দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া যাইত, তিনি শিহরিয়া উঠিয়া শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিতেন।

মনের দুঃখ তিনি মনেই চাপিয়া রাখিতেন, নিজের সাধটুকু প্রকাশ করিয়া পুত্রকে ব্যথা দিতে চাহিতেন না। শুধু দুটি বেলা আহ্নিকের সময় ব্যথাহারীর উদ্দেশে মনের দুঃখ-ব্যথা সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়া জানাইতেন,—প্রভু! এ সাধটুকু কি আমার পূর্ণ হবে না? ছেলেকে সত্যই কি সংসারী দেখে যেতে পারব না?

বগলা মার ব্যথা বুঝিত, কিন্তু গায়ে মাখিতে চাহিত না; এই বলিয়া সে মনকে প্রবোধ দিত,—এ ব্যথা স্বপ্নের মত অমূলক, তাহাতে কোনও জ্বালা-যাতনা নাই, অশান্তির কোনও ছায়াটুকুও পড়ে না; কিন্তু ব্যথা দূর করিতে হইলে নূতন অশান্তিকেই ডাকিয়া আনা হইবে এবং তাহার ফলে এই শান্তিময় সংসারটির উপর এমন সব উপদ্রব আসিয়া পড়িবে, যাহার আবর্ত্তে মায়ের বুকখানি ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া যাইবে। বগলার মনোবৃত্তির উপর এরূপ কালিমা পড়িয়াছিল যে, অনাগতা বধূমাত্রকেই অনায়ত্তা সাব্যস্ত করিয়া সে এইভাবে কল্পনাজাল রচনা করিত।

অনেক সময় দেখা যায়, অতি বুদ্ধিমানের বুদ্ধিই এক সময় দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহারই বন্ধন পরিয়া সেই বুদ্ধিমানকে ধরা দিতে হয়। নারীপ্রগতির বিভীষিকায় ভীতিগ্রস্ত হইয়া বগলা তাহাদের সম্বন্ধে কল্পনার সাহায্যে যে সকল উদ্ভট জাল বয়ন করিতেছিল, এক দিন এক অপ্রত্যাশিত ক্ষণে তাহাকেই সেই জালে জড়াইয়া পড়িয়া হাস্যাস্পদ হইতে হইল। ইহাই ছিল তাহার ভবিতব্য।

* * * * *

হঠাৎ বগলার খেয়াল হইল, মায়ের অনেক দিনের একটা আকাঙ্ক্ষা সে পূর্ণ করিবে,—কাশীতে লইয়া গিয়া সোনার অন্নপূর্ণা ও অন্নকূট দেখাইয়া আনিবে। দেওয়ালীর ছুটীর উপর আরও সাত দিনের ছুটী সে মঞ্জুর করাইয়া লইল। চাকরীতে ঢুকিয়া অবধি সে কখনও রেলের পাশ লয় নাই বা নিজে পাশ কাটাইয়া অপরকে ব্যবহার করিবার সুযোগ দেয় নাই। এই প্রথম তাহার পাশ গ্রহণ এবং রেলে ভ্রমণ। ই আই রেল কোম্পানীর ট্রেণ এই প্রথম বগলাকে কক্ষে লইবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হইল।

যাহারা কোনও দিন বিদেশে যায় নাই, তাহাদের বিদেশ-যাত্রা এক বিচিত্র ব্যাপার! বগলা ও তাহার মা ভিন্ন সংসারভুক্ত ইহার আছে এক জন ভৃত্য, কতিপয় কৃষাণ ও এক পরিচারিকা। তাহাদের সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া এবং ঘর-বাড়ী রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিয়াও বগলা নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। মূল্যবান্ দলিল-দস্তাবেজ ও জরুরী কাগজপত্রগুলি অতি সাবধানতার নিদর্শনস্বরূপ সে সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। বন্ধুবর বরদা তাহার চামড়ার সুটকেসটি বগলাকে ধার দিয়াছিল। মায়ের প্রকাণ্ড তোরঙ্গটি জামা-কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রে ভরিয়া গেল। বন্ধুর সুটকেসটির মধ্যে বগলা দলিল-দস্তাবেজ ও নিজের যাবতীয় কাগজপত্র ভরিয়া লইল। বলা বাহুল্য, বিদেশযাত্রায় ইহাদের কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না, পাছে তাহাদের অনুপস্থিতিতে এগুলির কোনও প্রকার তছরূপ হয়, এই আশঙ্কায় অতিসাবধানী বগলা এগুলি সন্তর্পণে সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প করে। নিত্যব্যবহার্য্যের মধ্যে শুধু তাহার ডায়েরীগুলি সুটকেসের মধ্যে রাখিয়া দিল। পাঠ্যজীবন হইতে রোজনামচা পুস্তকাকারে লিখিয়া রাখা তাহার জীবনের একমাত্র সখ ছিল

এবং দীর্ঘ অবকাশ পাইলে আগাগোড়া সমস্ত ডায়েরী পড়িয়া সে চিত্তবিনোদন করিত। সুতরাং পুরাতন ডায়েরীগুলিও যথাযথভাবে সুটকেসে স্থান পাইয়াছিল।

হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া বগলা কুলীদের বখশিসের লোভ দেখাইয়া ইণ্টার ক্লাসের এমন একখানি ছোট কামরায় প্রবেশ করিল, একমাত্র যে কামরাখানিতে অল্প যাত্রীই উঠিয়াছিল এবং কোনও নারীর অস্তিত্বও সেখানে ছিল না। সামনাসামনি দুইখানি বেঞ্চির দুইটি প্রান্তদেশ মাতা পুত্র অধিকার করিয়া বসিলেন। লগেজপত্রের কতক বেঞ্চির নীচে, কতক বা বাঙ্কের উপরে রাখা হইল। বগলা মনে মনে বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইল,—এই গাড়ীখানিতে যেন কোনও শিক্ষিতা নারীর সমাগম না হয়।

ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় প্লাটফরম তোলপাড় করিয়া, ট্রেণের আরোহীদের চিত্তে শিহরণ তুলিয়া এক দল তরুণী ঝঞ্ঝার বেগে বগলাদের ছোট কামরাটির সম্মুখে আসিয়া থামিল। অগ্রবর্ত্তিনী তরুণীটি এই কামরায় কয়েকটিমাত্র প্রাণীর সমাবেশ দেখিয়া সোল্লাসে হাঁকিলেন,—এটা দেখছি মন্দের ভাল, Almost vacant.

আর একটি তরুণী সঙ্গে সঙ্গে কলকণ্ঠে কহিলেন,—Half a loaf is better than none! (নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো)—দ্বার খোলা যাক্ তা হ'লে।

বিশ্বনাথের উদ্দেশে বগলার প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া গেল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে দেখিল, সেই তরুণীর দল হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র কামরাটির ভিতর প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি ছোট বেডিং ও সুটকেস এবং বাহুমূলে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ব্যাজ আঁটা, তাহাতে লাল অক্ষরে লেখা—'নারীপ্রগতিবাহিনী।'

সহসা উত্তেজিত হইলে বিড়ালের সর্ব্বাঙ্গের লোমগুলি যেমন ফুলিয়া উঠে, এই অঘটন-সংঘটনে বগলার সর্ব্বাঙ্গও তেমনই কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মাথার খোঁচা খোঁচা চুলগুলো সূচের মত খাড়া হইয়া গেল; অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠকে মুক্ত করিয়া সে কহিল,—এটা পুরুষদের কামরা, অনুগ্রহ ক'রে আপনারা লেডীস্ কম্পার্টমেণ্টে যান—

ট্রেণের অজগরদেহ তখন দুলিয়া উঠিয়াছে এবং নারী-প্রগতিবাহিনীর সকলে কামরার ভিতরে উঠিয়া পড়িয়াছে। বগলার কথা শুনিয়া প্রত্যেকের সকৌতুক দৃষ্টি পড়িল তাহার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে এক জন ব্যঙ্গের সুরে উত্তর দিল,—Self preservation is the first law of nature, sir! আগে ত নিজেদের ব্যবস্থা করি, তার পরে লেডীস্ কম্পার্টমেণ্ট খোঁজা যাবে।

আর এক তরুণী বগলার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল,—এটাই এখন লেডীস্ কম্পার্টমেণ্ট হয়ে গেছে, কেন না, উপস্থিত এখানে লেডীরাই দলে ভারী!

সঙ্গে সঙ্গে বারো জন তরুণীর সমবেত উচ্চহাস্যে ট্রেণের ছোট কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল। বগলার মুখখানা কালো হইয়া গেল, কোন উত্তর না দিয়া সে ঘুরিয়া বসিয়া টাইমটেবলের পাতার উপর গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিল।

কামরার ব্যঙ্ক কয়খানির অধিকাংশই এই নারীপ্রগতিবাহিনীর সুটকেস ও বেডিংএ ভরিয়া গেল। দশ মিনিটের মধ্যেই তাহারা কামরার একাংশ অধিকার করিয়া বিছানা পাতিয়া এমন সুশৃঙ্খলে গুছাইয়া বসিল যে, বগলা নির্ব্বাক থাকিলেও মহামায়া মনে মনে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া সময় কাটান, সঙ্গে কোনও পুরুষ না লইয়া তাহারা এভাবে কোথায় চলিয়াছে প্রশ্ন করেন; কিন্তু বগলা তাঁহাকে চুপি চুপি কহিল,—ওদের দিকে ফিরেও চেয়ো না মা, ওরা কেউ ভাল মেয়ে নয়!

মা ভাবিলেন, তাহারা হয় ব্রহ্মজ্ঞানী, নয় খৃষ্টানী; নতুবা এমন হাল-চাল হইবে কেন? লজ্জাসরমের চিহ্নও নাই, কথায় কথায় হাসিয়া লুটোপুটি খায়, ছড় ছড় করিয়া ইংরাজী বলে! কিন্তু তাহাদের পরিষ্কার সাজসজ্জা, গোছগাছ করিবার কৌশল ও সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব তাঁহাকে অবাক করিয়া দেয়।

মহামায়া ছেলের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিলেও, তরুণীরা তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দিল না। এক জন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, মা?"

মার মুখে কথা নাই। মেয়েটির কথা যেন তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই, এমন ভাবে নীরব রহিলেন।

আবার প্রশ্ন হইল,—"এ গাড়ীতে আমরা উঠেছি ব'লে রাগ করেছেন, মা?"

আর এক জন কহিল,—"তা হ'লে বলুন, পরের ষ্টেসনে আমরা নেমে যাই!"

এবার মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যথার সুরে কহিলেন,—"সে কি মা, রাগ করব কেন? আর তোমরাই বা কেন নেমে যাবে, মা?"

"তবে কেন কথা কইছেন না আমাদের সঙ্গে?"

"কথা ত কইলুম, বাছা।"

"কোথায় যাচ্ছেন, মা? কাশীতে বুঝি?"

"হাঁ, বাছা; অন্নকূট দেখব ব'লে চলেছি, এখন তাঁর ইচ্ছা!"—হাত দুটি যুক্ত করিয়া ভক্তিভরে তিনি ললাটের উপর ধরিলেন। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন,—"তোমরাও বুঝি কাশী চলেছ?"

তরুণীরা জানাইল,—তাহারা উপস্থিত গিরিডি যাইবে। সেখানে এক দিন থাকিয়া অন্নকূটের সময় কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইবে।

মহামায়ার মনে আরও অনেক প্রশ্ন উঁকি দিতেছিল, কিন্তু সহসা ছেলের গম্ভীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি থতমত হইয়া চুপ করিলেন।

তরুণী-পক্ষ হইতে পুনরায় প্রশ্ন উঠিল,—"উনি বুঝি আপনার ছেলে?"

মা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"কি করেন?"

মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিলেন,—"রেল আফিসে চাকরী করেন।"

তরুণীদের চোখে চোখে অমনি যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! প্রশ্নকারিণী তরুণী হাসিয়া কহিল,—"ওঁর মাথার চুল দেখে আমরা কিন্তু ওঁকে ভুল বুঝেছিলুম।"

মহামায়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিলেন।

তরুণী একটু গম্ভীর হইয়া কহিল,—"ভেবেছিলুম, উনি প্রয়াগে চলেছেন মাথা মুড়ুতে,—এখন শুনছি, উনি রেল আফিসের কেরাণী!—সেই জন্যেই বুঝি আমাদের এই কম্পার্টমেণ্টে ঢুকতে দেখেই কোম্পানীর পক্ষ থেকে জুরিসডিকসন্ বাতলাচ্ছিলেন!"

পরক্ষণে আর এক তরুণী ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—"আপনার ছেলে কিন্তু খুব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী! এঁর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী!"

মহামায়ার মুখে কথা নাই, তিনি যেন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। ওদিকে তরুণীদের সব্যঙ্গ হাসি বগলার বুকে যেন শূলের মত বিঁধিতেছে। সে আর্ত্তস্বরে কহিল,—"বড় কষ্ট হচ্ছে আমার,—ওঃ!" কথার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্নের মত সে ছোট পুঁটলীটির উপর মুখ লুকাইল।

মহামায়া ব্যস্ত হইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিলেন। মধ্যে মধ্যে বগলার মাথা ধরিত, মাথা ধরিয়াছে ভাবিয়া তিনি তাহার দিকে সরিয়া বসিলেন।

তরুণীদলে চাঞ্চল্য দেখা গেল। সমবেদনার স্বরে প্রশ্ন হইল,—"কি হ'ল ওঁর?"

মা উত্তর দিলেন,—"মাথা ধরেছে; মাঝে মাঝে ধরে এমন।"

এক তরুণী কহিল,—"তাই ভাল! আমরা ভেবেছিলুম, ফিট হ'ল!"

আর এক তরুণী ব্যগ্রভাবে কহিল,—"আমাদের কাছে স্মেলিং সল্ট আছে, আপনি ভাববেন না মা, এখনই সারিয়ে দিচ্ছি দেখুন না—"

সঙ্গে সঙ্গে বগলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বিকৃত স্বরে কহিল,—"না, না, দরকার নেই কিছুর! মাথা ধরা আমার সেরে গেছে।"

তরুণীদের দিকে না চাহিয়া মুক্ত গবাক্ষটির উপর বগলা মুখখানি বাড়াইয়া দিল।

তরুণীদের মুখগুলি তাহার চক্ষুর উপর পড়িল না বটে, কিন্তু তাহাদের মুখের কথা বগলার কাণে বাজিল। মাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন কহিতেছিল,—"হঠাৎ এ ভাবে মাথা ধরা ত ভাল নয় মা, বোধ হয়, মাথার স্ক্রুগুলো ওঁর ঢিলে হয়ে গেছে, কাশীতে গিয়ে চিকিৎসা করাবেন।"

ছেলের ব্যথা মা বুঝিয়াছিলেন অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই; মেয়েটির কথার কোনও উত্তর দিলেন না। বগলার কাণের ভিতর কথাগুলি সূচের মত বিঁধিতেছিল, মাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

সে তখন ভাবিতেছিল, এমনই তাহার অদৃষ্ট, যাহাদের সে এড়াইতে চায়, তাহারাই দুঃস্বপ্নের মত দেখা দিয়া তাহাকে বাধা দেয়! এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, এ গাড়ী ছাড়িয়া সে অন্যত্র গিয়া উঠে; কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাট ভাবিয়া এ সঙ্কল্পও তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। সংবাদপত্রে বগলা হিটলারের ঝঞ্ঝাবাহিনীর কথা পড়িয়াছিল, আজ এই নারীপ্রগতিবাহিনীর বিক্রম দেখিয়া সে মনে মনে স্থির করিয়া লইল,—ইহারাও বাঙ্গালা দেশের ঝঞ্ঝা,—সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা এক দিন তছনছ করিবেই!

মায়ের সহিত কথোপকথনের সময় বগলা ইহাদের গন্তব্য স্থানটির কথা শুনিয়াছিল। টাইমটেবলে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিল, গিরিডি যাইতে মধুপুরে নামিতে হয়। কতক্ষণে মধুপুর আসে, ইহাই তাহার এখন বিশেষ চিন্তা।

মা খাইবার কথা বলিলেন। বগলা জানাইল, দশটার পর খাইব। মধুপুরে রাত দশটায় এই ট্রেণখানা ধরিবার কথা। যাহারা মধুপুরে নামিবে, তাহাদের অপেক্ষা বগলার মধুপুর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রতীক্ষা। মধুপুর যতই নিকটতর হইতেছিল, বগলার বুকের ভিতরটাও ততই যেন হাল্কা হইয়া আসিতেছিল।

আগের ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিতেই অতি সাবধানী বগলা নিজের মোটঘাটগুলির সুব্যবস্থায় সচেতন হইল; পাছে এই ঝঞ্ঝারূপিণীদের আবর্ত্তে পড়িয়া কোনও কিছু অদৃশ্য হইয়া যায়! বাঙ্কের উপর ছিল তাহাদের তোরঙ্গ ও সুটকেস। সেই সঙ্গে নারী-প্রগতি-বাহিনীর কয়েকটি সুটকেসও এই বাঙ্কে ছিল এবং ট্রেণের গতিবেগে সেগুলি হেলিয়া পড়িয়াছিল। বগলা তাড়াতাড়ি তোরঙ্গের উপর হইতে সুটকেসটি তুলিয়া নিজে যে বেঞ্চিখানির উপর বসিয়াছিল, তাহার তলদেশে রাখিয়া দিল। তাহাদের বিরাট তোরঙ্গটির সম্বন্ধে বগলার মনে বিশেষ আতঙ্ক ছিল না, কেন না, তাহা অদৃশ্য হইবার কথা নয়, কিন্তু তাহার মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজপূর্ণ ঘরের সুটকেসটিও পাছে নিজেদের ভাবিয়া ঝঞ্ঝারূপিণীরা উড়াইয়া লইয়া যায়, এই জন্যই সময় থাকিতে অতি সাবধানী বগলার এই সতর্কতা।

মধুপুরে ট্রেণ থামিতেই, যেমন ঝড়ের মত এই প্রগতিবাহিনী আসিয়াছিল, তেমনই উদ্দামভাবেই তাহারা নামিয়া পড়িল। যাইবার সময় তাহারা প্রত্যেকেই মহামায়া ও বগলাকে যুক্তকরে নমস্কার করিতে ভুলিল না। মহামায়াকে কহিল,—"আপনাদের খুবই অসুবিধা ঘটিয়ে গেলুম, এবার আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। কাশীতে আবার হয় ত দেখা হবে।"

এই অবসরে এক তরুণী বগলার কাছে ঘেঁসিয়া সহানুভূতির স্বরে কহিল,—"দেখুন, নিজের মাথার উপর নিজের দৃষ্টি পড়ে না, কিন্তু অন্যের দৃষ্টি আটকায় না, ও বস্তুটির প্রতি আপনি আর অবহেলা করবেন না; অন্ততঃ ঐ চুলগুলির সদ্গতি আগে প্রয়োজন,—যত ব্যাধি জড়িয়ে রয়েছে এখানে! আচ্ছা, আসি তা হ'লে,—নমস্কার!"

বগলার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন রী-রী করিতেছিল। লজ্জায় ও পরাজয়ের অবমাননায় ভদ্রতার অনুরোধে প্রতিনমস্কারের অছিলায় হাত দুটি তুলিতেও সে ভুলিয়া গেল।

* * * * *

বাঙ্গালীটোলার এক প্রান্তে একটা ছোট গলির মধ্যে একখানা জীর্ণ বাড়ীতে বগলা তাহার মাকে লইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর মালিক সত্যহরি চক্রবর্ত্তী দূরসম্পর্কে বগলাদের আত্মীয়,—বগলার এক মাসীর মাসশ্বশুর; তিনি এই বাড়ীর একতলার একখানি ঘর মাসিক আট আনা বন্দোবস্তে ভাড়া লইয়া কাশীবাস করেন। কাশীতে তাঁহার কোন কাযকর্ম্ম নাই, সংসারের বন্ধনটুকুও সম্প্রতি ছিন্ন হইয়াছে। আটটি টাকা মাসহারা পান, সত্রে খান; সুতরাং কোন ঝঞ্ঝাট পোহাইবার প্রয়োজন হয় না।

বগলা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু তবুও এই বাড়ীখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে বড় অল্প বেগ পাইতে হয় নাই। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কুটুম্বদের আবির্ভাবে চক্রবর্ত্তী মহাশয় চমকিত হন নাই, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র বাসায় এরূপ আত্মীয়-অতিথির যেমন আকস্মিক সমাগম হইত, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাপ্তিযোগও তাঁহার অদৃষ্টে আসিয়া পড়িত।—বগলাদের পরিচয় পাইবামাত্র তাঁহার মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠে—হাঁকে ডাকে পাড়াকে সন্ত্রস্ত করিয়া—জীর্ণ আবাসখানি মুখর করিয়া—তিনি তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। দোতলার একখানা বড় ঘর ও সেই সঙ্গে রান্নার জন্য কুলুঙ্গির মত ছোট একটু স্থান দৈনিক এক টাকা ভাড়া সাব্যস্ত হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন আত্মীয়দের যাবতীয় ব্যবস্থা অতি সুবিধায় ও অল্প ব্যয়ে সমাধা করিয়া দিবার ভারও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

স্নানান্তে দর্শন ও পূজাপাঠ সারিয়া বাসায় ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইতিমধ্যে বগলার নিকট হইতে টাকা লইয়া বাজার-হাট করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, যে কয় দিন বগলারা এখানে থাকিবেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও আর হাত পুড়াইয়া রাঁধিবেন না,—সত্রে ভোজনের কথাটা তিনি চাপিয়া গিয়াছিলেন,—একসঙ্গেই তিন জনের আহারের আয়োজন হইয়াছিল এবং পল্লীসমাজের নিষ্ঠাবতী বিধবা কাশীধামে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় আত্মীয়স্থানীয় সদ্ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার এমন অবকাশ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ভোজনের অনেক বিলম্ব আছে বুঝিয়া, বগলা তাহার হাতের কাযগুলি সারিবার জন্য সুটকেসটি লইয়া বসিল। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, ডায়েরী লিখিতে বগলা অভ্যস্ত ছিল এবং এইটিই ছিল তাহার কর্ম্মজীবনে একমাত্র সখ। গত রাত্রির লেখা অসমাপ্ত হইয়া আছে, অথচ লিখিবার মত প্রচুর উপাদান তাহার চক্ষুর উপর ভাসিতেছে। সুটকেসটি বন্ধ করিয়া বগলা তাহার চাবি নিজের পৈতায় ফাঁস দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। বগলা সুটকেসের চাবি খুলিতে গেল, কিন্তু সুটকেসের কলে চাবি ঘুরিল না;—আশ্চর্য্য ত! এই একটিমাত্র চাবিই সে সুটকেসের সহিত বন্ধু বরদার নিকট হইতে আনিয়াছিল এবং এই চাবি দিয়াই সে সুটকেস খুলিয়া, কাগজপত্র রাখিয়া, বন্ধ করিয়া পৈতায় বাঁধিয়াছিল—তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তবে চাবি কলে ঘুরিতেছে না কেন? বগলার মাথা ঘুরিয়া গেল,—ধীরে ধীরে তাহার দৃঢ়তা তরল হইয়া আসিল। চাবি সম্বন্ধে তাহার ধারণা সুনিশ্চিত,—কিন্তু সুটকেস? ইহার ভিতরেই কি সে তাহার দলিল-দস্তাবেজ ভরিয়াছিল এবং বরাবর তাহার সঙ্গে আনিয়াছে? কিন্তু সুটকেসটি বারবার নাড়াচাড়া করিয়া বগলা বুঝিতে পারিল না—এইটিই ঠিক তাহার কি না! বুঝিবার সাধ্যও তাহার ছিল না,—পরের জিনিষ সে চাহিয়া আনিয়াছিল, চিনিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার মনে পড়িয়া গেল, ট্রেণের কামরায় সুটকেসটির সম্বন্ধে সে নিজেই হইয়াছিল সতর্ক ও সচেতন,—পাছে খোয়া যায় বা বদলায়, এই আশঙ্কায় সে নিজেই এটিকে ব্যাঙ্ক হইতে ক্ষিপ্রহস্তে বেঞ্চির নীচে আড়ালে রাখিয়াছিল,—কিন্তু তখন ত সে দেখিয়া নামায় নাই! তবে? তাড়াতাড়িতে নিজেরটি ছাড়িয়া, নারীপ্রগতিবাহিনীর কাহারও সুটকেস ত—

বগলার চিন্তাজাল শতচ্ছিন্ন হইয়া গেল, মস্তিষ্কের ভিতরে যেন বিষের জ্বালা ধরিল। কি সর্ব্বনাশ! নিজের হাতে সে এ কি বিভ্রাট বাধাইয়াছে! সুটকেস ফেলিয়া ক্ষিপ্তের মত সে বাহিরে ছুটিল—সুটকেস খুলিবার উপায় অন্বেষণে।

* * * *

সুটকেস খুলিয়া তাহার ভিতরে আসবাবপত্র দেখিয়া বগলার চক্ষুস্থির! স্তব্ধবিস্ময়ে সে দেখিল, সুটকেসের মধ্যে তাহার ডায়েরী নাই, দলিল-পত্র নাই, তাহার মূল্যবান্ কাগজপত্রের কোন কিছুই নাই,—আছে তিনটি ব্লাউস, দুটি সেমিজ, কয়েকটি সায়া, খান কতক সাড়ী, এক বাক্স সাবান, এক শিশি এসেন্স, একটা ক্রীম, একখানা চিরুণী, চুলবাঁধা কালো ফিতা এক তাড়া, আয়না একখানি এবং তোয়ালে জড়ানো একটা বাণ্ডিল;—তাহাতে রহিয়াছে একখানা খাতা ও তিনখানা বাঁধানো বই!

বগলার দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে! নারীকরস্পৃষ্ট এই সব বিলাস-সম্ভারের সংস্পর্শে তাহার হাত দুইখানিও হইয়াছে আড়ষ্ট, সারা মনটিও নৈরাশ্যে পূর্ণ। কি কুক্ষণেই সে কাশী-যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছিল, এবং এই সর্ব্বনাশীর দল বাছিয়া বাছিয়া তাহারই সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই কি সেই রাত্রিতে সেই কামরায় গিয়া উঠিয়াছিল! তাহার যথাসর্ব্বস্ব যে সেই সুটকেসটির ভিতর; দলিল-দস্তাবেজ, নানাবিধ হিসাবপত্রের জরুরী কাগজ, ডায়েরী, মায় ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটগুলি পর্য্যন্ত! এখন সে কি করিবে?

নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ঠিকানার আশায়, সে তোয়ালে-জড়ানো বই কয়খানি লইয়া পড়িল। প্রথম বাঁধানো বইখানা খুলিতেই দেখিল, সেখানি আধুনিক সংস্করণের গীতা। টাইটেল পাতায় পরিষ্কার বাঙ্গালায় লেখা—শ্রীমতী মায়া ঘোষাল, বালীগঞ্জ। কিন্তু রাস্তা বা বাড়ীর নম্বর কিছু লেখা নাই। নাম পড়িয়া বগলার মনে বিস্ময় জাগিল,—নারী-প্রগতিবাহিনীতে নাম লিখাইয়াও ইনি এখনও নামের পূর্ব্বে প্রাচীন প্রথায় শ্রীমতী ব্যবহার করিয়াছেন! আশ্চর্য্য ত! আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শ্রেণীর মেয়েও সঙ্গে গীতা রাখে!

অপর কয়খানি বই খুলিয়াই বগলা বুঝিল, সেগুলি সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসের পাঠ্য, গণিত ও ইংরাজী সাহিত্য। প্রত্যেক বইয়েরই টাইটেল পাতার উপরে ইংরাজীতে লেখা আছে,—মিস্ মায়া ঘোষাল, সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস। কিন্তু কলেজের নাম নাই।

কলেজের নাম না থাকিলেও, ইনি যে কোনও কলেজের ছাত্রী, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়েন, নারীপ্রগতিবাহিনীর সহিত সম্পর্কও রাখেন এবং বগলার যথাসর্ব্বস্বভরা সুটকেসটি ইনিই কৃপা করিয়া লইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে বগলার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু 'ইনি' এখন কোথায়, ও কিরূপে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়? মাথায় হাত দিয়া বগলা ইহারই সমাধানে গভীর ভাবনার মধ্যে পড়িল।

রেল অফিসের কর্ত্তাদের মন যুগাইয়া, কলম পিষিয়া যে মাসে

আশী টাকা উপায় করিতে পারে, তাহার মস্তিষ্ক যে একেবারে নিস্তেজ, এ কথা বলা চলে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বগলা উপায় স্থির করিয়া ফেলিল।

সাত টাকা নগদ দক্ষিণা দিয়া বগলা কাশীর কমলা প্রেস হইতে সদ্য আড়াই হাজার ইস্তাহার ছাপাইয়া লইল। তাহার বয়ান ছিল এইরূপ—

৫০৲ টাকা পুরস্কার!

৩রা নভেম্বর রাত্রে বেনারস এক্সপ্রেসে আমার একটি স্যুটকেশ শ্রীমতী মায়া ঘোষালের স্যুটকেশের সহিত অদল-বদল হইয়াছে। যিনি ইহার সন্ধান দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রীবগলারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

ডি৯১৬ কুকুরগলি, বাঙ্গালীটোলা—বেনারস সিটি।

ছাপানো ইস্তাহারগুলি লইয়া সে দশাশ্বমেধ রোডে সংবাদ-পত্রের এজেন্টের দোকানে গিয়া দুটি টাকায় এই বন্দোবস্ত করিল যে, বিজ্ঞাপনগুলি সংবাদপত্রের ভিতরে দিয়া তাঁহারা কাগজ বিলি বা বিক্রয় করিবেন।

ট্রেণে কথোপকথনকালে এই কথাটি বগলার কাণে গিয়াছিল যে,—নারীপ্রগতিবাহিনী গিরিডিতে এক রাত্রি কাটাইয়া অন্নকূটের সময় কাশীতে আসিবে। কাশীতে আসিলেই যে এই শ্রেণীর মেয়েরা খবরের কাগজ কিনিয়া পড়িবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। হিসাব করিয়া বগলা সংবাদপত্রের মধ্যে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচারের এমন ব্যবস্থা করিয়াছিল, যাহাতে অন্নকূটের পূর্ব্বদিন হইতে পরদিন পর্য্যন্ত তিন দিনের সকল পত্রিকার মধ্যে ইস্তাহারগুলি সন্নিবেশিত হয়।

যে অন্নকূট উপলক্ষে বগলাদের কাশীতে এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসা, সেই অন্নকূট অবশেষে বগলার পক্ষে বিভীষিকাস্বরূপ হইয়া উঠিল। একে ত সে কোন দিনই লোকের ভীড় সহিতে পারিত না, তাহার উপর কাশীর পথে ঘাটে মন্দিরে মেয়েদের দুর্ব্বার গতি তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে,—এই ভীড় ঠেলিয়া মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাকে উৎসব দেখিতে হইবে! সর্ব্বনাশ! সে বাসায় বসিয়া মা অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর বৃদ্ধা মাকে অন্নকূট দেখাইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সারা দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তখনও কাহারও দেখা নাই। বগলা ভাবিল, মা হয় ত সন্ধ্যার আরতি দেখিয়া ফিরিবেন। সঙ্গে যখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আছেন, ভাবনার কারণ নাই। কিন্তু রাত্রি আটটার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন একা ফিরিয়া দুঃসংবাদ দিলেন,—মা হারিয়ে গিয়েছেন, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও সন্ধান পাওয়া যায়নি,—তখন বগলার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মার সন্ধানে সে তখন উন্মত্তের মত বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাশীর সেই বিপুল জন-সমুদ্র তোলপাড় করিয়াও বগলা মায়ের কোনও সন্ধান পাইল না।

পরদিন প্রত্যুষেই সে কমলা প্রেসে গিয়া আর এক ইস্তাহার ছাপাইয়া লইল। তাহার মর্ম্ম এই যে,—তাহার বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণী অন্নকূট উৎসব দেখিতে গিয়া আর ফিরেন নাই। তাঁহার সন্ধান যিনি দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই ইস্তাহারগুলিও পূর্ব্বোক্তভাবে সংবাদপত্রের মধ্যস্থতায় প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া বগলা বাসায় ফিরিল।

কাশীর অন্নকূট উৎসবে আর্ত্তসেবার উদ্দেশ্যে সে রাত্রিতে এই বাহিনীর বারোটি তরুণী বাহির হইয়া পড়ে। এই দলে কয়েকটি গ্রাজুয়েট আছেন, কয়েক জন পড়েন ফোর্থ ইয়ারে, আই, এ ও বি, এ পাস করিয়া মেডিকেল কলেজে ঢুকিয়াছেন, এমন ছাত্রীও দলে তিনটি আছেন। শ্রীমতী মায়া ইহাদের মধ্যে সকলের জুনিয়র। বয়স অল্প এবং পড়ে সেকেণ্ড ইয়ারে। অতি অল্পদিন হইল, সে এই দলে ভিড়িয়াছে এবং তাহাও পারিবারিক সমস্যাসূচক কারণে।

মায়ার আপনার বলিতে কেহ নাই—এক মামা ছাড়া। মামা বালিগঞ্জে থাকেন, কোনও সরকারী অফিসে কায করেন, মাহিনাও পান মোটা; কিন্তু ব্যয়ের ঘটাও এত বেশী যে, সঞ্চয় করিবার কিছুমাত্র সুযোগ পান নাই। বড় ছেলেকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন, সে সেখানে আইন পড়ে, ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবে। আর দুইটি ছেলে প্রেসিডেন্সীতে পড়ে। তিনটি মেয়ে; একটির বিবাহ দিয়াছেন, তাহার দেনা এখনও শোধ হয় নাই। আর দুইটি এখনও ছোট, স্কুলে তাহারা পড়ে। মায়া পিতৃমাতৃহীন হইয়া মামার স্নেহনীড়ে তাঁহার সন্তানদের সহিত সমান আদর-যত্নে এত বড় হইয়াছে, শিক্ষিতা হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের সমস্যা প্রবল হইতেই অশান্তির উদ্রেক দেখা গেল। মামীর ইচ্ছা নয়, মায়াকে আর মিছামিছি পড়ান হয়, কি তাহাতে লাভ? পাশ করিবে, বিবাহ ত বিনা পয়সায় হয় না! তাঁহার বড় মেয়ে নির্ম্মলাও ত দুইটি পাশ করিয়াছিল, তবে তাহার বিবাহ দিতে দশটি হাজার দণ্ড দিতে হইল কেন? এখনও যে মাসে মাসে তাহার দেনা শুধিতে হইতেছে।

মামা ভাবিয়া বুঝিলেন, কথাটা মিথ্যা নয়। মেয়েকে পাস করাইবার জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু খরচ করিয়া যাওয়া যত সহজ, বিবাহের জন্য এক কাঁড়ি টাকা বাহির করা তত সহজ নয়। সুতরাং মায়ার বিবাহ দেওয়াই সাব্যস্ত হয়।

সাব্যস্ত ত হইল, কিন্তু টাকা কোথায়? মামা মাসে পৌনে চারি শত টাকা মাহিনা পান, কিন্তু তবুও দেনার দায়ে বিব্রত। কিরূপে মায়ার বিবাহ দিবেন? শেষে মামী এক পাত্র স্থির করিয়া ফেলিলেন। গরলগাছায় মামীর পিত্রালয়, পাত্রের বাড়ীও সেইখানে। অবস্থা মন্দ নয়, যথেষ্ট জমীজমা আছে, তাহাই দেখা-শুনা করে। লেখাপড়ার সহিত যদিও তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, যখন তাহার সঙ্গতি আছে! কেবল এক দিকে সামান্য একটু খুঁৎ এই যে, পাত্রটি বিপত্নীক, প্রথম পক্ষের কন্যা একটি আছে, সেও শিশুমাত্র, বৎসর পূর্ণ হয় নাই;—আর পাত্রের বয়সও এমন কিছু বেশী নহে, এখনও চল্লিশের উর্দ্ধে উঠে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে, কিছুই দিতে হইবে না।

মায়ার স্নেহপ্রবণ হৃদয়টি অধিকাংশ সময়ই মামীর শাসন মানিয়া চলিত। মামীর যুক্তি অগ্রাহ্য করিবার মত শক্তিও তাঁহার ছিল না। সুতরাং মামীর প্রস্তাবিত পাত্রের সহিত মায়ার বিবাহসম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল।

মায়া বিছানায় পড়িয়া রাত্রিতে কাঁদে, চোখের জলে বালিস ভিজিয়া যায়; কিন্তু মুখে কাহাকেও কিছু বলে না। আর তাহার বলিবারই বা কি আছে! ভাবী বরের কথা সবই সে শুনিয়াছে, মামী যতই বাড়াইয়া বলুন, বুঝিবার মত বয়স তাহার হইয়াছে। সব চেয়ে এই কথাটুকু কাঁটার মত তাহার বুকে বাজে—এমন এক হৃদয়হীনের সংস্পর্শে সে চলিয়াছে—এক পত্নীকে হারাইয়া বর্ষ পূর্ণ না হইতে আর এক পত্নী-সংগ্রহে যাহার এতটুকু কুণ্ঠা নাই!

কিন্তু অলক্ষ্যে ভবিতব্য হাসিলেন, এবং মামার বড় মেয়ে নির্ম্মলা সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার উপলক্ষ্য হইলেন। মায়ার প্রতি নির্ম্মলার একটা আন্তরিক টান ছিল, তাহার স্বামী অমিয়নাথ ই, আই, রেলের রেট্‌স্ এণ্ড ডেভলপমেণ্ট্‌স্ অফিসার; নানা স্থানে তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। নির্ম্মলাও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফেরে। শিক্ষিতা পত্নীর সাহচর্য্যে অমিয়নাথের ভ্রাম্যমাণ প্রবাসজীবন শান্তি-চ্ছায়ায় মধুময়।

মায়ার বিবাহের কথা মায়ের পত্রে জানিয়া নির্ম্মলার নারী-হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে। মামার বাড়ীর দেশের সেই বিপত্নীক পাত্রটিকে তিনি দেখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মত শিক্ষিতা তরুণীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, মায়াকে গলগ্রহ ভাবিয়া তাঁহার মা এইভাবে তাহার হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে চান! মায়ার মত সুশীলা সর্ব্বগুণান্বিতা রূপবতী মেয়ের এই আত্মদানকে আত্মহত্যা ভাবিয়া নির্ম্মলা প্রতীকারে সচেষ্ট হন। নারীপ্রগতিবাহিনীর সহিত নির্ম্মলার ঘনিষ্ঠতা ছিল, পৃষ্ঠপোষিকা-রূপে নানাভাবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করেন। সুতরাং এই দুর্ব্বার মেঘমালার অন্তরালে থাকিয়া এমন সাংঘাতিক বাণ তিনি নিক্ষেপ করেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। মায়াও এই সূত্রে এই বাহিনীর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায়।

পূজার ছুটীর পর নির্ম্মলা স্বামীর সহিত গিরিডিতে আসেন এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য সেইখানেই অমিয়নাথের ক্যাম্প পড়ে। গিরিডিতে থাকিতে নির্ম্মলা সংবাদ পান, নারীপ্রগতি-বাহিনী অন্নকূট উৎসবে কাশীতে কায করিবার ভার পাইয়াছে। নির্ম্মলা তাহাদিগকে গিরিডির ক্যাম্পে আমন্ত্রণ করেন। চিঠি-পত্রে স্থির হয় যে, আসিবার সময় তাহারা মায়াকে তাহাদের দলে আনিবে এবং গিরিডিতে রাত্রিটুকু কাটাইয়া কাশীর ক্যাম্পে যাইবে।

নির্ম্মলার পীড়াপীড়িতে অমিয়নাথ তাড়াতাড়ি গিরিডির কায শেষ করিয়া, অন্নকূটের সময় কাশীতে ক্যাম্প ফেলিবার ব্যবস্থা করেন। কামাচ্ছায় পূর্ব্ব হইতে একখানা বড় বাগান-বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। নির্ম্মলার একান্ত ইচ্ছা, সেই বাড়ীতে সে নারীপ্রগতিবাহিনীর সম্বর্দ্ধনা করিবে এবং তাহাদের সহিত দিনগুলি আনন্দে কাটাইবে। অমিয়নাথ আদরিণী পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে মুক্তহস্ত হইলেন। লোকজন ছুটিল, উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইল, কামাচ্ছা'র বাগানবাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল।

গিরিডি ষ্টেসনের গায়েই অমিয়নাথের ক্যাম্প। ভূরি-ভোজনের পর নারীপ্রগতিবাহিনীর হাস্যোল্লাসের অন্ত নাই। গানে, গল্পে, হাসির প্রবাহে ক্যাম্প ভরপূর। হঠাৎ মায়ার আর্ত্তস্বর সব স্তব্ধ করিয়া দিল,—"সর্ব্বনাশ করেছি আমি, সুটকেস ট্রেণে ফেলে এসিছি!"

সকলেই বিস্ময়ে উৎকীর্ণ, একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন;—সে কি!

নির্ম্মলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—তোর হাতে ওটা কি?

হাতের সুটকেশটা ম্যাটিনের উপর ফেলিয়া দিয়া মায়া উত্তর দিল,—"এ ত আমার নয়, আমাদের কারুর নয়; আমারটি কে বদলে নিয়েছে!"

সবাই এবার হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া পড়িল,—বেওয়ারিস সুটকেসটিও রেহাই পাইল না, নানাভাবে তাহার উপর পরীক্ষা চলিল; শেষে সাব্যস্ত হইল,—সত্যই, এ তাহাদের কাহারও নয়।

মায়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—"তবে কার? কোন্ কাণা এ কায করেছে?"

নির্ম্মলা মুখ মচকাইয়া কহিলেন, "দোষ দিচ্ছিস্ কাকে তুই?—নিজেই ত এনেছিস্ পরেরটি হাতে ক'রে তুলে,—মনটি রেখে আসিস্‌নি ত ট্রেণে? আর কে ছিল সেখানে?"

মায়া মুখখানি গম্ভীর করিয়া ঝাঁঝিয়া কহিল,—"যাও!"

কিন্তু নারীবাহিনীর এগারোটি মূর্ত্তি নির্ম্মলার কথায় একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল,—বগলার মূর্ত্তি ও বিচিত্র ব্যবহার তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে তাহারা যেন একটা অভিনব গল্পের সূত্র পাইল। সঙ্গে সঙ্গেই দলের এক জন দৃঢ়স্বরে কহিল,—"এ সেই খোঁচা চুল রেল-বাবুটির কায।"

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল,—"সে আবার কে?"

তখনই বগলার কাহিনী আরম্ভ হইল, শ্রোত্রী একা নির্ম্মলা, বক্তা প্রায় সকলেই। আখ্যান শেষ হইলে এক জন কহিল,—"মায়ার কিন্তু তার উপর ভারি সিমপ্যাথী নির্ম্মলা দিদি!"

মায়ার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, বড় বড় দুই চক্ষুর দৃষ্টি খর করিয়া কহিল,—"কি সিম্‌প্যাথি দেখিয়েছিলুম শুনি?—ডিস ভ'রে খাবার তোমরা সাজিয়ে দিয়েছিলে, আমি তার মুখের ওপর ধরেছিলুম বুঝি? বল, বল।"

উত্তর হইল,—"মনে মনে সেই সাধটুকুই ত ছিল, বাদ সাধা হয়েছিল, তাই না এই অভিযোগ! ব্যথা আর বুঝি না?"

আর এক জন কহিল,—"রাইট এনাফ্! মনে নেই, ট্রেণে আমরা সবাই তাকে বিঁধেছি কথার হুলে, উনিই শুধু ছিলেন—একদম নির্ব্বাক! একে সিম্‌প্যাথি বলে না?"

মায়া হাসিয়া কহিল,—"আমার সিম্‌প্যাথি নিয়ে তোমরা সারা রাত রিসার্চ কর, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই; কিন্তু এখন এ সুটকেসটি নিয়ে আমি কি করব, আর আমার সুটকেস কি ক'রে ফিরে পাব—নির্ম্মলা দিদি, তুমি তার ব্যবস্থা কর।"

নির্ম্মলা ব্যবস্থা দিলেন,—"সুটকেস এখন আমার কাছে জমা থাক, কাশীতে গিয়ে এর তদ্বির করা যাবে।"

* * * *

অন্নকূটের পরও আরও দুই দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বগলা এই কয় দিনেও মায়ের কোনও সন্ধান পায় নাই। থানায় থানায় ঘুরিয়া, বিভিন্ন হাঁসপাতালে তল্লাস করিয়া কোনও তত্ত্বই বাহির করিতে পারে নাই। মায়ের সাধ মিটাইবার জন্যই এত কষ্ট সহ্য করিয়া তাহার কাশীতে আসা, সেই মাকে এ ভাবে হারাইয়া সে শোকে দুঃখে, ব্যথায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় দিন সকালের দিকে সকল কথা জানাইয়া বরদাকে একখানা পত্র লিখিতে বসিয়াছে, সহসা নীচের তলায় একটা গোলমালের মধ্যে নিজের নাম শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার চমক ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে ঘরখানি ভরিয়া গেল এবং সভয় বিস্ময়ে বগলা দেখিল,—ট্রেণের সেই নারীপ্রগতিবাহিনী এবং তাহাদের পুরোভাগে সাহেবী সজ্জায় এক সুন্দর যুবা।

এই যুবাই নির্ম্মলার স্বামী অমিয়নাথ। নির্ম্মলাও এই দলে ছিলেন।

অমিয়নাথ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার নাম বগলারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ?"

বগলা উত্তর দিল,—"হাঁ।"

দুই টুকরা ছাপা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া অমিয়নাথ কহিলেন,—"এই নোটিশ আপনি ছাপিয়েছেন ?"

বগলা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

অমিয়নাথ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার সুটকেশ এবং মায়ের সন্ধান পেয়েছেন ?"

বগলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল,—"না।"

অমিয়নাথ নারীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এঁরা পেয়েছেন এবং সেই সম্বন্ধেই এখানে এসেছেন।"

বগলা ব্যগ্র উল্লাসে প্রশ্ন করিল,—"মাকে পেয়েছেন ? কোথায় তিনি ? এনেছেন তাঁকে ?"

অমিয়নাথ কহিলেন,—"না, তাঁকে আনবার উপায় নেই এখন। অন্নকূটের দিন তিনি ভীড়ের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাত পান, নারীপ্রগতিবাহিনী জানতে পেরে তাঁদের ক্যাম্পে নিয়ে যান। এখনও সেখানে আছেন।"

আর্ত্তস্বরে বগলা কহিয়া উঠিল,—"কি সর্ব্বনাশ! আমি ত কোথাও খুঁজতে কসুর করিনি—"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু নারীপ্রগতিবাহিনীর ত্রিসীমাতেও যাননি! যদি যেতেন, মায় দেখা পেতেন, মায়া-দেবীরও সন্ধান মিলত; বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এত দণ্ডভোগ করতে হ'ত না।"

প্রগতিবাহিনীর এক তরুণী শ্লেষের সহিত কহিলেন,—"নারী-প্রগতির ক্যাম্প হলেও, সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না!"

বগলার কাণের ভিতর নির্ম্মলাদেবীর সব কথা হয় ত প্রবেশ করে নাই, মায়ের অবস্থা ভাবিয়া সে তখন মুহ্যমান, দুই চক্ষুর পাতা ভিজিয়া গিয়াছে, রুদ্ধ অশ্রুরাশির ভারে দুটি ডাগর চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে; অমিয়নাথের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল,—"সত্য বলুন স্যর, মা কেমন আছেন,—বেঁচে আছেন ত ?"—আর্ত্তস্বরের সহিত অশ্রু এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অমিয়নাথ কহিলেন,—"আপনি বৃথা অধীর হচ্ছেন, তাঁর জীবন সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ভাল ডাক্তার দিয়েই দেখান হয়েছে, তাঁর রিপোর্ট—ডিসলোকেসন অফ্ নী-জয়েণ্ট! ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে রীতিমত সারতে মাস-খানেক সময় লাগবে।"

"তাঁকে এখানে আনা চলে না ?"

"না।"

"ওঁদের ক্যাম্প কোথায় ?"

"উপস্থিত কামাচ্ছায়।"

"আমি সেখানে যেতে পারি ?"

"সার্টেনলি! আপনাকে নিতেই ত আমরা এসেছি। আপনি চলুন।"

নির্ম্মলাও সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—হাঁ, আসল কথাটাই যে বাকি রয়ে গেল! পুরস্কারের টাকাগুলোও সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

বগলার চক্ষুর উপর এবার যেন একটা কালো আবরণ আসিয়া পড়িল। বুঝিয়াও যেন কথাটা সে বুঝিতে পারিতেছে না! অসহায়ের মত অমিয়নাথের দিকে চাহিতে তিনিও গম্ভীরভাবে হাতের ছাপা ইস্তাহার দুখানা দেখাইয়া কহিলেন, "রিওয়ার্ড এনাউন্স করেছেন না? সুটকেসের জন্য পঞ্চাশ, আর মায়ের সন্ধানে পঞ্চাশ মোট এক শত টাকা,—এইটেই ওঁরা চাইছেন। আপনার সুটকেস, মা, সবই ওঁদের জিম্মায়,—আমাকে উকীল ধরেছেন, যাতে রিওয়ার্ডের টাকাটা নিয়ে কোন গণ্ডগোল না হয়, বুঝেছেন ?"

উকীলের কথায় বগলার মুখ শুকাইয়া গেল! এখন তাহার মনে বিঁধিতে লাগিল, না ভাবিয়া এমন টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া সে কি বোকামীই করিয়া ফেলিয়াছে! পুরস্কার সত্য সত্যই দিতে হইবে, এ ধারণা তাহার মনে তখন স্থান পায় নাই। এখন নারী-প্রগতি-বাহিনী, আবার তাহাদের সঙ্গে আদালতের উকীল; বগলার মাথা ঘুরিয়া গেল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে কহিল,—"এত টাকা ত আমার কাছে নেই!"

বিস্ময়ের সুরে নির্ম্মলা কহিলেন, "বলেন কি! টাকা কাছে নেই, অথচ অত টাকা রিয়োয়ার্ড দেবেন ব'লে নোটিস্ বের করেছেন! জানেন, এটা ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়োরের আমোলে আসে? আপনি কি বলেন, উকীল বাবু?"

অমিয়নাথ কহিলেন,—"আমি বলি কি, ও সব হাঙ্গামায় না গিয়ে, উপস্থিত এঁকে দিয়ে একটা একরারনামা লিখিয়ে নিন। আর এটাও ত ভাববার কথা, এখনই ভদ্রলোক অত টাকা পান কোথায়? দেশ থেকে আনিয়ে নিতেও ত সময় দরকার। আপনি কি বলেন, বগলা বাবু,—এতে কিছু আপত্তি আছে ?"

বগলা তখন মনে মনে ভাবিতেছিল,—"বসুমাতা তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি!" অমিয়নাথের কথায় যেন অকূলে সে কূল পাইল, কহিল,—"কোন আপত্তি আমার নেই, স্যর।"

স্যর তখন কোটের পকেট হইতে সদ্যঃক্রীত একখানা আন-কোরা ষ্ট্যাম্প-কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন,—"ভূত-ভবিষ্যৎ ভেবে উকীলদের এ সব কাযে হাত দিতে হয়! শেষে এই

দাঁড়াবে জেনেই আসবার সময় কাগজখানা কিনে আনি, নোটিসে নাম ঠিকানাও ছিল, তাই আটকায়নি। তা হ'লে আপনি এতে লিখুন বগলা বাবু, রিওয়ার্ডের টাকাটা কবে নাগাৎ দেবেন—"

হাত দুটি যোড় করিয়া বগলা বিনীতভাবে জানাইল,—"আমি কিছু লিখ্‌তে পার্‌ব না, উকীল বাবু, আমার এখন মাথার ঠিক নেই। যা লেখবার, আপনিই লিখুন, আমি বরং সই ক'রে দিচ্ছি।"

অমিয়নাথ কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন বগলার হাতে দিয়া কহিলেন,—"অগত্যা তাই হোক,—এইখানে আপনার নাম ও আফিসের ঠিকানা লিখুন।"

বগলা যথারীতি সহি করিয়া কাগজখানি ফিরাইয়া দিল।

অমিয়নাথ কাগজখানা নির্ম্মলার হাতে দিয়া বগলার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আমরা নীচে অপেক্ষা করছি, আপনি চট ক'রে কাপড়খানা ছেড়ে আসুন—"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু মায়ার সুটকেসটি যেন ছেড়ে আসবেন না, সেটিকে ত সঙ্গের সাথী ক'রে নিয়েছেন দেখছি!"

* * * *

কামাচ্ছার উদ্যান-বাটিকার একখানা প্রশস্ত কক্ষে পরিপাটী শুভ্র-শয্যায় পায়ে ব্যাণ্ডেজবাঁধা অবস্থায় মহামায়া দেবী পড়িয়া আছেন,—মাথার কাছটিতে বসিয়া মায়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে,—এমন সময় পরদা ঠেলিয়া বগলা সেখানে প্রবেশ করিল।

প্রথমেই মায়ার সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। মায়া চোখ দুইটি নত করিল, বগলা থতমত খাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

মায়া মহামায়ার কাণের কাছে মুখটি নামাইয়া আস্তে আস্তে কহিল,—"আপনার ছেলে এসেছেন, মা।"

উল্লাসে আত্মহারা হইয়া মহামায়া কহিলেন,—"বগলা! এসেছে! কই—কোথায়? উঠিয়া বসিবার জন্য তাঁহার চাঞ্চল্য দেখা গেল।"

মায়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে ধরিয়া কহিল,—"নড়বেন না মা,—ডাক্তারের মানা। শুয়ে শুয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলুন—"

বগলার আর পদমাত্র অগ্রসর হইবার শক্তি নাই; মায়ের শয্যায় বসিয়া তরুণী নারী! আবেগকম্পিত স্বরে সে ডাকিল,—"মা!"

মায়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বগলার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনি এখানে এসে বসুন, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, যেন বেশী কথা না বলেন, আর একটুও না নড়েন।"

কথা কয়টি বলিয়াই মায়া পরদা তুলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মায়ের মাথার কাছে বসিয়া বগলা কাঁদিয়া অস্থির। তাহার অশ্রুধারে উপাধান ভিজিয়া গেল! আর্ত্তস্বরে কহিল, "এ জন্যেই কি তোমাকে কাশীতে এনেছিলুম, মা!"

মা দিলেন পুত্রকে প্রবোধ। তাঁহার মুখে ইহাদের সুখ্যাতি ধরে না। পড়িয়া গিয়াই জ্ঞান হারান, কখন্ কি ভাবে এখানে আসেন, জানেন না। কিন্তু জ্ঞান হইলে চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পান, যেন স্বর্গে আছেন; আর স্বর্গের দেবকন্যার মত মায়া তাঁহার কি সেবাটাই না করিতেছে! এত যত্ন তিনি কোথাও পান নাই, ছেলের কাছেও নয়, নিজের বাড়ীতেও নয়।

বগলা স্তব্ধ হইয়া ভাবে,—মায়া! ইনিই কি তবে শ্রীমতী মায়া ঘোষাল! সুটকেসের সংস্রবে যাঁহার নাম—

* * * *

দেওয়ালীর ছুটীর পর আফিসে গিয়াই বরদা নির্ম্মলার নিকট হইতে এক তার পাইল।—নির্ম্মলা বরদার বৌদি; অমিয়নাথ তাহার খুড়তুতো ভাই। বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা বগলার সুটকেস খুলিয়া কাগজপত্র সার্চ্চ করিতে কিছুমাত্র অবহেলা করেন নাই। এমন কি, বগলার ডায়েরিগুলিও উপেক্ষিত হয় নাই। ডায়েরি হইতে বগলা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই তিনি আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে বরদার সহিত তাহার গভীর বন্ধুত্বের পরিচয়, এ ক্ষেত্রে তাঁহার কাযে লাগিয়া গেল। তিনি বরদার আফিসে তার করিলেন,—"বগলার মাতার অবস্থা সাংঘাতিক, তোমার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক, আমাদের বাসায় এসো।"

কামাচ্ছার বাসার ড্রয়িং-রুমে নির্ম্মলার নেতৃত্বে নারী প্রগতি-বাহিনীর বৈঠক তখন বসিয়াছে। বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য বিষয়—সহি করা ব্ল্যাঙ্ক ষ্ট্যাম্প কাগজখানির সহায়তায় কি ভাবে বগলাকে বাধ্য করা যায়—মায়ার সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-স্থাপনে!

নানা তর্ক, নানা প্রস্তাব চলিয়াছে,—এমন সময় ছোট একটা সুটকেস হাতে বরদার সে কক্ষে প্রবেশ। বরদাকে দেখিয়াই সকলে 'হুররে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সবিস্ময়ে বরদা প্রশ্ন করিল,—"ব্যাপার কি বৌদি! তার পেলুম, সাংঘাতিক বিপদ, এসে দেখছি ত তোফা মজলিস বসিয়েছ!"

নির্ম্মলা কহিলেন,—"শীগ্‌গীর হাতমুখ ধুয়ে এসো,—তোমার সঙ্গে জরুরী পরামর্শ আছে।"

বরদা কহিল,—"হাত-মুখ ধোয়া হয়ে গেছে আমার, কি বলবার স্বচ্ছন্দে বলতে পার।"

নির্ম্মলা তখন বগলা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বরদাকে শুনাইতে বসিলেন। সুটকেশ অদল-বদলের কথা, বরদার সুটকেশ খুলিয়া দলিল-দস্তাবেজ, সার্টিফিকেট, ডায়েরী হইতে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাত হইবার কথা এবং ব্ল্যাঙ্ক দলিলে তাহার সহি পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে,—সে সমস্তই প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ, আমার কি উদ্দেশ্য?"

বরদা হাসিয়া কহিল,—পাকা গোয়েন্দার ওপরে গিয়ে তুমি উঠেছ, বৌদি! কায করেছ সবই ঠিক, কিন্তু ধোপে টেঁকবে না, এই যা দুঃখ! বগলাকে তুমি বাগাতে চাও মায়ার ফাঁদ পেতে! ওকে করাবে বিয়ে! সর্ব্বনাশ! তুমি জান না, বৌদি, ও সে ছেলে নয়! মেয়েদের নাম শুনলেই ও লাফিয়ে ওঠে! এই জন্যে আপিসে ওর নাম হয়েছে—শুকদেব গোঁসাই!"

নির্ম্মলা কহিলেন,—"আসল শুকদেব গোঁসাই যদি তোমার বৌদির পাল্লায় পড়তেন, তাঁকেও দাঁড় করাতুম ছাদনাতলায়! ইনি ত নকল শুকদেব গোঁ মশাই! তবে ব্ল্যাঙ্ক দলিলখানায় সহি করিয়ে নিয়েছি কি করতে?"

বরদা সবিস্ময়ে কহিল,—"তাতে কি হবে ?"

নির্ম্মলা কহিল,—"সহি করা যখন হয়ে আছে, বডিতে আমাদের ইচ্ছামত বয়ান লেখা হবে। যথা—পুরস্কার ঘোষণা বাবত নগদ টাকা দিবার সামর্থ্য আমার না থাকায়, আমি শ্রীবগলারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত টাকার বিনিময়ে শ্রীমতী মায়া ঘোষালকে সহধর্ম্মিণীরূপে বিবাহ করিব বলিয়া এই অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি।"

বরদা কহিল,—"থাম বৌদি, থাম, আর তোমার বয়ান শোনাতে হবে না ;—তুমি সব পার বৌদি, সব পার।—আচ্ছা, আমি বগলার সঙ্গে দেখা করে—"

নির্ম্মলা কহিলেন,—"বল ত, তাকে না হয় এখানেই ডাকি ?"

বরদা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন করিল,—"তার মানে ?"

নির্ম্মলা উত্তর দিলেন,—"তিনি এখন কামাচ্ছার এই 'লজে' নজরবন্দী।"

বরদা সোল্লাসে কহিল,—"বল কি !"

নির্ম্মলা কহিল,—"মাকে দেখতে এসেছেন ; এখনও আধ ঘণ্টা হয় নি ; কিন্তু আসবামাত্রই শুভদৃষ্টি হয়েছে, সেই-খানেই। দুঃখের কথা এই,—শাঁখ সঙ্গে আসে নি, নইলে তখনই বাজিয়ে দিতুম।"

বরদা হাসিয়া কহিল,—এর জন্য দুঃখ করো না বৌদি, তুমি যখন এ কাযে হাত দিয়েছ, এই বাগানেই শাঁখ বাজবে, আর তার দেরীও নেই। আমি ধুলপায়েই বগলার সঙ্গে দেখা ক'রে তা হ'লে কথাটা পাকা ক'রে আসি।

* * * *

বগলাকে এবার রাজী করাইতে বরদাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। বরদার কথা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়। অগ্রহায়ণের শুভ ১লা তারিখেই কামাচ্ছার উদ্যানভবনে শুভবিবাহের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠে এবং কাশীর বিশিষ্ট সমাজ এই অপ্রত্যাশিত পরিণয়োৎসবে যোগদান করিয়া নবদম্পতির কল্যাণকামনা করেন।

সে রাত্রির বিবাহবাসর কিন্তু পরিপূর্ণরূপেই দখল করিয়া বিজয়পতাকা উড়াইয়াছিল—নারী-প্রগতি-বাহিনী !

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যক্ষ্মারোগ-প্রতিকারের উপায়

ভারতবর্ষে যে সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি অবাধে বিস্তার লাভ করিয়া দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে—যক্ষ্মারোগ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই রোগের সংক্রামকতার বিষয়ে অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং শারীরিক অপুষ্টির জন্য দৈহিক শক্তির অভাব হেতু এ মারাত্মক রোগাক্রমণ রোধ করিবার শক্তি ও সামর্থ্য বর্ত্তমানে আমাদের লয় পাইয়াছে। কর্ম্মকেন্দ্র সহরের সঙ্গে গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় বর্ত্তমানে সুদূর প্রান্তস্থিত গ্রামগুলিতেও যক্ষ্মারোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী, এমন কি, শিশুরা পর্য্যন্ত যক্ষ্মারোগের গ্রাস হইতে রক্ষা পায় না। সেই জন্য সকল রোগ অপেক্ষা যক্ষ্মা-রোগের বিভীষিকা বাঙ্গালায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার শতকরা দশ ভাগ লোকের মৃত্যুর কারণ যক্ষ্মা।

ভারতবর্ষের আবহাওয়া, দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও জন-সাধারণের সামর্থ্যের বিষয় বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে যক্ষ্মানিবাসে বা স্যানাটোরিয়ামে রাখিয়া যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করা এক প্রকার অসম্ভব। উহা এত অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া যাহাতে যক্ষ্মারোগী স্বীয় বাটীতে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া অল্পব্যয়ে সর্ব্বজনব্যবহৃত ও ফলপ্রদ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড দেশ যক্ষ্মারোগের আধুনিক চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু ধনী ব্যক্তি যক্ষ্মারোগ-চিকিৎসার জন্য ঐ দেশে গমন করে। রচি কোম্পানী সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত এবং "সিরোলিন" ঔষধ আবিষ্কার করিয়া বহুতর যক্ষ্মারোগীর উপকার-সাধন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক আধুনিক যক্ষ্মা-নিবারক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলী রচির "সিরোলিন" যক্ষ্মা-রোগীকে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ক্ষুধা ও শরীরের ওজন বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। "সিরোলিন" যে পৃথিবীর ব্যবহৃত ঔষধের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল ফুসফুসের ক্ষয়রোগের নহে, অন্ত্রের ক্ষয়রোগেও "সিরোলিন" রোগীকে রোগমুক্তির জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা দেশীয় ও পাশ্চাত্য বিখ্যাত চিকিৎসকগণ স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে যেরূপ দ্রুত গতিতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইয়াছে, এতদবস্থায় রচির "সিরোলিন" যক্ষ্মারোগে নিয়মিত ব্যবহারে রোগের গুরুত্ব কমাইয়া যে ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে লইয়া যাইয়া দরিদ্র দেশ ও অজ্ঞ দেশবাসীকে রক্ষা করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বহু বৎসরাবধি ব্যবহারের পর ইহা বলা যাইতে পারে যে, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্ত্রী পুরুষ কিম্বা শিশুদের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করাইতে একমাত্র "সিরোলিন রচিই" সমর্থ।

শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ (ডাক্তার)।

বৈষ্ণব মত-বিবেক

শ্রীসম্প্রদায় ও রামানুজাচার্য্য

অপূর্ব্ব গুরুভক্তি

ইহার পর যতিরাজ শিষ্যবর্গকে শঠারি ব শঠকোপ-বিরচিত সহস্রগীতি বা তামিল প্রবন্ধমালা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিরুপতি বা শ্রীশৈলের মাহাত্ম্য শ্রীবৈকুণ্ঠতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামানুজ উহা পাঠ করিয়া ঐ স্থানে আজীবন বাসের জন্য কোনও শিষ্য প্রস্তুত আছেন কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে অনন্তাচার্য শ্রীশৈলে আজীবন বাস করিতে স্বীকৃত হইলে, রামানুজ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে তথায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তিনিও সশিষ্য শ্রীশৈলে যাইবেন বলিয়া অনন্তাচার্য্যকে বলিয়া দিলেন। অনন্তাচার্য্য শ্রীশৈলে গমন করিলে যতিবর শিষ্যগণের সহিত তিনবার সহস্রগীতি অধ্যয়ন শেষ করিয়া সশিষ্য শ্রীশৈলতীর্থ গমনোদ্দেশে শ্রীরঙ্গম্ হইতে যাত্রা করিলেন। শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা অষ্টসহস্রগ্রামে বরদাচার্য নামক যতিবরের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিষ্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বরদাচার্য্য প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার পত্নী পরমা সাধ্বী ও অনুপম লাবণ্যময়ী লক্ষ্মীদেবীও স্বামীর উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। পতি-পত্নী দুই জনেই দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহকালে ও অবসরসময়ে শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিতেন। যখন শ্রীরামানুজ সশিষ্য বরদাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন বরদাচার্য্য ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী, একমাত্র বস্ত্র ধৌত করিয়া রৌদ্রে দিয়া চীরখণ্ড মাত্র পরিধান করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। যতিরাজ উপস্থিত হইয়া গৃহে কাহাকেও না দেখিয়া অন্তঃপুরের দিকে গমন করিয়া গৃহস্বামিনীর উদ্দেশ্যে স্বীয় আগমন-সংবাদ উচ্চৈঃস্বরে জ্ঞাপন করিলেন। প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মীদেবী করতালিধ্বনিরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা নিজের অবস্থা জানাইলে, যতিবর স্বীয় উত্তরীয় গৃহমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। লক্ষ্মী দেবী তদ্দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিয়া গুরুসমীপে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইয়া বলিলেন, "প্রভো! আমার স্বামী ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন, আপনি সশিষ্য সুখে উপবেশন করুন, আমি পাদপ্রক্ষালনের জল দিতেছি। আপনারা পাদপ্রক্ষালন করিয়া বিশ্রামান্তে সম্মুখের পুষ্করিণীতে স্নান করুন। আমি শীঘ্রই বিষ্ণুর নৈবেদ্য যোগাড় করিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া লক্ষ্মী দেবী গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন এবং পাদপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দিলেন; কিন্তু গৃহে তণ্ডুলকণাও অবশিষ্ট ছিল না। কি প্রকারে সশিষ্য গুরুদেবের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবেন, তিনি তাহা ভাবিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দেবী নিরতিশয় লাবণ্যবতী ছিলেন। তাঁহার বাসস্থানের সমীপবর্ত্তী এক ধনাঢ্য বণিক্ তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া দূতী প্রেরণ করিয়া নানাপ্রকারে অর্থ-সম্পদের প্রলোভনে বার বার তাঁহাকে বশীভূতা করিয়া স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু পরমা সাধ্বী লক্ষ্মী দেবী তাহার প্রার্থনাকে প্রতিবারই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অদ্য তাঁহার মনে হইল যে, "যদি অস্থিমাংসরক্ত-মলমূত্রময় নশ্বর দেহের পরিবর্ত্তে গুরুসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, তাহা কি আমার পক্ষে পরম লাভ নহে? আমার স্বামীর ধর্ম্মসাধনে সহায়তা করাই আমার কর্ত্তব্য। তিনি ভিক্ষাটনের দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়া আগমন করিবেন, তদ্দ্বারা সশিষ্য গুরুদেবের সেবা হইতে পারিবে না দেখিয়া তিনিও নিতান্ত দুঃখিত হইবেন। তাঁহার যাহাতে দুঃখ না হয় ও ধর্ম্মচ্যুতি না ঘটে, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। আর কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে গুরুসেবাই শিষ্যের কর্ত্তব্য, অতএব এখনই আমি ঐ বণিকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া গুরুসেবার উপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনি, পরে আমার পরম গুরু স্বামী আগমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই আমি পালন করিব।" এই মনে করিয়া লক্ষ্মী দেবী সেই শ্রেষ্ঠীর সপ্তদ্বারবিশিষ্ট সুবৃহৎ প্রাসাদে গমন করিয়া একেবারে অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন এবং বণিক্‌কে বলিলেন যে, "হে শ্রেষ্ঠিন্, অদ্য আমার গৃহে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব কৃপা করিয়া সশিষ্য আগমন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। তুমি অবিলম্বে তাঁহাদের সেবার উপযোগী সমস্ত দ্রব্য যথেষ্টরূপে সংগ্রহ করিয়া পাঠাও। আমি অদ্য রাত্রিতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।" বণিক্‌কে এই কথা বলিয়াই লক্ষ্মী দেবী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে বণিক্ এই কথায় পরম আনন্দিত হইয়া নানাবিধ উত্তম দ্রব্য ভারে ভারে বহু বাহকের দ্বারা লক্ষ্মী দেবীর গৃহে প্রেরণ করিল। লক্ষ্মী দেবী অল্পকাল-মধ্যেই নানাপ্রকার পবিত্র সুভোজ্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সশিষ্য শ্রীগুরুদেবকে আহ্বান করিলেন। শ্রীরামানুজ সেই অপর্য্যাপ্ত অন্নব্যঞ্জন, গব্যদ্রব্য ও মিষ্টান্নাদি শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিয়া, সেই নৈবেদ্যের দ্বারা পরম পরিতৃপ্তিসহকারে সশিষ্য ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন এবং গৃহস্বামী ও স্বামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে বরদাচার্য্য ভিক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া গৃহে আগমন করিয়া সশিষ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ সন্দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় নানাবিধ বিচিত্র উপাদেয়

অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা সশিষ্য গুরুদেবের সেবা করিয়াছেন, তখন তিনি যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া জায়ার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, পতিপ্রাণা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, "আপনার অনুমতি না লইয়াই শ্রীগুরুসেবার জন্য আমি এই সাহসের কার্য্য করিয়াছি, এইক্ষণ আপনি বিচার করিয়া যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।" এই বলিয়া পতিপ্রাণা লক্ষ্মী দেবী কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বরদাচার্য্য এই কথা শুনিয়া হর্ষাবেগে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"তোমার ন্যায় সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। তুমি রক্তমাংসময় এই নশ্বর দেহের দ্বারা গুরুরূপ নারায়ণের সেবা করিয়া আমাকে বিনামূল্যে কিনিয়া রাখিলে। গুরুরূপ নারায়ণই এ সংসারে একমাত্র পুরুষ, তিনিই যাবতীয় প্রকৃতি-কুলের একমাত্র পতি। তুমি নশ্বর দেহের বিনিময়ে সেই জগৎ-পতিরই সেবা করিয়াছ। তোমার ন্যায় ভক্তিমতী রমণী যাঁহার সহধর্ম্মিণী, কে বলে সে মহাসৌভাগ্যবান্ নহে।" এই বলিয়া তিনি সাধ্বীর হস্তধারণ পূর্ব্বক গুরুদেবের সম্মুখে লইয়া গেলেন এবং পতি-পত্নী উভয়েই সাষ্টাঙ্গে শ্রীগুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া অশ্রুধারায় তাঁহার চরণ সিক্ত করিলেন। পরে বরদাচার্য্য গুরুদেবের নিকট পত্নীর আচরণ নিবেদন করিলে যতিবর সশিষ্য বিস্ময়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে দম্পতি প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত প্রসাদসহ শ্রেষ্ঠীর আলয়ে গমন করিলেন। বরদাচার্য্য শ্রেষ্ঠীভবনের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মীদেবী বণিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রদ্ধাভরে ঐ সমস্ত প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। একে শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য, তাহাতে আবার ভক্তের ভুক্তাবশেষ, সৌভাগ্যবান বণিক এই মহাপ্রসাদ গ্রহণমাত্রেই তাহার চিত্তের মালিন্য অপগত হইল। তাহার কামভাবের আর লেশমাত্রও রহিল না। সে সাষ্টাঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কহিল—"মাতঃ! আমি মহাপরাধে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম, কলুষিতভাবে তোমার ন্যায় সতীসাধ্বীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে আমি ভস্মে পরিণত হইতাম। তোমার কৃপায় আমার চৈতন্য হইয়াছে। যাহাতে এই নরপশুর পশুত্ব বিদূরিত হয়, তোমার অভীষ্টদেবের নিকট আমাকে লইয়া যাইয়া তাহার উপায় বিধান কর। না হইলে আমার এই মহাপাপ হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই।" ইহা বলিয়া বণিক আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সতীসাধ্বী বহির্দ্দেশস্থ স্বীয় স্বামী বরদাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া বণিককে সান্ত্বনাদানানন্তর তাহাকে সঙ্গে লইয়া যতিবরের শ্রীচরণ-সন্নিকটে উপনীত হইলেন। শ্রেষ্ঠী নিজ পাপচরিত যতিবরের নিকট নিবেদন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। যতিবর শ্রীকরস্পর্শে তাহার যাবতীয় দুঃখ দূর করিলেন। বণিক কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীরামানুজ তাহাকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করিলেন। শ্রেষ্ঠিবর শ্রীরামানুজকে বহুধন দিতে গেলে, যতিবর শ্রীবরদাচার্য্যকে ঐ ধন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বরদাচার্য্য তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো! আমাকে এরূপ আদেশ করিবেন না। ধনমদে মানব পশুত্বে পরিণত হয়, ভোগের দ্রব্যের বাহুল্য ঘটিলে ইন্দ্রিয়লৌল্য বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে ভগবৎপাদপদ্ম হইতে চিত্ত বিমুখ হয়। আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছি, আমাকে এই সুখ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। ইহাতে আমাদের কোনই অভাব নাই।" যতিরাজ শিষ্যের এইরূপ নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ ভাব দর্শন করিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"তোমার ন্যায় নিস্পৃহ, শান্তিময় ভগবদ্ভক্তকে স্পর্শ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। শ্রীনারায়ণই যেন তোমাদের একমাত্র সম্পত্তিতে পরিণত হন।" এইরূপে এই আদর্শ দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যতিরাজ সশিষ্য কাঞ্চিপুরে উপনীত হইলেন। কাঞ্চিপুরে মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের সহিত ত্রিরাত্র বাস করিয়া তিনি শ্রীশৈলের পাদমূলে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীশৈলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীরামানুজ ভক্তিবিগলিত-চিত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীশৈল শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের চিরবিহারস্থল। এই জন্য রামানুজ শ্রীশৈলের উপরি-ভাগে আরোহণ করিতে চাহিলেন না এবং শ্রীশৈলের পাদদেশেই বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তদ্দেশস্থ রাজা বিট্‌ঠলদেব যতিবরের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সপার্ষদ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। বিট্‌ঠলদেব যে সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ গুরুদক্ষিণারূপে যতিরাজকে দান করিয়াছিলেন, যতিরাজ তাহা তদ্দেশস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। যতিরাজ পাদস্পর্শভয়ে শ্রীশৈলে আরোহণ করিবেন না শুনিয়া শ্রীশৈলের অধিবাসী সাধু তপস্বিগণ তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন যে, 'হে মহাত্মন্, জনসাধারণ আপনার আচরণকে প্রামাণিক মনে করিয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করিবে। আপনি যদি শৈলোপরি আরোহণ না করেন, তবে অন্য লোকে আর শ্রীশৈলে আরোহণ করিবে না। এইরূপে অর্চ্চকগণও হয় ত ভগবৎসকাশে গমন করিতে সম্মত হইবেন না। এইরূপে তাহা হইলে এই জগৎপাবন তীর্থটি লোকসমাগমের অভাবে লোপ পাইয়া যাইবে। অতএব আপনি কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীশৈলে আরোহণ করিয়া তীর্থমর্য্যাদা পালন করুন।"

যতিরাজ রামানুজ এই কথায় শৈলারোহণ করিলেন। ঐ শৈলে যতিরাজের মাতুল শ্রীশৈল যামুনাচার্য্যের স্নেহাস্পদ শিষ্য ভক্তবর বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ সপরিবার বাস করিতেছিলেন। রামানুজ শৈলারোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের পাদোদক ও প্রসাদ লইয়া শ্রীরামানুজের জন্য অগ্রসর হইলেন। রামানুজ শৈলারোহণে যখন কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, সেই সময় শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসাদ হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই ঋষিতুল্য বৃদ্ধ মহাপুরুষ স্বয়ং তাঁহার জন্য প্রসাদ বহন করিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া যতিরাজ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "হে প্রভো! আপনি নিজে এই অধমের জন্য প্রসাদ বহন করিয়া না আনিয়া একটি বালকের দ্বারা পাঠাইয়া দিলেই ত' ভাল হইত।" মহাপুরুষ শ্রীশৈলপূর্ণ ইহার উত্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যতিরাজ! আমিও তাহাই ভাবিয়া একটি সামান্য বালকের অনুসন্ধান করিতেছিলাম, কিন্তু

আমাপেক্ষা হীনমতি বালক কাহাকেও পাই নাই বলিয়া আমাকেই এই বহনভার সহ্য করিতে হইয়াছে।" শ্রীশৈলপূর্ণের এই দীনতায় মুগ্ধ হইয়া রামানুজ বলিলেন, "আজি আপনার নিকট এই দীনভাব শিক্ষা করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।" অতঃপর শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণে সশিষ্য তৃপ্ত হইলেন এবং অচিরকালের মধ্যেই শ্রীবেঙ্কটনাথের মন্দিরে উপনীত হইয়া শ্রীভগবানকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। স্বীয় শিষ্য অনন্তাচার্য্যকে তিনি পূর্ব্বেই আজীবন এই স্থানে বাসের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; অনন্তাচার্য্য আসিয়া প্রণাম করিলে যতিপতি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ সশিষ্য অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া তত্রত্য তীর্থশ্রেষ্ঠ সরোবরে স্নান করিলেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থানে ত্রিরাত্র বাস করিলেন। ঐ স্থানে রামানুজ তাঁহার প্রাণ-রক্ষাকর্ত্তা মাতৃষ্বস্রেয় ভ্রাতা ও বাল্যবন্ধু গোবিন্দকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া একান্তমনে গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া শ্রীশৈলপূর্ণের নিকটই অবস্থান করিতেছিলেন। গিরিশিখর হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট তাঁহার অনুরোধে এক বৎসর অবস্থান করেন। ঐ সময়ে মহাত্মা শৈলপূর্ণ প্রতিদিন যতিবরকে শ্রীরামায়ণ পাঠ করাইতেন, ও অতি সুললিতভাবে তাঁহার রহস্যার্থ শ্রবণ করিতেন। এইরূপে রামানুজ শ্রীরামায়ণ-রহস্যেও অভিজ্ঞ হইলেন।

গোবিন্দের গুরুভক্তি

শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট বাস করিবার সময় যতিরাজ গোবিন্দের অনুরাগপূর্ণ গুরুসেবা ও তাঁহার আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। গোবিন্দ প্রতিদিন গুরুর জন্য স্বহস্তে শয্যারচনা করিতেন। এক দিন রামানুজ দেখিতে পাইলেন, গোবিন্দ বিশেষ যত্নসহকারে শয্যারচনা করিয়া তাহাতে নিজেই কিয়ৎকাল শয়ন করিয়া থাকিলেন। রামানুজ ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া শ্রীশৈলপূর্ণকে নিবেদন করিলেন। শৈলপূর্ণ তখনই গোবিন্দকে আহ্বান করিয়া যতিরাজের সম্মুখেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ! গুরুতল্পে শয়ন করিলে কি হয়, তাহা কি তুমি জান না?" গোবিন্দ বলিলেন, "গুরুতল্পে শয়নকারীর অনন্ত নরক হয়।" শৈলপূর্ণ কহিলেন—"তবে তুমি জানিয়াও এরূপ আচরণ করিলে কেন?" গোবিন্দ বলিলেন—"আমি নরকবাসের জন্য বিন্দুমাত্র শঙ্কিত নহি। শয্যা রচনা করিয়া শয্যা সুখস্পর্শ হইল কি না, তাহাতে শয়ন করিলে সহজে আপনার নিদ্রাকর্ষণ হইবে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি নরকবাস স্বীকার করিয়াও শয্যা রচনার পর প্রতিদিন একবার শয়ন করিয়া থাকি। আমার অনন্ত নরকবাসের দ্বারা যদি আপনার কিঞ্চিৎ সুখলাভ হয়, তবে সে নরকবাস স্বর্গবাসের অপেক্ষা বহুগুণে আমার নিকট বাঞ্ছনীয়।"

রামানুজ গোবিন্দের অতুলনীয় গুরুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি এই গোবিন্দের সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজে লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন।

আর এক দিন রামানুজ দেখিতে পাইলেন যে, গোবিন্দ একটি বিষধর সর্পের মুখের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহা সবেগে টানিয়া বাহির করিলেন এবং সর্পটি যন্ত্রণায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিল। রামানুজ গোবিন্দকে বলিলেন—"ভ্রাতঃ! তোমার এরূপ সাহসের কায করা উচিত হয় নাই। ইহাতে তোমার শোণিতে বিষ সংক্রামিত হইতে পারিত। আর ঐ নিরপরাধ জীবটিও বিশেষ কষ্ট পাইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। তোমার ন্যায় সদাশয় পুরুষের কোন জীবকেই কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।"

গোবিন্দ বলিলেন—"একটি কণ্টকময় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে যাইয়া সর্পটির গলদেশে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় সর্পটি যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিল, এই জন্য আমি উহার মুখমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিয়া সেই কাঁটাটি তুলিয়া দিয়াছি, উহার আর পূর্ব্বের ন্যায় যন্ত্রণা নাই। কেবল ক্লান্তিবশতঃ নির্জ্জীবের ন্যায় পড়িয়া আছে, শীঘ্রই সুস্থ হইবে।" রামানুজ এই ব্যাপারে গোবিন্দের জীবহিতেচ্ছা-প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

শ্রীরামায়ণপাঠ শেষ হইলে বৎসরান্তে যখন যতিরাজ শ্রীশৈল-পূর্ণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, তখন শ্রীশৈলপূর্ণ রামানুজকে কহিলেন, "বৎস রামানুজ! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে আমাকে তাহা বল। অসাধ্য না হইলে আমি তাহা পূর্ণ করিব।"

যতিরাজ শৈলপূর্ণের নিকট গোবিন্দকে প্রার্থনা করিলে, শৈলপূর্ণ নিজ প্রিয়তম শিষ্য গোবিন্দকে তখনই যতি-রাজকে দান করিলেন। গোবিন্দকে লাভ করিয়া রামানুজের বহুদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। তিনি শিষ্যগণের সহিত ঘটিকাচলে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া এবং তথা হইতে পক্ষি-তীর্থে দেবদর্শন ও স্নানদানাদি পুরঃসর কাঞ্চিপুরে শ্রীবরদরাজের পাদমূলে সমাগত হইলেন। কাঞ্চিপুরে কাঞ্চিপূর্ণের সহিত ত্রিরাত্রি বাস করিয়া শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করিলেন।

গোবিন্দের শৈলপূর্ণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ থাকিলেও শৈলপূর্ণের অভিলাষ বুঝিয়াই তিনি যতিবরকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জ্ঞান করত অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবায় রত হইলেন। গোবিন্দের অসাধারণ সেবাপটুতা দেখিয়া যতিরাজের অন্যান্য শিষ্যগণ চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। এক দিন তাঁহারা গোবিন্দের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলে গোবিন্দ তদুত্তরে বলিলেন—"আমাতে প্রকাশিত এই গুণরাজি নিশ্চয়ই স্তবের যোগ্য।" গোবিন্দের এই কথায় তাঁহার প্রশংসাকারিগণ তাঁহাকে অহঙ্কৃত বিবেচনা করিয়া, এই বিষয় রামানুজকে জ্ঞাপন করিলেন। রামানুজ তৎক্ষণাৎ শিষ্যবর্গের সম্মুখে গোবিন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার সদ্‌গুণ দর্শনে ইহারা প্রশংসা করায় তোমার কি তাহাতে অহঙ্কৃত হওয়া উচিত?" গোবিন্দ বলিলেন, "প্রভু, আমি বহু-জন্মের পর মানবজন্ম লাভ করিয়াছি এবং এই জন্মেও আপনার কৃপা হইতেই বিপথ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আমি স্বভাবতঃই হীন ও জড়মতি। আপনার কৃপাতেই আমাতে যাহা কিছু প্রশংসনীয়, তাহার বিকাশ সাধিত হইয়াছে। সুতরাং মদীয় সদ্‌গুণের প্রশংসা দ্বারা আপনারই প্রশংসা হইল, ইহা মনে

করিয়াই আমি ঐরূপ বলিয়াছি।" এই কথায় সকলেই গোবিন্দের গুরুভক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন।

আর এক দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি কিছুই না করিয়া গোবিন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এক বারাঙ্গনার বহির্দ্বারে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া যতিরাজের শিষ্যগণ তদ্‌বৃত্তান্ত যতিরাজকে নিবেদন করিলেন। যতিরাজ গোবিন্দকে আহ্বান করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোবিন্দ বলিলেন, "প্রভো! ঐ অঙ্গনা অতি মধুরস্বরে রামায়ণকথা গান করিতেছিল, আমি পারায়ণ মানসে তাহা শেষ পর্য্যন্ত শুনিতেছিলাম, এই জন্য এখনও প্রাতঃকৃত্যাদি করা হয় নাই।" ইহা শুনিয়া সকলেই গোবিন্দের সরলভাব ও স্বাভাবিকী ভক্তিতে মুগ্ধ হইলেন।

গোবিন্দজননী দ্যুতিমতী এক দিন শ্রীরামানুজ-সকাশে আসিয়া বলিলেন—"বৎস। গোবিন্দ-পত্নী ঋতুমতী হইয়াছে, অতএব যাহাতে সে সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম রক্ষা করে, তাহার ব্যবস্থা কর।" মাতৃস্বসার এই কথা শুনিয়া রামানুজ গোবিন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"বৎস! অদ্য তুমি তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বধূমাতার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিও।" গোবিন্দ গুরুর আজ্ঞানুসারে সেই রাত্রিতে পত্নীপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলেন এবং পত্নীর সহিত নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গে যামিনী যাপন করিলেন। বধূমুখে রাত্রির সংবাদ শুনিয়া গোবিন্দজননী তৎসমুদায় রামানুজের নিকটে ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে যতিরাজ নিভৃতে গোবিন্দকে ডাকিয়া ঐরূপ আচরণের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন—"আপনি তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত শয়ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তদনুসারেই কার্য্য করিয়াছি। তমোগুণ পরিত্যাগ করিলে, হৃদয়-নিহিত স্বপ্রকাশ পরমপুরুষের প্রকাশ হয়। সেই প্রকাশের সম্মুখে আর কি কোনও ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তি অবস্থান করিতে পারে?"

শ্রীরামানুজ বলিলেন, "তোমার মনের অবস্থা যদি এইরূপ হইয়া থাকে, তবে তোমার আর গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থান করা উচিত নহে। তোমার পক্ষে তাহা হইলে অবিলম্বে সন্ন্যাস-গ্রহণই বিধেয়।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি এখনই প্রস্তুত।" যতিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া গোবিন্দজননী দ্যুতিমতীর আদেশ গ্রহণ করিয়া ও গোবিন্দ-পত্নীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া তখনই গোবিন্দকে পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন এবং দণ্ড ও কমণ্ডলু দান পূর্ব্বক তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দান করিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব কান্তি ও অলৌকিক তেজস্বিতা ও ভক্তিনিষ্ঠা দর্শন করিয়া রামানুজ গোবিন্দকে "মন্নাথ" আখ্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু রামানুজের নিজের নাম "মন্নাথ" ছিল বলিয়া গোবিন্দ গুরুর নাম গ্রহণে অস্বীকৃত হন। অতঃপর রামানুজ ঐ পদবী তামিলে অনূদিত করিয়া "এম্ পেরুমানার" পদ নিষ্পন্ন করেন এবং উহার আদ্যাংশ ও শেষাংশ একত্র করিয়া গোবিন্দকে "এম আর বা এমার" উপাধিদান করিলেন। উত্তরকালে শ্রীরামানুজ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এক সুপ্রসিদ্ধ মঠ স্থাপন করিয়া প্রিয়শিষ্য গোবিন্দের নামে ঐ মঠের "এমার মঠ" এই নামকরণ করেন। আজিও শ্রীশ্রীপুরীধামে এই মঠ বর্ত্তমান থাকিয়া গোবিন্দের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীভাষ্যরচনা

যতিরাজ শ্রীল রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়ের গুরুবর্গের নিকট সমগ্র উপদেশ লাভ করিয়া তামিলভাষার সমস্ত গ্রন্থে অধিকার লাভ পুরঃসর পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রপঞ্চিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্যক্‌রূপে অধিগত করিয়াছেন বলিয়া বোধ করিলেন। এইবার তিনি শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট বিশিষ্টাদ্বৈত মতের যে বেদান্ত ভাষ্য বিরচন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু শ্রীভাষ্য বিরচন করিতে গেলে পূর্ব্বাচার্য্য বোধায়নের বৃত্তি অবলম্বনেই ঐ ভাষ্য বিরচন করা উচিত, ইহা স্থির করিয়া তিনি বোধায়নবৃত্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে শুনিতে পাইলেন যে, কাশ্মীর দেশের সারদাপীঠে বোধায়নবৃত্তি বিদ্যমান। তখন রামানুজ প্রিয়তম শ্রুতিধর ও মহাপণ্ডিত শিষ্য কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরদেশে যাত্রা করিলেন। তিন মাস পরে যতিরাজ কুরেশকে লইয়া সারদা-পীঠে উপনীত হইলেন। তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রীরামানুজের সহিত শাস্ত্রালোচনায় পরিতুষ্টিলাভ করিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষভাবে সমাদর করিলেন। অতঃপর রামানুজ বোধায়নবৃত্তির উল্লেখ করিলে তথাকার অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ মনে করিলেন যে, "যখন ইঁহারও সিদ্ধান্ত মহর্ষি বোধায়নের অনুরূপ, তখন ইঁহাকে ঐ পুস্তক দেখিতে দিলে ইনি স্বমতের প্রবল সমর্থন পাইয়া, নিরতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন, এবং অদ্বৈতবাদ নিরসন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবেন।" এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পণ্ডিতগণ রামানুজকে বলিলেন—"মহাত্মন্! উক্ত পুস্তক আমাদের এখানে ছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কীটদষ্ট হইয়া তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" যতিপতি এই কথায় তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইল বলিয়া মহাদুঃখিত হইলেন এবং কাতরভাবে পীঠাধীশ্বরী দেবতা সারদা দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। রামানুজের মনোভাব অবগত হইয়া রাত্রিকালে সারদাদেবী * স্বয়ং রামানুজের নিকট আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে ঐ পুস্তক দান করিলেন এবং বলিলেন—"বৎস! তুমি এই পুস্তক লইয়া অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাও, কারণ, এস্থানের পণ্ডিতগণ ইহা জানিতে পারিলে তোমাকে এই পুস্তক দেখিতে দিবে না।" রামানুজ সরস্বতীদেবীর শ্রীচরণে প্রণতি-পুরঃসর অবিলম্বে কুরেশের সহিত সারদাপীঠ ত্যাগ করিলেন।

এই ব্যাপারের কয়েক দিন পরে সারদা-পীঠের পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রন্থাগার-সংস্কার-মানসে গ্রন্থাগার হইতে যাবতীয় পুস্তক বাহির করিয়া, উহা কীটদষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থাবলীর মধ্যে বোধায়নবৃত্তি দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং মনে করিলেন যে,

* কাহারও কাহারও মতে রামানুজ কাশ্মীরের কোনও গ্রন্থালয়ে ঐ পুস্তক প্রাপ্ত হন; কিন্তু উহার প্রতিলিপি গ্রহণের অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই, কেবল গ্রন্থটি অধ্যয়নের অনুমতি দান করা হয়। কিন্তু কুরেশ অধ্যয়ন করিবার সময়ে সমগ্র গ্রন্থখানি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন, এবং পরে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া উহা লিখিয়া ফেলেন। রামানুজ তাহারই সাহায্যে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে যে দুই জন পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই উহা অপহরণ করিয়া লইয়া যাইয়া থাকিবেন। তখনই কতিপয় বলবান্ পুরুষ গ্রন্থের অনুসন্ধানে প্রেরিত হইল এবং তাহারা দিবানিশি গমন করিয়া এক মাস পরে কুরেশের ও রামানুজের দর্শন প্রাপ্ত হইল। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, বোধায়নবৃত্তি ইঁহাদের নিকট আছে, তখন দ্বিরুক্তি না করিয়া বলপূর্ব্বক পুস্তকখানি গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে চলিয়া আসিল। রামানুজ এই ঘটনায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কুরেশ তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিয়া বলিলেন—"আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, কাশ্মীর ত্যাগ করিবার পর প্রতি রজনীতে আপনি নিদ্রিত হইলে আমি ঐ বৃত্তি পাঠ করিতাম, উহাতে সমগ্র বৃত্তিটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে, আমি এখনই উহা লিখিতে আরম্ভ করিতেছি।" এই বলিয়া তখনই লিখিতে আরম্ভ করিয়া ৫।৬ দিবসের মধ্যে উহা লিখিয়া ফেলিলেন। বোধায়নবৃত্তি লিপিবদ্ধ হইলে শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অবিলম্বে কুরেশকে লেখক করিয়া ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভাষ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি কুরেশকে বলিলেন—"তুমি আমার লেখক হইবে বটে, কিন্তু যখন ভাষ্যের কোনও স্থান তোমার নিকট শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখন লেখনী বন্ধ করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিও, তাহা হইলে উহাতে তোমার অসম্মতি বুঝিতে পারিয়া আমি ঐ বিষয়টি পুনরায় পর্য্যালোচনা করিব এবং ঐ বিষয় যদি ভ্রমাত্মক মনে হয়, তবে তাহা তখনই পরিবর্ত্তন করিব।" এইরূপে যতিরাজ শ্রীভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, সমগ্র ভাষ্য লিখনকালে কুরেশকে মাত্র একবার লেখনী বন্ধ করিতে হইয়াছিল। যখন রামানুজ শ্রীভাষ্যে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে লিখিতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন—"জীব স্বরূপতঃ নিত্য ও জ্ঞাতা।" কুরেশ অমনই গুরুর পূর্ব্বাদেশের অনুসরণ করিয়া লেখনী বন্ধ করিলেন, রামানুজ লিখিতে বলিলেও কুরেশ তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া রামানুজ বিরক্ত হইয়া কুরেশকে বলিলেন, "কুরেশ, তুমিই তবে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন কর।" ইহাতেও কুরেশ বিচলিত হইলেন না; তখন যতিবর ঐ বিষয়টি পুনরায় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার গীতার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই বাক্য স্মরণ হইল। সুতরাং জীব যে স্বতন্ত্র নহে, পরন্তু ঈশ্বরেরই অধীন, রামানুজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া জীবকে বিষ্ণুশেষত্ব-সংযুক্ত ও জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। কুরেশের লেখনী তখন অব্যাহতভাবে চলিতে লাগিল। এইরূপে শ্রীভাষ্য রচনা শেষ হইল।

রামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করিয়া নির্ব্বিশেষবাদ, মায়াবাদ খণ্ডন করিলেন। পরে এই মত প্রপঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, বেদার্থসংগ্রহ ও গীতাভাষ্য রচনা করিলেন। এইরূপে তিনি শ্রীযামুনমুনির নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা অধ্যাপনা করিয়া ঐ সকল প্রবন্ধকে দ্রাবিড়বেদ নামে আখ্যাত করিয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট কৃত দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন।

শিষ্যবৈভব

যতিরাজ অতুলনীয় শিষ্যবৈভবের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে গোবিন্দ বরদাচার্য্য, কুরেশ ও অনন্তাচার্য্যের কিছু কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য শিষ্যগণের পরিচয় প্রদান এ স্থলে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। রামানুজের শিষ্য কুরেশও বাৎস্যায়নগোত্রসম্ভূত মহাধনবান ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন। অণ্ডাল নাম্নী তাঁহার অনুরূপা সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দরিদ্র-সেবায় নিরত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি শ্রীরামানুজকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। যতিরাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি স্ত্রীর সহিত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতেন। তিনি বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, তিনি একবার যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিতেন, তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না। যাদব-প্রকাশ ইঁহার নিকট বাদে পরাভূত হইয়া রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনিই সুবিখ্যাত বোধায়নবৃত্তি কণ্ঠস্থ করিয়া পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কাঞ্চিপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে কুরুঅগ্রহার নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন। কুরুঅগ্রহারের ভূস্বামী বলিয়াই তিনি কুরেশ বা কুরনাথ নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহার বিপুল বৈভব দরিদ্রসেবায় ব্যয়িত হইত। প্রতিদিন ঊষাকালে ইঁহার ভবনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকিত। শ্রীরামানুজ যখন কাঞ্চিপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে চলিয়া গেলেন, তখন এই ঐশ্বর্য্য আর কোনও প্রকারে কুরেশের প্রীতিকর হইতেছিল না। কথিত আছে, ঐ সময়ে একদা গভীর রজনীতে কুরেশের বিশাল অট্টালিকায় লৌহদ্বাররোধধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাঞ্চিপুরের শ্রীবরদরাজ মন্দিরের লক্ষ্মীদেবী কাঞ্চিপূর্ণকে উক্ত ধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কাঞ্চিপূর্ণ কুরেশের দরিদ্রসেবার বৃত্তান্ত নিবেদন করেন এবং বলেন যে—"প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত দীন, অন্ধ, খঞ্জ ও অনাথগণের সেবা চলিতেছিল, এখন পরিচারকরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার জন্য বিশাল ধর্ম্মশালার দ্বার রুদ্ধ করিল। ঐ সুবৃহৎ লৌহ-কবাট-রোধের শব্দই আপনি শুনিয়াছেন।" ইহাতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী চমৎকৃত হইয়া কাঞ্চিপূর্ণকে কহিলেন,—"বৎস! উক্ত মহাত্মাকে প্রভাতে আমার নিকট লইয়া আসিও, আমি তাঁহাকে দর্শন করিব।" প্রভাতে কাঞ্চিপূর্ণ কুরেশকে এই কথা বলিলে কুরেশ অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়া উঠিলেন—

"কাহং কৃতঘ্নো দুর্ম্মনাঃ পাপিষ্ঠঃ পরবঞ্চকঃ।
ক্বাসৌ লক্ষ্মী জগন্মাতা ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দিতা॥"

আমার ন্যায় কৃতঘ্ন, দুর্ম্মনা, পাপিষ্ঠ, পরবঞ্চকই বা কোথায় আর ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দিতা জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবীই বা কোথায়? আমি মহাব্যাধিগ্রস্ত চণ্ডালাপেক্ষাও নরাধম, আমি তাঁহার দর্শনের অধিকারী নহি, জানি না, ইহজীবনে কখনও তাঁহার দর্শনের অধিকারী হইব কি না, তবে আমি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। আমার বিষয়-বিষ্ঠা-প্লুত দেহ-মন শ্রীগুরুদেবের কৃপাসুরধুনী ব্যতীত আর কিছুতেই পবিত্র হইতে পারে

না। আমি জগন্মাতার দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলাম। শ্রীগুরুপাদরজে সুস্নাত হইয়া আমি যদি এ ক্লেদ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে আপনার ন্যায় মহানুভবের আশীর্ব্বাদে হয় ত ইহজীবনেই আমি জগন্মাতার চরণ দর্শনের অধিকার লাভ করিব।" এই বলিয়া কুরেশ তখনই অঙ্গ হইতে বহুমূল্য মণিময় আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীরঙ্গমের দিকে যাত্রা করিলেন। সহধর্ম্মিণী অণ্ডালও সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। কেবল স্বামী তৃষ্ণাতুর হইলে তাঁহাকে জল পান করাইবার জন্য একটি স্বর্ণপাত্রমাত্র সঙ্গে লইলেন। কাঞ্চিপুর ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা বন-পথ আশ্রয় করিলেন। দুর্গম অরণ্যের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া অণ্ডাল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! এখানে ত' কোনও ভয় নাই?" কুরেশ বলিলেন, "ধনবানদিগের চৌর ও দস্যুর ভয় হইয়া থাকে, তোমার সহিত যদি কোনও অর্থাদি না থাকে, তাহা হইলে ভয় নাই।" এই কথায় অণ্ডাল তখনই স্বর্ণপাত্রটি দূরে ফেলিয়া দিয়া স্বামীর অনুসরণ করিলেন। শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলে রামানুজ তাঁহাদিগকে স্নানভোজনাদি করাইয়া বাসের জন্য একটি ভিন্ন বাটী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

কুরেশ ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া শাস্ত্রালোচনা, শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন ও গুরুসেবার দ্বারা অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা অণ্ডালও তাঁহার সেবা করিয়া পরমানন্দে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পতি-পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা তিনি স্মরণও করিতেন না। এক দিন বেলা দ্বিপ্রহর গত হইয়া গেল, তথাপি প্রাতঃকাল হইতে যে মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, তাহা থামিল না, সুতরাং ঐ দিন আর কুরেশ ভিক্ষায় বহির্গত হইতে না পারিয়া সস্ত্রীক অনাহারেই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলেন। কিন্তু অণ্ডাল পতির উপবাস দেখিয়া মনে মনে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীকে তাহা জানাইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চক নানাবিধ বহুমূল্য প্রসাদ আনিয়া কুরেশকে অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কুরেশ ইহাতে বিস্মিত হইয়া অণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি মনে মনে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলে? নতুবা আমরা যে সকল দ্রব্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তিনি তাহা পাঠাইলেন কেন?" অণ্ডাল অশ্রুপূর্ণলোচনে নিজের প্রার্থনার কথা জানাইয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কুরেশ কহিলেন—"যাহা করিয়াছ, তাহার আর প্রতীকার নাই, কিন্তু আর কখনও ওরূপ করিও না।" এই বলিয়া তিনি সেই মহাপ্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া অণ্ডালকে তৎসমস্ত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং নিজে বারংবার শঠারিসূক্ত গান করিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

এই প্রসাদ গ্রহণের পরেই অণ্ডাল গর্ভবতী হইলেন এবং দশ মাস পরে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। শ্রীরামানুজ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ নবকুমারদ্বয়ের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য গোবিন্দকে প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ তাঁহাদিগকে শ্রীনারায়ণচরণে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর যতিরাজ শিশুদ্বয়কে ধারণ করাইবার জন্য শ্রীবিষ্ণুর পাঞ্চজন্য, সুদর্শন, কৌমোদকী, নন্দক ও শার্ঙ্গ এই পঞ্চাস্ত্র সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ছয় মাস উত্তীর্ণ হইলে, যতিরাজ জ্যেষ্ঠের নাম পরাশর ও কনিষ্ঠের নাম ব্যাস রাখিলেন। এইরূপে যতিরাজ তাঁহার তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। এই শিশু দুইটিকে সকলেই শ্রীরঙ্গনাথের পুত্র বলিয়া জানিত! কারণ, শ্রীরঙ্গনাথের প্রসাদভক্ষণেই অণ্ডাল গর্ভবতী হইয়া ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পরাশর শিশুকাল হইতেই অতিশয় প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। এক দিন সর্ব্বজ্ঞ ভট্ট নামক এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দামামা বাজাইয়া রাজপথ দিয়া ঘোষণা করিয়া যাইতেছিল, "জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বজ্ঞ ভট্ট সশিষ্য গমন করিতেছেন, যে কেহ বিচার করিতে চাহেন বা তাঁহার শিষ্য হইতে চাহেন, তিনি তাঁহার পাদমূলে আগমন করুন।" ঐ চারি বৎসরের উলঙ্গ বালক পরাশর দামামাবাদকের ঐ কথা শুনিয়া এক অঞ্জলি ধূলি লইয়া হাসিতে হাসিতে সর্ব্বজ্ঞের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি ত' সর্ব্বজ্ঞ, বলুন দেখি আমার হাতে কতগুলি ধূলি আছে?" দিগম্বর শিশুর এই কথায় সর্ব্বজ্ঞের জ্ঞান হইল। তিনি বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"বৎস! তুমি আমার গুরু, তোমার প্রশ্নে আমার চৈতন্যলাভ হইয়াছে।"

উপনয়নের পর গোবিন্দ যখন ভ্রাতৃদ্বয়কে উপনিষদ্ পাঠ করাইতেছিলেন, তখন এক দিন গোবিন্দের মুখে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া বালক পরাশর জিজ্ঞাসা করিল, "এক জনের এই দুইটি বিপরীত গুণ কি প্রকারে সম্ভব হয়?" গোবিন্দ বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। কিশোর বয়সেই শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের কোনও আত্মীয়ের কন্যার সহিত পরাশরের বিবাহ দিয়াছিলেন।

যতিরাজ রামানুজ আর এক ব্যক্তির জীবনে কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীরঙ্গমে গরুড়োৎসব নামক এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দিবস শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ সর্ব্বজনসমক্ষে শোভাযাত্রায় বহির্গত হন। ঐ দিবস দর্শনার্থী বহু ভক্ত ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমের শ্রীমন্দিরে সমাগত হইয়া থাকেন। ঐ দিবস জনতার মধ্যে দেখা গেল যে, এক মহা বলবান্ পুরুষ একটি সুন্দরী যুবতী রমণীর পশ্চাতে ছত্র হস্তে শোভাযাত্রামধ্যে চলিতে চলিতে রমণীটিকে আতপ-তাপ হইতে রক্ষা করিতেছিল এবং একদৃষ্টে নির্লজ্জভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। শোভাযাত্রার সকল নর-নারীর মনই শ্রীরঙ্গনাথজীর উপর নিবদ্ধ; কিন্তু এই যুবকটির মন-প্রাণ ঐ যুবতীটির উপরই ন্যস্ত ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক লোকই এই ব্যাপারে অনেকরূপ কাণাকাণি করিতেছিল; কিন্তু যুবকের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। যতিরাজ ইহা দেখিতে পাইয়া কোনও শিষ্যের দ্বারা পুরুষটিকে আহ্বান করিয়া নিজের নিকটে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! তুমি ঐ যুবতীটির মধ্যে এমন কি পাইয়াছ যে, লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া এই বিপুল জনতার মধ্যেও মহাকামুকের ন্যায় ঐ যুবতীটির দিকে চাহিয়া আছ?" যুবক বলিল, "প্রভো! ঐ সুন্দরীর নয়ন-যুগল পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্যের অপেক্ষা আমার নিকট সুন্দর বলিয়া

বোধ হয়। আমি ঐ নয়ন-যুগল দেখিলে উন্মত্ত হইয়া পড়ি, আমার আর অন্য কোনও জ্ঞান থাকে না।" রামানুজ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এই যুবতীটি যুবকের বিবাহিতা পত্নী নহে। যুবকটি মল্লবিদ্যায় নিপুণ, তাহার নাম ধনুর্দ্দাস এবং যুবতীটির নাম হেমাম্বা। তখন রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে বলিলেন—"ধনুর্দ্দাস, যদি আমি তোমাকে ঐ যুবতীটির নয়ন অপেক্ষা আরও সুন্দরতর নয়নযুগল দেখাইতে পারি, তবে তুমি উহাকে ছাড়িয়া সেই নয়ন-যুগলের অধিকারীকে ভালবাসিতে পারিবে কি না?" ধনুর্দ্দাস বলিল, "যদি আমার প্রণয়িনীর নয়ন অপেক্ষা আর কাহারও সুন্দরতর নয়ন থাকে, তবে আমি উহাকে ছাড়িয়া তাহারই ভজনা করিব।" রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন। ধনুর্দ্দাস "যে আজ্ঞা' বলিয়া পূর্ব্ববৎ যুবতীর পার্শ্বে ছত্রধারী হইয়া গমন করিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে ধনুর্দ্দাস যতিরাজের নিকট আসিলে যতিরাজ তাহাকে লইয়া পাঁচটি গোপুর অতিক্রম করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মূল মন্দিরে সমাগত হইলেন। যে স্থানে শান্তাকৃতি, ভুজগবাহন পদ্মনাভদেব বর্ত্তমান ছিলেন, সে স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীল রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, "প্রভুর অনুপম মাধুর্য্যময় রূপ দেখিবার জন্য তোমার অপূর্ব্ব সামর্থ্য লাভ হউক।" অর্চ্চক যতিরাজকে দর্শন করিয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক কর্পূর গ্রহণ পুরঃসর ভগবানের আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরামানুজের কৃপাশীর্ব্বাদে ধনুর্দ্দাস শ্রীরঙ্গনাথজীর সুবিশাল পদ্মপলাশতুল্য নয়নদ্বয় দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং দরবিগলিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ত্রিজগতে যে নয়নমাধুর্য্যের তুলনা নাই—হেমাম্বার নয়নমাধুরীর কি তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে? ধনুর্দ্দাসের হৃদয় হইতে হেমাম্বার নয়নমাধুরীর স্মৃতি তিরোহিত হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া ভগবৎ-মাধুর্য্যসাগরে ডুবিয়া গেলেন। যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিল, তখন তিনি স্বপার্শ্বস্থিত যতিরাজের শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—"ভগবন্! আপনার অপার করুণায় এ কাম-পরায়ণ নরপশু আজ ধন্য হইল। আপনি আমাকে যে অপার্থিব আনন্দের অধিকারী করিলেন, তাহাতে আমি চির-কালের জন্য আপনার শ্রীচরণে বিক্রীত হইলাম। হায়! আমি এত দিন অমৃতসাগর তুচ্ছ করিয়া—তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখের অন্ধকূপে নিমজ্জিত ছিলাম। আমার ন্যায় মূঢ়ের আপনিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। আমি অদ্য হইতে আপনার চিরদাস হইলাম।"

পতিতপাবন যতিরাজ তাঁহাকে পঞ্চ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দীক্ষাদান করিলেন। হেমাম্বাও প্রিয়তমের এই সৌভাগ্যলাভে আনন্দিত হইল। সে ধনুর্দ্দাসকে পতির ন্যায় ভক্তি করিত। সে-ও ইন্দ্রিয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া যতিরাজের শ্রীচরণ আশ্রয় করিল। করুণাময় যতিরাজ তাহাকেও মোহান্ধকার হইতে উদ্ধার করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে কাম-সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে ভগবৎসেবামূলক প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। পতি-পত্নীর ন্যায় একত্র থাকিলেও তাঁহাদের মন নির্ম্মল হইয়া যাওয়ায় ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা আর তাহাদিগের চিত্তে স্থান পাইল না। তাহারা পূর্ব্ববাসস্থান ত্যাগ করিয়া যতিরাজের সন্নিকটে একটি গৃহ লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। ধনুর্দ্দাসের বৈরাগ্য, গুরুভক্তি, বিনয়, সরলতা ও মধুরভাষিতা প্রভৃতি গুণে যতিরাজ তাহার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রত্যহ কাবেরী-স্নানে যাইবার কালে দাশরথির করগ্রহণ করিয়া গমন করিলেও ধনুর্দ্দাসের হস্ত গ্রহণ করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ নিরতিশয় দুঃখিত হইত এবং কেহ কেহ যতিরাজের নিকট ইহার জন্য অনুযোগ পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কিন্তু যতিরাজ কোনও কথা না বলিয়া ইহাদিগকে ধনুর্দ্দাসের মহিমা প্রদর্শন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। যতি-রাজের ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ পরিধেয় বস্ত্র রাত্রিকালে রজ্জুর উপরি বিস্তৃত করিয়া রাখিত। শিষ্যেরা সকলে নিদ্রিত হইলে যতি-রাজ একদা প্রতি শিষ্যের বস্ত্রাঞ্চল হইতে কৌপিনোপযোগী কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া লইলেন। প্রভাতে শিষ্যগণ শয্যা হইতে উঠিয়া স্ব স্ব বস্ত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া পরস্পরের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। প্রায় এক প্রহরকাল এইরূপ কলহ চলিবার পর রামানুজ তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন। ঐ রজনীতেই তিনি কতিপয় ব্রাহ্মণ শিষ্যকে গোপনে কহিলেন—"দেখ, আমি অদ্য ধনুর্দ্দাসকে কথাচ্ছলে আমার নিকট বহুক্ষণ বসাইয়া রাখিব। তোমরা ঐ সময়ে তাহার প্রণয়িনী নিদ্রিত হইলে তাহার অঙ্গ হইতে যাবতীয় অলঙ্কার অতি সঙ্গোপনে আহরণ করিয়া আন। দেখিব, উহাতে ধনুর্দ্দাস বা তাহার প্রণয়িনীর কোনওরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হয় কি না।" গুরুবাক্যানুসারে শিষ্যগণ গভীর রজনীতে ধনুর্দ্দাসের গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিল যে, হেমাম্বা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া আছে। পতির প্রত্যাগমনের আশায় সে দ্বারে অর্গল বদ্ধ না করিয়াই শয়ন করিয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করিয়া অতি সাবধানে তাহার অঙ্গ হইতে যাবতীয় স্বর্ণাভরণ উন্মোচন করিতে লাগিল। বাস্তবিক হেমাম্বা ঐ সময়ে নিদ্রিতার ন্যায় ভাণ করিলেও সে পতির প্রতীক্ষায় নিদ্রিতা হয় নাই। কিন্তু তাহাকে জাগ্রত বুঝিতে পারিলে পাছে ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করে, এই জন্য সে স্থির হইয়া রহিল, ব্রাহ্মণগণ এক পার্শ্বের অলঙ্কার গ্রহণ করিলে অন্য পার্শ্বের অলঙ্কারগুলিও তাহাদিগকে দিবার জন্য নিদ্রাভিভূতার ন্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। ব্রাহ্মণগণ তাহাতে হেমাম্বা জাগ্রত হইয়াছে, এই আশঙ্কায় এক পার্শ্বের অলঙ্কার লইয়াই পলায়ন করিল এবং যতিরাজের নিকট তাবৎ বৃত্তান্ত গোপনে নিবেদন করিল। যতিরাজ তখন ধনুর্দ্দাসকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস! রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন গৃহে গমন কর।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া ধনুর্দ্দাস গৃহে গমন করিলে রামানুজ তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে বলিলেন—"তোমরা গোপনে উহাদের গৃহ-সন্নিকটে অবস্থান করিয়া উহাদের কথোপকথন শুনিয়া আইস।" শিষ্যগণ যাইয়া লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া শুনিতে পাইল, ধনুর্দ্দাস গৃহে গমন করিয়া পত্নীকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া কহিলেন, "এ কি, তোমার এক পার্শ্বের অলঙ্কার কি হইল?" হেমাম্বা বলিল, "প্রভো! কতিপয় ব্রাহ্মণ গৃহে অভাববশতঃ আমার এই অলঙ্কার-গুলি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি তৎকালে শয্যায় শয়ন করিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষায় মনে মনে ভগবন্নাম

জপ করিতেছিলাম। তাঁহারা আমাকে নিদ্রিতা জ্ঞানে এক পার্শ্বের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইলে—আমি অপর পার্শ্বের গুলিও তাঁহাদিগকে দিবার জন্য নিদ্রার ভাণে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা আমি জাগ্রত হইয়াছি মনে করিয়া ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন।" ইহা শুনিয়া ধনুর্দ্দাস কহিলেন—"তুমি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে যাইয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছ। তোমার অহঙ্কার এখনও গেল না, আমার দেহ, আমার অলঙ্কার, আমি দান করিব, এই দুর্ব্বুদ্ধিতেই তুমি এই অলঙ্কাররূপ পাপভার হইতে মুক্তিলাভের সুযোগ হারাইলে। তুমি যদি শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকিতে, তাহা হইলে তাঁহারা তোমাকে সুনিদ্রিতা মনে জানিয়া সকল অলঙ্কারই লইয়া যাইতে পারিতেন। যদি মঙ্গল চাও, তবে এখনই এই অহঙ্কার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা কর।" হেমাম্বা ইহা শুনিয়া আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "প্রিয়তম! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর আমি অহঙ্কারের বশীভূতা না হই।"

ব্রাহ্মণগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত রামানুজ-সকাশে নিবেদন করিলেন। রামানুজ রাত্রি অধিক হওয়ায় তাঁহাদিগকে গৃহে গমন করিতে বলিলেন। পরদিন শিষ্যগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অধ্যয়নার্থ সমাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে পণ্ডিতগণ! তোমরা শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করিয়া থাক, কিন্তু তোমরা পূর্ব্বদিন স্ব স্ব বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন দেখিয়া যেরূপ কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে ও গত রজনীতে সপত্নীক ধনুর্দ্দাস বহুমূল্য আভরণ অপহৃত হইলেও যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কোন্ আচরণটি ব্রাহ্মণোচিত হইয়াছে, তাহা বল।"

সকলেই লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"ধনুর্দ্দাসই ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করিয়াছেন, আমাদের আচরণ নিতান্ত নীচজনোচিত হইয়াছে।" তখন যতিরাজ বলিলেন—"বৎসগণ! জাতি কল্যাণের কারণ নহে, গুণই কল্যাণের কারণ, সুতরাং সকলে জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া গুণবান্ হইতে চেষ্টা কর। শুদ্ধ উত্তম জাতিতে জন্মিয়াছ বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইলে জাতিই পতনের কারণ হইয়া থাকে। আমি ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মিয়াছি, অতএব ব্রাহ্মণোচিত কর্ত্তব্য আমার অবশ্য অবলম্বনীয়—আবার এইরূপ জাতিবুদ্ধিই আত্মরক্ষার কারণ হইয়া থাকে।" এই ব্যাপারে রামানুজের ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ চৈতন্য লাভ করিলেন।

ধনুর্দ্দাস, গোবিন্দ ও কুরেশের ন্যায় বহু মহানুভব শিষ্য রামানুজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া তৎপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমের মঠে যাঁহারা অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ কৃতবিদ্য, ত্যাগী ও ভক্তিমান চতুঃসপ্ততি শিষ্য ছিলেন। সমগ্র বেদ ও দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা ইঁহাদের কণ্ঠস্থ ছিল। ইঁহাদিগকে সিংহাসনাধিপতি বা পীঠাধিপতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই সকল শিষ্যের গুণাবলী আলোচনা করিলে শ্রীল যতিরাজ যে কি পরিমাণে শক্তিশালী ছিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করা যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম. এ, বি, এল)।

নদী ও পুষ্করিণী

পুষ্করিণী নদীরে ডাকিয়া কয়,—
এম্‌নি করিয়া উজাড় হইয়া বোন,
আপনারে দেওয়া উচিত কখনো নয়।
জ্যৈষ্ঠের খরা মনে যেন সদা রয়।

আমি তো কখনো ধারিনে কাহারো ধার।
দিতে হয় পাছে কাহারে বিন্দু জল,
কঠিন করিয়া বেড়িয়া চারিটা ধার—
তুলিয়া দিয়াছি বিরাট উচ্চ পাড়!

তটিনী কহিল,—দুঃখ কি কবো মোর?
না দিয়া আমি যে থাকিতে পারি না ভাই,
দেওয়া শুধু জানি,—দেওয়ায় জীবন মোর।
দেওয়া-স্রোতে তাই চলেছি জীবন-ভোর!

নিদাঘের শেষে দগ্ধা ধরিত্রীর—
সারাটি বক্ষ ফেটে হোলো চৌচির।
রৌদ্রে সে যেন হানিছে অগ্নি-তীর—
পুষ্করিণীর ক্রমশঃ শূন্য নীর!

কাঁদিয়া কহে সে তুমি তো এখনো বোন,
তেম্‌নি চলেছো তুলি কল্লোল-স্বন।
আমার এ যেন আসে অন্তিম-ক্ষণ,
আমারি শুধু যে শূন্য মন!

তটিনী কহিছে—তখন বোঝোনি ভাই,
দাও নাই তুমি, তাই আজি তুমি নাই।
সিন্ধুর সনে রেখেছিনু আমি যোগ,
বিশ্বে আজিও বাঁচিয়া রয়েছি তাই।

দেওয়াতেই রয় ভূমার সঙ্গে যোগ,
যে দেয়, সে কভু করে না মৃত্যু-ভোগ!

শ্রীসাহাজী

১১

বাঘের ঘরে ঘোগ

ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনী মিস্ এনিড ফরেষ্ট যে কক্ষে নীত হইয়াছিল, ভার্ণি ও ক্যারো দলপতি মুলিঙ্গারের আদেশে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বারান্দায় আসিল। মুলিঙ্গার বারান্দার রেলিংএ ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সহকর্ম্মিদ্বয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভার্ণি ও ক্যারো মুলিঙ্গারের ইঙ্গিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে মুলিঙ্গার বলিল, "দেখ, এখন আর উহাদের পীড়ন করিও না, আমরা এই সুযোগে উহাদিগকে হত্যা করিয়া যদি এক জোড়া বস্তায় পুরিয়া, এবং পাথর বাঁধিয়া ও পাশের বারান্দা হইতে নীচে নদীর ভিতর ফেলিয়া দিতাম, তাহা হইলে উহাদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ কেহই জানিতে পারিত না, উহারা চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হইত। এ অল্প সুবিধার কথা নয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বে সুযোগ পাইয়াও যে উদ্দেশ্যে উহাদিগকে হত্যা করি নাই, ল্যাংটনের নিকট হইতে কৌশলে পত্রখানি আদায় করায়, আমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং উহাদিগকে জীবিত রাখিবার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার একটু সন্দেহ হইয়াছে; মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কে সন্ধান লইয়া যদি জানিতে পারি, ল্যাংটন ফটোখানি গচ্ছিত রাখে নাই, সে আমার সঙ্গে চালবাজি করিয়াছে, তাহা হইলে আমার সকল আশাই বিফল হইবে। ফটোখানি পাওয়ার পর উহাদিগকে সাবাড় করা কঠিন হইবে না। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

ক্যারো ও ভার্ণি শঙ্কাকুল-নেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। পুলিস তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছে, তাহাদের সন্ধানে ঘুরিতেছে। এ অবস্থায় প্রণয়ি-যুগলকে হত্যা করা হইলে পুলিস যদি সে জন্য তাহাদিগকে দায়ী করে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নরহত্যার অভিযোগে দায়রা সোপরদ্দ করে, তাহা হইলে বিচারে তাহাদের অতি কঠোর দণ্ড হইতেও পারে; এই কথা চিন্তা করিয়া তাহারা উভয়েই আতঙ্কাভিভূত হইয়াছিল।

মুলিঙ্গার তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। এখন উহাদের কোন অনিষ্ট করিব না; তোমরাও কিছু করিও না। আগে আমি উহার পত্রের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসি। ল্যাংটন যদি আমার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে ফটোখানি হস্তগত হইলেই আজ রাত্রিতে উহাদিগকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ এ ভাবে সরাইয়া ফেলিব যে, কেহই আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না; সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তাড়াতাড়িতে থি অ্যাসে ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটা ফেলিয়া আসিয়াছি। রমেড আমাকে যে রকম তাড়া করিয়াছিল, তাহাতে আমাকে বাপের নাম পর্য্যন্ত ভুলিতে হইয়াছিল, ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটা আনিতে ভুল হওয়া ত সামান্য কথা! তবে শিশিটা আনিতে পারিলে কায অনেক সহজ হইত! উহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া বস্তায় পুরিয়া নদীতে ফেলিয়া দিলেই চলিত। উহারা নির্ব্বিঘ্নে ডুবিয়া মরিত; অস্ত্রের সাহায্যে খোঁচাখুঁচি করিবার কোন প্রয়োজন হইত না।"

ক্যারো সাহস সঞ্চয় করিয়া তাহার কোমরবন্ধস্থিত ছোরার খাপ হইতে ছোরা বাহির করিল, এবং তাহা মুলিঙ্গারকে দেখাইয়া বলিল, "ক্লোরোফর্ম্মের শিশি আনিতে তোমার ভুল হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ত এই হাতিয়ার ফেলিয়া আসি নাই; ইহার আঘাতে উহাদিগকে সাবাড় করিতেও অধিক সময়ের দরকার হইবে না, উহাদের মুখ বাঁধা আছে, চীৎকার করিতে পারিবে না; আর মৃত্যু-যন্ত্রণায় উহারা চীৎকার করিলেই বা তাহা শুনিবে কে ?"

মুলিঙ্গার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তোমার হাতিয়ার রাখ। এক এক গুলীতে উহাদিগকে সাবাড় করাই ভাল। তাহার পর যাহা বলিয়াছি, বস্তাবন্দী করিয়া লাস দুটো অরওয়েলে ফেলিয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চম্পট দান করিব; তখন রাত্রির ট্রেণ ধরিবার সময় থাকিবে। কিন্তু আমার আর বিলম্ব করা হইবে না; ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার পূর্ব্বে সেখানে গিয়া ফটোখানি আদায় করিতে হইবে।"

মুলিঙ্গার আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি নীচের ঘরে আসিল, এবং ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে নূতন

ছদ্মবেশের কতকগুলি সরঞ্জাম বাহির করিল। সে চেয়ারে বসিয়া আয়নার সাহায্যে ছদ্মবেশে সজ্জিত হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার মুখাকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। তাহার মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ, চোখে সোণার ফ্রেমের চশমা। ললাটের মাংস শিথিল। তাহাকে তখন দেখিলে মনে হইত, সে ষাট বৎসর বয়সের পক্ককেশ সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ। মুখে সদাশয়তার চিহ্ন পরিস্ফুট।

মুলিঞ্জার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে ভার্ণি ও ক্যারোকে অপেক্ষা করিতে দেখিল। তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্তব্ধভাবে তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিল; কিন্তু তাহারা উভয়েই অত্যন্ত গম্ভীর এবং তাহাদের চোখে মুখে বিদ্রোহের ভাব সুস্পষ্ট। তাহাদের চক্ষুতে গভীর অবিশ্বাস ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

মুলিঞ্জার তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সে তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, বুকের পকেটে হাত পুরিয়া রিভলভারটা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর গোখ্‌রো সাপের মত অচঞ্চল হিংস্র দৃষ্টিতে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আবার কি খবর? আমি কি বলি নাই, এখানে আমার আর বিলম্ব করা চলিবে না?"

তাহার কথা শুনিয়া ভার্ণি তাহার দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "হাঁ, সে কথা আমাদের স্মরণ আছে; কিন্তু আমাদেরও তাড়াতাড়ি দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমি ক্যারোর সঙ্গে সেই কথারই আলোচনা করিতেছিলাম। কথা এই যে, তুমি ত ল্যাংটনের ব্যাঙ্কের চিঠি লইয়া সরিয়া পড়িতেছ, তুমি ফটোখানি হাতে পাইয়া আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না—ইহা আমরা কিরূপে জানিব? আর, তোমাকে ত আমরা চিনি; আমাদের ফাঁকি দেওয়া তোমার উদ্দেশ্য নয়, ইহার প্রমাণ কোথায়?"

মুলিঞ্জার আহত সর্পের মত ফোঁস্ করিয়া উঠিল; তাহার পর বিকৃত স্বরে বলিল, "সত্য না কি? আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা করিব কি না, তাহার প্রমাণ চাও? সত্যই কি আমাকে প্রমাণ দিতে হইবে?"

ভার্ণি বলিল, "কি অন্যায় কথা বলা হইয়াছে? তুমি আমাদিগকে ফাঁকি দিলে কে তোমাকে—"

"কে আমাকে আটকাইবে? এই কথা তোমরা বলিতে চাও? হী হী!" মুলিঞ্জার এই কথা বলিয়া এ ভাবে হাসিয়া উঠিল যে, সেই হাসি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ। সেই বিকট হাস্যধ্বনি শুনিয়া ভার্ণি ও ক্যারো উভয়েই সভয়ে দ্বারপ্রান্তে সরিয়া গেল। তাহাদের মুখ শুকাইল। ভার্ণির স্পর্দ্ধিত ভাব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। তাহারা যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে!

মুলিঞ্জার তাহার পকেটের রিভলভারটা বাহির করিয়া তাহা পরীক্ষা করিল; তাহার পর তাহা পুনর্ব্বার পকেটে রাখিয়া অবজ্ঞাভরে নীরসস্বরে বলিল, "তোমরা একান্ত গাধা! যদি আমাকে বিশ্বাস করিতে তোমাদের প্রবৃত্তি না হয়, সে জন্য দায়ী কি আমি? তোমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের জন্য আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে? আমাদের এক জনকে সেই ব্যাঙ্কে গিয়া ফটোখান আনিতে হইবে ত? আমি জানি, তোমরা সেই ভার লইবার উপযুক্ত নও; তোমরা কি বলিতে গিয়া কি বলিবে। তাহাদের জেরায় ঘাবড়াইয়া যাইবে; সকল কায নষ্ট করিবে। এ কাযে বুদ্ধি চাই, সে বুদ্ধি তোমাদের নাই, আমার আছে; এই জন্যই আমাকে ব্যাঙ্কে যাইতে হইতেছে। চিঠিখান আমিই কৌশল খাটাইয়া সংগ্রহ করিয়াছি; ফটোখানাও আমাকেই সংগ্রহ করিতে হইবে। সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইয়াছি; এখন কি তুমি আমাকে বাধা দিতে চাও, ভার্ণি?"

ভার্ণি নিরুত্তর; তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

মুলিঞ্জার হাসিয়া বলিল, "আমার কথা মন দিয়া শোন। আমি একটা জরুরী কাযে বাহির হইয়াছি; আমার সময় নষ্ট করিও না। আমি কায শেষ করিয়া আজ রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিব। আমার এ কথা তোমরা বিশ্বাস করিতে পার। আমি ফিরিয়া আসিয়া আমাদের পথের কাঁটা দুটোকে সরাইয়া ফেলিব। কিরূপে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পর, এ স্থান ত্যাগ করিয়া ফটোর সাহায্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিব। আশা করি, তাহাতে আমাদের সকল অভাব দূর হইবে। তখন আমরা নির্ব্বিঘ্নে এ দেশ ত্যাগ করিতে পারিব। বুঝিয়াছ?"

মুলিঞ্জার মুখে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে বলিল, "ল্যাংটন ও ছুঁড়ীটাকে আগে ত সাবাড় করি;

তাহার পর ভার্ণি ও ক্যারোকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। আমার হাতের কায শেষ হইলে উহাদের আর সাহায্য লইবার প্রয়োজন হইবে না। তখন ছেঁড়া জুতার মত উহাদিগকে ত্যাগ করিব।"

অতঃপর একটি সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ সেই উদ্যানভবনের বাহিরে আসিল। সে পথে আসিয়া রেলষ্টেশনগামী ব্যস পাইল। সেই ব্যসে চাপিয়া সে যখন ইপ্‌স উইচের ষ্টেশনে আসিল, তখন ট্রেণ আসিবার কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইলে ছদ্মবেশী মুলিঞ্জার একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিল। সেই দিন অপরাহ্নে ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে ছদ্মবেশী মুলিঞ্জারকে মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের শাখায় নিশ্চিন্তচিত্তে প্রবেশ করিতে দেখা গেল।

সেই শাখা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বৃদ্ধের নিকট ল্যাংটনের পত্রখানি পাইয়া তাহা পাঠ করিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পত্র-নির্দ্দিষ্ট ফটোখানি মুলিঞ্জারের হস্তগত হইল।

মুলিঞ্জার যথাসাধ্য চেষ্টায় আনন্দের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ধন্যবাদ ম্যানেজার! নমস্কার।" সাফল্যগর্ব্বে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল।

সেই সময় দুই জন ভদ্রলোক ম্যানেজারের আসনের কয়েক গজ দূরে বসিয়া বৈষয়িক কায করিতেছিলেন। এক জন তাঁহার হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন, আর এক জন কি একখান কাগজ দেখিতেছিলেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে 'বৈদেশিক বিনিময়' কথাটি মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল, যদি মুলিঞ্জার তাঁহাদের নিখুঁত ছদ্মবেশের অন্তরালে তাঁহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহার আনন্দ ও সাফল্যগর্ব্ব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইত।

মুলিঞ্জার ফটো লইয়া প্রস্থান করিলে পূর্ব্বোক্ত উভয় ভদ্রলোক ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে তাহার অনুসরণ করিলেন। মুলিঞ্জার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। তাঁহারাও অন্য ট্যাক্সিতে চাপিয়া, অগ্রগামী ট্যাক্সি তাঁহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারে, ট্যাক্সি-চালককে সেই ভাবে চলিতে আদেশ করিলেন। মুলিঞ্জার লিভারপুল ষ্ট্রীট ষ্টেশনে ট্যাক্সি হইতে নামিলে ছদ্মবেশী রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেল ট্যাক্সি ত্যাগ করিয়া মুলিঞ্জারের অলক্ষিত ভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন। মুলিঞ্জার ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া ট্রেণের একটি কামরায় প্রবেশ করিলে, তাঁহারা উভয়েই অন্যদিক হইতে প্লাটফর্ম্মে আসিয়া, মুলিঞ্জার ট্রেণের যে কামরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই কামরার পার্শ্বস্থিত একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

ট্রেণখানি চলিতে আরম্ভ করিয়া ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিল। সেই সময় ছদ্মবেশী রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "এইবার আমাদের অভিনয় শেষ হইবে, ইন্‌স্পেক্টর! আমরা ব্যাঙ্কে মুলিঞ্জারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতাম বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, ইহা অধিকতর সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই উপায়ে আমরা উহার গোপনীয় আড্ডার সন্ধান পাইব এবং উহার দলের অন্যান্য দস্যুদেরও গ্রেপ্তার করিতে পারিব। এতদ্ভিন্ন, ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনী জীবিত থাকিলে, দস্যুকবল হইতে তাহাদিগকেও উদ্ধার করিতে পারিব, আশা করি, তাহারা জীবিত আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডকে বলিলেন, "মেট্রোপলিটান শাখা ব্যাঙ্কে মুলিঞ্জারকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আপনার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই; আপনার অনুমানের বাহাদুরী আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ ট্রেণ ত প্রথমেই পরবর্ত্তী ষ্টেশন কলচেষ্টারে থামিবে। মুলিঞ্জার কোথায় নামিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি?"

রয়েড বলিলেন, "তাহা অনুমান করিতে পারি নাই; তবে আমার বিশ্বাস, হারউইচই উহার লক্ষ্য, হতভাগাটা হয় ত আরও দূরে যাইতে পারে। এই অনুমানে নির্ভর করিয়া তর্ক-বিতর্কে কোন লাভ নাই. আমরা উহার গোপনীয় আড্ডা পর্য্যন্ত উহার অনুসরণ করিব। আমি উহার আড্ডার বাহিরে লুকাইয়া থাকিয়া উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিব; আপনি সেই সুযোগে স্থানীয় থানায় গিয়া একদল পুলিস-প্রহরী সংগ্রহ করিয়া, যত শীঘ্র পারেন, আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। আমরা উহার আড্ডায় হঠাৎ হানা দিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ করিব। যদি সে বুঝিতে পারে, তাহার আর কোনও আশা নাই, এবং এক মিনিটেরও সুযোগ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এই নরপিশাচ ল্যাংটন ও

তাহার প্রণয়িনীকে সেই সুযোগে হত্যা করিয়া আমাদের সকল চেষ্টা বিফল করিবে। হাঁ, যদি ল্যাংটন ও মিস্ ফরেষ্টকে সে ইতিপূর্ব্বে হত্যা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই নিষ্ঠুর কায সে করিবেই, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।" তাঁহার কণ্ঠস্বর অচঞ্চল, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর।

ট্রেণখানি যখন ইপ্ সউইচ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। মুলিঙ্গার সেই ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল। রয়েড ও ইন্স্পেক্টর বেল প্লাটফর্ম্মে নামিয়া একটু দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। মুলিঙ্গার ষ্টেশনের বাহিরে ব্যসগুলির আড্ডার অদূরে দাঁড়াইল, তাহার অনুসরণকারিদ্বয় একটি দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুলিঙ্গার একখানি ব্যসে প্রবেশ করিলে রয়েড ও ইন্স্পেক্টর বেল সেই ব্যসের বাহিরের সিঁড়ি দিয়া তাহার ছাদে উঠিলেন, এবং দুইটি আসন অধিকার করিলেন। ব্যস তাঁহাদের তিন জনকে ও অন্যান্য আরোহিগণকে লইয়া গন্তব্য পথে ধাবিত হইল।

ব্যস পূর্ব্বোক্ত বাগানবাড়ীর অদূরবর্ত্তী পথে উপস্থিত হইলে মুলিঙ্গার ব্যস থামাইয়া তাহা হইতে নামিয়া পড়িল। তাহাকে সেখানে নামিতে দেখিয়া রয়েড ইন্স্পেক্টর বেলসহ সেই স্থানে অবতরণ করিলেন। মুলিঙ্গার সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানবাড়ীর সন্নিহিত গলির ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহার বৃদ্ধের ছদ্মবেশ থাকায় তখনও সে বৃদ্ধের মতই ঈষৎ অবনত দেহে ধীরে ধীরে পদক্ষেপণ করিয়া চলিতে লাগিল।

গলির প্রান্তবর্ত্তী তৃণরাশির উপর দিয়া লঘু-পদবিক্ষেপে মুলিঙ্গারের অনুসরণ করিতে করিতে রয়েড ইন্স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "হতভাগা কি রকম সতর্ক, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? অন্ধকারে একাকী চলিয়াছে, কিন্তু এখানেও বৃদ্ধের গমন-ভঙ্গী ত্যাগ করে নাই, পাকা খেলোয়াড় বটে!"

মুলিঙ্গার বাগানবাড়ীর দেউড়ী খুলিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। সেই উদ্যানের অভ্যন্তরস্থিত অট্টালিকার একটি কক্ষ হইতে মৃদু দীপরশ্মি উদ্যানের নিবিড় অন্ধকার বিদীর্ণ করিতেছিল। সেই ক্ষীণ দীপালোকে ছায়াচ্ছন্ন অট্টালিকা অস্ফুটভাবে দৃষ্টিগোচর হইল।

রয়েড বৃক্ষচ্ছায়ায় প্রচ্ছন্ন অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "ঐ অট্টালিকাই উহাদের বর্ত্তমান আড্ডা, উহা সম্ভবতঃ উহারই দলের কোন দস্যুর আবাস-গৃহ। যাহাই হউক, আপনি এখানে আর বিলম্ব করিবেন না। যত শীঘ্র সম্ভব, একদল পুলিস-প্রহরী লইয়া ফিরিয়া আসিবেন। আমি ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীর অনিষ্ট আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়াছি।"

ইন্স্পেক্টর বেল তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে সেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। রয়েড সতর্কভাবে বাগানবাড়ীর দেউড়ী খুলিয়া, কঙ্করাবৃত পথের পাশ ঘেঁসিয়া গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি অট্টালিকার অদূরে উপস্থিত হইলে একটি দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরও তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

রয়েড ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন তিনি আর কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না, তখন পুনর্ব্বার অধিকতর সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিলেন। তিনি সেই অট্টালিকার যে কক্ষের বাতায়ন হইতে দীপালোক-রশ্মি দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই বাতায়নটি অরওয়েল নদীর অভিমুখে সংস্থাপিত ছিল। রয়েড সেই কক্ষ হইতে একাধিক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন, সেই কক্ষে মুলিঙ্গারও কথা বলিতেছিল। তাহার কণ্ঠস্বর তাহার সঙ্গীদের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ, এবং তাহাতে উত্তেজনা ও অধীরতার আভাস সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

রয়েড এবার মাটীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রসারিত উভয় হস্তে ও জানুতে ভর দিয়া টিকটিকির মত গতি-ভঙ্গীতে সেই আলোকিত বাতায়নের নীচে অগ্রসর হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, ইন্স্পেক্টর বেল যেন অবিলম্বে সদলে এখানে আসিতে পারেন।"

যে কক্ষের বাতায়ন-পথে দীপরশ্মি নির্গত হইতেছিল, সেই কক্ষে ল্যাংটন ও এনিড ফরেষ্ট প্রতিমুহূর্ত্তে তখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুলিঙ্গারের রিভলভারের অব্যর্থ গুলীতে যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহাদের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সেই রজ্জুবদ্ধ অসহায় প্রণয়ি-যুগলের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

তাহাদের হস্তপদ তখনও দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ, এবং

রুমাল দ্বারা মুখও আবদ্ধ ছিল; সেই অবস্থায় তাহাদের উভয়কে গৃহ-প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। মুলিঙ্গার রিভলভার উদ্যত করিয়া তাহাদের সম্মুখে যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান!

তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল—সেই দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে তাহাদের পরিত্রাণের আশা নাই; তথাপি তাহারা অসঙ্কোচে অপরিহার্য্য মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই মুলিঙ্গারের হস্তস্থিত উদ্যত পিস্তলের দিকে অকম্পিত-হৃদয়ে চাহিয়া রহিল। তাহাদের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ভয়ের আভাসমাত্র ছিল না; তাহাদের ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না, এনিড তখন মনে মনে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, মুলিঙ্গারের রিভলভারের গুলীতে তাহাদের ললাট-বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যেন তাহাদের চেতনা বিলুপ্ত হয়; মৃত্যুযন্ত্রণা যেন তাহাদিগকে বিচলিত করিতে না পারে।

মুলিঙ্গার ল্যাংটনকে লক্ষ্য করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "তুমি সত্যবাদী, ল্যাংটন! আমার সন্দেহ হইয়াছিল, তুমি মিথ্যা কথায় আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে। আমি তোমার পত্র পাইয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলে, সে হয় ত ফটোর কথা অস্বীকার করিবে; বলিবে, তুমি তাহাদের ব্যাঙ্কে ফটো দাও নাই। কিন্তু ম্যানেজারের নিকট ফটো পাইয়াছি, এজন্য তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র। তুমি সত্যবাদী।"

মুলিঙ্গার তাহাদিগকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে এইরূপ বক্তৃতায় অনর্থক সময় ক্ষেপণ করায় তাহার কথাগুলা কাটাঘায়ে নুণের ছিটার মত ল্যাংটনের অসহ্য বোধ হইল। যে তাহার ধন্যবাদের পাত্র, তাহাকে হত্যা করিয়া সে চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে! কথাটা বলিতে তাহার বিন্দুমাত্র লজ্জা হইল না। কিন্তু মুলিঙ্গার কিরূপ নির্লজ্জ, ল্যাংটন তাহা অবগত ছিল না।

ল্যাংটনও তাহার প্রণয়িনীকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ক্যারো বিরক্তিভরে বলিল, "যে কায করিতে আসিয়াছ, তাহা চট্‌পট্‌ শেষ কর। গুলী করিবার জন্য রিভলভার উঠাইয়া অত বক্তৃতা করিবার কি প্রয়োজন?"

মুলিঙ্গার বলিল, "ক্যারো, তুমি কি আশা করিয়াছ, আমি তোমার উপদেশে চলিব? ল্যাংটনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার দুই চারিটি কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, ইহা তুমি কিরূপে বুঝিলে? তাড়াতাড়ি গুলী করিবারই বা প্রয়োজন কি? গুলী করিলেই ত সব শেষ হইয়া যাইবে। হত্যা করিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিতে চাই। উহাদিগকে এই মুহূর্ত্তে হত্যা করিলে সেই আনন্দ লাভ করিতে পারিব কি? এই আনন্দের গভীরতা তোমরা কি বুঝিবে, মূর্খ? ইহার পর আর এ সুযোগ পাইব কি?"

মুলিঙ্গার যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, ভার্ণিকে তাহার অংশ দানের জন্য মুলিঙ্গারের আগ্রহ হইল। ভার্ণি সেইখানে উপস্থিত না থাকায় মুলিঙ্গার তাহাকে আহ্বান করিল; কিন্তু নরহত্যা দেখিতে তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ হইল না, নারীহত্যা দর্শনে তাহার স্পৃহা না থাকায়, সে মুলিঙ্গারের আদেশ পালন করিল না। সে অন্য কক্ষ হইতে তাহার সম্মুখে আসিল না। ভার্ণি স্থির করিল, হত্যাকাণ্ডের পর সে মুলিঙ্গারের সম্মুখীন হইবে, বলিবে, সে ছেঁড়া থলি শিলাই করিতেছিল।—সেই অট্টালিকায় নূতন বস্তা পাওয়া যায় নাই।

মুলিঙ্গার এনিডের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল; তাহা দেখিয়া ল্যাংটন মুখ বাঁধা থাকায় কথা বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু দুটি যেন নীরব ভাষায় তাহাকে অনুরোধ করিল, "আগে আমাকে, আগে আমাকে হত্যা কর। আমি জীবিত থাকিতে আমার চক্ষুর উপর আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে হত্যা করিও না।"—ল্যাংটন বুঝিতে পারিল, অঙ্গুলীর যৎসামান্য চাপে মুহূর্ত্তমধ্যে রিভলভারের গুলী এনিডের বক্ষঃ ভেদ করিবে।

ল্যাংটনের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই নরপিশাচ হাসিয়া বলিল, "আমার অঙ্গুলীর মৃদু চাপে মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ সুন্দরী তরুণীর ইহলীলার অবসান হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ত? আমার দয়ার শরীর, আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ, এই জন্য তোমাকে অগ্রে হত্যা করিব না, তোমাকে আরও এক মিনিট জীবিত রাখিব। আমি ঘড়ী ধরিয়া সময় দেখিতেছি। এক মিনিট পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তোমাকে গুলী করিব না। এই এক মিনিট তুমি জীবনের মাধুর্য্য উপভোগ কর। হাঁ, তোমার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার অনুরোধে তোমার ঐ সুন্দরী প্রণয়িনীর পরমায়ুও

আর এক মিনিট বাড়াইয়া দিলাম। কিন্তু এক মিনিট মাত্র; এক মিনিট শেষ হইবামাত্র 'দুড়ুম্' শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। স্বর্গের পরীর দল তোমাদের পারলৌকিক মিলন-দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিবে।"

মুলিঙ্গার পিস্তলটা ডেস্কের উপর রাখিল, এবং করতলে সংরক্ষিত ঘড়ীর দিকে চাহিয়া, এক, দুই, তিন, চার—সেকেণ্ডগুলি অস্ফুট স্বরে গণিতে লাগিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "সময় যেন উড়িয়া যাইতেছে। তথাপি মনে হইতেছে, এক মিনিট কি দীর্ঘকাল! এই মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলি দয়ার অনুরোধে বৃথা নষ্ট করিতেছি; ঐটুকুই আমার দুর্ব্বলতা।" সে পুনর্ব্বার অনুচ্চস্বরে আরম্ভ করিল, "একুশ, বাইশ, তেইশ।" সে রুদ্ধশ্বাসে নির্নিমেষ-নেত্রে ঘড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্যারো তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে যতই নিষ্ঠুর হউক, সেই যুবক-যুবতীর অবস্থা দেখিয়া মুলিঙ্গারের পৈশাচিকতায় তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

মুলিঙ্গার অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন।"

সে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাক হইয়া রিভলভারটা হস্তগত করিবার জন্য ডেস্কের দিকে হাত বাড়াইল।

সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষের ডেস্কের উপর সংরক্ষিত বাতি দুইটির শিখা কম্পিত হইল; ইহার কারণ জানিবার জন্য মুলিঙ্গার সম্মুখস্থিত বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিল, কোনও অদৃশ্য হস্তের আকর্ষণে বাতায়ন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সে দৃষ্টি ফিরাইবার পূর্ব্বেই কে তাহাকে দৃঢ়স্বরে বলিল, "দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া ধর শীঘ্র।"

মুলিঙ্গার উদ্ঘাটিত বাতায়নের ধারীর উপর এক জন আগন্তুককে উপবিষ্ট দেখিল, তাঁহার রিভলভার তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত!

রয়েড, হতবুদ্ধি, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলদেহ ক্যারোকে লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ক্যারো, দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া ধর, এক কথা আমার দুইবার বলিবার অভ্যাস নাই।"

ক্যারোর মনে হইল, সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল; কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ এই আদেশ পালন করিতে হইল।

রয়েড চক্ষুর নিমিষে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া উদ্যত রিভলভারের সাহায্যে উভয় দস্যুকে নিষ্ক্রিয় করিলেন। মুলিঙ্গার ও ক্যারো ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার উপর হইতে হাত নামাইতে তাহাদের সাহস হইল না। উভয়েই বুঝিতে পারিল, রয়েডের হাতের সেই ক্ষুদ্র অথচ সাংঘাতিক রিভলভার মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের উভয়েরই ললাট বিদীর্ণ করিতে পারে।

মুলিঙ্গার আর কখনও এরূপ হতবুদ্ধি হয় নাই। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া জড়িত স্বরে বলিল, "তু—তুমি কি উপায়ে এখানে আসিলে?"

রয়েড হাসিয়া বলিলেন, "বাহিরের ড্রেণের পাইপের সাহায্যে। মনে হইতেছে, আমি ঠিক সময়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্বে আমার সকল শ্রম বিফল হইত। দু'জনে দেওয়াল ঘেঁসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াও। আমার এই ছয়ঘরা রিভলভার প্রায় একই সময় অনেকগুলি মাথা ফুটা করিতে পারে। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। ডেস্কের উপর রক্ষিত রিভলভারের দিকে চাহিয়া কোনও লাভ নাই। উহা তোমাদের দুই হাত দূরে থাকা, আর দুই মাইল দূরে থাকা এখন সমান। মাথার উপর হইতে হাত নামিবার পূর্ব্বেই তোমাদের মৃতদেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু আশা করি, তাহার প্রয়োজন হইবে না। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমাদিগকে বাঁধিয়া পুলিস-বাহিনীর হস্তে অর্পণ করিতে পারিব। তাহারা এই বাগান-বাড়ীতে হানা দিয়া, খানাতল্লাসীর জন্য প্রস্তুত। আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি। *

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

* পাঠকপাঠিকা কি আশা করিতেছেন, মুলিঙ্গার সদলে ধরা পড়িল, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই? না, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখিবেন, সে কি কৌশলে পলায়ন করিয়া প্রতিহিংসার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। দুর্ব্বোধ্য রহস্যের অনুসরণে নূতন রহস্যের তরঙ্গ ছুটিবে। বসু—সং।

রঙ্গের কথা

কবি বলিয়াছেন—"নানা ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ-ভরা"। সে রঙ্গ-কথা কহিতেছি না, কারণ, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালাদেশ হইতে রসের উৎস শুকাইয়া গিয়াছে, কৌতুক ও ব্যঙ্গ মরুতপ্ত বাঙ্গালীর জীবনে স্থান না পাইয়া পলায়ন করিয়াছে। সংস্কৃতে রঙ্গ বলিতে ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ বুঝি না। বর্ণ বুঝাইতে রঙ্গ শব্দের প্রয়োগ, চলিত কথায় শব্দান্ত স্বরত্যাগকারী বাঙ্গালীর মুখে রং হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সেই রঙের কথা বলিব।

দেশে রঙ্গরাজের অভাব হইয়াছে। যে সব পটুয়া প্রতিমা রং করিত, তাহারা প্রায় নির্ব্বংশ হইয়াছে। যাহারা রং তৈয়ার করিত, সেই রঞ্জক আর নাই, রঞ্জক আর কাপড় রং করে না, কাচিয়াই আপন কায শেষ হইল মনে করে। অবৈজ্ঞানিক হইয়া রঙ্গের কথা বলিয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিব, সে দুরাশা নাই, তবে দায়ে পড়িয়া এই ব্যঞ্জনা। রংবিদ্ পণ্ডিতের কৃপা-দৃষ্টিলাভের জন্যই এই সঙ্কলন।

দায়ের কথাটা বলি, ছোট বোন শোভনা প্রিয়ার তত্ত্বাবধানে শ্বশুরকুলে সম্রাজ্ঞী সাজিবার জন্য তৎপরা। পণ্ডিতম্মন্য তার জন্য অধ্যাপকের হস্তক্ষেপ করিয়াই গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। এক-খানি ইংরাজী পাঠ্যে সে রামধনুর কথা পড়িতেছিল। পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পর শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, রামধনুর সাতটা রঙ্গের বাঙ্গাল্য নাম কি?"

পার্শ্বোপবর্ত্তিনী প্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এইটে আর ব'লে দিতে পারনি?" কিন্তু স্বখনিত গর্ত্তেই নিজে পড়িয়া গেলাম। অতি পরিচিত এই রংগুলির বাঙ্গালা বলিতে পারিলাম না। ক্ষোভ হইল, বন্ধুদের প্রশ্ন করিলাম। তাঁহারাও তথৈবচ, বিদ্যা আমাদের দেশে কলার জন্য নহে, তাই তাহা নিষ্ফলা। পুস্তকস্থা বিদ্যা পুস্তকেই থাকিয়া যায়, প্রাত্যহিক জীবনে তাহার স্নেহস্পর্শ অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে না।

নিখিলের বিচিত্র সুষমা অন্তরকে পুলকিত করে। বিস্মিত নেত্রে জননী ধরণীর বর্ণ বৈচিত্র্য দেখি এবং মুগ্ধ-চিত্তে স্তবগান করি। বর্ণের লীলাপ্রাচুর্য্যের দেশে বর্ণজ্ঞানের অভাব কেন, সেজন্য জিজ্ঞাসা জাগিল। অবসরবিরল কর্ম্মজীবনে জ্ঞানার্জ্জন সুগম নহে, তাহার পর এই সব অনাবশ্যক বিষয়ে কৌতূহলও আমাদের দেশে সমাদৃত হয় না! উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা বরং আমাদের দেশে মানুষকে জিজ্ঞাসু হইতে বারণ করে।

বৈজ্ঞানিক বলেন যে, বর্ণ কেবল চোখের অনুভূতিমাত্র। জগতে যে সব বিচিত্রবর্ণ বস্তু দেখি, বর্ণ আদৌ তাহার অঙ্গাঙ্গি-ভূত নহে। চোখের উপর ইথার-তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিলে মনের উপর যে অনুভূতি হয়, তাহাই বর্ণজ্ঞান জন্মায়। ইথার-তরঙ্গের তারতম্যের উপর বর্ণের বিভিন্নতা নির্ভর করে। যখন একটি আলোকরশ্মি ত্রিশিরা কাচের ভিতর দিয়া যায়, তখন আলোকবর্ত্তি বিভক্ত হইয়া বর্ণছত্র উৎপাদন করে, এই বর্ণ-ছত্রে সাধারণতঃ সাতটি বর্ণ একটি সুবিন্যস্ত ক্রমে দেখা যায়। অপরিবর্ত্তনীয়ক্রমে যে রংগুলি থাকে, তাহা জানিবার একটি ইংরাজী সঙ্কেত আছে—vibgyor অর্থাৎ ভায়োলেট, ইণ্ডিগো, ব্লু, গ্রীন, ইয়োলো, অরেঞ্জ ও রেড। সাধারণভাবে বলা যায়, যখন ইথার-তরঙ্গ সকলের চেয়ে ছোট, তখন ভায়োলেট রঙের বোধ হয়, আর ক্রমান্বয়ে যেই বাড়িতে থাকে, অমনই যথাক্রমে ইণ্ডিগো প্রভৃতির অনুভূতি হয়।

বর্ণের তাই স্বকীয় কোন অস্তিত্ব নাই। যখন আলোকরশ্মি কোনও বস্তুর উপর পড়ে, তখন নানাভাবে বিচ্ছুরিত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয়। প্রতিফলিত এই বিচ্ছুরণই চোখে বর্ণ বৈচিত্র্য জাগায়। সূর্য্যের আলো শ্বেত, যে সকল বস্তু সূর্য্যকিরণকে সমগ্রভাবে বিচ্ছুরিত করে, তাহা আমাদের নিকট শ্বেতবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, যে সকল বস্তু সূর্য্যকিরণকে সমগ্রভাবে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, তাহা হইতে কোন কিছুই প্রতিফলিত হয় না এবং তাহাকে আমরা কৃষ্ণবর্ণ বলি। শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই সীমা। এই দুই সীমার মাঝে গ্রহণ ও বিকিরণের পার্থক্য অনুসারে অসংখ্য ও অশেষ বর্ণের ও লাবণ্যের বিকাশ হয়।

শ্বেত আলোকের যখন ত্রিশিরা কাচের মাঝে কিংবা রামধনুর অঙ্গে বিশ্লেষণ হয়, তখনই উল্লিখিত সপ্তকায় বর্ণচ্ছত্রের আবির্ভাব হয়। ইহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাম কি?

প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই রঙ্গের নাম দিয়াছেন লোহিত, পাটল, পীত, হরিৎ, নীল, ধূমল, বায়লেট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই নামকরণও সুসঙ্গত হয় নাই।

লাল রং মূল রং। ইহার সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণা কম হয়। রঙ্গের নাম প্রায়শঃ বস্তু-সাদৃশ্যে স্থির হইয়াছে। রক্তের মত বলিয়াই লালকে লোহিত বলি। লোহ কথার মানে রক্ত, লোহযুক্ত লোহসদৃশ বলিয়াই লোহিত। লোহিত কথাও রুধিরের প্রতিশব্দ। অমরকোষ লাল শব্দের প্রতিশব্দ দিয়াছেন—রোহিতো লোহিতো রক্তঃ শোণঃ কোকনদচ্ছবিঃ। বাঙ্গালায় রোহিত চলে না, শোণের অপেক্ষা শোণিমা চলে আর কোকনদচ্ছবি চলিবার ভরসা নাই।

রক্তবর্ণ বলিতে বাঙ্গালায় আমরা রাঙ্গা ও লাল শব্দ ব্যবহার করি। সকল বর্ণের তুলনায় দ্যুতিমান বলিয়া হয় ত রঙ্গ হইতে রাঙ্গা কথার উৎপত্তি হইয়াছে। "It is the most positive of all colours, infusing all hues into which it enters with warmth" সকল রঙ্গের অপেক্ষা লাল সুস্পষ্ট রং, অপর রঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইলে সেই রংকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় অরেঞ্জ বর্ণকে পাটল বলিয়াছেন। কিন্তু অমরকোষে পাই—শ্বেতরক্তস্তু পাটলঃ। শ্বেত ও রক্ত বর্ণের মিশ্রণজাত যে বর্ণ, তাহাই পাটল। কিন্তু কমলা রং পীতরক্ত মিশ্রবর্ণ। কালিদাসে পাটলসংসর্গসুরভি বনবাতের বর্ণনা পাই, কিন্তু সে ফুল কেমন, চিনি না। কিন্তু পাটল-ফুলের রং বর্ণনা হইতে অনুমান করি, গোলাপ-ফুলের মত হইবে। পাটলের অর্থ গোলাপী রং (Rose colour)। কাদম্বরীতে পাই—'একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসংপুটভিদি কিঞ্চিন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি সহস্রমরীচিমালিনি।' সেখানে পাটলিমা শ্বেতরক্ত

অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব কমলা রঙ্গকে পাটল বলিলে ভুল বলা হইবে। পীতরঙ্গের সংস্কৃত কি নাম, জানি না, বাঙ্গালায় কমলা চালাইলে চলিবে।

ইয়োলো বাঙ্গালায় হলুদ রং। অমরকোষে পাই 'পীতো গৌরো হরিদ্রাভঃ।' বাঙ্গালা ভাষায় পীত আর হরিদ্রা চলে। হলুদকে হলদেও বলি। কিন্তু গৌরবর্ণ লইয়াই গণ্ডগোল। সংস্কৃতেও গৌর অর্থের মানে শ্বেত আছে ও অরুণ আছে। 'গৌরোঽরুণে সিতে পীতে।' কাযেই যখন বলি, মেয়েটির রং গৌর, তখন কি বলিতে চাহিতেছি, বলা মুস্কিল। কথক ও শ্রোতার ভাব ও বুদ্ধি অনুসারে ধারণা বিভিন্ন হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ দুধে-আলতা রঙ বুঝাইতে গৌর বলি। অতএব পীত অর্থে গৌর শব্দ ত্যাগ করাই বিধেয়।

গ্রীণ বাঙ্গালায় সবুজ, সংস্কৃতে হরিৎ। অমরকোষকার বলেন, পলাশো হরিতো হরিৎ। পলাশ মানে পাতা, তাই পাতার রঙ্গই পলাশ রং। বাঙ্গালায় পলাশ চলে না, হরিত ও হরিৎ সবুজ অর্থে ব্যবহার হয়। নীল ও পীতের মিশ্রণেই সবুজ রং হয়। সব পাতার রং কিন্তু সবুজ নহে। প্রত্যেক পাতারই কিঞ্চিৎ আভান্তর আছে। ব্লু রং নীল। ইণ্ডিগোও নীল। গণ্ডগোল হয়। তাহা ছাড়া কাল পাড় আর নীল পাড়ের তফাৎ ধরিতে খুব কম লোকই পারে। এই ভুলের একটা সঙ্গত কারণও আছে। অমরকোষে পাই—কৃষ্ণে নীলাসিত-শ্যাম কাল-শ্যামল-মেচকাঃ। কৃষ্ণ, নীল, অসিত, শ্যাম, কাল, শ্যামল, মেচক, সকলই কৃষ্ণ বর্ণের নাম। অথচ এইগুলিই ব্ল্যাক, ব্লু ও ইণ্ডিগো এই তিন রং বুঝাইতে ব্যবহার হয়।

Farnchise কমিটীতে সাক্ষ্য দিবার সময় লার্কিন সাহেব বলিয়াছেন যে, নিরক্ষর গ্রামালোকদের বর্ণ সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ধারণা আছে। ইহাতে আমার বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে-ছিলেন যে, সাহেবের কথা ঠিক নয়। কিন্তু আমি বলিতে চাই, কেবল নিরক্ষর নয়, শিক্ষিত লোকেরও বর্ণ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা নাই।

সংস্কৃতে কি করা যায়, তাহা বলা মুস্কিল, কিন্তু বাঙ্গালায় এই তিন রঙ্গের নাম যথাক্রমে কৃষ্ণ, নীল এবং নীলি রাখা হইতে পারে। মসীর যে রং, তাহাই কাল এবং কৃষ্ণ এবং অসিত। অপরাজিতার ফুলের যে বর্ণ, তাহাই নীল। আকাশের যে নীল, তাহাকে 'আসমানি' বলা চলে। মেচক বাঙ্গালায় চলিবে না। শ্যাম ও শ্যামল লইয়া কিন্তু গণ্ডগোল।

শ্যাম বলিতে সবুজ এবং কাল বুঝায়, তাই প্রয়োগের পার্থক্য অনুসারে অর্থ করিতে হইবে। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সবুজ, নব-ঘনশ্যাম কাল, এ কথা মনে রাখিলে ভুলের সম্ভাবনা কম। কিন্তু চলিত কথায় যখন বলি—মেয়েটির রং শ্যাম, শ্যামল, তখন কাল বুঝি না। আধ ময়লা আধ ফরসা চেহারা মনে পড়ে। সংস্কৃতে ... নারী, 'শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা, তপকাঞ্চন-বর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা'। শ্যামলা কন্যাতে কি সেই স্মৃতি মনে পড়ে? কালিদাসের মেঘদূতে যক্ষবনিতা—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা, শ্যামা বলিতে তাই রূপহীনা মনে হয় না, গৌরী নয়, কিন্তু কাল নয়, মাঝামাঝি রঙ্গই শ্যাম এবং শ্যামল। কিন্তু যখন দেশজননীকে শস্যশ্যামলা বলি, তখন শ্যামল বলিতে সবুজ বুঝি, অন্ততঃ কৃষ্ণাভ সবুজ মনে করি; কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মনে করি না।

ইণ্ডিগো গাছের নাম। সংস্কৃতে এই গুল্মের নাম নীলি, কালা, ক্লীতকিকা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুণ্থা, তূণী, দোলা ও নীলিনী। কাল ও কালা কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়, অতএব কালাকে ইণ্ডিগো অর্থে চালানো দুরূহ, কিন্তু 'নীলি'র ব্যবহার নাই—ইহাকে সুসঙ্গতভাবেই চালাইয়া দেওয়া যাইবে। নীলবর্ণ শৃগাল কথায় 'নীলিবর্ণ' পাই—অতএব ইণ্ডিগোর বদলে 'নীলি' অনুবাদ করাই ঠিক। ভায়োলেট বাঙ্গালায় বেগুনি। নীল-রক্ত বর্ণই বেগুনি। ইহার সংস্কৃত নাম নীললোহিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইণ্ডিগোর বাঙ্গালা করিয়াছিলেন ধূমল। সংস্কৃত কোষে পাই—ধূম্রধূমলৌ কৃষ্ণ-লোহিতে। আমার মনে হয়, ধূমলের অপেক্ষা নীলিই সুষ্ঠু ও সার্থক। এই জন্য আমি রামধনুর সাত রঙের বাঙ্গালা নাম দিতে চাই—বেগুনি, নীলি, নীল, সবুজ, পীত, কমলা এবং লাল। কেহ কেহ বর্ণচ্ছত্রে ছয়টি রঙ ধরেন, তাঁহারা নীলিকে বাদ দিয়া দেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেগুনির তরঙ্গ ছোট আর লালের তরঙ্গ বড়। কিন্তু ভায়োলেট তরঙ্গের অপেক্ষা ছোট তরঙ্গ আছে, ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর এই তরঙ্গ কার্য্য করে। অদৃশ্য এই ইথার-তরঙ্গকে আমরা ultra-violet-light বলি। সংস্কৃতে বেগুনের এক নাম হিঙ্গুলী, ইহাকে আমরা তাই অতি-হিঙ্গুলী আলো বলিতে পারি। লালের নীচে যে বড় বড় তরঙ্গ আছে, তাহাকে infra-red light বা অনুলোহিত আলো বলিতে পারি। অতি-হিঙ্গুলী এবং অনুলোহিত আলোকে মানুষের ছবি তোলা যায়। আলো প্রতিভঙ্গে বিভক্ত এই সাত বর্ণকে পুনরায় ত্রিশিরা কাচের মধ্যে দিয়া চালাইলে আর বিশ্লেষণ হয় না। এই জন্য এই সাত রঙ অমিশ্র বর্ণ বলা যায়।

এই সাত রঙে সমান অনুপাতে মিশাইতে পারিলে পুনরায় সূর্য্যালোক পাওয়া যায়। একটি গোল চাকতিতে যদি পর পর সাতটি রঙ সাজাইয়া ঘুরানো যায়, তাহা হইলে সাত রং মিশিয়া গিয়া অস্পষ্ট সাদা রং দেখাইবে। অনুপাত যথাযথ হয় না বলিয়াই পূর্ণ শ্বেতবর্ণরূপে পরিণত হয় না।

কোন্ কোন্ বর্ণ অমিশ্র এবং মূলবর্ণ, তাহা লইয়া পণ্ডিতরা একমত নহেন। সাধারণতঃ লাল, পীত এবং নীলকে মূলবর্ণ ধরা হয়। কারণ, এই তিনটির বর্ণক যুগ্ম যুগ্ম সমাহারে যথাক্রমে, কমলা, সবুজ এবং বেগুনি পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণক বা রঙ্গের গুড়িকা মিলাইয়া এইরূপ পাওয়া গেলেও বর্ণচ্ছত্রের উক্ত রঙ্গের সংযোগে ঐরূপ ফল পাওয়া যায় না। যদি কোনও তিরস্করণী বা পর্দার উপর বর্ণচ্ছত্রের পীত এবং নীলের সংযোগপাত করা যায়, তাহা হইলে রক্তাভ শ্বেতবর্ণের উৎপত্তি হয়। এই তারতম্যের কারণ অনুপাতের ভিন্নতাজাত। অতি অল্পপরিমাণে নীল ও পীতের বর্ণক মিশাইলে সাদা হইবে। ধোপারা এই জন্যই কাপড়ের হলুদ দাগ উঠাইবার জন্যই কাপড়ে নীল দেয়।

কেহ কেহ বলেন, লাল, সবুজ ও নীল মূলবর্ণ। অপরে বলেন লাল, সবুজ আর ভায়োলেট। আবার কেহ কেহ বলেন, লাল, হরিদ্রা, সবুজ, নীল এবং purple (ধূমল) মিশাইলেই সমস্ত রং পাওয়া যায়। অল্প বিদ্যা লইয়া এই তর্ক-দুর্গম পথে

যাত্রার আশা নাই, সুধীদের করুণা ও আলোচনার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

বর্ণের তারতম্য বুঝাইবার তিনটি ভাগ করা হয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে বলা হয়, hue, shade and tint. লাল আর নীলের যে তফাৎ, সে তফাৎ hue আছে বলিয়াই আছে, বাঙ্গালায় ইহাকে রাগ বা বর্ণ বলিতে পারি। রঙ্গে কাল রং যোগ করিলে বর্ণের যে বিভেদ হয়, তাহাকে shade বলা হয়। বাঙ্গালায় ছায়া, ক্রম বা ভাগ বলিতে পারি। সাদা রং যোগ করিলে রাগের যে বৈচিত্র্য হয়, তাহাকে tint বলে, বাঙ্গালায় তাহাকে কান্তি বলিতে পারি। মূলবর্ণের নানা অনুপাতে মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন বর্ণ বা রাগ উৎপন্ন হয়। সাদা যোগ করিলে তাহার কান্তির তারতম্য হয় আর কাল যোগ করিলে তাহার ক্রম বা ছায়ায় বিভিন্নতা হয়। রক্ত রাগের কান্তির বিভিন্নতার এক সীমা রক্ত, অপর সীমা শ্বেত, রক্তরাগের ছায়ায় বিভিন্নতার এক সীমা রক্ত, অপর সীমা কাল। লাল আর সাদার মধ্যবর্ত্তী লাল রঙ্গের অসংখ্য ও অসীম কান্তিবৈচিত্র্য আছে, এবং লাল ও কালোর মাঝে অগণন ছায়া-বৈচিত্র্য আছে।

যে সব রং একত্র করিয়া মিশাইলে ফল সাদা হয়, তাহাদিগকে পরিপূরক বর্ণ বলে। (complementary colours), সবুজাভ পীত ও নীল পরিপূরক বর্ণ। কমলালেবু ও নীল, হরিদ্রাভ সবুজ আর বেগুনি, পীত ও ঈষৎ নীলি বর্ণ নীল, সবুজ ও ধূমল মিশাইলে শ্বেতবর্ণ উৎপন্ন হয়। ইহারা পরিপূরক বর্ণ। হেলম হোলৎজ্ পরিপূরক রং বাহির করিবার এক সহজ কৌশল উদ্ভাবন করেন।

সূর্য্যালোকই সকল আলো এবং বর্ণের আদি মূল। ইথার নামক অদৃশ্য, সর্ব্বব্যাপী শক্তির তরঙ্গে আলোর উৎপত্তি। এই তরঙ্গের তারতম্য সকল বর্ণজ্ঞান জন্মায়। পৃথিবীর বেশীর ভাগ জিনিষের উপর পড়িয়া সূর্য্যালোক কোন না কোন প্রকারে বস্তুসম্ভারকে দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিয়া দেয়। যে বস্তু বর্ণচ্ছত্রের সাত রং নিঃশেষে গ্রহণ করে, তাহাই কাল দেখায়; যে বস্তু সকলই বিকিরণ করে, তাহাই শ্বেত। রঙ্গিন জিনিষগুলি কতক রং শুষিয়া লয় এবং কতক প্রতিফলিত করে। যে রং বা রঙ্গসমষ্টি প্রতিফলিত হয়, তাহাই রঙ্গিন পদার্থের বর্ণবৈচিত্র্যের মূলকারণ।

বর্ণচ্ছত্রের সাত রঙ্গের কথা শেষ করিলাম। কিন্তু মিশ্রবর্ণ লইয়া আরও অসুবিধা। পুস্তকে পড়ি, পিঙ্গল, কপিল, ধূসর, পাণ্ডু প্রভৃতি; কিন্তু শব্দোচ্চারণের সহিত শতকরা নিরানব্বই জন লোকের কোনও অর্থ-প্রতীতি হয় না।

আগে সংস্কৃত নাম লইয়াই আরম্ভ করি। শুক্লবর্ণ মূলেরও মূল। শুক্ল বুঝাইতে সংস্কৃতে পাই—

শুক্ল-শুভ্র-শুচি-শ্বেত-বিশদ-শ্যেত-পাণ্ডরাঃ।

অবদাতঃ সিতো গৌরো বলক্ষো ধবলোঽর্জ্জুনঃ।

বাঙ্গালাতে শ্যেত, পাণ্ডর, অবদাত, বলক্ষ, অর্জ্জুন চলিবে না। গৌর বলিলে লালচে-সাদা বুঝি, সেটাও ভুলিয়া দেওয়া ভাল। বাঙ্গালায় বেশীর ভাগে বলি সাদা।

শাব্দিক নরসিংহ লিখিয়াছেন :—সিতপীতসমাযুক্তঃ পাণ্ডুবর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পাণ্ডর রক্তপীতস্তু পাণ্ডুরঃ শুক্লপীতকঃ। তাঁহার কথা মানিলে কমলা রঙ্গের সংস্কৃত নাম পাই পাণ্ডর।

হরিণঃ পাণ্ডুরঃ পাণ্ডুরীষৎ পাণ্ডুস্তু ধূসরঃ। হলদে ও সাদা মিশিয়া পাণ্ডু ও পাণ্ডুর। বাঙ্গালায় হরিণ চলিবে না। ধূসর অপাণ্ডু রং—ধূলির বর্ণই ধূসর, তাই সচরাচর বলি ধূলি-ধূসরিত। ধূসরের ইংরাজী গ্রে, বাঙ্গালায় পাঁশুটে ছাই-রঙ্গা। ধূসর ও পাণ্ডুতে শ্বেত রঙ্গের প্রাধান্য বেশী, যেখানে কাল রঙ্গের যোগ, সেখানে ধূসর, যেখানে পীতাভ, সেখানে পাণ্ডু। পাণ্ডু ইংরাজীতে পেল কিংবা ব্রাউন রূপে প্রযোজ্য। সোজা কথায় পাণ্ডু yellowish white রূপে অনুবাদ করিতে হইবে।

অব্যক্তরাগস্ত্বরুণঃ। অরুণ সূর্য্যসারথি, নবোদিত তপনের কান্তিই অরুণবর্ণ, অরুণ আলোহিত ঈষদ্রক্তবর্ণ। মদমত্ত ব্যক্তির চক্ষুরাগকে অরুণ বলা হয়। অমরদত্ত বলেন, কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণই অরুণ, এখানে ঈষৎ কালচে লাল বলিতে অরুণের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে লাল বুঝাইতেই অরুণের ব্যবহার প্রচলিত। ইংরাজী purple বোধ হয় অরুণ রং হইবে। কারণ, অরুণও কৃষ্ণলোহিত। তবে ধূমলে কাল রঙ্গের ভাগ বেশী আর অরুণে লাল রঙ্গের ভাগ অধিক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, লালের প্রতিশব্দ শোণ, লোহিত ও রক্ত। ভাগুরি নামক এক জন কোষকার কিছু পার্থক্য করিয়াছেন।

বন্ধুজীব-জবা-সন্ধ্যাচ্ছবৌ বর্ণে মনীষিভিঃ।

শোণ-লোহিত-রক্তানাং প্রয়োগঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

শোণ রং বাঁধুলী ফুলের মত, জবার রং লোহিত আর সন্ধ্যার রক্তচ্ছবি রক্তবর্ণ। এ ভেদ সাধারণতঃ রাখা হয় না।

শ্যাবঃ স্যাৎ কপিশো ধূম্র ধূমলৌ কৃষ্ণলোহিতে। কপিশ ও শ্যাব কৃষ্ণপীতবর্ণ, কৃষ্ণলোহিত বর্ণ ধূম্র-ধূমল। দুইটি রঙ্গেই কাল রঙ্গের আধিপত্য। কপিশে হরিদ্রাভ কাল রং আর ধূম্রে আলোহিত কাল রং। ইংরাজীতে বোধ হয় dark-gray and dark-brown বলিতে হইবে।

কড়ারঃ কপিলঃ পিঙ্গপিশঙ্গৌ কদ্রুপিঙ্গলৌ। এই ছয়টি পিঙ্গলবর্ণ-বাচক। নীলপীতমিলিত বর্ণ কড়ার আর কপিল। কপিল কথার অপভ্রংশ কবিল। পিঙ্গ পিশঙ্গ রোচনাভ। রোচন কথার অর্থ জিয়ালকচা বা কাফুলা গাছ। পলাণ্ডু, দাড়িম্ব, শ্বেত সজিনার গাছ, করঞ্জবৃক্ষ। খুব সম্ভব পেঁয়াজ রঙ্গই পিঙ্গ পিশঙ্গ। ইংরাজীতে বোধ হয় russet বলিয়া অনুবাদ করিতে হইবে।

নানা বর্ণের সমাহার বুঝাইতে সংস্কৃতে চিত্র, কির্ম্মীর, কল্মাষ, শবল, এত কর্ব্বুর প্রভৃতি কথা চলিত আছে। অর্থ প্রয়োগানুরূপ, ভাষা সচল। কবি ও সাহিত্যিকের তপস্যায় অর্থ শব্দরূপ হইতে প্রাণরূপে রূপায়িত হয়। এই জন্য অভিধান খুলিয়া অর্থ দেখিলে ভাবপ্রতীতি সম্ভব নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ভাবানুভব, শব্দ শুনিলে মনে যদি কোনও ভাব বা চিত্র ফুটিয়া না উঠে, তাহা হইলে নাম শেখা বা না শেখা সমান। তাহাতে বরং 'কতিপয় পিতাঠাকুরের' মত উল্টা উৎপত্তি হইতে পারে। এই জন্য দ্বিতীয় প্রবন্ধে বর্ণবাচক ও বর্ণদ্যোতক শব্দের প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করিব।

কিন্তু এখানেই বিদায় লইতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণবাচক আরও যাহার প্রয়োজন, তাহার কথা একটু আলোচনা

করিব। বিমিশ্র রঙ্গের কয়েকটি নাম আমরা বস্তুসাদৃশ্য হইতে পাই। রঙ্গের নামকরণ প্রায়ই এই বস্তুসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে। সোনার মত যাহা, তাহাই সোনালি, কনকপ্রভ কাঞ্চন, রূপার মত রূপালি, রজত, তামার মত তামাটে, তাম্র, আতাম্র, মরকত মণির ন্যায় যাহা, তাহা মরকত সবুজ (Emerald green), তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ কাঁচা সোনার রঙ্গ, গিরিমাটীর মত গৈরিক, স্ফটিকের মত স্ফটিকশুভ্র, কাচের মত কাচস্বচ্ছ।

ফুলের রঙ্গ হইতে পাই অতসীবর্ণা গৌরীকে, জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্য, যূঁইফুলী জ্যোৎস্না, ফুল্লেন্দীবরকান্তি, অমল-কমল-কান্তি, দাড়িমফুলের মত রাঙ্গা, চাঁপাফুলের রঙ্গ, নীলোৎপলশোভা, গোলাপী।

ফল হইতে পাই বিম্বাধর, কমলা রঙ্গ, বাতাবি লেবুর রঙ্গ, বাদামের মত বাদামী, কমলা রঙ্গ হিন্দীতে নারাঙ্গী, জাম হইতে জাম পাড়।

বিবিধ দ্রব্য হইতে পাই—অল্প সবুজ বুঝাইতে ফিরোজা, খদিরের মত বুঝাইতে খয়ের, ময়ূরকণ্ঠের মত ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী, খাকী, খড়ের মত রঙ্গ কটা, সিন্দূরের মত টক্‌টক্ লাল। রূপকথায় পাই হিঙ্গুল বরণ। হিঙ্গুল পারদমিশ্র দ্রব্যবিশেষ। ইহা তিন প্রকার;—চর্ম্মার, শুকতুক ও দখপাদ এবং যথাক্রমে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণ বুঝাইতেই সাধারণতঃ হিঙ্গুলের ব্যবহার হয়। মেঘের মত কালো, নবনীরদশ্যাম, দূর্ব্বাদল-শ্যাম, নবোদ্গত কিশলয়ের মত লাল।

এইরূপ ফুল, ফল ও দ্রব্য হইতে নানা রঙ্গের নাম পাই। হলুদের সহিত সবুজের আভা মিশিয়া জরদ, যেমন বাতাবী লেবু পাকিলে রঙ্গ হয়। পাতলা হলুদকে বাসন্তী বলে।

শ্রীযুত অঘোরলাল অধিকারী মূলবর্ণ লাল, পীত, নীল ও যুগ্মবর্ণ কমলা, সবুজ ও বেগুনি প্রত্যেকটিরই ঈষৎ, স্বাভাবিক ও গাঢ় এই তিন প্রকার ভেদে তিন প্রকার নাম করিয়াছেন। যথা—গোলাপী, লাল, হিঙ্গুল, বাসন্তী, হলুদ, পীত, আসমানি, নীল, নীলকান্ত, কমলাভ, কমলা, পীক, শ্যামল, সবুজ, মরকত, বেগুণফুলি, বেগুণি বঙ্গেশ। পীক কথা কোথাও চলিত আছে কি না, জানি না। ইহা ইংরাজি pink কথার বাঙ্গালা রকমফের নয় ত? বেগুণের এক নাম বঙ্গন, তাহা হইতে গাঢ় বেগুণে রঙ্গ বুঝাইতে বোধ হয় অঘোর বাবু বঙ্গনেশ ও বঙ্গেশ কথার সৃষ্টি করিয়াছেন।

উল্লিখিত ছয় রঙ্গের পাশে ছয়টি রং মিশ্রণের তারতম্য অনুসারে ছয়টি রং ফেলিয়াছেন, যথা—পাটল, কনক, জরদ, ময়ূরকণ্ঠী, ধূমল, আলতা এবং তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। লালের সহিত সামান্য হলুদ পাটল, যেমন ইটের রং; পীতের সহিত ঈষৎ লাল কনক, যেমন পাকা সোণা; হলুদের সহিত একটু সবুজ জরদ, যেমন পাকা বাতাবী লেবু; নীলের ভাগ অধিক যুক্ত সবুজ ময়ূরকণ্ঠী, নীলের মধ্যে একটু বেগুনের আভা ধূমল, লালের সহিত একটু নীল আলতা। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, অঘোর বাবু সংস্কৃত অর্থে শব্দ ব্যবহার না করিয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতেছেন, শ্বেতরক্ত পাটল, কিন্তু পীতাভ লালকে উনি পাটল বলিয়া চালাইতে চাহেন। ধূমল কৃষ্ণলোহিত, কিন্তু তাহাকে বেগুনের রঙ্গের আভাযুক্ত নীল বলিতে চাহেন।

কাল রঙ্গের যোগে তিনি আর তিন রঙ্গের নাম দিয়াছেন,—কপিল, কপিশ, পিঙ্গল। লাল, পীত ও একটু কাল কপিল; নীল, লাল ও একটু কাল কপিশ। নীল, হলুদ ও একটু কালকে পিঙ্গল বলিয়াছেন।

এক্ষণে ইংরাজী রঙ্গের বাঙ্গালা নাম কি হইবে, তাহাই আলোচনা করিব। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব আজ-কাল এত বেশী যে, খাঁটি বাঙ্গালী নব্য শিক্ষিতদের ভাষা ও লেখা বুঝিতে পারি না। অপরের কথা কি, ইংরাজী ও বাঙ্গালা পড়িয়াও অনেক লেখকের ভাষা ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সহিত কাব্য-কথাপ্রসঙ্গে এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'কালিদাসের শকুন্তলা বুঝি, সেক্সপীয়র বুঝি, কিন্তু আজকালকার বাঙ্গালা কবিতা বুঝি না। না পাই তার ভাব, না পাই তার মানে।' ইহার অন্যতম কারণ—আমরা অনেকেই মনে মনে ইংরাজীর তর্জ্জমা করিয়া লিখিতে বসি, কাযেই ভাষা আড়ষ্ট ও বিকৃত হইয়া যায়। অপরের পক্ষে তাহার অর্থগ্রহ সত্যই দুরূহ হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, ইংরাজী নামের বাঙ্গালা জানায় বিশেষ প্রয়োজন আছে। লাল রং ও তৎসদৃশ বুঝাইতে ইংরাজীতে বলি রেড, পিঙ্ক, স্কারলেট রোজ, ক্রিমজন ও পার্পল, অরেঞ্জ, ও গোল্ড। বাঙ্গালায় কি বলিব?

আমি নীচের নামগুলি গ্রহণ করিতে বলি,—লাল, আলোহিত বা লালচে, হিঙ্গুল, গোলাপী বা পাটল, শোণ, অলক্তক বা আলতা, অরুণ, কমলা, কনক বা সোনালি।

Straw-colourকে বাঙ্গালায় কটা বলিতে পারি। Maize এবং Maize-yellowকে আকনক বা ভুট্টা-রং বলিতে পারি। Citrine রং citron ফলের রং, হলুদের মধ্যে সবুজের আভা, বাঙ্গালায় জরদ বলিব। Lemon রং কাগজী লেবুর রং—সংস্কৃত 'জম্বীর' শব্দ বর্ণবাচক অর্থে প্রয়োগ করিলে বোধ হয় অপ-প্রয়োগ হইবে না।

Cerise রং ও cherry রং একই রং। চেরী কুলজাতীয় গাছ, কৃষ্ণ সাগরের পণ্টাস প্রদেশের সেরেসান প্রদেশ হইতে এই ফল রোমকরা য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত করেন। চেরী ফলের মত উজ্জ্বল লাল রঙ্গকে চেরী ও cerise রং বলে। চেরী ফল দেখি নাই, চেরী নাম বাঙ্গালায় গ্রহণ করা যাইতে পারে কিংবা লোহিত কথা দিয়া কায সারিতে পারি।

Drabকে বাঙ্গালায় কপিশ বা মেটিয়া বলা যাইতে পারে। ইংরাজের পার্লামেণ্ট সভায় কাগজপত্র নীল মলাটে ছাপা হয় বলিয়া blue-book বলিতে সরকারী ছাপা বই বুঝি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বই drab রঙ্গের মলাটে ছাপা হয়। ব্রাউন ও গ্রে রঙ্গের মাঝামাঝি এই রং।

Buff ঈষৎ পীত বুঝাইতে ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় পাণ্ডুবর্ণ বলা চলিবে।

Fawn হরিণের রঙ্গের ন্যায় রং। সংস্কৃতে হরিণের নাম হইতেই বোধ হয় 'হরিণ' কথা বর্ণ বুঝাইতে ব্যবহার হইয়াছে। ফন্ রংকে বাঙ্গালায় তাই হরিণ বলিয়া চালাইলে দোষ কি? Primrose কি রং বুঝায়, বুঝিতেছি না। ঈষৎ-গোলাপী চলিত কি না বলিতে পারি না।

Olive জলপাই ফল। কাঁচা জলপাই ফলের মত আপিঙ্গল সবুজকে অলিভ রং বলা হয়।

লিলাক রং ঈষদরুণ রং। লিলাক ফুলের রং। লিলাক ফুল কি, জানি না। সংস্কৃতের কোকনদচ্ছবি লিলাকের পরিবর্ত্তে বোধ হয় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

Slate শ্লেট পাথরের রং, আনীল ধূসর রং।

চকোলেট (chocolate) চকোলেটের মত, কৃষ্ণ ও লালযুক্ত ধূসর রং। বাঙ্গালায় চকোলেট রং শাড়ীর বিজ্ঞাপনে চলিতেছে দেখিতে পাই। খয়ের রং আর চকোলেট রঙ্গের মধ্যে বোধ হয় বিশেষ পার্থক্য নাই।

Chestnut—বাদামী রং।

Salmon—শ্যামন মাছ দেখি নাই, পিঙ্গলবর্ণ। তবে কেমন, ঠিক বলিতে পারি না।

Stone—পাথরের মত ধূসর।

রাসেট (russet) একটু কাল আভাযুক্ত লাল। সংস্কৃত পিঙ্গ ও পিশঙ্গকে বোধ হয় রাসেটের প্রতিশব্দরূপে লওয়া চলে।

Saffron জাফরাণ। জাফরাণ ফুলের রং গাঢ় পীতবর্ণ। জাফরাণকে সংস্কৃতে কুঙ্কুম বলে। কুঙ্কুমরাগ কিন্তু পীত নহে, অরুণবর্ণ।

ল্যাভেণ্ডার—সুগন্ধি পুষ্পবিশিষ্ট এক প্রকার বৃক্ষ। ইহার ফুলের রং অনেকটা বেগুন-ফুলের ন্যায়। ইহাকে বেগুন-ফুলি বলা যাইতে পারে। কাপড়ের বিজ্ঞাপনে হেলিয়ো বা বেগুন-ফুল রঙ্গের কাপড়ের উল্লেখ দেখিতেছি। হেলিও ট্রপ (heliotrope) সূর্য্যমুখী ফুল, তাহার রং হলদে। বেগুনি রঙ্গের আভাযুক্ত অরুণ অর্থে (heliotrope) কথায় এক অর্থ পাইতেছি (A shade of purple—Chambers Dictionary)

অন্য এক বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি 'ওক' রং। অর্থ বুঝি নাই। কথাটি ইংরাজী না বাঙ্গালা, তাহাও জানি না। ইংরাজী 'ওকার' বাঙ্গালা গৈরিকের বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। স্বনামখ্যাত বনস্পতি 'ওক' দেখি নাই, তাহার রঙ্গের মত কোনও রং আছে কি না, জানি না। আখরোট রং আর খয়ের রং একই প্রকার।

Sky-blue—আকাশী, আস্‌মানি। মেরুণ (Maroon) রংকে বাঙ্গালায় বাদামী বলিব—লাল ও পিঙ্গলের মিশ্রণ-সঞ্জাত রং।

Straw-colour—কট। Emerald green—মরকত Auburn অবার্ণ কথার ইংরাজী অর্থ রেডিস্ ব্রাউন—বাঙ্গালায় পিশঙ্গ ব্যবহার করা যাইতে পারে। Bottle-green—বাঙ্গালায় হরিতাভ।

ঈষৎ বুঝাইতে ইংরাজীতে যেখানে ish ব্যবহার হয়, তাহার বাঙ্গালায় আ উপসর্গ যোগে হয়। Yellowish—আপীত, আভা কথার যোগে বহুব্রীহি সমাস করিলেও চলে, যথা—পীতাভ। ইংরাজীতে দুইটি রঙ্গের মিশ্রবর্ণ বলিতে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যথা—yellow-green, সংস্কৃতেও এরূপ প্রয়োগ আছে, যথা—শ্বেতরক্ত, নীললোহিত। এইরূপ স্থলে আমরাও রক্তপীত, নীলরক্ত প্রভৃতি যুগ্ম কথা ব্যবহার করিতে পারি।

Light red বাঙ্গালায় আরক্ত, আলোহিত কিম্বা ঈষদ্রক্ত। Pale blue—আনীল বা নীলাভ।

উপরে কথিত বর্ণ ব্যতীত চিত্রকরগণ যে সকল water-colour এবং oil-colour ব্যবহার করেন, তাহারও অনেক নূতন নূতন নাম আছে। সিপিয়া, মভ, গ্যাম্বোজ, আম্বার প্রভৃতি। চিত্রকর-ব্যবহৃত এই বর্ণিকাভঙ্গ সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যতটুকু আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিতেছি, বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও নাম খুবই কম। বিশ্বের সুচারু ছবি, প্রকৃতির অনিন্দ্যকান্তি, আকাশে মেঘের লক্ষ লক্ষ বর্ণবিলাস, ফুলে ফলে তরুলতার অসংখ্য বর্ণভঙ্গিমা মানুষের মনে কত আনন্দ ও পুলকসঞ্চার করে। এই পুলক-প্রকাশের ভাষা হইতে কি আমরা বঞ্চিত থাকিব?

রসজ্ঞ ও সুধী ব্যক্তিগণকে এই আনন্দজনক কর্ত্তব্যে সাদর আহ্বান করিতেছি। বর্ণ-পরিচয়ের ও বর্ণ-নামকরণের কার্য্য তেলার নহে। আশা করি, পণ্ডিতগণের দৃষ্টি ইহাতে পড়িবে।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ-বি-এল)।

'সফল অভিসার'

তোরা নে সই, কণ্ঠহারে ফুল্ল কমল তুলে,
সরস বুকে আনবে সজীব দোলা,
আমার তরে মাল্য রচি' লাল করবীর ফুলে
দাঁড়িয়ে আছে হোথায় আপন ভোলা!
হাসুক্ তোদের প্রমোদ-শয়ন উৎসবেরি বুকে,
ভাসুক্ হিয়া আলো-হাসির বানে;
আমার তরে শ্মশানপুরে বাসর রচি' সুখে
চাহি' প্রিয় আছে পথের পানে।
কুঞ্জে তোদের ঢালবে মধু সুরের মাতাল পিক—
বসবে সখি, শুক পাপিয়ার মেলা;
হাসবে কুসুম, বর্ণবাসে ভরবে চারি দিক্
পাগ্‌লা অলির চলবে চপল খেলা।

আমার পাশে গাইবে ব'সে মত্ত শিবার দল
পাখার বাতাস ক'রবে শকুন কাক:
ক্ষিপ্ত নদীর কল্লোলে মোর কাঁপবে চরণতল,
শুনবো রবি চন্দ্র তারার ডাক।
জ্বলবে পাশে রুদ্র রোষে চিতার কালানল
অসীম সাধের কুঞ্জ হবে ছাই;
আমি প্রিয়ের অঙ্কোপরে রইব অবিচল
নাই বিরহ, দ্বন্দ্ববিরোধ নাই।
ডাকছে আমায় আর কি আমি থাকতে পারি, ভাই!
আবার কেন ফেলিস্ আঁখিধার!
যাবার বেলা এমনধারা কাঁদিয়ে দিতে নাই;
আজ যে আমার সফল অভিসার!

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

ব্যবধান

১

ম্যাট্রিক পাশের পর অনন্তের বিবাহটা মহা সমারোহে হইয়া গেল।

পিতা কলেজে পড়িবার ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হওয়ায় এত শীঘ্র এই অঘটন ঘটিয়া গেল।

মাতৃদেবী পরম পুলকিত হইয়া বধূ বরণ করিলেন।

অনন্তের মুখও অদূর-ভবিষ্যতের আশার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শ্বশুরের অর্থ-সাহায্যে সে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দশের মধ্যে কৃতী হইয়া উঠিবে,—জীবনের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে।

ফুলশয্যার রাত্রিতে নববধূ বহুক্ষণ অলঙ্কার-শিঞ্জিনী তুলিয়া, উঠিয়া বসিয়া, এ-পাশ ও-পাশ করিয়াও যখন তন্দ্রা-মগ্ন অনন্তের অন্তরে চৈতন্যের সঞ্চার করিতে পারিল না, তখন ধৈর্য্যহারা হইয়া সে ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে মৃদুভাবে একটি ঠেলা দিল।

অনন্তের তন্দ্রা টুটিয়া গেল।

নিদ্রালস আঁখি মেলিয়া সে জাগ্রত-স্বপ্নরাজত্বের শোভা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

রাত্রি মধ্যাহ্ন। কক্ষ স্তিমিত দীপশিখার ছায়াসুকোমল অস্পষ্ট আলোকে মায়ামণ্ডিত। পালঙ্কের সুবাসিত শুভ্র কুসুমশয্যায় পুষ্পাভরণা এক অপরিচিতা তরুণী—বাসন্তী পূর্ণিমার কিরণলেখার মত হৃদয়ের অতি সন্নিকটে শয্যা-লীনা; তাহার অঙ্গসৌরভে নাসারন্ধ্র আকুল।

অনন্তের অষ্টাদশবর্ষের অধ্যয়ন-নিরত বৃত্তিশূন্য চিত্ত সহসা কৈশোরের স্বপ্নজগৎ হইতে যৌবনের জাগ্রত জগতে উৎফুল্ল পাদক্ষেপ করিল।

সে শয্যালীনা সহচরীর পানে মুখ না তুলিয়াই প্রশ্ন করিল, "তোমার মন কেমন করছে?"

কিশোরী নীরবে হাসিল,—উত্তর দিল না।

অনন্ত কি বুঝিল, জানি না,—ম্লান দীপালোকে তাহার আনত মৃদুহাস্যরঞ্জিত মুখখানির পানে চাহিয়া সসঙ্কোচে কহিল, "তবে?"

কিশোরীর হাসির বেগ বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু এবারও কোন উত্তর আসিল না।

হাসি দেখিয়া অনন্ত দারুণ লজ্জিত হইয়া পুনরায় মুখ নীচু করিল, আর কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইল না।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর কিশোরী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তোমার বুঝি মন কেমন করছে?"

এবার হাসিবার পালা অনন্তের, কিন্তু কি জানি কেন, তাহার অন্তর সহসা প্রশ্নের এই অসঙ্গতিতে লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল এবং মনে হইল, ইহা বালকোচিত।

বয়সের যুগসন্ধিতে এমনই একটা অবিমিশ্র অবজ্ঞা বিগত জীবন সম্বন্ধে ফুটিয়া উঠে। বালক, যুবক ও বৃদ্ধ পরস্পর পরস্পরের আচরণ লইয়া নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দাবী করিতে ভালবাসে। জীবনের পাতায় যেন শুধু অভিজ্ঞতার অক্ষর দিয়া সে তাহার প্রাণ-পুস্তকখানিকে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে সযতনে পরিশুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে।

বধূর বিদ্রূপরঞ্জিত কৌতুকহাস্য শাণিত তীরের মতই অনন্তের অন্তরে আসিয়া বাজিল; সে না পারিল মুখ তুলিয়া সহজভাবে কথা কহিতে, না পারিল নব-অনুরাগ-সিক্ত হৃদয়-পদ্মের বদ্ধ দলগুলি মেলিয়া নূতন বর্ণের ছটায় অনুরঞ্জিত করিতে।

বর কোন উত্তর দিল না, সুতরাং বধূও নীরব রহিল। অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোক কুসুম-শয্যার প্রান্তে একখানি রজতনির্ম্মিত তরবারির মত দুইটি মিলনতৃষাতুর প্রাণীর মাঝখানে অনাবশ্যক ব্যবধান রচনা করিয়া নিশ্চল পড়িয়া রহিল।

আকাশের ঊর্দ্ধ সীমান্তে ম্লান-নক্ষত্রের হাসি শুষ্ক শুভ্র—প্রাণহীন। খণ্ড-চন্দ্রের পশ্চাতে একটুকরা কৃষ্ণ মেঘ দ্রুত-গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে নীলের সমারোহ। আলো ও ছায়ার এই অপরূপ কৌতুকলীলা লক্ষ্য করিতে বিশ্বমধ্যে নিশীথ রাত্রিতে কেহ বিনিদ্র ছিল কি না, জানা না থাকিলেও, ঐ দুটি নব জীবন-পথের পথিক, আনন্দ-নিকেতনের সুরম্য সৌধে প্রথম পাদক্ষেপমুখে সহসাই নীরবে ইহার গতি লক্ষ্য করিতেছিল।

ক্ষুদ্র বাড়ীতে আত্মীয়সমাগমে তিলধারণের স্থান ছিল না। মধুযামিনীর পর আর এমন নিরালা রাত্রি আসিল

না, যাহার আশ্রয় লইয়া লজ্জাতুর ম্রিয়মাণ হৃদয় অলক্ষ্য-প্রসারিত কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরাল সরাইয়া পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া সহজ স্বচ্ছন্দ উল্লাসে পরস্পরকে চিনিয়া লইতে পারে।

অষ্টাহান্তে শ্বশুরবাড়ী আসিলে তথাকার অধিবাসিবর্গের রহস্য উৎপীড়নে অনন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। নববিবাহিতের প্রতি কর্ম্ম—প্রতি পদক্ষেপ কি এমনই কৌতুকের সৃষ্টি করিয়া হাস্যতরঙ্গে কক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তুলে?

রাত্রিতে পত্নীকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, "এরা বড় অসভ্য, সমস্ত দিন যা জ্বালিয়েছে।"

রেণু শ্লেষের হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "অন্ততঃ বয়সের হিসাবজ্ঞান ওদের নেই!"

রহস্য অনন্তের অন্তরে বিঁধিল। ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া সে কি বলিতে গিয়া চুপ করিল।

রেণু বুঝিল না,—অভিজ্ঞতাভিমানী তরুণ প্রাণে এ আঘাত কতখানি বাজিল।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর আলাপ জমিল না। পরিপূর্ণ অভিমান লইয়া উভয়ে উভয়ের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল। শুক্লা রজনীর আর একটি মধুযামিনী এমনই অতর্কিতে মৃদু নিশ্বাসের মত বহিয়া গেল।

প্রভাতে শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কলেজে পড়বে ঠিক করলে, অনন্ত?"

অনন্ত মুখ না তুলিয়া উত্তর দিল, "পড়া কতদূর হয়ে উঠবে, বলতে পারি না, ইচ্ছে আছে, চাকরীর চেষ্টা দেখব।"

তিনি গড়গড়ার নলটা হাতে ধরিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে জামাতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি?" পরে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সহসা এক সময়ে গড়-গড়াটায় প্রবল টান দিয়া যেন সে কথাটাকে একদম উড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—"আমার মতে বঙ্গবাসী কলেজ মন্দ নয়।"

অনন্ত ঘাড় হেঁট করিয়া তেমনই মৃদু কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমি ত আর পড়বো না।"

সুশীল বাবু মনে মনে একটু আহত হইলেন। ছেলেটি বিনয়ী, নম্র এবং নিতান্ত বালকও বটে, কিন্তু মৃদু উচ্চারিত কণ্ঠে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল—যাহাকে ক্ষণিকের খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কোমল অথচ অনমনীয় এই কিশোরের আচরণ তাঁহাকে বিশেষরূপেই বিচলিত করিয়া তুলিল।

নলটা মাটীতে রাখিয়া তিনি কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "তা কি হয়, বাবা, এই অল্পবয়সে পড়া তোমার ছাড়া হবে না। এই ত সবে জীবনের আরম্ভ। অবহেলায় এ সুযোগ নষ্ট করলে সারা জীবন যে অনুতাপ ক'রে কাটাতে হবে।"

অনন্তের আর প্রত্যুত্তর করিবার ইচ্ছা হইল না। বার বার একই কথা পূজনীয় ব্যক্তির সম্মুখে বলা নিতান্ত অশোভন ও একগুঁয়েমির লক্ষণ।

রাত্রিতে পতিপত্নীর সাক্ষাৎ হইলে, রেণু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "শুনলুম, তুমি না কি আর পড়তে চাও না?"

অনন্ত বলিল, "আমার ইচ্ছে চাকরী করি!"

রেণু হাসিল, কহিল, "যে চাকরীর বাজার, কত বি, এ, এম, এ গড়াগড়ি যাচ্ছে। এ বাজারে কি বিশেষ সুবিধা হবে? বাবা কত দুঃখ করছিলেন।"

অনন্ত ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "তাঁর দুঃখ করা মিছে। সকলকে নিজের আদর্শমাফিক গড়তে যাওয়া মানুষের ভুল ধারণা।"

রেণু এ আঘাতটুকু সহ্য করিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু বাবা মা সন্তানের মঙ্গলকামনাই ক'রে থাকেন।"

অনন্ত শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "আতিশয্য জিনিষটা বড় দোষের। কথায় বলে—"

রেণুর মুখ-চোখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। সে কোন প্রকারে নিজেকে সম্বরণ করিয়া ধীরভাবে প্রত্যুত্তর করিতে গেল, কিন্তু কণ্ঠের তীব্রতা ঢাকিতে পারিল না।

সে বলিল, "মানুষ চায়—প্রত্যেকে যাতে মানুষের মত হয়,—প্রত্যেকে যাতে স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ ক'রে স্বচ্ছন্দ-ভাবে সংসারে হেসে খেলে বেড়ায়। এই তার আদর্শ। এতে দোষের বা অপমানের কি আছে, তা ত জানি না।"

অনন্ত ক্ষণকাল কোন উত্তর দিতে পারিল না। রেণুর কথার তীব্রতায় তাহার সারা অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। ইহার প্রত্যুত্তরে এমন কথা বলিতে হয়—যাহা যুক্তিতর্কবিরুদ্ধ ও নিতান্ত অশোভন।

বিবাহের প্রধান সর্ত্তই হইতেছে—এই লেখাপড়া

শিখাইবার প্রলোভনে এবং এই সর্ত্তের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহারাই। তাহার পিতা দারিদ্র্যপ্রযুক্ত পুত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় অপারগ হওয়ায় না এত শীঘ্র তাহাকে এই বন্ধন গ্রহণ করিতে হইয়াছে! সে কৃতবিদ্য হইবে—মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া জন্ম সার্থক করিবে, ইহাই ছিল তাহার মহৎ প্রলোভন। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই না পরম আনন্দে সে পথের ভাল-মন্দ বিবেচনা করে নাই, দান-প্রতিদানের কথা ভাবে নাই, সম্মান-সম্ভ্রমের দাবীও অগ্রাহ্য করিয়াছে!

রেণু আপন কণ্ঠের তীব্রতায় আপনি চমকিত হইয়া লজ্জিত হইল। ভাবিল,—ছি! সামান্য একটা সাংসারিক সমস্যা লইয়া এমন তিক্ত তর্কের প্রয়োজন কি? দূর-ভবিষ্যৎকে টানিয়া আনিয়া কেন বর্ত্তমানের সৌন্দর্য্য নষ্ট করি? অনুভবের পরম মুহূর্ত্তকে কেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে নগ্ন কদর্য্যতায় কুৎসিত করিয়া তুলি?

সে অনন্তের একখানি হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল, "রাগ করলে?"

অনন্ত রেণুর মুখপানে চাহিল না। চাহিলে হয় ত এই শরতের লঘু মেঘ বাতাসে উড়িয়া যাইত।

সে মনে মনে ভাবিল,—আঘাত দিয়া সান্ত্বনা দিবার এই প্রচেষ্টা যেন বালককে ভুলাইবার একটা কৌশলমাত্র।

অভিমানভরে রেণুর হাত মুক্ত করিয়া লইয়া শয্যার অপর প্রান্তে গিয়া সে নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। রেণুর কথার কোন উত্তরই দিল না।

রেণুও দারুণ অভিমানে দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করিল না। স্তব্ধ মৌনতায় ব্যর্থ প্রহরগুলি লইয়া নীরবে তৃতীয় নিশাও কাটিয়া গেল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া অনন্তকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। সুশীল বাবু রেণুকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাল তোর কাছে কিছু বলেছিল, মা?"

রেণু উত্তর দিল, "না?"

"তবে কোথায় গেল? এতখানি বেলা হ'ল,—যাই, নিজেই একবার দেখি।" বলিয়া তিনি উঠিতে যাইতে-ছিলেন, বাধা দিয়া রেণু বলিল, "সে চ'লে গেছে, বাবা।"

"চ'লে গেছে!" হতাশাভরে তিনি কন্যার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি ক'রে বুঝলি মা?"

নতমুখী রেণু মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "ব্যাগটা ত ঘরে নেই।"

তার পর কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিবার পর রেণু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্ণে সুশীল বাবু পুনরায় কন্যাকে ডাকাইলেন। বাড়ীতে গৃহিণী নাই, সুতরাং কন্যার সুখ-দুঃখের ভার যে তাঁহার। বিবাহের এমন মধুর স্বপ্ন কাটাইয়া যে তরুণ সহসা জাগ্রত জগতে নিতান্ত অকরুণের মত চলিয়া যাইতে পারে, তাহার অন্তরের বেদনা নিশ্চয়ই সুগভীর,—তাহাতে তাঁহার সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না।

কন্যা আসিলে তিনি সস্নেহে বলিলেন, "আমার কাছে লজ্জা করিস না, রেণু—সব বল। কি হয়েছিল?"

রেণু বলিল, "কৈ, কিছুই ত হয় নি, বাবা।"

"তবে শুধু শুধু না ব'লে ক'য়ে সে চ'লে গেল কেন?"

রেণু কোন উত্তর না দিয়া ফরাসের প্রান্তটা অকারণে নাড়িতে লাগিল।

সুশীল বাবু ধীরে ধীরে তাহার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "আমি যে একাধারে তোর বাবা মা, আমাকেও কি লুকোবার কিছু আছে, মা?"

অশ্রুভরে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

রেণুর নয়নও নিরশ্রু রহিল না। পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "এত শীগ্‌গির আমার বিয়ে দিয়েছিলে কেন, বাবা? তা হ'লে ত তোমায়—"

পিতা হাসিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লী মেয়ে কোথাকার! ছেলেমেয়ের মান অভিমান সহ্য করাই ত বাপ-মার গৌরব। এতে যে কি আনন্দ—"

রেণু মুখ তুলিয়া দীপ্তকণ্ঠে কহিল, "সে বোঝেন বাপ, মা। কিন্তু বাবা, এমন স্নেহের যে অপমান করতে পারে, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখাই—"

সুশীল বাবু বালকের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে হাসির বেগ ঈষৎ থামিলে ঘাড় দোলাইয়া বারম্বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, "অপমান—অপমান! তুই হাসালি রেণু। ঐ একফোঁটা ছেলে—ও করবে আমায় অপমান!"

রেণু বলিল, "নয় ত কি? দেখতে কোমল হ'লে কি হয়?"

সুশীল বাবুর মুখের হাসি নিবিয়া আসিল। রেণুর পানে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কেন, সে কি বলেছে তোকে?"

রেণু বলিল, "তোমার দান সে নেবে না। সে পড়বে না, চাকরী করবে।"

"কিন্তু রেণু, পড়ার সর্ত্ত ত তারাই করিয়ে নিয়েছিল। আমি নিজে থেকে এ প্রসঙ্গ তুলি নি।"

রেণু বলিল, "এখন মত বদলেছে। সে তার খুসী, এতে তোমার কি বলবার আছে, বাবা?"

রেণুর ক্রোধ দেখিয়া সুশীল বাবু হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা—আচ্ছা—সে আমি বুঝবো। আজ বুঝি আর খাবার দিবি নে আমায়;—প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো।"

রেণু লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিল।

তা কারণটা ধরিতে গেলে অনন্তের ক্রোধটা বালকোচিত বৈ কি! বিবাহের পূর্ব্বে এ আত্মসম্মানজ্ঞানটুকু যদি জাগ্রত থাকিত ত তরুণী পত্নীর সঙ্গে সামান্য কথার ফাঁকে এই বিরোধ ধোঁয়াইয়া উঠিয়া ভেদের প্রাচীর তুলিয়া দিত না। কিন্তু, তখন ত বয়সের হিসাবটা কেহ রহস্যের আঘাতে সচেতন করিয়া দেয় নাই! যে অভিজ্ঞতা হইতে এই অপূর্ব্ব আত্মসম্মানের সৃষ্টি,—তাহা যে একান্তই মানস-কল্পিত।

দিন কয়েক পরে বৈবাহিকের নিকট হইতে পত্র আসিল, আর আসিল মণিঅর্ডারে টাকা।

তিনি লিখিয়াছেন, "পত্রপাঠমাত্র যেন জামাতা বাবাজীবন কলিকাতায় গিয়া কোন ভাল কলেজে স্থান সংগ্রহ করিয়া লন, বিলম্বে স্থানাভাব ঘটিতে পারে।"

পিতা পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বেয়াই মশাই চিঠি দিয়েছেন, শীগ্‌গির কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হতে। দেরী হ'লে সিট্ পাওয়া মুস্কিল।"

অনন্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"কিন্তু আপনি ত বলেছিলেন, কলেজে পড়বার ব্যয়ভার বহন করতে পারবেন না?"

পিতা বলিলেন, "বিয়ের সর্ত্তই ছিল—তাদের পড়াবার। বেয়াই চিঠি লিখেছেন, টাকাও পাঠিয়েছেন।"

অনন্ত ধীর স্বরে বলিল, "তাঁদের টাকা নেওয়াটা কি ভাল দেখায়?"

পিতা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? সে সর্ত্ত কি ছিল না?"

অনন্ত বলিল, "সর্ত্ত যাই থাক, কুটুম্বের নিকট হ'তে ও দান না নেওয়াই ভাল। ওতে ছোট হ'তে হয়।"

পিতার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল। রূঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, "সে বিবেচনা আমার যথেষ্ট আছে। বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি,—কিসে মান অপমান, তোমার চেয়ে ভাল বুঝি, বাপু। ও সব উপদেশ আর আমায় দিতে হবে না। যাও—বিছানাপত্তর গুছিয়ে নাও গে। কাল সকালের ট্রেণেই রওনা হ'তে হবে।"

পিতার সম্মুখে আর প্রত্যুত্তর না করিয়া অনন্ত মায়ের নিকটে আসিয়া জানাইল, ইহা অসম্ভব। তাঁহাদের দান লইয়া কিছুতেই সে কলেজে পড়িবে না।

মাতা অনেক বুঝাইলেন—অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু অনন্ত দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিল,—অসম্ভব।

অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া মাতা বলিলেন, "তোর কি সবই অনাছিষ্টি। মান-অপমান-জ্ঞান আমাদের হ'লো না, হ'লো কি না তোর? যখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখবি, তখন ও কথা বলা সাজবে। কথায় বলে, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই—কুলো পানা চক্কোর।"

অনন্তও ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "বেশ, তাই হবে। বলবার মত অবস্থা যে দিন আমার হবে, সেই দিনই শুনো। কিন্তু ও টাকা আমি স্পর্শ করবো না। পারি ত নিজের পায়েই ভর দিয়ে দাঁড়াবো।"

পরদিন প্রাতঃকালে অনন্ত লক্ষ্মী ছেলের মত সত্য সত্যই কলিকাতায় চলিয়া গেল।

পিতা কয়েকখানি নোট তাহার হাতে দিয়াছিলেন। অনন্ত মায়ের চরণে প্রণাম করিবার সময় সে কখানি তাঁহার পায়ের উপর রাখিয়া বলিয়াছিল, "নিতান্ত অভাব বুঝি ত চেয়ে নেব, এখন রেখে দাও।"

স্বাবলম্বন জিনিষটা সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু কলিকাতার ঘনজনারণ্যে তাহা মায়ামরীচিকার মতই অদৃশ্য হইয়া গেল।

পথে পথে জনস্রোত—কর্ম্মপ্রবাহে চঞ্চল। এই সহরেরই সহজ বৈরাগ্যের মত, একটি নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টি তাহার নাই। আনত ভ্রূর নিম্নে কিসের কোলাহল বা ক্রন্দন, কিসের বেদনা বা আনন্দ, কিসের আবেদন বা আদেশ—কিছুরই বোধ তাহার নাই। কর্ণ আছে, শব্দ গ্রহণ করে; অর্থ লইয়া মাথা ঘামায় না। চক্ষু আছে, চাহিয়া দেখে; অন্তর স্পর্শ করে না। প্রাণ আছে, স্পন্দিত হয়; রক্তের সম্পর্ক মানিয়া চলে না। সহরের বায়ু দেহের উপর দিয়া লঘু স্বচ্ছন্দ গতিতে অবাধে বহিয়া যায়—মর্ম্মে আশ্রয় মাগিয়া ফিরে না।

পরিশ্রান্ত অনন্ত দ্বিপ্রহরে অনেক ঘুরিয়া একটা ছায়াচ্ছন্ন রকে আশ্রয় লইল। ব্যাগটা এক পাশে রাখিয়া অবিন্যস্ত 'কেশরাশি' সরাইয়া কপাল হইতে স্বেদবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া ঊর্দ্ধপানে চাহিল।

আকাশে প্রজ্বলিত সূর্য্যের দিগ্‌দাহী জ্বালাময়ী ময়ূখ-মালা—তীক্ষ্ণ, তীব্র, স্নেহলেশহীন। সেই কিরণচ্ছটায় নীলের সমারোহ সীমার কোলে আশ্রয় লইয়াছে। মধ্যাহ্নের তপ্ত আকাশ যেন সে প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়া পড়িবার অপেক্ষায় ধরণীর পানে নত-নয়নে চাহিয়া আছে। বায়ু শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিবাকরের এই উন্মত্ত অভিযান দেখিতেছেন।

"আরে অনন্ত যে! কোথা থেকে হঠাৎ?"

কণ্ঠস্বরে অনন্ত চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহারই পরিচিত সুরেন। তাহাদেরই গ্রাম হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে তাহার বাড়ী। সেখান হইতে জেলাস্কুলে নিত্য যাতায়াত করিত। কষ্টসহিষ্ণু শান্ত ছেলেটি তাহারই এক ক্লাস উপরে পড়িত। মাত্র গত বৎসর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সে কলেজে পড়িতে আসিয়াছে।

অনন্তের পরিশ্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, "বাড়ী থেকে আজ এসেছিস বোধ হয়? কোথায় উঠলি?"

অনন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কোথাও ত উঠিনি এখনও, কোন জানা যায়গাও নেই। তাই ভাবছি।"

সুরেন ক্ষণেক কি ভাবিল, পরে হাসিয়া কহিল, "আমাদের বাসায় বোধ হয় অসুবিধে হবে। একখানা ঘর,—চার জন লোক থাকি। নিজেদের হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়—বাসন মাজতে হয়। এত কষ্ট সইবে কি?"

অনন্ত বলিল, "সইবে ব'লেই ত বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। অভ্যাস না থাকলেও ক'রে নিতে হবে। চল না সুরেন দা,—ব্যাগটা রেখে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

সুরেন কহিল, "স্বাগতম্।"

আশ্রয় মিলিল।

অনন্তের মুখে সুরেন সব শুনিল। শুনিয়া কহিল, "নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অবশ্য খুবই গৌরবের এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিতও; কিন্তু ঋণ-গ্রহণে ক্ষতি কি? আপাততঃ যখন নিরুপায়, তখন টাকা নেওয়াই শ্রেয়ঃ। পরে শোধ করলেই হবে।"

অনন্ত বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল। সম্মুখে তাহার দুইটি পথ খোলা। শ্বশুরের অর্থ গ্রহণ করিয়া জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ, অথবা স্বল্প মাহিনার চাকুরীতে সমস্ত জীবনটাকে আহুতি-প্রদান।

প্রথমটিতে আপাত-বিদ্রূপের কশাঘাত অনন্তের মন জর্জ্জরিত করিলেও, পরিণামে সম্মান, অর্থ ও যশের কিরীট বিজয়ের গৌরব প্রচার করিবে, এবং দ্বিতীয় পথে স্বাবলম্বনের উৎকট উল্লাস আপাত সুরম্য হইলেও, ভবিষ্যতের কৃষ্ণ-যবনিকান্তরালে স্তরে স্তরে সজ্জিত অন্ধকাররাশি হৃত-স্বাস্থ্য—ভগ্নমনে পরাজয়ের কালিমা লেপন করিয়া দিবার প্রতীক্ষা করিতেছে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার পর সে মাতাকে অর্থ পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়া দিল।

সুরেনকে বলিল, "সংসারে একটা জিনিষের অভাব প্রবলভাবে অনুভব করছি, সে অর্থ। দরিদ্রের মান-সম্মান, আত্মগৌরব—সমস্তই মিথ্যা স্তুতিমাত্র।"

সুরেন দেখিল—দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অনন্তের নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু উথলিয়া উঠিল এবং অনেকখানি আশা ভগ্ন-পক্ষ বিহঙ্গমের মত নিরাশার ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

এক দিন সুশীল বাবু রেণুকে বলিলেন, "দেখলি মা, ছেলে-মানুষের খেয়াল বৈ ত নয়। খবর পেলুম—পড়াশোনা তার ভালই হচ্ছে।"

রেণু মুখ ভার করিয়া রহিল,—কোন উত্তর দিল না।

সুশীল বাবু বলিলেন, "অনেক দিন হ'লো, সে এখানে আসে নি, লিখে দিই।"

রেণু ইহারও কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

পিতার দৃষ্টিতে অসঙ্গতি কিছু ধরা না পড়িলেও বিভা আসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন বৃষ্টি করিয়া অনেক কিছুই জানিয়া লইল। বিভা সুশীল বাবুর ভাগিনেয়ী—রেণুরই সমবয়সী। অল্প দিন হইল, তাহার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে রেণুর তুলনায় তাহার অভিজ্ঞতা যে কত বেশী, ইহারই প্রমাণস্বরূপ সে একতাড়া রঙ্গীন সুবাসিত খাম রেণুর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল, "হিসেবের গরু ত বাঘে খায় না,—চেয়ে দেখ।"

রেণু হাসিয়া বলিল, "মরণ! কি অমূল্য জিনিষই পেয়েছিস্!"

বিভা কহিল, "নয়? এ যে মহামূল্য। এর রঙ্গীন বুকের লেখা—হীরা-মাণিকের চেয়েও মূল্যবান্। কারণ, টাকায় ত এ জিনিষ মেলে না। কৈ, তোর মাণিক একবার দেখি?"

রেণু তাচ্ছীল্যভরে কহিল, "আমার অমন কাঙ্গালের লোভ নেই।—কাচকে হীরে ব'লে আদর করতে শিখিনি।"

বিভা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "নে, রঙ্গ রাখ—বের কর তোর বরের চিঠি।"

রেণু গম্ভীরমুখে বলিল, "যে জিনিষ নেই, তা বের করবো কোথা থেকে?"

বিভা বিস্ফারিত-নেত্রে রেণুর পানে চাহিয়া কহিল, "সত্যি—সত্যি—সত্যি?"

রেণু ঘাড় নাড়িল।

বিভার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। স্তব্ধকণ্ঠে কহিল, "সে এমন কাঠখোট্টা কেন, ভাই? শুনেছি ত বয়সে দিব্য তরুণ,—কলেজের ছোকরা!—আমাদের উনি বলেন, কাব্য-কল্পনা যা কিছু হুড় হুড় ক'রে বেরোয় এই সময়টায়। পরে অবশ্য সংসারের পেষণে চাঁদের হাসি, ফুলের গন্ধ, মলয় হাওয়া—সব একাকার হয়ে যায়। তখন ও সব খুঁজতে গেলেই নাকি পাগলামো করা হয়।"

রেণু বলিল, "বয়স তরুণ ব'লেই ত সমস্যা এত জটিল। কিন্তু যাক এ সব কথা, তোর বরের কথা বল, শুনি।"

বিভা হাসিয়া বলিল, "সে সাত কাণ্ড রামায়ণ ত দিনরাত্রি শোনাব বলেই এসেছি। এর পর কাণ ঝালাপালা হয়ে উঠবে। কিন্তু ভাই, তোদের রকমখানা কি? তুই-ও তাকে চিঠি লিখিস নি?"

রেণু হাসিয়া বলিল, "কেঁদে মান আর যেচে সোহাগের মত বিড়ম্বনা জগতে খুব কমই আছে!"

বিভা বলিল, "স্বামীর কাছে পত্র লেখা কি ওর সঙ্গে সমান হ'লো? ছি—ছি! তুই বলিস কি? স্ত্রীর নতি স্বীকারে কোন দোষ নেই।"

রেণু বলিল, "ভালবাসা যেখানে সম্বন্ধকে নিবিড় ক'রে তোলে, সেখানে ও কথা সাজে, ভাই। অন্যথায় অপমান।"

বিভা ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কেন? স্ত্রী স্বামীর—"

বাধা দিয়া রেণু বলিল, "দাসী। কেমন? তা স্বীকার করি, একদেশদর্শী শাস্ত্র এই বিধান দিয়েছে। কিন্তু ভাই, এই দাসীত্ব যে কর্তৃত্বেরই নামান্তর। আসল সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে প্রাণের ভালবাসা থেকে। সে পরশমণির স্পর্শে লোহার জিঞ্জিরও সোণার ব'লে মনে হয়।"

বিভা বলিল, "তবেই বোঝ—পরাজয়ে কত সুখ, বন্ধনে কত তৃপ্তি।"

রেণু হাসিয়া বলিল, "যার অন্তরে প্রাণের এই সুনিবিড় যোগ নেই, তার পরাজয় ত গ্লানির, তার বন্ধন যে শৃঙ্খলের প্রচণ্ড উৎপীড়ন।"

বিভা বলিল, "ভালবাসা পেতে হ'লে কি করতে হয়, জানিস?—ত্যাগস্বীকার। পাব ব'লে দিতে গেলে মনে মনে একটা আঘাত লাগে, যা দেব, সে অনুপাতে না-ও ত পেতে পারি। কিংবা যা পেয়েছি—" বলিয়া হাসিয়া কহিল, "দূর ছাই—যত সব নীরস ভুয়ো তর্ক। সত্যিই কি তার কাছে তুই কিছু পাস নি? এক দিনের জন্য?—এক দণ্ডের তরেও?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে রেণুর পানে চাহিল। রেণুর মুখ পলকে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। এক দণ্ডের তরে সে কি সত্যই কিছু পায় নাই? সেই আবেগপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সম্বোধন—সেই প্রাণপূর্ণ উত্তপ্ত স্পর্শ? কে জানে,—ভালবাসার মৃদু লঘু পদক্ষেপ তাহারই অন্তরালে নিঃশব্দে ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল কি না? কে বুঝিবে, সেই দুটি সরল বালকোচিত প্রশ্নের মধ্যে কোন্ মহীরুহের ক্ষুদ্র বীজ লুকাইয়াছিল? ভালবাসার? হয় ত তাই।

শেষ চিঠি

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]

শিল্পী—শ্রীপার্ব্বতীকান্ত ভট্টাচার্য্য

বিভা তাহার আরক্তিম মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবে? বাঁধন যে তোর মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে, মুখে অস্বীকার করলে চলবে কেন? আয়, যদি লিখতে সঙ্কোচ হয়, আমি ব'লে দিচ্ছি—লেখ দেখি। এ বিষয়ে আমি এক্সপিরিয়েন্সড্।"

রেণু গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "না,—ছি!"

বিভা বলিল, "ছি—কেন? ও, বুঝেছি, মান হয়েছে! হি-হি-হি। আরে এ যে ভালবাসারই নামান্তর!"

হাসিতে হাসিতে সে রেণুর গায়ে লুটাইয়া পড়িল। রেণু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল।

বিভা স্বামীকে লিখিল, "···খোঁজ নিয়ে একবার দেখবে কোথায় রেণুর বর আছে। অর্থাৎ তার নাম······। পত্রপাঠ তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আনা চাই,—আমার হুকুম। অন্যথায় কলেজের চাকরী বজায় থাকলেও, এখানকার চাকরী অদ্য অপরাহ্ণ হতে টলটলায়মান। পত্রের উত্তর না দিলেও চলবে। হুজুরে হাজির হয়ে সমস্ত নির্ভয়ে নিবেদন করবে।"

তিন দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল, "···হুজুরে হাজির হবার বাসনাই ছিল, কিন্তু কলেজের বিশেষ জরুরী কাযের জন্য···থাক্, সে কৈফিয়ৎ সেখানে গিয়েই দেব। যার সংবাদ চেয়েছ—সে এই কলেজেই পড়ে—ছেলেটি ভাল। দেখি,—এক দিন সুবিধামত কথাটা পাড়বো। চাকুরী সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে হুকুম হয়। ও চাক্‌রীটুকু খোয়ালে—এ ভূতের বোঝা বইব কি ক'রে? অন্যের কি হয় বল্‌তে পারি না,—আমার সে ক্ষমতা নেই।"

বিভা হাসিতে হাসিতে রেণুর ঘরে আসিয়া চিঠিখানা তাহার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমার—ফিস্?"

রেণু আদ্যোপান্ত পড়িয়া তাহার এলো খোঁপাটায় একটা টান মারিয়া পিঠের উপর গোটা দুই কীল বসাইয়া দিল। হাসিতে হাসিতে বিভা কহিল, "ও বাবা, এ যে নগদ বিদায়! থাম—থাম মক্কেল মশায়,—ওটা মুলতুবী রাখ। চওড়া পিঠের ওপর অমন ফুলের মুঠো না পড়লে মানাবে কেন? সেখানকার যা পুরস্কার, এখানে তা তিরস্কার যে গো!"

রেণু গম্ভীর মুখে বলিল, "দোহাই বিভা, তোর পরোপকার-প্রবৃত্তিটা একটু কমা। শেষে ঝোঁকের মাথায় কোন্ দিন সর্ব্বস্ব খুইয়ে বসবি।"

বিভা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "ইস্ লো—তা আর নয়! সে ভয় আমি মোটেই করি না, রেণু। আমার পাওয়া কি শুধু বাইরের? মনের পূর্ণ তৃপ্তিই না বাইরের হাসিটুকু ফুটিয়ে তুলেছে! নিজের শক্তি না বুঝে কেউ পরের উপকার করতে যায় না, জানিস্?"

রেণু একটি মৃদু নিশ্বাস মোচন করিয়া বিভার একখানি হাত টানিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তুই-ই সুখী।"

স্বামি-গর্ব্বে বিভার উজ্জ্বল নয়ন দু'টি অশ্রুময় হইয়া উঠিল। রেণুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সে কহিল, "তুই-ই বা কেন সুখী হবি নে, রেণু? ও পরশমণি তোকেও পেতে হবে—এর তপস্যা তোকেও করতে হবে, ভাই! বল ভাই, আমি যা বলবো, তা ঠেলবি না, আমার কথা রাখবি?"

রেণু নীরবে মাথা নত করিল।

বিভা বলিল, "চুপ ক'রে থাকলে মৌনকে সম্মতি ব'লে ভুল করবো—এমন মেয়ে আমি নই। তোকে বলতে হবে। বল, তো হ'তে তার কোন অসম্মান হবে না?"

রেণু দীপ্তকণ্ঠে কহিল, "আমি করেছি তার অসম্মান?"

বিভা তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "চুপ, কোন কথা নয়। কর নি—করবে না, জানি। তবু যদি অসতর্ক হয়ে—উত্তেজিত হয়ে—"

রেণু ধীর স্বরে কহিল, "উত্তেজনার কারণ সে যদি হয়, আমি কথা দেব কি সাহসে? তবে হাঁ, স্বীকার করছি, সহ্য না করতে পারলেও আঘাত আমি করবো না।"

বিভা আনন্দে রেণুর মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "তবে আর একবার কলম ধরি গে। দেখি, এবারকার প্রহার সহ্য ক'রে কেমন বীরপুরুষ অটল নির্ব্বিকার হয়ে ব'সে থাকেন!"

বিভার স্বামী সে পত্রাঘাত সত্যই সহ্য করিতে পারিলেন না। রামপুরে আসিয়া বিভাকে বলিলেন, "জরুরী তলব কেন?"

বিভা গম্ভীর হইয়া বলিল, "সে কথা ত পত্রেই ব্যক্ত ছিল, আসামী কৈ?"

সুনীল বলিল, "ছেলেটি শান্ত, শিষ্ট, নম্র বটে, কিন্তু বৈশাখের মেঘমেদুর আকাশ। অন্তরে তার বজ্র লুকানো।"

বিভা সকোপ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আকাশ ত আষাঢ়েই মেঘমেদুর হয়। এরই মধ্যে তোমার বয়েস

বুঝি সাতের কোঠা পেরিয়েছে? যাক, আনতে পারলে না?"

সুনীল বলিল, "আমি সব খুলে বলতেই বললে, 'মাপ করবেন, স্যর! পরীক্ষা নিকটে—এ সময় যাওয়া অসম্ভব'!"

বিভা হাসিয়া বলিল, "অরসিকেষু রহস্যনিবেদনম্। পরীক্ষা? তুচ্ছ পুঁথির পরীক্ষাই তার বড় হ'ল, আর এই জীবনের পরীক্ষাটা বুঝি কিছু নয়?"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "যে যার মূল্য বোঝে। আমার মত নিরীহ প্রফেসার—যারা বই ঘেঁটে বুঝেছে, রসশূন্য শুষ্ক তত্ত্বের চেয়ে—এই রসাল তত্ত্বের গবেষণায়—"

কৃত্রিম কোপে তাহার মুখের উপর তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া বিভা কহিল, "থাম গো, থাম! আর বড়াই করতে হবে না। এখন রহস্য রেখে সত্যি ক'রে বল দিকি, এর উপায় কি?"

সুনীল বলিল, "পরীক্ষাটা না হয়ে গেলে, আপাতত উপায় নির্দ্ধারণে অক্ষম। যাক না আর দু' এক মাস।"

বিভা চিন্তিত হইয়া কহিল, "তা ত যাবে, কিন্তু আমি যে তখন এখানে থাকবো না।"

সুনীল বলিল, "আসতে কতক্ষণ? সে সব যোগাযোগ করতে বেশী বিলম্ব হবে না। হাঁ, ভাল কথা, আমায় কিন্তু কালই যেতে হবে।"

বিভা বলিল, "ইস্! অমন উড়ু উড়ু ভাব কেন? যাই বললেই কি যাওয়া হয়!"

"না—না, বিশেষ কায—"

বিভা বলিল, "সে আমি বুঝবো। এখন সে চাকরীর ভাবনা মুলতুবী রেখে—এখানকার হিসেব নিকেশ দাও দেখি।" বলিয়া মুখখানি গম্ভীর করিয়া স্থির হইয়া বসিল।

অতঃপর দীর্ঘদিন অদর্শনের পর নব-বিবাহিত স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে হিসাব নিকাশ আরম্ভ হইল, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে সমব্যথী পাঠক-পাঠিকাগণ, আশা করি, ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন না।

অনন্ত একটি প্রাইভেট টিউশানি যোগাড় করিয়া লইয়াছে, সুতরাং তাহার দিন চলিতেছিল মন্দ নহে। যে পরিবারে সে গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা উদারনৈতিক হিন্দু। কোন ধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁহাদের অন্তরে বদ্ধমূল সংস্কারের শিকড় প্রতিষ্ঠা করে নাই। উদার বিশ্বের সর্ব্ব-দিকের আলো ও বায়ু লইয়া তাঁহাদের জীবনবৃক্ষ সুশোভিত, হিল্লোলিত। অবাধ বিচরণের মধ্যে শালীনতা, উন্মুক্ত অবগুণ্ঠনের মধ্যে শুচিতা সেখানকার সম্পদ। তাই তথাকার শিক্ষিত মার্জ্জিত শোভন গণ্ডীর মধ্যে অনন্ত অতি সহজেই কুণ্ঠাশূন্য একটি স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল।

ছাত্রটি তার দুরন্ত তেজস্বী, কিন্তু কথার অবাধ্য নহে। মাষ্টার মহাশয়ের অপটু কথাবার্ত্তা ও জড়িত চালচলনে হাসি পাইলেও প্রাণান্তে সে তাঁহার সম্মুখে হাসিত না। হয় ত বাড়ীতে গিয়া একমাত্র রোদন ও হাসির সঙ্গিনী দিদিকে বলিত, "দেখেছিস ভাই দিদি,—মাষ্টার মশায়ের কথার শ্রী! আবার আমায় বলেন কি না, পড়বা না। হা—হা—"

দিদি অনীতা ধমক দিয়া বলিত, "চুপ দুষ্টু। হেসে ওঁর অসম্মান ক'রো না।"

বালক হাসি দমন করিতে গিয়া পুনরায় উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘরখানি ভরিয়া দিত। দিদিও তাহাকে শাসন করিতে গিয়া মুখে আঁচল চাপা দিত।

ক্রমে সহিয়া গেল। দু'চার দিনের ব্যবহারে দৃষ্টির কটুতা কাটিল।

অনন্তের বয়স ও পড়াইবার সহজ প্রণালী দেখিয়া অনীতা বিস্মিত হইল। এমনই দুঃখকষ্ট সহিয়া যাহারা বিদ্যার্জ্জনের তপস্যা করে, সেই সব মহৎ ধৈর্য্যশীল প্রাণই ত পরে পৃথিবীর বুকে নামের মৃত্যুহীন গৌরব রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয়।

অবশ্য বয়সের অভিজ্ঞতা অনীতার খুব বেশী নহে,—বেথুনের ম্যাট্রিক ক্লাসে সে পড়ে। পাঠ্য পুস্তকরাশির মধ্যে যেটুকু তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, সেই চশমাই তাহার স্বল্প দৃষ্টির সহায়স্বরূপ। সংসারের অনেক ক্ষেত্রেই সে তাহার প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং ফলাফল সম্বন্ধে নির্ব্বিকার।

অনন্তের সঙ্গে তাহার আলাপটা অতি সহজেই জমিয়া উঠিল। হয় ত ইহা বয়সের ধর্ম্ম। অনীতা পাঠ্য পুস্তকের কোন দুরূহ বিষয় বুঝিতে আসিলে, অনন্ত সাধ্যমত বুঝাইয়া দিত।

তাহার বুঝাইবার সহজ সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে বিস্মিত

হইয়া অনীতা মৃদু হাসিয়া বলিত, "এমন সোজা জিনিষটাও বুঝতে পারিনি। নাঃ, আমার দ্বারা কিছু হবে না, না মাষ্টার মশায়?"

অনন্ত মৃদু হাসিত, কোন উত্তর দিত না।

বয়স অল্প হইলেও নারীর এমন একটি সহজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, যাহার অভিজ্ঞতা পুরুষের প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে না। এই স্বল্পভাষী মৃদুপ্রকৃতি যুবকের মধ্যে এমন একটি দুঃখের স্বপ্ন-বিলাসিতা সমাহিত আছে, যাহা অনুভব করিতে বিশেষ রকমের দৃষ্টির প্রয়োজন। অনীতা আপন সহজাত সংস্কারবলে সে ব্যথা বুঝিতে পারিল! বুঝিয়া মনে মনে দুঃখিত হইল।

তরুণ ললাটে কেন এই বিদ্যুচ্চঞ্চল চিন্তার ভ্রূকুটি-রেখা ক্ষণতরে ভাসিয়া উঠে, নয়নে ক্লান্তির ছায়া নামিয়া আসে? কেন নিশ্বাস দীর্ঘতর হইয়া পড়িবার মুখে বুকের নীচে অতি সন্তর্পণে মিলাইয়া যায়?

এক দিন পড়া বুঝাইবার কালে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার মশায়,—আপনি মাঝে মাঝে কি ভাবেন বলুন দেখি?"

চমকিত হইয়া অনন্ত মুখ তুলিয়া বিস্মিত স্বরে বলিল, "ভাবি?"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "এই ত এখনও ভাবছেন, নয় কি?"

অনীতার দৃষ্টির মমতা ও সতর্কতা লক্ষ্য করিয়া অনন্ত বিস্মিত হইল। সহজ কণ্ঠে কহিল, "ভাবি—সে কথা সত্য। আমার অবস্থা স্বচ্ছল নয়,—পড়ার খরচ আমায় ধার ক'রে চালাতে হয়। কত দিনে সে ঋণ শোধ—"

ত্রস্তা অনীতা বাধা দিয়া বলিল, "চুপ করুন। আমি আপনাকে ব্যথা দিবার জন্য এ কথা জিজ্ঞাসা করি নি। অপরের সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশ নেওয়া বড়ই নিষ্ঠুরতা।"

ম্লান হাসিয়া অনন্ত বলিল, "নিষ্ঠুরতা নয়—মমতা। আপনাদের কাছে যে দয়া পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। সহজ মনের কথা—কেন কৃত্রিম সভ্যতার চাপে চাপা দিই? আমার জীবনকে আমি সহজ, সরল, চিরমুক্ত ক'রে রাখতে চাই।"

অনীতা বলিল, "আপনার দৈন্যের ইতিহাস—আপনি অনাত্মীয়ের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারেন—এতে আপনার কুণ্ঠা জাগে না?"

ধীর স্বরে অনন্ত বলিল, "কিছুমাত্র না। আমি জানি, আমার দুঃখে বা সুখে সে যখন সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারবে না, কিংবা করলেও সে সহানুভূতির মূল্য নেই, তখন অকুণ্ঠ মত প্রকাশে ক্ষতি কি? আপনি হয় ত বলবেন,— অন্তরে সে আমার দীনতাকে ব্যঙ্গ করবে—আমার দারিদ্র্যকে ঘৃণা করবে? তা করুক। আমার স্বাচ্ছল্য দেখে সে যদি বন্ধুত্বের জন্য দুটি মিষ্ট কথা ব'লে আমায় আপনার ক'রে নিতে চায়, তা হ'লে সেই শ্রদ্ধা ঐ ঘৃণারই নামান্তর নয় কি? তখন কে বেশী ক্ষতি করবে আমার? উপেক্ষা—না শ্রদ্ধা?"

অনীতা বলিল, "বুঝতে পারলুম না। মানুষ ভালবাসে মানুষের সঙ্গ; মানুষ কামনা করে—তার প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা। ও সবের আদান-প্রদানেই সমাজের সৃষ্টি।"

অনন্ত বলিল, "সমাজের কথা এখন থাক, মানুষের কথাই হোক। মানুষ যা ভালবাসে, সেই সত্য; যা ভালবাসে না, তাও ত অসত্য নয়!

"আপনার কথা হেঁয়ালী ব'লে বোধ হচ্ছে।"

অনন্ত বলিল, "আচ্ছা, স্পষ্ট করেই বলছি। শ্রদ্ধার মূল্য কোথা থেকে আসে জানেন? বাইরের হৈমস্তূপ থেকে। তারই সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্র গ'ড়ে উঠে—স্নেহ প্রীতি-ভালবাসা নিয়ে।"

অনীতা বলিল, "তাই তা অসত্য। সত্যকার যা নয় অর্থাৎ অন্তরের যা নয়—তাকেই আপনি বলছেন, অসত্য। ভাল, সে কথা মানি; কিন্তু মানুষকে আমি অত হীন স্বার্থপর ব'লে ভাবতে পারি না।"

অনন্ত বলিল, "আমি তাই ভাবি। স্বার্থই তার জীবন। স্বার্থপরতাই মানুষের উন্নতি, শ্রী, যশ, অর্থের প্রধান সোপান।"

অনীতা হাসিল, হাসিয়া বলিল, "সৃষ্টির মহত্ত্বকে আপনি এত সঙ্কীর্ণ ক'রে দেখতে ভালবাসেন কেন?"

অনন্তও হাসিয়া বলিল, "হয় ত আমার দৃষ্টির দোষ। কিন্তু জানবেন, এ পরীক্ষিত সত্য। যা নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি, তাই আমাদের অগৌরবের। অভাবও তাই বিশ্বের চারিদিকে।"

অনীতা বলিল, "অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গেছে। সমাজ ছেড়ে একেবারে বিশ্ব!"

লজ্জিত হইয়া অনন্ত বলিল, "আজ এ তর্কের সমাপ্তি এই-খানে হোক; উঠি।"

অনীতা উঠিতে উঠিতে বলিল, "কিন্তু যাই বলুন, আপনার এই অকারণ সন্দেহের মূলে যে একটি সূক্ষ্ম বেদনার রেখা আছে, তা গোপন করবার চেষ্টা মিছে।"

মুহূর্ত্তে অনন্তর মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "সে কথা আমি অস্বীকার করি না। আর যাবার আগে সে কথা হয় ত আপনার কাছে বলেও যাব। আজ আসি।" তাড়াতাড়ি সে কক্ষত্যাগ করিল।

অনীতা তাহার গতিপথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

৬

কিছুদিন পরে।—অনন্ত অনীতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মেসোমশায় বাড়ী আছেন কি?"

"কেন?"

অনন্ত বলিল, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে,—আজ রাতেই রওনা হব। বাবা লিখেছেন, বিশেষ দরকার। সেখানে ক'দিন দেরী হবে, তা ত বলতে পারি না।"

অনীতা বলিল, "আচ্ছা—আমি মেসোমশায়কে ব'লবো।"

অনন্ত দুই এক পা অগ্রসর হইয়া, মুখ ফিরাইয়া কহিল, "যদি অসুবিধা হয়—খোকার জন্য, অন্য মাষ্টার রাখবেন।"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "সে ভাবনা আমাদের। আপনি যান।"

তথাপি অনন্ত যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

অনীতা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আরও কিছু বলবেন কি?"

অনন্ত মুখ নীচু করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "হাতে কিছু নেই!—যাওয়া আসার খরচ—"

অনীতা দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল ও ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি নোট অনন্তের হাতে দিয়া বলিল, "মাপ করবেন। আপনি অভয় দিয়েছিলেন বলেই বলছি,—এ কুণ্ঠিত আচরণের কারণ আমি বুঝতে পারলুম না।"

অনন্ত হাসিমুখে বলিল, "সেদিনকার তর্কের কথা মনে ক'রে রেখেছেন দেখছি। কিন্তু অকুণ্ঠ মত প্রকাশ এক, ও পরের দুয়ারে হাত পাতা আর।"

অনীতা বলিল, "পর! পর কে?"

অনন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, "মাপ করবেন।"

অনীতা হাসিতে হাসিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। এমন কৌতুক যেন সে জীবনে উপভোগ করে নাই।

অনন্ত আরও লজ্জিত-মুখে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হাসির বেগ থামিলে অনীতা বলিল, "আপনার মুখে এ কথা শুধু নূতন নয়,—বিস্ময়কর বটে! মাপ! এতটা আদব-কায়দা পরের উপর প্রয়োগ করতে কবে থেকে শিখলেন, মাষ্টার মশাই?"

অনন্ত মুখ তুলিল। তাহার চক্ষুতে স্নেহসজল দৃষ্টি, মুখের উপর কিসের একটা স্নিগ্ধতৃপ্তির প্রলেপ মাখানো। এইমাত্র বুঝি বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত রুক্ষ তৃষ্ণাতুর পৃথিবীর উপর দিয়া একখণ্ড জলভারাবনত কোমল মেঘ সুশীতল বারিবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাতাসে বুঝি তাহারই শীতল সৌরভ রুক্ষ-ধূলির স্পর্শাতুর অঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

অনন্ত ক্ষণকাল অভিভূতের মত অনীতার পানে চাহিয়া পুনরায় মাথা নীচু করিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল, "সত্যই আমি অপরাধী। আপনার ব'লে পৃথিবীতে কেহ নেই; আত্মার যা আত্মীয়, তাই আপন,—আপনি আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।" ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

অনীতার অন্তর মুহূর্ত্তের তরে কাঁপিয়া উঠিল কি? ঐ আত্মবিহ্বল কোমল দৃষ্টির কোমলতায় তাহার ম্রিয়মাণ হাসিটুকু ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া গেল এবং তাহার পরিবর্ত্তে নয়নপ্রান্তে রহিয়া গেল—দুইটি সমবেদনাতুর অশ্রুর মুক্তাবিন্দু।

বাড়ী আসিয়া অনন্ত বুঝিতে পারিল, এখানেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। জীর্ণগৃহ সংস্কার করা হইয়াছে, গৃহসজ্জাও পুরাতনের সঙ্গে নূতন কিছু আসিয়াছে এবং বাড়ীর অধিবাসীদের অবস্থাও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল।

মা হাসিমুখে প্রবাসী পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতাও পাঠ্য বিষয়ে দু' একটা প্রশ্ন করিলেন।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল,—সজ্জা-পারিপাট্যে নূতন শ্রী ফুটাইয়া নবীন অতিথির অভ্যর্থনা করিতে ইহার প্রত্যেকটি দ্রব্য যেন আগ্রহে উন্মুখ। কোন্ অন্তরাল-বর্ত্তিনীর এই নিপুণ সজ্জা-কৌশল, তাহা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া আরক্ত আনন তাহার রুক্ষ হইয়া উঠিল। কেন? দৈন্যকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য ক্ষণকালের বাহ্য আয়োজনে এই গৌরবের মাল্য রচনা কেন? ধনগর্ব্বিতের অযাচিত করুণার তলে রিক্ত অন্তরে—নত মুখে, প্রসারিত করে এই দানটুকু বহিবার কি প্রয়োজনই বা ছিল? এ গৌরব যে লজ্জারই নামান্তর।

এই সমস্ত সজ্জার আয়োজন—তাহার দুর-প্রবাসের দুঃখ-তপস্যাকে শত কণ্ঠে ব্যঙ্গ করিতেছে, এই আত্মমর্য্যাদা অনেকটা দেহকে বাদ দিয়া অঙ্গুলির প্রতি মমতা পোষণের মত।

রাত্রিতে রেণু আসিয়া তাহার পায়ে প্রণাম করিয়া নতমুখে খাটের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহসজ্জার আয়োজনের অগৌরব তখনও অনন্তের সমস্ত অন্তর ছাইয়া ছিল, সে সহজভাবে তাহাকে সম্বোধন করিতে পারিল না।

রেণু কিছুক্ষণ পর মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ভাল আছ?"

প্রশ্নে চমকিয়া অনন্ত সে দিকে চাহিল।

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সে মুখ আবৃত ছিল। কণ্ঠের কম্পন অনুভবের অতীত—ক্ষীণ, মৃদু। প্রশ্নে না ছিল ব্যগ্রতা বা উৎকণ্ঠা। যেন আদব-কায়দা মাফিক্ জিজ্ঞাসা।

সে কোন উত্তর না দিয়া ভাবিতে লাগিল,—অনীতার অকুণ্ঠ আচরণের কথা। কেমন সহজ—সরল—প্রাণস্পর্শী। কোথাও জড়তার চিহ্নমাত্র নাই। ইহার অবগুণ্ঠনের গ্রাসে যে শ্রীশালীনতা সহজ সৌন্দর্য্য হারাইয়া মলিন হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার অনাবৃত আননে সে মাধুর্য্যটুকু কেমন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে! ইহার আধবিজড়িত স্বরের সঙ্গে সেই মিষ্ট কোমল পুষ্ট বাক্যের কতই না প্রভেদ!

অভিমানে রেণুর নয়নে অশ্রুর বাষ্প আসিয়া জমিল। দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষার পর যদি বা সে আসিল, যদি বা তাহার চরণে সকল গর্ব্ব—সকল অভিমান ভাসাইয়া দিল, কিন্তু তাহার সেই রিক্ততাকে পূর্ণ করিয়া একটি স্নেহমধুর সম্বোধন বা নিমেষের হর্ষ-কণ্টকিত স্পর্শ, উভয়ের সম্পর্ককে নিবিড় করিয়া তুলিল না। এ কি নিদারুণ উপেক্ষা! বিনা দোষে এ কি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আচরণ! বিভা ভুল বুঝিয়াছিল। দোষে-গুণে গঠিত দেবতার পায়ে ফুলজল দিলে দেবতা প্রসন্ন হন। তাঁহার নিকট ত্রুটির তিরস্কার যেমন আছে, উপাসনার পুরস্কারও তেমনই মিলে। কিন্তু প্রাণহীন পাষাণ-দেবতার কাছে ভক্তিশ্রদ্ধার কোন মূল্য নাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বললে না—কেমন আছ?"

নীরস কণ্ঠে উত্তর হইল, "ভাল।"

ইহার পর আর প্রশ্ন চলিতে পারে না। নির্লজ্জার মত বারম্বার যাচিয়া প্রশ্ন করিতে তাহার সরমে বাধিতে-ছিল। সঙ্গিনীদের স্বামিসম্ভাষণ কাহিনী তাহার অজ্ঞাত নহে। কোন্ পক্ষের কৌতূহল কোন্ পক্ষের লজ্জাকে পরাভূত করিয়া ধীরে ধীরে একটি স্বতঃ উৎসারিত সঙ্কোচলেশহীন পরিচয়ের সৃষ্টি করে, কোন্ পক্ষের আদর-সোহাগে কোন্ পক্ষ বর্ষাবারিস্ফীত তটিনীর মত উল্লাসে নাচিয়া উঠে, এ সকল তথ্য ত তাহার তরুণ মনের অগোচর ছিল না। এ যে সবই বিপরীত!

অনন্ত খাট হইতে নামিতে নামিতে কহিল, "তুমি উপরে শোও—আমি নীচে—"

রেণু অনেকটা সঙ্কোচ কাটাইয়া অভিমানভরে উত্তর দিল, "না, আমিই মেঝেয় শুচ্ছি।"

অনন্ত ইহাতে আপত্তি না করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার একবার মনে হইল, ইহা অন্যায়—ইহা নিষ্ঠুরতা। ধর্ম্মমতে তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, পত্নীর সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার সে প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া লাভ কি? কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাহার চিন্তাচ্ছন্ন ললাটে কুঞ্চিত রেখা মিলাইয়া গেল। মনে মনে হাসিয়া বলিল, "বিবাহ—না বন্ধন? আত্মপর জগতে নাই। আত্মার যে আত্মীয়—সেই আপন।"

মনে পড়িল, প্রথম বিবাহ-রাত্রির কথা। রেণুর নিষ্করুণ হাস্য—বয়সের অভিজ্ঞতা লইয়া ব্যঙ্গ! তাহার তরুণ মন সর্ব্ব অন্তর দিয়া যাহাকে কামনা করিয়া আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছিল, একটি নির্ম্মম হাস্যই না সে কামনার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে? সে দিনের শয্যালীন জ্যোৎস্নালেখা আজ এই অমানিশীথের ভাবী আভাস লইয়াই বুঝি দেখা দিয়াছিল!

চক্ষু মেলিয়া দেখিল, কক্ষ অন্ধকার। বাহিরের বিরাট অন্ধকার ঘরের অন্ধকারের সঙ্গে মিতালী পাতাইয়াছে; মনের অন্ধকারও বুঝি তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছে। মেঝেয় মাদুরের উপর যে প্রাণীটি শয্যা রচনা করিয়া নীরবে পড়িয়া আছে, তাহার নীরবতা ঐ অন্ধকারের মতই অতল মৌন।

কিন্তু সম্পর্ক হউক আর বন্ধনই হউক, ইহাকে অস্বীকার করিবার যে কোন উপায়ই নাই। তাহার তারুণ্যের নিত্য সঙ্গিস্বরূপ সে যে সুখের—দুঃখের—আনন্দের—বেদনার—সম্পদের—বিপদের—কর্ম্মের—ধর্ম্মের,—এক কথায় সমস্ত জীবনের বিচ্ছেদহীন মুহূর্ত্ত লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। আজীবন বন্দীকে শৃঙ্খল-ঘর্ষণের দুঃসহ বেদনা প্রতি অঙ্গে অনুভব করিতে হইবে। প্রতি পদে ইহার বন্ধন স্বচ্ছন্দ গতির প্রহরিস্বরূপ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতি তেমনই মূক মৌন। শুধু মাঝে মাঝে একটা রাত্রিচর পাখী অদূরের বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া আপন কর্কশ কণ্ঠস্বরে রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ইহার গভীরতা ঘোষণা করিতেছিল।

অনন্ত উঠিয়া বসিল। ইচ্ছা হইল, একবার স্পষ্ট বুঝা পড়া করিয়া লয়,—সে কি চাহে? এই নিস্তব্ধতা অসহ্য। অভিযোগের ভাষা যেখানে শব্দহীন, সেখানে অভিযোক্তার মনে ধীরে ধীরে একটা দুর্ব্বল মমতা হয় ত' সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাই তাহার ব্যগ্রতা অপরিসীম।

সে মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—"শুনছ?"

স্বর ভাষায় ফুটিল না—রেণুর কর্ণে গেল না।

তথাপি অনন্ত অন্তরে অন্তরে চমকিয়া উঠিল। এ কি দুর্ব্বলতা! গভীর নিশীথে—অন্ধকারের আবরণে নিরালা মুহূর্ত্তে এই সম্বোধনের পশ্চাতে কি অন্তর্নিহিত কামনার স্ফুলিঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই? একটি স্পর্শব্যাকুল নিশ্বাস,—একটুখানি কামনাপ্রত্যাশা—স্পন্দন,—তৃষার এক টুকরা অধরবিলীন হাস্য বুকের মাঝে মহাসাগরের মৃদু তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে কাহার আগমন ঘোষণা করিতেছে? না, না—ইহা প্রেম নহে—ভালবাসা নহে,—ইহা বুভুক্ষু মনের তৃষা তৃপ্তির ইঙ্গিত।

অনন্ত শয্যায় শুইয়া পড়িল।

অন্ধকার রাত্রি অন্ধকারেই মিলাইয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

চিঠি

একখানি তার চিঠি—
ঠিক যেন ঐ সন্ধ্যাতারার দীপ্তি মিটি-মিটি!
কিম্বা যেন নিশীথ-রাতের জ্যোছনাকণা ঝরা—
হাওয়ার ভরে ভেসে আসা সুর সে আকুল করা।

নদী-পারের বনের মাথায় খণ্ডচাঁদের টীপ্,
কিম্বা বাস্তুভিটায় যেন তুলসীতলার দীপ।
তেমনি ভীরু শিখায় যেন কাঁপ্‌ছে থর থর্
হাল্‌কা সহজ ভাবগুলি তার সয় না কথার ভর্।

হাতের লেখা নয়কো বটে মুক্তাদানার মত,—
মুক্তাদানা ঝর্‌বে তবু করবে মাথা নত!
সহজ সরল সাদা কথা নাইক কবিত্ব
নাইক মলয়, কোকিল-কুহু, বসন্ত-বিত্ত!

তবু তাতে প্রাণ ভরে যায়, বিভল সারা মন!
কঠিন ধরা স্বজন-লোকে হয় যে নিমগন!
চিঠির সাথে চিত্তে জাগে আঙুল চাঁপার মত,—
ভোম্‌রা কালো আঁখির তারা এর উপরে নত—

এর বুকেতে লেগেছে তার সুগন্ধ নিশ্বাস—
ভাব-সায়রের ছন্দে দোলা কতই কলোচ্ছ্বাস।
তাই ত' আমার ভালো লাগে তার লেখা এই চিঠি,—
পড়তে ব'সে শুনি কাণে বুকের কাঁপুনিটি!

শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত।

সেকালের স্মৃতি

১৭

বহুদিনের কথা, কোন্ সাল ঠিক স্মরণ নাই; কেবল এইমাত্র স্মরণ আছে—সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও এই দেব-দুর্লভ চাকরীতে বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি বরোদাপতি মহারাজা সয়াজি রাও গায়কবাড়ের আগ্রহে বরোদা সরকারে চাকরী লইয়া বরোদায় আসিয়াছিলেন এবং বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মিঃ লিটলডেল ছুটী লইয়া স্বদেশে যাত্রা করায় তিনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া বরোদা কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে রত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ য়ুরোপের বহু ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও, এমন কি, সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় য়ুরোপের একাধিক ভাষায় 'রেকর্ড মার্ক' পাইলেও তিনি মাতৃভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি শৈশবকালে পিতামাতার সহিত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন এবং বরোদা সরকারের চাকরী লইয়া যৌবনকালে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল ইংলণ্ডে প্রবাস-জীবন অতিবাহিত করায় তিনি মাতৃভাষায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তিনি ও তাঁহার মেজ দাদা সুকবি স্বর্গীয় মিঃ এম, ঘোষ (পরে ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক) দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পিতা সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে তাঁহাদিগকে কিরূপ অর্থ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দের নিকট তাহার বিবরণ শুনিয়াছিলাম। অনেকেই বোধ হয় জানেন না, শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাতে ছিলেন, তখন তিনি মিঃ এ, এ, ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি চাকরী গ্রহণ করিয়া বরোদায় আসিলেও তাঁহার বহু চিঠিপত্রের লেফাফায় 'এ, এ, ঘোষ' এই নাম দেখিয়াছি। অরবিন্দ নামের পূর্ব্বে অতিরিক্ত একটি 'এ' অক্ষর সংযোগের কারণ কি, তাহা তাঁহাকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করি নাই। স্মরণ হইতেছে—শুনিয়াছিলাম, ঐ 'এ' শব্দটি 'একর বেডের' সংক্ষিপ্ত সার। এই সাহেবী উপনামটি ব্যবহারের কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা এ কালে কেহ না কেহ বলিতে পারেন। সম্ভবতঃ তাহা তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীমান্ বারীন্দ্রকুমারের ও তাঁহার পূজনীয় মেসোমহাশয় শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং তাঁহার পরিজনবর্গের জানা থাকিতে পারে।

যাহা হউক, যে কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। শ্রীযুত ঘোষ নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যিনি য়ুরোপের বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, মাতৃভাষায় পারদর্শিতা লাভের জন্য তাঁহার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। দীর্ঘ অবকাশ উপলক্ষে যখন তিনি সুদূর গুর্জ্জর হইতে দেওঘরে মাতামহালয়ে আসিতেন, তখন তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের আলোচনার সুযোগ ঘটিত, কারণ, তাঁহার মাতামহালয় বঙ্গসাহিত্যের পীঠস্থান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সে কালে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান লেখকগণের অন্যতম ছিলেন, তাঁহার মাতুল যোগেন্দ্র বাবু ও মুনীন্দ্র বাবুও বঙ্গসাহিত্যের সুলেখক ছিলেন। তাঁহার মেসোমহাশয় 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র আজীবন বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অথচ চাকরী উপলক্ষে তাঁহাকে বৎসরের অধিকাংশকাল বাঙ্গালীবর্জ্জিত বরোদায় বাস করিতে হইত বলিয়া তিনি সেখানে বঙ্গভাষার আলোচনার সুযোগ পাইতেন না, এই জন্য একবার গ্রীষ্মাবকাশে দেওঘরে আসিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, বঙ্গভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে এক জন শিক্ষককে বরোদায় লইয়া যাইবেন। তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার জন্য এরূপ এক জন শিক্ষক খুঁজিতেছিলেন,—যিনি ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তাঁহাকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতে পারেন। বঙ্গসাহিত্যের কোন লেখক এই কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন বলিয়াই যোগেন্দ্রবাবুর ধারণা হইয়াছিল। রাজসাহীর জজ আদালতের চাকরীতে কি কারণে আমি বীতস্পৃহ হইয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। আমি সেই চাকরী ত্যাগের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কেবল পারিবারিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া সেই চাকরী ত্যাগ করিতে পারি নাই। তখন আমাদের সাংসারিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, চাকরী ছাড়িয়া উপার্জ্জনহীন অবস্থায় এক দিনও আমার বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না। যোগেন্দ্র বাবুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইলাম, শ্রীযুত ঘোষের সহিত আমি বরোদায় যাইতে সম্মত আছি। সে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় বি, এ, এম, এর এত ছড়াছড়ি ছিল না, এবং এক জন শিক্ষকের শিক্ষকতা করিবার জন্য কোন বাঙ্গালী উমেদার ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে সহজে সম্মত হইতেন কি না, জানি না। তবে অন্য কোন বাঙ্গালী যুবক যে এই চাকরীর জন্য চেষ্টা করেন নাই, এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না, এবং আমি তাহা কোনও দিন জানিবারও চেষ্টা করি নাই। যদি আমি মফঃস্বলের আদালতের এক জন নগণ্য কেরাণী, এই সম্বলটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়া এই চাকরী লাভের চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আমার চেষ্টা সফল হইত না, এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। কিন্তু আমার অন্য পরিচয়ও একটু ছিল, এবং তাহাই বোধ হয় আমার প্রধান সুপারিশ হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় পূজনীয় কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বড় দাদা পূজনীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল বাঙ্গালার প্রাচীনতম মাসিক পত্রিকাগুলির অন্যতম 'ভারতী'র সম্পাদকীয় ভার বহনের পর সেই ভার তাঁহার ভগিনী স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীকে প্রদান করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেও 'ভারতী'র সেই সময়ের লেখকগণের নাম তাঁহার ও তাঁহার পরম বন্ধু স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অজ্ঞাত ছিল না। বঙ্গসাহিত্যের যে সকল লেখক তখন 'ভারতী'র সেবা করিতেন, এই ক্ষুদ্র লেখকের নাম সেই সকল লেখকের নামের তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। আমার অকিঞ্চিৎকর রচনা সে

সময় নিয়মিতভাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইত। আমার রচিত একটি 'হেঁয়ালী নাট্য' সেই সময় 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইলে সেই সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' বিদ্রূপ কশাঘাতে আহত হইয়া পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীকে কিরূপ ইতর ও অভদ্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিল, এবং সেই আক্রমণে শিক্ষিত সমাজে কিরূপ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, এত কাল পরে কোনও বৃদ্ধের তাহা স্মরণ আছে কি না, জানি না; কিন্তু স্মরণ আছে, একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র সেই কদর্য্য রুচির পরিচয় পাইয়া সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালা সংবাদপত্রকে লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল 'Should be horse-whiped before the public gaze.'—ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে বিরত রহিলাম। সেই 'হেঁয়ালী নাট্যে' লেখকগণের নাম অপ্রকাশিত থাকিলেও লেখকের নাম ভারতীর অন্তরঙ্গ আত্মীয় দলের অজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রধানতঃ কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও নেতৃত্বে বাঙ্গালার সেই সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'সাধনা' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে আমি কবিবরের নিকট যে সকল পল্লীচিত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা তিনি সাদরে 'সাধনা'য় প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার এতই প্রীতিকর হইয়াছিল যে, তিনি 'পল্লীচিত্র' প্রসঙ্গে আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালা দেশের হৃদয় হইতে আনন্দ ও শান্তি বহন করিয়া আনিয়া আমাকে উপহার দিয়াছেন।'

এই সকল রচনা প্রকাশের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে বঙ্গ-সাহিত্যের কোন নবীন লেখক বঙ্গীয় পাঠক সমাজে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য মৎস্য-নারীর ভাষায় দেবদুর্লভ গালি বর্ষণ করিলেও গুণগ্রাহী যোগেন্দ্র বাবু বঙ্গসাহিত্যের এই অযোগ্য লেখককেই শ্রীযুত ঘোষের বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক হইবার যোগ্যপাত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন। এত কাল পরে যাঁহারা আমাকে গালি দিয়া লেখনীধারণ সার্থক মনে করিয়াছেন, সৌভাগ্যক্রমে তখন তাঁহারা দিগম্বর বেশে চুষিকাটী লেহনেই নিরুদ্বেগ শৈশব অতিবাহিত করিতেছিলেন; নতুবা যোগেন্দ্র বাবুর মত পরিবর্ত্তিত হইত কি না, কে বলিতে পারে? যাহা হউক, ভগবান্ আমাকে শ্রীযুত ঘোষের শিক্ষকতার গৌরবে বঞ্চিত করিলেন না। জজ আফিসের এক জন নগণ্য কেরাণীকেই তিনি এই দায়িত্বভার অর্পণ করিবেন।

কিন্তু জজ অফিসে আমি যে চাকরী করিতেছিলাম, তাহার ছুটী লইয়া গোল বাধিল। দায়রা বিভাগের অফিস সংক্রান্ত সকল কার্য্যভার আমার হস্তে অর্পিত ছিল, এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদেশের বিরুদ্ধে যে সকল ফৌজদারী আপীল হইত, রাজসাহী ও মালদহ এই দুই জেলার ফৌজদারী আপীলের বিচার রাজসাহীর সেসন্স জজকেই করিতেই হইত। এ কালের মত সে-কালে জেলায় জেলায় সহকারী বা অতিরিক্ত সেসন্স জজ নিযুক্ত হইতেন না। এ-কালে অনেক বহুবর্ষী সব জজকে সহকারী সেসন্স জজের ক্ষমতা প্রদান করা হইতেছে, তাঁহারা দেওয়ানী মামলার আপীলের ন্যায় ফৌজদারী আপীলের এবং দায়রার মামলার বিচার নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, এবং কিছু দিন পরে তাঁহারা অতিরিক্ত সেসন্স জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, যদি বহুমূত্রের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত চাকরী বজায় রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা পেন্সন গ্রহণের কিছু কাল পূর্ব্বে কায়েমীভাবে জেলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সে-কালে মুন্সেফী হইতে ক্রমোন্নতির ফলে পাকা জেলা জজ ও দায়রা জজের পদে কায়েমীভাবে নিযুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ছিল, অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান বিড়ালের ভাগ্যেই শিকা ছিঁড়িত। রাজসাহীর সে-কালের জেলা জজ ও দায়রা জজ স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকুমার শীল সিভিলিয়ান না হইলেও ঐরূপ জজ ছিলেন। শীল সাহেব রাজসাহী ত্যাগ করিলে ষ্টীনবার্গ, পালিত, ষ্টেলী প্রভৃতি অনেক সিভিলিয়ান জজ রাজসাহীতে জজিয়তী করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজসাহী ও মালদহের ফৌজদারী আপীল ও দায়রার বিচারকার্য্যে তাঁহারা কোন সহকারী বা অতিরিক্ত জজের সহায়তা পাইতেন না। রাজসাহীতে এক জনমাত্র সবজজ ও দুই জন মুন্সেফ ছিলেন, মালদহের দেওয়ানী আদালতে কেবল মুন্সেফই ছিলেন, সবজজ পর্য্যন্ত ছিলেন না।

রাজসাহীর সেসন্স জজকে রাজসাহী ও মালদহের দায়রার মামলা করিতে হইত, এবং দুই জেলার সমুদয় ফৌজদারী আপীল নিষ্পত্তি করিতে হইত। এজন্য ফৌজদারী আপীলের সংখ্যা অল্প ছিল না, এতদ্ভিন্ন রাজসাহী ও মালদহের জেলখানা হইতেও অনেক কয়েদী আপীল করিত, তাহাদের অনেকেই আত্মসমর্থনের জন্য উকীল নিযুক্ত করিতে পারিত না। জজসাহেব নিম্ন আদালতের নথিপত্র তলপ করিয়া এক তরফা বিচার করিতেন। শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, রাজসাহীর জজ আদালতের ট্র্যান্স্লেটার ছিলেন। তাঁহাকে অনেক দেওয়ানী মামলার ও দায়রার মামলার নথিপত্রের ইংরাজী অনুবাদ করিতে হইত। মামলার সংখ্যা এরূপ অধিক ছিল যে, এই সকল নথির অন্তর্ভুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, প্রথম এত্তেলা প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া ফৌজদারী আপীলের কাগজ-পত্রের অনুবাদ করা তাঁহার অসাধ্য হইত, এজন্য ঐ সকল কাগজ-পত্রের অনুবাদের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন মালদহের সার্কিট হাউসে দায়রার মামলা করিতে যাইবার সময় জজসাহেব পেস্কার স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র রায়কে ও আমাকেই সঙ্গে লইতেন, এজন্য মালদহের দায়রার মামলার নথি-পত্রের অধিকাংশের অনুবাদ আমাকেই করিতে হইত। এই জন্য অনুবাদ-কার্য্যে আমি কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলাম, এবং উত্তরকালে যখন সাহিত্যসেবাই আমার উপজীবিকা হইয়াছিল, তখন, বিশেষতঃ শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গভাষায় শিক্ষাদানকার্য্যে এই অভিজ্ঞতায় আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। আমার অনুবাদ জজদের মনোরঞ্জন করিতে পারিত কি না, তাহা কোন দিন জানিতে পারি নাই, কিন্তু সেই অনুবাদ পাঠে তাঁহাদিগকে কোন দিন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখি নাই, এবং ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করিতাম। তথাপি সকল কথা অনুবাদে ঠিক বুঝাইতে পারিতাম, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাটক পড়াইতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দকে 'মামীর পিরীতে মামা হ্যাঁকোচ প্যাঁকোচ'—কবিতার এই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া বুঝাইতে পারি নাই, এ কথা বোধ হয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সেইরূপ 'জয়লাল আমার হেতো ব্যাটা'—দায়রা মামলার প্রাথমিক

বিচারকালে এক জন সাক্ষীর জবানবন্দীর এই অংশও অর্থাৎ 'হেতো ব্যাটা' এক কথায় অনুবাদ করা আমার অসাধ্য হইয়াছিল।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই 'হেতো ব্যাটার' গল্পটি লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বহুকালের কথা, রাজসাহী কি মালদহ কোন্ আদালতের দায়রার মামলার কথা, স্মরণ নাই। এক জন নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সাক্ষীর জবানবন্দী হইতেছিল। বলিয়াছি, ইংরাজী অনুবাদে এক কথায় 'হেতো ব্যাটা'র প্রতিশব্দ লিখিতে পারি নাই। জজ-সাহেব কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সাক্ষীকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সরলপ্রকৃতি সাক্ষী সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া যে ব্যাখ্যা করিল, সিভিলিয়ান ইংরাজ জজ সাহেব তাহা বোধ হয় কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

সাক্ষী জজ সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হেতো ব্যাটা কারে কয় বুঝ্‌লি না সায়েব! ধর, তোর একটা ম্যাম (মেম সাহেব=পত্নী) আছে, আর সেই ম্যামের প্যাটের এক ছাওয়াল (পেটের ছেলে) আছে। তা, তুই হেকিমী (হাকিমী) কত্তি কত্তি শিঙে ফুক্‌লি। তোর ম্যাম আঁড় (রাঁড়=বিধবা) হলেন। মুই (আমি) তোর সেই আঁড় ম্যামকে নিকে (বিবাহ) করনু। তোর ম্যামের সেই ব্যাটা আমার ঘরে আস্যে আমারে বাপ্‌জান্ বুলে ডাকবি তো? সে হ'লো গিয়ে ত্যাখোন আমার হেতো ব্যাটা।"

তাহার এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় জজ সাহেব কিরূপ আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু এজলাসের সকল লোকের ওষ্ঠে হাসির বিদ্যুৎঝলক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অনেক বাঙ্গালা শব্দের যথাযোগ্য ইংরাজী অনুবাদে আমি আনাড়ীত্বের পরিচয় দিলেও আমার আশা ছিল, জজ আদালতের ট্রান্‌স্লেটার যদি কোন দিন উচ্চতর পদে প্রমোশন পান, তাহা হইলে হাতে কলমে যখন এত দিন কায করিলাম, তখন আমি ঐ পদের জন্য আবেদন করিলে, আমার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইতেও পারে। জজকোর্টের ট্র্যানস্লেটারের পদ সে-কালে সম্ভ্রমের চাকরী বলিয়া সকলেরই ধারণা ছিল; এবং সেই পদ হইতে হেডক্লার্ক, নাজীর বা সেরেস্তাদারী লাভের আশা, দুরাশা বলিয়া গণ্য হইত না। সুতরাং আমার কর্ম্মজীবনের ভবিষ্যৎ কেবল যে নিরাশার নিবিড় মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, এ কথা বলা যায় না, সেই মেঘস্তর মধ্যে মধ্যে আশার বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইত। কিন্তু তাহা কেরাণীগিরির লাঞ্ছনার মধ্যে আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। এই জন্য সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়া একটা তুচ্ছ অস্থায়ী চাকরী অবলম্বন করিয়া শস্য-শ্যামলা, নদী-মেখলা, তরুচ্ছায়া-শীতলা, স্নেহ-বিহ্বলা, শৈশবের ক্রীড়াকুঞ্জ, যৌবনের আনন্দনিকেতন সোনার বাঙ্গালা হইতে বহুদূরে গুর্জ্জরের মরুবক্ষে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আশ্রয় গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। কিন্তু ঘরে-বাহিরে নূতন নূতন বাধা দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় আমাকে পরিবেষ্টিত করিল। আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিলেন। আফিসে সেরেস্তাদার বাবু আমার পরম হিতৈষী ছিলেন, তিনি আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আভাস দিলেন, এবং চিরজীবনের অবলম্বন কায়েমী সরকারী চাকরী ও বার্দ্ধক্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল পেন্সনের আশা ত্যাগ করিয়া একটা উঠবন্দী বাকে চাকরী লইয়া অত দূরদেশে—বরগীর মুলুকে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। কিন্তু আমাকে চাকরীত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন, ইস্তফানামা দাখিল না করিয়া ছয় মাসের ছুটী লইয়া যাওয়াও মন্দের ভাল। বিনা বেতনে ছুটী, যদি নূতন চাকরীতে মন বসে, তাহা হইলে পরে আরও ছয় মাসের ছুটী পাওয়া তেমন কঠিন হইবে না—ইত্যাদি।

আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সেরেস্তাদার মহাশয়ের উপদেশে জজ সাহেবের নিকট বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিলাম; মনে হইল, সেই সুদূর প্রবাসে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত সমাজে দীর্ঘকাল বাস করিবার ইচ্ছা না হইলে ছয় মাসের মধ্যেই দেশে ফিরিব, আর যদি শ্রীঅরবিন্দের সহিত একত্র বাস করিয়া আনন্দ লাভ করি, দেশে ফিরিবার জন্য মন ব্যাকুল না হয়, তাহা হইলে পরে আরও ছয় মাসের ছুটী লইব। বিনা বেতনে ছুটী মঞ্জুর করিতে জজ সাহেবের আপত্তি না হইবারই কথা। সেরেস্তাদার মহাশয়ও আমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া, আমার ছুটীর দরখাস্তে অনুকূল মন্তব্য লিখিয়া দিলেন। দরখাস্তখানি আফিসের দস্তুর অনুসারে সেরেস্তাদার মহাশয় তাঁহার ফাইলের অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত পেশ করিবার জন্য নিজের নিকট রাখিলেন। প্রতিদিন সাহেব এজলাসে বসিবার পূর্ব্বে খাস-কামরায় বসিয়া আফিস-সংক্রান্ত কায-কর্ম্ম শেষ করিতেন, সেরেস্তাদার-প্রদত্ত কাগজপত্রও স্বাক্ষরিত করিতেন। পরদিন সাহেব কোর্টে আসিয়া তাঁহার খাস-কামরায় বসিলে, সেরেস্তাদার মহাশয় 'ফাইল' হাতে লইয়া সাহেবকে সেলাম দিতে চলিলেন। তিনি আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করাইয়া আনিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিবেন, এই আশায় আমার আফিস-কক্ষে আমি বসিয়া রহিলাম।

সেরেস্তাদার মহাশয় সাহেবের কামরা হইতে তাঁহার আফিসে ফিরিয়া টেবলের উপর সামলা নামাইয়া রাখিয়া আমাকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সাহেব তোমার ছুটী মঞ্জুর করলেন না। বিনি মাইনেয় ছ'মাসের ছুটী চেয়েছ, আমিও তোমার ছুটীর জন্য 'রেকমেণ্ড' করেছি; কিন্তু সাহেবের কি গোঁ, বল্লেন, অত লম্বা ছুটীর দরকার হয়, সে চাকরীতে 'রিজাইন' দিতে পারে।" আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। সেরেস্তাদার মহাশয় কাহারও ছুটীর জন্য সুপারিশ করিলে, সাহেব তাহা কোনও দিন অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এরূপ একটা দৃষ্টান্তও মনে পড়িল না।

তখন রাজসাহীর জজ কে ছিলেন, তাহা এতকাল পরে আমার ঠিক স্মরণ নাই। মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত রাজসাহী হইতে বদলী হইলে কয়েক জন জজ অল্পদিন থাকিয়াই পর পর রাজসাহী হইতে বদলী হইয়াছিলেন। আমি যে সময় ছুটী প্রার্থনা করি, সেই সময় মিঃ ষ্টেলী বোধ হয় রাজসাহীর জজ ছিলেন। আমি ও পেস্কার অবিনাশ তাঁহার সঙ্গে একাধিকবার দায়রার বিচার উপলক্ষে মালদহে গিয়াছিলাম। আমার কোনও কার্য্যে তাঁহার বিরাগ বা বিরক্তির পরিচয় পাই নাই।

সেরেস্তাদার মহাশয় সাহেবের খাস-কামরা হইতে ফিরিবার কয়েক মিনিট পরে নাজীর নন্দগোপাল বাবু, হেড ক্লার্ক কৃষ্ণলাল বাবু, ট্রান্‌স্লেটার শরৎ বাবু, মহাফেজ গদাধর বাবু, হেড

কম্পেয়ারিং ক্লার্ক মোহিনী বাবু প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের মাথা সাহেবকে সেলাম দিয়া ফিরিলেন, এবং স্ব স্ব সেরেস্তায় প্রবেশ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে সাহেবের চাপরাসী অলি আমার আফিস-কক্ষে আসিয়া বলিল, "সাহেব এখনও খাস-কামরায় ব'স্যা আছে, আপনাকে সেখানে যাতি বুল্লে।"

সাহেব খাস-কামরায় ডাকিয়াছেন! আর কোনও দিন আমার এরূপ সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল না। বুঝিলাম, আমার ছুটী সম্বন্ধে কোন কথা বলিবেন। বলা বাহুল্য, আমি আমার দরখাস্তে এ রকম কথা লিখি নাই যে, আমি স্থানান্তরে চাকরী পাইয়াছি, চাকরীটা ভাল লাগিবে কি না পরীক্ষার জন্য ছুটী চাই।—আমি লিখিয়াছিলাম, কোনও প্রয়োজনে আমাকে দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে যাইতে হইবে, এজন্য আমি বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটীর প্রার্থী।

আমি খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া, "গুড্ মর্ণিং সার!" বলিয়া তাঁহার টেবলের নিকট দাঁড়াইতেই, তিনি নীরস স্বরে বলিলেন, "বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটী চাহিয়াছ কেন?"

সাহেবের প্রশ্নে উৎকট সমস্যায় পড়িলাম। যেরূপেই হউক, রাজসাহী ত্যাগ করিব, এ সংকল্প স্থির ছিল; এবং নূতন চাকরী উপলক্ষে ছুটী লইতেছি, এ কথা স্বীকার করিলে কোন অপরাধ হইত না, ইহাও সত্য; কিন্তু চরিত্রগত দুর্ব্বলতাই হউক, আর সত্য কথা বলিবার সাহসের অভাব বশতই হউক, কথাটা মুখে বাহির হইল না। বোধ হয়, হাতের পাঁচের মায়া ত্যাগ করিতে না পারাই ইহার কারণ।" কিন্তু মিথ্যা কথাও ত বলা যায় না। এই জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "অতি অল্পদিনের মধ্যে বাবাকে এবং তুই কাকাকে হারাইয়াছি, জীবন অবলম্বনহীন। একবিন্দু সুখ-শান্তি নাই, মন অত্যন্ত চঞ্চল, কিছুকাল দেশ-ভ্রমণ, তীর্থদর্শন এই সকল করিব,—আপাততঃ গুজরাট অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা; দ্বারকাতীর্থ তাহার নিকটে অবস্থিত।"

সাহেব বলিলেন, "তোমাদের দেশের লোক বুড়া বয়সে পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য যে কার্য্য করেন, তুমি যৌবনেই তাহা শেষ করিয়া রাখিতে চাও! কিন্তু তীর্থদর্শন করিতে ত ছয় মাস লাগে না। তোমার আর্থিক অবস্থা কি এরূপ সচ্ছল যে, তুমি বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটী লইয়া এ সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে? মন খারাপ করিয়া লাভ নাই; ও খেয়াল ত্যাগ কর। মালদহের সেসন্সের সময় হইয়াছে; যাও, কাগজপত্র 'রেডি' করিয়া সে জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমার ছুটী মঞ্জুর করি নাই।"

বুঝিলাম, আমাকে ছাড়িবার ইচ্ছা নাই। সে সময় চারি পাঁচ জন উমেদার চাকরীর আশায় জজ কোর্টে শিক্ষানবিশী করিতেছিল। আমি চাকরী ছাড়িলে প্রার্থীর অভাব হইবে না; তথাপি আমি চলিয়া যাই—সাহেবের ইহা অনভিপ্রেত। কোনও সিভিলিয়ান হাকিম, তাঁহার আফিসের একটা ক্ষুদ্র, নগণ্য কেরাণী তাঁহার আফিসে থাক বা যাক—এ বিষয়ে উদাসীন নহেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে হয় ত বিরল ছিল না; কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় নিম্নপদস্থ কেরাণীরা জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট কীটপতঙ্গ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত হইতেন, ইহা আমার জানা ছিল না।

আমি তুই এক মিনিট নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ভাবিয়া দেখিবার জন্য এক দিন সময় লইয়া সরিয়া পড়িলাম।

আমার সহকর্ম্মী স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র রায় রাজসাহীতে দীর্ঘ-কাল ধরিয়া অনেক জজের পেস্কারী করিয়াছিলেন। ইংরাজ জজরা কোনও দিন তাঁহার প্রতি মৌখিক স্নেহ বা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি কোন দিন তাহার প্রমাণ পান নাই; কিন্তু এক জন স্বল্পভাষী, উগ্র প্রকৃতির জজ (তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি) রাজসাহী হইতে নদীয়ায় (কৃষ্ণনগরে) বদলী হইবার কিছুদিন পরে, নদীয়ার জজের নাজীরের পদ খালি হইলে, তিনি অবিনাশকে নদীয়ায় লইয়া গিয়া নাজীরের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবিনাশ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই চাকরী করিয়াছিলেন। আমরা স্বজাতি-প্রেমের খাতিরে ইচ্ছা করি, মুন্সেফরা কার্য্যদক্ষতা-গুণে প্রমোসন পাইয়া সব্ জজের পদ হইতে সহকারী জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, এবং অবশেষে পাকা জেলা জজ ও সেসন জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হউন; কিন্তু কোন মুন্সেফ-জজ যতই সহৃদয় হউন, তিনি এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বদলী হইয়া, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব পেস্কারের কার্য্য-দক্ষতার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে ভিন্ন জেলা হইতে আনাইয়া নিজের আদালতের নাজীরের পদে নিযুক্ত করিতেন না; পরের উপকারের জন্য অতখানি করিতে হয় ত তাঁহার সাহসেও কুলাইত না। আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানি, ষ্টীনবার্গ, পালিত, হৈলি প্রভৃতি সিভিলিয়ান জজরা সেকালে তিন চারিটি জেলা ঘুরিয়া, ই, আই, রেলের রাজমহল ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া, এবং চতুর্দ্দশ ক্রোশ পথ পাল্কী-বেহারার ঘাড়ে চাপিয়া মালদহে সেসন্স করিতে যাইতেন; আমাদিগকেও সঙ্গে লইতেন; কিন্তু স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকুমার শীল পাকা জজ হইয়াও, দায়রা উপলক্ষে কোনও দিন মুলুক ঘুরিয়া মালদহে যাইতে সাহস করেন নাই, পাছে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল এই ঘুরো পথের পাথেয় মঞ্জুর করিতে আপত্তি করেন, এবং অবশেষে টাকাটা নিজের পকেট হইতে বাহির করিতে হয়। দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশীয় কর্ম্মচারিগণকে অত্যন্ত সন্তর্পণে চলিতে হয়। বিলাতী আই, সি, এস্দের ইস্পাতের কাঠামোর নিস্পরোয়া নির্ভীকতা ও অদম্য দৃঢ়তা তাঁহারা কোথায় পাইবেন? আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিলাম। তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি বিন্দুমাত্র উৎসুক নহি। কিন্তু তাঁহাদের 'মেণ্টালিটি' "চাচা, আপনা বাঁচা;"—তা তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন।

যাহা হউক, এক দিন পরেই আমি চাকরীর ইস্তাফানামা দাখিল করিলাম। আমার পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর হইল। আমি সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া রাজসাহী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সজল-নেত্রে যে সকল বন্ধুর নিকট বিদায় লইলাম, তাঁহাদের অধিকাংশেরই সহিত ইহলোকে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। কেহ কেহ সুস্থ দেহে মোটা পেন্সন ভোগ করিতেছেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মসৌরী হইতেই আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ঠোঁট ফাটিতে সুরু হয়। প্রভাতে মুখ ধুইবার কালে আজ সেই ঠোঁট দিয়া প্রথম আমার রক্ত বাহির হইল। "পাহাড়ে শীত" এ কথাটা হাড়ে হাড়েই অনুভব করিলাম। দিবসে অসংখ্য মাছি ও রাত্রিতে শয়নকালে "পিশু"—এই উভয়ের উৎপাত সহ্য করিয়াই যমুনোত্তরী-দর্শন-মানসে মসৌরী হইতে ৮০মাইল দূরের এই যমুনা চটী একে একে সকলেই পরিত্যাগ করিলাম। প্রথমেই যমুনা নদীর পুল পার হইয়া স্রোতস্বতীকে দক্ষিণে রাখা হইল। দুই ধারেই কৃষ্ণবর্ণের পাহাড়, মধ্যে চির-উজ্জ্বল কল-কল-নিনাদিনী তটিনীর এই নীল জল উদ্দাম-বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। যতই ইহার তীর-সংলগ্ন সংকীর্ণ পথের ধার দিয়া আমরা আগে যাইতেছিলাম, ততই যেন কেবল এই পূত নির্ঝরিণীর সঞ্জীবতা চক্ষু-কর্ণ প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেছিল। যাত্রার সার্থকতা ত ইহারই উৎপত্তি-স্থান দেখিয়া লইবার জন্য! জানি না, সে স্থানে কি অসীম সৌন্দর্য্য বিস্তৃত আছে। এখনও এখান হইতে প্রায় ষোল মাইল পথ আগে যাইতে হইবে। দ্বিগুণ উৎসাহে সকলেই যাত্রাপথ অতিক্রম করিতেছিলাম। আড়াই মাইল আগে "ওজিরির" ছপ্পর-ঘর পথিমধ্যে দৃষ্টিগোচর হইল। একখানি-মাত্র দোকান, দোকানে যাত্রীর আবশ্যকমত চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সাজানো রহিয়াছে। বহুদিন পরে আজ এখানে "আখরোট" ফল কিনিতে পাইলাম। বলা বাহুল্য, এগুলি আশপাশের বৃক্ষ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। দোকানদার বাঙ্গালী যাত্রী দেখিয়া হালুয়ার জন্য সুজীর আবশ্যক আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। হঠাৎ মসৌরী হইতে এত দূরে এ জঙ্গলের মাঝখানে সুজীর কথা শুনিয়া দর সম্বন্ধে আমরা একটু কৌতূহলী হইলাম। দর প্রতি সের এক টাকা মাত্র। বলিতে কি, টাকা সের সুজী লইয়া হালুয়া খাওয়ার সাধ আমাদের মধ্যে কাহারও হয় নাই। চটীর এক পার্শ্বে একটু উচ্চ স্থানে লাল রংএর ছিন্ন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের অনেকগুলি ধ্বজা রোপণ দেখিয়া হঠাৎ আমার তিব্বতের স্মৃতিকথা মনে উদয় হইল। মানস-সরোবর ও কৈলাসের পথে স্থানে স্থানে প্রায়শঃ এইরূপ ধ্বজা-রোপণ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তবে কি এখানেও তিব্বতীদের বসবাস আছে? জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এ স্থানের অধিবাসিগণ 'রোজপুত।' ইহারা "নরসিংহ-বীর"কে এইভাবে মানসিক করিয়া পূজা দেয়। ইহা ছাড়া দোকানদার সেখান হইতে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিল, ওখানে কালী-মায়ীর মূর্ত্তি আছে। রোজপুতগণ কালীমায়ীরও আবার উপাসক। এখান হইতে এক মাইল আন্দাজ আগে "ডবর-কোট" চটী পার হইলাম। তার পর কিছু দূর যাইতে না যাইতেই যমুনা নদীর পুল পার হইয়া এইবার এক আকাশ-চুম্বী পাহাড়ের সম্মুখীন হইতে হইল। পাহাড়ের পর পাহাড় দেখিয়া এ পথের যাত্রীকে সন্ত্রস্ত হইলে চলে না। উপরে উঠিতেই হইবে। ঘন-সন্নিবিষ্ট ছায়া-শীতল জঙ্গলের মধ্যে ধীরে ধীরে সকলেই যষ্টির উপর ভর দিয়া চিহ্নিত পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। বেশীর ভাগ মসৌরীর মত "রডো-ডেনড্রাম" বা বুরাস্ ফুলের জঙ্গলই দৃষ্টিগোচর হইল। অন্যান্য বৃহদাকার পাহাড়ী বৃক্ষও আছে। এইভাবে কিছুক্ষণ উপরে উঠিয়া এই পাহাড়ের শেষ সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় দশটা হইবে। এক স্থানে প্রস্তরগাত্রে লিখিত আছে, "যমুনোত্তরী ১১ মাইল, টিহিরী ৬৩ মাইল।" এই উপরের শৃঙ্গ হইতে সম্মুখে যমুনোত্তরীর অমলধবল তুষারগিরিশৃঙ্গগুলি দেখিতে কতই উজ্জ্বল ও মধুর! আমরা এখান হইতে দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইয়া এক মাইল আগে একটি ঝরণার পার্শ্বে "রাণা" গ্রাম অতিক্রম করিলাম। আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে গ্রামটি অনেক উচ্চে। পথের দুই পার্শ্বে কতকগুলি বৃহদাকার বৃক্ষে আমলকীর মত অজস্র ছোট ছোট ফল ধরিয়াছে দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহার নাম "চুলু"। এই চুলু ফল পাকিলে গ্রামবাসীরা খাইয়া থাকে। বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে পরিশ্রান্ত চিত্তে সকলেই "হনুমান" চটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এ পর্য্যন্ত প্রায় ৯ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া এখানেই আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত ও কাতর হইয়া পড়িলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রায় দশ বারো জন গুজরাটী যাত্রী (বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক) এখান হইতে আগের পথে রওনা হইল। আহারাদি না করিয়াই ইহাদের অগ্রগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ইহারা "এ চটীতে অনেক অসুবিধা, 'মার্কণ্ডেয় আশ্রম' অর্থাৎ পরের চটীতে গিয়া আহারাদি করা হইবে" এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। সাথের সাথী "ভগবান্" ও ফতে সিং" এ স্থলে আমাদিগকে নিকটে ডাকিয়া জানাইয়া দিল, "আজ এখানে আহারাদি বন্ধ রাখিয়া মার্কণ্ডেয় আশ্রমে বরাবর যাওয়া হউক।" কারণ বুঝিতে বাকী রহিল না। গুজরাটী যাত্রীর দল আগে গিয়া মার্কণ্ডেয় আশ্রমের ঘরগুলি দখল করিয়া রাখিলে আমাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না! হয় ত উন্মুক্ত পাহাড়ে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, আমাদের মত গৃহী যাত্রীর পক্ষে ইহা আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। যমুনোত্তরী দর্শন করিতে গেলে মার্কণ্ডেয় আশ্রমে এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রাতে যাওয়াই নানা কারণে সঙ্গত, ইহা জানিয়া অবধি আমরা সেই উপায়ই অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছিলাম। অগত্যা আগের চটী উদ্দেশেই সকলের যাওয়া সাব্যস্ত হইল। দ্বিপ্রহরের ক্ষুৎপিপাসা রাত্রির ভাবনায় দমন রাখিয়া এখান হইতে আগে চলিলাম। আরও চারি মাইল আগে মার্কণ্ডেয় আশ্রম। দিন থাকিতে কোনও না কোন সময়ে অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হইতে পারিব, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া হনুমান চটী পরিত্যাগ করিলাম।

দলের মধ্যে আমিই দ্রুতগামী ছিলাম। ভগবান্ ও ফতেসিং সাবধান করিয়া দিল, আজিকার পথ হয় ত অনেক স্থলে ধ্বসিয়া থাকিবে, সুতরাং ডাণ্ডি ও সওয়ার লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে তাহাদের বেশী বিলম্ব হইতে পারে, এমত অবস্থায় গুজরাটী যাত্রিদলকে পশ্চাতে রাখিয়া আগেকার চটীর ঘর দ্রুত দখলের জন্য আমার উপরেই ভার পড়িল। সত্য বলিতে কি, এক মাইল পথ আগে যাইতে না যাইতেই গুজরাটী দলের সহিত ক্রমশঃই সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। দেখিলাম, পাহাড়ের গায়ের সংকীর্ণ পথের অবস্থা আজিকার দিনে খুবই সাংঘাতিক। অধিকাংশ স্থানেই উপর হইতে "ধ্বস্-ভাঙ্গা" রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া আসিয়া পথের উপরেই স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া আগে অগ্রসর হওয়া কতদূর বিপজ্জনক, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। গুজ্‌রাটী দলের অধিকাংশই 'কাণ্ডি'-সাহায্যে পথ চলিতেছিলেন। কাণ্ডিওয়ালা এ সকল স্থানে তাঁহাদিগকে কাণ্ডি হইতে নামাইয়া দিয়াছে। যাত্রিগণের প্রত্যেককেই ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে হাতের উপর ভর দিয়াই এই কঠিন অসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডের উপর পদক্ষেপ করিতে হইতেছে। একটু অসাবধানেই পদদ্বয় গড়াইয়া নীচে নামিয়া যাইতে পারে। পাশে দাঁড়াইবার এমন একটু স্থান নাই, যেখানে এই সকল যাত্রীকে কাণ্ডিওয়ালা হাত ধরিয়া পার করিয়া দেয়। যাত্রীর দুর্দ্দশা পাশের যাত্রী ভিন্ন দেখিবার কেহ ছিল না। পথের ভীষণতা ক্ষণেকের জন্য মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমাদের স্ত্রীলোক সহযাত্রীরা পশ্চাতে এই পথ ধরিয়াই ত আসিতেছেন! জানি না, কে তাঁহাদের সহায় হইবে। এই বিপদের পথ পার হইয়া কোন যাত্রী হাঁপ ছাড়িতেছেন, কেহ বা অন্তরে ভয় ও মুখে হাসি ফুটাইয়া অপরকে সাহস দিতেছেন—"ইচ্ছা করিয়াই ত এই দুরোরোহ যমুনোত্তরী তীর্থপথের পথিক হইয়াছি, সুতরাং কঠিন স্থানগুলি হাসিমুখে পার হইব।" ইত্যাদি কতই না সান্ত্বনার আভাস চোখে মুখে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছে। খুবই সন্তর্পণে আমি ইঁহাদিগকে একে একে অতিক্রম করিলাম। শেষের যাত্রী আমার দ্রুত গমনের অর্থ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, আমাকে আগে যাইতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ লোগোঁ খানা পীনা বনায়া নহীঁ"? আমি বলিলাম, মার্কণ্ডেয় আশ্রমে পৌঁছিয়া সেখানেই আহারাদি করিবার ইচ্ছা আছে।

এইরূপে আগে যাইতে যাইতে সত্যই এবার একা হইয়া পড়িলাম। প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত এই পথের অবস্থা অতীব বিপজ্জনক মনে হইল। এক এক স্থানে শুধু ধ্বস-ভাঙ্গা স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড নহে, একসঙ্গে অনেকগুলি ঝরণা নামিয়া আসায় উঁচুনীচু পথগুলিকে অত্যন্ত পিচ্ছিল, আবার কোথাও বা অত্যধিক মাটীর অংশে বিলক্ষণ কর্দ্দমাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে সকল স্থানের আঁকা-বাঁকা পথে আবার খাড়া চড়াই থাকায়, উঠিতে নামিতে উভয় সময়েই

সাবধানতার আবশ্যক করে। যাহা হউক, খুবই সন্তর্পণে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থল দিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছিলাম। এক স্থানে প্রস্তরগাত্রে "যমুনোত্তরী ৭ মাইল" লিখিত দেখিয়া ক্রমেই গন্তব্য স্থানের সমীপবর্ত্তী হইতেছি জানিতে পারিয়া মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। টিহিরী-রাজের তরফ হইতে নিযুক্ত কুলীর দল নিতান্ত সাংঘাতিক রাস্তাগুলিকে মধ্যে মধ্যে মেরামত করিয়া দিতেছিল, কিন্তু সে মেরামত অতি সামান্য বলিয়াই মনে হইল। বর্ষার প্রবল স্রোতে আবার তাহা যে এখনকার মত সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে না, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

আজিকার পথে দুই দিকে দুই রূপে পাহাড় প্রত্যক্ষ করিলাম। বামদিকে মুণ্ডিতকেশ, সমাধিমগ্ন যোগীর মত পাহাড়ের বিরাট দেহখানি একবারে নগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে, কেবল প্রশস্ত ললাটে মাঝে মাঝে তুষারের বিস্তৃতি বিভূতির মতই ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল, আর দক্ষিণ ভাগে ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ বৃহদাকার বৃক্ষলতাদি-শোভিত উপবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য বিস্তৃতি লাভ করিয়া রহিয়াছে। পাশাপাশি পাহাড়ের এ প্রকার বিভিন্ন রূপ এত দিন পর্য্যন্ত কই দেখি নাই!

স্থান হিসাবে রুচির পার্থক্যও অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। বুঝি বা সেই কারণে আজ লোকালয় হইতে এত দূরে এই হিমগিরি-নির্ঝরিণীর পবিত্র তীর্থসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া রোগ-শোক-তাপ-ক্লিষ্ট মানবের অন্তর এই ভাবে ধুইয়া মুছিয়াই পবিত্রতায় ভরিয়া উঠে!

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। চোখের সম্মুখের তুষার-শৃঙ্গের উপরে লক্ষ্য রাখিয়া চিহ্নিত পথে দুই ঘণ্টাকাল অতিক্রম করিয়াও ৪ মাইল দূরের মার্কণ্ডেয় আশ্রমে এখনও পৌঁছিতে পারিলাম না! পথে এমন এক জন যাত্রী বা পাহাড়ীর দর্শনও আজ দিন বুঝিয়া কি এতই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে? কোন জঙ্গলের পথ ধরি নাই ত? এইরূপ নানা প্রশ্নে মনকে সংশয়াকুল ও চিন্তিত রাখিয়া, অন্যমনস্কভাবে বেলা তিনটা আন্দাজ সময়ে দুই দিকে ধাবিত দুইটি পথের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম।

সম্মুখেই গন্তব্য পথ মনে করিয়া উপরের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি, শরীর ও মন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিলক্ষণ প্রপীড়িত! চটী পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে প্রতীকার নাই, হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে দূর হইতে "বাবু! বাবু!" ধ্বনি কর্ণে পৌঁছিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, এক পাহাড়ী অঙ্গুলীসঙ্কেতে দাঁড়াইতে বলিতেছে। এই নিভৃত পার্ব্বত্য-পথে মনুষ্যকর্ণের আহ্বান সে সময়ে কত মিষ্ট বলিয়াই না মনে হইল! নিকটে আসিলে দেখিলাম, লোকটি অপর কেহ নহে, এক পাহাড়ী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র। বালিকা প্রথমেই আমাকে যুক্তকরে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপ্ কাঁহা জাতে হ্যাঁয়? আপ্‌কা রাস্তা নীচে ছুট্ গয়া।" এ কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "নীচে কই কোন গ্রামের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই, তাই এ পথে আসিতেছিলাম। 'মার্কণ্ডেয় আশ্রম' আর কত দূরে?" সে বলিল, "আইয়ে, আপকো পথ দিখায়কে লে চলে।" এই নিরক্ষর পাহাড়ী বালিকার পরোপকারবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমে ত রাস্তার ভুল ধরিয়াই দিল, তার পর অযাচিতভাবে সঙ্গে লইয়া মার্কণ্ডেয় আশ্রম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবে, এ যে পথ-হারা পথিকের পক্ষে একবারেই ধারণাতীত! বালিকা যৌবনোন্মুখী, এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-পথে যাত্রী ভুলাইয়া কোন দুরভিসন্ধিতে অন্যত্র লইয়া যাইবার মতলব করিয়াছে কি না (অন্যত্র হইলে সেইরূপ সন্দেহই হইয়া থাকে), বুঝিবার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের পানে চাহিলাম। 'কপালকুণ্ডলা'র সেই ভাষা—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? সেই উপন্যাসের বর্ণনকাহিনীর মত সে সময়ে আমার ঠিক মনে হইল, কই, এ পাহাড়ী বালিকার চোখে মুখে কোনখানে এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছুই ত দেখা যাইতেছে না। এ যে শুধু অসহায় পরিশ্রান্ত তীর্থপথ-যাত্রীদের একমাত্র সহায়ক—সারল্য ও সৎসাহসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

নিঃশব্দে তাহার সহিত ফিরিয়া আসিয়া নীচের পথে নামিয়া চলিলাম। বালিকাই প্রথমে আবার কথা তুলিল, "আপ্ উপর মে জহা জাতে রহে, উস্ গাঁও কা নাম 'খরশালী' হ্যাঁয়। উস্ গাঁও মে জানে সে লৌটনা পড়্‌তা।" পথ ভুলিয়া যে দিকে যাইতেছিলাম, সে দিকের গ্রামের নাম 'খরশালী'। আরও শুনিলাম, ঐ গ্রামে এক্ষণে থাকিবার স্থান পাওয়া যাইত না। কারণ, "শীতলা মায়ী কী প্রকোপ হ্যায়।" ইহার জন্যই বালিকাটি আমাকে দূর হইতে ডাকিতে

বাধ্য হইয়াছে। সহর হইতে এত দূরে এমন পার্ব্বত্য-ঝরণা-প্রবাহিত স্বাস্থ্যকর গ্রামে আবার শীতলা মায়ীর প্রকোপ হইয়াছে শুনিয়া ক্ষণেকের জন্য মনটা অন্যমনস্ক হইল। বেলা সাড়ে তিনটা আন্দাজ সময়ে 'মার্কণ্ডেয় আশ্রমে' উপস্থিত হইলাম। বালিকাটি এবার কিন্তু চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, এক আধেলা ভিক্ষা দিজিয়ে গা ?" এক মাইল পথ সঙ্গে আনিয়া একটি অর্দ্ধ পয়সার জন্য এই সকরুণ মিনতি, আজিকার যুগে নিতান্ত অসহায়, অজানা তীর্থপথ-যাত্রীদের জন্য এমন করিয়া কে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, জানি না! বখশিস্স্বরূপ আমি কেবল পকেট হইতে একটি দুয়ানি মাত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। প্রথমে সে উহা লইতে চাহিল না, বলিল, "আপ কেয়া দেতে হ্যায় ?" চটীর লোকে যখন ইহার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সে যেন আনন্দে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বার বার সেলাম ঠুকিয়া একবারেই বিদায় লইল।

জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের দৃশ্য

অনাহারে তৃষ্ণায় সে দিন আমার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে প্রথমে কথা বাহির হয় নাই। দোকান হইতে অর্দ্ধপোয়া চিনি সংগ্রহ করিয়া তাহার সরবৎ পানান্তে প্রকৃতিস্থ হইলাম। এ দিকে আমার সহযাত্রিগণ কতক্ষণে আসিয়া পৌছিবেন, তাহাও এক্ষণে চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ তেরো মাইল পথ, পথের শেষ অংশে কেবলই আজ ধ্বসভাঙ্গা নগ্ন পাহাড়, দেখিতে অনেকটা তিব্বতের কৈলাস-তীর্থের আশ-পাশের মতই মনে হইল। এই মার্কণ্ডেয় আশ্রমের ধর্ম্ম-শালাটিকে কেহ কেহ "জানকী বাঈর ধর্ম্মশালা" বলিয়া থাকেন। শুনিলাম, বোম্বাইনিবাসী 'জানকী বাঈ' ইহা বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; অতি দুর্গম, কঠিনতম তীর্থে যেখানে কালীকম্লীওয়ালারও দৃষ্টির অভাব, সে সকল শীতবহুল স্থানের এই ধর্ম্মশালা অসহায় যাত্রিগণের পক্ষে কতদূর আশ্রয়, তাহা এক মুখে বলিবার নহে।

ধর্ম্মশালার ইমারত পাকা, দ্বিতল, উপরে ও নীচে দুই খানি করিয়া মোট চারিখানি ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলির সংলগ্ন সন্মুখভাগে প্রশস্ত বারান্দা, সুতরাং ঘরে যাত্রী ভরিয়া গেলে এই বারান্দায়ও যাত্রিগণ স্থান পাইতে পারেন। তবে উপরের মেঝেতে সমস্তই 'তক্তা' বিছানো আছে। একটু জল ফেলিলেই নীচে পড়িয়া থাকে। অনেক কষ্টে নীচের একখানি ঘর খালি পাইলাম তাহাতেই লাঠি, জামা, গায়ের কাপড় ইত্যাদি যেথা-সেথা ছড়াইয়া রাখিয়া ঘরখানি দখল হইয়াছে (নতুবা অন্য যাত্রী ভরিয়া যায়!), এরূপভাবে ব্যবস্থা রাখিয়া, আমার সহযাত্রিগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

পর্ব্বতের পাইন-বীথি

সন্ধ্যা পাঁচটা আন্দাজ সময়ে বৃদ্ধা দিদি, দাদা ও বৌদিদি প্রভৃতি সকলেই একে একে আসিয়া দর্শন দিলেন। সকলের মুখ শুষ্ক, পদদ্বয় নিতান্ত অবসন্ন। আর বোঝাওয়ালাদের ত কথাই নাই! বোঝা স্কন্ধে তাহারা তখন কত দূরে কে জানে! রাত্রির অন্ধকারে নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বোঝা নামাইয়া তাহারা যখন আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল, তার পর আমাদের দিনগত

পাপক্ষয়ের আয়োজন। বলিতে কি, সেদিনকার দুঃখ-ক্লেশ আমাদের মত সমতলদেশবাসীর পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় বলিয়াই সকলের মনে হইয়াছিল।

পরদিন ১৪ই বৈশাখ, অক্ষয়তৃতীয়ার শুভ পুণ্যবাসরে যমুনোত্তরীর মন্দিরদ্বার সাধারণের জন্য সর্ব্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হয়। এ দিনে আমরা মার্কণ্ডেয় আশ্রমে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইয়াছিলাম। ধর্ম্মশালার সম্মুখভাগে কিছু দূরেই যমুনা নদীর তুষার-শীতল ধারা তর তর বেগে নীচে নামিয়া যাইতেছে। একটু উপরিভাগে এক প্রস্তর-গহ্বরে ক্ষীণ উষ্ণ প্রস্রবণ ঝির ঝির শব্দে জমিয়া জমিয়া যাত্রিগণের স্নান ইত্যাদির জল জোগাইয়া থাকে। এই জলে বিলক্ষণ গন্ধকের গন্ধ বিদ্যমান। আশেপাশে দুই তিন বিঘা আন্দাজ

পাহাড়ী ছাগল

গম, যব ও সরিষার ক্ষেত্রভূমি। সরিষার ফুলকে আমরা এ দিনে ভাজি করিয়া খাইয়াছিলাম। মসৌরী হইতে প্রায় ৯২ মাইল দূরের এই লোকালয়-বিহীন চটীতে দোকানে চাউল, আটা প্রভৃতি সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যই একপ্রকার সুলভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চাউল ও আটা প্রতি সের পাঁচ আনা; ঘৃত, সুজী, চিনি ও আলুর দর প্রতি সেরে যথাক্রমে দুই টাকা, আট আনা, ছয় আনা ও এক-আনা মাত্র। কেরোসিন তৈল প্রতি বোতল আট আনা ও দুগ্ধ প্রতি সের ছয় আনা মাত্র। এ দিকের পথে, ঝরণার জলে অড়হর ডাইল আদৌ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দাল খাওয়ার সাধে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

কোন চটীতে এক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইলেই কুলীগণকে, দরের চুক্তি হিসাবে আহার্য্য জোগাইতে হয়। অগত্যা আমাদের ডাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালার প্রত্যেক কুলীকেই ৴৹ আনা হিসাবে ১৫ জনকে মোট ৪৷৵৹ এখানে অতিরিক্ত দিতে হইল।

পরদিন প্রভাতে সকলেরই যমুনোত্তরী দর্শনের কথা। সে পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্থানে স্থানে বিশেষভাবে তুষারাবৃত বলিয়া যাত্রিগণ ডাণ্ডি সহযোগে সেখানে যাইতে অক্ষম। অগত্যা ভগবান সিং ও ওস্থানের অন্যান্য যাত্রীর পরামর্শ-মত, আমাদের সহযাত্রী চারি জন স্ত্রীলোকের জন্য চারিখানি 'কাণ্ডি'র ব্যবস্থা হইল। মনুষ্যস্কন্ধের এই যান-সাহায্যে সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করা যাত্রীদের পক্ষে বরং সহজ, ডাণ্ডি লইয়া চারি জন লোকের পাশাপাশি

নদীর দুই দিকে পাহাড়ের ভিন্ন রূপ

যাইবার উপায় নাই। কাণ্ডিওয়ালা অনেকেই এই চটীতে যাত্রী লইবার জন্য ব্যস্ত। যমুনোত্তরী দর্শন করাইয়া পরদিন আবার এই স্থানে ফিরাইয়া আনিবে, এইরূপ চুক্তিতে প্রতি কাণ্ডি পিছু ১৷৵৹ দর স্থির করিয়া আমরা বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সকলে রওনা হইলাম। ডাণ্ডি ও ডাণ্ডিবাহক চটীতেই রহিয়া গেল, কেবল ফতেসিং ও আরও তিন জন মাত্র বাহক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পথিমধ্যে সাহায্য করিয়া আগে লইয়া যাইবে, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমরা তাহাদিগকে সঙ্গে লওয়া আবশ্যক মনে করিলাম। বোঝার প্রয়োজনে বোঝাওয়ালাও সঙ্গে চলিল, তবে অনাবশ্যক বোধে বিছানাপত্র ও কয়েকটি বাসন-পত্র ভিন্ন অন্য সকল আসবাবই ডাণ্ডিওয়ালার জিম্মায় চটীতে ছাড়িয়া দিয়া অনেকাংশেই বোঝা হাল্কা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এ স্থলে একটি কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সাধারণতঃ এ সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "মচ্ছড়ের" (শুধু মাছি বা পিশু নহে) উপদ্রবে যাত্রিগণ প্রায়ই উত্ত্যক্ত হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, অসাবধানতা বশতঃ আমি এ যাবৎ ষ্টকিং বা মোজা ব্যবহার না করিয়াই এ পথে চলিয়া আসিতেছিলাম। গত কল্য এই মচ্ছড়-জাতীয় ক্ষুদ্র জীবের দংশনে আমার পদদ্বয়ের অনাবৃত স্থান হইতে অলক্ষ্যে স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইয়াছিল। শুনিলাম, এই ক্ষত বেশী হইলে শুধু যে পথ চলা অসাধ্য হইবে, তাহা নহে, দুষ্ট ক্ষত শীঘ্র সারিবার উপায় থাকে না। এজন্য এখন হইতে অবশ্য এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক মনে করিলাম। আজিকার দিনে আমাদের সহযাত্রিণী অর্থাৎ বৃদ্ধা দিদি, বৌদিদি, বন্ধু-পত্নী ও জ্ঞাতি-পত্নী প্রত্যেকেই কাণ্ডির উপরে প্রথম সওয়ার হইলেন। সর্ব্বশরীর কাণ্ডির মধ্যে বসাইয়া দিয়া, মনুষ্য-পৃষ্ঠে বোঝার মত একভাবে জীবন্ত বসিয়া বসিয়া শরীর নিতান্ত অসাড় হইয়া যায়, কিন্তু নিরুপায়! এই বাহন ভিন্ন এ সকল পথে স্ত্রীলোকের ত আর কোন গতি নাই! সকলেই একে একে নিঃশব্দে আগের পথে অগ্রসর হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পৌষ

শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ, শুভ্রতনু হে মহাস্থবির!
শস্যহারা শূন্য মাঠে ব'সে আছ মহামৌনময়!
উচ্ছ্বাস, আবেগ, ইচ্ছা, সমস্তই হয়ে গেছে স্থির!
সমাধি-সমুদ্রে বুঝি চিত্ত-নদী লভিয়াছে লয়!

কম্রকণ্ঠে কলতানে কুহুরিয়া উঠে না কোকিল,
গাহিয়া গুঞ্জন-গীতি ভাব-ভরে ভ্রমে না ভ্রমর!
বহি পুষ্পগন্ধরাশি মৃদু-মন্দ বহে না অনিল,
বহে ব্যথা-গাথা গাহি ক্ষীণতোয়া তটিনী মন্থর!

শরতের শ্যাম সিন্ধু; বসন্তের বিচিত্রা বসুধা
গন্ধে—ছন্দে স্পন্দমানা, আনন্দের অনিন্দিত ছবি;
বরষার স্নেহাসার, আকাশের সঞ্জীবনী-সুধা,
অতি-দূর অতীতের স্বপ্নসম লাগে যেন সবি!

তপোমগ্ন হে সাধক! এ কি তব বৈরাগ্য কঠিন?
রোধি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধ যেন বোধি-দ্রুমতলে!
সৌন্দর্য্য-সাগরে কার সত্তা তব হয়েছে বিলীন?
কার পুণ্যোজ্জ্বল পদ পূজিতেছ প্রাণ-পদ্মদলে?

চির-বিরহীর মত শ্বসিতেছে উদাস-সমীর,
ধূসর কুহেলি-বাসে ধরণীও যেন বিরহিণী!
স্তম্ভিত দাঁড়ায়ে দূরে গিরিবর গহন-গম্ভীর,
বক্ষে তার খোঁজে ভাষা লক্ষ-লক্ষ যুগের কাহিনী!

পাপপূর্ণ পৃথিবীর তাপদগ্ধ দেখি পরিণাম,
বাসনার বক্ষ বেড়ি মরণের প্রমত্ত নর্ত্তন,
আকর্ষিয়া আপনারে হইয়াছ তুমি আত্মারাম,
জানিয়াছ—চিনিয়াছ, আমি সেই সত্য-সনাতন!

ক্ষীণ চন্দ্রকরজালে স্বপ্ন-ছবি যেন বসুন্ধরা,
নিকটের দৃশ্যাবলী মনে হয় বুঝি কত দূর!
শস্যশূন্য ম্লান মাঠ তোমারি তো অশ্রুবিন্দুভরা,
মত্ত মানবের তরে চিত্ত তব বেদনা-বিধুর।

সুদূর হিমাদ্রি-শিরে সুপ্ত যথা অনন্ত তুহিন
তথা তুমি ধ্যানমগ্ন চারিদিকে চির-বিজনতা!
কার সঙ্গ-প্রতীক্ষায় ব'সে আছ চির-সঙ্গিহীন?
চির-স্তব্ধতার বুকে শুনিতেছ কাহার বারতা?

শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন।

হাইটী দ্বীপ

আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের মাঝে কিউবা, হাইটী প্রভৃতি দ্বীপ-পুঞ্জ বিদ্যমান। হাইটী দ্বীপের এক দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান্ সমুদ্র। পূর্ব্বে এই দ্বীপ ফরাসীদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। কলম্বস্, কর্টেজ, পিজারো, ফ্রান্সিস্ ড্রেক, এল্ ওলোনর, লা কাসা, ক্যাপ্টেন কিড্, ডেসালিয়নস্, ক্রিষ্টোফ প্রভৃতি এই দ্বীপে আসিয়াছিলেন। কেহ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে, কেহ বা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য। কেহ বা আসিয়াছিলেন লুণ্ঠনব্যপদেশে, আবার কেহ ধর্ম্মপ্রচারের জন্যও আগমন করেন। এইরূপে শ্বেত জাতি এই দ্বীপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন।

হাইটী দ্বীপের প্রধান সহরের নাম পোর্ট-অ-প্রিন্স। সহরের অর্দ্ধেক ভবন প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত। অট্টালিকার প্রাচীর কোথাও বা ১৮ ইঞ্চি পুরু, কোন কোনটি বা তিন হাত পুরু। প্রত্যেক ভবনে লৌহ-নির্ম্মিত ভারী দরজা ও জানালা। বাকি ভবনগুলি দারুনির্ম্মিত। রাজপথগুলির ধারে ধারে অনেক স্থান ফাঁকা—অগ্নিদগ্ধ গৃহের অবশেষে পূর্ণ। কোনও রাজপথের ধারে কোন গলি-পথ নাই। পথের ধারে গভীর খানা এবং তন্মধ্যে আবর্জ্জনার স্তূপ। পথের উপরেও বোতল-কুচি বিস্তৃত। তাহাতে পথ চলা বিপজ্জনক। মাঝে মাঝে গর্ত্তও আছে, উহা কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা-পূর্ণ।

পথে নগ্ন-পদ নারীদল, কাহারও কাহারও মাথায় বোঝা, কেহ ক্ষুদ্রকায় গর্দ্দভদিগকে চালনা করিয়া চলিয়াছে। উহাদের পৃষ্ঠে প্রচুর দ্রব্যসম্ভার। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, উহা ১৯১২ খৃষ্টাব্দ। সে সময়ে হাইটীতে বিদ্রোহ আসন্ন হইয়াছিল। যে কোনও মুহূর্ত্তে লুণ্ঠন আরম্ভ হইতে পারে। পথে তখন পুরুষ ছিল না। যুক্তরাজ্যের সামরিক নৌ-বিভাগের ক্যাপ্টেন মিঃ জন হাউষ্টন ক্রেগ সে সময়ে হাইটী দ্বীপে বন্ধুসহ গমন করিয়াছিলেন। রাজপথে তখন তিনি কোন পুরুষকে দেখিতে পান নাই। পুরুষমানুষকে পথে দেখিলেই গুলী নিক্ষিপ্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। অথবা গুলীতে নিহত না হইলেও যুধ্যমান দুইটির একটি দলের হাতে বন্দী হইবার সম্ভাবনা ছিল।

দুর্ব্বল লোকের সংখ্যা অল্প নহে। নারীর সংখ্যা প্রচুর। প্রত্যেক রাজপথের কোণে ভিক্ষুকের দল বসিয়া রহিয়াছিল।

পোর্ট-অ-প্রিন্সের বন্দর

হাইটীয় বাস্‌গাড়ী
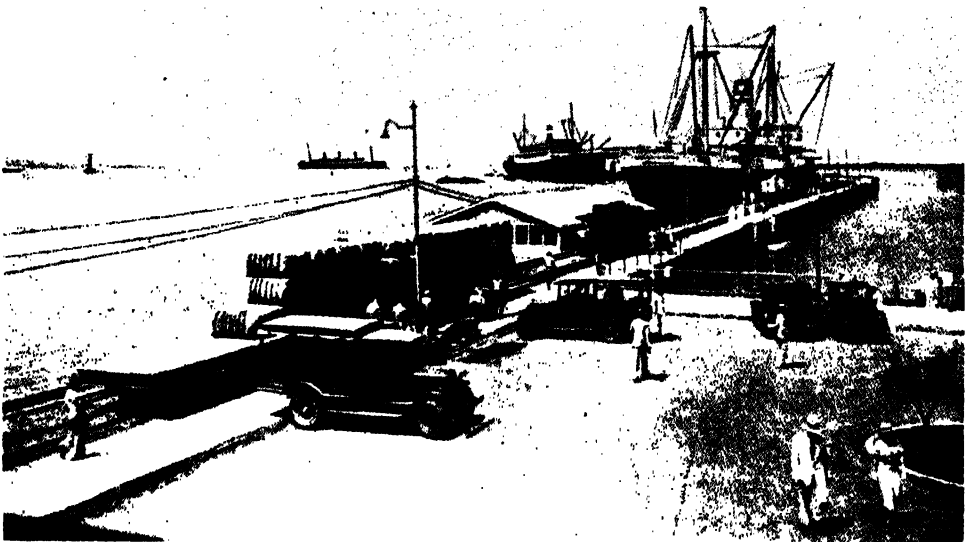
হাইটীর ব্যায়ামরত দেশীয় বালিকার দল

হাইটীর বৈঠকখানা-ঘর

তোরণদ্বারে গর্দ্দভারূঢ়া নারীর দল

ক্যাপ্টেন দেখিয়াছিলেন, অন্ধ, একচক্ষুহীন, খঞ্জ এবং স্ফীতপদ বহু নরনারী ভিক্ষুকের দলে ছিল। সকলেরই দেহ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

সূর্য্যালোক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। প্রখর সূর্য্যতাপে স্কন্ধদেশ যেন ভারী বোধ হয়, পদদ্বয় চলিতে চাহে না, মস্তিষ্ক যেন চিন্তা করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়ে এমনই অসহনীয় রৌদ্রতাপ।

রাজপথের ধারে ধারে ধনীদিগের পল্লী-ভবন। উদ্যানের ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী। ক্যাপ্টেন পরিভ্রমণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। এমন সময় ভীষণ জনকোলাহল উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দামামা বাজিয়া উঠিল। পর-মুহূর্ত্তে গুলীর শব্দ শোনা গেল। বাতাসে ধূম্রজাল দুলিতে লাগিল। দূরে একদল সৈনিক দেখা গেল। তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ছিল না। ঘোরতর বিশৃঙ্খলাই সেই সেনা-দলের বৈশিষ্ট্য।

একদল নিগ্রো পদব্রজে চলিতেছিল, আর এক দল নিগ্রো অশ্বারোহণ করিয়াছিল। কাহারও পদে জুতা ছিল না। কাহারও অঙ্গে পাজামা, কাহারও পরিধানে লোহিতবর্ণের প্যাণ্টালুন ও নীলবর্ণের কোট, মাথায় সোনালী ফিতাযুক্ত টুপী—ফরাসী সেনাদলের টুপীর অনুকরণে নির্ম্মিত। অর্দ্ধেক লোকের হাতে বন্দুক, তাহাও নানাশ্রেণীর। প্রত্যেকেরই কটিবন্ধে দেশীয় ছোরা।

সকলেই দৌড়াইতেছিল। যোদ্ধদলের মধ্যে কেহ উত্তেজিত হইয়া মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়িতেছিল। কেহ বা একসঙ্গে ৫।৬টি গুলী নিক্ষেপ করিতেছিল। উহা শেষ হইলে, সে বন্দুক স্কন্ধে তুলিয়া বা পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিতে-ছিল। কেহ চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। অমনই দলের সকলেই সেই সঙ্গে যোগ দিতেছিল। দামামার ধ্বনি ও শঙ্খরব এমন ভীষণ যে, কাণে তালা ধরিয়া যায়।

ক্যাপ্টেন কোন্ দিকে, শত্রু তাহার জন্য

হাইটীর জাতীয় প্রাসাদ

পোর্ট-অ-প্রিন্সের রেলগাড়ী

লিমনেড গির্জ্জার অভ্যন্তরভাগ

ধীবরগণ মৎস্যপূর্ণ নৌকা লইয়া ফিরিতেছে
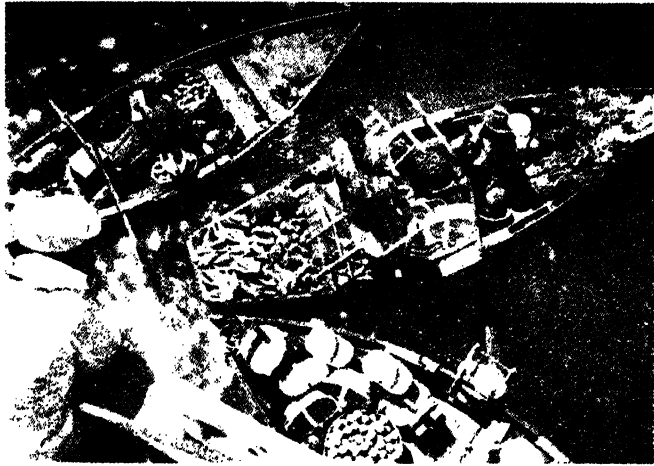
শঙ্খ, প্রবাল ও শুষ্ক মৎস্যপূর্ণ নৌকা

কন্দমূলচূর্ণ হইতে রুটী প্রস্তুত

ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। লোকগুলি এমন স্ফূর্ত্তি করিতেছিল যে, তাহাতে বিদ্রোহের কোনও আভাস মিলিতেছিল না।

দেশীয়গণ কোনও বিদেশীর কোন অনিষ্ট করে নাই বলিয়া ক্যাপ্টেন শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, দলের সকল লোক এই নিয়ম পালন করিয়া চলে কি না। সুতরাং ক্যাপ্টেন নিজেকে বিপন্ন করিতে চাহিলেন না। পশ্চাদ্‌ভাগে একশত গজ দূরে একটি প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গা দেখিয়া তিনি সেই দিকে চলিলেন। ৬ ফুট একটি খানা পার হইয়া তিনি উদ্যানে পৌছিলেন। বাগানের মধ্যে একটি সুন্দর বাসভবন। সম্মুখের দ্বারদেশে কয়েকটি বৃটিশ পতাকা উড়িতেছিল। উহা দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন।

ভিতরের কয়েক জন লোক তাঁহাকে আহ্বান করিলেন।• বিদ্রোহী সেনাদল কাছে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া গৃহের মধ্যে আশ্রয় লইলেন। গৃহাধ্যক্ষ এক জন লণ্ডনের ব্যারিষ্টার। টেবলের উপর "টাইমস্" ও "ডেলিমেল" পত্র সাজ্জিত ছিল।

ব্যারিষ্টার তাঁহাকে দ্বিতলের কক্ষে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে দৃশ্য উপভোগ্য। তাঁহারই নিকট ক্যাপ্টেন শুনিলেন, অল্পদিনের মধ্যে এরূপ বিদ্রোহ আরও চারিবার হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ব্যবসায়ের খুব ক্ষতি হয়। এ দেশের লোক শান্তি ও শৃঙ্খলার মর্য্যাদা বুঝে না। প্রেসিডেণ্ট যদি আজ কার্য্যভার গ্রহণ করেন, কল্য হয় তিনি নির্ব্বাসিত হইবেন, নয় ত তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলা হইবে। মাত্র এক জন শাসক এ পর্য্যন্ত কার্য্যকাল-শেষে নিরাপদে জীবন লইয়া ফিরিয়া যাইতে পাইয়াছেন। বাকি যাঁহারা আসিয়াছিলেন, সকলকেই হত্যা করা হইয়াছিল, অথবা তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।
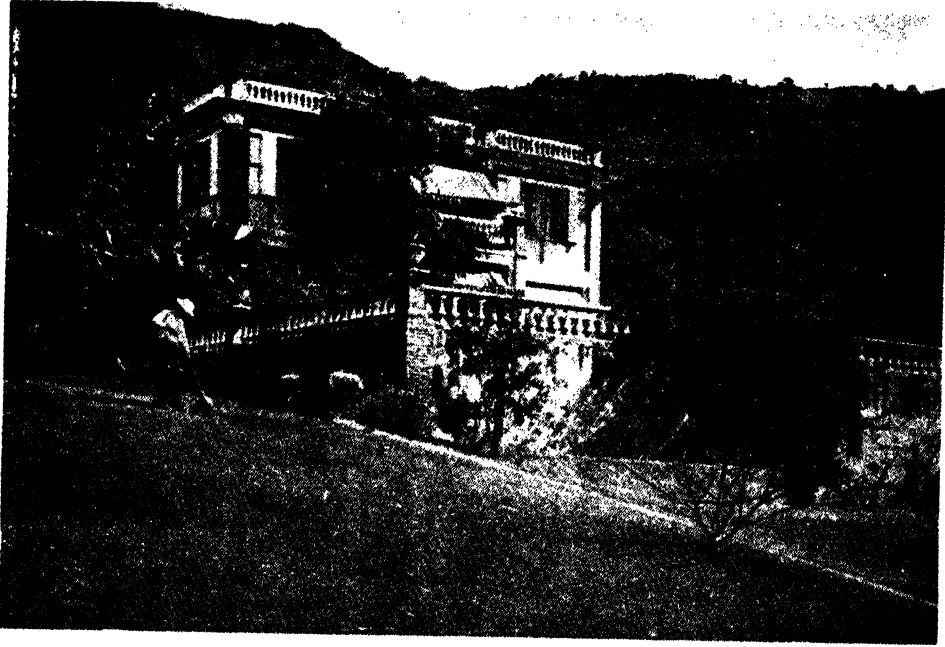
উচ্চশ্রেণীর হাইটীর বাসভবন

বিংশ শতাব্দীতে এরূপ বিশৃঙ্খল দেশ আর কোথায় আছে? প্রাগুক্ত সেনাদল ভাড়া করা। উহারা দস্যু অথবা সেই জাতীয় মানুষ। পর্ব্বত প্রদেশ হইতে উহারা আসিয়াছে। এক জন প্রেসিডেণ্টকে বিতাড়িত করা হইয়াছে, আর এক জন আসিয়াছেন। ঐ বিশৃঙ্খল সেনাদল হয় ত কয়েক শত জনকে মারিয়া ফেলিবে, তার পর লুণ্ঠন আরম্ভ করিবে। তার পর উহারা আবার পর্ব্বতাশ্রয়ে ফিরিয়া যাইবে। ভবিষ্যতে বিদ্রোহ করিবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।

ক্যাপ্টেন ঐ সব কথা শুনিয়া দ্বিতলে দাঁড়াইয়া সেনাদলের গতায়াত লক্ষ্য করিলেন। তার পর নীচে নামিয়া আসিলেন। তিনি জাহাজে ফিরিতে প্রস্তুত হইলে ব্যারিষ্টার তাঁহাকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

তখন সূর্য্যালোক আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ব্বতগাত্রে মেঘমালা প্রতিহত হইতেছিল। খানিক পরে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল। সূর্য্যালোক ম্লান হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হইল। ঝটিকার বেগে প্রকাণ্ড আম্র ও ওকবৃক্ষ সমূহ প্রবলবেগে দুলিতে লাগিল। চপলা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল—পরক্ষণেই ভীষণ বজ্রধ্বনি।

কলম্বাসের নোঙ্গর

অল্লক্ষণের মধ্যেই সুগভীর পয়ঃপ্রণালী সত্ত্বেও রাজপথ জলে ডুবিয়া গেল। জল ক্রমে তিন ফুট বাড়িল। অবশেষে প্রচণ্ড বজ্রনাদের পর সহসা ঝটিকাবেগ অন্তর্হিত হইল।
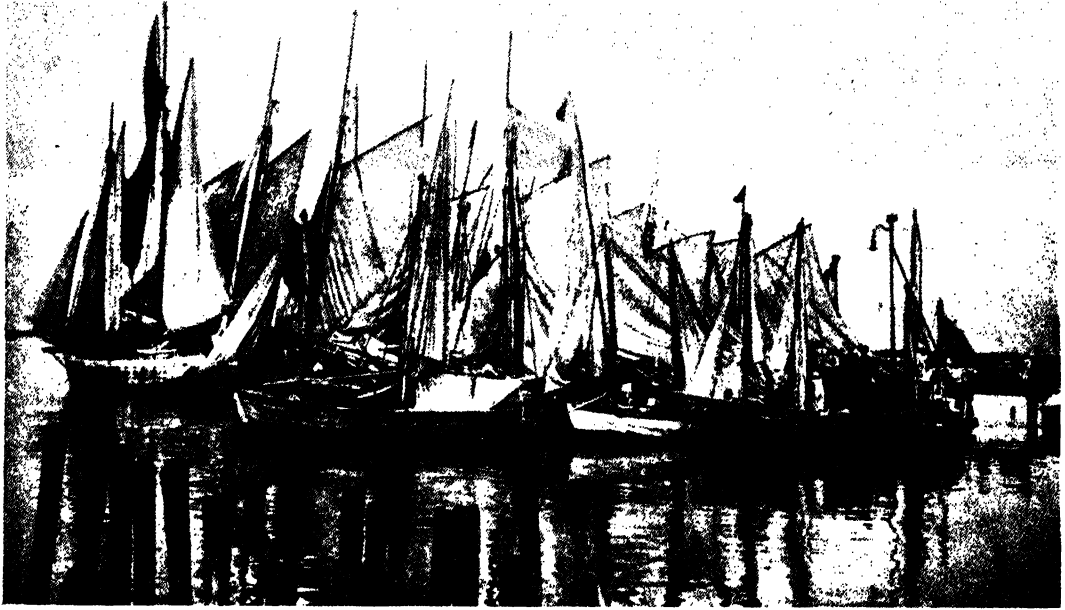
যাত্রী ও পণ্যবাহী নৌকাশ্রেণী

হাইটীর সুন্দরী যুবতী

তখনও এক ঘণ্টা দিবালোক ছিল। ক্যাপ্টেন জাহাজে ফিরিয়া যাইবার জন্য বাহিরে আসিলেন।

ঝটিকার ন্যায় বিদ্রোহ-ঝটিকাও সহরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। দেশীয় যোদ্ধার দল রাজপথে বিচরণ করিতেছিল। প্রত্যেক বাড়ীর বাতায়ন ও দ্বার রুদ্ধ। বৈদেশিক পতাকাগুলি অনেক গৃহের অলিন্দে পত পত রব করিয়া উড়িতেছিল। পথে যাইবার সময় এক দল অর্দ্ধনগ্ন রাজবন্দী নিগ্রোকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

উহারা প্রেসিডেণ্টের সেনাদল, অথবা যে দল জিতিয়াছে, তাহাদেরই অংশ হইতে পারে। সম্ভবতঃ উহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গুলী করা হইবে। কিন্তু বন্দীদিগের মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না যে, তাহারা বিন্দুমাত্র বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সিগারেট ধরাইয়া গল্প করিতে করিতে চলিতেছিল। মাঝে মাঝে প্রহরী বা রক্ষকগণ তাহাদিগকে বন্দুকের কুঁদা দিয়া প্রহার করিতেছিল।

জাহাজে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহারা দুই জন নূতন যাত্রীকে দেখিলেন। ফরাসী দম্পতি। উভয়েই খুব রসিক। ভদ্রলোকটি কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদক। হাইটী সংক্রান্ত একখানি ইতিহাস তিনি রচনা করিয়াছেন। তিনি অনর্গল ইংরাজী বলিতে পারেন। তিনি হাইটীর অনেক বিবরণ বিবৃত করিলেন।

ক্যাপ্টেন হাউষ্টন ক্রেগ হাইটীর লোকজন দেখিয়া যেরূপ

দুর্গপ্রাকারের নিম্নে পোর্ট-অ-প্রিন্সের দৃশ্য

ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, উক্ত ফরাসী ঐতিহাসিকের বিবরণ তাহার অনুরূপ নহে। উল্লিখিত ফরাসী ঐতিহাসিক, তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, হাইটীকে বুঝিতে হইলে দুইটি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। প্রথমতঃ ইহার অধিবাসীদিগের উৎপত্তি এবং দ্বিতীয়তঃ সভ্য সমাজ হইতে এই দ্বীপের সম্পর্কহীনতা। ফরাসীরা প্রথমতঃ এই দ্বীপে হাজার হাজার কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, কঙ্গোর অসভ্যরাও এখানে আনীত হইয়াছিল। ঔপনিবেশিক শ্বেত জাতির সহিত তাহাদের রক্তসম্পর্কিত সংস্রব ঘটে। সেই শ্বেতকায়দিগের মধ্যে অনেক অভিজাত সম্প্রদায়ের ফরাসীও ছিলেন। এই সংমিশ্রণের ফলে মিশ্র জাতির উদ্ভব হইল। ইহাতে যে ফল হইবার, তাহাই হইল। ডাহোমী সর্দ্দারের কন্যার সহিত ফরাসী মার্কুইসের সংস্রবের ফলে সেটিওয়েওর মত গাত্রবর্ণ এবং ট্যালের‌ার মত মস্তিষ্কবিশিষ্ট পুত্র-সন্তানের উদ্ভব ঘটিল। আবার কৃষ্ণবর্ণা দুহিতা জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার মনটা শ্বেতকায়দিগের মতও হইতে পারে। অথবা শ্বেতবর্ণা কন্যার মনটা কৃষ্ণবর্ণ লোকের অনুযায়ী হওয়াও স্বাভাবিক। সুতরাং বৈচিত্র্য অনিবার্য্য।

এক শত বৎসর ধরিয়া এই ভাবে হাইটীর জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। তাহারা স্বাধীন হইলেও জগতের সহিত সম্পূর্ণ বিযুক্ত ছিল। এই মিশ্রিত জাতি যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনই শিক্ষিত। তাহাদের পদানত একদল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকাবাসী। উহারা এইখানে নীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই জগতের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল।
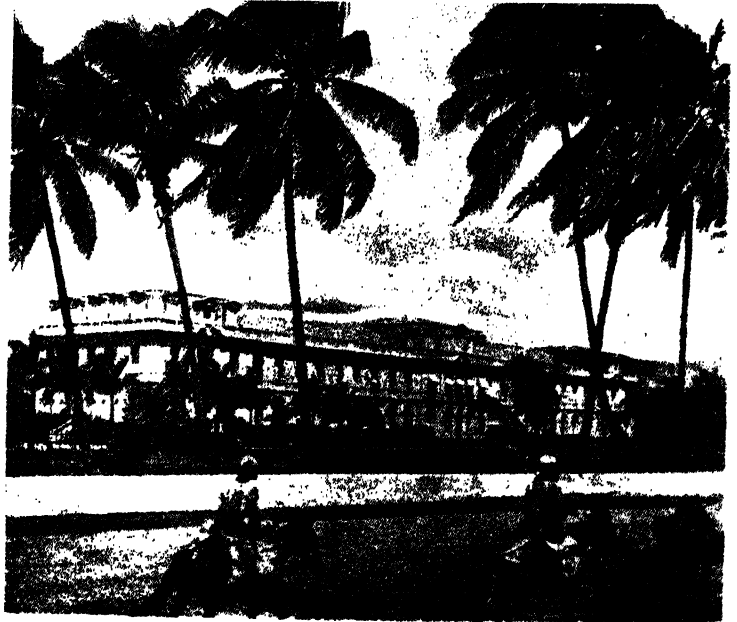
কৃষি কলেজ

এই মিশ্রিত সম্প্রদায়ের ভাষা ফরাসী, তাহাদের শিক্ষাও ফরাসীদিগের অনুরূপ; কিন্তু কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদিগের নিকট হইতে তাহারা বহু কুসংস্কার লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণকায়গণ তাহাদের পূর্ব্ব-ধর্ম্মমতের উপাসক ছিল এবং
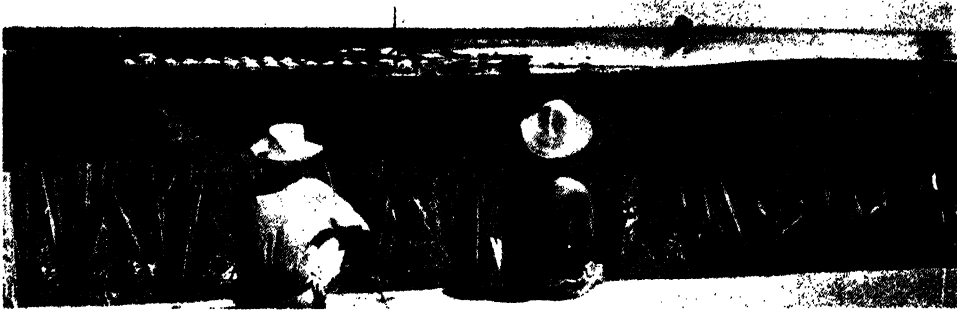
শণ চাষের ক্ষেত্র

পূর্ব্ব-রীতিনীতিও তাহারা পালন করিয়া চলিত; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারাও কোন কোন ফরাসী শব্দ আয়ত্ত করিয়া লইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মেরও কোন কোন বিষয়ে রপ্ত হইয়াছিল। এই সঙ্কর বর্ণের হাতেই ধনৈশ্বর্য্য ছিল। সরকারী ক্ষমতা তাহাদেরই করধৃত। মাঝে মাঝে কৃষ্ণকায়গণ বিদ্রোহ ও লুণ্ঠনতৎপর হওয়ায়, সঙ্কর জাতি কিছু কিছু অধিকার

সান্স সৌসিপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল; কিন্তু কোনও সম্প্রদায়ই নিয়মশৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে রাজি ছিল না। দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যবসায়ের সুপরিচালন, ঋণ শোধ—সরকারী বা বে-সরকারী এ সকল ব্যাপারে তাহারা কোনও নিয়ম মানিয়া চলিত না। কাযেই সমস্ত দ্বীপটা দেউলিয়ার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাণিজ্য-সংক্রান্ত চুক্তিপত্র 'চোতা' কাগজের মতই উপেক্ষিত হইত। দেশের মধ্যে কোনও সংক্রামক ব্যাধি হইলে, তাহা সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করিত—প্রতীকারের কোন ব্যবস্থাই হইত না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা কবিতা রচনা করিত, মহাকাব্য ভালবাসিত। এ দিকে দেশের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিপ্লবের প্রকোপে পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

ক্যাপ্টেনকে সেই ফরাসী ঐতিহাসিক অবশেষে বলিয়া ছিলেন, "এ রকম অবস্থা থাকিতে পারে না—ইহার পরিবর্ত্তন চাই। এই যুগে হাইটী দ্বীপ সভ্য জগৎ হইতে সম্বন্ধবিচ্যুত অবস্থায় থাকিতে পারে না। পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিরা কোনও ক্ষুদ্র দেশকে যথেচ্ছ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দিবেন না। তাই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, ২০ বৎসরের মধ্যে এই দ্বীপের মলিনতা ধৌত হইয়া যাইবে, উহা সভ্য হইবে। কবি হিসাবে আমি সে জন্য দুঃখ করিতেছি, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক হিসাবে আমি বলিতেছি, ইহা অবশ্যম্ভাবী।" পরদিবস ক্যাপ্টেন হাউষ্টন ক্রেগ হাইটী দ্বীপ পরিত্যাগ করেন।

হিস্পানিওলা দ্বীপের পশ্চিমাংশের এক-তৃতীয়াংশ স্থান হাইটীর অধিকারভুক্ত। এই সাধারণ-তন্ত্র-প্রধান. স্থানের

পোর্ট-অ-প্রিন্সের বাজার

ভাষা ফরাসী। উহারা প্রতিবেশী ডোমিনিকাস্ সাধারণ তন্ত্র হিস্পানিওলার দুই-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উহার অধিবাসীদিগের ভাষা স্পেনীয়। আচার-ব্যবহারও স্পেনীয়দিগের ন্যায়।

হাইটী সাধারণ-তন্ত্রের অধিকৃত স্থানের পরিধি—১০ হাজার ২ শত ৪ বর্গ-মাইল। হাইটী দ্বীপ বা সান্টো ডোমিঙ্গো কলম্বসের প্রথম জল-যাত্রার কালে আবিষ্কৃত হয়। হাইটীতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৬ জন লোক শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই ২৬ জনের মধ্যে দুই জন সম্রাট, এক জন রাজা ও ২৩ জন প্রেসিডেণ্ট। এক জন আত্মহত্যা করেন, চারি জনকে হত্যা করা হয়, ৫ জন কার্য্য করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ১৫ জনকে নির্ব্বাসিত করা হয়। বিদ্রোহীরাই তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করে। মাত্র এক জন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য পরিচালনার পর অবসর গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

হাইটী দ্বীপ হইতে প্রথমবার প্রত্যাবর্ত্তনের পর ক্যাপ্টেন হাউষ্টন ক্রেগ এক দিন সংবাদপত্রপাঠে অবগত হন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী হাইটী অধিকার করিয়াছে। এক জন প্রেসিডেণ্টকে পোর্ট-অ-প্রিন্সের রাজপথে হত্যা করা হয়। ঋণ পরিশোধ করিবার টাকা বন্ধ করা হয়। ফরাসী দূতনিবাস দেশীয়গণ আক্রমণ করে। ইহাতে বৈদেশিকগণ সমস্বরে প্রতিবাদ আরম্ভ করেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ফরাসী ঐতিহাসিকের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে অর্থাৎ ২০ বৎসরকাল পূর্ণ হইতে তখনও কয়েক বৎসর বাকী ছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই হাইটীর আবর্জ্জনাসংস্কারের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র হাইটীকে সভ্য করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

হাইটীর রাজপথ

ক্যাপ্টেন হাউষ্টন ক্রেগ হাইটী অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। তিনি পুনরায় পোর্ট-অ-প্রিন্স অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বন্দরে পৌঁছিয়া তিনি বহু পরিবর্ত্তন দর্শন করিলেন। সহরের দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে কফির ঘন সুগন্ধে বাতাস পূর্ণ। পূর্ব্ববারে আসিয়া তিনি বহু ব্যক্তিকে অর্দ্ধনগ্ন দেহে দেখিয়াছিলেন। এবার দেখিলেন, সকলেরই অঙ্গ আবৃত। রাজপথগুলি সুপরিষ্কৃত এবং সুসংস্কৃত। পথে বিদ্যুতের আলো। কুলীর দল সকল সময়েই ঝাড়ুহস্তে রাজপথ পরিষ্কার করিতেছে। বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের দল সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। অনেক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-পোতের চিকিৎসকগণের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া রোগমুক্ত হইয়াছে। তাহারা এখন কোন না কোন পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে।

মোটরগাড়ীর বাহুল্য দেখিয়া ক্যাপ্টেন বিস্মিত হইলেন। প্রথমবার যখন তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, একখানিও মোটরগাড়ী এই দ্বীপে তখন ছিল না। পুরাতন ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদের স্থানে এখন নূতন প্রাসাদ নয়নমন হরণ করিতেছে।

কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে 'ক্যাপ্ হাইটিয়েন্'এ যাইতে হইল। পোর্ট-অ-প্রিন্স হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব ১ শত ৮৫ মাইল। মোটরগাড়ীতে চড়িয়া তিনি সেখানে গমন

করিলেন। রাজপথ যেমন বিস্তৃত, তেমনই সংস্কৃত। পূর্ব্বে এইরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে অশ্বপৃষ্ঠে সপ্তাহকাল লাগিত। রাজপথের দুই ধারে পল্লী-নরনারীরা অবলীলাক্রমে স্ব স্ব কার্য্য উপলক্ষে গতায়াত করিতেছে, তিনি দেখিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র নরনারীও এখন সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে শিখিয়াছে।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ক্যাপ্ হাইটিয়েন, হাইটীর উত্তরভাগে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। উহার অদূরে একটি প্রবালদ্বীপ অবস্থিত। ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস, এইখানেই কলম্বসের চলিতেন। এ জন্য এই খ্রীষ্টোফের স্মৃতি এখনও হাইটীর বালকগণের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া থাকে। মার্কিণ ছাত্ররা প্রেসিডেণ্ট ওয়াসিংটনকে যেরূপ শ্রদ্ধা করে, হাইটীর বালকবৃন্দের মনেও খ্রীষ্টোফের স্মৃতি সেইরূপ শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছে।

হেনরী খ্রীষ্টোফ ১৭৬০ হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বৃটিশ দ্বীপ সেণ্ট খ্রীষ্টোফ হইতে ক্যাপ হাইটিয়ানে নীত হন। কোনও ফরাসী জাহাজে আশ্রয় লাভ করার পর হাইটীতে তিনি ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন।

কেন্স্ কফ্ উপনিবেশ

জাহাজ "সাণ্টা মারিয়া" ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ফরাসীদিগের আমলে এই স্থানের নাম ক্যাপ্ ফ্রাঙ্কাইস্ ছিল। উহাই তখন হাইটীর রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন নিগ্রো শাসক এখানে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। নগ্নপদ ক্রীতদাস হইতে তিনি শক্তিশালী শাসকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাতন্ত্রী, নির্দ্দয় শাসক হইলেও সাধুতা, সাহস ও বীর্য্যবত্তায় কম ছিলেন না। তাঁহার প্রতাপে এই দেশকে সকলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। যুরোপের বড় বড় শক্তিধর জাতি তাঁহাকে যেমন ভয় করিতেন, তেমনই সমীহ করিয়া প্রথমতঃ তিনি এক জন ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারীর নিকট কায করিতে থাকেন। সাভানা যখন শত্রুবেষ্টিত, সেই সময় উক্ত সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত তিনি জাহাজে চড়িয়া সেইখানে গমন করেন। তিনি যেমন গর্ব্বিত, তেমনই উৎসাহী, বুদ্ধিমান্ ছিলেন। অতি সত্বর তিনি লেখাপড়া শিখিয়া ফেলেন।

ফরাসী নৌবাহিনী প্রত্যাবৃত্ত হইলে খ্রীষ্টোফ এক জন পান্থনিবাসের অধ্যক্ষের নিকট বিক্রীত হন। সেই হোটেলের নাম "হোটেল কোরুন্"। সেই পান্থনিবাসের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। খ্রীষ্টোফ অত্যন্ত বিনয়ী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন

ভৃত্য ছিলেন। সযত্নে তিনি প্রভুর কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। অতিথিদিগকে পরিচর্য্যা করিবার সময় তিনি প্রত্যেকের নিকট হইতে যাহা কিছু পা'রতেন, শিখিয়া লইতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তিনি সাধারণ মানুষ নহেন—তাঁহার ক্ষমতা আছে। মনিবের অতিথিদিগের সহিত নিজের তুলনা করিয়া দেখিয়া তিনি বুঝিতেন, তাহাদের অপেক্ষা তিনি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি নিজের মনের ভাব কাহারও কাছে প্রকাশ করিতেন না। নিজের যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি অযোগ্য প্রভুর সেবা করিতেছেন, এজন্য এই রীতির উপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার মনে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, তিনি ইহাই প্রমাণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ মানুষের তিনি সমকক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণকায় মানুষ শ্বেতকায় মনুষ্যের সমতুল্য ত বটেই, শ্রেষ্ঠও হইতে পারে।

উপনিবেশে যখন ফরাসী বিদ্রোহের আনুষঙ্গিক অশান্তি প্রকাশ পাইল, খ্রীষ্টোফ্ তখন ফরাসী ঔপনিবেশিক সেনা-দলে প্রাইভেট সৈনিকরূপে ভর্ত্তি হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি সামরিক কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন। তার পর যখন টুসেঁ এল ওভারটুরের পতাকা-তলে কৃষ্ণকায়গণ সমবেত হইয়া ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তিনি বিদ্রোহী দলের নেতা হইয়া উত্তরাঞ্চলে সৈন্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। ফরাসীদিগের পরাজয়ের পর তিনি সাধারণতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টোফ্ ৩ হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাহাড়ের সমগ্র অংশ লইয়াই এই দুর্গ। এই দুর্গ নির্ম্মাণে ৫ লক্ষ টন মাল-মসলা লাগিয়াছিল। দশ হাজার লোক অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া এই দুর্গ নির্ম্মাণ করে। দুর্গটিকে অপরাজেয় করিবার জন্যই খ্রীষ্টোফ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ যেরূপ বিরাট, শরীরে তেমনই অসীম শক্তি ছিল। নিজের হাতেই অনেক সময় তিনি রাজমিস্ত্রীর কায করিতেন। অন্য দক্ষ লোক সারাদিন

ইক্ষু মাড়াই

পরিশ্রম করিয়া যে কায করিতে পারিত, তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন। গুরু পরিশ্রমে ২০ হাজার লোক মারা গিয়াছিল, কিন্তু রাজা খ্রীষ্টোফ তাঁহার ওভারসিয়ারগণকে নূতন শ্রমিক আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিতেন। দুর্গনির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত রাখিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

মোটরযোগে ক্যাপ্টেন হাউষ্টন ক্রেগ দেশীয় সহরের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলেন। একটি দেশীয় সহরের নাম মিলট। তাহারা অত উচ্চস্থানে প্রাসাদ-নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যসম্ভার বহনের ভার সহ্য করিতে পারিবে না, তাহা তিনি জানিতেন। তথাপি এককালে ৫ হাজার নর-নারী কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রাসাদ-নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয় এবং পরবৎসরে উহা সমাপ্ত হয়। যে ক্ষুদ্র উপত্যকা-ভূমিতে প্রাসাদটি রচিত হইয়াছিল, তাহার সর্ব্বত্র মর্ম্মর-প্রস্তর দ্বারা তিনি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। নানা দেশ হইতে নানাবিধ দ্রব্য আহরণ করিয়া খ্রীষ্টোফ প্রাসাদটিকে

কাচখণ্ডের সাহায্যে ক্ষৌরকার্য্য

বাজার অভিমুখে

এইখানে সানস্ সৌসি প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে, রাজা হেনরী রাণী ও পুরজনসহ এখানে বাস করিতেন। তাঁহার দরবারও এখানে বসিত। এই প্রাসাদ এখন ধ্বংসপ্রায়। খ্রীষ্টোফের অনেকগুলি প্রাসাদ ছিল, প্রত্যেকটিই সুন্দর। একদা তিনি জানিতে পারেন যে, প্রুসিয়াতে এমন সুন্দর প্রাসাদ আছে, যাহার সহিত তাঁহার কোনও সুদৃশ্য প্রাসাদের তুলনা হইতে পারে না। তাহার নাম সান্স্ সৌসী। তিনি ঐ নাম দিয়া একটি প্রাসাদ রচনার সংকল্প করেন। কিন্তু আকারে ও প্রকারে তাহা প্রুসীয় প্রাসাদ অপেক্ষা বৃহত্তর ও সুন্দরতর হইবে।

তিনি নারী ও বৃদ্ধগণকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করেন। য়ুরোপীয় রাজগণের ন্যায় তিনি প্রাসাদে রাজপরিবারগণের বাসোপযোগী হর্ম্ম্যমালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমীর-ওমরাহ-বংশের প্রতিষ্ঠাও তিনি করেন। অভিজাতবংশের মধ্যে কাউণ্ট অব লিমনেড ও ডিউক অব মার্ম্মেলেডের নাম কোনও দিন বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যাইবে না।

মূল্যবান্ ফরাসী দর্পণ সমূহ প্রাসাদের অলিন্দগুলিকে সুশোভিত করিয়াছিল। যে ঘরে রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিস্ময়কর। চারিদিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য-রচিত দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য। প্রাসাদ-সংলগ্ন রাজকীয় গির্জ্জা, রঙ্গালয়, সেনাবারিক নির্ম্মিত

হইয়াছিল। সেনাবারিকের অদূরে গোলা-বারুদ প্রস্তুতের কারখানা ও গোলাগুলী প্রভৃতি সঞ্চয় করিয়া রাখিবার গুদাম। এই সকল বিষয়ের চিহ্ন এখন বিলুপ্তপ্রায়। জনশ্রুতি বলে যে, রাজার মৃত্যুর পর দ্বিতলস্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত কক্ষগুলিতে আগুন লাগে। সান্‌স্‌ সৌসি আক্রান্ত হওয়ায় কামানের গোলা পড়িয়া উহাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া দেয়।

পাহাড়ের উপর যে দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দেও সম্পূর্ণ হয় নাই। ঐ বৎসর রাজার মৃত্যু হয়।

ডালার উপর বিস্তৃত কফিদানা

তিন জন বন্দী ফরাসী এঞ্জিনীয়ার দুর্গনির্ম্মাণকার্য্যে রত ছিলেন। দুর্গমধ্যে ১০ হাজার সৈনিকের অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল। রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত সেনাদলই এখানে থাকিত। যে শৈলোপরি দুর্গ অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিক এমনভাবে কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল যে, চারিদিক হইতে কামান দাগিবার সুবিধা। সে যুগে খ্রীষ্টোফ যে সকল ভারী কামান ব্যবহার করিতেন, তাহা এখনও সুরক্ষিত আছে। কিরূপে ঐ প্রকার বৃহদায়তন ও ভারী কামান পর্ব্বতশৃঙ্গে মনুষ্যশক্তির সাহায্যে স্থাপিত হইত, তাহা এ যুগে বিস্ময়ের বিষয়। রাজা হেনরীর বিবরণে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। খ্রীষ্টোফ এক শত জন লোককে একটা ভারী কামান পর্ব্বতোপরি তুলিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্যপথে কামান টানিয়া লইতে তাহারা অশক্ত হইয়া রাজাকে সবিনয়ে তাহা নিবেদন করে, রাজা তাহাতে বলেন যে, যে কোনও প্রকারে উহা যথাস্থানে লইয়া যাইতেই হইবে। যদি তাহারা তাহা না পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি অন্য ব্যবস্থা করেন। ১ শত জনের মধ্য হইতে ৫০ জনকে বাছাই করিয়া তদ্দণ্ডেই তিনি তাহাদিগের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করেন। তার

রাঙ্গা আলুজাতীয় কন্দ গুঁড়া করা হইতেছে

পর দেখা যায় যে, বাকি ৫০ জন লোকেই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছে।

পাহাড়ের পরিচ্ছন্ন ঢালু প্রদেশে সেনাদলের জন্য কদলী প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল-মূল রোপণ করাইতেন। তাহাতেই সেনাদলের খাদ্য সরবরাহ হইত। দুর্গের প্রত্যেক ছাদ ও প্রাঙ্গণ এমনইভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, বর্ষার জল পড়িয়া নির্গমনের পথ পাইত না। বড় বড় চৌবাচ্চা তৈয়ার করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। এজন্য সেনাদলের কখনও জলাভাব হইত না। প্রুসীয়রাজ ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সেনাদল কঠোর শ্রমসহিষ্ণু ও নিয়মানুগ জানিতে পারিয়া রাজা খ্রীষ্টোফ নিজের সেনাদলকে তাহাদের

অলাবু-বিক্রেতা

অশ্বপৃষ্ঠে কৃষিক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ

কৃষক-কুটীর

হাইটীর কাঠের বাড়ী

অপেক্ষাও রণদক্ষ, শ্রমসহিষ্ণু ও নিয়মানুগ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দুর্গের প্রাকার হইতে নিম্নের ড্রিল করিবার স্থান সোজা ২ শত ফুট নিম্নে অবস্থিত। কিংবদন্তী বলে যে, রাজার এই শিক্ষিত সেনাদল রাজ-আদেশ পাইবামাত্র ঐ দুই শত ফুট খাড়া স্থান হইতে নিম্নে লম্ফ দিয়া অবতরণ করিতে দৃক্‌পাতও করিত না।

দুর্গের দক্ষিণাংশে একটা স্তূপ আছে। রাজা খ্রীষ্টোফ এখানে দুইটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একটির নাম রামিয়ার, অপরটির নাম বেলিভিউ। এই প্রাসাদ দুইটি তেমন বৃহৎ ছিল না। রাজা যখন আমোদ-প্রমোদ করিতে চাহিতেন, এই প্রাসাদে অবস্থান করিতেন। এখানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরা সঞ্চিত থাকিত, উৎকৃষ্ট পাচক এখানে আহার্য্য রন্ধন করিত। রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী নারীরা এখানে বাস করিত। প্রিয় ওমরাহগণকে লইয়া রাজা এই সকল প্রাসাদে প্রমোদোৎসব করিবার জন্য গমন করিতেন। সময়ে সময়ে কোন কোন বৈদেশিক দর্শকও এখানে আমন্ত্রিত হইতেন।

রাজা খ্রীষ্টোফ কর্কশস্বভাব, স্বেচ্ছাচারী এবং নৃশংস প্রকৃতির শাসক হইলেও তিনি নিজ রাজ্যের দুর্ব্বল, অশিক্ষিত প্রজাগণকে শক্তিশালী ও শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি যে কোনও প্রকার ত্যাগস্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এই কার্য্যসাধনের জন্য তিনি প্রবল উদ্যমে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সে সকল কাহিনী উপকথার পরীর গল্পের ন্যায় বিস্ময়াবহ। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, স্বদেশকে সুদক্ষ রণনিপুণ যোদ্ধৃবৃন্দের দ্বারা শক্তিশালী করিয়া তুলা। তিনি এ জন্য অনেকগুলি দুর্জ্জয় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অজেয় বাহিনীর কথা সর্ব্বজন-বিশ্রুত ছিল। তাঁহার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, দেশকে সমৃদ্ধ করা।

এজন্য তিনি নিয়ম জারী করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট কাল পরিশ্রম করিবে। আইন-প্রণয়ন করিয়া তিনি প্রত্যেকের কার্য্যকাল ও কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া কেহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিবে, ইহা তিনি চাহিতেন না। আমেরিকা যে প্রণালীতে পূর্ব্বে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিত, রাজা খ্রীষ্টোফের ব্যবস্থা তদনুরূপ ছিল।

মার্কিণ ডলারের ন্যায় তাঁহার প্রচলিত "গোর্ডো" মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত। উহার মূল্যের তারতম্য, হ্রাসবৃদ্ধি ছিল না।

শণ শুষ্ক করা হইতেছে

প্রাচীনতম কাল হইতে ক্যারেবিয়ান সমুদ্রমধ্যস্থ যাবতীয় দ্বীপ—হাইটীও তাহারও অন্তর্গত—স্পেনীয় ডলার 'পেসো' ব্যবহার করিত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেনে রৌপ্য দুর্লভ হয়। এজন্য সীসার পেসো সে স্থান অধিকার করে। কিন্তু তাহার কোন মূল্য ছিল না। পরে মেক্সিকো ও পেরু হইতে রৌপ্যের আমদানী হয়। সীসার পেসো হইতে খাঁটী রূপার পেসোর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য, রৌপ্য-মুদ্রার উপর "পেসো—গোর্ডো" মুদ্রিত হইত।

হাইটীর অধিবাসীরা এই নূতন মুদ্রার মর্ম্ম বুঝিত—উহা যে খাঁটী জিনিষ, তাহা জানিত; কিন্তু যে শব্দ উহাতে উৎকীর্ণ ছিল, তাহার অর্থ বুঝিত না। স্পেনীয় শব্দ তাহাদের কাছে শ্রুতিকটু বোধ হইত। সুতরাং নিজেদের মুদ্রার নামকরণ করিয়াছিল, "পিয়াস্ত্রে—গোর্ডো!" পরে ঐ নামের পরিবর্ত্তে শুধু "গোর্ডো" এই নামই রহিয়া যায়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১৪ বৎসর কঠোর শাসনের পর খ্রীষ্টোফ পরলোকগমন করেন। দুর্গের প্রাঙ্গণে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। উহা দেখিতে কুকুরের ঘরের ন্যায়। প্রথমে রাজার পক্ষাঘাত রোগ হয়। নিম্নাংশ সম্পূর্ণ অবশ হইয়া গিয়াছিল। তখন দেশে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। পক্ষাঘাত ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজা বুঝিলেন, সময় আসন্ন। তখন রাজবেশে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া বিশ্বস্ত পার্শ্বচরগণের সাহায্যে তিনি সিংহাসনে বসিলেন। সকলের নিকট বিদায় লইয়া সূর্য্যাস্তের সময় তিনি একটি সোণার গুলীর দ্বারা মাথার খুলি উড়াইয়া দিলেন। ঐ গুলীটি তিনি নিজের কাছেই রাখিতেন। জানিতেন, ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। রাজা খ্রীষ্টোফ্ দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী রাজা হইলেও য়ুরোপের রাজন্যবর্গের আক্রমণ হইতে তিনি হাইটীকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া দেশবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের উল্লিখিত ব্যাপারের পর ক্যাপ্টেন ক্রেগ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় হাইটীতে গমন করেন। এবার তিনি হাইটীর এক জন পদস্থ সামাজিক কর্ম্মচারী হিসাবে এখানে আগমন করেন। এ জন্য তিন বৎসরকাল তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইয়াছিল। পোর্ট-অ-প্রিন্স হইতে ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী হিঞ্চ নামক গ্রামে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হয়। যে অঞ্চলে তিনি কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার অধিবাসীর সংখ্যা আড়াই লক্ষ। সকলেই নিগ্রো—গাত্রবর্ণ সকলেরই মসীকৃষ্ণ। ২॥ শত কৃষ্ণকায় সৈনিকসহ তিনি এখানে থাকিতেন।

ক্যাপ্টেন ক্রেগ এক জন নিগ্রো ভৃত্যকে লইয়া

দেশীয়গণের বাদ্যযন্ত্র

সমুদ্রজল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত

মোটরযোগে তাঁহার অধিকৃত স্থানগুলি পরিদর্শনে গমন করিলেন।

মায়ার বালায় পর্ব্বতমালার বাহিরে আসিয়া ক্যাপ্টেন এক জন পুলিস-কর্ম্মচারীর নিকট অবগত হইলেন যে, পথিমধ্যে পেলিগ্রি নামক নদী পার হইবার সময় বিশেষ অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে। তখন বর্ষাকাল। বেলা ১টার সময় সাধারণতঃ বারিপাত হইয়া থাকে। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মোটর লইয়া নদী পার হওয়া সম্ভবপর নহে। অবশেষে স্থানীয় কয়েক জন কৃষকের সাহায্যে মোটর পরপারে নীত হইল। যথাসময়ে তিনি হিঞ্চএ উপনীত হইলেন।

মোরগের লড়াইয়ে জেতার হাস্য

এখানে আইন অনুসারে মানুষদিগকে বাধ্য করা কঠিন। তাহারা আইনের ধার ধারে না। বুঝে কেবল লাঠি ও ছোরার বহর। লেখাপড়া-জানা নরনারীর সংখ্যা সেখানে অঙ্গুলির পর্ব্বে গণনীয়। এই স্থানের অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র। হিঞ্চএর কারাগার হইতে বন্দীরা কোন দিন পলায়ন করিত না। কারণ, তাহারা এখানে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিতে পাইত। এজন্য কারাগারে রক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হইত না। মার্কিণদিগের আগমনের পূর্ব্বে এতদঞ্চলে কারাগারের কোন অস্তিত্বই ছিল না। প্রথমতঃ কারাগারে আসিতে দেশীয়গণের আপত্তি ছিল; কিন্তু কিছুকাল পরে তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, কারাগারে শ্বেতকায়গণ তাহাদিগের উপরে কোন অত্যাচার করে না,
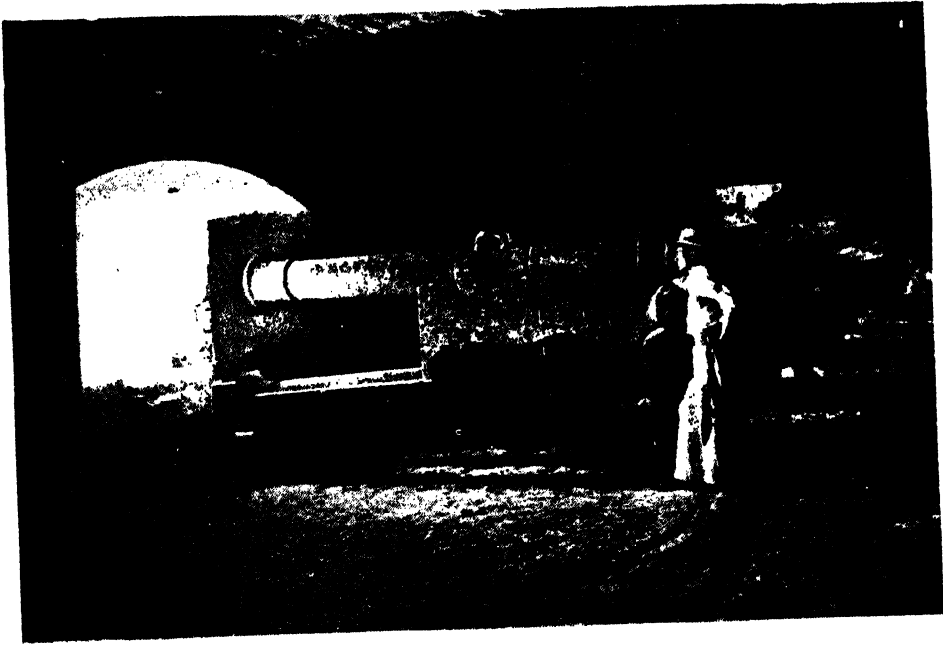
পুরাতন কামান

প্রতিদ্বন্দ্বী মোরগযুগল

বরং আহার ও শয়নের বিশেষ সুবিধা আছে, তখন তাহারা আদৌ আপত্তি করিত না।

কোন কোন বন্দী, তাহার কারাগারে অবস্থিতির সময় উত্তীর্ণ হইলেও যাইতে চাহিত না। ক্যাপ্টেন ক্রেগ ঐরূপ কোন বন্দীকে লইয়া বিশেষ বিপদে পড়িয়াছিলেন। অবশেষে তাহার কারাবাসকালের সময় তিনি বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে ক্যাপ্টেন ক্রেগকে হিঞ্চ ত্যাগ করিয়া সহরে যাইতে হইল, প্রথমে তিনি যখন এই সহরে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর দ্বাদশ বৎসর গত হইয়াছে, ইতিমধ্যে আমেরিকাবাসীদিগের সংস্রবে আসিয়া হাইটীর সহরগুলির বিশেষ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ মোটেই ছিল না, দাঙ্গাহাঙ্গামা, অগ্নিকাণ্ড আর ঘটিত না। যুক্তরাজ্যের নৌ-বিভাগীয় চিকিৎসকগণের চেষ্টায় সহরের স্বাস্থ্যের অসম্ভব উন্নতি হইয়াছিল। সংক্রামক ব্যাধির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। বীজাণুরহিত পানীয় জলের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এমন কি, ভীষণ ম্যালেরিয়া ব্যাধির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সহরে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সহরের পার্কগুলি সুসংস্কৃতও হইয়া উঠিয়াছিল। শ্বেতকায় অসংখ্য অট্টালিকা রাজপথের ধারে ধারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথে প্রান্তরে আবর্জ্জনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ক্যাপ্টেন ক্রেগ সহরের পুলিস-কোতোয়ালের পদ অধিকার করেন। সেই সময়

নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময়। আমেরিকা হাইটী অধিকার করার পর হইতে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন-ব্যাপার লইয়া কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামা বা বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই।

দেশীয় নিয়ম অনুসারে নব-নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টকে গির্জ্জাঘরে গিয়া উপাসনা করিতে হয়। নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট মিঃ লুই বোর্ণো প্রথামত গির্জ্জাঘরে গমন করেন। তখন পুলিসবাহিনী গির্জ্জাঘরে সারি দিয়া দাঁড়ায়। ইহাই দেশীয় প্রথা। পূর্ব্বে প্রত্যেকবারেই এইরূপ সময়ে বিদ্রোহ ঘটিত এবং অনেক সময় নূতন প্রেসিডেণ্টকে সেইখানেই নিহত হইতে হইত। কিন্তু আমেরিকা হাইটী অধিকার করার পর হইতে এ সকল আশঙ্কা স্বপ্নেরই ন্যায় অলীক বোধ হইত।

নব-নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট মিঃ বোর্ণোর বয়স ৫৩ বৎসর। মিঃ বোর্ণো মুসোলিনীর পরম ভক্ত। হাইটীতে তিনি গুরুর পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বদেশবাসীকে গড়িয়া তুলিতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র হাইটীতে এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অন্যান্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহা স্ব স্ব রাজ্যের সহিত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সে উদ্দেশ্য নহে। মহাশক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র এক দুর্ব্বল দেশকে সেনাবলের দ্বারা অধিকার করিয়া সেই দুর্ব্বল জাতিকে সভ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, সে দেশকে শৃঙ্খলা-পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এ সাহায্য না পাইলে হাইটীর এই উন্নতি সম্ভবপর ছিল না।

প্রয়োজন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র হাইটীতে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ নানা ভ্রম-প্রমাদ দেখা দিয়াছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে মতানৈক্যও ঘটিত। এজন্য দলাদলি প্রথমে ছিল। ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে কাকোবিদ্রোহে এই মতদ্বৈধ চরমসীমায় উপনীত হয়। তখন নূতন করিয়া সকল বিষয়ের গঠনের প্রয়োজন ঘটে। অভিজ্ঞগণ হাইটীতে গমন করেন। তন্মধ্যে ডাঃ কার্ল কেলসীও ছিলেন। তিনি পেন্‌সিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জর্জ্জ রিচার্ডস, যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশানুসারে অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন। তদনুসারে এক জন হাই কমিশনার পোর্ট-অ-প্রিন্সে প্রেরিত হন। তাঁহার নির্দ্ধারণই চরম বলিয়া গৃহীত হইবার ব্যবস্থা হয়।

প্রথম হাই কমিশনার হইয়া জে, এইচ রাসেল এখানে আসেন। তিনি নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। সামরিক পদমর্য্যাদা ব্যতীত তাঁহার "এনভয় এক্‌স্‌ট্রা-অর্ডিনারী" এবং "মিনিষ্টার প্লেসিপোটেননিয়ারী" পদও ছিল। তাঁহার নেতৃত্বে হাইটী আধুনিক সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

হাইটী ফ্রান্সের কাছে টাকা ধারিত। ফ্রাঙ্কের মূল্য যখন বিশেষভাবে হ্রাস পায়, তখন যুক্তরাষ্ট্র হাইটীকে ঋণ দান করেন। ইহাতে হাইটীর জাতীয় ঋণ বারো আনা হ্রাস পাইয়াছে। রাজস্ব আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এখন হাইটীর রাজকোষে প্রতি বৎসর টাকা জমিতেছে।

চাউল প্রস্তুতের পুরাতন পদ্ধতি

যুক্তরাষ্ট্র স্থির করিয়াছিলেন যে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সেনাবল সরাইয়া লইবেন, দেশীয়গণের হস্তেই হাইটীর সাধারণতন্ত্রের ভার থাকিবে। ক্যাপ্টেন ক্রেগ লিখিয়াছেন, তৎপূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে সেনাদল সরাইয়া লওয়া হইতেছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদল সর্ব্বপ্রথম হাইটীতে পদার্পণ করে। ১৯ বৎসরের মধ্যেই মার্কিণ তাঁহার সেনাবল সরাইয়া লইতেছেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মৃতদেহে জীবনী-শক্তির সঞ্চার

আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতরা মৃতদেহে জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। মার্কিণেও সে চেষ্টা চলিতেছে। কালিফোর্ণিয়ার ডাক্তার রবার্ট, ই, কর্ণিশ কয়েকটি মৃত কুক্কুর-দেহে জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সঞ্চারিত জীবনী-শক্তি অধিকক্ষণস্থায়ী হয় নাই। যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া (mechanical re-action) যতক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল, ততক্ষণ ঐ জীবনী-শক্তির লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। তাহার পরই আবার যে মৃতদেহ,—সেই মৃতদেহ। এখন ডাক্তার রবার্ট ই, কর্ণিশ মানুষের মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করিয়া দেওয়া সম্ভব কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, অর্থাৎ যাহাদিগকে জোর করিয়া মারিয়া ফেলা হয়, তাহাদিগের মৃতদেহ লইয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি ঐ পরীক্ষা সফল হয়, তাহা হইলে লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে জীবনী-শক্তি সম্পর্কিত একটা নূতন পর্দ্দা উঠিয়া যাইবে। প্রস্তাবটি বিবেচনার যোগ্য বটে। কিন্তু ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞদিগের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য আপত্তি উপস্থিত করা হইতেছে। ব্যবহারাজীবদিগের পক্ষ হইতে মার্কিণের জজ এণ্ডরু এ ক্রস ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন। ইনি দণ্ডবিধি আইন এবং অপরাধ-বিজ্ঞান (criminology) সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ইহা ভিন্ন সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। ইনি এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে, সহজ বুদ্ধির দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাকে আবার সজীব করিয়া সমাজে ছাড়িয়া দেওয়া কোনমতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ফাঁসীছেঁড়া পাপীরা সমাজে পুনরায় প্রবেশ করিলে সমাজের আরও অধিক অনিষ্ট করিবে। ইহার এই আপত্তি অনেকে যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছেন। ডেনভার সহরে যখন এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল, সেই সময়ে ধর্ম্মের দিক দিয়া এই প্রস্তাবটির বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। তথায় একদল ধর্ম্মযাজক বলেন যে, যে আত্মা একবার বৈতরণী পার হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইয়া আনা কর্ত্তব্য নহে। উহাতে বিধাতার নিয়মে বাধা দেওয়া হইবে। আর একদল ধর্ম্মযাজক অন্য কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, "ব্যবস্থার দোষে ভুলভ্রান্তির ফলে, চিকিৎসকের ত্রুটিতে বা ভ্রমের ফলে মানুষ অনেক সময়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং তাহাদিগকে বাঁচাইলে ভগবানের বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না।" ফলে এই ব্যাপার লইয়া কেবল তর্ক হইয়া গিয়াছে। এক জন খৃষ্টধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বলেন,—আত্মা দেহ ত্যাগ করিলে সে আর দেহে ফিরিয়া আসে না। শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত আত্মা সুপ্ত থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি আত্মাকে ফিরাইয়া আনা হয়, তাহা হইলে বিধাতার বিধানের প্রতিকূলতা করা হয়। তাহা করা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। আর এক জন ধর্ম্মযাজক বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানমতে মৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যদি লোক রোগ ভোগ করিয়া মরে, তবে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা বিধেয়। কারণ, ক্যাথলিক খৃষ্টানধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, কেহ মরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও তাহার দেহে আত্মা তিন ঘণ্টাকাল অবস্থিতি করে। বাইবেলে মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিবার যে কথা আছে, তাহা অলৌকিক ব্যাপার, ঐশী শক্তির দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষ সেই ঐশী শক্তি পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে।

কিন্তু এ কথা সত্য, যাহারা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছে অথবা বজ্রপতনে অথবা অন্যবিধ বৈদ্যুতিক শক্তির সজ্ঘর্ষে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও পুনর্জ্জীবিত করা গিয়াছে। এখন এই সকল লোক সত্য সত্যই মরিয়া গিয়াছিল কি না, তাহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা! সেই জন্য অনেকে বলিতেছেন যে, যাহারা দৈবদুর্ব্বিপাকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন এই বিষয় লইয়া পৃথিবীর বহু সভ্যদেশে বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে! যদি এই ভাবে লোককে বাঁচানো যায়, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে যে সকল সৈনিক বিষবাষ্প প্রয়োগের ফলে মরিবে, তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বাঁচানো যাইতে পারিবে। এখন দেখা যাউক কি হয়।

বিলাতে রাজনীতির গতি

সকলেই অবগত আছেন যে, বিলাতে রাজনীতিক্ষেত্রে কতকগুলি দল বিরাজ করিতেছে। শাসনকার্য্যপরিচালন সম্বন্ধে প্রত্যেক দলের সহিত প্রত্যেক দলের কিছু না কিছু মতভেদ বিদ্যমান। পার্লামেণ্টের কমন্স সভার সদস্য নির্ব্বাচনকালে প্রত্যেক দলই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের মতানুসারে

দেশ-শাসন করিলে দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে,অমঙ্গল নিবারিত এবং উন্নতি সংঘটিত হইবে। আপাততঃ বিলাতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি রাজনীতিক দল রহিয়াছে। প্রথম দল কনসারভেটিভ বা রক্ষণশীল। ইঁহারা টোরী নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ লিবারাল বা উদারনীতিক। ইহাদের সাবেক নাম ছিল হুইগ। তৃতীয় দলের নাম লেবর বা শ্রমিক। এই দলটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। জনসাধারণ কর্ত্তৃক সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে বুঝা যায়, কোন্ দলের লোক অধিক সদস্যপদ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে দলের সদস্যসংখ্যা অধিক হয়, তাহা দেখিয়া রাজা সেই দলের দলপতিকে ডাকিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক দেশের শাসন-তরণীর পরিচালনা করিবার ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহার দলের লোকই অধিক ভোট পাইয়াছে এবং দেশের লোকেরও তাঁহার নীতির উপর বিশ্বাস আছে,—ইহা বুঝিতে হইবে। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম এবং বিলাতের দলাদলির দ্বারা শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থা। এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় না, তাহা নহে। রাজা আইন অনুসারে যে কোন দলের দলপতিকে ডাকিয়া তাহাকেই মন্ত্রিত্ব দান করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বিনা কারণে তাহা করেন না। কারণ, যাঁহার দলে কমন্স সভার অধিক সদস্য নাই, তিনি যে প্রস্তাব করিবেন, তাঁহার প্রতিপক্ষীয় দলের অধিকসংখ্যক সদস্য তাঁহাদের অধিক ভোটের দ্বারা তাহা নাকচ করিয়া দিবেন। সুতরাং তিনি শাসনকার্য্য চালাইতে পারিবেন না। সেই জন্য রাজা বড় দলের দলপতিকেই মন্ত্রিত্ব প্রদানের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। ইহার ব্যতিক্রমও হয়। তিন বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে যে নির্ব্বাচন হইয়াছিল, তাহাতে রক্ষণশীল দলের লোক অধিকসংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেও সম্রাট মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে মন্ত্রিত্ব দিয়াছিলেন। তাহার কারণ, রক্ষণশীল দলের নেতা মিষ্টার বলডুইন স্থির করিয়াছিলেন যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে যদি রক্ষণশীল দল জয়লাভও করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলেও তাঁহারা শ্রমিক সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিকসংখ্যক সদস্য কমন্স সভায় প্রবিষ্ট করাইতে পারিবেন না। সেই জন্য তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা গ্রেট বৃটেনের এই অর্থসঙ্কটকালে সকল দল মিলিত হইয়া এক জাতীয় দল গঠিত করিয়া বিলাতী শাসনতরণী পরিচালিত করিবেন। মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডই সেই শাসন-তরণীর কাণ্ডারী হইবেন। ইহাই হইয়াছিল রক্ষণশীল দলের ধুয়া। তদনুসারে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে গতবার রক্ষণশীল দল অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করিয়াছিলেন। জাতীয় সরকারের পক্ষে সুতরাং ৪ শত ৯৯ জন

মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড

মিঃ বলডুইন

সদস্য অধিক হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী কমন্স সভায় শ্রমিকদিগের যত জন সদস্য ছিল, তাহা অপেক্ষা এইবার বহুসংখ্যক সদস্য কম হইয়াছিলেন। যে যে স্থান হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বাচনে শ্রমিক সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে ১৬টি স্থানে শ্রমিক সদস্যপদপ্রার্থীরা পরাজিত হইয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া সকলে চমকিত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী কথা অনুসারে মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে সম্মুখে রাখিয়া রক্ষণশীল দল জাতীয় সরকার গঠন করিয়াছেন। এই সরকার নামে জাতীয় সরকার হইলেও কাযে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল সরকার। ইঁহাদের সকল কার্য্যই রক্ষণশীল নীতি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

আজ তিন বৎসরকাল হইল, এই জাতীয় সরকার গ্রেট বৃটেনের শাসনতরণী পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই ইহা যে বিলাতী জনসাধারণের আস্থা হারাইয়াছেন, তাহার পূর্ণ লক্ষণ প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। উপনির্ব্বাচনে প্রায় সর্ব্বত্রই জাতীয় দল পরাজিত এবং শ্রমিক দল জয়ী হইতেছে। গত এক বৎসরের উপনির্ব্বাচনের হিসাব দেখিয়া বুঝা যায় যে, জাতীয় সরকার শতকরা ৪০টি ভোট হারাইয়া বসিয়াছেন। লণ্ডন কাউন্টি-কাউন্সিলে গত মার্চ্চ মাসে যে নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রমিকদলের প্রার্থীরা জয়লাভ করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া এই নির্ব্বাচনকেন্দ্র রক্ষণশীল সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া আসিতেছেন। এই নির্ব্বাচনফলে সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জাতীয় দল অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল দল দেশের লোকের আস্থা হারাইতে বসিয়াছেন। রক্ষণশীলগণও ইহাতে চমকিত হইয়া পড়িয়াছেন। বাহ্য দৃষ্টিতে দূর হইতে যাঁহারা এই ব্যাপার

দর্শন করিতেছেন, তাঁহারাও ইহাতে বিস্মিত। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, এই জাতীয় দলের আমলে বৃটিশ বজেটের আয়-ব্যয় এই দুই মুখ সমান হইয়া যাইতেছে আর বেকার লোকের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ জাতি ঠিক সেই ভাবে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছেন না। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বৃটিশ জাতি এই দলের নীতির দ্বারা কোন বিশেষ সুফল লাভ করিতে পারেন নাই। গ্রেট বৃটেন এত দিন অবাধ বাণিজ্যনীতির সেবক ছিলেন, এখন তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রক্ষানীতির (protection) অনুবর্ত্তী হইয়াছেন এবং অটোয়া চুক্তির দ্বারা সাম্রাজ্যের মধ্যে পক্ষপাত নীতি (preferential tariff) প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া রক্ষণশীল দল বলিয়া আসিতেছেন যে, এই দুইটি নীতির ফলে গ্রেট বৃটেন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। এখন গ্রেট বৃটেনের সাধারণ লোক এই বিষয়টি পরীক্ষা করিবার যে সুযোগ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, উহা সুফল প্রসব করে নাই। কেন করে নাই, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

প্রত্যেক দেশেরই শুল্কব্যবস্থা স্বতন্ত্র। মার্কিণে কতকগুলি বিদেশী পণ্যের উপর অতি অধিক হারে শুল্ক ধার্য্য আছে। কিন্তু ঐ দেশে অধিক আমদানী পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য্য নাই। অনেক পণ্যই তথায় বিনা শুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে প্রবেশ করিতে পারে। বৃটেনে কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা নাই। তথায় অধিকাংশ পণ্যের উপরই আমদানী শুল্ক ধার্য্য আছে। তবে সেই শুল্কের হার অনেক অল্প। শুল্ক না দিয়া অতি অল্প-সংখ্যক পণ্যই বিলাতে আমদানী করা যাইতে পারে। কাঁচা মাল অর্থাৎ যে সকল মাল পণ্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার এবং অর্দ্ধপ্রস্তুত মাল (semimanufactured articles) গুলির উপর প্রায় তাহাদের মূল্য শতকরা ১০ হইতে ১৫ পাউণ্ড হারে শুল্ক ধার্য্য আছে। সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত শিল্পজ পণ্যগুলিকে মূল্য শতকরা ২০ পাউণ্ড হিসাবে শুল্ক দিতে হয়! কেবল কতকগুলি বিশেষ পণ্যকে যথা লৌহ এবং ইস্পাত নির্ম্মিত পণ্যগুলিতে উহাদের মূল্য শতকরা ৩৩ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য আছে। সুতরাং বৃটিশ আমদানী শুল্কের হার অপেক্ষাকৃত অল্প, উহার মূল্য শতকরা গড়ে ২০ হইতে ২৫ পাউণ্ড হিসাবে তথায় ধার্য্য রহিয়াছে।

বৃটিশ জাতি বলেন যে, তাঁহাদের বাস একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপে। কিন্তু তাঁহাদের লোকসংখ্যা সাড়ে ৪ কোটি। যদি বৃটিশ জাতিকে তাঁহাদের স্বদেশজাত শস্যাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তিন মাসের অধিককাল আর জীবিত থাকিতে পারিবেন না! তাঁহারা যদি বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে পারেন এবং বিদেশীর নিকট আপনাদের পণ্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলেই তাঁহারা আপনাদের জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন। বিদেশ হইতে পণ্যের উৎপাদক কাঁচা মাল সংগ্রহ করার উপরই তাঁহাদের বিদেশে রপ্তানী বাণিজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। যদি রক্ষাশুল্কনীতি বৃটিশ জাতির বিদেশে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে বৃটিশ জাতির তাহাই অবলম্বনীয়। কিন্তু নূতন শুল্কাবধারণ দ্বারা কাঁচা মালের এবং অর্দ্ধ-প্রস্তুত পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহার ফলে উহা হইতে শিল্পজ পণ্য উৎপাদন করিবার ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে উহা বৈদেশিক বাণিজ্যে বৃটিশ জাতির অন্য শিল্পী জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার পথে বাধা জন্মাইয়া দিতেছে। এই হেতুবাদ দেখাইয়া রক্ষানীতির প্রতিপক্ষগণ বলিতেছেন যে, জাতীয় দলের এই শুল্কনীতি গ্রেট বৃটেনের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে।

এই নূতন শুল্কনীতির চূড়ান্ত ফল কি, তাহা লইয়া গ্রেট বৃটেনে বিলক্ষণ আলোচনা চলিতেছে। আজ জাতীয় দলের এই নীতি দুই বৎসর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন প্রথম বৎসরের হিসাব ঠিক জানিতে পারা গিয়াছে। উহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন যখন স্বর্ণমান বর্জ্জন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা কার্য্যতঃ তাঁহাদের রপ্তানীকারকদিগকে শতকরা ৩০ পাউণ্ড হিসাবে সাহায্য দান করিয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহাদের বিদেশে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবারই কথা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, তাহা হয় নাই। বরং রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাসই পাইয়াছে। রপ্তানীকারকদিগকে যে ধরাট (Premium) ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা শুল্কাবধারণজনিত আমদানী পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অবাধবাণিজ্যসেবী দল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর একটা কথা এই যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তারিখে রক্ষণশীলদিগের দলপতি রক্ষাশুল্কের সমর্থনকল্পে বলিয়াছিলেন যে, রক্ষানীতি অবলম্বন করিলে তাঁহারা অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপতিদিগকে বৃটিশ জাতির পণ্যের উপর আমদানী শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করাইতে পারিবেন। সেই কথা শুনিয়া অনেক অবাধবাণিজ্যনীতির সেবক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, তাহা হইল না। গ্রেট বৃটেন ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, আর্জ্জেন্টিনা এবং জার্ম্মাণীর সহিত ঐরূপ কতকটা সর্ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল সন্তোষজনক হয় নাই। সর্ব্বসাকল্যে বৃটেনের জাতীয় দল ৩০ লক্ষ টন কয়লা বেচিবার চাহিদা পাইয়াছেন। কিন্তু এইটুকু সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে, তাহার পরিমাণ অল্প নহে। উহার জন্য বিলাতের কমন্স সভায় ব্যবসায়ী সদস্যগণ বিষম হৈ-চৈ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য জাতীয় সরকার এই দিকে আর অধিক অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। শুল্ক-ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটাইলে জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থাও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। শুল্কের হার বৃদ্ধি করা সহজ, কিন্তু উহা কমান সহজ নহে। কারণ, উন্নত শুল্ক প্রাকারের রক্ষাধীনে যে সকল কারবার এবং অর্থনিয়োগ করা হইয়া থাকে, শুল্ক কমাইলে সেই সকল কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই নিয়োজিত মূলধন নষ্ট হইয়া যায়। জাতীয় সরকার যদি বৈদেশিক শুল্ক হ্রাস করিতে সমর্থ না হন, এবং তদ্দ্বারা বৃটিশ জাতির বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধি করিয়া না লইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দেশে শতকরা ১৫ জন লোক বেকার দশায় পতিত থাকিবেই। তাহার প্রতীকার করা আর সম্ভব হইবে না। তাহা করিতে হইলে বৃটেনের জাতীয় সরকারকে শুল্ক-হার আরও কমাইয়া দিয়া অল্প

কতকগুলি দেশকে বৃটিশ পণ্যের উপর ধার্য্য শুল্কের হার কমাইয়া দিতে সম্মত করাইয়া লইতে হয়। কিন্তু জাতীয় সরকার শুল্কের বর্ত্তমান হার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা আর এই পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন না।

জাতীয় সরকারের কর্ত্তৃপক্ষ বিগত নির্ব্বাচনের সময় এবং তাহার পূর্ব্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ইতরেতর অনুকূল শুল্ক-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে বৃটিশ পণ্যের কাটতি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। অটোয়া সমিতিতে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। বৃটিশ উপনিবেশগুলি বহুদিন ধরিয়া তাহাদের নিজ নিজ দেশে বৃটিশ পণ্য কতকটা সুবিধামত শুল্কে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া গ্রেট বৃটেন উহার প্রতিদানে তাহাদের কোনরূপ আনুকূল্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন যখন বিলাতে আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে, তখন বিলাতের জাতীয় সরকার উপনিবেশ হইতে আগত পণ্যের পর উহাপেক্ষাকৃত অল্প হারে শুল্ক লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদের দেশে অল্প হারে শুল্ক দিয়া তথায় ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে বৃটিশ পণ্য প্রেরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সে পথেও বিশেষ বাধা দেখা দিতেছে। বৃটিশ উপনিবেশবাসীরা তাঁহাদের দেশে এখন শ্রমশিল্পের বিকাশ-সাধন করিতে চাহেন ; কিন্তু গ্রেট বৃটেনই তাঁহাদের সেই কার্য্যে অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। উপনিবেশবাসীরা কার্য্যক্ষেত্রে বৃটিশ পণ্য তাঁহাদের দেশে ভূরি পরিমাণে প্রবেশ লাভ করে, তাহা ইচ্ছা করেন না : কারণ, বৃটিশ পণ্য তাঁহাদের দেশে যত অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিবে, ততই তাঁহাদের স্বদেশজাত শ্রমশিল্পজ পণ্য অল্প বিকাইবে। অটোয়া সমিতির ফলে ঐ সমস্যার সমাধান হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল,—কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, উহার দ্বারা ঐ সমস্যার সমাধান করা যায় নাই।

অটোয়া সমিতি বসিবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই কানাডা উপনিবেশে বৃটেনজাত ও অন্যান্য সকল দেশজ পণ্যের উপর অত্যন্ত চড়া হারে শুল্ক ধার্য্য করা হয়। কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার বেনেট অটোয়া সমিতিতে তাঁহাদের পিতৃভূমির অনুকূলে কতকগুলি শুল্কের হার কিছু কমাইয়া দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে কানাডায় বৃটিশ পণ্যের প্রবেশপথে যে শুল্ক-প্রাকার মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বেনেট মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে ঐ শুল্কপ্রাকার ততটা উন্নত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে অটোয়া সমিতির অধিবেশন হইবার পর হইতে কানাডায় বৃটিশ পণ্য অল্প বিকাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে যাঁহারা অটোয়া সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের দেশের পার্লামেণ্টকে না জানাইয়া কিছুই করিতে পারিবেন না। তাহার পর তাঁহারা এই বিষয়ে কিছুই করেন নাই। সামান্যভাবে এটা ওটার কিছু পরিবর্ত্তন মাত্র করিয়াছেন। নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী অটোয়া সমিতি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার দেশের পার্লামেণ্টের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন,—তাহাতে বেশ বুঝা গিয়াছিল যে, অটোয়া সমিতি না বসিলেও তিনি যাহা করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা করিয়া আসিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউনিয়ন সরকার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বৃটেনের নিকট শুল্ক বিষয়ে কোনরূপ অনুগ্রহ চাহেন না এবং কোনরূপ আনুকূল্য করিতেও পারিবেন না। ফলে সাম্রাজ্যমধ্যে শুল্ক বিষয়ে ইতরেতর আনুকূল্য নীতি (preferential tariff) ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ফলে রক্ষণশীলদল যে দুইটি নীতি অবলম্বনের দ্বারা বৃটিশ জাতির শক্তি বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, সেই দুই বিষয়েই তাঁহাদের গুমর গুঁড়া হইয়াছে !

এ দিকে বৃটিশ কৃষীবল দেখিতেছে যে, তাহাদের দেশে আমদানী শুল্কের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে সাম্রাজ্যের বহিস্থিত দেশ হইতে আমদানী কৃষিজ পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার দায় হইতে তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার বদলে সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত উপনিবেশগুলি হইতে কৃষিজ পণ্য আমদানী হইয়া তাহাদের তৈয়ার অন্নে ধূলা দিতেছে। পূর্ব্বে আর্জেন্টিনা এবং ডেনমার্ক হইতে গ্রেট-বৃটেনে মাংস-দুগ্ধাদি আমদানী হইত, এখন ঐ সকল দেশ হইতে উক্ত দ্রব্যগুলির আমদানী কমিয়াছে সত্য, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে তদপেক্ষা অধিক মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতির আমদানী হইতেছে। সুতরাং ঐ বাবদ ইংরাজজাতির টাকাটা আর্জেন্টিনার অধিবাসীরাই পাউক বা অষ্ট্রেলিয়ার পোপাল ও মাংস-বিক্রেতারাই পাউক,—তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কোন লাভ নাই,—তাঁহারা যে তিমিরে, ঠিক সেই তিমিরেই ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অন্নগ্রাস আর মুখে উঠিবার উপায় হইল না। তাই তাঁহারা উপনিবেশগুলি হইতে বিলাতে কৃষিজ পণ্য আমদানী বন্ধ করিয়া দিবার জন্য বিলাতী জাতীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন। এখন ইহাতেও বিভ্রাট বড় কম ঘটে নাই। নিউজিলাণ্ডের সহিত বৃটেনবাসীরা বিবাদ করিতে পারেন না। উক্ত দ্বীপবাসীরা তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের শতকরা ৮০ ভাগ বিলাতেই চালান দেয়। বৃটিশ সরকার যদি ঐ দেশ হইতে তাঁহাদের দেশে পণ্যের আমদানী বন্ধ বা সঙ্কুচিত করিয়া দেন, তাহা হইলে নিউজিলাণ্ডের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তাহারা আর বৃটিশ শিল্পজ পণ্য খরিদ করিতে পারিবে না, বৃটেন হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের রাজ্যে স্থান দিতে পারিবে না, অথবা তাহাদের দেশে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধনের আর সুদ দিতেও সমর্থ হইবে না। ফলে গ্রেট বৃটেনের রক্ষাশুল্কনীতি বা সাম্রাজ্যের পণ্য ইতরেতর শুল্কনীতি অবলম্বন করিযাছে বলিয়া বৃটিশ কৃষীবল সাম্রাজ্যের কৃষীবলের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এখন কিসে এই সমস্যার সমাধান হয়, তাহাই দেখা দিতেছে একটা উৎকট সমস্যারূপে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে দুইটি বড় আশ্বাস দিয়া বিলাতী জাতীয় দল ওরফে রক্ষণশীল দল নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে দুইটি উপায়ই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্যর্থ হইয়া যায় নাই,—উহার জন্য অমঙ্গলের আবির্ভাবও সূচিত হইতেছে। তাঁহাদের এখন নিরস্ত্রীকৃত যোদ্ধার দশা ঘটিয়াছে। এ দিকে সাধারণের হিতকর কার্য্যে তাহারা অর্থব্যয় করিতে পারিতেছে না। এ দিকে যাঁহারা অর্থনীতিবিশারদ, তাঁহারা বলিতেছেন যে,

সাধারণের কার্য্যের জন্য যদি অর্থ নিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে এই হইল তাহার প্রকৃষ্ট সময়। এখন কায করাইতে ব্যয় অল্প পড়িবে এবং টাকার সুদের হারও অল্প আছে। যুদ্ধের সময় ইংরাজ জাতি যখন সমরাঙ্গনে তাঁহাদের দেশের লোককে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাহাদের নিকট প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা বীরের যোগ্য বাড়ীতে বাস করিতে পারিবেন। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সরকার বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া ২০ লক্ষ নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিলাতের সমস্ত নগরের উপকণ্ঠে এখন এইরূপ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বাড়ী অনেক লক্ষিত হইতেছে। ইহার ভাড়াও অল্প এবং ভদ্রভাবের মজুররাই ইহাতে বাস করে। কিন্তু যাহারা নোংরা পল্লীতে বাস করে, তাহাদের ইহাতে কোন সুবিধা ঘটে নাই। বরং যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহারা যে সকল পল্লীতে এবং গৃহে বাস করিত, এখন তাহা অপেক্ষা তাহারা অধিকতর দুর্গন্ধময় ও কদর্য্য পল্লীতে ও বাড়ীতে বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু বিলাতের বর্ত্তমান জাতীয় সরকার আর এ দিকে তেমন ভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

তাহার পর পররাষ্ট্রনীতির দিকেও জাতীয় সরকার বিশেষ কোন সুবিধাই দেখাইতে পারেন নাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহারা বিলাতী শাসন-তরণীর কাণ্ডারীপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন য়ুরোপের রাজনীতিক গগন যেন কতকটা মেঘমুক্ত হইয়া আসিতেছিল। এখন কিন্তু আকাশে ক্রমশঃ কৃষ্ণমেঘ জমিতেছে। অচির-ভবিষ্যতে আবার য়ুরোপে সমর-সম্ভাবনা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিলাতের জাতীয় সরকার অথচ বলিতেছেন যে, এই সঙ্কটের জন্য তাঁহাদের কোন দোষ নাই,—অন্য জাতিরা বড় অবুঝ হইয়া চলিতেছে, সেই জন্য এই উদ্বেগজনক আশঙ্কা ঘটিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ জাতি নির্ব্বোধ নহে। তাহারা বুঝিতেছে যে, যদি সব দিকে সুবিধা ঘটিত, তাহা হইলে জাতীয় সরকার সে জন্য বাহাদুরী লইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ভাবিবার আছে। রক্ষণশীলদল এখন কঠোরনীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, অদূরভবিষ্যতে য়ুরোপে আবার একটা মহাসংগ্রাম বাধিবেই বাধিবে! রক্ষণশীলদল বলেন, এই আসন্ন যুদ্ধে বৃটিশজাতির যোগদান করা কর্ত্তব্য নহে। আপৎকালে কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গের কঠিন আবরণের মধ্যে আপনার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটাইয়া লইয়া থাকে, আগামী য়ুরোপীয় যুদ্ধে গ্রেট বৃটেনকে সেইরূপ কমঠনীতি অবলম্বন করিয়া আপনাকে দূরে রাখিতে হইবে। রক্ষণশীলদলের মুখপত্র "ডেলী মেল" এবং "ডেলী এক্সপ্রেস" সেই কথাই প্রতিদিন বলিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন, লোবার্ণোচুক্তির ভিতর থাকিয়াও কায নাই, জেনিভায় জাতিসঙ্ঘের আসর ভাঙ্গিয়া দাও এবং আমাদের জাতিসঙ্ঘ অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যকে লইয়াই অবহিত থাক। অপর দল অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিকদল বলেন যে, সে কাল আর নাই। এখন কমঠনীতি অবলম্বন করিলেই নিস্তার পাওয়া যাইবে না। যে দিন ব্লেরিত (Bleriat) বিমান ইংলিশ প্রণালী পার হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, সেই দিনই কমঠনীতির কায ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি জাতিসঙ্ঘ না থাকে, তাহা হইলে য়ুরোপ দুইটা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। তাহার কোন না কোন দলে গ্রেট বৃটেনের থাকিতে হইবে এবং যখন সেই অপরিহার্য্য সংগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন স্বীয় অবলম্বিত পক্ষের হইয়া গ্রেট বৃটেনকে যুদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং জাতিসঙ্ঘকে রক্ষা করিয়াই গ্রেট বৃটেনের চলা কর্ত্তব্য। বিবাদের বা মনোমালিন্যের কারণ ঘটিলে জাতিসঙ্ঘের দ্বারাই তাহার মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। সকল শ্রমিক এবং উদারনীতিক এবং কতকগুলি রক্ষণশীল এই মতাবলম্বী। কেবল বৃটেনের জাতীয় সরকার এই কমঠতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। জাতীয় দলের এই বিষয়ে নীতির দৃঢ়তা না থাকাতে গ্রেট বৃটেন য়ুরোপীয় জাতির নেতৃত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন।

ফলে গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীরা এখন জাতীয় সরকারের উপর আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন। সুতরাং আগামী নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদল বিশেষভাবে জয়লাভ করিতে পারিবেন কি না, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। বরং ইহাই মনে হইতেছে যে, আগামী নির্ব্বাচনের পর রক্ষণশীলদলের এই প্রাধান্য আর থাকিবে না।

সায়ারের সমস্যা

১৩ই জানুয়ারী বা ২৮শে পৌষ সায়ার অঞ্চলে জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করিবার দিন ধার্য্য ছিল। ঐ দিন ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত হইবেন, কিম্বা ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হইবেন, অথবা জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইবেন, সেই সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিবেন। সায়ার অঞ্চলটি ক্ষুদ্র হইলেও খনিজ সম্পদে সম্পন্ন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর হার হিটলার প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কগণ এই রাজ্যটি সহজে ত্যাগ করিতে সম্মত নহেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়করাও এই অঞ্চলটি আপনাদের করতলগত করিয়া রাখিবার প্রয়াসী, মিত্রশক্তিবর্গ কিন্তু ফ্রান্সেরই আনুকূল্য

হার হিটলার

করিতেছেন। এখন সমস্তই সায়ার অঞ্চলের অধিবাসীদিগের ভোটের উপর নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশ অধিবাসী যে দিকে ভোট দিবেন, তাহাই হইবে। পৌষ মাসের একবারে শেষের দিকে ভোট দানের দিন ধার্য্য হওয়াতে এই মাসের "মাসিক বসুমতীতে" উহার ফলাফল প্রকাশ করিবার সময় হয় নাই। অথচ ব্যাপারটা বড়ই গুরু। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার ফলে একটা বিষম সঙ্ঘর্ষ বাধাও অসম্ভব নহে। তবে বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কতকগুলি বড় বড় শক্তির সহিত তিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা মনে হয় না। ভোটের দিক দিয়াও গণ্ডগোল করিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কারণ, সায়ারবাসীদিগের পক্ষে এখন তিনটি পথ আছে, তাহা উপরেই বলা হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে,—এই বিষয়টির মীমাংসা হইবে কিরূপে? মনে করুন, যদি সায়ারের ২০ জন অধিবাসীর মধ্যে ৯ জন লোক জার্ম্মাণীর সহিত সংযুক্ত হইবার অনুকূলে ভোট দেন, ৬ জন ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন আর ৫ জন বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিবার পক্ষে ভোট দেন, তাহা হইলে কি হইবে? সাধারণ ভোট দ্বারা নির্ব্বাচনের নিয়ম অনুসারে তাহা হইলে জার্ম্মাণীর পক্ষে অধিক ভোট হইল বলিয়া জার্ম্মাণীর সহিত উহাকে সংযুক্ত করা হইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ, তাহা হইলে অন্য পক্ষ হইতে এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, জার্ম্মাণীর সহিত যোগ দিব না,—এইরূপ মতবাদীদিগের ভোট, অধিক হইয়াছে, কারণ, ২০ জনের মধ্যে ১১ জন জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত না হইবার পক্ষেই ভোট দিয়াছেন। তখন কি করা হইবে? অবস্থা ত তখন আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, তখন জার্ম্মাণীর দাবী আরও অধিক বলবৎ হইবে। ঐরূপ অবস্থায় পুনরায় ভোট গণনা হইতে পারিবে। জাতিসঙ্ঘ ঠিক করিয়াছেন যে, সায়ারের যে অংশের ভোট যে পক্ষে অধিক হইবে, সেই অংশ সেই দিকেই যাইবে। অর্থাৎ মনে করুন, যদি সায়ারের কোন অঞ্চলের অধিকাংশ লোক জার্ম্মাণীর সহিত একত্র থাকিবার অনুকূলে ভোট দেন, তাহা হইলে সেই অঞ্চলকে জার্ম্মাণীর সহিত সংযুক্ত করা হইবে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ গোলযোগ ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ২৮শে পৌষ রবিবার এই অঞ্চলে যাহা হইবার কথা, তাহা এবার প্রকাশ করা কোনমতেই সম্ভব নহে। এই অঞ্চলটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও জার্ম্মাণরা উহা পাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক। জার্ম্মাণরা যদি উহা না পায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে একটি অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বেই উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। হার হিটলার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, সায়ার অঞ্চল জার্ম্মাণীর সহিত ফ্রান্সের বিবাদের একমাত্র কারণ। জার্ম্মাণী যদি ঐ অঞ্চলটি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত ফ্রান্সের মনোমালিন্যের কোন কারণ থাকে না। ফ্রান্সের ঐ অঞ্চলটি পাইবার জন্য জিদ ইহা অপেক্ষা অল্প নহে। কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, সায়ার অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় পনর আনা জার্ম্মাণ। তবে নাজি সরকারের সহিত মতবিরোধের হেতু তাঁহাদের মধ্যে বারো আনা লোক আর জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে চাহিতেছেন না। ইহাদের মধ্যে অনেকে জার্ম্মাণী হইতে পলায়ন করিয়া সায়ার অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ রোম্যান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী, অনেকে কমিউনিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বস্বত্ববাদী। আবার জার্ম্মাণী হইতে বহু ইহুদীও সায়ারে পলাইয়া গিয়াছে। ইহারা সকলেই নাজি সরকারের ঘোর বিরোধী। উহারা সায়ার অঞ্চলে যাইয়া ঐ অঞ্চলের লোককে বর্ত্তমান জার্ম্মাণ শাসকদিগের বিরুদ্ধে অনেক প্রকার কার্য্য চালাইয়াছে। কাযেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জার্ম্মাণ হইলেও উহারা বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সরকারের উপর হাড়ে চটা। জার্ম্মাণী তাহা জানেন। সেই জন্য জার্ম্মাণীর কর্ত্তৃপক্ষও ভিতরে ভিতরে সায়ার অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিয়াছেন। শেষদিকে সেই প্রচারকার্য্য পরিচালনে বাধা ঘটিয়াছিল। সেই জন্য যখন এই মন্তব্যটি লিখিত হইতেছিল, তখন সকল দেশের লোকই সায়ার অঞ্চলে কি ঘটে, তাহা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল।

ভোটগণনার দিন সায়ার অঞ্চলে হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা জানিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা জেওফ্রি জর্জ্জ নক্স বলিয়াছিলেন যে, তিনি বৈদেশিক সৈন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে

জেওফ্রি জর্জ্জ নক্স

ঐ দিন কিছুতেই শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রথমে কথা হয় যে, তিনি ফরাসীদিগের সৈন্য লইয়া শান্তিরক্ষা করিবেন; কিন্তু ঐরূপ করিলে তাঁহার পক্ষে পক্ষপাতিত্বের দোষ আসিয়া পড়িত। জার্ম্মাণীরও ইহাতে ঘোর আপত্তি হইয়াছিল। এখানে বলা আবশ্যক এই যে, ফ্রান্স এবং জর্ম্মাণী উভয় দেশের পররাষ্ট্র-সচিবই কথা দিয়াছিলেন যে,যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না-হয় বা কোন পক্ষের দ্বারা কোনরূপ অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা তাঁহারাই করিবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি যে কতদূর রক্ষা করিবেন, বা রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। আসল কথা, এইরূপ ক্ষেত্রে

কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য শেষটা সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, বৃটেন, বেলজিয়াম, ইটালী প্রভৃতি দেশের সৈন্য লইয়া ২৮শে পৌষ সারের শান্তিরক্ষাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। গত ৬ই পৌষ শনিবার বৃটিশদিগের ইষ্ট লাঙ্কাশায়ার পল্টন, সারের ব্রাকেন অঞ্চলে আসিয়া হাজির হইয়াছে, সাঁজোয়া গাড়ী বড় দিনের পর যাইয়া পৌছিবে কথা ছিল। ফলে এখন ঐ অঞ্চলের দিকে সকলের দৃষ্টিই আকৃষ্ট হইয়াছে।

সার অঞ্চলের ভোট গণনা কিরূপ পদ্ধতিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিয়াছেন মার্কিণের জনৈক মহিলা। তাঁহার নাম সারা ওয়ামবাগ। ফলে ফরাসী এবং জার্ম্মাণদের হাতে বিশেষ কোন ভার দেওয়া হয় নাই। অথচ সকল পক্ষই এই ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা স্বাভাবিক! তবে জার্ম্মাণী এখন সকলের বিরাগভাজন, সেই জন্য তাঁহার দোষটা কেহ কেহ খুব বড় করিয়াই কীর্ত্তিত করিয়াছেন, ইহা সত্য হইতে পারে।

জার্ম্মাণীর নাজি সরকার এখন সার অঞ্চলের লোকদিগকে স্বদেশে আনিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইতেছেন। এই প্রলোভনে তাহারা ভুলিবে কি না, সে বিষয়ে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিতেছে। সন্দেহ জন্মাইয়া দিবার লোকেরও হয় ত অভাব হয় নাই। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের সহিত হার হিটলার পরিচালিত সরকার সদ্ব্যবহার করেন নাই, বরং অসদ্ব্যবহারই করিয়াছেন। রোমান ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মগুরু পোপের সহিত হার হিটলার বিশেষ ভাল ব্যবহার করেন নাই। সে জন্য পোপ বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সরকারের উপর সন্তুষ্ট নহেন। তিনি সারে ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া যাইবার পক্ষে মত দিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। তিনি প্রকাশ্যে এই বিষয়ে কোন মত দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁহার অভিপ্রায় যদি তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সম্ভবতঃ জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত হইতে চাহিবে না। ইহা ভিন্ন সর্ব্বস্বত্ববাদীরাও নাজিদিগের শাসনাধীন থাকিতে সম্মত নহে। কাযেই সার অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী জার্ম্মাণ হইলেও জার্ম্মাণী যে তাহাদের ভোট পাইবেন, তাহা মনে হইতেছে না। সুতরাং এই ভোটযুদ্ধের ফলাফল কি হইল, তাহা জানিবার জন্য সমস্ত সভ্যদেশের লোক বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

এখন পূর্ব্বাপেক্ষা উদ্বেগের কথা এই যে, যদি জার্ম্মাণী সার ফিরাইয়া না পায়, তাহা হইলে নাজিদিগের মনে বিষম বিক্ষোভ জন্মিবে। সেই বিক্ষোভের ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা বুঝা কঠিন। উপস্থিত নাজিরা এই ব্যাপার লইয়া যে একটা সংগ্রাম বাধাইবে, সেরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কারণ, য়ুরোপে জার্ম্মাণীর শত্রুপক্ষ অল্প নহে। সকলেই প্রবল পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাহে। এরূপ অবস্থায় উহা বর্ত্তমান সময়ে অশান্তির হেতু না হউক, ভবিষ্যৎ অশান্তির হেতু হইতে পারে। বিশেষতঃ ফ্রাঙ্কোপ্রসিয়ান যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী ফরাসীদিগের নিকট হইতে আলসেস ও লোরেণ অঞ্চল কাড়িয়া লইয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, এবার সার অঞ্চল ফ্রান্সকে দিলে সেইরূপ ফলই ফলিবে। অর্থাৎ জার্ম্মাণীর এবং ফ্রান্সের মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগাইয়া রাখা হইবে। কিন্তু ঘটনার গতি যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, এবারও একটা ভুল হইয়া যাইতে পারে। আর দুইচারি দিনের মধ্যে ব্যাপারটা জানা যাইবে। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন ব্যাপার কি, তাহার সংবাদপ্রাপ্তির জন্য সকলেই ব্যগ্র।

কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, অষ্ট্রিয়ার রাজনীতিক সঙ্কটের পর মুসোলিনী যে কথা বলিয়া য়ুরোপকে চমকিত করিয়াছিলেন,—তাহার ভিতর একটা রহস্য লুকাইয়া আছে। মুসোলিনী বলিয়াছিলেন—"বর্ত্তমান সময় কেহই সংগ্রাম চাহে না। কিন্তু আকাশে রণচণ্ডীর অট্টহাস্য ভাসিতেছে। যে কোন সময়েই সংগ্রাম উপস্থিত হইতে পারে। আমাদিগকে আগামী কল্যকার সম্ভাব্য সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলে চলিবে না। অদ্যই যেন সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।" এ কথা তিনি কেন বলেন? কেবল মুখের কথা নহে, কাযেও তিনি ইটালীতে যেন রণসজ্জা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ইহার কারণ কি? ইহার সবটাই কি ধাপ্পাবাজী?

মুসোলিনী

শ্যামরাজের সংকল্প

বাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণে মালয় উপদ্বীপের মধ্যে শ্যামরাজ্য একটি ক্ষুদ্র দেশ। এই রাজ্যটির বিস্তার প্রায় ১ লক্ষ ৯৯ হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার। রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও বাঙ্গালীর নিকট ইহার একটু আদর আছে। কারণ, কোন্ স্মরণাতীত কালে এই বাঙ্গালাদেশ হইতে ঐ রাজ্যে সভ্যতার বিস্তার হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীরা ভারতীয় ও মঙ্গোলীয় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া আধুনিক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যামবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে যে এই দেশে হিন্দুধর্ম্মই প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। কতকগুলি ব্যাপারে এই রাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী ভাবের লক্ষণও মিলে। সেই জন্য মনে হয়, এই অঞ্চলের সহিত বাঙ্গালী জাতির এককালে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজার নাম প্রজাধিপক। ইহার

মহিষীর নাম শ্রীমতী রামবাই বর্ণী। রাজা প্রজাধিপক এখন তাঁহার রাণী বর্ণীর সহিত ইংলণ্ডের সারে জিলার ক্রামলে নামক স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহার একটি চক্ষুতে ছানি পড়ে। সেই ছানি কাটাইবার জন্য তিনি বিলাত গিয়াছেন। গত জুন মাসে তাঁহার ছানি কাটান হয়। এখন তিনি বেশ ভাল আছেন। তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইটনে গমন করিয়া তথায় ৬ বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। উলউইচের সামরিক বিদ্যালয়ে ইনি সামরিক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্যে আসিয়াই ইনি ইঁহার বর্ত্তমান পত্নী রামবাই বর্ণীকে বিবাহ করেন। তাহার পর ইনি কিছুকাল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী সহরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার অগ্রজ ৪র্থ রামের মৃত্যুর পর ইনি শ্যামের সিংহাসন পাইয়াছেন। শ্যামদেশের প্রজাসাধারণ রাজা প্রজাধিপককে বিশেষ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করে। মার্কিণ প্রভৃতি রাজ্যেও প্রজাধিপক কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক সহরের ডাক্তার জন মার্টিন হুইলার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অপর চক্ষুর ছানি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

শ্যামরাজগণ বরাবরই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইদানীং শ্যামরাজ প্রজাধিপক স্বেচ্ছায় তাঁহার কতকগুলি ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন উনি কতকটা নিয়মনিয়ন্ত্রিত রাজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে রাজা প্রজাধিপক আপনাকে নিয়মনিয়ন্ত্রিত রাজা করিয়া দিয়াছেন। উহাতে তিনি দেশের লোককে ভোট দানের অধিকার প্রদান, এবং ক্ষমতাশালী প্রতিনিধি সভাগঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্য্যের জন্য প্রতিনিধি সভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন, এরূপ নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু যে সময়ে রাজা চক্ষুচিকিৎসার জন্য বিলাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্যামের প্রতিনিধি সভা রাজার কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া দিয়া এক আইন পাশ করিয়া লইয়াছেন। রাজা প্রজাধিপক এ জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, তিনি একবারে এক জন দর্শনধারী রাজা মাত্র হইয়া শ্যামদেশে ফিরিয়া আসিতে সম্মত নহেন। তিনি নাকি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, প্রজাসাধারণের মত না লইয়া সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। এরূপ অবস্থায় তিনি শ্যামের সিংহাসন ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। তবে যদি তাঁহার হস্তে কতকগুলি ক্ষমতা রাখা হয়, তাহা হইলে তিনি শ্যামরাজ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন। চিরকাল হইতে শ্যামরাজ্যে নিয়ম রহিয়াছে যে, কোন প্রজার প্রাণদণ্ড করিতে হইলে সে বিষয়ে রাজার সম্মতি লইতে হইবে। প্রজাপ্রতিনিধি সভা রাজার সে ক্ষমতা বিলুপ্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ দিকে প্রতিনিধিসভা রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া দিয়া তাঁহাকে একবারে সাক্ষীগোপালে পরিণত করাতে রাজা বলিতেছেন যে, শাসন ব্যবস্থায় তাঁহার যদি কোন হাতই না থাকে, তাহা হইলে তিনি একটা 'সাজা রাজা' হইয়া দেশে ফিরিতে চাহেন না। অতএব তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। এ দিকে রাজা প্রজাধিপক সত্য সত্যই প্রজারঞ্জক। প্রজারা তাঁহাকে চাহে। তাহারা এত দিন আশা করিয়া বসিয়াছিল যে, চক্ষুরোগ আরোগ্য হইলে রাজা দেশে ফিরিবেন। রাজার এই সঙ্কল্প শুনিয়া তাহারা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতেও রাজার হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে তথাকার রাজা এখন প্রায়ই মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রায় কোন কায করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া রাজার হস্ত হইতে সেই সকল ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। বিশেষতঃ শ্যামরাজ্যের ভোটাধিকার এবং নির্ব্বাচনপ্রথা আশানুরূপ সন্তোষজনক নহে। উহাতে জনসাধারণের মত যথাযথ প্রতিবিম্বিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় রাজহস্তে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। সম্প্রদায়বিশেষ হাতে ক্ষমতা পাইয়া যে তাহার অপব্যবহার করিবে, তাহাও ভাল নয়। সেই জন্য রাজা ৭ হাজার মাইল দূরে থাকিয়াই সিংহাসনত্যাগের সঙ্কল্প শ্যামসরকারকে জানাইয়াছেন। তিনি ঐ জন্য কোন হাঙ্গামা করিতে চাহেন না। যাহাতে কোনরূপ রক্তপাত না হয়, তাহাই তিনি করিতে চাহেন। এ দিকে সাধারণ প্রজারা রাজার জন্য ব্যাকুল। অগত্যা শ্যাম সরকার রাজার নিকট তাঁহাদের কয়েক জন বিশ্বাসী প্রতিনিধিকে পাঠাইয়া তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসনত্যাগের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছেন। প্রতিনিধিরা তথায় যাইয়া রাজার সহিত দেখা করিয়াছেন।

এখন এই ব্যাপারে প্রাচীর রাজনীতিক আকাশে যেন একটু শঙ্কাজনক মেঘের সঞ্চার হইতেছে। জাপান এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। তাহাদের সংবাদপত্র "আসাহি" বলিতেছেন, শ্যামরাজের সিংহাসন ত্যাগের ভয়প্রদর্শনের ভিতর অন্য কোন রাষ্ট্রনীতিক চা'ল আছে। শ্যামরাজ্যে জাপানের প্রভাব খর্ব্ব করাই উহার উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্ব্বে যে বৈদেশিক শক্তি শ্যামরাজ্যের আভ্যন্তর ব্যাপারের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে, সেই বৈদেশিক শক্তিই ভিতরে থাকিয়া ঐ কাণ্ড ঘটাইতেছে। ফলে এই ব্যাপার লইয়া একটু গণ্ডগোল ঘটিবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। এখন কি হয়, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। রাজা প্রজাধিপক যদি দেশে ফিরিয়া আবার সিংহাসনে বসেন, তাহা হইলে বিশেষ কোন হাঙ্গামা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চীনের ইষ্টার্ণ রেলওয়ে বিক্রয়

চীনের ইষ্টার্ণ রেলওয়ে লইয়া আজ প্রায় ১৫।১৬ মাস ধরিয়া জাপানের সহিত রুসিয়ার নানারূপ বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল। ইহার মধ্যে এই বিষয় লইয়া কত কথা-কাটাকাটি, কত কায বন্ধ হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মধ্যে এই রেলওয়ে লইয়া রুসিয়ার সহিত জাপানের বুঝি একটা সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। শেষকালে জাপানের পররাষ্ট্রসচিব এবং রুসিয়ার জাপানস্থ দূত মিলিয়া সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, মাঞ্চুকুয়ো সরকার ১৭ কোটি ইয়েন মূল্য দিয়া উক্ত রেলওয়ের রুসদিগের সমস্ত সর্ত্ত কিনিয়া লইবেন। এই সংবাদে সকলেই বিস্মিত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, সকলের অজ্ঞাতসারে কখন্ এই ব্যাপারের শেষ মীমাংসা হইয়া গেল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিওর সংবাদপত্রগুলিতে প্রথম এই কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু মাঞ্চুকুয়োর রাজধানী হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি এই সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইয়া পড়ে। কারণ, তাহাদের মনে ধারণা ছিল যে, গত আগষ্ট মাসে যে অচল অবস্থা ঘটিয়াছিল, সেই অচল অবস্থা তখন পর্য্যন্ত চলিতেছিল। মাঞ্চুকুয়োর পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী মন্ত্রী প্রথমে এই মীমাংসার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে সময়ে এই বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি টোকিয়োতে ছিলেন না, তিনি ছিলেন সিংকিং (Hsinking) সহরে। জাপানীরা বলিতেছে যে, তাঁহারা এই ব্যাপারের কোন পক্ষভুক্ত নহেন, তাঁহারা মাঝখানে থাকিয়া কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন।

এই ব্যাপার লইয়া অনেক দর-কষাকষি হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুন প্রকাশ পায় যে, রুসিয়া এই রেলের মূল্য বাবদ ২৫ কোটি রুবল বা ৬৫ কোটি ইয়েন চাহিয়াছিলেন। মাঞ্চুকুয়ো সরকার ৫ কোটি ইয়েন মাত্র দিতে সম্মত হন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে যখন শেষ অচল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন রুসিয়া উহার মূল্যস্বরূপ ১৯ কোটি ইয়েন চাহিয়াছিলেন, মাঞ্চুকুয়োর কর্ত্তৃপক্ষ ১৫ কোটি ইয়েন মাত্র দিবেন বলেন। এই অবস্থায় আর মীমাংসা হইল না বলিয়া মনে হইয়াছিল। উভয় পক্ষে তখন কেবল কলহ-কোন্দল চলিতে থাকে। রুস সংবাদপত্রগুলি জাপানকে গালাগালি দিতে থাকে, জাপানী সংবাদপত্রগুলিও রুসিয়ার উপর কোপপূর্ণ বাক্য বলিতে পঞ্চমুখ হয়। কিন্তু বাহিরে যেন চালমাত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে মনে হইলেও ভিতরে ভিতরে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। শেষে অকস্মাৎ প্রকাশ পায় যে, ১৭ কোটি ইয়েন দিয়া মাঞ্চুকুয়ো ঐ রেলপথের রুসিয়ানদিগের সমস্ত সর্ত্ত কিনিয়া লইলেন, স্থির হইয়া গিয়াছে।

মূল্য বাবদ রুসিয়া সমস্ত টাকার তিন ভাগের দুই ভাগ পণ্য লইতে সম্মত হইয়াছেন। আর যে সকল রুস এই রেলওয়েতে কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের বিদায়কালীন বেতন বাবদ ৩ কোটি ইয়েন নগদ টাকায় দিতে হইবে। মাঞ্চুকুয়ো সরকার ঐ টাকাটা কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া তুলিবেন ঠিক হইয়াছে। রুসিয়া টাকাটা তিন বৎসরে লইতে সম্মত হইয়াছেন। আর পণ্য বাবদ রেলওয়ের জন্য আবশ্যক পণ্য, এঞ্জিনীয়ারী দ্রব্য, ষ্টীমার এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রদত্ত হইবে। সম্ভবতঃ ঐ রেলের এঞ্জিন, গাড়ী প্রভৃতি রুসিয়া লইবেন। কারণ, রুসিয়ার রেলপথ বড় মাপের (broad gauge), জাপানী রেলপথ মাঝারী মাপের (standard gauge); সুতরাং মাঞ্চুরিয়ার রেলপথে উহার প্রয়োজন হইবে না।

জাপানীরা বলিতেছেন যে, রুসিয়া এই ব্যাপারে মাঞ্চুকুয়ো সরকারকে স্বীকার করিয়া লইলেন,—ইহাই একটা মস্ত লাভ। জাপানী সংবাদপত্রগুলি বলিতেছেন যে, রুসিয়া যখন জাতিসঙ্ঘে প্রবেশ করেন, তখন রুসিয়ার অন্যতম মন্ত্রী লিট্‌ভিনভ এই স্বীকৃতির পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, তখন তিনি জাতিসংঘকে বলিয়াছিলেন যে, রুসিয়া জাতিসঙ্ঘে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জাতিসঙ্ঘ যাহা করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে রুসিয়া নৈতিক হিসাবে বাধ্য থাকিবেন।

এখন এই ব্যাপারে চীন কি করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। চীন বলিতেছেন যে, রুসিয়ার সহিত বিবিধ চুক্তির ফলে তাঁহাদের এই রেলপথে অর্দ্ধেক সর্ত্ত রহিয়াছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট সরকারের সহিত চীনের যে চুক্তি হইয়াছে, সেই চুক্তি অনুসারে চীনের উহাতে অর্দ্ধেক স্বত্ব আছে বলিয়াই মনে হয়। তবে চীনারা এ পর্য্যন্ত সেই অধিকার পরিচালনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং অনেকে অনুমান করিতেছেন, যখন বিক্রয়ের শেষ দলিলপত্র লেখাপড়া হইবে, তখন চীনারা একটা প্রবল আপত্তি তুলিবে। কিন্তু রুসিয়া ও জাপান এই দুই পক্ষের কেহ চীনের সেই আপত্তি আমলে আনিবেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, এই বিক্রয়কার্য্য সম্পন্ন হইবার ফলে জাপানের সহিত রুসিয়ার মনোমালিন্যের একটা কারণ লুপ্ত হইবে, অনেকে এইরূপ আশা করিতেছেন। তবে উভয় পক্ষের বিবাদের সমস্ত কারণ যে তিরোহিত হইল, এমন কথা কেহ মনে করিতে পারেন না। বিবাদের অনেক কারণ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। যাহা হউক, বিবাদের একটা বড় কারণ যে অপগত হইল, ইহাই বহুলোকের ধারণা। কিন্তু সে ধারণা ভুল। মঙ্গোলিয়া লইয়া, সাখেলিন দ্বীপের উত্তরাংশের খনিজ তৈল লইয়া, এবং সাইবেরিয়ায় মৎস্য ধরা লইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ বাধিবার বহু প্রবল কারণ বিদ্যমান। বাহির মঙ্গোলিয়ায় (Outer Mongolia) এখন রুস ভিন্ন অন্য কোন বিদেশীর প্রবেশাধিকার নাই। জাপান ইহা ভাল মনে করেন না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে উভয় পক্ষের বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে,—ইহা কোনমতেই মনে করা যাইতে পারে না।

ফ্রান্সে মন্ত্রিপরিবর্ত্তন

ফ্রান্সে আবার মন্ত্রিপরিবর্ত্তন ঘটিল। গাষ্টন ডুমার্গ মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়া স্বীয় পল্লীভবনে প্রয়াণ করিয়াছেন। ইনি প্রাচীন যুগের রোম্যান কন্সল সিন্‌সিনেটাসের ন্যায় সরল এবং কঠোর ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। পদগৌরব লাভ করিয়া ইঁহার মাথা কখনই টলিয়া যায় নাই। যাঁহারা ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাজনীতিক গতি জানেন বা ঐ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, তথাকার রাজনীতিক প্রবাহ সরল খাতে চলিতেছে না। মন্ত্রী এবং মন্ত্রিমণ্ডলের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমরা গত বারে ফ্রান্সের অর্থসঙ্কটের কথা বলিয়াছি। তথায় নানা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। সেই সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিবার জন্য দেশের লোক মঁসিয়ে ডুমার্গকে তাঁহার পল্লীভবন হইতে ডাকিয়া আনিয়া মন্ত্রীর আসনে বসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবার জন্য তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তিনি তাহার কোন সমস্যারই সমাধান না করিয়া পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যে

সাধুতার জন্ম বিখ্যাত, সেই সাধুতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারিলেন না। ফ্রান্সে রাজনীতিক দলাদলি বড় তীব্র। তাহার উপর তথাকার শাসনযন্ত্রের কাঠামটি পুরাতন এবং ত্রুটিযুক্ত। উহা বহুদিন পূর্ব্বে আগমোজাভাবে গঠিত হইয়াছিল। অনেক জোড়া তালি দিয়া উহা এখন চালান হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও তথায় বার বার মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন হইতেছে। ফ্রান্সের এক জন রাজনীতিবিজ্ঞানবিশারদ বলিয়াছেন যে,—The Constitution of 1875 is a hang dog Constitution, a Cindaerella slipping noiselesily between the parties who despise her." অর্থাৎ "১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গঠিত এই শাসনপদ্ধতি অত্যন্ত রদিপদ্ধতি; যাহারা উহাকে ঘৃণা করে, উহা নিঃশব্দে তাহাদিগকে এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতেছে।" এরূপ অবস্থায় উহার সংস্কারসাধনের জন্য মধ্যে মধ্যে কথা উঠিতেই পারে। কিন্তু কাযে কিছুই হইতেছে না। জোড়াতালি দিয়াই কোনগতিকে ইহার দ্বারা কায চালান হইতেছে।

মন্ত্রী ম'সিয়ে গ্যাষ্টন ডুমার্গ এই শাসনযন্ত্রের কাঠামোখানি পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান দুইটি প্রস্তাব এই :— (১) সিভিলিয়ানদিগের রাষ্ট্রকে নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষা ও পদোন্নতির জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। উহারা যদি অসঙ্গত কারণে অথবা এক-যোগে কার্য্য ত্যাগ করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের সহিত ইহাদের এই যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে। (২) প্রধান মন্ত্রীর হস্তে প্রতিনিধি সভাকে বিদায় করিয়া দিবার ক্ষমতা দিতে হইবে। ইহা ভিন্ন তিনি ফরাসী প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, তিনি পূর্ব্বে কিছুদিন ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট পদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফ্রান্সের উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রীরা সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না। ফ্রান্সের রাজনীতিক গগনে আবার ঝঞ্ঝামেঘ দেখা দিল। ম'সিয়ে ডুমার্গ ম'সিয়ে হেরিওকে বলিলেন, "আমার প্রস্তাবে তোমরা সম্মত হও, ভালই, নতুবা আমি ঘরের মানুষ ঘরে ফিরিয়া যাইব।" উগ্রপন্থীরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। উহারা দেখিল যে, আবার নির্ব্বাচন হইলে উহারা অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। অতএব তাহারা সম্মত হইল না। ম'সিয়ে ডুমার্গ মন্ত্রীর আসন ছাড়িয়া তাঁহার পল্লীভবনে গমন করিলেন।

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে যখন তিনি তাঁহার নীতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা রেডিওযোগে ফ্রান্সের সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই সময় কতকগুলি লোক এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, মার্সেলিজ সহরে ঐ ব্যাপার লইয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে হাঙ্গামা এবং মারামারি উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে দুই জন নিহত এবং চারি জন আহত হইয়া হাঁসপাতালে গিয়াছিল। যাঁহারা দলস্থ উগ্রপন্থী ও অধীর, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, ডুমার্গ গণতন্ত্রের বিরোধী। তাঁহার প্রস্তাব ফাসিষ্টদিগের প্রস্তাবের ন্যায় প্রতিনিধিসভার এবং প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্যই পরিকল্পিত। সমাজতন্ত্রবাদীরা এবং উগ্রসমাজতন্ত্রবাদীরা তাহার সংস্কারপ্রস্তাবগুলি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন। কাযেই এই সদাশিববৎ রাজনীতিকটি হাঙ্গামা না করিয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজ গ্রাম টুর্ণেফুইনে যাইয়া পরিজনপরিবৃত হইয়া স্বস্তিতে ধূমপান করিতেছেন।

ম'সিয়ে ডুমার্গ

ম'সিয়ে হেরিও

ডুমার্গের সম্মুখে একটি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। সেটা মুদ্রা-সম্পর্কিত। তিনি স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, উহার পরিণামফল শুভ হয় না। বার্ত্তাশাস্ত্রে তিনি এক জন ধীরবুদ্ধি ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। এ বিষয়েরও তিনি কোন মীমাংসাই করিয়া গেলেন না। ফ্রান্সের রাজনীতিক্ষেত্রে যে হাঙ্গামা ছিল, তাহাই বজায় রহিল। বেকার-সমস্যারও সমাধান হইল না। ফলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক অবস্থা ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না।

বশ্‌রাই হাওয়া

(গল্প)

মোটরে টানা-পাড়ি দিয়া কাশ্মীর যাইতেছিলাম। অনেক দিনের কথা! পঞ্জাবের প্রচণ্ড রৌদ্রে জ্বলিয়া থাক্‌, তার উপর ধুলার ঘূর্ণী—সন্ধ্যার ঠিক পরে মোটর পৌছিল অমৃতসরে।

পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক—প্রাণ বুঝি যায়! ভাবিয়াছিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রি—নন্‌-ষ্টপ দৌড়ে রাওয়ালপিণ্ডি না হোক, লালামুশা ষ্টেশনে পৌঁছিব! কিন্তু দেহ-মনের যা অবস্থা, বিশ্রাম না মিলিলে এ অভিযানের সব আনন্দ বুঝি বা বিচুর্ণ হয়!

রেলওয়ে লাইনের মাথায় মস্ত ব্রিজ। সেই ব্রিজের উপর দিয়া মোটর চলিয়াছে, পথে প্রচণ্ড ভিড়—সেই ভিড়ের মধ্য হইতে সহসা বাঙালীর কণ্ঠে বাঙলা কথা শুনিয়া প্রাণ একেবারে মাতিয়া উঠিল। মোটর থামাইয়া নামিয়া পড়িলাম। স্বর-সন্ধানে তিনটি বাঙালী যুবককে পাকড়াও করিলাম; সরল বাঙলায় তাঁহাদের প্রশ্ন করিলাম—রাত্রে বিশ্রামের জন্য একটু নিরাপদ স্থান কোথায় পাবো, বলতে পারেন?

সবিস্ময়ে তাঁরা আমার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—আপনি কোথা থেকে আস্‌চেন?

কহিলাম,—কল্‌কাতা!

আমার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাঁরা কহিলেন,—এই রকম একছুটে!

হাসিয়া কহিলাম,—এক ছুটেই বটে! ঐ মোটরে।

—কোথায় যাবেন?

কহিলাম,—চলেছি কাশ্মীর। রাত্রের জন্য একটু আশ্রয় চাই। একটা ভাল হোটেল···?

নিমেষে তাঁরা যেন জাগ্রত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন,—হোটেল কেন! আমরা আছি একটা বাসা নিয়ে—জালিয়ানওয়ালা বাগের কাছে। আমাদের ওখানে···

সবিনয়ে জানাইলাম, আমি একা নহি; দলে আছি সাত-আট জন। এতগুলি লোকের জন্য আস্তানা···

তাঁরা বলিলেন,—বিলক্ষণ! বাঙালী আপনারা···না, না, আসুন। আমাদের বাসার কাছে একখানা খালি বাঙ্‌লো আছে। সেখানে সকলের ঠাঁই হবে—গাড়ী রাখবার জন্য গারাজ মিলবে। আসুন···

অকূলে কূল পাইয়া হারানো—তার অর্থ, বিপদকে বরণ করা! অগত্যা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সদলে তাঁদের সঙ্গে চলিলাম।

জালিয়ানওয়ালা বাগ ঘুরিয়া একটা খোলা জায়গা; তাহারি একধারে আস্তানা! চার-পাঁচটি পরিবার—সকলে বাঙালী—নীড় বাঁধিয়া পরম-আরামে বাস করিতেছেন। রাজ্যের শিখ ও জাঠ সমুদ্রে যেন স্নেহ-মায়ায় রচা একটি শ্যামল কুঞ্জ-দ্বীপ! তাহারি কাছাকাছি বাঙ্‌লো! সকলে মিলিয়া সেটি জোগাড় করিয়া দিলেন। আমরা সে বাঙ্‌লোয় প্রবেশ করিয়া স্নান সারিয়া দেহের ধূলি ও ক্লান্তি মুছিলাম।

তাঁদের বাসা হইতে আসিল চা ও হালুয়া। নিঃশেষ করিয়া বাঙলোর বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। বেতের ক'খানা চেয়ার সংগ্রহ হইয়াছিল।

আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। এ জায়গাটুকু সহরের প্রান্তে। কোলাহল নাই, ধুলা নাই! সামনে ধূ-ধূ প্রসারিত মুক্তপ্রান্তর! মন আরামে ভরিয়া উঠিল।

তাঁদের আতিথ্যে ভারী সমারোহ বাধিয়া গেল। নিষেধ করিলাম। কে শোনে! তাঁরা বলেন, দেশের লোক এতদূরে এসেচেন! আমাদের যে কি আনন্দ হচ্ছে···

জানা নাই, শুনা নাই—অথচ কি সমাদর! দেশে বাঙালী যত মামলা-বিরোধ করুক, দেশের বাহিরে বাঙলার বাতাসের কোমল-মাধুরীতে বাঙালীর মন ভরিয়া থাকে! কথাটা শুনিয়াছিলাম—আজ বুঝিলাম, কথাটা সত্য!

সকালে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছি—তাঁরা আসিয়া জানাইলেন, না! এখানকার সব দেখাশুনা না সারিয়া যাওয়া হইবে না! তাঁরা স্পষ্ট বলিলেন, ছাড়িয়া দিবেন না!

এমন প্রীতি—তার মায়া ছিন্ন করিতে পারিলাম না। সেদিনের মত রহিয়া গেলাম।

সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরিলাম। এক দিনেই ইহাঁরা প্রাণটাকে অধিকার করিয়া বসিলেন।

সন্ধ্যায় বাঙলোয় ফিরিয়া গল্প করিতেছি—এক অপরিচিত বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া দেখা দিলেন।

একজন হোষ্ট্ কহিলেন,—এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এঁর নাম উদয় বাবু। ইনি জার্ম্মাণ যুদ্ধে গিয়েছিলেন। মেশোপটামিয়া, বশরা—সব জায়গা ঘুরে এসেচেন! যা এ্যাডভেঞ্চার গেছে, সে এঁর কাহিনী শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবেন! শুধু এ্যাডভেঞ্চার নয়—রোমান্সও সেই সঙ্গে। দেশে ওঁর কেউ নেই। এখানে এক শিখ বন্ধু আছেন—তাঁর কাছে থাকেন। খাল্‌শা কলেজে চাক্‌রি কর্‌চেন।···এই শিখ বন্ধুটিকে সেই জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়েই সাথী পান্!···

ঝিম্-ঝিম্ সন্ধ্যা—জালিয়ানওয়ালা বাগের তরু-পল্লব কাঁপাইয়া বাতাস বহিয়া গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল! রেলওয়ে লাইনের উপর মালগাড়ী শাণ্ট্ করিতেছে, তাহারি অস্ফুট ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রকৃতি যেন জ্যোৎস্নার চাদর গায়ে টানিয়া তন্দ্রাতুর!

কহিলাম,—আমরা শুন্‌তে পাই না সে কাহিনী?

এক জন ভদ্রলোক কহিলেন,—বলো না, উদয়দা—বশরায় সেই যা হয়েছিল?

উদয় মৃদু হাসিলেন—মলিন হাসি! সে হাসির আভাসে দেখিলাম, বিদায়-রজনীর করুণ ব্যথা যেন ছল-ছল করিতেছে!

উদয় বাবু ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন,—এখনো সব কথা আমার মনে আছে—স্পষ্ট! বলি।

উদয় বাবু বলিতে লাগিলেন—আমি গিয়াছিলাম রশদের দলে। মেশোপটামিয়া ছাড়িয়া বশরার কাছে ছাউনি ফেলিয়াছিলাম। আমাদের দলে ছিল কতকগুলা উট। আমরা উটের পিঠে চড়িয়া পাড়ি দিতাম। কখন্ কোথায় ছুটিবার হুকুম আসিবে, তার কোনো স্থিরতা ছিল না। উটের পিঠে সওয়ার হওয়ায় প্রথমে ভারী অস্বস্তি ধরিত; শেষে এমন সহিয়া গেল যে, নৌকা বা জাহাজ ছাড়িয়া আমি উটের সওয়ার বাছিয়া লইতাম।

রশদের দলে থাকিলেও ছাউনির কাছাকাছি গোলা আসিয়া পড়িত না, এমন নয়। জার্ম্মানগুলার শয়তানীর সীমা ছিল না। আকাশে জেপ্‌লিন চড়াইয়া তার উপর হইতে সেই পুরাণের মেঘনাদের মত বোমা ফেলিত; নীচে যেখানে সে বোমা পড়িত, সেখানে বহুদূর জায়গা ফাটিয়া চুর্ হইয়া যাইত! সে বোমার হাত হইতে কি করিয়া নিস্তার পাইয়াছিলাম, সে কথা ভাবিলে আজো আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

সে দিনের কথা বলি। রাত্রে চারিদিক চুপচাপ—আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। এ মুল্লুকে আসা অবধি ঘুম এমন সজাগ হইয়াছে যে, একটু খশ্‌খশানি শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠি! সে দিন ঘুম ভাঙ্গিল বিউগ্‌লের রবে! সে রবের অর্থ বুঝিতাম। সে রাত্রের বিউগল বলিতেছিল—Retreat—হঠো···!

বিছানা ছাড়িয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। আদেশ মিলিল, রশদের মধ্যে যাহা পারো, লইয়া সরিয়া পড়ো।

ত্বরিতে পলানো চাই। সাজো-সাজো রব! তবু তাহার মধ্যে কতখানি শৃঙ্খলা! হাতের কাছে যাহা পাইলাম, লইয়া উটের পিঠে চড়িয়া বসিলাম। সামনে আলোয় আলো—দূরে বড় বড় মশাল জ্বলিতেছে। বুঝিলাম, গোলা ফাটিতেছে। তীব্র অগ্নিচক্রে তুফান তুলিয়া মরণ যেন করাল মুখে হাঁকিতেছে—ম্যয় ভুখা হুঁ!

সে যে কি তীব্র ঝঞ্ঝনা! সমস্ত দেহ-মনের স্পন্দন সে তীব্র ঝঞ্ঝনায় থামিয়া যায়! সামনে লেলিহান অগ্নিশিখা দেখিয়া ডাহিনের ঝোপ-জঙ্গল লক্ষ্য করিয়া উট চালাইলাম।

খানা, ডোবা, জঙ্গল, ছোট-বড় টীলা, কোথাও বা জনহীন গ্রাম—সে সব মাড়াইয়া, পার হইয়া কোন্ নিরুদ্দেশের পথে ছুটিয়া চলিলাম—কোনো খেয়াল ছিল না! চলিয়াছি···চলিয়াছি···

পিছনে হাঁকিতেছে মৃত্যুর দামামা—কামানের বিকট ধ্বনি! সামনে পৃথিবীর চিহ্ন যেন কে মুছিয়া দিয়াছে! শুধুই অন্ধকার···যেন দেওয়ালে ঝুলানো প্রকাণ্ড মানচিত্রের গায়ে কে কালির কলসী উপুড় করিয়া কালি ঢালিয়া মানচিত্রের অঙ্গ কালোয় কালো করিয়া দিয়াছে!

সেই কালির পাথার ভেদ করিয়া আমার উট চলিল!

আকাশে কয়েকটা নক্ষত্র—তারাও যেন ভয়ে কাঁপিয়া মেঘের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল! আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কে যেন কালো পর্দ্দার আবরণ টানিয়া দিল! মাঝে মাঝে সে আবরণের উপর বিদ্যুৎশিখার মত ঐ আলোর ঝলক চমকিয়া ওঠে—গোলা ফাটিবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরেখা—আর সেই বিকট গর্জ্জন। তার আর বিরাম নাই!

চেতনা-হীনের মত আমি বসিয়া আছি উটের পিঠে। বসিয়া আছি—সে কথা যেন মনে ছিল না! মনে হইতেছিল, জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক যেন চুকিয়া গিয়াছে! প্রাণটাকে দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া কে যেন শুধু দেহখানাকে উটের পিঠে তুলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে—যমপুরীর বিরাট তোরণের পাশে সেটাকে যেন কেহ নামাইয়া লইবে!

উট চলিয়াছে—মাঝে মাঝে সেই চেতনাটুকু মনে জাগিতেছিল—নিমেষের জন্য! পরক্ষণে আবার নিশ্চেতন ভাব! সে অবস্থার কল্পনাও আপনারা করিতে পারিবেন না!

একবার চেতনা জাগিল। মনে হইল, সারা দেহ-মন যেন পিপাসায় আকুল আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে! দু'চারিটা সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলাম পলাইবার মুখে। ভুলিয়াছিলাম শুধু জলের বোতল—এ পথে যে-বস্তু সব-চেয়ে অমূল্য পাথেয়! তখন কাণে আর সে বজ্র-হুঙ্কার আসিয়া স্পর্শ করিতেছে না! চোখের সামনে দেখি,—ধূ ধূ বালুকার বিস্তার। বুঝিলাম, দুস্তর মরুর বুকে আসিয়া পড়িয়াছি! কিন্তু জল··· জল···

উট গলা বাড়াইয়া চলিয়াছে—তার গতি মন্থর। এক-দিককার আকাশ চিরিয়া সেই কালির পাথার ঠেলিয়া প্রকাণ্ড লোহিত-চক্র গড়াইয়া যেন পৃথিবীর বুকে নামিবে—তাহারি আভাস পাইলাম! সে যে সূর্য্য, তাহা ভুলিয়া গেলাম। বালির সে বুক-জোড়া কালো পর্দ্দা যেন সরিয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে! চোখের সামনে শুধু দেখিতেছি···জল জল···

উট চলিয়াছে। যত চলে, জলের সে আভাস তত সরিয়া সরিয়া আগাইয়া যায়! বুঝিলাম, মরীচিকা! মরীচিকার পিছনে ছোটা! সে পথে অনেক ছুটিয়াছি—কিন্তু সেদিনকার মত এমন বিরাট মরীচিকা···কখনো উপলব্ধি করি নাই!

উট চলিয়াছে! গলা বাড়াইয়া চলিয়াছে। যেন পৃথিবীর ওপারে সে জলের সন্ধান পাইয়াছে! যদি সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়—যদি সে পথে পৌঁছিতে না পারে—তাই যথাসম্ভব গলা বাড়াইয়া দিয়াছে—কোনোমতে জলের এক-ঝলক যদি মুখে পায়!

আমার অবস্থাও তাই! মনে হইতেছিল, ধরিত্রী দেবী কখন আমার এ পিপাসা বুঝিয়া, মমতায় গলিয়া ফাটিয়া বুকের অমৃত-নিস্যন্দিনী ধারায় আমার দেহ-মনের এ প্রচণ্ড তাপ শান্ত করিবেন!···সমগ্র চেতনা ভরিয়া প্রাণে তখন আর্ত্ত আবেগ জাগিয়াছে,—মাগো মা, করুণাময়ী বিশ্ব জননী!

বিশ্ব যে আমাদের জননী, সেদিন তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আজো সে-কথা মনে পড়ে!···

পিপাসা তখন সারা দেহে-মনে উগ্র হইয়া উঠিয়াছে—যেন সারা জীবনের পিপাসা বুক হইতে গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে! সে পিপাসায় সহসা আর্ত্ত অধীর দুই চোখের সামনে জাগিল দূরে অতি-দূর-প্রান্তে দিক্‌চক্র-রেখায় শ্যামল তাল-খেজুর-বনের অস্ফুট আভাস; তারি ফাঁকে ফাঁকে মিনার-চূড়া!

মন মাতিয়া উঠিল। ঐ যে···গ্রাম? না, নগর। ওখানে মিলিবে চির-পিপাসিতের আরামের জল···জল···!

উটকে চাঙ্গা করিলাম। গলা সে আরও বাড়াইয়া দিল; শরীরকে যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া সে চলিল। তারো পিপাসা আছে! সে পিপাসা আমার পিপাসার চেয়ে কম নয়! ওগো মরুর জীব···ও মরীচিকা? না, সত্যই ঐ শ্যামল বনানীর পিছনে আছে—সর্ব্বজীবের জীবন-ধারা—জল?

উট চলিল। তালীবন ও মিনারের আভাস ক্রমে স্পষ্ট, স্পষ্টতর হইতে লাগিল।···লোকজনের কলরবের অতি ক্ষীণ ধ্বনি যেন ক্রমে কাণে বাজিল। আঃ, সে যেন পথ-হারার চিত্ত-দুলানো প্রাণ-জুড়ানো—ঘরের আবাহনী সুর!

উটটা বুঝি আমার মত এমনি কথা ভাবিতেছিল—নহিলে তার গতি সহসা অমন ক্ষিপ্র হইবে কেন? সে যেন তার সকল শক্তি সচেতন করিয়া ঐ অস্ফুট কলরবে নিজেকে ঢালিয়া দিবার জন্য ছুটিয়া চলিল।

মাথার উপর আকাশে তুলার মত টুকরা-টুকরা মেঘের ছুটাছুটি—তাহার গায়ে অরুণের বিচিত্র রেখা! ও আকাশ কোথায় এতক্ষণ সরিয়া গিয়াছিল! সমস্ত পৃথিবীকে যেন কে এতক্ষণ বায়ুহীন আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল—এখন আবার বাতাস বহিয়াছে! বাতাসের পরশে তালী-কুঞ্জে ঐ চামর দুলিয়া উঠিয়াছে—ঐ যে মিনারের গায়ে···

কি একটা বাধা! উট থামিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড কোলাহলের মাঝখানে আমি নামিলাম উটের পিঠ হইতে!···

দলে-দলে পথে লোক চলিয়াছে! মানুষের দেশে আবার আসিয়াছি। যে-সব মানুষ ঘর বাঁধিয়া, প্রীতি-স্নেহে পরস্পরকে আঁকড়িয়া ধরিয়া জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে! মরণের গোলায় পরস্পরকে মারিবার জন্য ক্ষেপিয়া ওঠে না!

ঐ যায় বোরখা-ঢাকা নারীরা! হাতে গাগরী—জল আনিতে যায়!

জল গো জল! আর কিছু চাহি না! দুনিয়ার আর কোনো বস্তুতে আমার বাসনা নাই—লোভ নাই!···

লোকের কলরব আবার অস্ফুটতর হইতে লাগিল। তালীবন কাঁপাইয়া মিনার ভাঙ্গিয়া প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া জল যেন মাতিয়া ছুটিয়া আসিতেছে···চোখের সামনে! ভোগবতী মা-জাহ্নবী একদিন যেমন আসিয়াছিলেন—কুরু-রণাঙ্গনে শরশয্যায় শায়িত তাঁর প্রিয় পুত্র মহাবীর ভীষ্মের আহ্বানে তাঁর জীবনের পিপাসা মিটাইতে!

আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। এও তো কুরুক্ষেত্র···আমিও শরশয্যায়···

চারিদিকে অজস্র প্রশ্ন—যেখানে যুদ্ধ চলিয়াছে, সেখান হইতে আসিলে? যুদ্ধের খবর কি? জার্ম্মানরা কত কাছে আসিয়াছে? ইংরাজ? ফরাসী? তুর্কি···?

কহিলাম—জল···জল···জল দাও···পিপাসার জল!···

এক দোকানী—তার হাতে ছিল খেজুরের বস্তা; সে কহিল—সামনের দোকানে এসো।

আমার হাত ধরিয়া সে আমায় আনিল তার দোকানে; বলিল—এ তোমার আস্তানা সাহেব!···

জল মিলিল। আহার মিলিল। দোকানী বলিল—আমার ছেলে গিয়াছে ঐ যুদ্ধে। পাঁচ মাস। কোনো খবর পাই নাই। আছে কি না, কে জানে! বোধ হয়, নাই। থাকিলে একটা খবর মিলিত!

নিশ্বাস ফেলিল। বেচারা!···

সন্ধ্যা হয়-হয়। দেহে-মনে আরাম। দোকান ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম। বশ্‌রা সহর! সেখানে আস্তানা পাইয়াছি—বুঝিলাম।

সেই বশ্‌রা—যার গোলাপ-কুঞ্জে জাগে বুলবুলের গান—যে-গানে সহর মশগুল্!

কিন্তু এখনো সে বশরা আছে? নিশীথে যে-বশরার পথে চলে কম্পিত-চরণে রেশমী চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া অভিসারিকা···হেনার গন্ধে দিক ভরিয়া! কার্বায় ভরিয়া খোজা হকার গোলাপী আতর সওদা করিয়া ফিরিতেছে! গালিচার দোকানে কিশোরী রূপসী আসিয়াছে সওদা লইতে—পথের দিকে মাঝে-মাঝে চোখের বিদ্যুৎ-চাহনি ঠিকরিয়া পড়িতেছে, যদি দেখা পায় কোনো তরুণ শাহজাদার, কিম্বা কোনো লায়েক রাহীর!

এমনি পাঁচ-সাত কথা মনের উপর রঙীন ঢেউ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। আরাম বোধ করিতেছিলাম। কামানের গোলায় দুনিয়ার চেহারাখানা ছরকুট্ করিয়া দিবার কোনো প্রয়াস এখানে নাই! হিংসার আগুনে দুনিয়া যদি আজ সত্যই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তবু এখানে এই তালী-খেজুর-বনের আড়ালে একটু জায়গা বাঁচিয়া থাকিবে—বেহেস্তের মত!

পথের ধারে ছোট সরাই। মাথায় ফেজ-আঁটা বহু লোক জমিয়াছে; চা পান করিতেছে। সিরাজী আছে! নাচ চলিয়াছে, গান চলিয়াছে। পাশে এমন প্রকাণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছে, সেদিকে যেন এ লোকগুলার বিন্দুমাত্র খেয়াল নাই! নাচে গানে সিরাজীর নেশায় নিজেদের এমন মশগুল রাখিয়াছে!

কেমন কৌতূহল জাগিল! ফৌজের রশদের হিসাব

নিকাশে দীর্ঘকাল মগ্ন থাকিয়া দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সরাইয়ে আমোদ-প্রমোদের সমারোহ দেখিয়া আবার যেন বাসনা-কামনায় ভরা নিজের সেই হারানো যৌবন ফিরিয়া পাইলাম! ধীরে ধীরে সরাইয়ে প্রবেশ করিলাম।

আমোদ-পিয়াসীদের নজর পড়িল আমার পানে। বিদেশী ফৌজ! সকলের কৌতূহল জাগিল! কেহ আসিয়া হাতে দিল গাছ হইতে সদ্য-পাড়া আঙুর:—নিটোল, রসালো—রূপসীর সুধা-ভরা ঠোঁটের মত! কেহ আনিল রাঙা আপেল; কেহ খেজুর; কেহ বা পেস্তা-বাদাম-আখরোট; পেয়ালা ভরিয়া লাল সিরাজী!

আতিথ্য জানে বটে বশরার লোক! গুলি-বারুদের কালিতে কালো আমার মন দরদে আবার তাজা হইল!

কিন্তু বেশীক্ষণ এ আমোদ ভালো লাগিল না! বাহিরে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না!—আমায় যেন ডাকিতেছিল। সরাই ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম।

পাশ দিয়া ছায়ার মত যেন কে সরিয়া গেল! সে আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল—তার সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না!

চকিতে আমার গতি হইল রুদ্ধ। থমকিয়া দাঁড়াইলাম! তার দেহে হেনার সুরভি—গোলাপী বর্ণে আকাশ ভরিয়া উঠিল! সে-রঙের আড়ালে কোথায় ঢাকা পড়িল জ্যোৎস্নার সে তুষার শুভ্র বর্ণ-বিভব!

আমি যেন পাথরের মূর্ত্তি!

বোর্‌খা-ঢাকা মূর্ত্তি একটা বাঁকের মুখে দাঁড়াইল। আমার দুই চোখের দৃষ্টি যেন সে রেশমী সূতায় বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল! মূর্ত্তি আমার দিকে হাত তুলিল; সে হাত আবার নামিল। বুঝিলাম, সঙ্কেত! এ সঙ্কেত আমাকে!

যন্ত্র-চালিতের মত অগ্রসর হইলাম। মূর্ত্তি বাঁকের ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি বাঁকের মুখে আসিলাম। মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। আমি আসিবামাত্র মুখের আবরণ খুলিয়া সে আমার পানে চাহিল। আমি দেখিলাম…কি—বুঝাইতে পারিব না! দুনিয়ার যত রঙ চকিতে যেন আমার চোখে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল! চোখে আমার পলক পড়ে না! কিশোরী রূপসী! এমন রূপ…

রূপসী আমার হাত চাপিয়া ধরিল। আমি কাঁপিলাম। রূপসী কহিল,—এসো।

আমি কোনো কথা বলিতে পারিলাম না। সমস্ত মনে ঝড় তুলিয়া বহিয়া গেল একটা নিশ্বাস।

রূপসী হাসিল; হাসিয়া কহিল,—বিদেশী তুমি! তাই ভয় হচ্ছে? কিন্তু ভয় নেই! এসো!

তার ভাষা…না, বাঙলা নয়! সে ভাষা…অর্থাৎ এত-দিন এ অঞ্চলে বাস করিয়া সে ভাষা বুঝিতে পারি; সে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি।

নিঃশব্দে কিশোরীর সঙ্গে চলিলাম…আপেল-বাগের উপর দিয়া—খেজুর-ঝাড়ের পাশ দিয়া—নিঝুম পুরী ডাইনে-বাঁয়ে রাখিয়া বিজন পথ ধরিয়া নিশীথ-অভিসারে কোন্ অজানা রাজপুরীর দেউড়ীর অভিমুখে!

ভারী কোমল স্পর্শ! তার কেশের সুরভি…অঙ্গের সুরভি…মনে হইতেছিল, কোন্ গোলাপ-বনে মশ্‌গুল মৌমাছির মত আমি চলিয়াছি!

কিশোরী আসিয়া মস্ত এক বাগানের কাছে দাঁড়াইল। মেহদির বেড়ায় রচা ছোট দ্বার। সে দ্বার ঠেলিয়া কিশোরী ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি পথে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিশোরী কহিল,—এসো।

বাগানে প্রবেশ করিলাম। কোথায় চলিয়াছি, কেন চলিয়াছি—সেখানে বিপদ, না, সম্পদ—এ সব কথা মনে উদয় হয় নাই—তিলেকের জন্য নয়!

কিশোরী কি মন্ত্রে অভিভূত করিয়াছিল। তাহার ইঙ্গিতে তাহারি সঙ্গে চলিলাম।

ছোট একটা পাহাড়। গা বহিয়া ঝর্ণা নামিয়াছে! চাঁদের জ্যোৎস্নায় জল যেন ফুলের পাপড়ির মত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে!

সেই ঝর্ণার ধারে কিশোরী বসিল; পাশে আমায় বসাইল। তার পর আমার বুকে মাথা হেলাইয়া দিয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিল—কথা কও! আমি তোমার মুখে কথা শুনবো বলেই যে তোমাকে এখানে আনলুম…"

কি কথা কহিব? আমার বুকের মধ্যে যা হইতে-ছিল…চারিদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিলাম। অদূরে গাছপালার অন্তরালে মস্ত প্রাসাদ…নিশীথ-নিদ্রার আবরণে মৌন-মূক দাঁড়াইয়া আছে!

কিশোরী কহিল,—মনে সুখ নেই। যেন তোমারি জন্য পথ চেয়ে বসে আছি!···এত লোক-জন···কাকেও দেখে আনন্দ পাই না! এরা বড় জানা, বড় চেনা। এদের সুখ ছোট, দুঃখ ছোট—আশা-কামনা সমস্তই ছোট! তাই খুঁজছিলুম এমন সাথী—যার কোন পরিচয় জানি না! যার বুকে আছে অনন্ত অসীম পরিচয়! বলো গো বলো, তোমার সব কথা—সব পরিচয়!

আমার বিস্ময়ের সীমা নাই! কিশোরী এ কি বলে? এতখানি সাহস···আর এতখানি পথ আসিয়া এ কি প্রশ্ন? আমার পরিচয়!

আমার পরিচয়ে কোনো নূতনত্ব নাই! অনাদি-কালের শত-সহস্র পুরুষেরই একজন আমি! এক আশা, এক বাসনা, এক সুখ, এক দুঃখ, এক ভয়! সেই এক ক্ষুধা, এক পিপাসা!···তাহাতে শুনিবার মত, জানিবার মত কি এমন আছে!

আমি কিশোরীর পানে চাহিলাম। কিশোরী নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাসের স্পর্শে আমার প্রাণ চূর্ণ হইয়া গেল।

আমি কহিলাম,—কি কথা বল্‌বো?

কিশোরী কহিল,—তোমার কথা। তোমার সুখ, দুঃখ, আশা, ব্যথা···

আমি কহিলাম,—সে সব কিছু আর মনে নেই! তুমি আমায় এমন বিহ্বল করেচো···

কিশোরী এ কথায় হাসিল, হাসিয়া কহিল—তাহলে আমার কথা শুনবে? ভারী দুঃখের কথা! তাই তবে বলি, শোনো···

কিশোরী আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। মনে হইল, তুলিয়া বুকে ধরি! কিন্তু হাত উঠিল না! সমস্ত দেহ-মন সে স্পর্শে যেন তড়িতাহত, নিস্পন্দ!

কিশোরী তার চাঁপার কলির মত আঙুল তুলিয়া সেই প্রাসাদের দিকে দেখাইয়া কহিল,—ঐ প্রাসাদ দেখচো?

আমি কহিলাম—দেখচি।

কিশোরী কহিল,—ও প্রাসাদ নয়—কারাগার। ঐ কারাগারে আমাকে বন্দী করে রেখেচে! দেউড়ীতে আছে শান্ত্রী-পাহারা; দেউড়ীর মধ্যে ছোট দরজায় আছে খোজার দল! নেশায় ভুলিয়ে রাখবার জন্য ঘরে ঘরে আছে বাতির ঝাড়, গোলাপের ফোয়ারা, মণি-ভূষণ, বাঁদী-বান্দা···অজস্র! ও-সব শিকল। আমার মন ও শিকলের চাপে হাঁফিয়ে ওঠে! ফাঁক খুঁজি—যদি পালাতে পারি! একদিন পেয়েছিলুম একটা চেরাগ···সেই চেরাগের মায়ায় এক দৈত্য এসে দাঁড়ালো পায়ের কাছে! বললে—কি হুকুম? আমি বললুম—নিয়ে চলো আমাকে এই কারার বাহিরে। সেলাম জানিয়ে সে বললে, পারবে না···মনিব গোঁশা করবে!

ভেঙ্গে ফেললুম সে চেরাগ! মিথ্যা চেরাগ! ছিল বটে এককালে চেরাগের শক্তি—যা চাওয়া যেতো তার কাছে, তাই পাওয়া যেতো—নির্ব্বিচারে! এখন যা চাও, তা পেতে এত কৈফিয়ৎ—এমনি সীমা-নির্দ্দেশ!···

আজ সাঁঝের হাওয়ায় খবর ভেসে এলো—বিদেশী এসেছে! এখানকার আব-হাওয়ার মলা যার মনে লাগেনি —সে এসেছে কল-কোলাহলের মাঝখান থেকে—জীবনের পিপাসা বয়ে!···

মনে হলো, যেমন করে পারি, এ কারা ছেড়ে চলে যাবো—যাবো সেই বিদেশীর কাছে! দেখবো, তার জীবনের সে-পিপাসা কতখানি—কিসে তা নিবারণ হয়! এই পিপাসা নিয়ে আমিও বসে আছি!···তারপর কি কষ্টে পথে বার হলুম—বাগানের ঐ মেহদির বেড়া দুমড়ে ভেঙ্গে···বুকে কি কাঁপন জেগেছিল···

পথে বাহিরের বাতাস গায়ে লাগলো। সব ভয় ঘুচে গেল! জন্ম-জন্মান্তরের যে বদ্ধ বাতাস দেহে-মনে লেগেছিল, তা কোথায় গেল সরে! নতুন বাতাস গায়ে লাগলো। সে বাতাসে প্রাণে কি সাহসই পেলুম! লজ্জা-সরম চকিতে সব বিদায় নিলে! পথে চলতে বুঝলুম, আমি চিরদিনের সে লজ্জা-জড়িতা ভীতা কিশোরী নই—আমি আজ সাহসিকা!···শুনবে? গান শুনবে? কিন্তু কেন তুমি এমন নীরব? কেন এমন মলিন? ম্লান? শোনো, গান গাই। সে গানে তোমার বুকের পাষাণ খশে যাবে! এ গান শিখেছি তোমাকে শোনাবো বলে'···!

কিশোরী গান ধরিল। বক্ষ-বসনের মধ্য হইতে বাহির করিল ছোট একটি এস্রাজ। তাহাতে ঝঙ্কার তুলিয়া সে গান ধরিল। সে গানে···

সহসা পাশে তীব্র কর্কশ পরুষ-কণ্ঠ! এস্রাজের সুর কাটিল। গান থামিল।···

চমকিয়া চাহিয়া দেখি, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী—কোমরে খাপ আঁটা—হাতে খোলা তলোয়ার—এক জুয়ান প্রহরী!

আমি চীৎকার করিলাম। কিশোরী কহিল—পালিয়ে এসো…

কিশোরী আমার হাত ধরিয়া ছুটিল। আমি যেন তার সঙ্গে আঁটা, বাঁধা!

কানন-পথে ছুটিলাম। আঁকা-বাঁকা পথ—পুষ্প-কুঞ্জ দিয়া, বন-তল ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া…

পথের শেষ নাই—চলারও শেষ নাই

অবশেষে মাথায় বাজিল তীব্র আঘাত! আর্ত্তনাদ তুলিয়া পড়িয়া গেলাম। কাণে বাজিল শুধু একটি স্বর—কিশোরীর অশ্রুবেদনা-জড়িত মিষ্ট আকুতি—ওগো, না গো, না… আমার দয়িত…আমার প্রিয়তম…

তার পর সমস্ত দুনিয়া প্রবল দোলায় নামিয়া চলিল অন্ধকার পাতালের গহ্বরে! রাশি রাশি অন্ধকারে দুনিয়ার সব আলো নিবিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল!…

চোখ চাহিলাম—কোথায় আমার সে কিশোরী পিয়ারী!…ডাকিলাম,—পিয়ারী…

কে বলিল—চুপ! কথা কয়ো না।

আমি তার পানে চাহিলাম। বেশ-ভূষায় চিনিতে বাকী রহিল না—ফৌজের ডাক্তার।

আমি কহিলাম—সে কোথায়?

ডাক্তার বলিল—সে! তার মানে, কে?

কহিলাম—আমার পিয়ারী…আমায় যে বলেছিল, দয়িত…প্রিয়তম!

ডাক্তার কহিলেন,—তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না। তুমি একা ছিলে।

একা! চক্ষু মুদিলাম। ব্যথায় বুক ভরিয়া গেল। নিশ্চয় সেই শয়তান তাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে! সেই পাষাণ-কারায় বন্দী করিয়াছে! দুঃখিনী—চির-দুঃখিনী!

আমি ডাকিলাম,—ডাক্তার সাহেব…

ডাক্তার কহিলেন,—কেন?

কহিলাম,—তার উদ্ধার হয় না?

—কার?

কহিলাম—সে বড় কষ্টে আছে! তাকে বন্দী করে রেখেছে! সে বশরার হুরী! কাব্যে-গানে-গল্পে তার কথা শুনে আসচি। আজ চোখে তাকে দেখেচি—কাণে শুনেচি তার দুঃখের কথা! আজ সে চায় মুক্তি!

ডাক্তার সাহেব কহিলেন—তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ!

স্বপ্ন! আমি কহিলাম,—না, স্বপ্ন নয়! সেই হেনার গন্ধ—গোলাপের গন্ধ! সেই গান—এস্রাজ! সেই পাগড়ী—খোলা তলোয়ার!

ডাক্তার সাহেব কহিলেন—বেশী কথা কহিয়ো না! তোমার মাথায় ভারী চোট লাগিয়াছিল! বহু কষ্টে চেতনা ফিরিয়াছে। পনেরো দিন তুমি অচেতন আছ।

পনেরো দিন!…না! তাহা হইলে তার মুক্তির আশা নাই—এতটুকু না!—পনেরো দিন কারার যাতনা সহিয়া সে কি বাঁচিবে?…বিশেষ কারার গণ্ডী ছাড়িয়া বিদেশীর সঙ্গে সে পথে আসিয়াছিল!

•

সারিয়া হাসপাতাল ছাড়িতে আরো আমার পনেরো দিন লাগিল।

কয়দিন সকলকে মিনতি জানাইয়াছি—ঐ তালী-বনের পিছনে প্রাচীর-ঘেরা বশরা-সহর… সেখানকার প্রাসাদে বন্দিনী রূপসী…চির-দুঃখিনী…

হাসিয়া সকলে জবাব দিয়াছে। কোথায় বশরা,—বশরা এখান হইতে বহু বহু দূরে!

সে রাত্রে কোনো বিউগ্‌ল্ নাকি পলায়নের সঙ্কেত দেয় নাই! কেহ পলায় নাই! সে আমার স্বপ্ন! খেয়াল! বশরাই খেয়াল! সকালে উঠিয়া আমাকে ছাউনিতে পাওয়া যায় নাই! রাত্রে কি খেয়ালের ঘোরে উঠিয়া উটের পিঠে চড়িয়া বনের পথে বাহির হইয়াছিলাম! বনে কেমন বেটক্করে উটের পায়ে আঘাত লাগে—উট পড়িয়া প্রাণ দিয়াছে! আমিও সে সময় উটের পিঠ হইতে পড়িয়া মাথায় জখম পাইয়া নাকি অচেতন পড়িয়াছিলাম! একদল ফৌজ প্রাতে সে পথে ফিরিতে আমায় দেখিয়া পথ হইতে তুলিয়া আনিয়াছে…

যে কথা যে বলুক, আমি তা বিশ্বাস করি না। সে উপলব্ধি...রাত্রে মশালের সেই তীব্র ঝলক...কামানের মুখে সেই বিকট গর্জ্জন—তারপর নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষে তাল-খেজুর-বনের অন্তরালে সেই বশরার আকাশ-বাতাস, পথ-ঘাট-কানন-প্রাসাদ! সরাইয়ে সেই আলোর মালা—নাচ-গান, সিরাজীর লীলা! আর সেই কিশোরীর রূপের প্রভা—তার সে ব্যথার গান—চির-বন্দিনী নারীর মুক্তির জন্য সেই আকুলতা...তার সেই স্পর্শ...

আজো আমার শরীরে রোমাঞ্চ জাগে!...

ছাউনির লোক বলে—বাঙালী জাত কবি! তাই বশরার নামে হুরীর স্বপ্ন দেখিয়াছি! সে বশরা কি আজো আছে? চিমনী-কল, বাস-ট্রামের ঘড়ঘড়ানিতে তার সে স্বপ্ন টুটিয়া গেছে! এখনকার বশরা আমাদেরি এই কলিকাতার মত...সেখানে এখন হুরী নাই—হেনা-গোলাপের কারবার নাই! গুণ্ঠন-তলে কিশোরীর চোখে সে বিলোল চাহনি নাই—সে বিজন-পথ নাই! আছে শুধু আইন, পুলিশ, কোর্ট, টাকা, পয়সা, জেলখানা!...

তবু মন আমার সে কথায় সায় দেয় না!...

উদয় বাবু চুপ করিলেন।

জ্যোৎস্নায় পৃথিবী স্বপ্নময়ীর বেশে সাজিয়া উঠিয়াছে। আমাদের কাহারো মুখে কথা নাই! মনে হইতেছিল, সামনে ঐ অনিবিড় পুষ্পকুঞ্জের আড়ালে সত্যই যেন দাঁড়াইয়া আছে উদয় বাবুর সেই ছায়াময়ী নায়িকা... বন্দিনী নারী...মুক্তি-পিয়াসিনী!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গাঁয়ের ছোট্ট নদী

গাঁয়ের ছোট্ট নদী
দক্ষিণ ধারে ক্ষীণধারা হয়ে চলিয়াছে নিরবধি।
নাই তার সেই উচ্ছল গতি, কুলু কুলু সুরে গীতি;
নাই তার বুকে পাল-দেয়া-নাও ভাটিয়ালে যেতে নিতি।
আজি চলে সেথা 'ঘাসি-কাটা-কুশী' ছেলেদের ছোট ভেলা-
জীর্ণ হয়েছে পুরাতন রূপ, করে সবে তাই হেলা।
যবে ছিল তার নূতন বয়স, গতি ছিল খরধার
ঘাটেতে লাগিত নৌকার ভিড়—উচ্ছল দেহভার।
প্রতি সাঁঝে সেথা লাগিত দেয়ালি, নদীতে পড়িত ছায়া,
লাগিত সেথায় উৎসব নিতি, বাড়া'ত জলের মায়া।
জেলে সেথা ভোরে 'খরা' পাতি একা বসিত মাচার পরে-
বক-চিলেদের মহা উল্লাস, মাছ যবে জালে পড়ে।
তার পথে নিতি ভরা সাঁঝ-বেলা পল্লীবালার হাতে
বাজিত কাঁকণ, মিশিত সে গান কুলু কুলু গতি সাথে।
বাজিত মধুরে রাখালের বেণু প্রাচীন বটের ছায়,
বহি যেতে সুর দূরে অতিদূরে নদীর 'জলোয়া বায়'।
যে গহীন জলে মাঝিদের 'লগি' নাহি পেত কভু থাই,
সেথা আজি মেলে কচুরীর ফুলে রূপের পসরা ভাই।
যে নদীর জলে পারাপার হ'তে লাগিত লোকের খেয়া,
হাঁটুজল ভাঙি' পার হয় সবে নাহি লাগে কড়ি দে'য়া।
হাট শেষ করি' নদীঘাট মাঝে দোকানী না ব'সে থাকে
'কোথায় মাল্লা, এ পারেতে এস' আর নাহি কেউ হাঁকে।
নদীর কাহিনী স্মরি'
হৃদয়েতে জাগে উদ্বেল শোক রাখিতে না পারি ধরি'।
হাওরের ডাকু কেনারাম যেথা আসিত পিপাসা লয়ে,
সেই "রাজী" নদী ক্ষীণধারা আজি, আছে শুধু র'য়ে র'য়ে।
নদীদের মাঝে ছিল গরবিণী, নাম 'রাজরাজেশ্বরী'
আজি শুধু 'রাজী গাঙ' সে যে, লোকে নাম গেছে বিস্মরি'।
আজি শুধু সে যে চলিয়াছে ধীরে, শতেক দুঃখ বুকে
হেলায় তাহার জীবন-যাত্রা, নাহি দেখে তায় লোকে।
সেই কথা ভাবি' মনে
গাহিছে কবিরা শোক-গীতি তার একতারা সুর সনে।

শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী।

বিচিত্র পকেটল্যাম্প

জার্ম্মাণীতে এক প্রকার পকেটল্যাম্প বাহির হইয়াছে, উহা নানা কাযে ব্যবহৃত হয়। এই ল্যাম্প বন্ধনীর দ্বারা ললাটে আবদ্ধ করিলে, হাত দুইটি মুক্ত থাকে। ল্যাম্পের সহিত একটা রশ্মি-প্রতিফলনোদ্দীপক আয়না থাকে। তাহার সাহায্যে কতটুকু
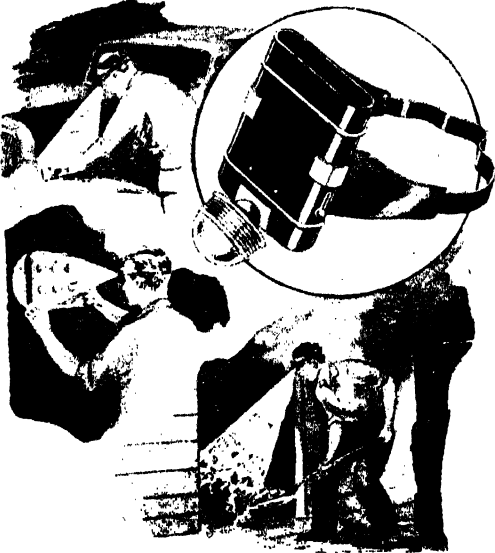
বিচিত্র পকেটল্যাম্প

আলোকের প্রয়োজন, তাহা নির্ণীত হয় এবং তদনুসারে আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। বন্ধনী অপসৃত করিলে পকেট-ল্যাম্পকে টেবল-ল্যাম্পে পরিণত করা যায়।

লক্ষ্যভেদ-শিক্ষায় কাগজের সেনাদল

জার্ম্মাণ সেনাদলের লক্ষ্যভেদ ব্যাপারের জন্য কার্ডবোর্ড-নির্ম্মিত নকল সেনাবাহিনী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বার্লিনের সন্নিহিত কোনও অরণ্যমধ্যে এই কার্ডনির্ম্মিত সৈনিকগণকে গাছের মধ্য দিয়া তারের দ্বারা পরিচালিত করা হয়। যখন নকল সৈনিকগণ বনের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইতে থাকে, সেই সময় জার্ম্মাণ সৈনিকগণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষেপ করিতে থাকে। ইহাতে লক্ষ্যভেদের খুবই সুবিধা।
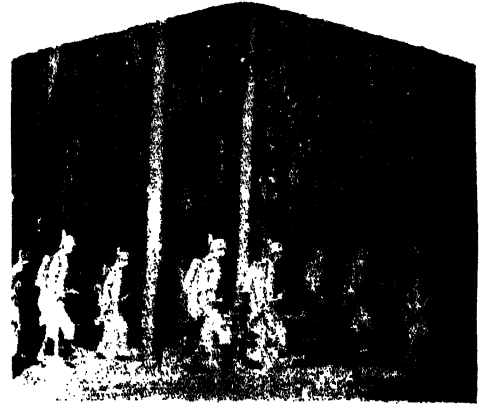
লক্ষ্যভেদে কার্ডবোর্ড-নির্ম্মিত সেনাদল

বিমানে হস্তিশাবক

একটি হস্তিশাবককে কনেকটিকট ব্রিজপোর্টে চালান দিবার কথা ছিল। জলযানযোগে ঐ শাবকটিকে নিউইয়র্কে প্রথমতঃ লইয়া

বিমানে হস্তিশাবক

আসা হয়। ক্রেনের সাহায্যে তথা হইতে তাহাকে একটি বিমানে নামাইয়া দেওয়া হয়। উক্ত বিমান হস্তিশাবকটিকে

নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়। ইহাতে শাবকটিকে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

সুইজারল্যাণ্ডে আল্‌পস্‌ পর্ব্বতমালার স্থানে স্থানে গুহার মধ্য দিয়া রেলপথ বিসর্পিত। গুহার দুই মুখে দ্বার আছে। পাছে তুষারপাতের ফলে গুহার বাহিরে তুষার স্তূপীকৃত হইয়া গুহার ভিতরে প্রবেশ করে, এজন্য উভয় মুখের দ্বার রুদ্ধ থাকে। বৈদ্যুতিক ট্রেণ যখন গুহার সন্নিহিত হয়, তখন আপনা হইতে দ্বার মুক্ত হয়। ট্রেণ চলিয়া গেলে আবার আপনা আপনি দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। রঙ্গীন আলোক দেখিয়া দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, তাহা বুঝা যায়। ট্রেণ যখন সন্নিহিত হয়, তখন দুই অশ্বশক্তি-যুক্ত মোটর কায আরম্ভ করে। তাহাতেই দ্বার মুক্ত

রুদ্ধদ্বার গুহামুখ ট্রেণের আগমনে খুলিয়া যায়

হয়। ট্রেণ চলিয়া গেলে মোটরের ক্রিয়া বন্ধ হয়, অমনই দ্বার রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

পুতুলের বাড়ী

ক্যালিফোর্ণিয়ার কোনও ভদ্রলোক অবসরকালে একটি পুতুলের বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পুতুলের বাড়ীটি দেখিতে চমৎকার। এই বাড়ী সাধারণ কাগজের বা কার্ডবোর্ডের নির্ম্মিত নহে। প্রকৃত বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে যে সকল মাল-মশলা লাগে, তাহারই সাহায্যে তিনি এই বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বাড়ীতে বিদ্যুতের আলোকের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত আছে। প্রত্যেক কক্ষ কাগজের দ্বারা সুশোভিত। টালির স্নানাগার, সিমেণ্টকরা মেঝে, দরজা, জানালা সবই আছে। দ্বার ও বাতায়নগুলি ইচ্ছামত খোলা যায়, রুদ্ধ করা হয়। ঘরের মধ্যে তাক আছে, গ্যারেজ আছে এবং কুকুরের ঘর পর্য্যন্ত বিদ্যমান। উক্ত ভদ্রলোক তাঁহার শিশু-কন্যার জন্য উহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। বাড়ী দুই বৎসরে সমাপ্ত হয়। এখন সে কন্যা বড় হইয়াছে। ভদ্রলোক এইরূপ অনেকগুলি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পুতুলের বাড়ী

চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

সানফ্রান্সিস্কো থিয়েটারের প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র অভিনেতাদিগের মুখাবয়বের অনুকরণে কার্ডবোর্ডনির্ম্মিত মুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুণ্ডগুলি অভিনেতাদিগের

চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

স্বাভাবিক বর্ণানুলেপে অনুরঞ্জিত। ঐ বৃহৎ মুণ্ডধারণ করিয়া পথে লোকজন বাহির হইয়া থাকে। মুণ্ডের গলদেশের কাছে রঙ্গীন পাতলা কাপড় এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, তাহার মধ্য দিয়া মুণ্ডধারীরা অনায়াসে সমস্তই দেখিতে পায়। কাযেই তাহাদের চলাফেরার কোনও অসুবিধা হয় না।

কেরোসিন টিনে সুরতরঙ্গ

ইন্দোচীনে ভ্রমণ করিতে গিয়া কোন কোন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী এক প্রকার অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র দেখিয়াছিলেন। একটি কেরোসিন টিন ফুটা করিয়া তাহাতে একতারা-জাতীয় তারের যন্ত্র বসাইয়া পথভিক্ষুকগণ সুরোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাতে যে সুর-তরঙ্গের উদ্ভব হয়, তাহা পাশ্চত্য ভ্রমণকারীর কর্ণপীড়া উৎপাদন

কেরোসিন-টিন-নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র

করে না, বরং তাহা শুনিয়া মন মুগ্ধ হয়। ভিক্ষুক এই গৃহজাত যন্ত্র বাজাইয়া অন্ন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যন্ত্রটি কিন্তু বিচিত্রদর্শন। ছবি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

গ্যারেজের উপর পুরাতন মোটর গাড়ী

নিউ ইয়র্কের কোনও গ্যারেজের মালিক তাঁহার কারখানার ছাদের উপর একখানি পুরাতন মোটর গাড়ী রাখিয়া দিয়াছেন।

ছাদের উপর মোটর গাড়ী

পথ চলিবার সময় মোটর গাড়ীর মালিকগণ অর্দ্ধ-মাইল দূর হইতে উহা দেখিতে পাইয়া থাকেন। কৌতুহলবশে তাঁহারা দোকানের নিকট আসিয়া থাকেন। ইহাও বিজ্ঞাপনের অন্যতম কৌশল।

ক্ষুদ্রকায় এঞ্জিন-চালিত পোত

অরিগনএ ক্ষুদ্রকায় বোট নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে মোটর বসান হইয়াছে। এই মোটরের শক্তি, একটি অশ্বের শক্তির চারি

ক্ষুদ্রকায় এঞ্জিনচালিত পোত

ভাগের এক ভাগ। বড় বড় নৌকা এই মোটর-বোটের সহিত রজ্জু-সংলগ্ন করিয়া দিলে উহা তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। উল্লিখিত ক্ষুদ্রকায় মোটর বোটের ওজন প্রায় ১২ সের। সুতরাং উহা সহজে বহন করাও চলে।

সঙ্করজাতীয় মহিষ

কানাডার সরকার উত্তর-প্রদেশের জন্য, গৃহপালিত গাভী ও পুং-মহিষের সমবায়ে এক প্রকার সঙ্করজাতীয় পশু উৎপাদনে

সঙ্করজাতীয় মহিষ

মনোনিবেশ করিয়াছেন। উত্তরাঞ্চলে এই শ্রেণীর পশু বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া এই ব্যবস্থা। প্রচুর দুগ্ধ এবং শীতকালে মাংস ভোজনের ইহাতে সুবিধা হইবে। গাভী ও পুংমহিষের সংশ্রবের ফলে যে পশু শিশুর উদ্ভব হইতেছিল, তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হওয়ায় যাক ও মহিষের সংশ্রবে স্বতন্ত্র পশুর সৃষ্টি হইতেছে। এই পশুর নামকরণ হইয়াছে "ক্যাটালো।"

বিমানবিহারীর অগ্নি-নিবারক পরিচ্ছদ

ফ্রান্সে বিমানবিহারীদিগের জন্য একপ্রকার অগ্নিনিবারক ও জলে ভাসিবার উপযোগী পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইয়াছে। মাথার টুপী ও

বিমানবিহারীর অগ্নি-নিবারক পরিচ্ছদ

গায়ের কোট আগুনে পুড়িবে না। পাজামা এমনভাবে নির্ম্মিত যে, ঘটনাক্রমে বিমানবিহারী যদি জলে নিপতিত হন, তাহা হইলে ঐ পোষাকের গুণে তিনি জলে ভাসিয়া থাকিবেন।

বিজ্ঞাপনের কৌশল

ফ্লোরিডার কোনও গৃহসজ্জার দোকানের ছাদের উপর একখানি অতিকায় চেয়ার সংস্থাপিত আছে। এই চেয়ারখানির উচ্চতা ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৪ ফুট। বসিবার স্থান হইতে চেয়ারের পদচতুষ্টয়ের গভীরতা ১২ ফুট। চেয়ারখানি সাইপ্রেস কাষ্ঠ হইতে কুঁদিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। গৃহসজ্জার বিজ্ঞাপনে সহায়তা করিবে বলিয়া দোকানের মালিক ছাদের উপর ঐ অতিকায় চেয়ার স্থাপন করিয়াছেন।

অতিকায় চেয়ার

বিচিত্র আকারের শিশি

কনেক্টিকটের এক ভদ্রলোক গত সাত বৎসর ধরিয়া নানা আকারের শিশি সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক শিশি
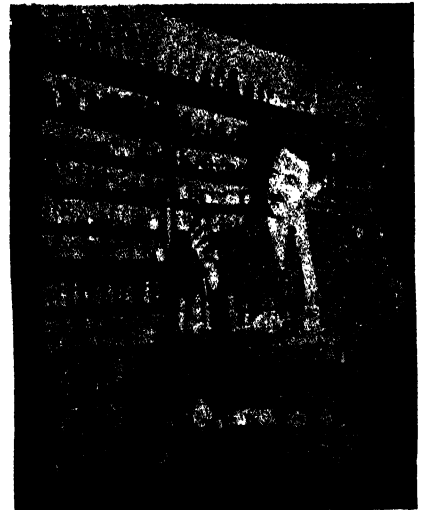
বিচিত্র আকারের শিশি

৪ আউন্সের এবং একটির সহিত অপরটির আকারের কোনও সাদৃশ্য নাই। এইভাবে তিনি ৮ হাজার শিশি সংগ্রহ করিয়াছেন।

সবাক্ চিত্র

৩

শব্দ ও শব্দ-যন্ত্রী

বহু বৎসরের পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞগণ কেমন করিয়া শব্দ-রহস্যের সমাধানে সমর্থ হইলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ফনোগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার হইতে শব্দ আসিয়া ফিল্মে স্থান লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আসলে ফিল্মের উপর ইহার আসন নির্দ্দেশ করিয়াছে গ্রামোফোন-রেকর্ড।

শব্দের যে স্পন্দন আছে, ইহা আজ কাহারও অবিদিত নয়। যে কোন প্রকারের শব্দ হউক, তাহার স্পন্দন হইবেই। টেবলের উপর হাতুড়ীর আঘাত করিলে কিংবা পেষ্টবোর্ড টানিয়া ছিঁড়িলে শব্দের স্পন্দন উঠে। যে কোন দ্রব্যের উপর শব্দ করিলেই শব্দের স্পন্দনগুলি প্রতি সেকণ্ডে প্রায় ষোলবার বদ্ধ হাওয়ার উপর ধাক্কা দেয়; এই স্পন্দনগুলিকে ধরিতে পারিলে 'ভাল্‌ভ্‌ এ্যামপ্লিফায়ার'-সাহায্যে খুব উচ্চ করিয়া সকলকে তাহা শুনাইতে পারা যায়। কিরূপে ইহা ঘটে বলিতেছি।

নিম্ন শব্দের (low sound) গতিকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে একটা মাত্র চোঙ্গার প্রয়োজন। ষাট ফুট লম্বা, পেন্সিলের মত সরু একটা চোঙ্গার ভিতর হইতে শব্দকে বাহির করিলে তাহা শ্রোতার কাণে শুনাইবে ব্যাঙের বাদ্যের ন্যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি তাহাই হয়, তবে সরু মোটা নানা প্রকার চোঙ্গা হইলেই কি প্রয়োজনীয় শব্দ উৎপাদন করা যাইবে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, না, তাহা অসম্ভব বলিয়াই ভাল্‌ভ্‌-এ্যামপ্লিফায়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাল্‌ভ এ্যামপ্লিফায়ারের কি কায? ইহার দ্বারা শব্দকে বর্দ্ধিত এবং কর্কশ শব্দকে শ্রুতিমধুর করা যায়।

কোন সঙ্গীত বা বাদ্যের ধ্বনিকে ধরিতে চাহিলে তাহার স্পন্দনের গতি বর্দ্ধিত হইবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শব্দের স্পন্দন প্রতি সেকণ্ডে প্রায় এক হাজার হইতে আট হাজার পর্য্যন্ত; কাযেই শব্দ-যন্ত্রীকে হুঁশ রাখিয়া শব্দ-যন্ত্র পরিচালনা করিতে হইবে।

এক জন ব্যক্তির পক্ষে শব্দের সমস্ত স্পন্দন আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য; সেজন্য বহু সময় শব্দ-যন্ত্রীকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শব্দের অর্থ বুঝিয়া লইতে হয়। বেতারে সঙ্গীত শুনিবার সময় কেহ বলিতে পারেন না যে, তিনি সেই সঙ্গীতের সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছেন।

রেকর্ডিং শব্দের গুরুত্ব ও গতি
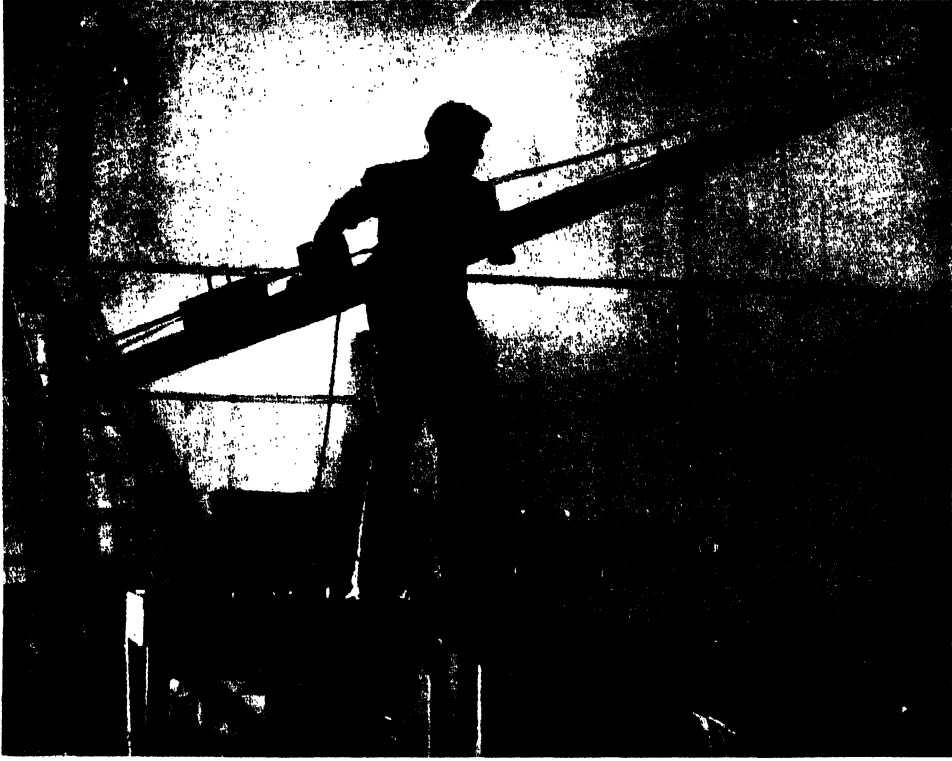
শব্দ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বাবস্থা

বুঝিতে হইলে তাঁহাকে কোন কোন স্থানে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ-অপারেটর অনেক স্থলে অনুমান করিয়া শব্দের অর্থ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন; সুতরাং বোধগম্য ভাষায় শব্দ গ্রহণ করিলে শব্দ-যন্ত্রীর কাযের সুবিধা হয়। কেন না, শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য কাণ-দুইটা তাঁহার মস্তিষ্ককে সাহায্য করিয়া থাকে।

আলোক-রশ্মি অথবা বৈদ্যুতিক স্পন্দনের কোন গুরুত্ব নাই। এই দুইটা জিনিষকে ইচ্ছামত কম-বেশী করা যাইতে পারে। মাইক্রোফোনের বার্ত্তাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে নিয়মানুযায়ী এ্যামপ্লিফায়ারের ভিতর লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আবার আলোকে পরিবর্ত্তন করিয়া একটা চুলের মত ছিদ্র এবং কয়েকটি ছোট লেন্সের ভিতর দিয়া ফিল্মের উপর ফেলা হয়। ইহাতে ফিল্মে যে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম আলোক-রশ্মি পড়ে, রসায়নাগারের কায শেষ হইলে সেগুলিকে দেখিতে হয় গাঢ়, লঘু প্রভৃতি নানা প্রকার চুলের অনুরূপ। ইহাই হইল সাউণ্ড-রেকর্ড বা সাউণ্ড-ট্রাক।

সাউণ্ড-ট্রাক আবার বহু প্রকারের হইয়া থাকে। তাহা হইলেও উপস্থিত দুই রকম সাউণ্ড-ট্রাকের প্রচলন হইয়াছে। আমেরিকার রেডিয়ো কর্পোরেসন যে-প্রণালীতে ফিল্মের উপর শব্দ গ্রথিত করেন, তাহার নাম 'ভেরিয়েবল্ এরিয়া' (variablo area) এবং ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক কোম্পানী যে ধারায় কায করিয়া থাকেন, তাহার নাম 'ভেরিয়েবল্ ডেন্‌সিটী'। ইহা ছাড়া ফক্স-মুভিটোন, রেডিয়ো ইন্সটলেসন কোম্পানীর শব্দ-গ্রহণের পদ্ধতি ওয়েষ্টার্ন ইলেকট্রিক হইতে বিভিন্ন হইলেও তাহা 'ভেরিয়েবল্ ডেনসিটী'। ভেরিয়েবল্ এরিয়ার মত 'ফিইডলেটোন্' শব্দ তুলিবার নিয়ম নাকি অতি চমৎকার!

ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক কোম্পানীর শব্দ-যন্ত্রের গূঢ় রহস্য এই যে, তাঁহারা ম্যাগনেটের সহিত সংযুক্ত একটা তারের দ্বারা রেকর্ডিং-আলোকের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; মাইক্রোফোনের বৈদ্যুতিক-বার্ত্তা এ্যাম্‌প্লিফায়েড হইয়া আসিয়া ম্যাগনেটের দুই দিকে সংযুক্ত তারে গিয়া ধাক্কা দিবার ফলে তাহা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া থাকে; ইতিমধ্যে

একটা সরু চুলের ন্যায় শ্লিটের (slit) মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি আসিয়া ফিল্মের উপর পতিত হয়।

সরু মেকানিক্যাল শ্লিটের মাপ হইতেছে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ। কোন রকম ধূলিকণা কিম্বা ময়লা রেকর্ডিং আলোকের পথ রুদ্ধ করিতে পারে বলিয়া তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বড় শ্লিটের মধ্য দিয়া রেকর্ডিং আলোকে objective লেন্সের সাহায্যে ছোট করিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য শব্দগ্রহণের কাযে আর কোনরূপ বাধা জন্মিতে পারে না এবং এই কারণ-বশতই অন্যান্য কোম্পানী অপেক্ষা ওয়েষ্টার্ণ ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর শব্দগ্রহণ করিবার পদ্ধতি নিখুঁত, নির্দ্দোষ।

মুখে কম্পমান লুপ থাকিবার দরুণ আলোকের সরু সরু লাইনগুলি বাহির হইয়া আসে।

ফক্স মুভিটোন্ রেকর্ডিং পদ্ধতি 'ভেরিয়েবল্ ডেন্সিটি'র ন্যায় হইলেও শ্লিটের মধ্য দিয়া একটা কম্পমান আলো-কের সাহায্যে ফিল্মের উপর শব্দ গ্রথিত করা হয়। তাঁহারা এই আলোকের নাম দিয়াছেন 'Aeo Light.' এই আলোকের ভিতর একপ্রকার গ্যাস দেওয়া আছে। যখনই মাইক্রোফোন হইতে বার্ত্তা আসে, তখন আলো একবার নিবিয়া যায়; পরমুহূর্ত্তে আবার তাহা জ্বলিয়া উঠে। সেই জন্য অল্পাধিক মাত্রায় আলোক-রশ্মি কয়েকটি লেন্সের ভিতর দিয়া ফিল্মের উপর গিয়া পড়ে।

SOUND RECORDING BY WESTERN ELECTRIC SYSTEM
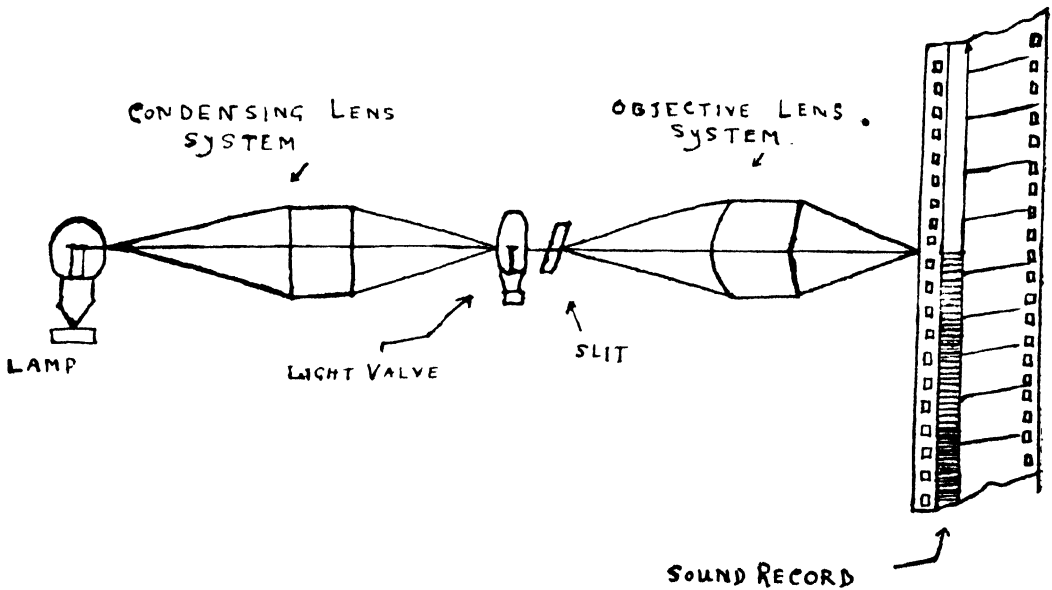
বামদিকে ১৮ এম্পের চিত্র-প্রক্ষেপণ যন্ত্রের আলোক রহিয়াছে; উহা কন্‌ডেন্সিং-লেন্সের (Condensing-Lens) ভিতর দিয়া লাইট-ভাল্‌ভের উপর পতিত হয়, এবং তাহা হইতে শ্লিট ভেদ করিয়া আলোক-রশ্মি গিয়া পড়ে Objectve লেন্সের মধ্যে।

মাইক্রোফোনের বার্ত্তা এ্যামপ্লিফায়েড হইয়া আসিয়া লাইট-ভাল্‌ভের আলোকে কম-বেশী করে; উপরন্তু শ্লিটের

মিক্সার (Mixer) হইতে মাইক্রোফোনের বার্ত্তাকে প্রেরণ করা হয় '৮সি' এ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে। তার পর ব্রীজিং-এ্যামপ্লিফায়ার হইতে তাহাকে চালাইয়া দেওয়া হয় Aeolight কন্‌ট্রোল-প্যানেলের ভিতর।

রেডিয়ো কর্পোরেসনের শব্দগ্রহণ-পদ্ধতিতে যথেষ্ট তার-তম্য আছে। ইঁহারা ম্যাগনেটের সহিত সংযুক্ত তারের
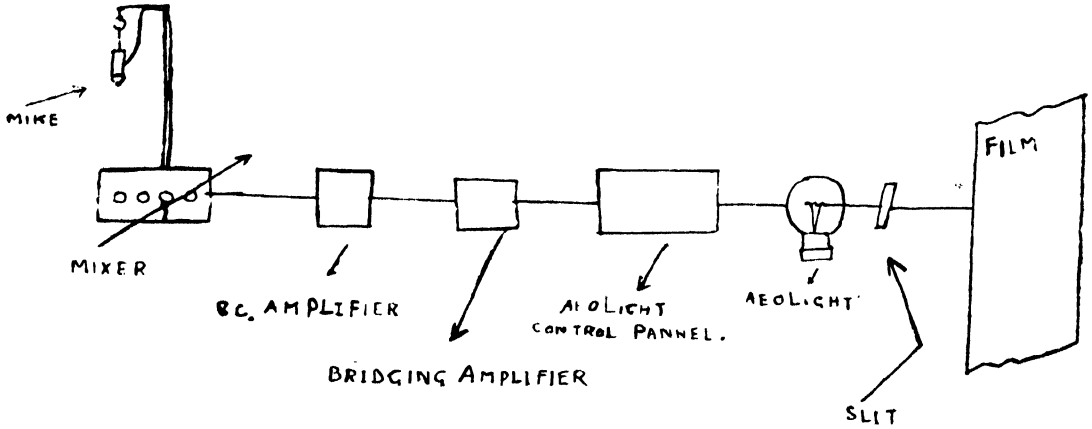
মধ্যে সুকৌশলে একটা আয়না বসাইয়া দিয়াছেন। আয়নার অপর দিকে একটা আলো জ্বলিতে থাকে। এ্যামপ্লিফায়ার হইতে বৈদ্যুতিক-স্পন্দন গিয়া ম্যাগনেটের তারে ধাক্কা দিলে আয়নাটি নড়িতে থাকে ও কয়েকটি লেন্স এবং শ্লিটের ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি ফিল্মের উপর আসিয়া পতিত হয়। এই কারণে শব্দের রেখাগুলি দেখিতে হয় চিরুণীর দাঁতের মত এবং ইহাকেই 'ভেরিয়েবল এরিয়া'র শব্দ-গ্রহণ-পদ্ধতি বলা হয়
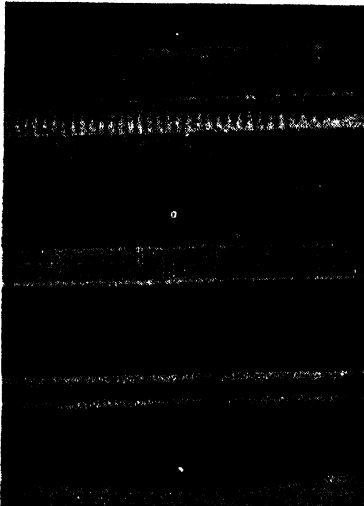
তিনপ্রকার শব্দের ট্রাক। আর-সি-এ, ওয়েষ্টার্ণ ও ফিইডলেটোন

গ্যাসভরা আলোক-রশ্মি 'ডবল্ কন্‌ভেক্স কন্‌ডেন্সিং লেন্সের' (Double Convex Condensing Lens) ভিতর দিয়া আসে আয়নার উপর (ক হইতে খ দ্রষ্টব্য)। আয়নার সহিত ভাইব্রেটর সংযুক্ত করা আছে। উহাতে আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া উল্টা দিকে কয়েকটি লেন্স ও শ্লিটের মধ্যভাগ দিয়া আসিয়া মাইক্রোসক্রোপ (Microscope) লেন্সে পড়িয়া সূক্ষ্ম হইয়া যায় (খ হইতে গ দ্রষ্টব্য)।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এ্যামপ্লিফায়ার হইতে বৈদ্যুতিক-স্পন্দন আসিয়া ভাইব্রেটরকে ধাক্কা দিবার ফলে আয়নাটি একবার আগাইয়া আসে, আবার তাহা পিছাইয়া যায়; এই জন্যই শব্দের রেখাগুলি চিরুণীর দাঁতের ন্যায় দেখিতে হয়। ওদিকে এ্যামপ্লিফায়ারের অপর বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রজ্বলিত আলোক-রশ্মিপাতকে কম-বেশী করিয়া দেয়।

প্রত্যেক ফিল্ম-ষ্টুডিয়োতে সবাক-ছবি তুলিবার সময় দুইটা করিয়া ক্যামেরা ব্যবহার করিবার রীতি আছে। একটা চিত্র-ক্যামেরা, অপরটা সাউণ্ড-ক্যামেরা। কিন্তু কখনো কখনো একই সময়ে মাত্র একটা ক্যামেরার সাহায্যে ছবি ও শব্দ দুই তোলা হয় বটে; কিন্তু তাহাতে কায ভালো হয় না। সাধারণতঃ 'নিউজ্ রীল' তুলিবার সময় একটা ক্যামেরায় শব্দ ও ছবি তোলা হয়।
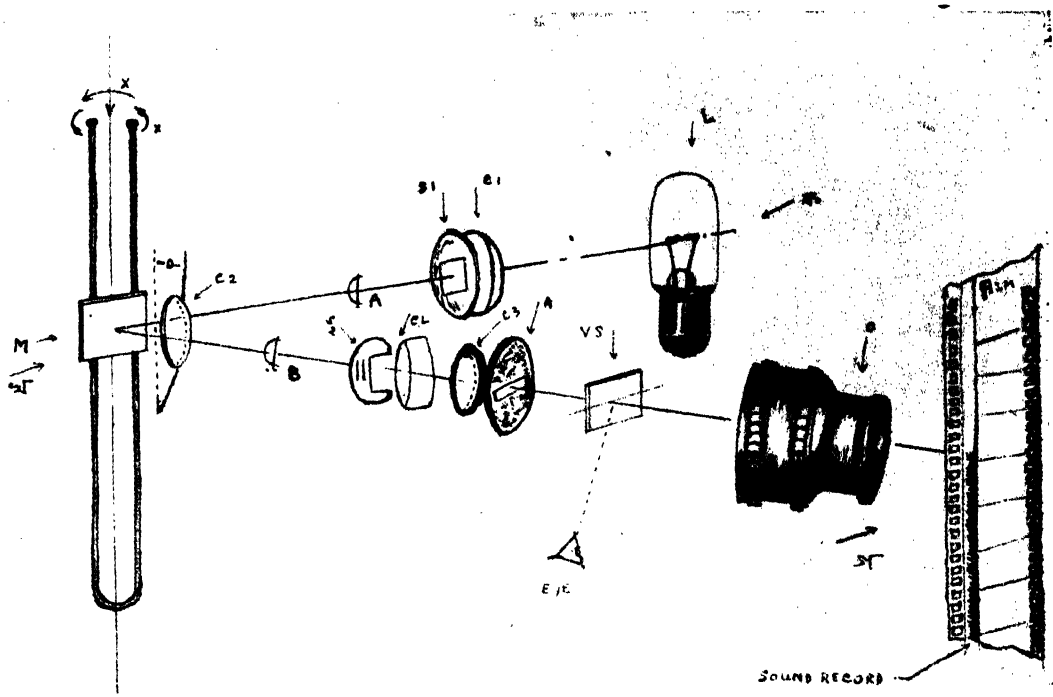
আর, সি, এ ফটোফোনের শব্দ-গ্রহণপদ্ধতি

চিত্র-ক্যামেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিকটে থাকে, কিন্তু শব্দগ্রহণ করিবার ক্যামেরা থাকে বহু-দূরে। তাহাকে নড়াইবার উপায় নাই, নড়াইলে শব্দ তুলিবার সময় বহু গলদ্ দেখা দিবে। ইহা ছাড়া, যাহাতে কোন রকম পারিপার্শ্বিক শব্দ আসিয়া না পড়ে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

শব্দের স্পন্দনগুলি মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়া প্রথমেই শব্দ-ক্যামেরায় আসিয়া পৌঁছায় না; মাঝপথে অন্যান্য কয়েকটি যন্ত্রের মধ্য দিয়া স্পন্দনগুলিকে বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া শব্দ ক্যামেরায় প্রেরণ করা হয়। দুইটা ক্যামেরা একসঙ্গে সম-গতিতে চলিতে থাকে।

সবাক-চিত্রের প্রথম যুগে এমন শক্তিহীন মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হইত যে, তাহাতে নট নটীদের স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিয়া অভিনয় করিবার উপায় ছিল না। অনেক স্থলে রেকর্ডিং হইত খারাপ। তার পর শক্তিশালী মাইক্রো-ফোন সৃষ্টি হওয়া অবধি এ অসুবিধা দূর হইয়াছে।

চিত্র-ক্যামেরা ও শব্দ-গ্রহণ করিবার ক্যামেরা

শব্দযন্ত্রীর অপর নাম মনিটর (Monitor)।

মনিটর একটা কাচের ঘরে বসিয়া শব্দ ও অভিনেত্রীবর্গের কণ্ঠস্বরগুলিকে একত্র করিয়া শব্দ-ক্যামেরায় পাঠাইয়া দেন।

অভিনেতা-অভিনেত্রীকে শেটের
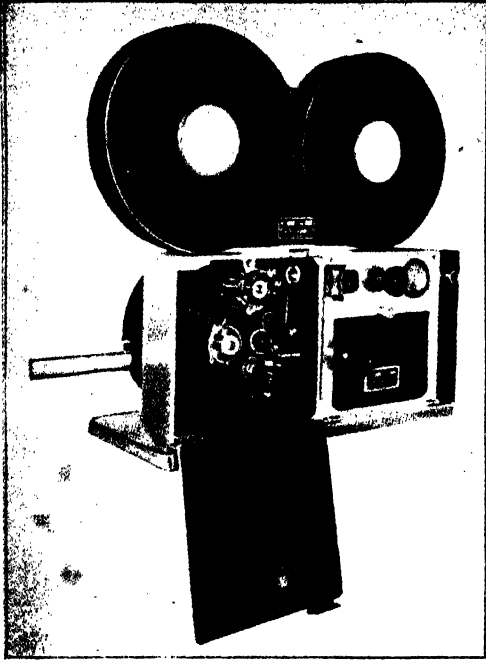
শব্দ গ্রহণ করিবার ক্যামেরা

ভিতর ইচ্ছানুযায়ী চলা-ফেরা করিয়া অভিনয় করিতে দিলে শব্দ-যন্ত্রকে অনেকগুলি মাইক্রোফোন ব্যবহার করিতে হয়। একটা সুসজ্জিত কক্ষের দৃশ্যে ছবির ফ্রেম, ফুলদানি বা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সব আসবাবপত্র দেখিতে পাওয়া যায়, আসলে সেগুলি হয়তো এক-একটা মাইক্রোফোন।

মোটের উপর অভিনেতা যেখানে যাইবেন, তাহার খুব নিকটবর্ত্তী কোন না কোন স্থানে মাইক্রোফোন রাখা চাই। প্রত্যেক মাইক্রোফোনের পৃথক সুইচ আছে। শব্দ-রেকর্ড করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনিটরকে সতর্ক হইয়া দেখিতে হইবে, এই মাইক্রোফোনের সুইচ ঠিকমত খোলা হইয়াছে কি না।

কোন স্থলে অভিনেত্রী হয়তো হল ঘরের ভিতর অভিনয় করিতে করিতে সিঁড়ির উপর উঠিয়া কথা বলিতে সুরু করিলেন। এরূপ দৃশ্যে তিন-চারিটা মাইক্রোফোন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

সবাক-চিত্রের যুগে নট-নটীদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্পদ, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর। চিত্র-শিল্পী ইচ্ছা করিলে যেমন সুন্দরী অভিনেত্রীকে কুরূপা করিয়া দিতে পারেন, তেমনই যে কোন সুন্দরী অভিনেত্রীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরকে বিশ্রী করিয়া দিতে পারেন মিক্সার বা শব্দযন্ত্রী। তাঁহাকে 'ষ্টুডিয়োর দেবতা' বলিলেও ভুল হইবে না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে চিত্র-শিল্পী হইতে আরম্ভ করিয়া কাহারও কিছু করিবার উপায় নাই।

কোন্ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর কত 'পিচ্'এ (pitch) তুলিতে হইবে, অতি নিম্ন হইতে অতি উচ্চ কণ্ঠস্বর কেমন করিয়া শব্দ-যন্ত্রে পাঠাইতে হইবে, তাহা তাঁহাকে আন্দাজ করিয়া লইতে হয়, এবং এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

রিহার্সালের সময় শব্দ-যন্ত্রীর কায বাড়িয়া যায়। কোন্ দৃশ্যে কোথায় কিরূপে মাইক্রোফোন ঝুলাইলে নট-নটীদের কণ্ঠস্বর যন্ত্রস্থ করিবার সুবিধা হইবে, তাহার জন্য তাঁহার পরিশ্রমের অন্ত থাকে না। সন্দেহ হইলে তিনি

শব্দযন্ত্রী অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করিতেছেন

মাইক্রোফোনের দ্বারা সেই দৃশ্যের অভিনয় শুনিয়া থাকেন। চিত্র-পরিচালকের ন্যায় পূর্ব্বেই তাঁহাকে অভিনয়াংশ পড়িয়া রাখিতে হয়। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁহারা চিত্র-নাট্য-রসিক না হইলে উপায় নাই।

বেতারের গায়ক-গায়িকা ও অভিনেত্রীবর্গ সবাক-চিত্রের কাযে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া এক শ্রেণীর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অমনোনীত ও প্রত্যাখ্যাত হন। বেতার ষ্টেশনে গিয়া মাইক্রোফোনের নিকটে দাঁড়াইয়া গান গাহিবার ও অভিনয় করিবার যে সুবিধা আছে, ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে তাহা নাই। সময় সময় অভিনেত্রীবর্গের নিকট হইতে মাইক্রোফোন অনেকখানি তফাতে থাকে। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য কারণে গ্রামোফোন ও বেতারের নামকরা শিল্পিদল সবাক-চিত্রাভিনয়ে কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না।

চিত্রপ্রিয়রা আজকাল আলোক-চিত্র অপেক্ষা শব্দের প্রতি বেশী নজর রাখেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দ ও কথাবার্ত্তাগুলি শ্রুতিমধুর না হইলে আট কিংবা দশ খণ্ডে সমাপ্ত এক-খানি সবাক-চিত্র কেহ ধৈর্য্য-সহকারে বসিয়া দেখিবেন কি না সন্দেহ।

কুশলী চিত্র-শিল্পী কুৎসিত চেহারাকে সুন্দর করিতে পারেন, কিন্তু শব্দ-যন্ত্রী বিশ্রী কণ্ঠস্বরকে সুমধুর করিতে পারেন না। ইহা তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে। তবে অভিনেতা অভিনেত্রীর ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।

যে-কোন অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অভিনেতার কণ্ঠস্বর উচ্চগামী। একই দৃশ্যে উভয়ের কথাগুলি সমভাবে রেকর্ড করিলে শুনিতে শ্রুতিমধুর হইবে না। একটা শক্তিশালী মাইক্রোফোন হইলে অনেকটা স্থানব্যাপী শব্দ তুলিতে পারা যায়। কিন্তু ব্যাক্-গ্রাউণ্ড-মিউজিকের প্রয়োজন হইলে অন্যান্য শব্দকে ঈষৎ চাপ দিয়া ভিন্ন মাইক্রোফোনের সাহায্যে ব্যাক্গ্রাউণ্ড-মিউজিককে অভি-নেত্রীবর্গের কথার সহিত বিজড়িত করিয়া শব্দ-যন্ত্রে প্রেরণ করা হয়।

পূর্ব্বে শব্দ ও চিত্র-ক্যামেরাকে পাশাপাশি রাখিয়া যান্ত্রিক উপায়ে শব্দ-গ্রহণ করা হইত। শব্দ-ক্যামেরাকে দূরে রাখিলে শব্দ গ্রহণে অসুবিধা ঘটিত বলিয়া শব্দ-ক্যামেরাকে চিত্র-ক্যামেরার পাশ হইতে সরানো হইত না। ইহাতে চিত্র-শিল্পিগণ অসুবিধায় পড়িলেন। একই স্থানে ক্যামেরা বসাইয়া ছবি তুলিবার ফলে প্রত্যেক দৃশ্যগুলি অতি নীরস ও একঘেয়ে হইত।

এই অসুবিধার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্য লইলেন। চিত্র-শিল্পিগণেরও সুবিধা হইল। তাঁহারা ইচ্ছামত ক্যামেরার গতিকে পরিবর্ত্তন করিয়া ছবি তুলিতে লাগিলেন। শব্দ-ক্যামেরাকে ষ্টুডিয়োর এক নির্জ্জন কোণে শালগ্রাম-শিলার ন্যায় বসাইয়া রাখা হইল। বৈদ্যুতিক মোটরের দ্বারা একসঙ্গে চিত্র ও শব্দ-ক্যামেরা পরিচালিত হইতে লাগিল। একটা মোটর-ডাইনামো হইতে দুই বা ততোধিক ক্যামেরা অনায়াসে চালাইতে পারা যায়।

প্রত্যেক বড় বড় ফিল্ম-ষ্টুডিয়োতে এক দিনে অনেকগুলি ছবি তোলা হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট ছবির দৃশ্য অন্য কোন ছবির দৃশ্যের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন ছবির কোন দৃশ্যই অপর কোন ছবির সহিত মিশিয়া যায় না।

একখানি আট হাজার ফুট দীর্ঘ ছবি তুলিতে বিশ হাজার ফুট ফিল্মের প্রয়োজন হইতে পারে। এরূপ অধিক ফিল্ম লাগিবার কারণ, বহু দৃশ্য নূতন করিয়া তুলিতে হয়, বহু দৃশ্য অনাবশ্যক-বোধে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এমনি কত কি! প্রত্যেক দৃশ্যের একটা করিয়া নম্বর ও নাম আছে। ছবি তুলিবার পূর্ব্বে এক ব্যক্তি ছোট একটা বোর্ড হাতে লইয়া ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন। সেই বোর্ডে লেখা থাকে, অমুক পরিচালক; অমুক দৃশ্য; অমুক চিত্র-শিল্পী এবং অমুক গল্প। প্রতিদিন যতবার নূতন দৃশ্য তুলিবার আবশ্যক হউক না কেন, অগ্রে সেই বোর্ডের ফটো লইতে হইবে।

শব্দ ও চিত্রের জন্য দুইটা পৃথক ফিল্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ-ক্যামেরায় ছবি তুলিতে পারা যায় না। টেলিফোনে শব্দ-যন্ত্রীর সহকারীকে জানাইয়া দেওয়া হয়—অমুক দৃশ্য তুলিবার আয়োজন করা হইয়াছে। তিনি সেই কথাগুলি একটা বোর্ডে লিখিয়া লইয়া শব্দ-ক্যামেরার

মাস্ক-গেট খুলিয়া শব্দ-ফিল্মে বোর্ডের ফটো তুলিয়া লন। রসায়নাগারের কায সমাপ্ত হইবার পর যে-কোন ব্যক্তি সেই শব্দ-ফিল্ম হাতে করিলেই বুঝিতে পারিবেন, তাহাতে কোন্ দৃশ্যের শব্দ রেকর্ড করা হইয়াছে।

আর এক নিয়মে শব্দ ও চিত্রের যোগাযোগ-চিহ্ন গ্রথিত করিতে পারা যায়। তাহার নাম 'ক্ল্যাপষ্টিক সীষ্টেম।' চিত্রাভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক ব্যক্তি অভিনেতৃবর্গের সম্মুখে কাঠের পাখা খুলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করেন; তারপর পরিচালকের সঙ্কেত পাইয়া তিনি পাখা দুইটাকে একত্র করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলে চিত্রাভিনয় সুরু হয়। কাঠের পাখা হাতে লইয়া তিনি যেরূপভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, ফিল্মে তাঁহার ঠিক সেইরূপ ছবি ওঠে এবং পাখা দুইটা একত্র করিবার ফলে একটা অস্বাভাবিক শব্দ গিয়া পৌছায় শব্দ-যন্ত্রে। 'ক্ল্যাপষ্টিক' নিয়মে ছবি তুলিলে লেবরেটরীর সহকারীদের কাযের সুবিধা হয় বেশী; তাঁহারা ইহাতে সহজে বুঝিতে পারেন, কত ঘর ছবি তফাৎ রাখিলে শব্দের সহিত চিত্র-ফিল্মের সংমিশ্রণ হইবে।

শব্দ ও চিত্র-ফিল্ম তোলা হইয়া গেলে তাহা লেবরেটরীতে আনা হয়। কিন্তু দুইটা ফিল্মের কোন্টা কি ফিল্ম জানিতে না পারিলে ডেভেলপ্ করায় অসুবিধা ঘটে। সেই জন্য চিত্র-শিল্পিগণ ছবি তোলা শেষ হইলে চিত্র-ফিল্মের একদিকে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া দেন। লেবরেটরীর সহকারীরা ম্যাগাজিন-বক্স হইতে ফিল্ম বাহির করিয়া তাহাতে হাত বুলাইয়া তাহা শব্দের কি চিত্রের নেগেটিভ, অনায়াসে বুঝিতে পারেন। চিত্র-ফিল্মের রসায়নের কায হইয়া যাইবার পর শব্দ-ফিল্মের রাসায়নিক কায আরম্ভ হয়।

ষ্টুডিয়োতে কি প্রকারে নানারকম দৃশ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে, এবার সেই কথা বলি।

একটা বড় বিবাহের দৃশ্য দেখাইতে হইলে দৃশ্যটি কেবল 'লঙ-সটে' তুলিলে চলিবে না, মাঝে মাঝে বর-কনের মুখের 'ক্লোজ-আপ'-ও লইতে হইবে; কিন্তু একই সময়ে দৃশ্যটির 'লঙ্-সট্' ও 'ক্লোজ-আপ' লওয়া হয় না। প্রথমে লওয়া হয় 'লঙ-সট্'; পরে 'ক্লোজ-আপ' লওয়া হয় সময়মত ষ্টুডিয়োর ভিতরে। দুইটা দৃশ্য যে সম্পূর্ণ পৃথক্রূপে তুলিয়া একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, ফিল্ম-সম্পাদনের গুণে কাহারও তাহা ধরিবার সাধ্য নাই।

টকীর বাল্যাবস্থায় শব্দ গ্রথিত করিবার সময় বাহিরের নানারূপ শব্দ আসিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করিত। বিশেষ করিয়া Surfaco noiso অর্থাৎ, যন্ত্রপাতির শব্দ এবং Spot noiso অর্থাৎ, প্রতিধ্বনি, দীর্ঘনিশ্বাস, কাসির আওয়াজ, পায়ের শব্দ প্রভৃতি এগুলাকে চাপা দেওয়া যাইত না। সাউণ্ড-প্রুফ ব্যবহার করিয়াও দেখা গিয়াছে, তৈয়ারী শেট হইতে শব্দের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বাহির হয়। তাহা এত ক্ষীণ যে, কাহারও কাণে বাজে না সত্য, কিন্তু ছবি দেখাইবার সময় তাহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়। তাই এই শব্দ-গুলিকে বন্ধ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, লাগিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন।

প্রথম-চিত্রে মিডসট ও দ্বিতীয়-চিত্রে অন্যস্থানে শ্রীমতী গার্ব্বোকে দাঁড় করাইয়া তাঁহার ক্লোজ-আপ লওয়া হইয়াছে

শ্রীনিতাই ঘোষ ও শ্রীসুকুমার হালদার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মেঘ

সন্ধ্যার দিকে হাতে তেমন কাজ ছিল না—নিজের ঘরে বসিয়া কণিকা সুপারি কুচাইতেছিল। দাসী মালতী আসিয়া কহিল,—দেবে গা বৌদি?

কণিকা কহিল,—কি রে?

মালতী বলিল,—সেই যে বলেছিলে, তোমার একটা পুরোনো জামা দেবে—কাল সকালে আমার মেয়ে যাবে শ্বশুর-বাড়ী—এখন পেলে তাকে দিতুম!

কণিকা কহিল,—সারা দিনে বুঝি কথাটা তোর আর মনে করিয়ে দেবার সময় হলো না!

অপ্রতিভ ভঙ্গী-সহকারে মালতী কহিল,—সারাদিন মনে জেগে আছে গো, বৌদি। গরীব মানুষের ভিক্ষে—সে কি এক-তিল মন-ছাড়া থাকে! ঐ ভিক্ষেটুকু আজ সারা দিন কাজ-কর্ম্মের উপর কাঁটার মত বুকে বিঁধে আছে! তবে বিরক্ত করিনি।···তা ছাড়া তোমায় বল্‌বো কখন্, বলো? একটা-না-একটা কাজ তো করচোই···

কণিকা তাকে ধমক দিল, দিয়া কহিল,—তুই থাম্! তোকে আর বন্দ-মাতা সুরধুনী গাইতে হবে না!···

মালতী কহিল,—দাও না বৌদি—সুপুরিগুলি কুচিয়ে দি!···কেন যে করা! আমাদের বল্‌লে কি আমরা দিই না?

মালতী জাঁতিখানা লইতে গেল; কণিকা কহিল,—হ্যাঁ, দিচ্ছি বৈ কি তোমাকে! আমার এ সখের জাঁতি। তা'ছাড়া তুই পারবি নে, মালতী। নীপু ঠাকুরপো বড়-কাটা সুপুরি খেতে পারে না। অভ্যাস নেই। থাকে বোম্বায়ে—কে দেয়! ও বল্‌ছিল বৌদি, কতকগুলো সুপুরি বেশ মিহি করে কুচিয়ে রেখো তো—সঙ্গে নিয়ে যাবো। তাই···হাতে কাজ ছিল না—সুপুরি কুচোচ্ছিলুম···

মালতী কহিল,—তা হলে বৌদি···

তার স্বরে বিনয়, সঙ্কোচ, আকুতি···

কণিকা কহিল,—তা হ'লে কি? সুপুরি কুচুবি? না, জামা চাই?

কণিকা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তুই পাবে না। সুপুরি তোমায় কুচোতে হবে না। আমি কুচোচ্ছি। তবে জামা দেবো। এক কাজ কর্—তোর মেয়ে তো ডাগর নয়—আমার এখনকার জামা তার গায়ে হবে না! আছে জামা। ঐ বাসনের ঘরে ছোট একটা সুটকেশ—যেতে পারবি? চাকরদের কাকেও না হয় বল্—এখানে এনে দেবে। তা থেকে যে কটা তোর পছন্দ হয়—নিস্!

আনন্দে মত্ত হইয়া মালতী ছুটিল বাসনের ঘরের অভিমুখে। কণিকা বসিয়া সুপারি কুচাইতে লাগিল।

চমৎকার বাতাস বহিতেছে। দক্ষিণ দিককার বড় খড়খড়ি খোলা। ফ্যান্ চালাইবার প্রয়োজন ছিল না।

সহসা সে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল রাধাবিনোদ। কণিকা বারেক মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল; তার পর যেমন কাজ করিতেছিল, তেমনি নিজের কাজে ব্যস্ত রহিল।

রাধাবিনোদ এ ড্রয়ার টানিয়া, ও ড্রয়ার বন্ধ করিয়া কতকগুলা শব্দ তুলিল: শব্দ তুলিয়া কণিকার পানে তাকাইল, কিন্তু কণিকা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সেদিকে কণিকা ফিরিয়াও চাহিল না।···

তখন রাধাবিনোদ আর চুপ করিয়া রহিতে পারিল না। বৈকালের দিকে যে শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিল, সে বাণ কণিকা গায়ে লয় নাই—সে বাণ তার বাজে নাই! সে বাণের যত জ্বালা রাধাবিনোদের মনে লাগিয়া আছে! এতক্ষণ এ জ্বালায় জ্বলিয়া সে কেবলি ভাবিয়াছে, কোথা দিয়া কি-বাণ নিক্ষেপ করিলে আক্রোশ মিটে! এখনো সেই কথা সে ভাবিতেছিল।

কণিকার পানে চাহিয়া সে কহিল,—একলাটি আছো যে!

কণিকা মুখ তুলিয়া রাধাবিনোদের পানে চাহিল, কহিল,—কোথায় আর কাকে দোকলা পাবো···

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাধাবিনোদ বেশ একটু শ্লেষ-মিশ্রিত স্বরে কহিল,—কেন—স্নেহের নীপু-ঠাকুরপো কোথা গেলেন?

কণিকা অবিচল কণ্ঠে কহিল,—সে বায়োস্কোপ দেখতে গেছে।

রাধাবিনোদ ভাবিল, ও! বলিয়া কহিয়া বায়োস্কোপ গিয়াছেন! সে কহিল,—তুমিও গেলে পার্‌তে! ভালো ছবি ছিল, শুনেচি।

কণিকা কহিল,—আমায় যেতে বলেছিল···

রাধাবিনোদের মনের উপর কে যেন জ্বলন্ত অগ্নি-শিখা নিক্ষেপ করিল। রাধাবিনোদ কহিল—তবু গেলে না! তার মানে?

কণিকা বেশ অবিচল স্বরে বলিল,—আমার ভালো লাগে না।

রাধাবিনোদ কহিল,—আশ্চর্য্য!

কণিকা কহিল—তোমার কাছে আশ্চর্য্য বোধ হতে পারে—কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই! সকলের রুচি সমান হয় না!

রাধাবিনোদের মনে হইল, এই রুচি কথাটার মধ্যে হয়তো তারি প্রতি কণিকার একটু ইঙ্গিত আছে! সে ইঙ্গিতের অন্তরালে তার বিগত জীবনের ইতিহাস লইয়া তার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, অবজ্ঞা এবং আরো কত-কি! তাই সে এ কথায় জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু উচ্চ কণ্ঠে সে জ্বালা প্রকাশ করিবে, তেমন বর্ব্বরতা সে কোনো দিন শিখে নাই; তাই ক্রোধ-মিশ্রিত চাপা কণ্ঠে ফোঁশ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—রুচির পরিচয় আমি জানি।···তার যেটুকু আভাস আজ স্বচক্ষে দেখেচি ভোজন-পর্ব্বের উৎসবে···

এ কথা কাণে যাইবামাত্র কণিকা নিমেষে কাঠের মত কঠিন হইয়া উঠিল। হাতের জাঁতি সুপারির ছোট ডালায় রাখিয়া সে চাহিল তীক্ষ্ণ অবিচল দৃষ্টিতে রাধাবিনোদের পানে। রাধাবিনোদ সে দৃষ্টির স্পর্শে একটু শঙ্কাতুর হইল। সে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

কণিকা তাকে যাইতে দিল না; ক্ষিপ্র চরণে উঠিয়া রাধাবিনোদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, কহিল—কিসের আভাস দেখেচো ভোজন-পর্ব্বের উৎসবে—শুনি!

রাধাবিনোদের মুখ যেন বিবর্ণ! সে কহিল—সে আভাস দেবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই।

কণিকা কহিল—কিন্তু তোমায় বলতে হবে! যেটুকু কথা বলেচো, হেঁয়ালি হলেও তার মধ্যে আছে অনেকখানি ইতরতা আর নীচতা! সে কথা স্পষ্ট করে তোমায় বলতে হবে!

কণিকার এ-মূর্ত্তি দেখিয়া রাধাবিনোদ ভড়কাইয়া গেল। নারীর অনেক পরিচয় সে জানে; এ পরিচয় জানিত না! সবলে মনকে নাড়া দিয়া সে কহিল—আমি ইতর। আমার কথায় তোমার এতখানি বিচলিত হওয়া উচিত নয়। আমি তো তোমার বাবার দয়ায়···

কণিকা কহিল,—চুপ করো। সেজন্য তোমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, আমি তা জানি!···আমার বাবার মেয়েকে বিবাহ করে তাঁকে আর তাঁর মেয়েকে কৃতার্থ করেচো!···সে কথা বলচি না! তবে একটা কথা জেনে রেখো—কার সঙ্গে কি-ভাবে কথা কইতে হয়—আর কি কথা কইতে হয়, তা বুঝে কথা কয়ো। রসিকতা আর ইতরতা—দুটো এক বস্তু নয়—এ কথাও জেনে রেখো।···

কণিকা আর কোনো কথা বলিল না; রাধাবিনোদ চলিয়া যাইতেছিল, মালতী আসিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইল, কহিল—বাক্স এনেচি বৌদি···

কণিকা কহিল—রাখ্! রেখে ঠাকুরকে বলে আয়, তোর নীপু দাদাবাবু আজ রাত্রে লুচি খাবে, বলে গেছে। সে বায়োস্কোপ দেখতে গেছে। যা, ঠাকুরকে বলে আয়, যেন ময়দা মেখে রাখে। ঠাকুরপো এসে খেতে চাইলে লুচি একখানি একখানি করে ভেজে দেবে! বুঝলি···?

বাক্স রাখিয়া মালতী কহিল,—বলে আসি।

মালতী চলিয়া গেল। কণিকা গর্ব্ব-ভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাধাবিনোদের পানে চাহিয়া রহিল। রাধাবিনোদ সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল; পরে লাঞ্ছিতের মত নিঃশব্দে সে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

কণিকা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, দুনিয়াকে দেখিয়াছ নিজের মত···অমনি ইতর, বর্ব্বর!···

তারপর সে আবার জাঁতি লইয়া বসিল।—

রাত্রে বায়োস্কোপ হইতে ফিরিবার পর নীপুর সঙ্গে রাধাবিনোদের দেখা। রাধাবিনোদ তখন তাস লইয়া খেলায় মত্ত। নীপু সেখানে বসিল না; সোজা আসিল অন্দরে দোতলায়।

মালতী জামা পাইয়া কৃতজ্ঞতায় তখন গলিয়া রহিয়াছে!

নীপু-দাদাবাবুর সাড়া পাইবামাত্র সে আসিয়া বলিল—তুমি খেতে বসবে তো, দাদাবাবু! ঠাকুরকে আমি লুচি ভাজতে বলি?

নীপু কহিল,—বৌদি কোথায়?

মালতী কহিল—সেলাইয়ের কল নিয়ে বসেচে।

নীপু কহিল,—এই রাত্রে! হঠাৎ কোথা থেকে অর্ডার এলো?

নীপু দেখিয়াছে, কণিকা মাঝে মাঝে সেলাইয়ের কল লইয়া বসে। ছোট ছোট ফ্রক তৈয়ার করে—বালিশের ওয়াড় সেলাই করে—মশারি সেলাই করে! নীপু প্রশ্ন করিয়া জবাব পাইয়াছে, বাড়ীর দাস-দাসী পাচক-ড্রাইভার প্রভৃতি যে সুবিধা পায়, শ্রীমতী গৃহিণীর কাছে আব্দার-বায়না তুলিয়া এগুলা আদায় করিয়া লয়! আজ রাত্রে কে আসিয়া বায়না ধরিল?—তাহারি প্রতি ইঙ্গিত করিয়া নীপু এ কথা বলিল।

মালতী কহিল—আমার মেয়ে কাল শ্বশুর-বাড়ী যাবে। বৌদি পাঁচটা জামা দিলে—বাক্সে পড়েছিল। এক টুকরো রেশমী কাপড়ও ছিল; বললে—সব পুরোনো জামা হলো রে মালতী—একটা নতুন তৈরী করে দি—খানিকটা ভালো কাপড় পড়ে আছে···

হাসিয়া নীপু কহিল—বটে!···আচ্ছা, খাবার হবে'খন পরে। আগে বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসি।

নীপু আসিল কণিকার বসিবার ঘরে। এ ঘরে আছে সেলাইয়ের কল, টেব্‌ল্ হার্ম্মোনিয়ম, রেডিও শেট্—ছোট বইয়ের আলমারী প্রভৃতি।

আসিয়া নীপু কহিল,—গেলে না বৌদি! ঠকলে! চমৎকার বই ছিল। দেখলে তোমার লাভ হতো!

—লাভ এইটুকু মাত্র বলিয়া সহাস্য মুখে কণিকা নীপুর পানে চাহিল; তার পর কহিল,—তুমি কি লাভ করে এলে—বলো তো আগে!

নীপু কহিল,—আমার লাভ, আনন্দ! তা ছাড়া আমার আর কি লাভ হবে?

কণিকা কহিল,—তুমি গল্পটা বলো, তা হলে সে লাভ থেকে আমিও বঞ্চিত থাকবো না! শুনে যদি সে-আনন্দ পাই, তা হলে কষ্ট করে ভিড়ে যাওয়ার কি-বা দরকার?

নীপু কহিল,—আগে শোনো। তার পর বুঝবে, কি লাভ হতো!

—বলো, এ সেলাই শেষ হতে আর বাকী নেই! আমি এটুকু সেলাই করতে করতে শুনি।

নীপু কহিল,—মানে, বইখানায় ছিল—মেয়েদের ব্যথার theme. এক দুরন্ত স্বামীর বিরাগী মনকে তার সুশীলা স্ত্রী কত নির্য্যাতনের মধ্যে থেকে—কি অবিচল ধৈর্য্য সয়ে সে অবশেষে আয়ত্ত করলো·

হাসিয়া কণিকা কহিল,—তুমি পাগল হয়েচো, ভাই! ও-সবে আমার কোনো রুচি নেই। ছবি দেখে, গল্প পড়ে বা পায়ে ধরে সেধে আমার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাতে আমি মোটেই লালায়িত নই!···সত্যি বলচি···

নীপু বিস্ময়ে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, পরে কহিল,—তোমার এ অবজ্ঞা। তা আমি স্পষ্ট বলবো, বৌদি! সংসার হলো স্বামী আর স্ত্রীকে নিয়ে। সেখানে স্বামী আর স্ত্রী যদি পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে দিন কাটায়, তা হলে সংসার আর সংসার থাকে না।

হাসিয়া কণিকা কহিল,—এ সংসারে তা ঘটেচে বলে যদি তোমার ধারণা হয়, তা হলে আমাকে বুঝিয়ে বলো তো, কোথায় তুমি এমন বিশৃঙ্খলা, এমন দুঃখের আব-হাওয়া দেখলে? এ সংসারের কোন্‌খানটা অচল বা বেচাল রয়েচে? এর কোন্‌খানে টান পড়চে?

নীপু এ কথায় থ হইয়া রহিল। কণিকা মর্ম্মর শব্দে

কল চালাইয়া সেলাইয়ের কাজ সারিতে লাগিল !···বাহিরের ওদিক হইতে তাস খেলার বিকট উল্লাস-রব মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল।

সেলাই শেষ করিয়া কণিকা কহিল,—শুনচো ?

নীপু যেন এতক্ষণ চেতন-হারা ছিল। কণিকার প্রশ্নে সে কহিল,—কি ?

কণিকা কহিল,—আমোদের উচ্ছ্বাস ! অমন নিশ্চিন্ত আমোদে খেলা চলেছে সদরে; অন্দরে গৃহিণী করচেন সেলাইয়ের কাজ ! এ সংসারের কোথায় তুমি অঘটন দেখলে, ঠাকুরপো ? যার জন্য অত বড় দার্শনিক মন্তব্য করলে !

নীপু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—না ! তুমি দেখচি একেবারে hopeless···

সেলাইয়ের কল বন্ধ করিয়া সদ্য তৈয়ারী ব্লাউশটা হাতে লইয়া কণিকা দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল,—মালতী···

মালতী কাছে ছিল। তার যাইবার উপায় নাই—মন পড়িয়া আছে এই ব্লাউশটির উপর।

কণিকার আহ্বানে মালতী আসিয়া দাঁড়াইল। কণিকা কহিল,—এই নে নতুন জামা ! এবার ঠাকুরকে বল্ গিয়ে, তোর নীপু দাদাবাবুর জন্য লুচি ভাজতে। এসো ঠাকুরপো···

যন্ত্র-চালিতের মত নীপু আসিল কণিকার সঙ্গে ভোজন-কক্ষে। ঠাকুর লুচি ভাজিয়া আনিতে লাগিল। এবং নীপু···

কণিকা বসিয়া আছে পাতের কাছে; জলদ পিশিমা আসিয়া ডাকিলেন,—বৌমা···

কণিকা কহিল,—কেন পিশিমা ?

পিশিমা বলিলেন,—তুমি ব্যস্ত ছিলে মা—বলতে পারি নি। লীনা,—আমার সেই ভাশুর-ঝী···চিঠি লিখেচে—প্রতাপের খুব অসুখ গেল কি না! তাই ডাক্তাররা ছুটী নিতে বলেচে। প্রতাপকে নিয়ে সে আসবে কলকাতায়। তা লিখেচে, রাধ্‌দাকে বলে ছোট একখানা বাড়ী যদি এ বাড়ীর কাছাকাছি ভাড়া করা যায়···

কণিকা কহিল,—কেন, এ বাড়ীতে তো ঢের জায়গা আছে, পিশিমা।

পিশিমা কহিলেন—হাজার হোক্, রোগী নিয়ে আসচে, মা ! অনর্থক তোমাদের বিব্রত করা···

কণিকা মৃদু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তাতে কি ! অসুখ-বিসুখেই তো মানুষের আরো দরকার হয় আপন-জনকে···

পিশিমার ইচ্ছা, এই গৃহেই তারা আসিয়া থাকে। কিন্তু কে জানে, রাধু ইহাতে···

পিশিমা কহিলেন—রাধুকে তুমি একবার বলবে, মা ?

কণিকা কহিল,—এ কথা আপনিই বলবেন, পিশিমা। অন্য বাড়ীর ব্যবস্থা উনিও পছন্দ করবেন না ! ওঁকে বলে' আপনি ব্যবস্থা করান—এখানে আসবার জন্য !

পিশিমা কহিলেন,—দেখি···তোমার তো আপত্তি নেই, বাছা ?

—আমার আপত্তি !···কি বলেন, পিশিমা ?

পিশিমা হাসিয়া কহিলেন,—সত্যি ! তা জানি মা, তোমার কোনো আপত্তি হবে না ! তুমি যে মা-লক্ষ্মী !

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বাতন্ত্র্য না খাতন্ত্র্য
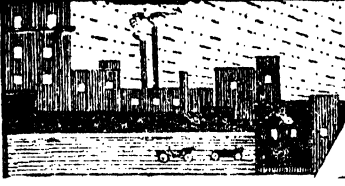
জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী সিলেক্ট কমিটীর প্রস্তাবগুলির কথা যতই স্থিরভাবে আলোচনা করা যায়, ততই মন বিস্ময়ে ভরিয়া যায়। আমরা ভারতবাসী, আমাদের অল্পবিস্তর চক্ষুলজ্জা আছে। সেই জন্য এই কমিটীর সদস্যগণ চক্ষুলজ্জার মস্তক চর্ব্বণ পূর্ব্বক কি করিয়া এই রিপোর্টখানি লিখিলেন, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বলবান জাতিসমূহ সবলদুর্ব্বলনির্ব্বিশেষে সমস্ত জাতিকে self determination বা স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিবেন শুনিয়াছিলাম। রাজনীতিক্ষেত্রে ঐ ইংরাজী শব্দের অর্থ নিজের রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা নিজেরা করিবার অধিকার। তন্ত্র শব্দের অর্থ নিজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সুতরাং ইহার প্রতিশব্দ স্বাতন্ত্র্য হইতেই পারে। সেই আশায় বুক বাঁধিয়া ভারতবাসী এই শাসনপদ্ধতির স্বরূপ কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার জন্য এত দিন উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু এ যে দেখিতেছি—

বুনলাম ধান, হলো তিল,
ফললো রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল!

সবই বিপরীত হইয়া গেল। ইহা স্বাতন্ত্র্য না হইয়া খাতন্ত্র্য হইয়া গেল। পরানুগ্রহপুষ্ট জীববিশেষও যেটুকু অধিকার লাভ করে, তাহাও পাওয়া গেল না। সুতরাং এই রিপোর্টে যে শাসনব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকে খাতন্ত্র্য বা খতন্ত্রতা বলা যাইতে পারে। এই রিপোর্টে বড় লাটের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে,তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা বোধ হয় কোন স্বৈরাচারী রাজা উপভোগ করেন না। বড় লাটের হস্তেই দেশরক্ষার এবং পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ক্ষমতাই থাকিবে। আর্থিক ব্যাপারেও রাজস্বের শতকরা ৮০ ভাগের উপর তাঁহার পূর্ণ অধিকার রহিবে। তিনি এক জন আর্থিক পরামর্শদাতার সহিত মন্তব্য করিয়া ঐ বিষয়ের যেরূপ ইচ্ছা, সেই ব্যবহার করিতে পারিবেন,—দেশের লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের বা প্রতিনিধিসভায় সে সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশের অধিকার থাকিবে না! ভারতের প্রজাসাধারণ কেবল হুকুম তামিল হিসাবে অর্থ যোগাইবে মাত্র। রেলওয়ের ব্যবস্থার উপরও দেশের লোকের অথবা প্রতিনিধি পরিষদের কোন কথা বলিবার অধিকার থাকিবে না। উহার পরিচালনার ভার থাকিবে সরকারেরই বিধিপ্রতিষ্ঠিত রেলওয়ে বোর্ডের উপর। সে বোর্ড গঠন করিবেন সরকার। তবে ব্যবস্থা পরিষদগুলি কি করিবেন? তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিবেন? তাহাও নহে। তাঁহাদের হস্তেই কেবল আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। বড়লাট অর্ডিনান্স জারি করিতে পারিবেন,—আইন করিতে পারিবেন, ব্যবস্থা পরিষদের প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। তিনি তাঁহার খেয়াল বা মর্জ্জি অনুসারে শাসন-পদ্ধতি (constitution) বন্ধ করিয়া দিয়া স্বয়ং স্বৈরশাসকরূপে প্রজাসাধারণের উপর যদৃচ্ছা ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বড়লাট সাধ্যপক্ষে এই অতিরিক্ত ক্ষমতার পরিচালনা করিবেন না। কিন্তু কমিটী যখন ঠিক কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে বড়লাট ঐরূপ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন, অন্যথা কোনমতেই তাহা পারিবেন না,—ইহা স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই,—তখন ঐ উক্তির মূল্য কতখানি, তাহা বলা যায় না। এখন আইনে কি করা হয়, তাহাও দ্রষ্টব্য। কিন্তু উঠন্তি ধান পত্তনেই চিনিতে পারা যায়। যাহা হইবে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত নহে।

তাহার পর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা। ভারতের কর্তৃপক্ষ নাকি ভারতের প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতেছেন। কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করা আবশ্যক। সুতরাং কমিটী সর্ব্ববিষয়েই প্রাদেশিক সরকারের হস্তে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, দেশীয় মন্ত্রীরা কেবল কাঠের পুতুল হইয়া এই শাসনতন্ত্রের কাঠামোতে বিরাজ করিতে থাকিবেন। মন্ত্রীরা সিভিলিয়ান এবং পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে বহাল বা বরতরফ করিতে পারিবেন না,—তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠাইতে সমর্থ হইবেন না। এক কথায় তাঁহাদের কর্তৃত্বশক্তি কিছুই থাকিবে না। পুলিশ এবং গোয়েন্দা পুলিস ইনস্পেকটর জেনারলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন, পুলিস বিভাগের ইন্স্পেক্টর জেনারল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার মতামত লইয়া সকল কার্য্য করিতে থাকিবেন, মন্ত্রী মহাশয় ঐ বিভাগের কোন তথ্যই জানিতে পারিবেন না। তিনি কেবল পুলিস ইন্স্পেকটর জেনারালের হুকুমবরদারী মাত্র করিবেন। তিনি এই বিভাগের কোন নীতিই পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন না। চমৎকার স্বায়ত্তশাসন! তাহার পর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সঙ্কটকালের দোহাই দিয়া শাসনযন্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থা রহিত করিয়া এবং প্রতিনিধি সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বয়ং সমস্ত বিভাগের কার্য্যপরিচালনা করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাই হইল দায়িত্বপূর্ণ শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। ইহা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশকেই কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত বৃটিশ জাতির অধীনে রাখিবার কায়েম ব্যবস্থা,—রক্ষণশীল দলের বুদ্ধিমত্তার অপূর্ব্ব নিদর্শন। ইহাতে কেবল বৃটিশ শাসকদিগের ক্ষমতা রক্ষার বিশিষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে,—দেশীয়দিগের কোনরূপ স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। মহাত্মাজীর বন্ধু লর্ড হালিফ্যাক্স এই পরামর্শ পরিকল্পনার এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরিতাপূর্ণ লৌহমূর্ত্তির উপর দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার

ক্ষীণ বর্ণ-লেপ মাত্র করা হইয়াছে। কোন সম্প্রদায়ের ভারতবাসীই ইহা চাহে না। আমরা মহাত্মাজীকে বলি যে, তিনি অসহযোগ দ্বারা নয় মাসে যে স্বরাজ আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, সে স্বরাজের স্বরূপ তিনি একবার দেখিয়া লউন, এবং বৃটিশ ডিপ্লোমেসীর তারিপ করুন। লর্ড হালিফ্যাক্স বলিয়াছিলেন যে, "ইংরাজ জাতিকে ভারতবাসীর সহিত শাসক ও শাসিতের ভাব মন হইতে বিসর্জ্জন দিয়া ভারতবাসীদিগকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমরা যদি ভারতবাসীদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারি যে, আমরা এইরূপ ধারণা লইয়া কায করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের অর্দ্ধেক অসুবিধা দূর হইয়া গিয়াছে।" এই কি সেই ভাবে অগ্রসর হইবার পরিচায়ক? তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, ভারতবাসীদিগকে জানেন, তিনি কি মনে করেন যে, ভারতবাসীরা এতই নির্ব্বোধ যে, তাহারা ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না? লর্ড হালিফাক্স ভারতে অবস্থানকালে বিলাতী মন্ত্রী সমাজের মত লইয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দায়িত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা (Responsible Government) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে কথা যে ভ্রমে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্টে একবারও ব্যবহৃত হয় নাই,—তাহা কি তিনি জানেন না? তিনি ত ঐ কমিটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি এই সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন, তাহা বলেন নাই কেন? আসল কথা, এই রিপোর্টে যে কেবল কংগ্রেসওয়ালারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা নহে,—উহাতে মডারেট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, এমন কি, মুসলমান সমাজও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা স্বার্থের জন্য মুখে সে কথা প্রকাশ করিতেছেন না,—তাঁহারা মনে মনে যে অসন্তুষ্ট, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ইহা দ্বৈতশাসন অপেক্ষা অনেক হীন। এই ভাবে শাসনসংস্কার না করিলেই ভারতবাসী বরং সন্তুষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান জাতীয় সরকার সকল দিকে অসাফল্য প্রকটিত করিয়া ভারতের জন্য এই ছুনিয়াছাড়া শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বহুৎ আচ্ছা।

সংস্কারে সঙ্কোচ

জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী সিলেক্ট কমিটীর এই রিপোর্টখানি পড়িলে একটা কথা স্বতই মনে হয় যে, কমিটীর সদস্যগণ যেন কতকটা উদ্বেগে, কতকটা আশঙ্কায় এবং কতকটা ক্রোধে এই রিপোর্টখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের দিক হইতে ইহাতে যে তাঁহাদের নৈপুণ্য প্রকাশ একেবারেই পায় নাই,—এ কথা আমরা বলিতে পারি না। ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, এক জন পক্ষসমর্থনে সুদক্ষ ব্যারিষ্টার একটা ত্রুটিযুক্ত ব্যবস্থার সুন্দরভাবে সমর্থন করিতেছেন। এ কথা সত্য যে, ভারতের সহিত গ্রেট বৃটেনের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ইহা কমিটীর সদস্যগণের ইচ্ছা এবং সেই সম্বন্ধ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ, ইহাও তাঁহাদের কামনা। কিন্তু ঠিক যেরূপ ব্যবস্থা করিলে দুই দেশের মধ্যে প্রীতির বন্ধন গ্রথিত হয়,—সেইরূপ [illegible]রিতে তাঁহারা ভয় পাইতেছেন। মানবদেহে যেমন কতকগুলি রোগ জন্মে, যাহার প্রভাবে যেমন রোগীর রোগবর্দ্ধক কুপথ্য গ্রহণে লালসা জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ বোধ হয় মানুষের এবং জাতির মনে এমন কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটে,—যখন যাহা সেই অবস্থায় করণীয়, তাহা করিতে ইচ্ছা যায় না,—যাহা করা উচিত নহে, বরং অনিষ্টজনক, তাহাই করিবার ঝোঁক অতিশয় বৃদ্ধি পায়। কুপথ্যকারী যেমন বুঝে যে, সে যাহা খাইতেছে,—যাহা করিতেছে, তাহা তাহার পক্ষে খাওয়া বা করা উচিত নহে,—মনঃপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি বা জাতি সেইরূপ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিয়াও তাহা করিতে পারে না,—তাহাতে যেন প্রেষ্টিজের হানি হয় মনে করে, এবং স্পর্দ্ধার সহিত দুর্ব্বল পক্ষের উপর শক্তি চালনা করিয়া অপ্রীতির অঙ্কুরকে ফলপুষ্পশোভিত মহাদ্রুমে বিকশিত করিয়া তুলে। সকল সময়ে যে কেবল এক পক্ষের দোষে এইরূপ ঘটে, তাহা নহে; দুই পক্ষের অল্পাধিক দোষ থাকে। তবে লোক প্রবল পক্ষকেই অধিক দোষ দেয়, কারণ, প্রবল পক্ষ একটা ভুল করিয়া তাহা সামলাইয়া লইতে পারে,—দুর্ব্বল পক্ষ তাহা পারে না। এই লিংলিথগো কমিটীর অন্যতম সদস্য লর্ড হালিফ্যাক্স (লর্ড আরউইন) লণ্ডনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যথার্থ ই বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ জাতি যদি ভারতবাসীর সহিত শাসক এবং শাসিত এই সম্বন্ধটা ভুলিয়া যাইয়া ভারতবাসীকে আপনাদের তুল্যমূল্য মনে করিতে পারেন,—তাহা হইলে ভারত শাসনের অর্দ্ধেক হাঙ্গামা মিটিয়া যায়। কথাটা যে খাঁটি সত্য, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। অধিকন্তু তাহা বুঝিয়া যদি শাসক পক্ষ ঠিক তদনুসারে কায করিতে পারেন, তাহা হইলে সমস্ত হাঙ্গামাই একবারে সম্পূর্ণ মিটিয়া যায়। কমিটীর সদস্যগণ যে তাহা বুঝেন না, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া ভারতবাসীদিগকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, সুতরাং তাঁহারা কেবল রক্ষাব্যবস্থার নাম দিয়া ভারতবাসীর অষ্টপৃষ্ঠে এবং ললাটে কেবল বন্ধনের রজ্জু কষিয়া বাঁধিতেছেন, তাঁহারা দিবেন বলিতেছেন স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু দিতেছেন কার্য্যতঃ বজ্রবন্ধন। তাঁহারা মুখে আমাদিগকে বলিতেছেন, সাম্রাজ্যের তুল্য অংশীদার—কিন্তু কার্য্যে বলাইতেছেন আমাদিগকে তাঁহাদের হুকুমপালক প্রজা। সাইমন কমিশন বলিয়াছেন যে, দ্বৈতশাসন উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। লিংলিথগো কমিটীও মাথা নাড়িয়া বলিতেছেন, উহা উঠাইয়া দেওয়া উচিতই বটে, এবং যেন এমন ভঙ্গী করিতেছেন যে, যেন তাঁহারা উহা উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বালুকাবিস্তারের মধ্যে প্রবাহিত ফল্গুর বারিপ্রবাহের ন্যায় উহা বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, ভারতবাসী আর্থিক বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে যেন বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে বৃটিশ পণ্য প্রস্তুতকারকদিগের ফিরিওয়ালা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বন্ধন যদি অত্যন্ত কঠোর হয়, তাহা হইলে সে বন্ধনের রজ্জু পাটের কি রেশমের, তাহা বদ্ধ ব্যক্তির বুঝিবার শক্তি লোপ পাইয়া থাকে। যদি এই সুযোগে তাঁহারা দুই হাতে সাহসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের পথে দাঁড় করাইয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে

এই সময়ে উভয় দেশের মধ্যে যথার্থ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। তাহা না পারার জন্য তাঁহারা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে যে শুভ যোগ হারাইয়াছিলেন, এবারও তাহা হারাইতে বসিয়াছেন, ইহাই আমাদের ধারণা। ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের পথে দাঁড় করাইতে হইলে শাসিত প্রজার অধিকার রক্ষার পক্ষে কতকগুলি বাঁধন-কষণ করা একান্ত আবশ্যক। আমরা সরল-ভাবেই এই কথাগুলি বলিলাম। শাসকবর্গ তাহা সরলভাবে বুঝিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল ঘটিবে।

মার্কিণের নজীর

শাসন বিভাগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রক্ষার্থে যে সকল বৃতি (Safe-guard) রক্ষা করা হইয়াছে, তাহা এত অধিক যে, কমিটীকে তাহার সমর্থন করিবার জন্য মার্কিণের নজীর দেখাইতে হইয়াছে। পাঠক কমিটী রিপোর্টের প্রথম খণ্ড ১২ পৃষ্ঠায় ২১ ধারা দেখিয়া লইবেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ঐ নজীর সম্পূর্ণ খাটে না। তাহা হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। ইংরাজদিগকে বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল বৃতি-বন্ধন কেবল যে কাগজে কলমে লেখা থাকিবে, উহার ব্যবহার হইবে না তাহা নহে। আবশ্যক হইলে উহা ব্যবহার করা হইবে। অর্থাৎ বিলাতে রাজার যেরূপ বিশেষ ক্ষমতা আছে, কিন্তু রাজা উহা প্রায় প্রয়োগ করেন না—ইহা সেরূপ হইবে না। তাহার পর ভারতবাসীদিগকে স্তোক দিবার জন্য যেন বলা হইয়াছে যে, "মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট যেরূপ সামরিক এবং আর্ণব বিভাগের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, সেইরূপ ভারতীয় বড়লাটকে সামরিক প্রভৃতি বিভাগের পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার দেওয়া হইল, সুতরাং দায়িত্বের সহিত ইহার যে সঙ্গতি নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। ভারতে ঐরূপ ব্যবস্থা না করিলে উহা ত্রুটিপূরক হইল না, এ কথা বলিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না। উহা না করিলে এই ব্যবস্থা সফল করিবার উপায় থাকিবে না। ভারতবাসীরা যখন রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যতা দেখাইতে পারিবে, তখন ঐ সকল বৃতি-বন্ধনের বা উহাদের বিনিয়োগের আর প্রয়োজন থাকিবে না।" এই কথায় ভারতবাসীরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ ইহাতে ভারতবাসীদিগের উপর শাসনকর্তৃপক্ষের অবিশ্বাসই সূচিত হইতেছে। ইহা তাহাদের অসন্তোষের একটা প্রবল কারণ। দ্বিতীয়ত মার্কিণের নির্ব্বাচক সমাজকর্তৃক প্রেসিডেণ্ট ৪ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট হইতে হইলে তাঁহার মার্কিণে জাত এবং ১৪ বৎসর কাল মার্কিণের বাসিন্দা হইয়া থাকা চাই। অধিকন্তু মার্কিণের সিনেট প্রেসিডেণ্টের নামঞ্জুরের আদেশও (Veto) নামঞ্জুর করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং তথায় দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার বৃতিবন্ধনও অতি সুন্দর আছে। তথাকার প্রজাসাধারণ প্রবল হইলেও তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বৃতির প্রয়োজন, কিন্তু ভারতীয় প্রজা অতি দুর্ব্বল হইলেও তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বৃতির প্রয়োজন নাই, ইহা কিরূপ মনে করা যাইতে পারে? এ পর্য্যন্ত ভারতীয় শাসনকর্ত্তারা সুযোগ বা অছিলা পাইলে যে তাঁহাদের হস্তে আইন অনুসারে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনে কোনরূপ সঙ্কোচ বা কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও মনে হয় না। কাযেই এই সকল বৃতি-বন্ধন দেখিলে ভারতবাসীরা মনে করে যে, শাসকবর্গ সুবিধা পাইলেও নিঃসঙ্কোচে তাহার ব্যবহার বা অপব্যবহার করিবেন। এখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট আইন করিবার সময় এই সকল বৃতি-বন্ধন আইনে কিরূপভাবে রক্ষা করিতে চাহেন,—তাহা দেখিবার জন্য অনেকের কৌতূহল অতিশয় উদ্রিক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ধাতুতে সহিবে না

জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটী ওরফে লিংলিথগো কমিটী একটা বিষয়ে সাফ জবাব দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন যে, বিলাতে যে ভাবে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা ভারতের রাজনীতিক ভূমিতে ঠিকমত গজাইয়া উঠিবে না। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে যে ধরণের পার্লামেণ্টারী শাসন বিকাশ লাভ করিয়াছে, ভারতে তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্ররূপ পার্লামেণ্টারী শাসন গজাইয়া তুলিতে হইবে। এ বিষয়ে তাঁহারা অবশ্য যুক্তি দিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন,—ভারতবাসীদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ধারা বা পদ্ধতি বৃটিশ জাতির জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ধারা ও পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব বিলাতী পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ভারতবাসীর ধাতুতে সহিবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই বিষয়টা কি এত দিন পরে কর্তৃপক্ষের মালুম হইল? শিক্ষাব্যবস্থায়, বিচারব্যবস্থায়,—আর্থিক ব্যবস্থায় ত হুবহু বিলাতী আদর্শের অনুসরণ করা হইতেছে। এখন এই পার্লামেণ্টারী স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাটি কেবল ভারতবাসীর পক্ষে ভাতের কাঠিটি হইল যে; উহা তাহাদের স্কন্ধে চাপাইলে তাহারা শুইয়া পড়িবে? এই হেতু-প্রদর্শন উপলক্ষে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বিলাতের জনসাধারণ এই কয়টা নিয়ম মানে, যথা—(১) "অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন স্বীকার করে। (২) উনজন সম্প্রদায় অতিজন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত তাৎকালিক-ভাবে মানিয়া লইতে সম্মত থাকে। (৩) বিলাতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দল আছে,—মূলনীতি হিসাবেই তাহাদের দলভেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ রাজনীতিক মতভেদই তাহাদের দলভেদের বনিয়াদ। ভারতে তাহা নহে। ভারতে সমাজের সাম্প্রদায়িক স্বার্থই দলভেদের কারণ। (৪) বিলাতে এমন বহু লোক আছেন—যাঁহারা কোন দলভুক্ত নহেন। তাঁহারা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেই মতের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি কোন দল বেচাল চালিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল লোক সেই দল ছাড়িয়া দেয়, তাহার ফলে রাজনীতিক তরণী আন্দোলিত না হইয়া সুন্দরভাবে চলিতে পারে।" কারণ-চতুষ্টয় হিসাবে কমিটীর সদস্যগণ যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা অস্বীকার করি না। অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ হওয়া উচিত, সে কথাও আমরা অস্বীকার করি না। যুরোপেও ঐ কয়টি বিষয়ে প্রায় সকল দেশে সমতা আছে, কিন্তু তাহা হইলেও তথায় দেশভেদে শাসনযন্ত্রের গঠনের কতকটা ভিন্নতা লক্ষিত হয়।

এরূপ অবস্থায় ভারতে যে হুবহু বিলাতী শাসনতন্ত্র আমদানী করিলে সুবিধা হইবে, তাহা আমরাও মনে করি না। যদি শাসনযন্ত্রকে অবাধে এবং স্বস্থভাবে গড়িয়া উঠিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে উহা দেশের ও সমাজের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সেইরূপ স্বস্থভাবে এবং অবাধে ভারতবাসীদিগকে তাঁহারা তাঁহাদের শাসনযন্ত্র গড়িয়া উঠিতে দিবেন কি? কমিটী পক্ষান্তরে উহার উপর আরও কিছু চাপ দিয়াছেন। যথা—তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "ভারতে আমরা দেখিতে পাই যে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই দুই সম্প্রদায় কেবল দুইটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মের সেবক নহে, পরন্তু দুইটি সভ্যতারও প্রতিভূ।" (রিপোর্ট ১১ পৃষ্ঠা ২০ প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য)। এ কথা সত্য নহে। ইংরাজ বণিকদল যে সময় ভারতবর্ষ অধিকৃত করিয়াছিলেন, সেই সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুমোদনক্রমে সৈয়দ গোলাম হোসেন সাহেব মুতাক্ষরীণ লিখিয়াছিলেন। রেমণ্ড উহার অনুবাদ করেন। উহাতে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিত হইয়াছে যে, চিনি এবং দুগ্ধ এই দুইটি বস্তু একত্র করিয়া ফুটাইলে উহারা পরস্পর যেমন মিশিয়া এক হইয়া যায়, হিন্দু এবং মুসলমানগণ সেইরূপ তাহাদের পার্থক্য ভুলিয়া এক হইয়া গিয়াছে (The two nations have come to coaslasce into one whole like milk and suger that have received a simmering—vol 3 sec 14)। এই সমসাময়িক কালের লেখা কি অস্বীকার করা যায়? উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অনেক ইংরাজ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে ঐরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। টপোগ্রাফী অফ ঢাকা এবং ইষ্টার্ণ গেজেটিয়ারে তাহা লেখা আছে। সেই জন্য হিন্দুমুসলমানের এই বিবাদকে ঠিক পুরাতন বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার দোষে এবং অন্যান্য কারণে এই বিবাদ গজাইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ভুল তথ্য জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীতে বিরল নহে। আসল কথা, এই রিপোর্ট পড়িয়া বহু লোকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৃটিশ জাতির ভারতবাসীদিগকে কস্মিনকালেও স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার ইচ্ছা আপাততঃ নাই। ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড বার্কেণহেড গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই বিলাতের পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই কথা তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি এই—I am not able in any farseeable future to discern a moment when we may safely either to ourselves or India abandon our trust. ইহার সরলার্থ এই যে, আমাদের এবং ভারতবাসীদিগের পক্ষে নিরাপদে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে আমরা ভারত শাসন পরিত্যাগ করিতে পারিব, তাহা ভবিষ্যতের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। এই প্রসঙ্গে লয়েড জর্জ্জের বিখ্যাত ইস্পাতের কাঠামোর কথাটাও স্মরণ করা আবশ্যক। তবে আর এই রিপোর্ট আলোচনা করিয়া লাভ কি?

উদারনৈতিক সঙ্ঘ

এবার মহারাষ্ট্র খণ্ডের পুণা সহরে বড়দিনের লিবারাল ফেডারেশন বা উদারনৈতিক সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহাতে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্টখানির বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। লর্ড মর্লি যখন ভারত-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় মডারেটদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। মডারেট নেতাদিগের রাজনীতিক জ্ঞান বেশ আছে। তবে কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা দেশের জন্য কখনই বিশেষ ত্যাগস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া বেশ রাজনীতির আলোচনা করিতে পারেন,—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেশের জন্য কিছু করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ইহারা নিতান্ত নিরীহ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া কেহ ইহাদিগকে মানিতে চাহে না, সরকারও ইহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না। ইহারা মহাত্মাজীর অসহযোগ এবং আইন অমান্য প্রভৃতি আন্দোলন হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন এবং স্বরাজীদিগের ভাঙ্গন-নীতিরও সমর্থন করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাদের প্রভাব কিছুমাত্র ও লক্ষিত হয় না। স্বরাজীদলের ভাঙ্গনব্যবস্থা নিষ্ফল হইলেও উহা কিছুদিন একটা আপনাদের ক্ষমতা রক্ষার জন্য দৃষ্টিগত (spectacular) ফল হইয়াছিল। আজ যে সরকার আপনাদের ক্ষমতা রক্ষার জন্য এতগুলি বৃতি রচনা করিয়াছেন,—ইহার মূল কারণ কতকগুলি লোকের মতে কংগ্রেসের ও স্বরাজীদলের ভাঙ্গন-নীতি। আজ এই সমস্ত প্রতিরোধনীতি নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে বলিয়া সরকার আপনাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এই সকল বেড়া শক্ত করিয়া বাঁধিতেছেন। ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকার স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য

শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

শ্রীযুত চিন্তামণি

আমলাদিগের ক্ষমতারক্ষাকল্পে এইরূপ বৃতি বা বেড়া বাঁধেন নাই,—তাহার কারণ, তাঁহাদের ক্ষমতা বা স্বার্থহানি করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কেহ ঐরূপ প্রবলভাবে চেষ্টা করে নাই। যত দিন পশুর দ্বারা শস্যহানি হইবার ভয় বা সম্ভাবনা না থাকে, তত দিন ক্ষেত্রপাল শস্যরক্ষার্থ বৃতি বা বেড়া বাঁধা প্রয়োজন মনে করেন না। সরকারের এই বৃতিবন্ধনের ঘটা দেখিয়া অনেকে মনে করিতেছেন যে, গান্ধী-আন্দোলন একবারে নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু উহার ফল যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে ত চমৎকার। যাহা হউক, এবারকার উদারনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধ নেতারা তাঁহাদের বক্তৃতায় খুব গরমাগরম চানাচুর বিলাইয়াছেন। সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ বলিয়াছেন যে, "তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে পারেন না।" তাঁহারা উহা ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন, কর্ত্তারা উহা তাঁহাদের সকলের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবেন। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, সরকার তাঁহাদের নিকট হইতে এক বিন্দুও সহযোগিতা পাইবেন না। সরকার উহাতে ভয় করেন না। তাঁহারা উদারনৈতিক-দিগের নিকট হইতে সহযোগিতা না পান, জন কয়েক উদার-নৈতিক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের পরিকল্পিত শাসনযন্ত্র চালাইতে থাকিবেন। শ্রীযুত চিন্তামণি বলেন,—"ভারতবাসী-দিগকে রাজনীতিক পথে অগ্রসর করিবার নাম করিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবাসীরা যে অধিকার পাইয়া আসিতেছিল, তাহা পর্য্যন্ত উহারা কাড়িয়া লইল।" "ইহার উপর যেরূপ অবিশ্বাসের ছাপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহা গ্রেট বৃটেনের পক্ষে দেওয়াও উচিত নহে—ভারতবাসীর পক্ষে লওয়াও উচিত নহে।" "অতএব তোমরা উহা ফিরাইয়া লইয়া যাও, আমরা উহা চাই না।" বটে! ঘুঘু দেখিয়াছ ফাঁদ দেখ নাই। উহা দেওয়াই যখন রক্ষণশীল দলের মতলব, তখন তোমাদের মতামত কে শুনিবে? ভিক্ষার চাউল আঁকাড়া বলিয়া তাহা ফিরাইয়া দিবার অধিকার ভিক্ষুকের নাই। তোমাদের অভিমানের তোয়াক্কা কে রাখে হে বাপু! শেষকালে মিষ্টার কুঞ্জরু আশা করিয়াছেন যে, সরকার সমস্ত জাতির সম্মিলিত ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর অবিবেকিতার পরিচয় দিবেন না। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা অনেক আশাই করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতগুলি সফল হইয়াছে? ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ। কিন্তু যাহারা ঠেকিয়াও না শিখে, তাহাদিগকে কি বলিব।

আগা খাঁয়ের ভারতে আগমন

মাননীয় আগা খাঁ এই সন্ধিক্ষণে আবার ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি এখন য়ুরোপপ্রবাসী। এই প্রবাস তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন। এখন হঠাৎ তিনি কি কারণে প্রবাসের মায়ামোহ কাটাইয়া ভারতে আসিয়া দেখা দিলেন, তাহা প্রকাশ নাই! তবে তিনি ভারতে পদার্পণ করিয়াই যে ভাবে পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে নানা লোকের মনে নানা সন্দেহ জাগিতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ রিপোর্টের ভিতর নানা দোষ আছে, উহা দেশের লোকের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার মত হয় নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও দেশের লোকের ইহা চালান উচিত। ইহাতেই অনেকে অনুমান করিতেছেন,—কেহ গভীর জলে থাকিয়া সোনাকে চররূপে পাঠাইয়াছেন। এ অনুমান সত্যও হইতে পারে। ইনি মুসলমান-দিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক কার্য্যই করিয়াছেন,—এবার আবার জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে ঐরূপ কোন মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ভারতে আসিলেন কি না, কে বলিতে পারে। এ কথা সকলেই জানে যে, ঐ রিপোর্টখানি মুসলমান সম্প্রদায়েরও রুচিকর হয় নাই। তাঁহারা অনেকেই ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে উহার প্রতিকূলে ভোট দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা বেজায় রাজভক্ত, তাঁহারা নির্ব্বিচারে সরকারপক্ষে ভোট দিবেন। কিন্তু সকলে তাহা নহেন। কিন্তু কংগ্রেসী দল, শিখ দল ও কতক-গুলি মুসলমান যদি সম্মিলিত হইয়া ঐ রিপোর্টখানির বিরুদ্ধে

আগা খাঁ

ভোট দেন, তাহা হইলে ত সরকারের বড়ই দুর্ভাবনার কথা। সেই জন্যই তিনি মুসলমান সভ্যদিগকে যথাসম্ভব রিপোর্টের অনুকূলে ভোট দেওয়াইবার জন্য তাঁহার এই পরিত্যক্ত দেশে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যসাধনে তিনি যদি সফলকাম হন, তাহা হইলে তাঁহার বাদশাহী এবং রাজত্ব মিলিবে ত? তিনি এই রিপোর্টখানির মধ্যে ভারতের জন্য ভবিষ্য ঔপনিবেশিক শাসনের বীজ প্রোথিত আছে,—ইহা ঠাহর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার দূরদর্শনের তারিফ করিতে হয়। তিনি কি মনে করেন, তাহার ভাঁওতায় সকলেই ভুলিবে? গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি অবশ্য তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এবারও কি তিনি সেই কৃতিত্ব প্রকটিত করিতে পারিবেন? দেখা যাউক,—কোথাকার জল কোথায় যাইয়া দাঁড়ায়। দেশের যখন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সকলই সম্ভব হইতে পারে।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

গত বড়দিনের ছুটীর সময় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বাঙ্গালাবাসী বাঙ্গালীরা তাঁহাদের প্রবাসী ভ্রাতাদিগের সঙ্গলাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। দিন কয়টি খুব আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছিল। এই উপলক্ষে মূল সভার সভাপতি এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সভাপতি ও বক্তারা যে অভিভাষণ এবং বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—তাহা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদই হইয়াছিল। মূলসভার সভাপতি হইয়াছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি নিকট ধার না করিয়া মায়ের ধন গ্রহণ করা কি এতই অসুবিধাজনক? তবে জীবন্ত ভাষায় দু দশটা বিদেশী শব্দ রূপ বদলাইয়া প্রবেশ করিবেই,—তাহাতে জোর করিয়া বাধা দেওয়া উচিত নহে। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, কথাবার্তার ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা এক হওয়া উচিত। তাঁহার কথা এই :—

"যদি আমরা ঠিক মনে করি যে, আমাদের ভাষা বাঙ্গালাই থাকবে, সংস্কৃত, পালি প্রভৃতির মিশ্রণে জটিল হয়ে উঠবে না, তা হলে লেখার ও কহিবার ভাষার তফাৎ করবার দরকারও থাকবে না।" সংস্কৃত হইতে আবশ্যক হইলে দুই চারিটি কথা লইলেই যে বাঙ্গালা ভাষার বাঙ্গালাত্ব যাইবে, ইহা আমরা মনে করি না।

মূল সভাপতি
সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

দর্শন-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার অভিভাষণে এমন অনেক কথা বলিয়াছিলেন,—যে সম্বন্ধে চিন্তা করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রবাসে থাকিলেও বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী, এ কথা সে সহজে ভোলে না। অর্থাৎ বাঙ্গালীরা সহজে তাহাদের জাতীয়তাটা বিকাইয়া দিতে চাহে না। ইহা অবশ্য প্রবাসী বাঙ্গালীদের গুণের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন বিশিষ্ট জাতিই তাহার জাতিত্ব সহজে ছাড়িতে চাহে না। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, প্রবাসে বাঙ্গালীদিগের মাতৃভাষা শিক্ষার বিশেষ অন্তরায় ঘটে। কিন্তু উপায় কি? প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সমবেতভাবে এই অসুবিধাটা যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। তাহার পর "বাঙ্গালা ভাষার রূপ" সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকল কথার আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। 'তিনি জীবন্ত ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,—তাহা অনেকটা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালায় যে সকল ভাবপ্রকাশক শব্দের অভাব আছে, তাহা তাহার জননী সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? পরের মানুষের যেমন একটা জাতি আছে, ভাষারও সেইরূপ একটা জাতি আছে। আমাদের দেশে চিরকালই সাহিত্যের ভাষার সহিত কথোপকথনের ভাষার পার্থক্য আছে। সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাকৃত ভাষার পার্থক্য চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার লিখিত সাহিত্য কালজয়ী হইয়া আছে,—প্রাকৃত ভাষার সাহিত্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। যাহা আছে,—তাহা সংস্কৃত সাহিত্যকেই আশ্রয় করিয়া। তিনি ইংরাজী ভাষার নজীর দেখাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, বিজ্ঞানের ও দর্শনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কি ইংরাজ জাতি গ্রীক এবং লাটিন ভাষা হইতে নূতন শব্দ গঠন করিয়া তাহা লইতেছেন না? যথা—Psychogony, Psychomancy, Psychometry, Somatogenic, Somatology প্রভৃতি। আইন হইতে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান হইতে, দর্শন হইতে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখান যায়। ফরাসী ভাষায় এবং জার্ম্মাণ ভাষাতেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত আছে,—ইহা আমরা বিশেষজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে হইলে,—জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ

ধন-বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত ভানুভূষণ দাস গুপ্ত
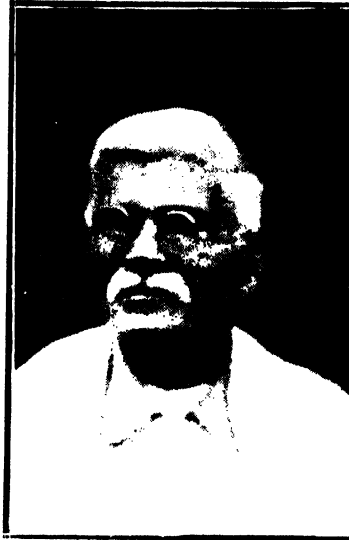
সাহিত্য-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
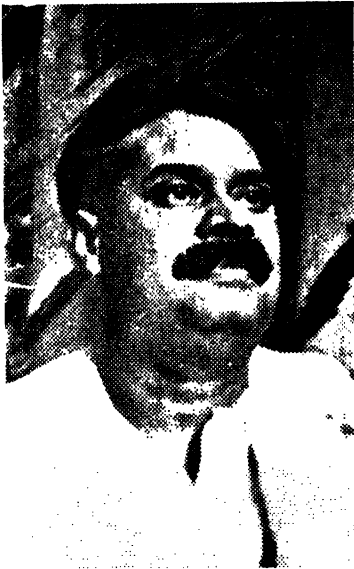
ইতিহাস-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়

বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার সভাপতি
গোষ্ঠবিহারী দে

শিক্ষা-বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত সুবিমল সরকার

শব্দ আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়াদির সাহায্যেই তাহা করিতে হইবে। তাহাতে ভাষা জটিল হইবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সংস্কৃত হইতে বহু শব্দ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার তেজস্বিতা বৃদ্ধি করিয়া যান নাই কি ?

তাহার পর মাননীয় সভাপতি Standard English এবং Provincial Englishএর কথা তুলিয়া সাহিত্যের ভাষা আর সাধারণ কথোপকথনের ভাষাকে যথাসম্ভব এক করিবার কথা বলিয়াছেন। এই তর্কটা বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার মুণ্ডপাতও যথেষ্ট হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি, বিলাতে কি colloquial ইংরাজীর সহিত classic বা standard ইংরাজীর পার্থক্য নাই ? ডকের মজুরদের ভাষা আর পার্লামেণ্টে গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতার ভাষা কি এক ? বিলাতের সাধারণ লোক কথা কহিবার সময় sentence প্রায় complete করে না এবং কতকগুলা করিয়া অপভাষা (slang) প্রয়োগ

করে। কিন্তু তথাকার সাহিত্যের ভাষা সেরূপ নহে। আমাদের দেশে আজকাল এক শ্রেণীর লেখক এবং পাঠক জন্মিতেছেন,—যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা ভাষাটা শিখিবার প্রয়োজন মনে করেন না। সুতরাং হেটো ভাষায় সাহিত্য গড়িবার জন্ম ব্যাকুল। কিন্তু ভাষার উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে উহা পরিশ্রম করিয়া শিখিতে হয়,—ঝি-চাকরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াই সাহিত্যিক হওয়া যায় না। ভাষা শিখিতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, "ভাষাকে মান বা মর্য্যাদা দিবার জন্ম উহাকে এমন ক'রে না গ'ড়ে তুলি—যাতে একখানা অভিধান কাছে না থাকলে সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে না পারে।" খবরের কাগজের ভাষা সম্বন্ধে সে কথা হইতে পারে, কিন্তু সকল ব্যাপারে তাহা হয় না। সভাপতি মহাশয় অন্য প্রসঙ্গে ইংরাজী ভাষার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইংরাজী ভাষার উচ্চ অঙ্গের ভাবপ্রধান ভাষা বুঝিতে হইলে কি একখানা ইংরাজী অভিধান কাছে রাখিতে হয় না? কার্লাইল বা ইমার্সনের লেখা কি অভিধানের সাহায্য না লইলে বুঝা যায়?

সভাপতি মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহার আলোচনা এইরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইতে পারে না। তিনি তিনটে শকারকে এক করিতে চাহেন। কিন্তু তাহাতে আর এক দিক দিয়া গোল বাধিবে। শব্দের চেহারা দেখিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝা যাইবে না। যেমন আভাস শব্দটি চোখে পড়িলেই বুঝা যায় যে, উহার অর্থ ইঙ্গিত। কেন না, ভাস ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া বা প্রকাশ পাওয়া। যাহা অল্প প্রকাশ পায়। কিন্তু আভাষ লিখিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। কারণ, ভাষ ধাতুর অর্থ বলা। উহার অর্থ আলাপ। যথা—তাঁহার আভাষে বুঝিলাম যে, তিনি যাইবেন না। ইহাতে বুঝিতে হইবে, তাঁহার ইঙ্গিতে, অর্থাৎ চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে, তিনি যাইবেন না। কিন্তু যদি লেখা যায় যে, তাঁহার আভাষে বুঝিলাম যে তিনি ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই যে, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে ইত্যাদি। ভাষায় অল্পে ভাব প্রকাশ করিতে হইলে উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি বাঙ্গালা অক্ষর তুলিয়া দিয়া নাগরী অক্ষর চালাইবার পক্ষপাতী। কারণ, তাঁহার মতে নাগরী অক্ষর প্রাচীন। সেটা তাঁহার ভুল।

প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীযুত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "যবদ্বীপের ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছি—যাহাতে অনেকটা আজকালকার মত বাঙ্গালা অক্ষরে ভবানী ও মামকী লেখা আছে।" সুতরাং বাঙ্গালা অক্ষর যে সাত আট শত বৎসরের পুরাতন, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। লালগোপালবাবু রোমান অক্ষর প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। ইহাতে লাভ কিছুই হইবে না,—বিড়ম্বনাই অধিক হইবে। এ প্রস্তাব অহেতুকী পরানুচিকীর্ষারই পরিচায়ক। উহাতে শব্দোচ্চারণে বিষম গোল বাধিবে। লাভ একবারেই হইবে না। যে অক্ষরে লেখার ফলে Put-র উচ্চারণ পুট হয়, কিন্তু But উচ্চারণ বট হয়, সে বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার প্রস্তাব যে এক জন বিবেচক ব্যক্তি করিতে পারেন, ইহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত।

সংস্কার ও সাহিত্য

সাহিত্য শাখার সভাপতি সুরসিক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণটি সারগর্ভ। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বিনয়ে সকলকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টায় সকলকামও হইয়াছেন। তিনি বালী ষ্টেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে যে অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি আধুনিক সাহিত্যিকদিগকে শুনাইয়া দিয়া ভাল কাযই করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন,—"ও ইচ্ছা (লিখিবার ইচ্ছা) যদি থাকে, খুব পড়ো, পুঁজি বাড়াও, এর পর বিতরণ সহজ হবে। * * দেখতে শেখাও চাই। ষ্টাইল শেখাতে হয় না, যা নিজের হয়ে দেখা দেবে, তাই তোমার ষ্টাইল। অন্যের মত ক'রে লিখতে যেও না, তাতে ঢুকুল যাবে—আমাদের সাহেব হবার মত।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার পর বলিয়াছেন,—"আজ ভাবি, কয়েক মিনিটের কথাবার্ত্তায় যা পেয়েছিলুম, ৪৫ বৎসরে ও তা পুরাতন বা অচল হয় নি।" আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকে সে উপদেশ পান নাই অথবা পাইয়াও তাহা পালন করা কর্ত্তব্য মনে করেন না। তাঁহাদের পুঁজি বাড়াইবার চেষ্টা নাই, কেবল দুই চারিটা অসম্বদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত ভাবের সহিত পরিচিত হইয়া, তাহাই উদ্গার করিতেছেন। তাহাতেও বদ্‌হজমের বিকট গন্ধ বিদ্যমান।
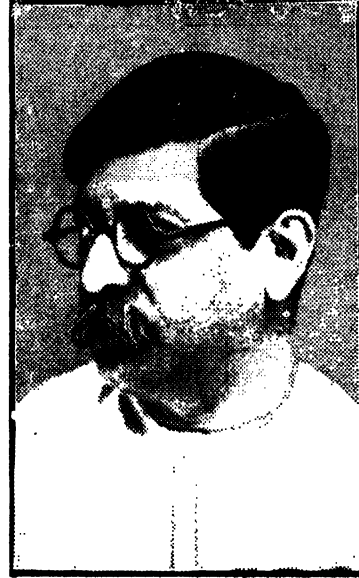
শিল্প শাখার উদ্বোধনকারী
শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দুই একটা অবান্তর বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ থাকিলেও আসল বিষয়ে আমরা তাঁহার প্রায় সকল মন্তব্যেরই সমর্থন করি। তিনি বলিয়াছেন,—"কোনও জাতিই সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত নহে। আবার বহুদিনের জাতিগত সংস্কার স্বভাবেই পরিণত হয়। স্বভাব চিরদিনই বলবান। সাহিত্যের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি তাকে বেদাগ মুছে দিতে পারে ব'লে মনে হয় না।" কথাটা খুবই সত্য। এই কথা আরও জোর ক'রে বলা আবশ্যক। কথাগুলি তিনি বলিয়াছেন, যেন হাওয়া দেখিয়া একটু সসঙ্কোচে। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন:—"আমাদের প্রায় সপ্ত-সুরই

আজ বিলাতী সুরগ্রামে বাঁধা। বাল্যকালেই We m t a lame man! ইংরাজীতেই আমাদের পঠন-পাঠন, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবনা-চিন্তা ; সে আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে এবং আমাদের অনেক কিছু নিয়েওছে.—জাত-ধাত পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম থাকিলে—ধর্ম্মও। ভালো মন্দের কথা বলছি না। নিজেরটা জানা থাকলে তার যাচাই চলতো। তা জানবার সুযোগ পাই নি, আক্ষেপের কথা—চেষ্টারও আবশ্যক বোধ করি নি। আমাদের সাহিত্যও অনেকটা সেই ধাত নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে, পুষ্ট হয়েছে। জ্ঞান ও রস, সে-ই জুগিয়েছে। সে ঋণ অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু এতোতেও সংস্কারমুক্ত কয় জন হ'তে পেরেছি ? মায়ের দেওয়া রক্তের সঙ্গে পাওয়া জিনিষ মজ্জাগত, তার একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাবও আছে। জাতি ব'লে জিনিষটা জগৎময় রয়েছে, তাদের বিভিন্ন সংস্কারও রয়েছে। বিশ্বমানব মহাপুরুষেরাই হন,—সংখ্যায় তাঁরা কয় জন ? পুরাণে বড় বড় উদাহরণ স্থলে দেখতে পাই—'যথা জনকাদি', দ্বিতীয় নাম শোনাতে কাউকে বড় দেখতে পাই না।

জাতির পরিচয়মধ্যে বৈশিষ্ট্য হিসেবে,—ভাষা, গীত, বাদ্য, শিল্প, অনেক কিছুই থাকে,—মনে হয়, সংস্কারটিও বড়গুলির মধ্যে অন্যতম।"

দাদামহাশয়ের এই উক্তিগুলিই তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সেরা। তিনি সাহিত্যে অতীতের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহার কোন কথাটি বাদ দেওয়া যায় না। পাঠক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবেন। শেষকালে তিনি তরুণ সাহিত্যিকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলের প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। তিনি নূতন শব্দ সৃষ্টির উপর ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, কৃষ্টি কথাটা কেমন মিষ্টি লাগে না—বোধ হয় অভ্যস্ত হই নি ব'লে। কিন্তু মিষ্টি যদি যোটে, তাহা হইলে কৃষ্টি রুচিবে না কেন ? যাহা হউক, সাধনার কথাটায় দাদামহাশয়ের রসনা বোধ হয় বেদনা পাইবে না। তিনি বলিয়াছেন যে, কালচারের দিকটা যাতে অশোভন না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শেষকালে তিনি বলিয়াছেন :—

"প্রথম কথা—বর্ণনাটা দু' তিন ছত্রে সেরে ফেলাই ভালো।

দ্বিতীয়—উচ্ছ্বাস। যত এড়ানো যায়, লেখা ততই স্বচ্ছ হয় বলেই মনে হয়। অলঙ্কার-বর্জ্জিত হ'তে বলছি না, সেটা যেন সুসামঞ্জস্য হয়, শোভন হয়। বাহুল্যোক্তি না এসে পড়ে।

তৃতীয়—জীবন ও জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে সাহিত্য। তার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টিই বোধ হয় প্রধান অর্থাৎ মানুষ গড়া কায, মানুষ—দোষে গুণে দুর্বৃত্ত বা নরহন্তা গড়ছি ব'লে, তার যে কোথাও দয়া-স্নেহ-মমতাদি কোমল ভাব একটুও থাকবে না, সে 'মেসিন-গানের' মত মানুষ-মারা লৌহযন্ত্রই হবে, তা না ক'রে ফেলি। ব্যাঘ্রের মধ্যেও বাৎসল্য আছে।

আদর্শ চরিত্রও গড়তে হয়। কিন্তু তিনিও মানুষ। কাম, ক্রোধ, লোভ, সাধুর মধ্যেও থাকে, তবে সংযমের দ্বারা সংযত, তাই তিনি বড়।

এই কয়টির প্রতি দৃষ্টি থাকলে, বাইরের কায মোটামুটি চ'লে যায়।

চতুর্থ—সূক্ষ্ম যা—তা মনের ক্রিয়া। লেখকের নিজের মনই, অভিজ্ঞতা মত, ঈপ্সিত চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলে। তাদের অবস্থা ও ক্রিয়াগুলির তখনি সুসঙ্গত রূপ তিনি দিতে পারেন, যদি সে সম্বন্ধে তাঁর দর্শন ও অভিজ্ঞতা তাঁহার সত্যবোধ উদ্‌বুদ্ধ ক'রে থাকে। সেই সত্যাশ্রিত রসই—সাহিত্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদান। লেখকের কল্পনাশক্তির সাহায্যে, সত্যানুভূতি-প্রণোদক যে সাহিত্য জন্ম নেয়, সেই সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করে। এই-ই আমার ধারণা।"

কবীন্দ্রের উদ্বোধন-বাণী

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহা নানা দিক দিয়া সুন্দর হইয়াছে। সাহিত্যের গতি অনেকটা নদীর গতির ন্যায়। উহা প্রথমে সঙ্কীর্ণ থাকে, ক্রমে উহার অগ্রগতির সহিত যেমন নানা উপনদী আসিয়া উহাতে বারি-সম্পদ জুটায়, তেমনই উহা পুষ্টিলাভ করে। অচল নদীতে বারিসম্পদের সহিত যেমন সময় সময় অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া উপস্থিত হয়, সাহিত্যেও যে সেরূপ আবর্জ্জনা আসে না, তাহা নহে। সকল সাহিত্যেই তাহা আসিয়া থাকে। কিন্তু আবর্জ্জনা স্রোতস্বিনী নদীতে স্থায়ী হয় না,—উহা চলিয়া যায়। সাহিত্যেও ভাব-সম্পদের সহিত যে অচলতা আসে, তাহাও স্থায়ী হয় না। রবীন্দ্রনাথ সে কথা উপমা দ্বারা সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। সে কথাগুলি এই :—

সম্মেলনের উদ্বোধনকারী
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মহৎ সাহিত্য প্রবাহিনীতে বাঙ্গালী চিত্তের পঙ্কিলতাও মিশ্রিত হচ্চে বলে দুঃখ ও লজ্জার কারণ সত্ত্বেও ভাবনার কারণ

অধিক নাই। কারণ, সর্ব্বত্রই ভদ্র সাহিত্য স্বভাবতঃই সকল দেশের সকল কালের, যা কিছু স্থায়িত্বধর্ম্মী, তাই আপনিই বাছাই হয়ে তার মধ্যে থেকে যায়; আর সমস্তই ক্ষণজীবী, তারা গ্লানিজনক উৎপাত করতে পারে, কিন্তু নিত্যকালের বাসা বাঁধবার অধিকার তাহাদের নাই। গঙ্গার পুণ্যধারায় রোগের বীজও ভেসে আসে বিস্তর, কিন্তু স্রোতের মধ্যে তার প্রাধান্য দেখতে পাইনে, আপনি তার শোধন এবং বিলোপ হতে থাকে। কারণ, মহানদী ত মহা নর্দ্দমা নয়, বাঙ্গালীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ, বা শাশ্বত, যা সর্ব্ব মানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্ত্তমান কাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকাররূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর যে পরিচয় সৃষ্ট হচ্ছে, বিশ্ব-সভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জ্জনা সে বর্জ্জন করবে, বিশ্বদেবতার কাছে বাঙ্গালা দেশের অর্ঘরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে।" ইহাই আমাদের পক্ষে আশার কথা। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক আবিলতা এবং আবর্জ্জনা ভাসিয়া আসিতেছে, এ কথা সত্য। বর্ষাবারিপুষ্টা নদীর জল আবিল হইয়াই থাকে, কিন্তু শরদাগমে সে আবিলতা থাকে না। সেই জন্য আমাদের বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-তরঙ্গিণীতে আবিলতা দেখিয়া যাঁহারা চিন্তিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সে চিন্তা করিবার বিশেষ কারণ নাই। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও সেই আশা দিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে এই আশার বাণীই দেশের প্রকৃত সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দর্শন শাখার কথা

ভারতবর্ষ দর্শনের দেশ। এ দেশে এককালে দর্শন-শাস্ত্রের যতদূর উন্নতি হইয়াছিল, আজিও বুঝি পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দর্শনশাস্ত্রের ততদূর উন্নতি হয় নাই। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। এবার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের দর্শন শাখার সভাপতি শ্রীযুত নিশিকান্ত সেন যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসনীয় হইয়াছিল,—তবে তিনি যত দোষ নন্দঘোষ হিসাবে হালফ্যাসানমতে দার্শনিক চিন্তার অন্তরায়ের জন্য যে কঠোর ব্রাহ্মণ্য শাসনকে দায়ী করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই গতানুগতিক ন্যায় হইয়াছে। এই মৌলিক চিন্তার অভাব ঘটিয়াছে বর্ত্তমান যুগের পল্লবগ্রাহী শিক্ষার জন্য। আজকাল ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে, এত শিক্ষা-বিস্তার সত্ত্বেও দর্শনের মৌলিকগ্রন্থ কয়জনই বা লেখে, কয়জনই বা পড়ে? কিন্তু তরল সাহিত্যের প্রচার বিস্ময়কর। বস্তুতান্ত্রিকতার দোহাই দিয়া হীন লালসামূলক প্রবৃত্তির প্রশ্রয়দাতা সাহিত্যেরই অবাধ প্রসার,—উহাতে লোকের মন তরল হইয়া পড়িতেছে,—তাহারা আর উচ্চচিন্তা মনে স্থান দিতে পারিতেছে না। মুসলমান শাসনকালেও এই বঙ্গে নব্য ন্যায়ের গৌরবভাতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তবে শেষকালে রাজনীতিক কারণে ভারতবাসীর চিন্তার মৌলিকধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য মুসলমান শাসনের শেষকালে হিন্দু দর্শনের সেই মৌলিকতা, গভীরতা ও ব্যাপকতা অন্তর্হিত হইয়া যায়। দেশে অশান্তি উপস্থিত হইলে আর দার্শনিক চিন্তার অবসর থাকে না। সুতরাং সে জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে কোনমতে দোষ দেওয়া যায় না। এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে এ সকল কথার আলোচনা করা যাইতে পারে না। তবে সভাপতি মহাশয় সুপণ্ডিত। তিনি কতকগুলি কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আমাদের দেশে দর্শনশাস্ত্র আধ্যাত্মিকতার ও পারমার্থিকতার পল্লবচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশেও বিশেষ করিয়া মধ্যযুগে খৃষ্টান ধর্ম্মের মতবাদ দার্শনিক চিন্তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; পরে বিজ্ঞানের প্রভাবেই পাশ্চাত্যদর্শন মোহমুক্ত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। আমাদের দেশের ধর্ম্ম খৃষ্টান ধর্ম্ম বা ইসলামের মত credal religion নহে; আমাদের দেশে আচার, অনুষ্ঠান ও অনুশাসনের দ্বারা মানুষের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যে আয়োজন হইয়াছে, আমরা তাহাকেই ধর্ম্ম আখ্যা দিয়াছি। বাস্তবিক আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও দর্শনের সহিত মানুষের সমষ্টিবদ্ধ জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল বলিয়াই ধর্ম্ম ও দর্শন অতীত যুগে সজীব ও শক্তিমান হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। চিন্তার মৌলিকতা, ব্যাপকতা, গভীরতা ও পরিবর্ত্তনশীলতাই (adaptibility) দর্শনের সজীবতা ও শক্তির লক্ষণ। এই হিসাবে হিন্দুদর্শন যে সজীব ও শক্তিমান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গভীরতা ও মৌলিকতার দিক দিয়া দর্শনের ইতিহাসে হিন্দু দর্শনের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করেন না। কিন্তু ব্যাপকতা ও পরিবর্ত্তনশীলতাই হিন্দু দর্শনের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনের এমন কোন দিক বোধ হয় ছিল না—যাহা দার্শনিক গবেষণার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হইয়া পড়ে নাই।"

তাঁহার এই কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। তিনি আর একটি কথা বলিয়াছেন এই যে, "মানুষের প্রয়োজনের জগতে দার্শনিকেরসত্য দৃষ্টিই মানুষকে কর্ম্মকুশল ও শক্তিমান করিয়া তোলে। মানুষ আপনার পরিবেষ্টনীকে পরামর্শলাভের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বিজ্ঞানের কর্ম্মশালায় নানাবিধ যন্ত্র ও উপকরণের সন্ধানে ফেরে বটে, কিন্তু এই সকল যন্ত্র ও উপকরণ মানুষের গৃহে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কি করিয়া সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে, তাহার সন্ধান দার্শনিকের নিকটই পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দার্শনিক মানুষের প্রয়োজনের জগতের বিশৃঙ্খলা অনাচার ও বিরোধদ্বন্দ্বকে আধ্যাত্মিকতার মোহে ভুলিয়া যান নাই। তাঁহাদের পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা সহজ হয় যে, সত্যোপলব্ধির প্রেরণাই মানুষকে অনন্ত শক্তি দান করিয়া জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে।" তাঁহার এই কথাগুলি আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের পার্থক্য কোথায়, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করিবেন,—কিন্তু তিনি তাহা বিশেষভাবে করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে দার্শনিক চিন্তা পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কেন,—তৎসম্বন্ধে তিনি যে

মত কতকটা চাপা সুরে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। এখানে সে কথার আলোচনার স্থান নাই। কারণ, সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সে কথার আলোচনা অসম্ভব। সমাজ-জীবনে আমাদের চিরাগত প্রথার দাসত্ব প্রভৃতি যদি আমাদের দার্শনিক বুদ্ধির অন্তরায় হইত, তাহা হইলে যাঁহারা সমাজের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যেই বা কয় জন দার্শনিক দেখা দিতেছেন, কয় জনই বা মৌলিক দার্শনিক নিবন্ধ লিখিয়াছেন? ক্বচিৎ দুই একটা সন্দর্ভ যাহা বাহির হইতেছে,তাহাও মেরুদণ্ডহীন ধার করা Ideologyর (মতবিজ্ঞানের) ক্ষীণ শক্তিই প্রকটিত করিয়াছে। দার্শনিক প্রবন্ধাদির পাঠকও জুটে না। তাহা সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ সম্পর্কে আলোচনার বহর দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে তিনি একটা কথা যথার্থ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে মনঃসংযোগের শক্তির অভাবে আমরা আর দার্শনিক চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাহার কারণ, আমাদের শিক্ষার দোষে মন তরল বিষয়ে চিন্তায় আসক্ত হইয়া পড়িতেছে,—আর তাহার সহিত জীবনধারণের সমস্যাগুলি দিন দিন জটিল হইয়া পড়িতেছে। প্রেমের কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিলে অথবা তৈললবণ-চিন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলে দার্শনিক চিন্তা গজাইবে কি করিয়া?

মহিলা শাখায় সভানেত্রীর উপদেশ

প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের মহিলা শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেনের অভিভাষণ খুবই সুন্দর হইয়াছিল। এই মহীয়সী মহিলার প্রত্যেক কথাটি আমাদের দেশের নারীদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার অভিভাষণ দীর্ঘ হইলেও উহা পাঠ করিতে কাহারও ক্লান্তিবোধ হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর পড়িবার জন্য আগ্রহের আতিশয্য জন্মিয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতায়, তথ্যের সমাবেশে এবং চিন্তাশীলতার প্রভাবে এই অভিভাষণটি সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তরুণ সাহিত্যিকদিগকে তিনি যে কশাঘাত করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন :—

"নির্ব্বিচারে বিদেশীয় ভাব, ভাষা ও সমস্যার আমদানী করিয়া যে চিত্র এক শ্রেণীর নূতন সাহিত্যে অঙ্কিত হইতেছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সাহিত্য যে কোন্ পথে চলিতেছে, কি তাহার বলিবার উদ্দেশ্য, কি তাহার লক্ষ্য—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যেমন নারী-চরিত্র, তেমনই পুরুষ-চরিত্র—ভাবপ্রবণ উচ্ছৃঙ্খল এবং কর্ম্মবিমুখ। যেন জীবনে কোন কাযই করিবার নাই। ভাষা অসংযত এবং বর্ণনাসমূহ অশোভন। বিশেষ আশঙ্কার কথা এই যে, অপরিণতবুদ্ধি তরুণদের চক্ষুর সম্মুখে ভোগের চিত্র মনোরম করিয়া ধরিলে স্বতঃই তাহা সংযম এবং সৎশিক্ষার পরিপন্থী হয়, এবং তাহাদের মনের বল এবং কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া কল্যাণের পথ হইতে দূরে লইয়া যায়।" কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, "যে আদর্শ সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সে আদর্শ যে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহা আমরা এইরূপ রচনা হইতেই জানিতে পারি। মানুষ হইয়া বাঁচিতে হইলে যে সংযম এবং চরিত্রবলের উপর আস্থার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, সে সত্য আজ এমনি করিয়াই সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে।" এই কথাগুলি ঠিক মাতৃ-উপদেশের মতই হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতির যে আমূল সংস্কার আবশ্যক, এ কথা আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। বিদুষী সভানেত্রী মহাশয়াও সেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে যে রীতিতে স্ত্রী-শিক্ষা চলিতেছে, তাহার আমূল সংস্কার হওয়া কর্ত্তব্য। মেয়েদের যে সব বিষয় পড়িতে হয়, তাহা অভ্যাস করিতে তাহাদের খুবই পরিশ্রম করিতে হয়। অথচ তাহা আমাদের জীবনযাত্রার পথে যথেষ্ট সাহায্য করে না। অল্প আয়াসে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। অধিকাংশ কলেজের মেয়েদের দেহ রুগ্ন, শীর্ণ এবং কঙ্কালসার, শ্রী ও স্বাস্থ্য পড়ার চাপে কোথায় চলিয়া গিয়াছে; তাহার উপর আজকাল নারী-নির্য্যাতন এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেক মেয়েরই শারীরিক শক্তি অর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, সুখের বিষয়, এ দিকে এখন অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তার পর তিনি স্ত্রীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা এই স্থলে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মহিলা সভার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেন

"তার পর মনে রাখিতে হইবে যে, মেয়েদের হাতেই সংসারের সব ভার। আর তার মধ্যে সব চেয়ে বড় দায়িত্ব ছেলেকে মানুষ করা—মাতৃত্ব। মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা লাভের কাযে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। জাতি গড়িবার মূলে রহিয়াছে শিশুদের শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার ভার মেয়েদের হাতে। জননীদের কর্ত্তব্য কেবল চাকর ও দাসীর উপর নির্ভর করিলে সুসম্পন্ন হইতে পারে না, মায়ের শক্তি ও প্রেরণাই জাতিকে মানুষ করিবে।"

এখন সামাজিকগণের এই কথাগুলিই বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমরা এই উপলক্ষে সভানেত্রী মহাশয়াকে এই মহদুপদেশ প্রদান করিবার জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি এই ভাবে উপদেশদানে দেশের লোকের, বিশেষতঃ মাতৃজাতির কল্যাণ-সাধন করিতে থাকুন, ইহাই আমাদের কামনা।

পিতৃহীন বসু-ভ্রাতৃযুগল

সুভাষচন্দ্র বসু বিমানযোগে আসিয়াও তাঁহার স্বনামধন্য বৃদ্ধ পিতা জানকী বাবুকে জীবিত দেখিতে পান নাই। পিতার স্নেহশীতল ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া দীর্ঘদিন রোগজীর্ণ শরীর লইয়া তিনি য়ুরোপে অবস্থানের পর এখনও রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। সরকারের অনুমোদনক্রমে ৫ সপ্তাহকাল পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থানের পর আবার তাঁহাকে য়ুরোপ ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। দিক্‌পাল পিতা জানকী বাবুর শ্রাদ্ধ-বাসরে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ও শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র যোগদানের সুযোগ পাইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহারা কতকটা সান্ত্বনালাভের অবকাশ পাইয়া থাকিবেন। শ্রাদ্ধবাসরে ভ্রাতৃযুগল নীরবে সমাগত
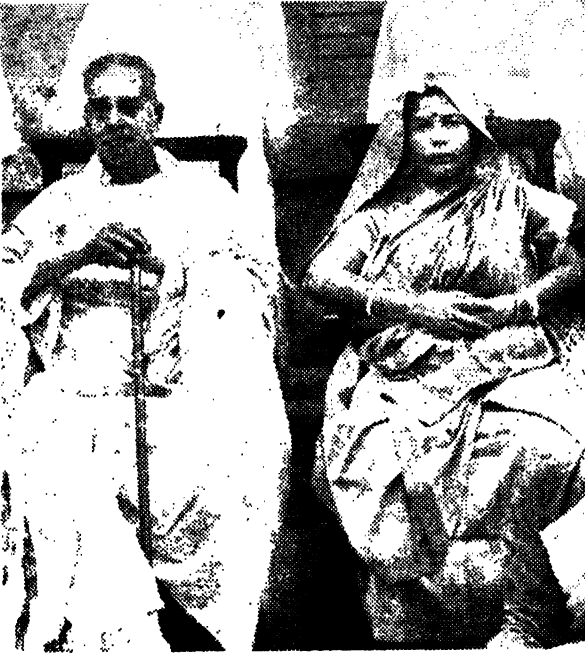
জানকীনাথ বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী

ব্যক্তিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া পিতৃকৃত্য সম্পাদন করেন। সংবাদে প্রকাশ যে, সুভাষ বাবুর য়ুরোপগমন কোনরূপ সর্ত্তাধীন করা হয় নাই। গত ২৩শে পৌষ মঙ্গলবার তিনি অপরাহ্ণ ৫টা ৩৪ মিনিটের সময় বেঙ্গল নাগপুর রেলের বোম্বাই মেলে বোম্বাই রওনা হইয়াছেন। বোম্বাই মেলে তাঁহার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছিল। কিন্তু শুনা যাইতেছে, সরকার তাঁহার বিলাতযাত্রার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। তবে তাঁহাকে জেনিভা হইতে বোম্বাই ফিরিবার জন্য রিটার্ণ টিকিট ক্রয় করিতে দেওয়া হইয়াছে। ২৫শে পৌষ ভিক্টোরিয়া জাহাজে বোম্বাই বন্দর ছাড়িয়া যাইবার কথা। সুভাষ বাবু সজলনয়নে তাঁহার জন্মভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত শরৎবাবু ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্য। সপার্ষদ বড়লাটের এক পরোয়ানা অনুসারে তিনি এখনও রাজবন্দী হইয়া আছেন। আগামী ২১শে জানুয়ারী হইতে নূতন দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে যোগদানের জন্য শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বড়লাটের নিকট হইতে একখানি নির্দ্দেশপত্র বা সমন পাইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধানের জন্য শরৎ বাবু ভারত সরকারের রাষ্ট্রনীতিক বিভাগের মতামত জানিবার জন্য পত্র লিখিবেন, শুনা যাইতেছে। ইহাতে যদি সন্তোষজনক উত্তর তিনি না পান, তাহা হইলে তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতির নিকট আবেদন করিবেন।

পরলোকে এটর্ণী শরৎচন্দ্র ঘোষ

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ এটর্ণী শরৎচন্দ্র ঘোষ সন্ন্যাসরোগে গত ৩০শে অগ্রহায়ণ হঠাৎ ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ৩৬ বৎসর ধরিয়া তিনি সুখ্যাতির সহিত নিজের আপিসে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। শরৎ বাবুর মৃত্যুকালে ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকে রাখালদাস

কলিকাতা ছোট আদালতের অবসরপ্রাপ্ত ব্যবহারাজীব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে তাঁহার সিমলা ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রাখাল বাবু ৪৫ বৎসর ধরিয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য করার পর অবসর গ্রহণ করেন। আদালতের বিচারপতিরা এই বিচক্ষণ আইনজীবীর গুণমুগ্ধ ছিলেন। স্বোপার্জ্জিত অর্থে রাখাল বাবু বিবিধ সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতৃভক্তি আদর্শস্থানীয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি একটি পুত্র, ৬টি পৌত্র ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ও জমীদার সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৬৪ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। এটর্ণীর কার্য্য ব্যতীত অধিকাংশ সময় তিনি কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য স্বগ্রাম দামপালে (বর্দ্ধমান জেলা) যাপন করিতেন। কৃষির উন্নতি ব্যতীত সাধারণের উপকারার্থ তিনি নানা প্রকার কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বীয় পল্লী ও সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভদ্রলোক-গণের মধ্যে যাঁহারা বেকার, তাঁহাদিগের অনেককেই তিনি জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের বিদ্যালয়ের তিনি সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় বিদ্যালয়টি পাকা-ইমারতে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনি বহুদিন বিপত্নীক। আমরা তাঁহার আত্মীয়গণকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

র ঘরে সকল আলো জ্বেলে
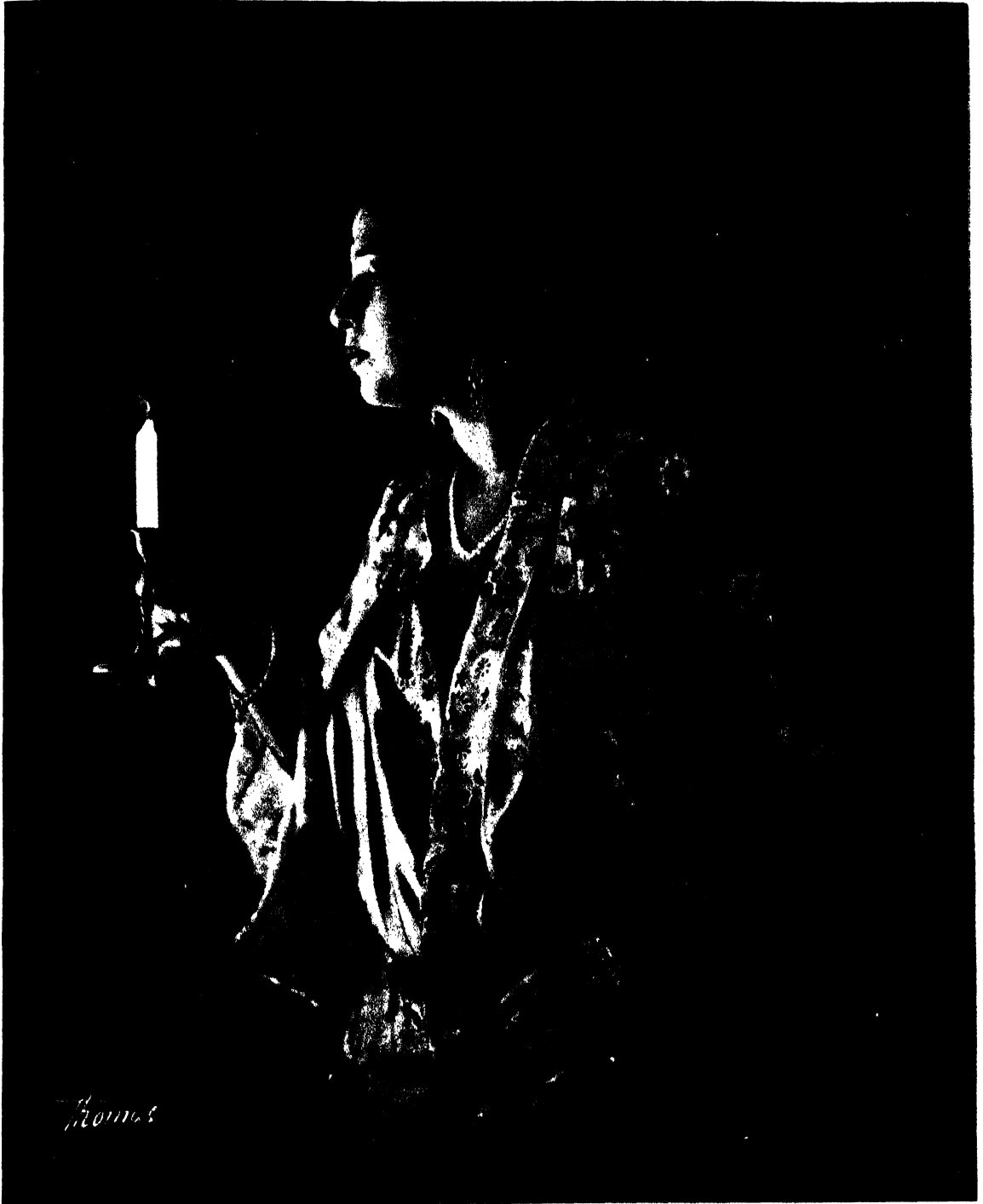
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে…” —রবীন্দ্রনাথ

বসুমতী-চিত্রবিভাগ | মিষ্টার টমাস

১৩ বর্ষ] মাঘ, ১৩৪১ [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

৪

সমস্ত জাতির মধ্যেই মনুষ্যকুলপ্রদীপগণ সময়ের মূল্য উপলব্ধি করিয়া জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কায়মনোবাক্যে সমগ্র প্রাণ নিয়োজিত করিয়া থাকেন; কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকায় সময়ের মূল্য সম্বন্ধেও অভিমতের বিভিন্নতা মানব-জীবনে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মহৎ লোকের জীবনেও সময়ের মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে না,—লোকবিশেষে জীবনের সার্থকতার বিভিন্ন আদর্শের জন্য সময়ের মূল্যেরও তারতম্য হইয়া যায়। যে সময় দিয়া পরোপকার করা যায়, সে সময়ের মূল্য পরোপকারের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে। পরোপকারই যাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য, তাঁহার নিকট সময়ের মূল্য একরূপ, আবার যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেশকে নির্ব্বিঘ্ন ও আপনাকে কর্ত্তব্যসাধনের গৌরবে মণ্ডিত করা যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, তাঁহার নিকট সেই সময়ের মূল্য অন্যরূপ। কিন্তু যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বিশ্বস্রষ্টার দর্শনলাভ, তাঁহার সময়ের মূল্য আর কাহারও সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। সময়ের ব্যবহার করিয়া যে বস্তু লাভ করা যায়, সেই বস্তুর মূল্য দিয়াই সময়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। কিন্তু যে সময় দিয়া আত্মজ্ঞান অথবা

ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে, সে সময়ের মূল্য নাই; সে সময় অমূল্য। কবি রামপ্রসাদ তাঁহার জীবনে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

'এমন মানব-জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা'

এই "সোণা" সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ম্মিগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সাধক রামপ্রসাদের ধারণা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল। তাই যৌবনের প্রারম্ভেই সাধক-জীবনের সময়, সন্ধ্যা হইলেই সমস্ত দিনের ব্যর্থতা তাঁহার ব্যাকুল মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিত, তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিয়া বলিতেন—

'একটা দিন বৃথা গেল, দেবীর দর্শন হ'ল না!'

ইহার অপেক্ষা সময়ের মূল্যজ্ঞান আর অধিক সম্ভবপর নহে। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে ধারণাই হৃদয়ে থাকুক না কেন, মানব-জীবনের সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য এমন ব্যাকুলতা আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় নাই। আমরা মনে করি, সময়ের প্রকৃত ব্যবহার অথবা মূল্য-নির্দ্দেশ পাশ্চাত্য জগতের বিশেষত্ব, কিন্তু সময়ের উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা মানব-জীবন ফলবান্ করিয়া তুলিবার আদর্শ প্রাচীর চিরন্তন ও নিজস্ব বস্তু।

ঠাকুরের জীবনে কিন্তু কোন দিনই ব্যর্থ হয় নাই, তাঁহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার সমস্ত দিনগুলিকে সাধনার উপ্তবীজের দ্বারা ঠাকুরের অজ্ঞাতেই সফল ও সার্থক করিয়া যাইতেছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অপরাহ্ণকালে একখানি নৌকা মন্দিরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। এক গৌরবর্ণা, আলুলায়িতকুন্তলা, ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী নৌকা হইতে ঘাটে অবতরণ করিলেন। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সন্ন্যাসিনী বলিলেন—

"বাবা, তোমায় খুঁজ্‌ছি,—তুমি এখানে রয়েছ,—এত দিনে তোমার দেখা পেলাম।"

কোথায় এই সন্ন্যাসিনী ঠাকুরকে খুঁজিয়াছিলেন, কি উদ্দেশ্যে সেই দিন অপরাহ্ণসময়ে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, ঠাকুরকে খুঁজিবার কি কারণ এই সন্ন্যাসিনীর জীবনে ছিল, কোন্ শক্তি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া সে দিন সেই পথে আনিয়াছিল, তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক হইলেও আজ তাহা চিরদিনের জন্য অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে।

সন্ন্যাসিনীর পূর্ব্বনাম যোগেশ্বরী, জাতিতে ব্রাহ্মণী এবং ভদ্রবংশসম্ভূতা। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অপূর্ব্ব রূপবতী এই সন্ন্যাসিনীর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্টতা ছিল যে, সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও ভঙ্গিমাই তাঁহাকে ভদ্রবংশসম্ভূতা বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিতে পারিত। কোন কোন লোকের আকৃতির মধ্যেই এমন একটা লাবণ্য ও বিশিষ্টতার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ লক্ষ মানবমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেও তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠবই তাঁহাকে ভদ্রবংশসম্ভূতা বলিয়া পরিচিত করিয়া দেয়। এই ব্রাহ্মণীর শরীরেও সেই বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় ব্রাহ্মণীর বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর। যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার সন্ধিক্ষণে এই যে বয়স, ইহা বড়ই গম্ভীর, বড়ই মনোরম। এই বয়সে যৌবনের সুগঠিত পরিপূর্ণতা বিদ্যমান থাকে অথচ তরল চাঞ্চল্য প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়া যায়। অপরাহ্ণের তরঙ্গহীন প্রশান্ত সাগরের ন্যায় এই বয়ঃক্রম বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। রূপের মাদকতা তখন থাকে না, অথচ দেবীপ্রতিমার সৌন্দর্য্যের মত সমস্ত মনকে মুগ্ধ করে। এই সময়ে নারী ব্রহ্মচারিণী হইলেও মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দেয়, সন্ন্যাসিনী হইয়াও যেন মানুষকে নিজ স্নিগ্ধ ক্রোড়ের দিকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বোপরি সত্ত্বপ্রধানা এই নারীর মুখে যে স্নিগ্ধশান্তি ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, তাহাতে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের ও অঙ্গসৌষ্ঠবের কমনীয়তা শতগুণে বর্দ্ধিত হইত। বিষয়ভোগপ্রয়াসী মথুরানাথ এক দিন এই মাতৃমূর্ত্তির নিকট নিজ বিষয়-বাসনা-লোলুপ মন লইয়া বিদ্রূপ করিতে গিয়াছিলেন। "ভৈরবি, তোমার ভৈরব কোথায়?" বলিয়া মথুরানাথ মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন। ভৈরবী দেবীর পদতলে শায়িত শবাকার মহাদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। চতুর মথুরানাথ বলিলেন, "ও যে নড়ে না।" শাণিত তরবারির ন্যায় একটা তীব্র দৃষ্টি একবার মথুরানাথের উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবীর বাণী আসিল—"ঐ শবকেই যদি না জাগাইতে পারি, তবে আমার সাধনা বৃথা।" মথুরানাথ যোগেশ্বরীর কথাটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন কি না, অথবা সেই শাণিত তরবারির ন্যায় অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া

পড়িলেন,তাহা আজ ঠিক করিয়া অনুমান করা কঠিন; কিন্তু সে দিন মথুরানাথ নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিষয়-রস-প্রলুব্ধ মন ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহাকে ভৈরবীর সহিত প্রচলিত বিদ্রূপ করিতে প্রণোদিত করে নাই।

সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিলেন না, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে একাদিক্রমে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর-কাল ঠাকুরের সান্নিধ্যে বাস করিয়া প্রথম দুই বৎসর তাঁহাকে নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়াকল্পে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঠাকুর এই সন্ন্যাসিনীর কথা বলিবার সময় 'ব্রাহ্মণী' বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিতেন। ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর দেবায়তনে পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণী প্রায় দুই বৎসরকাল ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত নানাবিধ সাধন করাইয়াছিলেন। বিল্ব-বৃক্ষমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন রচনা করিয়া নরকপাল, মহামাংস প্রভৃতি সংগ্রহ পূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত বিধিমতে এই ব্রহ্মচারিণী ঠাকুরকে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকল্পে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সাধনের সময় ঠাকুরের দীর্ঘ কেশরাশি ধূলাকাদা ও জল লাগিয়া জটায় পরিণত হইয়াছিল। দেহের প্রতি তখন কোন লক্ষ্যই ছিল না। ঠাকুর নিজে তন্ত্রোক্ত সাধন করি-লেও ভবিষ্যতে শিষ্যমণ্ডলীকে কখনও তন্ত্রসাধন করিতে উৎসাহিত করেন নাই। তিনি কোনও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে কখনও নিন্দা করেন নাই।

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী

এই তন্ত্র-সাধনার সময়ে ঠাকুরের জীবনের একটা ঘটনা আমরা উল্লেখ করিব। তন্ত্রসাধনায় নারীকে বিশ্ব-প্রসবিত্রী জগৎ-জননীর প্রতীকস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহায্যে সাধনার প্রথা বহুদিন হইতে তান্ত্রিক-সাধকদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঠাকুরের তন্ত্র-সাধনার সময় এক দিন ব্রাহ্মণী নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে রূপ-যৌবন-সম্পন্না একটি যুবতীকে সঙ্গে করিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রথায় পূজা করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করেন। কামিনী-কাঞ্চনবিরাগী এই সাধকের মন নারীর সান্নিধ্য ও সাহায্যে সাধনার কল্পনায় স্বভাবতঃই একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তির সহায়ে ও সমগ্র নারীজাতির মধ্যে বিশ্বজননীর অন্তর্নিহিতা সত্তা অনুভব করিয়া চিত্তের সেই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা পরিহার-পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই নারীর মধ্যেই বিশ্বজননীর পূজা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সাধক-জীবনে এই তন্ত্রসাধনার অন্য কোনও সার্থকতা হইয়াছিল কি না, তাহা তিনি ব্যতীত কেহই বলিতে পারে না; কিন্তু এই সাধনার ফলে মনুষ্যদৃষ্টির গোচরীভূত এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবনে চিরদিনের জন্য সংঘটিত হইয়াছিল,—তিনি সমগ্র নারীজাতির মধ্যে তাঁহার বিশ্বজননীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

৬।৭ দিন বাস করিবার পর ঠাকুর নিকটবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তাঁহার বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সর্ব্বত্যাগী সাধকপ্রবর নিজে সমাজের সহিত কোন সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট না হইয়াও সমাজ এবং হিতকর লোকমতকে কি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মণীর বাসস্থানের এই ব্যবস্থা হইতেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এই ব্রহ্মচারিণীর দেবায়তনমধ্যে ঠাকুরের নিকটে বাস করা সমাজের চক্ষুতে দৃষ্টিকটু হইতে পারে, ইহাই চিন্তা করিয়া শুদ্ধচিত্ত, ইন্দ্রিয়জয়ী শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বর গ্রামে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ধর্ম্মজীবনে প্রথম গুরু এই সর্ব্বস্বত্যাগিনী ব্রাহ্মণী রমণী। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতেই তন্ত্রশাস্ত্রমতে সমস্ত

অনেকে মনে করেন যে, ঠাকুর জীবনে কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শ প্রচার করিয়া সমগ্র নারীজাতির প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কামিনী ও কাঞ্চন এই দুইটি কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে সমাসবদ্ধভাবে প্রায়ই একত্র ব্যবহৃত হইয়া মানুষের মনে এই ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে যে, কামিনী ও কাঞ্চনকে তিনি সমভাবে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। ঠাকুর কাঞ্চনকে ঘৃণা করিতেন, অশেষ অনিষ্টের আকর বলিয়া ইহাকে জীবন হইতে দূরে—অতিদূরে—সর্ব্বদাই নিজ চক্ষুর অন্তরালে রাখিতেন। কাঞ্চনত্যাগ তাঁহার নিজ ও অপর সকলের জীবনেরই আদর্শ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নারীকে তিনি সমাদর করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন, কেবলমাত্র সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত মানবের পক্ষে ইহার বাহ্য আকর্ষণ মোহকর বলিয়া, ঈশ্বরলাভের অন্তরায়স্বরূপ জানিয়া অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজে কাঞ্চনের সহিত কামিনীত্যাগেরও আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মধ্যযুগের এক শ্রেণীর খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ও কামিনীকাঞ্চনত্যাগের আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নারীকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের সঙ্গ মানবজীবনে বিষবৎ অশেষ অনিষ্টের আকর বলিয়া ত্যাগ করিবার শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহাদের মতে নারী সয়তানের প্রতীকস্বরূপ, সুতরাং তাহার সঙ্গ পরিত্যাজ্য। কিন্তু ঠাকুর নারীকে বিশ্বজননীর প্রতীকস্বরূপা বলিয়া সর্ব্বদাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টি নারীর বাহিরের সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের কমনীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া সেইখানেই প্রতিহত হইয়া যায়, এই সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের মধুরতার অন্তরালে যে ঐশী শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তথায় প্রবেশলাভ করিতে পারে না। হীনবুদ্ধিসম্পন্ন লোক নারীর দেহ অধিকার করিতে পারিলেই তাহার সর্ব্বস্ব পাইল মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ লোক নারীর হৃদয়ে স্থান পাইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ নারীর নারীত্বের অন্তরালে সর্ব্বগুণাধার ঐশীশক্তিপ্রসূত উৎসের সন্ধান না পাইলে তাঁহাদের নারীজীবনের সহিত পরিচয় মিথ্যা ও নিষ্ফল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাই সাধারণ মনুষ্যের সহিত নারীর সম্বন্ধ দেহ ও মনের ভিতর দিয়াই শেষ হইয়া যায়, আত্মার পবিত্রতা ও জ্যোতির সন্ধান করিতে পারে না। সেই জন্যই ঠাকুরের বাণী, কামিনীসঙ্গত্যাগের আদর্শ বারংবার প্রচার করিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার জীবনে নিজ অপূর্ব্ব-ব্যবহারের দ্বারা নারীর যে মর্য্যাদারক্ষা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। তাঁহার সাধনজীবনে

শ্রীশ্রীভবতারিণী

তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধার্ম্মিক লোক দেখিলেই তাঁহাদের সাহচর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম গুরু যে নারী, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। নারীকে প্রথম গুরুরূপে বরণ করিয়া তিনি ধর্ম্মজীবনে নারীর মহিমা জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন :

বর্ত্তমান জগতে মানুষের সহিত নারীর সম্বন্ধ এতই জটিল ও বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঠাকুরের নারীসম্বন্ধে অভিমত একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে না। "শক্তিমদমত্ত ঐ বণিক বিলাসী ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে" সঙ্কুচিত হইয়া যখন সকল বিষয়েই আমরা হীন বলিয়া জগতের নিকট প্রতিপন্ন হইতেছিলাম, তখন আমরা মনে করিতাম যে, পাশ্চাত্যজগতের যাহা কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

তাহাই শ্রেয়ঃ, তাহাই সুন্দর। এই মোহের বশবর্ত্তী হইয়া এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, নারীর প্রতি পাশ্চাত্য জগতের যে ব্যবহার, তাহাই আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ, প্রাচী নারীজাতির প্রতি অনাদর ও অবিচার যুগ-যুগান্ত ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। যখন ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁহার সহধর্ম্মিণীর হস্ত ধারণ করিয়া সসম্ভ্রমে অশ্বযান অথবা বাষ্পযান হইতে অবতরণ করান, তখন মনে হয়, তাঁহাদের এই সপ্রেম ব্যবহারের ন্যায় আদর্শ স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ জগতে দুর্ল্লভ। এই বাহ্য সম্মান প্রদর্শনের কোনও মূল্য নাই, তাহা মূর্খ ব্যতীত অপর কেহ বলিবে না, কিন্তু এই বাহিরের সম্মানের পশ্চাতে যদি হৃদয়ের শ্রদ্ধা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে ইহার ন্যায় অলীক ও মূল্যহীন আর কিছুই কল্পনীয় নহে। ভারতবর্ষে নারীর সম্মান বাহিরের জগতে প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু ভারতবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধায় তাহার মূল্য আদর্শের দিক হইতে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতের এই আদর্শ যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রচলিত হইয়া সমাজের উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই অনুমেয় হইতে পারে। নারী মাতৃরূপে মহীয়সী। সহধর্ম্মিণী, কন্যা অথবা ভগিনীরূপেও নারীর গৌরব কম নহে, কিন্তু মাতৃত্বে নারীর অখণ্ড মঙ্গল-ময়ী মূর্ত্তির প্রকাশ। এই মূর্ত্তিতে ভারত নারীকে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা করিয়া আসিতেছে। এই দেশে সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী যখন গৃহকর্ত্রীর নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসে, তখন "মা" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করে, এই দেশে ভিখারী "মা ভিক্ষা দাও" বলিয়া হস্তপ্রসারণ করে, এই দেশেই নারী নিজ সখীকে "অমুকের মা" বলিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া থাকে, এ দেশের দাসদাসীরা প্রভুস্থানীয়া গৃহস্বামিনীকে "মা" বলিয়া তাঁহার নিকট আদেশ গ্রহণ করে, এ দেশে "রামের মা" "শ্যামের মা" বলিয়া নারী সমাজে আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত হয়। নারীর এই মাতৃমূর্ত্তিই ভারতের সমাজে চিরপরিচিত। নারীর প্রতি এই যে অন্তরের শ্রদ্ধা প্রতি পদবিক্ষেপে সমাজে নিবেদিত হইতেছে, ইহার তুলনা জগতের আর কোনও দেশে নাই। এই কথাই এক দিন মেঘমন্দ্রস্বরে ভারতের কোন্ প্রান্তরে অসুরনিপীড়িত দেবগণ কর্ত্তৃক উদ্গীত হইয়াছিল, তাহা আজ আমরা জানি না।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

ভারতের এই অনাদিকাল-প্রচলিত-সত্যদৃষ্টি ঠাকুরের ভিতর দিয়া ভারতে আর একবার প্রকাশিত হইয়াছে। সত্য অনাদি ও অনন্ত, ইহাকে নূতন করিয়া কেহ সৃষ্টি করে না। কিন্তু যখন কোনও মহাপুরুষ নিজ জীবনে সেই সত্য অনুভূতি করিয়া তাহাকে প্রচার করেন, তখন সেই পুরাতন সত্য যেন আবার নবীন হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেই অনাদি সত্য এইরূপে মহাপুরুষগণের জীবনে নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। নারীর প্রতি জগতের অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ঠাকুরের জীবনে নূতন করিয়া পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে। নর ও নারীর সমান অধিকার, ইহা শুধু মুখের কথা মাত্র, হৃদয়ে যত দিন নারীকে বিশ্বজননীর অংশরূপে অনুভব না করা যায়, তত দিন নারীর পূজা বাহিরের একটা নিষ্ফল আচারমাত্র, হৃদয়ের প্রকৃত শ্রদ্ধা-নিবেদন হইতে পারে না। ঠাকুর নারীর মধ্যে বিশ্বজননীকে দেখিয়াছিলেন, তাই সমগ্র নারীজাতিকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করা তাঁহার পক্ষে সহজ ও সম্ভবপর হইয়াছিল। এই কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর বাহিরের কঠিন আবরণের নিম্নে রমণীর প্রতি কি কোমল শ্রদ্ধাধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইত, তাহা কল্পনা করা এই বস্তুসর্ব্বস্ব ও দেহসর্ব্বস্ব পৃথিবীতে আজ সহজ নহে। দক্ষিণেশ্বরে রমণী নামে এক পতিতা নারী বাস করিত। এক দিন ঠাকুর পূজার সময় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরমধ্যে দেবী ভবতারিণীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া ধ্যান করিতে গিয়া দেখেন যে, সেই পতিতা রমণীর মূর্ত্তিতে জগৎজননী তাঁহার নিকট আবির্ভূতা হইয়াছেন! ঠাকুর এক দিন নিজ সহধর্ম্মিণীকে বলিয়াছিলেন যে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার গর্ভধারিণী জননী ও নিজ সহধর্ম্মিণী, ইহারা সকলেই তাঁহার একই বিশ্বজননীর বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ। নিজ সহধর্ম্মিণীকেও যিনি বিশ্বজননীর অংশসম্ভূতা বলিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন তাঁহার এই অপ্রতিহত সত্য দৃষ্টির দ্বারা তিনি সমগ্র নারীজাতিকে কত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কল্পনা-শক্তির দ্বারা অনুমেয়, ভাষার দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নহে। কলিকাতায় অভিনয় দেখিয়া ফিরিবার সময় রাজপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা পতিতা রমণীগণকে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখলাম, সবই জগদম্বার অংশ।" নারীসম্বন্ধে তাঁহার একটি তুলনা হইতেই সমগ্র নারীজাতির প্রতি তাঁহার অখণ্ড শ্রদ্ধার কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। বালিশের খোল নানাবিধ বর্ণের, নানাবিধ ছিটের, বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। সেইরূপ নারীজাতি সামাজিক সম্বন্ধ ও নৈতিক জীবনের দিক্ হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সকলের ভিতর সেই এক

মথুরামোহন

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান আছেন, ইহাই ঠাকুর ইঙ্গিত করিতেন। এই সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী দৃষ্টির নিকট যে সত্য প্রকাশিত হইত, সেই সত্য দৃষ্টি অনেক সাধনার ফলে লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং সেই সত্য অনুভূতিপ্রসূত যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিনি নারীজাতিকে নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কাহারও পক্ষে সহজ অথবা সম্ভবপর নহে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজ ঐশীশক্তিপ্রসূতা কল্পনাশক্তির প্রভাবে জীবনের এক শুভমুহূর্ত্তে এই অনুভূতি লাভ করিয়া

রামায়ণের তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের ভিতর দিয়া নারীজাতির প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রতিফলিত করিয়াছেন। পতিতা নারী সে দিন সমগ্র নারীজাতির হইয়া সেই এক কথাই নিবেদন করিয়াছিল।

দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি
নিয়ে গেল সবে মাটীর ঢেলা,
দূর দুর্গম মনো-বনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।

আনন্দে মোর দেবতা জাগিল
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

দেবতারে তুমি দেখেছো, তোমার
সরল নয়ন করেনি ভুল।
দাও মোর মাগে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।

মানুষ নারীর নিকট হইতে মাটীর ঢেলা লইয়াই পরিতৃপ্ত, তাহার দেবতাকে আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু যে দিব্যদৃষ্টি সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের মত পতিতা নারীর ভিতর হইতে দেবতাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই দিব্যদৃষ্টি যে আরও সহজে ধর্ম্মপ্রাণা সংসারিণী নারীর মধ্যেও দেবীর অধিষ্ঠান দেখিতে পাইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, গৃহস্থজীবনযাপিনী সাধ্বী রমণীগণ যখন তাঁহার নিকট আসিতেন, তখন তাঁহাদের ঠাকুর সেই এক কথাই বলিতেন :—

"মেয়েরা আমার মার এক একটি রূপ।"*

এক দিন উপবাসিনী ব্রতচারিণী রমণীর শুষ্ক মুখ দেখিয়া বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন :—

"আমি মেয়েদের উপবাসী দেখ্‌তে পারি না।"

বাঙ্গালাদেশের যে অর্দ্ধাশনপরিক্লিষ্টা কুললক্ষ্মীগণ হাসিমুখে নিজ অন্নগ্রাস অপরের জন্য পরিত্যাগ করিয়া নীরবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে নিজ সরল জীবন বহন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সেই শুষ্কমুখ দেখিয়া যাঁহার কোমল হৃদয় বেদনায় পরিম্লান হইয়া উঠিত, সেই ঠাকুর রমণীর প্রতি অনাদর বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহার ন্যায় অসম্ভব আর কিছুই হইতে পারে না। নিজ উপাস্যা বিশ্বজননীর সহিত একই আসনে যে নারীর স্থান তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই নারীকে জগতের কোন্ মানব বা জাতি তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর আসন আজ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে?

কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সকলের নাই, তাঁহার শুদ্ধ পবিত্রতা সাধারণ মানবের আয়ত্তাধীন নহে। মানুষ কত দুর্ব্বল, তাহা তাঁহার অপ্রতিহত দৃষ্টির অগোচর ছিল না। বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম যে বিদ্বান্‌কেও আকর্ষণ করে, অভিভূত করে, অন্ধ করে, তাহা তিনি জানিতেন বলিয়াই লোকশিক্ষার জন্য সাধারণ মানবকে কামিনীকাঞ্চন হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেন—"সন্ন্যাসী জগদ্-গুরু,—তাকে দেখে লোকে শিখবে।" এই কথার মধ্যেই ঠাকুরের কামিনীসঙ্গ বর্জ্জনের উপদেশের বীজ নিহিত রহিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ এক দিন এই কথাই অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন :—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

তাই ঠাকুর দিব্যদৃষ্টি সহায়ে নারীর ভিতর দেবীকে দেখিয়াও সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কামিনীসঙ্গ পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণী ছয় বৎসরকাল দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়া কাশী-যাত্রা করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণেশ্বরে আর কখনও প্রত্যা-বর্ত্তন করেন নাই।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

২৮

নিস্তারের মুখরোচক বর্ণনা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। বাহিরে জুতার খুট খুট শব্দ শোনা মাত্র নিস্তার গায়ের শিথিল বস্ত্র সংযত করিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে মুচকি হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি এখন গেনু বৌরাণী, ছোটরাজা আস্‌ছেন।" কুহু ত্রস্তে উঠিয়া আলোর সুইচ্‌টি টিপিয়া দিতেই জয়ন্ত গৃহে প্রবেশ করিল। আজ তাহার মন অত্যন্ত প্রফুল্ল। বিবাহের আট দিন বরের বাড়ীর বাহির হইতে নাই। আত্মীয়-কুটুম্বিনীদের নানাবিধ ওজর আপত্তিতে জয়ন্ত এ কয়েক দিন বড় একটা বাহিরে বেড়াইতে পারে নাই। বন্ধু-বান্ধবীর মজলিসে যোগ দিতে পারে নাই। আজ দ্বিপ্রহরে সমস্ত বাধা অপসারিত হইয়াছে।

মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা অবধি বন্ধু-মহলে ঘুরিয়া সকলের নিকটে তাহার বধূ-নির্ব্বাচনের প্রশংসা জয়ন্তকে কুহুর কাছে টানিয়া আনিয়াছিল।

আজ আকাশে চাঁদের আলো ম্লান থাকিলেও বৈদ্যুতিক আলোকে জয়ন্তর শয়ন-কক্ষ হাসিতেছিল, আর হাসিতেছিল শুভ্রবসনা গৃহলক্ষ্মীর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যের দীপ্তিতে।

মধ্যাহ্নে মহার্ঘ বসন-ভূষণ ছাড়িয়া কুহু একটি রাঙ্গা-পাড় খদ্দরের সাড়ী পরিয়াছিল। গায়ে শাড়ীর অনুরূপ একটি সাধারণ জামা। দুই একটি গহনা। অপরাহ্নে দিবাকর আসিয়া পড়ায় বিশ্রামের সাদাসিদা বেশ বদলাইয়া নিস্তার তাহার প্রসাধন করিয়া দিতে পারে নাই। দিবাকর চলিয়া গেলে নিত্য-নৈমিত্তিক বৈকালিক সাজ-সজ্জার কথাটা কুহুকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু নূতন কর্ত্রীর বিমুখতায় পীড়াপীড়ি করিতে সাহসী হয় নাই।

উজ্জ্বল দীপালোকে আবেণীবদ্ধ অভূষিতা কুহুকে নিরীক্ষণ করিয়া জয়ন্তর মনে একটা মোহের সঞ্চার হইল। এ কয়েক দিন হীরা-মুক্তার আবরণে, শাড়ীর ঔজ্জ্বল্যে পল্লী-বাসিনী বনলক্ষ্মীর মূর্ত্তিখানি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এখানে যদিও সে বন নাই, দীঘির কালোজল রূপসীদের অঙ্গ-সঞ্চালনে তরঙ্গায়িত হইতেছে না; বসন্তের মধুগন্ধি বায়ু-হিল্লোলে বনবিতান মর্ম্মরিত হয় না; বকুলের শাখান্তরাল হইতে কুহু নামের প্রতিধ্বনি তুলিয়া কোকিল ডাকিতেছে না; তবুও জয়ন্তর মনে হইল—সন্ধ্যাটি বড় মনোরম, বাতায়ন হইতে যতটুকু আকাশ দেখা যায়, তাহা মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। সে সময় মেঘ-শিশুর দলে চাঁদ লুকোচুরি খেলিতেছে। আসন্ন বর্ষণ-সম্ভাবনায় বাতাস আর্দ্র, ধরিত্রী পুলকিত। দূরের তালীবন হইতে পাখীর অস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। জানালার নীচেই অসংখ্য চাঁপাফুল ফুটিয়া গন্ধোদ্গমে চারিদিক্ পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা যেন কুহুরই নিমিত্ত, উহারই বিপুল পক্ষচ্ছায়া গভীর মেঘ কৃষ্ণ-নেত্রের অপরূপ মায়ায় গগনের মেঘ দূরে যাইতে পারিতেছে না। নিশীথিনী উহারই কুন্তলজালে আবদ্ধ হইয়া ধীর মৃদু পদে নামিয়া আসিতেছেন। গালিচার কৃত্রিম ফুলগুলি যেন কৃত্রিম নহে, বিশ্বপ্রকৃতি কানন উজাড় করিয়া ওই পদ-পল্লবের তলে অঞ্জলি দিতে পুষ্পসম্ভার বহিয়া আনিয়াছে।

জয়ন্ত আবেগভরে কুহুর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল, "তুমি একা রয়েছ, কু? আমি তা জানতাম না। অনেক দিনের পর ছুটী পেয়েছিলাম কি না, তাই ফিরতে একটু দেরী হ'ল। কা'ল থেকে তোমায় সঙ্গে নিয়েই বেরুবো।"

কুহু একটুখানি হাসিয়া চুপে চুপে কহিল, "না, একলা ছিলাম না ত। বিকেলে দাদা এসেছিলেন, তিনি গেলে, নিস্তার বসেছিল।"

"নিস্তার কেন? তুমি বৌদির কাছে গেলেই পারতে? বেবীকে ডেকে পাঠালে সেও আসতো।"

"তাঁরা বেড়াতে গেলেন, আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। দাদা আসবেন ব'লে আমি তাঁদের সঙ্গে যাইনি।"

জয়ন্ত কেদারায় বসিয়া পাশে কুহুকে বসাইয়া কহিল, "দাদা এসেছিলেন, তা আমি হিরণের কাছে শুনেছি। আরো শুনেছি, দাদার সাথে যেতে না পেরে তুমি কেঁদেছ। দেখ কু, একটা কথা, পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ছলছুতায় ছিঁচকাঁদুনে স্বভাব আমার দুচোখের বিষ। এ অভ্যাসটি তোমাকে সকলের আগে ছাড়তে হবে। দেখ দেখি, বৌদি কেমন? রাত-দিন হাসি-গান নিয়ে আছেন। তোমাকে বৌদির মত হ'তে হবে।"

কুহু নিরুত্তরে কেদারার হাতল খুঁটিতে লাগিল। হিরণ জয়ন্তকে তাহার কান্নার খবর দিয়াছে জানিয়া হিরণের প্রতি

কুহুর রাগ হইল, অভিমান হইল। স্বামী তাহার ব্যথায় ব্যথিত না হইয়া পল্লীবাসিনীদের অযথা নাকে কান্নার অপবাদ দিলেন। রূপে, রসে, গন্ধেভরা শ্যামলা পল্লীর সরলা মেয়েদের হৃদয় স্নিগ্ধ নবনীতুল্য। নগরীর কঠিন মরুভূমির মধ্যে থাকিয়া তর্কে আলোচনায় হৃদয় কোমলতাশূন্য হয় না বলিয়া কি গ্রামের মেয়েরা মানুষ নহে? স্কুলে, কলেজে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয় না বলিয়া তাহারা কি নিরক্ষরা, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিতা? ইহারাও পল্লীবাসী, দুই দিন সহরে বাস করিয়া সহরের চাকচিক্যে গ্রাম্য রমণী সম্বন্ধে মনের মধ্যে মন্দ ধারণা পোষণ করিতে শিখিয়াছে।

কুহুর মৌনতায় জয়ন্তর বিরক্তি বোধ হইতেছিল। তাহার মুগ্ধভাব অন্তর্হিত হইল। কথা কহিলে প্রত্যুত্তর না দেওয়া জয়ন্তর অসহ্য। সে কুহুর বাহুমূলে একটা ঝাঁকুনি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জবাব দিচ্ছ না কেন? কেউ কিছু বল্লে তখনি যে জবাব দিতে হয়, সেটাও কি তোমায় শেখাতে হবে?"

কুহু কোন দিকে না চাহিয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমায় ত কিছু জিজ্ঞাসা করোনি? দিদির মত হ'তে বলেছিলে, আমি হ'তে পারবো কি না ভাবছিলাম।"

"ভাবা-চিন্তা নয় কু, তোমায় হতেই হবে। আমার অনেক মহিলা বন্ধু আছেন, তাঁদের সাথে মিশতে হ'লে তোমার শিক্ষার দরকার। তুমি গেঁয়ো ব'লে এখুনি তাঁরা ঠাট্টা করছেন, যাতে আর ঠাট্টা করতে না পারেন, সে বিষয়ে তোমাকে সাবধান হ'তে হবে।"

"আমি যা, তা ত তুমি জেনে-শুনেই আমাকে এনেছ। তোমার বন্ধুদের পছন্দে তোমার পছন্দ হ'লে তাঁদের ওপরেই তোমার স্ত্রী বাছাই ক'রে আনবার ভার দেওয়া উচিত ছিল। সকলে আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে আমি কি করবো, বল? আমি এখন ছোট নেই, বড় হয়ে গেছি, এখন আমাকে নিয়ে তোমার কেবলি বিড়ম্বনা।"

কুহুর সতেজ কণ্ঠস্বরে জয়ন্ত চমকিয়া উঠিল, সে স্ত্রীকে যতখানি গোবেচারা ভাবিয়াছিল, এতক্ষণে অনুমান করিল, সে তাহা নহে। নয়নাভিরাম পুষ্পস্তবকের মধ্যে লুক্কায়িত কাঁটাটুকুও আছে। মনে পড়িল, গ্রাম্য রমণীদের কলহ করিবার স্পৃহা। তাহারা যতই মুখচোরা নির্ব্বোধের ভান করিয়া থাকুক না কেন, কিন্তু সময়ে প্রখরা হইতে বাধে না। ছাইচাপা আগুন বাতাসে আত্মপ্রকাশ করে।

মিনমিনে স্বভাব জয়ন্ত পছন্দ করে না। এ কয়েক দিন কুহুর শান্ত কোমল ব্যবহারে জয় করিবার উৎসাহ জয়ন্ত অনুভব করিতে পারে নাই। এখন তাহার ধারণা হইল, বনের বিহগীকে সে খাঁচায় বন্দী করিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করা হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে হৃদয়ের বালাই জয়ন্ত উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহার ব্যবসা দেহ লইয়া। এক অনাস্বাদিত ভাবোচ্ছ্বাস অকস্মাৎ সুপ্ত হৃদয়-তন্ত্রীতে ঘা দিয়া বারম্বার বলিতে লাগিল, "বাহিরে দেহের ব্যবসা চলে, ঘরে হৃদয়ের কারবার করিতে হয়।" কিন্তু হৃদয়ের কারবার জয়ন্তর অজানা। কে শিখাইবে? নবীন ভাবোচ্ছ্বাস জয়ন্তর কাণে চুপে চুপে বলিল, "কুহু শিখাইবে। সকল প্রিয়জনের অপেক্ষা তোমাকে প্রিয়তর করিয়া ভালবাসিতে শিখাইবে।"

জয়ন্তর অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্বেলিত হইল। সে কুহুর একটি হাত হাতে লইয়া, হাসিমুখে কহিল, "রাগ করলে, কু? তোমায় নিয়ে আমার কিসের বিড়ম্বনা? বিড়ম্বনার জন্যে তোমায় আনিনি ত? কে বলে তুমি বড় হয়েছ? এই দেখ, তুমি আমার চেয়ে কত ছোট।"

বলিতে বলিতে জয়ন্ত কুহুকে বক্ষে টানিয়া লইল। স্বামীর বিশেষ আদরে কুহুর হৃদয়ের মেঘ স্থায়ী হইতে পারিল না, সে প্রসন্ন হইয়া বলিল, "এখন ক্ষীরপুরে যাওয়া হ'ল না ব'লে আমি কাঁদিনি। আমার চোখে জল এসেছিল দাদার জন্যে। দাদা কত দূরে—কত দুঃখের ভেতর চ'লে গেলেন। ক'দিন পর তুমি ত আমাকে ক্ষীরপুরে নিয়ে যেতে চেয়েছ। আমাদের সাথে হিরণ দাদাও যাবেন; ক'দিন ক্ষীরপুরে থাকা হবে?"

"তা এখনি কি বলা চলে? যেতে চেয়েছি—নিশ্চয় নিয়ে যাব; কিন্তু আমি যেমন তোমায় নিয়ে যাব, তেমনি আমারো একটি সাধ তোমায় পূর্ণ করতে হবে, কু!"

কুহু নিরুত্তরে তাহার জিজ্ঞাসু নেত্রদ্বয় জয়ন্তর মুখে স্থাপিত করিল।

জয়ন্ত বলিতে লাগিল—"আমার সাধ, তুমি লেখাপড়া শেখো, মেমদের মত ইংরাজীতে চটপট কথা কইতে পার।

বৌদির মত গান-বাজনা জানো। এ সব তোমাকে শিখতেই হবে।"

কুহু কহিল, "তুমি শেখালেই আমি শিখবো। আমার কেবলই ভয় করছে, আমি হয় ত তোমার মনের মত হ'তে পারবো না। না পারলে তোমাকে যে কষ্ট দেওয়া হবে, তা আমারই কষ্ট।"

কৃত্রিম উপায়ে কুহুর মুখ বন্ধ করিয়া জয়ন্ত আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, "তোমার ভয় নেই, কু। তুমি আমার মনের মতই আছ, একটু পালিশ হলেই সোনায় সোহাগা হবে। আমি সেইটে তোমার কাছে চাই, সেটা তোমায় দিতেই হবে।"

কুহুর বাসন্তী-জ্যোৎস্নাবিকশিত অন্তরাকাশ এক অজানা বিষাদের ক্ষীণ মেঘে ছায়ান্বিত হইল। সে কি উপায়ে স্বামীকে আনন্দ দিবে, তৃপ্ত করিবে? যে আবেষ্টনে তাহার শৈশব কৈশোর কাটিয়া গিয়াছে, আজ তরুণ যৌবনের অরুণ কিরণপাতে সম্মুখের চলার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সে পথ রাখিয়া কোন্ দুর্গম গহন পথে সে পা বাড়াইয়া দিবে? .

স্বামীর শিক্ষার আদর্শ ভাতি। কিন্তু তাহার অনুকরণ করিবার কল্পনায় কুহু সংশয়ে সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। এ অল্পসময়ে কুহুর অন্তরের অন্তস্তলে ভাতির যে স্থান হইয়াছে, তাহাকে কোনরূপেই প্রীতি বা শ্রদ্ধা বলা চলে না। তবুও কুহু মনে মনে বলিল, "স্বামীর সুখের জন্য, স্বামীকে শান্তি দিতে আমি সবই করিব, সবই পারিব। আমাকে পারিতেই হইবে।"

২৯

মানুষ মনে মনে যে সঙ্কল্পই করুক না কেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। মন বাধ্য থাকিলে তাহার উপর হুকুম চলিতে পারে, অবাধ্য হইলে জোর খাটাইতে গিয়া কেবলই নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়।

বর্ষার নিবিড় নিশীথে স্বামীর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া প্রেমবিহ্বলা কুহু ভাবিয়াছিল, স্বামীর সুখের নিমিত্ত সে সবই করিতে পারে। এ বিশাল বিশ্বে স্বামীকে অদেয় তাহার কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু রজনীর মায়া কুহেলিকা অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিরাভ্যস্ত দৈনিক জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তে নবীনকে বরণ করিয়া লইবার তেমন আগ্রহ রহিল না।

প্রতিদিনের ন্যায় প্রভাতে স্নান করিয়া কুহু ভাতির বসিবার ঘরে উপস্থিত হইল। সেখানে তখন পুরাদমে আসর জমিয়া উঠিয়াছে, আসরের লোক ভাতি, জয়ন্ত, বাসনা হইলেও তিন জনের সংমিলিত হাসিগল্পে চারিদিক মুখরিত হইয়াছে।

ভাতির সম্মুখে চেয়ারের উপর চায়ের কেটলি এবং নানাবিধ খাদ্যাদি। কুহুকে আসিতে দেখিয়া ভাতি ডাকিয়া কহিল, "এস, এস কুহু, আজ চা তোমার হাতেই খাওয়া যাক্। দেখি তোমার মা তোমায় কেমন অন্নপূর্ণা বানিয়ে দিয়েছেন। এ ক'দিন পরীক্ষা করা হয় নাই, আজ থেকেই সুরু করা যাক।"

কুহু একটুখানি হাসিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, এখানে কথার পৃষ্ঠে কথা না বলিয়া হাসির দ্বারা উত্তর দেওয়াটা নিতান্তই অভদ্রতা! কাযেই বাধ্য হইয়া তাহাকে মুখ তুলিতে হইল। কুহু বলিল, "অন্নপূর্ণার পরিচয় ত রান্নাঘরে, দিদি, চায়ের টেবলে নয়।"

ভাতি শ্লেষের হাসি হাসিয়া জয়ন্তর দিকে তাকাইয়া কহিল, "শুন্‌লে ঠাকুরপো? এই ত বৌ চটপট উত্তর দেওয়া শিখে গেছে, আর তোমার দুঃখ নেই। আমি ত আগেই তোমায় সান্ত্বনা দিয়েছি ভাই, বনের টিয়ে যত তাড়াতাড়ি শিখলি কাটতে শেখে, খাঁচার টিয়ে তা পারে না। আচ্ছা, তোমার রান্নাঘরের অহঙ্কার দিনে দিনে পরীক্ষা হবে, কুহু, আজকের মত চায়ের টেবলেই হোক।"

কুহুর মুখ মলিন হইল। কথায় কথায় উত্তর না দেওয়া এখানে অপরাধ, আবার উত্তর দিলেও অহঙ্কার। এখানকার পথ ত সহজ সরল নহে।

কুহু চা ছাঁকিয়া দুধ-চিনি মিশাইয়া টেবলের তিন পার্শ্বে উপবিষ্ট তিন জনের নিকটে পেয়ালা ধরিয়া দিতেই ভাতি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চা নিলে না, কুহু?"

কুহু সংক্ষেপে কহিল, "না"।

"না কেন? চা খাবে না? কি হ'ল?"

"কিছু হয়নি, আমার চা খাওয়ার অভ্যাস নেই, খাব না।"

"আগের অভ্যাস তোমায় ছাড়তে হবে। আমাদের যা, তাই তোমাকে অভ্যাস ক'রে নিতে হবে। অভ্যাস নেই আজ বলছ, কিন্তু তোমার ঘরে আমি প্রত্যহ চা টোষ্ট্ কেক-টেক পাঠিয়ে দিয়েছি। তা কি তুমি খাওনি?"

বাসনা বলিয়া উঠিল, "বোধ হয় খাননি। এক দিন আমি নিস্তারকে পূবের ঢাকা বারান্দায় বোসে চা খেতে দেখেছি।"

জয়ন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "বৌদি পাঠিয়ে দিতেন, তা নিজে না খেয়ে ঝিকে ধ'রে দেওয়া অন্যায়, ভারী অন্যায়।"

ভাতির দুই চোখে কলহ ঘনাইয়া আসিল। সমস্ত বিষয়ে জয়ন্তের নিকটে কুহুকে খাটো করিতে পারিলেই ভাতির আনন্দ। তাহার নিমিত্ত ছল-ছুতা খুঁজিবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু এখন আর ছল খুঁজিতে হইল না। জয়ন্তর 'অন্যায়' শব্দটা সমর্থন করিয়া ভাতি বিকৃত মুখে বলিতে লাগিল, "আমার দেওয়া খাবার ঝিকে ধ'রে দেওয়া অন্যায় নয় ঠাকুরপো। আজ যদি আমাদের মা থাকতেন, তাঁর দেওয়া জিনিষ ঝি-চাকরকে খাওয়ানো অন্যায় হ'ত। আমি সম্বন্ধে বড়যা, আমার আবার মান-সম্ভ্রম কিসের?"

কুহু ভীত হইল। ইহারা ধনী, সম্ভ্রান্ত, উদার কিন্তু স্থানবিশেষে তুচ্ছ ছোট ঘটনাকে বড় করিতে ইহাদের কোথাও বাধে না। বাল্যে পুতুল-খেলার মধ্য দিয়া বালিকা কল্পনায় যে স্বর্গরাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে কি এই?

কুহুর অসহায় মুখের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া জয়ন্ত কহিল, "যে অন্যায় হবার, তা হয়ে গেছে, বৌদি! এখন তুমি ওকে তোমারি মতন ক'রে গ'ড়ে নাও। এই সব অশান্তির জন্যেই আমি বিয়ে করতে চাইনি, একলা বেশ ছিলাম। তোমরা পাঁচজন মিলে ঘাড়ে বোঝা চাপালে। এখন বোঝাটা যাতে সহ্য হয়, তা তোমাকেই ক'রে দিতে হবে। তুমি ওর শিক্ষার ভার নাও। যা করতে হবে, তুমিই কর। আমি ঝঞ্ঝাটের ভেতর থাকতে পারবো না।"

ভাতি প্রীত হইল। দেবর যে তাহারই অনুকরণে স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা করিবার ভার তাহার প্রতি ন্যস্ত করিতেছে, ইহাতে তাহার গর্ব্বের সীমা রহিল না। সে গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল, "তুমি যেন বলেই খালাস হ'লে, ঠাকুরপো, ছোট মেয়েকে শিখানো যত সোজা, বেশী বয়েস হ'লে তেমন সহজ নয়। ভাল শিক্ষয়িত্রীর দরকার। অবশ্য আমিই ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারি, তবে আমার সময় কোথা ভাই? নানা কাযে বাইরে বাইরেই ঘুরতে হয়। এ সময় মিস্ ব্রাউন থাকলে বেশ হ'ত। বাঙ্গালীর মেয়ে যত লেখা-পড়াই শিখুক না কেন, কিন্তু ওদের কাছে কি লাগে?"

বাসনা চায়ের বাটিটা টিপয়ের উপর নামাইয়া মহা উৎসাহে বলিল, "মিস্ ব্রাউনকেই রাখো না, বৌদিমণি? তাঁকে রাখলে খুব ভাল হবে, তিনি খুব ভাল। চল না। এখুনি আমরা তাঁর হোটেলে যাই?"

জয়ন্ত ক্ষণেক মৌন থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তাঁকে রাখতে পারলে সব চেয়ে ভাল হ'ত বৌদি, কিন্তু দাদা যাকে বিদায় করেছেন, তাকে আবার ডেকে আনা কি ভাল হবে?"

"মন্দই বা হবে কিসে? তাঁর যদি ভুল হয়, আমাদের কি উচিত নয়, সে ভুল সংশোধন করা? আমি আজ একবার মিস্ ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করবো। ও কি নতুন বৌ, তুমি যে কলা-বৌ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছ? চা খেতে তোমার মানা থাকলে খাবার খেতে ত মানা নেই? খাবারটা খেয়ে নাও!"

কুহু বলিল, "আমি এখন খাব না দিদি, পরে খাব।"

"পরে কেন? আমাদের সাম্‌নে খেলে কি জাত যাবে?"

"না দিদি, তা নয়, বড় ঠাকুর এখনো খাননি, তাঁর খাওয়া হ'লে আমি খাব।"

কুহুর অদ্ভুত বাক্যে ভাতি হাসির উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। বাসনাও খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। জয়ন্ত হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। রাগে তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল।

হাসির বেগ প্রশমিত হইলে ভাতি বলিল, "একটা নতুন কথা শোনালে কুহু, এমনটি কখনো শুনিনি। তোমার ভাসুর যদি এক দিন না খেয়ে উপোস দেন, তা হ'লে তুমিই কি তাই দেবে? এত ভক্তি ভাল নয়, কথাতেই আছে "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।"

কুহু অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব করিল, "বড় ঠাকুরের খাবার ত' দেরী নেই দিদি, পুজো হ'লেই খাবেন। তখন আমিও খাব। মা বলেন, গুরুজনদের আগে মেয়েদের খাওয়া উচিত নয়।"

"বলি হারি কুসংস্কারের, সবতাতে সেখানকার উদাহরণ, যাদের জলখাবারের পয়সা নেই, তাদেরি নানাতর ব্যবস্থা। তুমি এখুনি মিস্ ব্রাউনের কাছে যাও বৌদি, তাঁকেই ঠিক কর। তার পর সংস্কারের বহর দেখা যাবে!" বলিয়া জয়ন্ত মহাক্রুদ্ধভাবে চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে লাগিল।

কুহুর মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। পায়ের তলার মেঝেটা সরিয়া যাইতে লাগিল। একটা কঠিন উত্তর কণ্ঠ অবধি আসিয়া ওষ্ঠ দুইটি বার বার কম্পিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তে কুহু আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "আমার শিক্ষার জন্যে আপনারা মিস্ ব্রাউনকে ডাক্‌বেন না, দিদি! ঢের বাঙ্গালীর মেয়ে আছেন, যাঁরা জীবন-ভোর বাঙ্গালী মেয়েকে শেখাতে পারেন। তাঁদের এক জনকে আমায় এনে দিন। আমি মেমের কাছে কিছু শিখতে পারবো না।"

জয়ন্ত ক্রোধভরে সম্মুখের টেবলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "মেমের কাছে শিখ্‌তে পার্‌বে না কেন? আল্‌বৎ শিখ্‌তে হবে!"

ভাতি বিনাইয়া বিনাইয়া বলিল, "তোমার যে বিদ্যা, বেবীই তোমাকে পাঁচ বছর শেখাতে পারে। বাঙ্গালীর মেয়ে পার্‌বে না কেন? তুমি এতই মূর্খ যে, মিস্ ব্রাউন ভিন্ন তোমাকে তাড়াতাড়ি মানুষ করা আর কারুর সাধ্যি নেই।"

"অমন মানুষ হয়ে আমার কায নেই দিদি, যিনি এ বাড়ীর প্রধান, তিনি যাকে ছাড়িয়েছেন, আমি তার কাছে কিছু শিখবো না। ইংরাজ মেয়ের কাছে হাজার চেষ্টাতেও আপনারা আমায় কিছুই শেখাতে পার্‌বেন না।" বলিয়া কুহু বাহির হইয়া গেল।

৩০

জয়ন্তর মহলে না যাইয়া কুহু সম্মুখের সোপান বাহিয়া ত্রিতলে চলিল। সে যে কোন স্থানে এখন নিজেকে লুকাইতে পারিলে বাঁচে। ব্যাধের কবলমুক্ত বিহগী যেমন অনির্দ্দেশের উদ্দেশে ছুটিয়া পলায়, কুহুরও সেই দশা।

বালিগঞ্জে আসিয়া অবধি কুহু এক দিনও ত্রিতলে আসে নাই। উন্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়ানমাত্র তাহার নাসাপথ দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস বহিল।

প্রভাতের গগন কি শুভ্র, সুন্দর! তালবনের শীর্ষদেশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে। কিন্তু এখনো তাঁহার সহস্ররশ্মি দিক্‌বিদিকে বিচ্ছুরিত হয় নাই। পূবের নারিকেলকুঞ্জে সূর্য্যের রক্তিম প্রভা ঠিকরিয়া পড়িয়াছে। দূরের অস্পষ্ট লেকের শান্ত জলাশয় রূপার পাতের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দূরে—আরও দূরে অস্পষ্ট গ্রামরেখা।

ছাদে চিলে-কোঠার পাশে এক প্রশস্ত কক্ষ। ওইটি জ্যোতির্ম্ময়ের পূজার বা ধ্যানের মন্দির।

কুহু একটু ইতস্ততঃ করিয়া সেই কক্ষে উপনীত হইল। ঘরের চারিদিকে প্রশস্ত বাতায়ন, সাদা পাথরের মেঝের মাঝে মাঝে কালো পাথরের টিক্‌লি। কোণের মাটীর নক্সা-কাটা ধূপদানিতে একরাশি ছাই; আর একখানি কম্বলের আসন পাতা।

দেয়ালে একটিমাত্র চিত্র, কৈলাসের দৃশ্য। ঘন অরণ্য-বেষ্টিত কৈলাস পর্ব্বত। বনানীর ঊর্দ্ধে স্তরে স্তরে মেঘ-রাজি, তাহারই শিখরে অনন্ত তুষার-সমুদ্র। নিম্নে গহন-কান্তারে শিলাসনে শিবদুর্গা বিরাজিত। শুভ্র-রজতকান্তি ভোলানাথের বদনমণ্ডল হইতে জ্ঞানের অপার্থিব জ্যোতিঃ বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে। পদতলে ধ্যানমুগ্ধা উমা। দেবীত্বে, মাতৃত্বে, মহিমায় সমুজ্জল আঁখি দু'টি ভোলানাথের ভাবে ঢল ঢল মুখের প্রতি মেলিয়া নিগূঢ় তত্ত্বকথা শ্রবণে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন।

কুহু বিমুগ্ধ নয়নে সেই অপূর্ব্ব আলেখ্যের পানে তাকাইয়া রহিল। মুহূর্ত্তে তাহার তাপদগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া গেল। এ কয়েক দিন সে এমন নিভৃত স্থানের সন্ধান পায় নাই! ছবির গায়ে ধূলা জমিয়া গিয়াছে, জানালার গরাদে মাকড়সা জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। পাথরের জোড়ায় ময়লা দাগ ধরিয়াছে। এমন ঘরের ছোট-খাটো ত্রুটি কুহুকে পীড়া দিতে লাগিল।

নিস্তার এক বোঝা ভিজা কাপড় ছাদে শুকাইতে দিতে আসিয়াছিল। কুহু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "পুঁটুর মা, কাপড় রেখে তুমি আগে আমায় এক বাল্‌তি জল, ঝাঁটা, আর একটা ঝাড়ন এনে দাও। ওই ধুনাচিটা নিয়ে যাও, কাউকে দিয়ে আগুন করিয়ে ধুনো পাঠিয়ে দিও। মালীকে ব'লে দাও গে, চারটি ফুল, আর একটা মালা যেন দিয়ে যায়।"

নিস্তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আশ্চর্য্যভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার রাণীদিদির মৃত্যুর পর এ বাড়ীতে এ সব পূজা অনুষ্ঠান তাহার চোখে পড়ে নাই। দেশের ঠাকুর-বাড়ীতে পূজা হয়, উৎসব হয়, কিন্তু তাহার বাতাস রাজবাড়ীর আনাচে কানাচে প্রবেশ করিতে পারে না, বড় রাজা সকালে সন্ধ্যায় তেতলার ঘরে আসেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধূপের বা ফুলের দরকার হয় না। আজ আবার এখানে হঠাৎ সমারোহ লাগিবার কারণ কি ? কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিস্তারের সাহস হইল না। একেই রাজরাণীদের মেজাজ গরীব বুঝিতে পারে না, তায় ছোটরাণীর মুখ-চোখের ভাব আসন্ন-বর্ষণ মেঘের মত থমথম করিতেছে। কি জানি, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে।

নিস্তার নিরুত্তরে ভিজা কাপড় ছাদের আলিসার উপর রাখিয়া নীচে নামিয়া গেল। প্রভাতেই যে কাযের সূচনা আরম্ভ হইল, বরাবর এই কাযের ধারা সমানে চলিবার আশঙ্কায় সে মনে মনে রুষ্ট না হইয়া পারিল না।

কিয়ৎকাল পর কুহুর আদেশানুযায়ী জল, ঝাঁটা, ধূপ, মালা সমস্তই আসিয়া হাজির হইল। তাহার পর ঝাড়া-মোছার ধূম পড়িয়া গেল।

অল্পসময়ে গৃহের শ্রী ফিরিয়া আসিল। ধূপের গন্ধে, পুষ্প-পরিমলে ঘরখানিকে পূজামন্দির বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পূবের রুদ্ধ বাতায়ন দুইটি খুলিয়া দিতেই প্রভাতের রৌদ্র পাথরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

কুহু আরব্ধ কায শেষ করিয়া, দ্বার ঈষৎ ভেজাইয়া দিয়া চিত্রের সম্মুখে বসিয়া নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না। বুক হইতে কণ্ঠ অবধি যে অশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছিল, কাষের উৎসাহে নবীন উদ্যমে তাহার বাষ্প শুকাইতে পারে নাই। দেবতার চরণে প্রাণের গোপন ব্যথা নিবেদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

কুহু যুক্তকরে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "ঠাকুর, আমায় বল দাও, বলহারা করো না। আমার সামনে যে মহা আবর্ত্ত, দিক্‌বিভ্রম ক'রে আমায় বিলাসের আবর্ত্তে ফেলে দিও না। বাবার ধর্ম্ম, মার বিশ্বাস, দাদার ত্যাগ আমাকে ভুলতে দিও না !"

প্রার্থনার অশ্রুধারায় কুহুর বিবাহের পর বিদায়ক্ষণ মনে পড়িল, পিতা মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "মা, ধর্ম্মে তোমার অচলা মতি হোক।" অশ্রুবিগলিত মাতা ললাট চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, "সত্য তোর শিরো-ভূষণ হবে কুহু, এই তোর মায়ের আশীর্ব্বাদ।" ত্যাগী সহোদর ত্যাগের মধ্য দিয়া তাহার মুকুলিত জীবন পূর্ণ বিকশিত হইবার শুভেচ্ছা জানাইয়াছিলেন। ছায়াচিত্রের ন্যায় সেই দৃশ্য একটির পর একটি হৃদয়-দর্পণে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কুহু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পাষাণপ্রতিমার মত বসিয়া রহিল।

ক্রমে প্রভাতের রৌদ্র প্রখর হইয়া শ্যামল বসুধার বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল।

দ্বারে পায়ের শব্দ শুনিয়া কুহু চকিত হইয়া চোখ তুলিতেই জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত চোখোচোখি হইল।

জ্যোতির্ম্ময় স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিয়া গায়ে উত্তরীয় জড়াইয়া নগ্নপদে গৃহে প্রবেশ করিতে যাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন, কিন্তু তখনই তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। পুনরায় দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইলেন।

কুহু উঠিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া এক কোণে জড়সড়ভাবে দাঁড়াইল।

জ্যোতির্ম্ময় কুহুর সম্মুখীন হইয়া স্নিগ্ধ কোমলস্বরে বলিলেন, "তোমার উপযুক্ত যায়গায় তুমি এসেছ, তাতে লজ্জা কি, মা ?"

এই কথা কয়টিতেই কুহুর তাপদগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া শীতল হইয়া গেল, কোথাও আর দুঃখের লেশটুকুও রহিল না।

কুহু গলায় আঁচল দিয়া জ্যোতির্ম্ময়কে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া চুপে চুপে কহিল, "আমি কিছুই জানি না, আপনি আমায় শিখিয়ে দেবেন।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

বৈষ্ণব মত-বিবেক

৬

শ্রীসম্প্রদায় ও রামানুজাচার্য্য

প্রচার ও প্রভাব

ভক্তিধর্ম্মের স্থাপন করিবার জন্য শ্রীসঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভাষ্য বিরচন করিয়া শ্রীমদাচার্য্যদেব ভক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। ভক্তির দ্বারাই যে শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও অন্য সমগ্র শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা যতিরাজ তাহা প্রতিপাদন করিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাহা প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। সদাচার ও শাস্ত্রশিক্ষার দ্বারা শিষ্যমণ্ডলীকে উপযুক্ত-রূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়া শিষ্যমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া তিনি প্রচারে বহির্গত হইলেন। শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথমে শ্রীকাঞ্চীনগরে গমন করিলেন। তথায় শ্রীবরদ-রাজের আদেশ গ্রহণ করিয়া তিনি কুম্ভকোনম্ যাত্রা করিলেন। তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচার করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়ন করিলেন। তথা হইতে রামানুজ পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মদুরা নগরীতে উপনীত হইলেন, এবং তথায় দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা ব্যাখ্যা করিয়া রাজধানীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে দ্রাবিড় দেশের অন্তর্নিহিত ভক্তিধারায় সুস্নাত করিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীভাষ্যকে প্রামাণিক বেদান্তব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের সেবায় নিরত হইলেন। অতঃপর যতিবর সশিষ্য শঠরিপুর জন্মস্থান কুরুকাপুরীতে গমন করিয়া তথায় সেই ভক্তবরের বিগ্রহ দর্শন পুরঃসর তাঁহার স্তব করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ভক্তগণের আরাধনা যে ভগবানের আরাধনার অপেক্ষাও শ্রেয়স্কর, যতিরাজ তাহা জগৎকে শিক্ষা দিলেন। এই স্থান হইতে তিনি কুরঙ্গ নগরীতে গমন করিলেন। এই নগরীর শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। কথিত আছে, শ্রীবিষ্ণুও এই স্থানে ভক্তের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য "বৈষ্ণবনম্বি" নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তথা হইতে যতিরাজ কেরল বা মালাবার দেশে গমন করিলেন এবং ঐ দেশের রাজধানী তিরু-অনন্তপুরম (Trivandrum) গমন করিয়া—অনন্তশয়ান পদ্মনাভ স্বামীকে দর্শন করিয়া সমস্ত সহর ভক্তিপ্রবাহে পরিপ্লুত করিলেন। এই স্থান হইতে তিনি উত্তরদিকে—দ্বারাবতী, মথুরা, বৃন্দাবন, শালগ্রাম, সাকেত (অযোধ্যা), বদরিকাশ্রম, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন ও সেই সেই স্থানে ভক্তিমহিমা প্রচার করিয়া কাশ্মীরের সারদাপীঠে উপনীত হইলেন। কথিত আছে, সারদা দেবী তাঁহার "কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষং" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "ভাষ্যকার" এই আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরদেশীয় তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ রামানু-জের বৈষ্ণব মত প্রচারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের জন্য তান্ত্রিক মারণক্রিয়ায় রত হইয়াছিলেন। কিন্তু উহার ফলে অভিচারপরায়ণ পণ্ডিতগণই প্রাণান্তক পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াই কাশ্মীররাজ ও পণ্ডিতগণ শ্রীরামানুজের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীরামানুজ তাঁহা-দিগকে কৃপা করিয়া সুস্থ করিলে তাঁহারা যতিবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কাশ্মীর হইতে যতিরাজ একটি হয়গ্রীব-মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া মহীশূরের "পরকাল" মঠে স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীসারদা দেবী যতিবরকে শ্রীকাশীধামে যাইতে আদেশ করিলেন। যতি-পতি শ্রীকাশীধামে গমন করিয়া তত্রত্য বহু পণ্ডিতকে ভক্তি-পথে আনয়ন করিয়া সে স্থলে একটি মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীপুরী-ধামে উপনীত হইলেন। এই স্থানে যতিরাজ নিজ প্রিয় শিষ্য গোবিন্দের নামে "এমার মঠ" নামক একটি মঠ স্থাপন করেন। পুরীধামের পণ্ডিতরা ভয়ে তাঁহার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইলেন না। কিন্তু যতিপতি তথায় পাঞ্চরাত্রপদ্ধতি অনুসারে শ্রীজগন্নাথের অর্চ্চনা করিবার উপদেশ দান করেন। শ্রীভগবান স্বয়ং যে আচারে ভক্তের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পতিত উদ্ধারের জন্য সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সে আচারের অন্যথা বিধান করা উচিত নহে, স্বীয় আগ্রহে যতিবর তাহা বিস্মৃত হইয়া স্বমতানুযায়ী সেবাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠার জন্য রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন। ইহাতে অর্চ্চকগণ কুলক্রমাগত আচার-পরিবর্ত্তনে প্রত্যবায়ের আশঙ্কা করিয়া রাজার উপরও যিনি রাজা—সেই ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথদেবের শরণ গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীল জগন্নাথদেব, বিশ্বম্ভর, পতিতপাবন ও ভক্তরক্ষক। তিনি অর্চ্চক-গণের প্রার্থনা অনুসারে শ্রীরামানুজ নিদ্রিত হইলে রজনীযোগে তাঁহাকে শত যোজন দূরস্থ কূর্ম্মক্ষেত্রে রাখিয়া আসেন। স্ববিগ্রহাবতার শ্রীরামানুজ শ্রীজগন্নাথের অন্তরূপ ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গলাভের জন্য ভক্তিভরে শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চনা করিলেন। ভগবান শ্রীকূর্ম্মদেব অর্চ্চকগণের দ্বারা তাঁহাকে ঐ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিবার আদেশ করিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তিনি সিংহাচলে গমন করিলেন। তথা হইতে তিনি গারুড় পর্ব্বতের অহোবল মন্দিরে উপনীত হইলেন এবং তথায় এক মঠ স্থাপন করিয়া ঈশালিঙ্গালে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিলেন। তথা হইতে বেঙ্কটাচলে বা তিরুপতিতে আগমন করিলেন। ঐ সময়ে ঐ স্থানের বিগ্রহ শিব বা বিষ্ণু হইবেন, ইহা লইয়া শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। যতিরাজ অমানুষী শক্তি দ্বারা উহা যে বিষ্ণুবিগ্রহ, ইহা প্রমাণ করিলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের অবসান হইল। অতঃপর তিনি কাঞ্চীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীবরদরাজকে দর্শন করেন। তথা হইতে তিনি শ্রীনাথ মুনির ও শ্রীযামুনাচার্য্যের জন্মস্থান বীর-নারায়ণপুর দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করিবার কিছুদিন পরেই কৃমিকণ্ঠ নামক এক নৃপতি—চোল-রাজ সমস্ত দেশকে শৈবমত অবলম্বন করাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীরামানুজকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারিলে দাক্ষিণাত্য হইতে—এমন কি, চোল রাজ্য হইতে বৈষ্ণব মত নিরসন করা যাইবে না। এই জন্য হয় রামানুজকে স্বমতে আনয়ন করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া শ্রীরঙ্গম হইতে শ্রীরামানুজকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন। শ্রীরামানুজ তাঁহাদের সহিত যখন কাঞ্চীপুরে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রিয় শিষ্য কুরেশ তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভো! এ স্থানে যাইয়া বৈষ্ণব মত গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে আপনার প্রাণনাশ অনিবার্য্য। মাদৃশ দাস থাকিতে কিছুতেই সেখানে আপনাকে যাইতে দিব না। অতএব আমাকে যদি দাস বলিয়া জ্ঞান থাকে, তবে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে—আপনি আমার শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অপর দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করুন, আর আমাকে আপনার কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া চোলরাজের নিকট বিচারার্থে গমন করিবার আদেশ করুন।" শ্রীরামানুজ শিষ্যের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ছদ্মবেশে শ্রীরঙ্গম্ ত্যাগ করিলেন এবং কুরেশ যতিবরের ছদ্মবেশে কাঞ্চীপুরের চোলরাজ-সভায় গমন করিলেন। চোলরাজ কিছুতেই কুরেশকে বৈষ্ণব মত ত্যাগ করাইতে না পারিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলাইবার আদেশ দিলেন। রাজাদেশে কুরেশের দুইটি চক্ষুই উৎপাটন করা হইল। কিন্তু কুরেশ যন্ত্রণা অনুভব করিলেও উৎপীড়নকারীদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে স্বীয় অভীষ্টদেবকে ঈদৃশ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিতে পারিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া অন্তরে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"ভ্রাতৃগণ, তোমরাই আমার প্রকৃত বন্ধু, যে নয়নদ্বয় বাহিরের সৌন্দর্য্যে লুব্ধ করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রাণনাথ হইতে মনকে অন্যপথে চালিত করে, সে নয়ন শত্রুস্বরূপ। তোমরা আজ আমাকে সেই শত্রুদ্বয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমার মঙ্গলসাধন করিলে, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।" কুরেশের এই প্রকার ব্যবহারে তাঁহার উৎপীড়নকারীদিগের হৃদয়েও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। তাহারা লোক দিয়া তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিল। ইহার অল্পকাল পরেই চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিল।

শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গম্ হইতে পলায়ন করিয়া শ্রীরঙ্গমের পশ্চিমস্থ বনভূমিতে গোবিন্দপ্রমুখ শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া চোলরাজ্য ত্যাগ করিবার জন্য দিবারাত্রি চলিয়া দুই দিন পরে চোলরাজ্যের সীমান্তে উপনীত হইলেন। সেই স্থানের চণ্ডালগণ তাঁহাদিগের শ্রান্তি দূর করাইয়া নিকটস্থ এক ব্রাহ্মণ-পল্লীতে পৌছাইয়া দেয়। শ্রীরামানুজ সশিষ্য এক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গৃহস্বামী উপস্থিত না থাকিলেও গৃহিণী যথাবিধানে তাঁহাদিগকে ভোজ্যাদির দ্বারা তৃপ্ত করিলেন। তিনি তথা হইতে শালগ্রাম নামক স্থানে আগমন পূর্ব্বক তত্রত্য আন্ধ্ পূর্ণ নামক এক জন চিরকুমার তপস্বীকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সঙ্গী করিয়া লইলেন। এই আন্ধ্ পূর্ণ কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় নিরত থাকিতেন। তথা হইতে যতিবর ভক্তগ্রামে গমন করেন। ঐ স্থানের রাজা বিঠ্ঠলদেব তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করায় তিনি বিঠ্ঠলদেবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তদীয় রাজসভায় উপনীত হইলেন। এই রাজার রাক্ষসগ্রস্তা কন্যা যতিবরের দর্শনমাত্রেই আরোগ্যলাভ করিলেন। বিঠ্ঠলদেব বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি যতিবরের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণকে যতিবরের সহিত বিচারার্থ আহ্বান করিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণ বাদে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া কূট পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করিলে, রাজা তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া সপরিবারে ও সপার্ষদ শ্রীরামানুজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া মনস্বী প্রজাবর্গও বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল। শ্রীরামানুজ রাজার 'বিঠ্ঠলদেব' এই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'বিষ্ণুবর্দ্ধন' নামে অভিহিত করিলেন।

সম্রাট-কন্যার অপূর্ব্বভক্তি

অনন্তর যতিরাজ সশিষ্য যাদবাদ্রিতে (বর্ত্তমান নাম মেলকোটা) গমন করিলেন। মুসলমান অত্যাচারে ঐ স্থানের শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহকে সেবকগণ গুপ্তস্থানে রক্ষা করিয়াছিল। পরে তাহাদের মৃত্যু হওয়ায় ঐ বিগ্রহের আর সন্ধান হয় নাই। শ্রীল রামানুজ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি তুলসীকাননমধ্যস্থ বল্মীকস্তূপ হইতে ঐ বিগ্রহ উদ্ধার করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ পুরঃসর তাঁহার সেবার সুব্যবস্থা করিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রতি দেবমন্দিরে প্রত্যেক দেবতার দুইটি করিয়া বিগ্রহ থাকে। উহাদের একটির নাম অচল বিগ্রহ, তিনি সর্ব্বদা মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজিত থাকেন, আর একটির নাম সচল বিগ্রহ বা উৎসব-বিগ্রহ। ইনি উৎসবাদিতে বাহিরে আসিয়া সর্ব্বসাধারণকে দর্শন দান করেন। শ্রীযাদবাদ্রিপতি দেব শ্রীরামানুজকে দিল্লীস্থ সম্রাটের প্রাসাদ হইতে তাঁহার উৎসব-বিগ্রহ সম্পৎকুমারকে আনয়ন করিতে স্বপ্নে আদেশ করেন। তদনুসারে কয়েক জন শিষ্য-সহকারে রামানুজ দিল্লীনগরীতে সম্রাটের নিকট গমন করেন। অন্তর্যামী ভগবানের প্রেরণায় দিল্লীশ্বর চাহিবামাত্রই রামানুজকে ঐ বিগ্রহ দান করিতে আদেশ করেন। কিন্তু লুণ্ঠিত বিগ্রহগণ যথায় সুরক্ষিত আছেন, তথায় সম্পৎকুমারকে পাওয়া গেল না দেখিয়া সম্রাট তাঁহার কন্যার ভবনে সুরক্ষিত একটি বিগ্রহ দেখাইলেন; যতিবর ঐ বিগ্রহকেই সম্পৎকুমার বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ঐ বিগ্রহকে লইয়া যাদবাদ্রির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যখন রামানুজ বিগ্রহটিকে গ্রহণ করেন, তখন সম্রাটকন্যা গৃহে ছিলেন না, তিনি আসিয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার প্রিয়তম বিগ্রহকে কে লইয়া গিয়াছে, তখন তিনি যৎপরোনাস্তি ব্যথিতা হইলেন। তিনি পুতুলখেলার ন্যায় সম্পৎকুমারকে লইয়া খেলিতেন না, প্রাণনাথ জ্ঞানে হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রেমপাশে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীরামানুজ ইহা বুঝিতে পারিয়াই রাজকুমারী জানিতে পারিলে সম্পৎকুমারকে লইয়া যাওয়া কিছুতে সম্ভবপর হইবে না জানিয়া সম্রাটকন্যা—লচিমারের অনুপস্থিতিকালেই বিগ্রহটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। স্বীয় অভীষ্টদেবকে না পাইয়া

সম্রাটদুহিতা লচিমার প্রিয়বিয়োগে উন্মাদিনীর ন্যায় হইলেন দেখিয়া সম্রাট একদল সৈন্যকে যতিবরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিগ্রহটিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিতে চাহিলে লচিমারও সেই সৈন্যদলের সহিত গমন করিতে চাহেন। সম্রাট তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে দাসদাসী ও উপযুক্ত রক্ষকসহ শিবিকারোহণে সৈন্যদলের অধিষ্ঠাত্রী করিয়া প্রেরণ করিলেন। এ দিকে যতিবর যাদবাদ্রিতে আগমন করিয়া শ্রীবিষ্ণুর উৎসব-বিগ্রহকে শ্রীমন্দিরের অতি গুপ্তস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সম্রাটপ্রেরিত সেনাদল লচিমার সহ যতিবরের গমন-পথের সন্ধান পাইল না। রাজকুমারী লচিমারের আর্ত্ত-নাদে বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া উঠিল। এক দিন সৈন্যদল নিদ্রিত হইলে একাকিনী তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় অভীষ্ট-দেবের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। প্রাণের ঐকান্তিক আকর্ষণে দুর্গম বনানী অতিক্রম করিয়া, আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া তিনি যাদবাদ্রিতে উপনীতা হইলেন। যতিবর কোথায় সম্পৎকুমারকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, লচিমারকে তাহা বলিয়া দিতে হইল না। লচিমার প্রাণের ঐকান্তিক আকর্ষণে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; বলা বাহুল্য, যতিপতি তাঁহার অলৌকিক প্রেমসম্পত্তি দেখিয়া তাঁহাকে মন্দিরপ্রবেশে বাধা দিলেন না। যাঁহার সর্ব্বস্ব ভগবানে অর্পিত হইয়াছে—তিনি লৌকিক জাতিকুলের অতীত। পরন্তু তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবের সজাতীয়ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। লচিমার বহুদিনের পর তাঁহার হৃদয়েশ্বরকে দেখিয়া বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা হইয়া তাঁহার প্রিয়তম সম্পৎকুমারকে আলি-ঙ্গন করিলেন, এবং তখনই তাঁহার পবিত্র অঙ্গ শ্রীভগবদঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। ভক্তের ও ভক্তির জয় আবার বিঘোষিত হইল। শ্রীল রামানুজ অশ্রুপরিপ্লুতহৃদয়ে লচিমারের ও সম্পৎকুমারের পূজা করিলেন। অদ্যাবধি লচিমারের পবিত্র বিগ্রহ বৈষ্ণব মন্দিরে পূজিত হইতেছে এবং হিন্দুধর্ম্মের পরমো-দার সার্ব্বভৌমভাবের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কুরেশের মহত্ত্ব

এ দিকে কুরেশ নয়নদ্বয়হীন হইয়া কিছুদিন পরে সহধর্ম্মিণী ও সন্তানদ্বয় সহ যাদবাদ্রিতে শ্রীগুরুদেবের নিকটে গমন করিলেন। যতিবর কুরেশকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"অদ্য আমি ভক্ত-সংস্পর্শে কৃতার্থ হইলাম।" কুরেশ ও তাঁহার জায়া ও সন্তান পরম সুখে যতিরাজ-সন্নিধানে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস পরে শ্রীরামানুজ কুরেশকে কহিলেন—"বৎস! তুমি কাঞ্চীপুরে গমন কর এবং শ্রীবরদরাজের স্তব করিয়া তোমার চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর।" কুরেশ আদেশানুসারে কাঞ্চীপুরে সমাগত হইয়া পরম প্রেমভরে শ্রীবরদরাজের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবরদরাজ কুরেশের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি কি প্রার্থনা কর, বল, আমি এখনই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" কুরেশ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "প্রভো! চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ যেন আপনার অনুগ্রহে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।" শ্রীবরদ-রাজ কুরেশকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। কুরেশ পুনরায় শ্রীবরদরাজের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় বর প্রার্থনা করিতে কহিলে, কুরেশ কহিলেন,—"প্রভো! যাঁহাদের পরামর্শে কৃমিকণ্ঠ পাপাচরণে আসক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা যেন আপনার অনুগ্রহে পরম পদ প্রাপ্ত হন।" শ্রীবরদরাজ "তথাস্তু" বলিয়া এই বর প্রদান করিলে কুরেশের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি নিজের অন্ধতার বিষয় বিস্মৃত হইয়া মন্দির হইতে চলিয়া আসিলেন। যাদবাদ্রিস্থ রামানুজ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, স্বীয় জনৈক শিষ্যকে কুরেশের নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, —"বৎস! তুমি নিজেই আনন্দ লাভ করিতেছ। কিন্তু তুমি কি জান না যে, তুমি, তোমার শরীর ও মন এ সমস্তই এখন আমার, তখন আমার স্বার্থরক্ষায় যথোচিত অবহিত হওয়া তোমার উচিত। তুমি অবিলম্বে আমার আদেশে শ্রীবরদরাজের শ্রীচরণে তোমার নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিয়া লইয়া আমাকে সুখী কর।"

কুরেশ সতীর্থের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দভরে বলিয়া উঠিলেন, "এই মহাবিষয়ীকে তিনি আপনার বলিয়া অঙ্গীকার করায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমি অদ্যই শ্রীশ্রীবরদরাজের নিকট হইতে যতিরাজের জন্য আমার নেত্রদ্বয় ভিক্ষা গ্রহণ করিব।" ইহা বলিয়া তিনি তখনই শ্রীশ্রীবরদরাজের নিকটে উপসন্ন হইয়া সুমধুর স্বরে ভক্তিবিনমিত-হৃদয়ে স্তব করিতে লাগিলেন। পরমদয়াল শ্রীশ্রীবরদরাজ বলিলেন,—"বৎস কুরেশ! তোমার যাহা প্রার্থনা থাকে বল, তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।"

কুরেশ প্রণতি পুরঃসর কহিলেন, "প্রভো! কিছুকাল পূর্ব্বে আমার অভীষ্টদেবের দুইটি প্রিয় বস্তু আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি, আপনার অনুগ্রহে অদ্য যেন তাহা পুনর্লাভ করি।" শ্রীবরদরাজ কহিলেন—"এখনই তোমার দিব্য নয়নদ্বয় তোমার পবিত্র দেহের শোভাবর্দ্ধন করিবে। তাদৃশ ভক্তগণের জন্যই আমি ধরাধামে অবস্থান করিতেছি। ভক্তহীন ভগবানের অস্তিত্ব অসম্ভব। ভক্তগণ যেমন মদ্দর্শনের ও সেবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ ভক্তসমাগমে আনন্দলাভ করিয়া থাকি।"

কুরেশ ভগবানের অমৃত-মধুর কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিজনয়নদ্বয়ের পুনঃপ্রাপ্তিতে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া গদ্গদস্বরে ভগবানের স্তব করিয়া হর্ষভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে সকলেই যতিরাজ ও তাঁহার শিষ্যগণকে অলৌকিক প্রভাবশালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ কুরেশের নয়নপ্রাপ্তি ও শত্রুগণের প্রতি কুরেশের অনুগ্রহের বিষয় শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আর আমি পরমপদপ্রাপ্তির জন্য চিন্তা করি না; কারণ, কুরেশ যখন আপনার শত্রুগণকেও পরমপদদানে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহার প্রভাবে আমার আর মুক্তির বাধা হইবে না।" যেমন গুরু, তেমনই শিষ্য। মহাপুরুষগণের অলৌকিক চরিত্র এমনই হইয়া থাকে।

অতঃপর শ্রীরামানুজাচার্য্য যাদবাদ্রি ত্যাগ করিয়া মথুরার সন্নিকটস্থ বৃষভাচলে ভগবান্ সুন্দরবাহুর মন্দিরে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। শ্রীমতী অণ্ডাল নাম্নী পরম ভক্তিমতী রমণী শ্রীনারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলে শ্রীসুন্দরবাহুকে শত ঘট পায়স ও শত ঘট নবনীত দান করিবেন, এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শ্রীভগবানকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন

তিনি শ্রীরঙ্গনাথে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহা ভাবিয়া শ্রীরামানুজ অণ্ডালের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ সুন্দরবাহুকে শত ঘট পায়সান্ন ও শত ঘট নবনীত প্রদান করিলেন। এই কার্য্যের দ্বারা যতিপতি অণ্ডালের অগ্রজ বা গোদাগ্রজ * আখ্যায় অভিহিত হইলেন। তথা হইতে শ্রীরামানুজ অণ্ডালের জন্মভূমি পাণ্ড্যদেশের শ্রীবিল্লিপুত্তুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য শেষশায়ী নারায়ণকে দর্শন করিয়া অণ্ডালের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রেমভরে তাঁহার পূজা ও স্তব করিলেন। যতিরাজ এই স্থান হইতে পরম ভক্ত শঠারির জন্মভূমি কুরুকাপুরে গমন করিয়া শ্রীশঠারি বিগ্রহের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তদনন্তর তিনি শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরঙ্গমস্থ শিষ্যগণ ও ভক্তমণ্ডলী শ্রীরামানুজের আগমনে পরমানন্দে বিভোর হইলেন।

শ্রীল রামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গমের মঠে আগমনের দুই বৎসর পরে তাঁহার প্রিয় শিষ্য কুরেশ তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়াই দেহত্যাগ করেন। যতিবর তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইলেও নিজে ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং কাবেরীতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিয়া তদুদ্দেশ্যে মাসব্যাপী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে তিনি কুরেশের পুত্র পরাশরকে স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর ও সম্প্রদায়স্থ ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়কত্বে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, —"ভক্তগণ! ইনি কুরেশনন্দন নামে পরিচিত হইলেও ইনি প্রকৃতপক্ষে ভগবান রঙ্গনাথের সন্তান। ইনি ভক্তিতে ও জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে পিতৃতুল্য। অতএব ইনিই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ রক্ষাকর্ত্তার পদে বৃত হইলেন।" ইহা বলিয়া তিনি নিজেই পরাশরের মস্তকে পুষ্পময় মুকুট পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনের দ্বারা তিনি পরাশরে স্বশক্তির সঞ্চার করিলেন এবং পরাশর অতঃপর সম্প্রদায়ের রক্ষক হইয়া শ্রীরঙ্গমে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

* অণ্ডালের কথাগুলি অতি মধুর ছিল, তিনি গোদা (গাং মধুর-বাক্যং+দদাতি=গোদা) নামে অভিহিত হইলেন। এই অযোনি-সম্ভবা কন্যা শ্রীলক্ষ্মীদেবীরই মূর্ত্তিবিশেষ এবং শ্রীরঙ্গনাথকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া তদঙ্গে বিলীন হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতা পেরিয়া আলোয়ার ইঁহাকে তুলসীকাননে প্রাপ্ত হন। ইঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—

"আষাঢ়ে পূর্ব্বফল্গুন্যাং তুলসীকাননোদ্ভবাম্।
পাণ্ড্যে বিশ্বম্ভরাং গোদাং বন্দে শ্রীরঙ্গনায়িকাম্॥"

তিরোভাব

কুরেশের তিরোভাবের পর রামানুজ আর শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন নাই। তিনি অলৌকিক গুণশালী শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া শ্রীরঙ্গনাথের পাদমূলে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার বয়স যখন এক শত বিংশতি বৎসর হইল, তখন তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমনের বাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার বিরহের সম্ভাবনায় বিষম দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে যতিপতি সুদক্ষ ভাস্কর আনয়ন করিয়া তাঁহার এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি গঠনের আদেশ দান করিলেন। প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইলে তিনি ঐ মূর্ত্তির ব্রহ্মরন্ধ্র আঘ্রাণ করিয়া তন্মধ্যে স্বশক্তি অর্পণ করিলেন এবং শিষ্যগণকে বলিলেন,—"ইনিই আমার দ্বিতীয় স্বরূপ। ইহাতে আমাতে কোনও ভেদ নাই। আমি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থ নূতন দেহ আশ্রয় করিলাম।" ইহা বলিয়া যতিরাজ প্রিয়তম শিষ্য গোবিন্দের ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া ও সেবাপরায়ণ শিষ্য অন্ধ্রপূর্ণের ক্রোড়ে পদদ্বয় রক্ষা করিয়া নিজগুরু মহাপূর্ণের শ্রীপাদুকাদ্বয় দর্শন করিতে করিতে ১০৫৯ শকাব্দের মাঘী শুক্লা দশমী তিথিতে শনিবার দ্বিপ্রহরে নিত্যধামে গমন করিলেন। এইরূপে ভক্তি ধর্ম্মের বিগ্রহবান মহাপুরুষ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম, এ, বি, এল)

পরবাসে

জ্যোছনা যেদিন নামিয়া আসিল মৌ-তরুতলে ধীরে
সেদিন নীরব রাতে—
মোর পাশে তুমি ছিলে না তো প্রিয়, অভিমান ছিল ঘিরে
উন্মনা আঁখি-পাতে!

পাখী ডেকেছিল, "বউ কথা কও," "বউ কথা কও," ব'লে
উন্মুখ যৌবনে,
করুণ মিনতি সে নিরালা রাতে পড়েছিল গ'লে গ'লে
মোর পায়ে মৌ-বনে!

তৃষিত এ মোর অধরে সেদিন কি যেন গোপন বাণী
ফুটিতে পারে নি সখা,
তব আসা-পথে মেলেছিনু দিঠি, অন্তর অভিমানী
গুমরি কেঁদেছে একা!

হাস্নুহানার আবাহন-লিপি পেয়েছিল বুঝি অলি,
এসেছিল অভিসারে?
বাসর রচিয়া সে রাতে শেফালি ঘুমেতে পড়িল ঢলি'
একেলা নদীর ধারে!

বাঞ্ছিত তা'র আসে নাই কাছে অভিমানে বুঝি তাই
দলগুলি পরভাতে—
তটিনীর বুকে ঢেকেছিল মুখ, আঁখি মেলি' চা'তে নাই
পরদিন আর রাতে।

দোপাটী-বধূর সুপ্ত কামনা জাগি' অন্তর মাঝে
হ'য়েছিল চঞ্চল!
অলি-পরশনে হাস্নুহানার সেদিন মৌন-সাঁঝে
কেঁপেছিল অঞ্চল!

তুমি পরবাসে, আজো একা আমি, শিয়রে প্রদীপ জাগে,
"চোখ গেল—" ডাকে পাখী;
তন্দ্রা আসিয়া মিনতি জানায় মোর আঁখি-পুরোভাগে
ঘুম নাহি জানে আঁখি।

শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ।

ঘরের বউ

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

১

পরিত্যক্তা স্ত্রী—কয়েক বৎসর যাবৎ স্বামীর কোনও সন্ধানই পায় নাই। মৃত কি জীবিত, তাহাও জানিত না! দৈবাৎ সেই স্বামীর সন্ধান পাইল,—সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতে পারিল, স্বামী সম্পন্ন ও পদস্থ এক জন ব্যক্তি। কিরণ বোধ হয় প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার এই সম্পদের ও পদমর্য্যাদার অংশভাগিনী করিতে প্রস্তুত, এই সংবাদ পাইলেই কৃতার্থ হইয়া সুরবালা চলিয়া আসিবে। স্ত্রী যে আর একটি ছিল, সে ত ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে আছে এবং সপত্নীও বটে। তবে সপত্নীর এই অস্তিত্ব বরুণার পক্ষে যতই আপত্তির কারণ হইয়া থাক, প্রাচীন আদর্শানুবর্ত্তিনী হিন্দুকন্যা হিন্দুকুলবধূ সুরবালার পক্ষে আপত্তির কারণ বড় কিছু হইবে না। বাস্তবিক এইরূপ কিছু একটা মনে না করিলে, একটিবার দেখাও না করিয়া, কত বড় গর্হিত আচরণ সে করিয়াছে, তাহার জন্য ঠিক পরিতপ্ত না হউক, অন্ততঃ কৈফিয়তের দুটি কথাও কিছু না বলিয়া, অন্য কাহারও মারফতে সোজাসুজি এমন ধারা একটা প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে বোধ হয় সে পারিত না। যেন ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরের ন্যায় এমনভাবেই সুরবালা তাহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদের লোভে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে যে, তু বলিয়া ডাকিলেই অমনই সে ছুটিয়া আসিবে, আর সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদটুকু পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবে। বরুণার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন তাহার সুখের হয় নাই। রূপ ছিল, ইংরাজী শিক্ষার ছাপ ছিল, নৃত্য-গীতাদি কলাকুশলতাসহ সভ্য, নব্য আদবকায়দারও মোহন পারিপাট্য বেশ একটা ছিল। জীবনসঙ্গিনীর যে আদর্শ চিত্র মানসপটে সে আঁকিয়া রাখিয়াছিল, বরুণাতেই তাহার বাস্তব মূর্ত্তি সে দেখিয়াছিল।

কিন্তু বিবাহের পর বরুণার উগ্রস্বভাব, দৃপ্ত ব্যবহার, ভোগ-বিলাসে স্বামীর সাধ্যাতীত ব্যয়বহুল আড়ম্বর এবং স্বামীর কোনও প্রকার অনুশাসনে একান্ত অসহিষ্ণুতা, তাহাকে যার-পর-নাই তিক্তবিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিজেও সে ছিল অতিমাত্রায় আত্মপরায়ণ। নিজের অনুশাসনেই সর্ব্বথা বরুণাকে চালাইতে চাহিত, তাহার কোন অনুশাসন গ্রাহ্যই করিত না। নিজের সুখসুবিধাই বরুণার কাছে চাহিত,—বরুণার সুখসুবিধা কিসে হইতে পারে, সেটা বড় ভাবিত না। বাস্তবিক ঠিক কঠোরচিত্ত কি স্নেহবিহীনা না হইলেও, বরুণাও স্বামীর কাছে নিজের পাওনাই বেশী করিয়া আদায় করিয়া লইতে চাহিত, স্বামীরও যে পাওনা একটা তাহার কাছে আছে ও থাকিতে পারে, এ কথাটা তাহার মনেও বড় কখনও উঠিত না। একে ত স্বভাবেরই ত্রুটি এই ছিল, তাহাতে আবার এরূপ শিক্ষাও কিছু লাভ করে নাই, যাহাতে ইহা সংযত হয়। যাহা করিয়াছিল, তাহাতে বরং স্বভাবের এই গতিই অতি প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং দাম্পত্য-জীবনের প্রাথমিক মাদকতার অবসানের পরেই সদাসর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে অতি অশান্তিকর সংঘর্ষ ঘটিত। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার, জীবনের সার্থকতার পক্ষে সমানভাবেই উভয়ের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার আবশ্যকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে মুখে যেই যাহা বলুক, বাস্তব কর্ম্মে কি ব্যবহারে স্বভাবের গতি কেহ অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। ভাবিয়া কি হিসাব করিয়া চলিবার অবসরও কাহারও হয় না; ব্যবহার অজ্ঞাতসারে আপনা হইতেই স্বভাবের গতি ধরিয়া চলে।

মধ্যে মধ্যে সুরবালার কথা তাহার মনে হইত। মনে হইত, বাহিরের পারিপাট্যে বরুণার তুলনায় যতই হীনা সে হউক, একান্ত আত্মসমর্পিতা স্ত্রী হইয়া সংসারে সে তাহাকে বোধ হয় সুখী করিতে পারিত। কিন্তু তাহাকে যত সহজে ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিয়াছে, বরুণাকে অত সহজে এখন ত্যাগ করিয়া সুরবালাকে লইয়া নূতন একটা সংসার সে গড়িয়া তুলিতে আর পারে না। অবশ্য সুরবালাকে মুক্তি দিয়া সুরবালার নিকট হইতে মুক্তি লইয়াই সে আসিয়াছিল,—তবে সেটাও যে অন্তরের কোন গভীর অনুভূতি অথবা সত্য সত্যই অতি সত্য বলিয়া জীবনধর্ম্মে গৃহীত কোনও নীতির কথা তাহার ছিল, তাহা নয়। যে প্রবৃত্তি তখন তাহার চিত্তে প্রবল ছিল, তাহারই বশে মাত্র সে মনে করিয়াছিল, এইরূপ একটা কিছু শেষ কথা বলিয়াই শেষ বিদায় লইয়া তাহার আসা উচিত। এই মুক্তির সত্য যে জীবন ভরিয়া তাহাকে মানিয়া চলিতেই হইবে, আর তাহা সুরবালার সঙ্গে পুনর্ম্মিলনে অলঙ্ঘনীয় একটা বাধা হইয়া থাকিতে পারে, এরূপ কিছু সে অনুভব কখনও করে নাই। এই কথাই বরং মনে হইত, বরুণার সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং সুরবালার সঙ্গে আবার মিলন হইলেই বোধ হয় সে সুখী হইবে। ইহাও বেশ বুঝিত, মনেও করিত, মিলন সে চাহিলে সুরবালার পক্ষ হইতে আপত্তি ত কিছু হইবেই না, বরং আগ্রহেই সে এই মিলনকে বরণ করিয়া লইবে।

ঠিক এমন সময় এক দিন সে জানিতে পারিল, তীর্থ-ভ্রমণে সুরবালা তাহার মাতার সঙ্গে এলাহাবাদে আসিয়াছে। মাতা যখন গৃহে আসেন, আশু কোনও সান্ধ্য সম্মেলনের ব্যয়ের কথা লইয়া বরুণার সঙ্গে তাহার প্রচণ্ড কলহ চলিতেছিল। কলহের কঠোর কয়েকটি অপভাষাও মাতার কর্ণগোচর হয়। তাহার উল্লেখ করিয়া পুত্রের বর্ত্তমান এই সংসারের অশান্তি সম্বন্ধে শক্ত কয়েকটি কথাও মাতা বলেন। কথাগুলির সত্য সেও বেশ তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিল, বরুণা তাহার পর তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিচ্ছেদ ত ঘটিলই; সুরবালাও নিকটে, মিলনে আর বাধা কি? মনে হইল, হয় ত সুরবালাকে লইয়া সে সুখী হইবে, এই মিলন আরও আকাঙ্ক্ষিত হইল, এই বিবেচনায় যে বরুণার সকল দুর্ব্যবহারের উপযুক্ত শাস্তিও ইহাতে হইবে। পরদিনই সে সতীশকে ডাকিয়া বলিয়া

পাঠাইল, সুরবালাকে সে গ্রহণ করিবে, অবশ্য তাহার এই সংসারের যোগ্য গৃহিণী হইয়া যদি সে থাকিতে প্রস্তুত হয়। সুরবালা যে এমন সুযোগ উপেক্ষা করিবে, কোনও রূপ দ্বিধা করিবে, একটি বারের জন্যও এমন একটা কথা তাহার মনে হয় নাই।

পথ চাহিয়া সে ছিল, সতীশ কখন্ সুরবালাকে লইয়া আসিবে, আদর করিয়া সে তাহাকে গৃহে আনিবে, গৃহের সব ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর তাহাকে দেখাইয়া তাহাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াই ফেলিবে! কিন্তু আসিল একখানি পত্র, আর পত্রে এই সংবাদ যে, সুরবালা তাহার সেই প্রস্তাব, আর প্রস্তাবে ঐহিক এই জীবনে যত কিছু সুখের প্রলোভন তাহার ছিল, সব উপেক্ষা করিয়া একবারে দেশেই ফিরিয়া গিয়াছে! অবশ্য তাহার মাতা যে এখানে আসিয়া থাকিবেন, এটা এখন বড় একটা আপত্তির কারণ নাও হইতে পারিত। গৃহে তাহার স্থান যথেষ্ট আছে, তাঁহার পুত্রকন্যা সহ নিজে তিনি যে ভাবে থাকিতে চান, অনায়াসে এখানে থাকিতে পারিতেন। আর সে সুরবালাকে লইয়া নিজের অভিরুচিমত চলিত!—তার পর বরুণার কথা,—সে ত ত্যাগ করিয়াই তাহাকে গিয়াছে। ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা যদিও থাকিত, সুরবালা একবার আসিয়া তাহার গৃহে গৃহিণী হইয়া বসিলে, আর কি বরুণা সপত্নী-গৃহে ফিরিয়া আসিবার কল্পনা স্বপ্নেও কখনও মনে করিত? সেও যে আর বরুণাকে চায় না। যে বন্ধন নিজেই সে ছিন্ন করিয়া গিয়াছে, সাধ করিয়া আবার কি সেই দুঃখের বন্ধনে আপনাকে সে বদ্ধ করিতে পারে?

তবে দুইটি পুত্র তাহাদের হইয়াছে। তা হইয়াছে ত হইয়াছে। মাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহার পুত্রদের সঙ্গে বিচ্ছেদও অনিবার্য্য। যেখানেই তাহারা থাক, মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, খরচপত্রের এমন ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইল, সে সামর্থ্যও তাহার আছে। মমতার টান? কিন্তু যে বিষে বরুণা তাহার জীবনকে জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি চাহিলে এ মমতার টান ছিন্ন করিয়া ফেলিতেই হইবে। যাহাই হউক, একটিবার তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া এ সব সমস্যার সমাধান কিছু হইতে পারে কি না, তাহার সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিবার অবসরও তাহাকে না দিয়া সুরবালা একবারে চলিয়াই গেল। এত বড় একটা অবজ্ঞার অবমাননা ঐ সুরবালা তাহাকে করিল, অযোগ্য বলিয়া এক দিন সে যাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে! কেমন একটা রাগ ও অভিমান তাহার হইল, পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া বারান্দায় অস্থিরভাবে কতক্ষণ পদচারণা করিল। আবার গৃহমধ্যে আসিয়া টেবলের উপরে মাথাটি রাখিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল। রাগ ও অভিমান যতই হউক, কেমন একটা বেদনাও অন্তর হইতে বিঁধিয়া উঠিতেছিল, উঠিয়া পত্রখানি আবার তুলিয়া লইল, একবার—দুইবার—তিনবার পড়িল; ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কথার উপরে বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াই পড়িল, তার পর পত্রখানি আস্তে আস্তে ভাঁজ করিয়া দেরাজে তুলিয়া রাখিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মনে পড়িল, শেষ সেই বিদায়ের দিনকার ঘটনা, তাহার সব কথা, উত্তরে সুরবালার সেই সংক্ষিপ্ত কথাগুলি, সেই তাহার ধীর নম্র ব্যবহার, তাহার ত্যাগে সেই নির্ব্বিকার উপেক্ষা। ব্যথিতা স্ত্রীর অভিমান কিছু নয়, আত্মস্থ নারীর মর্য্যাদারই স্পষ্ট একটা আভাস তাহার কথাগুলিতে আর ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছিল। তখনই কেমন একটা শ্রদ্ধা তাহার চিত্ত হইতে সুরবালার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনাও যেন অনুভব করিতেছিল। অনেক সময়ই সুরবালার সেই চিত্রটি তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিত। তাহার এই ব্যবহারের রহস্যটাও বুঝিতে কিছু চেষ্টা করিত, কিন্তু ঠিক পারিত না।—আজও যে ঠিক পারিল, তাহা নয়,—যদিও বুঝিবার চেষ্টা অনেক করিল। সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে; অথচ সুরবালা তাহারই পৈতৃক গৃহে রহিয়াছে। পিত্রালয়ে গিয়া সে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত, কিন্তু তাহা যায় নাই। বহু অভাবের ক্লেশ নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিয়াও তাহারই মাতার ও ভ্রাতা-ভগিনীর সেবা করিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ত তাহারই স্ত্রী বলিয়া। সেই স্ত্রীর অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়াও তাঁহাদের সেবা করিয়াছে,—আজ সেই অধিকার পাইয়াও অনায়াসে সে ছাড়িয়া গেল; তাহারও বড় একটি কারণ—তাহারই সেই পিতৃগৃহে তাহার মাতার কাছে থাকিয়া তাঁহারই সেবা সে করিতে চায়! স্বামীর সঙ্গে যে সুখসৌভাগ্যের অধিকারিণী সে হইত, তাহা অপেক্ষাও সেই দীন-গৃহে শাশুড়ীর সেবাটাই তাহার বড় হইল! এক হইতে পারে, স্বামীর প্রতি কোনও প্রেমের বিকাশ তাহার চিত্তে এখনও ঘটে নাই। কিন্তু তাহাই যদি না ঘটিয়া থাকে, তবে সেই স্বামীরই পিতৃগৃহে থাকিয়া তাহার মাতা ও ভ্রাতাভগিনীর প্রতি এত স্নেহ, তাঁহাদের সেবায় একান্তভাবে আত্মদানের এই প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? আশ্চর্য্য নারী বটে! চরিত্রের রহস্য ঠিক ধরিতে পারুক না পারুক, নারীরূপে সুরবালার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বের শক্তি ও মহিমা এমন আছে, স্বামীর অধিকারবলে যাহা সে দমাইতে নামাইতে কখনও পারিবে না,—সর্ব্বদা তাহার অনুগতা স্ত্রী হইয়াও সে চলিবে না। বরুণাও তাহা চলে নাই, বরুণাকেও সে মনের মত করিয়া লইতে পারে নাই, কিন্তু পারে নাই আত্মসুখভোগে বরুণার অত্যধিক স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতায়, আর সুরবালাকে পারিবে না, তাহার নারীত্বের শক্তিমহিমায়। সুরবালা ভোগবিলাস কিছুই চাহিবে না, একান্তভাবে তাহারই সেবা করিবে, সাংসারিক বহু সুখস্বচ্ছন্দতা আরাম-বিরাম তাহাকে দিবে, উগ্র কোন ব্যবহারে কিম্বা রূঢ় কোনও কথায় কোনও অশান্তি কখনও তাহার ঘটাইবে না। কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য ও ব্যবহারাদি সম্বন্ধে স্বামীর ইচ্ছামতও কখনও চলিবে না, বরং তাহার নিজ চরিত্রমহিমার সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন প্রভাবে মতানুবর্ত্তী করিয়া ক্রমে তুলিবে। বরুণাকে লইয়া সে সুখী হয় নাই। সুরবালাকে লইয়াও ঠিক সুখী হইবে কি? কিন্তু তবু—তবু—সুরবালার দিকেই চিত্তের প্রবল একটা আকর্ষণ সে অনুভব করিতে লাগিল। এটা—না, ঠিক প্রেমের আকর্ষণও নয় তবে তবে—কিসের আকর্ষণ? অনেক ভাবিল,—ভাবিয়া কিছু কূল পাইল না। মনটা বড় অশান্ত—চঞ্চল হইয়া উঠিল; ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, ছটা বাজে; তখন শীতকাল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চিত্তবিনোদনে মনের এই অধীর অশান্ত ভাব যদি কিছু দূর হয়, তাই তখন ক্লাবের দিকে গেল।

"এমন ধারা একটা জঘন্য ব্যবহার তুমি করেছ কিরণ, শিক্ষিত ভদ্রলোক কেউ যা কখনও করতে পারে না?"

কিরণের শ্বশুর নীলাম্বর বাবু পরদিন আসিয়াছিলেন। তিনি এই প্রশ্ন করিলেন।—একটু ভ্রূকুটি করিয়া কিরণ উত্তর করিল, "এই সব গালাগাল দেবার জন্যই যদি আপনি এসে থাকেন, তা হ'লে—"

"তা হ'লে কি? কি বলতে চাও? আসা আমার উচিত হয়নি?"

"সেটা নিজেই ভেবে দেখতে পারেন।"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "সে উচিত অনুচিত যাই হউক, না এসে পারলাম না। বরুণা আমার কন্যা, তার সুখ-দুঃখের কথাটা আমাকে ভাবতে হয়। বড় একটা সঙ্কটে পড়লে তার একটা কিনেরার চেষ্টাও করতে হয়।"

"কিন্তু সে কিনেরা কি আমাকে এই ভাবে গালাগাল দিয়ে কিছু হবে ব'লে মনে করেন?"

"না, তা হবে না। আদবেই কিছু হবে কি না, জানি না।—তবু—তবু—গালাগাল—গালাগালই যদি বল—তা না দিয়েও ত পার্‌ছি না। কেউ এ অবস্থায় পারে না।"

"বেশ, তবে গালাগালই দেন। ধৈর্য্য ধ'রেই সব শুন্‌ছি।"

নীলাম্বর বাবু ভ্রূকুটি করিলেন। দম লইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন "না, গালাগাল দিয়ে কিছু হবে না। সে ধাতুরই মানুষ তুমি নও। বড় দুর্ভাগ্য আমার যে, অমন বরুণাকে আমার তোমার মত পাষণ্ডের হাতে দিয়েছিলাম।"

"তার পর?—" একটু হাসিও কিরণের মুখে ফুটিল।

"হাস্‌ছ? মনে মনে বিদ্রূপ করছ, গালাগাল কিছু দেব না ব'লে আবার উনি সেই গালাগালই দিচ্ছেন?"

"দিচ্ছেন ত বটেই।"

"যাক্!—এখন গোটা কত কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"করুন।"

"দেশে তুমি একটা বিবাহ ক'রে এসেছিলে?"

"সব ত শুনেছেন। প্রশ্নটা এখন নিষ্প্রয়োজন নয় কি?"

চটিয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "এই রকম ধারা সব উত্তর ক'রছ—কি ভাবছ বল দিকি তুমি? এত বড় গর্হিত একটা আচরণ তুমি করেছ—ধরা পড়েছ—আর একটু লজ্জা—একটু কুণ্ঠা কি সঙ্কোচ কি পরিতাপ—কিছু তোমার নেই?"

"তার এমন কোনও কারণ আছে ব'লেও মনে হচ্ছে না।"

"আশ্চর্য্য!—তুমি যে একেবারেই এমন হৃদয়হীন, মনুষ্যত্বের সকল উন্নতভাববর্জ্জিত, তা জানতাম না। দেখছি, আসাটাই আমার ভুল হয়েছে।"

কিরণ নীরব।

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "যাক্, যখন এসেছি, কিনেরা একটা ক'রে যাবার চেষ্টা কিছু অন্ততঃ কর্‌তেই আমাকে হবে। তা, সেই যে বিবাহ করেছিলে—কি মনে ক'রে করেছিলে?"

একটু কি ভাবিয়া কিরণ উত্তর করিল, "এইটুকু অন্ততঃ আপনাকে বলতে পারি—যদি তাতে কিছু সন্তুষ্টি আপনার হয়। বিবাহ ঠিক আমি করিনি, বাবা দিয়েছিলেন—জোর ক'রে আমার অমতে।"

"কচি খোকাটিও বোধ হয় তখন তুমি ছিলে না। তা—যে ভাবেই হ'ক্, বিবাহ ত' হয়েছিল। তা সে স্ত্রীকে কেন ত্যাগ ক'রে চ'লে এলে?"

"সেটা আমার ইচ্ছা। কোনও কৈফিয়ৎ বোধ হয় কারও কাছে দিতে আমি বাধ্য নই।"

"বাধ্য অন্ততঃ আমাদের কাছে নিশ্চয়ই!—তবে না দিলে জোর ক'রে কোনও কৈফিয়ৎ অবশ্য আদায় ক'রে নিতে পারিনে! কিন্তু বরুণাকে শেষে আবার বিবাহ কেন কর্‌লে?"

"ইচ্ছে হয়েছিল, আপনারাও অতি আগ্রহে দিতে চেয়েছিলেন। বরুণাও বুঝতে পারলাম আমার প্রতি আকৃষ্ট, তাই করেছিলাম।"

মুখখানি নীলাম্বর বাবুর লাল হইয়া উঠিল। একটু দম লইয়া কহিলেন, "কিন্তু তখন কি এটা মনে হয়নি, বিবাহে এত বড় একটা বাধা রয়েছে?"

"না, তা হয়নি।"

"কিসে হয়নি? বিবাহ তোমার একটা হয়েছে, স্ত্রী একটি বর্ত্তমান—"

"ত্যাগ করেই তাকে এসেছিলাম।"

"সে ত্যাগে যে ত্যাগ হয় না, ধর্ম্মতঃ আর আইনতঃ সে তোমার স্ত্রীই থাকে, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান তুমি—এটাও কি জান্‌তে না?"

কিরণ উত্তর করিল, "এটা অন্ততঃ জান্‌তাম—ভাল ক'রে জেনেও নিয়েছিলাম। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে হিন্দুমতে কোনও পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহে কোনও বাধা হয় না। হিন্দুয়ানী আর কিছুতে মানুন না মানুন, বিবাহ আপনি হিন্দুমতেই দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের বিবাহ হিন্দুমতেই দিয়ে থাকেন। তা এ সব কথা বরুণাকেও ত আমি খুলে সব বলেছি।"

"কিন্তু তবু—এ কথাটা কি আগে আমাদের জানান তোমার উচিত ছিল না? তুমি কি মনে কর, যতই বড় তুমি হও, কি হবার সম্ভাবনা তখন দেখা যাক্, পূর্ব্বে তোমার বিয়ে হয়েছে জানতে পারলেও আগ্রহে তোমার সঙ্গে বরুণার বিবাহ দিতাম?"

"সম্ভব নয়।"

"তবে?"

"অযাচিতভাবে গায়ে প'ড়ে জানান আমি দরকার বলেই মনে করিনি। জেনে নেওয়া আপনারই আগে উচিত ছিল। মেয়ের বিবাহ দিচ্ছেন, আর ছেলের ঘরের খবর কিছু নেন নি, সেটা কি এখন আমার দোষ হ'ল?"

গালে যেন একটা থাপ্পড় নীলাম্বর বাবুর গিয়া লাগিল! হাঁ, অতি কঠোর হইলেও সত্য কথাই কিরণ এইবার বলিয়াছে! এ সব খবর তাঁহারই আগে লওয়া উচিত ছিল বৈ কি? কিন্তু তবু—তবু—ঐ কিরণ—

আমতা আমতা করিয়া শেষে কহিলেন—"না, তা করিনি—করা উচিত ছিল বটে। তবে অতি সাধুবুদ্ধির যুবক ব'লে ব

একটা শ্রদ্ধা তোমার উপরে ছিল। মনেই করতে পারিনি, এত বড় একটা—"

"প্রতারণা আমি করতে পারব।—কিন্তু এটাকে তেমন একটা প্রতারণা বলেই আমি মনে করিনি।—অযাচিতভাবে নিজের কোনও ত্রুটি কাউকে না জানালেই সেটা প্রতারণা হয়, এমন কথা কেউ বল্‌তে পারবে না।"

"কিন্তু তবু—এটা কি প্রত্যাশা করতে পারিনি কিরণ—এত বিশ্বাস তোমাকে করতাম—"

"কেন করতেন? কিসে করতেন? হয় ত আমার প্রতিভার কি যোগ্যতার পরিচয় অনেক পেয়েছেন। কিন্তু আমি যে ঠিক সাধুবুদ্ধির যুবক—সকল বিষয়ে নিখুঁৎ, কি আপনি সাধু ব'লে যাকে মনে করেছেন, ঠিক সেই ভাবেই চলি—সেটার কি এমন পরিচয় তখন পেয়েছিলেন?"

আর একটা কড়া থাপ্পড় নীলাম্বর বাবুর গালে গিয়া লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই তিনি বসিয়া রহিলেন। টেবলের উপরেই সব ছিল; সিগারেটের কৌটা, দিয়াশলাই ও ash tray (ছাই ফেলিবার পাত্রটি) সব শ্বশুরের সম্মুখে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া কিরণ বাহিরে গেল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিজেও একটি সিগারেট ধরাইল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শ্বশুর গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতেছেন। ধূমপানে মনের দারুণ অশান্তির বিক্ষোভও নাকি তখনকার মত কিছু উপশম হয়—লোকে অন্ততঃ এইরূপ বলিয়া থাকে। পরিচারক চা ও কিছু টোষ্ট আনিয়াও টেবলের উপরে রাখিল। তাহাও নিঃশব্দে নীলাম্বর বাবু সেবন করিলেন—করিয়া আর একটি সিগারেটও ধরাইলেন। মনটাও ক্রমে কিছু স্থির হইয়া আসিল। ইহাও বুঝিলেন, রাগারাগি বকাবকি করিয়া এখানে সুবিধা কিছু হইবে না। আসিয়াছিলেন কিরণের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবেন। কিন্তু তাহাতে নিজেই বেশ একটু বেকুব হইয়া গেলেন। ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, "যা হবার, তা ত হয়ে গেছে, এ নিয়ে এ সব বাদ-বিতণ্ডায় লাভ এখন আর কিছু নেই। তা—এখন কি করতে চাও তুমি?"

"আমি! আমার আর করবার কি আছে এখন? বরুণা স্বেচ্ছায় চ'লে গেছে। আমি তাকে তাড়িয়ে দেই নি, কি যেতেও বলি নি।"

"গেছে—না গিয়ে উপায় কি? কি ক'রে আর সে তোমার সঙ্গে তোমার এই সংসারে থাকে?"

"বাধাই বা কি?"

"বাধা কি? আমাদের এই সমাজের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে—আর একটা স্ত্রী তোমার রয়েছে, এটা জান্‌তে পেরেও—"

"তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আমার নাই।"

"তবু সে ত রয়েছে। তার এই অস্তিত্বটাকে—"

"লোপ ক'রে দেওয়াও ত সম্ভব হচ্ছে না। হ'ত, যদি এক্ষুনি গিয়ে তাকে খুন ক'রে ফেলে আস্‌তে পারতাম।"

"সে কথা কে বলছে?—তুমি কি মনে কর, সেই রকম একটা কিছু অভিপ্রায় নিয়ে—"

"না, তাও ঠিক মনে করছি না। তবে সে আছে। আর তার এই অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করতেও আমরা কেউ পারছি না।"

"সেই অস্তিত্বটাকে স্বীকার করেই বা কি ক'রে সে আর স্বামী ব'লে তোমাকে গ্রহণ করবে?"

"না পারে, করবে না। জোর ক'রেও ত গ্রহণ করাতে আমি চাইছি না। যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারে। খরচপত্রের ব্যবস্থা যা দরকার—করতে আমি প্রস্তুত আছি।"

"কিন্তু সেটা ত সুখের অবস্থা কিছু নয়। আর বড় একটা কেলেঙ্কারীও বটে।"

"কি করতে বলেন তবে আমাকে? উপায় আর কি আছে?"

"এখানে এসে থাকা যদি সম্ভব কোনও মতে হ'ত—"

"এসে থাকলেই সম্ভব হয়। আমার সেই স্ত্রীর অস্তিত্বে যদি বরুণার সঙ্গে এই বিবাহ অবৈধ হ'ত, তবে সে কথা ছিল আলাদা। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না—"

"বিবাহ অবৈধ না হ'লেও, তোমার আর একটি স্ত্রী আছে, এটা ত সে জানে। ভুলতেও কিছু পারছে না—"

"স্ত্রী আর একটি আছে, সেটা জানে কি ভুলতে পারে না, এটাকে এত বড় একটা অন্তরায়ই বা কেন মনে করছেন? আপনার ছেলে ভূপেনের স্ত্রী কি ভূপেনকে ত্যাগ ক'রে গেছে না তার সঙ্গে ঘর করছে না?"

মুখখানি নীলাম্বর বাবুর অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল।—বলিলেন, "ভূপেন? তার স্ত্রী—কেন তাকে ত্যাগ করবে?—দ্বিতীয় আর একটি স্ত্রী তার নেই।"

"স্ত্রী না থাক, বেয়াদবী মাফ করবেন, প্রণয়িনী একটি ছিল, সন্তানও দুটি হয়। তাহাদের ভরণপোষণও এখনও তাকে করতে হচ্ছে। আর তাদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই ভূপেনের নেই, এ কথাও জোর ক'রে বলতে পারেন না।"

"তবু সে বিবাহিতা স্ত্রী নয়। আর এ জাতীয় দোষ-ত্রুটি তরুণ বয়সে—"

"তার চাইতেও কি আমার বিবাহ করাটা, আর সেই বিবাহের স্ত্রীর বর্তমান থাকাটা এত বেশী দোষের হ'ল? তবু তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আমার নেই।"

নীলাম্বর বাবু স্তব্ধ, নীরব। কিরণ কহিল, "এ জাতীয় দোষ-ত্রুটি, আপনিও জানেন, সকলেই জানে, আপনাদের এই উন্নত সমাজেও বহু পুরুষেরই আছে। জেনে শুনেও কোনও স্ত্রী কখনও স্বামী ত্যাগ করে না। নির্ব্বিকার মনেই বরং তার সংসারে থাকে, সংসারে কর্তৃত্বও করে। আমি বরং এ গর্ব্বই করতে পারি, এ জাতীয় দোষ-ত্রুটি আমার কিছু নেই। বাবার ইচ্ছায় বিবাহ একবার করেছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেই এসে বরুণাকে বিবাহ করেছি। কোন সংবাদ তার আর রাখিনি। তার প্রতিপালনের যে একটা দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল, তাও নিইনি। আমার আয়ের ভাগও বরুণাকে বঞ্চিত ক'রে তাকে কখনও দিই নি। পাঁচ বছর পরে দৈবাৎ সে এখানে আসায় তার এই অস্তিত্বের সত্যটা আপনাদের কাছে ধরা পড়েছে।"

চুপ করিয়া নীলাম্বর সব শুনিলেন, চুপ করিয়াই ততক্ষণ বসিয়া কি ভাবিলেন। শেষে কহিলেন, "ভাল, একটা প্রতিশ্রুতি তুমি দিতে পার?"

"কি, বলুন?"

"তার এই অস্তিত্বটাকে বরং উপেক্ষা করতে পারি। বরুণাও যাতে করে, তাকে বুঝিয়ে সে চেষ্টাও করাতে পারি। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি চাই, সম্বন্ধ যেমন তার সঙ্গে রাখনি, তেমনি কখনও আর রাখ্‌বেও না। এই পাঁচ বছর যেমন গেছে, বরাবর ঠিক এম্‌নিই যাবে।"

"না, তা পারিনে। দুঃখ-ক্লেশ যথেষ্ট তারা পেয়েছে, এখনও পাচ্ছে, ও দিক্‌টা ভাবিই নি বড় কখনও। সুখে স্বচ্ছন্দে যাতে তারা থাকতে পারে—সে আর আমার মা ভাই বোন এরা—তার একটা ব্যবস্থা অন্ততঃ আমাকে এখন কর্‌তেই হবে।"

"সেটা স্বচ্ছন্দে করতে পার। তোমার রোজগারের টাকা—যাকে ইচ্ছে সাহায্য করতে পার। তবে একটা কথা, তা সোজাসুজি ব'লে ফেলাই ভাল। এই ধর, বরুণা যদি ফিরেই আসে, তার আর এই সংসারের প্রয়োজনটা আগে তোমাকে দেখ্‌তে হবে। তার পর যা বাঁচাতে পার—"

"কিছুই পারব না। প্রয়োজনের তার সীমা নাই। দেশে ওঁদের জন্যে খরচপত্র কিছু পাঠাতে আমি যে চাই-নি, তা নয়, তবে পারিনি। কারণ, আমার সব আয়ের মালিক বরুণা, তার প্রয়োজনের ওপরে বাঁচিয়ে এ রকম সব দরকারে কিছু সে আমাকে দিতে পারে নি। ধার ক'রেও তার প্রয়োজনটা আমাকে চালাতে অনেক হয়েছে।"

হুঁ—তবে কি না একটু refined higher style of lifeএ (পরিমার্জ্জিত উচ্চতর ধরণের জীবনে) সে অভ্যস্ত—।"

"অভ্যস্ত যাতেই থাক, স্বামীর আয় বুঝেই স্ত্রীকে ব্যয় কর্‌তে হয়। স্ত্রীর যেমন আছে, স্বামীরও সে রকম দুটো প্রয়োজন থাক্‌তে পারে। সে যাই হ'ক, এদ্দিন যা হয়েছে, হয়েছে। এখন ওঁদের দরকারে যা লাগ্‌তে পারে, সেটা আগে রেখে বাকী টাকাটাই বরুণাকে আমাকে দিতে হবে, যদি সে ফিরেই সত্যি আসে।"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "কিন্তু সেটা কি পরিমাণ তুমি রাখ্‌তে চাও—তা বুঝ্‌তে পার্‌লে—"

"আমার মা ভাই বোন এদের ভরণপোষণের জন্যে কখন্ কত দেব, তারও একটা হিসেব নিকেশ কি আপনাকে দিতে হবে?"

"আমাকে না দেও, বরুণাকে ত দিতে হবে।"

"তাই বা কেন হবে? যেমন স্ত্রী বরুণার, তেমনি তাদেরও বড় কটা দাবী আমার উপরে আছে। অন্ততঃ এ দেশে সেটা বরাবরই আছে। আর সে দাবীদাওয়া পূরণ করতে স্ত্রীর মতের অপেক্ষাও এ দেশে কেউ করে না। তবে আমি এদ্দিন কথাগুলো তেমন ভাবিনি—এখন না ভেবে আর পারছিনি।"

"হুঁ—"

"তবু সে দাবীদাওয়া কেবল লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একটা দাবী-দাওয়া; না মান্‌লে জোর ক'রে কেউ মানাতে পারে না। কিন্তু সে জোর সুর—আমার সেই স্ত্রীর আছে। নালিশ যদি করে, বরুণা যা পাচ্ছে, সমান ভাগে সেও সেটা আদায় ক'রে নিতে পারে। তবে সেটা সে করবে না।"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "[illegible] বিষম একটা সঙ্কটেরই সৃষ্টি দেখছি ক'রে ফেলেছ। বল্‌ব সব বরুণাকে, বুঝে যদি চল্‌তে পারে, আস্‌বে, না হয় আসবে না। তবে খরচপত্রের কথাই ত বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে—আপত্তির মূল কথা যেটা—সেটা হচ্ছে—"

"কি, বলুন?"

"খরচপত্র সম্বন্ধে—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা যা দরকার, তুমি কর্‌বে, আমি আর কিছু বল্‌তে চাইনে। তবে এই একটি প্রতিশ্রুতি অন্ততঃ তোমাকে দিতে হবে, স্ত্রী ব'লে কখনও তাকে গ্রহণ করবে না, সে জাতীয় কোন সম্বন্ধই তার সঙ্গে কিছু থাকবে না। ত্যাগ করেই ত এসেছ—"

"তাই এসেছিলাম বটে, সম্বন্ধও কিছু নেই। তবে এ রকম প্রতিশ্রুতি কিছু একটা দিতে পারব না।"

"তাও পার্‌বে না?"

"না, কেন এ প্রতিশ্রুতি চাইছেন? আর দিলেই বা তার মূল্য কি? প্রতিশ্রুতি যদি আমি না রাখি, কি করবেন আপনারা?"

"না, করব আর কি? এই যে সেই বিয়ের কথাটা এখন ধরা পড়ল, তাই বা কি কর্‌ছি?"

"তবে কেন এই প্রতিশ্রুতি চাইছেন? দিলেও—সেটা একটা লিগাল এগ্রিমেণ্ট (আইনের চুক্তি) কিছু হতে পারে না যে, ভাঙ্গলে আদালতে গিয়ে তার খেসারৎ আদায় ক'রে নেবেন।"

"না—তা হয় না। তবু অন্ততঃ—"

"কিছু দরকার নাই। এটা জান্‌বেন, বরুণা যদি সত্যিই ফিরে আসে, তার পায়ে গিয়ে খুন হয়ে মরলেও স্ত্রীভাবে আমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ সে স্বীকার করবে না। বরুণা চ'লে যাবার পর তাকে এখানে আন্‌তে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে এল না। একটিবার আমার সঙ্গে দেখাই করলে না, অমনি দেশে চ'লে গেল! কেন জানেন? সে মনে করে, বরুণা ত্যাগ ক'রে গেলেও আমার ত্যজ্য সে এখন আর হ'তে পারে না। এ সংসার এখন বরুণার সংসার—আজ ভেঙ্গেছে, কাল আবার জুড়তে পারে। সে কোনও কণ্টকের সৃষ্টি এর ভেতর করতে চায় না। দেখা না ক'রে একটা চিঠিতে মাত্র এই কথা জানিয়ে অমনি চ'লে গেল। চিঠিও তার নয়,—আমার এক বন্ধুর—যার সঙ্গে এই তীর্থভ্রমণে তারা এসেছিল।"

কথাগুলি একটু যেন ভার হইয়া আসিল।

"হুঁ—ঠিক কথাই ত বলছে। মেয়েটি—সুবুদ্ধিই বটে। তা সে যাই হ'ক্—অন্ততঃ বরুণার সন্তুষ্টির জন্য প্রতিশ্রুতি একটা দিতেই বা তোমার এমন আপত্তি কি তবে?"

"আপত্তি—সে যাই থাক্ না থাক্—প্রতিশ্রুতি কিছু আমি দেব না, দিতে ইচ্ছাই করি না। বরুণা আমার স্ত্রী—দাবী আছে—ইচ্ছে হয়, এখানে এসে থাকতে পারে। কেবল খরচপত্তর সম্বন্ধে একটা সীমার মধ্যে তাকে থাকতে হবে। প্রস্তুত না হয়, অশান্তি হবে। যেমন আমার, তেমনি তারও।"

"দেখি, কি বলে।—আচ্ছা, তবে উঠি এখন।"

"কোথায় যাবেন? এখুনি ত কোন গাড়ী নেই?"

"উপেনের ওখানে উঠেছি। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত সেইখেনেই হয়েছে। আসি বাবা।"

বলিয়াই নীলাম্বর বাবু উঠিয়া বাহির হইলেন।

৩

প্রত্যূষে এক দিন সুরবালা উঠানে গোবরছড়া দিতেছিল। খুব শীত তখন পড়িয়াছে,—ময়লা শাড়ীখানি মাত্র দুইটি ফেরে গায়ে জড়ান। দরিদ্র গ্রাম্য গৃহস্থ বধূরা এইভাবেই কাযকর্ম্মের সময় শীত-নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকে। মোটা কাপড়ের সেমিজ একটি পরিবার সম্বলও সকলের থাকে না,—সুরবালা-দেরও তখন ছিল না। সেমিজ দুই একটি যাহা ছিল, বাহিরে কোথাও যাইবার সময় ব্যবহার করিত; শীত যতই হউক, গৃহে কাযকর্ম্মের সময় পরিত না। সৌদামিনী পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু সুরবালা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; কহিত, "কি দরকার মা? চ'লে ত যাচ্ছেই। ইন্দু ছেলেমানুষ—তাকে দিতে হবে, অত কুলোবে কেন? আপনিও ত সেমিজ পরেন না।"

"ও মা, আমি বিধবা, বুড়ো মাগী—"

"তাই ব'লে শীত কি গায়ে কম লাগে? রক্তের জোর ক'মে গেছে, আমার চাইতে বেশীই বরং লাগবে—"

"তা একটু আগুন-টাগুন জ্বেলে নিয়ে ত বসি—"

"হাত-পা যখন বড় ঠাণ্ডা হয়ে আসে, আমিও ত গিয়ে একটু সেঁকেটেকে আসি।"

"সেই ভোরে উঠে, ছড়া দেওয়া, ঘর নিকোন, বাসন মাজা—ফুরসুতই বা কতটুকু হয়?"

"যা হয়, সেই ঢের। একটা সেমিজ পরলে আর কতই গরম হবে? আর ঠাণ্ডা যা লাগে হাতে পায়ে—তা জুতো-দস্তানা ত আর পরতে দেবেন না?"

"আবাগীর কথা শোন! হঁা, তবে—তাও পরতিস্ বই কি? ভাগ্যে যার আছে, পরছে।—আর তুই—"

"এমন অভাগিতেও কিছু নেই, মা।"

"প্রদীপ ঘরে না থাকলে জোনাকীই মস্ত আলো!—যেমন ভাগ্যি, মতিগতিও ত তেম্‌নি হবে।"

"সেইটে হলেই খুব ভাল হয় না, মা?" বলিয়া এক দিন খিল খিল করিয়া সুরবালা হাসিয়াই উঠিল।

যাহা হউক, এই ভাবেই দিন যাইতেছিল। এই ভাবেই সে দিন ময়লা শাড়ীখানির দুইটি ফেরে মাত্র গা ঢাকিয়া শীতের প্রত্যূষে সুরবালা গোবরছড়া দিতেছিল। হঠাৎ কাহার জুতার শব্দ পাইয়া সে ফিরিয়া চাহিল,—চাহিয়া দেখিল, স্বামী আসিয়াছেন!—মাথার কাপড় টানিয়া সুরবালা আড়ালে সরিয়া গেল। রান্নাঘরের সম্মুখে ছোট উঠানটিতে কতকগুলি কুচিকুচো যোগাড় করিয়া লইয়া সৌদামিনী একটু আগুন জ্বালিবার যোগাড় করিতেছিলেন। কাযকর্ম্মের অবসরে বউ আসিয়া হাত-পা সেঁকিয়া যাইতে পারে, তাই এইরূপ একটু আগুন রোজই তিনি জ্বালিতেন। নিজেও আগুন পোহাইতেন; প্রতিবেশিনীরাও গৃহ-কর্ম্মের অবসরে কেহ কেহ আসিয়া হাত-পা সেঁকিয়া যাইতেন।

সুরবালা আসিয়া কহিল, "ওদিকে একটিবার যান মা,—দেখুন গিয়ে কে এসেছেন।"

"কে?"

"দেখুন গিয়ে।"

আড়ঘোমটায় মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া সুরবালা পিছনের দিকে সরিয়া গেল।

সৌদামিনী উঠিয়া আসিলেন।

"কে রে—কিরণ!—আমার কিরণ, তুই এলি—"

"হঁা, মা।"

অগ্রসর হইয়া কিরণ মাকে প্রণাম করিল, দুই হাতে ধরিয়া তুলিয়া পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সৌদামিনী কহিলেন, "আয়—আয় বাবা! আমার বুকে আয়। পাঁচ বছর পরে এলি, যেচে এসে বাড়ীতে পা দিলি—এ যে স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারিনি, বাবা।" সৌদামিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন, একটু সামলাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ডাকিলেন, "ও সত্য! ও ইন্দু!—ওরে দ্যাখ এসে রে, তোদের দাদা এয়েছে।"

সত্য আর ইন্দু সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল—কাছে আসিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। মায়ের ডাকে তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিল। সলজ্জভাবে দাদাকে প্রণাম করিল।

"এই যে আয়! ভাল আছিস্ ত তোরা?" বলিয়া কিরণ ছোট ভাইবোন দুটিকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া গাল টিপিয়া একটু আদর করিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সৌদামিনী পুত্রের মুখপানে চাহিয়াছিলেন। তখন বেশ ফর্সা হইয়াই উঠিয়াছিল; চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "ইস্, কি রে? তোর কি অসুখ-বিসুখ কিছু করেছিল? মুখে যে কালী ভেঙ্গে দিয়েছে। চোখ দুটি ব'সে গিয়েছে। শরীর শুকিয়ে যেন আধখানা হয়ে গেছে! সে দিনও দেখে এলাম—কি হয়েছে রে?"

"ও কিছু নয় মা। এম্‌নিই কদিন থেকে একটু দুর্ব্বল—"

"আয় ঘরে আয়। এই পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় এসে বোস্। এখুনি রোদ এসে পড়বে। বড্ড শীত—একটু আগুন জ্বেলে দেব?"

"না মা, কিছু দরকার নেই। এমনিই গিয়ে বস্‌ছি চল।"

পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় সৌদামিনী মাদুর এবং তার উপরে একখানি তোষক আনিয়া পাড়িয়া দিলেন। আদেশ পাইয়া সুরবালা জল গরম করিয়া পাঠাইল। কিরণ হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিল। সত্যকে পাঠাইলেন—সে একটু চা দুধ ও চিনি যোগাড় করিয়া আনিল।

পাশেই বিন্দীর মার বাড়ী, সে তখন মুড়ি ভাজিতেছিল। ইন্দু গিয়া গরম টাটকা মুড়ি কিছু লইয়া আসিল। চা ও মুড়ি আনিয়া সৌদামিনী পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন।

"নে, এই চাটুকু আর মুড়িকটা খেয়ে ফেল্, বাবা। কত ভাল খাস্ তোরা—তা এই গেঁয়ো ঘরে কোথায় আর কি পাব—"

হাসিয়া কিরণ কহিল, "এই বেশ খাব মা। ভাল, যাই খাই, গরম মুড়ির মত চায়ের সঙ্গে আর কিছুই তেমন ভাল লাগে না।"

সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীরাও সকলে ছুটিয়া আসিলেন। সকলের সানন্দ সম্বর্দ্ধনায়, ও আদর-আপ্যায়নে কিরণ অতি পরিতৃপ্তই হইল। কয়েক বৎসর বহু বিলাস-ব্যসনে তাহার জীবন কাটিয়াছে। কেমন একটা ক্লান্তি বিরক্তির ভাবই যেন তাহাতে আসিতেছিল। পল্লীগৃহের সরল অনাড়ম্বর আবেষ্টনী, তাহার তৃপ্তির জন্ম পল্লীবাসিনী মাতার সস্নেহ

আগ্রহ, সেই স্নেহের স্পর্শে মধুর পল্লীর এই মুড়ি জলপান, হাসিভরা মুখে পল্লীবাসী প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীগণের বুকভরা দরদের সম্ভাষণ, ঘরগুলির আড়াল হইতে পাড়ার সব পল্লীবধূর সলজ্জ সচকিত হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি—সব কি যে এক আনন্দরস আজ তাহার চিত্ত ভরিয়া তুলিল, যাহা সারা কৈশোর অতীত হইবার পর জীবনে কখনও আর সে পায় নাই। বহু বিলাস-ভোগাড়ম্বরের মধ্যেও যে অশান্তি তাহাকে তিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল, তাহার পর আজ এই আনন্দ—পরিতৃপ্তির আরাম তাহার বড় মিঠাই লাগিল। কিন্তু হায়, এই মধুর জীবনে সে কি সত্যই নিজেকে ফিরাইতে এখন পারিবে?

কতক্ষণ গেল। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, ক্রমে অনেকেই বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। কাযকর্ম্ম ত যাহা হউক কিছু না কিছু সকলেরই আছে। আর কিরণ এত দিন পরে আসিয়াছে, দুই চারি দিন কোন্ না থাকিবে? দেখা-শুনা সদা-সর্ব্বদাই হইবে। কিরণ কহিল, "সবাইকে দেখ্‌লাম, সতীশ কোথায়, মা? সে বুঝি বাড়ীতে নেই? আর মেজ জ্যাঠাইমা—"

সৌদামিনী কহিলেন, "তিনি তাঁর বাপের বাড়ী গেছেন, একটি ভাইঝির বিয়ে। সতীশও গেছে। এখুনি হয় ত ফিরে আসবে।"

"আসবে? যা হ'ক, তা হ'লে দেখা হবে।"

"কেন, তুই কি আজই আবার ফিরে যাবি না কি? এলি এতদিন পরে—"

"ঠিক আজই নাও যেতে পারি, তবে থাকতে পার্‌ব না বেশী দিন। পরের চাকরী করি—আচ্ছা, উঠি এখন, একটু ঘুরে ফিরে আসি গে, মা। দেখি যদি সতীশ এসে থাকে—"

বলিয়া কিরণ উঠিয়া বাহির হইল।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া কিরণ আসিয়া উত্তরের ঘরের বারান্দায় বসিল, বেশ রোদ আসিয়া সেখানে পড়িয়াছিল। উঠানে সৌদামিনী ধান শুকাইতে দিয়াছিলেন, সেই ধান ভানা হইবে, তবে বোধ হয় পরদিন উনানে হাঁড়ি চড়িবে। কিরণ চাহিয়া চাহিয়া ধানগুলি দেখিতেছিল। তার সঙ্গে ঢেঁকী-ঘর, ধামা কুলা, সেই ঢেঁকীর পাড়ে মলিনবসনপরিহিতা সুরবালার চিত্রটি তাহার মনের চোখে ফুটিয়া উঠিল। একটি নিশ্বাস সে ছাড়িল। ধানগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া সৌদামিনী আসিয়া কাছে বসিলেন। ইন্দু এক পেয়ালা চা আনিয়া সম্মুখে রাখিল।

"আরে, বাপ রে? এখুনি আবার চা এনেছিস্? নিয়ে যা, সারাটি দিন কি কেবল চাই খাই আমি! নিয়ে যা—নিয়ে যা। একগ্লাস ঠাণ্ডা জল বরং নিয়ে আয়!"

ইন্দু জল আনিয়া দিল, ভরা গ্লাস জল কিরণ খাইয়া ফেলিল। কতক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, শেষে ধীরে ধীরে কহিল, "তোমরা খুব দুঃখ-ক্লেশ পাচ্ছ, মা?"

"কি কর্‌ব বাবা? সম্বল ত এমন কিছু নেই—"

"হুঁ—! আমি জানতেও কিছু পারি নি—"

কি ক'রে জানবে, বাবা? কটা বছর গেল, কোনও খবরও করনি, আর ঠিকেনাও কিছু পাইনি যে জানাব। তা তুমি, বাট, বেঁচে আছ, ভাল আছ, প্রয়াগে গিয়ে দৈবাৎ এইটে জানতে পেরেও, তবু একটা সোস্তি পেলাম। নইলে কি ভাবে যে কটা বছর কাটিয়েছি—"

"অন্যায়ই করেছি খুব। তবে—তবে—একটা ধারণাও ছিল, বাবা থাকতে সংসারটা যেভাবে চলত"—

সৌদামিনী কহিলেন, "তিনি ছিলেন পুরুষমানুষ, কাযকর্ম্ম নিজে দেখে শুনে করতেন—বাসা-ভাড়াটা নিজে গিয়ে আদায় ক'রে আনতেন। আর আমরা মেয়েমানুষ—"

"হুঁ, বুঝতে পারি নি কিছু। কথাটা ভাবিও নি তেমন। খুবই দুঃখ-ক্লেশ পাচ্ছ। ঘর-দরজাও সব ভেঙ্গে পড়ছে। এই শীত—ভোরে এসে দেখ্‌লাম, তোমাদের বৌ গোবরছড়া দিচ্ছে, পরণে ময়লা একখানি শাড়ী মাত্র।"

"তার কপাল!"

একটি নিশ্বাস "হুঁ—!" ছাড়িয়া সৌদামিনী কহিলেন, "বড় ঘরের মেয়ে, বাপও খুব ভালবাসে—যত্ন-আত্তিও করতে চায়। তা আবাগী দুদিনও গিয়ে সেখানে থাকতে চায় না।"

"কেন চায় না?"

"চায় না—বলে, একা আমার কষ্ট হবে, ঐ দুটো বালাই আবার রয়েছে। অনেক বলেছি বাবা, তা যায় না। কালে ভদ্রে কখনও গেলেও দু তিন দিনের বেশী থাকে না। তা মনে কিছু করো না, বাবা, পেটের ছেলে তুমি ছেড়েছ, আর বিয়ে দিয়ে ওকে ঘরে এনেছিলাম, ও ছাড়তে পারছে না।

"হুঁ, শুনেছি সব সতীশের কাছে। আমিও আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।"

আবার একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী কহিলেন, "বুঝলে না বাবা, আর হেলা ক'রে ফেলে গেলে। কি রত্নই যে বিধেতা তোমার ভাগ্যে মিলিয়েছিলেন!"

চাপিয়া কিরণ একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

সৌদামিনী কহিলেন, "নতুন একটা সংসার করেছ, তা যা শুনলাম আর একদিন যা দেখে এলাম, এখন সুখে যে কিছু আছ, তাও ত মনে হ'ল না।"

"না!"

"টাকাও অনেক রোজগার করছ—দু'হাতে ওড়াচ্ছ,—আর অবাগী এখানে এই হালে আছে। চোখেই ত দেখ্‌লে, বাবা—"

কথাটা যেন চাপা দিবার অভিপ্রায়েই কিরণ ক'হল, "খরচ-পত্তর—কি জান মা,—বাঁচাতে কিছু পারিনি—কর্ত্তৃত্বও আমার হাতে বড় কিছু ছিল না। নইলে, পাঠান কিছু তোমাদের দরকার, এটা যে মনে কখনও হয়নি, তাও নয়। তবে এখন থেকে পাঠাব—বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে যাতে তোমরা থাকতে পার—"

"সে ফিরে আসেনি?"

"না।"

"ছেলে দুটি?"

"তাদের মার কাছেই আছে।"

"মনটা তখন আমার কাছেই ছিল না।—গেলাম—চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম না। হাজার হ'ক, তারা তোর ছেলে ত! কি যে দুঃখে পু'ড়ে মরছি, বাবা—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আঁচলে সৌদামিনী মুখ ঢাকিলেন।

কিরণ কহিল, "ও দুঃখু আর মনে ক'রো না,মা!—কে তোমার তারা?—আমারই বা এখন কে?"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে সৌদামিনী কহিলেন, "নিজের রক্ত-মাংস—কেউ নয় বল্লেই কি কেউ নয় তারা অমনি হয়ে যায়? মুখে যাই বলিস, মনে মনে সত্যিই কি তারা কেউ নয় ভাবতে পারছিস্? সে যে পারবার যো নেই, বাবা।"

চাপিয়া কিরণ আবার একটি নিশ্বাস ফেলিল। পরে কহিল, "এসেছিলাম মা, যদি ও যেত, সঙ্গে নিয়ে যেতাম।"

"বেশ ত, তাই নিয়ে যা। কৃতার্থ হয়ে আমি পাঠাব।"

"নিতেই ত চেয়েছিলাম। আপত্তি তার ছিল—তা দুটি কথাও বুঝিয়ে বলবার অবসর না দিয়ে, তাকে নিয়ে চ'লে এলে।"

সৌদামিনী কহিলেন, "নিয়ে ত আমি আসিনি বাবা, সেই আমাকে নিয়ে চ'লে এল। আর যা বল্লে, সেটা—সেটা—মনে তখন হ'ল, ঠিকই বলেছে। তা বেশ ত—যদি যায়, তাকে বল—যদি যায়, নিয়েই যাও।—সুখী হবে।"

"অবিশ্যি তোমরা গিয়ে সেখানে থাকতে পার। আপত্তির কারণ এমন তাতেও কিছু নেই।"

"আমরা? না বাবা, আমরা কোথাও যাব না।"

"কেন, আপত্তি কি? আর এও ত জান, তোমরা না গেলে—"

"জানি, সহজে সে যেতে রাজি হবে না। আর তাই—থাক্ বাবা, ওসব কথায় আর কায নেই। তাকে বল, আমিও বুঝিয়ে বলব—ধেয়ে এদ্দুর এসেছ—কেন সে যাবে না? তোমার মনের দিকে কেন একটু চাইবে না? সোয়ামী ত তুমি—"

"সোয়ামীর মত ব্যবহার ত করিনি, মা—"

"তবু সোয়ামী, আর সে বউ। তোমার মত বড় গুরুও ত তার কেউ আর নেই।"

কিরণ চুপ করিয়া রহিল।

সৌদামিনী কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "নাই যদি রাজি হয়, বেশ যাবই বরং। সে সুখী হবে—তুমিও সুখী হবে—সেই খাতিরেই বরং যাব।—বলতে কি বাবা, পেটের ছেলে তুমি—তা তোমার চাইতেও সে এখন অনেক বড় আমার হয়ে উঠেছে। সে যদি সুখী হয়—নিজের কোনও বিবেচনা—না বাবা, কিছুই আমি করব না। বেশ, যাব। তার পর—তোমাদের একটা স্থিতি-ভিত্তি হ'লে, তখন আবার ফিরে আসব।"

কিরণ কহিল, "যদি যাওই মা, একা ফিরে বোধ হয় আর আসতে হবে না। হাঁ, দুঃখ তোমার একটা হ'তেই পারে, মা ব'লে কোনও দরদ কখনও করিনি, মানও রাখিনি। সেই দরদে সেইখানেও সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছিনি—চাইছি বৌয়ের খাতিরে! হাঁ, বুঝতে পারছি মা, দুঃখু—অনিচ্ছে হতেই তোমার পারে। না হওয়াই অস্বাভাবিক। তবে—তবে—গেল ক'দিন ধ'রে অনেক কথাই ভাবছি মা—মনটাও আমার বদলে যাচ্ছে। যদি—যাওই মা—বোধ হয়—বোধ হয় মায়ের মত মায়ের মানেই তোমাকে রাখতে পারব।"

"সেও ত বাবা, ঐ বৌএরই খাতিরে।"

একটু হাসিয়া কিরণ কহিল, "তুমিও যে এই গ্লানি—এই ঘেন্না বরদাস্ত ক'রে যেতে চাইছিলে—সেও ঐ বৌএর খাতিরে, মা?"

একটু হাসি তখন সৌদামিনীর মুখেও ফুটিল।—কহিলেন, "তা বৌমাকে যা বলতে হয়, বল।—আপত্তি ত কেবল তার এইটেই ছিল না। আর যেটা রয়েছে—তা বল, তাকেই সব বুঝিয়ে বল। সেটা আমি আর কি বলব বাবা,—তোমরাই বুঝে শুঝে যা হয় একটা মীমাংসা ক'রে ফেল। যাও, ঐ ঘরে গিয়ে ব'সো। আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরে ইন্দু, যা ত, ঐ পশ্চিমের ঘরে গিয়ে তোর দাদাকে বসবার একটা যায়গা ক'রে দি গে' ত যা। ঐ ত মাদুর আর তোষকটা তোলা রয়েছে, সেই দুটোই গে' বিছিয়ে দে।"

৫

"কেন আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ? নিয়ে গে' রাখতে পারবে না, ফিরিয়ে আবার পাঠাতে হবে।"

"না। যদি যাও, নিয়েই যদি যেতে পারি, রাখতে পারব, ফিরিয়ে পাঠাতে হবে না! তা হ'লে—তা হ'লে—এই ভয়েই কেবল যেতে চাও না? নইলে—নইলে—যেতে তোমার নিজের আপত্তি কিছু নেই?"

"আমার আপত্তি! নিজের আমার?—কি হ'তে পারে?—তাও কি হয় কখনও?"

"বড় অপমান করেছি! অনেক দুঃখু দিয়েছি! অযোগ্য ব'লে ত্যাগ ক'রেই চ'লে গিয়েছিলাম। গিয়ে—গিয়ে—"

"ছি! কেন আর ওসব কথা তুলে আমায় লজ্জা দিচ্ছ? যা হয়ে গেছে—গেছে।—এখন—"

"এখন তা হ'লে আমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে পেরেছ? আবার আমাকে গ্রহণ ক'রে—আমার—স্ত্রী হয়ে আমার কাছে থাকতে তুমি প্রস্তুত আছ? অবিশ্যি শেষ যাবার দিন তোমাকে মুক্তি দিয়ে মুক্তি নিয়েই আমি গিয়েছিলাম।"

"ও সব ছেলেমানুষী কথা আর কেন? মুক্তি যাকে বল—মেয়েমানুষ আমাদের ত সেটা হ'তেই পারে না। পুরুষমানুষ তোমরা মুক্ত বল্লেই মুক্ত—বেঁধে কেউ রাখতে পারে না। তাও ত দেখছি হ'তে পারছ না—"

একটু হাসি মুখে ফুটিতে ফুটিতে চাপিয়া মুখখানিই সুরবালা ফিরাইয়া লইল। হাসি একটু কিরণের মুখেও ফুটিল। কহিল, "আমরা পারি, আবার পারিও না। তবে পারা না পারাটা অনেকটা আমাদের ইচ্ছাধীন বটে। আর তোমাদের পক্ষে—"

"পারবার যো নেই।—আমাদের স্বভাবেরই ধর্ম্ম পারতে আমাদের দেয় না। তোমরা যা ভাব, যে সব কথা আজ-কাল বল, তা নয়। আর মুখে যাই বল, যাকেই যত অপরাধী কর, বাঁধতে একবার পারলে মুক্তি কি তোমরাই দিতে চাও, যদি না নিজের গরজ সেটা চা'ওয়ায়?"

"ঠিক—ঠিক বলেছ সুরবালা, পুরুষ জাত আমরা এমনি স্বার্থপরই বটে। আর তোমরা—তোমরা—অনেকেই তোমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে কি না করতে পার আমাদের জন্ম! আজ এত বড় একটা স্বার্থের দাবীই নিয়ে আসতে যে তোমার কাছে পেরেছি, তাই না পেরেছি।"—

একটু ভাবিয়া সুরবালা কহিল, "উনি ত রাগ ক'রে চ'লে গেছেন, ফিরে কি আর আসবেন না?"

"আসেনি এখনও।—তবে—আসবে না, এমন কথাও বলতে পারিনে, আসতেও হয় ত পারে। হয় ত—আসবেই—"

"তা হ'লে কেন আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ? উনি এলে কত বড় একটা সঙ্কটের সৃষ্টি তখন হবে, বুঝতে পারছ না?—কি করবে তখন? আমাকে ফিরিয়ে পাঠান ছাড়া—"

কিরণ কহিল, "আসতে সে পারে হয় ত। কিন্তু তুমি গেলে আর আসবে না। আমিও চাই না, সে আসে—"

চকিত দৃষ্টিতে সুরবালা স্বামীর মুখ পানে একটিবার চাহিল,—চাহিয়াই মুখ একটু নত করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "ও, তাই বুঝি তার আসবার পথে একটা বাধা সৃষ্টি করবার জন্যই তাড়াতাড়ি ক'রে আমাকে নিতে এসেছ?"

কিরণ বড় অপ্রতিভ হইয়াই পড়িল। এত বড় এরূপ কঠোর একটা সত্য যে সুরবালা বলিবে, কি বুঝিয়া বলিতেই পারিবে, এটা তাহার মনেই হয় নাই। মুখ তুলিয়া সুরবালা চাহিয়া দেখিল, লজ্জায় কুণ্ঠায় স্বামী যেন এতটুকু হইয়া বসিয়া আছেন। কহিল, "কিছু মনে করো না। কথাটা হয়ত আমার বলা উচিত হয় নি। কিন্তু তোমারই কি এ অবস্থায় আমাকে নিয়ে যাওয়া উচিত?"

"বড় অসুখী আমি সুরবালা। একেবারে অতিষ্ঠ হয়েই উঠেছি। এখন এই সব ঘটনার পর সে যদি ফিরে আসে, ওর ঐ সংসারে আমার অবস্থা যে কি হবে, কল্পনাই তুমি করতে পারবে না। স্ত্রীর মত সুখশান্তি আর কেউ কাউকে দিতে পারে না। আবার স্ত্রী যদি অসুখ অশান্তি ঘটায়, অত দুঃখও কেউ মানুষকে দিতে পারে না। ঠিক তেমনি দুঃখই আমি পাচ্ছি। এখন আরও পাব। উপায় নাই সুরবালা—এড়াতে পারছিনি,—প্রতিকার অসম্ভব! যেন যাঁতা কলে ফেলে আমায় পিষ্‌ছে। এখন এক—এক তুমি আমায় রক্ষা করতে পার। নইলে জীবনটাই আমি আর বহন করতে পারব না।"

এক হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া, আর এক হাতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সুরবালা বলিয়া উঠিল, "ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, অমন ক'রে আর ব'লো না। আমি—আমি যে সইতেই পারছি নি। কিন্তু কি করব? উপায় যে আর নেই।"

কিরণ কহিল, "স্বার্থপর আমি, আর বড় একটা স্বার্থের দাবী নিয়েই তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু এ স্বার্থ আমার জীবন-মরণের স্বার্থ। কিছু গ্রাহ্যি না ক'রে হেলায় এ স্বার্থ তুমি ছেড়ে দিতে পার—দিয়েছ—জানি। কিন্তু আমি পারছি নি।"

"কি করবে?—তাঁকে ত সত্যি ত্যাগও করতে পার না।"

"ত্যাগ ত সেই আগে ক'রে গেছে।"

"না, ত্যাগ ক'রে যায়নি। যেতে পারে না—"

"পারে—পারে! তুমি জান না সুরবালা, ওরা সব পারে।"

"পারে? সত্যি পারে? কি ব'লছ! এই কটা বছর ত সংসার করলে। সত্যি কি একটু দরদ কখনও পাওনি?"

"পাইনি—এমন কথাও ঠিক বলতে পারিনে। তবে—"

"তবে ত্রুটি আর যাই থাক্, ত্যাগ ক'রে সত্যি যেতে পারবে না। দুটি ছেলেরও মা, ত্যাগ ক'রে কি যেতে পারে? কোথায় যাবে? গিয়ে কি করবে! না না, ত্যাগ ক'রে যায়নি; রাগ ক'রে গেছে, আবার আসবে।"

"আসবে—আবার আসবে—হাঁ, আসবে জানি। কিন্তু—কিন্তু—আবার সেই কথাই বলছি, তুমি গেলে আর আসবে না।"

"তুমি—ভাবছ সুখী হবে। হয় ত হবে। কিন্তু তাই ব'লে তার ফিরে আসবার পথে এত বড় একটা কাঁটা হয়েও ত আমি গিয়ে বসতে পারিনে। ন্যায্য যে দাবী তার রয়েছে—"

"সে দাবী কি তোমার নেই? তুমিও ত আমার স্ত্রী।"

"তার দাবী অনেক বড়। সাধ ক'রে যেচে গিয়ে তাকে বিয়ে ক'রে এনেছ, ক'বছর তাকে নিয়ে সংসার করেছ, দুটি ছেলে তার পেটে হ'য়েছে,—না না, আমি তার কাছে কে? সে যে এখন তোমার অনেক বড়। অশান্তি ঘটাচ্ছে—কি করবে? অদেষ্টে যদি থাকে, অনেক দুঃখ অশান্তিই মানুষকে ভুগতে হয়। কেউ তা এড়াতে পারে না, ধীরভাবে সহ্য করেই যেতে হবে।"

"তা হ'লে সত্যই তুমি যাবে না সুরবালা?"

"পারছি না,—যাওয়া আমার উচিত হবে না। বুঝতে পারছ না তুমি, আজ—আজ এত দিন পরে এসেছ—যা পেলে এই নারীজন্ম আমার সার্থক হয়ে যাবে, যেচে তাই দিতে চাইছ—কিন্তু তবু—তবু—নিতে যে আমি পারছি নি—"

দুই হাতে মুখ বুক ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগ সুরবালা সম্বরণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিল।

কিরণ কহিল, "কেঁদো না, কেঁদো না, সুরবালা! সত্যিই অতি স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর আমি—বড় দুঃখই তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু উচিত হচ্ছে না, যে দুঃখু তোমাকে দিয়ে রেখেছি, তার ভার আজ আরও বাড়িয়ে তুলছি।"

"না না, অমন কথা ব'লো না, দুঃখু—দুঃখুই যদি হয়, যা দিয়েছিলে, সব তা তুলে নিয়ে জীবন আমার আজ কৃতার্থ করেছ তুমি। কাঁদছি, দুঃখু পাচ্ছি—তোমাকে যা দেবার, তা দিতে পারছি নি—এইভাবে এত দুঃখু দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে পাঠাচ্ছি, তাই। কিন্তু ক্ষমা ক'রো আমায়। যা পারছি না, তোমারই ভাল ভেবে পারছি না। তুমি বুঝছ না—ভাবছ, আমি গেলে সে আর আসবে না। কিন্তু যদি আসে—যে দাবী তার আছে, সেই দাবী নিয়ে যদি তোমার ঘরে এসে ওঠে, কি করবে তুমি? আমিই বা তখন কি করব?"

"ঠিক, ঠিক বলেছ সুরবালা! যে ফাঁস গলায় পরেছি, অত সহজে খুলে তা ফেলতে পারব না! কি করব? নিজের কর্ম্মফল ভুগতেই হবে। তবে—তবে—আজ না পেয়েও যা নিয়ে গেলাম আমি—দেখি সেই সম্বলের বলে, এ দুর্ভাগ্য সইতে আমি পারি কি না। যদি পারি, বুঝব, আজ আমায় না দিয়েও তুমি যা পাওয়ালে, তার যোগ্য আমি!"

বলিয়াই কিরণ উঠিল।

মাতার একান্ত অনুরোধে অগত্যা সেই রাত্রিটা বাড়ীতে থাকিয়া পরদিনই সে চলিয়া গেল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম এ)।

কাজীর বিচার

(সেকালে ও একালে)

পূর্ব্ব বঙ্গের 'কান্ত কবি' স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন যাঁহার রচিত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' প্রভৃতি সঙ্গীত স্বদেশীর প্রথম যুগে বাঙ্গালার শত শত পল্লীর লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গীত হইয়া বর্ণজ্ঞানহীন অশিক্ষিত পল্লীবাসীর চিত্ত স্বদেশীয় তাঁতি ও জোলাদের তাঁতোৎপন্ন মোটা ও খস্‌খসে বিশ্রী ধুতি ও সাড়ীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেই স্বদেশ-প্রেমিক ভাবুক ও ভক্ত কবি রজনীকান্ত রাজসাহী জজ আদালতের উকীল ছিলেন, এবং আমি তত্রত্য জজ আদালতের চাকরী উপলক্ষে দীর্ঘকাল তাঁহার 'বড় কুঠী'র বাসায় বাস করিয়া তাঁহার সাহচর্য্যের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তাহার কিছু কিছু বিবরণ আমার 'সে-কালের স্মৃতি'র আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। আমি লিখিয়াছিলাম, ঝঙ্কারময়ী ভাষায় সুললিত ও ভাবপূর্ণ সঙ্গীত-রচনাতেই যে তিনি সুনিপুণ ছিলেন, এবং স্বরচিত অতুলনীয় হাসির গানে ছেলে-বুড়োর মজলিশ মাতাইতে পারিতেন, এরূপ নহে, তাঁহার গল্প বলিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। সেই সকল গল্প যেরূপ সুমিষ্ট, সরস, কৌতুকাবহ ও সুরুচিপূর্ণ, তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গীও সেইরূপ হাস্যোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক ছিল। অতি গম্ভীরপ্রকৃতি প্রবীণ ব্যক্তিও তাঁহার গল্প শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারেন না !

এক দিন রাজসাহীর কোন সিভিলিয়ান জজ একটা ফৌজদারী আপীলের বিচার করিয়াছিলেন। এত দিন পরে সেই জজের নাম আমার স্মরণ নাই ; সম্ভবতঃ, তাহা নাটোর বা সদরের কোনও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল, এবং তাহা দাম্পত্য-স্বত্ব (Conjugal right) সাব্যস্ত-সংক্রান্ত মামলার আপীল বলিয়াই মনে হইতেছে। সেই আপীলের বিচারে সেসন্‌স জজ যেন একটু খামখেয়ালীর পরিচয় দিয়াছিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর রজনী বাবুর আড্ডায় বন্ধুগণ সেই ফৌজদারী আপীলের রায়েরই সমালোচনা করিতেছিলেন। কে এক জন বলিলেন, "তা তোমরা যাই বল, জজ সাহেবের বিচারটা সেকালের কাজীর বিচারের মত উদ্ভট হয়েছে।"

রজনী বাবু গড়গড়ার নল মুখে গুঁজিয়া নিবিষ্টচিত্তে ধূমপান করিতে করিতে বন্ধুগণের আলোচনা শুনিতেছিলেন, নির্ব্বাক্ শ্রোতা, কাহারও কোন মন্তব্যে অভিমত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু 'জজ সাহেবের বিচার কাজীর বিচারের মত উদ্ভট হয়েছে' এই মন্তব্য শুনিয়া তিনি গড়গড়ার নলটা নামাইয়া রাখিয়া, সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহা সাহিত্যের ভাষায় লিখিতেছি।

রজনী বাবু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "তোমাদের কি ধারণা, সেকালে মুসলমান বাদশাদের আমলে কাজীরা হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর বিচারের মত বিচার করিয়া রামের অপরাধে শ্যামকে শূলে চাপাইতেন, এবং জয়নালের দেনার দায়ে বকাউল্লার তৈজসপত্র ক্রোক করাইতেন ? প্রত্যক্ষ সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে তাঁহারা কিরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিতেন, তাহার একটা গল্প বলি, শোন।"

মোগল বাদশাদের মধ্যে সম্রাট্ আকবর সকল বিষয়েই বড় ছিলেন ; সুবিচারের প্রতিও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজধানীর কয়েক ক্রোশ দূরে কোন পল্লীগ্রামে এক জন কাজী ছিলেন, সুবিচারক বলিয়া কাজীর খ্যাতি ছিল। সম্রাট্ এ কথাও শুনিয়াছিলেন যে, সেই কাজী সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে কেবল স্বাভাবিক সংস্কারবলে আসামী-ফরিয়াদীর অভিযোগ ও জবাব শুনিয়া যে রায় প্রকাশ করিতেন, তাহাতে সুবিচারের ব্যতিক্রম হইত না। প্রকৃত অপরাধী কোন কৌশলে তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারিত না। প্রকৃত অপরাধীকেই তিনি শাস্তি দিতেন।

সাক্ষী নাই, প্রমাণ নাই, কাজী কেবল সংস্কার-বলে ন্যায়-বিচার করেন, এই সংবাদ শুনিয়া কাজীর বিচার-কৌশল পরীক্ষা করিবার জন্য সম্রাটের কৌতূহল হইল। সম্রাট এক দিন অপরাহ্নে রাজকীয় পরিচ্ছদের উপর সাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি আলখেল্লা আঁটিয়া, ঝুটা দাড়ি-গোঁফে সজ্জিত হইয়া, সেই ছদ্মবেশে একাকী প্রাসাদের বাহিরে আসিলেন, এবং আস্তাবল হইতে তাঁহার প্রিয় একটি অশ্ব লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তিনি

কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কাজী সাহেবের বাসগ্রাম অভিমুখে অশ্ব পরিচালিত করিলেন।

সম্রাট্ রাজধানী ত্যাগ করিয়া সহরতলীর পথে চলিতে লাগিলেন; অবশেষে একটি নির্জ্জন পল্লীপথে প্রবেশ করিতেই বৃক্ষমূলে এক জন খোঁড়াকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। খোঁড়া অশ্বারোহীকে সেই পথে যাইতে দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল, "মিঞা সাহেব, আপনি কত দূর যাইবেন?"

ছদ্মবেশী সম্রাট্ ঘোড়া থামাইয়া কাজীর বাসগ্রামের নাম বলিলেন।

খোঁড়া কাতরভাবে বলিল, "মিঞা সাহেব, আমি খোঁড়া, নাচার মানুষ, আমিও ঐ গ্রামে যাইব বলিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম, এবং একখান লাঠীতে ভর দিয়া অতি কষ্টে দুই এক পা করিয়া চলিতেছিলাম। চলিতে চলিতে শ্রান্তি বোধ হওয়ায় আমি লাঠীখানি পাশে রাখিয়া এখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, ইতিমধ্যে কয়েকটা 'চ্যাংড়া' (যুবক) এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমার লাঠীখানি দেখিয়া, লোভ হওয়ায় সেই দলের একটি 'চ্যাংড়া' লাটীখান আমার পাশ হইতে খপ্ করিয়া তুলিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। আমি খোঁড়া মানুষ, দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া লাঠী কাড়িয়া লই, সে শক্তি আমার নাই, তাহা দেখিতেই পাইতেছেন; নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছি, এখন করি কি? যদি এ পথে কোন গাড়ী যাইত, তাহাতে আশ্রয় লইয়া আমার গন্তব্য স্থানে যাইবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে আশা বিফল হইয়াছে। আপনি যদি মেহেরবানি করিয়া এই নিরুপায় খোঁড়াকে আপনার ঘোড়ায় তুলিয়া লইয়া গ্রামে পৌছাইয়া দেন, তাহা হইলে চিরদিন আপনার কেনা গোলাম হইয়া থাকিব। খোদাতালা আপনার মঙ্গল করিবেন।"

খোঁড়া পথিকের প্রার্থনা শুনিয়া উদারহৃদয় সম্রাটের হৃদয়ে করুণা-সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হইতে নামিলেন, এবং খোঁড়াকে সযত্নে ঘোড়ায় তুলিয়া লইয়া তাহার সম্মুখে বসিলেন। খোঁড়াকে বলিলেন, "তুমি দুই হাতে আমার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাক, আমি ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাইতেছি। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া তোমাকে নামাইয়া দিব।"

খোঁড়া নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ছিল না; সে লেখাপড়া জানিত। সে মুন্সী, এবং তাহার পরিচ্ছদাদিও মূল্যবান্ ছিল। ভদ্রসমাজ-সুলভ শিষ্টাচারেও সে অভ্যস্ত ছিল। সম্রাটের করুণায় সে অভিভূত হইয়া গভীর কৃতজ্ঞতাভরে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অভিবাদন করিল, এবং আচকানের আস্তিনাবৃত উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া তদ্দ্বারা সম্রাটের কটিদেশ বেষ্টিত করিল। সম্রাট্ সেই অবস্থায় তাহাকে পশ্চাতে বসাইয়া অশ্ব পরিচালিত করিলেন।

সম্রাট্ নির্দ্দিষ্ট গ্রামে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎস্থিত খোঁড়াকে বলিলেন, "গ্রামে ত আসিয়াছ, নামিবে কি?"

খোঁড়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

সম্রাট্ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "এই গ্রামেই ত আসিতে চাহিয়াছিলে, তবে নামিবে না কেন?"

খোঁড়া বলিল, "আমার খুসী। আপনার ইচ্ছা হয় নামিয়া যান। আমি কেন নামিব?"

সম্রাট্—"আমার ইচ্ছা হয় নামিয়া যাইব, আর তুমি ঘোড়ায় বসিয়া থাকিবে? তুমি যে ভাবে কথা বলিতেছ, তাহা শুনিলে মনে হয়, এ ঘোড়া তোমার, আমাকে দয়া করিয়া ইহার পিঠে স্থান দিয়াছ!"

নির্লজ্জ খোঁড়া বলিল, "সত্য কথাই বলিয়াছেন। হাঁ, এ ঘোড়া আমার। আপনি মিথ্যা কথা বলিয়া আমার ঘোড়ার দাবী করিতেছেন। মাথার উপর খোদা আছেন, তিনি সত্য-মিথ্যার বিচারক। আপনি মিথ্যা কথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া ঘোড়াটি লইতে চাহেন, তা হইবে না। গ্রামে আসিয়াছেন, এখন নামিয়া যান, আপনাকে নামাইয়া দিয়া যেখানে খুসী যাইব। শীঘ্র নামিয়া যান, আমার সবুর সহিতেছে না।"

সম্রাট্ খোঁড়ার ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বেহায়া লোক বিস্তর দেখিয়াছি, মিথ্যাবাদীও বহুৎ দেখা আছে, কিন্তু তোমার মত বেহায়া মিথ্যাবাদী দ্বিতীয় দেখি নাই। উপকার করিলাম, তাহার এই প্রতিদান! ভাল চাও ত শীঘ্র নামো।"

খোঁড়া বলিল, "কাজী সাহেবের চাবুক খাইবার ইচ্ছা না থাকে ত শীঘ্র নামিয়া যাও। পরের ঘোড়া নিজের বলিয়া দাবী করিতেছ, বেহায়া আমি, না তুমি? কে মিথ্যাবাদী, ঘোড়া কাহার, কাজী সাহেবের বিচারে তাহা স্থির হইবে। চল কাজী সাহেবের আস্তানায়। সেখানে

কোঁড়া খাইবার জন্য তোমার পিট সুড়্‌সুড়্‌ করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। কাজী সাহেব ঠিক বিচার করিবেন, চল। সোজা রীতের মানুষ নও তুমি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।”

সম্রাট্ খোঁড়ার সঙ্গে আর অধিক তর্ক-বিতর্ক না করিয়া তাহাকে লইয়া গ্রামপ্রান্তে কাজী সাহাবের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, কাজীকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই খোঁড়া কাজীকে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে বলিল, “খোদাবন্দ, আমি খোঁড়া মানুষ, আমার ঘোড়ায় চড়িয়া এই গ্রামে আসিতেছিলাম, পথের মধ্যে এই মুসাফিরের সঙ্গে আমার দেখা, লোকটি আমাকে বলিল, বহুদূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় আর চলিতে পারিতেছে না, যদি আমি উহাকে আমার ঘোড়ায় তুলিয়া লই, তাহা হইলে উহার অত্যন্ত উপকার হয়। উহার উপকার করিতে আমার আপত্তি ছিল না; বিশেষতঃ, উভয়ে একই গ্রামে আসিব কি না, ইহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই ভাবিয়া উহাকে আমার ঘোড়ায় উঠাইয়া আমার সম্মুখে বসাইয়া লইলাম। এই গ্রামে প্রবেশ করিয়া আমি উহাকে ঘোড়া হইতে নামিতে বলিলে, ধূর্ত্ত ঘোড়া হইতে নামিল না; অধিকন্তু বলিয়া বসিল, এ ঘোড়া উহার, আমাকে দয়া করিয়া উহার ঘোড়ার পিঠে আশ্রয় দিয়াছে! আমি নিরুপায় হইয়া সুবিচারের আশায় হুজুরের দৌলতখানায় আসিয়াছি। খোদাবন্দ সুবিচার করিয়া আমার ঘোড়া আমাকে দেওয়ার হুকুম দান করুন; আর এই মিথ্যাবাদী ধূর্ত্ত প্রতারককে শাস্তি দিয়া ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করুন। হুজুর বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন, আমি খোঁড়া মানুষ, ঘোড়ায় না চড়িয়া আমার কি গ্রামান্তরে আসিবার সাধ্য হইত? আর ঐ ধূর্ত্ত প্রতারক জোয়ান মরদ, অনায়াসেই এতদূর হাঁটিয়া আসিতে পারিত, এবং হাঁটিয়াই আসিতেছিল, কিন্তু পথের মধ্যে কি জন্য আমার ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইয়াছিল, তাহা হুজুর বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিতেছেন।”

কাজী সাহেব খোঁড়ার অভিযোগ শুনিয়া ছদ্মবেশী সম্রাট্‌কে বলিলেন, “এই ফরিয়াদীর অভিযোগ কি সত্য? তোমার কি জবাব?”

যাহা প্রকৃত ঘটনা, সম্রাট্ তাহা সমস্তই কাজীর গোচর করিলেন; এবং তিনি এ কথাও জানাইলেন যে, তিনি কাজী সাহেবের বিচার-দক্ষতার প্রশংসা শুনিয়া, কি ভাবে তিনি বিচার করেন, তাহাই দেখিবার জন্য বহু দূর হইতে সেই গ্রামে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এই বিভ্রাট। ঘোড়াটি তাঁহার নিজের এবং তিনি সর্ব্বদাই তাহার তত্ত্বাবধান করেন। তিনি সুবিচারপ্রার্থী। বলা বাহুল্য, সম্রাট্ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিলেন।

কাজীর প্রশ্নে খোঁড়া জানাইল, ঘোড়াটি তাহার নিজের, ইহার কোনও সাক্ষী বা প্রমাণ উপস্থিত করা তাহার অসাধ্য। সম্রাট্‌ও সেইরূপ অক্ষমতা জানাইলেন।

কাজী সাহেব বলিলেন, “বিচার কাল সকালে হইবে; আজ তোমরা যাইতে পার।”

খোঁড়া বলিল, “আমার চলিবার শক্তি নাই। কোথায় যাইব?”

কাজী বলিলেন, “নিকটেই মোসাফিরখানা আছে, সেখানে রাত্রিতে বাস করিতে পার। মামলার বিচার করিতে সময়ের প্রয়োজন; তোমার গরজে এক লহমায় বিচার শেষ হইবে না।”

সম্রাট্ ও খোঁড়া উভয়েই প্রস্থানোদ্যত, সেই সময় আর দুই মূর্ত্তি সেই স্থানে উপস্থিত। একটা টাকার তোড়ার এক মুড়া ধরিয়াছিল এক জন জোলা, অন্য মুড়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল এক জন খুলু।

জোলা বস্ত্রশিল্পী, ইহারা মোটা সুতায় ধুতি, সাড়ী, গামছা প্রভৃতি বয়ন করে। খুলুরা কাঠের ঘানীতে সর্ষপ, মসিনা প্রভৃতির তৈল নিষ্কাশন করে; উভয়েই মুসলমান সমাজের নিম্নস্তরের লোক।

খুলু বলিল, “হুজুর কাজী সাহেব, এই জোলা মিঞা আমার দোকানে তেল কিনিতে আসিয়াছিলেন, উঁহার সঙ্গে একটি ছেলে ছিল। আমি উঁহার ভাঁড়ে এক সের তেল ওজন করিয়া দিলে, ছেলেটি তেল লইয়া চলিয়া গেল। উনি একটি টাকা বাহির করিয়া তেলের দাম বাদ বাকী পয়সা চাহিলে, আমি আমার তেল-বিক্রীর তহবিলের টাকার তোড়া বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিলাম, তাহার পর তাহা হইতে সিকি, দুয়ানী বাহির করিয়া গণিতেছি, উনি থাবা দিয়া আমার তোড়া তুলিয়া লইলেন; তাহার পর তোড়াটি লইয়া সরিয়া পড়েন দেখিয়া, আমি তোড়াটা চাপিয়া

ধরিলাম। উনি তাহার অন্য মুড়া ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় জোলা মহাশয়কে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া হুজুরে হাজির করিয়াছি। আমার টাকার তোড়াটি আমাকে ফেরত দিয়া এই বাটপাড় জোলাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে আদেশ হউক। আমি সুবিচারের প্রার্থনা করি।"

কাজী বলিলেন, "ওহে কারিকর! তুমি এই খুলুর টাকার তোড়া রাহাজানী করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলে? উহার এজ্‌হার সত্য?"

জোলা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না খোদাবন্দ, উহার কথার এক কড়াও সত্য নয়। আগাগোড়া ধাপ্পা-বাজি! আমি হাটে কাপড় বিক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম, ঘরে এক ফোঁটাও তেল নাই, তেলের অভাবে পাক-শাক বন্ধ। আমি ছেলেটাকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি খুলু-বাড়ী তেল আনিতে চলিলাম। হাটে কাপড়-চোপড় বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা আমার তোড়া-তেই ছিল, তাড়াতাড়িতে তোড়াটা বাক্সে তোলা হয় নাই, সঙ্গেই রহিয়া গেল। খুলুর কাছে এক সের তেল কিনিয়া, ছেলেটার হাতে দিয়া তেলের ভাঁড় তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠাইলাম। তাহার পর টাকার তোড়া হইতে তেলের দাম বাহির করিতেছি, হঠাৎ জোচ্চোর খুলু ছোঁ মারিয়া আমার হাত হইতে তোড়াটা ছিনাইয়া লইল! আমি তৎক্ষণাৎ তোড়া চাপিয়া ধরিলাম; এই বদ্‌মায়েসও অন্য মুড়া ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। এই অবস্থায় উহাকে হুজুরের দরবারে ধরিয়া আনিয়াছি। সুবিচার করিয়া আমার তোড়া ফেরত দিতে আজ্ঞা হয়; আর এই প্রতারক খুলুর উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।"

কাজী বলিলেন, "তোড়ায় কত টাকা আছে?"

খুলু ও জোলা কেহই টাকার সংখ্যা বলিতে পারিল না; উভয়েই বলিল, তাহারা মাল বিক্রয় করিয়া ক্রেতার নিকট যখন যাহা পাইয়াছিল, তোড়ায় রাখিয়াছিল; কত টাকা জমিয়াছিল, গণিয়া দেখে নাই।

কাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তোড়া লইয়া যে সময় তোমরা উভয়ে টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিলে, সেই সময় কেহ সেখানে উপস্থিত ছিল?"

খুলু ও জোলা উভয়েই জানাইল, সে সময় কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না।

কাজী বলিলেন, "তোমরা উভয়েই তোড়ার মালিক বলিয়া দাবী করিতেছ, কিন্তু নিজের অনুকূলে কেহই প্রমাণ দিতে পারিতেছ না; উত্তম, তোড়াটা আজ আমার কাছে রাখিয়া যাও, কাল সকালে বিচার হইবে।"

কাজী সাহেব বিচারপ্রার্থী চারি জনকেই বিদায় দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন; বেলা তখন অবসানপ্রায়। সহসা পথের দিকে অস্ফুট কোলাহল শুনিয়া সকলেই সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

অল্পকাল পরে একটি সুন্দরী যুবতীর দুই হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে আর দুই জন মিঞার আবির্ভাব! ইহাদের এক জন সন্নিহিত কোন নগরের মৌলবী সাহেব, দ্বিতীয় ব্যক্তি মৌলবী সাহেবের প্রতিবেশী; সে প্রতিষ্ঠাপন্ন খলিফা, অর্থাৎ দরজী। এই খলিফা ধনাঢ্য ওমরাহ ও দরবারীদের পোষাক-পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিত। মৌলবী সাহেবেরও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। এ-কালের মৌলবী হইলে তিনি খাঁ বাহাদুর বা সামসুল-উলেমা প্রভৃতি খেতাব লাভ করিয়া একটা মিনিষ্টার-টিনিষ্টার কিছু হইতে পারিতেন। রাজদ্বারে তাঁহার সম্মান-প্রতিপত্তির অভাব ছিল না।

খলিফা কাজী সাহেবকে কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "খোদা-বন্দ, এই আউরাৎ আমার বিবি। এই মৌলবী তাঁহার ব্যবহারের জন্য আমাকে আচ্‌কান, চাপকান ও ইজের বানাইতে দিয়াছিলেন, দুই এক দিন বিলম্ব হওয়ায় আজ আমার ঘরে তাগিদ দিতে আসিয়াছিলেন; সেই সময় আমার এই বিবিকে পর্দ্দার আড়াল হইতে উঁকি মারিতে দেখিয়া, উহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, উহার হাত ধরিয়া উনি টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন; কিন্তু ও আমার জান্, আমার কলিজা, উহাকে কি করিয়া ছাড়িয়া দিই? আমি উহার অন্য হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই লোভী মৌলবী আমার বিবিকে ছাড়িতে চাহে না, নিজের স্ত্রী বলিয়া দাবী করে। এই জন্য উহাদের দুই জনকে হুজুরের দরবারে লইয়া আসিয়াছি। আমার সম্পত্তিতে আমি দখল চাই; আর এই লোভী, লম্পট মৌলবীটার আপনি যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করুন, মেহেরবান! এই বদ্‌মাস্ ভবিষ্যতে যেন পরস্ত্রীর প্রতি লোভ না করে।"

কাজী বলিলেন, "আপনার কি বলিবার আছে মৌলবী সাহেব ? আপনি কি সত্যই খলিফার বিবিকে তাহার দখল হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছিলেন ? আপনার কি বিবি নাই ?"

মৌলবী সাহেব বলিলেন, "আছেই ত ; ঐ আউরাৎ আমারই বিবি। আমার এই বিবি হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া যখন খলিফার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় এই বদমায়েস খলিফা পথে আসিয়া উহার হাত ধরে, এবং বাড়ীর ভিতর টানিয়া লইয়া যায়। আমি খবর পাইয়া স্বয়ং সেখানে দৌড়িয়া যাই, এবং উহাকে বদ্‌মাস খলিফার কবল হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করি ; কিন্তু খলিফা আমাকে আমোল না দিয়া বলে—এই আউরাৎ উহারই বিবি ! এই জন্য উহাদের উভয়কে আপনার দরবারে হাজির করিয়াছি। আপনি সুবিচার করিয়া আমার স্ত্রীকে আমার হস্তে অর্পণ করুন, আর এই ধূর্ত্ত নারীচোরের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের বিধান করুন। আপনার সুবিচারের খ্যাতি ভুবন-বিদিত।"

কাজী বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন, এই আউরাৎ আপনারই বিবি ; লেকেন ও কি আপনাকে খসম্‌ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ?"

খলিফা উৎসাহভরে বলিল, "বহুৎ উম্‌দা বাৎ খোদাবন্দ ! যদি এই আউরাৎ বলে—ঐ মৌলবী উহার খসম্‌, তাহা হইলে আমি আমার বিবির উপর দাবী ছাড়িয়া দিব, এবং হুজুর যে সাজা দিবেন, তাহাই পিঠ পাতিয়া লইব। আমার বিবি পরপুরুষকে তাহার খসম্‌ বলিয়া স্বীকার করিবে ? আল্লা ! সে রকম বেইমান স্ত্রীর মুখ দেখিতে চাহি না। খোদা মালুম !"

কাজী সাহেব যুবতীকে বলিলেন, "কে তোমার খসম্‌, এই খলিফা, না, ঐ মৌলবী সাহেব ? তুমি তোমার খসমের সঙ্গে নির্ভয়ে ঘরে যাইতে পার। যে মিথ্যাকথা বলিয়া তোমাকে দখল করিবার জন্য দাবী করিতেছে, তাহাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে।"

কাজীর আদেশ শুনিয়াও যুবতী কথা কহিল না, কে তাহার স্বামী, কাজী সাহেবকে তাহা বুঝিতে দিল না ; অবনত-নেত্রে মাটীর দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন কাঠের পুতুল !

কাজী সাহেব বিরক্তিভরে কঠোর স্বরে বলিলেন, "কে তোমার স্বামী ? কেন কথা বলিতেছ না ?"

তথাপি যুবতী নিরুত্তর, যেন তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছিল। সে মুখ তুলিয়া কাহারও দিকে চাহিল না।

কাজী সাহেব মৌলবীকে ও খলিফাকে বলিলেন, "আজ তোমরা যাও, এই আউরাৎ আজ রাত্রিতে আমার অন্দরে বাস করিবে। কাল সকালে আমি এই মামলার রায় দিব। ইহাকে ইহার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিব, এবং প্রকৃত অপ-রাধী কঠোর শাস্তি পাইবে।"

কাজী সাহেব ঘোড়াটা তাঁহার আস্তাবলে, এবং টাকার তোড়া ও যুবতীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। যুবতী ইহাতে আপত্তি করিল না।

বিচারপ্রার্থীরা প্রস্থান করিলে, কাজী সাহেব অপ-রাহ্নের উপাসনা শেষ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন; পরে তিনি যুবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি এখন বাহিরে যাইব ; অন্দরে আমার যে দপ্তরখানা আছে, সেই কামরায় আমার খাতা, চিঠিপত্র, কেতাবগুলি, দোয়াত, কলম ফরাসের উপর এলোমেলো হইয়া পড়িয়া আছে, সেগুলি তুমি বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে গুছাইয়া রাখিবে। কোন গাফিলী না হয়। আমার কথা সম্‌ঝাইতে পারিয়াছ ?"

যুবতী নির্ব্বাক্‌ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে তাঁহার আদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে। কাজী সাহেব সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া, তাঁহার দপ্তরখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার আদেশ পালিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টাকার তোড়াটি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু কি ভাবে তাহা তিনি পরীক্ষা করিলেন, এবং পরীক্ষায় কি ফললাভ করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না !

পরদিন প্রভাতে তিনটি সঙ্গীন্‌ মামলার বিচার ! সাক্ষী নাই, প্রমাণ নাই, অথচ কাজী সাহেবকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে। প্রকৃত মালিককে তাহার দাবীর জিনিষ অর্পণ করিয়া, অপরাধীকে শাস্তি দিতে হইবে। সকলেই গভীর আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় রাত্রি অতিবাহিত করিল। তিনটি মামলাই সমান জটিল, সমস্যা দুরূহ !

পরদিন প্রভাতে কাজী সাহেব বিচারাসনে উপবেশন করিলে, ছদ্মবেশী সম্রাট ও খোঁড়া বিচারফল জানিবার জন্য

তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। কাজী সম্রাটের ঘোড়া তাঁহার অট্টালিকা-সংলগ্ন আস্তাবলে রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াই প্রথমে ঘোড়ার দাবী করিয়াছিল, এ জন্য কাজী সাহেব খোঁড়ার হাত ধরিয়া আস্তাবলে প্রবেশ করিলেন; কয়েক জন প্রহরী তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া কাজী সাহেব খোঁড়াকে বলিলেন, "তুমি এই ঘোড়ার মালিক বলিয়া দাবী করিয়াছ। উহার পিঠে চড়।"

খোঁড়া বলিল, "আমি খোঁড়া মানুষ, ঘোড়ার পাশে টুল রাখিয়া তাহার সাহায্যে ঘোড়ায় চড়ি। বিনা অবলম্বনে সোয়ার হইতে পারিব না, খোদাবন্দ! আমার এক পা জখম!"

কাজী সাহেবের ইঙ্গিতে এক জন প্রহরী একখানি টুল আনিয়া ঘোড়ার পার্শ্বে স্থাপিত করিল। খোঁড়া সেই টুলে উঠিয়া ঘোড়ায় চড়িতে উদ্যত হইল। কিন্তু বাদশাহের ঘোড়া, ঐরূপ আরোহী পিঠে লইতে সে অভ্যস্ত ছিল না; তাহার উপর টুলের আবির্ভাবে সে ভড়কাইয়া গেল, কোন-মতেই খোঁড়াকে পিঠে লইল না। খোঁড়া আত্মসমর্থনের জন্য বলিল, "নূতন যায়গায় আসিয়া ঘোড়াটা তরাসে হইয়া গিয়াছে, এ জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে না।"

খোঁড়া টুল হইতে নামিয়া ভয়ে ভয়ে ঘোড়ার গলায়, কপালে, পিঠে হাত বুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘোড়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গা ঝাড়িল, এবং দাঁত বাহির করিয়া খোঁড়াকে দংশনোদ্যত হইল।

"ঘোড়ার মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে"—বলিয়া খোঁড়া সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। কাজী সাহেব খোঁড়াকে এক জন প্রহরীর জিম্মায় আস্তাবলের বাহিরে পাঠাইয়া, ঘোড়ার অন্য দাবীদার ছদ্মবেশী সম্রাট্‌কে আস্তাবলে আহ্বান করিলেন, এবং ঘোড়ায় চড়িতে আদেশ করিলেন।

সম্রাট্ ঘোড়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ঘোড়া তাঁহার দেহের ঘ্রাণ পাইয়া উল্লাসে 'চিঁহি' শব্দে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিল। সম্রাট্ আদর করিয়া তাহার গলায় ও কপালে হাত বুলাইলে সে তাঁহার বাহুমূলে মাথা ঘষিল। সম্রাট্ তাহার বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিলেন। তখন ঘোড়া তাঁহাকে লইয়া আস্তাবলের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

কাজী সাহেব সম্রাট্ সহ আস্তাবলের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এই ভদ্রলোকই ঘোড়ার মালিক, খোঁড়াটা প্রতারক। প্রহরী, ও খোঁড়াকে টিক্‌টিকিতে বাঁধিয়া লাগাও পঁচিশ কোঁড়া!"

খোঁড়াকে টিক্‌টিকিতে ফেলিয়া, তাহার হাত-পা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর তাহার পিঠে, হাতে, পায়ে শপাশপ্ বেত চলিল। খোঁড়া প্রহার-যন্ত্রণায় আর্ত্ত-নাদ করিয়া বলিল, "কসুর মাফ করুন, কাজী সাহেব, আপনি যথার্থ বিচার করিয়াছেন। ঘোড়া ঐ মিঞা সাহেবের। লোভে পড়িয়া ঘোড়ার দাবী করিয়াছিলাম।"

সম্রাট্ রাজ-পরিচ্ছদের আবরণ-বস্ত্র ও ঝুটা দাড়ি-গোঁফ অপসারিত করিলে কাজী সাহেব তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইলেন, এবং নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "কসুর মাফ করিতে আজ্ঞা হয়, জাঁহাপনা! সম্রাট্‌কে আমি চিনিতে পারি নাই।"

সম্রাট্ কাজী সাহেবের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "তোমার মত বিচারক আমার সাম্রাজ্যের গৌরব। তোমার কোন কসুর হয় নাই, তুমি ন্যায়বিচারই করিয়াছ। আমি ছদ্মবেশে তোমার বিচারকার্য্য পরীক্ষা করিতে আসিয়া-ছিলাম। একটি বিচারে তোমার দক্ষতার পরিচয় পাইলাম, অন্য দুইটি বিচার শেষ কর। বিচার-ফল জানিবার জন্য আমারও কৌতূহল হইয়াছে।"

কাজী সম্রাটের অভ্যর্থনার পর বলিলেন, "এই প্রতারক খুলুকে দেউড়ীর থামে বাঁধিয়া পনের কোঁড়া লাগাও।"

প্রহারের পূর্ব্বেই খুলু বন্ধন-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "দোহাই হুজুর, আমি নিরপরাধ, অবিচারে আমাকে সাজা দেওয়া হইতেছে; ঐ তোড়া সত্যই আমার। অপরাধ ঐ জোলার। জোচ্চোর জোলা আমাকে ঠকাইয়া—"

বাধা দিয়া কাজী বলিলেন, "শাস্তির ভয়ে আবার মিথ্যা কথা? এজন্য আরও পাঁচ কোঁড়া বেশী। লাগাও বিশ কোঁড়া।"

সম্রাট্ বলিলেন, "কোন্ প্রমাণে এই খুলুকে অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছ?"

কাজী বলিলেন, "জাঁহাপনার বোধ হয় অজ্ঞাত নহে যে, জোলারাই কাপড় বুনিবার সূতায় তেল লাগিবার ভয়ে সতর্কভাবে তেল ব্যবহার করে, অনেকে তেল মাখে

না। এই জোলার রুক্ষ কেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—এই ব্যক্তি তেল ব্যবহার করে না; কিন্তু খুলুরা ঘানীতে তৈল প্রস্তুত করে, ভাঁড়ে চোঙায় সর্ব্বদা তেল ব্যবহার ও বিক্রয় করে। উহারা তৈল বিক্রয় করিতে করিতে ক্রেতার নিকট যে টাকা-পয়সা গ্রহণ করে, তাহাতে তেল লাগিয়া যায়। এই খুলু বলিয়াছে, সে জোলাকে তেল বিক্রয় করিয়া, তোড়া খুলিয়া টাকার ভাঙ্গানী দিতেছিল; সুতরাং তাহার তৈলাক্ত হাতের তেল তোড়ায় লাগিবারই কথা। কিন্তু আমি তোড়ার টাকা, সিকি, দুয়ানী, পয়সা প্রত্যেকটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, প্রত্যেকটি তৈলসংস্পর্শহীন। তাহার পর ঐ তোড়া এক গামলা জলে ফেলিয়া রগড়াইয়া দেখিয়াছি, গামলার জলে তেলের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করি নাই। এই জন্য আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি—এই তোড়ার মালিক জোলা, খুলুই প্রতারক; তাহার অভিযোগ মিথ্যা। সে দণ্ডলাভের যোগ্য।"

সম্রাট্ এই বিচারে প্রীতিলাভ করিয়া বলিলেন, "এই যুবতী কাহার স্ত্রী? খালিফার, না মৌলবীর? যুবতী কি একরার করিয়াছে?"

কাজী বলিলেন, "না, উহার মুখ হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারি নাই; কিন্তু উহার কার্য্যেই আমার সমস্যার সমাধান হইয়াছে, খোদাবন্দ! উহার স্বামী কে, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য আমি আমার দপ্তরখানার কাগজপত্র, কেতাব, নথির তাড়া, দোয়াত, কলম সমস্তই সেই কক্ষের চারিদিকে এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া রাখিয়া, উহাকে সেগুলি গুছাইয়া রাখিতে আদেশ করিয়া কাল সন্ধ্যার পর বাহিরে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি—এই যুবতী প্রত্যেক দ্রব্য এরূপ নিপুণভাবে ও সুশৃঙ্খলরূপে আমার দপ্তরখানায় সাজাইয়া রাখিয়াছিল যে, আমি বুঝিতে পারিলাম, এই কার্য্যে সে অভ্যস্তা। যদি সে মৌলবীর স্ত্রী না হইয়া খলিফার স্ত্রী হইত, তাহা হইলে দপ্তর সম্বন্ধে সে এরূপ সুরুচি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারিত না। তথাপি সে মৌলবীর স্ত্রী কি খলিফার পত্নী, এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার কারণ, আমার বিশ্বাস, এই খলিফার সহিত উহার আসনাই আছে। সম্ভবতঃ মৌলবী খলিফার বাড়ী পোষাকের জন্য তাগিদ দিতে গিয়া হঠাৎ তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়াছিল; তাহার পর উভয়ে যুবতীকে ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করে, এবং বিচারের জন্য এখানে লইয়া আসে। যদি আমি উহাকে খলিফার স্ত্রী বলিয়া রায় প্রকাশ করিতাম, এবং খলিফার হস্তে উহাকে অর্পণ করিতাম, তাহা হইলেও তাহাতে উহার আপত্তি ছিল না বলিয়াই এই নারী আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিল। খলিফাকে তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি না দিলে আমার কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিবে।"

কাজী সাহেব খলিফাকে টিকটিকিতে বাঁধিয়া কুড়ি কোঁড়ার আদেশ প্রদান করিলেন। বেত খাইয়া খলিফা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং বাদশাহের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, কাজী সাহেব যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য। মৌলবীর হস্তে তাহার স্ত্রীকে অর্পণ করা হইলে সে তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। সম্রাট্ কাজীর বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিয়া অশ্বারোহণে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

রজনীবাবুর গল্প শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ-কালের কাজীর বিচার কি প্রকার?"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাহা ত নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছ; তথাপি একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গোদাবরী-তীরেই বল, আর আমাদের পদ্মাতীরেই বল, এক বিজন অরণ্যে একটি বৃহৎ শাল্মলীতরু ছিল। 'অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলী-তরুঃ;' মনে পড়ে কি? সেই শাল্মলী-তরুতে এক পেচক-দম্পতি সুখে বাস করিত। সেই শাল্মলী-তরুর অদূরে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষ ছিল; তাহার শত শাখা-প্রশাখা বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, এবং সেই সকল শাখায় শতাধিক বায়স বাস করিত, সেই সকল দাঁড়কাকের যে দলপতি, শাল্মলী-তরু-শাখাবাসিনী পেচক-পত্নীর প্রতি তাহার লোভ হওয়ায়, সে সদলে পেচককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার পত্নীকে হরণ করিল, তাহাকে লুঠিয়া আনিয়া তাহাদের আশ্রয়-তরু সেই অশ্বত্থ-বৃক্ষের একটি কোটরে লুকাইয়া রাখিল।

পত্নীহারা পেচক বিরহ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল, এবং পত্নীর উদ্ধারের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া এ কালের কাজীর নিকট পত্নীচোর কাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কাজী একদল সাক্ষীর

উপর শমন জারী করিলেন। সেই অরণ্যে অন্য সাক্ষী আর কাহাকে পাওয়া যাইবে? অশ্বত্থ-বৃক্ষবাসী শত শত কাক সাক্ষীর সমন পাইয়া কাজীর এজলাসে সাক্ষ্য দিতে আসিল। আসামী কাক এবং ফরিয়াদী প্যাঁচা কাজীর এজলাসে হাজির হইল।

সাক্ষী কাকের দল একবাক্যে প্রতিপন্ন করিল, আসামী কাক পেচক-পত্নীকে হরণ করিয়াছে—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। পেচক চিরকুমার, তাহার পত্নী-টত্নী ছিল না; সে শাল্মলী-তরুতে চিরদিনই একাকী বাস করিত। অশ্বত্থ-বৃক্ষের কোটরে যে পেচকী বাস করিতেছে, সে আসামী বায়সের ধর্ম্ম-পত্নী। সাক্ষীরা চিরদিন পেচকীকে আসামীর সহিত সেই অশ্বত্থ-বৃক্ষে পরম সুখে বসবাস করিতে দেখিতেছে। একচক্ষু নামক একটি বিজ্ঞ বৃদ্ধ দাঁড়কাক হলপান জবানবন্দী দিল, আসামীর সহিত পেচকীর বিবাহে সে মন্ত্রপাঠ করিয়াছিল। ফরিয়াদী পেচক আসামীর ধর্ম্মপত্নীকে লাভ করিবার জন্য এই মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিয়াছে। কাজী এতগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ না পাইয়া বিরহ-কাতর পেচকের মামলা ডিস্‌মিস্ করিলেন। পেচকী কাকের পত্নী বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইল। সকলে বলিল, এ কাজী দ্বিতীয় দানিয়াল।

কাজীর বিচারফল দেখিয়া এবং পত্নীর উদ্ধারসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া, পেচক মনের দুঃখে সেই শাল্মলীতরুর শাখায় বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, বিরহ-বেদনায় তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইল।

কয়েক দিন পরে কাজী সাহেব ব্যাঘ্র-শিকার উপলক্ষে সদলে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ব্যাঘ্রের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্ত শাল্মলী-বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। কাজী সাহেবকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া অদূরবর্ত্তী অশ্বত্থবৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট ধূর্ত্ত কাক অনুমান করিল, কাজী সাহেব ত স্বয়ং এখানে উপস্থিত, পেচককে ঐ ভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া, যদি উঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হয়, তাহা হইলে হয় ত উনি মামলার রায় উল্টাইয়া পেচকীকে পেচকের হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ দিবেন, তাহাতে বায়স-সমাজে আমাকে ভয়ঙ্কর অপদস্থ হইতে হইবে, অপমানেরও সীমা থাকিবে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া কাকও উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। উভয়ের রোদনধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া কাজী সাহেব প্রথমে পেচককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেচক, তোমার রোদনের কারণ কি?"

পেচক পদযোড়ে বলিল, "হুজুর, আপনার বিচার-মহিমা স্মরণ করিয়া রোদন সংবরণ করা আমার অসাধ্য হইয়াছে। কতকগুলা কাকের মিথ্যা সাক্ষ্যে নির্ভর করিয়া আমার সত্য মামলা ডিস্‌মিস্ করিলেন; একবারও বিবেচনা করিলেন না যে, পেচকী পেচকের পত্নী না হইয়া কিরূপে কাকের পত্নী হইতে পারে? কাক এক জাতীয় বিহঙ্গ, পেচক অন্য জাতীয়, কাকের সহিত কি পেচকীর বিবাহ হইতে পারে? কিন্তু সাক্ষীদের জবানবন্দী মিলিয়া গিয়াছে, এই জন্য কি সম্ভব, কি অসম্ভব—তাহা বিবেচনা না করিয়া কেবল সাক্ষ্য-প্রমাণে নির্ভর করিয়াই, মামলার রায় প্রকাশ করিলেন। ঐ গাছের কাকগুলা তাহাদের দলপতির পক্ষ-সমর্থনের জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, এ কথাটাও আপনার বুঝিবার শক্তি হইল না! দেখিতেছি, আপনি নিতান্ত ঘটিরাম কাজী—এই দুঃখেই কাঁদিতেছি।"

কাজী সাহেব অনন্তর কাককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বায়সবর, তোমার রোদনের কারণ কি?"

কাক তাহার কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল, "হুজুর ধর্ম্মাবতার, আপনি আমার স্বজাতীয় বিহঙ্গ-দলের সাক্ষ্যে নির্ভর করিয়া আমাকে মামলায় জিতাইয়া দিয়াছেন। আমার আশঙ্কা ছিল, পেচকী কিরূপে কাকের স্ত্রী হইতে পারে?—এই প্রশ্ন আপনার মনে উদিত হইলে মামলায় জয়লাভ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব, সঙ্গত-অসঙ্গত, এ সকল চিন্তা মনে স্থান না দিয়া আমার সাক্ষীদের জবানবন্দীতেই খুসী হইয়া মামলা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন। আপনার অভাব হইলে আপনার মত বুদ্ধিমান্ ডিস্‌মিসের কাজী আর কোথায় পাইব—এই কথা চিন্তা করিয়াই রোদন করিতেছি।"

"এ কালেও কাজীর অভাব নাই, এবং তাঁহাদের বিচার-প্রণালী এইরূপ অনিন্দ্যসুন্দর।"—এই কথা বলিয়া রজনীকান্ত পুনর্ব্বার গড়গড়ায় মনঃসংযোগ করিলেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

২৫

সকালবেলা পাহাড়ে অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া আসিয়া তুলাকা ও গারা দেখিলেন, কুশানের এক ভৃত্য একটি ছোট বাক্স হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাক্সের উপর চমৎকার কারুকার্য্য। ভৃত্য গারার হাতে পত্র দিল। গারা খুলিয়া পড়িলেন, কুশান লিখিয়াছে, এই বাক্স আর চারিটি চর্ম্ম পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

বাক্স রাখিয়া ভৃত্য চলিয়া যায়, গারা তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলেন। বাক্স খুলিয়া দেখিলেন, কুশানের বাড়ীতে কাচের আলমারিতে তাঁহারা যে সকল লোমশ চর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, তাহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চারিটি কুশান পাঠাইয়া দিয়াছে। প্রত্যেক চর্ম্মে একখণ্ড কাগজ আঁটা, তাহাতে নাম লেখা।

তুলাকা বলিলেন, এ যে বহুমূল্য সামগ্রী, আমাদের কি গ্রহণ করা উচিত?

লুলু বলিল, না করিলে কুশানকে অপমান করা হয়।

তুলাকা ও গারা একবার লুলুর মুখ দেখিলেন, তাহার পর গারা পত্রের উত্তর দিয়া ভৃত্যকে বিদায় করিলেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চর্ম্মে লুলুর নাম। তমদার নাম যাহাতে লেখা ছিল, সেখানাও বহুমূল্য। সে বলিল, আমি কোন্ হিসাবে এমন দামী জিনিষ পাই?

লুলু বলিল, যে হিসাবে আমরা পেয়েছি। আমরা যেমন, তুমিও তেমনই।

বাক্স কে পাইবে? সকলে স্থির করিলেন, সেটা লুলুর প্রাপ্য, লুলুর ওজর-আপত্তি কেহ শুনিল না।

বৈকালে তুষারমণ্ডিত হ্রদের তীরে কুশানের সঙ্গে সকলের দেখা হইল। গারা বলিলেন, আপনার উপহার পেয়ে আমরা অভিভূত হয়েছি।

কুশান বলিল, আমাকে এত লোকের সাক্ষাতে লজ্জা দেবেন না। আপনারা আমার জিনিষ নিয়েছেন, তাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আর আমাকে যদি এত দূরে না রেখে একটু নিকটে স্থান দেন, তা হ'লে আমি কৃতজ্ঞ হই। আমি ত একটা মাতব্বর লোক নই, লুলু যেমন আপনাদের স্নেহের পাত্রী, আমাকেও সেই চোখে দেখ্‌বেন।

গারা বলিলেন, লুলু, কি বল?

লুলু মাথা নাড়া দিয়া বলিল, আমি আবার কি বল্‌ব? তোমাদের হচ্ছে কথা, মাঝখান থেকে আমাকে নিয়ে টান কেন?

তুলাকা বলিলেন, লুলুর কোন মতামত নেই, আমাদেরও কোন আপত্তি নেই। এখন থেকে আর তোমাকে আপনি বল্‌ব না, তুমিও আমাদের আপনার লোকের মতন হ'লে।

কুশান আনন্দিত হইয়া বলিল, আজ থেকে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা কর্‌ব।

লুলু এখন বিনা সাহায্যেই পায়ে চাকা বাঁধিয়া বরফের উপর ঘুরিয়া বেড়াইত। লুলু ও কুশান পাশাপাশি ঘুরিতে লাগিল।

কুশান বলিল, আমাদের অনেক কথা এখনও বাকি আছে।

লুলু কহিল, তোমার যখন ইচ্ছা হয় বলো।

—আমার ইচ্ছে আমি সর্ব্বক্ষণ বলি।

—কে তোমাকে বল্‌তে বারণ করে?

কুশান লুলুর হাত ধরিল। লুলু কুশানের অঙ্গুলি ঈষৎ চাপিল। দুই জনে বার বার পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিল, চোখে চোখে যত কথা হইল, মুখে তত নয়। লুলুর হৃদয়ের ভাব তাহার নয়নে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

বরফের উপর ঘোরা শেষ হইলে কুশান বলিল, কাল সকালবেলা আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?

—যাব।

সকাল বেলা গারারা সকলে ভ্রমণে বাহির হইতেছেন, এমন সময় কুশান আসিয়া জুটিল। গারা বলিলেন, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। চল, সকলে একসঙ্গে যাওয়া যাক্।

পথে যাইতে হয় আর সকলে কিছু পিছাইরা পড়িল কিম্বা লুলু ও কুশান কিছু এগাইয়া গেল। পাহাড়ের পথ উঁচু-নীচু, বাঁকাচোরা, একটা বাঁক ফিরিলেই পিছনে আর কিছু দেখা যায় না। যে পথ দিয়া লুলু ও কুশান যাইতেছিল, অনেকেই সেই পথে চলাফেরা করে। এক স্থানে গিয়া পথের পাশ দিয়া আর একটা সঙ্কীর্ণ পথ উপরদিকে চলিয়া

গিয়াছে। কুশান কহিল, চল, আমরা এই পথ দিয়ে উপরে উঠি।

লুলু কহিল, "ওরা বোধ হয় উঠ্‌তে পারবেন না, আমাদের দেখ্‌তে না পেয়ে খুঁজবেন।

কুশান কহিল, আমরা ত আর হারিয়ে যাব না, একটু পরে ফিরে আস্‌ব।

সেই পথে দুই জনে চলিল। স্থানে স্থানে পথ দুরারোহ, চিক্কণ উপলখণ্ডে পা হড়কাইবার আশঙ্কা। এক একবার কুশান লুলুর হাত ধরিতেছিল, কিন্তু লুলু পাহাড়ে উঠিতে নাচিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, লঘুপদে আরোহণ করিতে লাগিল। উপরে উঠিয়া খানিকটা সমতল স্থান, লুলু চারিদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কি সুন্দর যায়গা!

চারিদিকে সারিবাঁধা মহাতরু, তাহাতে লতাবিতান। তরুমূলে, তরুর অঙ্গে নধর পুরুপুরু মখমলের মত শৈবাল। সম্মুখে নীহারমণ্ডিত শুভ্র গিরিশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে, তাহার উপর প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণরেখা। মুগ্ধ, নিবিড় দৃষ্টিতে লুলু নিসর্গের সেই অপূর্ব্ব গম্ভীর শোভা দেখিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পিছন হইতে এক খণ্ড মেঘ আসিয়া তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিল। আশেপাশে চারিদিকে মেঘ, তাহারা মেঘের মধ্যে দাঁড়াইয়া। ক্রমে মেঘ ঘনীভূত হইল, তাহাদিগকে যেন বাষ্পপাশে জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিল। এমন গাঢ় অন্ধকার যে, গাছপালা কিছুই দেখা যায় না, এমন কি, পরস্পরের মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখের উপর যেন একটা ধূমের মুখস। ললাটে, মুখে স্বেদবিন্দুর ন্যায় বৃষ্টিবিন্দু দেখা দিল। কুশান ও লুলু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া, তথাপি কেহ কাহারও মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের অলস সঞ্চার আরম্ভ হইল। ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক স্ফুরণ নয়, মেঘের প্রান্তভাগে, মেঘের মধ্যে সংসর্পিত বিদ্যুৎরেখা ধীরে দেখা দেয়, ধীরে মিলাইয়া যায়। মেঘগর্জ্জনও শ্রবণবিদারী দুন্দুভিধ্বনির তুল্য নয়, মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় মধুর গম্ভীর।

এত নিকটে বিদ্যুৎ দেখিয়া লুলু কুশানের আরও নিকটে সরিয়া আসিল। কুশান লুলুকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল, কহিল, ভয় নেই, মেঘ এখনই স'রে যাবে।

লুলু উন্নমিত আননে কুশানের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আমি ভয় পাইনি। তোমার কাছে রয়েছি, কিছু হ'লে দু জনেরই হবে।

মেঘাবৃত ছায়ায় উভয়ের ওষ্ঠাধর সংলগ্ন হইল, বক্ষে বক্ষ মিলিল। আজ পর্য্যন্ত কেহ কখন লুলুর মুখচুম্বন করে নাই। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মোহাবিষ্ট হইয়া শিথিল হইল, তাহার মস্তক কুশানের স্কন্ধে নমিত হইল।

মেঘ অপসৃত হইল। লুলু আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কুশান বলিল, আমাদের বিয়ের কথা গারাকে কি আমি বলব?

লুলু চিত্তের চঞ্চলতা সম্বরণ করিয়া কহিল, না, আমি বল্‌ব। আমাদের কিছু দিন অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

কুশান আবেগের সহিত কহিল, কেন? আমাদের এখনই বিবাহ হইতে বাধা কি?

লুলু বলিল, আমার একটু কায আছে, তার পরে হবে।

—তোমার আবার কি কায?—কুশান অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

—এর পর তোমাকে বল্‌ব।

দুই জনে নীচেকার পথে নামিয়া আসিল। কিছু দূর গিয়া আর সকলের সহিত দেখা হইল। গারা বলিলেন, তোমরা কি উপরে উঠেছিলে? এই যে একখানা কালো মেঘ গেল, তার মধ্যে পড়েছিলে না কি?

লুলু বলিল, ঠিক পড়েছিলাম। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মনে হ'ল, গায়ের উপর সাপের মত বিদ্যুৎ বেড়াচ্ছে!

লুলুর কণ্ঠস্বর আর এক রকম, কথার ভাবে একটা অস্থিরতা। আর কেহ বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিল না, কেবল তমলা লুলুর চক্ষুর উজ্জ্বলতা ও তাহার কর্ণমূলের লালিমা লক্ষ্য করিল।

কুশান গারাদের বাড়ী গেল না, নিজের বাড়ীর অভিমুখে ফিরিল। মাটীতে পা পড়িতেছে কি না, অনুভব করিতে পারিতেছিল না। আকাশে বাতাসে যেন বাঁশী বাজিতেছিল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে জলদ-তেতালার তাল রক্ষিত হইতেছিল।

পথে যাইতে একটা পুস্তাকাগার। পাহাড়ে যাঁহারা ভ্রমণ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য অনেক রকম পুস্তক সঞ্চয় করা হইয়াছিল, নানা দেশের সংবাদ

পত্রাদিও আসিত। এত দিন সেখানে যাইবার কথা কুশানের মনে পড়ে নাই, আজ হঠাৎ সেখানে প্রবেশ করিল। দেখিল, একটা লম্বা টেবলের উপর অনেক সংবাদপত্র সাজানো রহিয়াছে, টেবলের চারি পাশে বসিবার চেয়ার।

মধ্যাহ্নে ও মধ্যাহ্নের পর সেখানে লোক হইত, সকাল-বেলা বড় একটা কেহ যাইত না। কুশান দেখিল, এক জন লোক ঘরের কোণে বসিয়া একখানা পুস্তক পড়িতেছে। কুশান বসিয়া কতকগুলা কাগজের তাড়া টানিয়া লইল। সংবাদপত্র সমস্ত নথি করা, পরের পরের তারিখের কাগজ গাঁথা রহিয়াছে। যেখানায় প্রথমে কুশানের নজর পড়িল, সেখানা লুলুর উল্লিখিত দুই সহরের মধ্যে একটা সহরের! নামটা চোখে পড়িতেই কুশান কৌতূহলের সহিত কাগজের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল, মাঝে মাঝে সংবাদের উপর চক্ষু বুলাইয়া গেল। এই রকম করিয়া প্রায় এক মাসের কাগজ উল্টাইতে একেবারে লুলুর ছবি বাহির হইয়া পড়িল। কুশান মুখে অস্ফুট শব্দ করিয়া অবাক্ হইয়া সেই ছবি দেখিতে লাগিল। এই অল্পবয়সে লুলু এমন কি কীর্ত্তি করিয়া থাকিবে—যে কারণে উহার ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়! তাহার পর কুশান পড়িতে আরম্ভ করিল। সকল সংবাদপত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া লুলুর সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত পড়িল। প্রথমে কুশানের মনে একটু আঘাত লাগিল। এইমাত্র লুলু তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছে, অথচ লুলুর পরিচয় সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। দোষ কাহার? লুলু কি নিজের মুখে আত্মযশ ঘোষণা করিবে, বলিবে যে, অসভ্য জাতির কন্যা হইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার নামের ডাকে গগন ফাটে? যাঁহারা লুলুর সঙ্গে আছেন, তাঁহারাই বা ঢাক বাজাইতে গেলেন কেন? ঢাক ত বাজিয়াছিল সর্ব্বত্র, কেবল বনবাসী কুশান শুনিতে পায় নাই। কুশানের মানস চক্ষুর সম্মুখে সমুদায় ঘটনা সমুদিত হইল। অকূল সমুদ্রে পথহারা, দিগ্‌ভ্রান্ত লুলু জাহাজের নাবিকের নয়নগোচর হইয়া কিরূপে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, গারা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, কুশান যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার পর লুলুর কলাবিদ্যা শিক্ষা, তাহার প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ চিত্রপটে চিত্রিত ছবির ন্যায় কুশানের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। কমল-কলিকা প্রভাত-সূর্য্যের করস্পর্শে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, সেইরূপ লুলুর প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। পুস্তকাগারে একা বসিয়া আছে, সে কথা কুশান বিস্মৃত হইল। সে দেখিল, প্রশস্ত রাজপথ, তাহাতে লোকের বিপুল জনতা। আলোকিত সমুজ্জ্বল নাট্যশালা, কোথাও তিলমাত্র স্থান নাই, কেবল দর্শকমণ্ডলীর ঘন-সন্নিবেশ, পংক্তির পর পংক্তি, শ্রেণীর পর শ্রেণী। স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে; সকলেরই দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের অভিমুখে। মঞ্চে দাঁড়াইয়া একেশ্বরী লুলু। নৃত্যে চরণবিন্যাসের কি মনোহর কৌশল, সঙ্গীতে কি অপ্সরা-কণ্ঠ, তানের কি মধুর মূর্চ্ছনা! তাহার পর সহস্র কণ্ঠে সেই উদ্বেলিত, উত্তেজিত অভিনন্দন,— লুলু! লুলু! লুলু!

কুশান স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আসন ত্যাগ করিয়া পুস্তকালয়ের বাহির হইয়া গেল। বাড়ীতে ফিরিয়া সে আর কোন কথা ভাবিতেই পারিল না, বার বার লুলুর বিচিত্র বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। গারা তুলাকা কি মনে করিয়া থাকিবেন? যখন তাঁহারা শুনিবেন, লুলু অনভিজ্ঞ কুশানকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছে, তখনই বা তাঁহারা কি মনে করিবেন? লুলুকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে কথাও কুশানের স্মরণ হইল। ক্রোধে কুশানের চক্ষু অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। যে দুইটা তস্কর ধরা পড়ে, তাহাদের পিছনে কে ছিল? সে কথা ত বিচারের সময় প্রকাশ পায় নাই। লুলুর নির্ভীকতা ও সাহস স্মরণ করিয়া আনন্দে গৌরবে কুশানের বক্ষ স্ফীত হইল! লুলুকে দেখিলে কি মনে হয়, তাহার এমন সাহস আছে?

ও দিকে লুলু বাড়ীতে ফিরিয়া গারাকে নিজের শয়ন-কক্ষে লইয়া গিয়া বলিল, আজ বেড়াবার সময় আমি কুশানকে বিয়ে করতে অঙ্গীকার করেছি। তোমার মত আছে?

গারা লুলুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গালে চুম্বন করিলেন, বলিলেন, এ ত খুব সু-খবর। আমাদের সকলেরই মত আছে। তুলাকার সঙ্গে আমার এই কথাই হচ্ছিল। কুশানের মত সুপাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? আমার

মনের একটা বোঝা নেমে গেল। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন, তোমাদের সুখে রাখুন। তুলাকাকেও বল্‌লে ভাল হয় না ?

—বেশ ত, বল।

তুলাকা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, লুলুকে আলিঙ্গন করিলেন। মুমী শুনিয়া খুব খুসী। তাহার পর একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ের পর আমাকে কি বিদায় ক'রে দেবে ?

লুলু বলিল, তুই আবার কোথায় যাবি ? যেখানে আমি যাব, আমার সঙ্গে যাবি।

সব শেষে লুলু তমলাকে আলাদা ডাকিয়া বলিল। তমলা লুলুর হাত ধরিয়া বলিল, শুনে আমার খুব আহ্লাদ হ'ল, কিন্তু আমি বরাবরই জানি, তোমাদের দুজনের ভালবাসা হবে। চিরকাল সুখে থাক, এই কামনা করি।

তমলার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। লুলু দেখিল, তমলার চক্ষু ছল ছল করিতেছে, কোন দুঃখের স্মৃতিতে তাহার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। লুলু তমলার হাত ধরিয়া কহিল, তোমার কি হয়েছে ? তুমি অমন করছ কেন ?

তমলা বলিল, আমার কথা শুনে কি হবে ? তোমার এই সুখের সময় আমার এ রকম করা অন্যায়, তাতে অকল্যাণ হ'তে পারে। কিন্তু পোড়া মন যে বোঝে না !

লুলু চাপিয়া ধরিল, কহিল, আমাকে সব বল্‌তে হবে। এখন কোন কথা গোপন করলে শুন্‌ব না।

তমলা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, এক দিন আমারও সুখের সম্ভাবনা হয়েছিল, আজ সেই কথা মনে প'ড়ে গেল।

—তুমিও কাউকে ভালবেসেছিলে ? কি হয়েছিল, বল।

তমলা বলিল, তিন বছর আগে আমারও আশা হয়েছিল, আমি সুখী হব। আমাকেও এক জন ভালবাস্‌তেন। তিনি কোন কর্ম্মের উপলক্ষে বিদেশে যান, ফিরে এলে পর আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল। তিনি যাবার পর কোন সংবাদ পাই নি। তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম, কোন উত্তর আসেনি। অবশেষে নিরাশ হয়ে আমি রোগীর সেবা-শুশ্রূষা-ব্রত গ্রহণ করেছি।

লুলু বলিল, কে তিনি ?

—তাঁর নাম মোহাল। তাঁর ছবি আমার কাছে আছে।

—কৈ, নিয়ে এস ত, একবার দেখি।

তমলা গিয়া নিজের বাক্স খুলিয়া ছবি লইয়া আসিল; লুলু দেখিল, দিব্যকান্তি, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, যুবা পুরুষ। লুলু তমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার কোমল নয়নে আতুরতা, গণ্ডস্থলে অল্প রক্তিমরাগ। লুলু বলিল, এ ছবি এখন আমার কাছে থাক্।

তমলা কিছু বিচলিত হইয়া কহিল, কেন ?

—আমি একবার কুশানকে দেখাব। তিনি অনেক দেশ ঘুরেছেন, হয় ত এঁকে কোথাও দেখে থাকতে পারেন।

তমলা কহিল, আর সকলে টের পেলে অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন। আমি কোথাকার কে, আমাকে তুমি দয়া ক'রে তোমার সঙ্গে নিয়ে এসেছ, আমার দুঃখের কথায় তোমাকে জড়াই কেন ?

লুলু দুই হাত দিয়া তমলার মুখ বেষ্টন করিল, কহিল, আমার চেয়ে তুমি কোথাকার কে নও। দয়ার নাম কর্‌লে আমি রাগ করব। এখন আমি আর কাউকে কিছু বল্‌ব না। আমার মনে হচ্ছে, এইবার তোমার দুঃখের অবসান হবে।

—এমন দিন কি আমার হবে !—বলিয়া তমলা নিশ্বাস ফেলিল।

—হবে বৈ কি !—বলিয়া লুলু তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

২৬

কুশানের মন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। লুলু ত তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে ; কিন্তু তাহার অজ্ঞতা সম্বন্ধে সে কি মনে করিয়া থাকিবে ? আহারাদির পর কুশান লুলুদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর বারান্দায় গারা একা বসিয়াছিলেন, সেখানে আর কেহ ছিল না। গারা উঠিয়া কুশানের হাত ধরিয়া সানন্দে কহিলেন, লুলুর মুখে আমরা সব শুনেছি। আমাদের কি যে আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারিনে।

কুশান সঙ্কোচের সহিত কহিল, লুলুকে যখন বিবাহের কথা বলি, তখন সে যে কে, তা কিছুই জানতাম না।

—এখন জান না কি ?

—পুরানো খবরের কাগজ প'ড়ে সব জেনেছি। লুলুর

যশ যে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তা এখন জানি। সে আমাকে কি মনে ক'রে থাকবে ?

গারা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, তুমি যে কিছু জান্‌তে না, সেই পরম সৌভাগ্যের কথা। লুলু এত দিন কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপই কর্‌ত না, সকলের উপর তার সন্দেহ হ'ত যে, সে যশস্বিনী ব'লে তারা ওর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চায়। গুণী ব'লে ওর মনে এতটুকুও অভিমান নেই, তুমি কিছু জান্‌তে না ব'লে ওর মন তোমাতে অনুরক্ত হয়েছে, তোমাকে আত্মসমর্পণ কর্‌তে স্বীকার করেছে। তোমার ক্ষোভের কোন কারণ নেই।

কুশান অনেকটা ভরসা পাইল, বলিল, তবে আমার শাপে বর হয়েছে। এখন একবার লুলুর সঙ্গে দেখা হবে ?

—দেখি সে কি কর্‌ছে। তুলাকা একটু বিশ্রাম কর্‌ছেন, লুলু কি কর্‌ছে, ঠিক বল্‌তে পারি নে !

এমন সময় আর এক পাশে একটা ঘরে বাজনার শব্দ হইল। অঙ্গুলির মৃদু মৃদু আঘাত, যন্ত্রের শব্দ কোমল। গারা বলিলেন, লুলু বোধ হয় গান কর্‌বে। ঐ ঘরে যাবে ?

কুশান বলিল, আগে এইখান থেকে একটু শুনি।

বাদ্যধ্বনি স্পষ্ট হইল, সেই সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া লুলু গান ধরিল। যে কণ্ঠের মাধুর্য্যে ও সঙ্গীত-কৌশলে সহস্র সহস্র লোক মুগ্ধ—মোহিত হইয়াছিল, সেই পীয়ূষ-কণ্ঠ কুশান আজ প্রথম শ্রবণ করিল। সে স্তব্ধ তদ্গত হইয়া শুনিতে লাগিল।

গীত সমাপন হইলে গারা কহিলেন, এইবার চল, আমরা ঐ ঘরে যাই।

ঘরে প্রবেশ করিয়া কুশান দেখিল, লুলু বাজনার কাছে বসিয়া আছে। তুলাকা বোধ হয় এইমাত্র ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তমলা একটা ছোট অনুচ্চ আসনে বসিয়া আছে। অধ্যক্ষ বাড়ী ছিলেন না।

কুশানকে দেখিয়া লুলু হর্ষ-লজ্জায় আরক্তমুখী হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কুশান অগ্রসর হইয়া কহিল, আর একটি গান কর্‌বে না ?

লুলু আবার বসিল, বলিল, বেশ, গান কর্‌ছি।

লুলু গাহিতে আরম্ভ করিল। কয়েকটা অন্য গান গাহিয়া, নিজের ভাষায় একটা গান করিয়া বন্ধ করিল।

গারা কুশানকে বলিলেন, তুমি এখন যেতে পাবে না, একেবারে রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাবে।

কুশান বলিল, সে জন্য আমাকে বেশী পীড়াপীড়ি কর্‌তে হবে না।

তুলাকা কুশানকে বলিলেন, তুমি ভাগ্যবান্, লুলু তোমার ঘরে গেলে তুমি বড় সুখী হবে।

কুশান নতমস্তকে বলিল, সে একবার ক'রে বল্‌তে ?

আর সকলে ঘরের বাহির হইয়া গেল, রহিল কেবল লুলু ও কুশান। কুশান লুলুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমি তোমার পরিচয় কিছুই জান্‌তাম না, জান্‌লে হয় ত আমার এত সাহস হ'ত না।

লুলু কুটিল রঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে কুশানের প্রতি চাহিল। কহিল, পরিচয় না জেনে কি ভাল হয় নি ?

—তোমার দেশবিদেশব্যাপী যশের কথা আমি কিছুই জান্‌তাম না।

—কখন্ জান্‌লে ?

—ঘণ্টা কয়েক হ'ল। পুস্তকালয়ে গিয়ে কিছু দিন আগেকার খবরের কাগজ দেখে জান্‌তে পেরেছি।

—এর আগে কিছু জান্‌তে না ?

—এক বর্ণও না।

—সেই বিশ্বাসে আমাদের দু'জনের আলাপ হয়। যদি তুমি আমার পরিচয় জান্‌তে, তা হ'লে হয় ত আমি তোমার কাছে ঘেঁষতুম না। এখন আমার মনে কোন সংশয় নেই, তোমারও ক্ষোভের কোন কারণ নেই।

—তা হ'লে আমি যে এত দিন বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, সে ভালই হয়েছে।

—আর আমি যে একটা অসভ্য-জাতের মেয়ে, তাতেও কোন ক্ষতি হয় নি।

তাহার পর যে সব কথা হইল, তাহার বিস্তারিত বিবরণে কোন প্রয়োজন নাই। সে সকল কথা প্রণয়ীরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছে। কিছু হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত কথা, কখন অর্দ্ধোক্তি, কখন উভয়ে নীরব, কেবল চোখে চোখে তড়িৎবাহিত সাঙ্কেতিক ভাষা। কখন কথা হস্তস্পর্শে, কখন অধরে অধরে কথা।

হঠাৎ লুলু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে।

কুশান বিস্মিত হইয়া বলিল, কি কথা ?

—তুমি বসো, আমি এখনই আস্‌ছি,—বলিয়া লুলু ঘরের বাহিরে গেল।

কুশানের বিস্ময় অপনীত না হইতেই লুলু ফিরিয়া আসিল, হাতে একখানা ফটোগ্রাফ। সেখানা কুশানের হাতে দিয়া বসিল, বলিল, এই লোকটিকে কোথাও দেখেছ ?

কুশান ছবি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ছবি তুমি কোথায় পেলে ?

—সে কথা পরে বল্‌ছি, আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও।

—একে খুব চিনি, এ ব্যক্তি আমার বাড়ীতে আছে। এর নাম উমার।

লুলু কিছু বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িল, কহিল, তা হ'লে হ'ল না। এঁর নাম মোহাল।

—রসো, রসো! উমার ওর সত্যিকার নাম নয়, আমাদের রাখা। ওকে যখন আমরা দেখতে পাই, তখন ওর স্মৃতিলোপ হয়েছিল, নিজের বিষয় কিছুই বল্‌তে পারে না। সেই থেকে আমাদের কাছে আছে, আমি ওর চিকিৎসা করাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, আজই আমি ওর সম্বন্ধে চিঠি পেয়েছি, এই আমার পকেটে রয়েছে।

পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া কুশান লুলুকে পড়িতে দিল। কুশানের কর্ম্মচারীর লেখা। বাড়ীর ও বিষয়-সম্পত্তির কথার পর লেখা আছে, উমার সারিয়া উঠিয়াছে, তাহার লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। চিকিৎসক মহাশয়কে ও আমাদিগকে আগেকার সকল কথা বলিয়াছে। তাহার নাম মোহাল। তাহার দেশ অনেক দূরে, বিদেশে আসিয়া কোন দুর্ঘটনায় তাহার স্মৃতিলোপ হয়। স্বদেশে ফিরিয়া তাহার বিবাহ হইবার কথা। সে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। যে যুবতীর সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল, তাহার সংবাদ জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে।

পত্রে সকল কথাই লেখা ছিল। তমলার নামধাম, নিবাসস্থান সব ছিল। পত্র পড়িয়া কুশান বুঝিতে পারে নাই যে, সেই তমলা লুলুর সঙ্গে এখানে আসিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া লুলু হাস্য-মুখে কহিল, তুমি বসো, আমি তমলাকে ডেকে আনছি। আজ তার কি আনন্দের দিন !

লুলু ছুটিয়া, যে ঘরে তমলা বিমনা হইয়া একা বসিয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইল। কোন কথা না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। তাহার কটি ধারণ করিয়া তাহাকে লইয়া ঘরময় নাচিতে লাগিল। অবশেষে লুলুর বাহুবন্ধন হইতে কোনমতে মুক্ত হইয়া তমলা রুদ্ধ-নিশ্বাসে আলুথালু-বেশে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে? তুমি কি পাগল হয়েছ ?

লুলু তমলার গালে ঠোনা মারিয়া কহিল, দেখছ কি, আজ পাগলের মেলা! মেলা দেখতে যাবে চল।

আর কোন কথা না বলিয়া লুলু তমলার হাত ধরিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া কুশানের কাছে লইয়া গেল। বলিল, তমলা বল্‌ছে, আমি পাগল হয়েছি, তুমি কি বল ?

তমলা লজ্জায় অধোবদন। পলায়নের উপায় নাই, লুলু তাহার হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আছে।

কুশান সকল কথা বলিল, পত্র পাঠ করিয়া শুনাইল।

লুলু তমলার হাত ছাড়িয়া দিয়াছিল। কুশানের সকল কথা শুনিয়া তমলা বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষুতে পুলকাশ্রু ঝরিতেছিল। লুলু তাহার পাশে বসিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল। কুশানকে কহিল, এখন কি করবে? মোহালকে এখানে ডেকে পাঠাবে ?

কুশান কহিল, চিঠি লিখ্‌লে অনেক সময় লাগ্‌বে। আমি এখনই গিয়ে তার কর্‌ছি। তাতে সব কথা ব'লে মোহালকে এখানে আস্‌তে বল্‌ব।

কুশান আর বিলম্ব করিল না। টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া তাহার কর্ম্মচারীকে একটা লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাইল। যাইবার সময় লুলুকে বলিয়া গেল, তারের উত্তর আসিলেই সংবাদ দিবে। রাত্রিতে আহারাদির পর কুশান চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

র আদর্শ *

নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, এমন লোক এখনও একবারে নাই, এ কথা বলিতে পারা না যাইলেও, তাঁহাদের সংখ্যা যে এখন খুবই কম, ইহা নিঃসংশয়েই বলা যায়। এখন সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার উপকারিতা প্রায় সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি-কল্পে সহর অঞ্চলে যে চেষ্টা হইতেছে, অবশ্য তাহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও নিতান্ত কম নহে। শিক্ষিতা মহিলাবৃন্দের এ বিষয়ে চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে নারী-শিক্ষার পথে বাধা, নানা বিষয়ে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে নানা স্থানে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মেয়েদের শিক্ষার পথ কিছু সুগম হইয়াছে এবং শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। সেই সঙ্গে কৃতবিদ্য মহিলার সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এখন অনেক বিভাগেই নারীর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদের পারদর্শিতা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, ইহাও সপ্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে নারীর শিক্ষা লইয়া একটা অস্বস্তি, একটা নৈরাশ্য, একটা বেদনার ভাবও যে বহু ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। বিজাতীয় শিক্ষা বা সময়ের প্রভাবে যে কারণেই হউক, ছেলেদের শিক্ষার ফলও যে সকল ক্ষেত্রেই বেশ সন্তোষজনক হইতেছে, তাহাও বলা যায় না। তবে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় তাহা কতকটা উপেক্ষা করিতে হইতেছে, যাহা নারীর জন্য করিতে আমরা এখনও প্রস্তুত হইতে পারি নাই। সুতরাং শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সে কথা ভাবনার মধ্যেই আইসে নাই এবং সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কিছু করিতে হয় নাই। এখন সে ভাবনা আসিতেছে। যেমন কোন কোন নির্ধন ব্যবসায়ী ব্যবসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম প্রথম speculation বা তাহার ক্ষমতাতিরিক্ত অন্য যে কোন সাহসের কাযে পশ্চাৎপদ হয় না, কিন্তু পরে কিছু সঞ্চয় হইলে আর সে অবস্থা থাকে না, তখন সাবধানের কথা মনে আসে, সেইরূপ নারীশিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে আসিয়া এখন যেন একটা চিন্তা—একটা সাবধানতা অবলম্বনের কথা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

এতাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশের মনীষিবৃন্দ কেহই সমষ্টিগত-ভাবে বিশেষরূপে চিন্তার দ্বারা নারীশিক্ষা সম্বন্ধে তাহার বিষয় ও ব্যবস্থাদির নিরূপণ করেন নাই। দেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-ভাবে যে সকল নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অধিকাংশেরই মূলে প্রায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই নিহিত আছে। অবশ্য অনেক মহীয়সী মহিলাও এক্ষণে এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। অনেক পরে হইলেও মুসলমান সমাজও এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং মেয়েদের শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিতেছেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আমাদের দেশে এক শতাব্দীর মধ্যে যে সকল বিষয়ের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। স্থলবিশেষে বিদ্যা-লয়ের শিক্ষাপ্রাপ্তা কোন কোন মহিলার বিরুদ্ধে যে সকল অভি-যোগ শুনা যায়, তাহা মিথ্যা নয়, কিন্তু তাহা সুশিক্ষা নয়, অশিক্ষা বা কুশিক্ষারই ফল। শিক্ষাবিবর্জ্জিত অবস্থা বা কুশিক্ষার ফলে পুরুষের চরিত্রও বহু দোষের আকর হইতে দেখা যায়। শিক্ষায় মানুষকে যেমন উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে, অশিক্ষায় বা শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে তেমনই তাহাকে হীন করিতে পারে। সচরাচর দেখা যায়, একটি সাধারণ অশিক্ষিত মানবের সহিত একটি ইতর জীবের আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য যে পরিমাণ থাকে, একটি শিক্ষাসমুজ্জল বিশিষ্ট মানবের সহিত ততটা থাকে না। সুশিক্ষা মানুষমাত্রেরই আবশ্যক।

নারীর জ্ঞানচর্চ্চা ও বিদ্যাশিক্ষার প্রাচীনকালে এ দেশে কোন বাধাই ছিল না। বহু বিষয়েই যে তাঁহারা জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন, এ পরিচয়ের অভাব নাই। যদ্দারা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি, ত্যাগ, সংযম, দূরদর্শিতা, উদারতা প্রভৃতি গুণাবলী স্ফুরিত হইতে পারে, সাহিত্যে, শিল্পে, সামাজিকতায়, এমন কি, রাজ্যশাসন, জমীদারী পরিচালনা প্রভৃতি বৈষয়িক কার্য্যে পারদর্শিনী হইতে পারা যায়, এমন সব শিক্ষালাভের কোন অভাব ছিল না। এক কথায় নারীর শক্তি-সামর্থ্যের চারিত্রিক উৎকর্ষলাভের জন্য শিক্ষার দ্বারা যাহা কিছু সুফললাভ সম্ভাবনা, তাহা তখনকার শিক্ষা ও তাহার ব্যবস্থার মধ্যে সবই ছিল। ভারতের এই শিক্ষা-সাধনার ব্যবস্থা তখনকার দিনে যেরূপই থাকুক, বর্ত্তমান যুগের বহুলাংশে দায়িত্বজ্ঞানহীন বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল না, ইহা সুনিশ্চিত।

যে দেশের যাহা, তাহা একবারে ত্যাগ করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইলে বিপত্তিলাভের সম্ভাবনা থাকিবেই। ভারতীয় সাধনাকে একবারে উপেক্ষা করিয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহা হইতে সুফলের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনামাত্র, এ কথা স্বীকার করি। যুগের সহিত চলিতেই হইবে, তদ্ভিন্ন

---

* শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র বালিকা-বিদ্যালয়ে গত বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

গত্যন্তর নাই। এক্ষণে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন যখন উপায় নাই, তখন নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয় স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্যপালনে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

প্রথমেই দেখা দরকার—নরনারী-মিলিত জগতে সাংসারিক জীবনকে স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য শিক্ষাবিষয় প্রকৃত কি উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে গার্হস্থ্য আশ্রমের কথাই বলিতেছি। যে শিক্ষার প্রভাবে নরনারী গৃহস্থ আশ্রমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমূহ হইতে বিচ্যুত না হইয়াও তাহাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া যাহাতে জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত হইতে পারে, তাহাই শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মনুষ্যত্বের হিসাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমস্ত বিষয় সমান, ইহা মানিয়া লইলেও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান কথা, নারীর আদর্শ মাতৃত্ব এবং পুরুষের আদর্শ পিতৃত্ব। ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। আবার ইহার মধ্যে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার, পুরুষ পিতৃত্বের আদর্শ হইতে যদি দূরে থাকে তাহাতে সন্তানের পক্ষে যে ক্ষতি না হয়, নারীর পক্ষে মাতৃত্বের আদর্শচ্যুত হওয়ায় অনিষ্টাশঙ্কা অনেক বেশী। কারণ, সন্তানের দেহ ও মনের পুষ্টতা-সাধনে তাহার উপর যে পরিমাণ নির্ভর করে, পিতার উপর তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আদর্শ মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের যাহা অনুকূল নহে, গৃহস্থাশ্রমীদের শিক্ষার মধ্যে তাহার স্থান থাকা বিধেয় নহে। যে শিক্ষার দ্বারা এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা অন্যদিকে আমাদের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে যতই সহায়তা করুক, তাহাতে সাংসারিক বিশৃঙ্খলা আনিয়া হৃদয়-মন অশান্তিময় করিয়া তুলিবেই।

নারীর সর্ব্বপ্রথম কথা তাঁহার মাতৃত্ব। ইহাকে দূরে রাখিয়া মহিলাদের জাগতিক কোন প্রকার উন্নতি করিতে যাওয়া ভ্রান্তিমাত্র। সংসারের মধ্যে নারী ও পুরুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা উচিত নহে অর্থাৎ নারীর স্বাধীনতা মাতৃত্ব ও পুরুষের স্বাধীনতা পিতৃত্বের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম হয়, সেখানে বহু বিপর্য্যয়ই ঘটাইয়া থাকে। পুরুষ ও নারীর সমবেত সাধনা ব্যতিরেকে উভয়ের মধ্যে আত্ম-বিকাশ সম্ভব নয়। যেখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা, সেখানে একত্র ঐকান্তিকভাবে সাধনাও সম্ভব নহে।

এই যে অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা প্রভেদ বা দূরত্বের ভাব দিনের পর দিন পরিলক্ষিত হইতেছে, তথাকথিত শিক্ষিতা নারী নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টিতে রত হইয়াছেন, ইহাও নারীজন্মের মূল তত্ত্বের কথা বিস্মৃতির পরিণতি বলিয়াই মনে হয়। ইহার জন্য দায়ী কে? প্রধানতঃ বর্ত্তমান শিক্ষাবিধিই দায়ী, কিন্তু মূলত দায়ী এই বিধির প্রণয়নকর্ত্তা পুরুষ।

আমরা প্রায় সকল নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যমধ্যে সুমাতা, সুস্ত্রী ও সুকন্যা যাহাতে গঠিত হয়, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মাতার কর্ত্তব্য মাতৃত্বের গুরুত্ববিষয়ে ছাত্রীরা কতটুকু জ্ঞান লইয়া শিক্ষালয় ত্যাগ করে, সে কথা ভাবিয়া দেখিলে নিরাশ হইতে হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাহার প্রতিকারে যে মনোযোগ দেওয়া দরকার, আমরা তাহা দিই না। তার পর দ্বিতীয় কথা, মানুষ মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, এ কথা ছাড়িয়া দিলেও নারীর মাতৃত্বই যখন প্রধান কথা, তখন শুধু সন্তানকে মানুষ করার জন্যও তাঁহার শিক্ষার আবশ্যক। সুমাতা ভিন্ন সুসন্তান প্রায় হয় না। সন্তানকে উপযুক্তরূপে গড়িয়া তুলিবার প্রথম দায়িত্ব মাতার। মাতৃ-অঙ্কই শিশুর প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র। যখন বর্ণমালার আদ্যক্ষর উচ্চারণের অভ্যাস হয় না, তাহার পূর্ব্বে মাতৃসকাশে শিশুর শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। জগতে এমন কোন শিক্ষালয় নাই যে, তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে।

লেখাপড়ার বিষয়ক প্রারম্ভিক শিক্ষাও মা ছেলেমেয়েকে যে ভাবে দিতে পারেন, অন্যে তাহা পারে না। শিশুমাত্রেরই শিক্ষা নারীর দ্বারা যেরূপ সুন্দররূপে হইতে পারে, পুরুষের দ্বারা তদ্রূপ হয় না। ইহা অনেক বুধ জনেরই মত। জাপানে শিশুর শিক্ষার ভার নারীর উপরই ন্যস্ত হইয়া থাকে। মাতৃস্তন্য যেমন শিশুদেহের পূর্ণতা-সাধনের জন্য অপরিহার্য্য, শৈশবে যে দুর্ভাগা এ সুধা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার দৈহিক অপূর্ণতা ও অন্যান্য ত্রুটি যেমন প্রায় আজীবন থাকিয়া যায়, সেইরূপ মাতৃক্রোড়ে শিক্ষার সুযোগ না পাইলে উত্তর-জীবনে মানসিক পূর্ণতা লাভেও বাধা পড়িয়া থাকে। তৎপরে শৈশব অতিক্রমের সহিত শিক্ষার বিষয় ও ধারার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। তখনও পিতামাতা ও পরিজনপূর্ণ গৃহই বালক-বালিকার প্রকৃত শিক্ষালয়। এই গৃহের আবেষ্টনকে পূত, পবিত্র, সুন্দর ও স্বাস্থ্যবন্ত রাখিতে হইলে সংসারের পরিজনদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া দরকার।

ভারতীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম। সে কালের মনুষ্যত্বের প্রতিভাদীপ্ত মানব, শিক্ষাকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে জানিতেন না। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া যে জীবন তখন গড়িয়া উঠিত, তাহা সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে এত সহজে বিচলিত হইত না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণের জন্য এত জটিল-তার মধ্যে বাড়িয়া হতবুদ্ধি হইতে হইত না। আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে, সমাজ শাস্ত্র প্রভৃতিকে এমন করিয়া দলিত করিতে পারিত না। এখন শিক্ষার লক্ষ্য পথ ভিন্ন হইয়াছে, তদুপরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এখনকার সর্ব্ব-প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রকৃত শিক্ষার ফললাভ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইতেছে।

নারীর শিক্ষার বিষয়াদি কি হওয়া উচিত, এ প্রসঙ্গে তাঁহাদের বিশিষ্ট শিক্ষাকে উপেক্ষা না করিয়া পুরুষদের শিক্ষিতব্য বহু বিষয়ই তাহাদের শিক্ষার বিষয় হইতে পারে, আমি এই মত পোষণ করিলেও আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার লোভটাই আমাদের নারীশিক্ষার পথের একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। শিক্ষার গতি ক্রমে যে ভাবে চলিয়াছে, তাহাতে কি নারী—কি পুরুষ তাহাদের এ লোভ এখন যাইবার নহে; সুতরাং প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুতি না ঘটাই বিস্ময়ের বিষয়।

বর্ত্তমানের শিক্ষার যে গুণই থাক, ইহা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে ক্রমে ক্ষুণ্ণ হইতেছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। সকল দেশের মনোবৃত্তি, চিন্তাধারা,

সভ্যতা প্রভৃতি এক নহে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ-সমূহের নারীদের স্বাধীনতাবৃত্তি, দাম্পত্য ভাব, সামাজিকতা প্রভৃতি ইটালীয় দেশের নারী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইটালীয় নারী ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য লালায়িতা নহেন, তাঁহাদের কাছে সামাজিকতার আদর্শ পবিত্র, তাঁহারা সামাজিকতাকে পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তিনি যে এক জন নারী, সংসারের এক জন এবং জাতির এক জন, এ কথা অনুক্ষণ তাঁহার মনে থাকে। নারীসুলভ গুণ ও ভাব সকলের বিকাশসাধন দ্বারা নারীত্বের গৌরব রক্ষা হয় এবং তাহা রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য ও তদ্দ্বারা সমাজের ও জাতির গৌরব রক্ষা হয়, ইহা তাঁহাদের আশৈশব সংস্কার। সুইজারল্যাণ্ডের নারীরাও এইরূপ ভাবাপন্ন। তাঁহারাও ইটালীয় নারীদের ন্যায় স্বামীর সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য উৎসুক এবং সেজন্য সাংসারিক কার্য্যে গুরু পরিশ্রমে বিমুখ নহেন। তাঁহারা সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই পুরুষের অংশভাগিনী, এই শিক্ষাই তাঁহারা বাল্যকালে পাইয়া থাকেন। জাপানের নারীশিক্ষা-ব্যবস্থাও এইরূপ। তাঁহাদের সাধারণ শিক্ষার সহিত সংসারযাত্রা-প্রণালী ও গৃহস্থালী কায-কর্ম্মও ছোট বেলা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহারাও সাংসারিক স্বচ্ছন্দতার প্রয়াসী।

তেমনই আমাদেরও একটা জাতীয় ভাবধারা আছে যে, ভারতীয় ধারা অনুসরণে চলিয়া আমরা নিজেদের গৌরববোধ করিয়া থাকি। তাহার অংশ-বিশেষ অন্য কোন কোন জাতির সহিত মিল থাকিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে নিজস্বও অনেক আছে। পরিতাপের বিষয়, আমাদের আধুনিক শিক্ষায় নারীজনসুলভ মনোবৃত্তি-নিচয় দিনের দিন অভারতীয়ভাবে ভিন্ন পথে যাইতেছে। বলিতে লজ্জাবোধ হয়, আজকাল তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতাদের মধ্যে কেহ কেহ কথায় ও লেখায় তাহা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, অধিকন্তু বরং তাহাতে গর্ব্বানুভবই করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাধীনতা নারীগৌরবের বিরোধী, এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। মহিলা কবির মহামন্ত্র—

> "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
> আসে নাই কেহ অবনীপরে,
> সকলের তরে সকলে আমরা
> প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নন।

আমাদের নারীর শিক্ষার মধ্যে যে সব ত্রুটি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহা হওয়া উচিত মনে হয়, তাহাই সংক্ষেপে বলিলাম। এ কথা বলাই বাহুল্য, এ সব বলা যেরূপ সহজ, কি করিলে আমাদের এই আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের আদর্শানুযায়ী নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়া কত কঠিন, তাহা যাঁহারা এই কার্য্যে রত আছেন, তাঁহারাই জানেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, পরিচালকবর্গ আমাদের নারী-শিক্ষালয়গুলির যাহা কিছু সব শুধু পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের অনুকরণে গঠনের প্রয়াস না পান। তাঁহাদের সাধারণ শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছু গ্রহণীয় হইলেও শিক্ষার বিষয়াদি সম্বন্ধে আমাদের উদ্দেশ্যের—আমাদের প্রয়োজনের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে না বিস্মৃত হন। নারীশিক্ষার ভার লওয়া শুধু একটা খেয়াল বা সখের বিষয় নহে। মনে রাখিতে হইবে, মাতৃজাতির কল্যাণের সহিতই জাতির কল্যাণ বিজড়িত। তার পর নারীশিক্ষা-মন্দিরের কথায় ইহাই সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে, বিশুদ্ধতাই উহার প্রাণ। উহার মধ্যে কোনরূপ আবিলতা না থাকিতে পারে। উহার পবিত্রতা ও শুচিতা বালিকার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রধান অবলম্বন। নারীর দেহ ও মন নারীত্বের গৌরবে যেন চিরদিন গরীয়ান্ থাকে। তাঁহাদের আত্মদান, সহনশীলতা, ত্যাগ, সংসারশৃঙ্খলানুবর্ত্তিতা সমস্তই ঐ নারীত্বের আবরণে সমুজ্জ্বল।

এ সব বা যাহা কিছু শিক্ষিতব্য, তাহা শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন যোগ্যা শিক্ষয়িত্রী। কতিপয় বৎসর যাবৎ নারী-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে খুবই দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, আমাদের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার-বিষয়ক বহু অন্তরায়ের মধ্যে সুযোগ্যা শিক্ষয়িত্রীর অভাব সর্ব্বোপরি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা পর পর বাড়িয়া চলিয়াছে সত্য এবং তন্মধ্যে ভাল শিক্ষয়িত্রীও দেখা যাইতেছে, কিন্তু যে ভাবে নিত্য নূতন নূতন নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইতেছে, সে তুলনায় উহা পর্য্যাপ্ত নহে। তদ্ভিন্ন এ কথাও বলিতে হয়, আজকাল যে সকল মহিলা কলেজ হইতে বাহির হইয়াই শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন, তাহার মধ্যে কাহারও কাহারও দায়িত্বজ্ঞান বড়ই কম দেখা যায়। সুতরাং যে সব প্রতিষ্ঠানে শুধু নারীর দ্বারাই শিক্ষাদানকার্য্য করাইতে হইতেছে, সেখানে প্রায়ই সুযোগ্যা শিক্ষয়িত্রীর অভাবের কথা শুনা যায়।

মেয়েদের দিক হইতে শিক্ষার অন্তরায় প্রথমতঃ তাহাদের অল্পবয়সে বিবাহ। কিন্তু অন্য দিকে মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা একটা সমস্যা ও উপযুক্ত বিদ্যালয়েরও অভাব। নারীর শিক্ষা পুরুষদের দ্বারা সঙ্গত কি না বা সহশিক্ষা ভাল কি মন্দ, সে বিষয় এখানে আলোচনা করিব না—কতকগুলি সুবিধার জন্যই যতদূর মনে হয় যে, অদূর-ভবিষ্যতে অনেক বাধাই অপসারিত হইয়া যাইবে, অথবা সে সবকে আর বাধা বলিয়া ধরা হইবে না। অবশ্য তখন যেরূপ হয় হইবে, দেশ-কালের দিকে চাহিয়া এখন যাহা প্রয়োজন, এখন যে সব অভাবের জন্য আবশ্যকানুরূপ স্ত্রীশিক্ষা প্রসারলাভ করিতে পারিতেছে না, তাহা দূর করিবার জন্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত। আর অভিভাবকগণের নিকটও নিবেদন করি, তাঁহারা কন্যাদের শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে কেবল-মাত্র বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, সে জন্য পুত্রদের ন্যায় তাহাদেরও যত্ন লওয়া উচিত। আর সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা দরকার, মেয়েদের প্রধান শিক্ষার স্থান গৃহ। এই স্থান হইতে তাহারা যত সহজে সংসার, সমাজ, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশকে ভালবাসিতে শিখিতে পারে, এত সহজে বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। আর নারীদের যে শিক্ষাই দেওয়া হউক, সকল সময়ই লক্ষ্য রাখা দরকার, মনুষ্যত্বের অধিকার

বিষয়ে তাহাদের দাবী পুরুষেরই মত, কেবল তাহা যেন নারীত্ব ও মাতৃত্বের বিরোধী না হয়, ইহাই যেন তাহাদের আবাল্য সংস্কার থাকে। ইহার দ্বারাই আমরা নারীকে স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী ও শান্তিময়ীরূপে দেখিতে পাইব।

শ্রীহরিহর শেঠ।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হুগলী জেলা হইতে প্রকাশিত পুরাতন সংবাদপত্র*

হুগলী হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র :—

১। সাহিত্য-কুসুম—"সাহিত্য-কুসুম মাসিক পত্র, হুগলী বুধোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। মূল্য অতি অল্প, অগ্রিম বার্ষিক ৮০ আনা ও ডাকমাশুল ।৵০ আনা।" সাধারণী ১২৮১৷২২শে আষাঢ়।

২। চিত্তবোধ মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক অম্বিকাচরণ গুপ্ত। "বিজ্ঞাপন। চিত্তবোধ প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আমার বঙ্গদর্শনের মত ১৬ পৃষ্ঠা, অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০ পশ্চাদ্দেয় ২ টাকা।" "সাধারণী ১২৮১৷৩০শে কার্ত্তিক।"

৩। আক্তিজন নেহার—১৮৭২ খৃঃ অব্দের ৩রা জুলাই প্রকাশিত হয়। 'সাধারণী' ২৮১১৷২৫শে জ্যৈষ্ঠ লিখিতেছেন—"আক্তিজন নেহার বঙ্গীয় মুসলমানগণের মুখস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে···হুগলী কলেজের মুসলমান ছাত্রগণ ইহা প্রকাশ করিতেছেন। আক্তিজন নেহার আমাদের প্রতিবেশী।"

৪। আদরিণী—মাসিক পত্রিকা, ১লা ভাদ্র ১২৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২ টাকা। আদরিণী কার্য্যালয় শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস। "সোমপ্রকাশ ১২৮৭৷১৯শে শ্রাবণ।"

৫। দৈনিক বার্ত্তাবহ নামে বৃহদাকার এক কাগজ বাহির হইয়াছিল।

৬। পূর্ণিমা ১৮৯৩ খৃঃ বৈশাখ মাসে বাহির হয়-ইহা মাসিক পত্রিকা। উহা পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বাঁশবেড়িয়া হইতে বাহির হয়।

৭। শুভঙ্করী পত্রিকা—"হুগলী (বালী) হইতে প্রকাশিত হয়।" ১২৬৯৷১৪ জ্যৈষ্ঠ "সোমপ্রকাশ।"

৮। সংবাদ কৌমুদী—কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উহা পরিচালনা করিতেন। রাজা রামমোহন রায় উহার সহিত বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি সহমরণ সম্বন্ধে কটাক্ষ করিলে ভবানীচরণ উহার সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। ভবানীচরণের পর তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্তের নামে ঐ পত্রিকা চলিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহনই সম্পাদক হইলেন। কিন্তু ১৪ মে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে উহা বন্ধ হয়। কিন্তু পরবৎসর (১৮২৩) এপ্রিল মাসে আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের* সম্পাদকত্বে পুনরায় দেখা দিল। রাজা রামমোহন বিলাত গেলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছুদিন সংবাদ কৌমুদী পরিচালনা করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের পর উহার প্রচার বন্ধ হয়।

"সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" পৃঃ ১৮৮—১৯০ ; দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। ব্রাহ্মণসেবধি—১৮২১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনরীরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অযথা আক্রমণ করিলে, রাজা রামমোহন রায় "শিবপ্রসাদ শর্ম্মা" এই ছদ্মনামে Brahmunical Magazine ও ব্রাহ্মণসেবধি নামে একখানি কাগজ বাহির করেন। "ঐ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।"

সংবাদ কৌমুদী ও ব্রাহ্মণসেবধি হুগলী জেলায় ছাপা হইত না, কিন্তু রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার লোক বলিয়া এইখানে উল্লেখ করিলাম।

১০। দর্শক—সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র ঘটক।

১১। কুমুদিনী—সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

১২। বাসনা—সম্পাদক জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ সকল কাগজের মধ্যে সকলগুলিই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৩। ভক্তিপ্রভা—সম্পাদক মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি—গ্রাম এলাটী।

বৈদ্যবাটী হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র—১। আর্য্যধর্ম্ম ২। বন্দনা—এই দুইখানি পত্রিকাও লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কৈকালা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র—হিন্দুসখা—সম্পাদক রামকুমার বেদতীর্থ।

কোন্নগর হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র—ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা—"১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মে (?) মাসে এই মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১১ই জুলাই (২রা আষাঢ় ১২৬১) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছেন—কোন্নগরনিবাসী শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন, তাহার দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার ভাগ প্রকাশ করাই ঐ পত্রের উদ্দেশ্য ।"

কিন্তু এই পত্রিকাখানি সর্ব্বপ্রথম ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি অল্পদিনের জন্য প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশিত গুপ্ত কবির সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তেও দেখিতেছি যে, ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা "কোন্নগর ধর্ম্মসভার মুখপত্র ছিল।" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—"সন ১২৫৭ সাল। ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা—কোন্নগর ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। স্থিতিকাল কয়েক সংখ্যা" নবজীবন আষাঢ় ১২৯৩।

সম্ভবতঃ এই মাসিক পত্রখানির সম্পর্কে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদ

---

* শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র যথাস্থানে লিখিত হইবে।

* আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিবাস কোন্নগর ; 'বাকার্ণব' গ্র… তাঁহারই লিখিত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই (১৫ শ্রাবণ ১২৫৭) তারিখে লিখিয়াছেন :–"কোন্নগরস্থ ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা সভার সংগৃহীত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদক কর্ত্তৃক অস্মৎ-সমীপে প্রেরিত হওয়াতে আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম।"

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উদ্ধৃত করিলাম; সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৯। চতুর্থ সংখ্যা পৃঃ ২৪০। ২। জ্ঞানোদয় ১২৫৮ সাল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ; কোন্নগরনিবাসী চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক জ্ঞানোদয় পরিচালিত হইত। সম্পাদক এই 'চন্দ্রশেখর' স্বনামখ্যাত "ব্রহ্মধর্ম্মাশ্রিত ডেপুটী কালেক্টর বাবু 'চন্দ্রশেখর দেব' বৈ আর কেহই নহেন।" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় চন্দ্রশেখর দেব নাম ভুল করিয়াছেন। ঐ নামে কোন্নগরে আজ পর্য্যন্ত কোন ডেপুটী কালেক্টর হন নাই। সম্ভবতঃ শিবচন্দ্র দেব হইবেন। কিন্তু তাঁহার জীবনচরিতে বা অন্য কোন স্থানে ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ হয় নাই।

উদ্ধৃত অংশ জন্মভূমি নববর্ষ ১৩০৭। আশ্বিন ৩য় সংখ্যা হইতে দিলাম। ঐ দুই পত্রের কোনখানির অস্তিত্ব নাই।

উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র :—

১। উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্র ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত।

২। কর্ম্মযোগিন্ ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়—১৩১৭ পর্য্যন্ত ছিল। শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন।

৩। গ্রামবাসী—নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায়ের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হইত। উহা ৫।৬ মাস জীবিত ছিল। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক D. N. Mullick প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

৪। সবিতা—মাসিক পত্রিকা। এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল।

৫। উত্তরপাড়া কলেজ ম্যাগাজিন—১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া কলেজের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা মাসিক-পত্রিকা।

৬। খেয়াল মাসিক-পত্র—The Whim Magazine.

৭। অর্চ্চনা ও চয়ন—(১৯১১-১২ খৃঃ) উত্তরপাড়া কলেজের ছাত্রগণ-পরিচালিত মাসিক-পত্র। অর্চ্চনা মৃত হইলে "চয়ন" প্রকাশিত হয়।

৮। বিকাশ—১৩১৬ সাল হইতে ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত ছিল। সারস্বত সম্মিলন হইতে প্রকাশিত।

"উত্তরপাড়া বিবরণ" পুস্তক হইতে ঐ তালিকা গৃহীত হইল।

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত সংবাদ-পত্র :—

১। প্রজাবন্ধু—সাপ্তাহিক-পত্রিকা—সম্পাদক তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২। ধূমকেতু—সাপ্তাহিক-পত্র—সম্পাদক শিবকৃষ্ণ মিত্র, ১২৯৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩। বঙ্গবন্ধু—সাপ্তাহিক-পত্র—সম্পাদক—যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪। চন্দননগর প্রকাশ—সাপ্তাহিক-পত্র—সম্পাদক, এন, মুখোপাধ্যায়।

৫। বঙ্গপ্রভা—মাসিক-পত্র—সম্পাদক বিপিনবিহারী কোলে—১২৯৮ সালে প্রকাশিত।

৬। হিত-সাধন—সম্পাদক নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১২৯৮ সালে প্রকাশিত।

৭। বাহক।

৮। মাতৃভূমি—পাক্ষিকপত্র—সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ সেন।

৯। চন্দননগর-পত্রিকা—সম্পাদক অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।

১০। ভারত-দর্পণ—সম্পাদক অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।

১১। প্রবর্ত্তক—প্রথম পাক্ষিক, পরে বর্ত্তমানে মাসিক-পত্রিকা হইয়াছে—সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ নায়েক ও মতিলাল রায়। এই পত্রিকাখানি এখনও জীবিত আছে।

১২। নব-সঙ্ঘ—সাপ্তাহিক, পরে পাক্ষিক হয়।

১৩। তরুণ-ভারত—সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ সেন।

১৪। Le petit Bengali সাপ্তাহিক—সম্পাদক চার্লস্ পুম্যান।

১৫। The Bearer সাপ্তাহিক—সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

১৬। Amateur Workshop সাপ্তাহিক—সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বসু ও কুসুমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭। Tit for Tat.

১৮। Standard Bearer সাপ্তাহিক—সম্পাদক গগনচন্দ্র নন্দী।

২০। নিবন্ধ-মাসিক-পত্র সম্পাদক বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১। মুকুলমালা—সম্পাদক কেদারনাথ ঘোষাল।

চন্দননগর সংবাদ-পত্রের তালিকা শ্রীযুত হরিহর(?)নাথ চক্রবর্ত্তী M. A. B. L.এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। [ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনন্ত চণ্ডীদাস

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কবি চণ্ডীদাসের অপর নাম অনন্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে এই কবির আবির্ভাব-কাল খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধ। চৈতন্যদেব অবশ্য এই চণ্ডীদাসের পদ শুনিয়াই প্রেমে পুলকিত হইতেন। নীলরতন বাবুর 'চণ্ডীদাস' পুস্তকের পরিশিষ্টে চণ্ডীদাস-বন্দনার ৮টি পদ আছে। তা ছাড়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের একটি পদ—

"শ্রীজয়দেব কবি কর রাজা।
বিদ্যাপতি তাহে মত্ত কর সাজা॥
ছুটল গাঢ় তাহে শূর তুরঙ্গ।
চণ্ডিদাস তাহে পদক পতঙ্গ॥
আর যত সব কবি তৃণ সমতুল।
কহে এ নরবর হাম উড়হি ধূল॥"

শ্রীচৈতন্যদেব এক চণ্ডীদাসের পদ শুনিয়া পুলকিত হইলেন; আর তৎপরবর্ত্তী কালের নরহরি দাস, বৈষ্ণব দাস প্রভৃতি ভক্তগণ অপর এক চণ্ডীদাসের বন্দনা গাহিলেন—কথাটা সঙ্গত কি?

বৃন্দাবন হইতে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস কৃত ও অন্য ভক্তকৃত চারি ভার গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসিবার পথে শ্রীনিবাস আচার্য্য জাজিগ্রামে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। নরোত্তম দাসও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তখন অবশ্য নরোত্তম-শিষ্য চণ্ডীদাসের সৃষ্টি হয় নাই। কিরূপ মহানন্দে, রাধাগোবিন্দ-সংকীর্ত্তনাদিতে আচার্য্য ঠাকুর সেখানে রাত্রি যাপন করিতেন, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি যদুনন্দন বলিয়াছেন :—

* * * * *

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দ।
রায়ের নাটক গ্রন্থ গায় পরমানন্দ॥
রজনীতে ভক্তসঙ্গে রাসাদি বিলাস।
গান শিক্ষা দেন ভক্তের প্রেমের উল্লাস॥"

চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহ করিতে গিয়া নীলরতন বাবু রাস-লীলারই ছুইখানা পুঁথি পাইয়াছিলেন। যত গোল 'অনন্ত'কে লইয়া। নরোত্তমশিষ্য চণ্ডীদাসেরও বরাতজোর বলিতে হইবে।

চণ্ডীদাসের অনন্ত নামের উল্লেখ কোনও পদকর্ত্তা না করিয়া গেলেও পদসংগ্রাহকগণ ইহা অবিদিত ছিলেন বলা যায় না; কোন কোন পদসংগ্রহের পুঁথিতে 'চণ্ডীদাস' ও 'অনন্ত' ভণিতা-যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পদ পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। আমার নিকট ১১৮৬ সালের লিখিত একটি পদসংগ্রহের অসম্পূর্ণ পুঁথি আছে। পুঁথিখানির নয়টি পত্রে মোট ২৯টি আক্ষেপানুরাগের পদ আছে। তন্মধ্যে ১৮টি পদ চণ্ডীদাসের, ৭টি জ্ঞানদাসের বলরামদাসের ২টি ও কবিবল্লভের ১টি। চণ্ডীদাসের পদগুলির মধ্যে ৭।৮টি নীলরতন বাবুর পুস্তকের পদের সহিত মিলে। প্রভেদ কেবল 'দ্বিজ' ও 'দাস' লইয়া। পুঁথির ২১ নং চণ্ডীদাসের পদটির পরেই 'দাস অনন্ত' ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত (২২ নং) পদটি আছে :—

পিরিতি বলিআ এ তিন আখর
এ তিন ভুবন সার।
কারে না কহিঅ গুপতে রাখিয়
জেন কসাএর জার॥
পিরিতি পরশ সদাই আবেশ
নিতুই নুতন জার।
জেই অনুরত সেই সে বেকত
অনেক বুঝাএ আর॥
হিআএ ধরিহ সঘনে ঝুরিহ
অনঙ্গ সঙ্গিনি জার।
প্রেমে ধিকি ধিকি উঠে ঘন জাগি
তরাসে আণী বিথার॥
দাস অনন্ত মনের সরম
ভরম ভাঙ্গিআ কয়।
উ কথা জাহার মোনের মরম
তারে সে অন্তর দয়॥ ২২॥

চণ্ডীদাসকেও বিজ্ঞানে পাইয়াছে। ছুরি-কাঁচির মুখে আমার 'দাস অনন্ত'এর অবস্থা কিরূপ হইবে, অনুমান করিতে পারিয়াও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। সাহিত্য-পরিষদের চণ্ডীদাসপদাবলী-সম্পাদকগণ এ দিকে দৃষ্টি দিবেন কি?

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত।

অভিমানিনী

নাসিকাপুটের পত্র দুখানি কাঁপে
অন্তরে পোরা অজানা বাষ্প চাপে,
কেন গো তরুণি? কি হ'ল তোমার আজি?
চক্ষু দুটির পক্ষ্ম ফেল গো থির?
কোণে কোণে কেন উছলে অশ্রুনীর?
সুরে বাঁধা বীণা বেসুর উঠিছে বাজি'?

কেন বাণী নাই বাধাহীন তব মুখে?
ভাষা কি তোমার বাঁধা পড়ে' গেছে বুকে?
ফাগুনের পিক কেন বা নীরব হ'ল?
অভিমান যদি,---অভিনয় কেন তার?
এ ব্যাধি ধরিবে, পরশিবে তনু যার!
তোমার মৌন বিশ্বে ভরিয়া গেল!

কপালে তোমার কেন কুঞ্চন-রেখা?
ভ্রূযুগে তোমার কেন বঙ্কনা আঁকা?
বসনাঞ্চলে কেন ধূলি ঝ'রে পড়ে?

যদি অভিমান,—অভিযান কেন ভূমে?
তরুশির-ফুল কঠিন মাটীরে চুমে!
বিকল বীথিকা যেন বৈশাখী ঝড়ে!

অধর-ওষ্ঠে সৃষ্টির সেরা দান,
করো না নষ্ট! মানিনী গো সাবধান!
দীন বিশ্বেরে করো না'ক দীনতর!
অভিমান যদি, সাথিহীন করো তারে!
বিষাদ বিরাগ এনো না তাঁহার ঘরে।
রূপেরে করো না অরূপেতে মন্থর!

শুধু অভিমান,—রূপের অরুণ-শিখা;
বিষাদ ঘটায় সে শিখায় ধূম-রেখা;
অভিমান আলো, বিষাদ আঁধার পুরী!
করো অভিমান, নাহি তাহে মম দুখ,
বিষাদ এনো নাই এইটুকু রেখো সুখ,
আলো রেখো ওগো আঁধিয়ারে দূর করি'!

রূপেরে সাজায় রূপসীর অভিমান,
বিষাদ ঘটায় সে রূপের অপমান!

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য (এম, এ)।

ব্যবধান

(গল্প)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৭

পরদিন সে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর যে কূল ভাঙ্গে—তাহার বিপরীত কূল গড়িয়া উঠে। এত দিন পল্লীমায়ের সবুজ কোলটিতে সন্তানের জন্য বিশ্রামের সুখ-মুহূর্ত্ত স্মৃতির দুয়ারে প্রলোভনের সৃষ্টি করিত,—আজ—শৃঙ্খলিত নগরীর প্রাণান্তকর বন্দি-কোটরে তাহার সেই সঞ্চিত সুখের নীড়খানি বাঁধিয়া উঠিল। ও-পারের ভগ্ন তটে উন্মত্ত তরঙ্গের আকুল ক্রন্দন—এপারের শুভ্র শান্ত বালুতীরে মৃদুল রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিয়াছে।

অনীতা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কবে এলেন, মাষ্টার মশাই!"

"কাল।"—সহাস্য-মুখে অনন্ত উত্তর দিল।

অনীতা বলিল, "কিন্তু আর ত আপনার প্রয়োজন নেই। খোকার মাষ্টার ঠিক হয়ে গেছে।"

অনন্তের মুখের হাসি অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। একটু থামিয়া শুষ্ককণ্ঠে কি বলিতে গিয়া দেখিল,—চাপা হাসির ছটায় অনীতার সারা মুখখানি তরঙ্গিত ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

অনীতা হাসিতে হাসিতে বলিল, "মনে নেই, কি ব'লে গেছলেন?"

অনন্ত বলিল, "তবু ভাল। এই প্রাণান্তকর রহস্য—আমি মনে করেছিলাম, সত্যই বা হবে।"

খোকা আসিয়া কহিল. "দিদি, সমীর বাবুরা গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন,—বায়স্কোপে যাবে না?"

অনীতা অনন্তের পানে চাহিয়া বলিল, "কি বলেন, যাব?"

অনন্ত বলিল, "বেশ ত—যান না।"

অনীতা বলিল, "নাঃ—থাক্ গে। আপনার সঙ্গে ব'সে ব'সে খানিক গল্প করা যাক্। ছবি দেখতে দেখতে আমার চোখ কেমন জ্বালা বোধ হয়। খোকাকে আজ ছুটী দিন—ও যাক্।"

"আচ্ছা।"

খোকা একলম্ফে চলিয়া গেল।

অনন্ত বলিল, "হয় ত আপনার অনেক ক্ষতি করলাম।"

অনীতা বলিল, "তা করলেন। কিন্তু আনন্দের ভারে ক্ষতিটা এমনি চাপা প'ড়ে গেছে যে, তাকে টেনে তুলতে ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা, মাষ্টার মশাই, জীবনটা খণ্ড খণ্ড স্বপ্নে আগাগোড়া গাঁথা, নয়?

অনন্ত বলিল, "জীবনকে ও-ভাবে আমি কখনও দেখিনি। তবে স্বপ্নের সঙ্গে ওর তুলনা করা যায়। তার কতক বা সত্য, কতক বা মিথ্যা। কিন্তু জীবনের মর্ম্মান্তিক সত্য এই যে, মিথ্যাগুলোই সেখানে সারাক্ষণ চোখ রাঙ্গিয়ে আধিপত্য ক'রে সত্য হ'তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ প্রতারিত হয় এবং সেই প্রতারণাকে পরম উল্লাসে প্রেয়ের আসনে বসিয়ে পুজো করে। এর চেয়ে নিষ্ঠুর মর্ম্মঘাতী আর কি আছে?"

অনীতা বলিল, "এ ত হ'ল পরমদুঃখবাদীর কথা।"

অনন্ত বলিল, "এবং সত্য। দুঃখটাই যেন এখানে পনেরো আনা তিন পাই। আপনি হয় ত তর্ক তুলবেন,—সুখের অভাবও ত নেই এখানে! দুঃখ দুঃখ ক'রে অনর্থক গলা না ফাটিয়ে সুখের স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া ঢের ভাল।"

অনীতা বলিল, "কিন্তু আমি ত তা বলিনি। আমি জানি, সুখ বা দুঃখের সংজ্ঞা সকলের এক নয়। কাযেই ও নিয়ে তর্ক করা বৃথা। জেলকে কেউ ভয় করেন, কেউ বা গৌরবের ব'লে জানেন। সুখের পরিমাণ কারও অর্থে, কারও বা যশে, কারও বা মহত্ত্বে।"

অনন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ঠিক তাই। এই সব বিচিত্র অভিমতেই জীবনের বৈচিত্র্য।"

অনীতা বলিল, "আপনার কাছে আমিও সত্যকথা শুনতে চাই, মাষ্টার মশাই। এত অল্পবয়সে এই দুঃখবাদ কি ক'রে আপনার মনে শিকড় গাড়লো? এক দিন বলে-ছিলেন, বল্‌বেন।—আজ বলুন না?"

অনন্ত শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আজ নয়—আর এক দিন। আজ আমি বড় দুর্ব্বল।"

অনীতা তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "তবে থাক।"

৮

ইহার পর একটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বলি বলি করিয়া অনন্তের সে কথা বলা হয় নাই,—অনীতাও জিজ্ঞাসা করে নাই।

কদিন পরীক্ষার পরিশ্রম গিয়াছে। সে দিন অবসর-মুহূর্ত্তে পুরাতন স্মৃতি অনন্তের মনে তরঙ্গ তুলিল। সে স্থির করিল—আজই এ কথা অনীতাকে বলা আবশ্যক। দিনে দিনে তাহার অন্তরে এই সত্য দৃঢ় হইয়াছে,—পৃথিবীতে মানুষের সর্ব্ব-কামনাকে সাফল্য দিতে পারে—একমাত্র ভালবাসা। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা যাহার, সে তৃণশিরে প্রভাতের ক্ষণস্থায়ী শিশির-সৌন্দর্য্যের মত স্বল্পায়ু নহে। তাহার আয়ুঃসীমা দীপ্ত মধ্যাহ্নের প্রখর কিরণে ঝলসিত উত্তপ্ত নব কিশলয়ের সুষমার মত;—কোমল অথচ প্রাণময়। উত্তাপে আতপ্ত হইলেও শুষ্ক হয় না। ফুলের এক বেলার জীবন বা গন্ধের প্রহরব্যাপী উন্মাদনা লইয়া তাহার ভালবাসার উদ্যান রচনা করিলে চলিবে না। সে উদ্যানে গোলাপ-গন্ধরাজের সঙ্গে নব অঙ্কুরিত দূর্ব্বাদলও শোভা পাইবে। কোকিলের পাশে পাপিয়াও ডাকিবে—আকাশ-নীলিমার সঙ্গে ভূমির রুক্ষতাও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবে।

মেসের বাহির হইতেই সুনীল বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন, "তোমার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম। রামপুর থেকে চিঠি এসেছে,—মামা বাবুর খুব অসুখ। তোমায় বিশেষ ক'রে নিয়ে যেতে লিখেছেন।"

অনন্তের সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেল। নতমুখে বলিল, "কিন্তু সার—"

সুনীল বাবু তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এ তোমার কর্ত্তব্য। আমায়ও যেতে লিখেছেন, তাই একেবারে তৈরী হয়ে এসেছি। যাও—কাপড়-জামা বদলে এস।"

না যাইবার কোন হেতু নাই। সম্পর্কের বন্ধন কর্ত্তব্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিভা রামপুরেই ছিল।—পরম-পুলকিত হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল, "ও মা, একি সৌভাগ্য! কোন্ দেশের মানুষ গো!—এস,—ভাই,—এস।"

অনন্ত তাহাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতেই সে শশব্যস্তে কহিল, "থাক—থাক, সম্পর্কে বড় হ'লেও বয়সে তুমি জ্যেষ্ঠ। তা ভাই,—এত দিন পরে দিদিকে মনে পড়লো?" পাখা লইয়া সে শ্রান্ত অনন্তকে বাতাস করিতে লাগিল।

এই মিষ্ট সহজ সেবা ও দরদ-ভরা প্রশ্ন অনন্তের সমস্ত কুণ্ঠাকে মুহূর্ত্তে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

বিভা অতীতের কাহিনী লইয়া কোন অনুযোগ করিল না, রেণুর প্রসঙ্গও সাবধানে এড়াইয়া গেল। অনন্তের কুশল ও তাহার পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং নিজের প্রতিদিনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখের কাহিনী বলিয়া গেল। শেষে হাসিমুখে বলিল, "এমন সুন্দর আমার ছোট ভাইটি যে, এত দিন না দেখতে পাওয়ার জন্য দুঃখ হচ্ছে; তুমি ব'স, আমি আসছি।"

বহুদিন পরে অনন্তের মনে হইল,—এখানেও কারাগারের কষ্ট কল্পনা কিছুমাত্র নাই। একদা যে তিক্ততার কটু আস্বাদ ইহার প্রত্যেক অণুটি হইতে উৎসারিত হইয়াছিল, আজ তাহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া মিলে না। মহানগরীর মুক্তিপ্রাচুর্য্যের মধ্যে এই পল্লীরও যেন একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এ মায়া দূর হইতে আকর্ষণ না করিলেও শিরায় শিরায় বন্ধনরজ্জু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

জলযোগান্তে সে শ্বশুরের রুগ্ন শয্যাপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতে পারিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে উৎকট আত্মমর্য্যাদার আবেগে যে কায সে করিয়াছিল, আজ এই কক্ষে পদার্পণ করিবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহা সত্যই মনুষ্যত্ব-পরিপন্থী! পিতৃতুল্য এই স্নেহময় পূজনীয়ের অমূল্য দানের অমর্য্যাদা সে করিয়াছে,—সে অপরাধী। এই অপরাধ ক্ষমাভিক্ষার ভিতর দিয়া নিষ্পত্তি হইবার নহে। ক্ষমাহীন দুর্ব্বিষহ পীড়নে ইহা তাহাকে নিয়তই লজ্জিত, কুণ্ঠিত করিয়া রাখিবে।

বৃদ্ধ সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, "ভাল ত বাবা? বড় রোগা হয়ে গেছ।" পরে সেই অবস্থাতেই ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন,—"ওরে বিভা, অনন্তকে ও ঘরে নিয়ে বসা,—একটু হাওয়া কর।"

অনন্ত কোনমতে প্রশ্ন করিল, "আপনি কেমন আছেন ?"

"ভাল। তোমায় দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। সুনীল, এদের পরীক্ষা হয়ে গেছে ? কেমন রেজল্ট্ করলে ?"

সুনীল বাবু বলিলেন, "ভাল।"

"—বেশ—বেশ।" আনন্দিত হইয়া তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন। অনন্তকে সাবধানে থাকিবার স্নেহ-সতর্ক উপদেশ,—তাহার ভাবী উন্নতির রমণীয় কল্পনাচিত্র, তাহার কলেজের কথা—এমনই কত কি ? কিন্তু একবারও সেই গ্লানিকর প্রশ্ন করিলেন না।

জিজ্ঞাসা করিলেন না,—কেন ? যেন সে আঘাত আঘাতই নহে,—দুষ্ট ছেলের ক্রীড়াচ্ছলে দৌরাত্ম্য মাত্র !

বিভার আহ্বানে অনন্ত উঠিয়া গেল।

তাহার মনে হইল, স্নেহ যেমন অত্যাচার সহ্য করে, এমন আর কিছুই নহে। আপনার না হইলে কেহ কি এই উৎপীড়ন বুক পাতিয়া লয় ? রেণুর কাছেও সে হয় ত' অপরাধী। এমন স্বচ্ছন্দ গণ্ডীর মধ্যে জোর করিয়া মর্য্যাদাকে টানিয়া আনা নিষ্ঠুরতা, অন্যায়। স্নেহ যেখানে অবারিত অযাচিতভাবে প্রবাহিত, সেখানে মর্য্যাদার কোন মূল্য নাই। সেখানে দানের গৌরব ও দাতার দম্ভ ত গ্রহীতাকে ম্লান করিয়া অবনমিত করে না।

রাত্রিতে বিভা হাসিমুখে বিদায় অভ্যর্থনা করিল, "তোমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে যাকে এক ক'রে নিয়েছ ভাই, সে যদি দোষ করে, ভুল করে, ত নিজের গুণে শুধরে নিয়ো। মানুষের দোষ-ত্রুটি আছে, তাই ক্ষমাও আছে। যে ক্ষমা করে—সে মহৎ।"

অনন্তের মনে অকারণ পুলক জাগিয়া উঠিল। সে কল্পনা করিল, এই বাড়ী তাহার আপনার।

বিভার মিষ্ট দরদভরা হৃদয়টুকু তাহার প্রতি সহানুভূতিতে ভরা,—যেন স্নেহময়ী ভগিনীর মমতা-সম্পদ্। শ্বশুরের অন্তরেও এই স্নেহের ফল্গুধারা প্রবাহিত। আঘাতও সহ্য করিয়া তিনি হাসিমুখে তাহার কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। আর যে তাহার সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী, জীবনসঙ্গিনী ? অনন্ত কল্পনা করিল,—চারি পার্শ্বের স্বচ্ছ সুনির্ম্মল প্রবাহে তাহারও কলুষ ত্রুটি কোথায় ধুইয়া গিয়াছে।

অভিমানিনী রেণু তাহার ম্লানমুখখানি লইয়া ছল-ছল অশ্রুভারে সিক্ত মর্ম্ম-পীড়িত দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। কণ্ঠে স্বর নাই,—ওষ্ঠে হাসি নাই,—অঙ্গ-সঞ্চালনে চাঞ্চল্য নাই। নত-নয়নের বাক্যহারা ভাষা ক্ষমা-ভিক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তরালে অপরাধী অন্তর কুণ্ঠায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে।

অপরাধ কি, জানা না থাকিলেও, এই আনত মুখখানি, এই দুটি বাহু দ্বারা তুলিয়া ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া লইতে ইচ্ছা করে। এই তপ্ত অশ্রু-কলুষিত গণ্ডের কালিমাটুকু উষ্ণ-ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়া মুছাইয়া দিতে আকাঙ্ক্ষা জাগে।

কিন্তু কল্পনার মাঝে এ মুখখানি কাহার ? রেণুর,—না অনীতার ? কাহার অপরাধকে এমন সুমধুর ক্ষমা দিয়া সে মুছিয়া লইতে চাহে ? কাহার বেদনায় তাহার অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠে ? কাহার মৌন আকুতির সম্মান রাখিতে তাহার সর্ব্বদেহ আশ্লেষের আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে ? কল্পনা—কল্পনায় মিলাইয়া থাক। অনীতা রেণুর মাঝে আত্মপ্রকাশ করুক। তবে বিবাহ; এ যে সারাজীবনের—জন্মজন্মান্তরের ! ক্ষণিকের ধূমাচ্ছন্ন কুয়াসা-মণ্ডিত কল্পনায় যতই কেন না সৌন্দর্য্য থাকুক, তাহার রাজত্ব খেয়ালের ভিত্তিতে। সত্য-সূর্য্যের কিরণ তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই—সে স্বপ্নের অবসান হইবে। ভুল সত্য হউক,—সত্য সুন্দর হউক,—সুন্দর অক্ষয় হউক। রেণু—রেণু,—অনীতা নহে, রেণু—রেণুই তাহার সারাজীব-নের সুখ-দুঃখের—লাঞ্ছনা-গৌরবের—জন্মজন্মান্তরের সঙ্গিনী !

দ্বারবন্ধের শব্দে অনন্তের কল্পনা টুটিয়া গেল। দেখিল,—দুয়ারের পাশটিতে পরিমলবাহী চন্দ্রকিরণের মত রেণু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আর সে সঙ্কোচবিহ্বলা অবনতমুখী প্রত্যুষের আধ-বিকশিত রক্ত-শতদল নহে,—পরিপূর্ণ আলোকে মুদিত আঁখির দলগুলি মেলিয়া, শ্রী-সৌন্দর্য্যে হিল্লোল বহাইয়া পূর্ণতররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবের আবেগে সে পালঙ্ক হইতে নামিয়া কোমলকণ্ঠে ডাকিল, "রেণু !"

রেণু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে আপন মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তখানি তুলিয়া ধরিল।

উদ্যতফণা কালসর্প যেন পথের মাঝে অসতর্ক পথিকের সম্মুখে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

অনন্তের মুখ হইতে একনিমেষে কে যেন সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া লইল। সেই তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করিয়া সে পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িল।

রেণুর হাতে কয়েকখানি নোট।

রেণুর ওষ্ঠপ্রান্তে তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত একটি নিষ্ঠুর হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

তীব্র অথচ চাপাকণ্ঠে সে কহিল, "বাবা এ অপমান হাসিমুখে সয়েছেন, কেন না, সম্পর্ককে তিনি মিথ্যা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু—কিন্তু—তুমি কি? আত্মমর্য্যাদার দোহাই দিয়ে এই আচরণ করতে তোমার একটুও বাধলো না?" কণ্ঠ তাহার আর্দ্র হইয়া উঠিল।

পুনরায় সে ধীরকণ্ঠে কহিল, "যা করেছ, হয় ত কর্ত্তব্য ভেবেই ক'রেছ। কিন্তু সব অধিকারে বঞ্চিতা ক'রে আমায় কেন এই কলঙ্কের সমুদ্রে নামিয়ে দিলে? তিনি কিছু বলেন নি, সেই দুঃখেই না আমার বুক ফেটে যাচ্ছে? এ তুমি কেন পাঠালে—কেন পাঠালে?"

রেণু চুপ করিল,—হয় ত কাঁদিতে লাগিল।

অপরাধী অনন্ত সে দিকে চাহিতে পারিল না,—কোন উত্তরও দিল না। হয় ত এই অপরাধ এত গুরু-পাষাণভার লইয়া তাহার মাথায় চাপিয়া থাকিত না। কিন্তু আজিকার সস্নেহ আচরণ—অকুণ্ঠ প্রীতি, সুনিপুণ সেবা তাহার চৈতন্যকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করিয়া জ্ঞান-আঁখি উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে। ছি! ছি! এত হীন—এমন বর্ব্বর সে?

রেণু অগ্রসর হইয়া আলো নিবাইয়া দিল, মেঝেয় শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া পড়িল। ক্রমে তাহার ক্লান্ত নিশ্বাস সুপ্তির ভারে শব্দহীন হইয়া গেল,—তথাপি মগ্নচৈতন্য অনন্তের বাহ্যজ্ঞান ফিরিল না।

তাহার অপরাধের ভারে আজ সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সুখ, সাধ, কল্পনা, বাস্তব, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা সকলই সে স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

রাত্রির যৌবন তখন ফিরিয়া আসিয়াছে। সৌধ-অন্তরালবর্ত্তী চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাহার বিচ্ছুরিত কিরণ আসিয়া শয্যার প্রান্ত স্পর্শ করিয়াছে। এ যেন আলেয়ার আলো। কক্ষের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার নিশ্ছিদ্র আবরণে সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে,—শুধু ঐ আলোর টুকরা পলাতক আসামীর মত বাতায়নের উন্মুক্ত পথ দিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে।

অনন্ত নিশ্বাস মুক্ত করিয়া অন্ধকার কক্ষতলে চাহিল। জাগরণের কোন স্পন্দন নাই। বাতায়ন-বাহিরে দেখিল, সৌধের একটি পার্শ্বে আলোর শুভ্রতা—অন্য পার্শ্বে ছায়ার কৃষ্ণ-কুন্তল এলায়িত। তরুশিরে নব-পল্লবপুটে উজ্জ্বল হাসির ঝিকিমিকি। আকাশের যে প্রান্তটুকু নয়নে পড়ে—তাহাতে নীলের বর্ণসুষমা শুভ্রলহরে ভাসিয়া গিয়াছে, নক্ষত্রমণ্ডলী ম্লান।

সবই স্বপ্নময়,—কিন্তু সেই কখানি নোট তাহার সকল স্বপ্নকে নিষ্ঠুর প্রহারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বাস্তবের জগৎ ছাড়াইয়া অন্ধকারের বিরাট বুকে নামাইয়া দিয়া গিয়াছে।

অপরাধের বোঝা বহিয়া সে-দিনের জ্যোৎস্নাও দিনের আলোকে শুকাইয়া গেল।

৯

প্রভাতে বিভা আসিয়া রেণুকে আপনার ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার ঘুমভারজড়িত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল, "কি লো অভিমানিনী,—মানের পালা সাঙ্গ হ'লো?"

রেণু হাসিবার চেষ্টা করিল, মুখে হাসি ফুটিল না। বিভার হাতখানি ঠেলিয়া ফেলিয়া কহিল, "কি যে রঙ্গ করিস, ভাল লাগে না।"

বিভার হাসির বেগ বর্দ্ধিত হইল। বলিল, "সত্যি—সত্যি? ইস্! কি চাপা মেয়ে তুই, রেণু,—পাছে আবার আমাদের ভাগ দিতে হয়? তা যাক। বুনো ঘোড়া বশ করবার মন্তর-তন্তর ত ভুলে যাস নি লো? বলি কেমন—" অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যের সঙ্গে সে চোখের একটা রহস্যময় ইঙ্গিত করিল।

রেণুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। গম্ভীরকণ্ঠে সে কহিল, "আবার ছ্যাবলামো। তোর বুনো ঘোড়া বশের মন্তর তুই মুখস্থ ক'রে রাখিস।"

বিভা কহিল,—"আর তোর বুঝি পোষা? তা বেশ, বেশ! একেই বলে মোহিনীবিদ্যে। এক রাত্রেই কামরূপের তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ!"

তথাপি রেণু হাসিল না—রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

বিভার মনে সন্দেহের উদয় হইল। নব-বসন্ত-বিকশিত মলয়-হিল্লোলিত কুসুমে কোথায় সেই প্রিয়-কর-স্পর্শ-জনিত লাবণ্য অনুরাগ, কোথায় বা তাহার সলজ্জ মৌন স্মিত হাস্যরেখা? বর্ষাবারিস্ফীতা তটিনীর উদ্বেল আনন্দ ছুটি তীরের বাঁধনে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া কূল ছাপাইবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষায় নৃত্য করিতেছে না কেন?

অনন্তের কক্ষে আসিয়া দেখিল—সে জামা-কাপড় পরিয়া কোথায় বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

বিভা আসিতেই অনন্ত তাহার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া কহিল, "চল্লুম, দিদি।"

বিভা বিস্ময়ে কহিল," কোথায় ? না, না,—সে কি ? কাল এসে আজ যাওয়া !" পরে তাহার গমনপথ রোধ করিয়া মিনতিভরাকণ্ঠে কহিল, "আমি সব বুঝেছি, ভাই। কিন্তু অজ্ঞান অবোধ ব'লে তুমি যদি ক্ষমা না কর,—তুমি যদি—"

অনন্ত ম্লান হাসিয়া বলিল,"অপরাধী আমি। আপনাদের স্নেহ-ভালবাসা ভোগ করবার মত অন্তর আমার নেই।"

বিভা কাতরকণ্ঠে কহিল, "সে কি,—ভাই ! তুমি ছেলে-মানুষ, এই সবে সংসারে পা বাড়িয়েছো—ও কথা ব'লো না—আমার বড় কষ্ট হয়। রেণুর অপরাধ—"

অনন্ত বলিল, "একের অপরাধে অন্যকে দোষী করবেন না, দিদি। আমায় মাপ করুন। আজ কোনমতেই থাকা সম্ভব নয়।"

বিভা বলিল,—"আমার অনুরোধ।"

অনন্ত আর একবার তাহার পায়ের গোড়ায় অবনত হইয়া প্রণাম করিল। কহিল, "অনুরোধ করবেন না। আমি অক্ষম ! আপনাকে সব জানাবো। সমস্ত জেনে অবোধটিকে ক্ষমা করবেন।" ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল।

বিভার দুটি নয়নে অশ্রুর ধারা ছুটিয়া উঠিল।

দ্রুতপদে সে আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া রেণু পরম নিশ্চিন্তে একখানি বই পড়িতেছে। এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, রেণুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই ! রাগে তাহার সারা অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। রেণুর হাত হইতে বইখানি কাড়িয়া লইয়া মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "এই কি তোর বই পড়বার সময় ?"

রেণু বিভার ক্রোধ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তবে কি গান গাইবার সময় ? তা বিভা—অর্গ্যানটা—"

বিভার উদ্যত মুষ্টি আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে পড়িল,—রেণু বুঝিল, ক্রোধের মাত্রা অত্যধিক।

কহিল, "উঃ, মেরে ফেল্লি যে, মুখপুড়ী ?"

বিভা সক্রোধে কহিল, "তোর মরাই উচিত।"

রেণু বলিল, "অত ক'রে ডাকছি—তবু ত সে আসে না, ভাই। সে এত নিষ্ঠুর কেন ?" বাক্যশেষে রেণু উচ্চৈঃ-স্বরে হাসিয়া উঠিল।

রেণুর হাসি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বিভার চোখে জল আসিল। এ হাসি যে কান্নার চেয়েও করুণ !

ধীরে ধীরে তাহার পাশে বসিয়া দুটি বাহু বাড়াইয়া রেণুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোমল অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "সত্যি বলবি, রেণু—কাল রাতে তোদের কি হয়েছিল ? অনন্ত অমন ভাবে চ'লে গেল কেন ? তোকেই বা মরণ-কামনা করতে হয় কেন ? আমার দিব্যি—সত্যি বলবি।"

রেণু কহিল, "ছাড়,—বলছি।"

রেণু অকপটে সমস্ত বলিয়া গেল, বিভা স্তব্ধ কর্ণে শুনিল।

বাক্যশেষে উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। অবশেষে বিভা শ্রান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দোষ তোরই। মেসোমশায়ের অপমান তুই কেন খুঁচিয়ে তুলতে গেলি ?"

রেণু গ্রীবা উন্নত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি যে তাঁর মেয়ে। তিনি অপমানটা চেপে গেছেন—আমারই মুখের পানে চেয়ে; কিন্তু আঘাতটা সামলাতে পারেন নি। বিভা, আর কেউ না জানুক, আমি ত জানি—তাঁর অসুখের মূল কারণ কি ! সে ওই টাকা ফেরত পাঠানোর ব্যাপার। আগে জানতুম, দরিদ্র হ'লে মহৎ হয়,—এখন দেখছি, সে ধারণা ভুল।"

বিভা বলিল, "কিন্তু সে তোর স্বামী।"

রেণু বলিল, "সেই জন্যই আমার দুঃখ এত বেশী। আমাদের সম্বন্ধ নিয়ে সে ছেলেখেলা আরম্ভ করেছে। আমায় সে লাঞ্ছনা অপমান যাই করুক না কেন—আমার তত বাজে না, কিন্তু কন্যাদান ক'রে বাবা কি তার চরণে এতই অপরাধী—"রেণু আর বলিতে পারিল না,—বিভার বুকে মুখ লুকাইল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ রোদনের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

বিভা রেণুর অশ্রুস্নাত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই, এ জন্য সে অনুতপ্ত। তার মুখ দেখে সত্যিই আমি চোখের জল সামলাতে পারিনি। তোদের দীর্ঘ জীবনের কথা ভেবে—আমার মন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, সে স্বামী—তোর ক্ষমা করবার অধিকার নেই, কিন্তু—কিন্তু—ভুলে যা, রেণু !"

রেণু বলিল, "ভোলা কি এতই সহজ, বিভা?"

বিভা তাহার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া সাগ্রহে কহিল, "আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর, ভুলবি? না হ'লে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।"

রেণু বলিল, "চেষ্টা করবো।"

বিভার মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

১০

অনন্ত কলিকাতায় আসিতেই সুরেন তাহার হাতে একখানি রঙ্গীন খাম দিয়া হাসিমুখে কহিল, "এটা উপলক্ষ মাত্র। কাল থেকে বার পাঁচ ছয় লোক যাতায়াত করেছে। ব্যাপারখানা কি?"

অনন্ত খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল, "আমি যেখানে পড়াই—তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন। আজ তাঁর ভাইঝির জন্মদিন।"

সুরেন বলিল, "তা হ'লে ধড়াচূড়া বদলে এখনি রওনা হও। কিন্তু তোমার মুখখানা অমন আষাঢ়স্য দিবসের মত থমথমে কেন? বাড়ীর খবর?"

গম্ভীর কণ্ঠে অনন্ত বলিল, "ভাল। তুমি কি বেরুচ্ছো?"

"—হাঁ। কেন?"

"আমাকেও একবার নিউমার্কেটে যেতে হবে। আচ্ছা, কি প্রেজেণ্ট করা যায় বল দেখি? কিছু না দিলে ত ভাল দেখায় না।"

সুরেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "তরুণী? সুন্দরী? কিছু রোমান্সের ছায়াও যেন ভাসছে! আচ্ছা চল,—যেতে যেতে ভাবা যাবে'খন।"

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে অনীতা বন্ধু-বান্ধব-পরিবৃত হইয়া গল্প করিতেছিল। খোকা আসিয়া তাহার কাণে চুপি চুপি কি বলিতেই সে ত্রস্তে উঠিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

অনন্ত বাহিরের ছোট ঘরখানিতে বসিয়া জনসমাগম ও বাটীর সাজ-সজ্জা দেখিয়া অন্তরে অন্তরে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। ঐশ্বর্য্যের বিদ্যুতালোকে সে যেন ভগ্ন-কুটীরের কোণে ক্ষুদ্র মাটীর স্তিমিত দীপশিখা!

অনীতা আসিয়া কক্ষমধ্যে দাঁড়াইল ও অবনত হইয়া তাহার পায়ের উপর প্রণাম করিল। পরে হাসিমুখে কহিল, "কোথায় হঠাৎ অজ্ঞাতবাস করেছিলেন?"

এই প্রশ্নে অনন্তের গম্ভীরমুখে পাংশুছায়া নামিয়া আসিল। নতমুখে সে ফুলের তোড়া হইতে একটা গোলাপ-ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া নিবিষ্টমনে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

অনীতা হাসিমুখে বলিল, "ও কি, আমার জন্মদিনের উপহার? বাঃ, সুন্দর তোড়াটি ত! দেখি—দেখি।" অনন্তের হাত হইতে সেটি লইয়া বক্ষের অতি সন্নিকটে আনিয়া পরম তৃপ্তিতে আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

অনন্ত উৎফুল্লমুখে সে দিকে চাহিয়া বলিল, "অতিরিক্ত প্রশংসায় আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদি কিছু মনে না করেন ত—" বলিতে বলিতে বুক-পকেট হইতে একটি ছোট ভেলভেট কেস খুলিয়া একটি প্রজাপতি ব্রোচ বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিল।

আনন্দে অনীতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। টপ্ করিয়া সেটি তুলিয়া লইয়া বাহুর উপর কোঁচান কাপড়ের প্রান্তটায় আঁটিতে আঁটিতে কহিল, "আমার জন্মদিনের এর চেয়ে পছন্দসই উপহার একটাও পাই নি। আসুন ওপরের হলঘরে।"

অনন্ত আপনার খদ্দরের জামার পানে চাহিয়া বলিল, —"না, থাক। এ বেশ নিয়ে যেতে—"

অনীতা বাধা দিয়া বলিল, "আবার লজ্জা! মনে আছে সেই এক দিনের তর্ক?"

সে কথা স্মরণ হইতে দু'জনেই হাসিয়া উঠিল। অনন্ত বলিল, "চলুন।"

নিমন্ত্রণশেষে গভীর রাত্রিতে মেসে ফিরিবার মুখে অনন্তের অন্তরে বিন্দুমাত্র বেদনা—গ্লানি—নৈরাশ্য ছিল না। এ যেন আর একটা জগৎ—দুঃখলেশশূন্য। নির্ম্মেঘ, নির্ম্মল, কিরণময় ইহার উজ্জ্বল আকাশ। পশ্চাতের পল্লীপ্রান্তে যে জগৎ পড়িয়া রহিল, তাহার অন্ধকারাবৃত উচ্ছ্বসিত ফেন-লহরী ইহার চরণপ্রান্তে আসিয়া স্থিরশুভ্র সৌন্দর্যে আত্মহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। গরিমা আছে—গর্জ্জন নাই, সঙ্গীত আছে—কোলাহল নাই, আবেগ আছে—অবসাদ নাই।

সে জগতের চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা, সুখ-দুঃখের উল্লাস-বেদনায় কখনও বা উজ্জ্বল, কখনও বা ম্লান।

এ জগতের গ্রহ-তারা আচ্ছন্ন করিয়া একই পূর্ণচন্দ্র প্রতিদিনের এবং অবিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তের তরে আকাশ-সীমান্ত

আলোক-প্লাবনে ভাসাইয়া দিয়া একটি শ্রেষ্ঠ ঋতু-উৎসবে মনকে চির উৎফুল্ল করিয়া রাখে। এ জগতের বায়ুস্পর্শে সে জগতের কথা দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। আবার সে জগতের সংস্পর্শে আসিলে এ জগৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।

কিছুদিন পরে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে ছুটীর অবসরে সকলে বেড়াইতে আসিয়াছেন। অনন্তকেও অনীতা টানিয়া আনিয়াছে। দিবা দ্বিপ্রহর। ছায়া-ঘেরা বন-ঝোপের আশ্রয়ে পরিশ্রান্তরা বিশ্রাম লইতেছেন এবং উন্মুক্ত আকাশতলে শীতের মধ্যাহ্নটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছেন।

খোকার শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই। ছুটিয়া বাগানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ফুলপাতা সংগ্রহ করিয়া ও বৃক্ষতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া বেড়াইতেছে। অনীতা ও অনন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বৃক্ষের পরিচয় দিতেছিল।

বৃদ্ধ-বটবৃক্ষের তলায় আসিয়া অনীতা বলিল, "একটু বসে আসুন।"

উভয়ে বসিল। খোকা কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া পুনরায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাগানের অন্য প্রান্তে চলিয়া গেল।

অনীতা অনন্তের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "কি ভাবছেন, মাষ্টার মশায়?"

তরুতৃণলতার সান্নিধ্যে আসিয়া অনন্তের পল্লীস্মৃতি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্ষণেকের তরে সে হয় ত আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবিতেছিল—এ কি মরীচিকা!

কোথায় পথ,—কোথায় বা আলো? যে সুরকে লইয়া রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শে নূতন জগৎ রচনা করিতেছি, সে যে একান্তই মায়া! একটি দীর্ঘ-নিশ্বাসের ভরে সে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এ কি দুরাশা!

অনীতার প্রশ্নে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল—উদ্বেগে সে মুখখানি পরিপূর্ণ। আত্মসম্বরণ করিয়া অনন্ত কহিল, "অনীতা, ও ব্রোচটা তুমি আজও প'রে এসেছো কেন?"

অনীতা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "আপনার জিজ্ঞাসার হেতু বুঝতে পারলুম না।"

একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত বলিল, "না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আর কারও স্মৃতি যে জড়িত হয়, এ ইচ্ছা আমি করি না। অনীতা, এই দুপুরবেলায় আকাশের পানে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছে, জান? একটি স্বপ্নের কথা। সে স্বপ্ন—মধুর—কোমল—"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "এবং কবিত্বমণ্ডিত।"

অনন্ত ম্লান হাসিয়া বলিল, "তা তুমি যাই বল, কবিত্ব এর প্রাণ। প্রতিদিন কাছে কাছে থেকে একটা কথা আমি বুঝেছি, আর তুমিও হয় ত অস্বীকার করবে না, একই সুরে আমরা আত্মহারা হয়েছি,—একই পথে হাত ধরাধরি ক'রে পা বাড়িয়েছি।"

অনীতা লজ্জারক্ত মুখখানি নত করিয়া কহিল, "থামুন"।

অনন্ত বলিয়া চলিল, "কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের গতি দুদিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।"

অনীতা আরক্ত-মুখে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।

অনন্ত তাহা লক্ষ্য করিল, কহিল, "অবস্থার তুলনা করছি না। যদিও সে দিক দিয়ে দেখলে—ও আশা দুরাশা!"

অনীতা নতমুখেই বলিল, "মেসোমশায় আমায় সন্তানের চেয়ে ভালবাসেন। আমার সুখের জন্য তাঁরা—" লজ্জায় সে কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

মুহূর্ত্তের তরে অনন্তের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই দুশ্চিন্তার ছায়ায় তাহা ঢাকিয়া গেল। ভগ্নকণ্ঠে সে বলিল, "অনীতা, আমায় ক্ষমা কর। আমি জান্‌তাম ও অসম্ভব। কিন্তু কি জানি কেন, তোমায় বারবার জানাতে গিয়েও জানাতে পারিনি। আমারই দুর্ব্বলতা। আজন্ম দুঃখের মাঝে একটুখানি সুখকে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই জাগিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু—কিন্তু—"

অসহ্য বেদনায় তাহার চক্ষু ফাটিয়া জলধারা নামিয়া আসিল।

অনীতা মর্ম্মাহত হইয়া ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "ছি! আপনি না পুরুষ?"

অনন্ত অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "আমি মানুষ।" পরে ঈষৎ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "জান অনীতা,—আমার ইতিহাস?"

অনীতা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, শুনতে চাই না, চলুন।"

অনন্ত বলিল, "কিন্তু আজ বলবো ব'লেই মনকে বেঁধেছি, শোন।" সে কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, ললাটের কয়েকটি শিরা ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুখে জোর করিয়া হাসি ফুটাইতে গেল—পারিল না। অবশেষে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বিবাহিত।"

অনীতা নির্নিমেষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ঐ স্তব্ধ দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রাণখানি যেন আকুল উদ্বেগে আঁখির কৃষ্ণ তারকায় ভাসিয়া উঠিয়াছে।

অনন্ত সংক্ষেপে তাহার কাহিনী বলিয়া গেল।

অনীতা শুনিতে শুনিতে তেমনই অপলকে চাহিয়া রহিল,—আঁখির অভ্যন্তরে কিসের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল, কেহ জানিল না!

বহুক্ষণ পরে সে ধীর স্বরে বলিল, "চলুন।" যন্ত্রচালিতের মত অনন্ত উঠিল।

পশ্চিমদিগন্তে সূর্য্য তখন অনেকখানি ঢলিয়া পড়িয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। তরুলতার উর্দ্ধশীর্ষ পুষ্প-পল্লব সেই রক্ত-সমারোহে স্নাত হইয়া গিয়াছে।

১১

তিন দিন অনন্ত এ বাড়ীতে আসিতে পারিল না। যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার হৃদয়ের স্নায়ু-শিরায় একটি মৃদুল রাগিণীর মোহময় গুঞ্জন অতি ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়া সুরের জাল বিস্তার করিতেছিল,—সব দ্বিধা,—সব সংশয়ের গণ্ডী পার হইয়া—দুটি মনের ব্যবধান সরাইয়া সে যখন একান্ত সন্নিকটে আসিয়া স্নিগ্ধ কিরণচ্ছটায় বিকশিত হইয়া উঠিল, তখন ধ্বনি তাহার নীরব হইয়া গিয়াছে; গুঞ্জন আছে কি নাই—বুঝা যায় না; এবং অপসারিত যবনিকার অভ্যন্তরে ব্যবধাননির্ম্মুক্ত যাহা নয়নপ্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহার মাঝে যেন অগাধ উন্মত্ত সিন্ধুর ফেন-তরঙ্গ উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছে। আবিষ্কারের অনন্ত আনন্দ—না পাওয়ার বেদনায় বিমূঢ় বিহ্বল হইয়া গিয়াছে।

তিন দিন পরে আসিতেই অনীতা তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, "আসুন—আসুন। এই তিন দিন যে একেবারে অজ্ঞাতবাস! আমি ভাবলুম—বুঝি আবার নতুন মাষ্টার ঠিক করতে হ'লো।"

অনন্ত তাহার হাসিমুখের পানে চাহিয়া একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমি বড়ই অসুস্থ।"

অনীতা সকৌতুকে বলিল, "দেহে—না মনে?"

অনন্ত বিষণ্ণ মুখে বলিল, "পরিহাস নয়, অনীতা—আমায় বিদায় দাও।"

অনীতার মুখের মৃদুহাসি মিলাইল না। কহিল, "কেন?"

অনন্ত বলিল, "আমার কিছুই ভাল লাগে না। কিসের জন্য এই ভূতের ব্যাপার খেটে মরছি? কোন্ আশায়?"

অনীতা বলিল, "এক দিন দুঃখকে আপনি শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন না?"

অনন্ত বলিল, "দুঃখকে শ্রেষ্ঠ আসন দিই নি,—শুধু বলেছিলাম—একে অস্বীকার করা যায় না। জগতের ষোল আনাই দুঃখ দিয়ে তৈরী।"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "এবং তা সত্য। তবে? প্রত্যক্ষ সত্যকে অস্বীকার করতে চান কেন? নিজের মন দিয়ে জগৎ রচনা করলে চলবে কেন? জগতের মত নিজেকে তৈরী ক'রে নিতে হবে।"

অনন্ত বলিল, "কিন্তু বাহ্য জগতের চৈতন্য যে মনে। আমি জগৎকে ভালবাসি—নিজেকে ভালবাসি ব'লে। অহং বাদ দিলে জগতের কিছুই থাকে না।"

অনীতা মধুর স্বরে বলিল, "সে কথা সত্য। কিন্তু জগতের কল্যাণ কিসে গ'ড়ে ওঠে জানেন?—এক একটি দুঃখ-জর্জ্জরিত প্রাণের সেবা শতদল,—নিঃস্বার্থপরতার সৌরকিরণ-স্নাত হয়ে অপরূপ শ্রীতে ফুটে ওঠে। নিজের দুঃখকে যাঁরা বদ্ধ হৃদয় থেকে উন্মুক্ত জগতের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন, তাঁদের দুঃখকে আমি অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ যা কিছু—তার মূলে এই দুঃখ অনুভূতি,—এ কি আপনি অস্বীকার করেন?"

অনন্ত বিস্মিত হইয়া অনীতার পানে চাহিল। ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—না, ইহা সে অস্বীকার করে না।

অনীতা পুনরায় বলিতে লাগিল, "জগৎ যদি আমার মাঝে ধরা না দেয় ত—আমার সাধনা কেন তাকে ধরবে না! এই মানুষ হয়ে জন্মেছি—শুধু কি হা-হুতাশ দুঃখ করবার জন্য? এক জনের মুখে যদি হাসি ফোটাতে পারি, নিজের মনে সে হাসির আনন্দ-দীপ্তি এসে কি লাগবে না?"

অনন্তর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যেন মেঘান্তরালে আবৃত অপ্রকাশিত সত্য ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। কে জানে,—স্বার্থ-সংঘাতে ইহার আয়ু কতক্ষণের জন্য? দুঃখকে জয় করিবার এ এক অভিনব পন্থা বটে। তবে এ জয়ের যুদ্ধ—হয় ত জীবন ব্যাপিয়া চালাইতে হইবে। বর্ম্ম হওয়া চাই—তীক্ষ্ণ আঘাত-সহিষ্ণু,—অস্ত্র হওয়া চাই শাণিত।

না,—এ যে অসম্ভব।

অনন্ত আবেগ-বিহ্বল স্বরে বলিল, "কিন্তু অনীতা, আমরা পরস্পরকে চিনেও—একটা সামান্য ভুলের জন্য—এই শাস্তি কি আজীবন বইবার জন্য বৃথাই মনকে প্রবোধ দিচ্ছি না? ভাঙ্গা হাত নিয়ে কি কায করা সম্ভব?"

অনীতা ধীর স্বরে বলিল, "কর্ত্তব্যের কথা যদি বলেন ত, এই আবেগের ওজর—যে কর্ত্তব্য রয়েছে, তার অমর্য্যাদা করেন কোন্ সাহসে? জেনে শুনে যাঁকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন—তাঁকে জোর ক'রে ছেঁটে ফেললেই কি তৃপ্তি পাবেন? আপনার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—"

আর্ত্তস্বরে অনন্ত বলিল, "জানি—জানি, অনীতা। সেই সত্যই আজ রক্তচক্ষু নিয়ে আমার গতির পথরোধ করেছে। এক দিন ভেবেছিলাম, তা সত্য, কিন্তু আজ বুঝেছি, মিথ্যার মর্য্যাদা নিয়ে ভুলেছিলাম। উঃ, যদি ভুলই করলাম ত তোমায় কেন এর মধ্যে টেনে আনলাম?"

অনীতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তাতে কিছু মাত্র ভুল করেন নি। আপনার কাছে আমি যা পেয়েছি—তা সত্য বলেই গ্রহণ করেছি। আপনি হয় ত মিথ্যা ব'লে অনুতাপ করবেন, কিন্তু আমার পাওয়াটা যে সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। হোক না দুঃখ-কষ্ট—তবু ত সে সত্য।"

অনন্ত আর একবার অনীতার পানে চাহিল। কিসের প্রদীপ্ত গৌরবে সে মুখের মৃদুহাস্যটুকুও গৌরবমণ্ডিত। শান্ত সমাহিত দুটি উজ্জ্বল চক্ষু, প্রভাতের বালসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত মেঘের মত ক্লেদপরিশূন্য নির্ম্মল ললাট, মৃদুহাস্যস্ফুরিত অথচ দৃঢ়সন্নদ্ধ দুটি অধরোষ্ঠ যেন ভাবী সাধনার হোমাগ্নি-শিখায়—অন্তরের মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া বাহিরে দীপ্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।

১২

দীর্ঘ দুটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে!

দুঃখকে পরম সম্পদ্ বলিয়া অনন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই।

অনীতা কোথায় এবং কেমন আছে, সে সংবাদও সে রাখে না। তাহাকে ভুলিবার জন্য নিষ্ঠুর নির্ম্মম আচরণ সে করিয়াছে;—কিন্তু ভুলিতে সে পারে নাই। রেণুর স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব আসিয়া জমিয়াছে—অনীতার প্রতিটি স্মৃতির সঞ্চিত সৌরভে। দুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা তাহার নাই। সঙ্গিহীন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের প্রিয় সহচর এই ভালবাসাকে নির্ব্বাক্ প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। সংযম—সাধনা—এ সকল মিথ্যাকথা, দুঃখকে জয় করিবার দুঃখময় প্রচেষ্টা মাত্র।

জীবন যেমন সত্য—তাহার কামনাও তেমনই সত্য; এবং কামনার সমষ্টিতেই ভালবাসার জন্ম। সে ভালবাসাকে মিথ্যা প্রবোধের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া,—কঠোর তপশ্চর্য্যার নিগড়ে বাঁধিয়া—জোর করিয়া ঊর্দ্ধমুখী করিয়া লাভ কি? জরাগ্রস্ত যৌবন,—ক্লিষ্ট কম্ম,—অবসন্ন হৃদয়,—মগ্ন চৈতন্য—পক্ষাঘাতগ্রস্ত অনুভূতি—মিথ্যাশ্রিত সত্যেরই নামান্তর। ভোগবিমুখ অন্তরই ত বৈরাগ্যকে আঁকড়াইয়া ধরে।

কিন্তু কি বিচিত্র গতি মনের। যখনই সে উদ্দাম হইয়া উঠিতে চায়,—যখনই মিথ্যাজালে প্রাণহীন বলিয়া সেই প্রেমকে নির্ব্বাসিত করিয়া নব আনন্দের সহজ প্রবাহে গা ঢালিয়া দিতে চায়,—অমনই তাহার চারিদিকে জাগিয়া উঠে—স্নেহ-সতর্ক কিসের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর! বন্ধনমুক্তির প্রয়াস-মাঝে ফুটিয়া উঠে নববন্ধনের মধুর নিশ্চেষ্টতা। এ-যেন অজগরের নিশ্বাস,—শত-পাকে বেষ্টন করিয়া—মুক্ত জগতের প্রলোভন সম্মুখে জাগাইয়া—মোহের ফাঁসে গ্রন্থির পর গ্রন্থি রচনা করিতেছে।

সে দিন দুখানা পত্র আসিল। অনন্ত বিস্মিত হইয়া প্রথমখানি খুলিয়া প'ড়ল,—অনীতার লেখা। দীর্ঘ দুটি বৎসরের ব্যবধান সরাইয়া,—শরীরিণী নহে, লিপির মধ্য দিয়া অনীতার মূর্ত্তিখানি ফুটিয়া উঠিল।

পত্র সংক্ষিপ্ত। "কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি—কত দিনের জন্য,—কে জানে? রাত আটটার সময় একবার হাওড়া ষ্টেশনে আসবেন - পাঞ্জাব মেলে যাব!

ইতি—অনীতা।"

পত্রের প্রথমে ও শেষে কোন প্রিয় সম্বোধনের স্মৃতি নাই। সরল অনাড়ম্বর ভাষা,—কিন্তু কি প্রচণ্ড আকর্ষণ উহার প্রতিটি ছত্রে। কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়াছে—কত দিনের জন্য, কে জানে? কেন? কিসের জন্য?

দ্বিতীয় পত্রে আর এক দিকের জগৎ আসিয়া দেখা দিল।

বিভা লিখিয়াছে;—"রেণু আজ কয়েকমাস হইতে অসুস্থ, —পীড়া সঙ্কট। ভাই, দুরন্ত অভিমানবশে জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে কেন দুটিতে কষ্ট পাচ্ছ? আমি জানি, রেণুর এ

অসুখ কিসের জন্য! তোমার কাছে বড় বোনের দাবী জানিয়ে বলছি, লক্ষ্মীটি,—অভিমান ত্যাগ কর। তোমাদের বাঁধন ত ছেলেখেলা নয়,—এ যে জন্ম-জন্মান্তরের। একে অস্বীকার করা মানে—ছুটি প্রাণকে ধীরে ধীরে নষ্ট করা। ভাইটি আমার, পত্রপাঠ চ'লে এসো—নইলে এ আপশোষ জীবন-ভোর বইতে হবে।"

ছুটি জগৎ একই সঙ্গে দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সহরের কোলাহল-মুখরিত বৃহৎ অট্টালিকা—আর পল্লীর নিভৃত প্রান্ত। একটিতে বেদনা-দুর্ভর চিত্তকে সংযমের গণ্ডীতে বাঁধিয়া সুদূরের যাত্রী শান্তিপ্রয়াসী অনীতা,—অপরটিতে রোগশয্যা-শায়িত মরণোন্মুখ রেণু। বিদায়ের আয়োজনে ছুটি জগতের প্রাণীই আজ পা বাড়াইয়াছে,—ছুটিরই লক্ষ্য জীবন-সীমানাপ্রান্তে! হায় রে! এই উষর আকাশের বুকে কেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল ওই ছুটি ক্ষুদ্র তারা! কেনই বা জ্যোতি রেখায় উহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের চলিবার প্রয়াস জাগিয়াছিল,—আবার কেনই বা কক্ষচ্যুত উল্কার মত গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া এমনই অতর্কিতে পৃথিবীর অন্ধকারে মুখ লুকাইতে চাহে! আকাশের সুবিস্তীর্ণ সীমাহীন বক্ষে অনন্ত কোটি তারার আবির্ভাব—ওই ছুটি নক্ষত্রের দীপ্তিতে ছাইয়া গিয়াছে। বুঝি এই প্রচণ্ড বিদারণের অসীম শূন্যতা বাহিয়া বন্ধ্যা কর্কশ আকাশকে চিরকাল—জন্ম জন্ম ঐ তারকার দুঃখময় দুষ্কৃতিভারে হাহাকার করিতে হইবে!

সন্ধ্যার সময় সে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল, অনীতা উৎসুকনেত্রে তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

খোকা ম্লানমুখে দিদির হাতখানি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছুটি বৎসরের অভিজ্ঞতা তাহার চাঞ্চল্যকে সংহত করিয়াছে। অনন্তকে দেখিয়া সে বিনীতভাবে প্রণাম করিল। অনন্ত তাহার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া কুশল প্রশ্ন করিল।

পরে অনীতার পানে চাহিতে গিয়া দেখিল, সে তাহার মৃদু হাস্যরঞ্জিত মুখখানির ব্যগ্রতা দিয়া অনন্তর পানে প্রশ্ন-উন্মুখদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

কেহ কাহাকে অভিবাদন করিল না।

অনীতা হাসিমুখেই বলিল, "যাচ্ছি অনেক দূরে—কাথিয়াবাড়ে। অনাথ আশ্রমের কর্তৃত্বভার পেয়েছি।"

অনন্ত পরম অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া কহিল, "আমিই তোমার দেশত্যাগের কারণ।"

অনীতা সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি? কেন? না, না, ছি, ও কথা ব'লে আমায় দুঃখ দেবেন না। যাবার সময় আমি দুঃখ সম্বল ক'রে যেতে চাই না।"

পরে অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন কোমলকণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "তোমার কাছে যা পেয়েছি—তার তুলনা হয় না। সে জিনিষ পেয়েছিলুম ব'লেই আজ জগতের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কত তৃপ্তি পাচ্ছি। তুমি জান না—ক্ষুদ্রত্ব পরিহার ক'রে বৃহতে এসে পৌছানয় কত শান্তি—কত তৃপ্তি!"

অনন্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনীতা বলিল, "কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে। কখনো কিছু চাই নি—"

ব্যস্ত হইয়া অনন্ত বলিল, "বল। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।"

অনীতা বলিল, "তুমি দেশে ফিরে যাও,—আর—"

বাধা দিয়া অনন্ত বলিল, "আমি বুঝতে পেরেছি—কি তোমার অনুরোধ! আমিও মনে করেছি—অবশিষ্ট জীবন এই চেষ্টায়ই আমায় কাটাতে হবে। আমি যাব, অনীতা,—স্থির করেছি—আমি যাব।"

অনীতা উৎফুল্ল স্বরে বলিল, "আজ কত যে সুখী করলে আমায়।"

গার্ডের বাঁশী বাজিল,—সবুজ নিশান দুলিল,—সচেতন সরীসৃপের মত মেলের অনড় দেহটা নড়িয়া উঠিল।

অনন্ত অনীতার পানে চাহিয়া দেখিল,—তখনও সে মাথাটি হেলাইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

গাড়ীর গতি দ্রুত হইয়া উঠিলে অনীতা মুখ তুলিল।

ষ্টেশনের উজ্জ্বল আলোকের দীপ্তিতে অনন্ত দেখিল, তাহার অশ্রুসিক্ত ছুটি চোখের দৃষ্টি—এই দিকেই পলকহীন হইয়া নিবদ্ধ রহিয়াছে। সাড়ীর প্রান্তে সেই ব্রোচটিও তেমনই ভাবে শোভা পাইতেছে!—

কয়েক দিন সেই বিদায়কালের আলোক-বিচ্ছুরিত অশ্রুসজল দৃষ্টি ধ্যান করিয়া অনন্তের কাটিয়া গেল।

অন্তর অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলে মনে পড়িল অনীতার ব্যগ্র অনুরোধ—"তুমি ফিরে যাও।" সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, যাইবে। কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া কি এতই সহজ?

আরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল,—অনন্ত মন বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল। না, যাইতেই হইবে। কর্ত্তব্যের ফাঁসি সে স্বেচ্ছায় পরিয়াছে,—সহস্র লোক তাহার সে বন্ধনের সাক্ষী।

বিভা তাহাকে হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করিল। কহিল, "ছি ভাই, এমন অভিমান তোমার! শরীরটা যে একেবারে মাটী ক'রে ফেলেছ!"

অনন্ত অবনতমুখে স্নেহের অভিযোগটুকু উপভোগ করিল।

বিভা পুনরায় কহিল, "মেসো মশায়ের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। আর রেণু? তুমি হয় ত তাকে চিনতেই পারবে না। এসো, দেখবে এসো।"

দেখিবে আর কি? তাহারই ত্রুটিতে অপরাধের বোঝা ভারী হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য ভুলে আজ সংসারের সুচারু সুবিন্যস্ত আশা-আনন্দের সুসজ্জিত সামগ্রীগুলি শ্রীভ্রষ্ট—স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রির শুভ্রবক্ষে অন্ধকারের লেশমাত্র ছিল না। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাশ্রীতে পৃথিবী পরিস্নাত। রেণুর শয়ন-কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া চন্দ্রকিরণ শুভ্র বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া অন্ধকারময় কক্ষে একটি জ্যোতির সিংহাসন রচনা করিয়াছিল। অনন্ত অর্দ্ধশায়িতভাবে বাহিরের কৌমুদী-কিরণ-স্নাত উজ্জ্বল বৃক্ষরাজির পানে চাহিয়া বিগত স্মৃতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিল কি না,—কে জানে!

ধীরে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। এক ঝলক জ্যোৎস্নার সঙ্গে দুখানি ক্ষীণ কম্পিত চরণ একটি লঘুদেহের ভার বহিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। কক্ষদ্বার বন্ধ করিল। মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া স্তিমিত দীপশিখাটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। শয্যার আলোক সে আলোকে ম্লান হইয়া গেল।

অনন্ত দেহভার উঠাইয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে রেণুর পানে চাহিল। স্তিমিত দীপের ক্ষীণ শিখার মত এই যে জীবনের অবশেষ,—যাহা নিভিতে নিভিতে থমকিয়া গিয়া করুণ নয়নে পশ্চাতে চাহিয়া পরিত্যক্ত প্রাণকে মমতাময় আবেগে নিরীক্ষণ করিতেছে,—তাহা পুনঃ প্রজ্বালিত করিতে হইবে তাহারই সোহাগ-তৈলদানে! জীবনের বিনিময়ে জীবন,—প্রাণের শুষ্ক অঙ্কুর প্রণয়-সলিলে সঞ্জীবিত করিতে হইবে।

রেণু আসিয়া তাহার চরণে মাথা রাখিল। অনন্তর অন্তর মমতায় ভরিয়া উঠিল। আপনাকে আপনি ঘৃণায় শতবার ধিক্কার দিল। ছি! নিষ্ঠুর নারীহন্তা পশু!

রেণুর মাথাটি সে আপনার দরদভরা দুটি করে তুলিয়া ধরিয়া অবনত মুখের নিকটে মুখখানি আনিয়া হয় ত প্রথম দিনের সামান্য বিরোধের স্মৃতিটুকু ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। আনন্দে বেপথুমতী রেণুর সারাদেহে রোমাঞ্চ জাগিল—দুটি আঁখি অশ্রুসমাবেশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে কক্ষের দীপশিখা বারেকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া অকস্মাৎ নিভিয়া গেল এবং বাতায়ন-নিঃসৃত চন্দ্রালোক রেণুর অশ্রুসিক্ত মুখখানির উপর লুটাইয়া পড়িল।

স্মৃতির প্রহারে অনন্তের সারা অন্তর সচকিত হইয়া উঠিল। এই জ্যোৎস্নাস্নাত অশ্রুসিক্ত দুটি চোখের কোমল করুণ দৃষ্টি, সে দিন গতিশীল ট্রেনের গবাক্ষপথে, হয় ত আত্ম-জয়ের বেদনায় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যুজ্জ্বল আলোক-প্রহারে সে দিনের বিদায়-সম্ভাষণ সারা অন্তরের রক্তাক্ত স্মৃতিটুকু নীরব নয়নের ভাষায় বহিয়া আনিয়াছিল এবং আজিও তাহা নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

এই দুটি নয়নের অভ্যন্তরে অনুরাগ-উজ্জ্বল—সেই দৃষ্টিটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আবেগ-কম্পিত স্ফুরিত ওষ্ঠ মুহূর্ত্তের তরে কাঁপিয়া উঠিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত বিহ্বলতা কাটাইয়া—চুম্বনাকৃষ্ট ওষ্ঠকে সজোরে শাসিত করিয়া—সে রেণুর আনত মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিল।

একখণ্ড দ্রুত সঞ্চরণমান কৃষ্ণমেঘের অন্তরালে চন্দ্রদেবও অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সহ-শিক্ষা

আজকাল আমাদের দেশের সমক্ষে কয়েকটি নূতন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। সহ-শিক্ষা তন্মধ্যে অন্যতম। সহ-শিক্ষা অর্থে নর এবং নারীকে মিশ্রিত করিয়া একসঙ্গে শিক্ষাদান। এই ব্যবস্থার আদিস্থান মার্কিণ মুলুক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে মার্কিণ দেশে এই সহ-শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন মার্কিণের অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রায় সকল বিদ্যালয়েই বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, এবং যুবক-যুবতীরা একসঙ্গে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। ক্রমে এই ব্যবস্থা য়ুরোপেও আসিতেছে। য়ুরোপের অনেকগুলি দেশে এই ব্যবস্থা অল্পাধিক পরিমাণে অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু মার্কিণের ন্যায় ব্যাপকভাবে তথাকার কোন দেশেই উহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই এই সহ-শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান।

আমাদের দেশে এই ব্যবস্থাটি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বেশ একটু চেষ্টা সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি গবেষণা-পূর্ণ সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি অনেকটা সাবধানতার সহিত ঐ ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পর গত ডিসেম্বর মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে মার্কিণ-প্রবাসী অধ্যাপক ডক্টর সুধীন্দ্র বসু ঐ প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া আর একটি সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা দুই জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সুতরাং অধ্যাপনা-কার্য্যে অভিজ্ঞ। ইঁহাদের সমর্থন পাইয়া এক দল প্রগতিশীল লোক খুবই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন; সুতরাং যাঁহারা ইঁহাদের সহিত ভিন্নমতাবলম্বী, তাঁহাদের এই সময়ে স্বপক্ষের কথা বলা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এখন সকলের পক্ষেই নিরপেক্ষ-বুদ্ধিতে এবং ধীরভাবে এই বিষয়ের আলোচনা ও বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? নর এবং নারীকে ঠিক একরূপ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? বড়ই দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত দুইটি প্রবন্ধের কোন প্রবন্ধেই এই দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। ডক্টর রাধাকুমুদ বাবু বলিয়াছেন যে, সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিত হইলে সহশিক্ষায় সুফল ফলিতে পারে; আর এক জন বলিয়াছেন, মার্কিণে এই ব্যবস্থার সুফল ফলিয়াছে। কিরূপে সুফল ফলিয়াছে, তাহা সামাজিক তথ্য দ্বারা তিনি সপ্রমাণ বা নির্দ্দেশ করেন নাই। য়ুরোপে এবং মার্কিণে বিবাহ-ব্যবস্থা যে বানচাল হইয়া গিয়াছে বলিয়া রোদনধ্বনি উঠিয়াছে, তাহা এই সহ-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পরে না পূর্ব্বে? এই সহ-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পর বিবাহ-বিচ্ছেদের হার কমিয়াছে না বাড়িয়াছে, পত্নীহত্যা ও পতিহত্যার হার পর পর বাড়িতেছে না কমিতেছে, তাহা দেখাইয়া ইহার ফলাফল বিচার করা উচিত ছিল। তাহা কেহ করেন নাই। ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া কতকগুলি কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল কথা বলেন নাই। বোধ হয়, মনস্তত্ত্বের কতকগুলি কথা আলোচনা করিতে তিনি কতকটা লজ্জাজড়িত সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি এই সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কয়েকটি কথা বলিব।

মনুষ্য-জীবনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। প্রথম মত—হিন্দুদিগের। মানব-সৃষ্টির আদি-কাল হইতে মানুষের মনে স্ফুট বা অস্ফুটভাবে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, "এই জগৎ কি? আমরাই বা কি? এই বিশ্বের আদি-কারণই (first cause) বা কি?" এই সনাতন প্রশ্নের সমাধান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাই পরা বিদ্যা। ইহার সমাধানের উপরই সমস্ত সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে; কিন্তু প্রতীচীর বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা এই প্রশ্নের সমাধানে অসমর্থ হইয়াই যেন এই প্রশ্নটি মানুষের মন হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছেন। যাহা হউক, এ বিষয়টি সম্বন্ধে আমি এই প্রবন্ধে কোন কথা বলিব না; কারণ, ইহা এখন পরিত্যক্ত।

দ্বিতীয় মত—শিক্ষার উদ্দেশ্য, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির বিকাশসাধন করিয়া এবং প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ করিয়া, সংসারে ক্ষমতা এবং শক্তিলাভ। বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এই মত স্বীকার করেন। তাঁহারা প্রকৃতির রহস্য উদ্ভিন্ন করিয়া ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন সত্য, কিন্তু শান্তি-লাভ করিতে পারিতেছেন না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে কোথাও এমন কোন দোষ রহিয়াছে, যাহার ফলে তাঁহাদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। তাঁহারা সমস্ত জীবনটাই যেন একটা অখণ্ড সংগ্রাম বলিয়া মনে করিতেছেন। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম, মানুষের সহিত সংগ্রাম, তির্য্যক্ প্রাণীর সহিত সংগ্রাম, প্রতিবেশ অবস্থা এবং ব্যবস্থার সহিত সংগ্রাম প্রভৃতি লইয়াই মানুষের জীবন যদি কাটিয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ ইহজীবনে শান্তি পাইতে পারে না। তাই শান্তিলাভের জন্য মানুষের মন এত কাঁদিয়া উঠিতেছে। আসল কথা, বাহ্য প্রকৃতির এবং ব্যাপারের সহিত মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির সামঞ্জস্যসাধন করিয়া লইলেই শান্তিলাভ সম্ভবে। য়ুরোপ সে দিকে দৃষ্টি দান করিতেছেন না।

মানুষের অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তিগুলির অনুশীলন দ্বারা বিকাশসাধন করাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, নর এবং নারীর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তি কি সমান? উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কি প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই? অতি সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়, প্রকৃতি উভয় শ্রেণীর মানবকে বহু বিষয়ে সাম্য প্রদান করেন নাই। উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়েই বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকৃতিতে যেমন বৈষম্য, প্রকৃতিতেও সেইরূপ বৈষম্য। দেহের সর্ব্বত্রই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃতি বৈষম্যের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ব্যাধিভোগেও উভয়ের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। মানস প্রকৃতিতেও এই বৈষম্য পরিস্ফুট। যে সময়ে নারীদিগের

রজঃপ্রবৃত্তি হইতে থাকে অথবা হইবার উপক্রম হয়, সেই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম বয়সে বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ দ্রুত হইতে থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উন্নীত হইলে বালিকারা পিছাইয়া পড়িতে থাকে, তাহারা আর পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারে না। তাহারা দৈহিক এবং মানসিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতে থাকে। গ্রেট বৃটেনে ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কিশোরদিগের সহিত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইয়া কিশোরীদিগের দেহ ভগ্ন হইয়া যায়। ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, এ দোষ সহ-শিক্ষার নহে, স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দান করিলেও এ দোষ ঘটে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের মহিলা শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেন তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—"অধিকাংশ কলেজের মেয়েদের দেহ রুগ্ন, শীর্ণ এবং কঙ্কালসার, শ্রী ও স্বাস্থ্য পড়ার চাপে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শরীর সুস্থ না থাকিলে জীবনধারণই বিড়ম্বনা হইয়া যায়।" সভানেত্রী মহাশয়া দিল্লী প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানের অভিজ্ঞতা হইতেই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে কি মনে হয় না যে, নর এবং নারীকে একসঙ্গে শিক্ষাদান কেবল দোষের নহে,—উভয় শ্রেণীকে একই বিষয়ে এবং একই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান জীবনব্যাপী বিড়ম্বনার কারণ হয়?

আর একটা কথা সহ-শিক্ষার সমর্থন-কারীদিগের স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিধাতা বা প্রকৃতি নারীদিগকে জননী করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি নারী-জাতিকে আবশ্যক গুণাবলীতে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য জাতিরা নারীর এই মাতৃত্বের দিকটা তেমন ভাবে লক্ষ্য করেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের সাহিত্যে এবং ব্যবহারে নারীদিগের এই দিকটার প্রতি উপেক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও ঐ দিকটা প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি নারীচরিত্রে দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণা, সহানুভূতি, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সেবা-শুশ্রূষা করিবার প্রবৃত্তি যে পরিমাণে দিয়াছেন, নরচরিত্রে তাহা দেন নাই। স্নেহ-মমতা নারীর যত অধিক, পুরুষের তত অধিক নহে। কারণ, সন্তান পালন করিতে এই সকল গুণের অতিশয় প্রয়োজন। নারীদিগের অন্তঃকরণ পুরুষের অন্তঃকরণ অপেক্ষা উন্নত হইয়া থাকে। নারীদিগের অনেক ব্যাপারের সূক্ষ্মাংশ দর্শনের ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তির ব্যাপকতা পুরুষ অপেক্ষা কিছু সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। শিক্ষাদানকালে নারীদিগের এই বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নারীজাতির বৈশিষ্ট্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, এইরূপ ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। মিষ্টার জে লায়নেল টেলার বলেন যে, শিক্ষার ব্যাপারে যাহাতে নারীত্বের বিকাশসাধন হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতি এবং পুরুষ-জাতিকে একসঙ্গে এবং একই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

এ কথা খুবই সত্য যে, প্রকৃতি মাতৃত্বের ভার স্কন্ধে দিয়াই নারী-জাতিকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। বন্ধ্যা নারী ভিন্ন আর সকল নারীকেই সন্তান পালন করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য প্রকৃতি নারী সৃষ্টি করেন নাই, প্রকৃতির ব্যবস্থা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মানব-জীবনের কার্য্যকরী শক্তি বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। এই সময়েই নারীরা রজস্বলা হইয়া থাকেন। তখন মাসের মধ্যে অন্ততঃ চারিদিন নারীদিগকে দৈহিক এবং মানসিক শ্রম বর্জ্জন করিয়া থাকিতে হয়। এ সময়ে তাঁহাদের দৈহিক এবং মানসিক শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই জন্যই দেখা যায় যে, স্মরণাতীত কাল হইতে নারী পুরুষের অধীন হইয়া আছে। এই সময় নারী-জাতিরা এতই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, তাহারা অধিকাংশই এই সময়ে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসে। উইনবার্গ বলেন যে, নারীরা যত ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করেন, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক ক্ষেত্রে তাঁহারা রজস্বলা অবস্থাতে ঐ অপকর্ম্ম করিয়া বসেন। তাহার পর গর্ভাবস্থাতেও নারীদিগকে অনেকটা পুরুষের রক্ষাধীনে থাকিতে হয়। কাযেই তাঁহাদের পক্ষে পুরুষের অধীন হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, সে সময় তাঁহারা সর্ব্বথা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন না। মাতৃত্বের জন্যই আদিম যুগের মানবকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে এবং তাহাই মানুষের সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করিবার আদিকারণ বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা অনুমান করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় নারীরা যে কোন কোন বিষয়ে পুরুষের অধীন হইয়া পড়িবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

দ্বিতীয়তঃ নারীজীবনে গর্ভধারণ প্রয়োজন। কারণ, নারীরাই জাতিরক্ষক এবং বংশরক্ষক। যদি নারীর সংখ্যা অধিক থাকে, নর অতি অল্প থাকে, তাহা হইলেও জাতি রক্ষা পায়, কিন্তু নরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইলে এবং নারীর সংখ্যা অতিশয় অল্প হইলে জাতি রক্ষা পায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোন দেশে ভীষণ যুদ্ধ বা অন্য কোন কারণে অত্যন্ত অধিকসংখ্যায় পুরুষক্ষয় হইয়াছে, তখন নারীর সংখ্যা অধিক থাকাতেই সেই জাতির বংশ রক্ষা পাইয়াছে।

সুতরাং মাতৃজাতিই জাতিরক্ষার হেতু, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জাতিরক্ষার জন্যই প্রকৃতি দেবী ইহাদিগের উপর সন্তান ধারণের ও পালনের ভার দিয়াছেন এবং সে জন্য বিধাতা ইহাদিগকে বিশ্বের মঙ্গলসাধক কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণেরও অধি-কারিণী করিয়াছেন। কিন্তু সেই গর্ভধারণকালে নারীদিগের দেহে এমন কতকগুলি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়—যাহার জন্য তাঁহাদিগকে অন্যের অধীন হইয়া পড়িতে হয়। ঐ সময় তাঁহাদিগকে উৎকট মানসিক পরিশ্রম এবং উদ্বেগ হইতে দূরে রাখাই বিধেয়। গর্ভাবস্থার প্রথমকালে মাথাঘোরা, অরুচি প্রভৃতি দেখা দেয় এবং শেষ তিন মাস স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নারীকে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয়। পুরুষের জীবনে ঐরূপ কিছুই নাই। সুতরাং এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বিধাতা নারীকে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য অথবা এই উভয় জাতিকে সমগুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

কার্য্যক্ষেত্রে নরনারীর পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। নারীরা শুশ্রূষা কার্য্যে, লালন-পালন কার্য্যে এবং সহানুভূতি-প্রকাশে যত দক্ষ, পুরুষ সহস্র চেষ্টা করিলেও সেরূপ দক্ষতা প্রকটিত করিতে পারে না। আবার পুরুষ সাহস, বিক্রম, দেশরক্ষা, সংগ্রাম প্রভৃতি কার্য্যে যেরূপ দক্ষ, নারী তাহা হইতে পারেন না। অবশ্য কোন কোন পুরুষে নারীত্ব বা নারীভাবের আধিক্য আছে, আবার কোন কোন নারীতে পুরুষভাবের আধিক্যও লক্ষিত হয়। উহা ধর্তব্যের মধ্যে নহে সাধারণ অবস্থা দেখিয়াই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। যাহা অসাধারণ বা প্রকৃতির বিকৃতি হইতে উদ্ভূত, তাহা ধরিয়া বিচার করা সঙ্গত নহে। নর এবং নারীর গুণগত এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়, উহা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকরাও উহা অস্বীকার করিতে পারেন না। এখন জিজ্ঞাস্য, যাহাদের পরস্পরের দৈহিক এবং মানসিক বৈষম্য এত অধিক, তাহাদিগের শিক্ষাব্যাপারে সাম্য হইতে পারে কি না।

প্রকৃতি নারীজাতির উপর যে মাতৃত্বের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, সে ভার নারীজাতি যাহাতে যোগ্যতার সহিত বহন করিতে পারেন, নারীদিগের শিক্ষার তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ, জীবনের কার্য্য সুন্দরভাবে নির্ব্বাহিত করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত অন্তর্নিহিত গুণগুলিই শিক্ষার দ্বারা বিকশিত করিয়া লইতে হয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা সঙ্গত হইতে পারে না। উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থা সমান করিতে হইলে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে, তাহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতের একটি নারী, তাঁহার শিশুসন্তানটি বড় কাঁদিয়া বিরক্ত করিতেছিল বলিয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুর দিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছিলেন। এই নারীটি মাতৃত্বলাভের অনুকূল শিক্ষা লাভ করেন নাই, জননী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নাই, বরং উহাকে চাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রকৃতি বিকৃত হইয়া এইরূপ বীভৎসভাবে বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। সহশিক্ষা ক্রমবিবর্ত্তনের বিরোধী, বহু ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষাদান ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পরিপন্থী, এ সম্বন্ধে জনৈক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল সমাজতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

এইরূপ কথা পাশ্চাত্য দেশের অনেক সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং নর-নারীতত্ত্বজ্ঞ মনীষীই স্বীকার করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এবং স্থানাভাবে এ স্থলে তাহার উল্লেখ বা উদ্ধার করা হইল না।

অধ্যাপক টমসন বলেন, মাতৃত্বের পোষক গুণগ্রামই নারীকে মহীয়সী করিয়া তুলে। উহাই দাম্পত্য-জীবনকে মধুময় করিয়া দিবার কারণ। ঐ গুণই দাম্পত্য-জীবনকে দৃঢ় এবং সুখজনক করিয়া থাকে। এক জন সমাজতত্ত্বজ্ঞা পাশ্চাত্য মহিলা বলিয়াছেন যে, "নারীজাতির প্রকৃত ভালবাসার বনিয়াদ মাতৃত্বের কোমলতা দিয়া গড়া (The foundation of every true woman's love is a mother's tenderness)। এই মাতৃত্বগুণই রমণীর রমণীয়ত্ব। ইহা তাঁহাকে মনুষ্যত্ব হইতে দেবীত্বে উন্নীত করিয়া দেয়। মাতৃত্বের কোমলতাই মানব-সমাজকে প্রকৃত প্রগতির পথে চালিত করিয়া আসিতেছে। উহা বিকাশে যাহাতে বাধা না ঘটে, তাহার দিকে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাহা না করিলে মানব-সমাজের উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। *

লাটিন ভাষায় একটি প্রবচন আছে, তাহার অর্থ—"সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুর যদি বিকৃতি ঘটে, তাহা হইলে উহা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট হইয়া উঠে।" নারীগণ উন্নত এবং উন্নতিসাধক গুণযুক্ত। কিন্তু সেই নারী-চরিত্র যদি বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। নারী যদি মদ্যপায়িনী হইয়া পড়েন, ‡ তাহা হইলে তাঁহাকে আর মদ ছাড়ান যায় না, বেশ্যারা লম্পট পুরুষ অপেক্ষা অধিক অধঃপতিত হইয়া থাকে, ব্যবসায়ে নিযুক্তা নারী লাভের জন্য যত দর কষাকষি করে, পুরুষ ব্যবসায়ী তত করে না। ম্যাক্‌বেথ অপেক্ষা লেডী ম্যাক্‌বেথের চরিত্র অধিকতর ভীষণ। ইহাই স্বাভাবিক। সেই জন্য এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, সমাজের হিতসাধন করিতে হইলে যাহাতে নারীচরিত্র বিপথে চালিত শিক্ষার প্রভাবে ভ্রষ্ট বা বিকৃত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক।

নর এবং নারীর অবাধ-মিশ্রণ সর্ব্বতোভাবে কল্যাণজনক হইতেই পারে না। প্রকৃতি তাঁহার সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার উদ্দেশ্যে উহাদের মধ্যে যে দৈহিক মিলন এবং আসঙ্গলিপ্সা জন্মাইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। স্বভাবতঃ জীবজগতের সর্ব্বত্রই এই লিপ্সার তীব্রতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য মানব-সমাজে যে কত অপরাধ এবং অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কত পীড়ন ও মনস্তাপ সংঘটিত হইতেছে এবং হইয়া গিয়াছে, কত রাজ্য ছারেখারে গিয়াছে, এবং কত সংসার দগ্ধ হইয়া

* It is clear that any strict system of co-educating is self condemned. A girl's mind is always a little or a great deal different from a boy's mind in the process of growing and from boyhood upwards to maturity becomes more and more markedly divergent It is ridiculous if these natural distinctions are of value to attempt to train the unlike by like methods. * * * Co-education of the sexes, therefore, is in the nature of its assumption as anti-evolutionary as collective education, the former method would crush out sex individuality and the latter destroys the individuality of each individual.—Aspects of Social Evolution by J. Lionel Tayler, P 207.

* Womanly qualities are too precious to be risked rashly, they are allied too closely with higher advances in social development to be thrown carelessly away by thoughtless or dishonest disregard for them.—Taylers.

‡ The drunken woman is more irretrievably drunken than the man, the harlot more debased than the libertine, woman in business drives harder bargains — Ibid.

গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ইহার জন্যই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ভস্মীভূত, এবং ট্রয় নগরী ছারখার হইয়া গিয়াছে। ইহা যে কত পারিবারিক অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা সম্ভবে না। সুতরাং ইহাকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। মিল্টনের ন্যায় পিউরিটান্, নিউটনের ন্যায় মনীষী, পরাশরের ন্যায় ঋষিকেও ইহার প্রভাবে আত্মসংযম হারাইতে হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কৈশোরে অর্থাৎ নারীদিগের রজঃপ্রবৃত্তি হইবার সময় হইতে এবং পুরুষদিগের যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই এই প্রমাথিনী প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়া থাকে, ইহা শারীরবিজ্ঞানবিশারদদিগের সিদ্ধান্ত। সে সকল মত আর উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধি করিতে চাহি না। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে উহা সকলেই বুঝিবেন। তবে ব্যক্তিভেদে ও ব্যক্তির প্রকৃতিভেদে অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় এই প্রকৃতির প্রাবল্যেরও ইতরবিশেষ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। মানসিক এবং স্নায়বিক অবস্থার ভিন্নতায় এবং স্বাস্থ্যের তারতম্য অনুসারে এই প্রবৃত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রবৃত্তি যে গোড়ায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞানহীন তরুণদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সময়ে তরুণ-তরুণীদিগকে অবাধে মিশিতে দিলে তাহার ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। লোভনীয় বস্তু সম্মুখে থাকিলে এবং কতকটা সহজলভ্য হইলে, লোভের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবেই পাইবে। ইহা স্বাভাবিক। অস্বাভাবিকভাবে বর্দ্ধিত মনের আবেগ—প্রবৃত্তির প্রবাহ—চাপিয়া রাখা কঠিন এবং চাপিয়া রাখিলেও তাহার ফল ভাল হয় না। চিন্তার বা প্রবৃত্তির বেগ চাপিয়া রাখিলে যে নানাবিধ মানসিক এবং স্নায়বিক ব্যাধির উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, ইহা বর্ত্তমান যুগে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণী বিদ্যার (Psycho-analysis) দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। আবার প্রবৃত্তির প্রবাহে ভাসিয়া গেলেও সামাজিক এবং নৈতিক পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটে, পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তি শিথিল এবং চূর্ণ হইয়া যায়। ইহা অস্বীকার করা চলে না। জীববিশেষের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া থাকিলে বিপদকে পরিহার করা যায় না, বরং উহার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সেই জন্য আমি এই বিষয়ে সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি।

সুধী ডক্টর সুধীন্দ্রনাথ বসু মার্কিণ-প্রবাসী। মার্কিণে তিনি বহুকাল বসবাস করিতেছেন। সুতরাং মার্কিণী সমাজ সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ, এ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া মার্কিণীদিগের অপেক্ষা তিনি মার্কিণ সমাজ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে না। তিনি তথায় শিক্ষা-কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন; সুতরাং ইহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, তিনি ছাত্র-সমাজের কথা বিশেষভাবে জানেন। কিন্তু সে কথা সর্ব্বথা স্বীকার করা যায় না। যেখানে বহু ছাত্রকে একসঙ্গে অধ্যাপনা করা হয়, সেখানে ছাত্রদিগের মনোভাব ও আচরণ শিক্ষকের পক্ষে তন্ন তন্ন করিয়া জানা সম্ভবে না। তাহা হইলেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন যে, মার্কিণ মুলুকে অন্ততঃ গত ৫০ বৎসর ধরিয়া সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার ফল অতি সুন্দর হইয়াছে। সার মাইকেল, ই, স্যাড্লার বলিয়াছেন যে, "তের বৎসরের উপরে কিশোর-কিশোরীদিগকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া অবাঞ্ছনীয় এবং অবিবেকিতার কার্য্য।" সেই জন্য ডক্টর সুধীন্দ্র তাঁহাকে এই বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, Pure Sadler! Virtuous Sadler। তাঁহার যুক্তির বহর ঐ পর্য্যন্ত। যেন নিষ্পাপ এবং ধার্ম্মিক হওয়া অতি বড় দোষের! মার্কিণে প্রবাস করিয়া বঙ্গজননীর সন্তানের যে এইরূপ মনোবৃত্তি হয়, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এ সকল বিষয়ের আলোচনাকালে শ্লেষ-বিদ্রূপের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ধীরভাবে তথ্য এবং যুক্তির দ্বারাই প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। এইরূপ ভাবে বিদ্রূপ করাতে ডক্টর বসুর স্বপক্ষের যুক্তিহীনতা এবং মনের তরলতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

তৎপরে ডক্টর বসু আর এক জন ইংরাজ শিক্ষকের কথা বলিয়াছেন। সেই শিক্ষকটিকে বসু মহাশয় সুবিদিত এবং সরলভাবে চিন্তা করিতে পারেন বলিয়াছেন। ঐ শিক্ষকটি বলিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডের স্বতন্ত্র বিদ্যালয়গুলিকে এত প্রশংসা করা হয় বটে,—কিন্তু সেগুলি নীতিনিষ্ঠার নিলয় নহে। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি দুর্নীতির দুর্গ। নর এবং নারীদিগকে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা হয় বলিয়া দুর্নীতি-পাপ উহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে।" তিনি না কি আরও বলিয়াছেন যে, ইহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে সহ-শিক্ষা; কারণ, উহা প্রলোভনকে দূরীভূত করিয়া উহার আনুষঙ্গিক কুফল নষ্ট করিয়া দেয়। এই সুবিদিত শিক্ষক মহাশয় কি নাম ধরেন এবং কোথায় বসতি করেন, ডক্টর সুধীন্দ্র বসু তাহা প্রকাশ করেন নাই। ইঁহার কথার মর্ম্ম এই যে, প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে পাইলে লোক আর পাপ করে না। অর্থাৎ চোর যদি লোকের ঘটি-বাটি হাতের গোড়ায় পায়, তাহা হইলে সে সিঁদ কাটিয়া দূরস্থ প্রতিবেশীর গৃহে চুরী করিতে যায় না। কাযেই সে ধরা পড়ে না, অতএব সে নিষ্পাপ। "প্রবাসীর" প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছেলে-মেয়েদের একত্র শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"প্রাচীনপন্থীরা জানেন, কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা শকুন্তলার সখী যেমন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ছিলেন, তেমনই সতীর্থ ছিলেন শার্ঙ্গধর এবং শারদ্বত। শকুন্তলা কিন্তু ইঁহাদের কাহারও প্রণয়-পাশে অবদ্ধ হন নাই—হইয়াছিলেন দুষ্মন্ত নামক এক আগন্তুকের।" প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের এই নজীর প্রাচীনপন্থীরা মানিয়া লইতেই পারেন না। কারণ, ত্যাগের শিক্ষাস্থল তপোবনের আবহাওয়া আর ভোগের লীলাস্থল পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ের আবহাওয়া একরূপ নহে। তপোবনে যাহারা বাস করিত, তাহারা সামান্য বল্কল পরিধান করিয়া থাকিত, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল,—আধুনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের ন্যায় রুজ-পমেটম মাখিয়া, বিলাস বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া বিদ্যালয়ে যাইত না, অধিকন্তু তপোবনবাসীরা আধুনিক তরুণ-তরুণীদিগের ন্যায় ভগবানকে গদিচ্যুত করিয়া ভোগের দেবতা কন্দর্প ঠাকুরকে তাঁহার স্থানে বসাইত না। দ্বিতীয়তঃ, শার্ঙ্গধর ও শারদ্বত যে শকুন্তলার সহিত একসঙ্গে বসিয়া কণ্বমুনির নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন, এমন চিত্র ত কালিদাস শকুন্তলার কুত্রাপি অঙ্কিত করেন নাই। বরং যে দিকে শকুন্তলা ও তাঁহার

সখীগণ থাকিতেন,—সে দিকে শাঙ্গর্ধর প্রভৃতির দর্শন মিলিত না। তপোবনের যে অংশে শকুন্তলা ও তাঁহার সখীগণ থাকিতেন, সে অংশে শাঙ্গর্ধব ও শারদ্বতের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমের লীলা যেমন শকুন্তলার সখীদিগের নয়নে পড়িয়াছিল, তেমনই উহা শাঙ্গর্ধরাদির দৃষ্টিতে পড়িত। কুলপতি কণ্বের ভগিনী গোতমীর দৃষ্টিতে বরং উহা পড়িতে পড়িতে রহিয়া গিয়াছিল। শকুন্তলা শাঙ্গর্ধর ও শারদ্বতের সতীর্থ ছিলেন, এই সত্য প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দ বাবু কোথায় আবিষ্কার করিলেন? শকুন্তলা কণ্বের পালিতা কন্যা ছিলেন। স্নান করিতে যাইয়া কণ্ব শকুন্তলাকে মালিনী-তীরে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। শিষ্যরা সে কালে গুরুকন্যাকে স্বীয় ভগিনী মনে করিতেন। গুরুকন্যারাও পিতার শিষ্যদিগকে নিজ সহোদর ভাবিতেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে প্রেম-রসের সঞ্চার হইত না। বর্ষীয়ান্ রামানন্দ বাবু যে নজীর দাখিল করিয়াছেন, তাহা অন্য দিক দিয়াও বিচারসহ নহে। শাঙ্গর্ধর ও শারদ্বত কালিদাসের কল্পনার সৃষ্টি। মহাভারতে উহাদের উল্লেখ নাই। কাল্পনিক চিত্রকে কখনই বাস্তব ব্যাপারে নজীর বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। তবে এ কথা সত্য যে, পূর্ব্বকালে একই গুরুর নিকট বা অধ্যাপকের নিকট নর-নারীরা অধ্যয়ন করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত ক্বচিৎ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা একসঙ্গে একই পংক্তিতে বসিয়া পড়িতেন বা পাঠ লইতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব ঐ নজীর গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যাহা হউক, ডক্টর সুধীন্দ্র বসু মার্কিণে সহ-শিক্ষার ফল বড় ভাল হইয়াছে বলিয়া কয়েক জন মার্কিণবাসীর মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এক জন বলিয়াছেন যে, সহ-শিক্ষার দ্বারা মার্কিণ সমাজের নৈতিক উন্নতি ঘটিয়াছে। তিনি তথ্য দ্বারা উহা সপ্রমাণ করেন নাই। তিনি যদি ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিতেন যে, গত ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে মার্কিণে প্রতি বৎসর যত সংখ্যায় পতি-পত্নী-হত্যার মামলা উপস্থিত হইত, অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা ঘটিত, এখন তাহার শতাংশের একাংশও হয় না, তাহা হইলে তাঁহার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবার মত হইত, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তিনি সে পথে হাঁটেন নাই। এ দিকে মার্কিণ বিচারপতি লিণ্ডসে তাঁহার লিখিত Companionate marriage (আসঙ্গ বিবাহ) এবং Revolt of modern youth নামক গ্রন্থ দুইখানিতে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, মার্কিণে ব্যভিচারের ব্যাপকতা এতই বাড়িয়াছে যে, উহাকে আর দুর্নীতি বা অপরাধ বলিয়া ধরা যাইতেছে না। তিনি বলেন, এখন আইন করিয়া ব্যভিচারকে দুর্নীতির পর্য্যায় হইতে সুনীতির পর্য্যায়ে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখের মার্কিণের হেরাল্ড এণ্ড একজামিনার পত্রে মার্কিণের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড এসানুডেও মার্কিণ যুবক-যুবতীদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার সম্বন্ধে এক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের দুর্নীতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা দায়ী। বস্তুতান্ত্রিক এবং ধর্ম্মজ্ঞানহীন শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফলে ছাত্র এবং ছাত্রীরা অধঃপাতে যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংগঠন অপেক্ষা সংহারের কার্য্যই অধিক চলিতেছে।" সিকাগো সহরের মহিলা পুলিস আন্না লুকস্ বলিয়াছেন,—"মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের সমবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা আজ উচ্ছৃঙ্খল নর-নারীপূর্ণ নাচঘরে এবং সহরের বাহিরে প্রমোদশালায় মদ খাইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেছে।" ইনি লিখিয়াছেন যে, মার্কিণে ১৪ বৎসরের অনধিক-বয়স্কা মেয়ে ও ছেলেরা অবাধ প্রেম, পরীক্ষা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে। * বিচারক লিণ্ডসে লিখিয়াছেন যে, "তথায় ১১ বৎসর-বয়স্ক বালক-বালিকারা ব্যভিচারে লিপ্ত হইতেছে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের মধ্যে ছাত্রীরা ছাত্রদিগকে লাম্পট্যে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া থাকে।" উক্ত লেখক তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "পূর্ব্বে ডেনভার সহরে শতকরা ৫০ জনের অধিক বিদ্যালয়ের ছাত্র বেশ্যালয়ে যাইত, এখন বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীরা আপনাদের মধ্যে তাহাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে।" পরিণতবয়স্ক নর এবং নারীদিগের মধ্যে যৌন পাপের প্রসার এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বালক-বালিকারাও প্রকাশ্যে ঐ পাপ করে। ডাক্তার এডিথ্ হুকার নাম্নী এক জন মহিলা চিকিৎসক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। ধনী পরিবারবর্গের মধ্যে সাত আট বৎসরের বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে শিক্ষা করে। আমি পাদটীকায় উক্ত লেখিকার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। † উহার অনুবাদ আর দিলাম না। আর নরক ঘাঁটিতে প্রবৃত্তি নাই। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মার্কিণে সহ-শিক্ষার ফল কিরূপ চমৎকার হইতেছে, ডক্টর বসু যদি তাহা না দেখেন, তাহা হইলে আর কি বলিব? অন্যান্য দেশেও স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিশ্রণের ফলে সমাজে ব্যভিচার বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে। তথায় সহ-শিক্ষার কুফল লক্ষিত হইতেছে। এ বিষয়ে আমি সকলকে Havelock Ellis প্রণীত Sex in Relation to Society নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বলি। তবে যাঁহারা কামবৃত্তি চরিতার্থ করাকে পাপের তালিকা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা ততটা প্রগতিশীল হইতে পারি নাই।

কিন্তু এই কদাচারের ফল তথাকার সমাজে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। তথায় স্ত্রীহত্যা এবং স্বামি-হত্যার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মিসেস লিলিয়েণ্ডাল নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিতা মহিলা স্বামিহত্যার অপরাধে আদালতে

* Chicago Herald and Examiner, 10th December 1927. শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত "মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা" নামক গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

† It is not very unusual even among the most cultivated and wealthy families for little ones of seven or eight to have lovers of about their own age with whom they have sexual intercourse sometimes in the presence of others. (Laws of sex by Dr. Edith Hooker page 328.)

অভিযুক্তা হইয়াছিলেন! তাঁহার পক্ষসমর্থনকারী বলেন যে, তাঁহার মত এক জন শিক্ষিতা মহিলা যে স্বামীকে হত্যা করিবে, ইহা সম্ভবে না। উত্তরে সরকারপক্ষের উকীল বলেন, What is unusual about a woman killing her husband now-a-days. "আজকাল এ দেশে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীকে হত্যা করায় অসাধারণত্ব কি আছে?" এরূপ মামলা মার্কিণের সকল আদালতেই উপস্থিত হইতেছে। ফল কথা, মার্কিণের তরুণ-তরুণীরাই এখন অপরাধকারীদিগের মধ্যে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ছাত্রমহলে ব্যভিচারের প্রাবল্য কত অধিক, তাহা Carolina Magazine নামক পত্রে ছাত্রদিগেরই স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সে সকল কথা আর উদ্ধৃত করিতে চাহি না। উহা বড়ই বীভৎস। মার্কিণী সমাজের উপর পাপের প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। তথায় তরুণ-তরুণীরাই অপরাধীর অগ্রগণ্য। সিকাগো অপরাধ অনুসন্ধান সমিতির প্রেসিডেণ্ট এডোয়ার্ড ইগোর ন্যাশনল হোটেলের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, "মার্কিণ মুলুকের পুরাতন অপরাধী আর নাই; এখন তরুণ-তরুণীরা তাহাদের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরাধ অনুষ্ঠান ব্যাপারে যুবতীরা যেরূপ প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, মার্কিণের ইতিহাসে এরূপ আর কখনও হয় নাই।" * তথায় গণতন্ত্রের স্থানে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং কোটিপতির শিক্ষিত সন্তানরা শিশু অপহরণ করিয়া লোকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেছে। তথাকার রাজনীতিজ্ঞগণ এই অসম্ভব অপরাধ বৃদ্ধির জন্য মদ্য-পান-নিবারণ আইন (Volstead act) প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফলও ভাল হয় নাই। তথায় বিষাক্ত এলকোহল বা সুরাসার পান করিয়া যত লোক মরিয়াছে, তত লোক একটা বড় যুদ্ধেও মরে না। গোপনে মদ্য প্রস্তুত চলিতেছে। ফলে মার্কিণের অনেক বড় বড় চিন্তাশীল লোক বলিতেছেন যে,"জাতির চরিত্রে যদি উচ্ছৃঙ্খল ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা হইলে জাতির অধঃপতন ঘটিবেই ঘটিবে। ব্যাবিলন এবং রোমের কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য।" আজকাল য়ুরোপের এবং মার্কিণের এক দল লোক বলিতেছেন যে, সভ্যতাটা একটা কৃত্রিম ব্যাপার, প্রাকৃতিক অবস্থাই ঠিক। ডক্টর সুধীন্দ্র বসু মহাশয় কি সেই মতাবলম্বী?

যাঁহারা বলেন, সভ্য অবস্থা অপেক্ষা প্রাকৃতিক অবস্থা ভাল, তাঁহাদের সকল কথার প্রতিবাদ করিবার স্থান এবং সময় আমার নাই। উহার সকল কথার প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজনও আমাদের নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা গবেষণার বা অনুমানের সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে,আদিম মানব বা পশুভাবাপন্ন আদি-যুগের মানব (man-animal) পশুর ন্যায় বনস্থলীতে বিচরণ করিত; তাহার সঙ্গে কেবল নারী ও তাহার সন্তানাদি থাকিত। ইহা অবশ্য পূর্ণমাত্রায় অনুমান। কিন্তু সে সময়ে নরনারীরা যে ব্যভিচারী ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বহু তির্য্যক্ প্রাণীর মধ্যে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা জোড়ায় জোড়ায় বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার নাই। যথা—পক্ষী, সর্প, সিংহ প্রভৃতি। সুতরাং মানুষের যে নিতান্ত আদিম অবস্থায়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যভিচার ছিল, ইহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমস্তই কাল্পনিক বা আনুমানিক। কারণ, আদি-মানবের অবস্থা ঠিক কিরূপ ছিল, তাহা কেহ দেখে নাই। উহা লক্ষ্য করিবার অবসর কাহারও ঘটে নাই। এরূপ অবস্থায় মানবের দাম্পত্য-জীবন কি করিয়া গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বুঝা এবং বলা কঠিন। উহার অধিকাংশই অনুমানসিদ্ধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিছুই নহে। এরূপ ক্ষেত্রে এই অনুমানসিদ্ধ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিজ্ঞানের (Exact science) সিদ্ধান্তের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না এবং সেই সিদ্ধান্তের দোহাই দিয়া ব্যভি-চারকে প্রাকৃতিক বলিয়া পাপের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ঘোর মূর্খতার কর্ম্ম।

আমাদের মনে হয়, নারীর উপর সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং সন্তান-প্রতিপালনের ভার প্রকৃতিপ্রদত্ত—ইহা প্রত্যক্ষ তথ্য। সুতরাং সেই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য তাঁহারা যাহাতে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যোগ্যতার সহিত পালন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে সেই শিক্ষাই দেওয়া আবশ্যক। পুরুষের সহিত তাঁহাদিগকে এক-সঙ্গে বসাইয়া একই বিষয় শিক্ষাদানের প্রয়োজন নাই। জ্ঞানের বিষয় এতই বিস্তৃত যে, মানুষ আমরণ সাধনা করিলেও তাহার শতাংশের একাংশও অধিগত করিতে পারে না। সুতরাং যাহার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার পক্ষে তাহা সম্যক্‌ভাবে করিবার যোগ্যতা লাভ করিবার চেষ্টা করাই বিধেয়। পুরুষ দেশরক্ষা করিবে, কৃষিকার্য্য করিবে, বাণিজ্য করিবে, শান্তিরক্ষা করিবে, তাহাদিগকে তাহার জন্য যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক,তাহাই শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। নারী সন্তান পালন করিবে, শিশুদিগের জীবন ও মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলিবে, সেবা-শুশ্রূষার কার্য্য করিবে, গৃহ-স্থালীর কার্য্য করিবে, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিবে, ইহাই ছিল প্রাচীন মত। এখন নবীনপন্থীরা সব ওলট-পালট করিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন। ইহার ফল ভাল হইতেছে না; হইবেও না। প্রতীচ্য জাতিরা যে ভুল করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে, ভারতবাসীরা কি আজ তাহাই তাহাদের দেশে আমদানী করিবে? প্রতীচ্য জাতিরা বলবান্, তাহারা যাহা সহ্য করিতে পারিতেছে, দুর্ব্বল ভারতবাসীরা কি তাহা সহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে? সমস্যা এইখানে।

ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা খুব সাবধানতার সহিত পরিচালিত করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন যে, An unregulated mixture of sexes has its evils at all ages অর্থাৎ "অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে নর-নারীর মিশ্রণ সকল যুগেই কুফল প্রসব করিয়া আসিতেছে।" আবার বলিয়াছেন, "All are not always fit for co-education অর্থাৎ সকলেই সকল সময়ে সহ-শিক্ষার যোগ্য নহে।" এখন জিজ্ঞাস্য, কে যোগ্য, কে অযোগ্য এবং কখন্ যোগ্য, তাহা গোড়ায় বুঝা যাইবে কি করিয়া? ঠিক বুঝিবার

* The old criminal as cartooned with the short hair and the undershot jaw is no more and the youth of the land is out in front. Criminally the girls are playing a more conspicuous part than ever before in crime history.

উপায় নাই। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন—What Psyco-analysis calls 'repression' has its evils অর্থাৎ সাইকো-এনালিসিস বিজ্ঞানবিদ্‌রা যাহাকে মনোভাবের নিষ্পেষণ বলেন, তাহার নানা দোষ বিদ্যমান; সহ-শিক্ষার যে দোষ আছে বা দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই ধর্ম্মহীনতার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে সহ-শিক্ষায় সম্যকপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা কি সম্ভবে? কোথাও তাহা হইতেছে কি? কুত্রাপি না। অতি-সাবধান ইংলণ্ডেও নহে। তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবতী কিশোরীরা মর্দ্দানা-ভাবের (Tomboy stage) মধ্য দিয়া গতি করে। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের নারীসুলভ শালীনতা পরিহার পূর্ব্বক কিছু দিনের জন্য মর্দ্দানাভাব গ্রহণ করে। এই সময় তাহাদের যে চরিত্রভ্রংশ হয় না, তাহা নহে। পর-জীবনে হয় ত কেহ কেহ তাহার প্রভাব পরিহার করিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই পারে না। তবে এখন খাল কাটিয়া ঘরে এই কুমীর আনিবার প্রয়োজন কি?

ডক্টর মুখোপাধ্যায় সাইকো-এনালিসিস বা মনোভাব বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, প্রকৃতিদেবী সৃষ্টির প্রবাহ রক্ষার্থ এই যৌন প্রবৃত্তি সর্ব্বজীবেই দিয়াছেন। তির্য্যক্ প্রাণিসমূহে এই প্রবৃত্তি যেমন, মানুষেও উহা সেইরূপ। তবে অনেক তির্য্যক্ প্রাণীর এই উত্তেজনা সাময়িক, কিন্তু মানুষের তাহা নহে। পরন্তু মানুষে উহা বড় প্রবল। তির্য্যক্ প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায় যে, পুরুষে ঐ প্রবৃত্তি বড়ই প্রমাথী হয়; হস্তীই মস্তী হয়, গো মহিষ মেষ বরাহ প্রভৃতিকে নষ্টপুংস্ত্ব করিয়া তবে পুষিতে হয়। নতুবা তাহারা কোন বাধা মানে না। স্ত্রী-জীব সাময়িক উত্তেজনাকালে ডাকে মাত্র। বিজ্ঞান-বিদ্‌রা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নারীদিগের ঐ প্রবৃত্তি অনেকটা নিষ্ক্রিয় (passive); অন্ততঃ পুরুষের তুলনায় অনেকটা নিষ্ক্রিয়, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নহে। কিন্তু উত্তেজনা পাইলেই উহা সতেজ হইয়া উঠে। পুরুষের সঙ্গফলে অথবা কামোদ্দীপক গ্রন্থাদি পাঠ করিলে ঐ প্রবৃত্তি প্রবল হইবেই হইবে। তখন উহা নিষ্পেষণ করিতে গেলেই উহার ফল বিপরীত হইয়া থাকে। সেই জন্যই মনুষ্য-চরিত্রজ্ঞ কালিদাস বলিয়াছেন, 'অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ।' তবে আর ঘরে ঘরে অভিসারিকা শূর্পনখার সৃষ্টি করিয়া লাভ কি? আমি সঙ্ক্ষেপে কথাগুলি বলিয়া দিলাম। ইহার বিস্তৃত আলোচনা সঙ্গত নহে। মনস্তত্ত্ববিৎ পাঠকরা এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিবেন। প্রবৃত্তিকে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করিয়া নিষ্পীড়ন করিতে যাইলে উহা করা সম্ভব হইবে না। অতএব সাবধান!

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন।

ব্যথার সুর

অজানা সে কোন্ দূরদেশী বীণ হৃদয়-বীণার ছিন্নতারে
বেদন-বেহাগ বাজায় নিয়ত আজিকে ব্যথার অশ্রুধারে।
বঞ্চিত এই বিশ্বের ব্যথা মরমেতে হানে বাজ
হতাশার বাণী বিরহীর গাথা জগৎ ভরিছে আজ।
সুন্দরী তুমি প্রণয়িনী নারী, প্রেমে তুমি পরিপুর,
কেন তোলো তবে বোধন-বাঁশীতে রিক্ত বিদায়-সুর!
স্নেহ-ভালবাসা থাকে যদি ওগো তোমার পাষাণ-বুকে;
কেন ফুটাবে না অপূর্ণ আশা পরিপূর্ণের সুখে!

ফাগুন রাতের নিরালা স্বপ্ন মৃদু দক্ষিণ বায়
নিশ্বাস সম চিত মর্ম্মরি কোথায় মিলায়ে যায়!
বিশ্বগ্রাসী হাহাকার ঘোর, অপূর্ণতার ব্যথা
যদি ভুলাইতে পারিত আমার বাণীর কল্পগাথা;
বৈতরণীর আঁধার কূলেতে রাখিয়া যেতাম সুর
মূর্চ্ছনা যার আকুল করিত ব্যথার মর্ত্ত্যপুর।

শ্রীমতী পুষ্পরেণু সিংহ।

রাজার রাণী

(গল্প)

গঙ্গার তীর ঘেঁসিয়া প্রাচীন শ্মশান। তাহার উপরেই শ্মশানেশ্বরের মন্দির। কোন্ মহাত্মা এই শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, অথবা প্রতিষ্ঠাব্দ কোন্ শতাব্দীর অঙ্কে আশ্রয় লইয়া তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মধ্যে মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণের দেবতা, সর্ব্বসাধারণ অবকাশ পাইলেই স্নানান্তে দেবতার মাথায় এক লোটা গঙ্গাজল ঢালিয়া দিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন, কিন্তু জীর্ণ মন্দিরটির যে আশু সংস্কার প্রয়োজন, সে দিকে লক্ষ্য দিবার অবকাশ পাইতেন না। গ্রামবাসীদের এই নিস্পৃহভাব দেখিয়া অবশেষে দেবতা নিজেই নিজের উপায় করিয়া লন।

শুনা যায়, কলিকাতার এক ধনী ব্যবসায়ীর বাণিজ্য-তরণী একদা এই ঘাটে ভিড়িয়াছিল। ব্যবসায়ী স্বয়ং সেই তরণীতে ছিলেন এবং ঘটনাচক্রে এই স্থানেই তাঁহাকে রাত্রিবাস করিতে হয়।

এই ঘটনার সপ্তাহ পরেই কয়েকখানি মহাজনী ভড় আসিয়া এই ঘাটে নোঙ্গর ফেলে। দেখা গেল, ভড়গুলি ইট, পাথর, চূণ, সুরকী, বালি প্রভৃতি মাল-মসলায় পূর্ণ এবং কৌতূহলী গ্রামবাসী সবিস্ময়ে শুনিল, যে ব্যবসায়ী একদা এই ঘাটে রাত্রিবাস করিয়া গিয়াছেন, তিনিই এই ভড়গুলি পাঠাইয়াছেন—শ্মশানেশ্বরের জীর্ণ আবাস ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ নাটমন্দিরটির আমূল সংস্কারের জন্য। তখনই গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া যায় এবং দানশীল মহাজনের এই সঙ্কল্পের মূলতত্ত্ব অন্বেষণে গ্রামের বহু মাতব্বরই আকুল হইয়া উঠেন। অবশেষে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে, সেই রাত্রিতেই মহাজন বাবার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কোনও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন, যাহার প্রভাবে তিনি এই ধ্বংসোন্মুখ দেবায়তনটির আমূল সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন।

সংস্কারের পূর্ব্বে শ্মশানেশ্বরের নিয়মিত পূজারও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। যাঁহার ইচ্ছা হইত, তিনি একটু জল বা দুটি ফুল-বেলপাতা বাবার মাথায় ফেলিয়া যাইতেন। সারা বৎসরের মধ্যে দুইটি দিন বাবার পূজার আড়ম্বরের অন্ত থাকিত না। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে যেমন সন্ন্যাসীদের উদ্দাম উৎসব দেখা দিত, পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বাহ্নে তেমনই কুমারী কন্যাদের সমাগমে, তাহাদের কলকণ্ঠের মধুর শিবস্তোত্রে মন্দিরে একটা অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিত। এই দিন নানা বয়সের কুমারীরা গঙ্গাস্নানান্তে দলে দলে মন্দিরে আসিয়া শিবের মাথায় ফল-ফুল-মালা চড়াইয়া থাকে—মনোমত পতিকামনায়। কুমারী কন্যা-দের এই ভাবে শিবমন্দিরে সমাগমসূত্রে সম্ভবতঃ গ্রামখানি কন্যাহাটি নামে প্রসিদ্ধ হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বাহ্নে কুমারীদের এই শিবপূজার প্রথা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু কন্যাহাটি গ্রামের কুমারীরা নহে, সন্নিহিত দূরস্থ গ্রামের কন্যারাও এই স্মরণীয় দিনটিতে এই উদ্দেশ্যে বাবার স্থানে পূজা দিতে আসে, অভিভাবিকারা সঙ্গে থাকিয়া পতিলাভ সম্বন্ধে যত প্রকার উচ্চ প্রার্থনা হইতে পারে, তাহা বাতলাইয়া দেন।

সংস্কারক শুধু মন্দির সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে নিয়মিতরূপে যথাবিধি দেবার্চ্চনা হয়, তাহার জন্য মাসিক একটা চাঁদার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং গ্রামেরই এক নিষ্ঠাবান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

সুসংস্কৃত দেবায়তনে এই প্রথম পৌষ-সংক্রান্তির উৎসব। প্রভাত হইতেই পূজার্থিনীরা পৌষের শীতে গঙ্গাস্নান করিয়া মন্দিরে চলিয়াছে মন্দিরেশ্বরকে প্রসন্ন করিতে। প্রত্যেকেরই হাতে শিবপূজার বিবিধ উপচার। প্রধান পুরোহিত মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া পূজাপ্রসঙ্গে প্রত্যেক কুমারীকেই সাহায্য করিতেছিলেন। যাহারা মন্ত্র জানে না, তাহাদিগকে পূজামন্ত্র পড়াইয়া ও পদ্ধতি দেখাইয়া, শেষে কি বর চাহিতে হইবে, তাহাও হাসিমুখে বলিয়া দিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীদের কচি কচি মুখগুলি সলজ্জ হাসিতে ভরিয়া উঠিতেছিল।

মন্দিরের ভিতর অর্চ্চনার স্তোত্র যেমন অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল, মন্দিরের বাহিরে নাট-মন্দিরের শেষপ্রান্তে বাঁধানো চাতালটির নীচে বসিয়া এক শীর্ণকায় খঞ্জ তেমনই নিরবচ্ছিন্ন আর্ত্তস্বর তুলিয়াছিল। বেচারা তাহার বসিবার স্থানটুকু ঠিক নির্ব্বাচন করিতে পারে নাই। মেয়েরা গঙ্গার ঘাটে স্নান সারিয়া যে পথে নাট-মন্দিরে উঠিতেছিল, সেই সন্ধিস্থলটি আশ্রয় করিয়া সে ভিক্ষায় বসিয়াছিল। মেয়েদের সারা মন তখন মন্দিরে ছুটিয়াছে, শিবের পূজা না সারিয়া হাতের উপচারের এক কণাও খঞ্জের সম্মুখে আস্তৃত ন্যাকড়াটির উপর নিক্ষেপ করিবার কল্পনাও কাহারও মনে উঠে নাই, উঠিতে পারে না। অতঃপর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূজার্চ্চনার পর অন্য পথ দিয়া তাহারা সকলেই চলিয়া যায়, ঘাটের পথে ফিরিবার প্রয়োজন তাহাদের থাকে না এবং দুর্ভাগা ভিখারীর আর্ত্তস্বর তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

পূজার্থিনীদের জনতা তখন বিরল হইয়া আসিয়াছে, বেলাও অনেকখানি হইয়াছে। এই সময় দুটি তরুণী স্নান করিয়া নাট-মন্দিরের দিকে আসিতেছিল। দুজনেই প্রায় সমবয়স্কা,—পঞ্চদশীর গণ্ডী পার হইয়া গিয়াছে। দুটিতে একসঙ্গে প্রায় পাশাপাশি আসিলেও, অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্ত্তিনী কন্যাটির বেশভূষা ও ভাবভঙ্গী যেন একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তাহার সঙ্গিনীকে পদে পদে খাটো করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। আর সেই সঙ্গিনীটির সাজসজ্জার দৈন্য যতই থাকুক না কেন, তাহার সহজাত অপরিসীম সৌন্দর্য্য তাহাকে অতি সন্তর্পণে ঢাকিয়া নিজেকেই মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছিল। রূপের এই স্পর্দ্ধাকে দাবাইবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কিন্তু নিজের প্রবৃত্তিকে সে তাহার সীমার বাহিরে যাইতে দেয় নাই। একই বাড়ী হইতে

তাহারা দুই জনে আসিয়াছে, এক সংসারে একান্নে তাহারা উভয়ে প্রতিপালিতা, তথাপি সে বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান এবং তাহার স্থান অনেক নিম্নে।

বাড়ীর পরিচারিকা ইহাদের পিছনে পিছনে আসিতেছিল। তাহার এক হাতে প্রথমোক্তার পূজার উপচারপূর্ণ একখানা বড় থালা, অপর হাতে তাহার পরিত্যক্ত ভিজা কাপড় গামছায় বাঁধা। শেষোক্তা মেয়েটি মাটীর একখানি সরায় ভরিয়া পূজার সামগ্রীগুলি সাজাইয়া আনিয়াছে। তাহাতে আছে আতপ-চাল, ছাড়ানো কড়াইশুটি, দুটি শাঁকআলু, একটা কমলালেবু, খানিকটা পাটালি; তাহার উপরে দক্ষিণার একটি পয়সা। এই উপচারগুলি তাহার মা অতি কষ্টে কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। মেয়েটি নিজের ভিজা কাপড়খানি গুছাইয়া তাহার উপর উপচারপূর্ণ সরাখানি রাখিয়াছে। তাহার উপরে পাতায় মোড়া একছড়া ফুলের মালা, কিছু ফুল, দূর্ব্বা ও কতকগুলি পরিচ্ছন্ন বেলপাতা চন্দনচর্চ্চিত। প্রথমোক্তা মেয়েটির পূজার উপচারপাত্র যাহা দাসীর জিম্মায় রক্ষিত, তাহাতে নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন এবং দক্ষিণার্থ পূর্ণ একটি রজতখণ্ড!

কন্যা দুইটি পূর্ব্বোক্ত খঞ্জের কাছটিতে আসিবামাত্রই সে আর্ত্তস্বরে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কেউ আমার দিকে ফিরে তাকায় নি, একটা দানাও এখানে পড়ে নি, তোমরা দয়া কর, মা! কাল সারা দিন-রাত পেটে দানাপানি পড়ে নি গো!" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রথমোক্তা মেয়েটি সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, কিন্তু অপরটি খঞ্জের সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল; সে হেঁট হইয়া দেখিল, সত্যই এত বেলা পর্য্যন্ত তাহার ময়লা কাপড়খানা শুধুই পাতা রহিয়াছে, একমুঠি চাউলও তাহার উপর পড়ে নাই। দেখিয়া দুই চক্ষুর পাতা তাহার ভিজিয়া গেল।

কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তিনী পরিচারিকার তীক্ষ্ণস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ঝঙ্কার দিয়া কহিতেছিল, "কি দেখতে দাঁড়ালে এখানে, বাছা? ভ্যালা মেয়ে যা হোক!"

কিন্তু যাহার উদ্দেশে এই তীক্ষ্ণ কথা, সে তৎক্ষণাৎ কলার পাতার মোড়া ফুলের ঠোঙ্গাটি তুলিয়া রাখিয়া, চাল ও অন্যান্য উপচারপূর্ণ সরাখানি সেই খঞ্জের সম্মুখে আস্তৃত কাপড়খানির উপর রাখিয়া দিল।

পরিচারিকার রুক্ষস্বরে অগ্রবর্ত্তিনী কন্যাটি ফিরিয়া চাহিয়াছিল, সঙ্গিনীর কাণ্ড দেখিয়া সে ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল,—"করলি কি পোড়ারমুখী, করলি কি! ঠাকুরের জিনিষ কুকুরের মুখে দিলি?"

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া দাসীও সঙ্গে সঙ্গে রসান দিল,—"অ-মা, এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড ত কোথাও দেখি নি! হাত যে খসে যাবে!"

কোনও উত্তর না দিয়া শেষের মেয়েটি মুখখানি নীচু করিয়া মন্দিরের দিকে চলিল। খঞ্জ তখন সুর ফিরাইয়া ভগ্নস্বরে স্বস্তিবাচন শুনাইতেছিল,—"রাজরাণী হও, মা! রাজরাণী হও, মা! রাজরাণী হও!"

* * * *

যে মেয়েটি এরূপ দুঃসাহস দেখাইয়া গেল, তাহার নাম মমতা এবং তাহার প্রগল্‌ভা সঙ্গিনীটির নাম গঙ্গা। গঙ্গার পিতা কোনও এক ঘুমন্ত জমীদারের বিপুল জমীদারীর নায়েব ও তহশীলদার। কন্যা দুটি। গ্রামে তাঁহার প্রবল প্রতাপ ও প্রতিপত্তি। মমতার পিতার অবস্থা এক সময়ে বিশেষ ভালই ছিল, কিন্তু ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও সেই অবসরে জ্ঞাতিগণের চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সপরিবার পথে দাঁড়াইতে বাধ্য হন। তাঁহার শ্বশুর, গঙ্গার পিতামহ তখন জীবিত, তিনি সাগ্রহে কন্যা-জামাতাকে আনিয়া নিজ সংসারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। মমতার বয়স তখন সাত বৎসর, তাহার কোলে পর পর দুইটি ভাই ও বোন। একটির বয়স পাঁচ, অপরটি দুই বৎসরের শিশু। তাহার পর আট বৎসর অতীত হইয়াছে। মাতার স্নেহময় মাতামহ অনেক দিন হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া পরলোকের পথে পাড়ি দিয়াছেন। মামাই এখন সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং তাঁহার মন্ত্রণাদাত্রী মমতার মামীঠাকুরাণী,—গঙ্গার মা। মামার সংসারে মমতার বর্ত্তমান অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

মন্দিরে প্রবেশ করিতেই পুরোহিত ঠাকুর ব্যগ্র উল্লাসে গঙ্গাকে বাবার সম্মুখে বসাইয়া পরিচারিকার হাত হইতে প্রচুর উপচারপূর্ণ পাত্রটি ধরিয়া লইলেন। মমতাও গঙ্গার পার্শ্বে স্থান পাইল। মমতা কলাপাতার মোড়াটি খুলিয়া, নিজের হাতে গাঁথা মালা-ছড়াটি শিবের মাথায় চড়াইতেই, গঙ্গা পূজা করিতে করিতে তাহার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের সুরে কহিল,—"এ কাযটা কিন্তু ঠিক হ'ল না, মম,—মালা-ছড়াটা সেই খোঁড়ার গলায় পরালেই মানাত ভাল।"

গঙ্গার কথা শেষ হইতেই পশ্চাৎ হইতে তাহার দাসীটি খোঁটা দিয়া কহিল,—"মিছে কথা নয় দিদিমণি, তোমার ও মালা কিন্তু বাবা নেয় নি।"

পুরোহিত ঠাকুর গঙ্গাকে পূজা করাইতেছিলেন। হঠাৎ বাধা পড়ায়, তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন,—"কি হয়েছে, মা?"

গঙ্গাকে উত্তর দিতে হইল না, দিল তাহার দাসী। কালো মুখখানা ঘুরাইয়া কহিল,—"হবে আবার কি? ভিখিরীকে দেখে একবারে গ'লে গেলেন, সরাশুদ্ধ পূজোরনৈবিদ্যি দিলেন তাকে ধ'রে! মা গো মা, টস্‌ দেখে আর বাঁচি না! তবু যদি নিজের হ'ত।"

এই ধরণের কথার প্রহার মমতাকে সদাসর্ব্বদাই সহিতে হইত এবং ইহাতে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহার পক্ষ হইতে কোনও উত্তর আসিল না। দুই চক্ষু মুদিয়া সে তখন শিবের উদ্দেশে তাহার মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতেছিল,—'বাবার মুখে শুনেছি, যত্র জীব, তত্র শিব; তুমি ত সর্ব্বত্যাগী আর্ত্তের দুঃখমোচনে,—কাল সারা দিন-রাত ঐ ভিখিরীর মুখে একটি দানা পড়ে নি, তোমার দোরে ধন্না দিয়ে প'ড়ে আছে, এক মুঠো চাল ওর কাপড়ে পড়ে নি,—তোমার জন্য যে উপচার আনছিলুম, সে সব ওকে ধ'রে দিয়েছি, তাতে কি তোমার পূজো হয় নি, বাবা? তুমি কি ওর মধ্যে তখন ছিলে না? ঐ ভিখিরী যদি ওতে তৃপ্তি পায়, তুমি তৃপ্ত হবে না, প্রভু?'

এই সময় পুরোহিত ঠাকুরের স্নেহার্দ্র-স্বর মমতার কাণে বাজিল,—"তাতে কি হয়েছে, বাছা? ছেলেমানুষ, ভুলই যদি

ক'রে থাকে ! তুমি মা, কালই একটা সিধে সাজিয়ে এনো—বাবা প্রসন্ন হবেন।"

নাট-মন্দিরের উপরেই উঁচু চাতাল, তাহাতে উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। সেই চাতালটির উপর এক অবধূত বসিয়াছিলেন। অদ্ভুত মানুষ। এক মুখ দাড়ি, লম্বা লম্বা চুল, পরনে একখানা খাটো কেটের কাপড়, গায়ে কোনও আবরণ নাই, হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই; সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, মুখে কথাটিমাত্র নাই। মমতার কাণ্ড তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, তাহার উপর তাঁহার দৃষ্টি অব্যাহতই ছিল। পূজা সারিয়া মমতা যেমন উঠিয়াছে, তিনি মুখখানি বাড়াইয়া ডাকিলেন,—"ওগো মেয়েটি, একবার এ-দিকে এস ত মা!"

চোখোচোখি হইতেই মমতা আস্তে আস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

অবধূত কয়েক মুহূর্ত্ত বদ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"বাবা আজ তোমার পূজোই নিয়েছেন, মা! মনে তুমি দুঃখ ক'রো না, মা।"

মমতার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা ও তাহার পরিচারিকা আসিয়াছিল। গঙ্গা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—"বাবা যখন এর পূজো নিয়েছেন, তখন বিয়ের ফুলও ফুটিয়ে দিয়েছেন ত? মমর বরটি কেমন হবে, ঠাকুর? ঐ খোঁড়ার মত বোধ হয়?"

অবধূত গঙ্গার মুখের দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন,—"খোঁড়ার মুখের কথায় যে স্বস্তি পড়েছে, মা। ও ত মিছে হবার নয়; মম রাজরাণীই হবে।"

পরক্ষণে মমতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন,—"তোমার নাম বুঝি মা মম?"

মুখখানি নত করিয়া মমতা উত্তর দিল,—"আমার নাম মমতা, এঁরা মম ব'লে ডাকেন।"

অবধূত কহিলেন,—"তুমি মা মূর্ত্তিমতী মমতা।"

অবধূতের কথা গঙ্গা ও তাহার পরিচারিকার মনঃপূত হয় নাই। গঙ্গা ছলছল-নেত্রে দাসীর দিকে চাহিতেই, দাসী অগ্রসর হইয়া খরকণ্ঠে কহিল,—"আপনি কি রকম বাবাঠাকুর গো! যা নয়, তাই কইতেছ? ওনার ত বিয়ের কথা পাকা হয়ে রয়েছে, দোজবরে বর, চটকলে কাষ করে, আটগণ্ডা টাকা মাইনে আনে, তিনি আবার রাজপুত্তুর হলেন কবে? তোমার কথাতেই হবেন রাজরাণী? আর ঐ সম্বন্ধ ত আমার দিদিমণির বাবাই কৃপায়, শ্রদ্ধায় করেছেন গো, সবই যে তেনারই দায়!"

অবধূত গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আট গণ্ডা টাকা মাইনের চটকলের কেরাণী এ মেয়ের বর হ'তে পারে না। কপালের রেখা মিছে হবার নয়।"

দাসী এবার এ কথা পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাকে লইয়া পড়িল, কহিল,—"তা হ'লে আমার দিদিমণির কপালের রেখাটা কি বলে, বাবাঠাকুর? রাঁধুনীর বেটী যদি রাজরাণী হয়, তা হ'লে আমার রাজা মনিবের মেয়ে—"

অবধূতের দুই চক্ষু তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, চোখোচোখি হইতেই দাসীর দৃষ্টি যেন ধাঁধিয়া গেল, মুখের কথা আর বাহির হইল না। অবধূত কহিলেন, "রাজা মনিবের মেয়ে হ'লে কি হয় বাছা, এর কপালে বড় দুঃখের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

কথা কয়টি বলিয়াই অবধূত উঠিয়া পড়িলেন, তাহার পর কাহারও দিকে না তাকাইয়া আপন মনে টলিতে টলিতে শ্মশানের দিকে চলিলেন।

গঙ্গার মুখে কথা নাই, মমতার মনের ভিতর ভাবনা গভীর হইয়া বসিল, এই অপ্রীতিকর কথাপ্রসঙ্গে বাড়ীতে গিয়া মামীর নিকট কত গঞ্জনাই হয় ত তাহাকে শুনিতে হইবে। দাসীর মুখে তখন কথার খই ফুটিয়াছে, অবধূতের চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার করিতে করিতে সে দিদিমণিদের লইয়া বাড়ী চলিল।

নিজের সম্বন্ধে অবধূতের কথায় মমতার মনে উল্লাস নাই, গঙ্গার সম্বন্ধে তাঁহার রূঢ় কথা কয়টি সারা পথ কাঁটার মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতেছিল।

* * * *

মমতার পিতা সত্যম্বর রায় অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক; ছল-চাতুরীর সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন না, সাধুতাই তাঁহার লক্ষ্যপথ। সংস্কৃতে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার, সেই সূত্রে পরীক্ষার পর তিনি বিদ্যালঙ্কার উপাধি পান। সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর শ্বশুরের আশ্রয়ে আসিয়া তিনি উপার্জ্জনে বিরত হন নাই। ভট্টপল্লীর এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া মাসে পঁচিশটি টাকা বেতন পাইতেন। সেই টাকা সমস্তই শ্বশুরের নিকট পাঠাইতেন, এবং নিজে ভট্টপল্লীর এক ধনিগৃহে প্রাইভেট টিউসনি করিয়া নিজের খরচ চালাইয়া লইতেন। শ্বশুরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই তিনিও কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। কর্ম্মস্থানেই এই রোগ হয়। যে ধনীর পুত্রকে পড়াইতেন, তিনিই নিজের বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা করান। কোনও প্রকারে জীবন তাঁহার রক্ষা হয়, কিন্তু স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে। কাযেই কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বেকারভাবেই তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে ফিরিতে হয়।

শ্যালক অম্বিকা চক্রবর্ত্তী তখন সংসারের কর্ত্তা। ভগ্নস্বাস্থ্য ভগিনীপতিকে কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় ফিরিতে দেখিয়া তিনি গম্ভীর হইলেন। শ্যালকপত্নী শিবরাণী ননদ অন্নপূর্ণা দেবীকে শুনাইয়া অনেক কথাই কহিলেন। অম্বিকাচরণ বুঝিলেন, ফেলিবার নয়, প্রতিপালন করিতেই হইবে। তিনি ছিলেন এমন এক সমৃদ্ধ তালুকের নায়েব-তহশীলদার, পাশাপাশি সাতখানা মৌজা যাহার অন্তর্গত এবং জমীদারও এমনই মহানুভব যে, হিসাবনিকাশের কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত না। মাথা খাটাইয়া অম্বিকাচরণ এক উপায় স্থির করিলেন; জমীদারী-সংক্রান্ত কাগজপত্র, খোকা, হস্তবুদ, চৌহদ্দী, আরজী, চিঠা প্রভৃতি লিখিবার ভার ভগিনীপতি রায় মহাশয়ের উপর অর্পণ করিলেন। বাড়ীতে বসিয়া সারাদিন এবং সময় সময় সারারাত্রি জাগিয়া রায় মহাশয়কে জমীদারী সেরেস্তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈয়ারী করিয়া দিতে হয়।

তিনটি মুহুরীর কাষ তাঁহাকে বাড়ী বসিয়া একা করিতে হয়, পত্নী অন্নপূর্ণার উপর সমস্ত সংসারের কাষ, হেঁসেল পর্য্যন্ত তাঁহার ঘাড়ে, দুটি বেলাই তাঁহার সমান খাটুনি; বড় মেয়ে

মমতা, ছোট মেয়ে সমীতা ও একমাত্র শিশুসন্তান সঞ্জীব,—কাহারও খাটুনির বিরাম নাই; তথাপি এমন দিন কখনও কাটে না—যে দিন এই আশ্রিত পরিবারটিকে গঞ্জনা শুনিতে না হয়! তাহাদের খাটুনির কোনও মূল্য নাই, অক্লান্ত পরিশ্রম সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই, কিন্তু তাহারা যে আশ্রিত, তাহারা যে গলগ্রহ, দুটি বেলা এই পাঁচটি প্রাণী যে দশখানি পাতা পাড়িয়া অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর অন্ন ধ্বংস করিতেছে, এ অপবাদের আর অন্ত থাকে না।

রায় মহাশয় সবই শুনিতেন, বুঝিতেনও সব; কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থা ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন। তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য দেখিয়া স্কুল-কমিটীর কর্ত্তারা তাঁহাকে খাটাইতে সাহস করেন নাই, কিন্তু উপায়ক্ষম শ্যালক রুগ্ন ভগিনীপতিকে সামান্য অবসরটুকু প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত। ইহার ফলে শ্বাসরোগ ভগ্ন দেহকে আশ্রয় করিল। হাঁপানির টানে সময় সময় অস্থির হইয়া পড়িতেন, স্ত্রী-কন্যারা ছুটিয়া আসিত, মূর্ত্তিমতী সেবার মত মমতা পিতার বুকে মালিশ করিতে বসিত, কিন্তু এ কার্য্যেও তাহাদের স্বাধীনতা ছিল না। শিবরাণী এমন হাঁকডাক করিতেন যে, রায় মহাশয় দুই হাতে বুকের ব্যথা চাপিয়া স্ত্রী-কন্যাকে সংসারের কাযে পাঠাইয়া দিতেন। শ্বাসকষ্ট একটু কম পড়িলেই আবার তাঁহাকে কলম লইয়া বসিতে হইত।

মমতা ও গঙ্গা দুজনেই প্রায় সমবয়সী। কিন্তু মমতার অসামান্য রূপ ও অতি নম্র ব্যবহার শিবরাণীর চক্ষুতে একান্ত বিসদৃশ ঠেকিত। তাহার কন্যা গঙ্গার গায়ের রংটি যদিও ছিল ফরসা, কিন্তু মুখের আকৃতি ও সর্ব্বাঙ্গের গঠন সেই অনুপাতে ছিল অত্যন্ত কদর্য্য। মমতার দিকে চাহিলে চোখ ফিরিতে চায় না, তাহার মাথার চুল খুলিয়া দিলে কোমর পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়ে, যেমন সুন্দর রং, বাঁধুনিও তেমনই মনোরম। যে দেখে, সে-ই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কহে,—'মেয়ে ত নয়, যেন প্রতিমা।' গঙ্গার সম্বন্ধে উঠে ঠিক ইহার বিপরীত মন্তব্য। মাথার চুল তাহার এত খাট যে, গুছির সহায়তায় খোঁপা বাঁধিতে হয়। এই বয়সেই মুখখানি যেন পাকিয়া গিয়াছে, তাহাতে কমনীয়তার চিহ্নমাত্র নাই। গঙ্গার মায়ের সম্মুখে যে যাহা বলুক, অন্তরালে সবাই কিন্তু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া জানায়—মেয়ে যেন ডানাকাটা পরী।

দাসী হরিমতি ছিল শিবরাণীর মন্থরা! সকলের কথা সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার উপর প্রয়োজনমত রসান দিয়া সে দুটি বেলা প্রভুপত্নীর কর্ণকুহরে প্রয়োগ করিত। হরিমতি গৃহিণীর পিত্রালয় হইতে এই সংসারে স্থায়িভাবে বদলী হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহার মামলা এক তরফা ডিক্রী পায়, আপীল নাই, ডিসমিস্ নাই।

নিজের মেয়ে গঙ্গার নিন্দা ও মমতার খ্যাতি শিবরাণীর বুকে কাঁটার মত বিঁধিতে থাকে। যে পোড়ারমুখী তাহাদেরই আশ্রিতা, কৃপাদত্ত অন্নে প্রতিপালিতা, তাহার রূপের এত বড়াই কেন? প্রতিবেশিনীদের তিনি প্রায়ই ঘটা করিয়া শুনাইয়া দেন,—এখন মেয়ের রূপ কি চোখেই যাচাই হয়,—যাচাই হয় লোহার সিন্দুকে! আমার গঙ্গার চুলই বল—আর গড়নই বল—সব তোলা আছে তার ভেতরে। যেখানে পয়সা নেই, সেখানে কিছুই নেই, রূপ নিয়ে আধিক্যেতা সেখানে মিছে। এই যে কাশীপুরের ঘোষাল বাবুদের ছেলের সঙ্গে গঙ্গার বিয়ের কথা হচ্ছে, কত বড় লোক তারা, লাখপতি বল্লেই হয়; নগদে গয়নায় সাত হাজার চায়। আর আমাদের মমর ত রূপ ধরে না, কিন্তু কটা সম্বন্ধ এসেছে শুনি? সেই যা উনিই চেষ্টা-যত্ন ক'রে সম্বন্ধ এনেছিলেন, দোজবরে, কলে কায করে, ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে, এই যা! অনেক ধরা-পাকড়া করেছিলেন, তাই দিতে থুতে কিছু হবে না, কিন্তু তবুও পাঁচশোর কমে পার পাবেন না। নন্দাই ত এখন তাকেই পাকা কলা ভেবে হাঁটাহাঁটি লাগিয়ে দিয়েছেন—মমকে পার করতে। রূপের ত অভাব নেই, রূপ দেখিয়ে বড় ঘরের বর যোগাড় করতে পারলেন না?

কথাটা মিথ্যা নয়। ভগিনী ও ভগিনীপতির একান্ত পীড়াপীড়িতে অম্বিকাচরণই উদ্যোগী হইয়া ভাগিনেয়ী মমতার বিবাহের এক সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলেন। তাঁহার শ্বশুরালয়ের সম্পর্কে এই পাত্র আত্মীয়স্থানীয়। বয়স বত্রিশ, সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, সন্তানাদি কিছুই নাই, বাড়ী ও ভূসম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে ভাত-কাপড়ের কষ্ট নাই; উপরন্তু হাবড়ার জুটমিলে টাইমকিপারের কায করে, বেতন আটাশ, কিন্তু উপরি পাওনা বেতনের সহিত পাল্লা দিয়া চলে। পাত্র-পক্ষ মেয়ে দেখিয়া খুব খুসী, কিন্তু তাই বলিয়া পাওনা গণ্ডা একবারে ছাড়িতে রাজী নন। কিছুদিন দর-কসাকসি চলে। অম্বিকাচরণ আশ্বাস দিয়েছেন, ভয় নাই, এ পাত্র হাতছাড়া হইবে না। তবে তোষামোদ চাই। রায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে সেয়ারের নৌকায় যাতায়াতে নয় আনা ব্যয় করিয়া কন্যাহাটি হইতে শিবপুরে পাত্রের বাড়ীতে তোষামোদ করিতে যান। একে পল্লীবাসী, তাহাতে কন্যার পিতা, ভাবী জামাতার বাড়ীতে রিক্তহস্তে উমেদারীর জন্য যাইতে মনে সঙ্কোচ আসে, তাই প্রতিবারই কিছু না কিছু উপচার সঙ্গে লইয়া যান। ভাবী জামাতা কলের বাবু, সুতরাং তাহার সাক্ষাৎ সব সময় পান না, বৈবাহিক ও বৈবাহিকা উভয়েই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, নিজেদের বিপুল বৈভবের পরিচয় দেন, তাঁহার কন্যা যে জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার বলে এই সংসারে আসিতেছে, সে কথা খুব ঘটা করিয়া শুনাইয়া দেন, কিন্তু সেই শুভদিনটি কবে উপস্থিত হইবে, সেই কথাটিই ব্যক্ত করিতে ভুলিয়া যান। কাযেই কথাটা আদায় করিবার জন্য মাসের মধ্যে অন্তত একটিবার রায় মহাশয়কে স-উপচারে শিবপুরে ছুটিতে হয় এবং এই ছুটাছুটি সমভাবেই চলিয়াছে, কিন্তু ছুটি এখনও সাব্যস্ত হয় নাই।

এ-হেন বৃহৎ সংসারটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন এই ধারায় চলিয়াছে, তখন পৌষ-সংক্রান্তির সেই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি আকস্মিক অনর্থের মত সব ওলটপালট করিয়া দিল!

* * *

বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই গঙ্গা এমনভাবে কাঁদিয়া উঠিল যে, হাতের কায ফেলিয়া বাড়ীর সকলকেই সেখানে ছুটিয়া আসিতে হইল। মমতা অপরাধিনীর মত মুখখানি নীচু করিয়া ছল-ছল-চোখে নিজের কাযে গেল। দাসী হরিমতি সালঙ্কারে এমন ভাবে মন্দিরের ব্যাপারটা ব্যক্ত করিল, যেন মমতাই তজ্জন্য

দায়ী ; সে-ই যেন অবধূতের সহিত যোগ-সাযোগ করিয়া গঙ্গার সম্বন্ধে এত বড় রূঢ় কথা শুনাইয়াছে !

শিবরাণী যখন শুনিলেন, তাঁহার মেয়ের কপালে বড় দুঃখ, আর মমতা রাজরাণীর কপাল লইয়া জন্মিয়াছে, তখন তাঁহার যত কিছু রাগ মমতার উপরেই পড়িল। সকলকে শুনাইয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন,—"রাজরাণী হবেন না ? দেখছ না, জন্ম অবধি কি আম্বপয় দেখিয়ে আসছেন ! ভাগ্যিস্ মামার বাড়ী ছিল, নইলে যে ট্যানা প'রে ভিক্ষে মেগে খেতে হ'ত ! সন্ন্যেসীর সো হ'তে গিয়ে পূজোর নৈবিদ্যি ভিখিরীকে বিলিয়েছেন, নবাবের বেটী, পরের দুঃখ্যু দেখে গ'লে গিয়েছিলেন ; নিজের কাঁড়ি কে যোগায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই ! রাজরাণী হবেন, আহাহা ! কত ব'লে ক'য়ে হাতে পায়ে ধ'রে আইবুড়ো নাম খণ্ডাবার চেষ্টা ক'রে মরছি আমরা। ও মা ! আস্পদ্ধার কথা শুনে আর বাঁচি না ; যদি বা আইবুড়ো নাম ঘুচতো, দাঁড়াও না, সে পথেও কাঁটা ফেলছি ; কে রাজরাণীর বরাত নিয়ে জন্মেছে, পাড়াপ্রতিবাসীদের তার হাড়হদ্দ দেখিয়ে তবে ছাড়বো।"

মমতার মা অন্নপূর্ণা দেবী কাঠ হইয়া কন্যার খোয়ার শুনিলেন। কন্যার প্রকৃতি তাঁহার অজ্ঞাত নয়, ভায়ের সহিত তিনি দীর্ঘকাল ঘরকন্না করিতেছেন ; তাহাকে তিনি ভালরূপেই চেনেন, দাসী হরিমতীকে তিনি প্রতি পদেই এড়াইতে চান, কিন্তু সে তাঁহাকে রেহাই দিতে নারাজ, কারণে অকারণে সে ঘনিষ্ঠতা করিতে চায়—যেন সে ইঁহাদেরই আপনার জন।

মমতাকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছিল, মম ?"

মমতা মাকে সব কথাই বলিল,—সেথানে সে যাহা করিয়াছে, দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে। মেয়ের মুখে সত্য কথা শুনিয়া মায়ের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। মনে মনে তিনি শ্মশানেশ্বরের উদ্দেশে কহিলেন, "মমর আমার বড় মায়া, তাই তার মন গ'লে গিয়েছিল ; কিন্তু এই নিয়ে তাকে কেন নিমিত্তের ভাগী করলে, বাবা!"

বাড়ীতে যখন এই বিভ্রাট, কাছারী-বাড়ীতেও তখন এক নূতন বিভ্রাট অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া অম্বিকাচরণকে একেবারে হতভম্ব করিয়া দিয়াছে।

যে বিশাল জমীদারী-পাদপের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া অম্বিকাচরণ এত দিন নিরুদ্বেগে তাঁহার রাজগি চালাইয়া আসিয়াছেন, হাটখোলার সিংহবাবুরা ছিলেন পুরুষানুক্রমে তাহার আসল মালিক। এককালে তাঁহাদের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না ; বনেদী বংশের উপযুক্ত বদান্যতায় তাঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আদব-কায়দা, আড়ম্বর ও অমিতব্যয়ের মোহ তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে মোহ যখন কাটিল, ঋণপঙ্কে তখন আবক্ষ প্রোথিত, মহালগুলি বিক্রয় ভিন্ন নিস্তারের উপায়ান্তর ছিল না। বাবুদের মর্য্যাদা যাহাতে ক্ষুন্ন না হয়, তজ্জন্য গোপনভাবে এই বিক্রয়পর্ব্ব শেষ হইয়া যায় যে, মহালের কর্ম্মচারীরা ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিতে পারে নাই।

পৌষ-সংক্রান্তির দিনেই কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। যাঁহারা বিক্রেতা, তাঁহারা কথা চাপা রাখিলেও, যাঁহারা ক্রয় করিতেছেন, তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। অম্বিকাচরণই এই দিন কাছারীতে গিয়া সবিস্ময়ে শুনিলেন, মহালের মালিক বদল হইয়াছে। কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই ; কিন্তু নূতন মালিকের প্রতিনিধিরা সদলবলে কাছারীতে আসিয়া যখন দখল লইবার জন্য সব ব্যস্ত করিলেন, তখন অম্বিকাচরণের মাথা ঘুরিয়া গেল। নূতন মালিক শুধু যে দখল লইতে লোক পাঠাইয়াছেন, তাহা নহে,—অম্বিকাচরণের নিকট 'নিকাশ' তলব করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার না বলিবার উপায় নাই, কেন না, বিক্রয়-কোবালায় বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে, মহালের বাকি-বকেয়া সমস্তই ক্রেতা আদায় করিতে পারিবেন এবং মহালের নায়েব-তহশীলদারেরা তাঁহার সরকারে যথারীতি নিকাশ দিয়া ছাড়পত্র লইবেন। কোবালার এই অংশটুকু অম্বিকাচরণকে দেখানো হইয়াছে এবং সাবেক জমীদারসরকারের এক হুকুমনামাও ইঁহাদের মারফতে অম্বিকাচরণ পাইয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,—দুর্গাপুরের রাধারাম বাপুলী মহাশয় কন্যাহাটির মহাল খরিদ করিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মচারীরা দখল লইতে যাইতেছেন। তুমি সর্ব্বতোভাবে ইঁহাদের সহায়তা করিবে এবং হাত নাগাৎ হিসাব নিকাশ ইঁহারাই তোমার নিকট তলব করিবেন। যথাযথভাবে নিকাশ দিয়া তুমি ইচ্ছা করিলে পুনরায় ইঁহাদের সরকারে বাহাল থাকিতে পারিবে।

অম্বিকাচরণের পক্ষ হইতে ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না, কিন্তু চিন্তা করিবার অনেক কিছুই ছিল। তাঁহার জীবিতকালে সিংহবাবুদের সদর সেরেস্তায় কোনও দিন যে নিকাশের জন্য তলব আসিবে, এ কল্পনাকে তিনি কোন দিন মনে স্থান দেন নাই। আজ কিন্তু কল্পনার অতীত সেই হিসাব-নিকাশের বিভীষিকা বক্রপথে আচম্বিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। অথচ তিনি বেশ জানেন যে, নিকাশের পর মোটা রকমের যে অঙ্কটি ঘাটতিরূপে ধরা পড়িবে, নূতন মালিক যদি তাহা তলব করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব বেচিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

নূতন মালিকের লোকজনরা মুখে অম্বিকাচরণের প্রতি কোনও রূপ অসদ্ব্যবহার করিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারাই যে অতঃপর সেরেস্তার কর্ম্মকর্ত্তা এবং নিকাশ না দেওয়া পর্য্যন্ত অম্বিকাচরণের অবস্থা যে নজরবন্দীর মত, তাঁহাদের সুশৃঙ্খল কার্য্যকলাপে তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

স্থির হইল, ১লা মাঘ হইতে অম্বিকাচরণ নিকাশ দিতে আরম্ভ করিবেন। সেরেস্তার দপ্তরের চাবি নূতন মালিকের কর্ম্মচারীদের হাতে দিয়া অম্বিকাচরণ ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ীতে তখন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। অত বেলা পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়াও শিবরাণীর রাগ পড়ে নাই। স্বামীকে দেখিয়া তেজ আরও তীব্র হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া কহিলেন,—"ওগো, নাচো নাচো, পার ত, ন্যাংটো হয়ে নাচো, —তোমার ভাগ্নী শীগ্‌গীর রাজরাণী হবে যে!"

অম্বিকাচরণ স্ত্রীর আস্ফালন দেখিয়া অবাক্। নিজের বুকের মধ্যে ভাবনার সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে, মাথা তাহার টলিয়া পড়িতেছে, বাড়ীতে ঢুকিতে না ঢুকিতে এ কি কাণ্ড! বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ব্যাপার কি ?"

শিবরাণী ঝাঁঝিয়া উত্তর দিলেন,—"কেন, শোন নি না কি? তোমার ভাগনী যে আজ শিব-পূজোর নৈবিদ্যির সরা শিবকে না দিয়ে একটা খোঁড়া ভিখিরীর হাতে ধ'রে দিয়েছে, তাইতে এক সন্ন্যেসী নাকি বাহোবা দিয়ে বলেছে—মম হবে রাজরাণী, আর তোমার গঙ্গার কপালে নাকি বড় দুঃখ।"

শিবরাণী হিসাব করিয়াই স্বামীর উদ্দেশে তীর ছুড়িয়াছিলেন; কিন্তু অধিকতর বিষাক্ত তীরে স্বামীর বক্ষ যে বিদ্ধ হইয়াছিল, সে সংবাদ পান নাই। অন্যদিন হইলে, এই কথা শুনিয়া, এই অম্বিকাচরণ অগ্নিমূর্ত্তি ধরিতেন; কিন্তু আজ আর তিনি সে মানুষ নন। পত্নীর কথায় কিছুমাত্র উষ্ণ না হইয়া ধীরভাবে তিনি কহিলেন,—"সন্ন্যেসী মিছে বলে নি; যে ঘরে মম পড়ছে, তার পক্ষে সে ত রাজার ঘর। আর গঙ্গার কপালে যদি দুঃখই না থাকবে, তা হ'লে বাবুদের তালুক আজ বিকিয়ে যায়?"

শেষের কথায় যেন জোঁকের মুখে নুণ পড়িল, শিবরাণীর মুখখানি মুহূর্ত্তে ছাইএর মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তাহার ঘটে বুদ্ধির অভাব ছিল না, স্বামীর কথাও দুর্ব্বোধ্য নয়, তাঁহার মুখ ও চক্ষুর মালিন্য যেন কথা কহিয়া ব্যক্ত করিতেছিল—সুখের দীপ নির্ব্বাপিত! তবুও তিনি মুখখানি তুলিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন,—"কি বলছো গো?"

মনের রুদ্ধ আবেগ এবার উথলিয়া উঠিল। পাগলের মত মুখভঙ্গী করিয়া অম্বিকাচরণ কহিলেন,—"কি বলব আর—কি চাও?—সিংহী বাবুদের মহাল ত শুধু বিকিয়ে গেল না—আমার মাথাও যে তার সঙ্গে বিকিয়ে গেছে! আজ আমি এ মহালের কেউ নই, আমার কিছু নেই—কিছু নেই; আমি ফকীর—রাস্তার ভিখিরী!"

বলিতে বলিতে দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া অম্বিকাচরণ উঠানের উপর মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। শিবরাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হাতের কায ফেলিয়া আর একবার বাড়ীর সকলে উঠানে আসিয়া জড় হইল।

* * * *

পহেলা মাঘ আখ্যানদিন উপলক্ষ করিয়া নূতন মালিকের তরফ হইতে নূতন ব্যবস্থায় সেরেস্তার কায আরম্ভ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রজা-মহলে নূতন মালিকের নাম ও সে সম্বন্ধে নানা কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নবাগত কর্ম্মচারীরাও তাহাদের মনিবের প্রশংসায় শতমুখী। শুনা গেল, নবীন জমীদার রাজারাম বাপুলী অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। স্বকৃত উপার্জ্জনে তিনি এত বড় হইয়াছেন। দুর্গাপুরের মাইনর স্কুলে তাঁহার বাবা মাষ্টারী করিতেন। দুইখানি মেটে ঘর, একটা পুকুর এবং তৎসংলগ্ন ছোট একটি বাগান; এই ছিল তাঁহার সম্পত্তি। জ্ঞাতিরা জমীদারের নায়েবের সহিত চক্রান্ত করিয়া পুকুর ও বাগানটি কাড়িয়া লয়। রাজারাম বাপুলীর বয়স তখন আঠারো বৎসর। এক বন্ধুর নিকট কিছু টাকা লইয়া মোকামে মোকামে ঘুরিয়া তিনি পাট-চালানী কায করিতেন। সেই সময় হঠাৎ এক তার পাইয়া তাঁহাকে দুর্গাপুরে ফিরিতে হয়। বাড়ী আসিয়া দেখেন, পিতার অন্তিম অবস্থা। মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ওরে রাজু! জ্ঞাতশত্রুরাই ওঁর কাল হ'ল রে! পুকুর-বাগানের শোক সইতে পারলেন না।

পিতাও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পুত্রকে অনুরোধ করিয়া গেলেন, "বাবা রাজু! যে দিন ঐ বাগান-পুকুর উদ্ধার করতে পারবে, সেই দিন শ্রাদ্ধও তুমি করবে। তার পূর্ব্বে আমার শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ রইল।"

পিতার সৎকার করিয়া ফিরিয়াই রাজারাম জ্ঞাতিদের নিকট হইতে বাগান ও পুকুর উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু জ্ঞাতিরা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। রাজারাম তখন নিরুপায় হইয়া পিতার উদ্দেশে দশপিণ্ড দিয়া শুদ্ধ হন। শ্রাদ্ধের জন্য সমাজ হইতে পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইলে রাজারাম অবজ্ঞাভরে উত্তর দেন,—"জ্ঞাতিদের শ্রাদ্ধের সঙ্গে বাবার শ্রাদ্ধ একসঙ্গেই করা যাবে, তারই আয়োজনে চললেম।"—সেই দিনই মাকে লইয়া রাজারাম দুর্গাপুরের ভিটা ত্যাগ করিয়া যান এবং দশটি বৎসর পরে যে দিন মায়ের সহিত পৈতৃক ভিটায় ফিরিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ যথোপযুক্ত ঘটা করিয়া সাধিতে বসেন, সে দিন তিনি পিতৃহস্তচ্যুত তুচ্ছ পুকুর ও বাগানখানির সহিত দুর্গাপুর তালুকটির ষোল আনা মালিক। শ্রাদ্ধের আসনে বসিয়া তিনি সমবেত সকলকে বলেন,—"বাবার শ্রাদ্ধ করতে দেরী হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আমি একটি দিনও নিয়মভঙ্গ করিনি, বরাবর হবিষ্যি ক'রে এসেছি, আর এই শ্রাদ্ধের স্বপ্ন দেখেছি; দশ বছরের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে।"

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই শ্রাদ্ধের উপযোগী স্থান তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল এবং সেই সূত্রে জ্ঞাতিদের শ্রাদ্ধেরও ত্রুটি হয় নাই। তাহাদের ভিটাটুকু মাত্র রেহাই দিয়া ভিটা-সংলগ্ন সমগ্র জমী জমীদার-সরকারে খাস হইয়া যায় ও অধিকৃত সমগ্র ভূভাগ ব্যাপিয়া লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে তড়াগ-উদ্যান-সমন্বিত বিশাল 'বাপুলী-নিবাস' প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞাতিরা তাহাদের জীর্ণ আবাসে বসিয়া সর্ব্বক্ষণ এই নিদর্শন দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে বলিয়া বাপুলী-মহাশয় কৃপা পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভিটাচ্যুত করেন নাই।

দশটি বৎসর ধরিয়া রাজারাম বাপুলী এমন একনিষ্ঠভাবে লক্ষ্মীর আরাধনা করেন যে, মা-লক্ষ্মী তাঁহার এই প্রিয় ভক্তের প্রতি পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। পাটের ব্যাপারে রাজারাম বাপুলী 'রাজা-বিশেষ' হইয়া উঠেন। প্রত্যেক মোকামে তাঁহার কারবার, বড় বড় আফিসে তাঁহার অতুল প্রতিষ্ঠা,—লক্ষ লক্ষ টাকার নিত্য লেন-দেন, বহু ব্যাঙ্ক ও গদীর তিনি কর্ণধার। বড় বড় তালুক তাঁহার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ,—এই সূত্রেই দুর্গাপুর তালুক অতি সহজেই তাঁহার হাতে আসে এবং ইহার পর তালুকের নেশা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলে। ফলে পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি তালুকের মালিক হইয়া বসিয়াছেন। কন্যাহাটি মহালখানির উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল,—রাজারাম বাপুলীর দৃষ্টি যাহার উপর পড়িত, তাহা আয়ত্ত হইতে বিলম্ব হয় না,—এমন একটা প্রবাদও প্রচলিত হইয়া পড়ে। কন্যাহাটি তালুকখানি খরিদ করিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

নূতন জমীদার সম্বন্ধে এই সকল মুখরোচক তথ্য প্রত্যেক মহালে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। সকাল-সন্ধ্যায় ইহাই এখন প্রত্যেকের একান্ত আলোচ্য বিষয়। এই সঙ্গে কন্যাহাটির সাবেক মালিক ও মহালের সর্ব্বেসর্ব্বা অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর অদৃষ্টালোচনাও

বাদ পড়ে না। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধেও নানা জনরব নানাভাবে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে,—নিকাশে নাকি নানা গলদ ধরা পড়িয়াছে।

কথাটা যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত, তাহাও বলা যায় না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই তালুকের নায়েবের পদে বহাল হইয়া অবধি কোনও সনই হিসাব-নিকাশ দেন নাই বা সদর হইতে এ সম্বন্ধে কখনও কোনও তাগিদ বা তাড়া আসে নাই। কাযেই তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগ না রাখিয়া বেপরোয়াভাবেই নায়েবী করিয়াছেন। নিজের চা'ল সব দিক্ দিয়াই এমনভাবে বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন যে, এভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অতিরিক্ত ভারে বোঝাই নৌকা যে বানচাল হইতে পারে, সে আশঙ্কাটুকুও মনে স্থান দেন নাই; সুতরাং এই আকস্মিক হিসাব-নিকাসের ঠেলায় তাঁহার ভরাডুবি হইবার উপক্রম দেখা গেল।

ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী একটি সপ্তাহ ধরিয়া খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—"করেছেন কি, চক্রবর্ত্তী মশাই! এ যে একেবারে পুকুর চুরি! বুঝিছি, এই জন্যেই সিংহীবাবুরা আজ পথে দাঁড়িয়েছেন! কিন্তু মশাই, এ বড় শক্ত ঠাঁই;—পাণ থেকে চূণটুকু খসবার যো নেই; রাজারাম বাপুলীকে ঠকিয়ে কেউ কোন দিন একটি পয়সাও নিতে পারে নি। আপনিও পারবেন না।"

অম্বিকাচরণ মিনতির সুরে কহিলেন,—"নতুন হুজুর রাজা মানুষ, আর এ সব হচ্ছে বকেয়া ব্যাপার; তিনি ইচ্ছা করলেই এগুলো ছেড়ে দিতে পারেন।"

দৃঢ়স্বরে কর্ম্মচারী উত্তর দিলেন,—"না, তা পারেন না। জানেন, বাকী বকেয়ার জন্যে পোণের ওপর মোটা টাকা ধ'রে দিতে হয়েছে; কত হাজার টাকায় শুধু বাকী বকেয়া কেনা হয়েছে জানেন?"

অম্বিকাচরণ থতমতভাবে কহিলেন,—"আমি ত আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর জেনে আমার কোন লাভ নেই। দেখতেই ত পাচ্ছেন, ছাঁপোষা ব্রাহ্মণ, খেয়ে ফেলেছি সব, এখন আপনিই হচ্ছেন মালিক, আপনি মনে করলে আমাকে রক্ষা করতে পারেন।"

কর্ম্মচারী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—"চুরি করেছেন আপনি, আর রক্ষা করব আমি? কি বলছেন?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় খপ্ করিয়া কর্ম্মচারীর হাতখানি দুই হাতে ধরিয়া কহিলেন,—"বলছি, আপনিই সব পারেন, আপনাকে পারতেই হবে, আমি ব্রাহ্মণ, রক্ষা আপনাকে করতেই হবে;—অবশ্য আমি শুধু হাতে ঘি তুলতে বলছি না,—আপনাকে আমি পাঁচশো টাকা জল খেতে দেব।"

কর্ম্মচারী শ্লেষের সুরে কহিলেন,—"ও! তাই বলুন, আপনি আমাকে জল খাইয়ে রক্ষা করতে চান! কিন্তু সব শুনেও এ কথাটা ভাবতে ভুলে গেলেন, চক্রবর্ত্তী মশাই,—আমরা যদি ঘুস খেতুম, তা হ'লে রাজারাম বাপুলীর দিন দিন এমন উন্নতি হ'ত না! চুরি ক'রে, আপনার বুক এমন ব'লে গেছে যে, আমাকে দলে ভেড়াতে লজ্জা পাচ্ছেন না,—আপনার মনিবের দুর্দ্দশা দেখেও!—আমা হ'তে কিছু হবে না মশাই, যা বলবার—বলবেন হুজুরকে নিজে।"

* * *

একটি ছোট পুঁটুলীর মধ্যে একছড়া মর্ত্তমান কলা, কিছু পাটালী, গুটিদশেক কমলা লেবু ও সেরখানেক সাঁকালু বাঁধিয়া লইয়া বড় আশা করিয়া রায় মহাশয় শিবপুরে ভাবি বৈবাহিক-বাড়ীতে আসিয়াছিলেন,—কিন্তু এবার তাঁহাকে সকল আশার মূলোচ্ছেদ করিয়া ফিরিতে হইয়াছে। গৃহস্বামী তাঁহাকে বসিবার অধিকারটুকুও দেন নাই, যাইবামাত্রই কঠোরস্বরে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন,—"গরীবের কুটীরে কি মনে ক'রে আসা হয়েছে শুনি? যান—যান,—রাজপুত্তুরের সন্ধান করুন, মেয়ে আপনার রাজরাণী হবে শুনেছি,—তবে এখানে কেন!"

স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রথমে রায় মহাশয়ের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই, একটু সামলাইয়া, অনুমানে কথার হেতু বুঝিয়া তিনি যেমন উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছেন, গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ গর্জ্জন করিয়া হুকুম দিলেন,—"আপনি বেরিয়ে যান বলছি, কোনও কথা আপনার শুনব না আমি, আপনার মেয়েকে ঘরে আনব না—এ স্থির, অন্যত্র আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে গেছে, টাকাও বেশী পাবো—যান আপনি।"

রায় মহাশয় আর কথা কহিবার প্রয়াস না করিয়া উঠিলেন, দুই চক্ষু তাঁহার অশ্রুতে তখন ভরিয়া গিয়াছে। হাতের পুঁটুলীটি আগেই ঘরের মেঝের উপর রাখিয়াছিলেন, কত সাধ মনে পোষণ করিয়া সেটি বহিয়া আনিয়াছেন এত দূর, যাহাদের নাম করিয়া আনা, না দিয়া পুনরায় তুলিয়া লইতে হাত উঠিল না, গৃহস্বামীর দিকে হাত দুটি তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠিক সেই সময় আকস্মিকভাবে এক অঘটন ঘটিয়া গেল। যে সওগাত রায় মহাশয় বহিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা এভাবে ছাড়িয়া যাওয়ায় গৃহস্বামীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। বাড়ী বহিয়া তাঁহার মত মানী ব্যক্তিকে এভাবে অবমাননা! তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুঁটুলীটি লইয়া তিনি ঘরের বাহিরে আসিলেন। রায় মহাশয় তখন টলিতে টলিতে কয়েক পা মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় গৃহস্বামীর হস্তনিক্ষিপ্ত পুঁটুলীটি তাঁহার পিঠের উপর গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভারে তিনি হুমড়ি খাইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া গেলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে একখানি গতিশীল প্রাইভেট 'কার' তাঁহার উপরে আসিয়া সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। 'গেল গেল' শব্দে আশে পাশের লোকেরা ছুটিয়া আসিল, গাড়ীর মধ্যে এক জন আরোহী ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া রায় মহাশয়ের সংজ্ঞাহীন দেহ গাড়ীর ভিতর তুলিয়া লইলেন। মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে তাঁহার দেহের সহিত মটরের সংঘর্ষ হয় নাই, সুদক্ষ চালকের তৎপরতায় সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। আরোহীর আদেশে ড্রাইভার তাঁহার বাড়ীর উদ্দেশ্যে মোটর চালাইল।

* * *

মোটরের আঘাত রায় মহাশয়কে মোটেই স্পর্শ করে নাই, স্পর্শ করিয়াছিল সেই হৃদয়হীন গৃহস্বামীর নিষ্ঠুর প্রহার,—যে নরাধমের সন্তানের হস্তে নিজের স্নেহময়ী কন্যাকে সমর্পণ করিবার জন্য তিনি দীর্ঘ ছয়টি মাস উমেদারী করিয়া আসিয়াছেন।

মোটরের মধ্যে যে সদাশয় ছিলেন, তিনি যেন ভগবৎপ্রেরিত হইয়াই অকুস্থলে দেখা দিয়াছিলেন। রায় মহাশয়কে তিনি

নিজের প্রাসাদোপম আবাস-ভবনে লইয়া গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্থ করিয়া তুলিয়াছেন, ছিন্ন মলিন বসন ছাড়াইয়া উত্তম বসন পরাইয়াছেন, প্রচুর দুগ্ধ ও ফল-মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং বহুদিনের পরিচিতের মত তাঁহার সহিত মিশিয়া, আলাপ-আলোচনায় তাঁহার সকল তথ্যই জানিয়া লইয়াছেন। সরল ব্রাহ্মণ এই প্রিয়দর্শন পুরুষটির হৃদয় ও বৈভবের পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকট কোন কথাই গোপন করেন নাই। কথা রাখিয়া ঢাকিয়া কহিবার মত কৌশলও তিনি অবগত ছিলেন না; সুতরাং নিজের কারবার ও বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হইবার পর কি ভাবে শ্বশুরালয়ে তাঁহাকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ভট্টপল্লীর বিদ্যালয়ে কত দিন অধ্যাপনা করেন, ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কি ভাবে শ্যালকের গলগ্রহ হইয়া আছেন, সপরিবার যথাসাধ্য খাটিয়াও যে তাঁহার মন পান না, এবং পৌষ সংক্রান্তির দিনে মন্দিরের ব্যাপার হইতেই যে কন্যাটি তাঁহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে ও তাঁহাদের চক্রান্তেই বিবাহের পাকা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—এ সমস্তই তিনি বিশদভাবেই ব্যক্ত করিয়া বুকের বোঝাটিকে নামাইয়া দিয়াছেন।

রায় মহাশয়ের প্রতি কথাটিই গৃহস্বামী আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের রহস্যময় ব্যাপার শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠে,—অনেক কথাই সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং কথাপ্রসঙ্গে সেই বিচক্ষণ মানুষটির বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, বয়ঃস্থা কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার নিদারুণ চিন্তাটিই, এই উদার ব্রাহ্মণের দুর্ব্বল বুকটির ভিতর কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়াছে।

আলাপ-আলোচনা শেষ হইলে তিনি রায় মহাশয়কে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "আপনার কন্যার কথা যা শুনলুম, তাতে তার বিবাহ আটকাবে না।"

রায় মহাশয় বাবুটির অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাবু কহিলেন,—"আমি আপনাকে বৃথা স্তোক দিচ্ছি না, রায় মহাশয়! আমি আপনাকে জোর ক'রেই বল্‌ছি, আপনার মেয়ের বিবাহ আটকাবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান,—এ ভার আমার। হাঁ, তবে আপনার মেয়েটিকে একবার আমাদের দেখা দরকার। এ মাসের পনেরো তারিখে আমরা আপনার মেয়েটিকে দেখতে যাব।"

রায় মহাশয়ের মুখে কথা নাই,—বিস্ময় ও উল্লাস তাঁহাকে একবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এ কি সত্য, ইহা কি, সম্ভব! আজ প্রাতে উঠিয়া তিনি কোন্ ভাগ্যবানের মুখ দেখিয়াছেন! বাবুটির প্রশ্নে তাঁহার সে ভাব কাটিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার মেয়ের ক্ষেত্ররাশি ও জন্মতারিখ আমাকে লিখে দিয়ে যেতে আপত্তি আছে কি?"

আপত্তি?—গাঢ়স্বরে রায় মহাশয় কহিলেন,—"বাবা! আপত্তির কথা কি বলছ? আমি যে এখনও প্রকৃতিস্থ হ'তে পারি নি,—বুঝতে পারছি না, তুমি—কি! মানুষ, না—দেবতা! এত দয়া, এমন সহানুভূতি! এ যে এ যুগে দুর্ল্লভ।"

সহাস্য উত্তর শোনা গেল,—"কিছু নয়, কিছু নয়,—এটা হচ্ছে মনুষ্যত্ব, মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আপনার শ্যালক অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, আর শিবপুরের সেই আপনার ভাবী বৈবাহিকটির ব্যবহার নিয়ে মনুষ্যত্বের যাচাই করতে গেলেই অবশ্য এমন সন্দেহ আসবেই। হাঁ, তা হ'লে ও-গুলো লিখে দিন আমাকে।"

হাতকাটা বেনিয়ানটির ভিতরেই তাঁহার কন্যার জন্মকোষ্ঠী ছিল। সেখানি বাহির করিয়া কহিলেন,—"মায়ের কোষ্ঠী আমার সঙ্গের সাথী হয়ে ফেরে। এতেই সব পাবেন।"

বাবু কোষ্ঠীখানি লইয়া কহিলেন,—"বেলেঘাটার দিকে আমার কায আছে, এখুনি বেরোতে হবে। চলুন, আপনাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যাব।"

মোটরে বসিয়া রায় মহাশয়ের হুঁস হইল, তিনি তাঁহার সঙ্গীর কাছে তাঁহার মনের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ত কোনও পরিচয় পান নাই, জিজ্ঞাসাও করেন নাই, সহরের কোন্ অংশে এতক্ষণ ছিলেন, তাহাও তাঁহার ধারণার অতীত। কুণ্ঠার সহিত কহিলেন,—"একটা কথা বাবা, আমি ত আপনার সম্বন্ধে কোন কিছুই—"

রায় মহাশয়ের অভিপ্রায়টুকু বুঝিয়াই বাধা দিয়া বাবুটি কহিলেন,—"সে সব হবে পনেরোই। আমার বাসায় পায়ের ধূলো দিয়ে আপনি নিজের কথা শুনিয়েছেন,—ঐ দিন আপনার বাড়ীতে ব'সে আমাদের কথা সব শুনিয়ে দেব, তার জন্য ব্যস্ত হবেন না, রায় মহাশয়।"

* * * *

বাড়ীতে ফিরিয়া রায় মহাশয় সবিস্তারে সব কথাই সকলকে শুনাইয়া দিলেন। শিবরাণী অন্তরাল হইয়া চাপাকণ্ঠে বিদ্রূপের সুরে কহিলেন,—"ঠাকুরজামাই যে রকম ক'রে কথা আরম্ভ করলেন, আমি ভেবেছিলুম, বুঝি সত্যি সত্যিই রাজপুত্তুরের সন্ধান পেয়েছেন! ও মা, তা নয়,—শেষে কি না জোচ্চোরের পাল্লায় পড়লেন! জানা নেই, শোনা নেই, অমনি ছুট বল্‌তে ছুটে এসে ওঁর দায় উদ্ধার করবে! দূর! দূর!"

অম্বিকাচরণ বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর নিকট সমস্ত শুনিলেন, ভগিনীপতিকে ডাকিয়া সে সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নও করিলেন। কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন।

শিবরাণী স্বামীকে বুঝাইয়াছিল যে, দায়ের মাথায় কুমড়ো কাটাই ঠিক,—যে রকম গোলমাল বেধেছে, একটা কিছু হবার আগে গঙ্গার বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল। এর পর না আপশোষ করতে হয়।

তদনুসারে তাড়াতাড়ি গঙ্গার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। ১৫ই তারিখে পাত্রপক্ষের কন্যা দেখিতে আসিবার কথা, ঐ দিনই সব পাকা হইয়া যাইবে। ভগিনীপতির কল্পিত পাত্রপক্ষও ১৫ই তারিখে মমতাকে দেখিতে আসিবে শুনিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন,—"ও-দিনটা পেছিয়ে দিতে হবে, রায় মশাই,—কেন না, ঐ দিন যে গঙ্গার পাকা দেখা।"

রায় মহাশয় হতাশের সুরে কহিলেন,—"কি ক'রে পেছিয়ে দেব ভাই,—আর, আমি ত এ কথা আগে জানতুম না যে, ঐ দিন গঙ্গার পাকা দেখা হবে।"

তীক্ষ্ণস্বরে অম্বিকাচরণ কহিলেন,—"তুমি কি আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে কায কর যে জানাব? আজই

সেই লোককে চিঠি লিখে জানাও, যেন অন্য দিন আসে দেখতে।"

বিষাদের সুরে রায় মহাশয় কহিলেন,—"তাঁর নাম ঠিকানা ত আমি পাইনি ভাই, জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনি বল্লেন, এখানে এসে সব বল্‌বেন।"

তিরস্কারের ভঙ্গীতে অম্বিকাচরণ কহিলেন,—"তুমি পাগল, তুমি গাধা;—তাই এই রূপকথা সবাইকে শুনিয়ে আহ্লাদে নেচে বেড়াচ্ছ। যাও, যাও, ঘরে গিয়ে ঘুমোও,—সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।"

*　　　*　　　*　　　*

দেখিতে দেখিতে পনেরোই মাঘ আসিয়া পড়িয়াছে। গঙ্গার আজ পাকা দেখা। যদিও অম্বিকাচরণের কর্ম্মক্ষেত্রে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে ও দুশ্চিন্তার মেঘ দিন দিন ঘন হইয়া দেখা দিতেছে, তথাপি কন্যার বিবাহ-ব্যাপারটি বেশ ঘটা করিয়া সারিবার জন্য তাঁহার একটা জেদ পড়িয়া গিয়াছে। দুই হাতে সমস্ত বিপদের বিভীষিকা ও দুশ্চিন্তাকে ঠেলিয়া রাখিয়া অম্বিকাচরণ পত্নী শিবরাণীর তুষ্টিবিধানে তৎপর।

পাত্রপক্ষ হইতে বারো জন আসিয়াছেন পাত্রী দেখিতে। এই উপলক্ষে অম্বিকাচরণ গ্রামের বাছা বাছা ভদ্রলোকদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহাদেরও অনেকেই আসিয়াছেন। বাহিরের বৈঠকখানা প্রায় ভরপূর। পাণ-তামাক চলিতেছে, আদর-আপ্যায়নের অন্ত নাই। আলাপ-আলোচনার পর ফর্দ্দ দাখিল হইয়াছে এবং দেনা-পাওনা লইয়া প্রবলভাবে দর-দস্তুর চলিয়াছে। পাত্রপক্ষের দাবী, নগদ দুই হাজার, সোনা পঞ্চাশ ভরি, রূপা হাজার ভরি, তার পর, হাত-ঘড়ি, আংটী, দানসামগ্রী, নমস্কারী প্রভৃতির যথারীতি ফিরিস্তি ত আছেই! পাত্র রেল আফিসে চাকরী করে, যদিও উপস্থিত বেতনের পরিমাণ পচাত্তর, কিন্তু কালে পাঁচশোর কোটায় উঠিবেই। বিশেষতঃ তাহাদের সংসারে যখন কোন অভাব নাই, মাথার উপর বাবা ও অগ্রজগণ বিদ্যমান এবং ঘর-বাড়ী ও পুকুর-বাগানও দেখিবার মত,—এমন পাত্রের পক্ষে এই পণ কি পর্য্যাপ্ত!

এইভাবে দর কসাকসি চলিতেছে, এমন সময় দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং সকলকে অতিক্রম করিয়া ফরাসের মধ্যস্থলটি অধিকার করিয়া বসিলেন। আগন্তুকদ্বয় এই সভাস্থ সকলেরই যে অপরিচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি ও ভঙ্গীতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা সকলকেই আকৃষ্ট ও ত্রস্ত করিয়া তুলে এবং প্রত্যেকেই সসম্ভ্রমে তাঁহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান ও তাকিয়া ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া বসিতে বাধ্য হইলেন।

অম্বিকাচরণের বিস্ময়ের সীমা নাই। এই অনাহূত ব্যক্তিদ্বয় কে?—এভাবে তাঁহার আবাসভবনে ইহারা আসিয়া বসেন কোন্ স্পর্দ্ধায়! পাত্রপক্ষের ধারণা, ইহারা কন্যাপক্ষের কোনও বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি। আলাপ-পরিচয়ের জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উন্মুখ হইলেন।

অম্বিকাচরণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আগন্তুকদ্বয়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"মহাশয়দের ত চিনতে পারছি না। কোথা থেকে আসা হচ্ছে, আর কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন?"

আগন্তুকদ্বয় উভয়েই সমবয়স্ক, উভয়েই দীর্ঘাকৃতি, সবল স্বাস্থ্যময় দেহ, প্রশস্ত ললাট, অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যকান্তি; বয়স তাঁহাদের ত্রিশের সীমা অতিক্রম করিলেও, স্বাস্থ্যপারিপাট্যের জন্য আরও অল্প বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহাদের সাজসজ্জায় বিশেষ আড়ম্বর ছিল না,—ধুতি, কোট ও শাল। কিন্তু তিনটিই তাহাদের মালিকের আকৃতির মত নিজেদেরও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছিল।

অম্বিকাচরণের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল,—"আমরাও যে আজ আমন্ত্রিত।—সত্যম্বর রায় মহাশয় কোথায়? আমরা তাঁর কন্যা মমতা দেবীকে দেখতে এসেছি।"

অম্বিকাচরণের মনে হইল, সমস্ত ঘরখানি তাঁহার চক্ষুর উপর নৃত্য করিতেছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"দেখুন, আপনারা আজ বৃথা কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন। আজ আমার কন্যার দেখাশুনার দিন যে ধার্য্য ছিল, তা তিনি জানতেন না। আপনারাও তাঁকে কোনও ঠিকানা জানান নি, তাই আপনাদের নিষেধ করা হয় নি। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আর এক দিন এলে ভাল হয়।"

অম্বিকাচরণের কথাগুলি যেন উপেক্ষা করিয়াই তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিলেন,—"তুমিই বোধ হয় অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী, সত্যম্বর রায় মহাশয়ের শ্যালক! তিনি কোথায়? আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব, ডাক তাঁকে।"

এতগুলি ভদ্রলোকের সমক্ষে, নিজের প্রতি এইরূপ সম্ভাষণে অম্বিকাচরণ চটিয়া অগ্নি-অবতার হইলেন। কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"অম্বিকা চক্রবর্ত্তী কারুর হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না; কাউকে ডেকে দেবার ফুরসদ আমার নেই। ভদ্রলোকরা এসেছেন আমার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করতে, আমাদের কথা আছে, কায আছে,—বাইরের লোকের এখানে বসবার কোনও দরকার বুঝি না।"

উত্তর হইল,—"আমরাও ভদ্রলোক। আমরাও এসেছি এই অভিপ্রায়ে। তবে, এঁরা ছেলে বেচবেন, সেই সূত্রে দর কসাকসি নিয়ে অনেক কথা উঠবে,—আমাদের কোনও কথার ঝঞ্ঝাট নেই, কেন না—আমরা বেচাকেনা করতে আসি নি, মেয়ে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, বিনামূল্যে ছেলে দেব ব'লে। আমাদের কায মিটতে দেরী হবে না।"

আর যায় কোথায়? সভাস্থ সকলেই এবার রুখিয়া উঠিলেন। অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও গায়ে বিষম লাগে,—পাত্রপক্ষের বুকে কথাটা বাজিয়াছিল। একটা হট্টগোল উঠিল, অম্বিকাচরণ তাঁহার দরোয়ানকে ডাকিবার জন্য বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইতে দেখিলেন, কাছারী বাড়ীর নবাগত কর্ম্মচারীদের লইয়া দুই জন ভীমকায় দরোয়ান দেউড়ীর দিকে আসিতেছে! কর্ম্মচারীদের তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দেউড়ীর সম্মুখে গিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন,—"আসুন, আসুন, পরম সৌভাগ্য আমার!"

রায় মহাশয় এতক্ষণ ঠাকুর-ঘরে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তিনিও গোলমাল শুনিয়া স্পন্দিতবক্ষে কম্পিতপদে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন।

মহাসমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া কাছারী-বাড়ীর আমলাগণ বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিতেই সভার মধ্যস্থলে উপবিষ্ট দুই মূর্ত্তির উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বর নির্গত হইল,—"হুজুর!"

পরক্ষণেই তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের অভিবাদন জানাইয়া আদেশ-প্রতীক্ষায় করযোড়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। হুজুরের সহিত একাসনে বসিবার স্পর্দ্ধা তাহাদের ছিল না।

অম্বিকাচরণও চমৎকৃত! ব্যাপার কি! গা টিপিয়া এক জন আমলাকে প্রশ্ন করিলেন,—"কে?"

আমলা চাপা কণ্ঠে জানাইল, "হুজুর, খোদ মালিক, বাবু রাজারাম বাপুলী, আর তাঁর বন্ধু চৌধুরী সাহেব, এষ্টেটের ম্যানেজার।"

অম্বিকাচরণ দুই হস্তে দরজার চৌকাঠটি ধরিয়া টাল সামলাইলেন, কিন্তু তাঁহার আপাদ-মস্তক ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিখ্যাত ধনী, দশখানা তালুকের মালিক, কন্যাহাটি মহালের মালিক তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার বৈঠকখানায়, আর তিনি তাঁহাকে—ও!

রায় মহাশয়কে দেখিয়াই দুই মূর্ত্তি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নমস্কার করিয়া তাঁহাকে নিজেদের সম্মুখে বসাইয়া ব্যগ্র উল্লাসে প্রশ্ন করিলেন, "কেমন আছেন রায় মহাশয়? আমার কথা বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন, কিন্তু আমি ভুলি নি! দেখুন, ঠিক এসেছি।"

রায় মহাশয় তখনও নির্ব্বাক্, তিনি হাসিবেন কিম্বা কাঁদিবেন, ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

বক্তা পুনরায় কহিলেন, "ভাল কথা, আপনাকে সে দিন বলেছিলাম যে, আমাদের কথা জানাব আপনার বাড়ীতে। সেই কথাই জানাচ্ছি। আমার নাম রাজারাম বাপুলী, আর ইনি আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হৃষীকেশ চৌধুরী।"

চৌধুরী মহাশয় রায় মহাশয়কে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—"আপনার কন্যার কোষ্ঠীর ফল খুবই ভাল। তাঁর জন্য খুব ভাল পাত্রই স্থির করা হয়েছে, এখন শুধু তাঁকে একবার দেখা প্রয়োজন। আপনি যান, এখনই তাঁকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করুন।"

রায় মহাশয় উঠি-পড়ি অবস্থায় বাড়ীর ভিতর ছুটিলেন। চৌধুরী মহাশয় সভাস্থ ভদ্রলোকদের দিকে চাহিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "দেখুন, আমরা আপনাদের মধ্যে এসেছি ঠিক স্বপ্নের মত, এখনই স'রে যাব। তার পর আপনাদের দেখাশোনার কাম চলুক।"

রাজারাম বাপুলীর নাম শুনিয়া ভদ্রলোকদের তেজ তখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্বরে সকলেই সায় দিলেন,—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনাদের দেখাশুনা আগে হয়ে যাক্।"

একখানি লাল-পাড় সাড়ী পরিয়া মমতা যখন সভায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মনে হইল, রূপশ্রী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আবির্ভূতা। মমতার দিকে মুগ্ধভাবে সকলেই চাহিয়া রহিলেন, পল্লব পড়িতে চায় না।

চৌধুরী মহাশয় মমতাকে তাঁহাদের সম্মুখে বসাইয়া যে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন, মমতা নতমুখে তাহার উত্তর দিল, শুনিয়া দুই বন্ধুই তুষ্ট হইলেন। কাণে কাণে তাঁহাদের মধ্যে কি একটা পরামর্শ হইয়া গেল।

চৌধুরী মহাশয় তখন রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখুন রায় মহাশয়, আপনার কন্যার যোগ্য পাত্র আমরা পাই নাই। অথচ আমার বন্ধু আপনার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আপনার কন্যার বিবাহ আটকাবে না। আমার বন্ধু এ পর্য্যন্ত অর্থের তপস্যাই করেছেন, এ ভিন্ন অন্যদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না, এখন পর্য্যন্ত ইনি অবিবাহিত; সুতরাং যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তা হ'লে আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে আমি আপনার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করি।"

সভাস্থ সকলে এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে স্তম্ভিত, কাহারও মুখে কথা নাই। অম্বিকাচরণ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন,—সংক্রান্তির দিনে সন্ন্যাসীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার কাণে বাজিয়া উঠিল।

রায় মহাশয় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—পাগলের মত উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—"বাবা! বাবা! কি বলছ! কি বলছ! এ আমি কি শুনছি! এ কি সত্য! বল—বল—উপহাস করছ না?"

চৌধুরী মহাশয় তাঁহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া জামার ভিতর হইতে এক স্বর্ণময় পেটিকা বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে পাত্রী আশীর্ব্বাদের অঙ্গ ধান্য-দূর্ব্বা-চন্দন-চর্চ্চিত স্বর্ণখচিত এক ছড়া বহু মূল্যবান্ রত্নহার ছিল,—ধান্যদূর্ব্বা মমতার মস্তকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া হারছড়াটি তাহার হাতে দিলেন।

শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-মহলে রব উঠিল,—মম সত্য সত্যই রাজরাণী হ'ল!

রাজারাম বাপুলী রায় মহাশয়ের পদধূলি লইয়া কহিলেন,—"দেখুন, আপনি যে পৈতৃক সম্পত্তি হারিয়েছেন, সে সব আমার তালুকের মধ্যে। সে তালুক আমি আপনাকে ইজারা দেব,—নূতন মূর্ত্তিতে আপনি সেখানে যাবেন। আর এক কথা, শুনেছিলুম, এক সন্ন্যাসী আপনার কন্যাকে দেখে বলেছিলেন, ইনি রাজরাণী হবেন। সে কথা মূলে কতদূর সত্য হবে, জানি না,—তবে নামের দিক দিয়ে আমি যখন রাজারাম বাপুলী, সে হিসাবে ইনি অবশ্যই রাজার পত্নী।"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ। (১৫)

গতি এবং শব্দ দ্বারা (বুঝিতে পারা যায় যে, এই দহর আকাশ হইতেছে ব্রহ্ম)। (অন্য শ্রুতিতেও) ইহা দেখা যায়। এইরূপ চিহ্নও আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পরে আছে, "ইমাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি" (এই সকল প্রাণী প্রত্যহ ব্রহ্মলোকে গমন করে, তথাপি এই ব্রহ্মলোককে জানিতে পারে না)। এই গমনের উল্লেখ হেতু বুঝিতে পারা যায় যে, দহর আকাশই ব্রহ্ম; কারণ, জীব সুষুপ্তির সময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এইরূপ "শব্দ" (শ্রুতিবাক্য) অন্যত্রও আছে। যথা "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (সুষুপ্তির সময় জীব সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মে বিলীন হয়)। এখানে 'ব্রহ্মলোক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মস্বরূপ (ব্রহ্ম এব লোকঃ), চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার বাসস্থান (সত্যলোক) নহে, কারণ, জীব সুষুপ্তির সময় সত্যলোকে যায় না।

রামানুজের ব্যাখ্যাও কতকটা এইরূপ। 'গতি',—জীব প্রত্যহ দহর আকাশে গমন করে, অতএব দহর আকাশ-ব্রহ্ম। 'শব্দ' দহর আকাশকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মলোক এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব দহর আকাশ=ব্রহ্ম। 'তথা হি দৃষ্টং' অন্যত্রও পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মলোক এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'লিঙ্গং চ' সুষুপ্তির সময় জীব দহর আকাশে বিলীন হয়, ইহা দহরাকাশের ব্রহ্মত্বের লিঙ্গ।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, এই ব্রহ্মলোক হইতেছে 'অর' এবং 'বৈণ্য' নামক সুধাসমুদ্র।

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্য অস্মিন্ উপলব্ধেঃ। (১৬)

ধৃতি অর্থাৎ বিধারণরূপ মহিমার উল্লেখ আছে (অতএব এই 'দহর' পরমেশ্বর)। কারণ, পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই মহিমার উপলব্ধি হয়। শ্রুতিতে এই দহর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" (এবং যে আত্মা, সে এই সকল লোকের পার্থক্য-নির্দ্দেশক এবং বিধারক-সেতু)। পরমেশ্বর যে জগতের বিধারক, তাহা শ্রুতিতে অন্য স্থানেও উল্লেখ আছে দেখা যায়,—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" (বৃহদারণ্যক)—হে গার্গি, এই অক্ষর (ব্রহ্মের) আদেশে সূর্য্য এবং চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করে। পুনশ্চ বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতি-রেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়"—ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সকল প্রাণীর রক্ষক, পালক, ইনি এই সকল লোক যাহাতে না মিশিয়া যায়, তজ্জন্য বিধারক-সেতু। দহরকেও যখন সকল লোকের বিধারক সেতু বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই দহর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

রামানুজ সূত্রটি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—অস্য (এই দহরের) অস্মিন্ (এই বাক্যে) ধৃতি (জগৎ-ধারণ)-রূপ মহিমা উপলব্ধি হইতেছে (অতএব এই দহর পরমাত্মাই)। শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, রামানুজও সেই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধেশ্চ। (১৭)

আকাশ শব্দের ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে (অতএব দহর=ব্রহ্ম)।

যে শ্রুতিবাক্যের বিচার হইতেছে, তাহাতে আছে "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ"—ইহার মধ্যের আকাশ দহর (ক্ষুদ্র)। এখানে আকাশ শব্দের প্রয়োগ হেতু বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের কথাই হইতেছে। কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আকাশ শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। যথা, "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" (ছান্দোগ্য)—আকাশ নাম এবং রূপের কর্ত্তা (জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কিছু নূতন বস্তু নাই, ব্রহ্মই সেই নাম ও রূপের কর্ত্তা)। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে (এই সমস্ত প্রাণী আকাশ হইতে—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়) এই সকল স্থানে ব্রহ্ম সম্বন্ধেই আকাশ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। জীবকে লক্ষ্য করিয়া কোথাও আকাশ শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

ইতর-পরামর্শাৎ স ইতি চেৎ ন, অসম্ভবাৎ। (১৮)

ইতর অর্থাৎ অন্য বস্তু, জীব। ইতরের পরামর্শ অর্থাৎ

উল্লেখ আছে, অতএব দহর শব্দ জীবকেই বোঝায়, যদি ইহা বলা হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে, না, এখানে দহর জীবকে বুঝাইতে পারে না ; কারণ, ইহা অসম্ভব।

যে শ্রুতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, তাহার শেষে আছে, "অথ য এষ সম্প্রসাদ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা,"—অনন্তর জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হয়, পরমজ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা। মনে হইতে পারে যে, এই স্থানে জীবের যখন উল্লেখ আছে, তখন দহর শব্দে জীবকে নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, দহর সম্বন্ধে যে অপহতপাপ্মত্ব (নিষ্পাপত্ব) প্রভৃতি যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, জীবের সে সকল গুণ থাকিতে পারে না।

উত্তরাৎ চেৎ আবির্ভূতস্বরূপস্তু। (১৯)

উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে) চেৎ (যদি মনে করা যায় যে দহর শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে), আবির্ভূতস্বরূপস্তু (কিন্তু তাহা নহে,—পরবর্ত্তী বাক্যে জীবের স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছে, এরূপ অবস্থার উল্লেখ আছে)।

শঙ্করভাষ্য।—দহর সম্বন্ধে যে শ্রুতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, তাহার পরে উল্লেখ আছে যে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এজন্য এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী বাক্যে যখন জীবের প্রসঙ্গ আছে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যেও দহর শব্দ জীবকে বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে। কিন্তু জীবের স্বরূপ হইতেছে ব্রহ্ম (শঙ্করের মতে)। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে। পরবর্ত্তী বাক্যে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আছে। উভয় প্রসঙ্গ একই।

রামানুজভাষ্য।—পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে অপহতপাপ্মত্ব-(নিষ্পাপত্ব) রূপ গুণের উল্লেখ আছে, পরবর্ত্তী প্রজাপতিবাক্যেও অপহতপাপ্মত্বরূপ গুণের উল্লেখ আছে ; উভয় স্থানে এক গুণের উল্লেখ থাকাতে মনে হইতে পারে যে, উভয় স্থানেই এক বস্তুরই আলোচনা হইতেছে ; প্রজাপতিবাক্যে জীবের প্রসঙ্গ আছে, ইহা সুস্পষ্ট, অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে দহর শব্দও জীবকেই বুঝাইতেছে, ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে দহর শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। অপহতপাপ্মত্ব গুণ তাঁহার সর্ব্বদাই থাকে। কিন্তু জীব সাধারণতঃ কর্ম্মফলের অধীন থাকে, তখন তাহার অপহতপাপ্মত্ব গুণ থাকে না। যখন জীব "আবির্ভূত-স্বরূপ" হয়,—নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে, তখন তাহার অপহতপাপ্মত্ব গুণ প্রকাশ পায়। পরবর্ত্তী বাক্যে প্রজাপতির উপদেশপ্রসঙ্গে জীবের এই "আবির্ভূত-স্বরূপ" অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া অপহতপাপ্মত্ব-গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। অপহতপাপ্মত্বগুণ উভয় স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া উভয় স্থানে এক বস্তুর প্রসঙ্গ আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে, জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি কয়েকটি গুণ,—মুক্ত জীব ও ব্রহ্ম উভয়েরই আছে সত্য ; কিন্তু ব্রহ্মের কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে—যাহা মুক্ত-জীবের নাই ; জগৎ সৃষ্টি, জগৎ ধারণ এবং জগৎ ধ্বংস করিবার ক্ষমতা ব্রহ্মের আছে, মুক্ত-জীবের নাই। "জগৎব্যাপারবর্জ্জম্" এই ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৭) ব্রহ্ম এবং মুক্ত-জীবের এই প্রভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ। (২০)

পরামর্শঃ (জীবের উল্লেখ) অন্যার্থঃ (অন্য অর্থে করা হইয়াছে)।

শঙ্কর।—দহরবাক্যশেষে জীবের এইরূপ উল্লেখ আছে :—

অথ য এষঃ সম্প্রসাদ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮ সূত্র দেখুন)।

(অনন্তর এই জীব এই দেহ হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতি অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা)।

জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর,—এই অর্থে এখানে জীবের উল্লেখ আছে।

রামানুজ।—শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিলেন, সেই বাক্যটি দহরবাক্যেও আছে, পরবর্ত্তী প্রজাপতিবাক্যেও আছে। পরবর্ত্তী প্রজাপতিবাক্যের অন্তর্গত এই বাক্যটি দহরবাক্যে পরামর্শ বা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, জীব ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মের

ন্যায় জীবেরও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণের আবির্ভাব হয়। এই সকল কল্যাণগুণ ব্যতীত ব্রহ্মের আরও কতকগুলি কল্যাণগুণ আছে,—যথা জগৎস্রষ্টৃত্ব, জগৎ-বিধারকত্ব ইত্যাদি। ফলতঃ ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণের আধার। মুক্ত-জীব ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মের প্রসাদে মাত্র কতকগুলি কল্যাণগুণ পাইতে পারে।

মধ্বের ব্যাখ্যা রামানুজের অনুরূপ। ব্রহ্মের প্রসঙ্গে জীবের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মের প্রসাদে জীব নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং সে স্বরূপ অতি রমণীয়।

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম্। (২১)

"অল্পশ্রুতেঃ" অল্পবিষয়ক বাক্য শ্রুতিতে আছে বলিয়া, "ইতি চেৎ" যদি বলা যায় যে, এই বাক্য পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করে না, "তৎ উক্তং" এই আপত্তির উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছে "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" অর্থাৎ ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে। এজন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, ব্রহ্ম অনন্ত, কিন্তু জীব অণুপরিমাণ। ইহার উত্তর এই যে, পরমেশ্বর অনন্ত হইলেও, উপাসনার জন্য তাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।* "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎ ন নিচায্যত্বাদেব ব্যোমবচ্চ" (ব্রহ্মসূত্র ১।২।৭) এই সূত্রে এইরূপ আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

অনুকৃতেস্তস্য চ। (২২)

"অনুকৃতেঃ" অনুকৃতি হেতু, "তস্য চ" তাহার।

শঙ্কর বলেন, এখানে নিম্নলিখিত উপনিষদ্‌বাক্য বিচার করা হইয়াছে:—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

মুণ্ডক এবং কাঠক উভয় উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়। ইহার অনুবাদ,—

সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ কিছুই প্রকাশ পান না, অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তিনি প্রকাশ পান বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ সকল বস্তু প্রকাশ পায়। তাঁহার আলোকে এই সকল প্রকাশিত হয়।

সূত্রের "অনুকৃতি" অর্থাৎ অনুকরণ শব্দটি এই শ্লোকের অনুভাতি শব্দকে সূচিত করিতেছে এবং "তস্য চ" এই শব্দদ্বয় শ্লোকের চতুর্থ চরণকে "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" লক্ষ্য করিতেছে। সূর্য্যের ন্যায় এরূপ কোনও তেজঃপুঞ্জ নাই—যাহার আলোকে সূর্য্য, এবং অপর সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্মের আলোকেই জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হয়।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রে পূর্ব্ববর্তী সূত্রগুলিতে আলোচিত দহরবাক্যের এবং প্রজাপতিবাক্যেরই বিচার করা হইয়াছে। "তস্য অনুকৃতি" অর্থাৎ জীব কর্তৃক ব্রহ্মের অনুকরণের উল্লেখ আছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে, দহর বাক্যে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, জীবের প্রসঙ্গ নহে, কারণ, যে অনুকরণ করে এবং যাহার অনুকরণ করে, উভয়ে ভিন্ন বস্তু। প্রজাপতিবাক্যের নিম্নলিখিত অংশে মুক্ত-জীব-কর্তৃক ব্রহ্মের অনুকরণ উল্লিখিত হইয়াছে:—

স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ৎ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা
যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা ন উপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্।

ছান্দোগ্য ৮।১২।৩

অনুবাদ,—মুক্ত-জীব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার পর সর্ব্বত্র যাতায়াত করে,—হাসিতে হাসিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, স্ত্রীগণ অথবা যান-বাহন অথবা জ্ঞাতিদের সহিত আনন্দ করিতে করিতে। যে শরীরে সে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, সে শরীরের কথা তখন তাহার স্মরণ থাকে না।

উপনিষদে অন্যত্রও উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুক্ত-জীব ব্রহ্মের অনুকরণ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান অবস্থা লাভ করে।

যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্
আদিত্যবর্ণং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। (মুণ্ডক ৩।১।৩)

দ্রষ্টা (জীব) যখন সুবর্ণবর্ণ, আদিত্যের ন্যায় বর্ণযুক্ত, ব্রহ্মার কারণভূত পুরুষকে দর্শন করে, তখন তত্ত্বজ্ঞান

* হিন্দুর প্রতিমাপূজা সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রয়োগ করা যায়।

লাভ করিয়া, পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়।

মধ্ব বলেন, শঙ্কর যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন (ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ইত্যাদি), এই সূত্রে সেই বাক্যেরই বিচার করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে এই শ্লোকের পূর্ব্বের শ্লোকে "অনির্দ্দেশ্য পরম সুখের" উল্লেখ আছে। সেই অনির্দ্দেশ্য পরম সুখ ব্রহ্মেরই সুখকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, জ্ঞানী বা মুক্তব্যক্তির সুখকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, কারণ, জ্ঞানীর সুখের অথবা আলোকের অনুকরণে চন্দ্র-সূর্য্য প্রকাশিত হন না, ব্রহ্মের আলোকের অনুকরণেই প্রকাশিত হন।

অপি চ স্মর্য্যতে। (২৩)

স্মর্য্যাতে অর্থাৎ স্মৃতিগ্রন্থেও ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। (বেদকে শ্রুতি বলা হয়, কারণ, শিষ্য গুরুর নিকট বেদ শ্রবণ করে, গুরু তাঁহার গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, এইরূপ পরম্পরায় বেদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ ভিন্ন অপর সকল শাস্ত্রকে—যথা পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা—স্মৃতি বলা হয়, কারণ, ঋষিগণ বেদের উপদেশ স্মরণ করিয়া এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদের অর্থ সমর্থন করিবার জন্য স্মৃতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যেখানে বেদের সহিত বিরোধ না হয়, সেখানে স্মৃতি-বাক্য প্রামাণিক)।

শঙ্কর পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের আলোকে জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সমর্থন জন্য শঙ্কর ভগবদ্গীতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক এই সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

"সূর্য্যের যে তেজ নিখিল জগৎ প্রকাশিত করে, চন্দ্রের যে তেজ এবং অগ্নির যে তেজ, তাহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে।"

রামানুজ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুক্ত জীব পরব্রহ্মের অনুকরণ করে। এই কথা স্মৃতিতেও আছে (স্মর্য্যতে), ইহাই রামানুজের মতে বর্ত্তমান সূত্রের তাৎপর্য্য। ইহার প্রমাণস্বরূপ রামানুজ গীতার নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥

"যাহারা এই জ্ঞান আশ্রয় করে, তাহারা আমার সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তাহারা সর্গের সময় উৎপন্ন হয় না, প্রলয়ের সময় কষ্ট পায় না।"

মধ্বের এই দুইটি সূত্রের ভাষ্য শঙ্করের অনুরূপ।

শব্দাদেব প্রমিতঃ। (২৪)

প্রমিতঃ (যে বস্তুর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহা ব্রহ্মই) শব্দাৎ এব (শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়)।

কঠোপনিষদে নিম্নলিখিত বাক্য আছে :—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থান করে।

পুনশ্চঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশনোভূতব্যস্থ স এবাদ্য স উত্তর এতদ্বৈতৎ॥

"ধূমহীন জ্যোতির ন্যায় অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ। অতীত ও ভবিষ্যতের কর্ত্তা। তিনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন। ইনিই তিনি।"

মনে হইতে পারে যে, পরমাত্মা অনন্ত, তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা যায় না, এজন্য জীবকেই এখানে লক্ষ্য করা হইতেছে। কিন্তু শ্রুতিতে যখন তাঁহাকে অতীত ও ভবিষ্যতের কর্ত্তা বলা হইয়াছে (ঈশানোভূতভব্যস্থ), তখন বুঝিতে হইবে যে, ইনি জীব হইতে পারেন না, ইনি ব্রহ্ম।

মধ্ব বলেন যে, এই সূত্রে কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ বিচার করা হইয়াছে :—

উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে॥

"প্রাণকে উর্দ্ধে উন্নয়ন করেন, অপানকে অধোভাগে প্রেরণ করেন, মধ্যে বামনরূপে আসীন থাকেন, তাঁহাকে বিশ্বদেবগণ উপাসনা করে।"

বামন শব্দের প্রয়োগ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে ভগবানের প্রসঙ্গ হইতেছে।

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ। (২৫)

হৃদয়কে অপেক্ষা করিয়া (ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমা[illegible]

বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে) ; কারণ, এই শাস্ত্রে মনুষ্যের অধিকার আছে।

ব্রহ্ম জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। মনুষ্যের হৃদয় এক অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত। মনুষ্যেরই শাস্ত্রে অধিকার আছে। এ জন্য ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে, উপাসকের হৃদয়ে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়া থাকেন, এ জন্য হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরাগ্রমাত্র (চর্ম্মবেধক সূচের অগ্রভাগের নাম আরাগ্র)। কিন্তু জীব হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া কোনও কোনও স্থলে জীবকেও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা হইয়াছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ। (২৬)

তদুপরি অপি (মনুষ্যের উপরে যাঁহারা থাকেন,—দেবাদি—তাঁহাদেরও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে), বাদরায়ণঃ (ইহা বাদরায়ণ ঋষির মত), সম্ভবাৎ (কারণ, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়)।

মনুষ্যের পক্ষে যেমন মোক্ষলাভ বাঞ্ছনীয়, দেবতাদেরও সেইরূপ মোক্ষলাভ বাঞ্ছনীয়। কারণ, মোক্ষলাভ না হইলে চিরকালের জন্য সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে, ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দেবগণের দেহ আছে, ইহা রামানুজ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থই এ বিষয়ে প্রমাণ।

মধ্ব বলিয়াছেন, সাধারণতঃ পশুদের বিশিষ্ট বুদ্ধি থাকে না, এ জন্য তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয় না। কোনও কোনও স্থলে তাহাদের বিশিষ্ট বুদ্ধি থাকে। তখন তাহারা অধিকারী হয়। দৃষ্টান্ত জরিতার্য্য।

বিরোধঃ কর্ম্মণি, ইতি চেৎ,ন,অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ। (২৭)

দেবগণের বিগ্রহ থাকিলে কর্ম্মবিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়,—যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই যে—না, দেবগণ যুগপৎ অনেক রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ দেখা যায়।

একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়। ইন্দ্রের যদি দেহ থাকে, তাহা হইলে তিনি কিরূপে বিভিন্ন যজ্ঞক্ষেত্রে একই সময়ে আবির্ভূত হইতে পারেন? এ জন্য মনে হইতে পারে যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ দেহ-হীন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল। দেবগণ যুগপৎ অনেক দেহ ধারণ করিতে পারেন। অথবা যেমন অনেক লোক যুগপৎ এক ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে পারে, সেইরূপ এক দেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বিভিন্ন স্থানে যজ্ঞে ঘৃত অর্পণ করিতে পারে, তাহাতে কোনও বিরোধ হয় না।

শব্দে ইতি চেৎ ন অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। (২৮)

শব্দে বিরোধ হয়, যদি এই আপত্তি করা যায়, তাহার উত্তর এই যে, না, শব্দ হইতেই দেবগণের উৎপত্তি হয়, বেদ এবং স্মৃতিগ্রন্থে এ কথা আছে।

যদি দেবগণের বিগ্রহ থাকে, তাহা হইলে দেবগণকে অনিত্য বলিতে হয়। কারণ, দেহধারী বস্তুমাত্রই অনিত্য। তাহা হইলে দেববাচক ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দও অনিত্য বলিতে হয়, বেদকেও অনিত্য বলিতে হয়। ইহার উত্তর এই যে, দেবগণের দেহ অনিত্য হইলেও বেদ নিত্য। সৃষ্টির সময় ঈশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদমন্ত্র সকল উদ্বুদ্ধ করেন। ব্রহ্মা সেই সকল মন্ত্র স্মরণ করিয়া, তদনুরূপ দেব প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। পূর্ব্ব-কল্পের সৃষ্টির অনুরূপ বর্ত্তমান কল্পে সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে বৈদিক মন্ত্র আছে—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—ব্রহ্মা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বেদ নিত্য, ইহার অর্থ বেদের শব্দরাশি অথবা বর্ণ সকল নিত্য।

অতএব চ নিত্যত্বম্। (২৯)

এই কারণেই বেদের নিত্যত্ব। যে হেতু, ব্রহ্মা বেদের শব্দরাশি স্মরণ করিয়া তদনুরূপ দেবমনুষ্যাদি সৃষ্টি করিলেন, অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, বেদের শব্দরাশি নিত্য।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যে ঋষি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা হইবার উপযুক্ত হইবেন, ব্রহ্মা প্রথমে সেই প্রকার ঋষি সৃষ্টি করেন, পরে উপযুক্ত তপঃপ্রভাবে সেই ঋষি সেই মন্ত্র দর্শন করেন। মন্ত্র পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিল। ঋষি দর্শন করেন মাত্র। এই ভাবে বেদের নিত্যত্ব খণ্ডিত হয় না।

মধ্ব এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—যে হেতু বেদ নিত্য, অতএব বেদোক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রবাহরূপে নিত্য—

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ইন্দ্র ছিলেন, তিনি এক্ষণে ইন্দ্র না থাকিলেও, তত্তুল্য আকৃতি-শক্তি প্রভৃতিযুক্ত অপর ব্যক্তি ইন্দ্র হন, এই ভাবে ইন্দ্র দেবতা বিদ্যমান থাকেন।

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তৌ অপি অবিরোধঃ দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ। (৩০)

সমান নাম ও রূপ থাকে বলিয়া আবৃত্তি অর্থাৎ মহা-প্রলয়ের সময়েও বিরোধ হয় না। বেদ ও স্মৃতিতে এরূপ উল্লেখ আছে।

মহাপ্রলয়ের সময় দেব, মনুষ্য প্রভৃতি থাকেন না। কিন্তু তাহার পর যখন সৃষ্টি হয়, তখন পূর্ব্বকল্পে দেব, মনুষ্য প্রভৃতির যে নাম ও রূপ ছিল, তদনুরূপ সৃষ্টি হয়। এইভাবে বেদের শব্দরাশি নিত্য থাকে, সে বিষয়ে কোনও বিরোধ হয় না। বেদ ও স্মৃতিতে উল্লেখ আছে যে, পূর্ব্ব-কল্পে সৃষ্ট বস্তু-সমূহের যে নাম ও রূপ ছিল, বর্ত্তমান কল্পে সৃষ্ট বস্তু-সমূহের সেই নাম ও রূপ আছে, এইভাবে সৃষ্টি অনাদি ও নিত্য।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রলয় দ্বিবিধ ;— নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত। নৈমিত্তিক প্রলয়ে জগৎ ধ্বংস হয়, কিন্তু ব্রহ্মার ধ্বংস হয় না, তিনি নিদ্রিত থাকেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মার ধ্বংস হয়। প্রাকৃত প্রলয়ের পর পুনরায় পূর্ব্বসৃষ্টির বেদ কিরূপে প্রচার হইতে পারে,—কারণ, তখন যে নূতন ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়, তিনি ত পূর্ব্ব-সৃষ্টির বেদ জানেন না? এ বিষয়ে উপনিষদ বলেন—

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
বেদাংশ্চ সর্ব্বান্ প্রহিনোতি তস্মৈ

ঈশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বেদের জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

এইভাবে প্রাকৃত প্রলয়ের পর পূর্ব্বকল্পের বেদ পুনরায় প্রচারিত হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

পল্লী-বিধবা

ডাক্তার মিছে কি হবে ডাকিয়া আজিকে ঠাকুরঝি ?
বাঁচিব না আর, বেশ জানি ভাই কাঁদিছিস্ কেন, ছি !
আমার মতই বিধবা যে জন দুখিনী জন্মাবধি,
এই দুনিয়ায় কে আর মরিবে সেই না মরিবে যদি ?

বেঁচে থাক্ তুই, সাঁথার সিঁদুর হাতের নোয়ার সাথে
অক্ষয় হোক্ চিরতরে, এই শুভাশিস দিই মাথে।
উহু এ কি হলো ? বুকটা আবার ব্যথিয়া উঠিছে ভাই,
দেখ্ দেখি তুই ঘড়িটার পানে—রাত বুঝি আর নাই।
এইবার তবে খুলে দে দুয়ার জনমের শোধ আজি
দেখে নিই ঐ সুনীল গগন উজল তারকারাজি।
এ কি দেখি হায় ঢুলু ঢুলু আঁখি—চাঁদ বুঝি ডোবে নভে ?
ছল-ছল চোখে চেয়ে আছে ওটা, শুকতারকা বুঝি হবে !
এইবার তবে হাত ধরি মোরে নিয়ে চল্ আঙিনাতে—
সারা বাড়ী ঘুরি সব ঠাঁই আমি দেখে নিব শেষ রাতে !

শেষ দেখা আজি, আর তো দেখিতে আসিব না ধরা'পরে।
গায়ে হিম্ লাগে ? লাগিতে দে ভাই শুধু এক নিশি তরে !
এইবার তবে শোয়ায়ে দে ভাই, শেষ শয্যায় আনি'
কি হবে ওযুধ ? ছুড়ে ফ্যাল্ দূরে—কাছে আয় ভাই "রাণি" !
দীপ নিভে যায় ? কি বলিস্ "রাণু" ! আমারো জীবন-আলো
নিভে যাবে ঐ প্রদীপের সাথে,. নামিবে মরণ কালো !
কি বলিস্ তুই ? "সারিবে অসুখ" ? আবার বাঁচিব "রাণি !"
শোন্ দেখি তবে, ব্যাঘ্র-শিকারী বাঘ মারে বটে জানি,—
কিন্তু সে দিন আসিবে একদা ব্যাঘ্র গরজি যবে—
শিকার করিবে শিকারীরে তার লক্ষ্য ব্যর্থ হবে।

দীপ নিভে গেল, কি হলো হঠাৎ মিলিল না আর সাড়া,
ঘুমায় বিধবা চিরঘুমে ঐ নিশ্চল আঁখি-তারা।

কাদের নওয়াজ।

মেক্সিকো

সমগ্র মেক্সিকো পরিভ্রমণ না করিলে বুঝা যায় না, স্পানিয়ার্ডরা যে মেক্সিকো জয় করিয়াছিল, তাহা কিরূপ অসম্পূর্ণ। দক্ষিণ ওয়াক্‌সাকা এবং গুয়েরোরো অঞ্চলে কদাচিৎ কোন স্পানিয়ার্ড প্রবেশ করিয়াছিল। উল্লিখিত অঞ্চলে স্পেনীয় সভ্যতা, কৃষ্টির কোন পরিচয় নাই।

সমগ্র মেক্সিকো অঞ্চলে প্রায় ৫ শত স্বতন্ত্র উপজাতি এবং দুই শত স্বতন্ত্র ভাষা আছে। ওয়াক্‌সাকা এবং সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির দৃশ্যবৈচিত্র্য সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোথাও ঈগল পাখীর প্রাচুর্য্য, কোথাও বা শুকপক্ষীর সমাবেশ পর্য্যটকের চিত্তকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলে।

এই সকল অঞ্চলে রেলপথ নাই, পাকা রাজপথের অভাব। কোথাও পান্থনিবাস পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। শয্যার একান্ত অভাব, মাখন বা তাজা সব্জী কোথাও
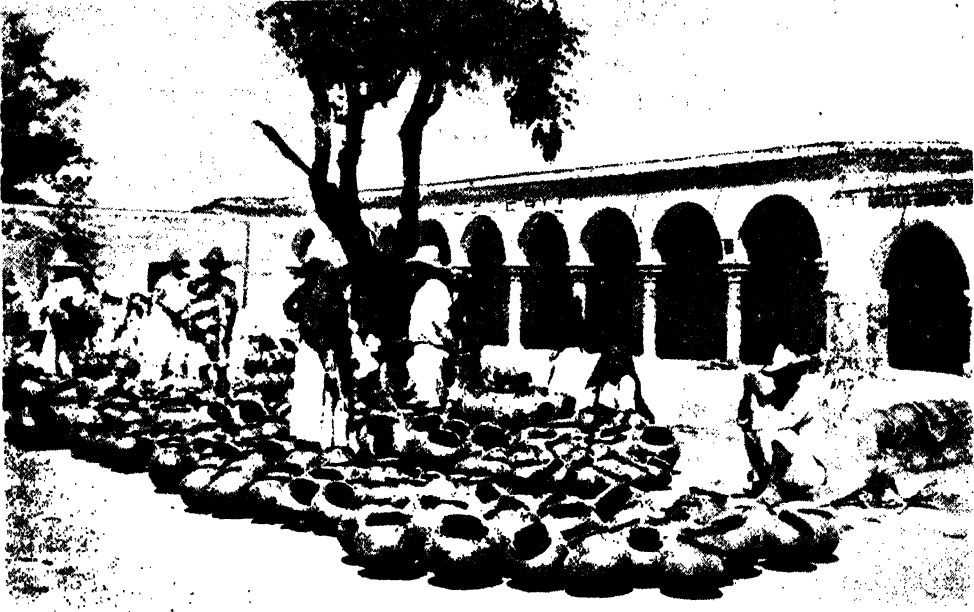
মেক্সিকোর মাটীর হাঁড়ি প্রভৃতি

আকাপুলকো পর্য্যন্ত বিস্তৃত ৪ শত মাইলব্যাপী স্থানে মিঃ মরীন্ হার্ব্বার্ট, মিঃ জেমস্ ষ্টরকেন্ এবং মিঃ বার্ণার্ড বিভান পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মিটলা পর্য্যন্ত বাস্-যোগে গমন করিয়া তাঁহারা জাপোটেক্, চ্যাটিনো, মিক্‌সটেক্ এবং নিগ্রো নামক ৪টি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী উপজাতির মধ্য দিয়া সীমান্ত অঞ্চল অতিক্রম করিয়াছিলেন। ট্লাকোলুলায় তাঁহারা আর একটা উপজাতির দেখা পান। এই উপজাতি মিক্‌সই নামে পরিচিত। য়ুকাটানের মায়া নামক উপজাতির সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য আছে।

সভ্যতার বৈচিত্র্য অনুসারে মেক্‌সিকোর বাহ্য প্রকৃতির বিশিষ্টতা সহজেই অনুভবযোগ্য। কিছুদূর অতিক্রম করিবার পাওয়া যায় না। এই পথে কোনও শ্বেতকায় পূর্ব্বে কদাচিৎ পা দিয়াছেন। পথে বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা—দস্যু-তস্করের হাতে প্রাণ যাইতে পারে। যে সকল ইণ্ডিয়ানের মতিগতি ভাল, তাহারাও বিদেশীকে দেখিলে মনে করিয়া থাকে যে, স্বর্ণের সন্ধানে তিনি আসিয়াছেন। স্পানিয়ার্ডদিগের রত্নানুসন্ধানের প্রচেষ্টা তাহারা কোনও দিন ভুলিতে পারে নাই—পারিবে না। সুতরাং যদি কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক গিয়া তাহাদের কাছে বলেন যে, তিনি ভাস্করকলা অধ্যয়নের জন্য সেখানে গিয়াছেন, বা কোনও জীবতত্ত্ববিদ্ কীটপতঙ্গ সংগ্রহের জন্য ঐ কার্য্য করিতেছেন, তাহা হইলে তাহারা সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের অযোগ্য

বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের মধ্যে এমন প্রবাদও চলিয়া আসিতেছে যে, পরিপুষ্টদেহ ইণ্ডিয়ানের দেহ অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া তাহার দেহের চর্ব্বি গ্রহণ করিবার জন্য শ্বেতকায়গণের আগ্রহ আছে। ঐ উদ্দেশ্যে ছোট ছোট শিশুগণকেও শ্বেতকায়গণ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের মনের এই কুসংস্কার এখনও পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে বিদ্যমান।

ঐ সকল অবস্থা অবগত হইয়া ভ্রমণকারীরা দরিদ্র পিয়নের ছদ্মবেশে উল্লিখিত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা থলিতে করিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। নগদ মুদ্রার বিনিময় ব্যতীত নিরক্ষর পল্লীবাসীদিগের নিকট হইতে কোনও দ্রব্য ক্রয় করা অসম্ভব।

মিটলা হইতে তাঁহারা দুইটি গর্দ্দভের পৃষ্ঠে দ্রব্যসম্ভার চাপাইয়া পদব্রজে যাত্রা করেন। তাঁহারা এক জন গর্দ্দভচালককে পথিপ্রদর্শকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা এক সহরে উপনীত হন। বাজারে দুগ্ধ, কফি, চকোলেট, নানাপ্রকার রুটী এবং শুষ্ক মৎস্য প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পান। কমলালেবু, কদলী এবং আনারস স্তূপীকৃত অবস্থায় বাজারে বিক্রয়ার্থ আসিয়াছে। শিমের বীজও এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছিল।

পরিব্রাজকগণের গর্দ্দভ-বাহিত ঝুড়ি

কুম্ভকার-রচিত নানাবিধ তৈজসপত্রে শিল্পীর নিপুণতা বিদ্যমান। প্রত্যেক গ্রামের প্রস্তুত তৈজস স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। গোয়াডালাজারা, পিওবেলা প্রভৃতি সহরের তৈজসপত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিস্তৃত মাদুরের উপর নক্ষত্র, মৎস্য, শঙ্খ, ঝুমঝুম সাপের ল্যাজ, নানাবিধ পাখীর পালক এবং বিভিন্ন প্রকার লতাগুল্ম সজ্জিত। ঐ সকল দ্রব্যের সাহায্যে মনুষ্য ও পশুর নানাবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সেখান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা বৃক্ষহীন প্রান্তর অতিক্রম করিতে থাকেন। প্রান্তরের কোন কোন স্থানে ফণি-মনসার ঝোপ এবং কৃত্রিম বালিয়াড়ি বিদ্যমান। বহু লোক এই উপত্যকাভূমিতে বাস করিলেও, সভ্যতার কেন্দ্রস্থান বলিয়া এই স্থানকে অভিহিত করা যায় না। সারাদিন পর্য্যটনের পর তাঁহারা সান্ পেড্রো এপস্টল নামক গ্রাম দেখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে তাঁহারা আরোকোয়েজকো নামক স্থানে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। সেখানে আরও ১৫ জন পিয়ন—পুরুষ ও নারী—রাত্রিবাস করিয়াছিল। ওয়াক্সাকা উপত্যকাভূমি অতিক্রম করিবার পর তাঁহারা রায়ো অটোয়াক্ অভিমুখে গমন করিতে থাকেন। এই গিরিসঙ্কটে ঝুমঝুম্ সর্পের বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

সোলা উপত্যকাভূমির পর মোটর-চালিত যান ও

পর্য্যটকগণ অবশেষে রায়ো আটোয়াক্-তীরবর্ত্তী অরণ্যে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে অর্দ্ধেক পথ প্রান্তরের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার পর এক কদলীকুঞ্জে উপনীত হইলেন।

অতঃপর তাঁহারা জুচাটেঙ্গো নামক গ্রামে পৌছিলেন। ইহার চারিদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত-মালা। এখানে নানাবিধ ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ; কিন্তু অন্যত্র প্রেরিত হইবার সুবিধা না থাকায় নামমাত্র মূল্যে ফল বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যহ এখানে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম্য ধর্ম্মযাজককে হত্যা করার ফলে ভগবানের অভিশাপে এখানে ভূমিকম্প হইতেছে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ওয়াক্সাকা সহর ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া যায়। সেই ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে প্রায় ৯ হাজার ৫ শত বর্গমাইল স্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়। উল্লিখিত ভূমিকম্প বশতঃ সে অঞ্চলে একটি অট্টালিকাও বিদ্যমান নাই। এমন কি, পাহাড় পর্য্যন্ত ধ্বসিয়া গিয়াছে। নদীর খাত মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়াছে।

গাছের গুড়ির নৌকা

জামিলটেপেক্ সহরের পর কষ্টা চিকার অনেকগুলি সহর পূর্ব্ব-ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ওয়াক্সাকার ৬০টি কেন্দ্রে ভূমিকম্প হইয়াছিল। গুয়ারেরোর ২৫টি কেন্দ্রে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

আয়োলোটেপেক নামক গ্রামে উপনীত হইয়া ভ্রমণ-কারীরা দেখিলেন যে, কেহই স্পেন ভাষা জানে না। জাপোটেক ভাষায় তাঁহাদের দ্বিভাষী কথা কহিলে স্থানীয় কৃষকগণ উহা বুঝিতে না পারিয়া হাসিতে লাগিল। এখানে যে সম্প্রদায়ের বাস, তাহাদের সংখ্যা ১২ হাজার।

যাত্রার অষ্টম দিবসে তাঁহারা জুকুইলা নামক স্থানে উপনীত হন। ওয়াক্সাকা হইতে উহার দূরত্ব ১ শত ১৯ মাইল। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে জুকুইলা একটি প্রসিদ্ধ সহর ছিল। উহার অধিবাসীর সংখ্যা ৫ হাজার। কিন্তু দূরের কথা, কোনও গরুর গাড়ী চলিতে পারে না। পথটি এমনই দুরধিগম্য। জুকুইলার ২ হাজার ৮ শত ফুট উঠিয়া নামিবার সময় একবারে ৭ হাজার ৭ শত ফুট নামিতে হয়। তাহার পরই আবার ৮ হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়। এইরূপ দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালার জন্য ভাষার এত বিভিন্নতা, বিক্রেয় পণ্যের আদান-প্রদানের এমন বাধা। সভ্যতাও সর্ব্বত্র সমান হইতে পারে নাই। সোলো নামমাত্র জাপোটেকের অন্তর্গত। উহার পরবর্ত্তী সহরের নাম চ্যাটিনো।

অত্যুচ্চ সীমান্ত গিরিবর্ত্মমধ্যে বৃক্ষলতাদির বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। কোথাও কদলীবৃক্ষের ঝোপ, ইক্ষুদণ্ডের ক্ষেত্র ; আবার কোথাও খালি দেবদারু ও অন্যজাতীয় বৃক্ষের প্রাচুর্য্য।

বর্ত্তমানে উহার লোকসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে—একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় ক্ষুদ্র দারু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই দারুমূর্ত্তির উচ্চতা মাত্র ৮ ইঞ্চি। প্রতি বৎসর ৮ই ডিসেম্বর তারিখে হাজার হাজার ইণ্ডিয়ান্ এই মূর্ত্তির উপাসনা করিবার জন্য সমবেত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ তীর্থযাত্রী ওয়াক্‌সাকা ও মিকস্‌টেকা আল্‌টা হইতে আসিয়া থাকে। দুই শত আড়াই শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও তীর্থযাত্রী এখানে আগমন করে। যাহার যেরূপ 'মানত' থাকে, তাহার জন্যই উহারা এখানে আসে। সকলেই পদব্রজে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে—কেহ কেহ নতজানু অবস্থায় পথ অতিক্রম করে।

নিগ্রো শিকারী

সোলা হইতে যে পথে ভ্রমণকারীরা যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার নাম কুমারীর পথ। এই পথের প্রান্তবর্ত্তী প্রত্যেক পাহাড় অলৌকিক ব্যাপারের স্মৃতিপূর্ণ। এই পথের মধ্যে কোন লোক যদি কোন প্রকার শপথ করে, তাহা হইলে তাহার কোন না কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটিবে, ইহা অধিবাসীদিগের বিশ্বাস।

এই বন্ধুর পার্ব্বত্যপ্রদেশে পথ অতিবাহন করা বিশেষ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাহার উপর অনেক স্থানে আহার্য্য দুর্লভ। এক গ্রাম হইতে ভিন্ন গ্রামের অবস্থিতি বহু দূরবর্ত্তী। বড় সহর ব্যতীত রুটী কোথাও মিলে না।

কোনও গ্রামে খাদ্য-দ্রব্যাদির দোকান নাই। নবাগত কোনও

জুচাটেক্লো নদীর তীরবর্ত্তী কুটীর

ব্যক্তির আহার্য্যের প্রয়োজন হইলে কুটীরে কুটীরে তাহার সন্ধান লইতে হয়। প্রথমেই এই উত্তর শুনিতে পাওয়া যাইবে—"নাই, নাই।"

জুকুইলা হইতে টুটুটেপেক পর্য্যন্ত ভূভাগ মনুষ্যবর্জ্জিত বলিতে পারা যায়। ৫০ মাইলের মধ্যে মাত্র দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। একখানি গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে হইলে ১১ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সুদীর্ঘ স্থানের মধ্যে জীবনের স্পন্দন নাই বলিলেই চলে। ঐ দুইখানি গ্রামের একটির নাম পানিক্‌স্‌ট-লাহুয়াক। এই চ্যাটিনো গ্রামটি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। গ্রামের চারিদিকেই জলের প্রাচুর্য্য। কুক্কুট, শূকর প্রচুর। কুটীরগুলি তৃণাচ্ছাদিত।

গ্রাম্য ধর্ম্মমন্দিরে বিশ পঁচিশটি চ্যাটিনো নারী, মাদুরের উপর

ওয়াক্‌সাকার শূকর

জানু পাতিয়া বসিয়া মেরী মাতার স্তোত্রপাঠ করিয়া থাকে। তাহাদের কাহারও কাহারও পৃষ্ঠদেশে শিশু সন্তান বাঁধা রহিয়াছে।

ধর্ম্মমন্দিরে কোন বাতায়ন নাই। বসিবার চেয়ার, অর্গান বা ধর্ম্মযাজক পর্য্যন্ত নাই। কয়েক জন যুবক পিত্তলের বাদ্যযন্ত্র বাজায়। তাহাতে সুরসমাবেশের অত্যন্ত অভাব। বাদ্য থামিলে, যন্ত্রীরা স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তিত হইতে থাকে। মূর্ত্তির দেহে বস্ত্র, চক্ষু কাচনির্ম্মিত, মাথায় মানুষের মত কেশরাজি। তার পর তিন জন গ্রাম্য সর্দ্দারের সম্মুখে ৬টি হাউই এবং দুইটি ছোট বোমা ছোড়া হয়।

পথচারী ইণ্ডিয়ানদিগের সময়-জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। তাহারা

কুম্ভীরপূর্ণ-নদী পার হওয়া

অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু। বিরাট বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া তাহারা পর্ব্বতের উপর দিয়া ৩০ মাইল একই দিনে চলিতে পারে। তবে সময় অথবা দূরত্ব সম্বন্ধে তাহারা অন্ধ।

টুটুটেপেক্ ওয়াক্সাকা, হইতে ১ শত ৭২ মাইল দূরে অবস্থিত। মিক্স্টেক ইতিহাসে ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে পক্ষি-শৃঙ্গ নামক পাহাড়ে টুটুটেপেকের রাজা রাজত্ব করিতেন। স্পানিয়ার্ডরা ওয়াক্সাকা অধিকার করার পর উক্ত রাজবংশের এক জন অধিপতি স্পানিয়ার্ডদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি এ জন্য স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজার এই অবাধ্যতা দর্শনে কর্টেজের বীর সহকারী—ডন্ পেড্রো দে আল্‌ভারাডো টুটুটেপেকএ ১৫২২ খৃষ্টাব্দে গমন করেন। তাঁহার এই অভিযান, কর্টেজের মেক্সিকো নগর অধিকারের সমতুল্য।

জামিলটেপেকের অরণ্য

রাজা স্পানিয়ার্ডগণকে নিজের প্রাসাদে বাসস্থান ও আহার্য্যাদি দান করেন। আল্‌ভারাডো সেই দারুনির্ম্মিত ভবনে বাস করা নিরাপদ মনে করেন নাই। কারণ, তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, ইণ্ডিয়ানরা ঘরে আগুন দিয়া তাঁহাদিগকে পুড়াইয়া মারিতে পারে। এ জন্য তিনি প্রাসাদের সন্নিহিত স্থানে এক শিবির স্থাপন করেন। এই বস্ত্রাবাসে রাজা প্রত্যহ স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিসহ আল্‌ভারাডোর সহিত দেখা করিতে আসিতেন। প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য পাইয়া স্পানিয়ার্ডদের লোভ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহারা রাজাকে পুনঃ পুনঃ স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া আসিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দেয়, রাজা যে দিন উহা দিতে অসমর্থ হইলেন, স্পানিয়ার্ডরা অমনই তাহাকে বন্দী করে। ইহার অব্যবহিত পরেই রাজার মৃত্যু হয়।

গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে ভার-স্থাপন

টুটুটেপেকএর সে দিনের অবস্থা

জামিলটেপেকের প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির

ওমেটেপেকের রেস্তোরাঁ

এখন নাই, একটি বালিয়াড়ির উপর স্পানিয়ার্ডদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি গির্জ্জা আছে। একটি ছোট পাথরের দেবমূর্ত্তি মিউনিসিপ্যাল ভবনের সম্মুখে অবস্থিত। উহার অদূরে আর একটি মূর্ত্তি আছে। উহা উচ্চে ৬ ফুট। বৃষ্টিদেবতা বলিয়া উহা প্রসিদ্ধ। টুটুটেপেকএর তিন মাইল দূরে পিউয়েবলো ভিয়েজো নামক আর একটি প্রাচীন সহর আছে।

উক্ত সহর এবং রায়োভার্ড নদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি পাহাড় আছে। উহার নাম সেরো দে সান্ ভিসেন্‌টি। সেই পর্ব্বতে একটি গুহাও বিদ্যমান। পর্ব্বতগাত্রে নানা প্রকার চিত্র অঙ্কিত। স্থানীয় অধিবাসীরা এই গুহাকে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। সপ্তাহে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে, গ্রামবাসীরা সেখানে পূজা করিতে আসে। তাহাদের বিশ্বাস, মিক্‌স্‌টেক রাজগণের ধনভাণ্ডার এইখানে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

প্রত্যেক প্রাচীন ইণ্ডিয়ান সহরে ঐরূপ ধনভাণ্ডার গুপ্ত আছে, ইহা মেক্‌সিকোবাসীদিগের ধারণা। এ জন্য অনেক সময় স্থানীয় অধিবাসীরা কোনও শ্বেতাঙ্গকে কোনও রাজকীয় সমাধি-ক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী হইতে দেয় না।

ইণ্ডিয়ানরা প্রত্নতাত্ত্বিক পদার্থ-সমূহ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহে। স্পানিয়ার্ডরা মেক্সিকো জয় করিবার পূর্ব্বে, প্রাচীন যুগের কুঠার, মুখোস, ছোট ছোট দেবমূর্ত্তি, কবচ, কাচের কণ্ঠহার প্রভৃতি স্তূপে স্তূপে সজ্জিত করা থাকিত। স্বর্ণের অপেক্ষাও উহাদের মূল্য অধিক ছিল। আজটেকরা অধীন সামন্ত রাজগণের নিকট হইতে উপহারস্বরূপ ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিত। কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দন্তপাতির সমাদর ছিল।

হরিৎবর্ণের এক জাতীয় প্রস্তর এই দেশে অত্যন্ত মূল্যবান্ পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্পানিয়ার্ডরা উহার সৌন্দর্য্যের কদর

সীমের বীজ বিক্রেত্রী

বৃদ্ধ মেক্সিকান্ কলসী ক্রয় করিতেছে

গ্রাম্য বিশ্রাম-কুটীর

মেক্সিকোর বৃষ্টি-দেবতা

মেক্সিকোর মহিলার মাংস ক্রয়

সান্টাকাটারিনা নদী

করিত না। অবশ্য দ্বিতীয় ফিলিপ ঐ প্রস্তরের একটা মালা ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের জন্য নহে; যকৃতের পীড়ায় উহা উপকারী বলিয়া ব্যবহার করিতেন। প্রায় ৪ শত বৎসর ঐ প্রস্তরের শিল্প মাধুর্য্যের চর্চ্চা বন্ধ হইয়াছে বলিলে চলে। উক্ত প্রস্তর মেক্সিকো ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। প্রাচীনতম সমাধিগুলির মধ্যে ঐ প্রস্তরনির্ম্মিত নানাবিধ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ প্রস্তরের কোনও খনি এ পর্য্যন্ত কোনও শ্বেতকায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রস্তরের কোনও খনি বিদ্যমান নাই। শ্বেতাঙ্গ দ্বারা এই দেশ বিজিত হইবার পূর্ব্বে এতদঞ্চলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ ঐ প্রসিদ্ধ হরিৎ প্রস্তর নদীতট হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে।

পিনোটেগার অধিবাসীরা বাজি পুড়াইতেছে

কোন কোন হরিৎ প্রস্তরে নদীতরঙ্গের চিহ্ন নাকি দেখা যায়। কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তরখণ্ড-সমূহ কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহা এখনও রহস্যান্ধকারে আবৃত। কথিত আছে, টিয়োজোমুনকো নামক

পিনোটেগার নারীরা উৎসব-ভোজনের আয়োজন করিতেছে

স্রোতস্বিনী সোলাদে ভেসার সন্নিহিত। ঐ স্থান এবং মিক্স্টেক অঞ্চলের মধ্যে অনেক প্রস্তর আছে, যাহাকে উত্তমরূপে মসৃণ করা চলে।

পর্য্যটকগণ তালীবনসমাবৃত জামিলটেপেকএ গমন করিয়া দেখিলেন যে, স্থানটি পরম রমণীয়। এখানে একটি সুদৃশ্য শ্বেত ভজনাগার আছে। স্থানীয় নর-নারীর বেশভূষা বিশেষভাবে দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। নারীদিগের পরিধানে তুলাজাত শাদা স্কার্ট। তাহার উপর কোমরবন্ধ। গলদেশ হইতে সার্ট বিলম্বিত।

বস্ত্রবয়নকারিণী মেক্সিকো-নারী

পিনোটেপা নাসিওনেল নামক সহরটি অপেক্ষাকৃত বড়। এখানে আসিয়া পর্য্যটকগণ একটি মিক্স্টেক উৎসব দর্শনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই ভোজ-উৎসবে কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হয় না। যে কেহ যোগ দিতে পারে। বাৎসরিক চাঁদার টাকায় যদি ব্যয়-সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে পুরুষ অতিথিরা ৫ সেণ্ট করিয়া অতিরিক্ত চাঁদা প্রদান করে। তার পর আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণ করিবার সুযোগ ঘটে। নারীরা কোনও চাঁদা দেয় না।

উৎসব-ক্ষেত্রে বাদকগণ বাঁশী, ঢাক, তূরী প্রভৃতি যন্ত্র

কোয়াপিনোলা পর্ব্বত-সানুদেশস্থ গ্রাম

ইক্ষুকর্ত্তনোপযোগী ছোরা

গ্রাম্য বিদ্যালয়

প্রাচীন দুর্গ সানডায়েগো

সান্ লুই আকাট্লানের কুটীর

লইয়া বাজাইতে থাকে। পুরুষরা নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়, দর্শক বা অতিথিরা বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত শুনিতে থাকে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নানা প্রকার বাজি পোড়ান হয়।

মেক্সিকোর কষ্টা চিকা অঞ্চলে আফ্রিকা-দেশীয় নিগ্রোদিগের বাস। আকাপুল্‌কো এবং মাজাটলাস অঞ্চলে ইক্ষু-চাষের জন্য স্প্যানিয়ার্ডরা যে সকল ক্রীতদাস আমদানী করিয়াছিল, উহারা তাহাদেরই বংশধর। ঐ সকল ক্রীতদাসের অধিকাংশকেই পশ্চিম-আফ্রিকা হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। ফিলিপাইন হইতেও কেহ কেহ আসিয়াছিল।

বহু শতাব্দী ধরিয়া নিগ্রোরা এখানে বাস করায় এবং তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থান-সমূহ—উহার বিস্তার ত্রিশ মাইল হইবে—যেন আফ্রিকার একটি অংশে পরিণত হইয়াছে। উহারা ইণ্ডিয়ান বা আফ্রিকার ভাষায় কথা কহে না। স্পেনীয় ভাষার একটি বিচিত্র সংস্করণ উহাদের ভাষারূপে পরিগণিত।

উহারা যে সকল গ্রামে বাস করে, তাহা দেখিতে সুন্দর। বাসভবনগুলি পত্রাচ্ছন্ন কুটীর। এই সকল কুটীর দেখিলেই বেলজীয় কঙ্গোর দৃশ্য দর্শকের মনে পড়িবে।

কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদিগের প্রকৃতি ইণ্ডিয়ান-দিগের প্রকৃতির মত নহে। সাধারণতঃ তাহারা অশিষ্ট এবং ক্রোধপ্রবণ। ইণ্ডিয়ানরা উহা-দিগকে বিশ্বাস করে না।

পরিব্রাজকগণ লানোগ্রাণ্ডি নামক একটি বড় সহরে গমন করেন। এই সহরে নিগ্রো এবং ইণ্ডিয়ান উভয় সম্প্রদায়েরই বাস। কুকুররা পরিব্রাজকগণের যাবতীয় আহার্য্য রাত্রিকালে লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল।

মিঃ বাণার্ড বিভান লিখিয়াছেন, "ভোর ৪টার সময় খাদ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। আমি অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে খাদ্য সংগ্রহের
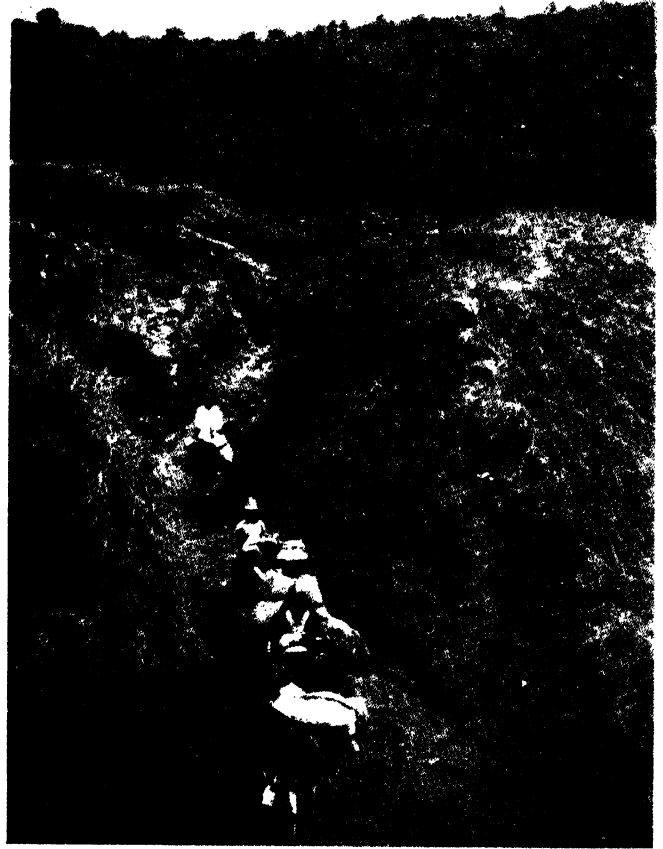
পার্ব্বত্য পথ—বর্ষায় নদীর আকার ধারণ করে

মৃত-কচ্ছপ, কুম্ভীর, প্রবাল, মৎস্য প্রভৃতি হইতে অলঙ্কার নির্ম্মাণ

আয়ুটলার ধর্ম্মমন্দির-সংলগ্ন বাজার

তিন জন জ্যাকাটেপেকাস্ গ্রাম্য-সর্দ্দার

জন্য গ্রামের মধ্যে গমন করিলাম। একটি কুটীর হইতে বিচিত্র বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। আমি উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ৪ জন কৃষক—নিগ্রো-ইণ্ডিয়ান—একটি কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া রহিয়াছে। দুই জনের হাতে বীণা, এক জনের হাতে সেতার-জাতীয় যন্ত্র, এক জনের হাতে ঢোলক। তাহারা যন্ত্রযোগে একটি সুন্দর গান গাহিতেছিল।

"কুটীরের মাঝখানে একটি টেবলের উপর একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। তাহার চারিদিকে প্রজ্জলিত বাতি। মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে নীল পরিচ্ছদ, মাথায় স্বর্ণ ও রৌপ্যরচিত মুকুট। কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে একটি সাদা পর্দ্দা। তাহাতে বাদামী রঙ্গের ফলের গুচ্ছ দোদুল্যমান।

"বাহিরে কতকগুলি লোক বসিয়া বসিয়া তন্দ্রাভরে ঢুলিতেছিল। এক জন বৃদ্ধা একটি কটাহে পোজল নামক শস্য সিদ্ধ করিতেছিল। সতর্কভাবে আমি প্রশ্ন করিলাম, কারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপার চলিতেছে কি? কে মারা গিয়াছে? এক জন বীণাবাদক ইঙ্গিত করিয়া মূর্ত্তিটির প্রতি দেখাইল। অতি মৃদু কোমল কণ্ঠে সে বলিল, 'এই ক্ষুদ্র দেবতা।' তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, যে মূর্ত্তিটি রঙ্গীন বস্ত্র ও কাগজে আবৃত, সে একটি শিশু।

"বৃদ্ধা বলিল যে, জ্বররোগে শিশুটি মারা গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ নারী এক পেয়ালা চকোলেট ও এক পাত্র পোজল আমাকে প্রদান করিল। আমি চকোলেট-পেয়ালা ফেরৎ দিলাম। কারণ, গত পূর্ব্বদিবস আমি একটা বিচিত্র রীতির কথা শুনিয়াছিলাম। উহার সহিত নরমাংস ভোজনের পার্থক্য খুব অল্পই।

"উল্লিখিত প্রথা শুধু নিগ্রো এবং নিগ্রো-ইণ্ডিয়ানগণের মধ্যেই আবদ্ধ। সমস্ত মেক্সিকোর মধ্যে ইণ্ডিয়ান শিশুকে মেরী মাতার পরিচ্ছদে ভূষিত করা হয়। এখানেও তাহাই দেখিলাম। মৃত শিশুকে সমস্ত রাত্রি এই ভাবেই রাখা হয়। বাদক ও গায়কগণ তাহার উদ্দেশ্যে গীতবাদ্য করিয়া থাকে। কয়েক ঘণ্টা পরে আর এক দল লোক এই ভাবে শোক প্রকাশ করিবার জন্য, পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া থাকে। এক জন পাচক বা পাচিকা তাহাদিগকে আহার্য্য যোগাইয়া থাকে।"

কৃষ্ণকায়দিগের গ্রামগুলির স্বাস্থ্য ভাল নহে। অনেকেই পিন্‌টো বা মেকসিকান্ কুষ্ঠরোগে পীড়িত। হাতের উপর সাদা দাগ, মুখে কালো অথবা গায় নীল ফোস্কা। সংক্রামকতা-দোষ বিশেষভাবে না থাকিলেও উহা বংশ-পরম্পরানুক্রমে চলিতে থাকে। এই রোগে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনয়ন করে না। এমন অনেক গ্রাম আছে যে, প্রত্যেক গ্রামবাসী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ডাকবাহী হরকরা

অনেকে রক্তামাশয় ও ম্যালে-রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের ঔষধ এদেশবাসীরা ভাল জানে না। বসন্ত-ক্ষতে এ দেশবাসীরা সামুদ্রিক শঙ্খ চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিয়া থাকে। প্রবাল-চূর্ণ মদ্য সহযোগে পান
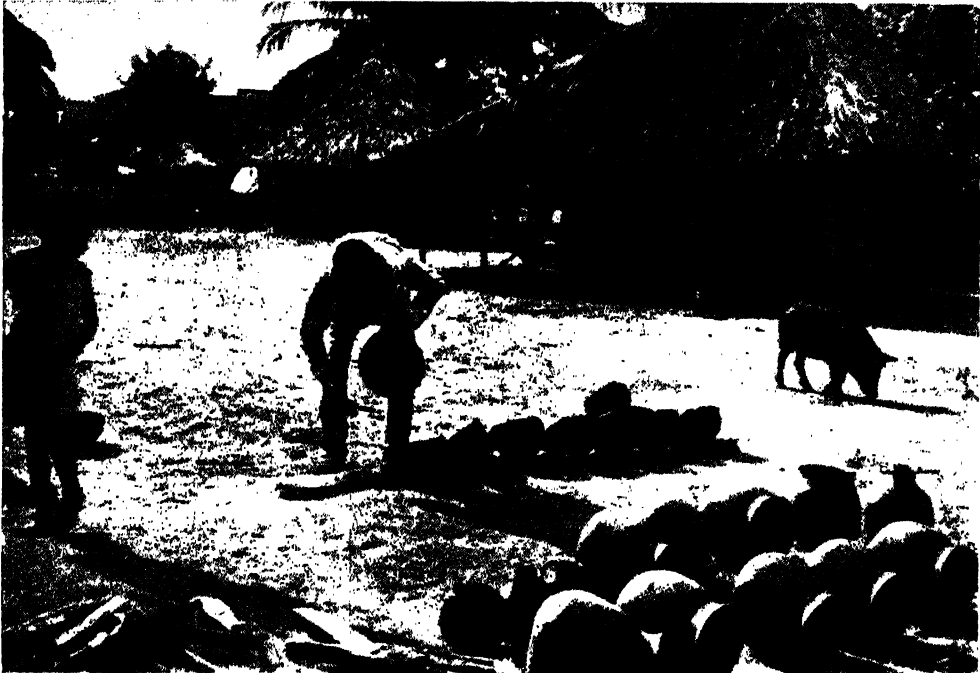
কষ্টা চিকার নিগ্রোদিগের হাঁড়ি-কলসী

করিলে হৃদ্‌রোগের আক্রমণ আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া এ দেশবাসীরা উহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

সপ্তদশ দিবসে পর্য্যটকগণ গুয়েরোরো এবং ওমেটেপেক্ অঞ্চলে প্রবেশ করেন। এখানকার সহর অপেক্ষাকৃত বড়। সহর দেখিলে মনে আনন্দ জন্মে। রাজপথগুলি পরিচ্ছন্ন, পথের দুই ধারে দ্বিতল অট্টালিকাশ্রেণী। ওয়াক্‌সাকার পর এরূপ সুন্দর সহর পর্য্যটকগণ দেখেন নাই।

ওমেটেপেক সহরে বহু ইণ্ডিয়ান উপজাতি ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকে। লাউয়ের খোলা হইতে বিবিধ

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের বন্দুক

দ্রব্য বর্ণ-সমাবেশে সুদৃশ্য। নানাপ্রকার আধার, কাঠের বাক্স প্রভৃতি এখানে কিনিতে পাওয়া যায়।

এখানকার বহু উপজাতি তাহাদের বেশভূষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট। প্রত্যেকেই উপজাতীয় ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

স্পানিয়ার্ডরা মেক্সিকো জয় করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে আজটেকরা এই অঞ্চলে আপতিত হইয়াছিল। ওমে-টেপেকের সন্নিহিত দুইটি গ্রামে এখনও আজটেক বা মেক্সিকোর ভাষা প্রচলিত। ইণ্ডিয়ানরা কিরূপ রক্ষণশীল, তাহা এই ব্যাপার হইতেই

মেক্সিকান্ বাসভবন

বুঝিতে পারা যায়। ৫ শত বৎসর ধরিয়া তাহারা এই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিতেছে। তবে আমুসগো ভাষা গুয়েরোরোর ৬টি গ্রামে এখনও প্রচলিত, ওয়াকসাকায় তিনটি ভাষা চলিতেছে। এরূপ আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

মিক্স্টেক ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিলেও, উক্ত আমুসগো ভাষায় অল্পসংখ্যক পরস্পর সংযোগশীল কথা দেখিতে পাওয়া যাইবে। অধিকাংশ শব্দই দ্বিধ্বন্যাত্মক। তন্মধ্যে আনুনাসিক শব্দের প্রাচুর্য্য অধিক। প্রত্যেক শব্দেই ব্যঞ্জনবর্ণের আরম্ভ এবং স্বরবর্ণে শেষ। স্বরবর্ণের উচ্চারণভেদেই শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবে।

যাহারা এই ভাষায় অভ্যস্ত নহে, তাহাদের কর্ণে উহা চৈনিক ভাষার ন্যায় ধ্বনিত হইবে। অতি অল্পসংখ্যক আমুসগো, স্পেনীয় ভাষায় কথা বলিতে পারে। তাহাদের উচ্চারণ চৈনিক ভাষার ন্যায়।

আমসগসের তরুণী-যুগল

এই ক্ষুদ্র উপজাতির ইতিহাস অনুমান করিতে যাওয়াও নির্ব্বুদ্ধিতার দ্যোতক। এই উপজাতির লোকসংখ্যা ২ হাজার হইতে পারে। মিক্স্টেক সভ্যতা অপেক্ষাও এই সভ্যতা প্রাচীনতম। মিকস্টেক, জাপোটেক কিম্বা চ্যাটিনো ভাষা হইতে উহাদের ভাষার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। অথবা উহারা যাহাদের বংশধর, সেই জাতির ভাষা হইতে ঐ ভাষার উদ্ভব হইতে পারে।

আমুসগোস্ অধ্যুষিত গ্রামসমূহে স্পানিয়ার্ডরা বহু শতাব্দী ধরিয়া শাসনকার্য্য চালাইয়াছিল; কিন্তু স্পেনীয় ভাষা তাহাদিগকে শিখাইতে পারে নাই, তাহাদের রীতিনীতিরও পরিবর্ত্তনসাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। মেক্সিকো সহর হইতে তাহাদের বালকবালিকা আধুনিক নৃত্য ও গান করিতে শিখিতেছে।

ওমেক্টেপেক্ হইতে দুইটি স্বতন্ত্র পথ বাহির হইয়াছে। ঐ পথে আকাপুল্কো যাওয়া যায়। আট দিন কঠোর শ্রম সহ্য করিবার পর পর্য্যটকগণ পার্ব্বত্য অরণ্যপথে আবার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আজোইয়ো নামে গ্রামে পৌঁছিয়া তাঁহারা জনৈক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সন্দর্শন করেন। উল্লিখিত শিক্ষককে কেহ হত্যা করিয়াছিল।

নিহত কুম্ভীর

সান্লুই আকট্নাল গ্রামের অধিবাসীদিগের নিকট তাঁহারা অবগত হইলেন যে, আজোইয়ো গ্রামের লোকরা অতি মন্দ-প্রকৃতির। উহারা প্রায়ই আত্মকলহে নিযুক্ত

থাকে—মারামারি কাটাকাটি করিতে ভালবাসে। এজন্য তাহারা ঐ গ্রামবাসীদিগকে প্রায়ই পরিহার করিয়া চলে। শুধু কোন কোন পর্ব্ব উপলক্ষে তাহারা একত্র সম্মিলিত হয়।

সমগ্র অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া ভ্রমণকারীরা একটি বিষয়ে বিশেষ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সরকার সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ছাত্রগণ অত্যন্ত মেধাবী এবং উৎসাহসহকারে শীঘ্র বিদ্যার্জ্জন করিয়া থাকে। সরকারী অর্থে ঐ সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ছোট ছোট সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক কর্ম্মঠ পুরুষ এ জন্য চাঁদা দিয়া থাকে। সেই অর্থেই বিদ্যালয়-সমূহের প্রতিষ্ঠা। জাতির যথার্থ গৌরব উহাতেই নিহিত।

অল্পদিন হইল, বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখনও প্রাচীন রীতি-নীতি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রবীণগণ উহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। সান্ লুই আকাটলাস্ এবং আয়ুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী কন্‌কর-ডিয়ায়, মেরিমাতার উৎসব-ভোজে, ১৬ই জুলাই তারিখে প্রাচীনপন্থী মেক্‌স্টেকেরা দলে দলে সমবেত হয় এবং একটি লৌহ-ক্রশের পাদপীঠে কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া থাকে।

শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন রীতিনীতির ক্রম তিরোধান হইতে থাকিলেও বয়স্কগণ এখনও মিক্‌স্টেক সভ্যতার অনুরাগী। সেলাইয়ের কল, বোতাম এবং মোটর-চালিত যন্ত্রাদির নাম মিকস্টেক ভাষায় নূতন করিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছে। 'ভয়' এই শব্দটির সহিত মোটর-চালিত যন্ত্রের সংস্রব আছে।

আয়ুলিয়া বেশ উন্নতিশীল সহর। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩ হাজার। একটি বিস্তৃত উপত্যকা-ভূমিতে বাজার বসিয়া থাকে। সমুদ্র এখান হইতে ১৫ মাইল দূরে—দেখা যায়। এখানে পতঙ্গের উৎপাত অত্যন্ত অধিক। আয়ুটলা হইতে আকাপুল্‌কা পর্য্যন্ত স্থানটি নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ানদিগের সমবায়ে গঠিত। কোন কোন গ্রামের অধিবাসীরা অত্যন্ত বিনয়ী।

পরিব্রাজকগণ ২৫ দিন পর্য্যটন করিয়া ৪ শত মাইল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সাত রাত্রি তাঁহাদিগকে অরণ্যে নিদ্রা দিতে হইয়াছিল। সাত রাত্রি মাটীর উপর ইণ্ডিয়ান গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এক দিন রাজপথের উপরেই রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। আকাপুলকোতে আসিয়া তাঁহারা উষ্ণ আহার্য্য ও উষ্ণ শয্যা পাইয়াছিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বাণী

রবি-করোজ্জ্বল প্রভাতের মাঝে, জননী আমার, এসেছ আজি ;
নীরব ছিল সে হৃদয়-তন্ত্রী তোমারি পরশে উঠিল বাজি !
কত দিন মা গো হয়ে তোমা ছাড়া হৃদয় আঁধার বিষাদে মোর,
বরষের পরে পড়েছে কি মনে তনয়ারে আজি, জননি, তোর ?
হৃদয়-কমল ছিল যে কলিকা নয়ন মুদিয়া জনমাবধি,
প্রভাতে সে আজ মেলেছে নয়ন, ক্ষণেক দাঁড়াও এসেছ যদি।
রাজরাজেশ্বরী, জননী, তুমি গো আমি যে দুখিনী তনয়া তোর—
কনক আসনে বসাতে মা তোরে নাহি যে, জননি, শকতি মোর !
কিছুই যে নাই পূজা-উপচার ভগ্ন জীর্ণ কুটীর মোর,
কিছুই যে নাই কি দিয়ে বাঁধিব বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত চরণ তোর ?
যে চরণ লাগি মহেশ পাগল গৃহহীন যোগী শ্মশানচারী
যে পদ-পরশে পাষাণে পীযূষ মরুর মাঝারে সরসী-বারি—
যে পদ লাগিয়া গোলোকের পতি বার বার ত্যজে গোলোকধাম !
যে চরণ-রেণু মাগে রবি শশী ! যে চরণ-তলে কাঁদিছে কাম !
নব মঞ্জরী আবীর কুঙ্কুমে শ্যামলা ধরণী আনিছে ডালা,
সমীর ফিরিয়া বনে উপবনে তব তরে মা গো গাঁথিছে মালা।
অমরাবতীর অমল পঙ্কজে পাঠায়ে দিয়াছে অমরাপতি,
রত্নাকর দেছে রতন-মেখলা, মেঘমালা দেছে জলদ-জ্যোতি ;
হিমালয় দেছে হীরক-কিরীট, নূপুর দিয়াছে—যক্ষরাজ,
নারদ দিয়াছে বীণাখানি তার জনম সফল করিতে আজ ;
রূপের ঈশ্বরী জ্ঞানের প্রসূতি দেবী বীণাপাণি জননী মোর,
কি আছে আমার যার বলে মা গো বাঁধিয়া রাখিব চরণ তোর ?
তবে যদি মা গো আপনি এসেছ দীনের কুটীরে দীনতা-মাঝে,
রাজরাজেশ্বরী-বেশে নহে, মা গো, এস শুধু মোর জননী-সাজে।
একবার চাহো করুণা-নয়নে—দাও মা তোমার প্রসাদ-সুধা
ঘুচাও, জননি, প্রাণের বেদনা, মিটাও আমার জ্ঞানের ক্ষুধা।
ত্রিলোকে যে স্নেহ ঢালিয়া দিয়েছ তার কণা দিয়ে করাও স্নান,
অচেতন হিয়া হবে সচেতন ফিরিয়া পাইব নূতন প্রাণ।
মধুর হাসিয়া ও রাঙ্গা-চরণে বারেক আয় মা কুটীরে মোর,
অজ্ঞান আঁধার দূর হয়ে যাক্ বিমল অঙ্গ-জ্যোতিতে তোর।
সুযোগ্য তনয় যারা তব, মা গো, তাদেরি কি শুধু দিবি মা স্নেহ ?
আমি কি মা,তোর সন্তান নহি ? আমি কি মা,তোর নহি গো কেহ ?
কত সন্তান খেলিতে আসিয়া চরণেতে করে কতই ত্রুটি—
তা বোলে, জননী, ফিরাইবে মুখ—কাঁদিবে সন্তান ধূলায় লুটি ?
ধূলা ঝেড়ে, মা গো, চরণেতে লও—অমৃত-বাণী এ কণ্ঠে দাও,
স্নেহের পরশ বুলায়ে অঙ্গে—চরণাগতারে হাসিয়া চাও !

শ্রীমতী ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

নিষ্কৃতি

এক

সুরভি নামটার সহিত অনেক দিনের পরিচয় থাকিলেও আসল মানুষটিকে জানিবার সুযোগ এমন করিয়া অশোকের কোন দিনই মিলে নাই, মিলিল যেমন সেবার পূজার ছুটীর অবসরে গিরিডিতে। এক কথায় বলিতে গেলে, সুরভি সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং বেশ একটু নব্য প্রকৃতিরই মেয়ে। তাহাদের মেলা-মেশার বাধাও কিছু ছিল না, বরং সেতুর মত তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পরিচয়ের অবাধ অবসর দিয়াছিলেন—অশোকের বৌদিদি নীলিমা। কারণ, সুরভি ছিল নীলিমার মামাতো বোন্।

বয়সের অনুপাতে সুরভি ছিল একটু বেশী চঞ্চল ও বাচাল। অশোক ছিল উহার বিপরীত,—মন্থর এবং স্বল্প-ভাষী। অনেক দিন অনেক বিষয়েই তাহাদের দুজনের আলোচনা চলিত। তবে কথা বলিত সুরভিই বেশী, আর অশোক মুগ্ধভাবে তাহার কথা শুনিত এবং তাহাকে সমর্থন করিত। তাহার এই গম্ভীর অথচ ছেলেমানুষের মত সহাস্য দৃষ্টিটুকু সুরভির ভাল লাগিত।

কাযকর্ম্মের অবসরে নীলিমাও অনেক দিন ইহাদের আলোচনায় যোগ দিত, ইহাদের দুজনের ব্যবহারটুকু তাহার বড় মিষ্ট লাগিত। সে দিন সে তাই স্বামীকে বলিয়াছিল, "ঠাকুরপোর সঙ্গে যদি সুরোর বিয়ে হয়, তা হ'লে ওদের একটি দিনের জন্যেও ঝগড়া হবে না।"

অমল বাবু বলিয়াছিলেন, "কেন গো?"

"ঠাকুরপো যেন সুরোর নামে অজ্ঞান!"

"সেটা তোমারই কারসাজি। কিন্তু—"

স্বামীকে চুপ করিতে দেখিয়া নীলিমা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কি?"

"আমার কিন্তু একেবারেই সাহস হয় না,—ওর বিয়ের কথা মনে আন্‌তে!"

"কেন বল ত? নাও বাপু, তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি ভয়! আমি ত বলি, ঠাকুরপো এই এক বছর হ'ল, দিব্যি সেরে গেছে। ও-যে রীতিমত জাগ্রত ঠাকুরের ওষুধ গো! তুমি ত বিশ্বাস কর্‌তেই চাওনি! এখন ওর ফল বুঝছো ত?"

অমল বাবু ইহার কোন প্রতিবাদই করিতে পারেন নাই।

কিন্তু, এই জাগ্রত ঠাকুরের ঔষধটা লইয়াই ঘটিল যত গোলযোগ!

এখানে আসিয়া অবধি একাধিকবার অশোক নীলিমাকে বলিয়াছে, "বৌদি, এবার এ লোহার বাঁধন হ'তে মুক্তি দাও আমায়! তোমাদের কথায় এটাকে আমি অনেক দিন সহ্য করেছি, কিন্তু, আর অসম্ভব!"—

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একগাছা মোটা লোহার তাগা, আজ বৎসরাধিককাল অশোকের বাহুতে আশ্রয় লইয়াছে। নীলিমা বলিয়াছিল, "ও মা, কি যে বল, ঠাকুর-পো! ও যে ঠাকুরের জিনিষ—মন্ত্রপূত জিনিষ!—বেশ ত' আছ, আবার এত দিনে ওটার ওপর তোমার ঝোঁক পড়লো কেন?"

ঝোঁক যে কেন পড়িয়াছিল, তাহার সবটুকু বৌদিদির কাছে প্রকাশ করিয়া বলা চলে না, তাই সে চুপ করিয়া গেল।

সুরভির পিতাও আসিয়াছিলেন গিরিডিতে—তাঁহার ভাঙ্গা স্বাস্থ্যকে অটুট করিয়া তুলিতে। বার্গাণ্ডা অঞ্চলে কাছাকাছি দু'খানি বাড়ীতে এই দুটি পরিবার বাস করিতেছিল।

অনেক দিন হইতেই জল্পনা চলিতেছিল, উশ্রী-প্রপাত দেখিতে যাওয়ার এবং সেখানেই একটা পিক্‌নিক্ করার। নীলিমা তাহার মামাবাবুকে বলিয়া সুরভিকেও সঙ্গে লইল।

জলপ্রপাত দেখিয়া সুরভি একবারে আত্মহারা হইল। সে অনর্গল এলোমেলো বকিতে-বকিতে একটা পাথর হইতে আর একটা পাথরে ছুটিয়া যায়, সেই বাধাবন্ধহীন মুক্ত গতির ছন্দে তাহার মাথার এলো-খোঁপার বাঁধন টুটিয়া ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের রাশি পিঠের উপর এলাইয়া পড়ে। এক দিকে পাহাড়ী ঝরণার গীতি-মুখর অপরূপ নর্ম্মলীলা, অন্য দিকে তাহারই মত ছন্দ-গীতিতে ভরা সুন্দরী তরুণীটির লীলায়িত গতিভঙ্গী। অশোক চুপচাপ্ দেখিতেছিল; সে দৃষ্টিতে একটা অচঞ্চল মুগ্ধতার ভাব সন্ধ্যাতারার মত

জ্বলিতেছিল। সুরভি এক সময় তাহার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা অশোক বাবু! আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনি হয় ত বোবা! মুখ বুজে থাক্‌তেও পারেন এত।"

"কেন, বেশ ত দেখ্‌ছি!"

"কি দেখ্‌ছেন, তাই বলুন ত? সব-চেয়ে কোন্‌টা ভাল লাগছে?"

অশোক মুচকি হাসিয়া বলিল, "তা বল্‌বো না।"

"কেন? বল্‌বেন না কেন?"

"আমি দেখছি শুধু তোমাকেই!"

"যান্! কি যে সব বাজে কথা বলেন।"

অশোক প্রতিবাদ করিল না, শুধুই হাসিল।

দুখানা খুব বড় পাথরের আড়ালে বসিয়া নীলিমা ও সুরভি খিচুড়ী রাঁধিল, অশোক তাহাদের কাছে বসিয়া জ্বালানী কাঠ যোগাইতে লাগিল।

নীলিমা বলিল, "বাবাঃ! ঠাকুরপো যে ঘেমে সারা হয়ে উঠেছ! গায়ের জামাটা খুলে ঐ ছায়ায় ঠাণ্ডা হয়ে বসো না একটু!"

অশোক তাড়াতাড়ি বেশ একটু জোর দিয়াই বলিল, "না না, আমার একদম্ গরম লাগেনি ত!"

রান্না শেষ হইলে সুরভি বলিল, "নিন্ অমল বাবু, চট্ ক'রে আপনারা চান্ ক'রে নিন্!"

খানিক দূরে ঝাঁক্‌ড়া একটা গাছের ছায়ায় সতরঞ্চি বিছাইয়া অমল বাবু বসিয়া কি একখানা বাঙ্গালা মাসিকের পাতা উল্টাইতেছিলেন; বলিলেন, "আমার চান্ হয়ে গেছে অনেক আগেই, সুরো! তোমার হাতের খিচুড়ী খাবার লোভে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি।"

নীলিমা বলিল, "তা হ'লে ঠাকুরপো, তুমি ভাই আর দেরী ক'রো না। তোমার চান্ করতেই ডিম-ক'টা ভাজা হয়ে যাবে। সুরো, তুইও ভাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস্।"

সম্মুখেই দুইটি বিস্তীর্ণ জলধারা বিশাল কালো পাথরের বুক হইতে নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, এবং সেই বিপুল জলরাশি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাথরে পাথরে প্রতিহত হইয়া শেষে এক নদীর আকারে বহিয়া চলিয়াছে। সুরভি সেই প্রপাতের পাদমূলে বসিয়া চুপ করিয়া জলরাশির সেই রুদ্র-মধুর মূর্ত্তিটুকু দেখিতেছিল, মুখে চোখে এলোচুলে আসিয়া লাগিতেছিল—ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত সুস্নিগ্ধ শীকরবিন্দুগুলি। হঠাৎ এক সময় ফিরিয়া তাকাইয়াই বলিয়া উঠিল, "ও মা, এ কি কাণ্ড, অশোক বাবু?"

কাণ্ড আর কিছুই নহে, অশোক তাহার গায়ের গেঞ্জি এবং সিল্কের কামিজ সমেত জলে নামিয়া স্নান করিতেছিল। সুরভি হাসিয়াই আকুল! হাসিতে হাসিতেই কহিল, "পাগল হলেন না কি, অশোক বাবু! ও দিদি," বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে একবারে নীলিমার কাছে আসিয়া তাহার গায়ে ধাক্কা মারিয়া বলিল,—"দিদি, দেখ ভাই, অশোক বাবুর রঙ্গ দেখ!"

নীলিমা দেখিল, অশোক ভিজা কাপড় ও ভিজা জামায় জলের ধারে দাঁড়াইয়া তোয়ালে লইয়া মাথা মুছিতেছে। সে বলিল, "সত্যই ত! ও কি ঠাকুরপো? জামাটা—"

আরও সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া অশোক একরকম ছুটিতে ছুটিতেই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুরভি হাসিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ নীলিমার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া সেও গম্ভীর হইয়া গেল। নীলিমা বলিল, "ওর যখন যা' খেয়াল! এখনও যেন ছেলেমানুষটি!"

খানিক পরে অশোক মাথা মুছিয়া একখানি শুষ্ক ধুতি পরিয়া এবং খালি-গায়ের উপর গলা-খোলা গরমের কোট চাপাইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরভি আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "আবার বুঝি এখন একটা মোটা কোট গায়ে চাপালেন?"

নীলিমা কিন্তু সুরভির সে হাসিতে যোগ দিল না। অশোকও তাহার কথার কোনও উত্তর দিল না, শুধু মুখ টিপিয়া সামান্য একটু হাসিয়াই নীলিমার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "উঃ, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, বৌদি! জলটার এম্‌নি গুণ!"

সুরভি কি বুঝিল, কে জানে, ঐ সামান্য ব্যাপারটাকে আর সে ঘাঁটাইয়া তুলিল না।

অশোকের এই খেয়ালের পশ্চাতে যে মস্তবড় একটা কারণও প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা বুঝিল একা নীলিমাই। বাড়ীতে আসিতে সে স্বামীকে বলিল, "ঠাকুরপো ত কেবলই বলে, তাগাটা খুলে দেবার জন্যে। হ্যাঁ গা, তা দেওয়া চলে?"

"কি ক'রে বল্‌বো বল ? আবার যদি কিছু হয় ?"

"তাই ত আমিও ভাবি ! ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার, এ ত ছেলে-খেলা নয় !"

স্বামী বলিলেন, "আর তা থাক্‌লেই বা ! ওটাকে নিয়ে কিই বা এমন মুস্কিল বাধ্‌ছে ?"

মুস্কিল যে কোথায় এবং কোন্ দিক দিয়া বাধিতেছিল, সে সম্বন্ধে নীলিমার অনুভূতিও সুস্পষ্ট নহে, তাই কোনও কথাই সে বলিতে পারিল না।

খ

অশোক বুঝিল, তাহার এই জামা গায়ে দিয়া স্নান-করা ও দারুণ দুপুরের রৌদ্রে মোটা কোট চাপাইয়া আহারে বসা অত্যন্ত বিশ্রী এবং বিসদৃশভাবেই সুরভির চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। স্পষ্টই সে ত বলিল, "আপনি পাগল হলেন না কি ?" সত্যই সুরভি তাহাকে পাগল বলিয়াই ভাবিল না কি ? সে কি তবে কিছু জানিয়াছে ?

সকলে বলে, কবে না কি সে এক দিন পাগলই হইয়াছিল, এবং তাহারই জন্য তাহাকে কোথায় কোন্ ঠাকুরবাড়ী লইয়া যাওয়া হয় ও ঐ বিশ্রী কদাকার লোহার তাগাটা তাহার বাহুতে আঁটিয়া দিয়া তাহাকে আরোগ্য করা হইয়াছে। কিন্তু, কৈ, তাহার নিজের ত কিছুই মনে পড়ে না ! আর, সত্যই যদি অতীতে এক দিন তাহার মাথার একটু বিকৃতিই ঘটিয়া থাকে, সে কি ঐ লোহার তাগা পরিয়াই ভাল হইয়া গেল ? সমস্তই ভণ্ডামী, আগাগোড়াই ধাপ্পাবাজী ! ধর্ম্মের নামে দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ যে কত বড় শঠতা করিতে পারে, তাহার নিদর্শন এইখানেই। মন্ত্রপূত তাগা ? ঐ শ্রীহীন খানিকটা লোহার ভিতর দেবতার পবিত্র মন্ত্র স্থান পাইল কোন্ দিক দিয়া ?

তবু ত বৌদিদি শুনিবেন না ! তাঁহার অটুট বিশ্বাস ঐ বস্তুটার উপর। ওটাকে খুলিলেই না কি সে আবার পাগল হইবে ! বৌদিদির এ স্নেহের অত্যাচার এতখানি অসহনীয় সে মনে করে নাই কোনও দিন, যেমন আজ করিতেছে।

সুরভি যদি কোন রকমে এ ব্যাপারের আভাসমাত্র জানিতে পারে ? কি ভাবিবে সে ? ভাবিবে যে, অশোক বাবু যাহাই কিছু বলুক্ না কেন, আসলে তাহার কথার কোনও দামই নাই। কারণ, সে একটা পাগল বৈ আর কিছুই নয় যে ! অশোকের কথার উপর, অনেক বিষয়ে তাহার মতামতের উপর সুরভির অচঞ্চল আস্থাটুকু তখন কোথায় থাকিবে ?

সুরভির সহিত আলাপ হওয়ার পর হইতেই ঐ কথাটা অশোক অনেক দিন অনেকবার ভাবিয়াছে। কিন্তু ঐ কথাটা কোনও দিনই তাহাকে এতখানি চঞ্চল করিয়া তোলে নাই, যেমন করিয়াছে আজ ঐ পিক্‌নিকের পর হইতে।

সে ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা, অমনভাবে জামা-পরার অভিনয়টুকু না করিয়া অন্য কোনও দিক দিয়া কি ঐ জিনিষটাকে গোপন করা চলিত না ? স্নান না করিলেও ত চলিতে পারিত ! তা চলিত, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক বুদ্ধি মাথায় আসিল কোথায় ? কে ভাবিয়াছিল, ঐ তুচ্ছ ব্যাপারটা সুরভির চোখে এমন করিয়া বিঁধিবে ? যদি সে এমনি একটা কিছু সন্দেহ করিয়া ঝোঁকের বশে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই বসে ?

সুরভি যে বোকা মেয়ে না, বরং তাহার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, সে বিশ্বাস অশোকের ছিল।

তাই, সে দিন বাড়ীতে ফিরিয়া অবধি ঐ একটা কথাই নানা প্রশ্ন ও নানা সমস্যার আকারে অশোকের মাথার ভিতর এমন একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে, রাত্রিতে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়াও তাহার নিদ্রা হইল না এবং ঘুরিয়া-ফিরিয়া এই একটা সিদ্ধান্তই তাহার মাথায় জাঁকিয়া বসিল যে, যেমন করিয়া হউক, ঐ লোহার তাগা-টাকে খুলিয়া ফেলিতে না পারিলে কোনও দিক দিয়াই তাহার নিস্তার নাই। নিশীথ রাত্রিতে নির্জ্জন কক্ষের এই স্তিমিত আলোকে সে নিজের অন্তরের তন্ন তন্ন খোঁজ লইয়া দেখিল, তাহার আজীবনের শিক্ষা—তাহার মর্য্যাদা, সমস্তই নির্ভর করিতেছে ঐ একটা জিনিষের উপরেই। রাহুর মত তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঐ লোহার তাগাটা তাহার সমস্ত সত্তাকে ধূলির সহিত মিশাইয়া দিবার মতলব আঁটিয়া বসিয়াছে। তাহার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে।

সকালে উঠিয়া অশোকের মুখের পানে চাহিয়া নীলিমা চমকিয়া উঠিল।

"তোমার অসুখ করেছে না কি, ঠাকুরপো ?"

অশোক হাসিয়া বলিল,—অসুখ কেন করবে, বৌদি ?"

"মা গো মা ! মুখ-চোখ শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে যে !"

অশোক হাসিয়াই উত্তর দিল, "ঠাট্টা করছো, না ?"

"ঠাট্টা কি গো ! সত্যি বল্‌ছি, তোমাকে বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি বুঝি ?"

হঠাৎ কেমন করিয়া অশোকের কিন্তু নিশ্চিত ধারণা হইয়া গেল, সুরভির প্রসঙ্গ লইয়া বৌদিদি তাহার সহিত রহস্যই করিতেছেন ; এবং সেই সূত্রেই ঐ ঘুম না হওয়ার ইঙ্গিত ! সে হাসিয়াই কহিল, "যাও যাও, তোমার দুষ্টুমী আমি সব বুঝিছি !" বলিয়া সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বরাবর নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

একটু পরেই সুরভি আসিয়া একবারে তাহার ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"ব্যাপার কি ? আজ কি আর বেড়াতে যাবেন না, অশোক বাবু ?"

অশোকের মুখখানা হঠাৎ লজ্জায় তাতিয়া উঠিল। "বা রে, কেন যাবো না ?"

সুরভি বলিল, "আজ আপনাদের হ'ল কি বলুন ত ? জামাইবাবু ত এখনো ঘুমুচ্ছেন, সংসারের ঠেলায় দিদির বেরুবার ফুরসৎ নেই, আপনিও দেখছি—"

"কেন, আমি কোন্ দিন বেড়াতে যাইনে বল ?"

"তবে চলুন না, আমরাই বেড়িয়ে আসি !"

অশোক একটু যেন দমিয়া গিয়া বলিল, "একা তুমি আর আমি ?"

"হলই বা !" বলিতে বলিতে সুরভিও অকারণে আরক্ত হইয়া উঠিল।

অশোক কি ভাবিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, "তা, চল, আমার আপত্তি নেই।"

এ ভাবে দুজনে বেড়াইতে যাওয়ায় আদৌ কিছু নূতনত্ব না থাকিলেও আজ দু'জনেরই যেন অনেকখানি নূতনত্ব ঠেকিতে লাগিল। রাস্তায় তাই কেহই বড় একটা কথা কহিতে পারিল না। অশোকের কেবলই মনে হইতেছিল, সুরভি হয় ত আজ—এই নির্জ্জনতার সুযোগে সেই প্রসঙ্গটাই তুলিতে চায়। হঠাৎ যদি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, কেন সে সকল সময়েই জামা গায়ে দিয়া থাকিতে ভালবাসে ? কি উত্তর দিবে সে ? তাহা ছাড়া, যদি কাহারও নিকট সে কিছু শুনিয়াই থাকে, এবং সেই লইয়াই কিছু প্রশ্ন করিয়া বসে ?

সুরভির চিন্তাধারা কিন্তু বহিতেছিল সম্পূর্ণ অন্য দিকে। আজ যেন তাহার মনে হইতেছিল, সত্যই বুঝি এমনই নির্জ্জনে দু'জনের বেড়াইতে আসায় লজ্জার কথা কোথাও একটু ছিল ! কলেজের ছাত্রী সে, পুরুষ-ছাত্রদের সহিত মেলা-মেশা তাহার কাছে এমন একটা লজ্জাজনক কাণ্ডও কিছু নয় ; আর, ঐ অশোকেরই সহিত ইতিপূর্ব্বে কত দিন একা ঘরে-বাহিরে কত গল্প-গুজব, আলাপ-আলোচনা সে করিয়াছে, তবে, আজই বা এ কথা মনে হয় কেন ?

সুরভি বলিল, "আজ আপনার বেড়াতে আসবার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না, নয় ?"

অশোক বলিল, "তা, সত্যি, বেড়ানোর কথাটা আজ মনেই ছিল না একেবারে !"

"তাই ভাবছি যে, কাল থেকে আমি একাই যাবো বেড়াতে।"

"কেন ?"

"আমি আপনাদের ভারী ব্যস্ত ক'রে তুল্‌ছি দিন দিন !"

"ব্যস্ত ক'রে তুল্‌ছো ? বেশ যা-হোক্ !"

"নয় ত কি ?" বলিয়া সুরভি হঠাৎ অনাবশ্যক জোরের সহিত বলিয়া উঠিল, "সত্যি, কি যে আপনাদের মন ! আমার সঙ্গে একা বেড়াতে যাওয়ার কথায় আপনি যেন শিউরে উঠলেন ! আমি ত বলি, ঐগুলোই আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা !"

অশোক কি ভাবিল, বলা যায় না, কিন্তু কোনও উত্তরই সে দিতে পারিল না।

সুরভি অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়া বলিল, "দিদি বল্‌ছিলেন, আপনার শরীর নাকি আজ ভালো নেই !"

অশোক বলিল, "ও সব বৌদির দুষ্টুমী ! তোমার কথা নিয়ে বৌদি খালি ঠাট্টা করে আমায় !"

আবার একবার সুরভির ফর্সা মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। পরে মৃদু একটু হাসিয়া কহিল, "তা জানি। সে-কথা আমারও কাণে আস্‌তে বাকী নেই। দিদি যেন কি !—" পরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তাই ত বল্‌ছিলুম, আমাদের মনেরই ভেতরে যত রকমের অশান্তি ! কবে কার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাই নিয়ে

এখন থেকে যত রকমের 'কিন্তু'র কাঁটা মনের ভেতরে জড়ো কর্‌তে হবে ?"

অশোক বলিয়া ফেলিল, "তবে কেন তুমি আর আস্‌বে না বল্‌ছো ?"

তাহার মিনতি-মাখা কথার ভঙ্গীতে সুরভি না হাসিয়া পারিল না। অশোকের চোখ দুটি কিন্তু হঠাৎ যেন ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে বলিয়া ফেলিল, "সত্যি বল্‌ছি, তোমার দেখা না পেলে আমি বাঁচবো না।"

সুরভি হাসিয়া কহিল, "আপনার সবই খেয়াল !—কিন্তু, এ দিকে যে আমাদের বাড়ী ফেরবার দিন এগিয়ে এল !"

অশোক বিস্ময়ের সুরে কহিল, "কেন, আমরা ত এখন হাওড়াতেই আছি। কল্‌কাতায় ফিরে তুমি আর আমাদের বাড়ী যাবে না ?"

তাহার প্রশ্নের এই ছেলেমানুষী রেশটুকু সুরভির ভারী মিষ্ট লাগিল। সে মাথা দুলাইয়া বলিল, "যাব নিশ্চয়ই, অবশ্য যত দিন যাওয়া চলে !"

সারা দিনটা ধরিয়া সুরভির কথাগুলিই অশোকের মগজের ভিতর ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। সুরভি যে তাহার সম্বন্ধে মনে কোনো মন্দ ধারণা পোষণ করে নাই, বরং কলিকাতায় ফিরিয়াও সে তাহাদের বাটীতে যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, এই চিন্তাটাতেই সে অত্যন্ত আরাম বোধ করিল।

খট্‌কা লাগিয়াছে কিন্তু তাহার একটি কথায় ! সুরভি বলিল, যত দিন যাওয়া চলে, তত দিনই সে তাহাদের বাটীতে যাইবে। কেন ? কিসের বাধা সে আশঙ্কা করে ? তবে কি সে তাহার সম্বন্ধে সব কথা জানিয়াই ইঙ্গিতে ঐ কথাটি বলিয়া গেল যে, পাগলের সহিত মেলামেশা তত দিনই চলিতে পারে, যত দিন—

তাই কি ?

কথাটা ভাবিতে গিয়া অশোকের একে-একে মনে পড়িতে লাগিল, সারা পথটা সুরভি যেন কি-এক রকম অন্যমনস্কভাবে পথ চলিয়াছিল, এবং থাকিয়া থাকিয়া অশোকের মুখের পানে চাহিয়া কি যেন সে দেখিতেছিল। প্রত্যহ যে মেয়েটি অত বেশী কথা বলে, আজ সে খুব কমই কথা কহিয়াছে, সে-কথা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি অসম্পর্কিত। আজ যেন কি একটা অব্যক্ত কারণেই অনেক কথা বলি-বলি করিয়াও সুরভি তাহাকে বলিতে পারে নাই। কি সে কথা ?

আবার এক সময় স্পষ্টই সে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল, না, সুরভি কিছুই টের পায় নাই। সে তাহাকে ভালবাসে। এমন কি, সত্যই ভবিষ্যতের কোনও এক শুভ মুহূর্ত্তে তাহারই সহিত সুরভির বিবাহের প্রস্তাব হইলে সে তাহাতে অসম্মত না হইতেও পারে।

কিন্তু, তাই যদি হয়, তাহা হইলে কি হইবে ? ঐ কদাকার তাগাটা ? বৌদির কাছে মিনতি করিয়া কোনও ফল হইবে না। তবে ?

না, বৌদিকে সে আর কিছুই বলিবে না, ঘুণাক্ষরে জানিতে দিবে না কোন কথা ! তাঁহাকে না জানাইয়াই ইহার একটা কিনারা তাহাকে করিতেই হইবে।

সে দিন বৈকালে একা বেড়াইতে বাহির হইয়া বাজার ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অশোক একটা মাঝারি গোছের উখা কিনিয়া ফেলিল। জিনিষটা কিনিয়া তাহার আর আনন্দ ধরে না ! বাড়ীতে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন নীলিমা ও সুরভি সবে বেড়াইয়া ফিরিয়া বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছে। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বরাবর নিজের ঘরে আসিয়া উখাটা তাহার বিছানার তলায় রাখিয়া দিল।

নীলিমার বড় ছেলে মণ্টু, বয়স বছর আট। অশোক চুপি-চুপি মণ্টুকে তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল, এবং বাঁ-হাতের তাগাটা দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখি মণ্টু, তোর গায় কেমন জোর ! এইটেকে আচ্ছা ক'রে ক'ষে ধর্‌ দিকিন্‌ !"

মণ্টু তাহার ছোট-ছোট দুই হাতে শক্ত করিয়া তাগাটা চাপিয়া ধরিল। অশোক উখা লইয়া তাহার উপর ঘষিতে আরম্ভ করিল। উখার ঘর্ষণের সেই বিশ্রী শব্দটা স্নিগ্ধ সন্ধ্যার সমস্ত নিস্তব্ধতাকে কাঁপাইয়া তুলিল। অশোকের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সে প্রাণপণ জোরে উখা চালাইয়া গেল।

হঠাৎ এক বিপত্তি ঘটিল। নীলিমার ত্রস্ত কণ্ঠস্বরে অশোকের হাত থামিয়া গেল। সে হতবুদ্ধির মত নীলিমার মুখের পানে চোখ তুলিতেই নীলিমা চোখের পলকে তাহার

হাত হইতে উখাটা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "মা গো মা, সর্ব্বনাশ না বাধিয়ে তুমি ছাড়বে না দেখ্ছি, ঠাকুরপো! আশ্চর্য্য খেয়াল ত তোমার! কি কাণ্ড হয়েছিল সেবার, তা বুঝি ভাবতে পারো না একবার?"

হায় রে, ভাবিবে কে? অশোকের মাথায় যে কেবল ঐ চিন্তা—ঐ একটা চিন্তা! সে যে পুরাপুরি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, ঐ তাগাটাই তাহার মরণ-শত্রু! ঐ তাগাটাই যে সমস্ত জগৎ-সংসারে নিরন্তর প্রচার করিয়া দিতেছে, সে উন্মাদ রোগগ্রস্ত! তবে আবার ভাল হইল সে কেমন করিয়া? ঐ তাগা পরাইয়াই তো তাহাকে দাগী পাগল বানাইয়া বিশ্বের পথে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে!

কিন্তু, একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। নীলিমা উখাটা লইয়া চলিয়া গেল। পশ্চাতে ছুটিল মণ্টু। একা সেই ঘরের মেঝেয় বসিয়া অশোক সেই তাগাটার উপর উখার গভীর ক্ষতটুকু বারম্বার দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক সময় মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাহার দুটি চোখ ভিজিয়া উঠিল।

গ

রাত্রিকালে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল। অশোকের চোখের পাতায় কিন্তু নিদ্রার আবেশটুকু পর্য্যন্ত নাই। সে তাহার কাপড়ের সুতা ছিঁড়িয়া তাগাটায় লাগাইয়া কেবলি পরীক্ষা করিতেছিল, ঐ অল্পক্ষণে উখাটাতে কতখানি কায হইয়াছে।

এখন তো সবাই নিদ্রিত! এই সময় একবার উখাটা হাতের কাছে পাইলে সে একাই এই রাত্রির নির্জ্জনতায় বসিয়া বসিয়া এই সর্ব্বনাশা শত্রুটার নিপাত করিতে পারে!

ধীরে ধীরে সে দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শুক্লা একাদশীর আকাশে মেঘ জমিয়াছিল, রীতিমত মেঘলা বাতাস দিতেছিল। সেই ঝাপসা আলোয় অশোক তাহার দাদার ঘরের কাছে আসিয়া দরজায় চাপ দিয়া দেখিল, ভিতর হইতে বন্ধ। বুকের ভিতরটা ছটফট করিয়া উঠিল। লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে দরজাটা? কিন্তু—না, তাহা সে করিবে না। ছেলেমানুষী করিলে কোন কাযই হইবে না। পা টিপিয়া-টিপিয়া উঠানের দরজা খুলিয়া সে বাহিরের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ওদিক দিয়া ঘুরিয়া গিয়া দাদার ঘরের জানালার নীচে আসিয়া সন্তর্পণে খড়খড়ি তুলিয়া দেখিল, শুধু খড়খড়ি নহে, তাহার উপর আবার শার্শি পর্য্যন্ত আঁটা। আবার মনে হইল, শার্শি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে?—মন বলিল, না, হৈ-চৈ করিলে লোক জাগিবে, কায হইবে না।

অনেকক্ষণ সে স্তব্ধের মত সেই খোলা কম্পাউণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। পূবে-বাতাস হু-হু করিয়া তাহার সারা দেহের উপর দিয়া বহিতেছিল। তাহার গতি-তরঙ্গে যেন কত কথা—কত উৎসাহ! সে যেন সব বুঝিয়াছে, তাহার অন্তরের সমস্ত বেদনার গোপনতম খবরটিও যেন তাহার অজানা নাই! মনে হইল, সে যেন স্পষ্টই বলিতেছে, তুমি পাগল না হইলেও দশচক্রে তোমায় পাগল করিয়াছে; সহিবে কেন তুমি এই অত্যাচার—এই অবিচার?

দূরে—ঐ চড়াইয়ের উপর পালকের মত ধব্ধবে সাদা বাড়ীখানা, ঐ ত সুরভিদের বাংলো? আর ঐ যে ঘরখানি দেখা যাইতেছে, ঐ ত সুরভির ঘর? কে জানে, সুরভিও হয় ত এখনও জাগিয়া আছে! যদি সে ঐ জানালাটার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়? তাহাকে সে দেখিতে পাইবে কি? দেখিলে হয় ত ভাবিবে, পাগল না হইলেই বা এই গভীর রাত্রিতে এমন করিয়া—

অশোক একটু আড়ালে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যই কি সে তবে পাগল? ঐ তাগাটার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আবার সে পাগল হইল না কি? মিথ্যা কথা! পাগল সে কোন কালেই ছিল না। তবু কেন লোকে তাহার দেহে পাগলের ঐ তকমা আঁটিয়া দিল? এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে লড়াই করিবে—হ্যাঁ, দস্তুরমত লড়াই করিবে! সে মূর্খ নয়; নিষ্ফল তাহার সমস্ত বুদ্ধি—বিবেক—শিক্ষা, যদি না ঐ একটা অহেতুক কলঙ্কের গ্লানি হইতে নিজেকে সে রক্ষা করিতে পারে!

কিন্তু, কি করিবে সে? তাহার লুপ্তরত্ন ঐ উখাটিকে উদ্ধার করিবার জন্য সে জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে যে! কেমন করিয়া সে তাহা ফিরিয়া পাইবে?

অশোক আকাশ-পাতাল ভাবিল। মাথার ভিতর অসহনীয় চিন্তার জ্বালা! থাকিয়া-থাকিয়া প্রবল হতাশায় সে তাহার হাতের তাগাটা লইয়া ঝাঁকানি দিল। সে ঝাঁকানিতে শরীরের সমস্ত হাড় কন্-কন্ করিয়া উঠিল। বাহুর ঐ হাড়খানা বুঝি কাটিয়াই পড়ে বা!

ফটকের ধারেই মালীর ঘর। মালী রাত্রিতে এখানে থাকে না। ঘরের চাতালের উপর একখানা কোদাল, এক খানা কুড়ুল এবং আরও কত কি এলোমেলো জিনিষ পড়িয়া।

অশোক সেইখানে বসিয়া-বসিয়া একে-একে সব জিনিষ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল,—কোনটাকে তাহার নিজের কাযে লাগানো চলে কি না!

হঠাৎ নজর পড়িল ছোট একটা হাতুড়ীর উপর। কি ভাবিয়া অশোক খুব বেশী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখানা ছোট গোল পাথরও সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিল। এই পাথর ও হাতুড়ীটাকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া করিয়া শেষে কাপড়ের ভিতর সে উহা লুকাইয়া লইয়া বরাবর নিজের ঘরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

তার পর বাকী রাতটুকু সেই লোহার তাগা আর হাতুড়ী লইয়া তাহার কি মর্ম্মান্তিক ব্যর্থ সংগ্রাম!

উন্মত্ত মনের খেয়ালের সঙ্গে তাল রাখিতে গিয়া দেহ কিন্তু বিদ্রোহ করিয়া উঠিল।

পরের দিন অনেকটা বেলা পর্য্যন্ত অশোকের ঘুম ভাঙ্গিল না। বেলা আটটা বাজিয়া গেলে নীলিমা ডাকা-ডাকি সুরু করিল। ঘুম ভাঙ্গিলেও বিছানা হইতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিবার শক্তিটুকুও যেন অশোকের আর অবশিষ্ট নাই। অনেক কষ্টে বিদ্রোহী দেহখানাকে টানিয়া তুলিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল। নীলিমা বলিল, "বাবা, কি ঘুম! কিছু না হবে ত পাঁচবার তোমাকে ডাক্‌তে এসে ফিরে গেছি। চা রেখেছিলুম, তাও জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। মুখ-হাত ধোও, আমি আস্‌ছি চা তৈরী ক'রে নিয়ে।"

নীলিমা চলিয়া গেলে অশোক আবার বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। মাথার ভিতর সব কিছুই যেন ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। বৌদিদি কি যে বলিয়া গেলেন, তাহারও যেন অর্থবোধ হইল না। গত রাত্রিটা কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহারও এতটুকু স্মৃতি যেন আর অবশিষ্ট নাই। সমস্ত শরীর যেন একটা বিরাট জড়পিণ্ড! না আছে কোন চেতনা, কোন অনুভূতি, কোন প্রচেষ্টা!

মিনিট-পনেরো পরে নীলিমা যখন গরম চায়ের পেয়ালার সঙ্গে হালুয়া এবং টোষ্টের রেকাবী লইয়া ঘরে ঢুকিল, তখন সে বসিয়া থাকিতে থাকিতে বালিসের উপর কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নীলিমা বলিল, "ও মা! এখনও তুমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছ যে, ঠাকুরপো! ওঠো, ওঠো শীগ্‌গীর।" বলিয়া সাম্‌নের টি-পায়ার উপর হাতের রেকাবী নামাইয়া চায়ের পেয়ালায় সসারটি ঢাকা দিতে দিতে বলিল, "একটু আগেই সুরো এসেছিল দেখা কর্‌তে, তা তুমি এমনি ঘুমুচ্ছিলে, সে আর তোমার ঘুম ভাঙ্গালে না। সকালের ট্রেণেই তারা কল্‌কাতা চ'লে গেল।"

জড়পিণ্ডের ভিতর দিয়া যেন প্রাণের স্পন্দন খেলিয়া গেল। একটু নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া বসিয়া অশোক কি বলিল, বোঝা গেল না। সুরভির চলিয়া যাওয়ার প্রসঙ্গ লইয়া রহস্যের যে ক্ষীণ হাসির রেখা নীলিমার অধর-কোণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এখন অশোকের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া তাহার পানে চাহিতে গিয়া সে-হাসি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। নারী-মনের সূক্ষ্মতর অনুভূতির সূত্র ধরিয়া নীলিমা সুরভির চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে অশোকের আজিকার এই নিস্পৃহ ঔদাস্যটুকুর একটা সহজ সঙ্গতি খুঁজিয়া লইয়া মনে মনে ভারী একটা কৌতুক অনুভব করিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ এখন মনে হইল, কোথায় যেন তাহার ভুল হইয়াছে। তাড়াতাড়ি আরও কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে তোমার বল ত? দেখি—"

বলিয়া ডান হাতখানা উল্টাইয়া অশোকের কপালের উপর রাখিয়াই একবারে সচকিত হইয়া উঠিল, "ও মা গো! গা যে একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে! এত জ্বর কখন্ থেকে হ'ল?"

অশোক কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু তাহার নিষ্পলক শূন্যদৃষ্টি নীলিমার মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। গাঢ় স্নেহের কণ্ঠে নীলিমা বলিল, "কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছে, আমাদের একটিবার ত বল্‌লেও পারতে!—চা খাবে কি এখন? খাও না একটু! ঐ চেয়ারটায় উঠে ব'সে খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ বিছানাটা একটু ঝেড়ে দিই।"

অশোক চেয়ারে উঠিয়া বসিল। নীলিমা বিছানা-বালিস ঝাড়িয়া সুবিন্যস্ত করিতে গিয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। মাথার বালিসের নীচে হইতে একটা বহুদিনের মরচে-ধরা হাতুড়ী এবং বড় এক কুচি পাথর পাওয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতার মত বসিয়া থাকিয়া সে দুটি হাতে তুলিয়া অশোকের পানে ফিরিয়া বলিল, "এ সব কি, ঠাকুরপো?"

অশোক চায়ের বাটি লইয়া সবে একটি চুমুক দিয়াছিল, হাতুড়ী ও পাথরটা চোখে পড়িতেই তাহার মগজের ভিতর একসঙ্গে রাশি-রাশি এলোমেলো স্মৃতি জট পাকাইয়া উঠিল, হঠাৎ মনে হইল, কোথা দিয়া তাহার কি-যেন একটা সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

পেয়ালাটা তাহার হাত হইতে মাটীতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল, গরম চা চারিদিকে ছড়াইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সে একবারে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া আসিয়া নীলিমার হাত হইতে হাতুড়ী ও পাথর-কুচি ছিনাইয়া লইতে লইতে বলিল, "দাও বল্‌ছি আমায়! কেন তুমি এম্‌নি ক'রে সবই কেড়ে নেবে বল ত?—দাও—দাও—"

চোখে তাহার এক বীভৎস দৃষ্টি! নীলিমা শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া অশোকের হাতখানা জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখি তোমার হাতটা!"

বলিতে বলিতে হাতখানা এদিক্ ওদিক্ ঘুরাইয়া দেখিয়াই সে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। অশোকের বাহুমূলে সেই লোহার তাগাটার নীচে একখানা ছাল-ওঠা দগ্‌দগে ঘা, আশে-পাশে রক্ত জমিয়া উঠিয়াছে!

ঘ

বাড়ীর পাশেই রাস্তার উপরে একটা মস্ত কামারশাল। অন্ধকার-ঘেরা প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে খালি লোহা-পেটার শব্দ, টক্‌টকে লাল লোহার উপর জোয়ান কামারটার হাতুড়ী পেটার আর বিরাম নাই।

হাওড়া অঞ্চলের একখানি মাঝারি-গোছের বাড়ী। সম্প্রতি অমল বাবু হাওড়ায় বদ্‌লী হইয়া এই বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। গিরিডি হইতে অশোককে জ্বর-গায়েই লইয়া আসার পর পনেরো দিন সে অবিশ্রাম জ্বর ভোগ করিয়াছে। মাত্র আজ সকালে ডাক্তারবাবু আশার বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন যে, রোগীর অবস্থা আশাতীত রকম ভালই; কেবল হার্টটা দুর্ব্বল, তা সে জন্য রীতিমত কিছুদিন ব্যবস্থিত ঔষধটা খাইলেই সারিয়া উঠিবে।

আজ তাই এত দিনের পরে অমল বাবুর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, নীলিমা আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছিয়াছে।

দোতলায় নিজের ঘরটিতে রোগ-দুর্ব্বল শরীরকে ক্যাম্বিশের চেয়ারের উপর এলাইয়া দিয়া খোলা জানালার ধারে অশোক চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। কাণে আসে ঐ কামারশালের হাতুড়ী-পেটার শব্দ। সে শব্দের যেন শেষ নাই। বিশ্বসৃষ্টির অতি-পুরাতন দিন হইতে তাহার ভাঙ্গাগড়ার কায চলিয়াছে, আজও তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

নীলিমা হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "একটা সু-খবর দিতে এলুম, ঠাকুরপো! সুরো আজ চিঠি লিখেছে। তোমার অসুখের খবর শুনে বেচারী ভেবে সারা হচ্ছে।"

অশোক বৌদিদির মুখের উপর দৃষ্টি রাখিল। তাহাতে শিশুর কুণ্ঠাহীন সরলতা। আস্তে আস্তে সে বলিল, "সে ত আস্‌বে বলেছিল, বৌদি! কৈ, এলো না ত!"

নীলিমা এবার মিথ্যা বলিল, "লিখেছে, শীগ্‌গীর আস্‌বে।"

"আস্‌বে? সত্যি ত?" বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া অশোক বলিল, "কিন্তু, যে দিন আস্‌বে, আমাকে আগে থেকে খবর দিও যেন।"

"কেন, ঠাকুরপো?"

অশোক মুহূর্ত্তকাল শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরে খানিকটা বিরক্তির কণ্ঠেই বলিল, "আবার বলে কেন? জানো না বুঝি? এই তাগাটা নিয়ে আমি তার সাম্‌নে পাগল সেজে দাঁড়াব বুঝি?"

"ও মা, সে কি, ঠাকুরপো? ঐ তাগাতেই ত ভাল হয়েছ তুমি!"

অশোকের চোখ দুটা যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, "সব বাজে কথা! ঐ তাগাটাই আমায় পাগল বানিয়েছে। পাগল আমি কোন দিনই ছিলুম না—কোন দিন না!"

নীলিমার মুখখানি পাংশু হইয়া গেল। তাহার মুখে একটা কথাও জোগাইল না। ইহার উপর আর তর্ক করা যে একবারেই নিষ্ফল, এ বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দু-ই তাহার ছিল। একটা অছিলা করিয়া সে অন্যত্র সরিয়া গেল। নির্জ্জনে আসিয়া তাহার মনে একটা খটকাই জাগিতে লাগিল, সত্যই কি ঐ লোহার তাগাটার জন্যই ওর মনে যা-কিছু অশান্তি! ঐ বাঁধন হইতে মুক্তি পাইলেই কি—

তখনই আবার মনে পড়িল, কিন্তু ও যে দেবতার মন্ত্রপূত জিনিষ! সে যোড়-হাত মাথায় ঠেকাইয়া দেবতার

উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নিজের মনের এই সন্দিগ্ধতার ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা যাচিয়া লইল।

রোগের আচ্ছন্নতা হইতে মুক্তি পাইয়া মস্তিষ্ক আবার নূতন চিন্তার নেশায় মশ্‌গুল হইয়া উঠিয়াছে। সুরভি চিঠি লিখিয়াছে, এবং তাহার অসুস্থতার জন্য সে উদ্বিগ্ন! না হইয়াই যে পারে না সে!—তাহা হইলে সত্যই সে তাহাকে ভালবাসে!

ঐ একটা কথাকেই নানা দিক দিয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া—নানা বর্ণ-বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব করিয়া দেখিয়াও অশোকের যেন কিছুতেই বিরতি নাই। আর সেই সঙ্গে আসে ঐ সর্ব্বনাশা চিন্তা। বৌদিদি বলেন, এক দিন সুরোর বিবাহ হইবে না কি তাহারই সহিত! কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভব? এই একটা তক্‌মা-আঁটা পাগলের সঙ্গে? আর যে জানে জানুক, সুরভিও জানিবে তাহাকে পাগল বলিয়া?

রাত্রিকালে রোগমুক্ত-দেহে বহুদিনের পর শান্ত সুগভীর নিদ্রা। বাড়ীর সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

কিন্তু, নিদ্রার মাঝে স্বপ্নের ভিতর দিয়াও সেই সুরভি! সে যেন আসিয়াছে তাহারই ঘরে—তাহারই পাশে বসিয়া সে কথা বলিতেছে। যেন মুখ টিপিয়া টিপিয়া সে হাসিয়া বলিতেছে—'জানি গো, আমি সবই জানি। জানি, কেন তোমার হাতে ঐ মোটা লোহার তাগা!—জানি, বুঝি ত সব; তবু কেন সহিতে পারি না তোমার ঐ তাগা!—তোমার ঐ সুন্দর-সুকুমার বাহুখানিকে ঘিরিয়া কোথাকার ঐ কুৎসিত তাগা!' অশোক যেন লজ্জায়—নতমুখে বসিয়া রহিল। একবার বলিতে গেল, "পাগল ত' আমি কখনও ছিলাম না—কখনও না!"—সুরভি কিন্তু হাসিল—ঠোঁট-বাঁকানো অবিশ্বাসের হাসি! সে-হাসি অশোক সহিতে পারিল না।—শপথ করিল, যেমন করিয়া হউক, মুক্তি লইবে ঐ কুগ্রহ হইতে।—সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা পাথর কুড়াইয়া লোহাটার উপর ঠুকিতে লাগিল। সে কি এক-ঘেয়ে বিকট শব্দ! লোহা জখম হয় না, কেবল ঐ বিকট শব্দে কাণে তালা লাগিয়া আসে।

ঘুম ভাঙ্গিল। বাহিরে কিন্তু তখনও সেই দুম্‌দাম্ শব্দ!

অশোক তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকের জানালা খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শব্দটা আরও প্রচণ্ড হইয়া কাণে বাজিল। সে দেখিল, কামারশালে জ্বলন্ত হাপরের ভিতর লোহা পোড়াইয়া ঝাঁকড়া-চুলো কামারটা তাহাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ী পিটিতেছে। চারিদিকে রাত্রিশেষের ক্রমশঃ বিলীয়-মান আঁধার এখনও স্তব্ধ—নিশ্চল। অশোকের মনে হইল, কামারশালের ভিতরের ঐ কর্ম্মচাঞ্চল্যই ত চারি-দিকের পঙ্গু প্রকৃতির প্রাণ-স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে চায়। ও-ই ত ঘুচাইবে তাহার যা-কিছু গ্লানি—যা-কিছু অবসাদ! বিশ্বের সমস্ত মিথ্যা—সমস্ত বঞ্চনাকে চকিত করিয়া ও-ই ত জাগিয়া আছে চিরন্তন নিষ্ঠুর সত্যের মত; উহার প্রতিটি আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হইবে—নিঃশেষ হইবে যত কিছু শঠতা, অসত্যের যত কিছু আবরণ!

বেশীক্ষণ সেখানে সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া বারান্দা পার হইয়া সে নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল।

সদর-দরজার খিল খুলিতেই চাকরটার সাড়া পাওয়া গেল। "কে গো?"

ধরা পড়িবার ভয়ে অশোক রীতিমত সশব্দেই দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং যেমন সে বাহির হইতে যাইবে, অমনই চারিদিকের ঘুমন্ত আঁধার হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোর আঘাতে আঁৎকাইয়া উঠিল চাকরটা বলিল, "এ্যাঁ, ছোটবাবু যে!—আপনি এত ভোরে—"

বহুদিনের চাকর। রুগ্ন ছোটবাবুকে এমন ভাবে বাহির হইতে দেখিয়া উদ্বেগের সীমা নাই। পশ্চাৎ হইতে সে তাই ছোটবাবুর শীর্ণ বাহু দুখানি চাপিয়া ধরিল।

"ছেড়ে দে বল্‌ছি হতভাগা"—বলিয়া অশোক মরিয়া হইয়া পশ্চাতে একটা লাথি ছুড়িল। চাকরটা পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে বাড়ীর সকলে জাগিয়া উঠিল। অমল বাবু ছুটিতে-ছুটিতে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাড়াতাড়ি সদর-দরজা পার হইতে গিয়া অশোক তখন সেই চৌকাঠের উপরই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিতেছে, "ওরে, ডাক্—ডাক্ ঐ কামারটাকে। ভেঙ্গে দিতে বল্ আমার এই লোহার বাঁধন—"

অমল বাবু সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা

জগন্নাথদেবের মন্দির

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]

[শিল্পী— শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সিংহ।

কোলে তুলিয়া দেখিলেন, অশোকের কপাল ফাটিয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে নীলিমাও ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই অমল বাবু বলিলেন, "বড় বৌ! শীগ্‌গীর দাও—মুক্তি দাও ওর ওই বাঁধন হ'তে!—ওরে শঙ্কর! ডাক্ বাবা ঐ কামারটাকে—"

রজনীর সেই অন্তিম প্রহরটিতে কামার ডাকাইয়া অশোকের হাতের তাগা খুলিয়া দিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহার শোবার ঘরে লইয়া আসা হইল। সকালের দিকে ডাক্তার বাবু আসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া হার্টের অবস্থা দেখিয়া দেখিয়া তিনি ইসারায় অমল বাবুকে নীচে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

আধ-ঘোম্‌টাটুকু মাথার উপর তুলিয়া দিয়া নীলিমা অশোকের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "ঠাকুরপো! এই দেখ, তোমার হাতের তাগা আমরা খুলে দিয়েছি ত! এবার তুমি ভাল হয়ে ওঠো ভাই—"

অস্থিসার মুখের উপর দিয়া হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কোটরগত চোখ-দুটিতে কি পরম পরিতৃপ্তি! ধরা-গলায় সে আস্তে আস্তে শুধু বলিল,—"বৌদিদি! সুরো এলে ব'লে দিও তাকে, সত্যি-সত্যি পাগল আমি ছিলুম না কোনদিন!"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

আপ-টুডেট্

শিল্পী—শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

উড়িষ্যার মন্দিরে চিত্রাবলী

উড়িষ্যার দেব-মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত অশ্লীল চিত্রের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে আন্দোলন চলিতেছে। সেই সঙ্গে চিত্রগুলি লুপ্ত করিবার জন্য কতিপয় সমাজসংস্কারক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়টির পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক সত্যের চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অপূর্ব্ব গবেষণার সামগ্রী। আমি এই বিষয়টির যে সারমর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আলোচনাপ্রসঙ্গে সাহিত্যামোদী সুধীবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যদিও ইহা অকিঞ্চিৎকর, তবুও এ বিষয়ে বিদ্বৎসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র।

এই অশ্লীল চিত্রের বিশেষত্বধারা নিম্নলিখিত অংশে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছি :—

(১) জনমত বা বিশ্বাস। [Popular belief.]

(২) শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসন। [Laws of Architecture.]

(৩) চিত্রধারার পূর্ণ বিকাশ। [Full Development in Sketching and Drawing a Figure.]

(৪) ধর্ম্মধারায় সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব। [Sectarian views and methods of speculation in religious cults.]

(৫) কলাবিদ্যার উৎকর্ষ। [Achievement of sculptural works.]

(৬) তন্ত্রযুগের বিভীষিকা। [Characteristic of Tantric Age with its downfall.]

(৭) বন্ধন-শাস্ত্রের ৬৪টি যোগ। [Sixtyfour yoga system in the book of Erotics.]

(৮) দেশকালপাত্রভেদে নীতির বিভীষিকা ও নৈতিক চরিত্র গঠন। [Different customs and usages of morality in different country according to different ways and methods.]

(৯) বৈষ্ণব শাস্ত্রের রসকথা। [Love in different aspects.]

(১০) আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। [Spiritual explanation.]

(১১) জগন্নাথ দেবের প্রধান মন্দির বা বিমানে অশ্লীল চিত্র নাই—রেখা দেউল বা স্ত্রী-দেউলে আবির্ভাবের কারণ ইহা গর্ভ-দেউল নামে অভিব্যক্ত।

(১) উড়িষ্যাবাসীর মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত রহিয়াছে যে, স্ত্রীপুরুষের বন্ধনমূর্ত্তি মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত বা অঙ্কিত থাকিলে উচ্চ মন্দিরশৃঙ্গে বাজ (lightning) পড়িবে না। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস যে, positive ও negative radical স্বরূপ ঐ শক্তিকে নিষ্ক্রিয় (neutralise) করিবে।

(২) শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনের মধ্যে ইহা একটি প্রয়োজনীয় নিয়ম যে, মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অধিকারীর অধিকারভেদে তিন রকম মূর্ত্তির সমাবেশ থাকিবে। কারণ, তমঃপ্রধান বা কুলোকের কুদৃষ্টির দ্বারা মন্দিরের স্থাপত্য deteriorate বা নষ্ট হইবার কথা। সেই জন্য তাহাদের কুদৃষ্টিকে দূর করিবার জন্য কুচিত্রের মধ্যে তাহাদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিয়া মন্দিরকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত লাউ, কুমড়া ইত্যাদি উদ্ভিদজাতীয় দ্রব্যাদি কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কালীমাখা হাঁড়ি, ঝাঁটা ইত্যাদি বৃক্ষের নিকট রাখা হয়।

(৩) চিত্রধারার পূর্ণ বিকাশ।—মনুষ্য বা দেবতার চিত্র অঙ্কন কার্য্যের প্রথম (outline sketching) বা প্রারম্ভ নক্‌সাটিতে নগ্ন চিত্র আঁকিয়া শরীরের অবয়ব ও পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে চিত্রকর বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা উহা সুন্দর ও সুশোভন করিয়া তুলেন। কিন্তু চিত্রধারার সত্য-স্বরূপটি এই নগ্নতার মধ্যে লুপ্ত রহিয়াছে এবং পূর্ণ বিকাশের দিক্ দিয়া ইহারই মধ্যে চিত্রকরের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হইতেছে। মন্দির-গাত্রেও চিত্রের এই অনুশাসনের দ্বারা পাথরের উপর নগ্নচিত্র অঙ্কিত হয়।

(৪) ধর্ম্মধারায় সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব। উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রের অশ্লীল চিত্রগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে যেরূপ রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের কুৎসা চিত্রিত বা বর্ণনা করিয়া

সাধারণের নিকট তাহাদিগকে হেয় করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে, সেইরূপ অতীত যুগে ধর্ম্মের গোঁড়ামীতে অন্ধ হইয়া ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকের মধ্যে এক জন অন্য জনের চিত্র মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত করিয়া সেই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সাধারণের দৃষ্টিতে হেয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। দেখা যায়, বিশেষ সম্প্রদায়ের জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে এই বন্ধনমূর্ত্তির মধ্যে চিত্রিত করিয়া সাধারণের কাছে লম্পট প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কখনও কখনও ঐ সন্ন্যাসীর মুখখানি ইচ্ছা করিয়াই কুকুরের মত করা হইয়াছে।

৫। কলাবিদ্যার ঔৎকর্ষ্য।

শিল্পী ও কবিরা সৌন্দর্য্যের উপাসক। অবয়বের বিশেষ বিশেষ অংশে সৌন্দর্য্য-সুষমা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চিত্রকর তুলির রেখা টানিয়া সেই সেই অংশের বিশেষ মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে মানব-মনের চিরন্তন সত্যধারার তত্ত্বটি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কণারকের অশ্লীল চিত্রের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মিলনের মধ্যে পুরুষের পৌরুষব্যঞ্জক চিত্র ও শরীরের বিশেষ বিশেষ অবয়বের স্নায়বিক ঔৎকর্ষ্য ক্ষোদিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে স্ত্রীলোকের কমনীয়তা, লজ্জাশীলতা ও মুখের অপূর্ব্ব ভাবমাধুর্য্য সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং এই রমণ-বিলাসীদের দেহ ও মনের আনন্দের অভিব্যক্তিটা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—ইহাই আদর্শ শিল্পীর অপূর্ব্ব ঔৎকর্ষ্যের সুন্দর নিদর্শন।

৬। তন্ত্রযুগের বিভীষিকা। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, বামাচারী তান্ত্রিক ও শৈব তান্ত্রিকদের ভয়াবহ পরিণাম পঞ্চমকারের মধ্যে স্ত্রীলোক লইয়া উপাসনা-প্রণালী। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার প্রণালীতে কামকে জয় করিবার শ্রেষ্ঠ উপাদান স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া সাধনপ্রণালী বীরাচারী সাধকের মূলমন্ত্র। এই সাধনা সাধারণের মধ্যে বীভৎসরূপে জঘন্য ঘৃণিত রোগের ন্যায় সমাজ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জাতীয় নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতি আনয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে কি চিত্রে, কি পুস্তকে, কি মন্দিরগাত্রে, শিল্পীদের ভাবধারা সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইয়াছিল।

৭। কোকশাস্ত্র বা কামশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি পণ্ডিতদের গভীর গবেষণার সামগ্রী হইয়া তালপাতার পুঁথির মধ্যে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাঁহারা এই বিষয়টি ৬৪ বন্ধনযোগ নামে কামশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেন এবং এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সাধনা শিল্পীদের মধ্যে মন্দিরের কারুকার্য্যের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

৮। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহা আদিরস ও শৃঙ্গাররস নামে অভিহিত হয়। কি চিত্রে, কি শিল্পে, পূর্ণতা-সাধনের জন্য আদিরস, মধুর রস, বীর-রস প্রভৃতি রস চিত্রিত করিবার প্রণালী চলিয়া আসিতেছে এবং বাল্যলীলা, কৈশোর-লীলা, যৌবনলীলা ও বার্দ্ধক্যলীলার সত্য পরিচয়টি শিল্পী ক্ষোদিত করিয়া লীলার ধারাতে পূর্ণতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

৯। দেশ-কাল-পাত্রভেদে নীতির বিভীষিকা ও নৈতিক চরিত্র গঠন।

এক প্রদেশের নীতি ও আচারপদ্ধতির সঙ্গে অন্য প্রদেশের কোন কোন বিষয়ে সামঞ্জস্য নাই। এক দেশে যাহা স্বাভাবিক, অন্য দেশে তাহা প্রচলিত হইতে পারে না। কেন না, চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়ায় ও ব্যবহারের গুণে প্রণা-দিও বিভিন্ন হয়। পাঞ্জাব বা কাশ্মীরে নদীর তীরে স্ত্রীলোকরা বস্ত্রাদি নদীর ঘাটে রাখিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে নগ্ন-দেহে অবগাহন করিয়া স্নান করিয়া থাকে। ইহা আমাদের দৃষ্টিতে বিভীষিকাময়। কিন্তু সেই দেশের নরনারীরা ইহার মধ্যে কিছুই বিভীষিকা দেখে না। জাপানে একই স্নানাগারে নরনারীরা উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করে, তাহা দ্বারা উহাদের নৈতিক চরিত্রের কোন অবনতি দেখা যায় না। মণিপুরের স্ত্রীলোকরা যেরূপভাবে কাপড় পরে, তাহার দ্বারা তাহাদের দেশের নৈতিক চরিত্রের বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করে না। অতএব কোন জাতির নৈতিক উত্থান-পতনের বিষয় বিচার করিতে যাইলে দেখা যায়, এক এক যুগে এক এক প্রণালী অনুযায়ী নৈতিক চরিত্র গঠিত হইয়াছে এবং দেশকালপাত্রভেদে নৈতিক চরিত্র পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে গঠিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সেই যুগের জনসাধারণকে বা রাজাদের লম্পট বলিয়া বর্ণনা করিলে বিশেষ অন্যায় ও অযৌক্তিক হইবে।

১০। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—

মন্দিরটি আমাদের দেহের সহিত তুলনা করিয়া হৃদয়ের মাঝে দেবতার আসন স্থাপন করিয়া থাকি। যাহা কিছু অশ্লীল ছবির চিত্র মন্দিরের বাহিরে অঙ্কিত হয়, ভিতরে তাহার কোন স্থান নাই। বাহিরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে মন বহির্ম্মুখ হইতে অন্তর্ম্মুখে প্রবেশ করিতে পারে। সেইরূপ বাহিরের অশ্লীল ছবি দেখিয়া যাঁহার চিত্ত মলিনতা প্রাপ্ত হয় না, তাঁহারই মন্দিরের ভিতরে দেবদর্শনের প্রকৃত অধিকার। এই বিষয়ে অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

১১। বড় মন্দিরকে, বিমান বা বড় দেউল বা পুরুষ মন্দির বলে। দ্বিতীয় দেউলটি রেখা দেউল বা জগমোহন বা গর্ভ দেউল বা স্ত্রী দেউল বলে। সাধারণতঃ স্ত্রী দেউলেই এই সমস্ত চিত্র থাকে—প্রধান দেউলে বা পুরুষ দেউলে থাকে না। স্ত্রী দেউল বা গর্ভ দেউলেই ইহার বিকাশ দেখা যায়; কারণ, সৃষ্টির রহস্য-প্রকরণ ইহারই মধ্যে ব্যক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, জগমোহনকে Audience chamber বা বৈঠকখানা-ঘর বলা যাইতে পারে। বড় দেউল বা বিমানকে The tower sanctuary বা ঠাকুরঘর বলা যাইতে পারে। একটি Place of action বা পরীক্ষাগার—ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সংসারের ভাল-মন্দ, আঁধার-আলো, উঠা-নামার ছন্দের তরঙ্গ সেই স্থানটিতে ব্যক্ত। অন্যটি Place of prayer বা ভজন-ঘর—সেখানে শুদ্ধ, মুক্ত, শান্ত, স্থিরবুদ্ধির নির্ম্মল প্রকাশ।

সর্ব্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আজকাল আমরা যেরূপ যাদুঘর, মিউজিয়াম, শিল্পাগার বা Art gallery প্রভৃতি সংগ্রহশালা তৈয়ার করিয়া থাকি—পূর্ব্বকালে আমাদের মন্দিরগুলি বিভিন্ন সভ্যতার স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্ব বিশিষ্টতার মধ্য দিয়া শিল্পসাধনাগুলি প্রস্ফুটিত হইত। সেই জন্য চিত্রকর বা শিল্পীদের রঙ্গমঞ্চ ছিল এই দেবমন্দিরগুলি—তাঁহাদের একাগ্র সাধনার অপূর্ব্ব সাধনক্ষেত্র। ইহারই মধ্যে শিল্পীরা নানাভাবের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া সেই পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সর্ব্বস্তরের শিল্প-সাধনা নিবেদন করিয়া জীবনকে সার্থক করিতেন।

পূর্ব্বের শিল্পীরা সত্যকে কখনও গোপন করিতেন না কিম্বা নিজের নামের জয়ডঙ্কা বাজাইবার প্রয়াসী ছিলেন না। সাধনের মধ্যে বিদ্যা-অবিদ্যা, আলোক-আঁধার, ভাল-মন্দ সমস্ত তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া অনন্তের উদ্দেশ্যে আপনাদিকে নিবেদন করিতেন। এই বন্ধন-মূর্ত্তিগুলিও সনাতন প্রথা। ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহার মধ্যেই জীবনের মহৎ তত্ত্বগুলি লুক্কায়িত রহিয়াছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়।

পল্লী-বধূ

পাখীরা সব ফিরছে বাসায়
নাম্‌লো আঁধার ধরার বুকে,—
দুষ্টু ছেলে খেলার শেষে
ফির্‌লো ঘরে হাস্যমুখে,—
আঁচলখানি জড়িয়ে গলায়
পল্লী-বধূ! প্রদীপ হাতে
তুলসী-তলায় প্রণাম দিতে
বেরিয়ে এলে আঙ্গিনাতে।
গতির স্রোতে ভাসিয়ে তুমি
চাওনি নিজে ভেসে যেতে,
যুগের হাওয়ার পরশ নিয়ে
উছল তুমি হওনি মেতে!
লজ্জা-মেশা চাউনি চোখের
হাস্য-চপল, লাস্য-গীতে,
বরণ ক'রে নাওনি তুমি—
তৃপ্ত আছো শান্ত-চিতে!
জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি লয়ে
মাতৃ-স্নেহে বক্ষ ভরি
নিরালাতে সন্তানেরে
তুলছ তুমি মানুষ করি।
ভ্রান্ত যারা ছুটুক তারা
মিথ্যা মরীচিকার পাছে,
দূরের পানে দৃষ্টি রেখে
হারাক্ যা' তা'র হাতের কাছে,
রাজপথেতে আধুনিকা
জ্বালাক্ গৃহে বিজলী-আলো,
তোমারে এই তুলসীতলেই
পল্লী-বধূ, মানায় ভালো।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া দুরন্ত চড়াই উতরাই পথ এতদূর অতিক্রম করিয়া আসিলাম, মনে করিলে কষ্টের অবধি নাই, শেষে কি এই চারি মাইল মাত্র বিপজ্জনক রাস্তার ব্যবধানে আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত যমুনোত্তরী-দর্শন অসম্পূর্ণ রহিবে? ইহা কখনই সম্ভবপর মনে হইল না। অর্দ্ধ মাইল আন্দাজ আগে আসিয়া গান্ধারী নদীর পুল পার হইলাম। চারি জন কাণ্ডিওয়ালার প্রত্যেকেই সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ। তথাপি আজিকার

স্থানবিশেষের তুষারধারা

দুরারোহ প্রস্তরখণ্ডের স্তূপের মধ্যে স্কন্ধে মানুষের বোঝা লইয়া উঁচু নীচু পথে উঠা নামা করিতে প্রত্যেকেই বিলক্ষণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। চারি জন সওয়ারের মধ্যে বৃদ্ধা দিদিই একমাত্র ক্ষীণ-শরীরা, সুতরাং ওজনে সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা। আর আর সওয়ারত্রয়ের ওজন বড় কম ছিল না। বিশেষ করিয়া আমার পূজনীয়া বৌদিদির সমধিক স্থূল-শরীরের ভার কাণ্ডিওয়ালার পক্ষে ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রত্যেক পনেরো মিনিট যাইতে না যাইতেই সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার এই মুহুর্মুহু বিশ্রামের ফলে সকলেরই অগ্রগমনে বাধা জন্মিল। অবশেষে বৃদ্ধা দিদির (হাল্কা ওজনের) বাহকের উপরেই সকলেরই নজর গেল। বিশেষ করিয়া বৌদিদির কাণ্ডিওয়ালা বলিতে আরম্ভ করিল, "দর যখন সকলেরই সমান, তখন হাল্কা মানুষ লইয়া একা সেই বা কেন বরাবর আগে যাইবে?" ভারী সওয়ার অদল-বদল করিয়া না লইলে আগে যাওয়া সে সময়ে 'মুশ্‌কিল' ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া, আমরা এ প্রস্তাবে সায় দিলাম। ফলে বৃদ্ধা দিদির বাহকের সহিত অনেক বিবাদ-বচসার পরে সে সওয়ার বদল করিতে স্বীকার পাইল। পরিণাম ইহাই হইল, সকলেই বৃদ্ধা-দিদিকে কেবল স্কন্ধে লইতে চাহে। দিদির পক্ষে প্রত্যেকবার নামিয়া নামিয়া সকলের স্কন্ধে উঠা এক দিকে যেমন অধিকতর বিরক্তিকর, অন্যদিকে ভারী শরীরে বৌদিদি আমার (যাহারই স্কন্ধে উঠেন) দুঃখের কথা বলিতে কি, ক্রমশঃই পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য সকলেই দাঁড়াইয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। এইরূপ অবস্থায় বৌদিদিই ক্রমে বাঁকিয়া বলিলেন, "আমার ভারী ওজনের জন্যই ত এই বিবাদ. আমার ত আর স্বস্তির সীমা নাই! ঝুড়ীর মধ্যে ঠাসা ফুল-কপির মত একভাবে বসিয়া বসিয়া আমার 'গা-গতর' ইহার মধ্যেই ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে!" সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডি হইতে নামিয়া পড়িয়া "পদব্রজে যাইতে যে অনেক সুখ" এ কথা বার বার উচ্চারণ করিতে বিস্মৃত হইলেন না। আমরা পদব্রজের যাত্রী বেশ স্বচ্ছন্দ-চিত্তেই ইহাদের এই কৌতুক-রঙ্গ দেখিতে দেখিতে আগে যাইতেছিলাম, কিন্তু বৌদিদির কথায় সে সময়ে হাস্য করিতে অক্ষম হইলাম।

বৌদিদি পদব্রজেই চলিলেন। কাণ্ডিওয়ালা খালিবোঝায় চলিতে থাকে দেখিয়া আমার অগ্রজ মহাশয় (সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন) বৌদিদির পরিবর্ত্তে নিজেই কাণ্ডির উপর চাপিয়া বসিলেন। বোধ হয় কাণ্ডিচড়ার সুখ ও মজুরীর সার্থকতা সে সময়ে তাঁহার মনে আসিয়া এককালীন উপস্থিত হইয়াছিল। সওয়ার বদল করিয়া বাহক কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলেও নিশ্চয় বলিতে পারি, বাহক-স্কন্ধে বসিয়া অগ্রজ মহাশয় বৌদিদির প্রতি বারম্বার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে সময়ে তাঁহার পদব্রজে যাত্রার পক্ষে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিল।

সরু রাস্তার উপরে অনেক স্থলেই বরফ জমিয়া পথ পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধা দিদিকে স্কন্ধে রাখিয়াই কাণ্ডি-বাহক স্বচ্ছন্দে সে সব স্থল অতিক্রম করিয়া চলিল। কাণ্ডি উঠিতে বিরক্ত হইলেও বরফের মধ্যে পা দিতে দিদি কিন্তু পারত পক্ষে রাজী নহেন। এজন্য কাণ্ডির উপরে নীরবে বসিয়া থাকা তিনি আরামপ্রদ মনে করিলেন। অপর সহযাত্রী এ স্থলে কাণ্ডি হইতে নামিয়া পদব্রজেই যাইতে বাধ্য হয়েন। বরফের পিচ্ছিল পথ পার হইতে কাণ্ডিওয়ালার হস্তধারণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এইবার সম্মুখেই এক আকাশ-স্পর্শী পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এ-পাহাড়েও নানা জাতীয় বৃক্ষই দেখিলাম, বিলক্ষণ শৈবাল-পরিপূর্ণ। উপরে উঠিয়া পাহাড়ের দৃশ্য ক্রমশঃই যেন অধিকতর মনোরম বলিয়া মনে হইল। আশে পাশে সর্ব্বত্রই পুষ্পবৃক্ষের শোভা—কোথায় সারি সারি নয়ন-রঞ্জক বৃহদাকার স্থলপদ্মের মত অগণিত পুষ্পরাশি পাহাড়ের এক দিক্ আলো

করিয়াছে। কোথায় বা ভগবানের বিচিত্র মহিমা! বৃক্ষ একেবারেই পত্রহীন, কিন্তু তাহার শাখায় শাখায় নানা বর্ণের কুসুমসম্ভার যাত্রিগণের চিত্তে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিতেছে। ক্রমশঃই তুষারের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। এই সকল পুষ্প-বৃক্ষের কোলে কোলে পুঞ্জীভূত তুষাররাশি খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়াইয়া চতুর্দ্দিকে কেবল শ্বেত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। এরূপ অভিনব দৃশ্য আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া কাহারও মনে হইল না। এ যে কেবল তুষারেরই প্রত্যক্ষ সজীবতা! এখানেও স্থানে স্থানে "রডোডেন্‌ড্রাম্" বৃক্ষে নয়ন-মনোহর অজস্র রক্ত-জবার সৌন্দর্য্য, আবার কোথায়ও বা কাশবৃক্ষের মত শ্বেতপুষ্প-শোভিত বৃক্ষের উপবন। তুষারকণামণ্ডিত হইয়া এ স্থানের প্রত্যেক পুষ্পই যেন সতেজ ও চির-নবীন ভাবে বিকাশ রহিয়াছে। শিখরের স্তূপীকৃত তুষারপুঞ্জের উপরে তখন রৌদ্র-কিরণ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। শ্বেত-সৌন্দর্য্যের সেরূপ উজ্জ্বলতা ভাষায় বর্ণনীয় নহে। যিনি প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছেন, তিনিই বিশেষভাবে ইহার মাধুর্য্য বুঝিয়া থাকিবেন। এই তুষার-সমুদ্রের মধ্য হইতে এক স্থানে, পাহাড়ের গা দিয়া বহুদূর-ব্যাপী তুষারধারা ফেনপুঞ্জের ন্যায় কেমন এক সর্পাকৃতি উজ্জ্বল শ্বেত-রেখা নীচে নামাইয়া দিয়াছে, চোখের সম্মুখে সে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সমাবেশ। শিখরের কাছাকাছি এই পাহাড়ের পার্শ্বদেশে, বামদিকে এক ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে "ভৈরবনাথজীর দর্শন পাইলাম।" "ইহার কৃপাকটাক্ষ বিনা যমুনোত্তরী-দর্শন অসম্ভব" ভগবান্ সিং এ কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিল। কাশী থাকিতে গেলে যেমন কাশী-কী কোতোয়াল ভৈরবনাথের শরণ লইতে হয়, আজ শুভক্ষণে কাশী হইতে এত দূরে সেই ভৈরবনাথের উদ্দেশেই সকলেই প্রণত-মস্তক হইয়া আবার আগে চলিলাম। উপরে উঠিয়া এইবার বাঁকের মুখে দক্ষিণ ভাগে কি দেখিলাম! সম্মুখেই দিগন্তপ্রসারী আর এক পাহাড় উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। আমরা তিন মাইলব্যাপী যে পাহাড় অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলাম, এ পাহাড়টি তদপেক্ষা আরও উচ্চ। বিস্ময়ের বিষয় এই, উপর হইতে নীচের দিক পর্য্যন্ত ইহার সমস্ত গাত্রই একেবারে তুষারাবৃত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিরাট-আয়তন অখণ্ড রজতপ্রভা-সমন্বিত এই উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যরাশি চোখের এত সন্নিকটে ঝলমল করিতেছে, এ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষু সে সময়ে অপলক নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া যেন ঝলসিয়া গেল। এমন বুক-ভরা-সৌন্দর্য্য কাহার না দেখিবার সাধ হয়! মনে পড়িল, তিব্বতে কৈলাস-যাত্রার পথ। রাবণ-হ্রদের তীরে তীরে "গুরেলা-মান্ধাতা"কে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে তুষারাবৃত দেখিয়াছি। তাহার সৌন্দর্য্য সে সময়ে ক্ষণেকের জন্য মনকে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু খর্ব্বাকৃতি নগ্ন পাহাড়ের সে রূপের সহিত যমুনোত্তরীর এই আকাশস্পর্শী বিশালায়তন দেহের সৌন্দর্য্যের কখনই তুলনা করা চলে না।

এ কান্তি যেন প্রকাণ্ড স্বচ্ছ-হীরকের মত সদাই উদ্ভাসিত রহিয়াছে। দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পল্লী-কুটীর, নির্ব্বাসন সবই যেন নিমেষমধ্যে ভুলিয়া গেলাম। লোকালয়-হীন পার্ব্বত্য-পথের এই দুরতিক্রম্য অভিযান আজ যেন সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, মনে হইল। ভগবান বলিল, "এই রজত-গিরির পাদদেশ পর্য্যন্তই মানুষের গতি সীমাবদ্ধ, উপরের দৃশ্য এখান হইতেই প্রত্যক্ষ করিয়া লউন।" এইবার উতরাই পথে নামিতে সুরু করিলাম। পথ চলার বিরাম নাই, তথাপি দারুণ শীতে সকলেরই শরীর কণ্টকিত। কাণ্ডির উপরে চুপচাপ একভাবে বসিয়া যাত্রিগণ অধিকতর শীতভোগ করিতেছিলেন। এইবার বাধ্য হইয়া নীচে নামিতে হইল। দূরে মন্দির ও ধর্ম্মশালা দেখা যাইতেছে, কিন্তু পথের অধিকাংশ স্থানেই উতরাইএর উপর আবার তুষার জমিয়া আছে। নামিতে গেলে পদব্রজে খুবই সাবধানে যাইতে হয়। বলা বাহুল্য, একটু অন্যমনস্ক হইয়া এই তুষারের উতরাই রাস্তা কাহারও নামিবার উপায় নাই। সময় বুঝিয়া এই সময়ে এক পশলা শিলা-বৃষ্টি হইয়া গেল। অসহ্য শীতে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া ক্ষণকাল সকলেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দক্ষিণ ভাগের রজতগিরির দৃশ্য—নীচে নদী

ভৈরবনাথের কৃপাকটাক্ষ স্মরণ করিয়া আমরা নিরাপদে যখন যমুনোত্তরী আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ণ তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।

এই কি সেই চির-উচ্ছল যমুনা নদীর মহা-মহিমময়ী পবিত্র পুণ্য-ধারা, যেখান হইতে সর্ব্বপ্রথম ইহার সুবিমল উৎস আবেগ-ভরে তুষারের প্রচণ্ড পাহাড় প্রকম্পিত করিয়া সুদূর বৃন্দাবন পানে ছুটিয়া চলিয়াছে? এই প্রস্রবণই ত ক্রমে নদীর আকারে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া উভয় তটের স্থানগুলিকে তীর্থে পরিণত করে? কালো জলের এ শ্যাম-শোভাই ত বাঁকা শ্যামের চিত্ত হরণ করিয়াছিল! ইহারই শেষ স্রোত সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, হিন্দুর কাছে দুইয়েরই ধারা সমান পবিত্র। "গঙ্গা চ যমুনা চৈব সমে ত্রৈলোক্য-পাবনে।" আজ আমরা সেই পুণ্যতোয়ারই প্রথম উৎস-সান্নিধ্যে

তুষারের রাজ্য

উপস্থিত হইয়া ভক্তি-নত চিত্তে চারিদিক দেখিয়া লইলাম। "যমুনোত্তরীমাহাত্ম্যে" লিখিত আছে,—

"অত্র বহ্নিঃ পুরা বিপ্র তপস্তেপে সুদারুণম্।
অত্রৈব তপসা প্রাপ্তং দিগীশত্বং তদাগ্নিনা॥"

অর্থাৎ যেখানে অগ্নি কঠিন তপস্যা দ্বারা "দিক্‌পাল" পদলাভ করেন—এই কি সেই তপস্তেজোময় হিমগিরির এক নির্জ্জন তুষার-প্রান্ত, যেখানে অগ্নি লক্ লক্ জিহ্বায় তুষার-গলিত হিম-শীতল জলের মধ্যেও আপনার জ্বলন্ত মহিমা এখনও বিকাশ রাখিয়াছেন? দুরন্ত শীতে মানুষ এখানে অসাড় হইয়া যায়, তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তার এ কি এক অদ্ভুত কৌশল! অত্যধিক শীতে প্রথমেই আমরা যমুনা নদীর পুল পার হইয়া, এক গরম কুণ্ডের আশে পাশে নিজ নিজ শরীর গরম করিয়া লইলাম। ততক্ষণে বোঝাওয়ালারা সকলেই ধীরে ধীরে আসিয়া পৌঁছিল।

সুখের বিষয়, এখানে একখানি দ্বিতল ধর্ম্মশালা দেখিয়া রাত্রিবাসের সুবিধা হইবে মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলাম। পাকা ইমারত, ছাদে পাথরের টালি;—সম্মুখে আচ্ছাদন-যুক্ত বারান্দা (কেবল সম্মুখদিক্ খোলা) দেখিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। উদ্দেশ্য, ঘর যদি খালি পাওয়া যায়। উপরের চারিখানি ঘরের একটি ঘরও খালি দেখিলাম না। নীচেও ঠিক তাই, অগত্যা উপরের এক দিকের বারান্দায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল স্থানে ঘরের মেজেতে কাঠের তক্তাই বিছানো থাকে, উপরে জল ফেলিতে গেলেই পাছে নীচের ঘরে গড়াইয়া যায়,—এ আশঙ্কায় কোন যাত্রীরই জল ফেলিবার উপায় নাই। যাত্রীর মধ্যে কতক দাক্ষিণাত্য-প্রদেশী,—কতক হিন্দুস্থানী, বিশেষ বিশেষ করিয়া সুলতানপুর জেলার লোকই বেশী দেখিলাম। উপরের একটি ঘরে দুই জন মাত্র সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম-মাখা কৌপীনবস্ত সাধু দেখিয়া প্রথমে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল, ঐ ঘরেরই এক পার্শ্বে আমরা রাত্রি কাটাইব। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত সাধুদ্বয়ের রোষ-কষায়িত নেত্র সে সময়ে আমাদের কাহারও (বিশেষ করিয়া সহযাত্রিনীদিগের) ভাল লাগে নাই!

এ দিনে "মার্কণ্ডের আশ্রম" হইতেই আমরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং আসবাবপত্রাদি রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে আজ কেবল সকলেই আশ পাশ ঘুরিয়া দেখিলাম। ধর্ম্মশালার প্রস্তরগাত্রে এক স্থানে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে, "ধর্ম্মশালেয়ং ১৯৮১ বিক্রমাব্দে তদনুসারং ১৯২৫ ইসাব্দে জিলা মুরাদাবাদান্তর্গত ঠাকুর দ্বারানগরনিবাসী শ্রীমতা সাহু রামরত্নাত্মজেন সাহু রঘুনন্দন শর্ম্মাণ শ্রীমত্যাঃ সরস্বতী দেব্যাঃ কম্মরারপেণ সকল যাত্রীজন সুখার্থায় বিনির্ম্মিতা।" সকল যাত্রিজন সুখার্থের নিমিত্ত সরস্বতী দেবীর স্মারক চিহ্নস্বরূপ ইং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রঘুনন্দন সাহু কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, মোটামুটি ইহাই জানা গেল। মুরাদাবাদ জেলার এই মহানুভব ব্যক্তি প্রত্যেক যাত্রীর নিকটেই যে ধন্যবাদ লাভ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম।

ধর্ম্মশালার বাহিরে আসিয়া উহারই সংলগ্ন উত্তর কোণের পাহাড়ের গা দিয়া যেখান হইতে যমুনা নদী ঝরণার আকারে প্রবাহিতা হইতেছেন, সে স্থানটি দেখিলাম, তুষারের চাপে একদম আবৃত। ধর্ম্মশালা হইতে একটু পশ্চিমদিক ঝুঁকিয়াই ইনি নিম্নাভিমুখী হইয়াছেন, এই জন্যই ওপার হইতে পুল পার হইয়া ধর্ম্মশালায় পৌঁছিতে হয়। ধর্ম্মশালার ঠিক সম্মুখভাগে (পশ্চিমে) তিনটি ছোট ছোট কুণ্ড, তাহার প্রত্যেকটিতেই গরম জলের প্রবাহ দৃষ্ট হয়। পাণ্ডা বলিয়াছিল, একটির নাম "গোমুখী কুণ্ড" আর একটি "সূর্য্যমুখী কুণ্ড" আর একটিকে "গোরকডিবি" অর্থাৎ গোরক্ষনাথের তপস্যাস্থান বলা হইয়া থাকে। যাত্রিগণ এখানে বসিয়া কেহ কেহ সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিতেছিলেন। বাহিরে বিলক্ষণ বাতাস বহিতেছিল। সে বাতাস এতই আর্দ্র যে, আমাদের শীতবস্ত্র সমস্তই যেন ভিজিয়া রহিয়াছে মনে হইল। এই গরম কুণ্ডের নিকটে যাত্রীরা আরামের জন্য ইচ্ছা করিয়াই উপবেশন করিতে চাহেন।

ধর্ম্মশালার বামভাগে একটু দূরে পাহাড়ের নিম্নেই সারি সারি আরও তিনটি কুণ্ডের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। এই স্থানের প্রত্যেক কুণ্ডেরই জল এত অধিক গরম যে, হাত

দিয়া রাখা অসঙ্গ মনে হয়। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এগুলি "নারদকুণ্ড," "সূর্য্যকুণ্ড" ও "গৌরীকুণ্ড"। ভগবান্ বলিল, "এই কুণ্ডের জলে শুধু পুণ্যার্জ্জন নহে, অনায়াসলব্ধ মহাপ্রসাদেরও ব্যবস্থা আছে।" দেখিলাম, কোন কোন যাত্রী এই কুণ্ডে গামছার এক কোণ উপর হইতে হাত দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, অপর অংশে চাউল ও আলু বাঁধা-অবস্থায় আপনা হইতেই জলে সিদ্ধ হইতেছে। সাধারণতঃ অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই এই অভিনব উপায়ে চাউল অন্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সুতরাং জলের উত্তাপের পরিমাণ বড় কম নহে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ১৯৪'০৭ ডিগ্রী উত্তাপ মাপিয়া দেখিয়াছেন। পার্শ্বেই পাহাড়ের অভ্যন্তরস্থ সরু গহ্বর-বিশিষ্ট স্থানে গরম জলের নিরন্তর "টগ্‌বগ্" ফোটার শব্দ (শুধু প্রবাহ নহে) যাত্রিগণের কর্ণে ভীষণতার মত কি এক অব্যক্ত শব্দ প্রচার করিতেছে শুনিলে শুধু বিস্ময় নহে, এই হিম-শীতল নির্জ্জন তুষার-প্রদেশে আতঙ্কেরও সৃষ্টি করে। বুকভরা বেদনার ন্যায় এই মর্ম্ম-গীতি পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কি জন্য উত্থিত হইতেছে, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব তত্ত্বান্বেষিগণ উদ্‌ঘাটিত করিতে এখনও অসমর্থ। উপরে বিরাটভাবে রাশি রাশি তুষারের বিস্তৃতি আর সেই পাহাড়েরই অভ্যন্তরে নিম্নভাগের এই উষ্ণ-প্রবাহ, সৃষ্টির প্রহেলিকার মত আমাদিগের প্রত্যেকের প্রাণে কি এক অননুমেয় অনুভূতি আনিয়া দিল! ভগবান্ সিং বলিতে লাগিল, "এখানে মহর্ষি গৌতম তপস্যা করিয়াছিলেন।" তপস্যার সহিত এই গরম জলের প্রবাহগুলির কিরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিলেও, ইহা নিশ্চিত সত্য যে, হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারে এই লোকালয়বর্জ্জিত হিমগিরির তুষার-সমাচ্ছন্ন পুণ্য-পীঠে দেবতা, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদির যত কিছু লীলা, সম্পদ বা ঐশ্বর্য্যরাজির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ঋষি-প্রতিম পিতৃপুরুষগণ সেই সেই তপোদ্ভূত পবিত্র স্থানের বিচিত্র শাশ্বত-মহিমায় আজীবন আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এ স্থানের অপরিসীম সৌন্দর্য্য সেই মহীয়সী মহিমারই এক জ্বলন্ত মূর্ত্তিমান্ নিদর্শনরূপে সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। এ যে সেই মুনিজন-মনোহারী চির-দুর্ল্লভ পবিত্রতম তপস্যারই এক নিভৃত নিলয়, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, মনুষ্যমধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি এই আকাশ-স্পর্শী হিমাচল-শোভি সৌন্দর্য্যের মধুরতায় আপনাকে ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক না রাখিয়া থাকিতে পারেন! ওই সুবিশাল রজত-গিরির পাদদেশে পুণ্যতোয়া যমুনা নদীর এক দিকে উষ্ণ ও অন্যদিকে তুষার-শীতল প্রবাহ—দুই-ই যাত্রীর কাছে সমানভাবে আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে।

এই যমুনোত্তরী সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১২ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। ধর্ম্মগ্রন্থে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন পুণ্য-প্রবাহিণীরই কথায় অনেক কিছু মাহাত্ম্যের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তীর্থ পথের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া, পাঠক-বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় সে বিষয়ের আলোচনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি। যাঁহারা উপাখ্যান পাঠে অনুরক্ত বা অভ্যস্ত, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই তীর্থ-সলিল সম্বন্ধে সবিশেষ জানিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। আমি শুধু এ স্থলে এই সূর্য্যনন্দিনী যমুনার অবতরণ সম্বন্ধে কাশী কেদারখণ্ডের দু-একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলাম—"এবমুক্তা তদা তেন হিমবন্তমুপাগতা। শিবমারাধ্য তত্রস্থং তদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনী॥"... ভবেদিতি বরং প্রাপ্য জাতাহং ভু প্রবাহিণী—" ১০৯...১১১ শ্লোকা: একাদশাধ্যায়: - ব্রহ্মার বরে শিবের আরাধনা করিতে ইনি হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ভূমণ্ডলে প্রবাহিত হয়েন। বলা বাহুল্য, যেখান হইতে ইহার উৎপত্তি ও অবতরণ, পর্ব্বতের সেই চির-নির্জ্জন তুষার-প্রদেশে ধর্ম্মশালার দক্ষিণ ভাগে একটি ক্ষুদ্র মন্দির শোভা পাইতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই মন্দিরের পূজারী মহাশয় ঘন ঘন শঙ্খ ফুকারিয়া "মায়ের

নিকট হইতে ঝলমল তুষারপুঞ্জ

আরতি হইবে, দর্শনেচ্ছু-যাত্রী চলিয়া আইস।" এ কথা বার বার জানাইয়া দিলেন। আমরা সকলেই একে একে মন্দির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

মন্দিরমধ্যে এক দিকে শ্বেতবর্ণা গঙ্গা ও অপর দিকে কৃষ্ণ-বর্ণা যমুনার প্রস্তর-মূর্ত্তি পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। যমুনা-মূর্ত্তির কোলে আবার ত্রিলোক-পাবন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে হনুমানজীর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল। পঞ্চপ্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া এ দেশের পূজারী ব্রাহ্মণ আরতি ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীভাষায় ভাব গদ্‌গদচিত্তে বন্দনা সুরু করিলেন। পার্শ্বে এক জন খঞ্জনী ও অপর এক জন শঙ্খ বাজাইয়া, এই বন্দনা-গীতির সহিত সমানভাবে সুর-যোজনা করিয়া এই নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরের পবিত্র মন্দির মুখরিত রাখিয়াছিল। ঢাক-ঢোল কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতির আড়ম্বর না থাকিলেও এই নির্জ্জন পবিত্রতম মন্দিরমধ্যে কেবল-মাত্র জন কয়েক যাত্রী-সঙ্গে এ দিনকার আরতি-দর্শন ও নীরবে বন্দনা-শ্রবণ এতই মধুর ও উপভোগ্য মনে হইয়াছিল যে,

এখন লিখিতেও লেখনী কম্পিত, মনে হইতেছে। পথের দুর্গমতা স্মরণ করিয়া শেষ অবধি এই কঠিন তীর্থ-সান্নিধ্যে নিরাপদে পৌঁছিতে সমর্থ হইব কি না, এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের একটা দুশ্চিন্তা ছিল। বারান্দায় আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সে দুশ্চিন্তা একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। ধর্ম্মশালার সম্মুখভাগে 'পট্‌কা' বাজীর মত ফট্‌-ফট্‌ শব্দে যখন অনেকগুলি শুষ্ক-কাষ্ঠে এককালীন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ধর্ম্মশালার সকল যাত্রীই বাহিরে আসিয়া সে সময়ে কিছুক্ষণের জন্য শীত নিবারণের সুযোগ পাইলেন। আহার্য্য দ্রব্যেরও অভাব নাই, বরং স্থানের তুলনায় ইহা যথেষ্ট সুলভ দেখিলাম। এই তুষারশীতল জন-বিরল তীর্থে প্রতি সের আটা চারি আনা, ঘৃত দুই টাকা, চিনি তেরো আনা এবং আলু এক আনা মাত্র। রাত্রিতে লুচি ও আলুর তরকারী পরিপূর্ণ-মাত্রায় জলযোগান্তে সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

প্রভাতে ডাণ্ডিওয়ালা কুলীগণের সর্দ্দার "ফতেসিং" এবং বোঝাওয়ালা কুলীর তরফের "কর্ণসিং" উভয়েই পাঁচ ধামের এক ধাম—যমুনোত্তরীতীর্থে পৌঁছিবার দরুণ সর্ত্তমত প্রত্যেক কুলীরই ইনাম ও খিচুড়ী চাহিয়া বসিল। বলা বাহুল্য, আমরা প্রত্যেকের ইনাম এক টাকা এবং খিচুড়ীর জন্য ।৵০ সাত আনা হিসাবে (সে স্থানের আটা প্রভৃতির দরের হিসাবমত) সকলেরই প্রাপ্য চুক্তি করিলাম। এই কুলীগণই ত আমাদের এক ধাম যাত্রা সম্পূর্ণ করিল। কাণ্ডিওয়ালা চারি জনকেও কিছু কিছু বখশিস দিয়া আমরা এখানকার দর্শন-পূজাদি যথাসম্ভব সত্বর সারিয়া লইতে উদ্যোগী হইলাম। ধর্ম্মশালা হইতে কতক নীচে নামিয়া বসুধারার তপ্তকুণ্ড, সেইখানে যাত্রিগণের সাধারণতঃ স্নানের বিধি আছে। স্নানার্থী যাত্রী প্রথমতঃ এই তপ্তকুণ্ডে স্নান করিয়া তার পর মায়ের পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। "যমুনোত্তরী মাহাত্ম্যে" এই তপ্তকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"দিব্যং সরশ্চ তত্রাস্তি তপ্তোদং পাপিদুর্গমম্।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ লভতে পরমং পদম্॥"

এই তপ্তকুণ্ডটির চতুর্দ্দিকেই সিঁড়ির আকারে প্রস্তর সুসজ্জিত আছে। জলে নামিয়া কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে, এই প্রচণ্ড শীতে বেশ আরামপ্রদ বলিয়াই আমাদের মনে হইল, কিন্তু ডুব দিতে গেলেই জলের উত্তাপে শরীর কষ্ট বোধ করে। যাহা হউক, সকলেই যথারীতি স্নানান্তে প্রথম যমুনা-মাতার মুখারবিন্দে পূজা শেষ করিলাম। বলা বাহুল্য, তীর্থগুরুই এ সকল পূজা সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। সেখান হইতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গঙ্গা-যমুনার পূজাদি শেষ করিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। মন্দিরের পূজারীর "ষোল আনা দক্ষিণা"র প্রতি বেশ দৃষ্টি আছে। ইহার অধিক দিতে পারিলে যাত্রীর যে শুধু ভবিষ্যৎ-জীবনেই মুক্তি, তাহা নহে, পূজারীর হাত হইতেও অতি শীঘ্র মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নতুবা কতক্ষণে ইঁহাদের প্রকৃত সন্তোষবিধান সম্ভবপর হয়, বলা সুকঠিন!

বসুধারার তপ্তকুণ্ডে পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডদানেরও নিয়ম আছে শুনিয়া, পূজাশেষে বৃদ্ধাদিদি, আমি ও আমার পূজনীয় অগ্রজ মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইলাম। প্রথমে পিণ্ডদানের চাউল এ স্থানের প্রথানুসারে সূর্য্যকুণ্ডে সিদ্ধ করিয়া লওয়া হইল। তার পর সেই অন্ন তিল, গুড় প্রভৃতির সহিত মাখিয়া তিন জনেই বসুধারায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বসুধারার উষ্ণ প্রবাহ (বসুধারার কুণ্ড হইতে একটু নীচে) সেখানে নামিয়া আসিয়া তুষার-শীতল যমুনার ধারায় সম্মিলিত হইয়াছে, সেই উচ্ছল কল-কল-নিনাদিনীর পবিত্র সঙ্গম-স্থলে পিতৃপুরুষগণের যথারীতি পিণ্ডদান সম্পন্ন করিয়া যখন উপরে আসিলাম, তখন বেলা বারোটা আন্দাজ হইবে। এইবার পাণ্ডাঠাকুর ব্রাহ্মণভোজনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহারা পাঁচ ভাই একযোগে এ স্থানের যাত্রিগণের পূজা শেষ করাইতে নিযুক্ত আছেন জানিয়া, পাঁচ জনের ভোজন ও তদ্দক্ষিণা বাবদ আমরা প্রত্যেককেই এক টাকা হিসাবে গণিয়া দিয়া সেখানকার তীর্থকৃত্য একপ্রকার সারিয়া লইলাম। প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া পাণ্ডাঠাকুর শেষের দিকে আবার "সুফলের" জন্য "ষোল আনা" চাহিয়া লইতে বিস্মৃত হইলেন না।

সূর্য্যকুণ্ডের জলে সেদিনকার 'মহাপ্রসাদ' ও আলুসিদ্ধ ভক্ষণ এক অপূর্ব্ব মধুর পবিত্র আস্বাদরূপে আমাদের সকলেরই রসনা আজও যেন আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছে। আমার এ উক্তি পাঠকবর্গ হয় ত 'অতিশয়োক্তি'র মত মনে করিতে পারেন, কিন্তু নিঃসঙ্কোচে আজ আপনাদিগকে এই কথাই জানাইব, মসৌরী হইতে মাত্র ৯৬ মাইল দূরবর্ত্তী পবিত্র তীর্থস্থানের অফুরন্ত মহিমা ও সৌন্দর্য্যের নিদর্শন এই "যমুনোত্তরী"—সর্ব্বদিক্ দিয়াই মানুষকে যুগ-যুগান্তর হইতে কোন্ এক অদ্ভুত অজ্ঞাত রাজ্যের সন্ধান দিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে স্বতঃপ্রলুব্ধ মন আজও সকলের অগ্রে সেই পথের পথিক হইয়া ছুটিয়া যাইতে চাহে। জানি না, সে রাজ্যের সে আলোকের ঝল-মল পবিত্র উজ্জ্বলতা আর কোথায়ও দেখিতে পাইব কি না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যুগোশ্লেভিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা

বিগত ৯ই অক্টোবর য়ুরোপের এক বিষম দুর্দ্দিন গিয়াছে। ঐ দিন মার্সেলিজ সহরে যুগোশ্লেভিয়ার প্রবলপ্রতাপ শাসক আলেকজাণ্ডার এক জন আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ঐ সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সমস্ত য়ুরোপ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত সভ্যজগৎও চমকিত হইয়া উঠে। য়ুরোপের এই ত্রাসের কারণ বাহিরের লোক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপের—বিশেষতঃ মধ্য এবং প্রাচ্য য়ুরোপের অবস্থা প্রশান্ত নহে। বাহিরে একটা শান্তভাব থাকিলেও ভিতরে যেন একটা প্রবল তুফান চলিতেছিল। বিভিন্ন জাতির স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে কখন্ ভিতরের তুফান বাহিরে রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দেয়, সেই চিন্তাতেই য়ুরোপীয় বুধমণ্ডলী উদ্বিগ্ন ছিলেন। রাজা আলেকজাণ্ডার একটা বড় রকমের রাজনৈতিক জটিলতা মিটাইবার জন্যই ফ্রান্সে—মিত্রের দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থিত এবং সম্মানিত করিবার জন্য দেশবাসীরা বন্দরটি সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের পররাষ্ট্র ও প্রবীণ সচিব তাঁহাকে সসম্ভ্রমে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং তাঁহার সহিত মোটরে যাইতেছিলেন। সকলের মুখেই উৎসাহের চিহ্ন প্রকটিত। এইবার য়ুরোপের একটা বড় সমস্যার সমাধান হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় ইটালীর সহিত যুগোশ্লেভিয়ায় মিলন হইবে। কিন্তু অকস্মাৎ বিনা মেঘে এ কি বজ্রাঘাত! রাজ-অতিথিকে দর্শন-লোলুপ জনতার ভিতর হইতে কে এক জন রক্তপিপাসু বিপ্লবী মন্থরগামী রাজকীয় যানের উপরে উঠিয়াই চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে অতিথিকে ও অতিথিসেবক প্রবীণ মন্ত্রীকে হত্যা করিল। জনতা চমকিয়া উঠিল। শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত পুলিস ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া হস্তস্থিত কৃপাণের আঘাতে হত্যাকারীর দেহকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ধরায় লুটাইয়া দিল। ক্রোধোন্মত্ত জনতা সেই ছিন্নদেহের চঞ্চল অঙ্গকে পদদলিত করিতে থাকিল। "হায় কি হ'লো" "হায় কি হ'লো" রবে দিগ্বধূ ফুকারিয়া উঠিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত সেরাজেভোর কাণ্ড স্মরণ করিয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্রপালগণ শিহরিয়া উঠিলেন। সে দিন ছিল ফ্রান্সের অতি দুর্দ্দিন। রাত্রিতে রাষ্ট্রপালগণের নয়নে আর নিদ্রাদেবী ভর করেন নাই।

রাজা আলেকজাণ্ডার

মুসোলিনী

কয়েক দিন বিষম দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। যুগোশ্লেভিয়া নব-বৈধব্যবেদনবিধুরা পুরস্ত্রীর ন্যায় ক্রন্দনে ইটালী এবং হাঙ্গেরীর উপর অনেক অভিযোগ ও কটূক্তিবর্ষণ করিল। ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্তা সেনর মুসোলিনী এই ব্যাপারে উত্তেজিত না হইয়া কতকটা আত্মসংযমেরই পরিচয় দিলেন। ৬ই অক্টোবর তারিখে মিলান সহরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—"এইরূপ কটূক্তি-বর্ষণে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। এরূপ হইলে যুগোশ্লেভিয়ার সহিত ইটালীর সম্বন্ধ উন্নত করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে ইটালী শক্তিশালী; সেই জন্য সে যুগোশ্লেভিয়ার সহিত একটা মিটমাট করিবার সুযোগ দিতেছে।" ইটালীর সহিত রাজা আলেকজাণ্ডারের মিত্রতা করিবার ইচ্ছা কত দূর ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রকাশ—ফরাসীরা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে হাফ্‌সবার্গ বংশের এক জনকে বসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন

এবং ইটালী তাহার সমর্থন করিবেন, এইরূপ জনরব শত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছিল। রাজা আলেকজাণ্ডার সেই জন্য মনে মনে জার্ম্মাণীর দিকে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। জার্ম্মাণীও তাহাই ইচ্ছা করিতেছিলেন। জার্ম্মাণী মধ্য-য়ুরোপে আপনার পক্ষভুক্ত কতকগুলি রাজ্য গড়িবার চেষ্টায় ছিলেন।

অগত্যা ব্যাপার বড় বিষম হইয়া পড়ে। জাতিসঙ্ঘের পরিচালকবর্গের ললাটে কুঞ্চন-রেখা দেখা দেয়। কিন্তু ইটালী প্রভৃতি রাজ্যের রাষ্ট্রনায়কদিগের সংযমের ফলে তখনই একটা গুরু ব্যাপার উপস্থিত হয় নাই। এ দিকে যুগোশ্লেভিকিয়ার রাজার দেহান্ত হইলেও রাষ্ট্রপরিচালনার প্রয়োজন। তাহার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। তথাকার জাতীয় শাসনপদ্ধতির নিয়মানুসারে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের বয়স একাদশ বৎসর মাত্র। সে সময় এই রাজকুমার ইংলণ্ডে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাকেই দ্বিতীয় পিটার নাম দিয়া সিংহাসনে বসান হইল। কিন্তু বালক দ্বারা ত রাজ্য পরিচালন করা সম্ভবে না। সুতরাং তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক জন যোগ্য ব্যক্তিকেই রাজকার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে। তথাকার রাজ্যের নিয়ম অনুসারে রাজা স্বয়ং তিন জন রিজেণ্ট মনোনীত করিয়া যাইবেন,—অথবা উইল করিয়া জীবনান্তে কে কে রিজেণ্ট হইয়া কার্য্য করিবেন, তাহার নির্দ্দেশ করিয়া যাইবেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজা আলেকজাণ্ডার উইল করিয়া গিয়াছিলেন। সেই উইলখানি খুলিয়া দেখা গেল যে, তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর কুমারের নাবালক অবস্থায় যাঁহারা রিজেণ্ট হইবেন, তাহার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই তিন জনের নাম এই,—প্রিন্স পল কারাজর্জ্জভিক, ডাক্তার বোডেনকো ষ্ট্যাঙ্কোভিক এবং ডক্টর পেরোভিক। ইঁহাদের মধ্যে প্রিন্স পল সম্পর্কে রাজা আলেকজাণ্ডারের ভ্রাতা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। দ্বিতীয় ডাক্তার ষ্টাঙ্কোভিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ছিলেন, পূর্ব্বে ইনি কিছুকাল শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রিত্বও করিয়াছিলেন। ইনি জাতিতে সার্ব্ব। তৃতীয় ব্যক্তি ডক্টর পেরোভিক জাতিতে ক্রোট এবং সাভার অন্তর্ভুক্ত বনটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই তিন জনের পরিবর্ত্তে,—অর্থাৎ ইঁহারা কেহ বা সকলে যদি রিজেণ্ট হইতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ উইলে তাঁহাদের স্থানে আরও তিন জনের নাম উল্লেখ ছিল। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে সেনাপতি টমিক, সিনেটর বানুজানিন এবং জেক। ইঁহারা সকলেই পদস্থ ও কৃতী লোক।

ইঁহাদের সকলেরই কার্য্য করিবার শক্তি এবং সামর্থ্য যথেষ্ট থাকিলেও যুগোশ্লেভিয়ার ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর বিদ্বেষে ছিন্ন-ভিন্ন দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করা সহজ ব্যাপার নহে। রাজা আলেকজাণ্ডারের ঐকান্তিকভাবে কার্য্য করিবার ও অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিবার শক্তি এবং দেশের মধ্যে একতা স্থাপনের বাসনা ছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। প্রিন্স পলই রিজেন্সির প্রধান পরিচালক হইবেন,—ইহা বেশ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি কিরূপ কার্য্য-দক্ষতা দেখাইতে পারিবেন, তাহার পরিচয় কখনও মিলে নাই। তিনি কখনই রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করেন নাই। ইহা রাজনীতিক ব্যাপারে তাঁহার অনাসক্তির ফল, কিম্বা রাজা আলেকজাণ্ডারের অভিপ্রায়জনিত, তাহা কেহ জানে না। সুতরাং যুগোশ্লেভিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি ভাবে পরিচালিত হইবে, তাহা এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। রাজা আলেকজাণ্ডার স্বহস্তে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া আপনার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন প্রজা-মণ্ডলীর মধ্যে একতাস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সে কার্য্যসাধনে তিনি সম্পূর্ণভাবে সমর্থ হন নাই। যুগোশ্লেভিয়া রাজ্যের প্রধান সমস্যা এই যে, এই রাজ্যের ক্রোট, শ্লোভেন প্রভৃতি জাতিরা সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চাহে। তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহিত, কেবল ইটালীর ভয়ে তাহা করিতে ভরসা পায় নাই। রাজা আলেকজাণ্ডার তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি আত্মতৃপ্তির জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি সংযম, ধৈর্য্য এবং প্রজাবর্গের হিতসাধন উদ্দেশ্যেই রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। যুগোশ্লেভিয়ার সহিত ইটালীর যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা এবং অষ্ট্রোহাঙ্গেরীর রাজশক্তিসংরক্ষক-দলের প্রভাবফলে যুগোশ্লেভিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাঁহার মনে ছিল। তাই তিনি কতকটা জবরদস্তির সহিত রাজশক্তি পরিচালনা করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ফ্রান্সে যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, তাহা যদি সফল হইত, ইটালীর সহিত যদি যুগোশ্লেভিয়ার মিলন হইত, তাহা হইলে য়ুরোপের ভাগ্য বোধ হয় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। এখন যুগোশ্লেভিয়া মধ্য-য়ুরোপের একটা শঙ্কাজনক ঝটিকা-কেন্দ্র হইয়া থাকিবে কি না, কে বলিতে পারে? এখন তথায় বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা অনুমান করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রিন্স পল কারাজর্জ্জভিক

রাজা আলেকজাণ্ডারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দুই দিন পরে নাবালক রাজার অভিভাবক প্রিন্স পল কারাজর্জ্জভিকের অভিপ্রায় অনুসারে ২০শে অক্টোবর তারিখে উজনোভিক মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করেন। রাজ-অভিভাবক প্রিন্স পলের বিশ্বাস যে, যুগোশ্লেভিয়ার এখন যেরূপ সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা, তাহাতে যাহাতে ঐ রাজ্যে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য।

তাহা করিতে হইলে স্লোভেন (slovene) দিগের দলপতি ফাদার কোরোশেচজকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তিনি প্রতিপক্ষীয় দলপতিদিগকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর পরামর্শ করিয়া সাব্যস্ত হয় যে, মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনে অথবা রাষ্ট্রপরিচালন নীতিতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হইবে না। সুতরাং উজনোভিককে আবার মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীতে যাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা রিজেণ্ট বা রাজার অভিভাবকের নিকট পেশ করেন। অভিভাবক তাহাতে সম্মত হন। এই মন্ত্রিমণ্ডলীতে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। সেনাপতি পেরাঝিভকোভিক মন্ত্রিমণ্ডলীতে গৃহীত হইয়াছিলেন। রাজা আলেকজাণ্ডার ইঁহাকে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। ইনি হইলেন সমর-বিভাগের মন্ত্রী। ইঁহার নিয়োগে মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্মানবৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মিলান গ্রোস্কিচ এবং ভোইস্লাভ মারিণকোভিক নামক দুই জন ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীকেও মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে কোন বিশেষ বিভাগের ভার দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে, ফাদার কোরোশেচজ এবং প্রতিপক্ষ দলের অন্যান্য নায়কদিগকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান দিতে চাহিলেও তাঁহারা ঐ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক, এখন সাব্যস্ত হইয়াছে যে, রাজা আলেকজাণ্ডার যে ভাবে স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রনীতি চালাইয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই যুগোশ্লেভিয়ার শাসননীতি চালাইতে হইবে।

এখন একটা সমস্যা এই যে, ইহার ফল কি দাঁড়াইল? শাসনতন্ত্রের বহিরঙ্গ অবিকলভাবে রক্ষা করা হইল সত্য, কিন্তু যিনি দৃঢ়হস্তে এই শাসনতন্ত্র পরিচালিত করিতেন, তিনি ত আর নাই। সুতরাং এই ভাবে শাসননীতি পরিচালনার ফল কি হইবে, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। এ দিকে রাজা আলেকজাণ্ডারের হত্যা সম্পর্কে জটিল ব্যাপার আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পাছে কেঁচো খুঁজিয়া বাহির করিতে যাইয়া সর্প বাহির হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে জাতিসঙ্ঘ এই ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করিলেন না। ব্যাপার বড়ই সঙ্গীন। হত্যাকারীর পরিচয় প্রথমে ঠিক পাওয়া যায় নাই, পরে যে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা মাসিক বসুমতীতে প্রদত্ত হইয়াছে। সে উষ্টাশী নামক বিপ্লবী সমিতির এক জন সদস্য। জাতিতে ক্রোশীয়ান। ইটালীতে এবং হাঙ্গেরীতে এই বিপ্লবীদিগের সমিতি বিদ্যমান আছে। যুগোশ্লেভিয়ার প্রান্তসীমা হইতে ৫ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত জাঙ্কাপুষ্টা (Janca puszta) নামক স্থানে এই উষ্টাশী নামধেয় বিপ্লবীদিগের এক উপনিবেশ ছিল। রাজা আলেকজাণ্ডারের হত্যাকারী এই বিপ্লবী উপনিবেশ হইতে জাল ছাড়পত্র লইয়া মার্শেলিজে উপস্থিত হইয়াছিল। যুগোশ্লেভিয়ার আপত্তি অনুসারে হাঙ্গেরী সরকার এই বিপ্লবী উপনিবেশটি বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ প্রকাশ। কিন্তু ইটালীতে বিপ্লবীদিগের যে উষ্টাশী উপনিবেশ আছে, গত বৎসর শীতকালে শুনা গিয়াছিল যে, এই উপনিবেশের এক জন ক্রোশীয়ান বিপ্লবীই জাগ্রোর রাজা আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পুলিসের সংবাদে প্রকাশ—ইটালীর এই বিপ্লবী উপনিবেশটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সম্প্রতি হাঙ্গেরী সরকার দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এই হত্যা-সম্পর্কিত ব্যাপারের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য, কিন্তু ইটালীয় সরকার ঐ বিষয়ে কোন কথাই বলিতেছেন না।

কাণ্ডটা নিতান্ত সামান্য নহে। পূর্ব্ব য়ুরোপে জেকোশ্লোভেকিয়া, যুগোশ্লেভিয়া, এবং রুমেনিয়া এই তিনটি রাজ্য সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র আঁতাতে (Entente) বা ছোট মিত্ররাষ্ট্রসঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধতা নষ্ট করিবার জন্য হাঙ্গেরীর এবং ইটালীর চেষ্টা আছে বলিয়া কেহ কেহ অভিযোগ করিয়া থাকেন। জেকোশ্লোভেকিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব ডক্টর এডয়ার্ড বেনস্ জেনিভার জাতিসঙ্ঘ পরিষদে বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই ক্ষুদ্র রাজ্যসঙ্ঘের একতার উপর কোনরূপ আঘাত করেন, তাহা হইলে সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই কথায় সমগ্র য়ুরোপে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। জাতিসঙ্ঘ পরিষদে ডক্টর বেনস্ এই কথা বলিবার পূর্ব্বে জাতিসঙ্ঘ পরিষদ শুনিয়াছিলেন যে, এক দল সশস্ত্র লোক রাজা আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে, আর হাঙ্গেরী উহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। উক্ত পরিষদ আরও শুনিয়াছিলেন যে, মার্কিণে কতকগুলি ক্রোট সভা করিয়া রাজা আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করে; সুতরাং ঐ হত্যাকাণ্ড যুগোশ্লেভিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মাত্র। উহা ক্রোট এবং সার্ব্বদিগের মধ্যে বিবাদের ফল। ডক্টর বেনস্ আরও বলেন যে, হাঙ্গেরীর সীমান্তপারে মার্শেলিজের হত্যাকাণ্ডের ন্যায় হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার আরও চেষ্টা চলিতেছে। জেকোশ্লোভিকিয়ার উপরও ঐরূপ অত্যাচার করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইনি আরও বলিয়াছেন যে, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে যদি এই ব্যাপার ঘটিত, তাহা হইলে যুগোশ্লেভিয়ার সহিত হাঙ্গেরীর নিশ্চিতই যুদ্ধ বাধিত। ফলে অবস্থা সঙ্গীন। যুগোশ্লেভিয়া হইতে হাঙ্গেরীবাসীদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে। প্রকাশ, গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে যুগোশ্লেভিয়ার একদল সার্ব্বসৈন্য নরকপাল এবং এড়ো অস্থিচিহ্ন (মৃত্যুসূচক) ধারণ করিয়া হাঙ্গেরীর সৈনিকদিগকে গালি পাড়িয়াছিল। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে য়ুরোপের উপরে সমরের করাল ছায়া পতিত হইয়াছে। জাতিসঙ্ঘ না থাকিলে এত দিন হাঙ্গেরীর সহিত যুগোশ্লেভিয়ার যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। এখন যুগোশ্লেভিয়া বলিতেছেন যে, যাহাতে এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে না পারে, তাহার জন্য জাতিসঙ্ঘ হাঙ্গেরীকে সমঝাইয়া দিন। সার্ব্বগণ এই রাজহত্যার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর। অন্য রাজগণ শান্তিরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এখন ইহার পরিণাম কি দাঁড়ায়, কে বলিবে। তবে রিজেণ্ট প্রিন্স পল শান্তিরক্ষার প্রয়াসী।

অদ্ভুত বালক

পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত বালক-বালিকার কথা শুনা যায়। এমন অনেক শিশু দেখা যায় যে, যাহারা অতি শৈশবেই অনেক অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে, সাধারণ বালকগণ বহুদিন ধরিয়া বিশেষভাবে

শিক্ষা না করিয়া কখনই সেরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। ফ্রান্সের বিখ্যাত গণিতবিদ্যাবিশারদ প্যাস্কাল (Pascal) সম্বন্ধে ঐরূপ কথা শুনা যায়। এইরূপ আরও অনেক শুনা যায়। সম্প্রতি মার্কিণের ব্রুকলীন (Brookllyn) সহরে ঐরূপ একটি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বালকের আবির্ভাব হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। স্থানীয় সংবাদপত্রাদিতে এই বালকটি সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্ময়কর কথা প্রকাশ পাইতেছে। এই বালকটির নাম আর্থার গ্রীণউড। তাহার বয়স এখন সাড়ে সাত বৎসর। তাহার পিতা ইহুদী ব্যবসাদার। ছেলেটি এখন ব্রুকলীন 'এথিক্যাল কালচার' স্কুলে পড়িতেছে। এই বালকটির বুদ্ধির দৌড় যেরূপ দেখা যায়, এ পর্য্যন্ত সেরূপ বুদ্ধির দৌড় আর কাহারও দেখা গিয়াছে বলিয়া জানা নাই। বুদ্ধির দৌড়ে সে নাকি আইনষ্টীনকেও পরাজিত করিয়াছে। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল, এবং আধ আধ কথা বলিত, তখন সে যে ভাষা বলিত, তাহা সম্পূর্ণ ব্যাকরণসঙ্গত হইত। এক্ষণে বলা আবশ্যক, মার্কিণের কথোপকথনের সাধারণ ভাষা ব্যাকরণের নিয়মসঙ্গত নহে। যখন এই বালকটির বয়স সবে দুই বৎসর মাত্র, তখন সে বেশ পড়িতে শিখিয়াছিল। তাহার সাধারণ বুদ্ধির যেরূপ বিকাশ দেখা যাইতেছে, সতের আঠার বৎসরের বালকেরও সাধারণ বুদ্ধি সেরূপ বিকাশ লাভ করে না। জ্যামিতির দুরূহ অঙ্ক সে হেলায় কষিতে পারে। এই বালকটি এক প্রকার আঙ্কিক অক্ষর (Numerical alphabet) আবিষ্কার করিয়াছে; তাহার সাহায্যে সে খুব জলদ লিখিতে পারে। সে সঙ্গীতের স্বর সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিবার কৌশল বাহির করিয়াছে। সে যে ভাষায় কথা কয়, তাহার শব্দগুলির মাত্রা অধিক (Polysyllabic)। ইহার দৈহিক আকার ইহার সমবয়স্ক বালকদিগের ন্যায়। তাহাকে দেখিলে তাহার যেরূপ বয়স, তাহাই মনে হয়, অধিক বয়স বলিয়া মনে হয় না। এই ছেলেটি একেবারেই মিনমিনে বা সাহসশূন্য নহে। খেলাধূলায় সে সাহসের কাযই করিতে চাহে। সে কাহারও সহিত কলহ বা কথা-কাটাকাটি করিতে ভালবাসে না। সে প্রায়ই বলে, "আমি ঝগড়া করিতে বা তর্ক করিতে ভালবাসি না।"

য়ুরোপীয়রা পুনর্জ্জন্ম মানেন না। কাযেই তাঁহারা এইরূপ অসাধারণ বালক-বালিকাদিগের বিষয় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, প্রকৃতির একটা খেয়ালে এইরূপ হয়। বিশেষতঃ ইহা যেন দেখা যায় যে, বয়সবৃদ্ধি হইলে এইরূপ অসাধারণ বালকদিগের অসাধারণত্ব লোপ পায়। হিন্দুরা বলেন, ইহা এক প্রকার জাতিস্মরত্ব। যাহারা জাতিস্মর হয়, তাহারা পূর্ব্বজন্মের সব কথা বাল্যকালে স্মরণ করিতে পারে, কিন্তু এই শ্রেণীর বালকরা তাহা পারে না। তাহারা পূর্ব্বজন্মের সাধনালব্ধ কোন কোন গুণ বিনা আয়াসে এবং বিনা অনুশীলনে লাভ করিয়া থাকে। হিন্দুরা বলেন যে, পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত বিদ্যা পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত ধন এবং পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত পুণ্য (ধর্ম্মবুদ্ধি) মানুষ ইহজন্মে পাইয়া থাকে। তবে অনেকের পক্ষে তাহা সাধনার দ্বারা বিকশিত করিয়া লইতে হয়, কেহ কেহ তাহা বিনা সাধনাতেই পাইয়া থাকে।

সায়ারে ভোট গ্রহণ

গত ১৩ই জানুয়ারী (২৮শে পৌষ) সায়ার অঞ্চলে ভোটগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে সময় কোনরূপ গোলযোগই হয় নাই। নাজী বা নাৎসীরা হাঙ্গামা বাধাইবার জন্য কোনরূপ চেষ্টাই করে নাই। নানা দেশ হইতে যে সকল সৈনিক সায়ারে শান্তিরক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সাজান পুত্তলির ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদ আঁটিয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপারের শোভামাত্র বর্দ্ধন করিয়াছিল। অবশ্য এ কথা সত্য যে,, মার্কিণের জনসাধারণের ভোট বা মতগ্রহণ-কৌশলে বিশেষজ্ঞ সারাওয়াম্বাগ পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, গতিক দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, জার্ম্মাণীর পক্ষে ভোট অধিক হইবে। ব্যাপারটা নিরাপদে কাটিয়া যাইবে বলিয়া ফরাসীরা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই। হাঙ্গামা বাধিলেই তাহারা অকুস্থলে পাঠাইবার জন্য সৈন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিল। কিন্তু সায়ার কমিশনের বিনা অনুরোধে ত তাহারা সৈন্য পাঠাইতে পারে না। কাযেই কোন হাঙ্গামাই বাধে নাই। ব্যাপারটা নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের আর একটা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনাও কাটিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছে,—জার্ম্মাণী। সায়ার অঞ্চলে যত লোক ছিল, তাহার প্রায় শতকরা ৯০ জন জার্ম্মাণীর সহিত সংযুক্ত হইবে বলিয়া ভোট দিয়াছে। এত অধিক ভোট যে জার্ম্মাণী পাইবে,—তাহা জার্ম্মাণী নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ভোট দিবার সময় তিনটি প্রশ্ন মাত্র ভোট দিবার কাগজে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ১ম প্রশ্ন—তোমরা যেরূপ শাসন-ব্যবস্থায় আছ, ঠিক সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা কর কি না? ২য় প্রশ্ন—তোমরা জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা কর কি না? ৩য় প্রশ্ন—তোমরা ফ্রান্সের সহিত মিলিত হইবার বাসনা কর কি না? এই তিনটি প্রশ্নের উত্তরে যে প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ লোকের মত পাওয়া যাইবে, সেই মতই ব্যবস্থা করা হইবে কথা ছিল। অবশ্য সায়ার অঞ্চলের অধিবাসিসংখ্যা সম্বন্ধে নানা জন নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। তবে যে সময়ে ভোট লওয়া হইয়াছিল, সেই সময়ে ইহার অধিবাসিসংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ২০ হাজার। ইহার কতকটা এ-দিক ও-দিক হইয়াছে কি না, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এই রাজ্যে যে লোকের খুব ঘন বসতি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরও অধিক শ্রমিক এবং কৃষীবল। আর শতকরা ৯৫ জন জার্ম্মাণ। জার্ম্মাণদিগের জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত হইবার বাসনাই স্বাভাবিক। কিন্তু নানা কারণে নাজী সরকারের উপর অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে,—সে কথা আমরা গত মাসেই বলিয়াছি। তাহা হইলেও ভোট-গণনার ফলে বুঝা গিয়াছে যে, ইহাদের স্বজাতির দিকে টানই অধিক হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৫ জন লোক ভোট দিয়াছে। তন্মধ্যে ২ হাজার ২ শত ৪৯টি ভোট বাতিল হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণীর পক্ষে হইয়াছে ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ১ শত ১৯টি ভোট অর্থাৎ

হাজারকরা ৯০৮টি ভোট। বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থাৎ লীগের শাসন-ব্যবস্থায় থাকিবার পক্ষে ভোট হইয়াছে ১৬ হাজার ৫ শত ১৩টি; অর্থাৎ হাজারকরা সাড়ে ৮৮ জন বর্ত্তমান ব্যবস্থায় থাকিবার অনুকূলে ভোট দিয়াছে; আর কেবলমাত্র ২ হাজার ১ শত ২৪টি প্রাণী ফ্রান্সের সহিত সম্মিলিত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। অর্থাৎ হাজারকরা ৪ জন মাত্র সায়ারবাসী ফ্রান্সের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছেন। সুতরাং জার্ম্মাণীর পক্ষেই জয় জয়কার। ফ্রান্স একবারেই ভোট পান নাই বলিলেই চলে। হাজারকরা ৪ জনের মত গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না। আসল কথা, নাৎসী সরকারের বিরুদ্ধে যত গুজব রটান হইয়াছিল, তাহা সত্য নহে বলিয়াই বুঝা গেল। উপস্থিত য়ুরোপের গগন হইতে একটা প্রলয়-ঝটিকা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা কতকটা তিরোহিত হইল। নাৎসী-দলের নায়ক এই উপলক্ষে আয়ারলণ্ডের অধিবাসীদিগকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, "আমরা পৃথিবীর শান্তিরক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প।" সায়ারের ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। কেবল জন কয়েক একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন জাতিসঙ্ঘ জার্ম্মাণীকে সায়ার ফিরাইয়া দিবেন, তবে জার্ম্মাণী ফ্রান্সকে ঐ অঞ্চলের কয়লা-খনিগুলির মূল্য দিবেন। মূল্যও নাকি ধার্য্য হইয়াছে ৩০ হইতে ৪০ কোটি স্বর্ণ-ফ্রাঙ্ক। নিতান্ত অল্প টাকা নহে। জার্ম্মাণরা এখন এত টাকা কোথায় পাইবেন? অথচ অনেকে বলিতেছেন যে, ৩০ কোটি স্বর্ণ-ফ্রাঙ্ক উহার ন্যায্য দর। ব্যাপার সহজ নহে। ইহা লইয়া হয় ত আবার একটা বিষম গোল বাধিতে পারে। কিন্তু গোল বাধিবার আরও কারণ আছে। এত দিন সায়ার অঞ্চলের পণ্য শুল্ক না দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিতেছিল। অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি খরিদদার সস্তা দরে সায়ারের পণ্য পাইতেছিল! প্রতি বৎসর ৫ কোটি টন করিয়া কয়লা সীমান্ত পার হইয়া ফ্রান্সে যাইত। এখন ঐ পণ্যের গতি কি হইবে? সেগুলি কি জঞ্জালের গাদায় নিক্ষিপ্ত হইবে? এই প্রশ্ন যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা একটু বাড়াবাড়ি করিতেছেন। ঐ পণ্যের একটা গতি নিশ্চিত হইবে। তবে উপস্থিত ইহা লইয়া একটা হাঙ্গামা বাধিবে, ইহা নিশ্চিতই। ইহার ফলে আর্থিক অবস্থার কিছু বিপর্য্যয় ঘটিবে।

কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটা বড় রকমের সমস্যা উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা আছে। এখন যদি জার্ম্মাণী ৩০ কোটি স্বর্ণ-ফ্রাঙ্ক দিয়া সায়ার অঞ্চলের খনিগুলি কিনিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে ফ্রান্স ঐ খনিগুলির মালেকান স্বত্ব ছাড়িবে না। যত দিন খনিগুলির মালেকান স্বত্ব সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা না হইতেছে, তত দিন এই অঞ্চল কিছুতেই নাৎসীদিগের হাতে আসিবে না। আর যত দিন তাহা না আসিতেছে, তত দিন এই ব্যাপারের শেষ মীমাংসা হইতেছে না। কারণ, এই জটিল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে এখনও কিছু সময় লাগিবে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে,—ক্ষীণদৃষ্টি মানবের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে।

ধর্ম্মের সহিত বিরোধ

আজকাল পৃথিবীর বহু দেশেই ধর্ম্মের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। রুসিয়া, স্পেন, জার্ম্মাণী এবং মেক্সিকো হইতে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য বড় বিষম চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি মেক্সিকোতে এই ব্যাপার বড়ই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। মেক্সিকো উত্তর-আমেরিকার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ দেশ। এই দেশের বিস্তার ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ১ শত ৯৮ বর্গ-মাইল। ইহার লোকসংখ্যা আনুমানিক ১ কোটি ৬৪ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি য়ুরোপীয় আছেন,—কিন্তু অধিকাংশই য়ুরোপীয় এবং আদিম অধিবাসীদিগের বর্ণ-সঙ্কর। আদিম অধিবাসী এখনও কিছু আছে শুনা যায়। এই দেশটির শাসনতন্ত্র মার্কিণী শাসনতন্ত্রের অনুকরণে গঠিত। ইহার মধ্যে ৮৭টি রাজ্য আছে। এই রাজ্যের এখন যিনি প্রেসিডেণ্ট, তাঁহার নাম জেনারাল লেজারো কার্ডেনাস। ইনি এতদূর সভ্য যে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে ঘৃণাবোধ করেন। এই বিষয়ে ইনি রুসিয়ার ষ্টেলিনেরই তুল্য। ইনি সর্ব্বস্বত্ববাদী এবং ধর্ম্মসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার পক্ষপাতী। ধর্ম্মায়তনগুলির সহিত মেক্সিকোর কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই বিবাদ নূতন নহে। বহু দিন ধরিয়া এই বিবাদ চলিয়া আসিতেছে! অবশ্য মেক্সিকো-বাসী সকলেই যে নিরীশ্বরবাদী, তাহা নহে। তথায় অনেক ধার্ম্মিক রোমান ক্যাথলিক আছেন। রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ তথায় জনসাধারণকে বরাবরই শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। এখন মেক্সিকোর কর্ত্তৃপক্ষ নিয়ম করিতেছেন যে, রাজ্যের কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষই কোন প্রকার শিক্ষাদান করিতে পারিবেন না। সরকারই সকলের শিক্ষাদানের ভার লইবেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রবাদের মতানুগ হইবে, কোন প্রকার ধর্ম্মমতের সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিবে না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং নর্ম্মাল শিক্ষায় কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত কোন ধর্ম্মমতাবলম্বীই কোন প্রকার শিক্ষাদান করিতে পারিবেন না, বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবেন না। শিক্ষাব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিবে। ইত্যাদি। এক কথায়, মথুরায় কংস-রাজত্বকালে যেমন হরিনাম বর্জ্জনীয় বলিয়া রাজাদেশ জারি হইয়াছিল, মেক্সিকোতে সেইরূপ এখন বিশ্বেশ্বরের নাম বর্জ্জিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তারা এবং ধর্ম্মযাজকগণ বলিতেছেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে সকল লোককে স্বাধীনতা দান করা উচিত। কিন্তু সে কথা কেহই কাণে তুলিতেছেন না। সাধারণ ধর্ম্মমাত্রের উপরই মেক্সিকো সরকারের এই সংগ্রাম ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীরা সম্মিলিত হইয়া রাষ্ট্রপালদিগের এই আচরণের প্রতিবাদ করিতেছে। রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, ইহুদী প্রভৃতি সকলেই এখন সম্মিলিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে তথাকার ছাত্র-সমাজও যোগ দিয়াছেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও এই ব্যাপারে ধর্ম্মযাজকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। ফলে এই ধর্ম্ম-সংগ্রামে মেক্সিকোতে বেশ একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। পুলিসের সহিত ছাত্র-সম্প্রদায়ের হাতাহাতিও হইতেছে। পুয়েব্লাতে (Pueble) যে সেণ্ট

থেরেসার ক্যাথলিক স্কুল ছিল, সরকার তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়াতে ক্যাথলিক এবং ছাত্রদল সম্মিলিত হইয়া দাঙ্গা বাধায়। দুই দিন ধরিয়া দাঙ্গা চলিয়াছিল। সেই দাঙ্গায় তিন জন নিহত এবং বহু লোক আহত হয়। মণ্টেরী, জেকাটেবাস প্রভৃতি স্থান হইতে এইরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। চিহুয়াহুয়া (Chihuahua) নগর হইতে দুই জন ধর্ম্মযাজক শিক্ষককে এবং ২২ জন ছাত্রকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। আবার সরকারপক্ষ হইতে তাহাদের নীতিসমর্থক লোকদিগকে লইয়া শোভাযাত্রা করান হইতেছে। ফলে মেক্সিকোতে ধর্ম্মযুদ্ধের বেশ একটু ঘটা উপস্থিত হইয়াছে।

য়ুরোপীয় জাতিদিগের চিন্তার ধারা এখন নিরীশ্বর ভাবের দিকে ঝোঁক দিয়া চলিতেছে। কতকগুলি দেশের সরকার এখন নিরীশ্বরতা বা নাস্তিক্যবাদের সমর্থন করিতেছেন। ইহার তরঙ্গ যাইয়া আমেরিকার এই সকল সঙ্কর জাতির উপর পড়িতেছে। ইহারা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকে ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরভক্তিকে কুসংস্কার বলিয়াই মনে করেন। ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, জার্ম্মাণী হইতে এই ভাবতরঙ্গ মেক্সিকোয় যাইয়া পড়িতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণীকে বর্জ্জন করাই ইহার প্রতিকারের প্রধান উপায়। আমাদের ধারণা, রুসিয়া হইতে এই ভাবের ধারা প্রবাহিত হইয়া সমস্ত সভ্যজগৎকে প্লাবিত করিতেছে। ইহা দুর্লক্ষণ বলিয়াই মনে হয়।

ফিলিপাইনে মোরো বিভ্রাট

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ চীনা সমুদ্র এবং প্রশান্ত মহাবারিধির সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের অতীত ইতিহাস বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। তবে শুনা যাইতেছে যে, এককালে এই দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সে কাহিনী এখন স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, স্পেন-বাসীরা ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপটি দখল করিয়া লয়। এখন এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীর সংখ্যা অনেক অল্প। তথায় অধিকাংশই এখন সঙ্কর জাতি। নামতঃ ইহারা রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। এখন এই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণের অধিকারভুক্ত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহা মার্কিণের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এই দ্বীপের অধিবাসিসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ হইতে পারে,—কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ মোরো জাতির বাস। এই মোরো জাতিরা সকলেই মুসলমান। যে সকল মুসলমান এবং হিন্দু বোম্বেটিয়া এই সকল দ্বীপপুঞ্জে উৎপাত করিয়া বেড়াইত, ইহারা তাহা-দিগেরই বংশধর। স্পেনিয়ার্ডরা যে সময় এই দ্বীপটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ইহাদিগকে মূর জাতি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাদিগকে মোরো এই নাম দিয়াছেন। ইহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রামপ্রিয় জাতি। চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সকল বোম্বেটিয়া বা জলদস্যু সেলেবিস সাগরে এবং দক্ষিণ ফিলিপাইন দ্বীপগুলির আশে পাশে বোম্বেটেগিরি করিয়া বেড়াইত। সেই সময় ইহারা সাগরপ্রান্ত স্থান হইতে আদিম অধিবাসীদিগকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাড়াইয়া দিয়া তথায় বাস করিতে থাকে। এই প্রকারে জোলো এবং জাম্বোয়াঙ্গা নগরের পত্তন হয়। ক্রমে মোরোগণ উহার বিস্তার বাড়াইয়া লয়।

এই মোরো সম্প্রদায়ের সহিত ফিলিপাইন দ্বীপবাসীদিগের সদ্ভাব নাই, বরং ঘোর শত্রুতা আছে। ইহারা এককালে ফিলিপাইনবাসীদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিয়াছে। এখনও সুবিধা পাইলে ইহারা উহাদিগের ছোট ছোট শিশু ও নারী-দিগকে হরণ করিবার সুযোগ ত্যাগ করে না। তবে মার্কিণীরা উহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। ইহারা বলে যে, আজ যদি মার্কিণীরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ফিলিপাইনের খৃষ্টান অধিবাসীরা ইহাদিগকে বধ করিবে, ইহাদিগের উপর বৈর-নির্য্যাতন করিবে। মার্কিণ সরকার যখন ইহাদিগকে নিরস্ত্র করেন, তখন তাঁহারা বলিয়া-ছিলেন, তাঁহারাই তাহাদিগকে খৃষ্টানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু এখন যদি তাঁহারা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইবে। এই মর্ম্মে তাহারা মার্কিণের কংগ্রেসের নিকট অনেক দরখাস্ত করিয়াছে বলে,—কিন্তু তাহাদের সকল দরখাস্ত নাকি কংগ্রেসের নিকট পৌঁছায় নাই। এ কথা কত দূর সত্য, তাহা বুঝা কঠিন। তবে এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ফিলিপাইনের খৃষ্টান অধিবাসীরা শিক্ষা-দিতে যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, মোরো জাতি সেরূপ উন্নতি-লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি, তাহারা কিছুমাত্র শিক্ষালাভ করে নাই। তাহারা স্পষ্টই বলে যে, তাহারা তাহাদের পুরাতন কৃষ্টি, চিরাগত রীতি-নীতি, তাহাদের ভাষা প্রভৃতি পরিহার করিতে ইচ্ছা করে না। আরণ্য বিদ্যালয়ে ফিলিপাইনের খৃষ্টানগণ তাহাদিগকে যে জংলা ইংরাজী (Bamboo English) শিখায়, তাহা শিখিয়া তাহাদের কোন লাভ নাই। বিনা যুদ্ধে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না এবং বুঝে না। কি করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হয়, কি উপায়ে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে শাসন-কর্ত্তা নির্ব্বাচিত করিতে হয়, তাহার কৌশল তাহারা কিছুই বুঝে না। এই অজুহত দেখাইয়া মোরো সর্দ্দাররা বলিতেছে যে, তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিবার কৌশল না শিখাইয়া মার্কিণী-দিগের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। উহাদের কথা এই যে, ফিলিপাইনবাসী খৃষ্টানরা সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক, তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মোরোরা নিরস্ত্র। এরূপ অবস্থায় মার্কিণ যদি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে খৃষ্টান ফিলিপিনোরা মোরোদিগকে হত্যা করিয়া উজাড় করিয়া দিবে। এ সকল কথা কত দূর সত্য, তাহা বুঝা কঠিন। খৃষ্টান ফিলিপিনোগণ বলিতেছেন যে, মোরো সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের কোনো বিবাদ নাই। কিন্তু সে কথা সত্য নহে। খৃষ্টানগণ বলিতেছেন যে, আমরা উহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া লইব। মোরোরা বলিতেছে যে, ৫ লক্ষ মোরোকে এইরূপ ভাবে চিরাগত শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া মার্কিণের

চলিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না। এখন ইহার ভিতর সাম্রাজ্য-বাদী মার্কিণীদিগের কোন প্রকার কূট চা'ল আছে কি না, কে বলিতে পারে? ইহা ফিলিপাইন দ্বীপের একটা খুব প্রবল সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। মার্কিণ এই দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া লইবার পূর্ব্বেও ত মোরোরা ঐ দ্বীপে ছিল। কিন্তু কৈ, তখন ত খৃষ্টান ফিলিপিনোরা উহাদিগকে মারিয়া উজাড় করিয়া দেয় নাই। তবে এখনই মোরোদিগের মনে ঐরূপ আশঙ্কা জন্মিতেছে কেন? ইহার সদুত্তর পাওয়া কঠিন।

চাকো-সংগ্রাম

সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় যে প্যারাগুয়া এবং বোলিভিয়া নামক দুইটি দেশের মধ্যে আজ কয়েক বৎসর সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার সংবাদ মাসিক বসুমতীর পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছেন। এই দুইটি জাতি যে ভূখণ্ডের স্বত্ব ও স্বামিত্ব লাভের জন্য এই প্রকার ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে, সেই দেশটির নাম চাকো। ইহার বিস্তার ১ লক্ষ বর্গ-মাইল। ইহা পিলকোমাইয়ো এবং প্যারাগুয়া নাম্নী দুইটি নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূমি। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এত দিন এক প্রকার অস্বামিক অবস্থায় পতিত ছিল। এ অঞ্চলে লোকের বসতি বড় একটা নাই। আছে কেবল অপার মরুকান্তার এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-তৃণবহুল বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অধিকাংশই সমতল ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে প্রস্তরকঙ্করময় ঢিবি বা উচ্চস্থান আছে। পশুপাল চরাইতে ভিন্ন অন্য কেহ এই অঞ্চলে প্রায় যায় না। প্যারাগুয়ার লোকরা বর্ণসঙ্কর জাতি। বোলিভিয়াবাসীরাও প্রায় তাই। তবে প্যারাগুয়ার লোকরা খুব সাহসী। প্যারাগুয়া আয়তনে ক্ষুদ্র বলিয়া ঐ অঞ্চলটা তাহারা অধিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে বোলিভিয়ারও অধিকার ছিল না, প্যারাগুয়ারও অধিকার ছিল না, উভয় সরকার কর্তৃক ঐ মরুময় প্রান্তরটি পরিত্যক্ত ছিল। এই অঞ্চলে আয় নাই বলিয়া কেহ উহা পূর্ণমাত্রায় দখলে রাখিবার চেষ্টা করে নাই।

এত দিন জেনিভায় জাতিসঙ্ঘ উভয় রাজ্যের মধ্যে এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য বিবিধমতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কোন পক্ষই মীমাংসায় সম্মত হয় নাই। সম্প্রতি প্যারাগুয়া সরকার এই মীমাংসার জন্য ডক্টর রামণ কাবালেরো বেডোয়াকে জাতিসংঘের শালিসী কমিশনের সদস্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহাতে মীমাংসা হইবার সামান্য আশা জন্মিয়াছে। প্যারাগুয়া এখন অনেকটা ভূভাগ প্রায় ২০ হাজার বর্গ-মাইল স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। উহার পশ্চিমদিকে ৬২ দ্রাঘিমা-রেখা এবং উত্তর দিকে ২০ লম্বিমাবৃত্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। প্যারাগুয়া সরকার তাহাদের বিজয়লব্ধ এই স্থানটি যে ত্যাগ করিবে, তাহা মনে হয় না। আবার কয়েক মাস পূর্ব্বে চাকো সমিতিতে উরুগুয়ায় এলবার্টোগুয়েনী বলিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপারের মীমাংসাভার আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির হস্তে দেওয়া উচিত। এখন মধ্যস্থ দ্বারা মীমাংসা যে নিশ্চিতই হইবে, তাহা বলা যাইতেছে না। তবে কি হয় দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক রহিয়াছেন।

আত্মগ্রাহিতা

লুইম্যান নামক জনৈক চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্প্রতি "ইউনিটি" নামক পত্রে বর্ত্তমান সময়ে সভ্যদেশে যে দোষ উপস্থিত হইয়াছে,—যাহার জন্য ধর্ম্মভাবের মূল শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া এক সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। উহাতে পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত সকল দেশের কথাই আছে। তিনি বলেন, বর্ত্তমান সময়ে সকল সভ্যদেশেই আত্মগ্রাহিতা দোষ দেখা দিয়াছে। এই আত্মগ্রাহিতার নাম তিনি দিয়াছেন Autarchy। শব্দটি নূতন করিয়া গড়া। ইহার অর্থ আপনাকে লইয়াই আপনি থাকা। অন্য কাহারও তোয়াক্কা না রাখা। ইনি বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণী এই ভাবের পোষণ করিতেছেন, ইটালী এই আত্মগ্রাহিতার কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—মার্কিণ এখন এই মনোভাবের কথাটা লইয়া বহুলভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই ভাবটি অনেকটা আত্মসর্ব্বস্বতা (অথবা ইংরাজী self-sufficiency শব্দের) দ্বারা প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু ঐ শব্দগুলির বহু প্রয়োগ হেতু ইহার লক্ষণাগত ভাবের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মিষ্টার ম্যান এই নূতন শব্দ রচিয়াছেন। আমরা সেই জন্য ইহাকে আত্মগ্রাহিতা বলিলাম। ইহার অর্থ জাতি হিসাবে বা দেশ হিসাবে লোক পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, এইরূপ মনোভাব। অর্থাৎ এক জাতি আর এক জাতির সহিত কোনরূপ সহযোগ করিবে না, এইরূপ স্বার্থিক ভাব। আর্থিক ক্ষেত্রেই এই ভাবটি অধিক পরিস্ফুট। জাতীয়তার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হইয়াছে, তাহাকে পিছাইয়া দেওয়া জাতীয় শৈশবকে ডাকিয়া আনা হইবে। এই ভাবটি প্রবল হইলে এক জাতি বা এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের সহিত সহযোগ করিবে না। লেখক বলেন, ইহার ফলে আবার সেই আদিমকালীন বর্গীয় অবস্থাকে (tribalism) ফিরাইয়া আনা হইবে। জার্ম্মাণী এখন অবিমিশ্র জাতীয়তা লাভের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা যে ভাবে উহা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহাতে জাতির অপকর্ষ ঘটিবে বলিয়া লেখকের বিশ্বাস। বর্ত্তমান সময়ে ত্বরিতগতিতে যাতায়াতের ও মালপত্রাদি প্রেরণের সুবিধা হওয়াতে ধর্ম্মভাবের প্রধান লক্ষ্য "বসুধৈব কুটুম্বকমের" অর্থাৎ সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা জাগিয়া উঠিয়াছে, জাতিগত রাষ্ট্র, গোষ্ঠীগত রাষ্ট্র, বার্ত্তিক রাষ্ট্র (economic state) এবং আত্মগ্রাহী রাষ্ট্র সেই উদ্দেশ্যকে বিফল করিয়া দিবে। এক সময়ে লোক রাজার শক্তিকে ভগবানের শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিত,—কিন্তু যখন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইল যে, উহা মানুষের পক্ষে শয়তানী শক্তি, তখন ঐ বিশ্বাস লোক পরিহার করিয়াছিল। এমন এক দিন ছিল, যখন লোক ধর্ম্মযাজকদিগকে ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান মনে করিত, কিন্তু যখন লোক বুঝিল, ধর্ম্মযাজকরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান কথাই বলে, উহারা রক্ষণশীল এবং কুসংস্কারের সমর্থক, তখন লোক সে বিশ্বাস ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখনও লোক রাষ্ট্রের সর্ব্বতোমুখ অধিকারের সমর্থন করিতেছে, এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ঐশ্বরিক শক্তির সম্মান দিতেছে, তাহার ফলে পৃথিবীস্থ লোকদিগের সন্দেহ, অবিশ্বাস

ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, অশুভ ইচ্ছা, যুদ্ধের ভয়প্রদর্শন প্রভৃতিতে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। মানুষের ঐশ্বরিক শক্তি এখনও জন্মে নাই। ভবিষ্যতে উহা জন্মিবে।

মিষ্টার লুইম্যান্ তাহার পর বলিয়াছেন, এখন যদি মঙ্গল-গ্রহের অধিবাসীরা আসিয়া এই পৃথিবীবাসীদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে ধরাবাসীরা এই আত্মগ্রাহিতা বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া সকলে সম্মিলিত হইয়া যাইবে। জার্ম্মাণীর সহিত আর ফ্রান্সের, ফ্রান্সের সহিত আর জার্ম্মাণীর বৈরিভাব থাকিবে না, বৃটিশ জাতি জাতীয় প্রাধান্যজনিত অপরের উপর ঘৃণা পরিহার করিবে, ইটালীর সরকার বাণিজ্যজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভুলিয়া যাইবে, জাপানীরা আর মার্কিণের উপর সন্দেহ পোষণ করিবে না। তখন আর লোকের মুখে পীতাতঙ্কের, ফাসিষ্টভীতির, সর্ব্বস্বত্ববাদ প্রচারের এবং সমাজতন্ত্রানুরক্তির কথা শুনা যাইবে না। তখন সকলেই সার্ব্বজনীন শক্রর বিরুদ্ধে এককাট্টা হইয়া দাঁড়াইবে। এখন আমরা মঙ্গল গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই নাই, পরন্তু রণদেবতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। জাতীয়ত্বই তাঁহার প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত যাজক। ইহার কথা সত্য। জাতীয়তারূপ সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিয়াই এই ধরাতলে অনেক অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। ইহা শয়তানেরই খেলা। বর্ত্তমান সভ্যতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া মানুষ শয়তানের এই লীলা পরিহার করিতে পারিবে কি?

নৌবহরে প্রতিযোগিতা

বর্ত্তমান যুগে ভণ্ডামিটা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। লোক বলিতেছে এক, করিতেছে আর এক। কথায় কাযে মিল নাই। মুখে বড় বড় শক্তিশালী রাজ্যের পরিচালকবর্গ বলিতেছেন, অস্ত্রসঙ্কোচ করিতেই হইবে; কিন্তু তাঁহাদের কাযে অন্যরূপ দেখা যাইতেছে। সকল দেশেই যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। রণতরী প্রস্তুতের জন্য অজস্র ব্যয় মঞ্জুর হইতেছে, সৈনিক ও যুবকদিগকে সামরিক কুচ-কাওয়াজ শিখান হইতেছে, কামান গর্জ্জিতেছে। এই সকল ব্যাপার শান্তিরক্ষার মনোভাবের প্রকাশ করিতেছে না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীতে একটা খুব বড় রকমের যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্য সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটন সহরে যে নৌশক্তির সঙ্কোচনসাধিনী সমিতি বসিয়াছিল, তাহাতে পঞ্চশক্তি যোগ দিয়াছিলেন। যথা—গ্রেট বৃটেন, মার্কিণ, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স। শেষোক্ত দুইটি দেশের সরকার এই চুক্তি স্বীকার করিতে অসম্মত হন। তখন কেবল গ্রেট বৃটেন, মার্কিণ এবং জাপান এই তিন শক্তির মধ্যেই এই চুক্তিসূত্র আবদ্ধ হইয়াছিল। উহাতে সাব্যস্ত হয় যে, গ্রেট বৃটেন এবং মার্কিণ উভয় রাজ্যই প্রত্যেক ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন করিয়া রণতরী রাখিতে পারিবেন, কেবল জাপান ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টনের রণতরীর অধিক রণতরী রাখিতে পারিবেন না। জাপান এই চুক্তিতে তখন সম্মত হইয়াছিলেন। ইংরাজ ও মার্কিণীরা বলেন যে, জাপানের উহার অধিক রণতরীর আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, জাপানীরা পরে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের ঐ সর্ত্তে সম্মত হওয়া উচিত হয় নাই। ইহার পর লণ্ডন সহরে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এক নৌবৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতে অধিক কিছুই সাব্যস্ত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে ধার্য্য হয় যে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই চুক্তি বহাল থাকিবে।

এখন জাপান গত ২১শে ডিসেম্বর জানান দিয়াছেন যে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পর আর তাঁহারা ওয়াসিংটন চুক্তি মান্য করিবেন না। এই ব্যাপারে বিষম হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ মার্কিণ এবং গ্রেট বৃটেন ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিতেছেন। তাঁহারা ইহাতে জাপানেরই স্বার্থপরতা দেখিতেছেন।

তাঁহারা বলেন যে, গ্রেট বৃটেন সমস্ত সাগরেরই অধিপতি, সর্ব্বত্রই তাহার অধিকার বিস্তৃত। সুতরাং তাহার পক্ষে অধিক রণতরী রক্ষার প্রয়োজন আছে। মার্কিণেরও দুই পাশে দুই সমুদ্র, সুতরাং তাহারও অধিক রণতরী না রাখিলে চলে না। জাপানের ত কেবলমাত্র প্রশান্ত বারিধি লইয়া কারবার; সুতরাং তাহার পক্ষে প্রায় অর্দ্ধেক রণতরীই যথেষ্ট। এ যুক্তি কোন-মতেই সঙ্গত নহে। জাপানী রণতরী কেবল প্রশান্ত মহাসাগরে নহে, ভারত মহাসাগরেও আসিতে পারে। কারণ, ভারত মহাসাগরে তাহাদের পণ্যবাহী জাহাজ আসিয়া থাকে। সেগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য জাপানের ভারত মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত রণতরী আমদানী করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং রণতরীর প্রয়োজন যে অল্প আছে, তাহা মনে করা ভুল। দ্বিতীয়তঃ, এ কথা বিদিত ভুবনে যে, মার্কিণের সহিত জাপানের বেশ একটু রেষা-রেষি চলিয়াছে। যদি মার্কিণের সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে জলধিবক্ষেই সেই যুদ্ধ হইবে। কিন্তু নৌশক্তিতে দুর্ব্বল বলিয়া জাপানের সেই যুদ্ধে পরাজিত হইবার সম্ভাবনা সমধিক। এরূপ অবস্থায় জাপানের পক্ষে নৌশক্তিতে মার্কিণের সমকক্ষতা লাভ করিবার প্রয়াস স্বাভাবিক। উহাকে অসঙ্গত দাবী বলা যাইতে পারে না।

জাপান প্রাচ্যশক্তি। সমস্ত এসিয়ায় একমাত্র জাপান ভিন্ন আর দ্বিতীয় এমন কোন জাতি নাই, যে জাতি কোন যুরোপীয় জাতির সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং জাপানের উপর অনেকের ঈর্ষ্যা স্বাভাবিক। সে জন্য জাপানের এই সমকক্ষতার দাবীকে অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য মার্কিণী এবং বৃটিশ সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র যে খুব ওকালতি করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, জাপান সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া এই অসঙ্গত দাবী করিতেছে। জাপান সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সত্য। কারণ, তাহারা মাঞ্চুকুয়োতে এবং জিহোলে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জাপানকে এই সাম্রাজ্যতন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষা দিবার গুরু কাহারা? শ্বেতাঙ্গ জাতিরা কি নহেন? প্রবল সাম্রাজ্যস্পৃহা না থাকিলে ফ্রান্স কি জন্য ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ এবং তরঙ্গভঙ্গভীষণ জলনিধি পার হইয়া কম্বোডিয়া দখল করিয়া লইয়াছেন, মার্কিণই বা কি জন্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হাতে পাইয়া ছাড়ি ছাড়ি করিয়াও ছাড়িতে পারিতেছেন না? সুতরাং এ বিষয়ে সমান সকলেই। তবে অন্যের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালান আজকাল য়ুরোপীয় শক্তি-দিগের একটা রাজনীতিক কৌশল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং জাপানকে সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া অভিযুক্ত করা য়ুরোপীয় কোন জাতির সাজে না। কেবল আপনাদের কোলে ঝোল টানিলে

জগতে কোন মহৎ কার্য্য সাধন করা যায় না। তোমরা যখন সমর-সজ্জার জন্য এত হুড়াহুড়ি করিতেছ, তখন জাপানই বা আত্মরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা না করিবে কেন? জাপানের এই সঙ্কল্প জানিয়া মার্কিণ দ্রুত রণতরীবৃদ্ধিরই চেষ্টা করিতেছেন!

শ্যামরাজের সঙ্কল্প

শ্যামরাজ প্রজাধিপক সিংহাসন ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছেন, এ সংবাদ পাঠক জানেন। কেন তাঁহার এই মতি হইল, তাহা

শ্যামের রাজা ও রাণী

লইয়া নানা জনে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। শ্যামরাজ নিজেই মনে করিতেছেন যে, তাঁহার এখন সময় বড় মন্দ। তাঁহার সেক্রেটারী সম্বাক্স্ম্যান বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত ঘটনার জন্য শ্যামরাজের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে :—

(১) রাজা এবং রাণী বেলজিয়ামে যাইয়া রাজা এলবার্টের সহিত দেখা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সব প্রস্তুত, এমন সময় রাজা এলবার্টের অপমৃত্যু ঘটিল।

(২) ইহার পর ইহারা হলাণ্ডে যাইয়া তথাকার রাণীর সহিত দেখা করিবেন স্থির করেন। দেখা করিবার সমস্তই ঠিক, ঠিক সেই সময়েই রাণীমাতার মৃত্যু হইল।

(৩) তৎপরে তাঁহারা ভিয়েনায় যাইয়া ডক্টর এঙ্গেলবার্ট ডলফাসের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন ঠিক হইল। তাঁহারা যাত্রা করিলেন, এমন সময় ডলফাস নিহত হইলেন।

(৪) শেষকালে রাজা প্রজাধিপক এবং রাণী বর্ণী হলণ্ডে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। সবই প্রস্তুত। এমন সময় তথাকার রাজ্ঞীর স্বামী পঞ্চত্ব পাইলেন। এবারও যাওয়া বন্ধ করিতে হইল।

এই সমস্ত ঘটনাই এক বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছে। কাযেই রাজা প্রজাধিপক এবং রাণী রামবাই বর্ণীর মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের কেমন দুঃসময় পড়িয়াছে। তাই তাঁহারা যে কায করিতে যাইতেছেন, তাহাতেই এইরূপ বাধা পড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যদি শ্যামরাজ্যে গমন করেন, তাহা হইলে হয় ত রাজ্যেরই কোন অমঙ্গল হইতে পারে। সেই ভয়ে তাঁহারা আর এখন শ্যামরাজ্যে আসিতেছেন না। অন্য লোকও যেন কেমন কেমন মনে করিতেছেন। পাছে রাজ্যের অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে রাজা প্রজাধিপক সিংহাসন ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন। ইনি যথার্থই প্রজারঞ্জক।

সমুদ্র-বিদ্যুৎ

(Phosphorescence)

উচ্ছল তরঙ্গ-ভঙ্গে উজ্জল-অদ্ভুত—
জ্বলে ওঠে সমুদ্র-বিদ্যুৎ!
বিপুল-বিস্ময়ে মুগ্ধ অনিদ্র নয়নে
আমি আজ দ্বিতলের এই বাতায়নে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠি,
মনে হয়, মোর মর্ম্মে পড়ে লুটি' লুটি'
সেই অগ্নি-উর্ম্মি-মালা! রুদ্ধ-অন্ধকার
অজাগর-রজনীতে জাগর-ঝঙ্কার
সাগর-ধ্বনিয়া ওঠে বজ্র-গর্জ্জনেতে,
বহ্নি জ্বলে বক্ষোধমনীতে।
সুপ্তিমগ্ন এ অনন্ত মহাকালনিশি
আপনার মোহে আছে মিশি!
তারই বক্ষে সমুদ্রের নিদ্রাহারাকালী
মঞ্জীর মুখরি' চলে নৃত্য-সুর ঢালি,'
যুগান্তের পুঞ্জীভূত অন্ধকারতলে
ক্ষণে ক্ষণে তার অঙ্গ-অলঙ্কার জ্বলে,

তারই মাঝে শ্যাম-রূপ ঝলকি'-ললকি'
দেখা দেয় পলকে-পলকে! ওঠে ও কি
সংঘাত-অসুরে হানি' লক্ষ শতবার
প্রজ্বলিত খর-খড়্গা তার।
আপন রতন লয়ে অনন্তের জল
কি আনন্দে করে ঝল্-মল্!
অজস্র মুকুতামণি হেলায় ছুড়িয়া
প্রদীপ্ত কৌতুকে সিন্ধু ওঠে বিচ্ছুরিয়া
অসীম-ঐশ্বর্য্য তুলি' উদ্ভাসিয়া তার
মুক্ত ক'রে কোন্ চির রহস্যের দ্বার!
মোর মুগ্ধ আঁখি মেলি' আজি ক্ষণে ক্ষণে
সে-ঐশ্বর্য্য লভি আমি, এই বাতায়নে!
আপন-রতন লয়ে আজি সারাবেলা
অনন্তের এ কেমন খেলা!

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী।

মৃত্যু-কবলে

১২

শিয়াল-ফাঁকি

মুলিঞ্জার নির্ব্বাক্‌ভাবে ক্রোধারুণ-নেত্রে ডিটেক্‌টিভ রয়েডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু রয়েডের হাতের অটো-মেটিক রিভলভার তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত, সেই কঠোর হৃদয়বিদারক একবারমাত্র গর্জ্জন করিয়া যে অমোঘ রায় প্রকাশ করিবে, তাহার আপীল নাই,—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে ঊর্দ্ধবাহু সাধুর ন্যায় উভয় হস্ত মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া, অদূরবর্ত্তী ডেস্কের উপর সংরক্ষিত পিস্তলটির দিকে দুই একবার দৃষ্টিপাত করিল। তাহার ইচ্ছা হইল, বিদ্যুদ্বেগে হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লয়; কিন্তু তাহা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই রয়েডের অব্যর্থ গুলীতে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইতে পারে। সুতরাং সে পিস্তলের আশা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন্ উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

কিন্তু সেই অপরিচিত স্থানে, শত্রুপুরীতে হঠাৎ অতর্কিত-ভাবে কোন্ দিক হইতে কি বিপদ আসিবে, তাহা বুঝিতে না পারায় রয়েডের মনও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছিল; তিনিও আর অনাবশ্যক তর্ক-বিতর্কে অধিক সময় নষ্ট করা অসঙ্গত মনে করিয়া তাঁহার হাতের রিভলভার পূর্ব্ববৎ উদ্যত রাখিয়াই বাম হস্তে পকেট হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরী বাহির করিলেন এবং তাহার সাহায্যে চক্ষুর নিমেষে ল্যাংটনের উভয় হস্তের বন্ধন-রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, তাহার হাতের বন্ধন মোচন করিলেন, পরে ছুরীখান ল্যাংটনের হাতে দিয়া তাহাকে বলিলেন, "প্রথমে তুমি তোমার পায়ের বাঁধন কাটিয়া ফেল, তাহার পর মিস্ ফরেষ্টের হাতের ও পায়ের বাঁধন কাটিয়া দাও। এই কাযের ভার তোমাকেই লইতে হইতেছে; আমার এই বন্ধুযুগলের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্য কোন কাযে হাত দিব, আমার সেরূপ অবসর নাই।"

ল্যাংটন তাহার ও তাহার প্রণয়িনীর জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে রয়েডের আবির্ভাব দৈবানুগ্রহ বলিয়াই তাহার মনে হইল; কিন্তু জীবনের সেই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে এই ভাবে মৃত্যু-কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও সে হতবুদ্ধি হইল না, সে ক্ষিপ্রহস্তে রয়েডের আদেশ পালন করিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় রয়েড তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বারের দিকে পরিচ্ছদ আন্দোলনের শব্দের মত খস্‌খস্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি মুলিঞ্জার ও ক্যারোর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না; কিন্তু সে জন্য তাঁহার অসুবিধা হইল না। তাঁহার সম্মুখে অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে একখান আয়না ঝুলিতেছিল; সেই আয়নায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বার প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই দ্বারটি অতি ধীরে এক এক ইঞ্চি করিয়া উদ্ঘাটিত হইতেছিল। দ্বারটি এইভাবে অর্দ্ধোন্মুক্ত হইলে ভার্ণির অন্যান্য অবয়বের প্রতিবিম্বও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ভার্ণির হাতের পিস্তলটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না!

রয়েড ভার্ণির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার রিভলভারের ঘোড়ায় অঙ্গুলী স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "প্রথমেই মুলিঞ্জারের পালা!"

তাঁহার কথা শুনিয়া মুলিঞ্জার ঘামিয়া উঠিল এবং তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ী পড়িতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, ভার্ণি দ্বার অতিক্রম করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র রয়েডের রিভলভারের গুলী তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিবে, ভার্ণি তাহাকে সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে পঞ্চত্বলাভ করিতে হইবে; কারণ, ভার্ণি তখনও রয়েডকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করে নাই।

সেই কক্ষের দ্বার রয়েডের পশ্চাতে থাকিলেও এক চক্ষুতে তিনি মুলিঞ্জার ও ক্যারোর ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে-ছিলেন এবং অন্য চক্ষু আয়নায় স্থাপিত করিয়া ভার্ণির গতিবিধি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, ভার্ণি দ্বারপ্রান্তে শিকারী বিড়ালের মত গুড়ি মারিয়া বসিয়া যেন কি একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া রয়েড বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে ; দীর্ঘকাল এভাবে কাটিতে পারে না। জয়-পরাজয় যাহাই ঘটুক, মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহা শেষ হইবে, এবং দুশ্চিন্তা অসহ্য হওয়ায় তাহাই তিনি প্রার্থনীয় মনে করিলেন। ল্যাংটন বা তাহার প্রণয়িনীর কথা চিন্তা করিবার তখন তাঁহার অবসর ছিল না।

রয়েড ভার্ণির উজ্জ্বল চক্ষুর দিকে চাহিয়া দর্পণে তাহার মানসিক ব্যাকুলতা প্রতিফলিত দেখিলেন ; কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে গুলীবর্ষণে বিলম্ব করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু মুলিঙ্গারের বিপদে সে কাতর হইয়া তাহার প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন সকলেই স্তব্ধভাবে যেন কি একটা ভীষণ কাণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই কক্ষে তখন এরূপ প্রগাঢ় স্তব্ধতা বিরাজিত যে, সকলেই স্ব স্ব শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। রয়েড মুলিঙ্গারের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভার্ণি সম্মুখে ঝুঁকিয়া অবনত-দেহে অতি ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার হাতের পিস্তলটা সে তখন ঈষৎ ঊর্দ্ধে তুলিয়াছিল।

তাহার পর যেন বিদ্যুদ্বেগে কি একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল! রয়েডের ধারণা হইল, ক্যারো মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া ভার্ণিকে কি একটা ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিতে ভার্ণি ক্যারোর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিল এবং ক্যারো সেই মুহূর্ত্তেই রয়েডের দিকে লাফাইয়া পড়িল।

কিন্তু রয়েড সতর্ক ছিলেন ; ভার্ণি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিবামাত্র তিনি একপাশে কাত হইয়া পড়িয়া সেই কক্ষের মেঝের উপর দেহ প্রসারিত করিলেন। ভার্ণির পিস্তলের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখস্থ দেওয়ালে বিদ্ধ হইল। ক্যারো রয়েডের দেহের উপর পড়িবে, এইরূপ আঁক করিয়াই লাফ দিয়াছিল ; কিন্তু রয়েড ক্যারো কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই মেঝের উপর দেহভার প্রসারিত করায়, ক্যারো তাঁহার দেহে বাধিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল এবং রয়েডের হাতের রিভলভারটা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সে মাতালের মত টলিতে টলিতে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া উভয় হস্ত ডেস্কের দিকে প্রসারিত করিল।

মোমবাতি দুইটি ডেস্কের উপর পাশাপাশি স্থাপিত ছিল। সেই দুইটি বাতি ভিন্ন সেই কক্ষে অন্য কোন আলো ছিল না। ক্যারো চক্ষুর নিমিষে বাতি দুইটি তুলিয়া লইয়া ফুৎকারে তাহা নির্ব্বাপিত করিল ; তাহার পর সেই কক্ষ হইতে পলায়নের অভিপ্রায়ে সিঁড়ির দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। রয়েড তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছিলেন, পুলিসবাহিনা সেই অট্টালিকা পরিবেষ্টিত করিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন ; এ কথা তাহারা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিল এবং সেই অট্টালিকা হইতে তাড়াতাড়ি পলায়নের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। এই জন্য ক্যারো দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া নিবিড় নৈশ অন্ধকারে যে মুহূর্ত্তে সিঁড়িতে পদার্পণ করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভার্ণিও সিঁড়িতে লাফাইয়া পড়িল ; কিন্তু সে অন্ধকারে সিঁড়ির ধাপের উপর না পড়িয়া সবেগে ক্যারোর দেহের উপর পড়িল। সেই ধাক্কায় ক্যারো ঊর্দ্ধ-পদে ও অধোমুখে সিঁড়িতে আছাড় খাইল। ক্যারো ঐ ভাবে নিপতিত হওয়ায় ভার্ণিও বেগ সামলাইতে না পারিয়া তাহার দেহের উপর গড়াইতে লাগিল! দুই জনেই তখন সিঁড়িতে লটর-পটর!

রয়েড অন্ধকারে তখনও সেই কক্ষের মেঝের উপর পড়িয়াছিলেন। তাঁহার হস্তস্খলিত রিভলভারটা ক্যারোর পদাঘাতে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে নিরস্ত্র হইতে হইয়াছিল। তিনি রিভলভারটা সংগ্রহ করিবার আশায় অন্ধকারে দুই হাত বাড়াইয়া তাহা হাতড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় অদূরে একটা পিস্তল গম্ভীর শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথার কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়া একটা গুলী সবেগে উড়িয়া গেল। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, মুলিঙ্গার সুযোগ বুঝিয়া ডেস্কের উপর হাত বাড়াইয়া তাহার পিস্তলটি সংগ্রহ করিয়াছিল এবং অন্ধকারে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তাঁহার পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিয়াছিল।

রয়েড মেঝের উপর উঠিয়া বসিয়া, উভয় হস্তে তাঁহার পিস্তলটি খুঁজিতেছিলেন, মুলিঙ্গার-নিক্ষিপ্ত গুলী তাঁহার

মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর দীর্ঘ দেহ প্রসারিত করিলেন।

সেই সময় ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীর কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাদের বিপদের আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইলেন। তিনি প্রাণের ভয় তুচ্ছ করিয়া প্রণয়িযুগলের প্রাণরক্ষার আশায় সেই বিপৎসঙ্কুল অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টায় মানুষের যাহা সাধ্য, তাহা তিনি করিয়াছিলেন; কিন্তু মুলিঙ্গার আকস্মিক বিপদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যে ভাবে গুলীবর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে তাঁহার ন্যায় তাহাদেরও আহত হইবার আশঙ্কা ছিল। এই জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন :—

"ল্যাংটন!"

তাঁহার সাড়া পাইয়া, তিনি কোন্ স্থান হইতে ল্যাংটনকে আহ্বান করিলেন, মুলিঙ্গার তাহা বুঝিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উপর্য্যুপরি দুইবার গুলীবর্ষণ করিল। সেই দুইটি গুলীও তাঁহার শায়িত দেহের কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়া চলিয়া গেল। তিনি মেঝের উপর সেই ভাবে উপুড় হইয়া পড়িয়া না থাকিলে সেই উভয় গুলীতেই তাঁহাকে আহত হইতে হইত, ইহা তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন; কারণ, দুই গুলীই উপর্য্যুপরি তাঁহার মাথার উপর দিয়া যাইবার সময় তিনি তাহাদের উত্তাপ অনুভব করিয়াছিলেন।

এই ভাবে আহত হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি ল্যাংটনকে সতর্ক করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি দৃঢ়স্বরে পুনর্ব্বার ল্যাংটনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'ল্যাংটন, তোমার প্রণয়িনীকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র এই কক্ষ ত্যাগ কর। যেরূপে পার, বাগানের বাহিরে পলায়ন কর। এখানে থাকিলে তোমাদের প্রাণরক্ষার আশা নাই।"

তিনি মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুলিঙ্গার পুনর্ব্বার তাঁহার উদ্দেশে গুলী বর্ষণ করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি উভয় পদের গোড়ালী দ্বারা মেঝের উপর সবেগে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই শব্দে নিস্তব্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি যেখানে পদশব্দ করিলেন, মুহূর্ত্ত পরে ঠিক সেই স্থান দিয়া আর একটা গুলী চলিয়া গেল। কিন্তু তিনি অদূরে পরিচ্ছদের খস্-খস্ শব্দ এবং লঘু পদধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ল্যাংটন তাঁহার উপদেশে তখন সেই কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল।

ল্যাংটন তাহার প্রণয়িনীর হাত ধরিয়া লঘুপদবিক্ষেপে সেই কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

সেই মুহূর্ত্তে মুলিঙ্গারের পিস্তল পুনর্ব্বার গর্জ্জিয়া উঠিল; তাহার নলের মুখ হইতে যে ধূমানল শিখা নিঃসারিত হইল, মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী সেই অস্ফুট আলোকে রয়েড ল্যাংটনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, ল্যাংটন উভয় হস্তে তাহার প্রণয়িনীকে জড়াইয়া ধরিয়া সতর্কভাবে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সেই আলোকে তিনি মুলিঙ্গারকেও দেখিতে পাইলেন। সে তখন ডেস্কের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বাঁ হাত ডেস্কের উপর সংরক্ষিত, এবং তাহার ডান হাতে ধূমায়মান পিস্তল।

সেই আলোকে মুলিঙ্গারও রয়েডকে দেখিতে পাইয়াছিল। মুলিঙ্গার তাঁহাকে দেখিবামাত্র, তিনি গড়াইয়া কয়েক ফুট দূরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু মুলিঙ্গারের পিস্তল পুনর্ব্বার গর্জ্জিয়া উঠিল এবং মুলিঙ্গার মুহূর্ত্তের জন্য যে স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার পিস্তলের গুলী ঠিক সেই স্থানে বর্ষিত হইল।

পিস্তল-নিঃসারিত ক্ষীণ আলোকপ্রভা অন্তর্হিত হইলে, সেই কক্ষের অন্ধকার গভীরতর হইল। রয়েড সেই স্থানে পড়িয়া থাকিয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া ব্যাকুলভাবে রিভলভারটি খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা যে পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এ আশা তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

রয়েড তখন নিরস্ত্র, কিন্তু মুলিঙ্গারের হাতে পিস্তল ছিল; এজন্য সেই অন্ধকারেও তিনি আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মুলিঙ্গারের পিস্তলটি তাহার ডেস্কের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ছয়-ঘরা পিস্তল; তাহাতে ছয়টি টোটা ভরিয়া রাখা হইয়াছিল। মুলিঙ্গার তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে পাঁচবার ফায়ার করিয়াছিল, তাহাও তাঁহার স্মরণ ছিল। এই জন্য রয়েড ভাবিলেন, তাহাতে আর একটিমাত্র টোটা অবশিষ্ট ছিল, মুলিঙ্গার যদি এই শেষ টোটাটি খরচ করে, তাহা হইলে তাহার হাতে পিস্তল থাকা না থাকা সমান হইবে। তাঁহাদের উভয়েরই অবস্থা তখন সমান হইবে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, রয়েড যে স্থানে প্রসারিতদেহে

পড়িয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে তাঁহার পদদ্বয় কিছু দূরে অপসারিত করিয়া তদ্দ্বারা সেই কক্ষের মেঝের উপর দুপ্-দাপ্ শব্দ করিতে লাগিলেন।

মুলিঞ্জার সেই শব্দ শুনিয়া কোন রকম সাড়া দিল না।

রয়েড দুই তিন মিনিট নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকিয়া পা দুইখানি ঘুরাইয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ করিলেন। মুলিঞ্জারের ধারণা হইল, তিনি অন্ধকারে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিলেন। এ জন্য সে আর মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব না করিয়া পিস্তলের শেষ টোটাটি ব্যবহার করিল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল আওয়াজ করিল।

রয়েড তাহার পূর্ব্বেই সেই স্থান হইতে পদদ্বয় অপসারিত করিয়াছিলেন; পিস্তলের গুলী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিদ্ধ হইবামাত্র রয়েড যেন সেই গুলীতে আহত হইয়াছেন, এই ভাবে আর্ত্তনাদ করিলেন! সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া মুলিঞ্জার বুঝিতে পারিল, এবার তাহার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। আনন্দে ও উৎসাহে সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া রয়েডকে ধরিবার জন্য উৎফুল্ল-হৃদয়ে অগ্রসর হইল। তাহার আশা হইল, আহত রয়েডকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিবে, এবং শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। তাহার পর পুলিস-বাহিনীকে শিয়াল-ফাঁকি দিয়া পলায়ন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে সে সতর্কভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটি মনুষ্যদেহে তাহার হাত ঠেকিল; তাহা যে রয়েডের দেহ, এ বিষয়ে মুলিঞ্জারের সন্দেহ রহিল না। সে তাড়াতাড়ি হাত দুইখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার উভয় হস্তই যেন কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল! রয়েড মুহূর্ত্তমধ্যে মুলিঞ্জারের হাত ধরিয়া এরূপ বেগে একটা ঝাঁকুনী দিলেন যে, মুলিঞ্জার সেই প্রচণ্ড আকর্ষণের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মুখ গুঁজিয়া রয়েডের বুকের উপর পড়িয়া গেল। সেই সুযোগে রয়েড উভয় হস্তে মুলিঞ্জারের গলা টিপিয়া ধরিলেন। তিনি তাহার কণ্ঠনালীর উপর এরূপ জোরে চাপ দিলেন যে, মুলিঞ্জারের মুখ-গহ্বর হইতে আধহাত জিভ বাহির হইয়া পড়িল এবং শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল!

কিন্তু মুলিঞ্জারের দেহেও অসাধারণ শক্তি ছিল, মৃত্যু-কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। সে রয়েডের হাত দুইখানি তাহার কণ্ঠনালী হইতে অপসারিত করিবার জন্য উভয় হস্তে রয়েডের মুখে, বুকে, মাথায়, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কিল, চড়, ঘুসি মারিতে লাগিল। তাঁহার উভয় হস্তের মণিবন্ধে তীক্ষ্ণধার নখর বিদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিল। সে ব্যাদিত মুখে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে তাঁহার হাত দুইখানি দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। তখন মুলিঞ্জার একখানি পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রচণ্ডবেগে তাঁহার তলপেটে পদাঘাত করিল।

রয়েড আঘাত-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিলেন এবং মুলিঞ্জারের কণ্ঠ হইতে একখানি হাত সরাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা আহত তলপেট স্পর্শ করিলেন। সেই সুযোগে মুলিঞ্জার প্রচণ্ডবেগে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়া তাঁহার অপর হস্তের বন্ধন হইতে কণ্ঠনালী মোচন করিল। কিন্তু রয়েড মুহূর্ত্ত-মধ্যে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া মুলিঞ্জারকে পুনর্ব্বার জড়াইয়া ধরিলেন। এ জন্য মুলিঞ্জারের পলায়নের চেষ্টা সফল হইল না। সে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া অন্ধকারে রয়েডের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল।

মুলিঞ্জার রয়েডের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। রয়েডকেও তাহার সঙ্গে মেঝের উপর গড়াইতে হইল। একবার রয়েড তাহার দেহের উপর উঠেন, আবার উভয়ে ঝটাপটি করিতে করিতে মুলিঞ্জার তাঁহার দেহের উপর উঠে। সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই কিল, চড়, ঘুসি এবং পাদতাড়ন চলিতে লাগিল। সেই গজকচ্ছপের যুদ্ধে কাহার জয় হইবে, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

উভয়ে মেঝের উপরে গড়াগড়ি দিতে দিতে অবশেষে মুলিঞ্জারের পদদ্বয় সেই কক্ষের মুক্তদ্বার স্পর্শ করিল। মুলিঞ্জার রয়েডের উভয় হস্তের কঠিন বন্ধন-পাশ শিথিল করিতে না পারায়, তাঁহাকে টানিতে টানিতে সেই দ্বার অতিক্রম করিল; দ্বারের বাহিরেই সোপানশ্রেণী, তাহা একতলার হল-ঘর পর্য্যন্ত প্রসারিত। উভয়ে জড়াজড়ি ও ঠেলাঠেলি করিয়া সেই সিঁড়ির মাথায় আসিয়া পড়িলে উভয়কে গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির নীচে চলিতে হইল। ল্যাংটন তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া সেই সোপানশ্রেণীর একপাশে দাঁড়াইয়া রয়েডের প্রতীক্ষা করিতেছিল; সে

সিঁড়ির স্তিমিত আলোকে রয়েডের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার আশায় সিঁড়ির মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিল; কিন্তু সে উভয়ের নিম্নগামী দেহের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া, সেই বেগে পদস্খলন হওয়ায়, মুলিঙ্গার ও রয়েডের সহিত গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির নীচে চলিল! সোপানশ্রেণীতে

ল্যাংটন মুলিঙ্গার ও রয়েডের সঙ্গে সিঁড়িতে গড়াইতেছে

যেন তিনটি কুপো গড়াইতে লাগিল। রয়েড ও মুলিঙ্গার জড়াজড়ি করিয়া নিম্নতম সোপান অতিক্রম করিয়া নীচে পড়িলে, রয়েডের মস্তক সবেগে সিঁড়ির পার্শ্বস্থ দেওয়ালে ঠুকিয়া গেল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে রয়েডের মস্তিষ্কে এরূপ ঝাঁকুনী লাগিল যে, পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। মুলিঙ্গার রয়েডের দেহের উপর নিপতিত হওয়ায় অল্পই আঘাত পাইয়াছিল। রয়েডের চেতনা বিলুপ্ত হওয়ায়, সে অল্প চেষ্টাতেই তাঁহার ভুজবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হল-ঘরের দেওয়ালে সংরক্ষিত একখানি তীক্ষ্ণফলা বর্শা টানিয়া লইল, সে সেই বর্শার সুদীর্ঘ দণ্ড কাঁধে তুলিয়া, হল-ঘর হইতে বাহিরে পলায়ন করিল। তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া যদি পুলিসের প্রহরীরা তাহার গতি-রোধের চেষ্টা করে, তাহা হইলে খালি হাতে আত্মরক্ষা করা অসাধ্য হইবে বুঝিয়া সেই বর্শাখানি সঙ্গে লইয়াছিল। নিরস্ত্র অবস্থায় গৃহত্যাগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

মুলিঙ্গার বাহিরে আসিয়া দ্রুতপদে বাগান অতিক্রম করিল। সে বাগানের দেউড়ি পার হইয়া পথে উপস্থিত হইবামাত্র পুলিসের এক জন প্রহরী প্রান্তপথবর্ত্তী বৃক্ষের আড়াল হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল। প্রহরী দৃঢ়স্বরে বলিল, "কে তুমি? কোথায় যাইতে চাও?"

এই কন্‌ষ্টেবল রোঁদে বাহির হইয়া উদ্যানমধ্যবর্ত্তী অট্টালিকায় পুনঃ পুনঃ পিস্তলের নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়াছিল। কারণ জানিবার জন্য সে বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইতেই মুলিঙ্গারকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিল; এ অবস্থায় তাহার সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।

মুলিঙ্গার বাধা পাইয়া কন্‌ষ্টেবলের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল; তাহার পর কোন কথা না বলিয়া, হাতের বর্শা ঊর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে কন্‌ষ্টেবলের কণ্ঠে বিদ্ধ করিল। বর্শার তীক্ষ্ণধার ফলা কন্‌ষ্টেবলের কণ্ঠ ভেদ করিয়া ঘাড় দিয়া বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণহীন দেহ পথিপ্রান্তে নিপতিত হইল।

মুলিঙ্গার বর্শাখানি সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করিল। দুই এক মিনিট পরে রয়েড ল্যাংটনকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হই-লেন। তাঁহারা কন্‌ষ্টেবলের বর্শাবিদ্ধ মৃতদেহ পথের প্রান্তে নিপতিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

মুলিঙ্গারই যে বর্শার আঘাতে কন্‌ষ্টেবলকে হত্যা করিয়াছিল, রয়েড মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহা বুঝিতে পারিলেন।

তিনি মৃতদেহের পাশে বসিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্স্পেক্টর বেল পুলিস-বাহিনীসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সেখানে আসিতে পারিলে কন্ষ্টেবল বেচারাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইত না, মুলিঙ্গারও ধরা পড়িত; কিন্তু বিধাতার বিধান দুর্ব্বোধ্য! রয়েডের উপদেশ বিফল হইয়াছিল।

*　　*　　*

মুলিঙ্গার পুলিসের প্রহরীকে হত্যা করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরে প্রবেশ করিল, তাহার পর সে দ্রুতবেগে নদীর দিকে ধাবিত হইল। চলিতে চলিতে সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইল না, এ জন্য সে আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিল। সে জানিত, তাহার সহযোগী কীল নদীতীরে টিনের একখানি চালাঘর নির্ম্মাণ করিয়া সেই চালার ভিতর তাহার মোটর-বোটখানি বাঁধিয়া রাখিত। মোটর-বোটখানি সুদৃঢ় ও দ্রুতগামী। যদি সে সেই চালাঘরের দ্বার খুলিয়া মোটর-বোটখানি অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে অরওয়েল নদীর স্রোতের অনুকূলে তাহা সহজেই পরিচালিত করিতে পারিবে। সে সেই অন্ধকার-রাত্রিতে নদীপথে কিছু দূরে পলায়ন করিতে পারিলে পুলিস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আর তাহাকে ধরিতে পারিবে না।

আত্মরক্ষার আশায় সে সেই চালাঘর লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে দৌড়াইতে লাগিল।

নদীতীরে কতকগুলি বৃক্ষ ছিল; মুলিঙ্গার সেই বৃক্ষগুলির নিকট উপস্থিত হইয়া অদূরে মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহার মনে হইল, দুই জন লোক অস্ফুটস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল।

মুলিঙ্গার শব্দ লক্ষ্য করিয়া সতর্কভাবে আরও কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিল, পূর্ব্বোক্ত চালাঘরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুই জন লোক উত্তেজিতভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল। সেই সময় কীলের মোটর-বোটের আশ্রয়স্থানে কোন লোক থাকিবে, এরূপ সম্ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে স্থান পায় নাই। সে কৌতূহলের বশীভূত হইয়া, সেই সঙ্কীর্ণ চালাঘরের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া লোক দুইটির পরামর্শ শুনিবার চেষ্টা করিল এবং প্রথমেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিস্মিত হইল। বক্তা তাহারই অনুচর ক্যারো!

মুলিঙ্গার ক্যারোর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিল—দ্বিতীয় ব্যক্তি ভার্ণি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। তখন তাহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল, একটু আনন্দও হইল। সে চালাঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল এবং মৃদু দীপালোকে দেখিল, ক্যারো ও ভার্ণি উভয়ে মোটর-বোটখানি চালাঘরের বাহিরে ফাঁকা যায়গায় লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতেছিল। মুলিঙ্গারের মত তাহাদেরও মনে হইয়াছিল, সেই মোটর-বোটের সাহায্যে দূরে পলায়ন করিতে পারিলে তাহারা নিরাপদ হইতে পারিবে।

মুলিঙ্গারকে মোটর-বোটের নিকট অগ্রসর হইতে দেখিয়া ক্যারো ও ভার্ণি উভয়েই ভীত হইল। তাহাদের সন্দেহ হইল, পুলিস তাহাদের সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। ক্যারো তৎক্ষণাৎ তাহার পিস্তল তুলিয়া মুলিঙ্গারকে গুলী করিতে উদ্যত হইল।

মুলিঙ্গার বুঝিল, তাহার অনুচরদ্বয় তাহাকে চিনিতে পারে নাই; সে আর পদমাত্র অগ্রসর না হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "থামো ক্যারো! আমি আসিয়াছি।"—সে পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার অনুচরদ্বয়ের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ক্যারো মুলিঙ্গারের কথা শুনিয়া পিস্তল নামাইল, তাহার পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভার্ণির মুখের দিকে চাহিল।

ক্যারো ও ভার্ণি মুলিঙ্গারকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তাহাদের মুখ শুকাইল, উভয়েই নির্ব্বাক্।

মুলিঙ্গার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমাদের মতলবটা কি শুনি। তোমরা কি ফন্দী করিয়াছিলে, আমাকে সাংঘাতিক বিপদে নিক্ষেপ করিয়া এই বোট লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবে? তোমরা ইতর পশুরও অধম, ধড়িবাজ, বিশ্বাসঘাতক, ইচ্ছা করিলে আমি এখনও তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারি—সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাদের মত বিশ্বাসঘাতক, নরপিশাচ ক্ষমার অযোগ্য।—যদি আমার এখানে আসিতে দুই এক মিনিট বিলম্ব হইত, তাহা হইলে—"

ক্যারো তাহার কথায় বাধা দিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "তাহা হইলে কি আর হইত ? এই বোটে চাপিয়া আমরা এতক্ষণ বহু দূরে সরিয়া পড়িতাম। অত লম্বা লম্বা কথা বলিয়া লাভ কি ? আমাদের এখানে আসিবার পূর্ব্বেই যদি তুমি আসিতে, তাহা হইলে আমাদের প্রতীক্ষায় বোট লইয়া বসিয়া থাকিতে কি ? তুমি আগে আসিলে যাহা করিতে, আমরা আগে আসিয়া তাহাই করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। বিপদে পড়িলে সকলেই নিজের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করে, কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া ধরা পড়িবার জন্য বসিয়া থাকে না। পুলিস পিছনে তাড়া করিয়াছে, আর আমরা তোমার সুবিধার জন্য ধরা দিই ? সকলেই যাহা করে, আমরা তাহাই করিয়াছি; সেজন্য যা খুসী, তাই বলিয়া গালি দিবে ? তোমার সঙ্গে কি রকম বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে ? তোমার মতলব কি আমরা বুঝিতে পারি নাই ? আমরা ঘাস খাই ?"

মুলিঙ্গার ক্যারোর স্পর্দ্ধিত উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইলেও নিজের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া জিহ্বা সংযত করাই সঙ্গত মনে করিল। সে তখন নিরস্ত্র, অথচ ক্যারো টোটাভরা পিস্তল লইয়া আত্মরক্ষায় উদ্যত; তাহার উপর তাহারা দুই জন। আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়া লাভ নাই বুঝিয়া সে অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিল, "পুলিসের ভয়ে তোমরা অত কাহিল হইলে কেন, বুঝিতে পারিলাম না। আমরা পুলিসকে শিয়াল-ফাঁকি দিয়া পলাইয়া আসিয়াছি, এ কথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন ? আমরা এই বোট একবার নদীতে ভাসাইতে পারিলে পুলিসের বাপেরও সাধ্য নাই যে আমাদের সন্ধান পায়। আমরা তিন জনই পুলিসকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাইয়াছি, তবুও ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছ ? ইহাতে কি করিয়া বলি তোমরা মরদ ?"

মুলিঙ্গার উভয় হস্তে বোটে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল; সেই ধাক্কায় মোটর-বোট জলে ভাসিলে ক্যারো বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে এঞ্জিন লইয়া নাচাচাড়া করিতে লাগিল। তাহার পর সে মুলিঙ্গারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বোট চালাইয়া এখন আমরা যাইব কোথায় ? নদীতীরে কোনও নির্জ্জন স্থানে গিয়া কি বোট হইতে নামিব, পরে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া কোনও দূরের গ্রামে আশ্রয় লইব ? তোমার মতলব কি ?"

মুলিঙ্গার বলিল, "সাধে কি তোমাদিগকে গাধা বলি ? যত দূরেই যাই, আর যে গ্রামেই আশ্রয় লই, এ দেশে এখন আমরা নিরাপদ নহি। দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় না লইলে দুই দিনের মধ্যেই হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, আমাদিগকে ধরা পড়িতে হইবে, আর ধরা পড়িলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইবে, তাহা না বুঝিতে পারে, এ রকম গাধা দুনিয়ায় জন্মিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।"

এবার ভার্ণি কথা কহিল। মুলিঙ্গারের কথা শুনিয়া সে বলিল, "দেশান্তরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে ? সে কোন্ দেশ ?"

মুলিঙ্গার বলিল, "নিকটে যে দেশ আছে। হল্যাণ্ডে।"

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া ভয়ে ভার্ণির মুখ সাদা হইয়া গেল; সে যেন মুলিঙ্গারের কথা ঠিক বুঝিতে পারে নাই, এইভাবে বলিল, "কি বলিলে ? আমাদিগকে ওলন্দাজের মুলুকে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে ? মোচার খোলার মত এই বোটে আমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়া হল্যাণ্ডে যাইব ? তবেই হইয়াছে ! এ দেশে থাকিয়া জেল খাটিতে হইলে কিছু দিন পরেও মুক্তিলাভের আশা আছে; কিন্তু এই ভেলায় চড়িয়া সমুদ্রপার ? আমরা নিশ্চিত ডুবিয়া মরিব। না, আমরা ও চেষ্টা করিতে পারিব না। সমুদ্রে পড়িতে না পড়িতে এক ঝাঁক হাঙ্গর আসিয়া আমাদের দেহের মাংসগুলা করাতের মত দাঁত দিয়া টুকরা টুকরা—"

ভার্ণির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুলিঙ্গার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "থামো !—নিস্তব্ধ রাত্রি, একটুকুও বাতাস নাই। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, পুষ্করিণীর জলের মত স্থির। প্রভাতের পূর্ব্বে আমরা হল্যাণ্ডে পৌঁছিতে পারিব। আমরা হল্যাণ্ডে আশ্রয় লইয়া, ভবিষ্যতে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব, তাহা স্থির করিয়া ফেলিব। এ দেশের পুলিসের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য কি কৌশল খাটাইতে হইবে, তাহাই প্রথমে স্থির করা প্রয়োজন। আসল জিনিষ, ল্যাংটনের ফটো সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; এ কথা ত ভুলিলে চলিবে না। কয়েক দিন পর কার্য্যোদ্ধারের জন্য ছদ্মবেশে আমাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। যে জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলাম, এত বিপদ মাথা পাতিয়া লইলাম, সেই লাভের কাযটি না করিয়া কি প্রাণের ভয়ে হল্যাণ্ডে বসিয়া থাকিব ?

ক্যারো, তুমি এঞ্জিনের সকল হদিস্ জান ; এই মোটর-বোটের এঞ্জিন চালাইতে পারিবে না ?”

মুলিঙ্গার এই কথা বলিয়া সন্দিগ্ধ-চিত্তে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। পুলিসবাহিনী সঙ্গে লইয়া রয়েড যে কোন মুহূর্ত্তে সেখানে উপস্থিত হইতে পারেন।

ক্যারো মাথা চুল্‌কাইয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, “তুমি সমুদ্র পাড়ি দিয়া হল্যাণ্ডে যাওয়াই স্থির করিয়াছ ?”—সে আরও কিছু বলিবার জন্য প্রস্তুত ছিল ; কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া এঞ্জিন পরিচালনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে এঞ্জিন সচল হইল। ঘস্-ঘস্ শব্দ করিয়া মোটর-বোটখানি কাঁপাইতে লাগিল।

মুলিঙ্গার হালের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাতে হাত দিল। ক্যারো একটি ‘লেভার’ আকর্ষণ করিতেই মোটর-বোট মুক্ত নদীতে প্রবেশ করিল। বোট চলিতে আরম্ভ করিয়া নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে নদীতীরবর্ত্তী বৃক্ষ-শ্রেণীর অন্তরালে মিশ্রকণ্ঠের কোলাহল উত্থিত হইল।

ভার্ণি একমনে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল—বোটখানি সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে যদি হঠাৎ ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে সে জলে পড়িয়া ডুবিবার পূর্ব্বেই হাঙ্গরগুলার উদরে প্রবেশ করিবে ! কিন্তু এই পরম তত্ত্বের মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই জনকোলাহল শুনিয়া সে সভয়ে বলিল, “সর্ব্বনাশ ! পুলিস আমাদের সন্ধান পাইয়াছে !”

সে সোজা হইয়া বসিয়া পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিল।

মুলিঙ্গার তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পিস্তলটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

ক্যারো উত্তেজিত স্বরে বলিল, “ও সব মতলব ছাড়িয়া দাও। দেখিতেছ না, বোট চলিতেছে, তাহার উপর এই অন্ধকার রাত্রি ; আমাদিগকে কে বাধা দিবে ?”

ইন্‌স্পেক্টর বেল যে সকল কন্‌ষ্টেবল সহ উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, শিকার পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া তিনি তাহাদের কয়েক জনকে পলাতক দস্যুদের সন্ধানে নদীর দিকে পাঠাইয়াছিলেন। মোটর-বোটের আরোহীরা তাহাদেরই কোলাহল শুনিতে পাইয়াছিল। সেই দলের এক জন নদীতীরে আসিয়া নদীবক্ষে মোটর-বোটের এঞ্জিনের ঘস্‌ঘসানি শুনিতে পাইল। সেই শব্দ শুনিয়া সে ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ডিটেক্‌টিভ রয়েডকে সংবাদ দিতে চলিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল, রয়েডের সঙ্গে তখন সেই দিকেই আসিতেছিলেন।

রয়েড ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, “আপনি যদি আর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বাগান-বাড়ীতে হানা দিতে পারিতেন—”

ইন্‌স্পেক্টর বেল রয়েডকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, “তাহা পারিলে ত বদমাসগুলাকে বাঁধিয়া এতক্ষণে থানার গারদে পুরিতাম। এ রকম দৌড়াদৌড়িও করিতে হইত না। কিন্তু আমার অপরাধ কি বলুন। সরকারী লাল ফিতার মহিমা কি আপনার অজ্ঞাত ? চোর ধরা পড়ুক না পড়ুক, তাঁহাদের লেফাপা আগে দুরস্ত করিয়া রাখা চাই। কেতাবতি আড়ম্বর শেষ করিয়া সকলকে গুছাইয়া লইয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল।”

যে সার্জ্জেণ্ট পুলিস-বাহিনীর ভার লইয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলের সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল, সে ইন্‌স্পেক্টার বেলের কথা শুনিয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, “হাঁ মহাশয়, আফিসের মামুলী দস্তর-মাফিক্ কায করিতে গিয়াই একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, এজন্য আমরা দুঃখিত ; কিন্তু সেই ডাকাত-গুলা যতই চতুর ও চট্‌পটে হউক, আমরা—”

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক জন কন্‌ষ্টেবল দ্রুতবেগে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল। এই কন্‌ষ্টেবলই নদীতীরে অগ্রসর হইয়া ক্যারো-পরিচালিত মোটর-বোটের এঞ্জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিয়া সেই সংবাদ তাঁহাদিগকে জানাইতে আসিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল আগন্তুক কন্‌ষ্টেবলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “অত হাঁপাইতেছ কেন, কন্‌ষ্টেবল ! তোমার সংবাদ কি ?”

কন্‌ষ্টেবল যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই সংবাদ ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ডিটেক্‌টিভ রয়েডের গোচর করিল। তাহার কথা শুনিয়া রয়েড চিন্তিতভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “স্রোতের মুখে মোটর-বোট ছাড়িয়া দিয়া দ্রুত-বেগে পলায়ন করিয়াছে ! এখন কি করা যায় ?”

তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুলিস-বাহিনীর সার্জ্জেণ্টকে বলিলেন, “নিকটে কোথাও টেলিফোনের আড্ডা আছে, সার্জ্জেণ্ট ! আমরা অবিলম্বে সমুদ্রতটের সকল ঘাঁটির প্রহরীদের নিকট টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিব। বিশেষতঃ, নদীর মোহনায় যে ঘাঁটি আছে,

প্রত্যাবর্ত্তন

শিল্পী—শ্রীবিভূতিভূষণ ভৌমিক।

সেই ঘাঁটির প্রহরীকে সতর্ক করিলে, উহারা সেই পথে পলায়নের চেষ্টা করিলে ধরা পড়িতে পারে। অবুওয়েন নদীর মোহনার দূরত্ব এখান হইতে অধিক নহে; এই জন্য শীঘ্র টেলিফোনে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন।"

সার্জেণ্ট রয়েডের প্রস্তাব শুনিয়া সম্ভ্রমভরে বলিল, "আমি একটা সদুপায়ের কথা বলিতে চাই, মিঃ রয়েড! আপনি দয়া করিয়া আমার গোস্তাকী মাফ করিবেন কি?"

রয়েড বলিলেন, "তুমি আবার কি সদুপদেশ দিবে, সার্জেণ্ট! বেশ, বল, আগে তোমার কথাই শুনি।"

সার্জেণ্ট বলিল, "এই স্থান হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে ঐ নদীর তীরেই বুড়া চিক্‌নীর মোটর-বোটের আড্ডা। বুড়া দেশবিদেশের যাত্রীদের মোটর-বোট ভাড়া দিয়া বেশ দু-টাকা রোজগার করে। সংপ্রতি সে একখানি ছোট-খাটো দ্রুতগামী 'স্পীড্‌বোট' কিনিয়া ভাড়া খাটাইতেছে। সেই বোটখানি ভাড়া লইয়া ঐ দুষমনগুলার মোটর-বোটের অনুসরণ করিলে কি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে টেলিফোনে সংবাদ দেওয়া অপেক্ষা অধিক ফল পাইবার আশা করা যায় না?"

সার্জেণ্টের প্রস্তাব শুনিয়া রয়েডের দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত হইল, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, "তুমি খুব ভাল প্রস্তাব করিয়াছ, সার্জেণ্ট, উহাদের অনুসরণ করিবার সুযোগ থাকিলে তাহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমাদের সঙ্গে শীঘ্র চল, সেই বুড়ার আড্ডা দেখাইয়া দিবে।"

সার্জেণ্ট আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, একটা লণ্ঠন হস্তে তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া নদীর ধারে ধারে বুড়ার মোটর-বোটের আড্ডার দিকে চলিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ডিটেক্‌টিভ রয়েড দ্রুতবেগে সার্জেণ্টের অনুসরণ করিতে করিতে নদীতীরবর্ত্তী তিনটি প্রান্তর অতিক্রম করিলেন।

সেই গভীর রাত্রিতে পুলিসের পরিচ্ছদধারী ইন্‌স্পেক্টর বেল ও সার্জেণ্টকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মোটর-বোটের আড্ডায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া আড্ডার মালিক বৃদ্ধ চিকনী গভীর বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রয়েড তাহাকে সংক্ষেপে তাঁহাদের সেখানে গমনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে, গভীরতর বিস্ময়ে তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল; তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া রয়েড সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রয়েডকে হাসিতে দেখিয়া বুড়া গরম হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আপনারা বোট ভাড়া লইবেন বলিতেছেন, বোট ভাড়া দেওয়াই আমার পেশা, আপনাকে আমার স্পীড্-বোট ভাড়া দিতে আপত্তি নাই; কিন্তু সে কথা শুনিয়া দন্তবিকাশ করিবার কি কারণ ঘটিল? আপনারা পুলিসের লোক, আপনাদের ভয়-ডর নাই; আমার বোট লইয়া দুই জনে ডাকাতের মোটর-বোটের পিছনে ছুটিবেন। কিন্তু এই রাত্রি-কালে আপনাদের দুই জনের পক্ষে কাযটা কি সহজ হইবে? অবশ্য, কথাটা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা; কিন্তু আমার দামী বোট, তাহার কোন ক্ষতি না হয়, সেই কথা ভাবিতেছি। আমার স্পীড-বোট লইয়া যাইবেন, তাহা চালাইবে কে?"

তাঁহাদের সঙ্গে যে সার্জেণ্ট আসিয়াছিল, সে বলিল, "আমিই চালাইয়া লইয়া যাইব। পুলিসে চাকরী লইবার পূর্ব্বে চাকরী পাইবার আশায় আমার ভগিনীপতির মামার মোটর-বোটের কারখানায় এপ্রেণ্টিসী করিয়াছিলাম। মোটর-বোটের এঞ্জিন বিগড়াইলে আমি মেরামত পর্য্যন্ত করিতে শিখিয়াছিলাম। এখন চোর-ডাকাত ধরিয়া বেড়াই, সে জন্য দরকার হইলে মোটর-ব্যস চালাই; সুতরাং মোটর-বোট চালাইতে আমার অসুবিধা হইবে না। উড়োপ্লেন চালাইতেও ভয় পাই না। ও তিনই ত এক-জাতীয় জীব; যেমন টিকটিকি, কুমীর, আর চাম্‌চিকে; কেহ স্থলচর, কেহ জলচর, কেহ বা খেচর।"

বৃদ্ধ বলিল, "টিকটিকি ও চাম্‌চিকেতে যখন তোমার সমজ্ঞান, তখন তুমি পারিবে।"

সে আর অধিক তর্ক না করিয়া স্পীড বোটের গুদামের দরজা খুলিয়া বোট নদীতীরে ভিড়াইয়া দিল। রয়েড সঙ্গিদ্বয় সহ তাহাতে উঠিলে, বোটের মালিক বৃদ্ধ চিকনী হাত তুলিয়া সার্জেণ্টকে বোট চালাইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "দেখি কেমন তুমি ওস্তাদ।"

সার্জেণ্টের অঙ্গুলী-স্পর্শে স্পীড-বোটের এঞ্জিন ঝঙ্কার করিয়া সবেগে নদী-স্রোতের অনুকূলে ধাবিত হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নারী—পাশ্চাত্য-সমাজে ও হিন্দু-সমাজে

পাশ্চাত্যে বহুসংখ্যক নারী বহুকাল অবিবাহিত থাকে বলিয়া তৎকালে তাহারা কাম ও মাতৃত্ব উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়, না হয়, যথেচ্ছা কাম উপভোগ করিয়া একটি অভাব মোচন করিতে হয়। সেরূপ করায় গর্ভ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ভ্রূণ-হত্যা করিতে হয়—পাশ্চাত্যে তাহা কত অধিক পরিমাণে হয়, তাহা ১৩৩৯ সালের বসুমতীতে দেখাইয়াছি—অথবা জারজ সন্তান একা পালন করিতে হয়—অথবা সন্তান ত্যাগ করিতে হয়। ঐ সন্তানদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সেই জন্যই এখন প্রধানত: গর্ভনিরোধ-প্রথা অবলম্বন করিয়া যথেচ্ছা কাম উপভোগ করা বিধেয় এবং তাহা নারী-স্বত্বপ্রসার বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন করিবার অধিকার দেওয়াও যেমন তাহাদিগকে ধনী প্রভৃদিগের দাসত্বজালে আবদ্ধ করিবার ছলনামাত্র, তাহাতে তাঁহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করাই হইতেছে, এইরূপে যথেচ্ছ কাম উপভোগের অধিকার লাভে তাহাদিগের দুর্গতি যে আরও অধিক বৃদ্ধি হইতেছে—দেশেরও প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা এখন দেখাইতেছি।

যত অধিক নারী গর্ভনিরোধপ্রথা অবলম্বন করিয়া যথেচ্ছা কাম উপভোগ করিবে, ততই বিবাহসংখ্যা কমিবে। কারণ, পুরুষদিগকে আর কামের তাড়নায় বিবাহ করিতে হইবে না। যত দিন নারীরা বিবাহ ব্যতিরেকে কাম উপভোগ করা দূষণীয়, এই সামাজিক বিধি মানিয়া চলিত, তত দিন পুরুষদিগকে কাম উপভোগ করিতে হয়, বিবাহ করিতে হইত, না হয়, বেশ্যাগমন করিতে হইত। বেশ্যাগমনে অর্থব্যয় আছে—যৌনব্যাধি ভুগিবার ভয় আছে—ঘৃণিত সংসর্গের বিরক্তি আছে—বদমায়েস দ্বারা নানারূপে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা ও ভয় আছে। নারীরা পূর্ব্বপ্রচলিত সামাজিক বিধি না মানিলে পুরুষদিগকে আর বেশ্যা-গমন করিতে হইবে না, বহুনারী উপভোগ করিবার সুবিধা পাইবে; সুতরাং বিবাহ করিয়া স্ত্রী অপত্যাদি প্রতিপালনের ভার বহন করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। সুতরাং অধিকাংশ পুরুষই বিবাহ করিতে চাহিবে না। যত বিবাহসংখ্যা কম হইবে, ততই অধিকসংখ্যক নারীদিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপর্জ্জেন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হইবে—ততই তাহাদিগের স্নায়ুবিকৃতি হইবে, ততই তাহাদিগের প্রকৃতিজ মাতৃভাব পিষিয়া নিষ্কাশিত হইবে—ততই তাহারা গৃহস্থালী কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে—ততই তাহারা পরে বিবাহিত হইয়াও সুখী হইতে পারিবে না—স্বামী অপত্যকে সুখী করিতে অপারগ হইয়া পড়িবে—ততই তাহাদিগের জীবন অশান্তিকর হইয়া উঠিবে, ততই পুরুষরা স্বয়ং উপার্জ্জনশীল নারী উপভোগ করিবার সুবিধা পাইবে। এরূপ হওয়ায় পুরুষদিগেরই সুবিধা বৃদ্ধি হইবে, স্ত্রী অপত্যাদিপালনভার বহন হইতে তাহারা মুক্তি পাইবে, জন্মসংখ্যাও কমিবে, অপত্যরা পিতার আন্তরিক যত্ন ভালবাসা ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে। নারীরা মাতৃত্বের সুখবোধ হইতে উত্তরোত্তর অধিকভাবে বঞ্চিত হইবে—অপত্যদিগের পিতৃমাতৃভক্তি উদ্দীপিত হইবে না—বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থ অবস্থা, সকলেরই,—কি পুরুষ কি স্ত্রী—বিশেষত: অর্থ-সচ্ছলতাশূন্য লোকদিগের—এ দেশ ঐরূপ লোকই শতকরা নিদেন ৯৭।৯৮টি—অত্যন্ত কষ্টকর—নির্জ্জন কারাবাসতুল্য হইবে সুতরাং ইহা নারীস্বত্বপ্রসার নয়,—নারীনির্য্যাতনের প্রকৃষ্ট উপায়।

ইহার নিমিত্ত লোকসংখ্যাও কমিবে, তজ্জন্য ও অন্যান্য কারণে সমাজের পক্ষেও ও ঘোর অনিষ্টকর এইরূপ প্রথা অবলম্বন করার ফলে আর একটি কারণেও বিবাহসংখ্যা কমিবে। পুরুষরা বখন দেখিবে, নারীরা যথেচ্ছা কাম উপভোগ করিয়া থাকেন, বিবাহের পরও যে তাঁহারা তাহা করিবেন না, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পরকীয় প্রেমের আকর্ষণ এত প্রবল যে, তাহা যে উপভোগ করিয়াছে, বিশেষত: তাহার পক্ষে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বড় কঠিন। স্ত্রীর চরিত্রদোষ সচরাচর পুরুষরা সহ্য করিতে পারে না। যাহাকে অপত্যপ্রতিপালনের ভার লইতে হয়, সে তাহার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যে তাহার ঔরসজাত, তদ্বিষয়ে নি:সন্দেহ থাকিতে চায়। পরের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের সন্তান বলিয়া সচরাচর কেহ প্রতিপালন করিতে চাহে না, করিতে বাধ্য করাও ন্যায়সঙ্গত নয়। নারীদিগের যথেচ্ছ কাম উপভোগের স্বাধীনতা স্বীকারে পুরুষরা সচরাচরই স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ থাকিবে, এইরূপ সন্দিগ্ধতাও পুরুষদিগকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত করে—পাশ্চাত্য দেশীয়রা তাহাও করিতেছে। আবার এই সন্দিগ্ধতা বিবাহিত জীবনকে ঘোর অশান্তিকর করে, মহাত্মা টল্‌ষ্টয় তাঁহার Kreutzer Sonata নামক পুস্তকে তাহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং ইহার ফলে যে বিবাহসংখ্যা আরও কমিবে, বিবাহ আরও অশান্তিকর হইবে, পরস্পর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল প্রণয়—যাহা মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—যাহা ইহ-জীবনের শান্তি-তৃপ্তির প্রধান উৎস, তাহা হইতে লোক অধিকভাবে বঞ্চিত হইবে। ইহা অপেক্ষা লোকের দুর্ভাগ্য, সমাজের পক্ষে অমঙ্গল কি হইতে পারে? পাশ্চাত্যদেশে তাহাই হইতেছে। প্রথম-যৌবনে যখন প্রাণ-মন ঢালিয়া ভালবাসিবার প্রবৃত্তি প্রকৃতি হইতেই আইসে, তখন ধনীদিগের বিলাসভোগ দেখিয়া লোক সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসপ্রবণ হওয়ায় লোকরা তখন বিবাহ করিল না, অর্থ ও বিলাসভোগই তাহাদিগের প্রধান কাম্য হইয়া পড়িল। নারীরা অর্থোপার্জ্জনের ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় তাঁহাদিগের মাতৃত্বের অঙ্গীভূত পরার্থপরতাও সঙ্কুচিত হইল; সুতরাং সম্পূর্ণ নির্ভরশীল প্রকৃত ভালবাসারই বিকাশ পাশ্চাত্যদেশে হইতে পাইতেছে না, অনেকে তাহা দেখিতেছেন Ellen Key তাঁহার জগদ্বিখ্যাত Love and marriage নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"people are forgetting the meaning of the idea of love. People of the present day are excluded from love, not merely from the possibility of realising it in marriage, but also from the possibility of fully

experiencing (লোকে জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতেছে। এ কালের লোকেরা ভালবাসা হইতেই বঞ্চিত হইতেছে।—শুধু যে বিবাহ করিয়া ভালবাসা উপভোগ করিতে পায় না, তাহা নহে—কোথাও তাহা পায় না।' (Chapter V. P. 171) এই জন্য এ কালের পাশ্চাত্য সাহিত্য নৈরাশ্যপূর্ণ (Pessimism)। আত্মহারা ভালবাসা পাইলে ও ভালবাসিতে পাইলেই জীবন সরস থাকে—উপভোগ্য থাকে, তদভাবে হৃদয়ই শুষ্ক হয়, জীবনই মরুময় হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা ঘোর অনিষ্ট কি হইতে পারে? এ কালের সকল চিন্তাশীল পাশ্চাত্য লেখকই পাশ্চাত্যদিগের জীবনে যে হৃদয়ের আবেগ নাই—বিশ্বাস নাই—তৃপ্তি নাই—সন্তোষ নাই—প্রকৃত আনন্দ নাই—কোন মহদুদ্দেশ্য নাই—কোন স্থিরলক্ষ্য নাই—তাহারা সকলেই ধনোপার্জ্জনকারী যন্ত্রের অঙ্গে পরিণত হইতেছে—কেবল বিলাস ও উত্তেজনাপ্রয়াসী হইতেছে বা অপরাপর জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অধিক ধনী হইবার প্রয়াসী ও অধিক লোকহত্যাকারী যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইতেছে—তাহা দেখিতেছেন। আমাদিগের নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত তরুণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়ায় ভোগের উপকরণ অর্থাভাবে তাহাদিগের দুর্দ্দশার অত্যধিক বৃদ্ধি হইতেছে।

এখন দেখা যাউক, বিবাহের উদ্দেশ্য কি ও কাহাদের মঙ্গলের জন্য ইহা প্রধানতঃ আবশ্যক এবং প্রকৃতির ধারা পর্য্যবেক্ষণে এ বিষয়ে কোন আলোক পাওয়া যায় কি না।

জীবসৃষ্টিতে এক কৌষিক জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সরীসৃপ পর্য্যন্ত (Reptilia) সকল জীবই বহু সন্তান—সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ সন্তান প্রসব করে। তাহাদিগের মাতা বা পিতা তাহাদিগের কোন যত্ন লয় না। জীব-জগতের ক্রমবিকাশে উভচরে (amphibia) আসিয়া—কোন কোন পণ্ডিতের মতে সরীসৃপে আসিয়া—ক্রমবিকাশ যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়—এক দিকে পক্ষিশ্রেণীতে, অন্যদিকে স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত হয়। ক্রমবিকাশের ধারায় এইখানে আসিয়া আমরা প্রথমে মাতৃপক্ষীকে ও মাতৃজন্তুকে শাবকদিগের বিশেষ যত্ন লইতে দেখিতে পাই। আর দেখিতে পাই যে, এখন আর সহস্র সহস্র শাবক হয় না—বিশ, ত্রিশটি—ক্রমে দুই একটিমাত্র শাবক হয়—যথা হাঁস, মুরগী, শূকর—পায়রা, চড়ুই, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি।

নিম্ন শ্রেণীর জীবদিগের মাতা বা পিতা কেহ শাবকদিগের কোন যত্ন লয় না বলিয়া বহু শাবকই মরিয়া যায়; সুতরাং জীবসৃষ্টি-রক্ষার্থে প্রকৃতি তাহাদিগকে বহু শাবকপ্রসবকারিণী করিয়াছেন—যখন মাতা জীব সন্তানদিগের যত্ন লয়, তখন মাতার সাহায্য পাওয়ায় অনেক শাবক বাঁচিতে পারিবে, সুতরাং সৃষ্টিরক্ষার্থে আর অত অধিকসংখ্যক শাবক হইবার আবশ্যক থাকে না বলিয়াই শাবকসংখ্যা কম হইয়া যায়। এই সকল শাবকও কতক পরিমাণে অসহায় অবস্থায় জন্মায়—সুতরাং মাতাদিগের সাহায্যও আবশ্যক হয়। ক্রমবিকাশের জীবসৃষ্টিতে এইখানে আসিয়াই প্রথম মাতৃত্বের প্রকাশ দেখা যায়। এই মাতৃত্বেই প্রথম পরার্থপরতার বিকাশ পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার পূর্ব্বে কেহ অপরের জন্য কোন কার্য্য করিত না—কোন কষ্ট স্বীকার করিত না। অসহায় শাবকরা তাহাদিগের অসহায়ত্বের গুপ্ত শক্তির দ্বারাই যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পরার্থপরতা, ভালবাসা টানিয়া আনিল—অপত্যস্নেহেই ভালবাসার জন্ম পৃথিবীতে হইল।

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, কতক শ্রেণীর পক্ষীর (কতক জন্তুদিগেরও) শাবক সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় জন্মায় এবং দীর্ঘকাল ঐরূপ অসহায় অবস্থায় থাকে, যথা—পায়রা, ঘুঘু, চিল, চড়ুই ইত্যাদি। আর কতক শ্রেণীর পক্ষীর শাবকরা অত অসহায় অবস্থায় জন্মায় না ও ঐরূপ অসহায় অবস্থায় বহুকাল থাকে না, যথা—মুরগী, হাঁস। তাহারা চলিতে পারে—আহার সংগ্রহও করিতে পারে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষীদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় শাবক জন্মায়। তাহারা কেবল মাতা পক্ষীদিগের সাহায্য পায় এবং তাহারা প্রজননক্রিয়ায় যথেচ্ছাচারী। প্রথম শ্রেণীর পক্ষীদিগের একটি, দুইটি, তিনটিমাত্র শাবক জন্মায়—তাহাদিগের পিতা পক্ষীরা তাহাদিগের আহার জোগাইবার ভার লয় এবং পিতা ও মাতা পক্ষী একত্রে বিবাহিতের মত জোড়া জোড়া থাকে। তাহাদিগের বিশেষতঃ—মাতা পক্ষীদিগের ব্যভিচারদোষ প্রায় দেখা যায় না। সুতরাং প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়া বুঝা যায় যে, দীর্ঘকাল অসহায় শাবক পালনের সুবিধার জন্যই পিতা-পক্ষীর সাহায্য আবশ্যক এবং তজ্জন্যই পিতা ও মাতা পক্ষীর একত্রে স্থায়িভাবে সহবাস বা বিবাহও আবশ্যক। তদভাবে দীর্ঘকাল অসহায় শাবক প্রতিপালনের ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার একা মাতা-পক্ষীর উপর পড়িত—তাহাতে তাহার অতিশয় কষ্ট হইত—শাবকদিগেরও অতিশয় দুর্গতি হইত—অধিকাংশই মরিয়া যাইত—সৃষ্টিলোপ হইবার সম্ভাবনা হইত। যেখানে শাবকরা পিতা-পক্ষীর (বা জন্তুর) সাহায্য পায় না, সেখানে প্রকৃতি সৃষ্টিরক্ষার্থে মাতা-পক্ষীকে বহু সন্তানপ্রসবকারিণী করিয়াছে। জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশে এইখানে আসিয়া প্রথম পিতৃত্বের বিকাশ হইল—পুরুষ-পক্ষীর (বা জন্তুর) ভিতর প্রথম পরের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে দেখিতে পাওয়া গেল—অর্থাৎ পরার্থপরতা দেখা গেল।

আবার দেখা যায়, যে সকল পক্ষী স্থায়িভাবে জোড়া জোড়া হইয়া একত্রে থাকে, উভয়ে মিলিয়া একত্রে শাবক পালন করে, তাহাদিগের ভিতর দাম্পত্য-প্রেমেরও অধিক বিকাশ হয়—এমন কি, একের মৃত্যুতে অপরকে মৃত্যুকেও বরণ করিতে দেখা যায়। (চক্রবাক-চক্রবাকীর কথা যেন মনে থাকে)। এরূপ প্রগাঢ় প্রেম কোন যথেচ্ছাবিহারী জীবে দেখা যায় না। সুতরাং যৌন প্রেমের প্রকৃষ্ট বিকাশও বিবাহেই সম্ভব, তাহা বুঝা যায়; পরার্থপরতাও এইরূপে প্রসার পায়। ভালবাসা বলিতে তরুণরা সচরাচর যৌন প্রেমই বোঝেন, তাহারই উপভোগপ্রয়াসী। তাহার শ্রেষ্ঠ উপভোগ যে বিবাহেই সম্ভব, তাহা মনে রাখিলে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় না, তরুণীরাও অবশ্যম্ভাবী দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইতে পারেন।

Westermarck তাঁহার Evolution of marriage নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সকল অসভ্য সমাজেই কোন না কোন প্রকার বিবাহপ্রথা আছে; কিন্তু অনেকের ভিতর দাম্পত্য

প্রণয় নাই বলিলেই চলে। পুরুষ স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করে, কিন্তু সন্তানদিগকে যথেষ্ট যত্ন করে। ইহা হইতে মনে হয় যে, দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ব্বে অপত্য-স্নেহের বিকাশ হইয়াছে এবং অসহায় শিশুর প্রতি উভয়ের ভালবাসা ও যত্ন, পুরুষ ও নারীর কামজ আকর্ষণকে পরার্থপর প্রকৃত ভালবাসায় পরিণত করে ও স্বর্গসুখাবহ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধে। এই জন্যই অপত্যকে Pledge of love (ভালবাসার জামিন) বলে। অপত্যদিগের প্রতি উভয়ের ভালবাসার জন্য পরস্পরের ব্যবহারের ত্রুটি সহ্য করিবার প্রবৃত্তি হয়, এবং ইহাই লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু "কৃষ্ণকান্তের উইল"এ গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন ভ্রমরকে তাহার বহুকাল পূর্ব্বে মৃত শিশুর জন্য শোক প্রকাশ করাইয়াছেন। অপত্যরা যে দাম্পত্য-প্রেম স্থায়ী ও দৃঢ় করে, তাহা বোধ হয় সকল দীর্ঘকালবিবাহিত অপত্যের পিতা-মাতাই স্বীকার করে এবং তজ্জন্যই আমাদিগের প্রবীণারা কন্যা ও বধূদিগের অপত্য কামনা করিতেন বা করেন, তরুণরা তাহা বুঝেন না বলিয়া সন্তানদিগকে দাম্পত্য প্রেম উপভোগের বিঘ্ন মনে করেন।

পরার্থপরতা পক্ষীতে অপত্য-স্নেহে ও দাম্পত্য-প্রেমে পর্য্যবসিত বলা চলে—তদপেক্ষাও অতি অল্প বিকাশও দেখা যায়। কিন্তু পক্ষি-শাবক অপেক্ষা মনুষ্য-শিশু বহু দীর্ঘকাল অসহায় থাকে এবং তাহারই ভিতর অন্য শিশু জন্মায় বলিয়া মানুষের ভিতর পরার্থপরতা আরও অধিক বিকশিত হইয়াছে। সন্তানরা বহুকাল একত্রে পিতা-মাতার অধীনে থাকায় তাহারাও পরস্পর যত্নসাহায্যশীল হয়—পরার্থপরতার বিকাশ আর এক সোপান অতিক্রম করে।

দীর্ঘকাল পিতা-মাতার আন্তরিক যত্ন, সেবা ও সাহায্য পাইয়া সন্তানরা মাতা-পিতাকে ভালবাসিতে—যত্ন-সেবা করিতে শিখে। বিশেষতঃ সেই সন্তানরা যখন নিজে পিতা ও মাতা হয় নিজেদের অপত্যদিগের প্রতি কিরূপ ভালবাসা হয়, তাহারা নিজেদের অপত্যদিগের নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে, তাহা বুঝে, তখন তাহাদিগের পিতৃ-মাতৃভক্তিও দৃঢ় হয়—ভালবাসা—পরার্থপরতা ঊর্দ্ধগামী হয় এবং অপত্যদিগের যত্ন, সাহায্য ও সেবা পাওয়ায়—বৃদ্ধবয়স—অসুস্থ অবস্থা—যখন পরের যত্ন, সেবা, সাহায্য পাওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়,—ভীষণ কষ্টকর হয় না—নির্জ্জন কারাবাসতুল্য হয় না—তাহাদিগের আন্তরিক যত্ন ও সেবা পাইয়া জীবনে শান্তি ও তৃপ্তি থাকে। গরীবদিগের পক্ষে—আমাদিগের দেশের শতকরা ৯৫টি গরীব বলা যাইতে পারে—বৃদ্ধবয়স ও অসুস্থ অবস্থায় অপত্যদিগের আন্তরিক যত্ন ও সেবা-সাহায্য না পাইলে কি ভীষণ কষ্টকর—তাহাদিগের সেবা ও সাহায্য পাওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা না তরুণরা, না অবস্থাপন্ন নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্যক্ উপলব্ধি করেন। আমাদিগের না আছে হাসপাতাল—না আছে আতুরাশ্রম—তাহা করিবারও সামর্থ্য সুদূরভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা অল্পই আছে।

নিজের অপত্যদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা আছে বলিয়া—নিজেদের অপত্যাদির পীড়া ও মৃত্যুতে নিজেদের কিরূপ কষ্ট হয় দেখিয়াই অপরের অপত্যাদির পীড়া ও মৃত্যুতে তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি হয়—তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি হয়। এখন আমরা অনেক উন্নত হইয়াছি—আমাদিগের সহানুভূতির—পরার্থপরতার অধিক বিকাশ হইয়াছে বলিয়া আমরা ভুক্তভোগী না হইয়াও আমরা সহানুভূতিশীল হইয়াছি; কিন্তু পরার্থপরতার সহজ বিকাশ নিজের অনুভূতি হইতেই হইয়াছে। এখনও ভুক্তভোগীর সহানুভূতি যে আন্তরিক আছে, অভুক্তভোগীর সহানুভূতিতে সচরাচর সে আন্তরিকতা দেখা যায় না; সুতরাং তত তৃপ্তিদায়ী হয় না।

অপত্যবৎসল মাতা-পিতার পক্ষে অপত্যদিগের মৃত্যুর অপেক্ষা হৃদয়বিদারক যন্ত্রণাভোগ অতি অল্পই আছে। এই মৃত্যুর দ্বারা যত অধিক ও ব্যাপকভাবে সহানুভূতি ও পরার্থপরতার বিকাশ হইয়াছে, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় নাই। ইহাতে ধন-মান-পদের গর্ব্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া যায়—অহমিকা চূর্ণ হইয়া যায়। দীন-দরিদ্র, ধনী, পাপী, ধার্ম্মিক, রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য সকলেই শোকসূত্রে গ্রথিত। পৃথিবীতে যদি শোক—বিশেষতঃ অকাল-মৃত্যু না থাকিত, পৃথিবী কত সহানুভূতিহীন ও কঠোরতাগ্রস্ত হইত—জীবন সহানুভূতি-বিহীনতায় কত দুঃসহ হইত, তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি না। শোকের মত প্রকৃত মহাশিক্ষক আর নাই। যে জীবনে শোক পায় নাই, তাহার প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে কি না সন্দেহ—তাহার সহানুভূতিতে আন্তরিকতার অভাব থাকে, যাহার জন্য তাহা কষ্ট নিবারক হইলেও সেরূপ তৃপ্তিদায়ী হয় না।

অপত্যপালন হইতে সদ্গুণের, কষ্টসহিষ্ণুতারও বিকাশ হয়। অপত্যদিগের ভাবী দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্যই পিতা-মাতারা ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিতে শিখে—তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করে—পক্ষীরা নীড় বাঁধে—লোক সঞ্চয়শীল হয়—সতর্কতারও বৃদ্ধি হয়। সেই জন্যই দেখা যায়, অবিবাহিতরা সচরাচর মিতব্যয়ী হয় না—তাহারা হঠকারী হয়। অবিবাহিতরা খালি জাহাজের মত অল্প তুফানে বিপর্য্যস্ত হয়—জাহাজের পক্ষে ভারের (ballast) মতন স্ত্রী বা স্বামীর অপত্যের একান্ত আবশ্যক। বিবাহের পর—অপত্য জন্মাইবার পর লোক আর শুধু নিজের জন্য কার্য্য করে না—নিজের স্ত্রী বা স্বামী ও অপত্যদিগের—সকলের শুভাশুভ দেখিয়া কার্য্য করে অর্থাৎ আমিত্বের প্রসার হয়—আমি যেন আর শুধু আমি থাকি না—স্ত্রী বা স্বামী, অপত্য ও আমি সকলকে জড়াইয়া যেন এক বড় আমি হই।

বেদান্তমতে এই আমিত্বের প্রসার যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত হয়, যখন আমার ইচ্ছা, চিন্তা ও কার্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হয়, তখনই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তৎ ত্বমসি" "একমেবাদ্বিতীয়ং" সম্যক উপলব্ধি হয়—তাহাই স্থায়িভাবে হওয়াই মুক্তি। আমাদিগের উন্নতির চরম লক্ষ্যই সেই উপলব্ধিতে—তখনই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়—পরমানন্দ উপভোগ হয়। এই আমিত্বের প্রসারই উন্নতির মাপকাঠী। আমরা যখন স্বামী বা স্ত্রী অপত্যদিগকে প্রগাঢ় ভালবাসার ফলে আমার পৃথক ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া তাহার সহিত একীভূত হই, তখনই আমরা জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হই। ইহাই আমিত্বের

প্রসারের সুখ—সমাধি অবস্থায় সকলের সহিত একীভূত হওয়ার সুখের স্বল্প আভাস মাত্র।

বিবাহই এই আমিত্বপ্রসারের প্রধান ও সহজ উপায়। এই প্রসারপ্রাপ্তিই হিন্দুর জীবনের লক্ষ্য—তাহাই প্রকৃত উন্নতি বলিয়া গণ্য। প্রকৃতির ধারা পর্য্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, এই প্রসারপ্রাপ্তি বিবাহের দ্বারা সহজে হয়—সেইজন্য হিন্দুমতে বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার। বিবাহ আদিকাল হইতে আছে বলিয়া মনুষ্য-সমাজে পরার্থপরতার সহজ বিকাশ হইতে পাইয়াছে—মনুষ্য-সমাজ এত উন্নত হইয়াছে।

পরার্থপরতা আছে বলিয়াই মনুষ্য-জীবন উপভোগ্য আছে। পরার্থপরতার আবশ্যকতা স্বীকৃত বলিয়া শিক্ষার দ্বারা তাহার বিকাশ করা হয়। স্বদেশ-প্রেম, হিতৈষিতা, দয়া, দান, ভালবাসা, ভক্তি—পরার্থপরতার অঙ্গ। পরার্থপরতা সমাজের—নিজের পক্ষেও কত শুভজনক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—কতকটা বুঝিলেও পরার্থপর হওয়া দুরূহ—স্বার্থপরতা তাহার ব্যাঘাত করে। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, কেন্দ্রগ ও কেন্দ্রাতিগ (centripetal and centrifugal) শক্তির ন্যায়—আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ন্যায়, একই সময়ে কার্য্য করিয়া জগৎ ধারণ করিয়া আছে। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার সামঞ্জস্য করিতে জীবনে সকলকেই চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু তাহা বড় কঠিন সমস্যা। সচরাচর লোকের পক্ষে তাহা সম্যক্ সামঞ্জস্য করা সম্ভবপর নয়। শুনিয়া শেখা—শিক্ষার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ-পরার্থপরতা কার্য্যে পরিণত করিতে ভুল অধিক হয়। পাশ্চাত্যের পরার্থপরতা অধিকাংশই শুনিয়া শেখা পরার্থপরতা বলিয়া তাহার বিকৃত বিকাশ হইয়াছে—বিকট বা বিকৃত স্বদেশভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্য অন্য দেশ জয় করিয়া স্বদেশের ধন ও গৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়াছে—পৃথিবীশুদ্ধ লোকের জীবন ভীষণ অশান্তিকর ও কষ্টকর করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির নিয়মে বিবাহ করিয়া অপত্যপালন করিয়া যে পরার্থপরতার সহজ বিকাশ হয়, তাহা ধাপে ধাপে আত্মীয়-স্বজাতিতে, স্বজনে, স্বগ্রামে, স্বদেশে সর্ব্বমানবে প্রসারিত হইলে তাহা ঐরূপ বিকৃত হয় না, সকলের জীবনে শান্তি-তৃপ্তি বর্ষণ করে। হিন্দু সভ্যতার বিস্তৃতিকালে সেই জন্য একালের পাশ্চাত্য সভ্যতা-বিস্তৃতির জন্য যেরূপ প্রায় সকল লোকের জীবন অশান্তিকর করিতেছে, সকল দেশই যেরূপ পরস্পরের ধ্বংসে প্রবৃত্ত সৈন্য আবাসে পরিণত করিয়াছে, তাহা হয় নাই—সকলের জীবনে শান্তি ও সুবিধা বৃদ্ধিই করিয়াছিল।

প্রকৃতির ধারা পর্য্যালোচনায় আর পাওয়া যায় যে, যে সকল পক্ষীর ও জন্তুর শাবকরা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় জন্মায় ও কিছুকাল অসহায় অবস্থায় থাকে, তাহারা জোড়া-জোড়াই থাকে ও ঐ সকল শাবকের মাতাদিগের ব্যভিচারদোষ প্রায় দেখা যায় না। পিতৃ-পক্ষীর (বা জন্তুর) শাবক প্রতিপালনে সাহায্য পাইতে হইলে স্ত্রীপক্ষীর কাম উপভোগে একনিষ্ঠত্ব (অর্থাৎ সতীত্ব)ও একান্ত আবশ্যক। অন্য সকল স্ত্রীপক্ষী ও জন্তু যথেচ্ছা কাম উপভোগ করে, কিন্তু যাহাদিগের শাবকরা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় জন্মায় ও কিছুকাল ঐরূপ অসহায় থাকে, তাহাদিগেরই কেবল সেই মাতৃ-পক্ষীর বা জন্তুর কাম উপভোগের স্বাধীনতা লোপ করিতে প্রকৃতি বাধ্য হইল দেখা যায়। তখনই বুঝা উচিত যে, দীর্ঘকাল অসহায় শাবক পালনে পিতৃপক্ষীর বা জন্তুর সাহায্যও একান্ত আবশ্যক ও তাহা পাইতে হইলে—পুংপক্ষীর বা জন্তুর পরার্থপরতা উদ্দীপিত করিতে হইলে—স্ত্রী-পক্ষীর বা জন্তুর একনিষ্ঠ কাম উপভোগ (বা সতীত্ব)ও একান্ত আবশ্যক। তদভাবে পিতৃপক্ষীর বা জন্তুর সাহায্য পাওয়া অসম্ভব, স্ত্রী-পক্ষীর বা জন্তুর শাবক পালনে অতিশয় দুর্গতি হয়—শাবকদিগেরও দুর্গতি হয়—অনেকগুলিই মরিয়া যায়—সৃষ্টি-লোপ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং প্রকৃতির শিক্ষা বা নিয়মই এই যে, সুদীর্ঘকাল অসহায় মানব-শিশু পালনের সুবিধার জন্য—তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য—অপত্যপ্রতিপালনে নারীদিগের সাহায্যের ও কষ্টনিবারণের জন্য পিতার সাহায্য পাওয়া একান্ত আবশ্যক এবং তাহা পাইতে হইলে স্থায়িভাবে বিবাহও আবশ্যক—নারীদিগের সতীত্বও আবশ্যক; তদভাবে সেরূপ সাহায্য পাইতে পারা যায় না—নারীদিগের ও অপত্যদিগের অশেষ দুর্গতি হয়—পুরুষদিগের পরার্থপরতাও বিকশিত হয় না—প্রকৃতির উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। বিবাহের অর্থই স্ত্রী ও অপত্যপালনের ভার লইবার প্রতিশ্রুতি—তাহাদিগকে যাবজ্জীবন যত্ন ও যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি—বিবাহের দ্বারাই সেই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়—তাহার উদ্দেশ্যই নারীদিগকে একা সন্তান প্রতিপালন করিতে হইলে যে অবশ্যম্ভাবী অশেষ দুর্গতি হয়, তাহা হইতে মুক্তিদান—তাহাতেই সৃষ্টিরক্ষা হইতে পারে—তাহার দ্বারাই পরার্থপরতার বিকাশ হয়। যাবৎ কোন পুরুষ সেইরূপ প্রতিশ্রুতি না দেয়—অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ না করে, তাবৎ তাহার সহিত কাম উপভোগে অসহযোগিতা করাতেই (non co-operation) পুরুষদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-পালনের ভার লইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছে—(এই অসহযোগিতাই দুর্ব্বলের প্রধান অস্ত্র—কি সমাজে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে)। এইরূপ প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে কাম উপভোগে অসহযোগিতা করাই সতীত্বের প্রধান অঙ্গ। বিবাহ ব্যতিরেকে নারীদিগের কাম উপভোগ করার ফলে যখন বিবাহ-সংখ্যাই কমিয়া যায়, নারীদিগের অশেষ দুর্গতি হয়—অথবা অপর নারীর গৃহদাহ হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে সকল নারী যথেচ্ছা কাম উপভোগ করে, তাহারা নারীজাতিরই শত্রুতা করে এবং স্বপক্ষদ্রোহী (traitor to their own sex) বলিয়া তাহারা এতাবৎকাল নারীদিগের অধিক ঘৃণার্হ ছিল—এখন মাতৃত্বনিরোধ প্রথা অবলম্বন করিয়া এইরূপে স্বপক্ষদ্রোহিতা করাই নব্যতন্ত্রী অবলা-বান্ধবরা নারীস্বত্বপ্রসার বলিয়া বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতেছেন—স্বপক্ষদ্রোহীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে যে নারীজাতির মঙ্গল ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তাহাও স্পষ্ট দেখিতেছেন—বিবাহ-সংখ্যা কম ও বিবাহ-বিচ্ছেদসংখ্যা বৃদ্ধিই তাহার অকাট্য প্রমাণ বলিয়া বুঝিয়াছেন!

আদর পাওয়া, ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়াই মনুষ্যজাতির মুখ্য অভাব। দীর্ঘকাল অসহায় শিশু অন্যের ভালবাসা-যত্ন ও সাহায্য না পাইলে বাঁচিতেই পারে না—মানব-সৃষ্টি রক্ষাই হয় না; সুতরাং ভালবাসা পাওয়া আমাদিগের জীবনের মুখ্য অভাব। ভালবাসা পাওয়া মনুষ্য

জীবনের মুখ্য অভাব বলিয়াই মানুষের মন বা হৃদয় এরূপে গঠিত যে, সকলেরই ভালবাসিবার সহজ প্রেরণা আছে ও তজ্জন্য ভালবাসাই মানুষ বিশেষ সুখ বোধ করে। সেই জন্যই ভালবাসাই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ বলিয়া স্বীকৃত—সেই জন্যই পুরুষ ও নারীতে প্রবল আকর্ষণ আছে। নারীরাই মাতৃজাতি—মাতৃত্বের জন্য তাহার সকল অঙ্গ গঠিত। মাতার বক্ষেই দুগ্ধ হয়—তাহাই শিশুর প্রধান আহার—সেই জন্যই নারীজাতিরই মাতা হইবার প্রেরণা—প্রাণ-মন ঢালিয়া শিশুকে ভালবাসিয়া অশেষ সুখবোধ প্রকৃতি নারীহৃদয়ে দিয়াছেন। Havelock Ellis তাঁহার Man and woman নামক পুস্তকে ৩৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"In the gifts of children Nature has given to women a massive physiological joy to which there is nothing in men's lives to correspond. আহার অভাবে শরীর যেমন শুষ্ক হয়, এইরূপ ভালবাসিতে না পাইলে নারীর হৃদয়ই শুষ্ক হয়—জীবনের প্রকৃতিপ্রদত্ত সুখের প্রধান উৎস শুকাইয়া যায়—জীবনই কষ্টকর হয়। সুতরাং মাতা হইতে পাওয়া—শিশুকে প্রাণ-মন ঢালিয়া ভালবাসিতে পাওয়া নারী-জীবনের মুখ্য অভাব। মুখ্য অভাব অপূরণের নির্য্যাতন গৌণ অভাব অধিক পূরণে নিবারিত হইতে পারে না—তাহা হীরা-মুক্তা পরাইয়া, না খাইতে দেওয়ারই মত মার্জ্জিত উপায়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্য্যাতন। পাশ্চাত্য-সমাজে সাম্যবাদ ও সকল কর্ম্মে সকলের সমান অধিকার ও অবাধ প্রতিযোগিতা প্রচলন থাকার নিমিত্তই যত অধিকসংখ্যক নারীকে বহুকাল বা চিরকাল বিবাহ করিতে না দিয়া—মাতা হইতে না দিয়া নারীদিগের মুখ্য অভাব অপূরণের নির্য্যাতন ভোগ করিতে বাধ্য করে—শতকরা ৪৩·৪টি নারীকে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয় না—(১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যার বসুমতী দেখুন) বোধ হয়, কোন কালে কোন দেশে তত অধিকসংখ্যক নারীকে সে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই পাশ্চাত্য সমাজই অধিক নারীমঙ্গল ও সম্মানকারী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, আর এ দেশের শিক্ষিত পাশ্চাত্যের সখের গোলামরা (volunteer slave) তাহাই অবনত-মস্তকে স্বীকার করেন—পাশ্চাত্যদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কারক সাজেন! মাতৃত্ব-নিরোধ-প্রথা অবলম্বন করিয়া কাম উপভোগ করা ও পরের গোলামী করা—যাহা তাহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করে—তাহাই নারীস্বত্বপ্রসার বলিয়া তরুণীদিগকে বুঝাইতেছেন!

হিন্দু সমাজ-বিধানকর্ত্তারা সকলের বিবাহ করা অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার প্রচারে সকল নারীই বিবাহিতা হইতে পাইত। যৌথ পরিবার ও জাতিভেদপ্রথা * মুষ্টিভিক্ষাপ্রথা প্রচলনে—শ্রাদ্ধে, পূজায়, বিবাহাদি শুভকর্ম্মে—আনন্দের দিনে দরিদ্রদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান অবশ্য কর্ত্তব্য প্রচারে—সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন ও মুখ্য অভাব-পূরণের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সকল নারী বিবাহিতা হইয়া কাম ও মাতৃত্ব উপভোগ করিতে পাইত। যৌথ-পরিবারে সকলের সময়ে সাহায্য পাওয়ায় বহু সন্তানের মাতাদিগেরও সন্তানপালনে বিশেষ কষ্ট হইত না—যাহা ব্যক্তি-তান্ত্রিক সমাজে অবশ্যম্ভাবী ও যাহার নিমিত্ত পাশ্চাত্যের বিবাহিতা অপেক্ষাকৃত অর্থস্বচ্ছল নারীরাও মাতৃত্ব-নিরোধ প্রথা ও ভ্রূণ-হত্যা করিতে বাধ্য হয়—নিঃসন্তানরাও যৌথ-পরিবারস্থ অপরের সন্তান পালন করিয়া—মাতৃত্বের অভাব পূরণ করিতে পাইত—সন্তানরা পিতামাতা ও পিতামহ-পিতামহী প্রভৃতির যত্ন, সাহায্য ও ভালবাসা পাইত—পিতৃমাতৃহীনরাও সেইরূপ যত্ন, সাহায্য ও ভালবাসা পাওয়ায় তাহাদিগের জীবন কষ্টকর হইত না—(ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে মাতৃপিতৃহীনদিগের—বিশেষতঃ অর্থস্বচ্ছলতাশূন্যদিগের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহা দেখিতে বলি) প্রায় সকল নারীই সন্তানকে প্রাণ-মন ঢালিয়া ভালবাসিতে পাইত (বালবিধবা মাত্র শতকরা দেড়টি—তাহাদিগের ভিতরও অনেকের বিবাহ হয়) স্বামীর অভাবে বা অসৎব্যবহার সত্ত্বেও নারীহৃদয়ের ভালবাসিবার ক্ষুধা অতৃপ্ত থাকিত না—সকলেরই পরার্থপরতা প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে বিকশিত হইতে পাইত—বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পুত্রপৌত্রদিগের পুত্রবধূ প্রভৃতিদিগের যত্নসেবা পাইত এবং এইরূপে মনুষ্য-জীবনের মুখ্য অভাব—গ্রাসাচ্ছাদন ও ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়া—অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও সকলেরই পূরণ হইত—এবং তজ্জন্য সকলের জীবন উপভোগ্য থাকিত—জীবনে আনন্দ থাকিত—দরিদ্রদিগকে পশুত্বে নীত করিত না। ভারতের অতিশয় দীন দরিদ্র—সভ্যতার নিম্নতম শ্রেণীর লোকদিগের নৈতিক জীবন যে পাশ্চাত্যের নিম্ন শ্রেণীর অপেক্ষা যাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অর্থস্বচ্ছল অপেক্ষা উন্নত, তাহা সকলেই স্বীকার করে—তাহাদিগের জীবনে যে আনন্দ আছে, তাহা পাশ্চাত্যে দেখা যায় না—সেই জন্য Happy as poor Indian villagers (ভারতের দরিদ্র গ্রামবাসীর মত সুখী) পাশ্চাত্যে চলিত কথায় আছে—Greatest good of the greatest number—সমাজের অধিকাংশ লোকের অধিক মঙ্গল-বিধান করাই সমাজ-বিধানের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠী, সেই পরীক্ষা দ্বারা হিন্দু সমাজ গঠনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আমরা পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি দেখিয়াই মুগ্ধ—সে সমৃদ্ধি অধিকাংশ স্থলেই অপর দেশের ধন দোহন ও সেই সকল দেশবাসীর জীবন কষ্টকর করিয়া হইয়াছে—তাহাও কেবল অর্থশালী লোকদিগের—সে সমৃদ্ধি তাহাদিগের বিলাসাতিশয্য বৃদ্ধি করে—তাহা দেখিয়া সকলেরই ভোগতৃষা বিষম বর্দ্ধিত হয়—তৎপূরণাভাবে জীবন কষ্টকর ও তৃপ্তিহীন হয়—বিলাস-ভোগ যাহা মনুষ্য-জীবনের গৌণ অভাব মাত্র—তাহার মোহাবর্ত্তে সকলেই সর্ব্বদাই ঘূর্ণায়মান—ও তজ্জন্য সকলেরই ব্যয়বাহুল্য ও তজ্জন্য চিন্তাকুল ও সন্তোষহীন—বৃদ্ধবয়স কিরূপ ভীষণকর—তাহা আমরা দেখি না।

প্রাণভরা ভালবাসা পাইলে ও ভালবাসিতে পাইলেই জীবনে তৃপ্তি থাকে। পুরুষের অপেক্ষা নারীরা প্রকৃতির নিয়মে তাহা পাইবার জন্য লালায়িত। কবি বায়রণ লিখিয়াছেন—'Love is woman's whole existence—ভালবাসাই তাহাদিগের জীবন। ভালবাসায় যে তৃপ্তি আছে—ভোগে সে তৃপ্তি নাই। ভোগে ভোগতৃষা বৃদ্ধি করে—ভোগের আকাঙ্ক্ষা কখনই পূরণ হয় না। পাশ্চাত্যে তাহারই জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে

* জাতিভেদপ্রথা কত মঙ্গলজনক, তাহা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সকলেই চেষ্টিত। কিন্তু যাহাতে সকলে ভালবাসা পায় ও ভালবাসিতে পায়, নারীদিগকে বহুকাল বা চিরকাল অথবা জীবনের শূন্য-হৃদয়ের অশেষ কষ্টভোগ করিতে না হয়, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, বরং অর্থস্বচ্ছলতা পাইবার নিমিত্ত প্রাণভরা ভালবাসারই অভাব বৃদ্ধি করা হইতেছে। ভালবাসিবার প্রকৃষ্ট সময়—যৌবন—ভোগসুখের প্রয়াসে কাটিয়া যাওয়ায়—ক্ষুধার সময়ে বহুকাল খাইতে না পাইলে শরীরই যেমন বিকৃত ও শুষ্ক হয়—মনের ক্ষুধা—ভালবাসার, সময়ে প্রাণভরা ভালবাসা না পাইলে, ভালবাসিতে না পাইলে মনও তেমনই বিকৃত হয়, হৃদয়ও শুষ্ক হয়—ভালবাসিবার শক্তিই ক্ষীণ হয় এবং সেই জন্য কাহারও জীবনে শান্তি ও তৃপ্তি নাই। পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র অশান্তির মূলকারণই এই, এবং তজ্জন্যই ধনী ও শ্রমিকের বিরোধ—পুত্রকন্যাদিগের বিদ্রোহ—নারী ও পুরুষের বিরোধ—বিবাহবিচ্ছেদের আধিক্য। এ দেশে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, আমাদিগের জীবনে সেইরূপ অশান্তি আসিতেছে এবং আমরা গরীব বলিয়া সেই অশান্তি চিন্তা-কুলতা ভীষণভাবে বাড়িতেছে—প্রাণখোলা হাসি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে—অশেষ দুর্গতি হইতেছে।

দীর্ঘকাল অসহায় মানব-শিশু প্রতিপালনে পিতার যত্ন-সাহায্য ও ভালবাসা পাইতে হইলে—তাহাদিগকে একা প্রতিপালনের দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইতে হইলে স্ত্রীজাতির সতীত্বই প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট একমাত্র উপায় বুঝিয়াই নারীর সতীত্বের মাহাত্ম্য—সতীত্বই তাহাদিগের ধর্ম্ম—যাহা তাহাদিগকে রক্ষা করে—বলিয়া হিন্দু সমাজবিধানকর্ত্তারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্যই নারীর মঙ্গলসাধন—দূরদর্শিতার অভাবে তাহা আমরা দেখি না।

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে আরও পাওয়া যায় যে, যখন স্ত্রীজন্তুরা মাতৃত্বের উপযোগী হইল, তখন হইতেই পুং-জন্তুরা তাহাদিগকে অনুসরণ করে ও তাহারা গর্ভবতী হয়। উদ্ভিদদিগের যখন পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখনই মক্ষিকারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাওয়ায় উদ্ভিদদিগের গর্ভ হয়—ফল জন্মায়। যত দিন রজো-নিঃসরণ হয়, তত দিনমাত্র নারীদিগের গর্ভধারণক্ষমতা থাকে। সুতরাং রজঃ আরম্ভই নারীদিগের গর্ভধারণ উপযোগিত্যর প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন—শরীরায়তনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি নয়। বহু জন্তুই শরীরায়তন পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই গর্ভধারণ করে—গর্ভ হওয়ার পরেই স্তনের বৃদ্ধি হয়। উদ্ভিদজগতে ত আয়তনবৃদ্ধি শেষ হওয়ার পর কোন উদ্ভিদই ফলদান করিতে আরম্ভ করে না। স্ত্রী-জন্তুর গর্ভধারণক্ষমতা হওয়ার পরই পুংজন্তুরা তাহাদিগের অনুসরণ করে ও গর্ভবতী হয়; সুতরাং রজঃ আরম্ভের পর সংসারানভিজ্ঞা তরুণীরা পুরুষদিগের দ্বারা প্রতারিতা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে—সর্ব্বত্রই কতক সংখ্যক তরুণী প্রতারিতা হয়; সুতরাং রজঃ আরম্ভের পূর্ব্বে বিবাহপ্রথা তরুণীদিগকে ঐরূপে প্রতারিত হওয়ার অশেষ দুর্গতি ভোগ নিবারণের উদ্দেশ্যেই প্রচলিত করা হইয়াছিল।

অল্পবয়সে বিবাহ হওয়ায় প্রথম যৌবনের স্বার্থজ্ঞানে অকলঙ্কিত প্রাণ মন অঙ্গ ঢালিয়া ভালবাসিবার প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রবৃত্তি নারী-দিগের কাহাকেও রোধ করিতে হইত না; সকল কবির দ্বারা প্রশংসিত প্রথম ভালবাসা স্বামি-স্ত্রীর ভিতরই উদ্রেক হইত—অপ্রাপ্য স্থানে সঞ্চারিত হইয়া জীবন বিষাক্ত করিতে পাইত না। পিতা-মাতার ও অপত্যের সম্বন্ধ যেমন বিধাতার নির্ব্বন্ধ এবং প্রায় রূপ-গুণ-নিরপেক্ষ, তাহা যেমন সকলকেই স্বীকার করিয়া নিজেকে তদুপযোগী করিয়া লইতেই হয়,—অল্পবয়সে সেইরূপ করা সহজ—দম্পতিরা পরস্পরের উপযোগী হইতে—পরস্পরের ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইতে—সহজেই পারিত; দুই জনে একত্র বর্দ্ধিত হইয়া একই হইয়া যাইত—বিবাহ সচরাচর সুখশান্তিদায়ী হইত; তজ্জন্যই বিবাহবিচ্ছেদের আইনের আবশ্যক হয় নাই—তজ্জন্যই এ দেশে এত 'সতী' হইত—স্বামীর অমনঃপূত দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও তাহাকেই পরজন্মে স্বামিরূপে পাইতে চাহিত—কেবল তাহার সুমতি প্রার্থনা করিত।

বিকৃত পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে এক দল নব্যতন্ত্রী আমাদিগের স্ত্রীদিগের এইরূপ মনোভাবকে দাস্য-মনোভাব বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না—স্বদেশের সকল শিক্ষা, সকল প্রথা—সকল অনুষ্ঠানের নিন্দা করাই তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের ও অদ্ভুত স্বদেশ-ভক্তির নিদর্শন। প্রকৃত (বা শ্রেষ্ঠ) ভালবাসায় আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানই লোপ পায়, অসৎ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তিই হয় না। Oliver Twistএ Nanaর চরিত্র বর্ণনে Dickens তাহা দেখাইয়াছেন। পরস্পরের সদ্ব্যবহারসাপেক্ষ ভালবাসা—যাহা অসৎ ব্যবহারে লোপ পায় বা ক্ষীণ হয়—তাহা সৎব্যবহারের বিনিময় মাত্র—তাহাতে ভালবাসার তৃপ্তি নাই—সুধাবর্ষণও নাই—তাহা ভালবাসাপদবাচ্যই নয়—তাহাও তাঁহারা ভুলিয়া যান।

পাশ্চাত্যে স্ত্রীর ভোগসুখের জন্য খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য স্বামীরা অনেক অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করে ও অধিক বাহ্য সম্মান প্রকাশ করে দেখিয়া নব্যতন্ত্রীরা ভাবেন যে, পাশ্চাত্যে নারী-সম্মান অধিক। এ দেশে স্ত্রীর প্রতি বাহ্য সম্মান প্রকাশ না থাকার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ হিন্দুসমাজে (মুসলমান সমাজেও) নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র সুনিয়মে অবধারিত—তাহা কিরূপ, তাহা পরে দেখাই-বার চেষ্টা করিব। গৃহই নারীদিগের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র—এই জন্য নারীদিগকে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় আসিতেই হয় না—মান্য প্রকাশের অবকাশই নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগের নারীদিগের মাতৃত্বের অঙ্গীভূত ত্যাগধর্ম্মীর ভালবাসার সম্যক্ বিকাশ হওয়ার নিমিত্ত তাহাদিগের ভোগ-সুখের বা বাসনা-পূরণের জন্য, যাহাতে স্বামীর বা অন্যের কোনরূপ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা, তাহা করাইবার প্রবৃত্তিই হয় না—স্বামী সেরূপ করিতে প্রস্তুত হইলেও তাহা করিতে দেন না। তৃতীয়তঃ, অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধুর সহিত ব্যবহারে যেরূপ বাহ্য সম্মান প্রকাশ থাকে না, তাহাকে বাহ্য অসম্মানপ্রকাশক, এমন কি, রূঢ় কথাও অনেক সময়ে অসঙ্কোচে বলা চলে, আমরা স্ত্রীর সহিত একীভূত বলিয়া স্ত্রীর সহিত ব্যবহারে বাহ্য সম্মান প্রকাশ থাকে না। চতুর্থতঃ, যৌবনে যখন ভোগস্পৃহা অধিক থাকে, তখন স্ত্রীরা সংসারাভিজ্ঞা শ্বশ্রূ বা অন্য বয়োজ্যেষ্ঠা গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিত—তাঁহারা সংযমের শিক্ষা দিতেন—ভোগস্পৃহার, অমিতব্যয়িতার প্রশ্রয় দিতেন না। এরূপ প্রথাও নারীদিগের কত মঙ্গলজনক, তাহাও পরে আলোচিত হইবে। ইহা নারীদিগেরই স্বায়ত্তশাসন—

পুরুষের অত্যাচার বা শাসন নয়। কিন্তু বাহ্য সম্মানপ্রকাশ অল্প হইলেও আন্তরিক নারীসম্মান হিন্দু-ভারতে যত অধিক, তত পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। তাহাদিগের ত্যাগধর্ম্মীর ভালবাসার মাহাত্ম্যের পদতলে পুরুষরা অবনতমস্তক। সেই জন্যই এ দেশে স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বলে—বিপত্নীককে লক্ষ্মীছাড়া সচরাচরই বলে। নারীজাতির প্রতি অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকার নিমিত্তই এ দেশে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে নারী-আকারে কল্পনা করা সম্ভব হইয়াছিল—সেই জন্যই সাধারণতঃ অপরিচিতা নারীকে মাতৃ-সম্বোধনের রীতি প্রচলিত—সেই জন্যই ডাকাতরাও সচরাচর নারীর প্রতি শারীরিক বলপ্রয়োগ করিত না। লোক সচরাচরই পরিবারস্থ নারীদিগের নামে বিষয় বেনামী করে—পুত্র অযোগ্য বিবেচিত হইলে পিতা অনেক স্থলেই পুত্রের প্রাপ্য অংশ তাহার স্ত্রীর নামে উইল করিয়া লিখিয়া দেয়—এমন কি, যে উচ্ছৃঙ্খল স্বামী স্ত্রীর প্রতি অতিশয় দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, পৈতৃক বিষয়াদি প্রায় সমস্ত উড়াইয়া দিয়াছে, সেও বক্রী বিষয় সংরক্ষণের জন্য সেই স্ত্রীর নামে লিখিয়া দেয়। নারীদিগের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সম্মান না থাকিলে এরূপ সচরাচর হওয়া সম্ভব হয় না। অত সম্মান কোথাও নাই বলিয়াই এরূপ প্রথা কোথাও নাই। এ দেশ মাতৃভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ দেশের নারীসম্মান যে অধিক, তাহা বিদেশীরাও দেখিয়াছেন। Emma Wilkinson লিখিয়াছেন :—"The real fact is not that Indian woman has too little power but that in the mass they have far too much * * * The Sex is worshipped."

"The older women, the mother of grown up sons has a power that the voting western Women seldom know" "আসল কথা এই যে, ভারত-নারীদিগের ক্ষমতা বা প্রভাব যে অল্প, তাহা নয়, বরং সাধারণতঃ তাহাদিগের ক্ষমতা অত্যধিক। * * * নারীজাতিই (সেখানে) পূজিত।

বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকরা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের মাতাদিগের যে কত ক্ষমতা আছে, তাহা ভোটাধিকারপ্রাপ্তা পাশ্চাত্য নারীরা জানেই না।"

বহুকাল এদেশবাসের ও দেশবাসীদের সহিত মেলামেশার অভিজ্ঞতায় বিখ্যাত সুলেখিকা Mrs Flora Annies Steel (কমিশনার পত্নী) লিখিয়াছেন :—

The Indian Women is 9 times out of 10 quite content with the choice of others. There are indeed few happier house holds than Indian ones, or rather one should use the past tense, Since the Indian girls are beginning to read novels and would ere long grasp the fact that Love makes the world go round by turning peoples heads" * * * The men of India poor souls, are the most hen. pecked in the world" ভারতের দশটি নারীর ভিতর নয়টি পরের দ্বারা স্বামী নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট। ভারতের পারিবারিক জীবন যত সুখদায়ী, তত সুখদায়ী পারিবারিক জীবন অতি অল্পই আছে। হয় ত আমার 'আছে' বলার অপেক্ষা ছিল বলাই উচিত। কারণ, ভারত-তরুণীরা উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অল্পদিনেই শিখিবে যে, ভালবাসা লোকের মাথা ঘুরাইয়া দেয় বলিয়াই পৃথিবী ঘুরিতেছে।" * * * "ভারতের স্বামী বেচারীরা যত অধিক স্ত্রীশাসিত, তত আর কুত্রাপি নাই।"

মিসেস ষ্টীল ঠিকই ধরিয়াছেন যে, ভারতের পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি শীঘ্রই নষ্ট হইবে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের বহু তপস্যায় অর্জ্জিত জ্ঞানবলে যে মৌলিক চিন্তার ধারা ও মনোভাব, যাহা হিন্দুর বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়া যে সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, যাহার আশ্রয়ে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু রাষ্ট্র-বিপ্লব—বহুকালব্যাপী অরাজকতা সত্ত্বেও হিন্দুসভ্যতা অক্ষুণ্ন ছিল, প্রায় সহস্র বৎসর পরাধীনতা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে হিন্দু প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল—সকল কালেই অতি দীনদরিদ্রদিগের অসভ্য জাতিদিগেরও মুখ্য অভাব পূরণ হইতে পাইয়াছিল, তাহাদিগেরও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে পাইয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে আমাদিগের সে মনোভাব পরিবর্ত্তিত হওয়ার নিমিত্তই হিন্দু সমাজ গঠনের শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখিতে পাই না। শিক্ষিতরা হিন্দুর সামাজিক বিধি-নিষেধ অকুণ্ঠিতভাবে উপেক্ষা করেন—হিন্দুর সমাজগঠন ভাঙ্গিতেছেন—পাশ্চাত্য আদর্শে তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন—এইরূপ পরিবর্ত্তনকে সংস্কার আখ্যা দিয়া সংস্কারক সাজিতেছেন। সকল জাতিরই মৌলিক চিন্তাধারা ও মনোভাবের অভিব্যক্তি হয় সেই জাতির সমাজ-গঠনে। যাহারা সেই সকল চিন্তার ধারা ও মনোভাবচ্যুত, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিদেশীরই ভিতর গণ্য।' এইরূপ পাশ্চাত্যপ্রভাব-গ্রস্ত, হিন্দু মনোভাব ও চিন্তার ধারা চ্যুত, শিক্ষিত লোকরাই আমাদিগের নেতা হইয়াছেন—এইরূপ প্রকৃতপক্ষে অহিন্দু হিন্দু নেতাদিগের—যাহাদিগের মতের বিশেষ মিল নাই—নেতৃত্ব পাইবার লোভে ঝগড়া-বিবাদেরও অন্ত নাই—তাহাদিগের নেতৃত্বে হিন্দুদিগের অশেষ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। উত্তরোত্তর আমাদিগের দুর্গতির বৃদ্ধি হইয়াছে—হিন্দুস্থানেই আমরা অ-মুসলমান আখ্যা লাভ করিয়াছি। পাশ্চাত্যদিগের অনুরূপ ভোগলোলুপ হইয়াছি—তজ্জন্য পল্লীবাস ছাড়িয়াছি—তাহাতেও পল্লীসকলের ধ্বংস-সাধন হইতেছে—অশনে বসনে, বিলাসদ্রব্যে, গৃহসজ্জায়, খেলায় পাশ্চাত্যদিগের অনুবর্ত্তন করিতেছি; তজ্জন্য পল্লীশিল্পের ধ্বংস হইতেছে—দেশের ধনদোহনের সহায়তা করিতেছি—জীবনের সকল কার্য্যেই রাজসরকারের প্রভাব বিস্তারের সহায়তা করিয়া আসিতেছি—ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে স্বাধীনতা স্বহস্তে রাজসরকারের হস্তে তুলিয়া দিয়াছি—কেবল মুখেই অসহযোগিতা ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা ও স্বইচ্ছায় পরাধীনতা বরণ—হিন্দু সমাজগঠনের ভিত্তি—যৌথ পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়াছি বলিলেই হয়—অল্পবয়সে বিবাহপ্রথা আইন করিয়া ভাঙ্গিয়াছি—জাতিভেদ-প্রথা ভাঙ্গিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র—পাশ্চাত্যভাবের সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসভোগগ্রস্ততায় যৌথ পরিবারপ্রথা ভাঙ্গায়—দেশের চতুর্দ্দিকেই হাহাকার উঠিয়াছে—অপেক্ষাকৃত বহু অর্থস্বচ্ছল লোকরাও অর্থের অনটনে সর্ব্বদা দুশ্চিন্তাভার-গ্রস্ত—সকলের জীবন সন্তোষ ও শান্তিহীন—পিতৃমাতৃবাধ্যতা ও ভক্তি—যাহা হিন্দুর মৌলিক মনোভাব—তাহাও ছাড়িয়াছি—

পিতা-মাতারা পুত্রদিগের ব্যবহারে মর্ম্মাহত—সমাজের উচ্চস্তরের অর্দ্ধস্বচ্ছল লোকদিগের আত্মীয়া-কুটুম্বিনীদিগকে ইতিমধ্যেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইতেছে—কন্যাদিগের ২০।২৫ বৎসর বয়সেও বিবাহ হওয়াও দায় হইয়াছে—বিবাহের বয়স শীঘ্রই আরও বাড়িবে—যৌবনে বালবিধবাদিগেরই মত স্বামিসহবাস-সুখবঞ্চিত হইতেছে, পরের গোলামীগিরি করিতে পাওয়াই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে—তাহাই নারীস্বত্বপ্রসার বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে। এত কাল নারীরা হিন্দুভাবাপন্না ছিলেন—অবসর-কালে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আদি অমূল্য গ্রন্থ পড়িতেন বা শুনিতেন ও তদ্দ্বারা মহৎ আদর্শে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইত—তাঁহাদিগের গুণে এখনও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হইতে পায় নাই। এখন তরুণদের মত তরুণী-দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—সেই শিক্ষাস্রোত দ্রুত-গতিতে বাড়িতেছে—রামায়ণ-মহাভারতের পরিবর্ত্তে ছাগ-সাহিত্য পড়িতেছেন—নারীদিগের মনোভাব পাশ্চাত্যপ্রভাবগ্রস্ত হইতেছে—স্বীয় স্বত্বপ্রসারের জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইতেছেন—কর্ত্তব্যের দিকে সেরূপ লক্ষ্য নাই—কর্ত্তব্যজ্ঞানও পাশ্চাত্য আদর্শের—তাহাও ভাসাভাসা—তাঁহারাও পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় ভোগসুখপ্রয়াসিনী হইতেছেন—তাহা সামান্যভাবেও পূরণ করি-বার শক্তি আমাদিগের নাই—তাহা কেহই দেখিতেছেন না; সুতরাং আমাদিগের পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তিও নির্ব্বাসিত হইবে—বিবাহ-বিচ্ছেদ করারও আবশ্যক হইবে—তাহাও উন্নতির চিহ্ন—নারীপ্রগতি বলিয়া বুঝিবেন—মিস্ মেয়োর মত আমা-দিগের স্বদেশী ও বিদেশী হিতৈষীদিগের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে—এ দরিদ্র-পরাধীন দেশে ভোগসুখ হইতে পারে না—পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তিও নষ্ট হওয়ায় সকলেরই জীবন ধন্য হইবে—সকলেই প্রগতির জয় নাচিয়া নাচিয়া গাহিবে!

[ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)।

হে আকাশ

হে আকাশ! হে অসীম! তুমি আছ যুগ যুগ, লুপ্ত আর সবি!
অচ্যুত-অক্ষয় তুমি! ফোটে ডোবে বক্ষে তব লক্ষ ছায়া-ছবি!

যখন ছিল না কিছু, আগেনিক' সৃষ্টি-ধ্বংস, তুমি ছিলে শুধু!
বাক্যহীন ব্যাপ্তি তব সুপ্ত মহানিশা-মাঝে মরুসম ধূ ধূ!

তার পর কেমনে যে স্তম্ভিত সে স্তব্ধতায় জাগিল ওঙ্কার,
মুখরি সে মহামৌন মন্দ্রি উঠে মুহুর্মুহু মহান্ ঝঙ্কার।

সে মহান্ মন্দ্র-ছন্দে স্পন্দমান কোটি-কোটি জ্যোতি-পরমাণু!
মিলন-বন্ধনে যার জনমিল দীপ্তিমান চন্দ্র-তারা-ভানু!

তোমার অনন্ত-শূন্যে কে জানে কোথায় ছিল এই বিশ্ব-বীজ,
ক্রমে ক্রমে যাহা হ'তে হ'ল পূর্ণ-বিকশিত সৃষ্টি-সরসিজ।

পুরাণ পুরুষ যিনি তুমি তাঁর চির-সঙ্গী, তুমি তনু তাঁর।
তোমারি ব্যাপ্তির বুকে লিপ্ত তাঁর শিব-সত্তা অনন্ত অপার!

এখনো তোমার মাঝে বিরাজিছে যে আদিম স্তব্ধতা নিবিড়!
সৃষ্টি ফুটিবার আগে ছিল যা সর্ব্বাঙ্গে তব প্রশান্ত-গম্ভীর!

অচঞ্চল ধ্যানাবেশে এখনও পাতিলে কাণ, হে বিরাট ব্যোম!
শোনা যায় সে ঝঙ্কার, সে আদিম অনাহত ওম্—ওম্—ওম্!

হে অনন্ত! হে প্রশান্ত! তব নীল-কান্ত রূপে মুগ্ধ মোর মন,
অবিশ্রান্ত দেখিতেছি তবু দেখিবার তৃষা নিত্যই নূতন।

তোমার ও শ্যামতায় অভিব্যক্ত কভু শ্যাম—কখনো বা শ্যামা!
সাধক তোমাতে শোনে দিব্যকর্ণে দেবতার দুন্দুভি-দামামা!

রহস্যের রঙ্গভূমি, বিচিত্রার চিত্রাগার, স্বপ্নের আলয়,
মলিন এ মৃত্তিকার মরণার্ত্ত মানবের অনন্ত-বিস্ময়!

দিনান্তে ডুবিলে রবি ছাইলে ব্যাপিয়া বিশ্ব গাঢ় অন্ধকার
তোমার উদার বক্ষে কে লেখে আলোকাক্ষরে কাব্য চমৎকার?

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক শিল্পী করে সবিস্ময়ে পাঠ,
কেহ না বুঝিতে পারে নিগূঢ় তাহার মর্ম্ম, রহস্য বিরাট!

ধরণীর ধূলি দিয়ে গড়িয়াছি মোরা এই তুচ্ছ খেলাঘর,
কিন্তু সত্য তত্ত্বালোকে তোমার সন্তান মোরা ওগো নীলাম্বর!

তুমি বাহ্য প্রকৃতির অপরূপ লীলা-মঞ্চ প্রদোষে-প্রভাতে
কে আঁকে বিচিত্র-চিত্র আয়ত ললাটে তব নানাবর্ণপাতে?

চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত তব স্বপ্নময়ী শোভা, ওগো মহাকাশ!
মর্ত্ত্য মানবের মনে এনে দেয় নন্দনের সৌন্দর্য্য-আভাস!

কিন্তু কি যে রুদ্র লীলা চলে তব বক্ষ-তলে আসিলে আষাঢ়,
বিদ্যুদগ্নি-শিখা জ্বলে, বজ্র গরজিয়া উঠে বক্ষে বার বার!

লুপ্ত তুমি মেঘে-মেঘে, ঝঞ্ঝা বহে ভীমবেগে, ভয়ার্ত্তা বসুধা!
সেই প্রলয়ের মাঝে তুমি দাও ধরণীরে সঞ্জীবনী সুধা।

উন্মাদিনী প্রকৃতির প্রচণ্ড পীড়ন সেই, ওগো মহাভাগ!
সুনির্ম্মল বক্ষে তব অঙ্কিত করিতে নারে এক বিন্দু দাগ।

হে অব্যক্ত! হে অতল! কি আছে তোমার মাঝে কেহ নাহি জানে,
যুগে-যুগে মানবের কত চেষ্টা কত যত্ন তাহারি সন্ধানে।

সুদূর-বীক্ষণ-যন্ত্র, ব্যোম-যান, বায়ুপোত করিয়া নির্ম্মাণ
জানিতে রহস্য তব আপনার ক্ষুদ্রতায় মোরা ম্রিয়মাণ।

নিনিমেষ নেত্রে চেয়ে অহর্নিশ হে আকাশ কি বলিতে চাও?
অতীন্দ্রিয় ছন্দে-সুরে কোন্ চির-সুন্দরের স্তব-গীতি গাও?

অদৃশ্য তোমারি মাঝে তারা সব ছিল যারা প্রাণাধিক প্রিয়,
চাহিলে তোমার পানে তাই জাগে ব্যথা এক অনির্ব্বচনীয়।

জীবনের জাল ছিঁড়ে আমিও দাঁড়াব যবে মরণের কূলে,
ওগো স্নেহময়ী মাতা নিও চিরশান্তি-কোলে আমারেও তুলে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন (সাহিত্য-বিশারদ)।

জন্ম মৃত্যু এবং……

(গল্প)

কথাটা চলতি।

বাঁধা-ধরা নিয়মে ঘটক আসিয়া পাত্র-পাত্রীর খবর দেয়; তার পর দেখাশুনা, কোষ্ঠী-বিচার ও হিসাব-নিকাশের ফয়শালা চুকিলে পাঁজি দেখিয়া শুভদিনের নির্ঘণ্ট হাতড়াইয়া এক সুতহিবুক যোগে বরযাত্রী লইয়া বর যাত্রা করে; বিবাহে সেই কবিতা, সামিয়ানার নীচে সেই কুশাসন, কলাপাতা, মাটীর খুরি-গেলাস ও প্রচণ্ড কোলাহল; মেয়ে-মহলে ছান্‌লা-তলায় শঙ্খরোলের মধ্যে স্ত্রী-আচার ও শুভদৃষ্টির সমারোহ—বাঙালীর ঘরে শতকরা নব্বইটা শুভবিবাহ এভাবে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া চলিত কথাটা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি! কিন্তু বাকী দশটা বিবাহের মূলে যে বিচিত্র ঘটনা, যে সুমধুর রোমান্সের আমেজ দেখি, তাহাতে ঐ চলিত-কথা না মানিলে চলে কৈ!

এমনি একটা কথা আজ বলিতে বসিয়াছি।

এ বিবাহে ঘটনাচক্র ছিল একটু অসাধারণ রকমের। তা থাকিলেও যে-রোমান্স অতনুর পুষ্পশরে ঝরিয়াছিল…

কিন্তু ভূমিকা রাখিয়া আসল কথা সুরু করা উচিত।

গ্রাম শেয়াখালা। হাওড়া-আমতা-লাইনের ট্রেণের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি বুঝিবেন, এ পথে যাত্রা…

কিন্তু না,—এখান হইতে গল্প সুরু করা চলিবে না। অনেক অবান্তর কথা উঠিতে পারে। সে সব কথা হয়তো দৈনিক সংবাদ-পত্রের এলাকা-ভুক্ত!

রায় বাহাদুর বিনোদশঙ্কর পশ্চিমে দীর্ঘকাল জেলা-জজীয়তীর পর এক দিন চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। অবসর লইয়া তিনি আসিলেন কলিকাতায় এবং ক'মাস কলিকাতায় থাকিবার পর সহসা মনে হইল, দেশের বাড়ী ত্যাগ করিয়া থাকা উচিত হইবে না। দেশ শেয়াখালায়। তখনি বহুকালের পরিত্যক্ত জীর্ণ গৃহের সংস্কার-সাধনে উদ্যোগী হইলেন।

মিস্ত্রী আসিল। ইট-সুরকি-বালি-চুণের তাগাড় জমিল। কাজ শেষ হইতে চায় না। তখন বুঝিলেন, গৃহে মিস্ত্রী ঢুকিলে তারা গৃহ ছাড়িয়া যাইবার নাম করে না বলিয়া যে একটা কথা চলিত আছে, সে-কথা মর্ম্মান্তিক সত্য!

পঞ্জিকায় বহু শুভদিন পাতার পর পাতা উন্টাইয়া সরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রায় বাহাদুর বিনোদশঙ্কর অধীর হইয়া উঠিলেন এবং বাড়ীর অবস্থা যেমন থাকুক,—অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি একটা ভালো দিন দেখিয়া গৃহিণী সরলা ও কন্যা প্রীতিলতাকে লইয়া দাসদাসী-সহ তিনি শেয়াখালা যাত্রা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,—গৃহপ্রবেশ তো হলো! দু'চারটি লোক-জন না খাওয়ালে কি ভালো দেখায়?

রায় বাহাদুর বলিলেন,—সাম্‌নে বড় দিনের ছুটী—তখন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করো!

গৃহিণী কহিলেন,—সত্যি!

প্রীতি কহিল,—কিন্তু এই ইট-সুরকির মধ্যে কোথায় তোমার লোকজন এসে বসবে, বাবা?

বাবা বলিলেন,—এখানে এসে যখন বসেছি, তখন মিস্ত্রীদের সঙ্গে লেগে পড়ে তাদের হাত চালিয়ে কাজ শেষ করে ফেলাবো।

মেয়ে হাসিল।

গৃহিণী কহিলেন,—এবার বাড়ী-ঘর করে থিতু হয়ে বসে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো। বয়স হলো সতেরো—আর ভালো দেখায় না।

রায় বাহাদুর মেয়ের পানে চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন,—এখনো ছোট আছে! এর মধ্যে তাড়া কেন?

এ ঘটনার পর পৌষ মাসে আমাদের কাহিনী সুরু।

২

বড় দিনের ছুটীতে শেয়াখালার মিস্ত্রীরা রায় বাহাদুরের বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না! গৃহিণী তাগিদ দিলেন; মেয়ে প্রীতিলতা গুম্ হইয়া রহিল। চারি দিকে ভারার বাঁশ খাটানো—চুণ-সুরকির জঞ্জাল—

এমন করিয়া ধূলা মাখিয়া মানুষ থাকিতে পারে? জন-মানবের মুখ দেখিবার উপায় নাই! মেয়ে বলে,—বনবাসে এসেছি! গৃহিণী বলেন,—সত্যি!

অগত্যা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিতে হইল। এবং বড় দিনের প্রভাতে বাড়ী একেবারে লোকের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল।

অতিথিদের দলে আসিয়াছিল হিমাংশু। হিমাংশুর বাবা সুধাংশু বাবু হাইকোর্টের মস্ত এ্যাডভোকেট; রায় বাহাদুরের বাল্যবন্ধু। সুধাংশু বাবুর শরীর খারাপ—তাই হিমাংশু আসিয়াছে তাঁর প্রতিনিধি-স্থলাভিষিক্ত হইয়া। হিমাংশু এম-এ পাশ করিয়া আইনের দুটা পরীক্ষার ধাপ্‌ টপ্‌কাইয়া তৃতীয় পরীক্ষার ধাপে দাঁড়াইয়াছে।

রায় বাহাদুর যখন কলিকাতায় ছিলেন, হিমাংশু তখন অনেক বার সে-বাড়ীতে গিয়াছে। প্রথমবারে সে যায় পিতার আদেশে কি একটা কাজে—গিয়া প্রীতিকে দেখে। সেই দেখার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর উপর তার এমন আকর্ষণ জন্মিয়া গেল যে, কারণে-অকারণে এখানে আসা থামাইতে পারিল না। প্রীতির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হইত চায়ের টেবিলে। কথা হইত খুব কম। কথা কহিবে, খুব ইচ্ছা—কিন্তু প্রীতি আসিয়া সামনে দাঁড়াইলে তাহার মাথা যেন মাটীতে লুটিয়া পড়িত; কি কথা কহিবে, ভাবিয়া পাইত না! কাজেই রায় বাহাদুরের সঙ্গে বাজার-দর লইয়া আলোচনা এবং কখনো তাঁকে খুশী করিবার জন্য বড়বাজারের লোহাপটীতে ঘুরিয়া জয়েষ্ট আর টীর দর যাচাই করিয়া আসিয়া তাহার রিপোর্ট পেশ করিত।

লোহার চাপে মনের বাসনা-প্রার্থনা কি ভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, গৃহে ফিরিয়া সেই কথা ভাবিয়া তার পরিতাপের সীমা থাকিত না।

গৃহে বসিয়া ভাবিত, প্রীতি আসিয়া চায়ের টেবিলে বসিলে সদ্য-দেখা মরিশ শেভালিয়র ফিল্মের কথা সে পাড়িয়া বসিবে; বালী-ব্রিজ-রচনায় অসাধারণ আয়োজনের কথা তুলিবে; এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়া বলিয়া বসিবে,—একদিন চলুন, সকলে দেখিয়া আসিবেন।

কিন্তু বিভ্রাট ঘটিত—অদৃশ্য দেবতার নির্ম্মম ইঙ্গিতে! রায় বাহাদুরের গৃহে বসিয়া সে দেখিত, রায় বাহাদুর মিস্ত্রীর হিসাব লইয়া সরকার শ্রীপতি বাবুর সঙ্গে মহা তর্ক বাধাইয়া দিয়াছেন। তাকে দেখিবামাত্র রায় বাহাদুর আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন—ত্যাখো তো হিমাংশু, শ্রীপতির শুধু তর্ক! পাঁচ হন্দর রঙ এসেছে—তাতে সমস্ত খড়খড়ি-জানলার কাজ কেন হবে না? আমার বিশ্বাস, ওর ষড় আছে মিস্ত্রীদের সঙ্গে!···আমারো যেমন হয়েচে—দেখবার লোক কেউ নেই···ওরা তেমনি দাঁও পেয়ে বসেচে! ত্যাখো তো বাবা···

মনের সঙ্গে হিমাংশুর অমন করিয়া বুঝাপড়া কোথায় যে অন্তর্হিত হইত! বেচারা আইনের বই লইয়া আইনের চর্চ্চা করে—রায় বাহাদুরের চিত্ত-লাভের বাসনায় ডুম্‌ করিয়া শুভঙ্করী কষিতে বসিয়া যাইত। রায় বাহাদুরের সঙ্গে শেয়াখালায় আসিয়া মিস্ত্রীদের কাজ দেখিতেও ত্রুটি রাখিত না! এমনি করিয়া প্রীতির প্রণয়-তপস্যায় বিঘ্নের পর বিঘ্নেরই সৃষ্টি হইয়াছে! নিজের মনের কোনো পরিচয় প্রীতির সামনে সে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে নাই।

সে ভাবিত, প্রীতি হয়তো ভাবে, হিমাংশু আর দশজন বাঙালী ছাত্রের মত পড়ার কেতাব লইয়াই আছে। তার মনের প্রসার যে কতখানি···হায়রে!

আজ গান-গল্প খাওয়া-দাওয়া চুকিতে রাত্রি হইয়া গেল। অতিথিদের মধ্যে যাঁদের মনে কোনো বাসনা ছিল না, তাঁরা যথাসম্ভব তাড়া দিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লাষ্ট ট্রেণে শেয়াখালা ত্যাগ করিয়া গেলেন। যাঁরা স্ত্রীপুত্র সহ আসিয়াছেন, শীতের রাত্রিটা তাঁরা পথে বাহির হইতে চাহিলেন না; রহিয়া গেলেন। হিমাংশু সচেতনভাবে নিজেকে রায় বাহাদুরের হিসাব-নিকাশে এমন মগ্ন রাখিল যে কলি-কাতা-যাত্রী লাষ্ট ট্রেণের সময় কাটিয়া যাইবার পরে সহসা মুখ তুলিয়া স্বরে রাজ্যের অসহায়তা ভরিয়া বলিয়া উঠিল—লাষ্ট ট্রেণের সময় চলে গেছে?

রায় বাহাদুর কহিলেন—বহুক্ষণ।

হিমাংশু কহিল,—উপায়?

রায় বাহাদুর কহিলেন—জলে পড়োনি তো! রাত্রিটা এখানে থেকে যাও।

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে হিমাংশু কহিল—আপনাদের এই সব অগোছালোর মধ্যে···

রায় বাহাদুর কহিলেন—বিছানা দিতে পারবো। তবে কোনোমতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা! আরাম পাবে না. না হোক, একটা রাত্রি বৈ নয়!

হিমাংশুর বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল! সে মাথা নামাইল,—মনের আনন্দ মুখ-চোখের কোনো ভঙ্গীতে না প্রকাশ পায়!

রায় বাহাদুর কহিলেন—পাশে ঐ ছোট ঘর—কতকগুলো জিনিষ ঠাশা আছে। তা হোক, ঐ ঘরে থেকো। ছোট স্প্রিংয়ের খাট একটা আছে। তাতে নানান জিনিষ ডাঁই হয়ে আছে। নামিয়ে নেবে'খন। ও-ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকে লালু। সে না হয় আজ অন্য কোথাও শোবে। একটা রাত!...

হিমাংশু ভাবিতেছিল, একটা রাত্রি কি! সে যে-আশায় এখানে আসিয়াছে...যে-স্বপ্ন এই ক'মাস ধরিয়া তাকে উদ্‌ভ্রান্ত রাখিয়াছে...

এখানে আজ এমন ভিড় লাগিবে, তা সে জানিত না। জানিলে হয়তো আসিত না! এ ভিড়ে প্রীতিলতার সঙ্গে আলাপ—অসম্ভব! তাই ভাবিতেছিল, না হয় দুদিন থাকিয়া যাইবে। এবং সে দুদিনে রায় বাহাদুরের মিস্ত্রীর কাজকর্ম দেখিয়া, তদ্বির করিয়া—অর্থাৎ যেমন করিয়া হোক—কোনো ছলে...

রাত্রিটা থাকিয়া যাইবার ব্যবস্থা তো হইল! কিন্তু...

সে নিশ্বাস ফেলিল। বুকের মধ্যে তরঙ্গ তুলিয়া বহিতে লাগিল রবীন্দ্রনাথের দুই ছত্র কবিতা,—

> পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো এ কি সন্ন্যাসী,
> বিশ্বময় দিয়াছ তারে ছড়ায়ে!

৩

এক-তলায় সিঁড়ির কোণে ছোট ঘর। একখানা স্প্রীংয়ের খাট আছে—তার উপর ছোবড়ার গদি। গদির উপর একখানা সুজনি পাতা; দুটা বালিশও আছে। ঘরে একটা মাত্র খড়খড়ি; এখনো তাহাতে রঙ বসে নাই। দেওয়ালের গায়ে একটা আলমারি। ঘরে ঢুকিবার দ্বার একটিমাত্র—দ্বারটা নীচু।

রায় বাহাদুর নিজে আসিয়া ঘর দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন—মাথা নীচু করে এসো,...নাহলে মাথা ঠুকে যাবে।

কথাটা সত্য! ভাগ্যে রায় বাহাদুর বলিয়া দিলেন, নহিলে...

হিমাংশু ঘরে আসিল। রায় বাহাদুর হারিকেনটা মেঝেয় রাখিয়া বলিলেন—একটু হুঁশিয়ার হয়ে শুয়ো, বাবা... খড়খড়ির রঙ নেই। তা শীতের রাত—খুলে শুতে হবে না। ঘরে আর জানলা নেই। যদি গরম বোধ করো, খড়খড়ির পাখি খুলে দিয়ো। দরজা বন্ধ করে শুয়ো। চোরের ভয় আছে। দুটো attempt হয়ে গেছে—কিছু নিয়ে যেতে পারেনি অবশ্য!...পাড়াগেঁয়ে চোর—প্রাণে ভয় আছে! এ ঘরটায় পরে লালুই শোবে। আগে সব কাজ শেষ হোক্!...

হিমাংশু চুপ করিয়াছিল...সহসা ঘরে প্রবেশ করিল প্রকাণ্ড কুকুর। কুকুর নয়, যেন বাঘ! কুকুরটা আসিয়া সন্দিগ্ধভাবে হিমাংশুর গায়ের ঘ্রাণ লইবার বাসনায় একেবারে তার অঙ্গে নাসাগ্র স্থাপন করিল। ভয়ে হিমাংশু একেবারে...

জিমি তার পানে চাহিল। রায় বাহাদুর কহিলেন—ফ্রেণ্ড! পরে হিমাংশুর পানে চাহিয়া কহিলেন—ভয় নেই। কিছু বলবে না। ও-ও এই ঘরে রাত্রে পড়ে থাকে। ভালো জাতের কুকুর—আলশাটিয়ান্ হাউণ্ড। মরিশন সাহেব ছিল চাম্পারাণের কমিশনার—এতটুকু বাচ্ছা যখন, প্রীতিকে দিয়েছিল তার মেম!...হারিকেন রইলো ঘরে। যে-মেহনৎ গেছে সারাদিন, এক ঘুমেই রাতটুকু কেটে যাবে'খন! যদি দরকার বোঝো, সামনের ঐ প্যাশেজে লালু থাকবে—ডেকো।...খড়খড়ির পাখি খোলা থাক্। শুয়ে পড়ো... আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারো...তোমার মর্জ্জি! মুস্কিল, বৈঠকখানা ঘরে অবিনাশ তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুচ্ছে—না হলে ঐ ঘরেই তোমায় শুতে দিতুম। ঘর তো এখনো সব হয়ে ওঠেনি—একটু অসুবিধা। এমনি উপদেশ দিয়া রায় বাহাদুর বিদায় লইলেন।

হিমাংশু খাটে বসিল। জিমি কুকুর তার দীর্ঘ দেহ প্রসারিত করিয়া মেঝেয় শুইয়া পড়িয়াছে!...আতঙ্ক হয়! এই বাঘটাকে ঘরে লইয়া শোওয়া!

উপায় কি? তপস্যায় এর চেয়ে কত বড় বড় বিঘ্ন... বাঘ, সিংহ, ভূতপ্রেত-রাক্ষস অবধি আসিত যে! পুরাণের পাতাগুলা মনের উপর জ্বল-জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল।...

উঠিয়া সে খড়খড়ির পাখি খুলিয়া দিল, পরে দ্বার ভেজাইয়া হারিকেনের আলো ক্ষীণ করিয়া বিছানায় শুইয়া গায়ে লেপ টানিয়া দিল।···

মিষ্টান্ন ফেলিয়া রাখিলে নিমেষে কোথা হইতে যেমন অসংখ্য পিপীলিকা আসিয়া তাহা ছাইয়া ধরে, শয়ন মাত্রে নানা চিন্তা আসিয়া তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। সে-চিন্তা ঐ প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া···

তারপর এমনি চিন্তার মধ্যে কখন যে দুই চোখে নিদ্রা আসিয়া আসন পাতিয়া বসিল···

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ভয়ের চমকে! যেন বাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া ঘাড়ে পড়িয়াছে! জাগিয়া হারিকেনের স্তিমিত আলোয় চাহিয়া হিমাংশু দেখে, জিমি কুকুর তার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া ভূমিশয্যা ছাড়িয়া তার খাটে একেবারে তার লেপের উপর চড়িয়া বসিয়াছে···জিমির নিশ্বাসের স্পর্শ গায়ে লাগিতেছে! ভয়ে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া জিমিকে তার জায়গায় বাহাল রাখিয়া কম্পিত চিত্তে হিমাংশু আবার চক্ষু মুদিল।

৪

তারপর বোধ হয় এক ঘণ্টা কাটিয়াছে।

চারিদিক নিশুতি। মাঝে মাঝে দু-একটা পথের কুকুর তাদের অতৃপ্তি আর হিংসা জানাইতেছে দূরে কর্কশ চীৎকার তুলিয়া···

জিমির ডাকে হিমাংশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া সে দেখে, ভেজানো দ্বারে দুই পা তুলিয়া জিমি যেন বাহিরের দিকে কিসের সন্ধান করিতেছে!

অর্থ না বুঝিয়া হিমাংশু ডাকিল,—জিমি···

ভীত আহ্বান! জিমি সাড়া দিল ভৌ···সাড়ায় অত্যন্ত তাচ্ছল্যের ভাব। সঙ্গে সঙ্গে দ্বার গেল খুলিয়া এবং হিমাংশুর বিস্মিত নয়নের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল তার স্বপ্নের প্রতিমা প্রীতিলতা!

আলুথালু বেশ···মাথার কবরী ত্রস্ত। প্রীতির মুখে-চোখে আতঙ্ক ও উদ্বেগ!

হিমাংশু স্তম্ভিত! স্বপ্ন নয় তো? প্রীতি ডাকিল—লালুদা···

হিমাংশু লেপ ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। না, স্বপ্ন নয়!

ভীত চোখের দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে বুলাইয়া প্রীতি আবার ডাকিল,—লালুদা···

হিমাংশু কহিল—কি হয়েচে?

প্রীতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তার বিবর্ণ মুখে দ্বিধা ও সংশয়! সে কহিল,—আপনি! আমি লালুদাকে খুঁজচি। লালুদা এখানে শোয়···

হিমাংশু কহিল,—আজ আমি এখানে শুয়েচি···

—লালুদা কোথায়? লালুদা?···প্রীতি নিশ্বাস ফেলিল। স্তব্ধ ঘরে সে-নিশ্বাস···

জিমি যেন প্রীতিকে ছাড়িবে না! তার গা ঘেঁষিয়া সে নিজেকে সঁপিয়া দিতে চায়···

প্রীতির স্বরে নৈরাশ্য! সে গমনোদ্যত হইল। হিমাংশু খাট হইতে নামিয়া কহিল,—কি হয়েছে, আমাকে বল্‌বেন না?

প্রীতি কহিল,—চামচিকে!

—চামচিকে?

হিমাংশু যেন নাই! তার স্বরে এমনি বিস্ময়!

প্রীতি কহিল,—হ্যাঁ। আমার ঘরে।

হিমাংশু কহিল,—বলেন কি! তা, সে কি কর্‌চে?

প্রীতি কহিল,—ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার গায়ে পড়েছিল দু'বার! ওঃ···

প্রীতি শিহরিয়া উঠিল।

হিমাংশু কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মত রহিল। এমন বিপদে মানুষ কখনো পড়িয়াছে বলিয়া তার জানা নাই!

প্রীতি কহিল,—মশারি ফেলে শুই না। দোতলায় সিঁড়ির পাশে আমার ঘর। বাবাকে ডাকতে পার্‌লুম না! হঠাৎ তাঁর ঘুম ভাঙ্গলে বুকে হাঁফ ধরে। তাই নীচে এলুম··· লালুদাকে ডাকতে। আধ ঘণ্টা ধরে তাড়াবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু···

প্রীতি হাঁফাইতেছিল। শ্রান্তির নিশ্বাস! সে ভীত নিশ্বাসে প্রীতির অঙ্গে-অঙ্গে যে অপরূপ ছন্দ নাচিয়া চলিয়াছে···দেখিয়া হিমাংশু মুগ্ধ, বিহ্বল!

প্রীতি বলিল—লালুদাকে এখন কোথায় পাই? কোথায় শুয়েচে? জানতুম না, আপনি এ ঘরে আছেন। মিছিমিছি আপনার ঘুম ভাঙ্গালুম···

হিমাংশুর মনে দ্বাপর যুগের অর্জ্জুন জাগিয়া উঠিলেন! দৈত্যের ভয়ে স্বর্গের দেবী আসিয়াছেন···

সে কহিল,—না, না,—আমি রাত্রে বড় ঘুমোই না...

কথাটা নিজের কাণেই কেমন ঠেকিল! রাত্রে ঘুমাও না? কখন তবে ঘুমাও বাপু? দিনের বেলায়?

সে কহিল,—আমি দেখবো চেষ্টা করে?

জিমি তখন প্রীতিকে দুই পা দিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছে···

প্রীতি বিরক্ত হইয়া তার মাথায় ছোট চড় দিয়া বলিল,—ছাড়্, ছাড়্ হতভাগা···তার পর হিমাংশুর পানে চাহিয়া কহিল,—যদি পারেন, দেখবেন?

সে স্বরে কি কাকুতি! হিমাংশুর জীবন সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল।

সে কহিল,—চলুন···

প্রীতির হাতে বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছে। প্রীতির সঙ্গে হিমাংশু আসিল সিঁড়ি বহিয়া দোতলায় প্রীতির ঘরে। জিমিও সঙ্গে আসিল।

ঘরে বহু আসবাব—ড্রেসিং টেবল, আলমারি, বইয়ের শেল্‌ফ্, আন্‌লা···আন্‌লায় অনেকগুলা শাড়ী; কড়ির সঙ্গে শিক-লাগানো তক্তা—তাহার উপর কতকগুলা বিছানাপত্র।

হিমাংশু কহিল,—শোবার ঘরে এগুলো···

প্রীতি কহিল,—আপাততঃ আছে। সব ঘর তৈরী হয়ে গেলে থাকবে না। যে-কষ্টে সকলে এখন আছি!···কিন্তু কোথায় গেল, বলুন তো?

হিমাংশু চারিদিকে চাহিল,—ঝুঁকিয়া খাটের নীচে অবধি দেখিল। নাই! চামচিকা নাই!

সে কহিল,—আপনি নীচে যাবার সময় দরজা খুলে রেখে গেছলেন তো? খড়খড়িও খোলা ছিল?

প্রীতি কহিল,—সব খড়খড়ি খুলে দিয়ে ছিলুম···তবু যায় না! কি পাজী···বলুন তো! কোথাও লুকিয়েচে নিশ্চয়···

হিমাংশু কহিল,—হয়তো পালিয়ে গেছে! তাই হবে।

সে বাহিরের দিকে চাহিল। আকাশে একরাশ নক্ষত্র··· চাঁদ নাই।

হিমাংশু কহিল—যে গাছপালা, চামচিকে আসবে, সে আর বিচিত্র কি! তা, জিমি আপনার ঘরে থাকুক···যদি বেরোয়, ওস্তাদ-কুকুর···ঠিক কাবু করবে!···

সে জিমির পানে চাহিয়াছিল। জিমির বহিয়া গিয়াছে চামচিকার জন্য মাথা ঘামাইতে! সে প্রীতির গা ঘেঁষিয়া মাথা নাড়িতেছিল। তার অঙ্গের সুরভি-গ্রহণে মশ্‌গুল!

হিমাংশুর সারা অন্তর চূর্ণ করিয়া ব্যথার নিশ্বাস··· হায়রে! হিমাংশু না হইয়া সে যদি জিমি হইত!

প্রীতির চোখে অধীর সন্ধানী দৃষ্টি! সমস্ত মন সেই একটা চামচিকার দিকে! সে কহিল—ঠিক যেমন শোবো, অমনি এসে আবার উৎপাত বাধাবে! কি মুস্কিল হলো, বলুন তো! রাত এই সবে একটা বেজেছে!

হিমাংশু কি ভাবিতেছিল, কহিল—দেখুন, একটা বইয়ে আমি পড়েছিলুম—চামচিকে তাড়াবার উপায়···

দুই চোখের সাগ্রহ ব্যাকুল দৃষ্টি হিমাংশুর মুখে স্থাপিত করিয়া প্রীতি কহিল—কি বইয়ে? কি উপায়?

হিমাংশু ভাবিল, অনেক ভাবিল, মাথায় আঙুলের টোকা মারিয়া অনেক চিন্তা করিল; শেষে বলিল—হ্যাঁ, মনে পড়েচে। বইখানার নাম মনে পড়্‌চে না, তবে উপায় মনে পড়েচে! সে বইয়ে লিখেচে, ঘরের দোর-জানলা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবে। তাতে চামচিকের বিশ্বাস হবে, তাকে শীকার করার ঝোঁক আর নেই, তখন সে আবার ওড়া সুরু করবে—সেই সময় ধাঁ করে দোর-জানলা বা খড়খড়ি খুলে দেওয়া···রাস্কেল চামচিকে বেরিয়ে যাবার পথ পাবে না।

কেহ ডুবিতেছে, এমন সময় সামনে ভেলা দেখিলে তার যেমন আনন্দ হয়, তেমনি আনন্দে প্রীতি কহিল—তাই করলে তো হয় আমাদের···

কথার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারটা সজোরে সে চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল; দিয়া খড়খড়ি চারিটাও···

হিমাংশু কহিল—আমি বন্ধ করচি···

—বেশ, দুজনে মিলে বন্ধ করি, আসুন···

খড়খড়ি বন্ধ হইল। তারপর প্রীতি কহিল—আলোটা নিবিয়ে দিই?

—দিন।

—দাঁড়ান···দিয়াশলাইটা আগে হাতে রাখি।

বালিশের তলায় ছিল দিয়াশলাই। সেটা হাতে লইয়া একটি ফুৎকারে প্রীতি বাতি নিবাইয়া দিল।

প্রীতির ফুৎকার···তার মুখে বাতির রশ্মি যে আভা

বিস্তার করিল, সে-আভা হিমাংশুর মনটাকে যেন সোনার রঙে রাঙাইয়া দিল !

তারপর অন্ধকার ঘর···সে অন্ধকারেও প্রীতির মুখের সে দিব্য বিভা জ্বলজ্বল করিতে লাগিল···হিমাংশুর চোখে ধাঁধা লাগিল।

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট···পনেরো মিনিট চুপ-চাপ !

চামচিকার দেখা নাই !

হয়তো তারো কৌতুক লাগিয়াছিল ! কিন্তু সে রহস্যের মীমাংসা করুন জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ! যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা তাহাই বলি।

হিমাংশু কহিল—চামচিকে তাহলে নেই ! চলে গেছে।

—বাঁচলুম।

—আমি আসি।

—দাঁড়ান, আলো জ্বালি। নাহলে দোরে কি আল-মারিতে মাথা ঠুকে যেতে পারে !

প্রীতি আবার বাতি জ্বালিল। এবং সারা বুক আলোয় আলো করিয়া হিমাংশু দ্বার খুলিল।

প্রীতি কহিল,—সিঁড়িতে অন্ধকার। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি···

দুজনে ঘরের বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিতে হিমাংশু দেখিল, সিঁড়ির নীচে কে দাঁড়াইয়া আছে ! চিনিল, সরকার শ্রীপতি। শ্রীপতির সঙ্গে চোখের দৃষ্টি মিলিল। শ্রীপতির চোখে কেমন হতভম্ব ভাব ! শ্রীপতি তার ঘর হইতেই বাহির হইয়াছে। হিমাংশুর বুকটা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল। কেন সে ঘরে নাই ? কেন সে এখানে ? প্রীতির কাছে ? বোধ হয়, এ ব্যাপারের অর্থ বলিবার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু শ্রীপতি ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল। তার চোখে হিমাংশু যে-দৃষ্টি দেখিল···

বুকে একটু আগে যে আলোর আভা জাগিয়াছিল, সে আভা ও-দৃষ্টির কালিতে মুছিয়া গেল !

হিমাংশুকে তার ঘরে পৌঁছাইয়া প্রীতি ফিরিয়া দোতলায় উঠিল। হিমাংশু ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ থ হইয়া খাটের সামনে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে-ছিল। অগত্যা খাটে শুইয়া গায়ে লেপ চাপা দিল।

৩

ঘুম কি হয় ! যে সোনালি ছোপ্ মনে লাগিয়াছে !···

কেবল প্রীতির চিন্তা···মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে ! বুকে যেন কে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। সে ঝাঁজে ঘরও তাতিয়া আগুন ! দম যেন বন্ধ হইয়া যায় ! উঠিয়া সে খড়খড়ি খুলিয়া দিল।

তার পর চিন্তা। চিন্তার মধ্যে একটু তন্দ্রা আসে, অমনি কোন্ মায়া-স্বপ্নের নন্দন হইতে হাওয়ায় ভর দিয়া মনে আসিয়া দাঁড়ায়, প্রীতি ! কি অপরূপ তার বেশ ! কি মধুর তার মূর্তি ! কবরী-বন্ধ শিথিল··শাড়ীর আঁচলখানি কিভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছে···চাঁপার বরণ গ্রীবা···কপালের উপর কয়েক গাছা চূর্ণ কুন্তল ঘামে ভিজিয়া ল্যাপ্‌টাইয়া আছে···চোখে আতঙ্ক···!

এই স্বপ্নের মধ্যে একটু ঘুম···

সে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল প্রীতির আহ্বানে,—হিমাংশুবাবু···

না, সে চোখ খুলিবে না। স্বপ্ন ! চমৎকার স্বপ্ন ! যেন প্রীতি আসিয়া তাকে ডাকিতেছে—আমায় বাঁচান, বাঁচান হিমাংশু বাবু···প্রীতি যেন তার সামনে নতজানু হইয়া বসিয়াছে—অঞ্জলিবদ্ধ দুই করপুট···চোখের দৃষ্টিতে মিনতি···

না, না, এ স্বপ্ন না ভাঙ্গে !

তবু সেই স্বর—হিমাংশু বাবু···হিমাংশু বাবু···

মধুর ! মধুর ! মধুর ! সত্য যদি স্বপ্ন হইত এবং সত্য স্বপ্ন ! হয় না ?

অবশেষে ছোট একটু ধাক্কা···করের স্পর্শ !

হিমাংশু চোখ মেলিল ; মেলিয়া দেখে, স্বপ্ন নয়··· প্রীতি।

লেপ ফেলিয়া হিমাংশু ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, কহিল, —কি হয়েছে ?

প্রীতি কহিল,—আবার সেই উৎপাত !

—তার মানে ?

—চামচিকে।

—সেইটে ? না, আর একটা ?

প্রীতি কহিল,—তা তো চিনতে পারচি না। সব একই রকম দেখতে যে !

হিমাংশু প্রমাদ গণিল। তাই তো! তার পর কি মনে হইল, বলিল,—যা বলেচেন। চেনা শক্ত! আমি জানি। শুধু চামচিকে চেনা যায়। তা নয়! চীনেম্যানও। সকলের মুখগুলো এমন এক রকমের যে চেনা দায়! একবার আমায় ঠকিয়ে গিয়েছিল একটা চীনেম্যান, চায়না-শিল্ক বেচতে এসে। তার পর আর-একটা চীনেম্যান যেমন আর এক দিন শিল্ক এনেছে, আমি তাকে চেপে ধরলুম; বল্লুম, জোচ্চোর! সত্যি, শেষের লোকটা কিন্তু আগের চীনেম্যান নয়—তবু মুখ এক রকমের কি না! তাই চিনতে পারিনি। চেনবার উপায় নেই। নিজেরা ওরা কি করে পরস্পরকে চেনে, আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়…কিন্তু চীনেম্যানের কথা যাক! চামচিকের কথা যে বল্‌চেন,…উৎপাত! এটাও কি খুব ওড়া সুরু করেচে?

সকাতরে প্রীতি কহিল,—হ্যাঁ। পাঁচ-সাত বার গায়ে পড়েচে…জিমি লাফালাফি করলে—তবু এ শায়েস্তা হয় না। আপনার কথামত আলো নেবালুম,—দোর জানলা বন্ধ করলুম। ওড়ে। অমনি দোর-জানলা খুললুম। তবু বেরুতে চায় না! মহা মুস্কিল। ঢং ঢং করে সবে এই দুটো বাজচে!

প্রীতির সুরে গভীর হতাশার ভাব! হিমাংশু কহিল,—হুঁ! উপায়?

প্রীতি কহিল,—আর একবার দয়া করে আসবেন? সত্যি, আপনাকে ঘুমোতে দিচ্ছি না,—লজ্জা করচে… কিন্তু উপায় কি, বলুন?

হায়রে, ঘুমাইতে সে চায় না। তুমি কি জানিবে দেবি, এই চামচিকাকে হিমাংশু মনে মনে কত ধন্যবাদ দিতেছে!

প্রীতি কহিল,—আসবেন?

—নিশ্চয়।

আবার সেই সন্ধান…সেই দীপ-নির্ব্বাণ…সেই দ্বার-জানালা বন্ধ করা…

চামচিকা দেখা দিল না!…দু'জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল…নিশ্বাস বন্ধ করিয়া…উদ্‌গ্রীব…উৎকর্ণ…

হিমাংশুর মনে হইল, ঐ না—ডানার শব্দ!…সে ছিল দ্বারের পাশে দ্বারের হাতল ধরিয়া। যেমন চামচিকা দেখিবে, অমনি…

ঠিক…ভুল নয়! ডানার শব্দ! হিমাংশু দ্বারের হাতল ধরিয়া হড়াৎ করিয়া টান্ দিল…

দ্বার খুলিল না। হাতলটা ছিল পুরানো—সমূলে উপড়াইয়া হিমাংশুর হাতে রহিয়া গেল এবং সে প্রচণ্ড টানের বিপরীত ধাক্কায় সশব্দে ঘরের মেঝেয় সে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল।

প্রীতি কহিল,—পড়ে গেলেন!

প্রীতি দিয়াশলাই জ্বালিল। বাতি জ্বলিল। হিমাংশু ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রীতি কহিল,—কি হলো?

হাতে দ্বারের হাতল; হাতল দেখাইয়া হিমাংশু কহিল,—হাতলটা উপড়ে বেরিয়ে এলো।

প্রীতি কহিল,—লাগিয়ে দিন। দিয়ে দোর খুলুন…

—খুলি…

হিমাংশু চেষ্টা করিল। বহু চেষ্টা! কিন্তু সে হাতল আর বসিবার নয়! প্রীতি কহিল,—হলো না?

—না!

—দরজা খুলবেন কি করে?

হিমাংশুর মুখ বিবর্ণ…মনে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! নাকে-মুখে ঝাঁজ! সে বলিল,—দেখি।

—দেখুন। প্রীতির চোখে দারুণ উদ্বেগ!

দ্বার ধরিয়া বহু টানাটানি…সদ্য রঙ-দেওয়া দরজা—কাপে কাপে কপাট দু'খানা এমন চাপিয়া বসিয়াছে, কার সাধ্য ভিতর দিক্ হইতে টানিয়া খোলে! উপরে ছিট্‌কিনি ছিল; সেটা ধরিয়া টানাটানি করিল…তবু সে খুলিল না। দ্বার যেন পণ করিয়াছে…কি যেন তার অভিসন্ধি…বিদ্রোহ! দ্বার খুলিল না।

প্রীতি বিরক্ত হইল। ঝাঁজিয়া সে কহিল,—কি করে এখন বাইরে যাবেন?

হিমাংশু ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—তাই ভাবচি।

প্রীতি কহিল,—ভাবচেন কি! দোর খুলুন, যেমন করে পারেন! বাঃ! রাত্রে এ-ঘরে আপনার থাকা হতে পারে না।

দারুণ উদ্বেগে ভয়ে-দ্বিধায় জড়িত স্বরে হিমাংশু কহিল,—না, না—তা হতে পারে না!

কিন্তু উপায় ?

দুশ্চিন্তায় দু'জনে ঘামিয়া সারা। ঘরের বদ্ধ-বাতাস যেন পাথরের মত দু'জনের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। প্রীতি তাড়াতাড়ি খড়খড়ি খুলিয়া দিল।

হিমাংশু কহিল,—ঐ খড়খড়ি দিয়ে বেরোনো যায় না ? নীচে লাফিয়ে পড়বো !

প্রীতি শিহরিয়া উঠিল ; কহিল,—ক্ষেপেচেন ! তা কি হয় ? সব খড়খড়িতে লোহার মোটা রড···

হুঁ !...একবার দেখি, বেঁকিয়ে গলতে পারি কি না !

ভীত স্বরে প্রীতি কহিল,—না ! না ! শেষে একটা বিপদ বাধাবেন হাত ভেঙ্গে !

উপায় ?

নিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশু আসিয়া খোলা খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইল। বাহিরে এক-আকাশ নক্ষত্র···ঐ গাছপালা···সব যেন নিথর ! তাদের নিরুপায় অসহায়তার কথা ভাবিয়া প্রকৃতিও যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে !

সহসা নিশ্বাসের শব্দ ! প্রীতির নিশ্বাস ! হিমাংশু ফিরিয়া চাহিল। প্রীতি খাটে হেলান্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে···

হিমাংশু সে মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। অপরাধের কুণ্ঠায় তার মাথা নত হইয়া গেল। কিন্তু কি তার অপরাধ, ভগবান্ ?

প্রীতি কহিল,—খড়খড়ির ধারে শুধু ঐ গেঞ্জি-গায়ে দাঁড়াবেন না। শীতের রাতি ! বাইরে যাবার উপায় যখন নেই···

হিমাংশুর মন কোন্ পাতালের রন্ধ্রে নামিয়া চলিয়াছিল ; প্রীতির এ-কথায় সহসা সে গতি রুদ্ধ হইল। মন দুলিতেছে—দুলিতেছে···সেই পুরাণের রাজা ত্রিশঙ্কুর মত··· শূন্যে !

প্রীতি কহিল,—আপনি ঐ বড় ট্রাঙ্কটা টেনে তাতে না হয় শুয়ে পড়ুন। রাতটা তো কাটাতে হবে। এই নিন র‍্যাগ...ভোরে বাইরে থেকে দরজা ঠেলিয়ে খোলাতে হবে···

এ কথায় মনে শক্তি জাগিল। সে কহিল,—আপনি নির্ভয়ে শুয়ে থাকুন। আমার জন্য ভাববেন না ! আমি বসে চৌকি দেবো'খন—চামচিকে আসবে না···

এই ব্যবস্থাই হইল।

বসিয়া প্রীতির পানে চাহিয়া থাকা···সে তো ভাগ্য···

কিন্তু নিদ্রা—মমতাময়ী নিদ্রা আজ কঠিন বিরূপ··· হিমাংশু নিদ্রা চায় না···

তবু দুই চোখ ঘুমে জড়াইয়া মুদিয়া আসে। জোর করিয়া হিমাংশু জাগিয়া চাহিয়া থাকিতে চায় ! আকাশের রঙ বদলাইয়া চলিয়াছে···মুহুর্মুহু ! ঐ নক্ষত্র দলে কি যেন কাণাকাণি ! দুটা নক্ষত্র সরিয়া গেল···ওদিকে আর দুটা আসিয়া আকাশের আসরে বসিল।

এমন করিয়া রাত্রির দৃশ্য হিমাংশু পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই ! সুন্দর !

সহসা ঝন্-ঝন্ শব্দ !···নীচে ? তাই !

চমকিয়া হিমাংশু উঠিয়া দাঁড়াইল ; খোলা খড়খড়ির ধারে আসিল। চারিদিক আবার স্তব্ধ !

—কি হিমাংশু বাবু ?

চমকিয়া হিমাংশু ফিরিল। বালিশের উপর মাথা তুলিয়া প্রীতি প্রশ্ন করিল।

হিমাংশু কহিল,—বাসন পড়লো যেন—না ?

—তাই।···কিন্তু আপনি সেই অবধি ঠায় জেগে আছেন ?

প্রীতির দৃষ্টিতে অপ্রতিভ ভাব ! মৃদু হাসিয়া হিমাংশু কহিল,—না।

—এই শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ?···আমারো ভাঙ্গলো···

হিমাংশু কোনো কথা বলিল না, মৃদু হাসিল।

প্রীতি কহিল,—খুব নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন ! সারা জীবন এ-রাত্রের কথা মনে থাকবে···কি বলেন ?

হিমাংশু হাসিল। প্রীতি কহিল,—রাত্তির কত ?

হিমাংশু কহিল,—চারটে বাজলো।

প্রীতি কহিল,—আপনি ঘুমোন।

হিমাংশু কহিল,—কিন্তু···

—বুঝেছি। ভাববেন না। একটু বিশ্রী তো দেখাবে তা, উপায় কি ? তবে হ্যাঁ বাড়ীর আর সকলের আগে ওঠে বিন্দুর মেয়ে সিন্ধু। সে এসে আমায় ডাকে। তাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাই আমি সকালে। সে ডাকলে আপনাকে উঠিয়ে দেবো'খন···উঠে আপনি

না হয় এই খাটের তলায় থাকবেন। তার পর আমরা চলে গেলে আপনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন···

প্রীতি পাশ ফিরিল···

একটু পরে আরাম-নিদ্রা···নিশ্বাসের ধ্বনি !

হিমাংশু দেওয়ালে মাথা ঠেশিয়া খোলা খড়খড়ির পানে চাহিয়া রহিল।···

৬

প্রীতির আহ্বানে হিমাংশুর ঘুম ভাঙ্গিল। খুব চাপা গলায় সে কহিল,—সকাল হয়েছে। সিন্ধু এসেচে। ডাকচে।··· আপনি ঐ খাটের তলায় গিয়ে ঢুকুন···

হিমাংশু চোরের মত খাটের নীচে প্রবেশ করিল। প্রীতি তখন উচ্চ কণ্ঠে সিন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—দোরটা বাইরে থেকে জোরে ঠ্যাল্ ভাই! এঁটে বসেচে! খুব জোরে ঠ্যাল্। বুঝলি সিন্ধু···

দ্বার খোলা হইল এবং মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া গায়ে চেষ্টারফীল্ড-কোট চড়াইয়া পায়ে নাগরা দিয়া প্রীতি বাহির হইয়া গেল।

খাটের নীচে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া হিমাংশু দেখিল, লাল রঙের নাগরার মধ্যে দুখানি চাঁপার বরণ পা আশ্রয় লইল; তারপর সে অরুণ চরণ-দুখানি ধীরে ধীর দ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

এক মিনিট—দু'মিনিট—তিন মিনিট···পায়ের ধ্বনি মিলাইয়া সারা গৃহ স্তব্ধ: আবার তখন নিঃশব্দে উঠিয়া হিমাংশু গিয়া আপনার একতলার ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করিল···

প্রবেশ করিয়া ঘরের যে-মূর্ত্তি দেখিল, তাহাতে অঙ্গ হিম হইয়া গেল!

গা-আলমারিটা মোচড় দিয়া কে খুলিয়াছে···জিনিষ-পত্র একেবারে তচ্‌নচ্! তার উপর এ-ঘরে সে খুলিয়া রাখিয়া ছিল তার নিজের দামী চেষ্টারফীল্ড কোট···সোনার বোতাম-লাগানো ভায়েলা সার্ট···সে সবের চিহ্ন নাই! খড়খড়িটা খোলা। জিনিষ-পত্র যেন সরিয়া গিয়াছে। বাহিরে চাহিয়া দেখে, খড়খড়ির নীচে বাহিরে তৃণশয্যায় পড়িয়া আছে একটা ট্রাঙ্ক—ডালা ভাঙ্গা···

শীতের আকাশে কুয়াশার পর্দ্দা ছিঁড়িয়া তখন আলোর ধারা পৃথিবীতে নামিতেছে!

সে শিহরিয়া উঠিল। চুরি হইয়া গিয়াছে—এ তাহারি চিহ্ন! তাহা হইলে সে ঝন্‌ঝন্ শব্দ···

সর্ব্বনাশ!

হিমাংশুর দেহে রোমাঞ্চ! সে চিন্তিত হইল। সে এখন কি করিবে? এ-ঘরে চুরি! এই ঘর দিয়াই চোর আসিয়াছিল! অথচ রায় বাহাদুর জানেন—বাড়ীর সকলে জানে—এ ঘরে সে শয়ন করিয়াছিল রাত্রে···

কিন্তু রাত্রে সে এ-ঘরে ছিল না; ছিল প্রীতির ঘরে··· এ-কথা প্রকাশ করিয়া বলা চলে না। প্রীতি তরুণী··· প্রীতির বিবাহ হয় নাই। তার ঘরে কি কারণে এবং কি করিয়া তার রাত্রি কাটিয়াছে···

বলিবে, চাম্‌চিকার ভয়ে···?

এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? এ কি বিশ্বাস করিবার কথা! এ কথা অপরে বলিলে সে নিজে বিশ্বাস করিত? অথচ ভগবান জানেন, কোনো অপরাধে তারা অপরাধী নয়!

শীতের সকাল বেলায় গায়ে সুতির গেঞ্জি···তবু হিমাংশু ঘামিতে লাগিল।···

ঘরের কোণে একতাল নারিকেল-দড়ি ছিল। ঐ দড়ি দিয়া নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া মেঝেয় পড়িয়া থাকিবে? সকলকে বলিবে, চোর তার হাতে-পায়ে দড়ি বাঁধিয়া নৈশ অভিযান সারিয়া চলিয়া গিয়াছে?

তাছাড়া উপায় কি!

সে উঠিল···দড়ির তাল কুড়াইয়া লইল···

সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে কোলাহল জাগিল···লোকজনের কণ্ঠে মিশ্র কোলাহল—ওমা, একখানি বাসন নেই যে গো···এখানে সেই ছেঁড়া কাপড়ের বাক্সটা নেই যে···

বিস্ময়···ভয় গর্জ্জন···এক সঙ্গে যেন হাজার তোপ দাগিল!

দড়ির তাল কোণে রাখিয়া হিমাংশু ফিরিয়া স্তম্ভিত বুকে খাটে বসিয়া রহিল।···সে যেন পাথর! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটা পাথর বনিয়া গেল! তার রূপ-রস-শব্দ মিলাইয়া গেল!

রায় বাহাদুর কহিলেন—এই ঘর দিয়েই চোর এসেচে। তুমি কিছু জানতে পারো নি? আশ্চর্য্য!

হিমাংশু কহিল—আজ্ঞে না···

—এই ঘরে তুমিই তো ছিলে রাত্রে?

—আজ্ঞে, এক রকম তাই !

—চোর এসেছে এই খড়খড়ি দিয়ে···নিশ্চয়।

গৃহিণী কহিলেন—ওকে মার-ধোর করেনি তো ?

রায় বাহাদুর কহিলেন—হ্যাঁ হে হিমাংশু···

—আজ্ঞে, না···

হিমাংশু চাহিল রায় বাহাদুর ও গৃহিণীর পানে। তাঁদের পিছনে সেই শ্রীপতি সরকার! তার চোখে অজস্র কৌতুক···সে দিকে হিমাংশুর দৃষ্টি পড়িল।

হিমাংশু কাঁপিল ; কাঁপিয়া কোনোমতে কহিল—আজ্ঞে, আমি এ-ঘরে সারা রাত ঠিক ছিলুম না। মানে···

—ছিলে না! জিমি ?

—আজ্ঞে, না···

রায় বাহাদুর চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। তাঁর মনের মধ্যে কঠিন 'জজ' আবার বহুদিন পরে আসন পাতিয়া বসিল। তিনি কহিলেন—কোথায় ছিলে তুমি ?

হিমাংশু নিশ্বাস ফেলিল, ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—আজ্ঞে, অন্য ঘরে। তার মানে, একটু ব্যাপার···অর্থাৎ···

কথার ভঙ্গী দেখিয়া রায় বাহাদুর জ্বলিয়া উঠিলেন। সাক্ষীর খাঁচায় এমন ভঙ্গী জীবনে তিনি অনেক লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি কহিলেন,—তোমরা সকলে এ ঘর থেকে যাও···

গৃহিণী কহিলেন,—আমি থাক্‌বো···

—বেশ, থাকো। আর সকলে যাও···

আজ রায় বাহাদুর আবার সেই আগেকার হাকিম। তাঁর আদেশে সকলে চলিয়া গেল। প্রীতি ডাকিল,—বাবা···

তার স্বর করুণ। মুখ পাংশু! হিমাংশু তাহা লক্ষ্য করিল ; মনে মনে বলিল, ভয় নাই দেবি···

রায় বাহাদুর কহিলেন—তুমি এখান থেকে যাও প্রীতি···

সকলে চলিয়া গেল। জজ রায় বাহাদুর বলিলেন—কোথায় ছিলে রাত্রে ? বলো। এই বাড়ীতে ? না···?

—আজ্ঞে, এই বাড়ীতে ছিলুম।

—কোন্ ঘরে ?

হিমাংশু নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—আমাকে ক্ষমা করবেন···এ কথার জবাব দিতে আমি পারবো না। এ জবাবের সঙ্গে একজন কুমারীর মান-সম্ভ্রম···

কুমারীর মান-সম্ভ্রম !

রায় বাহাদুরের বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল! গৃহিণীর বুকখানা ধ্বশিয়া যেন কোন্ পাতালে নামিয়া গেল! তিনি স্প্রীংয়ের খাটের উপর বসিয়া পড়িলেন।

রায় বাহাদুর গৃহিণীর পানে চাহিলেন—তাঁর দুই চোখে আগুন! গৃহিণীর দুই চোখের পিছনে যেন আটলান্টিক মহাসাগর ঢেউ তুলিয়া ফুঁশিয়া উঠিল···বুকে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দোলা !

ভ্রূকুটি-ভঙ্গীসহ রায় বাহাদুর ডাকিলেন—হিমাংশু···

হিমাংশু মুখ তুলিল ; তুলিয়া রায় বাহাদুরের পানে চাহিল।

রায় বাহাদুর কহিলেন—তুমি সুধাংশুর ছেলে···চরিত্রে সুধাংশু চিরদিন আমাদের আদর্শ ছিল···

হিমাংশু মাথা নামাইল।

রায় বাহাদুর কহিলেন—তার ছেলে বলেই তোমাকে আমার গৃহে গ্রহণ করেচি···

হিমাংশু কহিল—আপনার বা বাবার এতটুকু অমর্য্যাদা আমি করিনি, রায় বাহাদুর···

—কিন্তু এই যে বললে, এক কুমারীর মান-সম্ভ্রম! নিশ্চয় কোনো কুমারীর ঘরে···

হিমাংশু কহিল—তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন···বড্ড বিপন্ন হয়ে ডেকেছিলেন।

—তিনি ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন!··· তাঁর ঘরে ? রাত্রে ? বিপন্ন হয়ে ? আমি শুনতে চাই।

হিমাংশু কাতর কণ্ঠে কহিল,—আমাকে ক্ষমা করবেন···

তার দুই চোখ বাষ্পার্দ্র! মনের মধ্যে যা হইতেছিল, অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন!

রায় বাহাদুর নিশ্বাস রোধ করিয়া গৃহিণীর পানে আবার চাহিলেন ; গৃহিণী মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। হিমাংশু মাথা নত করিল।

রায় বাহাদুর কহিলেন—অপুর মেয়ে সুস্নিগ্ধা নয় তো ? ভয়ঙ্কর ফাজিল, জ্যাঠা মেয়ে! হেন সাব্‌জেক্ট নেই, যাতে কথা কয় না! সাম্য প্রীচ্‌ করে বেড়ায়···

কথাটা বলিয়া রায় বাহাদুর চাহিলেন হিমাংশুর পানে ; গৃহিণী রায় বাহাদুরের পানে চাহিয়াছিলেন।

হিমাংশু কহিল—না।

রায় বাহাদুর কহিলেন—সুরবালা ?

গৃহিণী কহিলেন—টুনি ? চারু ? মোক্ষদা ?

হিমাংশু কহিল—আজ্ঞে, না।

রায় বাহাদুরের রাগ বাড়িয়া গেল। সগর্জ্জনে তিনি কহিলেন—সে যেই হোক···দাসী বিন্দুর মেয়ে সিন্ধুও যদি হয়, তাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। এর অন্যথা হবে না!···তোমার বাবাকেও এতে মত না করিয়ে আমি ছাড়বো না···

হিমাংশুকে কে যেন অন্ধকার পাতাল হইতে আলো-বাতাসে ভরা এই পৃথিবীর শ্যামল বুকে তুলিয়া আনিল! সে কহিল—আজ্ঞে, তাতে যদি তাঁর ইজ্জৎ রক্ষা হয়, আমি প্রস্তুত আছি।

রায় বাহাদুরের গর্জ্জন থামিল না। তিনি বলিলেন—তুমি খুব উদার! মহৎ! আমি বুঝেচি। ছি, এখন বলো, কে সে···এবং কি-বিপদেই বা তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? ···এ সব কালের হাওয়ার দোষ গিন্নী, বুঝেচো! আমি বরাবর বলি, ঐ সব মাসিক কাগজ-টাগজগুলো বাড়ীতে ঢুকতে দিয়ো না—তুমি সে-কথা শোনো না! এখন আমার যা মনে হচ্ছে···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি হিমাংশুর পানে চাহিয়া কহিলেন—বলো···

হিমাংশু নিশ্বাস চাপিয়া রায় বাহাদুরের পানে চাহিল, এবং বলিল...

বলার ফলে গোড়ায় যাহা বলিতেছিলাম, জন্ম, মৃত্যু এবং···

শ্রীমতী প্রীতিলতার সহিত শ্রীমান্ হিমাংশুকুমারের শুভ পরিণয়! রায় বাহাদুর কথার মানুষ···জজ!

হিমাংশু নিজের ঘরের দেওয়ালে চামচিকার একখানা মস্ত অয়েল-পেন্টিং ঝুলাইয়া দিয়াছে। একটা স্তবও রচনা করিয়াছে—বাঙলা পয়ার ছন্দে—

নমো নমো চামচিকা, ইষ্টদেবী অয়ি!
তোমার প্রসাদে আজি লভি প্রীতিময়ী!

হাসিয়া প্রীতি বলে—এত জানো তুমি!

হিমাংশু বলে—আমি! না, তুমি! দু'দুবার আমাকে ডেকে নিয়ে গেলে—কুমারী, ষোড়শী! আমি রাত্রের অতিথি! কেন? না, চামচিকে তাড়াতে হবে! অথচ দু'বারের কোনোবারেই চামচিকের টিকি দেখতে পেলুম না!...আমি বুঝি না বটে, তোমার প্রণয়-নিবেদনের বিচিত্র ভঙ্গী? তারপর তোমার বাবার বিচার! হ্যাঁ, জজ বটে! Just and impartial!

হাসিয়া প্রীতি বলিল—সে বিচারের ফলে···

হিমাংশু বলিল,—যাবজ্জীবন তোমার দ্বীপান্তর-বাস দণ্ড।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পরলোকে সার আবদুল্লা সারবর্দ্দী

বিখ্যাত মুসলমান জননায়ক ও চিন্তাশীল লেখক সার আবদুল্লা সারবর্দ্দী আর ইহলোকে নাই। নিয়তির নির্ম্মম আহ্বানে তিনি ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালার এক বিশিষ্ট ও প্রতিভাশালী মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষায়, বিদ্যায় এবং বুদ্ধিমত্তায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম জীবনে মুসলমানদিগের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ছিলেন। ইনিই লণ্ডনের প্যান্

আবদুল্লা সারবর্দ্দী

ইস্‌লাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ণিয়ায় যেবার বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, সেইবার ইনি উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ইঁহার তিরোধানে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

চয়ন

বিরাট বোঝাবাহী কুম্ভকার

ক্যারিবিয়ান সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী স্থানে মায়ারা নানাবিধ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্য তৈয়ার করিয়া থাকে। কুম্ভকার বহুসংখ্যক প্রকাণ্ডকায় মৃত্তিকানির্ম্মিত তৈজস পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া

বিরাট বোঝাবাহী কুম্ভকার

বিক্রয়ার্থ ফেরী করিয়া থাকে। এই সঙ্গে যে ছবি প্রদত্ত হইল, দেখিলেই বুঝা যাইবে, এক জনের পৃষ্ঠে কিরূপ গুরুভার রহিয়াছে।

পাখাবিশিষ্ট জলযান

ওহিও অঞ্চলের আক্রন্ নামক স্থানে একপ্রকার জলযান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জলযানে চারি জন আরোহীর স্থান আছে। এই ভাবের জলযান পূর্ব্বে কখনও নির্ম্মিত হয় নাই। দুই জন শিল্পী অবসরকালে দেড় বৎসর ধরিয়া উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জলযানের দুইটি ডানা আছে। বিমানের ন্যায় এই ডানা কার্য্যকর। এই ডানার সাহায্যে চালক জলযানকে আকাশপথে উড্ডীন করিতে পারে। ডানা দুইটির দৈর্ঘ্য ৪৮ ফুট। পাখা দুইটির পরিসর ২০৬ বর্গফুট। যানের নীচে মাত্র একখানি চাকা আছে। উহার সাহায্যে পোতখানি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতে পারে।
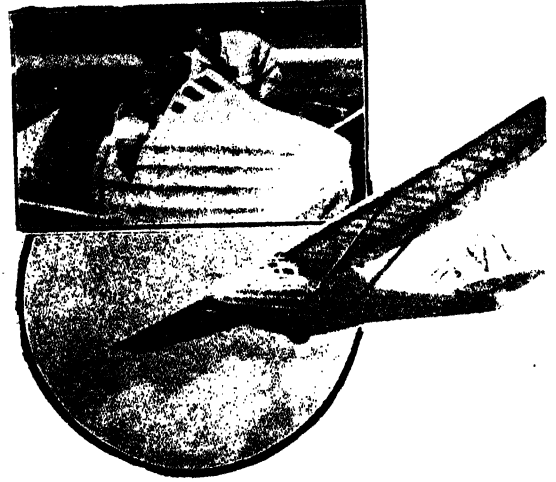
পাখাবিশিষ্ট জলযান

গাড়ীর ছাদে বস্ত্রাদি রাখিবার আধার

মোটরগাড়ীর ছাদে পরিচ্ছদপূর্ণ আধার রাখিবার অভিনব ব্যবস্থায় দূরপথযাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই বস্ত্রাধার ধূলি
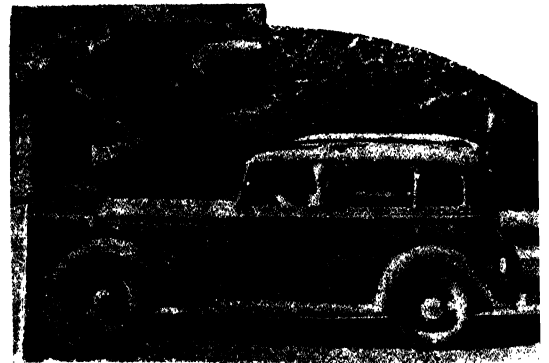
গাড়ীর ছাদে বস্ত্রাদি রাখিবার আধার

ও জলনিবারক কাপড়ে নির্ম্মিত। গাড়ীর ছাদে আধার রাখিবার এমন ব্যবস্থা আছে যে, পরিচ্ছদ প্রভৃতির ইস্ত্রি আদৌ নষ্ট হয় না।

শয্যাধার-সংলগ্ন ড্রয়ার

সিডার কাষ্ঠনির্ম্মিত খাটে, কম্বল প্রভৃতি রাখিবার জন্য ড্রয়ার নির্ম্মিত হইয়া বিক্রী হইতেছে। এই ড্রয়ার বা টানা-শয্যার
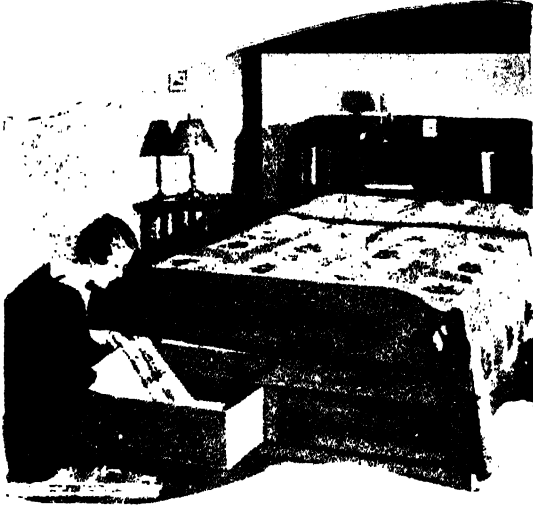
শয্যাধার-সংলগ্ন টানা

পায়ের দিকে অবস্থিত। মাথার দিকে অনেকগুলি বই রাখিবার ব্যবস্থা আছে। রেডিওযন্ত্রের একটি ঘটিকাও যথাস্থানে বিন্যস্ত। এই খাটে তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

স্পেনীয় দুর্গের অনুকরণে বাড়ী নির্ম্মাণ

কালিফোর্নিয়ায় স্পেনীয় দুর্গের অনুকরণে একটি বাড়ীর নমুনা রচিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষুদ্রতম কারাকক্ষ, অস্ত্রাগার, বারুদ-খানা সবই আছে। তবে কামানের গোলা বা বারুদ নাই।
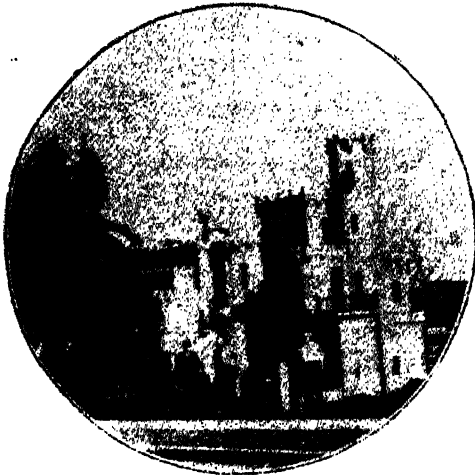
স্পেনীয় দুর্গের অনুকরণে বাড়ী

এই দুর্গাকার ক্ষুদ্র ভবনটির দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। উহা প্রস্থে ১৯-ফুট হইবে। দ্বিতলে ৫টি কক্ষ আছে। ক্ষুদ্র সোপানশ্রেণীর বিস্তার ১২ ইঞ্চি। উহা ত্রিতল পর্য্যন্ত প্রসারিত। ত্রিতলে ৪টি ঘর আছে। মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত উহার উচ্চতা ৬ ফুট।

দৃশ্যমান প্রশ্বাস

শীতকালের চলচ্চিত্র যাহাতে বস্তুতান্ত্রিকতা-পূর্ণ হইতে পারে, এ জন্য অভিনেতার দৃশ্যমান প্রশ্বাসের ছবি গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃত্রিম দন্তপংক্তির সাহায্যে অভিনেতা বরফের টুকরা মুখের মধ্যে রাখিয়া দেয়। তাহাতে আসল দাঁতের

দৃশ্যমান প্রশ্বাস

কোনও ক্ষতি হয় না। উষ্ণ শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে বরফ হইতে দৃশ্যমান বাষ্পপ্রবাহ নির্গত হয়। শীতকালে সাধারণতঃ মানুষের মুখ দিয়া যেমন বাষ্পপ্রবাহ নির্গত হয়, ইহাতেও সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। এই কৌশল অবলম্বন করায় অভিনেতার কথার কোন প্রতিবন্ধক হয় না।

সংবাদপত্র ফেরীর ব্যবস্থা

লস্ এঞ্জেলসের সংবাদপত্র-ফেরীওয়ালাদিগের বক্ষোদেশে কাগজের নাম আঁটিয়া দেওয়া হয়। মোটর-গাড়ীর মাথার

সংবাদপত্র-ফেরীর ব্যবস্থা

উজ্জ্বল আলোকপাতে সংবাদপত্রের সাঙ্কেতিক নাম প্রতিভাসিত হয়। ইহাতে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—চাপা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না এবং বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। রক্তবর্ণ জমীর উপর শ্বেত অক্ষরে সংবাদপত্রের নাম মুদ্রিত থাকে। ফেরীওয়ালার সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ, উভয় দিকেই নাম থাকে। ফেরীওয়ালা বলিয়া থাকে যে, এই উপায়ে তাহারা অধিক সংখ্যক কাগজ বিক্রয় করে।

চীনা-অভিনয়ে মহামূল্য পরিচ্ছদ

সান্‌ফ্রান্সিস্কোর মাণ্ডারিন্ রঙ্গমঞ্চে ক্যাণ্টন ও সাংহাই হইতে চৈনিক অভিনেতারা অভিনয় করিতেছেন। রাত্রি ৭টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয় হইয়া থাকে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের পরিচ্ছদ অত্যন্ত মহার্ঘ। অভিনেতারা মুখে পর্য্যাপ্ত রঙ্গ মাখিয়া মুখোস পরিধান করিয়া থাকে। পরিচ্ছদের ছাঁটকাট ও বর্ণের দ্বারা সামাজিক ব্যাপারের অভিনয় করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে সরল ও নম্র ভূমিকার অভিনয়ের প্রয়োজন, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সে অবস্থায় মুখে রঙ্গ মাখেন না।

চীনা-অভিনয়ে মহামূল্য পরিচ্ছদ

কিন্তু যেরূপ ক্ষেত্রে কূটমন্ত্রণাকারী রাজনীতিক ভূমিকার অভিনয় করিতে হইবে, সেরূপ অবস্থায় অভিনেতারা মুখে যথেষ্ট বর্ণ-সমাবেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ন্যায়বান্ ভূমিকার অভিনয় করেন, তাঁহার দেহ রক্তবর্ণেই অনুরঞ্জিত করা হয়। কৃষ্ণবর্ণ অথবা আধাকৃষ্ণ আধাশ্বেতবর্ণ নিষ্ঠুর ও বদ্‌মাস চরিত্রের ভূমিকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৪০ রকমের তুলিকা এই বর্ণানুলেপনে ব্যবহার করা হয়। ভ্রূভঙ্গী অথবা অঙ্গুলিহেলন প্রভৃতি ব্যাপারে চীনা অভিনেতারা যথেষ্ট ছন্দানুবর্ত্তী। নাটকীয় অভিব্যক্তিতে অধিকাংশই দক্ষ। অভিনেতারা একই নাটক দুইবার অভিনয় করেন না। ইহাতে অভিনেতাদিগের অভিনয়-নৈপুণ্যই ঘোষণা করিয়া থাকে। এই অভিনয় ব্যাপারে ৫০ হাজার ডলার মুদ্রার পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যুগ্ম-মোটরচালিত বিমান

ক্যালিফোর্ণিয়ায় মিঃ এলেন্ লক্‌হিড্ নামক এক ব্যক্তি একটি বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বিমানকে শঙ্কাশূন্য নামে
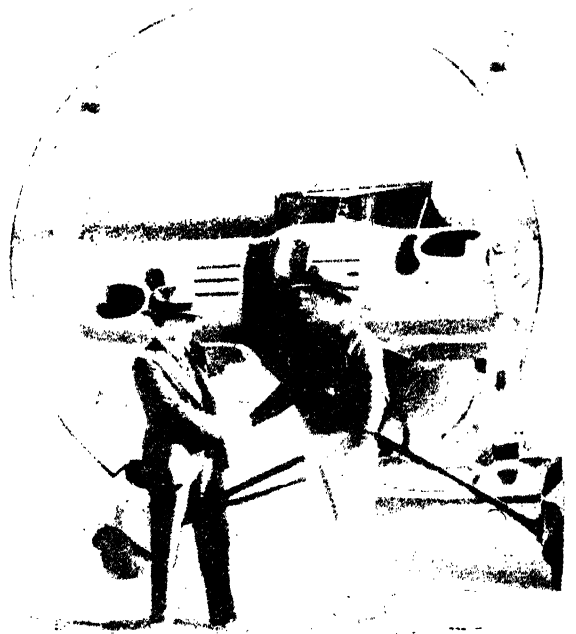
যুগ্ম-মোটর-চালিত বিমান

অভিহিত করা হইয়াছে। বিমানের নাসিকা যেখানে অবস্থিত বলা যাইতে পারে, সেখানে দুইটি মোটর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মোটর দুইটি এমন ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবেশিত যে, দৈবাৎ যদি একটির ক্রিয়া বন্ধ হয়, অপর মোটরটির সাহায্যে বিমান সমানভাবে চলিতে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় বিমান-দুর্ঘটনার আশঙ্কা বিলুপ্ত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ঊর্ণনাভ

প্রতাপকে লইয়া লীনার এখানে আসিবার পাঁচ-সাত দিন পরের কথা বলিতেছি।

প্রতাপের অসুখ এখন নাই; তবে শরীর খুব দুর্ব্বল। নড়িতে-চড়িতে পারে না। মাথার রোগ। সকল রকমের পরিশ্রম নিষেধ; লেখা-পড়াও করিতে পারিবে না। বিছানায় শুইয়া তার দিন কাটে।

প্রতাপ বলিল—এমন জীবন্মৃত হয়ে থাকার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়াই ছিল ভালো! নিজের কষ্ট, সবার কষ্ট···

ঘরের মেঝেয় বসিয়া কণিকা ফুড্ তৈয়ার করিতেছিল, লীনা কাছে ছিল। মুখ তুলিয়া কণিকা কহিল,—থাক্, থাক্—সকলের কষ্ট ভেবে এখন হা-হুতাশ নাই করলেন! সকলের কষ্টের কথা আগে থেকে মনে রেখে সেইমত বুঝে চলা উচিত ছিল।

লীনা কহিল—দিন-রাত্তির পড়া আর পড়া! দুনিয়ার পানে তাকানো নেই। আমরা যেন মানুষ নই—আমাদের পানে নাই তাকালেন,—তবু মানুষের সখ, আমোদ-আহ্লাদ তো থাকে। তা কিছু নয়, ভাই! দিবা-রাত্র পড়া আর পড়া!

প্রতাপ মৃদু হাসিয়া কহিল,—অন্যায় হয়েচে এক জায়গায়—এখন বুঝতে পারচি।

···সে চাহিল লীনার পানে, চাহিয়া কহিল—তোমার পানে কখনো চেয়ে দেখিনি—না? কিন্তু তুমি চাওয়াওনি, লীনা!

লীনা কহিল—পাশে থাকলেও যে-মানুষ চেয়ে দেখে না, তাকে কি করে চাওয়াতে হয়, জানি না!

কণিকা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সত্যি, বইয়ের মধ্যে এমন কি অপরূপ সৌন্দর্য্য পেয়েছিলেন ঠাকুর-জামাই যে···

কথাটা বলিতে বলিতে কণিকা বারেক অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে লীনার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—এ মনোমোহিনীর পানেও তাকান্ নি!

প্রতাপ কহিল—উনি চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েচেন কোনো দিন?

কণিকা লীনার পানে চাহিয়া কহিল,—এ-কথা সত্যি, ঠাকুরঝি?

লীনা কহিল—শোনো কেন ভাই! এই যে কথা ফুটেচে, এখন এই যে হাসি দেখচো, এ কি ছিল! কখনো আমি চোখে দেখিনি বিয়ে হয়ে অবধি! তোমার দৌলতে আজ দেখচি। তোমায় দেখে প্রাণের উপর থেকে ভারী পাথর সরে গেছে—হাসি আর কথার উৎস ঝরচে তাই!

এ কথায় কণিকার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে মাথা নামাইয়া নিজের কাজে মনোনিবেশ করিল এবং ফুড্ তৈয়ার হইলে প্রতাপের সামনে আসিয়া কহিল—খান্···

প্রতাপ কহিল,—আপনাকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছি, বৌঠাকরুণ···

কণিকা কহিল—সেজন্য সেরে উঠে ধন্যবাদ দেবেন'খন···

প্রতাপ ফুড্ খাইল। লীনা কহিল—এই যে লক্ষ্মী হয়ে নিঃশব্দে খেলেন, এ কি আমার দ্বারা সম্ভব ছিল! সেখানে যখন খুব বাড়াবাড়ি চলেছে, কি ধকল যে গেছে··· একলা আমি···ওষুধ-পথ্যি খাওয়াতে প্রাণ একেবারে বেরিয়ে যেতো, ভাই!

প্রতাপ কহিল,—বাঁচবার আমার ইচ্ছা ছিল না, লীনা···

কণিকা শিহরিয়া উঠিল, কহিল—কেন বলুন তো? পৌরুষ প্রমাণ করবার জন্য?

প্রতাপ কহিল—জীবনে কিছুই হলো না,—শুধু নৈরাশ্য!

কণিকা কহিল—ঠাকুরঝির কথা মনে পড়েনি—না?… একটা জীবনের ভার নিয়ে তাকে এমন নিরাশ্রয়ভাবে ছেঁটে ফেলা…

প্রতাপ কহিল—থেকেও ওঁকে কোনো দিন আমি সুখী করতে পারলুম না—না থাকলে কি অভাব ওঁর হবে! এই কথাই মনে হতো…

কণিকা ক্ষণেকের জন্য চুপ করিয়া রহিল। সেই ক্ষণকালেই তার বুঝিতে বাকী রহিল না, জগতে সেই শুধু নিঃসঙ্গ নয়! তার মত নিঃসঙ্গতা অপরেও ভোগ করিতেছে! কিন্তু…

সে লীনার পানে একবার চাহিল—লীনার মূর্ত্তি অবিচল! যেন কাঠ! এত বড় কথায় তার মনের কোণে কোনো আঘাত লাগিয়াছে, মুখ দেখিয়া তাহা মনে হয় না!

সে কহিল—আচ্ছা, এখন এ সব মন্দ কথা বন্ধ থাক! ভালো কথা কন্…

প্রতাপ কহিল—ভালো কথা আমার জানা নেই, বৌঠাকরুণ! আমি জানি শুধু বইয়ের কথা! ভালো কথা আপনি বলুন…ভালো কথা শুনবো বলেই আপনার আশ্রয়ে এসেচি।…

এ কথায় কণিকা খুশী হইল; হাসিয়া সে কহিল,—ভালো লোককে মুরুব্বি ধরেচেন বটে! মুখ্যু মেয়েমানুষ… আমি ভালো কথার কি-বা জানি! শিখলুম কবে?…কি বলো ভাই ঠাকুরঝি…আমরা ওঁদের পানেই চেয়ে থাকি ভালো কথা শোনবার জন্য।

কথাটা বলিতে বলিতে ঠাকুরঝির পানে সে একবার চাহিয়া দেখিল। কিন্তু লীনার মুখ-চোখ তেমনি কঠিন, অবিচল! সে যেন পাথরে গড়া মূর্ত্তি!

কণিকা চুপ করিল, ভাবিল, কোথায় যে ঠাকুরঝির কি ব্যথা আঁটিয়া আছে! প্রতাপ তো মানুষ মন্দ নয়! তবু…কে জানে!

একটা উদ্গত নিশ্বাস রোধ করিয়া সে আবার প্রতাপের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—আচ্ছা, আপনাদের ওখানে দিন-রাত বৃষ্টি হয়? শুনেচি, চেরাপুঞ্জিতে যেমন বৃষ্টি হয়, এমন বৃষ্টি নাকি পৃথিবীর আর কোনো জায়গায় হয় না। সত্যি? আচ্ছা, কেন এমন হয়? আপনার সে জায়গা খুব ভালো লাগতো?

এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন! কি সরল সে প্রশ্ন-ধারা! প্রতাপ মুগ্ধ নয়নে কণিকার পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু উত্তরের জন্য কণিকা এক তিল অবসর দেয় না! এত ভালো লাগিল…

এমনি প্রশ্ন-বর্ষণের মধ্যে আসিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল রাধাবিনোদ। তার হাতে একটা ছাপানো বিজ্ঞাপন।

রাধাবিনোদ আসিয়া প্রতাপের পানে চাহিয়া কহিল,—কেমন বোধ করুচেন?

মৃদু হাসিয়া প্রতাপ কহিল,—ভালো।

রাধাবিনোদ কহিল,—আপনার ডাক্তার বল্‌ছিলেন, মাসখানেক তাঁর বিধি মেনে চল্‌লে আপনাকে তিন মাসে তিনি চাঙ্গা করে তুল্‌বেন। তবে কাজকর্ম্ম তার পরেও তিন মাস বন্ধ রাখতে হবে।

কথাটা বলিয়া সে প্রতাপের পানে চাহিয়া রহিল; প্রতাপের মুখে মলিন ছায়াপাত হইল।

রাধাবিনোদ কহিল,—আপনারা পণ্ডিত লোক—স্বাস্থ্য-বিধি সম্বন্ধে এমন উদাসীন থাকেন কি করে—তাই ভাবি। আরো ভাবি, এমন কি পড়াশুনা মানুষ করে, যার জন্য…

লীনা ফোঁশ্ করিয়া উঠিল। সে বলিল,—ওঁদের উচিত নয়, বিয়ে করে আর একটা জীবনকে দায়গ্রস্ত করা…

প্রতাপ কহিল,—তা কখনো করিনি লীনা, করতুমও না! এবং আমি বেঁচে থেকে তোমাকে কোনো শৃঙ্খলে বেঁধে রাখিনি, যার জন্য তুমি এ কথা বল্‌চো!

কথাটা রূঢ়—এ কথায় কণিকা চমকিয়া উঠিল।

লীনা কহিল,—বেঁচে আছো বলেই যেটুকু সুখ জীবনে সংগ্রহ কর্‌তে পারুচি নিজে থেকে, করুচি। তুমি বেঁচে না থাক্‌লে আমার সেটুকও যাবে…তাই আমার বলা। মানুষ হয়ে যখন জন্মেচি, তখন মানুষের মত থাক্‌তে চাওয়াটা কি বড় বেশী চাওয়া!

প্রতাপের কথা রূঢ় হইলেও লীনার উত্তর…এ আরো বিশ্রী! শুনিয়া কণিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

প্রতাপ কহিল,—যাক্, বৌঠাকরুণ নিষেধ করেচেন,—মন্দ কথা বল্‌তে পাবো না। কাজেই আমি চুপ করে রইলুম।…

এ কথার পর ক্ষণেক স্তব্ধতা। কাহারো মুখে কথা নাই। কণিকার ভালো লাগিতেছিল না। বাতাস যেন

ভারী হইয়া বুকে চাপিয়া বসিতেছে! সে উঠিয়া পথ্যের পাত্রাদি সরাইতে উদ্যত হইল।

প্রতাপ কহিল,—চল্লেন বৌঠাকরুণ?

কণিকা কহিল,—এগুলো পড়ে রয়েছে···নিয়ে যাই।

রাধাবিনোদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

প্রতাপ কহিল,—অনেকক্ষণ থেকেই পড়ে আছে। চাকররা যথাসময়ে নিয়ে যায়। বুঝেছি, এ সব বিরোধ আপনার ভালো লাগে না! আপনি রাগ করেছেন···

কণিকা তাড়াতাড়ি বলিল,—না, না; রাগ করিনি। এগুলো রেখে আমি এখনি আস্‌ছি।

কণিকা পাত্রাদি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রতাপ তখন রাধাবিনোদের পানে চাহিয়া কহিল,—হাতে ও কাগজ কিসের?

রাধাবিনোদ কহিল,—একদল র‍্যাশিয়ান ডান্সার এসেছে কল্‌কাতায়। এম্পায়ারে তাদের নাচের আসর বসেচে—তার বিজ্ঞাপন। মহীন্দ্র এনেছিল···

প্রতাপ কহিল,—যাওয়া হবে?

রাধাবিনোদ একবার লীনার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—না। এ সবে আর রুচি নেই! অনেক দেখেচি···

প্রতাপ কহিল,—আপনার ভগ্নী দেখেন নি বোধ হয়। তিনি যদি দেখতে চান···সত্যি, বনদেশে আমার সঙ্গে বাসা বেঁধে এ সব ওঁর কখনো দেখা হলো না! যদি ব্যবস্থা করে দেন, ভালো হয়। এই রোগের সেবা নিয়ে ক'মাস উনি পাগল হয়ে আছেন! আশ্চর্য্য ধৈর্য্য বটে!

কথাগুলায় শ্লেষ। রাধাবিনোদ তাহা বুঝিল না। সে লীনার পানে চাহিল, হাস্যমুখে কহিল,—যাবে না কি, লীনা?

রাগে লীনার কঠিন মুখ আরো কঠিন হইল এবং স্বরে তীব্র ঝাঁজ মিশাইয়া সে কহিল—না!

কথাটা বলিয়া সে আর এক নিমেষ সে-ঘরে দাঁড়াইল না— বাহিরে চলিয়া গেল।

রাধাবিনোদ অবাক্! সে প্রতাপের পানে চাহিল। প্রতাপ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—পাগল!

রাধাবিনোদ কহিল,—আপনাদের বুঝি তর্ক হচ্ছিল? ওকে রাগিয়েচেন?

প্রতাপ কহিল,—আপনার ভগ্নী তো চব্বিশ ঘণ্টাই রেগে আছেন···

—কিন্তু এমন তো কখনো দেখিনি!

প্রতাপ কহিল,—ব্যক্তি-বিশেষের সাহচর্য্যে ওঁর ক্রোধ রিপুটা প্রবল হয়!···

রাধাবিনোদ ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—হুঁ!···

বৈকালের দিকে লীনা সজ্জা-ভূষণ করিতেছিল কণিকার ঘরে। কণিকা একটা ঔষধের শিশি হাতে আসিয়া কহিল,—এই ওষুধটা ঠাকুর-জামাই সন্ধ্যার আগে খান্ তো, ঠাকুরঝি?

লীনা কহিল,—আমি জানি না। যাঁর ওষুধ, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো না, ভাই! আমি তো তাঁর শত্রু!

কণিকা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে লীনার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইল; দেখিয়া কহিল,—কোথাও যাবে?

লীনা কহিল,—মাথাটাও আমার আঁচড়াতে নেই? অমনি কোথাও আমোদ করতে যাচ্ছি বলে অনুমান করবে, ভাই! আমি কি সত্যি এমন বেহায়া যে, স্বামী পড়ে আছে রোগ-শয্যায়, আর আমার আমোদ-প্রমোদের লোভ প্রাণে জেগে আছে ষোল আনা!

অপ্রতিভ হইয়া কণিকা কহিল,—তা নয়। তবে ঐ ক্রীম দিচ্ছ মুখে···

লীনা কহিল,—সাধে দিচ্ছি! মুখখানা যেন পুড়ে পুড়ে পাঙাশ হয়ে আছে! ···গালদুটো চড়চড়্ করছে দ্যাখো না! তাই···

কণিকা দাঁড়াইল না; লীনার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

কণিকার অস্বস্তি ধরিতেছিল। লীনা আসিলে সে অনেকখানি আশা করিয়া তার সঙ্গে মিশিতে গিয়াছিল; কিন্তু লীনাকে তেমন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পাইল না। কখনো লীনা খুব দরদ-ভরে মিশ্ খায়, আবার পরক্ষণে এমন থাকে, যেন কণিকা তার কেহ নয়—তার সঙ্গে যেন কোন দিন আলাপ-পরিচয় নাই!

কণিকা ভাবে, কেন লীনা তার সঙ্গে মিশিতে চায় না? সে ধনীর মেয়ে···তাই? দু'একবার টাকার কথা তুলিয়া লীনা দু'একটা শ্লেষও করিয়াছে! কিন্তু বাপের টাকা লইয়া কণিকা কোনোদিন তার উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা তো করে নাই। এখানে নয়—কোনো খানে নয়। তবে?

সন্ধ্যার পর প্রতাপের ঔষধ খাইবার কথা। লীনা তার হাতে এ ভার দিয়াছে। আসিয়াই লীনা বলিয়াছিল—আমার হাতের ওষুধে তোমার ঠাকুর-জামাইয়ের অসুখ তো সারলো না ভাই, তাই এখানে নিয়ে এলুম। ওষুধের হাত-বদলাইয়ে যদি উপকার হয়! তুমি ভাই এ ভারটুকু নিয়ো।

ভাষাদাটা খুব ভদ্র না হইলেও রোগের ব্যাপারে তাহা লইয়া কণিকা কোনো আপত্তি তোলে নাই; খুশী-মনেই এ ভার গ্রহণ করিয়াছে।

এখন প্রতাপের ঘরে আসিয়া দেখে, প্রতাপ ইজি-চেয়ারে হেলিয়া শুইয়া আছে, কাছে আছে নীপু! নীপুর সামনে কি একখানা বইয়ের পাতা খোলা।

কণিকা আসিয়া বলিল—সাতটা বেজেচে। আপনাকে ওষুধ দি, ঠাকুর-জামাই।

প্রতাপ ও নীপু এ কথায় কণিকার পানে ফিরিয়া চাহিল। নীপু উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—আসুন বৌদি…

প্রতাপ কহিল—আপনার কথা হচ্ছিল…

কণিকা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া শিশি হইতে ঔষধ ঢালিল, ঢালিয়া কহিল,—খান…

ঔষধের গ্লাশ হাতে লইয়া প্রতাপ কহিল,—আপনার কথাই হচ্ছিল আমাদের…

কণিকা কহিল,—জানি, আপনারা খুব মহৎ!

নীপু কহিল—মহৎ! তার মানে? আপনার কথা বুঝি মহৎ-লোক ছাড়া আর কেউ কীর্ত্তন করতে পারে না?

কণিকা কহিল—তা নয়।

—তবে?

কণিকা কহিল,—মহৎ যারা, তারাই পরের কথা কয়। নাহলে হীন-জন নিজেদের কথা সারাক্ষণ কয় কিনা…

হাসিয়া প্রতাপ কহিল—Exactly so! বৌদি ঠিক কথা বলেচেন! আমরা তাহলে মহৎ, নীপু বাবু…

কণিকা কহিল—নিন, ওষুধটা খেয়ে নিন…তারপর মহত্ত্বের আলোচনা করবেন।

প্রতাপ নিঃশব্দে ঔষধ সেবন করিল। কণিকা গ্লাস লইয়া ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; দিয়া কহিল,—ইজি-চেয়ারেই বসবেন এখন?

প্রতাপ কহিল—আর একটু বসি। শুয়ে শুয়ে কেমন আতঙ্ক ধরে গেছে। মনে হয়, জন্মের মত বুঝি ওঠবার আশা ঘুচে গেল!

কণিকা দুই চোখে মৃদু ভর্ৎসনা ভরিয়া কহিল—আবার ঐ কথা! ও কথাগুলো বলে ভারী আরাম পান—না? পুরুষমানুষের পৌরুষ!…ডাকবো ঠাকুরঝিকে?

মৃদু হাসিয়া প্রতাপ কহিল—তাঁকে ডাকলে এখন পাবেন না।

বিস্ময়ে কণিকা প্রতাপের পানে চাহিল। আবার বুঝি কি তর্ক হইয়াছে এবং সে তর্কের ফলে…

কিন্তু তা নয়। কণিকার ভুল। সে ভুল ভাঙ্গিল প্রতাপের কথায়। প্রতাপ বলিল—তিনি গেছেন এম্পায়ারে রাশিয়ান ডান্সারদের নাচ দেখতে!

নাচ দেখিতে! স্বামীর এই শরীর!…

বিস্ময়ে তার চোখ বিস্ফারিত দেখিয়া প্রতাপ হাসিল, হাসিয়া আবার বলিল—আপনি আশ্চর্য্য হলেন এ-কথা শুনে—কিন্তু আমি হইনি। তিনি আমাকে বলেই সেখানে গেছেন…

কথার শেষে ছোট একটা নিশ্বাস। সে নিশ্বাস চাপিয়া প্রতাপ কহিল,—সত্যি, কাঁহাতক রোগের দুঃখ সইবে? মানুষ তো! তাকে বাঁচতে হবে। সেজন্য আমি এতটুকু দুঃখিত নই।

কণিকার বিস্ময়ের মাত্রা তবু কাটিতে চায় না! সে কেমন আত্মগতভাবে কহিল,—একলা গেছে?

প্রতাপ কহিল—না। তার ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে …রাধদা।

নীপু কহিল,—ও! তাই রাধদা আমাকে বলছিল বটে,—যাবে হে নীপু? আমি বললুম,—না! রাধদা বললে,—লীনাদি তাকে ভারী ধরেছে—রাধদার যাবার তেমন ইচ্ছা ছিল না! আমি বললুম,—না ভাই, ও-সবে আমার মন লাগচে না!

প্রতাপ কহিল—হ্যাঁ। আমিই রাধদাকে বললুম, তোমার বোনের সখ, রুশ-নৃত্য দেখে…

কণিকা কোন কথা কহিল না। তার মনে পড়িল বৈকালের দিকে লীনার সেই সজ্জা-ভূষণের কথা!

কিন্তু তখন সে কথা গোপন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কণিকা তাকে নিষেধ করিত না—বা সঙ্গেও যাইতে চাহিত না! [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচন

বিগত ২৪শে জানুয়ারী ১০ই মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই সভাপতিত্ব পদপ্রাপ্তির জন্য দুই ব্যক্তি প্রার্থী হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিষ্টার টি, এ, কে সেরওয়ানীকে এবং স্বাধীন দলের পক্ষ হইতে সার আব্দার রহিমকে ঐ পদ দিবার প্রস্তাব করা হয়। উভয় পক্ষের যাচনদার বা হুইপই স্বীয় পক্ষের ভোট যোগাড় করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষকালে সার আব্দার রহিমই এই ভোট-সংগ্রামে জয়লাভ করেন। ঐ দিন ব্যবস্থা পরিষদে ১ শত ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ১ শত ৩৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ভোট দিয়াছিলেন। সার আব্দারের পক্ষে একটি ভোট বাতিল হইয়া যায়। অবশিষ্ট ১ শত ৩২ জনের মধ্যে সার আব্দারের পক্ষে ৭০ জন এবং মিষ্টার সেরওয়ানীর পক্ষে ৬২ জন ভোট দিয়াছিলেন। সুতরাং ৮টি ভোটের সংখ্যাধিক্যে সার আব্দারই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা আনন্দেরই কথা। কারণ, সার আব্দারের এই কার্য্যসাধনে যে যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি বুদ্ধিমান, এবং বিবেচক। ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির, নির্ভীকতার এবং নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ব্যবস্থা পরিষদেও তিনি দৃঢ়তার সহিত দেশবাসীর স্বার্থরক্ষায় অবহিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিয়োগে যে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু সার আব্দার রহিম বাঙ্গালী। বাঙ্গালার গগন-পবনে তাঁহার মানস প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সাফল্যে বাঙ্গালীর মন উৎফুল্ল হইবার কারণ আছে। মিঃ গজনভী তাঁহার নির্ব্বাচনে বলিয়াছিলেন যে, "এক জন বাঙ্গালী এই সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন, ইহাই আনন্দের বিষয়।" সেই সময় আর এক জন সদস্য বলেন, "প্রাদেশিকতা ত্যাগ করুন।" আর এক জন বলিলেন, "উনি ভারতবাসী।" সার আব্দার রহিম বাঙ্গালী বলিলে কি তিনি ভারতবাসী, ইহা বুঝায় না? বাঙ্গালী কি ভারত ছাড়া? যিনি প্রাদেশিকতা ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিষ্ঠা দেখিয়া আমরা বিস্মিত। এ নিষ্ঠামি তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে দেখাইয়া থাকেন! তাঁহারা কি তাঁহাদের প্রদেশে বাঙ্গালী যাইলে হৈ-চৈ করেন না? তখন এই নিষ্ঠা থাকে কোথায়? যাহা হউক, আমরা আশা করি, সার আব্দার রহিম ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি-পদে আসীন হইয়া দূরদর্শিতা এবং নিরপেক্ষতা অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

মতের পরিবর্ত্তন

পাঠক জানেন, মহাত্মা গান্ধী এক সময়ে মন্দিরপ্রবেশ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষভাবে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার বৈবাহিক এবং অনুচরবর্গ সকলেই ঐ আইনের জন্য একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি, মহাত্মাজীরই মতের কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সম্প্রতি নয়া দিল্লীর হরিজন উপনিবেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে তিনি বলিয়াছিলেন,—"সদস্যরা যেন মন্দিরপ্রবেশ আইন প্রণয়ন করিবার চেষ্টা এখন আর না করেন।" তাহার কারণ, প্রথমে আইনের অনুকূলে লোকমত গঠন করিতে হইবে। আর এক কথা, এরূপ ব্যাপারে কেবল ভোটের সংখ্যাধিক্য অনুসারে চলিলে হইবে না।" তাঁহার এই উক্তির প্রথম অংশ পাঠ করিলে মনে হয়, হরিজনদিগকে মন্দিরপ্রবেশে অধিকার দান সম্বন্ধে তাঁহার মতের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তবে তিনি এইটুকু বলিতে চাহেন যে, অগ্রে জনমত গঠন করিয়া তবে আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। কিন্তু শেষাংশটুকু পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তাঁহার মনের কোণে এই বিষয়ে একটু সংশয়ের ছায়াপাত হইয়াছে। 'এরূপ ব্যাপারে কেবল ভোটের সংখ্যাধিক্য অনুসারে চলিলে হইবে না, এ কথার উদ্দেশ্য কি? ইহাতে কি মনে হয় না যে, ইহার ভিতর আর একটা কিছু আছে, যাহা না বুঝিয়া কেবল জনমত দ্বারা চালিত হইলে চলিবে না? এ কথা বলিলে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না যে, মহাত্মাজী যতই সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক হউন না কেন,—স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায়—মহাপুরুষের ন্যায় তিনি হিন্দুর সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিণে রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতাদানপ্রসঙ্গে সাধনের প্রথম সোপান বিষয়ে বলিয়াছিলেন,—তোমাদের মধ্যে যাহাদের সুবিধা আছে, তাহাদের সাধনের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এই গৃহ শয়নার্থ ব্যবহার করিও না,—ইহাকে পবিত্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া ও শরীর-মন শুদ্ধ না করিয়া এ গৃহে প্রবেশ করিও না। এ গৃহে সর্ব্বদা পুষ্প ও হৃদয়ানন্দকারী চিত্রসকল রাখিবে। প্রাতে ও সায়াহ্নে তথায় ধূপ-ধূনাদি প্রজ্বালিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ, ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা যেন না হয়। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে। ঐরূপ করিলে শীঘ্রই সেই গৃহটি সত্ত্বগুণে পূর্ণ হইবে। এমন কি, যখন কোন প্রকার দুঃখ অথবা সংশয় আসিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। মন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতি করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল। এখনও অনেক মন্দির ও গির্জ্জায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু

অধিকাংশ স্থলে লোকে ইহার উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে পবিত্র চিন্তার পরমাণু সকল স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া থাকে।” (উদ্বোধন গ্রন্থাবলী, রাজযোগ, বাঙ্গালা সংস্করণ ৩৬—৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যে মহাপুরুষ কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ইহা সেই মহাপুরুষেরই কথা। ইহা তাঁহারই প্রত্যক্ষসিদ্ধ মত। বিশেষজ্ঞের এই মত কখনই অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুর দেবমন্দির সেই স্বতন্ত্রীকৃত সনাতন সাধনের গৃহ। উহাতে সকলকে নির্ব্বিচারে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া সঙ্গত নহে। মহাত্মাজী বোধ হয় ক্রমশঃ তাহা বুঝিতেছেন,—তাই তিনি বলিয়াছেন, “এ সকল ব্যাপারে ভোটের সংখ্যাধিক্য অনুসারে চলিলে চলিবে না।” ইনি এক সময় বলিয়াছিলেন যে, “মলত্যাগ করিবার গৃহই গীতা পাঠ করিবার স্থান। কারণ, মলত্যাগ করিবার পরই মাথাটা খোলসা হয়।” যিনি ধর্ম্মসাধনার পথে কখনই হাঁটেন নাই,—হিন্দুরা তাঁহার কথায় চালিত হইবেন, না, যিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সাহিত্য, দর্শন, এবং বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া এবং ভূতলে অবতীর্ণ ভগবানকে গুরুরূপে পাইয়া, কঠোর সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই উপদেশ শুনিয়া কায করিবেন? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা স্বামীজীর নাম ভাঙ্গাইয়া আপনাদের পসার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাও স্বামীজীর উপদেশ অবহেলা করিয়া মহাত্মাজীর মতেই ডিটো (Ditto) দিতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই। ইহাই আমাদের দেশের জনমত। ইহারাই এই অধঃপতিত সমাজের ভোটদাতা। অধঃপতনের আর বাকি কি আছে? মহাত্মাজী আবার লোকমত গঠনের কথা বলিয়াছেন। সেই-ই ত ভয়ের কথা।

নূতন কর

বঙ্গীয় সরকার অনেক চিন্তার পর এই করভারপীড়িত বাঙ্গালীর স্কন্ধে নূতন করের বোঝা চাপাইবেন স্থির করিয়াছেন। ভারত সরকার বাঙ্গালার নিকট হইতে বিস্তর টাকা গ্রহণ করেন বলিয়া বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে টাকার বিশেষ টানাটানি ঘুচিতেছে না। কাযেই বাঙ্গালা সরকার আবার পাঁচ দফা নূতন করের ভার বাঙ্গালীর উপর চাপাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সেই পাঁচ দফা কর এই:—(১) গৃহস্থের বাড়ীতে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়, তাহার উপর কর ধার্য্য করা হইবে। (২) তামাক-বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে লাইসেন্স ফী আদায় করা হইবে। (৩) কোর্ট-ফির হার বৃদ্ধি করা হইবে। (৪) ষ্ট্যাম্প আইনের সংশোধন এবং (৫) থিয়েটার, সিনেমা, সার্কাস প্রভৃতি লোকের প্রমোদদায়ক প্রতিষ্ঠানের উপর নূতন কর ধার্য্য করা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এ দেশের উপর আর ন্যায়তঃ কর ধার্য্য করিবার কোন স্থান নাই। বাঙ্গালায় পাট, ধান এবং অন্যান্য পণ্যের মূল্য এত অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা বিক্রয় করিয়া উৎপাদনের খরচা সকল স্থানে পোষাইতেছে না। কাযেই বাঙ্গালী সমাজের সর্ব্বস্তরেই হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালার উপর নূতন কর ধার্য্য করিলে লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে। মেষ্টন কমিটী বাঙ্গালা প্রদেশের উপর যে ঘোর অবিচার করিয়া গিয়াছেন,—তাহার আর সংশোধন হইল না। পাটের রপ্তানী শুল্ক বাবদ আয়টা ন্যায়তঃ সমস্তই বাঙ্গালার প্রাপ্য। কারণ, বাঙ্গালী রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া এবং জ্বরে ভুগিয়া ঐ পাট উৎপন্ন করে। অনেকে মনে করেন যে, বাঙ্গালায় জ্বর-রোগের বৃদ্ধির কারণই পাট। সেই পাটের রপ্তানী শুল্ক বাঙ্গালী পাইবে না কেন? বাঙ্গালা সরকার বঙ্গপ্রদেশবাসীদিগের জন্য যত অল্প টাকা ব্যয় করেন,—তত অল্প টাকা মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের সরকার তাঁহাদের প্রদেশবাসীদিগের জন্য ব্যয় করেন না। কাযেই এ জন্য বাঙ্গালা দেশের লোকের অসন্তুষ্টি স্বাভাবিক। দেশবাসীদিগকে এইভাবে অসন্তুষ্ট করা কোন সরকারের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

তবে এ কথা সত্য যে, প্রতি বৎসর যদি সরকারী তহবিলে প্রায় ২ কোটি টাকা করিয়া ঘাটতি পড়ে, তাহা হইলে সরকারের তাহার একটা উপায় করাই উচিত। দুই উপায়ে সেই উপায় করা যাইতে পারে। প্রথম সরকারের ব্যয়-হ্রাস। দ্বিতীয় আয়-বৃদ্ধি। ব্যয়-হ্রাসের উপায় যথেষ্ট আছে, কিন্তু সরকার সে উপায় অবলম্বন করিবেন বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, বাঙ্গালার বিভাগীয় কমিশনারের পদগুলি উঠাইয়া দেওয়াই উচিত। উহার প্রয়োজন বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রীদিগের পদের সংখ্যা এবং বেতনের হার কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে শাসন-পরিষদের সদস্যদিগের বেতনের হারও হ্রাস করা বিধেয়। যে দেশের আয় অল্প, সে দেশে ব্যয়ের বাহুল্য সাজে না। অধিকন্তু এই প্রদেশে পুলিসের ব্যয় আজকাল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ না করিয়া উহা কি পর্য্যন্ত কমান যাইতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। অন্যান্য দিকেও যদি ব্যয় সঙ্কোচ করা যায়, তাহা করিতে হইবে।

যে কয় দফা কর ধার্য্যের কথা উঠিয়াছে,—বলা হইতেছে, তাহা গরীবদিগের পক্ষে পীড়াদায়ক হইবে না। কিন্তু সে কথা সত্য নহে। প্রথম দফা বৈদ্যুতিক শক্তির উপর কর ধার্য্য করিলে কলিকাতা বা ঐরূপ সহরবাসী অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘোর কষ্ট হইবে। তাহারা বৈদ্যুতিক আলো না জ্বালাইয়া কেরোসিনের আলো জ্বালাইবে। ফলে সহরের স্বাস্থ্য খারাপ হইবে। দ্বিতীয় দফা, তামাকের উপর লাইসেন্স ট্যাক্স বসাইলে, তামাক, সিগারেট, বিড়ি প্রভৃতির দর বাড়িবে, ফলে কি সহর, কি মফস্বল, সর্ব্বস্থানের তাম্রকূটসেবীদিগের ঘোর কষ্ট জন্মিবে। ইহা করিয়া সরকার কত লাভ করিবেন? লাভ বিশেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিড়িওয়ালাদের ব্যবসা মাটী হইবে। কোর্টফির হার বাড়াইলে গরীবদিগেরই ঘোর কষ্ট ঘটিবে। কারণ, অনেক সময় লোক দায়ে পড়িয়াই মামলা করে। গরীব লোক বিচারপ্রার্থী হইতে পারিবে না। চতুর্থতঃ, গৃহস্থমাত্রেরই উপর ষ্ট্যাম্প আইন বর্ত্তে, সুতরাং উহার মূল্যের হার বৃদ্ধি করিলে গরীব মারা পড়িবে। পঞ্চমতঃ, গরীব লোকের জীবনেও আমোদ-প্রমোদের দরকার আছে। সমস্ত দিন গাধার খাটুনি খাটিয়া প্রত্যহই ঘরে আসিয়া “মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর” এই ধরণের গীত গাহিলে প্রাণ যে অতিষ্ঠ হইয়া

উঠিবে। অনেক থিয়েটার এবং সিনেমাকে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে। ইহাতে অনেক লোকের বৃত্তি মারা যাইবে। সুতরাং এই পাঁচ দফার মধ্যে কোন দফার করের আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না।

—

সরকারের পরাজয়

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসুকে মুক্তি দিবার জন্য যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, সেই প্রস্তাব ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। এই মুক্তিদান প্রস্তাবের অনুকূলে ৫৮টি এবং প্রতিকূলে ৫৪টি ভোট হইয়াছিল। সুতরাং ব্যবস্থা পরিষদের মারফতে যে জনমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শরৎ বাবুকে মুক্তিদানের অনুকূল। বাহিরের জনমতও পূর্ণ-মাত্রায় শরৎ বাবুকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সরকারকে বারংবার অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। দেশের সর্ব্বসম্প্রদায়ের সংবাদ-পত্র একবাক্যে শরৎবাবুকে মুক্তিদানের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। কলিকাতার অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতারা তাঁহাকেই ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার উপরই আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। জনমত যে শরৎ বাবুর অনুকূল, ইহা বুঝিতে সরকারের বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। কিন্তু তথাপি সরকার বলিতেছেন এবং সম্ভবতঃ একান্তভাবে বিশ্বাস করিতেছেন যে, শরৎ বাবু "ঘোর বিপজ্জনক ব্যক্তি।" তিনি সরকারের কি বিপদ ঘটাইয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। সরকার তাঁহার বিপজ্জনকতার কি প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় সরকার তাঁহাকে কত কাল এইরূপভাবে আটক রাখিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। বিশ্বনিয়ন্তা যত দিন তাঁহাকে মুক্তি না দিতেছেন অর্থাৎ তাঁহার প্রাণপক্ষীটিকে দেহপিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া না দিতেছেন, তত দিনই সরকার কি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া মুক্তি দিবেন না? ইহা বড় বিষম ব্যবস্থা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ অপরাধে যাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাদের অপরাধ যতই ভীষণ বলিয়া সপ্রমাণ হউক না কেন, তাহাদের দণ্ডের একটা মেয়াদ থাকে ;—অর্থাৎ কত দিন তাহারা আটক থাকিবে, তাহার একটা নির্দ্দেশ থাকে। কিন্তু কেবল সরকার পক্ষের কতকগুলি লোকের সন্দেহমাত্রে যাঁহারা আটক হইবেন, তাঁহাদের আটককাল সম্বন্ধে কোন মেয়াদ থাকিবে না,—ইহা কোন্ দেশী বিচার-সিদ্ধান্ত? শরৎ বাবু ত আদালতে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বিচার চাহিতেছেন। তাহাই বা করা না হইতেছে কেন? বড়লাট শরৎ বাবুকে আটক রাখিয়া আবার তাঁহাকে আইন সভায় উপস্থিত হইতে আহ্বান করিয়া উৎকট পরিহাস করিলেন। ইহাতে আমাদের দেশের লোকের আইনসঙ্গত অধিকার কতটুকু, তাহা বুঝিতে কি কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত?

—

বড়লাটের বক্তৃতা

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকে ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্টে যে ভাবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংস্কারসাধনের আভাস দেওয়া হইয়াছে,—তাহার সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। অল্প কথায় তাহার সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশ সম্ভবে না। তবে এ কথা সত্য যে, যাঁহারা তাঁহার এই বক্তৃতায় নূতন কিছু পাইবার আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে। ইহাতে আছে সেই খাড়া বড়ি থোড় আর থোড় বড়ি খাড়া। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বহুদিন ভারতে আছেন। তাঁহার মনে পড়ে, ছিল এক দিন—যে দিন লোক সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা সুদূর কল্প-লোকের কথা বলিয়া মনে করিত। এখন সেই কল্পনা বাস্তব লোকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জয়েণ্ট কমিটীর রিপোর্টের ফলে উহা যে কল্পনা-লোক হইতে বাস্তব লোকে কিরূপে আসিয়াছে, আমরা সেইটাই ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শাসক সম্প্রদায় তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাগুলি যেরূপ সঙ্গীনের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যে কস্মিন্‌কালেও অধিগত হইবে, তাহা মনে করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক বেরিডেল কীথও বলিয়াছেন যে, ঐ সকল সরকারী স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পিত সঙ্গীনের বেড়া যেটুকুও দিবার মত করা হইয়াছে, তাহাও কাড়িয়া লইয়াছে। সুতরাং আমরাই যে আমাদের বুদ্ধির দোষে ঐরূপ মনে করিতেছি, তাহা নহে। আর এক কথা, যে পক্ষ দুর্ব্বল, সেই পক্ষের স্বার্থ-রক্ষার জন্য শক্ত বেড়া দিবার প্রয়োজন হয়। যাহার সন্তান দুর্ব্বল, সেই সেই ছেলের গলায় মহামৃত্যুঞ্জয়-কবচ ঝুলাইয়া দেয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্টে প্রবল-প্রতাপ সরকারের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কল্পিত অধিকারের বেড়ার বাঁধন কষণ খুবই শক্ত করা হইয়াছে। একবারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গপূর্ণ কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে,—কিন্তু গরীব ভারতবাসীদিগের অধিকারের সীমাজ্ঞাপক একটু আলি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। ইহাতে লোক কি বুঝিবে? তাহার পর তিনি সংহতিতন্ত্রের কথা পাড়িয়াছেন। লর্ড উইলিংডন সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় সংহতি-তন্ত্রের (Federalism) বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার কথার ভাবে মনে হয়, উহা যেন আমাদিগকে হাতে হাতে চতুর্ব্বর্গ দিবে। তাহা নহে। ব্র্যাণ্ড (Brand) লিখিয়াছেন, "Federalism is after all a concession to human weakness. ইহার অর্থ মোটের উপর রাষ্ট্রীয়-সংহতি-তন্ত্র, একটি শেষ উপায়, মানবের দুর্ব্বলতার জন্য ইহা মানিয়া লওয়া হইয়া থাকে।" ইহার অসুবিধা অনেক আছে। কিন্তু যদি এই প্রকারের শাসনতন্ত্রই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেও ইহাতে দেশীয় রাজন্যবর্গকে টানিয়া আনিয়া একটা জগাখিচুড়ী রকমের গোলযোগ পাকাইবার কোন হেতু দেখা যায় না। কবে এই সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার ঠিকানা নাই, কাযেই ইহা কখনই এ দেশের লোকের মনঃপূত হইতে পারে না।

সংহিত রাষ্ট্রসংঘ সঙ্গে সঙ্গে গঠন না করিলে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা গজাইয়া উঠিবে,—প্রদেশে প্রদেশে বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাইবে। বড়লাট অনেক কথাই বলিয়াছেন; উহার অনেক আলোচনাই হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সেই সকল কথা তুলিয়া আমরা এই মন্তব্য ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। তিনি স্বীকার করিবেন যে, ভারতের কোনও সম্প্রদায়ই এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই। এমন কি, মুসলমান সম্প্রদায়ও ইহার উপর সন্তোষ-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। কয়েকজন মুসলমান জন-নায়ক কেবল এই ভেদসূচক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "ভারতবাসীর মধ্যে যে মতভেদ বিদ্যমান, তাহার জন্য সম্রাটের সরকার ভারতীয় শাসনসংস্কারের পথে বাধা জন্মাইতে দেন নাই।" বটে! সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে বিলাতী সরকার যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মতভেদকে চিরস্থায়ী করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দকে জোর করিয়া ভাল বলিলে লোকের মনে উহাকে ভাল বলিয়া প্রত্যয় জন্মাইয়া দেওয়া যায় না। ভারতবাসীদিগের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করিবার জন্যই এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে,—বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন।

ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তি

ভারতবর্ষকে ইংরাজরা কেবল তাঁহাদের অধিকৃত দেশ মনে করেন না,—পরন্তু ইহাকে তাঁহারা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রও মনে করিয়া থাকেন। সেই জন্য লর্ড ডফরিণ একবার বিলাতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "আজ যদি ইংলণ্ডের সহিত ভারতের রাজনীতিক সম্বন্ধ আংশিক ভাবেও ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে গ্রেট বৃটেনের শিল্পপ্রধান স্থানে এমন একটিও কুটীর রহিবে না, যাহাতে সেই বিপৎপাতের ফল অনুভূত না হইবে।" অর্থাৎ ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির একান্ত অধীন হইলে বৃটিশ শিল্পীদিগের বিশেষ সুবিধা থাকিবে। কাযেই যাহাতে ভারতে ইংরাজ জাতির বাণিজ্যের প্রসার অপ্রতিহত থাকে এবং দিন দিন বৃদ্ধি পায়, সে চেষ্টা সমস্ত স্বদেশহিতৈষী বৃটেনবাসীর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁহারা যে ঐ কার্য্য সাধন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আজ যে বৃটিশ রাজনীতিকরা নানা ওজর এবং আপত্তিতে ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানে বিলম্ব করিতেছেন, তাহার মূল কারণ,—পাছে ভারতবাসী হাতে ক্ষমতা পাইলে আত্মস্বার্থ রক্ষা করিতে যাইয়া বৃটিশ বাণিজ্যের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করে,—এই সন্দেহ। যাহা হউক, সম্প্রতি ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকার মিলিত হইয়া এক বাণিজ্য-চুক্তি করিয়াছেন, উহার নাম ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তি। ঐ চুক্তি করিবার সময় বৃটিশ সরকার গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্য-সচিব মিষ্টার ওয়াল্টার রান্সিম্যানের মারফতে বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ভারতেও বড়লাট ভারতীয় ইংরাজ সওদাগরের মত লইয়াছিলেন,—কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের মত গ্রহণ করেন নাই। এরূপ কাণ্ড নূতন নহে, সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যাহা হউক, এই চুক্তির কথা প্রকাশ পাইলে পর ইহার বিরুদ্ধে ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই চুক্তির কথা আলোচিত হইয়া গিয়াছে। ঐ পরিষদের অন্যতম সদস্য মিষ্টার গোবা উহা নাকচ করিয়া দিবার জন্য পরিষদে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভোটে মিষ্টার গোবারই জয় হইয়াছে। মিষ্টার গোবার পক্ষে ৬৬টি ভোট এবং সরকারের পক্ষে ৫৮টি ভোট হইয়াছিল। সুতরাং ব্যবস্থা পরিষদ ঐ চুক্তি নাকচ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এত অধিক ভোটে যে সরকারকে এই ব্যাপারে পরাজিত হইতে হইবে,—সম্ভবতঃ সরকার তাহা মনে করেন নাই। পরিষদে সরকারের পক্ষে সার জোসেফ ভোর এবং য়ুরোপীয়দিগের পক্ষে মিষ্টার জেমস্ এই চুক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়া খুব জবরভাবে ওকালতী করিয়াছিলেন। সার জোসেফ ভোর বলেন যে, ঐ চুক্তিতে কোন নূতন কথা নাই, সেই জন্য সরকার ভারতবাসী ব্যবসায়ীদিগের মতামত গ্রহণ করেন নাই। ব্যবস্থা পরিষদে যে নীতি বার বার গৃহীত হইয়াছে,—তাহার সম্বন্ধে আবার ভারতবাসী ব্যবসায়ীদের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে কেন?"—ইহার উত্তরে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ বলেন, "যদি ইহাতে নূতন কিছু না থাকে, তবে সরকার গোপনে এই নূতন চুক্তি করিতে গেলেন কেন?" ফলে বাদানুবাদের ঘটাটা খুবই হইয়াছিল। এখনে সব কথার আলোচনা সম্ভবে না। যাহা হউক, ব্যবস্থা পরিষদ ঐ চুক্তি অগ্রাহ্য করিবার জন্য মত দিলেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এখন সরকার কি করিবেন? আমাদের বিশ্বাস, সরকার কাণে তূলা দিয়া বসিয়া থাকিবেন। ইহাতে আমাদের এত সাধের ব্যবস্থা পরিষদের স্বরূপ বোঝা যাইবে।

সুভাষ বাবুর পত্র

বাঙ্গালায় রাজনীতিক অবস্থা যে অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। বাঙ্গালীর যে রাজনীতিক প্রতিভা অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও ভারতীয় রাজনীতিক গগনকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, বাঙ্গালীর সে প্রতিভা আজ অস্তমিত। আজ বাঙ্গালা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ফেরুপালের চীৎকারে উহার গগন-পবন মুখরিত। যে দিন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন,—যে দিন চিত্তরঞ্জন অপশোষে তুর্জ্জয়লিঙ্গশিরে শমনকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—সেই দিন হইতে বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রে কেশরীর কণ্ঠ-নিঃসৃত কম্বুরব নীরব হইয়া গিয়াছে। তাই আজ বাঙ্গালার ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। পিতৃশ্রাদ্ধকালে কয়েক দিনের জন্য বাঙ্গালায় আসিয়া সুভাষচন্দ্র যাহা দেখিয়া এবং শুনিয়া গিয়াছেন, তাহাই তিনি জানিতে পারিয়াছেন। কারণ, সরকার তাঁহাকে কাহারও সহিত আলাপ করিতে দেন নাই। তাই তিনি সব কথা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন নাই। তিনি প্রতিভাশালী এবং বুদ্ধিমান; তাই তিনি প্রকৃত ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "দুইটি পেষণ-চক্রের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালী চূর্ণ হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

এক দিকে সরকার, আর এক দিকে কংগ্রেস।" বাঙ্গালার উপর সরকারের অসন্তুষ্ট হইবার কারণ আছে। বাঙ্গালী রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রণী, বাঙ্গালী অসহযোগ আন্দোলনে যত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, এত দূর অন্য কোন প্রদেশের লোকই অগ্রসর হয় নাই। তাই এখনও ২ হাজার বাঙ্গালী যুবক সরকারের বন্দিশালায় আটক রহিয়াছেন। বাঙ্গালাতেই স্বরাজী দল বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কাযেই সরকার বাঙ্গালীর উপর বিরক্ত। শাসকের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। আজ বাঙ্গালার দেউটি একে একে নিবিয়া গিয়াছে। রামগোপাল ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত বহু মনীষী রাজনীতিক্ষেত্রে পথিপ্রদর্শন করিয়াছেন।

সেই জন্য মহারাষ্ট্রীয় মনীষী স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী আজ যাহা ভাবে, অন্যান্য প্রদেশ তাহা কা'ল ভাবিয়া থাকে। তাই সরকারের বহু রাজপুরুষ বাঙ্গালীর উপর বিরক্ত। এ দিকে আজ বাঙ্গালার আলোক নির্ব্বাপিত হইতে যাইতে বসিয়াছে বলিয়া এত দিন যে সকল প্রদেশের লোক মনে মনে বাঙ্গালার উপর নিষ্ফল বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিল, তাহারা এখন সুবিধা পাইয়া বাঙ্গালীর উপর চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই যে সময় সার এস, পি, সিংহ বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহিত বিহারবাসীর ব্যবহারে ভারতবাসী একতার পথে কিরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহা বুঝা গিয়াছিল। তাই বাঙ্গালী এখন কংগ্রেস হইতে নির্ব্বাসিত। কংগ্রেসের একমাত্র পরিচালক মহাত্মাজী সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদটি বাঙ্গালার পক্ষে যেরূপ ভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায়কে একেবারে পঙ্গু হইয়া যাইতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রতিভা আর যাহাতে মস্তক উত্তোলন করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রকারে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এ দিকে বাঙ্গালায় যাঁহারা রাজনীতিক চর্চ্চা করিবার আস্থা রাখেন, তাঁহারা এখন হীন স্বার্থসাধন করিবার জন্য দলাদলি লইয়াই মশগুল হইয়া রহিয়াছেন। দেশ রসাতলে যাউক, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা কেবল চাহেন—আপনার কোলে ঝোল টানিতে। তাই সুভাষবাবু বাঙ্গালীদিগকে আত্ম-কলহ পরিহার করিয়া একযোগে কায করিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালার কংগ্রেস কমিটীর পরিচালকমণ্ডলী এত দিন নির্ব্বিবাদে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে বাঙ্গালীর স্বার্থের সহিত বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন; সুভাষবাবু সেই জন্য এই সকল পরিচালককে বাদ দিয়া সর্ব্বদলের প্রতিনিধি লইয়া একটি নূতন পরিচালক সমিতি গঠিত করিতে বলিয়াছেন। আজকাল কংগ্রেসের পরিচালকবর্গ অতিকায় স্বৈরাচারী (autocrat) হইয়া উঠিয়াছেন। বড় রাজনীতিক দলের লোক বলিয়া, তাঁহাদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কথায় 'যো হুকুম' না বলিলে তাঁহারা "মারমুখো" হইয়া উঠিতেছেন। ইহাই তাঁহাদের গণতন্ত্র সেবার নিশানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যদি বাঙ্গালার কংগ্রেস কমিটী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নষ্ট করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কংগ্রেস-পরিচালক দলের বিরাগ-ভাজন হইতে হইবে! সেই জন্য সুভাষবাবু বাঙ্গালার পক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য পথের নির্দ্ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ পরামর্শ যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমরা স্বীকার করি। বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিয়া সুভাষবাবু মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন,—তাই তিনি ভিয়েনা হইতে বাঙ্গালার কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদককে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন। পত্রখানি সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক তাহা পড়িয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। সুভাষবাবু পুণা প্যাক্ট সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী।

হ্যালেট সার্কুলার

মহাত্মা গান্ধী পল্লী-সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি পল্লীর শিল্পোন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন বলিতেছেন আর অমনই সরকারের মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে,—মহাত্মাজী পল্লীশিল্পের উন্নতিসাধনের অছিলায় দেশের জনসাধারণের মনে রাজনীতিক বিষ ঢালিয়া দিবেন। সেই জন্য তাঁহারা মহাত্মাজীর এই প্রচেষ্টায় বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য গোপনে এক সার্কুলার জারি করিয়াছেন! সেই সার্কুলারখানি হ্যালেট সার্কুলার নামে অভিহিত। একখানি ইংরাজী দৈনিক-পত্র ঐ সার্কুলারখানি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহা লইয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সার্কুলার যে জারি করা হইয়াছে, সরকার তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার হেনরী ক্রেক বলিয়াছেন যে, যদি দেখা যায় যে, সরকারের ধারণা ভুল, মহাত্মাজী কেবল গ্রাম্য শিল্পমাত্র পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টায় আছেন, তাহা হইলে সরকার এই চেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিবেন। সরকারের এই সন্দেহ দেখিয়া নানা লোক নানা কথা বলিতেছে। এখন দেখা যাউক, সরকার তাহাদের কথা কিরূপ রক্ষা করেন। কিন্তু এ কথা সরকার জানেন যে, মহাত্মাজী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই পল্লীসংগঠন কার্য্যের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই;—পরন্তু তিনি পরোক্ষভাবে কোন কায করিতে অভ্যস্ত নহেন; কিন্তু সরকার তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যতক্ষণ মহাত্মাজীর কাযের সহিত কথার অনৈক্য দেখা না যাইতেছে,—ততক্ষণ মহাত্মাজীর কার্য্যের বিরোধিতা করিবার কারণ কি?

সরকারের তৃতীয় পরাজয়

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে সরকারের আবার একবার পরাজয় ঘটিয়াছে। সীমান্তপ্রদেশে খোদাই-খিদমদগার নামক একটা দল গঠিত হইয়াছে। এই দলের কর্ম্মীরা অহিংস নীতির উপাসক। ইহাদের উপর ভারত সরকার কতকগুলি বিধিনিষেধের ভার চাপাইয়া ইহাদিগকে পঙ্গু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ বি, দাস গত ৫ই ফেব্রুয়ারী এই মর্ম্মে এক প্রশ্ন উপস্থিত করেন যে, উত্তরপশ্চিম

সীমান্তপ্রদেশের এই প্রতিষ্ঠানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে, তাহা দূর করিবার অথবা দূর করাইবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আবশ্যক উপায় অবলম্বনের নিমিত্ত এই ব্যবস্থাপরিষদ বড়লাটের নিকট সুপারিশ করিতেছেন। খোদাই খিদমদগার অর্থে ভগবানের সেবক। ইহারা জনসেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া আছে। মিঃ দাস বলেন, খোদাই খিদমদগারদিগের কার্য্যকারিতার ফলেই সম্প্রতি সীমান্তপ্রদেশে শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সরকার ইহাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন। সরকারের ধারণা, এই দল বলসেবিক দলের মত আবহাওয়া দেশে ছড়াইয়া দিতেছে। মিষ্টার দাস বলেন যে, সরকারের ধারণা ভুল। মিষ্টার সেরওয়ানী বলেন যে, সীমান্তপ্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠাই ঐ দলের লক্ষ্য। কিন্তু ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন যে, উহারা অতিশয় ভীষণ লোক, উহারা আফ্রিদীদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে। এ উক্তি যে নিতান্তই হাস্যজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরকারের পররাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার মেটকাফ কিছুকাল পেশওয়ারের ডেপুটী কমিশনার ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি খোদাই খিদমদগারদিগের সামাজিক কার্য্য দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের দলপতি খান আবদুল গফুর খাঁকে দেখা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আবদুল গফুর খাঁ তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, দেখা করিলে তাঁহার প্রভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। দেখা করিতে অসম্মতি কি একটা অপরাধের লক্ষণ? যাহা হউক, ভোটে সরকার পক্ষের ঘোর পরাজয় ঘটিয়াছে। মিষ্টার দাসের প্রস্তাবের অনুকূলে ৭৩টি এবং প্রতিকূলে অর্থাৎ সরকারের অনুকূলে ৪৬টি মাত্র ভোট হইয়াছিল। সুতরাং অত্যন্ত অধিক ভোটে যে সরকারের পরাজয় হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—

পাঠাগার আন্দোলন

গত ৮ই ও ৯ই পৌষ কংগ্রেস ভবনে কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় এম এল সির সভাপতিত্বে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের নবম অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় ভারতের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিসমাগম হইয়াছিল। এই সঙ্গে একটি প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় বাহাদুর যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি প্রথমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাতকারী মিষ্টার বার্ডেনের জন্য শোক প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি বরোদার গ্রন্থাগার-সমূহের কিউরেটর মিষ্টার নিউটান মোহন দত্ত বিলাতে পক্ষাঘাতশয্যাশায়ী হইয়া আছেন, এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ইনি বাঙ্গালাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনেক আনুকূল্য করিয়াছিলেন। "প্রায় ২৫ বৎসর হইল, ভারতে গ্রন্থাগার-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। বরোদা রাজ্যেই তাহার উৎপত্তি। বৃটিশ ভারতের মধ্যে অন্ধ্রদেশে ১৭ বৎসর পূর্ব্বে এবং বাঙ্গালাদেশে ৯ বৎসর পূর্ব্বে এই আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আমার বাসগ্রাম বাঁশ-বেড়িয়ায়, বাঙ্গালাদেশের মধ্যে প্রথম গ্রন্থাগার-সম্মেলন ও প্রদর্শনী হইয়াছিল। এই আন্দোলনের আদর্শ প্রচারে অন্ধ্রদেশই অগ্রগণ্য। Indian Library Journal প্রকাশই তাহার অন্যতম নিদর্শন।"

তৎপরে সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় বলেন, জনসাধারণের পাঠস্পৃহা-বর্দ্ধন, নূতন পাঠকগণকে আকর্ষণ, পাঠ্য বিষয় সহজলভ্য করণ এবং পাঠকদিগের নিকট গ্রন্থাগার যাহাতে অপরিহার্য্য এবং জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান আদর্শে চালাইতে হইবে অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা

শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায়

যেমন মালের কাটতি বাড়াইবার জন্য নানা অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, গ্রন্থাগারগুলিতেও তদনুরূপ পাঠক আকর্ষণের জন্য এবং পুস্তকের চাহিদা বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণের সেবায় সুব্যবস্থার উপরই সকল প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। সেবা করিতে হইলে মশলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা এবং মাল-মশলার সদ্ব্যবহারের নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মাল-মসলা সরবরাহের শক্তি ও সামর্থ্য অর্জ্জন করা চাই। আমাদের সম্রাট গ্রন্থাগার আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক। বিলাতের গ্রন্থাগারগুলিকে এক সূত্রে গাঁথিবার জন্য যে কেন্দ্রী জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উদ্বোধন উপলক্ষে সম্রাটের হৃদয়গ্রাহী বাণী তাহার পরিচয় দিতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য করিয়াছিলেন। সরকারের এবং সাধারণের নিকট সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "সম্রাটের এই রৌপ্য জুবিলী উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতি সদা জাগরূক রাখিবার জন্য প্রত্যেক পল্লীতে একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপনা করা হউক এবং সেই সঙ্গে পল্লীর জনসংখ্যা বুঝিয়া সাধারণের মেলামেশার কেন্দ্র এবং সামাজিক ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে একটি

করিয়া মিলনগৃহ নির্ম্মাণ করা হউক। গণতন্ত্রের যুগে এই ধরণের মিলনকেন্দ্র অতীব বাঞ্ছনীয়।" সভাপতির এই উক্তিগুলি যে সুন্দর হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে প্রত্যেক পল্লীতে যে একটি করিয়া মিলনগৃহ বা হল নির্ম্মিত হইবে, তাহার ব্যয়ভার লইবে কে? পল্লীবাসীদের যে দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে,—মনীষী সভাপতি মহাশয় কি তাহা জানেন না? তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "আমাদের সাধারণ পাঠাগারগুলির পুস্তকের বরাদ্দের মধ্যে বাজে নাটক-নভেল খরিদের ব্যয়ের অনুপাত অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে।" কথা সত্য। কিন্তু ইহার কারণ কি, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? উহার কারণ, লোক উহাই চাহে। ভাল ভাল পুস্তক কেহ পড়িতে চাহে না। সে প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা অনেকেরই নাই। অনুরোধ করিয়া, জোর করিয়া ভাল পুস্তক পড়িতে দিলে লোক উহা পড়িতে চাহে না,—ইহা আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছি। শিক্ষার দোষে লোকের মতিগতি ঐরূপ হইয়াছে। তিনি এই সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। সকল কথার আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

হিন্দু সভায় আলোচনা

গত ২রা মাঘ শনিবার কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে নিখিল বঙ্গীয় হিন্দু সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু সভাপতি হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দর হইয়াছিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, হিন্দু সভা রাজনীতিকভাবে প্রভাবিত হিন্দুদিগেরই সভা। সভাপতি মহাশয় পার্লামেণ্টারী জয়েণ্ট কমিটীর রিপোর্টখানি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া উহার আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সকলের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই রিপোর্টখানি শ্বেতপত্রের পরিকল্পনা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। ইহার পর শাসন-সংস্কার আইনের যে পাণ্ডুলিপিখানি রচিত হইয়াছে, তাহা আরও হীন হইয়াছে। বিশেষতঃ আইনের খসড়াখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জন্য সভাপতি মহাশয় উহার সম্যক্ আলোচনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আসল কথা,—'ছিল ঢেঁকি হ'লো তুল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।' সাইমন কমিশনের রিপোর্ট হইতে শ্বেতপত্রের পরিকল্পনা অনেক হীন,—তাহা অপেক্ষা জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট আরও হীন; এখন শাসন-সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপি তদপেক্ষা আরও হীন। উঠন্তি ধান পত্তনেই চেনা যায়। শেষটা আইনে পরিণত হইলে বিলাতী জাতীয় সরকারের কৃপায় ইহা যে কি অপরূপ রূপ ধরিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তিন বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন,—এখন তাহা সবই ভুলিয়া গিয়া ভারতের পায়ে আইনের এই লৌহনিগড় নির্ম্মমভাবে পরাইতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সরকার বহুবার ভারতবাসীদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও এই সকল সরকারী দলিলে সে কথা কুত্রাপি ভ্রমেও একবার বলা হয় নাই। ইহাতেই ভারতের প্রতি রক্ষণশীল-শাসিত জাতীয় দল কতটা সুবিচার করিতে বসিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্টে হাইকোর্টের তথা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যে কি ভাবে ক্ষুণ্ণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সভাপতি মহাশয় তাহাও সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নূতন কথা কিছু না বলিলেও বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মর্ম্মকথা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ দ্বারা হিন্দু সমাজকে যে ভাবে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, পুণাচুক্তিতে তাহা বর্দ্ধিত করিবার জন্য যেন তাহার ভিতর আবার একটা শঙ্কু চালাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যাঁহারা এই কায করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের নামটিও করেন নাই। এ সব বিষয়ে আর নীরব থাকা কর্ত্তব্য নহে। এই ব্যবস্থা রদ করিবার জন্য বাঙ্গালাকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। আর চক্ষুলজ্জা করিলে চলিবে না।

পুস্তক প্রকাশে আপত্তি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু যখন করাচিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট তাঁহার প্রণীত "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল। পুলিস তখন উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিল। যাহা হউক, সম্প্রতি ঐ পুস্তকখানি লণ্ডনের

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

উইসার্ট কোম্পানী প্রকাশ করিয়াছেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সপরিষদ বড়লাট ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বৃটিশ ভারতে উহার আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। উহার অনুবাদ বা অনেক অংশ যাহাতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারও ভারতে আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ পুস্তক বৃটিশ ভারতের কোন অধিবাসী পাঠ করিলে তিনি যে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিবেন, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ কামনা করিবেন, এমন কোন কথা আছে কি না, তাহা অবশ্য আমরা বলিতে পারি না। তবে পুস্তকের নাম পড়িয়া মনে হয় যে, উহাতে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনলাভের প্রয়াসের কথাই বর্ণিত আছে। যাহা হউক, যদি কোন লোক বিলাতে যাইয়া ঐ পুস্তক পড়ে, তাহা হইলে তাহাকেও কি ভারত সরকার ভারতে আসিতে দিবেন না? সে কথাটার একটা মীমাংসা হওয়া ভাল। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিবার জন্য মানুষের মন সর্ব্বদাই লোলুপ হয়। সেই জন্যই আমরা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়েছি।

অর্দ্ধোদয়ের শিক্ষা

সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর পরে ২০শে মাঘ, রবিবার অর্দ্ধোদয় যোগ আসিয়াছিল - মহিমা-প্রভায় ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের গগন-পবন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া —হিন্দুর ধর্ম্ম-গৌরবের মানব-মঙ্গল-জ্যোতিঃ সম্প্রসারিত করিয়া—জাতির মনে প্রাণে সনাতন ধর্ম্ম-গৌরবের পুণ্যপ্রভা সঞ্চারিত করিয়া আবার কালসমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। পুণ্যযোগে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীর গঙ্গাস্নান—তীর্থকৃত্য সম্পাদন—দেব-দর্শন—ধর্ম্ম-সাধনার আকুল আকাঙ্ক্ষা—প্রাণপাত আগ্রহ দেখিয়া—আশায় উৎফুল্ল হইয়া বুঝিয়াছি যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা বিস্তারের নিত্য নূতন শত প্রচেষ্টা—প্রবলতর উদ্যম—লক্ষ প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া—উপহাস করিয়া—আজও কালজয়ী হিন্দুধর্ম্ম বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইয়া, নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া যায় নাই। হিন্দুর জাতীয় জীবনে যে ধর্ম্মসংস্কার বদ্ধমূল—সেই চির-মহিমাদীপ্ত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া—জীবনের চরম সম্বল করিয়া—আজও হিন্দুজাতি তাহার জীবন-রস সঞ্চয় করিয়া জীবিত আছে।

যে জাতির জ্ঞানসাধনাপ্রভাবে জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার অপসারিত হইয়াছিল—জ্ঞানপ্রভায় বিশ্ব সমুজ্জ্বল হইয়াছিল—জগতের জ্ঞানভাণ্ডার যাহার দানে চিরসমৃদ্ধ—চির-উপকৃত—আজও জগতের সত্তায় সেই ধর্ম্মপ্রাণ জাতির প্রয়োজন আছে—আজও বহুতর দান-যোগ্য রত্নরাজি তাহার জাতীয়-ভাণ্ডারে সুসঞ্চিত আছে। হিন্দুধর্ম্মের সেই মৃতসঞ্জীবনী প্রভাব বিনষ্ট করিতে না পারিলে হিন্দুজাতির ধ্বংসসাধন সম্ভবপর নহে।

একাকারপন্থী সমাজ-সংস্কারক—ধর্ম্ম-সংহারকগণ কত আয়োজন—কত ব্যয়সাধ্য প্রচার-প্রচেষ্টা করিয়া আজিও হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল-দীপ নির্ব্বাপিত করিতে পারেন নাই; কোন যুগে পারিবেন বলিয়াও বিশ্বাস হয় না! এ সুস্নিগ্ধ প্রভায় হিন্দুর জীবন—সাধনা চির-গৌরবদীপ্ত। রাজনীতিক প্রসাদ-আকাঙ্ক্ষায়—স্বার্থসিদ্ধির মোহে সংস্কারকগণ কত প্রলয়-তাণ্ডব করিয়াও বিরাট, বিশাল, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লক্ষ অংশের এক
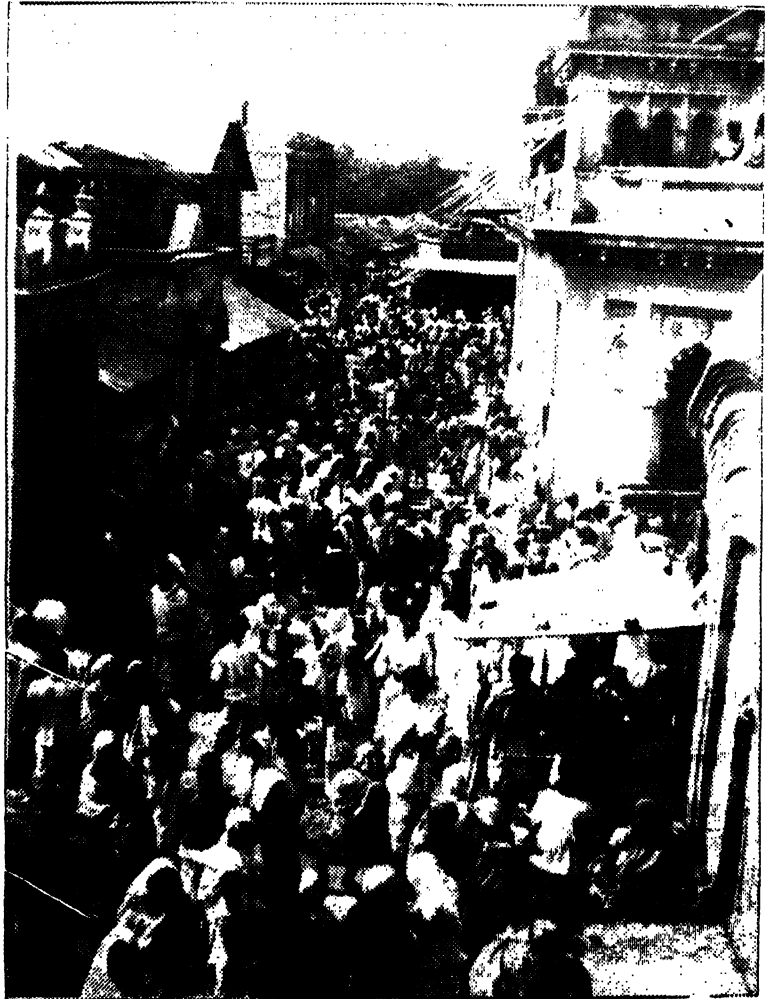
অর্দ্ধোদয় যোগের পর কালীঘাটে কালীমন্দিরে যাত্রীর ভীড়

অংশেরও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাস—স্বধর্ম্মানুরক্তি—হৃদয়-নিহিত নিষ্ঠা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা বিনষ্ট—বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। শত রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়—ধর্ম্ম-বিপ্লবেও যে ধর্ম্ম-গৌরব স্থাণুর মত অচল—অটল—বক্তৃতার ঝঞ্ঝাপ্রভাবে—সংবাদপত্রের নিষ্ফল আন্দোলনে তাহা প্রকম্পিত করা সম্ভব কি?

আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য শিক্ষার উগ্র মাদকতায় আত্ম-বিস্মৃত—জাতীয় বৈশিষ্ট্য-বিসর্জ্জিত—ধর্ম্ম-বিশ্বাসবিহীন সংস্কার-পন্থিগণ ত' ইংরেজের দয়াদত্তদানে ভোটাধিক্যের স্বরাজ-প্রাপ্তির আশায় দেশবাসী সমাজে—ধর্ম্মে—সংস্কারে যেটুকু স্বাধীনতা আজও উপভোগ করিতেছে, তাহাও শুরু ইংরেজের পদপ্রান্তে বিসর্জ্জনের জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়াছেন। হিন্দুয়ানীর পিণ্ডদান করিয়া খৃষ্টাননীতি সাদরে বরণ করিতে না পারিলে আর নাকি আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই! তাহার পরিণামে দেবতার লীলাভূমি—ঋষি-অবদান-মহিমান্বিত হিন্দুস্থানে ঋষি-বংশধরগণ অ-মুসলমান খেতাবের খ্যাতি শিরোপা লাভে ধন্য হইয়াছে। তাঁহারা ত' বহু অর্থব্যয়ে—বহুতর আয়োজনে—সংবাদপত্রের ঢক্কানিনাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া, লক্ষ লক্ষ হ্যাণ্ডবিল প্লাকার্ডে সর্ব্বসহরের রাস্তা-ঘাট সুরঞ্জিত করেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন সভা-সমিতিতে অর্দ্ধোদয়যোগে ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষায় সমবেত লক্ষ লক্ষ নরনারীর সহস্রাংশের একাংশ জনতাও কোন দিন কোন সভায় সমবেত করিতে পারিয়াছেন কি?—সুদূর-ভবিষ্যতে কোন কালে পারিবেন বলিয়া কল্পনা করিতেও পারেন কি?

অর্দ্ধোদয়যোগে—কালীমন্দির-প্রাঙ্গণে কালীমাতাদর্শনার্থী দল

আর অর্দ্ধোদয়যোগে স্নানের জন্য আত্মপ্রাণ-উপেক্ষার আগ্রহ লইয়া কাহারা আসিয়াছিল?—বাঙ্গালার প্রাণসর্ব্বস্ব—দরিদ্র—মধ্যবিত্ত নরনারী—অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত গৃহস্থ-সম্প্রদায়, তাহাদের ধর্ম্মানুরাগ মজ্জাগত সংস্কার—সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাস উদ্দীপনার জন্য কোন হ্যাণ্ডবিল প্লাকার্ড—সংবাদপত্রের আন্দোলন—আমন্ত্রণ—নিমন্ত্রণের—বিজ্ঞাপন-প্রচারের কোন প্রয়োজন হয় নাই। পাঁজির বিজ্ঞাপন-স্তূপের ভিতর ২০শে মাঘ রবিবার অর্দ্ধোদয়যোগ—ছোট অক্ষরে ছাপা ছিল মাত্র। তাহা দেখিয়াই তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছিল,—নিজের আরাম—সুখস্বাচ্ছন্দ্য—গৃহ-সংসার—সুবিধা অসুবিধা—জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট কোন কথাই চিন্তা করিবার অবকাশ হয় নাই—প্রয়োজনও বোধ করে নাই।

এই মধ্যবিত্ত—অশিক্ষিত—অল্পশিক্ষিত গৃহস্থগণই যথার্থ হিন্দু-সম্প্রদায়, বাঙ্গালার প্রাণ, ইহারাই বাঙ্গালা মায়ের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ সন্তান—হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক। ইহাদের প্রাণপণ পরিশ্রমের উপরই পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আরাম—নির্ভর। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুর্ব্বহ ভার ইহারা দীর্ঘকাল নীরবে বহন করিতেছে! ইহাদের কঠোর শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনের উপর শিক্ষিত সম্প্রদায় আরও কত দিন রাহাজানী করিবেন, কে বলিতে পারে? ইহাদেরই স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিনিধি সাজিয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদে নিত্য নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়া শিক্ষিত সমাজ ইহাদিগকে আইনের

নাগপাশে আবদ্ধ—নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। দেশকে দেখিবার —সমাজকে বুঝিবার—শাস্ত্রানুশাসনের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার অবকাশ তাঁহাদের কোথায় ?

আর অর্দ্ধোদয়যোগে দেখিলাম, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী—তরুণগণের আত্ম-নিবেদিত সেবা ;—এই স্নানার্থী বিরাট জনতা—অসংখ্য মোটরগাড়ীর সুনিয়ন্ত্রণ-কৌশল। হাস্য-প্রফুল্লবদন— উৎসাহ-দীপ্ত তরুণগণের অক্লান্ত সেবা—আত্মীয়বৎ ব্যবহার দেখিয়া তাহারা আমাদের ঘরের ছেলে বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি। তাহারা এই লাঞ্ছিত জাতির গৌরব—ধন্যবাদ আশীর্ব্বাদের পাত্র—বাঙ্গালীর আশা-ভরসা। দেশবাসীর সেবায় তাহাদের এই আত্মনিবেদিত সাধনা ধন্য !

কলিকাতা করপোরেশনের নেতৃবৃন্দ অর্দ্ধোদয়যোগে যে সাহায্য সগৌরবে দান করিয়াছেন, তাহা সমুদ্রে শিশির-বিন্দুতুল্য তুর্লক্ষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হরিদ্বার-প্রয়াগে কুম্ভমেলার জনসেবা—সাধুসেবা কার্য্যে হরিদ্বার ও এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি সেবার যেরূপ সুব্যবস্থা করেন, তাহার সহিত কলিকাতা করপোরেশনের সেবা-বন্দোবস্ত তুলনার যোগ্য নহে—উপেক্ষণীয়।

অর্দ্ধোদয়যোগে—শ্রীশ্রীকালীমন্দিরের দ্বারদেশে

অর্দ্ধোদয় যোগের পুণ্যক্ষণ সমুপস্থিত হইয়াছিল—পুণ্য প্রভায় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ধর্ম্মমাহাত্ম্য উদ্দীপিত করিয়া—জাতিকে স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া—দেশাত্মবোধ উদ্দীপিত করিয়া আবার কালস্রোতে বিলীন হইল। রাখিয়া গেল—সেই পুণ্য-স্মৃতি—স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুর মানসে, নয়নে, গৃহে চির-প্রতিভাত সেই মহিমময় ধর্ম্মজ্যোতি-রশ্মিরেখা। ভবিষ্য-যুগের হিন্দু সেই জ্যোতির প্রোজ্জ্বলপ্রভায় ধর্ম্ম-জীবন সমুজ্জ্বল করিতে—সাধনা সার্থক করিতে—ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরববার্ত্তা বিঘোষিত করিতে পারিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ২৪শে জানুয়ারী ১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার কলিকাতা গড়ের মাঠে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব পালিত হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সে আজ ৭৭ বৎসরের কথা। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতে পাশ্চাত্য আদর্শে সংগঠিত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা পুরাতন। যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রথম গঠিত হয়, তখন লোকের মনে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশা এবং আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পর আজ ত্রিপাদ-শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আশা সফল হইবার তেমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে কৈ ? ইহার দ্বারা যে কোন উপকার হয় নাই, সে কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ইহা ভারতবাসীকে প্রতীচ্য ভাবধারার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে। বিখ্যাত সিপাহী-বিদ্রোহের পর এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ; সুতরাং সে সময় ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণতা-বর্জ্জিত ছিল না ; সেই জন্য ইহার ফলও আশানুরূপ হয় নাই। ইহা ভারতীয় কৃষ্টির বিকাশসাধনে কিছুমাত্র সহায়তা করে নাই। পরন্তু উহা ভারতীয় কৃষ্টিকে অবনমিত করিয়া তাহার স্থানে য়ুরোপীয় কৃষ্টিকে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। উহার ফল যাহা
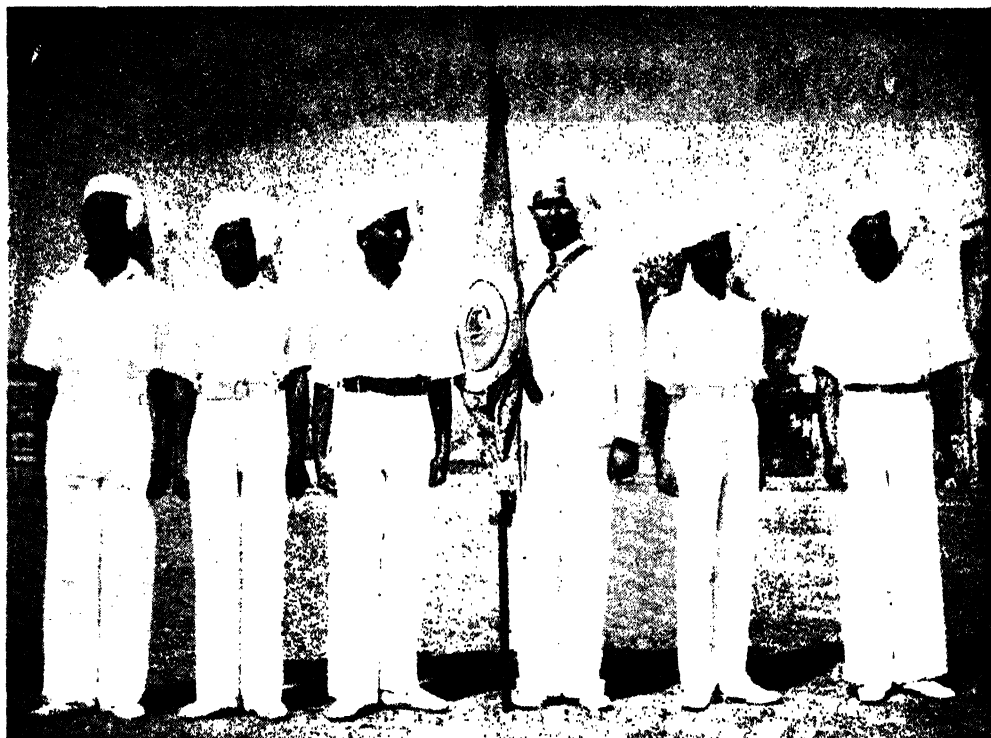
কলিকাতা য়ুনিভারসিটি পতাকা রক্ষীদল

প্রেসিডেন্সী কলেজের সৈন্য-বাহিনী
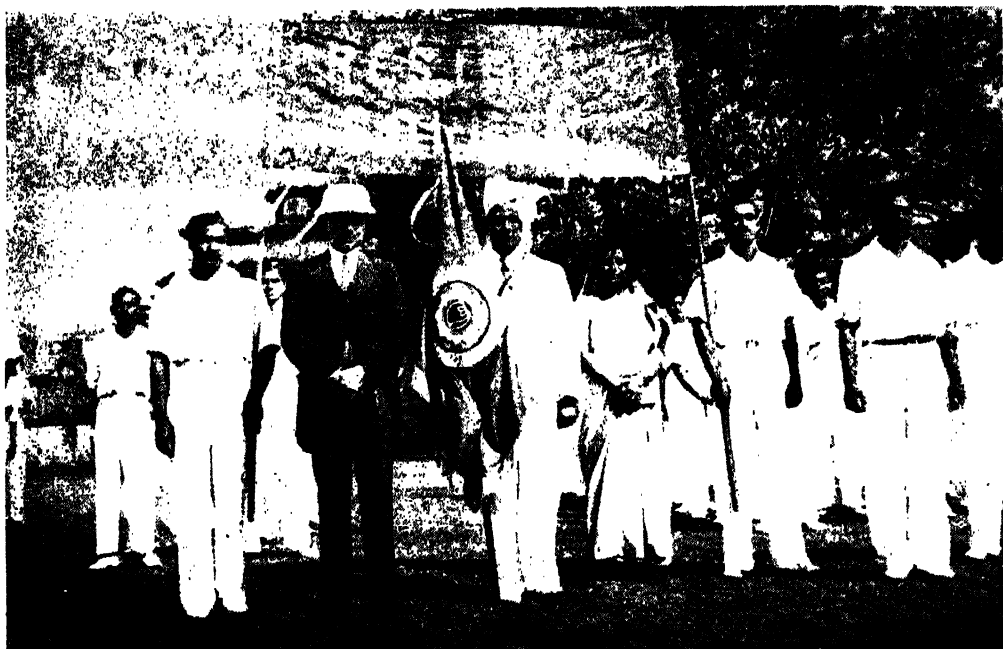
প্রেসিডেন্সী কলেজের পতাকা-রক্ষী ও ছাত্র বাহিনীর একাংশ
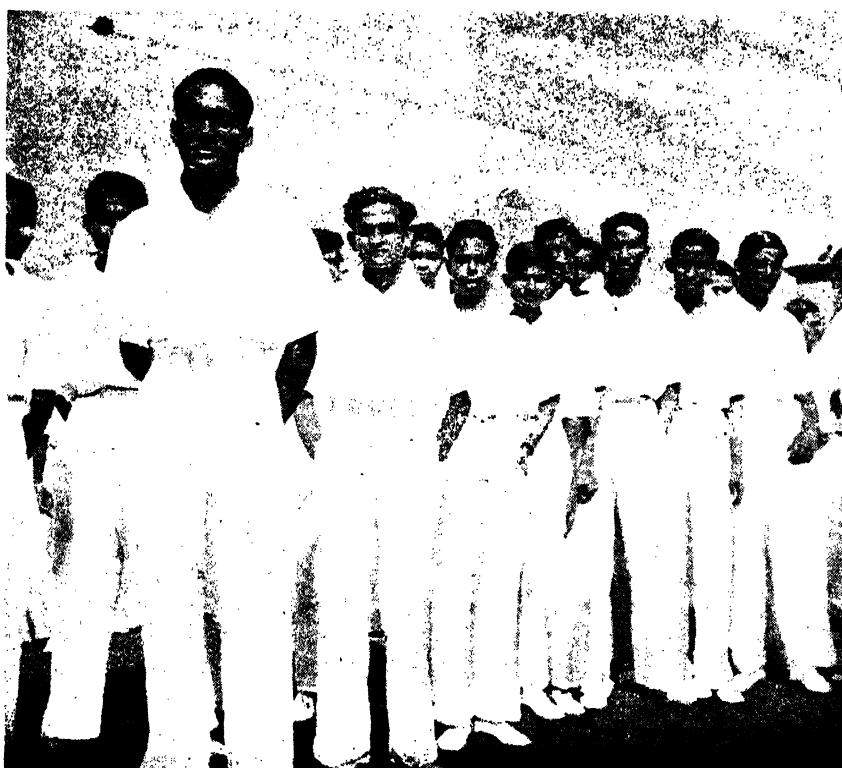
প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম ছাত্র-বাহিনী

হইয়াছিল, তাহা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "সেকাল ও একাল" নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও এই বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রভাবমুক্ত হয় নাই। যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশীয় কৃষ্টির বিকাশসাধন না করে, সে বিশ্ববিদ্যালয় কখনও দেশের লোকের ও দেশীয় সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে সমর্থ হয় না। তাই এখনও উহা কেরাণী গড়িবার এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিবার যোগ্যতা ভিন্ন আর কিছু করিতে পারে নাই। ইহার এই সকল দোষ থাকিলেও ইহা যে ভারতবাসীকে ভারতের বাহিরের ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ দিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ইহা ভারতবাসীর সাময়িক দুর্দ্দিনের ফলে সংঘটিত কূপমণ্ডূকত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দিশাহারা করিয়াও দিয়াছে। এখন ইহার মিশ্র ফল কি হইয়াছে, সে জমা-খরচ করিবার স্থান ইহা নহে। যাহা হউক, এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ভাইস চান্সলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দর হইয়াছিল। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড় কতকটা ফিরাইয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ বাবু যদি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতে তাঁহার কীর্ত্তি-কেতন চিরদিনের জন্য উড্ডীন থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম"—এই নীতিবাক্য সার আশুতোষের পক্ষে সফল হউক।

—

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক দেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়গুলি তুলিয়া দিয়া তাহার স্থানে বর্ত্তমান কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন; সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরের ১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার কাল একশত বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য ঐ দিন এই কলেজের শতবার্ষিক অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বাঙ্গালার শাসক রাইট অনারেবল সার জন এণ্ডার্শন ইহার আকস্মিক দুর্ঘটনা-সম্পর্কিত চিকিৎসাগারের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। ইহা একটি মহৎ কায সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছে। ইহাতে চিকিৎসা-সম্পর্কিত যাবতীয় ঔষধ, অস্ত্র, টীকার বীজ প্রভৃতি প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক বক্তৃতাও হইয়াছিল। এবার স্থানাভাবে আমরা তাহার আলোচনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

—

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

চির-নবীন, উৎসাহশীল, সুরসিক অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৬২ বৎসর বয়সে সহসা কাশীলাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আত্মীয়বিয়োগবেদনা অনুভব করিয়াছি। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ সাহিত্য-জগতেও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত তাঁহার সম্পাদিত কালিদাস-গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য 'কালিদাস ও ভবভূতি', 'শ্রীকণ্ঠ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার অমরকীর্ত্তি। তিনি কাশীবাসী হইয়া মাসিক বসুমতীর জন্য মহাকবি কালিদাসের নাট্যকাব্যরাজির রস-বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি শেষ জীবনে 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' সঙ্কলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মাসিক বসুমতীতে এই সুদীর্ঘ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু সমাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের অবসান হইল।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। যশোহরের স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নিকট তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার অধ্যয়ন করেন। পরে মূলাযোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে স্মৃতি-শাস্ত্রের উপাধি প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন-প্রতিষ্ঠিত হাবড়া জেলার নারিটের স্কুলে রাজেন্দ্রনাথ প্রথম অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মেট্রপলিটান কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বয়সে নবীন হইলেও তিনি অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি মিষ্টার এন, ঘোষের নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় তিনি কলিকাতা সংস্কৃত

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রচারের গ্রন্থ সম্পাদন অনুবাদাদি করিয়া সহায়তা করেন। পরে প্রতিভাপ্রভাবে তিনি আশুতোষ সরস্বতী মহাশয়ের প্রীতি অর্জ্জন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের অধ্যাপক ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সার আশুতোষ পরলোকে গমন করিলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করেন। কিছুকাল পরে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

অধ্যাপনা কার্য্যে—বঙ্গ-সাহিত্যসাধনায়—দেশ-সেবায় রাজেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত মুঙ্গেরে আদর্শ 'প্রতিমা নগর' প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অসুস্থ শরীরে দিল্লী, শিমলা, দারজিলিং, ডেরাডুন প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ সুদর্শন, মিষ্টভাষী, বিশিষ্ট বাগ্মী, পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে এক জন প্রতিভাবান সাহিত্যিক—দেশপ্রাণ কর্ম্মীর অভাব হইল।

পরলোকে

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুরের সুপ্রসিদ্ধ সরকারী উকীল রায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ২৮শে মাঘ, শনিবার সায়াহ্নে, ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন প্রভৃতি বিপ্লবাত্মক মামলা এবং সম্প্রতি পাকুড় ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালন-নৈপুণ্যে নগেন্দ্রবাবু বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ নদীয়া জেলার বীরনগর—উলার নীলকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এম এ বি এল পরীক্ষায় পাশ করিয়া সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের সহকারিরূপে আলিপুর কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী উকিল নিযুক্ত হন।

ম্যালেরিয়া প্রভাবে ধ্বংসপ্রায় নিজ জন্মভূমি উলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান নগেন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা ছিল। তিনি স্বগ্রামে হাঁসপাতাল—প্রাথমিক বিদ্যালয়—কূপ-পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় বেকার যুবকগণের অন্নসংস্থানের জন্য তিনি বীরনগরে কৃষিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার নিমন্ত্রণে বাঙ্গালার শাসক বীরনগর পরিদর্শন করিয়া নগেন্দ্রবাবুর পল্লী-সংগঠন—পল্লী-সংস্কারসাধনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া আসিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর কর্ম্মময় জীবনের অবসানে তাঁহার জন্মভূমি এক জন একনিষ্ঠ—প্রিয় সেবকের অভাব অনুভব করিবে।

সমাজপতি-জননী পরলোকে

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সমালোচক-চূড়ামণি, সাহিত্য ও বসুমতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের জননী হেমলতা দেবী গত ২৪শে মাঘ শান্তিধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্রের মত দিক্‌পতি পুত্রদ্বয়কে হারাইয়া তিনি জীবন্মৃত হইয়াছিলেন, এতদিনে তাঁহার সেই দুর্ব্বিষহ শোকের অবসান হইল। কবিবর শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য অগ্রহায়ণ সংখ্যা মাসিক বসুমতীর ১৯০ পৃষ্ঠায় এই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

পরলোকে

আর্য্যকুমার চৌধুরী

কলিকাতা হাইকোর্ট-গৌরব, মাননীয় বিচারপতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার সার আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্র-শিল্পী আর্য্যকুমার চৌধুরী গত ৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। চিত্রে—ভাস্কর্য্যে—স্থাপত্য-বিজ্ঞানে—আলোকচিত্রে আর্য্যকুমার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বহু সুরঞ্জিত চিত্রে মাসিক বসুমতী, বার্ষিক বসুমতী, ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তিনি কলালক্ষ্মীর একনিষ্ঠ উপাসক—ফটোচিত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। শ্রীভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—রবীন্দ্রনাথ [শিল্পী—মিষ্টার টমাস।

বসুমতী-চিত্র বিভাগ

১৩ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪১ [৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

৫

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতিকালের মধ্যেই জটাধারী নামে এক পশ্চিম-ভারতীয় পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তথায় আগমন করেন। এই সন্ন্যাসীর নিকট বালক শ্রীরামচন্দ্রের এক বিগ্রহ ছিল। বিগ্রহটি অষ্টধাতু-নির্ম্মিত, নাম রামলালা। এই বিগ্রহই জটাধারীর নিত্য উপাস্য ইষ্টদেবতা,—স্নেহ ও বাৎসল্যপূর্ণ ব্যবহারে ইহার সেবা করাই এই সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত জটাধারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং সর্ব্বদাই ভগবৎসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া উভয়ের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। জটাধারীর সংস্পর্শে আসিয়া ঠাকুর যেন ধর্ম্মজীবনের একটা নূতন দিক্ সহসা দেখিতে পাইলেন। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—ঠাকুর অনন্তশক্তিশালী বিশ্বস্রষ্টাকে মাতৃরূপে পূজা করিতেছিলেন। জটাধারীর ইষ্টদেবতা রামলালা কিন্তু অনন্ত শক্তিমান্ হইয়াও বালকরূপে, বাৎসল্য-প্রেমের সেবা লইবার জন্য যেন বিগ্রহ-মূর্ত্তিতে জটাধারীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। জটাধারী সেই বিগ্রহকে নিজ পুত্রের মত সর্ব্বদাই নিকটে রাখিয়া

স্নেহরসসেচনে সেবা করিতেছিলেন। বাৎসল্য-প্রেমের দ্বারা অনন্ত শক্তিমানের এই আরাধনা ঠাকুরের নিকট এক অভিনব অভিজ্ঞতা আনিয়া দিল। জটাধারী কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াই দেখিলেন যে, বাৎসল্যপ্রেমের সাধনায় ঠাকুর তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর উপযুক্ত সাধক। সাধারণ মানুষের জীবনে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে মানুষ নিকটে রাখিয়া নিজস্ব প্রেম ও সেবার দ্বারা আপনার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে চাহে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর প্রেম ও সেবাদান করিবার উপযুক্ত পাত্রকেও নিজ প্রেমাস্পদের সেবা করিতে দিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রেমাধার ভগবানের সেবার সময় সাধকদের ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃত ভক্ত আপনার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত সাধককে নিকটে পাইলে, তাহার পথ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া নিজ প্রেমাস্পদের সম্পূর্ণ পূজা দেখিয়াই নিজ জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকে। জটাধারীর জীবনেও সাধক জীবনের এই অপূর্ব্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। জটাধারী 'রামলালা' বিগ্রহটি ঠাকুরের নিকট সমর্পণ করিয়া, সেই বালক নারায়ণের সেবার সম্পূর্ণ ভার ঠাকুরের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এ যেন 'প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা'— গচ্ছিত ধন দাতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হওয়া। ঠাকুর জটাধারীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন এবং সেই বিগ্রহকে নিজ সান্নিধ্যে রাখিয়া বাৎসল্যরসের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রামলালার আহার, স্নান, শয়ন প্রভৃতি সমস্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলী নিজহস্তে সম্পাদন করিয়া ঠাকুরের দিন কাটিতে লাগিল। রামলালা স্নানের সময় গঙ্গার শীতল বারিতে বালকসুলভ চপলতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিতে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিব্রত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করেন। আহারের সময় রামলালা অনেক আবদার করে, শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহা স্নেহশীলা জননীর ন্যায় সহ্য করিতে হয়। রাত্রিকালে ঠাকুরের কক্ষের নিকট শিশু-দেবতা শয়ন করিয়া থাকে। এক দিন রামলালা খই খাইবার জন্য আবদার আরম্ভ করিল। ঠাকুর তাহার পুনঃ পুনঃ আবদারে বিরক্ত হইয়া কিছু খই রামলালার সম্মুখে ছড়াইয়া দিলেন, তাহার ভিতর যে দুই একটি খই ধান্য-মিশ্রিত হইয়াছিল, তাহা বাছিয়া দিবার ধৈর্য্য অথবা অবসর রহিল না। সেই খই খাইবার সময় একটি ধান্যের তীক্ষ্ণ কণায় রামলালার কোমল জিহ্বা চিরিয়া গেল, সে কাতরবদনে ঠাকুরকে তাহা দেখাইল। তখন অশ্রুধারায় ঠাকুরের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। ঠাকুর লক্ষ্য করিয়া ধান্যগুলি খই হইতে পৃথক করিয়া দেন নাই কেন, ইহা মনে করিয়া বারংবার অনুশোচনা করিতে লাগিলেন; যে কোমল অধরে কৌশল্যাদেবী কত ক্ষীর সর নবনীত স্নেহ সহকারে প্রদান করিয়াছেন, সেই নবীন বদনে ঠাকুর তীক্ষ্ণ-ধান্যকণামিশ্রিত খই হেলায় দিয়াছেন, এই কথা চিন্তা করিয়া, ঠাকুর আপনাকে সংবরণ করিতে না পারিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজীবনে বাৎসল্যরসের এই যে সাধনা, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার বিশ্বাস অথবা ভক্তি আমাদের নাই। সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ মন সহজে কিছুই বিশ্বাস করিতে চায় না, নিজের জীবনে ধর্ম্মের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, অপরের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনিলেও সন্দেহ-কলুষিত মন সহজে কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না।

ঠাকুরের জীবনে এই অপূর্ব্ব সাধনার কথা চিন্তা করিতে গেলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যময় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি রসের আলোচনা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তাকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যকল্পনার দ্বারা চিন্তা করিতে গেলে সাধক এবং সাধনার বস্তুর মধ্যে অনেক দূরত্ব আসিয়া পড়ে। যে অসীম অনন্ত শক্তি এই সীমাহীন বন্ধনবিহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি কল্পনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, সেই ঐশ্বর্য্য ধারণা করিতে করিতেই মানব-হৃদয়ের ক্ষুদ্রশক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়, বিশ্বস্রষ্টার নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। সুদূর অতীতে যখন বিশ্বের চিত্র অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ ছিল, তখনই মানবের পক্ষে সেই অশেষ ঐশ্বর্য্যের সম্যক্ অনুধাবন করা কঠিন হইত। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানের দৃষ্টিশক্তির প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডও এখন সমস্ত সীমার বন্ধন অতিক্রম করিয়া তাহার স্রষ্টার মতই অসীম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের জগতে যে সূর্য্য তাপ প্রদান করে, সেই সূর্য্য

আমাদের পৃথিবীর ন্যায় এইরূপ আরও বিশ লক্ষ পৃথিবীকে সমভাবে উত্তাপ প্রদান করিতে সমর্থ। অসংখ্য সৌরমণ্ডল আছে, সেই সৌরমণ্ডলে আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা আরও বৃহত্তর লক্ষ লক্ষ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র অবিরত ঘুরিতেছে। ইহা কি সহজে কল্পনীয় অথবা অনুমেয় হইতে পারে? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রতম বিন্দু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভাবসমাধিমগ্ন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

জগতের এক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকৌশল হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

The mind of man is utterly unable of conceive the grandeur and wonder of creation"

(বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকৌশল মানুষের পক্ষে ধারণাতীত)

ঠাকুর একবার এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুনিয়া তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রী—মকে (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাঁহাকে কিছু বুঝাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণমাত্র এই সম্বন্ধে আলোচনার পরই শ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "আর থাক্, মাথা টন্ টন্ করুছে।" বৈজ্ঞানিক এই সমস্ত অদ্ভুত গবেষণা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে মাথা টন্ টন্ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং সেই অসীম অনন্তশক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টার ঐশ্বর্য্য পরিকল্পনার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবার চেষ্টা করিলে মনে ভয়ের উদ্রেক হয়, নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও বিশ্বপতির অসীমত্ব উভয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান আসিয়া পড়ে, মানুষকে তাঁহার নিকটে না আনিয়া যেন আরও দূরে লইয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভগবানের সমস্ত বিভূতি জানিবার জন্য অর্জ্জুনের মনে একবার কৌতূহল হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীভগবান্ নিজমুখেও আপনার সমস্ত বিভূতি বর্ণনা করিতে অক্ষম বলিয়া, 'নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে' (আমার বিভূতির অন্ত নাই) বলিয়া 'প্রাধান্যতঃ' বলিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন!
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

(হে অর্জ্জুন, ইহার অধিক জানিয়া তোমার কি ফল হইবে? তুমি সার জানিয়া রাখ যে, আমি আমার একাংশের দ্বারাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছি।)

স্বয়ং নারায়ণের যে শ্রীমুখ নিজ বিভূতি-বর্ণন করিতে অক্ষম হইয়াছিল, সেই বিভূতি বর্ণনা অথবা ধারণা করিবার প্রয়াস ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ঐশ্বর্য্য পরিকল্পনার দ্বারা তাঁহার প্রতি আস্থাবান্ হইবার চেষ্টা খৃষ্টান ধর্ম্ম-গ্রন্থের জোব (Job) নামক পুস্তকেও আমরা দেখিতে পাই। জোব নামক জনৈক ধাম্মিক ব্যক্তি হঠাৎ ভাগ্য-বিপর্য্যয় হওয়ায় ভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস অবিচলিত রাখিতে পারেন নাই, সন্দেহের গাঢ় ছায়া মনকে ক্রমশঃ অধিকার করিতেছিল, দোদুল্যমান চিত্তবৃত্তি

তাঁহার মনে শান্তিপ্রদান করিতেছিল না। এমন সময়ে এক দিন ভগবান্ তাঁহার নিকট ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র-নিকর ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সৃষ্টজীবের প্রতি জোবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন—এই অসীম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অনন্তপুরুষের শক্তি অথবা জ্ঞানসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করাই বাতুলতা। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জোবের সময়ের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও আমাদের সময়ের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনেক পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। জোব পুস্তকখানি দ্বিসহস্র বৎসরের উর্দ্ধকাল হইল রচিত হইয়াছিল, সুতরাং বিজ্ঞান বর্ত্তমানকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তাহা জোবের সময়ে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। তথাপি এই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের কথা কল্পনা করিয়াই জোব বিহ্বল হইলেন এবং বিশ্বপিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া নতশিরে নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও ভগবানের মহিমা স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ভীত হইয়া তাঁহার মহিমা স্বীকার করা এক কথা, আর তাঁহাকে আপনার হৃদয়মধ্যে অনুভব করা অন্য কথা। ঐশ্বর্য্যের চিন্তা আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার নিকটে যাইতে কোনও সাহায্যই করে না, বরং অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই ঐশ্বর্য্য-পরিকল্পনা অপেক্ষা তাঁহাকে নিকটে পাইবার সহজ ও সরল পথ বৈষ্ণবভক্তগণ অনেক দিন হইল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ ভক্তদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-পরিকল্পনার পথকে বন্ধুর ও দুর্গম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লাইট্ (H. F. Lyto) নামক জনৈক ভক্ত ধর্ম্মযাজক বহুবর্ষ যাবৎ নিজ ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া যে দিন বৃদ্ধবয়সে সেই ধর্ম্মমন্দির হইতে বিদায় লইতেছিলেন, সেই দিন নিজ সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতাস্বরূপ একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার যাজকমণ্ডলীকে শুনাইয়া চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। সেই কবিতাটিতে ভক্ত বলিতেছেন :—

Come not in terrors, as the king of kings,
But kind and good, with healing in thy wings;
Tears for all woes, a heart for every plea,
Come, Friend of sinners, and thus 'bide
with me!

(হে প্রভু, রাজাধিরাজরূপে আমার নিকট আসিও না, আমি ভীত হইব। শান্ত ও মধুররূপে আমার নিকট আবির্ভূত হও, আমার দুঃখতাপক্লিষ্ট হৃদয়ে তোমার শ্রীহস্ত বুলাও। হে পাপি-তাপীর একমাত্র শরণ, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।)

এখানে "রাজার উপরে রাজা রাজরাজেশ্বর"রূপে ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত মহাসমারোহে না আসিতে ভক্ত ভগবানকে মিনতি করিতেছেন, তিনি সখারূপে (Friend of sinners) ভক্তের হৃদয়ের সব দুঃখতাপ অপহরণ করিবার জন্য সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' ইহাই ভক্তের প্রার্থনা। তাই আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণবগণ কখনও দাসরূপে প্রভুকে, সখারূপে সখাকে, মাতারূপে পুত্রকে এবং প্রকৃতিরূপে পুরুষকে সেবা করিয়া তাঁহারই সেবা করিয়াছেন। এই যে চারিটি সম্বন্ধ, ইহাদের তুলনায় ঐশ্বর্য্যপরিচিন্তনের সম্বন্ধ অনেক দূর ও অধিকতর কঠিন। এই চতুর্বিধ সম্বন্ধের যে কোনটির ভিতর দিয়া আমরা বিশ্বপিতার যত নিকটে যাইয়া পড়ি এবং আত্মীয়রূপে নিবিড়ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হই, এমন আর কোনও সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই সম্ভবপর নহে। ভক্তমালগ্রন্থে বিবৃত ভক্তশ্রেষ্ঠা মীরাবাইএর জীবনের একটি ঘটনায় ভগবানকে সহজ ও নিবিড়ভাবে পাইবার এইরূপ উপায়ই নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মীরাবাই বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরমভক্ত বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী সন্ন্যাসীদিগের নারীদর্শন নিষেধ বলিয়া মীরাবাইএর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন মীরাবাই তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার ব্যঞ্জনা যত গভীর, তত সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী কর্তৃক অনূদিত বাঙ্গালা "ভক্তমাল" গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে।

গোস্বামী কহেন মুই বনে করি বাস,
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ।
এ কথা শুনিয়া বাই ক্ষোভ পাই মনে,
পুনঃ কহি পাঠাইল গোস্বামীর স্থানে।
এত দিন শুনি নাই শ্রীধাম বৃন্দাবনে,
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে।

সেই পরমপুরুষ ভগবানকে প্রকৃতিরূপে মধুররসের দ্বারা সেবা করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজা, ইহাই মীরাবাই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী মীরাবাইএর এই ভক্তিপূর্ণ মধুর রসের শিক্ষা উপলব্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া সেই ভক্তশ্রেষ্ঠার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে, এইরূপে নানাবিধ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

রসের ভিতর দিয়া বিশ্বস্রষ্টাকে আস্বাদন করাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। কোনও একটা সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর মত সকল শ্রেণীর অথবা ধর্ম্মজীবনের সকল স্তরের লোকের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম সকল মতকে আশ্রয় করিয়া এবং বিভিন্ন পথকে সমন্বয় করিয়া সার্থক হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবের চিরপিপাসিত আধ্যাত্মিক জীবনকে তৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করিয়া আসিতেছে। ঐ চতুর্ব্বিধ রসের দ্বারা ভগবানকে নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া হৃদয়মধ্যে অনুভব করা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সাংসারিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই অনন্ত বিরাট্ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সমস্ত মানব-সম্বন্ধকে রঙ্গ করিয়া অনুক্ষণ আপনার অপরূপ মহিমাকে সীমার বেষ্টনীর মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, এ কথা হিন্দুধর্ম্মের সার সত্য বলিয়া, সমস্ত হিন্দু-সমাজ চিরদিন গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। হিন্দু স্ত্রী তাই আপনাকে ভুলিয়া নিজের দেহ, মন ও প্রাণ দিয়া আপনার স্বামীকে দেবতা বলিয়া সেবা করিয়া আসিতেছে, এবং হিন্দুস্বামী নিজ সহধর্ম্মিণীর মধ্যে অনন্তের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের প্রকাশ স্বীকার করিয়া তাহাকে নিজের প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে লক্ষ্মীর আসন প্রদান করিয়াছে। গোপালরূপী নারায়ণ পুত্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া পিতামাতাকে বাৎসল্য-রস আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের জীবন সার্থক করিতেছেন। এই সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের অনাদি অনন্ত-কাল-প্রচলিত প্রথা ও বিশ্বাস। কোনও সম্বন্ধই তুদিনের পুতুল-খেলার সম্বন্ধ নহে, আইনের অর্থহীন বাক্যসমষ্টির দ্বারা কোন সম্বন্ধই স্থাপিত হয় না, কোনও সম্বন্ধই ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। ইহা জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই ভগবান্ মানবজীবনে লীলা করিয়া থাকেন। হিন্দু-স্ত্রী বিপথগামী হওয়ায় সামাজিক সম্বন্ধ লুপ্ত হইলেও ধর্ম্মের চক্ষুতে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ চিরদিনই থাকিয়া যায়, হয় ত জন্মজন্মান্তরেও বিচ্ছিন্ন হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজ-সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি সহায়ে এই সত্য দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার অনেক রচনার ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমার বিশ্বাস, আমাদের সব স্নেহ, আমাদের সব ভালবাসাই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতন-ভাবে করি—ভালবাসামাত্রেই আমাদের ভিতর দিয়া

বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিলজগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি।"

এই অচেতন এবং পূজা লইয়াই সাধারণ মানুষ ও ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। এ কথা কবিবর আরও বিশদভাবে অন্যস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন।

"বৈষ্ণবধর্ম্মে পৃথিবীর প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত, লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।"

তাই তাঁহার কবিতার মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই—

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে স্মরিব জীবননাথ।

* * * *

পিতামাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি তুমি আছ মোর সাথ
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে স্মরিব জীবননাথ॥

সমগ্র ভারতবর্ষে কেবলমাত্র বাঙ্গালীজাতির মধ্যেই এই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবচতুষ্টয়ের সম্যক্ পরিস্ফুরণ ও অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধের সমস্ত পরিকল্পনা বাঙ্গালীর জীবনের সহজ ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়টি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে, অবান্তর অথচ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট আর একটি বিষয়ের অবতারণা আমাদের এইখানে করিতে হইবে। যখন ইংরাজগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়া ধীরে ধীরে এ দেশে তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তখন সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আপনাদের শিক্ষা ও অনুশীলন এ দেশে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের উপর ইংরাজের আধিপত্য ও শিক্ষাপ্রচার সমভাবে বিস্তৃত হইলেও বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও অনুশীলন যত সহজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, এমন আর কোনও প্রদেশেই হয় নাই। বাঙ্গালীজাতির পক্ষে এই ইংরাজী শিক্ষা এত সহজে গ্রহণ করিবার একটি নিগূঢ় কারণ ছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকরা অনেকে মনে করেন যে, বাঙ্গালীজাতি অনুকরণ-প্রিয় বলিয়াই তাহারা নূতন ইংরাজী শিক্ষা ও অনুশীলন সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এই অনুকরণ-প্রিয়তার কথা এক দিন জাপানীজাতির সম্বন্ধেও বলা হইত, এবং তাহারা য়ুরোপীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করার জন্যই য়ুরোপীয় জাতিগণের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে, ইহাই সচরাচর নির্দ্দেশ করা হইত। কিন্তু কোনও জাতি অন্তরে বস্তু না থাকিলে কেবলমাত্র অনুকরণপ্রিয়তার দ্বারা জগতে বড় হইতে পারিয়াছে, ইহা এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। জাপান যেমন তাহার শক্তি ও প্রতিভার অনুরূপ জিনিষগুলিই য়ুরোপ হইতে গ্রহণ করিয়া নিজের ভিতরকার বস্তুকেই জাগ্রত ও সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি যে সব বিষয়ে য়ুরোপের সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই, সেখানে সে য়ুরোপকে বর্জ্জন করিয়াছে, সেইরূপ বাঙ্গালী জাতিও শুধু অনুকরণপ্রিয়তার জন্যই ইংরাজী শিক্ষা ও অনুশীলন গ্রহণ করে নাই, যাহা তাহার যুগযুগান্তর-প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষার সহিত সমীভূত, তাহাই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজ ভারতবর্ষ জয় করিয়া যে অনুশীলন তাহাদের সহিত আনয়ন করিল, তাহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রসূত তিনটি ভাবের আলোকমণ্ডিত সভ্যতাবিশেষ মাত্র। এই তিনটি ভাব—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—Equality, Fraternity, Freedom. য়ুরোপে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে ইহাদের ব্যঞ্জনা বিভিন্ন হইলেও বঙ্গদেশে ইহারা চিরপুরাতন, কেবলমাত্র নূতন নামে ও নূতন পরিচ্ছদে ইহারা আমাদের নিকট দেখা দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের সময় হইতেই যে ভাবস্রোত

বঙ্গদেশের তটভূমিকে অবিরত আঘাত করিয়াছে, তাহার মূলমন্ত্রই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। অবশ্য যে ভাবগুলি কেবলমাত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, ইংরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, কলেজসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া সেই ভাবগুলি সাধারণ মনুষ্যের জীবনে প্রবেশলাভ করিয়া তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক সামাজিক জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিল। সুতরাং বাঙ্গালাদেশ এই শিক্ষার জন্য য়ুরোপের নিকট যায় নাই, তাহার পুরাতন জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া, সে নিজের জিনিষকেই ভাল করিয়া ফিরিয়া পাইয়াছিল। এই জন্যই বাঙ্গালাদেশে ইংরাজীশিক্ষা যত সহজে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, এমন আর কোনও প্রদেশেই হয় নাই।

আমরা দেখিতে পাই, শ্রীপরমহংসদেব নানাবিধ সাধনার দ্বারা বিশ্বস্রষ্টাকে আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিন ভাবেই সাধনা করিয়াছিলেন। যে বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ইহার মাটীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের মাটীর সহিত এই রস-চতুষ্টয়ের সাধনা নিবিড়ভাবে চিরদিনই সংশ্লিষ্ট। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যুগ হইতেই ভাবপ্রবণতা যে জাতির দোষ ও গুণ উভয়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আপনার ভাবপ্রবণতার দ্বারাই তিনি সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরাকার ব্রহ্মেরও উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। এইরূপে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'কে বহুরূপে দর্শন ও আস্বাদন করিয়া তিনি ধর্ম্মের বিভিন্ন বিভিন্ন পথকে সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার নিকট তন্ত্রবিদ্যাপারদর্শিনী ভৈরবী, বাৎসল্যরসাস্বাদী জটাধারী এবং নিরাকারবাদী তোতাপুরী সকলেই সমভাবে আদৃত ও গুরুপদে বৃত হইয়াছিলেন। একই সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর উপায়ে ভগবানের আরাধনা তিনি কখনই অনুমোদন করিতেন না। ঠাকুর বলিতেন, 'কেন একঘেয়ে হব?' এই সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনি সানাই বাঁশীর উপমা দিতেন। এক জন সানাই বাজাইয়া একই সুর ধরিয়া আছে, আবার কেহ তাহারই মধ্য হইতে নানাবিধ সুর ও তান উত্থিত করিয়া তাহাদিগকে শ্রুতিমধুর করিয়া তুলিতেছে। একটি সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর পন্থার সহিত ভগবানকে নানাভাবে উপাসনা করার ইহাই প্রভেদ। জগতে বিশ্বনিয়ন্তার কোনও কার্য্যই যদি নিরর্থক না হয়, তাহা হইলে ঠাকুরের শিক্ষা ও ধর্ম্মমতের বিষয় চিন্তা করিলে, তাঁহার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ যে অর্থহীন এবং একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

সন্ন্যাসী জটাধারী চলিয়া যাইবার পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তোতাপুরী নামে এক নিরাকারবাদী সন্ন্যাসী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

নৃত্য

সচকিত ভীত কপোতীর মত
ব্যাধ-বিচলিত হরিণী প্রায়
আধ-নিমীলিত তরল আয়ত
আঁখি দুটি কোথা লুকাতে চায়?

রূপ-ঢল-ঢল আনন-কমল
কিসের সরমে অত রাঙ্গা হ'ল?
এখনি ত বালা করে ফুল-মালা
নেচে নেচে গেলে কি লঘু পায়!

চমকায় আলো চুম্‌কীর ফুলে,—
চুম খেয়ে দোলে নীলাম্বরী!
মধু-ইঙ্গিতে তনু-ভঙ্গিতে
সুষমা নাচিছে দিগম্বরী!

রুণু রুণু রুণু ঝুমুর ঝুমুর
অলকার বোল্ তুলিছে নুপুর,
ঢুলু ঢুলু দু'টি আঁখির পাখারা
ঘুমে সকাতর, খোঁজে কুলায়!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

দান-প্রতিদান

৩১

সে দিন চায়ের মজলিসে শিষ্টাচার-বিগর্হিত প্রতিবাদ করিয়া কুহু যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছিল, সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ জয়ন্ত শয়নকক্ষে আসা বন্ধ করিল। ভাতি ও বাসনা একযোগে কুহুকে পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া রহিল। পৃথিবীর প্রাণস্বরূপ সূর্য্য যেমন এক দিক অন্ধকার করিয়া অপর দিকে আলো বিতরণ করিতে যাইবার সময় চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাখিয়া যান, তেমনই কুহুর তরুণ তপন অন্তরালে থাকিলেও হৃদয়স্নিগ্ধকারী চন্দ্রকিরণ হইতে সে বঞ্চিত হইল না।

এ সংসারের একটি প্রাণী যে অহরহ তাহারই সুখের নিমিত্ত—শান্তির নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া কুহু শ্রদ্ধায় ভক্তিতে দ্রবীভূত হইল। তিনি আর কেহই নহেন, জ্যোতির্ম্ময়। আজকাল সকাল-বেলাটা কুহুর জ্যোতির্ম্ময়ের পূজামন্দিরেই কাটিয়া যায়। সেখানে খুঁটিনাটি অনেক দ্রব্য সংগ্রহ হইয়াছে। নিত্য নব নব পুষ্পমাল্য রচনার নিমিত্ত মালীকে সাজি ভরিয়া ফুলের যোগান দিতে হইতেছে।

জ্যোতির্ম্ময়ের জলখাবার আর ভৃত্য-হস্তে আসে না। জয়পুরী পাথরের রেকাবীতে মিষ্টান্ন, ফলের টুকরা, তরমুজের সরবৎ সাজাইয়া অন্নপূর্ণা যেমন স্নেহে ভক্তকে প্রসাদ তুলিয়া দিতে আসেন, তেমনই ভাবে কুহু ভাসুরের খাদ্যদ্রব্য বহিয়া নিকটে বসিয়া খাওয়ায়। তাহাকে যে নিজের পথ নিজেরই করিয়া লইতে হইবে। কায না করিলে সে থাকিবে কি লইয়া?

মাতৃ-বিয়োগের পর জ্যোতির্ম্ময়ের ভাগ্যে এমন আদর-যত্ন একটি দিনের জন্যও লাভ হয় নাই। বধূর আন্তরিক সেবায়, আগ্রহে জ্যোতির্ম্ময় মাতৃ-স্নেহের আস্বাদ পাইয়া পুলকিত হইলেন। সকলের নিকটে শতমুখে বধূর সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

ভাতি ইহা সহিতে পারিতেছিল না। গ্রাম্য মেয়ের ছলনায় নির্ব্বোধ স্বামী মুগ্ধ হইয়াছেন ভাবিতেই তাহার হৃদয়ে আগুন জ্বলিতে থাকে। সে অনলে কুহুকে দগ্ধ করিতে পারিলে ভাতি বাঁচিতে পারিত। কিন্তু দগ্ধ কাহাকে করিবে? যে ধরার ছোঁয়ার ভিতরে নাই, অগ্নি যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

সে দিন জলযোগে বসিয়া জ্যোতির্ম্ময় বধূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এখানে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে মা, সারাদিন একলা থাকতে হয়, আমার ঘরে ঢের বই আছে, তুমি ইচ্ছামত নিয়ে এসে প'ড়ো, নতুন কোন বইয়ের দরকার হ'লে আমাকে বলো, আমি আনিয়ে দেব।"

কুহু তখনকার মত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের পাঠাগারে ঢুকিল, বাতায়নের পথে সুসজ্জিত পুস্তকের রাশি তাহার লুব্ধ মনকে বারম্বার আকর্ষণ করিলেও সে সাহস পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। কুহু বাল্যকাল হইতে লেখাপড়া করিতে অতিশয় ভালবাসিত। পাঠের প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখিয়া দিবাকর কলেজের অবকাশের সময় ছোট বোনটিকে সযত্নে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিল। কুহু এত-খানি বয়সে এ পর্য্যন্ত একসঙ্গে এতগুলি বই দেখে নাই, বইয়ের ঘরে আসিয়া তাহার উল্লাসের সীমা রহিল না। এগুলিকে সাথী করিয়া নিত্যকার জীবনযাত্রা সে অনায়াসেই অতিবাহিত করিতে পারিবে। তাহার অন্য কিছুর দরকার হইবে না, সে আর কিছু চাহিবে না।

* * *

যে ফুল নয়নপথে ফুটিয়া সৌরভ বিতরণ করে, মানব-হৃদয় সাধারণতঃ তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হয়। দৃষ্টির বাহিরে বিজন বনে যে ক্ষুদ্র বনফুল নীরবে ফুটিয়া নীরবে গন্ধ বিলায়, তাহার বার্ত্তা কয় জন জানে? জ্যোতির্ম্ময়ের স্নেহে মমতায় কুহুর প্রবাসের নিরানন্দ দিনগুলি সহনীয় হইয়া আসিয়াছিল। সে জানিত, বাবা, মা, দাদার পর আর কেহ তাহাকে এত ভালবাসিতে পারিবে না। কিন্তু একটি স্নেহের নির্ঝর কুহুর নিকটে লুকান ছিল। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আর যে কেহ তাহারই উদ্দেশে স্নেহবারি বর্ষণ করিতে পারে—কুহু তাহা জানিত না।

জয়ন্তর অপ্রসন্নতা হিরণের কাছে গোপন রহিল না। জয়ন্তকে কয়েক দিন শান্তভাবে থাকিতে দেখিয়া হিরণের আনন্দের সীমা ছিল না। বন্ধুর ছন্নছাড়া জীবনে সুখসূর্য্য

উদয় হইল ভাবিয়া হিরণের হৃদয়াকাশ বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্য স্থায়ী হইল না। কিসে কি হইল, না জানিলেও হিরণ ব্যথিত হইয়া লক্ষ্য করিল—জয়ন্ত পুনরায় নিশাচর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। পারিষদ-বর্গ নিত্য নূতন আমোদের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতেছে। হিরণের বিশ্বে আর আলো রহিল না। অন্তর, বাহির, চরাচর গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই অন্ধকারে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত কুহুর প্রীতিপ্রফুল্ল মুখখানি জাগিয়া রহিল। হিরণ এ কি করিয়াছে? একটি ভুল সংশোধন করিতে গিয়া এক সরলা বালিকাকে ভুলের সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়াছে? তাহার জ্ঞানকৃত এ পাপ কি ভগবান ক্ষমা করিতে পারিবেন? জীবনের শত দৈন্য—সহস্র ত্রুটি ছাপাইয়া আজ এই অপরাধ যে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিপ্রহরে জয়ন্ত বাড়ীতেই ছিল। শয়নকক্ষ কুহুকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য ঘরে একখানি নেয়ারের খাটে গড়াইতে-ছিল। হিরণ আসিয়া জয়ন্তর পাশে বসিল। তাহার দুই চোখে এক অব্যক্ত মিনতি। মুখচ্ছবি মলিন বিষাদাচ্ছন্ন।

জয়ন্ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি শরীর ভাল নেই, হিরণ? এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন?"

হিরণ শরীরতত্ত্বের ধার না ধারিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিল, "তুমি এ কি করছ, জয়ন্ত? আমার পাতকের বোঝা না বাড়ালে কি তোমার চলে না? আমি তোমার কাছে এতই কি অপরাধী, ভাই?"

"পাতকের বোঝা, অপরাধ? এর মানে কি, হিরণ? হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট ক'রে না বল্লে আমি বুঝবো কি ক'রে? চিরকাল তোমার কথার ধরণ কবিতার মত অস্পষ্ট। বুঝ্‌তে পারি না।"

"স্পষ্ট শুনতে চাও? বলছি, তুমি আরম্ভ করেছ কি? একটি নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নিয়ে এমন খেলা কি ভাল? তুমি নিষ্ঠুর হয়ে ভুলে যেয়ো না, কুহুর এক ফোঁটা চোখের জলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে। সে সর্ব্বনাশ থেকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।"

জয়ন্তর নিকটে সব পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার হাসির উচ্ছ্বাস শতধা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাঃ হিরণ, চমৎ-কার, তুমি কাব্য রেখে অভিনেতা হও না, ভাই? কুহু তার প্রতিনিধি ক'রে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে না কি? মেয়েলী ছলা-কলা, সর্ব্বনাশ, অভিসম্পাত, চোখের জল কোনটাই ত বাদ দিলে না। কিন্তু এর কি দরকার? বিয়ে করেছি ব'লে ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিই নি। যে ভাল ব্যবহার করতে জানে, সেই ভাল ব্যবহার পাবার যোগ্য। আমি লেখাপড়ার কথা বলতে গেলাম, উনি তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে গেলেন, এখন থাকুন তেজ নিয়ে।"

হিরণ সে দিনের ঘটনা জানিত না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল জয়ন্ত, কিসের তেজ?"

জয়ন্ত সমস্তই বিবৃত করিল। চা'য়ের কথা হইতে মিস্ ব্রাউনের প্রসঙ্গ কিছুই বাদ দিল না।

হিরণ কহিল, "তোমারই অন্যায়, ভাই! দিবাকরের বোন মিস্ ব্রাউনকে পোষণ করিতে পারেন না। যাকে দাদা তাড়িয়েছেন, তাকে রাখা ভূষণডাঙ্গার রাণীর কায নয়। কুহু যা পারবে না, তা সরল অকপটে ব'লে চ'লে গেছে, এতেও তোমরা তারই দোষ দিচ্ছ? তাকে জব্দ করতে আবার তুমি সকলের সাথে মিশে নরকের রাস্তায় যাচ্ছ? বিয়ে ক'রে যেমন স্বাধীনতা হারাওনি, তেমনই উচ্ছৃঙ্খলতা বরণ ক'রে নাও নি। তুমি কুহুকে দুঃখ দিতে পারবে না, জয়ন্ত, আমি তোমায় দিতে দেব না। তুমি বল, আমি তোমায় কুহুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার হৃদয়হীনতায় সে হয় ত লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে।"

হিরণের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। সে হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া জয়ন্তর হাত চাপিয়া ধরিল।

জয়ন্ত অবাক্ হইয়া গেল। ক্ষীরপুরে কুহুকে দেখিবার পর হইতে হিরণের পরিবর্ত্তনের আমূল ইতিহাস তাহার স্মরণপথে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কুহুর নিমিত্ত হিরণের এ আকুলতা কিসের? তাহার কান্নায় হিরণের অশ্রু টানিয়া আনিতে চাহে কেন? জয়ন্তর অদর্শনে কুহু যদি কষ্ট পাইয়াই থাকে, তাহাতে হিরণের কি? তবু কুহু তাহারই নিমিত্ত কাঁদিতেছে, কথাটি বড়ই মিষ্ট। রসপূর্ণ। জয়ন্তর মন ভিতরে ভিতরে নরম হইয়া আসিল। নূতনত্বের নেশায় রূপের মোহে জয়ন্ত এখনও অভিভূত। বন্ধুদের প্ররোচনায় ভাতিকে দেখাইয়া জয়ন্ত দূরত্বের একটা গণ্ডী টানিয়া দিলেও কুহুর নিকটে যাইবার জন্য তাহার মন ছটফট করিতেছিল। যে হাসির

মাণিক, কান্নার আধার, তাহার অধিকারে আসিয়াছে, এখনও যে তাহা ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। বন-ফুল বনের বুক হইতে তুলিয়া আনিলেও ভাল করিয়া তাহার আঘ্রাণ লওয়া হয় নাই। ফুল তাহারই সোণার ফুলদানীতে বিকশিত হইয়া মধুবিলাসী ভ্রমরকে অহর্নিশ লুব্ধ করিতেছে।

জয়ন্ত হিরণের হাতের ভিতর হইতে হাত টানিয়া লইয়া একটা সিগার ধরাইতে ধরাইতে কহিল, "তোমার দুর্ব্বলতা কি কখনও যাবে না, হিরণ? কার বিরহে কে কোথায় কষ্ট পাচ্ছে, চোখের জল ফেলছে, এ তোমার উৎকট কল্পনা! আমার খুশী ক'দিন বাইরে রইলাম, তাতে অন্যের কি ক্ষতি? যে অন্যায় করেছে, সে ত অনুতপ্ত হয়ে মাপ চাইতে আসেনি? বাইরে থাকার দোষ কি একা আমার, না তার?"

হিরণ কাতর হইয়া উত্তর করিল, "দোষ তোমাদেরই, জয়ন্ত। কুহু ছেলেমানুষ, নতুন এসেছে। তোমাদের তালে তাল দিয়ে চলার সময় দিতে হবে তাকে। সে এখনও সরু সুতো, তোমরা অত জোরে টান্‌লে ছিঁড়ে যাবে, ভাই! আমি জানি, তার অন্যায় হয়নি। তবু যদি তোমরা অন্যায় ধ'রে নাও, তা হ'লে আমিই তার হয়ে মাপ চাচ্ছি। তুমি তাকে মাপ কর।" বলিতে বলিতে হিরণ জয়ন্তর পা চাপিয়া ধরিল।

জয়ন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে পা টানিয়া লইয়া, হিরণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "হিরণ, তুই কি পাগল হয়েছিস? ছিঃ ছিঃ! পায়ে হাত দিলি? আমি কবে তোর কোন্ কথা রাখতে চেষ্টা করিনি? কিন্তু অভ্যাসগুলো ভারী বদ্, অভ্যাসের দোষে তোর অপ্রিয় কায করলেও তোর কথা যে রাখিনি, এমন নয়। কেবল তোরই কথায় আমি কুহুকে বিয়ে করেছি, হিরণ।"

"জানি জয়ন্ত, আর বলো না। তোমাকে দিয়ে আমিই কুহুকে আনিয়েছিলাম, সেই জন্যেই আমি তার শুভাশুভের দায়ী। তার ওপর অন্যায় হ'লে যিনি সকলের ওপরে আছেন, তিনি তোমাকে ক্ষমা করলেও আমাকে করবেন না। জয়ন্ত, তোমার কাছে আমার একটিমাত্র ভিক্ষা, তুমি কুহুকে কষ্ট দিও না। তার দুঃখ আমি সইতে পারবো না। আমি ভিখারী, আশ্রিত, তুমি চিরকাল আমাকে অনুগ্রহ ক'রে এসেছ, এখানেও করতে হবে।"

ভিখারী, আশ্রিত, দয়া, অনুগ্রহ কথাগুলি জয়ন্তর হৃদয়-তন্ত্রীতে কেবলই আঘাত করিতে লাগিল। বন্ধুর খেদপূর্ণ বাক্যের প্রতিবাদস্বরূপ যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া হিরণের কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে পারিলে জয়ন্ত পশ্চাৎপদ হইত না। হিরণ কি জানে না, তাহাকে অদেয় জয়ন্তর কি থাকিতে পারে?

জয়ন্ত বিরক্ত হইয়া কঠোরস্বরে কহিল, "হিরণ, থামো, যখন তখন যা তা আমায় শুনিও না, বারণ ক'রে দিচ্ছি। উনি ভিখারী, আমি রাজা, শুনতে শুনতে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। রাজার ভাই-বন্ধু ভিখারী হয় না। ওঠো, চল, কোথায় নিয়ে যাবে, এখুনি যাচ্ছি! আমি একা গেলে হবে না, বৌদিকেও ডেকে নিতে হবে, নইলে তিনি ঠাট্টা করবেন। তোমার কু তাঁকেও কম অপমান করে নি। তাঁর সামনেই আপোষে মিটাতে হবে।"

পূর্ব্বেই হিরণের চোখে জল আসিয়াছিল। আনন্দে তাহা আর চাপা রহিল না।

৩২

শ্রাবণের নীরব নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। কয়েক দিনের অনাবৃষ্টিতে বড়ই গুমট হইয়াছে। শ্যাম চিক্কণ তালীবনের ঊর্দ্ধে গুটি কয়েক চিল কান্ত সকরুণ স্বরলহরীতে আকাশ প্লাবিত করিয়া শ্রাবণের খর রৌদ্রে উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুই একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের পাখী অকারণ চিলের অনুসরণ করিতেছে। প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া যে কেয়া-গাছটি উঠিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। গাছের নীচে ঝুপি ঝুপি আকন্দবন, কিন্তু পুষ্পশূন্য। দুইটি বন্য কপোত ঝোপে-ঝাড়ে খাদ্যানুসন্ধানে ঘুরিতেছে।

কুহুর গৃহদ্বারে ঘন নীল বর্ণের পর্দ্দা বাতাসে দুলিতেছে। নীচের বিছানায় কুহু বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বালিসের উপর ভিজা চুলের রাশি। সাদা সেমিজ ঢাকিয়া সাধারণ শাড়ীর কাল পাড়টি আঁকিয়া বাঁকিয়া তাহার তনুকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

এত দিন জয়ন্ত কুহুর দিক হইতে মনের রাশ টানিয়া রাখিয়াছিল। রাশ আলগা করিবামাত্র তাহার বিমুখ মন সবেগে কুহুর প্রতি ধাবিত হইল।

ঘরে ঢুকিয়া কুহুকে নিরীক্ষণ করিয়া জয়ন্ত মোহাভিভূত

হইয়া পড়িল। ঐ মুখ, কোথাও বুঝি উহার তুলনা নাই। ঘরের পাখা বন্ধ, বিন্দু বিন্দু ঘাম কুহুর কপালে জমিয়া রহিয়াছে। নয়নপদ্ম মুদ্রিত। ঘন সূক্ষ্ম পক্ষ্মজালের ঊর্দ্ধে দুইটি পদ্মের পাপড়ি। মুদ্রিত নয়ন যে এত সুন্দর হইতে পারে, জয়ন্তর তাহা জানা ছিল না। কুহুর চিবুকের খাঁচটি জয়ন্ত এমনভাবে লক্ষ্য করে নাই। বিশ্বশিল্পী বড় যত্নে সাবধানে ঐ রেখাটি যেন টানিয়া দিয়াছেন।

বাহির হইতে ভাতি মিহিসুরে ডাকিল, "ঠাকুরপো, আসবো?

"এস বৌদি"। বলিয়া জয়ন্ত কুহুর গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহাকে তুলিয়া দিল।

বিস্মিতা কুহু মাথার কাপড় তুলিয়া দিতে না দিতেই ভাতি, বাসনা ও হিরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

চঞ্চলা বাসনা পাখা খুলিয়া দিয়া, কুহুর পাশে বসিয়া কহিল, "বৌদির ত খুব পড়া-শোনা হচ্ছিল? ও মা, কি কাণ্ড! দেখ না বৌদিমণি, এদুটো দাদামণির লাইব্রেরীর বই। এটা সংস্কৃত, ওটা ইংরাজী। আমি ত সংস্কৃত একেবারে জানি না, ভালও লাগে না। কি কট্‌কটে ভাষা, পড়তে নিলেই মাথা ধ'রে ওঠে। বইটার নাম কি?"

কুহু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "কাদম্বরী, দিদি, বসুন, দাদাও যে দাঁড়িয়ে? বসুন।"

সকলে উপবেশন করিলে, বাসনা অন্য পুস্তকখানা টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "বৌদিমণি দেখেছ, এটা 'গোল্ডেন ট্রেজারী', বৌদি ত আচ্ছা লোক, কিছু জানে না ব'লে আমাদের ফাঁকি দিয়েছিল? মা গো, দেখ না কাণ্ড, শেলির কবিতার বাঙ্গালা অনুবাদ করা হচ্ছিল। তোমরা বলতে, আমি ওকে পড়াতে পারি, এখন দেখছি, দাদামণি ছাড়া এ বাড়ীর আর কেউ বৌদিকে পড়াতে পারবে না।"

কুহু লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। একা সময় কাটে না বলিয়া সত্যই সে শেলির বিখ্যাত "ক্লাউড" কবিতার বাঙ্গালা অনুবাদ করিতেছিল, খাতার ছেঁড়া পাতাখানা কবিতার পাতায় রাখিয়া পেন্‌সিল হাতে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার গোপন বিদ্যা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে পূর্ব্বেই সে সাবধান হইত।

জয়ন্ত প্রসন্ন নয়নে কুহুর পানে তাকাইয়া রহিল।

হিরণ পুলকিত হইয়া বলিল, "আমি তখনই ত বলেছি বৌদি, দিবাকরের বোন্ মূর্খ হতে পারে না। দিবার মত ছেলে ক'টা আছে? আচ্ছা, দিদি, তুমি কার কাছে লেখা-পড়া শিখেছ? তোমাদের গাঁয়ে ত ভাল স্কুল নেই?"

লজ্জিতা কুহু মুখ না তুলিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আমি বেশী কিছু শিখিনি, দাদা। সামান্য যা একটু আধটু ছুটির ভেতর দাদাই শিখিয়েছেন। সংস্কৃত বাবা পড়াতেন। বাবা খুব ভাল সংস্কৃত জানেন। মা অল্প অল্প শিখেছেন।"

বাসনা প্রশ্ন করিল, "তোমার সংস্কৃত পড়তে ভাল লাগে? মাথা ধরে না?"

কুহু হাসিয়া কহিল, "মাথা ধরবে কেন? ভাল লাগে বৈ কি।"

জয়ন্ত বলিল, "সংস্কৃত পড়তে মাথা ধরলেও এবার তোকে ছাড়া হবে না বেবী, শিখতে হবে।"

"সংস্কৃতের ওপর এত ভক্তি হ'ল কেন, ভাই? পরের মেয়ে যেটা জানে, ঘরের মেয়ে সেটা না জানলে হিংসা হয় নাকি?" বলিয়া হিরণ হাসিতে লাগিল।

ভাতি একেবারে নীরব হইয়া গেল। কাহারও হাসি-কথায় যোগ দিতে পারিল না। নব বধূ তাহার রূপের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছে। শিক্ষার গৌরব, রুচির গরিমা তাহাও চূর্ণ করিতে বসিয়াছে। তবে একটা গর্ব্ব এখনও ভাতির যায় নাই, সেটা তার সুধাকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত। কুহু নামে কুহু হইলেও কণ্ঠ তাহার 'কুহু' নহে। সে গাহিতে বাজাইতে নিশ্চয়ই জানে না। জানিবে কোথা হইতে? ভাইএর কাছে মুখস্থ বুলি শিখিতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতবিদ্যা যে বিধিদত্ত। সেইটুকুই ভাতির সান্ত্বনা।

ভাতির ভাবান্তর প্রথমে হিরণ লক্ষ্য করিয়া সসঙ্কোচে কহিল, বৌদি, চুপ ক'রে রইলেন যে? কুহুদিদিকে লেখাপড়া শেখানোর দায় থেকে মুক্তি পেলেন ব'লে খুব আরাম লাগছে? কিন্তু সহজে আপনার মুক্তি নেই। এক দায়ের বদলে আর একটি দায় সারতে হবে।"

ভাতি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কৃত্রিম হাস্যের সহিত জবাব করিল, "দায় মুক্ত হ'লে ত বেঁচে যেতাম, হিরু ঠাকুরপো, দু'পাতা বই পড়াই সব জানা নয়। ভদ্র সমাজে মিশতে গেলে অনেক কিছু জানতে হয়—শিখতে হয়।"

"আমি সেই কথাই বলছি বৌদি, কুহু দিদির

গান-বাজনা শেখানোর ভার আপনাকেই নিতে হবে। একে ছেলেমানুষ, তায় নতুন এসেছে, আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে না নিলে কে নেবে, বৌদি ?"

"বাঙ্গালী ঘরের এত বড় মেয়ে, তুমি তাকে কোন্ হিসাবে ছেলেমানুষ বল, হিরু ঠাকুরপো ? যার ভাই অত বড় দিগ্বিজয়ী, তার বোনের কি কোন বিদ্যা বাকী আছে ? আমি গান শেখাব, আমার সময় কৈ ? এই ত একটু বাদেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। গানের স্কুল নিয়ে বড্ড ঝঞ্ঝাটে রয়েছি।"

ভাতি উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাসনা বলিল, "বৌদির এখন গান শিখতে হবে না, হিরুদা, আগে যত ইংরাজী কবিতার বই আছে, তা থেকে ভাল ভাল কবিতা বেছে বাঙ্গালায় অনুবাদ করতে থাকুন। তার পর আর সব হবে।"

জয়ন্ত কহিল, "ইংরাজী বাঙ্গালা করবার তোর এত আগ্রহ কেন, বেবী ?"

হিরণ বলিল, "তা বুঝতে পারছ না ? আমাদের বেবী রাণী বাঙ্গালা ভাষাটিকেই সব চেয়ে ভাল বোঝেন। এত দিন যে অসুবিধা হচ্ছিল, সেইটাকে সুবিধা ক'রে নিতে ইচ্ছা। আমি বলি, বেবী সকলের আগে সংস্কৃত ক্লাশের ছাত্রী হোক। কুহুদি মাষ্টারী করুন। আমরা মাথা ধরার ওষুধ খুঁজে বেড়াই।"

বাসনা রঞ্জিত-মুখে মাথা দুলাইয়া বলিল, "যান, অত ঠাট্টা করতে হবে না। আমি এখন ছোট আছি ব'লে সংস্কৃত পড়তে মাথা ধরে। বড় হ'লে ধরবে না, কত শিখে নেব। বৌদির মত আমি চুপে চুপে শিখবো না। সব্বাইকে জানিয়ে শিখবো. বৌদি বড্ড মিনমিনে, এত জানে, তা কারুকে জানায় না। যাই দাদামণিকে বৌদির গুণপণা ব'লে দিই গে।"

বায়ুচালিত এক টুকরা মেঘের মত বাসনা নৃত্যের ভঙ্গীতে চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভাতি বাহির হইয়া গেলে হিরণ বলিতে লাগিল, জয়ন্ত খুসী হলে, ভাই ? লোকের বাইরেটা দেখাই হ'ল তোমাদের অভ্যাস। র'য়ে স'য়ে তোমরা কারুর ভেতরের খবর নিতে জানো না। হাজারবার তোমায় বলেছি, আবার বলছি, তোমার জিৎ, সম্পূর্ণ জিৎ হয়েছে। আমার দিদি কোন বিষয়ে কারুর চেয়ে ছোট নয়। যারা নিজের বিজ্ঞাপন দিতে পারে না, তাদের জানতে গেলে সময়ের দরকার হয়। তোমরা বিজ্ঞাপনের বাহারে ভোল, খাঁটী জিনিষ চোখে পড়ে না।"

"আমার না পড়লে ক্ষতি নেই, তোমার পড়লে আমি তার সন্ধান পাই। আজ তুমিই আমায় ডেকে এনেছ। না ডাকলে আমি জানতে পারতাম না, তুমি জহুরী, রত্ন চেনো স্বীকার ক'রে নিলাম।"

বলিয়া জয়ন্ত কুহুর পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। লজ্জায় কুহুর কর্ণমূল হইতে ললাট অবধি রাঙ্গা হইয়া গেল। এ আশাতীত আনন্দ-প্রীতি যে বহিয়া আনিল, আজ মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ দিবালোকে কুহু তাহাকে ভালরূপেই চিনিয়া লইল। তাহার এক দাদা দূরে, আর এক দাদা নিকটে থাকিয়া তাহারই শান্তির উপাদান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

৩৩

সকলে প্রস্থান করিলে জয়ন্ত কুহুর পাশে আসিয়া আবেগ-ভরে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল। কুহু এ বন্ধনে ধরা দিতে পারিল না। অকারণে বিনা অপরাধে এ কয়েক দিন স্বামী তাহাকে যে শাস্তি দিয়াছেন, তাহার নারী-প্রকৃতি এত সহজে তাহা ভুলিতে পারিল না।

হিরণই যে জয়ন্তকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইতে পারিল না। যাহার নিজের গরজ নাই, পরের তাড়নায় সোহাগ দেখাইতে আসা, সে সোহাগ নহে, কৃত্রিমতা। ছলনার প্রতি কুহুর আন্তরিক ঘৃণা। সত্য যাহা, তাহাকেই সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতে শিখিয়াছে। সত্যের অপলাপ প্রাণান্তেও সহিতে পারিত না।

কুহু স্বামীর বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অনুচ্চ অথচ সতেজে কহিল, "হিরণদাদা তোমাকে এখানে ডেকে এনেছেন। আনবার কি কিছু দরকার ছিল ? আমি যদি দোষই ক'রে থাকি, আমার কাছে যদি তোমার দরকার না থাকে, তা হ'লে অন্যের অনুরোধে আমাকে তোমার প্রয়োজন হওয়া ঠিক নয়। এখানে এসে অবধি শুনছি, তোমার বিয়ে করবার ইচ্ছা ছিল না। সেখানে কিন্তু উল্‌টো শুনেছিলাম। সেটা বোধ হয় হিরণদাদার কাষ ?"

জয়ন্তর মুগ্ধতা তখনও কাটে নাই। কুহুর নব নব সৌন্দর্য্য চির-সৌন্দর্য্যপিপাসু জয়ন্তকে তন্ময় করিয়া তুলিতেছিল। উহাকে পাইয়াও যেন পাওয়া যায় না। নিকটে টানিলে দূরে সরিয়া যায়, সরিয়া গেলেও কুহুকে জয়ন্তর চাই। কুহু নহিলে প্রমত্ত হৃদয়ের নেশা জমিয়া উঠিতে চাহে না। রসপাত্র কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠে না। হিরণের দৌর্ব্বল্য তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইতেছে।

জয়ন্ত ক্ষণেক মৌন থাকিয়া শান্তভাবেই উত্তর করিল, "হিরণের কায নয় কু, আমি স্বইচ্ছাতেই তোমায় বিয়ে করেছি। আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি লেখাপড়া একেবারেই জানো না! তাই শিক্ষার কথা তুলেছিলাম। আমার বৌদির মুখের ওপর অমন ক'রে জবাব দিয়ে তোমার কি চ'লে যাওয়া উচিত হয়েছিল? সেই জন্যই আমি এত দিন তোমার কাছে আসি নি। তুমি কি রাগ করেছ, কু? আমি মুখে যাই বলি না কেন, ক্ষীরপুরে তোমায় দেখে তোমার রূপে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। হিরণ আমাকে তোমার কাছে আনে নি, তোমার রূপ আমায় তোমার কাছে ডেকে এনেছে।"

কুহু ক্ষুব্ধ হইল। স্বামী তাহার রূপের পূজারী, দেহের ভিখারী ভিন্ন কিছুই নয়। তাহার পুষ্পিত তনু, আরক্ত অধর স্বামীকে কি তাহার পাশে ডাকিয়া আনিয়াছে? তাহার উন্মুখ অন্তঃকরণ, আকুল প্রতীক্ষা, আত্মার নীরব আহ্বান—তাহার কি মূল্য নাই? প্রাণ যাহার প্রাণে স্পন্দন জাগাইতে পারে না, আত্মার সহিত সেখানে আত্মার মিলন হয় নাই, বাহিরের দেহের মোহ সে কি আবার প্রেম? যাহা কামনায় কলুষিত, বাসনায় উগ্র, সে প্রেম কে চাহে?

কুহু কহিল, "আমার রূপ তোমায় ডেকে এনেছে, আমি নয়? তুমি আমায় সুন্দর বল; কিন্তু তুমিও কম সুন্দর নও, তবু তোমাকেই আমার বেশী ভাল লাগে। তোমার সৌন্দর্য্যকে নয়। আমি সামান্য লেখাপড়া জানি ব'লে তুমি আজ আমার ওপর সন্তুষ্ট হ'লে? না জানলে কি ফেলে দিতে? উচিত অনুচিতের কথা বলছ, আমি ত অন্যায় কিছু ব'লে তোমাদের অসম্মান করিনি? আমায় দিয়ে যা সম্ভব হবে না, তা কেমন ক'রে স্বীকার করবো? এতেই কি আমার অপরাধ হয়েছে? যদি হয়েই থাকে, সেটা কি তুমি আমায় ডেকে বলতে পারতে না? আমি যা না জানবো, তুমি তা আমায় শেখাবে বলেই না স্বামী? বাবা আমায় তোমারই হাতে সঁপে দিয়েছেন।" বলিতে বলিতে কুহুর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া চোখের প্রান্ত ভিজিয়া গেল।

ইহার পর জয়ন্ত আর শান্ত থাকিতে পারিল না। যাহার হাসিতে মাণিকের ছড়াছড়ি, কান্নায় মুক্তা বরিষণ, তাহার প্রতি জয়ন্ত কি রাগ করিতে পারে? জয়ন্ত কুহুর দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কোমলস্বরে বলিল, "তোমায় কষ্ট দেওয়া আমার অন্যায় হয়েছে, কু। আর কখনও তোমায় আমি কষ্ট দেব না। তুমি রাগ করো না লক্ষ্মীটি! এবারের মত আমায় মাপ কর।"

কুহু আর কঠিন হইতে পারিল না। স্বামীকে ব্যথা দিতে পারিল না। স্বামীর হাত ধরিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, "ছিঃ, ও কথা বলো না। দোষ আমারই, আমি কেন তোমার মনের মত হ'তে পারছিনে? আমার ত্রুটি হ'লে তুমি আমায় শুধ্‌রে নিও। রাগ ক'রে আমায় ত্যাগ ক'রো না।"

"না কু, তোমায় ত্যাগ করবো না। ত্যাগ করবো ব'লে ত গ্রহণ করি নি। ভয় কি ভীরু? ভয় নেই।"

কয়েক দিনের পুঞ্জীভূত মেঘ একটা দমকা বাতাসে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল। শান্তির স্নিগ্ধালোকে কুহুর অন্তরাকাশ উজ্জ্বল হইল। প্রথম দৃষ্টিপাতে যে কুমারী তাহার অমলিন হৃদয়ের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি স্বামীর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছে, সে ক্ষেত্রে কি কঠোরতা আসে? বিমুখতা থাকিতে পারে না। কুহু কুহুস্বরে অনেক কথা জয়ন্তর কাণে ঢালিয়া অবশেষে বলিল, "আমায় ক্ষীরপুরে নিয়ে যাবে কবে? বাবা, মা, তপুর জন্যে বড্ড খারাপ লাগে। তুমি একটিবার আমায় নিয়ে দেখিয়ে আনো, তার পর তোমার কাছেই থাকবো। কোথাও যেতে চাইব না।"

জয়ন্ত সাদরে পত্নীর চিবুকটি নাড়িয়া দিয়া বলিল, "সত্যি যেতে চাইবে না, কু? আমায় ছেড়ে কোথাও থাক্‌বে না? আমি তোমায় শীগ্‌গির ক্ষীরপুরে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমায় ছেড়ে তুমি কখনও থাক্‌বে না? স্বীকার না করলে নিয়ে যাব না।"

"স্বীকার করলাম। তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে চাইব

না। কিন্তু তুমি যদি ছেড়ে চ'লে যাও ? ছাড়ার কাষ কর, তা হ'লে"—কুহু কথাটা শেষ করিতে পারিল না। আতঙ্কে শিহরিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

আকাশের ঈশানকোণে সহসা বিকট শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। দূর-প্রান্তর হইতে একটা ঘূর্ণিবায়ু রাজ্যের খড়কুটা, বালি উড়াইয়া ছুটিয়া আসিল। বৃক্ষবল্লরী শাখা দুলাইয়া বর্ষার গাঢ় ঘন মেঘপুঞ্জকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। আসন্ন বৃষ্টির সাড়া পাইয়া ধরণী পুলকে পূর্ণ হইল।

৩৪

আবার ক্ষীরপুরে। সেই বজরা, সঙ্গী হিরণ। গুটি তিনেক ভৃত্য, দাসী নিস্তার, আর কুহু।

জলাশয়ের নির্ম্মল জল টলমল করিতেছে। পথ-ঘাট এখনও শুষ্ক হয় নাই; জীব-জন্তুর পদসঞ্চালনে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার ভাঙ্গা আসরে শরতের আগমনীর বাঁশী বাজিতেছে। গগনপট শুভ্র, মেঘশূন্য, ধরিত্রী পুলকিত। কত অজানা পাখীর সঙ্গীতঝঙ্কারে শ্যামচিক্কণ বনখণ্ড মুখরিত। স্থলে জলে পুষ্পের কি সমারোহ, নদীর দুই তীর শুভ্র কাশের ফুলে আলোকিত।

সে দিন এত বেলায় স্নানান্তে পূজা করিয়া যশোদা রন্ধনশালায় যাইতেছিলেন। ভোলানাথ বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসিয়া নিবিষ্টমনে সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন।

হঠাৎ তপুর উল্লাস চীৎকারে যশোদা সচমকে ঘাড় ফিরাইলেন। তপুর হাত ধরিয়া শরৎলক্ষ্মীর মত কুহু হাসিতে হাসিতে আসিতেছে, এ অভাবনীয় আনন্দে মা'র বক্ষ স্পন্দিত হইয়া চোখে জল আসিল। মার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বাহির হইল—"কুহু এলি মা ?" 'কুহু' শব্দটুকু ভোলানাথের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি কাগজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কুহু ততক্ষণ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছে। পিতার পাদবন্দনা করিয়া মা'র পায়ের কাছে নত হইতেই মা মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। প্রায় তিন মাস হইতে গেল, ইহার ভিতর কুহু যেন মা'র কাছে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। এত দিনের পর সন্তানকে নিকটে পাইয়া মা অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। দীর্ঘদিনের অদর্শন-জনিত ক্ষুধা মা সেই মুহূর্ত্তেই মিটাইয়া লইতে চান।

ভোলানাথ কুহুর সম্মুখীন হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "আজ খুব সকালে ত ষ্টীমার এসেছে, এমন এক দিনও আসে না। তোকে কে দিয়ে গেল, কুহু! পাঠিয়ে দিয়েই ষ্টীমারে ফিরে গেছে ?"

কুহু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তপু বলিল, "না বাবা, দিদি ত ষ্টীমারে আসেনি। ষ্টীমার কি এত সকালে আসতে পারে ? দিদি বজরায় এসেছে, সেই নীল রংএর বজরা, লাল—টুক-টুকে লাল। আমি নদীর ধারে বকুলফুল কুড়াচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম, রোজ রোজ ফুল কুড়িয়ে দুটো বড় মালা গেঁথে দিদিকে একটা আর সুরাটে দাদাকে একটা পাঠিয়ে দেব। বকুলফুল ত নষ্ট হয় না। শুকিয়ে গেলেও গন্ধ থাকে। ভুতো এসে বল্লে, 'দেখ, কেমন সুন্দর একটা বজরা আস্‌ছে।' মা গো; বল্লে বিশ্বাস করবে না, চেয়ে দেখি, জামাই বাবুর বজ্‌রা। ভূতো বলে, 'না, জামাই বাবুর বজরা নয়। তোর জামাই বাবু ছাড়া আর কারুর যেন বজরা থাকতে নেই!' যেমন বলেছিল, তেমনি জব্দ হয়েছে। একটু বাদেই দিদি এসে নাম্‌লো।"

যশোদা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "তোর সঙ্গে কে এসেছে, কুহু ? ও, জয়ন্ত নিজেই নিয়ে এসেছে। ওগো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, জয়ন্ত এসেছে যে। তপুকে নিয়ে এখুনি যাও, তাকে নামিয়ে নিয়ে এস!"

স্বামি-পুত্রকে জামাতার অভ্যর্থনার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিয়া যশোদা মেয়ে লইয়া বসিলেন। কুহু ইহারই মধ্যে মাথায় একটু বাড়িয়াছে। 'সোণার বরণ' ফিকা হইয়া পল্লীর নিটোল স্বাস্থ্য অনেকখানি ঝরিয়া গিয়াছে!

মা সন্দিগ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ রে কুহু, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন ? পেট ভ'রে খাস না নাকি ? জা খাবার দাবার যত্ন করে ত ?"

মা'র প্রশ্নে জায়ের চায়ের ঘটনা কুহুর স্মরণ হইল। এ স্নেহপারাবারের নিকটে সে ব্যথার কাহিনী বলিয়া মনটাকে হাল্কা করিয়া লইতে সাধ হইলেও কুহু চাপিয়া গেল। ভাতির অদ্ভুত আচরণ, জয়ন্তর খামখেয়ালি ব্যবহার জানিয়া মা দুঃখিত হইবেন। দিবাকরের নিমিত্ত মায়ের কত মনস্তাপ সহিতে হয়। তাহারা সুখে আছে, শান্তিতে আছে জানিলেই মা পরিতৃপ্ত, প্রসন্ন। কুহুর ভবিষ্যৎ পথ যে কণ্টকসঙ্কুল, তাহার আভাস দিয়া মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত

করিবে কেন? কুহু হাসিয়া বলিল, "দিদি বেশ যত্ন করেন মা, বরং আমি কিছু না খেলেই রাগ করেন। তুমি অনেক দিন পর দেখছ ব'লে রোগা লাগছে। আমি রোগা হইনি। খাইও খুব।"

যশোদা সানন্দে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে লজ্জা করিসনে, কুহু; জয়ন্ত তোকে আদর-যত্ন করে ত? ভালবাসে?"

কুহু আরক্ত মুখখানি মা'র কোলে লুকাইয়া ফেলিল। তাহার সলজ্জ রক্তিম মুখে মা নব অনুরাগের চিহ্ন দেখিয়া প্রীত হইয়া ভাবিলেন, যে বিবাহের সময় জল-কাদার ওজোর দর্শাইয়া পল্লীগ্রামে আসিতে স্বীকৃত হয় নাই, সেই ব্যক্তি কুহুকে ভালবাসিয়া, তাহাকে প্রসন্ন করিতে এ পল্লী-আবাসে আসিয়াছে; এখনও গ্রাম জলে ডোবা, পথ কর্দ্দমাক্ত। রাজার দুলালকে ভিখারীর মেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ না করিলে ইহা অসম্ভব রহিয়া যাইত। কুহু সুখী হইয়াছে, তাহাকেও সুখী করিয়াছে। এখন তুচ্ছ বাধা-বিঘ্নের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কিন্তু মা'র ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে বিশেষ সময় লাগিল না।

কিয়ৎকাল পর তপুর সহিত ভোলানাথ ফিরিয়া আসিলেন।

যশোদা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, জয়ন্ত এলো না? একেবারে চান্ ক'রে আসবে না কি? তার জল-খাবার গুছিয়ে রাখতে হয়। নটবরের দোকান থেকে কিছু চম্‌চম্ আর রসগোল্লা আনিয়ে দাও। আমি ঘরেই কখানা নোন্‌তা নিম্‌কি সিঙ্গাড়া ভেজে দিচ্ছি।"

ভোলানাথ কহিলেন, "তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি কুহুকে খেতে দাও। জয়ন্ত বজরা ছেড়ে নাম্‌বে না। এখানে খাবেও না। তার সঙ্গে চাকর, বামন আছে, সেখানেই তারা খাবে দাবে।"

"নাম্‌বে না? আমার কাছে খাবে না? তুমি তাকে ভাল ক'রে বলনি? হাতে ধ'রে বল্লে সে কি না এসে পারত? তোমার কথার ঠিক নেই, কি বলতে কি ব'লে ফেলেছ; তাই জয়ন্ত আস্‌তে চাচ্ছে না।"

তপু বলিল, "বাবা অনেক করেই বলেছেন মা; হিরণ-দাও কত বল্লেন, জামাই বাবু কারুর কথা শুন্‌লেন না। বল্লেন, 'যাব কোথায়? ও স্যাপ-ব্যাঙের আড্ডায় কখনও থাকিনি, আমার পোষাবে না।' হিরণ দা বল্লেন, 'যদি ওখানে নাই থাকো, একবার গিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে এস।' জামাইবাবু বল্লেন, 'সে পরে দেখা যাবে। এখন কিছু পারবো না।' দেখ মা, হিরণ দা কিন্তু খুব ভাল, আমায় ডেকে কত আদর করলেন, ভালবাস্‌লেন। হিরণ দাদা যদি দিদির বর হ'ত, তা হ'লে সব চেয়ে ভাল হ'ত।"

মা'র তখন ভালমন্দ মীমাংসা করিবার মনের অবস্থা ছিল না। সব শুনিয়া তাঁহার মুখের হাসি নিবিয়া গেল। তাঁহারা দরিদ্র, দরিদ্রের প্রতি আপন জনের এ অবজ্ঞা যে একবারে অসহ্য। ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে মানুষ মানুষকে কি এত আঘাত দিতে পারে? এত স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য ইহা কি ধন-গর্ব্বিতের হৃদয় স্পর্শ করিয়া আসন টলাইতে পারে না? দরিদ্রের কন্যা যে অধিকার পাইয়াছে, তাহার হতভাগ্য জনক-জননী সে করুণার এক কণা পাইবারও কি অযোগ্য?

জামাই ঘাটে বজরা বাঁধিয়া সেখানেই খাইবেন, এটা যশোদার কিছুতেই সহিতেছিল না। তিনি তখনই বাজারে লোক পাঠাইয়া মাছ, দুধ, দই, মিষ্টান্ন প্রভৃতি আনাইলেন। রাঁধিয়া-বাড়িয়া পরিপাটীরূপে সাজাইয়া বজরাতে পাঠাইয়া দিলেন। জয়ন্ত শ্বশুরের ভিটায় পদার্পণ না করিলেও শাশুড়ীর স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া মাতৃস্নেহের আস্বাদ জানিবে। কিন্তু যশোদার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল।

জয়ন্ত শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত খাবার ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইল, তাহাদের পাখীর মাংস রান্না হইতেছে। সেই জন্য এ সব খাইতে পারিবে না; এ খাবার সে পছন্দ করে না।

পিতামাতার দুঃখে অপমানে কুহুর সর্ব্বাঙ্গ যেন অগ্নি-তাপে দহিতেছিল, কেন সে মরিতে এখানে আসিল? না আসিলে ত এত কাণ্ড ঘটিত না। ঘুণাক্ষরে ইহার ইঙ্গিত পাইলে কুহু ক্ষীরপুর আসিবার নাম পর্য্যন্ত করিত না। যাহা হইয়া গেল, কি উপায়ে সে তাহা সংশোধন করিবে? স্বামীর হৃদয়হীনতায় তাহার হৃদয়ে যে মসীরেখা বিস্তার করিতেছে, সপ্তসিন্ধুর জলে সে ছায়া ধুইবার নহে। আজ কুহুর আকাশে কি বজ্র নাই? বজ্রের আগুনে পুড়িয়া মরিলেই কুহুর এ দুর্নিবার লজ্জার অবসান হইত। মৃত্তিকা দুই ভাগ হইলে কুহু তাহারই অভ্যন্তরে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিতে পারিত; কিন্তু কোথাও কিছুই নাই। কেহই কুহুর লজ্জা নিবারণ করিতে সাহায্য করিল না।

৩৫

যাহার নিমিত্ত স্নেহের অশেষ আয়োজন, সেই স্নেহের পাত্রকে একান্তে মমতার পরিবেষ্টনের মধ্যে আনিয়া ভালবাসিয়া, আহার্য্য দিয়া হৃদয়ের অসীম বাৎসল্যে অভিসিক্ত করিতে সাধ হয়। সে নিষ্ঠুর যদি প্রাণের সেই দুর্ল্লভ সম্পদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম না করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার আর ঠাঁই থাকে না। বঞ্চিত-হৃদয় বক্ষঃপিঞ্জরে থাকিয়া কেবলই হাহাকার করিতে থাকে।

জামাতার ব্যবহারে সদানন্দ ভোলানাথকে কিছু ম্রিয়-মাণ বিষাদাচ্ছন্ন করিলেও যশোদাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিল। জামাই-মেয়ে লইয়া সাধ-আহ্লাদ মিটাইবেন, ইহা তাঁহার চির-পোষিত আশা। ইহাপেক্ষা উহারা না আসিলেই তিনি আশায়, অপেক্ষায় অনায়াসে সময় কাটাইতে পারিতেন। যে কাছে আসিয়াও দূরে রহিল, তাহার আসা ত আসা নহে, দুঃখদায়ক।

যশোদা খাদ্যসামগ্রী যে ভাবে পাঠাইয়াছিলেন, তেমনই ভাবে ফেরত আসিয়া পড়িয়া রহিল। তিনি সে দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। স্বামি-পুত্রকে খাওয়াইয়া মেয়েকে বলিলেন, "কুহু, তুই খেতে বোস, আমার জন্যে থাকিস্ নে মা, আমি আজ খাব না। আমার মুখে কিছু রুচবে না। তুই খেয়ে নে।"

কুহু তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না। মা'র দিকে চোখ তুলিয়া তখনই নামাইয়া লইয়া কহিল, "কত দিন তোমার সাথে ব'সে খাই না মা, আজ তুমি না খেলে আমিও যে খেতে পারবো না।"

মা নিরুত্তরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কি কাযের নিমিত্ত বাহিরে যাইতে গিয়া পিছাইয়া আসিলেন।

হিরণ আসিয়া ডাকিল, "মা কোথায় যাচ্ছেন? আমি এসেছি, খেতে এসেছি। খেতে দেন, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।"

যশোদা অগ্রসর হইয়া একটু বিপন্নের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "এস বাবা, ভাল আছ ত? তপু, বারান্দায় একখানা আসন পেতে তোর হিরণদাদাকে বসতে দে।"

খুঁটির গায়ের পিঁড়িখানা টানিয়া লইয়া হিরণ বসিল। বসিয়া বলিল, "তোমার আর কষ্ট ক'রে আসন পেতে দিতে হবে না, তপু! এই ত আমি দিব্যি বসেছি। এস ভাই, তুমি আমার কাছে এস।"

তপু হিরণের কাছে বসিলে যশোদা যেন কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলেন না। মধ্যাহ্নে এক ব্রাহ্মণকুমার মা ডাকিয়া তাঁহার নিকটে খাইতে চাহিতেছে, এটা সত্য, না উপহাস? যশোদা অন্যমনস্কভাবে তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তপু কহিল, "আপনি মা'র কাছে খেতে এসেছেন, হিরণদা? বজরায় পাখীর মাংস খেলেন না? আপনাদের কি পাখীর মাংস রান্না হচ্ছিল? তখন খাবার নিয়ে গিয়ে দেখি, বড্ড গন্ধ বেরুচ্ছে। পাখীর মাংসের সাথে অন্য কিছু কি খেতে নেই? তাই জামাইবাবু মা'র রান্না করা সমস্ত জিনিষ ফিরিয়ে দিলেন। কিছু রাখলেন না।"

হিরণ ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "কি পাখীর মাংস রান্না হচ্ছিল, তা ত আমি জানি না, তপু; আমি পাখী-টাখি খাই নে, তার খবরও রাখি নে। ক্ষিধে পেয়েছে, মা'র কাছে খেতে এসেছি, মা যা দেবেন, তা ওদের পাখীর মাংসের চেয়ে ঢের ভাল জিনিষ।"

ইহা শুনিয়াও যশোদা নড়িলেন না, দেখিয়া হিরণ একটু কুণ্ঠিত হইল। সে পরান্নভোজী হইলেও পরের নিকটে চাহিয়া চিন্তিয়া খাইতে পারে না। জয়ন্তের রূঢ়তায় ক্ষুণ্ন হইয়াই সে তাহার স্বভাবের বহির্ভূত কায করিতে আসিয়াছিল। অপর পক্ষের আগ্রহের অভাবে তাহার আহারের স্পৃহা চলিয়া গেল। এখন এ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইতে পারিলেই সে যেন বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু তপু ইহার জের মিটাইতে দিল না।

হঠাৎ হিরণের নিকট হইতে উঠিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের স্বরে বলিল, "মা, তোমার হ'ল কি? হিরণদা খেতে এলেন, তুমি তাঁকে খেতে দিচ্ছ না কেন? কত বেলা হয়েছে দেখ ত, সারা উঠোন রোদে ভ'রে গেছে। হিরণদার বুঝি পিত্তি পড়ে না?"

যশোদা একটুখানি করুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "হিরণ, তুমি কি সত্যি করেই আমার কাছে খেতে এসেছ? এত বেলা হয়েছে, এখনও তোমার খাওয়া হয় নি?"

"না মা, আমার খাওয়া হয় নি; আমি সত্যি সত্যিই আপনার কাছে খেতে এসেছি।"

"দুপুরবেলা খেতে এসেছ, তুমি বামুনের ছেলে, আমি তোমাকে ভাত দেব কি ক'রে? অথচ দুপুরের খাওয়া, ভাত না খেলে তৃপ্তি হয় না।"

"আমি ভাত খেতেই এসেছি মা, আপনার ভয় নেই,

আমার ভেতর ব্রাহ্মণের 'ব'টুকুও আর অবশিষ্ট নেই। জীবনে অনেক পাপ অনাচার করা গেছে, আপনার হাতের ভাত খেলে সে অনাচারের বোঝা কম্‌বে ভিন্ন বাড়বে না।"

হিরণ যাহাই কেন বলুক না, যশোদা কিন্তু তাহাকে ভাত দিতে পারিলেন না। হাজার হউক ব্রাহ্মণ—সংস্কারে বাধিল। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ময়দা মাখিতে লাগিলেন।

রান্নাঘরের বারান্দায় জল ছিটাইয়া ঠাঁই করিয়া হিরণকে খাইতে বসাইয়া দিয়া যশোদা কাছে বসিয়া রহিলেন। কুহু মা'য়ের পশ্চাতে আসিয়া বসিল।

বিবিধ উপকরণের সহিত ভাতের পরিবর্ত্তে লুচির আবির্ভাবে হিরণের অনুযোগ অভিযোগের অন্ত রহিল না।

হিরণ কুহুর দিকে চাহিয়া কৃত্রিম রাগের ভাণ করিয়া বলিল, "মা যেন দুপুরে রোদে আমার লুচির ব্যবস্থা করলেন। তা ব'লে তুমিও কি আমায় দু'টো ভাত দিতে পারলে না, দিদি? জয়ন্ত আজ শেষরাতেই বজরা ভাসাতে চাচ্ছে, ভেবেছিলাম, তাকে ধ'রে তোমার মেয়াদ দুই দিন বাড়িয়ে নেব। তা ভাত যখন দিলে না, তখন তোমার হয়ে লড়বে কে?"

কুহু তেমনই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। হিরণের বাক্য যে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তেমন লক্ষণ দেখা গেল না।

কথাটা বলিয়া হিরণ অপ্রস্তুত হইল। একে কুহুর নীরবতা, তায় যশোদার আসন্ন বর্ষণোন্মুখ মেঘতুল্য জলদ-গম্ভীর মুখশ্রী হিরণকে পীড়া দিতে লাগিল।

হিরণ খাইতে খাইতে পুনশ্চ কহিল, "ঢের বেলা হয়েছে, আপনারা আর আমার কাছে ব'সে থাকবেন না মা, খেয়ে নিন গে, আমাকে দুদিনের খাবার সাজিয়ে দিয়েছেন, এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে অনেক সময় লাগবে। আমি তপুর সঙ্গে গল্পে গল্পে খাচ্ছি, আপনারা যান।"

যশোদা কহিলেন, "ব্যস্ত কি? তুমি আস্তে আস্তে খাও। তপুর সঙ্গে গল্পে গল্পে খাবে, তবেই হয়েছে। তপু যে গল্পের মানুষ।"

তপু অভিমানে ঠোঁট ফুলাইল। "আমি যদি গল্পের মানুষ নাই হব মা, তা হ'লে বাবা এতক্ষণ আমার সাথে গল্প করছিলেন কেন? তুমি এখন খাবে না, তাই বল! জামাই বাবু বজরা থেকে নামলেন না, দিদিকে নিয়ে আজকেই যেতে চাচ্ছেন, তাইতে মা'র ক্ষিধে পায়নি, মন খারাপ হয়েছে।"

হিরণ তপুর কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি মন খারাপ করবেন না, মা, জয়ন্ত আজ যেতে চাহিলেও তার যাওয়া হবে না। দিদি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে বোস, আজ সপ্তমী পুজো, অষ্টমী, নবমী আরো দুটো দিন তাকে আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারবো।"

"তুমি সেই চেষ্টাই করো, বাবা! আমার ত জোর করবার মুখ নেই। মেয়েটা এত দিনের পর এলো, এখনও তাকে কাছে নিয়ে দুদণ্ড বসতে পারিনি। দুটো কথা কইতে পারিনি। আমরা গরীব হলেও বাপ-মা ত?"

এত অপমানের পরেও গণা দুইটি দিন মেয়েকে কাছে রাখতে মার এ মিনতি কুহুর ভাল লাগিল না। নগণ্য তুচ্ছ একটা মেয়ের নিমিত্ত পিতা-মাতার কিছুই বাকী রহিল না। আর কেন?

কুহু মুখ না তুলিয়া শান্তস্বরে কহিল, "আপনি আমাদের হয়ে আর দয়া ভিক্ষা চাইবেন না, হিরণদা। বাবা, মা গরীব হলেও বড়লোকের অনুগ্রহপ্রার্থী নন। থাকা যদি না হয় নাই হবে, দেখা হ'ল, এই যথেষ্ট।"

বলিতে বলিতে কুহু উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া উঠিয়া গেল। কুহু দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া গেলে হিরণ যশোদাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কুহুদি বড্ড রাগ করেছে। রাগ করবারই কথা, জয়ন্তর সব ভাল, এক মস্ত দোষ এক-গুঁয়েমি। নিজে ইচ্ছা করেই ত কুহুদিকে নিয়ে আপনা-দের সাথে দেখা করতে এসেছে। এসে খেয়াল হ'ল, আজ নামবে না। নামলে আবার দেখতেন মা, আপনার বাড়ী কিছুতেই ছাড়তো না। ও ছেলেবেলা থেকে অমনি ধরণের। আমি ওকে জানি, যারা জানে না, তারা ভাবে, বড়লোকের অহঙ্কার। আসলে ওর অহঙ্কার নেই। গরীবকে যদি ঘেন্নাই করবে, তা হ'লে আমাকে এত ভাল-বাসতে পারত কি? ছেলেমানুষ, কিছু জ্ঞান নেই, বোঝে না, মাংসের সাথে অন্য কিছু খাবে না, যেম্‌নি খেয়াল হ'ল, তেমনি আপনি যা কিছু পাঠিয়েছিলেন, তা রাখতে পারলে না। আমি তখন ছিলাম না, বাজারের দিকে একটু গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, এত কাণ্ড।"

জয়ন্তর স্বপক্ষে হিরণের কৈফিয়তে যশোদা কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

বৈষ্ণব-মত-বিবেক

৬

রামানুজীয় মতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

চৈত্রার্দ্রাসম্ভবং বিষ্ণোর্দর্শনস্থাপনোৎসুকম্।
তুণ্ডীরমণ্ডলে শেষমূর্ত্তিং রামানুজং ভজে॥

"যিনি চৈত্র মাসের আর্দ্রা নক্ষত্রে তুণ্ডীরমণ্ডলে বা চোলরাজ্যে বিষ্ণুভক্তিপ্রধান শারীরকমীমাংসাভাষ্য প্রচারাকাঙ্ক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীঅনন্তদেবের অবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামানুজের পূজা ও বন্দনা করিতেছি।"

"বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" শব্দের অর্থ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কথার যৌগিকার্থ এই যে—দ্বিধা ইতং দ্বীতম্, তস্য ভাবঃ দ্বৈতম্, যথা—"দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈত-মুচ্যতে।" ন দ্বৈতং—অদ্বৈতং (ভেদাভাবঃ)। বিশিষ্টস্য চেতনা-চেতনসমন্বিতস্য অদ্বৈতং—বিশিষ্টাদ্বৈতম্। অথবা দ্বয়োর্ভাব—দ্বিতা, দ্বিতৈব দ্বৈতং—ভেদঃ, ন দ্বৈতম অদ্বৈতম্—ভেদাভাবঃ ঐক্যমিত্যর্থঃ। বিশিষ্টং চ বিশিষ্টং চ, বিশিষ্টে—স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং চ ব্রহ্মণী; তয়োঃ বিশিষ্টয়োঃ ব্রহ্মণোঃ অদ্বৈতং বস্তুতোঽভেদঃ—বিশিষ্টাদ্বৈতম্, তন্নির্ণায়কো পদঃ সিদ্ধান্তঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যর্থঃ।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, বিশিষ্ট অর্থে চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম; আর দ্বৈত অর্থে ভেদ, অদ্বৈত অর্থে অভেদ বা একত্ব, বাদ অর্থে সিদ্ধান্ত, সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত কথাটির অর্থ চেতনাচেতন-বিভাগবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বনিরূপক সিদ্ধান্ত। অন্য কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে, ব্রহ্ম স্থূল চেতনাচেতন-বিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট এই দুই প্রকার। এই উভয়বিধ ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্বপ্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এই মতে চেতনাচেতন পদার্থনিচয় ব্রহ্মের শরীর আর সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা বা আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম। শরীর কখনও শরীরী আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত হইতে পারে না এবং শরীর ও শরীরীর একত্বব্যবহারই লোকপ্রসিদ্ধ, সুতরাং চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্বনিরূপণ কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না। বৃক্ষের যেমন স্বরূপতঃ একত্ব সত্ত্বেও —শাখাপ্রশাখাদি অংশের স্বগতঃ ভেদ আছে, অথচ ঐ সকল অংশভেদ লইয়াই যেমন বৃক্ষের একত্ব সিদ্ধ হয়, তেমনই জীব, জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হইলেও এতৎসমষ্টিবিশিষ্ট পরম পুরুষ ব্রহ্মের একত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রাচীনতা

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অতি সুপ্রাচীন। স্মরণাতীত কাল হইতে 'এই মত' সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া আর্য্যভূমিতে বিরাজমান ছিল। ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতমতাবলম্বী আচার্য্য আশ্মরথ্যের নাম সূত্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মসূত্র রচনা হইবার পূর্ব্বেও এই মত ঋষিসম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত ছিল। তাহার পর আর্য্যাবর্ত্ত হইতে এই সম্প্রদায়ের এক শাখা দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তদ্দেশে এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে তামিল ভাষায় দাক্ষিণাত্যের ভক্তবীর বা আলোয়ারগণ * বিশিষ্টাদ্বৈতমত-মূলক বহু ভক্তিগাথা রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পোইহে আলোয়ার বা সারযোগী দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ের সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন।† ইনি নারায়ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাঞ্চীপুরে দেবসরোবরের মধ্যে জলরাশির নিম্নে অদ্যাপি এক মন্দির বিদ্যমান, সেই মন্দিরের মধ্যে এই মহাপুরুষের বিগ্রহ ধ্যাননিমীলিতনেত্রে শয়ান আছেন; সুতরাং ইঁহার ঐতিহাসিকতা সুনিশ্চিত।

ইঁহার পরবর্ত্তী আলোয়ারগণের মধ্যে শঠকোপ বা শঠারি নামক আলোয়ার কলিযুগের প্রথম বৎসর বা ৩১০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইনি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ভক্তিপ্রভাবে সর্ব্বত্র পূজ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত প্রবন্ধগুলি শঠারিসূক্ত বা তামিল বেদ নামে প্রসিদ্ধ। নাথমুনি, যামুনাচার্য্য, রামানুজ-প্রমুখ প্রাচীন আচার্য্যগণ যেরূপ ভক্তিভরে এই প্রবন্ধগুলি গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে এই প্রবন্ধগুলি যে অতি প্রাচীনকালে শ্রীসম্প্রদায়ে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এতদ্ব্যতীত মধুরকবিও তামিল ভাষায় বহু সুন্দর ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে যেরূপ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি-প্রমুখ বৈষ্ণব-পদকর্ত্তৃগণ সমাদৃত, দাক্ষিণাত্যেও এই সকল তামিল কবি তামিলভাষাভাষী অধিবাসিগণের নিকট সর্ব্বতোভাবে সমাদৃত। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে রাজা কুলশেখরও এক জন আলোয়ার। ইনি ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মালাবার দেশস্থ চোলপট্টন বা তিরুভঞ্জিক্কোলম্ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজা কুলশেখর কেরলদেশের অধিপতি ছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ "মুকুন্দমালা" নামক সংস্কৃত স্তবের রচয়িতা।

দাক্ষিণাত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা জানা গেলেও প্রাচীনকালে উত্তর-ভারতে ঐ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায় না দেখিয়া স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল

---

* তামিল ভাষায় 'আল' শব্দের অর্থ 'শাসন' ও "ওয়ার" শব্দের অর্থ কর্ত্তা; সুতরাং আলোয়ার শব্দের অর্থ শাসনকর্ত্তা।

† তুলায়াং শ্রবণে জাতং কাঞ্চ্যাং কাঞ্চনবারিজাৎ।
দ্বাপরে পাঞ্চজন্যাংশং সারযোগিনমাশ্রয়ে॥

হইতে ভারতে বর্ত্তমান ছিল কি না? ইহার উত্তরে এইমাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীনকালে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধগণ প্রভাবশালী হইয়া যে প্রকারে অদ্বৈতবাদকে গ্রাস করার ফলে ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতবাদমূলক প্রাচীন ভাষ্যাদির উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল, সেই প্রকারেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রাচীন ভাষ্যাদিও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্মই বোধায়ন, উপবর্ষ, ভারুচি, কপর্দ্দী, ভর্ত্তৃহরি, ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারের নাম শোনা গেলেও সেই সমস্ত ভাষ্য ও বৃত্তি আর পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের শ্রীসম্প্রদায় নামক যে শাখা দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন, সেই সম্প্রদায় কখনও লোপ পায় নাই এবং এই সম্প্রদায়ই ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ধারা ও সাধনপ্রণালী অব্যাহতভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ভারতের এই প্রাচীন ভাবধারা রক্ষা করিবার জন্য ভারতবাসী নরনারী এই সম্প্রদায়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রাচীন ঐতিহাসিকতার আরও একটি প্রমাণ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র। এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র অতি সুপ্রাচীন। এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ঐতিহাসিকগণও এই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে অতি সুপ্রাচীন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শ্রীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপুরাণ প্রমুখ পুরাণে এবং মহাভারতে পাঞ্চরাত্র মতবাদের ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের মূল যে পাঞ্চরাত্র মত, তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, পক্ষান্তরে, আচার্য্য শঙ্করের সমসাময়িক ভাস্কর তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে পাঞ্চরাত্র মতবাদের সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলস্বরূপ পাঞ্চরাত্র মত অতি প্রাচীন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রকে সুপ্রাচীন প্রামাণিক বৈষ্ণবমতাবলম্বী শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "সর্ব্বসম্বাদিনী" গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের সমর্থন করিয়াছেন।

আচার্য্য গৌড়পাদ যেমন বর্ত্তমান অদ্বৈতবাদের আদিগুরু, অর্থাৎ তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই যেমন শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বিস্তৃতিসাধন করিয়াছেন, সেই-রূপ যামুনাচার্য্য যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ধারা প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদাচার্য্য রামানুজ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিপুষ্ট করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্য বা শ্রীভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছেন। পাছে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারেন,এই জন্য শ্রীমদাচার্য্য রামানুজ বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে গুরু-করণ করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের তামিল প্রবন্ধ এবং যামুনাচার্য্যের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও তাঁহার উপদেশাবলী যামুনাচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যদিগের নিকট হইতে বহু পরিশ্রমে অধিগত করিয়া-ছিলেন। গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকা প্রমুখ গ্রন্থ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিলে যেমন আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রায় বুঝিতে কষ্ট হয় না, সেইরূপ যামুনাচার্য্যের "সিদ্ধিত্রয়ম্" প্রমুখ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে শ্রীআচার্য্য রামানুজের গ্রন্থাবলীর মর্ম্মকথা সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

যামুনাচার্য্যের মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই ব্রহ্মসূত্রের সম্মত। ঐ মতে পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের যে সকল ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে। যামুনাচার্য্যের মতে আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ নহে, কিন্তু জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতৃস্বভাব আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ হইলেও আত্মার বন্ধ ও মোক্ষ আছে। আত্মা সবিশেষ, আত্মা অহম্ শব্দের বাচ্য। আত্মা সংবেদী, বা বেত্তা, জ্ঞান সেই আত্মার ধর্ম্ম। জ্ঞান শক্তিরও সবিশেষ ও আপেক্ষিক, নির্ব্বিশেষ কোনও পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞানও নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। এই আত্মা আবার ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে দ্বিবিধ। সর্ব্বভূতান্তর্যামী আত্মাই সমস্ত ব্যষ্টি-জীবা-ত্মার আশ্রয় ও পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই নিশ্চয় পুরুষোত্তম। জীব হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ।

সাধারণতঃ জীব বদ্ধস্বভাব, অণুচৈতন্য ঈশ্বর হইতে নিত্য পৃথক। জীব অংশ, ঈশ্বর অংশী। জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ঈশ্বর সত্যসংকল্প নিঃসীম সুখসাগর। জীব শোকদুঃখার্ত্ত। তবে এই জীব ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু কখনও ঈশ্বরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই ঈশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বৃহত্ত্ব হেতু তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়।

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্ম হইতে অন্য বস্তুর সদ্ভাব নিবারিত হয় না। বরং ব্রহ্মের সদৃশ বা বিসদৃশ অন্য কেহই নাই, ইহাই সূচিত হয়। এই জগৎ তাঁহার কলামাত্র বিভূতি, যেমন চোল-নৃপতি ভূতলে অদ্বিতীয় বলিলে তত্তুল্য অন্য নৃপতির নিবারণ করা হয়, পরন্তু চোলনৃপতির ভৃত্য পুত্র কলত্রের নিষেধ হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলিলেও সুর, নর, অসুর, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির নিষেধ হয় না। অনন্তকোটি জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম, ব্রহ্মই কলা দ্বারা স্বেচ্ছায় জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম জগতের আত্মা, আত্মা ও শরীর অভিন্ন, জগৎও তদ্রূপ ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মে জীবে ও জগতে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে।

যামুনাচার্য্যের মতে তিনটি মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান। যথা—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। চিৎ জীব, অচিৎ জগৎ ও পুরুষোত্তম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সবিশেষ, সগুণ, অশেষ কল্যাণগুণের নিলয় ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব তাঁহার দাস। তত্ত্বমসি বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা নহে; তৎ পদ শুদ্ধ জীবত্ব ও ত্বং পদ অশুদ্ধ জীবত্ব-বাচক ও এই পদদ্বয় জীবপর তাদাত্ম্যগোচর।

বস্তুতঃ ঈশ্বরের সহিত জীবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এ কথা সত্য; কিন্তু সে সম্বন্ধ একত্ব নহে; পরন্তু জীব চিরকালই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অধীন পদার্থ এবং একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই জীবের স্বাভা-বিক কর্ত্তব্য। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, কিন্তু মায়া ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরের কৃপাই মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের একমাত্র উপায়। অজ্ঞান বা মায়া এক পদার্থ নহে, জ্ঞানের অভাবের নাম অজ্ঞান, তাহা জীবগত; কিন্তু মায়া ভগবানেরই শক্তি।

রামানুজাচার্য্যের মতবাদ

আচার্য্য রামানুজ যামুনাচার্য্যের এই মতবাদকে সুশৃঙ্খলায় আনয়ন করিয়া তাহার পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছেন। তিনি এক-টিকে ব্যবহারিক ও আর একটিকে পারমার্থিক বলিয়া দুইয়ের মধ্যে স্থায়ী ভেদরেখা না টানিয়া ব্যবহারিক জগৎকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া পারমার্থিকের দিকেই তাহার ক্রমোন্নতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি সর্ব্বপ্রথমে "বেদ ক্রিয়া-পর" * বলিয়া যিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই জৈমিনির সহিত বেদান্তদর্শনের মতবাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ শ্রীভাষ্যের সর্ব্বপ্রথমেই—বৃত্তিকারের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—"বক্ষ্যতি চ কর্ম্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসয়োরৈক্য-শাস্ত্রং—সংহিতমেতৎ শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ ইতি।" অর্থাৎ বৃত্তিকারও বলিলেন যে, এই শারীরকসূত্র অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা জৈমিনিকৃত কর্ম্মমীমাংসার সহিত সংহিত বা সম্মিলিত হইয়া ষোড়শাধ্যায়ে পূর্ণ; অতএব উভয়ই এক শাস্ত্র। অপৌরুষেয় নিত্য বেদবাক্যই শব্দপ্রমাণ।

আচার্য্য রামানুজের মতে সিদ্ধ ব্রহ্মপর বাক্য সকলও উপাসনা-রূপ কার্য্যান্বয়ী। সুতরাং বেদবাক্যের উপাসনা-পরতত্ত্বরূপ ক্রিয়া-পরত্ব থাকায় জৈমিনির সহিত মতভেদ বা মতবিরোধ হইল না এবং বেদের শুদ্ধ উপনিষৎ অংশই ব্রহ্মবিচারের প্রমাণ না হইয়া সম্পূর্ণ বেদই প্রমাণ হইল।

পূর্ব্বমীমাংসার সহিত উত্তর-মীমাংসার সম্বন্ধ

আচার্য্য রামানুজের মতে অগ্রে বেদাধ্যয়ন, পরে তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তদনন্তর কর্ম্মফলের অনিত্যত্ব বিষয়ে জ্ঞান হয়। অতঃপর মোক্ষাভিলাষ জন্মে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। যথা—"অধীত-সাঙ্গ-সশিরস্ক বেদস্য অধিগতা অল্পাস্থির-ফল-কেবল-কর্ম্মজ্ঞানতয়া সংজাতমোক্ষাভিলাষস্যানন্তস্থিরফল-ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হ্যনন্তরভাবিনী।" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি বেদ-বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ অধ্যয়নে অবগত হইয়াছে যে, কেবল অর্থাৎ জ্ঞানরহিত কর্ম্মের ফল অল্প, অস্থির বা ধ্বংসশীল, পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল অনন্ত বা অক্ষয়, তাহার পক্ষে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভের অভিলাষ হয় এবং তদনন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাও তাহার পক্ষে অবশ্য-ভাবিনী "অতোঽপেক্ষিতকর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানং কেবলকর্ম্মণামপবাস্থির-ফলত্বজ্ঞানং চ কর্ম্মমীমাংসাবসেয়ং ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্ম-মীমাংসায়াঃ পূর্ব্ববৃত্তা বক্তব্যা ॥" (শ্রীভাষ্য ৩২পৃঃ) অর্থাৎ "অতএব অপেক্ষিত কর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং কেবল অর্থাৎ উপাসনা-রহিত কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) জ্ঞান কর্ম্মমীমাংসা হইতে জ্ঞাতব্য, এজন্য অপেক্ষিত সেই (কর্ম্মমীমাংসাকেই) ব্রহ্মমীমাংসার পূর্ব্ববৃত্ত বলিতে হইবে।"

আচার্য্য রামানুজের মতে স্বাভাবিকভাবে আশ্রমধর্ম্ম প্রতি-পালন করিয়া গেলে বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তের শুদ্ধি হইয়া থাকে। তখন কর্ম্মপথের অনিত্যত্বজ্ঞান হয় এবং তদনন্তর মোক্ষাভিলাষ সঞ্জাত হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদয় হয়। সাধারণতঃ এইরূপ ব্যক্তিমাত্রই বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী। আচার্য্য রামানুজ সাক্ষাৎভাবেই আশ্রমধর্ম্মোপেত কর্ম্মকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণরূপে স্থির করিয়াছেন। সুতরাং আচার্য্য শঙ্কর নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই চারি প্রকার সাধনের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ তাহা স্বীকার করেন না। পরন্তু আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পৃথক শাস্ত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য রামানুজের মতে এই দুইটি কখনও পৃথক শাস্ত্র নহে, পরন্তু সম্মিলিতভাবে একটি শাস্ত্র—পূর্ব্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় ও উত্তরমীমাংসার চারি অধ্যায় এই ষোড়শ অধ্যায়ে মীমাংসাশাস্ত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ব্রহ্মের স্বরূপ

আচার্য্য রামানুজের মতে স্থূলসূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মই জ্ঞানের বিষয়। আচার্য্য বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়া-সংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে।

সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং, সোঽস্য মুখ্যোঽর্থঃ স চ সর্ব্বেশ্বর এব অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ।"

অর্থাৎ "ব্রহ্মশব্দে স্বভাবতই সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, অবধি ও তারতম্যরহিত, অনন্ত কল্যাণময় গুণগণসমন্বিত পুরুষোত্তমকে বুঝায়। ব্রহ্মশব্দ সর্ব্বত্রই বৃহত্ত্বগুণের যোগ বা সম্বন্ধ অনুসারে প্রযুক্ত হয়। যাহাতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নিরতিশয় বৃহত্ত্ব বর্ত্তমান আছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ।" আচার্য্য রামানুজের মতে ব্রহ্ম যখন শব্দগম্য, তখন তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। শ্রুতিবাক্যবলেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্ম শব্দের বা বেদবাক্যের অতীত নহেন, অতএব ব্রহ্ম সবিশেষ। আচার্য্য রামানুজ বলেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রমাণের অবিষয়; কারণ, সমস্ত প্রমাণই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক, নির্ব্বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ, এরূপ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

"নির্ব্বিশেষবস্তুবাদিভির্নির্ব্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্। সবিশেষবস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্।

অতঃপর রামানুজ দেখাইয়াছেন যে, অনুভবও কখনও নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। কারণ,'আমি ইহা দেখিয়াছি' এই সকল অনুভব-স্থলে কোন একটি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে। বিশেষণবিহীন বস্তুর প্রতীতি হইতে পারে না। অনুভব-পদার্থটি সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটি বিশেষণ-সহযোগে প্রতীয়মান হইলেও যদি কোন একটি যুক্তির আভাসের দ্বারা নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে সত্তার অতিরিক্ত স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বভাব (যাহা অন্যত্র নাই এরূপ) দ্বারাই তাহাকে নিকৃষ্ট বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে। সুতরাং সে স্থলে সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম ও বিশেষ বিশেষ স্বভাব দ্বারা সবিশেষ হইয়া পড়ে। এই কারণেই বস্তু কোনও বিশেষণে বিশেষিত হইলেই তাহা

---

* "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ"—মীমাংসকগণের মতে ক্রিয়ার্থপরত্বেই বেদবাক্যের সার্থকতা।

অন্যান্য বিশেষ ধর্ম্ম সকল নিবারিত হইয়া যায় ; অতএব কুত্রাপি নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হয় না। দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার (যিনি বিষয় অনুভব করেন, তাঁহার) জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয়-প্রকাশকত্ব এবং স্বপ্রকাশকত্ব সিদ্ধ হয়। সুষুপ্তি, মত্ততা ও মূর্চ্ছা-কালীন অনুভবও যে নির্ব্বিশেষ নহে, পরন্তু সবিশেষ, তাহাও বিচার করিলে উত্তমরূপে প্রতীতি হয়। চিদচিৎ শরীরত্বও ব্রহ্মের লক্ষণ। তিনি সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টবেশে জগতের উপাদানকারণ ; সংকল্পবিশিষ্টবেশে নিমিত্তকারণ, কালাদি অন্তর্য্যামিবেশে সহকারী কারণ, কার্য্যরূপে বিকারযোগ্য বস্তুর উপাদান। জীব ও জগৎ তাঁহার শরীর, ভগবানই কার্য্য, তিনি বিভু ও ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য। দেশ, কাল বস্তুপরিচ্ছেদই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্য

অতএব ব্রহ্ম শ্রুতিবাক্যের প্রতিপাদ্য। সুতরাং যাঁহার অবধি এবং সীমা এবং যদপেক্ষা অতিশয়ও নাই, তাদৃশ ব্রহ্মই পরম-পুরুষার্থরূপে সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ, সুতরাং ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিময় কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল পুরুষার্থ প্রাপ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তৎসমস্ত বিষয় পুরুষার্থ হইলেও পরমপুরুষার্থ নহে, পরন্তু নিত্য নির্দ্দোষ ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংই পরমপুরুষার্থ এবং সমস্ত বেদান্তবাক্যই সমন্বয়ে তাঁহাকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন ; সেই নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দলাভই জীব-নিচয়ের একমাত্র প্রয়োজন ; সুতরাং বেদান্তশাস্ত্র প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিবোধক না হইলেও নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক হইতে পারে না ; পরন্তু সর্ব্বপ্রয়োজনের সারভূত ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্ম নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ নহে, পরন্তু তিনি সগুণ ও সবিশেষ এবং জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতিই তাঁহার বিশেষ ধর্ম্ম এবং চেতনাচেতনসমন্বিত জগৎও তাঁহার বিশেষণভূত শরীর আর নির্গুণত্বাদিবোধক শ্রুতিগুলিও তাঁহার হেয় প্রাকৃতিক গুণ সম্বন্ধই প্রত্যাখ্যান করিতেছে ; সুতরাং নির্গুণত্ববোধক শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণই নিষেধ করা হইতেছে, পরন্তু ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বা গুণহীনত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে না।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, শ্রুতি নিষেধমুখেই ব্রহ্মের প্রতি-পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে "তিনি এইরূপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, কারণ, তিনি "অবাঙ্‌মনসোগোচর"—অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে শ্রুতি সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা অন্বয়মুখেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের গম্য নহেন বটে, কিন্তু অপৌরু-ষেয় শ্রুতিবাক্যপ্রতিপাদ্য এবং শ্রুতিবাক্যের কোন অবস্থাতেই অপহ্নব হইতে পারে না।

জীব ও ব্রহ্ম

জীব ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম ও জীব উভয়েই চেতন, ব্রহ্ম বিভু ও জীব অণু। ব্রহ্ম ও জীবে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই ; কিন্তু স্বগতভেদ আছে। ব্রহ্ম পূর্ণ, জীব খণ্ডিত ; ব্রহ্ম ঈশ্বর, জীব-দাস ; মুক্ত জীবও ঈশ্বরের দাস। জীব কার্য্য, ঈশ্বর কারণ ; ঈশ্বর ও জীব উভয়ই স্বয়ংপ্রকাশ, উভয়ই চেতন ও জ্ঞানাশ্রয়, উভয়ই আত্মস্বরূপ, এইগুলি সামান্য লক্ষণ। জীব দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ হইতে বিলক্ষণ, জীব নিত্য, জীবের স্বরূপও নিত্য। জীব প্রতি শরীরে ভিন্ন, স্বাভাবিকরূপে জীব সুখী, কিন্তু উপাধিবশে তাহার সংসারভোগ হয়। জীবই কর্ত্তা, ভোক্তা, শরীরী ও শরীর। জীব প্রকৃতির অপেক্ষায় শরীরী ও ঈশ্বরের অপেক্ষায় শরীর। জীব ঈশ্বরের কার্য্যরূপ এবং জ্ঞানরূপ বলিয়াই স্বয়ং-প্রকাশ। এই জীব তিন প্রকার ;—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। যাহাদের সংসারনিবৃত্তি হয় নাই, তাহারা বদ্ধ। দেবতা, মনুষ্য, বনস্পতি, তির্য্যক্, স্থাবর প্রভৃতি সকলই বদ্ধ। জীবের বন্ধনের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যা বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রবাহরূপে অনাদি। বদ্ধজীব দুই প্রকার ;—শাস্ত্র-বশ্য ও শাস্ত্র-অবশ্য। যাহাদের জ্ঞান করণায়ত্ত, তাহারা শাস্ত্রবশ্য। তির্য্যক্ স্থাবর প্রভৃতি শাস্ত্র-অবশ্য। শাস্ত্রবশ্য আবার দ্বিবিধ ;—বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু। যাহারা ত্রিবর্গনিষ্ঠ, তাহারা বুভুক্ষু, ইহারা অর্থকামপর ও ধর্ম্মপরভেদে দ্বিবিধ। যাহারা দেহাত্মাভিমানবান্, তাহারা অর্থকামপর। যাহারা অলৌকিক শ্রেয়ঃসাধনতৎপর, বৈদিক ধর্ম্ম-লক্ষণ-লক্ষিত সতত-দান তপঃ আদিনিষ্ঠ, তাহারাই ধর্ম্মপর। ধর্ম্মপর আবার দ্বিবিধ ;—যাহারা কামনাবশে অন্য দেবতাপর, আর যাহারা ভগবৎনারায়ণপর। ভগবৎপর আবার তিন প্রকার ;—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী। মুমুক্ষু আবার দুই প্রকার ;—কৈবল্যপর ও মোক্ষপর। জ্ঞান-যোগের দ্বারা প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত যে নিজ আত্মা, সেই স্বাত্মানুভবরূপ অনুভবই কৈবল্য, তাহাই যাঁহার লক্ষ্য, তিনি কৈবল্যপর। মোক্ষপর জীব আবার দ্বিবিধ ;—ভক্ত ও প্রপন্ন। যাঁহারা বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, পূর্ব্বোত্তরমীমাংসার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, এবং তৎফলে চিদচিদ্ বিলক্ষণ অনবধিকাতিশয়ানন্দরূপ নিখিল হেয় প্রত্যনীক সমস্ত কল্যাণগুণ-স্বরূপ ব্রহ্মকে অবধারণ করিয়া তৎ-প্রাপ্তির উপায়ভূত সাঙ্গভক্তি স্বীকার পূর্ব্বক মুক্তিকামী, তাঁহারাই ভক্ত।

যাঁহারা অকিঞ্চন, অনন্যগতি ও ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারাই আশ্রিত, তাঁহারাই প্রপন্ন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অভিলাষী, তাঁহারা ত্রৈবর্গিকপর আর সৎসঙ্গের ফলে যাঁহাদের নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেকের ফলে নির্ব্বেদ জন্মে এবং নির্ব্বেদের ফলে মোক্ষকামী হইয়া বেদবিৎ আচার্য্যের নিকট উপনীত হন এবং পুরুষকাররূপ ভক্ত্যাদি অন্য উপায়ে অশক্ত বিধায় শ্রীগুরুর সাহায্যে অকিঞ্চন ও অনন্যগতি হইয়া ভগবানের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন, এইরূপ প্রপন্নই মোক্ষপর। প্রপত্তিতে সকলেরই অধিকার আছে। অন্যরূপে প্রপন্ন দ্বিবিধ ;—একান্তী ও পরমৈকান্তী।

আচার্য্য রামানুজের মতে ভগবদ্দাসত্বলাভই জীবের পরম-পুরুষার্থ। বৈকুণ্ঠস্থিত শ্রীনারায়ণই পরব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্। এই শ্রীনারায়ণদেব সর্ব্বদা শ্রী বা লক্ষ্মী, "ভূ" বা পৃথিবী বা আধার-শক্তি, এবং লীলাশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত। শ্রীমদ্রামানুজ 'নিত্যারাধনগ্রন্থে' ইহাদের আরাধনার ক্রম এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন—

"কল্পিতে নাগভোগে সমাসীনং ভগবন্তং নারায়ণং পুণ্ডরীক-দলামলায়তাক্ষং কিরীটহার-কেয়ূর-কটকাদি-সর্ব্বভূষণৈর্ভূষিত-মাকুঞ্চিতদক্ষিণপাদং প্রসারিতবামপাদং জানুন্যস্তপ্রসারিতদক্ষিণ-ভুজং নাগভোগে বিন্যস্তবামভুজম্ ঊর্দ্ধভুজদ্বয়েন শঙ্খচক্রধরং সর্ব্বেষাং সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-হেতুভূতমঞ্জনাভং কৌস্তভেন বিরাজ-মানং চকাসন্তমুদগ্র-প্রবুদ্ধ-স্ফুরদপূর্ব্বাচিন্ত্য-পরমসত্ত্ব-পঞ্চশক্তি-ময়ং বিগ্রহং পঞ্চোপনিষদৈঃ ধ্যাত্বা সান্নিধ্যযাচনং কুর্য্যাৎ। * * * ততো ভগবন্তং প্রণম্য দক্ষিণতঃ 'ওঁ শ্রীং শ্রিয়ৈ নমঃ' ইতি শ্রিয়মাবাহ্য প্রণম্য 'ওঁ ভূং ভূম্যৈ নমঃ' ইতি মন্ত্রেণ ভুবমাবাহ্য "ওঁ লীং লীলায়ৈ নমঃ" ইতি লীলামাবাহ্য কিরীটায় মুকুটাধিপতয়ে নমঃ ইত্যুপরি ভগবতঃ পশ্চিমপার্শ্বে চতুর্ভুজং চতুর্ব্বক্ত্রং কৃতাঞ্জলিপুটং মূর্দ্ধি ভগবন্তং কিরীটধরং কিরীটাখ্যং দিব্যভূষণং প্রণম্যৈকমেব "ওঁ কিরাটমালায়ৈ আপীড়াত্মনে নমঃ" ইত্যাপীড়কং তত্রৈব পুরস্তাৎ প্রণম্য "ওঁ দক্ষিণকুণ্ডলায় মকরাত্মনে নমঃ" ইতি দক্ষিণকুণ্ডলং দক্ষিণতঃ প্রণম্য "ওঁ বাম-কুণ্ডলায় মকরাত্মনে নমঃ" ইতি বামকুণ্ডলং বামতঃ প্রণম্য 'ওঁ বৈজয়ন্ত্যৈ বনমালায়ৈ নমঃ' ইতি বৈজয়ন্তীং পুরস্তাৎ প্রণম্য "ওঁ শ্রীমত্তুলস্যৈ নমঃ" ইতি তুলসীং দেবীং পুরস্তাৎ প্রণম্য… অতঃ সর্ব্বাভরণপূজানন্তরং সর্ব্বপার্ষদান্ পূজয়েৎ।"

অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পিত শেষনাগভোগে সমাসীন পদ্মপলাশের ন্যায় অমলায়তনয়ন, কিরীটহারকেয়ূরকটকাদি সর্ব্বভূষণের দ্বারা ভূষিত আকুঞ্চিতদক্ষিণপাদ, প্রসারিতবামপাদ ন্যস্ত-প্রসারিতদক্ষিণহস্ত নাগভোগে বিন্যস্ত-বামহস্ত, ঊর্দ্ধহস্তদ্বয়ে চক্র এবং শঙ্খধারী নিখিলবিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের হেতুভূত কৌস্তভযুক্ত নবঘনশ্যাম দীপ্তিমান্ অত্যুজ্জ্বল, প্রবুদ্ধ অচিন্ত্য অপূর্ব্ব পরমসত্ত্বময় প্রতাপশীল পঞ্চশক্তিময় শ্রীবিগ্রহ পঞ্চো-পনিষদোক্ত ধ্যানের দ্বারা ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রজপ পুরঃসর প্রার্থনানন্তর মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করত উত্থিত হইবে এবং স্বাগত নিবেদন পূর্ব্বক আরাধনাসমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের সান্নিধ্য প্রার্থনা করিবেন। এইরূপে শ্রীভগবান্‌কে আবাহন এবং পুনরায় প্রণামানন্তর তাঁহার দক্ষিণদিকে শ্রীধরাদেবীকে, বামদিকে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে এবং তৎবামে শ্রীলীলাদেবীকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম এবং আবাহন করিয়া ভগবানের পশ্চিমপার্শ্বে ঊর্দ্ধদিকে মূর্ত্তিধারী মুকুটাধিপতি, কিরীট-নামক দিব্য ভূষণকে, সম্মুখভাগে ঊর্দ্ধদিকে কিরীটমালাকে, দক্ষিণদিকে দক্ষিণকর্ণের কুণ্ডলকে, বামদিকে বামকর্ণের কুণ্ডল এবং সম্মুখভাগে যথাস্থানে বনমালা, বৈজয়ন্তী, শ্রীতুলসীদেবী, সর্ব্বাভরণাধিপতি হার-প্রমুখ সর্ব্বভূষণকে, সর্ব্বায়ুধকে এবং তদনন্তর ভগবৎপাদসংবাহনকারিণী দিব্য পরিচারিকা ও দিব্য পরিচারকগণকে প্রণাম করিবে। অতঃপর পৃষ্ঠদিকে চতুর্ভুজ হলমুষলধারী কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত মণিময় সহস্রফণাযুক্ত ভগবদ্দর্শনানন্দে উৎফুল্লদেহ ভগবান্ অনন্তদেবকে ধ্যানপুরঃসর প্রণামপূর্ব্বক ভগবৎপাদুকা ও পরিচ্ছদ সমূহকে প্রণাম করিবেন। অতঃপর ভগবৎপার্ষদ গরুড়, বিষ্বকসেন, গজানন, জয়সেন প্রভৃতি পার্ষদগণকে ধ্যান ও প্রণতিপুরঃসর দ্বারপালগণের পূজাদি করিবে। ইত্যাদি।

উৎক্রামণকালে সাধারণ ভক্ত, প্রপন্ন বা একান্তীগণ স্বপ্রয়োজনবশে নিত্যনৈমিত্তিক ভগবদাজ্ঞা কৈঙ্কর্য্য সাধন করিয়া পাপবর্জ্জন পুরঃসর বাক্যে মন সমর্পণ পূর্ব্বক ক্রমে হৃদয়স্থিত পরমাত্মার বিশ্রাম লাভ করেন। পরে মুক্তিদ্বারভূত সুষুম্নাখ্য হৃদয় নাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারে নির্গত হন। তদনন্তর জীব হৃদয়স্থ দেবতার সহিত সূর্য্যকিরণ দ্বারা অগ্নিলোকে গমন করেন এবং পথিমধ্যে তিনি দিন, পক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, অভিমানী দেবতাগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হন। তৎপর নভোরন্ধ্র দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে গমন করেন এবং পরে তাহা ভেদ করিয়া চন্দ্র বিদ্যুৎ বরুণ ইন্দ্র প্রজাপতি প্রমুখ আতিবাহিক পথিপ্রদর্শকগণের সহিত তত্তৎলোক অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিরূপ বৈকুণ্ঠসীমা-পরিচ্ছেদক বিরজা উত্তীর্ণ হন। এই স্থলে সূক্ষ্মশরীর পরিত্যাগ পুরঃসর জীব অপ্রাকৃত চতুর্ভুজ শরীর লাভ করিয়া অপ্রাকৃত বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বৈকুণ্ঠদ্বারপালগণের আদেশক্রমে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ লাভ করেন। তৎপরে ভগবৎ-পার্ষদগণকে প্রণাম করিয়া সিদ্ধদেহধারী স্বীয় আচার্য্যগণকে প্রণাম পুরঃসর ভগবৎসান্নিধ্যে উপনীত হন। সে স্থলে তিনি শ্রীভূলীলাসেবিত অপরিমিত কল্যাণগুণসমন্বিত ভগবানের চরণে প্রণাম করিলে ভগবান নারায়ণ তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া স্বীয় দাসরূপে গ্রহণ করেন। তখন গুণাষ্টকের আবির্ভাব হয়। ইহাই রামানুজ-মতে মুক্তির চরম অবস্থা।

আচার্য্য রামানুজের মতে ধ্রুবানুস্মৃতি বা ভক্তি ইহা উপা-সনার পর্য্যায় বা একার্থবোধক। যথা—"এবংরূপা ধ্রুবানু-স্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনাপর্য্যায়ত্বাদ্ভক্তি-শব্দস্য। (শ্রীভাষ্যং ১।১।১—২৮ পৃঃ) সেই ধ্রুবানুস্মৃতি কি, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

"সেয়ং স্মৃতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতা-পত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্। ইতি (কঠ-২।২৩। মুণ্ড ৩।২।৩) অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাস-নানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা "যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে, তেনৈব লভ্য" ইত্যুক্তম। ২২। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ং স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতেত ইতি ভগবতৈবোক্তম্—

"তেষাং সততযুক্তানং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। ইতি (গীতা ১০।১০)

অর্থাৎ সেই ধ্রুবাস্মৃতিকে দর্শনরূপা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, দর্শনরূপতা অর্থ প্রত্যক্ষত্ব-প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎকার। এই প্রকারে, অপবর্গের সাধনভূতা এবং প্রত্যক্ষভাবাপন্না স্মৃতিকে (শ্রুতি) বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"এই আত্মাকে (কেবল) প্রবচন (মনন) দ্বারা লাভ করা যায় না, কেবল মেধা (নিদিধ্যাসন) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং বহুবিধ শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না; (পরন্তু) ইনি অর্থাৎ এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহার লভ্য হয়, এই আত্মা তাঁহার নিকট স্বীয় তনুর আবরণ মুক্ত করেন অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপে

প্রকাশিত হন। এ স্থানে কেবল (উপাসনা-রহিত) শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে আত্মলাভের অনুপায় (উপায় নহে) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া এই আত্মাই যাঁহাকে বরণ করেন, তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভক্তের নিকট নিজ রূপ প্রকাশ করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। (দেখা যায়) প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয়, (সুতরাং) ইনি পরমাত্মা যাঁহার সর্ব্বাধিক প্রিয়, তিনিই ইঁহার প্রিয়তম হন। এই প্রিয়তম ব্যক্তি যেরূপে আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, ভগবান্ স্বয়ংই তদনুরূপ যত্ন করেন; ইহা ভগবান্ই বলিয়াছেন:—যাঁহারা আমাতে সততযুক্ত অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন, আমি সেই সকল সেবকগণকে সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।"

আচার্য্য রামানুজের মতে ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যাননিয়োগ বা ধ্যানবিধিই বন্ধনিবৃত্তির হেতু। আচার্য্য রামানুজ বলেন—"অনেন জ্ঞানমাত্রান্মোক্ষশ্চ নিরস্তঃ। অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি। তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ।" অর্থাৎ ইহার দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা) কেবল জ্ঞান হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি নিরস্ত হইল। অতএব সকল ভেদনিবৃত্তিরূপা নির্ব্বিশেষ মুক্তি জীব হইতে সম্ভব হয় না। সেই জন্য ধ্যানযোগের দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানফলের দ্বারা বন্ধনিবৃত্তি হইয়া থাকে। রামানুজের মতে ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ, বন্ধন যখন পারমার্থিক, তখন এরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব ভক্তিবলে ভগবান্ প্রসন্ন হইলে মুক্তি প্রদান করেন। অতএব ভক্তিই মুক্তির সাধন।

রামানুজের মতে প্রপত্তি বা ভগবানে আত্মসমর্পণই ভক্তির প্রধান সাধন। সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াই আনুকূল্যের সংকল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনই প্রপত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতেও—

"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।" সর্ব্বতোভাবে ভগবানের আনুকূল্য করিয়া তাঁহার লীলাদি আলোচনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ। গৌড়ীয়মতে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

এই শ্লোকোক্ত আত্মনিবেদনই শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রপত্তি। গদ্যত্রয় নামক নিবন্ধে আচার্য্য রামানুজ প্রপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সত্যকাম সত্যসংকল্প পরব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম মহাবিভূতে শ্রীমন্ নারায়ণ বৈকুণ্ঠনাথ অপার-কারুণ্যসৌশীল্য বাৎসল্যৌদার্য্যৈশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য-মহোদধে, অনালোচিত-বিশেষাবিশেষ লোকশরণ্য প্রণতার্ত্তিহর আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধে অনবরত-বিদিত-নিখিলভূতজাত যাথাত্ম্য অশেষ চরাচর ভূত-নিখিল নিয়ম-নিরত-অশেষ চিদচিদ্বস্তু-শেষিভূত-নিখিল জগদাধার অখিল জগৎ-স্বামিন্ অস্মৎস্বামিন্ সত্যকামসত্যসঙ্কল্প-সকলেতর-বিলক্ষণ অর্থিকল্পক আপৎসখ শ্রীমৎ নারায়ণ অশরণ্যশরণ্য, অনন্যশরণঃ ত্বৎপদারবিন্দযুগং শরণমহং প্রপদ্যে।"

[ক্রমশঃ ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

প্রিয়-বিরহে

নারী-জনমের সাধ-আহ্লাদ যাহা কিছু ছিল মোর
ফুরায়ে গিয়াছে হায়, তুমি গেছ যেই দিন!
ব্যথা-সায়রের দুই তীর ব্যেপে অভিমানী আঁখি-লোর
এ বুকে হয়েছে লীন প্রিয়-হারা নিরালায়!
মদির স্বপন টুটিয়া দিয়াছে কাল-বৈশাখী বায়!

ফুল-সজ্জার ফুল গেছে ঝ'রে, কাঁটা শুধু প'ড়ে, হায়!
তারি পানে চেয়ে চেয়ে আঁখি ভ'রে উঠে জলে!
শুক-তারকার অস্ত-লগনে যে শেফালি ঝ'রে যায়
মোর এ আঙিনা-তলে কামনা লইয়া বুকে,—
তার পাশে অলি আসে না তো আর সান্ত্বনা দিতে দুখে!

শুষ্ক ফুলের মর্ম্মর-ধ্বনি করি তোলে চঞ্চল
নিরালা পথের ধারে ঘর-ছাড়া সমীরণে!
শিহরিয়া উঠে সমীর পরশে ঝরা কুসুমের দল
শেষ বিদায়ের ক্ষণে! কিছুতে কাটে না মোর—
পথ পানে চেয়ে দিবস-রজনী, তুমি নাই মন-চোর!

'বউ কথা কও' কেন ডাকে আর? ফুটে গো রজনীগন্ধা?
জ্যোছনা ঢলিয়া পড়ে আমার শয্যা 'পরে?
স্মৃতি লয়ে বুকে বল প্রিয়তম, কেমনে মাধবী-সন্ধ্যা
গোঙাবো একেলা ঘরে ব্যর্থ-জীবন ভোর?
সুধা মন্থনে উঠিল গরল সে কি অপরাধ মোর?

শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ।

হট্টমালার যুগ

(গল্প)

উপক্রমণিকা

—ব্যাঙের জন্মরহস্য—

গভীর বন। তবে সে বন শাল-তমাল-তাল-পিয়াল-অশ্বত্থ-বট প্রভৃতি দ্রুমরাজিশোভিত নহে। এক সময়ের স-যত্নে তৈয়ারী খিড়কীর পুষ্পোদ্যান, বর্ত্তমানে পুষ্পবৃক্ষশূন্য হইয়া, নানাশ্রেণীর পরিচিত এবং অপরিচিত বন-জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কাননমধ্যস্থ একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গোলাকার বেদী, সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য ফাটল লইয়া এখনও কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তাহার চারি পার্শ্বের স্থানসমূহ বন্য লতা-গুল্মে আচ্ছন্ন হইলেও, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের 'লুকোচুরি' প্রভৃতি খেলার কল্যাণে জরা-জীর্ণ বেদী, বেদীমূল এবং বাহির হইতে তৎ-প্রদেশে যাইবার সঙ্কীর্ণ পথ-রেখার উপর এখনও কেহ সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের ঢাকিয়া ফেলে নাই।

উপরি-বর্ণিত স্থান।

কাল—গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ।

পাত্র—কেহ নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে, পাত্রী—শ্রীমতী উমারাণী দাসী। তাঁহার মুখে বিষাদ, চক্ষুতে জল, মাঝে মাঝে বুক ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। চরিত্রহীন স্বামী কর্ত্তৃক নিত্য নির্য্যাতিতা উমা, আজ দ্বিপ্রহরে স্বামী-দেবতার কোন একটা অন্যায়ের সামান্য একটু প্রতিবাদ করিবার ফলে, বীর-দেবতা তাহার মস্তকের দীর্ঘ কেশাকর্ষণ করিয়া, পাদুকা-প্রহরণ দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত করিয়াছে। তাই সে খিড়কীর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিবার ইচ্ছায় প্রথমে এখানে আসে; কিন্তু ডুবিয়া মরিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া, জঙ্গলাকীর্ণ বাগানের এই নির্জ্জন স্থানটায় বসিয়া, চোখের জল ও দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবিয়া মরিতেছিল। এমন মরণ প্রায় নিত্যই তাহাকে মরিতে হয়, আর মরিতে মরিতে নিত্যই সে আর এক অ-দেখা দেবতাকে ডাকিয়া মনে মনে বলে—"ঠাকুর, আর অত্যাচার সহ্য করতে পারি না; তোমার কোলে টেনে নাও, দয়াময়।" দয়াময় কিন্তু কোন দিনই তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। আজিকার দুঃখটা বোধ হয় উমার চরমে উঠিয়াছিল। তাই শুধু কর্ণপাত নয়, উমার কাতর আহ্বানে ঠাকুর একবারে সশরীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন—"মা, সকলই দেখিতেছি, বুঝিতেছি। পুরুষকে পাদুকা এবং নারীকে দীর্ঘ কেশরাশি দিয়া আমি মস্ত একটা ভুল করিয়াছি। পুরুষ অন্তঃপুরমধ্যে বীরত্বে পরিপূর্ণ হইলেই, প্রায়ই তাহার পাদুকা দ্বারা নারীর দীর্ঘ কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার কোমল অঙ্গে প্রহার করিয়া থাকে,—এ ঘটনা নিত্যই নানা স্থানে নানাভাবে আমার চক্ষুর গোচর হইতেছে।"

ভক্তি-গদগদ-ভাবে উমা কহিল—"সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে এই দুই দ্রব্যের—অর্থাৎ পুরুষের পাদুকার ও নারীর দীর্ঘ কেশের বিলোপসাধন করিলেই ত পারেন?"

"তা পারি; কিন্তু করিব না। কারণ, আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের নিম্নতম অঙ্গ—পা, এবং ঊর্দ্ধতম অঙ্গ—মস্তক। মনুষ্য এই দুইয়ের প্রভাবে—অর্থাৎ পদভরে এবং মস্তিষ্ক-চালনায় সারা পৃথিবী যে টলটলায়মান করে, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে গৌরবের। সুতরাং এমন যে পা এবং মস্তক, তাহার শোভা পাদুকা এবং দীর্ঘ কেশ। এই দুইটি দ্রব্য আমি পক্ষপাতশূন্য হইয়াই নর এবং নারীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই ভাগেই আমার ভুল হইয়াছিল। এক্ষণে আমি মনস্থ করিয়াছি, আমার ঐ ভুল সংশোধন করিয়া লইব।"

উমা সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরূপে সংশোধন করিবেন?"

"আমি নারীর দীর্ঘ কেশরাশি গুচ্ছাকারে পুরুষকে এবং পুরুষের পাদুকা নারীকে অর্পণ করিব। তবে নারীর এই নূতন পাদুকা, ইচ্ছা করিলে পথে, ঘাটে, গৃহে, পুরুষও ব্যবহার করিতে পারিবে, যদি তাহাতে নারীর কোন আপত্তি না থাকে।"

বিনয়-নম্র বচনে উমা নিবেদন করিল—"পুরুষের কেশাধিক্যের হিংসায় নারীর আবার না ক্লেশাধিক্য ঘটে, সে বিষয়ে আপনার একটু লক্ষ্য রাখা উচিত, কেন না, একেই ত মুখমণ্ডলে পুরুষকে গুম্ফ-শ্মশ্রুরূপে আপনি যথেষ্ট কেশ দান করিয়াছেন।"

"সে বিষয়েও আমি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। পুরুষদের যেমন নারীর দীর্ঘ কেশের অধিকারী করিতেছি, পুরুষের উক্ত গুম্ফশ্মশ্রুরূপ আপদেরও তেমনি শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছি। হয় ত, দুই এক জন পুরুষের 'ফ্লাই গোঁফ' দেখা যাইবে, কিন্তু তাহাকে গুম্ফ বলিয়াই মনে হইবে না; মনে হইবে, যেন মকরন্দ অভিলাষে মধুকর আসিয়া ওষ্ঠ-পল্লবে স্থিরভাবে বসিয়া আছে।"

স-খেদে উমা কহিল—"রমণীর সুকোমল ওষ্ঠকে ঠেলিয়া রাখিয়া পুরুষের কঠিন ওষ্ঠের সহিতই আপনি পল্লবের উপমা দিতেছেন?"

"তখন সেই পুরুষরাই রমণীস্বরূপ হইবে, উমা। তুমি দুঃখিত হইও না।"

"ভাল। কিন্তু কিরূপ পাদুকা আমাদের দিবার ব্যবস্থা করিবেন? খোঁপার ফিতা-বাঁধা আমাদের অভ্যাস থাকিলেও, দীর্ঘ কেশের সঙ্গে খোঁপা-বাঁধার হাঙ্গামা যদি আমাদের উঠিয়া যায়, তাহা হইলে জুতার ফিতা বাঁধা আমাদের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর এবং অসুবিধার হইবে, ঠাকুর।"

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"তোমাদের যে জুতা দিব, তাহাতে ফিতা বাঁধিতে হইবে না এবং সম্পূর্ণ শ্রীচরণও তাহাতে বাঁধা পড়িবে না। সে জুতার ফাঁকে ফাঁকে, তোমাদের অমল-কোমল-ধবল কিম্বা শ্যামল মধুর চরণের শ্রী উঁকি দিয়া দেখা দিবে এবং তন্মধ্যে তোমাদের পদ-রেণুরও অভাব ঘটিবে না। সে জুতার নাম হইবে—'স্যাণ্ডেল'।

হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে দেবতার মুখের প্রতি চাহিয়া উমারাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কত দিনে আপনার এই নতুন বিধি-ব্যবস্থা ধরায় প্রচলিত হবে?"

"শীঘ্রই। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তোমাদের দুই জন স্বামি-স্ত্রীর কাল পূর্ণ হইবে। তখন উভয়েই সেই নবযুগে, নবালোকপ্রাপ্ত ও উন্নত এই দেশে আসিয়া আবার জন্ম পরিগ্রহ করিবে।"

"আবার স্বামি-স্ত্রীরূপে?"

আর উত্তর আসিল না। উমা মুখ তুলিয়া দেখিল—দেবতা অদৃশ্য হইয়াছেন।

—

প্রথম অংশ

—'Wanted a স্বামী'—

উক্ত সময়ের পর দীর্ঘ ৩২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

৩২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে যে জীর্ণ বাড়ীটিতে সাপ্তাহিক পত্রিকা—'প্রচণ্ড সমাচার-সমুদ্রে'র আফিস ছিল, ঠিক সেই বাড়ীটির পরিবর্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত সংস্করণে এক্ষণে সুবিখ্যাত দৈনিক 'সোনালী পত্রে'র আফিস বসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র পল্লী সদৃশ সেই ত্রিতল বাটীখানির কক্ষে কক্ষে দিবারাত্র মনুষ্য-সমাগম ও কোলাহল। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত এবং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তথায় আর কার্য্যের বিরাম নাই। কোন কক্ষে প্রেসের ঘড়-ঘড়ানি, কোন কক্ষে টাকার ঝন্-ঝনানি, কোথাও সম্পাদক-মণ্ডলীর আলাপ-আলোচনার ফোয়ারা, কোথাও বা চাকর-বাকরদের দ্বন্দ্ব এবং ঝগড়া। শুধু কেরাণীবাবুদের বৃহৎ হলঘরখানি কোলাহলশূন্য। তথায় ডজন দুই বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন প্রকারের বাবুর দল ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে একনিষ্ঠভাবে সাদার উপর কালি পাড়িয়া যাইতেছেন।

ত্রিতলের একখানি দরজার উপর পিতলের ফলকে লেখা ছিল—Box Office (বক্স অফিস)। তন্মধ্যে একটি বাবু সম্মুখস্থ টেবলের উপর পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারের উপর একাকী বসিয়া ঘন ঘন হাই তুলিতে তুলিতে বেহারার উদ্দেশে কলিং বেলে ঘা দিলেন। যে প্রবেশ করিল—সে বেহারা নয়, এক জন বেহারী ভদ্রলোক। ঢুকিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"বক্স নং একশো ছতিশ—যো বিগোয়াপোন্ নিক্লা হুয়া, হাম উসিকা ওয়াস্তে—"

"ও ত স্রেফ বাংগালীকা আস্তে।"

"ওহি বাত্ হাম্ পুছনে আয়া থা। গুড্ বাই।"

বেহারী ভদ্রলোকটি বাহির হইয়া যাইবার পর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বাঙ্গালীবাবু প্রবেশ করিলেন।

"মশাই, বক্স নম্বর ১৩৬—"

"'Wanted a স্বামী'র বিজ্ঞাপনের কথা বল্‌ছেন ত? আপনি নিজেই candidate (ক্যাণ্ডিডেট্) কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই য়্যাপ্লিকেশন্ আমি লিখে এনেছি।"

"দিয়ে যান। আপনার age (এজ) হবে কত? তিরিশের বেশী বলেই যেন মনে হয়।"

"আজ্ঞে না। আমার ঠিকুজি আছে। কোর্টের এফিডেবিটের দরকার হ'লে, তা'ও না হয়—"

"আচ্ছা, দরখাস্ত দিয়ে যান।"

দরখাস্তখানি লইয়া Box-বাবু বক্রদৃষ্টির দ্বারা দ্বিতীয় আগন্তুক বাবুটির আপাদমস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন এবং আর একবার জোরে কলিং-বেলে ঘা দিলেন। এবার জোরে 'কিড়িং'-য়ের ফলে বেহারা ছুটিয়া আসিলে, Box-বাবু তাহাকে চায়ের ফরমাজ করিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে চা ও চাকরের সঙ্গে সঙ্গে আর এক আগন্তুক তাঁহার ঘরে উদয় হইল।

অদ্যকার 'সোনালী-পত্রে' নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইয়াছিল :—

Wanted a স্বামী

এক জন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সুকোমল, সচ্চরিত্র, ভাবী-পত্নীগতপ্রাণ, গ্রাজুয়েট্ স্বামী আবশ্যক। তাঁহার বয়স ২৫এর কম এবং ৩০এর বেশী না হয়। আবেদনকারী পিতৃ-মাতৃহীন হওয়া আবশ্যক। যাঁহার বর্ত্তমান আয় অধিক এবং পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ প্রচুর, তাঁহারই আবেদন সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইবে। কন্যা—under-graduate, অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী, নৃত্য-গীতে দক্ষ, ক্রিকেট ও টেনিসে সিদ্ধহস্ত। সর্ব্ববিধ কলা-বিদ্যায় well-accomplished। মোটের উপর কন্যা সর্ব্বতোভাবে নব্যা, ভব্যা এবং লোভ্যা—অর্থাৎ লোভনীয়া। বয়স ২৩। সবিস্তার বিবরণ—এবং স্ব স্ব ফটো সহ দরখাস্ত—'বক্স নং ১৩৬, সোনালীপত্র'—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

অদ্য প্রাতে উপরি-উক্ত বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পর, দলে দলে উমেদারের পর উমেদার এবং দরখাস্তের পর দরখাস্তের প্রবল বন্যা আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয় আগন্তুক বাবুটি বাহির হইয়া গেলে, নূতন আগন্তুক যিনি আসিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ। ক্যাম্বিসের জুতা হইতে সুরু করিয়া, পরিধেয় বস্ত্র, পিরাণ, উত্তরীয়, মস্তকাবরণ এবং ছাতার কাপড় সবই গেরুয়ায় রঞ্জিত। মস্তক ক্ষুর-মুণ্ডিত—কেশশূন্য। তাঁহার নাম নকলানন্দ স্বামী। দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন—"Wanted a স্বামী ব'লে আজকের কাগজে যে বিজ্ঞাপনটা বার হোয়েছে—

Box-বাবু টেবলের উপর হইতে প্রসারিত চরণ-যুগল গুটাইয়া লইয়া স্বামীজীকে তাঁহার বাকী কথা বলিবার অবসর না দিয়া, মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন—"বিজ্ঞাপনটার সবটা আপনি পড়েছেন কি?"

"না। এক জন সংবাদ দিলেন যে, বক্স ১৩৬-এ এক জন স্বামীর প্রয়োজন। তাই———"

"সংবাদটা এক দিকে ঠিক, আর এক দিকে বেঠিক। স্বামী মানে এখানে হস্‌ব্যাণ্ড—পতি, 'ওয়াইফে'র ম্যাস্‌কুলা—"

"ওঃ! বুঝিছি; আমি মনে করেছিলুম, বুঝি কোন নতুন মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তারই জন্যে—আচ্ছা, নমস্কার।"

যেমন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনই ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া স্বামীজী চলিয়া গেলেন। বক্স-বাবুও ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, চুমুকে চুমুকে চা পান করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে রূপের তরঙ্গ তুলিয়া এক সুন্দরী তরুণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুন্দরীর পরণে নীল-শাড়ী, গায়ে নীলাভ সিল্কের ব্লাউজ, কর্ণে নীল দুল, পায়ে সোনালী স্যাণ্ডেল। মাথার কুঞ্চিত রুক্ষ কেশদাম—কতক গ্রীবাদেশ, কতক কপালের উপর, কতক কর্ণমূলে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই হ্রস্ব কেশগুচ্ছমধ্যস্থ তরুণীর ঢল-ঢল, সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মনে হয়, একটি পূর্ণ-বিকসিত স্থলকমল, চারিপার্শ্বের অন্ধকাররাশিকে জড়াইয়া ধরিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তরুণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কহিল—"গুড্ মর্ণিং মিষ্টার সেন।"

বক্স-বাবু ত্রস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—"গুড মর্ণিং, আসুন। আপনার কথাই ব'সে ব'সে ভাবছিলুম।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে তরুণী কহিল—"দেখছি, সকলেই আমার কথা ব'সে ব'সে ভাবেন। সুতরাং ভাগ্যটা আমার ভাল।"

"সত্যই আপনার ভাগ্য খুব ভাল, মিস্ ঘোষাল। তার সাক্ষী এই দেখুন।" বলিয়া বক্স-বাবু সম্মুখস্থ ড্রয়ারের মধ্য হইতে একতাড়া দরখাস্ত বাহির করিলেন ও তন্মধ্য হইতে বাছিয়া একখানা দরখাস্ত ও একখানা ফটো, মিস্ ঘোষালের হাতে দিয়া কহিলেন—"দি মোষ্ট ডিসায়ারেবল্ ক্যান্ডিডেট্ য়্যামং দি হোল্ ক্রাউড।"

মিস্ ঘোষাল ভাঁজ-করা দরখাস্তখানা বাঁ-হাতে ধরিয়া, ডান হাতে ফটোখানা লইয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল—"এঁর নাম কি ?"

"কুঙ্কুম রায়।"

দ্বিতীয় অংশ

—পূর্ব্বরাগ—

"তোমরা দু'জনে ব'সে ব'সে কথা কও, বাবা, আমি তোমাদের জন্যে চা ক'রে আনি।" স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে মিসেস্ ঘোষাল শ্রীমান্ কুঙ্কুমকে উপরি-উক্ত কথা কয়টি বলিয়া ভিতরের দিকে উঠিয়া গেলেন।

কুঙ্কুম ঝরণার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"শ্রাবণের 'তরুণলেখায়' আপনার—'হিয়া কেঁদে মরে কাহার তরে' প'ড়ে আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলুম—এক জন genius (জিনিয়স)। ঝরণা ঘোষাল, এ নামটা কাগজের পাতাতেই তখন দেখেছিলাম আর সেই সঙ্গে তাঁর চেহারাটার যে-একটা কল্পনা ক'রে নিয়েছিলাম, আজ সত্যিকারের ঝরণা ঘোষালের চেহারার সঙ্গে হুবহু তা মিলে যাচ্ছে। কবিতা এত deep (ডিপ) এর আগে আমি পড়িনি। কি sublime (সাবলাইম)! কি grand (গ্র্যাণ্ড)!"

মিস্ ঝরণা ঘোষাল সে দিনের মতই বেশ-ভূষায় সজ্জিত। অধিকন্তু আজ সেই নীল শাড়ীতে একটি ছোট 'নার্সিসাসে'র গুচ্ছ পিন-বদ্ধ হইয়া তাহার বুকের উপর শোভা পাইতেছিল। ঝরণা কহিল—"আমিও কুঙ্কুম বাবু, আপনার গল্পের এক জন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সে দিন আপনার 'চ'লে যেতে পড়ি ঢ'লে' প'ড়ে মা আর আমি হেসে হেসে ম'রে যাই।"

'Wanted a স্বামী'র বিজ্ঞাপনের ফলে এই দুই তরুণ-তরুণীর মিলন ঘটিয়াছে। শুধু বাহিরের মিলন নয়, অন্তরের মিলন হইয়াছে। কেবল পুরোহিতের দু'টা মিলন-মন্ত্র উচ্চারণের যা বাকী। শীঘ্রই এক শুভ রজনীর শুভ মুহূর্ত্তে সেই বাকী কাযটুকু সুসম্পন্ন হইয়া, এই দুই পবিত্র এবং ঈপ্সিত আত্মার পরম মিলন সংঘটিত হইবে। শ্রীমান্ কুঙ্কুম প্রত্যহই নিয়মিত সময়ে, তাহার ভাবী-পত্নী-সকাশে প্রকাশ হইয়া সুখের ও আনন্দের সুগন্ধ বিকীর্ণ করে, আর শ্রীমতী ঝরণা, সহজ, সরল, চপল গতিতে, রূপের ঝিকি-মিকি অঙ্গে ধরিয়া তাহার মিলনের পথে হাসিয়া, গাহিয়া, নাচিয়া চলে। তাই মিসেস্ ঘোষালের আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই। ঝরণা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়,—সাত রাজার ধন মাণিক। তাহাকে গর্ভে ধরিবার জন্যই যেন তিনি ত্রিশ বৎসরের কুমারী জীবনের অন্ত করিয়া, মিস্ গুপ্তা নাম ঘুচাইয়া, দুই বৎসরের জন্য, মিসেস্ ঘোষাল নামটি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং কন্যার জন্মের পর, স্বামী অবিচারে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও, পতি-পরিত্যক্তা, সাধ্বী স্ত্রী আজ পর্য্যন্ত স্বামীর পদবীর ছাপ আপন নাম হইতে পরিত্যাগ করেন নাই। যে ঝরণাকে বুকে চাপিয়া এ যাবৎ কত সুখ, তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কত গভীর মনোবেদনা, কত অসহ্য দুঃখ তিনি সহ্য করিয়া আসিতেছেন, সেই ঝরণাকে তিনি মনোমত করিয়া মানুষ করিয়াছেন, এবং এত দিন পরে, তাঁহার সেই অতি বড় আদরের ঝরণার উপযুক্ত স্বামী মিলিয়াছে।

যেমন ঝরণা, কুঙ্কুমও তেমনই। রাজ-যোটক। বিপত্নীক সব-জজ পিতা, তাহার একমাত্র পুত্রটিকে, বৃহদাকার না হউক, মধ্যমাকার টাকার স্তূপের উপর বসাইয়া দিয়া সম্প্রতি স্বর্গীয় হইয়াছিলেন। ঠিক গ্রাজুয়েট না হইলেও, 'আই-এ' দিবার পর, বার বার তিনবার গিয়া কুঙ্কুম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় দ্বার বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল। আকৃতি—সুন্দর, দেহ—সুগঠিত, কার্ত্তিকের রূপলাবণ্য-সংযুক্ত; শ্রী মনোমুগ্ধকর। এ সমস্ত ছাড়া, নিত্য বায়োস্কোপ-যাত্রী; কবিতার সমজদার; এবং

গল্পের লেখক। সুতরাং এই তরুণ-তরুণীর শুভ মিলন, প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার ধন, বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ।

মিসেস্ ঘোষাল ঝিয়ের হাতে চা ও জলখাবার চাপাইয়া বাহিরের ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিতেই, সদরের ফটক খুলিয়া তাঁহার পিছন পিছন আর এক ব্যক্তি ঈষৎ টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—"বৌমা, বড় সময়ে এসে পড়েছি। তোমার ঐ রাবিস মিষ্টি ফিষ্টি, এখন এ মুখে আর আমার ভাল লাগবে না, নিমকি দু'একখানা না হয় দিতে পার, কিন্তু চা একটা কাপ নইলে নয়।" তার পর ঝরণার দিকে চাহিয়া কহিল—"জয় হোক্-দিদি-রাণী! আরে, নাত-জামাই যে! বাঃ—বাঃ—কেয়া তোফা!" লোকটি থপ্ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং তাহার শেষ কথাটার রসিকতার সূত্রে ঝরণা ও কুঙ্কুমের মুখের দিকে যেন মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

লোকটি এই পাড়ারই একজন। কিছু বিষয়-সম্পত্তি—অর্থাৎ খান তিনচার বাড়ী আছে, তাহারই আয় হইতে স্বচ্ছলে সংসার চলিয়া যায়, অন্য কাযকর্ম্ম কিছুই করেন না। কথা-বার্ত্তা ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি একটু সেকেলে গোছের,—অর্থাৎ কাছার সবটাই গোঁজেন, গোঁফের সবটাই রাখেন, চুল-ছাঁটা সম্বন্ধে সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগের প্রতি পক্ষপাতশূন্য, পাঞ্জাবীর বোতাম চারিটার মধ্যে গলার বোতামটা শুধু আঁটা নয়—সর্ব্বাগ্রেই আঁটেন, চোখ ভাল থাকিলেও চশমা লয়েন নাই এবং দর্জ্জিকে সেলাইয়ের পূরা দাম দিয়া জামার পুরা ঝুলই রাখিয়া থাকেন। এ সমস্ত ছাড়া আর একটি তাঁহার মন্দ অভ্যাস আছে। মাঝে মাঝে একটু 'ইয়ে' খান; হুইস্কি সেরির ধার দিয়া যান না, একেবারে খাঁটি স্বদেশী—এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয়নকক্ষে খিল লাগাইয়াও খান না। একমাস দেড়মাস অন্তর খান, কিন্তু যখন খান, তখন তাঁহার সেই পান-যজ্ঞে উদর-দেবতার বাকী প্রাপ্য আহুতি ভাল করিয়াই পোষাইয়া দিয়া থাকেন; অর্থাৎ একবার সুরু করিলে উপর্য্যুপরি তিনচারি দিন ধরিয়া তাহা সমানেই চলিত। কিন্তু বে-হুঁশ তিনি কখনই হইতেন না, এবং কথা কিম্বা মন্তব্য, স্পষ্ট ছাড়া অস্পষ্ট কখনই তিনি বলিতেন না; তবে, হয় ত তাহাতে রসের কিছু রসান থাকিত মাত্র।

নাম তাঁহার যাহাই থাকুক, মিসেস্ ঘোষালের তিনি 'নেড়া মামা' হন। কিন্তু মায়ের 'নেড়া মামা'কে ঝরণাও যে কোন্ হিসাবে 'নেড়া মামা' বলিয়া ডাকে, তাহা বিশেষরূপ গবেষণা ছাড়া বলিবার উপায় নাই। 'নেড়া-মামা' কিন্তু নাতিনী হিসাবে তাহাকে 'দিদি-বাবু' বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন।

'কেয়া তোফা' বলিয়া নেড়া মামা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িতেই, মিসেস্ ঘোষাল ঝরণাকে কি-একটা ইসারা করিয়া কহিলেন—"বসুন নেড়া মামা, ওরা একটু বায়োস্কোপ দেখতে যাবে কি না, তাই একটু তাড়া-তাড়ি করছি। ছ'টায় শো বিগিন্—আর বেশী দেরী নেই। চা-টা খেয়ে নিয়ে চট্ ক'রে এসে কাপড়টা ছেড়ে নে, ঝরণা।" বলিয়া মিসেস্ ঘোষাল ব্যস্ত হইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গেই খাবারের থালাখানা টানিয়া লইয়া নেড়া মামা কহিলেন,—"দেরী বিন্দুমাত্র আমিও করাব না, দিদিমণি।" থালায় যে কয়খানি নিম্‌কী এবং সিঙ্গাড়া ছিল, অতি দ্রুত সেগুলি শেষ করিয়া, টি-পট হইতে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইয়া পান করত নেড়া মামা কুঙ্কুমের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"ধূমের ব্যবস্থা কিছু সঙ্গে আছে বাবাজী—সিগারেট, কি বিড়ি-টিড়ি কিছু? আচ্ছা থাক্, তোমাদের দেরী হয়ে যাবে। আমি চল্লুম তা'হলে দিদিবাবু,—গুড বাই।"

দ্রুতগতি নেড়া মামা অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে, পথের দিকের খোলা জানালার ফাঁকে আবার নেড়া মামার মূর্ত্তি প্রকট হইল। মুখ বাড়াইয়া তিনি কহিলেন—"বায়োস্কোপ দেখার বদলে, দু'জনে মিলে বায়োস্কোপের ফিল্ম তুলছ নাকি, দাদাবাবু দিদিমণি?"

সদর ঘুরিয়া তিনি ভিতরে আসিয়া বসিলেন। কহিলেন—"বউমা তখন আমায় ধাপ্পা দিয়ে কেমন সুন্দররূপে ভাগিয়ে দিলেন, পাছে তাঁর কন্যা-জামাতার মধুর সদালাপে—"

ঝরণা বলিয়া উঠিল—"সত্যি না, নেড়া মামা; 'দক্ষ-যজ্ঞ'টা দেখে আসবো ব'লে আজ সিট্ রিজার্ভ পর্য্যন্ত করেছিলুম, কিন্তু শেষকালে দেখলুম—"

"যে 'দক্ষ-যজ্ঞ'টা নেহাৎই 'দক্ষ-যজ্ঞ', তার বদলে, দু'টিতে মিলে এই মধুর সন্ধ্যায় গল্প-যজ্ঞ করলে লাভ আছে ;—তাই না ?"

কুঙ্কুম কহিল—"না, সত্যই আমরা বায়স্কোপে যাবার জন্মে প্রস্তুত হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ওঁর মাথাটা বড্ড ধ'রে উঠল, তাই উনি—"

নেড়া মামা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—"দাদাবাবুর কি গভীর পত্নীপ্রেম! বিয়ে না হোতেই—'ওঁর—উনি'। দেখো ভায়া, সুর ঠিক বজায় রাখা চাই। তা থাকবে। উনি অতীব সৎ কন্যা, সর্ব্ববিদ্যাতেই ওঁর অসাধারণ পারদর্শিতা,—এই নাচ বল, গান বল, ক্রিকেট বল, টেনিস বল,—তার ওপর সাইকেল, সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, কবিতা লেখা ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বভাবটি সুমধুর। আর মধুর রূপটি দেখে যে না ভোলে, সে নিশ্চয়ই মানুষ নয়—হয় দেবতা, নয় অপদেবতা।"

ঝরণা কৃত্রিম রাগের সহিত কহিল—"ইচ্ছে করে, নেড়া মামা, আপনার মুখটা কিছুদিন সেলাই ক'রে রাখি।"

"বিশেষ ক্ষতি নেই। নাক দিয়ে খাব আর কথা কইব। কিন্তু তখন নাকি সুরের কথা শুনে, ভূত ভেবে যেন আঁৎকে মূর্চ্ছা যেও না। তবে নেহাৎ-ই যদি সেলাই কর ত ঐ কোমল সুন্দর হাতে সিল্কের সুতো দিয়ে কোরো দিদিমণি, ঠোঁট আমার সার্থক হয়ে যাবে।"

কুঙ্কুম মৃদু হাসিয়া কহিল—"মামা দেখছি রসিকতায় অদ্বিতীয়।"

"তোমার গিন্নীটিও বড় কম যান না। সময় এলেই তা জানতে পারবে। যাই হোক, দাদাবাবুর খুব জোর ভাগ্য যে, সাক্ষাৎ স্ত্রী-রত্নকে বধূরূপে লাভ করলে। কিন্তু কাযটা হচ্ছে কবে? আমার যেন আর দেরী সইছে না।"

"আজ্ঞে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।"

"উত্তম, উত্তম। ঝরণা, পেট ভরিয়ে সে দিন খাইয়ে দিও, দিদি। কেলনার-ফেল্‌নারে আমার দরকার নেই,—ডজনখানেক দিশী হলেই আমার চলবে। তবে পুরো বারো বোতলের কম যেন না হয়; কেন না, তোমার বিয়েতে ৩ দিন ধ'রে ওই খেয়েই কাটাবো, আর কিছু খাব না।"

কুঙ্কুম ও ঝরণার মধুর খিল্ খিল্ হাসিতে ঘরের বায়ু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় অংশ

—মিলন—

মিলন হইয়াছে।

গত জ্যৈষ্ঠের এক শুভদিনে শুভক্ষণে, শুভ মিলন-মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই তরুণ হিয়ার মধুর মিলন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। মিলন-জ্যৈষ্ঠের পর মধুমাস আসিয়াছে। নব বসন্ত এবার যেন শুধু এই প্রেমিক নবদম্পতিকেই অভিবাদন জানাইবার অভিলাষে, ঘটা ও আয়োজন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছে! ইহার পর আর দুইটি মাস কাটিলেই আর এক জ্যৈষ্ঠ আসিয়া শুভ মিলনের এক বৎসর পূর্ণ হইবে।

মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসে, ঝরণার কি একটা অসুখ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে ঝরণা সকলকে বলিত—অম্বল, অজীর্ণ, বায়ু, হেন-তেন ইত্যাদি। কুঙ্কুম কাহাকেও কিছুই বলিত না, মুখ সিঁটকাইয়াই থাকিত। মিসেস্ ঘোষাল সদাসর্ব্বদাই যাতায়াত ও দেখাশুনা করিতেন। কুঙ্কুম বড় একটা তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিত না। অবশেষে অগ্রহায়ণের শেষের দিকে জামাতার ভাব-গতিকে অসন্তুষ্ট হইয়া মিসেস্ ঘোষাল নিজেই ঝরণাকে কোথায় এক স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া গেলেন ও তথাকার জলবায়ুর গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যে কন্যাকে রোগমুক্ত করাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কুঙ্কুমের মনটা এই সূত্রে মোটেই ভাল নয়। কি যে তাহার হইয়াছে, বলা কঠিন। গল্প লেখা ছাড়িয়া দিয়াছে; বিয়ের পর যে সব কবিতার বই, ঝরণার সহিত পছন্দ করিয়া কিনিয়াছিল, সে সব পোড়াইয়া ফেলিয়াছে; বাড়ীতে প্রায়ই থাকে না; যতটুকু থাকে, ঝরণার সহিত খিটিমিটি লাগে। কেন তাহার এরূপ হইল? অন্য কোন তরুণীর প্রতি আকর্ষণ?—না, তাহা ত নহে। শরীর খারাপ? তাহাও নয়; শরীর বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভাল বলিয়াই বোধ হয়। অর্থাভাব?—মোটেই নয়। তবে?

যাহাই হউক, কোথাও কিসে যেন একটা খুব গরমিল ঘটিয়া গিয়াছে। অতি নব্য তরুণ-তরুণীর মিলনে তাই অশান্তির ছায়াপাত হইয়াছে।

সে দিন বৈকালে হঠাৎ নেড়া মামা আসিয়া হাজির।

এরূপ মধ্যে মধ্যে তিনি আসিয়া থাকেন : ঝরণা বাড়ী ছিল না। কোথায় এক মেয়েদের সভায় সভানেত্রী হইয়া বক্তৃতা দিতে গিয়াছিল। কুঙ্কুমকে মামা জিজ্ঞাসা করিলেন —"দাদাবাবু, জোড়-ভাঙ্গা হয়ে যে? দিদিবাবু কই?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া কুঙ্কুম কহিল—"জানি না।"

"দিদিমণির ওপর এরি মধ্যে এত চট্‌লে চল্‌বে কেন? দুর্লভ দিদিমণি আমার ; লেখায়, পড়ায়, গানে, বাজনায়, কবিতায়, বক্তৃতায়, চালে, চলনে—"

"বেলা ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠে, চা খেয়ে সেই বেরিয়েছেন, সন্ধ্যা হ'তে চল্‌লো, এখনো বিবি সাহেবের বাড়ী আসা হোল না। হয় ত আজ আর আসবেনই না। উঃ! কি ভুল যে ক'রে ফেলেছি।"

"সে কি কথা ভায়া! তুমিও নব্য এবং তিনিও নব্যা, তোমাদের নব্যতন্ত্রে, এ আর ভুল কায কি হয়েছে?"

"বিষম ভুল—বিষম ভুল ক'রে ফেলেছি, নেড়া মামা।"

"সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, ভুল একটু করেই ফেলেছ কুঙ্কুম। অতটা অপ্-টু-ডেট্ বৌ ঘরে না এনে, একটু যদি কম অপ্-টু-ডেট্ দেখে আন্‌তে, তা হ'লে আর অশান্তিটা ভোগ কর্‌তে হ'ত না। সত্যি বল্‌ছি, কুঙ্কুম, আমাকে নেহাৎ সেকেলে ব'লে অগ্রাহ্য কোরো না। আমিও খুব অপ্-টু-ডেট্। তোমাদের চেয়েও আমার মনের ভেতরটা কাঁচা আর একেলে। কিন্তু তবুও, আজকালকার এই ধরণের মেয়ে আর তার সঙ্গে আধখানা রাজত্ব পেলেও, আমি তাকে বিয়ে ক'রে ঘরে আন্‌তে পার্‌তুম না। ভাল মেয়েরও অভাব নেই। সত্যিকারের শিক্ষিত অথচ ভাল মেয়ে খুঁজলে এখনো অনেক পাওয়া যায়। ভায়া, জাপানী-ফানুষের ঝক্-ঝকে রঙে যদি না ভুল্‌তে ত আজ এই আপশোষটুকু আর কর্‌তে হ'ত না। তা, এক কায কর না কেন। তুমি স্বামী, সে স্ত্রী। অশান্তির কারণ হয়, স্পষ্ট ব'লে কয়ে, বিদেয় ক'রে দাও।"

"যতটা সোজা ভাবছেন, ততটা নয়। যেমন ইনি, তেমনি এঁর মা। বিদেয় কর্‌লেও যাবেন না কি, মনে ভেবেছেন? কোর্টে খোরপোষের দাবী দিয়ে নালিস কর্‌বে, নেড়ামামা।"

"তা কর্‌লেই বা।"

"সে একটা ঢি ঢি প'ড়ে যাবে। চারিদিকে আমাদের বড় বড় আত্মীয়-স্বজন—বুঝতে পাচ্ছেন না। বাপ-ঠাকুর্দ্দার দৌলতে আমাদের বংশের একটা উঁচু নাম-সম্ভ্রম রয়েছে,—সেই জন্যেই ত কিছু একটা করতে পাচ্ছি না, নইলে—"

অতঃপর আরও দু'এক কথার পর নেড়া মামা চলিয়া গেলেন। কুঙ্কুম মুক্ত জানালা দিয়া অপরাহ্নের আকাশের দিকে তাকাইয়া, আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবিতে লাগিল।

সেই দিন গভীর রাত্রিতে কি একটা শব্দে কুঙ্কুমের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং সদ্য-আগত ঝরণা, অপরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া কৌচের উপর বসিয়া সিগারেটের ধূমপান করিতেছে। বাহিরের সাজ-পোষাক এখনো তাহার ছাড়িবার অবসর হয় নাই।

কুঙ্কুম পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে, অসম্ভব ধীর এবং শান্তগলায় কহিল—"রাত্রেই ফির্‌লে?"

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া ঝরণা কহিল—"হ্যাঁ।"

হি হি করিয়া একটুখানি হাসিয়া কুঙ্কুম কহিল—"ভাল।"

তাহার পর কেহই আর কোন কথা কহিল না।

ইহারই দিন পাঁচ সাত পরে, উপরের ঘরে কুঙ্কুম শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। আজ দুই দিন হইতে তাহার জ্বর। ঝরণা চা খাইয়াই বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার খান দুই শাড়ী ও আর আর কি সব জিনিষ কিনিবার জন্য। কুঙ্কুম একটু জলের জন্য দুই একবার চাকরকে ডাকিয়া সাড়া না পাওয়াতে, শেষবারে ভীষণ চীৎকার করিয়া এক ডাক দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল এবং নেড়া মামা আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"কি হে, কেমন আছ? গলা অত চড়া কেন?"

ভৃত্যও আসিয়াছিল। তাহাকে জল আনিতে বলিয়া কুঙ্কুম কহিল—"কি মুস্কিলেই যে পড়িছি, মামা! এ ছাড়েও না, যায়ও না। এর হাত থেকে কি ক'রে যে উদ্ধার পাই, তাই ভাবছি!"

"আমরা হ'লে সহজেই উদ্ধার পেতুম, তোমার দ্বারা তা আর হবে না। এর বিধি হচ্ছে সোজা-সুজি 'হাফ-মুন', অর্থাৎ কি না—অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় ; তোমার দ্বারা ত' তা আর হবে না। কারণ, তুমি তা পার্‌বে না, যেহেতু দিদি-মণির ঝক্-ঝকায় তুমি ডুবে, তলিয়ে গিয়েছ। আর তা

ছাড়া, সেদিন যা বল্‌লে—লোক-লজ্জার ভয়েও তুমি ততদূর কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না, আমি বুঝতে পার্‌ছি।—হ্যাঁ হে দাদামণি, ঐ বক্‌সিং গ্লোবস্‌ জোড়া কার হে?"

"আপনার দিদিমণির।"

নেড়া মামা বিষম বিস্ময়ে সেইখানকার মেজের উপর ঝরণার উদ্দেশে মাথা ঠেকাইয়া তিনবার প্রণাম করিলেন। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ঝরণার ড্রেসিং আয়নার ধারে গিয়া তদুপরিস্থিত স্নো, ক্রীম, লিপষ্টিক প্রভৃতি প্রসাধনের দ্রব্যগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

"হ্যাঁ হে, সিঁদুর-ফিঁদুরের হাঙ্গামা বুঝি নেই? আল্‌তা?"

কুঙ্কুম চুপ করিয়া রহিল। টেবলের উপরের একখানা খোলা চিঠি তুলিয়া লইয়া নেড়া মামা একবার চোখ বুলাইয়া লইলেন—

'মাই ডিয়ার মিসেস্‌ রায়,

আস্‌ছে রোববার আমি ত্রিশ বিঘের জঙ্গলে শীকারে যাচ্ছি। সঙ্গে আপনাকে পেলে পরে খুব সুখী হব। আশা করি অমত হবে না।

আপনার
পি, কে, লোহিড়ী।

কুঙ্কুম হঠাৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল—"আচ্ছা নেড়া মামা, খৃশ্চান হ'লে হয় না?"

"কারণ?"

"খৃশ্চান হয়েছি দেখে, যদি স'রে যায়।"

"মাথা খারাপ কোরো না, দাদামণি। অসুখ হয়েছে, চুপটি ক'রে শুয়ে থাক।—ভাল কথা, ঐ পি, কে, লোহিড়ীটি কে হে? তা হ'লে, রবিবার দিদিবাবু আমার শিকারে যাচ্ছেন না কি?"

কুঙ্কুম আবার শুইয়া পড়িল; কোন উত্তর দিল না।

নেড়া মামা কহিলেন—"তোমার এই তিন কাঠার বাড়ীতে, যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ত্রিশবিঘের ভেতর থেকে তাকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে?"

কুঙ্কুম নীরবে শুইয়াই রহিল। নেড়া মামা একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে টানিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ অংশ

—মিলনের দুঃখ—

পরের রবিবার, সারাদিন ধরিয়া ত্রিশবিঘার জঙ্গলমধ্যে—পি, কে, লাহিড়ীর সহিত শিকারে মাতিয়া, ঝরণা যখন গৃহে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে বিলাতী ছবিগুলার সঙ্গে যে দুই একখানা হিন্দু দেব-দেবীর ছবি ছিল, তাহা খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, দুই একখানা নূতন ফ্রেম ঝোলান হইয়াছে—তাহাতে বাইবেল হইতে বাক্য উদ্ধৃত। একখানাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"My God Shall Supply All Your Needs."

ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখে যেখানে ঝরণার বড় এন্‌লার্জমেন্ট-খানা টাঙানো ছিল, সেই ফ্রেমেতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রকাণ্ড ছবিখানি শোভা পাইতেছে। টেবলের উপর হইতে ঝরণার ডাইরী বইখানা কোথায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে—একখানি সুদৃশ্য, মরোক্কোয় বাঁধানো স্বর্ণাঙ্কিত বাইবেল।

কুঙ্কুম ঘরের মধ্যেই ছিল।

ঝরণা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার কিছুই নয়; আমি খৃশ্চান হয়েছি।"

কুঙ্কুম আশা করিয়াছিল যে, তাহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিলেই ঝরণা তাহার গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

হইলও তাই। ব্যাপার দেখিয়া পরদিনই ঝরণা তাহার মায়ের নিকট চলিয়া গেল।

মা পরামর্শ দিলেন,—"তুমি কাপড়-চোপড় গহনাপত্র নিয়ে চ'লে এস। আমাদের ধর্ম্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম্মে কিছুতেই যাওয়া হবে না। টাকা-পয়সা? যাদের কুঙ্কুম নেই, তারা কি টাকা-পয়সার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে?"

সুতরাং সেই দিনই ঝরণা তাহার কাপড়-চোপড় ইত্যাদি লইয়া এ বাড়ী চলিয়া আসিল।

কুঙ্কুমের দিন এক রকম শান্তিতেই কাটিতে লাগিল। সে নিত্য প্রভাতে ক্রাইষ্টের নাম লইয়া শয্যাত্যাগ করে, খায়-দায়, বেড়ায়, বায়স্কোপ দেখে আর মধ্যে মধ্যে শয়ন-গৃহস্থিত যিশুর প্রকাণ্ড ছবিখানির নীচে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া,

'প্রভু' বলিয়া প্রার্থনা সুরু করে এবং 'আমেন' বলিয়া শেষ করে।

প্রায় মাসখানেক পরে এক দিন সকালে এইরূপ যিশুর ছবিখানির নীচে জানু পাতিয়া বসিয়া যখন প্রার্থনা করিতেছিল,—'হে স্বর্গীয় পিতা, তুমি পাপীর প্রতি সর্ব্বাগ্রে তোমার মঙ্গল হস্ত প্রসারিত কর, সুতরাং—' ঠিক সেই সময়ে নিকটে কাহার পদশব্দ পাইল। তত্রাচ সে চক্ষু না চাহিয়াই তাহার প্রার্থনা শেষ করিল—'সুতরাং আমার অন্ধকার দুর্দ্দিনে আমাকে, হে দয়াল প্রভু, তোমার প্রেমের হস্ত দান করিও।' তৎপরে চক্ষু চাহিতেই দেখিল যে, ঠিক তাহারই পার্শ্বে সমভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—ঝরণা। তাহার বুকের ক্রুচের সঙ্গে স্বর্ণ-নির্ম্মিত একটি ক্রস ঝুলিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় মনে মনে যাহা সে এতক্ষণ বলিতেছিল, এবং সেই প্রার্থনাটি শেষ করিয়া হঠাৎ সে—'আমেন্' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুঙ্কুম সবিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—"এ কি ?"

"কিছুই না। কাল আমিও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছি।"

"উঃ!" বলিয়া কুঙ্কুম মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

* * *

দিন পাঁচ সাত তালে-গোলে কাটিয়া গেল।

জোসেফ অর্থাৎ কুঙ্কুম দেখিল, ক্যাথারাইন অর্থাৎ ঝরণা ছাড়িবার পাত্রী নহে, তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং সে মহা-চিন্তিত হইয়া উঠিল। এমনই সময় এক দিন নেড়ামামা ঈষৎ টলিতে টলিতে আসিয়া বক্তৃতার সুরে সুরু করিলেন—"তোমার স্বর্গীয় পিতা যেন তোমার পাপ ক্ষমা করিয়া তোমায় আলোকদান করেন। ভাই রে, তাড়াতাড়ি কাযটা ক'রে বসলে, সেকেলে লোকের একবার পরামর্শটাও নিলে না। ঝরণার মত কলেজে-পড়া শিক্ষিতা মেয়েকে যখন বিয়ে করেছ, তখন অনেক দুঃখ তোমার বরাতে আছে, জানতে পারছি।"

জোসেফ কহিল—"শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করিছি, সেইটেই কি আমার দোষ হয়েছে, নেড়ামামা ? আপনি কি বলতে চান, সে-যুগের মত কুসংস্কারে ভরা আর অশিক্ষিতা মেয়ে—"

"আরে রাম—রাম, আমি তা বলছি না। মেয়েদের শিক্ষা আর সংস্কারে অন্ধ ক'রে রাখলে এ জাত আর ক'দিন টিঁকবে। মেয়েদের শিক্ষা না দিলে আর উপায় নেই। কিন্তু আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েরা কি সাংঘাতিক হাওয়া সৃষ্টি করছে, তা এখন ভাল করেই বুঝতে পারছ বোধ হয়। দোষ—মেয়েদের নয়, দোষ মেয়েদের বাপ-মাদের, দোষ স্কুল-কলেজের কর্ত্তাদের। শিক্ষার সুফল কই, নীতি কই, আসল দেশপ্রীতি কই, ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা কই, সত্যিকারের জ্ঞান কই ?"

জোসেফ কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া নেড়ামামা কহিল—"ফাঁকির প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করো না। হাড়ে হাড়ে ত কুফল ভোগ করছ, দাদাভাই। শিক্ষার প্রকৃত পথে চল্লে, মেয়েদের দ্বারাই এ দেশ আবার উঠবে, আর শিক্ষার বিকৃত পথে গেলে, যা বর্ত্তমানে হচ্ছে, এমনই হবে—জাত আর দেশ রসাতলে যাবে।"

উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথার আলোচনা ও পরামর্শ হইল।

পথে আসিতে আসিতে নেড়ামামা ভাবিলেন—'যেমন দেবা, তেমনী দেবী। যেমন কুঙ্কুম, তেমনই কুঙ্কুমী;—যেমন ঝরণা, তেমনই ঝরণ। এদের আবার ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম। এরা না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান। এদের খৃষ্টান হলেই বা কি আর হিন্দু থাকলেই বা কি, ধর্ম্মের ত এরা ধারও ধারে না। এদের খৃষ্টান হওয়া শুধু একটা খেয়াল ছাড়া ত আর কিছুই নয়। এ সব হচ্ছে—এদের খেলা। ছিল হিন্দু, হ'ল খৃষ্টান, তার পর হবে হয় ত বৌদ্ধ। আজ যে ঝরণার জন্যে মন খারাপ,—কাল সেই ঝরণার জন্যে হয় ত পাগল হয়ে যাবে।

পঞ্চম অংশ

—মিলনের মধু—

সাত দিন পরের কথা।

সন্ধ্যাকাল।

কুঙ্কুমের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কৌচের উপর মনোমুগ্ধকর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া ঝরণা কুঙ্কুমের হাত ধরিয়া কহিল—"আমায় পায়ে রাখ তুমি।"

"পা ছেড়ে মাথায় ক'রে তোমায় রেখেছিলুম, ঝরণা !"

"পুরাণো কথা সব তোমাকে একেবারে ভুলে যেতে হবে। বল, ভুলে যাবে? আমার মুখের দিকে চেয়ে বল, নইলে তোমায় কিছুতেই আজ আর ছাড়ছি না।"

ঝরণা কুঙ্কুমের হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

কুঙ্কুম একদৃষ্টে ঝরণার অপরূপ সৌন্দর্য্য-শ্রীমণ্ডিত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে কোন কথা আর বাহির হইল না। ক্রমে ঝরণার হাত শিথিল হইয়া আসিল, কুঙ্কুমের নিষ্প্রভ চক্ষু বুজিয়া আসিবার মত হইল। ঝরণার মাথা কুঙ্কুমের বুকের মাঝে হেলিয়া পড়িল। তাহার ববড্-করা সুবাসিত কেশগুচ্ছগুলি হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে কুঙ্কুম ডাকিল—"ঝরণা!"

"কুম্—কু!"

"তুমি আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক, তোমায় ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? কোন কষ্ট, কোন অশান্তিকেই আর মনে স্থান দেব না। তুমি যাই হও, তুমি আমারই ত বটে। তোমায় যে আমি স্বয়ম্বর-সভা থেকে, সাত শ' প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাভ করেছি, ঝরণা!"

আবেগের ভরে উভয়ের কেহই লক্ষ্য করে নাই যে, নেড়ামামা জানালার ফাঁকে দাঁড়াইয়া ইহাদের প্রেমের অভিনয় দেখিতেছিলেন। সেইখানেই দাঁড়াইয়া মামা মনে মনে বলিলেন,—"এরা অতি জঘন্য, অতি যাচ্ছেতাই। এদের বরাতে অনেক কিছুই—আছে। —প্রকাশ্যে কহিলেন, "বাঃ বাঃ—অতি সুন্দর। এত রসের ছড়া-ছড়ি, এ দিকেও যেন ছিটে-ফোঁটা কিছু আসে।"

কুঙ্কুম ও ঝরণা চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মামা কহিলেন—"আচ্ছা কুঙ্কুম, একটি কথা ঠিক ক'রে বল ত, দাদামণি। সত্যিই কি তুমি খৃশ্চান হয়েছিলে?"

"না মামা; সমস্তই মিথ্যা আর অভিনয়। কিন্তু অভিনয় কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আর নিখুঁৎ হয়েছিল, তাই একবার বলুন।"

"আর ঝরণা,—তুমি?"

"আমারও অভিনয়।"

মামা অবাক হইয়া দু'জনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ অংশ

—উপক্রমণিকার জের—

শ্যামবাজারে মিত্র কোম্পানীর সুবিখ্যাত স্বদেশী 'পাদুকা-শিল্পাগার।' এবার নববর্ষে তাঁহাদের নব অবদান—এক-প্রকার নূতন গঠনের স্যাণ্ডেল। এই স্যাণ্ডেলের মধ্যস্থলে ক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী মনোগ্রাম বা নাম সোনালী অক্ষরে ঝলমল করে—ইহাই ইহার অভিনবত্ব।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ঝরণা ও কুঙ্কুমের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। কাল আবার সেই ১৫ই জ্যৈষ্ঠ। সে দিন ঝরণা কথায় কথায় বলিয়াছিল—"১৫ই জ্যৈষ্ঠ তুমি আমাকে কি উপহার দিচ্ছ, কুম্?" কুঙ্কুম কহিয়াছিল—"যা দেবার সব ত দিয়েছি, ঝরণা; আর ত কিছু বাকী নেই।" ঝরণা বলিয়াছিল—"বেশী কিছু নয়, একখানা রেডিও সাড়ী, সেই পীসেরই একটা ব্লাউজ, একজোড়া গিনির ওপর মিনেকরা দুল, আর পাদুকা-শিল্পাগারের নাম লেখা স্যাণ্ডেল একজোড়া। স্যাণ্ডেলের order আমি কাল দিয়েই এসেছি।"

"স্যাণ্ডেলে কার নাম লেখা থাকবে?"

"তোমার প্রিয়তম—তোমার'; আবার কার?"

"আমার বহু জন্মের পুণ্য যে, আমার নাম, যা তোমার পায়ের তলায় রাখবার যোগ্য নয়, তা পায়ের ওপর রাখবে!"

তার পর ১০ দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। কাল পনরই। আজ ঝরণার রেডিও সাড়ী কিনিতে হইবে, মিনে-করা ঝুমকো, সেণ্ট, সাবান, স্যাণ্ডেল—কত কি কিনিবার রহিয়াছে, কিন্তু যে কিনিয়া দিবে, সে কোথায়? কুঙ্কুম আজ প্রাতেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, সমস্ত দিন সে বাটী ফিরে নাই।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখিয়া ঝরণা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বাহির হইতেও পারিল না, ঘরেও তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কুঙ্কুম টাকা দিয়া গেলে সে নিজেই পছন্দমত জিনিষ এতক্ষণ কিনিয়া আনিতে পারিত।

ঝরণা কুঙ্কুমের দেরাজের চাবি খুঁজিয়া দেখিল, পাইল না। অযথা একটু টানাটানি করিল, দেরাজ খুলিল না। তখন পাশের বাড়ী হইতে তাহাদের চাবির গোছা আনাইয়া চেষ্টা করিল, হইল না। আর এক বাড়ীর

চাবির খোলো আনাইল। এবার একটা চাবিতে দেরাজ খুলিয়া গেল। খান দুইচার নোট লইয়া ঝরণা তাহার সাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি কিনিতে বাহির হইল। যাহাদের চাবি, তাহাদের ফেরৎ দিয়া পাঠাইল। দেরাজ খোলাই রাখিয়া দিল, আবার যদি দরকার হয়।

মনোমত দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করিয়া ঝরণা যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত প্রায় দশটা। তখনও কুঙ্কুম ফিরিয়া আসে নাই। বাজার করিয়া যে কয় টাকা বাঁচিয়াছিল, তাহা দেরাজের মধ্যে তুলিয়া রাখিতে গিয়া, সে তাহার মধ্যে কুঙ্কুমের এটা সেটা জিনিষ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ একখানা চিঠি তাহার চোখে পড়িল। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে তাহার পা অবশ হইয়া আসিল। সে কৌচের উপর বসিয়া তাহা পড়া শেষ করিল।

চিঠিখানি এই :—

প্রিয় কু—

মেঘের আশায় চাতকিনী আর কত দিন থাক্‌বে? মনে থাকে যেন—১৪ই জ্যৈষ্ঠ। তারিখটা—ভুলো না। ইতি—

তোমারই শুধু—

দীপালী

ঝরণার মাথা ঘুরিয়া গেল। আজই ত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। তাই আজ সারাদিন—। কে এই—'তোমারি শুধু'? দীপালী? আমার সঙ্গে পড়তো, সেই দীপালী দাস নাকি?

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঝরণার চক্ষুতে নিদ্রা আসিল না। শয্যায় শুইয়া সে নানাদিকে নানাভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

পরদিন একটু বেলায় শয্যাত্যাগ করিয়া ঝরণা সাজ-গোজ করিয়া 'পাদুকা-শিল্পাগারে' গেল। কাল রাত্রিতে অত দূর গিয়া স্যাণ্ডেল জোড়াটি সে আনিতে পারে নাই।

স্যাণ্ডেল-জোড়া বাস্তবিকই অতি সুন্দর হইয়াছিল। মনোমুগ্ধকর রঙীন ভেলভেট্ ও ক্রোকোডাইল লেদারে তাহা প্রস্তুত। মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে বিচিত্র ভঙ্গীতে লেখা—'কুঙ্কুম'।

জুতাটি লইয়া দোকান হইতে ফুটপাথে নামিতেই এক বিষম দৃশ্য ঝরণার চক্ষুতে পড়িল। দ্রুতগামী এক ট্যাক্সিতে বসিয়া কুঙ্কুম, আর তাহার পার্শ্বে—সেই—সেই—সেই বটে। তাহারই সঙ্গে কলেজে পড়িত—সেই দীপালী—দীপালী দাস। দীপালী অপরূপ বেশে সজ্জিত, মাথাটা তাহার কুঙ্কুমের কাঁধের উপর রক্ষিত, একখানা হাত কুঙ্কুমের কোলের উপর। গাড়ীখানার হুড তোলা থাকিলেও, চক্ষুর নিমেষে এই দৃশ্য ঝরণার নয়নগোচর হইল। এক বছর পূর্ব্বে আজকার এই দিনটি তাহার স্মরণে আসিল। সে-দিনই বা কি আর আজই বা কি? সমস্ত অন্তর তাহার বিষে ভরিয়া উঠিল। সে কাগজে-মোড়া স্যাণ্ডেলের প্যাকেটটা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখী একখানা 'বাসে' উঠিয়া পড়িল।

বাড়ী আসিয়া সে তাহার নূতন-কেনা সাড়ী, ব্লাউজ, ব্রুম, সেণ্ট, দুল প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত হইল। নূতন স্যাণ্ডেলটি পায়ে পরিল। তার পর আলমারি খুলিয়া বক্রী দুইখানা নোট যাহা ছিল, তাহা লইয়া—পি, কে, লাহিড়ীর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

যখন ফিরিল, তখন রাত প্রায় বারোটা। চোখ দু'টা কিছু উজ্জ্বল, দৃষ্টি আবেগময়, দেহ ক্লান্ত, মনের পরিচয় পাইবার উপায় নাই। সে সাড়ী ছাড়িল না, ব্লাউজ খুলিল না, বুকের ব্রুচ বুকেই গাঁথা রহিল, পায়ের স্যাণ্ডেল পায়েই থাকিল। সেই অবস্থাতেই কৌচের উপর শ্রান্তদেহ এলাইয়া দিল এবং অল্পসময়ের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘরের মধ্যে সাড়া-শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল, কুঙ্কুম তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সে চোখ মেলিয়া চাহিতেই কুঙ্কুম কহিল—"তোমার হয়েছে কি? এই ভাবেই এখানে প'ড়ে ঘুমুচ্ছ?"

"তোমারই জন্যে অপেক্ষা কচ্ছিলুম।" বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝরণা সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষিপ্রতার সহিত কুঙ্কুমের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ বাঁ হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া, ডান হাতে তাহার সেই নূতন স্যাণ্ডেল পা হইতে খুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা সজোরে কুঙ্কুমের সর্ব্বাঙ্গে—চটাপট শব্দে আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল।

ঠিক সেই মধুর ক্ষণে ছাদের দিক হইতে যেন একটা দৈববাণী শুনিতে পাওয়া গেল—"৩২ বৎসর পূর্ব্বকার দুঃখের আজ তোমার শোধ উঠলো, উমারাণী। বলা বাহুল্য, আমার যে ভুলের জন্য তোমার সেদিনের সেই দুঃখের সৃষ্টি হয়েছিল, বর্ত্তমান হট্টমালার যুগে আমার সে ভ্রম সংশোধন ক'রে নিয়েছি।" বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হট্টমালা-যুগের এই আদর্শ দম্পতি তখন ছাদের কড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে গোষ্ঠ-লীলা

বৈষ্ণব-সাহিত্য রসের চিরন্তন নির্ঝর। বৈষ্ণব-সাহিত্যে রসবিকাশের যে পরাকাষ্ঠা দেখি, তাহা পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ। বৈষ্ণব সাধকগণ বিশ্বনিয়ন্তাকে রসময় বলিয়া জানেন। উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ। রসময় রসিককে রসের মধ্য দিয়াই অনুভব করা, রসের মধ্য দিয়াই উপাসনা করা বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

ভগবানের সহিত মানুষের এই সম্বন্ধকে বৈষ্ণবরা পাচটি রসের মধ্য দিয়া অনুভব করিতে চাহিয়াছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শান্ত ও মধুর। পাঁচ রসের মধ্যে বৈষ্ণবরা মধুর রসকে শ্রেষ্ঠ সাধন বলেন। মধুর রসের নিগূঢ় কথা অনুভূতি-বেদ্য, সে কথা আজ বলিব না। গোষ্ঠলীলায় সখ্য ও বাৎসল্য রসের যে অনুপম প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

বৃন্দাবন যেন বাস্তব পুরী নয়, সে কল্পনার মায়ালোক। সেই কল্পনার কল্পলোকে কালিন্দীর শীতল কাল জল-ভরা কূলে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি সখাগণের সহিত ধেনু চরাইতেন। কৃষ্ণ-হারা যশোদা নয়ন-পুত্তলিকে নয়নের আড়াল করিলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। সখ্য ও বাৎসল্যের এই চিরনির্ম্মল চিরদীপ্ত ছবি গোষ্ঠলীলায় প্রকাশ।

এই ব্রজরসের রসাবেদন আধুনিক মানুষের মনকেও ভুলায়। কবি রবীন্দ্রনাথ এক কবিতায় লিখিয়াছেন :—

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নব বঙ্গে নূতন যুগের চালক,
আমি নাই বা গেলেম বিলেত নাই বা পেলাম রাজার খিলেত
যদি পরজন্মে পাই রে হতে ব্রজের রাখাল বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা-ফুলের মালা গেঁথে পরে পরায় গলে ;
যারা বৃন্দাবনের বনে সদাই শ্যামের বাঁশী শোনে
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শীতল কালো জলে।

* * * *

আমি হব না ভাই নব বঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননীছানার গাঁয়ে কোথাও অশোক নীপের ছায়ে
আমি কোন জন্মে হতে পারি ব্রজের রাখাল বালক !

ব্রজরাখালগণের এই নিত্যানন্দময় সুন্দর জীবনের সুন্দর ছবি গোষ্ঠলীলাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান জীবনের সংকীর্ণতা, কলকোলাহল হইতে সেই আনন্দরসঘন জীবনের মাঝে ফিরিবার কোনও পথই নাই—তথাপি কল্পনায় সেই চিরপ্রফুল্ল চিরসরস মাধুর্য্য উপভোগ করিতে সকলকে আহ্বান করি।

জয়দেব বৈষ্ণব-কবিতার প্রথম চারণ। তাঁহার অমৃতময় ললিতমধুর পদাবলীতেই প্রথম কৃষ্ণলীলা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল ; জয়দেবের পন্থা অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস মধুময় পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা প্রেমের রসবিচিত্র মাধুর্য্য পরিবেষণ করিতেই ব্যাপৃত ছিলেন, বাৎসল্য ও সখ্যরসের বিশেষ প্রকাশ তাঁহাদের কাব্যে নাই।

চৈতন্যের যুগের ও চৈতন্যপরবর্ত্তী পদকর্ত্তারাই গোষ্ঠলীলার গান গাহিয়াছেন। প্রেমের অবতার গৌরচন্দ্র, ব্রজরস নিঃশেষে পান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই তিনি নিজ জীবনে কৃষ্ণলীলা পরিস্ফুট করিতে সতত ব্যাকুল ছিলেন। চৈতন্যের এই প্রেমময় উন্মাদনা পদকর্ত্তাদের মনে বাৎসল্য ও সখ্য রসের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়াছিল।

চৈতন্যদাস নামে এক জন পদকর্ত্তা লিখিয়াছেন :—

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল
পূরব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল।
গৌরীদাস মুখ হেরি উল্লসিত হিয়া
আনহ ছান্দন ডুরি বোলে ডাক দিয়া।
আজ শুভদিন চল গোষ্ঠেরে যাইব
আজি হইতে গোদোহন আরম্ভ করিব।
ধবলী সাঙলী কোথা শ্রীদাম সুদাম
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম।
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন,
নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেই ক্ষণ।
চৈতন্য দাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি
হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি।

গৌরাঙ্গ গোষ্ঠলীলার অনুপম আনন্দ পার্ষদগণের সহিত নানারঙ্গে, নানা ভঙ্গে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই রসানুভূতির উজ্জ্বল আবেগ নানা কবিতায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে ধেনু চরাইবেন বলিয়া বায়না করিয়াছেন। খেয়ালী পুত্রের খেয়ালে মাতা সন্ত্রস্ত। কৃষ্ণ বলিতেছেন :—

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর।
অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বলরাম,
সবাই দাঁড়াঞা রাজপথে।
বিশাল অর্জ্জুন নাম, রুক্মিণী অংশুমান,
সাজিয়া সবই গোষ্ঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল-নয়নে রাণী,
অচেতনে ধরণী লোটায়।

যশোদা বাৎসল্য-রসের খনি। গোপালের জন্য তাঁহার সকাতর আকৃতি, গভীর মর্ম্মবেদনা প্রেমিক বৈষ্ণব কবির নিপুণ তুলিকায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের স্নেহ-উজ্জ্বল মমতার এই অনুপম আলেখ্য দেখিয়াও আশা মিটে না। অন্তর ইঁহাদের রসে রসায়িত হইয়া উঠে।

গোপাল বনে যাইবে শুনিয়া যশোদার আকুলতার অন্ত নাই। রাণী বলিতেছেন—

গোপাল নাকি যাবে দূর-বনে
তবে আমি না জীব পরাণে
দধিমন্থন কালে, সম্মুখে বসিয়া খেলে,
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া, যদি গোপাল খেলে যাঞা,
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
গোপাল যাবে বাথানে কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি
নয়ান নিমিখে হই হারা॥

গোপাল আমার পরাণ-পুতলি
তোমারে সঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই
তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি।

নয়নের পলক ফেলিতে না ফেলিতে যাহাকে হারাই হারাই মনে হয়, যশোদা কেমন করিয়া তাহাকে বনে পাঠাইবেন, ভাবিয়া পান না। কিন্তু কৃষ্ণসখাগণ নাছোড়বান্দা। রাণী তাই আভরণ পরাইতে লাগিলেন।

কাঁদিয়া সাজায় নন্দরাণী
হেরি হলধর পানে ধারা বহে দু'নয়নে
মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী॥
অলকা তিলকা দিতে, মুখ ঘামে আচম্বিতে,
দেখিয়া বিভোর যশোমতী।
নারিল পাঠাতে বনে দেখিয়া সে মুখপানে,
শিশুগণে করয়ে মিনতি॥
স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে, বসন ভিজিয়া পড়ে,
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।
কাঁদি গদগদ কহে, আজি রাখি যাহ সবে,
শূন্য না করিহ মোর ঘর॥

মায়ের এই আর্ত্তি পাঠকের চক্ষুকে সজল করিয়া তুলে। কৃষ্ণ বড় হইয়াছেন, স্তন-ক্ষীর পান করেন না, কিন্তু তথাপি বাৎসল্য-প্রতিমা যশোদার স্তন-ক্ষীর বসন ভিজাইয়া ফেলে। কবির লেখনী ধন্য। নিপুণ তুলিকার দু একটি রেখা-সম্পাতে এমনই অনবদ্য এক একখানি চিত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পদকল্পতরু পড়ি আর ভাবি, যেন কোন মনোমোহন চিত্রশালায় গিয়াছি—চলচ্চিত্রের ছবিতে যেন কৃষ্ণের জীবন-লীলা চোখের সম্মুখে অভিনীত হইতেছে।

এক জন সাধক বন্ধুর সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "ভগবানকে সখা, প্রভু, পিতা ও স্বামী না হয় বুঝিলাম, কিন্তু তাঁকে পুত্র বলিয়া কেমন করিয়া ভাবি?" কথা দিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে পারি নাই। কারণ, জিনিষটি কথার নহে—রসের ও রসানুভূতির। অরসিকে তার সংবেদন সম্ভব নহে।

কৃষ্ণ গোষ্ঠযাত্রা করিতেছেন, তাহার একখানি ছবি তুলিতেছি—

প্রণতি করিয়া মায়, চলিলা যাদব-রায়,
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোখুর-রেণু,
সুর নর হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল, পাছে ধায় ব্রজ-বাল,
হৈ হৈ শব্দ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম, দক্ষিণে সে বলরাম,
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব, আবা আবা কলরব,
শিরে চূড়া নটবর বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে, নানা রঙ্গে খেলা করে,
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহ যায় বৃষ ছান্দে, কেহ কার চড়ে স্কন্ধে,
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে, কি শোভা যমুনাকূলে,
রামকানাই আনন্দে খেলায়॥

গোধন চিরকাল ভারতবর্ষে আদরের ধন। রাখাল বালক ও তাহার জীবন তাই কেবল কবিকল্পনা নয়। pastoral poetry নামে য়ুরোপেও রাখালী গান ও কবিতা লেখা হইয়াছে, কিন্তু আমার মনে হয়, ব্রজ-রাখাল-গণের লীলা সুমধুর কবিতায় মাধুর্য্যের সহিত সেই সকল pastoral কবিতার তুলনা হয় না। ইংরাজীতে যে সব pastoral কবিতা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে যেন অস্বাভাবিকতা রহিয়াছে।

কৃষ্ণকে বনে পাঠাইয়া যশোদার অস্বস্তির বিরাম নাই, পথ হইতে তাই তাহাকে ডাকিয়া বার বার করিয়া সাবধানে থাকিতে বলিয়া দিতেছেন :—

আমার শপতি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পুরিহ মোহন বেণু,
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বাম ভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গ-ছাড়া না হইও,
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা হইলে চাহি খাইও, পথ পানে চাহি যাইও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাইতে না যাইও কানু,
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও, বাধা পানই হাতে থুইও,
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

যশোদার এই অনুপম মাতৃত্বের ছবি কোমলহৃদয় বাঙ্গালী কবির একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। বাঙ্গালার মাতার সন্দেহব্যাকুল স্নেহদুর্ব্বলতার এই অনবদ্য চিত্র তাই প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠকের অন্তরকে ভাবরসার্দ্র করিয়া তুলে। বাঙ্গালী জননী পুত্রকে রণসাজে সাজাইয়া কঠোর জীবনযুদ্ধে পাঠাইতে কাতর—স্নেহ-মমতায় পক্ষপুটে তাহাকে সে আবৃত করিয়া রাখিতে চাহে, যশোদার ছবিতে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।

গোষ্ঠে চলিবার ছবি, তার পরে দেখি,
গোষ্ঠেরে সাজল গোপাল।
ধবলী শাঙলী, পিউলি বলিয়া,
হাঁকারে সব রাখাল॥
কারু কাঁধে চেলি, বিনোদ পাগড়ি,
কারু গলে গুঞ্জকাভা।
শ্বেত-লোহিত, কারু নীল পীত,
কটি-তটে ভাল শোভা॥
ভাই বলরাম, পূরিছে বিষাণ,
কানাই পূরিছে বেণু।
উচ্চে পুচ্ছ করি, শ্রবণ তুলিয়া,
আগে চলে সব ধেনু॥
নাচত গাওত, বেণু বাজাওত,
ধেনু চালাওত রঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার লৈয়া আগুসার,
যাদবেন্দ্র চলু সঙ্গে॥

রাখাল বালকগণের মধুর জীবনের সুমধুর আলেখ্য। চিন্তার দুর্ব্বহ জ্বালা নাই—অর্থনীতির কাতরতায় শিশুগণ এখানে আড়ষ্ট হইয়া উঠে নাই। আনন্দ-উচ্ছ্বাস আনন্দের

বন্যায় যেন সকলে ভাসমান। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও এই রাখালী সরলতা ও পুলক বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে ছিল, কিন্তু নিরঙ্কুশ কাল সকলই দূর করিয়া দিতেছে।

রাখালবালকগণ যমুনার তীরে মিলিয়াছে—সেখানে সবুজ ঘাসের মাঠে গোধন ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে রাখালরা খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই খেলার কথা একটু তুলি :—

ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে,
শ্বেত শ্যাম দুই ভাই, চাঁদ মেঘ এক ঠাঞি,
শিশুগণ তারা যেন ফিরে।
কেহ জলপানে ধায়, অঞ্জলি পূরিয়া খায়,
কেহ দেখে নিজ অঙ্গছায়া,
যমুনা আনন্দ মন, তরঙ্গ উঠিছে ঘন,
দেখি ব্রজবালকের মায়া।
তুলিল কানাইর * * ঠাঞি ঠাঞি রাখালের থানা,
সুবলের থানা সবার আগে,
মাঝে রাজা শ্যামঠাম, তার বামে বলরাম,
রাখাল বেড়িয়া লাখে লাখে।
কেহ হাতী ঘোড়া হয়, রাখাল রাখালে বয়,
কেহ নাচে, কেহ গায় গীত,
কেহ বায় শিঙ্গা বেণু, বলে রাজা হৈল কানু,
বলাই হইলা তার মিত।
কেহ বলে সাজ সাজ, বসিলা রাখালরাজ,
অসুর উপরে দেও হানা,
বংশীবদনে গায়, দধি-দুগ্ধ কাড়ি খায়,
কংসের যোগান দিতে মানা।

ভগবানের লীলারস মনে করিয়া ভক্ত-কবির লেখনী রসে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। কিন্তু ভক্তিরসের ফাঁকে ফাঁকে সেকালের বাঙ্গালার সরল সুন্দর চিন্তাভারহীন মধুর জীবনের পরিপূর্ণ একটি ছবি আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। সমালোচনা করিতে তাই মন উঠে না। মনে হয়, শুধু শুদ্ধচিত্তে বিস্ময়ে ও আনন্দে এই রসসুধা আকণ্ঠ পান করি।

খেলা শেষ হইয়াছে। খেলার শেষে যমুনার তীরে রাখালবালকগণের ভোজনলীলা চলিতেছে :—

ভাগ্যবতী যমুনা মাই।
যার একূলে ওকূলে ধাওয়াধাই।
শ্বেত শাঙল দোন ভাই
যার জলে দেখে আপন ছাই।
খেলা সমাধিয়া, শ্রমযুত হৈয়া,
সখাগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার, দিল ভারে ভার,
ভোজনে বসিলা রঙ্গে॥
যমুনাপুলিনে, বেড়ি সখাগণে,
মাঝে করি বৈসে কানু।
পাড়ি বন-পাত, তাহে নিল ভাত,
জল ভরি শিঙ্গা বেণু॥
সব সখা মেলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া, মুখ হতে লৈয়া,
সব দেই কানুর মুখে॥
সবে কহে ভাই, আমার কানাই,
মোরে বড় ভালবাসে।
আমার সমুখে, বসি খায় সুখে,
সদা রহে মোর পাশে॥
এহি করি মনে, করয়ে ভোজনে,
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
বিশ্বম্ভর দাস, করি মনে আশ,
রহে সুবলের পাশে॥

খেলাশেষে গোধূলিকালে গোষ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে ফেরেন। পুত্র-কল্যাণকামী যশোদা ব্যাকুলচিত্তে পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন।

বন সঞে আওত নন্দ-দুলাল।
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর,
আজানুলম্বিত বন-মাল॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ, বেণু-রব শুনাইতে,
ব্রজ বাসিগণ ধায়।
মঙ্গল-থারি, দীপ-করে বধূগণ,
মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়॥

পীতাম্বরধর, মুখ জিনি বিধুবর,
নবমঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মণ্ডিত,
রাখই মোহন বংশ॥
ব্রজবাসিগণ, বালবৃদ্ধ জন,
অনিমিখে মুখশশী হেরি।
ভুখিল চকোর চান্দ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥
গোগণ সবহুঁ গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতী আওল
মোহন ভণিত রসাল॥

ব্যাকুলা রাণীর আনন্দের সীমা নাই। হর্ষ ও পুলকের উচ্ছ্বাসে কুশলপ্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন :—

কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু
আজি কেন চাঁদমুখে শুনি নাই বেণু।
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বাঁধিয়া
বুঝি কিছু খাও নাই শুকাঞাছে হিয়া।
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে
না জানি ভ্রমিলা কোন্ গহন কাননে।
নব তৃণাঙ্কুর কত বিঁধিল চরণে
একদিঠ হৈয়া রাণী চাহে মুখপানে।
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখেছে।

মাতার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত শঙ্কা ও বেদনা প্রকাশ পাইয়া আনন্দে পরিণত হইয়াছে।

গোপবালকগণ সংশয়িতচিত্তা যশোদাকে অনুযোগ করে। গোপালের চরিত্র রহস্যময়, সে যে কি করে, কি বলে, তাহারা কিছুই বুঝে না। গোপালদের কথা শুনিয়া যশোদা অন্তরে সামান্য প্রবোধ পান কি না পান, জানি না, কিন্তু গোপালকে বুকে পাইয়া অতীত বেদনা-স্মৃতিতে সাজাইয়া রাখিতে সম্মত নন। তাই—

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে,
বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে বলাই রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে।
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়াছে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মহাসুখে
নিরখয়ে চাঁদমুখ পানে।
গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে।
জ্বালিয়া রতন বাতি করে সবে আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দসাগরে ভাসে
দুহুঁ রূপের বলি হারি যাই।

গোষ্ঠলীলার নিরুপম বাৎসল্য ও সখ্য কাব্য-জগতের অতুলনীয় সৃষ্টি। রসানুভূতির এমন মাধুর্য্য অতি বিরল। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা তাই ভক্তগণের নিকট অতি প্রিয়।

স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্য উচ্চ কাব্যের প্রাণ—গোষ্ঠ-লীলায় আমরা স্বাভাবিকতার অনুপম বর্ণনা দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের প্রাণ সমাহিত শান্তি, নব্য কাব্যের প্রাণ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। বর্ত্তমান তাহার কলকোলাহল লইয়া অন্তরকে উদ্বেজিত করে—কিন্তু প্রাচীন কবির জীবনে যেন কোথাও অশান্তির উদ্বেল তরঙ্গ নাই—বেদনার বিহ্বল ঝটিকা নাই—সেখানে শুধু হৃদয়াভিরাম সৌন্দর্য্য ও প্রীতির ছড়াছড়ি। তাই গোষ্ঠলীলা পড়িতে পড়িতে আমরা যেন বর্ত্তমানের সমস্ত অতৃপ্তি, সমস্ত বেদনা পশ্চাতে ফেলিয়া অতীতের ধ্যান সুন্দর তন্ময়তার মাঝে ডুবিয়া যাই।

কবিদের বর্ণনা এত সহজ, এত সরল, এমন হৃদয়গ্রাহী যে, ভাষা দিয়া সেই সরলতাকে ব্যক্ত করা চলে না, অন্তর দিয়া তাহা অনুভব করিতে হয়। কথা বলিয়া যেন তাহাকে কুজ্ঝটিকাবৃত করি—সে যেন আপন দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত।

রসাবেগ, মাধুর্য্য, আন্তরিকতা এই কবিতাগুলির মর্ম্মবাণী। আমার অনুরোধ, রসপিপাসুগণ যেন এই অনবদ্য কাব্যরসামৃত পান করিবার আনন্দকে অবজ্ঞা না করেন।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম, এ, বি, এল)।

২৭

গারা ও তুলাকাকে লুলু তমলার সকল কথা বলিল। শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তমলাকে বলিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছিলে, ভালই হয়েছে। তোমার আর লুলুর একসঙ্গে বিয়ে হবে।

লজ্জায় ও আনন্দে তমলা অধোমুখী হইল, কোন কথা কহিল না। লুলু বলিল, তা কেন, ওর বিয়ে আগে হবে। আমার বিয়ের এখনও দেরী আছে।

বিস্মিত হইয়া তুলাকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? কুশান এখন বিয়ে করবে না?

স্মিত-মুখে লুলু বলিল, তা নয়, আমি কিছু সময় চাই।

গারা বলিলেন, তোমার আবার কি হ'ল?

লুলু কহিল, আমার আরও কিছু টাকার দরকার। আমি আরও কিছু দিন অর্থ উপার্জ্জন করব। তুমি ত জান, আমি একবার নিজের দেশের সন্ধান করব।

—সে কথা ত কুশানকে বললেই হবে, ও সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

লুলু ঘাড় নাড়িল, বলিল, না, আমি আর কারুর সাহায্য চাই নে। আমি ত গোড়া থেকে ব'লে রেখেছি, নিজের টাকা ব্যয় ক'রে আমাদের দ্বীপের অনুসন্ধান করব। তার আগে বিয়ে করব না।

তুলাকা বলিলেন, এ যে ধনুক-ভাঙ্গা পণ। তুমি যত দিন তোমাদের দেশ খুঁজে পাবে না, তত দিন বিয়ে করবে না?

লুলু কহিল, তা আমি বলছি নে। তবে আর কিছু টাকা আমার হাতে হওয়া চাই। বিয়ের পরেও আমি বাপ-মার খোঁজ করতে পারি। কুশানকে আমি এখনও সব কথা বলি নি, কিন্তু বিয়ের জন্য কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে, এ কথা বলেছি।

পরদিবস আহারাদির পর কুশান আসিয়া উপস্থিত। হাতে টেলিগ্রাম। গারা, তুলাকা, লুলু তাহাকে বসিতে বলিলেন, সকলেই সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত। কেবল তমলা একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

কুশান টেলিগ্রাম পড়িয়া শুনাইল। কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন, মোহাল সেই দিনই যাত্রা করিবে, সঙ্গে এক জন লোক থাকিবে। এখন মোহালের কোনরূপ চিত্তবিকার নাই।

কুশান বলিল, তাদের আসতে দশ বারো দিন লাগবে. খানিকটা জাহাজের পথ, তার পর রেল। তারা এলেই মোহালকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসব।

লুলু বলিল, তমলার বিয়ে আমরা এখানেই দেব। ওকে আর হাঁসপাতালে ফিরে যেতে হবে না।

পিছন হইতে তমলা মৃদু স্বরে বলিল, আমাদের ত সম্বল কিছু নেই, কি দিয়ে সংসার পাতব?

লুলু বেগের সহিত কহিল, তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। আমি কিসের জন্য আছি?

কুশান বলিল, আমার কি কিছু বলবার নেই? মোহাল যখন আমার কাছে আছে, তখন তার সংসারের ভার আমার। আমার আরও কর্ম্মচারীর আবশ্যক, সুতরাং মোহাল আর তমলার জন্য কোন চিন্তা নেই।

তুলাকা কহিলেন, এই সঙ্গে তোমাদেরও বিয়ে হয়ে যাক না কেন?

কুশান বলিল, আমি ত এখনই প্রস্তুত। লুলুর কি কায আছে ব'লে বিলম্ব করতে চায়।

লুলু সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া কুশান কহিল, তুমি যেমন বলবে, তাই হবে। কত দিন অপেক্ষা করতে হবে?

—ছয় মাস। আরও দু একটা সহরে আমাকে যেতে হবে। তার পর আর সময় চাইনে।

তমলা বলিল, আমাদেরই বা কি এমন তাড়া? লুলুর আগে আমি বিয়ে করব না।

তুলাকা বলিলেন, এই বেশ কথা। কি লুলু, এখন তোমার কি মত?

লুলু হাসিয়া উঠিল। তমলার হাত ধরিয়া কহিল, বেশ, ভাই। আমরা দুজন ছয় মাস আইবুড়ো থাকব। এত কাল ছিলাম, না হয় আর কটা মাস থাকব।

সকলে হাসিতে লাগিল, কেবল কুশান কাষ্ঠ-হাসি হাসিল। তাহাকে আরও ছয় মাস ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে।

২৮

কয়েক দিবস পরে কুশানের এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে মোহাল শাহানায় আসিয়া উপনীত হইল। পরদিবস মধ্যাহ্নের পর কুশান মোহালকে গারার বাড়ীতে লইয়া গেল।

মোহাল কুশানকে অত্যন্ত সমীহা করে। যখন সে পীড়িত, বিদেশে নিরাশ্রয়, সেই অবস্থায় কুশান তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাকে চিকিৎসা করাইয়া তাহাকে রোগমুক্ত করাইয়াছিল। গারার বাড়ীতে গিয়া মোহাল কুশানের সাক্ষাতে বসিতে চায় না, দাঁড়াইয়া রহিল। কুশান তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বসাইল।

গারা ও তুলাকা অত্যন্ত সমাদরের সহিত মোহালকে অভ্যর্থনা করিলেন। মোহাল শান্তপ্রকৃতি, যুবা পুরুষ, সঙ্কোচের সহিত কথা কহিতে লাগিল। মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে লুলু তমলাকে সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মোহাল বিস্মিত হইয়া লুলুকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর তমলাকে দেখিল। তমলা লজ্জিতা, মোহালকে দেখিয়া চক্ষু নত করিল। মোহাল তাহাকে দুই একটি কুশল-প্রশ্ন করিয়া নীরব হইল।

তুলাকা ও গারা উঠিয়া বাহিরে গেলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি লুলু এবং কুশানও বাহিরে আসিল। কুশান লুলুকে ডাকিয়া বাগানে লইয়া গেল।

কুশান বলিল, ওদের অনেক কথা আছে, আমাদের সাক্ষাতে লজ্জা হবারই কথা।

লুলু কহিল, কত দিন পরে ওদের দেখা হ'ল! তমলা ত একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তোমার জন্য ওদের আবার দেখা হ'ল।

—আমার জন্য না তোমার জন্য? তুমি আমাকে ফটোগ্রাফ না দেখালে আমি কিছুই জানতাম না।

দুই জনে বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মোহাল ও তমলা বাহির হইয়া আসিল। তমলা আরক্তমুখী, উজ্জ্বল সিক্তচক্ষু, মোহাল উৎফুল্ল-বদন।

গারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, জলযোগ প্রস্তুত, একটু কিছু খেতে হবে।

আহারের সময় গারা তমলাকে মোহালের পাশে বসিতে বলিলেন। তাহারা দুই জনই সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল। পরস্পরে বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিল না, কেবল মাঝে মাঝে পরস্পরকে কটাক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহাদের আনন্দ পূর্ণসলিল নিস্তরঙ্গ তড়াগের ন্যায়, তরঙ্গসঙ্কুলা কলনাদিনী স্রোতস্বতীর তুল্য নহে। সে আনন্দে গভীরতার শান্তি, চঞ্চলতার উচ্ছ্বাস নাই।

সেই দিন হইতে ভ্রমণকালে সকলে একত্র বাহির হইতেন, কিছু দূর গিয়া লুলু ও কুশান আর এক দিকে চলিয়া যাইত, তুলাকা ও গারা পিছাইয়া পড়িতেন, তমলা ও মোহাল আর এক দিকে যাইত। টোটো লুলুর নিত্যসঙ্গী, সর্ব্বদা তাহার পিছনে পিছনে যাইত।

এক সপ্তাহ পরে তুলাকা চলিয়া গেলেন। লুলুর শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল। এবার কোথায় যাইবে, অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল।

লুলু তাঁহাকে বলিল, দেখুন, আর ছয় মাস আমি কায করব, এই সময়ের মধ্যে যত বেশী টাকা উপার্জ্জন করতে পারি, ততই ভাল। তার পর কি হবে, বলতে পারি নে। আপনি এমন তিনটে সহর ঠিক করুন—যেখানে লোক খুব বেশী হওয়া সম্ভব আর অর্থাগমও সেই রকম হবে। প্রত্যেক স্থানে দু'মাস ক'রে থাকব।

অধ্যক্ষ বলিলেন, তোমার বিয়ে হ'লে পর হয় ত রঙ্গালয়ের কায তোমাকে একেবারে ছাড়তে হবে। তার ত কোন উপায় নেই। আমাকে যেমন বলছ, আমি সেই রকম ব্যবস্থা করব।

২৯

স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া লুলু শাহানাতে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছে, এ কথা অপ্রকাশিত ছিল না। নানা দেশের নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। লোকের আশা ছিল, লুলু আরোগ্যলাভ করিয়া আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবে।

লুলু যে শুধু অসামান্য প্রতিভাশালিনী, তাহা নহে, তাহার প্রকৃতিতে অসাধারণ দৃঢ়তা ছিল। প্রেমের বন্যায় তাহার চিত্ত চঞ্চল হইলেও তাহার সংযমকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। কুশান দেখিল, প্রতিদিন লুলুর বেড়াইতে যাইবার অবসর হয় না। লুলু আবার কর্ম্ম করিবে, এ কথা প্রকাশ হইতেই রাশি রাশি পত্র আসিতে আরম্ভ হইল। অধ্যক্ষের সঙ্গে বসিয়া লুলু সেই সকল পত্র পাঠ করিত,

কোন্ পত্রের কি উত্তর দিতে হইবে, সংক্ষেপে তাহা বলিয়া দিত। কুশান আসিলে লুলু তাহাকে নিজের পাশে বসাইত। কুশান জিজ্ঞাসা করিত, বেড়াতে যাবে না?

লুলু বলিত, যাব বৈ কি। এই একটু কায সারা হলেই যাব।

কোন দিন কুশান বসিয়া থাকিত, কোন দিন বলিত, আমি না হয় একটু ঘুরে আসি, ততক্ষণ তুমি তোমার কায সেরে নাও।

লুলু কোন আপত্তি করিত না।

এক দিন বৈকালবেলা লুলু কাযকর্ম্ম সমাপন করিয়া ভ্রমণ করিতে গেল। সঙ্গে আর কেহ ছিল না। কুশান আসিয়া দেখা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তমলা ও মোহাল তাহার পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তুলাকা কয়েক দিবস পূর্ব্বে নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। গারা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন। টোটো অসুস্থ, শিকলে বাঁধা ছিল।

সূর্য্য অস্তমিত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। লুলু পাহাড়ের দীর্ঘ যষ্টি হাতে করিয়া লঘুপদক্ষেপে চলিতেছিল। সে যে পথে গমন করিল, সে দিকে অধিক লোকের যাতায়াত ছিল না। পথ সঙ্কীর্ণ, পথের পাশেই প্রকাণ্ড খাদ, এত গভীর যে, নীচে চাহিয়া দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। পাহাড়ের গায় পাইন গাছ, চারিদিকে ডালিয়া, বড় বড় লাল রোডো-ডেনড্রন ফুল ফুটিয়া আছে। খানিক দূর পাহাড়ে উঠিয়া শৈবালাবৃত সমতল স্থান ছিল, লুলুর ইচ্ছা, সেইখানে গিয়া একটু বিশ্রাম করিবে।

লুলু একবারও পিছনে ফিরিয়া দেখে নাই। পথ মাঝে মাঝে দুর্গম বলিয়া তাহাকে সম্মুখে ও পাশে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইয়াছিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলে দেখিতে পাইত যে, এক ব্যক্তি অলক্ষিতভাবে তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। পাহাড়ের পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি লুলুর অনুগামী হইয়াছিল, সে প্রত্যেক বাঁকের কাছে একবার করিয়া দাঁড়াইতেছিল, যাহাতে লুলু তাহাকে দেখিতে না পায়। কিন্তু লুলু পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছিল না। একে ত শঙ্কার কোন কারণ ছিল না, তাহা ছাড়া লুলু সহজে ভয় পাইত না।

সমতল স্থানে উপনীত হইয়া লুলু দাঁড়াইল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশে গোধূলির কোমল রাগ, দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গ তুষারমণ্ডিত, চারিদিকে সান্ধ্য স্তব্ধতা।

লুলু একটা বৃক্ষমূলে বসিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে কে বলিল, এই যে, অনেক দিন পরে আবার দেখা!

সচকিত হইয়া লুলু ফিরিয়া দেখিল—মোরের রাজ-কুমার! সহসা তাহার অঙ্গ শিহরিল, অজানিত আশঙ্কায় হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইল। পর-মুহূর্ত্তে আত্মসংযম করিয়া লুলু কহিল, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করি নে। আপনি কি আমার পিছনে পিছনে এখানে এসেছেন?

রাজকুমার কঠোর হাস্য করিলেন, কহিলেন, তাতে দোষ কি? তোমাকে আর একবার দেখবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে আছে।

রাজকুমার হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। লুলু পশ্চাতে সরিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে লাঠি ধরিল, কহিল, আপনি আমার কাছে আসবেন না, আমাকে স্পর্শ করবেন না।

—কেন, আমি কি অস্পৃশ্য নীচজাতীয়? আমি রাজ-বংশীয়, কিছুদিন পরে স্বয়ং রাজা হব। আমাকে এত অবজ্ঞা কেন? তোমার কি ব্যবসা, মনে রেখো। তুমি অর্থ চাও, আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দেব।

ক্রোধে, লজ্জায় লুলুর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, একবার আপনার দুই জন লোককে শিক্ষা দিয়াছিলাম। আপনি এখান থেকে এখনই যান, নইলে এই লাঠি মেরে আপনাকে তাড়াব।

কিছু না বলিয়া রাজকুমার এক লম্ফে লুলুকে জড়াইয়া ধরিলেন। লুলু লাঠি তুলিবার অবসর পাইল না। রাজকুমার বলপূর্ব্বক তাহার লাঠি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর তাহাকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিলেন। লুলু চীৎকার করিল না, কোন কথা কহিল না, নিঃশব্দে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। সে স্ত্রীলোক হইলেও সুস্থদেহ, ব্যায়ামপটু, বলবতী। রাজকুমার আলস্য-বিলাসে কাল কাটাইয়াছেন, স্থূল, শিথিল শরীর, অধিকক্ষণ বল প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। লুলু তাঁহার হস্তমুক্ত হইয়া দৌড়িয়া গিয়া দুই হাতে লাঠি তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এক পা এ দিকে এলেই তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব।

ইতিমধ্যে সেখানে আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহাকে লুলু অথবা রাজকুমার কেহ দেখিতে পায় নাই। তৃতীয় ব্যক্তি কুশান। সে জানিত, লুলু কখন কখন এই স্থানে আসে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশায় সে আসিয়াছিল। সে দেখিল, লুলুর বেশ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, ক্রোধে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে। কুশান কোন কথা না বলিয়া রাজকুমারের সম্মুখে গিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। লুলুকে বলিল, এই ব্যক্তি বোধ হয় তোমাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছিল? তুমি একটু স'রে যাও, এর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

লুলু হাতের লাঠি নামাইল। তাহার ললাট মুক্ত হইল, ক্রোধের উপশম হইল। অল্প হাসিয়া কহিল, কি কথা বলবে বল, আমি শুনতে চাই। আর কথা ছাড়া যদি আর কিছু কর, তা হ'লে আমি দেখতে চাই।

রাজকুমার ক্রুদ্ধভাবে কুশানকে বলিলেন, তুমি যে বড় আমার গায় হাত দাও, আমি কে জান?

কুশান বলিল, জানি। তুমি দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড, স্ত্রীলোককে একা পাইয়া তাকে অপমান কর।

রাজকুমার সদর্পে কহিলেন, আমি মোরের রাজকুমার। আমাকে অপমান করলে তোমার কঠোর শাস্তি হবে।

—বটে? রাজবংশে অনেক কুলাঙ্গার হয়। তারা দুষ্কর্ম্ম ক'রেও নিষ্কৃতি পায়, কিন্তু তোমার অদৃষ্টে আজ তা ঘটবে না। যদি পার ত আত্মরক্ষা কর।

কুশান মহা বলবান্ পুরুষ, তাহার তুলনায় রাজকুমার দুর্ব্বল শিশুর ন্যায়। কুশান তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া ভূমিশায়ী করিল, তাহার পর তাঁহাকে পশুর ন্যায় প্রহার করিল। লুলু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার লাঞ্ছনা দেখিতে লাগিল।

কুশান যখন রাজকুমারকে পরিত্যাগ করিল, তখন তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই। অঙ্গের বহুমূল্য বেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, মুষ্ট্যাঘাতে মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে, পদাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজকুমার অতিকষ্টে উঠিয়া অধোমুখে চলিয়া গেলেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে লুলু কুশানকে সকল কথা বলিল। রাজকুমার কিরূপে অলঙ্কারাদি দ্বারা তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া, লোক নিযুক্ত করিয়া কিরূপে তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বলিল।

কুশান মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিল, এর পর আর কখন কিছু করবার চেষ্টা করবে না।

লুলু হাসিতে লাগিল। কহিল, ওর শিক্ষা আজ শেষ হয়েছে। তোমার মত গুরুমশায়ের কাছে আর কখন কিছু শিখতে আসবে না।

এবার রাজকুমারকে কাহারও কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। পরদিবসই তিনি শাহানা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। লুলু অথবা কুশান আর কখন তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

৩০

কয়েক দিবস পরে লুলু শাহানা পরিত্যাগ করিল। সে অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া আর একটা বড় সহরে যাইবে স্থির করিয়াছিল। অধ্যক্ষ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি গিয়া লুলুর বাসস্থান, সংবাদপত্রাদিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রভৃতি স্থির করিলেন। লুলুর জন্য সহরের প্রধান রঙ্গালয় ভাড়া করা হইল। অধ্যক্ষ যাইতেই প্রচুর অর্থাগম আরম্ভ হইল।

গারা লুলুর সঙ্গে শাহানা হইতে একত্র যাত্রা করিয়া নিজের দেশে চলিয়া গেলেন। লুলুর সঙ্গে রহিল তমলা। সে লুলুর অনুরোধ অনুসারে হাঁসপাতালের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল। কুশান মোহালকে লইয়া লুলুদের সঙ্গে গেল। একত্র নয়। কারণ, কুশান নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু পথে লুলুর যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ থাকিত। লুলু অধ্যক্ষকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল যে, তাহার সহরে পৌছিবার দিন যেন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা না হয়, তাহার আগমনের সময় যেন লোকের ভিড় না হয়।

লুলুর আগমন-সংবাদ সহরে কেহ জানিতে পাইল না। রেলের ষ্টেশনে অধ্যক্ষ অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে কেহ চিনিত না। লুলুর সঙ্গে তমলা ও মুমী গাড়ী হইতে নামিল। টোটো শিকলে বাঁধা, শিকল লুলুর হাতে। কুশান ও মোহাল আর একটা গাড়ী হইতে নামিল। লুলু অধ্যক্ষের সঙ্গে

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। কুশান একটা বড় হোটেলে গিয়া উঠিল।

ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ হইল, লুলু সহরে আসিয়াছে। অমনি তাহার বাড়ীতে এক দল খবরের কাগজের লোক আসিয়া উপস্থিত। অধ্যক্ষ তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, লুলু কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন, আপনারা জানেন। পথশ্রান্তিতে তিনি কিছু ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহার উপর আজ রাত্রিতেই তাঁহাকে রঙ্গালয়ে যাইতে হইবে। তিনি আপনাদের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

সংবাদপত্রের সৈন্য এত সহজে রণে ভঙ্গ দেয় না। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা অধ্যক্ষকে চাপিয়া ধরিল, তিনি না দেখা করিতে পারেন, আপনি আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

অধ্যক্ষ সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, লুলু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছেন। পাহাড়ে তিনি সর্ব্বদা হাঁটিয়া বেড়াইতেন, আর তাঁহার ব্যায়ামেরও অভ্যাস আছে। আপনারা লিখিবেন, লুলুর কলাবিদ্যা অক্ষুণ্ণ আছে।

কয়েক দণ্ড পরেই ঐই কথা নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। মধ্যাহ্নের পর কয়েকখানা সংবাদপত্র হাতে করিয়া কুশান আসিল, মোহাল সহর দেখিতে গিয়াছিল।

লুলু আরাম-চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তমলাও সেখানে ছিল। কুশান আসিতেই তমলা উঠিয়া যাইতে চায়, লুলু তাহাকে নিষেধ করিল, বলিল, তুমি ব'সে থাক, আমাদের কোন লুকানো কথা নেই।

কুশান সংবাদপত্র দেখাইল, বলিল, এদের কাছে কিছু লুকোবার জো নেই।

লুলু হাত নাড়িয়া কহিল, ও সব রেখে দাও, আমি দেখতে চাই নে। রূপকথা বলাই ওদের কায।

কুশানও অধিকক্ষণ রহিল না। সে বাহির হইয়া আসিতে অধ্যক্ষ তাহাকে থিয়েটারের টিকিট দিলেন। বলিলেন, তোমার বসবার আলাদা যায়গা ক'রে দেব, তা হলেও খানিক আগে যেও, পথে বড় ভিড় হবে।

কুশান টিকিটের দাম দিতে চাহিলে অধ্যক্ষ বলিলেন, তোমাকে টিকিট বেচেছি শুনলে লুলু আমাকে তাড়িয়ে দেবে।

অভিনয় আরম্ভ হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কুশান থিয়েটারে উপনীত হইল। থিয়েটারের সম্মুখে পথে লোকে লোকারণ্য। কুশানের মোটর রঙ্গালয় হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইল, আগে যাইবার পথ নাই। কুশান নামিয়া রঙ্গালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে এক জন দ্বাররক্ষক তাহার পথ রোধ করিল, কহিল, ভিতরে দাঁড়াবারও স্থান নেই, টিকিট বিক্রী অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে।

কুশান তাহাকে টিকিট দেখাইল, তখন সে পথ ছাড়িয়া দিল। রঙ্গালয়ের ভিতরে স্বতন্ত্র স্থানে কুশানের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে গিয়া কুশান রঙ্গালয়ের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোথাও তিলমাত্র স্থান নাই। যাহারা বসিবার স্থান পায় নাই, তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপর দর্শকদিগের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। দর্শকরা পরস্পরের সহিত মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে, কিন্তু বহু সহস্র মিলিত কণ্ঠে রঙ্গালয় পরিপূরিত হইতেছে। রমণীদিগের অনাবৃত বাহু ও কণ্ঠদেশ রত্নময় অলঙ্কারে পূর্ণ, শত শত বৈদ্যুতিক আলোকে সেই সকল আভরণ নক্ষত্রমালার ন্যায় জ্বলিতেছে। যেমন অলঙ্কারের সমারোহ, তদনুরূপ বেশের পারিপাট্য, দেখিলে চক্ষু যেন ঝলসিয়া যায়।

লুলু রঙ্গালয়ে যাইবার সময় তমলাকে সঙ্গে লইয়াছিল। তাহার প্রবেশপথ অন্য দিকে, সে বদ্ধ মোটরে আসিয়া অলক্ষ্যে থিয়েটারে প্রবেশ করিল। সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবামাত্র বিপুল দর্শকমণ্ডলী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া মিলিত মুক্তকণ্ঠে তাহাকে অভিবাদন করিল—লুলু! লুলু! লুলু! সহস্র করতালি-শব্দে বিশাল নাট্যশালা ধ্বনিত হইল, চারিদিক হইতে লুলুর সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, কুসুমরাশিতে রঙ্গমঞ্চ সমাকীর্ণ হইল। লুলু মস্তক অবনত করিয়া দর্শকদিগকে প্রত্যভিবাদন করিল।

অধ্যক্ষ স্বয়ং সেই স্তূপাকার পুষ্প তুলিয়া লইয়া গেলেন। রঙ্গমঞ্চ পরিষ্কার হইল। তখন লুলু নৃত্য আরম্ভ করিল।

কুশান সংবাদপত্রে যাহা পড়িয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিল, স্বকর্ণে শুনিল। কিন্তু যাহা দেখিল ও শুনিল, তাহা তাহার কল্পনাতীত। সে অনেক স্থানে অনেক অভিনয় দেখিয়াছিল, প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রী অনেক দেখিয়াছিল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখন এরূপ দেখে নাই। রঙ্গালয়ে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের শুধু কৌতূহলের আগ্রহ

নয়, কলাবিদ্যার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। তাহাদের দৃষ্টিতে লুলু অলৌকিক ক্ষমতাশালিনী, সকল কলার মূর্ত্ত আদর্শ।

কুশানের অন্তঃকরণে বেদনা ও বিষাদ উৎপন্ন হইল। এই শত সহস্র লোকের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কুশানের সঙ্গে কালযাপন করিয়া কি লুলুর পরিতৃপ্তি হইবে? এই স্থান ত নাট্যশালা নহে, ইহা মন্দির এবং লুলু মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নানা দেশব্যাপী উপাসক সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করিলে কি লুলুর ক্ষোভ হইবে না? দ্বিধায়, শঙ্কায় কুশানের চিত্ত আলোড়িত হইতে লাগিল।

কিন্তু আত্মগ্লানি অথবা আত্মশঙ্কার অবসর রহিল না। লুলুর নৃত্যকৌশলে সকল অবসাদ তিরোহিত হইল। অপর দর্শকদিগের ন্যায় বিস্মিত, মুগ্ধ হইয়া কুশান লুলুর বিচিত্র চরণবিন্যাস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লহরীলীলা দেখিতে লাগিল। একবার নিমেষের তরে দুই জনের চক্ষু মিলিল, কিন্তু সে সময় লুলুর চিত্ত নৃত্যে নিবিষ্ট, সে ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

নৃত্য সমাপ্ত হইতেই লুলু চলিয়া গেল। দর্শকরা তাহার নাম করিয়া অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিল, কিন্তু লুলু ফিরিল না। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাহাকে আবার গান করিতে হইবে।

অভিনয় সমাপ্ত হইলে কুশান নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেল। লুলু রঙ্গালয় হইতে যাইবার পূর্ব্বে কুশানের সহিত দেখা করিতে চাহিল, অধ্যক্ষ সন্ধান করিয়া আসিয়া বলিলেন, সে চলিয়া গিয়াছে।

পরদিবস লুলু কুশানকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। কুশান আসিলে তাহাকে বলিল, কাল রাত্রিতে থিয়েটারে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে তুমি চ'লে গিয়েছিলে কেন?

কুশান বলিল, তখন তুমি ব্যস্ত ছিলে, তাই তোমাকে বিরক্ত করি নি।

লুলু মৃদুমন্দ কুটিল হাসি হাসিয়া বলিল, লোকজনের গোলমাল তোমার ভাল লাগে নি, না?

কুশান বলিল, এত লোক তোমাকে দেখবার জন্য লালায়িত, তার মাঝখানে আমার কি প্রয়োজন? তোমার ক্ষমতায় লক্ষ লোক মুগ্ধ, তুমি কেমন ক'রে রঙ্গালয় ছেড়ে দেবে, তাই ভাবি।

লুলু কুশানের হাতের উপর নিজের হস্ত রক্ষা করিল, বলিল, সে ভাবনা আমি ভেবে রেখেছি। তোমার জন্য আমি স্বচ্ছন্দে এ কায ছেড়ে দেব। এই ক'টা মাস ধৈর্য্য ধারণ কর।

কুশান লুলুর হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, আমাকে ক্ষমা কোরো, আমি চিত্তের দুর্ব্বলতা দমন করব। যেমন তোমার অভিমত, তাই হবে।

—আজ থেকে রাত্রিতে তমলার সঙ্গে তুমিও আমার গাড়ীতে যাবে। ফেরবার সময় রাত্রি বেশী হয়ে যায়, তখন আর তোমার আসবার আবশ্যক নেই।

কুশানের মন হইতে দ্বিধা দূরীভূত হইল। সেই দিন হইতে সে সন্ধ্যার সময় লুলুর বাড়ী যাইত, লুলু, তমলা ও সে একত্র থিয়েটারে যাইত। মোহাল টিকিট পাইয়াছিল, প্রতি রাত্রিতে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইত।

লুলুর বিবাহ হইবে, এ সংবাদ প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না। অমনি সংবাদপত্রের চরেরা লুলু ও কুশানকে ঘিরিল। লুলু বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দিল, বলিল, আমার বিবাহের সঙ্গে সংবাদপত্রের অথবা সমাজের কি সম্বন্ধ? কুশানও কোন কথা প্রকাশ করিতে সম্মত হইল না। সে বলিল, সে সংবাদপত্রের কোন ধার ধারে না, সে কি করে না করে, জানিবার কাহারও কোন আবশ্যক নাই।

ইহাতে নিরুৎসাহিত হওয়া দূরে থাকুক, সংবাদপত্রে কল্পনার ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। বড় বড় অক্ষরে এই সংবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। লেখার একটা নমুনা এই রকম—'আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, বিশ্ববিখ্যাত কলাবতী অভিনেত্রী শ্রীমতী লুলুর শীঘ্র শুভ পরিণয় হইবে। এই সংবাদ শ্রবণে আমরা যেরূপ আনন্দিত হইয়াছি, সেইরূপ কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আনন্দ—তাহার বিবাহসংবাদে, আশঙ্কা—যদি বিবাহের পর তিনি রঙ্গালয় পরিত্যাগ করেন। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার যশ, সে সূর্য্য এত শীঘ্র অস্তমিত হইলে বিষাদের অন্ধকারে জনসমাজ ম্রিয়মাণ হইবে।'

এই সংবাদে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, কিন্তু তাহাতে লুলুর লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইল না। লোক যখন জানিল, অল্পদিনের মধ্যে লুলুর বিবাহ হইবে এবং বিবাহের পর লুলু হয় ত থিয়েটার ছাড়িয়া দিবে, তখন থিয়েটারে লোকের ভিড় আর

কিছুতে থামে না। দশ পনর দিন পূর্ব্বে সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়, যাহারা থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া টিকিট কিনিতে পায় না, তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। এত অল্পসময়ের মধ্যে এত অধিক অর্থাগম কখন হয় নাই।

অধ্যক্ষ লুলুর সহিত পরামর্শ করিলেন, এমন অবস্থায় আর কোন সহরে যাইবার প্রয়োজন আছে কি না। লুলু বলিল, টাকা হইলেই হইল, তবে আর কোথাও যদি ইহার অপেক্ষা বড় রঙ্গালয় থাকে, তাহা হইলে মাস দুই তিনের জন্য সেখানে যাইতে হইবে।

তাহাই হইল। ছয় মাস অতিবাহিত হইলে লুলু প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুশানকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। গারা বলিয়া রাখিয়াছিলেন, বিবাহ তাঁহার বাড়ী হইতে হইবে। বিবাহের কিছু দিন পূর্ব্বে লুলু গারার বাড়ী গেল। গারার বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল।

লুলু অধ্যক্ষকে বলিয়াছিল, বিবাহের পর সে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিবে। অধ্যক্ষ বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু লুলুকে মত-পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিলেন না। তিনি জানিতেন, উপরোধ অনুরোধে কোন ফল হইবে না।

বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে এবং সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইলে নানা দেশ হইতে নানা লোকের নিকট হইতে লুলুর জন্য বহুমূল্য উপঢৌকন আসিতে আরম্ভ হইল। অলঙ্কারে ও নানাবিধ বিচিত্র সামগ্রীতে গারার গৃহের কয়েকটি কক্ষ পূর্ণ হইল। লুলু কিছু অলঙ্কার ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী তমলাকে দান করিল। তমলার বিবাহ লুলুর বিবাহের কয়েক দিবস পূর্ব্বে হইয়া গেল। মোহালকে কুশান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাহার উত্তম বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিল।

লুলুর বিবাহের দিন গারার বাড়ীতে লোক ধরে না! পথের চারিদিকে জনতা, লোকের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। তুলাকা কয়েক দিন গারার বাড়ীতেই ছিলেন। মুমীর আনন্দের সীমা নাই, গারা তাহাকে বলিয়াছিলেন, লুলুর বিবাহের পর সে লুলুর সঙ্গে যাইবে।

বিবাহের পরদিবস বরকন্যা চলিয়া গেল। গারা ও তুলাকা সাশ্রুনয়নে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

উপেক্ষিতের নিবেদন

যত বুড়ী হাত জুড়ি কবিদের কহে,
রূপসী তরুণী ভরা ধরা শুধু নহে।
যমের অরুচি মোরা আছি একধারে।
আমাদের পানে চাও নয়ন-কিনারে

কর্কশ স্বরে কাক কবিরে বলে,
কোকিলের সুরে তব হৃদয় গলে।
আমাদের ডাক শুনে কর 'দূর দূর'
অপরাধ সুমধুর নহে এই সুর।

ঘেঁটু ফুল বলে কবি গোলাপের তরে,
তোমাদের মরমের মমতা সে ক্ষরে।
সৌরভ রূপহীন মোদের তরে,
ছন্দের নির্ঝর—কভু না ঝরে।

গাব গাছ কহে, কবি একি আচরণ,
বন্দন কর তুমি চন্দন বন।
আমাদের পরে তুমি হ'লে কেন বাম,
কদাকার স্থূল দেহ তাই নাই দাম?

ঢাক বলে ওগো কবি নিনাদ আমার,—
কর্ণ পটহ তব করে কি বিদার?
আমি বুঝি তাই তব চক্ষের শূল,
বেণু বীণা ভেরী লয়ে আছ মসগুল।

শীত বুড়া কেঁপে কেঁপে কবিরে সুধায়,
বর্ষা ও ঋতুরাজ তব পূজা পায়।
আমারে দেখিলে কেন মুখ কর ভার,—
করিয়াছি আমি তব কিবা অপকার?

অমানিশা বলে কবি দুখে মরে যাই,
পূর্ণিমার তরে তব কত প্রেম ভাই।
আমার এই কাল দেহ দেখিলে পরে
ভাবের মুকুল তব যায় কি ঝরে?

মানহীনদের পানে কবি তুমি চাও—
গানে বেঁধে আমাদের মানী করে দাও।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

মধ্বাদিষু অসম্ভবাৎ অনধিকারং জৈমিনিঃ (৩১)

মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অসম্ভব বলিয়া (দেবগণের ব্রহ্ম-বিদ্যায়) অধিকার নাই, ইহা জৈমিনির মত।

দেবগণের যদি ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকে, তাহা হইলে উপনিষদুক্ত সকল বিদ্যাতেই অধিকার থাকা যুক্তিযুক্ত হয়। তাহা হইলে মধুবিদ্যাতেও অধিকার আছে বলিতে হইবে। মধুবিদ্যা ছান্দোগ্য উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে—"অসৌ আদিত্যো দেবমধু" এই সূর্য্য দেবগণের মধু (মধুর ন্যায় আনন্দদায়ক), এ স্থলে সূর্য্যকে দেবমধু কল্পনা করিয়া উপাসনা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যদেব নিজেকে মধু কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে পারেন না। সুতরাং সূর্য্যদেবের মধুবিদ্যায় অধিকার নাই স্বীকার করিতে হইবে। পুনশ্চ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, এই উপাসনার ফলে উপাসক একটি বসুরূপে পরিণত হয়। সুতরাং বসুনামক দেবগণের এই উপাসনায় অধিকার নাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার আরও উপাসনা আছে, যাহাতে কোনও কোনও দেবতা অথবা ঋষির অধিকার নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবগণের অধিকার নাই, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।

রামানুজ বলেন, যে উপাসনায় যে দেব উপাস্য, সেই উপাসনায় সেই দেবের অধিকার থাকিতে পারে না, ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য। মধ্বও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ (৩২)

জ্যোতির্ম্মণ্ডলেই (সূর্য্য) থাকেন, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডলকেই সূর্য্য বলা হয়, (সুতরাং সূর্য্য অচেতন বস্তু, সূর্য্যের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিতে পারে না)।

জৈমিনির মতে সূর্য্য ত জড়পিণ্ড, তাঁহার কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিবে?

রামানুজ এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদে আছে—"তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্"—দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতি (পরমাত্মাকে) আয়ু এবং অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, দেবগণ এইভাবেই (আয়ু এবং অমৃতরূপেই) পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবেন, মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অধিকার নাই, মানবদেরই আছে।

ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি (৩৩)

পূর্ব্ব দুই সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, বাদরায়ণ (বেদব্যাস) তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, দেবগণের ব্রহ্ম-বিদ্যায় অধিকারের "ভাব" আছে, অর্থাৎ অধিকার আছে। মধুবিদ্যায় দেবগণের অধিকার যখন সম্ভব নহে, তখন নাই বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল স্থানে অসম্ভব নহে, সে সকল স্থানে দেবগণের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যায় দেবগণের অধিকার সম্ভব, অতএব নিশ্চয়ই অধিকার আছে। সকল বৈদিক কর্ম্মে সকল মনুষ্যেরও অধিকার নাই, যথা রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। সূর্য্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডল জড়পিণ্ড হইতে পারে, কিন্তু ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যযুক্ত দেবতা আছেন, তিনি ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিতে ইহা উল্লিখিত আছে। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, মহাভারতে যখন উক্ত হইয়াছে যে, বেদব্যাস দেবগণের সহিত কথোপকথন করিতে পারিতেন, তখন উহা নিশ্চয় সত্য। এখন কোনও ব্যক্তি দেবগণের সহিত কথোপকথন করিতে পারে না, ইহা সত্য কিন্তু সে জন্য ইহা স্বীকার করা যায় না যে, কেহ কখনও পারে নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে জগতের বৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয়।

রামানুজ বলেন যে, মধুবিদ্যা প্রভৃতিতেও দেবগণের অধিকার আছে। যেখানে সূর্য্যের উপাসনা বিহিত আছে, সেখানে সূর্য্যদেব তাঁহার নিজ হৃদয়স্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবেন। যেখানে উপাসনার ফল বসুত্বপ্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, বসুও এইভাবে উপাসনা করিলে, পরকল্পে বসু হইতে পারিবেন এবং অন্তে ব্রহ্মকে পাইবেন।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি (৩৪)

শুক্ (শোক) তস্য (তাঁহার হইয়াছিল) তৎ (ইহা বুঝিতে পারা যায়) অনাদরশ্রবণাৎ (অনাদরের কথা শোনা যায় বলিয়া) তদ্—আদ্রবণাৎ ('তৎ' অর্থাৎ সেই শোকহেতু 'আদ্রবণাৎ' গমন করিয়াছিলেন বলিয়া)।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। এজন্য মনে হইতে পারে, সকল মানবেরও অধিকার আছে, অতএব শূদ্রেরও অধিকার আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, রৈক ঋষি জানশ্রুতিকে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে "শূদ্র" শব্দে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যটি শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সমর্থন করিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই, এ কথা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে বলা আছে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ, তাহার বেদ পাঠ করিবার অধিকার নাই, যে হেতু তাহার উপনয়ন হয় না। জানশ্রুতি জাতিতে শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে শূদ্র শব্দে অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহার শুক্ বা শোক হইয়াছিল, যেহেতু হংসরূপী ঋষিগণ তাঁহাকে অনাদর করিয়া কথা বলিয়াছিলেন।* জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে (শুচ্+র=শূদ্র)।

শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে তাহার দুঃখ নাশ হইবে, এজন্য ইহা বলা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের "অর্থিত্ব" অর্থাৎ প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহার সামর্থ্য নাই, কারণ, তাহার বেদপাঠ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে যাহার যে কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই তাহার অমঙ্গলজনক।

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ (৩৫)

জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়; কারণ, পরে চৈত্ররথের সহিত তাঁহার উল্লেখ আছে।

চৈত্ররথ ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা সুবিদিত। তাঁহার সহিত জানশ্রুতির উল্লেখ থাকাতে বুঝিতে হইবে যে, জানশ্রুতিও ক্ষত্রিয় ছিলেন।

অধিকন্তু ইহা উক্ত হইয়াছে যে, জানশ্রুতি বহু পক্কান্ন দান করিতেন, অনেক জনপদের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার সারথি ছিল। এই সকল কারণেও অনুমান হয় যে, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন।

সংস্কারপরমর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ (৩৬)

বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে উপনয়ন-সংস্কার প্রয়োজন আছে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। শূদ্রের এই সংস্কারের অভাব উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব শূদ্রের বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না।

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ (৩৭)

তদভাব (শূদ্রত্বের অভাব) যখন নির্দ্ধারণ হইল, তখন প্রবৃত্তি হইয়াছিল, (ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শূদ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করা নিষিদ্ধ।

সত্যকাম গৌতমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। গৌতম সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কি গোত্র?" সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিলেন, তাঁহার গোত্র জানা নাই। গৌতম বলিলেন, "তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই। এজন্য জানিলাম, তুমি ব্রাহ্মণ।" এই বলিয়া সত্যকামের উপনয়ন প্রদান করিলেন।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ (৩৮)

শূদ্র কর্তৃক বেদ শ্রবণ, অধ্যয়ন, অর্থজ্ঞান এবং অনুষ্ঠান প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। স্মৃতিগ্রন্থেও নিষেধ আছে।

বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানের ফলে শূদ্রজন্মেও জ্ঞান হইয়াছিল দেখা যায়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

---

* উপনিষদের আখ্যায়িকাটি এইরূপ :—জানশ্রুতি রাজা গ্রীষ্মকালে প্রাসাদের ছাদে শুইয়াছিলেন। দেখিলেন, আকাশে কয়েকটি হংস উড়িয়া যাইতেছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস অগ্রগামী হংসকে বলিল, "ভল্লাক্ষ, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, রাজা জানশ্রুতির তেজ স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, ঐ তেজে তুমি পুড়িয়া যাইবে।" অগ্রগামী হংস বলিল, "তুমি যে জানশ্রুতিকে শকটযুক্ত রৈক্কের ন্যায় তেজস্বী বলিতেছ।" অর্থাৎ রৈক ব্রহ্মজ্ঞ এবং যথার্থ তেজস্বী, জানশ্রুতি বহু অন্নদান প্রভৃতি সংকীর্ত্তি করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। জানশ্রুতি হংসদের বাক্য শুনিয়া রৈক্কের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যালাভ করিলেন।

ঐ হংসগণ প্রকৃতপক্ষে ঋষি। জানশ্রুতির কল্যাণের জন্য তাঁহারা হংসরূপ ধারণ করিয়া এইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন।

ভারতযুদ্ধ-কাল-নির্ণয়

ভারতযুদ্ধ-কাল-নিরূপণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হইয়াছে। উইলফোর্ড মতে যুধিষ্ঠিরের কাল ১১৮০ খৃঃ পূঃ অব্দ এবং যুধিষ্ঠির জ্যোতিষী পরাশরের সমসাময়িক ছিলেন। ডেভিস বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ১৩৯১ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। কোলব্রুক, স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ মতেও ভারতযুদ্ধকাল ১১৮০ খৃষ্ট পূঃ অব্দ। ইঁহাদের গণনার অবলম্বন ছিল ভট্টোৎপলোদ্ধৃত পরাশরতন্ত্র-বচন। বুকানন্ মলয়দেশ ভ্রমণ করিয়া জানিয়াছিলেন, সেই দেশে পরশুরামাব্দ ব্যবহার ছিল, এবং ১৮০০ খৃঃ অব্দে পরশুরামাব্দের ২৯৭৬ বৎসর অতীত হইয়াছিল; অতএব এই পরশুরামের সময় ১১৭৬ খৃঃ পূঃ অব্দ ছিল এবং ইহাই পাণ্ডবকাল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়াছেন যে, "বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়।" পার্জিটারের মতে খৃঃ পূঃ ৯৫০ অব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ খৃঃ পূঃ ৯০০ অব্দ। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল মতে ভারতযুদ্ধকাল খৃঃ পূঃ ১৪২৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ভারতযুদ্ধকাল খৃঃ পূঃ ১৪৫৫ অব্দ, এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। অপর পক্ষে আমরা পাইতেছি যে, আর্য্যভট্টমতে ভারতযুদ্ধকাল, বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ; আবার বরাহমিহিরমতে যুধিষ্ঠিরকাল ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ অব্দ।

কোলব্রুক প্রভৃতির মতের অবলম্বন এই যে, পরাশরতন্ত্রে লিখিত আছে, ধনিষ্ঠানক্ষত্রের আদিতে উত্তরায়ণারম্ভ হইত। ডেভিস্ ধনিষ্ঠার আদি বিন্দুতে Alpha Delphinis অবস্থিত ছিল মনে করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী জন্মেজয়ের পুরোহিত তুরকাবসেয় হইতে গুণাখ্য সাংখ্যায়ন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ জনমেজয় হইতে গৌতম বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরা অবলম্বনে তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অন্যান্য সব মত পুরাণাশ্রিত এবং ইঁহাদের অধিকাংশেরই একমাত্র অবলম্বন এই বাক্য যে—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এবং বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥

"পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত ১০৫০ বৎসর" ইহা পুরাণের কোন প্রাচীন লেখকের লেখা নহে। ইহা এক জ্যোতিষীর লেখা। তাঁহার জ্যোতিষিক জ্ঞান বিশেষ কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে। ইঁহার মতের সঙ্গে পুরাণকথিত মগধরাজ-বংশাবলীর সঙ্গে ঐক্য নাই। ইনি অনেক পরের লেখক বলিয়াই মনে হয়। কি কিম্বদন্তী বা জ্যোতিষিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইনি এইরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। ইঁহার জ্যোতিষিক উক্তির কোন অর্থ করাও সম্ভবপর বোধ হয় না। আমরা মহাভারতাশ্রিত গণনাই গ্রহণীয় মনে করি। কিন্তু মহাভারতোক্তিতেও লেখক-পাঠক-অধ্যাপক-অধ্যেতৃ-দোষে অনেক আবর্জ্জনা জমিয়াছে। পূর্ব্বে "ভারত" ও "মহাভারত" দুইখানি গ্রন্থ ছিল, যথা—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ৩য় অধ্যায়, ৪র্থ কাণ্ডিকা, ৪র্থ সূত্রে আছে—"সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্রভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যা জানন্তি।" আমরা এক্ষণে শুধু মহাভারতই পাইতেছি; সুতরাং মহাভারত হইতেই বাছিয়া লইয়া ভারতযুদ্ধকাল—পাণ্ডবকাল নিরূপণের প্রয়াস পাইব। মহাভারতে পাণ্ডবকালের জ্ঞাপক দুই প্রকারের উক্তি পাওয়া যায়। একপ্রকার উক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে সেই কালের অয়ন এবং বিষুবস্থিতি পাওয়া যায়; অপর প্রকার উক্তিতে যুদ্ধকালীয় মাস, নক্ষত্র, ভীষ্মদেবের দেহত্যাগসময় হইতে ভারতযুদ্ধকালীয় অয়নান্ত বিন্দুর অবস্থিতি নিরূপণ সম্ভব। এই দ্বিতীয় প্রকার উক্তি হইতেও পাণ্ডবকাল নির্ণয় করা সহজ। আমরা ক্রমে এই দুই মত হইতেই ভারতযুদ্ধকাল বা পাণ্ডবকাল নিরূপণ করিতেছি।

(ক) মহাভারতাশ্রিত পাণ্ডবকালীয় অয়ন ও বিষুবস্থিতি-জ্ঞাপক বাক্যাবলী।

(১) শান্তিপর্ব্ব, ১৮২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"বরান্নপূর্ণা বিপ্রেভ্যঃ প্রাদান্মধুঘৃতপ্লুতাঃ।
তস্য নিত্যং স আষাঢ্যাং মাঘ্যাং চ বহবো দ্বিজাঃ॥ ১৭॥
ঈপ্সিতং ভোজনবরং লভন্তে সংকৃতং সদা।
বিশেষতস্তু কার্ত্তিক্যাং দ্বিজেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি॥ ১৮॥
শরদ্ব্যপায়ে রত্নানি পৌর্ণমাস্যামিতি শ্রুতিঃ।

বিপ্রগণ প্রতি বৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের ভবনে পরম সমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজনসামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন। আর শরৎকাল অতীত হইলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ।

এই বাক্য হইতে আমরা ইহা বুঝিতেছি যে, পাণ্ডবকালে কৃত্তিকানক্ষত্রাশ্রিত পূর্ণিমায় সূর্য্যের বাসন্ত বিষুবস্থিতি এবং মঘা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাতে সূর্য্যের দক্ষিণায়নান্ত বিন্দুতে অবস্থিতি ছিল। আষাঢ়ী পূর্ণিমা যে কেন পুণ্যকাল বলিয়া উল্লিখিত হইল, তাহার কারণ আমাদের অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য যে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা এখনও সৌর অগ্রহায়ণের মধ্যসময়ে হইতে পারে, যথা—বর্ত্তমান বাং সন ১৩৪০, ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হইয়াছে।

আমরা বুঝিতেছি যে, কৃত্তিকানক্ষত্রে বাসন্ত বিষুব এবং মঘা-নক্ষত্রে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু পাণ্ডবকালে অবস্থিত ছিল। বাসন্ত বিষুব হইতে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু ৯০° অংশ অর্থাৎ ৬¾ নক্ষত্র দূরে বলিয়া, যদি মঘানক্ষত্রের আদিবিন্দুতেই উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর স্থিতি ধরা যায়, তবে কৃত্তিকানক্ষত্রের প্রথম পাদান্তে বাসন্ত বিষুব ধরিতে হইবে।

(২) অনুশাসনপর্ব্বের ২৫শ অধ্যায়ে দুইটি শ্লোক আছে—

দশতীর্থসহস্রাণি তিস্রঃ কোট্যস্তথা পরাঃ। ৩৫২/১।
সমাগচ্ছন্তি মাঘ্যাং তু প্রয়াগে ভরতর্ষভ। ৩৬২/১।

উর্ব্বশীং কৃত্তিকাযোগে গত্বা চৈব সমাহিতঃ।
লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ৪৬ ॥

"প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিন কোটি দশ সহস্র তীর্থের সমাগম হয়। যিনি সেই মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগে পবিত্র হইয়া স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন।"

"কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সমাহিতচিত্তে উর্ব্বশীতীর্থে গমন ও নিয়মানুসারে লৌহিত্যতীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল-লাভ হয়।"

কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ।

এই স্থানেও আমরা পাণ্ডবকালীয় বাসন্ত বিষুব এবং উত্তরায়ণান্ত বিন্দু যে কৃত্তিকা ও মঘানক্ষত্রে ছিল, তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

(৩) অনুশাসনপর্ব্ব, ৬৪ অধ্যায়, এবং ৮৯ অধ্যায়, কালী-প্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারতানুবাদে কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে। সুতরাং পাণ্ডবকালের বাসন্ত বিষুব কৃত্তিকা-নক্ষত্রেই ছিল।

এই তিনটি প্রমাণের সঙ্গে পঞ্জিকায় লিখিত থাকে যে, মাঘী পূর্ণিমাতে কলিযুগোৎপত্তি এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি, এই বাক্যের ঐক্য হইতেছে। কারণ, যুগারম্ভ যে উত্তরায়ণারম্ভ হইতে হইত, তাহার প্রমাণ জ্যোতিষবেদাঙ্গ হইতে পাওয়া যাইতেছে, যথা—

স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাত্তদাদিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্ ॥

"যে সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র ধনিষ্ঠানক্ষত্রের সহিত আকাশে অবস্থিতি করেন, তাহাই যুগাদি, মাঘ বা তপঃ মাস, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ।"

সুতরাং পাণ্ডবকালে কৃত্তিকাতে বাসন্ত বিষুবস্থিতি ছিল এবং উত্তরায়ণান্ত বিন্দু মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। উপরে দেখান হইয়াছে যে, কৃত্তিকার অন্ততঃ প্রথম পাদান্তে বাসন্ত বিষুবস্থান ধরা যাইতে পারে। এক্ষণে কৃত্তিকা নক্ষত্রের আরম্ভ কোথায় ?

পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতে আছে—কৃত্তিকা ধ্রুবক হইতে ৬ অংশ পশ্চাতে কৃত্তিকা নক্ষত্রের আদি, আর্য্যভট্টমতে (শিষ্যধীবৃদ্ধিদ) কৃত্তিকা ধ্রুবক হইতে ৯ অংশ ২০ কলা পশ্চাতে কৃত্তিকার আদি; ব্রহ্মগুপ্ত-মতে কৃত্তিকা ধ্রুবক হইতে ১০ অংশ ৪৮ কলা পশ্চাতে কৃত্তিকার আদি; আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ঐ বিন্দু কৃত্তিকা-ধ্রুবক হইতে ১০ অংশ ৫০ কলা পশ্চাতে। ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণ করিতে গিয়া আমরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মতই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকার মতই এ স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং গ্রহণীয়। কৃত্তিকার আদিবিন্দু কৃত্তিকার ধ্রুবকান্ত হইতে ৬° অংশ পশ্চাতে অবস্থিত, ইহা হইতে ৩° অংশ ২০′ কলা বা একপাদ নক্ষত্র বাদ দিলে কৃত্তিকা ধ্রুবকের ২° অংশ ৪০′ কলা পশ্চাতে পাণ্ডবকালীয় বাসন্ত বিষুব ধরিতে পারা যায়।

এক্ষণে—

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিকার ধ্রুবক =	৫৮ ৬′
সুতরাং পঞ্চসিদ্ধান্তিকার কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তবিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট =	৫৫° ২৬′

এই ৫৫° অংশ ২৬′ কলা পরিমিতই হইল অয়নান্তাপসার।

খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে বার্ষিক অয়নগতি =	৪৯″·৩৯০৫ বিকলা
খৃষ্টীয় ১৯৩১ অব্দে =	৫০″·২৬৩৩ বিকলা
মধ্যমমান =	৪৯″·৮২৭ বিকলা
সুতরাং গতকাল =	৪০০৫ বৎসর

অতএব পাণ্ডবকাল হইতেছে খৃঃ পূঃ ২০৭৫ অব্দ। ইহাকেও পাণ্ডবকালের নিম্নসীমা ধরা যাইতে পারে।

আবার মঘা নক্ষত্রের আদি বিন্দুতেই উত্তরায়ণান্তবিন্দু (পাণ্ডবকালীয়) ধরিয়া কাল গণনা করা যাউক।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মঘাতারার ধ্রুবক =	১৪৯° ২০′
মঘানক্ষত্রের আদিবিন্দু মঘাধ্রুবক হইতে পঞ্চসিদ্ধান্তিকামতে ৬ অংশ পশ্চাতে বলিয়া মঘার আদিবিন্দুর স্ফুট =	১৪৩° ২০′
সুতরাং অয়নান্তাপসার =	৫৩° ২০′

অতএব পাণ্ডবকাল হইতেছে খৃঃ পূঃ ১৯২২ অব্দ। এই দুই নিরূপণের মধ্যমমান খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দ ধরা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দকে নিম্নসীমা ধরিয়া লইতেছি। এই সময় হইতে উর্দ্ধসীমা ৭২০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া ২৭২০ খৃঃ পূঃ অব্দে পড়িতে পারে, যেহেতু ঐ সময়ে পঞ্চসিদ্ধান্তিকার কৃত্তিকান্ত বিন্দুতে বাসন্ত বিষুবস্থিতি ছিল।

এই উভয় গণনায় আমরা স্থূলনক্ষত্র, বা ক্রান্তিবৃত্তের ১/২৭ অংশ বা ৮০০′ কলা পরিমিত স্থানকে নক্ষত্র ধরিয়া গণনা করিয়াছি। এক্ষণে "কার্ত্তিকী পূর্ণিমা" এবং "মাঘী পূর্ণিমা" দ্বারা বিষুব ও অয়ন সূচনা হইতেছে, তবে এ স্থানে নক্ষত্র শব্দে স্থূল নক্ষত্র ধরা উচিত মনে হইতেছে না। এগুলি "দৃষ্ট" নক্ষত্র বলিয়াই বুঝা উচিত। এইরূপ নক্ষত্র ভগ্রহযুতির নক্ষত্র বলিয়াই বুঝায়; সুতরাং "কৃত্তিকা" অর্থে কৃত্তিকাতারা এবং "মঘা" অর্থে মঘাতারা ধরিয়া লইয়া পুনরায় গণনা করিতে হইতেছে।

১৯৩১খৃঃ অব্দে কৃত্তিকার স্ফুট =	৫৯° ১′ ৪৪″।
সুতরাং পাণ্ডবকাল হইতে ১৯৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অয়নান্তাপসার এই—	৫৯° ১′ ৪৪″।
খৃঃ পূঃ ২৪০০ অব্দে অয়নগতি =	৪৯″·৩০১৮ বিকলা।
১৯৩১ খৃঃ অব্দে বার্ষিক অয়নগতি =	৫০″·২৬৩৩ বিকলা।
মধ্যমমান =	৪৯″·৭৮২৬ বিকলা।
গতকাল =	৪২৬৮ বৎসর।
অতএব পাণ্ডবকাল =	২৩৩৮ খৃঃ পূঃ অব্দ।

পুনরায় মঘা অর্থে মঘাতারা ধরিয়া লইলে কি সময় পাওয়া যায়, তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে—

১৯৩১খৃঃ অব্দে মঘার স্ফুট =	১৪৯° ২০′
সুতরাং অয়নাস্তাপসার =	৫৯°২০′
অতএব পাণ্ডবকাল =	২৩৬১খৃঃ পূঃ অব্দ।

এ স্থলে ইহাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে,

কৃত্তিকার স্ফুট =	৫৯°১′৪৪″
মঘার স্ফুট =	১৪৯°২০′
অন্তর =	৯০°১৮′১৬″

কৃত্তিকাতারায় ক্রান্তিবৃত্তীয় স্থানে বাসন্ত বিষুব অবস্থিত হইলে, মঘাতারা প্রায় ভেদ করিয়া উত্তরায়ণান্তরেখা গমন করে।

(খ) মহাভারতান্তর্গত যুদ্ধকালের সময়জ্ঞাপক বাক্যাবলী।

এক্ষণে আমরা মহাভারতান্তর্গত যুদ্ধকালজ্ঞাপক বাক্যাবলী হইতে ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণের প্রয়াস পাইতেছি। বলা বাহুল্য যে, আমরা উৎপাতলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া চলিব। যে সব গ্রহস্থিতি ও যে সকল গ্রহণ এই সব উৎপাতলক্ষণে আছে, তাহা ত্যাগ করিতেছি। কারণ, উৎপাতলক্ষণের কোনও ঐতিহাসিক বা জ্যোতিষিক মূল্য নাই। গ্রহস্থিতির ৬০ বৎসর পর পর স্থূলভাবে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন—

ষষ্ঠ্যা সূর্য্যাব্দানাং সর্ব্বে পূবয়স্তি ভপরিণাহম্।

সুতরাং গ্রহস্থিতি দ্বারা ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণ হয় না। শুধু তিথিনক্ষত্র দ্বারাও ভারতযুদ্ধকাল নিরূপিত করিতে পারা যায় না। কারণ, তিথিনক্ষত্রের পুনরাবৃত্তি ৩ বৎসর, ৫ বৎসর, ১৯ বৎসর বা ১৬০ বৎসর পর পর হইয়া থাকে। তার পর শুধু গ্রহণ দ্বারাও ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণ হয় না, কারণ, গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ১৮ বৎসর ১১ দিন পর পর হইয়া থাকে। আমরা চন্দ্র-নক্ষত্রযুতি এবং অয়নান্তাবস্থান দ্বারা ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণ করিতেছি।

উদ্‌যোগপর্ব্বে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—

সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদামাবস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে যুজ্যতাং তস্যাং তাং হ্যাহুঃ শক্রদেবতাম্॥
উদ্‌যোগপর্ব্ব, ১৮১ অঃ ১৮শ শ্লোক।

ইহা কর্ণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

"অদ্যাবধি সপ্তম দিন হইতে অমাবস্যা হইবে; ঐ অমাবস্যার দেবতা ইন্দ্র। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, তোমরা ঐ দিনে যুদ্ধ আরম্ভ কর।"

ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যার অর্থ জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত অমাবস্যা। এই অমাবস্যাতে অনেক সময় চান্দ্র অগ্রহায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধ ঠিক অমাবস্যায় আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ব্যাসদেব যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব-সন্ধ্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন,—

অলক্ষ্যে প্রভয়া হীনাং পৌর্ণমাসীং চ কার্ত্তিকীম্।
চন্দ্রোঽভূদগ্নিবর্ণশ্চ পদ্মবর্ণে নভঃস্থলে॥ ২৩।
ভীষ্মপর্ব্ব, ২য় অধ্যায়।

"আজি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীকে প্রভাহীন দেখিতেছি, পদ্মবর্ণে নভঃস্থলে চন্দ্র অগ্নিবর্ণ হইয়াছিল।"

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অমাবস্যা হইলে পরবর্ত্তী পূর্ণিমায় কৃত্তিকা-নক্ষত্র পড়ে না। কারণ, জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হইতে কৃত্তিকায় পৌঁছিতে ১৩ স্থূল নক্ষত্র পার হইয়া যায় এবং জ্যেষ্ঠাতারা (Antares) হইতে কৃত্তিকাতারায় পৌঁছিতে মধ্যম গতিতে চন্দ্রের ১২ দিন ২৩ ঘণ্টা লাগে। সুতরাং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বসন্ধ্যায় চন্দ্রকৃত্তিকাযোগ হইয়াছিল, এবং সে চন্দ্র তের দিনের চন্দ্র ছিল। এখানে ভগ্রহযুতিই বুঝাইতেছে। ব্যাসদেব ভ্রমক্রমে ১৩ দিনের চন্দ্রকে পরিপূর্ণ চন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, এবং পাণ্ডবকালে সুতরাং প্রাচীন মহাভারতোক্তিতে আমাদের মত তিথিনক্ষত্রগণনা ছিল, ইহা মানিয়া লওয়া উচিত বোধ হয় না। চন্দ্রনক্ষত্রযোগ দ্বারাই মাসপরিচয় হইত।

চতুর্দ্দশ রাত্রি যুদ্ধে ঘটোৎকচের নিধন হয়। ঐ রাত্রিতে যুদ্ধ অন্ধকারেই হইয়াছিল। সৈন্যগণ রাত্রিযুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া অর্দ্ধরাত্রির পর যুদ্ধক্ষেত্রেই নিদ্রাগত হইয়াছিল। পরে চন্দ্রোদয় হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

"যথা চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ ক্ষুভিতঃ সাগরোঽভবৎ।
তথা চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ স বভূব বলার্ণবঃ॥ ৬৫॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং পুনরেব বিশাম্পতে।
লোকে লোকবিনাশায় পরং লোকমভীপ্সতাম॥ ৬৫॥"
দ্রোণপর্ব্ব, ১৮৫ অধ্যায়।

"যেরূপ চন্দ্রোদয় হইলে সাগর উদ্ধূত এবং ক্ষুভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সেই বলসমুদ্র চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে উদ্ধূত হইল। হে রাজন্, তখন পুনরায় পরলোকে শ্রেষ্ঠগতিলাভার্থী সৈন্যগণের লোকবিনাশার্থ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

ঐ রাত্রিতে যুদ্ধ কখন্ আরম্ভ হইল, এই সম্বন্ধে এই উক্তি আছে—

"ত্রিভাগমাত্রশেষায়াং রাত্র্যাং যুদ্ধমবর্ত্তত।" দ্রোণপর্ব্ব, ১৮৭ অঃ ১ম শ্লোক।

"ঐ রাত্রির তিন ভাগ অতীত হইলে এবং এক ভাগ শেষ থাকিতে যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হইল।"

ঐ রাত্রিতে যেরূপ চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা এই—

"হরবৃষোত্তমগাত্রসমদ্যুতিঃ স্মরশরাসনপূর্ণসমপ্রভঃ।
নববধূস্মিতচারুমনোহরঃ প্রবিসৃতঃ কুমুদাকরবান্ধবঃ॥" ৬০॥
দ্রোণপর্ব্ব, ১৮৫ অধ্যায়।

"তখন সেই হরবৃষমস্তকসমপ্রভ, পূর্ণকন্দর্পচাপসদৃশ, নববধূর হাস্যের ন্যায় মনোহর কুমুদবান্ধব চন্দ্র আলোকমাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ।

চন্দ্র তীক্ষ্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট ছিল; শেষ রাত্রিতে, এক প্রহর থাকিতে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্ব-গণনায় সে রাত্রির চন্দ্র ২৭ দিনের চন্দ্র অর্থাৎ কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্র ছিল। এই বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, অমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভ হয় নাই। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বসন্ধ্যার চন্দ্র তের দিনের চন্দ্রই ছিল।

ভীম এবং দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধকালে বলদেব উপস্থিত ছিলেন, ঐ সময়ে শ্রবণানক্ষত্র হইয়াছিল। * গদাযুদ্ধের দিন সন্ধ্যায়

---

* চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ॥ শল্যপর্ব্ব, ৩৪ অধ্যায়।

চন্দ্রশ্রবণাযুতি হইয়াছিল। মধ্যমগতিতে চন্দ্রের কৃত্তিকা হইতে শ্রবণাতারাতে (Altair) পৌঁছিতে ১৮ দিন ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট লাগে। সুতরাং গদাযুদ্ধের দিন চন্দ্রশ্রবণাযোগ হইলে, তাহার ১৮ দিন পূর্ব্বে নিশ্চয়ই চন্দ্রকৃত্তিকাযুতি হইয়াছিল। ঐ দিনের সন্ধ্যায় চন্দ্র ৩১ দিনের চন্দ্র হইয়াছিল;

যুদ্ধারম্ভ হইতে ১০ দিন পর ভীষ্মের শরশয্যায় পতন, তাহার ৫৮ দিন পর উত্তরায়ণ এবং ভীষ্মের দেহত্যাগ।

"দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি কৌন্তেয় সহামাত্যো যুধিষ্ঠির।
পরিবৃত্তো হি ভগবান্ সহস্রাংশুর্দিবাকরঃ ॥
অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যাং শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা ॥
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥"

অনুশাসন, ১৬৭ অধ্যায়।

ভীষ্মদেব অন্তিমসময়ে যুধিষ্ঠিরকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, ভাগ্যক্রমেই তুমি অমাত্যগণসহ আসিয়াছ; ভগবান্ সহস্ররশ্মি দিবাকর পরিবৃত্ত হইয়াছেন। নিশিতাগ্র শরসমূহে শয়ান অবস্থায় থাকিয়া আমার অদ্য অষ্টপঞ্চাশৎ রাত্রি অতীত হইল; মনে হইতেছে, যেন একশত বৎসর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে চান্দ্রমাঘ সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারও তিন ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই পক্ষ শুক্ল হওয়া সম্ভব।"

এখানে "শুক্ল" কথাটি সংশয়াত্মকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা যেরূপ গণনা করিয়াছি, তাহাতে ইহা "শুক্ল" না হইয়া "কৃষ্ণ"ই হইবে।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বসন্ধ্যার চন্দ্র	১৩ দিনের।
ভীষ্মের শরশয্যায় পতনের দিনের চন্দ্র	২৩ দিনের।
ভীষ্মের দেহত্যাগের দিন তাহার	৫৮ দিনের পর।

মোটের উপর ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যার, (১৩ + ১০ + ৫৮)দিন = ৮১ দিন পর ভীষ্মের দেহত্যাগ এবং উত্তরায়ণারম্ভ। যদি মাস ধরিয়া হিসাব করা যায়, তবেও ঐ ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যা হইতে এই ৮১ দিনই হয়, যথা—

চান্দ্র অগ্রহায়ণ	= ২৯ ৫৩০৬ দিন
চান্দ্র পৌষ	= ২৯·৫৩০৬ দিন
¾ চান্দ্র মাঘ	= ২২ ১৪৮০ দিন
সমষ্টি—	= ৮১·২০৯২ দিন

অমাবস্যার ৮১ দিন পরের চন্দ্র ২২ দিনের চন্দ্র হয়, এই চন্দ্র কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্রই হইয়া থাকে। সুতরাং সংশয়াত্মক "শুক্ল" প্রকৃতপক্ষে "কৃষ্ণ"ই ছিল।

এই সকল বাক্য হইতে আমরা ভারতযুদ্ধকাল গণনার উপযোগী নিম্নলিখিত তিন প্রকার উপকরণ প্রাপ্ত হইতেছি।

১। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে একটি অমাবস্যা হইয়াছিল, ঐ সময়ে রবিচন্দ্র জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুতি হইয়াছিল। তার পর ৮১ দিন অতীত হইলে উত্তরায়ণারম্ভ হইয়াছিল।

২। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বসন্ধ্যায় চন্দ্র কৃত্তিকাযোগকালের ঠিক ১০ + ৫৮ = ৬৮ দিন পর উত্তরায়ণারম্ভ হইয়াছিল। ঐ পূর্ব্বসন্ধ্যার চন্দ্র ১৩ দিনের চন্দ্র ছিল।

৩। গদাযুদ্ধের ৫০ দিন পর ভীষ্মের দেহত্যাগ এবং উত্তরায়ণারম্ভ। গদাযুদ্ধের দিনের চন্দ্র ৩১ দিনের চন্দ্র, এবং চন্দ্রশ্রবণাযোগ হইয়াছিল।

আমরা স্থূল নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া ভগ্রহযুতির নক্ষত্র বা যোগতারা ধরিয়াই গণনা করিতেছি। জ্যেষ্ঠা অর্থে আমরা Antares, শ্রবণা অর্থে Altair, কৃত্তিকা অর্থে Eta Tauri গ্রহণ করিতেছি। এই সকল প্রাচীন উক্তি-সমূহে তিথি ত্যাগ পূর্ব্বক শুধু চন্দ্র এবং নক্ষত্রের উল্লেখ আছে।

প্রথম উপকরণানুযায়ী গণনা—

জ্যেষ্ঠাতারার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের স্ফুট =	২৪৮°৪৭′৫৭″
অতএব ঐ কথিত অমাবস্যান্তে সূর্য্যাবস্থানের বর্ত্তমান স্ফুট =	২৪৮°৪৭′৫৭″
৮১ দিনে সূর্য্যগতি =	৭৯°৫০′৩″
সুতরাং ভারতযুদ্ধকালীয় দক্ষিণায়নান্তবিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট =	৩২৮°৩৮′০″
অয়নান্তাপসার =	৫৮°৩৮′০″
খৃঃ পূঃ ২৩০০ অব্দে বার্ষিক অয়নগতি =	৪৯″·৩২৪০ বিকলা
খৃষ্টীয় ১৯৩১ অব্দে =	৫০″·২৬৩৩ বিকলা
মধ্যমমান =	৪৯″·৭৯৩৬ বিকলা
সুতরাং ভারতযুদ্ধকাল =	২৩১১ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দ।

দ্বিতীয় উপকরণানুযায়ী গণনা—

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বসন্ধ্যার চন্দ্র তের দিনের চন্দ্র, কৃত্তিকাযুক্ত ছিল। তাহার ৬৮ দিন পর উত্তরায়ণারম্ভ।

কৃত্তিকার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের স্ফুট =	৫৯°১′৪৪″
সুতরাং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বসন্ধ্যার চন্দ্রের বর্ত্তমান (১৯৩১) স্ফুট =	৫৯°১′৪৪″
১৩ দিনের চন্দ্র, সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তী ছিল $\frac{১৩ \times ৩৬০°}{২৯·৫৩০৫৮৮}$ অংশ	= ১৫৮°২৮′৪১″
ঐ পূর্ব্বসন্ধ্যার সূর্য্যাবস্থানের বর্ত্তমান স্ফুট =	২৬০°৩৩′৩″
৬৮ দিনে রবিগতি =	৬৭°১′১৭″
সুতরাং ভারতযুদ্ধকালীয় দক্ষিণায়নান্ত বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট =	৩২৭°৩৪′২০″
অয়নান্তাপসার =	৫৭°৩৪′২০″
সুতরাং ভারতযুদ্ধকাল =	২২৩১ খৃঃ পূঃ অব্দ।

তৃতীয় উপকরণানুযায়ী গণনা—

গদাযুদ্ধের দিন চন্দ্র-শ্রবণাযোগ; চন্দ্র ৩১ দিনের চন্দ্র; তাহার ৫০ দিন পর উত্তরায়ণারম্ভ।

শ্রবণার বর্ত্তমান (১৯৩১) স্ফুট =	২৯৭°১১′৩″
সুতরাং গদাযুদ্ধের দিনের সন্ধ্যায় চন্দ্রাবস্থানের বর্ত্তমান স্ফুট =	২৯৭°১১′৩″

চন্দ্র, সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তী ছিল, (৩১ × ৩৬০°) / ২৯·৫৩০৫৮৮ অংশ = ৩৭৭°৫৪'৪৭"

ঐ দিন সন্ধ্যায় সূর্য্যাবস্থানের বর্ত্তমান স্ফুট = ২৭৯°১৬'১৬"

৫০ দিনে রবিগতি = ৪৯°১৬'৫০"

সুতরাং ভারতযুদ্ধকালীয় দক্ষিণায়নান্ত বিন্দুর বর্ত্তমান (১৯৩১) স্ফুট = ৩২৮°৩৩'৬"

অয়নান্তপসার = ৫৮°৩৩'৬"

সুতরাং ভারতযুদ্ধকাল = ২৩০৫ খৃঃ পূঃ অব্দ।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে কয় প্রকারে ভারতযুদ্ধ নির্ণয় করিয়াছি, তাহা এই—

অবলম্বন	নক্ষত্র	অয়নান্তাপসার	নির্ণীত কাল	
বিষুবাবস্থান	কৃত্রিমকৃত্তিকা	৫৫° ২৬′	২০৭৫ খ্রীঃ পূঃ	নিম্নসীমা
উত্তরায়ণাবস্থান	কৃত্রিম মঘা	৫৩° ২০′	১৯২২ খ্রীঃ পূঃ	নিম্নসীমা
বিষুবাবস্থান	কৃত্রিমকৃত্তিকা	৬৫° ২৬′	২৭৯৫ খ্রীঃ পূঃ	উর্দ্ধসীমা
উত্তরায়ণাবস্থান	কৃত্রিম মঘা	৬৩° ২০′	২৬৪২ খ্রীঃ পূঃ	উর্দ্ধসীমা
বিষুবাবস্থান	দৃষ্ট কৃত্তিকা	৫৯° ১′৪৪″	২৩৩৮ খ্রীঃ পূঃ	
উত্তরায়ণাবস্থান	দৃষ্ট মঘা	৫৯° ২০′	২৩৬১ খ্রীঃ পূঃ	
যুদ্ধকালীয় উক্তি	দৃষ্ট জ্যেষ্ঠা	৫৮° ৩৮′	২৩১১ খ্রীঃ পূঃ	
ঐ	দৃষ্ট কৃত্তিকা	৫৭° ৩৪′ ২০″	২২৩১ খ্রীঃ পূঃ	
ঐ	দৃষ্ট শ্রবণা	৫৮° ৩৩′ ৬″	২৩০৫ খ্রীঃ পূঃ	
মধ্যম ফল		৫৮° ৫৭′ ৪১″	২৩৩১ খ্রীঃ পূঃ	

সুতরাং সমস্ত গণনার মধ্যমফল এই যে, ভারতযুদ্ধকাল প্রায় ২৩৩১ খৃঃ পূঃ অব্দে হইয়াছিল। যদি কৃত্রিম নক্ষত্রাশ্রিত গণনা ত্যাগ করা যায়, এবং শুধু দৃষ্ট নক্ষত্রাশ্রিত গণনাই অবলম্বন কর যায়, তবে ভারতযুদ্ধকালের মধ্যমফল ২৩১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে পড়ে. অন্তর মাত্র ১৬ বৎসর হয়।

সুতরাং মোটামুটি হিসাবে ভারতযুদ্ধকাল খৃঃ পূঃ ২৩২৫ এবং অয়নাস্তাপসার (১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ৫৮°৫২'৪২" গ্রহণ করা যাউক। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী, ভারতযুদ্ধকালীয় উত্তয়াবণান্ত বিন্দুর স্ফুট (১৯৩১ খৃষ্টাব্দে) ১৪৮° ৫২' ৪২"

মঘাতারার (Regulus) এর (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের) স্ফুট = ১৪৯° ২০' ০"

পুলস্ত্যতারার (Gamma Ursa Major) স্ফুট (১৯৩১) = ১৪৯° ৩০' ৪"

অত্রি তারার (Delta Ursa Major) স্ফুট (১৯৩১) ১৫০° ০' ৪২"

কৃত্তিকাতারা হইতে মঘা তারার অন্তর = ৯০° ১৮' ১৬"

এইরূপ তারার অবস্থানে কৃত্তিকাতারা পশ্চিমাকাশে, ভারত-যুদ্ধকালে, অস্তমিত হইলে দণিণোত্তর রেখায় মঘাতারা, মঘার দ্বিতীয় তারা বা Eta Leonis, পুলস্ত্য ও অত্রি তারা দৃষ্ট হইত। এ বিষয়ে আমাদের বৃদ্ধ গর্গের উক্তির সঙ্গে ঐক্য হইতেছে, যথা—

> কলিদ্বাপরসন্ধৌ তু স্থিতাস্তে পিতৃদৈবতম্।
> মুনয়ো ধর্ম্মনিরতাঃ প্রজানাং পালনে রতাঃ ॥
> ভট্টোৎপলধৃত বৃদ্ধগর্গবচন, বৃহৎসংহিতা, সপ্তর্ষিচার।

কলি এবং দ্বাপর যুগের সন্ধিতে স্বধর্ম্মনিরত এবং প্রজাপালনে রত মুনিগণ (সপ্তর্ষিগণ) মঘা নক্ষত্রে ছিলেন।

বরাহমিহির বৃদ্ধগর্গমতানুসরণ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

> আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ পালতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
> ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥
> বৃহৎসংহিতা, সপ্তর্ষিচার, ৩য় শ্লোক।

"রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। শককালের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে সেই রাজার কাল হয়।"

শকব্দার সঙ্গে ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয়, সুতরাং ঋণাত্মক ২৫২৬ এর সঙ্গে ৭৮ যোগ করিলে খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে যুধিষ্ঠিরাব্দ গণনারম্ভ ধরা যাইতে পারে। এই কাল আমাদের গণিত ২৩২৫ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১২৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও অসম্ভব বলিতে পারা যায় না। দ্রষ্টার ভ্রম জন্য গণিতকালের এই অনৈক্য সম্ভব হইতে পারে। বরাহমিহির অর্থ করিয়াছেন যে, সে সময়ে মঘা-তারা বা মঘাতারাপুঞ্জ পূর্ব্বদিকে উদিত হইলে, সপ্তর্ষিপংক্তি স্পষ্ট দেখা যাইত। আমাদের গণনায়ও তাহা আইসে, কারণ, আমাদের নিরূপিত ভারতযুদ্ধকালীয় উত্তরায়ণান্তগামী রেখা মঘাতারা ভেদ করিয়াই যাইত। ধ্রুবের উন্নতি ১৮° ১৫' হইলেই মঘার উদয় ও সপ্তর্ষিপংক্তির উদয় তখন সমকালিক হইতে পারিত। যদিও আমরা বরাহমিহির কি প্রকারে যুধিষ্ঠিরের কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখন চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারিব কি না সন্দেহ, তথাপি আমাদের গণনায় কোনওরূপ ভ্রান্তি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের গণিতলব্ধ ভারতযুদ্ধকালই ঠিক্ হউক বা বরাহমিহিরকথিত ভারতযুদ্ধকালই ঠিক্ হউক্, আমরা যতদূর বুঝিতেছি, ভারতযুদ্ধকাল খৃঃ পূঃ ২০০০ এর পরবর্ত্তী নহে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ (অধ্যাপক)

কেন ভালবাসি

তুমি মোর আশা, তৃপ্তি,
সুখ, শান্তি, জীবনের আলো,
সাধনা, কামনা তুমি,
তাই তো তোমারে বাসি ভালো।

শ্রীঅশ্রুপূর্ণ ভট্টাচার্য্য (বি-এস-সি)।

প্রত্যাবর্ত্তন

১

বাঃ, বেশ খাসা মেয়ে ত! যেমন নাচিতে পারে, তেমনই গাহিতে পারে। লেখাপড়া ত জানেই। সেই সঙ্গে লাঠি-খেলায় বাজী জিতিয়া ১০।১২টা মেডেলও পাইয়াছে!

মনে মনে এইরূপ অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে করিতে বন্ধু প্রোজ্জ্বলের সঙ্গে কুমারী ইরার গৃহ হইতে নীরেশ নিষ্ক্রান্ত হইল। ইরার সহিত প্রোজ্জ্বলের স্ত্রীর প্রণয়,—একই কলেজের পাঠ্যাবস্থা হইতে। শুনিয়া বন্ধু-পত্নীর উপরও তাহার শ্রদ্ধা শতগুণ বাড়িয়া গেল। সসম্ভ্রমে বন্ধুকে বিদায় দিয়া নীরেশ গৃহাভিমুখে ফিরিল।

মোড় ঘুরিতেই সম্মুখে এক চলন্ত মোটর তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া থমকিয়া গিয়াছে। ড্রাইভারের আসনে এক জন বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী,—পার্শ্বে এক জন রূপবান্ যুবক!

লজ্জায় নীরেশ কয়েক পদ পিছাইয়া গেল। গাড়ী পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

চলিতে চলিতে নীরেশের মনে হইল,—কুমারী ইরাও কি উহার মত গাড়ী চালাইতে পারে? সভ্য সমাজের যুবতী সে,—যুবকটি তাহার সাহচর্য্যে না জানি কতই সুখী!

কুমারী ইরা,—ই-রা,—বেশ সুন্দর নাম ত! শ্যামবর্ণা বটে; কিন্তু মেডেল-গুলা ঝুলাইয়া যখন সে করকম্পন করে, তখন তাহাকে কি সুন্দরই না দেখাইতেছিল! উহার যে স্বামী হইবে, উহাকে পাইয়া বোধ হয় সে খুবই ধন্য হইবে। আচ্ছা, সে কি তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না? পরিচয় ত পাওয়া গিয়াছে—ঠিক নীরেশের পালটা-ঘরই উহারা। তবে পিসীমা রাজী হয়েন কি না, ইহাই সমস্যা।

২

রান্না সারিয়া, পিসীমা বসিয়া আছেন,—নীরেশের অপেক্ষায়। ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। নীরেশ বাড়ী ফিরিল। তাহাকে দেখিয়াই পিসীমা বলিলেন,—"হ্যাঁ রে, এত বেলা পর্য্যন্ত কি কর্‌ছিলি? কখন্ রান্না হয়ে গেছে,—সেই ৯টা থেকে ঠায় হাঁড়ি নিয়ে ঠাকুর ব'সে! যা, যা, একটু জিরিয়ে শীগ্‌গীর চান্ ক'রে আয়।"

মাতাপিতা-ভাই-ভগিনী-বিহীন নীরেশ বাল্যকাল হইতে পিসীকেই একমাত্র অতি-আপন জন বলিয়া জানে,—নিঃসন্তান বিধবা পিসীমাও কলিকাতা সহরের কয়খানি বাড়ীর মালিকান্ স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াও, ভ্রাতুষ্পুত্রটির জন্যই এই বানপ্রস্থের বয়স,—'পঞ্চাশৎ'এর ঊর্দ্ধকালেও কাশী-বাস করিতে পারেন নাই। নীরেশের বিবাহ দিয়া, তাহাকে একটু সংসারী দেখিলে,—সংসার হইতে ছুটী লইতে তাঁহার যাহা কিছু একটু বিলম্ব! কিন্তু আজকালকার ছেলেরা সহজে বিবাহ করিতেই চায় না,—বিবাহের কথা উঠিলেই বলিয়া বসে,—দাঁড়াও, ২০০৲ টাকার গ্রেডে ঢুকি, তার পর দেখা যাবে তখন।

কিন্তু তাহার পিসীর বাড়ীভাড়ার মাসিক ৪ শত টাকা আয় বাঁধা থাকিতে কেন যে তাঁহার একমাত্র 'হবু' উত্তরাধিকারী নীরেশকে ২০০ টাকার গ্রেডের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে, তাহার কোন হেতু বৃদ্ধা ভাবিয়াই পান না।

কাযেই হাসিতে হাসিতে নীরেশ যখন বলিল,—"পিসী, এইবার তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ কর্‌ব,—মেয়ে দেখে এসেছি।"

রাধামাধব বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সাগ্রহে পিসী বলিলেন,—"ও মা, এত দিনে রাধামাধব তোর সুবুদ্ধি ঘটালেন! কোথায় দেখে এলি রে, কেমন মেয়ে সে?"

"বেশী বোলে আর দরকার নেই,—চমৎকার মেয়ে! কত মেডেল তার,—নাম শুনে থাক্‌বে বোধ হয়,—কুমারী ইরা।"

"কোন্ ইরা রে—সেই লেঠেল মেয়েটা না কি? তার পায়ের খুরে খুরে দণ্ডবৎ। সে কি তোদের বংশের যোগ্য? রামঃ, রামঃ। ও মা, সে যে মদ্দাদের সঙ্গে লাঠি খেলে,—তাদের হাত কচ্‌লা-কচ্‌লি ক'রে,—ঐ যে কি বলে,—বাক্স-বাজী খেলে! ও মা, সেই মেয়েকে বিয়ে কর্‌বি, ছ্যাঃ!"

"হ্যাঁ—মেডেল-শুদ্ধ তাকে দেখায় যেন ঠিক অসুর-নাশিনী ভগবতী।"

"না, বাপু, অমন ভগবতী-টগবতীর আমার দরকার নেই। একটা পরমাসুন্দরী লজ্জাশীলা, গেরস্তর মেয়ে হ'লেই আমার চল্‌বে। অমন বেহায়া মেয়ে ঘরে আন্‌লে পিতৃ-কুলের নাম-ডাক ডুব্‌বে যে।"

একটু শক্ত হইয়া নীরেশ বলিল,—"আমি যে তাকেই পছন্দ করেছি।"

পিসীমা রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন,—যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,"তাকে বিয়ে করতে হয়, কর্ গে যা। আমায় বাপু, কাশী রেখে আয়। বাড়ী'ক'খানা বেচে সেখানে একটা ধর্ম্মশালা খুলি গে,—পরকালের কায হবে অখন্।"

সপ্তাহমধ্যেই নীরেশ যখন দেখিল, সত্যই বাড়ী বেচিবার জন্য দালালরা পিসীমার সঙ্গে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেছে, তখন সে একমাত্র আপন-জনের বিরহাশঙ্কায় অনুতপ্তচিত্তে পিসীমার কাছে গিয়া বলিল,—"তোমার যে রকমের ইচ্ছে, সেই রকমের মেয়ে আন ঘরে। আমার কোনও অমত নাই।"

আনন্দে বৃদ্ধার চক্ষুতে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, বলিলেন—"রাধামাধব তোর মঙ্গল করুন!"

৩

নীরেশের পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু—ততোধিক ছিলেন আবার তাহার মা,—সন্ধ্যা-আহ্নিক না সারিয়া উভয়েই জলগ্রহণ করিতেন না।

উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত, মজ্জাগত সংস্কারের জয় হইল, না পিসীমার জিদ্ বজায় রহিল,—কে বলিতে পারে? ঐরূপ নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর ঘরের একটি সুন্দরী ষোড়শীর সঙ্গে নীরেশের শুভ-পরিণয়-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পিসী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বেচারী নববধূ না জানে ভাল করিয়া কথা কহিতে, না পারে সাহস-ভরে মুখ তুলিয়া চাহিতে, যেন লজ্জায় সে সদাই ম্রিয়মাণা—তাহা সে পুরুষই হউক, আর স্ত্রীলোকই হউক—সকলের সম্মুখে।

বিবাহের পর বৎসর ঘুরিতে যায়,—তবু তাহার সদা-সলজ্জ-ভাব যেন ঘুচে না!

বধূতে নীরেশের মন কি যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়, অথচ পায় না,—শুধু আছড়াইয়া পিছড়াইয়া মরে! ঐ যে বিস্তর স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, ট্রামে-বাসে, পার্কে-পথে, থিয়েটারে-বায়স্কোপে, পাশাপাশি অম্লানবদনে গল্প করে, তাহারা কেমন সুখী! তাহাদের মত একটি দিনও যদি সে তাহার সঙ্গে বাটীর বাহির হয়!

একবার একটা প্রশ্ন করিলে, সাতবার সেটার পুনরুক্তি করিতে হয়, তবে যদি একটা সলজ্জ, মৃদু উত্তর তাহার কাছ হইতে আদায় হয়। কি পোড়া কপালই তাহার! মানবের শক্তি-দায়িনী নাড়ী ইড়া যে ইরায় পরিণত হইয়াছে, তাহা কে না জানে? শক্তি না হউক্, শান্তি ত তাহার কপালে জুটিবে! তাই কুমারী ইরার সদৃশ নাম খুঁজিতে গিয়া বহুভাগ্যে, যদি বা নববধূর সে-কেলে "সুশীলা" নামের পরিবর্ত্তে পাইয়াছে সে—সুষুম্নার অপভ্রংশ সুষুমা বা সুষমা, তবু সেটা তাহাকে গ্রহণ করাইতে গিয়া তাহার কি কাল ঘামই না ছুটিয়াছিল! এমনই দুর্ভাগা সে! তবু বেচারা, সুষমায় শান্তি পায় কই?

যে আলোক-ধারায় তাহার হৃদয়-মন উছলিত, প্লাবিত হইয়া আছে, তাহার বর্ষণ কি সম্ভবে ঐ 'জড়ভরত' সুষমায়?

নীরেশের নৈরাশ্য দেখিয়া, প্রোজ্জ্বলের পত্নী প্রীতি রহস্য-সহকারে বলিলেন, "ছেলেবেলাকার সাধ-আহ্লাদ তোমার ত গিয়েছে সব, ঠাকুরপো। তোমরা বরং দু'জনে ভট্‌চায্যির টোল খুলে ফেল। আমরা না হয় মধ্যে মধ্যে গিয়ে এক-আধটা প্রেণামী দিয়ে, কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়ে আস্‌ব-এখন।"

নীরেশকে আরও অপ্রস্তুত হইতে দেখিয়া বন্ধুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রোজ্জ্বল বলিলেন,—"সুষমার আচরণটা মন্দ কোন্‌খানে শুনি? স্বামী যতক্ষণ না জল গ্রহণ করে, ততক্ষণ সে উপোসীই থাকে, তার মত স্বামি-সেবা করতে, পিস্-শাশুড়ীর যত্ন করতে নিষ্ঠেবতী এমন একটা মেয়ে আমাদের সভ্য সমাজের মধ্যে দেখাও ত দেখি?"

ঝঙ্কার দিয়া প্রীতি জবাব দিলেন, "আরে! নাও,—এ আবার তোমার একটা কথা। কেন? নীরেশের বাড়ীতে কি ঝি-চাকরের অভাব যে, অমন আদরের সামগ্রী বউ মানুষ সকলের কন্না ক'র্‌তে যাবে? ও-সব নীতি-কথা দরকার শুধু সেইখানে, যাদের ঘরে পয়সা নেই, ঝি-চাকর রাখবার সামর্থ্য নেই। ওর ঘরে সে-সবের অভাব কোন্‌খানটায় শুনি?"

"হ্যাঁ, ঝি-চাকরদের সেবায় প্রাণের তেমন দরদ থাকে কি না?" বলিয়াই প্রোজ্জ্বলের দৃষ্টি সহসা প্রীতির মুখের উপর পড়িতে, তাঁহার যেন মনে হইল,—কথাগুলিতে পত্নী সহসা আহতা হইয়াছেন! কারণ, সেবা নামের কোনও কাযেই প্রীতি অভ্যস্ত নহেন। রুজ—পোমেটম্—ল্যাভেণ্ডার,

থিয়েটার—বায়স্কোপ, আখড়া, সম্মিলন, এই সব চর্চ্চাতেই দিন-রাত্রি অধিকাংশ সময় কাটে যে !

কথাটার মোড় ঘুরাইয়া দিবার জন্য প্রোজ্জ্বল তাড়াতাড়ি বলিলেন—"অভিনয়-রাজ্যের রাণী মার্লিন ডিট্রিইচের ভাল প্লে আছে আজ,—ত্থানা টিকিট আনিয়েছি ! যাবে ত শীগ্‌গীর তৈরী হয়ে নাও। এই নাও টিকিট ত্'খান।"

প্রীতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যাবে না ?"

—"নাঃ, আজ আমার শরীরটা ভাল নয়। তুমি আর নীরেশ,—তোমরা ত্'জন বরং বেরিয়ে পড়। আমি কাল যাব অখন্।"

ভাল পোষাকেই নীরেশ বাহির হইয়াছিল,—প্রীতি সত্বর সাজসজ্জা সারিয়া লইলেন। কয়েক দিন মাত্র হইল, প্রীতি মোটর হাঁকাইয়া গিয়াছেন। নীরেশ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া চলিল। যে দিন যুবতী-ড্রাইভারটা তাহাকে হঠাৎ চাপা দিতে দিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, সেই দিনকার কথা আজ তাহার মনের ফাঁকে বড় করিয়া জাঁকিয়া বসিল। আজ সে কি সুখী নহে ? ভাগ্যবান নহে ?

৪

মিঃ প্রোজ্জ্বল রায়,—কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট। ৫ বৎসরের মধ্যেই সহসা তাঁহার পসারটা যেন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। সকাল-সন্ধ্যায় মক্কেলের দল তাঁহার বৈঠকখানা হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী রাস্তার বারান্দা পর্য্যন্ত, যেন বাতুড়ের মত ঝুলিতে থাকে ! কাযেই তাঁহার ফুরসৎ নাই,—থিয়েটার, টকি, কিংবা বায়স্কোপ দেখিবার বা স্ত্রীকে দেখাইবার পক্ষে।

নীরেশই এখন প্রীতিদেবীর একমাত্র ভরসা। সেই-ই যত্র-তত্র তাঁহাকে লইয়া যায়।

অবশ্যই সভ্য সমাজের শিক্ষিতা, আলোক-প্রাপ্তা প্রীতি রায় অতটুকু 'তোয়াক্কা' নীরেশের না রাখিলেই নয়, এমন নহে। তবে কি না, নেশায় যেমন সঙ্গী না হইলে আনন্দ মিলে না, বায়স্কোপ বা থিয়েটারের বেলা ঠিক তেমনটিই খাটে বোধ হয় !

সে দিন ছিল শনিবার,—আগে হইতেই টকির সমস্ত 'সীট' রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে। ষ্টীয়ারিং হুইলে হাত রাখিয়া প্রীতি বলিলেন—"আজ ত বায়স্কোপ দেখা ঘ'টে উঠল না। আর এত সকালে বাড়ী ফিরেই বা কি করব। তার চেয়ে বরং আজকের পূর্ণিমার রাতে,—চল মাঠের কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক্।"

বলিয়াই প্রীতি দ্বিগুণবেগে মোটর হাঁকাইয়া দিলেন। তাঁহারা তখন চলিলেন,—যেন কোন্ নিরুদ্দেশ স্থানের উদ্দেশে।

কি একটা ভারি 'কেসের' উপলক্ষে, প্রোজ্জ্বলকে দিন দশেকের জন্য বরিশালে যাইতে হইল। বাড়ীর সমস্ত দেখা-শুনার ভার নীরেশের উপরই রহিয়া গেল।

প্রোজ্জ্বলের গৃহ-তত্ত্বাবধানে নীরেশও এমনই ব্যাপৃত হইয়া পড়িল যে, সব দিন সময়মত সে নিজ বাটীতে জুটিতে পারিত না,—এমন কি, কোনও কোনও দিন রাত্রিতে পর্য্যন্তও না !

আর যে দিন বা আফিস যাইবার সময় হঠাৎ সে আসিয়া পড়িত, সে দিন তাহার এমন এতটুকু সময় পর্য্যন্ত থাকিত না যে, ভণিতা করিয়া ত্' দণ্ড সুষমা কথা কয় !

যে দিন রাত্রিবিশেষের দ্বিপ্রহরের পর তাহার বাটী ফিরিবার সময় ঘটিয়া যাইত, সে দিন হয় সুষমা অপেক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, নয় ত বা অভিমানে তাহার অন্তরটা এমনভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত যে, নিজে যাচিয়া মুখ ফুটিয়া একটি কথা পর্য্যন্তও কহিবার শক্তি তাহার থাকিত না।

প্রোজ্জ্বল ফিরিলেন। তুই চারি দিন চলিয়া গেল, তবুও নীরেশের কায ফুরায় না কেন ? সেই গতানুগতিক ভাব। ঠিক আফিসের সময়টিতে ছুটিয়া আসা আর মধ্য-রাত্রির পর ঘরে ঢুকিয়াই মড়ার মত বিছানায় পড়া আর মিনিট খানেকের মধ্যে নাক ডাকান !

এক জন ত বেশ ঘুমায়, তবে নীরব-নিশীথে সুষমার কেন নিদ্রা আসে না ?

সে দিন ঘরের মধ্যে কি একটা শব্দে চমকাইয়া নীরেশকে কয়েকবার সে ঠেলিয়াছিল। তবু কি ছাই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল ?—অবশেষে নিজেই হুম-দাম শব্দে আলো জ্বালিয়া ঘরের কোণ, খাটের তলা, সুটকেশের পশ্চাৎ, দরজার খিল, এ সব তন্ন-তন্ন দেখিয়া আলো নিভাইয়া তবে শোয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এততেও নীরেশের ঘুম ভাঙ্গিল না ! 'বলি, এত ঘুমটা কিসের ওর শুনি ?—নেশা-টেশা ক'রে না কি,—এই যেমন সিদ্ধি ?'

আচ্ছা, আফিসের কোটটা আজ, জুতা-জোড়াটা কাল, স্নানের গামছাটা পরশ্ব এমনই করিয়া লুকাইয়া রাখিলে কেমন হয়? দুই একটা কোন্দলের কথা, 'চেঁচামেচি' এমনইতর একটা কিছু যদি বা হয় ই—মন্দ কি! বেশ গরম গরম দুই চারিটা কথা শুনাইয়া দেওয়া যাইবে এখন।

কিন্তু, আঃ পোড়াকপাল! উহাতেও তাহার গা' ঘামিল না যে! বেশ স্বচ্ছন্দে অন্য কোটে, অপর জুতা-জোড়ায়, শুষ্ক কাপড়ের খুঁটে কায চালাইয়া দিল যে,—একটা কথাও মুখে বলিল না! আচ্ছা লোক ত সে! এমনটি বুঝি ভূ-ভারতেও মিলে না! ইহার পর সুষমা অন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে?

আচ্ছা, অমন ভালমানুষটির ভিতরে অত-বড় ঔদাসীন্যই বা কেন? সে কি তবে তাহার মনের মত নহে? হইবেই বা!

হ্যাঁ, মনে পড়ে,—বিবাহের পর (সে সব কি দিনই না গিয়াছে), সে সাধ করিয়া শ্লীপার কিনিয়া আনিতে চাহিয়াছিল, তাহার সহিত পাশাপাশি রাস্তায়-ঘাটে, বাসে-বায়স্কোপে বেড়াইয়া বেড়াইতে,—বন্ধু প্রোজ্জ্বলের সঙ্গে মাথার কাপড় খুলিয়া সহজ-সরলভাবে বাক্যালাপ করিতে,—পিস্-শাশুড়ীর মুখের উপর (ও মা কি ঘৃণা, লজ্জা-সরম জলাঞ্জলি দিয়া!) তাহার সহিত প্রাণখোলা আলাপ করিতে। কিন্তু, তাহার বংশের কেহ যাহা পারে নাই, তাহা সে করে কি করিয়া?

বাড়ীর পুরাতন বিশ্বস্ত চাকর রেমোকে দিয়া সুষমা গোপন-অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিল। সে জানিল,—তাহার দাদাবাবু বেশীর ভাগ সময় কাটান প্রোজ্জ্বলের বাটীতে,—কখনও বা কুমারী ইরাদের চায়ের পার্টিতে আলোক-প্রাপ্তা মহিলাদের সাহচর্য্যে আর বাকী সময়টা ব্যয়িত হয়—ঐ সব উজ্জ্বলাদিগের সাথে বায়স্কোপ-থিয়েটার আর ব্যায়াম-আখড়ার মজলিসে

আর একটা আশ্চর্য্য সংবাদ সে দিল,—গত কয়েক দিন যাবৎ প্রোজ্জ্বল বাবুর টায়ফয়েড জ্বর হইয়াছে। পাছে 'ছোঁয়াচ্' লাগে, তাই প্রীতি স্বামীর ঘর পর্য্যন্তও মাড়ান না! প্রোজ্জ্বলের বৃদ্ধা মা তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। আর প্রীতি দিনের অধিকাংশ সময় কাটান কুমারী ইরাদের আখড়ার জন্য লোকের বাড়ী বাড়ী চাঁদা সংগ্রহে, কিংবা কোথাও কোন শো দেখাইবার প্রাক্কালীন বন্দোবস্ত করার ব্যাপারে। আর তাহার দাদা বাবু? তিনি ঘুরিয়া বেড়ান ঐ সব প্রজাপতির সঙ্গে এখানে সেখানে।

হ্যাঁঃ, এত দিনে বুঝা গেল,—তাঁহার মনটা ঘরে টিকে না কেন। বাহিরে অত মাতামাতি করিয়া আসিয়াই বিছানায় পড়িয়া মড়ার মত নিঃসাড়ে ঘুমাইবার হেতু কি!

৫

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সুষমা স্থির করিল,—তাহার কার্য্য-ধারা সে বদলাইবেই; অন্ততঃ ঐ বাহারে প্রজাপতিদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া দেখিবে, নীরেশের দৌড়টা কতদূর!

ইচ্ছা থাকিলে, সুযোগের অভাব কি? দিন-পনেরর জন্য পিস্‌শাশুড়ী কাশীর 'অন্ন-কূটে' গিয়াছেন। বাড়ীতে একা তাহার ভালও লাগিতেছিল না। এই সুযোগে একটা মজা করিলে হয় না?

হাল ফ্যাসানের মেয়েদের সে কতবার রাস্তায় ঘাটে একাকিনী দেখিয়াছে। তাহাদের মত সাজ-সজ্জা করিয়া, নীরেশের পছন্দ করিয়া কিনিয়া দেওয়া স্লিপার জোড়াটা পায়ে গলাইয়া, বাড়ী-ঘর-দোর রেমোর জিম্মায় দিয়া সুষমা এক দিন সহসা গাড়ী করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই দিনই মধ্য-রাত্রিতে বাটী ফিরিয়া নীরেশ দেখিল,—বাড়ী শূন্য, যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। রেমোর নিকট শুধু এইটুকু জানিল,—সেই যে বেলা বারোটার সময় গাড়ী ডাকিয়া বৌদিদিমণি বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছেন, তদবধি আর ফিরেন নাই। তাই ত! এ কেমন হইল!

সুষমার বাপের কুটুম্বদের নিকট নীরেশ সেই রাত্রিতেই দৌড়াদৌড়ি সুরু করিয়া দিল, কিন্তু কোনও উদ্দেশই পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে প্রভাতের আলো দেখা দিল। নীরেশ দুশ্চিন্তায় পাগলের মত হইল।

পরদিন প্রাতে ম্লান-অবসন্ন মুখে নীরেশ প্রোজ্জ্বলের বাটী দেখা দিল। সকল কথা শুনিয়া প্রীতিও চিন্তিত হইলেন

প্রোজ্জ্বলের মা প্রাতস্নান করিবার জন্য রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন। পথে নীরেশের সহিত দেখা। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "অমন গুণের বৌ আজকাল আর দেখা যায় না—সেই কোন্ সকালে দু'টো হাতে-ভাতে ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তার পর রোগীর চর্য্যায় সমস্ত রাতটা তার বুকের ওপর দিয়ে চ'লে গিয়েছে,—মুখে

জলটুকু পর্য্যন্ত দেয়নি, আহা! বেঁচে থাক্ ভাগ্যিবন্ত— হাতের নোয়া সিঁদূর চির-বজায় হক্ তার।"

সোৎসুকে নীরেশ বলিল,—"কে, মাসীমা?"

"কেন, তোমার বউ, সুষমা! তুমি কিছু জান না বুঝি? ও মা, অবাক্ করলে যে!"

"না, মাসীমা, সত্যই জানি না।"

প্রীতিও ইতিমধ্যে ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন,—"কি সৌভাগ্য আমার, সুষমা এসেছে এ বাড়ীতে। কই, আমায় ত কিছু বলেন নি, মা?"

"তুমি কি বাড়ী ছিলে বাপু? তা' ছাড়া—ছেলের যে টাল্ গিয়েছে কাল। ডাক্তার-কব্রেজের তাল সামলায়ই বা কে, আর রোগীর চর্য্যা করেই বা কে? সবই ত আমার ওপর আর ঐ একটা বাইরের নার্শের ওপর!"

আজ যেন 'ছোঁয়াচ' বাধাটার বাঁধ তাহাদের দুইজনকে, প্রীতি আর নীরেশকে,—তেমন করিয়া আট্‌কাইতে পারিল না। প্রীতি সুষমার দৃষ্টান্তে আপনাকে ঘোর অপরাধিনী মনে করিলেন। তিনি স্বামীর কক্ষে সন্তপ্ত মনে প্রবেশ করিলেন। নীরেশও তাঁহার অনুসরণ করিল। সত্যই সুষমা রোগীর মাথায় আইস্‌ব্যাগটা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। কোথায় গিয়াছে তাহার ঘোমটা, আর কোথায় সে সলজ্জ ভাব,—যেন একটি জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি! উঁহাদের দেখিয়া কোনও চাঞ্চল্যই সে প্রকাশ করিল না,—যেন ঐ কায সে কত দিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। প্রীতি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিলেন। নীরেশ বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহির হইলে সে সুষমাকে ধরিবে, এই আশায় নীরেশ একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছিল।

স্নানের সময় বাহিরে আসিতেই সুষমাকে নিভৃতে পাইয়া, নীরেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"বলি, কাল্‌কের রাতটুকু ত এখানে কাটালে। বাড়ী-টাড়ি যেতে হবে না?"

অচঞ্চলমুখে সে উত্তর করিল,—"যত দিন না প্রোজ্জ্বল বাবু সেরে ওঠেন, তত দিন আর যেতে পাচ্ছি কৈ?"

বাক্যের প্রচ্ছন্ন অভিমান নীরেশকে বিঁধিল। সে বলিল,— "ইস্, বলি,—নার্সগিরি আবার শিখলে কবে থেকে?"

বড় দুঃখে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল,— "অবস্থাবিপর্য্যয়ে পড়লে মানুষকে সবই শিখতে হয়।"

—"কি অবস্থাবিপর্য্যয়টা ঘটল তোমার, শুনি— পণ্ডিতমশাই?"

"সেটা শোনবার জন্যে আজই কেন তোমার অত পেট কামড়াচ্ছে, বল দেখি। গত ক'মাসের মধ্যে সেটা শুধুবারও অবসর পাওনি, বুঝি?"

নীরেশের সহসা মনে পড়িয়া গেল,—সত্যই ত, সে কয়েক মাস তাহাকে অত্যন্ত হতাদর করিয়া আসিয়াছে— সোহাগের কথা ছাড়িয়া দিলেও একটা মিষ্ট কথা পর্য্যন্তও সে ভ্রমক্রমে কহে নাই। একটু অনুতপ্তস্বরে সে বলিল, "বড্ডই ভুল হয়ে গেছে,—ভারী অন্যায় করেছি। কিন্তু সে অপরাধের কোনও ক্ষমা নাই কি?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে সুষমা বলিল,—"কি যে বল, তার ঠিক নেই। তুমি আমার স্বামী দেবতা,—তুমি আমায় ক্ষমা করবে, না তোমায় আমি—"

নীরেশ বলিল,—"তোমার অপরাধটাই যে খুঁজে পাইনি, তা আবার ক্ষমা—"

কথা কাড়িয়া লইয়া সুষমা বলিল,—"তুমি না পেয়ে থাক, আমি ত পেয়েছি।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

—"আচ্ছা, না হয় অজানা অপরাধ মাপই করলুম,— ঘরে ফিরবে কখন্, বল?"

—"ফিরব, কিন্তু, একটা সর্ত্তে—"

—"কি সে?"

—"আফিসের সময়টুকু ছাড়া এবারে যখনই তুমি বাইরে যাবে, আমাকে সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু—"

—"ওঃ, এই কথা? ও আর্জ্জি তো কবে হুজুরের নিকট পেশ করা হয়েছিল।"

সহসা প্রীতি আসিয়া সুষমার হাত ধরিয়া টানিলেন। বলিলেন,—"বোন্, শুধু গল্পেই কি পেট ভরবে? চল, বেলা গেছে, তোমায় চান্ করিয়ে আনি গে। বয়সে ছোট হলেও তুমি আমার দিদি। আমাকে ক্ষমা করো বোন্।"

সুষমা প্রীতির মুখের দিকে চাহিল। নারীর জন্মগত সংস্কার কি আজ এই আধুনিকার প্রাণে নব উদ্যমে জাগিয়া উঠিয়াছে?

ধীরে ধীরে সে প্রীতির সহিত স্নানাগারের দিকে চলিয়া গেল।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ (বি-এল)।

কালিদাস ও আর্য্য-সভ্যতা

দ্বিতীয় স্তর

সভ্যতা বলিলে কি বুঝায়? মানুষের ইতিহাস যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য সন্তানের মত যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিত, কন্দমূলফল অথবা আমমাংস ভক্ষণ করিত, তাহার কোন সমাজ বা সমাজের বিধিনিষেধ ছিল না, বাহুবলই তখন ছিল অধিকারের গোড়ার কথা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কল্পিত চিত্রে দেখা যায়, বলবান্ পুরুষ তাহার বাঞ্ছিত নারীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহার গুহায় লইয়া যাইতেছে।

আমাদের দেশেও শ্বেতকেতুর পূর্ব্বে সমাজে বিবাহের সৃষ্টি হয় নাই। বিবাহ সামাজিক বিধিনিষেধের প্রধান অঙ্গ। সমাজবদ্ধ হইয়া যখন মানুষ বসবাস করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই তাহার আইন-কানুন ও বিধিনিষেধের সৃষ্টি হইল। শ্বেতকেতু যখন দেখিলেন, তাঁহার জননীকে এক জন বলবান্ পুরুষ ধর্ষণ করিতেছে, তখনই তিনি এই অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়ের জন্য আইনের কড়াকড়ির প্রবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে মানুষ যতই সমাজবদ্ধ হইতে লাগিল, ততই প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে লাগিল এবং প্রকৃতির আইন-কানুনের তোয়াক্কা না রাখিয়া আপনাদের আইন-কানুন প্রণয়ন করিতে লাগিল।

সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, সমাজবদ্ধ জীবের সভ্যতা-প্রতিষ্ঠা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করারই নামান্তর। সভ্যতার যতই বিকাশ হইয়াছে, ততই মানুষ লজ্জাসরম, শ্লীলতা, শালীনতা, শিষ্টতা, ভব্যতা প্রভৃতি মানুষের সৃষ্ট গুণের অনুসরণ করিয়া প্রকৃতির নগ্ন পশুত্বের ভাবকে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছে। মানুষের নীতি হইল প্রকৃতির দুর্নীতির বিরোধ। ইহাই সভ্যতা।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার আরাম ও ভোগবিলাসের জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার উপায় অবলম্বন করিয়াছে। প্রকৃতির ঝড়বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার্থে মানুষ বৃক্ষশাখা ও গুহার আশ্রয় ছাড়িয়া কুটীর ও পরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, আমমাংস ছাড়িয়া রন্ধনের দ্বারা প্রস্তুত মাংস আহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, প্রকৃতির নগ্নতার লজ্জা ঢাকিবার জন্য বৃক্ষপত্র ছাড়িয়া কার্পাস, রেশম ও পশম-বস্ত্রের আচ্ছাদনের আশ্রয় লইয়াছে, এমন কি, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক ব্যবধান লঙ্ঘনের জন্য যানবাহনের সৃষ্টি করিয়াছে। শেষে ভূগর্ভে প্রোথিত প্রকৃতির ধন-রত্ন (কয়লা, লৌহ, মণিমাণিক্য, তৈল প্রভৃতি) আহরণ করিয়া আপনার কাযে লাগাইয়াছে এবং রাবণ যেমন দিকপালগণকে নিজের কাযে খাটাইয়া লইয়াছিল, তেমনই প্রকৃতির জল, বিদ্যুৎ, বায়ু প্রভৃতি শক্তিকে ধরিয়া খাটাইয়া লইতেছে।

মানুষ সভ্যতার স্তরের পর স্তরে যত উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে,ততই সে প্রকৃতির নীতি ছাড়িয়া আপনার গড়া নীতির অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই তাহার চরিত্রের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। তাহার পর সে আপনার বংশানুক্রমিক আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবধারা, সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিখিল। পূর্ব্বপুরুষগণ যেভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ধারা বংশ ও গোষ্ঠীতে সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজের এবং তাঁহাদের উত্তরপুরুষদের জন্য কাহিনী, ইতিহাস, পুরাণ ও সাহিত্য সৃষ্টি করিল। মানব-সভ্যতা এইরূপে স্তরের পর স্তর আরোহণ করিতে লাগিল।

এই সাহিত্যের মধ্যে কাব্য, নাটক, গাথা, ইতিকথা, উপন্যাস ও গল্পই প্রধান। আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য হইতে আমাদের আর্য্য সভ্যতার প্রাণধারা গোমুখী-নিঃসৃত পবিত্র জাহ্নবীধারার মত আবহমানকাল বহিয়া আসিতেছে এবং উহা হইতে আর্য্যজাতি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাহাদের চরিত্র, চিন্তা-ধারা ও সাহিত্য-জ্ঞানবিজ্ঞান পুষ্ট করিয়াছে। উপন্যাস ও ছোট গল্প ঠিক আমাদের দেশের নিজস্ব জিনিষ নহে, উহা প্রতীচ্যের আমদানী। আমাদের দেশে কাদম্বরী, কথাসরিৎসাগর, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার মত গল্পের প্রচলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঠিক যে ভাবে প্রতীচ্যে Novel বা Short story লিখিত হয়, সেভাবে প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে এ দেশে কথাসাহিত্যের প্রচলন হয় নাই।

কিন্তু নাটক সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। আর্য্য সভ্যতার আদিম যুগে—কত যুগ যুগ পূর্ব্বে নাটকের প্রচলন হইয়াছিল, তাহা এখনও ঠিক নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,অতি প্রাচীন যুগে এ দেশে নাটকের প্রভাব সুবিস্তৃত হইয়াছিল এবং রাজারাজড়ার রাজপ্রাসাদে রীতিমত রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। নটনটী, কুশীলব, প্রেক্ষণাগার ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব ছিল না এবং থিয়েটারের টেকনিকও যে বিশেষরূপে জানা ছিল, তাহাও সংস্কৃত নাটক হইতে জানা যায়।

নাটকের অবস্থা-সমাবেশ, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং চরিত্রের ক্রমবিকাশই হইল জান। এ বিষয়ে অতি প্রাচীন যুগেও সংস্কৃত নাট্যকাররা প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির কি চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। নাট্যকার যে যুগের, সেই যুগের প্রাসাদ হইতে কুটীরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের নিখুঁত ছবি আশ্চর্য্য কৌশলে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, সে ছবি দেখিয়া মনে হয়, এখনও যেন আমরা সেই যুগে বিচরণ করিতেছি, সে যুগের মানুষ-মানুষীকে কথা কহিতে দেখিতেছি, সেই যুগের সমাজের আচার-ব্যবহার, খাওয়া-পরা, ভালবাসা-ঘৃণা, হর্ষ-বিষাদ প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের সম্মুখীন হইয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিতে হয়, আর্য্যজাতির কত মহান্ ও বিরাট সভ্যতার যুগেই না সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছিল!

বস্তুতঃ জাতির সভ্যতার চরম বিকাশের যুগেই শ্রেষ্ঠ নাটক ও শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইয়া থাকে। মৃত গ্রীক ও রোমক সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিলেও জীবন্ত ইংরাজী সভ্যতার চরম বিকাশ হইয়াছিল রাণী এলিজাবেথের যুগে—সেক্সপীয়ারের নাটকে এবং মিলটনের কাব্যে। তেমনই আমাদের দেশে উজ্জয়িনীর গুপ্তবংশীয়

সম্রাটদিগের যুগে আর্য্যসভ্যতার চরম বিকাশ হইয়াছিল— বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় এবং কালিদাসের নাটকে ও কাব্যে।

ঘটনাসমাবেশ ও চরিত্রবিকাশ

নাটকের যাহা প্রাণধারা এবং যাহা জাতির সভ্যতার উৎকর্ষ অপকর্ষের ব্যারোমিটার, সেই ঘটনাসমাবেশ ও চরিত্রের ক্রম-বিকাশে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপিয়ার কি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই কিছু নমুনা দিতেছি।

তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy) কিং লীয়র। প্রসিদ্ধ dramatic critic Hazlitt এই নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"We wish we could pass this play over and say nothing about it. All that we can say fall far short of the subject, অর্থাৎ—

এই নাটকের কোন সমালোচনা না করিয়া নীরব থাকিতে ইচ্ছা করে। আমরা যাহাই বলি না কেন, এই নাটকের বিষয়-বস্তুর আলোচনার পক্ষে তাহা অতি তুচ্ছই হইবে।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে। 'লিয়রে' মহাকবি সেক্সপিয়ার মানুষের মনের গভীরতম আকুঞ্চন-প্রসারণ লইয়া যে যাদুকরের ভেল্কী-বাজী খেলিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত Master mindএই সম্ভব। অবশ্য শেলী যে 'লিয়ারকে' বলিয়াছেন,—"The most perfect specimen of the dramatic art existing in the world," ইহার সহিত হয় ত সকলের মতের মিল নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহাও সত্য যে, লিয়রে মানুষের উন্মাদ রোগের ক্রমবিকাশে সেক্সপিয়ার যে অদ্ভুত উদ্ভাবনীশক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোলরিজ সত্যই বলিয়াছেন,—

"The strange yet by no means unnatural mixture of selfishness, sensibility and habit of feeling, derived from and fostered by the rank of Lear; intense desire of being intenesly loved; selfish but loving and kindly nature; self-supportless leaning on another; craving for sympathy; anxiety, distrust and jealousy, etc.

অর্থাৎ লিয়র রাজা; সেই রাজপদে সমাসীন থাকিলে মানুষের মনে যে সকল ভাবের উদ্ভব ও পুষ্টি হওয়া সম্ভব, তাহাই লিয়রে দেখা দিয়াছিল। লিয়রের চরিত্রে, আশ্চর্য্য অথচ অস্বাভাবিক নহে, এমনই মনোবৃত্তি সমূহের সমাবেশ হইয়াছিল; স্বার্থপরতা, অভিমানজনিত বেদনা এবং গভীর অনুভূতির স্বভাব; সকলের অত্যধিক ভালবাসা পাইবার জন্যে অত্যুৎকট আকাঙ্ক্ষা; স্বার্থপর হইলেও দয়ামায়া ও ভালবাসার অভাব ছিল না; নিজের ভার লইতে অক্ষম, পরের উপরে নির্ভরশীল; সকলের সহানুভূতির প্রার্থী; মনে সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তা, অবিশ্বাস ও হিংসা;—এই সকলের মেশামিশি লইয়া ছিল লিয়রের মন গঠিত।

এমন মন যাহার, সে যদি কাহাকেও অত্যধিক ভালবাসে এবং যে কারণেই হউক, সে ভালাবাসার আবদার করিতে গিয়া যদি মনে করে, তাহার ভালবাসার প্রতিদান পাইল না, পরন্তু তাহার হৃদয় কোমল ও দয়ালু হইলেও যদি স্বার্থপরতাকে সকল সদ্‌বৃত্তি আচ্ছাদন করিয়া রাখে,—তাহা হইলে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়? বিশেষতঃ যদি সে স্নেহ-ভালবাসার প্রতিদান পাইলাম না বলিয়া অহরহঃ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় এবং তাহার মনে দারুণ সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দেয়, তবেই ত সর্ব্বনাশ!

লিয়রের তাহাই হইয়াছিল। লিয়র সকলের চেয়ে ছোট মেয়ে কর্ডিলিয়াকে ভালবাসিতেন। যখন তিন মেয়ের মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়া দিলেন, তখন কৃতজ্ঞতায় মেয়েদের অন্তর ভরিয়া গেলে, তাহারা কি বলে, তাহা শুনিবার জন্য সমস্ত প্রাণ দিয়া আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বড় ও মেজো মেয়ে কুটিল, মনের আসল ভাব গোপন রাখিয়া তোষামোদী কথা শুনাইল, লিয়র গলিয়া গেলেন। কিন্তু সব চেয়ে আদরের মেয়ে কর্ডিলিয়া সত্যবাদিনী, সে তোষামোদ করিল না, সত্য কথা বলিল,—

"I love your Majesty
According to my bond; no more, nor less."

অমনই লিয়রের মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—

"How, now, Cordelia? mend your speech a
little, lest you may mar your fortunes."

কিন্তু কর্ডিলিয়া সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইল না। তখন লিয়র কন্যার এই 'অকৃতজ্ঞতায়' একবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, এমন কি, তাঁহার পরম প্রিয় বিশ্বস্ত সভাসদ আরল অফ কেণ্ট বুঝাইয়া বলিতে গেলে তাঁহাকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিলেন, আর কর্ডিলিয়াকে ত রাজ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করিলেনই। তখন হইতেই লিয়রের উন্মাদ-রোগের সূচনা।

লিয়র-চরিত্রের ক্রমবিকাশের ইহা প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখিতে পাই, লিয়রের জ্যেষ্ঠা কন্যা গণরিল পিতা লিয়রকে ও লিয়রের বন্ধু-বান্ধব ও পোষ্যগণকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করিবার জন্য আপনার ভৃত্যপরিজনকে শিখাইয়া দিতেছে, কেন না, তখন লিয়রের হাতের রাজদণ্ড তাহাদের দুই ভগিনীর হাতে আসিয়াছে, লিয়রের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি রাজ্য বিলাইয়া তাহাদের দুয়ারে ভিখারী। লিয়র যখন অপমানের বেদনার কথা অভিমানভরে কন্যার কাছে জানাইতে গেলেন, তখন গণরিল বলিল,—

"You protect this course, and put it on
By your allowance:"

অর্থাৎ তোমার লোকজন যে মাতলামি আর অত্যাচার করিতেছে, তুমি তাহাতে প্রশ্রয় দিতেছ, কিন্তু জানিয়া রাখ, আমি এ সব অনাচার ক্ষমা করিব না।"

কন্যার মুখে এই কথা? যে কন্যা তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে বলিয়া রাজ্যাংশ লইয়াছিল? লিয়রের ভালবাসার কাঙ্গাল স্বার্থপর মন আলোড়িত হইল, মাথার আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল, বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, হতভম্ব লিয়র বলিলেন,—

"Are you our daughter?"

পিতা ও কন্যার মধ্যে এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। জামাতা ডিউক অফ এলব্যানি সেই সময়ে উপস্থিত। লিয়র তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন,—

"O Sir, are you come ?
Is it your will ? Speak, Sir,—Prepare
my horses.
Ingratitude ! thou marble-hearted fiend,
More hideous, when thou show'st thee
in a child,
Than the Sea-monster !"

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই লিয়র আপশোষ করিতেছিলেন,—কেন রাজ্য বিলাইয়া দিলাম, woe, that too late repents. কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এলব্যানি দেখা দিলেন, অমনি তাঁহার বিক্ষিপ্ত মন তাঁহাকে দেখিয়াই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল যে, যে জামাতাও কন্যার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, অথচ সত্যই তাহা নহে। কিন্তু লিয়রের মাথা তখনই খারাপ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই জামাতাকে দেখিয়াই তিনি একরাশি গালাগালি করিলেন। হঠাৎ চিন্তাধারার গতি ফিরিয়া গেল, আপনার অনুচরদের হুকুম দিলেন,—যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও, এ মেয়ের বাড়ী এক দণ্ড থাকিব না। অমনই তাহার পর কন্যার অকৃতজ্ঞতার কথা মনে পড়িল। অকৃতজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া মনের ব্যথা বাহির হইয়া পড়িল। এই যে একটা বিষয়ে মন স্থির করিতে না পারা, ইহাই মস্তিষ্ক-বিকারের লক্ষণ।

তাই আবার জামাতা এলব্যানি যখন মিষ্টকথায় বলিলেন,—

"Pray, sir, be patient,

তখন লিয়রের সে দিকে মন নাই, মন কন্যার অস্বাভাবিক আচরণের দিকে, লিয়র দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিতেছেন,—

"Detested kite ! thou liest :—"

তাহার পর আত্মপক্ষ সমর্থন ও কন্যার দোষ কীর্ত্তনের পর লিয়র আপনার মাথার উপর আঘাত করিতে করিতে বলিলেন,—

"O Lear, Lear, Lear !
Beat at this pate, that let thy folly in,
And thy dear judgm nt out !—
Go, go my people."

কিরূপ অসম্বদ্ধ উক্তি দেখুন—ইহাই প্রলাপ। কিন্তু উহার মধ্য দিয়াও একটা চিন্তার সূক্ষ্ম-ধারা সঙ্গোপনে বহিয়া যাইতেছে,—"আমি কি বোকামি করিয়াছি, রাজ্য পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছি,—এই মাথাটার মধ্যে কি বোকামিই ঢুকাইয়াছি!' এই জন্যই এই নাটকের আর একটি সুন্দর চরিত্র এড্‌গার লিয়রের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—Reason in madness. বস্তুতঃ মনে হয় যেন লিয়রের প্রলাপে যুক্তি আছে, কিন্তু সত্যই তাহা নহে। মহাকবি সেক্সপিয়ারের মানুষের মনস্তত্ত্বজ্ঞানের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা এইখানেই পরিস্ফুট। বড় বড় মানসিক রোগ-চিকিৎসক বলেন, মানুষ পাগল হইয়া যাইবার সময় তাহার মনের অবস্থা ঠিক এইরূপই হয়।

তাহার পর তৃতীয় স্তরে আমরা লিয়রকে মধ্যমা কন্যা রেগানের প্রাসাদে দেখিতে পাই। সেখানে অপমানদিগ্ধ ভালবাসায় আবৃত, অভিমানচালিত বৃদ্ধ পিতা অপরা কন্যার কাছে প্রথমা কন্যার ব্যবহারের সম্বন্ধে নালিশ করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রভুভক্ত ভৃত্য (ছদ্মবেশী) আরল অফ কেণ্টই তথায় তাঁহার কন্যা ও জামাতার হস্তে, তাঁহারই জন্য নির্য্যাতিত হইতেছে! বৃদ্ধের মনের কি অবস্থা হইতে পারে? এই যে অপূর্ব্ব কৌশলে ঘটনার সমাবেশ এবং এক অবস্থার ঘাতের পর অন্য অবস্থার প্রতিঘাত অঙ্কন,—ইহা হইল Dramatic artএর চরমোৎকর্ষ এবং মানুষের সভ্যতা ইহার অপেক্ষা উচ্চ স্তরের মনোবৃত্তি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মহাকবি সেক্সপিয়ার লিয়রকে এখানে যে অবস্থার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা শুধু অনুভবের যোগ্য, বর্ণনা করিয়া বোঝান যায় না।

কেণ্টকে এই অবস্থায় দেখিয়াই লিয়রের অপমানদিগ্ধ মন আরও অপমানের আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল। মন হইতে তিনি সেই আশঙ্কা ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন,—'কে তোমার এমন অবস্থা করিল?' ভাবেন তিনি এ প্রাসাদের কর্ত্তা গৃহিণী কে—তবুও যদি আশঙ্কা মিথ্যা হয়! কিন্তু কেণ্ট জানাইয়া দিলেন,—It is both he and she, your son and daughter. বস্! আর যায় কোথা! কেণ্ট যত বলেন, হাঁ, আপনার কন্যা-জামাতার এই কায, লিয়র তত বলেন, না, কখনই না। বৃদ্ধের মনে তখনও আশা,—মধ্যমা কন্যা রেগানের মন ভালবাসায় পরিপূর্ণ, জ্যেষ্ঠা কন্যার ব্যবহারের কথা শুনিলে সে নিশ্চয়ই পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইবে।

কিন্তু কি ভীষণ জাগরণ! এ মেয়ে যে সেই রাক্ষসী—সেই marble-hearted fiend পাষাণী পিশাচী অপেক্ষাও কঠিন নির্দ্দয়।

কন্যা-জামাতা যে দেখা করিতে, কথা কহিতে চাহে না!—

Lear.—Deny to speak with me? They are sick ?—Fetch me a better answer.

Gloster.—You know the fiery quality of the duke :
How unremovable and fix'd he is
In his own course.

Lear.—Vengeance ! Plague ! Death ! Confusion !
Fiery ? What quality ?

যেন একটা powder magazineএ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া দেওয়া হইল! কিন্তু তবুও—তবুও একবার কন্যা তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার কথা শুনিলে—Lear বুকে হাত চাপিয়া বলিলেন,—

"Oh me, my heart, my rising
heart !—but, down."

রেগান আসিল স্বামীর সঙ্গে। লিয়র ব্যথিত হৃদয় লইয়া দুইটা ভালবাসার কথা, দুইটা মিষ্ট কথা শুনিবার আশায় ছুটিয়া গেলেন,—

"Beloved Regan, thy sister's naught;
O Regan, she hath tied
Sharp-tooth'd unkindness,
like a vulture, here,
(Points to his breast)

কন্যা রেগান এই ভালবাসার আবদারের, এই অভিমানের বাতনার কি জবাব দিল? গনরিলের কাছেই ফিরিয়া গিয়া মাপ চাহিতে বলিল। লিয়র জ্বলিয়া উঠিলেন,—

"Ask her forgiveness?"
Never, Regan."

কপট রেগান যতই ভগিনীর প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতে বলে, বৃদ্ধ ততই জ্বলিয়া উঠেন ও গণরিলকে অভিসম্পাত দেন:—

"All the stor'd vengeances of heaven fall
On her ingrateful top! Strike her young bones,
You taking airs, with lameness!"

আবার:—

"You nimble lightnings, dart
your blinding flames
Into her scornful eyes! Infect her
beauty, you fen-suck'd fogs,
drawn by the powerful sun,
To fall and blister."

বৃদ্ধ মনে কত বড় আঘাত পাইয়াছেন যে, আপন কন্যাকে এমন অভিসম্পাত দিতেছেন। ঠিক সেই সময়ে গণরিল নিজে তথায় আসিয়া উপস্থিত! বৃদ্ধের অপমান-লাঞ্ছনার মাত্রা পূর্ণ হইল। দুই ভগিনীতে মিলিয়া বৃদ্ধকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিল। গণরিলের বাক্যবাণে লিয়র একবারে উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিলেন,—

"I prithee, daughter, do not make me mad:
I will not trouble thee, my child; farewell:"

পাগল করিও না বলিলেন বটে, কিন্তু তখন তিনি পাগলই হইয়াছেন। একবার কন্যাদের স্তুতি করিতেছেন, পর-মুহূর্ত্তেই অভিসম্পাত দিতেছেন, এই ঘাতপ্রতিঘাত মহাকবি অসামান্য নৈপুণ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন:—

"But yet thou art my flesh, my blood,
my daughter;
Or, rather, a disease that's in my flesh,
Which I must needs call mine; thou
art a boil,
A plague-sore, or embossed carbuncle,
In my corrupted blood.
But I will not chide thee:
Let shame come when it will,
I do not call it:
I do not bid the thunder bearer short,
Nor tell tales of thee to high judging Jove."

বৃদ্ধের ক্ষতবিক্ষত মনের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন। একবার ভৎর্সনা, পরক্ষণেই তোষামোদ, আবার পর-মুহূর্ত্তে ভগবানের কাছে বিচার প্রার্থনা!

শেষ যখন উভয় কন্যার দ্বারা চরম উত্ত্যক্ত হইয়াছেন, তখন লিয়র বলিতেছেন,—

"You heavens, give me that patience,
patience I need!
You see me here, you gods, a poor old man,
As full of grief as age;.........................
Fool me not so much
To bear it tamely; touch me with noble
anger......
... ...
You think I will weep?
No, I'll not weep:—
I have full cause of weeping: but
this heart
Shall break into a hundred thousand flaws,
Or ere I'll weep:—O, fool, I shall go mad!"

আবার সেই 'আমি পাগল হইয়া যাইব!' পাগল হইবার তখন আর বাকী কি? বড় মেয়ের কাছে অপমান, মেজো মেয়ের কাছে অভিমানভরে ছুটিয়া আসিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য আবদার!—তাহার কি জবাব পাইলেন লিয়র? যে স্নেহ-ভালবাসার জোরে লিয়র মেয়েদের মধ্যে রাজ্য বিলাইয়া দিলেন, তাহার কি প্রতিদান পাইলেন?—অপমানের উপরে অপমান, লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা, গঞ্জনার উপর গঞ্জনা! তাহার উপর বড় মেয়ে আসিয়া তাহাতে যোগ দিলেন,—লিয়র কেন, সহজ মানুষই ইহাতে পাগল হইয়া যায়। লিয়র পাগলের মত একবার বলিতেছেন,—'আমি বৃদ্ধ, শোকে কাতর, হে ভগবান! আমায় ধৈর্য্য দাও, সহিবার ক্ষমতা দাও' আবার পর-মুহূর্ত্তেই দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিতেছেন,—'হে ভগবান্, আমি যেন এ অপমান ক্লীবের মত সহ্য না করি, আমায় মহত্তের উপযোগী ক্রোধে পূর্ণ কর।' আবার বলিতেছেন, 'না, না, কাঁদিব না—কাঁদিবার যথেষ্ট কারণ আছে বটে, কিন্তু এই হৃদয় সহস্রধা চূর্ণ হইয়া যাক্, তবুও কাঁদিব না।'

এই যে মানুষের মনের বৃত্তির বিশ্লেষণ মানুষেরই উক্তি-প্রত্যুক্তির দ্বারা,—ইহার চরমোৎকর্ষ সেক্সপিয়ারের লিয়রে যে পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে, তাহার তুলনা অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একটির পর একটি ঘটনার সমাবেশ, তাহাদের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত আর তাহার মধ্য হইতে মানুষের চরিত্রের ক্রমবিকাশ শেষ গিয়া পৌঁছিয়াছে, Lear in the heath অর্থাৎ প্রান্তরমধ্যে লিয়রের দৃশ্য। সে ভয়াবহ, সে মহান্, সে মর্ম্মভেদী, সে করুণ, সে হৃদয়দ্রাবী দৃশ্যে মানুষের হৃদয় গভীর

করুণায়, সমবেদনায়, শোকে দুঃখে আলোড়িত হইয়া উঠে। Coleridge যথার্থই বলিয়াছেন,—লিয়র ক্রোধে কন্যার প্রাসাদ হইতে চলিয়া গিয়া জনশূন্য ধূধূ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন,—

The night, the storm, houseless, Gloster with eyes put out, Fool a semblem of madman, and Lear in madness—bound together by a strange kind of sympathy.

সেই অন্ধকারময় রজনী, সেই ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, সেই নিরাশ্রয় অসহায় বৃদ্ধ রাজা, মাত্র প্রভুভক্ত Fool (বয়স্য)কে লইয়া ভীষণ প্রান্তরে উপস্থিত, - ভীষণ ঝড়ে তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু উড়িতেছে, কেহ নাই তাঁহাকে আশ্রয় দিবার, সাহায্য করিবার, সান্ত্বনা দিবার। উন্মাদরোগগ্রস্ত লিয়র বলিতেছেন,—

"Blow winds, and crack your cheeks !.........
Spit, fire ! spout, rain !
Nor rain, wind, thunder, fire, are my
daughters !

I tax not you elements, with unkindness,
I never gave you kingdom,
call'd you children."

কিন্তু সেই উন্মত্ততার মধ্যেও তিনি কন্যাদের অকৃতজ্ঞতার কথা ভুলিতে পারিতেছেন না,—Reason in Madness! মহাকবির অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিই যে তাঁহাকে মানুষের মনটাকে এমনই করিয়া খুলিয়া দেখাইতে সমর্থ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষ দৃশ্যে কর্ডিলিয়ার অকালমৃত্যুতে মন সত্যই ন্যায়ান্যায়-বিচারের নিরপেক্ষতায় সন্দিহান হয়, ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। Kent সত্যই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

"Is this the promis'd end ?"

লিয়র কর্ডিলিয়ার মৃতদেহ বুকে করিয়া প্রবেশ করিতে করিতে বলিতেছেন,—'Howl, howl, howl !' তখনও তাঁহার মনে প্রান্তরের সেই অমানিশার ঝড়বৃষ্টির কথা গাঁথিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কর্ডিলিয়াকে বুকে ধারণ করিয়া ইহাও বলিতেছেন যে,—

"She's gone for ever !—
I know when one is dead, and when one lives ;
She is dead as earth :"

এ জ্ঞান তাঁহার মনের মধ্যে চকিত চপলা-চমকের মত দেখা দিতেছে, ইহাকে Lucid interval বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রভুভক্ত বিশ্বাসী Kent যখন প্রভুর কাছে আত্মপরিচয় দিতে গেলেন, তখন লিয়র বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

'Prithee, away, বিনয় করি, দূর হও।'

এডগার যখন বুঝাইতে গেলেন,—'Tis noble Kent,— তখন লিয়র বলিলেন,—

"A plague upon you, murderers, traitors, all !"

তখন লিয়র কেবল কর্ডিলিয়ার মৃতদেহের উপরই নিবিষ্টচিত্ত, অন্যদিকে নজর নাই, পাছে অপরে তাঁহার ও তাঁহার কন্যার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, ইহাই ভয়! তাই কন্যার গুণের কথা আবৃত্তি করিতেছেন,—

"Her voice was ever soft,
Gentle, and low ; an excellent thing
in a woman"—

তখনও লিয়রের মন কন্যার জীবনে নিঃসন্দেহ হয় নাই,— এত সুন্দর, এত ভালবাসার কন্যা কি মরিতে পারে? তাই লিয়র বলিতেছেন,—

"This Feather stirs ; she lives."

কিন্তু বৃথা আশা! মুহূর্ত্ত পরেই লিয়র বলিতেছেন,—

"No, no, no life !
Why should a dog, a horse, a rat, have life,
And thou no breath at all ? Thou'lt
come no more,
Never, never, never, never, never !"

হৃদয়ের অন্তস্তলের এ মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন—এ যে বুকফাটা! পরমুহূর্ত্তেই লিয়র জামাটার বোতাম টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন,—

"Pray you undo this button :"—

'উঃ, আমার বোতাম খুলিয়া দাও, ছিঁড়িয়া ফেল।" এই একটি কথায় মহাকবি সেক্সপিয়র মানুষের হৃদয়ের ভাবসমুদ্র যে ভাবে আলোড়ন করিয়াছেন, তাহা সপ্ত পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করাও অপরের সাধ্যে হয় কি? ইহাই ক্ষণজন্মা বাণীর বরপুত্র মহাকবির বৈশিষ্ট্য। সেক্সপিয়রের ওথেলো যখন শেষ মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলেন যে, ইয়াগো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাধ্বী পত্নী ডেসডিমোনার অকলঙ্ক চরিত্রে তাঁহার সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে, যখন আয়াগোর পত্নী এমিলিয়া তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "O gull ! O do't !" তখন ওথেলোর মথিত দলিত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একরাশ ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বাণী উত্থিত হইল না, বাহির হইল কেবল একটি কথা,—"Oh ! Oh ! Oh !"

ইহাও লিয়রের মত বুক-ফাটা কান্না। ইহা সেক্সপিয়র ও কালিদাসের মত ক্ষণজন্মা মহাকবিতেই সম্ভবে।

ওথেলো, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, রোমিও-জুলিয়েট প্রমুখ বিয়োগান্ত নাটক অথবা টেম্পেষ্ট, উইন্টারস টেল, মেজার ফর মেজার, এজ ইউ লাইক ইট, টুয়েল্‌ফথ নাইট, মাচ এডো এবাউট নাথিং, অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস ওয়েল প্রমুখ মিলনান্ত নাটক, কিম্বা কিং জন, কিং রিচার্ড থার্ড, হেনরী ফোর্থ, হেনরী ফিফ্‌থ প্রমুখ ঐতিহাসিক নাটক,—মহাকবি সেক্সপিয়রের প্রত্যেক নাটকের ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে লিয়রেরই মত ক্রমবিকাশের আশ্চর্য্য স্তরের পর স্তর দেখাইতে পারা যায়। সেক্সপিয়র কোন ঘটনা বা চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে সোপানের পর সোপান অতিক্রম না করিয়া এক লম্ফে কল্পনাসৌধশীর্ষে উপনীত হন নাই, নাট্য-রসামোদীকেও আপনার সঙ্গে সেই রসের অংশ পরিবেষণে পরিতৃপ্ত

না করিয়া এক পদও অগ্রসর হন নাই। সে ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ সুদীর্ঘ হইবারই সম্ভাবনা, তাহার স্থান ও সময় অভাব। তবে লিয়রের ঘটনা ও চরিত্র সমূহের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া আমি এইটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, জগতে যে কয়টি যথার্থ ক্ষণজন্মা মহাকবি ও নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র-চিত্রাঙ্কন একই ধারার অনুযায়ী, তাহাতে দেশ, কাল বা পাত্রের পার্থক্য নাই। তাঁহারা যে সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রকৃষ্ট নিদর্শনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি হয় ত দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু মূলে তাহার প্রাণ-ধারা একই।

এইবার মহাকবি কালিদাসের নাটকে ঘটনা-সমাবেশ ও চরিত্রের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, কালিদাসের নাটকে কোনও ঘটনা আকস্মিক ঘটে নাই, কোন চরিত্র সহসা তাঁহার মানসকমলে ফুটিয়া উঠে নাই, সকলেরই সকলের সহিত একটা যোগসূত্র রহিয়াছে। অতি উচ্চ স্তরের সভ্য জাতি না হইলে মানুষের কল্পনাশক্তি এত ঊর্দ্ধে পৌঁছিতে পারে না। আমাদের নাগা, কুকি প্রভৃতি আদিম জাতিরা ২০ রাশির অধিক গণনা করিতে জানে না এবং কত পথ অতিক্রম করিতেছে, তাহা তাম্বুল-চর্ব্বণ দ্বারা নির্ণয় করে, অর্থাৎ একটি পাণ গালে পূরিয়া চিবাইতে আরম্ভ করিয়া যখন শেষ উগ গলাধঃকরণ করিবে, তখনই জানিবে যে, সে এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে,—এইরূপ শোনা যায়। মানুষ সভ্যতার সীমারেখা হইতে যত দূরে—যত নিম্নে অবস্থিত, তাহার চিন্তাধারা বা কল্পনাশক্তিও সেই পরিমাণে অল্প পুষ্ট, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। পক্ষান্তরে, সভ্য হইতে সভ্যতর জাতির মধ্যে এই শক্তির স্ফুরণ ক্রমবিবর্দ্ধমান অবস্থায় দেখা দেয়। আমাদের মহাকবি কালিদাসের নাটকে তাঁহার সেই শক্তির স্ফুরণ কিরূপ হইয়াছিল, তাহা একে একে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কালিদাসের কল্পনাশক্তি

কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।" তাই প্রথমে এই নাটকের ঘটনাসমাবেশ ও চরিত্রসৃষ্টির ক্রমবিকাশ কিরূপে মহাকবি অপূর্ব্ব কলাকৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাই নির্ণয় করা যাউক।

১

প্রথমেই নামের এক সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। অভিজ্ঞান অর্থাৎ রাজা দুষ্মন্তের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী, এখানে অভিজ্ঞান অর্থে উহাকেই বুঝাইতেছে। বিশেষরূপে কোন জিনিষকে যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাকে অভিজ্ঞান বলে। রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দ্বারা শকুন্তলাকে রাজার স্মরণ হইবার কথা, তাই রাজা গান্ধর্ব্ব-বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজধানী-প্রত্যাগমনের সময় অঙ্গুরীটি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, রাজধানীতে খবর পাঠাইবার সময় এই অঙ্গুরীয়টি পাঠাইও, তাহা হইলেই তোমাকে লইয়া যাইতে রাজধানী হইতে আমার লোকজন তপোবনে আসিবে।' দুর্ব্বাসার শাপে শকুন্তলাকে রাজার ভুলিবার কথা; কিন্তু সখীদের অনুনয়-বিনয়ে ঋষি এইটুকু অনুগ্রহ করিয়াছিলেন যে, যদি শকুন্তলা রাজাকে কোন 'অভিজ্ঞান' দেখাইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার শকুন্তলাকে মনে পড়িবে। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজধানীযাত্রাকালে স্নান করিতে গিয়া শকুন্তলা অঙ্গুরীয়টি শচী-তীর্থে হারাইয়া ফেলেন। তাই রাজধানীতে গিয়া রাজার স্মরণ না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হইলেন। আবার ধীবরের নিকট হইতে অঙ্গুরীয় বা অভিজ্ঞান পুনঃপ্রাপ্তির পর রাজার শকুন্তলাকে মনে পড়িল এবং কশ্যপের আশ্রমে রাজা ও রাজমহিষীর শুভ মিলন হইল। সুতরাং এই অভিজ্ঞানকে উপলক্ষ করিয়াই নাটকের মূল ঘটনাসমাবেশ ও চরিত্রসৃষ্টি। এই হেতু ইহার সার্থকতা কত বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কালিদাসের সময়ে রাজা-রাজড়াদের অভিজ্ঞান অঙ্গুরী Signet ring এর প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী বা শীলমোহরের প্রথা সভ্য জাতির মধ্যেই লক্ষিত হয়। সুতরাং অতি প্রাচীন যুগ হইতেই যে এ দেশে আর্য্যসভ্যতা উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিল, অভিজ্ঞানই তাহার প্রমাণ।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বড় বড় পণ্ডিত ও সভাসদদের সম্মুখে নাটকের অভিনয় হইতেছে। তাঁহারা সকলেই সাগ্রহে সোৎসাহে কালিদাসের নাটকের অভিনয় দেখিবেন। তাই প্রথম হইতেই তাঁহাদের ঔৎসুক্যের উদ্রেক করা হইল, এই 'অভিজ্ঞান' নামটি দিয়া। রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী?—ইহার সহিত শকুন্তলার সম্পর্ক কি? আচ্ছা, দেখাই যাউক না, কি হয়।

ইহাই হইল নাট্যকারের কলাকুশলতা। দর্শকের ঔৎসুক্য (interest) বরাবর অক্ষুণ্ণ রাখাই হইল নাট্যকারের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা, দর্শকের interest flag করিলেই নাটক মার খাইল, সে নাটকের অভিনয় এক সপ্তাহের বেশী চলে না।

২

তাহার পর সূত্রধার ও সূত্রধারপত্নীর আবির্ভাব। যাঁহারা অভিনয়ে অতিমাত্র সুদক্ষ,—এক কথায় যাঁহারা একরূপ Rehearsal master, তাঁহারাই এই দুই ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইতেন। কেন না, প্রথম মুখেই আসর জমাইবার শক্তি না দেখাইতে পারিলে নাটকাভিনয়ের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে না।

সূত্রধার ও তৎপত্নীর নাটক সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হইল, নাটকের পরিচয় দেওয়া হইল, তাহার পর নাটকের নায়ককে (hero) রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করা হইল। সূত্রধার সেটি কি অপূর্ব্ব কৌশলে সাজাইতেছেন দেখুন,—

> "তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
> এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা।"

অর্থাৎ প্রিয়ে, তোমার এই চমৎকার মনোমোহন গানে আমার মন যেমন মোহিত হইয়া পূর্ব্বেকার কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে, তেমনই এই সারঙ্গ অর্থাৎ সুচিত্রিত হরিণটা নিজের সৌন্দর্য্যে এবং বিচিত্র গতিতে রাজা দুষ্মন্তের মন ভুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে দেখ।

এইখানে কালিদাসের ঘটনার ক্রমবিকাশটিও লক্ষ্য করা যায়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকখানি 'ভ্রান্তির' উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাজার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল বলিয়াই নাটকখানিকে কালিদাস খাড়া করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। শকুন্তলা রাজার চিন্তায় ভুলো-মন হইয়াই দুর্ব্বাসার আহ্বান শুনিতে পান নাই, আর তাহাতেই রাজার 'ভুলের' উপাদান যোগাড় করিয়া দিলেন। রাজা তপোবনে প্রবেশ করিয়াই সুন্দর হরিণের গতিভঙ্গী দেখিয়া আর সব কথা ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং এই 'ভুলের' পর 'ভুল' সাজাইয়া মহাকবি যে অবস্থার পূর্ব্বসূচনা করিয়া রাখিলেন, শ্রোতা ও পাঠকরা পরে তাহার অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ পাইবেন।

৩

ঋষি-তাপসদের নিষেধে দুষ্মন্ত মৃগের প্রতি উদ্যত বাণ সংহার করিলে তাপসরা আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

"জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি॥

অর্থাৎ মহারাজ! আপনার জন্ম পুরুবংশে (মহৎ ক্ষত্রিয় আর্য্য বংশে), সুতরাং আমাদের কথায় বাণসংহার করিয়া আশ্রমমৃগকে রক্ষা করা আপনার ন্যায় মহৎ জনের উপযুক্তই হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, আপনারই গুণের অনুরূপ গুণশালী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করুন।

[কালিদাস-গ্রন্থাবলী, বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ]

মহাকবি কালিদাস এইখানে ঘটনার আর একটি স্তর বিন্যাস করিয়া রাখিলেন। দুষ্মন্তের রাজান্তঃপুরে মহিষীর অভাব ছিল না; কিন্তু দুঃখের কথা, তাঁহার একটিও সন্তান নাই। ভবিষ্যতে শকুন্তলার গর্ভে যে তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, মহাকবি তাহার সূচনা করিয়া রাখিলেন। এই পুত্রই পঞ্চবর্ষবয়সে বনের সিংহকেও দমন করিয়াছিল, তাই তাহার নাম হইয়াছিল সর্ব্বদমন। পরে তিনি ভরতরূপে সাম্রাজ্য-শাসন করেন এবং তাহা হইতেই ভারতবংশ এবং ভারতবর্ষ নাম হইয়াছিল। এই যে সামান্য একটু তুলিকাস্পর্শ, ইহা হইতেই চিত্র ফুটিয়া থাকে।

৪

তাপস বৈখানস যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন,—

"এষ খলু কাশ্যপস্য কুলপতেঃ অনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে। ন চেদন্যকার্য্যাতিপাতঃ প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ—

অর্থাৎ এই মালিনী নদীর তটে কুলপতি কাশ্যপ কণ্ব মুনির আশ্রম দেখা যাইতেছে। যদি আপনার কোন বিশেষ কায না থাকে, তবে ঐ আশ্রমে গিয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

[কালিদাস-গ্রন্থাবলী, বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ]

দেখুন, কি চমৎকার কৌশলে মহাকবি দুষ্মন্তকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে লইয়া যাইতেছেন। আশ্রমে না গেলে শকুন্তলার সাক্ষাৎ হয় না, সাক্ষাৎ না হইলে নাটক হয় না।

তাহার পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ?"

কুলপতি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত আছেন ত?

বৈখানস বলিলেন,—"ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলাম্ অতিথি-সৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ।

না, তিনি কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়া শকুন্তলারই গ্রহশান্তির জন্য সোমতীর্থে গিয়াছেন।"

[কালীদাস-গ্রন্থাবলী, বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ]

এখানে শকুন্তলা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইল, রাজা তথায় অতিথির সেবা পাইবেন, এটুকুও বলিয়া রাখা হইল। আর ঐ সূত্রে যে শকুন্তলার সহিত রাজার মিলন ঘটিবে, এই ঘটনাটুকুরও সূত্রপাত করিয়া রাখা হইল। কেমন স্তরের পর স্তর ক্রমবিন্যাস!

৫

আশ্রমদ্বারে প্রবেশকালে রাজা বলিতেছেন,—

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।

এই শান্ত বনাশ্রমে প্রবেশ করিতে গিয়া আমার (দক্ষিণ) বাহু স্পন্দিত হইতেছে। এখানে অর্থাৎ এই তপোবনে আমার ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজার কি ফললাভ হইবে?"

[কালিদাস-গ্রন্থাবলী, বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ]

পুরুষের দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইলে বিবাহ-আদি শুভ ফল-লাভের সম্ভাবনা হয়, ইহাই এদেশের প্রচলিত কিম্বদন্তী। এই কল্পনাটি একবারে insulor, সীমাবদ্ধ, ভারতেই উহা প্রচলিত। কিন্তু যাহাই হউক, ইহা দ্বারা মহাকবি শকুন্তলার সহিত রাজার গন্ধর্ব্ব-বিবাহ অনুসূচিত করিয়া রাখিলেন।

৬

তিনটি তাপসকন্যা বয়সের অনুরূপ ছোট ছোট ঘট লইয়া বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতে আসিয়াছেন, তিনটিই 'মধুরমাসাং দর্শনম্.' তিনটিই 'শুদ্ধান্তদুর্লভবপু' (রাজান্তঃপুরেও অমন রূপ দেখা যায় না)। রাজা 'নিপুণং নিরূপ্য'—খুব ভাল করিয়া দেখিয়া, শকুন্তলা কথা কহিতেই বলিলেন,—"কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা? এই কি সেই কণ্বদুহিতা?"

[কালিদাস-গ্রন্থাবলী, বসুমতী গ্রন্থাবলী-সিরিজ]

তিনটি সমান বয়স, তিন জনেই ছোট ছোট কলসী লইয়া ছোট ছোট গাছে জলসেচন করিতেছে, তিন জনেই মধুর আলাপ করিতেছে,—অথচ রাজাকে কেহ বলিয়া না দিলেও রাজা শকুন্তলাকে ঠিক চিনিয়া ফেলিলেন। একে শকুন্তলার রূপ অসামান্য, তিনি অপ্সরাসম্ভবা, তাহার উপর মস্ত বড় কথা, রাজহংসী না পাইলে সাগর কি বক্ষ পাতিয়া দেয়? মহাকবি ক্রমেই রাজাকে শকুন্তলার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন।

৭

শকুন্তলাকে প্রথম দর্শন করিয়াই রাজা তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তৎপরে তাঁহার সেই অসামান্য রূপ ও কুসুম-কোমল লাবণ্য কঠোর তাপসসেবিত বল্কলে ঢাকা দেখিয়া তাহার প্রতি মস্ত অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে মনে একটা আপশোষ অথবা উষ্মা—যাহাই হউক—পোষণ করিতেছেন।

রাজা।—"কামম্ অননুরূপমস্যা বয়সো বল্কলং ন পুনরলঙ্কার-শ্রিয়ং ন পুষ্যতি,—

মহর্ষি কণ্ব এই কোমল সুন্দর শরীরে কিরূপে বল্কল পরাইয়াছেন? এই রূপে কি বল্কল মানায়, এই যৌবনের পক্ষে বল্কল কি মোটেই শোভা পায়? মহর্ষি কণ্বের কি বিন্দুমাত্র বিবেচনা নাই?"

[কালিদাস-গ্রন্থাবলী, বসুমতী-গ্রন্থাবলী সিরিজ]

এই যে শকুন্তলার প্রতি সহানুভূতি—ইহা রাজার হৃদয়ের আকর্ষণের প্রথম সোপান। মহাকবি এই স্থান হইতে রাজা দুষ্মন্তের রূপজ মোহের পর আর এক স্তরে তাঁহাকে উন্নীত করিলেন। Romeo Julietএর মত তাঁহার প্রেম এখনও My love is as boundless as the sea হয় নাই বটে, তবে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে বটে!

৮

যখন অনসূয়া বলিল,—"হলা সউন্দলে! বণজোসিণিত্তি বিসুমরিদাসি,"—তখন শকুন্তলা বলিল,—"তদা অত্তাণং বি বিসুমসসং।"

অর্থাৎ অনসূয়া বলিল, ওলো শকুন্তলে, তুই কি বনজ্যোৎস্নাকে (বনলতাকে) ভুলে গেলি? শকুন্তলা তখন সেই লতাটিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—একে যে দিন ভুল্বো, সে দিন নিজেকেও ভুলে যাবো!

[কালিদাস-গ্রন্থাবলী, বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ]

বনের লতার মত লালিতা-পালিতা শকুন্তলার স্নেহ ও দয়ামায়ায় ভরা কোমল মনটি রাজা দুষ্মন্তের কাছে কেমন ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতেছে! যেন পুষ্পকোরক তাহার হরিৎ আবরণপট ভেদ করিয়া সোনার বরণ দেখাইয়া নয়ন-মন তৃপ্ত করিতেছে! রাজার অনুরাগ স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে।

৯

যখন রাজা মনে মনে বিচার আলোচনা করিতেছেন,—শকুন্তলা 'ক্ষত্রিয়পরিগ্রহক্ষমা' কি না, তখন শকুন্তলা তাঁহার অন্তরের অতি নিভৃত অন্তস্তলের কতটা জুড়িয়া বসিয়াছেন,তাহা বুঝিয়া দেখুন।

১০

ভ্রমর তাড়াইবার ছলে রাজা সখীদের সম্মুখে দেখা দিয়াই প্রথমেই শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"অপি তপো বর্দ্ধতে?—আপনাদের তপস্যার কায নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইতেছে ত?"

শকুন্তলা রাজার কথা শুনিয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় নীরব ও অবনতমস্তক হইয়া রহিলেন,—(সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতি)।

[কালিদাস গ্রন্থাবলী, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ]

কেন? অন্য অতিথি আসিলে শকুন্তলার এই ভাবান্তর উপস্থিত হইত কি? তিনি মহর্ষি কণ্বের কন্যা, কুলপতি তপোবনের অতিথিসেবাদির সমস্ত ভার তাঁহার উপর দিয়া তীর্থে গিয়াছেন। রাজা রাজা-রূপেই হউক বা রাজপুরুষরূপেই হউক,—যেরূপেই হউক, যখন তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়াছেন, তখন শকুন্তলার তাঁহার সাদরে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া সৎকার করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তিনি লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন কেন? তরুণ সম্রাট্ দুষ্মন্ত সাক্ষাৎ কন্দর্পের মত রূপবান্,—প্রথম দর্শনেই শকুন্তলা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া জগৎসংসার সমস্ত ভুলিয়াছেন,—অতিথি-সৎকাররূপ কর্ত্তব্য ত ভুলিয়াছেনই। যাঁহার মুখে এত কথা, তিনি এক মুহূর্ত্তে নীরব। ইহা কি Love at first sight নহে? মহাকবি অপূর্ব্ব কলাকৌশলে এক—"সাধ্বসাদবচনা" কথাটি বসাইয়া মানুষের মনোরাজ্যের কত বড় একটা বিরাট্ দিক্ বিশ্লেষণ করিয়া দিলেন, তাহা নাট্যরসামোদিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাই চরিত্রসৃষ্টির ক্রমবিকাশ—ইহা হইতেই নাট্যকারের বিরাট মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রস্ফুট হয়।

এই Love at first sight,—এটা যে কি, তাহা শকুন্তলা প্রথমে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না, তাই স্বগত বলিতেছে:—কিং ণু কৃখু ইমং পেক্খিঅ তপোবণবিরোহিণো বিআরস্‌স গমণীঅ মহি সংবুত্তা।

অর্থাৎ কেন এঁকে দেখে অবধি আমার মনে তপোবনের বিরুদ্ধ একটা ভাবের উদয় হচ্ছে?"

[কালীদাস গ্রন্থাবলী, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ]

এই রকমই হয়। তপোবনের তাপসকন্যার মন অতিথিকে দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় কেন? ইহা ত তপোবনের উপযুক্ত নহে। কিন্তু "মন্মথো দুর্নিবার":—সে যে ফুলধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা ত ব্যর্থ হইবার নহে। রাজার দিকে শকুন্তলার ইহা প্রথম আকর্ষণের পরিচয়—ইহারই ক্রমবিকাশ মহাকবি পরে দেখাইয়াছেন।

১১

যখন অনসূয়া রাজার পরিচয় চাহিলেন, তখন শকুন্তলা মনে মনে বলিতেছে,—"হিঅঅ মা উত্তম্ম এসা তুএ চিন্তিদাই অণসূআ মন্তেই।

অর্থাৎ "হৃদয়! অত উতলা হচ্ছ কেন? তুমি যা জানবার জন্য আকুল হয়েছ, অনসূয়া তাই জিজ্ঞাসা করেছে।"

[কালিদাস গ্রন্থাবলী, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ]

ইহা শকুন্তলার অনুরাগের পরিচয়ের দ্বিতীয় স্তর।

১২

যখন অনসূয়া বলিল,—"সণাআ দাণিং ধম্মআরিণো। অর্থাৎ, তবে ধর্ম্মচারী তপস্বীরা ইদানী স-নাথ হইল," তখন শকুন্তলা কি করিলেন? তিনি ("শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তি") অর্থাৎ অনসূয়ার স-নাথ কথাটিতে নাথ অর্থাৎ স্বামী কথাটি সূচিত হইল বলিয়া, শকুন্তলার প্রেমের অভিব্যক্তি হইল এবং সে জন্য বিষম লজ্জাও উপস্থিত হইল, সে লজ্জা সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না, লজ্জায় সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ইহা শকুন্তলার অনুরাগ অভিব্যক্তির তৃতীয় স্তর।

১৩

সখীরা শকুন্তলার এই ভাব লক্ষ্য করিল, রাজারও আকার-প্রকারে ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। তাই তাহারা চুপি চুপি বলিল,—

"হলা সউন্দলে জই এত্থ অজ্জতাদো সন্নিহিদো ভবে," অর্থাৎ ওলো শকুন্তলে! যদি আজ এখানে তাত কণ্ব উপস্থিত থাকৃতেন?"

শকুন্তলা বলিল, "তদো কিং ভবে,—অর্থাৎ তা হ'লে কি হোতো ?"

সখীরা অমনই বলিল,—"ইমং জীবিদসব্বস্সেণ বি আদী-হিবিসে সহ কদত্থং করিস্সদি," অর্থাৎ তা হ'লে আজ তাঁর জীবন-সর্ব্বস্বকে দান করিয়াও অতিথিসৎকার করিতেন।"

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপে বলিল, "তুম্ হে অবেধ। কিং বি হিঅএ কারিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅনং সুণিস্সং।"

অর্থাৎ তোরা দূর হ! মনে কি একটা ফন্দী এঁটে তোরা এ সব কথা বলছিস্। তোদের কথা আমি শুনতে চাই নে।"

[কালিদাস গ্রন্থাবলী, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ]

প্রণয়ি-প্রণয়িনীর পরস্পর মনের আকর্ষণের কি অপরূপ চিত্র তুলিকাস্পর্শে শিল্পী ফুটাইয়া তুলিতেছেন! মনের আসল আকাঙ্ক্ষা সখীদের কথায় ব্যক্ত হইতেছে, অথচ কৃত্রিম অভিনয়ে তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। আর্য্যজনসুলভ লজ্জা, স্বাধীনতা ও সামাজিকতার আবরণ কি শোভনই হইয়াছে!

১৪

তাহার পর সখীদের মুখে রাজা যখন শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন,—

"মানষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ॥

অর্থাৎ মানবীতে কি এমন রূপ সম্ভব হয়? মাটীর পৃথিবী হইতে কি বিদ্যুৎপ্রভা উৎপন্ন হয়?"

শকুন্তলা অমনই রাজার কথা শুনিয়া ("অধোমুখী তিষ্ঠতি") অধোমুখে লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল।

[কালিদাস গ্রন্থাবলী, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ]

প্রণয়ী, প্রণয়িনী নিজের লভ্য হইতে পারে কি না,—স্বয়ং ক্ষত্রিয় রাজা, সুতরাং শকুন্তলা ক্ষত্রিয় রাজার অনুরূপ ক্ষত্রিয় রাজার ঔরসজাত কি না,—জানিতে চাহিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার মনের বাসনার কথাটা প্রণয়িনীকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসামান্য রূপের প্রশংসা করিয়া প্রণয়িনীকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কামনা করিতেছেন। প্রণয়িনী শকুন্তলাও প্রণয়ী রাজার মুখে সে কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, বুঝিলেন,—রাজা তাঁহারই। কিন্তু বুঝিয়াই আর্য্যনারীর স্বভাব-সুলভ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

ক্রমবিকাশের ইহা অন্যতম স্তর। [ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)।

ফাল্গুনে

ফাল্গুন আসে ফাল্গুন আসে বন-মর্ম্মরে;
মন্দার শাখে পুষ্পের ঝাঁকে গীতি সঙ্করে;
সঙ্কার তারি কোথা অন্তরে ?
নূতন পাতায় নূতন আশায় জাগিল বাণী,
পুষ্প মুকুল ব্যগ্র আকুল কি যেন জানি;
দিকে দিকে নূতন প্রাণের জাগে বার্ত্তা রে।
আশায় উজল নূতন পথে কর যাত্রা রে।

ফাল্গুন আসে জ্যোৎস্না-বিলোল নীল-নভসে,
কোকিল কুহু জাগ্‌ছে মুহু জাগ্‌ছে রভসে।
মোদের হিয়ায় নাহি পরশে।
দখিণ পবন মাতাল হ'ল ফুলেরি বাসে,
আজ ধরণী হয় তরুণী ফুলেরি বাসে;
না জানি আজ কোন্ কুহকীর কুহক মন্তরে,
নূতন প্রাণের লাগ্‌ল সাড়া লাগ্‌ল অন্তরে।

মিছে কথা গাহ কবি আজি ফাল্গুনে;
দুখ্‌ভরা দিন যায় আমাদের আশার কাল গুণে;
মিছে বেঁধ রসেরি তূণে।
কত ব্যথা, কত পীড়া, কত নিরাশা,
দুঃখের পাথার নিবিড় আঁধার না মিলে দিশা;
রসের বাণী মিছে কথা মিছে জল্পনা
তোমার অলস মনের শুধু অলস কল্পনা।

মিছে নয় ভাই, চেয়ে দেখ মধু ফাগুনে,
মিছে জ্বল মিছে মর দুঃখ আগুনে;—
লও ডেকে লও মধু-ফাগুনে।
জানি জানি ব্যথা আছে তবু এস না,
রসকল্প তরুর শাখে ক্ষণিক ব'স না।
ছন্দ-দোদুল হিল্লোল দোলে ক্ষণিক দোল না
গীতিমুখর উৎসব সুরে ব্যথা ভোল না।

মিছে নয় ভাই হারায়েছ চোখেরি দৃষ্টি
অন্তর তলে যে চোখ করে সুন্দরে সৃষ্টি।
যে চোখ করে সুধারি বৃষ্টি।
বিশ্ব-চলার সুরে কর হৃদয় ছন্দিত,
ভালবাসার মন্ত্র পড় হবে বন্দিত
প্রেমের সুরে জেগে দেখ মিটেছে ক্ষুধা,
ভুবন ভরি ঐ উতরোল ঝরিছে সুধা।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।

মিশ্র জৌনপুরী—একতালা

আমারে ভালোবেসে আমারি লাগিয়া
সয়েছ কত ব্যথা, বেদনা-অপমান—
আজ তাই নিয়ে আমি যাই গো দূরে যাই
তোমার সব দুখ হউক অবসান!

আমারে স্মরি প্রিয়, অধীর চঞ্চল
হয়ো না যেন তুমি ফেলো না আঁখিজল।
আমি যা নিয়ে যাই, তুলনা তারি নাই,
তোমার শত স্মৃতি, কত সে কথা-গান!

কথা—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।

II{ সা রা মা | মা গমা মা | রমা পদা পা | -া -া -া I মপদা দা দা | -া -া দা |
আ মা রে | ০ ভা লো | বে০ ০০ সে | ০ ০ ০ আ০০ মা রি | ০ ০ লা

প ণদা পা | -দা পদপা মা I মা মা পদা | ণর্সা ণধা ণা | পা দা পা | -দা পদপা মা I
গি ০০ য়া | ০০ ০০০০ স য়ে ছ০ | ০০ ক০ ত | ব্য ০০ থা | ০০০০০০

রমা মা রমা | পদা পমা পা | রা মা া | রজ্ঞা মজ্ঞা রসা } I { পা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্রা |
বে দ না০ | ০০ অ০ প | মা ০ ০ | ০০ ০০ ০ন্ } { আ জ তা | ই নি য়ে

পধা ধর্সা র্সর্রা | সর্র্মা জ্ঞম জ্ঞর্রা র্সা | র্সা র্রা র্সর্সা | -া ণা ধপা | ণা -া -া | -া -া -া I
আ০ ০০ ০০ | মি০ ০০ ০ | যা ই গো০০ | ০ দূ রে | যা ০ ০ | ০ ০ ই

ধা ধর্সা ণর্সণা | ণা ধা ধণা | পধা -া পা | -া -া -া | সা রা রা | -া রপা মপা |
তো মা০ র০০ | ০ স ব০ | দু০ ০ খ | ০ ০ ০ | হ উ ক | ০ অ০ ব০

সজ্ঞা -া -া | -া রা সা } II
সা ০ ০ | ০ ০ ন্ }

{ জ্ঞা মা দা | -া দা দা | দণা দণা দণা | -া -া -া I ণা ণর্সা র্সর্ঋা | র্সণা দা দণা |
আ মা রে | ০ স্ম রি | প্রি০ ০০ য় | ০ ০ ০ অ ধী০ র০ | ০০ ০ চন্

দণা র্সর্ঋা ণর্সা | া -া -া I র্সা সর্রা র্সর্সা | ণা ণা ণ | পধা ধর্সা র্সর্ঋা | র্সর্র্মজ্ঞা র্রা র্সা I
চ০ ০০ ল | ০ ০ ০ হ য়ো০ না০০ | ০ যে ন | তু০ ০০ ০০ | মি০০০ ০ ০

র্সা র্সা ণর্সা | র্জ্ঞর্সা ণা র্সা | ণর্সণা দা পা | পদা (পদপা ম) } I মা র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্রজ্ঞর্মজ্ঞা র্রা |
ফে লো না০ | ০০ আঁ খি | জ০০ ০ ল | ০০ (আ০০ মি) } যা ০ নি | য়ে যা০০০ ০

র্সা -া র্রজ্ঞ র্রজ্ঞা | ণা া ণা I ণা র্সা ণর্সা | র্জ্ঞর্সা ণা র্সা | ণর্সণা দা পদা | পদপা মা মা I
০ ০ ০০ ০ | ০ ০ ই তু ল না০ | ০০ তা রি | না০০ ০ ০০ | ০০০ ০ ই

মা -া পদা | ণর্সা ণধা ণা | পা দা পা | -দা পদপা মা I মা মা রমা | পদা পমা পা |
তো ০ মা০ | র্ শ০ ত | স্মৃ ০ তি | ০০ ০০০ ০ ক ত সে০ | ০০ ক০ থা

রা মা -া | রজ্ঞা মজ্ঞা রসা II
গা০ ০ | ০০ ০০ ০ন্

সেকাল ও একাল

সেই ছোটবেলার কথা।

ঈশ্বর মণ্ডল ছিল আমাদের সেই ঠাকুর্দ্দার আমলের চাকর, অতিবৃদ্ধ। উঠানের যে অংশটায় প্রথমেই আসিয়া রৌদ্র পড়িত, সেখানে বসিয়া বসিয়া সে তামাক খাইত। আমরা ছোট ছোট ডালায় করিয়া মুড়ি-গুড় লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিতাম, রৌদ্র পোহানো, গল্প শোনা এবং মুড়ি খাওয়া চলিত।

বাহিরবাড়ীর পূবের অংশে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া তাহার মধ্যে কয়েকটি খড়ের ঘর করা হইয়াছিল, ঐটি ছিল আমাদের চাকরবাড়ী। ঈশ্বর মণ্ডল সপরিবারে সেই স্থানে থাকিত।

আমার জন্মের পূর্ব্বেই আমার ঠাকুর্দ্দা মারা যান। ঠাকুর্দ্দার অভাব আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। আমাদের সকল আহ্লাদ-আব্দার আমরা ঈশ্বর দাদুকেই জানাইতাম, ঈশ্বর দাদুও নিজ নাতি-নাৎনীর মতই আমাদের ন্যায্য আব্দার রক্ষা করিয়া চলিত। অনেক সময় মা-পিসীদের সহিত এই লইয়া তাহাকে ঝগড়া করিতেও দেখিয়াছি।

বাবা-কাকারাও ঈশ্বর দাদুকে মানিয়া চলিতেন, ঈশ্বর দাদুর কাছে তাঁহারাও কোন অন্যায় করিয়া রেহাই পাইতেন না। অনেক পারিবারিক সমস্যার সময় দেখিয়াছি, তাঁহারা একযোগে ঈশ্বর দাদুর সহিত পরামর্শ করিতেন। ঈশ্বর দাদুও যেন আমাদেরই পরিবারের এক জন, এমনি-ভাবেই উপদেশ দিত। আমাদের লজ্জায় যেন তাহারও লজ্জা, আমাদের পরিবারের সুখে যেন তাহারও আনন্দ।

ঈশ্বর দাদুর এখন আর খাটিয়া খাইবার বয়স নাই। সে কেবল তামাক খাইত আর ছোটদের তত্ত্বাবধান করিত। তাহার ছেলে পরাণ মণ্ডলই এখন আমাদের বাড়ীর প্রধান চাকর। পরাণ মণ্ডলকে আমরা পরাণ কাকা বলিয়া ডাকিতাম। পরাণ কাকার মাহিয়ানা ছিল মাত্র দুই টাকা, কিন্তু পরাণ কাকার স্ত্রীকে দেখিতাম, প্রত্যহ আসিয়া এক ধামা চাল-ডাল, তেল-নুন লইয়া যাইত।

৺পূজার সময় প্রত্যেককেই সম্বৎসরের কাপড়-জামা দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত বাড়ীর পুরাণো জামা-কাপড়ে ত' তাহাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিলই। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সম্পূর্ণ ভরণপোষণ আমাদের পরিবার হইতেই চলিয়া যাইত। শুধু আমাদের পরিবারেই নয়, প্রায় প্রতি গৃহস্থের আশ্রয়েই এই রকম এক ঘর করিয়া চাকরবাড়ী, নাপিতবাড়ী অথবা ধোপাবাড়ী আছে দেখিতাম এবং তাহারা উক্ত গৃহস্থের একান্ত আপনার জনের মতই ব্যবহার পাইত।

ঈশ্বর দাদুর কাছে আমরা অনেক গল্পই শুনিতাম,—প্রায় সবই আমার ঠাকুর্দ্দার কথায় ভরা। সে বলিত, "যে দিন তোদের দাদু বিয়ে ক'রে এলেন, সে দিন এই এক আমিই তাঁর পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে পেরেছিলাম, আর সব পেছিয়ে গেল। পাল্‌কি যখন এই উঠোনে এসে নামল, নিজের গা থেকে রেশমের উড়ুনীটা খুলে নিয়ে আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। সে উড়ুনী এখনো আমার বাক্সে তোলা আছে, আমরা চাকর মানুষ, আমাদের কি আর রেশমের উড়ুনী গায়ে দেওয়া চলে!"—সে দিন হয় ত ঠাকুর্দ্দার বিবাহের গল্পই চলিত। এখনকার বুড়ী ঠাকুরমাটি সে দিন কতটুকু ছিলেন। তাঁহার সাত হাত চেলীর দেড় হাত ঘোমটার নীচে হইতে তিনি ভয়ে ভয়ে কেমন পিট্ পিট্ করিয়া তাকাইয়াছিলেন, এই সব গল্প বলিয়া বৃদ্ধের যেন আশা মিটিত না।

কোন দিন হয় ত বলিত, "দেখ্, তোদের ঠাকুর্দ্দার গায় কি রকম জোর ছিল জানিস্? তবে বলি শোন্—তখন শীতকাল, রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবু তামাক খাচ্ছিলেন, আর আমার সঙ্গে গল্প কচ্ছিলেন। কতক্ষণ পর ছিলিমটা বদলে দেওয়ার জন্য কল্‌কে নিয়ে রান্নাঘরে আগুন চাইতে গেলাম। তোর বড় পিসী ভেতর থেকে আগুন দিচ্ছিলেন, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালাম। হঠাৎ কি রকমে পা-পিছলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তেই তোর পিসীর হাতে আমার ছোঁওয়া লেগে গেল। তখন বাবুদের সব খাওয়া হয়ে গেছিল, খালি মেয়েরা বাকি ছিলেন, কিন্তু সে দিন আর মেয়েদের খাওয়া হ'ল না। রান্নাঘরে আমার ছোঁওয়া লাগায় সমস্ত হেঁসেল বার ক'রে দেওয়া হ'ল। তোর পিসীমা গিয়ে নামলেন

পুকুরে। আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি, এমনি সময় দাদাবাবু হঠাৎ আমাকে খপ্ ক'রে তুলে নিয়েই ছুটলেন পুকুরের দিকে, 'ব্যাটা, অসাবধান কোথাকার, মেয়েটাকে এই দুপুর রাতে চান করিয়ে ছাড়লি। ছাখ্ ব্যাটা, জলে নেমে কেমন মজা লাগে।' বলতে বলতে সেই শীতের রাতে ঐ পুকুরের ঠাণ্ডা জলের মধ্যে আমাকে ঝুপ্ ক'রে ফেলে দিলেন, কত চেষ্টা করেছিলেম, কিছুতেই তাঁর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারিনি।"

বৃদ্ধকে রাগাইবার জন্য আমরা বলিয়াছিলম, "হুঁ—দাদু তোমাকে একটুও ভালবাসতেন না, তা নৈলে কি আর অমন শীতের রাতে কখনো এমনি ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ফেলে দেয়? তুমি কি আর মানুষ নও? ছোঁওয়া গেছল তাতে কি হয়েছিল, চান্ করতে হবে কেন, যত গোঁড়ামি আর কু-সংস্কার।" ইচ্ছা ছিল, একটা লেক্‌চার ঝাড়িয়া দিব, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বুড়া একবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। "বটে, বটে, তোরা এই দু'দিনের ছোঁড়া, তোরা সে সব বুঝবি কি রে, ও যে ধম্মো। আমাদের ছোঁওয়া তোরা খাবি কি ক'রে—তাতে তোদেরও জাত যায়, মোদেরও পাপ হয়, ও কি বলতে আছে,—ছিঃ, তোরা যে বামুন।"

ভাবিলাম, হায় হায়! এদের আমরা কি করিয়াই রাখিয়াছি। সত্যকারের ধর্ম্ম ত কিছুই নাই, আছে খালি আচার আর সংস্কার মাত্র।

ঈশ্বর দাদু কিন্তু বলিয়াই চলিয়াছে, "বাবু আমাকে "ভালবাসতেন কি না, তাও আজ তোদের কাছে শিখতে হবে না কি! আমাকে কি রকম ভালবাসতেন শুনবি তবে, এ সব তোদের কাছে গল্প ব'লে মনে হবে। সেবার আমি যখন ব্যামোতে পড়লাম, দাদাবাবু কি না করলেন! আমার গায় ছিল একটা কাঁথা, বাবু ছুটে গিয়ে তাঁর নিজের লেপটা এনে আমার গায় মাথায় চাপা দিয়েই ছুটলেন কব্‌রেজ ডাকতে। গাঁয়ের সেরা কবরেজকে ডেকে আনলেন। তার পর কত বড়ী, কত পাচন নিজের হাতে আমাকে খাওয়াতেন, আর ক'দিন যে রাত জেগেছিলেন, তার ত ঠিকই নেই।" এই সব বলিতে বলিতে গর্ব্বের আনন্দে এক দিকে বৃদ্ধের মুখ যেমন চক্‌চক্ করিয়া উঠিত, আবার আর এক দিকে ঠাকুর্দ্দার অকালমৃত্যুর শোকে চোখ ছলছল্ হইয়া আসিত।

আমাদের শৈশব আমরা এই বৃদ্ধকে সঙ্গী করিয়াই কাটাইয়াছি। আমাদের দাদু ছিলেন না, কিন্তু এই বৃদ্ধের নিকট আমরা যে স্নেহ পাইতাম, দাদু থাকিলেও তাঁহার নিকট ইহার অপেক্ষা বেশী পাইতাম কিনা সন্দেহ।

ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জ্জন এবং অর্থোপার্জ্জনের চাহিদা আসিয়া পড়িল এবং বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতে হইল। বাড়ীতে রহিলেন জ্যাঠামহাশয়ের একমাত্র ছেলে—আমার একমাত্র দাদা।

অতঃপর বহু বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সুদূর কর্ম্মস্থলে নানা কাযের ব্যস্ততায় পঁচিশ ত্রিশটা বৎসর হঠাৎ ফুরাইয়া গেল। এই দীর্ঘ সময়টা বাড়ীর কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মাঝে একবার খবর পাইয়াছিলাম, আমাদের সেই স্নেহময় দাদাটি মারা গিয়াছেন। এখন তাঁহারই ছেলেরা বাড়ীতে আছে।

ছুটীছাটা যে একেবারে না পাইতাম, তাহাও নয়, কিন্তু গৃহিণী এবং পুত্র-কন্যাদের আব্দারে শিলং দার্জ্জিলিং পুরী ঘাটশীলা করিয়াই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইত, বাড়ী যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিত না। এবার হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সামান্য কয়েক দিনের ছুটী ছিল, রওনা হইয়া পড়িলাম। গৃহিণী এবং ছেলে-মেয়েরা সাহেবী ভাবাপন্ন, তাই তাহাদিগকে সঙ্গে লইলাম না—তাহারাও পাড়াগাঁয়ে যাইতে চাহিল না।

গ্রামে ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম, এ গাঁ যেন আমার নয়—নিজ বাড়ী ঢুকিলাম, এ বাড়ীর সহিত আমার পরিচয় নাই, এ যেন সম্পূর্ণ অন্য কাহারও বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। বাড়ীর পুরাণো ঘর-দরজাকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দিয়া যথাসম্ভব আধুনিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে সেই লাউ-কুমড়োর মাচা আর নাই—সুন্দর ফুলের বাগান করা হইয়াছে। যেখানে ধানের মরাই ছিল, সেখানে রুচিসঙ্গত বাথরুম্ তৈরী হইয়াছে। ধানের হাঙ্গামা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহিরে একটা ওয়েটিংরুম, একটা ড্রইংরুম, ভেতরে একটা লেডিজ রুমও আছে। বাচ্চাগুলির চুল বব্ করিয়া কাটা, পোষাক-পরিচ্ছদ সবই আধুনিক। পাউডার-স্নো-ক্রীমের অপ্রতুল নাই।

দেখিয়া শুনিয়া মনটা ভারি খুসী হইয়া উঠিল। আমি

ভাবিয়াছিলাম, বুঝি কেবল আমার সংসারটাই এ'রকম ধারায় চলিয়াছে, কিন্তু এখানে আসিয়া বুঝিলাম, দেশ সত্যই অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই সভ্য কায়দায় চলিতে ফিরিতে শিখিয়াছে, প্রতি পরিবারেই শিক্ষিত এবং কেতাদুরস্ত ছেলে-মেয়ের অভাব নাই। বুঝিলাম, ইহাই অগ্রগতি। খুব খুসী মনেই ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রামটি দেখিতে লাগিলাম। কোথাও লাইব্রেরী, কোথাও ক্লাব। বারোয়ারি চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকিয়া দেখি, সেখানে ছেলেরা ডন-কুস্তি উঠবস করিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হয় না, কুস্তিখানায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

খুব হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, ঠিক যেন আমারই মনের ভাবগুলি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্ব্বকালের যত সব কুসংস্কার এবং গোড়ামী হইতে দেশ ক্রমশঃ মুক্ত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু ইহার চাইতেও বড় বিস্ময় আমার জন্য যে সঞ্চিত আছে, তাহা তখনও জানিতাম না। সেই বিস্ময় প্রকাশিত হইল আহারে বসিয়া। একটি ছোক্‌রা আসিয়া একমাত্র আমাকে বাদ রাখিয়া আর সকলকে পরিবেষণ করিয়া গেল; আমার আহার্য্য বাড়ীর মেয়েরা নিজের হাতে লইয়া আসিলেন। এ স্বতন্ত্র ব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর শুনিলাম, উক্ত ছোক্‌রাটি আমাদের সেই ঈশ্বর দাদুর নাতি, পরাণ মণ্ডলের ছোট ছেলে নিতাই মণ্ডল; সুতরাং তাহার হাতে যদি আমার আহারে আপত্তি থাকে, সেই কারণেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খবর লইয়া জানিলাম, বাড়ীর মা-লক্ষ্মীরাও তাহার হাতেই খান। কারণ, একটা ঠাকুর ও একটা চাকর আলাদা না রাখিয়া এই 'কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ডে' অনেক সুবিধা। ওকে মাত্র ৮ টাকা মাহিনা দিতে হয়। মা-লক্ষ্মীরা নিজের হাতে রান্না করিলে যে খরচায় আরও সুবিধা হয় এবং খাদ্যগুলিও সুভোজ্য হইয়া উঠে, তাহা বলিতে আর সাহসে কুলাইল না যাহা হউক, ইহাও আমার কাছে একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের সংবাদ। কারণ, আমার নিজ সংসার তখন বাবুর্চ্চিতে প্রমোশন্ পাইয়াছে। এই একটা বিষয়ে আমার একটু সঙ্কোচবোধ হইতেছিল, এবারেও সেই সঙ্কোচটুকুও কাটিয়া যাওয়ায় অনেকটা হাল্কা বোধ করিলাম। তাহাদের জানাইয়া দিলাম, নিতাই মণ্ডলের হাতে আহার্য্য গ্রহণে আমার আপত্তি নাই। শুনিয়া তাহারাও সুখী হইল।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া উঠিতেই বাড়ীর কর্ত্তা অর্থাৎ আমার বড় ভাইপো শ্রীমান্ অমূল্যভূষণ ছুটিয়া আসিল, "চলুন কাকাবাবু। আজ আমাদের মিটিং আছে—অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন—আমাকেও ধরেছে বলবার জন্য, চলুন শুনবেন।"

তাহার আগ্রহাতিশয্যে মিটিংয়ে যাইতে হইল। আমার ভাইপোটি বেশ বলিতে পারে। বেশ গুছাইয়া এক ওজস্বিনী ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা করিল—শুনিয়া গর্ব্ব বোধ করিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া চা-পান করিতেছি, এই সময় আমাদের সেই পুরণো চাকর পরাণকাকা আসিয়া উপস্থিত, বুড়ো এখনও বাঁচিয়া আছে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছ, কাকা?"

বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাহারা আমার সম্মুখে ছিল, তাহারা একটা চাকরকে কাকা বলিতেছি শুনিয়া এমন বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকাইল যে, আমি বেশ একটু লজ্জা পাইয়া গেলাম। ওদের কাছে আমরা আজ ব্যাক্‌নাম্বার হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের ছোট বয়সটা চট করিয়া উঁকি মারিয়া গেল। তখন আমরাই ছিলাম ভবিষ্যৎ-সংখ্যা। আজ আবার আমরাই অতীত সংখ্যায় পিছাইয়া পড়িয়াছি। এই ভাবিয়া মনকে একটু চাঙ্গা করিয়া লইলাম যে, আবার এমন দিনও আসিবে—যখন উহারাও আমাদের দলে আসিতে বাধ্য হইবে।

পরাণ কাকা ততক্ষণ প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়াছে। সে বলিল, "আর বাবু, থাকা না থাকা, এখন যেতে পারলেই হয়। অভাবের তাড়নায় না খেয়ে মরবার যোগাড় হয়ে উঠেছে।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি কাকা! তুমি পেতে দু'টাকা মাইনে, এখন তোমার ছেলে পাচ্ছে আট টাকা, তোমার ত সুবিধাই হয়েছে।"

পরাণ কপাল চাপড়াইয়া বলিল, "কোথায় সুবিধা বাবু, আমি মাইনে পেতাম দু'টাকা, আমার সেই দু'টাকাই জমা থাকত, খাওয়া-পরা সবই ত আপনারা দিতেন। এখন ছেলে আট টাকা মাইনে পায় বটে, কিন্তু রোজের চালডাল বন্ধ হয়ে গেছে, বছরে একজোড়ার বেশী কাপড়ও পায় না। এমন কি, পুরনো জামা-কাপড় পর্য্যন্ত এক টুক্‌রো পাই

না—এ্যালুমনিয়মের বাসনওয়ালা বাসন দিয়ে সে সব নিয়ে যায়। আট টাকা মাইনেয় কিছুই কুলোয় না। আপনাদের আমলে দেওয়া যে ক'টা টাকা ছিল, তা পর্য্যন্ত ফুরিয়ে গেছে। সময় অসময় আছে, কি যে করব বাবু কিছু কূল-কিনারা পাই না। এর ওপর আর এক বিপদ, আমাদের এই সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে চ'লে যাওয়ার জন্য বাবুরা নোটিশ দিয়েছেন। আমরা আপনাদের সাত পুরুষের চাকর বাবু, আমাদের ওপর একটু দরদ নেই, একটু মায়া হ'ল না—সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন! আপনারাও বাবু ছিলেন, আর আজকালও বাবু হয়েছে। আপনারা আমাদের চাকর ব'লে কখনও মনে করতেন না, নিজের ভাই কাকার মতই মনে করতেন—কত দরদ ছিল, আমরাও ছিলাম আপনাদেরই এক জন। আর এখন দেখছি, বাবুদের সব একটু মায়া নেই, একটু দরদ নেই, মাইনে দিচ্ছি, কায কর—তুমি চাকর, আমি মনিব, বাস্, এই পর্য্যন্ত। দেখুন দেখি, এখন এই বুড়ো বয়সে কোথায় দাঁড়াই, কি করি?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল কাপড়ের খুঁটটায় চোখ মুছিল।

পরাণ মণ্ডলকে ভিটা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে নোটিশ দিয়াছে শুনিয়া আমিও বড়ই দুঃখিত হইলাম। হঠাৎ এমন কি আবশ্যক হইল যে, উহাকে উঠাইয়া দেওয়ার মত ব্যবস্থা করিতে হইল, বুঝিতে পারিলাম না; কিছুই জানি না, সুতরাং ঐ বিষয়ে চুপ করিয়া অন্য দিকে কথা তুলিলাম, বলিলাম, "না না, ওটা তোমার ভুল বিশ্বাস কাকা; আজ-কালকার বাবুদেরই ত দেখতে পাই, তোমাদের জন্য বেশী দরদ। এই ত যায়গায় যায়গায় মিটিং ক'রে তোমাদের জন্য কত কাণ্ড করার ব্যবস্থা হচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে বামুন-কায়েতরা একসঙ্গে উঠছে, বসছে, খাচ্ছে। তোমার বাপ এক দিন রান্নাঘরের ভিটে ছুঁয়ে দিয়েছিল ব'লে তাকে কম হেনস্থা হ'তে হয়েছিল? আর আজ তোমার ছেলে সেই রান্নাঘরেই কর্ত্তা হয়ে উঠেছে, এ কি কম সুখের হে! আগের দিনের বাবুরা তোমাদের ছায়া মাড়ালেও চান করতেন, আর আজকাল আমরা তোমাদের হাতের রান্না কি রকম আদর ক'রে খাই। তবু বলছ, আজ-কালকার বাবুদের দরদ নেই? এ তোমার রাগের কথা, কাকা। তোমাকে উঠে যাওয়ার নোটিশ দিয়েছে, তাই তুমি চ'টে গেছ। তা নৈলে তোমরা কোথায় ছিলে, আর তোমাদের আমরা কোথায় তুলেছি, একবার ভেবে দেখ দেখি?"

পরাণ মণ্ডল একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "চুলোয় যাক্ বাবু, আমাদের অমন উঁচুতে উঠা। আপনাদের রান্নাঘরে ঢুকতে পেলেই আমাদের এমন কি স্বর্গলাভ হয়ে যাবে? রান্নাঘরে ঢুকতে চাই না, বরং রান্নাঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আপনার বাপদাদার মত বুকের ওপর টেনে নিন, তাই আমরা চাই। আট টাকা মাইনে চাই না, দু' টাকাই দেবেন। তেমনি ধামা-ভরা চাল, ডাল, তেমনি জামা-কাপড়, তেমনি দরদ দিয়ে আমাদের আবার কাছে টেনে নিন্ বাবু, তাতেই আমরা বেশী সুখী হব। এক দিকে যেমন রান্নাঘরে ঢুকতে দিয়েছেন, আর এক দিকে তেমনি প্রাণ থেকে দিয়েছেন দূর ক'রে। এমন জাতে ওঠার চাইতে বরং আগের জাতে ঠ্যালাই খে ছিলাম ভাল।" এই সব বলিতে বলিতে পরাণ ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভাবিলাম, ব্যাটা মুর্খ, আজ-কালকার অগ্রগতির কিছুই বোঝে না। এ সব কথা ও বুঝিবেও না, ওকে বোঝানোও মুস্কিল। আমরা ওদের মঙ্গলের জন্য কত চেষ্টা করিতেছি, ওরা সে সব কি বুঝিবে? বলিলাম, "দেখ পরাণ কাকা, তুমি এ সব ঠিক বুঝবে না, তোমাদের উন্নতির জন্য আমরা অনেক চেষ্টা কচ্ছি। অনেক সভা-সমিতি ক'রে—অনেক কাগজে লিখে আমরা তোমাদের ভাল করবার চেষ্টা কচ্ছি। এখন ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু আরও কিছু দিন পর দেখবে, এই থেকে তোমাদের খুব ভাল হবে।"

ইতিমধ্যে কোন্ সময় পরাণ কাকার ছোট ছেলে আমাদের সেই পাচক ছোক্রা নিতাই মণ্ডল যে আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। আমার কথা শেষ না হইতেই সে বলিয়া উঠিল, "তা বাবু, কবে যে আমাদের কি লাভ হবে, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। এখন ত বরং উল্টোটাই দেখছি। লাভ হ'ল আপনাদেরই—আপনারা এক লোক দিয়ে চাকর ঠাকুর দু'জনের কাযই পেলেন। ক্ষতি হ'ল আমাদের—খেটে খেটে প্রাণ গেল, তবু পেট ভরল না।"

এই বলিতে বলিতে সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, আমিও বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

আহারাদির পর অমূল্যকে ডাকিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ অমূল্য, তুমি না কি পরাণকাকাকে নোটিশ দিয়েছ উঠে যাওয়ার জন্য, ওরা এতকালের পুরণো লোক—দরকারটা কি খুবই জরুরী?"

অমূল্য উত্তর করিল, "হ্যাঁ কাকাবাবু, ওর উঠে যাওয়ার মেয়াদ আর মাত্র পাঁচ দিন আছে। এর পর ওকে উঠতেই হবে। ঠিক করেছি, বাইরে একটা টেনিস-লন করব, কিন্তু যায়গা কম প'ড়ে গেল, তাই ওকে উঠিয়ে দিলাম। আর আগেকার লোকদের সব কি বুদ্ধিই ছিল বলুন দেখি! বাড়ীর ভেতর একটা চাকরের গোষ্ঠী পুষে রাখা, যত ন্যাষ্টি (nasty), এই ক'রে ক'রেই দেশটা উৎসন্নে গেছে।"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "তা ও এখন কোথায় যাবে, সে সব কিছু কি ঠিক হয়েছে?"

অমূল্য আমার কথাগুলি শুনিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, "কাকাবাবু, আপনি দেখছি এখনও ঠিক্ সেই রকমই আছেন। ওরা কোথায় যাবে, তা নিয়ে আমাদের কি মাথাব্যথা। কাষ করছে? মাইনে দিচ্ছি—বাস্, এই পর্য্যন্ত। কোথায় থাকবে, কি করবে, তা নিয়ে আমার কি দরকার?"

বর্ত্তমান যুগ অনুযায়ী কথাগুলি খুবই ঠিক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই, কিন্তু তবু যেন আমার মন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সায় দিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। পাঁচ দিন পর পরাণ মণ্ডলকে ভিটাছাড়া হইতে হইবে—মনটা বারেবারেই খচ্ খচ্ করিয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে চারদিন অতীত হইয়া গেল, পঞ্চম দিন উহারা মোটমাট বাঁধিয়া চলিয়া গেল। তা যাক্—আমি ত আর দু'দিনের জন্য আসিয়া নিজ আত্মীয়-স্বজনের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতে পারি না, সুতরাং চুপ করিয়াই থাকিলাম। বাড়ী বদলের হাঙ্গামায় নিতাই তিন চারি দিন কাষের কামাই করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মাহিয়ানার হিসাবে তাহার সে কয়দিনের মাহিয়ানা কাটা গেল।

আমারও ফিরিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। ফিরিবার মুখে পরাণকাকার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার হাতে লুকাইয়া পঁচিশটা টাকা দিয়া আসিলাম। পূর্ব্বপুরুষের মজ্জাগত সংস্কার আমাকে যেন মুখ ভেংচাইয়া গেল। যে সংস্কারকে চিরকাল কত তীক্ষ্ণ যুক্তির আঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহারই নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। লোকটাকে তাহার সাতপুরুষের ভিটাছাড়া করিয়া দিতে প্রাণটা সত্যই ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—পাপ নয় ত? এই পঁচিশটা টাকা দিয়া যেন প্রায়শ্চিত্তই করিয়া আসিলাম। তা এতকালের সঞ্চিত সংস্কার কি দু'এক পুরুষেই লুপ্ত হয়? এই ত শ্রীমান্ অমূল্য—ওর ত কিছুই বাধিল না। তা বাধিবে কেন, ওরা যে সংস্কার-মুক্ত। আহা, বেঁচে থাকুক, ওরাই ত দেশের আশা-ভরসা!

আমাদের বাড়ীর গা-ঘেঁসিয়াই ট্রেণের লাইন। ছুটন্ত ট্রেণ হইতে দেখিলাম, পরাণকাকার ভিটা সমান করিয়া সেখানে 'টেনিস-লন' তৈরী হইতেছে আর রান্নাঘরের দরজা ধরিয়া নিতাই সেই দিকেই তাকাইয়া আছে।

•

ট্রেণ হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিল আর ছাই-ভস্ম অনেক চিন্তাই মাথার মধ্যে পাক্ খাইতে লাগিল।—পূর্ব্বে ধর্ম্ম ছিল না, কিন্তু গোঁড়ামি এবং সংস্কার ছিল; ধর্ম্মের জন্য না হইলেও গোঁড়ামি এবং সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াও লোক একটু ভয়ে ভয়ে অন্যায় হইতে দূরে থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমানে ধর্ম্মভাব ত পূর্ব্বের তুলনায় এতটুকুও উন্নত হয় নাই। উপরন্তু গোঁড়ামি এবং সংস্কারও ছুটিয়া গিয়াছে, সুতরাং কোন দুর্নীতিই আর আমাদিগকে লজ্জা বা পীড়া দিতে পারে না। লজ্জা ত পাই-ই না, বরং বাহাদুরী, জয়ধ্বনি, করতালি পাইয়া থাকি। পূর্ব্বে যাহা ছিল লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ, বর্ত্তমানে তাহাই হইয়া উঠিয়াছে প্রকাশ্যে বাহাদুরীর ব্যাপার।

ধ্যেৎ ছাই, এ সব কি ভাবিতেছি—যত বাজে। বৃদ্ধ হইলে যে কোন সামান্য বিষয়ও বড় বেশী উত্তেজিত করিয়া তোলে; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আর কি।

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিমালয়ে পাঁচ-ধাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এই যমুনোত্তরীর আশ-পাশ হইতে ক্বচিৎ দু'একটি পাহাড়ী পাখীর ডাক শুনা গেল, তাহা বেশীর ভাগ বৈকালের দিকে। কোনটির শব্দ কথঞ্চিৎ কর্কশ, আবার কোনটির সুর দুই তিন মিনিট কাল একসঙ্গে স্থায়ী। সে ডাকে কেবল এ স্থানের কঠিন নীরবতা সূচিত করে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের চমক ভাঙ্গিয়া দেয়। আহারান্তে এ দিন আমরা বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে বাহির হইলাম। যমুনা পার হইয়া দেখি, বামভাগে একটি আচ্ছাদন-হীন পাকা ঘর ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহা এককালে ধর্ম্মশালারূপেই ব্যবহৃত হইত। প্রচণ্ড তুষারপাতে উপরের আচ্ছাদনটি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ কোন সময়ে হয় ত বৃহৎ ধর্ম্মশালাটিরও (যেখানে আমরা ছিলাম) অবস্থা এইরূপে লয় পাইতে পারে! নিয়ত তুষার-পাতের রাজ্যে মানুষ কতটুকু শক্তিমান? সন্ধ্যা পাঁচটায় আমরা "মার্কণ্ডেয় আশ্রমে" ফিরিয়া আসিয়া কাণ্ডিওয়ালাদের পাওনা চুক্তি করিলাম। ডাণ্ডি-যাত্রিদ্বয়ের এই ভাড়া অতিরিক্ত পড়িল।

পরদিন দশ মাইল দূরে "ওজিরি" আসিয়া রাত্রিযাপন করিলাম। সারা রাত্রি বৃষ্টিপাত হইল। পুরাতন পথে ফেরতকালে যতই মনে হইতেছিল, কত দিনে আবার গঙ্গোত্তরীর নূতন পথ ধরিতে পারিব, ততই যেন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনের বেলা সর্ব্বক্ষণই বৃষ্টির উৎপাত সব দিক্ দিয়াই ক্লেশের কারণ। বোঝাওয়ালা ভিজিতে ভিজিতে বোঝা লইয়া চলে। এ স্থলে আসবাবপত্র, বিশেষ বিছানা প্রভৃতিকে বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিতে হয়। (বলা বাহুল্য, এই জন্যই এ পথে অতিরিক্ত অয়েলক্লথ সঙ্গে লওয়া আবশ্যক)। কুলীগণ পরিশ্রান্ত অবস্থায় যেখানে সেখানে ভিজা স্থানের উপরেই পৃষ্ঠের বোঝা নামাইয়া দিয়া আপনাদের শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে। তাহার উপর ডাণ্ডিওয়ালা ফতে সিংএর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। জ্বরাবস্থায় সওয়ার বসাইয়া ডাণ্ডি লইয়া চলা এক দিকে যেমন কষ্টকর, অন্য দিকে চলার পথে বিলম্ব বড়ই অসহ্য হইয়া উঠে। ওজিরি হইতে দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "গঙ্গানি" পৌছিলাম। সারা পথে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র—আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। সমতল-দেশবাসীর চক্ষুতে সেও এক নূতন দৃশ্য। কখনও দেখিলাম, পাহাড়ের কোলে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যেন শুইয়া রহিয়াছে, কোথায়ও সূর্য্য-কিরণ-স্নাত এই মেঘে আগুন লাগিয়া যেন অনর্গল ধূম্র বাহির হইতেছে, কোথায়ও বা স্বচ্ছ সুনীল আকাশের তলে বর্ষাধৌত পাহাড়ের পাশ দিয়া দূর দিগন্তের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রং-বে-রংএর মেঘে বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ দেখাইতেছে। প্রকৃতির সংসারে সেও এক অভিনব শ্রী-সম্পন্ন নূতন সম্পদ সন্দেহ নাই।

গঙ্গানির ধর্ম্মশালাটি যাত্রাপথ হইতে কিছু নীচে। ইমারত পাকা হইলেও, ইহার অবস্থা আমাদের দেশের 'চাম্‌চিকার' বাসা-ঘর বা গোয়াল-ঘরের মত। এই ঘরের সম্মুখে লম্বা বারান্দাও আছে। বারান্দা হইতে কিছু দূরে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ধারায় যমুনা নদী কল-কল শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছেন। ও-পারেও ধূম্র পাহাড় সমানভাবে সুবিস্তৃত রহিয়াছে। দক্ষিণভাগে কিয়দ্দূরেই একটি কুণ্ড, তাহাতে এক হাত মাত্র পরিষ্কার জলে সে সময়ে অনেকগুলি মৎস্য (রোহিত মৎস্যের মত) অবাধে খেলিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। কুণ্ডের সম্মুখে একটি ছোট মন্দিরে গঙ্গা ও যমুনার প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির হইতেই বেশ দেখা যাইতেছিল। প্রত্যহই এখানে পূজারতির ব্যবস্থা আছে মনে হয়। পূজারী ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, "এ স্থানে মহাতেজা জমদগ্নি মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের জলের সহিত 'উত্তর-কাশী'র গঙ্গার ধারা সম্মিলিত আছে।" জমদগ্নির তপস্যাপ্রভাবে উত্তরকাশী হইতে গঙ্গার ধারা এই কুণ্ডমধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছেন কি না, জানিবার উপায় নাই। বিরাটকায় পর্ব্বতের বেষ্টনীমধ্যে অভ্যন্তরে কোথা হইতে এই স্বচ্ছ জলের প্রস্রবণ চলিয়া আসিতেছে, কে বলিবে? তবে পাহাড়ের পাশ দিয়া দিয়া মানুষ-নির্ম্মিত পথের দূরত্ব মাপিলে এখান হইতে উত্তর-কাশী প্রায় একুশ মাইল হইতেছে। কুণ্ডটির ঠিক উত্তরে একখানি দ্বিতল মাটীর ঘরের নীচে একটি দোকান, তাহাতে চাউল, আটা,

ঘৃত, চিনি ও সর্ব্বপ্রকার দালই বিক্রয়ার্থে মজুত রহিয়াছে। উপরের ঘরে দোকানদার নিজেই বাস করে। এ পথে কিছু দূর পর্য্যন্ত ঝরণার জলে দাল সিদ্ধ হয় শুনিয়া আমরা কিছু কিছু দাল খরিদ করিয়া রাখিলাম। পরদিন অর্থাৎ ১৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রভাতে সাড়ে ছয়টা আন্দাজ সময়ে এই গঙ্গানি পরিত্যাগ করিয়া ঘণ্টাকালমধ্যেই "সিমল" চটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যমুনোত্তরী হইতে ফিরিয়া গঙ্গোত্তরীর পথ ধরিতে গেলে যাত্রিগণ এই চটী পর্য্যন্তই অর্থাৎ প্রায় ২৮৷৷০মাইল পুরাতন পথে আসিতে বাধ্য হয়েন।

নীচের রাস্তা ছাড়িয়া এইবার উপরের চড়াই-পথে উঠিতে হইবে। যাঁহারা কেবলমাত্র গঙ্গোত্তরী যাইতে ইচ্ছুক, ধরাসু হইতে গঙ্গার ধারে ধারে যে পথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথে তাঁহারা সাধারণতঃ গিয়া থাকেন, পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে সে কথা অবগত হইয়াছেন। এই সিমল চটী হইতে ধরাসুর দূরত্ব প্রায় সাড়ে তেইশ মাইল। এ পথে না গিয়া অন্য পথে আমরা "নাকুরী" নামক স্থানে ধরাসু-গঙ্গোত্তরীর পথেই সম্মিলিত হইব, ইহাই অবগত হইলাম। ধরাসু হইতে আবার নাকুরীর দূরত্ব তেরো মাইল আন্দাজ হইবে। সুতরাং এক হিসাবে প্রায় সাড়ে ছত্রিশ মাইল (২৩৷৷×১৩) পথ বাঁচাইবার জন্য এই সিমল চটীর উপরের রাস্তা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই চটী হইতে নাকুরী পৌছিতে প্রায় সাড়ে বারো মাইল আগে যাইতে হয়। কাযেই মোট সাড়ে ছত্রিশ হইতে সাড়ে বারো বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে চব্বিশ মাইল পার্ব্বত্যপথই বাঁচাইতে পারা গিয়াছে, ইহা সমতলদেশবাসী যাত্রীর পক্ষে বড় কম কথা নহে!

যমুনা নদীকে এখান হইতে পশ্চাতে রাখিয়া গঙ্গার তীর নাকুরী পর্য্যন্ত যাইতে এই উপরের পথ আমাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছে। শাস্ত্রমতে—"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যং পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতং" * এই উক্তির নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার অগ্রে এই গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগের চড়াই-উতরাই পথে উভয় স্থলেই আমরা এত অধিক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা লেখনীলেখ্য নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ চারি মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল, কাযেই এ স্থানে একটি দোকানদারের ছপ্পর-ঘরে (নাম শুনিলাম "জঙ্গল" চটী) দ্বিপ্রহরের ভোজন শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া লওয়া হইল। এই জঙ্গলে প্রতিসের চারি আনা হিসাবে উৎকৃষ্ট দধি সংগ্রহ হইয়াছিল। আহারাদির পরে আবার প্রায় ৫ মাইল চড়াই শেষ করিয়া এই জঙ্গলাকীর্ণ পথে যখন উতরাই নামিতে সুরু করিলাম, প্রত্যেক যাত্রীই পা পিছলাইয়া পদে পদে ভূপতিত হইতে বাধ্য হইলেন। গাছের পাতা রাস্তার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছিল। তাহা ছাড়া মাটীর সহিত ছোট ছোট এক প্রকার কাঁকর এমন ভাবে মিশ্রিত যে, পা ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই প্রায় একই দশায় উপনীত হইতে হয়! ডাণ্ডিওয়ালা ডাণ্ডি সমেত পা পিছলাইয়া দুইবার পড়িয়া গেল। সুখের বিষয়, সওয়ারের আঘাত সেরূপ কঠিন হয় নাই। বৃদ্ধা দিদি জুতা খুলিয়া (জুতার নীচে রবার, সুতরাং পদস্খলনের আশঙ্কা!) অনাবৃত পদেই খুব সাবধানতার সহিত নীচে নামিতেছিলেন, তাহাতেও নিস্তার ছিল না! "ইহাই হইল 'সিঙুঠা'র প্রসিদ্ধ উতরাই পথ।" ভগবান্ দুইবার এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পড়িয়া গেল। বৃদ্ধা দিদির এবারের আঘাত কিছু বেশী মনে হওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন, কে যেন তাঁহার মস্তক ধরিয়া ঘুরাইয়া দিল! "শুক্‌না ডাঙ্গায় আছাড় খাইবার" সাধ থাকিলে পাঠকগণ, এই সিঙুঠার উতরাই পথে ক্ষণেকের জন্য উপস্থিত হইলে অনায়াসেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন, এ কথা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি।

মসৌরী যমুনোত্তরী পর্য্যন্ত ৯৬ মাইল পথের মধ্যে আমাদের দুইটি মাত্র ভীষণ চড়াই পথের স্মরণ ছিল। একটি ৫৬ মাইল আসিয়া "কুম্‌রানা" চটীর আগে এবং অপরটি একবারে শেষের দিকে অর্থাৎ "মার্কণ্ডেয় আশ্রম" হইতে যমুনোত্তরী পৌছিবার দিকে, এই দুই চড়াই পথই দুরারোহ মনে হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত "হনুমান" চটী হইতে "মার্কণ্ডেয় আশ্রম" পর্য্যন্ত ধ্বস-ভাঙ্গা প্রস্তররাশির মধ্যেও অনেকটা আশঙ্কার কারণ ছিল। তার পর অদ্যকার এই সিঙুঠার উতরাই আরও সাংঘাতিক। দীর্ঘ সাড়ে তিন মাইল উতরাই শেষ করিয়া যখন ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মশালাটি দ্বিতল, পাকা ইমারত। তবে সম্মুখদিক্

---

* জঘনং অর্থে　নাভেরধভাগঃ ইতি নীলকণ্ঠঃ
মহাভারত, বনপর্ব্ব ৮৫ অধ্যায়।

একবারেই খোলা। নীচে একটি দোকান-ঘর, তীর্থ-যাত্রীর আহার্য্য দ্রব্যের অভাব পূরণ করিতেছে। সিঙ্গুঠা গ্রামটি অনেক উচ্চে, পাহাড়ের কোলে, এখান হইতে সুস্পষ্ট দেখা যায়। দোকানে চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া গেল। প্রতি সের দুগ্ধের দাম চারি আনা এবং প্রতি সের আলু তিন আনা। এখান হইতে আলুর দর মহার্ঘ হইতে চলিল। একটু নীচেই একটি নাতি-প্রশস্ত অরণ্য নামিয়া গিয়াছে। দুরন্ত চড়াই-উতরাই পথে আজিকার অপরিসীম ক্লেশ, রাত্রির বিশ্রামে দূরীভূত হইল।

বনের একটি দৃশ্য

বৃদ্ধা দিদি, দাদা, বৌদিদি প্রভৃতি সকলেই নিদ্রা যাইবার অগ্রে পদদ্বয়ে গরম সরিষা তৈল মালিশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিবার ইহাও যে একটি অমোঘ দেশী ঔষধ, এ প্রদেশে সহজেই তাহা বুঝা যায়।

প্রভাতে সাতটায় বাহির হইয়া বেলা সাড়ে আটটা আন্দাজ সময়ে সাড়ে তিন মাইল দূরে "নাকুরী" পৌছিলাম। এই স্থানেই ধরাসু-গঙ্গোত্রীর রাস্তা সম্মিলিত হইল। এত দিন পরে আবার গঙ্গা-মায়ীর দর্শনলাভ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলাম। ইহারই মনোরম তট-সংযুক্ত একটু প্রশস্ত স্থানে জনৈক স্বামীজী একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উপস্থিত তাঁহার শিষ্য (ব্রহ্মচারীবিশেষ) এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। আশে-পাশে আম, নেবু ও পেয়ারার কয়েকটি গাছ কতকটা বাগানের মত এবং কতকটা বা গোলাপ, চামেলি, পান, এলাচি প্রভৃতি রকমারী বৃক্ষে শোভিত হওয়ায়, স্থানটিতে শুধু যে মনুষ্য-সমাগমের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, যমুনোত্তরীর চির-দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পথের অন্ত হইয়াছে মনে করিয়া সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পার্শ্বে অনতিদূরেই একটি "ডাক-বাংলো"। সেখানে টিহিরী-রাজ মধ্যে মধ্যে পদার্পণ করিয়া থাকেন শুনিলাম। ভুটিয়াদিগের অনেকগুলি তাঁবু দেখিলাম। ভুটান হইতে ইহারা ব্যবসায় উদ্দেশে প্রতি বৎসরেই আগমন করে। উপর হইতে লবণ, উল, ভেড়ার লোম ইত্যাদি আনিয়া তৎপরিবর্ত্তে গম, আটা, চাউল, দাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। গঙ্গোত্রীর নিকটবর্ত্তী "হরশিলা" নামক শীত-বহুল স্থানে ইহাদের প্রধান 'আড্ডা'। এখান হইতে তিন মাইল দূরে "ঢুণ্ডা" গ্রামেও ইহারা ব্যবসায়ার্থে আসিয়া থাকে।

গঙ্গাবক্ষে পরপারে যাইবার একটি মজবুত দড়ির পুল। ওপারে গ্রামান্তর ("আঠালী" প্রভৃতি) হইতে এখানে লোক-চলাচলের সুবিধার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। আর ছয় মাইল আগে যাইতে পারিলে"উত্তর-কাশী" পৌছিব, জানিয়া সকলেই দ্রুতগতি এ স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

প্রায় তিন মাইল পথ গঙ্গার তীরে তীরে চলিয়া আসিলাম। পথের ধারে কেবলই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রভূমি বাঙ্গালাদেশের কথাই মনে আনিয়া দিল। বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে "উত্তর-কাশীর" সমীপবর্ত্তী হইলাম। প্রথমেই বামভাগ হইতে ঝরণার আকারে একটি নাতি-প্রশস্ত নদীকে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসায় জানা গেল, উত্তর-কাশীর উত্তর ভাগে ইহাই "বরণা" নদী। সুদূর কাশীর মত এখানেও উত্তরে বরণা ও দক্ষিণভাগে "অসি" প্রবাহিতা জানিয়া, আনন্দ ও বিস্ময়ে যুগপৎ সকলেরই হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ভগবান্ বলিল, শুধু ইহাই নহে, ঐ দেখুন! পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কাশীর মতই এই উত্তর-কাশীকে বেড় দিয়া উল্লাসে উত্তরাভিমুখেই ছুটিয়া চলিয়াছেন। এখানেও ইহার তীরে তীরে "মণিকর্ণিকা", "কেদারঘাট" "অসিঘাট" প্রভৃতি ঘাট-সমূহ এবং "বিশ্বনাথ", "অন্নপূর্ণা," "কেদার" "কালভৈরব," এমন কি, "ঢুণ্ডিরাজ গণেশ" প্রভৃতি কাশীর দেবতাবৃন্দও আনন্দে বিরাজমান। এই নির্জ্জন হিমগিরির পুণ্য-পূত তপঃ-প্রদেশে সকল দিক দিয়াই কাশীর সহিত এইরূপ সৌসাদৃশ্য কত দিন হইতে এইভাবে চলিয়া আসিতেছে, এ সূক্ষ্ম গোপন

তত্ত্বের এ কি এক অদ্ভুত মনোরম সৃষ্টি-রহস্য! বারাণসীর পূজা ও গৌরবের যাহা কিছু, সমস্তই এখানে বিদ্যমান—একই মুক্তি-মন্ত্রের এই সাধন-পীঠ দর্শন করিবার আশায় অস্থির হইলাম। আনন্দে সকলেই ঝরণার জল স্পর্শ করিয়া মস্তকে ধারণ করত ধীরে ধীরে হতভম্বের মত অগ্রসর হইলাম।

মন বলিতেছিল, সেই কাশী আর এই উত্তর-কাশী—উভয় তীর্থের মাঝখানে প্রভেদ কোনখানে কতদিক দিয়াই না আজ চোখের আগে ফুটিয়া উঠে! শাস্ত্র খুঁজিলে শুধু পুরাণ বা কাশীখণ্ডে নহে, রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে, এমন কি, বেদে উপনিষদে * পর্য্যন্ত অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। আর এই উত্তর-কাশীর কথা কেবলমাত্র উত্তরাখণ্ডের তীর্থপুস্তকেই লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং উত্তরকাশী অপেক্ষা কাশীর প্রাচীনতা অনেক বেশী, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, বাহ্য দৃষ্টিতে এই উভয় মুক্তিক্ষেত্রের স্বরূপ যাত্রীর চক্ষুতে অনেকাংশেই পার্থক্য জানাইয়া দেয়। কোথায় এই পুণ্যপূত, মনোরম, নির্জ্জন ভাগীরথী-তট—যেখানে জন কয়েকমাত্র সাধুসন্ত তপস্যাকেই হৃদয়ের সাধন-মন্ত্র মনে করিয়া নিরুদ্বেগে কেবল মুক্তি-অন্বেষণেই আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, চোখের আগে শুধু প্রকৃতির বিরাট-রূপ বিশালকায় পাহাড়-পর্ব্বত ভিন্ন দেখিবার কিছুই নাই, কাণে নিয়তই কুলু-কুলু-নিনাদিনী সুর-তরঙ্গিণীর সুমধুর গীতি-ধ্বনি, মনকে কেবল অজানা দেশের নূতন বারতাই সূচিত করিতে থাকে, সংসারের কল-কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া এই হিমগিরি-গর্ভের সাধন-সুন্দর স্থান উত্তরকাশী আর সেই কাশী প্রাচীন ও পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র—এই একই গঙ্গার পবিত্র তীরে অবস্থিত হইলেও স্থান ও রুচিভেদে আমরা আজ সেখানে কি দেখিতে পাই! নানা হাব-ভাব-চাহনি-বিশিষ্ট, ভোগবাসনা-পরিপুষ্ট বিলাস-বিলাসিনীগণের একাধারে লীলা ও রঙ্গ দেখিবার বিচিত্র নাট্যশালার মত! সন্ধ্যারতি-বন্দনার মাঝখানেও সেখানকার ঘাটে ঘাটে,—ইহাদেরই লোলুপ পাপ-রসনা চরিতার্থের নিমিত্ত কেবলই কটু, তিক্ত, তীব্র গন্ধেরই সরস (?) উপাদান সৃষ্ট হইতেছে! লজ্জার কথা বলিতে কি, অমুক ভট্টাচার্য্যের "ঘি'য়ে ভাজা Salted বাদাম", অমুক চাটার্জ্জির "অবাক্ জলপান চানা ভাজা" প্রভৃতি জিহ্বারোচক "মুক্তির বাণী" (!) কাণের আগে মূলমন্ত্রের মত অনর্গল কোন্ রুচির জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায়, তাহা লিখিতে গেলে এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কেবল অবান্তর কথাই আসিয়া পড়ে।

উত্তর-কাশীর সীমানা-মধ্যে চলিয়া আসিতে প্রথমেই বামদিকে লালবর্ণের গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ-ফুলের উপর নজর পড়িল। ইহাও সেই শ্বেতবর্ণের 'লতানে' গোলাপ বৃক্ষেরই মত পাহাড়ের কোলে স্থানে স্থানে ঝোপ করিয়া রাখিয়াছে। সাদা গোলাপে একটি করিয়া পাপড়ী থাকে, ইহার পাপড়ী কিন্তু ডবল দেখিলাম। ফুলগুলি পরিপূর্ণ-সৌন্দর্য্যে আপনা

পাহাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা

হইতেই যেন শাখাগুলিকে নত করিয়া দিয়াছে। কলুষ-নাশিনী গঙ্গার তীরে তীরে কয়েকটি পুষ্পবাগিচা ও তন্মধ্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরগুলি দেখাইয়া ভগবান বলিল, এ সকল স্থানই বেশীর ভাগ গৈরিকধারীদের তপোবন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেখিতে দেখিতে আমরা ধর্ম্মশালার সমীপবর্ত্তী হইলাম। কালীকম্লীওয়ালার এই সুবৃহৎ দ্বিতল ধর্ম্মশালাটি আমাদের চোখে যেন নূতন ঠেকিল। উপরে ও নীচে বড় বড় ঘর লইয়া প্রায় চল্লিশখানির কম নহে। ঘরগুলির ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই প্রশস্ত লম্বা বারান্দা। একমাত্র ভিতরের বারান্দার মধ্যেই বহু লোকের রাত্রি-যাপন চলিতে পারে। নীচে এক দিকে সারি সারি রান্নাঘর। বাটীর বহির্ভাগে পাইখানা প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা আছে।

* অথর্ব্ববেদ, জাবালোপনিষদ, প্রভৃতি পাঠ করিলে পাঠকগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

ভিতরভাগের প্রশস্ত আঙ্গিনা দেখিলেই ইহার একান্ততা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আমরা উপরের একখানি প্রশস্ত ঘরে আশ্রয় পাইলাম। অধ্যক্ষ মহাশয় ঘরে বিছাইবার একখানি বৃহৎ সতরঞ্চি এবং বহির্বারান্দায় বসিবার একখানি স্বতন্ত্র কম্বল অযাচিতভাবেই পাঠাইয়া দিলেন। এ সকল সুব্যবস্থা যাত্রীর চোখে কতই না সুন্দর! ধর্ম্মশালার বাহিরেই একটি বড় দোকান, তাহাতে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। আটা, চাউল, ঘৃত, চিনি হইতে সুজী, মিছরী, কিশ্‌মিশ্‌, এমন কি, কাগজ, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি যাঁহার যাহা আবশ্যক, সমস্তই কিনিতে পাইবেন। আলুর সের চারি আনা, ইহাই এ সকল প্রদেশের একমাত্র তরকারী, অনেক কষ্টে এখানে তিন সের আন্দাজ একটি কুমড়া (বিলাতী) আট আনা মূল্যে সংগ্রহ করিলাম। রুচি বদ্‌লাইবার জন্য ইহাই তখন উপাদেয় মনে হইল। পোস্তদানা দেখিয়া দোকান হইতে উহাও এক পোয়া (চারি আনা মূল্যে) খরিদ করিয়া লইতে বিস্মৃত হইলাম না। এখনও ত এ দিকের পার্ব্বত্য-পথে বহু দিন থাকিতে হইবে। কোন না কোন সময়ে ইহার সদ্ব্যবহার চলিতে পারে। এখানে 'পোষ্টাফিস্' আছে জানিয়া সে সময়ে সকলেই নিজ নিজ বাটীতে যমুনোত্তরী হইতে নির্ব্বিঘ্নে এ স্থানে পৌছান সংবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম। আহারাদির পরে এইবার আমরা একবার আশপাশ বেড়াইবার জন্য সকলেই বাহির হইলাম। দশ-বিশ ঘর বসতবাড়ী, কয়েকটি রকমারী দোকান, কোথায় বা কথঞ্চিৎ ক্ষেত্রভূমি, (তাহাতে তখন তামাকের চাষ দেওয়া ছিল) দু'একটি 'আরি' ফলের গাছ, ইহাই দেখিতে দেখিতে আমরা একটি ছোট স্কুল-ময়দানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এখানে কাশীর এক পরিচিত-মুখ বাঙ্গালী দণ্ডীর (নাম পুরুষোত্তমতীর্থ) সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। ইনি এখানে দুই বৎসর হইল আসিয়াছেন এবং আশ্রম তৈয়ারের জন্যই বিশেষ ব্যস্ত আছেন। উত্তরকাশীতে বাঙ্গালী দণ্ডী বা সাধুর সংখ্যা কত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, তাঁহারা চারি জন, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পাঁচ জন এবং গঙ্গার পরপারেও আরও চারি জন সাধু লইয়া মোট তেরো জন বাঙ্গালী এখানে রহিয়াছেন।

উত্তর-কাশী যাইতে গঙ্গার উপর দড়ির পুল

উত্তর-কাশীতে অম্বাজী ও অম্বিকেশ্বরজীর মন্দির

কালী-কমলীওয়ালার সত্র ভিন্ন এখানে আরও তিনটি, একটি জয়পুর-রাজের, একটি পঞ্জাব সিন্ধুপ্রদেশীর ও আর একটি দণ্ডীর সত্র বিদ্যমান। প্রত্যেক সত্রেই দণ্ডী বা সাধুদিগের আহারের ব্যবস্থা আছে। কেবল দণ্ডীর সত্রে দণ্ডীরাই মাত্র আহার পাইয়া থাকেন। বয়োবৃদ্ধিবশতঃ যাঁহারা সত্রে উপস্থিত হইতে অক্ষম, তাঁহাদিগেরও আশ্রমে 'সিধা' (চাউল ইত্যাদি) পাঠানোর নিয়ম আছে। হিমগিরির এই নির্জ্জন পবিত্র পুণ্য-পীঠে যাঁহারা এই

সকল সাধু মহাত্মার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এক দিকে তাঁহারা যেমন ধন্য, অন্য দিকে চতুর্দ্দিক পাহাড়-বেষ্টিত এই অপরূপ শ্রী-সম্পন্ন মুক্তিক্ষেত্রে বাস করিতে পাইয়া সাধুগণও আপনাদিগকে যেন ধন্য মনে করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। শীত ঋতু আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পাহাড়ের উপরে নীচে সর্ব্বত্রই তুষারাবৃত হয়, তখন চতুর্দ্দিকেই ইহার অমল-ধবল উজ্জ্বলতা যে স্থানেরই শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহা নহে, সুরনর-মুনি-বন্দিতা সুরধুনীতীরে বসিয়া সাধুগণও এ দৃশ্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে এ দিন আমরা কেদারঘাটের নির্জ্জন উপকূলে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, কত কথাই না আলোচনা করিয়াছিলাম। বেশ মনে আছে, আমার অগ্রজ মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে সে সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বল দেখি, এই যে আমরা নিরন্তর পাহাড়, নদী, নির্ঝরের মধ্য দিয়া বরাবর চলিয়া আসিতেছি, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আজ আমাদের মনের গতি কিরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে?" তদুত্তরে আমি দশ লাইন মাত্র কবিতার আকারে তাঁহাকে এই কথাই শুনাইয়াছিলাম,—

দিশেহারা নদীর কূলে মন কেন আজ আপন-হারা,
ভাসে নদীর মতই তাহার গতি—প্রাণের মাঝে প্রেমের ধারা।
নদী যেমন বাধ মানে না, অকূল পানে যাচ্ছে ছুটে—
যতই কেন আকাশ-ঠেকা ধূম্র পাহাড় পায়ে লুটে!
মনের গতি সেইমত আজ ছুট্‌ছে অচিন্ দেশের পানে
ভোগ-বাসনার পাহাড় ঠেলি যাচ্ছে ভেসে কেমন টানে!
মর্ত্তাভূমে স্বর্গ যেমন, হিমগিরির তুষারমাঝে,
তেমনি এ মোর মলিন হিয়া উঠলো রেঙ্গে নবীন সাজে!
আপন, স্বজন, কেউ কোথা নাই, আসক্তি আজ কোথায় ছাড়া,
"চল্ আগে চল্", পরাণ কেবল ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছে তাড়া!

পরদিন প্রভাতে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে সকলেই বিশ্বনাথ দর্শনে বহির্গত হইলাম। কাশীর মত এখানে প্রথমে ঢুণ্ডিরাজ গণেশের পূজা করিতে হয়। মন্দিরে সুবৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গ। সাধারণতঃ এ সকল স্থানে মন্দিরের দরজা প্রায়ই ছোট দেখিলাম। যাত্রীর ভিড় আদৌ নাই, এ জন্য পূজা করিতে বসিয়া কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দিরের মত মানুষে মানুষে ধাক্কা খাইবার আশঙ্কা নাই। বেশ নিবিষ্ট-চিত্তে আপনি আপনার ইচ্ছা ও শক্তিমত পূজা করিতে পারিবেন। পাণ্ডা বা পূজারীর কিছুমাত্র অত্যাচার নাই বলিলেই হয়। সম্মুখে মন্দির-বাহিরে শিবশক্তির এক সুবৃহৎ স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। ইহাই এ স্থানে এক নূতন, আশ্চর্য্য ও পবিত্র দৃশ্য। স্তম্ভ-গাত্রটি আগাগোড়া পিত্তল দিয়া ঢাকা। উপরিভাগে একটি কুঠার ও তদুপরি আবার একটি প্রকাণ্ড ত্রিশূল বিদ্যমান। পূজারী মহাশয় বলিলেন, "পরশু-রামের স্তবে সন্তুষ্টা শিবশক্তিরূপা ভগবতী তাঁহাকে এই কুঠার প্রদান করিয়াছিলেন।" স্তম্ভগাত্রে টানা-টানা অক্ষরে কিছু লেখা রহিয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কবে কোন্ ভাষায় কি-ই বা লিখিত হইয়াছে, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আজও ইহার মর্ম্ম-উদ্ঘাটনে অসমর্থ (?) শুনিলাম। এ স্থানের পূজা সমাপনান্তে আমরা একে একে আর আর মন্দিরে "অন্নপূর্ণা", "দত্তাত্রেয়" "গোপেশ্বর" "পরশুরাম" ও "কেদারনাথ" প্রভৃতি দেবতাগণের দর্শনাদি শেষ করিলাম। সর্ব্বশেষে জয়পুররাজের প্রতিষ্ঠিত মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি জয়পুর-মহারাজার এক অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইংরাজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে "অম্বিকেশ্বর" শিবমূর্ত্তি, ও "অম্বাজী" দেবীমূর্ত্তি এবং আরও অনেকগুলি দেব-দেবী বিরাজ করিতেছেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে দারুণ বৃষ্টিপাত হইল। সে বৃষ্টিতে ধর্ম্মশালা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইবার উপায় ছিল না। অগত্যা এ দিনেও এ স্থানে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলাম। সর্ত্তমত সকল কুলীকেই আহারের জন্য অতিরিক্ত মূল্য স্বীকার করিতে হইল।

সন্ধ্যার পরে এখানকার প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় "গরুড় ভগবান্"জীর প্রসাদ বিতরণ, যেন নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের মত প্রত্যেক যাত্রীরই হস্তগত হইয়া থাকে। আর এক বিষয় লক্ষ্য করিলাম, কাশীর মত এখানেও ঢক্কা বাজাইয়া শবের শোভাযাত্রা করার প্রথা আছে। উত্তর-কাশীর আশে-পাশে আরও অনেক কিছু দেখিবার থাকিলেও আমাদের দুর্ভাগ্য-ক্রমে এ স্থানে বেশী দিন থাকা ঘটিল না। পাহাড়ের উপরিভাগে "রেণুকা" দেবীর (জমদগ্নি ঋষির পত্নী) মন্দির এবং দুই মাইল দূরে "লাক্ষা-গৃহ" বা পঞ্চপাণ্ডবদিগের জতুগৃহ ও তৎসংলগ্ন সুড়ঙ্গ প্রভৃতি দর্শন না করিয়াই পরদিন প্রভাতে এ স্থান হইতে আগে অগ্রসর হইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মনের বাঁধন

১

সোমেন্দ্র যেমন মনীষাকে চোখের অন্তরাল করিতে পারে না, তেমনই মনীষাও স্বামীর কাছ-ছাড়া হইয়া থাকিতে অসহ্য মনে করিত। এমনই ছিল এই দম্পতির প্রণয়বন্ধন।

আজ দুই বৎসর ইহাদের বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে, মাত্র তিনটি দিন মনীষা মাতুলালয়ে বাস করিতে পারিয়াছিল। ইহার বেশী অবসর করিয়া লইতে সে পারে নাই। সোমেন্দ্র ছিল মনভোলা মানুষ। কোনও বিষয়েই তাহার খেয়াল থাকিত না। মনীষা স্বামীর যাবতীয় ব্যাপার পরিদর্শন করিত; সুতরাং এমন নির্ভরশীল, আপনভোলা স্বামীর কাছ ছাড়া হইয়া থাকিলে সোমেন্দ্রের সকল বিষয়েই ঘোর অসুবিধা হইত। মনীষা নহিলে তাহার একটি দিনও চলিত না।

মা-বাপের কথা মনীষার স্মরণই হয় না। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা উভয়েই স্বর্গীয় হইয়াছিলেন। মাতুলগৃহেই সে মানুষ। মামা-মামী তাহাকে তাঁহাদের সন্তানেরই মত স্নেহও করিতেন, সেই মামাত-বোনের বিবাহ। মনীষা স্থির করিয়াছিল, স্বামীকে ফেলিয়া সে যাইবে না। আজ কয়দিন হইতে সোমেন্দ্রের জ্বর; কিন্তু অবশেষে স্থির হইয়াছিল, তিন দিনের জন্য সে বিবাহে যাইবে।

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়া। নিজের কাপড়-চোপড় পরা ও জিনিষ-পত্র গোছান ইত্যাদি সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু মাসীমাকে একটা প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিলেই হয়। কিন্তু মনটা তাহার ভাল লাগিতেছিল না, স্বামীর আজ কয়েক দিন হইল অপরাহ্ণের দিকে জ্বর হইতেছে। সোমেন্দ্রও পিতৃ-মাতৃহীন, মাসীমাই সংসারের কর্ত্রী।

মাসীমা গিয়াছিলেন সোমেন্দ্রকে পথ্য খাওয়াইতে। ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "না! আমি পারলাম না। কি হয়েছে, তুমি একবার দেখে এস, বাছা।"

মনীষা মাসীমাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল। প্রণাম করা আর তাহার হইল না। বিরক্তমুখে পাত্রটা লইয়া স্বামীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সোমেন্দ্র শূন্যপানে চাহিয়াছিল। মনীষা আসিয়া কহিল, "সত্যই কি তোমার ইচ্ছা নয় যে রাণীর বিয়েতে আমি যাই?"

সোমেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কি এনেছ দাও, আমি খাচ্ছি!"

"সে না হয় দিলাম; কিন্তু আমি যা বল্‌লাম, তার জবাব কি?" বলিয়া মনীষা স্বামীর মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"আমি ত তোমায় যেতে বলেছি, মনী! এ কয়টা দিন কোনমতে আমি কাটিয়ে দেব।" বলিয়াই নিরুপায় হইয়া, মানুষ যেমন হতাশভাবে এলাইয়া পড়ে, সোমেন্দ্রও ঠিক তেমনই ভাবে ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

মনীষা প্রশ্ন করিবে কি? কাণ্ড দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সোমেন্দ্র চোখ বুজিয়া বোধ করি মনীষার যাওয়ার কথাটাই ভাবিতেছিল। আপন মনে দিন গণিতে লাগিল, "আজ, কাল, পরশু।" তার পর উদাস-ভাবে সে ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া তাহার স্বর বাহির হইল না বটে, কিন্তু তাহার বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

এই দীর্ঘশ্বাস কাণে যাইবামাত্র মনীষা একবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। পাঁচ দিন নয়, দশ দিন নয়, মাত্র তিনটা দিনও স্বামী তাহাকে কাছছাড়া করিতে অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছেন! ইহার অব্যক্ত আনন্দে যেমন সে অভিভূত হইয়া গেল, তেমনই মামাত-বোনের বিবাহে যদি সে যোগদান করিতে না পারে, তাহা হইলে ব্যাপারটা কিরূপ অশোভন হইয়া উঠিবে, ইহা ভাবিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে স্বামীর শয্যায় গিয়া বসিল। তার পর স্বামীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, "তিন দিনের বেশী একটা দিনও আমি থাকব না। বুঝলে? অনুমতি দিচ্ছ তা হ'লে?" বলিয়া সে সোমেন্দ্রের বুকের উপর চিবুক রাখিয়া, এমন করুণ-ব্যথিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল যে, সেই মুখখানির প্রতি তাকাইলেই আর 'না' বলা চলে না। সোমেন্দ্র ধীরে ধীরে স্ত্রীর চুলগুলি চিরিয়া দিতে দিতে কহিল, "না মনী, তুমি একবার ঘুরেই এস গিয়ে!"

মনীষার গৌরবর্ণ মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিল, "তা হ'লে হাসিমুখে বিদায় দিচ্ছ কিন্তু?" বলিয়া নিজেই মনীষা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তা হ'লে চললুম, হুজুর মশাই! আবার যদি ছুটী নামঞ্জুর হয়েই যায়" বলিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল; সোমেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মনীষা দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছিল, শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া আর তাহার পা চলিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মাসীমা পাশের ঘরেই ছিলেন। মনীষা আসিয়া কহিল, "আমার যাওয়া হবে না, মাসীমা!"

মাসীমা বধূটিকে কোন দিনই সুনজরে দেখিতেন না। স্বামীর আদরিণী পত্নী এবং গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বধূ যে তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিত, তাহা নহে, বরং সে স্বামীর মাসীমাতাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধাই করিত। কিন্তু তথাপি মনে মনে তিনি বধূর ভাগ্যের ঈর্ষ্যা করিতেন। তাই ভাবিয়াছিলেন, বধূর অবিদ্যমানে কয়টা দিন তিনি শান্তি পাইবেন। তিনি মুখ কালো করিয়া কহিলেন, "কি জানি, তোমাদের কি রকম ভাব! যে মামা ভাত-কাপড় দিয়ে মানুষ করেছিল, তাঁর মেয়ের বিয়েতে তুমি যাবে না। এমন অধর্ম্মের কাযে আমি সায় দেব না, বাছা। সে তুমি রাগই কর, আর যাই কর!" তিনি কালো মুখ আরও কালো করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা সত্য। মনীষা চুপ করিয়া রহিল বটে; কিন্তু বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিবার মত এতটুকু আগ্রহও তাহার রহিল না। স্বামীর বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি স্মরণ করিয়া সমস্ত উৎসাহ-আনন্দ তাহার নিভিয়া গেল।

বামুন ঠাকরুণ পাশেই ছিলেন। কহিলেন, "আদর ক'রে তাঁরা ডাকছেন, যাও মা! আমরাই চালিয়ে নেব।"

মনীষা অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "আমার রোগা স্বামীকে ফেলে, আমোদ-আহ্লাদ আমার আসছে না, বামুন ঠাকরুণ!"

সোমেন্দ্র কাণ খাড়া করিয়া শুনিতেছিল। এই করুণ কণ্ঠ কাণে যাইবামাত্র সে আকুল হইয়া কহিল, "মনী! না, তুমি আর দেরী করো না! এ কটা দিন আমি নিজেই চালিয়ে নেব।"

মনীষার ইচ্ছা নয় যে, সে রুগ্ন স্বামীকে রাখিয়া বিবাহে যোগদান করে; কিন্তু স্বামীর এই উক্তি কাণে যাইবামাত্র আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না, অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গে দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিল। যাইবার সময় স্বামীকে শুনাইয়া কহিল, "আমাকে বিদেয় করতে পারলেই তুমি বাঁচ! যে কটা দিন পাপটা দূরে থাকে!"

সোফার মোটর লইয়া প্রস্তত। মনীষা গাড়ীতে আসিয়া উঠিয়া বসিল। গাড়ী তখন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। সোমেন্দ্র ঝুল-বারেন্দার রেলিংয়ের উপর বুক বাধাইয়া, ঝুলিয়া পড়িয়া অতৃপ্ত নয়নে তাহাই দেখিতেছিল।

হাতে ঔষধ খাওয়ানর সরঞ্জাম, মুখে বকর্-বকর্ শব্দ করিতে করিতে মাসীমা আসিয়া হাজির হইলেন।

সোমেন্দ্র ফিরিয়াও চাহিল না। মাসীমার স্বগত উক্তিগুলি ক্রমশঃ উচ্চ সপ্তকে উঠিতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঔষধটা খাইয়ে গেলেই ত পারতেন; না, বাপের বাড়ীর নামে যেন সব অজ্ঞান।" বলিয়াই তিনি ঔষধ ঢালিবার উপক্রম করিতেছিলেন, সোমেন্দ্র একবারে চেঁচাইয়া উঠিল, "ঔষধ-বিষুধ এখন থাক, মাসীমা। আমার এখন ভাল লাগছে না! দয়া ক'রে নিরিবিলিতে আমাকে একটু থাকতে তোমরা দাও!" গাড়ীখানা তখনও বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া। স্বামীর এই কণ্ঠস্বর কাণে যাইবামাত্র মনীষা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাসীমা তবুও ঔষধ ঢালিতেছিলেন। সোমেন্দ্র ভীষণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "না—না—না—একশবার বলছি, আমার এখন দেহটা ভাল নেই।" গাড়ীখানা তখন শব্দ করিয়া মৃদুগতিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনীষা একটানে চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমায় নামিয়ে দাও, গণেশ, আমি যাব না!"

* * *

২

মাসখানেক গত হইয়াছে। কিন্তু সোমেন্দ্রের জ্বরের অবস্থা সেই একই প্রকার। সোমেন্দ্রের জননীর কঠিন যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হইয়াছিল। ডাক্তার এখন সেই সন্দেহই

করিতে লাগিলেন। এ দিকে মনীষার আহার-নিদ্রা কিছুই আর মনে রহিল না। সর্ব্বক্ষণ পাশে বসিয়া চোখের জল ফেলিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

অন্যান্য দিন সোমেন্দ্র মনীষার হাতখানি বুকে চাপিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে; কিন্তু আজ যেন তাহার কি হইয়াছিল। সে কহিতে লাগিল, "মনী! আজ কেবলই মনে হচ্ছে, সমস্ত জীবনটাই তোমার বৃথা ক'রে আমি দিলাম। কিছু দিলাম না, কিছু পেলে না তুমি।" শীর্ণ বক্ষঃপঞ্জর কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া আক্ষেপবেদনা শব্দ করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

মনীষার ইচ্ছা হইল, সেই বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলে, "ওগো আমার স্বামী, আমার রাজা, তোমায় ভালবাসতে দিয়েছ; তোমার ভালবাসা আমি পেয়েছি; এই ত সব; এর চেয়ে বড় পাওয়া নারীর আর আছে না কি?"

কিন্তু সে মুখে কহিল, "আমাদের নূতন গাড়ী একখানা করতে চেয়েছিলে যে, আর ও পুরোনো গাড়ী আমার ভাল লাগে না।" সে উদ্গত রোদনবেগ সম্বরণ করিতে দাঁত দিয়া অধরোষ্ঠ শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। প্রত্যুত্তরে একটা মধুর সম্ভাষণবাক্য শুনিবে বলিয়াই সোমেন্দ্র আশা করিয়াছিল। ঠিক এই হৃদয়হীন অপ্রত্যাশিত বাক্য কাণে যাইবামাত্র সে চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রমেন্দ্র ডাক্তার পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ডাক্তার রমেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সোমেন্দ্রের পিস্তুত ভাই। সে বাহিরে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া দম্পতির কথা শুনিতেছিল।

মনীষার এই উক্তি কাণে যাইবামাত্র সমস্ত চিত্ত তাহার শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিল।

গতকল্য অন্য এক জন প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে দিয়া সোমেন্দ্রের রোগ পরীক্ষা করিবার পর, ডাক্তার মনীষাকে নিভৃতে ডাকিয়া, ডাক্তারী শাস্ত্রের উপদেশ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, যদি মনীষা এখন হইতে সতর্ক না হয়, তাহা হইলে সোমেন্দ্রের কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। এ সংবাদ শুনিয়া ত্রাসে মনীষার বুকের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার উপদেশচ্ছলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, "বউঠাকুরুণ! ছলনার আশ্রয় নিয়ে এমনভাবে চল্‌তে হবে, যাতে আপনার ব্যবহারে আকর্ষণের উত্তেজনা ওঁর না আসে। দাদা আপনাকে কাছে পাওয়ার চেয়ে যাতে দূরেই সরিয়ে রাখতে চান, তাই করবেন।"

মনীষার সর্ব্বদেহ ভয়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল। প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া সে বলিয়াছিল, "আমার দেবতার সঙ্গে আমি ছলনা করতে পারব না।"

ডাক্তার গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "স্বামীকে বাঁচাবার জন্য—তাঁকে পাওয়ার জন্য পারবেন না?"

মনীষা তখন জবাব করিতে পারে নাই। শুধু তাহার দুই চোখ দিয়া ধারা নামিয়াছিল। আজ সেই উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালিত হইতেছে দেখিয়া ডাক্তার উৎসাহ দিয়া কহিল, "এই ত চাই, বউঠাকুরুণ!"

মনীষা ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "এই শেষ! এ আমি পারব না, ঠাকুরপো?" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সোমেন্দ্র চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। চোখ মেলিয়া কহিল, "কে? রমা! এসেছিস্?

রমেন্দ্র 'হ্যাঁ দাদা' বলিয়া ষ্টেথিস্কোপ্ বাহির করিতেছিল।

সোমেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, "বুক পরীক্ষা এখন থাক, ভাই। তোকে একটি কায আমার ক'রে দিতে হবে। দিতেই হবে কিন্তু।"

রমেন্দ্র কহিল, "বলুন।"

সোমেন্দ্র অপরিসীম আগ্রহে, ভাইয়ের হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "একখানা ভাল গাড়ী আমায় আজ বিকেলেই কিনে দিতে হবে।"

রমেন্দ্র একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। এত বড় নির্ম্মম আঘাতের পরও মনীষার ইচ্ছাকে সফল করিবার এই ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া, রমেন্দ্র অভিভূতের মত মনে মনে কহিতে লাগিল—'এ ভালবাসার তুলনা নাই! তুলনা নাই! এ অপূর্ব্ব!'

মনীষা ও ঘরে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। সে মাটীতে একবারে লুটাইয়া পড়িল।—"ওগো, সব মিথ্যে

বলিছি ! তোমার অগাধ ভালবাসা জানানর জবাব কি ঐ ! না—আমি পারব না—আমি প্রাণ খুলেই জানাব ।” বলিয়া সে এ ঘরের দিকে আসিতেছিল ।

রমেন্দ্র দেখিতে পাইয়া, এ ঘরে আসিয়া কহিল, “বউঠাকুরুণ্ ! এই বুঝি ?”

মনীষা ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, “ঠাকুরপো ! ভিতরটা আমার ফেটে যাচ্ছে যে ! কার সঙ্গে ছলনা করছি ? যিনি আমার——”

মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল ।

৩

ডাক্তার চলিয়া গিয়াছে । মনীষা তখনও বিছানায় পড়িয়া। এ দিকে সোমেন্দ্র মনীষাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল । মাসীমা মালা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন । “ও বউমা, সোম ডাক্‌ছে যে ।” মনীষা বালিসের ভিতর মুখ গুঁজিয়া কহিল, “আমি এখানেই একটু প’ড়ে থাকি ; আপনি না হয় শুনে আসুন, কি উনি চান ।”

সোমেন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মাসীমাকে দেখিয়া কহিল, “একবার মনীকে পাঠিয়ে দাও, মাসীমা !”

মাসীমা কহিলেন, “বল্লাম ত, এলো না ।”

এমন কাণ্ড সোমেন্দ্র বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার স্বর কাণে যাইবামাত্র মনীষা ছুটিয়া আসে,—ইহাই সে দেখিয়া আসিতেছে ।

সোমেন্দ্র উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসিয়াছিল । বালিস-টাকে কোলের উপর টানিয়া আনিয়া এখন ভর দিয়া বসিল। তাহাও বোধ করি ভাল লাগিল না—“আচ্ছা, তুমি যাও, মাসীমা” বলিয়া পুনশ্চ সে শুইয়া পড়িল। মনীষা স্বামীর পাশের পালঙ্কে শয়ন করিত। ঝি আসিয়া বিছানা গুটাইয়া পাশের ঘরে লইয়া চলিল। সোমেন্দ্র সেই দিকে অপলক-নয়নে চাহিয়া রহিল ।

এই আঘাত তাহার প্রাণে এমন করিয়াই বাজিল যে, ঝিকে ডাকিয়া, বিছানাপত্র তুলিয়া লইয়া যাইবার হেতু জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না ।

রাত্রিকালে মনীষা আসিয়া কহিল, “আমি এই পাশের ঘরটাতেই থাকব ।”

সোমেন্দ্র কহিল, “হুঁ ।”

মনীষার রোদনবেগ কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিবার উপক্রম হইল। আজ দুই বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে, কোন দিন সে স্বামীকে ছাড়িয়া অন্য ঘরে বাস করে নাই। অসহ্য আক্ষেপে বুকখানা তাহার ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তবুও সে কহিল, “কিছু দরকার হলেই আমায় ডাকবে কিন্তু ।”

সোমেন্দ্রের বুকের অস্থিপঞ্জর তখন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছিল। জবাব করা ত দূরের কথা, মনীষার মুখের পানে চাহিতেও সে পারিল না ।

মনীষা নিজের শয়ন-কক্ষে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল ।

ঝি শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়াই, বুকের ভিতর তাহার হু-হু করিতে লাগিল। শয্যা তাহার তেমনই পড়িয়া রহিল। সে মেঝের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িল, “আমি পারুছি না! আমি পারছি না! এ আমি পারব না!” এমনই করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত দাপাদাপি করিয়া যখন সে আর পারিল না, তখন ধীরে ধীরে স্বামীর শয়নকক্ষে আসিয়া সে প্রবেশ করিল ।

স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কখন্ যে সে সেই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিছুই মনীষার ঠিক নাই। চোখ মেলিয়া চাহিয়া, সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। তখন বেশ বেলা হইয়াছে। গরম কাল। রুগ্ন স্বামী উঠিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া, রুমাল নাড়িয়া বাতাস করিতেছেন। মনীষার প্রাণটা যেন জুড়াইয়া গেল। কিন্তু রুগ্ন স্বামীর পানে তাকাইয়া ভয়ে ও ভাবনায় তাহার আর জ্ঞান রহিল না। প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, “তোমাকে কে বলেছিল বাতাস করতে ? এর পর তোমার কাছে আর আসা আমার হবে না।” সোমেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল ।

মনীষা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর যে কি ঝড় বহিতেছিল, সে কেবল তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন ।

ঝি কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল, মুখের পানে চাহিয়া সে অবাক্ হইয়া কহিল, “কি হয়েছে, মা ?”

"কিছু না।" বলিয়া এ ঘরে আসিয়া বাজপড়া মানুষের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

ইদানীং নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে মনীষা স্বামীর কাছে বড় একটা যাইত না, বরঞ্চ দূরে থাকিয়া, ঝিকে দিয়া কাষ সারিয়া লইত। মনীষা যে দূরে দূরে থাকে, সোমেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল। আজকাল আর তাহার মান-অভিমান নাই। যেন একটা নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার ভাব। পূর্ব্বে ঔষধ-পথ্য খাওয়াইবার সময় মনীষাকে নিজে পাশে বসিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে স্বামীকে খাওয়াইতে হইত ; কিন্তু ইদানীং সোমেন্দ্র ঔষধ-পথ্য খাইতে আর আপত্তি করে না। যে কেহ হাতে দিবামাত্র এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া পাত্রটা ফিরাইয়া দেয়। মনীষা সমস্তই বোঝে ; দূরে দাঁড়াইয়া স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে, আর চোখ মুছিয়া সরিয়া যায়।

আজ যেন মনীষার কি হইয়াছিল। স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া, কোনমতেই মনীষা নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। এক বাটি দুধ হাতে করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই দুধটুকু খেয়ে ফেল দেখি ?"

সোমেন্দ্র উঠিতে যাইতেছিল। মনীষা হা—হা—করিয়া, বুক দিয়া গিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

সোমেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল,—"থাক্, আমি নিজেই উঠে বস্‌তে পারব !"

মনীষা শাসন করিবার ভঙ্গীতে কহিল,—"আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা" বলিয়া শান্তভাবে সোমেন্দ্র শুইয়া পড়িল, কিন্তু মনীষার যে হাতখানি তাহার বুকের উপর ছিল, সেখানি আর সে ছাড়িল না।

এই হাতখানির স্পর্শে সমস্ত দেহ-মন যেন তাহার শীতল হইয়া গেল। বিশ্বের সমস্ত শান্তি ও আরাম, যেন এই সুকোমল হাতখানিকে আশ্রয় করিয়া তাহার মন ও সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তাই সে চোখ বুজিয়া, পরমানন্দে উহা উপভোগ করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে সবলে, বুকের সঙ্গে পত্নীর কোমল করপল্লব চাপিয়া ধরিতে লাগিল। প্রতিবারই তাহার সেই নিমীলিত দুই চক্ষুর কোণ বহিয়া অশ্রুর ফোঁটা বালিসের উপরে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মনীষা মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই সে সামলাইয়া লইল। উত্তেজনায় স্বামীর দেহ যদি খারাপ হয় ! যদি পীড়া বাড়ে ! তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। হাতখানি ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেই সোমেন্দ্র চেঁচাইয়া উঠিল, "না, আমি ছাড়ব না"—বলিয়াই, চট্ করিয়া দুই হাতে মনীষার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখখানিকে বুকের উপর আনিয়া চাপিয়া ধরিল। বোধ করি, ইহাতেও এই পীড়িতের বুক-জোড়া তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। সে মনীষার মুখখানিকে সবলে ক্রমাগত বুকের সঙ্গে এমন করিয়া বার বার পেষণ করিতে লাগিল যে, তাহার নিজের পাঁজরা কয়খানা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

মনীষা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া সে প্রমাদ গণিল। রুক্ষস্বরে কহিল, "ছাড় আমায়। এ সকল আমার ভাল লাগে না বল্‌ছি।"

এই নিষ্ঠুর আঘাত কাণে যাইবামাত্র সোমেন্দ্র বিহ্বল-দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল। হাত দুইখানি তখন অবশ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে।

মনীষা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল বটে, কিন্তু স্বামীর বিষাদমাখা মুখখানির পানে চাহিয়া, তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল ; কিন্তু ছলনা তাহার পাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পাশের ঘরে ঝি ও বামুন ঠাকুরুণ তখন সঙ্গোপনে আলোচনা চালাইতেছিল। মনীষা যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে নাই।

ঝি কহিতেছিল, "এমন রোগা সোয়ামীকে একলা একঘরে ফেলে থাকে কেমন ক'রে ?"

ঠাকুরুণটি চকিতে চারিদিক্ দেখিয়া লইয়া কহিল, "বাবুর উপর মোটেই ওঁর টান নাই। দেখিস্ নে, কেমন উড়ো-উড়ো ভাব।"

এত বড় কলঙ্ক যে তাহার মাথায় চাপিতে পারে, এ কথা মনীষা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। তাহার চোখ, মুখ,

কাশীর ঘাট

বসুমতী চিত্র বিভাগ]   [শিল্পী—শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুর

কাণ ঝাঁ-ঝাঁ করিয়া, মাথার ভিতর যেন তাহার পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

যদি স্বামী কিছু মনে করিয়া থাকেন? যদি সে প্রাণে এতটুকুও দাগ লাগিয়া থাকে? মনীষা আর বসিতে পারিল না, এ ঘরে আবার ফিরিয়া আসিল। সোমেন্দ্র তেমনই ভাবেই শুইয়া ছিল। মনীষা তাহার পায়ের উপর গিয়া, উপুড় হইয়া পড়িয়া, দুই পায়ের ভিতর মাথাটাকে গুঁজিয়া দিল।

ঝি বিছানা করিতেছিল। মনীষা ডাকিয়া কহিল, "আমার বিছানা এ-ঘরে আজ হবে।"

সোমেন্দ্র চোখ বুজিয়া ছিল। চোখ মেলিয়া তাকাইল।

মনীষা কহিল, "পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেব?"

সোমেন্দ্র কহিল, "না, থাক্?"

মনীষা শুনিল না। স্বামীর পা দুখানি কোলে তুলিয়া বার বার সে বুকের উপর চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

সোমেন্দ্র হঠাৎ আবেগ-কম্পিতস্বরে কহিল, "মনু! একটা কথা আমার শুন্‌বে?"

এই সেই স্বর! মনীষার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

এতটুকু উত্তেজনাও যে তাহার স্বামীর স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, এ কথা ডাক্তার মনীষাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছিলেন। উত্তেজনার পূর্ব্বলক্ষণ মনে করিয়াই মনীষা সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "রাত্রে তখন শুনব।" বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

আদেশ অনুযায়ী ঝি মনীষার শয্যা আজ পূর্ব্বের মত এ-ঘরেই রচনা করিয়াছিল। সোমেন্দ্রও উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। সোমেন্দ্র আর উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারিল না। ঝিকে ডাকিয়া কহিল, "ওঁকে পাঠিয়ে দাও, ঝি।"

ঝি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা ও-ঘরে নীচে প'ড়ে ঘুমুচ্ছেন।"

সোমেন্দ্র অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, "উঠিয়ে দাও। ঠাণ্ডা লাগ্‌লে অসুখ হবে যে। একটা মাসী, পিসীও আমার নাই যে ওঁর সুখসুবিধে একটু বুঝ্‌বে। কত দুঃখু-কষ্টই যে পাচ্ছেন।"

সমস্তই মনীষার কাণে আসিল। তাহার বুকের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। তবুও সে "যাইবে না" বলিয়া দিয়া এ-ঘরেই পড়িয়া রহিল।

ঝি ফিরিয়া গিয়া কহিল, "তিনি আজ আর আস্‌বেন না।"

এ সংবাদে স্বামীর বুক চিরিয়া যে দীর্ঘশ্বাস পড়িল, তাহাও মনীষার কাণে পৌঁছাইল। এতক্ষণ সে ক্রন্দনবেগ চাপিয়া রাখিয়াছিল। এবার সে মাথা খুঁড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫

মনীষার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির পানে চাহিলেই বুঝা যায়, সোমেন্দ্রনাথ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। স্থির হইয়াছে, স্বামীকে লইয়া মনীষা পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে। গোছ-গাছ তাহার কয়েক দিন হইতেই চলিতেছিল। আজ সকাল হইতে একেবারে ধূম পড়িয়া গেল। অপরাহ্ণে মুসৌরী যাইবার ট্রেণ। এখানকার সব গুছাইয়া রাখা, সঙ্গের জিনিষ-পত্র কি যাইবে না যাইবে স্থির করা, আজ যেন নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ মনীষার ছিল না।

সোমেন্দ্র আসিয়া, তামাসা করিয়া কহিল, "ভাবছি, গাড়ীতে উঠে আমাদের মনীষা দেবী হাঁপিয়ে না উঠেন।"

মনীষা পরিহাস-তরলকণ্ঠে কহিল,—"হেতু বিবৃত করুন?" বলিয়া গলবস্ত্রে, করযোড়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। সোমেন্দ্র খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—"হেতু এই যে, গুছোনোর মত তখন যে আর কিছু থাকবে না। মনীষা দেবী তখন মনসা দেবীর মত ফোঁস ফোঁস না করেন, এই হয়েছে তার সঙ্গের মানুষটির দুর্ভাবনা।

মনীষা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সে দুশ্চিন্তা তাঁর করতে হবে না। কায আমার থাকবে গো, থাকবে। আমার সঙ্গের মানুষটি ত বড় কম যান না। অগুছানোর রাজা তিনি। কোনমতে ঢেকে-ঢুকে তাঁকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে বাঁচি।"

সোমেন্দ্র হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তা হ'লে এখন থেকেই সে মানুষটিকে আঁচলের তলায় ঢেকে-ঢুকে রেখে দাও না কেন?"

পাশেই একখানা শাল ছিল। তাহাই দেখাইয়া মনীষা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "এইখানা জড়িয়ে বুক দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাব; বুঝলে?" বলিয়াই জিভ কাটিয়া, মাথা নীচু করিল। সোমেন্দ্র বাহিরের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

ডাক্তার 'বৌদি' বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বউঠাকরুণও দাদার সঙ্গে যাচ্ছেন না কি?"

মনীষা সলজ্জহাস্যে মুখ নত করিল।

ডাক্তার একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিলেন, "আমি ত বলি, আপনি না গিয়ে একলা মাসীমাই দাদার সঙ্গে যান না কেন? বেশী লোক যাওয়া ভাল মনে করি নে।"

যেন এই সুখবরটা শুনাইবার জন্যই ডাক্তার আসিয়াছিল, শুনাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মনীষার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাথাটিকে আর সে সোজা রাখিতে পারিল না। সেই বাক্সের উপর মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল।

কিন্তু অশান্ত চিত্ত তাহার কোনমতেই বাধা মানিল না। স্বামি-ছাড়া হইয়া এইখানে পড়িয়া থাকিতে হইবে, এই কথাটা খোঁচা দিয়া তাহার অন্তরকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া, পুনশ্চ দ্বিগুণ উৎসাহে বাক্স বিছানা গুছাইতে লাগিল। চাকরকে ডাকিয়া কহিল,—"আমার বাক্স-বিছানা সব নীচে নিয়ে যা।"

এ দিকে গাড়ীর সময় যত আসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, উত্তেজনাও ততই তাহার নিভিয়া যাইতে লাগিল। এর পর আর সে বসিতে পারিল না, শয্যায় গিয়া বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল।

মাসীমা আসিয়া কহিলেন, "ও মা, ও বৌমা! এখনও তুমি বিছানায় প'ড়ে? সোম যে কাপড়-চোপড় প'রে তোমায় বেরুতে বলছে।"

মনীষা কহিল, "আমি এখানেই থাকব; আমি যাব না।"

মাসীমা অবাক্ হইয়া কহিলেন, "ও মা, কি অলক্ষুণে কথা!" বলিতে বলিতে বোধ করি প্রচার করিতেই তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা সোমেন্দ্রের বুকে গিয়া মুগুরের মত আঘাত করিল, কিন্তু কোন দিন সে কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কায আদায় করিতে চাহে না। এই নিদারুণ আঘাতে শুধু মুখখানা তাহার রাঙ্গা হইয়া, পরক্ষণেই ছাইয়ের মত সাদা হইয়া রহিল। নিজের দুঃখ যে কত বড়, সে ত আছেই। এখন তাহার দুশ্চিন্তা হইল মনীষাকে লইয়া। পাছে মাসীমা তাহাকে লাঞ্ছনা করেন, তাই মাসামাকে ডাকিয়া সোমেন্দ্র বুঝাইতে লাগিল, "ওঁরা হলেন পাড়াগাঁয়ের মানুষ; এ সকল দেশ-বিদেশে ঘোরা ওঁদের ভালও লাগে না, ধাতেও বরদাস্ত হয় না। বুঝলে, মাসীমা?"

মাসীমা সমস্তই বুঝিলেন এবং মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া রহিলেন।

সোমেন্দ্র পুনশ্চ কহিল, "পিসীমাকে তা হ'লে বলতে হয়, যাতে এ বাড়ীতে এসে কিছু দিন তিনি থাকেন।"

মাসীমা গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"আর আস্কারা ওকে দিস্ নে, সোম?"

সোমেন্দ্র দেখিল, মহা বিপদ। মনীষাকে আধ-মরা করিয়া তবে মাসীমা রওনা হইবেন। সে তাড়াতাড়ি কহিল,—"তা নয়, আমিও এক রকম নিষেধই করেছি।"

মাসীমা একেবারে ছিট্‌কাইয়া পড়িলেন। "কর গিয়ে যা তোমাদের খুসী, তোমাদের ভাল-মন্দতে যদি আমি আর থাকি—" বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ীর মোটর সোমেন্দ্রকে লইয়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হইল। মনীষার মনে হইতে লাগিল, মোটরখানা তাহার বুকের উপর দিয়া দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যাইতেছে। বুকখানা তাহার খালি হইয়া, দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল।

সাত দিনও কাটিল না; মনীষা একবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। রমেন্দ্র প্রত্যহ একবার করিয়া এ বাড়ীর খবর লইতে আসে। আজ মনীষা আসিয়া এমন করিয়া ধরিয়া বসিল যে, রমেন্দ্র উত্যক্ত হইয়া উঠিল। মনীষা ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিল, "অনেক দিন ত হয়ে গেল; এবার আমি সরকার মশাইকে সঙ্গে ক'রে মুসৌরী যাই।"

রমেন্দ্র বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চলিয়া যাইবার সময় কহিল, "অনেক দিন আবার কোথায় হ'ল, বৌদি? এক হপ্তাও ত এখনও হয় নাই?"

মনীষা দুই চোখে ধারা নামাইয়া বসিয়া রহিল।

ইহার পর এমন দিন যায় না, যে দিনটা রমেন্দ্রকে

সে উত্যক্ত করিয়া না তোলে, বিরক্ত হইয়া ডাক্তার এ বাড়ী আসা-যাওয়া ছাড়িয়া দিল।

এ দিকে মনীষার আহারও নাই—নিদ্রাও তাহার ঘুচিয়াছে। সর্ব্বক্ষণ দুই চোখের ধারায় বুক ভাসিয়া যায়। ক্রমাগত অত্যাচার ও অনিয়মে দেহটা আর বরদাস্ত করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে সে যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

ইদানীং আর সে উঠে না। শয্যা আশ্রয় করিয়া সে সর্ব্বক্ষণ পড়িয়া থাকে।

পিসীমা মেয়েমানুষ। হেতুটা ধরিয়া ফেলিলেন। পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "রমা, তুই করছিস কি? তাড়াতাড়ি ওকে একটু সুস্থ ক'রে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। ম'রে যাবে যে?"

রমেন্দ্র বিব্রত হইয়া পড়িল। এর উপর আজ তিন দিন মনীষার জ্বর। দুর্ব্বল দেহ, তার উপর জ্বর; ডাক্তার নিজেও ভয় পাইয়া গেল। ঝি-চাকরদের ডাকিয়া, সতর্ক করিয়া দিয়া কহিল, "দেখো, যেন ওঠা-উঠি না করেন।"

মনীষা জ্বরের ঘোরে সমস্ত দিন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। আজ অপরাহ্ণে জ্বর একটু নরম পড়িতেই সে সোজা উঠিয়া বসিল। স্বামীর সংবাদ সে আজ কয়দিন জানে না। সে বিছানা হইতে নামিয়া পড়িল। সরকার মহাশয় নীচের ঘরে বসিয়া হিসাবপত্র লিখিতেছিলেন। মনীষা টলিতে টলিতে আসিয়া কহিল, "মুসৌরী থেকে কি পত্র এসেছে, আমায় দেখান?"

সরকার জবাব করিবেন কি? কর্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া তিনি ভয় পাইয়া গেলেন।

মনীষা আকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, "বাবুর সংবাদ কি, আমায় বলুন শীগ্‌গীর?"

সরকার কহিলেন, "কোন চিঠি-পত্তর ত আজ বাবুর কাছ থেকে আসে নাই, মা!"

মনীষা পুনশ্চ প্রশ্ন করিল,—"কাল?"

সরকার মাথা নাড়িয়া জবাব করিলেন, আজ দিন তিনেক, কোন পত্রই তিনি পান নাই।

মনীষা কাঁপিতে কাঁপিতে মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। চোখের তারা সাদা হইয়া উপরের দিকে তখন ঠেলিয়া উঠিয়াছে। অস্ফুটস্বরে শুধু বাহির হইল, "তিন দিন—ও মা গো!"—বলিতে বলিতে সেইখানে সে আচ্ছন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

সংবাদ পাইয়া রমেন্দ্র ছুটিয়া আসিল। সমস্ত রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ভোরের দিকে মনীষার জ্ঞান হইল। ডাক্তার বুঝাইতে লাগিল, "বউঠাক্‌রুণ, আপনি একটু সুস্থ হন দেখি। আমি নিজে দাদার কাছে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব।"

মনীষার বিবর্ণ মুখখানি তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পরম আগ্রহ সহকারে কহিল, "আজই তা হ'লে নিয়ে চল না, ঠাকুরপো।"

ডাক্তার কহিল, "তা কি হয়। আপনি একটু ভাল হন দেখি। কালই তা হ'লে নিয়ে যাব।"

মনীষার প্রাণ আর চায় না যে, স্বামি-ছাড়া হইয়া এক দণ্ড এখানে থাকে। শীর্ণ বক্ষঃপঞ্জরের ভিতর প্রাণটা তাহার সমস্ত রাত্রি আছড়াইয়া মরিতে লাগিল; কতক্ষণে সে স্বামীর কাছে যাইবে।

পরদিন রমেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিতেই মনীষা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, সেই বিকেলের আগে কি আর যাবার গাড়ী আমাদের নাই?"

ডাক্তার কহিল, "এই দেহ নিয়ে যাবেন কেমন ক'রে? আর একটু সুস্থ হন দেখি।" বলিয়া সে সরিয়া গেল।

মনীষা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। সে আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। যেমন করিয়াই হউক, স্বামি-দর্শনে আজ তাহার বাহির হইতে হইবেই। সরকার মহাশয়কে ডাকিয়া, দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করিল, "আজ আমার মুসৌরী যাওয়া চাই-ই। আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

পাছে রমেন্দ্রের কাণে যায়, যদি কোন প্রতিবন্ধক ঘটে! বাড়ী শুদ্ধ লোকজনকে সে ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিল।

আজ দুপুরে আবার কম্প দিয়া জ্বর আসিল, কিন্তু সে-কথা আজ সে কাহাকেও বুঝিতে দিল না। কোনমতে স্বামীর কাছে পৌঁছাইতে পারিলেই সে এখন বাঁচে। যদি প্রাণটা উড়িয়া যায়, যদি দেখিতে না পায়,—এই চিন্তাই এখন তাহার প্রবল।

নীচে গাড়ী দাঁড়াইয়া। মনীষা হাঁপাইতে হাঁপাইতে, শয্যা হইতে নামিল। চলিবার শক্তি নাই। কঙ্কালসার দেহ জ্বরের প্রদাহে পুড়িয়া যাইতেছে। সে-দিকে তাহার

ভ্রূক্ষেপও নাই। এখন কোনমতে স্বামীর কাছে পৌঁছাইতে পারিলেই হয়। ঝিয়ের স্কন্ধে ভর রাখিয়া, সিঁড়ি দিয়া সে নীচে চলিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সোমেন্দ্র উন্মত্তের মত ট্যাক্সি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে ঢুকিল—"মনী,—মনু,—মনীষা আমার,—আমি এসেছি, আজই তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব ব'লে।"

কোথায় বা গেল মনীষার রোগ-যন্ত্রণা, কোথাই বা রহিল তাহার দুর্ব্বলতা। সে দেহে যেন অকস্মাৎ নূতন প্রাণ-সঞ্চার হইল। এক ঝাপ্টায় ঝিকে সরাইয়া দিয়াই ছুটিবার উপক্রম করিতেছিল,—কিন্তু সামলাইতে পারিল না। হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল। সোমেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া বুকের সঙ্গে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

কর্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া সরকার মহাশয় ভয় পাইয়া পরশ্ব সোমেন্দ্রকে তার করেন, সংবাদ পাইয়া সমস্ত রাস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে সে আসিয়াছে। মনীষার মুখের পানে তাকাইয়া সোমেন্দ্র একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল—"এ কি ক'রেছ, মনু ?"

মনীষার অধরোষ্ঠ তখন কাঁপিতেছে। কি যেন সে বলিতে চায়; কিন্তু স্বর বাহির হয় না। আক্ষেপে দুই ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তার পর অতি কষ্টে সে বলিল, "তোমার কাছে যাব ব'লে আজ বেরিয়েছি। বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল।" বলিতে না বলিতেই চক্ষুতারা ঘুরিয়া আসিয়া স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত হইয়া রহিল।

সোমেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ! এ কি হ'ল ? মনী, মনু, মনীষা—আমি যে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব ব'লে এসেছি।"

মনীষার দেহ তখন অসাড়, নিস্পন্দ। চক্ষুতারা প্রায় স্থির। শুধু ঠোঁট নড়িতে লাগিল; কিন্তু স্বর ফুটিল না। দুই চোখ দিয়া তখন অবিশ্রাম জল গড়াইতেছে।

মনীষার মাথাটাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সোমেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মনী, কি বল্তে চাইছ ? বল ?"

মনীষা তখন অতিকষ্টে কহিল, "তোমায় ছেড়ে প্রাণটা আমার বেরুতে চাইছে না। তাকে আট্কে রেখে দাও তুমি।" স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সোমেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময়ে রমেন্দ্র ডাক্তার সেখানে আসিয়া পড়িল।

ভাল করিয়া নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিল, "দাদা, চেঁচাবেন না। বৌদি বড় দুর্ব্বল, আর কোন ভয় নেই।"

রমেন্দ্র পত্নীর দেহ বুকের উপর তেমনই ভাবে রাখিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্! দয়া কর!"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

দখিণ-হাওয়া

টুট্‌ল আমার সব মোহ-ঘোর যেমন তোমার পরশ পাওয়া
শৈশবেরই সঙ্গী, কখন আস্‌লে তুমি দখিণ-হাওয়া ?
দগ্ধ-হৃদয়, ব্যথিত বুক, পড়ছে ঢুলি' সজল আঁখি
জুড়াও আসি হিল্লোলে প্রাণ, দরদি! আজ তোমায় ডাকি।
ফুট্‌ল না মোর আশার কোরক, দেখ্‌ছি নিতি সকাল সাঁঝে
বাজ্‌ছে শুধুই বেদন-গীতি বেহাগ-সুরে মনের মাঝে।
তৃষিত প্রাণ, ছুটছে হিয়া নাম-হারা কোন্ তেপান্তরে
নাই সেখানে মৃত্যু-জরা, নিত্য শুধু জ্যোৎস্না ঝরে।
উড়াও মোরে সেই দেশেতে গাইছে যেথা হুর-পরীরা,
উড়ছে "হুমা", (১) থির নীরদে ঝিলিক্ ঝলে মাণিক-হীরা।
গুলাবভরা পিচ্‌কারী সব দিচ্ছে যেথায় মেঘের সারি
ঢাল্‌ছে 'সাকী' আঙুর-সুরা হস্তে লয়ে জ্যোৎস্না ঝারী।
আস্‌ছে ছুটি 'বন্যা-হরিণ' জাফ্রাণেরি ক্ষেতের পাশে
সেথায় আছে দয়িত মোর জনম গোঁয়াই যাহার আশে।
উধাও হব সেই মুলুকে, দেখ্‌ব মোহন চাঁদের করে—
হাসছে উজল প্রবাল-ভূমি কানন-ঘেরা গিরির পরে,
উড়ছে অলি, স্বর্ণ-কমল ফুটছে নদীর দু'কূল বেড়ি
নাচ্ছে শিখী, ঝর্ণা-ঝারীর আয়নাতে তার বদন হেরি।
সেথায় যাব, খুশীর লহর ছুটছে যেথা সবার মনে
নাই বিরহ, দুঃখ গেছে সাগর-পারে নির্ব্বাসনে।
লুলিতকায় ব্যথাতে আজ পড়ছে নুয়ে জীবন মম,
ঝরছে আঁখি, কাঁদছে হৃদি সায়ক-বেঁধা বিহগ সম
নাই হেমন্ত, রয় যেখানে শুধুই মধুমাসের হাওয়া,
লও অচিরে সেই দেশে আজ উড়িয়ে মোরে দখিণ-হাওয়া!

কাদের নওয়াজ (এম-এ।

* হুমা—একপ্রকার স্বর্গের পক্ষী, ফাসি-সাহিত্যে কথিত আছে—ইহাদের ছায়া সৌভাগ্য দান করে।

ভারত-সীমান্তের কাজী

(সত্য ঘটনা)

গত মাঘ মাসের মাসিক বসুমতীতে সে-কালের কাজীর বিচার-কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের কোনও বন্ধু বলিতে-ছিলেন, সে-কালের কাজীর মত বিচারক এ কালে সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত হইয়াছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে; তবে এ-কালে বৃটিশ ভারতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন অনুসারেই বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে; এ জন্য সে-কালের মত এ কালে কাজীর বিচারের প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু এ কালেও ঐরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেচক ব্যক্তির অভাব নাই, এবং ইংরাজ সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারীরা যখন সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে প্রকৃত অপরাধী কে, তাহা স্থির করিতে না পারেন, তখন অগত্যা এই শ্রেণীর সেকেলে লোকের সাহায্য গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তা তাঁহাদিগকে কাজীই বলুন, বা মোল্লা, মৌলবী প্রভৃতি যে নামে অভিহিত করিবার ইচ্ছা, সেই নামেই অভিহিত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের গৌরবের হ্রাস হয় না। অল্পদিন পূর্ব্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত কোন বৃটিশ শিবির হইতে একটি রাইফেল অপহৃত হইলে রেজিমেণ্টের অধিনায়ক তস্করের সন্ধান না পাওয়ায় ঐ শ্রেণীর এক জন প্রাচীন মোল্লার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মোল্লা কি কৌশলে রাইফেল-চোরের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কৌতুকাবহ বিবরণ সংপ্রতি লণ্ডনের একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে। যে রেজিমেণ্ট হইতে রাইফেলটি অপহৃত হইয়াছিল, প্রবন্ধ-লেখক সেই রেজিমেণ্টেরই কোন পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী। তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন, সেই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উক্ত মাসিকে প্রকাশিত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার বর্ণনা কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত, এরূপ সন্দেহের কারণ নাই। এক জন কালা আদমীর বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় না পাইলে কোন ইংরাজ লেখক তাঁহার প্রশংসাসূচক কাল্পনিক গল্প লিখিয়া তাঁহার গৌরববৃদ্ধি করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না।

কয়েক মিনিট পরে মোল্লা আসিল

এই সামরিক কর্ম্মচারীর নাম মেজর সি এম্ এন্‌রিক্। তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল। মেজর এন্‌রিক্ লিখিয়াছেন, তাঁহার লিখিত বিবরণের এক বর্ণও অতি-রঞ্জিত নহে।

মেজর লিখিয়াছেন, "'ডি'-কোম্পানী উৎসাহহীন। কোন সুশৃঙ্খল সৈন্যমণ্ডলীর, বিশেষতঃ যে সকল সৈন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত আছে, সেই সৈন্যদলের ভিতর হইতে রাইফেল অপহৃত হওয়ার অপেক্ষা ভীষণতর দুর্ঘটনা আর কিছুই হইতে পারে না। তাহা হইতে যে সকল অপরিহার্য্য ঘটনার উদ্ভব হইতে থাকে, তাহাও অত্যন্ত অপ্রীতিকর। কারণ, এইরূপ চুরি হইলেই পুলিসে সংবাদ না দিয়া উপায় নাই; অথচ ডিটেক্‌টিভরা সৈন্যগণের লাইনের নিষিদ্ধ গণ্ডীর ভিতর

প্রবেশ করিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইবে, সৈন্যরা ইহা বরদাস্ত করিতে পারে না। ইহার উপর চুরির সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট টেলিগ্রাফে 'রিপোর্ট' করিয়াই নিস্তার নাই, সঙ্গে সঙ্গে লিখিত রিপোর্টও পেশ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন রাইফেল অপহৃত হওয়া কর্ণেলদের পক্ষে যেরূপ দুর্নামের বিষয়, আর কিছুই তদপেক্ষা অধিকতর দুর্নামের বিষয় বলিয়া গণ্য হয় না।

এই সকল ব্যাপারের পর অর্থদণ্ডের অমোঘ বজ্র অপরাধী ও নিরপরাধ সকলেরই মস্তকে সমভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে। সুবাদার হইতে বিউ-গিল্-বাদক পর্য্যন্ত কাহারও এই দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি নাই, প্রত্যেক ব্যক্তির বেতন অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হারে কঠোর নিরপেক্ষতার সহিত এই জরিমানা আদায় করা হইয়া থাকে। যে মামুলী আদেশে এই জরিমানা আদায় হয়, সে আদেশই অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার এক চুল ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই; শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, সুবাদারদের যখন সুবাদার-মেজরের পদে প্রমোশন পাইবার সময় হয়, এবং জমাদারদিগের ভিতর হইতে সুবাদার পদ প্রদানের জন্য বাছাই করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন এই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া, তাহারা প্রমোশন-লাভের যোগ্য কি না, তাহা বিবেচনা করা হয়, এমন কি, কোম্পানীর সেনানায়ক, যিনি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন, তিনিও নিষ্কলঙ্কভাবে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।

সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত কোনও ভারতীয় সৈন্যদলের ভিতর হইতে রাইফেল অপহৃত হইলে, তাহার ফল যেরূপ অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, আর কোন ব্যাপারে সেরূপ হইতে দেখা যায় না। সৈন্যদলের ভিতর হইতে রাইফেল অপহৃত হওয়ায় 'ডি' কোম্পানীর সেনানায়ক মেজর স্মিথের উদ্বেগের সীমা রহিল না; শ্রেণীবদ্ধ সাক্ষীদের পশ্চাতে আফিসের দ্বারের বাহিরে যে পীতাভ গিরিশ্রেণী উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল, মেজর উৎকণ্ঠাকুল-হৃদয়ে নির্নিমেষ-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বাহ্য ব্যবহারে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। তাঁহাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাইতেছিল। এই প্রকার দুর্ঘটনায় তদন্তকার্য্য পরিচালনের জন্য যে সকল বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, সেই সকল নিয়ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি রাইফেল চুরির তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু

"শপথ করিয়া পুনরায় বল—"

তদন্তে সুফল-লাভের সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যপূর্ণ হইলেও, তাঁহার গম্ভীর মুখ এবং অচঞ্চল চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার হৃদয়নিহিত নিরাশা কেহ বুঝিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

তাঁহার তদন্ত শেষ হইলে তিনি গম্ভীরস্বরে সংক্ষেপে আদেশ প্রদান করিলেন, "উহাদিগকে বাহিরে যাইতে বল।" তাঁহার সেই আদেশ শুনিয়া মনে হইল, তিনি গভীর অনুধাবন-শক্তির বলে এই গুপ্তরহস্য ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম বিচারের ফল প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন।

তাঁহার আদেশ শুনিয়া সুবাদার কঠোরস্বরে আদেশ করিল, "অভিবাদন কর। রাইট্-টর্ণ, কুইক্ মার্চ্চ!"

সুবাদারের কণ্ঠোচ্চারিত আদেশ কর্ণগোচর হইবামাত্র মেজর স্মিথের সম্মুখে সমাগত সাক্ষীর দল যেন মন্ত্রবলে মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। তাহাদের পদতাড়নে অফিস-কক্ষের অনাবৃত মেঝে হইতে পাতলা ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে, মেজর স্মিথ ও তাঁহার সম্মুখস্থিত সুবাদার শূন্যদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। মুহূর্ত্ত পরে মেজর স্মিথ সুবাদারকে সম্বোধন করিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "এই তদন্তব্যাপারে আমাদের আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই, সুবাদার সাহেব!"

এই সময়ের ঠিক তিন মাস পরে সুবাদার তাহার চাকরীর নিয়ম অনুসারে প্রমোশন পাইবে, এইরূপ স্থির ছিল; কিন্তু রেজিমেণ্টে এইরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাহার প্রমোশনের আশা শূন্যে বিলীন হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কাহারও বিরুদ্ধে অপরাধের কোন প্রমাণ নাই, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।"

সুবাদারের উত্তর শুনিয়া মেজর চিন্তাকুলচিত্তে বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। যদি কাহাকেও সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাতে তদন্তকার্য্যের সুবিধা হইত। আমরা এই ঘটনার আদ্যোপান্ত পুনরালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, রাইফেলটা কখন্ কি ভাবে অপহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি। সাক্ষ্যপ্রমাণ যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র গলদ নাই, এবং সে জন্য যথাসম্ভব সতর্কতাও অবলম্বিত হইয়াছিল, এ কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি। তাহা সুস্পষ্টভাবেই অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত, এই চৌর্য্য-ব্যাপারের সহিত যাহাদের বিন্দুমাত্র সংস্রব থাকিতে পারে বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই ব্যবহারের এবং গতিবিধির কারণানুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

"যদি একটিমাত্রও সূক্ষ্ম সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, এই নিবিড় রহস্যান্ধকারে যদি আলোকের একটি ক্ষীণ রশ্মিও আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে আমরা প্রকৃত অপরাধীকে ধরিতে পারিব, এ কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি। আমাদের সংগৃহীত প্রমাণসূত্রাবলম্বনের যে জাল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ভিতর পা বাড়াইলে আর তাহার পদমাত্র অগ্রসর হইবার উপায় থাকিবে না, তাহাকে সেই ফাঁদে ধরা পড়িতেই হইবে।"

মেজর হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া কি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সিগারেটের কৌটা হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। তাহার পর সুবাদারকে বলিলেন, "আপনি বসুন, সুবাদার সাহেব! আসুন, আমরা উভয়ে এই ব্যাপার সম্বন্ধে মাথা খাটাইবার চেষ্টা করি।"

অতঃপর উভয়েই দীর্ঘকাল নীরব রহিলেন, তাঁহাদের শ্রবণ-বিবরে তখন বাহিরের বিচিত্র শব্দ-কল্লোল প্রবেশ করিতেছিল, সৈনিকরা বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে কেহ কাসিতেছিল, কেহ কেহ মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। সীমান্তপ্রদেশের মধ্যাহ্ন-রবি-করোজ্জ্বল আকাশে চীল ও বাজের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে উড়িতে দীর্ণ-স্বরে চীৎকার করিতেছিল, সেই রৌদ্রপ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে ছায়াহীন পীতাভ মৃত্তিকা হইতে প্রচণ্ড উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছিল; কিন্তু আফিসের ভিতরটা ছায়াচ্ছন্ন, এবং অপেক্ষাকৃত অন্ধকারাবৃত।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর সুবাদার বলিল, "এই অঞ্চলে এক জন জ্ঞানী লোক আছেন, আমি তাঁহাকে জানি।"

মেজর বলিলেন, "বটে! কে সেই ব্যক্তি? এ অবস্থায় কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।"

সুবাদার বলিল, "সাহেব, তিনি পাহাড় অঞ্চলের মোল্লা। রেজিমেণ্টের যিনি মোল্লা আছেন, তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আপাততঃ তিনি মসজিদেই আছেন। মেজর সাহেব, এই মোল্লাজী সত্যই জ্ঞানী পুরুষ, জ্ঞানে তিনি যে কোন কাজীর সমকক্ষ।"

মেজর বলিলেন, "আপনার কি মনে হয়, আপনাদের এই মোল্লা বর্ত্তমান সঙ্কটে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন? এই সকল ব্যাপারে বাহিরের লোকের সাহায্য-গ্রহণ নিয়ম-বহির্ভূত (irregular)। যাহাই হউক, আপনার যদি ভাল মনে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাকুন, সুবাদার সাহেব!"

কয়েক মিনিট পরে, সুবাদারের আহ্বানে সেই জ্ঞানী মোল্লা মেজর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘকায়

দুর্ব্বল বৃদ্ধ, মুখে আবক্ষ-প্রলম্বিত সাদা দাড়ি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুক্তা-শুভ্র পরিচ্ছদে মণ্ডিত। এই সাধুপুরুষ যে সময় বারান্দা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন, তখন বারান্দাস্থিত সাক্ষীরা এবং অন্য সকলে যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল!

মোল্লাজী আফিসে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখে স্পর্দ্ধার ভাব পরিস্ফুট হইল। মেজর সাহেব উঠিয়া বন্ধুভাবে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। আর্দ্দালী একখানি চেয়ার আনিয়া দিলে, মোল্লাজী তাহাতে উপবেশন করিলেন, আফিসের দ্বার রুদ্ধ হইল।

সেই সময় সেই অট্টালিকায় বিরাট গাম্ভীর্য্য বিরাজিত; চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে উড্ডীয়মান চীলগুলির একঘেয়ে চীৎকার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। বারান্দায় যাহারা কাসিতেছিল বা মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতেছিল, তাহাদেরও কণ্ঠ নীরব হইল। আফিসের ভিতর পরামর্শ উপলক্ষে যে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে তাহা কাহারও কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। প্যারেডের ময়দানে যে মৃদু মধ্যাহ্ন-বায়ু-প্রবাহ উত্তপ্ত ধূলিরাশি উড়াইতেছিল, সেই বায়ু-হিল্লোল অপেক্ষাও সেই স্বরলহরী মৃদুতর।

অল্পকাল পরে আফিসের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে সুবাদার একখানি সঙ্গীন লইবার জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আরও কয়েক মিনিট পরে 'ডি' কোম্পানীর বিউগিল্ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণকে ময়দানে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইবার আদেশ প্রদত্ত হইল।

সেই মধ্যাহ্নের রবিকরপ্রতপ্ত প্রান্তরে সমবেত সৈন্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া সুবাদার গম্ভীরস্বরে বলিল, "রাইফেলটি অপহৃত হওয়া আমাদের পক্ষে নিদারুণ লজ্জার কথা; কেবল তাহাই নহে, আমাদের সকলকেই এই ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থদণ্ড দিতে হইবে। আমাদের গাফিলিতেই এই ক্ষতি হইয়াছে, আর আমাদের নসিবকেই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। সে যাহাই হউক, মেজর সাহেবের দৃঢ় ধারণা এই যে, এই অপরাধের আস্কারা হইবে না। অপরাধী সম্ভবতঃ আমাদের দলের লোক নহে; বাহিরের কোন লোক এই কায করিয়াছে। এইজন্য আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রচলিত প্রথা অনুসারে সঙ্গীন স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করিব, এইরূপ স্থির হইয়াছে। আমাদের দলের কেহ যদি মিথ্যা শপথ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার মস্তকে যেন আল্লার অমোঘ অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। রাইট টর্ণ, পর পর একে একে, কুইক্ মার্চ্চ!"

সরফরাজ খাঁয়ের অনুসরণ করিয়া প্রথম ব্যক্তি আফিসে প্রবেশ করিলে তাহাকে সেই কক্ষের এক কোণে লইয়া যাওয়া হইল। সেই স্থানটি অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইলেও সে সেই স্থানে একখানি ক্ষুদ্র টেবলের উপর একখানি সঙ্গীন সংরক্ষিত দেখিল, তাহার মুষ্টি তাহার দিকে প্রসারিত ছিল। কিন্তু নিকটে অন্য কোন লোক ছিল না। মেজর সাহেব সেই কক্ষে থাকিলেও তিনি অন্যপ্রান্তে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। বৃদ্ধ মোল্লা আরও কিছু দূরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকায়, সূর্য্যালোক তাঁহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হওয়ায়, তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকেও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং অচঞ্চল বলিয়া মনে হইতেছিল।

তিনি নিম্নস্বরে আদেশ করিলেন, "কোণের ঐ টেবলের কাছে যাও, তাহার পর সঙ্গীনখানি হাতে তুলিয়া লইয়া শপথের পুনরাবৃত্তি করিয়া বল, আমি আল্লার ও তাঁহার সুপবিত্র পয়গম্বরের সম্মুখে এই শপথ করিতেছি যে…"

সরফরাজ খাঁ যখন বারান্দার প্রখর আলোকে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার পর দ্বিতীয় যে ব্যক্তি শপথ গ্রহণের জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সকল ফুটিয়া উঠিল।

এই ভাবে "ডি" কোম্পানীর সৈনিকেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া একে একে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সেই টেবলের নিকট উপস্থিত হইয়া, সঙ্গীনের মুঠা মুঠায় পুরিয়া, সেই ভীষণ শপথ গ্রহণের পর বারান্দায় প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। সকল সৈনিকের ঐ ভাবে শপথ গ্রহণ করিতে প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইল। এই এক ঘণ্টার মধ্যেই সকলের শপথ গ্রহণ শেষ হইল।

অতঃপর ধর্ম্মপ্রাণ মোল্লা উঠিয়া বিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া মেজর সাহেবকে বলিলেন, "সাহেব, আমি যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছে। হুজুরের অনুমতি হইলে এখন আমি বিদায় লইতে পারি।"

অনন্তর তিনি মেজর সাহেবের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "রাইফেলটি কে চুরি করিয়াছে, তাহা আপনি এখন সহজেই স্থির করিতে পারিবেন। প্রত্যেকের করতলের ঘ্রাণ লইয়া দেখুন; যাহার হাতে পেঁয়াজের গন্ধ পাইবেন না, সেই ব্যক্তিই রাইফেল-চোর।"

মোল্লাজী মেজরের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে মেজর প্রত্যেক ব্যক্তির করতলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন। এক জন ব্যতীত অন্য সকলেরই করতলে পেঁয়াজের গন্ধ পাওয়া গেল। যাহার হাতে পেঁয়াজের গন্ধ ছিল না, তাহাকেই মোল্লার উপদেশে রাইফেল-চোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল এবং অল্প চেষ্টাতেই তাহার নিকট হইতে মেজর অপহৃত রাইফেল উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন।

পাঠকগণ বোধ হয় মোল্লাজীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছেন। মোল্লাজী কি কৌশলে চোর ধরিবেন, ইহা স্থির করিয়া, পলাণ্ডু-রসে পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীনের মুষ্টি সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক সৈনিক শপথ গ্রহণের সময় সঙ্গীনের মুষ্টি চাপিয়া ধরায় তাহার করতল পলাণ্ডুগন্ধ-বাসিত হইয়াছিল; কিন্তু যে সৈনিক রাইফেলটি চুরি করিয়াছিল, তাহার ধারণা হইয়াছিল, সে যদি সঙ্গীন স্পর্শ না করিয়া শপথ করে, তাহা হইলে সেই শপথে তাহাকে আল্লার অভিসম্পাত-ভাজন হইতে হইবে না। এই জন্য সে সেই কক্ষের টেবলের নিকট দাঁড়াইয়া শপথ আবৃত্তি করিবার সময় সঙ্গীনখানি টেবল হইতে তুলিয়া লয় নাই, সুতরাং তাহার করতলে পলাণ্ডুর গন্ধও পাওয়া যায় নাই।

মেজর স্মিথকে স্বীকার করিতে হইল, এই প্রকার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যেই সেকালের কাজীরা বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া, কে দোষী, কে নিরপরাধ, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন এবং মোল্লাজীর পেশা যাহাই হউক, তাঁহাকে কাজীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে তিনি সেই পদের সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আজি বসন্ত এসেছে

আজি বসন্ত এসেছে!
নয়নে সবার নব-কিশলয়-শ্যাম-অঞ্জন লেগেছে!
অরুণ বিমান বাহিয়া,
জোছনায় অবগাহিয়া,
শিশির-মুক্ত-বঞ্জুল ফুলে রঞ্জিতা ধরে ভেসেছে।

প্রজাপতি লয়ে দুকূলে,
দুলাইয়া চূত-মুকুলে,
মলয়-সমীর-সুরভি-মত্ত ঋতুরাজ আজি এসেছে!
বেলা-চম্পক-গন্ধে,
নব সুরে নব ছন্দে,
বকুলের বনে, কোকিল-কূজনে বেণুটি তাহার বেজেছে!

মালতী কুসুম গাঁথিয়া,
চিকণ চূড়ায় বাঁধিয়া,
তাল তরু-শিরে রুণু রুণু রবে নূপুর বাজায়ে নেচেছে!
নট-চঞ্চল চরণে,
মধুলিহ গুঞ্জরণে,
মধুপান-রত-বিম্ব-অধরে হরষ-মদিরা লেগেছে!

নব কিঞ্জল মাখিয়া,
চিতচোর চলে নাচিয়া,
ফুলধনু আজি ফুলশর লয়ে ঋতুরাজ সনে মেতেছে!
তটিনী লহরে নাচিয়া,
নব আভরণে সাজিয়া,
মূর্ত্ত আমোদ উৎসবে আজ সারা ভুবনেরে ছেয়েছে!

শ্রীমতী ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

শক্তিপূজা ও নিট্‌সেবাদ

শক্তি এই শব্দটাই সাধারণতঃ শারীর-সামর্থ্য-দ্যোতক। কিছু করিতে পারা, বাধাকে অতিক্রম করা, বিঘ্নকে দূরীভূত করা, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করা, এইগুলি শক্তির পরিচায়ক। শক্তির ইহা একদেশ। সমগ্র জীবনটাই বীর্য্যবত্তার দ্যোতক। বিদ্যা-বিজ্ঞানকে অধিগত করিয়া জ্ঞানলাভ করা, তাহাকে যদি শক্তির পরিচয় বলি, তাহা হইলে শক্তিমত্তাকে একান্তভাবে খর্ব্ব করা হয়।

ক্রোধকে পরাজয় করা, লোভকে অতিক্রম করা, হিংস্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া শান্তস্বভাববিশিষ্ট হওয়া, এইগুলিকে মাত্র চরিত্রবত্তা বলা হয়, চরিত্রবত্তা যে অধ্যাত্মবীর্য্য, একটা মহাশক্তির অভিব্যঞ্জক, এই সম্বন্ধে কোনও স্ফুটতর ধারণা আমরা পোষণ করি না। মানবজাতি প্রধানতঃ শারীরবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই শক্তির শারীর প্রকাশকেই বীর্য্যবত্তা বলিয়া অভিহিত করে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য বলিয়া যে সিদ্ধান্তটি রহিয়াছে, এমন হইলে উহার অর্থ হইত—শার্দ্দূল, সিংহ প্রভৃতি পশু জাতিই আত্মলাভক্ষম।

জীবের যখন শরীর আছে, তখন শারীর বলকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দৈহিক শক্তির কতকটা উপযোগিতা অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু উহা ঐ কতকটা। জীবন রক্ষা করিতে কতকটা দৈহিক বলবিক্রমের আবশ্যক। কিন্তু দেখা যাইতেছে, জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে অভ্যুদিত ও সুরক্ষিত করিতে উহার উপযোগিতা সর্ব্বথাই সার্থক নহে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—জ্ঞানই শক্তি—Knowledge is power। বাস্তব-ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে ? বুদ্ধিমান মানবজাতি অমিতশারীর-শক্তিসম্পন্ন পশুবীর্য্যকে পর্য্যুদস্ত করিয়া চলিয়াছে।

'নলেজ' যাহাকে বলা হইয়াছে, যাহার আক্ষরিক অনুবাদ জ্ঞান, প্রকৃতপক্ষে তাহা জ্ঞান নহে, বুদ্ধি। বুদ্ধি এবং জ্ঞান উভয়ের আত্যন্তিক প্রভেদ কতখানি, এইখানে সেই বিচার উপস্থিত করিবার আবশ্যক নাই; তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধি দৈহিক বলকে সর্ব্বক্ষেত্রেই পরাভূত করিয়া চলিয়াছে। এমন কি, অমন যে প্রাকৃতিক শক্তি, তাহাও আজ বুদ্ধি-বিজ্ঞানী মানবের কুক্ষিগত।

যে লক্ষ্য লইয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়ের আলোচনা, তাহাতে শক্তির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা লইয়া অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার আবশ্যক নাই। বাঁচিতে হইলে কতকটা শারীর সামর্থ্যের প্রয়োজন আছে, আবার কতকাংশ আধ্যাত্মিক বীর্য্যেরও অবকাশ অস্বীকার করা যায় না। সে যাহাই হউক, যে শক্তি জয়যুক্ত হইয়াছে, মনুষ্য-সমাজকে অভ্যুদিত করিয়াছে, সে শক্তি কোন্ শক্তি ? এবং সেই শক্তির উপাসনা করা যে মনুষ্যজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য, এতদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শক্তিপূজা জগতে দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ইতিহাসে দেখিতে পাই, রাজশক্তিদর্পিত বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের তপোবীর্য্যের নিকট পরাভূত হইয়া অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন :—

"ধিক্ বলম্ ক্ষত্রবলম ব্রহ্মবলম হি বলম্।"

ক্ষত্র-বল কিছুই নহে, ব্রহ্মবীর্য্যই একমাত্র বল। আবার ঋষি-কণ্ঠে এই বাণীও উদ্ঘোষিত হইয়াছে,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" অপর পক্ষে সমরবিমুখ পার্থকে প্রতিবোধিত করিতে শরীরী ভগবান পাঞ্চজন্য-মুখে প্রোৎসাহিত করিতেছেন :—

"ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ।"

ভারতবর্ষে শক্তিবাদ ও শক্তিপূজা চিরন্তনী রীতি। সেই জন্য অভ্যুদয়কামী দেবসঙ্ঘ মহাশক্তির বন্দনা করিতেছেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

অন্যপক্ষে শান্তিবাদী খৃষ্টসন্তানগণ এক অভিনব শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতীচ্যের ধর্ম্মাদর্শ যাহাই হউক, তাহাদের জীবনব্যাপারের মূল আদর্শ যোগ্যতমের উজ্জীবন Survival of the fittest—এই যোগ্যতার পরিচয়, কাড়িয়া খাওয়া, আহরণ করিবার শক্তি, অন্যকে পরাজিত পর্য্যুদস্ত করিয়া আপনি বাঁচিয়া থাকিবার যে শক্তি-সামর্থ্য, তাহাই যোগ্যতমের পরিচায়ক। যোগ্যতা কখনই ব্রহ্মবীর্য্য নহে, যে ব্রহ্মবীর্য্যকে অভিনন্দিত করিয়া বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রবলের অসারতা প্রতিপাদনকল্পে বলিয়াছিলেন—"ধিক্ বলম্ ক্ষত্রবলম্", এই যোগ্যতা একান্তই শারীর-শক্তি। সেই কারণে জীবন-যুদ্ধের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—struggle for existence জীবনরক্ষার জন্য দ্বন্দ্বজিগীষা।

জড়বৈজ্ঞানিক ডারুইন-প্রবর্ত্তিত এই মতবাদ জার্ম্মাণ দার্শনিক নিট্‌সে কর্ত্তৃক আর একটু বিশদরূপে বিবৃত হইল। তিনি খৃষ্টীয় কৃপাবাদকে ক্লীবের ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দার্শনিক নিটসে বলিলেন, বাঁচিতে হইলে প্রবল বলবিক্রমের সহিত বাঁচিতে হইবে। Will to power শক্তির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। ক্ষমা, মৈত্রী,

কারুণ্য, এ সকল অক্ষমতার পরিচায়ক। জীবনকে ঝঞ্ঝার মত প্রমত্ত করিতে হইবে, তবেই বাঁচার মত বাঁচিতে পারা যাইবে।

নিট্সের হিংস্র শক্তিবাদ জার্ম্মাণীকে সমরজিগীষায় প্রমত্ত করিয়া তুলিল। জার্ম্মাণীর কোষে তরবারি ঝণৎকার করিয়া উঠিল। অগ্নি-নালিকা তাহার রক্তবদনে স্ফুলিঙ্গলেহন আরম্ভ করিল, কীয়েল-খালে রণতরী সমূহ দংষ্ট্রাকরাল নক্রকুম্ভীরের মত তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। শক্তির উদ্বোধনমন্ত্র শ্রবণ করিয়া জার্ম্মাণীর অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, শক্তির সেই উগ্র সুরাবীর্য্য শক্তিবাদী দার্শনিকের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে এক বিষক্রিয়া উপস্থিত করিল। নিট্সে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জার্ম্মাণীতে ব্রহ্মজ্ঞ বশিষ্ঠ-ঋষি বর্ত্তমান থাকিলে হয় ত বিশ্বামিত্রের মত নিট্সেও বলিয়া উঠিতেন—"ধিক্ বলম্ ক্ষত্রবলম্।"

এ সকল কথার অবতারণা করিয়া কায নাই। শক্তির প্রয়োজন, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এখন সমস্যা—কোন্ শক্তির উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাঁচিয়া থাকা শক্তির পরিচায়ক। এই শক্তি শারীর সামর্থ্যও বটে, বুদ্ধি মনীষাও বটে। নিটসে যে শক্তির নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা বুদ্ধি-বলের সহায়ে শারীর বলের প্রবোধন। জীবন ধারণ করিতে হইলে দীনভাবে বাঁচা চলে না; প্রাচুর্য্য চাই। ঐ প্রচুরতার জন্য আহরণ আবশ্যক। আহরণ করিতে হইলে অন্যকে বঞ্চিত করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। ছলনায় এবং কৌশলে সর্ব্বসময়ে এই আহরণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। ইহার জন্য বলবীর্য্যের আবশ্যক। সেই বীর্য্যবত্তার নাম will to power.

ভারতবর্ষীয় জীবন-ভঙ্গিমায় জীবনের দুইটা দিক। একটা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, একটা জগদতীত তুরীয় লোক। এই পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতে জয় ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ইহার নাম অভ্যুদয়, এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার নাম নিঃশ্রেয়স। সর্ব্বাগ্রে অভ্যুদয়, তাহার পর নিঃশ্রেয়স। একটি নহিলে অন্যটি হয় না, কিম্বা উভয়ই পরস্পর অপেক্ষী। অভ্যুদয়ের জন্য বীর্য্য-বৈভবের প্রয়োজন ত রহিয়াছেই, নিঃশ্রেয়সও শক্তিসাপেক্ষ। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

এখন প্রশ্ন,—এই বল কোন্ বল? নিটসে যাহাকে will to power বলিয়াছেন, তাহাই? সেই বুদ্ধি-প্রযুক্ত শারীর-সামর্থ্য? না অন্য কিছু? বিশ্বামিত্র যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবলম্ হি বলম্।"

অধ্যাত্মলোকের তুরীয়াবস্থার কথা না কহিয়া নিতান্ত ব্যবহারিকতার বিষয় আলোচনা করা যাউক। য়ুরোপ শক্তি-পূজক। সেই শক্তি কতকটা পশুশক্তি। উহা আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শশূন্য। অধ্যাত্ম অভিমুখীনতাকে উন্মত্ত সমরদার্শনিক slave morality বলিয়াছেন, অর্থাৎ নৈতিক দাস্য। নৈতিক দাস্যও এক প্রকারের পরাজয়। উহা দুর্ব্বলতারই প্রকারান্তর। শরীর যখন পশুধর্ম্মী, এবং শরীরকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বৃত্তিও যখন একান্ত পাশব স্তরের, তখন পাশব ধর্ম্মকে কতকটা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। সেই জন্য ভারতীয় চিন্তার এইরূপ নির্দ্দেশ—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।

এই শারীর ধর্ম্মকে অঙ্গীকার করিয়াই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ-বিমুখ অর্জ্জুনকে প্রোৎসাহিত করিতে প্রবোধনা বাণী প্রয়োগ করিতেছেন :—

"জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যসমৃদ্ধিম্।"

এই ব্যবহারিক জগতের জয়-জিগীষাও আর্য্য ভারতীয়ের প্রেয় বস্তু। শক্তিমত্তাও উপাসনার, এবং ইহা ভারতবর্ষের চিরন্তন দিনের এষণার বিষয়। বেদও চাহিয়াছেন—আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ মানব।

তবে, শক্তি-সাধনার ভঙ্গিমায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য একান্তই বিভিন্ন। প্রতীচ্যের শক্তি-সাধনা একান্তই পশুধর্ম্মী। আহরণ করা, কাড়িয়া লওয়াই উহার মুখ্যতম উদ্দেশ্য। তবে ঐ জয়-সামর্থ্য বুদ্ধির দ্বারা অধিকতর বলশালী করিয়া তোলা। অর্থাৎ বুদ্ধিমান পশুধর্ম্মী হওয়া। প্রাচ্য ভারতে এই বীর্য্যবত্তাকে আসুর শক্তি এবং অধিকতর নিকৃষ্ট হইলে পৈশাচ শক্তি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়।

ভারতবর্ষও অনাদ্যন্তকাল হইতে শক্তিপূজক। তবে, সে শক্তি কখনই পার্থিব শক্তি নহে। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা বলিয়া আর্য্য প্রজ্ঞা শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে শক্তি নিবেদন করিতেছেন, কিন্তু সে শক্তির প্রতিষ্ঠা অন্যত্র। সে শক্তি সেই বিশ্বশক্তি। তাই, আর্য্য অন্তঃকরণের একপ্রকার প্রণতিমন্ত্র—যো দেবাগ্নৌ সে অপ্সু * * *

ওজোঽসি ওজোময়ি ধেহি! আর্য্য সন্তান নিরন্তর ওজঃ-প্রত্যাশী! এই ওজঃ মন্যু। মন্যু হইতেছে অসৎ, কুৎসিত, আসুরিক মনোবৃত্তিকে নাশ করিবার সামর্থ্য। এই মন্যুকেই পাশ্চাত্য দার্শনিক slave mentality বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, বীর্য্যব্যতিরিক্ত আত্মলাভ যখন কিছুতেই সম্ভব হয় না, তখন আর্য্যভারত একান্তভাবেই শক্তি-সাধক। খৃষ্টীয় কৃপাবাদ ভারতবর্ষে অনার্য্যপুষ্ট দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য ভারতের অন্তর্য্যামীর সুতীব্র অনুশাসন :—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং
ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

কিন্তু এই বীর্য্যবত্তা দৈবীভাবভাবিত। ভারতবর্ষ যে শক্তির প্রত্যাশী, তাহা অধ্যাত্মশক্তি—যাহার দ্বারা আত্মলাভ হয়।

এইবার অন্য প্রশ্নের উত্থাপন। আসুর শক্তি এবং অধ্যাত্ম-বীর্য্যের পরস্পর তুলনামূলক সমালোচনা। কে জয়ী হয়? প্রশ্নটা প্রধানতঃ ইহজাগতিক অভ্যুদয় ও বিজয়বত্তাকে কেন্দ্র করিয়া! কাহারা বাঁচে? কাহারা এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে? কোন্ শক্তির আশ্রয় লইলে জাতিরূপে এবং ব্যক্তির সন্ততঃ ধারাক্রমে বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়? বাঁচিয়া থাকা শক্তির পরিচায়ক। মৃত্যুর অপর নাম শক্তির নিঃশেষতা। যে শক্তিবলে অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সাময়িক বিজয়বত্তায় জয়ী হইতে পারা যায়, সেই শক্তি যদি কোনও একটা জাতিকে দীর্ঘজীবী করিত, তাহা হইলে অধ্যাত্ম-বিহীন উক্ত শারীর সামর্থ্যেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঘটনার বৈপরীত্য দেখা যায়। আসুরিক ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন জাতি প্রায়শঃই কেহ দীর্ঘজীবী হয় নাই; বরং

অনেকেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নামটা মাত্র কোনওরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। আর এমনও অনেক সমর-দুর্দ্ধর্ষ জাতি এক দিন ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান ছিল, যাহারা ধরণী মাতার বক্ষোদেশ হইতে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কালক্রমে তাহাদের নাম আবিষ্কৃত হইতেছে।

জীবনে সঞ্জীবিত থাকাই পরম বীর্য্যবত্তা। জীবনকে নিঃশেষ করিতে কতকগুলি বিরুদ্ধ শক্তি নিয়তই প্রক্রিয়াশীল। জীবনী-শক্তি যতক্ষণ সতেজ থাকিয়া ঐ বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করে, ততক্ষণই মানুষ বা অন্য জীবসত্তা জীবিত থাকে। প্রতিরোধ-ক্ষমতার অবসান হইলেই মৃত্যুর আক্রমণ। এই প্রতিরোধ-সামর্থ্যকে শক্তিমত্তা বলিলে হয় ত অন্যায় কিছু বলা হয় না।

নিট্‌সে যে শক্তির সুরাবীর্য্যে জার্ম্মাণ জাতিকে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই শক্তি পূর্ব্বতন পারসিক, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতির উপাস্য বীর্য্য ছিল। আহরণ ও আক্রমণ। কোনও গতিকে জীবন ধারণ মাত্র নহে। ইংরাজীতে যাহাকে বলে agressive, তাহাই। শক্তিমত্তাকে উত্তেজিত করিয়া বল-পূর্ব্বক অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়া। এই লুণ্ঠনবৃত্তি অতি বুদ্ধিশালী হইলেই যে তাহার অনিষ্টকারিতার হ্রাস হয়, এমন বলিতে পারা যায় না। বরং উহার দ্বারা সর্ব্বনাশের পথকে আরও প্রশস্ত করিয়া তোলা হইতেছে। নব্য য়ুরোপের will to power বৈজ্ঞানিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যাহাতে তাহাকে মৃত্যুর মুখ-গহ্বরে একবারে উপনীত করিয়াছে। য়ুরোপের বর্ত্তমান মনীষিবর্গ পর্য্যন্ত প্রতীচ্যের অবস্থা দেখিয়া আতঙ্কিত।

পৌরাণিক দৃষ্টান্ত-সমূহের উল্লেখ করিয়া বক্তব্যকে বহুবিস্তৃত করিব না, তবে শক্তির মধ্যে যাহা আসুরিক শক্তি বলিয়া কথিত, তাহার মধ্যে মৃত্যুর বীজ নিহিত রহিয়াছে এবং সেই আভ্যন্তরীণ ধ্বংস-প্রবণতার জন্যই ঐতিহাসিকদিগের শূরবীর জাতিগুলি একে একে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষাত্রশক্তিও শক্তি, কিন্তু তাহা শক্তির অতি সামান্য অংশ। তাহা সাময়িকভাবে একটা কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিলেও উহা কখনই সর্ব্ব-সাময়িক নহে। অদ্যকার খৃষ্টীয় জাতি সমূহের সাময়িক অভ্যুদয় দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা যায় না। য়ুরোপের বর্ত্তমান অভ্যুদয় এখনও পাঁচশত বৎসর অতিক্রম করে নাই। ইহাদের ভবিতব্য যে গ্রীক রোম কিম্বা শক হুনের মত হইবে না, এ কথা ত নিঃসংশয় বলা যায় না। বরং বিশেষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলে ইহাই অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, য়ুরোপের বিনাশ পুরোভাগে ঘনাইয়া আসিয়াছে। এ কথা য়ুরোপীয়রাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অতি প্রাচীন জাতিরূপে জগতে তিনটি জাতি এখনও তাহাদের জাতীয় সত্তাকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রাচ্য ভারতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি, দ্বিতীয় চৈনিক জাতি এবং তৃতীয়তঃ হিব্রু জাতি। এই জাতিত্রয় যে দুর্দ্দান্ত সামরিক জাতি, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির ক্ষাত্রবল বিশ্ববিদিত হইলেও চীন ও হিব্রুকে অনেকটা শান্ত জাতিই বলিতে পারা যায়। কিন্তু আর্য্য ভারতও তাহার সামরিক তেজোদর্পে জীবিত থাকে নাই। বরং ঠিক তাহার বিপরীতধর্ম্মী হইয়াই সে আপনাকে দীর্ঘজীবী রাখিয়াছে। তাহার জাতীয়তার মূলমন্ত্র :—ধিক্ বলম্ ক্ষত্রবলম্।

আর্য্যের, চীনের এবং হিব্রুর দীর্ঘজীবিত্বে শক্তির রূপা-ন্তর দেখা গিয়াছে। আক্রমণ না করিয়াও বাঁচা যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়াও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। শোণিত-পিপাসু জাতি না হইয়াও সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, সভ্যতার সর্ব্ববিভাগে সমৃদ্ধ জাতি হইতে পারা যায়। শক্তি—পেশী-সমূহের আক্ষেপ ও বিক্ষেপ নহে। আর নহে অন্তঃকরণবৃত্তির লোলুপতা, হিংস্রকতা, বিজিগীষুতাপরায়ণতা! শক্তির একটা অপমূর্ত্তিও আছে। সেই জন্যই উহাকে আসুরিক দুর্ম্মতি বলা হইয়াছে। এবং উহা অধঃপাতী এবং সর্ব্বনাশকর।

নিট্‌সের শক্তিবাদ—যাহা will to power, তাহা ঐ আসুরিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত! উহাকে অন্য কেহ পর্য্যুদস্ত করিতে পারে কি না, সে প্রশ্নের বিচার অন্যত্র হইতে পারে; এখানে বক্তব্য, ঐ আসুরিক শক্তি আপনার বিষেই আপনি মরিয়া যায়। সেই বিষদৃষ্টি সমগ্র য়ুরোমেরিকা জুড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাহুল্যের জন্য সে কথাও এখানে আলোচনা করিলাম না।

ভারতবর্ষ তাহার অনাদ্যন্ত দিন হইতে শক্তিসাধক। সে কল্যাণীশক্তি! উহা মঙ্গলময়ী! উহা আক্রমণশীল নহে, পরন্তু রক্ষণশীল। ভারতের শক্তিবাদে বৌদ্ধের অহিংসা এবং খৃষ্টের কৃপাবাদ না থাকিলেও উহা একান্ত সামরিক শক্তি নহে। যুদ্ধের প্রয়োজন—আততায়িনং উদ্যন্তং—উদ্যত-অস্ত্র আততায়ী হইতে আত্মরক্ষার জন্য। আর প্রয়োজন ধর্ম্মরক্ষার জন্য। এই ধর্ম্ম বর্ণধর্ম্ম। ভারতবর্ষে সামরিক বলকে একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছিল। যুদ্ধকার্য্য ক্ষত্রিয়ের নির্দ্দিষ্ট বর্ণধর্ম্ম; ভারত-জাতির যুদ্ধকার্য্য তাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। এই ধর্ম্মপ্রতিপালনে স্বর্গলাভ, অপ্রতিপালনে প্রত্যবায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে অনার্য্যোচিত ক্লীবতা বলিয়াছেন।

সামরিক জাতিরূপে পরিগণিত না হইয়াও ভারতবর্ষের আর্য্য-জাতি এবং চৈনিক ও হিব্রু জাতি যে বাঁচিয়া আছে, ইহাতে ইহাই উপলব্ধি হয়, শক্তির একটা দৈবী রূপ আছে। সেই রূপ বহুধা বিভক্ত। কিন্তু তাহার মূলরূপ সংরক্ষিণীশক্তি! সেই কারণে শক্তি-বন্দনা করিতে গিয়া আর্য্যকণ্ঠে এই মহিম্ন-স্তোত্র বাজিয়া উঠে :—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। শক্তিমাতা বিশ্বজননী। জননী তুষ্টি, পুষ্টি, ধী, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, মেধা, শান্তি!

নিট্‌সের শক্তিলাভের উদ্দেশ্য রাজ্য হইতে সাম্রাজ্যলাভ! সকলকে ঘৃষ্ট-পিষ্ট করিয়া আপনি বাঁচিয়া থাকা। ভারতের শক্তি-সাধনার উদ্দেশ্য—আত্মলাভ—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। আত্মলাভের জন্য যে শক্তি, তাহাই পরমাশক্তি। তাহা দৈবী-বীর্য্য। সে শক্তি আয়ুধহস্তে বিশ্বভুবন জয় করিতে সমর্থ হইলেও উহা তেমন উৎক্ষিপ্ত এবং বিজিগীষু হইতে চাহে না, হয় না। দৈবীশক্তি মৈত্রমুখী, বিশ্বমঙ্গলেই তাহার এষণা! আর, এই দৈবী-বীর্য্যের উপাসনায় জাতি অমর হয়। এমন একটা অজেয়তা লাভ করে যে, জাগতিক বা প্রাকৃতিক কোনও

শক্তিই তাহাকে উৎখাত করিতে পারে না। তাই যুগ যুগ ধরিয়া বহু বিরুদ্ধশক্তির উৎপীড়ন উপদ্রব সহ্য করিয়াও ভারতীয় আর্য্যজাতি বাঁচিয়া আছে, সভ্যতা-সমুন্নত হইয়া বাঁচিয়া আছে।

শক্তির প্রকাশ বিভিন্ন এবং তাহা শুধুই আক্রমণমূলক নহে; আর আক্রমণ-প্রবণ যে অংশটি, তাহা শক্তির অতি সামান্য অংশও কখনো কখনো অতি নিকৃষ্ট। সংরক্ষিণী শক্তিই বিজয়ী বীর্য্যবত্তা। দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারায় যে শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়, সামান্য কয়েক দিনের যুদ্ধ-বিগ্রহের উগ্র উদ্দামতায় তেমন নহে। বহু বিভীষণ বিরুদ্ধতাকে সবলে অপসারিত করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিবার নামই জীবন।

নিট্‌সের শক্তিবাদকে শক্তির পরমাদর্শ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে যে ব্যাঘ্রধর্ম্মকে বরণ করিয়া আনা হয়, তাহাতে মনুষ্য-জাতির সাময়িক আহরণবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে এবং অধিক-সংখ্যক কতকগুলির উপর আধিপত্য করিবার প্রমত্ত অধিকারে অধিকারী হইতে পারা যায়। আর তাহা সাময়িকভাবে সুবিধা ও লাভজনক হইলেও জীবন-বিজ্ঞানের দিক দিয়া উহা একান্তই অনিষ্টজনক। জীবনীশক্তি কেবলমাত্র শারীর-সামর্থ্য নহে। উহার আদ্য শারীরিকশক্তি এবং ক্রমশঃ বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞার ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়াও সেই পরম বীর্য্যলাভ, যাহার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কহিয়াছেন—বলহীন আত্মলাভ করিতে পারে না।

আসুরীশক্তির উর্দ্ধস্তরে যে মহাশক্তি অধিষ্ঠিতা রহিয়া বিশ্বের অমঙ্গলকে নিরন্তর ধ্বংস করিতেছেন, পদাঘাতে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত পশুপ্রবৃত্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, সেই আদ্যাশক্তিই আর্য্যের উপাস্যা দেবী। তাঁহার কৃপালাভের জন্য আর্য্যভারতের প্রণতিমন্ত্র :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

গহনা কর্ম্মণো গতিঃ

মীমাংসকরা কর্ম্মকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বময় কারণ বলিয়াছেন। কর্ম্মই সর্ব্বস্ব, কর্ম্মই উপাস্য, কর্ম্মই ব্রহ্ম। ব্রহ্মস্তুতিতে বলা হইয়াছে—"কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ" কর্ম্মরহস্য অতি জটিল, কর্ম্মের গতি অতি গহন। কর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বতন ভারতীয় মনীষীরা কি অদ্ভুত, কি গভীর চিন্তা করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস-মাত্র দিব।

কৃ-ধাতু হইতে কর্ম্ম পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা করা হয়, তাহাই কার্য্য। কার্য্যই কর্ম্ম। কর্ম্ম বাসনার ফল; বাসনাকে কর্ম্মের জনয়িত্রী বলে। অথবা বাসনাই চেষ্টারূপে বহিঃপ্রকাশ লাভ করিয়া কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। বাসনার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা ভাবনা; ভাবনা ও বাসনা প্রায় একই সামগ্রী।

প্রাণিজগতের কর্ম্মই বন্ধন। কর্ম্ম দ্বারাই মানব প্রভৃতি প্রাণিবর্গের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংস। কর্ম্মরূপ উপাদান লইয়াই নিমিত্তকারণ ব্রহ্মও উপাদানকারণ হইয়াছেন। কর্ম্ম না থাকিলে জন্ম-বৈচিত্র্য হইত না, নানা মানব দেখা যাইত না। সৃষ্টির প্রথমে কর্ম্ম কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া সকল দার্শনিক (অবশ্য ভারতীয়) সৃষ্টিকে অনাদি বলিয়াছেন। পূর্ব্বসৃষ্টি অনুযায়িক পরবর্ত্তী সৃষ্টি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অতীতের পশুভাবাপন্ন মানব কর্ম্মগুণেই বর্ত্তমান সুসভ্য ও উন্নত মানব হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির প্রথমে (মহাপ্রলয়ের পর) মানব ছিল যেন বীজের আকার, বর্ত্তমানে তাহা বহু শাখা-সমন্বিত বনস্পতি হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়া, নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অতীতের পশুভাবাপন্ন মানব বর্ত্তমান উন্নত মানব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে ইহা কর্ম্মেরই ফল।

অধ্যাত্মদর্শনে কর্ম্মকে বিশ্বের বীজ বলা হইয়াছে, কর্ম্মই বিশ্বের অসাধারণ কারণ; শস্যের বীজই যেমন শস্যোৎপত্তির অসাধারণ কারণ। অসাধারণ কারণই উপাদানকারণ। "প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ" ব্রহ্মসূত্রে "কর্ম্মাপেক্ষয়া ব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং" প্রমাণিত হইয়াছে।

কর্ম্মই সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যের কারণ। জন্মবৈচিত্র্য, অবস্থা-বৈচিত্র্য, প্রকৃতিবৈচিত্র্য, রুচিবৈচিত্র্য এবং আহার-বিহার-বৈচিত্র্য—সকল বৈচিত্র্যেরই কর্ম্মই কারণ। সকলকে কর্ম্ম করিতেই হয়। তবে কর্ম্মের ফলাফল অদৃষ্টরূপে মানবেই অনুবর্ত্তিত হয়। সদসদ্বিবেক মানবেই আছে, এ জন্য কর্ম্মফল মানবকেই ভুগিতে হয়। মানবকৃত কর্ম্মের ফলেই নানা জন্ম-বৈচিত্র্য। সদসদ্বিবেক আছে বলিয়াই মানব, মানব। মহত্তর কর্ম্মগুণেই মানব দেবতাবৎ পূজ্য হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ—সকলই কর্ম্ম।

আত্ম এবং পরহিত-কর্ম্মের নামই ধর্ম্ম। তদ্বিপরীত কর্ম্মের নাম অধর্ম্ম। অবশ্য আত্মপরহিত—এই আপনিই বা কে, পরই বা কে, ইহার অর্থ যেমন স্পষ্ট, তেমনই জটিল। এ সম্বন্ধে সকলে একমত নহে, এজন্য জাতি বা সম্প্রদায়ভেদে এবং কোথাও অধিকারভেদে আত্মপরহিত ভিন্ন ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে ধর্ম্মও নানাপ্রকার হইয়াছে। ঐহিকসর্ব্বস্ব ব্যক্তির এবং অধ্যাত্মবাদীর আত্মহিত এক হয় না, হইতেও পারে না।

বর্ত্তমান ঐহিক অভ্যুদয় বা ঐহিক অবনতির মূলে মানবের, তথা মানবজাতির কর্ম্মপ্রচেষ্টাই বর্ত্তমান। এই কর্ম্মপ্রচেষ্টাই প্রাণীদের জন্মবৈচিত্র্য, তথা অবস্থাবৈচিত্র্যের কারণ—ইহা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রস্বীকৃত। যথাপ্রজ্ঞং হি সংভবঃ"

* "তদ্যথেহ রমণীয়চরণা × × রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্"
† "য ইহ কপূয়চরণাঃ × × কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্"
"এষ উ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি স উন্নিনীষতে"
"য এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি স অধো নিনীষতে"।

ইহলোকের উন্নতি অবনতি মানবদিগের কর্ম্মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা ইহলোক ব্যতীত অন্য লোকের অস্তিত্ব মানেন, তাঁহারা যাবতীয় উন্নতি অবনতির কারণরূপে কার্য্যকেই স্বীকার করিবেন। ঈশ্বরের নিয়মে স্বেচ্ছাচার, খামখেয়ালী বা

* রমণীয়চরণাঃ শুভকর্ম্মকারিণঃ। † কপূয়চরণাঃ নিন্দিত-কর্ম্মকারিণঃ।

নিষ্ঠুরতার স্থান নাই। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, ইহা অকারণ নিয়ম নহে। ভগবান্ আপনা হইতে কাহাকে বড়, ছোট বা সুখী-দুঃখী করেন নাই। জন্ম হইতেই কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ বলবান্, কেহ দুর্ব্বল, কেহ সুস্থ, কেহ রোগী হইয়া থাকে, ইহা তাহাদের পূর্ব্বকার কর্ম্মফল। পিতা-মাতার গুণাগুণ তাহাদের কর্ম্মফলের জন্য লাভ হইয়াছে। অপরের কৃত কর্ম্ম অপরে ভোগ করে না। ইংলণ্ডের রাজপুত্র অর্দ্ধ-পৃথিবীর রাজা—ইহা তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেরই ফল। বর্ত্তমানকৃত কর্ম্মের ফল ত তাহা নহে। পরমেশ্বর কর্ম্মফলের নিয়ামক। তাঁহার পক্ষপাত নাই। যে অজ্ঞেয়, অদৃশ্য, অচিন্ত্য শক্তি এমন সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবে বিশ্বজগৎ চালাইতেছে, তাহা জড়শক্তি নহে, অচেতন শক্তি নহে। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হয়। কারণ যদি অচেতন জড়শক্তি হইত, তবে আমরা জড় অচেতনই হইতাম। মানব মানবত্বের বলেই জড়জগৎ এবং প্রাণীদিগের উপর আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছে, তাহা তাহাদের কর্ম্মের ফল। মানব হওয়াই যে তাহাদের কর্ম্মগুণ।

সৃষ্টির মধ্যে অনাদিকাল হইতে মানবদিগের কর্ম্ম ওতপ্রোত আছে। কর্ম্মই শরীরের ইন্দ্রিয়ের এবং মনের বন্ধন। জগৎই কর্ম্মের অধীন। "লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" আবার সেই কর্ম্ম দ্বারাই সেই বন্ধননাশ ঘটে। কর্ম্ম যেমন জন্মমৃত্যুর কারণ, তেমনই জন্মমৃত্যুর নাশক। কর্ম্মচক্রই সংসার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই কর্ম্মচক্র হইতে মুক্তিলাভই নির্ব্বাণ।

কর্ম্ম মুক্তির কারণ, সংসারপ্রবাহের নাশক। ভারতীয় দর্শনকার কোথাও কর্ম্মকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে, কোথাও পরম্পরা-সম্বন্ধে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, জাতশুদ্ধ ব্যক্তির জ্ঞানলাভ বা অজ্ঞাননাশ—এ স্থলেও পরম্পরা-সম্বন্ধে কর্ম্মকে স্বীকার করা হইয়াছে। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি-মাস্থিতা জনকাদয়ঃ" চিত্তশুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মই সিদ্ধিলাভের কারণ—ইহা শঙ্কর প্রভৃতির সিদ্ধান্ত। রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে উপাসনাত্মক কর্ম্মই মুক্তির কারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। উপাসনাত্মক কর্ম্মই ভগবদারাধনাত্মক। জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যান ঐ উপাসনাত্মক কর্ম্মেরই প্রকারভেদমাত্র। উহারা স্বতন্ত্র বস্তু নহে। অবশ্য ব্যাপক অর্থেও জ্ঞান এবং ভক্তি উপাসনাত্মক কর্ম্মের মধ্যে, এ মত আচার্য্য শঙ্কর মানেন নাই।

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে"

প্রভৃতি গীতার শ্লোকে কর্ম্মতত্ত্ব নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" এই কথাটির সত্যতা কর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারা যায়।

যে দিক দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, কর্ম্মকে অস্বীকার করার উপায় নাই বা তুচ্ছ করারও কারণ নাই। সকাম কর্ম্ম অহঙ্কারমূলক বা ঐহিক-সর্ব্বস্ব কর্ম্মের নিন্দায় কর্ম্মের একতম অংশকেই নিন্দিত করা হইয়াছে মাত্র। ইহাদেরও অধিকার-বিশেষে সার্থকতা নাই, তাহাও বলা চলে না। কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পাঠকদের নিকট বিদায় লইলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হুগলী ও জব চার্ণক

বাঙ্গালায় ইংরাজগণের ব্যবসায়ে বহু বিঘ্ন হওয়াতে মান্দ্রাজ হইতে উইলিয়ম হেজ ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে হুগলীর গভর্ণর নিযুক্ত হয়েন। ইতঃপূর্ব্বে হুগলী মান্দ্রাজের অধীন ছিল। এই সময় সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব। বিলাতের কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণ ইংরাজ গভর্ণরকে নবাবের হুকুম লইয়া গঙ্গা নদীর মুখে কেল্লা নির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু দূরদর্শী সায়েস্তা বুঝিয়াছেন যে, যদি ঐ কেল্লা নির্ম্মাণে হুকুম দেন, তাহা হইলে ইংরেজ সমস্ত নদীর উপর আধিপত্য করিবেন, সেইজন্য ঐ হুকুম দিলেন না। এই সময়ে বিহারেও নানারূপ গোলযোগ চলিতে-ছিল। সেই জন্য নবাব ইংরাজের কুঠী সকল বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য হুকুম দিলেন। ইংরাজ হতবুদ্ধি হইয়া অর্দ্ধেক মালপূর্ণ জাহাজ লইয়া ফিরিতে লাগিল। দিনেমারও এই সুযোগে নিজেদের ব্যবসার সুবিধা করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। ইংরাজ দেখিলেন, কোন উপায় নাই—হয় ব্যবসা বন্ধ করা, না হয় যুদ্ধ করিয়া ব্যবসার প্রসারবৃদ্ধি করা। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস এই শেষ মতটি পোষণ করিয়া, এডমিরাল নিকলসনকে ১০ খানি যুদ্ধ-জাহাজ ও ছয় শত সৈন্য দিয়া হুগলী পাঠাইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চারিখানি যুদ্ধজাহাজ সৈন্যসহিত বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া গেল। ইতোমধ্যে মান্দ্রাজ হইতেও চারি শত সৈন্য প্রেরিত হইল। নবাব এই যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়া ভীত হইয়া সন্ধির কথা তুলিলেন। যখন ঐ সন্ধির কথা চলিতেছিল, তখন এক আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত পণ্ড হইল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ৪ জন ইংরাজ সৈনিক হুগলীর বাজারে অত্যাচার করায়, নবাবের লোক তাহাদিগকে প্রহার করে। এই সামান্য সূত্র ধরিয়া নবাবপক্ষে ও ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ বাধে। নিকলসন জাহাজ হইতে তোপ দাগিয়া প্রায় পাঁচ শত গৃহ ভূমিসাৎ করিল, ইহার মধ্যে ইংরাজের কুঠীও ধ্বংস হইল। এই সময় হুগলীর মুসলমান গভর্ণর আবদুল গণি। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। যখন এই সংবাদ নবাবের নিকট পৌঁছিল, তখন নবাব হুকুম দিলেন যে, পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশিমবাজারের সমস্ত ইংরাজ কুঠী লুণ্ঠন করা হউক। ইংরাজ ব্যবসায়িগণ এই সংবাদ পাইয়া তাহাদের প্রেসিডেণ্ট জব চার্ণককেও মালপত্র লইয়া সুতানুটী * পলায়ন করিলেন। এই ঘটনা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর হয়। ইহার পর সন্ধি হইয়া ইংরাজ পুনরায় সমস্ত অধিকার পাইয়াছিল। নবাবের এই সন্ধির উদ্দেশ্য কালহরণ করিয়া, ইংরাজের সর্ব্বনাশ করা। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আবদুল সমেদ খাঁ বহু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। সুতরাং চার্ণকও সুতানুটী ত্যাগ করিয়া হিজলী যাত্রা করিলেন।

* সুতানুটী—যেখানে এখন কলিকাতার টাকশাল আছে, উহাই সুতানুটী ছিল।

হিজলী যাইবার পথে থানাদুর্গ * পড়ে। তিনি ঐ দুর্গ ধ্বংস করিয়া চলিয়া গেলেন। চার্ণক হিজলী পৌছিলেন বটে, কিন্তু হিজলী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর নিম্নভূমি। তিন মাসের মধ্যে তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য ধ্বংস হইল, অবশিষ্ট অধিকাংশ সৈন্য অসুস্থ হইয়া পড়িল। এই সময় ইংরাজের ব্যবসা একরূপ ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এই সময় মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কোর্ট অফ ডিরেক্টর হুকুম দিলেন, ব্যবসা উঠাইয়া দিয়া কেবল মোগল জাহাজ ধ্বংস কর। এই সময় বাদশাহ আরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি দেখিলেন, যদি ইংরাজ মোগল জাহাজ ধ্বংস করে, তাহা হইলে মক্কাযাত্রীর জাহাজও ধ্বংস হইবে। সেইজন্য তিনি ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট সন্ধি করিয়া হুকুম দিলেন, ইংরাজ ইচ্ছামত নানাস্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে পারিবে এবং উলুবেড়িয়ায় ডক্ ও বারুদের কারখানা করিতে পারিবে। চার্ণকও মোগল জাহাজ ফেরত দিলেন। চার্ণক প্রথমে উলুবেড়িয়া আসিয়া, পরে পুনরায় সুতানুটীতে আসিলেন। নবাব, ইংরাজকে সুতানুটীতে আসিতে দিলেন, কিন্তু হুকুম দিলেন, যেন কোন কেল্লা নির্ম্মাণ না করেন। এই হুকুম দিয়াই মোগল সৈন্যকে হুকুম দিলেন, ইংরাজের মালপত্র লুণ্ঠন কর। এই সময় চার্ণকের সৈন্যবলও ছিল না, ধনবলও ছিল না। তিনি বাধ্য হইয়া ঢাকার নবাবের কাছে দুই জন প্রতিনিধি পাঠাইলেন। তাঁহারা এই প্রার্থনা জানাইলেন, যেন তাঁহাদের সুতানুটীতে থাকিতে দেওয়া হয়। কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণ এই সংবাদ পাইয়া কাপ্তেন হিথ্‌কে (Heath) কিছু সৈন্য দিয়া হুকুম দিলেন যে, ইংরাজের মালপত্র, লোকজন লইয়া মান্দ্রাজে চলিয়া আসিবার জন্য। হিথ্ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাঙ্গালায় আসিলেন। ঐ সালের ৮ই নভেম্বর লোকজন ও মালপত্র লইয়া বালেশ্বর রওনা হইলেন। বালেশ্বর পৌছিবার পূর্ব্বেই মোগল ঐ স্থানের ইংরাজের মালপত্র আটক করিল—কতক কুঠীও লুণ্ঠন করিয়াছিল। হিথ্ ২৯শে নভেম্বর সৈন্যসহ বালেশ্বর পৌছিয়াই নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন এবং আগুন লাগাইয়া চট্টগ্রাম যাত্রা করিলেন। কিন্তু চট্টগ্রাম অধিকার করিতে না পারায় আরাকান যাত্রা করিলেন এবং আরাকান-রাজকে জানাইলেন, যদি ইংরাজকে আরাকানে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তাহারা মোগলকে আক্রমণ করিতে সাহায্য করিবেন। প্রায় এক পক্ষ অতীত হইলেও কোন সংবাদ না পাওয়ায় হিথ্ ১৫ খানি জাহাজ ও মালপত্র লইয়া মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। বাঙ্গালায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের পর ৫০ বৎসর পরে তাহাদের সব ত্যাগ করিতে হইল। অন্যদিকে সম্রাটের আদেশমত ইংরাজের মালপত্র লুণ্ঠিত হইল এবং ঢাকায় পূর্ব্বপ্রেরিত দুই জন ইংরাজ প্রতিনিধি বন্দী হইলেন।

* থানাদুর্গ—বর্ত্তমান শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেন। অনেকে থানাদুর্গ না লিখিয়া 'টানা' লেখেন।

সায়েস্তা খাঁ বার্দ্ধক্যবশতঃ কার্য্য হইতেই অবসর গ্রহণ করিলে, বাহাদুর খাঁ ও পরে ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার স্থানে বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ ধীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। এই সময় ইংরাজের ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হইল। ইংরাজকে পুনরায় আহ্বান করা হইল এবং ১৪শে আগষ্ট ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক পুনরায় সুতানুটীতে আসিয়া ইংরেজ-পতাকা তুলিয়া কলিকাতার ভিত্তিস্থাপন করিলেন এবং হুগলী ত্যাগ করিলেন।

১৬৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী বাদশাহের হুকুমমতে ইংরাজ আবার বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন এবং বৎসরে তিন হাজার টাকা দিতে হইবে, এই বন্দোবস্ত হইল। ইংরাজের রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়া জব চার্ণক ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী ধরাধাম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। ইংরাজের পূর্ণ উন্নতি তাঁহার দেখা হয় নাই।

চার্ণক সহমরণোন্মুখ এক হিন্দুবিধবাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই হিন্দু-পত্নীর গর্ভে কয়েকটি সন্তানও হইয়াছিল। চার্ণকের জীবদ্দশায় পত্নীর বিয়োগ হয়। তাঁহাকে চানকে (বারাকপুর) লাট সাহেবের বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে সমাহিত করা হয়। চার্ণক প্রায়ই ঐ সমাধির উপর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে বারাকপুর আসিতেন।* ঐ স্থানেই জব চার্ণকের সমাধি হয়। কলিকাতায় "চার্ণক প্লেস" চার্ণকের স্মৃতিচিহ্ন।

জনপ্রবাদ, চার্ণকই চানকের প্রতিষ্ঠাতা। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাসের কবিতায় চানকের উল্লেখ আছে, যখন ইংরাজ ভারতের খবর রাখিত না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।

* "Before the Mongul's war, Mr. Charnock went one time with his ordinary guard of soldiers, to see a young widow act that tragical catastrophe, but he was so smitted with the widows beauty, that he sent his guards to take her by force from her executioners and conducted her to his own lodgings. They lived lovingly many years and had several children, at length she died, after he had settled in Calcutta but instead of converting her to Christianity, she made him a Proselyt to Paganism and the only part of Christianity that was removable in him was burying her decently and he built a Tomb over her where all his life after her death he kept the aniversary of her death by sacrificing a cock on her tomb after the Pagan "Manner". Accounts of the East Indies P. & Vol. II By Alexander Hamilton 1739 A. D.

কংগ্রেসের নূতন গঠনবিধি

"লৌহকঠিন" গঠনবিধি

কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত নূতন নিয়মাবলী অনুসারে কংগ্রেস কমিটীগুলি পুনর্গঠিত হইতেছে। তন্মতে নূতন কংগ্রেস সভ্য করিবারও এবার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মীর মনোযোগ আবশ্যক। কাগজ-কলমে বা বক্তৃতায় আইন-কানুন পাশ করা যত সোজা, তাহাকে কার্য্যকর করা তত সোজা নহে। বোম্বাই কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রতিনিধিই প্রস্তাবিত নূতন গঠনবিধির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সর্ব্বমোট বিরোধিতাপক্ষে হইয়াছিল ৭৬ ভোট; কিন্তু মহাত্মাজী ১১০ ভোট পাইয়া বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় তাহা পাশ করিয়া লয়েন। মহাত্মাজী কংগ্রেস ছাড়িয়া গেলেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাঁহার এই "সামান্য দান (humble gift)" অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশকে দিয়া গেলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই নূতন গঠনবিধি যে কংগ্রেসের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, তাহা এখন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এই গঠনবিধিতে থাকিবে লৌহের বাঁধন; কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক ইহা হইতে ছাড়া পাইবে না।" কিন্তু এই গঠনবিধি মোটেই সুদৃঢ় নহে—অনিশ্চয়তা ইহার এক মূলনীতি। প্রথমেই বলা হইয়াছে, প্রতি ৫০০ কংগ্রেস সভ্য এক জন প্রতিনিধি বা 'ডেলিগেট' নির্ব্বাচন করিবেন। তিনি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্যও 'প্রতিনিধি' হইবেন। কিন্তু যে প্রদেশে এই প্রতিনিধি-সংখ্যা এক শতের অধিক হইবে, তথায় (যেমন বাঙ্গালায় সে দিন হইয়া গেল) নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্য হইতে পুনঃ ১০০ জন নির্ব্বাচিত করিয়া প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠন করিবেন। নিশ্চয়তা কোথায়? তার পর, ছয় মাসের সভ্যসংখ্যা দেখিয়া প্রতি বৎসর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি নূতন নূতন নির্ব্বাচক-মণ্ডলী (constituency) ঘোষণা করিবেন। ফলে, কোন বৎসর এমন হইতে পারে—ত্রিপুরা জেলায় দশ হাজার কংগ্রেস সভ্য হইয়াছে এবং তথায় বিশ জন প্রতিনিধি হইবেন; আর পার্শ্ববর্ত্তী চট্টগ্রামে মাত্র এক হাজার সভ্য হইয়াছে এবং তথায় মাত্র দুই জন প্রতিনিধি হইবেন। আবার পর-বৎসর হয় ত ত্রিপুরা মাত্র এক জন প্রতিনিধি পাইবেন এবং চট্টগ্রাম দশ জন পাইবেন। পূর্ব্বকার গঠনবিধিতে প্রতি জেলার লোক-সংখ্যার অনুপাতে তাহার প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিত—উহা একটা স্থায়ী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর বর্ত্তমান নিয়মে প্রতি বৎসর নূতন নূতন নির্ব্বাচক মণ্ডলী-গঠন ও প্রতিনিধি-সংখ্যা বণ্টন করিতে হইবে। নূতন নিয়মে কোনরূপ স্থায়িত্বের লক্ষণ নাই। তার পর শুধু ৫০০ কংগ্রেস সভ্য হইলেই এক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার সব সময় হইবে না। সমগ্র ভারতে দুই হাজারের অধিক প্রতিনিধি হইতে পারিবে না। (পূর্ব্বে কংগ্রেস প্রতিনিধি বা 'ডেলিগেট' হইত অনধিক ৬০০০ হাজার) কোন প্রদেশে আবার প্রতি দেড় লক্ষ অধিবাসীর জন্য এক জনের অধিক 'প্রতিনিধি' হইতে পারিবে না। তাহাও আবার ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে হিসাব করিতে হইবে। ঐ হিসাবে বাঙ্গালা ও সুরমা উপত্যকা বর্ত্তমানে তিন শত চুয়াল্লিশের অধিক 'প্রতিনিধি' নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে হিসাব করিলে বাঙ্গালা ও সুরমা উপত্যকার প্রাপ্য হয় তিন শত তেষট্টি জন প্রতিনিধি। এ ব্যাপারেও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের স্থলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গণনা ভিত্তি করায় এ প্রদেশের ১৯ জন প্রতিনিধি সংখ্যা কম হইয়াছে। আবার দশ হাজার অধিবাসিযুক্ত বাঙ্গালার সহরগুলি ঐ ৩৪৪এর এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ছিয়াশী জনের অধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না—তাহারা যত হাজারই কংগ্রেস সভ্য করুক্ না কেন। সুতরাং বেশী কংগ্রেস সভ্য হইলে ও প্রতিনিধিসংখ্যা বাঙ্গালায় অনধিক ৩৪৪ মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইলে, গ্রামে হয় ত প্রতি ৬০০ কি ৭০০ সভ্য মাত্র এক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন এবং সহরে হয় ত প্রতি হাজারে কি দু'হাজারে এক জন হইবে। তাহা প্রতি বৎসরের এক ষাণ্মাষিক হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করিবে। কার্য্যকারিতার দিক দিয়া ইহা কিরূপ ফলপ্রসূ হইবে, সহজেই অনুমেয়। এরূপ অনিশ্চয়তার ভিত্তির উপর কোন নিয়মাবলী গঠিত করা চলে না। একবার সভ্যসংখ্যা হিসাবে (অর্থাৎ প্রতি ৫০০ শতে এক জন) প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট করা হইল। আবার জনসংখ্যা অনুসারে প্রতি দেড় লক্ষে এক জন প্রতিনিধি সীমাবদ্ধ করায় ঐ ৫০০ শতের কোন মূল্যই রহিল না। এরূপ প্রথাকে "লৌহকঠিন গঠনবিধি" আখ্যা দেওয়ায় কোন সার্থকতা নাই।

ইহার দোষ কোথায়?

যে নিয়মাবলী দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর এক রকম ভালমতেই কার্য্যকর হইয়াছে, তাহা এত অতর্কিতভাবে, বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনের দু'চারদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে মাত্র এক নোটিশ দিয়া, রাতারাতি পরিবর্ত্তন করা উচিত হয় নাই। এ বিষয়ে বহুপূর্ব্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলির বিশেষ মতামত গ্রহণ করা উচিত ছিল। এরূপ তাড়াতাড়ি কতগুলি আমূল পরিবর্ত্তন গ্রহণ করা মহাত্মাজীর প্রতি আমাদের অকৃত্রিম ভক্তি ও বিশ্বাসের নিদর্শন হইতে পারে; কিন্তু কংগ্রেসের মত বৃহৎ এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের চিন্তাশীলতার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় নাই। এ গঠনবিধির স্রষ্টারা একবারও বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই, এরূপ নিয়মে জেলা ও মহকুমা কংগ্রেস কমিটীগুলির কি ভাবে গঠন বা পুষ্টি হইবে। নূতন নিয়মে তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থান কংগ্রেস মানচিত্রে কার্য্যতঃ অস্বীকার করা হইয়াছে। অতঃপর সহরে বা মহকুমা সহরে কংগ্রেস সভ্য করার উৎসাহ কর্ম্মীদের বিশেষ থাকিবে না। তাঁহারা গ্রামের দিকেই বিশেষ মনোযোগ করিবেন। ইহা ভাল কথা; কিন্তু সকল প্রগতির আরম্ভস্থল সহরের কংগ্রেস কমিটীগুলিকে এরূপ পঙ্গু করিলে গ্রামে প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? পূর্ব্বকার

নিয়মে যখন প্রতি জেলার নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার ছিল, তখন বিভিন্ন কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যে একটা সহযোগিতার সুযোগ ছিল ও হইত। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মে প্রত্যেক নির্ব্বাচনপ্রার্থী কর্ম্মী স্বীয় স্বার্থই প্রথমে দেখিবেন। নিজের নির্ব্বাচনের উপযুক্ত ৫০০ কংগ্রেস সভ্য স্থানবিশেষে করাই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইবে। সমস্ত জেলা বা মহকুমায় কংগ্রেসপ্রভাব যাহাতে বিস্তার হয়, তাহার চেষ্টা তাঁহার দ্বারা পরে হইবে বা হইবে না। তার পর, এই নূতন গঠনবিধির প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে দুর্নীতির অধিক সুবিধা হইবে। যাঁহারা অধিক টাকা খরচ করিবেন, তাঁহাদেরই 'প্রতিনিধি' নির্ব্বাচিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা হইল। গরীব কংগ্রেস-কর্ম্মীদের নির্ব্বাচিত হইতে অতঃপর বেগ পাইতে হইবে। পাঁচ শত হিসাবে নিম্নতম নির্ব্বাচকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় অপ্রকৃত কংগ্রেস-সভ্য করার ইহাতে অধিক সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের অনুপাতে সহরের 'প্রতিনিধি'-সংখ্যা গ্রামের এক-চতুর্থাংশ করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রামের প্রতি মমত্ববোধ বাড়িতে পারে। কিন্তু সহরগুলিকে এ ভাবে উপেক্ষা করিলে বর্ত্তমান সভ্যযুগে কোন রাষ্ট্রীয় উন্নতি অসম্ভব। স্থানবিশেষে নূতন নিয়মাবলীতে "সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল্ ভোটের" বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে প্রথা ভারতবর্ষ অপেক্ষা রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত পাশ্চাত্যের অনেক দেশেও কার্য্যকরী নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহারই এ দেশে এখন সূচনা হইল। আলোচ্য নিয়মাবলী দেখিলে আমরা বলিতে বাধ্য—ইহার স্রষ্টারা ইহার গঠনসময়ে দেশ ও কংগ্রেসের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া গিয়া এক আদর্শবাদের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে এই কিম্ভূত-কিমাকার গঠনবিধির সৃষ্টি!

প্রতিনিধি-হ্রাস প্রগতি-বিরোধী

সভ্যসংখ্যার উপরে 'প্রতিনিধি' নির্ব্বাচনের ভিত্তি করিয়া কংগ্রেসের ক্ষতি ভিন্ন হিত হয় নাই। ৬০০০ 'ডেলিগেট' থাকিলে কংগ্রেস অধিবেশনে কায হয় না ('business-like'), এই অজুহাতে অনধিক ২০০০ ডেলিগেট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ২০০০ ডেলিগেট দ্বারাও কি সে ভাবে কাযের সুবিধা হইবে? ভারতের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশে লোকশিক্ষার দিক দিয়া কংগ্রেসের এই ডেলিগেট-সংখ্যা কমান বিশেষ অন্যায় হইয়াছে। এ দেশে যত বেশী কংগ্রেস প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ, প্রত্যেক প্রতিনিধি কংগ্রেসের বাণী নিজ নিজ স্থানে সাধ্যমত প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ প্রতি ৫০০ কংগ্রেস সভ্যের জন্য এক জন 'প্রতিনিধি' নির্ব্বাচন নিয়ম করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলিকে শক্তি-হীন করা হইয়াছে। নানা কারণে প্রতিনিধি-সংখ্যা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তার পর বাঙ্গালার মত উন্নত প্রদেশে অধিক-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেও তাহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে ১০০এর অধিক প্রতিনিধি সদস্য থাকিবে না, এই নিয়ম আরও ক্ষতিকর। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রায় ৩০০ সদস্য থাকিলে ইহা যত শক্তিমান হইত এবং এই ৩০০ লোক কংগ্রেস কার্য্যে যে পরিমাণ উৎসাহ বোধ করিতেন, তৎস্থলে মাত্র ১০০ হইলে সে পরিমাণ হইবে না। কংগ্রেসের নিয়মকর্ত্তারা এ ব্যাপারেও বাঙ্গালার প্রতি গুরুতর অবিচার করিয়াছেন। তাঁহারা নিয়মাবলী গঠনসময়ে বাঙ্গালাকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র বা আজমীরের ন্যায় এক ক্ষুদ্র প্রদেশ মনে করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। উল্লিখিত কোন কংগ্রেস প্রদেশে এক শতের অধিক ডেলিগেট কদাপি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালাকেও ঐ মাপকাঠীতে ফেলিয়া অনধিক ১০০ প্রতিনিধি সদস্য তাহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালার প্রগতি-বিরোধী।

'কায়িক পরিশ্রম' ও গরীবের উপহাস

নূতন নিয়মাবলীতে সাধারণ কংগ্রেস সভ্যের সর্ব্বদা খদ্দর পরিতে হইবে, এই বাধ্যতামূলক বিধি রহিত করা হইয়াছে। ইহাতে কাহারও কাহারও পক্ষে শঠতার অবসান হইবে, ভাল কথা। কিন্তু যাঁহারা 'ডেলিগেট' নির্ব্বাচিত হইবেন বা কোন কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইবেন, তাঁহাদের জন্য আর এক অদ্ভুত নিয়ম করা হইয়াছে। তাঁহারা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ছয় মাস যাবৎ প্রতি মাসে কংগ্রেসের জন্য কিছু কিছু "শারীরিক পরিশ্রম" করিবেন। হয় প্রতি মাসে ৫০০ গজ সূতা কাটিয়া দাখিল করিবেন বা তদভাবে প্রতি মাসে আট ঘণ্টা করিয়া কংগ্রেস পক্ষে শারীরিক শ্রম করিবেন। "ওয়ার্কিং কমিটী" সম্প্রতি এই শ্রমের জন্য কতকগুলি কাযের উল্লেখ করিয়াছে—যথা, ঘরবাড়ী ঝাঁট দেওয়া; দর্জ্জী, ছুতোর বা কামারের কায; রোগীর শুশ্রূষা; পায়ে হাঁটিয়া সংবাদ বহন বা ঔষধ বিতরণ; খদ্দর ফিরি করা; স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কূপ, পুকুর প্রভৃতি পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এই নিয়মের উদ্দেশ্য—কংগ্রেস-কর্ম্মীদের পল্লীর প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি ও সাধারণ লোকদের সহিত সমভাব ও সমবেদনা অনুভূতি। কিন্তু এভাবে বাধ্যতামূলক নিয়ম করিয়া এ মহৎ উদ্দেশ্য সফল করা যায় না, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহার অন্য একটা দিকও আছে। ঝাড়ুদার, ছুতোর, কামার বা দর্জ্জী পেটের দায়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে; তাহা তাহার জীবিকার উপায়। আর সে কায যদি কোন ব্যারিষ্টার বা জমীদার-তনয় বা কোন প্রবীণ ডাক্তার মাসে আট ঘণ্টা করিতে যান, তবে তাহা দ্বারা ঐ পেটের দায়ের শ্রমিককে উপহাস করা হইবে মাত্র। ঝাড়ুদার কায়িক পরিশ্রম করে—নিজের ও পরিবারের এক মুষ্টি অন্নের জন্য; আর আমাদের কংগ্রেস-নেতারা ও কর্ম্মীরা তাহা করিবেন একরূপ সৌখীনতার জন্য। ইহাকে ব্যঙ্গ ভিন্ন আর কি বলা যায়? এরূপ বাধ্যতামূলক অস্বাভাবিক পথে পল্লীজনের প্রতি মমত্ববোধ বাড়িবে না। ইহাতে হিতে বিপরীত হয়, এবং দুঃখী পল্লীবাসীকে অপমান করা হয় মাত্র। যদি মহাত্মাকে সন্তুষ্ট করাই এই বিধির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, তবে ইহা বাধ্যতামূলক না করিলেও চলিত। ভয় হয়, পূর্ব্বেকার স্বভাবতঃ খদ্দর পরিধানের নিয়মের ন্যায় এই কায়িক পরিশ্রমের নিয়মও আর এক শঠতার প্রশ্রয় দিবে।

Unitary vs. Federal.

আলোচ্য গঠনবিধির এক বিশেষত্ব এই যে, ইহা দ্বারা কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক কেন্দ্রীভূত (unitary) করিয়া ইহার ওয়ার্কিং কমিটীকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি তাঁহার ওয়ার্কিং কমিটীর সমস্ত চৌদ্দ জন সদস্যকে মনোনীত করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, এবং স্থলবিশেষে কোন প্রাদেশিক সমিতি বেয়াড়া কায করিলে তাহার সমস্ত কমিটীও মনোনীত করিতে পারিবেন। সভাপতি তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (cabinet) মনোনয়ন করিবেন, ভাল কথা; যেমন বিলাতে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রণাসভার সদস্য নিজে মনোনয়ন করেন। কিন্তু বিলাতে প্রধান মন্ত্রী বা তাঁহার পারিষদগণ কোন অন্যায় করিলে, তাহার প্রতিবাদ বা বিচার-আলোচনা পার্লামেণ্টে চলে। তৎসম্বন্ধে কোন "রুলিং" দিবার জন্য পার্লামেণ্টে এক speeker বা নিরপেক্ষ সভাপতি আছেন। কিন্তু কংগ্রেসে সভাপতি বা ওয়ার্কিং কমিটী কোন অন্যায় করিলে বিতর্ক স্থলে ন্যায্য "রুলিং" পাওয়ার সভাপতির গ্যারাণ্টি কোথায়? সুতরাং এ স্থলে স্বেচ্ছাচারিতার কোন প্রতিষেধক নাই। ভারতের মত বিশাল দেশে এরূপ কেন্দ্রীভূত একচ্ছত্র ক্ষমতাযুক্ত নিয়মাবলী বা গঠনবিধি উন্নতির পরিপন্থী। কংগ্রেস ব্যাপারে এখন প্রত্যেক প্রদেশকে কতকটা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার (Federal constitution) না দিলে চলিবে না। প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, বিশেষতঃ রাজনীতিক ক্ষেত্রে; তাহা পাটনায় বা ওয়ার্দ্ধায় বসিয়া সমাধান করা যায় না। কংগ্রেসের গঠনবিধিতে ওয়ার্কিং কমিটীর এই একচ্ছত্র ক্ষমতা (unitary system) ছিল বলিয়াই বাঙ্গালার উপরও পুনা-চুক্তি অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় চাপান হইয়াছে। অথচ মাদ্রাজ বা অন্য প্রদেশের ন্যায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রশ্ন বাঙ্গালায় তত জটিল ও প্রকট নহে। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় এমন অনেক প্রশ্ন উঠিবে, যাহার সহিত অন্য প্রদেশের সমস্যার কোন সামঞ্জস্য থাকিবে না, এবং বাঙ্গালার কংগ্রেসকে নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় সে সকল বিচার করিতে হইবে। সে সময় ওয়ার্কিং কমিটীর মুখপানে বাঙ্গালার কংগ্রেসের তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। গতবার যখন স্বরাজী দল বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ঐ সভায় পাশ হইতে চলিল, তখন ওয়ার্কিং কমিটী বাঙ্গালার স্বরাজীগণকে আবার কাউন্সিলে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন; এমন কি, স্বরাজীগণ ঐ সময় কোন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট সদস্যগণসহ একযোগে ভোটও দিয়াছিলেন। ভাবী শাসনতন্ত্রে এরূপ অনেক বিষয় নিত্য নূতন উপস্থিত হইবে এবং বাঙ্গালার কংগ্রেসকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। প্রগতিশীল বাঙ্গালাকে পশ্চিম-ভারতীয় প্রভাবযুক্ত ওয়ার্কিং কমিটীর লেজে বাঁধিয়া রাখিলে বাঙ্গালার রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির অনেক অন্তরায় নিশ্চিত। রাজবন্দীর সমস্যা বাঙ্গালার নিজস্ব। ওয়ার্কিং কমিটী তাহার গুরুত্ব কখনও উপলব্ধি করেন নাই বা করিতেছেন না। বাঙ্গালাকে উপেক্ষা করা কিছুদিন যাবৎ ওয়ার্কিং কমিটীর এক নীতি বলিয়া মনে হয়। এ সকল বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের গঠনবিধিতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত (unitary) না করিয়া কতকটা প্রদেশে প্রদেশে ন্যস্ত (Federal) করা উচিত ছিল। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা না থাকিলে গত আইন অমান্য আন্দোলনের ন্যায় সমস্ত দেশে একযোগে কাযের সুবিধা হয় না, যাঁহারা এ তর্ক তুলিবেন, তদুত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট যে, যুদ্ধের সময় সর্ব্বত্র নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মকানুন স্থগিত থাকে—গত আন্দোলনে কংগ্রেসেরও তাহাই হইয়াছিল এবং আলোচ্য গঠনবিধিতে ঐরূপ একটি কথা সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ থাকিলে কংগ্রেসকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে কোন আপত্তিই হইতে পারে না। বাঙ্গালার প্রগতি, বৈশিষ্ট্য ও আত্মমর্য্যাদার জন্য কংগ্রেসের গঠনবিধিতে যাহাতে কেন্দ্রীয় সমতার হ্রাস হয় এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী (অধ্যাপক, এম, এ)

লুব্ধ

তব পানে চেয়ে থাকি তাহে এত রোষ!
সারা নিশি ধরা রয় চেয়ে চাঁদ পানে,
কুসুমেরে তোষে মক্ষি নৃত্যে আর গানে,
ভাল ভালবাসে সবে তাহে কিবা দোষ!

কমল ফুটিয়া ওঠে মধুর উষায়
উষার প্রকাশে হাসে মুগ্ধ বিশ্বখানি,
লুটিতে পরাগ-মধু পুষ্প-বক্ষ ছানি'
মৃদু পদে লোভাতুর গন্ধবহ ধায়।

তোমারে পাইতে মোর হিয়া ব্যাকুলিত,
নয়ন চঞ্চল দিতে দৃষ্টির চুম্বন;
কেমনে করিব তবে তারে নিমীলিত,
তুমি যে আমার বুকে পরাণ-স্পন্দন।

ভাল তুমি ভাল তোমা বাসিয়াছি তাই,
কর রোষ দাও দোষ তোমাকেই চাই।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়।

রূপান্তর

—"পেন্নাম হই, দা'ঠাকুর" বলিয়া লোকটি সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

বৃদ্ধ পদ্মনাভ গাঙ্গুলী মহাশয় একখানি ছিন্ন মাদুরের উপর বসিয়া, চোখে দড়ি-বাঁধা চশমা আঁটিয়া, লাল খেরো-বাঁধান খাতা খুলিয়া হিসাব দেখিতেছিলেন। মাথাটি ঈষৎ তুলিয়া, চশমার মধ্য দিয়া এক বিচিত্র ভঙ্গীতে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কল্যাণ হোক্!— তার পর? ঘোষের পো, কি মনে ক'রে?"

—"আজ্ঞে, এইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম ওই কবরেজ মশায়ের কাছে; তা' মনে করলাম, সেই সঙ্গে একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শনও করেই যাই।"

—"তা' বেশ করেছ!—আস্‌বে বই কি; তোমরা ছাড়া এ গরীব ব্রাহ্মণের আর কে আছে, বল না গো?— কিন্তু কবরেজবাড়ী কেন?"

—"সেই কথাই ত' বলতে এলাম, ঠাকুর মশাই; আপনার কাছে সংসারের সুখ-দুঃখের দুটো কথা কইব না ত' আর কা'র কাছেই বা কইব, আর কেই বা শুনবে।"

লোকটি আর একটু নিকটে আসিয়া ঢোক গিলিয়া বেশ যেন একটু চেষ্টা করিয়া বলিল,—"আহ্লাদীটা আজ চার দিন একজ্বরী হয়ে প'ড়ে রয়েছে; মুখে তা'র এক ফোঁটা ওষুধ পড়া ত' দূরের কথা, ঘরে একমুঠো চাল পর্য্যন্ত বাড়ন্ত।—গোটাদশেক টাকা ধার দিয়ে এ অসময়ে আপনি রক্ষে না করলে ত' আর বাঁচি না, দা'ঠাকুর।"

গাঙ্গুলী মহাশয় টেঁক হইতে নস্যাধার বাহির করিয়া নস্য লইতে লইতে বলিলেন,—"বিলক্ষণ! তোমাদের ঠাকুরমশায়ের ঘরে কি টেঁকশাল আছে ঠাউরেছ হে, যে, হাত পাতলেই টাকা পাওয়া যাবে?—একটা পেট, ভগবানের আশীর্ব্বাদে কোন রকমে চ'লে যায়, এই পর্য্যন্ত, ব্যস্। না হ'লে, তোমাকে দিতে আর কি বল না।"

লোকটি আর একবার শেষ চেষ্টা করার মত করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, দিলে বড় ভাল হ'ত—"

গাঙ্গুলী মহাশয় ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এও ত' ভ্যালা বিপদে পড়া গেল দেখছি, সক্কাল বেলা;—বল, তা' হ'লে তোমার জন্যে লোকের বাড়ী চুরি-ডাকাতি—"

তাঁহার বাক্যের শেষাংশটুকু শুনিবার জন্য আর অপেক্ষা না করিয়াই লোকটি অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে কি যেন বলিতে বলিতে চিন্তিতমুখে বিদায় হইল।

ইতিমধ্যে কোন্ সময়ে গাঙ্গুলী মহাশয় চশমাটি চক্ষুর উপর হইতে তুলিয়া কপালে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আবার যথাস্থানে ন্যস্ত করিয়া খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন ও অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া হিসাবের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। পাশেই একটা রঙ-চটা তোরঙ্গ ছিল, কিছুক্ষণ পরে তাহার মধ্য হইতে একটি তমসুক বাহির করিয়া অতি নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার কোটরগত চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি একবার হিসাবের খাতা, একবার তমসুকখানি দেখিতে দেখিতে স্বগতোক্তি করিতে লাগিলেন,—"হুঁ, তুমি রতন নন্দী, বেঁটে কায়েত, বড় চালাক, না?—মনে করেছ, ক'টা দিন গেলেই দলিল তামাদি হয়ে যাবে, তখন আমাকে লবডঙ্কা দেখাবে?—হুঁ, তাই সে দিন এসে নাকি সুরে মায়া-কান্না কাঁদা হচ্ছিল, ঠাকুরমশাই, ভাগ্নীটার অসুখ বলেই টাকা নিয়েছিলাম, তাকে ত' ধ'রে রাখতে পারলাম না; তা' আপনি টাকার জন্যে কিছু ভাববেন না; আর দু'মাস সময় আমায় দিন, মায় সুদশুদ্ধ আপনার সব টাকা আমি নিশ্চয় শোধ ক'রে দেব।'—ওরে, আমার ন্যাকা রে? —তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আর আমি যে বেড়াই চাঁদ পাতায় পাতায়।—তোর ভাগ্নী ম'লো কি কোন্ কুলের কে ম'লো, আমার তা'তে কি? সোজা আঙ্গুলে ঘি না ওঠে, দাঁড়াও, দিচ্ছি, তোমার নামে একখানা রুজু ক'রে।" বলিতে বলিতে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্যে তাঁহার মুখখানি বিশ্রী হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার পর সহসা তিনি খাতাপত্র বন্ধ করিয়া দলিল তোরঙ্গে তুলিলেন ও "তারা, তারা" বলিতে বলিতে উঠিয়া পড়িলেন। সশব্দে একটি হাই তুলিয়া আঙ্গুলে তুড়ি দিতে দিতে নিজের মনেই বলিলেন,—"যাই, বেটাদের আজ একবার তাগাদা দিয়ে

আসি; এই দুঃখেই ত' শুধু হাতে হ্যাণ্ডনোটে কাউকে টাকা দিতে চাই না।"

পরিধানে একখানি আটহাতি থান ধুতি, পায়ে চটিজুতা ও কাঁধের উপর একখানি চাদর—গাঙ্গুলী মহাশয় তাগাদায় যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। বাহিরের উঠানে আসিতেই সহসা প্রতিবেশিনী 'গেঁড়ির মা'র' আবির্ভাব হইল। "পাতঃ-পেন্নাম হই, বাবা" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই গাঙ্গুলী মহাশয় দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উপবীত ধারণ করিয়া বিশেষ এক ভঙ্গীতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

—"কি খবর গো, গেঁড়ির মা?"

—"আর বাবা, খবরের কথা আর শুধিয়ো নে; আ—আমার পোড়া কপাল, কথায় বলে, মেয়ে হ'লে জ্বালা, র'লে জ্বালা, ম'লে জ্বালা: তা' বাবা, শাস্তোরের নেকা কি আর মিথ্যে হয়? তবে বলি শোন, বাবা—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া গেঁড়ির মা চারিধারে চাহিতে লাগিল। তাহার অঞ্চলে কি যেন একটি দ্রব্য বাঁধা ছিল, গাঙ্গুলী মহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টিতে সেটুকু এড়ায় নাই। বৃদ্ধার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালনের ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া তিনি বলিলেন,—"ব'স না, ওই দাওয়ার ওপরেই ব'স।"

—"হ্যাঁ বাবা, তাই বসি,—বয়সও ত' হ'ল বাবাঠাকুর, আর বেশী দাঁড়াতে পারিনে।"

চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ার এক পার্শ্বে নিজের স্থানটুকু করিয়া লইয়া, বিবিধ গ্রাম্য প্রবাদ ও ছড়া সহযোগে বৃদ্ধা সবিস্তারে কন্যা "গেঁড়ি" ওরফে 'গরবীর" যে কাহিনী বলিয়া গেল, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, গত বৎসর বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরবাড়ীতে তাহার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবধি নাই; "বৌ-কাঁটকি" শাশুড়ী ও ননদীর নিকট তাহার নির্য্যাতন সম-ভাবেই চলিতেছে। কন্যা অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, তাহাকে যেন পৌষের তত্ত্ব একটু ভাল করিয়া করা হয়, না হইলে শ্বশুরবাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইবে, ইত্যাদি।

কন্যার নির্য্যাতন-কাহিনীর বিশদ বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেগে বৃদ্ধার কণ্ঠ রুদ্ধ ও নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

গাঙ্গুলী মহাশয় তাহাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—"কি আর করবে বল, গেঁড়ির মা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ত' কা'রও আয়ত্তের মধ্যে নয়, যা ভাগ্যে আছে, তা হবেই। তুমি ত' ভাল ঘর ভেবেই দিয়েছিলে, তার পর এখন—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়াই বৃদ্ধা বলিল,—"তাই ভাবলাম, যাই বাবাঠাকুরের কাছে, পাতঃকালে বেরাম্ভণের ছিচরণ দর্শনও হবে, আর ক'টা ট্যাকার দরকার, তাও"—বলিতে বলিতে মধ্যপথে থামিয়া গিয়া নিজের বস্ত্রাঞ্চলের বন্ধন মুক্ত করিয়া দুইটি স্বর্ণবলয় বাহির করিয়া বলিতে লাগিল,—"এই ন্যাও বাবা, এই বালা দু'গাছি এত দুখ্খু-কষ্টের মধ্যেও এতদিন কাছ-ছাড়া করিনি; তা'ও আজ আবাগীর জন্যে,—অক্ষয়বটের পেরমাই নিয়ে আর ক'দিন যে বেঁচে থাকব বাবা, তাও জানিনে। এক কুড়ি ট্যাকা আমায় দিতে হবে, বাবাঠাকুর।"

পল্লীগ্রামে যাহারা বন্দকী কারবার করে, তাহাদের প্রায় সকলেরই গৃহে অলঙ্কার যাচাই করার জন্য কষ্টিপাথর ও ওজন করার জন্য নিক্তি থাকে। গাঙ্গুলী মহাশয়ের বেলাও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি নিজের শয়নকক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে বলয় দুইটি কষ্টি-পাথরে কষিয়া, নিক্তিতে ওজন করিয়া মনে মনে হিসাব করিতে করিতে টাকা হাতে বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"কুড়ি টাকা ত' এতে দেওয়া চলবে না, গেঁড়ির মা, এই পনেরোটা টাকা নাও।"

বৃদ্ধা যেন আকাশ হইতে পড়িল। "ও মা, বল কি গো বাবাঠাকুর? অমন ভারি বালা জোড়া—"

ব্রাহ্মণ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"ওই ত' তোমাদের দোষ বাছা, অমনি মনে করলে, গাঙ্গুলী মশাই বুঝি তোমাকে ঠকিয়ে নিলে;—খালি ওজনটাই দেখছ, এ দিকে যে পানমরুতা বাদ দিয়ে ওর অর্দ্ধেক চ'লে যায়, সে ত' বোঝ না—"

—"না না বাবাঠাকুর, তা' বলছিনে; অমন কথা কি দেবতাকে বলিতে পারি?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধা যুক্তকর কপালে ঠেকাইল।—"কিছু মনে নিও নি বাবা, আমরা মুরুক্ষু সুরুক্ষু মেয়েমানুষ, হিসেবপত্তর অত কি আর বুঝি? তা' ন্যাও বাবা, পনেরটা ট্যাকাই দাও, আর কি হবে।"

বৃদ্ধা টাকা লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে গাঙ্গুলী মহাশয়ের শীর্ণ অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যের বিজলী খেলিয়া গেল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এটুকু তাঁহার নিকট অরুণালোকের মত স্পষ্ট ও মৃত্যুর মতই নিশ্চিত যে, এ বলয় বৃদ্ধা কখনও উদ্ধার করিতে পারিবে না। ইতিপূর্ব্বে গ্রামবাসী কত লোকের কত অলঙ্কারই তাঁহার সিন্দুকজাত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের আর প্রত্যর্পণ করিতে হয় নাই। দুরবস্থার প্রান্তসীমায় পৌছিয়া অনন্যোপায় প্রতিবেশীরা অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ কর্জ্জ লইত ; কিন্তু পরে চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যখন সুদে আসলে উহা বেশ মোটা অঙ্কে দাঁড়াইত, তখন তাহারা সে অলঙ্কার ফিরিয়া পাইবার কথা মুখে আনিতেও আর সাহস করিত না!

গাঙ্গুলী মহাশয়ের আদি বাসস্থান যে কোন্ দেশে, দরিয়া-পুরের কোন লোকই সে কথা জানিত না। পনেরো ষোলো বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই গ্রামে একাকী আসিয়া প্রথম বসবাস করেন। দেশের লোকের ক্রিয়াকর্ম্মে ভাল পুরোহিতের বিশেষ অভাব ছিল, সুতরাং তাহারা এই শাস্ত্র-অভিজ্ঞ, নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া বাঁচিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে আশপাশের তিন-চারিখানি গ্রামে তাঁহার বহু ঘর যজমান বাঁধা হইয়া গেল।

প্রথম প্রথম তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনবৃত্তান্ত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া কেহ তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি এরূপ সুকৌশলে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিতেন যে, তাহারা আপনাদের প্রশ্ন ভুলিয়া যাইত। গ্রামে বহুকাল একাদি-ক্রমে বাস করার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে ইদানীং তাঁহার যথেষ্ট প্রসার-প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং তিনি যে ভিন্ন দেশা-গত বিদেশী ব্যক্তি, দরিয়াপুরের লোকরা সে কথা প্রায়ভুলিয়া যাইতেই বসিয়াছিল। এই প্রতিপত্তির একটি কারণও ছিল। পৌরোহিত্য করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের যখন বেশ দু'পয়সা রোজগার হইল, তখন তিনি ক্রমে বন্ধকী কারবার সুরু করিলেন। গ্রামবাসী অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ; আর্থিক অনটন হইলেই তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হইতে হইত, এবং তিনিও অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া উচ্চহারে সুদ লইয়া তাহাদিগকে অর্থ কর্জ্জ দিতেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা সে বন্ধকী দ্রব্য আর উদ্ধার করিতে পারিত না। ফলতঃ, মহাজন ও খাতকের সম্বন্ধে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। তাহারা ব্রাহ্মণের অসাক্ষাতে তাঁহার বাপন্ত করিত, কিন্তু সাক্ষাতে তাঁহাকে তোষামোদ করিতে বিরত হইত না। নবীনা-প্রবীণা-নির্ব্বিশেষে স্নানার্থিনী গ্রাম্য নারীদের নদীর ঘাটে যখন বৈঠক বসিত, তখন পরমোৎসাহে এই "চশমখোর, হাড়কিপটে বুড়োবামুন কোন্ ভাগ্যবানের জন্য এই যক্ষির ধন সঞ্চয় করিতেছে," সে বিষয়ে বিবিধ টীকা-টিপ্পনী সহযোগে গভীর আলোচনা হইত; সঞ্চিত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টাও হইত কম নহে। কেহ বলিত,—"তা হবে বৈ কি, বুড়ো না খেয়ে না প'রে এত কাল ধ'রে খালি জমাচ্ছে ত'? তা' বেশ দু'পয়সা করেছে নিশ্চয়।—মা গো মা, বুড়ো পৃথিবীতে কি পয়সাই চিনেছিল গো? তেলের খরচা বাঁচাবার জন্যে রাত্তিরে আলো পর্য্যন্ত জ্বলে না।" আর এক জন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিত,—"তা' হবে বই কি, বামুন পিসী, যা ছিনেজোঁক্ ;—গরীব-দুঃখীর রক্ত শুষে, ভদ্রাসন-ছাড়া ক'রে, গাছতলায় দাঁড় করিয়ে, তবেই না ওর এত বোল্‌বোলা ; নেহাৎ নাকি বামুন—" বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া গিয়া, একটা নমস্কারের মত ভঙ্গী করিয়া, ছিন্ন সূত্রের জের টানিত,—"কিন্তু বড় দুঃখেই বলতে হয় পিসী,—হ্যাঁ কি না বল?" যাহাদের গৃহে অর্থাভাব নিবন্ধন অবিলম্বে গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট ঋণ-গ্রহণের সম্ভাবনা আসন্ন, তাহারা এরূপ শ্রুতিসুখকর মনোহারী আলোচনায় যোগদান করার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আবক্ষজলে দাঁড়াইয়া মুদিতনেত্রে সূর্য্যস্তব করিতে থাকিত ও সহসা "কায কি দিদি, আমাদের ও সব পরের কথায় থেকে ; কথায় বলে, দেয়ালেরও কাণ আছে," ইত্যাকার মন্তব্য করিতে করিতে জল হইতে উঠিয়া পড়িত।

গাঙ্গুলীমহাশয় সম্বন্ধে গ্রামের যুবকদেরও ধারণা বিশেষ উন্নত ধরণের ছিল না। স্থানীয় ক্লাবের প্রাত্যহিক সান্ধ্য সম্মিলনীতে তাঁহার বিষয়ে নানারূপ হাস্য-পরিহাস করিয়া তাহারা অনেক সময়ে তাহাদের অবসর-বিনোদন করিত। কেহ তাঁহার নামকরণ করিত—"আধুনিক শাইলক," কেহ তাঁহার হৃদয়ানুভূতিশূন্যতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া গীত রচনা করিয়া যথেষ্ট বাহাদুরী লইত। এইরূপ নব নব কৌতুক আবিষ্কারের সঙ্গে প্রচুর হাস্য-কোলাহলে ক্লাবগৃহটি মুখর

হইয়া উঠিত। গাঙ্গুলীমহাশয় সম্বন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধ আলোচনার মূলে একটি হেতুও ছিল। যুবকরা তাহাদের কোন বিশেষ সম্মিলনী অথবা প্রমোদানুষ্ঠান উপলক্ষে ইতিপূর্ব্বে বহুবার তাঁহার নিকট চাঁদা চাহিতে গিয়া কখনও সফলকাম হয় নাই।

কিন্তু দেশবাসী জনসাধারণের নিকট গাঙ্গুলীমহাশয় যতই অপ্রিয় হউন, দেশীয় জমীদারবংশ ও বহু পদস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সে জন্য তাঁহার অসাক্ষাতে যে যাহাই বলুক, সাক্ষাতে কেহই তাঁহাকে কোনরূপ অসম্মান করিতে সাহস করিত না। গাঙ্গুলীমহাশয়ও যে সে কথা বুঝিতেন না, তাহা নহে। এমন কি, তাঁহার সাক্ষাতে যাহারা সাড়ম্বরে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিত, চক্ষুর অন্তরাল হইলেই যে আবার তাহারাই তাঁহার মস্তক চর্ব্বণ করিত, সে কথাও তাঁহার অগোচর ছিল না। বলিতে কি, মানব-চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া তিনি বেশ কৌতুকই অনুভব করিতেন!

দরিয়াপুরের দক্ষিণদিক ঘেঁসিয়া, হলুদী নদীর পাশে পাশে পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বালম্বি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ধূলিধূসরিত পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে। সে দিন বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে নিষ্পাদপ উন্মুক্ত সেই পথে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল। বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম মনোহরপুরে তাঁহায় যজমানবাটী হইতে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সেই পথ ধরিয়া ফিরিতেছিলেন। গায়ে তাঁহার নামাবলী, এক হস্তে ছাতা ধরিয়াছেন, অপর হস্তে গামছায় বাঁধা নৈবেদ্যাদি। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া তাঁহার প্রাণ যেন তখন কণ্ঠাগত হইয়াছে, কণ্ঠতালু শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছে; চিরবাধ্য পদযুগল আজ বুঝি বিদ্রোহ করিতে চাহে। এক পা করিয়া চলেন আর অবশিষ্ট পথের হিসাব করেন। কুটীরে ফিরিয়া স্নিগ্ধ সুশীতল জল আকণ্ঠ পান করিয়া ক্লান্ত শরীরটাকে শয্যায় এলাইয়া দিতে না পারিলে প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না। ব্রাহ্মণ চলিতে চলিতে ভাবেন, বৃদ্ধবয়সে এই জরাগ্রস্ত শরীরের উপর আর কেন এই নিদারুণ অত্যাচার,—বিশেষ জীবিকার সংস্থান যখন আছে, যজমানদের ত বুঝাইয়া বলিলেই হয়,—"আমি অক্ষম বৃদ্ধ, এবার আমায় তোমরা নিষ্কৃতি দাও।" অন্যমনে চলিতে চলিতে তিনি কালভৈরবের মন্দির ও গ্রাম্য পাঠশালা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিলেন। পুলিস-ফাঁড়ি বামে রাখিয়া "দরিয়াপুর নিস্তারিণী দাতব্য চিকিৎসালয়ের" নিকট আসিতেই তাঁহার বাহ্যচেতনা ফিরিয়া আসিল। সেই চিকিৎসালয়ের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল কি যেন ভাবিলেন। কোন্ বিগত দিনের অর্দ্ধবিস্মৃত কাহিনী সহসা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, কে জানে, কিন্তু কেহ সে সময়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, সহসা তাঁহার মন্থরগতি দ্রুততর হইয়াছে। মুমূর্ষু রোগী যেমন উত্তেজক ঔষধ সেবনে সচেতন হইয়া উঠে, গাঙ্গুলী মহাশয়ও অকস্মাৎ যেন কিসের উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; শারীরিক সমস্ত অবসাদ ও দৌর্ব্বল্যকে যেন তিনি নবার্জ্জিত মানসিক শক্তিতে পরাভূত করিয়াছেন। সম্মুখের পথটুকু দ্রুতপদে চলিয়া অল্পকালমধ্যেই বাজারের নিকট আসিয়া মোড় ঘুরিতেই রমেশ চক্কোত্তি কোথা হইতে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হঠাৎ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। লোকটির বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশী হইবে না, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে জীবনযুদ্ধে শ্রান্ত। তাহার দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশ, রক্তবর্ণ চক্ষু ও রুক্ষ শ্রীহীন মূর্ত্তিতে স্বতঃই ব্যক্ত হইতেছে, কি উদ্দাম ঝঞ্ঝাসঙ্কুল আবেষ্টনে নিশ্বাসগ্রহণ করিয়া লোকটি টিকিয়া আছে। অতি কাতরভাবে অশ্রুসিক্ত-নয়নে সে বলিতে লাগিল,—"গাঙ্গুলী কাকা, আজ সকাল থেকে আপনার খোঁজে ঘরবার করছি; বিশেষ দরকার আপনাকে, তাই—"

গাঙ্গুলী মহাশয় তাহার অনর্গল বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সে তাঁহাকে সে অবসরটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া বলিয়া চলিল,—"বাড়ীতে আমার বড় বিপদ কাকা; আপনি পিতৃতুল্য, এ অসময়ে আপনার আশীর্ব্বাদ আর উপদেশ—" বলিতে বলিতে লোকটি উচ্ছ্বসিত ভাবাতিশয্যে রুদ্ধবাক্ হইয়া বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণের আর সংযম রক্ষা করা সম্ভব হইল না। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর মধ্যপথে এ কি উৎপাত! হইলই বা সে বন্ধুপুত্র, হইলই বা প্রতিবেশী! তাই বলিয়া সাংসারিক দুঃখের সুদীর্ঘ বিবরণ ভূমিকাসহযোগে দীর্ঘতর করিয়া সালঙ্কারে বর্ণনা করিবার ইহাই কি

উপযুক্ত সময়? স্থানকালের একটা বিবেচনা নাই? এরূপ অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া এই গ্রামে তাঁহার কুড়ি বৎসরের উপর অতিবাহিত হইল। তিনি রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার কি দয়ামায়া ব'লে একটা জিনিষ নেই, রমেশ? পাক্কা এক ক্রোশ পথ এই কাঠফাটা রোদ্দুরে, বুড়োমানুষ হেঁটে আস্‌ছি,—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—আর তুমি কি না আমার পথ আগ্‌লে তোমার দুঃখের কাহিনীর গৌর-চন্দ্রিকা সুরু করলে?—ব্যাপার ত' যেটুকু বুঝছি, টাকা ধার চাই; টাকার দরকার না হ'লে ত' আর কেউ এ বুড়ো বামুনের কাছে আত্মীয়তা দেখাতে আসে না; তা বাপু—"

ছেলেটি বাধা দিয়া অনুতপ্তস্বরে বলিল,—"আমার অপরাধ ক্ষমা করুন,—গাঙ্গুলীকাকা; নিদারুণ বিপদে আমার হিতাহিতজ্ঞান নেই। আপনার বৌমা পূর্ণ-অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কাল সন্ধ্যা থেকে অসহ্য প্রসব-বেদনায় সে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে; পাড়ার মেয়েরা সব দেখাশোনা করছে, তাই রক্ষে;—কি যে করি, একলা মানুষ—আর্থিক অবস্থাও—"

—"কি বল্‌লে? অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন?···কাল সন্ধ্যা থেকে?"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের দৃষ্টিতে কি-রহস্য ছিল, কে জানে, রমেশ সে-দিকে একবার চাহিয়াই মাথা নত করিল।

—"কিছু মনে ক'র না রমেশ; সত্যিই তুমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, মূর্খ—কই, এ কথা তুমি আগে জানাও নি আমাকে? তোমার বাড়ী থেকে আমার বাড়ী কিছু আট-দশ ক্রোশ তফাতেও নয়। ডাক্তার-ধাই কিছু দেখিয়েছ?"

রমেশ মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল,—"আজ্ঞে না, বিনা পয়সায় কে আর—"

বিরক্তিতে ব্রাহ্মণের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। "ধুত্তোর পয়সা, তুমি কালই সন্ধ্যায় যাও নি কেন আমার কাছে? কিছু মতলব আছে?—বৌটাকে মেরে ফেলে আবার নতুন ক'রে বিয়ে করতে চাও?"

অন্য সময় হইলে এরূপ নিষ্ঠুর বিদ্রূপের সে প্রতিবাদ করিত নিশ্চয়। তা' হউন না কেন উনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিয়া ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টিতে সে ভাবিতে লাগিল, কি লইয়া সে তাঁহার দ্বারস্থ হইবে? বন্ধক দিবার মত যাহাও বা দুই একটা জিনিষ ছিল, সে সব ত' বহুদিন পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের কবলে গিয়াছে; সম্ভবতঃ এত দিনে বিক্রীতও হইয়া গিয়া থাকিবে হয় ত'। বন্ধুপুত্র বলিয়া কোন অনুগ্রহ তাঁহার কাছে আশা করা যে কত বড় দুরাশা, সে কথা তাহার মত কে আর জানে?

সহসা স্কন্ধের উপর গাঙ্গুলী মহাশয়ের সস্নেহ করস্পর্শে রমেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। বিমূঢ়ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিতেই তিনি অতি স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন,—"কিছু মনে ক'র না বাবা রমেশ; বুড়ো মানুষ, মেজাজ ঠিক ছিল না, দুটো কড়া কথা ক'য়ে ফেলেছি, অর্থের জন্যে তুমি ভেবো না; সে ভার আমার ওপর রইল। মানুষের এ বিপদের কাছে অন্য সব বিপদ তুচ্ছ ব'লে অন্ততঃ আমি মনে করি। সন্তান-অভিলাষিণী আসন্নপ্রসবা নারীর প্রাণ যেন-তেন প্রকারে রক্ষা করা চাই, বাবা।"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"সাহস হারিও না; মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন, তাঁর ওপর অবিচলিত বিশ্বাস রেখে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও ধাত্রীর শরণাপন্ন হও; বৌমার সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রেখো। তার পর এ বুড়ো পুজোরী সুদখোর বামুনের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যা আছে—" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

নিজের চক্ষুকর্ণের উপর রমেশের অবিশ্বাস জন্মিয়া গেল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? আকৃতি-প্রকৃতিতে একটা মানুষের মুহূর্ত্তে কি এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব? অথবা বৃদ্ধ তাহার দুঃসময়ে উপহাস করিতেছেন? কিন্তু না, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাবকঠিন দৃষ্টিতে ঐ অপূর্ব্ব কোমলতা আসিল কোথা হইতে? কোথা হইতে আসিল তাঁহার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বরে ঐ সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্পর্শ?

—"যাও বাবা," গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "এখানে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থেকে এখন আর সময় নষ্ট ক'র না। বৌমা এতক্ষণ কত কষ্ট পাচ্ছেন; এখন তুমি তাঁর কাছছাড়া হয়ো না, বাবা।—পাড়ার কোন ছেলেকে তাড়াতাড়ি ভাল নামকরা এক জন ডাক্তার আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।—আর এই নাও, একটা টাকা দক্ষিণে পেয়েছিলাম, এখন তোমার কাছে রাখ; আমি এখুনি বাড়ী থেকে

একবারটি হয়েই ভগবতী ডাক্তারকে সঙ্গে ক'রে তোমার কাছে আসছি।"

রমেশ যন্ত্রচালিতের মত গৃহাভিমুখে চলিল; কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা সে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হয়, সমস্ত গ্রামবাসীকে ডাকিয়া আনিয়া বলে,—"ওরে ভ্রান্তের দল, দেখিয়া যা, তোরা যাহাকে এত দিন অর্থপিশাচ বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিস্, কত মহৎ সে। পিশাচ সে নয়,—সে দেবতা।"

কিন্তু শুধু সে নয়, গ্রামের সকলেই সেবার গাঙ্গুলী মহাশয়ের সেবাপরায়ণতা দেখিয়া প্রথমে বিস্ময়ে নির্ব্বাক ও পরে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া রমেশের বহিঃকক্ষে পড়িয়া রহিলেন। চিরাচরিত কার্পণ্য ভুলিয়া অকাতরে অর্থ-ব্যয় করা, চিকিৎসক বা ধাত্রীর বন্দোবস্ত করা, ঔষধ ক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত কার্য্যের ভার স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন।

অবশেষে সেই দিন সন্ধ্যাগমের সঙ্গেই অন্দর হইতে পুরনারীদের আনন্দকোলাহল ও ঘন ঘন শঙ্খরবে যখন রমেশের পুত্রের নিরাপদ জন্ম ঘোষিত হইল, তখন গাঙ্গুলী মহাশয় বারংবার "তারা ইচ্ছাময়ী মা" বলিয়া জগন্মাতার উদ্দেশে প্রণতি জানাইতে জানাইতে স্বগৃহে গমন করিলেন।

রমেশের পুত্রলাভের পর দেখিতে দেখিতে চার পাঁচ মাস গত হইল। এমন সুস্থ সবল শিশু পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ বাঙ্গালীর ঘরে কচিৎ দেখা যায়। গায়ের রঙ ফাটিয়া পড়িতেছে,—হাসিলে যেন মুক্তা ঝরে। হউক বিত্তহীন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশুকেই কেন্দ্র করিয়া, পিতামাতা কল্পনার তুলিতে কত নয়নমোহন আকাশকুসুমই রচনা করে। কি নাম তাহার হইবে, সে সমস্যার সমাধান অনেক কষ্টে হইয়াছে। গাঙ্গুলী মহাশয়ই তাহার নামকরণ করিয়া দিয়াছেন,—"অরুণকুমার"। ইহা লইয়া রমেশ সে দিন রহস্য করিয়া ঊর্ম্মিলাকে বলিয়াছিল,—এত নাম থাকতে উনি এই নাম রাখলেন কেন জান? সূর্য্যের কিরণে পদ্ম জাগে কি না? খোকার জন্মের ব্যাপারে তেমনি যেন ওঁরও জাগরণ হয়েছে, এই ভাব আর কি—ওঁর নাম পদ্ম, আর অরুণ মানে হচ্ছে সূর্য্য।"

ঊর্ম্মিলা সস্মিতমুখে বলিল,—"হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা! না গো না, আমার কিন্তু মনে হয়, ও মানুষটিকে তোমরা কেউ ঠিক চিনতে পার নি। লোকটিকে তোমরা বাইরে থেকে বিচার ক'রে যতটা রুক্ষ স্বভাবের ঠাওরাও, উনি বোধ হয় ঠিক তা' নয়।" মোটের উপর তাহাদের উভয়ের মনের নিভৃতে গাঙ্গুলী মহাশয় পরম শ্রদ্ধার একটি আসন পাইয়াছেন।

এই শ্রদ্ধার আরও একটি কারণ সম্প্রতি ঘটিয়াছে। গ্রামের জমীদারকে বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় জমীদারী সেরেস্তায় রমেশের একটি চাকরী জুটাইয়া দিয়াছেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রতি ঊর্ম্মিলা তাহার অন্তরের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা যে কিরূপে প্রকাশ করিবে, বুঝিতে পারে না। বহুনিন্দিত নিঃসম্পর্ক সেই বৃদ্ধ কি গভীর স্নেহের দৃষ্টিতেই যে তাহাদিগকে দেখিয়াছেন! ঊর্ম্মিলা তাহার নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, রমেশের সঙ্গে যে দিন সেই বৃদ্ধকে প্রথম নমস্কার করিতে গিয়াছিল, সে দিন তাঁহার সেই বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল কি মধুর হাস্যেই যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল! তিনি তাঁহার দুই অনভ্যস্ত হস্ত প্রসারিত করিয়া সাগ্রহে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বনে চুম্বনে শিশুর কোমল গণ্ড রক্তিমাভ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত ঊর্ম্মিলা পূর্ব্বে কখনও কথা কহে নাই। কিন্তু শিশুর আবির্ভাবের পর হইতে এই পিতৃতুল্য স্নেহশীল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত ক্রমে অনাত্মীয়তার সকল সঙ্কোচ কাটিয়া যাওয়ায় এখন স্বচ্ছন্দে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে তাহার কোন দ্বিধা নাই।

কিন্তু এ কয় দিন তাহাদের সময় বড়ই উদ্বেগের মধ্য দিয়া কাটিতেছে। আজ পাঁচ ছয় দিন হইল, ব্রাহ্মণ প্রবল জ্বরে শয্যাগত হইয়া আছেন। জমীদার নরেন্দ্রনারায়ণের বয়স হইয়াছে, তথাপি তিনি নিজে চিকিৎসক সহ প্রত্যহ একবার করিয়া আসিয়া কুল-পুরোহিতকে দেখিয়া যান। ডাক্তার সে দিন গম্ভীরমুখে বলিয়াছেন, ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগায় বুকে সর্দ্দি জমিয়াছে; ভয়ের কারণ যে নাই, এ কথা বলা যায় না। খুব ভাল করিয়া সেবার দরকার। ঊর্ম্মিলা ও রমেশ সানন্দে এই সেবার ভার লইয়াছে।

সে দিন মধ্যরাত্রি হইতেই রোগীর অবস্থা অনেকটা ভাল,—জ্বর নাই বলিলেই চলে। সকালে যখন জমীদার ও

চিকিৎসক আসিলেন, রোগীর নিকট তখন রমেশ ও উর্ম্মিলা দু'জনেই ছিল। শিশু অরুণ সেই গৃহেরই এক কোণে হাত-পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছিল, আর তক্তাপোষের উপর হইতে সস্নেহ দৃষ্টিতে সেই শিশুর চাপল্য দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের রোগশীর্ণ মুখেও ক্ষীণ হাসি ফুটিতেছিল। তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিতেই ব্রাহ্মণ আজ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"আসুন, আসুন, বসুন; আমি আজ অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি—"

ডাক্তারবাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"থাক্, থাক্, আপনি ব্যস্ত হবেন না;—আমরা বসছি।"

রমেশ তাড়াতাড়ি দুইখানা ভাঙ্গা চেয়ার তাঁহাদের দিকে টানিয়া দিল। ডাক্তারবাবু বসিয়া বলিলেন,—"তার পর? —আজ ত' আপনাকে বেশ ভালই দেখছি—"

বৃদ্ধ তাঁহার কথার সঙ্গেই বলিলেন,—"হ্যাঁ, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতন আর কি;" বলিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

জমীদার নরেন্দ্রনারায়ণ সাহস দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, —"আপনার মত প্রবীণ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণের মুখে এ সব কি কথা, গাঙ্গুলী মশাই? অসুখ কার না হয়? কিন্তু—"

রোগী কি বলিতে যাইতেছেন দেখিয়া ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন,—"থাক্, থাক্, আপনি এখন অত কথা কইবেন না।"

"আজ আপনাদের একটু অবাধ্য হব, ডাক্তার বাবু;—কারণ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আজ মন হাল্‌কা ক'রে আপনাদের কাছে সমস্ত কথা খুলে না বললে, এর পর আর বলবার অবসর হবে না। ওপারের ডাক এসে গেছে, আমি শুনতে পাচ্ছি যে, আর সে যে আমার জন্যে কত দিন অপেক্ষা ক'রে আছে, আর দেরী করা কি চলে?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"বৌমা,—"

অবগুণ্ঠিতা উর্ম্মিলা সেই গৃহেরই এক কোণে শিশুর নিকট জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল; আহ্বান শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। বৃদ্ধ শয্যার এক অংশ ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এরই নীচে একখানা ফটো আছে, দাও ত মা আমাকে।"

উর্ম্মিলা শয্যাতল হইতে একটি সুবেশা অষ্টাদশী তরুণীর ছবি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া স্বস্থানে গিয়া বসিল।

বৃদ্ধ সেটি হাতে লইয়া সস্মিত মুখে বলিলেন,—"বৌমা বোধ হয় ছবি দেখে অবাক হয়ে গেছেন, বুড়োর বিছানার নীচে এ আবার কার ছবি? এবার আপনাদের পালা; আপনারাও দেখুন। রমেশ, তুমিও দেখ বাবা।" বলিয়া বৃদ্ধ সকৌতুকে ছবিখানি সকলের দিকে আগাইয়া দিলেন।

ছবি দেখা হইলে সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি সহাস্যে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন,—"ওটি আমার পরলোকগতা স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর ছবি। তাঁরই বিষয়ে আজ আপনাদের সংক্ষেপে কিছু বল্‌তে চাই। সে আজ অনেক দিনের কথা হয়ে গেল; প্রায় দুটি দীর্ঘ দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর, একটি পুত্রসন্তান প্রসব ক'রে সে মারা গেল; অথচ মরতে সে কিছুতেই চায় নি। বাঁচবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত আর্ত্তকণ্ঠে কি তার কাতর আকুতি! সেই দিন বুঝলাম, দারিদ্র্য এ সংসারে কত বড় পাপ! পয়সার অভাবে ভাল চিকিৎসকও এক জন আনতে পারিনি, এ যে কি আপশোষ—" বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"সে যে কি অসহায় অবস্থা, বাবা রমেশ, তুমি কতকটা বোধ হয় বুঝে থাকবে। তার পর সেই মাতৃহীন শিশুকে লালন করবার প্রাণপণ চেষ্টা,—সেও ব্যর্থ হ'ল; বিন্দুর চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত রইল না।" বৃদ্ধের গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ডাক্তারবাবুর নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তিনি বলিয়া চলিলেন,—"কোন কুলে কেউ বড় ছিল না—এই দুর্ঘটনার পর স্বগ্রাম ত্যাগ ক'রে এই দরিয়াপুরে আপনাদের মধ্যে এসে পড়লাম।"

এই সময়ে বহুকণ্ঠের কলগুঞ্জন শুনিয়া বৃদ্ধ বুঝিলেন, গ্রামের আরও অনেকে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।

তিনি আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"সকলে এসেছ তোমরা বাবা, ভালই হয়েছে,—সকলেই শোন। আর ঝাঁ ক'রে গিয়ে একজন বাবা, ও-পাড়া থেকে রমাকান্ত বাবুকে ডেকে নিয়ে এস ত'।—হ্যাঁ, নরেন্দ্র বাবু, তার পর শুনুন।—চিকিৎসার অভাবে বিন্দুর সেই অসহায় মৃত্যুর কথা আমি ভুলতে পারি নি। সেই দিন থেকে আমার প্রতিজ্ঞা,—যেমন ক'রে হোক্, আমার স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশে একটি দাতব্য মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করব। তারই সাধনায় সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির চিন্তায় আমি আমার জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটি মুহূর্ত্ত নিয়োজিত করেছি—সুনাম নষ্ট ক'রে দুর্নাম

কিনেছি। গ্রামবাসী অনেকের অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছি, শুধু সেই একটিমাত্র উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে।—মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিন্দুর বাঁচবার সেই আকুল অথচ নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমি দেশের সন্তানসম্ভবা দরিদ্রা নারীদের নির্ব্বাক্ আবেদন শুনতে পেয়েছি;—তারা সন্তানের জননী হয়ে বাঁচতে চায়, অচিকিৎসায় অথবা কুচিকিৎসায় তারা মরতে চায় না।" ভাবাবেগে ও ক্লান্তিতে ব্রাহ্মণ চুপ করিলেন।

তপ্ত রুক্ষ বালুচর যেখানে খাঁ খাঁ করিতেছিল, তাহার অন্তরে অগোচরে প্রবহমান অন্তঃসলিলা নদীর স্রোত আবিষ্কার করিয়া সকলে অপরিসীম বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়াছিল। বৃদ্ধ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন,—"রমেশ, একটু জল!"

জলপান করিয়া বৃদ্ধ একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট প্রধান উকীল রমাকান্ত বাবুকে দেখিয়া বলিলেন,—ও, আপনি এসেছেন দয়া ক'রে? আমি একবার বিশেষ দরকারে—বুঝতেই ত পারছেন? শেষ সময়—শুনছেন ত? শুনুন, আপনারা জানেন, আমার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, আপনাদেরই পাঁচ জনের বাড়ী ক্রিয়াকলাপে যা পেয়েছি, আর এই দরিয়াপুরেরই জনসাধারণের,—হ্যাঁ, সত্যই রক্তশোষণ ক'রে যা কিছু সঞ্চয় করেছি—সব,—মায় কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কের বই, নগদ টাকা, অলঙ্কার সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় হাজার পঁচিশেক হবে,—ঐ সিন্দুকে আছে।" বৃদ্ধ ট্যাঁক্ হইতে চাবি বাহির করিয়া বলিলেন,—"এই নিন তার চাবি নরেন্দ্রবাবু। সকলের সাক্ষাতে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় আমি বলছি, নরেন্দ্রবাবু, পুণ্যবতী মা'র নামে যে দরিয়াপুর নিস্তারিণী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তারই সংলগ্ন জমীতে প্রতিষ্ঠিত হবে বিন্দুবাসিনী দাতব্য মাতৃসদন;—খুব বৃহৎ একটা প্রতিষ্ঠান না হোক্, অন্ততঃ জনকতক প্রসূতির চিকিৎসাও ত হ'তে পারবে। আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমি দান করছি; মাতৃসদন প্রতিষ্ঠার পর যে অর্থ বাঁচবে, তারই সুদ থেকে সদনের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হবে। আর অভিজ্ঞ ধাত্রী একজন থাকবে, সে এই গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা রমণীদের আবশ্যকমত সযত্নে শুশ্রূষা করবে। আমি এই সব কাযের তত্ত্বাবধানের জন্য অছি নিযুক্ত ক'রে যাচ্ছি,—নরেন্দ্রবাবু, ডাক্তারবাবু আর রমেশকে। রমাকান্তবাবু, সেই মত একখানি উইলের জন্য যা' করবার দয়া ক'রে ক'রে ফেলুন। এ দিকে আবার আমার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে কি না!' বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়া চুপ করিলেন।

ইহার পর সকলের সম্মুখে সিন্দুকের চাবি খুলিয়া অর্থের হিসাব করিতে ও উইল প্রস্তুত সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে তাহাতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহি লইতে বেলা গড়াইয়া গেল। উহার মধ্যে সমবেত জনতার ভিতর হইতে কত লোক ঘরে ফিরিল, কত নূতন লোক আসিয়া যোগ দিল! দেখিতে দেখিতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের আসন্ন মৃত্যুর ও তাঁহার অপূর্ব্ব দানের কথা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

সমস্ত মধ্যাহ্ন বৃদ্ধ অবসন্ন-দেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। শুধু মাঝে মাঝে মৃদুকণ্ঠে প্রলাপ বকেন,—"যাচ্ছি, যাচ্ছি বিন্দু, হয়ে গেছে, ব্রত পালন করেছি,—এই যে—"

উর্ম্মিলা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ দমন করিতে গিয়া কেবল ফোঁপাইতেছে আর চোখ মুছিতেছে,—যেন কোন পরম স্নেহশীল নিকটতম আত্মীয়কে সে হারাইতে বসিয়াছে! রমেশও দুঃখে ম্রিয়মাণ। তাহাদের দেখা দেখি অপর সকলের চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অপরাহ্ণে সূর্য্য পশ্চিম-গগনে হেলিয়া পড়ার সঙ্গেই বৃদ্ধ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নরেন্দ্রবাবুর নিজের তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধের শবদেহ বিরাট শোভাযাত্রা-সহযোগে শ্মশানে নীত হইলে নির্ব্বান্ধব, নিরাত্মীয়, চিরকৃপণ, সেই ব্রাহ্মণের শেষ দর্শনকামনায় সমস্ত দরিয়াপুরবাসী সেই শ্মশানে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

আটলাণ্টিক দ্বীপপুঞ্জ

আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের বক্ষে যে সকল দ্বীপপুঞ্জ বিদ্যমান, তন্মধ্যে "আজোরস্" দ্বীপপুঞ্জই সুপ্রসিদ্ধ। য়ুরোপ মহাদেশ হইতে উহাদের দূরত্ব এক হাজার মাইল, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে এক হাজার ৩ শত মাইল হইবে।

নিউইয়র্ক হইতে ষ্টীমারযোগে সাড়ে ৫ দিনে আজোরস্ দ্বীপপুঞ্জের প্রধান সহর পন্টা ডেল্গাডায় পৌছান যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগীজরা এই সকল দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। তদবধি পোর্ত্তুগীজরা এই সকল দ্বীপ শাসন করিয়া আসিতেছে। মাঝে ৬০ বৎসরের জন্য স্পানিয়ার্ডরা ঐ সকল দ্বীপে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল।

মাল পৌছাইয়া দিয়া গাড়ীগুলি কৃষিক্ষেত্রে ফিরিতেছে

উক্ত দ্বীপপুঞ্জ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমুদ্রবক্ষে জন্মগ্রহণ করে। ৩ শত ৭৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ঐ দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। তিনটি বিভিন্ন পংক্তিতে আজোরস্ দ্বীপপুঞ্জ বিভক্ত। কর্ভো দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্রতম। উহা উত্তরদিকে অবস্থিত। ফ্লোরেস্ দ্বীপ পশ্চিমভাগে বিদ্যমান। উহা যেমন রমণীয়, তেমনই সুজলা সুফলা।

দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে কেন্দ্রীয় দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। একটি দ্বীপের নাম ফ্যায়াল্। এইখানে তারযোগে বার্ত্তা প্রেরণের সামুদ্রিক ষ্টেশন। পিকো দ্বীপে প্রকাণ্ড ত্রিকোণাকার পর্ব্বত আছে। সাও জর্গ দ্বীপটি গৃহপালিত গো-মেষ প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার পনীর সুবিখ্যাত। গ্রাসিওসা দ্বীপে প্রচুর সুরা উৎপাদিত হয়। টার্সিরা দ্বীপ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

এই দ্বীপপুঞ্জের পর যে জলরাশি, তাহার পর আবার দ্বীপসমষ্টি। তন্মধ্যে সাও মিগুয়েল (বৃটিশ ও মার্কিণরা ইহাকে সেণ্ট মাইকেল বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ। ইহার প্রধান সহরের নাম পন্টা ডেল-গাডা। সাণ্টা মারিয়া দ্বীপটি উহার দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত।

পোর্ত্তুগীজ 'মেলবোট' লিস্বন হইতে মাসে দুইবার যাত্রা করিয়া থাকে। চারি দিনে ডাক লইয়া পোত পন্টা ডেলগাডায় পৌছে। একখানি পোত ফ্যায়াল হইয়া ফ্লোরেস্ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। ছোট কর্ভোদ্বীপে বৎসরে ৬ বার ডাক গিয়া থাকে। মোটর-চালিত জলযান এবং অন্যান্য অর্ণবপোতও গতায়াত করিয়া থাকে, তবে ঝটিকার সময় উহাদের গতায়াত বন্ধ থাকে।

ফলমূল ও যাত্রিজাহাজ পন্টা ডেলগাডা, লণ্ডন ও হ্যামবার্গে গতায়াত করিয়া থাকে। তবে মাসে দুইবারের বেশী নহে,

ইটালীয়, ফরাসী এবং গ্রীক্ জাহাজ সমূহও পন্টা ডেলগাডা ও হরটা বন্দরে ধরে।

উল্লিখিত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা আড়াই লক্ষ। দ্বীপে যে শস্য উৎপাদিত হয়, তাহাতেই দ্বীপবাসীদিগের সকল অভাব দূর করিয়া থাকে। নানাবিধ শস্য, ফলমূল, দুগ্ধ, মাংস, মাখন, পনীর, ডিম্ব সবই দ্বীপসমূহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিট্ হইতে তাহারা চিনি প্রস্তুত করে। মিঠা আলু হইতে স্পিরিট এবং আঙ্গুর হইতে সুরা তাহারা আপনারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। তামাক ও চা এই সকল দ্বীপেই উৎপন্ন হয়। সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া দ্বীপবাসীরা আপনাদের অভাব পূর্ণ করে। এক কথায় প্রয়োজনীয় আহার্য্যাদির জন্য তাহারা অন্য দেশের উপর নির্ভর করে না।

অগ্ন্যুৎপাত হইতে যে সকল পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহার সাহায্যে দ্বীপবাসীরা বড় বড় বাড়ী তৈয়ার করিয়া থাকে। অরণ্যে প্রচুর কাষ্ঠ পাওয়া যায়। তাহা হইতে আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়। ভেড়ার লোম হইতে তাহারা গরম পোষাক প্রস্তুত করে। বিলাসোপকরণ পোর্ত্তুগাল হইতে আইসে। যদি কোনও জাহাজ বিলাসোপকরণ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জে না আইসে, তাহাতে আজোরিয়ান্দিগের কোনও ক্ষতি নাই। উহারা অনায়াসে ঐ সকল দ্রব্যের অভাবে সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিবে।

পন্টা ডেলগাডার অধিবাসীরা "সান্ট্ ক্রিস্ট" মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে। প্রায় ৪ শত বৎসর ধরিয়া এই মূর্ত্তির উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। বহু মূল্যবান্ প্রস্তরে এই মূর্ত্তির অঙ্গ সুশোভিত। উৎসবের দিন (উৎসব কোন এক বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ হয়) ক্ষেত্রপালগণ ৫০টি গৃহপালিত পশু বলি দিবার জন্য লইয়া আইসে। উৎসৃষ্ট পশুর মাংস দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উৎসব
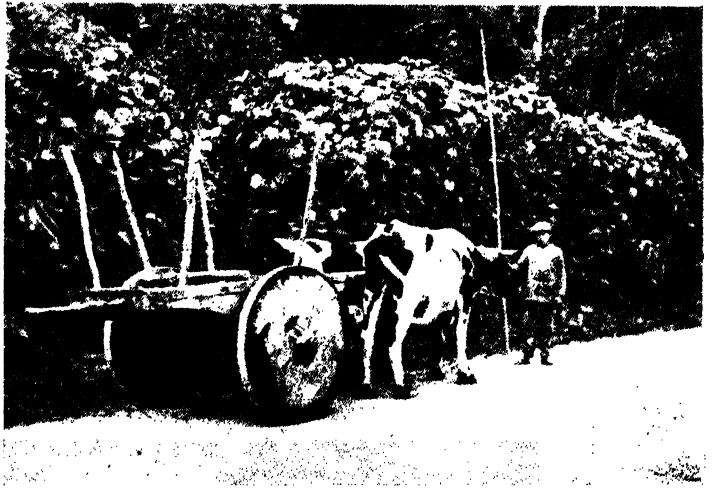
দেশীয়গণের নৃত্য

আজোরের গরুর গাড়ী

উপলক্ষে হাউইবাজি দিবাভাগেও আকাশপথে উত্থিত হয়। নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উৎসবকে মুখর করিয়া তুলে।

উৎসবের আরম্ভের পর যে শনিবার আসে, সেই দিন মন্দির হইতে মূর্ত্তিকে শোভাযাত্রাসহ ইস্‌পেরাঙ্কা গির্জ্জার বাহির করিয়া সহরের মধ্যে ঘুরাইয়া পুনরায় ঐ মঠে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার সঙ্গে পাদরী এবং জনসাধারণ থাকে। উচ্চশ্রেণীর নর-নারী, চাষী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সকলেই নির্ব্বিচারে এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। দেশীয় বেশভূষাও অনেকে পরিধান করিয়া থাকে। নারীরা মাথার উপর একপ্রকার অবগুণ্ঠন ধারণ করে। তাহার আকার অনেকটা কয়লার বাজরার মত। ঐ প্রকার অবগুণ্ঠন ধারিণী নারীরা পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইলে যখন কথাবার্ত্তা কহে, দূর হইতে শুধু হস্তভঙ্গী ব্যতীত আর কিছুই বুঝা যায় না। এই জাতীয় পরিচ্ছদ ও অবগুণ্ঠন ফ্লাণ্ডার্স হইতে আমদানী হইয়াছিল। আজোর-বাসীদিগের বিশ্বাস, স্পেন যখন এই সকল দ্বীপ শাসন করিয়াছিল, সেই সময় ঐরূপ পরিচ্ছদের প্রবর্ত্তন হয়। অন্যের দৃষ্টিপথ হইতে আপনাকে গোপন করিবার জন্য নারীরা ঐ প্রকার অবগুণ্ঠনে আবৃত হইত।

আনারসের চাষ

পন্‌টা ডেলগাডার শিক্ষিত কুকুর

পোর্ত্তুগীজরা যখন দ্বীপপুঞ্জের ভাগ্যবিধাতা হয়, তখন পোর্ত্তুগীজ রাজা বৈদেশিক প্রভাব হইতে দ্বীপবাসীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য আদেশ জারী করেন যে, ঐরূপ অবগুণ্ঠনে যে সকল নারী দেহ আবৃত করিবে, তাহাদিগকে জরিমানা দিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে, সেই নারীকে হয় কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত,

মঠে লইয়া যাওয়া হয়। সেই রাত্রিতে হাজার হাজার ভক্ত মূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া ভক্তি নিবেদন করে। নানা স্থান হইতে পূজকগণ রাজধানীতে সমবেত হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী রবিবার অপরাহ্নে মূর্ত্তিকে শোভাযাত্রাসহ

নয় ত নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে হইত। দুই শতাব্দী ধরিয়া নিপীড়ন চলিলেও ঐ পরিচ্ছদ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও নারীরা উহা ধারণ করিয়া থাকে।

মেষবাহিত গাড়ী

আধুনিকারা ঐরূপ অবগুণ্ঠনকে ঘৃণা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাচীনারা সংরক্ষণের পক্ষপাতিনী। তাঁহারা প্রায়ই উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাহারও সহিত রাজপথে দেখা হইলে অবগুণ্ঠনধারিণী যদি তাহাকে এড়াইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি অবগুণ্ঠনের পরিসর বাড়াইয়া দেন—তখন তিনি সুরক্ষিত দুর্গে যেন আত্মগোপনের অবসর পাইলেন।

এতদঞ্চলে উৎকৃষ্ট কমলালেবু উৎপাদিত হয়। ইদানীং আনারসের চাষ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। উহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধনাগম হইয়া থাকে। সাও মিগুয়েলকে অধুনা আনারস দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। য়ুরোপের বহু স্থানে এই আনারস রপ্তানী করা হইয়া থাকে। আজোরের আনারস প্রধানতঃ জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডে বিক্রীত হইয়া থাকে। ফ্রান্স এবং পোর্ত্তুগালও বহু আনারস ক্রয় করে।

কাচের ঘরের মধ্যে আনারসের চারা বর্দ্ধিত করা হয়। চারাগুলিতে একই সময় ফল জন্মে। ধূম্রসহযোগে গাছে অতি শীঘ্র ফুল ও ফল দেখা দেয়। এই ধূম্র প্রদানের পদ্ধতি হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়। কোনও আনারসের কাচের ঘরে এক জন সূত্রধর কায করিতেছিল। এক স্থানে অনেকটা কাঠের কুচা সঞ্চিত ছিল। দৈবক্রমে তাহাতে আগুন লাগিয়া যায়। ধূম্রজালে গাছগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া মালিকের আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেখা
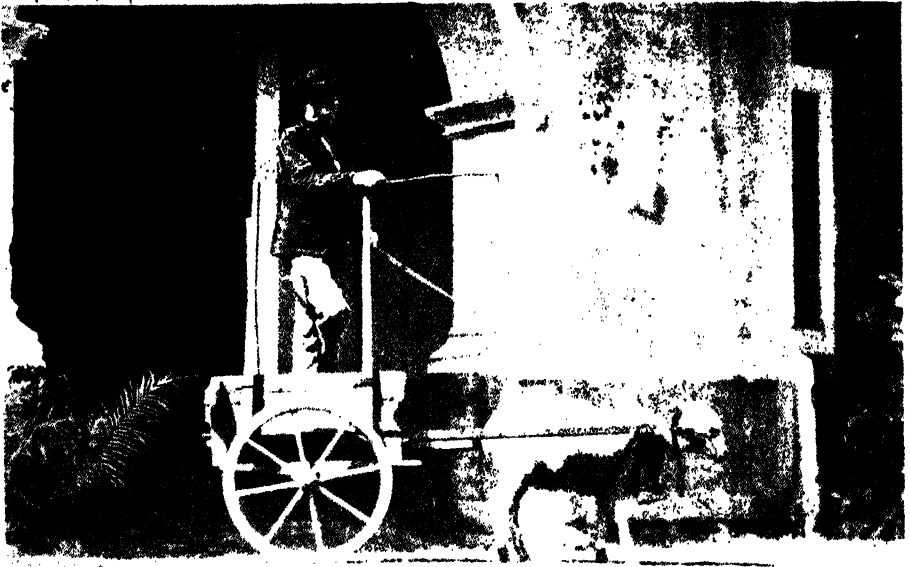
পন্টা-ডেলগাডার নারীদিগের অবগুণ্ঠন

গেল যে, নষ্ট না হইয়া প্রত্যেক গাছ মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর হইতে ঐরূপ আবৃত ঘরের মধ্যে
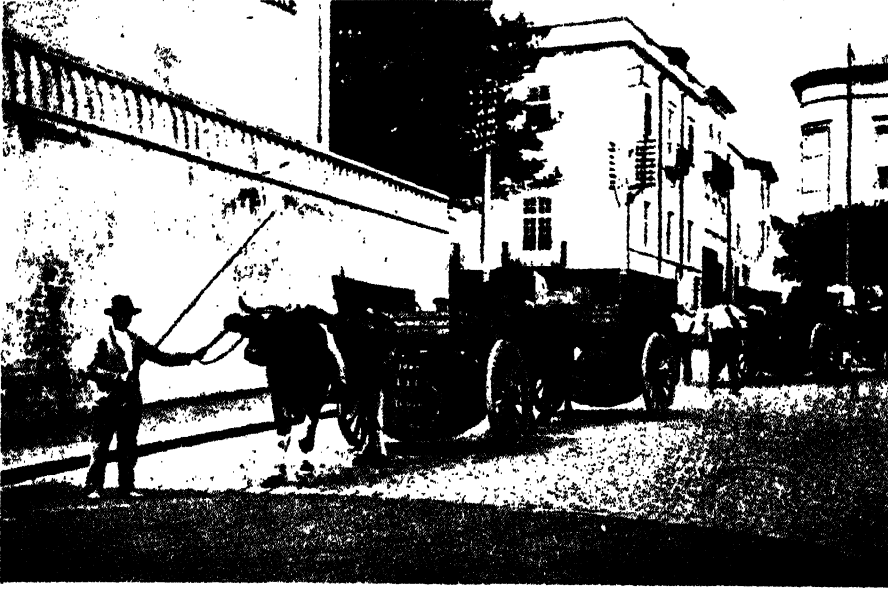
মদের পিপাপূর্ণ গাড়ী

বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছিল। বিনিময়ে ৫ লক্ষ ডলার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

দ্বীপে আর একটি বিষয়ের চাষ হয়। কালো এবং হরিদ্‌বর্ণের চা এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে যখন প্রথম চা-চাষ আরম্ভ হয়, তখন চীনা চাষীদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইদানীং দেশীয় শ্রমিক, প্রধানতঃ নারীরাই চার চাষ করিয়া থাকে। দ্বীপের উত্তরাংশে চা চাষের ক্ষেত্র। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশের বায়ুতে আর্দ্রতা অধিক।

দ্বীপের পল্লীপথগুলিতে মন্থরগামী গরুর গাড়ী দেখিতে পাওয়া যাইবে। পল্লী-অঞ্চল তৃণশ্যামল, পক্ষিকূজনসেবিত অরণ্যে পূর্ণ। প্রত্যেক পল্লী-কুটীরের সম্মুখে মাচা। তাহার উপর শস্যসম্ভার রক্ষিত।

ফরনাস্ উপত্যকা-ভূমির চারিদিকে উন্নতশীর্ষ সবুজ প্রাচীর। অনেক গিরি-চূড়া হইতে ধূমবাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে এখানে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রেস্‌কট্ তাঁহার পিতামহের গৃহে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সাও মিগুয়েলে্এ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রেস্‌কটের পিতামহ প্রথম দূতরূপে প্রেরিত হন। এখানে অনেকগুলি উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবণ আছে।

সমুদ্রতীরস্থ পল্লীসমূহে—গিরিশৃঙ্গের উপরে বহু প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। একটি অট্টালিকা ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

সহরের উচ্চশ্রেণীর অধিবাসীরা পরম আরামে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ক্লাবগৃহে প্রায় নৃত্য-উৎসব হইয়া থাকে। এক স্থানে ২ হাজার ৭ শত লোকের বসিবার

বালকের হস্তে কাষ্ঠ-পাদুকা

ধূম্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র আনারস পাওয়া যায়। গত বৎসর ২০ লক্ষ আনারস

লড়ায়ে ষাঁড়

ক্যালডেয়া ডাস্ হ্রদ

হুরটা বন্দর

আজোরস্‌এর চা-র ক্ষেত্র

আসন আছে। ফুটবল ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ, টেনিস-প্রাঙ্গণ, বেস্-বল খেলার মাঠ প্রভৃতি সহরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। চলচ্চিত্রাভিনয় সপ্তাহে দুইবার প্রদর্শিত হয়। হলিউডের চিত্রাবলীই প্রধানতঃ দর্শকদিগের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। আজোরসের যে সকল অঞ্চলে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত, তথায় আমেরিকার প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বীপবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ পক্ষপাতী। য়ুরোপের মহা সমরের সময় পন্টা ডেলগাডা বন্দর মার্কিণ রণপোতসমূহের পোতাশ্রয় ছিল।

দ্বীপের তরুণ-তরুণীদিগকে জনতার মধ্যে দেখা গেলেও, তরুণী ও তরুণদিগের মধ্যে মেলা-মেশার ব্যবস্থা আদৌ নাই। অভিভাবক-অভিভাবিকাহীন অবস্থায় কোনও তরুণী পথে বাহির হয় না, অন্যের সহিত মিশে না। কোনও তরুণী দ্বিতলের বারান্দা হইতে পথের উপর দণ্ডায়মান কোনও যুবক প্রণয়ীর সহিত কথা কহিতে পারে, তাহার বেশী নহে।

একটি নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির শিখরদেশের নাম "সেটি সিডাডেস্ (সপ্ত নগরী)। উক্ত আগ্নেয়গিরির মুখপ্রদেশের পরিধি প্রায় দশ মাইলব্যাপী। উহার সন্নিহিত স্থানে একটি হ্রদ আছে, হ্রদের তীরে পল্লী, গোচারণভূমি, শস্যক্ষেত্র আছে। হ্রদের সর্ব্বত্র সমান গভীরতা-বিশিষ্ট নহে। এই হ্রদটি অনেকটা ইংরাজী আটের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। যেন দুইটি হ্রদ এক হইয়া গিয়াছে। এক দিকের জল হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, অপর দিকের জল গাঢ় নীল। পন্টা ডেলগাডায় আহার্য্যদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা। কিন্তু মাংস দুর্ম্মূল্য। ৬০টি ছোট মাছের দাম আড়াই সেণ্ট, কিন্তু একটা তাজা গলদাচিংড়ির দাম ২৫ সেণ্ট। ধনী ব্যক্তি ছাড়া উহা জনসাধারণের পক্ষে দুর্লভ। পন্টা ডেলগাডা, আঙ্গরা ডো হিরোইস্মো এবং হর্টাতে সরকারী কৃষিক্ষেত্র এবং পশু

ফরনাস্ উপত্যকাভূমিতে ফুলের কার্পেট

পন্টা ডেলগাডার বিদ্যালয়ের ছাত্রী
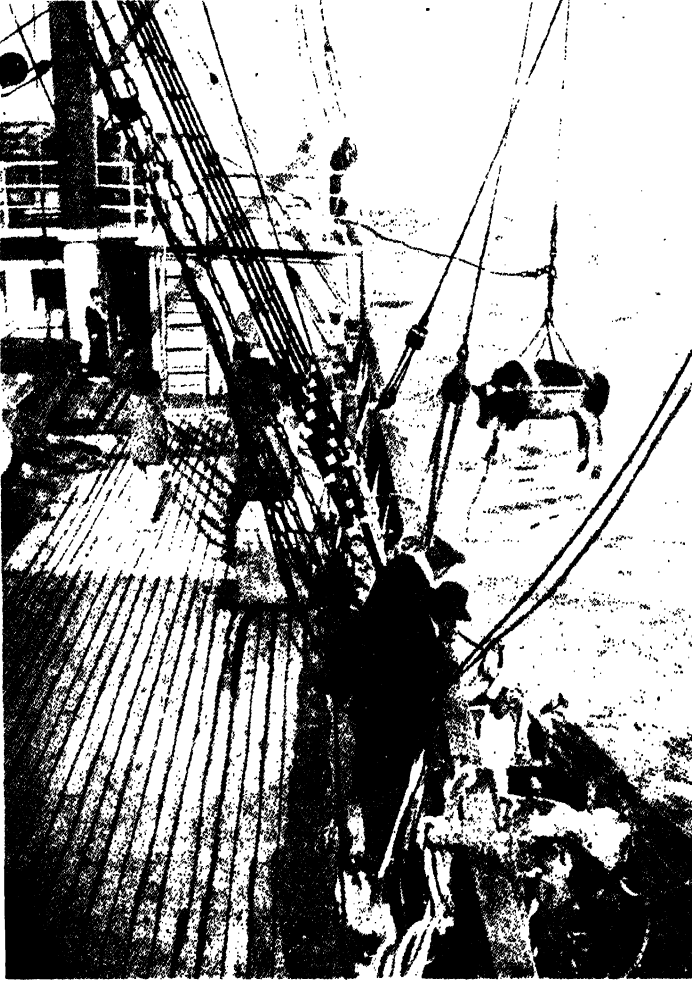
কপিকলের সাহায্যে গরু নামান
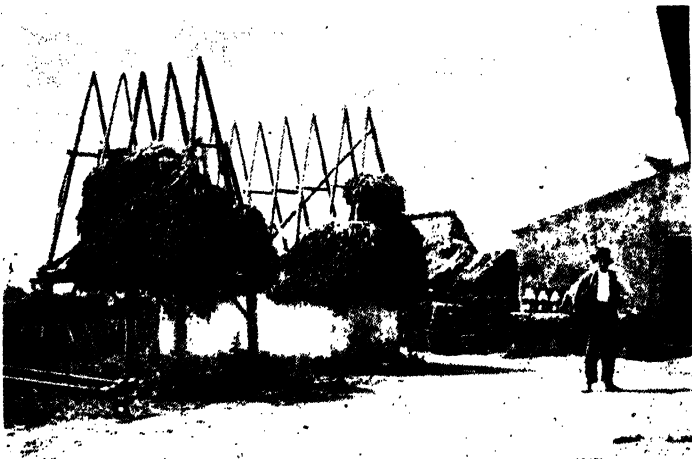
মাচার উপর সঞ্চিত শস্যগুচ্ছ

প্রতিপালন করিবার খোঁয়াড় আছে। টারসিরা দ্বীপের ক্ষুদ্র বন্দর আঙ্গরা ডো হিরোইস্‌মো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। বহুকাল হইতে আবিষ্কারক ও যোদ্ধৃবৃন্দ এই বন্দর-সহরে আশ্রয় লইয়া আসিতেছেন। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জোয়াও ভাজ কর্টি-রিয়েলকে সরকার এই দ্বীপের অর্দ্ধাংশ উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। কর্টিরিয়েল যে অট্টালিকায় বাস করিতেন এবং যে গির্জ্জার প্রাঙ্গণে তিনি সমাহিত হন, তাহা এখনও বিদ্যমান। পাওলো ডা গামাও এই গির্জ্জার প্রাঙ্গণে শেষ শয্যা বিছাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ ভাস্‌কো ডা গামার ভ্রাতা। পীড়িত হইবার পর পাওলোকে এইখানে আনা হয়। তাঁহার সমাধি এখানে আছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে টেরসিয়ার অধিবাসীরা, আক্রমণকারী স্পানিয়ার্ডদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। তাহাদের দুর্গ অধিকৃত হইলে, রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া বৃটিশ জলদস্যুদিগকে বাধাপ্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ফিলিপ যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথায় রাষ্ট্রনৈতিক বন্দীরা আবদ্ধ থাকে। য়ুরোপের মহা সমরের সময় পোর্ত্তুগালের জার্ম্মাণ অধিবাসীদিগকে এইখানে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। গণগুনিয়ানা নামক প্রসিদ্ধ জুলু সর্দ্দার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পর ধৃত হয়। এই দুর্গে তিন জন পুরুষ আত্মীয়সহ সে আবদ্ধ ছিল। এইরূপ গল্প শুনা যায় যে, এই বৃদ্ধ যোদ্ধা যখন কেপভার্ড দ্বীপে পৌঁছে (মোজাম্বিক হইতে সে টারসিরায় আসিতেছিল), তখন তাহাকে বলা হয় যে, আটটি পত্নীসহ

সে অগ্রসর হইতে পারিবে না। শুধু এক জন তাহার সহিত নির্ব্বাসনে যাইতে পাইবে। সুতরাং ৮টির মধ্যে কে তাহার সঙ্গিনী হইবে, তাহা তাহাকে বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জুলু সর্দ্দার তাহাতে সম্মত না হইয়া সকলকেই রাখিয়া যায়।
এই দ্বীপে ষাঁড়ের লড়াই চলে, তবে যুদ্ধে কোনও ষাঁড়কে বধ করা হয় না। রজ্জুবদ্ধ ষাঁড় লইয়া ক্রীড়া দেখিতে চিত্তাকর্ষক।

আজোরস্-এ যবমাড়াই কল (বায়ুচালিত)

ষাঁড়ের গলায় মোটা দড়ি বাঁধা থাকে। তাহার দুই শৃঙ্গ পিত্তল দ্বারা বাঁধান, দুই শত ফুট দীর্ঘ রজ্জুর অপর প্রান্ত সাত জন বলিষ্ঠ যুবক ধারণ করিয়া থাকে। ষাঁড়কে দেখিয়া চারিদিক হইতে বালক ও বয়স্কগণ তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে থাকে—লাঠি, লোষ্ট্র, ছাতা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে থাকে। ষণ্ড ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া তাড়া করে। কিন্তু কাহাকেও আহত করিতে পারে না। ষণ্ড তাড়া করিলেই যে যেখানে পায় আত্মগোপন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ষণ্ড বলপূর্ব্বক ৭ জন বলিষ্ঠ যুবকের হাত হইতে রজ্জু ছিনাইয়া লইয়া উত্ত্যক্তকারিগণকে তাড়া করে।

টেরসিয়া দ্বীপের ক্রুদ্ধ ষণ্ড

আঙ্গরা ডো হিরোইসমোতে আবহ বিভাগের কার্য্যালয় আছে। আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বাভাস দিয়া আবহ বিভাগ সমুদ্রমধ্যস্থ অর্ণবপোত সমূহকে সতর্ক করিয়া থাকে।

গ্রাসিওসা দ্বীপটি সমুদ্র হইতে তেমন মনোরম দেখায় না। জলের অভাব সত্ত্বেও এখানে কৃষিকার্য্য মন্দ হয় না। এখানে সুরা, শস্য উৎপন্ন হয়। পশুও মন্দ নহে। আজোরসের গর্দ্দভ এখানে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।
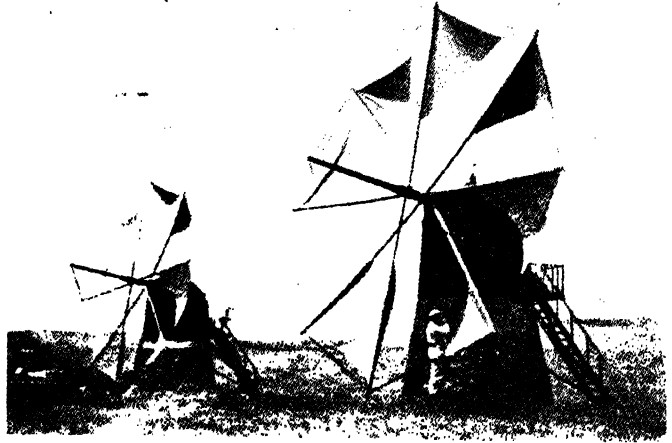
সাও জর্গে দেখিতে সুন্দর এবং অরণ্যসমাকুল। ভিলাডাস্ ভেলাস্ নামক সহরে এক জন দ্বীপবাসীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই লোকটি তাঁহার উপার্জ্জিত যাবতীয় অর্থে পীড়িত ও দরিদ্রদিগের জন্য রাজভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে তাহারা তথায়

কর্ভো দ্বীপের রোজারিও সহর

পিকো হইতে গৃহপালিত পশু লিস্‌বনে প্রেরিত হইয়া থাকে। রজ্জুবদ্ধ করিয়া কপিকলের সাহায্যে ঐ সকল গৃহপালিত পশুকে জাহাজে তোলা হইয়া থাকে।

ফ্যায়ালদ্বীপে হরটা একটি সহর। মার্কিণরা এই সহরের সহিত সুপরিচিত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পের পর হরটা সহর পুনর্গঠিত হইয়াছে। এখানে বায়ুচালিত শস্য মাড়াই করিবার কল আছে। বায়ু-প্রবাহের বেগ অনুভূত হইবামাত্র কলওয়ালা শঙ্খধ্বনি করিয়া জানাইয়া দেয় যে, এখন শস্য মাড়িতে হইবে। তিমি মৎস্যের দন্ত হইতে নানাবিধ দ্রব্য এই সহরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফ্যায়াল হইতে এক রাত্রিতে করভো দ্বীপে যাওয়া যায়। এখানে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। উহা এখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিদ্যমান। এখানে রোসারিও নামক একটি পল্লী আছে। উক্ত দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র

আঙ্গরা ডো হিরোইস্‌মোর বাসভবন-সমূহ।

প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখানে একটি আগ্নেয়গিরি আছে। তাহার নাম পিকো। উহার উচ্চতা ৭ হাজার ৮ শত ২১ ফুট। এখানে প্রচুর দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিকোর পুরুষগণ তিমি মৎস্য শিকারে অভ্যস্ত। সমুদ্রমধ্যে কোনও তিমিকে দেখিতে পাইলেই উহারা নৌকা লইয়া—ইদানীং মোটরবোটের প্রচলন হইয়াছে—তাহাকে আক্রমণ করে। নানাবিধ অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা সমুদ্ররাক্ষসকে জখম করিয়া ফেলে।

৭শত। এখানকার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই কঠোর পরিশ্রমসহিষ্ণু। তাহারা অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করে। ভোগবিলাস নাই বলিলেই চলে। তাহারা সর্ব্বাবস্থাতেই সন্তুষ্টচিত্ত। টাকার অভাব এখানে সুস্পষ্ট; কিন্তু ভুট্টা, গম, শাক-সব্জী এবং আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ভোর ক্ষুদ্রকায় গৃহপালিত পশু প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। সামুদ্রিক জীবন যাপন করিলেও দ্বীপবাসীরা নিরামিষাশী। এখানকার কোনও গৃহে তালাচাবির বালাই নাই।
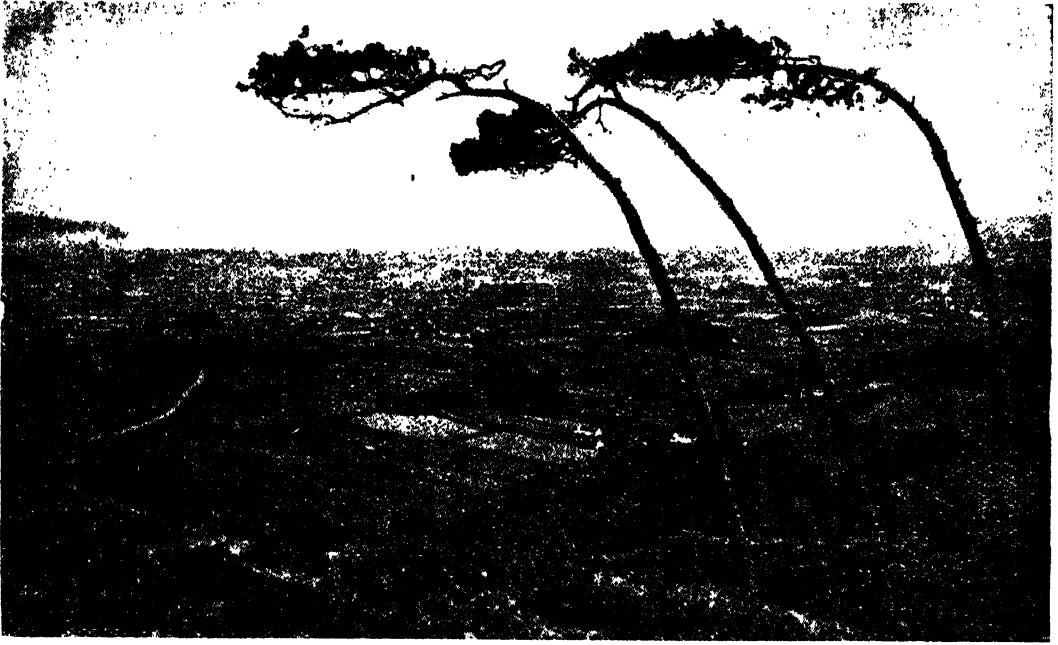
"প্রেয়া ডা ভিটোরিয়া"—শত বৎসর পূর্ব্বের রণক্ষেত্র

কারাগারের কোনও প্রয়োজনই এখানে অনুভূত হয় না। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ছেলে-মেয়ে-দিগের শিক্ষক, পুরোহিত তাহাদিগের উপদেষ্টা। কাহারও ভীষণ দন্তশূল-পীড়া জন্মিলে ফ্লোরেস দ্বীপে দন্ত-চিকিৎসকের জন্য নৌকা প্রেরিত হয়, অবশ্য যদি তখন জলঝড় না থাকে।

তিমি মৎস্য-শিকার

সকল দ্বীপ অপেক্ষা ফ্লোরেস অতি রমণীয়। জলের প্রাচুর্য্য আছে। স্রোতস্বিনীর জল সমুদ্রে গিয়া পড়ে। নানাবিধ সুন্দর ফুল এখানে জন্মে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত অসংখ্য জাতীয় পুষ্প দ্বীপটিকে মনোরম করিয়া রাখে। এই দ্বীপে কোনও রাজপথ নাই তবে শীঘ্রই একটি রাজপথ নির্ম্মিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। ফ্লোরেস ও করভোতে বেতার-বার্ত্তা আছে। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান চলে।
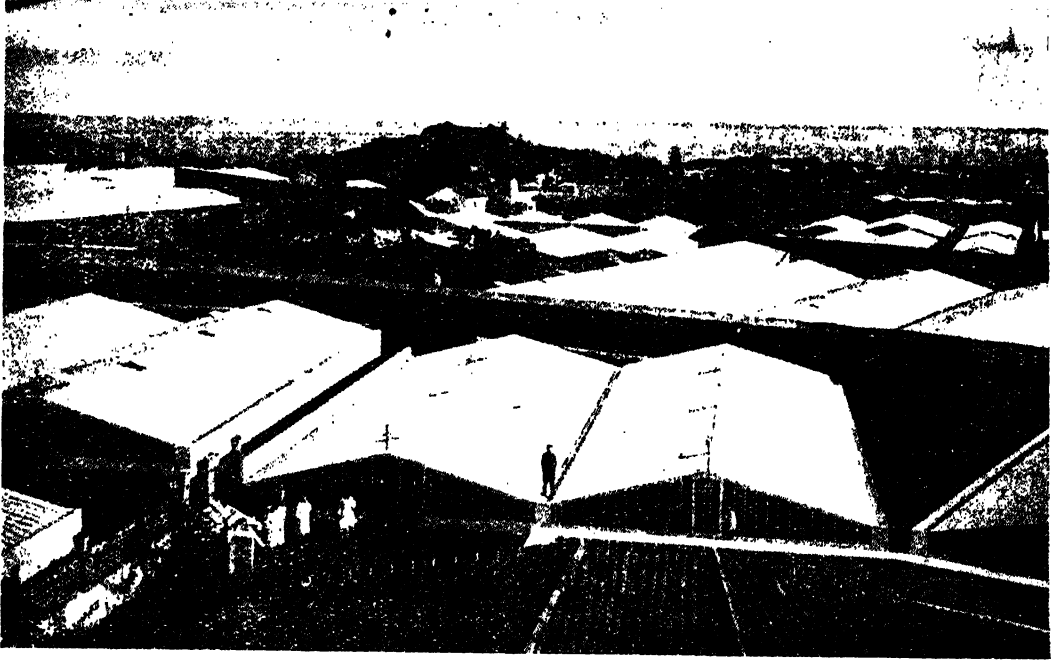
কাচ আচ্ছাদনের নিম্নে আনারস গাছ বর্দ্ধিত হইতেছে

সান্টা মারিয়া দ্বীপের মহিলা

সাণ্টা মারিয়া দ্বীপটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এ জন্য এখানে কর্দ্দম দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের জন্য মৃত্তিকা-তৈজস এখানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বড় বড় জালা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভিলা-ডো পোর্টো বন্দরে ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টোফার কলম্বস্ নিনা জাহাজকে নোঙ্গর করেন। তাঁহার দিনলিপি হইতে জানা যায় যে, নাকি কদল তীরে উঠিয়া দেবী মেরীর পূজার জন্য গির্জ্জায় গমন করে, সেই ঘটনার কথা গির্জ্জার গায় এখনও ক্ষোদিত আছে। সান্টা মারিয়ার তদানীন্তন শাসক, কলম্বসকে প্রলুব্ধ করিয়া তীরে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু চতুর কলম্বস্ নোঙ্গর তুলিয়া টেমস্ নদের মোহানায় জাহাজ লইয়া পলায়ন করেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সাহিত্যে হাস্যরস

সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এ কয়টি জিনিষ পশু ও নরের মধ্যে সমান দেখা যায় এবং একমাত্র ধর্ম্মই (কাহারও মতে বিদ্যা, জ্ঞান, কাহারও মতে বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচারশক্তি) মানুষকে পশু হইতে বিভিন্ন করিয়াছে ও তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব জানাইতেছে। শাস্ত্রকারগণ কোন্ দেশের কোন্ সময়ের মনুষ্য-সমাজের এরূপ বিশেষত্বের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে একটি বিষয়ে তাঁহাদের এই মতামত ও উপদেশ সম্বন্ধে দুঃখ করিবার জিনিষ আছে। হয় ত তাঁহারা কোনদিন হাসেন নাই, হাসিতে জানিতেন না অথবা হাসি আদৌ পছন্দ করিতেন না কিম্বা পশুরা যে হাসে না অথবা হাসিতে পারে না কিম্বা হাসিতে জানে না, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই এবং বলিতে সাহস করেন নাই; নচেৎ পার্থক্যের এ বিশেষত্বটুকু নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতর্কের গণ্ডীর মধ্যে এই পার্থক্যের বিচার ও বিষয় অনেকভাবে দেখান যাইতে পারে, তাহা (Exhaustive definition ভাবে) হয় ত সকলে স্বীকার করিতে রাজী হইবেন না। "হায়েনা" নামক জন্তুর ডাককে ইংরাজীতে "হাসি" বলা হয়, উটপাখীর আওয়াজকে কেহ কেহ (আরবদেশে) হাসি বলিয়া থাকেন এবং কাদাখোঁচা অথবা মাছরাঙ্গা পাখীর চীৎকারকে অনেকে হাসি নাম (laughing jackass) দিয়া থাকেন। সেইরূপ গাধার চীৎকারকে অট্টহাস্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু তাহাদের কোনটাই আমরা মানুষের হাসির সমশ্রেণী বলিয়া ধরিতে পারি না। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দ্বারা মানুষের শরীরে ও মনে যে আনন্দ ও প্রীতির উদ্রেক হয়, তাহার বহির্বিকাশকে আমরা হাসি অথবা রসবোধ বলিতে পারি। পশুদের মধ্যে এরূপ হাসি ও রসবোধ আছে কি না, অবশ্য তাহা বিচার্য্য বিষয় হইতে পারে। প্রভুকে দেখিলে কুকুর আনন্দে লেজ নাড়ে, উল্লম্ফন করে, খাদ্য দেখিতে পাইলে বিড়াল ও বক যেরূপ নিঝুমভাবে "ওত" পাতিয়া বসিয়া থাকে, গা চাটিবার সময় মায়ের কাছে বাছুর যে রকম ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, এ সব দৃষ্টান্তেও আমরা পরস্পর আনন্দ-প্রীতির বহির্ব্বিকাশ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহাকে হাসি কিম্বা রসবোধ বলি না। মানুষের মনোভাব অথবা মনোবৃত্তির আভাস প্রকাশ করিবার জন্য অথবা গোপন রাখার জন্যই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই ভাষার সাহায্যে আমরা যে রসবোধ করি, তাহাই সাহিত্যে ব্যাপকভাবে "হাসি" নামে পরিচয় করান যায়। যদিও সে ভাষা লিখিত কথিত চিত্রে অঙ্কিত, অঙ্গভঙ্গির দ্বারা প্রকাশিত, এরূপ বিভিন্ন উপায়ে তাহা আমাদের বোধগম্য হইতে পারে। পশুদের মধ্যে ভাষার এরূপ ব্যবহার নাই। অন্তত: যেটুকু যাহা আছে, তাহা মানুষে জানে না এবং রসবোধ উদ্দেশ্যে যে তাহাদের মধ্যে ভাষার এরূপ কোন ব্যবহার হয়, তাহা মানুষ আমরা স্বীকার করি না। তাহারা যে ডাক দেয়, চীৎকার ক'রে শব্দ উত্থাপন করে, তাহার ব্যতিক্রম বড় একটা দেখা যায় না এবং তাহা শুধু ভয় আহার নিদ্রা মৈথুন সম্বন্ধীয় অথবা নিজেদের অবস্থিতির অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্যই ব্যবহার হয়। ঝগড়া ও মারামারি করার সময় তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহা কোনরূপ ভাবব্যঞ্জক উদ্দীপনাময়ী "ভীমের" বক্তৃতা কি না, তাহা জানার কোন উপায় নাই। মানুষের ভাষা-ভঙ্গিমার মধ্যে তাহা বিষয়ীভূত করা যায় না, যদিও দূর হইতে এরূপ ঝগড়া দেখিতে ও শুনিতে অনেকেই আনন্দ বোধ করিবেন। "হাসি" এবং রসবোধ একই জিনিষ বলাতে একটু আপত্তি হইতে পারে। রসবোধ ও রসসৃষ্টিমাত্রেই হাসি অথবা হাসির জিনিষ নয়, বরঞ্চ রসবোধ ও রসসৃষ্টির মধ্যে "হাসি" একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট বিষয় ও প্রকরণ মাত্র বলা যায়। পিচ্ছিল স্থানে কেহ আছাড় খাইলে আমরা হাসি। তাহা একপ্রকার রসবোধ বলিতে পারি, কিন্তু হঠাৎ গাড়ীর চাকার তলে পড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গিলে, অথবা কাটা গেলে আমরা আর হাসি না। বরঞ্চ 'আহা,' 'উহু' করি, দুঃখ করি, সমবেদনা জানাই; ইহা অন্য একপ্রকার রসসৃষ্টি ও রসবোধ। হাসির ঠিক বিপরীত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা নয় প্রকার রসের উল্লেখ পাই—যথা, শান্ত (মধুর), সখ্য, দাস্য, বীর, আদি, রুদ্র (প্রচণ্ড), হাস্য, করুণ ও বীভৎস। ইহা ভিন্ন নিন্দা, স্তুতি, ব্যঙ্গ, (ব্যাজ) ভিক্ষা,তোষামোদ, অহঙ্কার, বিরক্তি প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার "রস" উল্লেখ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে তাহাদের স্থান কোথায়, তাহা বলা দুষ্কর। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে আমরা শান্ত, মধুর, সখ্য, দাস্য—এই কয় প্রকার রসের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে (রামায়ণ-মহাভারতে,) করুণ, বীর ও আদি রসের বৃত্তান্ত অনেক আছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার প্রাদুর্ভাব ও প্রাচুর্য্য বিশেষ কম নয়। নভেলে ও নাটকে করুণ ও হাস্যরসের অবতারণা করিতেই হয়। রুদ্র ও বীভৎস রস আজকাল সভ্য সমাজে বিশেষ আদর পায় না। ইহা লিখিত ভাষা ও সাহিত্যের অবলম্বন ও আশ্রয়, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে কি রকম রসের আমরা অবতারণা করি, তাহা বিবেচনা করার বিষয়। সব সময় যে "রস" উদ্দেশ্য করিয়া আমরা বাক্যালাপ করি, তাহা নহে। মুখবিকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি দেখাইয়া, "আলু তিন প্রকার,—বিলাতী, গোল ও রাঙ্গা" এই কথা কয়টি দ্বারা বিভিন্ন রসব্যঞ্জক ভাবও প্রকাশ করিতে পারা যায়। ভাবের অভিব্যক্তি নামে ও বিভিন্ন চেহারার ফটোগ্রাফ তুলিয়া ও দেখাইয়া অনেকে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। এই মুখভঙ্গিমা ও "রস" অথবা "ভাব" প্রকাশের চেষ্টা স্বভাবত: কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত। প্রকৃত রস অথবা ভাব প্রকাশ, স্বাভাবিক ও বিনা আয়াসে প্রকাশিত জিনিষ—সাহিত্যে, কাব্যে, বাক্যালাপে, চিত্রে আমরা তাহার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ও প্রকাশিত মূর্ত্তি উপভোগ করি। দৈনন্দিন সুখদুঃখ-জড়িত কৃতকার্য্য হতাশ-আলোড়িত জীবনে কোন না কোন সময় প্রত্যেকের ইচ্ছা হয়, যেন ক্ষণকালের জন্যও নিজের জীবনকে নিজেরা ভুলিয়া থাকি। অনেকটা

sweet abandonএর মত বলা যায়। তাহার জন্য কেহ ভ্রমণ করেন, কেহ তাস খেলেন, কেহ আড্ডা দেন, কেহ বিছানাতে গড়াগড়ি দেন—কেহ খেলাধূলা করেন, বই পড়েন ইত্যাদি অনেকপ্রকার উদ্যম করিয়া থাকেন। প্রকৃত বিশ্রামের (recreationএর) সঙ্গে কোনরূপ "রস"-বোধের সম্পর্ক আছে কি না, তাহা অবশ্য বলা কঠিন এবং এরূপ আলস্য-ব্যঞ্জক বিশ্রামকে অনেকে হয় ত ভাল চোখেও দেখেন না। তবু প্রত্যেক মানুষেরই বিশ্রাম উপভোগ করার কোন না কোন এক রকম প্রয়াস হয় (যাহাকে হয় ত ইংরাজীতে hobby নাম দেওয়া যাইতে পারে), তাহা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যের এবং লিখিত, পঠিত, উচ্চারিত ভাষার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা যদি রসসৃষ্টি বলিয়া ধরা যায়, তবে তাহার মধ্যেও মনের বিশ্রাম ও "আড্ডা" দেওয়ার ভাব ও ইচ্ছা স্বভাবতঃ আসে বলিয়া স্বীকার করা বোধ হয় কঠিন নয়। অবস্থানুসারে মনের ক্ষুধা নানাভাবে নিবৃত্তি করা যাইতে পারে। কিন্তু জীবনে লোক সুখকে যতটা সুখকর মনে করে, তাহা অপেক্ষা দুঃখকে বোধ হয় বেশী কষ্টকর ও প্রাণান্তকর বিবেচনা করে। তাহার জন্য সাধারণ "হাসি"র স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ অল্প সময়ের মধ্যে যত বেশী লোক আত্মবিস্মৃত হইয়া উপভোগ করে, অন্য কোন প্রকার রস-বিকাশে বোধ হয় ততটা করে না। এই জন্য পৃথিবীর আদিম কাল হইতে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক সাহিত্যে "হাস্যরস" অথবা রঙ্গ-ব্যঙ্গ আলোচনা ও কথোপকথন এতদিন একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যে লোক হাসে না—যাহার চেহারাতে হাসি ফুটিয়া ওঠে না, সে নিঃসঙ্কোচে ও নির্ব্বিবাদে মানুষ খুন করিতে পারে।" তাঁহার এই কথার সমর্থন করার জন্য কোন প্রমাণ দরকার হয় না। আধুনিক ছায়াচিত্র-জগতে Charlie Chaplinএর নাম যত অল্পসময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিল ও তাঁহার অভিনীত চিত্রাদি দেখিতে যত অধিক লোক একত্র আনন্দিত হইত, তাহা উপরি-উক্ত কথারই একটি প্রমাণবিশেষ। চিকিৎসাশাস্ত্রে সরল "হাসি"র স্থান কোথায়, তাহা বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনের আনন্দ ও হাসির স্ফূর্ত্তি থাকিলে রোগ-জ্বালা অর্দ্ধেক প্রশমিত হয় এবং বৃদ্ধও যৌবন লাভ করে। লোকসমাগমে ও মজলিসে কবিতা ও গানে হাসির কথা একটা বিশেষ উচ্চস্থানই লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। রসসৃষ্টি ও প্রকাশের সঙ্গে "রস" বোধ ও উপভোগ করার শক্তির কথা বাদ দেওয়া যায় না। এই বোধ কিম্বা উপভোগ করার ক্ষমতা সব লোকের সমান নয় এবং তাহা মানসিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও অন্যান্য অনেক জিনিষের উপর নির্ভর করে। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত লোকের কাছে নিজের শিকার-কাহিনী অথবা নাটক অভিনয় করার কৃতিত্বের কথা বোধ হয় কেহই পছন্দ করিবেন না, কিন্তু অন্য অবস্থাতে অথবা অন্য সময়ে হয় ত সে বর্ণনা প্রীতিকর বোধ হইতে পারে। কবি মিল্টনের Paradise Lost পড়িয়া এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "What does it prove ?" (ইহা কি প্রমাণ করে ?) কবিকে নিন্দা করিতে গিয়া বক্তা শুধু নিজের অক্ষমতা ও রসবোধের অভাবই প্রমাণ করিয়াছেন এবং সামান্য এই একটু কাহিনী শুনিয়া অনেকেই একটু হাস্য সংবরণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। মানুষের স্বভাব-বৈচিত্র্যের মধ্যে এই "হাস্য" উপভোগ করার শক্তিও বিভিন্ন প্রকারের এবং এক জনের কাছে যাহা হাস্যকর, অন্যের কাছে তাহা বিরক্তিকরও হইতে পারে। বয়স অনুসারেও ইহার তারতম্য দেখা যায়। জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও এরূপ একটা কথা বলা বিশেষ অন্যায় হইবে না। যে জাতির মধ্যে "হাস্য"রসের উপভোগ ও উল্লাস বেশী, তাহারাই জীবনে সুখী বেশী, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কবি কালিদাস বিশেষ মনোদুঃখে লিখিয়াছিলেন, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্, শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।" প্রত্যেক লেখক, কবি, গ্রন্থকর্ত্তা, বক্তা বোধ হয় অন্তরে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এ রকম "রহস্যে" রসবোধের অভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানে অনেক রকম ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে সব ঘটনার পশ্চাতেই যে হাস্যরসের রহস্য থাকে, তাহা বলা উচিত নয়। নীলকমলের "বাছা হনুমানের দৃষ্টান্ত" ও সে দৃশ্য শুধু যে তাহার ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। সব সমাজেই এরূপ লোকের অভাব নাই এবং ছেলেদের মত অনেক দর্শকও সে দৃশ্য উপভোগ করেন।

সাহিত্যের অন্যান্য রসের মত "হাস্য"রসের বিভিন্ন রকম আকৃতি ও উচ্ছ্বাস আছে। বিভিন্ন ভাবের প্রতিকৃতি স্বরূপ যে বিভিন্ন প্রকার হাসির উদ্ভব দেখা যায়, তাহা অন্য কথা এবং সামান্য একটু মুচকী হাসি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাণ্ড প্রচণ্ড অট্টহাসি পর্য্যন্ত যে সব স্বরূপ আকৃতি প্রকাশ হয়, তাহাও অন্য বিষয়। কারণ, সাহিত্যে এবং চিত্রে তাহার প্রতিমূর্ত্তি কিছু থাকে না—অন্যের উপভোগ করার মত সেরূপ বিকাশ ও উচ্ছ্বাস পাওয়া যায় না। সাহিত্যে যে কয়-প্রকার "হাস্য"রসের প্রাধান্য ও অবতারণা দেখা যায়, তাহাকে ইংরাজী ভাষাতে কতকগুলি বিভিন্ন কথা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যথা—

(১) Humour—যাহা একপ্রকার চিরন্তন ও শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন—অর্থাৎ যে কাহিনী, গল্প অথবা কথা যে কোন স্থানে যে কোন লোক যখনই শুনিয়া থাকেন না কেন, তখনই তাঁহার মনে মনে হাসি আসিবেই—তিনি তাহা প্রকাশিত না করিলেও করিতে পারেন—অনুভব ও উপভোগ যে করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব বলিতে গেলে, তাহাও "বুদ্ধিমানের বুদ্ধিহীনতা" অথবা "বুদ্ধিহীনের জ্ঞানের অভাব" এইরূপ একটা তথ্য আছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। জীবনে কেহ নিজেকে কোন দিন কোন সময়েই বুদ্ধিহীন অথবা সরল বোকা মনে করে না। বরঞ্চ প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবে, আমার মত বুদ্ধিমান্ আর জগতে কেহ নাই। সে জন্য অন্যের বুদ্ধিহীনতার দৃষ্টান্ত দেখিলে সহজেই লোকে উল্লসিত হয়। পরে ইহাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইবে। অনেক সময় parables ও ছোট গল্প এই শ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়।

(২) Wit—উপস্থিত জবাব অথবা প্রবাদবচন (Proverb)

কেহ কেহ ইহাকে "জমাট" অভিজ্ঞতা (crystallised experience) বলিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যকর জিনিষ না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার কথা, ভাষা ও উচ্চারণের ভঙ্গিমা এত সুন্দর যে, তাহা অপেক্ষা বেশী মনোজ্ঞভাবে ভাষান্তর করিয়া বিষয়টি বলা যায় না। ইহাকে দুইটি শ্রেণীতে ধরা যায়। (১) Repartee—ব্যঙ্গোক্তি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, তাহার মনে ও মর্ম্মে কিছু আঘাত দেওয়া হয় বটে—যেমন আদালতে উকিলে উকিলে বাক্যযুদ্ধ, কিন্তু দর্শকগণ ও শ্রোতারা তাহা উপভোগ করেন। বঙ্গদেশের অধুনালুপ্ত "কবির লড়াই"এ যাহাকে "চাপান দেওয়া" বলিত। (২) প্রবাদবচন—কোন একটি স্বভাব, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার ভঙ্গিমা যাহা লোকের মুখে মুখে এতাবৎ চলিয়া আসিতেছে। "ব্যাজস্তুতি"কে wit শ্রেণীর মধ্যেই ধরা হয়।

(৩) Satire—রঙ্গব্যঙ্গ উক্তি অর্থাৎ মূল সত্য জিনিষকে অনেকখানি অক্ষত রাখিয়া অন্যভাবে তাহা প্রকাশ করা। Mock-heroic styleএ ভাষা প্রকাশ করা। ইংরাজী ভাষার Pilgrims Progress, Don Quixote, Gulliver's Travels, ও বঙ্গভাষায় "খাস দখল," "গড্ডলিকা", "কজ্জলী" "ঊনপঞ্চাশী" প্রভৃতি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা যায়। (আরও অনেক পুস্তক আছে, সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব)।

(৪) Parody—মূল ভঙ্গিমা ঠিক রাখিয়া ভাষা ও ভাব বদল করিয়া দেওয়া। এক প্রকার পদ্য লেখার অনেক রকম অনুকরণ করা হয় এবং কবিতা ও কথিত ভাষার অদলবদল করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধনধান্যে পুষ্পভরা" সঙ্গীত বাহির হওয়ার পর কত রকম সমছন্দে পদ্য বাহির হইয়াছিল, এবং এক জন জজ জুরীকে "চার্জ্জ" দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, "Hulpable commicide not mudering to amount." ইত্যাদি।

(৫) Tomfoolery—অর্থহীন বৃথা ভঙ্গিমা ও ভাষার ব্যবহার। মুখোস পরা, নাচ-গান করা ও pantomime, মুখ-ভঙ্গী করা ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে ধরা যায়। সার্কাসের clown এবং যাত্রাদলের সং, এ সব দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন।

বঙ্গভাষায় পদ্য লেখা সম্বন্ধে একটি Doggerel verse আছে, যাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এখান থেকে মারলাম তীর লাগলো কলাগাছে।
হাঁটু ভেঙ্গে রক্ত বেরুল, চোখ গেল রে বাবা।

"তরজা" গানের দু এক লাইন ভাষার nonsense Tomfoolery দেখা যায়, যথা—

রাবণ রাজা এলেন যুদ্ধে প'রে বুটজুতো
হনুমান মারে তারে লাথি চড় গুঁতো। ইত্যাদি।

কিম্বা—

ত্রিম তা না না ব'লে গান করে রাবণ,
শেয়ালে কামড়াল সীতা পাগল হ'লো দুর্য্যোধন। ইত্যাদি।

অনেক সময় "ঠাট্টা" "বিদ্রূপ" "শ্লেষ"কে এই শ্রেণীতে ধরা যায়।

(৫) Ballad-Rhapsody—আবৃত্তি, কেচ্ছা, সুর করিয়া পড়া কিম্বা গান করা ইত্যাদি। বিষয়বস্তু কোন সময় ছোট হয়, অনেক সময় বড়ও হয়। ইংরাজী ও বঙ্গ সাহিত্যে ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাণিকপীরের ও চারণদের ছড়া এই শ্রেণীর বলা যায়।

(৬) Pun, Epigramme, Acrostic, Aliteration.

এক কথার বিভিন্ন অর্থ, অনুপ্রাস প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারের বাহাদুরী। যেমন, শেক্‌স্‌পিয়ারের "Not on thy sole but on thy soul", অথবা An Ass can never be a ('ors) horse but he may be a Mayor (মেয়ার-স্ত্রীঘোড়া)। অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গীতগোবিন্দের ভাষা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কবি Pope, Longfellow প্রভৃতি লেখকগণের পদ্য উল্লেখযোগ্য। বাইবেলের দশবিধ অনুশাসনের মধ্যে একটি প্রধান বিধান।

"Teach thy tongue to tell the truth".

কবি ওমারখায়েমের রুবায়েৎ Epigrammeএর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" "দুই বিঘা জমী"ও উল্লেখযোগ্য। পদ্যের ভাব ও ভাষা এক প্রকার আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহার শেষ ও "রেশ" অন্যভাব আনিয়া দেয়।

Acrostic.—ভাষার gymnastic, Cross—word puzzle অথবা word—making word—taking খেলার মত,—কথা বাছাইয়ের কসরৎ। ("কি লাভ হইল হথে, তোমার পিসীর" পদ্যের শেষ অক্ষরে মিল অনুসন্ধান করার মত যেন বোধ হয়।) উপরে যে কয়প্রকার "রহস্য" অথবা "রস" প্রকাশের প্রণালীর কথা বলিলাম, তাহা ভিন্ন আরও দুই প্রকার পন্থাও আজকাল সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। তাহাতে প্রকৃত হাস্যরস না থাকিতে পারে, বরঞ্চ বীভৎস রসই বেশী। তবু একশ্রেণীর লেখক ও পাঠক তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ ও আমোদ পাইয়া থাকেন।

(১) Suggestive,—লিখিত ভাষায় ভাব যতটুকু থাকে—তাহার বেশীর ভাগ ভাবই উহ্য থাকে। মনের ক্রিয়া ও "আমেজ" লাগিয়াই থাকে—বেশী অনুমানে প্রতিপাদ্য। (কোন এক সাংবাদিকের কথায় ইহাকে এখন "ফুটকি" অথবা "ড্যাস্" সাহিত্য নাম দেওয়া হইয়া থাকে)।

(২) Sensational.—রোমাঞ্চকর লোমহর্ষণ কাহিনী—(যাহার মধ্যে সাহস ও adventure বেশী কিম্বা কুলোকের কুচক্র, হত্যা, মহামারী, রক্তপাত প্রভৃতি বেশী চিত্রিত করা থাকে—অথবা sensation জমিয়া আসিতে আসিতে তাহা উবিয়া যায়।)

যাহাতে মনকে হাল্‌কা করে অথবা হাসির ভাব মুখে ফুটিয়া ওঠে—তাহা যে বাস্তবিকই হাস্যরসেরই এক প্রকার বিশেষত্ব, তাহা বলা যায় না। আদিরস, শান্ত, মধুর-রস কিম্বা বীভৎস-রসও তাহা সময় সময় করিতে পারে। সেজন্য প্রকৃত হাস্যোদ্দীপক জিনিষে সময় সময় উপরি-উক্ত কয়েক প্রকার প্রণালী ভিন্ন অন্য (মিশ্রিত) উপায়ও পাওয়া যায়। তাহাতে উপভোগকারীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও আছে বলা যায়। অনেক "Drollery", "ইতরামি", "বাঁদরামী", "ফাজ্‌লামী", "ইয়ারকি" ইত্যাদিকে হাস্যরসের আদিস্রষ্টা ধরা হয়। কিন্তু তাহার

মধ্যে অনেক সময় জঘন্য মনোবৃত্তি ও অশ্লীলতা এমন থাকে, যাহা পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি একসঙ্গে শুনিতে অথবা উপভোগ করিতে ঘৃণা বোধ করিয়া থাকে। যাহা প্রকৃতই "ভদ্দর লোকের পাতে দেওয়ার" উপযুক্ত নয়, তাহার সাহিত্যে বেশীদিন স্থান পাওয়া সুকঠিন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা হাসি কেন, অথবা কি রকম কি অবস্থা হইতে আমাদের মনে হাস্যের উৎপত্তি হয়? অসম্ভব কিছু, অস্বাভাবিক কিছু কিম্বা অঘটন সংঘটন করিতে পারিলে বঙ্গদেশে হয় ত গুরুগিরি-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা পাওয়া যায়। অথবা ইন্দ্রজাল ম্যাজিক black art দেখাইয়া লোককে বিমুগ্ধ বিস্মিত করা যায়। কিন্তু তাহাতে আমরা কোন দিন হাসিতে পারি না। তাহাদের গল্প শুনিয়া হয় ত কোন সময় কোন একটি বিশেষ বিষয় উল্লেখ করিয়া আমরা "হাসি" বোধ করিতে পারি। হাসি কেন, সে প্রশ্নের উত্তর সেজন্য স্বল্প ভাষায় দেওয়া কঠিন। মহাপণ্ডিত Aristotle বলিয়াছিলেন, "Humour may be translated as the Ridiculous which in itself is incongruous without involving any danger or Pain" (যে অসামঞ্জস্যের মধ্যে বিপদ ও দুঃখকষ্টের আশঙ্কা নাই, তাহারই বহিঃপ্রকৃতি হাস্যোদ্দীপক জিনিষ)" Coleridge তাহার অর্থ এরূপ করিয়াছেন—

"Where the laughable is its own end and neither inference nor moral is intended, or where at least the writer wishes it to appear. So, there arises what we call "drollery". The pure unmixed, ludicrous or laughable belongs exclusively to the understanding. It must be presented within the spheres of the eye and the ear and hence it is allied to fancy. It does not appertain to reason or moral sense and accordingly is alien to imagination."

ডাক্তার অথবা শরীরতত্ত্বের বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা হয় ত শুনিব, "Laughter কি, তাহা জান না? এই দেখ—তোমার pneumogastric nervesএর excitement হ'লে যে reflex action হয়, তাহাতে labial muscles ও olfactory and auricular nervesএর titillation হয় ও alternate compression এবং expansion হওয়ার জন্য breathটা ও-রকম আন্দোলিতভাবে বাহির হয়—তাহাকে তোমরা প্রচলিত কথায় "হাসি বল।"

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (philosophical, physiological, anatomical) যে ভাবে যাহাই দেওয়া যাউক না কেন, আমরা হাসি। হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমাদের হাসায় কেন, তাহার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ এতাবৎ কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। এই সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে চা'ন, সেরূপ লোকসংখ্যা খুবই কম এবং অনেকেই তাহা জানার জন্য আদৌ উৎসুক ন'ন। অনেক লেখক উপদেষ্টা ও দার্শনিক পণ্ডিত (serious minded) অনেক রকম ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই এতাবৎ সর্ব্ববাদিসম্মত ও সন্তোষজনক বলিয়া ধরা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে কতকগুলি স্বীকার্য্য বিষয় আছে, যাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে Aristotle যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে অসামঞ্জস্যের কথা (ridiculous) পাই। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি Platoর নিকট এই ভাব পাইয়াছিলেন। ইহার পর Plato বলিয়াছিলেন, "The pleasure we derive is an enjoyment of other people's misfortune due to a feeling of superiority or gratified vanity that we are not in the plight." (আমাদের যে সেরূপ অবস্থা হয় নাই, তাহা মনে হওয়াতে আমরা হাসি উপভোগ করি)। Aristotleএর ব্যাখ্যাকে কেহ কেহ বলেন, তাহার মধ্যে যেন disappointment অথবা frustrated expectation (আশা ভরসায় হতাশা) এমন একটা ভাব আছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, প্রত্যেক হাসির জিনিষের মধ্যে কয়েকটি জিনিষ থাকে, যথা—

(১) অন্য কাহারও দুঃখ-দুর্দ্দশা অসমঞ্জস অবস্থা (Discomfiture)।

(২) সে অবস্থার মধ্যে প্রকৃত বিপদ অথবা ক্ষতি, অনিষ্ট, অপকার, তেমন বেশী কিছু নাই।

(৩) আমরা অথবা দর্শক কিম্বা শ্রোতা—সে অবস্থায় যে পড়িবে, তাহা তাহার নিকট অসম্ভব মনে হয়। (Derision)

সার্কাসের clown হইতে আরম্ভ করিয়া Charlie Chaplin প্রমুখ অভিনেতা পর্য্যন্ত সকলেই এরূপ অসমঞ্জস্য (অস্বাভাবিক নয়) অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। এই অবস্থা কখন কি ভাবে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে অনুমান করা যায় না। স্ত্রীর "আঁচল-বাঁধা" স্বামী (henpecked husband) অভিনয় করিতে দেখিলে আমরা হাসি; কেন না, কেহই সেরূপ অবস্থাতে স্বেচ্ছায় পড়িতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু স্বামীর কঠোর শাসনে ও আয়ত্তাধীনে স্ত্রীর দুরবস্থা দেখিয়া আমরা হাসি না, বরঞ্চ চোখের জলও ফেলি কি না সন্দেহ। ("Taming of the Shrew" মনে পড়িবে)।

Derision theoryর মধ্যে অনেকপ্রকার wit, ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রভৃতিতে কেন হাসি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অনেক সময় তাহাতে "বুদ্ধিমানের বুদ্ধিহীনতা" অথবা "বুদ্ধিমানের বেকুবী" কিম্বা কথা বলার বিচিত্র ভঙ্গী থাকে। প্রকৃত "হাস্যরস" বলিতে যাহা বুঝি, তাহা বোধ হয় Passing Show" (খবরের কাগজ, সিগারেট নহে) অল্পকথায় বলিয়াছে—

"Without meaning any offence to friend or foe
We laugh at the world and let it go"

এক জন মহিলা একটি মোটর গাড়ীতে উঠিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ দিক্ তিনি উঠিবেন। গাড়ীর চালক তাঁহাকে বলিল, "আপনার যে দিক্ ইচ্ছা।" মহিলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? সে কি রকম?" চালক বলিল, "চড়ুন ত, গাড়ী যখন থামাব, তখন সব দিকই থামিবে—আপনার যে দিকে ইচ্ছা নামিতে পারিবেন।

বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে—ঘরের উপর এক জন উঠিয়াছে। নীচ হইতে এক জন চীৎকার করিল, "নেমে আয়, আগুনে পুড়ে যাবি—আমি ভিজা কাঁথা ধরছি।" সে লোকটি লাফ দিল, তখন কাঁথা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যে বলিয়াছিল—সে পুনরায় বলিল, "আমি এখন কাঁথা পাব কোথায় ?"

একটি কবরে একজন লোককে মৃত্যুর পর রাখা হইয়াছিল। শোক-সন্তপ্ত লোকদের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল, "হায়, হায়, লোকটা স্বর্গে বিশ্বাস করিত না, নরকেও বিশ্বাস করিত না—কাযেই কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে, কাপড়-চোপড় গায়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত শুয়ে আছে।"

উপরি-উক্ত গল্প কয়েকটির মধ্যে Derisionএর ভাব যে আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক। ইহার উল্টা অন্য অর্থ বলা যায়, superiority complex.

Disappointment theory সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা যায়। আমরা অস্বাভাবিক বা অসাধারণ কিছু দেখিলে অবাক্ হইয়া যাই—সব সময় যে তাহাতে হাসি, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ছবিতে বিকৃত চেহারা (যেমন মহাত্মা গান্ধীর আমেরিকানদের পোষাক-পরিহিত ছবি) কিম্বা চড়ক নাচন অথবা মহরমের সময় (pantomime) মুখোসপরা বাঁদর-নাচ অথবা ভাল্লুকের নাচ অথবা অতিকায় চেহারার কাছে ক্ষুদ্রাকৃতি (যেমন King-Kong অথবা Liliput, Brobodignaly ইত্যাদি) এ সব দেখিয়া হাসি (যে প্রকার হাসিই হউক না কেন)। বিদেশী লোকের পোষাক দেখিয়া হাসি, বিদেশীরা আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া হাসে (অথবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিও করে)। কায়দা-দুরস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ না থাকিলে, সম্ভ্রান্ত সমাজের লোকরা হাসে (অথবা ঘৃণা করে—Derision Theory আসিয়া পড়ে); তোৎলা লোক দেখিলে ছেলেমেয়েরা হাসিয়া অস্থির হয়। আমরা (বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া) বেকুব সরল লোক দেখিলে হাসি ও কপটতা, তঞ্চকতা ও affectation দেখিতে পাইলে হাসি। ইহার মধ্যে স্বাভাবিক সাধারণ প্রকৃতি যাহা আশা করি, তাহা পাই না বলিয়া (disappointment) যে হাসি, অনেকে এরূপ অনুমান করেন। কিন্তু ইহাতে যে বিস্ময়, অবাক্ হওয়ার ভাব আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অসাধারণ ও অস্বাভাবিক কিছু থাকিতে পারে। অন্য ভাবে দেখিতে গেলে এই সব ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তও আমরা পাই—

(১) Human Tragedy—যাহা আমাদের আশা ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে কল্পনা উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়।

(২) Incongruity—অসংবদ্ধ, অসংলগ্ন ও অসামঞ্জস্য—অস্বাভাবিক, অসাধারণ, এ রকম একটা ভাব।

(৩) Disappointment.—যাহা মনে করা হইয়াছিল, তাহা ঘটিল না বা হইল না।

দাবা খেলার সময় পুত্রকে সাপে কামড়াইয়াছে শুনিয়া এক জন লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কাদের সাপ ? তাড়িয়ে দেও"—সে গল্প অনেকেই জানেন—আবার সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির চোখে যে সাপ কামড়ায় নাই, তাহা শুনিয়া এক জন বলিয়াছিলেন, "আহা, লোকটা বড় বেঁচে গিয়েছে, চক্ষুরত্ন মহাযত্ন, সেটা ত রক্ষা পেয়েছে"—এ সব গল্পের মধ্যে disappointment—ভাব যে নাই, তাহা বলা যায় না। Incongruity অসংলগ্ন প্রলাপ আছে, সহজেই বোধগম্য হয়।

উপরি-উক্ত কয়েকটি বিষয় অনুমান করিয়া লইলেও দেখা যাইবে, প্রকৃত হাস্যরস কি (humour), তাহা যেন সম্পূর্ণভাবে ও সন্তোষজনকভাবে বর্ণনা করা যাইতেছে না। ইংরাজী humour কথার উৎপত্তি Latin *Humus* (moisture) হইতে। তাহাতে ধরা যায়, যাহা মনকে সরস (moist) করিয়া থাকে।

প্রকৃত "হাস্যরসই" যে একমাত্র মনকে সরস করে, তাহা নহে। মনের অবস্থার উপর সরসতা নিরসতা নির্ভর করে। ["রলয়োরভেদে" সূত্র ধরিলে অলসতা আলস্যের বিশ্রাম বলিলে অরসতা (রসহীনতা) বুঝাইবে]। ভাষার বিচিত্র ব্যাখ্যা বাদ দিলেও humour জিনিষটা আমরা প্রত্যেকে মনে মনে স্বভাবমত অনুভব করি। এক সময়ে একসঙ্গে যত বেশী লোককে ইহা বিমুগ্ধ করে (হাসায়), ততই তাহার কৃতিত্ব ও সার্থকতা বেশী।

হাসির উদ্ভব সাধারণতঃ হঠাৎ হইয়া থাকে এবং হাসি একটু যেন সংক্রামক (ব্যাধি নয়) এবং তাহাতে মনের একটা বিভিন্ন অবস্থা দেখা দেয়। এই বিষয় ধরিয়া কেহ কেহ বলেন, হাসির পশ্চাতে sudden glory এমন একটা ভাব থাকে। এক জন অল্প ইংরাজী জানা জার্ম্মাণ, বিলাতী থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। যখন দর্শকগণ কথা শুনিয়া হাসিতেছে, তখন সে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়াছিল। অন্য একটি করুণ দৃশ্য যখন দেখান হইতেছিল, তখন সকলে কাঁদিতেছিল ; কিন্তু সে পূর্ব্ব-দৃশ্যের কথা ততক্ষণ বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দর্শকগণ বিরক্ত হইয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। তখন সে পরের দৃশ্যের কথা মনে করিয়া (ও নিজের অপমানের কথা ভাবিয়া) কাঁদিয়া উঠিল। থিয়েটার ভাঙ্গার পর দর্শকগণ এ গল্প অনেকের কাছে করিল ও সকলেই হাসিল। (এই গল্পে Glory আছে, কিন্তু suddenness ইহাতে নাই, অন্ততঃ, জার্ম্মাণের পক্ষে তাহা ছিল না)

এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ"। রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা পদ্য না গদ্য ? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "ইহা পদ্য"। রাজা প্রশ্ন করিলেন, "চারি চরণ কই ?" উত্তর হইল, "বিড়াল—তাহার চারি পদ"। প্রশ্ন হইল, "রস কোথায় ?" উত্তর হইল "দুগ্ধেই রস"। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "ছন্দ কই ?" উত্তর হইল, "বিড়াল চুমুক দিতে পারে না, তালে তালে চুক্ চুক্ করিয়া খায়, তাহাই ছন্দ"। প্রঃ—"ইহার যতি কোথায়"? উঃ—'পিবতি গতিব্যঞ্জক'। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই হাসিলেন—কিন্তু রাজা তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া পুরস্কার দিলেন ও বলিলেন, "আপনার কথাব্যবহারের পাণ্ডিত্য ও অর্থের জন্য পুরস্কার।"

গল্পটিতে হাস্যোদ্দীপক যে বিশেষ কিছু আছে, তাহা বলা যায় না এবং কেহ কেহ বলিবেন, ইহা একটু ছেলে-ভুলান মত। কিন্তু সমস্ত গল্পটির মধ্যে যে পণ্ডিত-মূর্খের হাস্যরস আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

হঠাৎ বাদশাহ রাগ করিয়া হুকুম দিলেন—"উজীর সাহেবের

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হউক।" কারণ যাহাই থাকুক না কেন, বাদশাহার হুকুম আর ফিরিবে না। উজীর সাহেব অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। বাদশাহ স্থির, অটল। অনেকক্ষণ পর তিনি বলিলেন, "দণ্ডাজ্ঞা তোমার উপর থাকিবেই, তবে তুমি কিভাবে (কি উপায়ে) মরিতে চাও বল, তাহা আমি মঞ্জুর করিব।" উজীর সাহেব বলিলেন, "হুজুর মেহেরবান্, আমি বৃদ্ধ বয়স পাইয়া মরিতে ইচ্ছা করি।" বাদশাহ কথা আর উল্টাইতে পারিলেন না। (যমরাজের কাছে সাবিত্রীর বর প্রার্থনার কথা এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়িবে)। এই গল্পটিতে humour (হাস্যরস) অপেক্ষা wit-এর (উপস্থিত বুদ্ধি ও উত্তর) ভাবই বেশী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উত্তরে অবশ্য wit আছে, কিন্তু তাহা কিছু নিম্নস্তরের (gross)। Sudden glory যে কতখানি কি আছে, তাহা পাঠক অনুমান করিবেন।

Caricature, মুখভঙ্গী,কাতু-কুতু দিয়া অবশ্য লোককে হাসান যায়। কিন্তু তাহা "লোক হাসান" মত উপায় (নিম্নস্তরের), সাহিত্যে তাহাদের স্থান বিশেষ প্রকৃষ্ট বলা যায় না। কথকতা, বক্তৃতা ও গল্প আলাপ এগুলিকে সাহিত্যের অঙ্গ বলা যায়। তাহার মধ্যে সরল হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়া থাকে। লোকরঞ্জন মনের আমোদ ও ইচ্ছা সৃষ্টি (interest) করার জন্য নির্দ্দোষ হাস্যরস বিশেষ দরকার। অনেক সংবাদ পত্রিকাতে প্রত্যহ অনেক প্রকার wit ও humour প্রকাশিত হয়। ইহা অবসর সময়ের "খাদ্য" বলিয়া অনেকে তাহা পছন্দ করেন। বহু পুরাকাল হইতেই লোকেরা কোন না কোন ভাবে এরূপ গল্প ও কথা উপভোগ করিয়া আসিয়াছে। মানুষের জীবনে তাহার শক্তি কতখানি, কিভাবে ক্রিয়া করে ও প্রতিফলিত হইয়া আসিয়াছে অথবা হইয়া থাকে, তাহা অল্প কথায় বলা কঠিন। ভাষা ব্যবহারের, ভাব প্রকাশ করিবার এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও সজাগ করিবার জন্য হাস্যরস বেশী কার্য্যকর। তাহাতে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, উদারতা আনে। জীবনে সুখ-দুঃখকে একটা sportsman like spirit এ দেখিতে ও সহ্য করিতে পারে এবং অন্যের জীবনে আমা অপেক্ষা আরও অধিক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা মানুষ করিয়াছে, এরূপ একটা ভরসার কথা মনে করিয়া জীবনকে অনেকটা হাস্যরসে সিঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে।

সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে উদাহরণ দিতে গেলেই প্রথমেই মনে হয় যে এত ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে, যাহা উদ্ধৃত করিতে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার এবং কতকগুলি humour সাহিত্যে লিখিত ভাষায় স্থান না পাইলেও মুখে মুখে বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মূল উৎপত্তি বাহির করা কঠিন। তবে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সমাজে হাস্যরসের একটা স্বাভাবিক স্ফুরণ ও বিকাশ বিভিন্ন রকমের দেখা যায় তাহার ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান করিতে অনেকেই বিশেষ আনন্দ পাইবেন। ঐতিহাসিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের কথা ধরিতে গেলেও সাহিত্যে humour প্রকাশ করার উপায় ও ভঙ্গী বাদ দেওয়া যায় না। তাহার মধ্যেও অনেক প্রকার বিবর্ত্তন (evolution) দেখা যায়।

শ্রীকালিদাস বাগচী (এম. এস-সি)।

শক্তি-কান্তি

(The beauty of strength)

(প্রার্থনা)

শক্তি-আলো! দীপ্ত চির-
রবি!
মৌনে করো উন্মুখর
কবি!

তোমার নীল সাধনা বীর,
জপে যে প্রাণ পরিচিতির
লাগি',
চিরদিনের হও হে সাথী,
শরণ তরে শিখাও রাতি
জাগি'

বরিতে ঐ রক্তশিখা-
রাজি;
কান্ত! দীপা বাসন্তিকা
সাজি

ভরো অতুল ফুলদ-ভায়
বাসুক ফণী মণিমালায়
ভালো;
প্রাণি—এসো সুদূর প্রিয়!
সমীপে মোর চিরাত্মীয়
আলো!
তোমায় বরি' শক্তি যেন
মানি;
বীর্য্য! দাও তূর্য্য-ভানু-
পাণি।
বিরহ আর আমি
জপি' মিলন-স্বামী,
র'ব না আজ, কণ্ঠে জাগো
গানে;
বক্ষে জাগো সখ্য-বর-
দানে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

শৌর্য্য-শান্তি

(The Peace of power)

(সাড়া)

শক্তি আছে শক্তি আছে
প্রাণে;
উদ্বোধিয়া তোল রে গানে
গানে।

মেলিয়া ধর্ মুগ্ধ যত
বাসনা-মঞ্জরীর নত
দল
দুরাশ পানে; রে বৈভবী,
বক্ষে তোরি লক্ষ রবি-
বল

সুপ্তসম রয় যে চির
দিন;
ঝঙ্কৃ' তোল্ সে-সুর অম-
লিন।

সুখ-আলস দুখ-নিঝর
মূর্চ্ছনারে স্তব্ধ কর্
কবি!
কবিতা নয় কাঁদন শুধু
রিক্ত-ফুল তাপন—ধূ-ধূ
ছবি।
কাঁটার মত ব্যর্থ ব্যথা
চয়
নির্ম্মমতা কৃপাণে কর্
লয়
স্নিগ্ধ নহে ভবে
বিলাপ-উৎসবে
নিরাশা-জয় অশ্রুমুখী
গীতি;
শৌর্য্যভানু শান্তি ঢালে
নিতি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্বরমাত্রিক ছন্দে প্রতি পর্ব্বে স্বরকেও (syllable) ব্যষ্টি ধরা যায়, মাত্রাকেও। এ দুটি কবিতাতে প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে স্বর আছে। পাঁচটি ক'রে মাত্রা। তাই একে মাত্রাবৃত্ত ক'রেও পড়া যায়, স্বরবৃত্ত ক'রেই। "স্বরমাত্রিক" নাম শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের প্রদত্ত।

মৃত্যু-কবলে

১৩

নদীবক্ষে সংগ্রাম

সার্জ্জেণ্ট-পরিচালিত মোটর-লঞ্চ শৃঙ্খলমুক্ত শিকারী কুকুরের মত সবেগে নদীর অনুকূল স্রোতে ধাবিত হইল। তাহার গতিবেগে নদীর তরঙ্গরাশি তাহার উভয় পার্শ্ব হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আরোহিত্রয়ের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির কৃষ্ণবর্ণ আবরণ নিকষ-পাষাণের দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ সম্মুখে প্রসারিত ছিল, করাতের ন্যায় সেই অন্ধকার চিরিয়া লঞ্চ তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল, নদীতীরবর্ত্তী উন্নত-শীর্ষ তরুশ্রেণী সেই জমাট অন্ধকারে

নদীবক্ষে সংগ্রাম

শাখা-প্রশাখা আবৃত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পশ্চাতে সরিয়া যাইতে লাগিল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া নদীর উভয় তীরে যে সকল পীতাভ আলোক-বিন্দু লক্ষিত হইতেছিল, সেগুলি পশ্চাতে পড়িয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে লাগিল। আবার নূতন নূতন আলোক-বিন্দু উভয় তীর হইতে দূর-গগনস্থিত নক্ষত্রালোকের ন্যায় নির্নিমেষ নেত্রে সেই তরণীর দিকে চাহিয়া দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত এবং ক্রমশঃ নদীতীর-বর্ত্তী অন্ধকার-যবনিকায় বিলীন হইতে লাগিল। লঞ্চখানি পূর্ণবেগে ঠিক একভাবেই চলিতে লাগিল, তাহার গতি হ্রাস হইল না। ডিটেক্‌টিভ রয়েড় এবং ইন্‌স্পেক্টর বেল উভয়েরই

হৃদয় তখন উৎসাহে পূর্ণ। মুলিঙ্গারকে সদলে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহাদের সকল অবসাদ এবং পরাজয়-জনিত মনঃক্ষোভ যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়াছিল।

নূতন আশার আলোকে তাঁহাদের হৃদয়-নিহিত নিরাশার অন্ধকার অপসারিত হইলেও তাঁহারা যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা যে কেবল সঙ্কটসঙ্কুল—ইহাই নহে, তাহার নিশ্চয়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবারও উপায় ছিল না। কারণ, সেই নদীতে তখন বহুসংখ্যক বার্জ্জ, ষ্টীমার, মোটর-বোট প্রভৃতি যাতায়াত করায় তাহাদের দ্বারা তাঁহাদের গতিরোধের আশঙ্কা ছিল, তাহার উপর ঐ সকল বিভিন্ন জলযানের মধ্যে তাঁহাদের লক্ষ্য—মুলিঙ্গারের বোট কোন্‌খানি, তাহা নির্ণয় করাও দুরূহ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য ষ্টীমার, মোটর-লঞ্চ প্রভৃতি তাঁহাদের সম্মুখে পড়িলেও তাঁহাদের পরিচালিত লঞ্চে পুলিস-বোটের সাঙ্কেতিক আলোক প্রজ্বলিত থাকায় অন্যান্য ষ্টীমার প্রভৃতি দ্রুতগামী জলযান-সমূহ তাঁহাদের লঞ্চের সম্মুখ হইতে সতর্কভাবে দূরে সরিয়া যাইতেছিল; এ জন্য তাঁহাদের পথের বাধা অপসারিত হইতেছিল; সুতরাং তাঁহাদিগকে গতিবেগ হ্রাস করিতে হইল না, তাঁহারা কোন বাধাও পাইলেন না।

ইন্‌স্পেক্টর বেল নীরবে চতুর্দ্দিক্ লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের মোটর-লঞ্চ বহুদূর অগ্রসর হইলে তিনি কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব উচ্চ করিয়া বলিলেন, "যদি আমরা ডুবিয়া না মরি, তাহা হইলে সেই রাস্কেলগুলাকে নিশ্চিতই ধরিয়া জেলে পুরিতে পারিব। আমরা বোধ হয়, তাহাদের দ্বিগুণ-বেগে চলিতেছি, কি বলেন ?"

রয়েড মাথা নাড়িয়া তাঁহার উক্তির সমর্থন করিয়া অন্ধকারপূর্ণ নদীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "উহারা তিন জনই একসঙ্গে জুটিয়াছে কি না, তাহাই ভাবিতেছি। মুলিঙ্গার কি তাহার অনুচর দুটোকে—?"

রয়েড লঞ্চের যে স্থানে বসিয়াছিলেন, নদীর জলকণা সেই স্থানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার চোখে মুখে পড়িতেছিল। তিনি চক্ষু হইতে সেই সকল জলকণা অপসারিত করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "মুলিঙ্গার সেই বাগানবাড়ী হইতে পলায়নকালে তাহার সহযোগিদ্বয়কে মোটর-বোটে তুলিয়া লইয়া থাকিতেও পারে ; কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি চাই পালের গোদা সেই মুলিঙ্গারকে। তাহার হাতে দড়ি দেওয়ার জন্য আমি কোন কষ্টকেই কষ্ট জ্ঞান করিব না এবং তাহাকে মুঠায় পুরিবার জন্য যদি আমাকে সাঁতার দিয়া আটলাণ্টিক পার হইতে হয়, অথবা দুরারোহ হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল হাসিয়া বলিলেন, "কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ? সাঁতার দিয়া আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হওয়া বরং সম্ভবপর, কিন্তু হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টে আরোহণ কিরূপ অসাধ্য ব্যাপার, তাহা হিমালয়ে আরোহণের জন্য সচেষ্ট জাম্মাণ পর্য্যটকগণের অজ্ঞাত নহে, কুসংস্কারান্ধ দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গদের বিশ্বাস, হিমালয়ের দেবাত্মা তাহার পিঙ্গলবর্ণ ও গগনস্পর্শী জটারাশি আন্দোলিত করিলে হিমালয়ের আরোহিগণকে গিরিপাদমূলে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া অস্থিকঙ্কাল চূর্ণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলে, যাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া অতি কষ্টে হিমালয়ের জঘনদেশ হইতে অবতরণ করিয়া স্বদেশে পলায়ন করে, তাহাদেরও নিস্তার নাই ; হিমালয়ের ভূত আকাশ-পথে তাহাদের অনুসরণ করিয়া তাহাদেরও ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে নিজের দলভুক্ত করিয়া থাকে, ইহা কৃষ্ণাঙ্গ নেটিভগুলার কুসংস্কার হইতেও পারে, কিন্তু এই কুসংস্কার যে অমূলক নহে, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব আপনি সাঁতার দিয়া আটলাণ্টিক পার হইতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণের স্বপ্ন দেখিবেন না। মুলিঙ্গার বাঁচে বাঁচুক, কিন্তু তাহাকে ধরিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনি মরিবেন না ; আপনাকে হারাইলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অর্দ্ধেক গৌরব নষ্ট হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বেলের এই মন্তব্যে রয়েড ঐ প্রকার আত্মম্ভরিতা প্রকাশের জন্য লজ্জা বোধ করিলেন, তাঁহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল ; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর বেল সেই নৈশ অন্ধকারে তাঁহার সহযোগীর মুখভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। রয়েড মুখ ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।

তাঁহারা পূর্ব্ববৎ দ্রুতবেগে আরও কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের মোটর-লঞ্চ পরিচালিত করিয়া অরওয়েল নদীর মোহনার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কিছু দূরে যে দ্রুতগামী মোটর-বোট দেখিতে পাইলেন, তাহাই পলাতক দস্যু মুলিঙ্গারের মোটর-বোট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল, পলায়নের চেষ্টা ভিন্ন কেহই ঐরূপ দ্রুতবেগে মোটর-বোট পরিচালিত করে না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হইলেও পূর্ব্বাকাশে তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল ; কিন্তু খণ্ডবিখণ্ড মেঘস্তর মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় আকাশে ভাসিয়া যাইতেছিল ; নবোদিত খণ্ডচন্দ্র সেই মেঘরাশির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকায় অন্ধকারে প্রথমে তাঁহারা অগ্রগামী মোটর-বোটখানি দেখিতে পান নাই, কিন্তু সহসা যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডস্পর্শে সেই মেঘরাশি কিছু দূরে অপসারিত হওয়ায়, ক্ষীণপ্রভ শশধরের অস্ফুট আলোক নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইল। সেই কৌমুদী-রাশি-সম্পাতে অরওয়েল নদীর স্বচ্ছ সলিল-প্রবাহ তরল রজত-প্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং পলাতক দস্যু-পরিচালিত মোটর-বোটখানি সরোবর-সলিলে ভাসমান রাজহংসের ন্যায় দূর হইতে দূরে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের লঞ্চের গতিবেগ প্রশমিত না করিয়া পূর্ব্ব-বৎ দ্রুতবেগেই তাহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহাদের অনুমান হইল, পলাতক দস্যুগণের পরিচালিত মোটর বোটখানি

সেই স্থান হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে ছিল। যেন তাহা দিগন্তব্যাপী কৌমুদীরাশিতে স্নাত হইয়া রজতশুভ্র নদীপ্রবাহে দিগন্তের অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল।

এই দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া রয়েডের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সার্জ্জেণ্টের নিকট হইতে যে রিভলভারটি প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন, তাহা হাতে লইয়া অধীরভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বেল সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নির্নিমেষ-নেত্রে অগ্রগামী মোটর-বোটখানির গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নদীর জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় তাঁহার চোখ-মুখ প্লাবিত করিতেছিল, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি কি কৌশলে দস্যু-পরিচালিত মোটর-বোটের সন্নিকট-বর্ত্তী হইয়া তাহা আক্রমণ করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যে দুরূহ সংকল্পে তাঁহারা মোটর-বোটের অনুসরণ করিতে-ছিলেন, নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশে সেই সংকল্প সিদ্ধ করা কতদূর কঠিন হইবে, সে চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে স্থান পাইল না। কার্য্যসিদ্ধিই তখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য।

ইন্‌স্পেক্টর বেল ও রয়েডকে স্ব স্ব চিন্তায় বিভোর ও নির্ব্বাক্ দেখিয়া সার্জ্জেণ্ট এতক্ষণ পরে সর্ব্বপ্রথমে কথা কহিল। নিজের শক্তির উপর তাহার বিশ্বাস ছিল অসাধারণ; সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া সে বলিল, "আর অধিক বিলম্ব হইবে না, ইন্‌স্পেক্টর! আমরা দেখিতে দেখিতে উহাদের ঘাড়ে গিয়া পড়িব।"

সার্জ্জেণ্টের এই উক্তি যে অসার দম্ভ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। মুলিঙ্গারের সহযোগীর মোটর-বোট বেগবান্ যান হইলেও সার্জ্জেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর বেল ও ডিটেক্‌টিভ রয়েডকে যে স্পীড্-বোট ভাড়া করিয়া দিয়াছিল, তাহা এত লঘুভার এবং তাহার কল-কব্জা এরূপ সুদৃঢ় ও বাজি মারিবার উপযোগী ছিল যে, মোটর-বোট পূর্ণবেগে চলিয়াও দীর্ঘকাল সেই স্পীড্-বোটকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া দূরে চলিয়া যাইবে—তাহার উপায় ছিল না। সার্জ্জেণ্ট-পরিচালিত স্পীড্-বোট শক্তিশালী এরো-প্লেনের মত নদীর তরঙ্গরাশির উপর দিয়া যেন উড়িয়া চলিল। কোন মোটর-বোট সেরূপ বেগে চলিতে পারে না।

ক্ষণকাল পরে আর একখানি মেঘ আসিয়া, পূর্ব্বাকাশের ঈষৎ উর্দ্ধে সমুদিত চন্দ্রের বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। সহসা মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সুগম্ভীর শব্দে স্তব্ধ নদীবক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক-নিক্ষিপ্ত একটি গুলী ঝপাং শব্দে বায়ুবেগে ধাবমান স্পীড্-বোটের ঠিক পশ্চাতে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই সুগম্ভীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি নৈশবায়ুপ্রবাহে বিলীন না হইতেই 'দুড়ুম, দুড়ুম দুম্' শব্দে এক ঝাঁক গুলী বর্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টর বেল অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বেলের আর্ত্তনাদে বিস্মিত বিচলিত রয়েড বলিলেন, "কি হইল? আহত হইলেন কি? শত্রুরা আমাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর বেল যন্ত্রণা গোপন করিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "ঠিক; উহাদের নিক্ষিপ্ত গুলীতে আমার বাঁ হাত জখম হইয়াছে, কিন্তু ডান হাত সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম আছে, ইহা উহাদিগকে বুঝাইতে বিলম্ব হইবে না।"

দুই এক মিনিট পরে মেঘস্তর অপসারিত হইলে পুনর্ব্বার চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইল। ইন্‌স্পেক্টর বেল চন্দ্রালোকে সম্মুখবর্ত্তী মোটর-বোটের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়ায় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার উদ্যত করিলেন। মোটর-বোটখানি তখন স্পীড্-বোটের প্রায় একশত গজ দূরে ছিল, তথাপি ইন্‌স্পেক্টর বেল লক্ষ্য স্থির করিয়া রিভলভারের ঘোড়া টিপিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বেলের রিভলভার-নিক্ষিপ্ত গুলী যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাকে আহত করিতে পারিল কি না, তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল। একে দস্যুদলের মোটর-বোট হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী বর্ষিত হওয়ায় অবিশ্রান্ত বন্দুক-নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাহার উপর সেই স্পীড্-বোটের এঞ্জিনের অশ্রান্ত ঘস্ ঘস্ ধ্বনি এবং তাহার গতি নিবন্ধন জলের ঝপ্-ঝপ্ শব্দ। সকল শব্দ একত্র মিশিয়া যে মিশ্র শব্দ-কল্লোলের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া, মোটর-বোটের কোন আরোহী ইন্‌স্পেক্টর বেলের রিভলভারের গুলীতে আহত হইয়া থাকিলেও, তাহার আর্ত্তনাদ পশ্চাদ্বর্ত্তী স্পীড্-বোটের কোনও আরোহীর কর্ণগোচর হইবার

বসুমতী-চিত্রবিভাগ

সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা মোটর-বোটের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সুস্পষ্টরূপে কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

"সাবধান হউন"—স্পীড্-বোটের চালক সার্জ্জেণ্ট এই সংক্ষিপ্ত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াই চক্ষুর নিমেষে স্পীড্-বোটের গতি এ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিল যে, তাহা ভীষণ বেগে ডানদিকে ঘুরিয়া গেল। সেই নদীর প্রকৃতি, তাহার স্রোতের বেগ ও বিশেষত্ব, তাহার বিশেষ বিশেষ অংশের বৈচিত্র্য সার্জেণ্টের সুপরিজ্ঞাত ছিল। সে একটা ঝাঁকুনী দিয়া স্পীড্-বোটখানির গতি এক মুহূর্ত্তে এভাবে পরিবর্ত্তিত করিল যে, মোটর-বোটখানি তাহার বামে থাকিতে বাধ্য হইল। সে জানিত, স্পীড্-বোটের গতি এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে মোটর-বোটকে নিরুপায় হইয়া অগভীর জলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং তাহার ফলে তাহাকে চোরা বালির স্তরে গিয়া লটর-পটর করিতে হইবে। তাহার এঞ্জিনের সাধ্য হইবে না যে, সেই বাধা ঠেলিয়া তাহাকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিবে।

স্পীড্-বোট মোটর-বোটের গুলীবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইল; কিন্তু স্পীড্-বোটের পরিচালকের কৌশলে মোটর-বোটকে কোণ-ঠাসা হইতে হইল। তাহার বাম পার্শ্বে অধিক জল না থাকায় তাহাকে তীর-সন্নিহিত অগভীর জলরাশি ভেদ করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইল। সেই সময় উভয় বোট পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলিতেছিল এবং দস্যুরা ধরা পড়িবার ভয়ে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া স্পীড্-বোটের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীবর্ষণ করিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর বেল ও রয়েড মোটর-বোটের আরোহীদের লক্ষ্য করিয়া সাধ্যানুসারে গুলীবৃষ্টি করিতেছিলেন বটে, কিন্তু দস্যুরা সুকৌশলে আত্মরক্ষা করায় কেহই আহত হইল না। এ দিকে দস্যুনিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে স্পীড্-বোটের কাঠের তক্তার পাটাতন ঝাঁঝরা হইয়া গেল; তবে সৌভাগ্যক্রমে তাহার এঞ্জিনের কোন ক্ষতি হইল না। দস্যু-নিক্ষিপ্ত গুলী তাহার সুদৃঢ় আবরণ বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিতে পারিল না।

ইন্‌স্পেক্‌টর বেল হঠাৎ রিভলভার নামাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন মিঃ রয়েড, চাহিয়া দেখুন, মোটর-বোট চলিতে চলিতে চড়ায় বাধিয়া গিয়াছে; আর এক ইঞ্চিও সম্মুখে অগ্রসর হইবার শক্তি নাই! উহার বুকে মাটী ঠেকিয়াছে।"

মোটর-বোট তখন নদীর কিনারায় অগভীর জলের নিম্নস্থিত মাটীতে বাধিয়া কাঁপিতেছিল এবং তাহার শক্তিশালী এঞ্জিন সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেছিল, বোট ততই গভীরভাবে মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছিল। এঞ্জিনের প্রচণ্ড চেষ্টা বিফল হওয়ায় বোটের চারিদিকের জলরাশি আন্দোলিত ও আলোড়িত হইতেছিল।

মোটর-বোট এইভাবে অকর্ম্মণ্য হওয়ায় তাহার সাহায্যে পলায়ন করা অসাধ্য বুঝিয়া দস্যুপতি মুলিঞ্জার ও তাহার সহযোগিদ্বয় তাড়াতাড়ি মোটর-বোট হইতে নদীর তীরের দিকে লাফাইয়া পড়িল। সেই স্থানে এক কোমরের অধিক জল ছিল না, এবং তীরভূমিও তাহার অদূরে অবস্থিত। তাহারা তিন জনই এক হাঁটু পাঁকের ভিতর দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে তীরের দিকে ধাবিত হইল।

রয়েড এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার রিভলভারের কুঁদাটা বাম হস্তের মণিবন্ধে ঠেস দিয়া রাখিয়া, পলাতক দস্যুত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিলেন। সেই অমোঘ গুলীর আঘাতে তাহাদের এক জন আর্ত্তনাদ করিয়া, নদীতীরে পা বাড়াইবার পূর্ব্বেই, তীর-সন্নিহিত জলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িল, আর উঠিল না। তাহাকে এক হাঁটু জলে মুখ গুঁজিয়া পড়িতে দেখিয়া অবশিষ্ট পলাতক-দ্বয়ের এক জন মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অদূরবর্ত্তী স্পীড্-বোট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল; সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর শব্দ, আর সেই শব্দের সঙ্গেই স্পীড্-বোটের চালক সার্জেণ্টের কাতর আর্ত্তনাদ! সার্জ্জেণ্ট স্পীড্-বোটের হা'লের নিকট পড়িয়া খাবি খাইতে লাগিল। চালকহীন স্পীড্-বোট অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে চক্ষুর নিমেষে প্রচণ্ডবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং বাঁ ধারে তীরের দিকে চলিল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার গতিরোধ হইল; তাহা দস্যুদলের পরিত্যক্ত মোটর-বোটের অদূরে মাটীতে বাধিয়া গেল, এবং দুই একবার সবেগে আন্দোলিত হইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। স্পীড্-বোটের সেই অচল অবস্থায় নিরুপায় এঞ্জিনের ঘস্-ঘসানিতে তাহার শতছিদ্র পাটাতন কাঁপিতে লাগিল,—যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত!

দস্যু-নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলীতে সার্জ্জেণ্টকে আহত হইয়া হাঁ'লের অদূরে ছিটকাইয়া পড়িতে দেখিয়া, রয়েড স্পীড্-বোটের সঙ্কটজনক অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া সার্জ্জেণ্টের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার দেহের কোন্ অংশে গুলী বিদ্ধ হইয়াছে—তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আহত সার্জ্জেণ্ট আত্মসংবরণের চেষ্টা করিয়া সংযত স্বরে বলিল, "ঠিক আছি, আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমাকে ত্যাগ করিয়া নিজের পথ দেখুন।"—সে আড়ষ্ট হাতখানি অতিকষ্টে ঊর্দ্ধে তুলিয়া স্কন্ধ স্পর্শ করিল। গুলী বিদ্ধ হওয়ায় সেই স্থান হইতে শোণিতের স্রোত বহিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল ও রয়েড অচল স্পীড-বোটের উপর হইতে তীরের দিকে চাহিয়া অবশিষ্ট দস্যুদ্বয়কে পলায়ন করিতে দেখিলেন; তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তীরে উঠিয়া তাহারা প্রাণভয়ে অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইবে। তাঁহারা তাহাদের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে নদীর অগভীর জলে লাফাইয়া পড়িলেন। রয়েড তীরে উঠিবার পূর্ব্বেই, তীরবর্ত্তী দস্যুদ্বয়ের যে পশ্চাতে ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার গুলী ছুড়িলেন। সেই অব্যর্থ গুলীর আঘাতে সেই দস্যু দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরাশায়ী হইল। সে তখন রয়েডের প্রায় কুড়ি গজ দূরে ছিল।

তিন জন দস্যুর মধ্যে যে অক্ষতদেহে পলায়ন করিতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রয়েড বলিলেন, পালের গোদা মুলিঙ্গার ঐ পলায়ন করিতেছে। এত চেষ্টাতেও উহাকে পাকড়াইতে পারিলাম না! কি আফশোষ! কিন্তু উহাকেই যে চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল তাঁহার এই আক্ষেপোক্তি শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তৃতীয় দস্যু নদীতীরবর্ত্তী অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

রয়েড ও ইন্‌স্পেক্টর বেল নদীতীরে উঠিবার সময় তীর-সন্নিহিত জলে এক জন আহত দস্যুকে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। সে মুলিঙ্গারের সহযোগী ভার্ণি। ভার্ণির মাথা আধ হাত জলের ভিতর নিমগ্ন ছিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ আড়ষ্ট হইয়াছিল যে, সে জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত রাখিবে, তাহার সেরূপ শক্তি ছিল না।

রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলকে বলিলেন, "এ হতভাগাকে টানিয়া ডাঙ্গায় না তুলিলে জলের ভিতর রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারা যাইবে; আপনি এখানে থাকিয়া উহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করুন, ইন্‌স্পেক্টর! আমার বিশ্বাস, উহার আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে, চেষ্টা করিলেও দীর্ঘকাল উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না; তবে যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই নরপিশাচ বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে উহার মুখ হইতে দুই একটা কাযের কথা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু—আপনি—"

রয়েড হাসিয়া বলিলেন, "আমি? আমার জন্য কোন চিন্তা নাই; আমি একাকী মুলিঙ্গারের অনুসরণ করিব। একাকী এক দিন যে কায আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ একাকীই তাহা শেষ করিব। এবার যদি সে অদৃশ্য হয়, চির-জীবনের জন্য হইবে।"

রয়েড আর সেখানে না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি নদীগর্ভ হইতে তাহার তীরে উঠিলেন, তিনি কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া নদীতীরবর্ত্তী প্রান্তর-প্রান্তে ক্যারোর অসাড় দেহ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার রিভলভারের গুলী তাহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বিদ্ধ হওয়ায় আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নদীর তীরবর্ত্তী প্রান্তরের বহুদূর পর্য্যন্ত নল-খাগড়ার জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। মুলিঙ্গার তাহার অন্তরালে অদৃশ্য হইলেও রয়েড কয়েক গজ দূরে নলের ঝাড় আন্দোলিত হইতে দেখিলেন। চন্দ্র তখন পূর্ব্বাকাশের অনেক ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিল এবং মেঘস্তর অপসারিত হওয়ায় আকাশ নির্ম্মল হইয়াছিল। চন্দ্রালোক ঈষৎ ম্লান হইলেও সেই আলোকে সুবিস্তৃত প্রান্তর-ভূমির দৃশ্য সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। রয়েড নল-বনের কতকগুলি নলের ডগা ভাঙ্গিবার মট্-মট্ শব্দ শুনিতে পাওয়ায় শব্দ লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন।

সহসা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর শব্দ শুনিয়া রয়েড সচকিতভাবে এক পাশে লাফাইয়া পড়িলেন। অগ্নিময় ধাতুপিণ্ডের সংঘর্ষণে উত্তপ্ত বায়ু-তরঙ্গ তাঁহার ললাট-প্রান্তে

তপ্ত নিশ্বাস বুলাইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিবিড় গুল্ম-রাশির ভিতর মাথা গুঁজিলেন। তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় নূতন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই গভীর নিশীথে সেই ঘনসন্নিবিষ্ট গুল্ম-রাশির অভ্যন্তরভাগ এরূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল যে, রয়েড চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি অন্ধের ন্যায় হাতড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত-সঞ্চালনে গুল্ম-রাশির শাখা-পত্র হইতে খস্-খস্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে তাঁহার মনে হইল, সেই গাঢ় অন্ধকাররাশি অপেক্ষাকৃত তরল হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার অনুমান হইল, তিনি সেই অরণ্যের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন।

রয়েড নিবিড় তৃণরাশির ভিতর মাথা গুঁজিলেন

সেই স্থান হইতে আরও কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া রয়েড মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি সম্মুখে চন্দ্রকরোজ্জ্বল সুপ্রশস্ত সমতল প্রান্তর দেখিতে পাইলেন; সেই প্রান্তর বৃক্ষাদিবর্জ্জিত, সেখানে লতা-গুল্মের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহার কোন দিকে নয়ঞ্জুলি বা কোন বেড়াও তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল না। এই স্থানটি স্থানীয় 'এয়ার কোর্স' ষ্টেশনরূপে ব্যবহৃত হইত এবং এরোপ্লেন সমূহ ঊর্দ্ধাকাশে গমনাগমনের পথে এই স্থানে অবতরণ করিত। কিন্তু সেই সময় সেই স্থান খালি পড়িয়াছিল।

রয়েড বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। 'মুলিঙ্গার সেইরূপ অল্পসময়ের মধ্যে অধিক দূরে পলায়ন করিতে পারে নাই বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ন্যূনকল্পে আধ মাইলের মধ্যে এরূপ কোন বৃক্ষ অথবা লতাগুল্ম দেখিতে পাইলেন না, যাহার অন্তরালে কোন শৃগাল-কুক্কুর দূরের কথা, একটি বেজী লুকাইয়া থাকিতে পারিত। কিন্তু সেই মুক্ত প্রান্তরের একপাশে তিনি দুই বিঘা পরিমিত স্থানে দীর্ঘ তৃণরাশিপূর্ণ একটি জঙ্গল দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, মুলিঙ্গার পূর্ব্বোক্ত অরণ্য অতিক্রম করিয়া হয় ত এই তৃণরাশির অন্তরালে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইবামাত্র রয়েড স্বাভাবিক সংস্কারবশে আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা করিয়া পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সেই প্রান্তরের প্রান্তস্থিত একটি বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তিনি সেই বৃক্ষের অন্তরালে পদার্পণমাত্র পিস্তলের একটা গুলী, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানে সবেগে আসিয়া পড়িল। গুলীটি যে সেই তৃণ-রাশি-সমাকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, পিস্তলের গর্জ্জন শুনিয়াই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। মুলিঙ্গার সেই স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার আশায় গুলী নিক্ষেপ করিয়াছিল, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, অবিলম্বেই মুলিঙ্গারের সহিত তাঁহার সম্মুখ-যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং সেই যুদ্ধই তাঁহাদের শেষ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে তাঁহার বা মুলিঙ্গারের মৃত্যু অপরিহার্য্য। মুলিঙ্গার

বুঝিতে পারিয়াছিল, বৃক্ষলতাগুল্মবর্জ্জিত সেই সমতল মুক্ত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া রয়েডের অদৃশ্যভাবে দূরে পলায়ন করা তাহার অসাধ্য হইবে; এই জন্য সে সশস্ত্র অদূরবর্ত্তী তৃণক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকিয়া রয়েডকে আক্রমণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রয়েড পূর্ব্ব-কথিত বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে আততায়ীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মুলিঙ্গার তৃণরাশির আশ্রয় ত্যাগ করিল না; এই জন্য সে কোন্ স্থানে লুকাইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য রয়েড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি সেই তৃণরাশির কোন অংশ আন্দোলিত হইতে দেখিলেন না, কোন শব্দও তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। মুলিঙ্গার সেই স্থান হইতে কত দূরে ছিল, তাহাও তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

রয়েড ভাবিলেন, "মুলিঙ্গার বুঝিতে পারিয়াছে—পলায়ন করা তাহার অসাধ্য। সে জানে, তৃণরাশির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অনাবৃত মাঠে আসিলেই তাহার বিপদ; আমার রিভলভারের গুলীতে তাহাকে আহত হইতে হইবে। আমি এখানে থাকিলে তাহাকে ধরিতে পারিব না, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছে; আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে ঐ তৃণরাশির ভিতর প্রবেশ করি—ইহাই তাহার ইচ্ছা। সম্ভবতঃ সে আমাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি তাহার এই ইচ্ছা ব্যর্থ করিব।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রয়েড নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই তৃণরাশির ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই তৃণক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অনুচ্চ গুল্মের ঝোপও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই ঝোপের ভিতর দিয়া তিনি সতর্কভাবে অগ্রসর হইলেন। তিনি উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া সম্মুখ হইতে গুল্মশাখাগুলি অপসারিত করিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলেন। প্রত্যেক-বার পদবিক্ষেপের সময় তিনি সম্মুখে ও দুই পাশে যত দূর দৃষ্টি যায়—তত দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেঠো ইঁদুরের পলায়ন-শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। মুলিঙ্গার যেখানেই লুকাইয়া থাকুক, রয়েড তাহার সাড়া পাইলেন না।

রয়েড সতর্কভাবে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া উভয় স্কন্ধের উপর দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল, মুলিঙ্গারের অদৃশ্য হস্তস্থিত পিস্তল যে কোনও মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানেই ধরাশায়ী করিতে পারে।

সহসা অদূরবর্ত্তী গুল্মের শাখাপ্রশাখা আন্দোলিত হইল। সেই শব্দে রয়েডের গতিরোধ হইল। তিনি অসাড়-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু শব্দটা ঠিক কোন্ স্থান হইতে আসিল, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তবে তাহা যে অতি নিকটের শব্দ, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

রয়েড বিদ্যুদ্বেগে হাত বাড়াইতেই একটা কঠিন দ্রব্য তাঁহার হাতে ঠেকিল। প্রথমে তাঁহার ধারণা হইল, তাহা কোন অনতিদীর্ঘ বৃক্ষের কাণ্ড; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহা একটি শুষ্ক বৃক্ষশাখা, তাহা ভাঙ্গিয়া গাছে বাধিয়াছিল। তাহার অগ্রভাগ আঁকুশীর মত বাঁকা, তাহা হাতে লইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেই শুষ্ক শাখার বক্র অগ্রভাগের সাহায্যে অদূরবর্ত্তী কোন দ্রব্য আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

এই শাখাটি হাতে লইয়া হঠাৎ একটা নূতন ফন্দী তাঁহার মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিল। তিনি হাতখানি যথাসাধ্য প্রসারিত করিয়া সেই আঁকুশী একটি ঝোপের ডাল-পালায় বাধাইয়া দিয়া তাহা সবেগে আন্দোলিত করিতে লাগিলেন।

রয়েডের এই কৌশল বিফল হইল না। মুলিঙ্গার সেই আন্দোলিত শাখা-পল্লব লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলী বর্ষণ করিল। তাহার আশা হইল, সেই গুলী রয়েডের দেহে বিদ্ধ হইয়াছে।

সেই গুলীবর্ষণে কেবল যে গম্ভীর শব্দ হইল, এরূপ নহে, তাহা হইতে অনলপ্রভা নিঃসারিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সেই স্থান আলোকিত করিল। সেই মুহূর্ত্তস্থায়ী অনলপ্রভায় রয়েড অদূরবর্ত্তী মুলিঙ্গারকে দেখিতে পাইলেন। সে তখন রয়েডের প্রায় ছয় ফুট দূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সম্মুখস্থিত গুল্মের পত্ররাশির অন্তরালে সে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও তাহার দেহের কিয়দংশ রয়েডের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

তাহাকে দেখিবামাত্র রয়েড তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে উভয় হস্ত

প্রসারিত করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মুলিঙ্গারের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিলেন। সেই প্রচণ্ড চাপে মুলিঙ্গারের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইল। সে তাহার হাতের পিস্তল ঊর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা করিতেই রয়েড তাহার তলপেটে এরূপ জোরে পদাঘাত করিলেন যে, মুলিঙ্গারের হাত হইতে পিস্তল খসিয়া পড়িল, সে গভীর যন্ত্রণায় দুই হাতে তলপেট চাপিয়া ধরিল। কিন্তু রয়েডের উভয় হস্তের চাপে মুলিঙ্গারের শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় সে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া গলা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার হাত আর গলা পর্য্যন্ত উঠিল না, তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার উন্মুক্ত মুখ-বিবর হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। তখনও রয়েড দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার গলা এরূপ জোরে টিপিয়া ধরিলেন যে, তাহার উভয় চক্ষু কপালে উঠিয়া চেতনা বিলুপ্ত হইল। মুলিঙ্গার যতক্ষণ পারিয়াছিল, হাত-পায়ের সাহায্যে রয়েডকে আঘাত করিয়া তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চেতনা বিলুপ্ত হওয়ায় তাহার অবসন্ন হাত দুইখানি নিশ্চেষ্টভাবে দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িল।

রয়েড বলিলেন, "মুলিঙ্গার, যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছে ত? আত্মসমর্পণ করিবে না মরিবে?"

কিন্তু কে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবে? মুলিঙ্গার তখন চেতনাহীন নির্ব্বাক্। তাহার অচেতন দেহ রয়েডের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেই রয়েড তাহার গলা হইতে হাত টানিয়া লইলেন এবং তাহার দুই হাত একত্র করিয়া তাহাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিলেন।

কয়েক মিনিট পরে মুলিঙ্গারের চেতনা-সঞ্চার হইল। রয়েডের উভয় হস্তের ব্যায়াম-পুষ্ট সুদৃঢ় অঙ্গুলীর নিষ্পেষণে মুলিঙ্গারের চেতনা বিলুপ্ত হইলেও ঐরূপ অল্পসময়ে তাহার ন্যায় বলবান্ দস্যুর প্রাণবিয়োগ হইবে, তাহা তিনি সম্ভব মনে করেন নাই। তাঁহার অনুমান মিথ্যা হয় নাই; নৈশ-বায়ু-প্রবাহে সেই সুশীতল প্রান্তরে মুক্ত প্রকৃতির চন্দ্রাতপতলে পড়িয়া থাকিয়া তাহার চেতনা-সঞ্চার হইলে সে লৌহবলয়ালঙ্কৃত প্রকোষ্ঠযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল।

মিঃ রয়েড ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "চোরের পাঁচ দিন, সাধুর এক দিন। এত দিনে তোমার যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছে; তোমার প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

উৎসব-শেষে

উৎসব-সভার যত আয়োজন,
সকলি হয়েছে শেষ,
সভা-অবসান তাও হ'ল প্রায়,
গানেরও থামিল রেশ।

এসেছিল যারা চ'লে গেল সব,
বুকে বুকে ছিল যত অনুভব,
আজিকার এই ভাঙ্গা উৎসব,
রাখিল না কিছু লেশ;
প্রয়োজন সাথে সকলি ফুরালো,
উৎসব হ'ল শেষ।

সেই সে বাসরে আর কেহ নাই,
তুমি আছ, আমি আছি—
আঁখি 'পরে আঁখি যতনে রাখিয়া,
বুকে বুকে কাছাকাছি।

বলিবার যাহা বাসর-সময়,
শেষ হয়ে গেছে হাসি-অভিনয়;
মনে-মনে এবে শুধু পরিচয়,
প্রাণে প্রাণে যাচাযাচি।
আজি শুধু প্রিয়া তুমি-আমি আছি,
বুকে বুকে কাছাকাছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

যক্ষ্মারোগের সংক্ষিপ্ত আত্মকাহিনী

জার্মাণ পণ্ডিত রবার্ট কক্ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম-সাল আবিষ্কার করিলেও পৃথিবীর বুকে যে আমার অবাধ গতি-বিধি বহুশত বৎসরাধিককাল চলিয়া আসিতেছে, তাহার নিদর্শন কিছু কিছু ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ চরকসংহিতায় ও সুশ্রুতে উল্লেখ আছে। আমার গতিবিধির ধারা পূর্ব্বে সামান্যভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে ডাক্তার ভিটলেন নামে আর এক জন পণ্ডিত আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহাতে আমার বংশবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইলেও জনসাধারণের যে বিশেষ সুফল হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রথম আক্রমন
পশ্চাৎ গতি
রূপান্তর
আরোগ্য
কঠিন রূপান্তর
প্রথম গর্ত্তাবস্থায় পরিনতি
আরোগ্য
বিস্তার
অন্যভাবে কঠিন রূপান্তর
ফুস ফুসের উপরি ভাগে ও নিম্নে যক্ষ্মার উৎপত্তি
নির্গতি যক্ষ্মা
আরোগ্য
যক্ষ্মার কঠিন অবস্থা
প্রকৃত যক্ষ্মারোগে মৃত্যু
শেষ নির্গতি অবস্থা
যক্ষ্মার অচল অবস্থা
প্রকৃত যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু
অপ্রধান ফল উৎপাদন
আরোগ্য
কল্পিত যক্ষ্মায় মৃত্যু

যক্ষ্মার সংক্ষিপ্ত আত্ম-কথা।

উপরের চিত্র হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, মানবদেহে প্রবেশের পর আমার গতি ধীর হইতে থাকিলে রোগী আরোগ্য হয় বটে, কিন্তু আমার মরণ চিরদিনের জন্য ঘটে। আমার দুঃসময়ে কখনও কখনও কোন কঠিন দুর্গের ভিতর অবরুদ্ধ হইয়া ঐ সঙ্গে কঠিনভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়া লোকের আরোগ্য সম্পাদন করি বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আত্ম-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য জয়টীকা লইয়া দৌড়াইতে থাকি। তখন ফুস্‌ফুসের মাঝে গর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া নিজের অবস্থিতি জ্ঞাপনের জন্য কাসির সহিত রক্তে মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ি, তখন রোগীর মৃত্যু ভিন্ন কোন উপায় থাকে না। অবস্থান্তরে অচল হইলে রোগী সময়ে সময়ে অল্প সুস্থ হয় বটে, কিন্তু আমা হইতে অন্যান্য অপ্রধান ফল উৎপাদনে কল্পিত যক্ষ্মারোগে মৃত্যু অনিবার্য্য।

জীবনে আমি কাহাকেও ভয় করি নাই, কিন্তু নেপ্‌লসের যক্ষ্মারোগের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক রেঁজি যাবতীয় প্রতিরোধক ঔষধের মধ্যে রচির সিরোলিনকে আমার মৃত্যুর শ্রেষ্ঠ বাণ বলিয়া জগতে জানাইয়াছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত যক্ষ্মা-নিবাসে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলী সিরোলিনের যথেষ্ট কার্য্যকারিতা ও বীজাণুনাশক ক্ষমতা আছে বলিয়া বহুল পরিমাণে ব্যবস্থা করিতেছেন। সিরোলিন কেবল আমার গতিরোধ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় না, পক্ষান্তরে, রোগীর অপরাপর শারীরিক কষ্ট দুর করিয়া দেহ হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। বৃদ্ধবয়সে আমাকে সিরোলিনের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য।

ডাঃ কালীপদ ভৌমিক (এল-এম-এস্)।
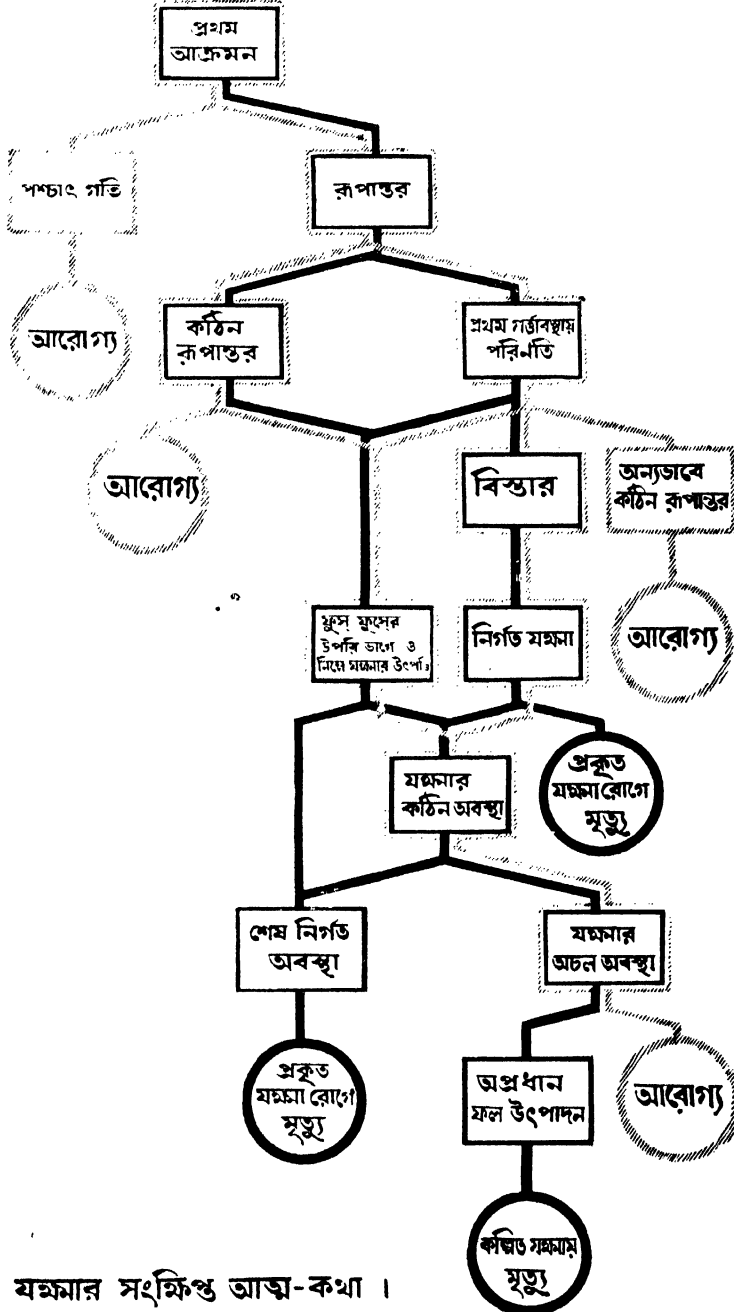
বৈজ্ঞানিকের মুখে বেদান্তের কথা

বৈজ্ঞানিকরা, বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞানবাদীরা বাহ্য জগতের, তথা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। বৈদান্তিকরা বলেন, উহা সত্য নহে, উহা মায়া বা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। সুতরাং উভয়ের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিপরীত। বেদান্তের মায়াবাদ ভারতীয় সিদ্ধান্ত। জড়বিজ্ঞানের বস্তুবাদ হিন্দু ব্যতিরেকে অন্য সকল মানবজাতির সাধারণ সিদ্ধান্ত। এত দিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই বস্তুবাদকে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি বিলাতের British Association of the advancement of scienceএর বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত সভায় সভাপতি (Sir James Jeans) সার জেমস্ জীনস্ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে সমবেত আড়াই হাজার বৈজ্ঞানিকের সমক্ষে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই বাহ্য জগতের অর্থাৎ নিখিল বাহ্য বস্তুর কোন সত্তাই নাই, অন্ততঃ আমরা যে ভাবে উহা দেখিতেছি, সে ভাবে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। এই উপলক্ষে কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, প্রতীচ্য জাতিরা বহির্মুখী দৃষ্টি লইয়া সত্যনির্ণয়ে অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু প্রাচ্য জাতিরা অন্তর্মুখী দৃষ্টির দ্বারা এই জাগতিক সমস্যার সমাধান করিয়া আসিতেছেন। সার জেমস্ জীনস্ চিরাগত প্রতীচ্য পদ্ধতিকে পরিহার করিয়া প্রাচ্য সিদ্ধান্তেরই বশবর্তী হইয়াছেন। তাঁহার মত প্রাচ্য সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিণে যে মত প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, সার জেমস যেন সেই মতেরই অবিকল প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। অথচ তিনি বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি—একবারেই বৈদান্তিক নহেন। তাঁহার এই উক্তিতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের চিন্তাসাগরে এক নূতন কল্লোল উপস্থিত হইয়াছে।

সার জেমস্ জীন্স্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্থান (space), কাল এবং বস্তুত্বমূলক জড়জগতের কোন সত্তাই নাই। মানুষের মানসকল্পনা ভিন্ন আর কুত্রাপি বাস্তব সত্তার কোন অস্তিত্বই নাই। বিলাতের বৈজ্ঞানিক রথী মহারথদিগের সভায় সার জেমস্ এই অভিনব তত্ত্বই আজ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে সার আইজাক নিউটনের যে মত এত দিন চলিয়া আসিতেছিল, তাহাকে বিদায় দিয়া সার জেমস্ এইবার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মায়াবাদের আসন পাড়িয়া দিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌রা আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্থিরসত্তা বলিতেছেন না। উহার নিয়মগুলি অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে পারিতেছেন না। যাহার অস্তিত্বই কেবল মানুষের কল্পনাক্ষেত্রে নিবদ্ধ, তাহার কোন স্থির নিয়ম থাকিতে পারে না। সার জেমস্ জীনস্ বলিয়াছেন যে, এই বিশ্বে যাহা কিছু লক্ষিত হইতেছে, তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে কেবল মানুষের সংবিত্তিতে (consciousness) এবং অনুভূতিতে (perception)। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই এই যে, এই বিশ্বের কোন কিছুরই বাস্তবত্ব (Reality) নাই। জড়বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া সার জেমস ঘোষণা করিতেছেন যে, প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে প্লেটো এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেটবৃটেনে বিশপ বার্কলে এই মায়াবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা এই সমস্যার সর্ব্বথা সমাধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "যদি সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব না থাকে, যদি উহার অস্তিত্ব কেবল মানুষের সংবিত্তিমাত্রেই নিহিত থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলেই একই সূর্য্য, একই চন্দ্র এবং একই নক্ষত্রনিচয় দেখি কেন ?" তিনি উত্তরে বলেন, বর্ত্তমান যুগের জড়বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। এই বাহ্য জগতের পরিদৃশ্যমান বস্তু-নিচয়ের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কিন্তু তাহারা একটিমাত্র কিরণ-রশ্মির অন্তর্ভুক্ত সত্তা। ইলেক্‌ট্রোনগুলি এমন একই অবিশ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তরঙ্গপ্রবাহের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এই বাহ্যবস্তুগুলিও ঠিক সেইরূপ। মানবদেহে যে অসংখ্য কোষ (cell) রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা যাইতে পারে।

যে সভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই সভায় আড়াই হাজার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সার জেমস প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "এই বিশ্বের বস্তুসমূহ সম্বন্ধে যাহা ধারণা করা সম্ভবে, ধারণাকারী মন সম্বন্ধে কি তাহা মনে করা যায় না ?" উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, যখন আমরা পরিচ্ছিন্ন স্থান এবং কাল হিসাবে আমাদিগকে ভাবিয়া দেখি, তখন আমাদের স্পষ্টই বোধ হয় যে, আমরা পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু আমরা যখন স্থান এবং কালকে অতিক্রম করিয়া গমন করি, তখন আমরা সম্ভবতঃ মনে করিতে পারি যে, আমরা একটি অবিশ্রান্ত জীবনীশক্তি-প্রবাহের উপাদান মাত্র। আমাদের মন কেবল অন্তরস্থ বস্তুর সহিত পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু বাহ্য বস্তুর সহিত পরিচিত হইতে সমর্থ হয় না। আমরা কোন বাহ্য বস্তুরই মূলতত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ নহি। এই রহস্যময় বাহ্য জগৎ—যাহা আমাদের বাহিরে রহিয়াছে, তাহার ভিতর আমাদের মন প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা

হইলেও আমরা দুইটি সমজাতীয় বস্তুর পরিমাণগত সত্তা এবং সংখ্যাঘটিত অনুপাত (Numerical rates) বুঝিতে পারি। ঐ উভয় বস্তু আমাদের নিকট যতই দুর্ব্বোধ্য হউক, আমরা ঐটুকু মাত্র বুঝিতে পারি। এই কারণে বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সংখ্যা এবং পরিমাণ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় এবং আমাদের নিকট এই বিশ্বের চিত্র—আমাদের জ্ঞানের আশ্লেষ (Synthesis of our knowledge) আঙ্কিক আকারেই আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। পার্থিব বস্তুর, যথা আপেল, পেয়ারা, কলা, ইহার অণু-পরমাণু, ইলেক্‌ট্রোন প্রভৃতির যে চিত্র আমরা মনোমধ্যে অঙ্কিত করি, তাহা অঙ্কশাস্ত্রের মূর্ত্তি দিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, উহা তাহাদের নৈসর্গিক মূর্ত্তি নহে—উহা বুঝিবার জন্যই আমরা কতকটা রূপকভাবেই উহা গ্রহণ করিয়া থাকি। সার জেমস্ বলেন যে, স্থান এবং কালকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য মিচেলসন মর্লি যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।

সার জেম্‌সের সকল কথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম আমরা এখানে দিতে পারিলাম না। এই জটিল তত্ত্ব সংক্ষেপে প্রকাশ করাও কঠিন। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা হইতেছে যে, অচির-ভবিষ্যতে জড়-বিজ্ঞান ভারতীয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের চরণে আত্মনিবেদন করিবে। গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্দ্বয়ম্।

এই বিশ্বে যে গ্রাহ্য (perceptible) এবং গ্রাহক (perceiver) এই দুইটি আছে, তাহা চিত্তের স্পন্দনফলমাত্র। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ দেবও বলিয়াছেন—"স্পন্দাৎ-স্ফুরতি চিৎ সর্গো নিঃস্পন্দাৎ ব্রহ্ম শাশ্বতম্। "চিৎস্পন্দ হইতেই বাহ্যজগৎ স্ফুরিত হয়, আর চিত্তের নিস্পন্দভাবই ব্রহ্ম।" সার জেম্‌সের এই সিদ্ধান্ত বস্তু-তান্ত্রিক য়ুরোপ এক কথায় মানিয়া লইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সত্যের আলোক যখন য়ুরোপীয় মনীষায় অত্যুচ্চ শৃঙ্গে পতিত হইয়াছে, তখন উহা ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা

মার্কিণ মুলুকে প্রায় ৪ লক্ষ খঞ্জ, পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ শিশু আছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় ঐরূপ বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। সে সময়ে যে সমস্ত বিকলাঙ্গ শিশুকে জীবিকা উপার্জ্জনের উপযোগী কার্য্য শিখান হইত, তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সকল বিকলাঙ্গ শিশুকে যতদূর সম্ভব সুস্থ করিবার জন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ যত্ন এবং ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার ফলে অনেক শিশুই বাঁচিয়া যাইতেছে এবং আপনাদের জীবিকা আপনারাই উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে। হিতৈষিণী সভাগুলির চেষ্টার ফলে তথায় বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। এখন মার্কিণের এলফ এণ্ড রোটারী নামক প্রতিষ্ঠান এই সকল দুর্ভাগ্য-পীড়িত শিশুদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্বয়ং এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন বলিয়া ইহাতে বিশেষ সুফল দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল বিকলাঙ্গ শিশুকে আরোগ্য করা অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহাদিগকে আরোগ্য করা হইতেছে, অধিকন্তু তাহাদিগকে জীবিকা উপার্জ্জনের এক একটা বৃত্তিও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই বিষয়ে প্রথমেই একটা বড় রকমের বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। কোথায় কত বিকলাঙ্গ শিশু ও বালক আছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাহাদিগকে যত্ন এবং চিকিৎসা করিবার জন্য হাসপাতালে বা আরোগ্য-সদনে লইয়া আসা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক শিশুর পিতা-মাতা অনুসন্ধানকারীদিগের নিকট তাহাদের বিকলাঙ্গ সন্তানের কথা প্রকাশ করেন না। তাহার দুইটি কারণ আছে। একটি কারণ—কেহ কেহ ঐ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে। আর কেহ কেহ মনে করে যে, তাহাদের শিশুদিগের ব্যাধি দুরারোগ্য, উহা আরাম হইবে না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। সকলে না হউক, অধিকাংশ শিশুই যত্নে এবং চিকিৎসায় আরাম হইয়া উঠিতেছে। ওয়ার্ম স্প্রিংস ফাউণ্ডেশনের চিকিৎসায় অনেক শিশুই শৈশবকালীন পক্ষাঘাত রোগ হইতে নিস্তার পাইতেছে।

পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে নিউ জার্সি অঞ্চলে বিকলাঙ্গ শিশু-দিগকে চিকিৎসা করিবার এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। তথাকার ট্রেণটনবাসী জোসেফ ডিবাক এই কার্য্যে প্রথম আত্মনিয়োগ করেন। এলক্‌স রোটারীর স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাকে এই কার্য্যে সহায়তা করে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত এখন গ্রাইন, রেডক্রস, কিউয়ানিস, লায়ন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও সহযোগিতা করিতেছে। নিউ জার্সিতে প্রায় ১৫ হাজার বিকলাঙ্গ শিশু এইরূপ প্রতিষ্ঠানে সাহায্য পাইতেছে। বিকলাঙ্গ শিশুদিগের অস্ত্র-চিকিৎসায় পারদর্শী চিকিৎসকগণ কি ভাবে কাহাকে কত দিন চিকিৎসা করিতে হইবে, কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা সমস্ত সাব্যস্ত করিয়া দিলে পর, ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যেক শিশুর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল দেখিয়া সকলে খুব উৎসাহিত হইতেছেন। এখন নিউ জার্সি হইতে এই ব্যবস্থা ক্রমশঃ ফ্লোরিডা, ইল্লিনয়, আইওয়া, নেব্রাস্কা, নর্থ ডাকোটা, টেক্সাস এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রসারিত হইতেছে। রকল্যাণ্ড কাউন্টিতে পোষ্ট মাষ্টার জেনারল মিষ্টার জেমস এ ফার্লি (James A Farley) এই সমাজহিতকর কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছেন।

এই সকল পাশ্চাত্য দেশে জনহিতকর কার্য্যে অনেকে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। সেই জন্য এত পাপেও এই সকল দেশ এখনও অবনত হইয়া পড়ে নাই।

মার্কিণী জনতার উগ্র ক্রোধ

পাঠক জানেন, মার্কিণদেশে কোন নিগ্রো কোন প্রকার গুরু অপরাধে অভিযুক্ত হইলে দেশের জনসাধারণ আদালতে তাহার বিচারের জন্য অপেক্ষা রাখে না, তাহারা সকলে মিলিয়া সেই অভিযুক্ত নিগ্রোকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া থাকে। সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি না, তাহা বিচার করিবার তাহারা

অপেক্ষা রাখে না। ইহাকে লিঞ্চ করা বলা হইয়া থাকে। এই প্রকার নৃশংস হত্যা নিবারণের জন্য কিছু দিন ধরিয়া মার্কিণে বিশেষ চেষ্টা হইয়া আসিতেছে,—কিন্তু কৃষ্ণকায় কাফ্রীদিগের উপর তথাকার শ্বেতকায় ব্যক্তিদিগের এতই প্রবল বিদ্বেষ যে, তাহারা জনৈক নিগ্রো অভিযুক্ত হইলেই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য যেন ক্ষেপিয়া উঠে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জনতা কর্তৃক এই অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, রাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তারাও ঐ কার্য্যসাধনে যত্ন করিতেছেন, কিন্তু জনতা কিছুতেই এই প্রকার অত্যাচার-সাধনে বিরত হইতেছে না। এই বিষয়ে জনতার আক্রোশ কতটা প্রবল হইয়া উঠে, সম্প্রতি তথাকার শেলবিভিলেতে যে কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই সহজেই বুঝা যায়। ঐ অঞ্চলের ই, কে, হ্যারিস নামক জনৈক নিগ্রো এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া শ্বেতকায়া কুমারীকে আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল। শেলবিভিলের বিচারালয়ে তাহার বিচার হইতে থাকে। কিন্তু ঐ সহরের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ হইতে বহু লোক দলবদ্ধ হইয়া হ্যারিসকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খুন করিতে আসে। আদালতে রক্ষী সৈন্য মোতায়েন ছিল। তাহারা জনতাকে বাধা দেয়। জনতা আদালত-গৃহের দিকে গুলী ছুড়িতে থাকে। চারিখানি শকটের উপরও তাহারা গুলী চালায় এবং লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। ক্রোধে দিশাহারা হইয়া তাহারা আদালত-গৃহটি ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। এক জন গ্রাম্য শ্বেতকায় গুণ্ডা আদালতের শার্সিবদ্ধ জানালা লক্ষ্য করিয়া একখানি বেঞ্চ নিক্ষেপ করে। ফলে রক্ষী সৈন্য জনতার উপর গুলী চালায়। এক জন লোক গুলী খাইয়া ধরাশায়ী হয়। তাহার নাম প্যাট লইস। প্রকাশ, সে নির্য্যাতিতা বালিকাটির আত্মীয়। এইরূপ ৪ জন লোক নিহত এবং ৬ জন লোক সঙ্গীনের খোঁচায় এবং বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছে। এই সময় আসামী হ্যারিসকে টেনেসির প্রধান নগর ন্যাসভাইলে লইয়া যাওয়া হয়।

এই ব্যাপার লইয়া টেনেসি ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই এই ব্যাপারে টেনেসির গবর্ণর মিষ্টার ম্যাক্ আলিষ্টরকে প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন যে, তিনি বিচারের সম্মান রক্ষা করিতে যাইয়া ভাল কাযই করিয়াছেন। আদালত-গৃহটি যাহারা ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে সে জন্য পরে পরিতাপ করিতেই হইবে। কারণ, উহা পুনর্নির্ম্মাণের ব্যয় তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে। অপরাধীকে গুরু অপরাধের জন্য শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে জনতার এই ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় নাই,—কৃষ্ণাঙ্গ অপরাধীর উপর বিদ্বেষফলেই উহারা ঐরূপ উত্তেজিত হইয়া ঐ কাণ্ড ঘটাইয়াছে। মার্কিণে জনতা কর্তৃক এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিতান্ত অল্প ঘটে না। গত বৎসরের হিসাব এখনও প্রকাশ হয় নাই। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৮টি এইরূপ লিঞ্চ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে টেনেসিতে ৩টি ঘটনা ঘটে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৪৮টি অভিযুক্ত নিগ্রোকে বিনা বিচারে এই প্রকারে শ্বেতকায় জনতার হস্তে অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হইতে হইয়াছিল। এই ব্যাপারে এই সকল সভ্য জাতির ভিতরকার খবর বুঝিতে পারা যায়।

মার্কিণের মুদ্রা-সম্পর্কিত মামলা

মার্কিণ মুলুকের সুপ্রীম কোর্টে মুদ্রা-সম্পর্কিত এক মামলা বিচারার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। মামলাটি বিশেষ জটিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেন বিদেশে তাহাদের পণ্য কাটাইবার জন্য মুদ্রামূল্যে সুবর্ণমান ত্যাগ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই মার্কিণের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্কিণী জাতিকে তাঁহাদের দেশের ডলারের মূল্য সুবর্ণমান হইতে বিচ্যুত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তদনুসারে মার্কিণের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সুবর্ণ-ডলারের মূল্য শতকরা ৫০ অংশ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। কিন্তু অবস্থাগতিকে ডলারের মূল্য শতকরা ৬৯ অংশ হিসাবে নামিয়া যায়। অর্থাৎ যখন মার্কিণী মুদ্রা স্বর্ণ-মূল্যের সহিত গাঁথা ছিল, তখনকার ১ শত সুবর্ণ-ডলার এখনকার প্রচলিত ডলারের ১ শত ৬৯ টির সমান দাঁড়াইয়াছে। এখন এই ব্যাপারে মার্কিণের বহির্ব্বাণিজ্য এবং আন্তর ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার এই হীনমূল্য ডলার-মূল্যের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়া গেল।

সম্প্রতি এই ব্যাপার লইয়া মস্ত একটা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। মার্কিণ সুবর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যাহারা দলিল লিখিয়া লোককে টাকা ধার দিয়াছিল, তাহারা বলিল, আমরা যখন অধমর্ণকে টাকা ধার দিয়াছিলাম, তখন ১ শত সুবর্ণ-ডলারের মূল্য ছিল এখনকার ১ শত ৬৯ ডলারের সমান। সুতরাং আমার এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে এখনকার ১ শত ডলার দিলে চলিবে না,—তখনকার ১ শত ডলারের মূল্য অর্থাৎ এখনকার ১ শত ৬৯ ডলার দিতে হইবে। সুদ সম্বন্ধেও সেই কথা। সুদের হারও শতকরা ৬৯ ডলার হিসাবে অধিক দিতে হইবে। উত্তমর্ণগণ বলেন যে, যে কাঠায় আমরা অধমর্ণকে মাপিয়া দিয়াছি, সেই কাঠায় আমরা তাহার শোধ লইব। তোমাদের ছোট কাঠায় বা হ্রস্ব মুদ্রায় আমরা সাবেক দেনা ওয়াশীল করিয়া লইব কেন? উত্তমর্ণদিগের এ কথা যে ন্যায়সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠাতেই শোধ করা ন্যায়সঙ্গত নিয়ম। কিন্তু তাহা করিতে হইলে দেনাদারেরই অসুবিধা, পাওনাদারের সুবিধা। কিন্তু দেনাদার বলিতেছে যে, আমি যাহাদের নিকট পাইতেছি, সে এখন এই হীনমূল্য মুদ্রায় আমাকে বেতন, মজুরী ও পণ্যমূল্য প্রভৃতি দিতেছে, অতএব আমি কোথা হইতে তোমাকে সাবেক অধিক মূল্যের মুদ্রায় আমার দেনাশোধ করিব? ব্যাপারটা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক্ দিয়া বড়ই গোলমেলে হইয়া দাঁড়ায়। শেষে এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য মার্কিণের সুপ্রীমকোর্টে এক মামলা রুজু হয়। সরকার অবশ্য প্রচলিত হ্রস্ব মুদ্রাতে সাবেক ঋণশোধের পক্ষপাতী। কারণ, তাহা না হইলে সরকারের যে এই কন্দীই মাটী হইয়া যায়। রপ্তানী বাণিজ্যের উপর তাহার তরঙ্গ-তাড়না আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং সুপ্রীমকোর্ট এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করেন, তাহা জানিবার জন্য সমস্ত মার্কিণবাসীই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন।

কেবল তাহাই নহে,—মার্কিণের সহিত অন্য যে সকল দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে, তাঁহারাও এই মামলায় সুপ্রীমকোর্ট কি রায় দেন, তাহা দেখিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যাহা হউক, প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর সুপ্রীমকোর্ট এই মামলার রায় দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেসরকারী লেনদেনে প্রচলিত মুদ্রাই চলিবে। অর্থাৎ তখনকার ১ শত ডলারের মত এখনকার এক শত ডলার দিলেই শোধ হইবে। অবশ্য উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক কি, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে এ সকল ব্যাপার প্রায় সুবিধার দিক্ দিয়াই মীমাংসা করা হইয়া থাকে। স্বার্থভেদে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এ সম্বন্ধে সকলেই যে একমত হইবেন, ইহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের মুদ্রামূল্য যখন কমিয়া গিয়াছে, তখন আমাদেরও এ সিদ্ধান্তে কোন ক্ষতি নাই।

বলসেবিক রাজ্যে বৈষম্য

রুসিয়ায় বলসেবিকদিগের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই এ দেশের লোকের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়াছে যে, তথায় বোধ হয় অনির্ব্বচনীয় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বুঝি সে দেশে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বলিয়া কোন অদৃষ্টজাত বৈষম্য নাই। কিন্তু সে ধারণা যে একবারেই ভুল, তাহা রুসিয়ায় পদার্পণ করিলেই বুঝা যায়। এই বৈচিত্র্যময় সংসারে বৈষম্যকে বিদায় দেওয়া সহজ নহে। রুসিয়ার রেলগাড়ীতে অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণী আছে। উহাতেই ত বৈষম্য পরিস্ফুট। তথাকার আন্তর্জ্জাতিক গাড়ী বা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে দুই জনের উপযোগী শয়নের স্থান আছে। তদ্ভিন্ন মোটমোটারী রাখিবার জন্য প্রচুর স্থান,—পোষাক প্রভৃতি টাঙ্গাইয়া রাখিবার হুক, একটি টেবিল ও একটা টেবিল-ল্যাম্পও আছে। কতকগুলি গাড়ীতে স্নানাদি করিবার ঘর আছে, তাহাতে কল কল করিয়া জল বহিয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। আর কতকগুলি গাড়ীতে দুই দিকেই সাধারণ শৌচাগার বিদ্যমান। এই শ্রেণীর কুলী বা মুটেরা যাত্রীদিগের হুকুম তামিল করিবার জন্য সদাই ব্যস্ত। যাত্রীরা তাহাদের নিকট হইতে গরম চা চাহিবামাত্র পাইয়া থাকেন।

ইহার পরই দ্বিতীয় শ্রেণী। রুসিয়ানরা এই শ্রেণীকে সফ্ট (soft) বলিয়া থাকে। ইহার কোন কোন কামরায় দুই জনের শয়ন-স্থান আছে, আর কতকগুলিতে চারি জনের শয়ন-স্থান বিদ্যমান। এখানেও শয়নের জন্য বিছানা আছে,—কিন্তু তাহা প্রথম শ্রেণীর বিছানার মত নহে। এই শ্রেণীর যাত্রীরা বেহারাদিগের নিকট হইতে যাইবার সময় খাদ্য এবং পানীয় পাইয়া থাকেন; উহারা মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা দেয়, এবং ট্রেণেই থাকে। ইহারা প্রথম শ্রেণীর বেহারাদিগের মত ততটা সৌজন্য প্রদর্শন করে না। ইহারা যাত্রীদিগের মার্জ্জিত ভাব দেখিয়া কায করে এবং যাত্রীরা বিশেষ প্রয়োজন হইলে সাধারণ শৌচাগারে যাইয়াই কায সারিয়া লয়।

তাহার পর তৃতীয় শ্রেণী। রুসরা ইহাকে হার্ড (Hard) বলে। আজকাল রেল-কর্ত্তৃপক্ষ এই শ্রেণীতে যাত্রীদিগকে শয্যা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন বটে,—কিন্তু যাত্রীদিগকে বালিস, কম্বল, খাদ্য আপনাদের জন্য লইয়া যাইতে হয়। ষ্টেশনে ষ্টেশনে এই শ্রেণীর যাত্রীরা জল বিনামূল্যে পায়, তাহা হইতে তাহাদিগকে আপনার জন্য চা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এই শ্রেণীতে যাত্রীদিগের শয়নের জন্য তিন স্তবক করিয়া তাক আছে। এই শ্রেণীর যাত্রীরা প্রায় পোষাক ছাড়ে না, তাহারা কেবল উপরের কোটটি ও পায়ের জুতা মাত্র খুলিয়া শয়ন করে। তৃতীয় শ্রেণীতে বহু যাত্রী একসঙ্গে যায়, এবং তাহারা যেন এক পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের ন্যায় পরস্পর খাদ্যদ্রব্যাদির বিনিময় করিয়া থাকে। ইহাতে অনেকে প্রায় নিদ্রা যায় না। অনেক বিদেশী এই শ্রেণীতে নানা অসুবিধা থাকিলেও ভ্রমণ করেন, তাহার উদ্দেশ্য—সাধারণ রুসদিগের সহিত পরিচয় করা। যখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা প্রথম শ্রেণীর দিকে বেড়াইতে যায়, তখন তাহারা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদিগের সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া উহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের গাড়ীর ভিতর দিয়া যায়, তখন তাহারা আপনাদের সুবিধার কথা ভাবিয়া আনন্দ বোধ করে।

এঞ্জিনিয়াররা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাইবে, আর সাধারণ লোক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইবে, ইহার হেতু কি? তাহার প্রধান কারণ, এঞ্জিনিয়ার এবং বড় বড় রাজপুরুষরা অধিক ধনী। তাহাদের কাযের কদর বেশী। সেই জন্য সরকার তাহাদিগকে অধিক হারে পারিশ্রমিক প্রদান করেন। ইহারা বলেন যে, আয়ের তারতম্য হইলেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মানদণ্ডের (standard of living) তারতম্য হইবেই; বলসেবিক সাম্যবাদীরা বলেন যে, যদি সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইয়া দেন, আর ঝাড়ুদার, মেথর, মজুর সকলেই ঐ শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অধিক আয়সম্পন্ন এঞ্জিনিয়ারগণ তাহাদের টাকা খরচ করিতে পারিবে না, উহারা হয় টাকা সঞ্চয় করিবে, অথবা কায করিবে না। উভয় ব্যবস্থাতেই সমাজের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ফলে সোভিয়েট সাম্যবাদীরা সকলের একরূপ আয়ের ব্যবস্থা করিতে চাহেন না,—তাঁহারা অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছেন যে, সকলকে তুল্যভাবে পারিশ্রমিক দিলে, যাহারা সমর্থ, তাহারা আর উচ্চ অঙ্গের কার্য্য করিবার জন্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করিবে না,—উহাতে ব্যক্তিগত প্রারম্ভক কার্য্যের (Initiative) হানি হইবে, অতএব তাহাদিগকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মানদণ্ড-ঘটিত পার্থক্যকে মানিয়া লইতেই হইবে। সুতরাং সেই বৈষম্যই সাম্যবাদীদিগের সমাজে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া হাজির।

সোভিয়েট রুসিয়ায় এই বৈষম্য দেখিয়া অনেক বিদেশী লোক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। সোভিয়েট-শাসিত সর্ব্বস্বত্ব-বাদীরা ইহার উত্তরে বলেন যে, বৈষম্যের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। সব বৈষম্য সমান দোষাবহ নহে। ধনাধিকারজনিত বৈষম্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষের। উহারা বলে যে, মানুষ ধনসঞ্চয় করিবার সুবিধা পায়, আর সেই সঞ্চিতধন মূলধনরূপে

ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহারা অন্যের সার শোষণ করিতে সমর্থ হয়। উহাই সমাজের পক্ষে অহিতকর। ফল কথা, সোভিয়েট মতাবলম্বীরা মূলধনবাদের (capitalism) বিরোধী,—বৈষম্যের বিরোধী নহেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ষ্টেলিন ঘোষণা করেন—By equality Marxism understands not lending of personal needs but elimination of clasees. অর্থাৎ কার্ল মার্কসের মতানুযায়ী সাম্যের অর্থ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সমতা-সাধন নহে, পরন্তু উহা শ্রেণীবিভাগেরই বিলোপসাধন মাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে রুসিয়ায় প্রাব্দা (Pravda) পত্রে "সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রখানিতে সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগের যাহারা নিয়ামক, তাহাদেরই মত প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ঐ সন্দর্ভে বলা হইয়াছিল যে, "সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত প্রতিভা, ঝোঁক, রুচি এবং প্রয়োজনীয় বস্তুর দাবী কোনমতেই অস্বীকার করে না। × × পরন্তু সমাজতন্ত্রবাদ এই প্রকার মানসিক ক্ষমতার যোগ্যতার এবং প্রতিভার বিকাশসাধনে যেরূপ সুযোগ প্রদান করে, এরূপ সুযোগ আর কেহ কখনই প্রদান করে নাই।" উহারা একটা পদ্ধতি অনুসারে পরস্পর প্রভিন্ন সম্প্রদায় গঠনের (regimentation) বিরোধী। উক্ত সন্দর্ভে আরও বলা হইয়াছে যে, সাম্য শব্দটা সাধারণতঃ বিষয়-ব্যবচ্ছিন্ন একটা শূন্যগর্ভ শব্দ মাত্র (an empty abstraction)। "নর এবং নারীর মধ্যে সমত্ব নাই।" উহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য-বিনাশের ফলে মানব-জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে। অন্য কথায় এই সমস্যাটি মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের উচ্ছেদ-সম্পর্কিত সমস্যা নহে। পরন্তু মানুষের সামাজিক বৈষম্যের বনিয়াদের বিনাশ-সম্পর্কিত সমস্যা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান লক্ষ্য এই যে, "যাহাতে এক শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের অপেক্ষা অসুবিধাজনক অবস্থায় পতিত অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অসুবিধায় সুবিধা পাইয়া তাহাদের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহারই ব্যবস্থাপন।" এই সম্বন্ধে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, এক জন কর্ত্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রমকুশল ব্যক্তি এবং এক জন অলস ব্যক্তি এই উভয়ে কখনই সমান হইতে পারে না। উভয়কে সমান বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। একই মাপকাঠিতে সকল মানুষকে মাপা চলে না। সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগের মধ্যে যাঁহাদের মত প্রামাণ্য বলিয়া সম্মানিত, তাঁহারা বলেন যে, যখন সর্ব্বস্বত্ববাদসম্মত সমাজ পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইবে, তখন যাহার যেরূপ সাধ্য, তাহার নিকট হইতে সেইরূপ কায লইতে হইবে,—যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তাহাকে সেইরূপ দিতে হইবে। আনন্দ করিবার জন্য কেহ বেহালা চায়, কেহ বা ডুগি পছন্দ করে। রুচিভেদে মানুষের এই বৈষম্য থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভবে না।

সোভিয়েট রুসিয়ায় কেবল যে রেলগাড়ীতে এই বৈষম্য লক্ষিত হয়, তাহা নহে, হাটে-বাজারে বিপণিতে সর্ব্বত্রই এই বৈষম্য প্রতিভাত। সকল দোকানে জিনিষের মূল্য সমান নহে। সরকারী দোকানে যে তরকারীর দাম এক আনা, ব্যবসায়ীর দোকানে ঠিক সেই পরিমাণ সেই তরকারীর মূল্য তিন আনা। চাষীদিগের হাটে সেই জিনিষের মূল্য হয় ত চারি আনা চাহে। কারণ, সরকারী দোকানে সকলের পণ্য কিনিবার অধিকার নাই। বিক্রেতারা যেখানে যে মূল্য চাহে, তাহারা সেই মূল্যই পাইয়া থাকে। কারণ, তাহাদের খরিদদারদিগের অন্য দোকানে জিনিষ কিনিবার অধিকার নাই। কোন দোকানই সকলের চাহিদা মত জিনিষ যোগান দিতে পারে না। কাযেই মস্কো সহরের রাজপথের পার্শ্বস্থ দোকানগুলির মধ্যে পণ্য-মূল্যের এইরূপ ঘোর বৈষম্য লক্ষিত হয়। সাম্যবাদী সোভিয়েট সরকারের ব্যবস্থায় এইরূপ নানাদিক্ দিয়া বৈষম্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

এত দিন সরকারের কার্ড দেখাইলে কতকগুলি লোক রুটী পাইত। ঐ কার্ডকে ব্রেড কার্ড বলা হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া এইভাবে কার্ড দ্বারা সোভিয়েট সরকার লোকের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে যাহারা সরকারের বিরাগভাজন, তাহারা কার্ড পাইত না। কাযেই তাহারা সাধারণ দোকান হইতে রুটী কিনিতে বাধ্য হইত। তাহাদিগকে অধিক মূল্য দিয়া রুটী কিনিতে ত হইতই,—অধিকন্তু অনেক সময় তাহারা রুটীই পাইত না; সুতরাং তাহাদিগকে অন্যবিধ উপায়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। গত ডিসেম্বর মাস হইতে রুসিয়ায় আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের কমিসারিয়েট সাধারণ দোকান হইতে রুটী এবং অন্যান্য শস্যজাত খাদ্য কিনিবার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। প্রথমে এক শত ৭৫টি সহরকে এইরূপ অধিকার দেওয়া হয়। গত ৩১শে জানুয়ারীর পর হইতে সর্ব্বত্র অবাধে রুটী ও শস্যজাত খাদ্য অবাধে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার কথা। এই ব্যবস্থায় যে আহারাদির বিষয়ে সোভিয়েট সরকারে প্রজাদিগের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। এই রুটীর কার্ড পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা হইল বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের বেতনের হার শতকরা ১০ টাকা হারে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। কিন্তু রুটীর কার্ড অনুসারে যাহারা রুটী পাইত, তাহাদিগকে অত্যন্ত অল্প হারেই রুটীর মূল্য দিতে হইত। এই প্রকারে অতি অল্প রুটীই যোগান দেওয়া হইত। এখন এই ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়াতে রুটী প্রভৃতির মূল্য দেড়া বা তাহার অধিক হইবে। তবে এখন সকলেই সমান মূল্যে উহা পাইবে। সাম্যবাদী রুসিয়ায় ক্রমশঃ ঠেকিয়া চৈতন্য হইতেছে। তাহারা বুঝিতেছে যে, এই জগতে উৎকট সাম্যবাদ কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। হিন্দুর বিশ্বাস, মানুষের জীবন কর্ম্মফল এবং অদৃষ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই জন্য মানব-জাতির জীবনে ব্যক্তিগতভাবে যত বৈষম্য লক্ষিত হয়, অন্য কোন প্রাণীর জীবনে তত বৈষম্য দেখা যায় না। পুরুষকার দ্বারা তাহা কতকটা প্রতিহত করা যায় সত্য, কিন্তু অদৃষ্ট সহায় না হইলে তাহা করা সম্ভবে না। হিন্দুর এই সিদ্ধান্ত আজ সভ্য জগতে অনাদৃত; কিন্তু কালে ইহাকে আদর করিতে হইবে। অতএব রহু ধৈর্য্যম্।

যদি যুদ্ধ বাধে

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর কিছুকাল ধরিয়া য়ুরোপের আবহাওয়া খুব বদলাইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের উপর শ্বেতাঙ্গ জাতিমাত্রেরই ঘোর অরুচি জন্মিয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় জাতিরা যুদ্ধ-সম্পর্কিত কেতাব কিনিতেন না,—যে সকল থিয়েটার সিনেমায় সংগ্রামের চিত্রাদি প্রদর্শিত হইত, তাহা দেখিতে লোক ছুটিত না। তখন সংগ্রামের উত্তেজনাপূর্ণ সাহিত্য ছাড়িয়া দিয়া আন্তর্জ্জাতিক বন্দোবস্ত করিবার কথাই সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইত। সংবাদ-পত্রে তখন প্রায়ই নারীর ব্যবসায়, শিশু বিক্রয়, আন্তর্জ্জাতিক পুলিস প্রভৃতি বিষয়ের ভূরি আলোচনা হইত। যুদ্ধের বিষয়টি তখন শিষ্ট সমাজে একবারে বর্জ্জিত হইয়াছিল। শিষ্ট সমাজে তখন নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে পাছে যুদ্ধের কথা বলিতে হয়, সেই জন্য সে কথাও মুখে আনিতেন না। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও দেখা গিয়াছিল যে, যুদ্ধের চিন্তা মানুষের মন হইতে একবারে নির্ব্বাসিত হয় নাই; আহত দস্যু যেমন জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে, যুদ্ধের চিন্তাটা তখন সেইরূপ য়ুরোপীয়দিগের মনে এক নিভৃত কোণে লুকাইয়া ছিল। কাযেই এই প্রতিক্রিয়ার ফল অধিক দিন স্থায়ী হইল না। উহা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিল। য়ুরোপের যুবকদল এবং কতকগুলি প্রবীণ লোক প্রথমে দৃঢ়তার সহিত বলিতে থাকিলেন যে, যদি যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহারা প্রাণান্ত পণ করিয়া তাহাতে বাধা দিবেন, কিছুতেই যুদ্ধে যোগ দিবেন না। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের সম্মেলনগুলি বলিতে লাগিলেন যে, যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহার জন্য যাঁহাদের আর্থিক লাভ হইবে, তাঁহাদের লাভের টাকাটা সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে, এই মর্ম্মে এক আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। এই উপলক্ষে সকলেই সংগ্রামের বিভীষিকার কথা নানা ভাষায় এবং নানা ছন্দে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আগামী যুদ্ধে বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা নগরকে নগর, জনপদকে জনপদ একবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া ফেলিবে,—নূতন নূতন বিষময় বাষ্প মানুষকে মুহূর্ত্তমধ্যে শমন-সদনে লইয়া যাইবে,—মৃত্যুসঞ্চারক আলোকরশ্মি (Deathray) মানুষবাহিনীকে বৈতরণী পার করিয়া দিবে; ফলে মানুষের প্রতিভা যে সকল পৈশাচিক অস্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছে বা করিবার সম্ভাবনা জন্মাইয়া দিয়াছে, পিতৃভূমি এবং পৈতৃক কৃষ্টি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহারই কথা বলিয়া লোককে যুদ্ধ হইতে নিবারিত করিবার কথা প্রচারিত হইতে থাকিল। এই ছিদ্র অবলম্বন করিয়া মানুষের মন আবার যুদ্ধের দিকে চলিয়া পড়িল। যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করা আর তেমন দোষের বলিয়া গণ্য হইতে থাকিল না।

এখন কিন্তু সকল দেশের সকল লোকের মুখেই অচির-ভবিষ্যতে যুদ্ধের কথা আলোচিত হইতেছে। দোদুল্যমান দোলক এখন দুলিয়া বিপরীত দিকে গিয়াছে। অচিরভবিষ্যতে যুদ্ধ হইবেই, ইহা যেন নিশ্চিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে। জাতিতে জাতিতে দল পাকাইবার দিকে সকলেই মনোযোগ দিতেছেন। এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়া য়ুরোপের ঘাড়ে পড়িবে, তাহাই এখন চিন্তার বা দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর পূর্ব্বদিক্-চক্রবালের প্রান্তস্থিত জাপানভূমি হইতে য়ুরোপের কেন্দ্রস্থিত জার্ম্মাণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের সর্ব্বত্রই রণচণ্ডীর ছায়াপাত কল্পনা করিয়া, সভ্যজাতিরা চমকিত হইয়া উঠিতেছেন। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন সহরে নৌবাহিনী সঙ্কোচের কথা বেশ আলোচনা হইয়াছিল। গত মাসে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, জাপান আর ওয়াসিংটন-চুক্তিতে বাধ্য থাকিবেন না বলিয়া জানান দিয়াছেন। ঐ চুক্তিতে সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, মার্কিণ, বৃটেন এবং জাপান এই তিন শক্তির আনুপাতিক নৌবল থাকিবে ৫ : ৫ : ৩ অর্থাৎ মার্কিণ এবং বৃটেনের নৌবাহিনী থাকিবে সমান আর জাপানের নৌবাহিনী থাকিবে তাহার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ। অর্থাৎ জাপানকে প্রায় অর্দ্ধেক রণতরী রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ফলে মার্কিণ ও গ্রেট বৃটেন যদি সম্মিলিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা যখন-তখন জাপানের নৌ-শক্তিকে চূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন। উভয়ের সম্মিলিত হওয়া অসম্ভব নহে। ইতোমধ্যেই বৃটিশ সরকার জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুকুয়োয় খনিজ তৈল বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন,—মার্কিণ এই ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনেরই সমর্থন করিতেছেন। ইহা লইয়া অবশ্য যুদ্ধ বাধিবে না,—কিন্তু এইরূপ একটা না একটা ব্যাপার লইয়া হাঙ্গামা বাধাও অসম্ভব নহে। ইহা ভিন্ন গত ২৮শে নবেম্বর বিলাতের কমন্সসভায় বিমান দ্বারা দেশরক্ষা এবং জার্ম্মাণ-বিভীষিকা সম্বন্ধে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে জার্ম্মাণী হইতে যে আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাটের অভিভাষণের উত্তরে মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চহিল প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গ্রেট বৃটেনের বিমানবাহিনী বর্দ্ধিত করা আবশ্যক হইয়াছে। মিষ্টার চার্চ্চহিল বলেন যে, জার্ম্মাণীর সেনাবল এখন প্রবল এবং সুসজ্জিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাহাদের অনেক সুশিক্ষিত ও সামরিক শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন বহুলোককে অপ্রকাশিত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর অস্ত্রনির্ম্মাণের কারখানা-গুলিতে যে-ভাবে অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, যেন এ দেশে যুদ্ধ উপস্থিত। উহারা যে-ভাবে রণবিমান প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতে অনুমান হইতেছে যে, এক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের রণবিমান বৃটিশ জাতির রণবিমানের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহাদের রণবিমানের বল বৃটিশ রণবিমান-বলের দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে। কয়েক দিন ক্রমাগত বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপের ফলে লণ্ডন সহরের যে কি দশা হইবে, তাহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কয়েক জন মাত্র দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তির দ্বারাই এই ভীষণ কাণ্ড করা সম্ভব হইবে। মিষ্টার ষ্ট্যানলী বলডুইন ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিন্ত হইবার মত কোন কথা ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, অদূরভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় বিশেষ শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি বলেন যে, জার্ম্মাণীর এখন ৬ শত হইতে ১ হাজারের মধ্যে সামরিক বিমান বিদ্যমান। ফরাসী রণবিমান-মন্ত্রীর মতে জার্ম্মাণীর ১ হাজার ১ শত রণবিমান আছে। ফরাসীদের অনুমান অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হয়। গ্রেট বৃটেনের বাহিরেই ৬ শত ৯০টি রণবিমান বিদ্যমান। আর

অতগুলি রণবিমান রক্ষিত হইয়া আছে। সুতরাং মা ভৈঃ! শঙ্কার কোন কারণ নাই। জার্ম্মাণীর প্রকৃত সামরিক শক্তি গ্রেট বৃটেনের সামরিক শক্তির অর্দ্ধেকও নহে। বৃটিশ জাতির রণবিমান নির্ম্মাণের যেরূপ আয়োজন ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—তাহাতে গ্রেট বৃটেন জার্ম্মাণীর উপরই থাকিবে। তবে জার্ম্মাণী, ১ লক্ষ বহুদিনের জন্য রক্ষিত সৈন্য অল্পদিনের মেয়াদে রক্ষা করিবার সৈন্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থায় সৈন্যসংখ্যা ৩ লক্ষে পরিণত করা হইতেছে। কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে এ কথাও বলিয়াছেন যে, রহস্যের অন্ধকারে জার্ম্মাণীর ভিতর কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সেই জন্যই ত লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে।

জার্ম্মাণী কমন্স সভার আলোচনার পাল্টা জবাব দিতে কসুর করে নাই। তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে, য়ুরোপ এখন কথায় কথায় চমকিত হইয়া উঠিতেছেন ইহা স্বীকার্য্য; তবে জার্ম্মাণী যে জাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেজন্য তাহারা দায়ী নহে। সেজন্য অন্য জাতিরা দায়ী। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সার জন সাইমন জেনিভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে জার্ম্মাণীকে যে তুল্যাধিকার দানের প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পথ বন্ধ করা হইয়াছে। সেই সময় হইতেই ফরাসীরা একগুঁয়ে ভাব ধরিয়াছে, সেই একগুঁয়েমির জন্য ইংরাজ ইটালীর এবং জার্ম্মাণদিগের মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণী বলিতেছেন, যদি ইংলণ্ড জার্ম্মাণীকে জাতিসঙ্ঘে যোগদান করাইতে চাহেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের তদনুকূল পূর্ব্বাবস্থার সৃষ্টি করিতেই হইবে। ফরাসীরা কিন্তু জার্ম্মাণীর ঘোর বিরোধী। তাঁহারা বলিতেছেন, জার্ম্মাণীর সহিত কথা বলিয়া কায নাই। জার্ম্মাণী অগ্রে জাতিসঙ্ঘে ফিরিয়া আসুক, তাহার পর অন্য কথা। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের বিশেষ কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। জার্ম্মাণী তুল্যতা চাহিতেছে। তাহারা সর্ব্বদিক্ দিয়াই তুল্যতা চাহে। সময়ে তাহারা তাহাদের উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া চাহিতে পারে। ফলে য়ুরোপের এই সমস্যা সোজা পথে মিটিবে বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মাণী ভিতরে ভিতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কি করিতেছে না করিতেছে, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এখন অন্ধকারে ঝোপ দেখিয়াই য়ুরোপ প্রেতের কল্পনা করিতেছে, কিম্বা সত্য সত্যই য়ুরোপের রাজনীতিক গগনে প্রেতের আবির্ভাব হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা বুঝা কঠিন। সারার সমস্যা সমাধানের ফলে এই সমস্যাটি কিছু সরল হইবার কথা; কিন্তু ফরাসীদিগের একগুঁয়েমি এবং জার্ম্মাণীর কূট চা'লের ফলে কখন্ কি দাঁড়ায়, কেহই তাহা বলিতে পারে না। তার হিটলারের নাটুকে নৃত্যের ফলে জার্ম্মাণীর বাহিরের দেশগুলিতে লোকের জার্ম্মাণী সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই অদ্ভুত গুজব রটিতেছে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? ফলে জার্ম্মাণীই য়ুরোপের একটা বিষম প্রবল ঝটিকাকেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে।

লিণ্ডবার্গ শিশুহত্যা

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, মার্কিণের বৈমানিক বীর লিণ্ডবার্গ-দম্পতির শিশুপুত্র চার্লস আগষ্টাস্ লিণ্ডবার্গ গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ১লা তারিখে তাঁহাদের সাওয়ারল্যাণ্ড হিলস্থিত ভবন হইতে অপহৃত হইয়া পরে নিহত হয়। যে দিন এই বালকটি নিহত হইয়াছিল, সে দিন বৃষ্টি হইতেছিল। বালকটি নিশা যোগে তাহার শয্যা হইতেই অপহৃত হইয়াছিল। এই স্থানটি মার্কিণের নিউ জার্সি (New Jersey) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, রাজ্যটি আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরেই অবস্থিত এবং ধনশস্যে সমৃদ্ধ। শিশুটি অপহৃত হইবার পর তাহার পিতামাতা এই মর্ম্মে এক পত্র পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যদি নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শিশুটি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই শিশু অপহরণের ভীষণ ঘটনা হইতে
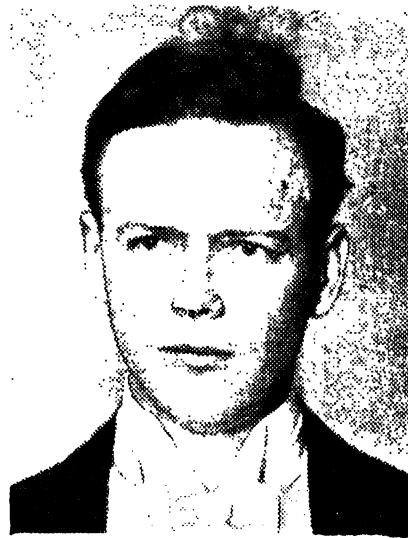
বৈমানিক বীর লিণ্ডবার্গ

বিচারপতি মিষ্টার টমাস ট্রেঞ্চার্ড

মার্কিণী পুলিস এই শিশুটির অপহরণকারীর অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া উহার কোন সন্ধান পায় নাই। কিছুদিন হইল, পুলিস ব্রঙ্কস্ (Bronk)-নিবাসী ব্রুনো রিচার্ড হপ্টম্যান নামক জনৈক সূত্রধরকে ঐ শিশুটির অপহরণকারী এবং হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। নিউজার্সির অন্তর্ভুক্ত ফ্লেমিংটনের আদালতে গত ২রা জানুয়ারী হইতে ব্রুনো হপ্টম্যানের বিচার আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে আদালতে লোকারণ্য হইয়াছিল। আদালতে আসন পাইবার জন্য সংবাদপত্রদিগের লোককে ৫ হইতে ১০ ডলার পর্য্যন্ত আসনভাড়া দিতে হইয়াছিল। আসামীকে ফ্লেমিংটনের নূতন কারাগৃহে রাখা হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী এবং পুত্র উহার ওখানি বাড়ী পরে বাসা লইয়া ছিলেন। আসামীর পক্ষসমর্থনকারী উকিল ও পত্নীপুত্র ভিন্ন আর কেহ রক্ষীদিগের অসাক্ষাতে তাহার সহিত দেখা করিতে পারিতেন না। আসামীর বিরুদ্ধে অবস্থা-ঘটিত বা আনুষঙ্গিক প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রমাণ ছিল না। প্রমাণের জন্য কয়েক গাড়ী জিনিষ আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। আসামী পক্ষের মামলা হালকা করিবার জন্য এই মর্ম্মে এক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল যে, লিণ্ডবার্গ শিশুটি অপহৃত হয় নাই, অথবা নিহতও হয় নাই। সে রাত্রিতে বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়, এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের বন্য জন্তু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই।

আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিয়াছিল যে, সে নির্দ্দোষ; ঐ শিশুহত্যা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। আসামীর স্ত্রী গত বড়দিনের সময় সকলকে জানায় যে, যত দিন বিচার শেষ না হইবে, তত দিন যেন তাঁহার স্বামীকে কেহ দোষী মনে না করেন। আসামীর স্ত্রী আরও বলিতেছেন যে, তিনি যে সময় ব্রোঙ্কসের রুটী প্রস্তুত করিবার কারখানায় কায করিতেছিলেন, সেই সময়ে আসামী তথায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিল। সুতরাং ঐ রাত্রিতে সে কখনই নিউ জার্সিতে যাইতে পারে না। আসামীর পক্ষে অনেক হোমরা-চোমরা ব্যারিষ্টার ছিলেন। জুরীদিগের মধ্যে কয়েক জন বিশিষ্টা নারী ছিলেন। জুরীরা মামলার সমস্ত বিবরণ শুনিয়া হপ্টম্যানকে শিশুহত্যা এবং শিশু-হরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিচারপতি টমাস ডবলিউ ট্রেনচার্ড (Trenchard) জুরীদিগকে মামলা বুঝাইয়া দেন। তিনি মামলার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিরপেক্ষভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে জুরীদিগকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিতেছিলেন, সে সময়ে আসামী হপ্টম্যান্ তাঁহার দিকে তীব্র কটাক্ষ করিতেছিল। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় জুরীরা রায় প্রকাশ করিয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। বিচারপতি মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা আসামীর প্রাণদণ্ড করা হইবে, ইহাই প্রথম স্থির করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আসামী নিউ জার্সির আপীল আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে। সে কারাপ্রকোষ্ঠে বসিয়া কেবল রোদন করিতেছে এবং বলিতেছে যে, সে নির্দ্দোষ। এই আপীল শুনানীর জন্য তাহার প্রাণদণ্ড সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকিবে। আপীলের কাগজ-পত্র সমস্তই সরকারী ব্যয়ে ছাপা হইবে। আপীলে যদি কোন ফল না হয়, তাহা হইলে এই শ্বেতকায় আসামী হপট্‌ম্যান ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিবে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদিগকে এইভাবে করুণা-প্রদর্শন প্রশংসনীয়

মিঃ হপট্‌ম্যান

সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ অঞ্চলের কৃষ্ণকায় নিগ্রো আসামীদিগের প্রতি কি এইরূপ করুণা-প্রদর্শন করা হইয়া থাকে? তাহাদের বেলা ত আদালতের বিচার পর্য্যন্ত সবুর সহে না। জনতা উন্মত্ত হইয়া বিচারের পূর্ব্বে আসামীকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া থাকে। মিস মেয়োর দল এ বিষয়ে কি বলেন? মামলার যখন আপীল হইয়াছে, তখন ন্যায়-বিচারের খাতিরে আমরা এই মামলা সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলিব না।

শ্যামরাজ্যের কথা

শ্যামরাজ প্রজাধিপক সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। প্রজাধিপক এক জন জনপ্রিয় রাজা। তাঁহার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে বলিয়া তিনি দেশে ফিরিতে অনিচ্ছুক, এ কথা পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে শ্যামরাজ্যে যে নিয়মনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই শাসনতন্ত্রানুযায়ী সরকার যাহাতে অন্যায়রূপে তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারেন, সেই জন্যই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার রাজ্যের প্রজারা যাহাতে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না করেন, সে জন্য তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, এ সংবাদও পাঠক জানেন।

সস্ত্রীক শ্যামরাজ প্রজাধিপক

গত ৭ই নভেম্বর তাঁহারা ন্যাশানাল এসেম্ব্লির প্রেসিডেণ্টকে, মন্ত্রিসভার প্রেসিডেণ্টকে এবং পররাষ্ট্র বিভাগের কার্য্যসম্পাদককে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন; যে দিন এই দূতগণ ব্যাঙ্কক হইতে বিলাত যাত্রা করেন, তাহার পরদিনই শ্যাম দেশের প্রধান সচিব এই মর্ম্মে ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন যে, শ্যামরাজ্যের প্রজাবর্গ তাহাদের রাজাকে চাহে, সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস, রাজা প্রজাধিপক সিংহাসন ত্যাগ করিবেন না। যে ব্যবস্থা-প্রণয়নের জন্য শ্যামরাজ প্রজাধিপক সিংহাসন ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাটি এই প্রধান মন্ত্রীর চেষ্টাতেই আইনে পরিণত হইয়াছে। গোলমালের প্রধান কারণ এই যে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে এইরূপ একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে যদি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলে সে ঐ দণ্ডাদেশের পর রাজার নিকট আপীল করিবার জন্য ৬০ দিন সময় পাইবে। রাজার তাহাকে ক্ষমা করিবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু ক্ষমা করিতে হইলে সেই মার্জ্জনা-পত্রে প্রধান মন্ত্রীর স্বাক্ষর থাকা চাই। যদি উভয়ের মধ্যে মতভেদের জন্য অথবা অন্য কারণে ষাট দিন অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে,—রাজার তাহাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহার দণ্ড হইবে। রাজা প্রজাধিপক বলেন,—এই আইনে রাজার কর্তৃত্বকে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় খর্ব্ব করা হইতেছে। এই আইন বলবৎ থাকিলে রাজপুরুষরা তাহাদের অপ্রীতিজনক ব্যক্তিদিগকে চক্রান্ত করিয়া আদালতের সাহায্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে, এবং যোগেযাগে নানা তর্ক তুলিয়া ৬০টি দিন কাটাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ফাঁসী দিতে পারিবে। রাজা প্রজাধিপক বলিতেছেন যে, যদি কেহ রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাহা হইলে রাজা যত দিন সেই বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া না দিবেন, তত দিন তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না। তাঁহার এই কথা যে সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজাকে এখন রাজ্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত করিতে পারা যায় নাই। তিনি এইরূপ অবস্থাতে আর রাজ্যভার লইতে চাহিতেছেন না। এ দিকে রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটু অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গত ১২ই ফাল্গুন রবিবারে শ্যামের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী লুয়াংপ্টিচুলা সংগ্রাম যখন ফুটবল-ক্ষেত্র হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। হত্যা করিবার চেষ্টাকারী তাঁহার মোটর লক্ষ্য করিয়া দুইটি গুলী ছোড়ে, গুলী তাঁহার গলায় এবং হাতে লাগিয়াছে। তবে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন নহে। এ বিষয়ে অধিক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না,—সুতরাং ভিতরের কথা ঠিক বুঝা কঠিন।

আবিসিনিয়ার সহিত ইটালীর যুদ্ধ

আবিসিনিয়ার সহিত ইটালীর যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। আবিসিনিয়া পূর্ব্ব-আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের অধিবাসীরা কাফ্রি। ইহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। সম্রাট মেনিলিকের আমলে এই রাজ্যের বিস্তার ৩ লক্ষ ২০ হাজার বর্গ-মাইল সাব্যস্ত হয়। জনসংখ্যা ৯০ লক্ষ। রাজ্যটি প্রাচীন। ইহার প্রাচীন নাম ইথিওপিয়া। পূর্ব্ব আফ্রিকার ইহা একটি শক্তিশালী রাজ্য। সম্রাট হাইল সিলাসী ইহার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা। তাঁহার রাজধানীর নাম আদ্দিস আবাবা। প্রাচীনকালে এই রাজ্যটি বিস্তারে অনেক বড় ছিল। এখন উহা নানা য়ুরোপীয় জাতির অধিকৃত দেশগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই আবিসিনিয়া রাজ্যটির সহিত ইটালীর বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি সেই বন্ধুত্ব ক্ষুন্ন হইয়া গিয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আবিসিনিয়ার সম্রাট তাঁহার সৈন্যদলকে আধুনিক সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছেন এবং ইটালী সেই জন্য লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী তাহার ইরিট্রিয়া উপনিবেশের এবং ইটালী কর্ত্তৃক অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ডের দুর্গগুলি সুদৃঢ় করিতেছেন বলিয়া ইটালী এবং আবিসিনিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দেহপূর্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাহার উপর ইটালী তাহার অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ড হইতে ইরিট্রিয়া পর্য্যন্ত একটি রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। এই রেলপথ করিতে হইলে যে স্থানগুলি আবশ্যক, তাহার একটি

স্থানের অধিকার লইয়া ইটালীর সহিত আবিসিনিয়ার বিবাদ ঘটিয়াছে। গত নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে আবিসিনিয়ার সৈন্য টানা হ্রদের সন্নিহিত গণ্ডার নামক স্থানের দূতসদন আক্রমণ করে। ফলে দূতসদনের প্রহরী সেনাদিগের মধ্যে এক জন নিহত এবং আর তিন জন আহত হয়। ইটালী ইহার জন্য অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ-প্রাপ্তির দাবী করেন। ইটালীর ঔপনিবেশিক সৈন্যদিগের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। আবিসিনিয়ার সরকার অবিলম্বে রোমে দুঃখ প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং গণ্ডারের শাসনকর্তাকে ইটালীর পতাকাকে অভিবাদন করিতে বলেন এবং হতাহত ব্যক্তিদিগের জন্য ক্ষতিপূরণ চাহেন। মৃত প্রহরী সৈনিকের জন্য ৮৫'২০ ডলার এবং আহত ব্যক্তিদিগের জন্য ১২'৭৮ ডলার ক্ষতিপূরণও সম্রাট হাইল সেলাসী অবিলম্বে প্রদান করেন। এই ব্যাপারে বিবাদ মিটিয়া যাইবে বলিয়াই আশা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, বিবাদ মিটে নাই। ইটালীতে রণসজ্জা উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্যাপারের বিস্তৃত সংবাদ এ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না। সুতরাং আসল ব্যাপার বুঝা কঠিন। যে স্থানটি লইয়া বিবাদ, সে স্থানের নাম ওয়েল ওয়ালিয়াল। আবিসিনিয়ার সৈন্য নাকি এই স্থানটি আক্রমণ করিতে যায়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহার পর ফ্রান্সের সহিত ইটালীর এক সন্ধি হইয়া গিয়াছে। ইটালীয়ানরা সেই সন্ধির এইরূপ একটা সর্ত্ত করিয়া লইয়াছে যে, ইটালী আবিসিনিয়ায় বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যাহা করিবেন, ফ্রান্স তাহাতে কোন কথা বলিতে পারিবেন না। ফ্রান্স সেই সর্ত্তে সম্মত। তাহার পরই সংবাদ পাওয়া যায় যে, গত জানুয়ারী মাসে আবিসিনিয়ার সৈন্যগণ ইটালীর সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে। পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইটালী হইতে দলে দলে সৈন্য জাহাজে চড়িয়া ইরেট্রিয়ার দিকে ধাবিত হইতেছে। গত ১৮ই এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী এইরূপই জাহাজ বোঝাই সৈন্য মেসিনা এবং নেপলস বন্দর হইতে ইরেট্রিয়ার দিকে যাত্রা করিয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণকায় আবিসিনিয়াবাসীদিগের ভাগ্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। সম্ভবতঃ এত দিন যুদ্ধ বাধিয়াছে। এখন অনেকের দৃষ্টি আফ্রিকার এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির উপর পতিত। ইহার পর মেসিনা বন্দর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথা হইতে আফ্রিকায় অনেক ইটালীয় সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৩ই ফাল্গুন তারিখের তারের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, তথা হইতে আরও ৩ হাজার ৬ শত ইটালীয় ফৌজ এবং ৩ টন সমর-সজ্জা ও সৈন্যদিগের সাজসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্র ঐদিকে চালান গিয়াছে। ৫ই মার্চ্চ বা ২১শে ফাল্গুনের মধ্যে ইটালীর ১৫ হাজার পেলোরিটানা সৈন্য এবং গভিনান সৈন্য বিভাগের সাড়ে ৭ হাজার ফৌজ ঐ দিকে প্রেরিত হইবে। এইবার প্রাচীন ইথিওপিয়া রাজ্যটি বোধ হয় লুপ্ত হইবে। মুসোলিনী উহাকে একেবারে মুষল আঘাতে চূর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না বলিয়া কৃতসংকল্প।

—

চাকো সংগ্রাম

দক্ষিণ-আমেরিকায় প্যারাগুয়া এবং বোলিভিয়ার সংগ্রাম আজ আড়াই বৎসরের অধিক কাল সমান তেজে চলিতেছে। বিগত ১৭ই নভেম্বর বাঙ্গালা ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে পিল কোমায়ো নদীর রক্ষী দুর্গ বল্লীভীয়ান এবং দশ হাজার বোলিভিয়ান সৈনিক শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছে। বোলিভিয়াবাসীদিগের বিস্তর অস্ত্র-শস্ত্র এবং রসদাদি বিজয়ী প্যারাগুয়ার হস্তে পড়িয়াছে। বল্লীভিয়ান (Bullivian) দুর্গ পতিত হওয়াতে বোলিভিয়াবাসীদিগের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই পরাজয়ের জন্য গত ২৮শে নভেম্বর বোলিভিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডানিয়েল সালামানকাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। এই দুর্গপতনের সহিত বোলিভিয়ার আশা-ভরসা সবই নিবিয়া গিয়াছে।

এ কথা সত্য যে, বোলিভিয়ার তুলনায় প্যারাগুয়া অনেক ছোট রাজ্য। প্যারাগুয়ার বিস্তার প্রায় পৌনে দুই লক্ষ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ৮ লক্ষের কিছু অধিক, তন্মধ্যে ৪৫ হাজার চাকোর আদিম অধিবাসী। অর্থাৎ সমগ্র প্যারাগুয়া রাজ্যে যত লোকের বাস, বাঙ্গালার একমাত্র কলিকাতা সহরে প্রায় তত লোকের বাস। কিন্তু বোলিভিয়া রাজ্যের বিস্তার ৫ লক্ষ ১৪ হাজার বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ২৮ লক্ষ। অর্থাৎ প্যারাগুয়ার সাড়ে তিন গুণ। তাহা হইলেও বোলিভিয়া পরাজিত হইতেছে,—ইহার কারণ, ঐ রাজ্যে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের সংখ্যা প্রায় ২৩ লক্ষ, শ্বেতাঙ্গ ও বর্ণসঙ্কর কিছু কম ৫ লক্ষ। আদিম ইণ্ডিয়ানরা দাস জাতিতে পরিণত। কাযেই এই দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার ভাব নাই। বরং তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব বিদ্যমান। কাযেই তাহারা প্যারাগুয়াবাসীদিগের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, জেনিভার জাতিসঙ্ঘ এই বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কতকটা চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উভয় পক্ষের কেহই তাঁহাদের কথা শুনে নাই। প্যারাগুয়াবাসীরা জাতিসঙ্ঘকে সম্প্রতি জানাইয়াছে যে, তাহারা জাতিসঙ্ঘের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে। কারণ, জাতিসঙ্ঘ এই গ্রাণচাকো বিবাদের মূল কারণ সম্বন্ধে কাহাদের দায়িত্ব অধিক, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে সম্মত নহেন। এই জন্য জাতিসঙ্ঘের সহিত প্যারাগুয়ারও বেশ একটু মন-কষাকষি উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, দক্ষিণ-আমেরিকার রাজ্যমণ্ডলী মধ্যস্থ করিয়া এই বিষয়ের একটা মীমাংসা করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এ দেশে যে সংবাদ আসিতেছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত সংবাদ না পাইলে আর কিছু বলা যাইতেছে না।

গল্পের প্লট

(গল্প)

মন্দা বসিয়া আনাজ কুটিতেছে, স্বামী বিমান আসিয়া কহিল,—তোমার চিঠি ···

বলিয়া সদ্য-ডাকে-আসা খামখানা বিমান স্ত্রীর হাতে দিল। খাম দেখিয়া মন্দা কহিল,—কে লিখেচে ?

বিমান কহিল,—ঘ্যাখো···

চিঠিখানা হাতে লইয়া মন্দা কহিল,—হাতের লেখা চিন্‌তে পার্‌চি না। আমার চিঠি তো ?

—বাঃ! তোমার নাম রয়েছে। এই ঠিকানা...আমি কিন্তু দাঁড়াতে পার্‌চি না। এক-গাদা প্রুফ এসেচে নতুন নভেলখানার—এখনি দেখে পাঠানো চাই! তাড়া আছে।

বিমান চলিয়া গেল; মন্দা খাম ছিঁড়িয়া চিঠি খুলিল। চিঠিতে লেখা আছে,—

> মন্দা,—আমার মন্দা,
>
> সম্বোধন দেখিয়া তুমি হয়তো শিহরিয়া উঠিবে। এ সম্বোধন করিব কি না, আজ চার দিন ধরিয়া সে কথা ভাবিয়াছি, কিন্তু এ সম্বোধন ছাড়া নূতন কি নামে তোমাকে ডাকিব জানি না···

এইটুকু পড়িয়াই মন্দা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, করিয়া চিঠির তলায় নাম দেখিল, কে লিখিয়াছে। তলায় নাম রহিয়াছে,—

"হতভাগা অমর"

অমর!

দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়িল। তার বিবাহ হইয়াছে আজ দশ বৎসর। দশ বৎসর পূর্ব্বে···

কৌতূহল হইল! নিশ্বাস ফেলিয়া মন্দা আবার চিঠি পড়িল। অমর লিখিয়াছে,—

> তিন বৎসর পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়াছি। অনেক সন্ধান করিয়াও তোমার ঠিকানা জানিতে পারি নাই। হঠাৎ সে-দিন "হিল্লোল" মাসিকপত্র চোখে পড়ে। তোমার স্বামী বিমান বাবু একজন নামজাদা নভেলিষ্ট—কথাটা শুনিয়াছিলাম। "হিল্লোলে" তাঁর লেখা নভেলের তিনটা পরিচ্ছেদ পড়িলাম। সে তিন পরিচ্ছেদ পড়িয়া তাঁর মনের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, তাঁর মতামতগুলো খুব liberal। হিল্লোল অফিস হইতে নভেলিষ্ট বিমানবিহারী রায়ের ঠিকানা জানিয়াছি, ২৬ নম্বর তারক ব্যানার্জ্জী লেন। ঠিকানা জানিয়া দু'দিন তোমাদের বাড়ীর সামনে গিয়াছিলাম। একদিন কাহারো সাড়া পাই নাই; দ্বিতীয় দিন তোমায় দেখি দোতলার খড়খড়িতে। সামনের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তুমি কথা কহিতেছিলে! তোমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই তো। দশ বৎসরেও ঠিক তেমনি আছ—রূপময়ী, বাসনাময়ী!
>
> আমার কথা বোধ হয় শুনিয়াছ। একটা বিবাহ করিয়াছি। সে কি স্ত্রী! ঘর-সংসার দেখিবার জন্য একজন নারীর প্রয়োজন—সেই প্রয়োজন শুধু মিটিয়াছে। প্রাণে যে পুষ্পাসন জাগিয়া আছে—সেখানে তাকে বসানো চলে না; মানায় না!
>
> কত স্বপ্নই দেখিতাম, মন্দা। সে পুষ্পাসনে তোমাকে বসাইয়া! তোমাকে কেন্দ্র করিয়া আমার ভবিষ্যৎ রচনা করিয়াছিলাম! তোমাকে হারাইব, এ চিন্তা কখনো মনে জাগে নাই!
>
> আমার অযোগ্যতা কোথায় ছিল, বলিতে পারো? তোমার বাড়ী যা দেখিলাম, বিমান বাবু তোমার মর্য্যাদা রাখিতে পারিয়াছেন, এমন মনে হইল না!
>
> তুমি জানো, তোমার সেই ফটো—যে ফটো তোমার অজ্ঞাতে আমি চুরি করিয়াছিলাম—সেই ফটো আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সেখানি সঙ্গে রাখিয়াছি চিরদিন।
>
> একটা হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছি। কাজ-কর্ম্ম করি না। ভালো লাগে না। গৃহ অসহ্য হইল। তোমায় দেখিব বলিয়াই কলিকাতায় আসিয়াছি। দূর হইতে সে দেখায় মন ওঠে না। এক দিন অনুমতি করো, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখিয়া আসি, প্রাণ ভরিয়া আমার দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া আসি।
>
> এ দয়াটুকু কি এমনি দুর্ল্লভ?
>
> প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, চিঠি লিখিব না। দেশে থাকিতে তোমার বাবার ঠিকানায় তোমায় তিনচারখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম—প্রাণে যে কথা জাগিয়াছিল, তাহাই লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব পাই নাই! এ চিঠির জবাব পাইব কি না, জানি না! তবু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।
>
> একটু জবাব দিয়ো। আর কোনো কথা না লেখো, কেমন আছ লিখিয়া জানাইয়ো—তাহাতেই কৃতার্থ হইব। সেটুকু চিঠি লিখিলে বাঙলার সাধ্বী-গৃহিণীর গৃহধর্ম্ম চূর্ণ হইবে না।
>
> বিশ্বাস করিবে কি,—আজো রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা হয় স্বপ্নে! তোমাকে স্বপ্ন দেখি!
>
> এক ছত্র লিখিয়া জানাইয়ো, তুমি সুখে আছ—স্বামীর আদরে···তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।
>
> তার বেশী ···
>
> সে আশা হয়তো দুরাশা! মন্দা, আমার মন্দা—আমার মত দুঃখী দুনিয়ায় আর নাই! সত্য কথা বলিতেছি, বিশ্বাস করিয়ো। দীন-দুঃখীকে মানুষ দয়া করিয়া কত কি দেয়—আমি যদি তোমার হাতের এক ছত্র লেখা আশা করি, সে আশা সত্যই নিষ্ফল হইবে?
>
> হতভাগা অমর।

২

চিঠি পড়িয়া রাগে মন্দা জ্বলিয়া উঠিল। আনাজ-বঁটি ফেলিয়া সে ছুটিল, বিমানের ঘরে।

বিমান প্রুফ দেখিতেছে, মন্দা আসিয়া কহিল,—প্রুফ রাখো। কথা আছে।

প্রুফের উপর হইতে চোখ না তুলিয়াই বিমান কহিল,—বলো···

মন্দা চটিল; চটিয়া প্রুফগুলা টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিল, দিয়া কহিল,—চিঠিখানা পড়ে ছাখো। কি ছাই-পাঁশ গল্প লিখে বেড়াবে, আর আমার এখানে···

কথা শেষ হইল না। চিঠিখানা বিমানের সামনে সে ফেলিয়া দিল। বিমান চিঠি পড়িল।

চিঠি পড়িয়া তার দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মন্দার পানে চাহিল।

মন্দা কহিল,—বেশ করে শিক্ষা দাও! হতভাগার আস্পর্দ্ধা ছাখো।

তার স্বরে বিস্ময়!

মন্দা কহিল,—নয়? ভেবেচে কি? ভদ্দর লোকের স্ত্রী—নভেলের নায়িকার মত প্রেম করবার জন্যে হাঁ করে বসে আছে! বটে! তার ঘর-সংসার নেই? কাজ-কর্ম্ম নেই।···এ প্রেমের মানে?

বিমান কহিল,—মানে আবার কি! প্রেম! তার মানে ভালোবাসা!···

মন্দা কহিল,—ভালোবাসা!

—হ্যাঁ।

মন্দা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—আমায় ভালো-বাসতে হবে এঁকে? চিঠি লিখেচেন বলে?

বিমান কহিল,—একটা lovor বটে! বেচারা তোমায় স্বপ্ন দেখে! তোমাকে ভুলতে পারেনি!

—ভুলতে পারেনি? মন্দা হুঙ্কার তুলিল,—ভোলার মানে? আমি তার গলা জড়িয়ে বলেছি না কি কোনো-দিন যে ওগো, আমায় তুমি ভালোবাসো!

বিমান চাহিল মন্দার পানে; বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল। মন্দা মনে মনে ভয়ঙ্কর তাতিয়া উঠিতেছিল।

বিমান কহিল,—তোমার কাছে হয়তো এমনি আভাস পেয়েছিল··

মন্দা জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—যে, আমি তার জন্যে মরি! না?

বিমান কহিল,—চটো কেন! শোনো না···

মন্দা কহিল,—কি শুন্তে হবে? ভদ্দর লোকের ঘরে কোন্ মেয়েমানুষ পরপুরুষকে ভালোবাসে? যেমন হয়েছে তোমাদের লক্ষীছাড়া লেখা! পড়ি তো! গা একেবারে ঘিন্-ঘিন্ করতে থাকে। সেদিন পড়ছিলুম একখানা কাগজে গল্প। এক লেখক গল্প লিখেচেন—বিয়ে হয়েচে একটা মেয়ের। দু'দিনের জন্যে সে এসেছে তার বাপের বাড়ী; এসে বড় ভাইয়ের দুই বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে! চা খাওয়া, হাসি, রঙ্গ, গান—তাতেও শাণালো না। গল্পের এক জায়গায় লিখচে, সন্ধ্যার সময় মেয়েটা বসে আছে—দাদার এক বন্ধু বসে আছে, মেয়েটা বললে, কাছে এসে বসুন···দূরে কেন? তাতে বন্ধু বল্লে, শুধু বসেই থাকবো? পড়ে এমন রাগ হলো! কাগজখানা উনুনের মধ্যে ফেলে দিলুম! হতভাগা! ঘর-সংসার কাকে বলে, চোখে কখনো ছাখেনি, বুঝি!

বিমান হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিয়া কহিল,—এতে দোষ কি?

—দোষ কি! মন্দা বিস্ময়ের ভঙ্গীতে ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল,—ও তোমায় বোঝাতে পারবো না। তুমি বুঝবে না। তুমিও অমনি লেখা সুরু করেচো কি না আজ-কাল!

বিমান কহিল,—এমনি লেখাই লোকে চায়! আগে এ সব লিখতুম না। তার ফলে লোকে লেখক বলে পুঁছতো না আমাকে। এমনি লেখা সুরু করেচি বলেই আজ আমার লেখার সম্বন্ধে কাগজে-কাগজে আলোচনা হচ্ছে। ছাখোনি—"ধুরন্ধর" কাগজে এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে···বাঙলার আধুনিক কথা-সাহিত্যে যে চার-পাঁচটি আকাশ-ফাঁশা প্রতিভা-স্র্র্য্য সার্টিফিকেট পেয়েচেন, আমি তাদের একজন! আগেও তো অনেক লেখা লিখেছি, কোনো সমালোচক আমার নাম করে নি—যেন আমি লেখক নই! আর যেই এমনি লেখা ধরেছি, অমনি সাহিত্যের দিক্‌পাল বনে গেছি! কন্‌টিনেন্টাল নভেলিষ্টদের পাশে ফার্ষ্ট ক্লাশে ট্রিপল্-প্রোমো-শন পেয়েছি···

বিমান বকিয়া চলিল মনের আবেগে—কথাগুলা মন্দা শুনিতেছে কি না, সেদিকে খেয়াল রহিল না।

খেয়াল হইবামাত্র বুঝিল, মন্দা এ-কথায় কর্ণপাত করে নাই; সে অন্য দিকে চাহিয়া আছে। কি ভাবিতেছে!

বিমান কহিল—কি ভাবচো ?

মন্দা আবার নিশ্বাস ফেলিল ; ফেলিয়া কহিল,—এর আস্পর্দ্ধার কথা…

বিমান কহিল,—শোনো, রাগ করো না…বলো আমাকে এই অমরের কথা। কি তার পরিচয় ? আমার মাথায় একটা আইডিয়া জাগচে।…বলবে ?

মন্দা ঝঙ্কার দিয়া কহিল—কথা আবার কি !

—তবু…

মন্দা কহিল—হতভাগা ! ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীর পাশে থাকতো। ওর বাবা…বাবার সঙ্গে ছিল তাঁর ভাব। একসঙ্গে দু'জনে বসে দাবা খেলতেন। অমর আসতো দাদার কাছে। আমাকে মাঝে মাঝে ফাই-ফরমাশ খাটতে ওদের সামনে বেরুতে হতো। অমর কবিতা লিখতো। দাদা বলতো, মস্ত কবি ! আমাদের বাড়ীতে প্রায় আসতো—কথাবার্ত্তাও আমার সঙ্গে কইতো। আমি গান গাইতুম—শুনতো ; মাঝে মাঝে চকোলেট-টফি কিনে আনতো—আমাদের দিত। এই…

বিমান কহিল—শুধু এই !…কোনো আভাস কখনো পাও নি তার ভালোবাসার ? তোমাকে ভালোবাসতো গোড়া থেকেই ! নাহলে টফি-চকোলেট দেবে কেন ?

মন্দা কহিল—বা রে ! আমরা তাকে দাদা বলতুম… দাদার বন্ধু !

বিমান কহিল,—এ রকম caseএ প্রেম হওয়া খুব স্বাভাবিক। বন্ধুর বোন্…আমাদের সাহিত্যে তারাই best targets !

মন্দা কহিল—থামো ! অতটুকু বয়সে আমরা অমন প্রেমের জন্য হেদিয়ে মরি নি। প্রেম ! প্রেম আবার কি ?

বিমান কহিল—প্রেম কি ! সত্যি মন্দা, এ কথা তুমি বলচো কি করে ?…এই প্রেম আছে বলেই…

—তোমাদের নভেল লেখার সুবিধা হয়েচে…না ?… রাখো তোমাদের নভেল। ভদ্দরলোকের ঘরের মেয়েরা প্রেম করে বেড়ালে তোমাদের দশা কি হতো, ভেবে দেখেচো কখনো ? না, নভেল লেখা নিয়েই মশগুল আছো !

বিমান হাসিল ; হাসিয়া কহিল,—তার মানে ?

মন্দা কহিল—তোমার কথাই ধরো। তুমি তো প্রুফ আর ছাপাখানা নিয়ে মেতে আছো ! আমি যদি রাস্তা থেকে মানুষ ধরে এনে প্রেম করে বেড়াই ?

বাধা দিয়া বিমান কহিল—Exactly the idea ! ঐ কথাই আমি ভাবছিলুম। লক্ষ্মী মন্দা, এ চিঠির তুমি জবাব দেবে নিশ্চয় !

মন্দা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—বয়ে গেছে আমার !

বিমান কহিল,—বয়ে গেছে কি ! বেশী কিছু না লেখো, ও যা চেয়েছে…একটি ছত্র…তুমি কেমন আছ ?

মন্দা কহিল—যদি লিখি, বড় দুঃখে আছি গো, প্রেমের অভাবে জগৎ শূন্য দেখচি—খুব খুশী হবে ?

বিমান কহিল—প্রাণের অকপট প্রকাশ—তাতে কোনো দরদী মানুষ অখুশী হতে পারে না ! সত্যি যদি তুমি দুঃখে আছো ভাবো, সেই কথাই লিখো।…লিখবে তো ?

মন্দা কহিল,—আমি পাগল হইনি তোমার মত !

—লিখবে না ?

—না !…দাও ও-চিঠি…

—কি করবে ?

—উনুন জ্বলচে…তাতে ফেলে দেবো…

বিমান কহিল,—না, না, না…আমার মাথায় মস্ত আইডিয়া জেগেচে। তুমি একে জবাব দাও…

বাধা দিয়া মন্দা কহিল—না…

—আমি বলে দেবো, কি লিখবে। ভয় নেই, এতে তোমার সেকেলে সতী-ধর্ম্ম…

—চুপ করো…

মন্দার স্বরে ভর্ৎসনার শিখা !

বিমান কহিল,—লক্ষ্মীটি…

মন্দা সে কথা কাণে তুলিল না, ঘর হইতে বাহির হইয়া বঁটী লইয়া বসিল।

বিমানের প্রুফ দেখা হইল না। সে তখনি আসিল, আসিয়া ডাকিল—মন্দা…

৩

বিমান অনেক মিনতি করিল—বহু সাধ্য-সাধনা… জবাবের খশড়া লিখিয়া আনিল।…মন্দা শুধু নকল করিয়া নিজের হাতে লিখিয়া দিবে। একটু মজা !…দোষ কি ?…

দেখা যাক্ না, সত্যকার ঘটনা লইয়া এ প্লট কেমন জমে···কোথায় কি-ভাবে শেষ হয়···

মন্দার কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ—না! প্রাণ গেলেও এমন চিঠি সে লিখিতে পারিবে না! কে অমর—কোথাকার লক্ষ্মী-ছাড়া···এত-বড় তার স্পর্দ্ধা। অপরের স্ত্রীকে এমন করিয়া কদর্য্য চিঠি লেখে···

ঘৃণায় মন্দার মন রী-রী করিয়া উঠিল। স্বামী··· লেখার নেশায় এমন মতিভ্রম ঘটিয়াছে যে গল্পের প্লট খুঁজিতেছে স্ত্রীর মান-মর্য্যাদা ভাসাইয়া দিয়া! না! সে চিঠি লিখিবে না···কখনো না!

বিমান যেন ক্ষেপিয়া উঠিল! চমৎকার প্লট! বাঃ! খাশা!

নিজেই অক্ষরগুলাকে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া বানানে ভুল করিয়া কোনো মতে মেয়েলি ছাঁদে হরফ সাজাইয়া বাঁ হাতে কলম ধরিয়া নিজেই শেষে অমরকে পত্র লিখিতে বসিল। লিখিল,—

বন্ধু হে!

তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হলো—সেজন্য ক্ষমা করো। এ চিঠি লেখা উচিত কি না, ভাবছিলুম। হাজার হোক, আমি এখন আর এক জনের স্ত্রী। লোকের চোখে তার একটা দাম তো আছে!

দশ বছর দেখা হয় নি! এমন আশ্চর্য্য লাগছে! আমার যেন মনে হচ্ছে, কাল তোমাকে দেখেছি! আমি গান গাইছি, তুমি আমার পানে চেয়ে আছ মুগ্ধ নয়নে! তোমার সে চোখের দৃষ্টি—ভাবো, আমি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতুম না? কিন্তু আমি নারী—সে কথা ভুলো না, বন্ধু!

এত বিলম্বে এ সুর কেন আমাকে শোনালে? যখন সময় ছিল, জীবনে যখন প্রথম বসন্ত জাগলো, তখন কি-সঙ্কোচে কণ্ঠ তোমার রুদ্ধ ছিল, বন্ধু? একটা নারীর সারা জীবন···তার কি দাম ছিল না? আমি কেমন আছি, জিজ্ঞাসা করেছো। তার কি জবাব দেবো? বাঙলা দেশে বাঙালীর মেয়ে—সংসারের জাঁতা-কল বৈ আর কি!

আমার স্বামী মস্ত নামজাদা নভেলিষ্ট। তাঁর মন liberal—সে উপন্যাসের কাল্পনিক নর-নারীদের বেলায়। ঘরের স্ত্রীর বেলায় সে liberality দেখালে তাঁর সংসার কে চালাবে, বলতে পারো? আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক—পরিচর্য্যা পাবার—সেবা আদায় করবার। আমাদের কি জীবন আছে যে, সে-জীবনের সুখ-দুঃখের সন্ধান নেবে তোমরা পুরুষ-মানুষ? আমার ভালো-মন্দের কথা জিজ্ঞাসা করো না। স্বামীর সংসারে আর পাঁচটা আসবাবের মর্ত আমিও আছি একটা আসবাব!

কিন্তু কেন তুমি এ চিঠি লিখলে, বন্ধু? আমার মন সংসারের জাঁতা-কলে পিষে এখনো যে চূর্ণ হয় নি! আমার বয়স সবে এই পঁচিশ বৎসর। এখনো ফুলের গন্ধে সে চারিদিকে তাকায়,—পাখীর গানে সাড়া তোলে!

তুমি আমায় চিঠি লিখো। তোমার চিঠির এ আদর-সোহাগ আমার ব্যর্থ-প্রাণে বসন্ত-বাতাস বয়ে এনেছে! সে বাতাসে মনের বনে ফুলগুলো আবার তাদের শুকনো দল মেলে সজীব হয়ে উঠেচে!

কি লিখছি, জানি না। তবে মনে যে কথা এসেছে, তাকে শাসন-নিষেধের রাশে বাঁধলুম না—ফেরালুম না!

বৌ পেয়ে সত্যি সুখী হও নি? না, অভিমান-বশে ও-কথা লিখেছো?

তোমার মত স্বামীর দাম যে স্ত্রী বুঝতে পারে না, জানি না, কি ধাতুতে ভগবান্ তাকে গড়েচেন!

তোমার সেই চিরদিনের পুরানো
মন্দা।

এ-চিঠির জবাব আসিল। অমর লিখিল,—

মন্দা, আমার মন্দা—

আজ সন্ধ্যার পর তোমার চিঠি পেয়েছি। কি আরাম সে চিঠিতে! আমার বুকে ছিল পাষাণ-ভার। সে পাষাণ-ভার তোমার চিঠি পেয়ে সরে খসে গেছে!

আজ আমার আনন্দের সীমা নেই! এ আনন্দ কাকে দেখাবো, মন্দা?

বেঙ্গল হোটেলে অনেক লোক। কি মিথ্যা কোলাহল নিয়ে সকলে মেতে আছে। ও ঘরে তাসের বাজি জিতে একদল আনন্দ করচে; পাশের ঘরে আছে এক রেশ-খেলোয়াড়। আজ নগদ আড়াইশো টাকা জিতে সে যেন নাচচে! হারে মূঢ়ের দল! কি অসার জিনিষে এরা আনন্দ পায়!

তোমার চিঠি পড়ে বুঝলুম, তুমি সুখ পাও নি। পাবার কথা নয়! আমি দেখেছি,—বিবাহটা ক্রমে বন্ধন হয়ে দাঁড়াচ্ছে! পুরুষ এত শিক্ষা, এত কালচার সত্ত্বেও সেই বর্ব্বর যুগের মত স্বার্থ-মত্ত আছে! নারীকে জানে শুধু দাসী! তার যে মন আছে, সে কথা আজো পুরুষ খেয়াল করে না!

ভয় নেই মন্দা···এ অত্যাচার কোনোদিন বিজয়লাভ করেনি। যখনি সীমা লঙ্ঘন করেচে, তখনি রুদ্র-পতাকা তুলে বজ্র-হুঙ্কারে জেগেচে বিদ্রোহ! চেয়ে ছাখো রাজনীতির ক্ষেত্রে! ফরাসী মুলুক, রাশিয়া, তুর্কি! রাজ-নীতির ক্ষেত্রে যা সত্য, তা মন-নীতির ক্ষেত্রেও সত্য। তবে এ বিদ্রোহে অগ্রদূতিনী হতে হবে নারীকে!

এসো নারী, আজ মুক্তির অঙ্গন-তলে তোমার বিদ্রোহ-পতাকা তুলে! ও-মন নিয়ে সংসারের জাঁতা ঘুরোবে বলে তুমি জগতে আসোনি! তুমি এসেচো তোমার মনের প্রদীপের আলোয় অভাগা পুরুষের চিত্ত আলোকিত করতে!

তোমার মনে কি আলোর আভাস, আমি তা দেখেছি তোমার কিশোর বয়সে! যৌবনের লাবণ্য যেদিন তোমার অঙ্গে অঙ্গে প্রথম দীপালী সাজাচ্ছিল···!

আমায় চিঠি লিখো—যখনি খুশী হবে, লিখবে। আমার চিঠির জবাব দিতেই শুধু চিঠি লেখা নয়। একদিনে যত বার আমায় স্মরণ করবে—মনের অতি ক্ষুদ্র কোনো কথা জানাবার জন্যে—ততবার আমাকে চিঠি লিখবে।

ভুলো না মন্দা—আমার প্রাণের অলকানন্দা—বিচিত্র-ছন্দা মন্দা···মন্দা, তোমার চিঠির আশায় আমি বেঁচে থাকবো—বেঁচে আছি!

আজ ভাগ্যবান
অমর

৪

এ জবাব আনিয়া বিমান দেখাইল মন্দাকে। মন্দা মশারি সেলাই করিতেছিল। চিঠি পড়িয়া লজ্জায় মন্দার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে কহিল,—ছি!

বিমান কহিল,—কিসের ছি!

মন্দা কহিল—তোমার লজ্জা করচে না? তোমার স্ত্রীকে কোথাকার কে একজন এমনি যা-তা লিখেচে?

বিমান কহিল—কিন্তু এ প্রেম···জগতে সব-চেয়ে বড় সম্পদ, মন্দা!

মন্দা অন্য দিকে চাহিয়া রহিল; বিমান কহিল—আমার ভারি মজা লাগচে! সংসারে নিত্য সেই রুটীন-বাঁধা কাজ! বিরাট গদ্য গদা তুলে দাঁড়িয়ে আছে! তার মাঝখানে একটু কবিতা···

মন্দা স্বামীর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—আমি যদি ওর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাই—তাতে তোমার গৌরব বাড়বে?

বিমান চুপ করিয়া কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল—বলা শক্ত।

সবিস্ময়ে মন্দা কহিল,—শক্ত!

বিমান বলিল,—শক্ত এই কারণে, যে, হাজার-হাজার বৎসর আমরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে মামুলি অধিকারের দর্পে বুক ফুলিয়ে চলে আস্‌ছি,—সে-দর্পে আঘাত পড়বে বলে হয়তো খানিকটা গর্জ্জন তুলবো—সংস্কার-বশে!··· নাহলে—মানুষের স্বাধীন মনের স্বাধীন গতির মর্য্যাদা যদি করি, তাহলে সত্য বলবো, স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক-বন্ধন—এটা ভয়ঙ্কর কৃত্রিম! সকলের পূর্ণ অধিকার আছে—মনকে স্বাধীন মুক্ত পথে অবাধে ছেড়ে দেবার···

মন্দা নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্বামীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, পরে কহিল—থামো! আমার সামনে এ সব লক্ষ্মীছাড়া কথা এমন করে বলো না। তোমাদের মত লেখাপড়া শিখিনি—অত চিন্তা করতেও শিখিনি···ও সব কথায় আমার মাথা কেমন ঘুরে যায়! আজই পড়ছিলুম আর-একটা গল্প—তাতে এমনি সব কথা! ভাবছিলুম, তোমরা কি সকলে মিলে পাগল হয়ে গেছ!

—পাগল!

—তাই। নাহলে···

মন্দা আর কোনো কথা বলিল না, চুপ করিল। তারপর মশারিটা কোলের উপর টানিয়া লইল; লইয়া কাটিম হইতে সুতা টানিয়া ছুঁচে পরাইল—পরাইয়া সেলাইয়ের কাজে মন দিল।

বিমান চলিয়া যাইতেছিল, তারো কাজ আছে। এ জবাবের একটা পাণ্টা জবাব লিখিবে।

মন্দা ডাকিল—শোনো···

বিমান ফিরিল।

মন্দা কহিল—তোমায় বারণ করচি, আমার নামে এ রকম জাল চিঠি খবর্দ্দার তাকে তুমি আর লিখবে না!

কথাটা বলিয়া সে স্বামীর পানে চাহিল। বিমানের চোখে বিস্ময়! মন্দা কহিল,—সে যদি পাঁচজনের কাছে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায়, আর একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী তার প্রেমে পাগল, তাতে তোমার পৌরুষ বাড়তে পারে, কিন্তু আমার তাতে অপমানের সীমা থাকবে না!

—অপমান!

—তাই! কি করে এতে অপমান হয়, তুমি লেখক মানুষ, নায়ক-নায়িকার কথাই জানো—সত্যকার মানুষকে জানো না—তুমি বুঝবে না!

বিমানের চিন্তায় গোলযোগ ঘটিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল, বেশ একটু মজা···ইহাতে আবার অপমান কি!

মন্দা কহিল—তাছাড়া এ তুমি আগুন নিয়ে খেলা করচো! বাজির আগুনে থাকবার ঘরও জ্বলে, মনে রেখো···

বিমান এতখানি দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োজন বুঝিল না; শুধু ডাকিল,—মন্দা···

মন্দা কহিল—যাও। শুধু তোমায় সাবধান করে দিলুম। মনে রেখো আমার কথা।

মন্দা মশারি সেলাই করিতে বসিল। বিমান চলিয়া গেল।

কিন্তু থাকিতে পারিল না; প্রেম-বিগলিত একখানি চিঠি সে লিখিয়া ফেলিল।

চমৎকার চিঠি। পড়িয়া নিজে খুব খুশী হইল। বুঝিল, যে কোনো উপন্যাসে এ চিঠি গুঁজিয়া দিলে, পড়িয়া

পাঠক-পাঠিকার মন নিশ্বাসে ভারী হইয়া উঠিবে! তাদের মত ঘরের কোণ ছাড়িয়া একেবারে পথে-প্রান্তরে বাহির হইয়া পড়িবে! ঘর-ছাড়া কি সুর যে এ চিঠির ছত্রে ছত্রে জাগিয়া আছে!

সে চিঠির জবাব আসিল। জবাবে হা-হুতাশ, দীর্ঘ নিশ্বাস, অশ্রু-আভাস। শেষের ছত্রে অমর লিখিয়াছে,—

> মাপ করো মন্দা,—আজ আমার স্পর্দ্ধা বেড়েচে! এই চিঠির ছত্রে ছত্রে আমার চুম্বনের তরঙ্গ তুলিয়ে দিলুম। এ তরঙ্গ যদি তোমার বুক দোলে, কৃতার্থ হবো আমি!
>
> অমর।

চিঠি পড়িয়া বিমান হাসিল। লোকটি সত্যই···প্রেমে যাহাকে বলে, একেবারে love-mad, তাই! অমরকে তার ভারী ভালো লাগিল। বেচারা! সত্যই ভালো-বাসিয়াছে! আহা! ভয়ঙ্কর ভালোবাসিয়াছে!

তবে ভীরু তার প্রেম!···

উপায় কি? আইন আছে। পুলিশ আছে। সভ্যতার বিজয়-পতাকা! এ পতাকা-তলে মানুষের প্রাণগুলা যে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিতে বসিয়াছে!

চিঠির মোহ বিমানকে শেষে পাইয়া বসিল। চিঠি লিখিয়া অধীর-আগ্রহে সে বসিয়া থাকে উত্তরের প্রতীক্ষায়। উত্তর আসিতে এক তিল বিলম্ব হয় না। উত্তর যেমন আসে, অমনি সব কাজ ফেলিয়া সে তার জবাব লিখিতে বসে।

সেদিন বিমান লিখিল,—

> তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারচি, তুমি শুধু বচনে ভালো-বাসো! সত্যই যদি আমার জন্ম এমন গভীর তোমার ভালোবাসা, কেন তবে অমন ভীরু-কম্পিত বুকে বসে আছো ঘরের কোণে?
>
> কাল আসবে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে সন্ধ্যা ছ'টার শো'তে। আমিও আসবো। সঙ্গে থাকবেন আমার স্বামী। কথা-বার্ত্তা হবে না। তবু চোখে দু'জনে দু'জনকে দেখবো তো! তোমাকে আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছা করচে।
>
> আসতে পারবে? না, ভয় করে? জেনো, ভীরু প্রেম কুৎসিত-কালো মাটীর বুকে চলে ইঁদুরের মত, ছুঁচার মত! কোনো দিন সে তাই সার্থক হয় না! যে প্রেম নির্ভীক, সে চলে আকাশ-ঝরা বাতাসের মত—সমস্ত গ্লানি মুছিয়ে আরামে চারিদিক ভরিয়ে তুলে!
>
> কাল তোমার পরীক্ষা নেবো। তুমি বসবে, লাষ্ট লাইনে পশ্চিম দিককার ফাষ্ট সীটে। আমি সীট রিজার্ভ করাবো—তার পরের দুটো সীট। বুঝলে? তোমাকে দেখবার জন্ম আমি যে কত অধীর, এই আয়োজন থেকেই তা বুঝবে।
>
> কোনো চপলতা যেন প্রকাশ না পায়! সাবধান! আমার স্বামী যেন কিছু না জানতে পারেন! হাজার হোক, সমাজ-সম্পর্কে স্বামী তো! এখনো আমি ঘরে বাস করচি।
>
> দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে, এ প্রস্তাব তোমার তরফ থেকে আসবে আশা করছিলুম। কিন্তু হায়, এমন মূঢ়, এমন তুমি ভীরু! নারীকে শেষে লজ্জা ত্যাগ করতে হলো!
>
> এ পরীক্ষায় যদি পাশ হও···
>
> কিন্তু সে কথা আজ নয়।
>
> মন্দা।

পরের দিন বৈকালে বিমান আসিয়া মন্দাকে কহিল,—দু'খানা টিকিট পেয়েছি, মন্দা—এলফিন্‌ষ্টোনে বায়োস্কোপ দেখবার। যাবে?

মন্দা ছিল ভাঁড়ার-ঘরে। মাসকাবারী বাজার আসি-য়াছে; সেগুলা হিসাব করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—এখন ক'টা বেজেছে?

বিমান কহিল,—পাঁচটা বাজে।

মন্দা কহিল,—এর মধ্যে আমার হবে কি করে? এই সব গুছোনো···

বিমান কহিল,—এসে ও-সব গুছিয়ো···

মন্দা কহিল,—না। তুমি যাও···

বিমানের বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল। এতখানি আয়োজন করিয়াছে!

সে কহিল,—দু'খানা টিকিট আছে। আমি একা গেলে একটা টিকিট নষ্ট হবে!...অমনি পাওয়া···ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট···দাম দু'টাকা চার আনা করে'!

মন্দা কহিল,—বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই—সঙ্গে যায়?

বিমান কহিল,—বন্ধু-বান্ধব নয়···তুমি চলো···লক্ষ্মীটি! তোমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করচে!···কোথাও তো যাও না··· দিবারাত্র ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছো···

মৃদু হাসিয়া মন্দা কহিল,—ইস্! আমার ভাগ্যি! কিন্তু···

মন্দা চুপ করিল। বিমান কহিল,—এর মধ্যে আবার কিন্তু কি আছে?

মন্দা কহিল,—ভাবচি, এ আমার সহ্য হবে কি!···

বিমান এ কথায় ব্যথা পাইল। সত্য, বেচারীর পানে

কখনো সে ফিরিয়া চাহে না! আজ নিজের একটা খেয়াল হইয়াছে বলিয়া ···

সে মন্দাকে বক্ষ-লগ্ন করিল, করিয়া কহিল,—আর আমার ত্রুটি পাবে না, মন্দা! বুঝচো তো, এ কি নেশা! এই সাহিত্যের···

মন্দা কহিল,—ছাড়ো···

বিমান মন্দাকে ছাড়িয়া দিল, কহিল,—যাবে তা হলে?

মন্দা কহিল,—তোমার যখন সাধ হয়েছে, যাবো।

এলফিন্‌ষ্টোনে দু'জনে আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন শো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মন্দা জানে না, ছবি দেখার অন্তরালে বিমানের গল্পের প্লট কতখানি বিছানো আছে! বিমান দেখিল, ফার্ষ্ট সীটে লোক বসিয়া আছে। বুঝিল, অমর, নিশ্চয়!···তার পাশের সীটে সে বসিল, পরেরটায় বসিল মন্দা।

ছবি কি দেখানো হইতেছে, সে-দিকে বিমানের মন ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, কতক্ষণে ইন্‌টারভ্যাল হইবে—পাশের প্রেমিকটিকে চক্ষে দেখিবে।

ইণ্টারভ্যাল আসিলে আলো জ্বলিল। সে আলোয় চাহিয়া বিমান পাশের সীটের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখে, সে সীটে বসিয়া আছে একজন পার্শী-ভদ্রলোক!

সর্ব্বনাশ! সে নিজে আজ বেলা বারোটায় আসিয়া এ দু'টা সীট যখন রীজার্ভ করে, তখন দেখিয়া গিয়াছে, ফার্ষ্ট সীটখানিতে রীজার্ভের ঢেরা! ভাবিয়াছিল, চিঠি পাইবামাত্র প্রেমিক-বন্ধু সীট রিজার্ভ করিয়া গিয়াছে!

তা তো নয়!

তবে? সে আসে নাই? না, অন্য কোনো সীটে··· অন্য সীটে থাকিলেও তার নয়নের দৃষ্টি নিশ্চয় মন্দার উপর ধ্রুবতারার মত অবিচল দেখা যাইবে!···

সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি ফিরাইল! কিন্তু···

বিশ-পঁচিশ জনকে দেখিল। তারা চাহিয়া আছে মন্দার পানে! মন্দা দেখিতে সুশ্রী...তার উপর বিমান তাকে যে বেশে আজ সাজাইয়া আনিয়াছে···

বহু দর্শকের শুষ্ক-প্রাণ, রুক্ষ-দৃষ্টি মন্দার রূপের স্পর্শে যেন দীর্ঘ দিনের মৃত্যু-তিমির ঘুচাইয়া জাগিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে!

এতগুলি লোকের মধ্য হইতে বন্ধুকে বাছিয়া লওয়া··· অসম্ভব! সে নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—তুমি বসো···আমি আসচি।

বাহিরে গিয়া একরাশ ছবি দেখিয়া সে সময় কাটাইল। ভাবিয়াছিল, হয়তো মন্দাকে একা দেখিয়া অমর-বন্ধু আসিয়া···

অ্যালার্ম বাজিলে বিমান ফিরিল। ফিরিয়া দেখে, মন্দা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কোথায় অমর-বন্ধু!

মন খারাপ হইয়া গেল। সাড়ে চারিটা টাকা স্রেফ বাজে খরচ এবং সেই সঙ্গে গাড়ী-ভাড়া।

বায়োস্কোপ ভাঙ্গিলে সে মন্দাকে লইয়া বাহিরে আসিল। এখন হয়তো···কিন্তু কোথায় অমর? দু'টি তৃষিত আঁখি লইয়া কোনো ভদ্রলোক করুণ মূর্ত্তিতে আশে-পাশে আসিয়া দাঁড়াইল না!

৫

পরের দিন চিঠি আসিল। অমর লিখিয়াছে,—

> আমায় মাপ করো, মন্দা। কাল সে সীট রিজার্ভ পাই নাই। ভাবিয়াছিলাম, সাড়ে পাঁচটা হইতে এলফিনষ্টোনে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব। তোমাকে দেখিলে টিকিট কিনিয়া কাছাকাছি অন্য সীট দখল করিব।
>
> কিন্তু পাঁচটার সময় আমার দুই সম্বন্ধী আসিয়া হাজির। এক জনের খুব অসুখ। তখনি ডাক্তারের ব্যবস্থা চাই। সে গোলমালে যাওয়া ঘটে নাই।
>
> আর এক দিন অনুমতি করো, মন্দা—সেদিন যদি প্রলয় ঘটে, তোমার আহ্বানে গিয়া হাজির হইব। সে যদি পৃথিবীর প্রান্তে গিয়া দেখা করিতে হয়, তাহাতেও হঠিব না।
>
> আমায় ক্ষমা করিয়ো। আর একটিবার ভক্তকে দর্শনের সুযোগ দিয়া তাকে কৃতার্থ করো।
>
> অমর

চিঠি পড়িয়া বিমান কি ভাবিল, ভাবিয়া অমরকে জবাব লিখিল,—

> কাল বেলা ঠিক তিনটায় আমার বাড়ীতে আসিবে। বাড়ীতে আসিয়া আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করিবে। বলিবে, তুমি যেন একজন নূতন পাবলিশার—তাঁর লেখা একখানি উপন্যাস প্রকাশ করিতে চাও। এমনিভাবে আলাপ করিয়ো। দু'চারি দিন তাহা হইলে আসিতে পারিবে। তার মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ মিলিবে। সে ব্যবস্থা আমি করিব। এ কথা পালন করা চাই। নহিলে চিঠি বন্ধ করিব।

মাছ এবারে টোপ গিলিল। বেলা তিনটায় এক ভদ্রলোক আসিয়া জানাইল, বিমানবাবুর সঙ্গে প্রয়োজন আছে।

বিমান বুঝিল, অমর আসিয়াছে।

দুজনে দেখা। ভদ্রলোকটির দেহ অস্থি-সার, মাথায় দীর্ঘ কেশ, চোখে পাঁশনে চশমা, বয়স প্রায়···

বিমান সেটা অনুমান করিতে পারিল না; তবে লক্ষ্য করিল, কেশে একটু পাক ধরিয়াছে! বুঝিল, প্রেমের নৈরাশ্য-দাহে!

বিমান কহিল—কি চাই?

ভদ্রলোক কহিল—আমি একটি পাব্‌লিশিং ব্যবসা খুলচি। প্রথমে চাই আপনার একখানি উপন্যাস ছাপাতে।

বিমানের বুকের রক্ত নাচিয়া উঠিল। কহিল—আপনার নাম?

ভদ্রলোক একটা ঢোঁক গিলিল, পরে কহিল—অমরনাথ রায়।

বিমান কি করিয়া মনের চাঞ্চল্য রোধ করিল, নিজেই ভাবিয়া পাইল না।

সে কহিল,—আর কোনো বই কখনো ছাপিয়েচেন?

—না।

—আপনি নতুন লোক। যদি দু'দিন পরে দোকান বন্ধ করে সরে যান?···মানে, আপনাকে অবিশ্বাস করচি, তা নয়। তবে এমন হয়ে থাকে কি না··· সেজন্য আপনার পরিচয়···মানে, কি দরের লোক আপনি, সেটা জানা দরকার নয় কি?

ভদ্রলোকের মুখের রঙ যেন বদলাইয়া গেল। ভদ্রলোক একবার চাহিলেন খোলা খড়খড়ির দিকে, পরক্ষণে মাটীর পানে, তারপর একটা ঢোঁক গিলিলেন, এবং অবশেষে জানাইলেন, নদীয়া জেলার ওদিকে তাঁর কিছু জমিদারী আছে; এ পর্য্যন্ত কোন কাজকর্ম্ম করেন নাই; প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া। কিন্তু এখন মনে হইতেছে, চুপ করিয়া দিন কাটানো ভালো নয়। তাই এ ব্যবসা··· নিজেরো একটু লেখার সখ আছে ইত্যাদি···

কথার শেষে ভদ্রলোক মৃদু হাসিলেন। ম্লান হাসি!

বিমান কহিল,—কোথায় আপনার বাড়ী, বল্‌লেন?

ভদ্রলোক কহিলেন,—কাঙ্‌টা। মুর্শিদাবাদের কাছে।

ভদ্রলোকের পানে বিমান ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, পরে কহিল—নাম বল্‌লেন, অমর রায়! আচ্ছা, ভবানীপুরে কখনো বাস করেচেন আপনি? সেখানকার হরগোবিন্দ বাবুকে জান্‌তেন?

ভদ্রলোকের মুখে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। ভদ্রলোক কহিলেন—তাঁর বাড়ীর পাশে এককালে থাকতুম।

—ও! তাই বলুন! বিমান যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কহিল—আমার স্ত্রীর কাছে আপনাদের কথা প্রায় শুনি। এখনো তিনি বলেন, কি ভাব ছিল দু'পরিবারে। মানে, হরগোবিন্দ বাবু আমার শ্বশুর। আমার স্ত্রীর নাম মন্দা। স্ত্রী বলেন, কোথায় তারা আছে—কেমন আছে! আশ্চর্য্য! একটা খপর পাই না। ···আপনার নাম অমরবাবু? আপনি কবিতা লিখতেন? আমার স্ত্রী বলেন, চমৎকার কবিতা! বটে!···

কথাটা বলিতে বলিতে বিমান উঠিল, কহিল,—আপনি বসুন। আমার স্ত্রীকে খপর দি। তাঁর বাল্যবন্ধু আপনি···

কথা শেষ না করিয়াই বিমান চলিয়া গেল এবং তিন মিনিট পরে মন্দার হাত ধরিয়া ফিরিয়া আসিল; কহিল—এঁকে চেনো গা?

মন্দা অবাক! লজ্জায় সে যেন মরিয়া যাইতেছিল··· বিমান গিয়া তাকে বলিয়াছে,—তোমার এক বাল্যবন্ধু এসেচে গো! চিন্‌তে পারো কি না, দেখবে এসো···

মন্দা চিনিল, অমর! চেহারায় অনেকখানি বদল হইয়াছে! শুধু ছেলেবেলাকার সেই সিড়িঙ্গে ভাব··· একটুও বদলায় নাই! মন্দা কহিল—অমরদা···

অমর সে আহ্বানে মুষড়িয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে···

এদিকে মন্দার মনে পড়িয়া গেল, সেই চিঠির কথা! স্বামী আবার সে চিঠির জাল জবাব লিখিয়াছে! লজ্জায় সে এতটুকু হইয়া গেল। এ-ব্যাপারের পরও স্বামী কোন্ মুখে অমরের সামনে তাকে ধরিয়া আনিয়াছে···

কিন্তু অমর কি বলিয়া আসিল? সে চিঠি লিখিয়া···

মন্দা কহিল—ভালো আছো সকলে? কাকাবাবু? কাকীমা? মন্টুদি? ভোনাদা?···

এতগুলা প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া মন্দা বলিল,—বসো। চা খেয়ে যাবে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি···

মন্দা চলিয়া গেল। অমর বসিয়া রহিল মূর্চ্ছিতের মত। বিমান বিস্ময়ে বাক্যহারা!

একটু পরে কাশিয়া বিমান কহিল,—বইয়ের ব্যবসা যখন করচেন, তখন আসবেন, মাঝে মাঝে। বেশ, বই আমি দেবো···কিন্তু লেখা তো নেই! আসবেন। তাগিদ দেবেন। দেবো বই। এমন নিকট-সম্পর্ক! ধরতে গেলে আপনি সম্বন্ধী হলেন! হা-হা-হা!

ভাঁড়ারের সামনে দালান। দালানে ষ্টোভ তার উপর এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র চাপাইয়া মন্দা চায়ের জল গরম করিতেছে—বিমান আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। স্বামি-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা চলিল:—

স্ত্রী। তুমি এ সবে প্রশ্রয় দিয়ো না, বলচি—খবর্দ্দার!

স্বামী। আহা, কিসের ভয়! মজাটা ছাখো না!

স্ত্রী। একে মজা বলে না। সাজা! কি বলে এলো? কি ভেবেচে?

স্বামী। ও এসেচে আমার কাছে বই নিতে। বই পাব্লিশ্ করবে।

স্ত্রী। মিথ্যে কথা! ঐ বলে বাড়ীতে ঢোকবার ফন্দী!

স্বামী। যদি তাই হয়ে থাকে! পাগলের পাগলামি—তাও আমি মান্চি!

স্ত্রী। পাগলকে ভয় করে চল্তে হয়। তার কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না! তা জানো?

স্বামী। বন্ধু বলে' তুমি আলাপ করবে মাত্র! কথা কইতে গেলেই ও তোমার কাছ থেকে অধর-সুধা চাইবে, ভাবো?

স্ত্রী। ও-সব ইতর কথা মানুষ কয় না স্ত্রীর সঙ্গে!

স্বামী। একটু কৌতুক!

স্ত্রী। কৌতুকও প্রাণঘাতী হয় সময়-সময়!

স্বামী। তার মানে, ওর মিষ্টি-মধুর বাণীতে তুমি আমায় ত্যাগ করে চলে যাবে?

স্ত্রী। বিচিত্র নয়। আমায় তুমি কি দিয়েছো, যার জন্য আমি এখানে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাক্বো? তোমরা তো এমনি কথাই আজকাল লিখচো!

স্বামী। সে ভয় তোমার সম্বন্ধে আমার নেই, মন্দা··· লক্ষ্মীটি এসো, দুটো কথাবার্ত্তা কও। বুঝচো না, আমি কি রকম study করচি, মনের pyschology···

স্ত্রী। চলো। আমি কিন্তু স্পষ্ট বলবো, সে চিঠি পড়ে আমি রাগ করেচি। খুব জঘন্য সে চিঠি। কোনো ভদ্র-লোকের সে চিঠি লেখা সাজে না! আর সে চিঠির জবাব লিখেচো তুমি···আমি তার কিছু জানি না!

জিভ কাটিয়া বিমান কহিল—লক্ষ্মীটি, না, না। সে কথা প্রকাশ করো না। তৃতীয় অঙ্কেই আমার এ নাটক কেটে নষ্ট করো না!···ওর এই আসা ব্যাপারের মধ্যে রহস্য আছে। আমি বলবো'খন তোমায়। লক্ষ্মীটি, আমার চিঠির মান বাঁচিয়ে যেয়ো। ও-কথা প্রকাশ করলে আমায় ভাববে, ভারী ছ্যাবলা!

মন্দা ঘৃণিত চোখের দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিল, কথা বলিল না। বিমান কহিল—আমার সঙ্গে co-operation···কেমন? লক্ষ্মীটি, ছাখো না মজা···

৬

পাবলিশিংয়ের কথা লইয়া বিমান এমন ব্যবস্থা করিল যে, অমরকে নিত্য আসিতে হইত এ-গৃহে। মন্দা কিন্তু বাঁকিয়া আছে—বিমানের কথায় সে কাণ দেয় না! সে চা ও ভোজ্য তৈয়ার করিয়া পাঠায়, আসিয়া অমরের সঙ্গে গল্প করিতে বসে না। বিমান বহু সাধ্য-সাধনা করে,—ওগো···

মন্দা ঝঙ্কার দিয়া বলে,—না, তোমাদের মজা যোগাতে আমি আমার অপমান করতে পারবো না···

এমনি ব্যাপারের মধ্যে বর্দ্ধমান হইতে নিমন্ত্রণ আসিল,—দু'দিন ধরিয়া সেখানে সাহিত্যের কি যজ্ঞ চলিবে, সে যজ্ঞে বিমানকে করিতে হইবে পৌরোহিত্য! সাহিত্যের রেশে তার ঘোড়া নাকি ছুটিয়া চলিয়াছে বিষম বেগে—সে ঘোড়ার চাট খাইয়া পাঠক-পাঠিকার মনের পচা মামুলি বহু সংস্কার চূর্ণ হইয়া ছিট্‌কাইয়া যাইতেছে, কাজেই তাঁকে খাতির-ধন্যবাদ! অর্থাৎ বক্তৃতার বাণীতে তাঁর সম্মান রক্ষা করিতে না পারিলে বাঙালী জাতটার কলঙ্ক রাখিবার··· ইত্যাদি ইত্যাদি!

বিমান ভাবিল, বর্দ্ধমানে যজ্ঞ! বাঃ! মস্ত সুযোগ!

অমর আহিরে খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিল, বিমান কহিল,—যাবেন বর্দ্ধমানে? সাহিত্য-সভার অনুষ্ঠানে?

অমর কহিল,—আমার সেই সম্বন্ধটি···মানে···

বিমান মনে মনে খুশী হইল, কহিল,—তা বেশ। এখানে আমি দু' চার দিন থাকতে পারবো না! আমার স্ত্রী থাকবেন একলা···আপনি একটু খবরাখবর নেবেন। তাঁকে একা রেখে কোথাও কখনো যাইনি! এই প্রথম। ভাবনা হচ্ছিল। তা আপনি ঘরের লোক···

অমর কহিল,—আচ্ছা।

বিমান কহিল—আপনার জন্য একটা প্লট ঠিক করে ফেলেছি···বর্দ্ধমান থেকে ফিরে লিখতে বসবো। একমাসেই লিখে শেষ করে দেবো'খন···

অমর কোনো কথা বলিল না, বিমানের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বর্দ্ধমানে যাওয়ার মুখে বিমান আর একটা টোপ ফেলিয়া গেল। সে চিঠি লিখিল অমরকে—আগেকার ভঙ্গীতে। লিখিল,—

> স্বামী চলিলেন বিদেশে। এতদিনে তোমাকে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার অবসর মিলিল।
>
> নিত্য তুমি এখানে আসো—কিসের আশায় তাহা কি জানি না? কিন্তু কি করিব, বলো? কুলের কুলবধূ আমি। বাহিরে আছে অক্টোপাশ সমাজ! তার বাঁধন, তার পীড়ন—আর সহ্য হয় না গো!
>
> আমার দুঃখের কথা শুনিয়া যা হয় ব্যবস্থা করিয়ো। এমন ঠাঁই কোথাও নাই, এত-বড় পৃথিবীতে—যেখানে শুধু প্রেম আর প্রীতি, আদর আর সোহাগ? ওগো, কোথায় সে ঠাঁই? কোথায়? যদি সন্ধান জানো, তবে আর দগ্ধাইয়ো না।
>
> মন্দা।

বাহির হইবার সময় মন্দা বলিল,—সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়েছি! খাবার অত্যাচার করো না যেন পরের পয়সায় রাজভোগ পেয়ে। বুঝলে,—ওই শুধু ভাবনা! যতক্ষণ না ফিরবে···

বিমান হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমি কিন্তু নির্ভাবনায় থাকবো···অমর বাবুকে বলে গেলুম দেখাশুনা করবে, তোমার খোঁজ-খবর নেবে!

মন্দা বলিল—ও! তা বেশ, শুনে সুখী হলুম। তোমার ভাবনা একেবারে এবার ঘুচিয়ে দেবো'খন্!

তিন দিনের দিন বর্দ্ধমান হইতে বিমান ফিরিল—সন্ধ্যাবেলায়।

গৃহে মন্দা নাই! মন্দা?

দাসী-চাকর সংবাদ দিল, বাহিরে গেছেন—বলিলেন, কি কাজ আছে!

টেবলের উপর ছোট একটু চিঠি।

বিমান পড়িল। লেখা আছে,—

> ড্রয়ারের মধ্যে চিঠি পাইবে, তাহাতে সব কথা লিখিয়া গেলাম।
>
> মন্দা।

সে চিঠি বাহির করিয়া বিমান পড়িয়া দেখে, তাহাতে লেখা আছে—

> বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে—এ কথা ভুল। প্রণয় অমর! অমর প্রণয়!
>
> তোমার কাছে আমি কি পাইয়াছি? এ গৃহে শুধু সেবা আর পরিচর্য্যা আর দাস্য করিয়া মরিয়াছি!
>
> অমরের সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, দাস্য আর জাঁতা ঘুরানোর আড়ালে কি আলোর পৃথিবীই আছে! দুটি চোখে আবেশ—প্রাণে শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন!
>
> অমর আমাকে প্রণয়-সুখে বিভোর রাখিবে। বিদায় লইলাম। এখনো আমার মন তরুণ আছে। চেহারা তোমার চোখে যত খারাপ লাগুক, এখনো এমন লোক দুনিয়ায় আছে, আমার চেহারা যাহাকে বিমুগ্ধ করে, বিভ্রান্ত করে।
>
> মন্দা

বিমান চেয়ারে বসিল। মন্দা চলিয়া গেছে! কথাটা বিশ্বাস হয় না! কৌতুক?

কিন্তু গেল কোথায়? কাল গিয়াছে! কোথায়? কোথায়?

বর্দ্ধমানে কয়দিন ধরিয়া ভক্তির সমারোহ—ট্রেণের কষ্ট—মাথা ভয়ঙ্কর ধরিয়াছিল। বিমান শুইয়া পড়িল···

ঘুম আসে না। ঘড়িতে আটটা নয়টা, ক্রমে এগারোটা বাজিতেছে।

ভাবিতেছিল, এখনি দেখিবে, মন্দা আসিয়া শিয়রে বসিয়াছে। তেমনি স্বপ্ন যেন দেখিতেছিল।

গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। একবার মনে হইল, মন্দা আসিয়াছে! তার শাড়ীর খশখশ শব্দ, না? চমকিয়া···

চোখ চাহিয়া দেখে, কোথায় মন্দা? কেহ নাই!

উঠিয়া সারা বাড়ী ঘুরিয়া আসিল। চাকররা তাস খেলিতে বসিয়াছে। প্রভুকে দেখিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিল। পাচক কহিল—খাবার দেবো?

বিমান বলিল,—না।

সে একেবারে দোতলায় আসিল—নিজের ঘরে।

চারিদিকে সহস্র স্মৃতি! মন্দা···?

বিমান চিন্তিত হইল। ভাবিতেছিল, হয়তো অমরের সঙ্গে কোথাও বেড়াইতে গিয়াছে! লেক! না হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল! নয় তো বায়োস্কোপ দেখিতে। কিন্তু এতখানি রাত্রি হইয়া গেল, এখনো ফিরিবার নাম নাই; গা ছমছম্ করিয়া উঠিল। মনে হইল, অমর যে-লোক!

কিন্তু না, অসম্ভব! মন্দাকে সে জানে। মন্দা স্ত্রী—ভালো করিয়া তাকে জানে।

তবে চিঠিতে যে-কথা মন্দা লিখিয়াছে! তার কাছে কি পাইয়াছে মন্দা! সে তো নিজের কাজ-কর্ম্ম লইয়া মত্ত আছে! মন্দা স্ত্রী···তার মন কি চায়···

কথাটা সত্য! উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা যা চায়, সত্যকার স্ত্রী যে তাহা চাহিবে না···

তবু না, না···অসম্ভব!

এ কৌতুক! কিন্তু কৌতুক হইলেও মন্দা কোথায় গেল? এখানে তার থাকিবার জায়গা কোথায়? এতখানি রাত্রি! বাহিরের বাতাসে ঘুরিয়া বেড়ানো—মন্দার যে সে অভ্যাস নাই!

···শ্বশুর মারা গিয়াছেন। সম্বন্ধী থাকে রাণাঘাটে। তাদের কেহ কলিকাতায় থাকে না।

কাহাকে গিয়া প্রশ্ন করিবে? চাকরদের জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, তাদের মা'ঠাকুরাণী কোথায় গিয়াছেন, বলিয়া যান নাই কি?

সে ভাবিল,···মিথ্যা এ ভাবনা!···

কি করিয়া যে রাত্রি কাটিল! এ-যাতনার এতটুকু তার এতগুলা নায়কের মধ্যে কেহ পাইয়াছে কি না, জানে না! এমন ঘটনা গল্পে সে অনেক ঘটাইয়াছে···কিন্তু কলমের খোঁচায় সে-ঘটনার মধ্য দিয়া কেমন পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে! নিজের বেলায় সে প্লট কি ভয়ঙ্কর জটিল হইয়া উঠিল!···

সকালে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, এক জন বাবু আসিয়াছেন।

বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। বাবু! কে?

নীচে নামিয়া দেখে, সত্য। সত্য ছোট সম্বন্ধী।

সত্য কহিল,—খুড়িমার মেয়ের বিয়ে। দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা শ্যামবাজারে বাড়ী নিয়েছি। দিদিকে এখন নিয়ে যাবো। ও-বেলায় পাকা দেখা। আপনারও নেমন্তন্ন।

ও! ঠিক! কৌতুক! মন্দা তাহা হইলে···

কিন্তু না, মচ্‌কানো হইবে না। বিমান কহিল,—তিনি ..মানে, এখানে এখন নেই। তাঁর এক বন্ধু এসেচেন কলকাতায়···

কথার মাঝখানে বিমানের কথার সুর কাটিয়া মন্দার স্বর জাগিল,—হ্যাঁ, এইমাত্র আসচি সেখান থেকে শুধু একটা কথা বলতে! তুই একটু যা তো সত্য···

সত্যর মুখ সস্মিত! সে সরিয়া গেল।

মন্দা কহিল,—তোমার কীর্ত্তি-কাহিনী আমি লিখেছি খুড়িমার ওখানে দু'দিন বসে। ছি! এই তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি···

বিমান যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে—এমনি তার মুখের ভাব! তার মুখে কথা ফুটিল না।

মন্দা কহিল,—'কে আমার ধ্যান করে প্রেমের তপোবনে না কচুবনে বসে'—তাকে রেখে গেছ আমার পাহারায়! শুধু তাই? ছাই-পাঁশ যা-তা চিঠি তাকে লেখা হয়েছে! গল্পের প্লট তৈরী হচ্ছে! দিচ্ছি আমি খবরের কাগজে ছাপিয়ে তোমার প্লটের ইতিহাস!···অমরকে আমি বলে দিয়েছি সব কথা যে, তুমি তাকে ঐ-সব চিঠি নিজের হাতে লিখে বাঁদর-নাচ নাচাতে! আমি সে সবের বিন্দুবিসর্গ জানি না।···ওমা—কথা নেই বার্ত্তা নেই, যেদিন বর্দ্ধমানে গেছ, তার পরের দিন ভোর হতে না হতে এসে হাজির! বাইরের ঘরে নয়—একেবারে দোতলায় আমার ঘরে। চিঠি দেখিয়ে হেসে বলে কি না,···হতভাগা! এরা মানুষ!···দিলুম তখন সব কথা ফাঁশ করে'। আরো অনেক কথা বলেছি। বলেছি, এ বাড়ীর মুখো হলে তার প্রেমের মাথায় চাবুক লাগাবো!···আমার সে-মূর্ত্তি দেখে সে শিউরে সরে গেছে! এবারে তোমার পালা···

দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া মন্দা চাহিল বিমানের পানে। বিমান একেবারে এতটুকু!

মন্দা বলিল,—সত্যকে ডেকে সে-কথা বলি! লজ্জাও হ না! ঘর-সংসার—তাকে পেয়েছো তোমাদের ফুটবল···না? যেমন খুশী লাথিয়ে খেলা করবে! বটে! মা-বোন, স্ত্রী···তাদের পেয়েছ তোমাদের উপন্যাসের ঐ পল্লবিকা, সঙ্কেতিকা, রেবা, খাবা, গবা, হাবা নায়িকা!

না? চলে গিয়েছিলুম কেমন! কি বলবো, তোমাদের উপন্যাসের রঙ যে এখনো গায়ে মাখতে পারি নি! না হলে…

বিমানের মুখে কথা না সরিলেও বুকের উপর হইতে রাত্রের সে পাথরখানা সরিয়া যাইতেছিল!

মন্দা বলিল—হতুম যদি তোমাদের ঐ উপন্যাসের ঝিল্লী, মিল্লী হিল্লীর মত দরাজ-ছাতির মেয়ে…তা হলে আমি চলে গেছি দেখে বাড়ী ফিরে ভারী পৌরুষ বোধ করতে? বড় গৌরব…না? গল্পে যে লেখো, লোকের স্ত্রী ঘর ছেড়ে স্বামী ফেলে প্রেমের পতাকা তুলে ঝাঁকড়া-চুলো ভ্যাগাবণ্ড নায়কের সঙ্গে চলে যায়—ভাবো তো, সেই স্বামীর দশা যদি তোমাদের হয়? এটা জেনে রেখো, স্ত্রীকে যে ঘরে ধরে রাখতে পারে না—দরাজ-ছাতির যত বড়াই সে করে বেড়াক, লোকে তার গায় থুতু দ্যায়…বুঝলে?

বাহির হইতে সত্য কহিল—তুমি কথা শেষ করে নাও, দিদি। তোমাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আমায় যেতে হবে মিউনিসিপাল মার্কেটে মাছ আর মাংস কিনতে…জানো তো?

বিমান ডাকিল—এসো হে সত্যচন্দর…আমি তাই বলছিলুম তোমার দিদিকে,…সত্যকে বরং ছেড়ে দাও…তুমি এদিককার গোছগাছ সারো, তারপর আমিই তোমাকে শ্যামবাজারে নিয়ে যাবো!

সত্য কহিল,—আঃ! তা যদি করেন, ভারী ভালো হয়। দিদিকে মা আজ আসতে দিচ্ছিল না। দিদি বললে, আপনি বর্দ্ধমান থেকে ফিরেচেন, আপনাকে বলে যায় নি, সংসারের গোছগাছ…তাই পনেরো মিনিটের ছুটি পেয়েচে শুধু…

বিমান কহিল,—আমিই ওঁকে নিয়ে যাবো। তুমি আর বাড়ী ফিরো না…সোজা চলে যাও মিউনিসিপাল মার্কেট…না হলে মাংস ভালো মিললেও মার্কেটে মাছ হয়তো উঠে যাবে!…কি বলো মন্দা?

মন্দা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তার দুই চোখের দৃষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হেমলতা দেবী

সাহিত্য-দিক্‌পাল সুরেশচন্দ্র সমাজপতির পুণ্যবতী জননী হেমলতা দেবীর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সমাজপতি মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ হিন্দু নারীর অনুসরণ যোগ্য।

একাধারে বসিবার আসন ও ষ্টোভ

পথে ব্যবহারের জন্য একাধারে বসিবার টুল ও ষ্টোভ নির্ম্মিত হইয়া মানুষের অনেক অভাব দূর করিয়াছে। এই আধারটির ওজন মাত্র দেড় পাউণ্ড—এক সেরও নহে। কিন্তু এই ভাঁজকরা

একাধারে টুল ও ষ্টোভ

ইস্পাত-নির্ম্মিত বস্তুটির ৩ শত ৫০ পাউণ্ড ওজনের ভার বহনের ক্ষমতা আছে। টুলটি উল্টাইয়া ধরিলেই ষ্টোভের কার্য্য চলিবে। দুইটি স্বতন্ত্র খণ্ডে এই টুল নির্ম্মিত। যন্ত্রটির ছবি দেখিলেই উহার স্বরূপ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

আলাস্‌কার প্রথম স্বয়ং-চালিত গাড়ী

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নানাপ্রকার বস্তুর সমবায়ে একখানি স্বয়ং-চালিত গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গাড়ীখানি যাদুঘরে এখন সংরক্ষিত আছে। রবার্ট ই, সেলডস্‌ উহার নির্ম্মাতা। তিনি পূর্ব্বে কখনও স্বয়ংচালিত কোন গাড়ী দেখেন নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পপুলার মেকানিকস্‌ পত্রে তিনি ঐ জাতীয় গাড়ীর একটা নক্সা দেখিয়াছিলেন। তিনি ঐ নক্সা দেখিয়া স্বয়ং একখানি গাড়ী নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করেন। ষ্টীয়ারিং চাকার পরিবর্ত্তে মিঃ সেলডস একটি হাতলের দ্বারা গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করেন। শক্ত রবারের চাকা গাড়ীতে তিনি সংযুক্ত করেন।

আলাস্‌কার প্রথম স্বয়ংচালিত গাড়ী

কলের বর্শা

সি, আর, ক্লিন নামক এক জন কালিফোর্ণিয়াবাসী কলের বর্শা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। খড়্গমৎস্য, হাঙ্গর প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায়

কলের বর্শা

সামুদ্রিক জীবকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। জলজ জন্তু শিকারের উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্র নির্ম্মিত হইলেও, উহার সাহায্যে বিপন্ন নৌকাকে রক্ষা করা যায়। বর্শার দেহে রজ্জু বাঁধিয়া বিপন্ন নৌকাতে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই রজ্জুর আকর্ষণে নৌকাকে তীরে টানিয়া আনা সম্ভবপর।

নূতন ধরণের ট্রলিগাড়ী

যাত্রিবহনের জন্য জার্ম্মাণী নূতন ধরণের গাড়ী রাজপথে চালাইতেছে। তিনখানি গাড়ী একসঙ্গে চলে। এক জন
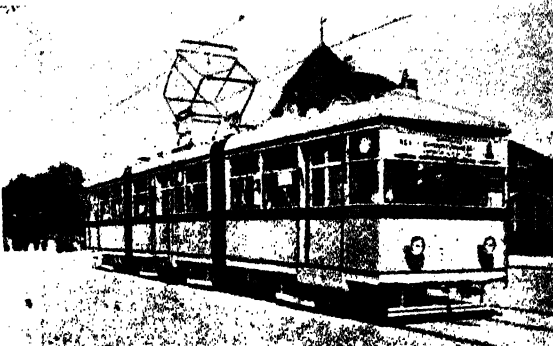
নূতন ধরণের ট্রলিগাড়ী

কণ্ডক্টার যাত্রীদিগকে টিকিট বিক্রয় করিয়া থাকে। গাড়ীর দুই ধারে বসিবার আসন, মাঝখানে পথ। চিত্র দেখিলেই সব বুঝা যাইবে। উপরের চিত্রে তিনখানি গাড়ী দেখান হইয়াছে। নিম্নের চিত্রে অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুপ্ত-রত্নের সন্ধান

প্রশান্ত মহাসমুদ্রে অবস্থিত কোকোস্দ্বীপে না কি অপর্য্যাপ্ত রত্ন ভূগর্ভে সমাহিত আছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে জলদস্যুরা দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ ধনরত্ন উক্তদ্বীপে লুকাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কোনও ইংরাজ কোম্পানী ঐ ধনরত্নের সন্ধান করিতেছেন। গুপ্ত-রত্নের সন্ধানে এ যাবৎ যতপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, সমস্তই এ বিষয়ে ব্যবহার করা হইবে। এই কোম্পানির মূলধন প্রচুর।

গুপ্তরত্নের সন্ধানে ব্যবহৃত যন্ত্র

ক্ষুদ্র পালের নৌকা

লস্ এঞ্জেলেসের এক ব্যক্তি একখানি ছোট নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। নৌকাখানি লম্বে সাড়ে ছয় ফুট। কিন্তু উহাতে
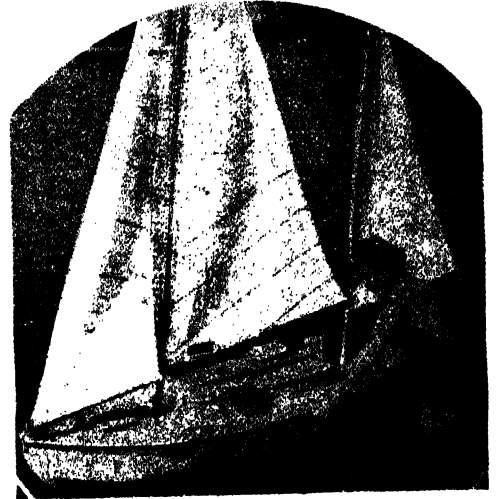
ক্ষুদ্র পালের নৌকা

পাল চড়াইয়া দিলে, নৌকাখানি এক জন আরোহীসহ অপর একখানি নৌকাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

জাহাজে তাজা ফুল ও গাছ পাঠাইবার ব্যবস্থা

অষ্ট্রেলিয়া হইতে লণ্ডনে প্রস্ফুটিত পুষ্পসহ গাছ তাজা অবস্থায় পাঠাইবার জন্য তুষারজমাটবাঁধা আধার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জাহাজে তাজা ফুল পাঠাইবার ব্যবস্থা

কয়েক সপ্তাহ ফুল তাজা অবস্থাতেই থাকে। এইভাবে অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা দেশীয় ফুল বিলাতে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া থাকে। ছবি দেখিলেই ব্যাপারটা বুঝা যাইবে।

জীবন-রক্ষক কক্ষ

জলে পড়িয়া জলমগ্ন হইবার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে এক প্রকার রবার-নির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। উহা দুই ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশে একটি কক্ষ আছে। উহাতে যে ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার মস্তক রক্ষা পায়। সমগ্র বস্তুটির মধ্যে বায়ু ভরিয়া রাখা হয়। দুইটি অংশের একাংশ যদি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বাকি অংশটি আরোহীকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিবে। জীবন-রক্ষক কক্ষের উপরিভাগে একটি পতাকালাঞ্ছিত দণ্ড থাকে। উহাতে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

পতাকাযুক্ত জীবন-রক্ষক কক্ষ

প্রাচীন যুগের লাঠি-নির্ম্মুক্ত তীর

প্রাচীন যুগে মায়া-শিকারীরা শিকার ব্যপদেশে যষ্টি সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করিত। তাহারা ধনু ব্যবহার করিত না। এই যষ্টিনিক্ষিপ্ত-তীর বহুদূরস্থ লক্ষ্য অব্যর্থভাবে ভেদ করিয়া থাকে।

মায়াশিকারীদিগের ব্যবহৃত যষ্টি-ধনু

প্রশান্ত সমুদ্রকূলের স্থানসমূহে এই যষ্টি-ধনুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। যুকাটানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা ঐ জাতীয় ধনু আবিষ্কার করিয়াছেন। আধুনিক ধনুর্ব্বিদ্‌রা উহার আদর্শে যষ্টি-ধনু নির্ম্মাণ করিতেছেন।

ষ্টুডিয়োর গুপ্তকথা

চার

এক জন রসিক চিত্র-সমালোচক লিখিয়াছেন—'কোলাহল-মুখরিত জনাকীর্ণ পুরাতন ষ্টুডিয়োগুলির পরিবর্তে আধুনিক সবাক-চিত্রের ষ্টুডিয়োগুলি হইয়াছে নীরব জনাকীর্ণ ষ্টুডিয়ো।'

কথাটা বর্ণে-বর্ণে সত্য।

নির্ব্বাক যুগে ছবি তুলিবার সময় কর্ত্তারা ভয়ানক চীৎকার করিতেন, সেই চীৎকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদিগকে প্রেমাভিনয় করিতে হইত। সবাক যুগে তাঁহাদের আর চীৎকার করিবার উপায় নাই, এখন তাঁহারা যত কিছু চীৎকার করেন, দৃশ্যাভিনয় হইবার পূর্ব্বে ও পরে।

ষ্টুডিয়োর দেওয়ালে বোর্ড ঝুলিতেছে। তাহাতে লেখা আছে—'কেহ গোলমাল করিবেন না। ছবি তুলিবার সময় সকলে নীরবে থাকিবেন।'

চিত্রাভিনয় আরম্ভ হইলে অন্যত্র সেট তৈয়ারী করা বন্ধ রাখিতে হইবে। আর্ট-পরিচালক হইতে কারুশিল্পী পর্য্যন্ত সকলকে নিজ নিজ কায বন্ধ রাখিয়া দৃশ্যাভিনয় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই আমরা 'লঙ-সট' ও 'ক্লোজ-আপ'-এর কথা বলিয়াছি। শিল্পীদের 'লঙ্-সট' ও 'ক্লোজ-আপ' কিরূপে লওয়া হয়, তাহার কথা কিছু বলিব।

নায়ক-নায়িকা গিয়া মাইক্রোফোনের তলায় দাঁড়াইলেন। ঘণ্টা পড়িল। সকলে বুঝিলেন, দৃশ্যাভিনয় আরম্ভ হইবে। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, এক জন 'ক্ল্যাপষ্টিক' লইয়া নায়ক-নায়িকার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পরিচালকের নির্দ্দেশ-মত তিনি সরিয়া যান; অমনি অভিনয় সুরু হয়।

সুন্দর সুপুরুষ নায়ক সুন্দরী নায়িকাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখের নিকট মুখ আনিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়া আমার! বহুকাল পরে আজ আবার তোমাকে আমি কাছে পেলাম।"

নায়িকাকে নায়ক চুম্বন করিলেন।

ডাইরেক্টর বলিলেন,—"কাট্ (Cut)।"

—"সাউণ্ড?" "ও-কে।" অর্থাৎ শব্দযন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হইল,—কথাগুলা কেমন শুনিলে?

শব্দযন্ত্রী কহিল,—ও-কে অর্থাৎ ভালো!
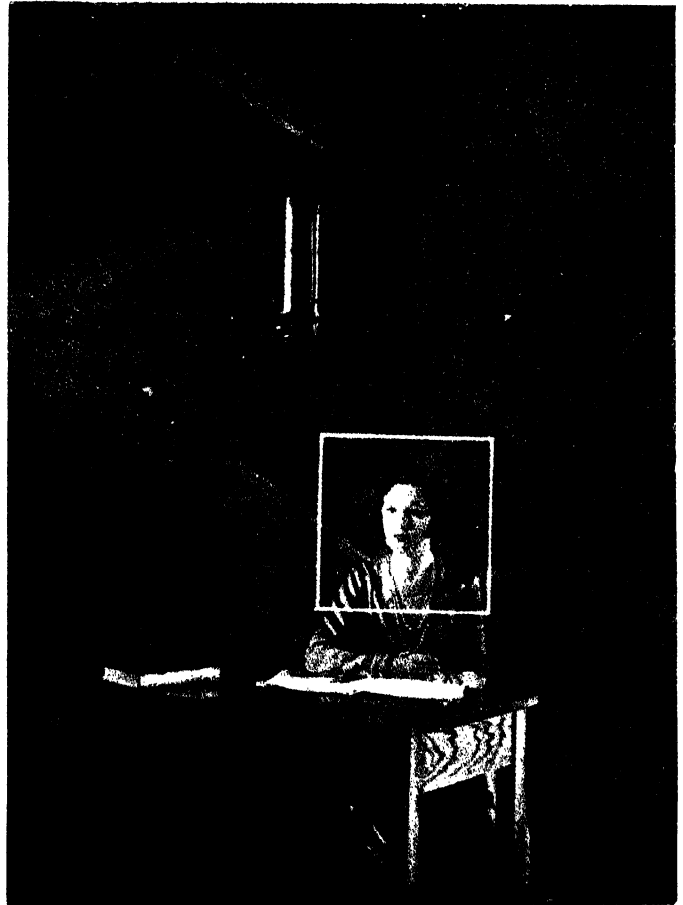
মাইক্রোফোন ও অভিনেত্রী

"ম্যাগাজিন বদলাও।"

"সট্ ৫৩৮, টেক্ ৫।"

"বন্ধ কর।"

"এর পর ?"

একসঙ্গে বহু লোকের চীৎকার। পরিচালক (script), লেখক, চিত্র-শিল্পী, শব্দ-যন্ত্রী ও সহকারিগণ একসঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘণ্টা পড়িল, অমনি সব চুপচাপ।

এবার নায়ক প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে নায়িকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"বল, আর তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না ?"
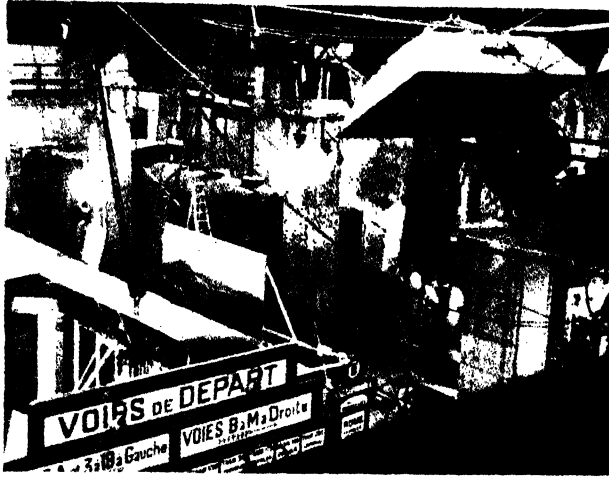
নায়কের বুকে মাথা রাখিয়া নায়িকা অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"না, আর আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, প্রিয়তম।"

ষ্টুডিয়োর মধ্যে ট্রেণের দৃশ্য লওয়া হইতেছে

—"কাট্।"

দৃশ্যটি লওয়া শেষ হইল। নায়িকা সে দিনের মত কায শেষ করিয়া ষ্টুডিয়োর হোটেলে গিয়া বলিলেন—"শীঘ্র কেহ আমাকে এক গেলাস জল দাও। সারাদিন কেবল আমার 'লিপষ্টিক' খেয়েই কেটেছে।"

জল পান করিয়া তিনি পোষাক পরিবর্তন করিয়া পুনরায় আপন-মনে বলিলেন—"বাঁচা গেল। যত গণ্ডগোল হয় কি কেবল শেষ দৃশ্য নিয়ে! কম ক'রে দৃশ্যটা পাঁচ পাঁচবার নেওয়া হলো।"

প্রত্যেক ষ্টুডিয়োতে প্রতিদিন অনেকটা এইরূপে চিত্রাভিনয় হয়। ক্যামেরার পিছনে দাঁড়াইয়া আপনারা প্রতিদিন এমনি ধরণের কত কি দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। আপনারা হয় তো বুঝিতে পারিবেন না যে, চলচ্চিত্র-নির্ম্মাতৃগণ কেমন করিয়া একখানি সম্পূর্ণ ছায়াচিত্রের কায সমাপ্ত করেন। বাস্তবতা ও অবাস্তবতা, সত্য ও মিথ্যার আশ্রয় লইয়া শিল্পিগণ কেমন করিয়া প্রাণবন্ত অভিনয় করেন, তাহা ভাবিবার বিষয়।

লঙ্-সট দৃশ্যে শিল্পীদের মুখ দিয়া বড় একটা কথা বলানো হয় না, এবং সেই দৃশ্যগুলি হয় সত্যকার স্বাভাবিক দৃশ্য।

কোন একটা দৃশ্যে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির-সম্মুখে হয়তো নায়ক-নায়িকাকে অভিনয় করিতে হইবে। দৃশ্যটি তুলিবার জন্য দল-বল এবং সাজ-সরঞ্জামসহ পুরী গেলে, খরচ অনেক পড়িবে, উপরন্তু রেকর্ডিং ভাল হইবে না। অতএব কেবলমাত্র নায়ক-নায়িকাকে পুরী লইয়া গিয়া শুধু লঙ-সট তোলা হইল, বাকী মিড-সট ও ক্লোজ-আপ গুলি লওয়া হইল, পিশ্ বোর্ড বা কাঠের উপর জগন্নাথ দেবের মন্দির আঁকিয়া লইয়া ষ্টুডিওর মধ্যে। সেই ছবি দেখিবার সময় কাহারও ধরিবার উপায় নাই যে, নায়ক-নায়িকারা কৃত্রিম দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিয়াছেন। দর্শকদের চোখে ধূলি দিয়া এমনই কৌশলে ছবি তুলিতে হয়।

বৈদেশিক ফিল্ম-ষ্টুডিয়োগুলিতে মাহিনা-করা আর্টিষ্ট আছে। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে তাঁহারা মনোরম উদ্যান, মন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতি সাজাইয়া দিতে পারেন। সময় সময় তাঁহারা সত্যকার ঘাস ও গাছগুলি এমন নিপুণতার সহিত বসাইয়া দেন যে, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

আপনারা ছবিতে দেখিতেছেন, একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া নায়ক নায়িকার সহিত প্রেমালাপ করিতেছেন। দৃশ্যটি আপনারা দেখিতেছেন মিড-সটে। তার পর তাঁহাদের ক্লোজ-আপ আসিল; তাঁহারা কথা বলিলেন। রহস্য এই যে, ক্যামেরা আগাইয়া পিছাইয়া মিড-সট ও ক্লোজ-আপ এক স্থানে লওয়া হয় না। ক্লোজ-আপ লওয়া হইয়াছে—ষ্টুডিয়োর মধ্যে গাছের গুঁড়ির পরিবর্ত্তে একটা মোটা কাঠের উপর উভয়কে বসাইয়া। আলোক-সম্পাতের গুণে তাহা গাছের গুঁড়ির ন্যায় দেখিতে হইয়াছে।

ধরা যাক, একটা ট্যাক্সি বা ট্রেণের কামরার মধ্যে বসিয়া নায়ক-নায়িকা কথা বলিতেছেন। প্রথমে তাঁহারা কেবিনে উঠিলেন দেখানো হইল, পরে দেখানো হইল—দুই জনে বসিবার আসনে বসিয়া কথা বলিতেছেন। প্রথম সটে বাস্তবতা বজায় রাখা হইল, কিন্তু দ্বিতীয় সটে একটা নকল গাড়ীর কুশনের উপর উভয়কে বসাইয়া সেটাকে মাঝে মাঝে দুলাইয়া ছবি তোলা হইল।

রাস্তার উপর দিয়া দুই জন অভিনেতা কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছেন। একটা ট্রলির উপর ক্যামেরাকে বসাইয়া দৃশ্যটি তুলিতে হইবে। মাইক্রোফোন রাখিতে হইবে ক্যামেরার পাশে একটা লম্বা লৌহদণ্ডের উপর। ওদিকে সহকারীরা অভিনেতাদের পিছনে পিছনে ট্রলিটি ঠেলিয়া লইয়া যাইবেন।

কয়েকটি স্থানে অতি অভিনব উপায়ে ছবি তুলিতে হয়। সমুদ্র-তীর হইতে জলের দৃশ্য লইতে হইলে কিরূপে লইতে হইবে? জলে ক্যামেরা বসাইবার উপায় নাই, তরঙ্গ আসিয়া ক্যামেরা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। নৌকায় রাখিলে স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে। কাযেই কর্ত্তারা এরূপ ক্ষেত্রে অশ্ব-চালিত লৌহ-নির্ম্মিত ভারী গাড়ীর উপর ক্যামেরা বসাইয়া ছবি তুলিয়া থাকেন।

ষ্টুডিয়োর মধ্যে যে উপায়ে বহির্দৃশ্য তোলা হয়, কেহ তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করিবেন কি না সন্দেহ।

বরফের পাহাড়ের তলদেশে দাঁড়াইয়া অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করিতেছেন। আসল বরফের পাহাড়ের তলদেশে দাঁড়াইয়া অভিনয় করা হয়তো সম্ভবপর নয়, কিন্তু পর্দ্দার উপর আমরা এই ধরণের বহু দৃশ্য দেখিতে পাই। সত্য কথা বলিতে হইলে দৃশ্যগুলি তোলা হইয়াছে ষ্টুডিয়োর মধ্যে। অভিনেতা-অভিনেত্রী 'ফারের কোট' গায়ে দিয়া, হাতে দস্তানা ও চামড়ার জুতা পরিয়া, নকল বরফের পাহাড়ের ধারে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া অভিনয় করেন। অপর দিকে পরিচালক ও তাঁহার সহকারিবৃন্দ Epsom লবণ হইতে জমাট বরফ, জিলেটিন হইতে গলিত-বরফ ও মোম-বাতির গুঁড়া হইতে বরফ-কণা সৃষ্টি করিয়া দৃশ্যটিকে আসল দৃশ্যের অনুরূপ করিয়া তোলেন। ঠাণ্ডার পরিবর্ত্তে তখন ষ্টুডিয়োর উত্তাপ ছিল হয়তো ১০৫ ডিগ্রি।

একখানি রোমাঞ্চকর চিত্র দেখিয়া আসিয়া স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! অত উঁচু থেকে মেয়েটাকে কি করে ফেলে দিলে? অত বড় রাজপ্রাসাদ নিশ্চয় ওদের তৈরী করতে হয়েছিল, কেমন?"

দোতলায় অভিনয়ের বিধিব্যবস্থা

স্বামী একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন—"আশ্চর্য্য বৈ কি। অত বড় রাজপ্রাসাদ হয় তৈরী করতে হয়েছে, নয় তাঁরা কোন রাজ-প্রাসাদে গিয়ে ছবি তুলেছেন।"

অনেকেই এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। ছবিতে তাঁহারা যাহা দেখিতে পান, সবই সত্য এবং বহু অর্থব্যয়-সাধ্য। কিন্তু যদি তাঁহাদের বলিয়া দেওয়া হয় যে, অত উচ্চ হইতে মেয়েটিকে মোটেই ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই, ফেলা হইয়াছিল একটা 'ডামি' পুতুলকে; প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদটিকে মাত্র ছয় ফুট কাচের উপর আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইলে আমাদের কথা তাঁহারা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে করিবেন না! না করিবার কথা, কিন্তু কথাটা সত্য।

ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি হইবার সহিত অস্বাভাবিক ও অবাস্তব জিনিষ দুইটা এত অধিক পরিমাণে আসিয়া দেখা দিয়াছে যে, ছায়া-চিত্রের মনোরম ও চমকপ্রদ দৃশ্য-গুলি সে জন্য মিথ্যা ও অস্বাভাবিক উপায়ে সেলুলয়েড ফিল্মের উপরে রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অতি ক্ষুদ্র জিনিষ, আমরা যাহা দেখিতে পাই না, ক্যামেরার চক্ষু তাহা-ও খুঁজিয়া বাহির করে। কৌশলী চিত্র-শিল্পীর হাতে পড়িয়া হাজার হাজার দর্শকের ম্যাজিক দেখাইবার মত ক্যামেরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিতেছে। শত-সহস্র চিত্রামোদীকে খুশী করিবার জন্য নায়ককে পৃষ্ঠে বহন করিয়া দ্রুতগামী অশ্বকে একলম্ফে পঞ্চাশ ফুট খাদ অতিক্রম করিতে হয়। ক্যামেরার কৃপায় আমরা দেখিতে পাই ভয়াবহ ট্রেণ-দুর্ঘটনা, ভীষণ জল-প্লাবন, আর-ও কত কি!

সেটের নিম্নভাগ নির্ম্মাণ করা হইতেছে

প্রাদেশিক কোন স্থানের ঘটনা-বহুল গল্পকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করিতে হইলে হয় দলবল লইয়া সেখানে যাইতে হইবে, নচেৎ তৈয়ারী-করা সেটে সেই দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি দেখাইতে হইবে। কিন্তু বিভ্রাট ঘটিবে বহির্দৃশ্য লইয়া। অন্তর্দৃশ্যের জন্য তৈয়ারী করা সেট-ই যথেষ্ট, তাহাতে খরচ-ও পড়িবে কম।

ঐতিহাসিক গল্প হইলে অনেক গোলযোগ আছে বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে আগ্রার তাজমহল, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট, পুরীর জগন্নাথের মন্দির প্রভৃতি এক ঘণ্টার ভিতর ছবিতে তুলিতে পারা যায়। এমন কোন প্রাসাদ বা উদ্যান নাই, যাহা ছায়াচিত্রে নকল করিয়া রূপান্তরিত করা যায় না।

'ট্রিক-ফটোগ্রাফী' বা 'ম্যাজিক-ফটোগ্রাফী'র দ্বারা সত্যই অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়। তবে 'গ্লাসওয়ার্ক' অর্থাৎ কাচের উপর আঁকিয়া যে সকল দৃশ্য লওয়া হয়, সেই গুলিই নাকি অত্যন্ত চমকপ্রদ ও সত্যানুরূপ। অন্তর্দৃশ্যের সেট, যথা—ঘর, দালান, গির্জ্জা প্রভৃতির সিলিং বা ছাদের তলা দেখানো হয় না। চিত্র-শিল্পীকে ইহা বাদ দিয়া ছবি তুলিতে হয়। অন্তর্দৃশ্যের সেটে আলোকের প্রয়োজন অধিক হয় বলিয়াই টপ্‌-লাইটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এবং সিলিং না দেখাইবার ইহাই একমাত্র কারণ। যাহা হউক, আজকাল ক্রমে সিলিং দেখাইবার রীতিও প্রচলিত হইতেছে।

সেটের প্রয়োজনীয় নিম্নভাগ তৈয়ারী হইলে ক্যামেরাকে একটা কাঠের প্লাট-ফরমের উপর সুদৃঢ়রূপে রক্ষা করা হয়। ক্যামেরা হইতে কয়েক ফুট তফাতে একখানি মোটা কাচকে একটা কাঠের বোর্ডের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। কাচের মাপ হইবে হয় তো ছয় ফুট স্কোয়ার। তাহাকে এমন করিয়া ঝুলাইতে হইবে, যেন সেট ব্যতীত তাহার উপরের এতটুকু ফাঁকা অংশ তাহার মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

সেটের নিম্নভাগ কাচের উপর প্রতিফলিত হইল, উপরিভাগ অত্যন্ত কৌশলের সহিত আঁকিয়া দেওয়া হইল কাচের উপর। ছবিতে দেখিলাম, একটা বিরাট প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকার ভিতর একসঙ্গে প্রায় হাজার লোক সমবেত হইয়াছে। বিরাট-প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার প্রথম স্তর কাঠের তৈয়ারী সেটে-ই হইল, বাকি স্তরগুলি মিলাইয়া আঁকিয়া দেওয়া হইল কাচের উপর।

খুব দূরবর্ত্তী কোন স্থানের মন্দির বা গৃহ দেখাইতে হইলে এক প্রকার সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়। সেই মন্দির বা গৃহকে অনুরূপ ছয় ফুট দীর্ঘ মন্দির বা গৃহ তৈয়ারী

করিয়া তাহার সন্নিকটে ক্যামেরা রাখিয়া ছবি তুলিলে ছবি দেখাইবার সময় দর্শকগণ দেখিবেন, যেন তাহা বহুদূরে অবস্থিত রহিয়াছে। এত সহজে চলচ্চিত্র তুলিতে পারা যায় শুনিয়া কিম্বা প্রবন্ধ পড়িয়া যেন কেহ ভাবিবেন না যে, সত্যই ইহাতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয় না। এইরূপ "ট্রিক-ফটোগ্রাফী" দেখাইতে গিয়া কর্ত্তারা জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিয়া বসেন, তদুপরি এক একটা দৃশ্য নিখুঁত করিতে অনেক ক্ষেত্রে দুই তিন দিনের উপর সময় লাগে।
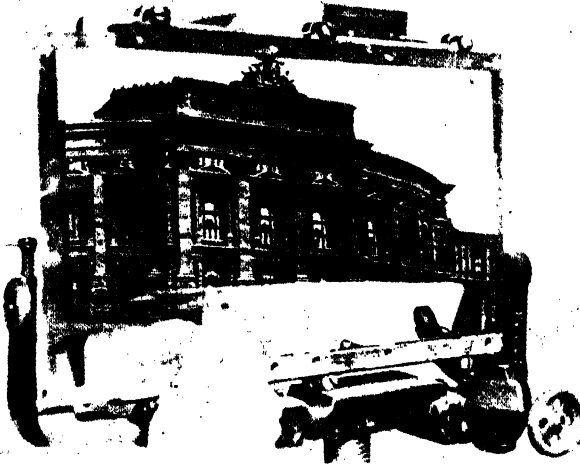
আয়নায় বাড়ীর দৃশ্যটি প্রতিফলিত করিয়া তোলা হইয়াছে

কোন কোন ছবিতে এক জন অভিনেতা দুইটা বিভিন্ন অংশে কেমন করিয়া অভিনয় করেন, একই ব্যক্তি দেখিতে দেখিতে কিরূপে ভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। এগুলি দেখাইতে হইলে চিত্র-শিল্পীকে "ডব্‌ল্‌-এক্সপোজার" ও "ডব্‌ল্‌-প্রিন্টিং" প্রভৃতির সাহায্য লইতে হয়।

ঐতিহাসিক ও বিদেশীয় গল্প লইয়া ও-দেশের চিত্র-নির্ম্মাতৃগণের চলচ্চিত্র তুলিতে পশ্চাৎপদ না হইবার একমাত্র কারণ এই যে, এমন কোন জিনিষ নাই; যাহা ষ্টুডিয়োতে নকল করিয়া তাঁহারা ছবিতে দেখাইতে পারেন না।

কোন কোম্পানী হয়তো তুলিলেন "রাজা হরিশ্চন্দ্র"। ছবি শেষ হইলে দেখা গেল, শ্মশানের দৃশ্যটি ভালো হয় নাই, তাহা কাটিয়া বাদ দিয়া আবার নূতন করিয়া তুলিতে হইবে। দৃশ্যটি লইতে হইবে "মিড-সর্ট" ও "ক্লোজ-আপে"। সামান্য একটা দৃশ্যের জন্য পুনরায় দল-বল লইয়া অর্থব্যয় করিয়া কর্ত্তারা কাশী যাইতে সম্মত নন্! স্থির হইল, চিত্র-শিল্পী একা গিয়া শ্মশানের দৃশ্য তুলিয়া আনিবেন, বাকি কায হইবে ষ্টুডিয়োতে। তাহাই হইল। তার পর কর্ত্তারা ছবিখানি ষ্টুডিয়োর মধ্যে পর্দ্দার উপর দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পর্দ্দায় শ্মশানের দৃশ্য প্রতিফলিত হইলে হরিশ্চন্দ্র ও চণ্ডাল পর্দ্দা এবং নকল-দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তাসহ অভিনয় করিতে লাগিলেন। ওদিকে শব্দযন্ত্রী ও চিত্রশিল্পী উভয়ে মিলিয়া দৃশ্যটি এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তাগুলি সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া লইলেন।

কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া গেলে যে-প্রকার শব্দ হয়, তাহা সাধারণ কোন শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুতগামী ও কর্কশ। সঙ্গীত বা অভিনয় অপেক্ষা ট্রেণ কিম্বা মোটর-দুর্ঘটনার শব্দ লইতে হইলে শব্দ-যন্ত্রীকে "ওয়াইড-রেঞ্জের" সাহায্য লইতে হইবে। পিস্তলের শব্দ, মেঝেতে চামচ পড়িবার শব্দ, মেঘগর্জ্জন, বজ্রপাত প্রভৃতির শব্দ অতি সাবধানতার সহিত নকল করিয়া লইতে হয়।

ইহাদের স্বাভাবিক আসল-শব্দ গ্রহণ করিবার উপায় নাই; করিলেও তাহা সবাক্-চিত্রোপযোগী হইবে না।

[ক্রমশঃ

শ্রীনিতাই ঘোষ ও শ্রীসুকুমার হালদার।
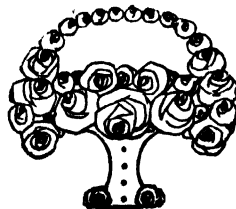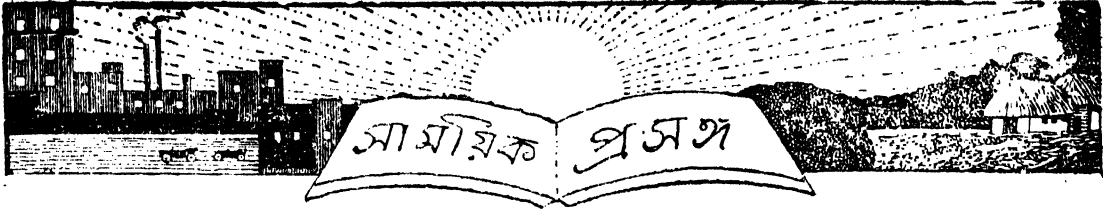
বাঙ্গালার লাটের বক্তৃতা

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালার আয়-ব্যয়-সম্পর্কিত অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া আগামী বর্ষের জন্য বজেট প্রস্তুত করাই এবারকার এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। সেই জন্য ইহাকে বজেটী বৈঠক বলা হয়। বাঙ্গালার শাসক সার জন এণ্ডার্সন এই ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাতে ইস্তক হিংসাশ্রয়ী বিপ্লববাদের কথা হইতে লাগাইত ম্যালেরিয়ার এবং বেকার-সমস্যার কথা ছিল। দেশের লোকের প্রতিনিধিবর্গের সমক্ষে শাসনকর্ত্তারা যাহা বলেন, তাহা দেশের লোককে উদ্দেশ করিয়া বলা হয়, ইহা সকলেই বুঝেন; সুতরাং সাধারণে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই থাকে। এই বক্তৃতায় সরকারের শাসন-নীতির একটা আভাস পাওয়া যায়; সুতরাং বক্তৃতাটি দেশের লোকের দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়।

বাঙ্গালার শাসক প্রথমেই হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবীদিগের কথা পাড়িয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের কথার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা বাঙ্গালায় এই মহাপাপের আবির্ভাব জন্য সমস্ত বঙ্গবাসী হিন্দুকে দায়ী মনে করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় যে এই মহাপাপের আবির্ভাব হইয়াছে, সে জন্য বাঙ্গালী হিন্দুরা যে কতদূর মর্ম্মাহত, তাহা সার জন এণ্ডার্সন এবং বৃটিশ রাজ-পুরুষরা জানেন না,—সেই জন্য তাঁহারা ঐরূপ মনে করেন। অবশ্য বাঙ্গালার এই পুণ্যভূমিতে এই মহাপাপের আবির্ভাব জন্য যে বাঙ্গালায় কোন লোকের দায়িত্ব নাই,—এ কথা আমরা বলি না। বাঙ্গালার শাসক বলিয়াছেন যে, ইহার আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এরূপ জটিল বিষয়ে মতভেদ থাকিতেই পারে। কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, ইহার মূল কারণ দুইটি, একটি কারণ বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত শিক্ষা, দ্বিতীয় কারণ বাঙ্গালী যুবকদলের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য। স্মরণাতীত কাল হইতে এই ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায়, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্ম্মজ্ঞানের বিকাশ-সাধন। আজ শিক্ষার সেই লক্ষ্য বর্জ্জিত এবং উপেক্ষিত। তাহার পরিবর্ত্তে ইহকালসর্ব্বস্ব শিক্ষাই এখন এ দেশে প্রবর্ত্তিত। যেখানে এই প্রকার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত, সেইখানেই এই মহাপাপ ভীষণমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তুরস্ক, মার্কিণ, ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রীয়া, ব্যাভেরিয়া, রুসিয়া, যুগোশ্লেভিয়া, পর্টুগাল, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশেও এই মহাপাপের তাণ্ডব দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতি চিরাগত লক্ষ্য এবং ভাবধারা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া উহা দেশীয়-দিগের প্রকৃতির বিকৃতিসাধন করিয়া দিতেছে। সেই বিকৃতি নানাদিক্ দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ফলে কেহ বা নাস্তিক, কেহ বা বিজ্ঞানবাদী, আবার কেহ বা বিপ্লবপন্থী হইয়া পড়িতেছে। তাহার পর বাঙ্গালার যুবকদল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় না দেখিয়া অর্থকষ্টে মোরিয়া হইয়া পড়িতেছে,—এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অসংযত যুবক জ্ঞানহারা এবং দিশাহারা হইয়া হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবী হইয়া উঠিতেছে। এই বিপ্লবীর দল যে সমাজের শত্রু এবং দেশের শত্রু, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দেশশুদ্ধ লোককে এই মহাপাপের আবির্ভাবের জন্য দায়ী মনে করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

সার জন এণ্ডার্সন রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার কোন আশাই দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সম্বন্ধে সরকারের কথা খুবই স্পষ্ট। সরকার পক্ষের কথা এই যে, যত দিন বিপ্লবীদিগের লোকসংগ্রহ ও চক্রান্ত বন্ধ না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত সরকার তাঁহাদের বজ্রমুষ্টি কিছুতেই শিথিল করিবেন না। অথচ তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, একবারে উহার কার্য্যকরী শক্তি বিনষ্ট না হউক, উহার অবস্থা যত দিন এরূপ না হইতেছে যে, সরকারের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইলেও উহা আবার আত্মপ্রকাশ করিবে না, তত দিন পর্য্যন্ত বন্দিগণ মুক্তি পাইবেন না। সে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কি না, কে বলিতে পারে? বিপ্লবীদিগের ভিতরের খবর ত বাহিরের লোকের জানিবার উপায় নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলা চলে না। এখন জিজ্ঞাস্য, বিপ্লবীদিগের সহিত আটক আসামীদিগের সম্বন্ধ কি? সে সম্বন্ধে সরকার স্পষ্ট কোন কথাই বলেন না। যে সময় আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যা অত্যন্ত প্রবলভাবে নামিয়া আসিয়াছিল, সেই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক যুবক গ্রেপ্তার এবং বন্দী হইয়াছিল। উহারা বিপ্লবী বলিয়া অভিযুক্ত হয় নাই। তবে তাহাদিগকে আটক রাখা হইতেছে কেন? সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে কে? যে মহাত্মাজী দশ মাসের মধ্যে স্বরাজ প্রসব করিয়া দিবেন, এইরূপ আশা দিয়া বঙ্গীয় যুবকদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে নামাইয়াছিলেন, তিনি এখন বে-গতিক দেখিয়া এবং স্বয়ং মুক্তি পাইয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—আর যে কংগ্রেস মহাত্মাজীর ভাঁওতায় পড়িয়া আইন অমান্যনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন,—সেই কংগ্রেসও এই সকল ভাব-প্রবণ, সহজে প্রলুব্ধ এবং অদূরদর্শী যুবকের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছেন না। এই সকল বন্দী যুবকের এবং তাহাদের আত্মীয়গণের তপ্তশ্বাস নিঃশব্দে অনন্ত অম্বরে মিশিয়া যাইতেছে। মহাত্মাজীর নেতৃত্বের তারিফ করিতে হয়। তিনি অবাধগতিতে হরিজন উদ্ধার করিয়া বেড়াইতেছেন,—আর তাঁহার কুহকে ভুলিয়া যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে ঐকান্তিকতার সহিত নামিয়াছিল, তাহারা এখনও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দিদশায় দিন কাটাইতেছে। এই কার্য্যে নূতনত্ব আছে!

বেকার-সমস্যা

সার জন এণ্ডাসন তাঁহার অভিভাষণে বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্যাটি অত্যন্ত কঠোর এবং বিকট (hideous)। ইহার সমাধান না করিতে পারিলে সংগঠনকার্য্য সম্পূর্ণ হইবে না। তাঁহার মতে সরাসরি এই সমস্যার সমাধান করিতে যাইলে সুবিধা হইবে না। শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারসাধন, পল্লীশিল্পের উন্নতিব্যবস্থা এবং শ্রমশিল্পে সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা এই সমস্যার যথাকালে সমাধান হইতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যে অবস্থাটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর বিলম্ব সহে না। এখন লক্ষ্মণ মরে, পরে বিশল্যকরণী আনিলে কি হইবে? এই রাক্ষসী সমস্যাটি সঙ্গীন এবং বিকট। ইহার সমাধান না করিতে পারিলে, বাঙ্গালায় শান্তিপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সার জন এণ্ডার্স ন যে তাহা না বুঝেন, তাহা নহে, কিন্তু সরকারী তহবিলে যেরূপ অর্থাভাব, তাহাতে হঠাৎ কিছু করিবারও উপায় নাই। তবে এ কথা সত্য যে, ভদ্রলোকদিগের মধ্যেই এই বেকার-সমস্যা উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু কেবল শ্রমের গৌরবের দোহাই দিয়া ভদ্রসন্তানদিগকে হল-কর্ষণের কার্য্যে, চর্ম্মকারের কার্য্যে বা সূত্রধরের কার্য্যে নিয়োগ করিতে গেলে সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। যাহারা স্মরণাতীতকাল হইতে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে ঐরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করে নাই, তাহাদের পক্ষে উহাতে পটুত্ব প্রকাশ করা দুই তিন পুরুষে সম্ভব হইবে না। দুই চারি জন তাহা হয় ত পারিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই তাহা পারিবে না। আর এক কথা এই যে, পল্লীশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দেশের করভার লঘু করা আবশ্যক। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাব চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতিরূপে মিষ্টার রবার্টসন টেলার যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছিলেন যে—A lightening of the burden of taxation is essential to industrial advance. অর্থাৎ শ্রমশিল্পের প্রগতিসাধন করিতে হইলে করভারের লাঘব করা আবশ্যক। কিন্তু বঙ্গীয় সরকার ত আরও পাঁচটি করের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপাইলেন। আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা মিষ্টার টেলর বলিয়াছিলেন,—A restoration of confidence is essential to economic reconstruction. অর্থাৎ বার্ত্তিক ব্যাপারের পুনর্গঠনের মূল প্রয়োজন :—অবস্থার পুনঃস্থাপন। সরকার কিসের উপর কিরূপ কর ধার্য্য করিয়া বসেন, তাহা না জানিতে পারিলে ত লোক ঋণ করিয়া পুঁজির টাকা তুলিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। সরকার তামাকের উপর সামান্য করভার চাপাইলেন, তাহার ফলে যাহারা বিড়ি বাঁধিয়া খাইতেছিল, তাহারা সে জন্য প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশালাইয়ের উপর স্বদেশী শুল্ক (excise duty) বসান হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালার দেশালাই শিল্পের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সার জন এণ্ডার্সন জানেন না কি? বিলাত হইতে আমদানী লৌহ-শিল্পের উপর ধার্য্য শুল্কের হ্রাস করিয়া দেওয়াতে টাটার অত বড় লৌহের কারখানাকেও শঙ্কিত হইতে হইতেছে। কাগজের উপর উচ্চহারে ডিউটী—বিশেষতঃ অতিরিক্ত হারে ডাকমাশুল বৃদ্ধি করাতে সৎসাহিত্যের প্রসার দিন দিন হ্রাস-প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার ফলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতেছে। অদূর-ভবিষ্যতে পুস্তকের ব্যবসা বন্ধ হইবার সম্ভাবনাও প্রবল। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় লোক যে যোগে-যাগে কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া কোন উটজ শিল্প বা মাঝারি শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবে, সে ভরসা বাঙ্গালীর নাই। বাঙ্গালী এত দরিদ্র যে, তাহারা ক্ষতি সহ্য করিতে অসমর্থ। এই সকল কারণে বাঙ্গালায় কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠায় ঘোর অসুবিধা ঘটিয়াছে।

মিলনের প্রয়াস

এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্র যখন নখদন্তহীন হইয়া শিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তখন সে এক ফন্দী খাটাইয়াছিল। সে এক পঙ্কপূর্ণ জলাশয়ের পরপারে যাইয়া বসিল এবং একটি সুন্দর সুবর্ণ-কঙ্কণ দেখাইয়া জলার পরপার্শ্বস্থিত পথের পথিকদিগকে ডাকিয়া বলিতেছিল,—"হে মানব-সকল! আমি সমস্ত জীবন কেবল হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাটাইয়াছি। আমার ইহকাল পাপে ভারী হইয়া উঠিয়াছে। সেই ভার লাঘব করিবার জন্য আমি আজ সুবর্ণ দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই সামান্য জলবিশিষ্ট জলা পার হইয়া আমার নিকট আসিবে, আমি তাহাকেই এই কঙ্কণটি এবং তৎসহ বিলক্ষণ দক্ষিণাও দিব।" অধিকাংশ পথিক ব্যাঘ্রের সেই আহ্বানে কর্ণপাত করিল না, দুই এক জন সুবর্ণ-কঙ্কণের লোভে সেই দিকে অগ্রসর হইলে যখন তাহারা পাঁকে পড়িয়া আর নড়িতে পারিত না, ব্যাঘ্র মহাশয় তখন তাহাকে ভোজন করিতেন। বোম্বাইয়ের মহম্মদ আলি জিন্নাও যেন কতকটা সেইরূপ ফন্দী আঁটিয়া বর্ত্তমান বর্ষের কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা মীমাংসা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবুও সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দিল্লীতে মিষ্টার জিন্নার মোকামে গিয়াছিলেন, উভয়ে অনেক কথা হইয়াছিল। শেষটা দাঁড়াইয়াছে—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের কোন মীমাংসাই হয় নাই। এখন উভয়েই নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতিই হউন আর যাহাই হউন না কেন, তাঁহার কথা যে নিখিল ভারতের হিন্দু সমাজ অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিবে, এমন কোন সম্ভাবনাই নাই। অবশ্য মিষ্টার জিন্নার কথাও যে সমস্ত মুসলমান সমাজ একবাক্যে গ্রহণ করিবেন, তাহা মনে হয় না। তবে সে কথা মুসলমানরাই বলিতে পারেন। মিষ্টার জিন্না অবশ্য বুঝেন এবং বলেন যে, বর্ত্তমান শাসনসংস্কার বিলে যে শাসনবিধি পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীর হাতে কোন অধিকারই দেওয়া হয় নাই। কেন দেওয়া হয় নাই, তাহা তিনি নিপুণভাবে ভাবিয়া দেখিয়া-ছেন কি? দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যদি ঐকমত্য থাকিত, তাহা হইলে কি ঐরূপ হইতে পারিত? কখনই না, কিন্তু তাহা বুঝিলেও তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের জন্য সিংহভাগ দখল করিয়া

বসিয়া থাকিতে চাহেন। সেই হেতু তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশটা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। তিনি অবশ্য জানেন যে, যেখানে ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই, সেখানে সেই ক্ষমতার অল্পাংশ বা অধিকাংশ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। তবে তিনি উহার জন্য অত চেষ্টা করিলেন কেন? তাহার কারণ, তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের দাবীটি এখন হইতে কায়েম করিয়া রাখিলেন। এইরূপে নিজ কার্য্যটি হাসিল করিয়া তিনি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সমস্যার সমাধানরূপ স্বর্ণ-কঙ্কণ দেখাইয়া শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে পরামর্শার্থ আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি ত স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সহিত সম্প্রদায়গত ধর্ম্মবুদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই। উহা উনজন সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পিত। তাঁহার শেষ কথাটি সত্য নহে, তাহাও তিনি মনে মনে জানেন। বাঙ্গালা প্রদেশে একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা শতকরা চুয়ান্ন জন। সুতরাং তাঁহাদিগকে কোনমতেই সংখ্যাল্প সম্প্রদায় বলা চলে না। তবে সেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কেন? ম্যাক্‌ডোনাল্ডের রোয়দাদে মুসলমানদিগের জন্য যতগুলি সদস্যপদ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা যথাযথভাবে রাখা চাই,—তাহার একটিও ক্ষুন্ন করা হইবে না,—এরূপ জিদ ধরার হেতু কি? যাহারা সংখ্যায় লঘু, তাহাদের জন্য যদি বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে যাহারা এই বঙ্গভূমিতে সংখ্যায় পৌনে তিন কোটিরও অধিক, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক, না যাহারা সংখ্যায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা বিধেয়? মিষ্টার জিন্না নিশ্চয়ই খোলসা মনে এ কথার উত্তর দিতে চাহিবেন না। আসল কথা, এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন এবং নির্ব্বাচক-মণ্ডলী সম্বন্ধে কোন মীমাংসাই অদূর-ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা নাই। কংগ্রেসের "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতি ইহাকে বিশেষ পোক্ত করিয়া দিয়াছে। এখন তাঁহারা উভয়েই বলিতেছেন যে, যদি তাঁহাদের দুই জনের মতানুসারেই কায হইত, তাহা হইলে তাঁহারা একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু বাহিরের লোক জুটিয়াই বাদ সাধিল। সাম্প্রদায়িক সদস্য নির্ব্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকিলে মিশ্রনির্ব্বাচনে কোন লাভ নাই। যতক্ষণ এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের কোন না কোন লোকের হস্তে আপনাদের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত না হইতে পারিতেছে অর্থাৎ যতক্ষণ অন্য সম্প্রদায়ের লোককে নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা যোগ্যতম মনে করিলেও তাহাকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে না পারিতেছে, ততক্ষণ মিশ্রনির্ব্বাচনের দ্বারা বিন্দুমাত্রও সুফল লাভের আশা করিতে পারা যাইতেছে না। ভবিষ্যতে লোকের সুবুদ্ধি হইবে, এই আশায় আর কায করা সঙ্গত নহে। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ফলাফল দেখিয়া কি চৈতন্য হইবে না? হিন্দুরা যদি নির্ব্বাচনপ্রার্থী না হন, তাহা হইলে ক্ষতি কি হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। কিন্তু তাহা করিবার মত শক্তি আমাদের এই হতভাগা হিন্দু-সমাজের মধ্যে কয় জনের আছে? তাহা যখন নাই, তখন বৃথা কাযে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আমাদিগকে লোক হাসাইতে হইবেই। অদৃষ্টের লেখা অখণ্ডনীয়!

বাঙ্গালার বজেট

ফাল্গুন মাসটা বজেটের সময়। এই সময় ভারত সরকার এবং অন্য সকল সরকার বজেটের কথাই আলোচনা করিয়া থাকেন। তদনুসারে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী (বাঙ্গালা ১০ই ফাল্গুন) বঙ্গীয় সরকারের অর্থ-সচিব এই সরকারের বজেট বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন। এই বজেটের হিসাব পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। কারণ, ইহার কোন দিক্ দিয়াই একটু আশার আলোক দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কেবল আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়াতে সরকারী জমা-খরচে ঘাঁটতির অঙ্কই লিখিত হইতেছে এবং সেই অজুহতে দেশের লোকের স্কন্ধে করের বোঝা চাপান হইতেছে। বাঙ্গালীদিগের ভাগ্যে রাম কেবল উল্টা বুঝিয়াই যাইতেছে। বাঙ্গালী সরকারী কর দিয়া যাইতেছে। যে অনুপাতে তাহারা উহা দিয়া যাইতেছে, সে অনুপাতে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় জাতি-গঠনমূলক কার্য্যে সরকারের নিকট হইতে তেমন অর্থ-সাহায্য বাঙ্গালীরা পাইতেছে না। গত বৎসর যখন বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বজেট করা হইয়াছিল, তখন অনুমান করা হইয়াছিল যে, বাঙ্গালা সরকারের রাজস্বখাতে ৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আয় হইবে। কিন্তু এখন সংশোধিত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, এই বৎসর বাঙ্গালা সরকারের ১০ কোটি ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় হইবে। তন্মধ্যে ভারতসরকারের নিকট হইতে বাঙ্গালা সরকার পাটের রপ্তানী শুল্কবাবদ ১ কোটি ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা পাইয়াছেন এবং অন্যান্য বাবদ ভারতবাসীরাও ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অধিক দিয়াছে। বৎসরান্তে হিসাব চূড়ান্ত হইলে বোধ হয়, আয়ের অঙ্ক আরও কিছু বাড়িয়া যাইবে। এবার ভূমির রাজস্বখাতে ১৭লক্ষ, বনবিভাগ হইতে ২লক্ষ ২৫ হাজার এবং রেজিষ্ট্রেশনবাবদ ৫লক্ষ টাকা পূর্ব্বানুমান অপেক্ষা অধিক আদায় হইবে। কিন্তু আবগারীর আয় পূর্ব্বের অনুমান অপেক্ষা ৫ লক্ষ টাকা কম পড়িবে। আগামী ১লা এপ্রিল, বাঙ্গালা ১৮ই চৈত্র তারিখ হইতে যে সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবে, ঐ বৎসরের জন্য সার জন উডহেড যে বজেট করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, পাট রপ্তানীর আয়বাবদ ভারত সরকারের নিকট হইতে যে ১কোটি ৫৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, জমার অঙ্কে সেই টাকাটা ধরিয়া আগামী বর্ষে বঙ্গীয় সরকারের কোষে ১১কোটি ১২লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা আয় এবং সর্ব্বসাকল্যে ১২কোটি ১৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং আগামী বৎসরও সরকারী তহবিলে ৮০ লক্ষ ৮৯ হাজার অর্থাৎ প্রায় ৮১ লক্ষ টাকা ঘাঁটতি পড়িবে। যদি ভারত সরকারের নিকট হইতে পাটের শুল্কবাবদ মোটা টাকাটা পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে বঙ্গীয় সরকারের তহবিলে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার উপর ঘাঁটতি পড়িত। সুতরাং এই ঘাঁটতির হাত হইতে নিস্তার নাই। বাঙ্গালার পুলিসের ব্যয় যত অধিক, এত আর কোন দেশেই নহে। বাঙ্গালায় বিপ্লবীদিগের অত্যাচার-ফলেই অনেকটা এই কাণ্ড হইয়াছে। সার জন উডহেড আরও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় আইন অমান্য আন্দোলন, বিপ্লবীদিগের অনাচার প্রভৃতি যদি না থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালা সরকারের

ঋণের পরিমাণ ৩ কোটি টাকারও কম হইত। কিন্তু ঐ সকল ঘটনার জন্য বাঙ্গালা সরকারের ঋণের পরিমাণ আনুমানিক ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইল। ইহাকে বাঙ্গালীর অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিব? ইহাতে কতকগুলি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের দোষের জন্য সমস্ত দেশবাসীদিগকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে না কি?

ভারত সরকারের বজেট

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখে ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব সার জেমস গ্রিগ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দের বজেট পেশ করিয়াছেন। ভারত সরকারের তহবিলে টাকার কিছু উদ্‌বৃত্তি দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। উহাতে বুঝা যায় যে, ভারত সরকার এ দেশের লোকের উপর অনাবশ্যক করের ভার চাপাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। যে সরকারের সামরিক ব্যয় তাহাদের আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক দাঁড়ায়, যে সরকারের সরঞ্জামী খরচা দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে অত্যন্ত অধিক, সে সরকারের যদি ব্যয় কুলাইয়াও তহবিলে কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে,—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে সরকার প্রজার উপর অধিক মাত্রায় কর ধার্য্য করিয়া থাকেন। ভারত সরকারের বার্ষিক আয়ের যত অংশ সমর-খরচার জন্য ব্যয় করা হইয়া থাকে, পৃথিবীতে অন্য কোন দেশের সরকারের তত অংশ সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় হয় না; সুতরাং এই ব্যয় যে নিতান্ত অসঙ্গত, তাহা বলাই বাহুল্য। গত বৎসর ভারত সরকারের তহবিলে ৬২ লক্ষ টাকা উদ্‌বৃত্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ভারত সরকারের তহবিলে খরচ-খরচা বাদ ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা উদ্‌বৃত্ত হইবে। সুতরাং আগামী ৩১শে মার্চ্চ সরকারী তহবিলে অন্যূন ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা মজুদ থাকিবে। এই প্রায় ৪ কোটি মজুদ টাকা হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধনকল্পে ভারত সরকার এক কোটি টাকা দান করিবেন। ৯টি প্রদেশকে ১ কোটি টাকা দিলে কোন প্রদেশই বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না। তবে ইহা মন্দের ভাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন ইহা কিরূপে ব্যয় হয়, তাহাই দ্রষ্টব্য। ইহা ভিন্ন ৪০ লক্ষ টাকা রাজপথের উন্নতিসাধনের জন্য ব্যয় করা হইবে। ইহা উপস্থিত না করিলেও চলিত। স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের জন্য এখন অধিক টাকা ব্যয় করা উচিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য যে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, উহা খাঁটি সামরিক ব্যয়, সুতরাং উহা সামরিক ব্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। দিল্লীতে পুষা-কলেজ স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অপব্যয়। ঐ কলেজ পুষায় থাকিলে সাধারণের কোন অসুবিধাই ছিল না। সুতরাং ঐ উদ্‌বৃত্ত টাকা যে দেশের বিশেষ কিছু অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয় করা হইল, তাহা মনে করা যাইতে পারে না।

আগামী বৎসরের জন্য ভারত সরকারের যে বজেট করা হইয়াছে, তাহাতে সরকারী কোষে রেলওয়ের হিসাব বাদে ৯০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা আয় ও ৮৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। এই বৎসর যে ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইল, তাহা সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তিত বেতন পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং সরকারী তহবিলে দেড় কোটি টাকা উদ্‌বৃত্ত হইবে অনুমান করা হইতেছে। ইহা হইতে রূপার আমদানী কর ৫ আনার স্থানে ২ আনা করা হইবে আর কাঁচা চামড়ার উপর ধার্য্য রপ্তানী কর উঠাইয়া দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য, দেশের লোক ইহা চাহে নাই। ইহাতে দেশের লোকের ক্ষতি হইবে। কারণ, রূপার দাম কমিলে গরিব লোকদিগের সঞ্চয়ের মূল্য কমিবে, কাঁচা চামড়ার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইলে হয় ত দেশীয় চামড়া পাকানর কাযের (tanning) অসুবিধা ঘটিবে। কিন্তু এই দুই বাবদ খরচ করিয়া সরকারী তহবিলে কেবলমাত্র ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা মজুদ থাকে। কিন্তু ঐ টাকা দিয়াও আয়কর যাহা বাড়ান হইয়াছে, তাহা কমান যায় না। আয়করের উপরও যে অতিরিক্ত করের বোঝা (surcharge) চাপান হইয়াছে, তাহা কমাইতে হইলেই ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দরকার, আর এক হাজার হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত যাহাদের আয়, তাহাদের প্রপীড়িত স্কন্ধ হইতে আয়করের বোঝা নামাইতে হইলে ৭৫ লক্ষ টাকা চাই। অত টাকা ত ভারত সরকারের তহবিলে নাই। তবে সে বোঝা একেবারে না কমাইয়া তাহার এক-তৃতীয়াংশ কমান হইল। গরিবের কাঁধের বোঝা কমাইলে ত লাভ নাই। উহার সাড়ে দশ আনা বজায় রাখা কর্ত্তব্য মনে হইল। সওয়া পাঁচ আনা কমাইয়া দিয়া বাহাদুরী লওয়া যায় কি? কিন্তু তাহা করিতেই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ উবিয়া যাইবে। তহবিলে থাকিবে কেবল ৬ লক্ষ। গরীবের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কি অমানুষী করুণা! আর আমদানী শুল্কটা আপাততঃ বজায় রাখা হইল। চমৎকার বজেট! এক জন বিশিষ্ট ইংরাজই বলিয়াছেন যে, সরকারী বজেটে যদি জমা এবং খরচ বেশ মিলিয়া যায়, আর দেশের লোকের ঘরের বজেটে যদি জমায় কমি ও খরচ বেশী হয়, তাহা হইলে তাহাতে দেশের লোকের উপর সহানুভূতির অভাবই সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং বজেটের বাহাদুরী দেখিয়া কোন্ চোখে বা হাসি বল, কোন্ চোখে বা কাঁদি!

সামরিক ব্যয়

প্রতি বৎসরই ভারত সরকারের বজেটের সময় সামরিক ব্যয়ের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এ বৎসরও তাহা হইয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাকুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন সামরিক ব্যয় বার্ষিক সাড়ে ২৮ কোটি ২৯ কোটি টাকা ছিল, তখনও ভারতবাসীরা ঐ ব্যয় অতিরিক্ত মনে করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। তাহার পর য়ুরোপে মহা সমরানল জ্বলিয়া উঠে। তখন আর সামরিক ব্যয় হ্রাস করিবার প্রস্তাবের অনুকূল সময় ছিল না। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ভারতের সামরিক ব্যয় একেবারে ৬৮ কোটি টাকায় যাইয়া দাঁড়ায়। এরূপ ব্যয়বৃদ্ধি আর কোন দেশে লক্ষিত হয় নাই। তখন ভারতের চারিদিক্ হইতে আর্ত্তনাদের গভীর ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিল। সকলেই বলিতে লাগিল যে,

এই দরিদ্র দেশে যদি এত টাকা কেবল সামরিক খরচ বাবদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যের জন্য অর্থ পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? সরকারও যে সে কথা না বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে। যাহা হউক, তাহার পর সরকার সামরিক ব্যয়ের বাবদ খরচ কিছু কমাইয়াছিলেন। উহার পর-বৎসর সাড়ে ৬৩ কোটি টাকা সামরিক ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যয়ও অত্যন্ত অধিক। একে দেশে অর্থ নাই,—তাহার উপর এই দেশ-শাসনের জন্য যত অধিক অর্থব্যয় হয়, এমন আর কোন দেশে হয় না,—তাহার উপর এত সামরিক ব্যয় অত্যন্ত অসঙ্গত, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কাযেই জঙ্গীলাট সমর-বিভাগের ব্যয় ধীরে ধীরে কমাইতে থাকিলেন। কিন্তু সে হ্রাসসাধন অতিশয় মন্থরগতিতে হইতে থাকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সামরিক ব্যয় ৫৫ কোটি টাকা ছিল। তাহার পরও উহা ধীরে ধীরে নামিতেছে। কিন্তু তাহাতে এই দেশের গরীব লোকরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। মিষ্টার পি, এন, সাপ্রু ভারত সরকারের ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারের বার্ষিক আয় ৭৭ কোটি টাকা। ঐ টাকা হইতে যদি ৪৫ কোটি টাকা সমরবিভাগের জন্য ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে আর দেশের জন্য থাকে কি? জঙ্গীলাট সার ফিলিপ চেটউড উহার উত্তরে বলেন যে, অন্যান্য দেশে সামরিক খরচ দুই গুণ হইতে ৫ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে,—ভারতেই কেবল সামরিক ব্যয় অত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা ভারতের জঙ্গীলাট বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, অন্যান্য দেশের সামরিক ব্যয় তাহাদের সরকারের মোট রাজস্বের কত অংশ, তাহাও তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমরা ত দেখিতে পাই যে, গ্রেট বৃটেনের সামরিক ব্যয় তাহাদের মোট রাজস্বের শতকরা ১৪ অংশ, ইটালী এবং ফ্রান্সের শতকরা ১০ অংশ, জাপানের শতকরা সাড়ে ১০ অংশ। কিন্তু ভারত-সরকারের তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এরূপ অবস্থায় ঐরূপ তুলনা সাজে না। এ বিষয়ে আমরা আর অধিক কথা বলিতে চাহি না। কারণ, আমাদের কথা ত কর্ত্তারা কাণে তুলিবেন না।

নিখিল ভারতীয় সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ-বিরোধী সমিতি

ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লী সহরে নিখিল-ভারতীয় রোয়দাদ-বিরোধী সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। 'লীডার' পত্রের প্রধান সম্পাদক শ্রীযুত চিরভূরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি সেই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সেই সভায় অনেক প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, এই সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সমিতি তথাকথিত সাম্প্রদায়িক রোয়দাদকে ঘোর অন্যায় (বিশেষতঃ হিন্দু এবং শিখদিগের পক্ষে), সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবর্দ্ধক এবং এ সমস্ত সমাজের দুঃখনিবারণকল্পে অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিকভাবে কার্য্য করিবার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া উহাকে নিন্দা করিতেছেন। উহা ভারতে বৃটিশ-প্রভুত্ব বর্দ্ধিত করিবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব, এই সমিতি এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন যে, ভারতের শাসনসংস্কার আইনের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে এই সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ এবং ভারতবাসীর স্বার্থের হন্তারক এবং ভারতীয় জনমতের বিরোধী ব্যাপার আছে বলিয়া উহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়াই উচিত, এবং তৃতীয় প্রস্তাব, এই সমিতি সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ এবং ইণ্ডিয়া বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করিতেছেন। এই সভায় মিষ্টার চিন্তামণি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দর হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, উহাকে রোয়দাদই বলা যাইতে পারে না। তিনি সরকারের প্রধান পরিচালক, সুতরাং ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি কোন রোয়দাদ দিতে পারেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যখন এই সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে বৃটিশ জাতির কোন স্বার্থ নাই, এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এক সময়ে স্বর্গীয় গোখলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যিনি মনে করেন যে, ভারতবাসীদিগের রাজনীতিক দ্বন্দ্ব কেবল বৃটিশ এবং ভারতবাসীদিগের মধ্যে নিবদ্ধ, তিনি ভ্রান্ত। ইহা প্রকৃতপক্ষে তিন পক্ষের সংগ্রাম। বৃটিশ, হিন্দু এবং মুসলমান এই তিন পক্ষমধ্যে এই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। তিনি বলেন, জ্যামিতির একটা তথ্য এই যে, যে কোন ত্রিভুজের দুইটি বাহু একত্র করিলে উহা তৃতীয় বাহু অপেক্ষা প্রবল হইবে। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও সে কথা সত্য। এখানেও ত্রিভুজের দুইটি বাহু তৃতীয় বাহু অপেক্ষা প্রবল হইবে। অতএব যদি হিন্দু এবং মুসলমান সম্মিলিত হইতে পারে, তবে রাজনীতিক ক্ষেত্রে সুফল ফলিবে। অন্যথা নহে। এরূপ ক্ষেত্রে দুই পক্ষের সম্মিলিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। যদি প্রবলতম পক্ষ অন্যপক্ষকে হাত করিতে পারে, তাহা হইলে এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, হিন্দুরা কিছুতেই মুসলমানদিগকে স্বপক্ষে রাখিতে পারিবে না। হিন্দুরা যতই ত্যাগ স্বীকার করিবে, ততই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদিগের দাবী বাড়িয়া যাইবে। ইহা স্বাভাবিক। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রবলের সেবাই স্বার্থসাধনের পক্ষে অনুকূল। সুদূর-ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখিবার মত কয় জন আছেন? যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কথাই বা কে শুনিতেছে?

দমননীতিসম্পর্কে মিষ্টার এণ্ডরুজ

মিষ্টার এণ্ডরুজ এক জন বিশিষ্ট ইংরাজ। ভারতবাসীর উপর ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। এ দেশের লোকের সহিত তিনি অকপটভাবে মিশিয়া থাকেন। ভারতবাসীর আশা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি জানেন এবং ভারত সরকারের বর্ত্তমান শাসননীতির সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত। তিনি সম্প্রতি ভারত সরকারের দণ্ডনীতির উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বিলাতের "নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড এথেনিয়াম" পত্রে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি ভারত সরকারের

চণ্ডনীতির প্রকৃত ব্যাপার বিলাতের জনসাধারণকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীতে জাতীয়ভাব সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে,—কিন্তু ফরাসীরা উহা গ্রাহ্য করিতেছে না বলিয়া আমরা ফরাসীদিগকে নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু ভারতেও আমরা (ইংরাজরা) ঠিক ঐরূপ অবস্থাতে ঠিক ঐরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করিতেছি। বাঙ্গালায় এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে কতকটা সামরিক আইন জারীর মত নিয়ম জারী করা হইয়াছে। তিনি আরও যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে সকল কথা এ দেশের সকল সংবাদপত্রেই বার বার বলা হইয়াছে বলিয়া আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহাদিগকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেককে ছয় বৎসরের অধিককাল আটক রাখা হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ৫ বৎসরের অধিককাল কারাদণ্ডের ব্যবস্থা অতি অল্প অপরাধেই আছে। অনেক লোক আদালতে অভিযুক্ত হইয়া মুক্তি পাইলেও আবার তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

মিষ্টার গডফ্রি নিকলসন নামক পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্য মিষ্টার এণ্ডরুজের ঐ পত্রের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিপর্য্যয়-সাধনের জন্য ধ্বংসকর কার্য্যাদির জন্য আটক আসামীদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয় নাই, পরন্তু তাহারা নরহত্যা-সম্পর্কিত কার্য্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। কিন্তু মিষ্টার নিকলসন ঐ সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে কোন প্রমাণ পাইয়াছেন কি? সে প্রমাণ কি ভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইয়াছিল? যাহা হউক, মিষ্টার সি. এফ. এণ্ডরুজ বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সার জন এণ্ডারসনকে যে হতভাগ্য এবং কুপথে চালিত বালক গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি তাহার প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যফলে বিভীষিকাবাদ যত দমিত হইবে, ঐ সম্বন্ধে আর সমস্ত চেষ্টা উহা দমনে ততটা সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, মিষ্টার এণ্ডরুজ খাঁটি ইংরাজ হইলেও তিনি দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মিষ্টার নিকলসন তাঁহার পরের মুখে শুনা এবং ক্ষণিক দেখা ব্যাপার হইতে সেরূপ অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালার জমীদার

বাঙ্গালার জমীদারদিগের কথা লইয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়া আসিতেছে। বিগত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জনের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস যে সময়ে বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা-প্রদেশের মোট রাজস্বের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা ছিল। ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দের সেই প্রদেশের শেষ রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে মোট ভূমির খাজনা বাবদ সাড়ে ১৬ কোটি টাকা আদায় হইতেছে। সুতরাং জমীদাররা বিস্তর লাভ করিতেছে। এই সময় লর্ড কার্জ্জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর একটু কটাক্ষও করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সেই সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থন করিয়া লর্ড কার্জ্জনকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সরকার পক্ষ হইতে মিষ্টার দত্তের সেই পত্রগুলির জবাব দেওয়া হয়। রমেশ বাবুও তাহার পাল্টা জবাব দিতে কসুর করেন নাই। এখন আর সে সব কথা তুলিয়া কায নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সেই হইল বঙ্গীয় জমীদারদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রপাত। এই সময়েই পাশ্চাত্য দেশ হইতে সমাজতন্ত্র-বাদের এবং সর্ব্বস্বত্ববাদের তরঙ্গ ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িতে থাকে। এ দেশের এক শ্রেণীর লোক কেরিয়ান সোসাইটীর সুলভ সাহিত্য পাঠ করিয়া, জমীদাররা বিনা পরিশ্রমে অনেক টাকা ভোগ করিয়া থাকেন বলিয়া একটা রব তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা কতকগুলি জমীদারের অত্যাচার-কাহিনী অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়া তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিতে থাকেন। এ দিকে লর্ড ডফরিণের আমলে প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া জমীদার এবং প্রজার মধ্যে সঙ্ঘর্ষের আবির্ভাব ঘটে। ফলে মামলা-মোকর্দ্দমার আবির্ভাব হেতু জমীদার এবং প্রজা উভয়েই নিঃস্ব হইয়া পড়িতে থাকে। তখন জমীদাররা পুষ্করিণী খনন, পথঘাট নির্ম্মাণ, স্কুল-পাঠশালার প্রতিষ্ঠা, সদাব্রত প্রভৃতি সদনুষ্ঠান করিতে বিরত হয়েন। বহু লোক প্রকৃত তথ্য না দেখিয়া এবং না বুঝিয়া জমীদার সম্প্রদায়ের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। তাহার পর জমীদাররা সাধারণতঃ সরকারী পক্ষের সমর্থক, সুতরাং দেশের প্রগতির বিরোধী—বলিয়াও জাতীয়ভাবে প্রভাবিত লোকরা তাঁহাদের উৎকট বিরোধী হইয়া দাঁড়ান। এই প্রকারে বঙ্গের জমীদাররা দেশের জনসাধারণের নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন।

সম্প্রতি এই ব্যাপার লইয়া আবার একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। অনেকে অবগত আছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় সরকারের রাজস্ব-সদস্য মাননীয় সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র নিখিল বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বাঙ্গালার জমীদারদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এখন বাঙ্গালার জমীর অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংস্কারসাধন করা আবশ্যক। জমীদারদিগের বিরুদ্ধে তিনি চারি দফা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। সেই চারি দফা অভিযোগ এই:—(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংস্কারসাধন আবশ্যক। (২) সরকার যদি জমীর উন্নতিসাধন করেন, তাহা হইলে তাহার ফলে যে অধিক আয় হইবে, সরকার তাহার ন্যায্য অংশের দাবী করিতে পারেন, (৩) জমীদাররা জনসাধারণের নেতৃত্ব হারাইয়াছেন এবং (৪) এই প্রগতির দিনে তাঁহারা সেই সেকেলে আচার-ব্যবহার আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান কালের সহিত তাঁহারা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছেন না। সার ব্রজেন্দ্রলালের এই অভিযোগগুলি তাঁহার নিজস্ব, না অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে এই অভিযোগগুলি সমস্ত ঠিক নহে। জমীদারদিগের পক্ষ হইতে কুমার শ্রীযুত হিরণ্যকুমার মিত্র তাহার উত্তর দিয়াছেন। জবাব সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে।

কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয় সুন্দরবন ভূস্বামী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে সার বি এল মিত্রের উক্তির জবাব দিয়াছেন। সার ব্রজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, জমীদাররা অতিশয় আরামপ্রিয়। জমীদাররা বোধ হয় মনে করেন যে, তাঁহারা সরকারের অনুগ্রহ এবং আশ্রয় লাভ করিয়া আছেন বলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, তাহা নহে। সরকার বর্দ্ধমান জনমতের প্রতিকূলে জমীদারদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিবেন না। সরকারী রাজস্ব সদস্যের এই অভিযোগ গুরু। কিন্তু কুমার হিরণ্যকুমার ইহার ষোল আনা জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আরামপ্রিয়তাই যদি জমীদারদিগের বিরুদ্ধে প্রবর্দ্ধমান জনমতের প্রতিকূলতার কারণ হয়, তাহা হইলে উদারনীতিকগণের বিরুদ্ধে জনমত দিন দিন অধিক প্রতিকূল হইয়া উঠিতেছে কেন? সপ্রু, জয়াকর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কি আরামপ্রিয়? তবে তাঁহারা জনমত পরিচালিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না কেন? সরকার অবশ্য দৃশ্যতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা জমীদারদিগের স্কন্ধে সেসের উপর সেস চড়াইয়া সেই সেস আদায়ের ভার জমীদারদিগের হস্তে দিয়াছেন। কিন্তু প্রজার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে প্রজার পক্ষে এখন বিনা ওজরে তাহাদের দেয় সেসের টাকা কি তাহারা দিতে পারিতেছে? যে সকল জমীদারের বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডে গিয়াছে, তাহাদের খাজনার টাকা কিরূপ আদায় হইতেছে, সার ব্রজেন্দ্রলাল কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছেন না? অধিকাংশ জমীদারই বর্ত্তমান যুগে আরামপ্রিয় নাই। অনেক ভূসম্পত্তি সরকারী খাজনার দায়ে জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে। অনেক জমীদার স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া লাট খাজনা দিতে বাধ্য হইতেছেন। ভূসম্পত্তির আর মূল্য নাই। ফলে এখন জমীদার সম্প্রদায়ের দুঃখের অন্ত নাই। বাঙ্গালায় কয় জন সমৃদ্ধ জমীদার আছেন? এখন প্রজা এবং জমীদার উভয়েই ঋণগ্রস্ত। জমীদারদিগের মধ্যে দুই দশ জন আলস্যপ্রিয় নির্ব্বোধ লোক আছেন বলিয়া সমস্ত জমীদার সম্প্রদায়কে সে জন্য দোষী করা সঙ্গত নহে।

জমীদাররা বাঙ্গালীসমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালার ভদ্রলোক সমাজ এরূপভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ কথা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা বাহুল্যভয়ে আর সে কথা এখানে বলিতে চাহি না। কুমার হিরণ্যকুমার জমীদারদিগকে বলিয়াছেন যে, প্রজার স্বার্থ এবং জমীদারদিগের স্বার্থ অভিন্ন। তাহা বুঝিয়া জমীদারগণ প্রজার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে যত্নশীল হউন। সার বি, এল মিত্র বাঙ্গালা সরকারের এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংস্কারসাধনের কথা বলিয়াছেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত না সরকারের মত, তাহা আমরা জানি না। তাহা না জানিলেও এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে পারিতেছি না। তাঁহার কথায় অনেকে আতঙ্কিত হইয়াছেন।

পরলোকে হাতি বাবু

বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী আপনাদের প্রতিভাবলে বিশেষ খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার অন্যতম। ইনি জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি জয়পুর নগরে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ওরফে হাতি বাবুই জয়পুরের মহারাজের এক জন প্রধান অমাত্য এবং জায়গীরদার হইয়াছিলেন। ইনিও এক জন বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জয়পুর সহরে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি জয়পুর মহারাজের কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, এবং পরে তাঁহার পিতার নিকট রাজকার্য্য শিক্ষা করেন। ইনি প্রথমে জয়পুর আপীল-আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন যে দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করেন, রায় বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার অন্যতম সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে কান্তি বাবুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলিয়া লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং ঈশান বাবুকে তাঁহার পিতার কার্য্যে সহায়তা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কান্তি বাবুর মৃত্যুর পর মহারাজা মাধো সিং ঈশান বাবুকে কাউন্সিলের সদস্যপদ এবং জায়গীরদার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইনিও ইঁহার প্রতিভাবলে সর্ব্বসাধারণের প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি শারীরিক অসুস্থতাহেতু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গত ১৯শে জানুয়ারী আশ্বিতে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে এক জন প্রসিদ্ধ প্রবাসী বাঙ্গালীর অভাব ঘটিল। ইঁহাদের পৈতৃকভূমি শ্যামনগরের সন্নিহিত রাহুতা গ্রাম। গ্রামে তিনি কান্তিচন্দ্র হাইস্কুল নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন এবং বহু সৎকার্য্যে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জয়পুরের পুলিস বিভাগের কর্ত্তা (ইনস্পেক্টার জেনারল) মিষ্টার এফ, এস, ইয়ং ঈশান বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়কে ঈশান বাবুর জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, ঈশান বাবু জয়পুর দরবারের একটি অলঙ্কার এবং প্রবল ভরসাস্থল ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে জয়পুর রাজ্যের উন্নতিসাধক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির অভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে সার হরিরাম গোয়েঙ্কা

গত ১৪ই ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত্রি ৩টার পর কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার সার হরিরাম গোয়েঙ্কা পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্পবয়সেই ব্যবসায়-কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায় বিষয়ে নিজ বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা কর্পোরেসনের এক জন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের এক জন সদস্য ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি কলিকাতায় এক জন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কায করেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাসানাল চেম্বার অব কমার্শের ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং মাড়োয়ারী এসোসিয়েশনের সভাপতির পদও পাইয়াছিলেন। কিছু দিন তিনি কলিকাতায় সেরিফের পদ প্রাপ্ত হন। সরকার তাঁহাকে নাইট এবং সি আই ই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অনেককে অর্থদান

সার হরিরাম গোয়েঙ্কা

করিতেন। তাঁহার তিরোভাবে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী সমাজের এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মীর অভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি কালীঘাট, দেওঘর প্রভৃতি বিভিন্ন তীর্থে ধর্ম্মশালা ও কলিকাতায় পিতার স্মৃতিস্বরূপ রামচন্দ্র গোয়েঙ্কা ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

আর্য্যকুমার চৌধুরী

কলা-লক্ষ্মীর বরপুত্র আর্য্যকুমার চৌধুরী ১২৯৪ সালের ৯ই ভাদ্র জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাই-কোর্ট-গৌরব মাননীয় বিচারপতি সার আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার জনক—বঙ্গের বীণাপাণি প্রতিভাদেবী তাঁহার জননী। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য পরিস্ফুট হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান্তে আর্য্যকুমার বিলাতে গিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্থপতি-বিদ্যায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী লীলাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রীমতী লীলাদেবী কবি—তাঁহার

আর্য্যকুমার চৌধুরী

কল্পনা-প্রসূত কিশলয় কবিতা পুস্তক আর্য্যকুমারের চিত্র-পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ।

আর্য্যকুমার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবসমন্বয়ে—মার্জ্জিত রুচির চিত্রাঙ্কনে অগ্রণী ছিলেন। আলোকচিত্রে তাঁহার প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল। তিনি ফটোগ্রাফিক সোসাইটীর প্রদর্শনীতে বহুবার ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন। ফাইন আর্টস্ সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতৃগণের তিনি অন্যতম ছিলেন। সিমলার ফাইন আর্টস্ চিত্রপ্রদর্শনীতে তিনি কয়েকবার বড়লাটের মেডেল পাইয়াছিলেন। নূতন ধরণের বাড়ীর নক্সা প্রস্তুত কার্য্যেও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অসিতানন্দ চৌধুরী সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছেন—ইনিও চিত্রকলার সাধক। তাঁহার সাধনা সফল হউক।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কৌতুকময়ী

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] শিল্পী—মিষ্টার টমাস।

১৩ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৪১ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

৬

নিরাকারবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরী আসিবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জননী গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য কামারপুকুর হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। ঠাকুরের জননীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা অনেক পরিমাণে সহজ হইবে। নারী-চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সম্যক পরিস্ফুট করা সাধ্যাতীত। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রাণী রাসমণির ভক্তি-প্রবাহই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ঠাকুরের ধর্ম্ম-জীবনে যে প্রথম দীক্ষাগুরু ব্রহ্মচারিণী যোগেশ্বরী, ইহাও একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীপরমহংসদেবের জননীর জীবনের দুই একটি ঘটনা অনুধাবন করিলে এই রত্নগর্ভা ভাগ্যবতী রমণীর প্রভাব ঠাকুরের চরিত্রের উপর কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমেয় হইবে। রাণী রাসমণির ন্যায় এই জননীও বঙ্গদেশের একজন "অশিক্ষিতা" রমণী। কিন্তু যে শ্রীপরমহংসদেব পাণ্ডিত্যাভিমানী মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে ভক্তিবিহীন বলিয়া তৃণখণ্ড অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান

করিতেন, সেই ঠাকুর নিজ "নিরক্ষরা" জননীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা চিরজীবন করিয়া গিয়াছেন। জননীর প্রতি আকর্ষণ ঠাকুরের জীবনে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

জননীদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া নহবৎখানার একটি প্রকোষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। সময়ে অসময়ে তুচ্ছ কোনও প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া অকস্মাৎ ঠাকুর নহবৎখানায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, জননীর ক্রোড়ের নিকট বসিয়া পুনরায় শিশু হইয়া যাইতেন, তখন ভক্তসম্রাট্ নিজ আধ্যাত্মিক সকল গৌরব বিস্মৃত হইয়া—মানবশিশু হইয়া জননীর স্নেহধারা আনন্দমুগ্ধমনে পান করিতেন। অশেষ প্রকারে ঠাকুর নিজহস্তে জননীর সেবা করিতেন, জননীর পদধূলি লইতে তাঁহার কোন দিন ভুল হইত না। জননীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহার নানাবিধ আচরণ ও কথাবার্ত্তা হইতে উপলব্ধি করা যায়। ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত নিরঞ্জন একবার কিছুদিন পরে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তখন নিরঞ্জন কলিকাতার কোনও আপিসে কর্ম্ম করিতেন। স্বাধীন চিন্তা ও চিত্তবৃত্তির মুর্ত্তিমান আবির্ভাবস্বরূপ শ্রীপরমহংসদেব দাসত্বজীবনকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সে দিন নিরঞ্জনকে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখে দাসত্বের এক কলঙ্কময় আবরণ পরিদৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু নিরঞ্জন নিজ জননীর ভরণ-পোষণের জন্য কর্ম্মচারীর পরাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, নতুবা দাসত্বজীবনের জন্য নিরঞ্জনকে শত ধিক্কার প্রদান করিতেন।—"তুই বুড়ো মার জন্যে চাক্‌রী কর্চ্ছিস্ তাই, নইলে তোর মুখ দেখতাম না!" * জননীর সেবার জন্য তিনি দাসত্বশৃঙ্খলও উপেক্ষা করিতে পারিতেন। জননী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিদর্শন আর কিছুই হইতে পারে না। হাজরা মহাশয় নামে পরিচিত ঠাকুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী জনৈক সংসারবিরাগী সাধক দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রকলত্রাদি অর্থের অনটনে গ্রামে সময় সময় কষ্ট পাইত। ঠাকুর সে সম্বন্ধে বিশেষ দুঃখিত হইলেও সাধারণতঃ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু যে দিন হাজরা মহাশয়ের জননী অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিজ গভীর মনোবেদনা ঠাকুরকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সে দিন শ্রীপরমহংসদেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, হাজরা মহাশয়কে তাঁহার বৃথা সাধনার জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জননীর সহিত সাক্ষাৎ ও অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা না করিয়া সাধনার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে তাঁহাদের জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বলিয়া গিয়াছেন, কেবলমাত্র এক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম তিনি অনুমোদন করিয়াছিলেন। বিশ্বজননীর দর্শনলাভের জন্য মানবী জননীর আদেশলঙ্ঘন শ্রীপরমহংসদেব অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর যখন দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বৈষ্ণবধর্ম্ম-ভাবসমূহ তাঁহার মনের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু জননীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এই সংসার-বন্ধন-বিরাগী সন্ন্যাসী দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। জননীর প্রতি এই আকর্ষণ বাক্যের দ্বারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের অনেক উর্দ্ধের বস্তু।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনেও জননীর প্রতি অসীম ভক্তি আমরা দেখিতে পাই। বাল্যকালে মহাপ্রভু বড়ই দুরন্ত ছিলেন, একবার কুপিত হইলে সহজে তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইত না। ক্রোধবশে বালক নিমাই বস্ত্রসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত এবং তৈল, ঘৃত, লবণসমূহের ভাণ্ডগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিত। সম্মুখে যাহা উপস্থিত হইত, তাহারই উপর নিমাইএর যষ্টিদণ্ড ঘন ঘন সঞ্চালিত হইত, জননী শচীদেবী শঙ্কিতা হইয়া একপার্শ্বে লুক্কায়িত হইতেন; কিন্তু এরূপ ক্রোধোন্মত্ততার সময়েও জননীর সম্বন্ধে বালক নিমাই কখনও আত্মবিস্মৃত হইত না। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বালক মহাপ্রভুর এই ক্রোধাবস্থার এক সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন॥"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর 'চাঁচর চিকুর কেশ' মুণ্ডিত করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শচীদেবী মুণ্ডিত শিরে হস্ত প্রদান করিয়া দুঃখে বিহ্বল হইয়াছিলেন। জননীর এই স্নেহবিহ্বলতা সংসার-বন্ধন-বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসীর চক্ষুতেও জল আনিয়াছিল। এই চিত্র বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"প্রভু ত কান্দিয়া কহে শুন মোর আই
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে।
জানি বা না জানি কৈল যগুপি সন্ন্যাস
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস।
তুমি যাহা কহ আমি তাহাই রহিব
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিব।
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার।"

ইহার বহুবর্ষ পরে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও তিনি প্রিয়শিষ্য পণ্ডিত জগদানন্দকে প্রতি বৎসর নবদ্বীপে পাঠাইয়া জননীর পাদপদ্ম বন্দনা করিতেন।

"নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিয় নমস্কার
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার।"

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরও জননীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীপরমহংসদেবের মাতৃভক্তি ও সন্ন্যাস গ্রহণের পরও মাতৃসেবার মধ্যে অপরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আইনষ্টিনের (Einstein) জীবন-চরিত আলোচনা করিবার সময় কোনও লেখক বলিয়াছেন—

The parents and grand parents of a famous man sometimes give a clue to the origin of his genius, (পিতা-মাতা এবং পিতামহ-পিতামহীদিগের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা অনেক সময় বিখ্যাত মনীষিগণের প্রতিভার মূলসূত্র দেখিতে পাই। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে এই উক্তিটি যত সত্য, মানবের ধর্ম্মজীবনে ইহার সত্যতা আরও সহজে উপলব্ধি করা যায়। মহাপুরুষগণের জীবন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে তিনি কখনও দ্রাক্ষাফল উৎপন্ন করেন নাই। মহৎ আধারেই মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, বিরাট আধারেই বিরাট শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বঙ্গদেশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আতুর ও দরিদ্রের বন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সকলেরই নিকট সুপরিচিত। এই কোমলহৃদয় পুরুষসিংহের বিধবা-বিবাহ সংস্কারের চেষ্টা তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মূলে বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতীদেবীর কোমল অন্তঃকরণের ভিত্তি ছিল, তাহা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। নিজ গ্রামের এক বালবিধবার দুঃখ দেখিয়া এই বর্ষীয়সী বিধবার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর-জননী নিজে নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবা ছিলেন এবং বাঙ্গালাদেশে হিন্দুবিধবা ধর্ম্মের জন্য কি কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন এবং অম্লানবদনে অপরকে সেই ত্যাগের আদর্শ পালন করিতে প্রণোদিত করিতে পারেন, তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণা বিধবার কোমল প্রাণ ব্যবহারিক শাস্ত্রের সমস্ত বন্ধন ও আদেশ অতিক্রম করিয়া রোদন করিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই রোদনের ধারাই এক দিন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের ভিতর দিয়া অপ্রতিহতগতিতে নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালাদেশের সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন সামাজিক প্রথাগুলিকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। জননীর এই কোমল অন্তঃকরণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের পরদুঃখকাতর হৃদয়ের জন্ম হইয়াছিল।

বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন ও বিভিন্ন আদর্শে পরিচালিত গ্রীকবীর আলেকজান্দারের জীবনেও তাঁহার মাতার প্রভাব অতি বিশদভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। পৃথিবী জয় করিবার উদ্দেশে আলেকজান্দার যখন সৈন্য পরিচালিত করিয়া দেশ হইতে দেশ পরিভ্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন বিজয়যাত্রার প্রারম্ভেই তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য

আন্টিপেটার নামে জনৈক কর্ম্মকুশলী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মাতা অত্যন্ত স্বাধীনচরিত্রা এবং অপরিসীম মানসিক-শক্তি-সম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি আন্টিপেটারের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আন্টিপেটার বিরক্ত হইয়া আলেকজান্দারের নিকট পত্র দ্বারা অভিযোগ করিয়াছিলেন। মহাবীর আলেকজান্দার তাঁহার পত্র পাইয়া বলিয়াছিলেন, "আন্টিপেটার জানে না যে, আমার জননীর এক বিন্দু অশ্রু তাহার শত সহস্র পত্রকে ভাসাইয়া দিতে পারে।" আলেকজান্দার নিজ জননীর দোষ বুঝেন নাই, তাহা নহে, কিন্তু জননীর অশ্রুজলের দৃশ্য সহ্য করা দূরের কথা, তাহা কল্পনা করিবার শক্তিও এই গ্রীক বিশ্ববিজয়ীর হৃদয়ে ছিল না। যে শক্তিমদমত্ত গর্ব্বান্ধ পশুশক্তি আলেকজান্দারকে পুষ্পলতা-পরিশোভিত ভারতের শস্যশ্যামলা প্রদেশগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত করে নাই, যে কঠোরহৃদয় মুমূর্ষু ও প্রপীড়িত বিজিত জাতির আর্ত্তনাদে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, সেই হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত স্থানে নারী-হৃদয়-প্রসূত এক বিন্দু কোমলতা সঞ্চিত ছিল, যাহার জন্য জননীর ম্লানমুখ আলেকজান্দার কল্পনা করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন। এই বিজয়-মহোৎসবের তাণ্ডব-নৃত্যের সম্মুখে পড়িয়া পারস্যাধিপতি দেরায়ুস রাজ্যচ্যুত হইয়া পলায়ন করিলে, তাঁহার অপূর্ব্বসুন্দরী কন্যাদ্বয়কে সৈন্যগণ আলেকজান্দারের সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য যুবতী দুইটির শারীরিক সৌন্দর্য্যের অশেষবিধ প্রশংসা করিয়াছিল। এই প্রলোভন-বাক্যের উত্তরে আলেকজান্দার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজ জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে মহাবীর বলিয়াছিলেন—"যদি নারীদ্বয়ের সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয় হয়, তাহা হইলে আমি দেখাইব যে, আমার আত্মসংযম তাহাদের শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা কোনও অংশে কম প্রশংসনীয় নহে।" এই কথা বলিয়া গ্রীক সম্রাট্ কন্যাদ্বয়কে সসম্মানে তাহাদের পিতার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মাতার নারীচরিত্রের কোমল-প্রভাব পুত্রের এই আদর্শ ব্যবহারের মধ্যে কি প্রকাশিত হয় নাই? তিনি কি সেই পিতৃক্রোড়-ভ্রষ্টা অসহায়া নারীদ্বয়ের বিষণ্ণমুখে নিজ জননীর মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইতে দেখেন নাই? ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করা আজ বৃথা; কিন্তু আলেকজান্দারের বিশ্ববিজয় হয় ত এক দিন ইতিহাসের মৃতপত্রখণ্ডের মধ্যে বিস্মৃতির করালকবলে নিহিত হইতে পারে; কিন্তু বিশ্বসম্রাটের অলিপিবদ্ধ অখণ্ড ইতিহাস-প্রবাহে আলেকজান্দারের ইন্দ্রিয়জয়ী বাণীর প্রভাব চিরদিনের জন্য সঞ্জীবিত থাকিবে সন্দেহ নাই। তাই পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাপুরুষগণের জীবনে জননীর প্রভাব অপ্রতিহত ও অনির্ব্বচনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও তাঁহার জননীর প্রভাব

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির

সেইরূপ অপ্রতিহত ও অনির্ব্বচনীয়রূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠাকুরের জীবনে তাঁহার কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শ ভারতে ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। ত্যাগই ভারতের ধর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্র, এবং এই মূলমন্ত্রই বিভিন্ন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিভিন্ন যুগাবতারের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীপরমহংসদেবের এই অপূর্ব্ব কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের আদর্শের বীজ তাঁহার জননীর চরিত্রের ভিতর নিহিত ছিল। শ্রীপরমহংসদেবের

জননীর জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সহজে উপলব্ধি করা যাইবে।

তখন ঠাকুরের জননী দক্ষিণেশ্বরে নহবৎখানার একটি প্রকোষ্ঠে বাস করিতেছিলেন। মথুরানাথ এক দিন নহবৎ-খানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এই মথুরানাথ সাধারণতঃ কৃপণস্বভাব ছিলেন এবং মন্দিরসংক্রান্ত ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত হিসাব ও সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু সুকৃপণ লোকেরও কোনও এক স্থানে দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়, যেখানে ব্যবহারের সময় তাহার প্রকৃতিগত কার্পণ্য-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া তিনি দাতারূপে স্বভাবের প্রতিকূল অজস্র ব্যয় করিয়া নিজ মানবধর্ম্ম চরিতার্থ করিয়া থাকেন। কৃপণ পিতামহকে অনেক সময়ে প্রিয় পৌত্রের বিবাহে অযথা অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়। মথুরানাথেরও এইরূপ মানসিক দুর্ব্বলতা ছিল। জমীদারীর চতুর্দ্দিক্ হইতে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে কঠোর-শাসনে মথুরানাথ অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, কিন্তু শ্রীপরমহংসদেবের সেবায় তাঁহার প্রীতির জন্য অকুণ্ঠহস্তে তাহা ব্যয় করিতে না পারিলে তাঁহার মানসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। সঞ্চয় আমাদের জীবনে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়—যদি তাহা কোনও স্থানে গিয়া আনন্দচিত্তে মুক্ত না করিতে পারি। মানুষের জীবনের এই উভয়প্রান্তস্থিত দুইটি বিপরীত মনোবৃত্তি কবি তাঁহার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার
পারি না বহিতে ;
পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায় ;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।
লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পূরাইবে কবে ?"

কবি ভগবানের সম্বন্ধে ভক্তের মনোবৃত্তি যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, মানবের সম্বন্ধেও সেই ভাব সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। সাধারণ মানুষ তাহার সঞ্চয় মানুষকেই ঢালিয়া দিয়া মুক্ত হয়, ভক্ত তাহার সঞ্চয় ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া ধন্য হয়, ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। মথুরানাথও শ্রীপরমহংসদেবের সেবায় তাঁহার সমস্ত ধনসম্পদ নিয়োজিত করিয়া কৃতার্থ হইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সর্ব্বস্বত্যাগী ঠাকুর মথুরানাথকে সে মুক্তি ও আনন্দ হইতে সততই বঞ্চিত করিতেন। তাই বহু দিনের নিষ্ফলপ্রয়াসে ক্ষুব্ধ হইয়া মথুরানাথ এক দিন ঠাকুরের জননীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অনেক মিষ্ট আলাপনের পর মথুরানাথ ধীরে ধীরে নিজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। "ঠাকুমা" বহুদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াও মথুরানাথের হস্ত হইতে কোনও সেবা গ্রহণ করেন নাই, আজ মথুরানাথ "ঠাকুমা"র সমস্ত পার্থিব অভাব পূরণ করিয়া নিজ জীবন চরিতার্থ করিবেন। "ঠাকুমা" কিন্তু তাঁহার কোনও অভাবই খুঁজিয়া পাইলেন না। এ যেন যুগযুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত মৈত্রেয়ীর অমর বাণী—

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্।

(যাহার দ্বারা আমি অমর হইব না, সে দান গ্রহণ করিয়া আমার কি লাভ হইবে ?)

মথুরানাথ আজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছেন, পুরুষসিংহ পুত্রের নিকট যে বাসনা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, কোমলহৃদয়া, সরলান্তঃকরণা জননীর নিকট সে বাসনা পূর্ণ হইবে, এ আশা মথুরানাথের হৃদয়ে তখন বলবতী। বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া মথুরানাথের "ঠাকুমা" বিব্রত হইয়া নিজ মুখে দিবার জন্য চারি পয়সার "গুল্" প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুরের জননীর এই একমুষ্টি ভস্মরাশির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বিভবশালী জমীদারের চক্ষুতে জল আসিল। এই তুচ্ছ প্রার্থনার মধ্যে কি গভীর ত্যাগ ও লোভহীনতার আদর্শ নিহিত ছিল, এই জননী নিজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই ত্যাগের মধ্যে বিচারশক্তি-জনিত দম্ভ ও অহঙ্কার ছিল না, অথবা তাঁহার যুগাবতার পুত্রের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের দৃঢ়সঙ্কল্প-প্রসূত আত্মপ্রকাশও ইহার মধ্যে ছিল না। কিন্তু সর্ষপপ্রমাণ বীজের ভিতর

যেমন বিশালকায় বনস্পতি লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ জননীর এই সহজ ও সরলভাবে প্রকাশিত ত্যাগ ও লোভহীনতার মধ্যেই শ্রীপরমহংসদেবের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের মহৎ আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল। জননীর চরিত্রের বিশিষ্টতা পুত্রের চরিত্রে অজ্ঞাতভাবে সংক্রমিত হইয়া থাকে, আমরা অনেক সময়ে তাহা লক্ষ্য করি না বলিয়া মূলকে বিস্মৃত হইয়া বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি।
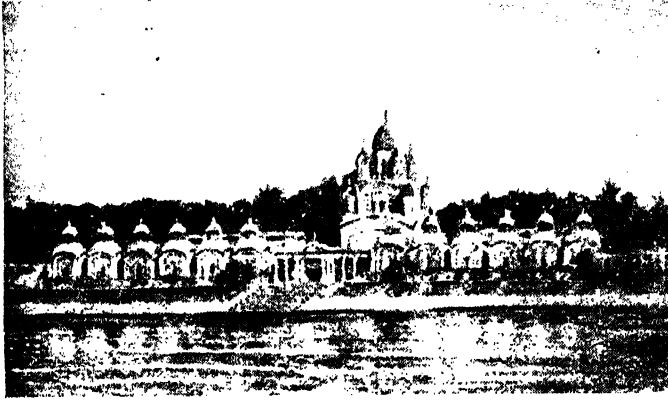
গঙ্গাবক্ষ হইতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দৃশ্য

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের এক জন কৃতী সন্তানের কথা আমাদের মনে পড়ে। এই রত্নপ্রসূ বঙ্গদেশের আর এক জন "অশিক্ষিতা" জননীর চরিত্রের জ্যোতিঃ তাঁহার পুত্রের জীবনে কি অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ব্রাহ্ম ভক্ত ও কর্ম্মবীর আনন্দ-মোহন বসুর নাম শিক্ষিত-সমাজে আজ সুপরিচিত। আনন্দমোহনের জননী বঙ্গদেশের সাধারণ "অশিক্ষিতা" রমণীদের মধ্যে এক জন মাত্র। এই নিষ্ঠাবতী হিন্দু-বিধবা অশেষ যত্নসহকারে নিজ পুত্রগণকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি পাল্কীতে আরোহণ করিয়া কোনও এক স্থানে গমন করিতেছিলেন। পথে এক মুসলমান পীরের সমাধির নিকট নিজ পাল্কী থামাইয়া আনন্দমোহনের জননী তথায় অবতরণ করেন এবং সেই পীরের নিকট অবনতমস্তকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিজ গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করেন। নিষ্ঠাবতী হিন্দু-বিধবাকে মুসলমান পীরের সমাধির নিকট এই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে দেখিয়া উপস্থিত কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে, আনন্দ-মোহনের জননী বলিয়াছিলেন,—

"ভক্তদের আবার জাত কি, তাঁরা সবাই এক জাত!"

শ্রীপরমহংসদেবের উক্তির সহিত এই উদার উক্তির কি বিস্ময়জনক সামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিতে পাইব। কিন্তু যে ধর্ম্ম ভারতবর্ষে মেঘমন্দ্র-স্বরে নূতন করিয়া ঘোষিত করিয়াছিল—

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাইক জাত-বিচার।

সেই ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আনন্দমোহনের জীবনের মূলসূত্র তাঁহার মহীয়সী জননীর ভক্তদিগের জাতিবিচার সম্বন্ধে অপূর্ব্ব বিশ্বাসের মধ্যেই আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।

যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন"—কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা ও বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইয়াছিলেন, সেই যুগপ্রবর্ত্তক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন উপলব্ধি করিতে হইলে তদীয় জননী-দেবীকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।
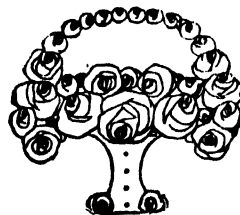
জয়ন্তীর জীবন-যজ্ঞ

১

"কথা কইতে কইতে মুখ ফেরালে কেন?"

"যে দুর্গন্ধ তোমার মুখে! মা গো—বমি আসে! ওয়াক্" বলিয়া জয়ন্তী মুখ ফিরাইয়া বিছানার এক ধারে গিয়া শুইল। স্বামী জীবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার হাত ধরিয়া টান দিয়া বলিল—"একরত্তি মেয়ের বড় যে আস্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি! স'রে এসো এ দিকে।"

"ছেড়ে দাও আমার হাত! খবর্দ্দার, আমার গায়ে হাত দিও না বল্‌ছি।" বলিয়া জয়ন্তী হাতের এক ঝটকানি দিয়া আগাপাশতলা পরিধেয় শাড়ীখানি মুড়ি দিল এবং সেই ভাবেই শুইয়া রহিল।

গতিক সুবিধার নয় বুঝিয়া জীবন রাগের মাত্রা কমাইয়া শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কি দুর্গন্ধ আমার মুখে—যার জন্য তোমার বমি আসে?"

"দুর্গন্ধ নয়?" বলিয়া জয়ন্তী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—"তামাক খেলে কি বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোয়,—যে তামাক খায়,—নিজে এক দিন তামাক না খেয়ে তার মুখ শুঁকে দেখো।"

"তা ব'লে এমন দুর্গন্ধ নয়—যাতে মানুষের বমি আস্‌তে পারে!"

"হ্যাঁ, আসে! আমার আসে।"

"যাক্—আর কখনো তামাক খাব না। আজ থেকে তামাক খাওয়া ছেড়েই দিলুম।"

ব্যস—সব গণ্ডগোল মিটিয়া গেল—জীবনচন্দ্রের এই কথা কয়টিতে জয়ন্তী আর সে জয়ন্তী নয়! তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আল্‌মারি হইতে এক শিশি এসেন্স বাহির করিয়া জীবনকে অতি যত্নে মাখাইয়া দিল এবং পাণের ডিবা হইতে গোটাকতক সাজা পাণ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে এলাইচগুলি বাছিয়া লইয়া স্বামীকে একটি পাণের সহিত খাওয়াইয়া সুবোধ মেয়েটির মত স্বামীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—"নাঃ। আর গন্ধ নেই।"

"দাম্পত্য-কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" কথাটি যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি যদি সে সময় এই নব-দম্পতীর কলহাবসানে লঘুক্রিয়ার পরিবর্ত্তে "প্রেমক্রীড়ার" আতিশয্য দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় লিখিতেন—"দাম্পত্যকলহস্যান্তে বর্দ্ধতে প্রণয়-প্রীতিঃ!" অনেকক্ষণ আদর, সোহাগ, ভালবাসা, প্রণয়-বিশ্রম্ভালাপের পর জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল,—"তামাক খেয়ে কি সুখ পাও?"

জীবন ভয় পাইল। ভাবিল, আবার বুঝি কেঁচে গণ্ডুষ হয়। তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "না—সুখ আর কি পাই? ভারি ত জিনিষ—! তাও আবার কত লুকিয়ে চুরিয়ে খেতে হয়!"

"ভারি তো জিনিষ—তাও আবার লুকিয়ে চুরিয়ে খেতে হয় যদি, এমন খাওয়া খাও কেন?"

"কেন খাই—তা জানি না। সবাই খায়, আমিও খাই!"

"সবাই খায় বলো না। আমার বাপের বাড়ীতে আমার বাবা—কাকা—আমার দাদারা,—আমার দাদামশাই,—কেউ খায় না।"

জীবন কোন উত্তর দিল না।

খানিকক্ষণ পরে জয়ন্তী বলিল—"নিতান্ত যদি খাবার ইচ্ছে হয়, —সত্যি বল্‌ছি,—তামাক খেলে যদি তোমার বেশ আনন্দ হয়—"

জীবন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না, না, আর আমি তামাকের ধার দিয়ে যাব না।"

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "মিছে কথা বলো না। আমার মন রাখতে বল্‌ছ—আর খাবে না! সত্যি বল্‌ছি,—ইচ্ছে হয় খেও, আমি কিছু রাগ করবো না, তোমায় আমি তার জন্যে কোনো কথা বল্‌বো না!"

"কি মুস্কিল,—আমি যদি তামাক খাওয়া ছেড়ে দিই আজ থেকে,—তাতে তোমার আপত্তি কেন?"

জয়ন্তী বলিল—"আপত্তি কেন হবে আমার? না খাও,—এ বদ্-অভ্যেস নিজের ইচ্ছেয় যদি ছেড়ে দিতে পারো, সে ত খুবই ভাল, বিশেষতঃ তোমার পক্ষে। কিন্তু আমি যে আজ হঠাৎ এর জন্যে রাগ ক'রে তোমাকে কড়া কথা বলেছি, তাতে আমার—"

জয়ন্তী আর বলিতে পারিল না। জীবন দেখিল, জয়ন্তীর চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল! আদর করিয়া পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সযত্নে তাহার চক্ষুর জল মুছিয়া দিয়া বলিল, "ছিঃ, তুমি এত ছেলেমানুষ? একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কান্নাকাটি লাগিয়ে দিলে!"

ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে জয়ন্তী বলিল—"হঠাৎ একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তোমাকে কড়া কথা ব'লে তোমার মনে দুঃখ দিয়ে কি অন্যায় করলুম আমি—"

জয়ন্তীর সে দুঃখ অপনোদন করিতে জীবনের প্রায় সমস্ত রাত্রিটা কাটিয়া গেল। তরুণ বয়স—নব-দম্পতীর অভিমান, রাত্রি-জাগরণ এ যেন সুখস্বপ্ন!

২

"ও মা—ছি-ছি—হ্যাঁলা জয়ী—জামাই এমন অধঃপাতে গেছে—তুই কিছু বল্‌তে পারিস্ না?"

জয়ন্তীর খুড়ীমা বড় দুঃখে জয়ন্তীকে প্রাণ-জুড়ানো মধুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবনের বিবাহের পর বছর চার পাঁচ অতিবাহিত হইয়া গেছে। জীবন সম্বন্ধে জয়ন্তীকে শুনাইয়া শুনাইয়া তাহার বাপের বাড়ীতে খুড়ীমা জ্যাঠাইমা খুড়তুতো জাঠতুতো, পিস্‌তুতো বোনেরা, এমন কি, নিজের সহোদরেরা পর্য্যন্ত অনেক কথা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, জয়ন্তী তাহাতে কর্ণপাত করিত না। ধরিয়া-পড়িয়া কেহ জোর করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে জয়ন্তী গম্ভীরভাবে উত্তর দিত—"সব বাজে কথা!" কাহাকে বলিত—"কই, আমি ত কিছু কখনও শুনিনি—কিছু দেখিনি বা জানি না!" এবার তার মেজ খুড়ীমা নিজের সচ্চরিত্র পুত্রের মুখে নাকি শুনিয়াছেন,—সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কলিকাতার এক দঙ্গল 'মেয়ে-মানুষ' লইয়া জীবন ষ্টীমারে চড়িয়া 'দ্বাদশ গোপাল' করিতে শ্রীরামপুরের ঘাটে গিয়াছিল।

জয়ন্তী একটু রুক্ষ স্বরে উত্তর দিল—"লোকে অমন লোকের নামে মিছি মিছি কত বদ্‌নামই দিয়ে থাকে, সব কথায় কাণ দিলে কি চলে খুড়ীমা?"

"মিছে কথা কি গো! হেবো যে স্বচক্ষে দেখে এসেছে! ডেকে জিজ্ঞাসা কর্ না" বলিয়া খুড়ীমা পুত্র হরিধনকে ডাকিতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

"থাক্—এ সব নোংরা কথার ভজাভজির দরকার নেই খুড়ীমা! যে অধঃপাতে গেছে—সে গেছে,—তাবু দা ত যায়নি—" বলিয়া জয়ন্তী সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

কলিকাতা সহর—প্রলোভন চারি দিকে। পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে, হাটে-মাঠে কোথাও নিষ্কৃতি নাই। বুঝিবার একটু ভুলে মনের রাশ একটু আল্‌গা দিলে হয় ত সারা জীবনটায় এমন উলট-পালট ঘটিয়া যায় যে, সামলানো দায় হয়। নিজের যায়গায় মানুষ ফিরিতে পারে না—ভিড়ে মিশিয়া কত দূরে কোথায় চলিয়া যায়! জীবনচন্দ্রের ঠিক তাই ঘটিয়াছে।

যত দিন জীবন বি, এ পাশ করে নাই, দাদা উমাশঙ্কর বাবু তত দিন বেশ কড়া শাসনে রাখিয়াছিলেন। বি, এ পাশের পর কনিষ্ঠ ভাইটিকে তিনি এমন "এলাকাড়ী" দিলেন যে, জীবন তাহার জীবনযাত্রার ঠিক পথটি বাছিয়া লইতে পারিল না। বছর কয়েক উপর্যুপরি আইন "ফেল্" করিয়া—অবশেষে হতাশ হইয়া জীবন এক সওদাগরী অফিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরীতে ঢুকিল।

প্রত্যহ রাত্রি করিয়া বাড়ী আসায়—কিম্বা লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া জয়ন্তী প্রথম প্রথম স্বামীর সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করিত। দু'জনে খুব বাগ্-যুদ্ধ চলিত,—কেহই হটিবার পাত্র নহে। জীবন রাগ করিয়া শয়নঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বৈঠকখানায় শুইয়া নিশাযাপন করিত। জয়ন্তীও স্বামী রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে দুম্ করিয়া দরজায় খিল দিয়া মেঝেতে শুইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিত। দু'পাঁচ দিন পরে আবার স্বামি-স্ত্রীর ভাব হইত,—আমে-দুধে মিশিয়া যাইত, নিন্দা-কলহ-কুৎসারূপ আঁঠিটি আঁস্তাকুড়ে স্থান লাভ করিত।

যাহা হউক,—বাপের বাড়ীতে—শ্বশুরবাড়ীতে যার-তার মুখে এত দিন স্বামীর নিন্দা-কুৎসা শুনিয়াও জয়ন্তী এক দিনের জন্য তিলমাত্র বিচলিত হয় নাই, কিন্তু যে দিন জীবনচন্দ্র গভীর রাত্রিতে দস্তুরমত মাতাল হইয়া ঘরে আসিয়া মেঝেতেই অজ্ঞান হইয়া শুইয়া পড়িল, সেই দিন জয়ন্তী বুঝিল, তাহার জীবনের সমস্ত সুখ—আশা-ভরসা জন্মের মত লোপ পাইল। সে দিন জয়ন্তী একবারও শয্যায় অঙ্গ রাখে নাই,—অচৈতন্য স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া অতিবাহিত করিয়াছে। তাহার পর প্রায় এক পক্ষকাল স্বামীর সহিত সে বাক্যালাপ করে নাই। জীবনও ঘৃণায়—লজ্জায়—আত্মগ্লানিতে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিয়া-পুড়িয়া স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে সাহস করে নাই। মনের ভিতর যাহাই থাকুক,—জয়ন্তী সংসারের কায করে, ছেলে-পুলেদের খাওয়ায়-পরায়,—জীবন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে খুব গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, কিন্তু নিজে উপযাচিকা হইয়া স্বামীকে কোন কথা বলে না বা জিজ্ঞাসা করে না।

জীবন এ সংসারে—যাহাকে বলে জ্ঞান-পাপী। নিজে অন্যায় করিতেছে—পদে পদে বুঝিতে পারে,—মনে মনে ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করে,—জয়ন্তীর প্রাণে আর সে কখনো ব্যথা দিবে না! কিন্তু এমনই দুর্ব্বলচিত্ত, কিছুতে আপনাকে সংযত রাখিতে পারে না। সংসর্গে পড়িয়া, হাত-পা এলাইয়া দিয়া, স্রোতে তৃণপ্রায় আপনাকে স্বচ্ছন্দে ভাসাইয়া দেয়। জয়ন্তী মনে মনে অনেক বিচার করিয়া বুঝিল—সিন্ধু এখন পর্ব্বতগুহ ছাড়িয়া আপন বেগ-ভরে সাগরোদ্দেশে চলিতেছে,—বাধা দেওয়া বিড়ম্বনামাত্র। সে প্রবল বেগে ঐরাবত শুদ্ধ ভাসিয়া যাইবে, আমি ক্ষুদ্র তৃণ, আমার সাধ্য কি, শক্তি কি, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখি! স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিন চক্ষুর উপর বাড়িতেছে দেখিয়াও জয়ন্তী কোন কথা কহিত না। রাগ-অভিমান করা দূরে থাক্, ভুলেও কখনও জীবনচন্দ্রকে বলিত না যে, এমন কায করিও না বা এ সব কায অত্যন্ত গর্হিত। জীবন ইহাতে আরও জো পাইয়া গেল। আগে বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া বাহিরে কোথাও গিয়া মদ্য পান করিয়া আসিত। জয়ন্তীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে, অর্থাৎ যখন দেখিল, এই মদ্যপান বা অন্যত্র নিশাযাপন ব্যাপারে পূর্ব্বের মত পত্নীর নিকট আর তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হয় না, অথবা এ সবের জন্য জীবনকে জয়ন্তী কোন কথা বলা দূরে থাকুক, পূর্ব্বের মত আদর-যত্নের এতটুকু ত্রুটি করে না, তখন সেই "পাশ-করা" পশু-মূর্খ যুবক নিঃসঙ্কোচে শয়নকক্ষে বসিয়াই পত্নীর চোখের সম্মুখে অবাধে পানকার্য্য চালাইতে সুরু করিল।

৩

জয়ন্তী মেয়েটি বড় ভাল। সংসারের কাযে-কর্ম্মে, লেখা-পড়ায়, রন্ধনবিদ্যায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে যথার্থ এই মুখুয্যে-পরিবারে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না বলিলেই হয়। বাড়ীতে কাহারও কোনরূপ শক্ত পীড়া হইলে, রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতে নতুন-বৌ সবার আগে ছুটিবে। এ-বিষয়ে সে কাহারো মানা শুনিবে না। এক মহা দোষ বলুন আর গুণই বলুন, জয়ন্তী স্বভাবতঃ একটু গম্ভীরপ্রকৃতি। গান-বাজনা, রঙ্গ-রহস্য, বাচালতা, সমবয়সীদের সঙ্গে বসিয়া গল্প-গুজব বা তাস খেলা, সে মোটে পছন্দ করিত না। সংসারে যে সকল গুণ থাকিলে লোকের প্রিয় হইতে পারা যায়, এবং লোকে তাহার সংসর্গের জন্য লালায়িত হয়, সে পুরুষ হোক্ বা স্ত্রীলোক হোক্, সে সমস্ত গুণের অভাব হইলে, স্বভাবতই সকলে তাহাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে, কোন কারণ না থাকিলেও, আড়ালে তাহার নিন্দা-কুৎসা করিয়া থাকে। "ঠ্যাকারে", "অহঙ্কেরে", "দেমাকে"—জয়ন্তীর এই ছিল অহেতুকী নামের বিশেষণ,—বিশেষতঃ শ্বশুরবাড়ীতে। কি জানি কে তাহাকে শিখাইয়াছিল, সংসারে নারীজন্ম ধারণ করিয়া, গৃহস্থঘরের কুলবধূ হইয়া যেটুকু কর্ত্তব্য, সেইটুকু সে করিয়া যাইবে।

সকলে বলিত—"জয়ন্তী ভারি চাপা মেয়ে, ম'রে গেলেও পেটের কথা ভাঙ্গে না!" বাঙ্গালীর মেয়ের ইহা অপেক্ষা দুর্নাম এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সংসারে এক জন ছিলেন, যাঁহার কাছে জয়ন্তী নিজের সমস্ত সুখ-দুঃখের কথা অকপটে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি তাহার বড়

দিদি—অশোকা। স্নেহময়ী অশোকা তাঁহার এই ছোট বোন্‌টিকে যথার্থ কন্যার অধিক ভালবাসিতেন। বড় বোন্ ছোট বোন্‌কে ভালবাসে, সংসারে এটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু অশোকার এই সোদরাপ্রীতিতে যথার্থ একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা সকলে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিত। জয়ন্তীর মাতার মৃত্যুর পর এই বড় দিদিটি যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে কোন্ কালে সংসারের দুঃখ-বেদনার চাপে পেসিত—লুপ্ত হইতে হইত।

অশোকার শ্বশুরালয় বাগ্‌বাজারে কোনও এক ধনবানের গৃহ। উমাশঙ্কর বাবুর বাটী হইতে বেশী দূরে নয়, প্রায় বিশ মিনিটের পথ। এক দিন দু'দিন অন্তর লোক পাঠাইয়া ছোট বোনের তত্ত্ব লওয়া, মাসের মধ্যে দশ দিন তাহাকে গাড়ী পাঠাইয়া নিজ শ্বশুরালয়ে আনা, কোনো কিছু আহার্য্য সখ করিয়া নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া বামুন-ঠাকুরকে দিয়া তৎক্ষণাৎ জয়ন্তীকে পাঠানো, বোনের একটু মাথা ধরার খবর পাইলে ছুটিয়া তাহাকে দেখিতে আসা,—ইহাই ছিল অশোকার ভগিনী-প্রীতির কতকগুলি প্রত্যক্ষ নিদর্শন। সুতরাং জয়ন্তী বুঝিত, এ সংসারে নিঃস্বার্থভাবে যদি তাহাকে কেহ ভালবাসে, সে ঐ দিদি! দিদি ছাড়া আর কেহ নহে, এমন কি তাহার স্বামী জীবনচন্দ্রও নয়। এইরূপই জয়ন্তীর ধারণা। কথাপ্রসঙ্গে দিদি বলিলেন—

"এ রকম ব'য়ে যাচ্ছে, কিছু বলবিনে?"

জয়ন্তী হাসিয়া উত্তর করিল—"ব'লে তো কোনো ফল নেই! মিছি মিছি মুখ নষ্ট ক'রে কি হবে?"

"তা ব'লে ঘরের ভেতর ব'সে ব'সে মদ খাবে স্ত্রীর সামনে?"

"কি করবো বল্! কি উপায় আছে, দিদি?"

ক্রোধে অশোকার সর্ব্বশরীর যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"উপায় কি? গলা টিপে ঘর থেকে বার ক'রে দিবি! গেলাস বোতল দূর ক'রে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে থাকবি। তুই হাবা, তাই ওকে ভয় করিস।"

জয়ন্তী দিদির কথায় কোনও উত্তর দিল না। একটু হাসি তাহার ঠোঁটের অগ্রভাগে নিমেষে দেখা দিয়া তখনই মিলাইয়া গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে যেন কে কালি মাড়িয়া দিল।

৪

"চাকরিতে কি আর দুঃখ ঘোচে? হুঁ—বড় জোর এক শো না হয় দেড় শো, খুব বরাত খুললো তো দুশো! ব্যস্, এর বেশী কেরাণীগিরিতে আর কি হবে?"

জীবনচন্দ্র জয়ন্তীকে প্রায় এই রকম কথা শুনাইত। জয়ন্তী শুনিয়া যাইত, এ বিষয়ে স্বামীর সহিত কখনও কোনও আলোচনা করিত না। জীবন নিত্য বলিত, সে ব্যবসায় করিবে। তাই কথা-প্রসঙ্গে জীবনকে সে এক দিন বলিয়াছিল,—"কখনো তোমাকে কোনো অনুরোধ করিনি, অনুরোধ করবো না। কেবল আমার একটি কথা রেখো, ব্যবসা ক'রে বড়লোক হবার আশায়, কিম্বা কোনো বন্ধুর পরামর্শে অফিসের চাকরিটি কখনো ছেড়ো না!"

জয়ন্তী কিন্তু মনে মনে জানিত, স্বামীকে এ অনুরোধ বৃথা। আবশ্যক হইলে,—নিজে ভাল বুঝিলে,—বন্ধুদের পরামর্শে এক দিন এক কথায় জীবনচন্দ্র অফিসের চাকুরীটি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ঢুকিবে। তখন কোথায় রহিবে তাহার স্ত্রীর অনুরোধ—কোথায় রহিবে তাহার এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে প্রতিশ্রুতি! জীবনচন্দ্রের ব্যবসা করিবার বিষম ঝোঁক দেখিয়া জয়ন্তী বলিল, "ব্যবসা করবো ব্যবসা করবো ব'লে যে ক্ষেপে উঠেছ, ব্যবসার তুমি কি বোঝ?"

জীবনচন্দ্র স্ত্রীর কথায় খুব উত্তেজিত হইয়া গলা ছাড়িয়া উত্তর করিল—"আমি ব্যবসার কিছু বুঝি না?"

"না। কিছু বোঝো না। ছেলেবেলা থেকে বই মুখস্থ ক'রে গোটা দুই তিন পাশ করেছ। শেখবার মধ্যে শিখেছ যত বয়াটের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে,—বাড়ী বাড়ী গান-বাজনা ফষ্টি-নষ্টি ক'রে বেড়াতে, আর—"

জীবনচন্দ্র বুঝিল—জয়ন্তীর বাকী কথাটা পৌঁছিবে কতদূর! স্ত্রীকে সে বিশেষ রকম চিনিত; সুতরাং আলোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িল।

জীবনচন্দ্র চাকুরীটি দয়া করিয়া ছাড়িল না বটে, কিন্তু ব্যবসা করিয়া বড়লোক হইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিল। প্রথমতঃ হাণ্ডনোটে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া জীবনচন্দ্র কোম্পানী কাগজের কেনা-বেচা শুরু করিল। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিয়াই হউক্ অথবা খুব বেশী লাভ করিবার প্রত্যাশা না করার দরুণই হউক্,—মাস পাঁচ ছয়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহার প্রায় হাজার টাকা লাভ হইল। তখন জীবনচন্দ্রকে পায় কে? জীবনচন্দ্র শেয়ার মার্কেটে গা ঢালিয়া দিল।

শেয়ারের কায করিয়া জীবনের ব্যবসার সখ মিটিল না। একজন পাকা ব্যবসায়ী বন্ধুর সহিত বখরায় জীবন এক লোহা-লক্কড়ের কারবার ফাঁদিয়া বসিল। প্রথম প্রথম লাভ মন্দ হয় নাই। কিন্তু নিজে তো আর অফিসের চাকুরী ছাড়িয়া দোকানে বসিয়া সকল দিকে তদারক করিতে পারে না। বছরখানেক না যাইতে কারবারে ভীষণ লোকসান শুরু হইল। বখরাদারের পরামর্শে এবং লোভের আশায় আশায় হঠাৎ কারবার বন্ধ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু বাজার ক্রমশঃ পড়িয়া যাওয়াতে এবং নির্দ্ধারিত সময়মত ব্যাপারীদের টাকা দিবার ভাবনায় জীবনচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সময় এবং সুযোগ বুঝিয়া অংশীদার বন্ধুটিও আপন পাওনাগণ্ডা বুঝিয়া লইয়া সরিয়া পড়িল। দেনার দায় জীবনচন্দ্রের ঘাড়ে রহিল!

উমাশঙ্কর বাবু জানিতেন না, জীবনচন্দ্র এত সব কাণ্ড-কারখানা করিয়াছে। জানিবার সম্ভাবনাই বা কি! এবং তাঁহাকে এ বিষয় জানাইবার কাহার প্রয়োজন—কাহার মাথাব্যথা? কাণাঘুসা শুনিয়া যদি বা জীবনকে কখনও তিনি এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন,—জীবন অম্লান বদনে তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিত। উমাশঙ্কর বাবুর অন্যান্য ভায়েরা চাকরী-বাকরী করিয়া উপার্জ্জন করে—কিন্তু সংসার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ ভার তাঁহারই উপর। শ্রদ্ধায় যদি কেহ কোন মাসে দাদার হাতে কিছু দিত, তিনি গ্রহণ করিতেন,—কিন্তু কেহ কিছু না দিলে তিনি কোন কথা বলিতেন না। জীবনচন্দ্র চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া প্রথম মাসের বেতন ঘরে আনিতেই জয়ন্তী তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিল—"তুমি যদি সংসারের খরচের জন্য টাকা না দাও, তা হ'লে আমি এ বাড়ীতে জলস্পর্শ করব না। পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেছ, রোজগার কচ্ছ, অতিথিশালার ভাত খেতে লজ্জা হবে না?"

জীবন দশটি মাত্র টাকা নিজের খরচের জন্য রাখিয়া সমস্ত টাকা জ্যেষ্ঠের হাতে দিত। তারপর যেমন অফিসে বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে, সেই হারে সে সংসারকে বরাবর সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং জীবনচন্দ্রকে উমাশঙ্করবাবুর বলিবার কিছু ছিল না।

৩

জয়ন্তীর শ্বশুরবাড়ীতে অশোকা একদিন দ্বিপ্রহরে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বহুদিন বড় দিদির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই;—দিদি নিমন্ত্রণ করিয়া গাড়ী পাঠাইলেও বোন্ যায় না। আজ ছেলের অসুখ, কাল নিজের অসুখ, সংসারের কায বেড়েছে, এই রকম একটা না একটা অজুহাতে জয়ন্তী অশোকার শ্বশুর-বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। এখন ছেলেমেয়ে বড় হইয়াছে, অবশ্য এ সময় বাপের বাড়ীতে গিয়া দু'মাস থাকা চলে না! কিন্তু দিদির বাড়ীতে এক বেলা বেড়াইতে যাইবার সময় হয় না! স্বামী নবীনচন্দ্রের মুখে বড় দিদি ব্যাপারটা সমস্তই শুনিয়াছেন। সে দিন জয়ন্তীর শ্বশুর বাড়ীতে নিভৃতে দুই ভগিনীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

অশোকা বলিলেন—"বুদ্ধিশুদ্ধি তোর কবে আর হবে শুনি! কি ছাই-পাঁশ ব্যবসা কর্ত্তে গিয়েছিল শুনি, যে তোর এমন হাড়ীর হাল করলে?"

জয়ন্তী হাসিয়া উত্তর করিল—"কি জানি, দিদি? আমি জিজ্ঞাসাও করি নি,—আমাকে কোনো কথা কখনো যেচে এসে বলেও নি।"

"চুলোয় যাক্! যে ব্যবসা-বাণিজ্যই করুক্—আমারও তা জানবার দরকার নেই! কিন্তু তুই সর্ব্বস্ব ধ'রে দিলি কোন্ আক্কেলে শুনি?"

জয়ন্তী এ কথার কোনো জবাব দিল না। অশোকা জয়ন্তীকে ঈষৎ একটি ধাক্কা দিয়া খুব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"কথার জবাব দিচ্ছিস্ নে যে?"

সেই রকম শুষ্ক হাসি হাসিয়া জয়ন্তী বলিল, "জবাব আর কি দেবো বল্! দিন-রাত্তির মুখটি শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াতো, রাত্রে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করতো,—চেহারাটা একবার দেখিস্ নি কি,—অমন ফরসা রং,—কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে!"

"তাই দেখেই একেবারে গলে গেলি! মরণ তোমার! ও সব বদ্‌মায়েসি ঢং! ব্যবসা করেছেন না চুলোর পাঁশ করেছেন! বোতোল বোতোল ব্রাণ্ডি খেয়েছেন, ইয়ার নিয়ে—মেয়েমানুষ নিয়ে বাগান করেছেন—ফূর্ত্তি ক'রে দুহাতে টাকাগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন,—তাতেই দেনা হয়েছে! আর এমন বোকা পোড়ারমুখী মেয়ে তুই,—স্বামীর দুদিন শুক্‌নো মুখ দেখে একবার স্বর সইলো না,—ধ'রে দিলি নিজের যথাসর্ব্বস্ব? দূর দূর,—কি তোর বুদ্ধি!"

জয়ন্তী গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অশোকা অনেকক্ষণ ভগিনীর মুখপানে নীরবে চাহিয়া রহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নগদ টাকাগুলো—সাত সাত হাজার টাকা,—একটা ছোটো খাটো বাড়ী কিনতে পারতিস্ কলকাতার সহরে! আচ্ছা—টাকাগুলো না হয় দিয়েছিলি! কিন্তু ঐ আট দশ হাজার টাকার গয়না, ওগুলো কোন্ আক্কেলে সব বের ক'রে দিলি? আর সে হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া বদ্‌মায়েস্ ছোঁড়া—নিলেই বা কোন্ আক্কেলে? কত টাকায় বেচলে? শুনেছিস্—না, তাও পোড়ার মুখ ফুটে জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে পারিস্ নি!"

"শুনেছি—ব্যাচেনি, সেগুলো বাঁধা আছে। কত টাকা—কি বৃত্তান্ত,—অত শত জানি না,—জিজ্ঞাসাও করিনি।"

"তুই দিলি কেন? তোকে আজ আমি মেরে ফেলবো। তুই তখন গয়নাগুলো দিলি কোন্ আক্কেলে? বিক্রী যদি না ক'রে থাকে, সে যখন বাঁধা পড়েছে,—আর কি এ জন্মে তা ফিরে পাবি?" বলিয়া অশোকা ছোট মেয়েটির মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। দিদির কান্না দেখিয়া জয়ন্তীর বুকখানা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইলেও সে নিজের অশ্রু কোনমতে গোপন করিয়া ছেলেবেলার সেই সরল হাসি হাসিয়া দিদিকে বলিল, "শুধু শুধু কাঁদিস্ কেন?" বলিয়া নিজের আঁচলে দিদির চোখ মুছিয়া দিয়া সাদরে দিদির গলাটি জড়াইয়া ধরিল।

জয়ন্তীকে ঠেলিয়া দিয়া নিজের আঁচলে চোখ মুছিয়া অশোকা বলিলেন, "আমায় রাগাস্‌নি, জয়ন্তী,—তোকে দেখে একে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর রঙ্গরস ক'রে আমার মেজাজ আরও বিগ্‌ড়ে দিস্‌নে!"

স্বামীর জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জয়ন্তীর প্রাণে যে তিলমাত্র দুঃখ বা বেদনা আছে,—তাহার কথাবার্ত্তায় বড় দিদিটিকে সে কিছুতেই তাহা বুঝিতে দিতে চায় না। কিন্তু অশোকা কিছুতে ভুলিতে চায় না! কেবল জয়ন্তীকে বলে—"কি আক্কেল—কিসের জন্যে—কেন তুই এমন ক'রে নিজের যথাসর্ব্বস্ব খোয়ালি? একবার নিজের কথাটা ভাবলি নে, জয়ী?"

জয়ন্তী বলিল—"ভাবিস্ নে, দিদি! সেকালে রাজা-রাজড়ারা সব কত বড় বড় যজ্ঞ করেছিলেন,—এই ধর্ অশ্বমেধ,—নরমেধ—আরও সব কি কি মেধ আছে না? আমিও কলিকালে ঐ রকম একটা যজ্ঞ করেছি! এটা হ'ল আমার জীবন-যজ্ঞ!" বলিতে বলিতে জয়ন্তী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল।

অশোকা জয়ন্তীর মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না,—বাধাও দিলেন না। জয়ন্তী বলিতে লাগিল, "সত্যই আমি জীবন-যজ্ঞ কচ্ছি, দিদি! তুই তো জানিস্,—ছেলেবেলা থেকে বিয়ে হবার আগে পর্য্যন্ত বরাবর আশা করেছিলুম, আমার স্বামী সুচরিত্র হবে, বিদ্বান্ হবে,—বুদ্ধিমান্ হবে, দশ জনের মুখে তাঁর সুখ্যাতি শুনবো, আমার শ্বশুর-বংশের—বাপের বংশের মুখোজ্জ্বল হবে,—এমনি কত কি সব আকাশ-কুসুম কল্পনা করেছিলুম! কিন্তু দেখলি তো দিদি,—কপাল-গুণে সব কেমন 'উলটা বুঝলি রাম' হ'য়ে গেল!"

গভীর নিস্তব্ধতা কক্ষমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। দুটি বোনের কাহারও মুখে কথা নাই। দু'জনেই ঘরের বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। অশোকা ভাবিয়াছিল, জয়ন্তীর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে এবং সেই সঙ্গে ভগিনীপতিকে খুব তিরস্কার করিবেন। কিন্তু জয়ন্তীর কথা শুনিয়া, তাহার প্রাণের অব্যক্ত যন্ত্রণার গভীরতা যে কতখানি, নিজে সেটা ঠিক অনুমান করিতে না পারিয়া, দুঃখ-বেদনায় কেমন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া খুব সান্ত্বনাসূচক স্বরে অশোকা বলিলেন, "তা যা বলেছিস্ জয়ন্তী, বড় মিথ্যে নয়। বরাত ছাড়া পথ নেই! তবে আমি বল্‌ছিলুম কি জানিস্ বোন্—সংসার করতে গেলে, স্ত্রীলোককে একটু কড়া হয়ে চল্‌তে হয়, একটু রাশভারী হ'তে হয়। অত আল্‌গা দিলে, স্বামি-পুত্র কেউই বশে থাকে না, কাকেও বাগ্ মানাতে পারা যায় না।"

জয়ন্তী আবার সেই শুষ্ক কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "বশে আমি কাকেও রাখ্‌তে চাই না, দিদি। বশে কারও থাকৃতে আমার নিজেরও ইচ্ছে নয়। কি একটা বইয়ে পড়েছিলুম—'মনুষ্য-জীবন কেবল কর্ত্তব্যের সমষ্টিমাত্র।' হিন্দুর ঘরে জন্মেছি, নারীজন্ম ধারণ করেছি, ভদ্রলোকের মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে, কুলের কুলবধূ আমি, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ যেটা আমার কর্ত্তব্য, নিক্তির ওজন ধ'রে তাই ক'রে যাব। ঐ ত বল্‌লুম, ছেলেবেলা থেকে অনেক আশাই করেছিলুম, তার একটাও কি পূরণ হলো? আর এ-জীবনে কোন আশা রাখি না, কোন আশা করিও না।"

"এত হতাশ হচ্ছিস্ কেন, জয়ন্তী? সংসারে দুর্দ্দিন, সুদিন, দুই-ই আছে। এখন দুর্দ্দিন পড়েছে, একটু কষ্ট পাচ্ছিস্ বটে! আবার সুদিন আস্‌বে, আবার সব দিকে জল-জলাট হবে! ঠাকুর-দেবতাকে ভক্তিভরে ডাক্, মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজো কর্ প্রাণ ভরে।"

দিদির কথায় বাধা দিয়া জয়ন্তী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ঠাকুর-দেবতার খুব পূজো করি, দিদি। সত্যি বল্‌ছি, রোজ রোজ ঠাকুর-ঘরে এক ঘণ্টা ধ'রে পুঁথি দেখে পূজো-আহ্নিক, জপ-তপ সবই করি। কিন্তু প্রাণ ধ'রে কখনও কোন মানত করতে পারব না! ঠাকুর দেবতাকে লোভ দেখিয়ে বল্‌তে পারবো না দিদি, আমায় এক গা জড়োয়া গয়না দাও, আমার স্বামীর লাখ টাকা রোজগার হোক্, আমার সিন্দুকভরা কোম্পানীর কাগজ হোক্"—বলিতে বলিতে জয়ন্তী হাসির বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া অশোকার গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

অশোকা বোনের রকম দেখিয়া ঈষৎ একটু হাসিয়া কৃত্রিম রোষে বলিলেন "মুখে আগুন! এই রকম শাদা প্রাণের জন্যেই আজ তোর এই দুর্গতি! এত সরল, এত ভাল, এত নিঃস্বার্থ হ'লে ক'দিন টিঁকে থাকৃবি শুনি?"

"কিছু ভাবিস্‌নি দিদি, জীবন-যজ্ঞ করতে বসেছি, যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হ'লে যেতে পারবো না! নিস্পরোয়া যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়েছি—তোর ভগ্নীপতিকে! কেমন বুক ফুলিয়ে সে দিগ্বিজয় ক'রে দেশে-বিদেশে ডঙ্কা মেরে বেড়াচ্ছে, তা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ তো! এই যজ্ঞাশ্ব যখন দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে আস্‌বে, তখন দেখ্‌বি, শেষ আহুতি দিয়ে বোন্‌টি তোর মহাসমারোহে জীবন-যজ্ঞ সমাধা কর্ব্বে!"

বহুদিন পরে নিরলঙ্কারা, নিরাভরণা, সর্ব্বস্বহারা আদরের প্রাণসমা ছোট বোন্‌টিকে দেখিয়া অশোকা প্রাণে প্রাণে যতটা ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ হৃদয়ে সুখানুভব করিলেন এই বুঝিয়া যে, তাহার স্বামীকে সে প্রাণ দিয়া যথার্থ ভালবাসে! স্বামীকে এত ভালবাসিতে না পারিলে সে এমন দুঃখ-কষ্ট অভাবে পড়িয়াও এমন প্রাণখোলা স্বর্গের হাসি কখনই হাসিতে পারিত না। জয়ন্তী যথার্থ স্বামিপ্রেমে উন্মাদিনী। পার্থিব দুঃখ-কষ্ট-অভাবে তাহার কি ক্ষতি?

৬

উমাশঙ্কর বাবু যত মহৎ, যত উদারপ্রকৃতি, যত সোদরপরায়ণ স্নেহশীল ব্যক্তি হউন, তাঁহার একটা মহাদোষ এই ছিল, তিনি বিষম "কাণ-পাতলা" ছিলেন। কোন বিষয় নিজে বিচার করিয়া মীমাংসা ক'রিতে পারিতেন না। পাঁচ জনে তাঁহাকে যাহা বুঝাইত, তাহাই তিনি ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন। জীবনচন্দ্রকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন; কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার আচরণে দেশশুদ্ধ লোকের ধারণা ছিল, তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব—জীবন-চন্দ্র এবং জীবনচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্রগণকে দিয়া যাইবেন। জয়ন্তীর প্রতিও তাঁহার ঐ ভাব বরাবর ছিল। সত্যই উমাশঙ্কর বাবু জয়ন্তীকে নিজের কন্যার মত স্নেহাদর করিতেন।

তোষামোদ স্তুতি-স্তাবকতা দুনিয়ায় কাহার না মুখরোচক? উমাশঙ্কর বাবু সংসারে আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট যে মিষ্টকথা, আপ্যায়ন প্রভৃতি চিত্তবিনোদনকারী বস্তুগুলি ন্যায্যপ্রাপ্তি হিসাবে পাইতেন, পুত্রোপম কনিষ্ঠ জীবনচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীর নিকট হইতে শ্রবণ-মনোরঞ্জন সে সব জিনিষগুলির একটিও পাইতেন না। "আপনার মত কেউ নেই", "আপনি দেবতা," "আপনার দয়ায় আমরা বেঁচে আছি", "আপনার মত দয়ালু" ইত্যাদি যে সমস্ত কথায় স্বর্গের দেবতারা, এমন কি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, দুর্গা-কালী-তারা-মা শীতলা দেবী পর্য্যন্ত তুষ্ট হন, এবং যে সমস্ত কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসীদের পদে পদে নানারূপ বিপদে-আপদে ফেলিয়া থাকেন, সে হিসাবে উমাশঙ্কর বাবু সামান্য মর্ত্ত্যের মানব হইয়া এতটা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া—এত বড় বৃহৎ গোষ্ঠীকে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়দানে এত কাল প্রতিপালন করিবার পর সে সব মধুময় বাক্য শুনিবার প্রয়াসী না হইবেন কেন? জীবনচন্দ্র তাঁহার সহোদর ভ্রাতা; শোণিত-সম্পর্কে তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহ-ভালবাসা, প্রাণের একটা স্বাভাবিক টান, সে ত বিধিবদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম! কিন্তু জয়ন্তী পরের মেয়ে; সে আসিয়াছে পরের বাড়ী—পরের ঘর হইতে। তাহার প্রতি উমাশঙ্কর বাবুর যে স্নেহ-ভালবাসা-প্রীতি জন্মাইবে, সেজন্য ত রীতিমত আবাদের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জয়ন্তী সে পাঠ মোটেই পড়ে নাই! জয়ন্তী পিতৃতুল্য উমাশঙ্কর বাবুর যথেষ্ট সেবা করিত। সে সেবা, সে ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিমাণ এত বেশী যে, সংসারে লোক নিজের ঔরসজাতা কন্যার নিকট ততটা পায় কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উমাশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণ থাকিলেও, নব-বধূ জয়ন্তী এ বাটীতে প্রবেশ করিয়া অবধি ভাসুরকে চিরদিন নানারকম খাদ্য-ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া খাওয়াইত। জয়ন্তী কোন দিন রোগে একবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িলে, বাস্তবিক উমাশঙ্কর বাবুর খাওয়া হইত না।

জয়ন্তীর রীতিমত দুর্দ্দিন পড়িল। সংসারে জয়ন্তীর নিন্দা-কারী বা তাহার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ আত্মীয়-স্বজনের অভাব ছিল না। জীবনচন্দ্র ঋণগ্রস্ত হইয়া অধঃপতনে গিয়াছে—উমাশঙ্কর বাবুকে সকলে বুঝাইয়া দিল—জয়ন্তী তাহার মূলাধার। জয়ন্তী যদি প্রত্যহ উমাশঙ্কর বাবুকে জীবনচন্দ্রের অধঃপতনের কথা জানাইয়া দিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি জীবনচন্দ্রের এতটা দুর্গতি হইতে দিতেন না! জয়ন্তী উমাশঙ্কর বাবুর বিষ-নয়নে

পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জয়ন্তী তাহা জানিয়া-শুনিয়া, বুঝিয়াও সে জন্ত তিলমাত্র দুঃখিত হইল না। হাসিমুখে চিরদিন যে-ভাবে সে সংসারের কাযকর্ম্ম করিত, তাহার কর্ত্তব্য পালন করিত, সেইরূপই করিতে লাগিল। নিঃসন্তান-বিপত্নীক উমাশঙ্কর বাবু মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পত্তি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, নিকটাত্মীয়, দূরাত্মীয় এমন কি পুরাতন চাকর-বামুনটিকে পর্য্যন্ত ভাগ করিয়া দিয়া গেলেন। একটি কপর্দ্দকও পাইল না শুধু কর্ত্তব্যপরায়ণা জয়ন্তী আর তাহার গর্ভজাত পুত্র-কন্যাগণ। অবশ্য জীবনচন্দ্রকে তিনি একবারে বঞ্চিত করেন নাই।

জয়ন্তী হাসিয়া দিদির গলা ধরিয়া বলিল, "ভাগ্যিস্ দিদি, তোর কথা শুনে ঠাকুরদের কাছে মানত করিনি—"

"তাতে কি হলো, জয়ন্তী? দুর্গতি অপমান বাড়লো বই তো নয়! দু'খানা রামকৃষ্ণ-কথামৃত বই পড়ে আর গীতার দু'ছত্র আউড়ে একেবারে নাস্তিক হ'য়ে গেছিস্ কি না,—তাই ঠাকুর-দেবতা মানিস্ না!"

"তুই আমার চেয়েও মুখ্যু, দিদি! নাস্তিকরা বুঝি গীতা পড়ে? আ তোমার বুদ্ধি!"

"দূর হ। আর ডেঁপোমি করিস্নে! ভাতারের তো ঐ দুরবস্থা, দেনার জ্বালায় ছট্‌ফট্ ক'রে ক'রে একেবারে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছে! তবু তোর চৈতন্য হোলো না? সবাই আমরা আশা করেছিলুম—যাহোক্ ভাসুর কিছু দিয়ে যাবে, তা হ'লেই—"

"গয়না গড়িয়ে জাহানারা বেগম সেজে ব'সে থাক্‌বো? আর এ দিকে যে তা' হ'লে আমার বিধাতার লিখনটি সব ওলোট-পালোট হ'য়ে যেতো! কিসের জন্যে আমি ভাসুরের বিষয় পাবার আশা কর্‌বো, বল্? আমি এদের বাড়ীতে এসে কখনো এদের একটা ঘটী-গেলাসে জল পর্য্যন্ত খাইনি, তা তো জানিস্! শ্বশুরবাড়ীর কোনো জিনিষ নেওয়া আমার বিধাতার বারণ!"

বলিতে বলিতে দিদিকে একটা ঠেলা দিয়া জয়ন্তী অনাবিল হাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিল।

অশোকা জয়ন্তীর রকম দেখিয়া হাসিবেন, কি কাঁদিবেন, কি রাগ করিয়া বোন্‌টিকে দু'ঘা চড় মারিবেন, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলেন না।

জয়ন্তী বলিতে লাগিল, "ছেলে-বেলা থেকে বাপ-মা মানুষ করেছেন—কত আদর-যত্ন করেছেন, পরিয়েছেন, কত জিনিষ-পত্তর দিয়েছেন! জানিস্ দিদি, বাপ-মা, বোনের মত কেউ কিছু দিতে পারে না! এই দেখ্ না, বিয়েতে প্রথমতঃ বর এনে দিলেন, গয়নাগাটী দিলেন, একরাশ নগদ টাকা দিলেন! তার পর মা যেই মরে গেলেন, মায়ের দরুণ সেও এক কাঁড়ী টাকা পেলুম। তার পর মা'র পেটের বড় বোন্ তুই, দিন-রাত্তির কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং ক'রে জিনিষ দিচ্ছিস্, নিজের হাতে কত রকম খাবার পর্য্যন্ত—"

জয়ন্তীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া অশোকা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বোনের কথার উত্তরে কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন, জয়ন্তীর চক্ষু দুটি জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাকে অত্যন্ত আদরে বাহু-পাশে বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "জয়ন্তী, বোন্‌টি আমার, সত্যি বলছি, কত পুণ্যি কল্লে লোকে তোর মত স্ত্রী পায়, তোর মত বাড়ীর বৌ পায়, তোর মত মেয়ে পায়, তোর মত বোন্ পায়! মানুষে তোর কদর বুঝলে না! তোর কদর হবে ভগবানের কাছে! আমি তোর বড় বোন্, মা স্বর্গে গেছেন, আমি আছি, তোকে মায়ের অভাব জান্‌তে দেব না। যতদিন বেঁচে থাক্‌বো, তোর মঙ্গলকামনা করবে, তুই দুঃখ করিস্‌নে!"

হঠাৎ অশোকার পায়ের ধুলা লইয়া জয়ন্তী নিজের মাথায়-গায়ে মুখে মাখাইল। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে দিদিকে বলিল, "কখনো নিজের কোনো সৌভাগ্যের জন্যে গুরুজনের কোনো আশীর্ব্বাদের প্রার্থী হইনি। এই আশীর্ব্বাদ আজ তুই কর্ দিদি, আমার জীবন যেন আমি হাসিমুখে শেষ কর্ত্তে পারি। তোর ভগ্নীপতিকে যেন সারিয়ে তুল্‌তে পারি!"

* * * *

জীবনচন্দ্র আজ তিন মাস শয্যাশায়ী। ডাক্তার আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে।

স্বামীর রোগে জয়ন্তীর প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সেবা-শুশ্রূষা-যত্ন-তদারক এত সুন্দরভাবে করিত যে, বড় বড় ইংরাজের হাসপাতালে নার্শরা সে রকম পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু মাস দুই পরে জীবনচন্দ্রের অবস্থা কেমন সুবিধাজনক বলিয়া কাহারও মনে হইল না। রোগী ক্রমশঃ শয্যায় বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। জয়ন্তীকে কাছে পাইলে সে অনেক কথা বলিতে চাহিত। জয়ন্তী বাধা দিত, কেবল বলিত, "ডাক্তারের কড়া হুকুম, তুমি মোটে কথা কইবে না। কথা যদি কও, তা হ'লে আমি তোমার কাছে আস্‌বো না। অপরে তোমার সেবা কর্ব্বে, এই তোমার ইচ্ছে? তা হ'লে বলো—"

বিপদ কখনো একা আসে না। হতভাগ্য জীবনচন্দ্র স্ত্রীর অলৌকিক সেবার গুণে রোগকে রোগ বলিয়া বুঝিতে পারিতে-ছিল না। কিন্তু আজ সাত-আট দিন যাবৎ জয়ন্তী ভীষণ জ্বরে এবং নিউমোনিয়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দুই দিন জ্বরের ধমকে অভাগিনী একবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া-ছিল। এক ঘরে দুই জন রোগীর থাকা বিধেয় নয়, সেই জন্য জয়ন্তীকে জীবনচন্দ্রের শয়নকক্ষের মেঝের উপর শুইয়া থাকিতে দেখিয়া ডাক্তার বাবু নিজে তদারক করিয়া, পাশের ঘরে জয়ন্তীর শয্যা করাইয়া দিলেন।

দিন দশেক পরের কথা। পূর্ব্বরাত্রে জীবনচন্দ্রের খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা গিয়াছে। সকালে সে নির্জ্জীব হইয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া জীবনচন্দ্র দেখিল, জয়ন্তী তাহার পায়ের তলায় মাথা, আর বাকী অঙ্গটা পালঙ্কের নিম্নে রাখিয়া নীরব হইয়া পড়িয়া আছে। ক্ষীণকণ্ঠে জীবন চীৎকার করিতে বাড়ীর সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, এই ব্যাপার! অশোকা এবং জীবনচন্দ্রের পুত্রকন্যারা কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিতা জয়ন্তীর কাছে গিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া অন্য ঘরে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিতে যাইতেছিল। মাথা নাড়িয়া জয়ন্তী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দিদি, আর আমাকে তফাৎ করিস্ নে। আমার জীবন-যজ্ঞ শেষ হয়ে এলো দিদি। এবার আমাকে আহুতি দিতে দে—"

দিদির কোলে জয়ন্তীর জীবন-যজ্ঞ সমাধা হইল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কম্পনাৎ (৩৯)

(শঙ্কর-ভাষ্য) কঠোপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়:—

যদিদং জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

"এই যে জগৎ, ইহা প্রাণ হইতে নিঃসৃত, প্রাণের প্রেরণায় ইহা কম্পিত হয়। উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। যাহারা ইহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয়।"

এই প্রাণ কি বস্তু? বজ্রই বা কি? মনে হইতে পারে যে, প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু, আকাশের বজ্র বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্য এখানে বজ্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। এখানে প্রাণ শব্দ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বাক্যের পূর্ব্বে এবং পরে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে। মধ্যস্থলে বায়ুর প্রসঙ্গ হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে—'প্রাণস্য প্রাণম্' (ব্রহ্ম প্রাণেরও প্রাণ)। কঠোপনিষদে পরে এইরূপ বাক্য আছে:—

ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

"তাঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্য তাপ দেন, ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু নিজ নিজ কার্য্য করেন।" বায়ু যাঁহার ভয়ে নিজ কার্য্য করেন, তিনি অবশ্য বায়ু হইতে ভিন্ন বস্তু হইবেন। দণ্ডের ভয়ে যেরূপ রাজপুরুষগণ রাজার আদেশ পালন করেন, সেরূপ ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দণ্ডের ভয়ে ব্রহ্মের আদেশ পালন করেন। প্রাণবায়ুকে জানিলে কেহ অমৃত লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অমৃতলাভ হয়।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)

"তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। অমৃতত্বলাভের অন্য উপায় নাই।"

(রামানুজ ভাষ্য) উপনিষদে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের ভয়ে দেবগণ কম্পিত হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। এখানেও সেই কম্পনের উল্লেখ আছে। অতএব এখানে ঈশ্বরের কথাই হইতেছে, বায়ুর কথা হইতে পারে না।

জ্যোতির্দর্শনাৎ (৪০)

(শঙ্করভাষ্য) ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্যটি আছে—"এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ, এই জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপে পরিণত হয়। এই 'জ্যোতি' সূর্য্য নহে, ইহা পরব্রহ্ম। কারণ, পরব্রহ্মের প্রসঙ্গ 'দর্শন' করা যায়, সেই প্রসঙ্গেই এই বাক্যটি পাওয়া যায়।

(রামানুজ) পরম 'জ্যোতি'র উল্লেখ আছে, এজন্য বুঝিতে হইবে যে, পরব্রহ্মের কথাই হইতেছে। কারণ, সকল তেজের আচ্ছাদক এবং সকল তেজের কারণীভূত জ্যোতি পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ (৪১)

"আকাশ" শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। কারণ, "অর্থান্তর" প্রভৃতির "ব্যপদেশ" অর্থাৎ উল্লেখ আছে।

(শঙ্করভাষ্য) ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়,—

আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা।
তেযাং যদন্তরা তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।

"আকাশ নাম এবং রূপ নিষ্পাদন করিয়াছে। নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, তাহাই আত্মা।"

এখানে আকাশ শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কারণ, আকাশ শব্দে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন বস্তু ("অর্থান্তর") নির্দ্দেশ করা হইতেছে। জগতের সকল বস্তুরই নাম ও রূপ আছে। কেবল ব্রহ্মের নাম ও রূপ নাই। অতএব এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গই হইতেছে।

(রামানুজ ভাষ্য) এখানে আকাশ শব্দ মুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হয় নাই, ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন কাহাকেও নাম ও রূপের নিষ্পাদনকর্ত্তা বলা যায় না। বদ্ধ জীবের নিজেরই নাম ও রূপ আছে, সে নাম ও রূপের কর্ত্তা হইতে পারে না। মুক্ত জীব জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না, অতএব নাম ও রূপ সৃষ্টি করিতেও পারে না। কেবল সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন, অতএব যাবতীয় বস্তুর নাম ও রূপ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্ম যে নাম ও রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা উপনিষদে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে। যথা মুণ্ডক উপনিষদে আছে,—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নামরূপং অন্নং চ জায়তে॥

"যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ্, জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, তাঁহা হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, নাম, রূপ এবং অন্ন উৎপন্ন হয়।" এখানে যখন নাম ও রূপ দ্বারা অস্পৃষ্ট ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন (৪২)

সুষুপ্তির সময় এবং মৃত্যুর সময় জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (অতএব এখানে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ হইতেছে)।

(শঙ্করভাষ্য) বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্য আছে,—

'কতম আত্মা' ইতি 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তঃ জ্যোতিঃ পুরুষঃ'।

অর্থাৎ প্রশ্ন, "আত্মা কে?" উত্তর 'এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রাণের মধ্যে এবং হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত, যাহার অভ্যন্তর জ্যোতির্ম্ময়'।' ইহার পর আত্মা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এই যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, ইহা সংসারী আত্মার কথা নহে, সংসারমুক্ত আত্মার কথাই বলা হইয়াছে। কারণ, সুষুপ্তির সময় এবং মৃত্যুর সময় সংসারী আত্মা এবং অসংসারী আত্মা উভয়ের প্রভেদ উল্লেখ করা হইয়াছে। সুষুপ্তি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে, অয়ং পুরুষঃ (অর্থাৎ জীব) প্রাজ্ঞেন আত্মনা (অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা) সম্পরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) ন বাহ্যং কিংচন বেদ (কোনও বাহ্য বিষয় জানিতে পারে না) ন আন্তরং (অন্তরস্থ কোন বিষয়ও জানিতে পারে না)।

মৃত্যু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—

অয়ং শারীর আত্মা (অর্থাৎ জীব) প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ (ব্রহ্ম দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া) উৎসর্জন্ (ঘোর শব্দ করিতে করিতে) যাতি (পরলোকে গমন করে)।

রামানুজ বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই দুইটি বাক্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই দুইটি বাক্যে সুষুপ্তি ও মৃত্যুর সময় জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মার উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মা অবশ্যই আছে। (রামানুজের মতে এই সূত্র অদ্বৈতবাদের বিরোধী, কারণ, অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব ও পরমাত্মা এক বস্তু, কিন্তু এই সূত্র অনুসারে ইহারা বিভিন্ন)। মধ্বও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পত্যাদি-শব্দেভ্যঃ (৪৩)

পতি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হেতু (বুঝিতে পারা যায় যে, এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে)।

(শঙ্করভাষ্য)। পূর্ব্ব-সূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে বলা হইয়াছে,—

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ।

অর্থাৎ নিখিল জগৎ তাঁহার বশীভূত, তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্মার সংসারী স্বরূপ প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, অসংসারী স্বরূপ প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য।

(রামানুজ ভাষ্য) পূর্ব্ব-সূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, সুষুপ্তির সময় প্রাজ্ঞ আত্মা জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করে; মৃত্যুর সময় জীবাত্মাতে অধিষ্ঠান করে। এই প্রাজ্ঞ আত্মা সম্বন্ধে পতি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি জগৎ ধারণ করেন, সকলের ঈশ্বর, ইত্যাদি। মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে এ সকল কথা বলা যায় না। অতএব নামরূপের নির্ব্বাহক আকাশ বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন,—তিনি ব্রহ্মই। যে সকল শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মা এবং ব্রহ্মকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে সকল

বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি, ব্রহ্মেই অবস্থান এবং ব্রহ্মেই প্রলয়,—অতএব জীবাত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও বস্তু নহে।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ পাদ

আনুমানিকম্ অপি একেষাম্ ইতি চেৎ ন শরীররূপক-বিন্যস্তগৃহীতেঃ দর্শয়তি চ। (১)

আনুমানিকম্ অপি (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতিও) একেষাং (কাহারও কাহারও মতে) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা যায়); ন (তাহা নহে) শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ (শরীর সম্বন্ধে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গৃহীত হইয়াছে) দর্শয়তি চ (ইহা দেখান হইয়াছে)।

শঙ্কর-ভাষ্য। আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি। (সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র-গুলিকে "অনুমান" বলা হয়। কারণ, ইহারা বেদের ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, ইহাদের প্রামাণ্য অনুমানের উপর নির্ভর করে)। সাংখ্যদর্শনে যে প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে, কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত অংশে সেই প্রকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

> ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
> মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
> মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
> পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

"ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-গণকে আকর্ষণ করিতে পারে), বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি।"

এখানে যে অব্যক্তের কথা বলা হইল, তাহাকেই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। এখানে অব্যক্ত শব্দের অর্থ শরীর। ইহার পূর্ব্বেই জীবকে রথারূঢ় ব্যক্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

> আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
> বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
> ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
> আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

"আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে, শরীরকে রথ জানিবে, বুদ্ধিকে সারথি জানিবে, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) জানিবে, ইন্দ্রিয়কে অশ্ব জানিবে, বিষয়কে (বাহ্য জগৎকে) পথ জানিবে, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত বস্তুকে পণ্ডিতগণ ভোক্তা বলিয়া জানেন।" ইহার পর বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিলে জীব বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

এখানে বিষ্ণু, আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে পুরুষ, অব্যক্ত, আত্মা, বুদ্ধি, মন, অর্থ ও ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে। "পুরুষ" ও বিষ্ণু একই বস্তু। বিষয় এবং অর্থও এক বস্তু। প্রথম বাক্যে অব্যক্ত শব্দ আছে, দ্বিতীয় বাক্যে তাহার স্থানে শরীর আছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ববাক্যে যে বস্তুগুলির উল্লেখ আছে, পরবর্তী বাক্যেও সেই বস্তুগুলিরই উল্লেখ আছে। অতএব অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে এখানে লক্ষ্য করা হয় নাই।

রামানুজও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা অপেক্ষা "অব্যক্ত"কে (অর্থাৎ শরীরকে) শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ এই যে, জীব পুরুষার্থলাভের জন্য যাহা কিছু চেষ্টা করিতে পারে, শরীরের সাহায্যেই সে সকল চেষ্টা করিতে হয়।

মধ্ব বলেন যে, এখানে অব্যক্ত শব্দ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ (২)

সূক্ষ্মং তু (শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তদর্হত্বাৎ (কারণ, তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য)।

আপত্তি হইতে পারে যে, শরীর স্থূল এবং সুব্যক্ত বস্তু; তাহাকে অব্যক্ত শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তর এই যে, যে সকল অব্যক্ত সূক্ষ্ম-ভূত হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই সকল সূক্ষ্ম ভূতকে লক্ষ্য করিয়া

শরীর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। * কারণ-বাচক শব্দ দ্বারা অনেক স্থলে কার্য্যকে নির্দ্দেশ করা হয়। † বেদে কোনও কোনও স্থলে "গো" শব্দ দ্বারা গাভী হইতে উৎপন্ন "দুগ্ধ"কে বুঝায়।

মধ্ব বলেন, ব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ। তাঁহাকেই অব্যক্ত শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত।

তদধীনত্বাদর্থবৎ (৩)

তদধীনত্বাৎ (এই অব্যক্ত ব্রহ্মের অধীন বলিয়া) অর্থবৎ (সার্থক)

* সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্ম আকাশ, সূক্ষ্ম আকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, তাহা হইতে সূক্ষ্ম অগ্নি, তাহা হইতে সূক্ষ্ম জল, তাহা হইতে সূক্ষ্ম ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে সূক্ষ্মভূত বলা হয়। সূক্ষ্মভূতগুলি বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া পঞ্চ স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে স্থূল জগৎ উৎপন্ন হয়।

† একটি বস্তু হইতে আর একটি বস্তু উৎপন্ন হইলে প্রথম বস্তুটিকে কারণ এবং দ্বিতীয় বস্তুটিকে কার্য্য বলা হয়।

সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সূক্ষ্ম এবং অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাংখ্যের প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? সাংখ্যের প্রকৃতিও অব্যক্ত বস্তু, তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।"

ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র (অর্থাৎ কাহারও অধীন নহে) কিন্তু বেদান্তের অব্যক্ত ঈশ্বরের অধীন। এই অব্যক্তের সাহায্যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। অব্যক্ত না থাকিলে ঈশ্বর কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেন? এই ভাবে অব্যক্তের কল্পনা সার্থক। এই অব্যক্তকে কোথাও আকাশ, কোথাও অক্ষর, কোথাও মায়া বলা হইয়াছে। ইহাই অবিদ্যা। ইহা বলা যায় না যে, অব্যক্ত শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম শরীর।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম, এ)।

চাওয়া-পাওয়া

সারা দিনের কাযের শেষে—হাসি-ভরা
দু'টি চোখের মিষ্টি চাওয়া, ক্লান্তি-হরা;
নিরালা সে ছাদে বসি, আমায় ঘিরে
দু'টি হাতের পরশ মেলে শ্রান্ত শিরে;
আকাশেতে জাগবে শুধু দু'টি তারা,
গন্ধ নিয়ে বইবে বায়ু আকুল-পারা;
জাগবে কাণে আদর-মাখা সোহাগ-বাণী
অধর-ছোঁওয়ায় মিলাবে মোর নিখিলখানি ;—
এই পাওয়াতে জীবন আমার সফল গণি,—
এর চেয়ে কি বড় চাওয়া রতন-মণি?

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

দান-প্রতিদান

৩৬

দ্বিপ্রহরের অবকাশে অনেকেই কুহুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ঠানদিদি-ঠাকুরমার দল নব জামাতার সহিত হাসি-তামাসা করিবার নিমিত্ত রসনায় 'শান' দিয়া আসিলেন। বিবাহের সময় ফাঁকি দিয়া সহরে বিবাহ করিবার শাস্তি জামাইকে দিতে না পারিলে গ্রামের মেয়েদের মান থাকে কোথায়? কিন্তু জামাতার অনুপস্থিতিতে বয়স্কারা দুঃখিত হইয়া যশোদাকেই শুনাইতে লাগিলেন—"জামাইয়ের এ গা-ঢাকা চলবে না, বৌমা; বারো মাস তিরিশটি দিনই ত আরাম-করা হয়। শ্বশুরবাড়ী এসেও বজরায় আরাম করা হচ্ছে। আমরা ঐটি হ'তে দেবো না, সকলে কষ্ট ক'রে দেখতে এলাম, জামাইকে ডেকে পাঠাও।"

যশোদা কুণ্ঠার সহিত কহিলেন, "সে এখন বিশ্রাম করছে, পিসীমা, হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছে, এখন ডাকলে আস্‌তে পারবে কি? তার চেয়ে সে যখন আসবে, আপনাদের খবর দেব।"

পিসীমা-কাকীমার দলের সহিত তরুণীরা সমস্বরে প্রতিবাদ করিল– "না, এখুনি ডাকুন। আমরা সকলে ঘুম কামাই ক'রে জামাই দেখতে এলাম, আর তিনি মজা ক'রে ঘুম দেবেন? তা হবে না, আমরা কিছুতেই তাঁকে আজ ঘুমুতে দেব না, কখনও না।"

যশোদার লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই রহিল না। ইহারা এখনও কিছু শুনে নাই, তাই রক্ষা, নহিলে এখুনি গ্রামের ভিতর টিটি পড়িয়া যাইত, কি জানি কি কথায় কি কথা উঠিয়া পড়িবে, যশোদা ভয়ে ভয়ে পাণ আনিবার ছুতায় উঠিয়া গেলেন। প্রবীণাগণ নিজেদের মধ্যেই গল্প জমাইয়া তুলিলেন।

তরু, বীণা, নীলা কুহুকে নিভৃতে টানিয়া লইয়া গেল। কুহুর অন্য সখীরা সকলেই শ্বশুরালয়ে, নীলা দিন কয়েক হইল আসিয়াছে। তরু আশ্বিনমাসে বাপের বাড়ী যাইবে, বীণা আর যায় নাই, সেই অবধি এখানেই আছে।

কুহু বীণার দিকে অবাক্ হইয়া চাহিতে লাগিল। বীণা কোন্ কালেই সুন্দরী ছিল না, কিন্তু তার শ্যামচিক্কণ দেহলতায় কমনীয়তার অভাব ছিল না। ভাসাভাসা চোখে কোঁকড়ানো চুলে মুখখানি মিষ্টই লাগিত। বীণার এ কি হইয়াছে? সম্মুখের চুল উঠিয়া কপালখানা ঢিপির মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরগত, কিন্তু তাহা হইতে একটা প্রখর জ্বালা ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে! শরীর শুষ্ক, পাণ্ডুবর্ণ। এই কয় মাসেই বয়স যেন পাঁচ বছর বাড়িয়া গিয়াছে।

কুহু বীণার হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বীণা, তুই এমন হয়ে গেছিস কেন? তোর কি অসুখ করেছিল?"

তরু কহিল, "অসুখ ব'লে অসুখ। সেই আষাঢ় মাস থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, দু'দিন ভাল থাকলে আর তিন দিন বিছানায় প'ড়ে থাকে।"

নীলা বলিল, "শুন্‌লাম, তার পর অত্যাচার আছে ষোল আনা। ওষুধ খাবে না, পথ্য করবে না, অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে কুপথ্য করা আছে, কাযেই মূর্ত্তি হয়েছে কঙ্কালসার।"

কুহু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "এ ত ভাল নয়, বীণা, কেন ছেলেমী করিস?"

"কেন যে করে, তা কি তোকে বলবে, ভাই? ওর সাধ হয়েছে, মানভঞ্জনের পালা করতে, কিন্তু এক্‌লা সেটা হয় না বলেই রাগে নিজের ওপর নিজে ঝাল ঝাড়ছে।" বলিয়া তরু টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বীণা সহসা বারুদস্তূপের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া ভেংচাইয়া কহিল, "ওর সাধ হয়েছে মানভঞ্জনের পালা করতে। ওঁর কাছে বলেছি, উনি গুণে জেনেছেন। সব-তাতেই ফোড়ন দেওয়া; আহ্লাদে মাটীতে পা পড়তে চায় না। একেই ধনীর ধনা গা, তায় ধনী পুতের মা।"

কুহু সবিস্ময়ে তরুর পানে তাকাইল। তরুর শরীরে নব-মাতৃত্ব-সম্ভাবনার লাবণ্য যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। রং দিব্য পরিষ্কার হইয়াছে। চক্ষু দু'টি স্বপ্নভারাতুর, মুখখানি এক অজানা সুখের মহিমায় ঢল ঢল করিতেছে।

কুহু খুসীর সহিত বলিয়া উঠিল, "সত্যি তরু-বৌদি, এ সুখবরটা তোমার আমাকে আগেই দেওয়া উচিত ছিল।

বীণা না বল্লে আমি ত বুঝতেই পারতাম না। বীণার সাথে তোমার না বনলেও তোমার যা কিছু সুখবর বীণার কাছেই পাওয়া যায়।"

নীলা কহিল, "ওদের ভালবাসার ঝগড়া, কুহু, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে কোন্দল করলেও দু'জনের ভেতর টান আছে খুব। ক'দিন আগে বীণার জ্বর বড্ড বেড়ে গিয়েছিল, তাই শুনে, না খেয়ে না দেয়ে তরুর কি কান্না : কেঁদেকেটে জ্যেঠাইমাকে ধ'রে সারারাত ঠায় বীণাকে নিয়ে ব'সে রইল, ভাবলাম, এইবার দু'জনার বুকের মধু মুখে ঝরবে। মা গো, দু'দিন পরে দেখি—যে বিষ, সেই বিষই।"

তরু হাসিয়া জবাব দিল, "তোমরা বুঝবে না ভাই, আমাদের মুখের বিষ মন্থন করতে করতে এক দিন অমৃত হবে। তবে সেটা এ জীবনে কি পরজন্মে, তা বলা শক্ত।"

"বলা শক্ত, কে যেন ওঁকে বলতে মাথার দিব্যি দিচ্ছেন। থাম্ বাপু, কেবল আবোল-তাবোল বকা। যাকে দেখতে এলাম, তার সাথে দুটো কথা কইতেও দেবে না। এ মুখপুড়ীকে সঙ্গে আনাই অন্যায় হয়েছে! হ্যাঁ রে কুহু, শ্বশুরবাড়ী কেমন লাগছে? মধুর হাঁড়ি না কুমড়া-বড়ী?"

বীণার প্রশ্নে কুহু ভীত হইল। স্বামীর বিরুদ্ধে বলিবার বিশেষ কিছু না থাকিলেও আজিকার ঘটনা সে কেমন করিয়া লুকাইবে? আর কেহ নহে বীণা, যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষ জাতির দোষ অন্বেষণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করা। পুরুষের সামান্য ত্রুটি যাহার নিকটে অসামান্য হইয়া পড়ে, তাহারই কাছে জয়ন্তর এত বড় ত্রুটি অন্যায় কুহু কিরূপে লুকাইবে? না লুকাইলেই বা এ মুখ লোকসমাজে বাহির করিবে কি করিয়া? কিন্তু লুকোচুরি, ছলনা মিথ্যা দ্বারা সত্যগোপন কুহু জানে না। পারেও না।

কুহু নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ী তোমাদের যেমন লেগেছিল বীণা, আমারো তেমনি লাগছে। তোমাদের চেয়ে অবশ্য ভাল লাগে নি।"

বীণা গম্ভীরভাবে মাথা দুলাইয়া বলিতে লাগিল,—"যা বলেছিস, প্রথম বোঝা দায়, অচেনা নূতন লোকদের ভেতর যেয়ে ভারী বিশ্রী লাগে। কিন্তু মিষ্টি সেই সময়টি। তখন বরদের নূতনত্বের মোহ থাকে, কি আদর-সোহাগের ঘটা, ময়নার মত কত বুলি কপ্‌চানো—'তোমাকে ভালবাসি! তোমার অদর্শনে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আশার বাতি, পিপাসার জল!' পোড়ার মুখ মরণ! সেই সময় ও জাতের মুখে ঝাঁটা মারতে হয়। তা না মেরে আমরা আহ্লাদে আটখানা হই, তাতেই ও জাতের সুবিধা হয়।"

"সুবিধা করা কেন? যা না, ঝাঁটা পিটে আয়। ঝাঁটা যদি না থাকে, আমি বাঁশের একগাছা তৈরি ক'রে দেব। নারকেলপাতার ঝাঁটার চেয়ে বাঁশের ঝাঁটা মজবুত বেশী। কিন্তু এক জনের দোষে সকলের পিঠে ঝাঁটা চল্‌বে কি ক'রে, ভাই?" বলিয়া তরু বীণার পৃষ্ঠে একটি ছোট্ট কীল বসাইয়া দিল। কীলের জবাবে চিম্‌টি কাটিয়া বীণা উত্তেজিতভাবে কহিল, "এক জনের দোষে? ননীর পুতুল! কিছু জানেন না? এ দিন থাকবে না লো, থাকবে না; তখন জান্‌তে পারবি, বীণা মিছে বলে নি। ওরা আবার ভাল, ওরা আবার সাধু! চোখ দিয়ে বিশ্ব গ্রাস করতে হাঁ ক'রে রয়েছে। এই খানিক আগে জয়ন্তকে দেখে এলাম। বজরার জান্‌লায় চোখের ফাঁদ পেতে ব'সে রয়েছে। ভেবেছিলাম, কুহুর মত সুন্দরী বৌ পেয়ে, পুরনো না হওয়া অবধি ও হয় ত ভাল থাকবে। সাধু সাজবার ভাণ করবে। তা নয়, সেই চোখ, সেই চাহনি। যে ভদ্রলোক মেয়েদের চানের ঘাটে অমন তাকিয়ে থাকতে পারে, তারা আবার ভাল! তাদের আবার অসাধ্য কায আছে? এ দিকে জমীদারী কায়দায় শ্বশুরবাড়ী নামা হ'ল না, দেমাক দেখানো হ'ল। ও দিকে শ্বশুরের গাঁয়ের মেয়েদের ওপর লোভের অন্ত নেই।"

নীলা কুহুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, "তোর কথাবার্ত্তা বড্ড বিশ্রী, বীণা। কেউ কারুর পানে চাইলেই কি দোষ হয়? তুই 'রজনীর' কালির বোতল, গলায় গলায় কালি ভরা। নিজের অভিমানের জ্বালায় নিজে ত জ্ব'লে পুড়ে মরছিস্, আবার আর এক জনকে সন্দেহের বিষে জ্বালাস কেন? ছি ছি! তোর বড় ছোট মন, অত সঙ্কীর্ণতা নিয়ে সংসারে বাস করা চলে না। আমরা তোর বরেরই দোষ দিই, কিন্তু এমন স্ত্রী নিয়ে ঘরকন্না করাও ত কম বিড়ম্বনা নয়! তুই এ দিকে নড়তে পারিসনে, অথচ জয়ন্তকে দেখতে যাওয়া হয়েছিল কখন্? পুরুষের নিন্দায় পঞ্চমুখ, তারা কারুর পানে চোখ তুল্‌লেই অপরাধ! কিন্তু তুই যে

জয়ন্তকে দেখতে গেলি, তাতে দোষ হ'ল না? 'নিজের বেলায় আঁটি-সাঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটী', তুই তেমনি ধরণের মেয়ে।"

বীণা জ্বলিয়া উঠিল। "তুই তেমনি ধরণের মেয়ে, কথার ছিরি শুনে বাঁচি না। কুহু এসেছে শুনেই না আমি ছুটে নামাতে গিয়েছিলাম। জয়ন্তর জন্যে আমার বয়েই গেছে। যেয়ে দেখলাম, কুহু বাড়ী এসেছে, জল-কাদায় তিনি নামতে পারবেন না ব'লে শ্বশুরকে ফিরিয়ে দিয়ে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাকে নিয়ে ঘরকন্নার বিড়ম্বনা বই কি? তোরা যা না, যেয়ে ঘরকন্নার স্বাদ জেনে আয়। তোরা সতী-লক্ষ্মী, তোরা উদার, আমার মন ছোট, আমার ক্ষুদ্রত্ব নিয়ে আমিই থাকি। তোরা বড়, বড়র সন্ধানে যা। আমি সন্দেহের বিষে কাউকে জ্বালাতে চাই না, সাবধান করতে চাই। নইলে আমার কি দায়?" বলিতে বলিতে বীণা দুই হাতে ললাট চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুহু সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল বীণা? অমন ক'রে উঠ্‌লে কেন?"

"মাথার ভেতর কেমন করছে, জ্বর এলো বোধ হয়। আমি যাই।" বীণা টলিতে টলিতে প্রস্থানোদ্যত হইল।

তরু শশব্যস্তে বীণাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আহা, জ্বর এলো, চল বীণা-ঠাকুরঝি, তুমি আমার বিছানাতেই শোবে চল। এখন বাড়ী যেতে কষ্ট হবে।"

৩৭

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। সমস্ত মধ্যাহ্ন প্রখর জ্বালা বর্ষণ করিয়া সূর্য্যদেব বাঁশবনের অন্তরালে বিদায়োন্মুখ হইলেন। শান্ত-জগতে আবার কর্ম্মপ্রবাহের সাড়া পড়িয়া গেল।

জামাতার সহিত রঙ্গ-তামাসার আশায় যাঁহারা ঘরের কায ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, কর্ম্মের তাড়নায় একে একে তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিতে হইল। জয়ন্তর ব্যবহার জানিতে কাহারও বাকী রহিল না। যাঁহারা যশোদার হিতৈষিণী, তাঁহারা প্রকৃতই ক্ষুব্ধ হইলেন। যাহারা তাহা নহে, তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। পথে বাহির হইয়া পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন যে হবে, তা ত তখুনি জানা গেছে। উনি খুদ-কুড়ানীর ব্যাটা হয়ে সাগর মল্লিককে ধরতে গেলেন! ধরা বল্লেই ধরা না-কি? এখন হজম কর। জমীদারের ছেলে সে, কেন শ্বশুরের কুঁড়েতে আসবে? আজ সমান ঘরে কায হ'ত, সমান ব্যবহার পেতে। মেয়ে দিয়ে ছেলে ভুলানো, মনে ভেবেছিলেন রাজত্ব কিন্‌লাম। জামাই তালুক কিনে দেবে, ভাঙ্গা কোঠা গ'ড়ে দেবে, সুখের সীমা থাক্‌বে না! এখন দেখ, সুখ কোথায়? তোমার বাড়ীতে আসতেই যার ঘেন্না, তুমি তার মাথায় হাত বুলুবে?"

এ সব মন্তব্য যশোদার কর্ণগোচর হইয়া তাঁহাকে আরও উন্মনা করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যাবেলা ভোলানাথ স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি তপুকে নিয়ে এখন একবার জয়ন্তর কাছে যাই। ও বেলা এলো না, এ বেলা যদি আসে, তোমার নাম ক'রে ডেকে আনি। খাবার জিনিষপত্র আছে ত? না আনিয়ে দিতে হবে?"

যশোদা বলিলেন, "কিছু আন্‌তে হবে না, সমস্তই আছে। আবার তুমি যেতে চাচ্ছ, সে কি আসবে? আসবার ইচ্ছা থাকলে তখনই আসত।"

ভোলানাথ চাদর আনিতে ঘরে ঢুকিলেন। কুহু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বাবাকে তুমি আর ওখানে যেতে দিও না, মা। তপুকেও না। কিছুতেই যেতে দিতে পারবে না।"

যশোদা সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন কুহু, বারণ করছিস কেন? জামাই আদর-যত্নেরই জিনিষ। তাকে মান্য ক'রে—খাতির ক'রে বাড়ীতে আনতে হয়। সে তখন আসেনি, খাবার ফিরিয়ে দিয়েছে বলেই কি আমরা তার ওপর রাগ ক'রে থাকতে পারি? একবার কেন, জয়ন্ত না এলে ওঁকে দশবার তার কাছে যেতে হবে।"

"না মা, আমি থাক্‌তে তোমাদের বার বার অপমান হ'তে দেব না। বাবা যদি এখন আবার যান, তা হ'লে আমিও বাবার সাথে বজরায় চ'লে যাব। যে তোমাদের এত অবজ্ঞা-তাচ্ছীল্য করতে পারে, তবু তোমরা হাজারবার তার কাছেই যাবে? না, যাওয়া হবে না, আমি যেতে দেব না।"

যশোদার চোখে জল আসিল। কষ্টে হৃদয়কে সংযত করিয়া তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "কুহু, তুই ত আগে

এমন অবুঝ ছিলি না মা, নিজের সন্তানকে দিয়ে পরকে আপনার করা, তার মর্ম্ম তুই জানিস না। যখন তোর মেয়ে হবে, মেয়ের বিয়ে হবে, তখন পরের ছেলের মর্ম্ম জান্‌বি। জয়ন্ত আমাদের যতই তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করুক না কেন, তবু আমরা তাকে না ডেকে পারবো না। তোকে কিছু করতে বলছি নে, উনি যাবেন, তাতে তোর কি ?"

"আমার কিছু হোক না হোক, মা, তবু আমি বাবাকে যেতে দেব না। তোমরা আমার কষ্ট বুঝতে পারছ না, পারলে এমন ক'রে বল্‌তে না।"

"কে বলে বুঝতে পারি না, কুহু ? তোর গরীব বাপ-মাকে তুই যতটা মনে করিস, অন্যে যদি তা না করে, তাতে অভিমান কিসের ? গরীবকে যে অনেক সইতে হয়। মান-অপমানের মাপকাঠি নিয়ে তাদের চলে না।"

"চলুক বা না চলুক, তা দিয়ে কায নেই, মা। তুমি বাবাকে বজরায় যেতে বারণ ক'রে এস। গরীব হয়েছ ব'লে তোমরা কি মানুষ নও ? আমারই জন্যে তোমাদের অপমানের মাত্রা আমি আর বাড়াতে পারবো না।"

মা অযথা কথা-কাটাকাটি না করিয়া স্বামীর উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

কুহু ধীরপদে বাগানে উপনীত হইল। এখানে আসিয়া এ পর্য্যন্ত তাহার প্রিয় পরিচিত গাছগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। একবার বাড়ীটা সে ঘুরিয়া দেখিয়াছে মাত্র। প্রাঙ্গণ, স্তূপ, ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালা সব-তাতেই যে একটা সুমধুর স্মৃতি বিজড়িত। ইহার নিকটে কলিকাতা, বালিগঞ্জ, স্বর্গও যে তুচ্ছ। কিন্তু ইহাদের হারাইয়া সে কি পাইয়াছে ? সে অনির্ব্বচনীয় শান্তি কোথায় ?

কুহু ঘুরিতে ঘুরিতে নালার ধারে আসিল। নালার জল কমিয়া গিয়াছে। অল্প জলে ক্ষুদ্র মাছের ঝাঁক আনন্দে বিচরণ করিতেছে। দুই পারে অসংখ্য জলো-ঘাস বাড়িয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের বড় আদরের বৃক্ষাসন ঘাসে আচ্ছন্নপ্রায়। কুহু এখানে থাকিতে ঐ আসনটির প্রতি তপুর লোভের অন্ত ছিল না। তুচ্ছ বৃক্ষাসন লইয়া দুই ভাই-বোনের ভিতর কত অনুযোগ অভিযোগ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যেমনই উহা তপুর একার অধিকারে আসিয়াছে, তেমনই আদরের লেশও নাই।

বৈশাখে প্রচুর ফুল দান করিয়া এখনও বকুল-বৃক্ষ ফুলশূন্য হয় নাই। ডালে ডালে থোকা থোকা ফুল ঝুলিতেছে। মৃত্তিকার উপর ঝোপে ঝাড়ে অজস্র শুষ্ক ও তাজা ফুল ঝরিয়া স্থানটি স্নিগ্ধ সুরভিময় করিয়াছে। জলের আগাছা বেড়িয়া একটি নলটুনির লতা উঠিয়াছে। সুন্দর সাদা সাদা ফুল, তেলাকুঁচার মত কয়েকটা নিটোল ফল ঝুলিতেছে। অদূরে ভাঁটিবনের পাশে উঁচু জমীটায় কুহু ও তপু ধুন্দুল গাছ বুনিয়াছিল, মা সনাতনকে দিয়া বাঁশের মাচা করিয়া দিয়াছেন। ফুলে, ফলে, লতায় বাঁশের মাচা ভরিয়া গিয়াছে। মা'র শশাগাছটা তেমন বাড়ে নাই, কেবল ফুল ধরিতেছে,—এখনও শশা ধরে নাই। তপুর সাধের কাঠ-টগরের গাছ গোরু নেড়া করিয়া খাইয়াছে। পত্রশূন্য শাখায় দুই একটি পাতা সবে অঙ্কুরিত হইতেছে।

নিশীথিনী ধীরে ধীরে ঘনায়মান হইয়া আসিল। আকাশের এক দিকে মেঘসম্ভার, অপর দিকে তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র রেখাকারে দর্শন দিলেন। বাঁশঝাড়ের মাথায় সন্ধ্যাতারা উদয় হইয়া মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল।

কুহু শাখাজালের মধ্য দিয়া পরিচিত তারকাটির প্রতি চাহিয়া রহিল। ও যেন পথহারা, স্থানভ্রষ্ট, উহার সহিত অনন্ত নক্ষত্রলোকের কাহারও যোগ নাই, সম্বন্ধ নাই, একাকী আসিয়া অনুজ্জ্বল নেত্রে ও কি দেখে ? প্রতি সন্ধ্যায় উদয় হইয়াও কি উহার দেখার শেষ হয় না ? আহা, সাথী-শূন্য, সঙ্গিহারা ক্ষুদ্র তারাটি!

কুহুর মনে হইতেছিল, সেও ঐ তারার ন্যায়। যূথভ্রষ্ট হইয়া কোন্ অনুদ্দেশের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিতেছে! তাহার সম্মুখে অন্ধকার, ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কালমেঘে অন্তরাকাশ মেঘাবৃত। স্বজনের স্নেহবেষ্টনের মধ্যে আর তাহার স্থান নাই, আশ্রয় নাই। সে একাকী, লক্ষ্যহারা। কিন্তু কিসের বিনিময়ে এ বিড়ম্বনা, এ সংশয় ? কি করিলে সেই অতীতের দিনগুলি আবার ফিরাইয়া আনা যায় ? সেই শান্তি, তৃপ্তি, অস্ফুট আশা, অনাবিল আনন্দ, সেই চিরন্তন জীবনযাত্রা। ছোট ভাইটিকে পাশে লইয়া একাগ্রদৃষ্টিতে ঐ তারকার পানে চাহিয়া থাকা! সে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ জীবন, একটিবার কি ফিরিয়া আসে না ?

আজ সমস্ত দিবসব্যাপী কুহুর বক্ষে যে অশ্রুর উৎস জমিয়া জমিয়া বুকখানা পাথরের মত ভারী করিয়াছিল, নিভৃতে আসিয়া সে উৎসের মুখ কুহু রোধ করিতে পারিল

না—ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ ক্রন্দনের বুঝি বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, এ রোদন ফুরাইবার নহে, ফুরাইবে না। ইহার সাক্ষী কেবল ঐ নীলাম্বর, ক্ষীণ চন্দ্রমা, ম্লান নক্ষত্র, নির্জ্জন বনবিজন।

৩৮

দুইটি দিন নদীর স্রোতের প্রায় কোথা দিয়া কাটিয়া কুহুর বিদায়-মুহূর্ত্ত আসিল। দিনটাও মেঘ্‌লা, হৃদয়গুলিও অশ্রুভারাতুর, ধরণীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মত একটি নিবিড় বেদনা যশোদার হৃদয়ে হাহাকার করিতেছিল। মেয়ে যে পরের জন্য সৃষ্টি, পরের নিমিত্ত পালন করিয়া পরের হাতে তুলিয়া দেওয়া। কিন্তু সেই পর তাহাকে কি দৃষ্টিতে দেখে, কি ভাবে রাখে, ইহাই যে পিতামাতার প্রধান চিন্তা। জয়ন্তর আচরণে যশোদা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কেহ কাহাকে ভালবাসিলে—স্নেহ করিলে এ ব্যথা কি দিতে পারে?

যাত্রাকালে জয়ন্ত কি জানি কি ভাবিয়া শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়া শাশুড়ীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

যশোদার চোখে জল আসিল। তিনি ধরাগলায় কহিলেন, "যাবার সময় কি গরীব মাকে মনে পড়লো, বাবা? এবার এসেও দূরে রইলে, শীতের সময় আবার এস। তখন জল-কাদা থাক্‌বে না, এ দিকে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। তখন এসে ক'দিন থেকে যেও।"

জয়ন্ত গম্ভীরমুখে জবাব করিল, "শীতের এখনও ঢের দেরী, সে সময় আসা হবে কি না, এখন বলা মুস্কিল।"

যশোদা আর কিছুই বলিলেন না। আসন পাতিয়া দুইখানি রেকাবীতে গৃহজাত নানাবিধ সামগ্রী সাজাইয়া জয়ন্ত ও হিরণকে খাইতে ডাকিলেন।

হিরণ বিনা আপত্তিতে খাইতে বসিল। জয়ন্ত না বসিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমি এইমাত্র চা খেয়ে আস্‌ছি, এখন ও সব খেতে পারবো না।"

প্রতিবেশিনীরা কুহুকে বিদায় দিতে আসিয়াছিল। এক বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া কাংস্যকণ্ঠে ঝঙ্কার দিলেন, "চা খেয়েছ ব'লে কি শাশুড়ীর দেওয়া দ্রব্য খেতে মানা, সায়েব বাবু? বৌ যত্ন-আত্যি ক'রে দিচ্ছে, বেশী না খাও, একটু তুলে নাও। বিদুর গরীব ছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ তার খুদ চেয়ে খেয়েছিলেন। খাও ভাই, ওতে দোষ নেই।"

জয়ন্ত উত্তর করিল, "দোষগুণের কথা হচ্ছে না। চা খাওয়ার পর ঘণ্টা দুই আমি কিছু খেতে পারি না। খেলেই অসুখ হয়।"

যশোদা কহিলেন, "খেলে যদি তোমার অসুখ হয়, তা হ'লে খেয়ে কায নেই, বাবা।"

পাড়ার একটি ছোট কটকটে মেয়ে হাসিয়া বলিল, "বাবা, জামাইয়ের আদর দেখে বাঁচি না।

শিব গেলেন শ্বশুরবাড়ী, বসতে দিলেন পিঁড়ে,
জল পান করিতে দিলেন শাল ধানের চিড়ে।
শাল ধানের চিড়া নয়, বিন্নে ধানের খই,
মস্ত মস্ত সবরি কলা, কাকমেরে দই।"

হিরণ স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল, "বেশ ত, খুকী। খুব ছড়া শুনিয়ে দিলে? কিন্তু ছড়ার বিন্নে ধানের খই, কাক-মেরে দইয়ের কোন নমুনা দেখালে না ত?"

খুকীর দিদি আগু বাড়াইয়া উত্তর দিলেন, "আপনারা যা নমুনা দেখাচ্ছেন, তাতেই ক্ষীরপুর গাঁ ধন্য হয়ে গেছে। এর পর আমরা বেশী নমুনা দেখাতে সাহস পাচ্ছি কৈ?"

মুখের মত জবাবে সমাগতা মহিলা-মণ্ডলার মুখে কৌতুকের হাসি খেলিতে লাগিল। অপ্রতিভ হিরণ আহারান্তে গেলাসের জলে হাত ধুইতে ধুইতে কহিল, "এক মাঘেই শীত পালায় না, আপনারা হতাশ হবেন না। সবুরে মেওয়া ফলে, আসছেবার এসে নমুনা অন্য রকম দেখানো যাবে।"

খুকীর দিদি তরুণীটিকে জয়ন্তর মন্দ লাগিতেছিল না। সে তাহার দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, "শীতের সময় আসবার নেমন্তন্ন পাওয়া গেছে। আপনারা এক মাস বিন্নে ধানের খইএর—শাল ধানের চিঁড়ের চাষ করতে থাকুন, আমরা ঐ জিনিষের লোভে নিশ্চয় আসবো!"

"ও মা, এই ত জামাইয়ের বুলি ফুটেছে, তবে আবার দুঃখ কিসের?" বলিতে বলিতে মহিলাবৃন্দ চতুর্দ্দিক্ হইতে জয়ন্তকে ঘিরিয়া ফেলিল।

যশোদা হিরণের নিকটে আসিয়া অঞ্চলে লুক্কায়িত একটি বিস্কুটের টীন হিরণের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপে চুপে বলিলেন, "এটা তুমি নিয়ে যাও হিরণ, এর ভেতর সামান্য কিছু খাবার আছে। তুমি খেয়ো, যদি পার, জয়ন্তকে একটু খাওয়াবে। তার জন্যেই তৈরি করেছিলাম।"

হিরণ সাগ্রহে বাক্সটা গ্রহণ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমায় খুব খাওয়ালেন, মা। এগুলো জয়ন্তই খাবে। এত লোকের ভেতর জয়ন্ত খেলো না ব'লে আপনি দুঃখ করবেন না। এ সমস্তই আমি ওকে খাওয়াব। রেকাবের ও গুলোও রুমালে বেঁধে নিচ্ছি।"

হিরণ নত হইয়া খাবারগুলি রুমালে বাঁধিতে লাগিল। জয়ন্ত একবার বক্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিবামাত্র, মেয়েরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি হচ্ছে, হিরণবাবু? খেয়ে কুলোতে না পেরে আবার বেঁধে নিচ্ছেন?"

হিরণ হাসিয়া উত্তর দিল, "বামুনের ছেলে যে? ফলারের ছাঁদা বাঁধাই ব্যবসা। চক্ষুলজ্জার খাতিরে জাত-ব্যবসা ত ছাড়া যায় না।"

হিরণের কথায় সকলেই হাসিতে লাগিল। এক দিকে হাসির ঝরণা বহিলেও অপর দিকে হাসির লেশটুকুও ছিল না। পৃথিবীর এক দিকে যেমন অন্ধকার না হইলে, অপর দিকে আলো হয় না, তেমনই এক দিকে হাসি-গল্পের উচ্ছ্বাস বহিল, অন্য দিকে কয়েকটি হৃদয় বিষাদের অশ্রুসমুদ্রে ভাসিতে লাগিল।

যাত্রাকালে মা মেয়েকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তুই আমায় কিছু বল্লি না, কুহু। বলতে পারলিনে, আমি জান্তে পেরেছি, তোর পথ কাঁটার ওপর দিয়ে হয়েছে। ভয় নেই মা, ভগবান্ তোকে রক্ষা করবেন। ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিস, সত্যে অবিচলিত থাকিস। মা'র আশীর্ব্বাদ তোর সাথে সাথে থাকবে। মনে দুঃখ হ'লে তাঁকেই ডাকিস—যিনি সুখ-দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা। আর একটি কথা মনে রাখিস, মা, হিরণের মত শুভার্থী সুহৃদ্ সংসারে দুর্ল্লভ। আমার দিবার মত ওকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিস, বিশ্বাস করিস।"

"মা, তোমার কথা, তোমাকে আমার সব সময় মনে থাকবে।" বলিয়া কুহু অশ্রুবন্যায় ভাসিতে ভাসিতে বজরায় উঠিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

পল্লী-সন্ধ্যা

সন্ধ্যা নামে সন্তর্পণে; সায়াহ্নের রবি
পশ্চিম-গগন-মেঘে আঁকে রক্তচ্ছবি।
পক্ষী ফিরে নিজ নীড়ে; পক্ষ-বিধূননে
আলোড়িয়া মৃদু স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণে।
দিবসের কর্ম্ম-ক্ষুব্ধ উচ্চ কোলাহল
শ্রান্ত হয়ে আসে ধীরে। সান্ধ্য নভস্তল
মুখরিয়া বাজে শঙ্খ দেবতা-মন্দিরে;
আরতি কীর্ত্তন-ধ্বনি সায়াহ্ন সমীরে
ফিরে ক্ষণকাল।

নম্র পল্লী-বধূ ধীরে
তুলসীর মঞ্চোপরি রাখে দীপটিরে।
তার পর যুক্ত-করে একান্ত নীরবে
স্রষ্টার চরণ পূজে অন্তরের স্তবে।
—হে দেবতা শান্তি দাও কর লক্ষ্মীময়
সংসার হাসুক পুণ্যে পাপ হোক ক্ষয়॥

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়।

সে-কালের স্মৃতি

১৮

জীবনের অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় অতীত স্মৃতির স্তিমিত আলোক ম্লান হইয়া আসিয়াছে, আসন্ন বিভাবরীর তিমির-গর্ভে তাহার বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রবল হইলেও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই; এই জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহালয় দেওঘর হইতে বরোদা গমনের সময়ের ঘটনাগুলি এখনও বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হয় নাই। স্মরণ হইতেছে, শ্রীঅরবিন্দ সেই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নে সাহিত্যরস উপভোগ ও কাব্যচর্চ্চার জন্য তাঁহার মাতামহালয়ে—দেওঘরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বড় মামা স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বাবু আমাকে লিখিয়াছিলেন, ছুটী ফুরাইলে শ্রীঅরবিন্দ যে দিন বরোদায় যাত্রা করিবেন, তাহার দিন দুই তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে সংবাদ দিবেন। তদনুসারে কয়েক দিন পরে আমি দেওঘরে যাত্রা করিলাম। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাত্রা করিতে হইলে নিত্য-ব্যবহার্য্য যে সকল সামগ্রী সঙ্গে লইবার প্রয়োজন হয়, তাহার কিছুই আমার সঙ্গে ছিল না। লোটা-কম্বল সঙ্গে থাকিলে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতাম, এবং একখান ডায়েরী যোগাড় করিয়া লইতে পারিলে, চক্ষু মুদিয়া গুর্জ্জরের ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে পারিতাম; কিন্তু ভাণ্ডে যে পরিমাণ তৈল থাকিলে মুরুব্বীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাদের কৃপায় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের ঘাড়ে সেই কেতাব চাপাইয়া দিয়া, পরস্মৈপদে কিঞ্চিৎ রসসঞ্চয় করিয়া, ভবিষ্যতের সংস্থান ও সাহিত্যিকবৃন্দের নির্জ্জলা স্তুতিবাদ উপভোগ করিতে পারিতাম, ভাঁড়ে তাহার অভাব থাকায় সাহিত্য-দিক্‌পালদের মহাজনীর অনুসরণ করিতে সাহস হয় নাই। যাচিয়া মান এবং কাঁদিয়া সোহাগ সংগ্রহের উচ্চ আদর্শ তখনও বাঙ্গালার মেকি সাহিত্যিকদের ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় প্রদানের সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই।

যথাসময়ে দেওঘরে আসিয়া অরবিন্দের মাতামহ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তাঁহার সারস্বত নিকেতনে 'ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক, ফরাসী-ফোয়ারা' শ্রীঅরবিন্দের সহিত সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতে তিনি আমার মনে আশানুরূপ অনুকূল ধারণা উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে পারি নাই; কিন্তু সেই প্রথম দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার কুঞ্চিত ওষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার, সরল দৃষ্টিতে প্রতিভার, অরুণ-কিরণ-সমুদ্ভাসিত হৃদয়ের কোমলতার এবং পার্থিব জগতের বহু ঊর্দ্ধস্থিত কল্পলোকের স্বপ্নময় ভাবের সহিত তাহার মিলন-মাধুর্য্যের প্রগাঢ়তা অনুভব করিলাম। সে সময় আমার মত সদ্য-পরিচিত 'মাছিমারা কেরাণী' সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা আমার অসাধ্য হইয়াছিল। মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ, ইহা আমার বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই, এবং আমি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম—বৈচিত্র্যবহুল কর্ম্মজীবনের বহু যুদ্ধে শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন, আত্মসমাহিত-চিত্ত সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর যুবক সংসারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখে অবিচলিত ও সম্পূর্ণ উদাসীন। পরবর্ত্তী জীবনে যে নিস্পৃহতা ও নির্লিপ্ততা তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তসংযমের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুকূলতায় তাঁহাকে সাধারণ মানবের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বহু ঊর্দ্ধে ধ্যানমগ্ন যোগীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাঁহার সেই উচ্ছ্বাসবিহীন ও চাপল্য-সংস্রব-বিরহিত, ব্রহ্মচর্য্যরত যৌবনের অনাগত মধ্যাহ্নে তাহার সুস্পষ্ট আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে দীর্ঘকাল পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় নাই। যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, আমি তাহা গ্রহণের এবং বহনের যোগ্য কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করিতে না দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, এ কথা সত্য; কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং দুই একটি কথায়, মানুষের সংস্কারসঞ্জাত অন্তর্নিহিত ভাব আয়ত্ত করিবার যে অদ্ভুত শক্তি ছিল, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সুতীব্র অনুভূতিকে প্রতারিত করে নাই, ইহা আমি পরে অভিজ্ঞতা-সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু সেই গম্ভীরপ্রকৃতি, স্বল্পভাষী, বিলাস-লালসা-বর্জ্জিত, আপনার ভাবে আপনি-বিভোর, আত্মসমাহিত যুবককে কোন দিন সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই। বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও ছিল না।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বাবুকে জীবনে সেই প্রথম দেখিলাম। শুভ্র দাড়ি-গোঁফ, জীবনের উপান্তোপনীত রোগক্লান্ত শয্যাশায়ী বৃদ্ধ, কিন্তু কি সৌম্যমূর্ত্তি! রোগ-যন্ত্রণা যেন তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার হইতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত। জীবনে কখন যোগি-ঋষি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই; কিন্তু সংসারে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত তপস্বীর আদর্শ যেন তাঁহাতেই দেখিতে পাইলাম বলিয়া মনে হইল এবং তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহারই ন্যায় শিক্ষাদানব্রতে উৎসর্গীকৃত-জীবন আর এক জন বৃদ্ধের কথা মনে পড়িল। তিনি স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী। স্বর্গীয় রসরসিক নাট্যকার দীনবন্ধু সরলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভগবদ্ভক্ত এই সাধুর প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সহবাসে পাপাসক্ত মন সাত দিন পবিত্র থাকে। রাজনারায়ণ বাবুর সম্বন্ধেও এই উক্তি তুল্যরূপে প্রযোজ্য বলিয়াই আমার ধারণা হইল। মনে হইল, রতনেই রতন চেনে; নতুবা কি তাঁহার ন্যায় সমপ্রকৃতির স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হইত? বহু দিন পরে এক দিন অরবিন্দ প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দাদামহাশয় (রাজনারায়ণ বাবু) তাঁহার বন্ধু দ্বিজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে যখন হাসেন, তখন তাঁহাদের হাসির গর্‌রায় ঘরের ছাদ উড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়!' এ অনেক দিন পরের কথা; কিন্তু সেই প্রথম দিন কথায় কথায় তাঁহার যে হাসি দেখিয়াছিলাম, সেরূপ শিশুর

ন্যায় সরল হাসির উচ্ছ্বাস অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তির মুখে উচ্ছ্বসিত হইতে দেখি নাই। মন শিশুর মনের ন্যায় সরল ও পবিত্র না হইলে মানুষ ওভাবে হাসিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র, নামযশোহীন সাহিত্যসেবকের নাম পূর্ব্বে কোন দিন তিনি শুনিয়াছিলেন কি না, জানিতাম না, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশেরও সাহস হয় নাই; কিন্তু তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনিই বক্তা, আমি নির্ব্বাক্ শ্রোতা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-প্রসঙ্গে তিনি কত কথা বলিলেন, এত কাল পরে তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু তাঁহার একটি কথা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। চণ্ডীদাসের অমৃত-মধুর পদাবলী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, সেরূপ কামগন্ধলেশ-হীন আদর্শ-প্রেমের কবিতা বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর কোথাও তিনি খুঁজিয়া পান নাই। সে কালের এক জন অত্যুৎসাহী ব্রাহ্মের মুখে চণ্ডীদাসের কবিতাগুলির এই প্রকার প্রশংসা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম; বিশেষতঃ, যখন মনে পড়িল—তিনি ডিরোজিওর সেই সকল ছাত্রের অন্যতম, যাঁহারা মদ্যপানকে হিন্দুর কুসংস্কারের প্রতিবাদ বলিয়া মনে করিতেন, এবং প্রতিবেশীর গৃহে নিষিদ্ধ মাংস-সংলগ্ন অস্থি নিক্ষেপ করা পৌরুষের কার্য্য মনে করিয়া সেই কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন।

রাজনারায়ণ বাবুর সহিত বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে স্মরণ হইল—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ-বধ কাব্য প্রকাশিত হইলে মাইকেল রাজনারায়ণ বাবুর নিকট তাহা পাঠাইয়া দিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার বাল্যবন্ধু ও পরম প্রীতিভাজন সতীর্থের অভিমত জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন; তাঁহার এই অনুরোধে স্পষ্টভাষী রাজনারায়ণ বাবু এই কাব্যের প্রচুর প্রশংসা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের জটা-বাকলের ফাঁক দিয়া কোট-প্যাণ্টলুন দেখা যাইতেছে। এত অল্প কথায় মাইকেল-অঙ্কিত রাম-লক্ষ্মণের চরিত্র-চিত্রের বিশেষত্ব আর কোন সমালোচক প্রদর্শন করিতে পারিতেন কি না, তাহা আমার অনুমান করিবার শক্তি নাই; কিন্তু এই সুসংযত ইঙ্গিতের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। তাহা শুনিয়া তিনি আমোদ বোধ করিয়া, হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই খোলা প্রাণের সরল হাসি। মনে হইতেছে, তিনি যেন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—তাঁহার বন্ধু রাম-লক্ষ্মণের চরিত্র অঙ্কিত করিবার সময় কবিগুরু বাল্মীকির অনিন্দ্য-সুন্দর মহান্ আদর্শ গ্রহণ করেন নাই; তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার সেই আদর্শ গ্রহণের বিরোধী ছিল,—যদিও মাইকেলের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ ছিল, এবং তাঁহার সেই প্রেমের অভিব্যক্তি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' পরিপূর্ণরূপেই পরিস্ফুট হইয়াছিল, এবং এখনও তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমি পূজনীয় রাজনারায়ণ বাবুর নিকট একটি আমোদপ্রদ গল্প শুনিয়াছিলাম। গল্পটি বোধ হয়, সে কালের সাহিত্যামোদী পাঠকগণের অনেকেরই সুবিদিত; তবে এ কালের যে সকল শিক্ষিত যুবক মধুসূদনের কাব্য ও কবিতাদি পাঠের অযোগ্য মনে করেন, সেকেলে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকেও যাঁহারা আমোল দিতে চাহেন না, অথচ যাঁহারা কথায় কথায় সেলী, বায়রণ, কীট্‌স্, সুইনবর্ণ প্রভৃতির নাম শুনিয়াই 'আহা এই শ্রীমাটীতেই শ্রীখোল হয়,' বলিয়া ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া গড়াগড়ি পাড়েন, তাঁহাদের নিকট গল্পটি হয় ত নূতন; এই জন্য এখানে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহ হইতেছে।

তখন ব্রজাঙ্গনা কাব্য সবে মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এ কালের মত তখন মফস্বল দূরের কথা, কলিকাতাতেও ছাপাখানার ছড়াছড়ি ছিল না, এবং বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রন্থকারের কাব্য-নাটকাদি প্রকাশিত হইলে, সেই সকল পুস্তক একালের মত অল্পদিনে মফস্বলের সাহিত্যা-নুরাগী পাঠক-সমাজে প্রচারিত হইত না। তখনও বঙ্গ-দর্শনের যুগ আবির্ভূত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি তখন অমর ঔপন্যাসিকের কল্পনালোকেই বিরাজিত; রমেশচন্দ্র তখন পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হন নাই; তাঁহার বঙ্গ বিজেতা রচনার কল্পনা ত দূরের কথা। তারকনাথের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণলতা সেই সময়ের অনেক পরে রাজসাহী হইতে প্রকাশিত সে-কালের শ্রেষ্ঠ মাসিক-সমূহের অন্যতম 'জ্ঞানাঙ্কুরে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে কত কাল পূর্ব্বের কথা! সেই সময় মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হইবার পর তাহার এক খণ্ড নবদ্বীপের কোনও সাহিত্যরসজ্ঞ সেকেলে পণ্ডিত (তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম,—এবং তিনি বিদ্যারত্ন, কি ন্যায়-পঞ্চানন উপাধিধারী ছিলেন, তাহাও এত দিন পরে আমার স্মরণ নাই) মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' পাঠে তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ব্রজাঙ্গনার কবি যে প্রকৃত সাধক ও প্রেমিক, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

এই সূত্রে সেকালের ও একালের পাঠকগণের চরিত্রগত ও রুচিগত বিশেষত্বেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইতেছে। সে-কালের পাঠকরা কোন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা পাঠে মুগ্ধ হইতেন; তাহা পাঠে উপকৃত হইলেন মনে করিতেন, লেখকের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইত। তাঁহারা প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। আর এ-কালের শিক্ষাভিমানী পাঠকগণের অধিকাংশই সমালোচক, তাঁহাদের সেই সমালোচনায় রসের উপভোগস্পৃহা অপেক্ষা পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টাই অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে; সাহিত্যরস বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া তাঁহারা যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন, তাহার ভিতর হইতে যে দম্ভ ও অহমিকা আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে অশোভন স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না এবং সেই পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত সমালোচনা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—সমালোচক তাঁহার বিশ্লেষণ-শক্তির সাহায্যে পাঠক-সমাজে লেখককে পরিচিত করিয়া যেন ধন্য করিলেন। কিন্তু সে-কালের সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকরা সাহিত্যরস উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন ও আপনাকেই ধন্য মনে করিতেন। তাঁহারা গ্রন্থকার

বা লেখককে ধন্য করিলেন, এরূপ প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না।

এই জন্যই নবদ্বীপের সেই রসগ্রাহী ভক্ত পণ্ডিতের হৃদয় এরূপ শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল যে, তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিকে একবার দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপ হইতে কলিকাতার দূরত্ব অল্প নহে, এবং সেকালে নদীপথে কলিকাতায় যাত্রা করা ভিন্ন স্থলপথে কলিকাতায় উপস্থিত হওয়াও সহজসাধ্য ছিল না। এই জন্য তাঁহাকে নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতে হইল।

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া তিনি মধুসূদনের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার ঠিকানা জানিবার চেষ্টা করিলেন। মধুসূদন তখন খিদিরপুরে বাস করিলেও বৌ-বাজারে সংস্থাপিত "ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসে" প্রায় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন, এবং একটি কক্ষে বসিয়া তাঁহার পুস্তকের প্রুফ্ সংশোধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

মধুসূদন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসে উপস্থিত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রুফ্ দেখিতেছিলেন; সেই সময় নবদ্বীপের পণ্ডিত ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসের ভবনে প্রবেশ করিয়া কোনও কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, মধুসূদন কোথায়? আমি একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

প্রেসের কর্ম্মচারী বিস্মিতভাবে বলিল, "মধুসূদন! আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন ঠাকুর?"

ঠাকুর বলিলেন, "শ্রীধাম নবদ্বীপে আমার নিবাস, আমি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবি—বৈষ্ণবচূড়ামণি, কবিশ্রেষ্ঠ পরম ভক্ত মধুসূদনের সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

কর্ম্মচারী বলিল, "ও, আপনি মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে চান? তাই বলুন। ভিতরে যান, সম্মুখের কুঠুরীতে তাঁকে দেখ্‌তে পাবেন।"

ঠাকুর আশ্বস্ত-হৃদয়ে প্রেসের সম্মুখস্থ কক্ষের ভিতর অগ্রসর হইলেন; তিনি নবদ্বীপ হইতে বহু পরিশ্রমে ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া পরম ভক্ত কবি মধুসূদনকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন; এত দিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে, নয়ন-মন সফল হইবে। মনের আনন্দ ও উৎসাহ গোপন করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, একটা জোয়ান মরদ মেটে ফিরিঙ্গী সাহেবী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কাগজে কি লিখিতেছে!

ঠাকুর সেই মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিলেন; মধুসূদনকে দেখিবার আশায় ভ্রমক্রমে তিনি এ কোন্ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন? ফিরিঙ্গীটা তাঁহার অনধিকারপ্রবেশ মার্জ্জনা করিবে কি? তিনি দুই এক মিনিট হতভম্বভাবে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগের উপক্রম করিতেই সেই গালপাট্টা-নিবিড়-কৃষ্ণ-গুম্ফধারী ফিরিঙ্গী কাগজ হইতে মুখ তুলিলেন, এবং পদ্মপলাশনেত্রে আগন্তুক ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া, স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি এখানে কি চান?"

ব্রাহ্মণ অপ্রতিভভাবে কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "আমি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মহাকবি, পরমভক্ত, সাধক মধুসূদনকে দর্শন করিয়া চক্ষু সফল করিতে আসিয়াছি; কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রমক্রমে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি। তিনি এই ছাপাখানায় আছেন শুনিয়াছি। একবার তাঁহাকে দেখিব—এই আশায় বহুদূর নবদ্বীপ হইতে আসিতেছি। কোন্ কক্ষে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব, দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন কি?"

মধুসূদন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, প্রশংসমান নেত্রে সেই দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মুণ্ডিতমস্তক, শিখাধারী ব্রাহ্মণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় বুঝিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বিনীতভাবে বলিলেন, "ঠাকুর, আমিই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের লেখক মধুসূদন দত্ত।"

ঠাকুর গভীর বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে দুই এক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর মধুসূদনকে বলিলেন, "বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট!"

অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য; কিন্তু সহস্র কথা বলিলেও তদ্দ্বারা মধুসূদনের চরিত্রগত বিশেষত্ব অধিকতর পরিস্ফুটরূপে বুঝাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

যে দুই এক দিন দেওঘরে ছিলাম, শ্রীঅরবিন্দের উভয় মাতুল যোগীন্দ্র বাবু ও মুনীন্দ্র বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। যোগীন্দ্র বাবু সাংবাদিক ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশের কোন অধিকার ছিল না। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দূরে দূরে ভ্রমণ করিতেন। মুনীন্দ্র বাবু পালোয়ান ছিলেন, কুস্তির নানাপ্রকার কসরৎ তাঁহার জানা ছিল। বঙ্গসাহিত্যেরও তিনি সুলেখক ছিলেন। সেকালের পাঠকরা 'সঞ্জীবনীতে' তাঁহার রচিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসগুলি পাঠে আনন্দ লাভ করিতেন। এই শান্তিপূর্ণ, সন্তোষ ও পবিত্রতাবেষ্টিত ভবনে দুই এক দিন অতিবাহিত করিয়া বাঁকিপুর যাত্রা করিলাম। অরবিন্দের এক কাকা সেখানে সরকারী আফিসে চাকরী করিতেন। পিতৃবংশীয় আত্মীয়গণের সহিত অরবিন্দের বা তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের অধিক ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও, অরবিন্দ সুদূর প্রবাসে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার কাকার সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার মেজ দাদা স্বর্গীয় মনোমোহন ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে আকস্মিক পিতৃবিয়োগে দারুণ অর্থকষ্টে যখন চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছিলেন, এবং মাইকেল সুদূর প্রবাসে অর্থাভাবে বিপন্ন হইলে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণ নেত্রের সদয় দৃষ্টি যেমন তাঁহার কাতর মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে বর ও অভয় প্রদানে উৎসাহিত করিত, পিতৃবংশের কাহারও সেইরূপ স্নেহ-কোমল দৃষ্টি সেই সুদূর প্রবাসে তাঁহাদের উদ্বেগ-কাতর মুখের দিকে প্রসারিত না হইলেও, পিতৃব্যের প্রতি অরবিন্দের শ্রদ্ধা ও সম্মানের অভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু তাঁহাদের পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার কোন অভিমত প্রকাশের অধিকার নাই।

বাঁকিপুরে আমাদের দুই এক দিন বিলম্ব হইয়াছিল। আমি সেখানে সেই অল্পসময়ের জন্য কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিব,

তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারি নাই; অবশেষে পিতৃবন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস, মহাশয়ের কথা হঠাৎ মনে পড়িল। পরেশ কাকা তখন বাঁকিপুরে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ইঁহারা দুই ভাই, জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরে কোনও জমীদারের এষ্টেটে চাকরী করিতেন; কনিষ্ঠ পরেশনাথ বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় কিছুকাল স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি—তাহার অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি বাঁকিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুচিকিৎসকের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহারা আবাল্য মেহেরপুরের অধিবাসী ছিলেন, এবং ইঁহাদের সহিত আমাদের পরিবারের আত্মীয়তা-বন্ধন যেরূপ সুদৃঢ় ছিল, নিজের পরিবারের বাহিরে আর কাহারও সহিত আমাদের সেরূপ নিবিড় আত্মীয়তা ছিল না। ইঁহারা দুই ভাই আমার পিতৃদেবকে ঠিক জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, এবং 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন। আমিও তাঁহাদিগকে 'কাকা' বলিতাম, এবং সেইরূপ ভয় ও ভক্তি করিতাম। বাবার এবং বড় কাকার সহিত তাঁহাদের যেরূপ বন্ধুত্ব ছিল, সেরূপ নিঃস্বার্থ প্রীতির আদান-প্রদান একালে অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। আমি যখন নিতান্ত শিশু, সেই সময় হরি কাকা মেদিনীপুর-মহিষাদলের রাজার পরিচালিত মধ্য-ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, তিনিই বড় কাকাকে তাঁহার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। সে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা; তখন স্বর্গীয় রাজা লছমনপ্রসাদ গর্গ মহিষাদলের জমীদার ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে সেই স্কুল এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। কাকা স্কুলের চাকরী করিতে করিতে কুমারদের গৃহশিক্ষক হইয়াছিলেন; পরে তিনি চরিত্রগুণে ও কার্য্যদক্ষতাবলে জমীদারীর ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হরি কাকাকেই তাঁহার উন্নতির মূল বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

হরি কাকা ও পরেশ কাকার জীবন সাধারণ পল্লীবাসীদের জীবনের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে ও বৈচিত্র্যবর্জ্জিতভাবে অতিবাহিত হয় নাই। তাঁহারা যখন কলিকাতা-প্রবাসী, সেই সময় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময় যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ব্যক্তিগত প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এই চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতা কেশব বাবুর সমাজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এবং উপবীত বিসর্জ্জন দিয়া মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিলে, ব্রাহ্মণ-সমাজ-পরিচালিত মেহেরপুরে যে ভীষণ আন্দোলন-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমার শৈশবকালে সংঘটিত সেই সকল ঘটনা যৎসামান্য মনে পড়ে; তথাপি মনে হয়, সমাজের সেই সময়ের অবস্থার সহিত একালের সমাজের তুলনা চলে না। হরি কাকা ও পরেশ কাকা যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহা তাঁহাদের পৈতৃক বাসভবন নহে; সেই বাড়ীর প্রকৃত মালিক ছিলেন তাঁহাদের মাতামহ-বংশীয়রা; এবং তাহা মেহেরপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণী, মুখোপাধ্যায়বংশীয়া স্বর্গীয়া সখীমণি দেবীর অধিকারভুক্ত ছিল। হাইকোর্টের একটি মামলার ফলে, সখীমণি দেবীর মৃত্যুর পর এই সম্পত্তিতে হরি কাকা ও পরেশ কাকা বেদখল হইয়া যান, এবং মুখোপাধ্যায়-বংশের অন্য এক সরিক তাঁহাদের আজন্মের বাসভবন অধিকার করিলে, মেহেরপুরে তাঁহাদের আর মাথা রাখিবার স্থান রহিল না। তাহার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় হিন্দু-সমাজের সহানুভূতিতেও তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন। এই সময় মেহেরপুরের মুখোপাধ্যায় জমীদার-পরিবার বহু সরিকে বিভক্ত হওয়ায় হীনবল হইলেও, 'বড়' ও 'ছোট' উপনামে পরিচিত দুই দীননাথ মুখোপাধ্যায় মেহেরপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের শক্তিশালী পরিচালক ছিলেন। মেহেরপুর-সমাজের ব্রাহ্মণরা সাধারণতঃ তেমন সুশিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন না হওয়ায়, তাঁহারা 'মুকুয্যে বাবুদের' ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইতেন। বাবুদের কাহারও সেকাল-সুলভ কোন গোপনীয় দোষ বা চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ছিল না, এ কথা বলা যায় না; কিন্তু হরি বাবু ও পরেশ বাবু চরিত্রের পবিত্রতায় ও নানা সদ্গুণে শিক্ষিত সমাজের গৌরবস্বরূপ হইলেও, তাঁহাদের উপবীতত্যাগের অপরাধ সমাজ মার্জ্জনা করিতে পারে নাই। ইহার ফলে তাঁহারা চিরদিনের জন্য মেহেরপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরেশ কাকার স্ত্রী লক্ষ্মী কাকী (স্বর্গীয়া মহালক্ষ্মী দেবী) তেলিনীপাড়ার জমীদার-বংশের দুহিতা; কিন্তু তিনিও এই ঘটনার পর পিতৃগৃহে অভিনন্দিতা হইয়াছিলেন, ইহা কোন দিন শুনিতে পাই নাই। হরি কাকা ও পরেশ কাকা মেহেরপুর ত্যাগ করিয়া বিহারে (তখন বিহার বাঙ্গালার ছোট লাটেরই শাসনাধীন ছিল) আশ্রয় গ্রহণ করিলেও আমরা তাঁহাদের স্নেহে বঞ্চিত হই নাই। বড় ভাই যেমন ছোট ভাইএর সংসারে বাস করেন, পিতৃদেব সেইরূপই অসঙ্কোচে দীর্ঘকাল তাঁহাদের প্রবাস-ভবনে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌভ্রাতৃ-বন্ধন কোন দিন শিথিল হয় নাই।

সুতরাং আমি যে দিন বরোদার পথে বাঁকিপুরে পরেশ কাকার প্রবাস-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, সে দিন কাকার ও কাকীমার স্নেহে, আদরে, যত্নে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কয়েক দিন প্রবাসের যে কষ্ট কাঁটার মত বুকে বিঁধিতেছিল, তাহা তাঁহাদের মমতা-ভরা আবেষ্টনের ভিতর আসিয়া অদৃশ্য হইল; মনে হইল, দেশের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

কথায় কথায় কাকীমাকে বলিলাম, "এখানে যে তোমার নূতন বেশ দেখ্‌ছি, কাকীমা! মেহেরপুরের বাড়ীতে তুমি, কুসুম কাকী, (তাঁহার বড় জা, হরি কাকার স্ত্রী) মা—সকলে এক যায়গায় ব'সে যখন সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প করিতে, তখন কোথায় ছিল তোমার জ্যাকেট, সেমিজ, আর কোথায় বা ছিল ঐ জুতো, মোজা! এখানে এসে তোমার রুচি বদ্‌লিয়ে গিয়েছে! এখন বেশ সভ্য-ভব্য দেখাচ্ছে তোমাকে, কাকীমা!"—কাকীমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সেকালের সঙ্গে এ কালের তুলনা দিস্‌নে বাবা। পল্লীগ্রামের সেই সমাজের সঙ্গে এখানকার

সমাজের তফাৎ বিস্তর। যে সমাজে মিশ্‌তে হচ্ছে, সেই সমাজের প্রথা, রুচি ও রীতি-নীতি না মান্‌লে কি চলে? তবে বেশভূষার সঙ্গে যাদের মনের গতির পরিবর্ত্তন হয়, তাদের মনের দুর্ব্বলতার প্রশংসা করতে পারি নে। শিক্ষা ও সংস্কারে মন যদি উঁচু না হয়ে, বৃথা অহঙ্কার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তা হ'লে শিক্ষা, সংস্কার বা সৎসঙ্গের প্রভাব সে মনের দৈন্য ঘুচাতে পারে না, বাবা! যে সব মেয়ে লেখাপড়া শিখে—ধর বি-এ পাশ-টাশ ক'রে মনে করে, 'আমরা এত লেখাপড়া শিখেছি, আমরা হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলব? এক রাশ বাসন মাজ্‌তে বসব,' লেখাপড়া শিখলেও সে শিক্ষার সাফল্য তারা লাভ করতে পারে নি।" কাকী-মা যাহাই বলুন, সেকালে, সেই প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, কাকীমার বেশভূষার পরিবর্ত্তন আমার অনভ্যস্ত চক্ষুতে একটু বে মানান দেখাইতেছিল। কারণ, যে সমাজে আমি পালিত ও বর্দ্ধিত, সেই সমাজের প্রথার সহিত তাহার সামঞ্জস্য ছিল না। কাকীমাকে আর কোন কথা বলিলাম না বটে, কিন্তু রাজসাহীতে বাসকালে আমার সুরসিক বন্ধু সুকবি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের একটি গল্প মনে পড়িল। সেকালে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের মহিলা-সমাজে রুচির যৎসামান্য পরিবর্ত্তন গৃহস্থ বধূদের কিরূপ সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন করিত, গল্পটিতে তাহারই আভাস ছিল। রজনী বাবু এই প্রসঙ্গেই এক দিন বলিতেছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের কোন পল্লীর এক যুবক স্বগ্রামের স্কুল হইতে এন্‌ট্রেন্স পাশ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া কোন কলেজে এল, এ পড়িতেছিল। এল-এ পড়িতে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার অভিভাবকরা একটি সুন্দরী বালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের গৃহস্থের মেয়ে, সভ্যতার সংস্পর্শ-বিহীন আর এক পল্লীতে আসিয়া, শ্বশুর-গৃহে শাশুড়ী, পিসেস, ননদ প্রভৃতি পাঁচ জনের সঙ্গে বাস করিতে লাগিল। তাহার স্বামী কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত, থিয়েটার দেখিত, বেথুন কলেজের অশ্বযুগলবাহিত লম্বা গাড়ীতে, কাণে দুল-পরা, আলুলায়িত-কুন্তলা, সুবেশধারিণী বালিকা ও কিশোরীদের কলেজে যাতায়াত করিতে দেখিত। একালের প্রগতির যুগ তখনও আরম্ভ হয় নাই; তথাপি পথে ঘাটে কোন কোন তরুণীকে সঙ্গিনী সহ অসঙ্কোচে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিত। দেশের বাড়ীতে সজীব পুঁটুলীরূপিণী স্ত্রীটি আধ হাত দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ-চন্দ্র আচ্ছাদিত করিয়া সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার সহিত এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্‌ভাবে গুরুজনের আদেশ পালন করিতেছিল, এই দৃশ্য মনশ্চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়া সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিত। নারীদের এইরূপ পল্লীসুলভ জড়তা ও অস্বাভাবিক লজ্জা তাহার হৃদয়কে এই কদর্য দেশাচার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইল। সে আলোক পাইল।

অবশেষে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পল্লীগ্রামের সেই শিক্ষার্থী পদ্মাপারবর্ত্তী স্বগ্রামে চলিল। তাহার পোর্টম্যাণ্টোতে নবীনা পত্নীর জন্য কত রকম সৌখীন দ্রব্য উপহার লইল, তাহা অপ্রেমিক জনের অনুমান করা অসাধ্য; কিন্তু সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে কাণের এক যোড়া দুল ছিল। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা, সে আদর করিয়া স্বহস্তে সেই দুল যোড়াটি তাহার আদরিণী পত্নীর উভয় কর্ণে দুলাইয়া দিবে। কিন্তু দুল পরিয়া পল্লীবাসিনী বর্ষীয়সীগণের সম্মুখে বাহির হওয়া পল্লীবধূর কিরূপ নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতার পরিচয়, সেই যুবকের তাহা জানা ছিল না। সেই পল্লীর গৃহিণী-সমাজ মনে করিতেন, এরূপ নির্লজ্জতা কেবল নর্ত্তকী (নটী)-দেরই শোভা পায়! গৃহস্থ ঘরের ঝি-বৌ দুল পরিয়া বেহায়াপনা প্রকাশ করিবে? ভদ্রঘরের ঝি-বৌর কি এতই অধঃপতন হইয়াছে? গৃহিণীরা বধূদের সহবতের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

যুবক গভীর রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে পত্নীর দেখা পাওয়ায়, দুল-যোড়াটি পরম সমাদরে তাহার কাণে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলে, তরুণী অসম্মত হইয়া তাহাতে বাধা দানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। দুল-যোড়াটা তাহাকে পরিতেই হইল। ইহাতে সে এতই লজ্জিত হইল যে, লজ্জায় সে আর মুখ তুলিতে পারিল না, তাহার দুর্জ্জয় অভিমানও ভঙ্গ হইল না। ছি, ছি! কি করিয়া প্রভাতে সে গুরুজনকে মুখ দেখাইবে? অথচ দুল খুলিবারও উপায় নাই; স্বামী তাহাকে দিব্য দিয়াছেন—স্বেচ্ছায় সে দুল খুলিলে, তাহাকে তাহার স্বামীর মরামুখ দেখিতে হইবে।

প্রত্যূষে স্বামী শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করিলে, তরুণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিল এবং কাহাকেও মুখ দেখাইতে সাহস না হওয়ায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল। নয়নে অশ্রুধারা।

বেলা ক্রমশঃ অধিক হইল, পুরাঙ্গনারা সকলেই প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলেন; কিন্তু নূতন-বৌ দ্বার খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল না; কাহাকেও সাড়াও দিল না। অবশেষে তাহার ননদ—সেই এল, এ পড়া যুবকের জ্যেষ্ঠা ভগিনী—তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিয়া ডাকিল,—"বৌ, তোমার কেমন আক্কেল? এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম! দুয়োর খুলে শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো।"

বিস্তর ডাকাডাকিতে বধূ সাড়া দিয়া ভারী গলায় বলিল, "আর কি আমার বাইরে যাওনের মুখ আছে? তোমার ভাই আমার সব্বোনাশ কইরা গেছে; আমারে নটী সাজাইছে!"

যেকালে গৃহস্থ বধূকে দুল ব্যবহারের জন্য এইরূপ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত, সেই কালে ভদ্র মহিলারা সেমিজ-ফ্রকে সজ্জিত হইয়া, জুতা পায়ে দিয়া পাঁচ জনের সম্মুখে বাহির হইলে পল্লীসমাজে তাঁহাদিগকে কিরূপ গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত, কাকীমার তাহা অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং ঐ দুলের গল্পটি সে সময় আমার স্মরণ হইলেও, আমি জিহ্বা সংযত করিলাম।

পরেশ কাকা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরম ভক্ত ছিলেন। কেশব বাবু স্বরচিত বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কুচবিহারে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং প্রত্যাদেশের আরোপ করিয়া এই কার্য্যের সমর্থন করায় অনেকেই তখন কেশব বাবুর অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ নববিধান সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেকে কেশব বাবুর প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া ও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থিত নববিধানী মন্দিরে উপাসনায় বিরত হইয়া, নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ-মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনেকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা

করিয়াছিলেন—"স্বর্গ যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব দাও।"—এই প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থাতেও পরেশ কাকা নির্ভীক সেনানীর ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কেশব বাবুর পতাকা বহন করিয়াছিলেন। কেশব বাবুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিদর্শন-স্বরূপ কেশব বাবুর পুত্র করুণাকুমারের নামের অনুকরণে তিনি তাঁহার পুত্রেরও করুণাকুমার নাম রাখিয়াছিলেন। এই করুণাকুমারই কলিকাতার স্বনামধন্য সুপ্রতিষ্ঠিত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার কে, কে, চাটার্জ্জি। ডাক্তার চাটার্জ্জির পরিচয় দিতে গিয়া আমি মৃৎপ্রদীপের আলোকের সাহায্যে মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল দিবাকরকে দেখাইবার চেষ্টায় হাস্যাস্পদ হইবার ইচ্ছা করি না।

আমি বরোদার পথে বাঁকিপুরে যখন পূজনীয় পরেশ বাবুর প্রবাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করি, সে সময় করুণাকুমার যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট। এক দিন তিনি য়ুরোপে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বদেশীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে বরণীয় আসন অধিকার করিবেন, 'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।' শাস্ত্রকারের এই ভবিষ্যৎবাণী সফল করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতার গৌরব বর্দ্ধন করিবেন, ইহা কি তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলেন ? এখন প্রায় সেই অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বের তাঁহাদের কথা মনে পড়ে—যাঁহারা পরেশ বাবুকেও মেহেরপুর হইতে বিদায় করিয়া আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণের অনেকে ডাক্তার করুণাকুমারের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দান করা শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় মনে করেন, এবং তাঁহার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত থাকেন। ভাগ্য-দেবতার বিধান এইরূপ বিচিত্র!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অন্ধতমোবিনাশী

হে পাবক, প্রোজ্জ্বলন্ত
অন্ধ-তমো-বিনাশি !
আজি অকস্মাৎ আসি,
তব নভ-রঞ্জন চুম্বন রচি'
অট্ট অট্ট হাসি'—
জ্বালি' তোলো তব মহোল্লসিত
লেলিহ-লিহ-লীলায়িত
সহস্রমুখ-ঝলক-ঝলল
রক্তোজ্জ্বল
অনল-উথল
বাণী,
তব খর-কৃপাণ-পাণি,
তব বিজয়দৃপ্ত মুক্ত-নৃত্য-ধারা—
গতি দিগ্ দিগন্ত-হারা।
আজি প্রলয় আন' প্রলয় আন'
অযুত-অগ্নি-বজ্র হান'
ধ্বংস-রূপ রূপায়িত
হে ভৈরব,
তব তাণ্ডব
তানে—
চির তমসাবৃত নিশ্চেতন বিশ্বজগৎ-প্রাণে
নব জীবন-রস-দানে—
তুমি জাগ্রত কর' তারে তব—
পরশ-হরষ উদ্ভাসিত গানে।

আজি যুগসঞ্চিত
যত পুঞ্জিত
কৃষ্ণগ্লানি জ্বালি।
শত দহন-নির্ঝর ঢালি'
যত তম-বন্ধন
করি' মোচন
আগে চল'—আগে চল' আগে।
নব নব দীপক-রাগে
তুমি আনো নব আলো,
মম মর জীবন জ্বালো
তব দীপ্ত অমর লক্ষ বর্ত্তিকাতে
ধর তব আপন হাতে,
তব সমুজ্জ্বল প্রভাতে
মোরে সাথী করি' লহ হে তব সাথে,
তব চিরজাগরলোকে লহ আজি
তব সুবর্ণনিভ নব-দীপক-রাগে মম
তনুর রুদ্র-তারে
ধ্বনি আনন্দিত ঝলসিত ঝঙ্কারে—
শত মীড় গমকি' গমকি' উঠুক বাজি।

তব আদিহীন অন্তহীন বিশাল সত্তাতে
মম মনপ্রাণ হরিয়া—
তব অপ্রমেয় প্রেমোজ্জ্বল আলিঙ্গন ভরিয়া—
লহ ধরিয়া।

এসো হে ভাস্কর বিবস্বান্ হে !
মম চিত্তে তব বিত্ত আন হে !
আজি বহ্নি-পুলক-পরশ-মধু-প্রয়াসী
প্রাণ আলো-উল্লাসী
হোক নব-নবীন-নিখিল-সৃজন-রচনা-উদ্ভাসী
এস দেবোত্তম হে পাবক
অন্ধ-তমো-বিনাশি ! *

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)

---

* লঘুগুরু ছন্দে মাত্রাবৃত্তেরই ঢং—কেবল তফাৎ এই যে, লঘুগুরু ছন্দে সংস্কৃতের মতন আ ঈ ঊ এ ও প্রত্যেকে দু'মাত্রার মর্য্যাদা পায়।

ঘরের বউ

(তৃতীয় পর্ব্ব)

১

কিরণ এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিল। গাড়ীখানি বারান্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে কিরণ উঁকি দিয়া চাহিল। তার পর গাড়ী হইতে নামিয়া বারান্দায় গিয়া উঠিল; বরুণাও আসিয়া তখন হলঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"ও—তু—তুমি—এসেছ—"

"হাঁ, এসেছিই ত। আস্‌তে হ'ল। বাবা পাঠালেন।"

"তা—এসেছ—বেশ—" বলিতে বলিতে কিরণ দরজার এক পাশ দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। বরুণাও সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে আসিল। কহিল, "হুঁ—! আমি এসেছি দেখে বিশেষ সুখী হ'চ্ছ বলে ত মনে হ'চ্ছে না। প্রত্যাশাও বোধ হয় করনি যে আমি আবার ফিরে আসব!—"

"প্রত্যাশা—হাঁ—আস্‌বে, তাই করেছিলাম বটে—"

টুপীটা খুলিয়া র‍্যাকে রাখিয়া কিরণ একখানি কৌচে গিয়া বসিল।

"আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবছিলে, না এলেই বাঁচি। আর আজ এসে পড়েছি, ঠিক যেন একটা আপদ-বালাইয়ের মত! হাঁ, ঠিক তাই মনে করছ!"

বরুণার কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় ও কম্পিত হইয়া উঠিল। মুখখানি অন্য দিকে একটু ফিরাইয়া লইল। কিরণ চাহিয়া দেখিল; কহিল, "ও সব কথা কেন বলছ? তুমি আস্‌বে—তোমারই ঘর-সংসার—অনর্থক রাগ ক'রে চ'লে গেলে—আমি ত—"

"স্পষ্ট বলেছিলে—গেলে তুমি সুখী বই দুঃখিত একটুও হবে না। আর আজ—আজ—ফিরে এসেছি—দেখে—দেখে তুমি চমকে গেলে! যেন—যেন—সত্যিই—একটা বিভীষিকা তোমার আমি—"

বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া হাত ধরিয়া কিরণ তাহাকে কৌচের পাশে আনিয়া বসাইল।

স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বরুণা কহিল, "কেন, কি অপরাধ করেছি আমি? তুমি—তুমি এমন একটা সর্ব্বনাশ করেছ।—এখন—এখন আবার আমাকেই অপরাধী করছ!"

কিছু শান্ত করিবার প্রয়াসে বরুণার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কিরণ কহিল, "অপরাধের কথা কেন তুলছ?—তোমার কোনও অপরাধ হয়েছে, এমন কথা ত আমি কিছু বলিনি!"

"কিন্তু যা বল্লে—আমায় দেখে চমকে উঠে যে ভাবে কথাগুলো বল্লে—"

"হাঁ, চমকে একটু গিয়েছিলাম বটে!—তুমি যে এত শীঘ্র নিজে আবার ফিরে আস্‌বে—"

মুখ তুলিয়া বরুণা চাহিল। চক্ষু মুছিয়া কহিল, "কেন, বল্লে না প্রত্যাশাই করেছিলে আমি আবার ফিরে আসব—"

"হাঁ, ফিরে আস্‌বে, সেটা ভেবেছিলাম।—কিন্তু এই কদিনেই—এখুনি আবার—"

"আস্‌ব ভাবনি। আর এসেছি—সেটাও না, যেন ভালই লাগছে না তোমার! তা না লাগে, খুলেই বল না? আমাকে এড়িয়েই যদি থাক্‌তে চাও, বেশ, খুলেই বল। এসেছি—মা বল্লেন, বাবা বল্লেন, আমি—আমি নিজেও পার্‌লাম না—"

ফুকারিয়া আবার সে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণ নীরব। একটু সামলাইয়া বরুণা কহিল, "তা এসেছি, অসুখী যদি হও, ভাল না লাগে, বল, এখুনি—এখুনি আবার চ'লে যাচ্ছি।"

"কেন ও সব বলছ, বরুণা? তুমি ফিরে এসেছ, তাতে আমি অসুখী, সেটা আমার ভাল লাগছে না, এমন কোনও কথা ত আমি বলিনি—"

"বলনি—না মুখে বলনি। কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝতে পারছি, আমায় দেখে তুমি সুখী হওনি—এসেছি, সেটা ভালই তোমার লাগছে না! ওঃ! কেন এলাম, কেন এলাম! যা তুমি করেছ, তার পর আবার যে এখুনি সত্যি ফিরে এসেছি—না, কেন এলাম, কেন এলাম! কেন নিজের মান-ইজ্জতের কথা একটিবার ভাব্‌লাম না? আবার তুমিও মনে মনে বিরক্ত হচ্ছ, ভাবছ, আপদটা কেন আবার ফিরে এল—"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া বরুণা কাঁদিতে লাগিল। নীরবে কিরণ একটি সিগারেট ধরাইল। বরুণা কহিল, "কিসে যে এমন একটা আপদ-বালাই তোমার হলাম, বুঝতে পারছি নি। কত বড় একটা দাগা আমাকে দিয়েছ, কিছুই গায়ে তুলে নিলাম না। চ'লে গিয়েছিলাম, সব ক্ষমা ক'রে নিজেই আবার দুদিন বাদে ফিরে এলাম। অথচ তুমিই যেন আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারছ না। কি যে অপরাধ আমার হ'ল,—ফিরে যে এলাম, তা তুলেও আবার খোঁটা দিচ্ছ।"

"ভুল বুঝো না, বরুণা। খোঁটা দিইনি আমি। তবে যে কারণে যে ভাবে রাগ ক'রে চ'লে গেলে—ফিরে এসেছ দেখে কিছু বিস্মিত হয়েছিলাম বটে—"

"বিস্মিত? কেবল বিস্মিত? বিরক্তও হয়েছ! যাবার সময় স্পষ্ট বলেছিলে, কথাগুলি আমি ভুল্‌তে পারিনি, পারবও না জীবনে কখনও! বলেছিলে, গেলে তুমি সুখী বই দুঃখিত হবে না। আর—আর—আর—না, সে কথা মুখেও আমি আন্‌তে পার্‌ছিনি!—তবে কি করব? মেয়েমানুষ, আরও এ দেশের মেয়ে। যাই কর, সবই আমাদের সইতে হবে। স'য়ে আবার তোমাদের সেবাও কর্‌তে হবে!"

বলিয়াই হঠাৎ বরুণা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কিরণ একটিবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। নীরবে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাত-মুখ ধুইল; কাপড়-চোপড় বদলাইয়া আবার কৌচে আসিয়া বসিল। একটি বালক ভৃত্য সাদা কাপড়ে ঢাকা ছোট একটি হালকা টেবল আনিয়া সম্মুখে রাখিল। একখানি

প্লেটে কিছু খাবারসহ বরুণা এবং তাহার পশ্চাতে আর একটি ভৃত্য একখানি ট্রের উপরে চা দুধ চিনি পেয়ালা চামচ ইত্যাদি সহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্লেটখানি কিরণের সম্মুখে টেবলের উপরে রাখিয়া বরুণা এক কাপ চা প্রস্তুত করিল। করিয়া তাহাও আনিয়া নীরবে টেবলের উপরে রাখিয়া নিকটেই পৃথক্ একখানি চেয়ারে গিয়া বসিল।

কিরণ কহিল, "তুমি খাবে না কিছু ?"

"না, ক্ষিদে নেই। তুমি খাও। ক্লান্ত হয়ে এসেছ—"

"এক কাপ চা অন্ততঃ—"

"চা—" বলিয়া বরুণা ট্রেখানির দিকে চাহিল।

"দিক্ না তৈরী ক'রে ? বয় !"

"বয়" আসিয়া সেলাম করিল। আদেশ পাইয়া এক কাপ চা তৈরী করিয়া আনিয়া বরুণার হাতে দিল।

কিরণ কহিল, "খোকারা কোথায় ?"

"টমকে নিয়ে রঘুয়া কোথায় বেরিয়েছে। জিমকে ত দেখ্‌লাম এই লখিয়ার কোলে।—দেখি।"

"না না, তুমি বসো, চা-টা আগে খেয়ে ফেল। আস্‌বে লখিয়া যখন হয়। ভাল আছে ত তারা ?"

"আছে।"

চায়ে দুই একটা চুমুক দিয়া বরুণা স্বামীর দিকে একবার চাহিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বড্ড রোগা দেখাচ্ছে তোমাকে। অসুখ-বিসুখ হয়েছিল কিছু ?"

"না, অসুখ-বিসুখ এমন কিছু হয়নি। তবে—হাঁ—মনটা ত ভাল ছিল না,—ঘুমও কদিন ভাল হ'ত না। তুমিও ত দেখ্‌ছি বেশ রোগা হয়ে গেছ—"

"ও কিছু না।" বলিয়াই বরুণা মুখখানি ফিরাইয়া লইল। চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বেগ সামলাইতে না পারিয়া হঠাৎ উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। চায়ের পেয়ালাটি এক হাতে ছিল। আর এক হাতে আঁচলে রগড়াইয়া চক্ষু দুটি মুছিল, কিন্তু অশ্রুর বেগ ছাই আর বাঁধ মানে না। বারান্দা ঘুরিয়া অন্য পথে বরুণা গিয়া বাথ-রুমে প্রবেশ করিল। চোখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিয়া তোয়ালেখানি লইয়া বেশ করিয়া মুখ মুছিল। তার পর ধীরে ধীরে আবার গৃহে প্রবেশ করিল। কিরণের তখন খাওয়া হইয়াছে। খাবারের রেকাবখানি ও চায়ের পেয়ালা সরাইয়া রাখিয়া বয় সিগারেটের কৌটা, ash tray এবং দিয়াশলাই আনিয়া রাখিল। কিরণ একটি সিগারেট ধরাইল। দরজার কাছে গিয়া গলা তুলিয়া বরুণা ডাকিল, "লখিয়া !"

লখিয়া শিশু জিমকে কোলে লইয়া ঘরে আসিল; হাসিমুখে গিয়া সাহেবের কাছে দাঁড়াইল।

গভীর একটি নিশ্বাস কিরণের বুক ভরিয়া উঠিল; তাহা চাপিয়া কিরণ ছেলেটির দিকে হাত বাড়াইল। তেমন একটা আদরের সাড়া না পাইয়াই হউক, কি যে কারণেই হউক, শিশু কেমন যেন স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাহিয়াছিল। হাত বাড়াইতেই ঘুরিয়া লখিয়ার গলাটি জড়াইয়া ধরিল। বরুণা কহিল, "যা, ওকে নিয়ে যা এখন।"

বরুণা বসিয়াই রহিল,—কথা কিছু কহিল না, তবে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই একবার স্বামীর দিকে চাহিতেছিল। কিরণ বড় অস্বস্তিই বোধ করিতেছিল। একবার মনে হইল, এই নীরব স্থিরতা কি বড় একটা ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ ?—ভাবিল, বাহিরে একবার বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না। উঠি উঠি করিয়া উঠিবে, এমন সময় বরুণা কহিল, "শরীর খারাপ হয়েছে—ডাক্তার কাউকে দেখিয়েছিলে ?"

"না।—শরীর ত এমন খারাপ কিছু হয়নি আমার।"

"বল্‌ছিলে রাত্রে ঘুম হয় না।"

"হয়নি কদিন। তবে গেল দু'রাত ঘুম মন্দ হয়নি।"

"কোথায় গিয়েছিলে তুমি ? কল্‌কেতায় ?"

"না।"

"তবে কোথায় ? বেনারস ? না বোম্বে ?"

কিরণ কহিল, "না। যাই, একটু ঘুরে আসি গে কারখানার ওদিকে—"

"কোথায় গিয়েছিলে তবে ? শুনলাম, ৬।৭ দিন আগে তুমি বেরিয়ে গেছ। কোথায় গেছ, কাউকে ব'লে যাওনি।"

"না।"

"কোথায় গিয়েছিলে ?"

"দেশে।"

"দেশে। দেশে—কোথায় ?" চমকিয়া বরুণা চাহিল। চক্ষু-মুখও কেমন যেন লাল হইয়া উঠিল।—

"কোথায় আবার ? আমাদের বাড়ীতে।"

"বাড়ীতে !—বাড়ীতে।—হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন সেথায় হ'ল ?"

"প্রয়োজন—কেন নিজের দেশ গাঁ—বাড়ী-ঘর—"

"আজ হঠাৎ এত দরদ হ'ল—কই, এই ক'বছর ভুলেও ত নামটি কখনও করনি। দেশ গাঁ, বাড়ী-ঘর—এ সব ব'লে কোথাও তোমার কিছু আছে, এমন মনেও ত কখনও হয়নি।"

"হয়নি—হাঁ—তা না হ'তেও পারে। কিন্তু তাই ব'লে এটাও ত ঠিক ধ'রে নিতে পারনি যে, ভুঁইফোড় একটা জানোয়ার কেউ আমি উঠেছি কি আস্‌মান থেকে দানো কেউ একটা ঝ'রে পড়েছি—"

"অন্ততঃ এটা ধ'রে নেবার কারণ যথেষ্ট পেয়েছিলাম যে, দেশ গাঁ একটা যেথাই থাক, সেথায় আপন জন কেউ তোমার নেই, কোনও বন্ধনও কারও সঙ্গে কিছু নেই। আর এ হিসেবে ঠিক আসমান-ঝরা দানো কেউ না হও, ভুঁইফোড় একটা—"

"থাম ! সাবধান হয়ে কথা বল, বরুণা ! আমার পৈতৃক দেশ গাঁ, পৈতৃক কুল বংশের অমর্য্যাদা ক'রে কোনও কথা ব'লো না। বড় সহরের যত বড়ই একটা বড়লোক তিনি আজ হ'ন, কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলে ত ? অমন একটা দেশ গাঁ তোমার পিতারও ছিল। কুল-বংশেও আমার পিতার চাইতে এমন বড় কিছু তিনি নন।"

রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া কিরণ চাহিল! হঠাৎ একটু অপ্রতিভ হইলেও ইহাতে দমিয়া যাইবার পাত্রী বরুণা ছিল না। সোজা মুখ তুলিয়াই কহিল, "এত বড় দেশ গাঁ—এত বড় মর্য্যাদার কুল বংশ তোমার—তা এত দিন কোনও পরিচয় ত আমাদের জান্‌তে দাওনি।"

"যেচে দেওয়ার প্রয়োজন আমি মনে করি নি। জেনে নেওয়া উচিত ছিল তোমার বাবার, যখন কন্যা আমার হাতে সম্প্রদান করেন—"

"সম্প্রদান!—সম্প্রদান করেন! বিবাহ দেন বল! জড় একটা জিনিষ-পত্তর কি কেনা দাসী আমি নই যে, সম্প্রদান করবেন!"

একটু মুখ বাঁকাইয়া কিরণ উত্তর করিল, "হিন্দুর বিবাহে বরকে কন্যা সম্প্রদানই করা হয়। শিক্ষিতা ব'লে গর্ব্ব কর, বিয়ের সময় মন্তরগুলোর অর্থও কি কিছু বোঝনি? আর তখন আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহের নাম গোত্রও বলা হয়, সেগুলোও কি কাণে যায়নি?"

বরুণা কহিল, "ও সব বাইরের ফর্ম্মালিটী (formality) কেয়ারই আমি কিছু করি নি! আমি জান্‌তাম, নারী আমি, বিবাহ হচ্ছে আমারই মনোনীত এক প্রেমপাত্রের সঙ্গে। তার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এরা আমার কে? কেউ এরা থাক্ কি না থাক্, কিছু এসে যায় না।"

"অন্ততঃ এরা ছিল, সবারই থাকে। আর তোমার সেই মনোনীত প্রেমপাত্র জন্মেছিলও এদেরই রক্তমাংসে। সে সম্বন্ধটাও কেউ একেবারে মুছে ফেল্‌তে পারে না।"

"তুমি অন্ততঃ ফেলেছিলে।"

"ফেল্লে—ফেল্‌তে পার্‌লে বিয়ের সময় তাঁদের নামগুলো করা হ'ত না। সাহেবদের মত কেবল আমারই নামটা করা হ'ত। সে যাই হ'ক্, এখন ত জান্‌তে পেরেছ, দেশ গাঁও আমার একটা আছে, আর সেথায় আপন জনও অনেক কেউই আছেন। মা আছেন, ভাই বোন আছে—"

"স্ত্রীও একটি আছে—এদের চাইতেও আপন—হয় ত এখন আমার চাইতেও—"

"আপন আরও কারও চাইতে হ'ক্ না হ'ক্, স্ত্রী যে একটি আছে, সে সত্যটাকে তোমরাও আর অস্বীকার কর্‌তে পার না, আমিও পারি না।"

"এত দিন ত করেছ। আজ যে ধরা পড়েছ, গোপন কর্‌তে পার্‌ছ না, সেটা এমন গৌরবের কথা কিছু তোমার নয়। মানুষ হ'লে লজ্জায় আজ মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে, মুখ তুলে চড়া মেজাজে কড়া কড়া অত কথাই বল্‌তে পার্‌তে না!"

"লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে থাকবার কোনও কারণ আমার নেই। থাক্‌লে তোমার বাবার আছে, যিনি পার্থিব ভাগ্যে আমার বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা দেখে যেচে তোমাকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন, খোঁজ-খবর আর কিছু নেন নি।"

"কিন্তু তুমি—তুমি কেন বিবাহ কর্‌তে আমাকে চেয়েছিলে?"

"আমি চাইনি। সম্বন্ধের প্রস্তাব আমি আগে করিনি, তিনিই করেছিলেন।"

"প্রস্তাব কে আগে করেছিল, জানিনে। কিন্তু তুমি—তুমি—আজ মনে নেই কিছু—সব ভুলে গিয়েছ—ভালবাসার ছলে—"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। একটু কোমল স্বরে কিরণ তখন কহিল, "ছল করিনি বরুণা, ভালই তখন তোমাকে বেসেছিলাম—ভালই তোমাকে খুব লাগ্‌ত। কিন্তু তোমার বাবা যদি অত আগ্রহ ক'রে দিতে না চাইতেন, যেচে আমি বিবাহের প্রস্তাব করতাম না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে বরুণা কহিল, "ভালই বেসেছিলে? ভালই লাগত? সত্যি বেসেছিলে? সত্যি লাগত? কিন্তু আজ সে ভালবাসা কোথায় গেল? আজ কেন আর ভাল আমাকে লাগছে না? কি অপরাধ করেছি আমি? ক'রেই যদি কিছু থাকি, মেয়েমানুষ আমি, তোমার পরিণীতা স্ত্রী—ক্ষমা কি কর্‌তে পার না?"

উঠিয়া বরুণার হাত ধরিয়া কিরণ তাহাকে আবার কৌচের পাশে আনিয়া বসাইল। গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, "আর ও সব কথায় কায নেই, বরুণা। ক্ষমা—তুমি স্ত্রী, অপরাধ যাই যখন হ'ক কর্‌তে আমি বাধ্য। তবে আমার ক্ষমা বড় কিছু করবার নেই। কর্‌তে তোমাকেই হবে। ক'রেই চল্‌তে হবে। যা হবার হয়ে গেছে। এ নিয়ে মিছে এখন গোল-মাল ক'রে লাভ কিছু নেই। কেবল অশান্তিই হবে। যেমন আমার, তেম্‌নি তোমারও।"

"কিন্তু—কিন্তু—তুমি ত গিয়েছিলে! আর গিয়েছিলেও তার—তারই কাছে—"

"গিয়েছিলাম, তা কি হয়েছে? নিশ্চিন্ত তুমি থেকো, সে তার কোনও দাবী নিয়ে এখানে আস্‌বে না।"

"কিন্তু তুমি—তুমি ত যাবে। হয় ত যখন তখনই আমায় ফেলে যাবে, সেথায় গিয়ে থাক্‌বে। তার সঙ্গে—"

"স্বামি-স্ত্রী ভাবে কোনও সম্বন্ধ আমার হবে না—যদি স্ত্রী হয়ে আমার সংসারে তুমি থাক।"

"কিন্তু যাবে ত?"

"যেতেও হয় ত কখনও পারি। কেন যাব না? মা আছেন, ভাই বোন্ দুটি আছে—"

"এদ্দিনও তারা ছিল। এই পাঁচ ছ' বছর—"

"খোঁজ-খবর কিছু নিই নি। নির্ম্মম পশুর মতই ব্যবহার করেছি। কিন্তু না, আর তা পারব না, বরুণা।"

"কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কি বল্‌তে চাও? সুরবালা সেখানে আছে? কি করব? সে থাক্‌বেই ওখানে। ওঁদের ছেড়ে কোথাও আর যাবে না। কিন্তু বল্লাম ত—"

"যাই বল, এবার যে গিয়েছিলে—সে ত তারই কাছে, তারই টানে; হয় ত—হয় ত আমি চ'লে গিয়েছি, তাকেই আন্‌তে গিয়েছিলে—" বলিয়া বরুণা স্বামীর মুখপানে চাহিয়া একটু যেন অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "হাঁ, তাই গিয়েছিলে! বল—বল, খুলেই বল, তাই গিয়েছিলে!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিরণ কহিল, "গিয়েই যদি তাই থাকি, এমন কি অপরাধ কিছু হয়েছে, বরুণা? স্পষ্ট তুমি এই ব'লে চ'লে গেলে, আমার স্ত্রী হয়ে এ সংসারে আর থাক্‌তে পার না।"

"তা হ'লে বল, আমি আর তোমার কেউ নই, সে-ই সব! তাকে নিয়েই থাক্‌তে চাও, আর আমাকে চাও এড়াতে। ও—তাই—তাই বুঝি আমাকে দেখে অমনি চম্‌কে গিয়েছিলে! ভেবেছিলে আপদটা কেন আবার এল!"

"আবার কেন ও সব অপ্রিয় কথা তুলছ, বরুণা ?"

"অপ্রিয়! অপ্রিয় হ'লেও সত্য কথাই বটে। আর খোলাখুলি সব বলাই ভাল। ওঃ! এত—এত নিষ্ঠুর, এত নির্ম্মম তুমি! আর এখনও এই প্রতারণা! বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—"

"প্রতিশ্রুতি ? না, কোনও প্রতিশ্রুতি তাঁকে আমি দিই নি।"

"দেওনি ? মিছে বল্‌ছো, অন্ততঃ এটা তাঁকে স্পষ্ট বুঝ্‌তে নিশ্চয়ই দিয়েছিলে, তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ তুমি রাখ্‌বে না।"

"অন্ততঃ থাক্‌বে না, এটা হয় ত তিনি বুঝেছিলেন, যদি ফিরেই তুমি এস।"

"যদি ফিরেই আমি আসি! যদি আসি! তা হ'লে আমার এই ফিরে আসাটা তুমি চাওনি? এসে পড়েছি—তাই অগত্যে ভালমানুষে তার খাতিরে তার সঙ্গে সম্বন্ধ তোমার থাক্‌বে না, অথবা রাখ্‌তে পার না ? কিন্তু চাও তুমি তাকেই, আমাকে আর নয়। ওঃ! কেন আমি এলাম—কেন এলাম! না, পারব না—পারব না! থাক্‌তে আর পারব না!"

"থাম—থাম! শান্ত হও বরুণা, মিছে আর—"

"না, ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও আমাকে। কেউ ত আর আমি তোমার নই। কেন থাক্‌ব? ওঃ! কি হ'ল! কি এ হ'ল আমার! না, ছাড়—ছাড়! সইতেই আমি আর পার্‌ছি না।"

জোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বরুণা চলিয়া গেল।

স্তব্ধভাবে কিরণ কতক্ষণ বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইল।

রাত্রি প্রায় ৮টায় কিরণ ফিরিয়া আসিল। শুনিল, দরজা বন্ধ করিয়া মেমসাহেব শুইয়াই আছেন, বাহির আর হন নাই; কেহ গিয়া ডাকিতেও সাহস করে নাই। কিরণ গিয়া ডাকিল; দরজায় কয়েকটা ঘা দিল। দরজা খুলিয়া বরুণা বাহির হইল; কহিল, "যাও, খাওয়া হয়ে থাক্‌লে গে' শুয়ে থাক্‌তে পার।"

"আর তুমি ?"

"আমি ও ঘরে গিয়ে শুচ্ছি।"

"খাবে না ?"

"ক্ষিদে হয়নি। মাথা ধরেছে—"

পাশ কাটাইয়া বরুণা সম্মুখের দিকে চলিল।

কিরণ কহিল, "কেন আর এ পাগলামো করছ, বরুণা ? বল, না হয় আমিই গিয়ে অন্য ঘরে শুচ্ছি। কিন্তু খাবে না কেন ?"

"বল্লাম না ক্ষিদে হয়নি, মাথা ধরেছে ?"

"ও ত ছুতো। রাগ হয়েছে—কত এমন রাগারাগি আমাদের হয়। তা, না খেয়ে কেন থাক্‌বে? এস, এস, যা হয় কিছু মুখে দিয়ে তার পর গে' শুয়ে থাক। এস, লক্ষ্মীটি, এস।"

হাত ধরিয়া বরুণাকে কিরণ কাছে টানিয়া আনিল। কাঁদিয়া স্বামীর বুকে বরুণা মাথাটি রাখিল; ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল! আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাইয়া কিরণ কহিল, "এই দেখ! কি পাগলামো করছ। সবাই ওরা দেখ্‌ছে, কি বল্‌বে, বল ত? পাড়ায় গিয়ে গল্প করবে। এত বড় একটা সংসারের কর্ত্রী তুমি, সবাই হাস্‌বে, ছি!"

মুখখানি বুকেই ছিল। দুইখানি হাত বাড়াইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে বরুণা কহিল, "তুমি—তুমি ত যাবে! আবার যাবে! কবে যাবে?—"

"পাগল! ওই কেবল ভাব্‌ছ। যাব—সে আজই কি? এই ত কেবল ফিরে এলাম।"

"কিন্তু যাবে ত আবার—হয় ত একমাস কি দু' হপ্তা পরেই আবার যাবে—"

"তাও কি হয় কখনও? পাগল! পরের চাকরী করি না আমি ?"

"কবে তবে যাবে ?"

"সে কি ক'রে এখুনি বল্‌ব ? হয় ত বছর দেড় বছরেই হবে না। মা যদি কখনও লেখেন, কি তাঁর অসুখ-বিসুখ একটা কিছু হয়েছে খবর পাই, তুমিই বল না, না গিয়ে তখন পার্‌ব? হঁা, বসো, বসো, এইখেনে। দাঁড়িয়ে এভাবে—কেমন কেঁপে উঠলে, হয় ত ভিরমী-টিরমী দিয়েই প'ড়ে যাবে। ব'সো।"

ছোট একখানি কৌচ দরজার বাহিরেই ছিল, বরুণাকে বসাইয়া কিরণ নিজেও পাশে বসিল। রোদন-বেগ কিছু সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া বরুণা কহিল, "তা যখন যাবে, একলা আমায় ফেলে যেতে পার্‌বে না। বল, সঙ্গে আমায় নিয়ে যাবে?"

"এই ছাখ, কি বল্‌ছ! তুমি সেখানে কোথায় যাবে? সে কুঁড়ে ঘর, চার ধারে জঙ্গল, জলকাদা, জোঁক-পোকা—আধ-ঘণ্টাও যে তিষ্ঠোতে পার্‌বে না তুমি।"

"তুমি ত যাবে ?"

"আমি যাব—তা জন্মেছি, মানুষ হ'য়েও উঠেছি সেই গেঁয়ো ঘরে, সেই জঙ্গলে আর জল-কাদায়। আমার গা-সওয়া আছে। তুমি কেন পার্‌বে? আমাদের বাঙ্গালার সব পাড়া গাঁ, তার সেই জঙ্গলে ঘেরা বাড়ীঘর, চোখেও বোধ হয় কখনও দেখনি—"

"না।"

"ভাবতেও পার্‌ছ না যে, সে কি একটা অবস্থা, আর কি ভাবে লোক সব সেখানে থাকে।"

"না হয় দেখেই আস্‌ব।"

"দেখবার মত সে কিছুই নয়, বরুণা। গিয়ে তখনি হয় ত আবার তোমাকে নিয়ে ফিরে আস্‌তে হবে।"

"না, তা হবে না। দুই একটা দিন থাকতে পার্‌ব। কেন পার্‌ব না ?"

"কিন্তু একটা কথা ভাব্‌ছ না, বরুণা? সুরবালা সেথায় আছে—"

আবার বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কহিল, "কেন সে সেথায় থাকে? সম্বন্ধ ত' তোমার সঙ্গে কিছু নেই, তবে—তবে—"

"কি কর্‌ব, বরুণ? সেথায়ই সে থাকতে চায়, আছে।

তার বাপ বড় লোক—তা দুঃখ-কষ্ট পেয়েও আমার মা'র কাছেই সে থাকে, তাই থাকতে চায়। কেন চায়, সেই জানে। আমি ত' বল্‌তে পারিনে, না, তুমি থাক্‌তে পাবে না। বাপের বাড়ী চ'লে যাও।"

"কিন্তু—তুমি যখন যাবে—"

"তখনই বা কি ব'লে লিখে পাঠাই যে, কয়েক দিনের জন্যে তাকে বাপের বাড়ী পাঠান হ'ক্? তেমন কোনও অধিকারও আমার আছে কি?"

বরুণা একটি নিশ্বাস ছাড়িল। কিরণ কহিল,—"ভয় নেই, বরুণা। প্রাণ থাক্‌তে, আমি চাইলেও আমার স্ত্রীত্ব সে স্বীকার কর্‌বে না। কারণ, সে মনে করে, তোমার দাবীর উপরে কোনও দাবী তার আমাতে হ'তে পারে না।"

"কিন্তু দাবী ত একটা আছে। আরও—আরও—আগে তাকেই বিয়ে করেছিলে।"

"তোমার খাতিরে সে দাবী সে ত্যাগ করেছে, ত্যাগ ক'রেই থাক্‌তে চায়।"

"দেখ্‌তে সে খুব সুন্দর?"

"না, তোমার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।"

একটু হাসি কিরণের ফুটিল। অলক্ষ্যে চাপিয়া লইল।

"লেখাপড়া ভাল শিখেছে?"

"না, ঘরে সামান্য কিছু শিখেছিল—শুনেছি, বাঙ্গালা আর সংস্কৃত—"

"গানটানও জানে না?"

"বোধ হয় না। শুনিনি ত' কখনও।"

একটি নিশ্বাস বরুণা ছাড়িল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "কিন্তু—তবু ত সেই তোমার কাছে এখন বড় হয়েছে। আর—আর—আমি—"

"আবার! ও-সব পাগলামো কথা আর কেন, বরুণা? চল, ওঠ, খেয়ে আসি গে। রাত অনেক হয়ে গেল। এস! খেয়ে উঠে তার পর দু'টো গানও শোনাবে আমাকে। এস!"

হাত ধরিয়া কিরণ বরুণাকে টানিয়া তুলিল, হাত ধরিয়াই খাবার ঘরে তাহাকে লইয়া গেল।

তখনকার মত একটা মিল স্বামি-স্ত্রীতে হইল। বরুণা আর এ সম্বন্ধে কোনও কথা তুলিল না। কিরণও তাহার ব্যবহারে এ সম্বন্ধে আলোচনার কোনও অবসর তাহাকে দিত না। সুরবালার জন্য প্রাণে যত বড়ই একটা বেদনা থাক্, সে বুঝিয়াছিল, বরুণাকে লইয়া তাহাকে এখন সংসার করিতে হইবে, আর সেই সংসারে অশান্তি যতটা কম ঘটে, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। আদর-সোহাগ বরুণা কখন্ কিরূপ চায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিত, রাখিয়া সেটা তাহাকে দিত। অবসর হইলেই বৈকালে তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইত; সন্ধ্যায় ক্লাবে না গিয়া বেশীর ভাগ দিনই গৃহে বরুণাকে লইয়া গল্প করিত, তাহার গান শুনিত, ছেলে দুটিকে লইয়াও খেলা করিত। বরুণাও সেবায়, যত্নে ও মিষ্ট-ব্যবহারে স্বামীকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত। কথায় কথায় রাগারাগি করিত না; যথাসম্ভব নিজের সব খেয়াল সংযত রাখিয়াই চলিত। বিবাহিত জীবনের প্রথম আমলটা যে-ভাবে কাটিয়াছিল, অনেকটা যেন সেই রকম অবস্থাই ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তখন স্বামীর আদর-সোহাগে প্রাণের যে সাড়া বরুণা পাইত, এখন সেটা আর পাইত না, অথবা মনে করিত, পাইতেছে না। কারণ, অন্তরে সে অনুভব করিত, স্বামীর প্রেম সে হারাইয়াছে, তাহাকে সরাইয়া দিয়া সুরবালাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। উপায় নাই, তাহাকে লইয়াই সংসারে থাকিতে হইতেছে, তাই মনের সেই টান চাপিয়া কতকটা জোর করিয়াই আদর-আপ্যায়নে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে তিনি চেষ্টা করিতেছেন। ইহাও লক্ষ্য করিয়াছে, রাত্রিতে নিদ্রাকালেও একটা শান্তির বিরাম তিনি পান না। সুরবালার নামও স্বপ্নের ঘোরে দুই এক দিন তাঁহার মুখে বাহির হইয়াছে। রূপে সে না কি হীনা,—আর কলাকুশলতাদি যে-সব গুণে, চিত্তাভিরাম যে পরিমার্জ্জনায়, উন্নত নব্য-সমাজে সকলের আদরণীয় একটা স্থান কোনও নারী গ্রহণ করিতে পারে, তাহাও কিছু তাহাতে নাই। অন্তত: উঁহার কথায় ত এইরূপ বুঝা যায়,—আর তাই না বিবাহের পরেই সেই সুরবালাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া তাহাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন—না, চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে, বরুণাকে ছাড়িয়া আবার ঐ সুরবালার উপরেই তাঁহার মনের সকল আকর্ষণ গিয়া পড়িয়াছে। যে নেশায় বরুণার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন,—হাঁ, সে একটা নেশাই ছিল বটে, সেটা কাটিয়া গিয়াছে। তাহার ত্রুটিগুলিই কেবল চক্ষুতে পড়ে, আর কড়া-কড়া কথায় তাহা তুলিয়া খোঁটাও দেন। অনেক সময় কেমন একটা অবজ্ঞার ভাবও দেখান। তাই ত সে কিছুই সহিতে পারে না, রাগ হয়, দুঃখ হয়, বকাবকি করে। ত্রুটি তার অনেক আছে, কিন্তু কার না থাকে? ওঁর কি নাই? আর ঐ সুরবালা—তারই কি নাই? তাহাকে লইয়া সংসার কখনও করেন নাই, তাই দেখিতে পাইতেছেন না। কেবলই দেখিতেছেন,—দেখিতেছেন—বড় একটা ত্যাগস্বীকার সে করিয়াছে, চরিত্র-মহিমায় সে অনেক বড়। ত্যাগ? ত্যাগ করিয়াছে? উনিই ত আগে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। যা কাহারও নাই, যা পাওয়া যাইবে না, সেই ত্যাগ আবার ত্যাগ? ঐ কথামালার গল্পে শিয়াল যেমন বলিয়াছিল, আঙ্গুর ফল টক! কিন্তু—কিন্তু এখন ত উনি তাহাকে চান, আনিতেও গিয়াছিলেন। তবু আসিল না, আসিলে ওঁকে পাইত, ওঁর এই সম্পদ্ আর পদমর্য্যাদারও অধিকারিণী হইত। কিন্তু আসিল না। বলে না কি, ওর চাইতে তার দাবী বেশী। বেশী! হাঁ বেশী বই কি? ওকে ফেলিয়া যাচিয়া আসিয়া তাকে বিবাহ করিয়াছেন। দাবী তারই বেশী বই কি? কিন্তু তবু—তবু—এ দাবী কয়জনে গ্রাহ্য করে? ইচ্ছা হইলেই আসিতে পারিত, এই সংসার দখল করিয়া ফেলিতেও পারিত। তবে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেটা ত জানিত না। হাঁ, ত্যাগই সে করিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া পারিল? স্বামীকে কি ভালবাসে না? ভালবাসিতে শেখে নাই? তাই ঠিক। নহিলে এ ত্যাগ কি করিয়া করিতে পারিল? কিন্তু অনেক সুখে ত থাকিত, সেটাও ত সে চাহিল না। অন্তত: স্বার্থপর সে মোটেই নয়। আবার বাপ না কি বড় লোক—সেথায় যায় না—ঐ কুঁড়ে ঘরে জঙ্গলে জল-কাদায়, বুড়ো ঐ শাশুড়ীটার কাছেই পড়িয়া আছে। দাসীর

মত খাটিতেছে। দুঃখ-ক্লেশও না কি কত পাইতেছে। হাঁ, ত্যাগও একটা আছে বই কি! খুব বড় ত্যাগই বটে! আর স্বামীর মনের টানটা তাই না তার উপরে গিয়া পড়িয়াছে। কথাটা যখনই মনে হইত, কেমন তীব্র একটা জ্বালায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বরুণার জ্বলিয়া উঠিত। যখনই ভাবিত, অনুভবও করিত, চরিত্রগুণে, নারীত্বের মহিমায়, সুরবালা তাহার অপেক্ষা অনেক বড়, বড় বলিয়াই স্বামীর প্রেম সে কাড়িয়া লইয়াছে, দুঃসহ একটা বিষের প্রবাহ তাহার সমস্ত মন-প্রাণ ভরিয়া ছুটিত।—তবে অতি আয়াসে সেটা চাপিয়াই রাখিত। কারণ, সে বুঝিয়াছিল, ইহা লইয়া গোলমাল কিছু করিলে, স্বামীর বিরাগ আরও বাড়িবে বই কমিবে না।—বিরাগ! বিরাগ! না, বিরাগটা ঠিক স্পষ্ট বুঝা না গেলেও অনুরাগ যে আর তেমন নাই, এটা—বেশ বুঝা যাইতেছে। ঝগড়া-ঝাঁটি তাহারা অনেক করিয়াছে। শেষ দিকে ঝগড়া-ঝাঁটিই বেশী করিত। কিন্তু তবু—তবু—সে ছিল এক রকম একটা অবস্থা সে জানিত, স্বামী—তাহারই স্বামী। আর তিনিও—সুরবালার কথা কখনও মনে করিয়াছেন কি? না, তেমন কিছু—আর কাহারও উপরে কোনও টানের কোনও সাড়া—কই, সে কখনও পাইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। ঝগড়া-ঝাঁটি যতই করুক—তবু তিনি ছিলেন কেবল তাহারই স্বামী, আর সেও ছিল, তাঁহার একমাত্র স্ত্রী। মাঝে—অন্যরূপ মনান্তর যাই যত ঘটুক—এ জাতীয় কোনও ব্যবধান ত ছিল না। আর আজ—ঝগড়া-ঝাঁটি নাই—রাগারাগি নাই—আদর-যত্নও তিনি খুব করেন, কিন্তু মাঝে এই ব্যবধানটি ত তিনি সরাইয়া ফেলিতে পারিতেছেন না, সে-ও পারিতেছে না। এই ব্যবধানটা রহিয়াছে—এখন এই যে আদর-সোহাগ, কই, তেমন একটা আনন্দের নিবিড় স্পর্শ ত সে তাহাতে পায় না। অনবরত যেন একটা গ্লানিই তাহাকে দিতেছে। কতদিন—কতদিন আর সে ইহা সহ্য করিতে পারিবে! তবু—এখন সে পারিতেছে। কিন্তু এমন কোনও ঘটনা যদি ঘটে, যাহাতে সুরবালার প্রতি অন্তরের এই অনুরাগের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার নামও যদি কখনও শ্রদ্ধায় কি মমতায় কি সহানুভূতিতে তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয়, সে যে তাহা সহ্যই করিতে পারিবে না। এই যে, যে ভাবেরই একটা শান্তি এখন সংসারে আছে, অতি আয়াসে যেন বুকের রক্তপাত করিয়া সে রক্ষা করিয়া চলিতেছে, তখন ত আর সে তাহা পারিবে না? কি হইবে! তখন কি হইবে!

কখনও কোনও দুঃখ সে সহিতে পারে নাই। কোন খেয়ালে, কি ইচ্ছায় কি চিত্তবেগে কোনও সংযমের ক্লেশও সে কখনও স্বীকার করে নাই। এখন অবিরত এই দুশ্চিন্তার বেদনা তাহার চিত্তকে মথিত করিতেছে। সুরবালার কথাও অবিরত মনে হইত, আর তীব্র একটা জ্বালায় তাহার দেহ মন প্রাণ যেন দগ্ধ হইয়া যাইত। এই বেদনা, এই জ্বালা সব তাহাকে আবার অতি কঠোর প্রয়াসে সংযত করিয়া রাখিয়াই চলিতে হইতেছে। ফলে মনের সঙ্গে দেহের স্বাস্থ্যও তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। আহারে রুচি কমিয়া গেল, নিদ্রা ভাল হইত না। শরীর দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

৩

ক্রমে মাস কাবার হইল। হাজার টাকা করিয়া মাসে কিরণ বেতন পাইত। কমিশন বোনাস ইত্যাদি বাবদ যাহা প্রাপ্য হইত, বৎসরান্তে হিসাবের পর পাইত। বরুণার নামেই ব্যাঙ্কে তাহা জমা থাকিত। বেতনের টাকা হইতে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ইন্‌সিওরান্স প্রিমিয়াম আর নিজের হাতখরচ ইত্যাদি বাবদ দুই শত টাকা বাদে, বাকী আট শত টাকা আনিয়া কিরণ বরুণার হাতেই দিত। কিন্তু এবার মাস কাবারে মাত্র পাঁচ শত টাকা আনিয়া দিল। বরুণা কহিল, "কেন, আর তিনশ' টাকা কি হ'ল?"

তুমুল একটা ঝড় যে আজ উঠিবে, কিরণ তাহা বুঝিয়াছিল, এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। ধীরভাবে উত্তর করিল, "দেশে পাঠিয়েছি!"

"দেশে—দেশে পাঠিয়েছ তিনশ' টাকা?"

"হুঁ।"

"তিনশ' টাকাই পাঠিয়ে দিয়েছ দেশে! কুল্লে এই পাঁচশ' টাকা, কি ক'রে এ দিয়ে সব খরচ আমি চালাব? আটশ' টাকাতেই পারিনে।"

"ওতেই যে ক'রে হয় চালাতে হবে। বাজে খরচ কমিয়ে দেও।"

"বাজে খরচ!—বরাবরই ঐ এক কথা শুনছি, বাজে খরচ—অপব্যয়! কি বাজে খরচ আমি করি? কোন্‌টা আমার অপব্যয়? কোন্‌টা কমাতে পারব?—কোন্‌টা আমাকে কমাতে বল?"

"আমি কিছুই বলতে পারব না, বরুণা, ওসব বুঝিও না কিছু। নিজেই বুঝে চলবে। চালাতে ঐ টাকাতেই হবে।"

"না, তা পারব না! চলতে এতে পারে না! কি করতে বল আমাকে?—লোকজন সব জবাব দেব? নিজের হাতে রাঁধব, বাসন মাজব, কাপড় কাচব, ঘর ঝাঁট দেব? না, অত আমার এ শরীরে কুলোবে না!"

"অত কিছু করতেও হবে না। ক'টি লোক নিয়ে তোমার এই সংসার?—তুমি, আমি, আর ঐ দুটি শিশু। পাঁচশ টাকা মাসে কম এমন কিছু নয়। এর চাইতে অনেক কম আয়েও বাঙ্গালী বহু গৃহস্থ যথেষ্ট সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।"

"আছে যারা আছে। সেকেলে সেই বাঙ্গালী গৃহস্থালী—না, তা কখনও শিখিনি, জানিনি। নতুন ক'রে এখন গিয়ে শিখতেও কারও কাছে পারব না।"

"অতটাও নেমে যেতে হবে না—নেমে যাওয়াই যদি তাকে বল!—একটু ছোটখাট রকম সাহেবী গৃহস্থালীও মাসে ঐ পাঁচশ টাকায় বেশ চলে।"

"না, তা চলে না।—আমার অন্ততঃ চলতে পারে না।—আটশ' টাকাতেই পারছি না, পারব পাঁচশ টাকায়? না, সে হবে না, মিষ্টার রায়!—পূরো ঐ আটশ' টাকাই আমাকে দিতে হবে।"

"কি ক'রে আর দেব? পাঠিয়ে দিয়েছি—"

"দিয়েছ!—কেন দিয়েছ?—আমাকে আগে না ব'লে, আমি কতটা স্পেয়ার (spare) করতে পারি না পারি, না জেনে, কেন পাঠিয়ে দিয়েছ?—কাকে পাঠিয়েছ?"

রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া বরুণা চাহিল।

"মাকে।"

"মাকে ? মাকে ?—না, ঐ সুরবালাকে ?"

দারুণ ক্রোধের আবেগের মধ্যেও স্বর যেন কেমন একটা মর্ম্মমথা বেদনার উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"না, মাকেই পাঠিয়েছি। সংসারের কর্ত্রী তিনি, সুরবালা নয়। খরচপত্তর তাঁকেই পাঠাতে হবে—"

"কিন্তু অত টাকা কেন ? গেঁয়ো ঘরে থাকেন, সেই গেঁয়োচালে গেঁয়ো গেরস্তালী করেন,—কটা টাকা মাসে তাঁর লাগতে পারে !"

"তাঁর ছেলে আমি, মাসে হাজার টাকা মাইনে পাই, আবার বছরে উপরি একটা পাওনাও বেশ আছে। তার উপরে কোনও দাবী তাঁর নেই ? আমি সাহেবীয়ানা ক'রে মাসে এতগুলো ক'রে টাকা ওড়াব, আর তিনি সেই গরীবানা গেঁয়ো গেরস্তালীতে কোনও মতে দুটি খেয়ে পরে জীবন কাটাবেন ? আবার ঐ ভাই বোন্ দুটি আছে—"

"না, আছে ঐ সুরবালা ! মা ভাই বোন্—হঠাৎ আজ এতটা দরদ হ'ল—যাদের নামও কখনও করনি, আছে না মরেছে খবরটি কখনও নেওনি, দয়ার ভিক্ষে ব'লেও দুটি টাকা কখনও পাঠাও নি—"

"গুরুতর একটা অন্যায় এতদিন করেছি। তাই ব'লে চিরকাল তাই ক'রতে হবে ?"

"না, তা কেউ করতে বলছে না। মানুষ হ'লে করা কারও উচিতও নয়। বেশ ত, তাঁদের খেতে পর্‌তে দিতে হয়, দেও। কতই আর লাগবে ? মাসে পঞ্চাশ, যাট—না হয় একশ টাকাই লাগুক্। যা লাগত, আমায় ব'ল্‌তে, আমিই পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু আমায় কিছু না ব'লে, পরামর্শ কিছু একটা না ক'রে, নিজেই একেবারে তিনশ' টাকা পাঠিয়ে দিলে, যেটা নাকি অতিরিক্ত—অতি অতিরিক্ত—অতিরিক্তেরও অতিরিক্ত !"

"মোটেই অতিরিক্ত নয়। আমি মনে করি, এ দেশে অন্ততঃ সবাই মনে করবে, আমার রোজগারের অন্ততঃ এই রকম একটা ভাগে আমার মা ভাই বোনের ন্যায্য দাবী একটা আছে—"

"না, তা মনে ক'র না—করতে পার না ! এ দেশের লোক ? তা তারা যা খুসী মনে করুক গে। তুমিও তাই মনে করবে, কবে এমন এ দেশের তেম্‌নি একটা লোক হ'লে ?"

"দেশেরই ছেলে আমি। উচ্ছৃঙ্খলতা যাই এতদিন ক'রে থাকি, দেশের লোকের মতি-গতি, আর দেশের নিয়ম-কানুনের খবরটা অন্ততঃ রাখি,—যা তুমি রাখ না।"

"রাখতেও কিছু চাইনে। সব তোমার বাজে ছল। কি ধাতুর মানুষ তুমি, এদ্দিনে চিনি নি ? মা ভাই-বোনের দাবী ! না, দাবী গণছ ঐ সুরবালার ! তাকে আমার আধা সরিকীতেই বসাতে চাও !"

কিরণ উত্তরে কহিল, "তা যদি চাইতাম, তিনশ' টাকা নয়, আধা-আধি ভাগ ক'রে পাঁচশ' টাকাই পাঠাতাম !"

"কি ক'রে পাঠাতে ? কেবল ত আমি নই, নিজে রয়েছ, ঐ দুটো ছেলে রয়েছে। খরচার হিসেব একটা ধ'রে দেখ, আধা আধির বেশীই পাঠিয়েছ, কম নয় ! সেত পাঠাবেই। সে হ'ল বড় গিন্নী, বড় ভাগটা ত তাকেই দেবে !"

কিরণ কহিল, "স্ত্রী ত বটেই। বিবাহও করেছিলাম, নালিশ যদি করে, ঠিক আধা আধিই ভাগ ক'রে সে নিতে পারে।"

বরুণা কহিল, "বেশ ত, তাই নিক ! দেখাই যাক্ কত বড় মহাত্যাগিনী সে, যাতে—যাতে নাকি তার পায়ে আপনাকে একেবারে বিকিয়ে দিয়েছ, মনে প্রাণে কেবল তারই ধ্যান করছ !" আবার বরুণার কণ্ঠস্বর চাপা রোদনের উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিরণ কহিল, "এ অভিযোগ করবার কোনও কারণ আমি তোমাকে দিই নি, বরুণা।"

"প্রতিনিয়তই দিচ্ছ ! আমি বুঝতে পারিনে কিছু। ভাবছ তোমার মুখের ভালমানুষেতায় একেবারেই আমি ভুলে রয়েছি।"

অতি আশ্চর্য্য হইয়া কিরণ চাহিয়া রহিল। কেমন একটা অপ্রতিভতার ভাবও প্রকাশ পাইল, একেবারে চাপিয়া দিতে পারিল না।

বরুণা কহিল, "বুঝতে পেরেছ, ঠিক কথাটাই আমি বলেছি ? তোমার মনের তল পর্য্যন্ত আমি দেখতে পাই। লুকোতে কিছু পার না ! পার না—পার না—তার কারণ, না, ব'ল্‌তে আর চাইনে, আমি—আমি—"প্রায় কাঁদিয়া উঠিতে উঠিতে বরুণা থামিয়া গেল। অতি আয়াসে উচ্ছ্বাসটা দমন করিল, একটু দম নিয়া শেষে কহিল, "যাক্, আর কথা কাটাকাটিতে কায নেই। তোমার ও টাকা—তোমার সুরবালার সঙ্গে সরিকী ভাগে দয়ার ঐ দান—এ হাতে আমি ছোঁব না। যে ক'রে পার, সংসার তুমি চালাও।"

"সংসার—আমি চালাব ? কি ক'রে চালাব ?"

"যে ক'রে পার, চালাও। আমি তার কি জানি ?"

ভ্রূকুটি করিয়া কিরণ কহিল, "হবে কি মাইনে ক'রে একজন হাউস্‌কিপার (h use keeper) রাখ্‌তে হবে ? কতগুলো টাকা মাসে মাসে আরও বেরিয়ে যাবে, ভাবছ ?"

"ভাববার আমার কিছু নেই। আমি কে যে ভাবব ? না পার, ঐ সুরবালাকেই আনাও। বড় গিন্নী সে, সংসারের কর্ত্তৃত্বে তাকেই এনে বসাও। আমি ত বাঁদী—বাঁদী হয়েই থাক্‌ব !"

বলিয়াই বরুণা চলিয়া গেল।

৪

পরদিন বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া কিরণ নোটের তাড়াটা বরুণার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমার খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত বাইরে এক হোটেলে করেছি। একেবারে উঠে গিয়ে থাকতেও সেখানে পারি, তাই যদি সুবিধে মনে করি। তোমাদের বন্দোবস্ত যেমন ইচ্ছে হয়, ক'রে নেও। না হয়, যা খুসী কর, আমি কিছুর জন্যে আর দায়ী নই।"

বলিয়াই কিরণ ফিরিল। রুখিয়া বরুণা কহিল, "তুমি এম্‌নি ক'রেই আমাকে জব্দ করবে ভেবেছ ?"

"নাচার।"

"নাচার। কেন, আমি কি এমন দায়িক হয়েছি।"

"দায়িক তুমিই বটে। আমার কায রোজগার ক'রে পয়সা এনে দেব—তা দিচ্ছি।"

"দিচ্ছ ? তাই বা দিচ্ছ কই ? যা দরকার, তা দিচ্ছ কই ?"

"যা সাধ্য, তাই দিচ্ছি। দরকারটা তারই সীমার মধ্যে আনতে হবে। ওতেই যে ক'রে পার, চালাতে হবে। না পার, ছেলেদের নিয়ে উপোস ক'রে মর। আমি যা পারছি, দিয়ে খালাস।"

"যা পারছ? না, যা পারছ, যা পার, তা দিচ্ছ না। সত্যিই যদি ভার নিয়ে সংসার আমাকে চালাতে হয়, অতগুলো ক'রে টাকা মাসে মাসে দেশে তুমি পাঠাতে পারবে না।"

"পাঠাতেই আমাকে হবে। এটা তাদের ন্যায্য পাওনা।"

"আর আমার ন্যায্য পাওনা কিছু নেই?"

"যা আছে, তা দিচ্ছি। বেশীই বরং পাচ্ছ, পাবে। কারণ, বছর কাবারে যে বোনাস কমিশন আমি পাই, সেটা তোমারই নামে এতদিন ব্যাঙ্কে জমেছে, এখনও তাই জমবে। তার কোনও ভাগ তাদের দেবার অভিপ্রায় আমার নেই।"

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া থমকিয়া কিছুকাল বরুণা বসিয়া রহিল। কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "বেশ! সত্যিই ত ছেলেদুটোকে না খাইয়ে মারতে পারব না। আর এও জানি, জিদ এতটুকু ছাড়বে, সে ধাতুরই মানুষ তুমি নও। বেশ, থাক্ তবে টাকা। কিন্তু এও ব'লে রাখছি, খরচ যা আমি দরকার মনে করি, করব, করতে আমাকে হবে। বেশী যা হয়, তার বিল সময়মত পাবে।"

শেষ কথাটা কিরণ বোধ হয় কাণেই তুলিল না। অথবা কি ভাবিল, সেই জানে। কেবল কহিল, "আমার বন্দোবস্তটা তা হ'লে হোটেলেই ক'রে নেব?"

"নাও! অত সব বাড়াবাড়ি আর করতে হবে না। কেলেঙ্কারী এমনিই যতদূর হবার তা হয়েছে।"

আর কিছু না বলিয়া কিরণ দরজার দিকে চলিল। ডাকিয়া বরুণা কহিল, "আফিস থেকে ফিরছ—খাবার কিছু আর চা পাঠিয়ে দেব।"

"সুবিধে হয় দাও।"

বলিয়া গিয়া হলঘরে বসিল।

অতি অশান্তিতেই দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। বরুণা এ সব সম্বন্ধে কথা আর কিছু তুলিল না, সংসারের কাযকর্ম্ম যেমন চালাইত, তেমনই চালাইয়া যাইতে লাগিল। আহারাদির ব্যবস্থা সময়মত এবং ঠিক তাহার রুচিমতই সর্ব্বদা হইত। পোষাক-পরিচ্ছদাদিও ঠিক যায়গামত পূর্ব্ববৎ পরিচ্ছন্নভাবে গুছান থাকিত। এ সব বিষয়ে কখনও কোনও অভাব কি অসুবিধা কিরণ বোধ করিত না। লোক-জনের সম্মুখে কথাবার্ত্তাও বরুণা শিষ্টভাবেই বলিত। কিন্তু নিভৃতে কোনও আলাপই স্বামীর সঙ্গে করিত না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে তাহার উত্তর মাত্র দিত। নিজে ভুলিয়াও কোনও কথা কখনও তুলিত না; প্রশ্নও কোনও বিষয়ে করিত না। এক গৃহেই উভয়ে শয়ন করিত; কিন্তু পৃথক্ শয্যায়, আর নিঃশব্দেই দম্পতির রাত্রি কাটিয়া যাইত। কোনও দিন হয় ত বাহিরে হলঘরেই কিরণ শুইয়া থাকিত। বরুণা তাহাকে ডাকিত না। রাত্রি-প্রভাতে জিজ্ঞাসাও করিত না, কেন সে শয়নগৃহে আসে নাই। এই ভাবে কোনও-মতে একটা মাস কাটিয়া গেল। আবার মাস কাবার আসিল। কিরণ তিনশত টাকা দেশে পাঠাইয়া বাকী পাঁচশত টাকা বেয়ারার হাতে বরুণার কাছে পাঠাইয়া দিল। পরদিন বরুণা কয়েকখানি বিল কিরণের কাছে পাঠাইল। কতক দামী কিছু কাপড়-চোপড়ের, কতক কিছু অলঙ্কারের, কতক নূতন কিছু আসবাব-পত্রের এবং কতক সংসারের অন্যান্য খরচের। হিসাব করিয়া কিরণ দেখিল, ঠিক তিনশত টাকার বিল!

বরুণাকে ডাকিয়া কহিল, "এতগুলো বিল কেন পাঠিয়েছ?"

"খরচ হয়েছে, কি করব?"

"খরচ কেন করলে?"

"দরকার মনে হয়েছে করেছি।"

"বলিনি তখন তোমাকে—ঐ পাঁচশ টাকাতেই চালাতে হবে।"

"আমিও বলেছিলাম, খরচ যখন যা দরকার মনে হবে করব। বেশী যা হয়, তার বিল সময়মত পাবে।"

"ঠিক তিন'শ টাকার বিল,—"

"খরচ ঐ হয়েছে।"

"ঠিক তিন'শ টাকার বিল, যেটা বাড়ীতে পাঠাতে হচ্ছে, তোমার অমতে।"

"খরচ আমার যা দরকার, করতেই হবে।"

"মাসে যদি তিন'শ টাকা ক'রে বেশী খরচ কর, বছরে কত হয় হিসেব ধ'রে দেখেছ?"

"তিন হাজার ছ'শ টাকা।"

"দেউলে হ'তে আমাকে হবে, সেটা ভাবছ?"

"ভাবতে হয় তুমি ভাব। আমার কোনও দরকার নেই।"

একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কিরণ কহিল, "বেশ, এবারকার এই বিলগুলো যে ক'রে হয়, আমি শোধ ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু এর পর—"

"এর পর?"

"আর এমন কোনও বিলের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না।"

"পার, নিও না।"

বলিয়াই বরুণা চলিয়া গেল। কিরণ একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িল। প্রতিকারের পথ কিছু দেখিল না। বুঝিল, আজ হ'ক, কাল হ'ক সত্যই তাহাকে দেউলিয়া হইতেই হইবে। একমাত্র উপায় হইতে পারে, পায়ে ধরিয়া বরুণার ক্ষমা চাহিয়া বেতনের সব টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিবে,—আর সে দয়া করিয়া যা তাহার মাকে পাঠায়। কিন্তু না! আর তা সে পারে না! সত্যই কি তাঁহাদের—তাহার মা ভাই-বোন, আর ঐ সুরবালার কোনও দাবী তাহার উপরে নাই?—মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন আর তাহার জন্যও ঐ বরুণার অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে থাকিতে হইবে? না, তা হইতেই পারে না। কিন্তু বরুণার জিদ—মাসে মাসে তাহার এই সব বিলের দাবী—কত দিন সে চালাইতে পারিবে? দারুণ এই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতির উপায় তাহার কি হইতে পারে?

৫

আবার মাস-কাবার আসিল। পাঁচ শত টাকা পাইয়া বরুণা আবার অন্যান্য রকম কতকগুলি খরচের হিসাবে ঠিক তিন শত টাকার বিল পাঠাইল। কিরণ একবারে আগুন হইয়া উঠিল। আচ্ছা

এক কায়দায় ফেলিয়া হতভাগী যে তাহাকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিতেছে। সত্যই কি সে একবারে নিরুপায়? নিরুপায়ভাবেই এইরূপ একটা যাঁতাকলে পড়িয়া ছটফট করিয়া তাহাকে মরিতে হইবে! না, আর সে পারে না—পারিবে না! এই জীবন—উচ্চ আয়ের এই কর্ম্ম—উচ্চ এই পদমর্য্যাদা—ভবিষ্যতে আর্থিক ও সামাজিক আরও কত উন্নতির আশা—হায়, কি সুখ তাহাকে দিতেছে? কি সুখ আর তাহাকে দিবে? ঘোর এক বিপদের বিভীষিকাই বরং ঘনাইয়া আসিতেছে, দুর্লঙ্ঘ্য এক সঙ্কটের দুঃসহ নাগপাশেই তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। না, আর সে পারে না, নিষ্কৃতি তার এখন চাই, যে-ভাবে হউক—চাই-ই!

ওদিকে বরুণার স্বাস্থ্যও একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শরীর শুকাইয়া যেন আধখানার কম হইয়া গেল। নিটোল মুখখানি শুকাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কেমন সরু ও লম্বা হইয়া পড়িল, মার্জ্জিত-গৌর মসৃণ ললাটে ঘন রেখার আঁধার-কুঞ্চন দেখা দিল, কালিভাঙ্গা কোটরে চক্ষু দু'টি অস্বাভাবিক এক দীপ্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। কিরণ লক্ষ্য করিল, কিন্তু কি সে করিবে? কি করিতে পারে? দুই একবার বলিয়াছিল, বরুণা গ্রাহ্যই করিল না।

সংবাদ পাইয়া বরুণার মা আসিলেন। তাঁহার সোনার প্রতিমা বরুণাকে অবিচারে ও অবহেলায় পাষণ্ড বর্ব্বর কিরণ একবারে শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, ইত্যাদি অনেক অনুযোগ করিলেন। গেলে তাঁহারই কন্যা যাইবে, কিরণের কি? তাহার পেয়ারের সুয়োরাণী সুরবালা রহিয়াছে দেশে। আপদ চুকিবে, তাহাকে আনিয়াই এই সংসারে সোনার খাটে বসাইবে, এইরূপ রূঢ় শ্লেষও অনেক করিলেন। তার পর বরুণাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। নির্ম্মম কিরণ পারিলেও মা হইয়া তিনি ত সত্যই মেয়েটাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন না। বরুণা প্রথমে যাইতে চাহিল না, কিন্তু মাতার অতি জিদে আর রাগারাগিতে শেষে বাধ্য হইল। তবে এইটুকু আস্থা স্বামীর উপরে তাহার ছিল, এই অনুপস্থিতির অবসরে সুরবালাকে আনিয়া এ সংসারে তিনি বসাইবেন না, মনে মনে যতই সে আকাঙ্ক্ষা থাক, আর বর্ত্তমান এই অশান্তির অবসানে যতই সুখ-শান্তির প্রত্যাশা তাহাতে তিনি করুন।

আরও এক মাস প্রায় চলিয়া গেল। পিতামাতার সহস্র সেবা-যত্ন সত্বেও শরীর বরুণার তেমন শোধরাইল না; দুর্ব্বলতাও কমিল না। কিরণের একখানি পত্র তখন আসিল। পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বরুণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কিরণ লিখিয়াছে,—

"চাকরী আমি ছাড়িয়া দিলাম। এই কায আর এখানকার এ জীবন আমার পক্ষে একেবারেই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলাদেশেই আমি কিছু জমি লইয়াছি, দরকারমত দুই চারিজন লোক মাত্র রাখিয়া গ্রাম্য গৃহস্থের ন্যায় চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। উচ্চপদ কি ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে কোনও লালসা আমার আর নাই। তার অপেক্ষা এইরূপ জীবনের নিরাবিল শান্তি ভাগ্যে যদি ঘটে, অনেক বেশী কাম্য বলিয়া তাহা আমার মনে হইতেছে। কয়েক বৎসরের বোনাস কমিশন ইত্যাদিতে ব্যাঙ্কে তোমার নামে সুদসহ প্রায় দশ হাজার টাকা জমিয়াছে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যাহা জমিয়াছে, আর লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্সের সব পলিসী ছাড়িয়া দিয়া যাহা পাওয়া গেল, তাহাতেও একুনে বিশ হাজার টাকা হইবে। ইহার অর্দ্ধেক দশ হাজার টাকা তোমার থাকিবে, আর বাকী দশ হাজার আমার মা, ভাইবোন আর সুরবালার ভরণপোষণের জন্য দিলাম। কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ আমার কাযকর্ম্মে অতি সন্তুষ্টই ছিলেন। কারবারের অনেক উন্নতিও আমার চেষ্টায় হইয়াছে। সাত হাজার টাকা পুরস্কারস্বরূপ তাঁহারা আমাকে দিয়াছেন। ইহারও পাঁচ হাজার তোমার থাকিবে। বাকী দুই হাজার টাকা মাত্র আমি মূলধনস্বরূপ নিজের হাতে রাখিলাম। দশ, দশ, আর এই পাঁচ, মোট পঁচিশ হাজার টাকার সম্পত্তি তোমার এখন হইল। বুঝিয়া চলিতে পারিলে, দুইটি পুত্রসহ স্বচ্ছন্দেই তোমার চলিবে বলিয়া আমি মনে করি।

যে কাযে আমি যাইতেছি—যদি উপার্জ্জন হয়, তাহা হইতেও মাসে মাসে তোমাকে কিছু কিছু দিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি। কারণ, নিজের প্রয়োজনে আমার ব্যয় অতি কমই হইবে। তবে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি, সেই উপার্জ্জনের একটা ভাগ বাড়ীতেও আমাকে পাঠাইতে হইবে।

যদি ইচ্ছা কর, গ্রাম্য সেই গৃহস্থালী যদি সহ্য করিতে পারিবে মনে কর, আমার সেই সংসারের গৃহিণী হইয়া গিয়া থাকিতে পার। সংসার আমার যেখানে যেরূপই যখন হউক, তাহার গৃহিণীত্বে তোমার দাবীই বড়। বাস্তবিকই আমি তাই মনে করি। সুরবালাও যে তাই করে, তাহাও তুমি জান।

দুইটি পুত্র তোমার হইয়াছে, তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং এখন অবধি নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিবে।"

তার পর স্থানের নাম ও ঠিকানা দিয়া লিখিয়াছে,—

"যদি ইচ্ছা হয়, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবে। যদি আসিতে চাও কখনও, রেলওয়ে একটা ষ্টেশনও ঐখানে আছে।" ইতি।

কিরণ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম, এ)

৩১

কুশানের বাসগৃহ অট্টালিকা-তুল্য। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী, তাহাতে কয়েকটা মহল। কুশান পিতার একমাত্র পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী কেহ ছিল না। মাতারও মৃত্যু হইয়াছিল। বাড়ীতে ছিলেন কুশানের এক বিধবা মাতুলানী, তাঁহারও সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ হইবে; কিন্তু এখনও বেশ শক্ত, সংসারের ভার তাঁহার উপর ছিল।

কুশানের বিবাহ-সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন; লুলুর পরিচয় সংবাদপত্রে অনেকবার পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, লুলু কুশানকে ধনবান্ জানিতে পারিয়া তাহাকে মায়াবদ্ধ করিয়াছে। লুলুকে দেখিয়া তাঁহার সে ভ্রম অপনীত হইল। এই সরলা অকপট-হৃদয়া সুন্দরী মায়াবিনী-জাতীয়া নহে। তবে সে কেন রঙ্গালয়ে নৃত্য-গীত করিত? এ প্রশ্নের উত্তরও সময়ে জানিতে পারিলেন। কুশান তাঁহাকে বলিল, লুলু নিজে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে এবং সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সে পিতৃ-মাতৃ-সন্ধানে বাহির হইবে।

সে কথা কিছু দিন চাপা রহিল। লুলু বৃহৎ প্রাসাদের সজ্জিত কক্ষ-সমূহে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাগান ফল-ফুলে ভরা, সেখানে টোটোকে সঙ্গে করিয়া ছুটাছুটি করে, অশ্বারোহণে কুশানের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে যায়, মোটরে করিয়া নানা স্থানে গমন করে। লুলুর জীবন দীর্ঘ অবকাশের ন্যায় হইয়া উঠিল। রঙ্গালয়ের সেই নিত্য পরিশ্রম, নিত্য লোকের মনোরঞ্জন, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া সে অসীম তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। এই অসভ্য জাতির কন্যার স্বভাবে এমন একটি স্বচ্ছ সরলতা ছিল—যাহা সভ্য জগতের সহস্র প্রলোভনে কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। কোথায় ছিল একটা নগণ্য, বর্ব্বর, অসভ্য জাতির কন্যা, আর কোথায় দেশ-দেশান্তরব্যাপী যশ! এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে তাহার কিছু-মাত্র আত্ম-প্রসাদ বা আত্ম-শ্লাঘা হয় নাই। যশোলিপ্সা মদিরার ন্যায়, যত পান করিবে, ততই সুরাতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইবে। পানপাত্র সম্মুখে পাইয়া লুলু সরাইয়া রাখিয়া-ছিল, এক বিন্দু পান করে নাই। যে বৃত্তি সে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে যত প্রলোভন, তেমনই অধঃপতনের মুক্তপথ। কিন্তু লুলুকে কোন প্রকার কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার নির্ম্মল চরিত্র ও প্রকৃতি বর্ম্মের ন্যায় তাহার দেহ ও মন রক্ষা করিত। রঙ্গালয় ছাড়িয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তের তরে তাহার মনে পশ্চাত্তাপ হয় নাই।

তাহার পর এই অভিনব দাম্পত্যপ্রীতি। জগৎসংসার লুলুর চক্ষুতে প্রীতিপূর্ণ হইল। এত বড় বাড়ী যেন একটা খেলাঘর, তাহাতে নবদম্পতি নিত্য খেলা করিতেছে, মনের অসংখ্য সাধ গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে। কুশানের সর্ব্বদা চিন্তা—পাছে কোন বিষয়ে কখন লুলু কিছু ত্রুটি অনুভব করে, কিন্তু সে চিন্তা অমূলক। অভাবে ত্রুটি হয়, কিন্তু যেখানে প্রেমে সমস্ত পরিপূর্ণ, সেখানে কিসের ত্রুটি? লুলু কুশানের কাছে কখন রঙ্গালয়ের উল্লেখ করিত না, সে প্রসঙ্গে কোন কথা কহিত না। কুশানের অনুরোধে সময়ে সময়ে গান করিত, কিন্তু আর নৃত্য করিত না। কুশানের রাশি রাশি পুস্তক ছিল, লুলু সেই সকল পুস্তক পাঠ করিত, নূতন পুস্তক ক্রয় করিত, সংবাদপত্র পড়িত। গারা ও তুলাকাকে নিয়মিত পত্র লিখিত, তাঁহাদিগকে একবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিত।

কিছুদিন পরে তমলা ও মোহাল আসিল। কুশান বিবেচনা করিল, তমলা থাকিলে লুলুর এক জন সঙ্গিনী জুটিবে আর মোহাল কুশানের সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কুশানের বাড়ীর নিকটে আর একখানি বাড়ী ছিল, তাহাতে মোহাল ও তমলার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। অবসর পাইলেই তমলা লুলুর সঙ্গে থাকিত, লুলু তাহার সঙ্গে গল্প করিত, তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইত।

মুমী এত বড় বাড়ী দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার পর ধারণা হইল, এমন বাড়ী না হইলে লুলুর উপযুক্ত হইবে কেন? লুলু নিজেই হয় ত কোন রাজকন্যা, এইরকম প্রাসাদেই ত তাহার বাস করিবার কথা। আর তাহার পরিচারিকা হইয়া মুমীই বা নিজেকে একটা সামান্য দাসী বিবেচনা করিবে কেন? মুমী বাড়ীর অপর দাস-দাসীর উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করিল। তাহারাও দ্বিধাশূন্য হইয়া তাহার আদেশ পালন করিত। মুমীর রকম-সকম দেখিয়া লুলু হাসিত, তাহাকে ক্ষেপাইত।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিবেশীরা লুলুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তাহাকে দেখিবার কৌতূহল সকলেরই ছিল, সকলেই তাহার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগত ছিল। কুশানের কথায় লুলু পরিচিত অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইল। ক্রমে সকলের সঙ্গে যাওয়া-আসা আরম্ভ হইল। এক বিষয়ে প্রতিবেশী রমণীগণ কিছু নিরাশ হইলেন। পূর্ব্ব-পরিচয়ের কোন কথা উঠিলে লুলু রঙ্গালয়ের কোন কথা বলিত না, হয় চাপা দিত, না হয় অন্য কথা পাড়িত। অপর রমণীদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার কোন উপায় রহিল না। লুলু সকলের সহিত অসঙ্কোচে সরলভাবে কথা কহিত, কেবল রঙ্গালয়ের সহিত তাহার পূর্ব্ব-সম্বন্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তাহার ভাবান্তর হইত, সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে সম্মত হইত না।

৩২

এক বৎসর পরে লুলুর একটি পুত্রসন্তান হইল। বিবাহের কয়েক মাস পরেই লুলু পিতামাতার অন্বেষণে বাহির হইতে চাহিয়াছিল, কুশানও কোনরূপ আপত্তি করে নাই, কিন্তু সন্তান হইবার সম্ভাবনায় সে প্রস্তাব স্থগিত হইল।

সূতিকাগারে তমলা সমস্ত ভার গ্রহণ করিল। সে রোগীর সেবা ও ধাত্রীকার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিল, আর কোন লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইল না। মুমীর পদমর্য্যাদা বাড়িয়া গেল। কুশানের মাতুলানী শিশুর জন্য অপর পরিচারিকা নিযুক্ত করিতে চাহিলে মুমী রাগিয়া উঠিল। সে থাকিতে আর এক জন কোথাকার কে লুলুর সন্তানের সেবা করিবে? লুলু সূতিকাগার হইতে বাহির হইতেই মুমী শিশুকে দখল করিল।

গারা স্বয়ং আসিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি লুলুকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, পুত্রসন্তান হইলে নামকরণের সময় যেন শোবাল রাখা হয়, সেই নামই রাখা হইল।

শোবাল দেখিতে হইল তাহার বাপের মত। সেই রকম গৌরবর্ণ, সেই রকম পিঙ্গল কেশ, সেই রকম নীল চক্ষু, সেই রকম প্রশস্ত ললাট। কেবল নাসিকা মাতার ন্যায় ঈষৎ চাপা হইল। কুশান ব্যঙ্গ করিয়া লুলুকে বলিত, দেখেছ তোমার ছেলের নাক! তোমার মত খাঁদা।

লুলু বলিত, দেখেছ তোমার ছেলের চুল! তোমার মত কটা।

মাতৃস্নেহ লুলুর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিল। এক দণ্ড সে ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। দুই মাসের শিশুকে মোটরে বেড়াইতে লইয়া যাইত, সঙ্গে থাকিত তমলা ও মুমী। যেমন যেমন শোবাল বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাহার দৌরাত্ম্যের কাহিনী দীর্ঘ হইতে লাগিল। এমন দুরন্ত ছেলে কেহ কখন দেখিয়াছে? ছেলের দাঁত উঠিল, হামাগুড়ি দিতে শিখিল, এক বৎসর বয়সেই হাঁটিতে শিখিল। তখন সর্ব্বদাই তাহাকে সামাল, সামাল! কখন্ কোথায় পড়িয়া যায়, কখন্ কি ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহার ঠিকানা নাই। লুলু তাহাকে লইয়া গিয়া বাগানে ঘাসের উপর ছাড়িয়া দিত, তাহাতে ছেলের মন উঠিবে কেন? সে টলিতে টলিতে গিয়া ফুল ছিঁড়িত, গোলাপ-কাঁটা হাতে ফুটাইয়া কান্না জুড়িয়া দিত। রাগিলে মাতার চুল ধরিয়া টানিত।

শোবাল দুই বৎসরের হইলে লুলু কুশানকে বলিল, এইবার আমি বাপ-মাকে খুঁজতে যাব। শোবাল এখন বড় হয়েছে, ওর জন্য এখন আর কোন ভাবনা নেই।

কুশান বলিল, হাঁ, মস্ত বড় হয়েছে! তা হ'লে ওকে রেখে যেও।

লুলু কহিল, তাও কি কখনও হয়? ওকে ছেড়ে আমি এক তিল থাকতে পারিনে। আর তুমি?

—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

—তা হ'লে একটা জাহাজের চেষ্টা দেখ। ভাড়ায় পাওয়া যায় ভাল, তা নইলে কিনতে হবে। টাকা কত লাগবে, বললেই আমি দেব।

—টাকা ত এখনই চাইনে, আগে একখানা জাহাজ দেখি, পছন্দ করি, তার পর সে কথা হবে। আমি চিঠি লিখে সব জেনে-শুনে তার পর গিয়ে দেখব।

লুলু বলিল, যেন বেশী দেরী না হয়। যত শীঘ্র হয়, সেই চেষ্টা করো।

৩৩

লুলু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাপ-মাকে খুঁজিতে যাইবার স্থিরসঙ্কল্প বরাবর তাহার মনে ছিল, এত দিন সে সঙ্কল্প

পূর্ণ করিবার সুযোগ হয় নাই। প্রথমতঃ, অর্থাভাব। সে অভাব এখন আর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, সংসার-প্রবেশ। সে বাধাও এখন আর রহিল না। স্বামি-পুত্র সঙ্গে লইয়া লুলু স্বচ্ছন্দে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে।

লুলুর আগ্রহ দেখিয়া কুশান অযথা বিলম্ব করিল না। পত্র দ্বারা সন্ধান লইয়া স্বয়ং জাহাজ দেখিতে গেল। লুলু তাহাকে টাকা দিতে চাহিলে বলিল, এখন টাকা কি হবে? আগে সব ঠিকঠাক হোক, তখন টাকা দিলেই হবে।

কুশান চলিয়া গেল। দুই চারি দিন পরে লুলুকে পত্র লিখিল, জাহাজ স্থির করা হইয়াছে। তাহাতে কিছু কায বাকি আছে, তিন মাস পরে পাওয়া যাইবে। টাকা সেই সময় দিলেই হইবে।

কুশান ফিরিয়া আসিল। লুলুর ব্যগ্রতা বাড়িতে লাগিল। তিন মাস পরে সংবাদ আসিল, জাহাজ প্রস্তুত।

কুশানের বাড়ী হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা বড় নদী। সেই নদীতে জাহাজ আসিয়া নোঙ্গর ফেলিয়াছে। কুশান লুলুকে বলিল, চল, গিয়ে জাহাজ দেখে আসবে।

মোটরে করিয়া সকলে গেল। শোবালকে সামলাইবার জন্য তমলা ও মুমী সঙ্গে গেল।

নদীর মধ্যস্থলে যেখানে গভীর জল, সেইখানে জাহাজ। খুব বড় নয়, কিন্তু দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। আগাগোড়া নূতন উজ্জ্বল সাদা রং করা, সঙ্কুচিত-পক্ষ বৃহৎ শ্বেত মরালের ন্যায় জলে ভাসিতেছে। জাহাজের এক পাশে বড় বড় সোনালী অক্ষরে নাম লেখা—লুলু।

লুলু কুশানের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, আমার নাম!

—আর কার নাম হবে? তোমার জিনিষ, তোমার নাম।

তাহারা ঘাটে পৌঁছিতেই জাহাজ হইতে একখানা নৌকা তাহাদিগকে লইয়া যাইতে আসিল। নাবিকদের নূতন পোষাক, সকলের মাথার টুপীতে জাহাজের নাম লেখা।

জাহাজে উঠিয়াই শোবাল ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। তমলা ও মুমী তাহার সঙ্গে রহিল। জাহাজের কাপ্তেন কুশান ও লুলুকে সেলাম করিলেন। জাহাজ কুশানের দেখা, সে লুলুকে জাহাজের ভিতর সমস্ত দেখাইতে লাগিল। সর্ব্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বসিবার ঘর, খাবার ঘর উত্তমরূপে সজ্জিত। লুলুর তিনটি কামরা, একটি বসিবার, একটি কাপড় পরিবার, আর একটি শয়নের। আরও পাঁচ ছয়টি কামরা আছে। একটি পুস্তকাগার, তাহাতে কয়েকটি আলমারিভরা নূতন পুস্তক রহিয়াছে। লুলু নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কুশানের স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিয়া কহিল, এ সব তুমি করিয়েছ। জাহাজ ছাড়া এই সকল জিনিষপত্র কিনতে অনেক টাকা লেগেছে। তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নাওনি কেন?

কুশান লুলুকে বক্ষে টানিয়া, তাহার চিবুকে হস্ত দিয়া, তাহার মুখ উন্নমিত করিয়া কহিল, এই জাহাজ আর এই সব আমি তোমাকে দিয়েছি। সমস্ত টাকা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লুলু কহিল, আমি যে এত ক'রে টাকা জমা করেছি, সেগুলো কি হবে?

—তোমার আর আমার টাকা কি আলাদা?

কৃতজ্ঞতার পুলকে লুলুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কথা কহিবার চেষ্টা না করিয়া, পতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

দুই জনে যখন জাহাজের উপর ফিরিয়া আসিল, তখনও লুলুর আর্দ্রচক্ষু। তমলা ও মুমী বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিল, লুলু কাঁদিয়াছিল কেন?

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া লুলু জাহাজে যাইবার জন্য জিনিষ-পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। যে ডিঙ্গী গারার বাড়ীতে ছিল, সেটা আনাইয়া ভাল করিয়া সারাইয়া রাখা হইয়াছিল। লুলু ডিঙ্গী জাহাজে পাঠাইয়া দিল। এক সপ্তাহ পরে লুলু কুশান ও শোবালকে লইয়া জাহাজে যাত্রা করিল। মুমী সঙ্গে গেল। তমলা যাইতে চাহিল, লুলু তাহাকে নিষেধ করিল। কহিল, আমরা কত দিনে ফিরব, তার ঠিক নেই, তুমি গেলে মোহালকে একলা থাকতে হবে। তোমরা দু'জনে এখানে থাক।

জাহাজের নূতন যাত্রীদের সঙ্গে টোটো গেল।

৩৪

সমুদ্রের সঙ্গে লুলুর জন্মাবধি পরিচয়। সমুদ্রকূলে তাহার জন্ম, বাল্যকাল হইতে সে সমুদ্রের ধারে, সমুদ্রের জলে খেলা করিত। সমুদ্রে পথ হারাইয়াই সে জগতের বিচিত্র

বিশালতা জানিতে পারিয়াছিল। সমুদ্রের বহুরূপী মূর্ত্তি সে জানিত। সমুদ্রের শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি, আবার সমুদ্রের গর্জ্জমান ভীষণ সংহারমূর্ত্তি, দুই-ই দেখিয়াছিল।

লুলু ও কুশান নিতান্ত অনির্দ্দিষ্টভাবে জাহাজে যাত্রা করে নাই। কুশান পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিল। লুলুর সঙ্কল্প জানিয়া কুশান অনেক রকম সন্ধান করিয়াছিল, বহু গ্রন্থ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়াছিল। লুলুর মুখে তাহাদের দ্বীপের বর্ণনা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, এক প্রশান্ত মহাসাগর ব্যতীত আর কোথাও ওরূপ দ্বীপ থাকিতে পারে না। নারিকেলগাছ আর কোথায় জন্মায়? জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গেও লুলু এবং কুশান পরামর্শ করিত। লুলুর কথা শুনিয়া ও তাহার ডিঙ্গী দেখিয়া কাপ্তেন বলিলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপ যে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। যদি আপনাদের মত হয়, তা হ'লে প্রথমে হোনোলুলু যাওয়া যাক, সেখান থেকে রীতিমত খোঁজবার একটা উপায় করা যাবে।

কুশান বলিল, এ কথা আমার বেশ সঙ্গত মনে হচ্ছে। আর দেখ, লুলু, ঐ যে হোনোলুলু নামটা, ওর আধখানা তোমার নাম। বাকি আধখানা পেলেই ত তোমাদের দেশ পাওয়া যাবে।

লুলু হাসিতে লাগিল, বলিল, তা হ'লে ত কোনই গোলই হ'ত না। হোনোলুলুর নাম কে না জানে?

কুশান বলিল, তারই কাছাকাছি নিশ্চয় কোথাও হবে!

কাপ্তেন বলিলেন, খুব কাছাকাছি হবে না, কেন না, হাওয়াইয়ের সকল দ্বীপ দেখা। তবে বলা যায় না, ঐ অঞ্চলটা ভাল ক'রে দেখতে হবে।

জাহাজ চলিতে লাগিল। নিত্য প্রাতে সমুদ্রগর্ভ হইতে সূর্য্যোদয় হয়, নিত্য সন্ধ্যায় সমুদ্র-সলিলে সূর্য্য অস্তগত হয়। লুলু প্রায় সারাদিন জাহাজের উপর বসিয়া থাকিত। কুশান কখন তাহার নিকটে থাকিত, কখন কাপ্তেনের সঙ্গে গল্প করিত। শোবাল খেলা করিত, মুমী তাহার সঙ্গে থাকিত। শোবালকে লুলু তাহাদের নিজের ভাষা শিখাইয়াছিল, সে মাতার সঙ্গে প্রায় সেই ভাষায় কথা কহিত, আবার কুশানের সঙ্গে অন্য ভাষায় কথা কহিত। মাঝে মাঝে শোবাল আবদার ধরিত, মাতাকে বলিত, চল, বাড়ী চল। জাহাজের ঐটুকু স্থানে তাহার ভাল লাগিত না। লুলু তাহার হাতে পুতুল দিয়া, নানা রকম গল্প করিয়া তাহাকে ভুলাইত।

অবশেষে জাহাজ হোনোলুলুতে পৌছিল। কুশান লুলুকে কৌতুক করিয়া বলিল, এই ত তোমার নিজের নামের দেশ। এইবার তোমাদের দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে।

লুলু বলিল, সেই জন্য ত এসেছি।

হোনোলুলুতে স্ত্রীলোকদিগের বেশ, তাহাদের মাথায় ফুলের সাজ দেখিয়া লুলু বুঝিল, আর এক দেশে আসিয়াছে! কাপ্তেন নানাবিধ সন্ধান করিতে লাগিলেন। কুশান তাঁহার সঙ্গে ঘুরিত। কয়েক দিবস পরে কাপ্তেন বলিলেন, জাহাজে করিয়া এক মাস সমুদ্রে চারিদিকে ঘুরিলে সে দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

কুশান লুলুকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তোমার কি মত? এবার তুমি একা যাবে, না আমি তোমার সঙ্গে যাব?

লুলু কহিল, তুমি এইখানে থাক, আমি একাই যাব। যদি আমাদের দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হ'লে বাপ-মার সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে আসব। এক মাসের বেশী হবে না।

শোবালকে লইয়া লুলু জাহাজে উঠিল। কুশান হোনোলুলুতে তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

৩৫

এক দিন প্রাতঃকালে ওনামাটুদের দ্বীপবাসীরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া দেখিল, দ্বীপ হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাদা নৌকা ভাসিতেছে। এত বড় নৌকা তাহারা কখন দেখে নাই। অনেকে ভয় পাইল, কিন্তু ভয়ের অপেক্ষা কৌতূহল প্রবল। দেখিতে দেখিতে দ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমুদ্রতীরে সমবেত হইল।

স্নিগ্ধ প্রাতঃ-সমীরণ বহিতেছে, বায়ুসঞ্চালিত নারিকেল-পত্র মর্ম্মরিত হইতেছে। চারিদিকে ফুল ফুটিয়াছে, বৃক্ষ-শাখায় পক্ষীর কূজন, ক্ষুদ্র মর্কটের কিচিমিচি। দ্বীপ-বাসীরা অবাক্ হইয়া জাহাজ দেখিতে লাগিল।

জাহাজ হইতে নাবিকরা একখানি ডিঙ্গী জলে নামাইয়া দিল। দ্বীপবাসীরা যে রকম ডিঙ্গী ব্যবহার করে, এ ডিঙ্গীও

দেখিতে ঠিক সেই রকম। তাহার পর একটি যুবতী একটি শিশুর হস্ত ধারণ করিয়া, জাহাজের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ডিঙ্গীতে উঠিল। সঙ্গে আর কেহ নাই, কোন নাবিক ডিঙ্গীতে উঠিল না। তীর হইতে যুবতার মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার বেশ একবারে নূতন ধরণের। শিশুকে পাশে বসাইয়া, দাঁড় বাহিয়া যুবতী তীরের অভিমুখে ডিঙ্গী চালনা করিল।

তীরে দাঁড়াইয়া সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছিল। ডিঙ্গী তীরের কাছে আসিতেই লুলুর মাতা আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, লুলু! অমনি চারিদিক্ হইতে নর-নারীর কণ্ঠ হইতে রব উঠিল, লুলু! লুলু! লুলু!

এ শব্দ লুলু কত স্থানে কতবার কত সহস্র কণ্ঠে শুনিয়াছিল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাহার নিজের নাম তাহার কর্ণকুহরে কখন এমন মধুর অনুভূত হয় নাই।

কয়েক জন লোক জলে নামিয়া লুলুর ডিঙ্গী টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল। লুলু শোবালের হাত ধরিয়া ডিঙ্গী হইতে নামিতে না নামিতেই তাহার মাতা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বৃদ্ধার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছিল। লুলুরও চক্ষু বাষ্পপূর্ণ, কিন্তু আনন্দে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। লুলু কোনমতে মাতার আলিঙ্গন-মুক্ত হইয়া পিতাকে অভিবাদন করিল। ওনামাটু মনের আবেগ চাপিয়া, লুলুর হাত ধরিয়া, সকলকে শুনাইয়া বলিল, আমি কি বরাবর বলিনি যে, লুলু আবার ফিরে আসবে? লুলু কত কি দেখে এসেছে, কি রকম নতুন নৌকায় ফিরে এসেছে।

শোবাল হতভম্ব। প্রথমে সে কাঁদিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রকৃতি ভয়-তরাসে নয়; লুলুর কয়েকটা সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়াই সে চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মাতার আঙ্গুল চাপিয়া ধরিয়া, কুতূহলী হইয়া নূতন প্রকারের মানুষগুলা দেখিতে লাগিল।

লুলু কাহার কথার উত্তর দিবে? চারিদিক্ হইতে তাহাকে শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তাহার শৈশব-সঙ্গিনীরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিল। লুলুর মাতা রোদন সম্বরণ করিয়া, শোবালকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইটি কে?

লুলু হাসিয়া বলিল, আমার ছেলে।

—তোমার বিয়ে হয়েছে?

—হয়েছে। সে সব অনেক কথা। বাড়ী চল, সেখানে গিয়ে সব কথা বলব।

—তোমার স্বামী কোথায়?

—তিনি আর এক যায়গায় আছেন, এখানে আসেননি।

ওনামাটু লুলুর হাত ধরিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। শোবাল কিঞ্চিৎ আপত্তির পর দিদিমার কোলে উঠিল। গ্রামের সমস্ত লোক কায-কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল।

বাড়ীতে গিয়া লুলু সকল কথা বলিল। অকূল সমুদ্রে পথহারা হইয়া সে ডিঙ্গীতে ভাসিয়া যাইতেছিল ও কিরূপে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, তাহা বলিল। পৃথিবীতে কত দেশ আছে, কত রকম লোকের বাস, তাহাদের কত রকম কৌশল, তাহার আভাষ দিল। বলিল, এক জন স্ত্রীলোক তাহাকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাষা শিখাইয়াছিলেন; নিজের কথা বিশেষ কিছু বলিল না। কুশানের সঙ্গে তাহার কিরূপে দেখা হয় ও পরে বিবাহ হয়, সংক্ষেপে তাহা বলিল। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সকলে তাহার কথা শুনিতে লাগিল।

শোবাল মাতার পাশে বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে একটা খাঁচায় একটা পাখী দেখিয়া, উঠিয়া গিয়া পাখী দেখিতে লাগিল।

লুলুর মা কন্যার জন্য আহার প্রস্তুত করিতে গেল। নেয়াপাতি ডাব কাটিয়া তাহার জল ও শাঁস লুলু ও শোবালকে খাইতে দিল। রন্ধন সমাপ্ত হইলে তাহাদের দুই জনকে সমুদ্রের মাছ, যবের রুটী, তরকারী পরিবেষণ করিয়া দিল। আহারান্তে লুলু শোবালকে লইয়া দ্বীপের এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সঙ্গে তাহার মাতা, পিতা ও গ্রামের অন্য লোক। লুলু তাহাদিগকে দেশ-বিদেশের নানা কথা শুনাইল।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, লুলু সকলকে গান গাহিয়া শুনাইল। গান তাহাদের নিজের ভাষায় নয়, অন্য ভাষায়। কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল।

বৈকালে লুলু ডিঙ্গীতে উঠিয়া জাহাজে ফিরিয়া গেল। বলিয়া গেল, পরদিবস প্রাতঃকালে আবার আসিবে।

এইরূপে কয়েক দিন গেল। লুলুর স্বামী তাহার সঙ্গে আসে নাই দেখিয়া লুলুর পিতা-মাতা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, লুলু আবার ফিরিয়া যাইবে, এখানে বাস করিবে না। তাহাকে যে আবার দেখিতে পাইল, ইহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য।

দশ পনর দিন পরে লুলু বিদায় প্রার্থনা করিল। তাহার মাতা কাঁদিতে লাগিল। লুলু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, আমি আবার আসব, প্রত্যেক বছর এই রকম এসে তোমার কাছে কিছুদিন থাকব। আমার স্বামী নিজের দেশ ছেড়ে ত এখানে এসে বাস করতে পারেন না, আমি মাঝে মাঝে আসব।

লুলুর যাইবার দিন গ্রামশুদ্ধ লোক আসিয়া সমুদ্রতীরে দাঁড়াইল। লুলু সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ডিঙ্গী বাহিয়া জাহাজে উঠিল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে জাহাজ অদৃশ্য হইল।

হোনোলুলুতে যখন জাহাজ ফিরিয়া আসিল, সে সময় কুশান বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল। কাপ্তেন তাহাকে বিনা তারে তাড়িত সংবাদ দিয়াছিলেন।

কুশান লুলুকে আলিঙ্গন করিল, শোবাল তাড়াতাড়ি বাপের কোলে উঠিল।

কুশান জিজ্ঞাসা করিল, সব ভাল দেখে এলে?

লুলু কহিল, হাঁ, সকলে ভাল আছে। আর-বছর আবার যাব ব'লে এসেছি।

কুশান বলিল, সে এখনও অনেক দিনের কথা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সমাপ্ত

“উপরে ও নীচে”

কিসের বেদন আজি দিনরাত জাগি'
সকাতর করে তব হিয়া,
পরাণ কাঁদিছে কোন্ অজানার লাগি'
মরম-কোণটি নিপীড়িয়া।
জীবন-কাননে কোন্ আধ-ফোটা ফুল
সহসা আজিকে গেছে ঝ'রে—
ঝড়ের বাতাস বুঝি দিয়েছিল দোল্,
সঘন বোঁটাটি তার ধ'রে?
সুন্দর শোভন কোন্ বিকশিত আশা
বিফল হয়েছে তব প্রাণে;
অথবা ব্যথিত হ'লো যৌবনের ভাষা
প্রিয়ারে শুধাতে কাণে কাণে?

ঘটুক যাহাই তব,—বুঝি বা না বুঝি,
সুদূর সবার প্রাণ-তল;
যেখানে বিঁধিছে প্রাণে সেখানেতে খুঁজি'
অশ্রু ছাড়া পাও না কি জল?
প্রাণের সাগর তলে সোণাভরা খনি,
তুলিতে পারো না প্রবেশিয়া?
হারাণো লুকানো, সেথা হয়ে যায় মণি,
উপরে তরঙ্গ প্রবাহিয়া।
বিফল তোমার কিছু হয় নাই জেনে,
মুছে ফেল ওই আঁখি-জল,
উপর-স্রোতেতে তোমা বৃথা লয় টেনে,
নীচে জমে রত্ন ঝল্-মল।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম-এ)।

শুভাকাঙ্ক্ষী

১

আফিস হইতে বাটীতে গিয়া সন্ধ্যার পর নিশ্চিন্ত-মনে বসিয়া তাম্রকূটের মহিমাতে শান্তি উপভোগ করিতেছিলাম, এমন সময় শ্রীমান্ রাখালচন্দ্রের সহসা আবির্ভাবে একেবারে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলাম। কোথায় শ্যামবাজার আর কোথায় চেৎলা, প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান, এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া রাখাল ভায়া অসময়ে, বিনা সংবাদে একেবারে সশরীরে হাজির, বিস্মিত না হইব কেন?

রাখালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বড়ই মধুর অথচ কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে সত্য গোপন করা হয় না। রাখালের মাসীর বাড়ী আমার শ্বশুরবাড়ীর নিকটে। সে বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে মাসীর বাটীতে গিয়া থাকিত, সেই সময় তাহার সহিত আমার আলাপ হয়। আপনারা হয় ত শুনিয়া অবাক্ হইবেন যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে পরিচিত রাখালের সহিত আমিই আমার ব্রাহ্মণীর প্রথম আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলাম। রাখালের বয়স যখন ১০।১২ বৎসর, তখন আমার তিনি, বাঙ্গালা প্রবাদ অনুসারে কুড়ি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া "বুড়া"গিরির দাবী করিতেছিলেন। আমার বিবাহের অনেক দিন পরে একবার শ্বশুরবাটীর কোন আত্মীয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই। সেই সময় ১০ বৎসর বয়স্ক রাখালকে আমি প্রথমে দেখি ও বাটীতে আসিয়া গৃহিণীর নিকটে রাখালের কথা বলি। গৃহিণী তখন তুইটি পুত্রের জননী হইলেও ঐ অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বালকটিকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহার পর-বৎসর বড়দিনের ছুটীতে রাখাল মাসীর বাড়ী গিয়াছিল, সেই সময় আমাকেও একবার শ্বশুরবাড়ীতে যাইতে হয়। গৃহিণীর ইচ্ছার কথা মনে করিয়া আমি রাখালকে বলিলাম, "রাখাল, আমার সঙ্গে কলিকাতায় বেড়াইতে যাইবে?" বলা বাহুল্য যে, আমার এই প্রস্তাব বালক রাখালের নিকটে এতই লোভনীয় হইল যে, সে কিছুতেই লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, তাহার মাসীমার সম্মতি লইয়া সে আমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিল।

এই তাহার প্রথম কলিকাতা দর্শন; সুতরাং পল্লী-গ্রামের বালক কলিকাতাকে প্রথমে যে কি চক্ষুতে দেখিয়াছিল, তাহা আমার লেখনী-মুখে বর্ণনা করা অপেক্ষা পাঠকগণ মনে মনে কল্পনা করিয়া লইলেই ভাল হয়। রাখালের সেই শুভ্র বিস্তৃত ললাট, কুঞ্চিত কেশ, উজ্জ্বল চক্ষু এবং বালকসুলভ চঞ্চলতা দেখিয়া গৃহিণী মুগ্ধ হইলেন, মাতৃহীন রাখালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বাৎসল্য রসে প্লাবিত হইল। রাখাল তাহাকে "দিদি" বলিয়া প্রণাম করিল, গৃহিণী তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "রাখাল আমার বড় ছেলে।" সুতরাং রাখালের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লউন।

সেই সময় হইতেই রাখালের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা। তাহার পর যুবক রাখাল এম-এ পড়িবার সময় কলিকাতায় কোথাও থাকিবার সুবিধা করিতে না পারিয়া পড়িবার আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিল। আমি তাহা জানিতে পারিয়া রাখালকে প্রায় তুই বৎসর আমার বাটীতে রাখিয়াছিলাম। এম-এ, পাশ করিয়া সে শিক্ষকতা করিতে করিতে আইন পরীক্ষা দিল। এখন সে আলিপুরে ওকালতী করে। এখনও বিশেষ পশার হয় নাই, গড়ে প্রতি মাসে তুই শত কি আড়াই শত টাকা উপার্জ্জন করে।

ওকালতীতে উন্নতি করিবার জন্য সে অত্যন্ত পরিশ্রম করিত। সকালে ছয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ন হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত হয় সে মক্কেলদিগের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিত, নতুবা আইনের পুস্তক পাঠ করিত। কিছুতেই সময়ের অপব্যয় করিত না। আমি তাহা জানিতাম এবং বোধ হয়, কতকটা আমারই উপদেশ অনুসারে সে সময়ের মূল্য বুঝিয়াছিল, তাই আমি তাহাকে অকারণে কখনও আমার বাটীতে আসিতে অনুরোধ করিতাম না। সে এইরূপ পরিশ্রমী ছিল বলিয়াই তাহার সমবয়স্ক নব্য উকীল-দিগের মধ্যে তাহারই উপার্জ্জন অধিক ছিল। তাই রাখালকে অসময়ে সহসা আসিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "রাখাল যে? এমন সময়ে হঠাৎ কি মনে ক'রে? ছেলেরা সব ভাল আছে ত? বউ কেমন আছে?"

রাখাল আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, সকলে ভাল আছে। দিদি কোথায়, আজ একটা সুসংবাদ এনেছি, দিদির কাছ থেকে সন্দেশ খেতে হবে।"

রাখালের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই তারা-গ্রামে বাঁধা। সে কখনও চুপি চুপি কথা কহিতে পারিত না; সুতরাং তাহার দিদিকে আর অন্য কাহাকেও দিয়া সংবাদ দিতে হইল না যে, শ্রীমান্ রাখালচন্দ্রের শুভাবির্ভাব হইয়াছে। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই গৃহিণী রন্ধনশালা হইতে একবারে সটান বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত।

তাঁহাকে দেখিয়াই রাখাল প্রণাম করিয়া সহাস্যে বলিল, "এই যে নাম কর্‌তেই দিদি এসেছেন। অনেক দিন বাঁচ্‌বেন। এখন সন্দেশ খাওয়ান, নইলে সুখবর দিব না।"

ব্রাহ্মণীও হাসিমুখে বলিলেন, "সুখবরটা কি শুনি? বউ বুঝি ঝগড়া ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে?"

রাখাল বলিল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, এমন দিন কি হবে? এখন ও বাজে কথা থাকুক্। অনিল ফার্ষ্টক্লাশ অনার পেয়েছে, সন্দেশ না দিলে আমি এ খবর কিছুতেই বলব না।"

আমার বড় ছেলে অনিল এ বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল, সে পরীক্ষায় বড় ভাল লিখিতে পারে নাই, তাই তাহার ভয় ছিল যে, বোধ হয়, এ বৎসর পাশ হইতে পারিবে না।

আমি বলিলাম, "এখনও ত গেজেট হয় নাই, তুমি খবর পেলে কোথা থেকে?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে ভবানীপুরে অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। হাইকোর্টের এক জন উকীল আমাকে একটু স্নেহ করেন। আমি শুনেছিলেম যে, তিনি 'মডারেটর' না 'ট্যাবুলেটর' এই রকম কি একটা হয়েছেন। আমি অনিলের রোল নম্বরটা তাঁকে দিয়েছিলেম, তিনি আজ বৈকালে আমাকে লিখেছেন যে, অনিল ফার্ষ্টক্লাস অনার পেয়েছে। এই দেখুন তাঁর চিঠি।"

গৃহিণী বলিলেন, "সত্যিই সুখবর। তা কেবল সন্দেশ খাবি কেন? ওঁর আজ মাংস-ভোজনের সাধ হয়েছে, রান্না হ'য়ে এল, চাট্টি ভাত খেয়ে যা'। বউকে ত ব'লে এসেছিস্ যে, আমাদের এখানে আস্‌ছিস?"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "শুধু ব'লে এসেছি? তাকে আমার চাল নিতেও বারণ ক'রে এসেছি।"

"তবে আয়। বাড়ীর ভিতরে ব'সে গল্প করবি আয়। তুমিও এস না গো—"

বলা বাহুল্য, এ আদেশটা এই অধীনের প্রতি হইল। বাটীর ভিতরে যাইতে যাইতে রাখালকে বলিলাম, "তোমার দিদির কথা শুনে যেন মনে ক'র না যে, এই বৃদ্ধবয়সে আমার মাংসে লোভ হয়েছে। কি জান? এই দাঁতকটা ষ্ট্রাইক করবার ভয় দেখিয়েছে, দু' একটা রিজাইনও দিয়েছে। তাই ভাবলেম—সব কটা মিলে যখন রিজাইন দেবে, তখন ত সাত্ত্বিক আহার আছেই, এখন বেটারা যত দিন আছে, একটু খাটিয়ে নেওয়া যাক্।"

গৃহিণী মুখঝামটা দিয়ে বল্লেন, "আচ্ছা আচ্ছা, আর নিজের দোষ ঢাকতে হবে না। না রে রাখাল, ওঁর কথা শুনিস্‌নে, ওঁর একটাও দাঁত পড়েনি।"

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "নাঃ, তুমি আমাকে বুড়ো হ'তে দেবে না দেখছি।"

২

রন্ধনগৃহের রোয়াকে গৃহিণী মাদুর পাতিয়া দিলেন, আমরা আসন গ্রহণ করিলাম। তিনি মাংস নামাইয়া ভাত চড়াইয়া দিয়া খোকাকে কোলে লইয়া নিশ্চিন্তমনে রোয়াকের এক পাশে পা ছড়াইয়া বসিলেন।

রাখাল বসিয়া বলিল, "সুখবর ত বল্লেম, কিন্তু একটা কুখবরও যে আছে।"

আমি রাখালের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার সদা হাস্যময় মুখখানি যেন একটু বিষণ্ণ। গৃহিণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুখবর আবার কি? বালাই, ষাট, ও কথা বলতে নাই।"

রাখাল বলিল, "কুখবর এমন কিছু নয়, তবে আমি এক শুভাকাঙ্ক্ষীর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি।"

"শুভাকাঙ্ক্ষীর জ্বালায় অস্থির কি রকম?"

রাখাল বলিতে আরম্ভ করিল:—

"আপনারা আমার বাল্যজীবনের অনেক কথাই জানেন, কিন্তু আবার অনেক কথাই জানেন না। এই শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা বলিতে হইলে আমার জীবনের প্রথম অংশের সব কথাই বলা দরকার।

"আপনারা জানেন, বাল্যকালেই আমি পিতৃ-মাতৃহীন হই। আমার পিসেমহাশয় আমার অভিভাবকস্বরূপ হইয়া বিষয়-সম্পত্তি দেখিতে লাগিলেন। বাবাকে আমার

বড় মনে পড়ে না, মা'র মুখে শুনেছিলেম, তিনি কোথায় সাত শত টাকা বেতনে চাকরী করতেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় এক শত বিঘা জমী আর নগদ সাত হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বাবা বিদেশে থাকতেন, প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় বা জমী বন্দোবস্ত করবার প্রয়োজন হ'লে সব সময় বাড়ীতে আসতে পারতেন না। মধ্যে মধ্যে প্রজাদের নামে বাকী খাজনার মামলা করতে হ'ত। এই সকল গোলযোগে তিনি বড় যেতে চাইতেন না। সেই জন্য তিনি পিসেমশায়ের নামে আমমোক্তারনামা লিখে দিয়েছিলেন।

"বাবার মৃত্যুর পর পিসীমা ও পিসেমহাশয় আমাদের অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন। পিসেমহাশয় বর্দ্ধমানে মোক্তারি করতেন। তিনি পিসীমাকে নিয়ে বর্দ্ধমানেই থাকতেন। মা'র মুখে শুনেছি যে, পিসেমহাশয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মা'র কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ নিয়েছিলেন। আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন মাও আমাকে ত্যাগ ক'রে বাবার কাছে চ'লে গেলেন। আমি তখন শিশুমাত্র, পিসীমা আমাকে বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখলেন।

"বর্দ্ধমানে পিসেমশায়ের কাছে আমি ২।৩ বৎসর ছিলেম। এই দুই তিন বৎসর যে আমার কিরূপে কেটেছে, তা মনে হ'লে আমি এ পৃথিবীর কথা একেবারে ভুলে যাই। সে সব কথা সবিশেষ বর্ণনা করবার প্রয়োজন নাই। এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি সেই আট বৎসর বয়স থেকে পিসেমশায়ের বাসাতে বিনা বেতনে চাকর নিযুক্ত হইলাম। পিসীমার ছোট ছেলেকে সর্ব্বদা আগলান, দোকানে যাওয়া, পিসেমশায়ের তামাক সাজা প্রভৃতি সকল কার্য্যই আমাকে করতে হ'ত।

"আমি শুনেছিলেম যে, আমার এক মাসী আছেন, কিন্তু কোথায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী, তাঁর আর কে আছে, তাঁর অবস্থা কেমন, এ সকল কথা আমি কিছুই জানতেম না। এক দিন পিসীমার কাছে কথায় কথায় শুনতে পেলাম যে, হরিরামপুরে আমার মাসীর বাড়ী। কিন্তু কোথায় সেই হরিরামপুর, কোন্ জেলায়, আমার মেসোমহাশয়ের নাম কি, আমি কিছুই জানি না। একটা কথা ব'লে রাখি, পিসেমশায়ের বাসাতে আমার আহার অপেক্ষা প্রহারের ব্যবস্থাটাই ভাল রকম ছিল। এমন কি, অনেক সময় অতিরিক্ত প্রহারে আমাকে দুই তিন দিন শয্যাশায়ী থাকিতেও হইত। আর গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে যে তিনি কতবার আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তার সংখ্যা হয় না।

"এইভাবে দিন কেটে যায়। যখন আমার বয়স এগার বৎসর, সেই সময় এক দিন একখানা পত্র আমার নামে এসে হাজির। আমাকে চিঠি দেয় কে? রিপ্লাই পোষ্ট-কার্ড, বাঙ্গালায় লেখা, আমি তখন বাঙ্গালা স্কুলে পড়ি। পোষ্টকার্ড প'ড়ে বুঝিলাম যে, মাসীমা আমার সংবাদ লইতে অগ্রসর হয়েছেন। পোষ্টকার্ডে মাসীর ঠিকানা ছিল, আমি সেই ঠিকানাটা লিখে রেখে মাসীমার চিঠির জবাব দিলাম এবং আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ মিনতি ক'রে জানালাম।

"প্রায় পনের দিন পরে এক জন লোক আমাদের বাসাতে গিয়ে পিসেমহাশয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে বললেন, 'রাখালকে নিয়ে যাবার জন্য তার মাসীমা আমাকে পাঠিয়েছেন।' পিসেমহাশয়, পিসীমা কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চাহিলেন না। কিন্তু সেই লোক কিছুতেই তাঁদের আপত্তি শুনলেন না, সেই দিনই তিনি আমাকে সঙ্গে ক'রে হরিরামপুরে নিয়ে গেলেন। সেই সময় থেকে আমার অদৃষ্ট ফিরিল।

"মাসীমা বিধবা। যিনি আমাকে বর্দ্ধমানে আনিতে গিয়েছিলেন, তিনি মাসীমার দেবর। তাঁরা ধনবান্ না হলেও তাঁহাদের সংসার বেশ সচ্ছল। আপনারা ত তাঁকে জানেন, তিনিই আমাকে পিসেমহাশয়ের কবল থেকে রক্ষা করেন। তিনি আমাকে রক্ষা করলেও, আমার টাকা বা ভূসম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন নাই। সেই যে পাঁচ হাজার টাকা পিসেমহাশয় মা'র কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তার একটি পয়সাও দেন নাই। তার পর একটু বড় হয়ে আমাদের পৈতৃক গ্রামে গিয়া অনুসন্ধানে জানলেম যে, আট দশ বিঘা জমী ও ভদ্রাসন বাটী ছাড়া আমার আর কিছুই নাই। পিসেমহাশয়ের সুব্যবস্থায় ও মোক্তারির কৌশলে সমস্তই খাজনার দায়ে নীলাম হয়ে গিয়েছে এবং পিসেমহাশয়ই নাকি বেনামী ক'রে সেই সকল জমী কিনে নিয়েছেন।

"হরিরামপুরে এসে মাসীমা এবং তাঁর দেবর নীলমণি কাকার যত্নে আমি বেশ সুখে রহিলাম। নীলমণি কাকা আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। তার পর হ'তে আমার জীবনের ইতিহাস আপনাদের অজ্ঞাত নাই। এখন আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর কথাটা বলি, পিসীমা-পিসেমহাশয়ের কথা প্রথমে না শুনলে, আমার এই শুভাকাঙ্ক্ষীর মহিমাটা আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন না বলেই আগে আমার সেই পিসীমা ও পিসেমহাশয়ের কথা বললেম।"

৩

গৃহিণী তন্ময় হইয়া রাখালের গল্প শুনিতেছিলেন। এখন তাহার জীবন-নাটকের একটা অঙ্ক শেষ হইল দেখিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বলিলেন, "রাখাল, দাঁড়া ভাই, একবার ভাতটা দেখে আসি, আমি এলে তার পর বলিস্।"

এই বলিয়া তিনি রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং প্রায় পাঁচ মিনিট পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ভাত হয়ে গেছে, তোমাদের তু'জনকে দেব কি?"

রাখাল বলিল, "না না, এত তাড়াতাড়ি কেন? এই ত রাত আটটা, অনিল আসুক না, একসঙ্গেই খাব।"

আমি ভৃত্যকে এক কল্কে তামাক দিতে বলিয়া রাখালকে বলিলাম, "এইবার তোমার শুভাকাঙ্ক্ষার কথাটা শুনি।"

রাখাল বলিল, "প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে এক দিন আমার স্ত্রীর ভয়ানক জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি-কাসি হইল। বিনা চিকিৎসায় ফেলিয়া রাখা উচিত নহে মনে করিয়া আমি এক জন চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। বউ বলিল যে, সে কিছুতেই এলোপ্যাথিক ঔষধ খাইবে না, কবিরাজী ঔষধেও তাহার বিষম আপত্তি, তাহার জন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চাই। আমার বাসার কাছেই এক জন ভাল ডাক্তার আছেন, কিন্তু তিনি এলোপ্যাথ। অগত্যা এক জন হোমিও-প্যাথের সন্ধানে বাহির হইলাম। এক জন প্রতিবেশী ভদ্র-লোক বলিলেন যে, চেৎলা হাটের কাছে নলিন ডাক্তার আছেন, তিনি পাশকরা ডাক্তার না হইলেও হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করেন ভাল; বিশেষতঃ নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্, ইনফ্লুয়েন্জা প্রভৃতি রোগে তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, তাঁর ঔষধ ডাকিলে সাড়া দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া নলিন ডাক্তারের উদ্দেশ্যে চেৎলাহাটে গেলাম। তাঁহার ডাক্তারখানা খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন কষ্ট হইল না। আমার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তার বাবু বাটীতেই ছিলেন। আমার আগমনের কারণ শুনিয়া তিনি বলিলেন,—

"চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়া রোগীকে দেখিয়া আসি। এ মহাশয় হোমিওপ্যাথি, রোগী না দেখে ঔষধ দিবার জো নাই। যেমন লক্ষণটি দেখিব, ঠিক তেমনই ঔষধটি দিতে হইবে, তবে ত এক মাত্রায় রোগ আরাম হইবে। শালারা বলে জলপড়া। জলপড়াই হউক আর ধূলাপড়াই হউক, রোগ আরাম করাই দরকার, কি বলেন মহাশয়?"

ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে পথে বাহির হইলেন। তাঁহার যেমন পা চলিতে লাগিল, তেমনই মুখ চলিতে লাগিল, এমন বাচাল আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। এক মিনি-টের জন্য তাঁহার কথা বন্ধ হইল না। পথে যাইতে যাইতে আমার নাম, উপজীবিকা, জন্মভূমি, শ্বশুরবাড়ী, শ্বশুর-মহাশয়ের নাম, তিনি কি করেন প্রভৃতি কত কথাই যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা অসম্ভব। এক কথায় চেৎলাহাট হইতে আমার বাসা পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে তিনি আমার সাংসারিক ও পারিবারিক সকল বিষয়েই ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিলেন।

বাসাতে উপস্থিত হইয়া গৃহিণীকে ডাক্তার বাবুর আগমন-সংবাদ দিলে, তিনি আপাদমস্তক একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন, ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই রোগিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কি রে সরি, জ্বর ক'রে বসেছিস্?"

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া আমি ত অবাক্। আমার স্ত্রীর নাম যে সরোজিনী, তাহা ডাক্তার বাবু কেমন করিয়া জানিলেন?

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়াই গৃহিণী ঘোমটা খুলিয়া বলিলেন,—"নলিনদাদা, তুমি ডাক্তার?"

ভিতরের কথাটা সংক্ষেপেই বলি। নলিনী ডাক্তার আমার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কীয় ভাই। আমার মামাশ্বশুরের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। যখন বাল্যকালে আমার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে মামার বাড়ী যাইত, তখন এই নলিনী ডাক্তারের ছোট ভগিনী তাহার খেলার সাথী ছিল। গৃহিণীর সম্পর্কে নলিনী

ডাক্তার আমারও নলিনী দাদা হইলেন, এই নলিনী দাদাই আমার "শুভাকাঙ্ক্ষী।"

বলা বাহুল্য যে, নলিনী দাদা আমাদের বাটীতে রোগী দেখিতে আসিলে ভিজিট নেন না, এমন কি, ঔষধের দাম পর্য্যন্ত লইতে আপত্তি করিতেন। কিন্তু আমি সে আপত্তি শুনিতাম না। ঔষধের দাম আমি দিতাম এবং ভিজিট লইতেন না বলিয়া অন্য প্রকারে তাঁহাকে কিছু কিছু দিতাম।

এইভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেল। নলিন দাদা চিকিৎসক মন্দ নহেন, কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জন তেমন অধিক ছিল না। কারণ, তিনি বাচালের চূড়ান্ত হইলেও রোগীর কাছে দোকানদারী করিতে জানিতেন না। বাটীতে এক জন রোগী আসিলে তাহার সহিত এত কথা কহিতেন যে, শেষে সেই রোগী যেন ডাক্তারের হাত হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচিত। কাহারও বাটীতে রোগী দেখিতে যাইলে তিন চারি ঘণ্টার কমে সে বাটী হইতে বাহির হইতেন না। ফলে তিনি একেবারেই পসার করিতে পারেন নাই। সুতরাং এক এক দিন সংসার অচলপ্রায় হইত। প্রথমে সাংসারিক কষ্টের কথা আমার কাছে বড় একটা বলিতেন না। তাঁহার মলিন বস্ত্র, ছিন্ন পাদুকাই তাঁহার দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দিত। আমি তাহা দেখিয়া যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। এক দিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমার নিজের জন্য জুতা ফরমাইস দিতে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও এক জোড়া ভাল জুতার অর্ডার দিলাম। এইরূপে তাঁহার জুতা, কাপড়, ছাতা হইতে আরম্ভ করিয়া লেপ, বালিশ, মশারি পর্য্যন্ত করিয়া দিলাম। মাসের মধ্যে ৫।৬ দিন তাঁহাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিতাম। উকীল মহলে যাহাতে তাঁহার একটু পসার হয়, সে চেষ্টাও করিলাম। ফলে অনেক উকীলের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় ও বন্ধুতা হইল।

পারিবারিক ব্যাপার লইয়া মধ্যে মধ্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার মত-বিরোধ—এমন কি, কলহও হইত, কোন্ সংসারে না হয়? নলিনদাদা যদি এইরূপ কলহের সংবাদ পাইতেন, অমনি ছুটিয়া আসিয়া মধ্যস্থতা করিতেন। দম্পতি-কলহে অযাচিতভাবে অপরের মধ্যস্থতা যে কোন পক্ষেরই বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু নলিনদাদার বিশেষত্ব এই যে, তিনি উপযাচক হইয়া মধ্যস্থতা করিতে অত্যন্ত দক্ষ। অনেক সময় আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের কলহের কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে একেবারেই নারাজ হতেম, কিন্তু নলিনদাদা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন ক'রে, জেরার উপর জেরা ক'রে, আদ্যোপান্ত না শুনে কিছুতেই ক্ষান্ত হতেন না। তাঁর কথার মাত্রাই ছিল, "আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, তোমাদের শুভকামনাতেই এ কথা বল্‌ছি।"

তাঁর এই পারিবারিক বিষয়ে অনধিকারচর্চ্চা, আমি আত্মীয় ভেবে সহ্য করিতাম, কিন্তু যখন কোন মক্কেলের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহিতাম, তখনও নলিন দাদার অযাচিত শুভকামনার জ্বালায় সময় সময় অস্থির হইতে হইত। অবশেষে এক দিন আমি তাঁহার শুভকামনা সহ্য করিতে না পারিয়া অন্তরালে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম,—"দাদা, এটা আইনের কথা, ঘর-সংসারের কথাও নয়, আর চিকিৎসার কথাও নয়। এ বিষয়ে তুমি কথা না কহিলেই ভাল হয়।"

আমার কথা শুনিয়া দাদা মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন। তিন চারি দিন পরে এক দিন বউ বলিল,—

"তুমি নলিন দাদাকে কি বলেছ, তিনি তোমার উপরে ভারি রাগ করেছেন।"

সেই দিন হইতে নলিন দাদা আমার সঙ্গে দেখা হইলেও ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। আমি সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও, তাঁহার অযাচিত শুভকামনার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি ভাবিয়া যেন একটু স্বস্তি বোধ করিলাম। কিন্তু "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।"

৪

এই সময় এক দিন বর্দ্ধমান হইতে এক পত্র পাইলাম, আমার পিসে মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আমার সঙ্গে যতই দুর্ব্ব্যবহার করুন না কেন, তাঁর মৃত্যু-সংবাদে মনটা কেমন বিষাদ-পূর্ণ হইল। আমি সেই দিনই মনি-অর্ডার করিয়া পিসীমার কাছে পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া দিলাম।

ইতিমধ্যে এক দিন আমার এক উকীল বন্ধু আমাকে বলিলেন, "রাখালবাবু, আপনার ঐ নলিন ডাক্তারটি কেমন লোক?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আপনি ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

বন্ধু বলিলেন, "সে দিন আমার ছেলের অজীর্ণ রোগের জন্য আমি আপনার কথামত নলিন ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাই। তাঁহার সহিত আমার সেই প্রথম আলাপের দিনই তিনি আমার নিকটে আপনাদের পারিবারিক কত কথাই না বলিলেন। আপনার স্ত্রীর ব্যবহারে যে আপনাদের সংসারে সর্ব্বদাই অশান্তি বিরাজ করিতেছে, আপনি মাসের মধ্যে ২০ দিন গৃহিণীর সঙ্গে কলহ করিয়া বৈঠকখানায় রাত্রি যাপন করেন, আপনার শ্বশুরবাটীতে সকলেই আপনাকে হেয় জ্ঞান করে, এইরূপে কত কথাই তিনি আমার কাছে বলিলেন। তবু যদি আমি আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে না জানিতাম! নলিন ডাক্তার ত বেশ মজার লোক। আমার কাছে তিনি যেমন বলিলেন, এইরূপ ত সকল স্থানেই বলিয়া বেড়ান ?"

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি হাসিব, কি নলিন দাদার উপরে রাগ করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। একটু হাসিয়া দাদাকে বলিলাম, "আপনি কিছু মনে করিবেন না, নলিন দাদার স্বভাবই ঐরূপ। তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কি না!"

বাড়ীতে আসিয়া আমার স্ত্রীর কাছে এই কথা বলিতে সে ত একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। বলিল, "আসুক ত নলিন দাদা, একবার তাকে ভাল ক'রে বুঝে নেব।"

আমি বলিলাম, "আমরা ত বুঝিয়া লইয়াছি, তাহা হইলেই হইল। অধিক কথা বাড়াইলে অশান্তি বই শান্তি হইবে না, চেপে যাওয়াই ভাল।"

আমার উপর যে নলিন দাদার ক্রোধ বা অভিমান হইয়াছিল, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি আবার পূর্ব্বের মত ঘন ঘন আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং উপযাচক হইয়া সকল ব্যাপারেই আমাদিগকে অযাচিত উপদেশ দিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে শুভ কামনা করিতে লাগিলেন। পাছে বউ তাহার নলিন দাদাকে কোন কথা বলিয়া ফেলে, সেই ভয়ে আমি তাহাকে বারংবার সাবধান করিতে লাগিলাম। নলিন দাদা যখন ভগিনীপতি সম্পর্ক ধরিয়া আমার সহিত রহস্যালাপ করিতেন, তখন আমি মনে মনে হাসিতাম, আর মনে করিতাম, ইনিই সুধীর বাবুর বাটীতে গিয়া আমাদের সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া আসিয়াছেন।

পিসেমহাশয়ের মৃত্যুর প্রায় এক মাস পরে এক দিন কাছারী হইতে বাসাতে গিয়া দেখি, পিসীমা তাঁহার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যাকে লইয়া বাসাতে উপস্থিত। সে দিন বিশেষ কোন কথাই হইল না, তিনি ত আমাকে দেখিয়া চোখের জলে ধরাতল প্লাবিত করিলেন।

পরদিন তিনি বলিলেন, "বর্দ্ধমানের বাস উঠাইয়া আসিয়াছি। বারো শত টাকায় বর্দ্ধমানের বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিলাম, প্রায় হাজার টাকা দেনা হয়েছিল। ভাবিলাম, রাখালকে এত যত্ন ক'রে মানুষ করিয়াছি, লেখাপড়া শিখাইয়াছি, মা-মরা ছেলেকে মা'র অধিক যত্নে পালন করিয়াছি, সে যদিও আমাদের খোঁজ-খবর লয় না, তবু তার কাছে গিয়া পড়িলে সে কিছু তাড়িয়ে দিতে পারবে না, বিধবার এক মুঠো আলোচাল আর এই গুঁড়ো-কটার দুবেলা দু মুঠো ভাত আর একটু দুধ সে যেমন করিয়াই হউক দিবে। তাই তোর কাছে এসেছি।"

পিসীমার কথা শুনিয়াই ত আমার চক্ষুস্থির। আমার বাসাতে মোট তিনখানা ঘর। ভিতরে দুইখানা, সম্মুখে ও বাহিরে একটা বসিবার ঘর। বাহিরের ঘরে আমার মুহুরী ও চাকর আছে। অন্তঃপুরের একখানা ঘর ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সঙ্কুলান হইবে কিরূপে ?

আমার মনে এ চিন্তার উদয় হইবার পূর্ব্বেই পিসীমা স্বয়ং এই কক্ষ-সমস্যার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোর ঘরে অটল আর অচল তোর সঙ্গে খাটের উপর শুইবে; বৌমা খোকা ও খুকীকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে শুইবে, আর আমি অক্ষয়, অনিল, খেঁদী আর ভূতিকে নিয়ে ও ঘরে শুইব।"

পিসীমার কথা শুনিয়া আমার অঙ্গ শীতল হইয়া গেল। তাঁহার ১৮ বৎসরের অটল ও ১৬ বৎসরের অচল আমার কাছে খাটে শয়ন করিবে আর আমার স্ত্রী আমার ৪ বৎসরের পুত্র ও দুই বৎসরের কন্যাকে লইয়া ঘরের মেঝেতে শয়ন করিবে! কি আব্দার!

আমি অবশেষে অটল ও অচলের বাহিরের ঘরে শয়নের ব্যবস্থা করিব বলাতে পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "ষাট ষাট, বাছারা আমার চাকর-নফরের সঙ্গে শুয়ে রাত কাটাবে ?

আর আমাকে তাই দেখতে হবে? আজ যদি তোর পিসেমশাই বেঁচে থাকতেন, তা হ'লে তুই কি এমন কথা মুখে আনতে পারতিস? আমি বড় অভাগী, তাই"—তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি অঞ্চল মুখে দিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। এমন সময় নলিন দাদা উপস্থিত।

পিসীমার কথা নলিন দাদার কিছু কিছু জানা ছিল। এখন সেই পিসীমাকে সশরীরে সাক্ষাতে বিদ্যমান দেখিয়া, দাদা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি গ্রহণ করিলেন। অগত্যা আমি পিসীমার নিকট নলিন দাদার পরিচয় প্রদান করিলাম। শয়নের ব্যবস্থাটা পিসীমার প্রস্তাবমত হইল না, আমার প্রস্তাবমতই হইল। তবে তাঁহারা বিছানাপত্র কিছুই সঙ্গে আনেন নাই, সুতরাং সেই দিনই আমাকে এই সাতটি আগন্তুকের জন্য তোষক, লেপ, বালিস, মশারি প্রভৃতি কিনিতে হইল। বুঝিতেই পারিতেছেন, ইহাতে আমার প্রায় আশী টাকা খরচ হইল।

পিসীমার চারিটি পুত্রই স্কুলে পড়িত, সুতরাং তাহাদিগকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। তাহারা যে পুস্তক আনিয়াছিল, সে পুস্তকের পরিবর্ত্তে নূতন পুস্তক কিনিয়া দিতে হইল। পিসীমা বলিলেন, দুধ না হইলে তাঁহার ছেলেদের খাওয়া হয় না, সুতরাং দুধের রোজ করিয়া দিলাম। এক কথায় সংসারে ছিলাম আমরা দুই জন স্ত্রীপুরুষ ও দুইটি শিশু, এখন হইলাম দশ জন।

ইহার উপর পিসীমার ও তাঁহার ছেলেদের আবদার আছে। আজ কালীঘাট, কাল চিড়িয়াখানা, পরশু পরেশনাথ দেখিবার আবদার। এই সকল বিষয়ে প্রধান উৎসাহদাতা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী নলিন দাদা। পিসীমার আগমনের দুই সপ্তাহের মধ্যেই দেখিলাম, নলিন দাদার সঙ্গে পিসীমার এবং তাঁহার ছেলেদের ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। নলিন দাদা আসেন আমাদের বাসাতে; কিন্তু আমার সহিত বা তাঁহার ভগিনীর সহিত বড় অধিক কথাবার্ত্তা কহেন না, একবারে পিসীমার ঘরে যাইয়া তাঁহার সঙ্গেই মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহার ছেলেরাও নলিন দাদার একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠিল।

পিসীমার কলিকাতায় আসিয়াই কি ব্যারাম হইল, আগুন-তাত সহ্য হয় না, রন্ধনশালায় যাইলেই তাঁহার মাথা ধরিত; সুতরাং আমার স্ত্রীকেই রন্ধন লইয়া সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিতে হইত। পিসীমা আমার কাছে আসিয়া তিন চার দিন স্বপাকে আহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আগুন-তাত সহ্য না হওয়াতে তাঁহার অন্নও আমার স্ত্রীকেই রাঁধিতে হইত। তিন চারি মাসের মধ্যেই অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার স্ত্রী কঙ্কালসার হইয়া পড়িল।

৫

স্ত্রীকে পীড়িত দেখিয়া আমি এক দিন নলিন দাদাকে ডাকিয়া চিকিৎসার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "চিকিৎসার জন্য ভাবিতে হইবে না; আমি ঔষধ দিব, তাহাতেই সারিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সরোজিনী কিছুতেই তাহার নলিন দাদার ঔষধ খাইতে সম্মত হইল না। অগত্যা আমি এক জন কবিরাজকে ডাকিয়া তাঁহার উপরেই চিকিৎসার ভার দিলাম। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দুই তিন দিন পরে এক দিন সহসা রুদ্রমূর্ত্তিতে নলিন দাদা আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়াই আমাকে বলিলেন,—"সরির না কি কবিরাজী চিকিৎসা হইতেছে?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "হাঁ।"

"কেন? আমি কি চিকিৎসা করিতে জানি না?"

"কবিরাজ মহাশয়ও চিকিৎসা করিতে জানেন।"

"তুমি জান, আমি তোমার এক জন শুভাকাঙ্ক্ষী?"

"আজ্ঞে, তা' জানি বলিয়াই ত' কবিরাজ মহাশয়কে চিকিৎসার জন্য ডাকাইয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া নলিনদাদা সক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কি, আমাকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া অপমান করিতেছ?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আমি আপনাকে আজ ডাকিয়া আনি নাই। প্রথমে যে দিন ডাকিয়াছিলাম, সে দিন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবেও ডাকি নাই, আত্মীয় হিসাবেও ডাকি নাই; ডাক্তার হিসাবেই ডাকিয়াছিলাম। আর অপমান আমি আপনাকে কখনই করি নাই।"

নলিন দাদা ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে চলিয়া গেলেন। সরোজিনীর পীড়ার জন্য আমি এক জন পাচক রাখিয়াছিলাম। পিসীমা পাচকের হাতে খাইতেন না, আপনার অন্ন আপনিই পাক করিতেন।

সন্ধ্যার সময় কাছারী হইতে বাটীতে গিয়া দেখি, বাটী একেবারে শূন্য। পিসীমার বা তাঁহার সন্তানদের কোন সাড়া-শব্দ নাই। ঝিকে ডাকিয়া বলিলাম, "ঝি, এঁরা সব কোথায় গেলেন ?"

ঝি বলিল, "মা'র সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঠাকুনমা ছেলে-পিলে নিয়ে বাড়ী থেকে চ'লে গেছেন। মামাবাবু তাঁদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছেন।"

ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দেখি, সরোজিনীর জ্বর আসিয়াছে, সে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। তাহাকে বলিলাম, "কি হয়েছে, জ্বর না কি ?"

সরোজিনী বলিল, "তুমি কাছারীতে যাবার পরই আমার জ্বর আসিল। আমি আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। ছেলেরা স্কুলে গেল। বেলা দুইটার সময় পিসীমা আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'বাছা, আর আমার এখানে থাকা হয় না, আমি চল্লেম। বিনা দোষে নলিনকে এত অপমান কল্লেন। এত অন্যায় ত আর চোখে দেখতে পারি না। থাক বাছা তোমরা ঘর-সংসার নিয়ে'—এই বলিয়াই পিসীমা চ'লে গেলেন। খানিক পরে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ হইল, বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই পিসীমা চলিয়া গেলেন।"

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু, কয়লা নেই, কয়লা আনতে হবে।"

সরোজিনী বলিল, "কেন ? পরশু যে এক মণ কয়লা এসেছে ?"

ঝি বলিল, "মামাবাবু (নলিন ডাক্তার) তাঁর চাকরকে সঙ্গে ক'রে এনে কয়লা, ঘুঁটে, চাল, ডাল, নুণ, তেল, আলু, লেপ, বালিস, বিছানা সমস্ত একে একে নিয়ে গিয়েছেন। বামুন ঠাকুর বল্লে, 'ওসব নিয়ে যাচ্ছেন কেন ?' তা তিনি বল্লেন, 'এ সব পিসীমাদের, তাই নিয়ে যাচ্ছি।"

ঠাকুরের কথা শুনে রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইল, তখনই থানাতে গিয়া নলিনদাদার নামে অনধিকারপ্রবেশ ও চুরির নালিশ করি। কিন্তু সরোজিনী বলিল, "যদি নলিনদাদাকে শাস্তি দিতে পার দাও, কিন্তু পিসীমাকে যেন কোন দায়ে পড়িতে না হয়। তিনি যদি আদালতে গিয়ে দাঁড়ান, তা হ'লে তুমি মুখ দেখাবে কেমন ক'রে ?"

সরোর কথায় আমার চৈতন্য হইল। নলিনদাদা আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য নিশ্চয়ই পিসীমাকে সাক্ষ্য মানিবেন। পিসীমাও আমার যেরূপ শুভাকাঙ্ক্ষী, তাহাতে তিনিও বিনা আপত্তিতে আদালতে গিয়া, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া আসিতে পারেন। এই সব সাত-পাঁচ ভাবিয়া আমি আর থানা-পুলিস করিলাম না। নূতন করিয়া চাল-ডাল, তরকারী, কয়লা, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়া আমাকে সংসার পাতিতে হইয়াছে তোষক, লেপ, বালিস প্রভৃতি যাহা আছে, তাহাতে আপাততঃ আমার একরূপ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু শীঘ্রই কতকগুলা বিছানা প্রস্তুত করাইতে হইবে, বাসাতে লোকজন আসিলেই বিছানার অভাব হইবে। অভাব হউক, তাহাতে দুঃখ নাই, সে সময়ে কিনিলেই চলিবে, কিন্তু এখন নলিনদাদার জন্য আমার লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হইয়াছে। তিনি সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, আমি পিসীমাকে যত্ন করিয়া ডাকিয়া আনিয়া শেষে স্ত্রীর কথায় তাড়াইয়া দিয়াছি, আর তাঁর টাকা-কড়ি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছি। এখন এই শুভানুধ্যায়ী মহাশয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই কিরূপে ?"

তন্ময় হইয়া রাখালের কথা শুনিতেছিলাম। তাহার কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম, "সে রাস্কেলকে আর বাড়ীতে ঢুকিতে দিও না।"

গৃহিণী বলিলেন, "শুধু তাকে ? যদি তোর পিসীমাকে কি তাঁর সম্পর্কের কাহাকেও তোর বাটীতে ঢুকিতে দিস্, তবে আমি আর তোর মুখ দেখিব না। এখন চল্, ভাত জুড়িয়ে গেল।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীবৈষ্ণব-মতবিবেক

৬

(শেষাংশ)

শ্রীরামানুজীয় মতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

পিতরং মাতরং দারান্ পুত্রান্ বন্ধূন্ সখীন্ গুরূন্।
রত্নানি ধনধান্যানি ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ ॥
সর্ব্বধর্ম্মাংশ্চ সন্ত্যজ্য সর্ব্বকামাংশ্চ সাক্ষরান্।
লোকবিক্রান্তচরণৌ শরণং তেঽব্রজং বিভো ॥

অর্থাৎ হে প্রভো! আমি পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, সখা, গুরুবর্গ, রত্ন, ধন, ধান্য, ক্ষেত্র, গৃহাদি, সকল ধর্ম্ম ও সমস্ত হৃদ্গত কামনা ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে নিরাশ্রয় হইয়া তোমার সর্ব্বলোকশরণ্য চরণ-কমলযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

মনোবাক্কায়ৈরনাদিকালপ্রবৃত্তোঽনন্তাবৃত্যকরণকৃত্যাকরণভগবদপচারভাগবতোপচারসহ্যাপচাররূপ-নানাবিধানন্তাপচারান্ আরব্ধকার্য্যাণি, অনারব্ধকার্য্যাণি, কৃতান্, ক্রিয়মাণান্ করিষ্যমাণাংশ্চ সর্ব্বান্ অশেষতঃ ক্ষমস্ব।

আমি কায়মনোবাক্যে অনাদিকালের আরম্ভ হইতে নানাবিধ অকর্ত্তব্য কার্য্যের আচরণ ও কর্ত্তব্য কার্য্যের অনাচরণের দ্বারা শ্রীভগবানের ও তাঁহার ভক্তগণের নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, আমার আরব্ধ কার্য্য, সঙ্কল্পিত কার্য্য, কৃত কার্য্য ও ভবিষ্যৎকালের যে-সকল কার্য্য করিবার, তাহার দ্বারা অনন্তপ্রকারের যে-সকল অপরাধ আপনি বা আপনার ভক্তগণ সহ্য করিয়াছেন, তাহা নিঃশেষে ক্ষমা করুন।

অনাদিকালপ্রবৃত্তবিপরীতজ্ঞানমাত্মবিষয়ং কৃৎস্নজগৎবিষয়ং চ বিপরীতবৃত্তং চাশেষবিষয়মদ্যাপি বর্ত্তমানং বর্ত্তিষ্যমানং চ সর্ব্বং ক্ষমস্ব।

অনাদিকাল হইতে আমার আত্মবিষয়ে বা এই জগৎবিষয়ে যে-সকল বিপরীত জ্ঞান আছে বা তদ্বিষয়ে যে বিপরীত ব্যবহার করিয়াছি, আমাতে অদ্যাপি বর্ত্তমান ঐ সমস্ত বিপরীত অভ্যাস বা ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা সকলই ক্ষমা কর।

মদীয়-অনাদিকর্ম্মপ্রবাহপ্রবৃত্তাং ভগবৎস্বরূপতিরোধানকরীং বিপরীতজ্ঞানজননীং স্ববিষয়াংশ্চ ভোগ্যবুদ্ধের্জননীং দেহেন্দ্রিয়ত্বেন ভোগ্যত্বেন সূক্ষ্মরূপেণ চাবস্থিতাং দৈবীং গুণময়ীং মায়াং দাসভূতঃ শরণাগতোঽস্মি তবাস্মি দাস ইতি বক্তারং মাং তারয়।

অর্থাৎ—আমার অনাদিকাল হইতে ভগবৎস্বরূপতিরোধানকারিণী ভগবদ্বিষয়ে বিপরীতজ্ঞানজননী, নিজ নিজ বিষয়বুদ্ধি ও তাহাতে ভোগ্যবুদ্ধির জননী, দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ভোগ্যবুদ্ধির জনয়িত্রী, সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতা দৈবী গুণময়ীমায়ার স্বরূপতঃ দাস না হইলেও দাসরূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করিয়াছি। হে প্রভো, অদ্য আমি সর্ব্বপ্রকারে তোমার শরণাগত হইয়া তোমার দাস হইলাম, তুমি আমাকে এই মায়ার দাসত্ব হইতে ত্রাণ কর।

এইপ্রকারে সর্ব্বপ্রকারের কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণগ্রহণই প্রপত্তি। সর্ব্বতোভাবে এই প্রপত্তি অবলম্বন করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি জীবের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"
শ্রীগীতা—১৮।৬৬

অর্থাৎ—সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, অতএব তজ্জন্য দুঃখ করিও না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটিই শ্রীভগবানের শ্রীমুখে উচ্চারিত গীতার চরম শ্লোক বা শেষ আদেশ বলিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের সর্ব্বত্র স্বীকৃত। এই চরমাদেশের ব্যাখ্যানুসারেই শ্রীপাদ রামানুজ প্রপত্তি বা ন্যাসমূলক গদ্যত্রয় নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেই জীবের আর কোনও ভয় থাকে না। শ্রীমৎ যামুনাচার্য্য স্তোত্ররত্নে মধুর গম্ভীরভাবে, যে-ভাবে আত্মনিবেদনের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ভক্তবর রামানুজ গদ্যত্রয় প্রবন্ধে তাহাকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণই এইরূপভাবে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করাকেই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অনেকে এইরূপ প্রপত্তিলক্ষণা ভক্তিকে দাসত্বেরই নামান্তর বলিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপিত না হইলে এইপ্রকার ভক্তির ও আত্মসমর্পণের ভাব কপটতামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সম্পূর্ণভাবে নিজের উপর প্রভুত্বলাভ করিতে না পারিলে আত্মসমর্পণ অসম্ভব। নিজেই যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়বাসনার দাসানুদাস থাকিয়া গেলাম, তবে কে কাহাকে সমর্পণ করিবে? স্বামিত্ব ব্যতীত সমর্পণ অসম্ভব। এই জন্য সর্ব্বপ্রকারে দেহেন্দ্রিয়াদির প্রভুত্বলাভ হইলেই শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ সার্থক হয়। এইরূপ শরণাগতি বা প্রপত্তি নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণ নহে। এইরূপভাবে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পিত হইলে জীব শ্রীভগবানে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়, তাহার সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি হইয়া যায় এবং ভগবান্ তাঁহার অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহার দ্বারা স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। এইরূপেই জীবের আত্মস্বরূপ যে ভগবান্—যিনি প্রকৃত আত্মা বা 'স্ব'রূপে অবস্থিত, জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হয়। ইহাই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ। যাঁহারা এই অবস্থাকে দাসত্ব ভাবিয়া এই ভাবের

দ্বারা জাতীয় জীবনে অধোগতি সাধিত হয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আচার্য্য রামানুজ এইপ্রকার প্রপত্তিতে স্ত্রী-পুরুষ-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদিও শ্রীরামানুজের মতে ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি এই প্রপন্নভক্তিতে সকলের সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হয়, শ্রীরামানুজের হৃদয়ের উদারতা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃত ভক্ত এবং বরদরাজের অনুগৃহীত বলিয়া শূদ্রবংশোদ্ভব কাঞ্চিপূর্ণের নিকট হইতে যিনি দীক্ষাগ্রহণে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে সঙ্কীর্ণতার অবকাশ কোথায়?

সাধন—আচার্য্য রামানুজের মতে ধ্যান ও উপাসনাদিই মুক্তির সাধন। জ্ঞান মুক্তির সাধন নহে। ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়। তিনি বলেন, ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, বন্ধন যখন পারমার্থিক, তখন এরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব ভক্তিবলে ভগবান্ প্রসন্ন হইলেই মুক্তিদান করিয়া থাকেন। পরন্তু শ্রবণের দ্বারা বুদ্ধিতে যে জ্ঞানাভাস প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বারা কদাচ মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার দ্বারাই জীবের বুদ্ধি দৃঢ়সংকল্পারূঢ়া হয় এবং তাহার দ্বারাই ভগবানে ভক্তিলাভ হয়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলা হইয়াছে—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

অর্থাৎ "যাঁহারা সতত আমাতে যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আমি যে বুদ্ধিযোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি।"

শ্রীভগবানের উপর ঐকান্তিক আকর্ষণের ফলে যদি ধ্যান ও উপাসনা হয়, তবে তাহা দ্বারা যে তাঁহাতে যুক্ত হওয়া যায়, এবং তাঁহার সেবায় বা ভজনে যে প্রীতিলাভ হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই প্রীতিযুক্ত ভজনের ফলেই প্রকৃত সাত্ত্বিক বুদ্ধি লাভ হয়। সেই বুদ্ধির দ্বারা সদসদ্বিচারের ফলে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এবং পরিণামে তাহার শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানে পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, যে ব্যক্তিই তন্ময়ভাবে এই প্রকারে ভজনে অগ্রসর হইবে, শ্রীভগবান্ তাহার প্রতি কৃপা করিয়াই তাহাকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন ও সেই বুদ্ধিযোগের দ্বারা সেই জীব ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজের দেশ-কাল-পাত্রাদি বিচারে এই উভয়েরই উপযোগিতা ও প্রাদুর্ভাবের কারণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধবাদ-পরিপ্লুত দেশে আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব যথার্থই সময়োপযোগী হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাবের সময়ে কঠোর যুক্তিবাদগর্ভ বেদপথের প্রবর্ত্তন না করিয়া ঐ সময়ে হৃদয়ের কোমলানুভূতিরূপা ভক্তি-সরণী সাধারণের রুচিকর হইত না। বেদপথের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই শঙ্করাবতার শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের বিশেষত্ব। বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডেরই যে উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া যে সকল বৈদিক সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সকল বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধনের জন্যও বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেকের মতে ইহারা প্রাচীন অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ও প্রাচীন সেশ্বর-সাংখ্য সম্প্রদায়েরও উচ্ছেদসাধন করেন। ফলতঃ বৌদ্ধবাদ নিরসনের পর সাংখ্যশাস্ত্র পুনরুজ্জীবিত হইলেও সেশ্বর-সাংখ্য সম্প্রদায়ের আর পুনরাবির্ভাব ঘটে নাই। এখনও সাংখ্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ভারতবর্ষের বহুস্থানেই হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুপরম্পরাবদ্ধ সাংখ্যসম্প্রদায় ভারতে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন সেশ্বর-সাংখ্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রাচীন অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আচার্য্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়দেশীয় * গৌড়পাদাচার্য্য সাংখ্যকারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক গোঁড়া অদ্বৈতবাদিগণ গৌড়পাদাচার্য্যের এই ভাষ্যকে গৌড়পাদের রচিত নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র এই ভাষ্য গৌড়পাদের কৃত নহে, এ কথা বলিতে পারেন নাই। ফলতঃ দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিলে গৌড়পাদের আবির্ভাবের সময় লুপ্তপ্রায় অদ্বৈতবাদিগণের সহিত সেশ্বর-সাংখ্যবাদিগণের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মনিরসনে তৎকালে ঐরূপ ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। যাহা হউক, গৌড়পাদাচার্য্য বৌদ্ধবাদ-নিরসনের যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, গুরু-পরম্পরাক্রমে শঙ্করেই সে চেষ্টা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর প্রতিপক্ষমত-খণ্ডনে কঠোরতার পরিচয় প্রদান করিলেও তাঁহার মতবাদ জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির ঐকান্তিক প্রতিকূল ছিল না। আচার্য্যের রচিত ভক্তিমূলক স্তবাবলীতে ও প্রবোধ-সুধাকর-নামক গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর ভারতবর্ষে বৈদিক মার্গের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে, ভারতীয় সাধনার সম্পূর্ত্তির জন্য প্রাচীন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্প্রদায় অবতীর্ণ হন। আচার্য্যের বেদান্তভাষ্যের বিচারমল্লতায় অভিভূত হইয়া যাঁহারা সাধনাপথবিচ্যুত হইয়া ভক্তিসাধনার প্রতিকূলাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের দমনের জন্য শ্রীল রামানুজাচার্য্যের ন্যায় এক জন শক্তিশালী আচার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়েই লক্ষ্মণাবতার শ্রীল রামানুজ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া দাস্য-ভক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া ভারতের প্রাচীন সাধনাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলেন। ফলতঃ বেদমার্গের প্রতিষ্ঠায় ভক্তির যে একান্ত আবশ্যক, তাহা

*শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের সুবিখ্যাত শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য (পূর্ব্বাশ্রমে মণ্ডন মিশ্র) গৌড়পাদাচার্য্যকে গৌড়দেশীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"এবং গৌড়ৈর্দ্রাবিড়ৈর্নঃ পূজ্যৈরর্থঃ প্রভাষিতঃ।
অজ্ঞানমাত্রোপাধিঃ সন্নহমাদিদৃগীশ্বরঃ॥"

নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি—৪র্থ অঃ। ৪৪ শ্লোক।

নারায়ণাবতার শ্রীমদ্ব্যাসদেব জীবগণকে বুঝাইবার জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়

শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈতমত সম্প্রদায়ানুসারে স্বীকার করিলেও এই বিশিষ্টাদ্বৈতমতে শ্রীমন্নারায়ণের পারতম্যই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নামে এক সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছেন; ইঁহারাও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সহিত ইঁহাদের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মতানুবর্ত্তী শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের একখানি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য আছে। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য—শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তীই হউন বা পরবর্ত্তীই হউন, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবেই আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছি। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শৈব সম্প্রদায়ের। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য সম্প্রদায়াচার্য্য হিসাবে শ্বেতাচার্য্যকে নমস্কার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজ যেরূপ পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসাকে একই শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠও তাহাই করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ মুক্তিকে জ্ঞানের ফল বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তন্মতে ধ্রুবানুস্মৃতিরূপা উপাসনার ফলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতেও জ্ঞানের ফলে মুক্তি হয় না। পরন্তু উপাসনার ফলেই মুক্তিলাভ হয়। আচার্য্য রামানুজের এবং শ্রীকণ্ঠের উভয়ের মতেই বৈধ বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলেই চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং তৎফলেই জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। রামানুজের ন্যায় শ্রীকণ্ঠও পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের সহিত শ্রীকণ্ঠের একটি বিষয়ে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে। আচার্য্য রামানুজ মুক্তিতে জীবের ভগবদ্দাস্য লাভ হয় বলিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তিতে জীবের ঈশ্বরের সহিত গুণসাম্য লাভ হয় এবং জীব ঈশ্বরের ন্যায় ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। কিন্তু এই মুক্তিও ঈশ্বর-প্রসাদে লাভ হয়। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ; তাঁহার অপার মহিমা, অনন্ত শক্তি ও তিনি নিরতিশয় জ্ঞানানন্দাদিবিশিষ্ট। চেতনাচেতন প্রপঞ্চবিলাস তাঁহারই রচনা; তিনিই জগদ্রূপে পরিণত হন। জ্ঞানরূপ শক্তিবলেই তিনি সুখানুভব করেন। অথচ জড় ও অজড়ের প্রেরক বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র।

পাঞ্চরাত্রমত ও অন্যান্য সম্প্রদায়

আচার্য্য ভাস্কর ভেদাভেদবাদী হইলেও ভাস্করের সহিত আচার্য্য রামানুজের মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শঙ্কর-বিজয়ের মতে আচার্য্য ভাস্কর শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক। কিন্তু আচার্য্য ভাস্কর বহুস্থলে শঙ্কর-সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্কর ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস স্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু ভাস্করাচার্য্য পাঞ্চরাত্র মতবাদের বিশেষভাবে সমর্থক। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রে পাঞ্চরাত্রমত বেদবিরোধী বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু ভাস্কর ঐ সূত্রে পাঞ্চরাত্র মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, "তদেতৎ সর্ব্বং শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব তস্মান্নাত্র নিরাকরণীয়ং পশ্যামঃ।" অর্থাৎ এই সকলই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ, অতএব ইহার কিছুই নিরাকরণযোগ্য নহে।

পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত অতি প্রাচীন মহাভারতে পাঞ্চরাত্রাগমের প্রশংসা পরিদৃষ্ট হয়। ভাস্করাচার্য্যপ্রমুখ ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীন ভাষ্যকারগণও পাঞ্চরাত্র মত সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীভাগবত চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকটই সমাদৃত। এই ভাগবতেও পাঞ্চরাত্র মত এবং তাহার মূলীভূত চতুর্ব্ব্যূহবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজও প্রাচীন আচার্য্য-পরম্পরাপ্রাপ্ত পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া পাঞ্চরাত্র নামানুসারেই শ্রীসম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব বলিয়াছেন—"কিন্তু তাঃ পাঞ্চরাত্রিকপ্রক্রিয়াঃ স্বয়ং ভগবতা বাদরায়ণেনৈব পুরাণাদিষু দর্শিতাঃ। বাসুদেবাদিব্যূহানাং শতশস্তত্রৈবাভ্যুপপত্তেঃ। শ্রুতিষ্বপি তাঃ প্রক্রিয়াঃ শতশো দৃশ্যন্তে। তথৈকস্য গুণগুণিরূপত্বমপি বিষ্ণুপুরাণাদৌ তদ্বদেবাঙ্গীক্রিয়তে।

(সর্ব্বসম্বাদিনী, সাহিত্যপরিষদ্ সংস্করণ ১৫১ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ "(এই ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকর্ত্তা) ভগবান্ বাদরায়ণ পুরাণাদিতেও এই পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাসুদেবাদি ব্যূহ সম্বন্ধেও পুরাণাদিতে শত শত স্থানে উল্লেখ ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। শ্রুতিরও শত শত স্থানে এই সকল প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এক বস্তুরই গুণগুণিত্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও অঙ্গীকৃত হইয়াছে।"

(ঐ অনুবাদ ৩৪২ পৃষ্ঠা)

শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে চতুর্ব্ব্যূহবাদ বা পাঞ্চরাত্রমত খণ্ডন করিলেও দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যাসপূজা প্রচলিত আছে। ঐ ব্যাস-পূজাবিধানে চতুর্ব্ব্যূহ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের পূজার বিধান আছে। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে যে দিনে পূর্ব্বাহ্ণে পূর্ণমা তিথির প্রাপ্তি হয়, সেই দিন সন্ন্যাসিমাত্রেরই এই ব্যাসপূজা কর্ত্তব্য। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সন্ন্যাসিগণের ক্ষৌরকার্য্য করিতে হয়, তাহাকে ব্যাস-ক্ষৌর বলে। ঐ ক্ষৌরের পর ব্যাসপূজা করিতে হয়। উহার বিধি এইরূপ—

"বপনান্তরং স্নাত্বা পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
মনসা কর্ম্মণা বাচা পূজয়েচ্চ পরম্পরম্ ॥ (অত্রিঃ) ২৩।

পুরুষোত্তমমিতি পূজ্যমাত্রোপলক্ষণং, তদুক্তং যতিধর্ম্মসমুচ্চয়ে—দেবং কৃষ্ণং মুনিং ব্যাসং ভাষ্যকারং গুরোর্গুরুম্। পূজয়েচ্চ গণাধ্যক্ষং দুর্গাং দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ২৪। গণো গণেশঃ অধ্যক্ষং ক্ষেত্রপালং ব্যূহঃ পুনঃ। অত্র কৃষ্ণাদিশব্দাস্তত্তদ্ব্যূহপরাঃ। ব্যূহশ্চ পরিবাররূপঃ। পরিবারাশ্চ পুরাণেষু প্রসিদ্ধাঃ দ্রষ্টব্যাঃ। তত্র কৃষ্ণস্য বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ ॥"

যতিধর্ম্মনির্ণয়ঃ, উত্তরভাগঃ। ২৫৮ পৃঃ।

অর্থাৎ "মুণ্ডনানন্তর স্নান করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীপুরুষোত্তমের পূজা করিয়া পরম্পরের পূজা করিবে। পুরুষোত্তমপূজা,

ইহার দ্বারা অন্যান্য পূজ্যগণের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উহার দ্বারা অন্যান্য পূজ্যগণকেও পূজা করিতে হইবে, ইহা বুঝিতে হইবে। যতিধর্ম্ম-সমুচ্চয়েও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ দেবতাকে, ব্যাসমুনিকে, ভাষ্যকারকে, গুরুর গুরুকে এবং গণেশ, দুর্গাদেবী ও সরস্বতী দেবীকে পূজা করিবে। গণ অর্থে গণেশ, অধ্যক্ষ অর্থে ক্ষেত্রপাল এবং ব্যূহ বুঝিতে হইবে। এ স্থলে কৃষ্ণাদি শব্দে সেই সেই দেবতার ব্যূহ বুঝিতে হইবে। ব্যূহ অর্থে পরিবার বুঝায়, পরিবার সমস্ত পুরাণাদিতে দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণের ব্যূহ =বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ।"

ইহাতে দেখা যায় যে, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে চতুর্ব্ব্যূহ-পূজা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। শুধু অদ্বৈত-বাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে নহে; প্রাচীন বিষ্ণুসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও এই চতুর্ব্ব্যূহপূজা প্রচলিত ছিল। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বল্লভ সম্প্রদায়ের আচার্য্য বল্লভ আচার্য্য শঙ্করের অনুকরণে ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্যে চতুর্ব্ব্যূহবাদ ও পাঞ্চরাত্র মতের খণ্ডন করিলেও সম্প্রদায়ে তাহা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কারণ, বল্লভাচার্য্য শ্রীভাগবতকে বেদান্তের ব্যাসসমাধিলব্ধ চতুর্থ প্রস্থান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীভাগবতের বহুস্থানেই পাঞ্চরাত্রমত গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুসারে চতুর্ব্ব্যূহের উপাসনাত্মক মন্ত্রাদিও শ্রীভাগবতে বিদ্যমান। * ফলতঃ যাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক নারায়ণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং পাঞ্চরাত্র মত বহুকাল হইতে শিষ্ট-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত আর কোনও প্রাচীন ভাষ্যকার পাঞ্চরাত্র মতের খণ্ডনে অগ্রসর হন নাই।

বস্তুতঃ পাঞ্চরাত্র মতবাদ দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একরূপ মূল উপজীব্য বলিলেই হয়। অথচ পাঞ্চরাত্রমতের সহিত বেদান্তের ব্রহ্মসূত্রের মূলসূত্রের বা বেদার্থের কোনও বিরোধ নাই। বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্রাগমের আচারের সহিতও বেদাচারের কোনও বিরোধ নাই। সুতরাং পাঞ্চরাত্রমতবাদকে কোনওক্রমে বেদবিরোধী বা অবৈদিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে কোনও কোনও পুরাণে পাঞ্চরাত্রমতবাদের যে নিন্দা দেখা যায়, তাহা অবৈষ্ণব পাঞ্চরাত্রপর বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদবিরোধী তন্ত্র যেমন শিষ্ট-সম্প্রদায়ের সম্মত নহে, সেইরূপ বৈষ্ণবমতবিরোধী পাঞ্চরাত্রাগমও শিষ্টসম্প্রদায়ের গ্রাহ্য নহে, ইহাই ঐ সকল পাঞ্চরাত্রবিরোধী পুরাণ-বচনের অভিপ্রায়। পুরাণশাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বহু পুরাণেই বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্রের ও চতুর্ব্ব্যূহবাদের প্রশংসা ও সমর্থন পরিদৃষ্ট হয়।

* ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমতি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥ (ভাং ১৫৩৭) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক; তুমি ওঁকারস্বরূপ; তুমি ভগবান্, তোমাকে ধ্যান ও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ শ্রীজীব গোস্বামী বলিতেছেন—পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে প্রাপ্ত সপ্রণব এই মন্ত্র দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে উপদেশ করিতেছেন।

অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত সাদৃশ্য

শ্রীসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান। উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষভাবদ্যোতক শ্রুতি পাওয়া যায়, তেমনই সবিশেষ-ভাবের শ্রুতিবাক্যও পাওয়া যায়। ফলতঃ সংখ্যাধিক্য দ্বারা বিচার করিতে গেলে সবিশেষ শ্রুতিরই বাহুল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে নির্ব্বিশেষ ভাবকেই প্রবল করিতে গেলে সবিশেষ শ্রুতিবাক্যগুলিকে হয় অনর্থক বলিতে হইবে, না হয় শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া গৌণভাবে তাহার অর্থ করিতে হইবে। শ্রীমদ্রামানুজ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব একবারেই স্বীকার করেন না, এই জন্য নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাক্যগুলিকে তিনি ব্রহ্মের প্রাকৃতগুণ নিষেধপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীমদাচার্য্য রামানুজের ঐ ব্যাখ্যা-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যায় শব্দের লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণপ্রণালী আদৌ স্বীকার করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণশিরোমণি।
লক্ষণা করিলে হয় স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥"

সর্ব্বসম্বাদিনীকার দার্শনিক-চূড়ামণি জীবগোস্বামী ঐকান্তিক নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডনে শ্রীল রামানুজের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

"'নিরবয়ব'—শব্দব্যাকোপশ্চ প্রাকৃতাবয়বরাহিত্যাদিনা পরিহৃতঃ। ইত্থমেব তস্য নিরুপাধেরেব স্বত আনন্দ-প্রকাশানিত্বং ব্যঞ্জয়ন্ "সন্দোহ"—শব্দমাত্রৈকদেশে শ্রীদত্তাত্রেয়ঃ—"কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ" (শ্রীভাং ১১।৯।১৮) ইতি। অতএবাপ্রকৃতাবয়বত্বেন তস্যানশ্বরত্বঞ্চ যুক্তম্। তথা 'জন্মাদ্যস্য' (ব্রহ্মসূত্রং ১।১।২) ইত্যাদেঃ শ্রুতত্বাচ্চ (ব্রহ্মসূত্রং ১।১।১২) ইত্যন্তস্য গ্রন্থস্য তাৎপর্য্যং তথৈবং ব্যাখ্যাতম্। শ্রীরামানুজ-শারীরকভাষ্যে যথা—"অতএব নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্মবাদোঽপি সূত্রকারেণাভিঃ শ্রুতিভিনিরস্তো বেদিতব্যঃ। পারমার্থিক-মুখ্যেক্ষণাদিগুণযোগি জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি 'গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ' (ব্রহ্মসূত্রং ১।১।৬) ইত্যাদৌ নির্ব্বিশেষবাদে হি সাক্ষিত্বমপ্য-পারমার্থিকম্; বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম চ জিজ্ঞাস্যতয়া প্রতিজ্ঞাতম্; তচ্চ চেতনমিতি 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' (ব্রহ্মসূত্রং ১।১।৫) ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে। চেতনত্বং নাম চৈতন্যগুণযোগঃ। অত ঈক্ষণগুণবিরহিণঃ—প্রধানতুল্যত্বমেবেতি" (শ্রীভাষ্যম ১।১।১২)

সর্ব্বসম্বাদিনী—সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণ (৫১।৫২ পৃষ্ঠা)
অর্থাৎ—

"'অপাণিপাদ' প্রভৃতি শ্রুতিতে নিরবয়বতাসূচক যে সকল শব্দ আছে, সেই সকল শব্দের অর্থ—"প্রাকৃত অবয়বরহিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে সেই নিরুপাধি পরম

তত্ত্বের আনন্দ-প্রকাশের অনন্তত্তা বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশে শ্রীদত্তাত্রেয়ের উক্তিতে 'সন্দোহ' শব্দের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়; যথা—তিনি নিরুপাধিক এবং কেবলানুভাব-সন্দোহ (শ্রীভাগবত ১১।৯।১৮) অতএব (অবয়ববিশিষ্ট হইলেও তাঁহাকে নশ্বর বলা যায় না; কেন না) তাঁহার অবয়ব অপ্রাকৃত; সুতরাং নশ্বর। এইরূপে জন্মাদ্যস্য হইতে শ্রুতত্বাচ্চ সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যায় সবিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে। 'শ্রুতত্বাচ্চ' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন, স্বয়ং সূত্রকার, এই সকল শ্রুতি দ্বারা নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ নিরস্ত করিয়াছেন। যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য, তিনি পরমার্থতঃই মুখ্যভাবে ঈক্ষণাদি গুণযোগ। (ঈক্ষ ধাতুর মুখ্য অর্থ দেখা) সুতরাং বেদান্তে যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন, তিনি দর্শন-গুণযোগি; অতএব নির্বিশেষ নহেন। "গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" ইত্যাদি সূত্রেও সবিশেষবাদই স্থাপিত হইয়াছে। নির্বিশেষ-বাদে ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব পর্য্যন্ত অপারমার্থিক হইয়া পড়ে। বেদান্তবেদ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার কথা আছে (যাহা জিজ্ঞাসায় জানিতে হয়, তাহা সবিশেষ), সেই ব্রহ্ম যে চেতন, 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই সূত্র দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চৈতন্যগুণযোগই—চেতনত্ব। সুতরাং যদি বল যে, তাঁহার ঈক্ষণ গুণ নাই—তিনি ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিত, তাহা হইলে তিনি অচেতন, প্রধানই হইয়া পড়েন।"

কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীরামানুজ যেমন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের একান্ত বিরোধী, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সে প্রকার নহেন। সেই একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যে সাধনার তারতম্যবশে—গ্রহণের অধিকারিভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে প্রতীত হন, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"
(ভাঃ ১।২।১১)

অর্থাৎ "তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।"

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—

"তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অন্তর্যামিত্বময়মায়াশক্তিপ্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি।"

অর্থাৎ "তন্মধ্যে শক্তিবর্গের লক্ষণ ও তাহাদের ধর্ম্মের অতিরিক্ত কেবল জ্ঞান ব্রহ্ম এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তির প্রাচুর্য্যবিশিষ্ট চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট তত্ত্ব পরমাত্মা শব্দে এবং পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট তত্ত্ব ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"

শ্রীরামানুজ এবং মধ্ব কেহই এত সূক্ষ্ম বিচারে অগ্রসর হন নাই।

উপাস্য তত্ত্ববিচারেও তাঁহারা নিখিল জীবের আশ্রয়স্থল পরাৎপর শ্রীশ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণকেই উপাস্য তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়া—দাস্যভাবালম্বনে তাঁহার উপাসনাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেবলাদ্বৈতবাদীদিগের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাকে অস্বীকার করেন নাই; পরন্তু উহার পরিপাকের অবস্থায় শ্রীভগবদুপাসনাতেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাবলম্বনে নানাবিধ রসবৈচিত্র্যময় উপাসনার পথ আবিষ্কার করিয়া শ্রীভগবানের নিখিল রসকদম্বের আশ্রয়ীভূত শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বাবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা তত্ত্বাংশে শ্রীবিষ্ণুর বা নারায়ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভেদ স্বীকার করিলেও রসবৈচিত্র্যাংশে শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ে উপাস্যবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই অদ্বৈতবাদিগণের উপর আক্রমণ করিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"প্রাকৃত বলিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"

শ্রীসম্প্রদায়, মধ্ব সম্প্রদায়, বল্লভ সম্প্রদায় ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দময় বলিয়া তাঁহাদের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ, শ্রীশ্রীবরদরাজ-প্রমুখ বিগ্রহগণকে অর্চ্চাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণই পরব্রহ্মকে বা শ্রীভগবান্‌কে অনন্ত শক্তির আধার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে নিঃশক্তিক ব্রহ্মের কল্পনা একবারে অসম্ভব। ফলতঃ ব্রহ্মে নিখিল কল্যাণগুণ ও অনন্ত শক্তিমত্তা স্বীকার না করিলে ব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য এক অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তিমত্তা স্বীকার করিলেও শক্তিবর্গের লক্ষণ ও তাহাদের ধর্ম্মের অতিরিক্ত ব্রহ্মের একটি বিশেষ ভাব স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে ইঁহারা কেবলাদ্বৈতবাদীদিগের অনুভবসিদ্ধ ভাবকে অসম্ভব বলিয়া খণ্ডন করেন নাই। কিন্তু নিখিল শক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবদ্বিগ্রহকেই পরিপূর্ণতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের বিবর্ত্তবাদে * ব্যবহারিক জগৎ স্বীকৃত হইলেও তাহার পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হয় নাই, পরন্তু উহা মিথ্যা। এই জগতের মিথ্যাত্বের জন্যই অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়কে সদসদতিরিক্ত একটি মিথ্যার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু এক অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কোনও সম্প্রদায়ই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন নাই। এই

* অতাত্ত্বিক অন্যথাভাবই বিবর্ত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগে রূপান্তর-প্রতীতি-বিধায়কত্বই বিবর্ত্ত। যেমন শুক্তিতে রজত-প্রতীতি—যেমন রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি, এ স্থলে শুক্তি বা রজ্জু আপন আপন রূপ পরিত্যাগ করে না অথচ উহাতে রজত ও সর্পের ভ্রম হয়, ইহাই বিবর্ত্ত।

জন্য অন্য সমস্ত বৈদান্তিক সম্প্রদায়ই ব্রহ্ম নিজেই স্বীয় শক্তি-বলে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিণামবাদ * স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজও পরিণামবাদী। তাঁহার মতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মের শরীরস্থানীয়; সুতরাং উহা মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ সৎ, ব্রহ্মশক্তি বা মায়া ব্রহ্মেতেই আশ্রিত, তাহা কখনই মিথ্যা ও অনির্ব্বচনীয় নহে।

"উপসংহার-দর্শনান্নেতি চেন্ন, ক্ষীরবদ্ধি" (২।১।২৪) অর্থাৎ দুগ্ধ ও জল যেমন বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই দধি ও হিমানীরূপে পরিণত হয়, তেমনই সাধনান্তর সংগ্রহ ব্যতীতও অদ্বিতীয়,—বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মেরও জীব ও জগদাকারে বিচিত্র পরিণাম উৎপন্ন হয়। ইহার পরের সূত্র "দেবাদিবদপি লোকে" (২।১।২৫) অর্থাৎ চেতনব্রহ্ম এক বা অসহায় হইলেও দেবতাদির দৃষ্টান্তে বিনা সাহায্যে সৃষ্টি করিতে পারেন। এই সকল সূত্র এবং ইহার পরের "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (২।১।২৬) এই সূত্রটির আলোচনা করিলে পরিণামবাদই যে ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রেত, তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হয়। এই পরিণামবাদকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দৃঢ় যুক্তিমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে—

"শঙ্কর শারীরকেঽপি—"আত্মনি চৈবম্" (ব্রহ্মসূত্রং ২।১।২৯) ইত্যত্র সূত্রে দেবাদিষু মায়াবাদিষু ইতি মায়াবাদিভ্যো দেবাদয়ঃ পৃথক্ পঠিতাস্তস্মাদ্দেবাদিবদবিচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিতস্যৈব পরিণামঃ। প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানাদ্রব্যাণি প্রসূতে ইতি।"

(সর্ব্বসম্বাদিনী—১৪২ পৃঃ, সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ)

অর্থাৎ—"আত্মনি চৈবম্" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেবাদি ও মায়াবাদি এইরূপ লিখিয়া ঐন্দ্রজালিক হইতে দেবাদিকে পৃথক্ করিয়া অভিহিত করিয়াছেন; সুতরাং দেবাদির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তিবলে বিকাররহিত হইয়াও ব্রহ্ম জীব ও জগৎরূপে পরিণমিত হইয়াছেন। লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে যে, চিন্তামণি নামক এক প্রকার মণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া নানা দ্রব্য সৃষ্টি করে।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই পরিণামবাদ স্বীকার করিলে সৃষ্ট্যাদিতে ব্রহ্মের বিকার-সম্ভাবনা নিরাকৃত হয়।

অদ্বৈতবাদীরা এক-জীববাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ এই এক-জীববাদ অঙ্গীকার করেন নাই। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই এই এক-জীববাদ স্বীকার করেন নাই। ফলতঃ জীব ও ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অভেদ স্বীকার করিতে হইলে এক-জীববাদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ সকলেই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অংশ ও অংশীর সহিত সেব্য-সেবক সম্বন্ধের স্থাপনার দ্বারাই তাঁহাদের যাবতীয় সাধনপথ স্থাপিত হইয়াছে। ফলতঃ জীব ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্মই সমস্ত জীবের আত্মাস্থানীয়—অতএব জীব ব্রহ্মের শরীরবৎ, এই রামানুজীয় সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রমুখ সমস্ত আচার্য্যই মানিয়া লইয়াছেন। "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (ব্রহ্মসূত্রং ৪।১।৩) অর্থাৎ সেই ঈশ্বর আত্মারূপেই উপাস্য, কেবল তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাকে আত্মারূপে প্রাপ্ত হয়েন এবং শিষ্যদিগকেও সেইভাবে উপদেশ করেন। এখানে সর্ব্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই এই সূত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া স্থূলতঃ আচার্য্য রামানুজের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

* দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইলে দধিকে দুগ্ধের পরিণাম বলা হয়। ইহাই পরিণাম।

শ্রীসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়

শ্রীসম্প্রদায় বহুকাল হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে যে ভক্তিসাধনা মানিয়া আসিতেছেন, শ্রীমদাচার্য্য রামানুজ সেই সেই মতই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদাবলম্বনে প্রপঞ্চিত করেন। শ্রীল রামানুজাচার্য্য সময়োচিতভাবে প্রপত্তি-মূলক ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। দেশকাল-পাত্রবিচারে রামানুজাচার্য্য সাধনার যে আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ যুগোপযোগী হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এই ভক্তিবাদের মূল মহীরুহ দাক্ষিণাত্যে কি প্রকারে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা আজিও দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গনাথের ও বরদরাজের সেবাপারিপাট্য দর্শনে কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের অসংখ্য নরনারী এখনও শ্রীরঙ্গনাথজীকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বোধে দর্শন ও উপাসনাদি করিয়া থাকে। কোটি কোটি প্রাণের ভক্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া দাক্ষিণাত্যকে অসংখ্য দেবমন্দিরে সুশোভিত করিয়াছে। তবে এ কথা সত্য যে, শ্রীল রামানুজাচার্য্যের কৃতিত্বে ভক্তির মূলভূমিকা জীবলোচনের গোচরীভূত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই মূল ভূমিতে বহু সুষমামণ্ডিত ব্রততীর আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যগর্ভা ভক্তিবাদের স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় প্রপঞ্চিত হইয়াছে, সেই ভক্তিসাধনার আদর্শ শ্রীসম্প্রদায়ে গৃহীত হইতে পারে নাই। এই শুদ্ধমাধুর্য্যগর্ভা অহৈতুকী ভক্তির স্বরূপের উদ্দেশ প্রদান করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে গৌড়দেশে আবার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে সপরিকরে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তাঁহার নিজের প্রতি যে অহৈতুক প্রেম—তিনি নিজে না আসিলে তাহা প্রদান করিবার শক্তি আর কাহারও হইতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের প্রবন্ধান্তরে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। কিন্তু এ কথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য যে, মহাত্মা রামানুজ এই ভক্তিবাদের যে সুপ্রশস্ত সর্ব্বলোকগ্রাহ্য বর্ত্ম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিরতিশয় সুখাবলম্ব্য। ভারতের কোটি কোটি নর-নারী এই পথ অবলম্বনে পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রীভগবৎকৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ জীবের একমাত্র আশ্রয়। সেই আশ্রয়কে অবলম্বন করিবার ও চিনিবার প্রয়াস শ্রীসম্প্রদায়ের প্রচারিত ভক্তিপথে যেরূপ সহজে সার্থকতা লাভ করে, অন্যপথে সেরূপ সহজে সার্থক হয় না। এই জন্য প্রপত্তিলক্ষণা এই ভক্তি যে অসমর্থ জীবকুলের পরম মঙ্গলদায়িনী, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

শ্রীলরামানুজ মতে পদার্থ বিভাগ

- পদার্থ
  - প্রমাণ
    - প্রত্যক্ষ
    - অনুমান
    - শব্দ
  - প্রমেয়
    - দ্রব্য
      - জড়
        - প্রকৃতি
          - প্রকৃতি
          - মহৎ
          - অহঙ্কার
          - মনঃ
          - পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়
          - পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়
          - পঞ্চতন্মাত্র
          - পঞ্চমহাভূত
        - কাল
          - ভূত
          - ভবিষ্যৎ
          - বর্ত্তমান
      - অজড়
        - পরাক্
          - নিত্য বিভূতি
          - ধর্ম্মভূত জ্ঞান
        - প্রত্যক্
          - জীব
            - বদ্ধ
              - শাস্ত্র-অবশ্য
                - তির্য্যগ্
                - স্থাবর প্রভৃতি
              - শাস্ত্রবশ্য
                - বুভুক্ষু
                  - অর্থকামপর
                  - ধর্ম্মকামপর
                    - দেবতান্তরপর
                    - ভগবৎপর
                      - আর্ত্ত
                      - জিজ্ঞাসু
                      - অর্থার্থী
                - মুমুক্ষু
                  - কৈবল্যপর
                  - মোক্ষপর
                    - ভক্ত
                    - প্রপন্ন
                      - একান্তী
                      - পরমৈকান্তী
                        - দৃপ্ত
                        - আর্ত্ত
            - মুক্ত
            - নিত্য
          - ঈশ্বর
            - পর (নারায়ণ)
            - ব্যূহ
              - কেশবাদি
              - বাসুদেবাদি
                - বাসুদেব
                - সঙ্কর্ষণ
                - প্রদ্যুম্ন
                - অনিরুদ্ধ
            - বিভব — মৎস্যাদি অনন্ত,
            - অন্তর্যামী — প্রতি শরীরবর্ত্তী,
            - অর্চ্চাবতার — বহু, যথা— শ্রীরঙ্গনাথ, বেঙ্কটনাথ প্রভৃতি সকল মানবনয়নগত মূর্ত্তিবিশেষ।
    - অদ্রব্য
      - সত্ত্ব
      - রজঃ
      - তমঃ
      - শব্দ
      - স্পর্শ
      - রূপ
      - রস
      - গন্ধ
      - সংযোগ
      - শক্তি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

বিদেশিনী

১

অনর্স নিয়ে যখন বি-এ পাস হলাম, তখন বাবা বললেন, শিবু, এবার সিভিল সার্বিস পরীক্ষা দিয়ে সিভিলিয়ান হও।

আমার নাম শিবচন্দ্র। বাবা জেলাকোর্টের বড় উকিল, বেশ পসার, কিছু টাকা জমাও করেছিলেন। আমরা দুই ভাই, আমি বড়, আর এক ভাই আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট, সে স্কুলে পড়ে। এক বোন আমার চেয়ে বড়, সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী থাকত।

পি এণ্ড ও কোম্পানীর মেল জাহাজে আরোহণ ক'রে আমি বিলাত যাত্রা করলাম। হাল ফ্যাসানে বলতে গেলে সেল করলাম। মার্সেল্‌সে জাহাজ থেকে নেমে রেলে উঠলাম।

লণ্ডনে জানা লোক ছিল, তাদের আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল। তারা কেউ সিভিলিয়ান, কেউ ব্যারিষ্টার, কেউ ডাক্তার হ'তে গিয়েছে। আমার বাসা ঠিক করা ছিল, আমি গিয়ে বাসায় উঠলাম।

লণ্ডন খুব প্রকাণ্ড সহর শোনা ছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখি, সহর আর ফুরোয় না। টিউব রেলওয়েতে রাস্তার নীচে দিয়ে যেতে খুব মজা লাগত। সিভিল সার্বিস পরীক্ষা দেবার কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যারিষ্টার হওয়াও ভাল। মিড্‌ল্ টেম্পেলে ঢুকলাম। যথারীতি লেকচার শুনতাম ও ডিনর খেতাম। এক মাষ্টারের কাছে সিভিল সার্বিসের পড়া তৈরী করতাম।

ও সবেতে বড় মন ছিল না। দেশে ঘরে বন্ধ থাকতাম, আহ্লাদ আমোদের পাটই ছিল না। এখানে আটক করবার কেউ নেই, যা খুসী, তাই কর। আমি গোড়াগুড়ি পোষাক আর চেহারাখানা দোরস্ত করলাম। ইয়া ইটন কলার আঁটলাম, অক্সফর্ড ফ্যাসানে চুল কপাল থেকে পিছন দিকে বুরুষ করতাম। তার পর কত রকম মজা! Had a swell time! Rippin'!

সিভিল সার্বিস পরীক্ষায় পাস হ'তে পারলাম না। কোনমতে ব্যারিষ্টারী পাস করলাম। বার-এট-ল হলাম। সেই সঙ্গে যে একটি মদর-ইন-ল সংগ্রহ করেছিলাম, এ খবর বাড়ীতে কেউ জানত না। মদর-ইন-লয়ের কন্যা, নীলচক্ষু ডোরা, আমার সঙ্গে দেশে ফিরলেন।

বিলাতে এ দেশ থেকে যেই যায়, সেই নবাবপুত্র কি না, ডোরা জানত আমরা মস্ত ধনী, অট্টালিকায় বাস করি, সোনার থালে খাই। এ ভ্রম ভাঙ্গবার আমি কিছুমাত্র চেষ্টা করি নি। ও দিকে মেম বিয়ে করেছি, এ কথাও বাড়ীতে লিখি নি।

জাহাজে সাহেব মেম বিস্তর। তারা সকলেই আমাদের দেখে পাশ কাটায়। ডোরা অত শত জানে না, দু একবার দু এক জন মেমের সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করেছিল। তারা ডোরার দিকে এমন ভাবে চেয়ে রইল, যেন ডোরা বেলোয়ারি কাচের তৈরী, এফোঁড় ওফোঁড় দিব্য দেখা যায়। বিলাতে ইংরাজরা আমার সঙ্গে অবাধে কথা কইত, জাহাজে the Briton's stony stare কাকে বলে, তা বিলক্ষণ অনুভব করলাম।

ডোরা বললে, The cats and the cads! Who cares for them?

টক আঙ্গুরের নীতিকথাটা আমার মনে প'ড়ল, কিন্তু আমি চেপে গেলাম।

এডেন পার হয়ে আমার মন দ'মে যেতে লাগল। কোন কথাবার্ত্তা নেই, আগে খবর দেওয়া নেই, একেবারে সস্ত্রীক বিদেশিনী পত্নী নিয়ে উপস্থিত হব? একবার ভাবলাম, wireless করি, আবার পিছিয়ে পড়লাম। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই আর করা হ'ল না।

জাহাজ থেকে নেমে দেখি, বাবা ও বাড়ীর আরও দুজন দাঁড়িয়ে আছেন। ডোরা আমার সঙ্গে নামল। আমি বাবাকে প্রণাম ক'রে বললাম, Meet my wife. ডোরাকে বললাম, Here's my father.

বাবা অবাক্। একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। ডোরা How do you do? ব'লে তাঁর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করলে, কিন্তু তাঁর স্তব্ধ মূর্ত্তি দেখে একটু জড়সড় হয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ পরে বাবা বললেন, আমরা ত কোন খবর পাই নি, মা রয়েছেন, তাঁকে না ব'লে ত তোমার বাড়ীতে যাওয়া হয় না। এখন তোমরা গিয়ে একটা হোটেলে ওঠ, এর পর কথা হবে।

বাবা আর তাঁর সঙ্গীরা চ'লে গেলেন। ডোরা আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমরা কি ওঁদের সঙ্গে যাব না ?

আমি বললাম, এখন আমরা একটা হোটেলে যাব। সব কথা তোমাকে এর পর বলব।

ডোরা ত কিছুই বুঝতে পারে না। হোটেলে যেতে পথে আমাকে বললে, এ কি রকম ? এত দিন পরে দেশে ফিরে তুমি বাড়ী না গিয়ে হোটেলে যাচ্ছ কেন ?

—হোটেলে গিয়ে তোমাকে বলব।

হোটেলে মালপত্র তুলে আমরা একটা ঘর দখল করলাম। ডোরা চেপে ধরলে, আগে তাকে সব কথা বলতে হবে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, আমাদের দেশে কতকগুলা কুপ্রথা আছে, তাইতে একটু গোল হয়েছে। আমার বুড়ী পিতামহী বড় গোঁড়া, ডোরা অপর জাতের মেয়ে, তাই আমাদের বাড়ীতে যাবার সম্বন্ধে কিছু আপত্তি হয়েছে।

তবু ডোরা বুঝতে পারে না। বললে, আমাদের বিয়ের কথা ত তোমার বাড়ীতে সকলে জানে, এখন আপত্তি কিসের ?

বিয়ের খবর যে বাড়াতে মোটে দিই নি, সে কথা ডোরাকে কেমন ক'রে বলি ? আমি বললাম, বিয়ের কথা সকলে জানে বৈ কি, তবে আমার ঠাকুমা বুড়ো মানুষ, বড় orthodox, তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

ডোরা তার বব-করা মাথা নেড়ে বললে, সে তুমি যা হয় বলো, কিন্তু এখানে আমি হোটেলে থাকতে আসি নি।

—তা কেন, আমি তোমাকে দু এক দিনের মধ্যেই বাড়ী নিয়ে যাব।

২

বিকেলবেলা বাবা এসে আমাকে ডাকিয়ে পাঠালেন। আমাদের ঘরে এলেন না। নীচে নেমে গিয়ে দেখি, তিনি হোটেলের সামনে তাঁর মোটরে ব'সে আছেন, গাড়ী থেকে নামেন নি। আমাকে বললেন, তুমি একবার আমার সঙ্গে বাড়ী চল, মা তোমাকে ডেকেছেন।

—একা যাব ?

—হাঁ, এখন একাই চল।

—তবে একবার ডোরাকে ব'লে আসি, ব'লে আমি আমাদের কামরায় গিয়ে ডোরাকে বললাম, আমি একবার একটু কাযে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসব। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

ডোরা বিরক্তভাবে বললে, দেশে এসে আমাকে বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে ত হোটেলে আনলে, তার পর আমাকে একা রেখে কোথায় যাচ্ছ ?

—ফিরে এসে তোমাকে সব বলব, বলেই আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম। বাবা আমাকে মোটরে তাঁর পাশে বসিয়ে শোফরকে বললেন, বাড়ী চল।

পথে বাবা বললেন, তুমি তিন বছর পরে দেশে ফিরলে, তোমাকে কোথায় বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সকলে আহ্লাদ করবে, না বাড়ীতে কান্নাকাটি প'ড়ে গিয়েছে।

আমি চুপ।

বাবা বলতে লাগলেন, তুমি মেম বিয়ে ক'রে যে কত বড় অবিবেচনার কায করেছ, তা কি বুঝতে পারছ না? তোমাকে আর তোমার স্ত্রীকে বাড়ীতে নিয়ে গেলে আমাদের একঘরে করবে, আমার মাথার উপর মা রয়েছেন, তিনি আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌বেন না। যদি তুমি বিলেত থেকে আমাকে বিয়ের কথা লিখতে, তা হ'লে আমি তোমাকে নিষেধ করতাম। এ একেবারে বলা নেই, কওয়া নেই, তুমি একেবারে মেম বউ নিয়ে উপস্থিত ! তোমার মা ত' আজ অন্ন স্পর্শ করেন নি, কেবল কাঁদছেন, আর আমার মা বল্‌ছেন, শিবু যদি এ বাড়ীতে মেম বউ নিয়ে আসে, তা হ'লে আমি এখানে থাক্‌ব না, কাশীবাস করব।

আমি ঢোক গিলে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লাম, আজকাল ত' অনেকে এমন বিয়ে করে।

—যারা করে, তারা করে, আমাদের বাড়ী ও-সব হবে না। আমি তোমাকে বিলাতে পাঠিয়েছিলাম পড়তে, বিয়ে করতে নয়। এত জান্‌লে আমি তোমাকে পাঠাতাম না, না হয় বিয়ে দিয়ে তার পর পাঠাতাম।

এ কথার কি জবাব আছে ? আমি আবার চুপ।

মোটর এসে বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াল। দরজা-গোড়ায় আমার ছোট ভাই বিমল দাঁড়িয়ে। সে আমাকে নমস্কার ক'রে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বাড়ীতে চুপচাপ। মা তাঁর নিজের ঘরের দরজার

সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার কর্‌লাম। ঠাকুমার দেখা নেই।

মা'র ৩টি চক্ষু দিয়ে জল উথলে উঠল, মুখ, বুক ভেসে গেল। মা আমার চোখে আঁচল দিলেন না, অজস্র অশ্রু-ধারা মুছে ফেল্‌লেন না। কাতর, করুণ, মর্ম্মচ্ছেদীকণ্ঠে বল্‌লেন, বাবা, শিবু, তিন বছর তোমার পথ চেয়ে আছি, তার পর কি এম্‌নি ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে আস্‌তে হয়? আমার যে বড় সাধ ছিল, আমার শিবু ফিরে এলে তার বিয়ে দিয়ে বেটা-বউ বরণ ক'রে ঘরে আন্‌ব। ওরে, তোর ঘর যে তোর জন্য সাজানো রয়েছে, বউ নিয়ে আস্‌ব ব'লে জোড়া পালঙ পেতে রেখেছি! আমার এ সাধে বাদ সাধলে কে?

মা'র কান্না দেখে আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না, কেঁদে ফেল্‌লাম। বাবা বৈঠকখানায় চ'লে গেলেন।

একটু সাম্‌লে আমি বল্‌লাম, মা, আমি যদি কুপুত্রই হই, তা হ'লে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌বে না ত' কে কর্‌বে?

মা চোখ মুছে ঘরের ভিতর গিয়ে আমাকে ডাকলেন। বললেন, ছেলের দোষ কি মা নেয়? কি করব, বাবা, তোমার ঠাকুমাকে ত জান, তাঁর অমতে এ বাড়ীতে কিছুই হ'তে পারে না। তিনি যে একেবারে বেঁকে বসেছেন, মেম ঘরে এলে তিনি এখানে থাকবেন না। উনি বরং ছেলেকে ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু মাকে কিছুতে ত্যাগ করবেন না।

—আমি একবার ঠাকুমার কাছে যাই, দেখি কি বলেন।

—তা যাবে বৈ কি, কিন্তু তিনি নরম হবেন না।

ঠাকুমা তাঁর ঘরের রোয়াকে মাটীতে বসেছিলেন। আমি গিয়ে নমস্কার করব, অমনি ব'লে উঠলেন, পায় হাত দিস্‌নে, তা হ'লে আমাকে ভর-সন্ধ্যেবেলা নাইতে হবে।

আমি তাঁর পায়ে হাত না দিয়েই প্রণাম করলাম।

ঠাকুমা কিছু রুক্ষভাবে বললেন, তুই গিয়েছিলি ম্লেচ্ছ দেশে পড়াশোনা করতে, বিয়ে করতে ত' যাস্‌নি। তাই যদি করেছিস, তা হ'লে তুই তোর বউকে এখানে নিয়ে আয়, আমি কাশী চ'লে যাই। বিশ্বনাথ আমায় কোনমতে যেতে দেয় না, তাই যেতে পারিনে।

বিশ্বনাথ আমার বাবার নাম।

আমি বললাম, ঠাকুমা, তুমি আর কোথাও যেতে গেলে কেন? আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বল করছি, আমি তোমাদের কাছে মানুষ হয়েছি, আমাকে ত্যাগ করো না।

—আমরা ত্যাগ করলাম, না তুই আমাদের ত্যাগ করেছিস? তুই প্রায়শ্চিত্ত করলে কি হবে, ফিরিঙ্গীর মেয়ে ত আর প্রায়শ্চিত্ত করলে হিঁদুর মেয়ে হয় না। আর একটা কথা তোর মনে পড়ে?

—কি কথা, ঠাকুমা?

—মায়াকে ভুলে গিয়েছিস? মেয়েদের স্কুলে পড়ত, আমাদের এখানে যাওয়া আসা ছিল? সে দুটো পাস করেছে, জলপানি পায়, আর এক বছর পরে বি-এ পাস করবে। আমরা জানতাম, তুই দেশে ফিরে এলে তার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

চকিতের ন্যায় পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠল। মায়া! মায়া তন্বী, গৌরী, উজ্জ্বললোচনা, হাস্যরঙ্গচঞ্চলা। আমাদের স্বজাতি, স্বতন্ত্র গোত্র, ধনীর কন্যা। কলেজে পড়তে তার সঙ্গে দেখা হ'ত, তার সঙ্গে কৌতুক করতাম, কালে তার সঙ্গে বিয়ে হবে, এমন কথাও কাণাকাণি হয়েছিল। তার পর সিন্ধুপারের বিদেশিনী রূপসীর মোহে মুগ্ধ হয়ে পূর্ব্ব-কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলাম। এখন সে কথা স্মরণ ক'রে কি ফল?

ঠাকুমা একটু নরমভাবে বলিলেন, হাঁ রে, তুই যাকে বিয়ে করেছিস, সে কি খুব সুন্দরী?

মজ্জমান ব্যক্তি প্রাণরক্ষার আশায় যেমন তৃণ ধরে, আমিও সেই রকম আশ্বস্ত হয়ে বললাম, ঠাকুমা, তুমি তাকে একবার দেখবে না?

ঠাকুমা নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোর বউকে দেখতে কি আমার অসাধ? নাতবৌকে নিয়ে কত আহ্লাদ-আমোদ করব, তা তুই যে সে পথে কাঁটা দিলি! তা আনিস তাকে এক দিন, কিন্তু এখানে নয়, বৈঠকখানায়। নইলে বাড়ী-ময় গোবরজল ছড়া দিতে হবে।

ঠাকুমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সাশ্রুমুখী জননীকে প্রণাম ক'রে বৈঠকখানায় বাবার কাছে গেলাম। কিছু সঙ্কোচ, কিছু সাহস ক'রে বললাম, "ঠাকুমা আমার বউকে দেখতে চেয়েছেন।"

বাবা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন' বললেন, "তা বেশ ত, তাকে নিয়ে এস। কিন্তু মা থাকতে তোমাদের এখানে থাকা হবে না, তিনি কিছুতেই রাজি হবেন না। তোমার মা'র কথা কিছু বলব না। তোমাকে আলাদা বাড়ী ক'রে দেব, খরচের জন্য মাসোহারা ক'রে দেব। বড় বড় কৌন্সিলীর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ আছে, কাউকে ব'লে ক'য়ে তোমাকে তার জুনিয়র করিয়ে দেব।"

আমার কণ্ঠরোধ হ'ল। আমি বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললাম, আমি একবার অপরাধ করেছি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন আপনার কাছে অপরাধী না হই।

৩

তার পরদিনই দুপুরবেলা আমি ডোরাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে গেলাম। আমাদের বাড়ী ত আর সাহেবী ধরণের নয়, আর খুব বেশী বড়ও নয়। ডোরা কিছু বললে না, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হ'ল, সে একটু নিরাশ হয়েছে। তবে বৈঠকখানা-ঘর খাসা সাজানো, নিন্দা করবার কিছু নেই।

ডোরাকে আমি অনেক ক'রে বুঝিয়ে রেখেছিলাম যে, ওদের দেশের পদ্ধতি আমাদের দেশে চলে না। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী পুত্রবধূকে চুমো খায় না। প্রণাম করাটা ইংরাজ-কন্যাকে দিয়ে হয় না, তবে ডোরাকে হেঁট হয়ে নমস্কার করতে শিখিয়েছিলাম। আগের দিন মাকে আমি ব'লে এসেছিলাম, তিনি যেন বৈঠকখানায় একা থাকেন, ঠাকুমাকে কিছু না বলেন। আমরা এলে খানিকক্ষণ পরে তাঁকে খবর দেওয়া হবে।

মাকে দেখে ডোরা হেঁট হয়ে নমস্কার করলে, রীতিমত courtesy। মা তার মুখের দিকে চেয়ে তাকে একেবারে বুকে চেপে ধরলেন। দুটি চক্ষু তাঁর জলে ভেসে গেল। হোক গে যে জাতের, যে দেশের মেয়ে, তাঁর ছেলের বউ ত বটে! ঠাকুমা নেই যে, তাঁকে ভয় করতে হবে।

মা'র চোখে জল দেখে ডোরারও চোখ ছল ছল করতে লাগল। সে মনের আবেগ সম্বরণ করতে না পেরে মাকে চুমো খেলে।

মা একটু সাম্‌লে চোখের জল মুছে, ডোরাকে বসালেন। নিজে একটু দূরে বসলেন। এখনি ঠাকুমা আস্‌বেন যে!

কথা আরম্ভ হ'ল। আমি দ্বিভাষী হয়ে দু'জনের কথা দু'জনকে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম।

একটু পরে ঠাকুমাকে খবর দেওয়া হ'ল। আমি ইংরিজি ক'রে ডোরাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলাম, সে যেন ঠাকুমাকে স্পর্শ না করে, তাঁকে যেন কোনমতে চুমো না খায়। সর্ব্বরক্ষে! তা হ'লেই হয়েছে আর কি!

ঠাকুমা এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন। ডোরা উঠে মাথা নত ক'রে নুয়ে তাঁকে অভিবাদন করলে।

ঠাকুমা তাকে ভাল ক'রে দেখলেন, দেখলেন তার মাথার সোনালী চুল, তার তুষার-শুভ্র বর্ণ, তার কপোলে ঈষৎ লোহিত আভা, তার নীলোৎপলের ন্যায় লোচনযুগল। দেখা হ'লে বল্‌লেন, বেশ সুন্দরী, চোখ দুটি নীল, তা ওদের দেশে ওই রকম হয়।

ঠাকুমা সাত হাত তফাতে বস্‌লেন। ডোরা চুপটি ক'রে নিজের আসনে বস্‌ল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা বিদায় হলাম। হোটেলে ফিরে এসে যখন ডোরাকে বল্‌লাম, আমরা আলাদা বাড়ীতে থাকব, তাতে সে বিস্মিত হ'ল না। ওদের দেশে এই নিয়ম, ছেলে বিয়ে ক'রে স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকে। ডোরার অভিমান হয়েছিল, তাকে এসেই বাড়ীতে নিয়ে যাইনি ব'লে। সেখানে উঠে তার পর আর একটা বাড়ীতে গেলে সে কিছু মনে করত না।

হোটেলে দিন দুই থেকে আমরা আর একটা বাড়ীতে গেলাম। বাবা দেখে শুনে একটা বাড়ী আমাদের জন্য ভাড়া করেছিলেন। বাড়ী খুব বড় নয়, আমরা ত দুটি মানুষ, বড় বাড়ী নিয়েই বা কি করব? বড় না হ'লেও দিব্য নতুন বাড়ী, ইংরাজী কায়দায় তৈরী, ঘরগুলি বেশ সাজানো, বাড়ীর সামনে একটি ছোট বাগান আছে।

বাড়ী দেখে ডোরা খুব খুসী। সব ঘরে ঘুরে ঘুরে, জিনিষপত্র দেখে সে হাততালি দিয়ে আমার হাত ধ'রে একবার নাচের ভঙ্গী করলে। বল্‌লে, How sweet! কি চমৎকার বাড়ী! এখানে আমরা খুব মজায় থাক্‌ব।

দেশে ফিরে এসে, বিশেষ মাকে দেখে, আমার প্রাণে

একটা আঘাত লেগেছিল। দেশের জন্য যেন একটা নতুন মমতা হয়েছিল। আমি বারিষ্টার, মেম বিয়ে ক'রে এনেছি, সুতরাং আমাকে সাহেবী ধরণে থাক্‌তে হয়, কিন্তু প্রাণ আঁকুবাঁকু করত দেশের ধরণ-ধারণের জন্য। দেশের খাওয়া, দেশের পরা, দেশের কথা যেন আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করতে ইচ্ছে করত।

মজুমদার সাহেব এক জন বড় বারিষ্টার। আমি তাঁর জুনিয়ার হ'লাম। গোড়া থেকেই তিনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহ করতেন। আমিও কাযে ফাঁকি দিতাম না, খুব পরিশ্রম করতাম, সন্ধ্যার পর ক্লাবে গিয়ে ব্রিজ খেলতাম না, মদ একেবারে স্পর্শ করতাম না, বৃথা আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট করতাম না। অফিস আদালতের কাযকর্ম্ম সারা হ'লে গড়ের মাঠে গিয়ে খানিক হাঁটতাম, তার পর বাড়ী ফিরে আহারাদি ক'রে, ঘণ্টা দুই কাগজপত্র দেখে কিম্বা আইন অথবা সাহিত্যের কেতাব প'ড়ে শুয়ে পড়তাম।

আমার ত সকলক্ষণই অবসর থাকত না, কিন্তু ডোরার সময় কেমন ক'রে কাটে? বাড়ীতে আর কি এমন কায, যা নিয়ে তাকে সারাদিন ব্যস্ত থাক্‌তে হবে? খানসামা, বেহারা, আয়া বাড়ীর সব কায করত, ডোরা খবরের কাগজ আর ফ্রেঞ্চ নভেল পড়ত। বইগুলো সব ভাল নয়, কিন্তু আমি কিছু বলতাম না। ডোরা ত আর ছোট মেয়ে নয় যে, তাকে শাসন করব। কিন্তু এ রকম ক'রে চুপ ক'রে থেকে তার মন মানবে কেন? তার বয়সে যুবক, যুবতী যেমন আমোদ-আহ্লাদ চায়, সেও সেই রকম চায়। আমি কদাচ কখন তাকে সিনেমা কিম্বা ইংরাজী থিয়েটারে নিয়ে যেতাম, কিন্তু আমার ও সব ভাল লাগত না। মিসেস মজুমদার মাঝে মাঝে আমাদের দু'জনকে নিমন্ত্রণ করতেন। আমি রোজ সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরবার পথে মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসতাম। তাতে ঠাকুমা আর বাবা দু'জনই খুসী হতেন, মায়ের ত কথাই নেই। ডোরা দু'চার দিন গিয়েছিল, তার পর সে বড় একটা গা করে না দেখে আমি আর তাকে অনুরোধ করতাম না।

এক বছরের মধ্যে আমার নিজের মোটর হ'ল, বাঁধা আয় হ'ল, নিত্য আয় বাড়তে লাগল। মিষ্টার মজুমদারের কায ছাড়া আমার আলাদা কায আসতে আরম্ভ হ'ল। তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন, বাবার কাছে আমার প্রশংসা করতেন।

সামাজিক উৎসবাদি অথবা পার্টিতে যাওয়া আমার বড় একটা ঘ'টে উঠত না। এক দিন বৈকালে মজুমদার সাহেবের এক বড় বন্ধু একটা পার্টি দিলেন। সেখানে না গেলেই নয়। সে দিন আমি ইংরাজী পোষাক ছেড়ে, পঞ্জাবী জামা, পঞ্জাবী জুতা প'রে, সিল্কের চাদর গায়ে দিয়ে গেলাম। ডোরা দেখে হেসেই অস্থির। My eyes! But you look awfully nice! Quite like a Roman senator!

পার্টিতে বিস্তর লোক। আমার বাঙ্গালী বেশ দেখে মিষ্টার মজুমদার বললেন, বেশ করেছ! সাহেব সেজে আসার চেয়ে এ ঢের ভাল।

ডোরার সঙ্গে অনেক নতুন লোকের পরিচয় হ'ল। আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, ডোরা এক জন জজের সঙ্গে কথা কইছে, আমি একটু এগিয়ে গিয়েছি, এমন সময় দেখা হবি ত হ একবারে মায়ার সঙ্গে! তিন বছরে মায়া মাথায় বেশ বড় হয়েছে, কৃশাঙ্গী অথচ পূর্ণায়তনী, স্বল্পাভরণা অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি। পরিধানে ফিরোজা রংয়ের রেশমের সাড়ী, হাতে দু'গাছি ক'রে মীনাকরা সোনার চুড়ী, আর কোন অলঙ্কার নেই। আয়ত লোচনে সেই কৌতুক-তরঙ্গ!

আমাকে দেখে মায়া থমকে দাঁড়াল। হেসে বললে, "আমাকে চিনতে পার?"

চিনতে পারব না? কিছুই ত ভুলিনি, সবই মনে পড়ে। বললাম, "সে কি কথা? চিনতে পারব না কেন?"

—"তাই ত, তুমি যে বাঙ্গালী সেজে এসেছ!"

—"বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী সাজতে হয় না; সাহেব হ'তে গেলে সাজ করতে হয়।"

—"তুমি বিলাত থেকে বিয়ে ক'রে এসেছ। তোমার বউকে দেখাবে না?"

এমন সময় ডোরা এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি দুজনকে পরিচিত ক'রে দিলাম।

দু'জনে কিছুক্ষণ পরস্পরকে দেখলে। দুজনই সুন্দরী, দুজনের রূপ দু'রকমের। ডোরা মায়ার হাত ধরেছিল, বললে, "তোমার মতন সুন্দরী দেখিনি।"

মায়া হেসে বললে, "আমারও ঐ কথা। তুমি খুব সুন্দরী।" দু'জনে কথা আরম্ভ হ'ল। মায়া কনভেণ্ট স্কুলে পড়েছিল, পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হয়েছিল। ইংরাজী চমৎকার বলতে পারে। সে বি এ পড়ে শুনে, ডোরা চোখ ডাগর ক'রে বললে, "তুমি ত পণ্ডিত। আমার কলেজে পড়া হয় নি।"

মায়া কথাটাকে আমল দিল না।

পার্টি থেকে আসবার সময় ডোরা মায়াকে আমাদের বাড়ী আসবার জন্য জেদ করতে লাগল। মায়া বললে, আমার পরীক্ষার বেশী দেরী নেই, অনেক পড়া, বড় একটা কোথাও যেতে পারিনে। আজ বাবা আমাকে জোর ক'রে নিয়ে এলেন। এখনি বাড়ী ফিরে গিয়ে পড়তে বসব।

মায়া আমাদের বাড়ী কখন আসেনি।

৪

আমার কাষ আর আয় দুই বাড়তে লাগল। অবসর ক'মে যেতে লাগল, কাগজপত্র বাড়ীতে এনে রাত্রে পড়তে হ'ত। ডোরার সঙ্গে কোথাও আর বড় একটা যাওয়া-আসা হ'ত না। মোটর ছিল একটা, এখন দু'খানা কিনলাম। আমার গাড়ী সারা দিন হাইকোর্টে থাকত, তাতে ডোরার বেড়াবার অসুবিধা হ'ত। সে নিজে পসন্দ ক'রে একখানা [illegible] গাড়ী কিনলে। চালাতে শিখে নিজেই গাড়ী চালাত, নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেত, বাজার করত, ঘোড়দৌড় দেখতে যেত, পোলো খেলা দেখত।

একটা পার্টিতে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। ইন্দ্রনাথ যুবা, সুপুরুষ, ধনী, খুব ধুমধামে সাহেবী ষ্টাইলে থাকে। কিছু দিন হ'ল তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, তার পর এখন পর্য্যন্ত আর বিয়ে করে নি।

সেই থেকে আমাদের বাড়ীতে ইন্দ্রনাথের আসা-যাওয়া আরম্ভ হ'ল। কখন বা ডোরা তাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করে, কোন দিন রাত্রে খেতে বলে। এক দিন ডোরা বললে, আমি মিষ্টার দের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাব?

ইন্দ্রনাথের উপাধি দে।

আমি বললাম, বেশ ত, যাও না। আমার ত এমন ফুরসত নেই যে, তোমার সঙ্গে কোথাও যাই।

কোন দিন সিনেমা, কোন দিন থিয়েটার, কখন চিড়িয়াখানা, কখন শিবপুরের বাগান, ডোরার এই রকম ঘোরা আরম্ভ হ'ল। থিয়েটার থেকে ফিরতে রাত বারোটা হ'ত। ডোরার সঙ্গে থাকত ইন্দ্রনাথ।

আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করতাম না, কিছু বলতাম না।

আমাদের বিয়ে হয়েছিল প্রায় তিন বছর, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ডোরার সন্তান হয় নি।

ডোরা রেস খেলতে আরম্ভ করলে। প্রথম প্রথম টাকা চাইলে আমি দিতাম। তার পর আমি তাকে ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলতে বারণ করলাম। ডোরা রেগে উঠল, তাতে কোন ফল হ'ল না। আমি বললাম, আবশ্যকমত তুমি খরচ কর, তাতে ত আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু জুয়া খেলার জন্য আমি টাকা দেব না।

ডোরা বললে, সকলেই ত খেলে।

—আমরা সে দলে নেই।

ডোরা রেগে, ফরকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার পর অন্য কথাও আমার কানে উঠল। বার লাইবেরীতে দু'এক জন আমার বন্ধু বারিষ্টার আমাকে আলাদা ডেকে বললে, এই যে, তোমার স্ত্রী ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, ওটা ভাল কথা নয়। লোকে নানা কথা বলছে, ইন্দ্রনাথের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, তোমার নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে চলবে না।

ডোরাকে আমি বুঝিয়ে বললাম। রেগেমেগে নয়, ভর্ৎসনার ভাবেও নয়। আমি বললাম, তোমার নামে কোন কথা উঠলে আমার কষ্ট হয়। তুমি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সব সময় ঘুরে বেড়াও, তাতে কথা উঠেছে।

আমি ভেবেছিলাম, ডোরা বুঝি রেগে উঠবে; কিন্তু তা ত হ'ল না। সে স্তব্ধ হয়ে, মাথা হেঁট ক'রে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তার পর বললে, তুমি কি আমাকে ঘরে পুরে বন্ধ করতে চাও?

—এমন কথা আমি ত বলিনি। তোমার একটু সাবধান থাকা দরকার।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে, ব'লে ডোরা আস্তে আস্তে উঠে গেল।

তার পরদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে দেখি, আমার টেবিলের উপর ডোরার হাতে লেখা একখানি ছোট চিঠি

রয়েছে। তাতে লেখা আছে, আমি চ'লে যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি, বুঝতেই পারবে। আমি আর ফিরব না।

চিঠি প'ড়ে আমার স্তম্ভিত হবার কথা, শোকাতুর হবার কথা, কিন্তু সে রকম কিছুই হ'ল না। চিঠিখানা আমি তুলে রাখলাম। খানিক ভাবলাম। একটা ঢলাঢলি হবে, লোকলজ্জা অনিবার্য্য। প্রতীকারের কোন উপায় নেই।

তার পরদিনই কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। বাবা এসে বললেন, তুমি এখানে একা থাকলে তোমার মন আরও খারাপ হবে, দিন কতক বাড়ী চল। তুমি গেলে মা খুসী হবেন, প্রায়শ্চিত্তের কোন কথা হবে না।

আমি রাজি হলাম না। চিত্তের দুর্ব্বলতা দূর হয়েছিল। আমি বললাম, আপনারা আমার জন্য ভাববেন না। এখান থেকে গেলে আমার কাযকর্ম্মের অসুবিধা হবে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, এ বিষয়ে তুমি কি করবে?

—ডাইভোর্সের জন্য কোর্টে আবেদন করব। যত শীঘ্র চুকে যায়, ততই ভাল।

ডোরা আর ইন্দ্রনাথ একটা পাহাড়ে ছিল। তারা প্রকাশ্যে বাস করছিল, গোপনে থাকবার কোন চেষ্টা করে নি।

হাইকোর্টে আমি মোকদ্দমা উপস্থিত করলাম। মোকদ্দমা উঠল এক জন ইংরাজ জজের বেঞ্চে। প্রতিবাদীদের কোন চিহ্ন নেই। পাহাড় থেকে আমরা দু চার জন সাক্ষী ডাকিয়েছিলাম। আমার পক্ষে ছিলেন এক জন বড় কৌঁসিলী। তিনি উঠে বললেন, তিনি ক্ষতিপূরণের কোন রকম দাবী করেন না।

জজ তাঁর দিকে আর আমার দিকে চেয়ে দেখলেন, বললেন, I appreciate your fine sense of honour।

তখনি decree *nisi* হয়ে গেল। ছয় মাস পরে ডাইভোর্সের পাকা হুকুম হ'ল।

৩

আরও ছয় মাস কেটে গেল। বিলাতে আমার বিয়ে করার পরিণাম লোকে ভুলে গেল। ক্রমে আমার পসার খুব বেড়ে গেল। মিষ্টার মজুমদারের পরামর্শে আমি নিজে একটা চেম্বার খুললাম। এটর্নীরা আমাকে ব্রীফ দিতে আরম্ভ করলে। ফৌজদারী মোকদ্দমায় আমার বেশ যশ হ'তে লাগল। মফস্বলেও আমার ডাক পড়তে সুরু হ'ল। কায থেকে অবকাশই হয় না, অন্য উকীল-বারিষ্টাররাও আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসত। আমার ফী ক্রমেই বেড়ে চলল।

কায যতই থাকুক, রোজ সন্ধ্যার পর মায়ের সঙ্গে দেখা করতাম। রবিবারে প্রায় বাড়ীতে যেতাম। ঠাকুমাও আমাকে যত্ন করতেন, বলতেন, যা হবার, তা হয়ে গিয়েছে, কত দিন তুই একা থাকবি? তুই হলি বাড়ীর বড় ছেলে, কাযকর্ম্ম বেশ করছিস, বাড়ী ছেড়ে আর কত দিন থাকবি? আবার বিয়ে থাওয়া কর, তোর বউকে আমরা ঘরে এনে আহ্লাদ করি।

মা নীরবে, তাঁর সেই মমতা-সাগরের ন্যায় আয়ত লোচনে আমার দিকে চেয়ে থাকতেন। কখন একটি নিশ্বাস ফেলতেন, কখন আমাকে একা পেয়ে অতি কোমল স্বরে বলতেন, বাবা, একটা দুঃস্বপ্নের জন্য কি চিরকাল মনস্তাপ থাকবে? আমার শিবদুর্গা দেখার সাধ কি পূরবে না, হরগৌরী বরণ কি আমার কপালে নেই?

মা গো! আমি যে তোমার কুপুত্র, নইলে কেন তুমি আমার জন্য ব্যথা পেয়েছ? ও মা, আর আমি তোমার কথা ঠেলব না, আর যেন আমার জন্য তোমার চোখের জল না পড়ে!

আমি দুই হাত দিয়ে মায়ের শ্রীচরণ চেপে ধরলাম, অশ্রুজড়িত গদগদ কণ্ঠে বলিলাম, মা, আমাকে যা বলবে, তাই করব।

মা আমার মাথা দুই হাতে ধ'রে কাছে টেনে নিলেন। তাঁর আনন্দাশ্রুতে আমার মাথা সিক্ত হ'ল, যেন তাঁর হৃদয়ের উৎস থেকে আশীর্ব্বাদের ধারা আমার নত মস্তকে প্রবাহিত হ'ল!

আমার মাথায় করকমল বুলিয়ে মা বললেন, ছেলে ত নয়, ভোলানাথ! কি বলব জানিস নে? বিয়ে করতে বলব।

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললাম, বেশ, বিয়ে দাও।

হেসে কেঁদে, আনন্দ-চঞ্চল হয়ে মা বললেন, কনে খুঁজতে হবে না, হাতের গোড়ায় আছে।

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, কে?

—কেন, মায়া। তাকে বিয়ে করতে কোন আপত্তি আছে ?

মায়া! সেই দেখা—যখন বিদেশিনী আর স্বদেশিনীতে সাক্ষাৎ সম্ভাষণ হয়েছিল। তার পর আর দেখা হ'ল কবে? কখন হয় ত কোথাও চকিতের মতন নিমেষের দেখা, চক্ষুর সেই উজ্জ্বল দীপ্তি, স্মিতহাস্য, মুখে দুইটি কথা! মাস কয়েক আগে কাগজে দেখেছিলাম, মায়া পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে, পরীক্ষকরা তাকে অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। মায়া! আমি ত ড্যামেজ হওয়া মাল, এক বিয়ে নিয়ে প্রকাশ্য আদালতে ঢলাঢলি হয়েছে, আমি কি মায়ার উপযুক্ত পাত্র ?

বিষণ্ণভাবে মাকে বললাম, আমার আপত্তি না থাকলেও মায়া কখন রাজি হবে না।

—কথা আমরা পাড়ব, তুমি একবার তার সঙ্গে দেখা কর, তাতে ত কোন দোষ নেই।

—কবে দেখা করতে বল ?

—যত শীঘ্র সুবিধে হয়। দেখা হ'লে পর আমাকে বলবে।

দুদিন পরে রবিবারে বিকেলবেলা মায়াদের বাড়ী গেলাম। হ্যাট-কোট প'ড়ে রইল, আমি সামান্য ধুতি-চাদর প'রে ভদ্রলোকের বেশে উপস্থিত হলাম।

মায়ার পিতা ভবানীচরণ, সৌম্যমূর্ত্তি প্রাচীন লোক, বাড়ীতে ছিলেন। আমাকে দেখে আহ্লাদ প্রকাশ ক'রে বললেন, এই যে শিবু, তোমার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। তোমার নাম ত খবরের কাগজে সর্ব্বদাই দেখতে পাই, এরির মধ্যে তুমি বড় বারিষ্টার হয়ে উঠেছ।

আমি বললাম, আপনাদের আশীর্ব্বাদে এক রকম চ'লে যাচ্ছে।

—কাল তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কথা এর পর হবে। এক পেয়ালা চা খাবে ?

—বেশ ত।

—চায়ের পাট হচ্ছে মায়ার কায। তাকে খবর দিই

মায়ার বাবা মায়াকে ডাকিয়ে পাঠালেন। সে এলে বললেন, এই দেখ, শিবচন্দ্র নেহাত বাঙ্গালীর মত এসেছেন। এখন দেখলে কে বলবে, ও এক জন বড় কৌসিলী। ওকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু চা খাওয়াও।

মায়া বললে, বেশ ত, চা তৈরী আছে।

মায়া আমাকে সঙ্গে ক'রে তার ঘরে নিয়ে গেল। দিব্য তোফা সাজানো ঘর, চার দিকে কাচের আলমারিতে নানা রকম কেতাব সাজানো রয়েছে। ঘরের মাঝখানে ছোট চায়ের টেবিল পাতা, মায়া একখানা চেয়ার টেনে আমাকে টেবিলের পাশে বসালে, নিজে আমার সামনে বসল। টেবিলে বসানো ছিল ইলেক্‌ট্রিক বেলের বোতাম, টিপতেই এক চাকর এসে উপস্থিত। মায়া বললে, চা আর কিছু খাবার নিয়ে এস।

চাকর চলে গেল। মায়াতে আমাতে চোখোচোখি হ'ল।

মায়া একটু গম্ভীর। চক্ষুর সে লোল কৌতুকতরঙ্গ চাপা, মুখের ভাব ধীর। বললে, আমাদের বাড়ীতে তুমি কবে এসেছিলে, আমার ভাল মনেই পড়ে না।

তৃষিত নয়নে আমি মায়ার মোহিনী-মূর্ত্তি দেখছিলাম। নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, সে কত যুগের কথা ?

মায়ার চক্ষু নত হ'ল, তার কপোলে ঈষৎ রক্তিম আভা দেখা দিল।

চা তৈরী করবার সময় আমি মায়ার চম্পক অঙ্গুলির চালনা, তার সুগোল মণিবন্ধে সরু চুড়ির সৌন্দর্য্য দেখছিলাম। চা খাওয়া হ'লে বললাম, মায়া, স্কুল-কলেজের কথা মনে পড়ে ?

—সব মনে পড়ে।

মায়ার দৃষ্টি চায়ের বাটির দিকে।

আমি সাহস ক'রে বললাম, আমার সঙ্গে খানিক বেড়াতে যাবে ?

—এস, বাবাকে জিজ্ঞাসা করি।

আমাকে সঙ্গে ক'রে মায়া তার বাপের কাছে গেল। বললে, বাবা, আমি শিবুর সঙ্গে বেড়াতে যাব ?

ভবানীচরণ বললেন, আমি নিজেই তোমাদের ঐ কথা বলব ভাবছিলাম। যাও না, দুজনে একটু বেড়িয়ে এস।

বাইরে এসে মায়া বললে, মোটর আনতে বলব ?

—কেন, আমার মোটর ত রয়েছে।

—বেশ, তাইতে চল।

ডোরার গাড়ী আমি বেচে ফেলেছিলাম। আর এক-খানা বেশ ভাল বড় সীডান গাড়ী বেড়াতে যাবার জন্য কিনেছিলাম। গাড়ী দেখে মায়া বললে, বাঃ, বেশ চমৎকার গাড়ী! একেবারে নতুন।

আমি গাড়ীর দরজা খুলে, মায়াকে তুলে তার পাশে বসলাম। শোফারকে বললাম, মাঠে চল।

গাড়ীতে মায়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করবে?

—কি আর করব? এম এ দেব, তার পর দেখা যাবে।

—বিয়ে থাওয়ার কোন কথা হয় নি?

—সে সব কথা আমি কিছু জানি নে। ত একবার হাঁকিয়ে দিয়েছি।

—তা ত আর বরাবর পারবে না।

—কেন, আমাকে কি জোর ক'রে বিয়ে দেবে না কি? সে কাল এখন আর নেই।

আমি মায়ার হাত ধরলাম। তার হাত একটু কেঁপে উঠল, আমি চেপে ধরলাম। মায়ার হাতেও অল্প চাপ অনুভব করলাম।

গাড়ী ইডেন গার্ডেনে এসে উপস্থিত। মায়াকে বললাম, বাগানে একটু বসবে?

—চল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে ঘোর হয়েছে। আমরা ব্রহ্মদেশীয় পাগোডা মন্দিরের কাছে জলের ধারে একটা বেঞ্চে বসলাম। জলে নক্ষত্রবিম্ব, ইলেক্‌ট্রিক আলোর চকচকে জ্যোতি। জলে একটু দূরে প্রকাণ্ড বারকোশের মত ভিক্টোরিয়া রেজিয়া ফুল ফুটে রয়েছে। সন্ধ্যার ছায়ায় চারিদিক্ আচ্ছন্ন।

আমি বললাম, মায়া, তোমাকে একটা কথা বলব, কিন্তু বলতে আমার সাহস হচ্ছে না।

—কি কথা?

—আমি সমাজে অপদস্থ হয়েছি, আমার লজ্জার কথা সব যায়গায় রটেছে, এখন আমি কোন্ মুখে তোমাকে বিয়ে করতে চাইব?

মায়া আবেগের সহিত বললে, তোমার তাতে কি অপ-রাধ? তুমি ত আর কিছু দুষ্কর্ম কর নি। তোমার লজ্জা পাবার কোন কথাই নাই।

—তা হ'লে কি বল? আমাকে বিয়ে করবে?

মায়া অবনত মস্তকে আমার হাতের উপর নিজের হাত রেখে অতি মৃদু স্বরে বললে, করব।

আমি মায়াকে আলিঙ্গন ক'রে চুম্বন করলাম, বললাম, এত দিন বলতে আমার সাহস হয় কি, কিন্তু আমি তোমাকে অনেক দিন থেকে ভালবাসি।

মায়া অকপটে আমার হাত ধ'রে বললে, আমি তোমাকে বরাবর ভালবাসি, তোমার বিলেত যাবার আগে থাকতে। এখন বাড়ী চল, রাত হয়ে যাচ্চে।

মায়ার হাত ধ'রে তার বাপের কাছে নিয়ে গেলাম, বললাম, আপনার কন্যাকে বিয়ে করবার জন্য আপনার অনুমতি নিতে এসেচি।

—কন্যা কি বলে? মায়া, তুমি বল।

মায়া আমার হাত ছাড়িয়ে বাপের বুকে মুখ লুকুলে। ভবানীচরণ মায়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আমাদেরও এই আশা ছিল। তোমার বাবা আমাকে এই কথা বলতে এসেছিলেন। বসো, বাড়ীর ভিতর খবর দিই।

মায়ার মায়ের আহ্লাদের সীমা নেই। আমাদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ করলেন, তাঁর স্বামীকে বললেন, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কোরো না। এই মাসেই বিয়ে দিয়ে ফেল।

আমি বললাম, হপ্তা তিনেক আমাকে সময় দিন। আমি নতুন বাড়ী কিনেচি বালীগঞ্জে, তাতে কাজ হচ্ছে, পনর দিনে শেষ হয়ে যাবে।

ভবানীচরণ বললেন, বেশ, তাই হবে।

আমি একটু সঙ্কোচের সহিত বললাম, বিয়েতে বেশী সমারোহ না হলেই ভাল হয়।

মায়ার মা ব'লে উঠলেন, সে আবার কি কথা! আমার প্রথম মেয়ের বিয়ে, আমি আহ্লাদ আমোদ করব না? এ বিয়ে যদি ঘটা ক'রে না হবে, তা হ'লে কার বিয়েতে ঘটা হবে?

কর্ত্তা বললেন, বুঝতে পারছ না শিবুর মনের ভাব?

—খুব বুঝতে পারছি। সে কথা নিয়ে বুঝি কেউ মন খারাপ করে? আমি দোজবরের হাতে মেয়ে দিচ্ছি নে। শিবু, এই তোমার প্রথম বিয়ে।

বাড়ীতে এসে আমি মাকে বললাম। তাঁর, বাবার, ঠাকুমার আনন্দ আর ধরে না। ঠাকুমা বললেন, বিশ্বনাথ, পাঁজি দেখ, পাঁজি দেখ! যত শীঘ্র দিন হয়।

বাবা পাঁজি দেখতে ব'সে গেলেন। বিলাতের বাতাস লেগে আমি ঠোঁটকাটা, বললাম, আর মাসের তেসরা ভাল দিন আছে। আমার নতুন বাড়ী তার আগে ঠিক হয়ে যাবে। এ বাড়ীতে মায়াকে আমি নিয়ে যাব না।

ঠাকুমা রঙ্গ ক'রে বললেন, ওরে, এ যে স্বয়ম্বর! পুরুত নাপিত আর ডাকতে হবে না! বর নিজে দিন দেখে রেখেছে!

বাবা বললেন, দেখো, এর পর কি হয়!

নতুন বাড়ীতে কাযের তাড়া দিলাম। মায়ার কাছে রোজ যেতাম। যদি কোর্টশিপ বলা যায় ত সে প্রথম দিনেই হয়ে গিয়েছিল। তাকে বাড়ী দেখালাম। সে বললে, এবার স্বদেশী, বিদেশী নয়। অবিশ্যি তোমাকে কতক ইংরাজী রাখতেই হবে, বাকি সব দেশী।

তাই হ'ল। বিদায় হ'ল সব বিলাতী ঠাট, প্রায় বাড়ীময় হ'ল স্বদেশী পাট।

এক দিন আমি বললাম, মায়া, তুমি কি এম এ-দেবে না কি?

—কেন দেব না? ভাবছি ল'ও পড়ব, ওকালতি করব। তখন হব তোমার learned friend on the other side।

—তা হলেই হয়েছে। আমার সব মক্কেল ভাগবে, তোমার দোরে জটলা করবে। তা তোমার বিদ্যের জন্য নয়, তোমার রূপ দেখে।

—বটে? পোর্শিয়া কি রূপে জিতেছিল?

বিয়ে হ'ল খুব সমারোহ ক'রে। হাইকোর্টের কেউ বাদ যায়নি। বিয়ের রাত্রে মায়া ঠিক কনে। সেই রকম কলা-বউয়ের মত ঘোমটা, সেই রকম লজ্জাভিভূতা।

বিয়ের পরদিন যখন বউ নিয়ে আমাদের নিজেদের বাড়ীতে গেলাম, তখন মা সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার প'রে মূল্যবান্ বারাণসী প'রে আমাদের বরণ করলেন, ডেকে বললেন, তোমরা দেখবে এস আমার শিবদুর্গাকে! দেখ আমার উমারাণীকে, দেখ আমার শিবশঙ্করকে! যুগল রূপ দেখে চক্ষু সার্থক কর!

মা যে জোড়া পালঙ কিনেছিলেন, তা ত ব্যর্থ হ'ল না, তাঁর বেটা বউ সেই খাটেই শয়ন করলে।

আট দিন বাড়ীতে থেকে আমরা নতুন বাড়ীতে উঠে গেলাম। বাড়ী মায়ার দেখা, জিনিষপত্রও তার পছন্দ করা। তার মহল একেবারে দেশী, বসবার মাদুর, তক্তপোষ, গালিচা।

বাড়ীতে এসে মায়া সব চাকরদের ডাকলে, বললে, দেখ, এ বাড়ীতে কেউ সাহেব কি মেম সাহেব নেই। ইনি তোমাদের বাবু, আমি ওঁর বউ।

গলা নীচু ক'রে আমাকে বললে, এক কালে গিন্নী হব।

—এখনি তার কসুর কি! এ বাড়ীতে কে তোমার মাথার উপর আছে?

সর্দ্দার বেহারা লম্বা সেলাম ক'রে বললে, বহুত খুব, বহুজী!

চাকররা বিদায় হ'ল। আমি বললাম, প্রথম হ'ল বি-এ, এখন হ'ল বিয়ে। তোমার ডবল বিয়ে পাস করা হ'ল।

মায়ার চক্ষে সেই পুরানো আলোকরা কৌতুক ফিরে এল। বললে, মেয়েমানুষের তা বুঝি আবার হয়? একটা হ'ল কুমারীর খেতাব আর এটা হ'ল বিয়ে। ডবল বিয়ে পাস হয়েছে তোমার।

সহসা আমার চোখে, কণ্ঠে বিষাদ দেখা দিল, আমি বললাম, একবার ফেল হয়েছি, এবার তুমি নম্বর দিলে পাস হব।

মায়া আমার গলা জড়িয়ে আমাকে কয়েকবার চুমো খেলে, বললে, এইবার গুণে দেখ। পাঁচ শো হ'ল। তুমি একেবারে প্রথম শ্রেণীতে পাস হয়ে গেলে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গুপ্ত কবি

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আমরা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের (১২১৩-১২৬৫ সালের) আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। নানা মতভেদের মধ্যে ধরিতে গেলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস বাঙ্গালা সাহিত্যের বীজ বপন করেন। ইঁহাদের পর বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে উদিত হন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। * ইঁহার পর কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস রামায়ণ ও মহাভারত উপহার প্রদান করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেন। ইঁহাদের পর রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন। পদাবলী-সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হইতেছে কৃষ্ণলীলা। কবিকঙ্কণ চণ্ডী-মাহাত্ম্য বিবৃতি করিয়াছেন। শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত লইয়াই সাধারণতঃ রামপ্রসাদের গ্রন্থ। ভারতচন্দ্রের মধ্যে আমরা ধর্ম্ম, ইতিহাস ও সমাজ-তত্ত্বের কিছু কিছু আভাস পাইয়া থাকি। কিন্তু আধুনিক কবির কবিত্বের উপাদান আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে যেরূপ প্রাপ্ত হই, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির লেখার মধ্যে সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। এই জন্যই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি।

জগতের অস্ফুট সৌন্দর্য্যকে স্ফুট করিয়া তাহাকে মূর্ত্তি-দান করাই কবির কার্য্য। এই মূর্ত্তি-দানকালে কবি হন শিল্পী। এই শিল্পরচনাকালে সেই শিল্পের উপর ছায়াপাত করে কবির মনের কল্পনা; সুতরাং কবির কাব্য বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কবিকে বুঝিতে হইবে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র বৈদ্যজাতীয় ৺হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র; কবি দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাতৃহীন হন এবং ইহার কিছু দিন পরে কবির পিতা দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করেন। কবি মাতৃস্নেহ হইতে চিরবঞ্চিত হইলেন ও তাহার পরিবর্ত্তে পাইলেন বিমাতা এবং তাঁহার রোষ ও বিদ্বেষ। বিমাতার সহিত কলহের ফলে কবি পিতৃগৃহচ্যুত হইলেন ও কলিকাতায় মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হইল। স্ত্রী হইলেন কুশ্রী ও "কতকটা হাবাবোবার মত"। জনশ্রুতি আছে যে, কবি স্বীয় পিতৃ-গ্রামের কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু পিতা দিলেন যে পত্নী, তাঁহাকে লইয়া কবি জীবনে সুখী হন নাই এবং ঘরসংসার করেন নাই। মাতার পরিবর্ত্তে পাইলেন বিমাতা, মাতৃ-স্নেহ-পরিবর্ত্তে পাইলেন বিমাতার বিদ্বেষ, পিতৃ-গৃহ হইতে বিতাড়িত, পিতৃস্নেহ-হীন সুদূর কলিকাতায় মাতুলালয়ে পর-গৃহে ও পর-অন্নে লালিত এবং পর-জীবনে পত্নীর প্রীতির পরিবর্ত্তে যাহা পাইলেন—তাহার ছাপ কবির রচনার মধ্যে পরিস্ফুট।

ঈশ্বরচন্দ্রকে আমরা কলিকাতা-নগরীর কবি বলিয়া জানি। এই কলিকাতা-নগরীতে জনৈক বন্ধুর সাহায্যে ইনি কবিতার আসরে পদার্পণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র কোনও বিশিষ্ট কাব্য রচনা করেন নাই—কতকগুলি খণ্ড-কবিতার সমষ্টি হইতেছে কবির কীর্ত্তি। এই খণ্ড-কবিতাগুলিকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়,—(১) পারমার্থিক ও নৈতিক, (২) সামাজিক, (৩) রসাত্মক, (৪) যুদ্ধ-বিষয়ক, ও (৫) ঋতু-বর্ণনা-সম্বন্ধীয়। কবিতাগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইলেও আমরা কবিকে এই পাঁচের মধ্য হইতে সহজেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি; এবং তাহার একমাত্র নিদর্শন হইতেছে কবির ব্যঙ্গ-প্রিয়তা। এক জন সামান্য ব্যক্তি মাত্র তাহার প্রতিভা লইয়া কলিকাতা নগরীর বক্ষের উপর বসিয়া কবিতা লিখিয়া কি ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, এই ব্যঙ্গের মধ্যে কবির কত প্রতিভা নিহিত আছে। এই ব্যঙ্গের জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র অমর প্রতিভা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীম সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে "ভারতীয় রাবিলে" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। *

ব্যঙ্গের মৌলিকতা হিসাবে এই তুলনা অতি সমীচীন। কিন্তু রাবিলের ব্যঙ্গের মধ্যে যে ঘৃণার কটাক্ষপাত পরিলক্ষিত হয়, ধর্ম্মের প্রতি যে হাস্য-রসের বিকৃত উদ্দামলহরী দৃষ্ট হয়, আমাদের কবির মধ্যে তাহা হয় না; রাবিলের রচনার মধ্য হইতে তাহার ঘৃণা ও প্রেমের পার্থক্য উপলব্ধি করা সহজ নয়। কিন্তু গুপ্ত কবির কবিতার মূল উপাদান হইতেছে—তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার আন্তরিকতা। অনেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে অশ্লীল বলিয়া 'খাটো' করিবার প্রয়াস পান। সমাজের প্রতি নানা কারণে তাঁহার ক্রোধ ছিল এবং আমাদের বিশ্বাস, সেই ক্রোধ-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য তাঁহার কবিতায় অশ্লীলতার উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ, তখনকার সমাজে এরূপ অশ্লীলতা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল—তাহা না হইলে ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ এইরূপ অশ্লীলতা সহ্য করিত না। অনেক সময়ে পাপ আমাদের মধ্যেই থাকে—কবির মধ্যে নয়। কবি যাহা সদুদ্দেশ্যে বলিলেন, তাহা আমরা কদর্থে নিয়োজিত করিলাম। অপর পক্ষে রুচি হিসাবেও কখনও কখনও একটি সুন্দরভাব অশ্লীলতায় পরিণত হয়। জগতে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ঈশ্বরচন্দ্রকে মাত্র ব্যঙ্গ-কবি বলিয়া আখ্যাত করিলে, তাঁহার উপর অবিচার করা হয়। তিনি বস্তুতান্ত্রিক কবি (Realist); জগতের অতি সাধারণ বিষয় ও দ্রব্যনিচয়ের মধ্য হইতে তিনি কাব্যের রস নিষ্কাশন করিয়া জগৎকে বিলাইয়াছেন। আজকাল

---

* "স্ব-কপোলরচনাশক্তি বিষয়ে মোটা ধুতি ও দোপাট্টা পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ (কবিকঙ্কণ), শোভন ধুতি ও উড়ানি পরিধান-কারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোট-পেন্টুলন-পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।"

—রাজনারায়ণ বসু কৃত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক বক্তৃতা ১৪ পৃষ্ঠা।

* "Iswar Chandra Gupta, a sort of Indian Rabelais."

Beame's Comparative Grammer Vol. I

এক দল লোক বস্তির পাঁকে ও ডাষ্টবিনে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া একপ্রকার নোংরা ও কুৎসিত সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র যে সুন্দর কাব্য-রস পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা নিছক খাঁটি বাঙ্গালী কবির দান। উদাহরণ-স্বরূপ—

"শয্যায় ভার্য্যার প্রায়, ছারপোক উঠে গায়,
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন।"

কোনও বাঙ্গালী কবি দিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

কবির আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর-ভক্তির আলোচনা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা অসম্ভব। কবির যত গভীর ভাব, প্রাণের যত উচ্ছ্বাস সব ঈশ্বরপ্রেমে ভরিয়া উঠিয়াছে। কবি জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই—বাল্য হইতেই মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত, যৌবনে ও প্রৌঢ়বয়সে যাঁহাকে লইয়া সুখী হইবার কথা—তাঁহার নিকট হইতে জীবনের কোনও 'সাড়া' পাইলেন না। কবি ভাবিলেন, জীবনটা দুঃখের এবং জগৎটা মায়ার—

"ছায়াবাজী মায়াবাজী কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর॥"

তাই কবি বলিলেন,—

"মায়া-জাল-মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত।"

কবি এই সত্যকে নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মরূপে ধারণা করিয়াছেন; ঈশ্বর পিতা, কবি পুত্র,—

"তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর।
গুপ্তকায়ে ব্যক্ত করি গুপ্তভাব ধর॥"

কবি পিতার নিকট "আবদার" করিতেছেন, আমার নিকট তুমি ব্যক্ত হও। কবি ঈশ্বরের সহিত আপনার সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। তিনি জনসাধারণের চক্ষু দিয়া ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন নাই; "জ্ঞানাগুনে ঝাঁপ দিয়ে," "প্রেম পোকা" হ'য়ে তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির গভীর বিশ্বাস ঈশ্বরকে সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে; কবি তাঁহার "হাবা আত্মারাম" পিতার সহিত মুখোমুখি হইয়া কথা কহিতেছেন; কিন্তু ঈশ্বরেরও মুখ নাই; কথা কহিবেন কি প্রকারে? কবি সে প্রশ্নের সমাধান করিলেন,—

"আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসারায় ঘাড় নেড়ে সায় দিও তায়॥"

কবি সাধারণের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। তাঁহার বিশ্বাস যে, মন পবিত্র না হইলে পরমার্থলাভ হয় না। সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন,—

"পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুন হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর কিবা ফল বাপু!"

আবার মালা ঘোরান সম্বন্ধে—

"ঠকঠকে ঠোকে যাবে, আয়ু ফুরাইলে।
কি হইবে মিছামিছি, মালা ঘুরাইলে॥"

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে তিনি "মণ্ডা-চোষা দধি-চোষার" দলে ফেলিয়াছেন। বৃত্তিসাধা বিপ্রগণ সম্বন্ধে—

"প্রাতে উঠি শৌচে গিয়া, হাত-মাটী মাটী নিয়া,
কপাল জুড়িয়া আর্কফলা।"

"দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
নস্যচ্ছলে মিসি লন কিনে।
পুঁতির ভিতরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি,
বাড়ী চ'লে যান ধীরে ধীরে॥"

কবির ঈশ্বরপ্রেম অতি উচ্চ অঙ্গের। তিনি কেবল সেই গীতোক্ত 'সত্য স্বরূপ অবিকার নির্ব্বিকার নিরাকার নিত্য নিরাময় পরম পুরুষকেই জানেন। তিনি ব্যতীত আর সব মিথ্যা। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া কবি কি দিয়া পূজা করিতেছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য,—

"প্রেম পুষ্প শ্রদ্ধা নীর ভাব বিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই পূজার সম্বল॥
শরীর নৈবেদ্য মম উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই লহ লহ লহ॥"

কবির সামাজিক কবিতার সমালোচনা করিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে, কবি সমাজের নিকট হইতে কি পাইয়াছেন। সমাজ তাঁহাকে মাতার পরিবর্ত্তে দিল বিমাতা, হৃদয়-সন্তাপ-হারিণী পত্নীর পরিবর্ত্তে দিল তাঁহাকে 'কার্ব্বলিক এসিড'। কবি সমাজের উপর খড়্গহস্ত হইলেন; তার পর সহায়-হীন, সম্পত্তি-হীন হইয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য স্বীয় দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে ছুটিলেন। সমাজ তাঁহাকে পদে পদে নির্য্যাতিত করিয়াছে; কবি এখন সময় পাইয়া সেই সকলের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সমাজের প্রতি পদস্খলনে তিনি সমাজকে বিভীষিকা-ময় ব্যঙ্গের বিষ-বাণে জর্জ্জরিত করিয়াছেন। সমাজের প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষগুলিকে তিনি বিকট ব্যঙ্গ-সহকারে জগতের সমক্ষে মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। বিধবা-বিবাহের প্রধান পুরোহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার ব্যঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই,—

"বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে॥"

"জ্ঞান-হারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে
কে পাইবে 'সৎ বাপ' মায়ের কল্যাণে॥"

* * * *

আবার কৌলীন্যপ্রথা লইয়া—

"বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তি-হীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥

দুধে-দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার॥"

"কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই"—এই কথার দ্বারা পিতার উপরও আক্রোশ লইয়াছেন। আবার স্নান-যাত্রা উপলক্ষে যে বীভৎস কাণ্ড হয়, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে সমস্ত অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার দৃশ্য লোক-চক্ষুর সমক্ষে প্রকটিত করিয়া কবি নিজের প্রতি সমাজের অত্যাচারের ঋণটা বেশ সুদে আসলে পরিশোধ করিয়াছেন। আবার নীলকরের অত্যাচারে প্রপীড়িত এই সমাজের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্তুতিকালে সমাজের মুখ-পাত্রগণের উপর একটা কামড় দিতে ছাড়েন নাই,—

"মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনে শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আম্‌লা, তুলে মামলা
গাম্‌লা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌বো না।"

কবি 'ইয়ং বাঙ্গাল'দের লইয়া নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়াছেন,—

"এরা না হিঁদু, না মোছলমান
ধর্ম্মধনের ধার ধারে না।"

কবি ইহাদের ডাকিয়া বলিয়াছেন, যখন শমন আস্‌বে, তখন—

"বুঝি লুট ব'লে, বুট পায়ে দিয়ে,
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।"

আবার আচার-ভ্রংশ, অনাচার প্রভৃতি সকল দিক্‌ দিয়াই কবি সমাজের উপর প্রতিশোধ লইয়াছেন,—

"এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লা ভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গি মাস নিয়া॥"

"পিতা দেন গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে॥"

সমাজকে ছাড়িয়া দিলে কবির ব্যঙ্গের মধ্যে বেশ একটু আমোদ পাওয়া যায়। কবির ব্যঙ্গের কোনও বাঁধাবাঁধি গণ্ডি নাই। একটু নির্দ্দোষ আমোদের জন্য কবি ধর্ম্মকে লইয়াও মাঝে মাঝে টানাটানি করিয়াছেন,—

"কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে।"

আবার জগন্মাতা কালীকে লইয়া—

"পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা॥
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাথা বিশ্বমাতা হয়ে॥"

লক্ষ্মীকে লইয়াও—

"লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাহি হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥"

বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক আইন সম্বন্ধে—

"করিছে আমার ধর্ম্ম আমাতে নির্ভর;
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে কেন দেন কর॥" *

সাহেব বিবিদেরও কাণ মলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। সাহেব গির্জ্জা হইতে—

"আলয়েতে আগমন মনের খুসিতে।
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চুষিতে চুষিতে॥"

বিবিদের লইয়াও তাঁহার ব্যঙ্গের ছড়াছড়ি,—

"বিবিজান চ'লে যান লবেজান করি।"

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ-রোজ কত রোজ ফুটে॥"

পাঁটাকে লইয়া—

"রস-ভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥"

"শুধু যায় পেট ভ'রে পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি কাছে থাকে বাঁধা॥"

"এমন পাঁটার মাংস নাহি খায় যারা।
ম'রে যেন ছাগীগর্ভে জন্ম লয় তারা॥"

অথবা তপ্‌স্যা মাছ—

"কষিত কনক-কান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥"

আবার আনারসকে লইয়াও—

"সকল নয়নমাঝে রক্ত আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥"

"লুণ মেখে নেবু-রস-রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥"

ছোলাকে লইয়া কবির অনাবিল আনন্দের উৎস দেখুন—

"বিধবার পক্ষে ইনি অতি গুণময়।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রণয়॥"

এ যুগের কবি রসরাজ অমৃতলাল বসু ব্যতীত বোধ হয় অন্য কোন কবি বাঙ্গালীর প্রিয় আহার্য্যের এমন স্তুতিবাদ করেন নাই।

বর্ষাকে লইয়া—

"বিরহীর বুকে বর্শা, মারিয়া নির্দ্দয় বর্ষা,
বর্ষা নামে হইল বিদিত।"

আবার বর্ষা-বর্ণনাকালে ব্যঙ্গ-কবির কবিত্বশক্তি দেখুন—

"সবুজ মেঘের দল, ঢল ঢল ছল ছল,
হতবল ধবল অনিলে।
স্থির চক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে তার চিলে॥

* যদিও আজকালকার দিন হইলে এই প্রকার লেখা আইনের কবলে পড়িত।—লেখক।

সোণার দামিনী হার, গলায় দুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
সেফালিকা প্রস্ফুটিত, অতিশয় সুশোভিত,
জরির লপেটা লতা পায়।"

কবির ব্যঙ্গ যেখানে বিদ্বেষ-বিহীন, সেখানে আনন্দের ঝারি দিয়া যেন হাসি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; সেখানে উপভোগ করিবার অনেক কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে বিদ্বেষ-সূচক ব্যঙ্গ লইয়া কবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, সেখানে আমরা কবিকে আর সুনয়নে দেখিতে পারি না; সেখানে কবির সেই বিদ্বেষ-সূচক মুখভঙ্গিমা যেন আমাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে, সেখানে যেন কি একটা বিকট দৃশ্য আমাদের মানস-নয়নে ফুটিয়া উঠে—আমরা নয়ন মেলিয়া রাখিতে পারি না, সেখানে কি যেন একটা দুর্গন্ধ আসিয়া আমাদের মাতৃ-দুগ্ধ পর্য্যন্ত উঠাইয়া দেয়। আমরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লই। কিন্তু যখন একটি নির্দ্দোষ হাসির ফোয়ারা কবি আমাদের হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলেন, তখন কি যেন একটা পারিজাত-সৌরভ-সুষমা আমাদের চারিদিকে ছড়াইয়া যায়, কি যেন একটা মধুর রাগিণী ধীর বায়ুসঞ্চালনে আমাদের হৃদয়ে আসিয়া প্রহত হইয়া পড়ে, কি যেন একটা হাসির উৎস আপনা আপনি ফুটিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদমত আমাদের মস্তকে আসিয়া পড়ে। বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গ হিসাবে আমাদের কবি পাশ্চাত্য ব্যঙ্গ-বিৎ সইফ্‌টের (Swift) অনুপম। উভয়েই সমাজের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ-গ্রহণমানসে নীচ-জাতীয় হিংস্র পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। এই প্রতিশোধ গ্রহণসময়ে উভয়েরই পাত্রাপাত্রজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল।

কবি সমাজ হইতে নিষ্ঠুরতার দাগা পাইয়া জীবনে ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন, তাই জীবনে কখনও নকল বা কৃত্রিম অথবা "মেকি"কে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। সারা জীবন সেই নকল বা মেকির বিরুদ্ধে কলম চালাইয়াছেন। নকল ধর্ম্ম, নকল সাজ-পোষাক, নকল আচার ব্যবহার, অক্ষয়সরকারের নকল পুস্তক "বাহু-বস্তু"ও তাঁহার ব্যঙ্গের কাছে নিস্তার পায় নাই। নকল বাবুরা—

"তেড়া হয়ে তুড়ি মারে টপ্পাগীত গেয়ে।
গোচেগাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি-রক্ষা এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হ'ল ধেনোগাঙ্গে বেনোজলে নেয়ে॥"

কবি কিন্তু সমাজের উপর প্রতিশোধ লইবার সময় সইফ্‌টের মত জগৎকে ঘৃণা করেন নাই। আর্ত্তের আর্ত্তনাদে কবি চক্ষুর জল ফেলিয়াছেন; কবির গুপ্ত অশ্রুধারা যেন কবিতার মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়াছে—কবির দীর্ঘ-নিশ্বাস যেন কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গুপ্ত কবি আমাদের সাহিত্যের রাজ্যে খাঁটি বাঙ্গালী কবি। পাশ্চাত্য-জ্ঞানে তাঁহার কবিতা অনুপ্রাণিত নহে। তিনি আমাদের সাহিত্যে একটা নূতন স্রোত আনয়ন করিয়াছিলেন; পুরাতন একঘেয়ে ভাবগুলি লইয়া তিনি আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হন নাই—তাই গুপ্ত কবির এত মর্য্যাদা। ভগবদ্ভক্তি, সমাজ-নীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা তিনি সমসাময়িক ঘটনার মধ্য দিয়া অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনও কবির রচনায় তাহা আমরা পাই না। কবি পূর্ণ-সৌন্দর্য্যময় প্রকৃতির দ্বারা যাহা পাইয়াছেন, তাহার আন্তর সৌন্দর্য্য স্ফুট করিয়া জগৎ-সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছে। জগৎ হাসি-মুখে কবির সেই দান মস্তকে তুলিয়া লইয়াছেন। সেই দানের রেণু লইয়া দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্যকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য (এডভোকেট)।

সমুদ্র-বেলা

সুদূর বেলা সিকতময় শায়িত চির-শয়নে,
হৃদয়ে শ্বেত অঙ্গবাস আবরি'
হীরককণা বসনে ঝলে প্রখর দিবা-তপনে
চরণ-তল ধৌত করে লহরী।

গভীর নাদে সাগর গায়, শুনায় যেন নিখিলে,
নীথর বেলা নীরবে তাই শুনিছে
নীল গগন বিভোর হয়ে ডুবেছে যেন সলিলে,
সাগর নীলবরণ তার মাখিছে।

জলধি-বুক বিদারি পলে পশিছে নবজীবনে
নবীন শত লহরী ফেনা বিথারি,
শিরেতে তার মাণিক জ্বলে, রবির খর কিরণে
ভূভাগ যেন উঠিছে বারি বিদারি।

সুদূর দূর তুফানময় অন্ত নাই সাগরে,
গিয়াছে যেন অসীম পথে চলিয়া,
অসীম দেহে মিলিতে সাধ, চলিছে তাই কাতারে—
তুফান পরে তুফান রাশি মিলিয়া।

ফেনিল নীল অঙ্গবরণে রবির কিরণ পশিয়া,
অতুল রূপ-মাধুরীরাশি রচিছে,
রবির প্রেমে শশীর স্নেহ জলধি-তল হাসিয়া,
গভীর স্বরে পুলক-ভরে নাচিছে।

অন্তহীন আকাশ যেন অঙ্গ ঢালে অলসে,
পুলক হৃদে জলধি-কোলে যতনে,
তাপিত বুকে সলিল ভেদি গগনতল পরশে
তপনদেব ঈষৎ লালবরণে।

শ্রীইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

১৪

ল্যাংটনের ফটোর ইঙ্গিত

রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলের নিকট পরে জানিতে পারিলেন—দস্যুপতি মুলিঙ্গারের সহকর্ম্মী ভার্ণি তাঁহার নিক্ষিপ্ত গুলীতে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর বেল, রয়েডের অনুরোধে তাহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচর্য্যায় তাহার আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই; অধিক কি, কিছুকাল পরেই তাহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। তিনি তাহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবার কয়েক মিনিট পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে ভার্ণির জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছিল; সে চক্ষু খুলিয়া ইন্‌স্পেক্টর বেলকে তাহার মাথার কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিল। প্রথমে তাহার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। তখন তাহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল এবং চিন্তাশক্তি বিলুপ্তপ্রায়; তাহার স্মৃতি যেন গাঢ় কুজ্ঝটিকাবরণে আচ্ছাদিত। সে মুদিত-নেত্রে অতীতের সকল ঘটনা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল, ক্রমশঃ অতীতের সকল কথাই ধীরে ধীরে তাহার স্মরণ হইল; অবশেষে তাহার মনে পড়িল, নদীর অগভীর জলে মোটর-বোট হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সে যখন নদীতীরস্থ অরণ্যের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ধাবিত হইয়াছিল, সেই সময় রয়েডের অব্যর্থ গুলীতে আহত হইয়া তাহাকে ধরাশয্যা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর বেল তাহার অসাড় দেহ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সে বুঝিতে পারিল, এ যাত্রা কোনও উপায়ে তাহার প্রাণ-রক্ষা হইলে ইন্‌স্পেক্টর বেল তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া হাজতে পুরিবেন; তাহার পর তাহাকে বিচারকের হস্তে অর্পণ করিয়া নরহত্যার অভিযোগে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। সে তাহার সহকর্ম্মী মুলিঙ্গারের আদেশে তাহার সহযোগে যাঁহাকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাঁহার নিকট সে কতটুকু উপকারের আশা করিতে পারে?

কিন্তু ভার্ণি নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল; তাহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়া ফাঁসীর ভয় তাহার মন হইতে তিরোহিত হইল। তাহার মনে হইল, মৃত্যুর নিবিড় অন্ধকার তাহার চক্ষুর উপর ঘনাইয়া আসিতেছে; কিন্তু আর অল্পকাল পরেই তাহাকে যে অজ্ঞাত রাজ্যে যাত্রা করিতে হইবে, সেই দুর্গম পথের কোন পাথেয় সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই। চিরজীবন পাপানুষ্ঠানে রত থাকিয়া সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, এই অন্তিম কালে তাহা তাহার কোন কাযেই লাগিবে না; তবে সে কোন্ লোভে, কি আশায়, দিনের পর দিন নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপের বোঝা ভারী করিয়াছিল? অন্তিমে যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিবার যিনি কাণ্ডারী,—সে ভুলিয়াও কোন দিন তাঁহার নাম স্মরণ করে নাই। তাঁহার অনন্ত করুণায় নির্ভর করিবার শক্তি সে লাভ করিতে পারে নাই। জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেও তাহার সাহস হইল না। তাহার সন্দেহ হইল, তাহার সারাজীবনের পুঞ্জীভূত পাপ ও অসংখ্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ কি তিনি ক্ষমা করিবেন? তাঁহার নিকট তাহার ক্ষমা-প্রার্থনার অধিকারই বা কি? জানি না, যে নর-পিশাচ চিরজীবন শয়তানের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তাহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকে, জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সে অনুতপ্ত হয় কি না; মনুষ্য-চরিত্র দুর্জ্ঞেয় রহস্যে পূর্ণ। মানুষ মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারে বলিয়া দম্ভ করে, মানবচরিত্রের বিশেষজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিৎ বলিয়া অহঙ্কার করে; কিন্তু যে আপনাকে চিনিতে পারে না, অন্য লোকের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া, সুরঞ্জিত চিত্রের অভিজ্ঞ চিত্রকরের ন্যায় লেখনী-মুখে সে তাহা ফুটাইয়া তুলিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

ইন্‌স্পেক্টর বেল, ভার্ণির চিরাচরিত পাপের কথা শুনিয়াছিলেন; সে কিরূপ নিষ্ঠুর, তাহাও তিনি জানিতেন, পুলিসের চাকরী করিয়া, বহু নরপ্রেতের সংস্রবে আসিয়া, তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—তিনি মানবচরিত্রানুশীলনে অভিজ্ঞতা লাভ

করিয়াছেন, ভার্ণির ন্যায় নরপিশাচ মৃত্যুকালেও অনুতপ্ত হইবে, তিনি তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মৃত্যুশয্যাশায়ী ভার্ণির মুখভাবের পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, যেন অস্তগামী তপনের পাণ্ডুর আভা।

ভার্ণির মনে পড়িল, তাহার এক জন সমব্যবসায়ী পাপিষ্ঠ দস্যু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার অনুষ্ঠিত জীবনব্যাপী পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া গ্রাম্য ভজনালয়ের পুরোহিত তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "বৎস, হতাশ হইও না; তোমার অনুষ্ঠিত পাপের কথা প্রকাশ করিয়া প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, সকল পাপ-কলুষ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তাঁহার করুণামৃতে অবগাহন করিবে। শান্তি পাইবে।"

ভার্ণি মনে করিল, পাদরীর সেই আশ্বাসবাণী কি সত্য? অপরাধ স্বীকার করিলে সত্যই কি মৃত্যুকালে শান্তি লাভ হয়? তাহার পাপভারক্লিষ্ট দুর্ব্বল চিত্ত সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল; কিন্তু অনুতাপানল অসহ্য হওয়ায় অবশেষে সে ইন্‌স্পেক্টর বেলের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

অবশেষে সে ইন্‌স্পেক্টার বেলকে তাহার মুখের কাছে কর্ণস্থাপনের জন্য ইঙ্গিত করিয়া, ওষ্ঠাগত প্রাণের সকল আগ্রহ শুষ্ক কণ্ঠে সঞ্চিত করিয়া, দুই একবার অধরোষ্ঠ কম্পিত করিল; তাহার পর ইন্‌স্পেক্টার বেল তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলে, বসন্তের ঈষদুষ্ণ সমীরণ-প্রবাহে বৃক্ষশাখার মৃদু কম্পিত পল্লবদল হইতে যেমন অস্ফুটধ্বনি নিঃসারিত হইতে থাকে, সেইরূপ কম্পিত কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে সে বলিতে লাগিল,—

বহুদিন পূর্ব্বে যৌবনের প্রারম্ভকালে সে ডুবুরীর কার্য্যে রত থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। সে এই কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিলে, 'য়ুনিভারসাল স্যাল্‌ভেজ কোম্পানী'র পক্ষে ডুবুরী নিযুক্ত হইয়াছিল। অবশেষে সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীর সব মেরিণের আক্রমণে 'আরানিটা' জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইলে, সেই জাহাজে যে বিপুল স্বর্ণরাশি প্রেরিত হইতেছিল, তাহাও সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইয়াছিল। য়ুনিভারসাল সালভেজ কোম্পানী সমুদ্রগর্ভ-স্থিত জাহাজ হইতে সেই স্বর্ণরাশি উত্তোলনের ভার পাইলে, সেই সময়ের প্রসিদ্ধ ডুবুরী বৃদ্ধ যেথো ল্যাংটনকে তাহারা এই কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। যেথো ল্যাংটন পূর্ব্ব হইতেই ডুবুরীর কার্য্যে ভার্ণির অসাধারণ দক্ষতার কথা জানিতেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে ভার্ণিকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিলেন। যেথো ল্যাংটন ভার্ণিকে সঙ্গে হইয়া গভীর সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিলেন এবং বহু চেষ্টায় সেই নিমজ্জিত জাহাজের খোলের ভিতর সঞ্চিত বিপুল স্বর্ণরাশি আবিষ্কার করিলেন। একালে যেমন প্রতি সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার বিশুদ্ধ স্বর্ণের থান বোম্বে বন্দর হইতে বিভিন্ন জাহাজে য়ুরোপে রপ্তানী হইতেছে, সেইরূপ কোটি কোটি মুদ্রা মূল্যের বিশুদ্ধ স্বর্ণের থান সেই জহাজের ধনাগারে সংগুপ্ত দেখিয়া সেই ডুবুরীদ্বয়ের উভয়েরই মনে লোভের সঞ্চার হইল। সেই লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, ডুবুরীসর্দ্দার যেথো ল্যাংটন তাহার সহকারী ভার্ণিকে জানাইলেন, সেই বিপুল স্বর্ণরাশির কিয়দংশ অপহরণ করিয়া নিজেরাই তাহা ভোগ করিবেন; কিন্তু তাহা জাহাজ হইতে সমুদ্রগর্ভের উর্দ্ধে উত্তোলিত করিলে আত্মসাৎ করা অসাধ্য হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা স্থির করিলেন, অপহৃত স্বর্ণরাশি তাঁহারা অদূরবর্ত্তী কোন মগ্ন শৈলের পাদদেশে সুকৌশলে লুকাইয়া রাখিবেন।

তাঁহাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারা যে স্বর্ণরাশি উত্তোলিত করিয়া য়ুনিভারসাল স্যালভেজ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিলেন, কোম্পানী তাহাই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। ডুবুরীরা যে তাহার কোন অংশ স্থানান্তরিত করিয়াছে, এরূপ সন্দেহ তাঁহাদের মনে স্থান পাইল না।

ডুবুরীদ্বয়ের দায়িত্ব ভার শেষ হইলে তাহারা সময়ান্তরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং অপহৃত স্বর্ণরাশি গুপ্ত স্থান হইতে অপসারিত করিয়া গোপনে সমুদ্রতটে লইয়া গিয়াছিল। তাহাদের এই কীর্ত্তি তৃতীয় ব্যক্তি জানিতে পারে নাই।

ইন্‌স্পেকটর বেল, রয়েডের নিকট ভার্ণির এই সকল গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "ভার্ণি মৃত্যুকালে আমার নিকট ইহাও স্বীকার করিয়াছিল যে, সে যেথো ল্যাংটনের সহযোগিতায় উক্ত জাহাজ হইতে যে

স্বর্ণরাশি অপহরণ করিয়াছিল, যেথো ল্যাংটন তাহার বারো আনা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সিকি অংশ তাহার ভাগে পড়িয়াছিল। সেই সিকি অংশেরই মূল্য বহু সহস্র পাউণ্ড। সেই স্বর্ণরাশি বিক্রয় করিয়া সে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছিল। ভার্ণি মিতব্যয়ী হইলে, সেই অর্থে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পরমসুখে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে অতিবাহিত করিতে পারিত; কিন্তু যাহারা অসৎ উপায়ে বা অতি সহজে পরের অর্থ হস্তগত করে, তাহারা অর্থের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারে না। অপহৃত অর্থের প্রতি ভার্ণিরও মমতা ছিল না। সে অতি অল্পদিনেই নানা কুক্রিয়ায় সেই বিপুল অর্থ ধূলি-মুষ্টির ন্যায় উড়াইয়া দিয়া অর্থকষ্টে বিব্রত হইয়াছিল। তিন বৎসরের বিলাসিতায় এবং নানাপ্রকার অপকর্ম্মে তাহার সঞ্চিত ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের সমস্ত নিঃশেষিত হইলে, তাহার সহকর্ম্মী যেথো ল্যাংটনের সঞ্চিত স্বর্ণরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার আগ্রহ প্রবল হইল।

যেথো ল্যাংটন কৃপণ ছিলেন, বিশেষতঃ সংসারে তাঁহার কোন পরিজন বা পোষ্য না থাকায় পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে অর্থব্যয় করিতে হইত না, তাঁহার নিজের ব্যয়ও অত্যন্ত পরিমিত ছিল; এজন্য তাঁহার সঞ্চিত বিপুল স্বর্ণরাশির কিছুই ব্যয় হয় নাই। বার্দ্ধক্যে তাঁহার মস্তিষ্কও প্রকৃতিস্থ ছিল না। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, তাঁহার সংগৃহীত স্বর্ণরাশি কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলে পুলিশ তাঁহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে; কারণ, সৎপথে থাকিয়া এরূপ বিপুল স্বর্ণ উপার্জ্জন করা তাঁহার সাধ্যাতীত, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিত। তিনি এই অপরিমিত স্বর্ণরাশি কোথায় পাইলেন, এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি কি উত্তর দিতেন? এতদ্ভিন্ন কোন ব্যাঙ্কেও যথা-সর্ব্বস্ব রাখিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। এইজন্য খেয়ালের বশে তিনি সেই বিপুল স্বর্ণরাশি অতি সঙ্গোপনে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, কোথায় তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের একখানি ফটো তুলাইয়াছিলেন, সেই ফটোতে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল, এবং সেই ফটোর ফ্রেমখানির সহিত সেই ভঙ্গীর সম্বন্ধ ছিল। ফ্রেমের ভিতর সেই ফটোখানি সংরক্ষিত হইলে, সেই ফ্রেমে তাঁহার অঙ্গভঙ্গীর ব্যাখ্যাসূচক যে সাঙ্কেতিক হরফগুলি লিখিত ছিল, ছবির সহিত সেই হরফগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলে, সেই স্বর্ণরাশি কোথায় প্রোথিত ছিল, তাহা আবিষ্কার করা যাইতে পারিত; কিন্তু যদি কেহ কেবল সেই ফটো অথবা ফটো-বর্জ্জিত ফ্রেমখানি মাত্র হাতে পাইত, তাহা হইলে সে চির-জীবন চেষ্টা করিলেও তাঁহার গুপ্তধনের সন্ধান পাইত না। গুপ্তধনের সন্ধান পাইতে হইলে ফ্রেমের ভিতর ফটোখানি আঁটিয়া, দেহের ভঙ্গী অনুসারে সাঙ্কেতিক হরফগুলির অর্থনির্ণয় করিতে পারিলে তাঁহার গুপ্তধনের সন্ধান মিলিবার আশা ছিল।

ভার্ণি, যেথো ল্যাংটনের গুপ্তধন আত্মসাৎ করিবার দুরভিসন্ধিতে তাঁহার সহিত পূর্ব্ব-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং বার্দ্ধক্যে যেথো ল্যাংটন রোগ-শয্যায় পড়িয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় সে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় রত ছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে যেথো ল্যাংটনের বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই; বিকার-ঘোরে তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠ হইতে যে সকল প্রলাপ নিঃসারিত হইত, তাঁহার পরিচর্য্যা-নিরত ভার্ণি উৎকর্ণ হইয়া আগ্রহভরে তাহা শ্রবণ করিত। অবশেষে একদিন ভার্ণির আশা পূর্ণ হইল। যেথো ল্যাংটন বিকারঘোরে তাঁহার ফটো ও ফটোর ফ্রেমের সহিত ভূগর্ভপ্রোথিত গুপ্ত-ধনের কি সম্বন্ধ, তাহা স্খলিত স্বরে প্রকাশ করিলেন। ভার্ণি বুঝিতে পারিল, মরণাহত, রুগ্ন বৃদ্ধের ফটো ও ফটোর ফ্রেম সংগ্রহ করিয়া একত্র সংযোজিত করিলেই গুপ্তধনের সন্ধান মিলিবে। ভার্ণি যে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণপণে রুগ্ন বৃদ্ধের সেবা করিতেছিল, তাহা যে মুহূর্ত্তে সে জানিতে পারিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে অন্তিম শয্যায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টায় প্রস্থান করিল। তাহার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। বৃদ্ধের বিপুল গুপ্ত-ধন সহজেই সে হস্তগত করিতে পারিবে, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল।

ভার্ণি, যেথো ল্যাংটনকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে, দুই এক দিন পরেই বৃদ্ধের মৃত্যু হইল।

কিন্তু যেথো ল্যাংটনের ফটো ও ফ্রেমের সাহায্যে

তাঁহার গুপ্তধন আবিষ্কার করা ভার্ণি প্রথমে যত সহজ হইবে মনে করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা তত সহজ নহে, ইহা বুঝিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। যেথো ল্যাংটনের মৃত্যুর পর তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে, ভার্ণি ফটোর ফ্রেমখানি হস্তগত করিতে পারিল বটে, কিন্তু সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, যেথো ল্যাংটন ফটোখানি পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সে ফটোখানি কি উপায়ে সংগ্রহ করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারায় সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হইল, এবং তাহার সঙ্কটের কথা তাহার পরম বন্ধু ক্যারোর গোচর করিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

ক্যারো এই ঘটনার পূর্ব্বেই দস্যুনায়ক মুলিঙ্গারের দলে যোগদান করিয়া নানাপ্রকার গর্হিত কার্য্যে তাহার সহায়তা করিতেছিল। ক্যারো মুলিঙ্গারের সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল। সে তাহার বন্ধু ভার্ণিকে মুলিঙ্গারের সহায়তা গ্রহণ করিবার উপদেশ দান করিল। তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, মুলিঙ্গারের অসাধ্য কর্ম্ম জগতে কিছুই নাই; মুলিঙ্গার চেষ্টা করিলে অতি সহজেই যেথো ল্যাংটনের ফটো উদ্ধার করিতে পারিবে, এবং সেই ফটো হস্তগত হইলে যেথো ল্যাংটনের গুপ্তধন হস্তগত করা সহজ হইবে।

কিন্তু মুলিঙ্গারের সহিত ভার্ণির পরিচয় না থাকায়, সে মুলিঙ্গারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। ভার্ণির সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া ক্যারো তাহাকে মুলিঙ্গারের নিকট লইয়া গিয়া তাহার সহিত পরিচিত করিল।

মুলিঙ্গার ভার্ণির গুপ্ত কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেও তাহার প্রস্তাবে প্রথমে কর্ণপাত করিল না, বরং তাহাকে নিরুৎসাহ করিবারই চেষ্টা করিল। সে ভার্ণিকে জানাইল, তাহার হাতে বিস্তর কায, সেই সকল কায মুলতুবী রাখিয়া সে বুনো হাঁসের পশ্চাতে ছুটিবে, ইহাতে তাহার লাভ কি? তখন ভার্ণিকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল, যেথো ল্যাংটনের গুপ্তধন হস্তগত হইলে তাহার অর্দ্ধাংশ সে মুলিঙ্গারকে দান করিবে, এবং অবশিষ্টাংশ সে ক্যারোর সহিত বখরায় ভোগ করিবে। এই ভাবে তাহারা তিন জনে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইল।

ইন্‌স্পেক্টর বেল, রয়েডকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলে রয়েড ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "আমি মুলিঙ্গারের হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিয়া তাহার পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিয়াছিলাম। তাহার কোটের পকেটে যেথো ল্যাংটনের সেই ফটোখানি পাইয়াছি। সে মরিস ল্যাংটনকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নিকট তাহার যে পত্র লইয়া গিয়াছিল, সেই পত্র পাঠ করিয়া ম্যানেজার তাহাদের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ফটোখানি মুলিঙ্গারকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। মুলিঙ্গার সেই ফটো মুহূর্ত্তের জন্য হাতছাড়া করে নাই। দিবারাত্রি তাহা সে নিজের নিকট রাখিত বলিয়াই তাহার কোটের পকেট হইতে তাহা উদ্ধার করিতে পারিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর বেল বলিলেন, "আমি ভার্ণির নিকট জানিতে পারিয়াছি, যেথো ল্যাংটনের ফটোর ফ্রেমখানি মুলিঙ্গার ভার্ণির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছে।"

রয়েড বলিলেন, "মুলিঙ্গারের ব্যাঙ্কে?"

ইন্‌সপেক্টর বেল বলিলেন, "হাঁ, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ক্যানন ষ্ট্রীটের শাখায়। এই ব্যাঙ্কের সহিত তাহার কারবার চলিতেছে; কিন্তু তাহার নিজের নামে নহে। ব্যাঙ্কে তাহার হিসাব আছে—জন হ্যারিস্ এই ছদ্ম নামে।"

ইন্‌সপেক্টর বেল ও রয়েড অতঃপর তদন্ত আরম্ভ করিয়া জানিতে পারিলেন, ভার্ণি মৃত্যুকালে যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। সে মৃত্যুকালে মিথ্যা বলিয়া ইন্‌সপেক্টর বেলকে প্রতারিত করে নাই। সে সত্যই অনুতপ্ত হইয়াছিল।

রয়েড ইন্‌স্পেক্টর বেলের সাহায্যে মুলিঙ্গারের ব্যাঙ্ক হইতে যেথো ল্যাংটনের পূর্ব্বোক্ত ফটোর ফ্রেমখানি সংগ্রহ করিয়া, সেই ফ্রেমে মুলিঙ্গারের পকেট হইতে সংগৃহীত ফটো সংযোজিত করিলেন, কিন্তু ফটোর সহিত ফ্রেমের গাত্রসন্নিবিষ্ট সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি মিলাইয়া তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিলেন না। যেথো ল্যাংটন তাঁহার সঞ্চিত গুপ্তধন কোথায় প্রোথিত করিয়া ছিলেন, তাহা তিনি বা ইন্‌স্পেক্টর বেল বিস্তর মাথা খাটাইয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। সেই দুর্ব্বোধ্য ও জটিল রহস্যের সমাধান হইল না। সমচতুর্ভুজ সাধারণ ফ্রেমের চতুর্দ্দিকে

কতকগুলি হরফ ছিল, ইহা ভিন্ন সেই ফ্রেমের কোন বিশেষত্বই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। তবে তাঁহারা হরফগুলি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন, ফ্রেমের তলার দিক্ হইতে হরফগুলি আরম্ভ হইয়া বাম ভাগে অগ্রসর হইয়াছিল এবং ফ্রেমের দক্ষিণাংশে গিয়া শেষ হইয়াছিল। ফ্রেমের গাত্রে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণদিক্ নির্ণয়ের জন্য ঐ সকল দিকের নামের আদ্যক্ষর স্থায়ী কালীতে লেখা ছিল। মরিস ল্যাংটন ও রয়েড বিস্ফারিতনেত্রে সেই রহস্যপূর্ণ ফ্রেমের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফটোখানি সেই ফ্রেমে পূর্ব্বেই যথানিয়মে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর রয়েড ল্যাংটনকে বলিলেন, "ফ্রেমের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চক্ষু দুটিকে ত কাহিল করিয়া ফেলিলে, কোন হদিস ঠাহর করিতে পারিলে কি ?"

যুবক ল্যাংটন প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তিন দিকের তিনটি হরফ—উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণদিক্ বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু অবশিষ্ট হরফগুলির মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।"

তাঁহারা ফ্রেম-সন্নিবিষ্ট ফটোর দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, বৃদ্ধের কঠোরতাপূর্ণ গম্ভীর মুখ যেন তাঁহাদের বুদ্ধিহীনতা লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

ল্যাংটন প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধভাবে হরফগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে বলিল, "ফটোর ফ্রেমে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, এই তিনটি দিক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহার নিশ্চতই কোন গূঢ় অর্থ আছে। অকারণ কেহ ফটোর ফ্রেমে দিক্-নির্ণয়ের চিহ্ন অঙ্কিত করে না।"

ল্যাংটনের কথা রয়েডের কর্ণে প্রবেশ করিল না ; তিনি ফটোর ছবিখানিতে যেথো ল্যাংটনের উভয় হস্তের অঙ্গুলি লক্ষ্য করিতেছিলেন ; তিনি দেখিলেন, উভয় হস্ত সংযুক্ত থাকিলেও দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ফ্রেমের 'ডি' অক্ষরটির দিকে ও বাম হস্তের তর্জ্জনী ঐ হরফটির পশ্চাদ্বর্ত্তী 'বি' অক্ষরটি লক্ষ্য করিয়া প্রসারিত ছিল।

রয়েড ল্যাংটনকে বলিলেন, "এই রহস্যের অন্ধকারে আলোকস্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইয়াছি। এ, বি, সি, ডি, জি, আই, কে, এই সাতটি বর্ণমালার হরফগুলি এভাবে ঘুরাইয়া বসাইতে পার—যাহাতে কোন অর্থবিশিষ্ট পদের সৃষ্টি হয় ?"

ল্যাংটন কয়েক মিনিট চেষ্টার পর বলিল, "ডি, আই, জি, বি, এ, সি, কে—এই ভাবে বসাইলে অর্থ হয়; 'ডিগ্ ব্যাক্'—(Dig back) (পশ্চাতে খোঁড়)—কিন্তু এই বাক্য-দ্বারা কি বুঝাইতেছে, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।"

রয়েড হাসিয়া বলিলেন, "এ ধাঁধার ঐ উত্তরই বটে; কিন্তু কোন্ স্থানের পশ্চাৎ খুঁড়িতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ? বৃদ্ধ নিশ্চতই কোন স্থানের প্রসঙ্গে এই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।"

যুবক ল্যাংটন বলিল, "তাঁহার বাংলো ও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগান ভিন্ন অপরের সম্পত্তির প্রসঙ্গে তিনি এরূপ ইঙ্গিত করিবেন, ইহা অসঙ্গত মনে হয়।"

রয়েড বলিলেন, "তাঁহার সটনের বাংলোর পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগান ভিন্ন অন্য কোন স্থান খুঁড়িতে ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। আমার অনুমান, এই ফটো-ফ্রেম তাঁহার বাগানেরই নিদর্শন এবং তিনি ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, পূর্ব্ব-সীমায় তাঁহার বাংলো, এই জন্য এই সীমার উল্লেখ নাই ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, বাংলোর পশ্চাতে উক্ত তিন সীমার মধ্যে খুঁড়িলে মাটীর ভিতর গুপ্তধনের সন্ধান মিলিতে পারে।"

রয়েডের এই অনুমান সত্য প্রতিপন্ন হইল।

রয়েড, ইন্স্পেক্টর বেল ও ল্যাংটনের সহযোগে যেথো ল্যাংটনের বাস-ভবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানের মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে এক স্থানে আট ফুট গভীর গর্ত্তের ভিতর এলুমিনিয়মের একটি আবরণের ভিতর অপহৃত সোনার থানের স্তূপ দেখিতে পাইলেন। উহা য়ুনিভারসাল স্যালভেজ কোম্পানীর সম্পত্তি বলিয়া সেই দিনই কোম্পানীকে এই বিপুল বিত্তের উদ্ধারের সংবাদ প্রেরণ করা হইল। এই স্বর্ণরাশির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোম্পানীর কোনও ধারণা ছিল না, সুতরাং এই স্বপ্নাতীত লাভের সংবাদ পাইয়া কোম্পানী কেবল যে অপরিমিত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, এরূপ নহে, যুবক ল্যাংটন ও রয়েডের নিকট তাহাদের কৃতজ্ঞতাও অপরিসীম হইয়াছিল। এই কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ ল্যাংটনকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোগ করিলে, ল্যাংটন তাঁহাদের আফিসে উপস্থিত হইল। তাঁহারা ল্যাংটনকে বলিলেন, ল্যাংটন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিপুল স্বর্ণরাশি আবিষ্কারের সংবাদ তাঁহাদিগকে না জানাইলে,

ইহার যৎসামান্য অংশও তাঁহাদের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা মৌখিক কৃতজ্ঞতায় ল্যাংটনের ঋণ পরিশোধের চেষ্টা না করিয়া, তাহকে একখানি চেক প্রদান করিলেন। সেই চেকে সে তাহার সততার যে পুরস্কার লাভ করিল, তাহা যে কেবল তাহার আশাতীত অধিক, এরূপ নহে; বহু দিন হইতে তাহার ইচ্ছা ছিল—সে কফির আবাদ-পূর্ণ একখানি বিস্তীর্ণ তালুক ও সেই তালুক-সংলগ্ন একখানি সুপ্রশস্ত ও আরামপ্রদ বাংলো ক্রয় করিয়া নববিবাহিতা পত্নীসহ সেখানে বাস করিবে। সে য়ুনিভারসাল স্যালভেজ কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নিকট পুরস্কারস্বরূপ যে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইল, তাহা তাহার দীর্ঘকালের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

* * * * *

আর দুই একটি কথার আলোচনা করিলেই আমরা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবহুল কাহিনী শেষ করিতে পারি।

রয়েড মুলিঙ্গারকে শৃঙ্খলিত করিয়া পুলিসের হস্তে অর্পণ করিবার পর পুলিস-তদন্তের ফলে মুলিঙ্গারের বহু কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায়, পুলিস তাহার সদর আফিস খানাতল্লাস করিয়া তাহার অনুষ্ঠিত বহু অপরাধ-জনক কার্য্যের অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল। কিন্তু সে পুলিসের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে রয়েডের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, তাহার সহযোগীর উদ্যান-ভবন হইতে নদীর দিকে গোপনে পলায়ন করিবার সময়, রেঁাদের যে পুলিস-প্রহরী কর্তৃক বাধা পাইয়াছিল, বর্শার আঘাতে তাহাকে হত্যা করিবার অপরাধই তাহার অনুষ্ঠিত অন্য সকল অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পুলিসের কর্ম্মচারীকে তাহার কর্ত্তব্যসম্পাদনে বাধাদান করিয়া, তাহাকে হত্যা করিবার অভিযোগ সপ্রমাণ হওয়ায়, এই একটিমাত্র অপরাধেই দায়রা জজের বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। রয়েডকে টেম্স্ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা, যুবক ল্যাংটন ও তাহার প্রণয়িনীকে গুলী করিয়া মারিবার চেষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধের স্বতন্ত্র বিচার করিবার প্রয়োজন হইল না।

এই মামলার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মরিস ল্যাংটন তাহার প্রণয়িনী মিস্ ফরেষ্টকে বিবাহ করিয়াছিল। বহু কষ্ট ও দুর্গতিভোগের পর প্রণয়িযুগল প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী হইয়াছিল। মুলিঙ্গারের অপরাধের বিচারের সময় রয়েড যখন দায়রা আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইলেন, সেই সময় তিনি নবপরিণীত প্রণয়ি-যুগলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মরিস ল্যাংটন ও তাহার পত্নী তখন ডচ্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়াস্থিত নবক্রীত আবাদের তালুকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

সেই দিন মরিস ল্যাংটন তাহাদের আশাতীত সৌভাগ্যের প্রসঙ্গে রয়েডকে বলিল, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তাহারা নর-পিশাচ মুলিঙ্গারের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত না, সেইরূপ সুখসৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া ত দূরের কথা! রয়েড বহুবার বহু কষ্ট সহ্য করিয়া, অধিক কি, মুলিঙ্গার ও তাহার সহযোগী ভার্ণি এবং ক্যারোর পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে বরণ করিয়া তাহার ও তাহার প্রণয়িনীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, নিকটতম আত্মীয়বন্ধুর নিকটেও কেহ সেরূপ উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারে না।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া মরিস ল্যাংটন কুণ্ঠিতভাবে রয়েডের নিকট প্রস্তাব করিল, "আমি পুরস্কার-স্বরূপ কৃতজ্ঞ য়ুনিভারস্যাল স্যালভেজ কোম্পানীর পরিচালক-বর্গের নিকট হইতে যে চেক্ পাইয়াছি, সেই চেকে আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন, আমি কোন দিন এরূপ অধিক পুরস্কারের আশা করি নাই। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে, এই পুরস্কারের অধিকাংশ আপনারই প্রাপ্য। আমার স্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন, আপনার সাহায্য ভিন্ন আমি এই পুরস্কারের অধিকারী হইতে পারিতাম না। এ অবস্থায় আপনাকে এই পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি তাহা গ্রহণ করিলে আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণের অতি যৎ-সামান্য অংশ পরিশোধ হইতে পারে।"

রয়েড সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি যে পুরস্কার লাভ করিয়াছ, তাহা তোমার নির্লোভিতা ও সততার পুরস্কার, মৃত্যু-কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ভগবানের অনন্ত করুণায় নির্ভর করিয়াছিলে, তাহারই পুরস্কার, আমি

উহার একটি পেনীও গ্রহণ করিব না; বিশেষতঃ তুমি বিবাহ করিয়াছ, স্ত্রীগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা (wives are expensive luxuries) নহে কি? তুমি কি বল মিসেস্ ল্যাংটন? মুলিঙ্গারের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আমি জয় লাভ করিয়াছি, তাহাই আমার পুরস্কার। যদি আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ না পাইতাম, তাহা হইলে আমার ছুটীর দিনগুলি অতিবাহিত করা অত্যন্ত কষ্টকর হইত। প্রার্থনা করি, সুদূর-প্রবাসে তোমাদের দাম্পত্য-জীবন মধুময় হউক। পরমেশ্বর তোমাদিগকে অবিচ্ছিন্ন সুখশান্তি দান করুন।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সমাপ্ত

অখ্যাত মহাপ্রাণ

সে যে অখ্যাত এক পল্লীর ছেলে
বিখ্যাত লোক নহে,
নাগরিক যারে ব্যঙ্গ করিয়া
"পাড়াগেঁয়ে ভূত" কহে।
নহে সে সভ্য সহর-ফেরৎ
বেশভূষা-পরায়ণ,
সাদাসিদে লোক নাই বড় চা'ল
সরল উচ্চ মন।
নহে ধনবান্ সে যে মহাপ্রাণ
আছে চরিত্র-ধন,
সুখ-দুঃখের সাথী সবাকার
সবার আপন জন।
তার খামারে বাগানে চলে সংসার
মোটামুটি খেয়ে প'রে,
হাসিমুখে সে যে খাটে গো ব্যাগার
নিত্য পরের তরে।
যেথা রোগ-শোক দুঃখ-অভাব
সে আছে সেথায় খাড়া,
তার কাছে নাই প্রভেদ কোনই
বামুন চামার-পাড়া।
সেবার আকালে গ্রামবাসী যবে
মৃতপ্রায় অনাহারে,
জমি ও গহনা বাঁধা দিয়ে নিজ
সে বাঁচাল সবাকারে।
রতনের মা'র রতন ভিন্ন
কেহ নাহি দুনিয়ায়,
সেই সে রতন সেবার যখন
হ'ল প্রায় যায় যায়,
রক্তহীনতা—তাহার লাগিয়া
সতেজ শোণিত চাই,—
কে দেবে রক্ত—আপন বলিতে
রতনের কেহ নাই।
সে যে হেসে শুনে ধমনী কাটিয়ে
দিল সে রুধির-ধার,
বাঁচিয়া উঠিল রুগ্ন রতন
তপ্ত শোণিতে তার।
সেবার কলেরা মহামারী রূপে
দেখা দিল সারা গাঁয়,
চলে অবিরত মৃত্যুর লীলা
কেবা কার পানে চায়।
সে যে নিশিদিন বিরাম-বিহীন
ঘোরে রোগীদের বাড়ী,
একাই যেন সে রুধিয়া রাখিবে
সে ভীষণ মহামারী।
একদা নিশীথে সে করাল ব্যাধি—
প্রাণ নিল তার কেড়ে,
জন্মের মত সে যে গেল হায়
গ্রামখানি তার ছেড়ে।
শব নিয়ে তার শোভাযাত্রায়
গেল না লক্ষ নর—
দিল না ত কেহ পুষ্প-অর্ঘ্য
মৃত সে দেহের 'পর,
শোকসভা ক'রে গদ্যে পদ্যে
উঠিল না হাহাকার,
ঘটা ক'রে কেহ দিল না মাল্য
ছবির গলায় তার।
শুধু গ্রামবাসী আঁখিজলে ভাসি
দিল তারে চিতা'পরে,
ভস্ম তাহার মিশিল ধূলায়
পল্লী-নদীর চরে।
স্মৃতিটুকু তার রহিল কেবল
গ্রামবাসীদের মনে,
আপদে বিপদে সবাই তাহারে
স্মরিবে ক্ষণে ক্ষণে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উত্তর-কাশী আসিয়া পর্য্যন্ত ডাণ্ডিওয়ালা ফতে সিং পুনঃ পুনঃ জানাইয়া আসিতেছিল, "এত-দিনে এদিক্‌কার দুর্গম কঠিনতম পথের শেষ করিয়া সুগম পথে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।" উদ্দেশ্য—সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকগণকে খুবই সাবধানে আনার জন্য কিছু বখশিস সঞ্চয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্রমশঃই আমরা উপলব্ধি করিতেছিলাম। এক দিকে সে যেমন মিষ্টভাষী ও দলের সর্দ্দারবিশেষ, অন্য দিকে ডাণ্ডির উপরে আরোহীর সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি তাহার যথেষ্ট দৃষ্টি আছে, এমত অবস্থায় স্ত্রীলোক সওয়ারকে মিষ্টবচনে আপ্যায়িত করিয়া মধ্যে মধ্যে সে যে কিছু আদায় করিয়া লইবে, বিচিত্র কি ?

উত্তর-কাশীর আগে 'অসি' নদী পার হইয়া দুই তিন মাইল যাইতে না যাইতে, দূরে চোখের সম্মুখে উত্তর-ভাগের তুষার-শুভ্র পাহাড়ের দৃশ্যগুলি ছবির মতই কয়েকবার উদ্ভাসিত হইল। দক্ষিণভাগে কুলুকুলুনিনাদিনী ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ। তাহারই ওপারে আকাশ-চুম্বী ধূম্র পাহাড়ের গায়ে গায়ে সর্ব্বত্রই এক্ষণে জরদা রংএর অজস্র কাঞ্চনপুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। সে এক অপরূপ বিচিত্র দৃশ্য। লোকালয়-বর্জ্জিত পাহাড়ের দেশে অযত্ন-সম্ভূত এ অগণিত পুষ্প-বৃক্ষ কে আনিয়া দিল ? তিন মাইল অতিক্রম করিয়া 'নাগানি' চটী ও তথাকার 'ডাক বাংলো' পশ্চাতে রাখিলাম। এইবার রাস্তা কতকটা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া গিয়াছে। ক্রমান্বয়ে ৯ মাইল পথ আগে গিয়া এদিনে "মনেরি" আসিয়া রাত্রি-যাপনের স্থির হইল। এখানে দুইটি পাকা ধর্ম্মশালা; একটিতে চারিখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা, অপরটিতে উপরে ও নীচে এক-খানি করিয়া ঘর ও সম্মুখে বারান্দা ছিল। আহারকালে এখানে তরকারীরূপে 'আলুশাক' ও উত্তর-কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দিরের সংলগ্ন ডুমুর-বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত ডুমুরের 'ডাল্‌না' এক অপূর্ব্ব রুচিকর বস্তু বলিয়া সে দিন মনে হইয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে পাঁচ মাইল পথ অগ্রসর হইয়া "কুমালুটি" চটী পার হইলাম। এখান হইতে আড়াই মাইল আন্দাজ পথ চলিয়া আসিলে দক্ষিণ-ভাগে গঙ্গাবক্ষে পুল ও ওপারে যাইবার রাস্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ঐ পথ বরাবর "কেদারনাথ" অভিমুখে গিয়াছে। এ স্থানের নাম "মন্‌লা" বা "বেলা-টিপ্‌রী"। গঙ্গোত্রী দেখিয়া আমাদিগকে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ পথ ধরিতে

"মনেরি"র নিকটে গঙ্গার দৃশ্য

হইবে। এখান হইতে 'ভাটোয়ারী'র দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল। এ পথটুকুর বেশীর ভাগই জঙ্গল, তন্মধ্যে "কুইস্থা" নামক পাহাড়ী বৃক্ষই অতিরিক্ত দেখা যায়। স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণের লতানে গোলাপের কুঞ্জ এবং কোথায়ও বা বিছুটীর ঘন-সন্নিবিষ্ট জঙ্গল ভেদ করিয়া খুব সাবধানে আগে যাইতে হয়। এক স্থানে আমাদের মাথার উপরেই এক বিরাটকায় উচ্চ পাহাড়ের প্রকাণ্ড 'চটান' সর্পের মতই ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া ভীতি উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা এগারোটা

আন্দাজ সময়ে আমরা "ভাটোয়ারী" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এক দিক্ দিয়া এ স্থানের বিশেষত্ব দেখা যায়। তীর্থযাত্রী যত কিছু মাল-পত্র-আসবাবাদি কুলীর স্কন্ধে লইয়া যান, তাহা সমস্তই এখানে ওজন করাইয়া কুলীগণের মজুরী হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে মাশুল লইবার জন্য "টিহিরী-রাজ সরকার" এখানেই 'আস্তানা' বসাইয়াছেন। শুনিলাম, মজুরী হইতে কুলীদিগকে প্রতি টাকায় /০ এক আনা হিসাবে মাশুল গণিতে হয়। ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঝাঁপান, ঘোড়া, গরু,

সর্পের ফণার মত প্রকাণ্ড 'চটান' (ভাটোয়ারীর নিকটে

মহিষ ইত্যাদিতে বা নিজ স্কন্ধে সওয়ার বা বোঝা লইয়া আসিবার দরুণ কুলীগণ যত টাকাই মজুরী হিসাবে অর্জ্জন করিবে, এই নিয়মে তাহারা কর দিয়া তবে আগে যাইতে পারিবে। ফতে সিং পাঁচ ধাম যাইতে যাত্রীর সহিত ২২০৲ টাকা হিসাবে প্রতি ডাণ্ডি মজুরী ঠিক করিয়াছিল, সুতরাং প্রতি ডাণ্ডি পিছু তাহাকে দুই শত কুড়ি আনাই মাশুল গণিয়া দিতে হইল। এইরূপে আবার কর্ণ সিং প্রভৃতি বোঝাওয়ালা আমাদের সমস্ত মালপত্র ওজন করাইয়া সর্ত্তমত ৪০৲ টাকা মণ হিসাবে সমস্ত মজুরীর উপরে প্রতি টাকায় /০ এক আনা হিসাবে উসুল দিয়া—'ছাড়পত্র' গ্রহণ করিল। সরকারের এই মাশুল হইতে কাহারও অব্যাহতি-লাভের উপায় নাই। দুই তিন জন কর্ম্মচারী রসীদ-বহি লইয়া সর্ব্বদাই নূতন যাত্রীর প্রতি নজর রাখিয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া মোটামুটি জানিতে পারিলাম যে, এ বিভাগে সরকার বাহাদুরের প্রতি বৎসরেই প্রায় দুই তিন হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। রসীদ-বহিতে অতিরিক্ত দুইখানি রসীদের মধ্যে কুলীর স্বাক্ষরিত একখানি রসীদ যাত্রীর নিকটে এবং যাত্রীর স্বাক্ষরিত একখানি রসীদ কুলীর নিকটে দিবার ব্যবস্থা আছে শুনিলাম। সরকার বাহাদুর এই সকল আদায়ী টাকা হইতে যাত্রীর সুবিধার্থে রাস্তা ইত্যাদির সংস্কার করিয়া থাকেন। দুঃখের কথা বলিতে কি, যে হিসাবে ইহা আদায়ের সুব্যবস্থা চোখে পড়িল, সে অনুপাতে তীর্থযাত্রীর কঠিনতম পথগুলি যথারীতি সংস্কার বা সুগম করা হইয়া থাকে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যমুনোত্তরীর ধ্বস্-ভাঙ্গা পথগুলির বা "সিঙুঠার" পাতা ঢাকা অস্পষ্ট কঠিন উতরাই-পথের অবস্থা স্মরণ করিলে স্বাধীন টিহিরী-রাজের সে দিকে কতদূর লক্ষ্য আছে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। এই সকল রসীদ-পত্রে কুলীগণের নাম, ধাম, মালের ওজন, মজুরী প্রভৃতি সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, যাত্রীদের পক্ষে এক উপকার ইহাই দেখা যায়, যাত্রীদের সহিত কুলীগণ মজুরী ইত্যাদি লইয়া কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতে পারে না, অধিকন্তু মালপত্র লইয়া কোন কুলী অন্যত্র পলাইয়া গেলে (কদাচিৎ গিয়া থাকে), সহজেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

এখানকার ধর্ম্মশালাটি পাকা ও দ্বিতল। উপরে ও নীচে চারিখানি করিয়া ছোট ছোট ঘর আছে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দায় বহু যাত্রীর সমাবেশ হইতে পারে। তত্রাপি যমুনোত্তরীর যাত্রিসংখ্যা অপেক্ষা এ পথে অধিক যাত্রীর সমাগম বলিয়া অনেক সময়ে ধর্ম্মশালায় স্থান লাভ করা কঠিন মনে হয়। বহু কষ্টে আমরা উপরের একখানি ছোট ঘর খালি পাইয়াছিলাম। তাহাতেই কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করা হইল।

সূর্য্যদেব এক সময়ে এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থানের অপর একটি নাম

"ভাস্কর-প্রয়াগ ।" "ভাস্করেশ্বর" শিব ও তাঁহার মন্দির অদ্যাবধি ইহার প্রাচীনত্ব সূচিত করিতেছে। ধর্ম্মশালা হইতে উত্তরে একটু নীচে নামিলেই গঙ্গা। সেখানে যাত্রিগণ সচরাচর স্নান করিয়া থাকেন। কাশীর মত সেখানে দুই চারি জন 'ঘাটিয়াল' ব্রাহ্মণ স্নানকালে সঙ্কল্প ও পূজা ইত্যাদি করাইয়া থাকেন। 'নব্‌লা' নদী এখানে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ওপারে ধূসর বর্ণের অত্যুচ্চ পাহাড় হইতে শঙ্খের আকারে এক ঝরণা নীচে নামিয়া আসিয়াছে, তাহাকে "শঙ্খ-ধারা" বলা হয়।

ধর্ম্মশালার সম্মুখেই দুই তিনখানি দোকান। দোকানে আহার্য্য দ্রব্য হইতে কেরোসিন তৈল, সাবান, কাগজ-কলম প্রভৃতি কতক কতক মনিহারী দ্রব্য পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট সুগন্ধিযুক্ত চাউল আমরা এখানে প্রতি সের।৶০ ছয় আনা হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এ যাবৎ পদব্রজে চলিয়া আসিয়া পূজনীয়া বৌদিদি কিছু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বিশেষতঃ যমুনোত্তরী পথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশকাক্রান্ত হইয়া তাঁহার পদদ্বয়ে দুষ্ট ক্ষত দেখা দেওয়ায়, তাঁহার জন্য আমরা সকলেই একখানি ডাণ্ডির প্রয়োজন মনে করিলাম। অনেক অনুসন্ধানে এ স্থানের জনৈক পাহাড়ীর নিকট হইতে ১৫ টাকা মূল্যে একখানি পুরাতন ডাণ্ডি কিনিতে পাওয়া গেল! তার পর সওয়ার বহন করিবার চারি জন কুলী এককালীন মোট ৭০ টাকা মজুরী স্বীকারে এখান হইতে গঙ্গোত্তরী হইয়া কেদারনাথ তক বরাবর পৌছিয়া দিবে, এইরূপ ঠিক হইয়া গেল। এই নূতন কুলীদিগের নাম, ধাম, মজুরী ইত্যাদি সরকারী বহিতে লিখাইয়া দিয়া যথারীতি মাশুল দেওয়া হইলে পরদিন প্রত্যূষে নিশ্চিন্তচিত্তে এইবার তিনখানি ডাণ্ডির স্ত্রীলোক-সওয়ার সহ আমরা একে একে ভাটোয়ারী হইতে গঙ্গোত্তরী অভিমুখে রওনা হইলাম।

গঙ্গার তীরে তীরে প্রায় ৬ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া গঙ্গাবক্ষের দোদুল্যমান লৌহ-সেতু পার হইতেই সম্মুখে "সতীনারায়ণ" চটীর লম্বা ছপ্পর ঘর দৃষ্ট হইল। এখান হইতে দুই মাইল আন্দাজ পথ আগা গোড়াই কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চট্টানের মুখ-বিবর দিয়াই যেন যাইতে হয়। শুধু মুখ-বিবর বলা যথেষ্ট নহে, পদ-দ্বয়ের নীচেকার "চোখা-চোখা" তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ডগুলি তীক্ষ্ণধার দন্তের মতই পায়ে বিদ্ধ হইতেছিল। খুবই ধীরে ধীরে এ সকল স্থান অতিক্রম করিতে হয়, নতুবা 'হোঁচট' খাইয়া বামদিকে প্রবল-স্রোতা গঙ্গাগর্ভে পতিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা। এই সকল চট্টানের গায়ে গায়ে মালতী প্রভৃতি নানা প্রকার লতা-বৃক্ষ সর্পের মত বেষ্টন করিয়াই উপরে উঠিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৯ মাইল আন্দাজ আসিয়া "গাঙ্গনানি" পৌছিলাম। গাঙ্গনানি স্থানটি প্রাকৃতিক

গাঙ্গনানির নিকটে "ঋষিকুণ্ড" (উষ্ণ-জলের প্রস্রবণ)

দৃশ্য হিসাবে অধিকতর গাম্ভীর্য্যময় মনে হইল। ধর্ম্মশালা পৌছিতে প্রথমে দুইটি গরম জলের ঝরণা পাহাড়ের গা দিয়া নামিয়া আসিতে দেখা যায়। উপরে "ঋষিকুণ্ড" ও তৎসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র মন্দির বিদ্যমান। শুনিলাম, পরাশর ঋষি এককালে এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তার পর সেতু-* সাহায্যে গঙ্গা পার হইয়া, একটি বৃহদাকার ঝরণার সম্মুখে ইহার অনর্গল প্রচণ্ড শব্দ, যাত্রিগণকে একেবারেই আত্ম-বিস্মৃত করিয়া দিয়া থাকে। ধর্ম্মশালার সম্মুখেই আকাশস্পর্শী

* মোটা মোটা লৌহ তার দিয়া এই সেতু নির্ম্মিত।

প্রকাণ্ড পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সর্ব্বত্রই কেবল অগণিত রক্তপুষ্প (বুরাস্‌ফুল) শোভা বিস্তার করিয়া আছে। মাথার উপরে মধ্যে মধ্যে খণ্ড খণ্ড তুষারের উজ্জ্বল বিস্তৃতি—সবগুলিই যেন যাত্রীদের চোখে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে।

ধর্ম্মশালা দ্বিতল, উপরে ও নীচে বহু ঘর, ভিতরভাগে প্রশস্ত বারান্দা। বেলা এগারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা উপরের একখানি ঘরে আশ্রয়লাভ করিলাম। কুলীরা বোঝা লইয়া তখনও আসিয়া পৌছে নাই। প্রায় প্রত্যহই তাহারা আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার অনেক পরে পৌছিত। এ জন্য আহারাদির কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিতে যথেষ্ট বিলম্ব ও অসুবিধা ভোগ হইলেও, কোন প্রকার প্রতি-বিধান চলিত না। আহারাদির পরে অপরাহ্ণ হইতেই আজ নূতন উৎপাত! প্রবল মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার মত নিদারুণ বৃষ্টিপাতে কোন যাত্রীকেই ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইতে দিল না। সারা রাত্রি বৃষ্টিপাত হইলেও প্রভাতে আকাশ পরিষ্কার হইল না; বরং মেঘ ও বৃষ্টির আড়ম্বর দেখিয়া আমরা এখানেই আজ যথাশীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া লইয়া আগে যাইবার মনস্থ করিলাম। আর্দ্র বাতাসে শীতও যেন সকলকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল। যাহা হউক, যথাশীঘ্র আহারাদি শেষ

গঙ্গাবক্ষে তারের পুল (গাঙ্গনানি)

করিয়া আমরা এ-দিনে বেলা ১১টা আন্দাজ সময়ে যাত্রা করিলাম। মাথার উপরে বৃষ্টি লইয়া এক হাতে ছাতা ও অন্য হাতে দীর্ঘ যষ্টি সঙ্গে, উঁচু-নীচু পার্ব্বত্য-পথে ক্রমান্বয়ে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলাম। এই গাঙ্গনানি হইতে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল হইবে। এক স্থানের পথ বৃষ্টি হওয়ায় অত্যন্ত পিচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কঠিন উতরাই, মধ্যে এক অতি পুরাতন জীর্ণ লৌহসেতু পার হইতে সকল যাত্রীই যথেষ্ট বেগ পাইলেন। এই সঙ্গীন পুলটির সন্নিকটেই আর একটি নূতন লৌহসেতু নির্ম্মিত হইতেছিল। জিজ্ঞাসায় সেখানকার কুলীগণ জানাইল, কলিকাতার জনৈক 'শেঠজী' পুল নির্ম্মাণ-কল্পে এককালীন দশ হাজার টাকা টিহরী-রাজের হস্তে দান করিয়াছেন। তাই এখানে একটি এবং উপরে যাইতে 'ভৈরবঘাটির' নিকটে আর একটি এই প্রকার পুল নির্ম্মিত হইতেছে। এই স্থানকে "লোহরীনাগ" বলা হয়। এখান হইতে রাস্তার আশ-পাশের দৃশ্য ক্রমশই যেন ভীষণ হইতে ভীষণতর মনে হইল। দুধারেই কঠিন-কায় আকাশস্পর্শী নগ্ন পর্ব্বতগুলির চাপে, প্রবলস্রোতা হইয়াও মা জাহ্নবী এখানে আপনার পরিসর কম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্রোধে উন্মাদিনীর মত বিপুল গর্জ্জনে তাই তাঁহার প্রচণ্ড প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে আছাড়িয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্রশক্তি মনুষ্যের কর্ণ এখানে একেবারেই বধির! অভ্রভেদী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চট্টানগুলি এক একটি বিকটাকার দৈত্যের মতই মুখব্যাদান করিয়া জলের উদ্দামগতি হ্রাস করিবার জন্য দুধারেই যেন ব্যর্থ-প্রয়াসে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। এ সকল পথে কোথায়ও গঙ্গার একদম তীরে উপল-খণ্ডের উপর দিয়া নামিয়া গিয়াছি, আবার কোথায়ও বা চড়াই-পথে কতক উপরে উঠিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হওয়ায়, প্রাণটুকু যেন ঐ প্রখর-গামিনী গঙ্গার সহিতই মিশাইয়া দিতে ইচ্ছা হইয়াছে! পাহাড়ের রংও স্থানে স্থানে বিভিন্ন দেখিলাম। কয়লার মত 'কুচ্‌কুচে' কালোর উপরে আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

অভ্রের মত উজ্জ্বল শ্বেতাভ বস্ত্র-মিশ্রিত পাহাড়ের দৃশ্যে আমরা এ দিনে মোহিত হইয়াছি।

স্থানবিশেষে এই নির্জ্জন পাহাড়-পুরীর নৈসর্গিক গুরু-গম্ভীর দৃশ্যগুলি আমাদিগের প্রত্যেককেই স্তব্ধ, বিস্মিত, কখনও বা আতঙ্কে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই শেষের ৪ মাইল পথে পরিশ্রান্ত-চিত্তে আবার সর্ব্বশেষে চড়াই ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাকাল নিয়ত চলিয়া আসিয়া অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকা সময়ে আমরা "সুখী" নামক চটীতে উপস্থিত হইলাম। দুঃখের বিষয়, সুখীর ধর্ম্মশালায় আমরা আদৌ

গঙ্গার ক্ষুদ্র পরিসর

সুখী হইতে পারি নাই। ধর্ম্মশালাটি পাকা ও দ্বিতল হইলেও উপরে ও নীচে সমস্ত ঘরই তখন যাত্রি-পরিপূর্ণ ছিল। নীচেকার একখানি ঘরে শুধু তালাবন্ধ দেখিয়া রক্ষককে কারণ জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, "ঐ ঘরে আসবাবাদি বন্ধ রাখিয়া এক দল যাত্রী আগে গিয়াছে। দু একদিনমধ্যেই ফিরিয়া আসিবে।" এ কথাটা আমাদের আদৌ ভাল লাগিল না। লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই সম্ভবতঃ রক্ষক মহাশয় এইরূপে অন্য যাত্রীকে কষ্ট দিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকিবেন। ঘরগুলির সংলগ্ন বারান্দা থাকিলেও, তাহার সম্মুখদিক্ যে একেবারেই খোলা! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেখান হইতে চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া দেখিলাম, সর্ব্বত্রই কেবল মধ্যে মধ্যে জমাট তুষারখণ্ড ছড়াইয়া আছে। সারাদিনের বৃষ্টিপাতে বাহিরের আর্দ্র বাতাস তখন সকলেরই শরীরে বিলক্ষণ কম্পন আনিতেছিল। দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিতে পারিলাম, রাত্রিকালে এই উন্মুক্ত বারান্দায় কালযাপন ও কঠিন শীত ভোগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অগত্যা শেষবার রক্ষক মহাশয়কে "নরমে-গরমে" অনেক কিছু বলিয়া, একখানি বড় সতরঞ্চি দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলাম। কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একখানি লম্বা সতরঞ্চি আনিয়া দিল।

কোন প্রকারে জলযোগ সমাপন করিয়া সে রাত্রি সেই বারান্দায় অনিদ্রায় বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রচণ্ড শীত, তদুপরি আকাশের দুর্য্যোগ ও সঙ্গে সঙ্গে তুষারস্পর্শী আর্দ্র বাতাসের প্রবল হুঙ্কারে আমরা সেই রক্ষক-দত্ত সতরঞ্চিখানি (বিছানার পরিবর্ত্তে) সম্মুখের উন্মুক্ত স্থানে 'আড়' করিয়া বাঁধিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।

এখানে একখানি দোকান। তাহাতে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। তবে কেরোসিন তৈল অত্যন্ত মহার্ঘ, প্রতি বোতল বারো আনা মাত্র!

ধর্ম্মশালাটির আশপাশ বেশীর ভাগ 'চুলু' বৃক্ষে ভরা। নিকটেই ঝরণার প্রশস্ত ধারা যাত্রীদের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া থাকে। প্রত্যূষে এখান হইতে আরও এক মাইল আন্দাজ উপরে উঠিয়া চড়াই-পথের শেষ হইল। চারি দিকেই পাহাড়ের মাথায় খণ্ড খণ্ড তুষারগুলি রাঙ্গা-রবির সংস্পর্শে তখন 'উজ্জ্বল-মধুরে' মিশাইয়া বেশ সুন্দর দেখাইতে-ছিল। এইবার উতরাই পথে নামিতে সুরু করিলাম। যতই নামিতে থাকি, ততই আবার এক্ষণে অন্যরূপ দৃশ্য প্রতিভাত হইল। দুধারের সে প্রকাণ্ড চট্টান কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রশস্ত স্থান দেখিয়া প্রবল-স্রোতা ভাগীরথী এখানে অপেক্ষাকৃত ধীর-গামিনী। জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। শতধা বিভক্ত হইয়াই নামিয়া গিয়াছে। এক স্থানে এক ফর্লং-ব্যাপী রাস্তার উপরে ফেনপুঞ্জ সদৃশ তুষার-রাশি অতিক্রম করিয়া তিন মাইল দূরে "ঝালা" গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ স্থানে কালীকমলীওয়ালার পাকা ধর্ম্মশালা ও পঞ্জাবীদের স্বতন্ত্র একটি ধর্ম্মশালা দেখা গেল।

পঞ্জাবীরাও এখানে 'সদাব্রত' দিয়া থাকে। এ স্থান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি নাতিপ্রশস্ত স্থানে অগণিত 'নুড়ি'র (প্রস্তরখণ্ড) বিস্তার চোখে পড়িল। পশ্চিমদিক্ হইতে আগত দুইটি বৃহদাকার ঝরণার পুল পার হইয়া আমরা পুনর্ব্বার গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিলাম। এখানে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল স্থানের বিস্তৃতির মধ্যে গঙ্গার দুই তিনটি নাতিপ্রশস্ত ধারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া এমন ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে যে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে উপর হইতে সেই দিকেই কেবল চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। আঁকা-বাঁকা স্বচ্ছ নীল জলের মধ্যে মধ্যে আবার শ্বেতবর্ণের ছোট ছোট অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডের উজ্জ্বলতা দূর হইতে দেখিতে যে এত সুন্দর হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই। দুই তিন স্থানে পর পর ফেনায়িত তুষারপুঞ্জের উপর দিয়া যাইতে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর আছাড় খাইলেন। কাহারও কাহারও হাতে বা কব্জিতে একটু আধটু আঘাত সহ্য করিতে হইল। এই সকল তুষারের উপরে 'খাঁজ' বা চিহ্ন করা থাকিলে এরূপে পড়িবার আশঙ্কা থাকিত না। এ সময়ে এক দল হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোক-যাত্রীর একটি গান বেশ শ্রুতি-সুখকর মনে হইয়াছিল। গানের শেষ চরণে "হো গয়ে ভব-সাগর সে পার—" এই কথাটার উপরে তাহারা পুনঃ পুনঃ জোর দিয়াই সুর ধরিতেছিল। যেন সেই কথাটাই তাহাদের অপরিসীম আনন্দলাভের হেতু! স্বদেশ-আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত এই দুরধিগম্য পার্ব্বত্য পথ যতই তাহারা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের মনে ততই যেন চির-দুস্তর ভবসাগরের পারে পৌঁছিবার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, এ অনুভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা সে সময়ে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম, এ কথা অত্যুক্তি নহে।

ঝালা হইতে তিন মাইল আন্দাজ আসিয়া 'বগোরি' পড়িল। এ স্থানটি কেবল ভুটিয়াদিগেরই জন্য। ব্যবসায় উদ্দেশে ইহারা যে এ স্থানটিকে একটি কেন্দ্রস্থল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা পথিপার্শ্বে তাহাদের সারি সারি দুধারের ঘরগুলিই প্রমাণ করিয়া দেয়। এখান হইতে একটু আগে যাইতেই "হরশিলা" পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিক্ পাহাড়-বেষ্টিত এ প্রশস্ত স্থানটি অতীব রমণীয় বলিয়াই মনে হইল। এখানে "লক্ষ্মীনারায়ণজীর" মন্দির একটি দ্রষ্টব্য স্থান জানিয়া রাস্তা হইতে দক্ষিণভাগে কতকটা ময়দান—কতকটা বা ক্ষেত্রভূমি পার হইয়া,—গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলাম। গঙ্গার পবিত্র তটদেশেই এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা দেখিয়া স্বতঃই থাকিবার প্রবৃত্তি জন্মে। মন্দিরের দ্বারদেশে প্রবেশ করিতেই চোখের আগে দুই দিকের দুই মূর্ত্তি নজরে পড়ে। একটি গরুড়জীর ও অপরটি হনুমানজীর। ভিতরের চতুর্ভুজ নারায়ণ ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখিতে আরও সুন্দর। মন্দিরের সংলগ্ন আরও কয়েক-খানি ঘর দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, এগুলি ধর্ম্মশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্বৎ ১৯৭৭ বিক্রমাব্দে মহারাজ নরেন্দ্রশাহের রাজত্বকালে এই মন্দিরাদি "রাজারাম ব্রহ্মচারী" কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্শ্বদেশে আরও একটি 'শিবমন্দির' পরবৎসরে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় 'হরশিলা' নামের-ই সার্থকতা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পূজারী মহাশয় বলিলেন, "আপনারা যে সকল ক্ষেত্রভূমি পার হইয়া এখানে আসিলেন, তৎসমস্তই এই দেবতাগণের সেবার্থে এই দাতা উৎসর্গ করিয়াছেন।" পাহাড়ীদের মধ্যেও এতদঞ্চলে এরূপ দাতা বর্ত্তমান জানিয়া আনন্দ হইল। যথাশীঘ্র দর্শনাদি শেষ করিয়া লইয়া, আগে যাইতে মন না সরিলেও আমরা এ দিনে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যাইতে যাইতে এই হরশিলায় টিহিরী-রাজের একটি বাংলো ও তৎসংলগ্ন উদ্যানের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি পড়ে। উদ্যানে তখন আপেল্ ও ন্যাসপাতি প্রভৃতি বৃক্ষে অজস্র সাদা রংএর ফুল প্রস্ফুটিত থাকায়, এ নির্জ্জন পাহাড়তলী যেন আলো করিয়া রাখিয়াছিল। এখান হইতে আরও তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে "ধরালী" উপস্থিত হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শুষ্কফুল ও পুরাণো মালী

১

অর্জ্জুন—মিত্রদের বাগানের পুরাতন মালী।

এই মিত্রদের বাগানে কায করিয়াই সে বৃদ্ধ হইয়াছে। আজ তাহার দীর্ঘ দেহ সম্মুখভাগে অনেকখানি নুইয়া পড়িয়াছে; চর্ম্ম শিথিল, এমন কি, লোল হইয়াছে; চক্ষুর দৃষ্টি অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে, কায করিবার সময় হাত কাঁপে, সে দিন কে বলিতেছিল, তাহার ঘাড়ও না কি আজকাল কাঁপে।

তা কাঁপুক, তবু সে কায করিতে ছাড়ে না। আজ একই বাগানে সে ৪০ বৎসর ধরিয়া একই কায করিতেছে। চোখ বুজিয়াও তাহার পক্ষে এ কায করা অসম্ভব নহে। আর বাগান সম্বন্ধে কোন্ জিনিষটাই বা সে জানে না! কোন্ সময় গোলাপের কলম—কখন্ করবীর—কখন্ চামেলি, বেলা, হাসনা, হেনা ইত্যাদির—এ সব কথা তাহাকে কোন দিন মনে করাইয়া দিতে হয় না। কোন্ সময় গাছ ছাঁটিতে হয়, গাছে সার দিতে হয়, গাছের শত্রু পোকামাকড় ও উই কি করিয়া নাশ করিতে হয়—এ সব তাহার কণ্ঠস্থ।

বাগানের বাহার কিসে খোলে, ফুল কি করিয়া বড় করে, শুধু হাজারী গাঁদা দিয়া কি করিয়া বাগানের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, এ সব বিষয়ে তাহার বহু দিনকার অভিজ্ঞতা আছে।

নরেশ মিত্রের সময় খোরাক, পোষাক ও ২৲ টাকা বেতনে সে কার্য্যে প্রবেশ করে। নরেশ মিত্র স্বর্গে গেলে তাঁহার পুত্র সুরেশের কাছে বহু সম্মানের সহিত সে এত কাল কায করিয়া আসিতেছে। এখন তাহার বেতন ১০৲। সুরেশ বাবু এখন বৃদ্ধ। বাগানের তেমন সখ আর নাই। তোড়া বাঁধিয়া—মালা গাঁথিয়া তাঁহাকে দিয়া আসিতে পারিলেই তিনি এখন সুখী। বাগানে আসিবার আর তেমন উৎসাহ নাই: তাঁহার ছেলেদের আজকাল বরং বাগানের সখ আছে, ফুল ভালবাসে, ফুলের গাছ দেখিতেও তাহাদের মন্দ লাগে না। বাবুর বড় ছেলে কিশোর কলেজের পড়া শেষ করিয়া সম্প্রতি বাড়ী ফিরিয়াছে। সেই সব চেয়ে ফুল ভালবাসে। যেমন সুন্দর তাহার আকৃতি, তেমনই মধুর তাহার বচন। আজ তাহার এক বন্ধুর সঙ্গে তাহার বাগান দেখিবার কথা আছে।

শীতকাল। পৌষ মাস। তথাপি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া অর্জ্জুন ফুলের দুটি তোড়া, দুগাছি বড় মালা, কয়গাছি ছোট মালা (কারণ, সঙ্গে খোকারা সব আসিতে পারে) তৈয়ারি রাখিয়াছে। ফুলগাছগুলির নীচে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—একটি কুটা পর্য্যন্ত নীচে পড়িয়া নাই। দেখিলে সত্যই আনন্দ হয়। শীতের তীব্র বাতাস গায়ে লাগিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কিন্তু সে বাতাসেই ফুলগুলি কি সুন্দর-ভাবে দুলিয়া উঠে। যেন বলিয়া উঠে—এস বন্ধু এস, তোমার সঙ্গে আমরা সবাই হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া উঠি। লাল কাঁকর দেওয়া পথের দুই ধারে প্রশস্ত রক্ত-গোলাপের সারি কি সুন্দর মানাইয়াছে। ঠিক যেন স্মিতাননা সুন্দরী যুবতীর সীমন্তের প্রশস্ত সিন্দূররেখা। ঐ অদূরে যে হাজারী গাঁদার ঝাড়—উহা যেন সমস্ত স্থানটিকে আলো করিয়া রাখিয়াছে। অপরাজিতা দিয়া কি সুন্দর কুঞ্জবন নির্ম্মিত হইয়াছে;—যাহার নীচে বসিলে মনে হয়, দ্বাপরে বৃন্দাবনের কোন কুঞ্জবনে আসিয়া বসিয়া আছি। চন্দ্রমল্লিকা ও চামেলির ঝাড় কি বিমল শুভ্রতাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ঐ রক্ত পথের গা ঘেঁসিয়া নানা বিচিত্র উজ্জ্বলবর্ণের মরসুমি ফুল যেন কৌষেয় বসনের পাড়ের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। বাগানের শেষ প্রান্তে সমস্ত বাগান ঘিরিয়া পদ্মকরবী যেন রাজবাড়ীর প্রহরীর মত সুগন্ধ মাখিয়া লাল পাগ্ড়ি আঁটিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থানে স্থানে দুই চারিটি গাছ দুই একটা ফুল লইয়া কথঞ্চিৎ শুকাইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তা যাক্, উহারাই ত এত দিন ধরিয়া বাগানটিকে অমরাবতীর মত সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এখনও উহাদের শোভা যায় নাই। যাক্ এখনও দুই চারি দিন। যখন উহাদের জীবনী-শক্তি একেবারে ফুরাইয়া যাইবে, তখন উঠাইয়া ফেলিয়া দিলেই চলিবে।

সকাল হইতেই ছেলের দল অন্য দিনের মত গেটের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহারও একটা ফুলের গাছ চাই, কাহারও মেহেদীর ডালের প্রয়োজন, কেহ বা

কিছু ফুল চায়। তাহারা ত জানে না যে, আজ কিশোর তাহার এক কলিকাতার বন্ধু লইয়া আসিতেছে; আজ আর ভিড় করিলে চলিবে না। বলিলেই কি তাহারা সে কথা মানে! কেহ বলিতেছে, ও অর্জ্জুন দাদা, দাও না দুটো গোলাপের ডাল—কলম লাগাব। কেহ বলিতেছে, দাও না দাদা দুটো লাল গোলাপ। আধ ঘণ্টা থেকে খোসামোদ করছি। আজ তোমার হয়েছে কি?

অর্জ্জুন সকলকে বলিল, "আজ আমার বাবু—সেই যে কিশোর বাবু, যে কলকাতা থেকে কত পড়া প'ড়ে এসেছে, সে আসছে। আজ আর কিছু পারবো না ভাই। কাল এসো সব, কাল সব ডবল ক'রে দেবো। আজ তোমরা যাও, ভাই।"

এই বলিয়া অর্জ্জুন সবাইকে মিষ্ট কথায় বিদায় করিল। মনটার মধ্যে একটু খ্বক্ করিয়া উঠিল। সে মনকে বুঝাইল, কাল খুব বেশী করিয়া ফুল ও ডাল উহাদের দিয়া দিবে; তাহা হইলেই উহাদের মনের দুঃখ দূর হইবে।

সকাল কাটিয়া গেল। ৮টা, ৯টা ১০টা করিয়া ক্রমে ১২টা বাজিয়া গেল। তবে এ বেলা আর কেহ আসিল না। অর্জ্জুন উঠিয়া আপনার কুটীরের কাছে গেল; রাস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কুয়ার জলে স্নান সারিয়া লইল। তখনও কাহারও দেখা নাই। কুটীরের মধ্যে ঢুকিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইল; কিন্তু রান্না করিতে সাহস বা ইচ্ছা হইল না। যদি বাবুরা সেইটুকুর মধ্যেই আসিয়া পড়ে। রাত্রিকার দুখানা রুটী করা ছিল, তাহা খাইয়াই সে এক প্রকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া লইল। তার পর তাড়াতাড়ি গেটের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু বাবু কই? ঐ না দূরে একখানা গাড়ী আসিতেছে? না, ও ত সোজা চলিয়া গেল। আর ওরকম ঘোড়াই বা কেন হইবে? তেমন সাদা প্রকাণ্ড ঘোড়া উহারা কোথায় পাইবে? একবার কি খোঁজ লইয়া আসিবে? সুঁড়ি পথ দিয়া গেলে ত ১৫ মিনিটের মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু তাহারই মধ্যে যদি বড় রাস্তা দিয়া আসিয়া পড়ে? তখন? না, তাহাতে আর কায নাই।

প্রতীক্ষায় আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তার পর সত্যই বৃহৎ শ্বেতাশ্ববাহিত যান আসিয়া বাগানের পথে বেঁকিল। ব্যস্ত হইয়া অর্জ্জুন গেট খুলিয়া দাঁড়াইল। ঐ যে কিশোর বাবু, আর সঙ্গে তাঁহার বন্ধু। অর্জ্জুন ঠিক প্রথামত কুর্ণিশ করিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল। গাড়ী বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল।

২

একটু দূরে গিয়াই কিশোর গাড়ী হইতে নামিল। বন্ধুও নামিয়া পড়িল। কিশোর প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "অর্জ্জুন জ্যেঠা, শরীর ভাল আছে?"

কিশোর,—শ্যামনগরের বিখ্যাত জমীদার সুরেশ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাকে 'জ্যেঠা' বলিয়া সম্বোধন করিল এবং তাহার কলিকাতার ধনী, বিদ্বান্ ও বিলাসী বন্ধুর সম্মুখে! গৌরবে বৃদ্ধের বক্ষ ফুলিয়া উঠিল। তাহার লোল চর্ম্মের নীচেকার শান্ত অনুষ্ণ রক্তের মধ্যে শিহরণ জাগিয়া উঠিল।

অর্জ্জুন স্নেহ ও সম্মান মিশাইয়া বলিল, "আপনাদের দয়ায় এ বয়সেও এক রকম টেঁকে আছি। এখন আপনাদের এই মানসম্ভ্রম দেখতে দেখতে—আপনাদের সবাইকে সুস্থ সবল দেখতে দেখতে চোখ বুজতে পারলেই বাঁচি বড় বাবু।"

কিশোর বলিল, "তুমি কেন 'বড় বাবু' বল্বে অর্জ্জুন জ্যেঠা? সেলামই বা তুমি কেন করবে? 'আপনিই' বা কেন বলবে? তার জন্য যথেষ্ট লোক আছে। তোমার মুখে 'বড় বাবু' শুনলে মনে হয়, যেন বড্ড বড় হয়ে গেছি—আর বুঝি বেশী দিন পৃথিবীতে থাকবার সময় নেই।"

অর্জ্জুন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও কি কথা বাবা! ও কথা বল্‌তে নেই। তুমি ত সেদিনকার ছেলে—খোকা বাবু। সেই সে দিন তোমায় কোলে ক'রে এখানে এনেছি, হাতে ফুল দিয়ে, গলায় ফুলের মালা পরিয়ে, বাড়ীর মধ্যে দিয়ে এসেছি।"

দুই বন্ধুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। অর্জ্জুন প্রসন্নমুখে উভয়ের পানে চাহিল। কিশোর তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বন্ধুকে বাগানের সবই দেখাইতে লাগিল। অর্জ্জুন তাহাদের পিছনে পিছনে ফিরিতে লাগিল।

কথায় কথায় কিশোর বন্ধুকে বলিল, "এ বাগান আমাদের এদিকের মধ্যে নামী বাগান। আগে এর শোভা আরও বেশী ছিল। বাবার তখন এ দিকে খুব দৃষ্টি ছিল। অর্জ্জুন জ্যেঠারও গায়ে তখন প্রচুর শক্তি আর মনে প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল।"

বলিতে বলিতে কিশোর একটি গাছের কতিপয় শুষ্কপ্রায় পুষ্পযুক্ত একটি শীর্ণ শাখা ভাঙ্গিয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

তাহার বন্ধু বলিল, "একটা বাগান ঠিক রাখা একটা রাজ্য-চালানোর সঙ্গে প্রায় সমান। যে গাছগুলো শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে আসছে, তাদের সরিয়ে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নূতন গাছ বসাতে হবে—যাতে ক'রে লোকের চক্ষুতে কোন স্থান শূন্য বা শ্রীহীন মনে না হয়।"

বলিয়া বন্ধুটি একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখ, ঐ যায়গাটার ফুল-গাছগুলো শ্রীহীন ও নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে। ওগুলো আগে থেকেই তুলে ফেলা উচিত ছিল। এই যায়গার সৌন্দর্য্য ঐ শুক্‌নো ফুলগুলো একেবারে মলিন ক'রে দিয়েছে।"

কিশোর সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, বন্ধুর কথা সত্য বটে। কতকগুলি ফুলগাছে বোধ হয় তাহাদের প্রতিবেশীর চেয়ে আগে ফুল ধরিয়াছিল; তাই তাহাদের কার্য্যকাল আগেই ফুরাইয়াছিল। সে সময়ে হঠাৎ অর্জ্জুনের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। অর্জ্জুনের মুখে লজ্জা, দুঃখ ও পরাজয়ের ছাপ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিশোর জানিত, এই বাগানই অর্জ্জুনের প্রাণ। যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা সম্বরণ করিয়া সে বলিল, "তবু এ বাগান এ দিকের মধ্যে সেরা বাগান।"

পরে অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, একটা কায করলে ত হয়। আর একটি লোক কেন রাখ না। তুমি এখন এত না খেটে তাকে দেখিয়ে দেবে, সে খাট্‌বে। তা হ'লে তোমার আগের যেমন বাগান ছিল, তেমনি হবে। বাগানের শোভা কখন ম্লান হ'তে পাবে না। আমি বাবাকেও ব'লে যাব'খন। আর ঐ যায়গা থেকে শুক্‌নো গাছগুলো সব তুলে ফেলে দিও।"

অর্জ্জুন ঘাড় নাড়িয়া আদেশ মানিয়া লইল। 'হাঁ, দেব'খন' এই ছোট কথাটাও তাহার মুখে যোগাইল না।

তার পর আরও একটু বেড়াইয়া দুই বন্ধু গাড়ীতে উঠিল। কলের পুতুলের মত অর্জ্জুন তাহার তৈয়ারী দুটি ফুলের তোড়া ও কয়গাছি মালা তুলিয়া দিল। গাড়ী চলিয়া গেল। সে গেটের বাহিরে আসিয়া বার্দ্ধক্য ও নৈরাশ্যের ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কি আনন্দ ও উৎসাহ লইয়া সে কিশোরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কোথা দিয়া কি যেন হইয়া গেল। কিশোর আসিল; প্রভুপুত্র সে। এক দিন প্রভু হইবে। তবু কত আত্মীয়তা ও সম্মানের সহিত সে কথা কহিল। কিন্তু কই, প্রভাতের সেই আনন্দ ও উৎসাহের কোন চিহ্নই ত আর তাহার অন্তরে নাই। কেন এমন হইল?

অর্জ্জুন নিশ্বাস ফেলিয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যন্ত্র-চালিতের মত সেই শীর্ণ গাছগুলির কাছে আগাইয়া আসিল। সেখানকার কতকগুলি গাছের ফুল সত্যই শুকাইয়া আসিতেছে; গাছগুলিও কিছু শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কই, তাহার চোখে ত তেমন বে-মানান দেখাইতেছে না। কেন এমন হইল? তাহার বার্দ্ধক্যের দৃষ্টিতে যৌবনের সে দীপ্তি আর নাই বলিয়া কি? আপনার চিন্তাশক্তিকে সে তাহার বিগত যৌবনের দিকে চালিত করিয়া দেখিতে চাহিল, সে সময়ে সে এই অর্দ্ধশুষ্ক ফুলগুলিকে কি দৃষ্টিতে দেখিত। সত্যই ত—সে তখন গাছ ম্লান হইয়া আসিতেই, ফুল শুকাইয়া আসিতেই তখনি সরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এখন সে পারে নাই কেন? ইহাই কি মনের বার্দ্ধক্য? বার্দ্ধক্যের সহিত ঘর করিয়া ফুলের বার্দ্ধক্য আর তেমন করিয়া তাহার চোখে ধরা পড়িতেছে না? সেই শীর্ণ গাছগুলি ও শুষ্ক ফুলগুলির পানে সে ক্ষণকাল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইহারাই ত আজ তাহার এতদিনকার কার্য্য সব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কেন সে দুর্ব্বল মমতায় এত দিন ইহাদের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে?—দেহের দুষ্ট ক্ষতযুক্ত অংশের মত কেন সে ইহাদের তুলিয়া ফেলে নাই?

ইহার পর আর বিলম্ব না করিয়া অর্জ্জুন সে গাছগুলাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে সমূলে উৎপাটিত করিয়া একধারে ফেলিল। কি ভাবিয়া সেগুলাকে আরও দূরে সরাইয়া রাখিল ও সেই স্থানটির পানে আর একবার চাহিয়া দেখিল। সত্যই যেন যায়গাটার শ্রী ইহাতেই বাড়িয়া গেল। বাতাস যেন সেখানটায় আরও সোহাগ ও আদর করিয়া বহিতে লাগিল। শোভা যেন আগেকার চেয়ে অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

আরও খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া অর্জ্জুন স্থির করিল যে, আর বৃথা মমতা সে করিবে না। অনর্থক নিজের নামে ও বাগানের নামে অখ্যাতি সে কিনিবে না।

মনে বল করিয়া সে ফুলগাছগুলাকে একত্র করিয়া একেবারে বাগানের বাহিরে আনিয়া একপাশে সশব্দে ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। চমকিয়া সে সেই উৎপাটিত শীর্ণ গাছ ও অর্দ্ধশুষ্ক ফুলগুলার পানে আর একবার চাহিল। অর্জ্জুনের মনে হইল, এক দিন ইহারাই ত বাগানের শোভা বজায় রাখিয়াছিল। আজ না হয় তাহাদের মধ্যে কৈশোরের সে দীপ্তি নাই, যৌবনের সে সৌন্দর্য্য নাই। তাই বলিয়া কি তাহারা একবারে পরিত্যজ্য হইয়া পড়িল? যে উদ্যানে তাহারা জন্মিয়াছিল, তাহাদের যৌবন-বিকশিত অঙ্গে শত শত পত্রপুষ্প বিকশিত করিয়া আপনাদিগকে ও সারা উদ্যানকে ধন্য ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, আজ কি তাহাদিগকে সেই উদ্যান হইতে এমন করিয়া দূর করিয়া দিতে হয়? আজীবন সেবার কি এই মূল্য—এই পুরস্কার? যৌবনের দীপ্তি ও কর্ম্মকুশলতা ফুরাইয়া গেলেই কি তবে সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইয়া যায়?

হঠাৎ বিদ্যুতের স্পর্শের মত তাহার মনে পড়িল, সেও ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও ত স্থান এখন তাহা হইলে জীবনোদ্যানের বাহিরে। এই গাছগুলার মতই কি সে এখন জীবনকে বৃথাই আঁকড়িয়া ধরিয়া নাই? অন্য এক মালীর সাহায্য লওয়ার কথা কি তাহারই একটা সদয় ইঙ্গিত নহে? আনমনে সেই গাছগুলার পাশে ঘাসের উপর সে বসিয়া পড়িয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত গেল। দিবসের আলোক ক্রমে মিলাইয়া আসিতে লাগিল। দূর-পথ বাহিয়া শ্রান্ত গাভীর দল মন্থরপদে ফিরিয়া গেল। নীড়াগত পাখীদের শ্রান্ত পাখার শব্দ ও ব্যস্ততা শান্ত হইয়া আসিল। চারিদিক্‌কার প্রান্তর, বনভূমি, শস্যক্ষেত্র জনবিরল হইয়া পড়িল। দূর হইতে অন্ধকার সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

জলভরা চক্ষুতে অর্জ্জুন সেই ঘনায়মান অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

আজ প্রিয়া

আজ প্রিয়া ক্ষান্ত হোক ঐশ্বর্য্যের গাথা,
মৌন হোক অহমিকা যত;
রুদ্ধ করি দাও স্মৃতিদ্বার,
মুছে যাক যাহা কিছু গত।
আজিকার পূর্ণিমার শুভ্র শান্ত রাতে—
মুক্ত কর প্রাণের আগল,
কস্তূরীর গন্ধ সম,
তব প্রীতি অনুপম—
অলক্ষিতে চিত্ত মোর করুক পাগল।
তোমার ও স্নিগ্ধ মূক দেহ-বীণাখানি
শোনাক আজিকে প্রিয়া অপার্থিব বাণী;
শব্দহীন রূপ-তান,
বাক্যহীন প্রেম-গান
মুগ্ধ করি দিক মন-বীথি,
শুনিব তাহারি রেশ একান্তে বসিয়া নিতি নিতি।

শ্রীবিমল রায়।

সাহিত্যে হাস্যরস

২

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্তের মধ্যে (Geological ages) আমরা হাসি-অঙ্কিত হাড়, fossil কিম্বা তাম্রশাসন কিছু পাই না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের কিম্বদন্তী ও ইতিহাস হইতে আমরা কতকটা তাহা অনুমান করিতে পারি। বিভিন্ন শতাব্দীতে, হাসির উৎপত্তি ও বর্ণনা সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জাতীয় জীবনে লোকের হাসি উপলব্ধি করার ক্ষমতা কিরূপ ছিল, কিছু বুঝিতে পারি। Aristotle ও Plutoর পূর্ব্বে আর কাহারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পরন্তু জ্যামিতিকারক Euclid যখন অঙ্ক কষিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করা হয় ও হত্যাকারী বলিয়াছিল, "আমাদের অঙ্কশাস্ত্রের কোন দরকার নাই" কিম্বা ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Lavoisierকে হত্যা করার সময় বলা হইয়াছিল, "The Republic has no need for chemistry"—তাহাতে মনে হয়, সে বিপ্লবের সময় লোকদের যেন আদৌ রসবোধশক্তি (Sense of Humour) ছিল না। Copernicusকে শাস্তি দেওয়ার সময় প্রধান যুক্তি দেওয়া হইয়াছিল (Solar system সম্বন্ধে),—"If it is not within the Bible it is wholly sacreligious and if it is within the Bible it is entirely unnecessary" এখন আমরা সে কথা শুনিয়া হাসি, কিন্তু ইহা সহজেই ধরা যায় যে, যাহারা Copernicusকে শাস্তি দিয়াছিল (এবং যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল), তাহাদের রসবোধ (charity) যেন আদৌ ছিল না। কোরাণে লিখিত ও অলিখিত বিষয় সম্বন্ধে এখনও অনেকে এরূপ মনোভাব পোষণ করেন। এইরূপে আমরা বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন সময়ের জাতীয় রসবোধ সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস অনুমান করিতে পারি। মিশর, বাবিলন, আমেরিকা, গ্রীক, রোম ও অন্যান্য দেশের পুরাকালের ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন হইলেও তাহাতে "হাসি"-সাহিত্যের একটি ধারা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়।

ফরাসী দেশে বহু পুরাকালের গুহাবাসীদের (cavedwellers) কবর পাওয়া যায়। তাহাতে বিভিন্ন রং ও চিত্র অঙ্কিত আছে দেখা গিয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন যে, গুহাবাসী আদিম মানুষের মধ্যে শরীর ও গৃহ রং দ্বারা চিত্রিত ও অঙ্কিত করার প্রথা ছিল। তাহাদের মধ্যে চিত্রিত দেহে উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করা বোধ হয় প্রধান আমোদের জিনিষ ছিল। আমেরিকার আদিম অধিবাসী ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আদিম লোকের বংশধরদের মধ্যে এই প্রথা এখনও কিছু বিদ্যমান আছে। তাহারা যখন আহার্য্য অন্বেষণে শিকার করিতে আরম্ভ করিল, তখন শিকার করা (মৃগয়া) বেশী মনোমুগ্ধকর হইয়া উঠিল। এই অভ্যাসের অবশ্যম্ভাবী ফল (Tribal war) যুদ্ধবিগ্রহ—দিগ্বিজয়। এই যুগে লোকের হাসি ঠাট্টা তামাসা করার অবসর ও সময় ছিল কি না সন্দেহ। যদি কিছু থাকে, তাহা যুদ্ধবিগ্রহ ও শিকারের কাহিনীর মধ্যে ছিল। এ পর্য্যন্ত অনুমান করা বোধ হয় অবান্তর ও অন্যায় হইবে না। আকস্মিক দুর্ঘটনা কিম্বা নৈসর্গিক কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রাকৃতিক লীলা দেখিয়া, মানুষের মনে একটা ভয় হয় এবং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে, অমানুষিক অপার্থিব কোন শক্তির ক্রিয়া আমরা কল্পনা করি। বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের দ্বারা পরিমার্জ্জিত জ্ঞান এবং বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সে শক্তি, ক্রিয়া ও ভয় অনেক পরিমাণে এখন দূর করিতে পারিয়াছি। কিন্তু পুরাকালের অশিক্ষিত আদিম মনুষ্য-সমাজে যে এরূপ একটা অলৌকিক কল্পনা বিশেষ প্রবল ছিল, তাহা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। অসভ্য বর্ব্বর জুলু, নিগ্রো, রেড্ ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে সে জন্য ভূত-প্রেত, ডাইনী, সর্প, যোগিনী ও কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তিপূজার প্রচলন দেখিতে পাই। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শিকার-কাহিনীর মধ্যে সময়োপযোগী পূজার দেবতাদের অলৌকিক মনগড়া কাহিনী ক্রমশঃ বিজড়িত হইয়া উঠে। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতে এরূপ একটা দৃষ্টান্তের আভাস ও পরিকল্পনা পাই। লোকমুখে প্রচারিত কাহিনীতে সত্য ঘটনা অথবা মূল গল্প ঠিক থাকে না। কেহ কোন অংশ বেশী বিস্তৃত করিয়া বলেন, কেহ হয় ত আবার সে অংশবিশেষ লক্ষণীয় মনে করেন না। তাহার ফলে নূতন নূতন গল্প ও পরিকল্পনার উদ্ভব হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। (যথা, রামায়ণ হইতে মেঘনাদবধ ইত্যাদি)। গল্পের মধ্যেও আদর্শবাদ প্রচার করার সময় অবাস্তব অতিমানুষ ও অলৌকিক ক্রিয়া কল্পনা করাও বিশেষ কম হয় না। বহু শতাব্দীর জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজের পরস্পর সংঘর্ষে মূল কাহিনী যে এখন কত স্থানে কত রকম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে অথবা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। বিভিন্ন প্রদেশ অধিকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সব প্রদেশের প্রাকৃতিক লীলা ও নৈসর্গিক ক্রিয়া প্রভৃতিও প্রচলিত গল্প ও কাহিনীর মধ্যে আসিয়াছে। গল্প-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইলেও অনেক স্থানের ইতিহাস যে গল্প-সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

বৈজ্ঞানিক ভাবে তথ্য বিশ্লেষণ ও সত্য ধারণা উপলব্ধি না করিয়াও আমরা হয় ত ধরিয়া লইতে পারি যে, ৫ বৎসরের শিশুর এখন যে রকম জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা দেখা যায়, আদিম যুগের পুরাকালের মানুষদের বোধ হয় জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা তদ্রূপই ছিল। তুলনা করার মূলে এমন একটা অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার ধরিয়া লওয়া অন্যায় হইবে না। ছোট ছেলেদের কথা বলিতে শিক্ষা করার পূর্ব্বে ও পরে অনুকরণ করার প্রবৃত্তি বেশী দেখা যায় এবং তাহা করিতে গিয়া শিশুরা নানা রকম ভঙ্গিমার সৃষ্টি করে।

সে যে ইচ্ছা করিয়াই এরূপ ভঙ্গিমা করে, তাহা বলা যায় না। মা-বাপ ছেলের এরূপ উদ্যমের মধ্যে স্বর্গীয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সামগ্রী দেখিতে পান, কিন্তু অন্য লোকরা তাহার মধ্যে

হাস্যরসের জিনিষ পায়। ইহা যে কেন হয়, তাহা বলা কঠিন। অনুকরণস্পৃহা ও ভঙ্গিমা (mimicry) শেষে ছেলেদের মধ্যে পরস্পর খেলা ও আমোদের জিনিষ হয়—তাহা কোন সময় বাজে মুখবিকৃতিরূপ দেখায়, কোন সময় হয় ত কল্পিত ক্রন্দনও হয়। ক্রমশঃ মুখোসপরা, রংমাখা ও দোললীলা করা এবং পশুদের মত শিং, পা, স্বর ও চেহারা অনুকরণ করা ইত্যাদি ক্রম-উন্মেষ যেন স্বভাবতঃই ইহা হইতে আসিয়া পড়ে। আদিম যুগের মানুষ-সমাজে কুসংস্কার বেশী ছিল, তাহা বলা অন্যায় হয় না—কেন না, এখনও অনেক সমাজে অনেক রকম কুসংস্কার বর্ত্তমান আছে (এক সমাজের সুসংস্কার অন্য সমাজের কুসংস্কারভাবে পরিচিত করানও হয়)। সামাজিক শাসন ও বিচারের পর দণ্ড প্রদান করা একটা উৎসবের ব্যাপার ছিল—তৎসম্পর্কে আমোদ-আহ্লাদ করা বিধান ছিল, ঠিক যেমন ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলাঘরের খেলা। সে উৎসবে যে আমোদ-প্রমোদ হইত, তাহা এরূপ পশুবৃত্তি অনুকরণ অথবা মুখভঙ্গী ও মুখবিকৃতি ইত্যাদি ধরণের হইত বিবেচনা করা যায়। দর্শকদের মনে আনন্দস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা অনিশ্চিত ভয়-দুঃখ-কষ্টের আশঙ্কা বিজড়িত হইয়া থাকিত এবং মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ হিসাবে তাহা জটিলভাব ধারণ করিত। ছোট ছেলেদের দৃষ্টান্ত হইতে দেখিতে পাই যে, তাহারা অনাবশ্যকভাবে অকারণে হাসে, তাহাদের দ্রব্য সংগ্রহ করার অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানবুদ্ধি অন্যের কাছে অবোধ্য বলিয়া তাহা হাসির ও ঠাট্টার জিনিষ হয়। আদিম যুগের মানুষের মধ্যে এরূপ যে সব হাস্যকর বৃত্তি ও হাস্য উপভোগ করার অকারণ ও অনাবশ্যক স্পৃহা ছিল, তাহার কতক কতক বর্ত্তমান সমাজে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে অজ্ঞাতভাবে রক্ষা করিয়া যাইতেছি। পুরাকালে মানুষ পশুকে যে শুধু মারিয়া খাইত, তাহা নহে, পশুদের নানারকম Instinct অনুকরণ করিত এবং অনুকরণ করাটাও Instinct বলিয়া গণ্য হইত। আমাদের দেশে যে প্রবাদ আছে, "ষাট বৎসরেও গোয়ালার বুদ্ধি হয় না", ইহা এরূপ কোন Instinct অনুকরণ করার ফল কি না, তাহা বৈজ্ঞানিকগণের বিবেচনার সামগ্রী, (জোলা-তাঁতিদের সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রবাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়)। চিত্রাদি অঙ্কিত করা অথবা শরীরে রং লেপন করিয়া অঙ্গপ্রসাধন করা, ইহাও অনুকরণ-প্রবৃত্তির ফল, (Imitation proceeds from admiration)। ভাস্করবিদ্যাও ইহার একটি অঙ্গ বলা যায় এবং কাদামাটি দ্বারা পুতুল তৈয়ারী করিতে এরূপ মুখভঙ্গিমা বিকৃতি করাইয়া হাস্যরস সৃষ্টি করার চেষ্টা হইত। ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কঠিন পদার্থ লইয়া গবেষণা করেন ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া হাসির কথা বিবেচনা করিতে পারেন না। নচেৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের কল্পনার মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট উপাদান তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। আজ যাহাকে "ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা যুগধর্ম্ম অনুযায়ী হাস্যরস-প্রকাশলিপি কি না, আমরা অবৈজ্ঞানিক লোক তাহা বলিতে পারি না। তাহার প্রশংসা দেখিয়া ও সংবাদপত্রে আলোচনা পড়িয়া মনে হয়, অন্য যুগের Sense of Humour বুঝিবার ক্ষমতা এ যুগে আমরা যেন হারাইয়াছি। অসভ্য বর্ব্বর জাতিদের মধ্যেও যে হাসির ইচ্ছা, আয়োজন ও চেষ্টা করা হইত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহাদের মধ্যে mimicry এবং Caricature প্রধানতঃ আমোদের সামগ্রী ছিল ও আছে, তাহা পরীক্ষা করা বিশেষ কষ্টকর নহে (এখনও স্থানে স্থানে ইহার চিহ্ন সভ্যসমাজেও পাওয়া যায়)। বলা বাহুল্য, ইহাতে কোন বিষয় বিশেষভাবে অতিরঞ্জিত করার চেষ্টা কম হয় না। যুদ্ধবিগ্রহ ও দুঃখ-কষ্টের কাহিনীর মধ্যে আমরা ইহার পরিচয় পাই। এমন কি, অসভ্য জাতিদের মধ্যে গৃহনির্ম্মাণের সময় চিত্র পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া দেখান এখনও বর্ত্তমান আছে বলা যায়। পুরাকালের মন্দিরগাত্রে অশ্লীল চিত্রাদি, কারিকর নির্ম্মাতাদের কৃত কার্য্যের সফলতার আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছিল কি না, তাহা অনেকে গবেষণা করিতে পারেন। ধর্ম্মভীরু ভক্তগণ অবশ্য অন্যরকম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবেন, অনেকের নিকট তাহা হাস্যকর বিবেচিত হইবে।

উল্লিখিত মনগড়া হাস্যস্ফূর্ত্তির অক্ষম ইতিহাস হইতে আমরা দুইটি জিনিষ কল্পনা করিতে পারি—(১) অমানুষিক অলৌকিক অপার্থিব কোন শক্তি ক্রিয়া-লীলা বিকাশ হইতে দেবদূত, পরী, জীন, ভূতপ্রেত ইত্যাদির কল্পনা এবং (২) অনুকরণপ্রিয় মুখভঙ্গী বিকৃত করিত শিক্ষিত ভাঁড় fool অথবা Buffoon এরূপ শ্রেণীবিশেষ লোক। এই দুই ধারণা অথবা কল্পনা হইতে আমরা হাস্যরস-সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিতে পারি। হয় ত ইহাদের মূলে মাদক দ্রব্যাদির সৃষ্টি ও ব্যবহার কিছু অধিক পরিমাণে কার্য্যকর হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা সাধারণতঃ গম্ভীরপ্রকৃতির ধর্ম্মযাজকপ্রকৃতির ছিলেন, তাঁহারা দেবদূত, পরী, জীন্ প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপ লইয়া থাকিতেন এবং যাঁহারা অল্পবিস্তর মাদকদ্রব্যসেবী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাঁড় fool অথবা Buffoon শ্রেণীর লোক বেশী হইত। ক্রমশঃ যখন গম্ভীরপ্রকৃতির লোকেরা মাদকদ্রব্যাদির আস্বাদন পাইলেন ও গোপনে ব্যবহার করা অভ্যাস করিলেন, তখন ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে wit এবং ভাঁড়দের মধ্যে সুমার্জ্জিত Humour আসিল। জাতীয় মোড়ল ও প্রধানদের সম্মুখে (পুরাকালে রাজা, Duke Marquis প্রভৃতিদের সহচর) উভয় দলের লোকদের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করার প্রতিযোগিতা আসিল। তাহারা সাহিত্য, স্থপতিবিদ্যা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিকে নানাভাবে মনোরঞ্জন আমোদ-প্রিয় করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং লিখিত ভাষা না থাকিলেও প্রত্যেকেই যেন এক একটি জীবন্ত পুস্তক হইয়া উঠিল। তাহারা সময়মত নাচিত, গান করিত ও নানা উপায়ে দলপতি-দিগকে Humour এ রাখিত। ছোট বড় সকলের কাছে গল্প-কেচ্ছা, বলিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। মিশর দেশের Thabas নামক গ্রামের কবর ও দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন চিত্রাবলীর মধ্যে একখানি চিত্রতে দেখা যায়, একটি ভোজসভার অনুষ্ঠান, যাহাতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মদ খাইয়াছে—কেহ ঢলিয়া পড়িতেছে, কেহ উত্তেজনাবশে অন্যকে ভর্ৎসনা করিতেছে, ফুল হস্তচ্যুতভাবে ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, কেহ গান করিতেছে—কেহ বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে—কেহ বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করিতেছে ইত্যাদি। (আধুনিক তথাকথিত সভ্যসমাজে afterdinner,postprandial উৎসবের মধ্যে কিরূপ আয়োজন হয়, তাহা লেখকের দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই)। পুরাকালের Thabasএর চিত্রাবলী হইতে

আমরা বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। বাইবেলেও আমরা দেবদূতের উল্লেখ পাই।

অনুকরণপ্রিয়তা হইতে আমরা দেখিতে পাই, এক শ্রেণীর সাহিত্য ও গল্পসৃষ্টি হয়—যাহাতে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে মনুষ্য-সমাজের কথিত ভাষা আরোপ করা হইয়াছে এবং পশুদের গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা এখনও উপমাস্বরূপ বলিয়া থাকি, সিংহের মত বিক্রম, কুকুরের মত প্রভুভক্ত, শৃগালের মত ধূর্ত্ত, শূকরের মত গোঁয়ার, বকের মত ধার্ম্মিক ইত্যাদি। Æsops Fables, কথাসরিৎ-সাগর, বিষ্ণু-শর্ম্মার হিতোপদেশ, আরব্যোপন্যাস, Grimm's Fairy Tales ইত্যাদি সুরসপূর্ণ গল্প ও কাহিনীতে আমরা পশু-অনুকরণ ও অলৌকিক দেবদূত-ভূত-প্রেত-মিশ্রিত উপাখ্যানগুলি পাই। ইহারা চিরকালই পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পত্তি থাকিবে। মানুষ যে ইচ্ছা করিলে, অথবা অভিশপ্ত হইয়া আকৃতিতে পশু হইতে পারে (Transmutation of Soul), এরূপ কল্পনা এই সব কাহিনী হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতেও আমরা তাহার দৃষ্টান্ত পাই। মিশর দেশের চিত্রে একটি বিড়াল দণ্ড-হস্তে হাঁস পালন করিতেছে অথবা পেচা পক্ষীদের রাজা হইয়াছে, এরূপ উল্লেখ করা আছে দেখা যায়। বাইবেলেও ঘুঘুকে Holy Ghost এবং মেষশাবককে Our Lord কল্পনা করা আছে। British Museumএ মিশর দেশের একখানি পুরাতন চিত্র আছে, তাহাতে সিংহ ও একশিংবিশিষ্ট ঘোঁড়া unicorn একত্র বসিয়া দাবা (chess) খেলিতেছে, অঙ্কিত করা আছে। (দাবা খেলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হইলেও ইহা যে হাস্য-রসাত্মক একটা Caricature, তাহা বলা অন্যায় হইবে না)। ৩০০০ বৎসরের পূর্ব্বকার একখানি প্রস্তরখণ্ডে অঙ্কিত আছে, সিংহ একটি রাজসিংহাসনে বসিয়া আছে এবং শৃগাল প্রধান ধর্ম্মযাজকভাবে একটি হাঁস ও একখানি হাতপাখা সিংহ-রাজাকে "সেলামী" দিতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়, যাহা হইতে আমরা পুরাকালের Humour এবং Sense of Humour কল্পনা করিতে পারি।

শাশ্বত সনাতন হাস্যরস-সাহিত্যের সীমা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব ব্যাপার। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সমাজের ক্রমোন্নতি বিবৃত করিতে যাওয়াও দুরূহ জিনিষ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আবার বিভিন্ন রকমের রসধারা প্রকাশ ও অনুভব দেখা যায়। প্রত্যেক বিষয় উল্লেখ করিয়া, উদাহরণ দিতে গেলে, কেহ এক জীবনে সমাপ্ত করিতে ও সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। গানে, কাব্যে, গাথায়, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে বিভিন্ন সময়ে সমাজের মধ্যে হাস্যরস কিরূপ ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করাও সম্ভব নয়। রাজা ও বড়লোকদের ভাঁড় ও বয়স্য কিম্বা সখা হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ-বিদেশপরিভ্রমণকারী চারণদের কাহিনী ইতিহাস ও সাহিত্যে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। সমাজের উঁচু-নীচু স্তরে ও জাতীয় জীবনে তাহাদের শক্তি ও ক্ষমতা কতখানি ক্রিয়া করিত, তাহা আজ অতীতের অভিনব কাহিনী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও গৃহের দ্বারে দ্বারে "লক্ষ্মীর পাঁচালী" ও "মাণিক পীরের গান" প্রতিধ্বনিত হইত—এখন আধুনিক সভ্যতার নিষ্পেষণে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। অনেকে হয় ত' বলিবেন, কুসংস্কার-পূর্ণ এই সব শ্রেণীর লোকদের কার্য্যকলাপে হাস্যরসের সমগ্রী কিছু ছিল না। সে সম্বন্ধে হয় ত' মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু হাস্যরসের এক অঙ্গ অথবা বিকাশ Sudden glorification যে ইহাতে ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। লোকশিক্ষা হিসাবে এই সব Living Books সমাজে Free Distribution Library ভাবে আদর পাইত। ক্রমে তাহা কথকতাতে ও লিখিত পুস্তকে সীমাবদ্ধ হয়। ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করিয়া আমরা শুধু হাস্যরসের বিস্তৃতি ও প্রকাশের ধারা বুঝিতে পারি; কিন্তু আমরা কেন ও কিসের জন্য কথাবার্ত্তা শুনিয়া হাসি, তাহার সমুচিত উত্তর খুঁজিয়া পাই না। "হাসি" বলিতে সাধারণতঃ প্রকাশিত "দন্তরুচি-কৌমুদী" বিকাশ ও ঠোঁট ও চোখের একটা বিশেষ বিকৃতি ও অবস্থা বুঝি; কিন্তু বহিঃপ্রকাশ কিছু না করিয়াও মনে মনে হাসিতে পারা যায় অথবা হাসির উল্লাস ও উচ্ছ্বাস উপভোগ করা যায়। সাহিত্যে এবং প্রকাশিত ও লিখিত ভাষাতে আমরা উভয় প্রকার "আনন্দ" দেখিতে ও বুঝিতে পারি। ভাষার কসরৎ ও বাহাদুরী এবং বিভিন্ন ধারা, এ সম্পর্কে আলোচনার বিষয়। লিখিত ভাষার মধ্যে "গ্রাম্যদোষদুষ্ট" বলিয়া একটা অপবাদের উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সেই "গ্রাম্য" (simple) ভাব হাস্যরসের উপাদানভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাও দেখা যায়। হাস্যরসের মধ্যে সে জন্য একটা আস্বাদন (taste) ও নির্ব্বাচন (selection) বিশেষ সমাজে বিশেষ ভাবে অবস্থানুসারে উপভোগ্য হয়। আধুনিক সভ্য সমাজে সে জন্য পূর্ব্বতন অনেক রকম taste অচল হইয়া উঠিতেছে। "কবির লড়াই" এখন ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

পুরাকালের গ্রীস্ ও রোমের Gladiatorদের খেলা একটা বড় উৎসব ছিল। এখন তাহা নৃশংস ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রীস্ ও রোমের সভ্যতা ও ইতিহাস এবং Illiad এবং Odessyর কাহিনীও গল্প-সাহিত্যে অনেক কথা প্রদান করিয়াছে। এখন মনে হয়, পুরাকালের সত্য ঘটনাগুলিই বোধ হয় উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পাইয়াছি। যুগযুগান্তের সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতে ও সংমিশ্রণে অনেক প্রক্ষিপ্ত জিনিষও আমরা যেন মানিয়া লইয়াছি, নচেৎ Siren, Satyr, Delphi Oracle প্রভৃতি বিষয়ের কল্পনা হয় ত আমরা কোনকালে করিতে পারিতাম না। বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা কোন্ দেশ হইতে সব-প্রথম কি জিনিষ গ্রহণ ও সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এখন নির্ণয় করা যায় না। ঐতিহাসিক Renaissance Period এবং Fall of constantinople হঠাৎ যেন সাহিত্য ও সামাজিক সভ্যতার পরস্পর দ্বার উন্মুক্ত ও উন্মোচন করিয়া দেয়। Crusadeএর সময়ও যে দেশব্যাপী আন্দোলন ও যুদ্ধবিগ্রহ হয়, তাহাতেও অনেক জিনিষ যেন আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। আমরা সাহিত্যপথে কি ভাবে কতখানি অগ্রসর হইয়াছি, তাহা বিবেচনা করিতে এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা বাদ দিতে পারি না। জাতীয় হাস্যরস উপলব্ধি করা এবং আলোচনা করা ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায়। এখানে তাহার বিবরণ দিতে চেষ্টা করা অসাধ্য ব্যাপার। অনেকে বলিয়া থাকেন। "নিছক্" হাস্যরস বিশেষ

মনোমুগ্ধকর জিনিষ হয় না—যদি তাহাতে একটু আদিরসের (কিম্বা অন্য রসের) চাটনী, "আমেজ" suggestion ছিটা-ফোঁটা না থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ছেলেদের কাতুকুতু দেওয়া ও মুখ ভেংচী করা ছেলেদের মধ্যে আমোদ ও হাসাহাসির জিনিষ হইতে পারে; কিন্তু তাহা গম্ভীরপ্রকৃতির দর্শকদের হয় ত হাসাইতে পারিবে না। কিন্তু সদ্যঃ বিবাহিত বর গৃহে ঢুকিয়া যদি বলে, "সবাইকে দেখছি, কিন্তু কাহাকেও দেখতে পাচ্ছি না," (কাহাকে মানে নব পরিণীতা বধূকে) তখন সকলেই হয় ত হাসিয়া উঠিবেন। আধুনিক হাস্যরস-সাহিত্যে সে জন্য বিভিন্ন রসের কিছু মিশ্রণ হইয়া থাকে এবং অনেক সময় একটু শ্লেষপূর্ণ অথবা প্রচ্ছন্ন নিন্দা-বিদ্রূপ থাকিলে তাহা একটু মুখরোচক বেশী হয়, তাহা অনেকেই মনে করিবেন। এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত রহস্য (unconscious humour) একটি উপভোগ্য জিনিষ সাহিত্যে স্থান পাইতেছে। পিতার সম্মুখে ছেলে, চাকরকে শাসন করার জন্য যখন বলিল, "শালাব বেটা শালা, বাবা আছেন তাই, তোমাকে কিছু বলিলাম না, নচেৎ হারামজাদা,জুতিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দিতাম," তখন ছেলে বুঝিল না, পিতা সম্মুখে থাকাতে সে তাঁহাকে কতখানি সমীহ করিয়া কথা বলিতেছে। আবার যখন প্রভু ভৃত্যকে গালাগালি করিতেছে, "হারামজাদা পাজি, শূয়রকি বাচ্চা," তখন ভৃত্য বলিয়া উঠিল, "হুজুর মা বাপ, আমি ত আপনার ছেলে," তখন প্রভুর মুখ-চোখ কেমন আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্যের সামগ্রী নহে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারা দেখাইলাম। অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

পুরাকালের যে সব জাতির ইতিহাস অস্পষ্টভাবে আমরা এখন জানিতে পাই, তন্মধ্যে ঈজিপ্সিয়ান, অ্যাসিরিয়ান, ব্যাবিলোনিয়ান এবং ইহুদী বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহাদের সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে হাস্যরসাত্মক কোন জিনিষ এখন আর পাওয়া যায় না। ইহুদী বংশের লোকদের যে রসবোধ কিছু ছিল না ও নাই, তাহা যেন এখন একটি প্রবাদের মধ্যে পরিণত হইয়াছে। (কবি সেকস্পিয়ারের শাইলক্-চরিত্র উল্লেখযোগ্য)। হিব্রু জাতির লোকদের সাহিত্যে আমরা Satire এবং Parodyর দৃষ্টান্ত কিছু পাই। অনুকরণপ্রিয়তা (mimicry) হইতে যে parodyর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয় এবং আমরা যেমন অন্যের কোন দোষ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি—কে কেমন ভাবে কথা বলে, কেমন ভাবে তাকায়, হাঁটে, হাসে ইত্যাদি অনুকরণ করিয়া দেখাইতে আমোদ বোধ করি, হিব্রুদের মধ্যেও সেরূপ অনুকরণ-প্রিয়তা যে ছিল, তাহা অনুমান করা সহজ। এইরূপ অনুকরণ-প্রিয়তা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অথবা উপাসনাত্মক কথা ও পদ্য ক্রমশঃ হাস্যরসাত্মক গান অথবা কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে ও তাহা হইতে satire উদ্ভব হইয়াছে। বঙ্গদেশে যেমন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুরোহিত প্রভৃতি লোকদের অনুকরণ করিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়, পূর্ব্বেও অনেক দেশে ধর্ম্মমন্দির, ধর্ম্ম আলোচনা হইতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে সেরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্ভব হয়। বাইবেলে সে জন্য আমরা এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাই, যাহাকে প্রকৃত satire বলা অশোভন হয় না। Jotham এবং Nathanএর গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৮০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে Bensira একখানি বই লিখিয়াছিলেন, তাহা satire নামেই প্রসিদ্ধ; তাহাতে তদানীন্তন স্ত্রীলোকদের বিলাসিতা এবং ধনবান্ লোকদের ঔদ্ধত্য, শ্লেষাত্মক কথার উল্লেখ করা আছে। পুরাকালের Rabbis লোকদের এবং Talmudi সাহিত্যে আমরা এরূপ শ্লেষবাক্যে গল্পের উল্লেখ দেখিতে পাই। একটি গল্প এখানে উল্লেখযোগ্য।

Rabbisদের মধ্যে একটি আইন ছিল যে, যদি কোন স্বামি-স্ত্রীর ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান-সন্ততি না হয়,তবে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ (Divorce) করিতে বাধ্য। একটি সহরে এমন এক যোড়া দম্পতি বাস করিত, যাহাদের ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন সন্তান হয় নাই। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। ১০ বৎসর পর তাহারা প্রধান যাজকের কাছে উপস্থিত হইল ও নিবেদন জানাইল, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নয়। ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "তাহা হইতেই পারে না—আইন-নিয়ম ভঙ্গ করার প্রস্তাব কখনও মুখে আনিও না। তোমাদের বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিতেই হইবে।" অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর তিনি স্বীকার করিলেন ও বলিলেন যে, "তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রিয় জিনিষ স্মৃতিচিহ্ন কিছু সঙ্গে রাখিতে পার এবং পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করার পূর্ব্বে উভয়ে ভোজের আয়োজন করিয়া পরিতোষ সহকারে উভয়কে খাওয়াইতে পার," (সে ভোজের আয়োজনে প্রবীণ ধর্ম্মযাজক যে নিমন্ত্রিত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য)।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, স্ত্রী স্বামীর জন্য চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় অনেক রকম খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিল এবং খাওয়ার সময় স্বামীকে উৎকৃষ্ট ও বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু মদ যথেষ্ট খাইতে দিল। মদের নেশাতে স্বামী যেন অচেতনভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তখন স্ত্রী তাহাকে নিজের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। পরদিন স্বামী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইল এবং ঘুম-শেষে জাগিয়া, চতুর্দ্দিকে অপরিচিত স্থান দেখিয়া বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া গেল। তখন স্ত্রী আসিয়া তাহাকে বলিল, "দেখ, আমি ধর্ম্মযাজকের উপদেশ 'বর্ণে বর্ণে' প্রতিপালন করিয়াছি। তিনি আমাকে তোমার স্মৃতিচিহ্ন সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে আসিতে বলিয়াছিলেন। আমার কাছে যাহা অত্যন্ত প্রিয়—তোমার জীবন ও শরীর—তাহাই আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি—আমি ত আইন ও বিধি অনুশাসন অমান্য করি নাই?" স্বামী স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিল এবং ধর্ম্মযাজকের নিকট স্ত্রীর উক্তি বলিয়া, ক্ষমা চাহিল। ধর্ম্মযাজক নিজের কথা আর উল্টাইতে পারিলেন না, বরঞ্চ তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিছুদিন পরে তাহাদের একটি পুত্র-সন্তান জন্মাইল। উভয়ে সুখী হইল।

উপরি-উক্ত গল্পটির মধ্যে হাস্যরসের বিশেষ বস্তু যে কিছু আছে, তাহা বোধ হয় অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু তাহাতে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং উপস্থিত বুদ্ধি (wit এবং glorification) আছে, তাহা বলা অন্যায় হইবে না। অন্য দিকে আবার, বহু পুরাকালে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য অভেদ্য মধুর সম্বন্ধ এবং তাহার কল্পনা ও অভিজ্ঞতা যে কিরূপ

সে সমাজে ছিল (আধুনিক সমাজে এখন যাহা আদর্শ বলিয়া ধরা যায়), তাহার একটি সরল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বৈদেশিক সাহিত্যের মধ্যে এরূপ (glorified wit) হাস্য-রসাত্মক গল্পের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তাহার সম্পূর্ণ তালিকা ও বিবরণ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়। আরব ও তুর্কীস্থান হইতে সাহিত্যে আমরা যে সম্পত্তি পাইয়াছি, তাহার মধ্যে আরব্যোপন্যাস এবং অনেকপ্রকার উপকথা, রূপকথা উল্লেখযোগ্য। যদিও পরবর্ত্তী সমাজে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত এই সব সাহিত্যে অনেক জিনিষ অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তবু যেন মনে হয়, তাহা চির-নূতন এবং অসম্ভব ঘটনা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক কল্পনা বেশী। তাহারা যেন পুরাতন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে একটা বড় বন্ধনী অথবা বেষ্টনী অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

পারস্য দেশে পুরাকালের কোন লিখিত ও কথিত ইতিহাস বিশেষ পাওয়া যায় না, কিন্তু ওমরখায়েম ও শেক সাদীর গ্রন্থা-বলি হইতে অনুমান করা যায় যে, সে দেশের সাহিত্যে পুরাকাল হইতে আদিরস ও করুণ-রসের আলোচনা যেন বেশ হইত। (Romantic এবং Sentimental).

ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষে বেদ অতি পুরাতন গ্রন্থ। বিভিন্ন বেদের সূত্রগুলির মধ্যে হাস্যরস-পরিচায়ক কিছু উদ্ধৃত করিতে যাওয়া অনেকটা অশাস্ত্রীয় ও বিধর্ম্মী ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু ঋক্‌বেদে বর্ষারম্ভে ভেকের বর্ণনা এবং ইন্দ্রস্তুতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে "প্রাণ" ও "ভাষা" কল্পনা করা হইত এবং লিখিত ভাষাতে যাহা স্থান পাইয়াছে, কথিত ভাষার মধ্যে তাহা হইতে যে রসাত্মক বাক্যের ব্যবহার হইত, কল্পনা করা অসম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীর পদ্যে আমরা "গাল্ ফোলা কোলা ব্যাঙ, ডাকিছে গ্যাঙ্গর গ্যাং" লিখিত দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয়, আদিম আর্য্য অধিবাসীদের মধ্যে "কোলা ব্যাঙ্" সম্বন্ধে যে রসবোধ ছিল, তাহা এত শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাতেও লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

রামায়ণ মহাভারত আর দুইটি পুরাতন গ্রন্থ, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যে সময়ে তাহা প্রথম লিখিত হইয়া থাকুক না কেন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে যে সব হাস্যরসাত্মক বাক্য, গল্প এবং situation আছে, তাহার তালিকা করা অসম্ভব। সে সময়ে সমাজের রীতিনীতি, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সব কাহিনী আমরা পাই, তাহা যেন চিরন্তন এবং সব রকম সভ্য-সমাজে তাহার কোন না কোন এক রকম ছায়া এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে অসম্ভব—অবাস্তব—প্রক্ষিপ্ত বলিয়া এখন যাহা আমরা আলোচনা করি, তাহা সে সময় কি ভাবে লেখকের কল্পনাতে আসিল, তাহা বলা দুষ্কর—অন্ততঃ তাহা ইহাই প্রমাণ করে যে, পরস্পর আচার-ব্যবহার মিলন-সংমিশ্রণে তদানীন্তন সমাজে যে হাস্য-রসের প্রাচুর্য্য কিছু কম ছিল, তাহা নহে। পরবর্ত্তী কালে কালিদাস, ভবভূতি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি মনীষিগণ যে সব খণ্ডকাব্য লিখিয়াছেন, তাহাতেও তদানীন্তন সমাজের হাস্য-রসবোধের একটা আভাস আমরা গ্রন্থগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারি। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইলেও তাহা পড়িয়া এখনও আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। রামায়ণে "হনুমান্"এর সৃষ্টি সাহিত্যে এক অভিনব জিনিষ (সেক্‌পিয়ারের Ariel চরিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য)। (পরে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইবে)। সাহিত্যে হাস্যরসের বিশেষ পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে আর একটি বিষয় বলা দরকার।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে হাস্য-রসের বিকাশ ও উপলব্ধি কেমন ছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সামান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা পুরাকালের সঙ্গে আধুনিক কল্পনার তুলনা করা হইল। হাস্যরস যে শুধু কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যেই সব যুগে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা বোধ হয় সত্য নয়। আদিম অসভ্যযুগেও হাস্যকর অবস্থার উদ্ভব ও সৃষ্টি এবং সামান্য অনিষ্টকর ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইত, তাহা অসম্ভব নয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে practical jokes বলে, তাহা কবে, কি ভাবে প্রথম সৃষ্টি হইল, এখন বলা যায় না। পঞ্জিকাকারী পণ্ডিতগণ (পঞ্জিকাসেবী, ন'ন) কোন্ উদ্দেশ্যে "নষ্টচন্দ্র" এবং "দোললীলা" আবিষ্কার করিয়াছেন ও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বলা কঠিন। বৎসরের মধ্যে এমন নির্দ্দিষ্ট দুই দিন নানারকম practical jokesএর জন্য, গ্রহ-নক্ষত্র সমাবেশে স্থির করার মধ্যে আধিভৌতিক ব্যাপার কি আছে, তাহা তাঁহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। ইংরাজদের মধ্যেও 1st. Aprilকে, All fool's day নাম দেওয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য কি আছে, তাহা জানা যায় না। (কোন কোন দেশে Leapyear-এর দিনে অর্থাৎ ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স্ত্রীলোকদের এরূপ অবাধ practical jokes করায় License দেওয়া হয়)। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ হয় ত এ সব সামাজিক অনুষ্ঠানের উপযুক্ত ব্যাখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা এই প্রকার (practical jokes) হাস্যরসের স্বরূপ ও প্রকৃতি কিছু অনুভব করিতে পারিব।

সংবাদপত্র প্রচলিত হওয়ার পর একটি গ্রাম্য মজ্‌লিশে এক জন ভদ্রলোক (চাষী গৃহস্থ) হঠাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হয়েছে, অনেকগুলি লোক এক-সঙ্গে পেঁয়াজ-রশুন খাওয়া ত্যাগ করেছে। আমার অবস্থা কি হবে? ফসল ঘরেই পচিবে।" সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে কে এমন করিল?" ভদ্রলোক চাষী গৃহস্থ সংবাদপত্রে প্রকাশিত যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের নাম পড়িতে আরম্ভ করিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকের ছেলে, ভাই, আত্মীয় প্রভৃতির নাম তাহার মধ্যে পাওয়া গেল—তাহারা ত' কাঁদিয়া অস্থির। শেষে জানা গেল, তাহারা কেহ মরে নাই, বরঞ্চ তাহাদিগকে যুদ্ধের পর বাড়ী ফিরিতে দেওয়া হইয়াছে (Discharge Listকে Casualty List ধরিয়াছেন)। পরে সে চাষী ভদ্রলোকের কি অবস্থা হইল, তাহা আর গল্পে উল্লেখ নাই। (পুরাকালের practical joke বলা যায়)।

অনেক দিন হইতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে (বিশেষতঃ ছোট ছেলে-মেয়েদের ভুলাইবার জন্য) একটি ধারণা ও বিশ্বাস আছে যে, "বড়দিনের" সময় রাত্রিতে Santa claus অনেক খেল্‌না দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া আসেন ও ছেলেদের মধ্যে যাহারা

ভাল, তাহাদের মোজার মধ্যে খেলনা বোঝাই করিয়া উপহার দিয়া যান। একটি পরিবারে দুইটি ছেলে ছিল। একটি শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক, আর একটি দুরন্ত দুর্দ্দান্ত ও "বিশ্ব-বখা"। বড়দিনের দিন পিতা শান্ত ছেলেকে বলিয়াছেন, "তুমি সুবোধ বালকের মত ঘুমাও, তোমার মোজা Santa claus ভরিয়া রাখিবেন।" দুর্দ্দান্ত ছেলেটিকে বলিয়াছেন, "Santa claus তোমাকে কিছুই দিবে না; কেন না, তুমি বড় অশিষ্ট।" সুবোধ বালক ঘুমাইয়াছে, কিন্তু দুরন্ত বালক না ঘুমাইয়া রাত্রিতে যাইয়া চুপি চুপি (পিতার প্রদত্ত) সব খেলনা শান্ত ছেলের মোজা হইতে বাহির করিয়া নিজের মোজাতে ঢালিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে। সকালে উঠিয়া শান্ত ছেলে নিজের মোজা শূন্য দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির, দুরন্ত ছেলে তাহার সম্মুখে নিজের মোজা আনিয়া দেখাইল ও বলিল, "Santa claus আমাকেই ভালবাসে—ভাল ছেলে হইলেই তাহাকে সে ভালবাসে না।" (এরূপ দৃষ্টান্ত ছোট ছেলেদের মধ্যে আধুনিক সমাজেও অল্প-বিস্তর কিছু পাওয়া যায়)।

এক জন বিশিষ্ট বক্তা ও বৈজ্ঞানিক (তিনি আরও দীর্ঘদিন জীবিত থাকুন, নাম উল্লেখ করা হয় ত' অন্যায় হইবে) একটি স্কুলের prize দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন—

"আমাদের দেশে এত ভাল ছেলের সৃষ্টি হয়েছে যে, ভাল ছেলের নাম শুনিলে যেন তাহা একটা অপবাদের কথা মনে হয়, তাহার কারণ এই যে, ভাল ছেলেরা বাস্তবিকই ভাল অর্থাৎ খারাপ হওয়ার তাহাদের ক্ষমতা আদৌ নাই, কিন্তু যদি কেহ খারাপ ছেলে থাকে, আমি তাহাকেই বেশী ভালবাসি; কেন না, যে খারাপ হইতে পারে, তাহার প্রকৃত ভাল হওয়ারও ক্ষমতা আছে। আমাদের দেশে সে জন্য ভাল ছেলে সৃষ্টি করা ত্যাগ করিতেই হবে। কতকগুলি 'ডানপিটে' খারাপ ছেলে হওয়া দরকার হয়েছে—যাহারা গাছ থেকে পড়তেও কুণ্ঠিত হবে না, জলে সাঁতার দিতেও ভয় পাবে না, ১০।১১ মাইল হাঁটিতেও পশ্চাৎপদ হবে না।" বক্তৃতার পর তিনি বলিলেন, নির্দ্দোষ আমোদজনক practical joke যে বালক করিতে পারিবে, তাহাকে তিনি একটি স্বর্ণপদক উপহার দিবেন। ইহার পর স্কুলের ও হোষ্টেলের ছাত্রদের মধ্যে অনেক রকম প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। সবই যে নির্দ্দোষ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের সে সব চেষ্টা ও উদ্যোগের বিবরণ দেওয়া সমুচিত হইবে না। যে ছেলে পুরস্কার পাইল, তাহার বাহাদুরী এই ছিল যে, সে হোষ্টেলের প্রত্যেকের জুতা ও চটি এমনভাবে অদল-বদল করিয়া দিয়াছিল যে, প্রত্যেকের জুতা দুই পাটি মিল করিতে প্রায় সপ্তাহাধিক কাল লাগিয়াছিল এবং তাহাও সমস্ত জুতা একত্র স্তূপাকার করার পর। এই প্রসঙ্গে আর একটি সাংঘাতিক practical jokeএর কথা উল্লেখযোগ্য। কোন একটি ছোট সহরে কলিকাতা হইতে একটি নামজাদা থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় করিতে যান। স্ত্রীলোকরা অভিনয় করে, তাহা দেখিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে অসম্ভব জনতা হয়। সহরে মোট ৫।৬ খানি ঘোড়ার গাড়ী ছিল। অভিনয় শেষ হওয়ার কিছু পূর্ব্বে কয়েকটি "দুরন্ত" ছেলে পরামর্শ করিয়া সমাগত স্ত্রী-দর্শকদের জানাইল, "গাড়ী হাজির আছে—অভিনয় ভাঙ্গার সময় অসম্ভব ভিড় হবে, আপনারা যদি আসিতে চা'ন, শীঘ্র বাহিরে আসুন, বাসায় পৌঁছাইয়া দিতেছি।" তাহাদের সরল কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেক বাড়ীর পরিবারবর্গ সেই কয়েকখানি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া গেল। সে দুরন্ত ছেলেদের প্রত্যেকেই এক এক গাড়ীর কোচম্যানের কাছে বসিল; কারণ, তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী জানে। কিছুক্ষণ গাড়ীতে যাওয়ার পর উপর হইতে ইঙ্গিত দেওয়ামত গাড়ী রাস্তায় থামাইল এবং "সোয়ারী" নামাইয়া দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। প্রত্যেক গাড়ী তার ক্ষেপ এরূপ সোয়ারী নামাইয়া অন্তর্ধান হইল। থিয়েটার ভাঙ্গার পর বাড়ীর কর্ত্তা, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি কেহই নিজের পরিবারবর্গকে সে রাত্রিতে ফিরিয়া পাইলেন না। অন্ধকারের মধ্যে সকলেই ছুটাছুটি হুটাহুটি দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলেন। ভোর হওয়ার সময় দেখা গেল, রামের স্ত্রী শ্যামের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হা-হুতাশ করিতেছে, শ্যামের স্ত্রী ও ছেলেপিলে পুষ্করিণীর ধারে ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে, যদুর স্ত্রী রামবাবুর দেউড়ীতে অপেক্ষা করিতেছে, নিজের পরিবার-বর্গকে সেনাক্ত করিয়া নিজ হেপাজতে লইতে প্রত্যেকের সমস্ত দিন লাগিল—আহার-নিদ্রা কাহারও হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সে দুরন্ত ছেলেদের ও কোচম্যানদের সহরে কয়েক দিন দেখা গেল না। সহরের লোকরা থিয়েটার কোম্পানীকে কিরূপ সমাদর ভাষায় আহ্বান করিয়াছিল, তাহা সে সহরে এখনও প্রবাদবাক্যের মধ্যে উল্লেখ করা হয়। মানহানির মোকদ্দমার ভয়ে নাম উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

পয়লা এপ্রিল তারিখে যে সব practical jokes করা হয়, তাহা বেশীর ভাগ সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। কারণ, তাহাদের জীবনে বদলী, উপরওলার আদর আপ্যায়ন, সম্মানযোগ, inspection প্রভৃতি যে সব আকস্মিক ঘটনা হয়, সাধারণ মানুষের পক্ষে তত টা সহজে তাহা হয় না। তাহার পর টেলিগ্রাম, সরকারী লেফাফা প্রভৃতি সকলে ব্যবহার করিতে পারে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে যে ভাবে fool সাজিয়াছেন অথবা অন্য কর্ম্মচারিগণ তাহাকে কি ভাবে fool করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অনেকেই হয় ত জানেন। অনেকের পক্ষে তাহার বর্ণনা তেমন "মুখরোচক" বোধ হইবে না। একটি ঘটনা অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য। কোন এক উচ্চ রাজকর্ম্ম-চারী বিশেষ কৃপণ ছিলেন। কেহ কোন দিন তাঁহার বাসাতে এক পেয়ালা চা পর্য্যন্ত পাইতেন না। ১লা এপ্রিল তারিখে সহরে ছাপান নিমন্ত্রণ-চিঠি বিলি করা হইল যে, সন্ধ্যার পর রাজ-কর্ম্মচারীর বাড়ীতে প্রত্যেকের ভোজনের নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যার পর সহরের গণ্যমান্য বরেণ্য লোকরা সকলে একে একে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কেহ যাওয়ার নামও করেন না, উঠিতেও চা'ন না। ভদ্রলোকদের বসিবার স্থানও তিনি সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারেন না। রাত্রি ১১টার সময় ১লা এপ্রিলের কথা প্রকাশ পাইল। তখন রাজকর্ম্মচারী বিশেষ বিব্রত হইয়া বাজার হইতে নানাবিধ খাবার আনিতে বাধ্য হইলেন; কারণ, নিমন্ত্রিত যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেকে fool বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই ঘটনার পর রাজকর্ম্মচারী উপরে তদ্বির করিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। অধিক

দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অনেকের মতে ১লা এপ্রিল তারিখ বদলাইয়া তাহা ১লা জানুয়ারী করা উচিত; কারণ, সে দিন অনেক প্রকার উপাধি-তালিকা প্রকাশিত হয়।

কোনরূপ বিশেষ কায না করিয়া শুধু কথা ও উচ্চারিত ভাষাতে practical joke করা যায়, তাহা অনেকেই বলিবেন। ইহা এক প্রকার wit বলা অসঙ্গত নয়। সাধারণ wit বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতে ইহাতে বিভিন্ন এবং শ্লেষাত্মক মর্ম্মঘাতী কথা একটু ভাল রকম থাকে বলিয়া wit হইতে ইহার পার্থক্য বুঝিতে পারি। কলিকাতায় সচরাচর যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাঁহারা ট্রেণে চড়েন, তাঁহারা "বাঙ্গাল" (অসভ্য গ্রাম্য লোক)! হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী চড়িলেই যে কেহ "ইংরেজ" হ'ন না। তবু এই বিশ্বাসের মূল কোথায়, তাহা বলা কঠিন। এমন এক জন পূর্ব্ববঙ্গবাসী একটি ট্রেণে উঠিয়া বসিয়াছেন, চেহারা ও বেশভূষাতে তাঁহাকে "বাঙ্গাল" বলা হয় ত অন্যায় হয় না। ট্রেণ ছাড়ার কিছু পূর্ব্বে ২।৩ জন কলিকাতাবাসী ব্যারাকপুরে Race খেলা দেখার জন্য সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। প্রবেশ করার সময় এক জন বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌ছ, বাঙ্গালটা আবার এই গাড়ীতে ব'সে রয়েছে"। পূর্ব্ববঙ্গবাসী সে কথা শুনিয়া একটু ক্ষুণ্ণমনা হইলেন, ট্রেণ ছাড়িয়া গেলে, উল্লিখিত ভদ্রলোক "বাঙ্গালকে" জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের নিবাস—কোথায় যাবেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "এই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর," নাম বলিলেন, রামচরণ। ভদ্রলোকটি ঘৃণার সহিত বলিলেন, "অজ্ বাঙ্গাল্ কোথাকার, তাও আবার ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর বাড়ী—ছোঃ।" পূর্ব্ববঙ্গবাসী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাইদের নিবাস।" উত্তর হইল, "পদ্মপুকুর রোড, জান? চেন?" "বাঙ্গাল" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মশাইএর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" উত্তর হইল, "তাহা শুনে বাঙ্গাল কি করিবে?" তিনি বলিলেন, "পরিচয় হয়েছে—ভবিষ্যতে যদি কোনদিন দেখা হয়।" ভদ্রলোক বলিলেন, "নাম শুভ্রেন্দুশেখর মুখার্জ্জি।" "বাঙ্গাল" জিজ্ঞাসা করিল, "পিতার নাম জানিতে পারি কি?" উত্তর হইল, "অমলেন্দুকুমার মুখার্জ্জি।" বাঙ্গাল মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে ছিঃ ছিঃ, এত সুরেন্ ব্যানর্জ্জি, সি আর দাস, লজপত রায় থাক্‌তে আপনার নাম হ'লো শুভ্রেন্দুকুমার, আর বাপের নাম হ'লো অমলেন্দুকুমার? ছি!" বাঙ্গালের কথা শুনিয়া কলিকাতাবাসী ভদ্রলোকগণ তখন কি মনে করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। "ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর" নাম হিসাবে এমন কিছু অন্যায় কথা নয়।

উপরে practical jokesএর যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, সাহিত্য আলোচনা করিতে তাহাদের স্থান দেওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাতে হাস্যরসের উপাদান যে সামান্য কিছু আছে (derision, disappointment, glorification ইত্যাদি), তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা যাইবে না। লিখিত ও পুস্তকে বর্ণিত ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে যে সব হাস্যরসের জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখ করার পূর্ব্বে কতকগুলি পুরাকাল হইতে প্রচলিত, ছোট ছোট গল্পের উল্লেখ করিতেছি। অনেক স্থানে ইহা সাধারণ Humour নামে পরিচিত হয় এবং প্রত্যেকটিতেই "মহাপণ্ডিতের মূর্খতা" কিম্বা "বুদ্ধিমানের বুদ্ধিহীনতা" অথবা "বুদ্ধিহীনের সরলতা" বেশীর ভাগ যে আছে, তাহা অনুমান করা যায়। বঙ্গদেশে পূর্ব্বে এক শ্রেণীর রসিকতা ছিল, যাহাকে "জামাই-ঠকান" প্রশ্ন আখ্যা দেওয়া হইত। কারণ, নূতন জামাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরদাদা হইতে নাতনী পর্য্যন্ত সকলেই যেন রসিকতা করার অবাধ অধিকার দাবী করিয়া বসেন ও practical jokes করিতেও অনেকে আমোদিত হ'ন—তাহা যেন একটা অলিখিত সামাজিক আইন ও বিধি সকলে নির্ব্বিচার মানিয়া ল'ন। এই প্রসঙ্গে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়। ইসপ্ সাহেবের গল্পে আমরা জ্যোতির্ব্বিদের আকাশে তাকাইয়া পথভ্রমণ করিতে গর্ত্তে পড়িয়া যাওয়ায় গল্প পড়ি। মহাপণ্ডিত Archimedis যখন "Eureka" "Eureka" বলিয়া উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তা দিয়া দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন—তখন রাস্তার লোক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়াছিল। তিনি যে তখন কি মহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে অনেক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিদাস বাগচী।

আবির্ভাব

বসন্ত হে চরণ তোমার বাজে ঝরা পাতায় পাতায়,
এলে বনের বুকের কাছে মরা শাখায়, লতায় লতায়!
বাতাস ভরা স্বপন আনো,
কতোই মায়া তুমিই জানো,
দিগন্ত যে ভরিয়ে দিলে প্রথম-প্রেমের গোপন-কথায়!

ফসল ফলা'র স্বপ্ন দেখে আম্র-কানন মুগ্ধ-আঁখি,
অঙ্গ-ভরা পূর্ণ হওয়ার মন-হরা তা'র গন্ধ বা, কি!
জীর্ণ-ধরার উপকূলে
এলে প্রাণের লহর তুলে,
ভুবন-মরণ-হরণ-প্রেমে এলে শ্যামল-কোমলতায়!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মুক্তি ?

রায় বাহির হইল,—প্রাণদণ্ড। অপরাধ হত্যা। সুতরাং এই কঠিনতম দণ্ডাদেশ অসঙ্গত হয় নাই। তথাপি একটা গভীর বিষণ্ণতা বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত প্রত্যেক শ্রোতার মুখকে ম্লান করিয়া দিল।

'সুধীর ডাক্তার নরহত্যার মামলায় জড়িত!' বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত এই ভয়ঙ্কর বার্ত্তাটা যে দিন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, সে দিন কথাটা সত্য হইলেও কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

দুই টাকার ভিজিট হইতে ধাপে ধাপে সুধীর যেমন বত্রিশ টাকার ভিজিটে উঠিয়াছিল, তেমনই তাহার প্রতি একটা শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিশ্বাস মানুষের অন্তরের স্তরে স্তরে দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

মাটীর ভরাট বুক ভূমিকম্পের দুঃসহ আঘাতে বিশ্বগ্রাসী হাঁ করে।

সুধীর ডাক্তারকে রক্ষা করিবার পথ তাহার ব্যবহারাজীবরা অনেকখানি অধ্যবসায় দ্বারা বাহির করিয়াছিল। একটা প্রমাণ দলবল লইয়া খাড়া হইয়াছিল সুধীরকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে, কিন্তু ফুঁ দিয়া আলো নিভাইয়া কক্ষের চেহারা পলকে বদলাইয়া দেওয়ার মত সুধীর নিজেই স্বীকার করিয়া বসিল, সে দোষী।

সে মুক্তকণ্ঠে জানাইল, অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান তাহার আছে। সে তাহার রোগী শরৎ রায়কে ঔষধের সহিত বিষ দিয়া হত্যা করিয়াছিল। কোন আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া বা কাহারও দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নহে। এ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া চিন্তা করিয়া, নিজের মনের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া, যখন পূর্ণভাবে সে অন্তরের সমর্থন লাভ করিয়াছে, তখনই সে ইহা করিয়াছে। মস্তিষ্ক তাহার বিকৃত হয় নাই। এ হত্যাকে অপকর্ম্ম বলিয়া সে বোধ করে না। কৃত কর্ম্মের জন্য সে অনুতপ্ত নহে। সুধীর বিশ্বাস করে, পাপ-পুণ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি নাই, প্রয়োজনের উপর তাহা নির্ভর করে। ক্ষমা সে কোথাও প্রার্থনা করে না।

দিনের উজ্জ্বল আলোর মাঝে অশরীরী আত্মা যেন আবির্ভূত হইল।

বিচারক, জুরী হইতে আরম্ভ করিয়া, আদালত-গৃহের প্রত্যেক প্রাণীটি এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকারোক্তিতে স্তব্ধ হইয়া গেল। অ-দৃষ্ট দেবতা মর্ম্মান্তিক কৌতুক করিতে বুঝি কয়েক মুহূর্ত্ত সকলকে মূক করিয়া রাখিল।

*　　*　　*

কুষ্ঠব্যাধি রোগের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।

শরৎ রায় লোকটা যেমন উচ্ছৃঙ্খল, তেমনই উগ্রচেতা ও অত্যাচারী। রেসের নেশায় ঘোড়ার পশ্চাতে পৈতৃক সঞ্চিত বিভবরাশি নিঃশেষ হইতেছে, তথাপি চৈতন্য নাই। আত্মপরিজন সকলেই একে একে সংসর্গ ত্যাগ করিতেছিল। প্রতিবেশীরা ডাকিয়া কথা কহিত না। মানুষ যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন সর্ব্ব-নিম্নতলদেশে সে গড়াইয়া পড়ে।

স্বামীর এই অধঃপতন নিবারণ করা নির্ম্মলার অসাধ্য ছিল। প্রতিবিধান যেখানে অসম্ভব, মুখ বুজিয়া সহ্য করার অভ্যাসটাও সেইখানে আপনা হইতে দেখা দেয়। কিন্তু আধারের অপেক্ষা আধেয়টা যখন বড় হয়, আধারটা তখনই ফাটিয়া যায়।

স্বামীর অনাচার, উৎপীড়ন সবই নির্ম্মলা এত দিন সহিয়া আসিতেছিল কিন্তু আজিকার ঘটনা তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিত ঘৃণা, ক্রোধ এক মুহূর্ত্তে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলিয়া একটা ভয়ানক কাণ্ডের সৃষ্টি করিল।

দিন কয়েক হইল শরৎ বাড়ী ছিল না। হেতু জমীদারীর কিস্তি দিবার টাকাটা আদায় হইয়াছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে সে আত্মগোপন করিয়াছিল। আজ ফিরিবার কারণ, মধু নিঃশেষে শুকাইয়াছে।

ঠাকুর-ঘরে পূজার আসনে বসিয়া, গৃহ-দেবতার পানে চাহিয়া নির্ম্মলা অশ্রুধারায় ভাসিতেছিল। জন্মান্তরের কোন্ কঠোর দুষ্কৃতির ফলে নারীর ভাগ্যে মন্দ স্বামী হয়! সব বস্তুরই শেষ আছে। ক্ষয় হয় না কি শুধু মেয়েমানুষেরই অপরাধ? পরজন্মের জের টানিয়া সে দুর্ভাগ্য কি তাহাকে বহন করিতে হয়?

এমনিতর একটা এলো-মেলো আদি-অন্তহীন অথচ অসহ বেদনার ঘোরে নির্ম্মলা আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছিল। চমক্ ভাঙ্গিল তপনের কণ্ঠস্বরে। সাত বছরের শিশুপুত্র তপন নাচিতে নাচিতে আসিয়া গর্ভধারিণীকে জানাইল, পিতা তাহাকে কেক্, বিস্কুট, চকলেট প্রভৃতি প্রদান করিয়াছে।

দেবতাকে আর প্রণাম করা হইল না। নির্ম্মলা ত্রস্তে আসন ছাড়িয়া পুত্রের নিকট আসিল, তাহার হাত হইতে খাদ্য-সামগ্রীগুলা কাড়িয়া লইল।

চাকর আসিয়া জানাইল, বাবু স্নানের ঘরে গিয়াছেন।

ক্রন্দনরত পুত্রকে সান্ত্বনা না করিয়া ত্বরিতপদে নির্ম্মলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। পাচকের সহিত থাকিয়া না রন্ধন করিলে স্বামীর আহার মনঃপূত হইবে না। ফলে একটা অনর্থের সৃষ্টি হইবে।

আহারে বসিয়া শরৎ কহিল,—"তপন কাঁদছিল, তাকে ওগুলো খেতে দাওনি কেন, নোঙরা ব'লে?"

নির্ম্মলা কোন কথা কহিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পত্নীর এই নীরবতা কঠিন অবজ্ঞার মত শরৎকে বিঁধিল। তাহার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হইল। সে কহিল,—"আমি জানতে চাই, তপনকে কেন কেক্, বিস্কুট খেতে দিলে না?"

উত্তাপের সহিত নির্ম্মলা উত্তর দিল,—"আমার খুসি।"

শরতের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, মুখভঙ্গী করিয়া সে কহিল,—"তোমার খুসির নিকুচি করাচ্ছি।" হুঙ্কার দিয়া সে ছেলে-মেয়েকে ডাকিল,—"এই, তোরা আমার পাতে খাবি আয়।"

ব্যাঘ্রকবলে পতিত হরিণ-শিশুর মত মরণভীতি মুখে মাখিয়া তপন ও ধীরা পিতৃ-আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল।

নির্ম্মলা ভীষণ ধম্‌কাইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া কহিল,—"তোদের না' বারণ ক'রে দিয়েছি, ওঁর ছোঁয়া খাবিনি।"

অন্য সময় হইলে নির্ম্মলা কথাটাকে অন্য প্রকারে বলিত। কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধ অন্তরের সমস্ত কোমলতাকে নিঃশেষে শুকাইয়া দেয়। আগুনে-পোড়া লোহার মত নির্ম্মলার চিত্তটা তখন তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পত্নীর এই একান্ত অপরিচিত উগ্রমূর্ত্তি, নিষ্ঠুর রূঢ়তা শরৎকে মুহূর্ত্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ করিল। কিন্তু তাহা পলকমাত্র। পরক্ষণেই চীৎকার করিয়া শরৎ কহিল,—"কার বাবার হুকুমে আমার ছেলে-মেয়ে আমার এঁটো খাবে না? আমি মেথর না মুচি?"

সমানে সমানে সংঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তেমনই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে নির্ম্মলা কহিল, "তবু তারা ভাল। তুমি তাদের চেয়ে মন্দ! তোমার শরীরে কি রোগ ধরেছে, জান না?"

"বটে! আমার শরীরে রোগ ধরেছে। তোর সাত গোষ্ঠীর ধরুক।"

হিংস্র জানোয়ার যেমন করিয়া শিকারের উপর সগর্জ্জনে লাফাইয়া পড়ে, তেমনই করিয়া শরৎ পত্নীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

* * *

দম্‌কা বাতাসের মত রবি সুধীর ডাক্তারের গৃহে ছুটিয়া আসিল। একান্ত বিপন্নের মত শঙ্কিতকণ্ঠে কহিল—"ডাক্তার বাবু, শীগ্‌গীর চলুন—"

কথাটাকে শেষ না করিয়া সে সুধীরকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

সংজ্ঞাহীনতাকে মৃত্যু অনুমান করিয়া সমস্ত বাড়ীখানা যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভিতরের ঘটনাটা কেহ তখন সুধীরের কাছে খুলিয়া বলিতে পারিতেছিল না। তথাপি তাহাদের ভীত কণ্ঠস্বরে, শঙ্কিত চোখে মুখে শোকের বেদনা অপেক্ষা অন্য একটা কিছু গুলাইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া সুধীরের ভিতরটা কেমন আপনা হইতে কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

আসল কথাটা প্রকাশ পাইল, নির্ম্মলার অনুনয়ে—

সুধীরের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া একান্ত মিনতিতে সে কহিল,—"তুমি ছেলের মত সব রোগ-বিপদে আমাদের দেখছ। যা সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, আর ফিরবে না। নতুন সর্ব্বনাশের হাত হ'তে তুমি তাকে রক্ষা কর, বাবা।"

সুধীর নির্ম্মলার মুখের পানে পলকহীনদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নিষ্ঠুর প্রহারের সমস্ত চিহ্নই সেখানে বিদ্যমান। তথাপি সেই নির্য্যাতককে রক্ষা করিবার জন্য, কন্যাহন্তাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত এই প্রচণ্ড শোককে চাপা দিয়া উগ্র হইয়া উঠিয়াছে শুধু এই দুঃসহ চিন্তা।

সুধীর ডাক্তার জানাইয়া দিল—এ নিস্পন্দতা লুপ্ত-সংজ্ঞা বলিয়া। প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই।

সূর্য্যের উত্তাপে বরফ গলিয়া নদীর সৃষ্টি হয়। তীব্রতর আতঙ্ক নির্ম্মলার কান্নাকে পাথর করিয়া রাখিয়াছিল। এতক্ষণে তাহা অশ্রুধারায় নামিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলা কহিল—"আঃ বাবা! ও বেঁচে আছে! এরা যে ভয়ে ডাক্তার অবধি ডাক্‌তে চাইছিল না।"

নির্ম্মলার এই আক্ষেপের একটা সান্ত্বনা বা সাড়া না দিয়া মেঘে-ঢাকা আকাশের মত আঁধারমুখে নিঃশব্দে সুধীর নিজের উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ব্যাগটা বন্ধ করিতে করিতে রবিকে কহিল,—"নিত্য এই খুনোখুনি কাণ্ড, এর প্রতিবিধান কি তোমরা কর্‌তে পার না?"

হতাশমাখা কণ্ঠে রবি কহিল,—"কি ক'রে হবে, ডাক্তারবাবু! বাবা অবুঝ—"

রবি থামিল। পিতা মন্দ, এ কথা উচ্চারণ করা যে কতখানি কঠিন, কত বড় দুর্ভাগ্য! এইরূপ দুঃসহ মনোবেদনা দুনিয়ার সব দুঃখকে বোধ করি পরাস্ত করে।

ঘৃণা যখন মনের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, তাহা গোপন করা তখন কঠিন হইয়া পড়ে। উত্তাপের সহিত সুধীর কহিল, "রবি! তুমি বড় হ'চ্ছ! এ সব বিষয়ে তোমার চিন্তা করা উচিত। সে দিন তোমার মা মরতে মরতে বেঁচেছেন। আজ তোমার বোন এই মরণের মুখে এসেছে। ভাল ছেলে, এই নাম বজায় রাখতে নিজের দায়িত্বকে অবহেলা—"

বাধা দিয়া ভীতকণ্ঠে নির্ম্মলা কহিল, "না বাবা, ওকে আর তুমি ক্ষেপিও না। মেয়েটা আজ থাকৃতে পারেনি, ছুটে এসেছিল আমাকে বাঁচাতে। এক ধাক্কা দিলে সেই রাক্ষস! বাছা দোরের চৌকাঠে—" নির্ম্মলা কথাটা শেষ না করিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুধীর নিস্তব্ধ রহিল। এই অনধিকারচর্চ্চা করিবার তাহার প্রয়োজন কি? কিন্তু পশুশক্তির বন্ধন হইতে শক্তিমানই দুর্ব্বলকে ত্রাণ করে। বিশ্বের নিয়ম এই। বুকের মাঝে রুদ্র দেবতা প্রলয়-নৃত্যে যেন তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। শেষ অবধি তাই নীরব থাকিতে না পারিয়া সুধীর কহিল, "বেশ ত, আপনারা সব কোথাও চ'লে যান।"

চোখ মুছিয়া নির্ম্মলা কহিল, "কোথায় যাব, বাবা! বড় মানুষের একটা মেয়ে হয়েছিলুম। তাই বাবা টাকা দেখে এখানে মেয়ে দিলেন। সমুদ্রমন্থন ক'রে আমার কপালে উঠল বিষ। যত দিন বাঁচব, এ বিষের জ্বালায় জ্বল্‌তে হবে।"

সুধীর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, "আমি উঠছি। রাত্রে আর একটা ইন্‌জেক্‌শন্ দেব। কেমন থাকে ধীরা, খবর দিও, রবি।"

*　　*　　*　　*　　*

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দিনের আলোকে ব্যথাতুর করিয়া তোলার মত সুধীরের চিত্তটা আজ ক্ষণে ক্ষণে বিষণ্ণতায় ভরিয়া উঠিতেছিল। বুকের মাঝে কেবলই জাগিতেছিল বিগত জীবনের যত কাহিনী। গর্ভধারিণীর হাঁসপাতালে মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া রোগের সূত্রপাত, দৈন্যের কারণ, সকল দিনের সব ঘটনা যেন ভিড় করিয়া আজ চোখের সম্মুখে দাঁড়াইতেছিল, আর সকলের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়া সকল স্মৃতিকে পশ্চাতে রাখিয়া সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যটাই তাহাকে দুঃসহ বেদনা দিতেছিল—মাকে যে দিন হাঁসপাতালে দিল।

পথে গাড়ীটা থামাইতে বলিয়া সুধীরের মা বলিয়াছিল, "সুধীর! এই রাস্তার এই লাল গেট্‌ওয়ালা বাড়ীটা বড্ড চেনা, একবার একটু দেখতে দে।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া সুধীর মা'র মুখের দিকে তাকাইতেই মা বলিয়াছিল, "ভুল বুঝিনি, বাবা! ওই বাড়ীতেই আট ঘোড়ার গাড়ী চেপে ক'নে হয়ে আমি ঢুকেছিলাম।"

ভূমিকম্পে সমুদ্র দোলার মত সুধীরের বুকের মাঝটা ভয়ানক দুলিয়া উঠিয়াছিল। গলা দিয়া যেন স্বর ফুটিতেছিল না। অনেকখানি চেষ্টার পর সে কহিয়াছিল, "ওই বাড়ী আমাদের ছিল, মা?"

"হ্যাঁ বাবা! আমাদেরই।"

বিদায়-মাখা দিনের আলোর শেষ রক্তাভার মত জননীর পাংশু মুখে যেন শোণিতের আভা দেখা দিল। গর্ভধারিণী কহিয়াছিল, "ওই বাড়ীটার নাম 'মায়াপুরী' আমার শ্বশুর রেখেছিলেন;—আমার শ্বশুরের ওই এক মেয়ে মায়া অসময়ে পৃথিবী ছেড়েছিল ব'লে। দেখ সুধীর,

নামটা অবধি বদল হয়নি। মায়া বড্ড ঘা তোর ঠাকুর্দ্দার বুকে দিয়েছিল, তাই তার নামটা তিনি জড়িয়ে রেখেছিলেন। কেউ না তাকে ভুলে যায়। পাবনার জমীদাররা বাড়ীখানা নীলামে ডেকে নিলে, কিন্তু ঠিক নীলাম ত নয় বাবা, তার মাঝে ফাঁকি ছিল। মেয়ের শোকে শ্বশুর আমার মারা গিছলেন, বাড়ীর শোকে উনি মারা গেলেন।"

সুধীর আস্তে আস্তে কহিল, "থাক্ মা! ও সব ভুলে যাও।"

অতীতের সমস্ত চিন্তা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বর্ত্তমান মধ্যাহ্ন-দিবালোকের মত তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। নিম্নতল হইতে পরিচিতকণ্ঠে আহ্বানধ্বনি আসিল,—"ডাক্তারবাবু!"

সুধীরের বিক্ষিপ্ত—উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত মুহূর্ত্তে সচেতন হইয়া উঠিল। বারান্দায় আসিয়া কহিল, "কে রবি? উপরে এস।"

রবি উঠিয়া আসিয়া জানাইল, "বাবা চোখ চেয়েছে, কিন্তু কিছু চিন্‌তে পাচ্ছে না।"

সুধীর কহিল, "মিক্‌শ্চারটা আর দু'দাগ দিও। কাল সকালে আমি যাব। কিন্তু সাবধান, কোন গোলযোগ আর না হয়। মাথায় যে ভাবে চোট লেগেছে, জ্ঞানের বিকৃতি ঘট্‌বার সম্ভাবনা আছে।"

সন্ধ্যার আকাশে রাত্রির ছায়া ফেলার মত রবির ম্লান মুখখানা ভয়ে কালো হইয়া গেল। শঙ্কিতকণ্ঠে কহিল, "বুড়ীর মাথার কিছু গোল হ'লে মা'র অবস্থা,ডাক্তারবাবু—"

দুঃখ করুণাকে উদ্দীপ্ত করে। সহানুভূতিমাখা কণ্ঠে সুধীর কহিল, "নিশ্চিত ক'রে আমি কিছু বলছি না। সাবধান কচ্ছি; নিত্য যে দুর্ঘটনা তোমাদের বাড়ী ঘটছে।"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রবি কহিল, "কোন উপায় নেই, ডাক্তারবাবু। বাবার কিছুতেই চৈতন্য নেই। সেই মারপিট ক'রে চ'লে গেছেন। যাবার সময় আঙ্গুল দিয়ে রক্ত পড়ছিল দেখেছি। উঃ! মদেই ওঁর সর্ব্বনাশ করলে!"

রবির মুখের পানে চাহিয়া সুধীর অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, "তোমার বাবা যদি হঠাৎ মারা যান?"

সুধীরের দুই চোখের দৃষ্টি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

রবি সুধীরের পানে চাহিল। বাতাসে কাঁপা তরু-পল্লবের মত অজানা আশঙ্কায় ভিতরটা থর থর করিয়া উঠিল। কোন উত্তর সে দিতে পারিল না। মাথাটা শুধু ঈষৎ নমিত হইল।

সর্ব্বনাশা ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির নিস্তব্ধ কালি-মাখা মূর্ত্তির মত সুধীর কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির-গম্ভীর থাকিয়া পরে কথা কহিল। কণ্ঠস্বর পলকে বদলাইয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে। সুধীর কহিল, "রবি, আমার কথার উত্তর দাও।"

ক্ষীণকণ্ঠে রবি কহিল, "এ কথার কি উত্তর দেব বলুন?"

"কি উত্তর দেবে? উত্তর দেবে, তোমার বাবার আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তোমাদের কিছু বাঁচে কি না? দুঃখের ভার লাঘব হয় কি না?"

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ দিয়া অনেক কথা অপরের তীক্ষ্ণতর জিজ্ঞাস্যের মাঝে বাহির হইয়া পড়ে। মৃদুকণ্ঠে রবি কহিল, "অন্ততঃ বাড়ীটা আর গ্রাসাচ্ছাদনের কিছু বাঁচে।"

সুধীর কহিল, "রবি! আমার অতীত শুনবে? এবার ম্যাট্রিক দেবে। বুঝতে ত পারবে কিছু।"

* * *

সুধীর আরম্ভ করিল, "জন্মেছিলুম বড় লোকের ছেলে হয়ে। যেমন তোমরা জন্মেছ। তোমাদের মত দুর্ভাগ্য আমার ছিল। পিতামহ উচ্ছৃঙ্খল হলেও সম্পত্তি রক্ষা করার বুদ্ধি তাঁর ছিল। বাবা উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব্বতনের উচ্ছৃঙ্খলতা পেলেন। বঞ্চিত হ'লেন শুধু পৈতৃক বৈভব-রক্ষার বুদ্ধি হ'তে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিগুলা তাঁর নামের পিছনে জোড়া থাকলেও তাঁকে ভোলান বড় সহজ ছিল। তাহার উপর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া-রোগ এসে তাঁকে আক্রমণ করল। সে দুরন্ত দস্যু নিঃশেষে সব কিছু হরণ ক'ল্লে! মা'র মুখে অবশ্য এ সব আমার শোনা গল্প। সম্পত্তিগুলা সরীকরা দেনার দায়ে কিনে নিলে। নিলে না শুধু তারা বাস্তুটা। পিতামহের বড় সাধের সম্পত্তি সেটা ছিল! অনেক অর্থব্যয় ক'রে সে ইন্দ্রভুবন তিনি নির্ম্মাণ করেছিলেন; স্মৃতির বেদনা দিয়ে সে প্রাসাদোপম গৃহের নামকরণ করেছিলেন। তাই তাদের বিশ্বাস ছিল, পিতামহের ক্ষুব্ধ নিশ্বাস অশরীরী আত্মার মত ওই বাড়ীর ভিতর জেগে আছে। ওটা কিন্‌লে ঠিক ভোগের সুবিধা হবে না।"

আগ্রহভরা কণ্ঠে রবি কহিল, "তার পর, ডাক্তারবাবু?"

সুধীর খোলা জানলাপথে অসংখ্য নক্ষত্রভরা আকাশের

দিকে তাকাইয়া ছিল। মুখ ফিরাইয়া রবির পানে চাহিল। দেখিল, কিশোর মুখের আয়ত আঁখি অশ্রুতে টলমল করিতেছে।

সুধীরের দৃষ্টি একবার কোমল হইয়াই পর-মুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, তার পর খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বড় মর্ম্মস্পর্শী। মা'র মুখে শুনেছি, একটি আকস্মিক বিশেষ প্রয়োজনে এক জমীদারের কাছে বাবা বাড়ীখানা বাঁধা রাখেন সামান্য টাকায়, কিন্তু কি ক'রে যে দলিলে অতটা টাকার অঙ্কপাত হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি জীবনের শেষ দিন অবধি বুঝ্‌তে পারেন নি। বাবা তখন বাতে পঙ্গু, নালিশ-মকর্দ্দমা করবার অর্থও তখন ছিল না। খোলার ঘরে বাবা যখন মারা যান, তখন মাকে বলেছিলেন, 'বড় বৌ! এই কথাটা বিশ্বাস কর, মাতাল হই, জুয়াড়ে হই, বাবাকে আমি ভক্তি করতুম। ভাল-বাস্‌তুম্‌! তাঁর সাধের সম্পত্তি আমি বিক্রী করিনি। প্রকৃত ঘটনাটা কি আজ বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? রায়েরা দলিলে কি ক'রে অত টাকা দেখালে!"

সুধীর কহিল, "আমার বয়স তখন এগার বছর। তার পর মা মারা গেলেন। অভিমান ক'রে আপনার লোকের আশ্রয় তিনি নিলেন না। অভিমান তাদের উপর নয়—অদৃষ্টের উপর।"

সুধীরের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

সে বলিয়া চলিল, "বিতৃষ্ণার জ্বালা যত বড় হোক, অনভ্যস্ত দেহটা তা সইতে পারলে না। যক্ষ্মার বীজাণু বুকখানাকে ঝাঁঝরা ক'রে দিলে। প্রতিবেশীর বাড়ী হ'তে ভিক্ষা ক'রে মাকে এনে দিতুম। এই শেষ ভোগটা নিয়ে মা হাঁসপাতালে আশ্রয় চাইলেন,—এ জন্মের মত বোঝাটা নামিয়ে ফেলবার জন্যে। রবি! এই রাস্তা দিয়ে তাঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলুম। গাড়ী ভাড়ার ক'আনা পয়সা এক জন লোক দিলে। তোমাদের বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ীখানা আস্‌তে মা একবার গাড়ীখানা থামাতে বল্লেন। সে দিন তোমাদের বাড়ীতে কিসের উৎসব ছিল। আগাগোড়া সাজান বাড়ীর দোরে নহবৎ বাজ্‌ছিল।"

ভয়ানক বিস্ময়ে রবি কহিল—"আমাদের বাড়ী?"

সুধীর কহিল—"হ্যাঁ রবি, তোমাদের বাড়ী। সেই দিন প্রথম জান্‌তে পাল্লুম, ঐ ইন্দ্রপুরীর মত বাড়ী, ঐ 'মায়াপুরী,' ঐ আমার পিতৃভবন! আমার পিসীমার নাম ছিল 'মায়া।'

সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন বিহ্বল হইয়া পড়ে, বুদ্ধিবৃত্তি আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সেইরূপ দুই চোখের পুঞ্জীভূত বিস্ময় লইয়া রবি ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। তার পর ক্ষীণস্বরে কহিল,—"আপনার বাড়ী!"

নিমেষে তাহার অন্তরের সমগ্র আগ্রহ অন্তর্হিত হইল।

সুধীর কহিল,—"ঐ ইন্দ্রালয়ে তোমাদের মত আমিও জন্মেছিলুম, শৈশব আমার ওইখানেই কেটেছে। আমি অভাগা! তোমরাও অভাগা! রবি! আমার অনুক্ষণ মনে হয়, বাবা যদি যৌবনের প্রারম্ভে মারা যেতেন, এতখানি দুর্গতি হয় ত তাঁকে ভোগ ক'রতে হোত না।"

রবি কহিল,—"মৃত্যু ত কারো ইচ্ছাধীন নয়? তাকে চাইলেই পাওয়া যায় না।"

তীব্রকণ্ঠে সুধীর কহিল, "কি বলছ রবি!" উত্তেজনায় দুই চোখ তাহার দীপ্ত অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিল! কহিল, "অপরের ইচ্ছার উপর দুনিয়াতে আমাদের আসতে হ'লেও বিদায় নেওয়া আমাদের হাতের মাঝে অনুক্ষণ আজ্ঞাবাহী। রবি! মনে রেখ, ভালবাসার পরিচয় শুধু আপনার লোককে দীর্ঘায়ু ক'রে রাখা নয়! যা শুভ, যা কল্যাণ, তাই প্রার্থনা করা তার নিমিত্ত। তা সে যত কঠিন, যত নিষ্ঠুর হোক, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকেই গ্রহণ করা।"

সুধীরকে কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া রবি উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "ডাক্তার বাবু, ও রকম ভয়ানক তর্ক আমি আপনার সঙ্গে করতে পারবো না।"

* * * *

ধীরা সুস্থ হইলেও তাহার মাথার কিছু গোলমাল ঘটিতেছিল। সে সব গুলাইয়া ফেলে, নির্ম্মলা কাঁদিয়া ডাক্তারকে কহিল, "কি হবে, বাবা?"

সুধীর কহিল,—"আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ত কচ্ছি, মা!"

নির্ম্মলা ললাটে করাঘাত করিয়া কহিল;—"বাছা আমার কোন দিন মারপিটের ত্রিসীমা মাড়াত না। সে দিন যখন জোর ক'রে আমার মুখে থুথু দিতে এল, তখন আর থাক্‌তে পারলে না।"

নির্ম্মলা চোখ মুছিয়া কহিল, "শাস্ত্রে বলে, স্বামী

দেবতা! যে রক্ষা করে, সেই দেবতা! যে ধ্বংস করে, সেও কি দেবতা?"

সুধীর কহিল,—"শরৎবাবু আসেন নি?"

"আসেন নি আবার! নেবার বেলায় ছুটে আসে। সে দিন আঙ্গুলটা মচ্‌কে রক্ত পড়ছিল। সেইটাই আবার ফুলে উঠেছে। যাবে এখন তোমার কাছে লোক। বাইরে বৈঠকখানায় শুয়ে আছে। পা'টাও খোঁড়াচ্ছে। আমি এই দুধ দিয়ে এলুম।"

সুধীর কহিল, "তা হ'লে তিনি বাড়ী আছেন?"

"হ্যাঁ, বাবা আছেন। বাড়ী বিক্রীর চেষ্টা চল্‌ছে। দলিল লেখা হবে।"

সুধীর চমকিয়া উঠিল। কহিল, "আপনাদের বাড়ী বিক্রী হবে? যাবেন কোথা? সব ত গেছে।"

নির্ম্মলা কহিল, "যাব আর কোথায়? রাস্তার ফুট-পাতে। ন্যাকড়া জড়িয়ে শেষে ত বসতে হবে!"

বর্শার ফলার মত সুধীরের দুই চোখের দৃষ্টি কঠিন ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। নীরস-কণ্ঠে কহিল, "উনি আপনার উপর অত্যাচার করেন ব'লে আপনি এই কামনা কচ্ছেন?"

বন্দুকের গুলীতে আহত জীব যেমন ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া যায়, তেমনই করিয়া নির্ম্মলা কয়েক পদ পিছাইয়া গেল, দুই চোখের যন্ত্রণাভরা দৃষ্টি মেলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, "আমি করি এই কামনা? কি বলছ, বাবা? এই এতখানি অত্যাচারের পরও আমি ওই রোগের সেবা করি, ছেলেমেয়েদের কাছে ঘেঁসতে দিই না। কিন্তু আমি জানি, এ রোগের বিষ কতখানি! এর পরিণাম কি! তবু আমার বুকে জাগে, উনি মায়ের কত আদুরে ছিলেন। কত সম্মান, কত সম্পদ ওঁর ছিল। বুদ্ধির দোষে সব খোয়ালেও আমি ওঁকে কোন দিন ফেলতে পারব না, ছেড়ে দূরে যেতেও পারব না। আজও আমার শ্বশুরের ভিটেতে আছি! কিন্তু এই শেষ। পর-মাসে কোথায় দাঁড়াব—"

একটু থামিয়া নির্ম্মলা বলিয়া চলিল, "রবি কি বলে জান, বাবা! বলে, মা, এ ভিটে যাওয়াই ভাল! এ ফাঁকির সম্পত্তি! তাই এত জ্বালা এতে আমাদের। রবি ছেলে-মানুষ—বুঝতে পারে না! ওর মা বাপ ত ন্যায্য অধি-কারেই পেয়েছে।"

* * * *

অনেকখানি দুঃখ-কষ্ট সহিয়া, পরের বাড়ী ছেলে পড়াইয়া সুধীর নিজের দিন কিনিয়াছিল।

খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শরৎ রায়ের গৃহ-সংলগ্ন ফুলবাগানের দিকে তাকাইয়া সুধীর তাহারই হিসাব করিতেছিল।

পূর্ণিমা-রাত্রি। অজস্র জ্যোৎস্নার আলো চারিদিক্ প্লাবিত করিতেছিল। কিন্তু বাড়ীর ছায়া, বৃক্ষের ছায়া সেই আলোকরাশির বুকে আঁধার রচনা করিয়া জানাইতে-ছিল যে, নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা কিছুই নাই। কালির দাগ কোথায়ও না কোথাও চিহ্নিত আছে।

জনপথ নিস্তব্ধ। শরৎ রায়ের আলোক-নির্ব্বাপিত প্রাসাদখানাও নিস্তব্ধ। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে যে গ্লানি, যে দুঃখ মানুষগুলাকে অনুক্ষণ পোড়াইতেছে, তাহারই জ্বালায় হয় ত ক্ষুদ্র পরিবারটা বিনিদ্রনেত্রে অশ্রুপাত করিতেছে!—আসন্ন গৃহ হারা, আশ্রয়-হারা হইবার শঙ্কায়।

সুধীরের চিন্তাধারা অন্য ভাবে বহিতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, ঐ ইন্দ্রপুরীতুল্য মায়াপুরীতে জগতের প্রথম আলো সে দেখিয়াছিল। উহারই কোন কক্ষে তাহার আগমনের মঙ্গলধ্বনি করিয়া শঙ্খ মুখরিত হইয়াছিল। মায়ের মুখে এইটুকু জানিয়া পূর্ব্বতনদের মত ঐ গৃহকে অন্তরের সমস্ত ভালবাসা সে ঢালিয়া দিয়াছে! তাই ঐ গৃহের সন্নিধানে সে নীড় বাঁধিয়াছে। "মায়াপুরীকে" দেখিবার আকাঙ্ক্ষা সুধীরের গর্ভধারিণীর মত সুধীরের বুকেও যে অনুক্ষণ জাগে।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সুধীর ভাবিল, কমলা তাহার উপর এখন প্রসন্না! ভবিষ্যতে কোন দিন হয় ত 'মায়াপুরী' তাহারই অধিকারে আসিবে। অদৃষ্টের কথা কে বলিতে পারে? কিন্তু রবি, ধীরা, তাহাদের গর্ভধারিণী নির্ম্মলা?

সুধীরের বুকের মাঝটা কাঁপিয়া উঠিল। ওদের জীবনের চরম মুহূর্ত্ত অশুভযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সুবিশাল হর্ম্ম্য হইতে ওদের বিচ্যুতি ঘটা আসন্ন। কিন্তু সুধীরের অবস্থার তুলনায় উহাদের অবস্থা দুঃসহ। পিতৃ ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত অভাগাদের পিতা হয় ত দিয়া যাইবে ঘৃণিত

ব্যাধি। অভিসম্পাতের মত সকলের বর্জ্জনীয় হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। মেরুদণ্ড যাহাদের ভাঙ্গিয়া যায়, দাঁড়াইবার শক্তি তাহাদের কোন দিন হয় না; দুনিয়াতে আপনাদের স্থান ওরা কখন করিতে পারিবে না।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত সুধীরের মাথার ভিতর সশব্দে খেলিয়া গেল, আজিও ওদের বাঁচিবার পথ খোলা আছে। পৃথিবীর বুক হইতে যদি শরৎ রায়ের অস্তিত্বটা কয় দিনের মাঝে মুছিয়া যায়! তবে—? উঃ, কি আরাম! একটা সংসার রক্ষা পায়, গুটিকয়েক নিরীহ প্রাণী পৃথিবীর আলো-বাতাস লইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। এক মুঠা অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে আর ফিরিতে হয় না। আর শরৎ রায় ধনীর সন্তান! অভিজাত-বংশধর! ও নিষ্কৃতি পায়, ঘৃণিত ব্যাধি, মর্ম্মান্তিক গ্লানি ও দুঃসহ অবমাননা হইতে। মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! কল্যাণ! শান্তি! আনন্দ! একটা মৃত্যুর অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে।

সুধীরের ললাট ঘামিয়া উঠিল। মায়ের দুঃখক্লিষ্ট পীড়িত মুখখানা, কোটরগত চোখে যন্ত্রণাশ্রু সুধীরের দৃষ্টিপথে সহসা ভাসিয়া উঠিল।

সুধীরের মনে হইল, দধীচির আত্মত্যাগ, অস্থিদান গল্প-কথা নহে, খাঁটি সত্য প্রাণের কথা।

হঠাৎ নিম্নতল হইতে রবির কণ্ঠস্বর তাহার আগমন ঘোষণা করিয়া বলিল,—"ডাক্তারবাবু! বাবার হঠাৎ খুব জ্বর এসেছে। মা ভয় পেয়েছেন। আপনাকে এখুনি যেতে বল্লেন।"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

একের বিহনে

গ্রাম-পথে যেতে সেই সে বাড়ীটি এখনো সমুখে পড়ে,
এখনো রয়েছে সেই আমগাছ নুয়ে-পড়া সেই ঝড়ে।
পুকুরে অতল শীতল জলেতে বাতাস তেমনি বহে,
এখনো তেমনি কানায় লুটায়ে ঢেউ কত কথা কহে!
পুকুর-পাড়ের বাগানে এখনো হাজারো কুসুম ফুটে,
গুণ্ গুণ্ রবে ভ্রমর তেমনি সেখানে এখনো জুটে।
বাড়ীর পিছনে গোচারণ-মাঠ তেমনি রয়েছে সেথা,
এখনো তেমনি রাখালের বাঁশী ধ্বনিয়া তুলিছে ব্যথা!

* * * *

কিন্তু আজিকে বাতায়ন-পাশে কেহ ত থাকে না চাহি,
আমগাছ-তলে আম কুড়াবার কেহ ত আজিকে নাহি।
ঘুরিয়া ফিরিয়া অকারণে আর কেহ ত আসে না ঘাটে,
জল ছিটাইয়া সিনানের কালে কেহ না সাঁতার কাটে।
রাশি রাশি ফুল মিথ্যা ফুটেছে চৈত্র মাসের প্রাতে—
আজিকে কেহই আসে না আর সাজিটি লইয়া হাতে।
আর ত আজিকে সন্ধ্যা-বেলার গান সে আসে না ভেসে,
রাখালের বাঁশী বাজিয়া কাঁদিয়া আকুল দিনের শেষে।
একটি কুসুম বিহনে আমার রিক্ত হয়েছে সাজি,
একের বিহনে পুরানো ধরণী হয়েছে নূতন আজি!

শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্ত্তী

শিবের রূপ-রূপান্তর

একবারে গাজনে প্রবেশ করতে হবে আমাদের। নতুবা মূলের সন্ধান পাওয়া যাবে না। ধান ভানতে শৈব মহিপালের গীত গাইলে চটিয়া ওঠেন অনেকে। যদিও তাহা মোটে ন'শ বছর আগের গান (১)। কিন্তু আমাদের যেতে হবে সেই "আদি-চাষার" গান (২) শুনতে। যুগযুগান্তরের বৃদ্ধ এই গাজন! দেবতা সেই বুড়োরাজ। ভারতের সব সভ্যতারই চিহ্ন আছে এই গাজনের দেহে। কেহ ভালবেসে জয়মাল্য পরিয়েছিল, কেহ চরণাঘাত করেছিল। স্বাধীন হিন্দু ভারতের আজন্ত বসন্তোৎসব গাজনে রূপান্তরিত হয়েছে।

কত সহনশীল গাজনের এই দেবতা! ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, প্রবলপ্রতাপে জয়ধ্বজা উড়িয়ে গেল তাঁর বুকের উপর দিয়ে, তবু তিনি নির্ব্বিকার। এই সহিষ্ণুতাই তাঁকে অমর করেছে। অমৃত তিনি পান নাই। ত্যাগী অকপট তিনি, আশুতোষ তিনি। গরল খাইয়াও তাঁর মৃত্যু হয় নাই কেন? তিনি যে সমাজ-হৃদয়কে জয় করেছিলেন। উদারতায়—ভালবাসায় জয় করেছিলেন। সেই কৃতজ্ঞ সমাজ এখনও তাঁকে মাথায় ক'রে নাচছে। অশুচি কেহ ছিল না তাঁর কাছে। তিনি জাতির বিচার করেন নি। আর্ত্ত—লাঞ্ছিত—ইতর তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিল। শুষ্ক পাণ্ডিত্যের কাছে তিনি মাথা নত করেন নাই। ভক্তি-প্রীতি তাঁর কাছে আদর পেয়েছে। কোনও কঠোর সাধনা ছিল না তাঁকে পেতে হলে। অথচ তিনি পরম যোগী—পরম জ্ঞানী ছিলেন। দেবের দেব মহাদেব তিনি। যোগেশ্বর যোগনাথ। তাঁর এই সরলতার জন্য তিনি ঠকিয়াছেন অনেক ক্ষেত্রে - অপদস্থ হয়েছেন। তবু তিনি দয়া করতে কৃপণতা করেন নি। একরূপে তিনি অনাথের নাথ। ভব-ব্যাধির মুক্তির পথ তিনি দেখিয়েছেন। আধি-ব্যাধির ঔষধও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আদি কবিরাজ তিনি। "ত্বাদত্তেভীঃ রুদ্রশংতমেভিঃ শতংহিমা আশীয় ভেষজেভিঃ। যৎ স্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ॥" ঋগ্বেদ ২-৩৩

শক্তিতে তিনি অপরাজেয় অথচ পরম ক্ষমাশীল। শান্ত সৌম্য শিব সুন্দর। তাঁর রূপের তুলনা ছিল না! রাজরাজেশ্বর হইয়াও সর্ব্বত্যাগী। বিভূতি ভূষণ বাঘছালের কটিবাস। এতই স্নেহশীল যে ক্রুর ফণিনী কণ্ঠহার হয়ে রয়েছে। অট্টালিকা ছেড়ে তিনি মহা বিশ্বশ্মশানে দাঁড়াইয়া সংসারের অনিত্যতা অট্ট অট্ট হাস্যে প্রকাশ করছেন—ডমরু বাজিয়ে শিঙার স্বননে। তাঁর বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই সঙ্গিনী। অবিদ্যাকে তিনি মাথায় রেখেছেন। পাপ ও পাপীকে, দুঃখ ও দুঃখীকে এত আদর বুঝি কেউ দিতে পারে নি। পরম সঙ্গীতজ্ঞ তিনি। ডম্বরু ধ্বনিত তাঁহার গম্ভীর (৩) নাদ-ব-ব-বম শব্দে চতুর্দ্দশ ব্যোমে শব্দায়মান হয়।

আবার তিনি অপূর্ব্ব নৃত্যকুশল। নটনাথ তিনি। কি অপরূপ রূপে মানুষ তাঁর মানুষ-দেবতার আলেখ্য এঁকেছে। বিশ্বের সৃষ্টি হ'তে আজ পর্য্যন্ত এত বড় মহান্—সুন্দর-কোমল (৪) অভীষ্টবর্ষী দেবতার কল্পনা কোন যুগে মানুষ করে নাই; হয় ত করিতে পারে নাই।

আর্য্য পূর্ব্বযুগের তিনিই দেবতা। তাঁহাকে মুঘল সভ্যতার প্রতীক বলা হয়। ভারত সে সময়ে শৈব। বাহির হইতেও যে সমস্ত জাতি তখন বা তাহার পরে ভারতে প্রবেশ করেছে, তারাও এই শৈব ধর্ম্মকে বরণ ক'রে লয়।

বোধ হয়, আর্য্য আভিজাত্যের বিরোধী ছিলেন তিনি। আর্য্যরা শৈবদের নির্য্যাতন করেছেন। তাদের ঘর দ্বার শস্যক্ষেত্র দখল ক'রে নিয়েছেন। বনমধ্যে তাদের বিতাড়িত করেছেন। শৈবদের অনার্য্য—রাক্ষস—বানর—যবন প্রভৃতি অপমানকর আখ্যা দিয়াছেন আর্য্যরা। অথচ এখন ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, আর্য্যগণ আসবার সময়ে যে সভ্যতা নিয়ে এসেছিলেন, তা তখন অপূর্ব্ব ছিল না। বরং তাঁহারা বিকৃত ইতিহাস দিয়াছেন অনেক স্থলে, এরূপ সন্দেহ করেন অনেকে। আর্য্যদের সঙ্গে অনার্য্যদের নিয়ত বিরোধ ছিল। এমন কি, আর্য্যদের দেবরাজ ইন্দ্রকে তারা পরাস্ত ক'রে তাঁর রাজধানী দখল ক'রে নিয়েছে। এই সব অনার্য্য সকলেই শৈব। এদের আঁটিয়া উঠিতে যখন পারেন নি, দেবতারা তখন শিবের শরণাপন্ন হয়েছেন। বিজেতা যদি বিজিতের ইতিহাস লেখে, তা কতদূর গ্লানিপূর্ণ হ'তে পারে, তার জ্ঞান আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। মহেঞ্জ-জারোতে যে সহর মাটীর তলায় পাওয়া যাইতেছে, তার মত উন্নত প্রণালীতে তৈরী সহর আজকাল-ও কম পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞরা বলছেন। এ সহর আর্য্যদের এঞ্জিনিয়র বিশ্বকর্ম্মার প্রস্তুত নয়। আর্য্যগণের গৃহশিল্পের অনুকরণ এতে নাই। বলা হইতেছে যে, এ সহর অন্য কোন সভ্যজাতির তৈরী। লঙ্কায়, পাতালে এবং

(১) মহিপাল—৯০৮ হইতে ১০৩৬।
(২) বেদ—২।৩৩ ঋক্।
(৩) শিবের নামান্তর গম্ভীর—শিব-সংহিতা।
(৪) বেদ—৬।৩ ঋক্।

আরও অনেক যায়গায় অনার্য্যদের বড় বড় প্রাসাদ ছিল ; আর্য্যগণের মারফৎ জানা যায়। শৈব ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া আমরা একটা জিনিষ অধিকাংশ স্থলে লক্ষ্য করিব। প্রায়ই শিবের স্ত্রী, শিবভক্তগণের বিরোধী। তিনি অতিমাত্রায় দেবতাদের পক্ষ। দেবতারা সত্যাশ্রয়ী এবং শৈবরা অসত্যাশ্রয়ী—পুরাণের বহু গল্পে এইরূপ দেখা যায়। রামচন্দ্র দুর্গার বরলাভ করিলেন (৫) শৈব রাবণকে পরাজয়ের জন্য। কালী, শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের কারাকপাট মুক্ত করিয়া দিয়া শৈব বাণরাজের পরাজয়ের কারণ হইলেন (৬) ইত্যাদি। তবে শিবকে হতমান করাই কি শিবের স্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল ? ইহার দ্বারা প্রচার করা হইয়াছে—শৈবরা ভ্রষ্টাচারী দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি, শিববলে বলীয়ান্ পাষণ্ড। আর্য্যগণ প্রচারকার্য্যে বেশ দক্ষ ছিলেন। কারণ, এই সব পুস্তকই ত আমাদের মধ্যে ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, শৈবগণ বা অনার্য্যগণ কিরূপ জঘন্য লোক ছিল এবং আর্য্যগণ কত সভ্য ছিলেন। শিবের স্ত্রী কে ছিলেন এবং দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতির আসল কারণ কি, তাহা লইয়া সমালোচকদের অনেক প্রকার মন্তব্য আছে। আর্য্যগণ ভারতে আসিয়াই শিবের রুদ্ররূপ দেখিলেন। (৭) কিন্তু তাঁর প্রথমা স্ত্রী যে প্রজাপতি দক্ষের কন্যা গৌরী, এ সব পুরাণের কথা। ঋকে কালী, দুর্গা, উমার নাম নাই। উপনিষদে কালী, দুর্গা, অগ্নির জিহ্বার এক একটি নাম। কিন্তু আমরা অন্য কথা বলিতেছিলাম। অনার্য্য শিবের সহিত আর্য্যকন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছিল। পুরাণ যুগে শিব আর্য্যদের জামাতা। তখন আর্য্যদের প্রধান জমীদাররা (প্রজাপতিগণ) সাময়িক ভোজ (যজ্ঞ) দিতেন। বিশ্বসৃষ্টি যজ্ঞে শিব নিমন্ত্রিত হইয়া গেলেন। তথায় দক্ষ আসিলে সকলে দক্ষকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মা এবং শিব করিলেন না। সভ্যতা জানিতেন না বলিয়া শিব করিলেন না—না, তিনি ভাবিলেন, আমি ভিন্ন জাতির রাজা, কেন মাথা হেঁট করিব—এই বলিয়া ? শিবের সহিত তখন তাঁর স্ত্রীর যথেষ্ট প্রণয় ছিল—তবে শ্বশুরের উপর শ্রদ্ধা না থাকিবার কারণ কি ? শ্বশুর জামাতাকে নিন্দা করিতেন—ঘৃণা করিতেন, ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। আর্য্যগণ নিজ কন্যা দান করিয়া দুর্দ্দান্ত শিবের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা করিয়া লইলে আমাদের এই নূতন টীকা সহনশীল হয় কি না বিচার্য্য।

যাই হোক, নমস্কার না পাইয়া দক্ষ শিবকে অপমান করিলেন। তিনি সভামধ্যে বলিলেন—তোকে জাতে তুলে নেওয়া হয়েছিল, যজ্ঞি-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইত—আবার তোকে অপাংক্তেয় করা গেল। শিবের সেনাপতি নন্দী ইহাতে ভয়ানক চটিয়া বলিল—এতটা স্পর্দ্ধা—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। মাথার উপর মাথা—দক্ষ রাজার মাথাই উড়িয়ে দেব! যুদ্ধ বাধে আর কি! দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু ছিলেন সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্। তিনি বলিলেন, আহা, কর কি—কর কি ? কথার লড়াই কর—হাতাহাতি কোরো না। নন্দীর কথাও থাক—দক্ষের কথাও থাক। বিষ্ণু মীমাংসা করিলেন। দক্ষের অভিশাপমত এখনও হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে শিবের বড় নৈবেদ্য না হোক, পঞ্চ-দেবতার মধ্যে কুচা নৈবেদ্য থাকবে বৈ কি। আর দক্ষের ঐ যা একটু—মাথাটা নিয়ে গোল বাধবে। (৮) ইহার পর দক্ষের যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ বাদ পড়িবারই কথা। স্বামীর মানা না শুনে সতী বাপের বাড়ী গেলেন। সেখানে স্বামীর নিন্দা শুনে মর্ম্মান্তিক হ'ল—মনের কষ্টে মারা গেলেন! শিব-সৈন্য দক্ষ-যজ্ঞ পণ্ড করলে, নন্দী দক্ষের বদন বিগড়ে দিলেন (মাথা অপারেশন হওয়াটা নাই বলিলাম)! এইরূপে দেখা যায়, হিন্দুরা আদি যুগে শিবকে ভয়ে ভক্তি করিতেন। সতীর মৃত্যুর পরে যে আর্য্য-কন্যার সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়, তিনি স্বামীর প্রতি আরও অনুরক্তা ছিলেন। কত যুগের এই সব কথা (Conception) কত সভ্যতার মধ্য দিয়ে নানা হাতফের হয়ে আমাদের কাছে আজ এসেছে।

বিষ্ণু আর্য্যসভ্যতার প্রতীক। তিনিই প্রধান দেবতা। শৈব ও বৈষ্ণবে অবিরত বিরোধ হয়েছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য শিব ও শৈবকে ক্ষুণ্ণ করিতে ছাড়ে নি। বাণ-উপাখ্যানের প্রধান উদ্দেশ্য শিব ও শৈবকে ছোট করা। ভাগবতে 'নষ্টশৌচো' শ্লোকে শৈবগণকে মাতাল ও মূঢ়, নষ্ট ব্যক্তি বলা হয়েছে। মঙ্গলচণ্ডীতে আবার শিবকে চাপিয়া রাখিয়া শক্তিকে প্রচার করার কথা আছে। তাহা করিতে স্বয়ং শক্তিই আদেশ দিতেছেন। কিন্তু শৈব সাহিত্য শিবের প্রতি পক্ষপাত ক'রে হিন্দু দেবতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, স্পষ্টতঃ তা দেখা যায় না।

ভারতের অন্যতম হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ ও জৈন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম শৈব তান্ত্রিক ধর্ম্মে সমাধি লাভ করে। স্থবির অশ্বঘোষ শৈব তান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করলেন। ইঁহাদের বৌদ্ধ মহাযান মাধ্যমিক বলা হয়। বুদ্ধ বা ধর্ম্ম বা নিরঞ্জন মহেশ্বর মূর্ত্তিতে পূজা পেলেন। বামে শক্তি। এই সময়ে বিগ্রহের পরিমাণ এত বাড়ল যে, বেদের তেত্রিশটি দেবদেবীমূর্ত্তির স্থানে এখন তেত্রিশ কোটি হইল। অর্থাৎ সংখ্যা করা যায় না—এত দেব-দেবীর কল্পনা হ'ল। জৈন ধর্ম্মের ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে শৈব ধরণ বহুলাংশে। আদি জৈন "ঋষভ" নির্ব্বাণ লাভ করলেন শিবরাজ্য কৈলাসে। জৈন পার্শ্বনাথ একেবারে ভৈরববেশে জন্মিলেন—দেহে সাপের চিহ্ন নিয়ে, গায়ের রংও নীল। বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগে "ত্রিরত্ন" (৯) মূর্ত্তি মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকাল হলেন। বোধিবৃক্ষতলে লোকেশ্বর চারি হাত, ত্রিনয়ন, জটাধারী—ঠিক বিল্ববৃক্ষতলে মহাদেব, (১০) ভারতের ক্ষত্রিয়যুগের প্রধান সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারতে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদি সহ গৃহস্থ শিবকে দেখি, রাবণ-রাজপ্রাসাদে দ্বারী ; এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধেও সেই মূর্ত্তি। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগের শিব গৃহী, (১১) ধর্ম্ম-সংহিতার মতে শিব মুনিপত্নীগণরত

(৫) বাল্মীকির আদি রামায়ণে এ বিবরণ নাই। পুরাণে আছে।

(৬) হরিবংশ।

৭। অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
মহাভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ॥—মহাভারত।

৮। বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ॥—মহাভারত।

৯। Cunningham—"Mahabodhi".

১০। A. S. of Maurbhanja.

(১১) "মহেশ করিবে বিভা জন্ম-জন্মান্তরে"—শূন্যপুরাণ।

হওয়ায় মুনিগণ অভিসম্পাত করিলে যে শিবলিঙ্গ খসিয়া পড়ে, তাহাকে 'বিজয়' বলা হয়। বায়বীয় ও জ্ঞানসংহিতাদি গ্রন্থে শিবলিঙ্গের পূজা-পদ্ধতি লেখা আছে। লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শিবপূজাই সাধারণতঃ দেখা যায়। গৌরীপট্টযুক্ত লিঙ্গই বেশী প্রচলিত।

শ্রীজনরঞ্জন রায়।

হুগলী জেলার ইতিহাস

হুগলী জেলার নদী

হুগলী জেলার অধিকাংশ নদীই মৃতপ্রায়; শুধু গঙ্গা নদী ও দামোদর নদই এখনও নির্জীব হয় নাই। এই দুই নদীতে এখনও বাণিজ্য চলিতেছে। অপর নদীগুলিতে বর্ষায় বড় নৌকা যাইতে পারে, অন্য সময় ছোট ছোট নৌকা দ্বারা কায চলে।

নদীর নাম :—(১) গঙ্গা ভাগীরথী বা হুগলী নদী—হুগলী নদীর নাম হইয়াছে—যখন হইতে বাণিজ্যের জন্য হুগলী প্রসিদ্ধি লাভ করে, নচেৎ ইহার নাম ভাগীরথী। এই নদী হুগলী জেলার মধ্যে ৫০ মাইল আছে। এই হুগলী নদী ষোড়শ শতাব্দীতে অল্পপরিসর ছিল। সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়াতে ইহা স্রোতঃপ্রবণ হইয়া নদীর পশ্চিমকূল বাড়িয়া গেল। বর্ত্তমান বল্লভপুরের পুরাতন ভগ্ন-মন্দির হইতে প্রায় ১ হাজার ফুট পূর্ব্বদিকে ঐ নদী বহমানা ছিল। এখন হুগলীর নিকট হইতে কোন্নগরের ভাগীরথীর পরপারে চড়া পড়িতেছে। অনেকে বলেন, হুগলীর জুবিলি ব্রীজ ইহার কারণ। (২) দামোদর নদ—ইহার উৎপত্তিস্থান রাঁচী জেলায়। বর্ষাকালে ১ হাজার মণ ভারবাহী নৌকা চলাচল করিতে পারে, কিন্তু অন্য সময়ে ২৫ মণ ভারবাহী নৌকা চলিতে পারে মাত্র। বর্ষাকালে দামোদর অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। একবার দামোদরের বন্যায় চুঁচুড়া পর্য্যন্ত ডুবিয়াছিল। প্রতি বৎসরই দামোদরের বন্যায় কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় দামোদর পায়ে হাঁটিয়া অনেক স্থানে পার হওয়া যায়। সে সময় নদীর খাত বালুকাপূর্ণ হইয়া থাকে। (৩) রূপনারায়ণ নদ—বন্দর হইতে নিম্নে রাণীচক পর্য্যন্ত মালবাহী নৌকা চলিতে পারে, উহা মাত্র ৬ মাইল। (৪) দ্বারকেশ্বর ও ধলকিশোর নদ,—ইহার দীর্ঘতা ২০ মাইল মাত্র; বন্দর হইতে ৫০০ মণ বোঝাই নৌকা বর্ষায় যাইতে পারে। (৫) বেহুলা নদী—১৫ মাইল দীর্ঘ, বড় জোর ২০০ মণ বোঝাই নৌকা বর্ষায় যাইতে পারে। এই নদী এখন "বেহুলাখাল" নামে অভিহিত হয়। (৬) কাণা-নদী বা কুন্তী নদী—৪০ মাইল দীর্ঘ। ছোট নৌকা ২০ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহাও খিয়ার সংযোগ পর্য্যন্ত। (৭) সরস্বতী নদী—সপ্তগ্রাম এই নদীতীরে অবস্থিত ছিল। ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নদী প্রবল ছিল। তখন সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। এখন সরস্বতীর স্থানে স্থানে চিহ্নমাত্র আছে, ইহা সর্ব্বশুদ্ধ ২২ মাইল আছে। পূর্ব্বে এই সরস্বতী বর্ত্তমান হাওড়া জেলার বেতড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৮) রোণ নদী—এই রোণ নদীতীরে 'দিল-আকাশ' গ্রাম। 'এইখানে এক দিন শনিয়া ধাওড় নামে এক বাগ্‌দী রাজা ছিল। ঐ রাজা চতুরানন নামে এক ব্রাহ্মণকুমারকে প্রতিপালন করে। পরে ঐ বাগ্‌দী রাজাকে হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণকুমার নিজে রাজা হয়। ঐ চতুরাননের দৌহিত্রবংশ ভূরশুট রাজবংশ। রোণ নদীকে এখন রোণের খাল বলে। (৯) ডানকুনী নালা—ছোট ছোট নৌকা যাইতে পারে মাত্র। (১০) বালীখাল—৮ মাইল দীর্ঘ, ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত। বর্ষাকালে ৫০ মণ ভারবাহী নৌকা যাইতে পারে; অন্য সময় ছোট নৌকা চলাচল করে। এই খালের উপর E. I. Ryএর একটি লৌহ-সেতু আছে এবং G. T. Roadএর উপরও একটি লৌহসেতু আছে। (১১) মুণ্ডেশ্বরী নদী বা কাণা নদী—১০ মাইল দীর্ঘ। এই নদীতীরে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পারিষদ অভিরাম গোস্বামীর লীলা হইয়াছিল।

হুগলী জেলার রাস্তা

হুগলী জেলার সমস্ত রাস্তার উল্লেখ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক গ্রামে কত রাস্তা আছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন ব্যাপার এবং বিশেষ আবশ্যক মনে করি না। সেই জন্য প্রধান রাস্তাগুলির এখানে উল্লেখ করিলাম।

১৬৫৮ হইতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাস্তা মানচিত্রে প্রথম প্রমাণ পাই। ঐ সময় ভেলেণ্টাইনের মানচিত্রে উল্লেখ আছে, ওলন্দাজ গভর্ণর Van den Brouche ঐ মানচিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তাহাতে দুইটিমাত্র রাস্তার উল্লেখ আছে—একটির নাম "বাদশাহি রাস্তা" বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত। অপরটি বর্দ্ধমান হইতে আরম্ভ করিয়া সলিমাবাদ ও ধনেখালির মধ্য দিয়া হুগলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ বাদশাহি রাস্তাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীন যখন বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তখন ঐ রাস্তা দিয়া তিনি সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন এবং আলীবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা যাইবার সময় এবং মারহাট্টা দমনের জন্য ঐ রাস্তা দিয়া গিয়াছিলেন। যখন ইংরাজ কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার পাইয়াছিলেন, তখন ঐ দুই রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন ভাল রাস্তা ছিল না এবং ২১৪টি মাত্র সাঁকো ছিল। ইহার পর রেলের মানচিত্রে (Plate VII of 1779) বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাস্তা সালকিয়া (বর্ত্তমানে হাওড়া জেলায়) হইতে, গ্রামের রাস্তার সহিত সংযুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য রাস্তা দেখান আছে। একটি রাস্তা উত্তরদিক দিয়া অগ্রসর হইয়া গঙ্গানদীর পশ্চিম সীমা ধরিয়া, বালী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, গরুটী, চন্দননগর, হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী এবং ইনকুলা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এইটিই বর্ত্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অংশ। দ্বিতীয়টির উত্তর-পশ্চিমদিক দিয়া চণ্ডীতলা, ধনেখালি হইয়া সলিমাবাদ, বর্দ্ধমানের উত্তর সীমা ছিল—সম্ভবতঃ এটি অহল্যা বাইয়ের রাস্তা। তৃতীয়টি—পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পশ্চিম কৃষ্ণনগর ও রাজবলহাট হইয়া দেওয়ানগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যে সকল রাস্তার নাম পাওয়া যায়, তাহা (১) বালী হইতে কালনা ইথুরার মধ্য দিয়া, (২) গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হুগলী ও বর্দ্ধমানের ভিতর দিয়া উত্তর-ভারত পর্য্যন্ত (৩) পুরাতন বেনারস রোড (রাণী অহল্যাবাই

নির্ম্মিত)। (৪) গরুটী হইতে দ্বারহাটা, (৫) বর্দ্ধমান হইতে কিশোরগঞ্জের ভিতর দিয়া মেদিনীপুর, (৬) ইলিপুর হইতে সিঙ্গুরের ভিতর দিয়া হুগলী পর্য্যন্ত, (৭) হুগলী হইতে ভাসতাড়া পলবার ভিতর গিয়াছে। এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দেন যে, ঐ রাস্তাগুলি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ঐ রাস্তাগুলি ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ও সৈন্য যাতায়াতের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ রাস্তাগুলি কোন্ সময়ে বা কাহার দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

যে রাস্তা হাওড়া হইতে আরম্ভ হইয়া গঙ্গার পশ্চিম দিক দিয়া হুগলী ও বর্দ্ধমানের ভিতর দিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছে, উহার বর্ত্তমান নাম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই রাস্তা হুমায়ুন-বিজয়ী সম্রাট সের শাহের নির্ম্মিত, ইহা সকলেরই ধারণা, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সের শাহ ঐ রাস্তা করেন নাই। তিনি সোণার গাঁ (ঢাকা) হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত ১৫০০ ক্রোশ রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। * হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ইহা কাহার দ্বারা বা কোন্ সময়ে নির্ম্মিত, তাহার সন্ধান পাই নাই। ডাক্তার ক্রফোর্ড সাহেবও তাঁহার "মেডিক্যাল গেজেটিয়ার হুগলীতে"ও এই কথা বলিয়াছেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও এই রাস্তার নাম হয় নাই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তখন কলিকাতা হইতে পলতা ঘাট হইয়া গঙ্গার পশ্চিমপারে হুগলী হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যে রাস্তা, তাহাকেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বলিত। † হুগলীর দক্ষিণ দিকের রাস্তার ঐ নাম ছিল না।

হুগলী জেলার বর্ত্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ইতিহাস ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা উম্যালি সাহেব ও ডাক্তার ক্রফোর্ড সাহেবের লেখায় পাওয়া যায়। তাঁহাদের মত এই যে, ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানদী তীরভূমি গ্রাস করিতে আরম্ভ করে। হুগলী, শ্রীরামপুর, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানের জমী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইতে লাগিল। সেই জন্য Mr. R. Blechynden সাহেবের উপর জরিপ-কার্য্যের ভার পড়ে। তিনি ৫ শত কয়েদী লইয়া নূতন রাস্তার কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হুগলীর উত্তর-পশ্চিমদিকের রাস্তা অতি শোচনীয় ছিল। উহার পুনর্গঠন আরম্ভ হয় এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। তখন পুরাতন বেনারস রোড দিয়া সৈন্য গমনাগমন করিত। পরে এই নূতন রাস্তা দিয়া সৈন্য-যাতায়াত আরম্ভ হয়। ঐ রাস্তা-নির্ম্মাণে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময় উহা হয় ; কিন্তু কেহই উল্লেখ করেন নাই যে, ঐ রাস্তা প্রথম এবং কোন্ সময় কাহার দ্বারা নির্ম্মিত—এখনও পর্য্যন্ত ঐ সংবাদ অন্ধকারে আছে।

মুর্শিদাবাদ রাস্তা—এটি একটি পুরাতন রাস্তা—ইনচোরা ও কালনার মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এই রাস্তায় নদীর উপর কোন পুল ছিল না। চুঁচুড়ানিবাসী ও জগদীশপুরের ব্রাহ্মণ জমীদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার ১৩ হাজার টাকা খরচ করিয়া সরস্বতীর উপর ত্রিবেণীতে একটি সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইংরাজরাজ সে জন্য তাঁহার সম্মানার্থে তাঁহার বাড়ীতে ৬টি সিপাহী পাহারা নিযুক্ত করেন।

ধনেখালির রাস্তা :—এই রাস্তা সাধারণের চাঁদায় হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ রাস্তার তত্ত্বাবধানের ভার মাখালপুরের জমীদার পরাণবাবু, ধরমপুরের জমীদার ছকু সিং এবং হাতিশালার জমীদার রায় রাধাগোবিন্দ সিংহ প্রাপ্ত হয়েন।

প্রাদেশিক রাস্তা :—(১) নূতন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—উত্তরপাড়া হইতে পলতাঘাট ১২ মাইল, সাড়ে পাঁচ ফার্লং দীর্ঘ। গড়পড়তায় প্রসার ২৫ ফুট। ইহার মধ্যে ৮ ফুট মাত্র পাকা রাস্তা ছিল। ডানকুনীর নিকট চওড়া ১২ ফুট এবং এইখানে একটি সাঁকো আছে। এই রাস্তাটি রেনেলের মানচিত্রে আছে। (২) পুরাতন গ্রাণ্ড টাঙ্ক রোড—পলতাঘাট হইয়া হুগলী পাণ্ডুয়া দিয়া বর্দ্ধমানের দিকে গিয়াছে। ইহার ৩৩ মাইল হুগলী জেলার ভিতর পড়িয়াছে এবং ৩ মাইল চন্দননগরের ভিতর আছে। এই রাস্তার ২৪ ফুট প্রসার—৮ ফুট পাকা। এই রাস্তা সপ্তগ্রামের নিকট সরস্বতী, মগরার নিকট কুন্তী নদী অতিক্রম করিয়াছে। মগরার নিকট একটি লৌহময় সেতু আছে। এই রাস্তাটি আবার গরুটি হইয়া বেনারস গিয়াছে।

জেলাবোর্ডের রাস্তা :—সদর বিভাগে—(১) চুঁচুড়া হইতে খানপুর, ধনেখালির ভিতর দিয়া ২৩½ মাইল দীর্ঘ। ইহার মধ্যে পাকা রাস্তা ১১½ মাইল। এই রাস্তার ভিতর সরস্বতী নদীতে, কুন্তী নদীতে ও ঘিয়া নদীতে ৩টি সাঁকো আছে। এই রাস্তাটি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পুরাতন পথ। (২) হুগলী হইতে মাগনন ১৮½ মাইল দীর্ঘ। এই রাস্তায় সরস্বতী নদীর উপর ১টি ও কুন্তী নদীর উপর ২টি সেতু আছে। (৩) ছকু সিংহের রাস্তা—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে মগরা ও খানপুর পর্য্যন্ত ২১½ মাইল দীর্ঘ ; ইহাতে ৩টি সেতু আছে ;—২টি কুন্তীর উপর ও ১টি ঘিয়া নদীর উপর। (৪) পাণ্ডুয়া হইতে কালনার রাস্তা—দীর্ঘ ১৩ মাইল ; সমস্ত রাস্তাটিই পাকা। ইহার মধ্যে বেহুলা নদীর উপর ১টি পুল আছে এবং বাসল নদীর উপর ১টি ঝুলান পুল আছে। (৫) বৈঁচি হইতে দশঘরার রাস্তা—ইহা ধনেখালির ভিতর দিয়া গিয়াছে—১৮½ মাইল দীর্ঘ ; ইহাতে ৩টি সেতু আছে। (৬) ধনেখালি হইতে হরিপালের রাস্তা—৯½ মাইল দীর্ঘ ; কানা নদীতে একটি সেতু আছে। (৭) চন্দননগর হইতে ভোলার রাস্তা—১২ মাইল দীর্ঘ ; সরস্বতীর উপর ১টি সেতু আছে। (৮) হুগলী হইতে সপ্তগ্রামের রাস্তা—৩½ মাইল দীর্ঘ। (৯) পাণ্ডুয়া হইতে কল্যাণপুর রাস্তা—৬ মাইল দীর্ঘ। (১০) ডুমুরদহ হইতে বলাগড় রাস্তা—৭ মাইল দীর্ঘ। (১১) ত্রিবেণী হইতে গুপ্তিপাড়া রাস্তা—১৬½ মাইল দীর্ঘ। ইহার মধ্যে ১টি পুল আছে ; ইহা বাদশাহি রাস্তার অংশবিশেষ। (১৪) সেয়া হইতে আলাসিন—মালিপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে ; দীর্ঘ ৮মাইল।

শ্রীরামপুর বিভাগ :—(১) বৈদ্যবাটি হইতে তারকেশ্বরের রাস্তা—দীর্ঘ ২১½ মাইল। ইহার ভিতর ১০ মাইল পাকা ও ৫টি সেতু

* Sher Shah page 388-389 By Kalikinker Quanongo.

† Vide Dr. Crawford's Medical Gazetter on Dt. Hooghly.

আছে। কাণা দামোদরের সেতুটি ইহার মধ্যে। (২) নবগ্রাম হইতে চরপুর রাস্তা—দীর্ঘ ১৩½ মাইল ; ৫টি সেতু আছে। (৩) কোন্নগর হইতে কৃষ্ণরামপুর—৯½ মাইল দীর্ঘ, পথে একটিমাত্র সেতু আছে। (৪) পুরাতন বেনারস রোড—দেবীপুর হইতে পাটুল প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ। ইহার মধ্যে ৪½ মাইল মাত্র পাকা রাস্তা এবং ৩টি সেতু আছে। (৫) ভদ্রেশ্বর হইতে নসীবপুর এবং নসীবপুর হইতে জনাই রাস্তা—১৩ মাইল দীর্ঘ। (৬) দীর্ঘাঙ্গ হইতে সিঙ্গুর—৬½ মাইল দীর্ঘ এবং একটিমাত্র লৌহের সেতু আছে। (৭) গঙ্গাধরপুর হইতে নবাবপুর রাস্তা—৮½ মাইল দীর্ঘ ; (৮) সিঙ্গুর ষ্টেশন হইতে মসাট ৬½ মাইল রাস্তা এবং ১টি সেতু আছে। (৯) গঙ্গা হইতে দোরহাটার মধ্য দিয়া রাজবলহাট রাস্তা ৭½ মাইল দীর্ঘ ; ইহার মধ্যে ৩টি সেতু আছে। ঐ তিনটির মধ্যে ১টি রোণের খালের উপর তালাই সেতু। (১১) মসাট হইতে দিৎপুর ৬ মাইল রাস্তা আছে।

আরামবাগ বিভাগ :—(১) আরামবাগ * হইতে নসেরাই, বর্দ্ধমান জেলার সীমা পর্য্যন্ত ৬ মাইল পাকা রাস্তা। ইহাতে ২টি খিলান করা সেতু আছে। (২) আরামবাগ হইতে উদরাজপুর ৭½ মাইল দীর্ঘ রাস্তা। (৩) আরামবাগ হইতে তেঁতুলমারী রাস্তা ১৭ মাইল দীর্ঘ। ইহাতে ১টি সেতু আছে। ইহাই পুরাতন নাগপুর যাইবার রাস্তা। (৪) পণ্ডাইত হইতে মানদালাই ১৫½ মাইল রাস্তা। ইহা পুরাতন মেদিনীপুর রাস্তা। (৫) আরামবাগ হইতে এধাণ্ডী ৬½ মাইল রাস্তা। (৬) মায়াপুর হইতে জগৎপুর, খানাকুলের মধ্য দিয়া ১৬½ মাইল রাস্তা। (৭) ভীকদাস * হইতে বালিহাট ৬½ মাইল রাস্তা। (৮) গোঘাট হইতে কুমারগঞ্জ ৭½ মাইল রাস্তা। রবুবাটী জলার উপর কাঠের সেতু আছে। (৯) বদনগঞ্জ হইতে সুবার চক ৭ মাইল রাস্তা।

* পূর্ব্বে জাহানাবাদ নাম ছিল।

হুগলী জেলার মধ্যে রেল রাস্তা

(১) উত্তরপাড়া হইতে বৈঁচি	৩৭ মাইল
(২) সেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর	২২ „
(৩) ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটী	৫ „
(৪) ব্যাণ্ডেল হইতে বারওয়ারা লাইন গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত	২২ „
(৫) বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল লাইন—তারকেশ্বর হইতে ত্রিবেণী	৩৫ „
(৬) তারকেশ্বর হইতে জামালপুরগঞ্জ	১৪ „
(৭) হাবড়া শেয়াখালা লাইট রেলওয়ে, হুগলী জেলার মধ্যে	১১ „
(৮) চাঁপাডাঙ্গা ব্রাঞ্চ	১৫ „
মোট	১৬১

[ক্রমশঃ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতীরত্ন

* ভীকদাস নামে এক জন বিখ্যাত দস্যু ছিল। এখনও স্থানীয় অতি বিস্তৃত মাঠকে ভীকদাসের মাঠ বলে।

ভগবান্ রামকৃষ্ণ

হে আমার প্রাণের ঠাকুর !
গাহিতে বন্দনা তব ভাষায় ছন্দ না জাগে—কণ্ঠে নাহি সুর !
মানবের মুক্তিদাতা—মুক্ত-শিরোমণি !
কে পরাবে তব পায়ে বাক্যের বাগুরা বুনি—ছন্দের গাঁথনি !
ছন্দোহীন ছন্দ দিয়ে তাই
হে দেবতা, বন্দিব তোমায়।
করুণার পারাবার, ক্ষমা-ক্ষেম-খনি !
দিব্য লীলার্ণব তব বর্ণিবার বাঞ্ছা ল'য়ে কতবার ধরেছি লেখনী ;
সিন্ধুর বিরাট মূর্ত্তি দেখি
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে শিশু যথা মনে ভাবে, এ কি !
চাহিলে তোমার পানে আমিও তেমনি ঠিক হই,
নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে রই।
অন্তর উন্মুখ—আবেগেতে স্পন্দমান বুক,
কুণ্ঠিত কণ্ঠের তলে ভাষা কিন্তু হয়ে পড়ে মূক।

প্রতীচীর বক্ষ হ'তে আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতার
মৃত্যু-ছন্দে নৃত্যপর সত্যহারা মত্ত পারাবার
রুদ্র বেশে ছুটে এসে ভারতের বক্ষোদেশে
আঘাত করিল বার বার।
বজ্র-রবে করিয়া গর্জ্জন
হিরণ্যকশিপু সম জিজ্ঞাসিল, কোথা তোর সত্য-সনাতন ?
চেয়ে দেখ চারিদিকে নৃত্য করে জড়,
কোথা তোর অতীন্দ্রিয় চিন্ময় ঈশ্বর ?
সাধনার রঙ্গ-ভূমে সন্দেহের সান্দ্র অন্ধকার
বিভীষিকা করিল বিস্তার,
বিশ্বাস-প্রহ্লাদ কাঁদি বলে, প্রভু এস একবার !
শক্তিমত্ত দানবের দম্ভদৃপ্ত এই অস্বীকার
সহে নাক আর !
বিশ্বাসের পানে চেয়ে ব্যঙ্গ করি বলিল বিজ্ঞান,
ওরে মূর্খ কোথা ভগবান্ ?
সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কিবা প্রয়োজন,
পরমাণু-পটলের সংযোগ-বিয়োগ-বলে এই আয়োজন !
নীহারিকা কিম্বা ইলেক্‌ট্রন
তাহারাই করিয়াছে এ বিশাল বিশ্ব বিরচন !
ভক্তি ও বিশ্বাস
বিজ্ঞানের বাণী শুনি ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
কাতর অন্তরে উঠে নিরন্তর করুণ উচ্ছ্বাস—
এস প্রভু হও সপ্রকাশ ! এ সংশয় কর এসে নাশ !

নিরীশ্বর নব্য-সভ্যতার ভোগের আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার,
দুর্ব্বলের বক্ষ দলি' সবলের রথ-চক্র চলে অনিবার!
অনশ্বর ঈশ্বরের উন্নত আসন
মরু-মরীচির-মত সুখৈশ্বর্য্যে করি সমর্পণ
নব্য-সভ্যজাতি যত পরস্পর করে রুদ্ররণ!
উৎপীড়িত বিশ্বাসের বেদনাশ্রুজল,
বন্দীদের ক্রন্দ-কোলাহল,
অন্তর্য্যামী নারায়ণে নিত্যলোকে করিল চঞ্চল!
ধন্য ধন্য পুণ্যধাম কামারপুকুর,
রামকৃষ্ণরূপে যথা অবতীর্ণ দীনের ঠাকুর,
বিশ্বে দেখি বেদনা-বিধুর,
প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি প্রেমে-পরিপূর, মা'র মত মমতা-মধুর!

নিশ্চয় আছেন ভগবান্,
জীবন্ত সাধনাবলে দেখাইলে জলন্ত প্রমাণ!
যে সত্য শাস্ত্রেতে ছিল সুপ্তি-নিমগন
তোমার সাধনা তাহে সঞ্চারিল নবীন জীবন—নব-জাগরণ!
তুমি যেন নৃসিংহাবতার!
নৃশংস সংশয়াসুরে করিয়া সংহার,
বিশ্বাসেরে আশ্বাসিলে, নাশিলে বিশ্বের হাহাকার,
ভক্তিরূপ প্রহ্লাদেরে বিতরিলে আহ্লাদ অপার!
তুমি সর্ব্বসমস্যার শেষ সমাধান!
কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান—
সাধনার ত্রয়ী পন্থা তোমার মাঝারে মূর্ত্তিমান!
শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞান, অদ্বৈতানুভূতি,
চৈতন্যের ভক্তিভরা অনন্ত আকুতি,
বুদ্ধ সম বিশ্বহিতে পূর্ণ আত্মাহুতি,
এই তিন মুক্তিমার্গ লভিল লীলায় তব মধুর মিলন!
সর্ব্বমত অনুসরি—সর্ব্বদেবে করি আরাধন
সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করিলে সাধন!

যুগাচার্য্য! যুগ-অবতার!
যুগ-ধর্ম্ম প্রচারিতে অবনীতে উদ্ভব তোমার!
তব কথামৃত-পারাবার সকল শাস্ত্রের সত্যসার!
কোথা কার্য্য—কোথায় কারণ?
নাহি করি শাস্ত্র-অধ্যয়ন সর্ব্বশাস্ত্র স্বতঃই স্ফুরণ!

নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
কেন আসে তার পাশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষা-ভিক্ষু জন?
কোথা সীমা সে শিক্ষা-সিন্ধুর
শিক্ষিতের শিরোমণি তাঁরে যার শিক্ষাতৃষাতুর!
নিত্যদৃষ্ট দৃষ্টান্তেতে গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিতে বিশ্বে অদ্বিতীয়
বাণী তব অনন্ত অমিয়।
বাক্যে তব অভিব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়!

চারিদিকে স্বর্ণ-উপাসনা,
বিবেক-বৈরাগ্য বন্দী, বলবান বিলাস-বাসনা।
তুমি বসি তার মধ্যস্থলে
মেঘ-মন্দ্রে বিঘোষিলে, টাকা মাটি তুল্য ধরাতলে,
ঘৃণাভরে উভয়েরে সমজ্ঞানে নিক্ষেপিলে জলে।
ভোগবাদ রাবণ দুর্ব্বার,
অধ্যাত্ম-সাধনা সীতা নির্ব্বাসিতা অত্যাচারে যার;
তুমি বিনাশিয়া তারে সাধনারে করিলে উদ্ধার।
জড়বাদ কংস-ধ্বংস করি সম্পাদন
জ্ঞান-ভক্তি-বসুদেব-দেবকীর ঘুচালে বন্ধন।
দাশরথি-বাসুদেব উভয়ের সম্মেলন-ভূমি
পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন রামকৃষ্ণ তুমি!

প্রদীপ্ত প্রজ্ঞান তব বিজ্ঞানেরে করিল নীরব,
জড়-যবনিকা তুলি দেখালে জগৎ জুড়ি চিতের উৎসব!
অতি ঘৃণ্য পতিতারও মাঝে
দেখিলে আনন্দময়ী জননী বিরাজে
বড়ই বিপন্ন ল'য়ে ভিন্ন ভিন্ন মত
ওগো সমন্বয়াচার্য্য, আবার তোমারে চাহে বিচ্ছিন্ন ভারত।
সর্ব্বজ্ঞ সারথিরূপে হে সত্য-শাশ্বত!
কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে চালাইলে অর্জ্জুনের রথ,
তেমনি চালাও আজি এ ভারত-রথ সুবৃহৎ।
হে অনন্ত ভাবসিন্ধু! চরিত্র তোমার মুক্তি-মৈত্রী-মাধুর্য্য-আধার,
লভুক তাহার মাঝে দ্বন্দ্বপর জাতি-ধর্ম্ম ঐক্য চমৎকার!
বিশ্বগুরু! তব শিষ্যবর
বিলাসের দৃঢ়দুর্গ-বিজয়ী বিবেকানন্দ মহাশক্তিধর!
তব জ্ঞান-জ্যোতিতে ভাস্বর!
কোটি নতি পাদপদ্মে যোগিরাজ ওগো ত্যাগীশ্বর!

শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন।

চলচ্চিত্রের রূপ-সাধন

সাত

চলচ্চিত্রের রূপ-সাধনের কথা বলিতে হইলে তাহার পরিস্ফুটন-আগারের (Laboratory) কথা বলিতে হয়।

সাধারণ চলচ্চিত্রের নেগেটিভ্ বা পজিটিভ্ ফিল্ম দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ। কিন্তু সেই হরিদ্রাবর্ণের ফিল্মই লেন্সের মধ্য দিয়া আসিয়া আলো-ছায়ার রূপ ধরিয়া (exposed) পরে পুরিস্ফুটন-আগারের ভিতর কতকগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ায় মেটে-রূপ ধারণ করে। তাহার নাম 'ডেভেলপ্‌ড্ নেগেটিভ্ ফিল্ম'; এবং ইহা হইতে অন্য একটি ফিল্মে যে প্রতিকৃতি তোলা হয়, তাহাকে বলে 'পজিটিভ প্রিণ্ট ফিল্ম'।

সচরাচর ছবি-ঘরে গিয়া আমরা যে-সব ছবি দেখি, সেগুলি পজিটিভ ফিল্ম। যে-কোন নেগেটিভ ফিল্ম হইতে অসংখ্য পজিটিভ-ফিল্ম তৈয়ার করা যায়। চিত্র-শিল্পী ও শব্দ-যন্ত্রীর কায শেষ হইলে ফিল্মগুলি গিয়া পড়ে ষ্টুডিয়োর রসায়নাগার-বিভাগে।

এই রসায়নাগার তিন ভাগে বিভক্ত ;—রসায়নাগার, ফিল্ম শুকাইবার ঘর ও ফিল্ম মুদ্রণ করিবার ঘর। প্রথমটিতে ফিল্ম হইতে চিত্রাকার (Image) বাহির করা হয় রাসায়নিক (chemicals) মিশ্রণে। দ্বিতীয় কক্ষে ফিল্ম বিধৌত হইয়া শুকাইতে থাকে ; তৃতীয় কক্ষে হয় পজেটিভ ফিল্মের প্রিণ্ট বা মুদ্রণ-কার্য্য। সুতরাং চিত্র ও শব্দ-ফিল্মগুলি আসিলে রাসায়নাধ্যক্ষের আদেশ পাইয়া সহকারীরা সর্ব্বপ্রথমে ফিল্মগুলি রাসায়নিক-মিশ্র-মধ্যে দেন, তার পর ঠিকমত সেগুলির কায হইলে শুকাইবার কক্ষে একটি গোলাকার কাঠের ড্রামে জড়াইয়া সেই ড্রামটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শুকাইবার ব্যবস্থা করেন—কয়েকটি বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে। ইহাই হইল নেগেটিভ-ফিল্ম।

ফিল্ম শুকাইলে মুদ্রণযন্ত্রে (Printing machine) চাপাইয়া তাহা হইতে যে সকল ফিল্ম বাহির করা হয়, তাহাদের বলে পজেটিভ-ফিল্ম। পজেটিভ ফিল্মকে আবার রাসায়নিকে ফেলিলে তাহা আসল চিত্ররূপ ধারণ করে।

রসায়নাগার কক্ষটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সে ঘরে আলোকের প্রবেশাধিকার নাই। অন্ধকারের মধ্যে থাকিবে কেবল Green safe light ও পজেটিভ্ কাযের জন্য থাকিবে Red ruby light, আর থাকিবে পর পর তিনটি ট্যাঙ্ক অথবা সাধারণ চৌবাচ্ছার মত জিনিষ। ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্ছা তিনটা এমনভাবে তৈয়ার করিতে হইবে যে, যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার মধ্যস্থিত রাসায়নিক মিশ্র অনায়াসে পাইপের সাহায্যে বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। খুব নিকটবর্ত্তী স্থানে ফিল্ম বিধৌত করিবার জন্য তোড়ে জল পাইবার পাইপ রাখা হয়। ট্যাঙ্কটি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, তাহার চারিপাশে ইচ্ছানুযায়ী বরফ ঢালিয়া দেওয়া যায়। প্রথম ট্যাঙ্কে থাকে রাসায়নিক মিশ্র, দ্বিতীয় ট্যাঙ্কে থাকে পরিষ্কার জল, তৃতীয়টিতে থাকে ফিক্সিং হাইপো। ইলোন্, সোডিয়াম সালফাইট, হাইড্রো কুইনিন্, সোডিয়াম কারবনেট্, পটাস্ ব্রোমাইড, নাইট্রিক এসিড, পটাসিয়াম মেটাবিসালফেট, মেটল ইত্যাদির সাহায্যে 'চলচ্চিত্রের রসায়ন তৈয়ারী করা হয়। ফিক্সিং-বাথ (fixing bath) তৈয়ার হয়, হাইপো, এলাম, মেটাবিসালফেট প্রভৃতি দিয়া।

সবাক-ছবি আসিবার ফলে আজকাল প্রায় প্রতি ষ্টুডিয়োতে হাজার ফুট করিয়া ফিল্ম ব্যবহার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে 'অটোমেটিক ডেভেলপিং প্ল্যাণ্ট'-এর (Automatic Developing Plant) কোনপ্রকার ব্যবস্থা না থাকিবার দরুণ কর্তৃপক্ষের প্রায় চারি শত ফুট ফিল্ম কাটিয়া লইয়া একটা কাঠের ফ্রেমে জড়াইয়া রসায়ন-ট্যাঙ্কে ফেলিতে হয়।

ছবির ফ্রেমের মতই ফিল্মের ফ্রেম, তফাতের মধ্যে ইহাতে এক একটা পিতলের পিন মারিয়া ফিল্ম জড়াইবার সুবিধা করিয়া লওয়া হয়। ফিল্ম জড়ানো শেষ হইলে ফ্রেমটি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্যাগাজিন্ বাক্স হইতে ফিল্ম বাহির করিয়া সহকারীরা সর্ব্বপ্রথম ফিল্মের উপর আঙ্গুল বুলাইতে থাকেন। যদি ফিল্মের উপর পিনবিদ্ধ ছিদ্রের মত ছিদ্র পান, তবে বুঝিবেন, উহা চিত্র-ফিল্ম, আর সেরূপ কিছু না পাইলে বুঝিবেন, উহা সাউণ্ড-ফিল্ম। চিত্র-ফিল্মের কায করা হয় সর্ব্বাগ্রে, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা চিত্র-ফিল্ম লইয়া কাঠের ফ্রেমে জড়াইবার ব্যবস্থা করেন।
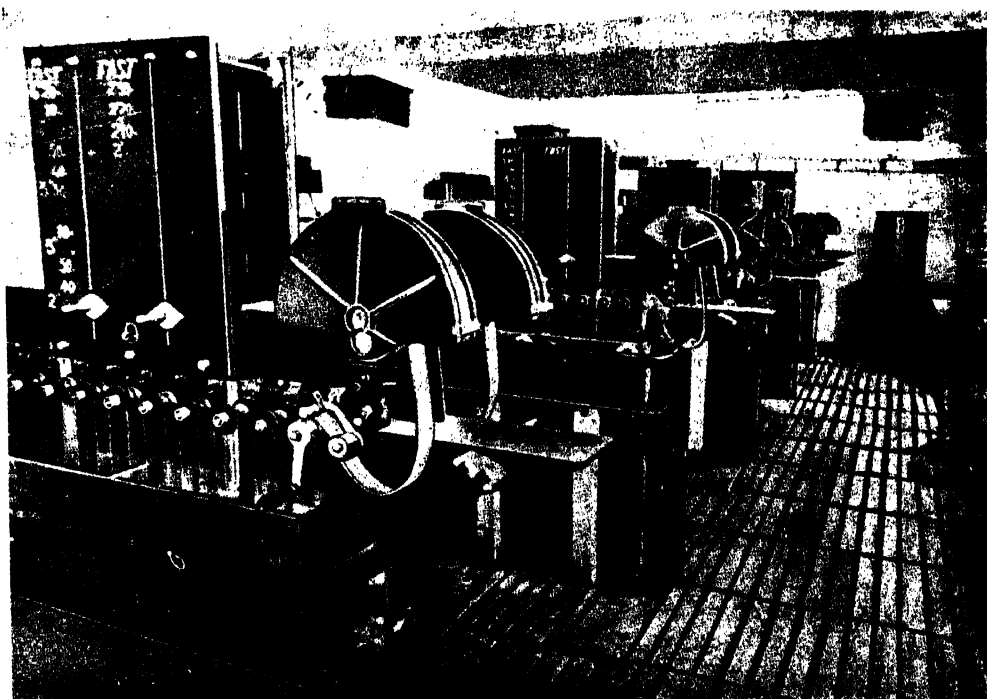
অটোমেটিক ডেভেলপিং প্ল্যাণ্ট
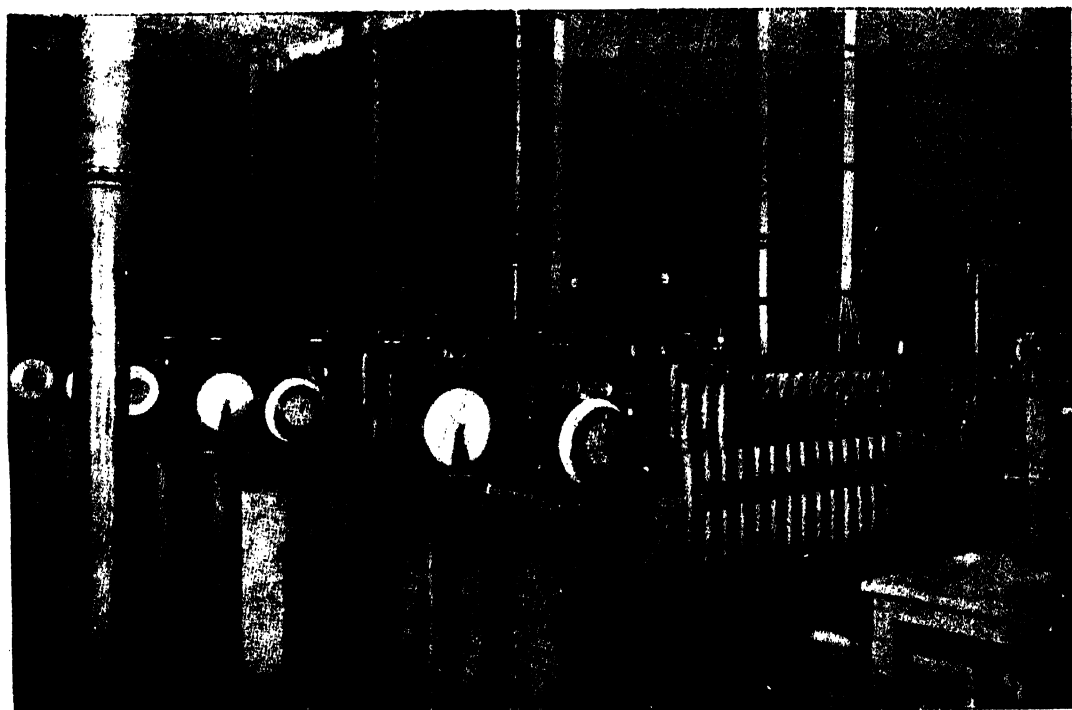
লণ্ডনে অটোমেটিক ডেভেলপিং প্ল্যাট

ফিল্ম জড়ানো শেষ হইলে প্রায় এক গ্যালন জল-মিশ্রিত রাসায়নিক-মিশ্রে ফ্রেমটিকে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, চার-পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে ফিল্ম হইতে ধীরে ধীরে চিত্রের রূপ (Image) ফুটিয়া উঠে। কোন কোন ষ্টুডিয়োতে ঘড়ি ধরিয়া ফিল্ম পরিস্ফুটনের কায করা হয়। তাহাকে বলে টাইমিং ডেভেলপিং (Timing developing)। আবার কোন কোন ষ্টুডিয়োর সহকারীরা এরূপ দক্ষ যে, কেবলমাত্র চোখ দিয়া দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারেন, ফিল্মের পরিস্ফুটন ঠিক হইল কি না। পরিস্ফুটনের কায শেষ হইলে তাঁহারা ফিল্ম-সহ ফ্রেমটি পরিষ্কার জলপূর্ণ ট্যাঙ্কে ডুবাইয়া লইয়া ফিক্সিং হাইপো সলিউসনের ট্যাঙ্কে ফেলিয়া দেন। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে ফিল্মের সাদা অংশগুলি পরিষ্কার হইয়া গেলে তাহাকে ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া নাড়িতে হয়। অনেক ষ্টুডিয়োতে তোড়ে জল দিবার ব্যবস্থা করা আছে। জলে উত্তাপ থাকিলে,—বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে বরফের দরকার, ইহাতে ফ্রিলিং হইবার আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

ঠাণ্ডা জলে আধঘণ্টা ফিল্ম রাখিবার পর উহা পরিষ্কার হইয়া যায়, তার পর ফিল্ম শুকাইবার ঘরে আনিয়া ড্রামে তাহা জড়াইবার ব্যবস্থা। শব্দ-ফিল্মকেও ঠিক এইরূপে পরিস্ফুট করিতে হয়। ইহাকে বলে চিত্র ও শব্দের ফিল্ম নেগেটিভ।

নম্বরে নম্বরে মিলাইয়া চিত্র ও শব্দের নেগেটিভ ফিল্ম গিয়া পৌঁছায় পজিটিভ মুদ্রণ (Print) করিবার কক্ষে এবং মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহাকে ফেলা হয় রসায়নে। সাধারণতঃ চিত্র-প্রদর্শন-যন্ত্রের (Projector) নিম্নে শব্দ হইবার প্রণালী-সম্বলিত একটা যন্ত্র থাকে, তাহাকে বলে 'সাউণ্ড হেড' (Sound head)। ইহার ভিতর হইতে কিরূপে শব্দ বাহির হয়, তাহা পরে বলিব। ফিল্ম প্রদর্শনের গেট হইতে প্রায় সাড়ে উনিশ ঘর ছবি নামিয়া আসিবার পর তবে শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। চিত্রাভিনেতার চিত্রের পাশে শব্দকে গ্রথিত করিলে তাঁহার কথা ও চিত্র সমভাবে প্রকাশ পাইবে না। এই জন্য পজিটিভ ফিল্ম বাহির করিবার সময় শব্দকে চিত্রের ঘর হইতে সাড়ে উনিশ ঘর আগে রাখিয়া চিত্র মুদ্রণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। দামী অটোমেটিক মুদ্রণযন্ত্র না থাকায় এ-দেশের ষ্টুডিয়োবিশেষজ্ঞদের দুইবার করিয়া সমস্ত ফিল্মকে এক্সপোজ করিতে হয়। তাঁহারা মুদ্রণ-যন্ত্রের মুখের মাপ লইয়া দুইটা মাস্ক তৈয়ার করিয়াছেন। প্রথমে সাউণ্ড-ট্রাকের অংশ বা ছিদ্র বন্ধ করিয়া কেবল চিত্রের মুদ্রণ-কার্য্য করিয়া যান, পরে এক্সপোজ্‌ড্‌ পজিটিভ-ফিল্ম গুটাইয়া লইয়া চিত্রের অংশ বা গেট মাস্ক দিয়া বন্ধ করিয়া শব্দের নেগেটিভ গ্রথিত করেন পজিটিভ-ফিল্মের পাশে।

মুদ্রণ-যন্ত্র দেখিতে অনেকটা উঁচু বাক্সের মত। উপরে দুইটা ও নীচে দুইটা স্পুল আছে। উপরের প্রথম স্পুল
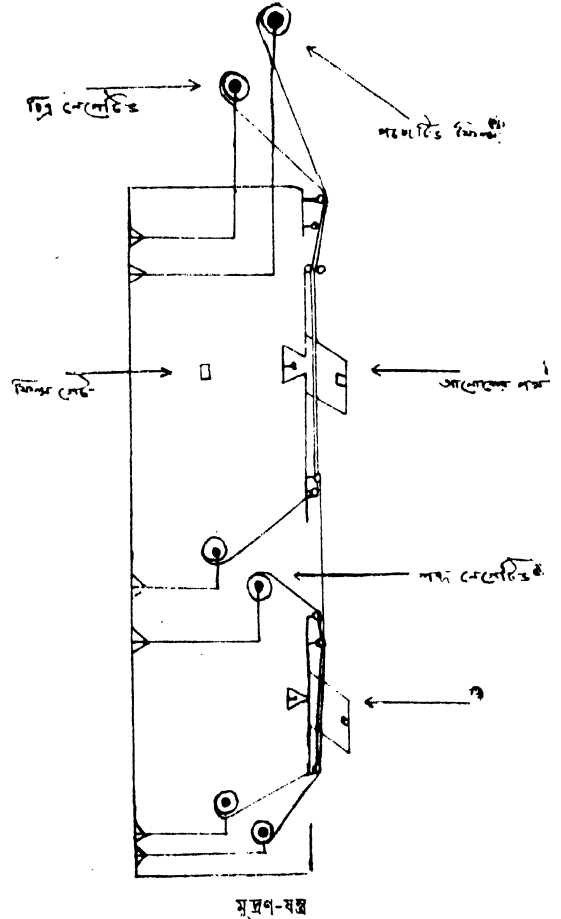
মুদ্রণ-যন্ত্র

হইতে শব্দ বা চিত্রের নেগেটিভ এবং দ্বিতীয় স্পুল হইতে পজিটিভ-ফিল্ম উপর-উপর চাপিয়া নীচের দুইটা স্পুলে আসিয়া আপনি জড়াইয়া যায় বৈদ্যুতিক মোটরের দ্বারা চালিত হইয়া। মাঝ-পথে একটা আলোকের সাহায্যে পজিটিভ-ফিল্ম এক্সপোজ্‌ড্‌ হইতে থাকে। যে সব ষ্টুডিয়োতে

অটোমেটিক মুদ্রণ-যন্ত্র আছে, সেখানে মুদ্রাকরকে সবাক্ চিত্রের পজিটিভ বাহির করিবার সময় দু'বার করিয়া পরিশ্রম করিতে হয় না।

মুদ্রণ-যন্ত্রের উপরের দুইটা স্পুল হইতে চিত্রের নেগেটিভ ও নূতন পজিটিভ ফিল্ম সরাসরি নামিয়া আসে। প্রথম গেটে আলোকের সাহায্যে ছবির কায শেষ হয়, মধ্যপথে চিত্রের নেগেটিভ-ফিল্ম একটা স্পুলে জড়াইয়া যায়; কিন্তু পজিটিভ ফিল্ম সোজা নামিয়া আসে। দ্বিতীয় গেটে যে আলোক রহিয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র শব্দের ফিল্ম এক্সপোজ্‌ড্ হইবে। মাঝ-পথ হইতে শব্দের নেগেটিভ-ফিল্ম একটা স্পুল হইতে নামিয়া আসিয়া পজিটিভ-ফিল্মের সহিত একত্র হইয়া নীচে নামিয়া গিয়া দুইটা ফিল্ম নিজ নিজ স্পুলে জড়াইয়া যায়।

ইহা ব্যতীত অটোমেটিক মুদ্রণ-যন্ত্র আছে অনেক প্রকার। মধ্যস্থানে রহিল এক্সপোজিং-লাইট, বামদিক্ হইতে শব্দ, চিত্রের নেগেটিভ ও পজিটিভ ফিল্ম তিনটা বিভিন্ন স্পুল হইতে নামিয়া আসিয়া একত্র হইয়া এক্সপোজ্‌ড্ হইতে থাকে এবং দক্ষিণদিকের তিনটা স্পুলে জড়াইয়া যায়।

ফিল্ম মুদ্রাকর (Film printer) ক্ল্যাপষ্টিক দেখিয়া দৃশ্যের নম্বর মিলাইয়া শব্দ ও চিত্রকে একত্র করেন প্রত্যেকটি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া। ফিল্ম এক্সপোজ দেওয়ার সাফল্য নির্ভর করে তাঁহার চোখ ও হাতের কৌশলের উপর। অবশ্য আসল কাযে হাত দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পরীক্ষা (test) বা টুকরা-টুকরা ফিল্মের নমুনা করিয়া দেখিয়া লইতে হয়।

এই গেল আমাদের দেশের কথা। এবার বলিব সাগর-পারের ফিল্ম-নির্ম্মাতৃগণ কেমন করিয়া পরিস্ফুটন-আগারের কার্য্যাদি করিয়া থাকেন।

সবাক্-ছবি আসিবার পূর্ব্বে ও-দেশের কর্তৃপক্ষদের আমাদের দেশের ন্যায় রীতি-পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় নাই। তাঁহারা দেখিলেন, যদি চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে উন্নতি ও প্রসার করিতে হয়, তবে তাঁহাদের সাহায্য লইতে হইবে অটোমেটিক যন্ত্রপাতির। এ জন্য এমন সব যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইল, যাহার ভিতর দিয়া এক্সপোজ্‌ড্-ফিল্ম স্বাধীনভাবে রাসায়নিকে পড়িয়া পরিস্ফুট হইবে, ফিক্সিং হইবে, ঠাণ্ডাজলে বিধৌত হইবে। মানুষের হাতের স্পর্শ না পাইয়া-ও ও-দেশের চলচ্চিত্রের রূপ অতি সুন্দররূপে অনায়াসে ফুটিয়া বাহির হয়।

ম্যাগাজিন্-বাক্সের স্পুল হইতে সর্ব্বপ্রথম ফিল্ম নামিয়া আসে রসায়ন-মিশ্রিত কয়েকটি ট্যাঙ্কে কতকগুলি রোলার বা স্প্রোকেটের সাহায্যে। পর পর ট্যাঙ্ক হইতে অন্য ট্যাঙ্কে আসিয়া ফিল্মের পরিস্ফুটন-কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হয় এবং রসায়নের কায হইয়া যাইবার পর তাহা জলপূর্ণ ট্যাঙ্কে গিয়া পৌঁছায়, পরে তথা হইতে ফিল্মটি হাইপো-ফিক্সিং ট্যাঙ্কে পড়িয়া পরবর্ত্তী ট্যাঙ্কে ধৌত হয় এবং তাহা পরিষ্কার হইবার পর আপনি গিয়া উপস্থিত হয় ফিল্ম শুকাইবার কক্ষে—এবং শুকাইয়া যায় লম্বা-লম্বি রোলারে (Roller)।

ফিল্ম শুকাইবার কক্ষে হাওয়া প্রবেশ করাইবার যথেষ্ট সুব্যবস্থা আছে। একটা কক্ষে প্রায় চৌদ্দ-পনেরো হাজার ফুট ফিল্ম একসঙ্গে অনায়াসে শুকাইয়া লওয়া যায়, হাজার ফুট লম্বা ফিল্ম রসায়নাগার হইতে রোলার ও স্প্রোকেটের দ্বারা সোজা চলিয়া যায় ফিল্ম শুকাইবার কক্ষে। ফিল্ম শুকাইয়া গেলে একটা কল টিপিলে পার্শ্ববর্ত্তী একটা স্পুলে জড়াইয়া যায়। ইহাই হইল অটোমেটিক ডেভেলপিং প্ল্যাণ্ট এবং ইহার নিয়ম-পদ্ধতির দ্বারা বিভিন্ন প্রকার হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, হাতের অপেক্ষা যন্ত্রেই পরিস্ফুটন-কার্য্য হয় সুন্দররূপে এবং নিখুঁতভাবে। নহিলে অত-বড় চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ের এত উন্নতি ও প্রসার হইত কি না সন্দেহ।

সাধারণ প্লেট-নেগেটিভ হইতে যেরূপে কাগজের উপর প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা হয়, ইলেকট্রিক আলোকের দ্বারা তেমনি গ্রহণ করা হয় গতিশীল চলচ্চিত্র। কিন্তু ইহার জন্য একটা যন্ত্র বাহির হইয়াছে, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফিল্ম-মুদ্রণ-যন্ত্র দুই প্রকার, যথা—'step by step' ও 'continuous' প্রিণ্টার বা মুদ্রণ-যন্ত্র। সমস্ত ক্যামেরায় একটা ম্যাগাজিন্ বাক্স হইতে অন্য বাক্সে যেভাবে ফিল্ম জড়াইয়া যায়, তাহা step by step রীতি-অনুযায়ী। সেই জন্য প্রত্যেক ফিল্ম নেগেটিভে এক একটা লাইনের ন্যায় দাগ পড়িয়া স্বরগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেয়, কিন্তু শব্দ তুলিবার ক্যামেরায় ফিল্ম গুটাইবার নিয়ম continuous রীতি অনুযায়ী। কারণ, step by step নিয়মে ফিল্ম গুটাইলে সাউণ্ড-ট্রাকের উপর একটি করিয়া দাগ বা লাইন পড়িয়া

যথেষ্ট ক্ষতি করিবে, ঠিক এই কারণেই আধুনিক সবাক্-ছবির যুগে step by step মুদ্রণ-যন্ত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কনটিনিউয়স্ ফিল্ম প্রিণ্টার

শব্দের ফিল্ম-ট্রাক এত সূক্ষ্ম যে, আন্দাজ করিয়া তাহাকে ঠিক পরিস্ফুট করা যায় না। ইহার একমাত্র অসুবিধা এই যে, রসায়নের শক্তি অল্প-বিস্তর কমিয়া যাইলে নিম্ন-পীচের (Low pitch) শব্দরেখা-গুলি হইয়া যায় 'ওভার ডেভেলপড্' বা অপরিমিত পরিস্ফুটন। কাযেই যন্ত্র-পাতির দ্বারা কাষ করিলে সুবিধা আছে যথেষ্ট। রসায়নের শক্তি কমিয়া গেলে রসায়নাধ্যক্ষ সেই মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিতে পারিবেন, তখন তাঁহাকে Reserve Tank হইতে টাটকা রসায়ন ছাড়িতে হইবে ব্যবহৃত রসায়নে। ইহাতে শব্দবিশিষ্ট ফিল্মের উপর মাঝে মাঝে খুব সূক্ষ্ম দাগ ধরিয়া যায়, যাহা চোখে দেখিয়া কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই—কেবলমাত্র চিত্র-প্রদর্শনের সময় সেই দোষগুলি বাহির হয়।
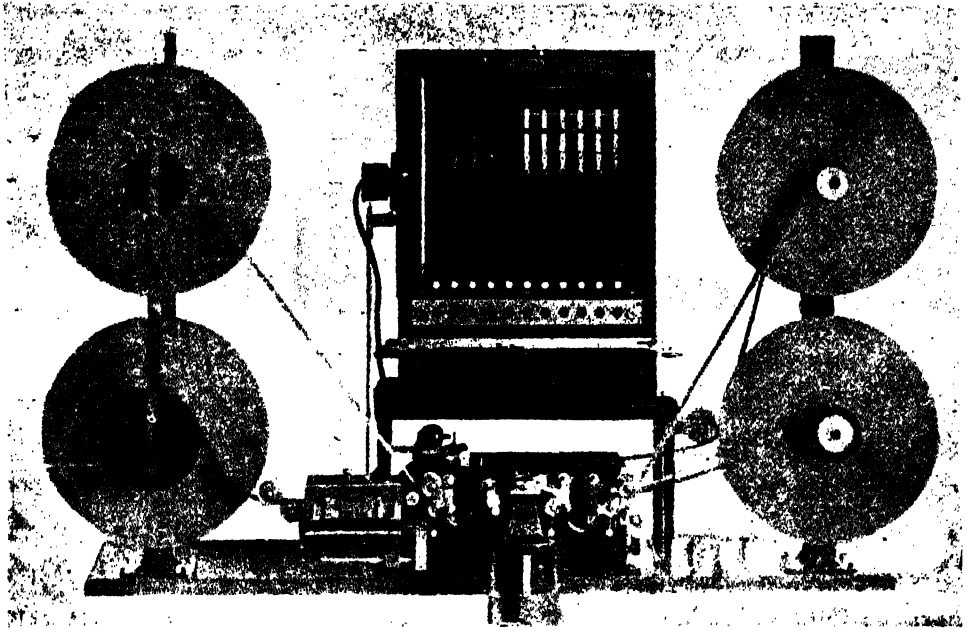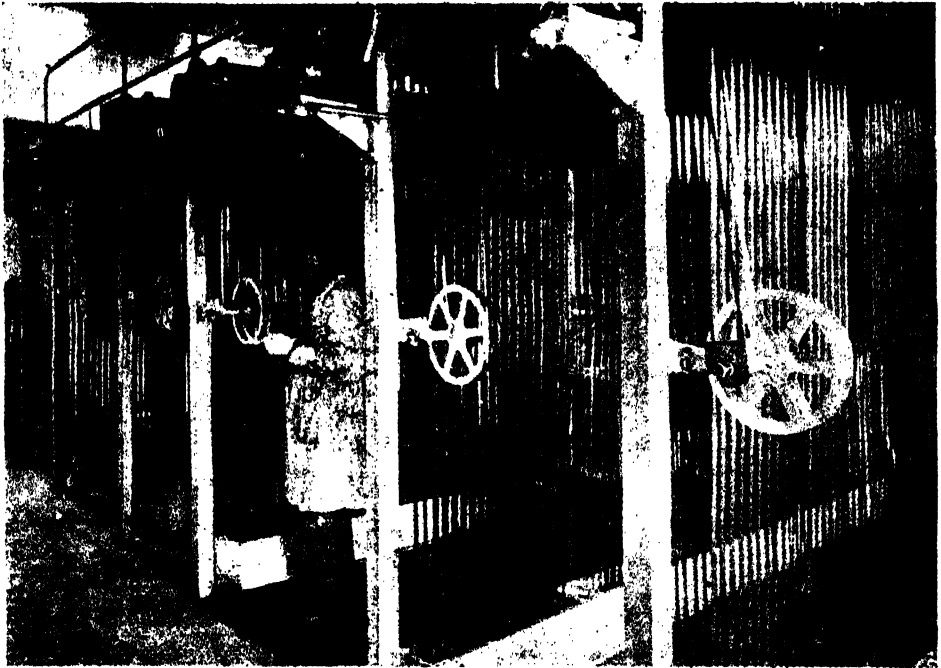
শুষ্ক করিবার ঘর

রসায়নাধ্যক্ষগণ বলেন—ফিল্ম পরিস্ফুটন করিবার সময় উহার উপর দিয়া যদি সামান্য বাতাস-ও প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে দাগ পড়িবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। ও-দেশের বিশেষজ্ঞরা ফিল্ম পরিস্ফুটন করিবার সময় কোনমতে সেখানে বাতাস যাইতে দেন না, এবং ফিল্ম যাহাতে নিখুঁতরূপে পরিষ্কার হয়, সে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

রসায়নের কায হইয়া গেলে পজিটিভ-প্রিণ্ট-ফিল্মগুলি যায় সম্পাদন-বিভাগে। ফিল্ম-সম্পাদক বলিয়া চিত্র-জগতে যে কেহ আছেন কিংবা থাকিতে পারেন, তাহা আমাদের দেশের অনেকে ভুলিয়া যান, কিন্তু তাঁহার দায়িত্বের কথা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। সম্পাদন-কার্য্য খুবই কঠিন। মনে করুন, সম্পাদককে পঁচিশ হাজার ফুট ফিল্ম দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে এক স্পূলে হয় ত আছে ছয়টি দৃশ্য, কোনটায় আছে হয় ত বারোটি দৃশ্য, সেগুলি হইতে বাছিয়া লইয়া প্রত্যেক দৃশ্য পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে প্রত্যেক দৃশ্যে এক টুকরা করিয়া কাগজ লাগাইয়া দৃশ্যের নম্বর বসাইতে হইবে। তার পর দৃশ্যগুলি রাখিতে হইবে একটা বড় টেবিল কিংবা অনেকগুলি ঘর-বিশিষ্ট র‍্যাকের উপর। কোন দৃশ্য হইল পঞ্চাশ ফুট, কোন দৃশ্য হইল দেড়শত ফুট। প্রয়োজনীয় দৃশ্যাদি প্রত্যেক স্পূল হইতে কাটিয়া লইয়া অসমঞ্জস দৃশ্যাদি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। চিত্র-সম্পাদন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেগুলিকে আলাদা রাখা হয়। সিনারিয়ো দেখিয়া সম্পাদক তখন দৃশ্য মিলাইবার ব্যবস্থা করেন। সমস্ত দৃশ্য, ছোটখাটো 'প্যাচ', ক্লোজ-আপ ঠিকমত মিলাইয়া পাইলে সেগুলি তিনি সহকারীদের 'সিমেণ্ট' (cement) দ্বারা জুড়িবার আদেশ দেন। ফিল্মের সঙ্গে অন্য ফিল্ম জুড়িবার (going) সময় সহকারীদের কায করিতে হয় অতি সাবধানে। সবাক্-ফিল্ম আসিবার পূর্ব্বে নীরব-ছবি জুড়িবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা ছিল না। যে-কোন স্থান কাটিয়া লইয়া 'পারফোরেসন্' মিলাইয়া ফিল্ম জুড়িতে কোন অসুবিধা ঘটিত না, কিন্তু এখন ফিল্মের পাশে শব্দ থাকিবার ফলে যদি উপর-উপর কর্ত্তিত ফিল্ম জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রদর্শনের সময় 'ফটোসেল' হইতে একপ্রকার বিশ্রী শব্দ উত্থিত হইবে। সেই জন্য দুইটা ফিল্ম জুড়িবার সময় দুই প্রকার প্রথার সাহায্য লওয়া হয়। একপ্রকার হয়—দুইটা কর্ত্তিত ফিল্ম পাশাপাশি রাখিয়া তাহার নীচে এক টুক্‌রা শাদা ফিল্ম সিমেণ্ট দিয়া জুড়িয়া দেওয়া। দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে—দুইটা ফিল্ম উপর-উপর জুড়িয়া শব্দের স্থানে কালো বা লাল রং মাখাইয়া তিনকোণা লাইনের ন্যায় করিয়া। ইহাতে ফটোসেলের ভিতর দিয়া জোড়া ফিল্ম অতিক্রম করিলেও কোনপ্রকার শব্দ হইবে না।

ফিল্ম জোড়া হইলে এক একটা স্পূলের ফিল্ম লইয়া 'প্লে-ব্যাক্ যন্ত্রের (Play Back Machine) মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হয়। যে-কোন একটা প্রদর্শন যন্ত্রের 'সাউণ্ড হেড' বসাইয়া কর্ত্তারা একপ্রকার অতি চমৎকার ক্ষুদ্র যন্ত্র বাহির করিয়াছেন। যে-কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ছবির কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবেন—অতি অল্পসময়ের মধ্যে এবং অতি অল্প-পরিশ্রমের ফলে।

ছবির সাফল্য নির্ভর করে সুসম্পাদনার উপর। অনেক সময় আমরা ছবি দেখিয়া আসিয়া বলি—ছবিখানির সর্ব্বত্র 'টেম্পো', (Tompo) 'কনটিনিউইটি' (Continuity) বজায় নাই। ইহার অর্থ এই যে, ছবির সম্পাদন-কার্য্য ভালো হয় নাই। আমাদের দেশী ছবিতে সম্পাদনের ভুল দেখা যায় অতিমাত্রায়। 'মীরাবাঈ' ছবিখানির কথা ধরা যাক। অভিরামের দল রাণী মীরার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য এক স্থানে মিলিত হইলেন। সকলেই মহাদেবীর নামে শপথ করিলেন যে, তাঁহারা মীরাবাঈকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবেন। কিন্তু দলের এক বৃদ্ধ সম্মত হইলেন না। সেনাপতির আদেশে তাঁহাকে গুলী করিয়া মারা হইবে ঠিক হইল। সাহসী বৃদ্ধ স্থিরচিত্তে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে এক জন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিল। এখানে দর্শকগণ বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু কাহাকে যে গুলী করা হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। চলিত-দৃশ্যের বাহিরে ঘটনাটি ঘটিল। বৃদ্ধ মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন, সেটা দেখানো খুব উচিত ছিল। মাত্র কয়েক ফুট ফিল্ম জুড়িয়া দিলে দৃশ্যটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত সন্দেহ নাই এবং এই কয়েক ফুট ফিল্মের অভাবেই সম্পাদকের একটা মারাত্মক ত্রুটি ছবিখানিতে রহিয়া গেল।

ইহাকে বলে সম্পাদকের দায়িত্ব।

শ্রীনিতাই ঘোষ ও শ্রীসুকুমার হালদার।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জের

রাত্রি প্রায় ন'টা। প্রতাপের ঘরে বসিয়া তিন জনে গল্প করিতেছে ;—প্রতাপ, নীপু ও কণিকা।

সজ্জিত বেশে লীনা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল ; মুখে-চোখে তীব্র চাঞ্চল্য ফুটাইয়া কহিল,—এখনো খেতে বসোনি ! ন'টা এখনো বাজেনি, বোধ হয় ? যে করে এসেচি···

প্রতাপ কহিল,—হ্যাঁ, তোমায় খুব চঞ্চল দেখচি···

লীনা কহিল,—ন'টায় খেয়ে তুমি শোবে। আমার কি আর সোয়াস্তি ছিল সেখানে ! নাচও থামতে চায় না···

প্রতাপ কহিল,—ভালো নাচ তো ? দেখে খুশী হয়েচো ?

মুখখানা বাঁকাইয়া লীনা জবাব দিল,—ছাই। ও সব কথার ভড়ং—শুধু পয়সা নেবার ফন্দী ! তা যাক্, আমি আসচি। এসে তোমায় খাওয়াবো।

প্রতাপ কহিল,—তুমি বিশ্রাম করো। এখানে রোগীকে দেখবার জন্য লোকের অভাব ঘটেনি !

লীনা চলিয়া যাইতেছিল, প্রতাপের এ কথায় ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—তা জানি। নতুন হাতের পরিচর্য্যা তোমাদের ভালো লাগবারই কথা ! পুরুষ-মানুষ ! তবু আমার একটা কর্ত্তব্য আছে তো ! বিয়ে করে যখন কৃতার্থ করেচো···

প্রতাপ কহিল—সেখানে বুঝি অগ্নি-নৃত্য দেখে এলে···

লীনা কহিল—তার মানে ?

প্রতাপ কহিল—দীপক রাগের রেশ মনে এখনো জেগে আছে দেখচি !···তোমার দাদা কোথায় ?

—জানি না। বলিয়া দুম্ দাম্ শব্দে লীনা বাহির হইয়া গেল।

কণিকাই এখন সেবা-পরিচর্য্যা করে। লীনা তাহাতে কোনো কথা কয় না। আজ সহসা কি এমন ঘটিল যার জন্য···

কণিকা যেন মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে ! নীপু একেবারে কাঠ !

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ কণিকার পানে চাহিল ; কহিল—হঠাৎ এমন মেজাজ হলো কেন, বুঝতে পারলেন, বৌদি ?

কণিকা কোনো কথা কহিল না ; মুখও তুলিল না।

নীপু কহিল,—নাচ বোধ হয় ভালো লাগেনি ! আপনি জোর করে পাঠিয়েছিলেন···

প্রতাপ হাসিল, হাসিয়া কহিল—বিবাহ একমাত্র সাজে তাদের, বুঝলে নীপু, নারী-জাতকে যারা চেনে। মেয়েদের মনের সঙ্গে সমানে তাল রেখে যারা চলতে পারে।···জীবনে যারা বাঁধা গণ্ডীর বাইরে একটু-কিছু করতে চায়, তাদের পক্ষে বিয়ে করা উচিত নয়।

নীপু কহিল,—আপনার কথার মানে বোঝা গেল না। আপনি যা বললেন, তা থেকে মনে হয়, বিয়ে করবার পূর্ব্বে নারীর সঙ্গে মিশে তাঁর temperamentএর সঙ্গে পুরুষ মানিয়ে চলতে পারে কি না, তার পরীক্ষা নেওয়া দরকার ! সে টেষ্ট-পরীক্ষায় যারা পাশ করবে, প্রজাপতির বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পাবে তারাই গ্রাজুয়েট হবার জন্য ! অর্থাৎ বিয়ের আগে একটা probation period থাকবে। কিন্তু তা কি সম্ভব, দাদা ?

কথাটা বলিয়া নীপু হাসিল ; হাসিয়া কণিকার পানে চাহিল। কণিকা লজ্জায় একেবারে জড়োসড়ো—মুখের যেটুকু দেখা যায়, সেটুকু ঐ লজ্জার স্পর্শে রক্তিম! কণিকা আঁচলের প্রান্তটুকু দিয়া হাতের একটা আঙুল জড়াইতেছিল,—একান্ত মনোযোগে।

প্রতাপ একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া শুধু কহিল,—হুঁ!

তার পর ঘরের মধ্যে স্তব্ধ স্তম্ভিত ভাব!

কণিকা প্রথমে স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া কথা কহিল ; বলিল,—আস্‌চি। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

প্রতাপ কহিল,—আমার এই স্ত্রীটিকে ঠিক বুঝতে পারলুম না—এতকাল ওঁর সঙ্গে বাস করেও!...ওঁর মধ্যে মন যেটুকু আছে, তা একেবারে ভয়ঙ্কর জীবন্ত! সংসারকে শুধু সমালোচনা করে চলেছেন! এতটুকু যদি ত্রুটি হয়,—যে ত্রুটি সন্ধান করতে হয়তো অণুবীক্ষণের প্রয়োজন,—তাহলেও উনি সমালোচনার তীক্ষ্ণ বচনে সে ত্রুটিকে বিদ্ধ করবেন! আবার বড় বড় ত্রুটি হয়তো চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে, সেগুলোয় গভীর ঔদাস্য!

নীপু কথাটা শুনিল, শুনিয়া মৃদু হাস্য করিল, কহিল,—আপনাদের ব্যাপার দেখে ভাবি, খুব বেঁচে গেছি! ভাগ্যে বিয়ে করিনি। এই যে রাধদা আর বৌদি...আপনি জানেন না বোধ হয় প্রতাপদা, দুজনে ঘর-সংসার করে চলেছেন, অথচ দু'জনের মন রয়ে গেছে সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী হয়ে! আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। সংসারেও যদি এত পলিটিক্স ঢোকে, তাহলে মানুষের আশ্রয় কোথায়?

প্রতাপ কহিল—সেকালে এ-ভাব ছিল না।

নীপু কহিল,—স্ত্রীর কোনো ব্যক্তিত্ব থাকবে না, এ কথাও আমি মানতে রাজী নই! সে-কালকে এ ব্যাপারে আমি খুব অভিনন্দিত করচি না। এ-কালে মেয়েদের প্রাণ হয়েচে জীবন্ত, পুরুষ তাঁদের মানচে—এ খুব ভালো! কিন্তু দু'মনে এই সংঘর্ষ—পরস্পরে এই যে বে-দরদ—এইটেই মস্ত বিপদের কথা।

প্রতাপ কহিল,—সমস্যা!

কিন্তু এ সমস্যার মীমাংসা হইল না—লীনা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, কহিল,—বৌ কোথায় গেল?

নীপু কহিল—চলে গেছেন। বোধ হয়, তাঁর কর্ত্তব্য-পালনে!

প্রতাপ কহিল,—তাই। তুমি এসেচো স্বামীর সেবার কাজে—তিনিও হয়তো তাঁর স্বামীর সেবায় কর্ত্তব্য পালন করতে গেছেন। তিনিও তো বাঙালী-স্বামীর স্ত্রী!

কথায় ছিল শ্লেষ এ শ্লেষ লীনার বুকে বিঁধিল। সে স্থির থাকিতে পারিল না, কহিল—তাহলে ভাবনা ছিল না। তার স্বামী সেবা চায় না—এবং স্বামীর সেবার জন্য বৌও লালায়িত নয়!...

কথাটা নীপুর ভালো লাগিল না। সে বলিল,—আপনার অন্যায় প্রতাপদা...পর-চর্চ্চা উচিত নয়।

প্রতাপদা কহিল—অন্যায়, স্বীকার করচি।...

এইটুকু বলিয়া প্রতাপ চাহিল লীনার পানে। লীনা যেন আগুনের মত ঝাঁজিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

প্রতাপ কহিল,—নাও, কর্ত্তব্য পালন করো সাধ্বী...

লীনা কহিল,—কি বললে?

প্রতাপ আর দ্বিতীয় বার সে বাক্য উচ্চারণ করিল না; চুপ করিয়া রহিল।

লীনা কহিল,—কথায়-কথায় তুমি যে ব্যঙ্গ করো, কি বলতে চাও, বলো তো?

প্রতাপ কহিল—এ প্রশ্নের মানে?

লীনা কহিল—তুমি বেইমান! তোমার রোগে যে আমি প্রাণটা ঢেলে দিয়েছিলুম, আর তুমি করো ব্যঙ্গ! পুরুষ মানুষ কি না...

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নীপু সরিয়া পড়িতেছিল, প্রতাপ কহিল—কোথায় যাও, নীপু?

নীপু কহিল—এ সময় আমার এখানে থাকা উচিত হবে না...

কথার সঙ্গে সঙ্গে নীপু বিদায় লইল।

প্রতাপ কহিল—চুপ করো, লীনা। এটা কলকাতা—সীলেট নয়।

লীনা কহিল—তা জানি। সেই সঙ্গে আরো জানি, দু' জায়গাই আমার পক্ষে সমান,—কোনো তফাৎ নেই!

প্রতাপ কহিল,—তফাৎ থাক, না থাক,—এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা কবো না। আমি ক্লান্ত হয়েছি লীনা, তোমার সঙ্গে তর্ক করে। এখন আমার অসুখ-শরীর—আমি

করজোড়ে মিনতি জানাচ্ছি, তোমার কোনো কাজে আমি কোনো প্রতিবাদ তুলবো না! তুচ্ছ তর্ক তুলে আজ মিথ্যা দুঃখ সৃষ্টি করো না—দু'জনের কেউ তাতে আরাম পাবো না।

লীনা কহিল—তর্ক আমি তুলতে আসিনি। তুমিই এ কথা বলেচো···

প্রতাপ কহিল—আমি এমন কথা বলিনি, যার জন্ম তুমি অস্ত্র হাতে নিতে পারো!

লীনা কহিল,—বলোনি! মনে-জ্ঞানে এ কথা বলচো?

প্রতাপ কহিল,—কি কথা বলেচি যা তোমার মনে বিঁধলো কাঁটার মত?

লীনা কহিল—ঐ যে বললে, সাধ্বী! ও কথার মানে আমি বুঝি না—না?

লীনা চুপ করিল। সে হাঁফাইতেছিল; একটু পরে আবার বলিল,—আমি সাধ্বী কি না, ভগবান জানেন! নাহলে···

প্রতাপ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না! তার পৌরুষ, তার স্বামিত্ব সহ্যের সীমা পার হইয়া লাঞ্ছনার ধূলা ঝাড়িয়া বুকের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল! সে কহিল—নাহলে কি···?

লীনা কহিল,—আমি কি না করতে পারি! আমার কোনো কিছুতে ভয় নেই, লজ্জা নেই এবং তার সুযোগও আমার নিজের হাতে, এ কথা জেনে রেখো! মনে করলে এই পৃথিবীটাকে নিমেষে আমি কালো করে দিতে পারি! দিই না—ইচ্ছা হয় না বলে···

কথায়-কথায় ব্যাপারটা দূষিত বাষ্পভরা কদর্য্যতার সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া প্রতাপ কহিল,—আমি ক্ষমা চাইছি, লীনা। আমার মাথায় এ সব তত্ত্ব এখন আসবে না। যদি এমন কথা বলে থাকি, যাতে তুমি ব্যথা পেয়েচো, তাহলে সে কথা আমি প্রত্যাহার করচি!···কিন্তু ক্ষমা চাইলেও এ কথা অকপটে স্বীকার করবো, আমার কোনো কথার মধ্যে কোনো রকম বাঁকা অর্থ ছিল না এবং তেমন বাঁকা প্যাঁচওয়ালা কোনো কথা বলবার ইচ্ছাও আমার ছিল না।

লীনা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতাপ বসিয়াছিল; সে চক্ষু মুদিল।

বহুক্ষণ এমনিভাবে কাটিল। তারপর লীনা একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তোমার খাবার দি···

প্রতাপ কহিল,—খাবো না। শরীর ভালো বোধ করচি না।

লীনা কহিল—সত্যি?

প্রতাপ কহিল—মিথ্যা বলিনি।

—বেশ!···এখন তাহলে ঘুমোবে?

প্রতাপ কহিল,—সেই চেষ্টাই দেখি।

লীনা কহিল,—আমাকে কোনো প্রয়োজন নেই? আমি তাহলে যেতে পারি?

প্রতাপ কহিল—স্বচ্ছন্দে। শুধু যাবার সময় দয়া করে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেয়ো।

তাহাই হইল। আলো নিবাইয়া লীনা চলিয়া গেল। প্রতাপ বিছানায় পড়িয়া ভাবিতেছিল, লীনা কি চায়? কিসে সে খুশী থাকে? রামধনুর বর্ণের মত তার মনের রঙ এই যে ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া চলিয়াছে, কেন? কেন এমন হয়? প্রতাপ তো কোনো দিন শাসনের দণ্ড তুলিয়া নিজের স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হয় নাই; লীনাকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে। যখন খুশী যেমন খুশী যাহা সে করে, তাহাতে কখনো আপত্তি তোলে নাই! তবু লীনার মন প্রসন্ন দেখিল না! উল্কার মত জ্বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! বেশ, ভালো না বাসো, কৃতজ্ঞতাও কি নাই এতটুকু!···

রাত্রি প্রায় দশটা। নীপু আহারাদি সারিয়া নিজের ঘরে গিয়াছে, কণিকা নীচের তলা হইতে দোতলায় নিজের ঘরে আসিতেছিল। বাহিরের ঘরে তাসের আসরে কলরব চলিয়াছে। সে কলরবে সারা গৃহ মাঝে মাঝে ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিতেছে···

কণিকা ঘরে প্রবেশ করিবে, লীনা আসিয়া ডাকিল,—বৌ···

লীনার সঙ্গে সে ঘটনার পরে কণিকার আবার এই দেখা!

কণিকা কহিল,—কোথায় ছিলে? খাওয়া হয়েচে?

লীনা কহিল,—খাবো না।

—খাবে না! কেন? অসুখ করেচে?

লীনা কহিল,—বড্ড মাথা ধরেচে। মাথা তুলতে পারচি না।

কণিকা কহিল—এসো, আমি ওষুধ দি…

লীনা কহিল,—কি ওষুধ?

—মাথা ধরার।

লীনাকে সঙ্গে করিয়া কণিকা ঘরে আসিল। কাচের আলমারি হইতে জেনাশপ্রিণের বড়ি লইয়া এক গ্লাস জল আনিল এবং লীনাকে ঔষধ খাওয়াইয়া কহিল—ঠাকুরজামাই শুয়েচেন?

লীনা কহিল—হ্যাঁ।

—তুমি এখন শুতে যাবে?

কণিকার খাটে লীনা বসিল, বসিয়া কহিল,—না।…

কণিকা বুঝিল, সেই ছোট কথাটুকুর পরে নিশ্চয় অনেক কথা হইয়া গিয়াছে…

কয়দিনে কণিকা এ পরিচয় পাইয়াছে যে, দুজনে তর্ক প্রায় বাধে এবং তর্ক বাধিলে সে তর্ক বহু দুর্গম স্থান দিয়া, বহু ঝড়, বন্যা, আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করিয়া কোথায় গিয়া থামে! ইচ্ছা করিয়া—সখ করিয়া এ তর্কের আশেপাশে সে গিয়া কখনো দাঁড়ায় নাই। তবু তর্কের ব্যাপার তার অগোচর নাই!

সে কহিল,—তা এখানে একটু শোবে? শোও না… এর পরে মাথা ছাড়লে একটু আরাম বোধ করলে নিজের ঘরে যেয়ো!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া লীনা কহিল,—আমার নিজের ঘর কোথায়?

কথাটা যেন নাটকের মত! এ কথায় কণিকা অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

লীনা কহিল,—স্বামীর কাছে মানুষ কত কি পায়। আমি কখনো কিছু পাইনি।

এ কথাও তীরের মত কণিকার মনে বিঁধিল! স্বামীর দল সকলেই এমন…স্ত্রীগুলা এমনি অবহেলা সহিতেই বাঙ্‌লা দেশে জন্ম লইয়াছে!

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কণিকা কহিল,—অভিমান হয়েচে? তা বেশ, এখানেই তুমি শোও… কিন্তু ঠাকুর-জামাইয়ের যদি কোনো-কিছুর দরকার হয়? রোগা মানুষ একলাটি থাকবেন? রাত্রিবেলা!

লীনার মনে আক্রোশ ফুঁশিয়া উঠিল—প্রতাপ যে-ব্যঙ্গ করিয়াছে, সে ব্যঙ্গের যত আক্রোশ! কণিকাকে দেখিয়া তার সঙ্গে তুলনা করিয়াই স্বামী নিত্য এখন এমন ব্যঙ্গ করে! এখানে এমন সেবা মিলিয়াছে…তাই? শীলেটে কে সেবা করিয়াছিল? জীবনে লীনা কখনো এত বড় দুশ্চর সাধনা করিয়াছে!…আজ তাই শ্লেষের বাণ! আপন-জন পাইয়াছ এখানে এই কণিকাকে? বটে! রূপসী… কিশোরী…

এ আক্রোশ সে রুখিয়া রাখিতে পারিল না।

লীনা কহিল,—এত যদি দুর্ভাবনা জাগে তো যাও না ভাই তুমি…ঠাকুর-জামাইয়ের শয্যাভাগিনী হও গিয়ে—আমিও তাহলে কৃতার্থ হবো।…

কণিকার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। অন্য সময় হইলে এ কথায় সে কৌতুক বোধ করিত। কিন্তু যে ব্যাপার সদ্য হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথায় কৌতুকের সে সরল নির্মল শুভ্রতা কোথাও দেখিল না…চারিদিকে কঠিন কালো জমাট অন্ধকার! তবু নিজেকে সম্বরণ করিয়া কণিকা কহিল,—ধেৎ…আমি কি তাই বলেচি!

লীনা কহিল,—কেন! মন্দ কি? ঠাকুরজামাই তো বৌদি বলতে অজ্ঞান! একেবারে যাকে বলে, বিমুগ্ধ…

কণিকা কোনো জবাব না দিয়া খোলা খড়খড়ির পাশে গিয়া দাঁড়াইল; বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

লীনা বসিয়া বসিয়া বলিল,—তাহলে এইখানেই শয্যা-গ্রহণ করচি, ভাই! রাধদা এলে বলো, আজ তোমরা অন্য ঘরে শোবে!

কণিকা ফিরিল, ফিরিয়া কহিল,—তুমি শোও,—তোমার দাদার সম্বন্ধে তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না!

—তার মানে?

কণিকা নিজেকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিল। মনের কথা ইহাকে কেন বলিবে? সে কহিল,—তিনি এলে যা বলবার, আমি বলবো'খন। তুমি শোও…

—তাই করি। মাথা যেন খশে যাচ্ছে—বসতে পারচি না।

লীনা শুইয়া পড়িল; শুইয়া চক্ষু মুদিল। কণিকা খড়খড়ির পাশে দাঁড়াইয়া রহিল···বহুক্ষণ।

তারপর ফিরিয়া আলো নিবাইয়া দিল···নিবাইয়া ঘরের সামনে খোলা বারান্দায় গিয়া বসিল।

এক-আকাশ নক্ষত্র পৃথিবীর পানে নীরবে চাহিয়া আছে। কোথায় কার মনে কি ঝড় বহিতেছে, সে ঝড়ে কাহার কতখানি খশিয়া ঝরিয়া যাইতেছে দিনে দিনে—নক্ষত্রেরা কি সে সংবাদ রাখে?

এমনি উদাস চিন্তায় কণিকার মন ভরিয়া উঠিল। এ সব কথা কখনো মনে জাগে না। আজ কোথা হইতে···

মনে হইতেছিল, জীবনের পথ দীর্ঘ পড়িয়া আছে সামনে···যতদূর দৃষ্টি চলে, অন্ধকারের আবছায়ায় ঢাকা! সে পথের কোথাও একখানি কুটীরের চিহ্ন নাই! এই দীর্ঘ পথ একা কি করিয়া সে চলিবে? যাত্রা-পথে ক্লান্তি দূর করিতে, শান্তি বা আরাম রচিতে কিছু নাই···

বুকখানা ভয়ে ভারী হইয়া উঠিল। সে ভারে নিশ্বাস শেষে বন্ধ হইবার জো!

কণিকা উঠিল, উঠিয়া ধীর পায়ে ঘরে আসিল। আসিবামাত্র মনে হইল, ঘর হইতে নিঃশব্দ সতর্ক পায়ে কে যেন সরিয়া গেল!

কণিকা কহিল,—কে?

কোনো জবাব পাইল না। সুইচ টিপিয়া সে আলো জ্বালিল। লীনা তখন বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। লীনা কহিল—কি ভাই?

কণিকা কহিল—কে এসেছিল ঘরে! চলে গেল···

বিস্ময়ের স্বরে লীনা কহিল,—সত্যি! কে?

—জানি না। দেখি।

কণিকা বাহিরে গেল···কোথাও কেহ নাই।

নীচের তলায় দাসী-চাকররা কথা কহিতেছে।

কণিকা আবার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, লীনা তখনো জাগিয়া বসিয়া আছে। তার দুই চোখে···

লীনা কহিল—কে?

কণিকা কহিল,—বুঝতে পারলুম না।

লীনা কহিল—আমারো মনে হলো, কে যেন এসেচে—ঘুমটা ভেঙ্গে গেল!···

কণিকা কোনো কথা কহিল না। লীনা কহিল,—রাধদা নয়তো?

কণিকার মনেও সেই কথা জাগিতেছিল। কিন্তু রাধাবিনোদ তো রাত্রে কখনো তার ঘরে আসে না! ওদিক্‌কার ঘরে শোয়!

কণিকা স্বামীর ঘরে গেল—শয্যা শূন্য। রাধাবিনোদ সেখানে নাই।

—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ছিদ্রেষ্বনর্থা

পরের দিন সকালে চা পান করিতে করিতে নীপু কণিকার পানে চাহিয়া কহিল,—কাল রাত্রে কি ঘুমোন নি, বৌঠাকরুণ?

কণিকা প্রতাপের জন্য পথ্য তৈয়ার করিতেছিল, নীপুর কথায় মৃদু হাসিয়া কহিল,—তোমার যেমন কথা! ঘুমোবো না কেন?

নীপু প্রতাপের পানে চাহিল, কহিল,—দেখুন তো প্রতাপদা, বৌঠাকরুণের চেহারা শুক্‌নো, চোখ ভারী··· নয়?

প্রতাপ কহিল,—মনে হচ্ছে তাই।

কণিকা কহিল,—কাল খোলা বারান্দায় শুয়েছিলুম। হয়তো ঠাণ্ডা লেগেচে।

নীপু কহিল,—হঠাৎ বারান্দায় শুতে গেলেন কেন?

কণিকা কহিল,—কারণ ছিল না। এমনি গিয়ে একটু শুয়েছিলুম, তারপর ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙ্গলো সকালে।

প্রতাপ কহিল,—ওঁর ঘরে কাল অতিথি ছিলেন আমার গৃহিণী।

নীপু কোন কথা কহিল না। এ কথার সঙ্গে মনে পড়িল, কাল রাত্রের সেই মান-অভিমান!

প্রতাপ কহিল,—কিন্তু রাধদার দেখা নেই যে! সকালে চায়ের কল্যাণে একবার তাঁর সাক্ষাৎ পাই। আজ আমরা কি অপরাধ করলুম যে তিনি আমাদের দর্শন-দানে বঞ্চিত করলেন!

নীপু কহিল—সত্যি, আমাদের পেয়ালা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলো—অথচ রাধদার দেখা নেই!

এই অবধি বলিয়া নীপু চাহিল কণিকার পানে; কহিল,—রাধদার খপর কি, বৌঠাকরুণ? কায তো কখনো করতে শেখে নি। সুতরাং কাযে বেরিয়েচে, এমন অনুমান কোনোকালে মনে জাগবে না!

কণিকা কোনো জবাব দিল না; ঘাড় নীচু করিয়া ওভালটিন তৈয়ার করিতে লাগিল।

প্রতাপ কহিল—একবার ডাকো হে, নীপু!

নীপু কণিকার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—কৈ, রাধদার পেয়ালাও তো মজুত দেখচি না! সত্যি, তাঁকে কোথাও পাঠিয়েচেন, বৌঠাকরুণ?···

কণিকা এবারও কোনো জবাব দিল না। এ কথার জবাব নাই।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া নীপু কহিল,—আমি একবার দেখি লোকটার সন্ধান করে।

পেয়ালা রাখিয়া নীপু গমনোদ্যত হইল, কণিকা কহিল, খেয়ে তবে যেয়ো, ঠাকুরপো। না হলে ও চায়ে আর পদার্থ থাকবে না।

হাসিয়া নীপু কহিল,—পদার্থবিদ্ যখন বসে আছেন, তখন নতুন পদার্থ তৈরী করিয়ে নিতে কতক্ষণ-বা সময় লাগবে?

কণিকা কহিল,—বটে! আমাকে বাঁদী পেয়েচো!

নীপু কহিল,—ছি, ছি! ও কথা বলবেন না। বাঁদী হলে তার হাতের চা আমি মুখেও দিতুম না!

কথাটা বলিয়া নীপু বাহির হইয়া গেল।

ওভালটিনের পেয়ালা লইয়া কণিকা প্রতাপের হাতে দিল, কহিল,—খেয়ে নিন।

প্রতাপ কহিল,—খাচ্ছি। কিন্তু তার আগে একটু কথা আছে।

কণিকা কহিল,—বলুন···

প্রতাপ কহিল,—আপনি সত্য করে বলুন, কাল রাত্রে আমার কোনো অপরাধ হয়েছিল যে জন্য উনি রাগ করে চলে গেলেন?···আপনার কাছেই ছিলেন, বোধ হয়? বোধ হয় আমার খুব নিন্দা করেচেন?

কণিকা কোনো কথা না কহিয়া নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতাপ কহিল,—না, বলুন। সত্যি, সারা রাত কাল ঘুমোতে পারি নি। গ্লানির ভরে কেবল ভেবেচি, হাজার হোক স্ত্রীলোক···

প্রতাপ নিশ্বাস ফেলিল। কণিকা কহিল,—এখন ও সব কথা থাক। আপনি ওটুকু খেয়ে ফেলুন। একেই খাবার একটু দেরী হয়েছে, আজ এক ঘণ্টা। এর পরে সেই ওষুধটা আবার খেতে হবে।

প্রতাপ কহিল—মিছে খাওয়া। কি হবে খেয়ে? সারা? আমি সারতে চাই না, বৌঠাকরুণ! সেরে লাভ নেই! এ কি জীবন! কি পেয়েচি? স্ত্রী যখন স্বামীকে বুঝতে পারলে না, তখন স্বামী কি সুখে বাঁচবে? বেঁচে সংসার করবে, বলতে পারেন?

কণিকা বিপদে পড়িল। এ সব কথায় মনে সে বড় কষ্ট পায়। এ সব কষ্ট কখনো দেখে নাই—এ কষ্টের কল্পনা করে নাই! সংসারে এত বিরোধ—এত জটিলতা, জানিত না। সে যেন শিহরিয়া উঠিল। তার মুখে মলিন ছায়া পড়িল—দুঃখে, দরদে।

প্রতাপ তার পানে চাহিয়াছিল। সে এ ভাব লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া শান্ত স্বরে কহিল,—দিন ওভালটিন।

প্রতাপ পেয়ালা লইয়া ওভালটিন পান করিল। তারপর কণিকা পেয়ালা লইলে প্রতাপ কহিল,—দেখলেন তো, উনি এমন অপমান বোধ করলেন যে, এ ঘরে ভুলে একবার ঢুকলেন না! অথচ···

কথা শেষ হইল না। লীনা ঘরে প্রবেশ করিল, করিয়া কহিল,—লাগানো হচ্ছে! ঘরে ঢুকলো না! কেন ঢুকবো? ...ভেবেচো, ভাত-কাপড় জুগিয়ে আসচো···স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করচো···আর কি চাই? কিন্তু স্ত্রীকে শুধু ভাত-কাপড়ের কাঙাল বলেই জেনো না। স্বামী যেমন চায়, স্ত্রী তাঁরি সব সুখ-দুঃখে চোখ রেখে চলবে···স্ত্রীর সুখ-দুঃখের পানে চেয়ে স্বামীরও তেমনি চলা উচিত! মধ্যস্থ মানতে চাও বৌকে···বেশ, মানো! আমিও প্রতি দিনের ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছি···

বাধা দিয়া শান্ত স্বরে প্রতাপ কহিল,—আমি কারো নামে কোনো অভিযোগ করি নি, লীনা! আমি বুঝেচি, আমি যে-কাজ করেছি, তার দণ্ড আমাকে নিতেই হবে! এবং আমি তা নেবো।

লীনা কহিল,—নিতে হয় নিয়ো···তার মধ্যে আমার কথা কেন? তাতে মহত্ত্ব প্রকাশ পাবে না।···

প্রতাপ কহিল,—মহত্ত্ব চূড়ান্ত প্রকাশ পেয়েচে···আর প্রকাশের বাসনা নেই!

লীনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতাপের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—কি বলতে চাও, শুনি?

প্রতাপ কহিল,—বলার কথা শেষ হয়ে গেছে। এখন কাজের পালা। যা করবো, তা দেখতে পাবে···তা নিয়ে কথা কবার কোনো প্রয়োজন দেখচি না!···তুমি আর এ নিয়ে মাথা ব্যথা করো না।

লীনা কহিল,—মাথা ব্যথায় আমার বয়ে গেছে!··· আমি এ ঘরে আসতুম না···যাচ্ছিলুম, হঠাৎ শুনলুম, আমার নাম হচ্ছে, তাই এসেছিলুম! সে জন্য অপরাধ করেচি···আমায় মাপ করো···তুমিও মাপ করো, ভাই বৌ!

কথাটা বলিয়া লীনা চলিয়া যাইতেছিল, প্রতাপ কহিল,—শুধু একটা কথা ··

লীনা ফিরিল···মুখে-চোখে, সারা অবয়বে প্রচণ্ড বিরক্তি! সে কহিল, আবার কি কথা! এই মাত্র তো চুকে গেছে কথার পালা···নিজের মুখে বলেচো!

প্রতাপ কহিল,—সে কথা নয়। আমার চাবিটা দয়া করে যদি দাও···আমার একটু কাজ আছে···

লীনা অঞ্চল হইতে চাবির রিং খুলিতেছিল, প্রতাপ কহিল,—তোমার সম্পর্কে এখানে এসেছিলুম···সব যখন চুকে গেল, তখন তোমার দায় আর কেন রাখবো! আজ আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

লীনা কহিল,—তোমার খুশী!

এই কথা বলিয়া চাবির রিংটা ছুড়িয়া বিছানায় ফেলিয়া লীনা সশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কণিকা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ ব্যাপারের সংস্পর্শ কাটাইয়া সরিয়া থাকিতে পারিলে ভালো হইত! এখন সরিতে গিয়া দেখিল, পা যেন কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

চাবির রিং লইয়া প্রতাপ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—কিছু মনে করবেন না, বৌঠাকরুণ। আমার এখানে থাকা চললো না। থাকতে পারলে ভালোই হতো। যে স্নেহ আপনার কাছে পেয়েছি, আপনি বয়সে ছোট···প্রমাণ করতে পারি না—তবে ছোট বোন-টোন নেই! বোন কেমন, তা জেনেছিলুম। কিন্তু কি করবো? আমার ভাগ্য চিরদিনই এমনি!

কথার শেষে প্রতাপ নিশ্বাস ফেলিল।

কণিকা বিস্ময়-শঙ্কা-ভরা কণ্ঠে কহিল,—আপনি সত্যি চলে যাবেন?

প্রতাপ আবার হাসিল, হাসিয়া কহিল,—না গেলে চলচে না। আমায় মাপ করবেন, বৌঠাকরুণ! বলেচি তো, যাবার এতটুকু ইচ্ছা নেই। তবু যেতে হবে। দয়া করে আমায় থাকতে বলবেন না। আমার উপর যদি তিল-মাত্র করুণা থাকে, তাহলে বুঝে দেখবেন! আমার দুঃখ বুঝলে আপনিও আমাকে যেতে বলবেন! থাকবার অনুরোধ করবেন না, এ আমার স্থির বিশ্বাস।

এ কথার অন্তরালে কতখানি বেদনা, কণিকা তাহা বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়া আর কোনো কথা বলিতে পারিল না; চুপ করিয়া রহিল।

প্রতাপও চুপ করিয়া রহিল। এমন সময় নীপু আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তার মুখে-চোখে বিস্ময়। নীপু কহিল,—লোকটা উবে গেছে! আশ্চর্য্য! লোক-জন সকলে বললে, ওদের বাবুকে সকালে উঠে ইস্তক কেউ চক্ষে ছাখেনি! রাত্রে কোথা বেরিয়ে গেছে কি না, তাও কেউ সঠিক বলতে পারলে না। অনুমান!

কথাটা বলিয়া নীপু কণিকার পানে চাহিল। কণিকা তখনো তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। নীপুর কথায় তার মনের চিন্তা···

কিন্তু সে চিন্তা কাটিয়া গেল নীপুর কথায়। নীপু বলিল,—আপনি এ সম্বন্ধে ঠিক খবর দিতে পারবেন বৌঠাকরুণ···রাধদা সত্যি গেল কোথায়? বলুন না, বলতেই হবে।

কণিকা কহিল,—জানি না।

নীপু কহিল,—আশ্চর্য্য!

বেলা বারোটা বাজিল। রাধাবিনোদের তবু দেখা নাই। কণিকা কি একটি সেলাই লইয়া বসিয়াছিল।

নীপু আসিয়া কহিল,—আমাদের কি খেতে দেবেন না, বৌঠাকরুণ?

কণিকা কহিল,—এখনো খাওনি? সে কি···

সেলাই ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। নীপু কহিল,—আপনি উপোস করে আছেন! আর আমরা খাবো! এতখানি unchivalric আমায় ভাবলেন কি বলে!··· রাধদা আসেনি—সে জন্য ভাববেন না। তার সন্ধান না নিয়েই কি আসচি! তিনি তাঁর কোন বন্ধুর উদ্যান-উৎসবে গিয়ে মেতেচেন! আপনি খেতে বসুন। কোনো বাধা ঘটবে না। কিন্তু প্রতাপদা সত্যি চললেন যে! ওঁর আসামী ভৃত্য গোছগাচ করচে। আমি কত বললুম! তা হেসে জবাব দিলেন,—অগস্ত্য-যাত্রা করচি না ভাই!··· তাজ্জবের কথা, মেজদা! দাম্পত্য-কলহের পরিণাম, আমার ধারণা ছিল, চিরদিন লঘুক্রিয়ায় দাঁড়ায়!···

কণিকাকে আহারে বসিতে হইল। নীপু কহিল,—ওঁকে বারণ করবেন না?

কণিকা কহিল,—আমায় উনি মানা করেচেন এ সম্বন্ধে কোনো অনুরোধ করতে।

নীপু ক্ষণেক হতভম্বের মত বসিয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, —সেদিন একটা বাঙলা বই পড়ছিলুম, হা-হুতাশ করে লেখক লিখেচেন, বাঙালীর সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী! কাজেই তাদের মধ্যে রোমান্স নেই, সুগভীর psychology নেই··· হুঁঃ! তাঁরা একবার লীনা-প্রতাপদাকে দেখে গেলে বুঝতেন, রোমান্স-ভূতের দৌরাত্ম্য কি রকম চলেছে! আমাদের আর জাগরণের বাকী কি! লীনাদি যে এই নিঃশব্দে বসে আছে অভিমান-ভরে···এতে যদি আমাদের জাতের দুঃখ না ঘোচে তো ঘুচবে কিসে জানি না!···

আহারাদির পর প্রতাপ সত্যই যাত্রার উদ্যোগ সারিয়া ফেলিল। লীনা কণিকার ঘরে বিছানায় শুইয়া নভেল পড়িতেছিল; কণিকা আসিয়া লীনাকে বলিল,—তুমি একবার বলবে না, ঠাকুরঝি? ঐ রোগা শরীর···

নভেলের পৃষ্ঠা হইতে চোখ তুলিয়া লীনা কহিল,—ঢের খোসামোদ করেচি বৌ··খোসামোদে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। ওঁর যদি মর্জ্জি হয়, বেশ, যান।

কথাটা বলিয়া সে কাঠ হইয়া রহিল। দুই চোখে দেখা দিল অগ্নিশিখা! নিমেষের জন্য। তারপর আবার নভেলের পাতায় মনোনিবেশ করিল।

কণিকা আসিল প্রতাপের কাছে। প্রতাপ সাজিয়া বসিয়া আছে। কণিকাকে দেখিয়া কহিল,—আপনাকে প্রণাম জানিয়ে যাবো বলে বসে আছি। রাধদার সঙ্গে আমার দেখা হলো না···তাঁকে বলবেন, আপনাদের স্নেহ জীবনে ভুলবো না।

কণিকা কহিল,—সত্যি যাচ্ছেন?

মৃদু হাসিয়া প্রতাপ কহিল,—হ্যাঁ। বলেচি তো, দয়া করে থাকবার জন্য আমায় অনুরোধ করবেন না!

কণিকা একটা ঢোঁক গিলিল; সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত নিশ্বাসটা চাপিতে পারিল না! কহিল,—সে অনুরোধ করবো না। কিন্তু আর একটি অনুরোধ আছে···বলুন, রাখবেন?

প্রতাপ কহিল,—আমার মনের উপর দরদ করে অনুরোধ?

—তাই।

—বেশ। বলুন,—আপনার কথা আমার শিরোধার্য্য।

কণিকা কহিল,—শরীরে অযত্ন করবেন না, বলুন···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ কহিল,—বেশ!

কণিকা কহিল,—কোথায় যাচ্ছেন, সে কথা বলবেন না? আপনাকে জ্বালাতন করবো না! ভয় নেই। তবে স্নেহ-বশে যদি কখনো খবর নিতে চাই···

প্রতাপ কহিল—আমি কলকাতাতেই থাকবো···

—চিকিৎসার যেন কোনো ত্রুটি না হয়···

প্রতাপ ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল,—এ জীবন রাখবার কি প্রয়োজন, বৌঠাকরুণ··?

কণিকা কহিল,—এ কথা আপনার মত বিদ্বানের মুখে সাজে না। পুরুষ মানষের ও কথা নয়···। ঠাকুরঝির আজ অভিমান হয়েচে···তা বলে' ভাবেন···

বাধা দিয়া প্রতাপ কহিল,—আপনি ওঁকে চেনেন নি, বৌঠাকরুণ! তা যাক! আমি কথা দিচ্ছি, আত্মহত্যার কোনো আয়োজন আমি করবো না।

কণিকা কহিল,—আসবেন এখানে দেখা করতে। যদ্দিন জানাশুনা ছিল না, তদ্দিন এক রকম ছিল। এখন যখন পরস্পরকে জেনেচি, স্নেহের পরিচয় পেয়েচি···

হাসিয়া প্রতাপ কহিল,—আসবো, আসবো, বৌঠাকরুণ! ···জীবন যখন বড্ড ভারী বোধ হবে, তখন নিশ্চয় আসবো আপনার পায়ের কাছে···সান্ত্বনা আর শক্তি সংগ্রহ করতে···

কথাটা বলিতে বলিতে প্রতাপ একেবারে নত হইয়া কণিকার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, কহিল,—সত্যি বৌঠাকরুণ, বয়সে ছেলেমানুষ হলে কি হয়! ক'দিনে আপনার যে পরিচয় পেয়েচি, বিশেষ এখন এই যে স্নেহ··· আপনার পায়ের ধুলো না নিলে যেন শান্তি পাবো না।

কণিকা এ কথায় শিহরিয়া সরিয়া গেল।

প্রতাপ কহিল,—দেবেন না পায়ের ধুলো?

—ছি! ও কথা বলতে নেই···আমি তা হলে আসি··· একবার ঠাকুরঝিকে দেখি···

প্রতাপ কহিল—না, একটু দয়া করুন···কোনো প্রয়োজন নেই···

কণিকা সে কথা শুনিল না···লীনার উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিতেছিল; দ্বারের বাহিরে পা দিতে দেখে, সামনেই লীনা।

কণিকা কহিল,—এই যে ঠাকুরঝি! এসেচো···

লীনা অবিচল কণ্ঠে কহিল,—আমি বিদায়-দৃশ্য দেখতে এসেছিলুম। শ্রীচরণের প্রার্থীকে পায়ের ধুলো থেকে সত্যি বঞ্চিত করো না বৌ···

কথাটা বলিয়া চোখে একটা বিচিত্র দৃষ্টি ফুটাইয়া লীনা যেন চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল! কণিকা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর সন্ধ্যার সময় কণিকা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে···প্রতাপ বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে,···মালতী আসিয়া কহিল,—চিঠি আছে বৌদি···

মালতী খামে-মোড়া চিঠি দিল। চিঠি খুলিয়া কণিকা দেখে, গুরুপদ লিখিয়াছেন!

কি চিঠি? গা কেমন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। চিঠি খুলিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ!

গুরুপদ লিখিয়াছেন,

মা কণিকা, তোমার বাবার খুব অসুখ। আমার কাছে তার আসিয়াছে। আমি ডাক্তার লইয়া চলিলাম। তোমাকে লইয়া যাইব, সে অবসর মিলিল না।

এ চিঠি পাইবামাত্র রাধুকে লইয়া তুমি যাত্রা করিবে। অধিক কি লিখিব? কি অসুখ, সে সংবাদ পাই নাই। চিন্তিত হইয়ো না। সেখানে দেখা হইবে।

শুভার্থী—
গুরুপদ।

আকাশে ছোট ফালি চাঁদ···কে যেন আকাশে কালি লেপিয়া সে চাঁদের চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।···

তার! তার আসিয়াছে! বাবার সেখানে অসুখ! নিশ্চয় বেশী অসুখ! নহিলে···

কিন্তু কাহার সঙ্গে যাইবে?···

মনে পড়িল নীপুর কথা। নীপুকে গিয়া সে ধরিল। নীপু কহিল,—সে কি! নিশ্চয় যাবেন। আমি নিয়ে যাবো আপনাকে। এর জন্য আবার রাধদার অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে হবে? আপনি পাগল হয়েচেন! নিন, তৈরী হোন্!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আমি যা'রে ভালবাসি

আমি যা'রে ভালবাসি
তা'রে যদি বলে কেহ কালো,
নিশ্চয় বলিতে পারি
তা'র চক্ষু কভু নহে ভালো।
আমার প্রিয়ার যে গো
সুনির্ম্মল চন্দ্রিমা বদন,
প্রিয়ারে আমি যে দেখি
চোখে মেখে প্রেমের অঞ্জন।

শ্রীঅশ্রুপূর্ণ ভট্টাচার্য্য (বি, এস্-সি)।

প্রাচীন ভারতের দলীল

মানুষের স্মৃতি দুর্ব্বল। সংসারে বাস করিতে হইলে মানুষে মানুষে নানা প্রকার লেন-দেন হয়, সেগুলি যত দিন কেবল স্মরণে রাখিতে হইত, মানুষের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। লেখার আবিষ্কার হইতেই মানুষ আপনাদের কাযকর্ম্ম ও পরস্পরের চুক্তি লিখিয়া রাখিতে শিখিল। যাহাতে ইহা লেখা থাকে এবং বিবাদ-বিষয়ে সাধারণতঃ যাহার প্রয়োজন হয়, তাহাকে দলীল বলে।

হিন্দু ব্যবহারের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীনরাও দলীলের ব্যবহার জানিতেন। আমাদের ব্যবহার বলে—বিবদমান বিষয়ের তিনটি প্রমাণ ;—লেখ্য, ভুক্তি, সাক্ষ্য। ইহার অভাবে দিব্য বিধি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্।
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে ॥"

তামা-তুলসী-গঙ্গাজল বর্ত্তমানের আদালতে একবারে অচল না হইলেও তাহার ব্যবহার বিবাদীর মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। শাস্ত্রেও দেখি, ঋষিরা মানুষী প্রমাণ পাইলে দিব্য প্রমাণ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মানুষী প্রমাণের মধ্যে আবার সাক্ষ্য অপেক্ষা লেখ্যের আদর বেশী। আজ লেখ্য বা দলীলের কথা আলোচনা করিব।

বশিষ্ঠ লেখ্যের দুই ভাগ করিয়াছেন ;—লৌকিক ও রাজকীয়।

"লৌকিকং রাজকীয়ং চ লেখ্যং বিদ্যাং দ্বিলক্ষণম্।"

রাজকীয় লেখ্য চারি প্রকার ;—শাসন, জয়পত্র, আজ্ঞাপত্র ও প্রজ্ঞাপনাপত্র।

"শাসনং প্রথমং জ্ঞেয়ং জয়পত্রং তথাঽপরম্।
আজ্ঞাপ্রজ্ঞাপনাপত্রং রাজকীয়ং চতুর্ব্বিধম্ ॥"

সে কালে রাজারা বড় বড় পণ্ডিতকে, কুশলী সেনাপতি প্রভৃতিকে কিম্বা কোন প্রিয়পাত্রকে মধ্যে মধ্যে দান করিতেন। সেই সব দান যে দলীলে লেখা হইত, তাহাকে শাসন বলিত। শাসনগুলি সাধারণতঃ তামার পাতে দেওয়া হইত, এই জন্য সেগুলিকে তাম্রশাসন বলা হইত। প্রাচীনকালের এই সমস্ত তাম্রশাসন সংগ্রহ করিয়া পুরাতাত্ত্বিকরা অনেক পুরাতন কাহিনী উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যে পাই :—

"দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যং তু কারয়েৎ।
আগামি-ভদ্র-নৃপতি-পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥"

যখন রাজা কোনও ভূমি বা নিবন্ধ কাহাকেও দান করেন, তখন যেন তিনি ভবিষ্যৎ নৃপগণের জ্ঞাতার্থ লেখ্য করিয়া দেন। নিবন্ধ পারিভাষিক শব্দ। বণিক প্রভৃতি প্রতি বর্ষে কিম্বা প্রতি মাসে কিছু কিছু লভ্যাংশ কোনও ব্রাহ্মণকে বা দেবতাকে দিবেন, এইরূপ বন্দোবস্তকে নিবন্ধ বলা হইত।

বৃহস্পতি এই বিষয়ে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

"দত্ত্বা ভূম্যাদিকং রাজা তাম্রপট্টে তথা পটে।
শাসনং কারয়েদ্ধর্ম্ম্যং স্থানবংশাদিসংযুতম্ ॥
অনাচ্ছেদ্যমনাহার্য্যং সর্ব্বভাব্যবিবর্জ্জিতম্।
চন্দ্রার্কসমকালীনং পুত্রপৌত্রান্বয়ানুগম্ ॥"

রাজা যখন ভূমি কিম্বা অন্য বস্তু দান করিবেন, তখন তাম্রফলকে বা বস্ত্রপুটে সেই দানের শাসন লেখাইবেন। শাসনে দানের স্থান, দাতা ও গ্রহীতার বংশপরিচয় নিবেশিত করিবেন। চন্দ্র-সূর্য্য যত দিন, তত দিন দানের স্থায়িত্ব ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য, ইহাও লিখিবেন। এই দান কোনও কারণেই ফিরাইয়া লওয়া হইবে না, কিম্বা কোনও কারণেই হ্রাস করা হইবে না এবং কোনও করাদি লওয়া হইবে না, তাহাও লিখিবেন।

অন্যান্য স্মৃতিকাররা এই বিষয়ে যে সব বিধান দিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, শাসনে রাজার নাম ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম, গ্রহীতার নাম, বংশপরিচয়, দানের সঠিক বিবরণ, ভূমির সীমা, দানাব্দ লিখা থাকিত। রাজার সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক শাসন লিখিতেন, রাজা তখন নিজ নাম লিখিয়া, নিজ মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া, শাসনগ্রহীতাকে দিতেন।

"সন্ধিবিগ্রহকারী চ ভবেদ্যশ্চাপি লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্।
স্বনাম তু লিখেৎ পশ্চাৎ মুদ্রিতং রাজমুদ্রয়া।
গ্রামক্ষেত্রগৃহাদীনামীদৃক্ স্যাদ্রাজশাসনম্॥"

প্রীতিদত্ত শাসনকে বৃহস্পতি প্রসাদলিখিত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এখন যেমন মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেওয়া হয়, তখনও তেমনই রায় দেওয়া হইত। রায় অনুসারে ডিক্রী দেওয়া হইত। ডিক্রীকে জয়পত্র বলা হইত। ব্যাস বলেন :—

"ব্যবহারান্ স্বয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বা প্রাড্বিবাকতঃ।
জয়পত্রং ততো দদ্যাৎ পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ।"

রাজারা তখন নিজে বিচার করিতেন। অসমর্থ হইলে প্রাড্বিবাক বিচার করিতেন। লোকের পরিজ্ঞানের জন্য জয়ীকে রাজা জয়পত্র দিতেন। ব্যাসে আরও পাই—

"জঙ্গমং স্থাবরং যেন প্রমাণেনাত্মসাৎ কৃতম্।
ভাগাভিশাপসংদিগ্ধো যঃ সম্যগ্বিজয়ী ভবেৎ।
তস্মৈ রাজ্ঞা প্রদাতব্যং জয়পত্রং সুনিশ্চিতম্॥"

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যখন কেহ যথোচিত প্রমাণ-প্রয়োগে আপনার সাব্যস্ত করিতে পারে, তখন রাজা তাহাকে জয়পত্র দিবেন। জয়পত্রে বাদ, প্রতিবাদ, সাক্ষ্য, প্রমাণ, তাহাদের পরীক্ষা ও বচন ও শেষ নির্ণয় সকলই লেখা থাকিবে।

বৃহস্পতিও এই কথা বলিয়াছেন :—

"পূর্ব্বোত্তরক্রিয়াযুক্তং নির্ণয়ান্তং সদা নৃপঃ।
প্রদদ্যাজ্জয়িনে লেখ্যং জয়পত্রং তদুচ্যতে॥"

রাজা বাদের পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, ক্রিয়া ও নির্ণয়যুক্ত যে লেখ্য জয়ীকে দেন, তাহাকে জয়পত্র বলে।

যখন কেহ নালিশ করে, তখন তাহার প্রদত্ত আরজীকে পূর্ব্বপক্ষ বলে, জবাবকে উত্তরপক্ষ বলে, সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়া বিচারকে ক্রিয়া বলে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ আলোচনা করিয়া যে রায় হয়, তাহাকে নির্ণয় বলে। জয়পত্রে বা ডিক্রীতে এই সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হইত। সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত লেখাই ছিল উদ্দেশ্য।

ব্যাস বলেন :—

"পূর্ব্বোত্তরক্রিয়াপাদং প্রমাণং তৎপরীক্ষণম্।
নিগদং স্মৃতিবাক্যং চ যথা সত্যং বিনিশ্চিতম্।
এতৎসর্ব্বং সমাসেন জয়পত্রে বিলেখয়েৎ॥"

আরজী, জবাব, প্রমাণ, তাহার পরীক্ষা, সাক্ষিবচন, স্মৃতিবাক্য, রায় সমস্তই সংক্ষেপে ডিক্রীতে লিখিবে।

কাত্যায়ন ইহার বিশদ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন :—

অভিযোক্তা ও অভিযুক্তের বচন আগে লিখিবে, সভ্য, প্রাড্বিবাক বা কুলের বচন পরে লিখিবে, পরে স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী নিশ্চয় লিখিবে, পরে রাজার মত লিখিবে।

তখন সাধারণতঃ বিচারকালে দু'তিন জন জজ থাকিতেন, তাহা ছাড়া জুরী থাকিতেন, সকলকেই ডিক্রীতে সহি করিতে হইত।

এখন যেমন একবার ডিক্রী পাইলে সে বিষয় Res Judicate হয়—পুনরায় সে সম্বন্ধে বিচার হয় না, পূর্ব্বেও তাহাই হইত। কাত্যায়নে পাই,—

"নিরস্তা তু ক্রিয়া যত্র প্রমাণেনৈব বাদিনা।
পশ্চাৎকারী ভবেত্তত্র ন সর্ব্বাসু বিধীয়তে।"

যে জয়পত্র বাদ, প্রতিবাদ, প্রমাণ ও বিচার-সম্বলিত থাকিত, তাহা পশ্চাৎ উত্থাপিত বিতর্কের নিরসন করিত, কিন্তু প্রমাণযুক্ত চতুষ্পাদ ব্যবহার না হইলে হইত না।

সমস্ত ডিক্রীই Res Judicate হইত না। যেখানে সমস্ত বিষয় সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া নির্ণীত হইয়াছে, সেই জয়পত্রই পশ্চাৎকাররূপে কথিত হইত। যেখানে সাধ্য অর্থের নির্ণয় হয় নাই, সেখানে বিচার চলিত। বৃহস্পতির বচন হইতে এ বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। বৃহস্পতির উক্তি :—

"সাধয়েৎ সাধ্যমর্থং তু চতুষ্পাদান্বিতে জয়ে।
রাজমুদ্রান্বিতং চৈব জয়পত্রকমিষ্যতে॥"

চতুষ্পাদান্বিত জয়ে বিবদমান বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবে এবং রাজমুদ্রাঙ্কিত করিয়া জয়পত্র দিবে।

যে সব বিষয়ে দ্বিপাদ ব্যবহার হইত, সেখানে ভাষা ও উত্তরযুক্ত জয়পত্র দেওয়া হইত, কিন্তু তাহা পশ্চাৎকারী হইত না। অন্যপ্রকার জয়পত্রও ছিল :—

"অন্যবাদ্যাদিহীনেভ্য ইতরেষাং প্রদীয়তে।
বৃত্তানুবাদসংসিদ্ধং তৎ স্যাদ্বৈ জয়পত্রকম্॥"

বাদহীন একতরফা ডিক্রীতে ঘটনাসংবলিত বিবরণ দেওয়া হইত।

যখন সামন্ত, ভৃত্য বা রাষ্ট্রপালের নিকট রাজা কোনও আজ্ঞা প্রচার করিতেন, তাহাকে আজ্ঞাপত্র বলিত। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন :—

"সামন্তেম্বথ ভৃত্যেষু রাষ্ট্রপালাদিকেষু বা।
কার্য্যমাদিশ্যতে যেন তদাজ্ঞাপত্রমুচ্যতে ॥"

আর ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য বা অন্যের নিকট যে নিবেদন প্রেরিত হইত, তাহাকে প্রজ্ঞাপনপত্র বলা হইত।

"ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যমান্যেম্বভ্যর্হিতেষু তু।
কার্য্যং নিবেদ্যতে যেন পত্রং প্রজ্ঞাপনায় তৎ ॥"

আজ্ঞাপত্র রাজার আদেশে অধীনস্থ ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হইত। প্রজ্ঞাপনপত্র মানীর নিকট প্রেরিত পত্রকে বলা হইত।

লৌকিক দলীল

লৌকিক লেখ্যের আর এক নাম ছিল—জানপদ লেখ্য। ব্যাস বলেন :—

"লিখেজ্জানপদং লেখ্যং প্রসিদ্ধস্থানলেখকঃ।
রাজবংশক্রমযুক্তং বর্ষমাসার্দ্ধবাসরৈঃ ॥
পিতৃপূর্ব্বং নামজাতি ধনিঋণিকয়োর্লিখেৎ।
দ্রব্যভেদপ্রমাণং চ বৃদ্ধিং চোভয়সম্মতাম্ ॥

লৌকিক লেখ্য লিখিবার জন্য বর্ত্তমানের মত রেজেষ্ট্রী আফিস ছিল। সেখানে এখনকার মত সাধারণ দলীল-লেখক থাকিত। তাহারাই এই সকল দলীল লিখিত। দলীলে রাজার নাম ও বংশ-পরিচয়, বর্ষ, মাস, পক্ষ ও দিন, দাতা ও গ্রহীতার নাম, পিতৃনাম, জাতি, গোত্র ও উভয়সম্মত দ্রব্য প্রভৃতি এবং বৃদ্ধি প্রভৃতি লেখা থাকিবে। এখনকার মত দলীল রেজেষ্ট্রী করিবার বিধানও ছিল।

বিষ্ণুসংহিতায় পাই :—অথ লেখ্যং ত্রিবিধম্ ;—রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্। যত্র কচন যেন কেনচিল্লিখিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতং সসাক্ষিকম্। স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্।

অর্থাৎ দলীল তিন রকম :—রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক, অসাক্ষিক। নিজে হাতে লেখা দলীল অসাক্ষিক। যে কোনও স্থানে যে কেহ যে দলীল লেখে এবং সাক্ষিগণ স্বহস্তে সহি করে, তাহাকে সসাক্ষিক বলে, আর রাজাধিকরণে রাজনিযুক্ত কায়স্থ কর্ত্তৃক লিখিত এবং অধিকরণাধ্যক্ষের হস্তচিহ্নিত দলীল রাজসাক্ষিক। ইহা হইতে জানা যায়, এখনকার মত তখনও Registration offico ছিল এবং সেখানে রাজনিযুক্ত Rogistrar এবং মুহুরী (কায়স্থ) থাকিতেন।

যাজ্ঞবল্ক্যে পাই :—

"যঃ কশ্চিদর্থো নিষ্ণাতঃ স্বরুচ্যা তু পরস্পরম্।
লেখ্যং তু সাক্ষিমৎ কার্য্যং তস্মিন্ ধনিকপূর্ব্বকম্ ॥"

যখন দুই পক্ষ পরস্পর সম্মতিমতে যে কোনও চুক্তি করিবে, তখন সাক্ষী রাখিয়া সে সম্বন্ধে দলীল করিয়া লইবে। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলেন : তাহাতে ধনীর নাম প্রথমে লিখিতে হইবে, এবং ঐ লেখ্য বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সব্রহ্মচারিক ও নিজ পিতৃনামাদি দ্বারা চিহ্নিত করিবে। সব্রহ্মচারিক অর্থ—আমি অমুক মাধ্যন্দিন, আমি অমুক পাঠক ইত্যাদিরূপ পরিচয় লিখিবে।

দলীল লেখা শেষ হইলে অধমর্ণ "উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা অমুকের পুত্র আমার কথিত মতে লেখা হইল" এই কথা স্বহস্তে লিখিবেন। সাক্ষিগণও 'আমি অমুক এ বিষয়ে সাক্ষী রহিলাম' বলিয়া পিতৃনাম পূর্ব্বক সহি করিবেন। আর সর্ব্বশেষে লেখক লিখিবেন, "অমুকের পুত্র আমি অমুক দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রার্থনা অনুসারে ইহা লিখিলাম।"

যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানের সহিত বর্ত্তমান বিধান কিছু স্বতন্ত্র, এখনসাধারণতঃ লেখক আগে সহি করেন, পরে ঋণী সহি করেন, তার পর সাক্ষিগণ সহি করেন এবং কোনও কোনও স্থলে লেখকও সাক্ষিস্বরূপ সহি করেন।

বশিষ্ঠও বলেন :—

"কালং নিবেশ্য রাজানং স্থানং নিবসিতং তথা।
দায়কং গ্রাহকং চৈব পিতৃনাম্না চ সংযুতম্।
জাতিং স্বগোত্রং শাখাং চ দ্রব্যমাধিং সসংখ্যকম্।
বৃদ্ধিং গ্রাহকহস্তং চ বিদিতার্থৌ চ সাক্ষিণৌ ॥"

লেখ্যে রাজার নাম, কাল, স্থান ও ঠিকানা, দায়ক ও গ্রাহক, উভয়ের পিতৃনাম, জাতি, গোত্র, শাখা, সসংখ্যকদ্রব্য বা আধি, বৃদ্ধি, গ্রাহকহস্ত বিদিতার্থ দুই জন সাক্ষীর নাম সন্নিবেশ করিবে।

দলীলে যোড় সাক্ষী হওয়ার বিধান ছিল, বিযোড় সাক্ষী লওয়া অবিধেয় ছিল। অন্ততঃপক্ষে দুই জন সাক্ষী রাখার নিয়ম ছিল। উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, দুই জন সাক্ষী, এবং লেখক এই পাঁচ জন অবশ্য অবশ্য থাকিবে বলিয়া দলীলকে পঞ্চারূঢ় পত্র বলা হইত।

দায়ক অশিক্ষিত হইলে অন্যে তাঁহার নাম লিখিয়া দিতে পারিত। নারদ বলেন :—

"অলিপিজ্ঞো ঋণী যঃ স্যাল্লেখয়েৎ স্বমতং তু সঃ।
সাক্ষী বা সাক্ষিণাঽন্যেন সর্ব্বসাক্ষিসমীপতঃ॥"

ঋণী লিপিজ্ঞানহীন হইলে স্বমত অন্য সাক্ষী কর্ত্তৃক সর্ব্ব-সাক্ষীর উপস্থিতিতে লিখাইবে।

যদি ঋণী দলীলের ভাষা না জানে, কিন্তু অন্য লিপি জানে, তখন সে স্বকীয় লিপিতেই লিখিবে।

"সর্ব্বে জানপদান্ বর্ণান্ লেখ্যে তু বিনিবেশয়েৎ।"

লেখ্যে সর্ব্ব জনপদের বর্ণমালাই সন্নিবেশ করা চলিবে।

তখনকার দিনে নানারকম দলীল চলিত ছিল। বৃহস্পতির বচনে সাত রকম দলীলের কথা জানা যায়।

"ভাগদান-ক্রয়াধান-সংবিদ্দাসঋণাদিভিঃ।
সপ্তধা লৌকিকং লেখ্যং ত্রিবিধং রাজশাসনম্॥"

জানপদ লেখ্যের সাধারণতঃ সাত ভাগ—(১) ভাগ-লেখ্য, (২) দানপত্র, (৩) কবালা, (৪) রেহেলি খত, (৫) চুক্তিনামা, (৬) দাসখত, (৭) খত আর রাজকীয় ত্রিবিধ—(১) দান, (২) প্রসাদলিখিত, (৩) জয়পত্র। এই সংখ্যা নিদর্শনমাত্র, আদি কথার দ্বারা আরও অন্যান্য প্রকার লেখ্য ছিল, তাহা বুঝা যায়। বৃহস্পতি এই সকল দলীল বর্ণনা করিয়াছেন। যখন ভাই ভাই স্বেচ্ছায় অবিভক্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয়, তখন তাহাকে ভাগলেখ্য বলা হয়। ভূমিদানের দলীলকে দানপত্র বলে। গৃহক্ষেত্রাদি ক্রয় করিলে তুল্যমূল্যাদিসংযুক্ত পত্রকে ক্রয়-লেখ্য বলে। যখন কেহ কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেয়—ভোগ্যাই হউক বা গোপ্যাই হউক, সেই আধির লেখ্যকে আধিপত্র বলে। গ্রামের ও দেশের লোকেরা পরস্পরের সুবিধার জন্য যে অঙ্গীকার করে, তাহাকে সংবিৎ-পত্র বলে। বিপন্ন হইয়া তোমার দাসত্ব করিব বলিয়া যে দলীল করে, তাহাকে দাসপত্র বলে।

সুদে টাকা কর্জ্জ লইয়া যে খত লেখা হয়, তাহাকে উদ্ধারপত্র বলে। ইহা ছাড়া সীমা-বিবাদ নির্ণীত হইলে সীমাপত্র লেখা হইত। ঋণ শোধ হইলে মুক্তিপত্র হইত।

এই সমস্ত দলীলের সম্বন্ধে ব্যাস আট রকম ভাগ করিয়াছেন ;—

"চিরকং চ স্বহস্তং চ তথোপগতসংজ্ঞিতম্।
আধিপত্রং চতুর্থং চ পঞ্চমং ক্রয়পত্রকম্।
ষষ্ঠং তু স্থিতিপত্রাখ্যং সপ্তমং সন্ধিপত্রকম্।
বিশুদ্ধিপত্রকং চৈবমষ্টধা লৌকিকং স্মৃতম্॥"

(১) চিরক, (২) স্বহস্ত-লিখিত, (৩) উপগত, (৪) আধিপত্র, (৫) ক্রয়পত্র, (৬) স্থিতিপত্র, (৭) সন্ধি-পত্র, (৮) বিশুদ্ধিপত্র।

চিরক পারিভাষিক। তাহার অর্থ নিম্ন-শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"চিরকং নাম লিখিতং পুরাণৈঃ পৌরলেখকৈঃ।
অর্থি-প্রত্যর্থি-নির্দ্দিষ্টৈঃ যথাসম্ভবসংস্তুতৈঃ।
স্বকীয়ৈঃ পিতৃনামাদ্যৈরর্থিপ্রত্যর্থিসাক্ষিণাম্।
প্রতিনামভিরাক্রান্তমর্থিসাক্ষিস্বহস্তবৎ।
স্পষ্টাবগমসংযুক্তং যথা স্মৃত্যুক্তলক্ষণম্॥"

চিরক পৌরলেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইত। সেই দক্ষ পৌরলেখক অর্থী প্রত্যর্থী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও যথাসম্ভব সংস্তুত হইত অর্থাৎ কার্য্যানুরূপ দক্ষিণা দিতে হইত। তাহাতে লেখক, অর্থী, প্রত্যর্থী ও সাক্ষিগণের নাম ও পিতৃনাম, অর্থী ও সাক্ষিগণের সহি থাকিত। স্মৃতিবিহিত নির্দ্দেশানুসারে সুস্পষ্ট ভাষায় লেখা হইত।

অর্থী নিজে দলীল লিখিলে তাহাকে স্বহস্তলিখিত বলা হইত। ঋণী কর্ত্তৃক স্বীকৃত দলীলকে উপগত বলা হইত, আধি ও কবালার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্থিতিপত্র সম্বন্ধে কাত্যায়নের সংজ্ঞা :—

"চাতুর্ব্বিদ্য-পুর-শ্রেণীগণপৌরাদিকস্থিতিঃ।
তৎসিদ্ধ্যর্থং তু যল্লেখ্যং তদ্ভবেৎ স্থিতিপত্রকম্ ॥"

চতুর্বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণের, নাগরিক বা গ্রামবাসীর, বণিক্‌সংঘের বা কারুসংঘের মধ্যে যে সমস্ত নিয়মাবলী রচিত হইত, তাহাকে স্থিতিপত্র বলা হইত। স্থিতিপত্রকে বর্ত্তমান দিনের কোম্পানী প্রভৃতি By laws বলা চলে। সন্ধিপত্র সোলেনামা। আর শুদ্ধিপত্র—যখন কেহ কোনও প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিত, তখন তাহাকে দেওয়া হইত।

দলীলের প্রয়োজন সম্বন্ধে হারীত বলিয়াছেন :—

"স্থাবরে বিক্রয়াধানে বিভাগে দান এব চ।
লিখিতেনাপ্নুয়াৎ সিদ্ধিমবিসংবাদমেব চ ॥"

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, আধান, বিভাগ বা দান প্রভৃতি বিষয়ে লেখ্য রাখাই উচিত। কারণ, কালান্তর হইলেও তাহা হইতে অঙ্গীকৃত বিষয়ের মর্ম্ম জানা যায় এবং বিবদমান বিষয়ের সিদ্ধি হয়। দৃষ্টপ্রয়োজনমতে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে এই সমস্ত স্থলে অবশ্য অবশ্য লেখ্য করিবে।

লেখ্যের গুরুত্ব নিবন্ধন যাজ্ঞবল্ক্য লেখ্য নষ্ট হইলে, চুরি গেলে, দেশান্তরে রহিলে, পড়িতে পারা না গেলে, ছিঁড়িলে, পুড়িলে, লুপ্তাক্ষর হইলে বা মর্দ্দিত হইলে অন্য লেখ্য করিবার বিধান দিয়াছেন।

কাত্যায়ন বলেন :—

"মলৈর্যৎ ভেদিতং দগ্ধং ছিদ্রিতং বীতমেব বা।
তদন্য কারয়েল্লেখ্যং স্বেদেনোল্লিখিতঞ্চ বা ॥"

নারদ বলেন :—

"লেখ্যে দেশান্তরন্যস্তে শীর্ণে দুর্লিখিতে হৃতে।
সতস্তৎকালকরণমসতো দৃষ্টদর্শনম্ ॥"

দলীল যখন ময়লা হয়, পুড়িয়া বা ছিদ্র হইয়া যায়, কিংবা নষ্ট হয়, কিংবা ঘামে মুছিয়া যায়, তখন অন্য দলীল করিবে। লেখ্য দুর্লিখিত, চোরিত, ছিন্ন বা দেশান্তরন্যস্ত থাকিলে, জ্ঞাতার্থ হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য লেখ্য করিবে আর না জানা গেলে সাক্ষিপ্রমাণ লইয়া লেখ্যান্তর করিবে।

উদ্ধৃত আলোচনায় আমরা সে-কালের যে অনুপম চিত্র দেখি, তাহাতে পুলকিত না হইয়া পারি না। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বেও আমাদের পিতৃপিতামহগণ যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তাহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই—এ-কথা চিন্তা করিতে কাহার না আনন্দ অনুভব হইবে ?

বর্ত্তমানের বিধিবিধানের সহিত অতীত বিধির এই সামঞ্জস্য ও ঐক্য দেখিয়া আমরা নিশ্চয়ই অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইব এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণকে অনগ্রসর মূর্খ মনে করিবার ধৃষ্টতা পরিহার করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ-বি-এল)।

ভ্রান্তি

(কবীর)

দুনিয়া এমন হয়েছে পাগল
ভক্তি না বুঝে কেহ,
কেহ চায় ছেলে, কহে, হে গোঁসাই
পুত্র আমারে দেহ।

দুখ-ভারে কেহ আসে মোর কাছে
বলে, কৃপা কর মোরে।
কেহ চায় ধন, কেহ দেয় ধন
উপহার ডালি ভ'রে।

সত্যের কেহ হ'ল না গ্রাহক
মিথ্যারে খোঁজে সবে,
হেন অন্ধেরে লয়ে কিবা করি
কে গো মোরে ব'লে দেবে।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

ভূচর-যান জলে পড়িলে যাহাতে অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত ভাসিয়া থাকিতে পারে, বৈজ্ঞানিক তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত যানের দুই পার্শ্বে রবার-নির্ম্মিত দুইটি ব্যাগ থাকে। কারবন ডায়ক্সাইড্ গ্যাস আপনা হইতে ঐ ব্যাগ দুইটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ফুলাইয়া তোলে। জলের

বামদিকের চিত্রে ব্যাগ ফুলিয়া উঠিতেছে; দক্ষিণের চিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে, জলের উপর যান ও পরিচালক নিরাপদে ভাসিতেছে
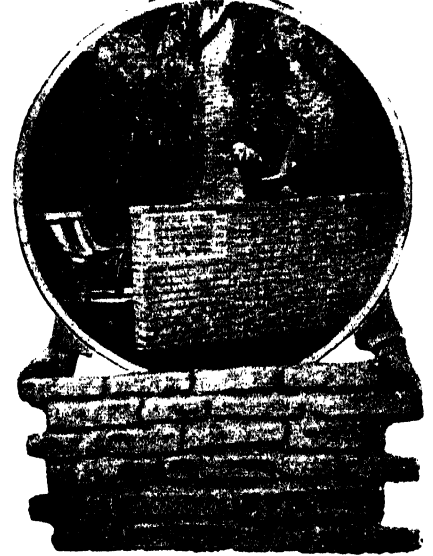
উপর যান পড়িবামাত্র একটা আধার হইতে তরল কার্ব্বন ডায়ক্সাইড নলের সাহায্যে প্রবাহিত হয়। ইহাতে নলের বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে তরল কার্ব্বন ডায়ক্সাইড বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পে পরিণত হইবামাত্র উহা ৫ শত গুণ স্থান অধিকার করিয়া বসে। যানের উভয় পার্শ্বস্থ পাখায় দুই পার্শ্বের ব্যাগ বাষ্পপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া পড়ে। তখন সমগ্র যানের ভার বহন করিয়া ব্যাগ দুইটি যানটিকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখে। যদি কোনও ক্রমে যানটি উল্টাইয়া জলের উপর পড়ে, ঐ উপায়ে তাহা সোজাভাবে জলের উপর ভাসিতে থাকিবে।

পাথর ও সিমেণ্টের জমাট প্রাচীর

পাথর ও সিমেণ্টের এক এক খণ্ড ৬ সারি করিয়া খাঁজকাটা জমান ব্লক ইদানীং নিউইংলণ্ডে প্রাচীরের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। উহা দেখিলে মনে হইবে, পুরাতন ইটে প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। ৬ সারি ব্লকের দুই দিকে খাঁজ আছে। একটা ব্লকের খাঁজ মিলাইয়া সিমেণ্ট করিয়া দিলে মনে হইবে,

পাথর ও সিমেণ্টের জমাট প্রাচীর

স্বতন্ত্র ইট দিয়া আগাগোড়া প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। একবার ভাল করিয়া রং করিয়া দিলে ঐ প্রাচীর যে বহু পুরাতন, তাহা দর্শকের মনে হইবে।

অসম্ভব দ্রুতগামী মোটর-গাড়ী

এই নূতন ধরণের গাড়ী হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট সহরে দর্শকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। এই গাড়ীর গতিবেগ প্রতি মিনিটে ৩ মাইলেরও উপর। অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৯৮ মাইল বেগে ইহা দৌড়িয়াছে। গাড়ীটির আকার অনেকটা চুরুটের মত।

গাড়ীর নাসিকা গোলাকার। এঞ্জিনের উপরের ঢাক্‌না, গাড়ী চালকের বসিবার আসনের মাথার উপরের দিক দিয়া পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত। এই ঢাক্‌না, পরিচালক ও যন্ত্রকে বায়ুর বেগ হইতে
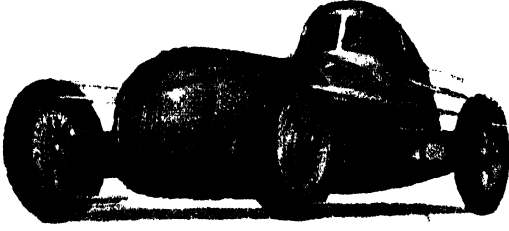
অসম্ভব গতিবেগশালী নূতন মোটর-যান

রক্ষা করে। উহা এমনভাবে নির্ম্মিত যে, বায়ুর বিরুদ্ধ বেগ উহাতে প্রতিহত হইয়া থাকে।

ঘুঁড়ির সংলগ্ন পতঙ্গধরা জাল

প্রকাণ্ড ঘুঁড়ির সঙ্গে বড় বড় জাল জুড়িয়া দিয়া তাহাতে পতঙ্গ ধরিবার ব্যবস্থা ইংলণ্ডে হইয়াছে। য়ুরোপ হইতে বায়ুপ্রবাহে নানাবিধ পতঙ্গ উড়িয়া আসে। এই ঘুঁড়ি আকাশে ছাড়িয়া দিলে জালের মধ্যে পতঙ্গগুলি ধরা পড়িয়া যায়। কি জাতীয়
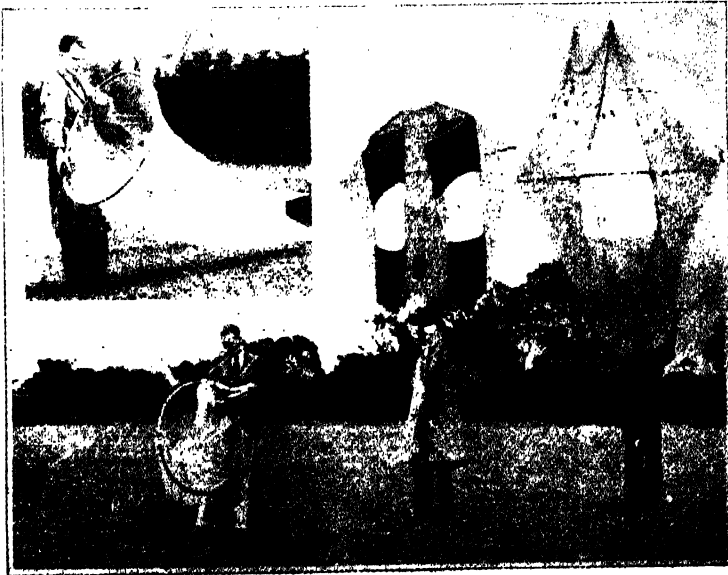
ঘুঁড়ির সংলগ্ন পতঙ্গধরা জাল

পতঙ্গ বাতাসে উড়িয়া আসে, তাহা পরীক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। কত উচ্চে কোন্ জাতীয় পতঙ্গ থাকে, তাহাও এই ব্যবস্থায় নির্ণীত হইয়া থাকে।

প্রাচীন যুগের বন্দুক

কালিফোর্ণিয়ায় প্রাচীন যুগের বন্দুক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মযুদ্ধের সময় যোদ্ধারা ঐ বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিত। পঞ্চদশ

প্রাচীন যুগের বন্দুক

শতাব্দীতে ঐ জাতীয় বন্দুকের ব্যবহার য়ুরোপ মহাদেশে হয়। তখন ইংলণ্ড তীরধনু ব্যবহার করিত। এই বন্দুক ৫ শত বৎসরের পুরাতন। কিন্তু বন্দুক হইতে গুলীর পরিবর্ত্তে তীর বাহির হইত। ঘোড়া টিপিলেই তীর নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটিয়া যাইত।

হুল-বর্জ্জিত মৌমাছির চাক

কালিফোর্ণিয়াতে মধুব্যবসায়ীরা হুল-বর্জ্জিত মৌমাছির সাহায্যে অতিরিক্ত মধু উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। সাধারণ মৌমাছিরা যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, তাহাতে যে পরিমাণ মধু পাওয়া যায়, হুলহীন মধুমক্ষিকা-নির্ম্মিত চক্রে তদপেক্ষা অনেক অধিক মধু পাওয়া যায়। ককেসস্ পর্ব্বত-মালায় এক জাতীয় মধুমক্ষিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ জাতীয় মধুমক্ষিকা রুসিয়ার আনিয়া ক্রোধ-প্রবণ ইটালীয় মধুমক্ষিকার সংযোগে যে নূতন মধুমক্ষিকার প্রজননক্রিয়া চলিয়াছে, তাহারা হুলহীন। ইহারা কদাচিৎ কাহাকেও দংশন করে। এই শ্রেণীর মধুমক্ষিকা যে চক্র রচনা

করে, তাহা হইতে অনায়াসে মধু সংগৃহীত হয়। এমন দেখা গিয়াছে যে, মধুমক্ষিকারা মধু নিষ্কাশনের সময় সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিলেও কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। এই সঙ্কর মৌমাছিদিগের মধুসংগ্রাহক জিহ্বা দীর্ঘ বলিয়া, তাহারা অধিক মধু

মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ—ওজন করিয়া দেখা হইতেছে, ২৪ ঘণ্টায় কত মধু সংগৃহীত হইল

এককালে সংগ্রহ করিতে সমর্থ। এই জাতীয় মৌমাছিদিগের মধুচক্র হইতে মধুসংগ্রহের সময় হাতে দস্তানা পরিতে হয় না, জাল বিছাইতে হয় না, ধূম্র সাহায্যে মক্ষিকা বিতাড়নেরও প্রয়োজন হয় না।

প্রবল আণবিক আকর্ষণ

বাউস্ এণ্ড লম্ব দৃষ্টিবিজ্ঞান-সংক্রান্ত দুই খণ্ড কাচ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ দুইখানি কাচ এমন সূক্ষ্মতমভাবে ঘষা হইয়াছে যে, কাচ দুইটিকে জুড়িয়া রাখিলে সহসা পৃথক করিতে পারা যাইবে না। প্রতি বর্গ ইঞ্চি-পরিমিত স্থানে ৯৫ হইতে এক শত পাউণ্ড ওজনের ভারেও কাচ দুইটি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইবে না। এখানে যে ছবি প্রদত্ত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কাচ দুইটি শুধু আণবিক আকর্ষণের ফলেই আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অন্য প্রকার বন্ধন নাই। এক জন যুবতী ঐ যুগ্ম কাচের একটিতে ঝুলিতেছে। অথচ একটি অপরটি হইতে

প্রবল আণবিক আকর্ষণের দৃষ্টান্ত

বিশ্লিষ্ট হইতেছে না। দুইখানি কাচ আণবিক আকর্ষণে পরস্পরকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

টোটা-নির্ম্মিত মডেল বাড়ী

ইলিনয়ের মিঃ ট্রায়ার নামক এক ব্যক্তি ১ হাজার ৫ শত শূন্যগর্ভ টোটার সাহায্যে একটি ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই টোটার ঘর নির্ম্মাণ করিতে দেড় পাউণ্ড রাং খরচ হইয়াছে। প্রত্যেক টোটা জুড়িয়া ঘরের সমস্ত অংশ রচিত হইয়াছে। শুধু জানালা ও দরজায়

গুলীশূন্য টোটা-নির্ম্মিত ঘর

টোটা ব্যবহৃত হয় নাই। অবসরকালে উক্ত ভদ্রলোক পরিশ্রম সহকারে উহা গঠিত করেন। এ জন্য ১৮ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

মোটর-গাড়ীর ছাদ সরাইবার কৌশল

য়ুরোপে নূতন ধরণের যে মোটর-গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ধাতব ছাদ সম্মুখের একটা বোতাম টিপিলেই পশ্চাতের দিকে আত্মগোপন করিবে। আবার পশ্চাতের দিকের একটা

মোটর-গাড়ীর ছাদ সরাইবার কৌশল

বোতাম টিপিলেই ছাদ আপনা হইতে যথাস্থানে বিন্যস্ত হইবে। ছবিতে তিনটি দৃশ্য আছে। উপরের দৃশ্যে দেখা যাইতেছে, ছাদযুক্ত গাড়ী চলিতেছে; মাঝেরটিতে দেখা যাইতেছে, বোতাম টিপিবার পর ছাদ পশ্চাতের দিকে চলিয়াছে, নিম্নের ছবিতে ছাদ অদৃশ্য হইয়াছে।

লক্ষ্যভেদের কৌশল

কালিফোর্ণিয়ার এক জন সুদক্ষ শিকারী, তাঁহার নাম কাপ্টেন এ. এইচ হার্ডি, অসাধারণ লক্ষ্যভেদকুশলী। তিনি টিন্-প্লেটের উপর বন্দুকের গুলীর দ্বারা নানাবিধ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। টিন-প্লেটের উপর কোনও রূপ মূর্ত্তির খসড়া অঙ্কিত না করিয়া তিনি বন্দুকের গুলী এমনভাবে নিক্ষেপ করিতে দড় যে, তাহাতে মূর্ত্তি সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়। একটি ছোট অটোমেটিক বন্দুক লইয়া টিন্-প্লেট হইতে ২০ ফুট দূরে তিনি অবস্থান করেন। দেড়শত গুলীর সাহায্যে ¼ ইঞ্চি ব্যবধানে টিন-প্লেটে ছিদ্র করিয়া ৩ মিনিটের মধ্যে তিনি যে কোন ইণ্ডিয়ানের মুখমণ্ডলের ছবি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন। ছবি আঁকিবার কৌশল তিনি জানেন বলিয়াই বন্দুকের সাহায্যে তিনি এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ।

বন্দুকের গুলীর সাহায্যে ছবি অঙ্কন

টেলিফোন যন্ত্রের নূতন আধার

কালিফোর্ণিয়ার কোনও মহিলা টেলিফোন যন্ত্র রাখিবার এক প্রকার চমৎকার আধার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ আধারে
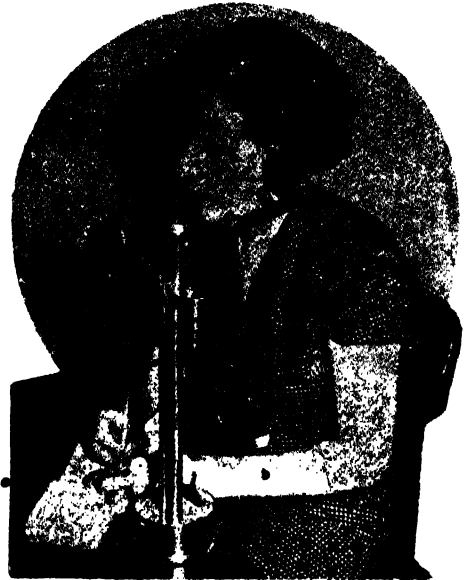
টেলিফোন যন্ত্রের নূতন আধার

টেলিফোন যন্ত্র রাখিলে, উভয় হস্ত মুক্ত থাকে। আধারটি এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, যন্ত্রের একাংশ কাণের কাছে থাকে, অপরাংশ মুখের কাছে থাকে। ইহাতে বলা ও শোনার কোনও বিঘ্ন হয় না।

নরখাদক মানুষ বাঘ ?

(শিকার-কাহিনী)

পঞ্জাব প্রদেশের কোন সামরিক কর্ম্মচারী শিক্ষানবীশ শিকারী হইলেও শিকারের সখ মিটাইবার জন্য মধ্যপ্রদেশে গমন করিয়া একটি নরখাদক ব্যাঘ্র শিকারের সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। সেই বাঘটি সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসিবর্গের ধারণা ছিল, সেটি মানুষ, সে মন্ত্রবলে ব্যাঘ্র-দেহে পরিণত হইয়া শতাধিক লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিল। শিকারী এই ব্যাঘ্র শিকারের অদ্ভুত কাহিনীগুলির কোন বিখ্যাত মাসিকে 'পঞ্জাবী' এই ছদ্ম নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত শিকার-কাহিনী পাঠক-পাঠিকাগণের প্রীতিকর হইবে, এই আশায় ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"..মধ্যপ্রদেশে শিকারের সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া আমি সেই অঞ্চলের বন-বিভাগের তিন জন কর্ম্মচারীকে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলাম, তাঁহাদের এলাকায় শিকারের জন্য 'ব্লক' (গুলী চালাইবার উপযোগী সীমাবদ্ধ স্থান) সংগ্রহের ব্যবস্থা হইবে কি না ? সেই তিন জনের নিকট হইতে আমার প্রশ্নের একই উত্তর পাইলাম। তাঁহারা সকলেই আমাকে বৎসরের সেই সময় মধ্যপ্রদেশে শিকারের খেয়াল ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন।

তাঁহাদের এই মন্তব্যে নিরুৎসাহ না হইয়া মেজর এক্সএর সহিত দেখা করিতে চলিলাম। তিনি মধ্যপ্রদেশে বহুবার শিকার করিয়াছেন ; এবং সুদীর্ঘ অবকাশের পর সংপ্রতি সরকারী কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। মেজর তখন মেসে বাস করিতেছিলেন। আমি তাঁহারই উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছায় তাঁহার মেসে উপস্থিত হইয়া, সেখানে তাঁহাকে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। আমি কোন ভূমিকা না করিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, 'মেজর, আমি মধ্যপ্রদেশে শিকার করিতে যাইব মনে করিয়াছি ; সেখানে বড় রকমের শিকারের কি সুবিধা হইতে পারে, তাহাই আপনার নিকট জানিতে আসিয়াছি।'

আমার কথা শুনিয়া মেজর মুখ হইতে তামাকের পাইপটা নামাইয়া ঊর্দ্ধমুখে এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন ; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'বৎসরের এ সময় সেখানে শিকারের কোন রকম সুবিধা হইবে না। বৎস ! এ সময় শিকারের সন্ধান পাওয়াই কঠিন ; তাহার উপর চতুর্দ্দিক্ জলে জলময়, এবং ঐ অঞ্চলটি এখন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। আমি যদি তোমার মত বাতিকগ্রস্ত হইতাম, তাহা হইলে খৃষ্টমাস বা আগামী বৎসরের প্রথমাংশ, অর্থাৎ বর্ষারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতাম। এ সময় সেখানে শিকারে গিয়া নিরাশামাত্র সঞ্চয় করিবে।' অগত্যা আমাকে স্বীকার করিতে হইল, আমি সেখানে শিকারের জন্য একটি ব্লক ভাড়া করিবার আদেশ করিয়া পত্র লিখিয়াছি। কিন্তু সেখান হইতে পত্রের যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা আদৌ উৎসাহ-জনক নহে।

মেজর বলিলেন, 'উৎসাহজনক না হইবারই কথা। তবে বনবিভাগের লোকরা এ সময় নরভুক্ ব্যাঘ্রের তত্ত্বতল্লাস লইয়া থাকে বটে।'

আমি চেয়ারের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সবিস্ময়ে বলিলাম, 'নরভুক্ ব্যাঘ্র ! আপনি বলিতেছেন কি, মেজর ! এ কালে ত ঐ শ্রেণীর বাঘের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না ; অথবা উহাদের অস্তিত্বের কথা কেবল গল্পেই শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা কি আপনি স্বীকার করেন না ?'

মেজর বলিলেন, 'এই শ্রেণীর বাঘ যে সুলভ নহে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যদি তুমি সি, পি, গেজেটের কোনও এক কাপি খুলিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তাহাতে মানুষ-খেকো বাঘ শিকারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। ভাল কথা—যদি তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চাঙ্গার ডেপুটী কমিশনারকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার—তাঁহার এলাকায় এখন মানুষ-খেকো বাঘের দৌরাত্ম্য আছে কি না।'

মেজর ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে ধূমপান করিয়া বলিলেন, 'যাহা হউক, যদি তুমি আমার উপদেশে চলিতে চাও—তাহা হইলে আমি বলিব যে, যে পর্য্যন্ত মানুষখেকো বাঘগুলার ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে না পারিতেছ, তত দিন পর্য্যন্ত উহাদের ঘাঁটাইতে না যাওয়াই ভাল। ঐ শ্রেণীর কোন বাঘ শিকার করিতে পারিলে কদাচিৎ এক শত টাকার অধিক পুরস্কার পাওয়া যায় ; কিন্তু ঐ রকম একটা বাঘ শিকার করিতে যতখানি বেগ পাইতে হয়, তাহার তুলনায় ঐ পুরস্কার সামান্য বলিয়াই মনে হয় ; ইহার উপর বিপদের যে আশঙ্কা আছে, সে কথা ত ধরিলামই না।'

নরভুক্ ব্যাঘ্র শিকার ! মেজরের নির্দ্দেশানুসারে আমি এই বিষয়েই কৃতসঙ্কল্প হইয়া চাঙ্গাতে এক পত্র লিখিলাম। দুই দিনের মধ্যেই আমার নিকট এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। টেলিগ্রামে লেখা ছিল—'চাঙ্গা হইতে চল্লিশ মাইল দূরে নরখাদক ব্যাঘ্র আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে। অনুমতির ব্যবস্থা হইতেছে। কবে আসা সম্ভব—তার করুন।—ডি—কম্।'

কি আশ্চর্য্য ! মেঘ চাহিতেই জল ! মহা উৎসাহে টেলিগ্রাম-খানি পকেটে পুরিয়া আমার লটবহর গুছাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম ; তাহার পর মধ্যপ্রদেশে যাত্রার আয়োজন। টেলিগ্রামখানি প্রায় পঞ্চাশবার পাঠের পর ট্রেণে উঠিয়া বসিলে টেলিগ্রামের একটা কথায় আমার মনে খটকা বাধিল। সেই কথাটি—'আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে !'—ইহা কি অশুভ ইঙ্গিত নহে ?—আমার মনে হইল, টেলিগ্রামের এই কথাটি অপেক্ষাকৃত মোলায়েম ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যাইত।

আমি যে প্রদেশে যাত্রা করিলাম, ভারতের সেই প্রদেশ সম্বন্ধে যে সকল পাঠকের অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদের একটা স্থূল ধারণা উৎপাদনের জন্য এ কথা বলিতে হইতেছে যে, বৎসরের এই সময় সেই প্রদেশের জঙ্গল অত্যন্ত নিবিড় হইয়া উঠে।

বর্ষা অতীত হইলেও বর্ষার বৃষ্টিধারায় শুষ্কপ্রায় বিশীর্ণ উদ্ভিদ্‌-রাশি পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত হইয়াছে। বৃক্ষরাজি ঘন-পল্লবদলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তৃণপুঞ্জ মনুষ্যের মস্তকের ঊর্দ্ধে উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান। অরণ্যের সর্ব্বত্র শ্যামায়মান লতাগুল্ম পরিপুষ্ট। শুষ্ক খাদগুলি জলে পূর্ণ হইয়া ভেকবাহিনীর উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; দিবা-রাত্রির কোনও সময় তাহাদের অশ্রান্ত মকমক-ধ্বনির বিরাম নাই।

গ্রাম্য জলাশয়গুলির জলরাশি আতট পূর্ণ; অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-ধারাপাতে মৃত্তিকা পিচ্ছিল, তাহার উপর দিয়া পদচালন করা অত্যন্ত কঠিন। উদ্ভিদ্‌রাশির বৃদ্ধি-নিবন্ধন সরীসৃপ ও কীট-পতঙ্গপুঞ্জে সহসা নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিষধর সর্পসমূহের আবাস-গহ্বরগুলি জলপ্লাবিত হওয়ায় তাহারা সেই সকল গর্ত্ত হইতে নিঃসারিত হইয়া সুদীর্ঘ তৃণরাশিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অথবা বৃক্ষশাখায় জড়াইয়া থাকিয়া শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে। খাল-বিলের বদ্ধ জলে কোটি কোটি মশক জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এবং সারাদিনব্যাপী সূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে তাহা হইতে আর্দ্র সোঁদা গন্ধ উদ্গত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হারও চরমে উঠিয়াছে।

১১ই নভেম্বর মধ্যাহ্নে আমার ট্রেণ চাঙ্গায় উপস্থিত হইল। আমার ভৃত্য এক দল কুলীর সাহায্যে ট্রেনের কামরা হইতে আমার লটবহর নামাইতে লাগিল; সেই সময় অফিসের এক জন লোহিত-পরিচ্ছদধারী বেহারা আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল। সেই পত্র পাঠে আমি জানিতে পারিলাম, সেই বেহারার সঙ্গে আমাকে ডেপুটী কমিশনারের বাংলোয় যাইতে হইবে। সেখানে আমাকে যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা হইবে, এবং কোন্ সময় আমাকে শিকারে যাইতে হইবে, সেই সংবাদও আমাকে প্রদান করা হইবে।

আমি যথাসময়ে ডেপুটী কমিশনারের বাংলোতে উপস্থিত হইয়া স্নানাহারে পরিতৃপ্ত হইলাম। তাহার পর ডেপুটী কমিশনার আমাকে একখানি আরামপ্রদ দীর্ঘ বেতের চেয়ারে বসাইয়া আর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আমার সম্মুখে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে সকল অবস্থার কথা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, 'মানুষের রক্তপানে যে সকল বাঘের 'নোলা' বাড়িয়া গিয়াছে, সেই সকল নরভুক্ ব্যাঘ্র-শিকার সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না, জানি না; কিন্তু আমি যে বাঘের কথা বলিতেছি, সে মনুষ্য শিকারে বাঘের রাজা। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাহার দৌরাত্ম্যের কথা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাহার পর তাহার উপদ্রব ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই অঞ্চলের অধিবাসিবর্গের প্রকৃত আতঙ্কের কারণ হইয়াছে।

'আজ পর্য্যন্ত এই বাঘটা শতাধিক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এবং ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকে সম্পূর্ণ রহস্যজনকভাবে নিহত হইয়াছে। এই বাঘটার সম্বন্ধে একটা ভারী কৌতুহলজনক গল্প প্রচলিত আছে; এবং যদিও আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নহি, তথাপি আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই গল্পের পোষকতাস্বরূপ এরূপ অনেক ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—যাহা সত্যই বিস্ময়কর।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ডেপুটী কমিশনার অন্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাকে একখানি লেজার-বহি দেখিতে দিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'আপনি এই বহির পাতাগুলি পড়িয়া দেখুন। কতকগুলি লোক ভীষণ অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; তাহাদের মৃত্যু সম্বন্ধে এগুলি পুলিসের সংগৃহীত বিবরণ, ইহাদের মধ্যে যেগুলি লাল কালীতে লেখা আছে, সেই-গুলি উক্ত নরভুক্ ব্যাঘ্রের কীর্ত্তি।'

আমি কৌতুহলভরে সেই বিবরণগুলি পাঠ করিতে লাগিলাম। বাঘের দৌরাত্ম্যের কতকগুলি প্রমাণ লাল কালীতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সেইগুলি পাঠ করিয়া আমি বলিলাম, 'এই ভীষণ নরহন্তা জানোয়ারটার আক্রমণ হইতে জেলার অধিবাসীদের রক্ষা করিবার জন্য কি এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই হয় নাই? সেরূপ চেষ্টা নিশ্চিতই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।'

আমার কথা শুনিয়া ডেপুটী কমিশনার হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ, আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম বৈ কি। কয়েক জন বিখ্যাত শিকারী সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, ফাঁদ পাতিয়া তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং পুরস্কারও ঘোষিত হইয়াছিল। যথাসম্ভব সকল চেষ্টাই করা হইয়াছিল; কিন্তু বাঘটা সম্পূর্ণ অক্ষত-দেহেই মানুষ খাইয়া বেড়াইতেছে!'

আমি বলিলাম, 'আপনার এত রকম চেষ্টা সফল না হইবার কারণ কি?'

ডেপুটী কমিশনার বলিলেন, 'ঐ প্রশ্নটি বাদ দিয়া অন্য কথা জিজ্ঞাসা করুন। কয়েকবার আমরা তাহাকে প্রায় মুঠায় পুরিয়াছিলাম, কিন্তু প্রত্যেক বারই সে সরিয়া পড়িয়াছিল, কোন কোনবার আমাদের চোখের উপর হইতেই অন্তর্দ্ধান করে। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকবার আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এখন তাহার অস্তিত্ব সংক্রান্ত সেই গল্পটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসী-দের মনে সত্য বলিয়া এরূপ দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, টাকার লোভ দেখাইলেও তাহারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে আর অগ্রসর হয় না। গত বৎসর বর্ষার প্রারম্ভকালে ক্ষেতে জল সরবরাহের একটা পুষ্করিণীর কায এই বাঘটার দৌরাত্ম্যেই বন্ধ হইয়াছিল। যে সকল শ্রমজীবী সেখানে কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের অনে-কেরই ঘাড় ভাঙ্গিয়া সে রক্ত পান করিয়াছিল।'

এই সকল বিবরণ শুনিয়া আমি বিলক্ষণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, পাকা শিকারীরা যে নরভোজী ব্যাঘ্রকে শিকার করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার মত আনাড়ী শিকারীর এই চেষ্টা সফল হইবে, তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি? কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি যে, ফিরিবার উপায় নাই।

অতঃপর শিকারের সকল আয়োজন শেষ হইল, অনুমতি-পত্রও সংগৃহীত হইল। কিন্তু কাযটি যে আমার সাধ্যাতীত, এ কথা ডেপুটী কমিশনারের নিকট স্বীকার করিব—আমি ততটুকু নৈতিক সাহস সঞ্চয় করিতে পারিলাম না। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই দুরূহ কার্য্যের ভার লইয়া কতখানি বোকামী

করিয়াছি, মনে মনে তাহার আলোচনা করিয়া বড়ই নিরুৎসাহ হইলাম।, আমার মনের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয়, তখন ডেপুটী কমিশনার পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

'আমি এই নরখাদক বাঘটার প্রসঙ্গে যে জনশ্রুতির কথা বলিতেছিলাম, তাহা আপনাকে খুলিয়া বলাই ভাল বলিয়া মনে করিতেছি। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইলে আপনি এ সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে পাইবেন। আমার কথা শুনিয়া আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, আমি বলি না যে, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এই প্রাচ্যদেশে গল্পের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত।

'আমি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। প্রায় এই সময়ে গোন্দ্-পুরোহিত শ্রেণীর দুই জন গ্রামবাসী একটি স্ত্রীলোক লইয়া বিরোধ আরম্ভ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে তাহারা স্থির করে, তাহারা উভয়েই কোন বিখ্যাত যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় তাহাদের বিরোধের নিষ্পত্তি করিবে। তদনুসারে তাহারা সেই যোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে, যোগী তাহাদিগকে জানাইলেন, তিনি তাহাদের উভয়কেই মন্ত্রবলে ব্যাঘ্রে পরিণত করিবেন ; তাহারা ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এবং সেখানে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়-পরাজয় দ্বারা তাহাদের বিরোধের মীমাংসা করিবে। যোগী তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন, ব্যাঘ্রদেহ লাভ করিবার জন্য তাহাদের উভয়কেই তাঁহার নিকট বসিয়া একান্তমনে আগ্রহ-ভরে প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহাদের মনুষ্যদেহ ব্যাঘ্রদেহে পরিণত হউক।

'প্রতিদ্বন্দ্বি-যুগলের মধ্যে যাহার বয়স অল্প, সে প্রথমে ব্যাঘ্র-দেহ লাভ করিল। তাহার পর যোগী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ব্যাঘ্রে পরিণত করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাঘ্রে পরিণত হওয়ায় তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে। অতঃপর তাহার আর ব্যাঘ্রদেহ ধারণের জন্য আগ্রহ হইল না। এই জন্য সে ব্যাঘ্রত্ব-লাভের জন্য একান্তমনে প্রার্থনাও করিল না। যোগীও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মনুষ্যে রূপান্তরিত করিতে না পারায়, সেই 'মানুষ-বাঘ' (panther man) ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গীকে হত্যা করিল। তাহার পর সে ব্যাঘ্র-দেহ লইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু সেই গ্রামে বাস করা ভিন্ন আতঙ্কাভিভূত গ্রামবাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য যে তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, ইহা সে তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সেই 'মানুষ বাঘ' কয়েক দিন সেই গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইল। সেই কয় দিন সে কাহারও হিংসা না করিলেও, গ্রামবাসীরা তাহাকে দেখিতে পাইলেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে সে গ্রামবাসী কোন গৃহস্থের পালিত কোনও পশুকে আক্রমণ না করায়, এবং উপর্য্যুপরি কয়েক দিন অনাহারে থাকায় ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল। সে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারায়, অবশেষে কোনও গৃহস্থের একটি পাঁঠার ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহার রক্তমাংসে ক্ষুধাশান্তি করিল।

এই সংবাদ শুনিয়া সেই গ্রামের মোড়ল গ্রামবাসীদের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঘটাকে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মানুষ-বাঘ গ্রামবাসীদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সাধুসঙ্কল্প ত্যাগ করিল এবং সুযোগ পাইলেই গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিয়া নরমাংসে উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। গ্রামের মোড়লই তাহার প্রধান শত্রু, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে প্রথমে সেই মোড়লের প্রাণ সংহার করিল, তাহার পর সেই গ্রামের যে সকল লোকের সহিত তাহার শত্রুতা ছিল, একে একে তাহাদের সকলকেই হত্যা করিল।

'মানুষ বাঘের অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় সেই গ্রামের এবং সন্নিহিত গ্রামসমূহের অধিবাসীরা দল বাঁধিয়া সেই বৃদ্ধ যোগীর নিকট উপস্থিত হইল এবং উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহাদের নিকট মানুষ-বাঘের উপদ্রবের কথা শুনিয়া যোগী বাঘটাকে এই শাপ দিলেন যে, তাহাকে বাইনগঙ্গা নদী পার হইয়া অপর পারে প্রস্থান করিতে হইবে, এবং সে আর কখনও ঐ সকল গ্রামে উপদ্রব করিতে পারিবে না।

যোগী মানুষ-বাঘকে যে শাপ দিলেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া বাইনগঙ্গা-নদীর অপর তীরবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীরা ভীত হইল ; এবং তাহারা যোগীকে তোয়াজে সন্তুষ্ট করিয়া মানুষ-বাঘটাকে সাগরের দিকে চালান করিবার ব্যবস্থা করিল।'

ডেপুটী কমিশনার এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি আমার মুখভঙ্গিতে বোধ হয় কিঞ্চিৎ অধীরতা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'গল্পটা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কেমন ? কিন্তু বাকি অংশটাও বলি, শুনুন! প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত গ্রামের দুই জন লোক সত্যই বিরোধ করিয়াছিল, এবং তাহাদের বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক জন যোগীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই দুই জন লোককে অতঃপর গ্রামে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায় নাই ; অধিকন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে যাহার বয়স অধিক ছিল, তাহার মৃতদেহের কিয়দংশ সেই অরণ্যেই পড়িয়া ছিল। অর্দ্ধভুক্ত মৃতদেহ দেখিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল, বাঘেই তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। হাঁ, তাহাকে বাঘে মারিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না।

'গ্রামের মোড়লের রিপোর্ট অনুসারে এই ঘটনার বিবরণ সরকারী বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর একটা প্রকাণ্ড বাঘকে কয়েক দিন ধরিয়া সেই গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল ; কিন্তু তাহার ব্যবহারে গ্রামবাসীদিগকে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। যে দুই জন লোক পরস্পর বিবাদ করিয়া অরণ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল, বাঘটা তাহাদেরই বাসগৃহের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, এবং তাহাদের কুটীরের অদূরবর্ত্তী আঙ্গিনা পার হইয়া যাইবার সময়, সেখানে কতকগুলি ছাগল বাঁধা থাকিলেও, সে তাহাদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করে নাই। তাহার পর যখন বাঘটা মানুষ মারিতে আরম্ভ করিল, তখন সে বাছিয়া বাছিয়া কাহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়াছিল, জানেন ? পূর্ব্বোক্ত যে দুই জন গ্রামবাসী বিবাদ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহার বয়স অল্প ছিল এবং যে অরণ্যের ভিতর

হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসে নাই, তাহারই শত্রুদের সে পর পর হত্যা করিয়াছিল। তাহার পর সেই বাঘটার ব্যবহার অধিকতর বিস্ময়োদ্দীপক হইয়াছিল। যে সকল শিকারী তাহাকে গুলী করিয়া মারিবার বা ফাঁদ পাতিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে কোন না কোন সুযোগে কেবল তাহাদিগকেই আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন যাহারা বাঘটার শিকারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল, যাহারা তাহার সন্ধানে বনে বনে ঘুরিতেছিল, তাহাদিগকেও তাহার কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পূর্ব্বোক্ত যোগীর মুখ হইতে প্রথম 'শাপ' উচ্চারিত হইবার পর বাইনগঙ্গা নদীর সেই তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে নরভোজী ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্য নিবৃত্ত হইয়াছিল; বাঘটা সেই পারের কোনও গ্রামের কোন অধিবাসীকে আক্রমণ, অথবা হত্যা করে নাই; এবং যোগীর কণ্ঠ হইতে দ্বিতীয় 'শাপ' উচ্চারিত হইবার পর তাহার আক্রমণে সমুদ্রের দিকের গ্রামসমূহের অনেক লোকই নিহত হইয়াছিল। এই সকল সংবাদ শুনিয়া আমার কৌতূহল বর্দ্ধিত হওয়ায় আমি তদন্ত করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিলাম। এখন আপনিই বলুন—ইহা অতি অদ্ভুত রহস্য নহে কি?'

এই সকল বিবরণ শেষ করিয়া ডেপুটী কমিশনার আমাকে মল-মারোদা নামক স্থানে প্রথম আড্ডা স্থাপনের পরামর্শ দিলেন, এবং বলিলেন, 'যদি সরকারী সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাকে এক ছত্র লিখিয়া পাঠাইবেন। যদি আপনার ভাগ্যে থাকে—এবং আমার বিশ্বাস, আপনার চেষ্টা সফলই হইবে—তাহা হইলে আপনি কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন—সরকারের প্রতিশ্রুত পাঁচ শত টাকার পুরস্কার আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে।'

এই কুটীর হইতে বাঘ শেষ শিকার লইয়া গিয়াছে

অতিথিবৎসল ডেপুটী কমিশনারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমার জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতেই বেলা শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যাস্তের ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বে একখানি পুরাতন গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই স্থান হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী মলে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যাসমাগমের পর সেই শকট-চালককে গাড়ী চালাইতে বাধ্য করিতে পারিলাম না; বকশিসের লোভ দেখাইলেও সে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে এক গজও চলিতে সম্মত হইল না। ইহার উপর আমার পথ-প্রদর্শক যখন আমাকে বলিল, আমরা যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের বিজন পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই সকল গ্রামের অধিবাসীরা নরভুক্ ব্যাঘ্রের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে—তখন আমি কিরূপ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলাম, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। পাঠকগণ বোধ হয় জানেন না, সাধারণ শ্রেণীর বড় বড় জানোয়ার শিকার করিবার জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বিত হয়, যে সকল নর-ভোজী ব্যাঘ্র দীর্ঘকাল হইতে নরশোণিতের আস্বাদন লাভ করিয়া আসিতেছে, এবং অত্যন্ত শঠ, তাহাদিগকে শিকার করিতে ঐ সকল কৌশল সম্পূর্ণ বিফল হইয়া থাকে। কোন অঞ্চলে নর-ভোজী ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে তাহার প্রতীক্ষা করুন; কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হইলে তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইবেন না। বাঘ সেই অঞ্চলে আর আসিতেছে না শুনিয়া গ্রামবাসীরা আর পূর্ব্ববৎ সতর্কভাবে চলাফিরা করিবে না, রাখালরাও গরুর পাল লইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত চিত্তেই গোচারণের মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিবে, সেই সুযোগে নরভুক্ ব্যাঘ্র আচম্বিতে সেই গ্রামে উপস্থিত হইবে, এবং কোনও হতভাগ্য গ্রামবাসীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহার রক্ত-মাংসে ক্ষুধাশান্তি করিবে। তাহারা এরূপ কৌশলে শিকার ধরিবে যে, তাহাদের সেই আক্রমণ অব্যর্থ। বাঘের আগমন-সংবাদ পাইয়া, গ্রামের লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার সন্ধানে আসিবার পূর্ব্বেই সে অদ্ভুত তৎপরতার সহিত অদৃশ্য হইবে!

যাহা হউক, মলে আমার সদর আড্ডা হইয়াছে, এই সংবাদ সন্নিহিত গ্রামসমূহের অধিবাসিবর্গকে জ্ঞাপন করা হইল। কিন্তু বাঘ আসিয়া কোন গ্রামের কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, সেই সংবাদ অবিলম্বে আমার নিকট প্রেরিত হইবে, ইহা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হইল। ডেপুটী কমিশনার আমাকে বলিয়াছিলেন, এই ব্যাঘ্র সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের একটা অন্ধ সংস্কার থাকায় তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, কোনও শিকারীর সাধ্য নাই যে, সে তাহাকে বধ করিবে। আমি কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিলাম—ডেপুটী কমিশনারের সেই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। বাঘটা কোন গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া আমি দুইবার মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া বাঘের সন্ধান না পাওয়ায় গ্রামের মোড়লদের ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমাকে সংবাদ পাঠাইতে বিলম্ব করা তাহাদের উচিত হয় নাই। তাহারা আমাকে সংবাদ পাঠাইতে কেন বিলম্ব করিল, এ কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা মাথা তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিল, 'খোদার মর্জ্জি!'

বস্তুতঃ, যে স্থানে তাহার আগমনের কোন সম্ভাবনা না থাকিত, সেই স্থানেই সে হঠাৎ উপস্থিত হইত। আমি জনরবে নির্ভর করিয়া বা কোন সূত্রে তাহার আগমনের সংবাদ পাইয়া তাহার সন্ধানে ধাবিত হইতাম; সে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া যে স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া যাইত, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মৃতদেহের অদূরে তাহার প্রতীক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া

থাকিতাম, কখন বা গো-মেষাদির পালের অনুসরণ করিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও দিন সেই নর-ভোজী ব্যাঘ্রের সন্ধান পাইলাম না।

যে জঙ্গলাবৃত জলাভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, তাহা রাশি রাশি জোঁকে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন বাঘের সন্ধানে কত দিন আমাকে দারিদ্র্য-সমাচ্ছন্ন গ্রামে বাস করিতে হইয়াছে। রাত্রির পর রাত্রি মাচানে বসিয়া নর-খাদক শার্দ্দূলের প্রতীক্ষা করিয়াছি; এজন্য আমার দেহ-মন অবসন্ন হইয়াছে। এইভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় আমি বুঝিতে পারিলাম, যাহার প্রতীক্ষায় আমি কষ্টভোগ করিয়া সময় নষ্ট করিতেছি, সে যে কোনও দিন আমাকে দর্শন দান করিয়া আমার চেষ্টা সফল করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর আমি সেই স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ছাওলীতে আড্ডা লইলাম। এক দিন প্রভাতে এক জন লোককে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকট দৌড়াইয়া আসিতে দেখিলাম। সেই অঞ্চলের লোক কোনও বিভ্রাটের সংবাদ জানাইতে আসিলেও ধীরে চলিয়া থাকে; এই জন্য তাহাকে দৌড়াইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, ব্যাপার কিছু গুরুতর!

আমার এই অনুমান সত্য। লোকটা আমার সম্মুখে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'হুজুর, আজ খুব সকালে সেই বাঘটা আমাদের গ্রামের এক জন লোকের ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে। আপনি তাড়াতাড়ি চলুন, বাঘটাকে মারিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করিবেন।'

বাঘটা কি ভাবে সেই লোকটিকে হত্যা করিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সংবাদদাতা বিশেষ কোন কথা বলিতে পারিল না। সে এরূপ ভীত ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহার মুখে কথা সরিতেছিল না। সে হাত নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

অতঃপর আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইলাম, এবং তাহার অনুসরণ করিয়া দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। আমি যথাসম্ভব দ্রুতভাবে চলিয়া প্রায় ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিলাম, শ্রান্তদেহে একটি অরণ্যের প্রান্তবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র কুটীরের নিকট আসিয়া আমার গতিরোধ হইল।

সেই গ্রামখানির নাম রাজোলী। গ্রামে যে কয়েকখানি কুটীর ছিল, তাহা কাষ্ঠদণ্ডনির্ম্মিত উচ্চ বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই বেড়ার কেন্দ্রস্থলে খানিক খোলা যায়গা ছিল, তাহা একটি বৃক্ষের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। আমার পথিপ্রদর্শক একটি দরজার ভিতর দিয়া সেই স্থানে আমাকে লইয়া চলিল। সেখানে কয়েক জন গ্রামবাসীকে দলবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিতে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। তাহারা আমার জন্য একখানি চারপাই আনিলে, আমি তাহাতে বসিয়া পড়িলাম। তাহারা আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইয়া একটি লোককে দেখাইয়া বলিল, যে লোকটিকে বাঘে খাইয়াছে—সেই ব্যক্তি তাহার পিতা, সেই হতভাগ্য বৃদ্ধ পুত্রশোকে অধীরতা প্রকাশ না করিয়া সেই শোচনীয় কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে অদূরবর্ত্তী কুটীরের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, 'আমার ছেলে ও আমি ঐ কুটীরে বাস করিতাম। কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই গ্রামের দুই দিকের 'কেওয়াড়ি' আগড় দিয়া মজবুৎ করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। রাত্রিকালে আমি ও আমার ছেলে অন্যান্য দিনের মত বিছানায় শুইয়া ছিলাম। সারা রাত্রি আমার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আজ সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গিলে আমার ছেলেকে বিছানায় দেখিতে পাইলাম না।

'প্রথমে আমার ভয় হয় নাই, কিন্তু বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে মাটীতে দাগ দেখিতে পাইলাম; তাহা দেখিয়া মনে হইল, কেহ কোন জিনিষ ছেঁচড়াইতে ছেঁচড়াইতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আরও কিছু দূরে মাটীতে রক্তের দাগ দেখিয়া ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সাড়া না পাওয়ায় ভয়ে আর্ত্তনাদ করিলাম।'

অতঃপর বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া বলিল, 'হুজুর আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে দেখাইয়া দিব।'

লোকগুলি পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলে, আমি সেই বৃদ্ধের সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। লোকগুলিও আমাদের সঙ্গে চলিল। সেই স্থানটি গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে গভীর অরণ্যমধ্যে অবস্থিত। দেখিলাম, বৃদ্ধের পুত্রের দেহের অধিকাংশই ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ করিয়াছিল, অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল। সেখানে অপেক্ষা করিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া আমি বৃদ্ধের কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই কুটীরেই রাত্রিবাস করিয়া কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

সেই রাত্রিটা আমি সেই কুটীরেই বাস করিলাম, কিন্তু উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনাই ঘটিল না, লাভের মধ্যে সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। পরদিন প্রভাতে আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, অরণ্যের সেই অংশটুকু চাষের জমী দ্বারা পরিবেষ্টিত; তাহার এক অংশে একটি ছোট পাহাড়, এই পাহাড়টি নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। বাঘটা যে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের পুত্রটির দেহের অধিকাংশ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পাহাড়ের সেই অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হওয়ায় আমি পাঁচটি ছাগল সংগ্রহ করিলাম, এবং সেই পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই শত গজ ব্যবধানে তাহাদের এক একটি বাঁধিয়া রাখিলাম। অবশেষে দুইটি সঙ্কীর্ণ পথের সংযোগস্থলে শেষের ছাগলটিকে বাঁধিয়া তাহার অদূরে বসিয়া সারারাত্রি বাঘের প্রতীক্ষা করিলাম। কিন্তু প্রভাতে সকল ছাগলকে জীবিত দেখিয়া সেই রাত্রিতে আরও পাঁচটা ছাগল আনিয়া পূর্ব্ববৎ বাঁধিয়া রাখিলাম এবং তাহার পরবর্ত্তী রাত্রিও জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিলাম।

পরদিন সকালে দেখিলাম, তিনটি ছাগল নিহত হইয়াছে। দেখিয়া আমার আনন্দ হইল, কিন্তু বাঘটা রাত্রিকালে কোন্ সময় আসিয়া ছাগল তিনটির ঘাড় ভাঙ্গিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই; বিন্দুমাত্র শব্দও শুনিতে পাই নাই। বাঘটা একটা ছাগল পাহাড়ের উপর টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই চিহ্ন দেখিয়া আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম, বাঘটা তখনও পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়াছিল; কিন্তু সেই জঙ্গল এরূপ দুর্ভেদ্য

যে, আমি সেই চিহ্নের অনুসরণ করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। সেই রাত্রিতে অবশিষ্ট সাতটা ছাগল পূর্ব্ববৎ দূরে দূরে বাঁধিয়া রাখিয়া, বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পরদিন প্রভাতে আরও দুইটি ছাগলকে নিহত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহাদের মস্তক অদৃশ্য হইলেও, বাঘ তাহাদের দেহের কোনও অংশ স্পর্শ করে নাই।

এই স্থানে বলা আবশ্যক, সৌভাগ্যক্রমে আমি দুই জন গ্রাম্য যুবকের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, তাহারা বাঙ্গোলী গ্রামবাসী খোন্দ যুবক। তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভীক। আমি এখানে ব্যাঘ্র শিকারে আসিয়া কেবল এই দুইটি লোকেরই সাহায্য পাইয়াছিলাম। তাহাদের সাগ্রহপূর্ণ সহযোগিতায় আমার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু নিদ্রার অভাবে এবং যথাযোগ্য খাদ্যদ্রব্য না পাওয়ায় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিশেষতঃ আমার ছুটীও প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল।

আমার ইচ্ছা ছিল, বাঘটাকে নিয়মিতভাবে আহার যোগাইয়া সেই বনেই বাস করিবার জন্য তাহাকে প্রলুব্ধ করিব। সে অল্প চেষ্টায় অদূরে শিকার পাইলে সেই বন ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে চাহিবে না। এইভাবে সে কয়েক দিন ধরিয়া সেখানে বাস করিলে কোন এক দিন হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িতে পারে; তখন আমার মনস্কামনা পূর্ণ করা হয় ত সহজসাধ্য হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি আরও পাঁচটি ছাগল যথাস্থানে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলাম; কিন্তু বাঘ একটিও ছাগলকে হত্যা না করায় আমার মন বড়ই দমিয়া গেল।

পরে আমি সংবাদ পাইলাম, বাঘটাকে সেই পাহাড়ের অন্য প্রান্তে অবস্থিত একখানি গ্রামের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। সেই দিকের জঙ্গল অপেক্ষাকৃত পাতলা ছিল।

তখন আমার ছুটী ফুরাইতে আর দুই দিন মাত্র বাকি ছিল। এবার আমি আমার ছাগলগুলিকে এরূপ একটি স্থানে বাঁধিলাম— যে স্থানে শেষবার তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। আমি কয়েকটি ছাগলকে দূরে দূরে বাঁধিয়া রাখিয়া একটি ছাগলের অদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

জলন্ত অগ্নি-গোলকের ন্যায় এক জোড়া চক্ষুর মালিক আমার দিকে ঝম্প প্রদান করিল

রাত্রিকালে সেখানে পাহারায় থাকিয়া আমি কোন প্রকার অস্বাভাবিক শব্দ শুনিতে পাই নাই, কিন্তু পরদিন প্রভাতে আর দুইটি ছাগলকে মুণ্ডহীন অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। ছাগল দুইটির মৃতদেহের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহারা অল্পকাল পূর্ব্বে নিহত হইয়াছিল। আমার খোন্দ বন্ধুদ্বয় বলিল, বাঘটা অদূরবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার পর প্রত্যূষে সেখানে ফিরিয়া আসিয়া ছাগল দুইটির মুণ্ডপাত করিয়াছিল। তাহারা ইহাও অনুমান করিয়াছিল যে, বাঘটার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এখন চাষের জমীর সন্নিহিত পাতলা জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া শিকারের চেষ্টা করাই সঙ্গত। তদনুসারে আমি সেই স্থানে একটি ছাগল বাঁধিয়া, অনুচ্চ মাচানে বসিয়া শিকারের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

মাচানটি কোন বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বাঁধিবার জন্যই আমার আগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থানের গাছগুলি চারা গাছ বলিয়া যে গাছে মাচান বাঁধিবার ব্যবস্থা হইল, তাহার সম্মুখে একটা কাঠের খুঁটি পুতিতে হইল। আমার শরীর ও মন ভাল থাকিলে, আমি ঐরূপ অনুচ্চ ও কম মজবুৎ মাচানে বসিয়া রাত্রিবাস করিতে সম্মত হইতাম না।

সেই মাচানের অন্যদিকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে একটা ফাঁকা

যায়গায় ছাগলটা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই স্থান হইতে আমাকে দেখিতে পাওয়ায় আর্ত্তনাদ না করিয়া স্থিরভাবে শুইয়াছিল। কিছুকাল পরে সে নিদ্রিত হইল; কিন্তু সেই মাচানের উপর আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। পুঞ্জ পুঞ্জ মশক আমার শোণিত শোষণ করিতে লাগিল। তাহাদের গুঞ্জনধ্বনি ও দংশনযন্ত্রণা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল।

আমার মন বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় আমার মাচানের তলায় একটা শব্দ শুনিয়া আমার কেশরাশি কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, আমি নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলাম, আমার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ী পড়িতে লাগিল, একটা ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া ছাগলটাকে ধরিয়া ফেলিল!

সে অতি ভীষণ দৃশ্য! আমি আতঙ্কাভিভূত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, যথাসাধ্য চেষ্টায় আমি আত্মসংবরণ করিয়া আমার 'টর্চ্চে'র সুইচ' টিপিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই ভীষণ-দর্শন প্রেতের ন্যায় একটা মূর্ত্তি আগুনের ভাটার মত চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফাইয়া পড়িল। আমি শিকার লক্ষ্য না করিয়াই বন্দুকের ঘোড়া টিপিলাম। সেই ধাক্কায় আমার 'টর্চ্চ' নিবিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি বন্দুকে টোটা ভরিয়া কোন রকমে সোজা হইয়া বসিলাম এবং বন্দুকের কুঁদা বুকে রাখিয়া পুনর্ব্বার 'ফায়ার' করিলাম। কিন্তু আমার রাইফেল হইতে গুলী বাহির হইবামাত্র মাচানটা সবেগে আন্দোলিত হওয়ায় আমার হাত হইতে রাইফেলটা খসিয়া পড়িল এবং সেই মুহূর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড বাঘ মাচানের প্রান্তভাগে আবির্ভূত হইল। দেখিলাম, তাহার সম্মুখের একখানি পা আমার পায়ের অদূরে স্থাপিত হইয়াছে!

সেই অবস্থায় বাঘটা সেই স্থানে ঝুলিতে লাগিল। তাহার ভীষণতা বর্ণনা করি, সে শক্তি আমার নাই। সে মাচানের উপর উঠিবার জন্য তাহার পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা মাচান ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ জন্য তাহার আকুলি-ব্যাকুলি কি ভীষণ! আমি তৎক্ষণাৎ সেই গাছটির সরু কাণ্ড ধরিয়া ফেলিলাম এবং বা পা রাখিবার জন্য একটি শাখাও আয়ত্ত করিলাম। সেই সময় আমি ডান পা বাড়াইয়া তদ্দ্বারা সবেগে আঘাত করিতে লাগিলাম। সেই মুহূর্ত্তে হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মাচানের কাঠের খুঁটিটা ভূমিসাৎ হওয়ায় মাচানটা আমার সমস্ত জিনিষপত্র সহ বাঘটাকে লইয়া ভূতলশায়ী হইল। আমি সেই গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম!

সৌভাগ্যক্রমে আমার 'সার্ভিস রিভলভারে' টোটা ভরিয়া পূর্ব্বেই তাহা আমার 'বেল্টের' সঙ্গে আঁটিয়া রাখিয়াছিলাম। এই হাতিয়ারের সাহায্যে আমি সেই ক্রোধান্ধ দুর্দ্দান্ত বাঘটাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ হইলাম। সে আমার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল। আমার ছয়-ঘরা রিভলভারের পাঁচটি ঘর এইভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে খালি করিলাম। শেষ গুলীটা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া খরচ করিলাম না। রাত্রি বারোটা বাজিবার অল্পকাল পরে বাঘটা আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার পর চারি ঘণ্টাকাল আমাকে সেই সরু তরু-কাণ্ড ধরিয়া সূচিভেদ্য অন্ধকারে ঝুলিতে হইয়াছিল, এবং সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার আশঙ্কা হইতেছিল, বাঘটা লাফাইয়া আমার পা ধরিয়া আমাকে নীচে টানিয়া লইবে।

পরদিন প্রত্যুষে আমার বিশ্বস্ত খোন্দ বন্ধুদ্বয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে আমি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম, ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না। আমি তাহাদিগকে আমার নৈশ অভিযানের কথা বলিয়া বাঘটাকে সেই স্থানে খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সন্ধান হইল না। কোন স্থানেই রক্তের চিহ্ন বা বাঘের পায়ের থাবার দাগ দেখিতে পাওয়া গেল না। বাঘটা আমার গুলীতে আহত হইয়াছিল, ইহাও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; কিন্তু উহা যে কোন মানুষ নহে, উহা সত্যই

নিহত নরখাদক ব্যাঘ্র

অতি ভীষণ নরভুক্ ব্যাঘ্র, কুসংস্কারান্ধ গ্রামবাসীদের এ কথা বুঝাইবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইল।

আমার খোন্দ বন্ধুদ্বয় আমার জিনিষপত্র কুড়াইয়া লইয়া আমার অনুসরণ করিল। কিছু দূরে জঙ্গলের ভিতর একটা ঝোপের নিকট একটা রঙ্গীন পদার্থ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেটা বাঘ কি না, দূর হইতে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ঢিল নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু সেই পদার্থটা নড়িল না। তখন আমি রাইফেলটা বাগাইয়া ধরিয়া সতর্কভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ব্যাঘ্রপ্রবর প্রসারিত-দেহে ধরাশায়ী হইয়াছে। আমার রাইফেলের গুলী তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিল।

বিভিন্ন পল্লীতে এই সুসংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না; শত শত গ্রামবাসী এই নরখাদক বিশালদেহ ব্যাঘ্রটিকে দেখিতে আসিল। এরূপ বৃহৎকায় ব্যাঘ্র এ দেশে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাঘ্রবধের পর সেই অঞ্চলের ব্যাঘ্রভীতি নিবারিত হইয়াছিল; অতঃপর আর কোন গ্রাম-বাসীকে ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই নরভুক্ ব্যাঘ্র শিকার করিয়া সরকারের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের পাঁচ শত টাকা যথাসময়ে আমার হস্তগত হইয়াছিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিলাতের রাজনীতিক গতি

পাঠক জানেন, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া জাতীয় দল কর্ত্তৃক বিলাতের শাসনতরণী পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই জাতীয় দলই ভারতের শাসনপদ্ধতির সংস্কারসাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এই দল নামে জাতীয় হইলে কাযে রক্ষণশীল। কারণ, বিগত বিলাতী নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলই অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় কমন্স সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তবে এবারকার বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলীতে সকল দলের দুই এক জন সদস্য আছেন বলিয়া ইহাকে জাতীয় দল বলা হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড নামে সমাজতন্ত্রবাদী, কিন্তু কার্য্যে এখন রক্ষণশীল অপেক্ষা অধিক রক্ষণশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই রক্ষণশীল বলিয়া বিলাতের শাসনকার্য্য রক্ষণশীলদিগের মতানুসারে চালিত হইতেছে। নামে যাহাই হউক, কাযে ইহা রক্ষণশীল বলিয়া ইহার কার্য্যের জন্য গ্রেট বৃটেনের ভিতরে এবং বাহিরে সকল লোকই শাসন-তরণীর পরিচালনের দোষ-গুণ সমস্তই রক্ষণশীল দলের উপর ন্যস্ত করিতেছে। রক্ষণশীলগণ প্রতিনিধি সভায় সর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া এই তথাকথিত জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে, "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।" কিন্তু তাহা হইতেছে না। ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের শীতকাল হইতে বুঝা গিয়াছে যে, তথাকার রাজনীতিক বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বিলাতী জনসাধারণ আবার শ্রমিক দলের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। কয়েকটি উপনির্ব্বাচনে শ্রমিক সদস্যই অধিক ভোট পাইল। শেষে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল হইতেও শ্রমিক সদস্য নির্ব্বাচিত হইল। মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনেই শ্রমিক দল জয়মাল্য লাভ করিল। কিন্তু তথাপি এই জাতীয় সরকারের এবং তাহার পরিচালক বলিয়া পরিচিত মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের আক্কেল-দাঁত গজাইয়া উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে বুঝা গেল যে, বায়ুর গতি আর ঘুরিয়া পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াইবে না। মন্ত্রিমণ্ডলী রাজনীতিক গগনের লক্ষণ দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। জনসাধারণের মধ্যে নানা মত নানাভাবে ব্যক্ত হইতে থাকিল। কেহ বলিলেন, মন্ত্রিমণ্ডলীকে আবার ঢালিয়া সাজিতে হইবে। কেহ বলিলেন, বর্ত্তমান কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আবার কেহ নির্ব্বাচনের আবশ্যকতার সমর্থন করিতে থাকিলেন। এ দিকে উদারনীতিক দলের নেতা মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ তাঁহার খামার-বাড়ী ছাড়িয়া রাজনীতিক আসরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে অবস্থার একট ওলটপালট ঘটিল। এ দিকে ওয়েভার ট্রী (Waver tree) নামক স্থানের উপনির্ব্বাচনের ফল রক্ষণশীল দলের উপর অনাস্থা সূচিত করিল। রক্ষণশীল দলের মধ্যে কতক লোক এই জাতীয় সরকার বহাল রাখিবার পক্ষপাতী। আবার এক শ্রেণীর রক্ষণশীল বর্ত্তমান জাতীয় দল গঠনের বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে, মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতীয় দলের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, এখন তিনি তাহাদের এক জন ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর যখন তিনি কমন্স

মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড
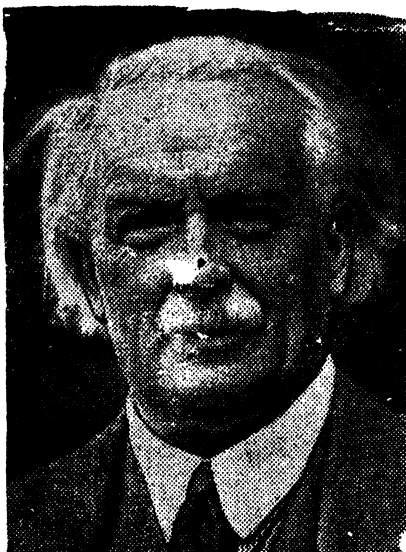
লয়েড জর্জ্জ

সভায় প্রবেশ করেন, তখন কেহ কোন শব্দও করেন নাই। যেন নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা লইয়া লোক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার উপর লোকের মনোভাব কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে নানা জনে নানা অনুমানই করিয়া থাকে। লয়েড জর্জ্জ আবার রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিলেন দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিলেন যে, এইবার মন্ত্রি-মণ্ডলীতে তিনি একটা স্থান পাইবেন এবং মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড মন্ত্রিমণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন। তিনি মিষ্টার বলড়ুইনকে নেতা স্বীকার করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীতে একটা পদ গ্রহণ করিতে চাহিবেন কি না, তাহা লইয়াও অনেক জল্পনা-কল্পনা হইতে থাকে। যাহা হউক, একটা কিছু পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা অনেকেই নিশ্চিত বলিয়া মনে করিতে থাকে। ক্রমে অনেকে এমন কথা বলিতে লাগিলেন যে, সত্বরই বিলাতী পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং নূতন করিয়া কমন্স সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে। আবার এরূপ কথাও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, পররাষ্ট্র আফিস হইতে মিষ্টার ম্যাক-ডোনাল্ডকে সরাইয়া সার জন সাইমনকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। এইরূপ জল্পনা-কল্পনা নানা আকারে বিলাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

মিষ্টার লয়েড জর্জ্জকে বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে একটা বড় অন্তরায়ও দেখা দিল। মিষ্টার নেভাইল চেম্বারলেনের সহিত লয়েড জর্জ্জের মত-বিরোধ সর্ব্বজনবিদিত। উঁহাদের উভয়ের মতের সামঞ্জস্য করা অসম্ভব। এ দিকে বলড়ুইন স্বয়ং চেম্বারলেনের সহিত কলহ করিতে একেবারেই অসম্মত। চেম্বারলেন এক জন পাকা সরকারী লোক। আর্থিক ব্যাপারে তিনি রাজস্বের দিক দিয়াই সকল ব্যাপার লক্ষ্য ও আলোচনা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, দেশের শ্রমশিল্প একটু অবনমিত হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আর্থিক দিক দিয়া দোষ ও ত্রুটিযুক্ত বনিয়াদের উপর উহা চালান কোন-মতেই কর্ত্তব্য নহে। সুদের হার হ্রাস করিবার দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। জোর করিয়া শ্রমশিল্পকে পূর্ব্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইলেই তাহার পরিণাম মন্দ ও ক্ষতিকর হইবে, ইহাই মিষ্টার নেভাইল চেম্বারলেনের মত।

পক্ষান্তরে, মিষ্টার লয়েড জর্জ্জের বর্ত্তমান মত ঠিক উহার বিপরীত। তিনি বলেন যে, যেন তেন প্রকারেণ শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি কর, তাহা হইলে রাজস্ব আপনার পথ আপনি করিয়া লইবে। অর্থাৎ ইঁহার মতে দেশের শ্রমশিল্পের প্রসার সাধিত হইলে আর কিছুই দেখিবার প্রয়োজন হইবে না, সমস্তই আপনা আপনি ঠিক হইয়া যাইবে। ইহা কেবল তাঁহার মত নহে। ইহা যেন তাঁহার মূলমন্ত্র। তিনি এই মূলমন্ত্রের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত নহেন। কাযেই এখন ইঁহাদের উভয়কে একসঙ্গে লইয়া কায করা অসম্ভব।

এরূপ অবস্থায় বিলাতে পুনরায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে, বরং বিশেষ সম্ভব। আমরা পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি, কিন্তু যত দিন যাইতেছে, ততই এই ব্যাপারটি যেন অধিক পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু রক্ষণশীল দল এখন পুনর্নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হইতে সম্মত নহেন। বর্ত্তমান সময়ে নির্ব্বাচন উপস্থিত হইলে রক্ষণশীলদিগকে যে পরাজিত হইতে হইবে, ইহা যেন তাঁহাদিগের নিকট ধ্রুব বলিয়া বোধ হইতেছে। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেছেন যে, আগামী নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের লোকই অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। জাতীয় দল বিলাতী বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না বলিয়াও তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছেন। তবে ভারতের কথা বিলাতের লোক বড় একটা আমলে আনে না,—কিন্তু তাহা হইলেও কতকগুলি লোক যে ভারতের ব্যাপারে রক্ষণশীল-দিগের উপর কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফ্রান্সের অবস্থা

ফ্রান্সের রাজনীতিক আবহাওয়া বিশেষ সন্তোষজনক নহে। তথায় প্রগতিশীল দলের সহিত সরকারী দলের মতবিরোধ আজ এক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। মঁসিয়ে ফ্লাণ্ডিন মন্ত্রিত্ব পাইয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি যে এই বিষয়ে বিশেষ কিছু করিয়াছেন, তাহাও মনে হইতেছে না। ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে বেকার-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আর ভূমিসম্পত্তি-সম্পর্কিত হাঙ্গামা এবং গণ্ডগোল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে,

মঁসিয়ে ফ্লাণ্ডিন

আগামী বৎসরে ফ্রান্সে কতকগুলি নির্ব্বাচন উপস্থিত হইবে। শীঘ্রই বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচনকাল আসিবে। আগামী শরৎকালে সিনেটের সদস্য নির্ব্বাচন হইবার কথা। বসন্তকালে বর্ত্তমান প্রতিনিধি সভার নির্ব্বাচনকাল। কাযেই সকল দলের মধ্যেই বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তুফানের মেঘ পশ্চিম আকাশে উদিত হইয়াছে দেখিয়া যেমন বর্ষাস্ফীতা পদ্মার মাঝী তাহার হালখানি দৃঢ়ভাবে ধরে, দাঁড়ীরা কূল পাইবার জন্য জোরে দাঁড় বাহিতে থাকে, প্রত্যেক রাজনীতিক দলের দাঁড়ীমাঝী সকলেই নিজ নিজ দলকে 'সামাল সামাল' বলিয়া ডাক ছাড়িতেছেন।

মঁসিয়ে ফ্লাণ্ডিন্ যে ভাবে ফ্রান্সের শাসনতরণী পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য লোক বুঝিয়া উঠিতে

পারিতেছে না। ফ্রান্সের চেম্বার অব ডেপুটীজ বা ফরাসী প্রতিনিধি সভাতে অপেক্ষাকৃত নরম দলের সহিত গরম দলের তিনি একটা আপোষ করাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে উগ্র দলের যে বিশেষ কিছু লাভ হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। শাসন-যন্ত্রের সংস্কারসাধনের প্রস্তাব উপস্থিত স্থগিত রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিচারপতিরা যে সকল বিধান দিয়াছেন, তাহাই আইনের ন্যায় প্রামাণ্য বলিয়া মান্য ও গণ্য হইতেছে। ফরাসী জনসাধারণ ইহা চাহে না। তথাকার সমাজতন্ত্রবাদীরা এই সকল আদালত-প্রদত্ত বিধানগুলি রহিত করিবার জন্য ফ্লাণ্ডিনকে বিশেষভাবে ধরিয়া পড়িয়াছেন। আর্থিক ব্যাপারে শ্রমশিল্পগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য সরকারপক্ষ হইতে চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে দলবদ্ধ হইয়া পণ্যমূল্য বর্দ্ধিত করিয়া রাখে, তাহার জন্যও প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে। ইহাতে যেন আর্থিক ব্যাপারে আপাততঃ জোড়-তালি দিয়া চালাইবার মত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্লাণ্ডিন ফরাসী শাসনতরণীর কাণ্ডারীর পদ গ্রহণ করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ফরাসি-তরণী যে বেশ সুপরিচালিতভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহার কোন পরিচয় মিলিতেছে না।

পররাষ্ট্রনীতির পরিচালন বিষয়ে মঁসিয়ে ফ্লাণ্ডিন্ বিশেষ কোনরূপ খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ব্যার্থ বা উমার্গের আমলে ফরাসী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি যেরূপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত ছিল, তাহা আর এখন নাই। মঁসিয়ে লাভালের চেষ্টা ছিল যে, তিনি জার্ম্মাণীর সহিত সাক্ষাৎভাবে একটা আপোষ নিষ্পত্তির পথ খোলা রাখিবেন। সে জন্য ফ্রান্সের সহিত রুসিয়ার যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে গোঁজামিল দিতেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। রুশপররাষ্ট্রসচিব কতকটা গা-ঢাকা দিয়া রহিলেন। কিন্তু সায়ারে ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জার্ম্মাণী যেরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন এবং জার্ম্মাণী প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য জাতির সহিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার সমকক্ষতা লাভের জন্য যেরূপ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাহার ফলে জার্ম্মাণ-নাৎসীদিগের মনোভাব কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, মঁসিয়ে লাভাল তাহা ঠিক আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। লিটভিনফ আবার নেপথ্য হইতে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জার্ম্মাণীর মনোভাব ঠিক বুঝা যাইতেছে না। জার্ম্মাণরা ভিতরে ভিতরে সমরসজ্জা করিতেছে কি না, তাহা নিশ্চিতভাবে কেহই বলিতে পারেন না। কাযেই ফরাসীরা এই বিষয়ে ঠিক কি করিবেন, অনুমান করা অসম্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় তাঁহারা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুতও নহেন। কাযেই পররাষ্ট্রনীতিতে ফরাসীদিগের দৌর্ব্বল্য দিকে দিকে প্রকটিত। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে লণ্ডন সহরে ফরাসী মন্ত্রীরা যাইয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। তাহাতে রণবিমান কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে তাহার রক্ষার উপায় করা হইয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন কিছুই হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

জার্ম্মাণীর অবস্থা

জার্ম্মাণীকে লইয়া এখন য়ুরোপ বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যাঘ্রভীত লোক জঙ্গলে প্রবেশ করিলে যেমন ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখে, সেইরূপ য়ুরোপের অনেক রাজনীতিকই জার্ম্মাণীর প্রত্যেক ব্যাপারেই যেন সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। জার্ম্মাণীর সহিত একটা এইরূপ চুক্তি করা হইতেছে যে, অন্য দেশ যাহাতে রণবিমান দ্বারা আক্রান্ত হইতে না পারে, তাহা-দিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে জার্ম্মাণীকে রণবিমানের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হয়। নতুবা তাহারা সেই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং জার্ম্মাণীকে রণবিমান বৃদ্ধি করিবার অধিকার দেওয়া আবশ্যক। জার্ম্মাণী তাহাই চাহে। জার্ম্মাণরা অন্য সকল জাতির সহিত তুল্যভাবে রণসজ্জায় সজ্জিত হইবার দাবী করিতেছে। তাহাদের সে দাবী অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু ফরাসীরা এই ব্যাপারটি সরলভাবে দেখিতে পারিতেছে না। ইহাও য়ুরোপের একটা ভীষণ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। এ দিকে জার্ম্মাণীর ভিতরকার অবস্থাও ভাল নহে। ইহুদীদিগের সহিত জার্ম্মাণীর ব্যবহার তথায় জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের উদ্ভব করিয়া দিয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীর ইহুদীরা অর্থ এবং জীবন দিয়া জার্ম্মাণ সরকারের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্ত্তমান নাৎসী সরকার ইহুদীদিগকে অনেক নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছেন,—ইহাতে পৃথিবীর লোক ঐ সরকারের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। ইহুদীদিগের মধ্যে যদি কতকগুলি লোক নাৎসী-দিগের বিরোধী হয়, তাহা হইলে আদালতে তাহাদের অপরাধের বিচার করিয়া তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া উচিত। কোন সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের অপরাধের জন্য সেই সম্প্রদায়ের সকল লোককে শাস্তি দেওয়া ঘোরতর পাশবিকতার পরিচায়ক। ইহার পরিণাম কখনই ভাল হইতে পারে না। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে কতকগুলি সরকার সম্প্রদায়বিশেষকে প্রপীড়িত করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। জার্ম্মাণীতে ইহুদী উৎপীড়ন, রুসিয়ার খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের উপর নির্য্যাতন, মেক্সিকোতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। মানুষের অধঃপাতের একটা সীমা আছেই। তাহা অতিক্রান্ত করিয়া গেলে সেই অধঃপতিত মানবসমাজের পরিণাম ভয়াবহ হইবেই হইবে। ইহার প্রথম অভিব্যক্তি জনসাধারণের অসন্তোষ। তাহা দেখিয়াও যদি লোক সাবধান না হয়, তাহা হইলে সেই মানবসমাজের ও সেই সরকারের উপর অলক্ষ্যে বিধাতার অভিসম্পাত আসিয়া পতিত হইবেই হইবে। যাহারা আপনা-দিগকে উৎপীড়িত বলিয়া মনে করে, তাহারা যদি অন্যকে উৎপীড়ন করে, তাহা হইলে তাহারা সমস্ত মানবসমাজের সহানুভূতি হারায়। জার্ম্মাণীর নাৎসীদল সেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, ইহাই অনেকের ধারণা। ইহা দেখিয়া অনেকে মনে করিতেছেন যে, জার্ম্মাণীর পরিণাম ভাল হইবে না। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন যে, এই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা নৈতিক বল দ্বারা পরিচালিত, তাঁহারাই তাহা মনে করেন। যাঁহারা তাহা মানেন না, তাঁহারা পশু-বলই উন্নতির উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এখন ভবিষ্যৎ কলাফলের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

জার্ম্মাণীর রণসজ্জা

জার্ম্মাণী আবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার জন্য পূর্ণমাত্রায় আয়োজন করিতেছে। জার্ম্মাণ জাতি গোপনে এই কার্য্য করিতেছে না, পরন্তু তাহারা প্রকাশ্যে এই কার্য্য করিতেছে। সার হিটলার বলিতেছেন যে, ভার্সাইলে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল যে, অন্যান্য শক্তিশালী রাজ্যগুলি, বিশেষতঃ বিগত যুদ্ধে লিপ্ত মিত্রশক্তিবর্গও তাঁহাদের সামরিক শক্তি কমাইয়া ফেলিবেন। কিন্তু তাঁহারা সে প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। বরং অনেকে তাঁহাদের সামরিক শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় সশস্ত্র বলবান্ শত্রু-বেষ্টিত হইয়া জার্ম্মাণী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। কাযেই জার্ম্মাণ জাতি আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য আবার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইতেছেন। জার্ম্মাণ জাতি কাহারও সহিত গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষা। সেই জন্য জার্ম্মাণ সরকার একটি সুশিক্ষিত বিমান-বাহিনী গঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বিমান-বিভাগে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন জার্ম্মাণীকে পাঁচলক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিক সংগ্রহ করিতে হইবে। জার্ম্মাণীর এই ব্যাপারে কোনপ্রকার লুকোচুরী ভাব নাই, জার্ম্মাণ সরকার সকল কথাই খুলিয়া বলিতেছেন। ফরাসীরা কিন্তু তাহা বলিতেছেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন নৌ-বাহিনী এবং বিমান-বাহিনীর জন্য টাকা মঞ্জুর করিবার কথা হইয়াছিল, তখন মিষ্টার বলডুইনও ঠিক ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। ফলে সকল শক্তিশালী জাতিই মুখে বলিতেছেন যে, তাঁহারা শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী এবং যুদ্ধে তাঁহাদের উৎকট অরুচি উপস্থিত, কিন্তু কার্য্যে তাঁহারা প্রাণান্তপণে সমরসজ্জার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এমন কি, মার্কিণ পর্য্যন্ত এই কাণ্ড হইতে বাদ পড়িতেছেন না। ফরাসীরাও অনেক রকম সামরিক আয়োজন করিতেছেন। তাঁহারা এই বিষয়ে অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সার অঞ্চল ফিরাইয়া পাইবার পর জার্ম্মাণীর বুকে বল হইয়াছে,—তাঁহারা আর কোন কথা রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে চাহিতেছেন না।

জার্ম্মাণীর এই আচরণে সমগ্র য়ুরোপ চমকিত। পূর্ব্ববর্ত্তী মিত্রশক্তিবর্গ ত্রস্ত। গত ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে জার্ম্মাণীতে নূতন রণ-বিমান-বাহিনী গঠিত হইবে কথা ছিল। তথায় সামরিক আয়োজনও নিতান্ত অল্প হইতেছে না। অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, পদশব্দ এবং সৈনিকদিগের অসির ঝনৎকার নাগরিকদিগের কর্ণে সদাই ধ্বনিত হইতেছে। ফলে এত দিন পরে ভার্সাইলের সন্ধিপত্র জঞ্জালস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইল। এই ব্যাপারে ফরাসীরাই বিশেষ ত্রস্ত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবে জার্ম্মাণী বুঝিয়েছে যে, এখন আচম্বিতে কেহই অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ বাধাইতে সাহস পাইবে না। কারণ, যুদ্ধ বাধিলে তাহার তরঙ্গ-তাড়না কতদূর বিস্তারলাভ করিবে, তাহা বুঝা কঠিন। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতেছে যে, জার্ম্মাণী একাকী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার পক্ষে অন্য কোন শক্তি আছে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? জার্ম্মাণী কিছু দিন পূর্ব্বে জাতিসঙ্ঘ হইতে নাম কাটাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ঐরূপ করিবার গূঢ় উদ্দেশ্য কি, তাহা কেহই ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। জাপানও জাতিসঙ্ঘ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে জাপান বিগত মহাযুদ্ধে যে পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, এবার আবার যে সেই পক্ষে যোগ দিবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। হইতে পারে, রুসিয়া যদি ফ্রান্সের পক্ষ হইয়া জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে জাপান অবসর বুঝিয়া সেই সময় পশ্চাদ্দিক্ হইতে রুসিয়াকে আক্রমণ করিবে। তাহা যে জাপান করিবেই, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু এরূপ ব্যাপার যে ঘটিতে পারে না, তাহা নহে। প্রাচ্য য়ুরোপের ব্যাপার যে কি, তাহাও বুঝা কঠিন। ভার্সাইলের সন্ধি অনেকগুলি রাজ্যের ঘোর অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সন্ধি বাতিল করিয়া দিবার জন্য হয় ত কেহ কেহ জার্ম্মাণীর পক্ষে যোগ দিতে পারে। কাযেই ফরাসীরা যে অগ্রসর হইয়া জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবে এবং তাহার ফলে একটা প্রলয়কাণ্ড বাধাইবে, তাহাও মনে হইতেছে না। এ দিকে জার্ম্মাণীর প্রবর্দ্ধমান শক্তিকে যদি খর্ব্ব করিতেই হয়, তাহা হইলে অবিলম্বেই জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করাই শ্রেয়ঃ, ইহা অনেকেই বুঝেন। কারণ, বিলম্ব করিলে জার্ম্মাণী নিজ বল বৃদ্ধি করিয়া লইবে। কাযেই এই সঙ্কটসময়ে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণের জন্য ফ্রান্সে, বৃটেনে, ইটালীতে এবং রুসিয়ায় খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র প্রকাশ্যে এবং গোপনে পরামর্শ চলিতেছে। বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলীতে জার্ম্মাণীর এই ঘোষণার কথা আলোচিত হইয়াছে। সার জন সাইমন এবং এণ্টনি ইডেন বার্লিনে গিয়াছিলেন। গ্রেট্ বৃটেনও হঠাৎ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান।

সার জন সাইমন

সার জন সাইমন এবং মিষ্টার এণ্টনি ইডেন বার্লিনে যাইবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্রসচিব ব্যারণ ভন নিউরাথ যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন এবং ইটালী প্রভৃতি শক্তি-বর্গ চমকাইয়া গিয়াছেন। ব্যারণ নিউরাথ বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী এখন সমস্ত শক্তিধর রাজ্যের সহিত পাল্লা দিবার মত শক্তিলাভ করিয়াছেন। তবে এই শক্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া জার্ম্মাণী ঐ শক্তি কাহারও বিরুদ্ধে বিনিয়োগ করিবেন না। সুতরাং এখন সকল দেশই আপনাকে নির্ব্বিঘ্ন মনে করিবে। এখন সকল শক্তিধর জাতিই পরস্পর নিজ নিজ গণ্ডী নিরাপদে

মিষ্টার এণ্টনি ইডেন

ভন নিউরাথ

বুঝিয়া লইতে পারিবে। ইনি আরও এক জন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলেন, "এবার যদি য়ুরোপে আবার একটা যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে য়ুরোপ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চিত।" ইহাতে বুঝা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণী আর তাহার পূর্ব্বতন বিজেতা-দিগের ভয়ে ভীত নহে। ফ্রান্স জার্ম্মাণীর এই অভিনব ভাব দেখিয়া যে কতকটা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, পাছে জার্ম্মাণ জাতি বলশালী হইয়া উঠেন, এ ভয় ফ্রান্সের বরাবরই ছিল। এখন ফ্রান্স, ইটালী এবং গ্রেট বৃটেন এই ত্রি-শক্তিই এই ব্যাপারে কি করা যায়, তাহা অবধারণ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতেছেন। এইরূপ ব্যাপারে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াই হইয়া থাকে।

এই ব্যাপারে ঘটনার গতি দ্রুত অগ্রসর এবং পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ঘটনা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। এ কথা সত্য যে, দেশের ভাগ্যবিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। যেখানে সমরসজ্জা প্রবল, সেখানে একটা সামান্য ব্যাপার হইতেই দিগ্‌দাহী অনলের আবির্ভাব হইতেই পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ কাণ্ড অনেক ঘটিয়াছে। গত য়ুরোপীয় মহাসমরের কারণও ঐরূপ তুচ্ছ। এখন জিজ্ঞাস্য, জার্ম্মাণী সত্য সত্যই রণসজ্জায় পূর্ণ-মাত্রায় সজ্জিত হইয়াছে না কতকটা সজ্জিত হইয়া অন্য সকলকে ভয় দেখাইয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইবার প্রয়াস পাইতেছে? তাহার ভিতরকার সজ্জা যে কিরূপ, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না।

আবিসিনিয়ার ভাগ্য

এখনও আবিসিনিয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না। কেবল ঘনান্ধকারে চপলা-চমকের ন্যায় এক একটা সংবাদ মিলিতেছে যে,—ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া ইটালীর সৈন্য জাহাজ-বোঝাই হইয়া ইটালীর অধিকৃত ইরিট্রিয়া অভিমুখে ছুটিতেছে। তথায় যাইয়া তাহারা কি করিতেছে, তাহার কোন সংবাদই নাই। তবে সৈন্য নিতান্ত অল্প যাইতেছে না। যুদ্ধ উপস্থিত না হইলে এত সৈন্য ঐ দিকে ছুটিয়াছে কেন? গত ফাল্গুন মাসের মাসিক বসুমতীতে আমরা আবিসিনিয়ার সহিত ইটালীর সংঘর্ষ হইবার কারণ কি, তাহার আলোচনা করিয়াছি। এ কথা সত্য যে, যে দেশে কেবল যাযাবরিয়া লোকের বসতি,—অর্থাৎ যাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘর-বাড়ী নাই,—যাহারা আজ এখানে কাল ওখানে তাঁবু ফেলিয়া বাস করে,—তাহারা সকল সময় তাহাদের স্বরাজ্যের এবং পররাজ্যের সীমারেখা মানিয়া চলিতে পারে না। সেটা যে একটা বিশেষ গুরু ব্যাপার, তাহা মনে না করিলেও চলে। কিন্তু তাহা হইলেও ইটালীয়ানদিগের সহিত আবিসিনিয়ানদিগের ঠোকাঠুকি, ঠেলাঠেলি এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর এরূপ হাঙ্গামা যে কত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাও নাই, প্রকাশও নাই। আফ্রিকার তিমিরাবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া তাহার সমস্ত কাহিনী কস্মিন্‌কালেও বহির্জগতে প্রকাশ পায় নাই। শেষটা ওয়েল ওয়ালওয়ালের ব্যাপার লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি কেন হইল, তাহা বুঝা গেল না। এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, আবিসিনিয়ার সহিত সংগ্রাম করিবার অনুকূলে ইটালীর পক্ষে কোন যুক্তিরই অভাব ঘটিবে না। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা ত প্রগতিসম্পন্ন জাতি নহে যে, তাহাদের মুখে একখানা পেটে একখানা থাকিবে। তাহারা যাহা করে, তাহা সোজাসুজিই করে। তাহাদের দেশে ক্রীতদাস ব্যবসায় চলে। স্মরণাতীত কাল হইতেই উহা চলিয়া আসিতেছে। সকলেই তাহা জানেন। উহারা কেনা গোলামদিগকে আরবদেশে চালান দেয়। এখানে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, আবিসিনিয়া দেশের কোন

দিকেই সাগরে যাইবার পথ নাই। সুতরাং এই সকল গোলাম চালানের কায ইংরাজ, ফরাসী অথবা ইটালীর উপনিবেশগুলির ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হয়। সুতরাং উহা ঐ সকল দুর্ভাগ্য জাতির জ্ঞাত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সকল সুসভ্য উপনিবেশ সরকারের জ্ঞাতসারে এবং কতকটা উপেক্ষায় ঐরূপ গোলাম চালানী কায চলিয়া আসিতেছে। নতুবা উহা চলিতে পারিত না। ওয়ালিওয়ালের ব্যাপারের পর ইটালী যদি' আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধান, তাহা হইলে ইটালীর সেই অভূতপূর্ব্ব নরহিতৈষণাই যে সংগ্রামের কারণ, তাহা কেহ মনে করিতে পারিবে না। অবিসিনিয়া রাজ্যে প্রচুর স্বর্ণ, প্লাটিনাম, রূপা, পেট্রোলিয়াম, তামা, সীসা, অভ্র, তূলা, কফি এবং দেশীয় কার্ব্বনেট অব সোডা বিদ্যমান। মিশরের খনির এঞ্জিনিয়ার জি, ই, আর সালে যে অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্লু নাইল (Blue Nile) নদীর স্রোতোবাহিত বালুকা ধৌত করিয়া তিনি তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ২ হাজার ৮ শত গ্রেণ স্বর্ণ পাইয়াছিলেন। সুতরাং এই দেশ দখল করিবার জন্য ইটালীর যে লোভ হইবে, তাহা স্বাভাবিক। ইতঃপূর্ব্বে ইটালী প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এক দিকে ইটালীর অধিকৃত ইউরাট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের এবং অন্য-দিকে অবিসিনিয়ার মধ্যবর্ত্তী কতকটা স্থান অস্বামিক (উহা কাহারও দখলে থাকিবে না) করিয়া রাখা হউক। আবিসিনিয়া সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। সেই জন্য কেহ কেহ আবিসিনিয়া রাজ্যকে নিন্দা করেন। কিন্তু পরে জানা গেল যে, ইটালীর সেই প্রস্তাবে যদি আবিসিনিয়া সম্মত হইতেন, তাহা হইলে তথাকার প্রজাদিগের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিত। ওয়ালিওয়ালের ইদেরাগুলি সমস্তই ইটালীর অধিকারভুক্ত হইত। সুতরাং সে জন্য আবিসিনিয়ার অধিপতিকে নিন্দা করা যায় না।

জনৈক মার্কিণী লেখক বলিয়াছেন যে, অনেকে সেই জন্য বলেন যে, সেনর মুসোলিনী মশা মারিবার জন্য কামান সাজাইয়া-ছেন। কিন্তু মিশরের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, সে কথা সত্য নহে। আবিসিনিয়াবাসীরা মশা নহে। এদেশের দানখালিল প্রদেশের অসভ্য অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। তাহারা নরমাংস খায়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী যখন ঐ দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহারা ১৮ শত ইটালীয় সৈন্যকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার উপর ইটালীর সৈন্যদিগকে ৩ শত মাইল বারিবিন্দুবিহীন শুষ্ক মরুভূমির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ঐ স্থানে অনেক সাংঘাতিক বিষধর পোকা, এবং সর্প আছে এবং তথায় উষ্ণ কোটি-বন্ধের জ্বররোগও অতিশয় প্রবল। সুতরাং ইটালীর পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ সহজ হইবে, তাহা মনে হইতেছে না।

যাহা হউক, আবিসিনিয়ার নরপতির জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী আদ্দিস আবারাস্থিত এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন যে, ইটালীর সৈন্য অভিযান আরম্ভ করিলেও আবিসিনিয়ার সৈন্যদল এক পদও অগ্রসর হয় নাই। ওয়ালিওয়ালের সঙ্ঘর্ষের পর তাহারা একবারেই নড়ে নাই। হাইলসিলাসী এই বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য জাতিসঙ্ঘের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ইটালী কিন্তু তাহাতে সম্মত হইতে-ছেন না। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইটালীর সহিত, আবিসিনিয়ার যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই এইরূপ সর্ত্ত করা হইয়াছিল যে, বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই সালিসী মানিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লইবেন। ইটালী এখন আর তাহা মানিতে চাহিতেছেন না। হাইলসিলাসীও বলিতেছেন যে, তিনি মধ্যস্থ দ্বারা বিবাদ মিটাইবার জন্য প্রস্তুত আছেন বটে, কিন্তু ইটালীর ভ্রূভঙ্গীকে তিনি ভয় করিবেন না। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বুঝা যাইতেছে। ইতোমধ্যে "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রের লণ্ডনস্থ জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, আবিসিনিয়া রাজ্যটি বিভক্ত করিয়া লইবার জন্য ফ্রান্স, ইটালী এবং গ্রেট বৃটেনের মধ্যে একটা গুপ্ত চুক্তি হইয়া গিয়াছে। তবে সেটা গোপন রহিয়াছে। সে কথা সত্য কি না, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, এত দিনে ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ বাধিয়াছে কি না, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। এ সম্বন্ধে কোন সংবাদই এখনও পাওয়া যায় নাই।

বৈতরণী পারে ?

জন পাকারিং বিলাতের এক জন ফল-মূল এবং তরিতরকারী উৎপাদক। তাহাকে হাঁসপাতালে অস্ত্রোপচার করিবার সময় তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রায় সাড়ে ৪ মিনিট কাল তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ ছিল। এই অতি স্বল্পস্থায়ী মৃত্যুর সময় তাহার মনে হইয়াছিল যে, তাহার আত্মা তাহার দেহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং স্বর্গে বা বৈতরণীর পরপারে এক অপূর্ব্ব লোকে কতকগুলি লোকের সহিত মিলিত হয়। যে স্থানে সে গিয়াছিল, সে স্থানটি যেন একটা প্রকাণ্ড দালানবাড়ী। তথায় খুব আলো আর বহু লোক ছিল। এত লোক তথায় উপস্থিত যে, সেই জনতা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা দেখিতে যত লোক উপস্থিত হয়, তথায় তত লোক বিদ্যমান। লোকগুলি সকলে বৃত্তাকারে দণ্ডায়-মান। সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে, সেখানে ছোট ছেলেমেয়ে ছিল না। তাহাদিগকে দেখিয়া তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এবং তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহাদিগকে সুস্থকায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহাদের মুখমণ্ডলে এরূপ আনন্দময় ভাব প্রতিবিম্বিত হইতেছিল যে, তাহাদের দলে সে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সে দুঃখবোধ করে নাই। সেই প্রফুল্ল মানব-দলে সে তাহার পূর্ব্বপরিচিত কয়েক জনকে দেখিতে পায়। তাহার মধ্যে ৭ বৎসর পূর্ব্বে এক জনের মৃত্যু হইয়াছিল। সে এই নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া পাকারিংএর মৃত্যুভয় ঘুচিয়া গিয়াছিল। সে বলিতেছে যে, সেই দৃশ্যটা তাহার বড়ই বাস্তব বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইতোমধ্যেই তাহার চিকিৎসকগণ তাহার হৃৎপিণ্ডকে সবল করিয়া দেন। সে সজীব হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ সময়কার স্মৃতি তাহার থাকিয়া যায়। সারিয়া উঠিলেও তাহার সেই স্মৃতি ছিল। এই ব্যাপার লইয়া বিলাতে এবং আমেরিকায় খুব আলোচনা হইয়াছিল। বিলাতের সুবিখ্যাত জড়বিজ্ঞানবাদী এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ববাদী সার ওলিভার লজ এই কাহিনীটিকে একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক

ইহা পারলৌকিক কাহিনী বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলেন যে, পাঁচ মিনিটের জন্য হৃদ্‌রোধ অঘটন ঘটনা নহে। হয় ত লোকটা অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারিয়াছিল। অসাড়তাসম্পাদক ঔষধের (Anæsthetic) ফলে এরূপ প্রায়ই ঘটে।

——

পূর্ব্বাকাশে ঘনঘটা

এসিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হইতেছে। গত নবেম্বর মাসে সংবাদ পাওয়া যায় যে, বাহির মঙ্গোলিয়ায় কতকগুলি সৈনিক ম্যাঞ্চুরিয়ার প্রান্তস্থিত এক অঞ্চলে প্রবেশ করে। ম্যাঞ্চুরিয়া বলিতেছে যে, ঐ অঞ্চলটি তাহাদের অধিকারভুক্ত। ম্যাঞ্চুরিয়া এখন জাপানের বশীভূত এবং বাহির-মঙ্গোলিয়া সোভিয়েট শক্তি রুসিয়ার অধীন। যাহারা বাহির-মঙ্গোলিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিতে যাইয়া ম্যাঞ্চুরিয়ার সৈন্যগণ বাহির-মঙ্গোলিয়ার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই ব্যাপার লইয়া প্রাচ্য-এসিয়াতে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। যে সময়ে এই কাণ্ড ঘটিতেছিল, সেই সময়ে মস্কো সহরে সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল। সেই অধিবেশনে রুসিয়ার ভাইস কমিসার (Commissar) টুখাচেস্কি (Tukhachesky) খুব এক গরম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, রুসিয়ার লাল পল্টনের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬২ হাজার নহে, উহা এখন ৯ লক্ষ ৪০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। এই শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে সীমান্তের রক্ষী সৈন্য ধরা হয় নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে রুসিয়ার লাল ফৌজ শতকরা ৪ শত ৩৫ জন হিসাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বিমানসৈন্যও শতকরা সাড়ে ৩ শত জন হারে বাড়িয়াছে। বিমানগুলির গতিও বহু পরিমাণে বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছে। উহার পরিদর্শনকার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার শক্তি তিন গুণ বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন রুসিয়ার যে সকল নাগরিক সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত নহেন, তাঁহাদিগকে বন্দুক লইয়া লক্ষ্যভেদ করিতে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে। দশ লক্ষ নাগরিক অব্যর্থ সন্ধানে গুলী ছুড়িতে সমর্থ, পাঁচ লক্ষ লোক প্যারা-স্যুট লইয়া লাফাইয়া পড়িতে জানে ইত্যাদি। এখন সোভিয়েট সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের এই হুমকিতে জাপান ভয় পাইবে বলিয়া মনে হয় কি? ফলে প্রাচ্যগগনে এই ব্যাপার লইয়া আবার একটা হাঙ্গামা বাধিবে কি না, কে বলিতে পারে? সমস্তই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। মানুষের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই।

——

মার্কিণের অবস্থা

মার্কিণের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলীন ডিঃ রুজভেল্ট যে সময়ে মার্কিণের প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মার্কিণের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন ছিল। তখন ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। অনেক ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াও গিয়াছিল। ফলে তখন আর্থিক ক্ষেত্রে অনেক দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। উহার সমাধানে কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। প্রেসিডেন্টের গদি পাইবার পূর্ব্বে এবং পরে মিঃ রুজভেল্ট এই আর্থিক সমস্যার সমাধান করিবেন বলিয়া অনেক আশ্বাস দিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি এই সকল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যে সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা মনে হইতেছে না। মার্কিণের বেকার-সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পায় নাই,—এখনও তথায় ১১ লক্ষ লোক বেকার অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদের কায মিলিতেছে না। রুজভেল্ট বলিতেছেন যে, এত অধিক বেকার লোকের কার্য্যের ব্যবস্থা করা সহজ নহে। সেই জন্য শ্রমিক দল তাঁহার শাসন-ব্যবস্থার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, এই কার্য্যে সরকারের অত্যন্ত অধিক অর্থব্যয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট

করিতে যাইয়া আরও কতকগুলি অবান্তর সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে শ্রমিকের কার্য্য করিতে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং যে সকল কলকারখানায় শ্রমিকদিগকে অত্যন্ত অধিকক্ষণ খাটায়, সেই সকল কলকারখানা বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন শ্রমিকদিগকে যাহাতে অল্প হারে বেতন দেওয়া না হয়, এবং অধিকক্ষণ খাটান না হয়, তাহার জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে। পক্ষান্তরে, তিনি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী। এই বিষয় লইয়া এখন নানারূপ আন্দোলন এবং আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, যাহারা অধিক মূল্যে সুতরাং অল্প খরচায় পণ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাদের প্রস্তুত পণ্য অত্যন্ত অপকৃষ্ট হয়, বরং যাহারা অধিক খরচা দিয়া ভাল পণ্য প্রস্তুত করে, তাহারা জীবনসংগ্রামে কিছু দিন টিকিয়া থাকিতে পারে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে

ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা সকলের মনঃপূত হইতেছে না। তাহারা বলিতেছে যে, উহা প্রকৃত ব্যবস্থা নহে। বড় বড় কলকারখানাওয়ালারা অধিক মজুরী দিতে পারে, দিলেও তাহাদের যথেষ্ট লাভ থাকে,—কিন্তু ছোট ছোট কারবারীরা তাহা পারে না। এ কথা সত্য, কিন্তু বড় বড় কারখানাওয়ালাদের খরচা বৃদ্ধির জন্য যদি পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ছোট কারখানাওয়ালারা তাহাদের সহিত যে প্রতিযোগিতা করিয়া কতকটা সুবিধা করিয়া লইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মার্কিণী পত্রগুলিতে প্রকাশ—ইহাতে সুফল ফলিতেছে। ইহাতে লোকের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা আয়কর দিয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, রুজভেল্টের ব্যবস্থাফলে কলকারখানাওয়ালাদের আয় ৬৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ডলার হইতে ১ শত ২১ কোটি ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ডলারে উন্নীত হইয়াছে। বেকারের সংখ্যাও আর পূর্ব্বের ন্যায় অধিক নাই; এখন বেকার লোকদিগের সংখ্যা ১১ লক্ষে নামিয়া আসিয়াছে। কৃষকদিগের আয়ও শতকরা ২০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এততেও রুজভেল্টের প্রতিপক্ষ শ্রমিক দল সন্তুষ্ট নহেন।

গত মাসে আমরা আর একটা কথা বলিয়াছি। মার্কিণের সুপ্রীম কোর্ট তথাকার মুদ্রা-সম্পর্কিত মামলার যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মার্কিণ সরকারের স্কন্ধ হইতে ২ সহস্র কোটি ডলারের দেনার গুরুভার নামিয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেনদারদের (যথা রেলওয়ে প্রভৃতির) স্কন্ধ হইতে ৫ সহস্র কোটি টাকা দেনা লাঘব হইয়া গিয়াছে। এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারপতি এই সিদ্ধান্তে একমত হন নাই। দুই দল প্রায় সমান হইয়াছিল। অবশেষে কাষ্টিং ভোট (casting vote) দ্বারা সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছিল। যে বিষয়ে উভয় মতই তুল্য প্রবল এবং যাহা শেষকালে চূড়ান্ত বিশেষ ভোট (casting vote) দ্বারা মীমাংসা করিতে হয়, সেই সিদ্ধান্ত কখনই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সন্তোষজনক হইতে পারে না। কাযেই এই সিদ্ধান্তে অনেকেই অসন্তুষ্ট। তবে এ কথা অবশ্য সত্য যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে মার্কিণ সরকারের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

বিলাতে অদ্ভুত সম্প্রদায়

ইংলণ্ডে এখনও এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, যাঁহারা ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও চিকিৎসক ডাকেন না বা ঔষধ সেবন করেন না। ইহারা মরিবে, তথাপি চিকিৎসক ডাকিবে না। ইহারা একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক। ইহারা 'অদ্ভুত লোক' বলিয়া তথায় অভিহিত। সম্প্রতি এই সম্প্রদায়ের এক দম্পতি পুলিস আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আসামীর নাম ওয়াল্টার লেভেট এবং তাঁহার পত্নী হানা লেভেট। তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা তাঁহাদের ১৩শ বর্ষীয় পুত্রকে হত্যা করার জন্য নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।

সরকার পক্ষের উকীল মিষ্টার জি কে বল অভিযোগ বিবৃতিকালে বলেন যে, ছেলেটি ২রা অক্টোবর তারিখে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতা-মাতা চিকিৎসক ডাকিতে আপত্তি করিয়াছিল। সেই জন্য বিনা চিকিৎসায় ছেলেটি মারা পড়ে। ১৩ই অক্টোবর তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। ছেলেটির নাম ছিল সাইরিল।

উইলিয়ম কপসি নামক উহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে যে, সে ঐ ছেলেটিকে দেখিয়াছিল, উহার গলায় ক্ষত হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমরা প্রভু যীশুখৃষ্টের নাম করিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়াছিলাম। (এইরূপ করিলে ঐরূপ রোগ আরোগ্য হয়, ইহাই ঐ প্রকার অদ্ভুত সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস) "আমরা মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং আমি, আমার জননী এবং আমার পিতা এই তিন জনে তাহাকে তেল (পড়া) মাখাইয়া দিয়াছিলাম।" শ্রীমতী লেভেট বলেন, তাহারা বালকটিকে কুলকুচা করিয়া কণ্ঠনালী ও গলা ধৌত করিবার জন্য ঔষধযুক্ত জল এবং গরম পানীয় দিয়াছিলেন। ১৩ই অক্টোবর তারিখে বন্দনশালায় প্রার্থনা করিবার মণ্ডলী করা হয়, সেই সময় উপর হইতে তাঁহাকে ডাকা হয় যে, ছেলেটি মরিয়া যাইতেছে। মিসেস এনিজা ষ্টামার্স মিসেস লেভেটের ভগিনী। তিনি বলেন যে, মিষ্টার লেভেট এবং তাঁহার পত্নী ছেলেটিকে খুব ভালবাসিতেন এবং বিশেষ যত্ন করিতেন। বালকটিকে ফ্লানেল গরম করিয়া সেক দেওয়া হইয়াছিল এবং অন্যরূপ চিকিৎসা করা হইয়াছিল। প্রার্থনা-পাঠের পর তাহার অবস্থা ভাল হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া সে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মরিয়া যায়। ইনি আরও বলেন যে, "আমিও বাড়ীতে ডাক্তার ডাকি না। আমি সকল সময়েই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকি,—আমার সন্তানগুলিও কখনও কখনও সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলেও সকল সময় আরোগ্যলাভ করে। যদি লোক প্রার্থনা-পাঠের ফলে আরোগ্যলাভ না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই রোগীর আরোগ্যলাভ ভগবানের অভিপ্রেত নহে।"

বিচারফলে বিচারপতি মৃত বালকের পিতা-মাতাকে এক বৎসরের জন্য মুচলেকায় আবদ্ধ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের লোকরা ভগবানের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল বলিয়া পাশ্চাত্যখণ্ডে উপহাসের পাত্র। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থাকিলে মানুষ কি হঠাৎ মরে না? এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুর হার অধিক কি না, তাহার নিখুঁত তালিকা কি কেহ সংগ্রহ করিয়াছেন? মানুষের কুসংস্কারের মূর্ত্তি যে কতরূপ, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

বেলজিয়ামের নূতন মুদ্রানীতি

বাণিজ্যব্যাপারে জয়যুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতিকবর্গ যে কত তুকতাক করিতেছেন, তাহা গণিয়া আর শেষ করা যায় না। তন্মধ্যে মুদ্রামূল্যে স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া পণ্যমূল্য হ্রাস করা একটি কৌশল। এই কৌশলটি কতটা কাযের, সে

বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। সেই হেতু সকল দেশের বার্ত্তাবিদ্‌রা এই নীতি অবলম্বন করিতে তাঁহাদের দেশের কর্ত্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিতেছেন না। অবশ্য যাঁহারা প্রথমে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রথম বাণিজ্যব্যাপারে কিছু লাভ হয়। কারণ, তাহার ফলে তাঁহাদের দেশে প্রস্তুত পণ্য, প্রস্তুতের খরচা এবং পণ্যের মূল্য হ্রাস পায়। পণ্য সস্তা হওয়াতে উহা বিদেশে অধিক পরিমাণে কাটে। কিন্তু যদি সকলেই মুদ্রামূল্য কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সে ফল আর থাকে না। যাহা হউক, ইহা যে একটা জোড়তালি দেওয়া ব্যবস্থা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। য়ুরোপের মধ্যে গ্রেট বৃটেন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পাউণ্ড ষ্টার্লিঙ্গের মূল্য স্বর্ণমান হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। তাহার দেখাদেখি উত্তর-রোডেসিয়া, দক্ষিণ-রোডেসিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং জাপান মুদ্রামূল্যে স্বর্ণমান ত্যাগ করেন। ক্রমে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, আর্জ্জেণ্টাইন, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশও পাল্লা দিয়া স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে থাকিলেন। বেলজিয়াম এ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করেন নাই। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বেলজিয়ামও তাঁহাদের দেশের প্রচলিত মুদ্রা "বেলগাবের" দর শতকরা ৩০ মুদ্রা হিসাবে স্বর্ণমান হইতে কমাইয়া দিয়াছেন। মার্কিণ যে ভাবে ঐ কার্য্য করিয়াছেন, বেলজিয়াম তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন। ইঁহারা বলিয়াছেন যে, সকল জাতি মিলিত হইয়া প্রচলিত মুদ্রা বিষয়ে যত দিন একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি না ধরিতেছেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বর্ণ-মুদ্রা বাহির করিবেন না। ফলে য়ুরোপে সকলেই মুদ্রা বিষয়ে প্রায় একই ক্ষুরে মাথা মুড়াইলেন। ইহাতে কোন দেশেরই বিশেষ লাভ হইল না। সকলেই বলিতেছেন যে, তাঁহারা অস্থায়িভাবে মুদ্রার মূল্যকে স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত করিলেন। ইঁহারা এখন স্বদেশেও স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং সকলেই ক্রমাগত স্বর্ণ-সঞ্চয়ের দিকে মন দিয়াছেন। কেন? ইহার কারণ কি? সকলেই যদি মুদ্রামূল্য হ্রাস করেন, তাহা হইলে বাণিজ্যের হিসাবেও যে কাহারও কোন লাভ হইবেই না, ইহা সকলেই বুঝিতেছেন। তবে যে বেলজিয়াম এত দিন মুদ্রায় স্বর্ণমানের মান রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি আচম্বিতে ঐ দলে ভিড়িলেন কেন? যাঁহারা এখনও স্বর্ণমান ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারাই বা কি কারণে স্বর্ণ-মুদ্রার সংখ্যা এবং পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য কেবল নোট চালাইতেছেন? ইহার নিশ্চিতই একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যে সকলেরই এখন স্বর্ণ-সঞ্চয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছে। এ কথা সত্য যে, যুদ্ধের সময় স্বর্ণই একমাত্র সহায়। তখন স্বর্ণই পসার (Credit) লাভের একমাত্র কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে বিশেষভাবে বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর উপর ভবিষ্যযুদ্ধের নিবিড় ছায়া পড়িয়াছে। সকল দেশের সরকার সেই জন্য স্বর্ণ সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইটালীও সাজ সাজ রবে হাঁক পাড়িতেছেন। ইহাতে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহা বুঝা যায়।

ইটালীর রণসজ্জা

পৃথিবীর সকল শক্তিশালী জাতিই ইদানীং যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেছেন। অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইটালীর প্রধান মন্ত্রী এবং রাজনীতিক নৌকার মাঝি সেনর মুসোলিনী বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ যে কখন্ বাধে, তাহার স্থিরতা নাই, উহা কল্যই বাধিতে পারে। সেই কথা শুনিয়া সমস্ত সভ্য জাতি চমকিয়া উঠিয়াছিল। আবার কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, ওটা মুসোলিনীর একটা উৎকট ধাপ্পাবাজী। তাহার পর কিছু দিন চলিয়া গেল। জার্ম্মাণীর রাজনীতিক কাণ্ডারী হার হিটলার অনেক গরম গরম কথা বলিতে লাগিলেন। সে কথা শুনিয়া
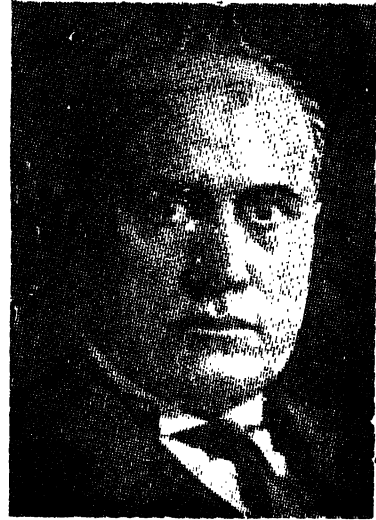
সেনর মুসোলিনী

অনেকে বিস্মিত হইয়া পড়িল। ফলে কেহ কেহ শঙ্কা করিলেন যে, য়ুরোপে আবার রণচণ্ডীর তাণ্ডবলীলা উপস্থিত হইবে। জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষার প্রহরীদিগের ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল। সম্প্রতি ইটালীর সমর বিভাগের আণ্ডারসেক্রেটারী সেনাপতি বাইশ ট্রেকৃচি তথাকার সিনেটে উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধ করিবার জন্য যে সকল জিনিষের প্রয়োজন হইয়া থাকে, ইটালীতে তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রস্তুত হইতেছে। বোমা, হাতবোমা, কামান, ম্যাক্সিম কামান প্রভৃতি অতি দ্রুত প্রস্তুত হইতেছে, এবং আগামী বসন্তকালের মধ্যে ঐ সমস্ত সমরসম্ভার সৈন্যদিগকে দেওয়া হইবে। গোলন্দাজ বিভাগের পক্ষে আবশ্যক অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্ষিপ্রতার সহিত সেনাদিগের অভিযানাদির অনুকূলভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে। সেনাপতি বাইশ ট্রেকৃচি কথাগুলি বেশ নাটুকে ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তিতে রাজনীতিকের গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার চাপল্যই অধিক ছিল। মস্তগুপ্তি অপেক্ষা ভ্রূভঙ্গীর বাহুল্যই লক্ষিত হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, যেন তিনি

তাঁহার প্রতিপক্ষদিগকে চমকিত করিয়া দিবার জন্য ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। তিনি আরও এই কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে ইটালীর আক্রমণকারীরা যে সকল উপত্যকা-ভূমিতে পাদক্ষেপ করিয়া ইটালীকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা যথাসম্ভব ভাল করিয়া রুদ্ধ এবং সুরক্ষিত করা হইয়াছে। ইনি আরও বলিয়াছেন যে, আগামী বসন্তকালে ইটালীর ৯ লক্ষ সৈনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইবে। প্রত্যেক ইটালীয় নাগরিককে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইতে হইবে। নিতান্ত নির্ব্বোধ ভিন্ন কেহ আপনাদের সমরায়োজনের কথা এবং আত্মরক্ষার বা পরাক্রমের ব্যবস্থার কথা শত্রুপক্ষের কর্ণগোচর করে না। কারণ, শত্রুপক্ষ তাহা হইলে অধিকতর সাবধান হইতে পারে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, এই কথাগুলি শত্রুপক্ষকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য হুমকী মাত্র। কিন্তু এই বিদ্যায় মুসোলিনী অপেক্ষা হার হিটলার অল্প দড় নহেন। তবে এ কথা সত্য যে, রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে যে বীরদর্প শ্রুতিসুখকর হয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেইরূপ ভৈরব গর্জ্জন অনেক সময় বিপৎপাতের হেতু হইয়া পড়ে। এইরূপ করিতে করিতেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ফলে যুরোপে বিষম সমর-শঙ্কা জাগিয়াছে।

সেনাপতি বাইস ট্রোক্চির এমন কথাও বলিয়াছেন যে, আপাততঃ কিছু দিন রাজনীতিক্ষেত্রে শঙ্কাজনক ভাব যাইবে, তাহার পরই আচম্বিতে কয়েক দিনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। ইহা যে একেবারে অসম্ভব, তাহাও মনে হয় না।

হাপ্‌টমানের মামলার খরচা

লিণ্ডবার্গের পুত্র চাল স আগাষ্টাস লিণ্ডবার্গ হত্যার মামলায় নিউইয়র্ক সিটি পুলিসের ৫১ জন লোক তদন্তকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। পুলিস বিভাগ এই কার্য্যের জন্য ৩ লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়াছিল। কিন্তু এই খরচাটা সমস্ত মামলা-খরচায় তিন ভাগের এক ভাগেরও কম। সর্ব্বসাকল্যে এই মামলায় সকল পক্ষের একুনে দাঁড়াইয়াছিল ১০ লক্ষ ডলার। সরকার পক্ষেরই ব্যয় হইয়াছিল ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ডলার। এই মামলার ব্যয় সম্পর্কে মার্কিণে নানা দিক দিয়া যে হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, এই মামলায় ১০ লক্ষ ডলারের কম খরচা হয় নাই। ১০ লক্ষ ডলার মোটামুটি আমাদের দেশের ৩০ লক্ষ টাকার সমান। মার্কিণে মামলার খরচ কিরূপ হইয়াছে, তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিপত্য ও মৃত্যুর হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বিভিন্ন রোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এ কথা অস্বীকার করিবার নহে। প্রতি বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর। এমন এক দিন ছিল—যখন বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য, ধনসম্পদ, আমোদ-প্রমোদ, আশা-ভরসা, সুখশান্তি ও স্বাস্থ্যবল সকলই বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে, প্রতি সহরে বিরাজমান ছিল, কিন্তু আজ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে দিনে দিনে পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য ক্রমশঃ নষ্ট হইতে চলিয়াছে, এ ধ্বংসের পথ রোধ না করিলে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি আর নাই। আজ যে কেবল এই রোগ এই প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে, বরং ইহা বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিয়াছে, ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবে পল্লীর কুটীরগুলি শূন্যপ্রায়, পল্লীর বৃহৎ অট্টালিকা এখন পরিত্যক্ত। দেশের স্বাস্থ্যের আব-হাওয়া এখন এত দূষিত যে, পুনরায় শীঘ্র ইহাকে বিশুদ্ধ না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার আর উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া এ দেশে এখন সাধারণভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে, এমন কি, নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত ইহার সহিত পরিচিত। ধনী প্রাসাদের মধ্যে ইহার আক্রমণ হইতে নিস্তার পান না। কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে এনোফিলিস মশক রক্ত শোষণ করিয়া ঐ বিষ যদি কোন সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তখন রোগ প্রকাশ পায়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, যে স্থলে এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশ জন। এই কালব্যাধিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি যে কত নষ্ট হইতেছে, তাহার পরিমাণ হয় না। শীর্ণ দেহে, প্লীহা-যকৃৎ সংযুক্ত উদরে, পাংশুমুখে কত শত উপার্জ্জনক্ষম যুবক গৃহের কোণে নিরুপায় হইয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া নবীনা মাতার স্তন্যদুগ্ধও শুষ্ক হইয়া যায়, ক্ষুধাতুর শিশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া-বিষ রক্তস্থ লাল কণিকাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বা ক্রমে তাহার ধ্বংসসাধন করিয়া রক্তাল্পতা উপসর্গ আনয়ন করে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর ক্ষীণদেহ রক্তের অভাব হেতু পাংশুবর্ণ হইয়া যায়, খাদ্যে অরুচি, পেটজোড়া পিলে, কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন এ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। বহু বৎসর গবেষণার পর ইহা বিশেষজ্ঞগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সুইজারল্যাণ্ডের আবিষ্কৃত রচিটোন ম্যালেরিয়া-রোগীর কর্ম্মশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করে। রচিটোনের মূল্যবান উপাদানগুলি স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ-সংমিশ্রণ বলিয়া অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার গুণ ও কার্য্যকারিতা অনেক বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর রচিটোন ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া জীবাণুদের ধ্বংসসাধন করিয়া, শরীরে নূতন রক্তকণিকা সৃষ্টি করিয়া রক্তকে সতেজ করে। ইহা সেবনে আহারে রুচি হয়, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। রচিটোন সেবনে দুর্ব্বলতা দ্রুত দূর হইয়া দেহে যথেষ্ট নববল ও জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়; উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

ডাঃ এম, জি, বসাক (এম, বি)

সেয়ার-সমস্যা

ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যবর্ত্তী, খনি ও কারখানাবহুল, এই স্থানটির নাম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুপরিচিত। সেয়ার অঞ্চলটি য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতিক জগতের নিকট রাষ্ট্রনীতিক কারণে ক্ষতস্থান বলিয়া পরিগণিত। সেয়ার আল্‌সেস্ লোরেনের উত্তরভাগে অবস্থিত।

সেয়ারের পরিমাণ ৭ শত ৩৮ বর্গ-মাইল মাত্র। উহার লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার। আল্‌সেস্ লোরেনের সহিত সেয়ার ঐতিহাসিক ও বার্ত্তিক বন্ধনে দৃঢ়-সংবদ্ধ।

সেয়ারের কৃষক-নারী জ্বালানিকাষ্ঠ লইয়া চলিয়াছে

অতি প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চল লইয়া য়ুরোপে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

আটিলা ও সিজারের সময় হইতে ফস্ ও ভন্ হিণ্ডেন-বার্গের যুগ পর্য্যন্ত সেয়ারে উপতক্যাভূমি ও অরণ্যানী অভিযানকারী সেনাদলের পদশব্দে ও হুঙ্কারে অনুরণিত হইয়া আসিতেছে।

য়ুরোপের মহাসমরের পর ভার্সালে সন্ধিসূত্রে ফরাসীরা জার্ম্মাণদিগের অধিকার হইতে আল্‌সেস্ লোরেনকে ফিরাইয়া পায়। উহার সংলগ্ন সেয়ার অঞ্চলটি সেই সময় স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হয় এবং ইহা সাব্যস্ত হয় যে, জাতিসঙ্ঘ ১৫ বৎসরকাল উহা শাসন করিবেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে সেই পনের বৎসর শেষ হইয়াছে।

উক্ত সন্ধিসর্ত্তে উল্লেখ ছিল যে, জাতিসঙ্ঘের পঞ্চদশ বর্ষ শাসনকাল উত্তীর্ণ হইলে, সেয়ার অঞ্চলের ভোটদাতারা তিনটি উপায়ে সেয়ারের সমস্যার সমাধান করিবেন। (১) ইচ্ছা করিলে সেয়ারবাসীরা জাতিসঙ্ঘের শাসনাধীন থাকিতে পারিবেন; (২) ফ্রান্সের সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন; (৩) জার্ম্মাণীর সহিত পুনরায় যুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন। সংবাদপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সেয়ার অঞ্চলের অধি-বাসীরা অধিক ভোটে জার্ম্মাণীর সহিত যুক্ত হইবার অধিকার পাইয়াছেন, য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রের এই ঝটিকা-কেন্দ্রটির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। "মাসিক বসুমতীর" পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সেই জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

ভৌগোলিক হিসাবে সেয়ার অঞ্চলটি শৈল-সমাকীর্ণ, মাঝে মাঝে উপতক্যাভূমি বিরাজিত। লক্সেমবার্গের পার্শ্বেই উহা অবস্থিত। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সেয়ার ক্ষুদ্র দেশ। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণের উহা ক্ষেত্রস্বরূপ (Buffer state)। প্রুসিয়া ও ব্যাভেরিয়া নামক জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের দুইটি রাজ্য হইতে

সেয়ারকে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে এই অঞ্চলের বসতি ঘন-সন্নিবিষ্ট—প্রতি বর্গ-মাইলে এক হাজার নর-নারীর বসবাস; সেয়ারের প্রধান নগরের নাম সেয়ার-ব্রুকেন। উহার লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার। অথচ বৎসরে সেয়ারের ট্রেণে ৬ কোটি যাত্রী গতায়াত করিয়া থাকে। সেয়ার-ব্রুকেনের যে কোনও কফিখানায় বসিয়া অতিথিদিগকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সকলেই লাল কপি এবং সিদ্ধ শূকরমাংস ভোজন করিতেছে—বীয়ার মদ্য পান চলিতেছে, বাদকদল বাদ্য-যন্ত্রে সঙ্গীতালাপ করিতেছে। স্থানটিকে দেখিলেই মনে হইবে, উহা যেন জার্ম্মাণীর শ্রমশিল্পের কেন্দ্রস্থান।

রোমকযুগেও সেয়ার-সমস্যা প্রবল ছিল। রাইন নদের পূর্ব্বতীরভূমি হইতে সে সময়েও বহুলোক এই অঞ্চলে অভিযান করিত। সিজারের স্বহস্তলিখিত বিবরণে জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিক-গণের পরিচয় পাওয়া যায়। রোমকদিগের একটা বিবরণে দেখা যাইবে যে, ১ লক্ষ ২০ হাজার বর্ব্বর এইখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল।

সিজার এই জার্ম্মাণদিগকে ভয় করিতেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল, উহারা রোম নগরকে পর্য্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিতে
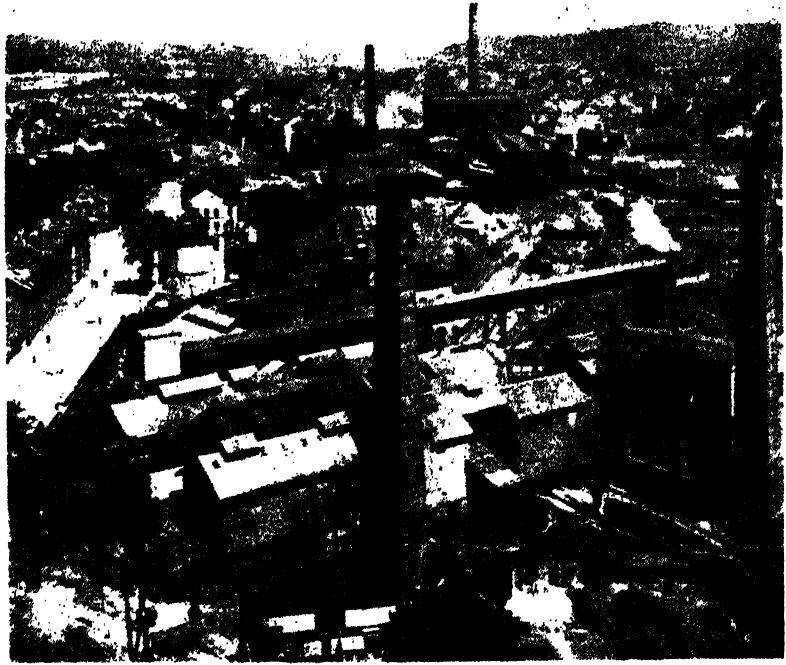
নিউন্‌কার্চ্চেনের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা

সেয়ারবার্গের প্রাচীন দুর্গ—নিম্নে সেয়ার নদ প্রবাহিত

সেয়ারব্রুকেনের পথে
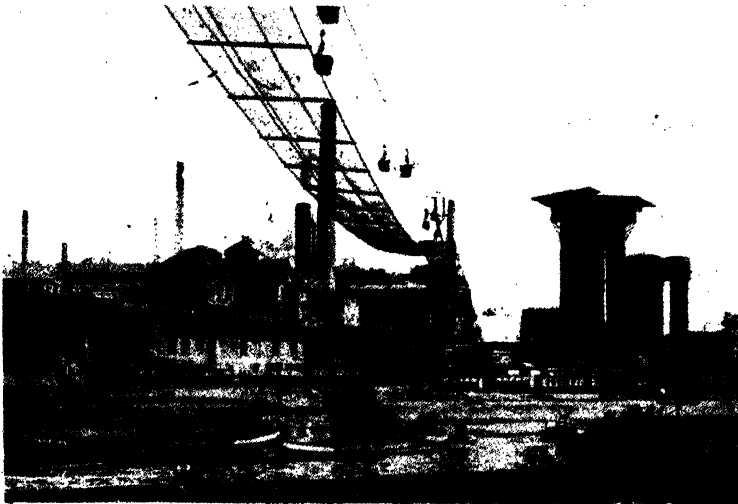
সেয়ার অঞ্চলের রাজপথগুলি ঐতিহাসিক। অনেক ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষও এখানে আছে। পিউটিঙ্গার মানচিত্রে কতকগুলি ২ শত খৃষ্টাব্দের সামরিক রাজপথের উল্লেখ দেখা যায়। আর্জ্জেনটোরেটম্ (বর্ত্তমান ষ্ট্রাস্‌বার্গ) এর উত্তরদিক হইতে আরম্ভ করিয়া একটি পথ সেয়ার নদীতট পর্য্যন্ত প্রস্তুত। সেয়ার নদীর উপর ঐরূপ সময়ে রোমকগণ একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। নদীর উপর একটি সেতু আছে। উহার উপর দিয়া সেনাদল গতায়াত করিত। সেয়ার সেতুর নামানুসারে সেয়ারব্রুকেন সহরের নামকরণ হইয়াছে। আধুনিক সেয়ারব্রুকেন সহরে রোমক দুর্গটিই প্রথম অট্টালিকা।

সেয়ার নদের তীরবর্ত্তী লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা

সে সময় নদীতীরবর্ত্তী সমগ্র স্থান অরণ্যসমাকুল ছিল। সেই অরণ্যে পৌত্তলিক ড্রুইড এবং বর্ব্বর কেলটিক সম্প্রদায় বাস করিত। তাহারা বর্শার সাহায্যে মৃগ, বরাহ প্রভৃতি শিকার করিত। সেয়ার অরণ্যে ড্রুইডদিগের কৃষ্টির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে

পারে। এজন্য তিনি গলদিগের সাহায্যে জার্ম্মাণদিগকে রাইন নদের অপর পারে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

গৃহবিবাদ—যুদ্ধ সংঘটিত হইত। এইরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে সেয়ার অঞ্চলের অধিবাসীরা বর্ব্বরতা পরিত্যাগ করিয়া সভ্য হইল, স্থিরভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অরণ্যভূমির মধ্যে দুর্গ, গ্রাম এবং সহর প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

মাউণ্টক্লেয়ার যাইবার পথে সেয়ার নদের দৃশ্য

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে অভিযানকারী ফরাসী সেনাদল সেয়ারব্রুকেন এবং ওটউইলোর অসংখ্য পুরাতন দুর্গে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। কোন কোন দুর্গের অধিবাসীদিগকে গিলোটিনে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সেয়ারব্রুকেনের জার্ম্মাণভাষাভাষী অধিবাসী, মোটরকার অধ্যুষিত রাজপথ, নবগঠিত বড় বড় হলগৃহ, স্নানাগার, প্রস্তররচিত সুদৃশ্য রাজপথ-সমূহ, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ, বিমান-বন্দর, যাদুঘর, কাচমণ্ডিত বিদ্যুতালোকিত বড় বড় দোকান, সংবাদপত্র-সমূহ, ছাত্র-ছাত্রীপূর্ণ বিদ্যালয়-সমূহ প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় না, কোনও যুগে এই সহর রোমক অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিল। রোম নগরে যেমন বহু ল্যাটিন ইমারত বিদ্যমান, সেরূপ কোনও অট্টালিকা সেয়ারব্রুকেনেও নাই।

অবশ্য রোমকযুগের অনেক ধ্বংসস্তূপ এখানে আছে—মৃত্তিকা খনন করিলে বহু ধ্বংসস্তূপ হইতে সে যুগের পল্লীভবন, স্নানাগার, সেতু এবং কোন কোন স্থানে খৃষ্টধর্ম্মমন্দিরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে। থোলে নামক স্থানে একটি ধর্ম্মমন্দির আছে, উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেয়ারব্রুকেনের সন্নিহিত স্থানে, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় একটা মৃসজেদ

লৌহ গাগান হইতেছে

সেণ্ট ওয়েণ্ডেলের ধর্ম্মমন্দির

ফরাসীরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেখানে মরক্কোর সেনাদল নমাজ পড়িত।

সামরিক দিক দিয়া ধরিলে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সেয়ারই স্বাভাবিক পথ। বহু শতাব্দী ধরিয়া উভয় প্রদেশের মধ্যে রাজ্যসীমা, উপলক্ষে সেয়ার লইয়া বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

শার্লামেন সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভার্ডুন সন্ধি অনুসারে সেয়ার জার্ম্মাণীর অন্তর্গত হয়।

ভার্ডেন সন্ধির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণী সেয়ারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিয়াছিল। মাঝে দুইবার অত্যল্প-কালের জন্য সেয়ার জার্ম্মাণীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। দুইবারের মধ্যে শেষবার—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ে নেপোলিয়ন ফরাসী সাম্রাজ্যের সীমান্ত রাইন নদ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ব্লুচার প্রুসীয় সেনাবাহিনীসহ ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে জার্ম্মাণবাহিনী যে পথে অগ্রসর হইয়াছিল, ব্লুচার সেই পথ ধরিয়াই অভিযান করিয়াছিলেন।

কয়লার খনির একটি দৃশ্য

ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের সময়, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভন্ মলট্‌কে ব্লুচারের নির্দ্দিষ্ট পথেই অভিযান করিয়াছিলেন। সেয়ারব্রুকেনের কাছেই উভয় সেনাদলের মধ্যে প্রথম সংঘাত হয়। সেই যুদ্ধে বিসমার্ক জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগ লাভ করেন। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় এই পথেই সেনাদল অভিযান করিয়াছিল এবং মিত্রশক্তি-পুঞ্জের বহু সৈনিক সেয়ার নদে তাহাদের পরিধেয় বসন ধৌত করিয়াছিল। শুধু সেয়ার নদ নহে,

কারখানায় গলিত লৌহ

সেম্বারের শস্যক্ষেত্র

সেয়ারে আলুর চাষ

ফ্রাঙ্কেন্‌হোলজ্ খনি

মসেল এবং রাইন নদের জলে এই কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল।

সেয়ারলুই সহরে মার্শেল নে জন্মগ্রহণ করেন। এই সহরের মধ্যস্থানে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও বিদ্যমান। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সহরের অধিবাসীরা ২ শত বৎসর ধরিয়া সেনাবারিকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। প্রথমতঃ ফরাসী, তার পর জার্ম্মাণ, অতঃপর ফরাসীদিগের সহিতই কারবার চলিত।

দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র

অধুনা উক্ত পুরাতন দুর্গের চারি পার্শ্বের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পরিখা বুজাইয়া বড় বড় পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। আমেরিকানগণ ম্যানিলা সম্বন্ধে যেমন করিয়াছিল, এখানেও সেই ব্যবস্থা করিয়াছে।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ পদাতিক, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী সেনা এবং সেনাবাহী যানসমূহ—যুদ্ধের যাবতীয় অর্থনাশকারী যন্ত্রপাতি—সেয়ারলুইয়ে ভিড় করিয়া থাকিত। তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিলে ফরাসীরা কিছুদিন এখানে ভিড় করিয়াছিল। কিন্তু এখন সেই বিরাট ও বিশাল সেনাবারিক শূন্যপ্রায়। কোনও শব্দই এখন সেখানে শুনিতে পাওয়া যাইবে না। রণবাদ্যের ঝঞ্চনা, সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী সেনাদলের কুচকাওয়াজ সবই এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেয়ার অঞ্চলের ভাষা জার্ম্মাণ, ঐতিহ্য জার্ম্মাণীর, কৃষ্টিও জার্ম্মাণজাতির। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি ২ শত অধিবাসীর মধ্যে মাত্র এক জনের মাতৃভাষা ফ্রেঞ্চ ছিল। শুধু আইনের একটা দুর্ঘটনায়, ভার্সাইল সন্ধিসর্ত্তের প্রভাবে এই অঞ্চলের জার্ম্মাণ
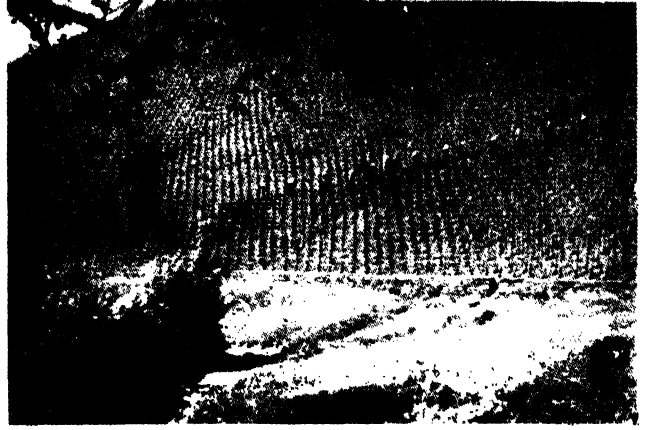
সেন্বিগ ধর্ম্মমন্দির—বোহেমিয়ার অন্ধরাজা জনের সমাধিক্ষেত্র

মেটলাকের গির্জ্জা

সেতুর উপর জার্ম্মাণ তরুণ-তরুণী

অধিবাসীদিগকে ছায়াময় একটা রাজ্যের অধিবাসী করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও অস্থায়িভাবে। উক্ত সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে সেয়ারবাসীরা কোনও জাতির অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পায় নাই। তাহারা আপনাদের মধ্য হইতে কোনও প্রেসিডেন্টও খাড়া করিবার সুযোগ পায় নাই। জাতিসঙ্ঘ পাঁচ জন য়ুরোপীয়ের নাম বাতলাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সেয়ারের ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন। ঐ কাল পর্য্যন্ত সেয়ার অঞ্চল সর্ব্বসাধারণের স্থান ছিল।

এই অঞ্চলের সিভিল সার্ভাণ্টগণ সকলেই জার্ম্মাণ। আদালত এবং স্কুলের কর্ম্মচারীরাও জার্ম্মাণ-জাতীয়।

সর্ত্ত অনুসারে ফ্রান্সের নিয়মে সেয়ারের শুল্ক নির্দ্ধারিত হইত। জার্ম্মাণ ও সেয়ার সীমান্তে ফরাসী শুল্ক-কর্ম্মচারীরা ঘুরিয়া বেড়াইত ফরাসী মুদ্রা এখানে প্রচলিত ছিল। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর দ্বারা ফ্রান্সের নিজস্ব কয়লার খনিগুলির ক্ষতি হওয়ায়, সেয়ারের কয়লার খনিগুলি ফ্রান্সের অধিকারে আসিয়াছিল। সন্ধিসর্ত্তে এইরূপ উল্লেখ ছিল যে, সর্ব্বসাধারণের ভোগকাল সমাপ্ত হইলে, জার্ম্মাণী ঐ সকল কয়লার খনি ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এইরূপ সর্ত্তও পাকাপাকি করিয়া লওয়া হইয়াছে।

শুধু সেয়ারলুই সহর ও তাহার আশপাশের কোন কোন স্থানে ফরাসী প্রভাব দেখা যায়। কয়েক জন ফরাসী তথায় বাস করেন বলিয়া এরূপ প্রভাব ঘটিয়াছে, তাহা নহে অতীত যুগেও এই প্রভাব ছিল। চতুর্দ্দশ লুই যখন ভৌবনের পুরাতন দুর্গকে ফরাসী সেনাবারিকে পরিণত করেন, তখন হইতেই উহা ফরাসী

কেল্লা-সহরে পরিণত হইয়াছিল। সমাধিক্ষেত্রে ফরাসী ভাষায় উৎকীর্ণ পরিচয় লিপিপূর্ণ সমাধি দেখিতে পাওয়া যাইবে। সহরের প্রাচীন অধিবাসীরা জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষার জগাখিচুড়ী-মূলক এক প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছত্র কথাটার ফরাসী নাম "প্যারাপ্লিঁ" (parapluie), জার্ম্মাণী নাম "রিজেন্ সিরিম্" (Regenschirm)। এখানে ছত্রকে "প্যারাপ্লিসিরিম" (paraplischirm) বলিয়া উল্লেখ করে।

জাতিসঙ্ঘের ভবন

সমগ্র অঞ্চলটি পরিপূর্ণ মাত্রায় জার্ম্মাণভাবাপন্ন—ভাষা, ভাব, গান—সকল বিষয়েই জার্ম্মাণ প্রভাব প্রকট। রেডিওযোগে যে সকল বক্তৃতা এখানে প্রচারিত হয়, তাহাও ফ্রাঙ্কফোর্ট ও ষ্টুট্গার্ট হইতে আইসে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে জনতা জার্ম্মাণ সঙ্গীত সহকারে স্মৃতিমন্দিরগুলিকে পুষ্পসম্ভারে আচ্ছন্ন করে।

অনেক দোকানে লেখা থাকে—'এখানে ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলা হয়।' ফ্রান্সের বহু মূলধন এখানে ফেলা হইয়াছে। অনেক খনি ও কলের বড় কর্ত্তা ফরাসী। কিন্তু শ্রমিক ও সাধারণ কর্ম্মচারীরা জার্ম্মাণ। খনির কায, দোকানপরিচালনপদ্ধতি, কৃষিকার্য্য, সবই জার্ম্মাণ পদ্ধতি অনুসারে চলিয়া আসিতেছে।

এখানকার বিরাটকায় মিল-সমূহ হইতে অনবরত ধূসর বর্ণের ধূম্রমেঘজাল নিঃসৃত হইয়া থাকে। অন্ধকার রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ড-সমূহের আলোকরাশি সমুজ্জ্বল দেখায়।

এখানকার প্রত্যেক শৈল কয়লায় পরিপূর্ণ। প্রত্যেক খনির উপরে প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর চাকা ঘুরিতেছে।
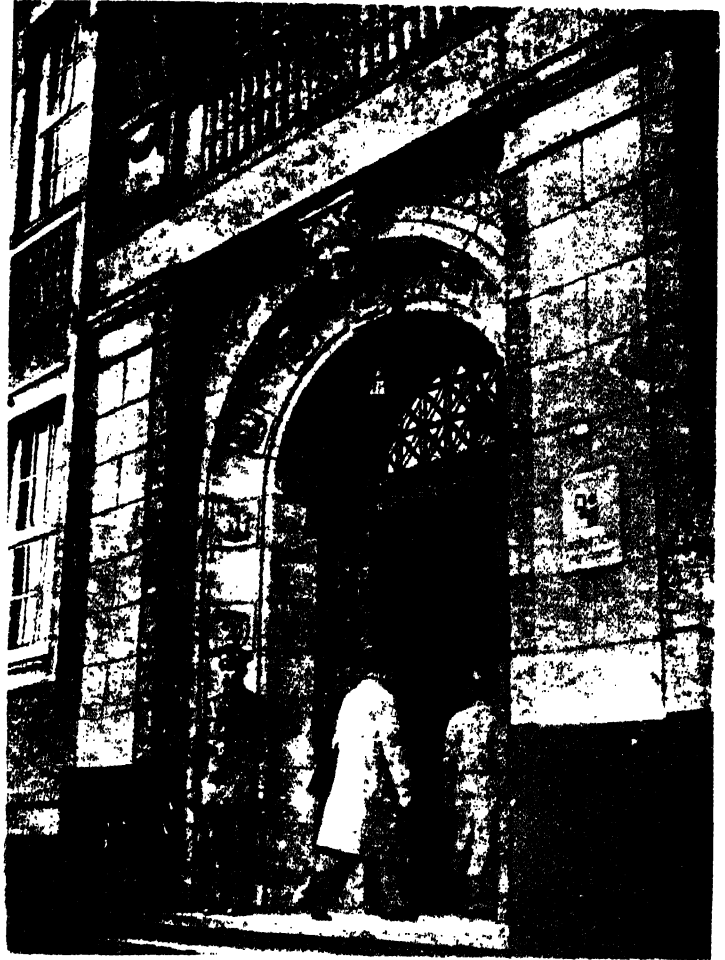
সেয়ার নদে মাছ-ধরা
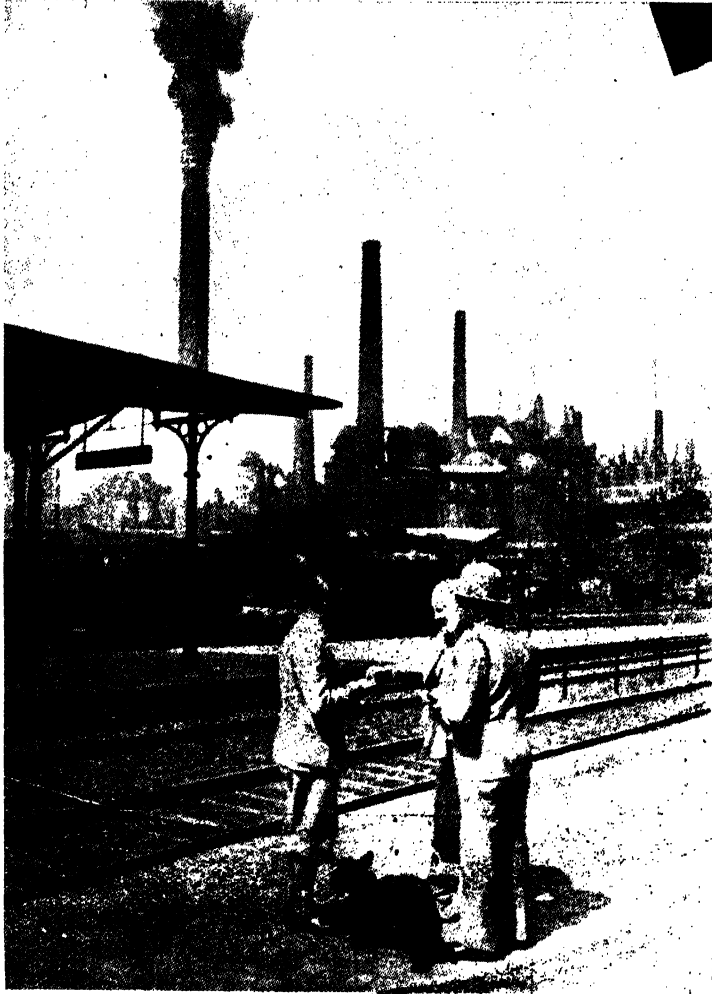
ভোল্‌ক্‌লিন্‌জেনের লৌহ-কারখানা

এখানে কয়লার খনি ও ইস্পাতের মিল অরণ্যের ধারে ভিড় করিয়া রহিয়াছে। এরূপ দৃশ্য পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। অরণ্য-সমূহ এখনও নিবিড় এবং বৃক্ষরাজি-পরিপূর্ণ। ড্রুইডদিগের সময় যেরূপ ঘন অরণ্য ছিল, এখনও তাহাই আছে।

বহু কয়লার খনির পার্শ্বস্থ সহর-অট্টালিকার প্রস্তর ও ইষ্টক কয়লার ময়লায় কালো হইয়া গিয়াছে; গাছ-পালার উপরেও কয়লার গুঁড়া। এমন কি, নদীর জলও যেন কয়লার গুঁড়ায় কালো হইয়া পড়িয়াছে।

খনির মধ্যে যাহারা কায করে, সকলেই স্থিরমস্তিষ্ক। কদাচিৎ কেহ উপহাস, বিদ্রূপ বা গান করিয়া সময় নষ্ট করে। খনির গর্ভে নামিবার পূর্ব্বে সকলেই টুপী খুলিয়া প্রার্থনার স্তোত্র-গুলি পাঠ করিয়া থাকে।

যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও খনির মধ্যে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ভূগর্ভের মধ্যে খনির কার্য্য বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময় হইতে একমাত্র ধর্ম্মবিশ্বাসই খনির শ্রমিক-প্রভৃতির একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় ছিল। সেয়ার নদের চারি পার্শ্বস্থ রাস্তার মোড়ে মোড়ে ক্রুশচিহ্ন দেখা যাইবে। প্রত্যেকটি ফুলের গুচ্ছে সুশোভিত। গুডফ্রাইডের উৎসবের দিন খনির শ্রমিকদিগের শিশুসন্তানগণ গ্রাম্য রাজপথে গান করিয়া বেড়াইতে থাকে।

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মাতা ও পুত্র

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রুসীয় খনি-পরিচালকগণ খনির কর্ম্মচারীদিগের জন্য এখানে বাসভূমি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি একটি সমিতি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই সমিতি শ্রমিকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকে। এই সমিতির নাম "ন্যাপ্‌সাফ্‌ট।"

সেয়ারে শস্য মাড়াই

সেয়ারের যাবতীয় খনির কর্ম্মচারী এই সমিতির সভ্য। পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেই এই সমিতি শ্রমিককে বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে। বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণের টাকার বিষয়েও এই সমিতি সকলকে সাহায্য করে।

সেয়ারে কয়লা, জ্বালানি কয়লা, ইস্পাত ব্যতীত সিমেণ্ট, আল্‌কাতরা প্রভৃতিও উৎপাদিত হয়; সাবান, নানাবিধ গন্ধ-দ্রব্য, চুরুট, চুরুটিকা, জুতা, দীপশলাকা, বীয়ার মদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি এখানকার কারখানা-সমূহে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু এখানকার উৎপন্ন খাদ্যশস্যে এ অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সঙ্কুলান হয় না। গম, মাংস, ফল, দুগ্ধ এবং শাক-সব্জী ফ্রান্স হইতে আইসে। তামাক প্রভৃতিও এখানে চুরী করিয়া বিক্রীত হয়।

এখানকার খনি ও কলের শ্রমিকদিগের অধিকাংশেরই নিজ বাসভবন আছে। প্রত্যেকের বাড়ীর সংলগ্ন ছোট চাষের জমী আছে।

সেয়ার নদের তীর ধরিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিলে, ফুলজবাচ্‌ এবং ফিস্‌বাচ্‌ উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া

সেয়ারের কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা

সেয়ারের অরণ্য—পার্শ্বে নদী

সেয়ারব্রুকেনএ পল জোসেফ্ গোয়েবেল্‌স্‌এর অভ্যর্থনা

সেয়ার-নদে বড় নৌকা

বটে, কিন্তু কোনও লোকের বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয় না। পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় পুরুষরা আহার্য্যদ্রব্যপূর্ণ পাত্র হস্তে ট্রেণে, ট্রামগাড়ীতে বা দ্বিচক্র-যানে চড়িয়া অথবা পদব্রজে চলিয়াছে।

সেরিগএ বোহেমিয়ার অন্ধরাজা জনএর দেহ সমাহিত হইয়াছে। সেইখানে একটি পুরাতন গির্জ্জা আছে।

বার্ত্তিক হিসাবে সেয়ার এবং গমনকালে পাশাপাশি অনেক গ্রাম দৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র সেই সঙ্গে দেখা যাইবে। প্রত্যেকের গৃহে দুগ্ধবতী ছাগী ও শূকর আছে।

সেয়ারের জনসাধারণের শতকরা দশ জন. কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। বাকি শতকরা ৯০ জন খনি ও কল-কারখানায় কায করে।

.বেকার-সমস্যা এখানেও আছে
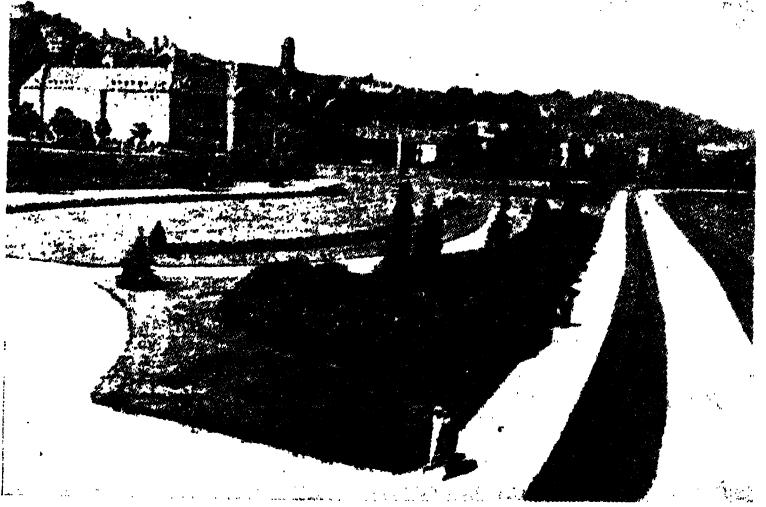
সেয়ারব্রুকেনের সরকারী ভবন

আল্‌সেস্ লোরেন আত্মনির্ভরশীল। কারণ, একটিতে কয়লা, অপরটিতে লৌহখনি বিদ্যমান। কিন্তু সকলেরই প্রাণে জাতীয়তাবোধ অর্থসংক্রান্ত চিন্তাকে কোণঠাসা করিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

এ অঞ্চলে যাহারই পতাকা উড্ডীন হউক না কেন, চিরদিনই সেয়ারের মধ্য দিয়া সেনাদলের অভিযান চলিবে।

পাহাড়ের ধারে কৃষক ও কৃষকপত্নী আলুর চাষ করিতেছে

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

"যৌবনে দাও রাজটীকা!"

(গল্প)

সভায় বিষম তর্ক চলিয়াছে। বয়সে কাঁচা—সকলেরই বচনে বাজি ফুটিতেছে। দাশু ওরফে দাশরথি বলিল,—বুড়োর দলকে নির্ব্বাসিত করতে না পারলে আমাদের বনে গিয়ে বাস করতে হবে। যে দিকে চাই, দেখি, বুড়োরা ফটক আগলে বসে আছে! তাদের কাছে আমরা কি পাই? শুধু নিষেধ আর শাসন!

অধীর বলিল,—কবি বলেচেন, 'যৌবনে দাও রাজটীকা!' আমাদের জীবনে কবির এই বাণী হবে অভয়-মন্ত্র!

দাশু কহিল,—বৃদ্ধ কবিবরকেও পেন্সন দিতে হবে। দুনিয়া ভরে চলবে আজ youth movement. দাও সকলে চাঁদা। আমরা যৌবন-অভিযানে বেরুবো!

শ্রীমতী প্রত্যুৎপন্নমতি দেবী কহিল,—যত কিছু প্রাচীন প্রথা-রীতির উচ্ছেদ চাই!

মিশ্র কলরব উঠিল।

—বিবাহ-বন্ধন করো উচ্ছেদ!

—পর্দ্দা-পাঁচিল করো বিভগ্ন!

চারু চমকিয়া উঠিল। তার স্ত্রী সুধীরা তরুণী, রূপসী। সে কহিল,—যে তরুণীকে আমি বিবাহ করেচি, তাঁকে আমি ত্যাগ করতে পারবো না!

দাশু কহিল,—যারা বিবাহ করেচে, তারা exceptions. তবে নিয়ম করো, ত্রিশ বৎসর বয়সের উর্দ্ধচারীদের আমরা চাই নির্ব্বাসন।

পলাশ কহিল,—কিন্তু আমরাও অদূর-ভবিষ্যতে ত্রিশের সীমা পার হবো যে···এই পঁচিশকে চির-জীবন আঁকড়ে থাকা তো সম্ভব হবে না। তখন···?

দাশু কহিল,—আমাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা ইতি-মধ্যে যে আব-হাওয়ার সৃষ্টি করবো, তাতে থাকবে যৌবনের সুর! যৌবনের ছন্দ! আমরা কখনো প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হবো না! আমাদের ত্রিশ বৎসর হবে মারাত্মক-সবুজ-রঙে রঙীন! সেই রঙের ছোপ লাগিয়ে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর বয়সেও আমরা থাকবো সবুজ, নবীন, কাঁচা!

দাশু কবি। তার রচিত সঙ্গীতে সভায় কোরাশ জাগিল। সকলে গাহিল,—

> করো জীবন যৌবন-লগ্ন!
> রহো শ্যামল সবুজে চির-মগ্ন!
> বিবাহের চির-বন্ধন—আতুর ক্রন্দন—
> পর্দ্দা-প্রাচীরে করো ভগ্ন!

সভা ভাঙ্গিলে সকলে চলিল শ্রীমতী প্রত্যুৎপন্নমতির গৃহে। সেখানে ছিল চায়ের আসর। সভা হইতে মাসিক-পত্র বাহির হইবে। শ্রীমতী প্রত্যুৎপন্নমতি দেবী সম্পাদিকা। দেবী 'অবতরণিকা' লিখিয়াছে। পড়া হইল।

লিখিয়াছে,—জগতের ইতিহাস খুলিয়া ত্যাখো,···দেখিবে, বৃদ্ধ চিরদিন বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে! দুনিয়া যে-সব নূতন ভাব পাইয়াছে···পাইয়াছে তাহা তরুণের কাছে। নূতন ভাব ··নূতন প্রেরণা জোগাইতে আসিয়াছে এই তরুণরা। বিবাহের পুঁথি খুলিয়া ত্যাখো—বিবাহ-সভায় তরুণ-তরুণীর আদর চিরদিন। বুড়া বর বা বঁধু কেহ চাহে নাই—কেহ চাহে না। মিলন-কামনায় মানুষ চিরদিন যৌবনের ললাটে রাজটীকা পরাইয়া আসিয়াছে! ইতর পশুর প্রতি চাহিয়া ত্যাখো, বৃদ্ধ পশু চিরদিন হঠিয়া গিয়াছে তরুণের সহিত সংগ্রামে। এমন কি, মর-সমাজেও দেখি, বৃদ্ধ পশুর জন্য পিঁজরাপোলের ব্যবস্থা। মানুষও বুঝিয়াছে, বৃদ্ধ পশু বাতিল। অথচ মানুষ নিজের বেলায় অন্ধ—এ সত্য দেখে নাই, স্বীকার করে নাই। এইখানে তার স্বার্থপরতা! কথায় কথায় সকলে যে-শাস্ত্র টানাটানি করো, সে শাস্ত্রে লেখা আছে, পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ! এ যুগে পরমায়ু কমিয়াছে। তাই আমরা পঞ্চাশ কাটিয়া বনং ব্রজেৎকে ত্রিশে আনিতে চাই! ইত্যাদি ইত্যাদি···

চায়ের পেয়ালায় সঘন-চুমুক দিতে দিতে সকলে অবতরণিকা শুনিল। রচনার তীব্র মোহে সকলের নয়ন অর্দ্ধ-নিমীলিত! পড়া শেষ হইলে সমস্বরে সকলে কহিল,—আমাদের অন্তরের বাণীর এমন সুস্পষ্ট

প্রকাশ আগে আর কোথাও দেখি নাই! জয় যৌবনের জয়!

* * * *

রাত্রি প্রায় আটটা। সকলে বিদায় লইয়াছে। লনে দু'খানি বেতের চেয়ার। সেই চেয়ারে বসিয়া শ্রীমতী প্রত্যুৎপন্নমতি দেবী আর দাশরথি। দু'জনে মাসিক-পত্রের স্বপ্নে বিভোর। মাথার উপর আকাশে সেই সনাতন চাঁদ—জ্যোৎস্না-ধারায় পৃথিবী ভাসাইয়া দিয়াছে। বেচারা বুড়া হইয়া গেল—আর কোনো কাজ নাই! জানে, মামুলি-প্রথায় শুধু সেই উদয় আর অস্ত!

দাশু ডাকিল—প্রতি দেবী…

প্রত্যুৎপন্নমতি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—কি বলচেন?

দাশু কহিল,—আপনি যেন কি ভাবচেন!

দেবী কহিল,—হ্যাঁ, ভাবচি ত্রিশ বৎসরটা হবে গণ্ডী? যদি আর পাঁচ বৎসর মেয়াদ বাড়িয়ে দেন, ক্ষতি আছে?

দাশু কহিল—না, ও-মেয়াদ আর বাড়ানো চলে না।

দেবী কহিল,—আপনার বয়স এখন কত?

দাশু মনে মনে হিসাব কষিল; তার পর কহিল—চব্বিশ চলেছে।

দেবী কহিল—ছ'টি বৎসর মাত্র সময় পাবেন!

দাশু হাসিল, হাসিয়া কহিল—বলেচি তো, আমাদের কথা স্বতন্ত্র!

দেবী কহিল—হুঁ! বলিয়া সে চক্ষু মুদিল।

দাশু তার পানে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িয়াছে প্রতির মুখে-চোখে…যৌবনের শ্রীটুকুকে দীপ্ত পরিপূর্ণ নিখুঁৎ করিয়া!

চাঁদ এমনি কিরণ বর্ষিয়া আসিতেছে অনাদি-কাল হইতে তরুণ-তরুণীর গায়ে এবং এই জ্যোৎস্না চিরদিন মনে জাগাইয়াছে বিভ্রম, মোহ, কুহক!

মামুলি জ্যোৎস্নায় দাশুর প্রাণেও বিভ্রম জাগিল। সে ভাবিতেছিল—চাঁদ, চাঁদ! দূর-গগনের চাঁদ! নাগালের বাহিরে চাঁদ…দুর্লভ চাঁদ…

একটা নিশ্বাস পড়িল। সে নিশ্বাসে প্রতির ধ্যান ভাঙ্গিল। চমকিয়া সে চাহিল। চাহিবামাত্র চারি চক্ষে মিলন।

প্রতি কহিল,—কি দেখচেন?

দাশু কহিল,—চমৎকার! চাঁদ যেন আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছে আপনার মুখে! চাঁদের দীপ্তি তাতে আরো উজ্জ্বল হয়েচে!

হাসিয়া প্রতি কহিল—আপনার কবিতা এই জন্য আমার এত ভালো লাগে। আপনার কবিতায় human touch পাই!

দাশু আর একটা নিশ্বাস ফেলিল।

প্রতি দেবী কহিল,—আমি ভাবছিলুম, পৃথিবী জুড়ে এই যে প্রৌঢ় আর বুড়োরা বসে আছে, তারা মরে না কেন? তারা মারা গেলে আমাদের গড়ার কাজ ভালো হয়! দেখেন নি, নতুন বাড়ী তৈরী করবার সময় পুরোনো জীর্ণ গৃহ ভেঙ্গে মানুষ তাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করে দেয়! তবে নতুন বাড়ীর বাহার খোলে।

দাশু কহিল—বুড়োরা দলে ভারী! এ পর্য্যন্ত তাদের মরার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না! দীর্ঘকাল বাঁচার ফলে বাঁচাটা তাদের এত বেশী রপ্ত হয়ে গেছে যে, মরণ চট্ করে তাদের কায়দা করতে পারে না। নাহলে দেখুন না, মাঝে মাঝে এপিডেমিকের যে হিড়িক ওঠে, তাতে উজাড় হয়ে যায় পল্কা তরুণগুলো! বুড়োর দল যেমন, তেমনি থাকে। কিন্তু এ সব আলোচনা এখন থাক্…সারাদিন আজ মস্তিষ্ক-চর্চ্চা হয়েছে। এখন এই জ্যোৎস্নায় মনের চর্চ্চা করলে মন্দ হয় না!

প্রতি হাসিয়া দাশুর পানে চাহিয়া রহিল। দাশু কহিল—আপনার পানে চেয়ে আমি কি দেখছিলুম, জানেন?

প্রতির বুকের মধ্যে ছোট একটা তরঙ্গ উঠিল। সে কহিল,—না।

দাশু কহিল,—এই দীপ্তি এমন উজ্জ্বল,—তার মানে, মুক্তির হাওয়ায়! বাঁধনে ধরা পড়লে এ-দীপ্তি মলিন হবে। বাঁধনে সেই ছোট গণ্ডী। দেখেন নি, অবাধ মুক্ত প্রসারের জন্য সাগরের জলে রূপালি দীপ্তি…আর ছোট গণ্ডীর বাঁধ আছে বলে ডোবার জল নোংরা, ঘোলা?…জগতের নিয়ম…

প্রতি কহিল—সত্যি, আপনি এমন চমৎকার কথা বলেন। কবি কি না।

দাশু কহিল—আকাশে চাঁদের পানে চেয়ে দেখুন··· তার দীপ্তি সার্থক হয়েচে এই পৃথিবীর মাটীকে চুম্বনে অভিষিক্ত করে···নয় ?

কথাটা প্রতি ঠিক বুঝিল না, কুতূহলী দৃষ্টিতে দাশুর পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে দাশুর মনে সাহস জাগিল; শক্তিও। সে বলিল,—ঐ চাঁদের দীপ্ত চুমায় পৃথিবীর মলিন অন্ধকার ধুয়ে মুছে গেছে! এই জন্য কবিরা বলেন,—আকাশ-ধরণী রূপের আলোয় একাকার! আমার মনেও আজ দুর্লভ বাসনা জেগেচে দেবি,—তার যেখানে যত কিছু মালিন্য আছে, সে সব মুছিয়ে দেবার জন্য···

প্রতির দুই চোখ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন···দাশু সে মৌন দৃষ্টির ভাষা কি বুঝিল...বুঝিবামাত্র নিজের উদ্যত অধর···

চমকিয়া প্রতি কহিল—দাশুবাবু···

দাশু কহিল,—যৌবনের এ দীপ্ত-মন্ত্রে আজ আমার অভিষেক হলো দেবি!···মুক্তি!···

প্রতি কহিল,—জীবনে এ নূতন অনুভূতি!

দাশু কহিল,—এ-মন্ত্র অমোঘ। আমাদের মন কখনো প্রৌঢ় হবে না, বৃদ্ধ হবে না! জানবেন, বিবাহ নয়, গৃহ নয়, সংসার নয়···পুত্র-কন্যার কদর্য্য কোলাহল জাগবে না···মুক্ত প্রাণের কারবারে কেবল আনন্দ-পুলক! দুঃখ নাই···শোক নাই···দুশ্চিন্তা নাই! সেগুলো বিষ··· বিবাহের ফলে গৃহ-সংসারে এসে জোটে! জীবনের সব সুর কেটে দেয়! এই জন্যই বিবাহকে আমরা বর্জ্জন করে চলতে চাই। তাতে আছে দায়িত্বের শৃঙ্খল। মনে সে শৃঙ্খল চেপে বসে। মানুষ সে শৃঙ্খলের ভারে পাষাণ বনে যায়! আসুন, চির-যৌবনের জয়ধ্বজা তুলে জীবনের মুক্ত পথে যাত্রা করি!

প্রতি কহিল,—দুনিয়ার রঙ্ বদ্‌লে যাবে···কি বলেন?

উচ্ছ্বসিত আনন্দে দাশু কহিল,—নিশ্চয়···

২

প্রত্যুৎপন্নমতি দেবীর সম্পাদকতায় "চিরযৌবন" মাসিক পত্র সমাজে একেবারে ফাল্গুনের বন্যা বহাইয়া দিল। "বাঁধন-কাটা" উপন্যাস; "পাঁচিল ভাঙ্গো" প্রবন্ধ; "লাল-নাগরা" কবিতা পড়িয়া বহু কিশোর-কিশোরী লেকের ধারে গিয়া আস্তানা পাতিল।

অধীর প্রবন্ধ লিখিল,—মোটর-গাড়ী, বিজলী-বাতি—এ-সবে মানুষ হইবার আশা নাই। ভাঙ্গিয়া ফ্যালো হাসপাতাল। সহরের বুকে জরা ও মৃত্যুর অত-বড় প্রতিমূর্ত্তি খাড়া রাখিবার প্রয়োজন নাই! দুনিয়ায় এ-সবে চাহিবার কিছু নাই। এসেম্বলি-কৌন্সিল, কর্পোরেশন—এ সব মিথ্যা মোহ···প্রাণ ইহাতে জাগিবে না। করো শুধু যৌবনের চর্চ্চা। গাহো গান বিরোধের! বিদ্রোহের! এ বিদ্রোহ রাজনীতির নয়। এ বিদ্রোহ হৃদয়-রাজ্যে। নর-নারীর মিলনে যে সব বিধি-নিষেধ প্রাচীর তুলিয়া আছে, চীনা প্রাচীরের মত দীর্ঘ প্রাচীর—তাহা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দাও!

যৌবন-বাসর কখনো অধীরের গৃহে বসে; কখনো প্রত্যুৎপন্নমতির বাড়ীর লনে; কখনো বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সামনে ময়দানে। আসরে কিশোর-কিশোরীর দল প্রথমে ছিল অল্প। তারপর যেন ফাগুন জাগিল বনে-বনে; ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়! দেশে যে সব কিশোর নিতান্ত একা বৈচিত্র্যহীন জীবন লইয়া পড়িয়াছিল, বৈচিত্র্যের লোভে যারা ঘুরিত সিনেমায়, জুয়ে, শিবপুরে; তারা আসিয়া মাঠে ভিড় করিতে লাগিল। ফুলের দিনে ফুলের গন্ধে ভ্রমরদল যেমন কোথা হইতে আসিয়া জোটে, তেমনি বহু প্রৌঢ় গলিত দন্ত বাঁধাইয়া, মাথার কেশে কালো রঙ মাখিয়া মাঠের আশে-পাশে ঘুরিতে লাগিল।

পাঁচ-ছয় মাস সভার কাজ চলিল পুরা বেগে! সে বেগ দেখিয়া সভ্যেরা ভাবিল, এক বৎসরের মধ্যে বাঙলা মুল্লুক হইতে যত প্রৌঢ় আর বুড়া তল্পী হাতে করিয়া সুন্দরবনের দিকে যাত্রা করিবে! নয়তো উড়িষ্যায় কিম্বা বেহার অঞ্চলে!

গ্রাহক কমিতেছে দেখিয়া একদল কাগজওয়ালা সবুজ-সভার বিরুদ্ধে গালি-বিদ্রূপের কামান দাগিতে সুরু করিল; তাহাতেও যখন ছাড়া গ্রাহক-গ্রাহিকাকে ফেরানো গেল না, তখন তারা পলিশি বাহির করিল। সে-পলিশিতে এই দলের লেখক-লেখিকাকে চেকের অর্থে প্রীত করিয়া তাদের কলমে-ঝরা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে নিজে-দের কাগজে দীপালী সাজাইয়া বাঁধা রোশ্‌নাইয়ের ব্যবস্থা করিয়া বসিল।

দিকে দিকে সামঞ্জস্য দেখা দিল।

কিন্তু মান্ধাতার আমোলের বুড়া প্রকৃতি কোনো চাঞ্চল্যে টলিতে জানে না। সে সেই গ্রামের বুড়া শিবের মত ভাঙ্গা মন্দিরে বসিয়া রঙ্গ দেখে! বুড়া প্রকৃতি তার সনাতন আসনে বসিয়া তরুণের রঙ্গ দেখিতেছিল! দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিল। হায়রে, চক্র ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া হাজির হয় তার চির-দিনের আস্তানায়। পথে ধূলা উড়াইয়া, মানুষ চাপা দিয়া বেড়াইলেও পথে থাকার রীতি তার নাই; ফেরে আস্তানায়! পৃথিবীর ছোট্ট গণ্ডী ছাড়িয়া বহু দুঃসাহসিক সীমা ছাড়িয়া অসীমের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল, শেষে তারা ফিরিয়া আসে সেই চির-পরিচিত সীমার মধ্যে। ফিরিয়া বলে, পৃথিবী গোল! পৃথিবী গোল বলিয়া যেখানে যাও, আবার ফিরিয়া আসিতে হয় সেই পুরানো আস্তানায়! পৃথিবী অসীম বলিয়া মানুষের উৎসাহের সীমা আছে! প্রগতির মস্ত বাধা এইখানে।

গৃহে মান রাখিতে পরাগের নাম লেখানো ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের বি-এ ক্লাসের খাতায়। সে কলেজের আইন-কানুন কড়া! যৌবনের বন্যা-রিলিফে মাতিয়া থাকিবার ফলে পরাগ থার্ড ইয়ারের শেষ-এগজামিনটায় যে রেজাল্ট করিল, তার ফলে ফোর্থ ইয়ারের দ্বার সে খোলা পাইল না। বেচারা ভাবিয়াছিল, তাদের উৎসাহের আবেগে যৌবনের রাজ-তখ্‌ত্‌ কায়েমি হইয়া আসিবে, কলেজ লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন থাকিবে না! কিন্তু তাহা ঘটিল না। কথায় কথায় খবরটা গিয়া কি করিয়া পরাগের বাপের কাণে পৌঁছিল। এম্‌নিতে তিনি নিরীহ নির্লিপ্ত সংসারী—টাকা ফেলিয়া দিয়া ভাবেন, সংসার ঠিক চলিয়া যাইতেছে—কোথাও কোনো বিরোধ নাই! এখন পরাগের কলেজের সংবাদে ছেলেকে ডাকিয়া দু'চারিটা প্রশ্ন করিয়া ছেলের যে-পরিচয় পাইলেন, তাহাতে পরাগের সম্বন্ধে তখনি internmentএর ব্যবস্থা হইল। পরাগ গেল বর্দ্ধমানে তার কাকার কাছে ফোর্থ-ইয়ারের বিদ্যা আয়ত্ত করিতে।

এমন বিপ্লব আরো দু'চারিটা ঘটিয়া গেল। অনেককে বুড়ার দল সরাইয়া দিল। দাশু শুধু রহিয়া গেল অটল, অবিচল। সে ভাবিল, সবুজের বিরুদ্ধে পীতের এ সনাতন অভিযান! হুঁশিয়ার!

উৎসাহের যে বাতাসে মাসিক-কাগজ কল-তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছিল, সে বাতাস থামিতে তার গতি হইল মন্থর।

দুর্দ্দিনের সূচনা দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি দাশুকে ডাকিল,—দাশুবাবু···

দাশু কবিতার প্রুফ দেখিতেছিল,—এ আহ্বানে মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল,—কি বলচেন?

প্রত্যুৎপন্নমতি কহিল,—আমাদের এ অভিযান মিথ্যা হবে?

মিথ্যা! দাশু চমকিয়া উঠিল, কহিল,—এ কথা কেন বলচেন?

—একে একে সকলে সরে যাচ্ছে।

দাশু সংশয়িত দৃষ্টিতে দেবীর পানে চাহিয়া রহিল।

দেবী কহিল,—শুনেচেন, অধীর বিবাহ করচে? রাগিণীর বিয়ে হয়ে গেছে? মদিরার বিবাহ সামনের শনিবারে।

দাশু নিশ্বাস ফেলিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি কহিল,—আমরা শুধু দুজন। এ ব্রত কি সফল হবে?

দাশু কহিল,—কেন হবে না? আমরা দু'জনে দুশো জনের উৎসাহ বুকে নিয়ে কাজ করবো! পরস্পরকে আমরা জোগাবো শক্তি, উৎসাহ।

অসম্ভব! প্রত্যুৎপন্নমতি নিশ্বাস ফেলিল; তার পর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল,—আমার সব উৎসাহ নিবে আসচে!

দাশু যেন শিহরিয়া উঠিল! কহিল,—সে কি! আপনার মুখের পানে চেয়েই এ পুণ্যাগ্নি আমি অনির্ব্বাণ রেখেচি আমার অন্তরে! বাড়ীতে বিদ্রোহ তুলেচি! জানেন বোধ হয়, আমার বাবা মারা গেছেন···আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি বলে আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবেন, ভেবেছিলেন। তা হয় নি! হঠাৎ মারা গেছেন। সুতরাং···

প্রত্যুৎপন্নমতি দাশুর পানে চাহিয়া রহিল। দাশু সে দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিল···

রাশি রাশি ফুল! পলাশ, অশোক, বকুল! তার মন গন্ধে ভরিয়া মশ্‌গুল হইল! সে যেন নেশা···

দাশু ডাকিল,—প্রতি·· দেবি···

প্রত্যুৎপন্নমতির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। মুখ নত করিয়া সে কহিল,—আমার একটু ইয়ে হচ্ছে···মানে ·· জানেন তো, বলাই সেন···সিভিলিয়ান হয়ে ফিরেচে। বাবা-মা তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির করেচেন and Mr. Sen wants to marry me within a fortnight··· তার পর তার সঙ্গে চলে যেতে হবে ঢাকা···সেখানে সে posted···

ক্‌-ক্‌-কড়াৎ !···বাজ হাঁকিল।

দাশু বুকখানাকে চাপিয়া ধরিল—নহিলে ফাটিয়া যাইত ! এ বাজ বুকে হাঁকিল ?

ধীরে ধীরে সে খোলা খড়খড়ি দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। না। এ বাজ অন্তরে নয়। বাহিরে হাঁকিয়াছে··· আকাশে। আকাশে কখন মেঘ জমিয়া এমন ঘনঘটা বাধাইয়া তুলিয়াছে, সেদিকে খেয়াল ছিল না! এখন ওদিকে চাহিতে দেখে, নিবিড় কালো মেঘে নিখিল ভরিয়া গিয়াছে···যেন প্রলয়ের মেঘ! আলোর কণা নাই! প্রগতির বেদনায় নিখিল যেন মরিতে চলিয়াছে !

আকাশের সে সবুজ রঙ কোথায় যে মিলাইয়া যাইতেছে ! ফাঁকে ফাঁকে কোথাও দিনের দাহ, কোথাও কালো মেঘ, কোথাও হিমানীপুঞ্জ !

প্রত্যুৎপন্নমতি আজ সুদূরে। দাশু বেণুহারা ! তবু তার গানের বিরাম নাই !

অধীর এ পথ ছাড়িয়া সেই মামুলি পথে চলিয়াছে। পাশ আর রোজগার—জীবনে তাহাই যেন পরমার্থ! মলয়, নিশীথ, বিহঙ্গ—তাদের দ্বারে গিয়া দাশু অনুযোগ তুলিয়াছে। হাসিয়া তারা জবাব দিয়াছে—পৃথিবী এখনো সবুজ শ্যামলকে বরণ করিবার মত হয় নাই ইত্যাদি! বিলোলা, কাকলী, মদিরা···বিবাহ করিয়া আজ সেই সংসারের পাঁক গায়ে মাখিতেছে! সকলে মুক্তির প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া জুটিয়াছে গিয়া সেই প্রাচীর-ঘেরা ছোট গণ্ডীর মধ্যে !

দাশু একা। তবু মন তার তেমনি সবুজের সুরে ভরা! জীবনের পথে সে ঠিক সেই এক জায়গায় রহিয়া গিয়াছে—বয়স যেন আগাইয়া যায় নাই—চিরযৌবনে সে সুস্থির ! যারা ছিল সঙ্গী, তারা পাশ ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে পিছনে যারা ছিল, তারা আজ পাশে আসিয়াছে। নূতন সঙ্গীদের পানে সে হাসিয়া তাকায়—তাদের সঙ্গ কামনা করিয়া পাশে গিয়া দাঁড়ায়, তারা বিস্ময়-কৌতুকের দৃষ্টিতে দাশুকে যেন বিঁধিতে থাকে !

দাশু বলে,—আমি চির-সবুজ, চির-শ্যামল···এসো, যৌবনের ললাটে দিই রাজটীকা···

তারা হাসিয়া সরিয়া যায়। তাদের কৌতুকের অন্ত থাকে না! দাশু কবিতা লেখে, গান লেখে। তাহাতে যৌবনের সুর—আবেগ—আকুলতা! সকলে পড়িয়া হাসে—তামাসা করে। দাশুর তাহাতে লজ্জা নাই··· সঙ্কোচ নাই !

পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। অধীর বলে—চির-কাল স্বপ্ন নিয়ে কাটাবে, দাশু ? ভালো দেখায় না !

নিশীথ বলে—পয়সা-কড়ি আছে। চাকরি না করো, একটা ব্যবসা ফাঁদো হে ! আর কিছুতে রুচি না হয়—বন্ধকী কারবার। যে depression চলেছে, দু'দিনে লাখোপতি হবে !

সুচারু বলে—লেখার চর্চ্চা করচো, বেশ! তাতেই না হয় commercial মোড় দাও !

বিলোলা বলে,—বিয়ে করে ফেলুন দাশুবাবু। একটি স্ত্রী অনেকখানি দুশ্চিন্তা দূর করবে। সব শূন্যতা পূর্ণ হবে।

মদিরা বলে,—এখনো এ-বয়সে লাল-নাগরার কবিত্বে মুগ্ধ থাকবেন ! সে নাগরা যে-পায়ের ভূষণ—সে পা'দুখানি একবার বুকে নিয়ে দেখুন, কি পান্ !

কথাগুলা দাশুর বুকে আসিয়া লাগে অগ্নি-শিখার মত ! কি মরীচিকা লইয়া ইহারা ভুলিয়া আছে ! ছোট গণ্ডীর মধ্যে কি আরাম ইহারা পায় !

দাশু আর একবার প্রচণ্ড উৎসাহে মাতিল। হাতে কিছু পয়সা আছে। পয়সা খরচ করিয়া একদল তরুণ-তরুণী জড়ো করিয়া এম্পায়ারে একটা অভিনয়ের সে আয়োজন করিল। নিজে নাটক লিখিল—যৌবন-অভিষেক ! নিজে সাজিল বসন্ত ; এবং ফুল, পাখী—নানা ভূমিকায় নামাইল এ-যুগের কয়েকজন কিশোর-কিশোরীকে !···

তবু প্রাণের আগুন নিবিল না! এ অভিনয়! ভোজন-বিলাসের মধ্য দিয়া অভিনয়-বিলাসের সমাপ্তি ঘটিল। দাশু দেখিল, সে যেমন নিঃসঙ্গ, তেমনি রহিয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, পৃথিবীতে যৌবনের মূল্য কেহ বুঝিল না!

বয়স ওদিকে গড়াইয়া চলিয়াছে। মনে এখনো ছন্দে-তালে কিশোরী জাগিয়া আছে! জাগিয়া থাকিলেও সে ছায়াময়ী! তাকে ধরা যায় না!

বিলোলা, কাকলী, মদিরা, লোভনা, দাদুরী···তারা আজ যৌবন শ্রীহারা ···কোথায় ঝরিয়া যাইতেছে তাদের সে লাবণ্য-বিভা!

দাশু আসিয়া দাঁড়াইল এক ফিল্ম-ষ্টুডিয়োতে। তাদের ছিল প্রয়োজন কতকগুলা গানের। দাশুর রচা গানে যৌবনের সুর···তা ছাড়া অন্য লোক গান বাঁধিয়া দিতে পয়সা চায়। দাশুর মনে সঙ্কীর্ণতা নাই। কাজেই···

দাশু এই মায়াপুরীতে একটু যেন আরাম পাইল! কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। অভিনয়ে যে মোহ ইহারা জাগায়, তার শিকড় বৃন্ত ধরিয়া কাহারো প্রাণকে স্পর্শ করে না! নানা ফুলের বিকাশ দেখা যায়; কিন্তু সেগুলা কাগজের ফুল, সোলার ফুল—তাহাতে রস নাই, গন্ধ নাই। রূপ আছে! সে রূপ নির্জীব!

দাশু ষ্টুডিও ছাড়িল। সহর ছাড়িল। দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইল।

যেখানে যায়, এক ভাব! অকাজকে কাজ বলিয়া সকলে মত্ত! মনকে ছেঁচিয়া দলিয়া তার পানে না চাহিয়া দুনিয়ার নর-নারী কি লইয়া মাতিয়া আছে! প্রেমের কথা কয়, প্রেমের গান গায়—সে যেন রুটিনের ব্যাপার!

নিশ্বাস ফেলিয়া দাশু ভাবিল, মরীচিকা!

দশ বৎসর পরে আবার সে দেশে ফিরিল। অধীর হইয়াছে ডাক্তার। রোগের ব্যাশিলি লইয়া মাতিয়া আছে সারাক্ষণ! নিশীথ এটর্ণি—বিল ফাঁপাইয়া তুলিতেই তার দিন কাটে! পল্লব ঢুকিয়াছে কেরাণীগিরিতে। প্রেম-সিন্ধু জুটিয়াছে হাকিমী করিতে—বসিয়া রায় লেখা মক্শো করে! বিলোলা, মদিরা···তারা প্রসবের যন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে সংসারের প্রান্তে। ছেলেমেয়ের হুপিং-কাশী আর হাম্-জ্বরের ভাবনায় শুকাইয়া কাঠি হইয়া গেল!

পিছনে যে-দল আসিতেছিল, তাদের লক্ষ্যও ঐ পথে··· দু'দিন তারা আস্ফালন করে, মাতন তোলে—জয় যৌবন··· তারপর কে যেন টুঁটি চাপিয়া ধরে! তারা অমনি নির্জীব নিরীহের মত সেই পচা মামুলি গোয়ালে গিয়া ঢোকে!

দাশু একা···

৪

আরো দশ বৎসর কাটিয়া গেল। দাশুর কেশে ধরিয়াছে পাক। সে-কেশে যথাসম্ভব কালি মাখাইয়া বাহির হয়। দাঁতগুলা নড়িয়া খশিয়া পড়ে। যে দাঁত পড়িবার নয়, দাশু সেই দাঁত কিনিয়া মুখে লাগাইল!···কিন্তু নিঃসঙ্গতা তবু ঘুচিতে চায় না।

এমনি নিঃসঙ্গ থাকিতে থাকিতে সহসা সে শুনিল, প্রত্যুৎপন্নমতির সেই স্বামীটা মরিয়াছে! প্রত্যুৎপন্নমতি আছে রাঁচিতে। স্বামী সেখানে বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিল।···সে ভাবিল, বিধাতার ইঙ্গিত! প্রতি আজ আবার একা···

দাশু তাকে চিঠি লিখিল—দু'দিন তোমার ওখানে ঘুরিয়া আসিতে চাই। বহু দিন দেখাশুনা নাই···

প্রত্যুৎপন্নমতি লিখিল—বেশ কথা! এসো···

দাশু রাঁচি যাত্রা করিল।

ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিবামাত্র একটি রূপসী কিশোরী আসিয়া কহিল,—আপনি দাশু বাবু?

দাশু চমকিয়া উঠিল! এ সেই প্রত্যুৎপন্নমতি··· অতীত দিনের যবনিকা তুলিয়া আবার আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছে!

হাসিয়া দাশু কহিল—তুমি···?

কিশোরী কহিল,—আমার নাম সঙ্গতি। মা আমাকে পাঠিয়েচে আপনাকে নিয়ে যেতে···

মা!

দাশুর বিস্ময় দেখিয়া কিশোরী কহিল—আমার মায়ের

নাম প্রত্যুৎপন্নমতি দেবী। আমার ছোট ভাই হিল্লোল এসেচে সঙ্গে। সে আছে মোটরে। সে ড্রাইভ্ করে এসেচে।···আসুন···

দাশু চলিল। মনের মধ্যে অনেকখানি বিপ্লব বাধিয়া গেল। এই রূপসী কিশোরী···

মোটর আসিয়া গৃহে পৌঁছিল। পাহাড়ের কোলে ছবির মত গৃহ।

হিল্লোল কহিল—আমার পাখী দেখবেন আসুন, দাশু মামা···

সঙ্গতি মামার হাত ধরিয়া টানিল, কহিল,—না দাশু মামা, তার আগে আমার বাগান। কি বড় বড় ক্রীশান-থিমাম ফুটেচে। আমি রোজ বাগান দেখি···

দাশু ছ'জনের পানে চাহিল। প্রত্যুৎপন্নমতি আসিল, আসিয়া কহিল—এসো দাশু বাবু···ওরে কি করিস তোরা? বুড়ো মানুষকে ধরে টানাটানি করিস্ নে। ছাড়্!

হিল্লোল কহিল—আমার পাখী দেখিয়ে দাশু মামাকে নিয়ে যাচ্ছি···

আবদারের সুরে সঙ্গতি কহিল—আমার বাগান···

প্রত্যুৎপন্নমতি কহিল—দাঁড়া। মানুষকে আগে জিরুতে দে। তোদের পাখী আর বাগান পালাচ্ছে না তো!

হিল্লোল ফোঁশ্ করিয়া উঠিল। সঙ্গতির ছুই চোখ সজল হইল।

দাশু কহিল—না, না, দেখে আসি। কোনো কষ্ট হবে না!···

ঘরে বসিয়া ছুজনে কথা কহিতেছিল। দাশু কহিল,—তোমাকে দেখে চেনা যায় না। এ কি হয়ে গেছ, প্রতি! মাথায় ছিল অমন কোঁকড়া কালো চুল···সব প্রায় পেকে গেছে! সে শ্রী নেই···

হাসিয়া প্রতি কহিল—সঙ্গতি হবার পর খুব অসুখ হয়···তাতেই সব চুল যায় উঠে! আর পাকার কথা বলচো? বয়স তো কম হলো না।

বয়স! দাশু একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—আমরা এই জরাকে জয় করবো বলেই তো সাধনায় নেমেছিলুম, প্রতি···

প্রত্যুৎপন্নমতি হাসিল, হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ···তুমি বিয়ে করেচো তো? ছেলে-মেয়ে···?

ম্লান হাসি মুখে দাশু কহিল—বিয়ে করিনি। আমাদের কি পণ ছিল, ভুলে গেছ?

বিস্ময়ে প্রতির ছুই চোখ বিস্ফারিত হইল। সে কহিল—সেই সব পাগলামি এখনো মনে পুষে রেখেচো!

প্রতি দাশুর পানে চাহিয়া তার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিল, করিয়া কহিল—তোমাকেও তো বার্দ্ধক্য ধরেচে, দেখচি!

দাশু কহিল—এটা দেহের বার্দ্ধক্য! মনকে এ বার্দ্ধক্য স্পর্শ করতে পারেনি!···কিন্তু তুমি···

প্রতি কহিল—বেশ আছি।

—সে সব কথা মনে পড়ে না?

—মোটে না।

—এই নিঃসঙ্গতা?

প্রতি নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—ভালোই আছি। স্বামী—আমার জীবনে ছিলেন সম্পদ! আমার ছুর্ভাগ্য, রইলেন না···সে আঘাত বড্ড বেজেছিল! কিন্তু সঙ্গতি, হিল্লোল···ওদের পানে চেয়ে সে আঘাতের দুঃখ ভুলতে হয়েছে!···হাসি পাচ্ছে তোমায় দেখে। সে সব কথা মনে পড়চে। সেই চির-যৌবনের তপস্যা···! ত্রিশ বৎসর বয়সের পর মানুষ হয় কাজের বার—এই ছিল আমাদের ধারণা! আমার স্বামীকে দেখেচি তো···বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুজনের মনে কি প্রশান্তি এসেছিল!···সংসার!···সংসার আমার মনকে কি পূর্ণতাই না দিয়েচে! এখানে দুঃখ পেয়েচি—ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েচি—তবু সুখও যা পেয়েচি—সে সুখের আড়ালে আগেকার জীবন কোথায় মিলিয়ে গেছে!

কথাগুলার প্রত্যেক বর্ণ দাশু শুনিতেছিল—একান্ত মনোযোগে, প্রচণ্ড আগ্রহে!···

বৈকালের দিকে সামনের লনে হিল্লোল আর সঙ্গতি নামিয়াছিল টেনিস খেলিতে; সঙ্গে ছিল ছুটি বন্ধু। দাশু কহিল,—আমি খেলবো।

সবিস্ময়ে হিল্লোল কহিল,—আপনি?

দাশু কহিল,—আমি। আশ্চর্য্য হচ্ছো?

সঙ্গতি কহিল,—বুড়ো মানুষ—ছুটতে পারবেন?

বুড়া মানুষ! দাশুর বুকে কেমন কাঁপন ছুটিল!

সে খেলায় নামিল।...

কিন্তু হায়রে, সবুজ মন দেহকে ঠিক লীলায়িত রাখিতে পারিল না। একটু খেলিয়া দাশু হাঁফাইয়া পড়িল। বহু দিন অভ্যাস নাই।' কবে খেলিয়াছে...

সময়ের নিরিখে সে কি আজিকার কথা!

বারান্দায় বসিয়াছিল প্রতি। গলদ্ঘর্ম্ম দাশু বারান্দায় আসিল।

হাসিয়া প্রতি কহিল,—সে বয়সে যা! তুমি পারবে কেন?

গ্লানির ভারে দাশুর মন তখন আচ্ছন্ন। সে কোনো কথা বলিল না। আজ প্রথম সে অনুভব করিল তার পরাজয়! তাইতো...এমন করিয়া পরাজয়ের গ্লানি...

সত্যই সে বুড়া হইয়াছে ...

সন্ধ্যার পর ড্রয়িং রুমে সকলে বসিয়া আছে। সঙ্গতি গান গাহিতেছে। গান শুনিতে শুনিতে তন্দ্রাভরে দাশুর দুই চোখ ভারী হইয়া মুদিয়া আসিল।...শত প্রয়াসে জাগিয়া থাকিতে চায়, তবু চোখ দুটা এমন বিদ্রোহী...

প্রতি কহিল,—ঘুমোবে? ঘুমোও। সত্যি, ঘুমের অপরাধ কি! ট্রেণে কষ্ট গেছে...দুপুরবেলায় একটু ঘুমোলে না—বিকেলে ছুটোপাটি করেচো...এ বয়সে সইবে কেন?

আবার সেই বয়সের কথা! মন ফুঁশিয়া উঠিল! হাসিয়া দাশু কহিল,—তা নয়। সারা রাত ট্রেণে এক জনের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েচি কি না...

পরের দিন দাশু কহিল,—চলো, ঐ পাহাড়গুলোতে চড়া যাক্!

প্রতি কহিল,—আমি পারবো না।...তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, ছেলেদের সঙ্গে যাও...

দাশু গেল। সঙ্গে হিল্লোল আর সঙ্গতি। উৎসাহের বেগে খানিকটা চড়া হইল। তার পর পা-দুটা এমন ভারী বোধ করিল,—দু'পায়ে যেন কে পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে!

হিল্লোল কহিল,—হাত ধরবো, মামাবাবু?

দাশু কহিল,—না, না...

কিন্তু পা আর পারে না! নিজের উপর রাগ ধরিল। এত কিছু থাকিতে এ সাধ কেন যে মনে জাগিল!

জাগিবার হেতু ছিল। প্রতির মুখে রাত্রে সেই বয়সের কথা! তাই সে প্রমাণ করিতে চায় এই কিশোর-কিশোরীদের কাছে...

এমন কঠিন, তখন বোঝে নাই!

কোনমতে গৃহে ফিরিয়া দাশু একেবারে নির্জ্জীবের মত বসিয়া পড়িল।

প্রতি আসিয়া কহিল,—হলো কি?

সঙ্গতি কহিল,—মামাবাবুর ভারী কষ্ট হয়েছে। খানিক উঠে এমন হলো...যে করে আমরা দু'জনে ওঁকে নামিয়ে এনেচি!

মনে মনে প্রতি হাসিল, মুখে বলিল,—খুব কষ্ট হচ্ছে, দাশু বাবু?

দাশু কহিল—না, না। শুধু তেষ্টা পেয়েচে। এদেশে তেষ্টা একটু বেশী পায়...হাওয়ার গুণ।

প্রতি ডাকিল—শম্ভু...পানি লাও...

শম্ভু বেয়ারা জল আনিল। জল পান করিয়া দাশু কহিল,—মানে, কিছুদিন আগে ব্রঙ্কাইটিশ হয়েছিল খুব—তার কাহিল-ভাব এখনো সারে নি। সেই জন্যই আমার আরো রাঁচিতে আসা!

কথা মিথ্যা। না বলিলে উপায় নাই! সে বুড়া হয় নাই—এ কথা বুঝাইতে চায় সকলকে! বিশেষ এই সঙ্গতি আর হিল্লোল...তারা যেন না তাকে বুড়া ভাবে!

৫

রাঁচির হাওয়ায় গুণ ছিল। দাশু একটু সবল হইয়া উঠিল। সে এখন সঙ্গতি ও হিল্লোলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া খুব খানিক ঘুরিয়া আসে—পায়ে ব্যথা ধরিলেও বসিতে চায় না।

সঙ্গ-সাহচর্য্যে সে চাহিত হিল্লোল আর সঙ্গতিকে। যেন তারা দাশুর সমবয়সী! প্রতি যেন তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়! প্রতি তার নাগালের ঊর্দ্ধে গিয়াছে! তাই ইহাদের নাগালের জন্য সে লালায়িত।

সেদিন তারা গিয়াছিল সুবর্ণরেখার পুলের উপর।

হিল্লোল বলিল—তোমরা বসো ঐ নদীর বুকে পাহাড়ের উপর। আমি একবার ঘুরে আসি তুলিন থেকে। একটা লোকের কাছে ভালো পাখী আছে··· অষ্ট্রেলিয়ান্ প্যারট। দেবে বলেছে।

হিল্লোল চলিয়া গেল। সঙ্গতি আর দাশু আসিয়া বসিল নদীর বুকে পাথরের উপর।

দাশু কহিল—আমায় মামাবাবু বলো না, সঙ্গতি···আমি সত্যি তোমার মামা হই না!

সঙ্গতি অবাক! দাশু কহিল,—শুধু দাশুবাবু বলে ডেকো।···ও-সব সম্পর্ক কৃত্রিম। মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল যা সম্পর্ক, তা মনের দিক দিয়ে।

কথাটা বলিয়া দাশু চাহিয়া রহিল আকাশের পানে! সঙ্গতি তার পানে চাহিয়া ছিল—তার কৌতূহলের অন্ত নাই!

দাশু ডাকিল—সঙ্গতি···

সঙ্গতি কহিল—কেন?

দাশু কহিল,—জীবনটার কথা কখনো ভেবে দেখেচো?

সঙ্গতি অবাক্!

দাশু কহিল—মানে, তোমার মাকে দেখে আমার দুঃখ হয়। একদিন কি ভাবে জীবনকে আমরা গড়বো ভেবেছিলুম! তোমার মা সে সঙ্কল্প রাখতে পারলে না। আমি কিন্তু পেরেচি! সংসারের দাস্য—জীবন তাতে বিশ্রী ভারী হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে এসেচি—জীবনকে ভালো করে উপভোগ করবো বলে··· সংসার আমাদের জীবনকে বেঁধে রাখে। তার রস নিঃশেষে মরে যায়, শুকিয়ে যায় সে বন্ধনের চাপে! সে-বাঁধনে তুমি তোমার এ পেলবতাকে পিষে মেরো না!

কথা নয়, যেন হেঁয়ালি! সঙ্গতির চোখে কৌতূহলের প্রশ্ন-রেখা আরো স্পষ্ট হইল।

দাশু কহিল,—তোমায় দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ দেখার প্রয়োজন ছিল! আমার মনে যে মানসী-তরুণী বসে আছে দীর্ঘ যুগ ধরে, সে তুমি! অনেক কিশোরীর সঙ্গে মিশেচি—কিন্তু মনে এর আগে এত আবেগ কখনো জাগেনি! তোমাকে উদ্দেশ করে আমি কবিতা লিখেচি। শুনবে?

সঙ্গতি অবাক! মামাবাবু বলে কি?

মামাবাবুর সেদিকে লক্ষ্য নাই। পকেট হইতে কাগজ বাহির করিল।

কবিতা। সঙ্গতির পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল,—আমি পড়ি, তুমি শোনো···

তোমায় আমার ভালো লাগে যদি
সে কি আমার মস্ত অপরাধ?
তোমার পানে থাকবো শুধু চেয়ে,
দেখবো তোমায়—আমার বড় সাধ।
তোমার কেশে আঙুর থোলো-থোলো—
টুকটুকে লাল আপেল দুটি গালও!
এ যৌবনে মৌ-বনেরি পাখী
প্রাণে আমার উড়চে ডাকি-ডাকি।
কি যে তুমি—কি যে তুমি নও—
ভেবে আমি পাইনে কোনো দিশি!
তবু আমার পরাণ, আমার এ মন
তোমার প্রাণে রহুক্ সখি, মিশি!

দাশু কবিতা পড়িয়া চলিল,—সঙ্গতি নীরবে শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বিস্ময়, ভয়, উল্লাস এবং অবশেষে কৌতুক···

পড়া শেষ হইলে দাশু কহিল,—কেমন হয়েচে?

সঙ্গতি কহিল,—বেশ।···আমার নামে লিখেচেন, মামাবাবু!

দাশু কহিল,—মামাবাবু নই। আমি তোমার কবি। তোমাকে উদ্দেশ করে কবিতা লিখেচি।

সঙ্গতি কহিল,—সত্যি?

দাশু কহিল,—বলেচি তো আমি যৌবনের কবি, মৌ-বনের মৌমাছি···আমি চির-তরুণ, চির-সবুজ, চির-শ্যামল···

সঙ্গতি কহিল,—আপনি ছিলেন মার বন্ধু···

দাশু কহিল,—আমি চির-কিশোরীর চির-বান্ধব কবি। বললুম তো, আমি যৌবনের পূজারী···চিরকাল কিশোরীর হৃদয়-বনে গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছি!

সঙ্গতি মুখ ফিরাইল; কোনো কথা বলিল না। দাশু তার পানে চাহিয়া রহিল।

সূর্য্য ওদিকে অস্ত যাইতেছিল···মৌ-বনের কবির কবিতায় বহুকালের বুড়া সূর্য্য লজ্জায় লাল!

দাশু কহিল,—সঙ্গ···অঙ্গ···রঙ্গ···ভঙ্গ···

সঙ্গতির চোখে বিস্ময়…সংশয়…ভয়…মুখে কথা নাই!

দাশু কহিল,—তুমি হয়তো ভাবচো, আমি বুড়ো হয়েচি! তা নয়। দেহখানার বয়স হয়তো দুনিয়ার রীতিতে বেড়েচে…কিন্তু মন আমার যৌবনে মন্থর হয়ে আছে! আমি তোমায় ভালোবাসি সঙ্গতি…তুমি আমায় ভালোবাসবে?

সঙ্গতির মাথায় কি কল্পনা…কি ভাব জাগিয়াছিল… জানি না! ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

দাশু সঙ্গতির হাত ধরিবার জন্য নিজের হাত বাড়াইল। সঙ্গতি একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল,—একটা কাঁকড়া-বিছে! বাবা রে!

দাশু চাহিয়া দেখিল…কথাটা সত্য! সে উঠিয়া দাঁড়াইল…এবং দাঁড়াইতে গিয়া…

পিছল পাথর…সবুজ শ্যাওলা…দাশু জলে পড়িয়া গেল।

জল অল্প। সুবর্ণরেখা ক্ষীণ ধারায় বহিয়া চলিছে…

সঙ্গতি ততক্ষণে ছুটিয়া একেবারে পথে গিয়া দাঁড়াইয়াছে—পথ হইতে চাহিয়া দেখে…

সবিস্ময়ে কহিল,—পড়ে গেলেন, মামাবাবু?

দাশু জল বহিয়া তীরে আসিয়া উঠিল, কহিল,—না। জলটা ঠাণ্ডা…ভালো লাগলো…

সঙ্গতি কহিল,—জুতো ভিজুলেন! মাগো! অসুখ করবে যে ভিজে জুতো পায়ে থাকলে…

অপ্রতিভ ভাবটাকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে দাশু কহিল,—না।

সঙ্গতি কহিল,—দাদার এখনো দেখা নেই! আমি বাড়ী যাবো। যাবেন আমার সঙ্গে হেঁটে? পারবেন?

সঙ্গতির সঙ্গ!…দাশু কহিল,—নিশ্চয়।…

৫

সকালে বিছানা ছাড়িয়া দাশু উঠিল না। মাথা বেশ ভারী…গাঁটে গাঁটে ব্যথা…গা গরম। মুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি আসিয়া কহিল,—ব্যাপার কি! এখনো শুয়ে…

দাশু কহিল,—মাথায় একটা আইডিয়া…

প্রতি হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সঙ্গতিকে উদ্দেশ করে?

দাশুর বুকে যেন ছুরি বিঁধিল! সে শিহরিয়া উঠিল।

প্রতি কহিল,—সঙ্গ বলছিল, ওর নামে কি প্রেমের কবিতা লিখেচো…পড়ে ওকে শুনিয়েচো…সত্যি?

দাশু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল।

প্রতি বলিল—তোমার এ পাগলামি কখনো যাবে না? ছি! বয়স হলো কত? ষাট? না, পঁয়ষট্টি? তুমি গেছ সঙ্গতিকে ভালোবাসা জানাতে! এতে হেসে সারা হবে না?…তুমি বলেচো, বয়স বেড়েচে, তোমার দেহখানার—মনের বয়স আছে এখনো আঠারো-উনিশ বছর। এ-কথা নিয়ে ওরা ভাই-বোনে এমন হাসাহাসি করচে…আমার লজ্জা হচ্ছে…

দাশু কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। কাল সন্ধ্যার আকাশতলে সুবর্ণ-রেখার উপল-খচিত তীরে যে-কথা মনে জাগে নাই, আজ এই ঘরে বহু দিনের সাথী-বন্ধু এই প্রতির সামনে সে কথা জাগিল…দাশু চক্ষু মুদিল।

প্রতি কহিল,—তার পর মনের বয়স দেখাতে গিয়ে ভিজে জুতো পায়ে দিয়ে এই পথ হেঁটে এসেচো—ওর মানা শোনো নি…অসুখ হলো না তো?

প্রতি তার কপালে হাত রাখিল, কহিল,—গা বেশ গরম দেখেচি যে। নিশ্চয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা! ডাক্তারকে খবর দি…

দাশু এবারও কোন কথা কহিল না।

ডাক্তার ডাকিতে হইল এবং ক'দিন রোগ ভোগ করিয়া দাশু পথ্য গ্রহণ করিল। পথ্য গ্রহণ করিয়া বলিল,—আজ একবার কলকাতায় যেতে হবে…এ সময়ে জমিদারীর আদায়-পত্তর…

তার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল! যৌবনের দাম কেহ বুঝিল না! প্রতি বোঝে নাই—সঙ্গতিও বুঝিল না!

সে নিশ্বাস ফেলিল।

প্রতি কহিল,—যেতে হয়, যাও। কিন্তু সাবধানে যেয়ো…

রাঁচি ষ্টেশন। দাশুকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল হিল্লোল আর সঙ্গতি…

গার্ডের সবুজ নিশানের ইঙ্গিতে বাঁশী বাজিল। সঙ্গতি

বলিল,—কম্ফর্টারটা কোথায় রাখলেন মামাবাবু? গলায় জড়ান। নাহলে অসুখ করতে পারে ···

এ কথায় হুল ছিল—দাশুর মনে বিঁধিল। মৃদু ভঙ্গীতে সে সঙ্গতির পানে চাহিল। সঙ্গতির অধরে হাসির বিদ্যুৎ-রেখা···হিল্লোলের অধরেও তাই। বেশ তীব্র, তীক্ষ্ণ সে-রেখা!

দু'মাস পরে কি একখান সচিত্র কাগজ আনিয়া সঙ্গতি মাকে দেখাইয়া হাসিয়া বলিল,—ছাখো ···

প্রতি দেখিল। কালনার ওদিকে কোথায় বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-সমিতিতে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সে অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন কবিবর শ্রীযুত দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার শেষে মেয়েরা সভাপতির কণ্ঠ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে। কবিবর স্ব-রচিত কবিতায় মেয়েদের অভিনন্দন করেন। সে কবিতা—

তোমাদেরি কবি আমি। তোমাদের গান
গাহিতেছি যুগে-যুগে রাত্রি-দিনমান!
সবুজ কবচে আঁটা মোর এই হিয়া
কিশোরী-চরণপদ্মে দিছি বিলাইয়া···

হাসিয়া সঙ্গতি কহিল,—কি মা!

প্রতি কহিল,—চিরদিন পাগল রয়ে গেল! মানুষ আর হলো না! বয়স হয়েচে। চুল পাকচে, দাঁত নড়চে···তবু সে কথা মানিবে না!···এ কবিতা মানুষ সভায় দাঁড়িয়ে পড়ে! পড়ে' শোনায় নাতি-নাতনির বয়সী ছোট-ছোট মেয়েদের! কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পরলোকে ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত

সুপ্রসিদ্ধ ডি, গুপ্ত এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী—স্বদেশী পেনসিল কারখানার প্রতিষ্ঠাতা রায় ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত বাহাদুর গত ৪ঠা চৈত্র ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ফণীন্দ্রবাবু ধনীর সন্তান হইয়া ব্যবসায়ে আত্মোৎসর্গ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি,এ পর্য্যন্ত পড়িয়া ডি, গুপ্ত কোম্পানীতে ব্যবসায় শিক্ষা করেন। স্বদেশী যুগে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমে ৫নং

ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত

মিডলটন ষ্ট্রীটে স্বদেশী কলম, পেনসিল, নিবের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাঁহার উদ্যম সাফল্যলাভ করিলে তিনি স্বদেশী পেনসিলশিল্পের কারখানাটি প্রসারিত করিয়া ১২নং বেলেঘাটা মেন রোডে স্থানান্তরিত করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী শিল্পকমিশনে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। ফণীন্দ্রনাথের সাধনায় ভারতে একটি কলম, পেনসিল, নিব, ঝরণা কলমের কারখানা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশবাসীর অভাব পূর্ণ করিয়াছে।

মিথিলার কবি গোবিন্দদাস ঝা

বৈষ্ণব কাব্য-সংগ্রহে গোবিন্দদাস নামধারী যে কয় জন কবির পদ-সমূহ আছে, তাঁহাদের মধ্যে যে এক জন মিথিলাবাসী এবং তাঁহার পদাবলী মৈথিল ভাষায় রচিত, এ কথা বাঙ্গালা দেশের লোকরা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মিথিলার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ রহিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বিদ্যার্থীরা সংস্কৃত শিখিবার জন্য মিথিলায় যাইতেন, তাঁহারাই মিথিলা হইতে মৈথিল কবিদের গীতাবলী স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কালে এবং সম্ভবতঃ তাহার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ভক্তগণ মৈথিল ভাষা জানিতেন। বিদ্যাপতি ও মিথিলাবাসী গোবিন্দদাসের অনুকরণে অনেক বাঙ্গালী কবি পদ রচনা করেন; কিন্তু তাঁহারা বিশুদ্ধ মৈথিল ভাষা লিখিতে পারিতেন না। কালে আমাদের দেশে লোকে মৈথিল ভাষার নাম ভুলিয়া গেল, কয়েক জন মৈথিল কবির রচনা বৈষ্ণব কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এ কথাও বিস্মৃত হইল।

লোকের ধারণা হইল, বিদ্যাপতি বাঙ্গালা এবং বৈষ্ণব কবিমাত্রেই বাঙ্গালী। সন ১২৮০ সালে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাজন-পদাবলী নামে বৈষ্ণব কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, ভূমিকায় লেখেন, বিদ্যাপতির নাম ছিল বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য ও তিনি যশোহরনিবাসী। এ কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অপ্রামাণিক, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানে পরিশ্রম স্বীকার করে কয় জন? বিদ্যাপতির নামে কতকগুলি অমূলক অপযশও রটিয়াছিল, এমন কি, বৈষ্ণব কবির পদেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির অনেক পদের ভণিতায় রাজা শিবসিংহের সহিত তাঁহার প্রধানা মহিষী লক্ষ্মী অথবা লছিমাদেবীর উল্লেখ আছে। কেবল এই কারণে সিদ্ধান্ত হইল যে, লছিমাদেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রসক্তি ছিল। যাহারা এই সম্পূর্ণ মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করেন, তাঁহারা জানিতেন না যে, বিদ্যাপতির গান শিবসিংহের সভায় গীত হইত, তাঁহারা জানিতেন না যে, জয়ন্ত নামক এক জন কায়স্থ গায়ক বিদ্যাপতির গানের সুর বসাইতেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন না যে, বিদ্যাপতির অপর পদ-সমূহে শিবসিংহের অন্য রাণীদেরও নাম আছে, এবং অন্য রাজা-রাণী, মন্ত্রী, মন্ত্রি-পত্নীদের নাম আছে। অপর মৈথিল কবিদের ভণিতাতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সম্মান ও সৌজন্যের প্রথা, আর কিছুই নয়।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী ছিলেন না, মিথিলাবাসী। স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন কিছু দিন দরভঙ্গায় সিভিলিয়ানের কর্ম্ম করিতেন। ইনি বিদ্যাপতির আশীটি পদ সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। অন্ততঃ তাহার পরে সাহিত্যানুরাগী সকলের জানা উচিত ছিল যে, বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী এবং তাঁহার পদাবলীর ভাষা মৈথিল ভাষা। এ সকল সন্ধান কে রাখে? বিদ্যাপতি ও মিথিলার গোবিন্দদাস ত বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাষার নামকরণ হইল ব্রজবুলি। এখন পর্য্যন্ত এই ভ্রম অপনীত হয় নাই। এখনও লেখকরা ব্রজবুলি সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ করেন, অজানিত শব্দ-সমূহের যথেচ্ছা অর্থ করেন।

ত্রিশ বৎসরের অধিক হইল, আমি বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও সম্পাদন করিতে আরম্ভ করি। মিথিলায় গিয়া অনুসন্ধানাদি করি, তরৌনী গ্রামে বিদ্যাপতির স্বহস্ত-লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের তালপত্রের পুথি দেখিয়া আসি। হিন্দী ও মৈথিল ভাষা আমি জানিতাম, কিন্তু বিদ্যাপতির কালের ভাষা আমাকে অনেক পরিশ্রম করিয়া শিখিতে হয়। দরভাঙ্গার মহারাজা রমেশ্বর সিংহ অনুগ্রহ করিয়া চণ্ডা ঝাকে (চন্দ্র কবি) আমার সহায়তা করিতে বলেন। সেই সময় আমি জানিতে পাই যে, এক জন গোবিন্দদাস মিথিলার কবি, এবং তাঁহার কবিতা উৎকৃষ্ট মৈথিল ভাষায়-রচিত; কিন্তু আমাদের দেশে অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যে সকল পদ আমাদের দেশে অশুদ্ধ আকারে প্রচলিত আছে, তাহাই শুদ্ধ আকারে মিথিলায় দেখিতে পাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গোবিন্দদাস ঝা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করি। ইহাও ত্রিশ

বৎসরের উপরের ঘটনা। সে সময় কোনরূপ প্রতিবাদ বা আন্দোলন হয় নাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল, আমি এই বিষয়ে আর একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করি। কলিকাতা পোয়েট্রি সোসাইটীতে ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং 'মডর্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হয়।

এবার আমি অব্যাহতি পাই নাই। অনেকে আমার প্রতিবাদ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়, অন্যান্য পত্রেও কিছু প্রকাশ হইয়া থাকিবে। অনেকে অসন্তুষ্ট হন, কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস কবিরাজ গোবিন্দদাস, শ্রীখণ্ড বুধরী-নিবাসী, জাতিতে বৈদ্য, আমি তাঁহাকে মিথিলাবাসী বলি কোন্ হিসাবে? বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর গৌরব খর্ব্ব করা কি বিবেচনার কায? যাহারা আমার প্রতিবাদ করেন, তাঁহাদের বিরক্তির প্রধান কারণ—স্বদেশবাৎসল্য ও বাঙ্গালা সাহিত্যের মর্য্যাদা। তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত যে, আমিও স্বদেশের ও ম[illegible] সেবা করিয়াছি, সিন্ধুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দেশের কাযে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, সেই উদ্দেশে এ বয়স পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার মাইল পরিব্রজ্যা করি, অনুরুদ্ধ হইয়াও কখনও ভারতের বাহিরে যাই নাই। কিন্তু দেশের প্রতি, ভাষার প্রতি যাহার যতই অনুরাগ থাকুক, সত্যের সমক্ষে মস্তক নত করিতেই হয়। সত্য জানিয়া তাহা গোপন করাও অসম্ভব। গোবিন্দদাস ঝার কবিতা পদকল্পতরুতে ও রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্কলন পদসমুদ্রে পাওয়া যায়। ভাষার অজ্ঞতায় ও লিপিকরের প্রমাদে সেই সকল পদ অশুদ্ধ ও অর্থশূন্য হইয়া গিয়াছে। সেই সকল পদই আমি বিশুদ্ধ আকারে মিথিলায় দেখিয়াছি। যাঁহারা আমার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মৈথিল ভাষা জানেন না, হয় ত মিথিলায় [illegible] যান নাই। গোবিন্দদাস নামের কয় জন বৈষ্ণব কবি ছি[illegible]লেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। কোন্ পদ কোন্ গোবিন্দদাসের রচিত, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিরুদ্ধ পাঠ শুদ্ধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যাঁহারা আমার প্রতিবাদ করেন অথবা আমার বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের আমি কোন উত্তর দিই নাই। বাদানুবাদে অথবা তর্কে কি ফল হয়? আমি সত্য জানিয়াছি, যাঁহারা আমার প্রতিবাদ করেন, তাঁহারা কাল্পনিক প্রবাদ ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

মিথিলা হইতেই আমার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। এত দিন মিথিলাবাসীরা নিজের কর্ত্তব্যে উদাসীন ছিলেন, এখন তাঁহারা কর্ত্তব্য-পালন করিতেছেন। মিথিলায় মৈথিল পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি-যন্ত্র নামক মুদ্রাযন্ত্র দরভঙ্গায় স্থাপিত হইয়াছে, মৈথিল অক্ষর ঢালা হইয়াছে। প্রাচীন মৈথিল গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। বর্ত্তমান দরভঙ্গা-মহারাজার ব্যয়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিল অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিল ভাষা পঠিত হইতেছে। আমার সম্পাদিত বিদ্যাপতির কবিতাবলী পাইবার জন্য অনেকে উৎসুক হইয়াছেন।

সম্প্রতি দরভঙ্গা লহেরিয়াসরায় হইতে গোবিন্দ-গীতাবলী নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীমথুরাপ্রসাদ দীক্ষিত, ইনি দরভঙ্গা রাজকীয় পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ। এই গ্রন্থে যে সকল পদ আছে, তাহা বঙ্গদেশেও পাওয়া যায়। সঙ্কলনকার যে এই সকল পদ আমাদের দেশ হইতে অপহরণ করিয়াছেন, বোধ হয়, এমন কথা কেহ বলিবেন না।

গোবিন্দদাস ঝার সম্বন্ধে বিতণ্ডা মিটিয়া গেল, পক্ষান্তরে, বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। কারণ, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ঝা বাঙ্গালী না হইলেও তাঁহারা বাঙ্গালা কাব্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশে তাঁহাদের রচনা চিরকাল সমাদৃত ও সম্মানিত হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

করাচির কাণ্ড

সিন্ধু[illegible] করাচিতে এক শোচনীয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তথায় সম্প্রতি মুসলমান জনতার উপর গুলী চালান হইয়াছিল এবং সেই গুলীর আঘাতে প্রায় ৩৫ জন নিহত এবং কমবেশী ২০শত জন আহত হইয়াছে। ব্যাপারটি একটু জটিল। নাথুরাম নামক এক জন হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্মের মহাপুরুষ মহম্মদের সম্বন্ধে কুৎসাজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম আদালতের বিচারে নাথুরামের দণ্ড হয়। নাথুরাম সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন। আপীলের জন্য যখন নাথুরাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন, তখন আব্দুল কোয়াম নামক জনৈক মুসলমান অপ্রতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া নাথুরামকে হত্যা করে। সেই অপরাধের জন্য আদালতের বিচারে আব্দুল কোয়ামের প্রাণদণ্ড হয়। করাচি সেণ্ট্রাল জেলে ইহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষ আসামীর শব সমাহিত করিবার জন্য উহা তাহার আত্মীয়গণের হস্তে প্রদান করেন। মৃতদেহ প্রদান-কালে তাঁহারা বলিয়া দেন যে, যেন কোনরূপ আড়ম্বর বা শোভাযাত্রা না করিয়া তাঁহারা আব্দুল কোয়ামের শব সমাহিত করেন। আত্মীয়গণও কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ যথাযথভাবে পালন করিয়া আব্দুল কোয়ামকে কবর দিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বহু-সংখ্যক মুসলমান নর-নারী ও বালক-বালিকা সমাধিক্ষেত্রে জমায়েতবস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন লোক আব্দুল কোয়ামের মৃতদেহ কবর হইতে খুঁড়িয়া বাহির করেন, এবং উহা লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিতে থাকেন। ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা সেই শোভাযাত্রাকারীদিগের ভাব-ভঙ্গীতে এবং কার্য্যে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। কর্ত্তৃপক্ষ শোভাযাত্রাকারীদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন। তাহারা সে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে থাকে। সংবাদপত্রের স্থানীয় সংবাদদাতাদিগের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছিলেন যে, শোভাযাত্রীদিগের কার্য্যফলে স্থানীয় হিন্দুরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ মৌখিক আদেশে সেই জনতাকে সংযত করিতে পারিলেন না দেখিয়া তাঁহারা জনতার উপর গুলী চালাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। গুলী চালাইবার ফলে অতগুলি লোক হতাহত হইয়াছিল। "অমৃত-বাজার" প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্থানীয় সংবাদদাতাদিগের প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ এই যে, জনতা যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে সরকার যদি সেই সময় গুলী না চালাইতেন, তাহা হইলে অনেক স্থানীয় হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত এবং প্রাণ-হানি ঘটিত। সুতরাং সরকার পক্ষের ঐ সময়ে গুলী চালান অসঙ্গত হয় নাই।

অবশ্য যে ব্যাপারের ফলে এতগুলি লোক হতাহত হয়, সে ব্যাপারকে শোচনীয় বলাই যাইতে পারে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য, কাহার দোষে এইরূপ কাণ্ড ঘটিল? আমরা হিন্দু জনসাধারণ এবং সাহিত্যিকদিগকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন মুসলমানধর্ম্ম এবং মুসলমান নবী ও পয়গম্বর সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কিছু না লিখেন এবং মুসলমানগণও হিন্দুর ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সম্বন্ধে কোন কথা না বলেন। কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া আমরা এই কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। এখন জিজ্ঞাস্য, এই ব্যাপারে দোষ কাহার? প্রথম দোষ নাথুরামের, হিন্দু হইয়া মুসলমান-ধর্ম্মের বা ধর্ম্মপ্রচারক সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে যখন মুসমানদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তখন ঐরূপ কার্য্য করিতে না যাওয়াই সঙ্গত। দ্বিতীয় [illegible] দোষ আব্দুল কোয়ামের। কারণ, যখন নাথুরামের আদ[illegible]লতে বিচার হইতে-ছিল, তখন তাহার অধীর হইয়া ঐ [illegible] ব্যক্তিকে খুন করিতে না যাইলেই হইত। তৃতীয় দোষ—[illegible] তাহারা নাথুরামের হত্যাকারী আব্দুল কোয়ামকে ধর্ম্মার্থ প্র[illegible] [illegible]ণদাতা বলিয়া অভিহিত বা মনে করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের। [illegible] আইনে তাহার প্রাণদণ্ডের কারণ, যে ব্যক্তি নরহত্যা করে, এইরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি বা যাহারা নরহত্যা করে, তাহার বা তাহাদের প্রাণ-দণ্ড হইবেই,—ইহা জানা কথা। হিন্দুকে খুন করিলে মুসল-মানদিগের প্রাণদণ্ড বা শাস্তি হইবে না, এরূপ আইন এখনও বিধিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং যে কার্য্যের যে ফল, তাহা তাহাদিগকে ভুগিতেই হইবে। চতুর্থ দোষ, যাহারা সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এই শোভাযাত্রা করিয়াছিল এবং হিন্দু জনসাধারণের শঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের। এরূপ অবস্থায় ঐ জনতাকে যদি অন্য উপায়ে সংযত করা অসম্ভব হইয়া থাকে এবং সেই জন্য যদি সরকার তাহার উপর গুলী চালাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে জন্য সরকারকে কোনমতেই দোষ দেওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যাঁহারা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইয়াছেন,—তাঁহারা মুসলমান সদস্য-দিগের সহিত প্রীতিসম্বন্ধ সংস্থাপন জন্য ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করি না। এ পর্য্যন্ত কয় জন মুসলমান নেতা মুসলমান কর্ত্তৃক এইরূপ নরহত্যার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বলিয়া দিবেন কি? আমাদের বিশ্বাস, যাঁহারা অকপটভাবে ঐরূপ হিন্দু-হত্যার [illegible] নিন্দা ক[illegible]রিয়াছেন, এরূপ মুসমান জননায়কের সংখ্যা অতিশয় অল্প। দুই এক জন আছেন কি না সন্দেহ। কেবল তোষা[illegible] কোন সম্প্রদায়কে তাহাদের উপস্থিত স্বার্থ ত্যাগ করাইয়া স্বপক্ষে আনয়ন করা সম্ভবে না। বরং তাহাদিগকে ঐরূপ হীন স্বার্থরক্ষায় অধিকতর জিদী করাইয়া থাকে। কংগ্রেসওয়ালাদের এ ভ্রম কি ঘুচিবে না?

হৃদয়ের পরিবর্ত্তন

ব্যবস্থাপরিষদে রাজস্বসচিব সার জেমস্ গ্রীগ একটা বড় বিষম কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সরকারের শাসননীতি সুস্পষ্ট। যখন সরকারের বিপক্ষদল তাঁহাদের হৃদয়-পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিবেন এবং সরকার বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, বিপক্ষদল জনগণের প্রকৃত স্বার্থে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত, কেবল তখনই সরকার তাঁহাদের দায়িত্বের অনুপাতে যতটুকু সম্ভব বিপক্ষদলের মতামত মানিয়া কার্য্য করা উচিত কি না, তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।"

সার জেমস্ গ্রীগের এই উক্তি আমাদের নিকট হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইল। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদ রাজস্ববিলের কতকগুলি বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। পরিষদের সদস্যগণ যাহা সাধারণের পক্ষে হিতকর মনে করিয়াছিলেন, তদনুসারেই ভোট দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর বড়লাট সেই রাজস্ববিলখানি পুনর্ব্বিচারের জন্য ব্যবস্থা পরিষদে ফিরাইয়া পাঠান। ব্যবস্থা পরিষদের কোন কোন সদস্য বলেন যে, তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়াই বিলখানির সংশোধন-প্রস্তাব করিয়াছেন। কাযেই তাঁহারা পূর্ব্বের ব্যবস্থাই বহাল রাখিবার মত ভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা পুনরায় লবণকর সরকারের মতানুযায়ী ভাবে রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। সার জেমস্ গ্রীগ দেখিলেন যে, ব্যবস্থা পরিষদ সরকারের সুপারিশমত কায করিতে চাহেন না; তখন তিনি ঐ কথা কয়টি বলিয়াছিলেন। এ কথা সত্য, দেশের লোক সরকারের খরচা যোগাইতে বাধ্য। তদনুসারে তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, দেশের লোকের যতদূর সাধ্য, তাহারা তাহাই করিবে। এই দরিদ্র দেশের শাসন-পালনের খরচা অত্যন্ত অধিক। কাযেই দেশের জনসাধারণের যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহারা সরকারকে খরচা কমাইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং যে সকল কর গরিব লোকদিগের পক্ষে পীড়াদায়ক, সেই সকল কর হ্রাস করিবার অনুকূলে ভোট দেন। ইহাতে জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অবশ্য, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যমাত্রেরই দেশের লোকের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করা উচিত। পক্ষান্তরে, সরকারের ও দেশের লোকের অবস্থা এবং দুঃখ বুঝিয়া তাহাদের প্রতিনিধিদিগের সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। ইহা হইলেই ভাল হয়। নতুবা এক পক্ষ কেবল অপর পক্ষকে চোখা চোখা বোল শুনাইয়া দিবেন, অপর পক্ষ কেবল কতক জিদের বশে চলিবেন, ইহা কখনই ভাল হইবে না। সুতরাং উভয় পক্ষেরই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কংগ্রেস-ওয়ালাদের বুঝা উচিত যে, নাচিতে দাঁড়াইয়া আর ঘোমটা টানিলে চলিবে না,—পরিষদে প্রবেশ করিয়া আর অসহযোগিতার ভাঁওতা করা উচিত হইবে না,—পক্ষান্তরে, সরকারী আমলাদিগেরও বুঝা উচিত যে, দেশশাসন করিতে ব্রতী হইলে চামড়া বিশেষ পাতলা হইলে চলিবে না,—দুই চারিটা বুলি সহ্য করিবার মত সহিষ্ণুতা থাকা চাই। তাঁহাদের আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, কতকগুলি তোষামোদকারী, একান্ত বশম্বদ বা ফেণচাটা লোক লইয়া ব্যবস্থা পরিষদ গঠন করিলে লোকের ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর শ্রদ্ধা থাকিবে না। তাই বলি, উভয় পক্ষেরই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন এবং দৃষ্টিপাতের দিক্ (angle of vision) পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। নতুবা উভয় পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

সরকারের সিদ্ধান্ত

জয়েণ্ট কমিটীর রিপোর্ট এবং ইণ্ডিয়া বিল সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে অনেক বাদবিতণ্ডা হইয়া গেল। এখন আমাদের দেশে এমন অনেক অতিবুদ্ধি লোক আছেন, যাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে, ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কথায় ক্ষুরধার দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনাদের সঙ্কল্প বর্জ্জন করিবেন। এ কথা খুবই সত্য যে, ভারতের কোন সম্প্রদায়ই মনে প্রাণে জয়েণ্ট কমিটীর রিপোর্ট এবং ইণ্ডিয়া বিলের সমর্থন করেন নাই। এমন কি, সরকারী খেতাবওয়ালা খয়ের খাঁরাও অন্তরের সহিত উহা ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তবে স্বার্থের খাতিরে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুখে সে কথা প্রকাশ না করিতে পারেন। ইহাই হইতেছে এ দেশের রাজনীতিক আলোচনাকারীদিগের ধারণা। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে সরকারের তরফ হইতে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলিয়াছিলেন যে, "সরকারের ইহাই বিশ্বাস যে, ভারতের বিভিন্ন দল-সমূহ প্রস্তাবিত ভারতশাসন আইন (ইণ্ডিয়া বিল) কার্য্যতঃ সফল করিতে অভিলাষী।" পরিষদ কিন্তু জয়েণ্ট কমিটীর সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পরিষদের অন্যতম সদস্য মিষ্টার আসফ আলি পরিষদে সরকার-পক্ষকে প্রশ্ন করেন যে, জয়েণ্ট কমিটীর সুপারিশ বিষয়ে ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার ফল-বিষয়ে সরকার কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং সেই সিদ্ধান্তের কথা তাঁহারা ভারত-সচিবকে জানাইয়াছেন কি না? সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সরকারপক্ষ হইতে ঐ প্রশ্নের যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—"সরকার ঐ সম্বন্ধে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং সে সিদ্ধান্তের কথা ভারত-সচিবকে জানাইয়াছেন, তবে সাধারণের স্বার্থের জন্য সরকার সে কথা প্রকাশ করিতে পারেন না।" কিন্তু এই জবাবের পরও বে-সরকারী সদস্যগণ আরও স্পষ্ট কথা শুনিবার জন্য প্রশ্ন করিতে থাকেন। তখন সার নৃপেন্দ্রনাথ বলেন,—"আমি সকল কথার জবাব দিব না। তবে আমি এইটুকু বলিতে প্রস্তুত যে, ভারতের সকল দলই এখন প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার আইন অস্বীকার করিলেও ভারত সরকার নূতন আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন।" তখন আবার বে-সরকারী সদস্যগণ প্রশ্ন করেন যে, ঐ সিদ্ধান্তের কথা ভারত-সচিবকে জানান হইয়াছে কি না? সার নৃপেন্দ্রনাথ উত্তর করেন,—"ভারত-সচিবকে আমরা যাহা জানাইয়াছি, তাহা গোপনীয়।" সোজা কথায় সরকার ভারত-সচিবকে যে কথা জানাইয়াছেন, তাহা তাঁহারা এ দেশের জনসাধারণকে জানিতে দিবেন না। কেন জানাইবেন না, তাহাও তাঁহারা বলিবেন না। ইহাতে বুঝা যায় যে, সরকার এ দেশের

ব্যবস্থা পরিষদকে এবং উহার সদস্যগণকে বিশেষ গ্রাহ্য করেন না।

এখন লোকের মনে সহজেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সরকার কি কারণে এইরূপ ধারণা করিলেন যে, ভারতের সকল দলই নূতন আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন? তাহার কারণ, ভারতবাসীদিগের দৌড় বা ঐকান্তিকতা কত দূর, তাহা সরকার বিলক্ষণ জানেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, মুসলমানগণ সর্ব্বাগ্রে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটুকু বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত। উহার নিকট তাঁহারা অন্য কোন অধিকারলাভকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। জিন্নার দল যখন কংগ্রেসকে সহায় করিয়া সেই বাটোয়ারা ব্যবস্থা কায়েম করিয়া লইয়াছেন,—তখন তাঁহাদের ত চৌদ্দ আনা বাসনা চরিতার্থ হইয়াই গিয়াছে। সত্য বটে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদ অধিকাংশের ভোটে জয়েণ্ট কমিটীর সুপারিশ মানিয়া লয়েন নাই। শাসনসংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপিতে সংহতিরাষ্ট্রতন্ত্র এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা যাহা আছে,—তাহার উপর তাঁহারা ঘোর অরুচি প্রকাশ করিয়াছেন। রাজন্যরাও সংহতিরাষ্ট্রতন্ত্রের মোহে মুগ্ধ হন নাই। সরকার তাহা বুঝেন এবং জানেন। তবে তাঁহারা ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন যে, যদি যোগে-যাগে এই পাণ্ডুলিপিখানি আইনে পরিণত করিয়া ভারতবাসীদিগের স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীরা ঐ আইন অনুসারে কায করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বজায় থাকিলে ঐ আইন অনুসারে কায করিতে কিছুতেই নারাজ হইবেন না। কারণ, তাঁহারা সরকারকে চটাইতে পারেন না। সরকার যদি অসন্তুষ্ট হইয়া সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা বদলাইয়া দেন, তখন কি উপায় হইবে, তাহা ইহারা নিশ্চয়ই ভাবিবেন। কারণ, "যার নদীর কূলে বাস, তার ভাবনা বারো মাস।" তাহার পর মডারেট দল,—ইহারা ত এখন বিষহীন বিষধর;—মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিক। ইহারা বচনে দুর্জ্জয়, কিন্তু কাযে বিশেষ কিছু করিতে পারেন না। অতএব কর্ম্মহীন লোক যেমন জীবন্ত খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করে,—ইহারা অগত্যা নূতন আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন,—আর বৎসর বৎসর নিরালায় সভা করিয়া বিষাদ-সঙ্গীত গাহিবেন। সুতরাং ইহারা নূতন আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন, ইহা সরকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন। অবশিষ্ট রহিলেন কংগ্রেসওয়ালারা। ইহারা ত এখন মহাত্মা গান্ধীর ভাঁওতায় পড়িয়া আপনাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া বসিয়া আছেন। ইহারাই বা এই আইন অনুসারে কায না করিয়া কি করিবেন? বাহিরে দাঁড়াইয়া বুলি ঝাড়িলে যে কিছুই হইবে না,—তাহা ইহারা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বোধ হয় সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতের সকল দল নূতন আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন। তবে তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, তাহা অচির-ভবিষ্যতেই বুঝা যাইবে। অতএব রহু ধৈর্য্যম্!

ইণ্ডিয়া বিল সম্বন্ধে পরামর্শ

ইণ্ডিয়া বিলখানি অর্থাৎ ভারতের শাসনসংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপিখানি এখন আইনে পরিণত হইলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়। এখন বাকি কেবল সেইটুকু হইতে। অবশ্য পার্লামেণ্টারী কমিটীতে বিলখানির বিচার হইবে। তখন কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বিলখানি প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যে তাহা করিবেন, এরূপ আশা,—তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া—অতি বড় বাতুলেও করিতে পারে না। লর্ড হিউ সিসিল পরামর্শ দিয়াছেন যে, যখন কমিটীতে ইণ্ডিয়া বিলখানির বিচার হইবে, তখন ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনোভাব এবং জয়েণ্ট কমিটীর সুপারিশ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপরিষদের সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়া বিলখানিকে প্রত্যাহৃত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য হইবে। কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য, ধর্ম্মনীতির দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে স্বার্থের টানই সর্ব্বাপেক্ষা বড় টান। সে টান ছাড়ান বড় কঠিন। কাযেই বিলাতের রক্ষণশীল-প্রধান জাতীয় সরকার যে ইহাদের পরামর্শমতে কার্য্য করিবেন, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না। প্রত্যেক ভারতবাসীই বলিবে যে, ইণ্ডিয়া বিলখানি আইনে পরিণত না করিয়া আপাততঃ শাসনসংস্কার স্থগিত রাখিলে ভাল হয়। অধ্যাপক হারল্ড ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, "ভারতের রাজনীতিক সমস্যার বিষয় আলোচনা করিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতের শাসনসংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপিখানি প্রগতির একান্ত বিরোধী; উহা ভারতের স্বার্থসাধনের জন্য রচিত হয় নাই।" এ কথা ত সকলেই বলিবেন। মিস এলেন উইলকিনসনও বলিয়াছেন যে, "ভারতবাসীর অনুমতি ভিন্ন ভারতীয় শাসনসংস্কার ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার কোন অধিকারই বৃটেনের নাই। ভারতের শাসনসংস্কার গঠন করিবার এবং সেই শাসনসংস্কারসাধন ভারতবাসীরই কায। সুতরাং ভারতবাসীকে তাহাদের শাসনসংস্কার করিতে বলাই বৃটেনের কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ভারতবাসীদিগের মতামত জানিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর এবং ভারতসচিবের ভারতে যাইয়া তথ্য সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।" এ সকল ত নীতিজ্ঞানের কথা। প্রত্যেক সুসভ্য এবং শিক্ষিত ব্যক্তির এটুকু নীতিজ্ঞান আছে যে, তাহারা এই কথা বুঝে। এমন কি, মিষ্টার চার্চহিলও তাহা বুঝেন। কিন্তু ধর্ম্মের কাহিনী ত সকলে সব সময় শুনিতে চাহে না। কূটরাজনীতিক কৌশলে (Diplomacy) ধর্ম্মনীতির স্থান কতখানি, তাহা কি কুমারী এলেন উইলকিনসন, লর্ড হিউ সিসিল অথবা অধ্যাপক হারল্ড ল্যাস্কি অবগত নহেন? তাহা তাঁহারা জানেন, ফলে বর্ত্তমান বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী এ কথা কাণে তুলিবেন না। কিন্তু তাহা হইলেও যাঁহারা জাতির প্রকৃত হিতৈষী, তাঁহাদের রাজনীতিকদিগকে ধর্ম্মনীতির কথা শুনাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ, ধর্ম্মনীতির উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে তাহার পরিণাম কখনই কোন পক্ষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলজনক হয় না। কিন্তু ইহাদের এই সকল উপদেশে আমাদের যে আশু কোন সুফল ফলিবে, আমাদের

তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। যাঁহারা ম্যাকডোনাল্ড বলডুইন কোম্পানীকে ধর্ম্মনীতি উপদেশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সার আর্ণেষ্ট বেনের এই কয়টি কথা স্মরণ রাখিতে বলি :—Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not diagrasing it incorrectly. and applying the wrong remedy অর্থাৎ "রাজনীতি বলিতে হাঙ্গামার অনুসন্ধান করিবার কৌশলকে বুঝায়। রাজনীতি কোথাও হাঙ্গামা আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, উহা এ হাঙ্গামার কারণ অনুসন্ধানে ভুল করে এবং হাঙ্গামা প্রতিরোধের জন্য ভ্রান্ত উপায় অবলম্বন করে।" কথাগুলি কি বিদ্রূপ বলিয়া মনে হয় ?

বন্দীদিগের মুক্তি

কি জানি, কি কারণে এ দেশে একটা গুজব উঠে যে, সম্রাটের রজত-জুবিলী উপস্থিত হইলে সেই উপলক্ষে অন্যান্য কয়েদীর মুক্তির সহিত রাজনৈতিক বন্দীদিগকেও মুক্তি দেওয়া হইবে। এই গুজবে লোক যে কি করিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, আমরা তাহা ভাবিয়াই বিস্মিত। নানা দিক্ দিয়া যাঁহারা সরকারের মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখিতেছেন, তাঁহাদেরই বুঝা উচিত যে, সরকার রাজনৈতিক অপরাধী মাত্র সন্দেহে যাঁহাদিগকে আটক রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এখন কিছুতেই মুক্তি দিবেন না। এ কথা খুবই সত্য যে, বৃটিশ সরকার চণ্ডনীতিতে, অর্থাৎ কঠোরতার সহিত দমননীতিতে অতি-বিশ্বাসী। তাঁহারা এ দেশে হিংসাশ্রয়ী বিপ্লববাদীদিগের আবির্ভাবে চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং যে কোন উপায়ে উহা তাঁহাদের পক্ষে দমন করা আবশ্যক, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা বিপ্লবী সন্দেহে কতকগুলি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। তাহার পর এই বাঙ্গালা দেশের যুবকরা মহাত্মাজীর কুহকে আইন অমান্য আন্দোলনে যতটা অগ্রসর হইয়াছিল,—সর্ব্ববিধ কষ্টকে যে ভাবে বরণ করিয়াছিল,—তাহাতে বিজেতা জাতির বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁহারা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া এই দেশ শাসন করিবার জন্য আসিয়াছেন, তাঁহারা উহা দেখিয়া বিচলিত না হইয়া পারেন না। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবী দল নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার এবং অবিমৃষ্যকারিতার ফলে মনে করিয়াছিল যে, তাহারা শাসকদিগের মনে বিভীষিকা উৎপাদনের দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত শাসক জাতিকে এইভাবে ত্রস্ত করা যে সম্ভবে না, তাহা ঐ সকল নির্ব্বোধের দল বুঝে নাই। এখন আইন অমান্য আন্দোলন এবং হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবপন্থীদিগের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সরকারের বিশ্বাস এই যে, এখনও লোকের মনোভাব এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় নাই যে, তাহারা আর কস্মিন্‌কালেও এইরূপ ব্যাপকভাবে আইন অমান্য করিয়া কোন রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত করিবে না। সেই জন্য সরকার এমন করিতে চাহেন যে, আর যেন কেহ তাঁহাদের আইনকে অমান্য করিয়া কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে সাহস না করে। ইহার ভিতর কতকগুলি পদস্থ রাজপুরুষের স্বার্থপরতার ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যষ্টিভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে স্বার্থ পরিহার করা বরং সহজ,—সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে তাহা সহজ নহে। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ধর্ম্মযাজক ডীন ইঞ্জ (Dean Inge) একবার বলিয়াছিলেন,—"Individuals sometimes rise above selfishness, classes never. Herd-morality is centuries behind individual morality." ইহার মর্ম্মার্থ :—লোক ব্যক্তিগতভাবে কখনও কখনও স্বার্থপরতাকে পরিহার করিতে পারে,—কিন্তু সমস্বার্থে স্বার্থবান্ বহু লোক দ্বারা গঠিত সম্প্রদায় তাহা কখনই পারে না। যৌথ নীতিজ্ঞান ব্যক্তিগত নীতিজ্ঞানের বহু শতাব্দ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, সুতরাং শাসক সম্প্রদায় তাহা এড়াইতে পারেন না। জন মর্লি একবার বলিয়াছিলেন যে, শাসনকার্য্যের ত্রুটির ফলে রাজনৈতিক উৎপাত আবির্ভূত হয় (Short comings in Government lead to out-breaks)। কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, সরকারের সেই উৎপাত দমন করা কর্ত্তব্য। সুতরাং সরকার উহা দমন করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। অতএব সরকার যে আচম্বিতে হতভাগ্য রাজবন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন, তাহা আশা করাই ভুল হইয়াছে। এখন যাঁহার ভাঁওতায় ভুলিয়া অদূরদর্শী যুবকগণ চিরকালের জন্য বন্দিদশায় অবস্থিতি করিতে চলিয়াছেন, সেই মহাত্মা গান্ধী কি বলেন? যিনি রাজনৈতিক বিষয়ে জননায়ক হইবেন, তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ সকল দিক্ ভাবিয়া কায করা উচিত। তাঁহার এই আন্দোলন নিষ্ফল হইলে সরকার যে তাহার ভীষণভাবে প্রতিশোধ লইবেন, তাহাও তাঁহার পূর্ব্বেই বুঝা উচিত ছিল। দেশের লোকের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, শক্তিশালী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই আইন অমান্য আন্দোলন সফল করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। তিনি কি বৃটিশ জাতির শক্তি কতটা—তাহা জানেন না? সার উইলিয়ম হারকোর্ট বলিয়াছেন যে, the greatest of political faults is that of attempting a revolution which could not possibly be successful. যে বিপ্লব সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই বিপ্লব উপস্থিত করিবার চেষ্টা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান দোষ। মহাত্মাজী সেই দোষ করিয়াছেন। গোড়ায় তাঁহার চেলাচামুণ্ডারা সে কথা বলিতেও দেন নাই। এখন মহাত্মাজী কি বলিবেন? বাঙ্গালায় ৩ হাজার ৩ শত ১২ জন যুবক এখনও বিনা বিচারে সরকারের কারাবাসে বন্দিদশায় দিনযাপন করিতেছে। বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র-সচিব অনারেবল মিরীত ত সে দিন স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, "সম্রাটের রজত-জুবিলী উপলক্ষে বাঙ্গালা সরকার কোন আটক বন্দীকে মুক্তি দিবেন না।" ইহাদের মধ্যে বহু লোক ৫ বৎসরের অধিককাল সরকারের বন্দিবাসে বাস করিতেছে। তাহারা যে কোন প্রকার হিংসাশ্রয়ী বৈপ্লবিকের কায করিয়াছিল বা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। তাহারা যে বৈপ্লবিক অপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বা হিংসাপন্থী নহে, এ কথা আদালতে প্রতিপন্ন করিবার কোন সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াও ত মহাত্মাজী

তাহাদিগকে ভুলিয়া এখন পতিতপাবন মূর্ত্তি ধরিয়া হরিজন উদ্ধারে মন দিয়াছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা না শুনিয়া এক দল কুবুদ্ধি যুবক হিংসাশ্রয়ী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখনই তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন না কেন? চৌরী-চৌরার ব্যাপারে তিনি ত তাহা করিয়াছিলেন। এবার যদি তিনি তাহা করিতেন, তাহা হইলে সরকার হিংসাশ্রয়ীদিগের সহিত আইন অমান্যকারীদিগকে ও [illegible]দিগকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখিবার অজুহাত গ্রহণ করিতে পারিতেন না। মহাত্মাজীর এই ভ্রান্তির জন্য বাঙ্গালী যুবকদিগকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে।

ধর্ম্ম ও পশুবলি

মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় এক ফতোয়া বাহির করিয়াছিলেন যে, যে সমস্ত মন্দিরে দেব-বিগ্রহের সম্মুখে পশুপক্ষী বলি দিবার ব্যবস্থা আছে, সেগুলিতে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবার জন্য হরিজনদিগের চেষ্টা করা উচিত নহে। এত দিন শুনিতেছিলাম যে, অন্যান্য বর্ণের সহিত সমানভাবে মন্দিরের ভিতর পূজা করিবার অধিকার পাইলেই হরিজনদিগের দুর্দ্দশা ঘুচিবে। এখন দেখা যাইতেছে, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। যে সমস্ত মন্দিরে পশুবলি দেওয়া হয়, সেখানে প্রবেশ করিলে পাছে হরিজনরাও পশুবলি দিতে শিক্ষা করে, এই ভয়ে মহাত্মাজী চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূজার জন্য পশুবলি দেওয়া একটা ভীষণ পাপ; আর সেই পাপ যাহাতে তাঁহার হরিজনদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, সেই জন্যই তাঁহার এই নূতন ব্যবস্থা।

পূজার জন্য দেব-বিগ্রহের নিকট পশুবলি দিলে যদি পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাঁহারা শক্তিপূজার অঙ্গ হিসাবে পশুবলির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ। মহাত্মা গান্ধীর যে এইরূপই ধারণা, তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে কালীঘাটের বর্ণনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি সেখানে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, মুসলমানদিগের কোন তীর্থক্ষেত্র বা ধর্ম্মমন্দির সম্বন্ধে সে সমস্ত কথা লিখিত হইলে এত দিন ছোরা-ছুরি চলিত। কিন্তু হিন্দু-সমাজে অধিকারভেদ স্বীকৃত হওয়ায় কোন সম্প্রদায়ই অপরের পূজাপদ্ধতিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পূজাপদ্ধতি ও উপকরণের প্রয়োজনীয়তা হিন্দু স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই স্বীকার করিয়া লয়। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্ববিধ অধিকারীর জন্য যে একই প্রকারের পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়া সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয়, তাহা কোন হিন্দুই মনে করেন না। আমার পূজা-পদ্ধতিই একমাত্র সত্য পন্থা, আর আমার যাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাহাই পাপ-দুষ্ট, এ কথা বলিবার মত অহঙ্কার হিন্দুর নাই।

মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয়, তাঁহার ভিতর এই হিন্দুসুলভ উদারতার একান্তই অভাব। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক, তাহা তিনি স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয় না। সকলকেই এক ছাঁচে ঢালাই হইতে হইবে, সকলকেই এক বাঁধনে বাঁধা পড়িতে হইবে—এই জবর-দস্তির ভাব তাঁহার মধ্যে বিশেষভাবে প্রবল। কংগ্রেসের মূল-নীতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এই জন্যই তাঁহার এত জিদ। আমাদের মনে হয়, এই অস্বাভাবিক জিদের মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির অসাফল্যের বীজ নিহিত।

রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি যেমন তেত্রিশ কোটি ভারত-বাসীকে রাতারাতি অহিংস করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল, ধর্ম্মের ব্যাপারে তিনি তেমনই সকলকে শান্ত, শিষ্ট বৈষ্ণব বানাইবার জন্য ব্যগ্র। "যত মত তত পথ", একাধিক পূজাপদ্ধতি বা সাধন-প্রণালীর সাহায্যে যে অভীষ্টলাভ সম্ভবপর—এ কথাটুকু তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সেই জন্য পশুবলি হরিজনদিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কি না, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বেই তিনি কালীমন্দিরে পশুবলি বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

এ সম্বন্ধে আমাদের আরও একটা কথা জানিবার জন্য কৌতূহল হয়। দেবতার উদ্দেশে পশুবলি কেবল শাক্ত সমাজেরই বিশেষত্ব নহে। মুসলমানদিগের মধ্যে যে কোরবানি দিবার প্রথা প্রচলিত, তাহা ঐ একই জিনিষ। কিন্তু মহাত্মাজীকে কোরবানি বন্ধ করিবার জন্য কোন চেষ্টা করিতে ত দেখিতে পাই না! মুসলমানদিগের পূজাপদ্ধতির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার যদি তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে শাক্তদিগের সম্বন্ধেই বা কোন্ অধিকারে তিনি উপদেশ দিতে যান? সর্ব্বগুণাধীশ ভগবান্ যে নিরামিষাশী সাত্ত্বিক পুরুষ এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে আমিষ উপকরণ নিবেদন করিলে তিনি যে সে পূজা গ্রহণ করেন না—এ সংবাদ মহাত্মাজী কোথায় সংগ্রহ করিলেন? অনন্তরূপধারী ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টমূর্ত্তিতে সাধকের মনস্কামনা পূর্ণ করেন, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে, ভগবানের পূজায় সাত্ত্বিক ভিন্ন অন্যবিধ উপকরণের স্থান নাই? নরসিংহ-মূর্ত্তি ধরিয়া যিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, ক্ষীর, সর, নবনীই কি তাঁহার একমাত্র ভোজ্য?

দশপ্রহরণধারিণী, মহিষমর্দ্দিনী, সিংহবাহিনীর পূজার উপকরণ যে যশোদার দুলাল গোপালের পূজার উপকরণের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত হইতে হইবে—এমনই কি বা কথা আছে? ভগবান্ দয়াময় বলিয়াই কি আমাদের দয়ার মাপকাঠি দিয়া তাঁহার দয়ার পরিমাণ স্থির করিতে হইবে? ভগবান্ যদি রক্তপাতে বীতস্পৃহ হন, তবে কে সে দিন বিহারে এক মিনিটে পঞ্চাশ হাজার নরমুণ্ড ধূলায় লুটাইয়া দিলেন? কোন্ মহারুদ্র ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সারা জগতে আগুন জ্বালিয়া কোটি নরপশুকে আপনার ক্রোধানলে আহুতি দিলেন? মহাত্মাজী আজ পশুর দুঃখে কাতর, কিন্তু সেই রুদ্রযজ্ঞে আহুতি দিবার উদ্দেশ্যে তিনিও ত তখন পশু-সংগ্রহের জন্য কম চেষ্টা করেন নাই! সত্যদ্রষ্টা ঋষি যাঁহাকে "ভয়ং ভয়ানকানাম্, ভীষণং ভীষণানাম্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, প্রাকৃতজনসুলভ হিংসা ও অহিংসার ধারণা লইয়া যে তাঁহার পূজাপদ্ধতি নির্ণয় করা চলে না, এ কথা মহাত্মাজী না জানিলেও হিন্দু-সমাজের দীক্ষাগুরুরা বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন।

ডাকমাশুল হ্রাসের প্রস্তাব

এ দেশে এক পয়সার পোষ্টকার্ড আর দুই পয়সার চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া সরকার এক সময়ে দেশবাসীকে সুবিধা দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় হইতে তাঁহারা এই ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এখনও দেখা যাইতেছে যে, সরকার ঐ ব্যবস্থা খুব দৃঢ়তার সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন; যুদ্ধের পর লোকের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়াতে আজ কয় বৎসর ধরিয়া এ দেশের লোক ক্রমাগতই সরকারের নিকট পোষ্টাফিসের চিঠিপত্র, বুক-প্যাকেট, ভিঃ পিঃ পার্শেল প্রভৃতির হার কমাইয়া দিবার জন্য আবেদন-নিবেদন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু সরকার যেন এই বিষয়ে কাণে তূলা গুঁজিয়া কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। যাহারা অতি গরিব, দুবেলা যাহাদের অন্ন জুটে না, তাহারাও দূরস্থ আত্মীয়স্বজনকে পত্র লিখিতে বাধ্য হয়। যে বিধবা মফস্বলে লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া তাহার সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখায়, সেও কলিকাতা হইতে ডাকযোগে পুস্তকাদি না আনাইয়া পারে না; সুতরাং ডাকমাশুলের চড়া হার যে দরিদ্র লোকদিগকে কি প্রকারে ক্লিষ্ট করিতেছে, তাহা যাহার হৃদয় আছে, সেই বুঝিতে পারে। যুদ্ধের পর ভারতে ডাকমাশুলের হার যত বাড়িয়াছে,—এত আর কোন দেশে বাড়িয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। সে দিন ব্যবস্থা-পরিষদে সার জেমস্ গ্রীগ বলিয়াছিলেন, সরকারই দেশের গরিব জনসাধারণের প্রকৃত ব্যথার ব্যথী। বিশ্বকর্ম্মা যে কত বড় কারিকর, তাহা জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝা যায়। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর সরকারের যে কেমন দরদ, তাহা তাঁহাদের ডাকমাশুলের হার-বৃদ্ধির ঘটা দেখিলেই বুঝা যায়। রাজস্ব বিলের আলোচনাকালে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে অধ্যাপক রঙ্গ এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, এক তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠির মাশুল এক আনা করা হউক, আর শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস প্রস্তাব করেন যে, পোষ্টকার্ডের মূল্য অর্দ্ধ আনা করা হউক। সরকারপক্ষ অবশ্য এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। সার ফ্রাঙ্ক নইস সরকার-পক্ষ হইয়া বলেন যে, চিঠির মাশুল কমাইলে পোষ্টাফিস বিভাগের ১৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে, আর পোষ্টকার্ডের মাশুল কমাইলে ৫৪ লক্ষ টাকা আয় কমিবে। অতএব এই দুই ব্যাপারে সরকারের ৭০ লক্ষ টাকা লোকসান অবশ্যম্ভাবী। সার ফ্রাঙ্ক নইসের এই হিসাবে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কারণ, ডাকমাশুল কমিলে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান বাড়িয়া পোষ্টাফিসের আয়বৃদ্ধি হইতে পারিত। বুক-প্যাকেটের মাশুল কমাইবার জন্য অনেক য়ুরোপীয়ও বলিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার তাহা শুনেন নাই। ইহাতে দেশের লোকের প্রতি সরকারের দরদের মাত্রা বেশ বুঝা যায়। সার ফ্রাঙ্ক নইস বলিয়াছেন যে, ডাক বিভাগটা ব্যবসাদারীর হিসাবে চালান হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এত বড় নির্ব্বোধ ব্যবসাদার কোথায় আছে, যাহারা লোকের যে সময় অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছে, সেই সময় পণ্যের মূল্য চড়া রাখিয়া কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তিত বেতন বাড়াইয়া দেয়? সকল ব্যবসাদারই বুঝে যে, পণ্যের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিলে তাহার কাটতি কমিয়া যায়; বিক্রেতাদেরও লাভ হয় না। অনেক বে-সরকারী ইংরাজ [illegible] ব্যবসাদার এবং ব্যবসাদারী বেশ বুঝেন,—তাঁহারা ডাকমাশুলের হার কমাইয়া দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যবসায়বুদ্ধির দিক্ দিয়া সরকারের ডাক বিভাগের এই কার্য্য কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। ব্যবস্থা পরিষদে অধ্যাপক রঙ্গের প্রস্তাবের অনুকূলে ৮০টি এবং প্রতিকূলে ৩৫টি ভোট এবং শ্রীযুত বসন্তকুমার দাসের প্রস্তাবের অনুকূলে ৭৯টি ভোট এবং প্রতিকূলে ৪৪টি ভোট হইয়াছিল। সরকারপক্ষ ইহাতে পরাজিত হয়েন। কেবল কংগ্রেসওয়ালারা নহেন, ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিরা যায় ইংরাজ এবং সরকারের মনোনীত অনেক সদস্যই ডাকমাশুল হ্রাসের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাট দেশের লোকের সমবেত মত উপেক্ষা করিয়া স্বীয় সঙ্কটকালীন হুকুম জারী করিয়া উহা বজায় রাখিলেন। সরকার যদি স্বেচ্ছায় এইরূপে দুর্নাম খরিদ করেন, তাহা হইলে অন্যে কি করিয়া তাঁহাদের সুনাম রক্ষা করিবে? এখনও বড়লাটের ঐ হুকুমনামা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

সরকার ও ব্যবস্থা পরিষদ

এবার ব্যবস্থা পরিষদ প্রভৃতিতে অনেকগুলি অর্থ-কর্ত্তন প্রস্তাব (Cut motion) এবং মূলতুবি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকার অনেক বিষয়ে যে টাকা চাহিয়াছিলেন,—ব্যবস্থা পরিষদ তাহা না-মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এই ব্যবস্থা পরিষদ প্রভৃতি জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট প্রায় সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। অপরন্তু কিং ভবিষ্যতি! ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদ শেষকালে সমস্ত রাজস্ব-বিলখানিই অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া সরকারপক্ষ হইতে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ নিতান্ত দায়িত্বহীনের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সরকার সার্টিফিকেসন দ্বারা রাজস্ব-বিলখানি সম্পূর্ণ বহাল করিলেন। ব্যবস্থা-পরিষদের একটি প্রস্তাবও গ্রাহ্য করিলেন না। এরূপ অবস্থায় দায়িত্বহীনের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে কোন্ পক্ষ? সরকারপক্ষ নহে কি? তাঁহারাই ত সমগ্র দেশের জনমত উপেক্ষা করিয়া স্বৈরক্ষমতার বলে রাজস্ব-বিলখানি বহাল রাখিলেন। ইহাতে তাঁহাদের দায়িত্বহীনতার পরিচয় মিলিল না, দায়িত্বহীনতার পরিচয় মিলিল ব্যবস্থা পরিষদের? সরকার রাজার নন্দিনী প্যারীর মত—আপনাদের মতলব-মত চলিবেন, আর অন্যকে দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত বলিয়া নিন্দা করিবেন, ইহা বড়ই বিস্ময়জনক। ব্যবস্থা পরিষদ কি চাহিয়াছেন? তাঁহারা চাহিয়াছেন যে, (১) ডাকমাশুলের হার হ্রাস করিতে হইবে, (২) লবণ-করের হার কমাইতে হইবে, (৩) অল্প আয়বিশিষ্ট লোকের উপর ধার্য্য আয়কর উঠাইয়া দিতে হইবে, (৪) দরিদ্র লোকদিগের আমোদ-প্রমোদের এবং পাণ-তামাকের উপর কর বর্জ্জন করিতে হইবে, (৫) সরঞ্জামী খরচা কমাইতে হইবে, (৬) সামরিক ব্যয় কমাইতে হইবে, (৭) মোটা বেতনের সরকারী

তা সংখ্যা অল্প করিতে হইবে, (৮) রেলওয়ে বোর্ড বাবদ বরাদ্দ কমাইতে হইবে, (৯) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি প্রজার হিতসম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করিতে হইবে এবং (১০) সরকারী কার্য্যে অধিকসংখ্যক ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন্ দাবীটা অন্যায় এবং অসঙ্গত হইয়াছিল, তাহা কেহ নিরপেক্ষভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? ডাকমাশুলের হার-বৃদ্ধির ফলে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এক দিকে কাগজের উপর অতিরিক্ত হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করায় সুলভে সংসাহিত্য প্রচারে বাধা ঘটিতেছে, অন্য দিকে ডাকমাশুলের হার অসঙ্গতভাবে বর্দ্ধিত করাতে "যা ছিল র'য়ে ব'সে, তাও গেলো বৈদ্য এসে" দশা ঘটিয়াছে। এ কথা কি মিথ্যা? আমাদের মত দরিদ্রের দেশে লোক ইচ্ছা করিলেই কি অধিক মূল্য দিয়া পুস্তকাদি ক্রয় করিতে পারে? এই প্রকার কাগজের আমদানী শুল্ক এবং ডাকমাশুল বর্দ্ধিত করাতে কি সরকারের প্রকারান্তরে সংসাহিত্যপ্রচারের এবং লোকশিক্ষাবিস্তারের বাধা ঘটান হইতেছে না? দ্বিতীয় দফা, লবণ-করের হ্রাস করিবার প্রস্তাব করাতে কি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগের বিশেষ দায়িত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে? এই হতভাগ্য দেশে এমন অনেক পরিবার আছে, যাহাদের মাসিক আয় ৫টি টাকাও নহে। তাহাদের সকল দিন অন্ন জুটে না। যে দিন জুটে, সে দিন তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে পায় না। কাযেই তাহাদিগকে কপালদোষে কচুঘাচু-ঘেচু প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়। তাহাতে তাহাদের কিঞ্চিৎ তৈলসংযোগ করা ত অসম্ভব, কিন্তু একটু লবণেও কি তাহারা চিরদিন বঞ্চিত থাকিবে? কেহ কেহ বলিবেন যে, আধ পয়সার লবণ কিনিলে ত তাহাদের দুই দিন যায়। কিন্তু সেই আধ পয়সা তাহাদের পক্ষে কিরূপ দুর্লভ, তাহা সর্বকালের চৌষট্টি হাজারী মুন্সবদারগণ কি বুঝিবেন? তাই বলি, ব্যবস্থা পরিষদের যে সকল সদস্য লবণকর হ্রাস করিবার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেন? কখনই না। তৃতীয়তঃ, এ দেশের গরীব লোকরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিবার পর দুই এক ছিলিম তামাক খায়। তাহাদের সেই শ্রমক্লেশ অপনোদনের একমাত্র উপায় তামাক এবং বিড়ির উপর রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তাদের শ্যেনদৃষ্টি পড়িল! ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত বলিয়া বিবেচিত হইলেন! দায়িত্বজ্ঞানের এরূপ অপূর্ব্ব সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ আর কেহ কস্মিন্‌কালেও শুনেন নাই। কংগ্রেসওয়ালারা ঐরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা দেশের লোকের সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন, আর সরকার অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে উহা নাকচ করিয়া দিলেন বলিয়া এ বিষয়ে সরকারের কার্য্য সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে কিরূপ ধারণা জন্মান স্বাভাবিক, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন কি? সরকারপক্ষ বলেন যে, ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ দেশের লোকের প্রতিনিধি নহেন। তবে দেশের লোকের প্রতিনিধি কাহারা যদি দেশের লোকের প্রতিনিধি কুত্রাপি না থাকে, তাহা হইলে কি সরকার বলিতে চাহেন যে, লোকমত না জানিয়াই তাঁহারা রাজ্যশাসন করিতেছেন? যাহা হউক, সরকার যদি কতকগুলি বিষয়ে জনসাধারণের মতানুযায়ী কতকগুলি রাজস্ব ত্যাগ করিয়া ফাইনান্স বিলখানি বজায় করিতেন, তাহা হইলেই তাহা শোভন হইত।

বিহারে প্রবাসী বাঙ্গালী

বিহার প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা সাড়ে পাঁচ জনেরও অধিক। ইংরাজ অধিকারের পর বাঙ্গালীরাই বিহারে যাইয়া ঐ প্রদেশে শিক্ষাদি বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন। এখন সেই বিহারবাসীরা বাঙ্গালীর উপর অতিশয় বিরূপ। এই প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের একটা সভা আছে। ঐ সভা Domiciled Bengali Association নামে অভিহিত। ইহাতে প্রবাসী বঙ্গবাসীদিগের অভাব-অভিযোগের কথা আলোচিত হয়। গত ১১ই চৈত্র এই সভার এক অধিবেশন হয়, সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিহারের প্রত্যেক বিভাগ (Division) হইতে অন্ততঃ এক জন প্রবাসী বাঙ্গালীকে যেন উক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য পদ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীযুত নন্দকুমার ঘোষের মন্তব্যের উত্তরদানকালে মাননীয় মিষ্টার জে, টি, হুইটী (Whitty) বিহার এবং উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় বলেন যে, "প্রবাসী সম্প্রদায় যখন এই প্রদেশে বাস করিতেছেন, তখন দেশের অন্যান্য বাসিন্দার অন্তর্ভুক্ত, ইহাই তাঁহাদের মনে করা উচিত, অতএব তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার অধিকারদানের প্রয়োজন নাই।" ইহাতেই সরকারের মনোভাব বেশ বুঝা যায়। এই ব্যবস্থাটি কি কেবল প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষে, না সকলের পক্ষে, তাহা ত মিষ্টার হুইটীর বলা উচিত ছিল। বিহারের মুসলমানগণ, খৃষ্টানগণ এবং আদিম অধিবাসীরা কি ঐ প্রদেশের জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত নহেন? তাহা যদি হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র সদস্যপদ রক্ষিত হইয়াছে কোন্ যুক্তি-বলে? বাঙ্গালীর জন্য কি সরকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এবং স্বতন্ত্র নিয়ম করিতে চাহেন? মধ্যপ্রদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যা শতকরা কেবলমাত্র ৫ জন। পক্ষান্তরে, বিহারে প্রতি ১৮ জন বাসিন্দার মধ্যে প্রায় এক জন করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী। তবে মধ্যপ্রদেশে মুসলমানদিগের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র আসন রক্ষা করা হইয়াছে কেন? যদি সম্প্রদায় হিসাবে স্বতন্ত্র সদস্যের আসন রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে বিহারে প্রবাসী বাঙ্গালীর জন্য উহা রক্ষা করা উচিত। বাঙ্গালীর উপর সরকারের দরদ কতটা, তাহা এই ব্যাপার হইতেই জানিতে পারা যায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।